চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন

শিল্পী — শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র দেবরায়

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

সপ্তদশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ—১৩৩৬

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্রসূচি

আষাঢ়—১৩৩৬

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রাবণ—১৩৩৬

বহুবর্ণ চিত্র

ভাদ্র—১৩৩৬

বহুবর্ণ চিত্র

আশ্বিন—১৩৩৬

বহুবর্ণ চিত্র

কার্ত্তিক—১৩৩৬

বহুবর্ণ চিত্র

অগ্রহায়ণ—১৩৩৬

বহুবর্ণ চিত্র

আষাঢ়—১৩৩৬

প্রথম খণ্ড } সপ্তদশ বর্ষ { প্রথম সংখ্যা

পুরুষ ও নারীর সীমা-রেখা

শ্রীনির্ম্মল দেব

মানুষের জীবন-ধারার এই দ্রুত পরিবর্ত্তনের যুগে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিরই সমাজের গোপন তলে তলাইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সামাজিক সকল সমস্যার সব চেয়ে বড় সমস্যা পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক। এই পুরুষ ও নারীর যৌন সম্বন্ধের সূত্র ধরিয়াই মানুষের বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টিগত জীবনে একদিন ধীরে ধীরে সমাজের উদ্ভব হইয়াছিল, তা'র-পর বহুযুগ ধরিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা আইন-কানুন গড়িয়া মানুষ পুরুষ ও নারীর পরস্পর সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পুরুষ ও নারীর কোন্ সম্বন্ধ সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ এবং মানুষের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণকর, আজ পর্য্যন্ত সে সমস্যার কোনো চরম মীমাংসা হয় নাই। তাই Feminism, Suffragism, Woman Emancipation, নারী-জাগরণ প্রভৃতি নানা নামে এই একই সমস্যা বিপ্লবের সুরে সমাজের মধ্যে আলোড়িত হইতেছে। এক দল চরমপন্থী বলিতেছেন—পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখিও না; শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম্ম, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দাও। অন্য দল প্রাচীনপন্থী বলিতেছেন—না, উচ্চ-শিক্ষায় নারীর কোনো প্রয়োজন নাই, অন্তঃপুরই নারীর ন্যায্য স্থান, গৃহস্থালীর মধ্যেই তাহার চরম সার্থকতা। প্রথমোক্ত দলের যুক্তি এই—নারীকে পুরুষের সমান করিয়া তৈয়ারী করিলে কর্ম্ম ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সহায় হইতে পারে, তাহার শ্রম অনেকখানি লাঘব করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে পুরুষের কার্য্য নারীর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে—যেমন গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইয়োরোপে হইয়াছিল। শেষোক্ত দলের যুক্তি এই—উচ্চ-শিক্ষা পাইলে গৃহস্থালীর প্রতি নারীর মন বিমুখ হইয়া পড়ে এবং অন্তঃপুরের ভার নারী হাতে করিয়া না লইলে কর্ম্ম-শ্রান্ত পুরুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও

গৃহস্থালীর কর্ত্তব্যগুলি কে দেখিবে! অধিকন্তু বাহিরের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নারী-প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হইলে বেকার-সমস্যা আরও কঠিন হইয়া উঠিবে।

এই দুই বিভিন্ন ধারার যুক্তি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, এই দুই দলেরই লক্ষ্য নারীর স্বাধীনতা বা পরাধীনতা নয়, পুরুষের সুবিধা-অসুবিধাই ইহাদের চিন্তার বিষয়, এবং এতাবৎকাল প্রধানতঃ অর্থনীতির দিক দিয়াই পুরুষ ও নারীর অধিকারের মীমাংসা হইয়া আসিয়াছে। তাই গত ১৯২১ সালের লোক-গণনায় যখন দেখা গেল যে, ইংলণ্ডে পুরুষের অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কুড়ি লক্ষ বেশী, অর্থাৎ সেই একপত্নীত্বের দেশে এই কুড়ি লক্ষ নারীর সারা জীবনে কোনো দিন স্বামী মিলিবার আশা নাই, তখন সেখানকার সমাজ-নেতারা কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, তাঁহারা উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—ইহাতে উদ্বিগ্ন হইবার কিছুই নাই, এই কুড়ি লক্ষ নারীর জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যথেষ্ট কাজ জগতে আছে,—অর্থাৎ যেন দু'টি খাইতে পরিতে পাইলেই নারী-জীবনের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়, নারীত্বের সব পরিসরটুকু পূর্ণ হইয়া ওঠে!

এমনি করিয়া একটা ভুল বিচার এতদিন ধরিয়া পুরুষ ও নারীর অধিকারের সীমা-রেখা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের মানসিক এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের যথার্থ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের জীবনের আদর্শ নির্ণয়ের কোনো সত্য চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাই নারীর অনুকূলে বা প্রতিকূলে যে-কোনো বিধান সমাজে হইয়াছে, সে বিধানের পিছনে আছে, হয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান বা পুরুষের সুবিধা এবং অধিকার বজায় রাখিবার চেষ্টা। তাই এক দিকে আমেরিকার মত দ্রুত-গতিশীল জাতি নারীকে সর্ব্ব বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার দিয়া তাহাকে পুরুষের মত স্বাধীন উপার্জ্জনক্ষম করিবার চেষ্টা করিতেছে, আবার অপর দিকে অন্য এক জাতি বোর্‌কা দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়া নারী-রূপী সম্পত্তিটির উপরে তাহাদের ষোল-আনা দখল বজায় রাখিয়াছে। ইহার ফলে এক দিকে বিবাহের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়িতেছে, এমন কি জাতির সংখ্যা-হ্রাসের আতঙ্কে কুমার-কুমারীর উপরে মোটা ট্যাক্স্ বসাইয়া বিবাহকে বাধ্যতা-মূলক করিতে হইতেছে, এবং অপর দিকে পুরুষের অন্যায় আধিপত্য-বিস্তারের বিরুদ্ধে নারীর অন্তরে একটা চাপা বিদ্রোহের সুর সাড়া দিতেছে, স্বৈরাচার, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি গোপন পাপের পচা পাঁক সমাজের তলে জমিয়া উঠিতেছে। এই যে একটা বিপ্লবের কালো মেঘ সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘনাইয়া উঠিতেছে, প্রাচীন দিনের যে অজ্ঞতার ফলে ইহার সৃষ্টি সে অজ্ঞতা দূর করিয়া পুরুষ ও নারীর অধিকার-সীমানার সত্য বিচার না করিলে সমাজে কোনোদিনই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

পুরুষ ও নারীর দৈহিক গঠন বিভিন্ন, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। কিন্তু এই বিভিন্নতা কেবলমাত্র বহিরঙ্গে নয়, দেহের অভ্যন্তরে অস্থি, কোষ, স্নায়ু, পেশী, রক্ত প্রভৃতি যাহা কিছু আছে সকলই বিভিন্ন। এমন কি পুরুষ ও নারীর মস্তিষ্ক পর্য্যন্তও আকারে ও পরিমাণে পৃথক। এ সকলের বিস্তৃত আলোচনা করিলে এ প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তাই সে আলোচনা করিলাম না। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশদভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহারা বিশ্ব-বিশ্রুত যৌন-তত্ত্ববিদ Havelock Ellisএর "Man and Woman" নামক গভীর-গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক রহস্য জানিতে পারিবেন। দেহের ভিতরে-বাহিরে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই যে প্রভেদ সে শুধু দেহে নয়, তাহাদের মনের মধ্যেও তাহা সুদূর-প্রসারিত। প্রকৃতির কোনো সৃষ্টিই নিরর্থক নয়, পুরুষ ও নারীর দেহে-মনে এই যে এক বিরাট পার্থক্য, তাহারও একটা গূঢ় কারণ ও উদ্দেশ্য আছে, বিভিন্ন সামাজিক আবেষ্টন তাহার কারণ নয়। (১) এই পার্থক্যের উপরেই পুরুষ ও নারীর মানসিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত, এবং সেই বৈশিষ্ট্যই পুরুষ ও নারীর স্বাভাবিক জীবন ধারাকে নিরূপিত করে।

---

(১) "The secondary sexual differences between man and woman—that is, the bodily difference of height, weight, muscular development, shape, blood pressure, temperature and so forth—are not altogether due to different social habits, as some feminists would like us to believe, but also to deep-rooted biological causes arising out of the very nature of male and female."—John Langdon-Davies—"A Short History of Women", Page 71.

মানুষের সকল কর্ম্মকে অনুপ্রাণিত করে—সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) ও বিচার-বুদ্ধি (Reason)। সহজাত প্রবৃত্তি বহু প্রাচীন, সৃষ্টির আদিম যুগ হইতেই অপর সকল প্রাণীরই মত এই একটা দুর্নিবার অন্ধ শক্তি মানুষের চরিত্রের মধ্যে প্রোথিত হইয়া আছে। বিচার-বুদ্ধির উদ্ভব হইয়াছে অনেক পরে, মানুষের জ্ঞান ও ভাবুকতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সহজাত প্রবৃত্তি বিচার-বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী, তাই সহজাত প্রবৃত্তিই মানুষের কর্ম্মের ও প্রকৃতির আদি প্রেরণা।

প্রত্যেক প্রাণীরই মধ্যে যে সহজাত প্রবৃত্তি থাকে, সে প্রবৃত্তির উৎপত্তির কারণ দুইটি:—(১) বংশানুগত কর্ম্ম-ধারা, অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে কৃত কর্ম্মের প্রভাব। আদি সৃষ্টি হইতে সুরু করিয়া বহু যুগ ধরিয়া পুরুষ-পরম্পরায় কোনো প্রাণী যে বিশেষ কর্ম্ম করে, সংখ্যাতীত বার পুনরনুষ্ঠানের ফলে সেই কর্ম্মের একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃদ্ধি সেই প্রাণীর চেতনারাজ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া ওঠে। মনোবিজ্ঞানে ইহাকে traditional consciousness বা জাতিগত চেতনা কহে। (২) দৈহিক গঠন, অর্থাৎ কোনো বিশেষ কার্য্যোপযোগী দৈহিক অংশের প্রভাব। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কোনো প্রাণীকে জীবন নির্ব্বাহ করিতে হয়, জীবন-সংগ্রামে সেই অবস্থার উপযোগী করিবার জন্য প্রকৃতি প্রত্যেক প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক বিশেষ ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং কোনো প্রয়োজনীয় বিশেষ কাজের জন্য বিভিন্ন-জাতীয় প্রাণীর দেহের কোনো অংশ বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে সেই প্রাণী পুরুষানুক্রমে দেহের সেই বিশেষ অংশ সেই বিশেষ কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। এইরূপে বহুযুগ ব্যবহারের ফলে, এখন প্রয়োজন হো'ক বা না হো'ক, দেহের সেই বিশেষ অংশ সেইভাবে ব্যবহার করিবার এক সহজাত প্রবৃত্তি সেই প্রাণীর মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। গণ্ডারের শিং দিয়া কাদা খোঁচা, বিড়ালের নখ দিয়া দেওয়াল আঁচড়ানো, ইঁদুরের দাঁত দিয়া কাঠ বা কাপড় কাটা প্রভৃতি কার্য্য এই সহজাত প্রবৃত্তির উদাহরণ। জীবন-ধারণের জন্য এখন এই প্রাণীদের এই সকল কার্য্যের আর কোনোই প্রয়োজন নাই, কিন্তু তবু একটা অন্ধ আবেগে ইহারা এই সকল কার্য্য করে, কারণ দেহের সেই বিশেষ অংশ শিং, নখ, দাঁত ইত্যাদির পরিচালনা করিতে না পারিলে তাহারা শান্ত, সুস্থ হয় না।

এখন দেখা যা'ক পুরুষ ও নারীর সহজাত প্রবৃত্তি কি। জীব-জগতে প্রত্যেক প্রাণীর মূল কার্য্য সন্তানোৎপাদন; কারণ, এই জন্ম-মৃত্যুর জগতে নূতনের উদ্ভব না হইলে পুরাতনের ফাঁক শূন্য থাকিয়া সৃষ্টি লুপ্ত হইয়া যায়। যৌন-আকর্ষণ ও দৈহিক-ক্ষুধা, এই যে দুইটি দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি প্রকৃতি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে চির-সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে, সে দুইটি কেবল এই সৃষ্টি-রক্ষার আনুষঙ্গিক উপায়মাত্র। কারণ, যথেষ্ট পরিমাণে উদরপূর্ত্তি করিয়া নিজেকে সবল পরিপুষ্ট না করিতে পারিলে জীবগণের সন্তান সবল সতেজ হইতে পারে না, এবং যৌন-প্রজননে পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া একত্র সম্মিলিত না হইলে সন্তানের জন্ম সম্ভব নয়। অপর প্রাণীর ন্যায় জীব-জগতে মানুষেরও মূল কার্য্য সৃষ্টি-রক্ষা। তাই সেই বিস্মৃত কালে সৃষ্টির প্রথম যুগে যখন অসভ্য আদিম মানুষ সম্পূর্ণ নগ্নদেহে বনের পশুরই মত একটা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিত, যখন সমাজ, সংস্কার, শাস্ত্র, ধর্ম্ম, নীতি এ সকলের লেশমাত্রও অস্তিত্ব ছিল না, তখন তাহার জীবনে একমাত্র কার্য্য ছিল প্রথম বয়সে কেবলমাত্র আহার-অন্বেষণ এবং পরিণত বয়সে যৌন-সঙ্গমের দ্বারা সন্তানোৎপাদন।

এইবার দেখা যা'ক এই সৃষ্টি-রক্ষা কার্য্যে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের কর্ত্তব্য কতখানি; কারণ, সেই কর্ত্তব্যের উপরেই তাহাদের দেহগত, প্রকৃতিগত এবং চরিত্রগত সকল বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত। প্রজনন-ক্রিয়ায় পুরুষের একমাত্র কার্য্য নারীর গর্ভ-সঞ্চার করা। এই গর্ভাধান কার্য্য সম্পূর্ণ হইলেই জীব-জগতে পুরুষের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র গর্ভ-সঞ্চার হইলেই নারীর কর্ত্তব্য শেষ হয় না,—নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত তাহাকে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিতে হয়, তা'র পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে স্তন্য দিয়া সেই সন্তানকে সবল ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হয়, এবং যতদিন সন্তান বড় হইয়া আপনি জীবন-ধারণক্ষম না হয় ততদিন পর্য্যন্ত সন্তানের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত আপদ-বিপদ হইতে তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনে পুরুষের কর্ত্তব্য অতি সামান্য কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু নারীর কর্ত্তব্য বহুদীর্ঘ কালের মধ্যে প্রসারিত।

তা'র পর, পুরুষের একমাত্র কার্য্য নারীর গর্ভোৎপাদনের জন্য প্রকৃতি পুরুষের দেহে এক সামান্য অংশে কেবলমাত্র জননেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু নারীর গর্ভ-ধারণ ও সন্তান-পরিচর্য্যার বিভিন্ন কার্য্যের জন্য নারীর দেহের অভ্যন্তরে ডিম্ব-কোষ, ডিম্ব-নালী, জরায়ু, স্তন্য-কোষ প্রভৃতি গর্ভধারণোপযোগী নানা জটিল অবয়বের এবং দেহের বাহিরে পীন পয়োধর, গুরু নিতম্ব, স্থূল উরু, কোমল অঙ্গ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে। এমন কি গর্ভ-সঞ্চারোপযোগী কালকে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য নারীর দেহে বিশেষ করিয়া মাসিক রজোনিঃস্রাবের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। পুরুষের একমাত্র কার্য্য নারীর গর্ভ-সঞ্চার করা, সেইজন্য পুরুষের যৌন-অনুভূতি জননেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূত এবং তাই পুরুষের যৌন-ক্ষুধা উদ্দীপ্ত হইলে যৌন-সঙ্গম এবং বীর্য্য-ক্ষরণ বিনা পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাহার যৌন-চেতনা যৌন-তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়—তাহার মনোরাজ্যে বিশেষ কোনো চিহ্ন রাখিয়া যায় না। কিন্তু অপর পক্ষে গর্ভ-ধারণ, সন্তান-প্রসব, সন্তানকে স্তন্য দেওয়া, পরিচর্য্যা করা ইত্যাদি নানা বিভিন্নমুখী অবসাদজনক কার্য্য সানন্দে সমাধা করিবার জন্য প্রকৃতি নারীর যৌন-অনুভূতিকে কেবলমাত্র জননেন্দ্রিয়ের মধ্যেই নিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, নারীর সারা অঙ্গে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে, তাই নারীর যৌন-তৃপ্তি তাহার সমস্ত চেতনার মধ্যে ও অগ্র-মস্তিষ্কে (Cerebrum) একটা গভীর রেখা আঁকিয়া দেয়। এই সকল ব্যাপার হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সন্তানোৎপাদনে পুরুষের কার্য্য অতি অল্প এবং যৌন-সঙ্গমের সামান্য কালটুকুর মধ্যেই তাহার পরিসমাপ্তি, কিন্তু নারীর কার্য্য বহু এবং তাহার প্রভাব নারীর দেহের ভিতরে-বাহিরে সুদূর-বিস্তৃত। (২)

গৃহস্থালীর বাহিরের জগতে অপর কোনো কার্য্যের গুরু ভার নারীর স্কন্ধে ছিল না, কিন্তু যৌন-ক্রিয়ার স্বল্প-পরিসর বিরামটুকুর বাহিরে পুরুষের একাধিক কার্য্য ছিল।—প্রথমতঃ শত্রু বা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণের আশঙ্কায় তাহাকে অনুক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইত, সেই সকল বিপদ হইতে তাহাকে নিজেকে এবং স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষা করিতে হইত; তা'র পর হয় পশু শিকার করিয়া, বা বনের ফল পাড়িয়া আনিয়া বা ভূমি-কর্ষণের দ্বারা শস্য উৎপাদন করিয়া তাহাকে নিজের এবং স্ত্রী ও সন্তানের আহারের সংস্থান করিতে হইত, অর্থাৎ আত্ম-সংরক্ষণ ছিল পুরুষের একটা প্রধান কার্য্য। তা'র পরে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে পুরুষ ভবঘুরে স্বভাব পরিহার করিয়া বিচ্ছিন্ন দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে সমাজ গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভাবুকতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা আইন-কানুন রচনা করিয়া ব্যষ্টিগত স্বার্থ ভুলিয়া সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য সমাজকে উন্নততর করিয়া তুলিতে লাগিল। এই সমাজ-প্রতিষ্ঠা পুরুষের একটা অতি বড় কৃতিত্ব।

প্রথমে বলা হইয়াছে প্রত্যেক প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তির মূল কারণ দুইটি—বংশানুগত কর্ম্মধারা এবং দৈহিক গঠন। উপরে পুরুষ ও নারীর যে-সকল বৈষম্য বিবৃত করা হইল তাহাতে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সন্তান-ধারণ ও সন্তান-পরিচর্য্যাই নারীর বংশানুগত কর্ম্ম-ধারা এবং তাহার দৈহিক গঠন সর্ব্বতোভাবে সেই কর্ম্মেরই উপযোগী। অনাদি কাল ধরিয়া নারী পুরুষানুক্রমে মাতৃত্বেরই সাধনা করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার দেহের ভিতরে বাহিরে প্রতি অংশে, তাহার চেতনায় অনুভূতিতে মাতৃত্বেরই এক বিরাট আয়োজন! অর্থাৎ নারীর সহজাত প্রবৃত্তি মাতৃত্ব, পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি আত্ম-সংরক্ষণ ও সমাজ-সংগঠন এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে অল্প কয়টি মুহূর্ত্তের যৌন আনন্দ। এই কারণেই নারীর প্রেম ভাবপ্রবণ এবং নারী পুরুষকে ভালবাসে তাহার সমস্ত প্রাণ, মন, চেতনা দিয়া। পুরুষের প্রেম মূলতঃ ইন্দ্রিয়জ, তাহার কর্ম্ম-চঞ্চল জীবনের ক্ষণিক বিরামমাত্র। তাই খ্যাতনামা যৌন-তত্ত্ববিদ Krafft-Ebing বলিয়াছেন—"To woman love is life, to man it is the joy of life" (৩) পুরুষ ও নারীর প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রেমিক কবি Byronও বলিয়াছেন—

(২) "The greater absorption of the human female by the sphere of sexual activities is the most significant difference between the sexes."—Otto Weininger—"Sex and Character", Page 89.

(৩) "Psychopathia Sexualis"—Page 15.

"Man's love is of man's life a thing apart ;
'Tis woman's whole existence." (৪)

নারীর এই যে সহজাত জননী প্রবৃত্তি, পুরুষের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে না পারিলে সে প্রবৃত্তি কখনও ফলবতী হইতে পারে না। তাই নারী স্বভাবতঃই পুরুষাভিমুখী, কারণ পুরুষই তাহার মাতৃত্বের পরশমণি। পুরুষের প্রতি নারীর এই প্রবৃত্তিগত নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করিয়াই বহু শতাব্দী পূর্ব্বে শাস্ত্রকার মনু বলিয়াছিলেন—নারীর স্বাতন্ত্র্য নাই। (৫) Otto Weininge ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—"The absolute female has no ego." (৬) তিনি আরও বলিয়াছেন—পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক কর্ত্তা ও কর্ম্মের সম্পর্ক, স্বামী এবং সন্তানরূপে পুরুষ চিরদিনই নারীকে লইয়া খেলা করিয়াছে। (৭) বিশ্ব-বিখ্যাত জার্মান্ দার্শনিক Nietzsche, Schopenhauer যে নারীর আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহারও মূলে এই স্বাতন্ত্র্যহীনতা। নারীর এই মাতৃত্ব-প্রবৃত্তি যাহাতে ব্যর্থ না হয় সেই কারণে মনু-পরাশরপ্রমুখ সকল প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে বিধান দিয়াছিলেন—স্ত্রীর ঋতুকাল কদাচ উল্লঙ্ঘন করিবে না। (৮) মনীষী Forelও বলেন—

"A man who does not understand the desires of maternity in his wife, and does not respect them, is not worthy of her love." (৯)

এই সহজাত মাতৃত্ব-ক্ষুধা নারীর সারা চেতনা-রাজ্যে এমন নিবিড়ভাবে পরিব্যাপ্ত যে, নারীর সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত ভাল, সমস্ত মন্দ তাহার অজ্ঞাতসারে এই প্রবৃত্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। (১০) তাই চিরদিনই নারীর যৌনজীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ—বিবাহ, কারণ বিবাহের ভিতর দিয়াই তাহার মাতৃত্বের সার্থকতার নিশ্চিত ও নিরাপদ সম্ভাবনা। অপর পক্ষে বিবাহের প্রতি পুরুষের কোনো স্বাভাবিক আকর্ষণ নাই, বরং তাহার মজ্জাগত বহু-পত্নীমুখী প্রবৃত্তি (Polygamous instinct) হেতু বিবাহ-বন্ধনের প্রতি সে স্বভাবতঃই বিমুখ। যৌন-সম্মিলনে পুরুষ সক্রিয় পক্ষ (active agevt), নারী নিষ্ক্রিয় পক্ষ (passive agent), এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি নারীর জননী-প্রবৃত্তিকে সার্থক করিতে পুরুষের সঙ্গ তাহার একান্ত প্রয়োজন। তাই যে-কোনো শক্তিমান পুরুষ নারীর অন্তরে আকর্ষণের উদ্রেক করে। (১১) বিবাহিত জীবনেও নারী এমন স্বামী চায় যে দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে, জ্ঞানে ও

(৪) "Don Juan"—Canto (i), Stanza 194.

(৫) "বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম॥"
—মনুসংহিতা—৫ম অধ্যায়, ১৪৮শ শ্লোক।
"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"
—মনুসংহিতা—৯ম অধ্যায়, ৩য় শ্লোক।

(৬) "Sex and Character"—Page 186.

(৭) "The relation of man to woman is simply that of subject to object. Woman seeks her consummation as the object. She is the plaything of husband or child, and, however we may try to hide it, she is anxious to be nothing but such a chattel"—"Sex and Character", Page 292.

(৮) "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া॥"
—মনুসংহিতা,—৩য় অধ্যায়, ৪৫শ শ্লোক।
"ঋতৌ স্নাতান্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"
— পরাশর সংহিতা ৪। অধ্যায়, ১৩শ শ্লোক।

(৯) "The Sexual Question"—Page 135.

(১০) "If she has virtues, they will be off-shoots from the reproductive instinct ; her vices will be the same. Her immorality, if she be capable of it, will be Life's immorality, vital immorality, positive immorality."—Ludovici—"Woman : A Vindication," Page 47.

(১১) "Every man who becomes famous either for good or evil, the fashionable actor, the celebrated tenor, etc., has the power of exciting love in women. Women without education or those of inferior mental quality are naturally more easily affected by the bodily strength of man, and by his external appearance in general."—Forel—"The Sexual Question", Page 132.

বুদ্ধিতে তাহার চেয়ে বড়, কারণ নারীর নিকটে পুরুষ তো কেবল তাহার সন্তানের জনক নয়, তাহার নিজের ও তাহার সন্তানের রক্ষক এবং পালক। তাই নারী স্বভাবতঃই দেহে-মনে শক্তিমান পুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করিতে চায়। যেখানে স্বামী তাহার নীচে, সেখানে সামাজিক বিধানে বাহ্যতঃ স্বামীর প্রতি তাহার কর্তব্য সে পালন করিতে পারে, কিন্তু সেরূপ স্বামীর প্রতি তাহার মন কখনও স্বতঃই আকৃষ্ট হয় না, এবং সেরূপ ক্ষেত্রে, দুর্বলচিত্তা নারী হইলে যে-কোনো শক্তিধর পুরুষ তাহাকে অনায়াসে প্রলুব্ধ করিতে পারে। এই কারণে স্ত্রৈণ স্বামীকে নারী কোনোদিনই শ্রদ্ধা করিতে পারে না এবং স্ত্রৈণ স্বামীর স্ত্রী প্রায়ই পরপুরুষাসক্ত হয়। বিবাহিত জীবনে নারীর অস্তিত্বের অভিব্যক্তি কেবলমাত্র সন্তানোৎপাদনে নয়, বিবাহের ভিতর দিয়া নারীর যৌন-চেতনা প্রেয়সী, জননী ও গৃহিণীরূপে ক্রমবিকশিত হয়। তাই নারী স্বামীকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসিতে পারে কেবল তখনই, যখন সে তাহার অন্তর্নিহিত মাতৃপ্রবৃত্তি শ্রদ্ধার দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া স্বামীর প্রতি সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে। (১২) বিবাহিত জীবনে পুরুষ ও নারীর অন্তরের এই অভিব্যক্তি Professor W. Thomas অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"The so-called happy marriages represent an equilibrium reached through an extension of the maternal interest of the woman to the man, whereby she looks after his personal needs as she does after those of the children— cherishing him, in fact, as a child—and in an extension to woman on the part of man of the nurture and affection which is his nature to give to pets and all helpless (and preferably dumb) creatures." (১৩)

এখন দেখা যা'ক সমাজের কঠোর বিধানে বা অবস্থা-দুর্বিপাকে পুরুষ এবং নারীর যৌন-প্রবৃত্তি যখন নিরুদ্ধ (repressed) হয়, তাহার ফল কি দাঁড়ায়। উপরে বিশদভাবে বলিয়াছি যে যৌন-প্রবৃত্তি পুরুষের একমাত্র প্রবৃত্তি নয় এবং তাহার যৌন-প্রচেষ্টা অতি সামান্য স্থান এবং কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু নারীর যৌন-চেতনা তাহার ভিতরে-বাহিরে দেহে-মনে সুদূর-প্রসারিত, এবং সে যৌন-ক্ষুধা তাহার মাতৃত্বের আনুষঙ্গিক উপায় মাত্র। তাই যৌন-নিরোধ পুরুষের জীবনে তত পীড়াদায়ক নয়, কারণ পুরুষের একাধিক কর্ম্ম আছে এবং সেই সকল বিচিত্র কর্ম্মের পথে তাহার জীবনী-শক্তিকে প্রবাহিত করিয়া নিরুদ্ধ যৌন জীবন সে অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু যৌন-নিরোধ নারীর পক্ষে অতি দুঃসহ এবং তাহার ফল তাহার পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর। (১৪) এ বিষয়ে সকল যৌন-তত্ত্ববিদগণ একমত। স্ত্রী-রোগ-বিজ্ঞানে বিখ্যাত পণ্ডিত Dr. Kisch বলেন—"It cannot be disputed that a certain and moderate amount of sexual gratification is requisite for the perfect maintenance of physical health in woman, and that the absence of this gratification or the gratification of the impulse in an abnormal or incomplete manner, entails disturbance of alike the mental and the physical equilibrium," (১৫) নারীর এই দুর্দ্দমনীয় যৌন-প্রবৃত্তি যখন সুস্থ ও স্বাভাবিক উপায়ে পরিণতি লাভ করিতে পারে না, তখন প্রতিহত বন্যা-স্রোতের

---

(১২) "The foundation of every true woman's love is a mother's tenderness. He whom she loves is a child of larger growth, although she may at the same time have a deep respect for him."—Havelock Ellis—"Studies in the Psychology of Sex," Vol. VI, Page 573.

(১৩) "Sex and Society"—Page 246.

(১৪) "In women an injurious result follows the non-satisfaction of the sexual impulse and of the 'ideal feelings', and the symptoms which thus arise (pallor, loss of flesh, cardialgia, malaise, sleeplessness, disturbances of menstruation) are diagnosed as 'Chlorosis'.—Havelock Ellis—"Psychology of Sex", Vol. III, Page 231.

(১৫) 'The sexual Life of Woman"—Page 281.

মত অতৃপ্তির উন্মাদনায় তাহা যে-কোনো বিকৃতরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। সাধারণতঃ স্নায়ু-মণ্ডলীর মধ্যেই এই বিকৃতির প্রকাশ হয়, এবং তাহার ফলে নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর স্নায়বিক রোগের সৃষ্টি হয়। (১৬) বয়স্থা কুমারী এবং যুবতী বিধবাদের মধ্যে যে এত স্নায়ু-রোগের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার একমাত্র কারণ এই যৌন-নিরোধ,—পরিমিত যৌন উপভোগই ইহার একমাত্র প্রতিকার। (১৭) এই জন্যই সন্তান-ধারণের পূর্ব্বে নারীর মূর্চ্ছা, মৃগী প্রভৃতি স্নায়বীয় রোগ এবং ঋতুকৃচ্ছ্র, বাধক, রজ-আধিক্য প্রভৃতি ঋতু ও জরায়ু-সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ সন্তান-ধারণের পরে আপনা হইতেই আরোগ্য হইয়া যায়।

নিরুদ্ধ যৌন-প্রবৃত্তি নারীর শিক্ষা, দীক্ষা এবং নৈতিক চরিত্র অনুসারে তাহার নানা কর্ম্মের মধ্যে নানা ভাবে প্রকাশিত হয়। Freud, Jones প্রভৃতি আধুনিক মনো-বিশ্লেষণ-রথীগণের মতে যৌন-নিরোধের ফলে যৌন-অনুভূতি সঙ্গমেন্দ্রিয় হইতে দেহের অপর অংশে পরিবৃত্ত হয় (transference of o gastic sensations from the genitalia to other parts of the body)। যৌন-বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় পণ্ডিত Havelock Ellisও বলেন—"The great diffusion of the sexual impulse and emotions in women is as visible on the psychic as on the psychical side. A woman can find sexual satisfaction in a great number of ways that do not include the sexual act proper, and in a great number of ways what apparently are not physical at all, simply because their physical basis is diffused or is to be found in one of the outlying sexual zones," (১৮) প্রকৃতির কোনো শক্তি কোনোদিনই বিনষ্ট হয় না, নারীর সারা সত্তা ব্যাপিয়া এই যে একটা বিরাট প্রজননী শক্তি প্রকৃতি সৃষ্ট করিয়াছে, মানুষের কোনো আইন-কানুনই তাহার বিনাশ সাধন করিতে পারে না। তাই সে দুর্ব্বার শক্তি যখন প্রতিহত হয়, তখন তাহার সহজ প্রত্যক্ষ রূপ পরিহার করিয়া সে শক্তি নানা ছদ্ম রূপে অভিব্যক্ত হয়। সামাজিক অবস্থা এবং সভ্যতার গতি অনুসারে সেই স্বাভাবিক রূপ অনেক সময়ে এত আমূল পরিবর্ত্তিত হয় যে, তখন তাহার ছদ্ম রূপের মধ্যে তাহার সে মৌলিক রূপকে সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। Ludovici বলেন,—

---

১৬) "The discharge of the sexual energy along nervous channels may lead to every variety of neuropathic symptoms The woman may become the victim of phobias, obsessions, melancholia, morbid self-contempt or morbid self-esteem (narcissism), facial tics, other spasms, insomnia, vicious secret habits and hallucinations."—Ludovici—"Woman ; A Vindication"—Page 239.

"Neurologists have observed women on whom continence was forced either during marriage or after its dissolution, who thereupon fell into a state of severe nervous exhaustion or nervous excitement, or suffered from threatening or even actually developed psychoses."—Kisch—"The Sexual Life of Woman", Page 172.

(১৭) "Sexual excitement is a remedy for various disorders of the sexual system in women, and abstinence is a cause of such disorders."—Havelock Ellis—"Psychology of Sex", Vol. VI, Page 187.

"In a number of the commonest varieties of nervous diseases occurring in neurasthenically predisposed subjects, such as neurasthenia, hysteria and neurosis of anxiety, the lack of sexual satisfaction aggravates these troubles, whilst suitably regulated sexual intercourse has an actively beneficial effect. I have frequently had occassion to observe this striking effect both in young women so affected entering upon marriage for the first time, and also in young widows who have remarried."

—Kisch—"The Sexual Life of Woman"—
Page 256.

(১৮) "Studies in the Psychology of Sex"—Vol. III, Page 250.

"The rebuff offered to woman's reproductive system by the long, endless wait is neither passed over by Nature nor forgiven. Such elaborate preparations as have been made in her body for a specific consummation can not end in nothing, without certain very definite reactions, which it is neither fanciful nor fantastic, but rather helpful, to describe collectively as a profound physiological disappointment. The fact that this physiological disappointment does not enter consciousness as a disappointment has nothing whatever to do with its reality." (১৯) অনেক ক্ষেত্রে রুচিশীলা নারীর জীবনে নিরুদ্ধ যৌন-প্রবৃত্তি একটা আকস্মিক ধর্ম্মপ্রবণতার রূপে প্রকটিত হয়। (২০) আমাদের দেশে পতি-বিয়োগের পর অনেক তরুণী ও যুবতী বিধবার হঠাৎ যে একটা ধর্ম্মের আবেগ এবং পূজা-অর্চ্চনার উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল কারণ এই, এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে উচ্ছ্বাস ক্রমে একটা বাতিকে গিয়া দাঁড়ায়। (মানুষের চেতনার অন্তস্তলে যৌন-প্রবৃত্তি এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির একটা সুনিবিড় সংযোগ আছে, এ প্রবন্ধের তাহা আলোচ্য বিষয় নয়, তাই সে আলোচনা এখানে করিলাম না।) ইয়োরোপ আমেরিকার মত যে সকল দেশে অবরোধ-প্রথার প্রচলন নাই, সেখানে নারীর বিরুদ্ধ যৌন-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক বিকাশের অভাবে অস্বাভাবিক পুরুষোচিত কর্ম্মের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাই বয়স্থা কুমারীরা সেখানে ফুটবল খেলে, মুষ্টি-যুদ্ধ করে, ঘণ্টায় দুইশত মাইল বেগে এরোপ্লেন ওড়ায়, সাঁতরাইয়া সমুদ্র পার হয়, ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায় পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দেয়। নারী-দেহের কমনীয়তা তাহাদের ম্লান, অন্তরের স্নেহ-রস শুষ্ক, গৃহস্থালী তাহাদের কাছে আতঙ্ক-জনক! (২১) এইরূপে বহু বৎসরের মনোবিকারের ফলে ক্রমে ক্রমে নারীর প্রকৃতিগত জননী-প্রবৃত্তি তাহাদের এতদূর অসাড় হইয়া আসিয়াছে যে, এখন তাহারা বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না, গর্ভ-নিবারক দ্রব্যাদির দ্বারা গর্ভ-নিবারণ করে, নিতান্ত সন্তান জন্মিলে তাহাকে প্রসব করিয়াই পরিচর্য্যার জন্য ধাত্রীর হাতে তুলিয়া দেয়, এমন কি শিশুকে স্তন্য দিবার জন্য ক্ষীর-ধাত্রী (wet nurse) নিযুক্ত করে! নারীর এই অধোগতি জাতি ও সমাজের ভবিষ্যতের পক্ষে যে কতদূর অকল্যাণকর তাহা উপলব্ধি করিয়া সে দেশের সমাজ-তত্ত্ববিদগণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। (২২)

যে নারীর নৈতিক বন্ধন শিথিল, তাহার নিরুদ্ধ যৌন-প্রবৃত্তি ব্যভিচাররূপে প্রকাশিত হয়। উপরে একাধিকবার বলিয়াছি যে, যৌন-প্রবৃত্তি নারীর একমাত্র প্রবৃত্তি এবং তাহা তাহার মাতৃত্বেরই অপরিহার্য্য উপায়মাত্র, মাতৃত্বের মধ্যেই তাহার পূর্ণ পরিণতি। নারীর নৈতিক জীবনে মাতৃত্বের প্রভাব যে কত গভীর তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া মনুর

---

(১৯) "Woman ; A Vindication"—P. 238.

(২০) "The sexual instinct, when disappointed and unappeased, frequently seeks and finds a substitute in religion......The cause of religious insanity is often to be found in sexual aberration."—Krafft-Ebing—"Psychopathia Sexualis" P. 8.

"The great prevalence in women of the religious emotional state is largely due to unemployed sexual impulse."—Havelock Ellis "Psychology of Sex"—Vol III. P. 250.

(২১) "The baneful effect of a sexless life is seen in its worst form in spinsters who, doomed to a lifelong solitary existence, so often become starved in emotion, cramped in outlook, and soured in temperament."

Herbert—"An Introduction to the Physiology and Psychology of sex"—Page 121.

(২২) "The modern tendency of women to become pleasure-seekers, and to take a dislike to maternity, leads to a complete degeneration of society. This is a grave social evil, which rapidly changes the qualities and power of expansion of a race, and which must be cured in time, or the race affected by it will be supplanted by others."

Forel—"The Sexual Question", Page 137.

ন্যায় নারী-বিদ্বেষী শাস্ত্রকার, যিনি কোনো অবস্থায়ই নারীর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের অধিকার দেন নাই, তিনিও অজাত-সন্তানা নারীর পক্ষে স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন—"নিজ স্বামী দ্বারা সন্তানোৎপত্তি না হইলে, স্ত্রী সম্যক নিযুক্তা হইয়া তাহার দেবর বা অন্য কোনো সপিণ্ড দ্বারা ঈপ্সিত তনয় লাভ করিবে।" (২৩) Ludovici তাঁহার "Woman : A Vindication" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের ২০৮ পৃষ্ঠায় কুড়ি বৎসরের বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, নিঃসন্তান বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা অতিশয় বেশী এবং সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা কমিয়া আসে, ছয়টি সন্তানের পর বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা নাই বলিলেও চলে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—যেখানে সন্তান আসিয়া পুরুষ ও নারীর যৌন-প্রবৃত্তিকে একটা অপরূপ রূপে রঞ্জিত না করে, নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সত্তার বাহিরে যখন তাহারা তাহাদের বৃহত্তর বিকাশ প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে না পারে, যখন পিতৃ-মাতৃ-জীবনের নানা বিচিত্র কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের দ্বারা তাহাদের জীবন শান্ত ও সংযত না হয়, সেখানে তাহাদের বৈচিত্র্যবিহীন প্রেম তাহাদের অলক্ষ্যে শিথিল হইয়া আসে। যে একটা বিরাট মাতৃত্ব-শক্তি নারীর দেহে-মনে প্রকৃতি জাগ্রত করিয়া দিয়াছে, প্রকৃতির সকল শক্তিরই মত সে শক্তি চায় নারীর জীবনে লীলায়িত হইতে। কিন্তু যখন অবস্থা-দুর্বিপাকে সে শক্তি সুস্থ-সহজ লীলার সুযোগ পায় না, তখন সে অপরিতৃপ্ত মাতৃত্ব-ক্ষুধা সেই নিষ্ফলা নারীর মগ্ন-চেতনার মধ্যে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, এবং তাহার অজ্ঞাতে তাহাকে মাতৃত্বের সার্থকতার পথ খুঁজিতে অনুপ্রাণিত করে। তখন সার্থকতার সম্ভাবনায় সে অশান্ত নারী এক অজ্ঞাত আকর্ষণে যে কোনো শক্তিমান পুরুষের পানে স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। তখন সমাজের কোনো বাঁধনই তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, একটা অন্ধ দুর্নিবার বেগে সেই পুরুষের পানে সে ছুটিয়া যায়। কিন্তু পুরুষের চিত্তে সেরূপ কোনো বিরাট ক্ষুধা নাই, তাই সেই নারী সে পুরুষকে বেশী দিন বাহুপাশে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে না। তাই একদিন সেই পুরুষের যৌন-জীবনে অবসাদ আসিলে সে সেই প্রলুব্ধা নারীকে অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পথে চলিয়া যায়। কিন্তু সে নারীর পক্ষে তখন সমাজের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন সেই রুদ্ধ-দ্বার সমাজের বাহিরে অন্ধকার বন্ধুর পথে তাহার বিপথগামী জীবনের দুর্ব্বহ বোঝা তাহাকে আমরণ বহিয়া বেড়াইতে হয়। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অনেক কুলত্যাগিনী নারীর হতভাগ্য জীবনের এই ইতিহাস! পতিতা নারীর এই করুণ মর্ম্ম-কাহিনী ফরাসী সমাজ-তত্ত্ববিদ **Emile Faguet** অতি মনোজ্ঞভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"**All prostitutes start their illicit amours with a strong monogamic bias, and it is only subsequently that circumstances drive them to promiscuity.**" (২৪) Ludovici ও বলেন—নারীর এই পাপ একটা প্রকৃতিগত পাপ নয়, প্রতিরুদ্ধ জীবনী-শক্তির ইহা একটা বিকৃত প্রকাশমাত্র। (২৫)

নিরুদ্ধ যৌন-প্রবৃত্তির কথা বলিতে গেলে আমাদের দেশের অসংখ্য বিধবাদের কথা স্বতঃই মনে আসে। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সের বিধবাদের কথা আমি বলি না, কারণ প্রকৃতির দুর্জ্ঞের বিধানে সে বয়সে নারীর যৌন-প্রবৃত্তি আপনা হইতেই ক্ষীণ হইয়া আসে। সন্তান-ধারণক্ষমা পরিপূর্ণযৌবনা বিধবাদের কথাই এখানে আলোচ্য। একমাত্র আমাদের সমাজ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো সভ্য বা অসভ্য দেশে বাধ্যতা-মূলক বৈধব্যের প্রচলন নাই। আমাদের শাস্ত্রকারদের কেহ কেহ বিধবা-বিবাহের বিধান দিলেও কোনো দিন তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, বরং এতাবৎকাল প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধেই প্রচার কার্য্য চলিয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য,

(২৩) "দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে
—মনুসংহিতা, ৯ম অধ্যায়, ৫৯শ শ্লোক।

(২৪) "The Feminism"—Page 254.

(২৫) "Her vices are not vices in their origin but only become so when certain vital principles within her get out of hand, or find expression in a way they were not intended to adopt."—"Woman"—Page 344.

আধ্যাত্মিক উন্নতি, পরলোকে অনন্ত স্বর্গবাস প্রভৃতি নানা বুজরুকীর দোহাই দিয়া আমরা চিরদিনই বিধবাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাহাদের জীবনটাকে নিষ্ফল করিয়া রাখিয়াছি। কপট ধর্ম্মের আবরণ সরাইয়া এই বাধ্যতামূলক বৈধব্যকে নিরপেক্ষ চিত্তে বিশ্লেষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা পুরুষের চিরন্তনী ঈর্ষা-প্রবৃত্তিরই পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই অসভ্য আদিম যুগে, যখন মানুষের নীতি-জ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই, যখন নারী ছিল পুরুষের প্রথম ও প্রধান সম্পত্তি—তাহার ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার খাদ্য, তাহার পরিশ্রমের যন্ত্র, তাহার বাণিজ্যের পণ্য, তাহার আদান-প্রদানের শ্রেষ্ঠ উপহার,—তখন পুরুষ কেবলমাত্র দৈহিক শক্তির জোরে অপর সকল সম্পত্তির মত নারীর উপরে তাহার অধিকার বজায় রাখিত, এবং দুর্ব্বল পুরুষের মনে একটা অবিচ্ছিন্ন ভয় ছিল পাছে কোনো সবল পুরুষ আসিয়া তাহার সেই নারী-রূপী সম্পত্তিটি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। তা'র পর সমাজ, ধর্ম্ম, বুদ্ধি, ভাবুকতা প্রভৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সেই প্রাচীন জীবন-ধারা যতই পরিবর্তিত হো'ক, মানুষ যতই সভ্য হো'ক, শিষ্ট হো'ক, উন্নত হো'ক, বিস্মৃত অতীত যুগের সেই একটা মজ্জাগত ভয় আজও পুরুষের মনের কোণে নীরবে লুকাইয়া আছে। তাই যুগ যুগ ধরিয়া সতীত্বের নামে কত ভাবে যে পুরুষ নারীকে উৎপীড়ন করিয়া আসিয়াছে, তাহার হিসাব করা যায় না। (২৬) বর্ব্বর যুগে নারীর সতীত্বে সন্দিহান হইলে নীতি-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত পুরুষ সেই সন্দেহভাজনা নারীকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিত। অনেক বর্ব্বর জাতি অসতী নারীর যোনিমধ্যে তীব্র লঙ্কার গুঁড়া বা জ্বলন্ত অঙ্গার প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহাদের ঈর্ষা প্রবৃত্তিকে শান্ত করিত। (২৭) তা'র পর সভ্যতার উন্মেষের পরেও ইয়োরোপের অনেক অর্দ্ধ-সভ্য জাতি নারীর সতীত্ব-রক্ষার জন্য বিবাহের পূর্ব্বে যোনির বহিরোষ্ঠ দুইটি টানিয়া সেলাই করিয়া রাখিত, এবং বিবাহের সময় সেই সেলাই খুলিয়া দিত; স্বামী প্রবাস গমন করিবার সময়ও ওই উপায়ে স্ত্রীকে সতী করিয়া রাখিয়া যাইত। (২৮) অনেক প্রাচ্য জাতি বহিরোষ্ঠে কড়া পরাইয়া রাখিয়া নারীর অসতী হওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিত। (২৯) মধ্যযুগে ইয়োরোপের বীরপুরুষেরা যুদ্ধে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীর কটিদেশে যোনিকে আবৃত করিয়া এক মোটা লোহার কৌপীন পরাইয়া রাখিয়া যাইত, যাহাতে তাহাদের অনুপস্থিতিতে সেই স্ত্রী অপর কোনো পুরুষের সহিত সঙ্গত হইতে না পারে। এই লৌহ-আবরণের নাম ছিল Girdle of Venus বা সতীত্বের

---

(২৬) "All the devices that savage cunning can invent, all the mysterious and masquerading horrors of devil-raising, all the secret sorceries, the frightful apparitions and bugbears which can be supposed effectual in terrifying the women into virtue and preventing smock-treason, are resorted to by the Pomo Leaders."—Stephen Powers—"The Tribes of California," Vol. III, Page 158.

(২৭) "In some parts of West Africa, a girl, at all events if of high birth, when found guilty of unchastity may be punished by the insertion into her vagina of bird pepper, a kind of capsicum beaten into a mass; this produces intense pain and such acute inflamation that the canal may even be obliterated."—Havelock Ellis—"Psychology of Sex," Vol. III, Page 272.

(২৮) "The operation of infibulation, as practised by many savage peoples, is in which the inner surfaces of the labia majora are freshened, stitched together, and allowed to adhere. This is practised by the Bedschas, the Gallas, the Somalis, the inhabitants of Harrar, at Massaua etc. The purpose of this practice is to preserve the chastity of the girls until marriage, when the reverse operative precedure is undertaken. If the husband goes away on a journey, in many cases the operation of infibulation is once more performed upon the wives."—Kisch—"The Sexual Life of Woman," Page 416.

(২৯) "Another less brutal method of performing infibulation, as practised by many Eastern races, is one in which a ring is fastened through the labia in such a way as to guard the introitus vaginae."—"The Sexual Life of Woman," Page 417.

ধর্ম্ম! পুরুষ-জাতির অতি হীন কলঙ্কের এই জীবন্ত সাক্ষ্য এখনও পর্য্যন্ত ইয়োরোপের অনেক মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। এমনি করিয়া সেই আদিম দিন হইতে সুরু করিয়া প্রতি যুগে সতীত্বের নামে পুরুষ নারীর প্রতি যে কত জঘন্য আচরণ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। আমাদের দেশের বাধ্যতামূলক বৈধব্যও সেই জঘন্যতার একটা সভ্য রূপ মাত্র! তাই পরিপূর্ণ ভোগের মাঝে অকস্মাৎ স্বামী-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই নারীকে নিরাভরণা করিয়া, শাদা থান পরাইয়া, কেশপাশ মুড়াইয়া, নিরামিষাশী করিয়া আমরা তাহার স্বর্গের সোণার সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া দিই!

বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ কি? যৌন-নিরোধ ব্রহ্মচর্য্য নয়, মানব-হৃদয়ের সকল উচ্চবৃত্তির যাহা মূল উৎস, সেই যৌন-ক্ষুধাকে হত্যা করার দুশ্চেষ্টার নাম সতীত্ব নয়! প্রেমের প্রেরণায় দৈহিক ও মানসিক প্রবৃত্তির শান্ত সমন্বয়ই যথার্থ সতীত্ব। (৩০) যে তরুণী বিধবার অন্তর-পটে প্রেমের রেখা অঙ্কিত হয় নাই, অপরিতৃপ্ত মাতৃত্ব যাহার সারা চেতনাকে অহর্নিশি বিক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে, দেহ ও মনের এই শান্ত সমন্বয় তাহার আসিবে কোথা হইতে? আত্ম-সংযমের দ্বারা ইচ্ছাশক্তি ও চরিত্রবলকে সুদৃঢ় করিয়া যৌন-জীবনকে শান্ত, সুন্দর ও সার্থক করিয়া তোলাই সত্যকার ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ। তাই যৌন-দমনের চেষ্টা ও সংগ্রাম ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ নয়, সে শুধু ব্রহ্মচর্য্যের পথ। সেই কঠোর চেষ্টা ও সংগ্রামকে অতিক্রম করিয়া জীবনের বাস্তবতার মাঝে ব্রহ্মচর্য্যের একটা বড় সার্থকতা থাকা চাই, সেই সার্থকতাই ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষ্য। Ellen Key বলেন—"Only erotic idealism can arouse enthusiasm for chastity." যে বিধবাকে সারাজীবন শুধু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই কাটাইতে হয়, সে সংগ্রামের বাহিরে একটা স্নিগ্ধ-সুন্দর যৌন-জীবনের মহান আদর্শ যে বিধবা খুঁজিয়া পায় না, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর মত বাস্তব জীবনে তাহার সে ব্রহ্মচর্য্যের কোনো মূল্যই নাই, সে ব্রহ্মচর্য্য সম্পূর্ণ অর্থহীন,—শুধু অর্থহীন নয়, সে ব্রহ্মচর্য্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তাহার নৈতিক সত্তার হানিকর। মানব-প্রেমের দুইটা দিক আছে—দৈহিক ও আধ্যাত্মিক, যৌন-প্রবৃত্তি তাহার প্রাণ, আধ্যাত্মিকতা তাহার পরিণতি। (৩১) ভাবুকতা ও নীতি-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত নিছক ইন্দ্রিয়-লালসা যেমন হীন, আদিরস-বিবর্জ্জিত আধ্যাত্মিকতাও তেমনই ক্ষুদ্র। (৩২) পতিহীনা নারীর যৌন-জীবনকে সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ করিয়া যে একটা কাল্পনিক সতীত্বের স্বর্গ তাহার চক্ষের সম্মুখে আমরা ধরিয়া রাখিয়াছি, সে সতীত্ব সম্পূর্ণ মিথ্যা, কপট। এই মিথ্যা সতীত্ব পাশ্চাত্য ঋষি Havelock Ellis অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন—"If chastity is merely a fatiguing effort to emulate in the sexual sphere the exploits of professional fasting men, an effort using up all the energies of the organism and resulting in no achievement greater than the abstinence it involves, then it is surely an unworthy ideal. If it is a feeble submission to an external conventional law which there is no courage to break, then it is not an ideal at all. If it is a rule of morality imposed by one sex on the

---

(৩০) "Chastity is harmony between body and soul in relation to love."

—Ellen Key—"Love and Marriage."

(৩১) "Sexuality first breathes into our spiritual being the warm and blooming life...... This intimate connection between the psychic-emotional being and the sexual impulse gave rise to a deepening, a concentration, and increasing intensity, of the feeling of love, whereby the latter becomes the most powerful influence affecting mankind in bodily and spiritual relations."

—Bloch—"The Sexual Life of Our Time," Page 94.

(৩২) "Spiritual love without eroticism is meaningless, while, on the other hand, physical lust without the wider psychic irradiation of love is not only devoid of a real human content, but ends by defeating itself."

—Herbert—"An Introduction to the Physiology and Psychology of Sex", Page 122.

opposite sex, then it is an injustice and provocative of revolt. If it is an abstinence from the usual forms of the sexuality, replaced by more abnormal or more secret forms, then it is simply an unreality based on misconception. And if it is merely an external acceptance of conventions without any further acceptance, even in act, then it is a contemptible farce." (৩৩)

সত্যকার যে সতীত্ব, যে নিষ্ঠা ও সংযম নারীর যৌন-প্রবৃত্তিকে উন্নত করে, সুন্দর করে, সে সতীত্ব চিরদিনই শ্রদ্ধার জিনিষ,—তাহার পায়ে মানুষ চিরদিন মাথা নোয়াইবে। যে-সকল দেশে বিধবা-বিবাহের অবাধ প্রচলন আছে, সে দেশেও সকল বিধবা পুনরায় বিবাহ করে না, সে সকল দেশেও মৃত স্বামীর প্রেমের পুণ্য স্মৃতি শ্রদ্ধাভরে বক্ষে ধরিয়া অসংখ্য বিধবা আমরণকাল একটা শুদ্ধ-শুচি জীবন কাটাইয়া দেয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নারীর প্রেম ভাবপ্রবণ এবং এক-পতিত্ব তাহার মজ্জাগত প্রবৃত্তি। তাই যেখানে নারীর অন্তরে স্বামীর প্রেমের সত্য ছায়া পড়িয়াছে, যেখানে নারীর নিখিল চেতনা স্বামীর প্রেমের পুণ্য স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, সেখানে নারী কখনও দ্বিতীয় পুরুষকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু দাম্পত্য-জীবনের উৎসব-বাসর সাজাইতে না সাজাইতে যে নারীর সব দীপগুলি এক মুহূর্ত্তেই নিভিয়া গিয়াছে, স্বামীর প্রেমের পরশমণি যে নারীর হৃদয়কে সোণা করিয়া দেয় নাই, সন্তান আসিয়া যে নারীর অস্ফুট নারীত্বকে বিচিত্র রূপে প্রস্ফুট করিয়া তোলে নাই, সে নিঃসম্বল নারীর জীবন-পথে চলার পাথেয় কোথায়! তাহার দেহের ও মনের বিরাট অতৃপ্তি তাহাকে চির-চঞ্চল করিয়া রাখিবেই, এবং সে অতৃপ্তি তাহার অজ্ঞাতে তাহাকে তৃপ্তির অন্বেষণে ঠেলিয়া দিবেই। অজাতসন্তানা তরুণী বিধবাদের কপট ব্রহ্মচর্য্যের পর্দ্দা সরাইয়া তাহাদের গোপন হৃদয়ের পানে দৃষ্টি করিলেই বেশ অনুভব করা যায় যে, তাহাদের অনেকেরই অন্তর একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মত—বাহিরে সে শান্ত, স্থির, কিন্তু সে শান্তি ও স্থৈর্য্যের অন্তরালে একটা অসীম জ্বালা ও ক্ষুধা তাহার ভিতরে আবর্ত্তিত হইতেছে! মনের উৎকর্ষ এবং আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে এই বাধ্যতামূলক বৈধব্যের সার্থকতা কি, বলিতে পারেন সেই জ্ঞানী পণ্ডিতরাই—যাঁহারা এই অস্বাভাবিক বিধান সমাজে দিয়াছেন, কিন্তু পুরুষ তাহার উপভোগ্য নারী-দেহটির উপরে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত রকম সভ্য কৌশলই অবলম্বন করুক, ইহা শাশ্বত সত্য যে—পুনর্বিবাহে অনিচ্ছুক বিধবাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনরায় বিবাহ দেওয়া যেমন মিথ্যা, পুনর্বিবাহে ইচ্ছুক বিধবাকে তাহার অনিচ্ছায় সারাজীবন বিধবা করিয়া রাখা ততোধিক মিথ্যা, এবং তাহার অনিবার্য্য ফল—নানা জটিল স্নায়বীয় রোগ ও আর্ত্তব বিকার, বা ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা এবং জারজ সন্তানের উৎপত্তি!

পুরুষ ও নারী দেহে মনে, প্রকৃতিতে প্রবৃত্তিতে, চিন্তায় কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং সমান অধিকার লইয়া তাহাদের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না এবং তাহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, সে তর্কও উঠিতে পারে না। মানব-জীবনের যাত্রা-পথে দুইয়েরই অপরিহার্য্য দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে। নারীর একমাত্র প্রবৃত্তি মাতৃত্ব এবং সেই মাতৃত্বকে কেন্দ্র করিয়াই নারীর চরিত্রের সমস্ত প্রস্ফুরণ। তাই গার্হস্থ্য-জীবনেই নারীর চরম বিকাশ এবং গৃহস্থালীর মধ্যেই নারীত্বের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা। (৩৪) সন্তানকে জন্ম দিয়া, সযত্ন পরিচর্য্যার দ্বারা সুস্থ-সবল করিয়া, তাহাকে তাহার ভবিষ্যতের অনুযায়ী একটা মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত

---

(৩৩) "Studies in the Psychology of Sex"—Vol. VI, Page 144.

(৩৪) "That all women do not marry—cannot marry, indeed, because of their preponderance in number over the other sex—is no reason for dissembling the truth that in wifehood and motherhood lie women's most vital and valuable roles. Nor is it a warrant for training the whole sex as though none were destined to fulfill this, their natural and noblest, if not always their happiest, vocation."

—Arabella Kenealy—"Feminism and Sex-Extinction," Page 211-12

করিয়া তোলা নারীর সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য। পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র গৃহস্থালীর বাহিরে বৃহৎ সমাজের মধ্যে, সমাজকে শান্ত সুদৃঢ় করিয়া মানব-জাতির উন্নততর সত্তার উপযোগী করিয়া তোলাই পুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। পুরুষ ও নারীর এই কর্ম্মভেদ সমাজের সৃষ্টি নয়, এ ভেদ যৌন-ভেদের স্বাভাবিক উদ্ভব। মানব-জীবনের আদিম দিন হইতেই এই রকম একটা কর্ম্ম-বিভাগ চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে। (৩৫) সমাজে বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তখনই, যখন অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পুরুষ ও নারীর এই স্বাভাবিক জীবন-ধারা ব্যাহত হয়। সমাজের যে বিধান নারীকে মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া একটা অস্বাভাবিক জীবে পরিণত করে, সে বিধান সব চেয়ে বড় অকল্যাণকর, কারণ নারীর মাতৃত্বের পরিসর অন্য কিছুরই দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। সারা সভ্য জগতে যে একটা নারী-চাঞ্চল্য সম্প্রতি দেখা দিয়াছে, সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা কারণে নারীর জীবনী-শক্তি মাতৃত্বের মধ্যে পূর্ণ সার্থকতার সুস্থ সহজ পথ খুঁজিয়া না পাওয়াই তাহার মূল কারণ, এবং তাহারই ফলে নারীর জীবন মাতৃত্বের পথ হারাইয়া অমাতৃত্বের পথে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই Otto Weininger বলেন—"A great deal of the 'woman movement' of the times is merely a desire to be free, to shake off the trammels of motherhood; as a whole the practical results show that it is a revolt from motherhood towards prostitution, a prostitute emancipation rather than the emancipation of woman that is aimed at." (৩৬) বিকৃত অবস্থার ফলে নারী যতই পুরুষ-ভাবাপন্ন হোক, নারী চিরদিনই নারী,—তাহার মানসিক গঠন-বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্ত্তন হয় না। (৩৭) পুরুষ ও নারীর জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র এবং বিকাশের পথ বিভিন্ন, সুতরাং তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ধারাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উচ্চ-শিক্ষায় নারীর কোনো প্রয়োজন নাই—একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। শিক্ষা জ্ঞানের জন্য, জ্ঞান বিনা মানুষ কখনও তাহার জীবনের দায়িত্ব উদার ও বিস্তৃতভাবে অনুভব করিতে পারে না। তবে গার্হস্থ্য-নীতিকে কেন্দ্র করিয়াই নারী-শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত, ব্যবহারিক বিজ্ঞানে নারীর কোনো প্রয়োজন নাই। পুরুষ ও নারী উভয়েরই পক্ষে যৌন-বিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাহাতে তাহাদের জীবনে এবং উৎকর্ষে যৌন-প্রবৃত্তির গুরুত্ব তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে। যৌন-প্রবৃত্তি মানব-অন্তরের সকল উচ্চবৃত্তির আদি প্রেরণা এবং এই যৌন-আকর্ষণের সূত্র ধরিয়াই সমাজ ও সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল। মানুষের অন্তর্জীবনের পরিব্যাপ্তি যখন ছিল না, তখন মানুষ অপর সকল প্রাণীরই মত কেবল নিজের স্থূল প্রয়োজনের মধ্যেই মগ্ন ছিল। কিন্তু সে ক্ষুদ্র সত্তা মানুষকে তৃপ্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই, তাই মানুষের যৌন-প্রবৃত্তি পশুর মত কেবলমাত্র বংশ-বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই, সন্তানোৎপাদনের গণ্ডী ছাড়াইয়া মানুষকে বহুদূরে লইয়া গিয়াছে। Otto Weininger বলেন—"The living units of the lower forms of life are individuals, organisms; the living units of the higher forms

(৩৫) "The militant side of primitive culture belongs to the men; the industrial belongs to women……The tasks which demand a powerful development of muscle and bone, and the resulting capacity for intermittent spurts of energy, involving corresponding periods of rest, fall to the man; the care of the children and all the very various industries which radiate from the hearth, and call for an expenditure of energy more continuous but at a lower tension, fall to the woman."

—Havelock Ellis—"Man and Woman," Page 2—5.

(৩৬) "Sex and Character"—Page 332.

(৩৭) "No matter to what degree woman may acquire masculine characteristics and aptitudes, she remains, at core, a creature of instinct, not of reason. As a creature of instinct she is invaluable to life—because Life is moulded upon instinct."

—Arabella Kenealy—"Feminism and Sex-Extinction," Page 105.

সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দ্বিজবাবু চায়ের বাটী ঠেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা, ভর্ত্তাকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কথাটার উত্তর দেও।"

"তুমি ত আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর নি।"

"তুমি যে আমার ছেলেকে মন্দ দেখ—"

"ও তোমারই ছেলে বটে," বলিয়া দ্বিজবাবু নীচে নামিয়া গেলেন।

ক্ষণপরে অন্দরমহল হইতে গোলমাল উঠিল। দ্বিজবাবু বড়ই বিরক্ত হইলেন। প্রিয় ভৃত্য ভজুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

"ছোটদাদাবাবু দিদিমণিকে ধরে মেরেছেন।"

"কেন?"

"শুধু শুধু। দিদিমণি আপন মনে পুঁতুল নিয়ে খেলা করছিলেন, আর ছোটদাদাবাবু এসে—"

"বুঝিছি।"

"মেরে ধরে ছোটদাদাবাবু বলছিলেন বাবা আবার বলেন কি না, ঠেঙ্গাবার সাহস শক্তি আমার নেই।"

"প্রণব কোথা?"

তিনি দিদিমণির চীৎকার শুনে ছুটে গিয়েছিলেন; কিন্তু গিন্নি-মা দরজার উপর দাঁড়িয়ে বললেন তুমি আমাব ঘরে ঢুকো না।"

"প্রণবকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।"

প্রণব আসিল এবং একটু সঙ্কোচের সহিত অদূরে দাঁড়াইল—তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী, তাহার চাহিবার ভঙ্গী অনন্যসাধারণ। রূপ অনেকের আছে; কিন্তু যে রূপ নয়ন তৃপ্ত করে, মন মুগ্ধ করে, পুনঃ পুনঃ দর্শনেচ্ছা দর্শকের অন্তরে জাগায়, সে রূপ সকলের নাই। প্রণব দাঁড়াইল একটু বাঁকিয়া, একটু হাসি রাঙ্গা ঠোঁটের উপর ফুটাইয়া, নীল চোখ দু'টি একটু নত করিয়া জ্যেঠার সম্মুখে দাঁড়াইল। কাপড় পরিয়াছে, শৈশবে পাটনায় যে ভাবে পরিত, সেই ভাবে—কতকটা বিহারীর মত, কতকটা বাঙ্গালীর মত। অঙ্গে জামা নাই চরণে পাদুকা নাই; যে অবস্থায় ছিল, জ্যেঠার আহ্বানে সেই অবস্থায় প্রণব ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর—কৈশোরের শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সৌন্দর্য্য এই বয়সে—এই বয়ঃসন্ধিকালে বিদ্যাপতি তাহা বুঝিয়া শ্রীরাধার চিত্রে লিখিলেন,—'শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেলা'—ইত্যাদি।

দ্বিজনাথ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্কুল থেকে এসে খাবার খেয়েছ?"

"না।"

"কেন?"

উত্তর নাই।

"তোমাকে বুঝি এখনও খাবার দেয় নি?"

"হুঁ।"

ভজুকে কর্ত্তা ডাকিলেন; কহিলেন, "আমার ও প্রণবের খাবার আমার ঘরে দেও, আর রোজ আমাদের খাবার তুমি দেবে। আমি প্রণবের সঙ্গে খাব।"

"রাতেও এ ব্যবস্থাটা হলে ভাল হয় কর্ত্তা।"

"বুঝেছি ভজু। আচ্ছা তাই হবে; এখন তুমি যাও ভজু, প্রণবের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এস।"

ভজু দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। প্রণব দুই পা অগ্রসর হইয়া জ্যেঠার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিয়াছিল, জ্যেঠা হয় ত তাহাকে তিরস্কার করিবেন; কিন্তু তিরস্কারের পরিবর্ত্তে যখন সে আদর পাইল, তখন সে সাহস করিয়া কহিল, "দেখুন জ্যেঠামশাই, সরিৎ করেছে কি—"

"আমি ত তোমাকে জিজ্ঞেসা করি নি প্রণব।"

"কেন জিজ্ঞেস করেন নি?"

"আমি জানি, আমার প্রণব কখন অন্যায় কাজ করে না।"

"আমি অন্যায় করেছি কি না তা' যে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না জ্যেঠামশাই; তাই আপনার কাছে আমি বলতে চাই।"

"তবে বল।"

"সরিৎ একটা স্কুলের ছেলের গায় এক দোয়াত কালী ঢেলে দিয়েছিল—"

"শুধু শুধু তার উপর এ অত্যাচার কেন?

"তার এই অপরাধ যে, সে একটা ভাল জামা গায়ে দিয়ে এসেছিল, আর সরিতের জামার নিন্দে করেছিল। আমি বাড়ীতে এসে সরিৎকে ধমক দিলে, সে আমার জামাতেও কালী ঢেলে দেয়। তাই আমি ওকে মেরেছি জ্যেঠামশাই। অন্যায় করেছি কি?"

"একটুও অন্যায় কর নি; তার আর একটু শাস্তি হওয়া দরকার, সে আমি বুঝব—তুমি এখন খাও।"

একটা ছোট টেবিলের উপর ভজু দুইখানা রেকাবি রাখিল; পশ্চাতে দ্বিতীয় ভৃত্য জগা চা ও জল লইয়া আসিল। ক্ষুধার্ত্ত বালক আহারে প্রবৃত্ত হইল।

(২)

প্রণবের পড়িবার ঘরটি বেশ প্রশস্ত। একধারে দুইটী কাচের আলমারি, তাহাতে অনেকগুলি ঝক্‌ঝকে বই সাজান রহিয়াছে। কোন খানা ইতিহাস, কোনখানা বা জীবন-চরিত; নাটক নবেল একখানিও নাই। ঘরের মাঝখানে একটা পাথরের গোল টেবিল, তা'র ধারে ধারে কয়েকখানা চেয়ার। তা' ছাড়া একখানা কৌচ, সেক্রেটেরিয়েট টেবল, হোয়াটনট, বড় ঘড়ি প্রভৃতি কয়েকটা মূল্যবান আসবাব ছিল।

সরিতের পড়িবার ঘরটি ছোট, আসবাবপত্রও বড় বেশী নাই। দুইখানা চেয়ার ও একটা টেবল ছিল; একটা বইয়ের আলমারিও ছিল, কিন্তু সেটা মেহগ্নি কাঠের নয় বলিয়া সরিৎ সেটাকে পছন্দ করিত না। দাদার ঘরে কেমন আলমারি! মাষ্টার আসিলে সরিৎ প্রণবের ঘরে পড়িতে যাইত। উভয়েরই পড়িবার ঘর দ্বিতলে—রাস্তার উপর। রাস্তার উপর দিয়া ট্রাম, বস্ যাতায়াত না করিলেও পথটি অপ্রশস্ত নয়—গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে। আলো বাতাসের কোন অভাব না থাকিলেও সরিৎ ছোট ঘর ছোটেই পছন্দ করিত না। দাদার ঘরের মত বড় ঘর হইলে সে মন দিয়া পড়াশুনা করিতে পারিত। সরিৎ তাহার মনের কথা পিতার নিকট কয়েকবার বলিয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। গৃহিণীও এ কারণ মাঝে মাঝে ঝঙ্কার ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তিনিও পাহাড়কে নড়াইতে পারেন নাই।

তার পর শয়ন ঘর। বাড়ীর যে ঘরটি শ্রেষ্ঠ, সেই ঘরে প্রণব শুইত। তা'র পাশের ঘরে কর্ত্তা নিজে থাকিতেন; কর্ত্তার ঘরের পাশে একটা ছোট ঘর সরিতের জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রণবের ঘরে বিজলী পাখা, বড় বড় আলো ছিল: অপর দুইটী ঘরে সেরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না।—ক্ষীণতেজ এক একটি আলো ছিল। সরিৎ একদিন রাগ করিয়া তাহার ঘরের আলোটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, তা'র পরে আর তাহাকে আলো দেওয়া হয় নাই; যখন সে শুইতে আসিত, তখন একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া আসিত।

পোষাক পরিচ্ছদেও বহু তারতম্য। প্রণব তাহার জামা কাপড় সরিৎকে দিলে তাহা সে লইত না—ছুড়িয়া ফেলিয়া দিত। নিজের শয়ন ঘর, পড়িবার ঘর [illegible] দিবার প্রস্তাব প্রণব একবার করিয়াছিল, সরিৎ [illegible] ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়া জ্যেষ্ঠকে অপমান করিয়াছিল। প্রণব তদবধি সরিতের সংশ্রবে বড় একটা আসিত না।

কিন্তু ছোট বোন বিন্দুকে প্রণব বড় স্নেহ করিত। বিন্দুও তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহার দাদাকে ভালবাসিত,—এতটা বুঝি তা'র মাকেও বাসিত না। সন্ধ্যাতারা তাহা বুঝিয়াছিলেন; বুঝিয়া বালিকাকে প্রণবের নিকট বড় একটা আসিতে দিতেন না। কিন্তু সে লুকাইয়া আসিত; ধরা পড়িত, মার খাইত, তবু সে আসিত। সে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সকল দুঃখ দাদার নিকট বলিত। প্রণব তাহাকে জামা কাপড়, পুতুল খেলনা আনিয়া দিয়া সান্ত্বনা দান করিত। প্রণবের অর্থের অভাব ছিল না, সে যখন যাহা চাহিত খাতাঞ্জির নিকট তখন তাহা পাইত। কর্ম্মচারীর উপর কর্ত্তার এই রকম হুকুম ছিল। কিন্তু সরিৎ পাইত না—একটী পয়সাও না।

কর্ত্তার এই পক্ষপাত অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। করে নাই শুধু বৃদ্ধ ভৃত্য ভজুর, আর বৃদ্ধ দেওয়ান হরকালীর। গৃহিণী ত উঠিতে বসিতে কর্ত্তাকে তিরস্কার করিতেন। কিন্তু দ্বিজবাবু সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

এই পক্ষপাত দেখাইয়া কর্ত্তা যে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। বুদ্ধির দোষে হউক বা যে কারণেই হউক তিনি সংসারে অশান্তির অনল জ্বালিয়াছিলেন। বালকদের বয়স যত বাড়িতে লাগিল, এ অনলের তেজও তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পুত্র ক্রমে ক্রমে পিতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইল; পত্নীও স্বামীর পার্শ্ব হইতে দিন দিন সরিয়া যাইতে লাগিলেন। দ্বিজ-নাথের ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি যে পথ ভাল বুঝিয়া ধরিয়াছেন, সে পথ হইতে তাঁহাকে নড়াইবার শক্তি কাহারও ছিল না। এক এক জন লোক থাকে যাহাকে কিছুতেই বুঝান

যায় না। পাছে তর্কে পরাস্ত হয়, অথবা তাহার অন্তরের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে তর্ক ক'রে না—চুপ করিয়া নিজের কাজ করিয়া যায়। দ্বিজবাবু এই ধরণের লোক ছিলেন। সন্ধ্যা কতদিন বলিয়াছেন, "তোমাকে আমি বলছি না তুমি প্রণবের চেয়ে ছেলেটাকে ভালবাস, আমি চাই তুমি দুজনের প্রতি সমান ব্যবহার কর।" কর্ত্তা কথাটা কাণেই তুলিতেন না।

গৃহিণীর রাগটা গিয়া পড়িত বেচারা প্রণবের উপর। শোধ তুলিতেন তিনি বালককে পেটে মারিয়া। প্রণব ও সরিৎকে পাশাপাশি খাইতে দেওয়া হইত। যাহা উৎকৃষ্ট ভোজ্য তাহা সরিৎকে দেওয়া হইত; আর যাহা নিকৃষ্ট—ঠিক নিকৃষ্ট না হইলেও—যাহা প্রণবের একেবারেই উপযুক্ত নয়, তাহা তাহার থালায় পরিবেষিত হইত। সকল দিন প্রণবকে জলখাবার দিতে গৃহিণীর স্মরণ থাকিত না। রাত্রিতে সরিৎ পাইত লুচি, মাংস, রাবড়ি; আর প্রণব পাইত কয়েকখানা রুটি আর একটু তরকারি। রুটির সঙ্গে কিছু গঞ্জনাও পাইত। প্রণব কথাটিও কহিত না—নীরবে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শুইতে যাইত।

পাচিকা নিস্তারের প্রাণে গৃহিণীর এ ব্যবহার বড়ই আঘাত করিত। একদিন সে রসনা দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিল, "আহা বাছার খাওয়া হ'ল না।"

গৃহিণী গর্জ্জিয়া কহিলেন, "গরীবের ছেলে আবার কি খাবে?"

"কেন, ছোটদাদাবাবু যা' খান্।"

"ছোটদাদাবাবু ওর বাপের খায়। নবর বাপ্ রেখে যেত—"

"বড়দাদাবাবুর বাপ্ ত গরীব ছিলেন না—"

"আ মলো যা! আমার কথার উপর কথা!"

"যা' শুনিছি তাই বলছি।"

"নবুর বাপ যে দেনা রেখে গিছল, সব বেচেতে হ'ল—কর্ত্তা বাই ছিলেন তাই রক্ষে।"

গৃহিণীর প্রিয় দাসী রাধি অগ্রসর হইয়া কহিল, "তুমি জান না বামুণদি—তুমি ত এই সে দিন এলে—আমার এখানে ন' দশ বছর হ'য়ে গেল. এই কর্ত্তাবাবু ত পাওনাদারদের হাত থেকে বড়দাদাবাবুকে কেড়ে নিয়ে এলেন। তারা না কি মড়া আটকেছিল, দাদাবাবুকেও আটক করেছিল; কর্ত্তা যাই ছিলেন—"

নিস্তার। তুই রাধি, এইছিস ত আজ সাত বছর, আর দাদাবাবু পাটনা থেকে এখানে এসেছেন দশ বছর বা তা'রও বেশী। তুই এত কথা জান্‌লি কি করে?

রাধি। তুমি অবাক করলে বামুণ-দি! আমি আবার জান্‌লাম কি করে—শোন না—

সন্ধ্যা। দেখ নিস্তার, তুমি আমাদের ঘরের কথায় থেকো না—চাক্‌রি করতে এয়েছ, চাকরের মত থাক।

নিস্তার। চাক্‌রি করতে এসেছি বলে দয়া মায়া খুইয়ে আসি নি।

বলিয়া সবেগে প্রস্থান করিল।

(৩)

কয়েক দিন পরে গৃহে আবার কলহ বাধিল। একদা সন্ধ্যার পরে গৃহিণী গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে কর্ত্তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি তখন একখানা কৌচের উপর বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। নয়নকোণে সন্ধ্যাতারাকে দেখিয়া লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু পাঠে মন বসিল না। গৃহিণী হাতমুখের বিচিত্র ভঙ্গী সহ কহিলেন, "কি কাল্‌সাপ তুমি ঘরে পুষেছ।"

কর্ত্তা নিরুত্তর।

"একবার দেখ্‌বে এস তোমার প্রণব কি করেছে।"

"সে পড়ে টড়ে যায় নি ত?"

"তা' কি পড়বে? ও যে যমের অরুচি।"

"আহা, তাই যেন হয়।"

"তার উপর অরুচি হোক, আর সরির উপর যমের রুচি হো'ক, এই তোমার ইচ্ছে, না? হতভাগা ছেলেটার যত আক্রোশ আমার সরির উপর; এতবড় হিংসুটে পাজি ছেলে ভূভারতে নেই। পাছে বাছা আমার বই পড়ে পণ্ডিত হয়, এই হিংসেতে হতভাগা সব বইগুলো ছিঁড়ে দিয়েছে!"

"তুমি কি তাকে গাল দিতে আমার কাছে এসেছ?"

"হ্যাঁ এসেছি। তাকে গাল দেব না ত কি? বাছা আমার জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে বই কেনে, তা' হাড়-হাবাতে ছেলে সব বইগুলো ছিঁড়ে কুচি কুচি করেছে!"

"আর কিছু বল্‌বার আছে?"

"তোমাকে একবার দেখ্‌তে যেতে হবে; নিজের চোখে না দেখলে ত আমার কথা পেত্যয় যাবে না।"

"প্রণব কোন মন্দ কাজ করতে পারে না, তুমি মিছে বোকো না।"

"আমার মাথা খাও তুমি একবার দেখ্‌বে এস; ঘরময় বই ছেঁড়া, সরি ব'সে ব'সে কাঁদছে। আমি মা বেঁচে থাক্‌তে বাছার আমার এই দুঃখু; এমন মা বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।"

গৃহিণী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। কর্ত্তা এ জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না,—তিনি কাগজখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিরক্তির সহিত কহিলেন, "চল, কি হয়েছে দেখি গে।"

উভয়ে সরিতের পড়িবার ঘরে আসিলেন। ঘরে বিজলী-আলো জ্বলিতেছিল। পিতা আসিতেছেন দেখিয়া সরিৎ পলায়নোদ্যোগ করিল। কিন্তু অবসর পাইল না—দ্বিজনাথ আসিয়া পড়িলেন। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হর্ম্মতল ছিন্ন পুস্তকে সমাচ্ছন্ন। তিনি বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন, "সত্যই কি এ প্রণবের কাজ?" সরিৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বই কে ছিঁড়্‌লে?"

"নবু।"

"আবার নবু! দাদা বলে ডাক্‌তে পার না?"

গৃহিণী কহিলেন, "সরির চেয়ে নবু—প্রণব তিন মাসের বড় বই ত নয়।"

কর্ত্তা সে কথা কাণে না তুলিয়া ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আর যেন তোমাকে সাবধান করতে হয় না সরিৎ! এখন বল, কে তোমার বই ছিঁড়েছে?"

"দাদা।"

"শুধু শুধু ছিঁড়্‌ল?"

"হ্যাঁ।"

গৃহিণী কহিলেন, "তা নইলে তোমাকে বলছি কি?"

কর্ত্তা ছিন্ন পুস্তকাংশ উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, কুপিত ব্যাঘ্র ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া যেমন তাহার আঘাতকারীর দেহ ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি এই পুস্তকগুলি কোন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়াছে। পুস্তকগুলি বাঙ্গলা—রেণল্ড সাহেব কৃত দুইখানি অশ্লীল পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। তা' ছাড়া ছিল "হরিদাসের গুপ্তকথা", আর "কলিকাতা রহস্য।" তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "প্রণব!"

প্রণব পাশের ঘরে বই সাম্‌নে রাখিয়া বসিয়া ছিল। সরিতের ঘরে তাহার মন ছিল—কেতাবে ছিল না। জ্যেঠামহাশয়ের ডাক শুনিয়া সে ঝটিতি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বিজবাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "প্রণব, তোমার উপর আমি একটু অসন্তুষ্ট হয়েছি।"

গৃহিণী পুলকিত হইলেন, পুত্র [illegible] প্রণব জিজ্ঞাসু নয়নে জ্যেঠার পানে চাহিল। দ্বিজবাবু কহিলেন, "যে কাজ আজ করেছ প্রণব, সে কাজ অনেক দিন আগে তোমার করা উচিত ছিল; এই সব জঘন্য পুস্তক এ বাড়ীতে!"

"আমি ত এ ঘরে বড় আসি না; এ সব বই কবে যে আমদানি করেছে—"

"তোমার দেখাশুনা করা উচিত ছিল।"

"জ্যেঠাইমা হয় ত সেটা পছন্দ করতেন না।"

"ওই ত ছেলেটার মাথা খেয়েছে। শোন সরিৎ, আর যদি কখন শুনি স্কুলের কেতাব ছাড়া অন্য কোন বই ঘরে এনেছ, তাহলে তোমাকে খেতে না দিয়ে ঘরে চাবি বন্ধ করে রেখে দেব।" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

দুই দিবস পরে একদা অপরাহ্নে দ্বিজবাবু যখন উপরের একটা ঘরে বসিয়া প্রণবের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন দুই বাটী চা লইয়া ভজু আসিল; পিছনে পাচিকা নিস্তার দুই থালা ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, নিস্তার না?"

নিস্তার থালা দুইখানি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া কর্ত্তাকে প্রণাম করিল; কহিল, "হ্যাঁ বাবা।"

"তুমি এলে কেন? জগাকে দিয়ে পাঠালেই ত হ'ত।"

"বাবা, আমি বিদায় নিতে এসেছি—চাকরি আর করব না।"

"কেন নিস্তার?"

"বাছার এত কষ্ট আমি চোখের সামনে দেখ্‌তে পারি না।"

"কার কষ্ট? প্রণবের?"

"হ্যাঁ।"

"তা'র কষ্ট? কি কষ্ট?"

"কি আর বলব বাবা ? এ দু' দিন তাঁকে যা' খেতে দেওয়া হয়েছে তা' ঝি চাকরে খায় না।"

দ্বিজবাবু স্তম্ভিত হইলেন ; রোষে দুঃখে অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইল। সহসা কথা কহিতে পারিলেন না। ক্ষণেক নিস্তব্ধতার পর তিনি কঠোর নয়নে [illegible] কণ্ঠে কহিলেন, "জগু তুই বড়ো [illegible]—"

"[illegible] কি ; দাদাবাবুকে কোলে পিঠে করে মানুষ [illegible]"

"ছাই মানুষ করেছিস,—তা'র এত কষ্ট, আর তুই চুপ করে রয়েছিস্ !"

"করব কি ? দাঙ্গা বাধাব ?"

"হ্যাঁ বাধাবি ; না পারিস, চলে যা'।"

পরে কর্ত্তা নিস্তারের পানে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি ভেতরে যাও নিস্তার, কোথাও যেও না—আমি এর ব্যবস্থা করছি। এই যে প্রণব এসেছে। ব'স বাবা ব'স, আজ তোমার এত দেরী হ'ল কেন ?"

ভৃত্য ও নিস্তার প্রস্থান কবিল। প্রণব একখানা চেয়ারে বসিয়া আহার করিতে করিতে উত্তর করিল, "দেখুন জ্যেঠামশাই, সেই যে একটা ছেলের জামায় সরিৎ কালি দিয়েছিল, সেই ছেলেটা আজ দল বেঁধে সরিৎকে মারবে বলে এসেছিল। ছুটি হয়ে গেলে আমি বাইরে এসে দেখি তিনটে ছেলেতে সরিৎকে ঘিরেছে। আমি বইগুলো সরিতের হাতে দিয়ে তাদের একটু একটু শিক্ষা দিয়েছি। [illegible]সতে দেরী হয়ে গেল।"

"তুমি তাদের মেরেছ ?"

"না জ্যেঠামশায়, আমাকে বিশেষ কিছু করতে হয় নি। আমি একজনকে ধাক্কা দিয়ে আর একটা ছেলের ঘাড়ে ফেলে দি, দু'জনেই পড়ে যায়, আর একটা পালায়।"

"তখন সরিৎ কি করছিল ?"

"তা' লক্ষ্য করিনি ; এসে দেখি সে গাড়ীতে কপাট বন্ধ করে বসে আছে।"

"সব গুণই আছে দেখছি।"

প্রণব আহারাদি শেষ করিয়া ফুটবল খেলিতে চলিয়া গেল।

কর্ত্তা অনেক গবেষণার পর ব্যবস্থা করিলেন, পরদিন হইতে তিনি বালকদের সহিত বসিয়া বেলা দশটার সময় আহার করিবেন। বহুকাল হইতে তিনি বেলা একটায় আহার করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটিল। রাত্রিতেও তিনি প্রণবের সহিত আহারে বসিতেন। পূর্ব্বে আহার করিতেন রাত্রি এগারটায়, এখন করেন নয়টায়।

(৪)

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। বালকদ্বয় ক্রমে ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করিল। সম্মুখে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। দুই জনে মন দিয়া পড়াশুনা করিতেছে। একদিন রাত্রি দশটার সময় প্রণব পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উঠিয়া সরিতের পাঠাগারে প্রবেশ করিল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে খুব প্রহার করিল। বাড়ীতে মহা গোল উঠিল। গৃহিণী সন্ধ্যাতারা গালিতে পঞ্চমুখ হইলেন এবং তাঁহার লাবণ্যহীন বড় বড় চক্ষু দুইটি সন্ধ্যা ও প্রভাত তারার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। রাবি ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। এবার গৃহিণী কর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না—নিজেই প্রতিবিধানের ভার লইলেন। প্রণব নিজের ঘরের কপাট ভেজাইয়া দিয়া চেয়ারে বসিয়া শান্ত শিষ্ট বালকের ন্যায় ব্যাকরণের সূত্র কণ্ঠস্থ করিতেছিল ; অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া গেল এবং গৃহিণী রুদ্রমূর্ত্তিতে কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কবিবর গাহিয়াছেন দৈত্যেন্দ্রাণী ঐন্দ্রিলা চরণ তুলিয়াছেন শচী দেবীকে মারিতে ; কবিবর বৃত্ররাণীর সে মূর্ত্তি দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমাদের সে মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। তবে এ কথা বলা যায় যে, আমরা যাহা দেখিলাম, তাহা হেমচন্দ্র আজ যদি জীবিত থাকিয়া দর্শন করিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে হয় ত আর একখানি মহাকাব্য তিনি লিখিয়া ফেলিতেন। বিস্রস্তবসনা সন্ধ্যাতারা ঘূর্ণী বায়ুর ন্যায় কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রণবকে প্রচণ্ডবেগে পদাঘাত করিলেন। চেয়ার ও প্রণব হর্ম্মতলে সজোরে পড়িয়া গেল। তাহার ভূপতিত দেহকে পদাঘাত করিতে সন্ধ্যা দ্বিতীয়বার চরণ উঠাইয়াছেন, এমন সময় দ্বিজবাবু আসিয়া প্রণবকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন। কাজেই সন্ধ্যাতারাকে ক্ষান্ত হইতে হইল। তাঁহার চরণ ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু রসনা অবিরাম আবর্জ্জনা উদ্গীরণ করিতে লাগিল।

এমন সময় নীচে একটা গোলমাল উঠিল। ভৃত্য জগা আসিয়া সংবাদ দিল, সামনের বাড়ীর বিরাজ বাবু কি বলতে এসেছেন। কর্ত্তা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীচের উঠানে দাঁড়াইয়া বিরাজ বাবু কহিলেন, "আপনার ছেলে সরিৎকে একটু শাসন করে দেবেন।"

"কেন সে করেছে কি?"

"আমার মেয়ে তা'র ঘরে শুতে গিয়েছিল, সরিৎ তা'র ঘরের জান্‌লা দিয়ে তা' দেখেছে। কি সব তাকে বলেছে, আর জান্‌লা দিয়ে একখানা চিঠি ঢিলে জড়িয়ে তার কাছে ঘরের ভেতর ছুঁড়ে দিয়েছে—এই সে চিঠি।"

"আমি এর ব্যবস্থা করছি বিরাজ বাবু, আপনি যান।"

"শুনলাম আপনার ভাইপো ভালরকমই ব্যবস্থা করেছেন।"

"আচ্ছা, আপনি এখন আসুন।"

"এই চিঠি রইল—পড়ে দেখবেন।"

দ্বিজনাথ ঘরে ফিরিয়া দেখিলেন, প্রণব ঘরের ভিতর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আর সন্ধ্যাতারা তাহাকে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে কর্ত্তা ক্ষিপ্ত হইলেন—হুঙ্কার ছাড়িয়া ডাকিলেন, "সরিৎ!"

সে হুঙ্কারে গৃহ কাঁপিয়া উঠিল—দাস দাসী ছুটিয়া আসিল—সন্ধ্যাতারা সরিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বিজবাবু আত্মসংবরণ করিলেন এবং ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া প্রণবকে বুকে তুলিয়া লইলেন। সরিৎ তখন একপাশে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল, দ্বিজনাথ তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া প্রণবকে একখান কৌচের উপর বসাইয়া তাহার অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া দিতে লাগিলেন। ভজু একখানা ভিজা তোয়ালে আনিয়া প্রণবের অঙ্গ মুছাইতে লাগিল। প্রণবের সে আদর গৃহিণীর অসহ্য হইল—তিনি প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। কর্ত্তা হাঁকিলেন, "যেও না—দাঁড়াও।"

সন্ধ্যাতারার চরণ আর উঠিল না—তিনি দাঁড়াইলেন। দাস দাসী দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল; কর্ত্তা ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা অদৃশ্য হইল। তিনি তখন রক্তচক্ষু সরিতের পানে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চিঠি তোমার লেখা কি না।"

"আমার বন্ধু অজয়কে চিঠিখানা লিখেছিলাম।"

"বিরাজ বাবুর মেয়ের ঘরে কি করে গেল?"

"তা ত আমি জানিনে—উড়ে যেতে পারে—যে জোর হাওয়া।"

"ইট শুদ্ধ উড়ে গিয়াছিল, না?"

"তাহলে বিরাজ বাবু ইট জড়িয়ে থাক্‌বেন, আমার ঘরে ত ইট নেই—দেখুন না।"

পিতা কহিলেন, "তুমি কুলাঙ্গার, তোমার মুখদর্শন করতে আমার প্রবৃত্তি নেই। পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তোমাকে বোর্ডিংয়ে পাঠাব। আপাততঃ—"

কর্ত্তা ভজুকে ডাকিলেন; সে আসিলে কহিলেন, "কাল সকালে তুমি সরিৎ আর তার গর্ভধারিণীকে শিকদার বাগানের বাড়ীতে রেখে আসবে।"

সন্ধ্যা। সেই খোলার বাড়ীতে?

দ্বিজ। হ্যাঁ।

সন্ধ্যা। সেখানে আমি থাক্‌তে পারব না।

দ্বিজ। সেই তোমার বাড়ী, সেখানে তোমাকে চিরদিন থাকতে হবে।

সন্ধ্যা। না না, সে স্যাঁতা বাড়ী—

দ্বিজ। প্রণবের অঙ্গে যে পদাঘাত করে, সে এ বাড়ীতে স্থান পেতে পারে না। (ভজুর প্রতি) আমার কথা বুঝেছ ভজু? দু'খানা ভাড়াটে গাড়ী ডেকে—বাড়ীর গাড়ী নয়—এদের জিনিষপত্র নিয়ে ভোরে রওনা হ'বে। সকালে উঠে যেন এদের মুখ দেখ্‌তে না হয়।

সন্ধ্যা। তুমি কি আমাদের বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

দ্বিজ। তোমাদের কর্ম্মফল তাড়াচ্ছে।

সন্ধ্যা। পরের এই ছেলেটার জন্যে তুমি স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করছ?

দ্বিজ। তোমার মত স্ত্রী, সরিতের মত পুত্র—যা'ক সে সব কথায় আর কাজ নেই। কেঁদে ভাসালেও আমার হুকুম নড়বে না—যাও, প্রস্তুত হওগে। তোমার সঙ্গে একজন দাসী আর একজন চাকর যাবে; মাসে মাসে ভজু খরচের টাকা দিয়ে আসবে।

সন্ধ্যা। অনেক পাপ করেছিলাম, তাই এমন স্বামীর হাতে পড়েছিলাম।

দ্বিজ। তা' হতে পারে, কিন্তু তোমার পাপের জন্যে আমি দায়ী নই। যাও, আর বিলম্ব করো না।

সন্ধ্যা পুত্রসহ বেগভরে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

প্রণব ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শীর্ষ স্থান অধিকার করিল। সরিৎ পাশ হইতে পারিল না—হোষ্টেলে গেল। এক বৎসর হোষ্টেলে থাকিবার পর দ্বিতীয় বিভাগে পাস হইল। পর বৎসর প্রণব আই-এ পরীক্ষা দিল এবং পুনরায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিল। দ্বিজনাথের আনন্দের সীমা নাই। সে দিন বাড়ীতে মহাভোজের আয়োজন হইল। এই উপলক্ষে সরিৎ আসিল, কিন্তু তাহার মা আসিল না। পুত্র নির্জ্জনে পিতাকে কহিল, "বাবা, আসছে বছর আমিও ফার্ষ্ট হ'ব।" পিতা কহিলেন, "পাস হও বা না হও, তা'তে আমার দুঃখ নেই; কিন্তু তোমার চরিত্র কলুষিত হ'লে আমি তোমার মুখদর্শন করব না। স্মরণ রেখো, ভদ্রসন্তানের একমাত্র সম্পদ্ তাহার চরিত্র।"

সরিৎ পর বৎসর শীর্ষস্থান লইতে পারিল না, তবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। দ্বিজনাথকে প্রণাম করিতে সে আসিল। পিতা কহিলেন, "পাস হ'য়েছ শুনে আনন্দ হ'ল। কিন্তু তোমার চরিত্র সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট পাচ্ছি না। তোমার দাদার আদর্শ ধবে চ'লবে, আর সকল সময় স্মরণ রাখবে তুমি ঋষির বংশে জন্মেছ।"

পুত্র পিতার নিকট যাহা আশা করিয়াছিল, তাহা সে পাইল না। তাহার দাদা পাইয়াছিল একখানা ভাল মোটর গাড়ী। সে শূন্য উপদেশ লইয়া অভিমান ভরে প্রস্থান করিল।

একদা প্রণব নির্জ্জনে তাহার জ্যেঠামহাশয়কে কহিল, "জ্যেঠামশাই—"

"বল।"

"আপনি রাগ করবেন না?"

"রাগ হয় এমন কথা ত তুমি বল না।"

"এই—এই জ্যেঠাইমাকে এখানে আনলে হয় না?"

দ্বিজনাথ উত্তর করিতে যাইতেছিলেন, "না।" কিন্তু বালকের মুখ প্রতি চাহিয়া যখন দেখিলেন, বালক অনেকখানি আশা লইয়া এ প্রার্থনা জানাইয়াছে, তখন তিনি কঠোর "না" কথাটা কণ্ঠমধ্যে চাপিয়া রাখিয়া কহিলেন, "তোমার আন্‌তে ইচ্ছে হয়ে থাকে তুমি গিয়ে নিয়ে এস।"

আনন্দে প্রণবের মুখ হাসিয়া উঠিল। দ্বিজনাথ কহিলেন, "কিন্তু সরিৎ হোষ্টেলে যেমন আছে তেমনি থাক্।"

"তা' যাক্," বলিয়া প্রণব উঠিল; এবং সোফারকে ডাকিয়া মোটরে উঠিল। ভজু ও একজন দ্বারবান সঙ্গে চলিল।

প্রণবকে দেখিয়া বিন্দু আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল। সন্ধ্যাতারা গম্ভীর হইলেন; কহিলেন, "তুমি কি মনে করে গরীবের কুঁড়েতে?"

প্রণব প্রণাম করিয়া কহিল, "তোমাকে নিতে এসেছি জ্যেঠাইমা—চল।"

"আবার সেখানে! আমি যাব না।"

"ইস্, যাব না বললেই হ'ল আর কি? ভজুদা, গুছিয়ে নেও।"

"সেবার গাল খেয়েছি, এবার কি মার খেতে যাব?"

"জ্যেঠামশাই ধ'রে মারলেও ত আমি সেটা অপমান মনে করি না।"

"তুমি সেটা অপমান মনে না করতে পার—"

"গুরুজনদের কাছে মান অপমান কি?"

"তোমার মান অপমান জ্ঞান না থাকে তুমি মার খাও গে।"

"মার খেয়েছি ত জ্যেঠাইমা—একটুও প্রতিবাদ করি নি।"

সন্ধ্যাতারা ইঙ্গিতটুকু বুঝিলেন। তিনি নিরপরাধ প্রণবকে লাথির উপর লাথি মারিয়াছেন, সে কথা তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু সে জন্য কখনও তিনি অনুতাপ করেন নাই, আজও করিলেন না। তবে একটু লজ্জা হইল; আজ তিন চারি বৎসর পরে প্রণব তাহার উল্লেখ করিল বলিয়া একটু লজ্জা হইল। সন্ধ্যা কহিলেন, "তা' এতদিন পরে হঠাৎ আমাকে মনে পড়্‌ল যে?"

"মনে ত রোজ পড়্‌ত জ্যেঠাইমা, তবে জ্যেঠামশাইকে বলতে সাহস হ'ত না।"

"তাহলে তুমি তাঁকে ব'লে ক'য়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ?"

"তা' কতকটা বটে—(দাসীর প্রতি)—নেও রাধি, গুছিয়ে নেও, (ভজুর প্রতি)—আমি জ্যেঠাইমা ও বিন্দুকে নিয়ে যাই, তুমি ভজুদা জিনিষপত্র নিয়ে পেছনে যেও।"

"সরি কিছু জান্‌ল না, আমার যেতে মন সরছে না।"

রাধি, সন্ধ্যাতারাকে একধারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কি বুঝাইতে লাগিল। প্রণব, বিন্দুর হাত ধরিয়া কহিল, "হ্যাঁরে বিন্দু, তুই এত বড় হ'য়েছিস!"

"তুমি কি মনে করেছিলে বড়দা, আমি ঠিক তেমনিটি আছি?"

"ঠিক্ তেমনিটি না হো'ক—তুই স্কুলে যাচ্ছিস?"

"যাই বই কি?"

"তাই তুই অনেক কথা শিখেছিস।"

"যারা স্কুলে যায় না, তারা বুঝি বোবা হয়?"

"তাই বলে তাদের মুখ দিয়ে এত কথা ফোটে না।"

"তোমার ত বড়দা, এখন খুব কথা ফুটেছে, দু'টো পাশ দিয়েছ কি না।"

"আগে কি আমি বোবা ছিলাম?"

"বোবা না থাক, তখন তোমার জিবের চেয়ে হাতটাই বেশী চলত।"

"মহাপুরুষরা বলেছেন, বেশী কথা কইলে শক্তি ক্ষয় হয়, তুই বেশী কথা কইবি নি।"

গৃহিণী আসিয়া কহিলেন, "তবে চল।"

প্রণব তাঁহাদের লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

(৬)

সন্ধ্যাতারা আসিয়া দেখিলেন, পাচিকা নিস্তারিণী প্রকৃতপক্ষে সংসারের গৃহিণী। কর্ত্তার ভগিনী চারু যখন আসিয়াছিল, তখন তাহারই হস্তে সকল ভার ন্যস্ত ছিল; সে স্বামিগৃহে যাইবার পর নিস্তারই সব দেখা শুনা করে। সংসারের ভার যখন তাহার ঘাড়ে পড়িল, তখন দ্বিতীয় পাচিকা নিযুক্ত করিতে হইল। নিস্তার অন্যান্য দাসদাসীকে বুঝাইয়াছে, যে বড়দাদাবাবুর সেবা-যত্ন করিবে সেই এ গৃহে স্থান পাইবে; যে সন্ধ্যাতারাকে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী মনে করিবে সে এ গৃহে স্থান পাইবে না। কর্ত্তার ব্যবহারে পূর্ব্বেও তাহারা এই রকম কতকটা বুঝিয়াছিল।

নিস্তার, সন্ধ্যাতারাকে অভ্যর্থনা করিল, কিন্তু ভাণ্ডারের চাবি দিল না। গৃহিণীকে অতিথিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া মোড়লি করিয়া গৃহময় ঘুরিতে লাগিল। প্রাধান্য একটুও ছাড়িল না। রাধির অবিরাম চেষ্টা সত্ত্বেও সন্ধ্যাতারা পূর্ব্ব পদ আর অধিকার করিতে পারিলেন না। দাসদাসীদের মন হইতে ভয় চলিয়া গিয়াছে, তাহারা রূঢ় না হইলেও গৃহিণীর আদেশ পালন করিতে পূর্ব্ববৎ তৎপরতা দেখাইত না। হৃত সম্মান ফিরিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। ফল হইল, তিনি সম্মানের পরিবর্ত্তে অসম্মান পাইলেন। তখন তিনি গালি ধরিলেন; দাসদাসীরাও মুখ ছাড়িল। তিনি তখন সপ্তমে উঠিলেন, দাসীরা পঞ্চমে উঠিল। গৃহিণী নিরস্ত হইয়া রাধির সহিত পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন।

রাধি বুঝাইল, "দাদাবাবুই সকল অনর্থের মূল। তিনিই দাসীদের শিখিয়ে দিয়েছেন তোমাকে অপমান করতে; নইলে তাদের সাহস হয়? তোমাকে অপমান করবার জন্যেই তিনি তোমাকে এখানে এনেছেন।" কথাটা গৃহিণীর মনে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহলে এখন উপায়? ফিরে যাব?" রাধি কহিল, "ফিরতে হবে না; আমরা সহজে ছাড়্‌ব না—শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌ব। তুমি এক কাজ করতে পার—ছোট দাদা বাবুকে এখানে আনাতে পার? তিনিই তোমার একমাত্র সহায়; তাঁর বুদ্ধিও খুব।"

"কি করে তাকে আনি? কর্ত্তাকে বলতে গেলে তিনি ত এখনি ঝাঁক্‌রে উঠবেন। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে গা!"

"তুমি দাদাবাবুকে ধর—মিষ্টি করে ভৎসনা কর—একটু কাঁদ, তা'হলেই তিনি গলে যাবেন, আমাদেরও কার্য্যসিদ্ধি; বুঝেছ?"

মন্থরা মরে নাই, আজও দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কৈকেয়ীরও অভাব নাই। রাধির পরামর্শে সন্ধ্যা, প্রণবকে ডাকাইলেন। সে আসিলে কহিলেন, "তুমি আমাকে ধরে আন্‌লে, আমি ত আস্‌তে চাই নি।"

"কেন, কি হয়েছে জ্যেঠাইমা?"

"কি হ'তে বাকি আছে? ধ'রে ঠেঙ্গালেই কি ভাল হয়?"

"ও সব কথা বলো না জ্যেঠাইমা।"

"সাধে কি বলি? আমার যেমন পোড়া কপাল! (চক্ষুতে বস্ত্রাঞ্চল) কত পাপ করেছিলাম!" (ক্রন্দন)

"কি হয়েছে বল না জ্যেঠাইমা!"

"আমাকে আন্‌লে, ছেলেটা কি পথে পথে ঘুরে বেড়াবে?"

"পথে পথে কেন সে ঘুরে বেড়াবে! সে ত হোষ্টেলে আছে।"

"আমি বললুম পথ, তুমি ইঞ্জিরি করে বললে হোটেল—পথও যা হোটেলও তাই।"

"একই কথা কি জ্যেঠাইমা! বড় বড় লোকের ছেলেরা হোষ্টেলে থাকে।"

"যাদের মা নেই তারাই থাকে; তা' নইলে সরি আমার মা-মরা ছেলের মত হোটেলে পড়ে থাকে?"

"আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না—তুমি জ্যেঠা-মশাইকে বোলো।"

"বোঝাবে আর কি? আমি ত বোকা নই, মুখ্যুও নই।"

[সন্ধ্যাতারা বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।]

"বুঝে দেখ জ্যেঠাইমা—"

"তুই সেদিনকার ছেলে—আমাকে আর কি বোঝাবি? শোন্—তুই তাকে বাড়ী নিয়ে আয়—বাছা আমার ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।"

"তুমি জ্যেঠামশাইকে বল।"

জ্যেঠামহাশয় আসিয়া পড়িলেন; কহিলেন "আমাকে কি বলতে চাও প্রণব?"

"আমি কিছু বলতে চাই নে। জ্যেঠাইমা বলছিলেন সরিৎ নাকি পথে পথে ভেসে বেড়াচ্ছে।"

"সরিৎ হোষ্টেলে বেশ আছে, এখানে আনবার দরকার নেই।"

"জ্যেঠাইমা তা' বুঝছেন না, বোধ হয় তাঁর মন কেমন করে।"

"প্রতি রবিবারে এসে সে দেখা করে যেতে পারে।"

এইখানেই প্রসঙ্গটা শেষ হইল; কিন্তু গুরুতর ঘটনার সূচনা হইল। কয়েকদিন পরে সরিৎকে একদা বাড়ীতে দেখিয়া হরকালী বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে যে?"

"বাবা আসতে হুকুম দিয়েছেন।"

"বটে! আচ্ছা আমি তোমার বাবাকে জিজ্ঞেসা করছি।"

বলিয়া তিনি দ্বিজনাথের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে হরকালীর একটু পরিচয় দিলে কোন ক্ষতি হইবে না। তিনি সম্বন্ধে প্রণবের মামা। ভৃত্যেরা কেহ তাঁহাকে মামাবাবু বলিয়া ডাকিত, কেহ বা দেওয়ান বলিত। তিনি কর্ম্মচারী হইলেও সর্ব্বেসর্ব্বা। বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত। হরকালীর কথার অবাধ্য হইতে দ্বিজনাথও অনেক সময় সাহস করিতেন না। তিনি বিপত্নীক, নিঃসন্তান—সংসারে তাঁহার কোন বন্ধন নাই। কিন্তু সংসারী জীব বন্ধন খুঁজিয়া বেড়ায়, তাই তিনি প্রণবের মায়াকে শৃঙ্খল করিয়া পায়ে জড়াইয়াছেন; জড়াইয়া এ গৃহে পড়িয়া রহিয়াছেন।

হরকালী আসিয়া দ্বিজনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি সরিৎকে এখানে আসতে হুকুম দিয়েছ?"

"প্রতি রবিবারে আসতে অনুমতি দিয়েছি।"

"কাজটা ভাল করনি। মায়ের সংসর্গে এলেই সরিৎ কেমন বিগড়ে যায়, আর বাড়ীতে আগুন জ্বলে।"

"দেখি কি হয়; পরে না হয়—"

"আপাততঃ তোমাকে আরাঙ্গাবাদ যেতে হচ্ছে দ্বিজ।"

"কেন?"

"আরাঙ্গাবাদের কুঠীতে অনেক টাকা বাকি পড়েছে; আমার সন্দেহ হয় ম্যানেজার চুরি করেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর সেখান হ'তে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমদানি হ'ত; গত দু'বছরে আমরা পঁচিশ হাজারও পাইনি। তোমাকে সেখানে যেতেই হবে।"

"তুমি নিজে যাও না কেন, কালীদা?"

"আমি গেলে কাজ হবে না—ম্যানেজার আমাকে উড়িয়ে দেবে।"

"আমি গেলেই কি হবে? আমি যে হিসেবপত্র কিছু বুঝি না।"

"সঙ্গে মথুরকে দেব, সে খুব চালাক।"

"আচ্ছা, প্রণবের পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক্, তখন তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"অত দেরী করলে চ'লবে না, তোমাকে কালই যেতে হবে।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"আমি শুনিছি ম্যানেজার পালাবার উদ্যোগ করছে।"

"আমি প্রণবকে ছেড়ে যাব কি করে?"

"মেয়ে মানুষের মত কান্নাকাটি আরম্ভ করলে?"

"সত্যই আমি মেয়ে মানুষের মত দুর্ব্বলচিত্ত হ'য়ে পড়ি যখন প্রণবকে ছেড়ে যাবার কথা উঠে। তুমি জান না কালীদা, প্রণব আমার বুকের কতটা জুড়ে বসেছে। পূজা আহ্নিক, ধ্যানধারণা সব আমার ঘুচে গেছে—"

"আমি সব জানি; জেনেও বলছি, কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হওয়া মনুষ্যোচিত নয়। তোমাকে সেখানে একবার যেতে হবে।"

"কত বিলম্ব হ'তে পারে?"

"তা' ঠিক বলতে পারি না, তবে দশ পনর দিন হ'তে পারে।"

"এত দিন!"

বলিয়া দ্বিজনাথ চিন্তাকুল অন্তরে উঠিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর প্রণবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পরীক্ষা কবে আরম্ভ হবে?"

"এখনও কুড়ি দিন দেরী। পরীক্ষার পরই—বলব জ্যেঠামশাই?"

"বল।"

"বিন্দুর বিয়ে দিতে ইচ্ছে করি।"

"বেশ, দিও। পাত্র স্থির করেছ?"

"হাঁ। ছেলেটি খুব ভাল। আপনাকে ত বলেছি, দিলীপ বরাবর আমার সঙ্গে রেশারিশি করে পড়ছে। তাদের অবস্থাও ভাল।"

"তা' ছাড়া আর একটা জিনিষ দেখবার দরকার আছে—সেটা চরিত্র।"

"ভদ্রবংশের ছেলে কি কুচরিত্র হয়?"

"খুব হয়। পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে ধার্ম্মিক সজ্জনও কুপুত্র লাভ করেন। যা' হো'ক, আমি ছেলেটিকে একবার না দেখে কিছু বলতে পারি না।"

সন্ধ্যাতারা আসিয়া কহিলেন, "আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না—পাত্র ঠিক আছে।"

দ্বিজ। আমার বিনানুমতিতে পাত্র ঠিক হ'তে পারে না।

সন্ধ্যা। সরি বলে ছেলেটি খুব ভাল।

দ্বিজ। ভাল কা'কে বলে সরির সে জ্ঞান নেই। তার কোন বন্ধুটন্ধু হ'বে বোধ হয়?

সন্ধ্যা। হাঁ—সরিতের পড়াশোনা করে—বেশ ছেলে।

দ্বিজ। সরিতের কোন বন্ধুর সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে হ'তে পারে না, তুমি এখন যাও, প্রণবের সঙ্গে আমার কথা আছে।

সন্ধ্যা প্রস্থান করিলেন। দ্বিজনাথ কহিলেন, "তাহ'লে প্রণব, তোমার পরীক্ষা শেষ হ'তে এখনও প্রায় এক মাস।"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আমাকে কিন্তু এর মধ্যে একবার বিদেশে যেতে হচ্ছে।"

"কেন জ্যেঠামশাই?"

"বৈষয়িক ব্যাপার, তুমি তা' বুঝবে না।"

প্রণবের বুকে আঘাত লাগিল। সহসা কোন উত্তর করিল না; একটু সামলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরতে কত বিলম্ব হবে?"

"তা' ত ঠিক বলতে পারছি না প্রণব, তবে দশ পনর দিন হতে পারে।"

"এতদিন!"

"হাঁ প্রণব, এতদিন।"

দুই জনের অন্তর ভাবী বিচ্ছেদে কাঁদিয়া উঠিল। দ্বিজনাথ, প্রণবকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন, "পনরটা দিন বই ত নয় প্রণব।"

"জ্ঞান হওয়া অবধি আমি যে আপনাকে ছেড়ে থাকিনি জ্যেঠামশাই।"

"আমিও যে থাকিনি বাবা।"

উভয়ে আবার নীরব। দুইজনের বুকের ভিতর ঝড় বহিতেছিল, কিন্তু বাহিরে উভয়ে স্থির শান্ত। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল, "এক মাস পরে গেলে হয় না জ্যেঠামশাই?"

"না। হরকালী বলছিল, কালই যেতে হবে।"

প্রণব নিরুত্তর রহিল। এই তার প্রথম আঘাত। এত বড় আঘাত পূর্ব্বে সে অনুভব করে নাই। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাব জ্যেঠামশাই।"

"তা' কি হয় বাবা? তোমাকে যে পরীক্ষা দিতে হবে।"

"এ বছর নাই বা দিলাম।"

"এক বছর যে নষ্ট হ'বে।"

"আপনি কাছে না থাকলে আমার মন যে পড়াশুনায় থাকবে না।"

"তা' জানি বাবা ; কিন্তু—আচ্ছা চল—না, তা' হ'তে পারে না—তোমার কুড়ি বৎসর পূর্ণ হ'তে আর কত দেরী ?"

"কয়েক দিন পরে—যে দিন পরীক্ষা আরম্ভ হবে সেই দিন আমি একুশে পড়্ব।"

"এই কয়দিন, তার পর—"

"আপনি যে বলেছিলেন, আমি একুশে পড়লে কি বলবেন।"

"আগে একুশে পড়, তার পর।"

"তার পর বলবেন ?"

"তার পর বলব, আর তোমার বিয়েও দেব। পাত্রী স্থির আছে। তোমার বাবা তাঁর এক বন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন তাঁর কন্যা হ'লে তা'র সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন। তোমার যখন সাত বছর বয়েস, তখন তাঁর এক মেয়ে হয়। সেই মেয়ের বয়েস এখন তের হবে, লেখাপড়া ভাল রকম শিখছে বলে গোপনে সংবাদ এসেছে। আমি মেয়েটিকে চুপিচুপি একবার দেখে আসব।"

বিবাহের প্রস্তাবে প্রণবের মুখ বন্ধ হইল।

(৭)

দ্বিজনাথ ভজুকে সঙ্গে লইয়া গয়া জেলার আরাঙ্গাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভজুকে সঙ্গে লইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু প্রণব জেদ করিয়া তাহাকে সঙ্গে দিল ; কহিল, 'ভজুদা কাছে না থাক্লে বিদেশে আপনার কষ্ট হবে।' সুতরাং ভজু গেল ; জগা রহিল প্রণবের কাছে। সরিৎ দাদাকে দেখাশুনা করিতে হোষ্টেল হইতে বাড়ী আসিল এবং অতি গোপনে রহিল। ভয়, হরকালী বাবু পাছে তাড়াইয়া দেন। থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাহার সাহস বাড়িয়া গেল, একটু বাড়াবাড়ি করিল ; তখন জগা চুপিচুপি হরকালীকে সংবাদ দিল। তিনি বুঝিলেন, সত্বরই একটা গোল বাধিবে ; কিন্তু পিতার অনুপস্থিতিতে মায়ের ক্রোড় হইতে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে তাঁহার মন উঠিল না। এই দুর্ব্বলতার জন্যে পরে তিনি অনুতাপ করিয়াছিলেন।

প্রণব পড়াশুনা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু পাঠে মন তেমন বসিল না। মনটা থাকিত জ্যেঠার কাছে ; তাহাকে সময় সময় টানিয়া আনিয়া পাঠে নিয়োজিত করিতে হইত। প্রণব জ্যেঠার নিকট হইতে প্রায় চিঠি পাইত। তিনি ভাল আছেন, শীঘ্র ফিরিবেন এই সব কথাই লিখিতেন। তা'র পর তিনি শয্যা লইলেন। সামান্য জ্বর ক্রমে গুরুতর হইল। রোগ কঠিন না হইলেও তিনি মৃত্যু-আশঙ্কায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। প্রণবকে যে সে গুপ্ত কথা বলা হয় নাই !—না বলিয়া ত তিনি মরিতে পারেন না ! তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে প্রণব কিন্তু এ রোগের কথা কিছুই জানিল না। সে যেমন চিঠি পাইয়া যাইতেছিল তেমনিই পাইতে লাগিল, তবে চিঠি বড় ছোট হইয়া আসিল, হস্তাক্ষরও তেমন সুবিধাজনক নয়। প্রণব অতটা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু হরকালী সব বুঝিলেন। তিনি চিন্তিত হইয়া আরাঙ্গাবাদের জনৈক কর্ম্মচারীকে পত্র লিখিলেন ; কর্ম্মচারী সব খুলিয়া লিখিল—কিছু লুকাইল না। তা'র দুই দিন পরে হরকালী একখানা বড় লেফাফা দ্বিজনাথের নিকট হইতে পাইলেন। লেফাফাখানি ইনসিওর করা। হরকালী খুলিয়া দেখিলেন, খামখানার ভিতর একখানি পত্র, আর একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট খাম। এখানি প্রণবের নামে। খামের মাথায় লেখা ছিল, প্রণব যেদিন একুশ বৎসরে পদার্পণ করিবে, সেই দিন তাহাকে ইহা পড়িতে দেওয়া হইবে। হরকালী যত্নসহকারে তাহা লোহার সিন্দুকে তুলিলেন। তিনি ভাবিলেন, কেহ তাহা দেখিতে পাইল না, কিন্তু একজন লুকাইয়া দেখিল। ইন্‌সিওর লেফাফা আসিতে সরিৎ দেখিয়াছিল, তৎপরে আর তাহাকে দৃষ্টির অন্তরাল করে নাই।

দ্বিজনাথের জন্যে হরকালী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেও তিনি প্রণবকে ছাড়িয়া আরাঙ্গাবাদ যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি গৃহ-চিকিৎসককে একজন কর্ম্মচারীর সহিত আরাঙ্গাবাদে পাঠাইয়া দিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত প্রণব একটুও জানিতে পারিল না। যদি সে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিত তাহার প্রাণতুল্য প্রিয় জ্যেঠা দূরদেশে রোগশয্যায় শায়িত, তাহা হইলে সে হয় ত তাহার পুঁথিখাতা গোল-দীঘির জলে ফেলিয়া দিয়া গয়ার পথে ছুটিত।

যেদিন প্রণবের পরীক্ষা আরম্ভ হইল, সেদিন সন্ধ্যার পর সন্ধ্যাতারা প্রণবের পড়িবার ঘরে আসিয়া কহিলেন, "তুমি এ ঘরে চেঁচিয়ে পড়্লে সরির ত পড়াশুনা হয় না।"

"আমি ত চেঁচিয়ে পড়ি না জ্যেঠাইমা ; এখনও কি ছোট আছি ?"

"মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠ বই কি—সরি বলছিল, সে চমকে ওঠে।"

"সরিৎই বরং চেঁচিয়ে পড়ে—আমি কথাটিও কই না।"

"চেঁচিয়ে না পড়্‌লে ওর পড়া হয় না।"

"তবে সরিৎ হোষ্টেলে যাক্‌।"

"কেন ও হোষ্টেলে যাবে ? যার চালচুলো নেই সেই যাক্‌।"

"আমাকে যেতে বলছ জ্যেঠাইমা ? আচ্ছা জ্যেঠামশাই আসুন, তখন যা' হয় করা যাবে। এখন তুমি পড়ার ব্যাঘাত করো না—ভেতরে যাও।"

"ওরে বাপ্‌রে ! উনি আবার আমাকে ধমক দেন ! এমন হতভাগা ছেলেও ত কখন দেখি নি !"

"ওরে জগা, তুই আমার বই ক'খানা নিয়ে নীচে চল।"

প্রণবের পশ্চাতে জগা পুস্তক লইয়া চলিল। প্রণব সে দিন আর পাঠ গারে ফিরিল না। পরদিন দেখিল, সরিৎ সে ঘর দখল করিয়া লইয়াছে।

হরকালী বাবু জগার নিকট সমস্ত শুনিয়া প্রতিকারোদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রণব তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল ; কহিয়াছিল, "পরীক্ষার এ কয়টা দিন শান্তিতে যেতে দিন্‌ মামাবাবু !" হরকালী বাবু আর কিছু করিলেন না।

কিন্তু তিন দিন পরে তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রণবকে সে দিন বড় লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। প্রণবের অপরাধ, নিদ্রিতাবস্থায় সে নাকি নাসিকাধ্বনি করে ; পাশের ঘরে সরিৎ ঘুমাইতে পারে না—ঘুমের ঘোরে চম্‌কে চম্‌কে উঠে। প্রণব শুইতে যাইতেছিল, কিন্তু স্নেহময়ী জ্যেঠাইমা তাহাকে শুইতে দিলেন না—সরিৎকে আনিয়া প্রণবের শয্যায় শোয়াইলেন। প্রণবের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সরিৎকে শয্যা হইতে টানিয়া আনিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয় ; কিন্তু সে বর্দ্ধমান ক্রোধকে দমন করিল। সে এক মহাপুরুষের নিকট শুনিয়াছিল, ক্রোধের উদয় হইলে স্থান ত্যাগ করিবে অথবা নির্ব্বাক থাকিবে। প্রণব বিনা বাক্যব্যয়ে স্থান ত্যাগ করিল এবং নীচে নামিয়া গিয়া একখানা কৌচের উপর আশ্রয় লইল !

জগা মহা কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকালীকে সংবাদ দিল। তিনি প্রণবকে শুইতে পাঠাইয়া দিয়া সবে স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। বুড়া দেওয়ান জগার প্রমুখাৎ এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং নগ্নপদে নগ্নগাত্রে উপরে উঠিয়া গেলেন। পিছনে জগাও ছুটিল। উপরে গিয়া হরকালী দেখিলেন, সরিৎ ও তাহার জননী অত্যধিক মনোযোগ সহকারে প্রণবের দেরাজ-অভ্যন্তরে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। একটু দূরে দাঁড়াইয়া রাধি পাহারা দিতেছিল। রাধি দেওয়ানকে দেখিয়া ভয়ে বাক্‌শূন্য হইল ; সন্ধ্যাতারাকে সতর্ক করিবার পূর্ব্বেই হরকালী ঝড়বেগে কক্ষমধ্যে আসিয়া পড়িলেন এবং হুঙ্কার ছাড়িয়া ডাকিলেন "দরওয়ান !"

সে হুঙ্কারে পুণ্যকামী ব্যক্তিত্রয় চমকিয়া উঠিলেন,—দেরাজ বন্ধ হইয়া গেল—যে সকল মূল্যবান দ্রব্য প্রণবের ন্যায় দরিদ্র ভিক্ষুকের ব্যবহারোপযোগী নহে বলিয়া স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে দেরাজের মাথার উপর রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা গুছাইয়া লইবার অবসর হইল না—সরিৎ পালঙ্কের নীচে লুকাইল, গৃহিণী মাথার উপর একটু কাপড় টানিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। দরওয়ান আসিয়া কহিল, "হুজুর !"

"রাধিকো কান্‌ পাকাড়্‌কে বাহার কর্‌ দেও। আউর এ লেড়্‌কা সরিৎকো—"

প্রণব আসিয়া পড়িল ; বাধা দিয়া কহিল, "ও সব কথা আপনি বলবেন না—ওকে ক্ষমা করুন।"

"ক্ষমা কি বলছ প্রণব ? ওটা বংশের কুলাঙ্গার। যে হতভাগা দাদার বাক্স ভেঙ্গে ঘড়ি চেন চুরি করতে পারে, সে এ বাড়ীতে আর থাক্‌তে পাবে না—এখ্‌নি দূর হো'ক।"

"এত রাতে সরিৎ কোথা যাবে মামাবাবু ? আজ রাত্তিরটা থাকতে দিন্‌।"

"তোমার কথায় ওকে থাক্‌তে দিলাম—কাল সকালে উঠে যেন চলে যায়। ওরে জগা, বিছানার চাদরটা বদ্‌লে দে। তেওয়ারি, এই বারান্দায় তুমি শুয়ে থাক, কেউ যেন প্রণবের ঘুমের ব্যাঘাত না করে।"

(৮)

বিবরের মধ্যে লুকাইয়া তিনজনে সমস্ত রাত্রি পরামর্শ করিল। সরিৎ প্রভৃতি এতই উত্তেজিত হইয়াছিল যে,

কোন দুষ্কার্য্য তাহাদের পক্ষে তখন অসাধ্য ছিল না। কিন্তু সে রাত্রিতে কোন পরামর্শ ই তাহারা স্থির করিতে পারিল না—উত্তেজিত মন কখন কোন পরামর্শ স্থির করিতে পারে না। গৃহিণীর ইচ্ছা ছিল, প্রণবকে আহার্য্যের সঙ্গে ধুতুরার বীচি বা এই রকম একটা কিছু খাওয়ান হয়; কিন্তু রাধি তাহাতে সম্মত হইল না, কহিল, 'শূলী ফাঁসির ভেতর সে নেই।' সরিৎ পরামর্শ দিল, গুণ্ডা লাগাইয়া পথের মাঝে নবুকে শেষ করিতে। এ প্রস্তাবও রাধি নামঞ্জুর করিল। রাধি কহিল, "নবুকে বাড়ী হ'তে তাড়াতে কতক্ষণ?—একটু সবুর কর না।" সরিৎ বলিল, "শুধু তাড়ালে হ'বে না, তাকে প্রাণে মারা চাই। সে বেঁচে থাক্‌লে বাবা হয় ত তাকে অর্দ্ধেক বিষয় দেবেন; আমি তাকে একটী পয়সাও দিতে পারব না।" মন্তব্য সকলেই প্রকাশ করিলেন, কিন্তু একটা কিছু স্থির হইল না।

পরদিন প্রভাতে দেওয়ান, সরিৎকে কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। সন্ধ্যাকালে জগা আসিয়া চুপি চুপি সংবাদ দিল, ছোটবাবু লুকিয়ে আছেন গিন্নীমার ঘরে।" সে দুর্গে প্রবেশ করিবার হরকালীর অধিকার নাই, দরওয়ান ত দূরের কথা। সুতরাং সরিৎ রহিয়া গেল। এবং দুর্গাভ্যন্তরে লুকাইয়া ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এই ভাবে দুই দিন কাটিল।

যে দিন ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত হইবার কথা, সে দিন প্রভাতে প্রণব, হরকালীর নিকট আসিয়া কহিল, "আজ আমার পরীক্ষা শেষ হবে মামাবাবু।"

"এবার কি রকম বুঝছ?"

"তেমন্ ভাল নয়।"

"সে কি, কেন?"

"মন রইল জ্যেঠামশাইয়ের কাছে, পড়াশুনা করব কি করে?"

প্রণব ভুলে নাই জ্যেঠাকে বিদেশে পাঠাইবার মূল তাহার মামা।

হরকালী এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। একটু পরে তিনি কহিলেন, "তোমার কাছে একটা কথা লুকিয়েছিলাম প্রণব। তোমার জ্যেঠা আরাঙ্গাবাদ গিয়ে রোগে পড়েছিলেন—"

"সে কি! তাঁর ব্যয়রাম হয়েছিল, আর আমি জানতে পারি নি।"

"তোমাকে জানাবার দরকার হয় নি; এখন তিনি ভাল হ'য়ে উঠেছেন।"

"বেশ ভাল হয়েছেন ত? না, আপনি আমাকে স্তোক দিচ্ছেন?"

"তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হ'য়ে না উঠলে তোমাকে এ সংবাদ দিতাম না। এই দেখ না তাঁর চিঠি। তিনি লিখেছেন, আজ কালের মধ্যেই এখানে আসবেন।"

"আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম, আজ রাতের গাড়ীতে আমি জ্যেঠার কাছে যাব।"

"যেতে হবে না, তিনি হয় ত আজই আস্‌বেন। আচ্ছা প্রণব, তোমার কুড়ি বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে কি?"

"হয়েছে—আজ কয়েক দিন হ'ল আমি একুশে পড়েছি।"

"দ্বিজনাথ তোমার নামে একখানা লেফাফা পাঠিয়েছেন। এই লেফাফার ভিতর তোমার বাপের পত্রাদি আছে। দ্বিজনাথ এই পনর বৎসর এই সব মূল্যবান্ কাগজ সযত্নে রক্ষা করে আস্‌ছেন, এমন কি কয়েক দিনের জন্যে আরাঙ্গাবাদ গেছেন, সেখানেও স'ঙ্গ নিয়ে গেছেন—আমার কাছে রেখেও বিশ্বাস করেন নি"—

"এ অনুযোগ করবেন না মামাবাবু; আপনাকে যদি বিশ্বাস না করতেন, তা'হলে আপনার কাছে পাঠাতেন না।"

"সহজ অবস্থায় পাঠান নি। যখন তাঁর মনে হ'য়েছিল, তিনি আর বাঁচবেন না, তখন তিনি পাঠিয়েছিলেন। সে যাই হো'ক তোমার জ্যেঠার আদেশ আছে, তোমার কুড়ি বৎসর পূর্ণ হ'লে, আর তোমার পরীক্ষা দেওয়া শেষ হ'লে—"

"কুড়ি বৎসর পূর্ণ হয়েছে, পরীক্ষাও আজ শেষ হবে।"

"লেফাফাও সন্ধ্যার পর তোমার হস্তগত হ'বে।"

"খামখানার ভিতর কি আছে মামাবাবু?"

"তোমার বাবার চিঠিপত্র থাক্‌তে পারে।"

"খামখানা একবার দেখান না মামাবাবু!"

"সন্ধ্যের পর দেখো; এখন আমাকে একবার হাইকোর্টে যেতে হবে—তোমারও কলেজে যাবার সময় হয়ে এল।"

"এখন একবার শুধু খামটা দেখান না মামাবাবু।"

হরকালী এ কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না—তিনি উঠিলেন—ঘরের ভিতর গেলেন—লোহার সিন্দুক খুলিলেন; কিন্তু সে লেফাফা নাই। সকল জিনিষ নামাইলেন, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও সে

বহুমূল্য কাগজখানি পাওয়া গেল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া সিন্দুক পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া প্রণব ব্যস্ত হইয়া ঘরের ভিতর আসিল। মামাকে নিস্তব্ধ নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রণব ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মামাবাবু?"

উত্তর নাই।

"সেটা কি খুঁজে পাচ্ছেন না?"

"না—নেই।"

"আর কোথাও হয় ত রেখে থাকবেন।"

"কাল রাত্তিরে দশটার সময়ও তাকে সিন্দুকে দেখিছি।"

"এই ক'ঘণ্টার মধ্যে সেটা গেল কোথা?"

"চুরি গেছে···আমি বেশ বুঝতে পারছি সেটা চুরি গেছে। হায় হায়, বাড়ীতে চোর আছে জেনেও আমি সতর্ক হ'লাম না! আমি কি আহাম্মক! এই জন্যেই দ্বিজ আমাকে বিশ্বাস করে নি।"

"বাড়ীতে চোর! কা'কে আপনি সন্দেহ করছেন?"

"কা'কে আবার? সরিৎকে। কিন্তু চাবি পেলে কোথা? ওঃ বুঝেছি···আমার ঘরের দোর যেমন খোলা থাকে তেমনি খোলা ছিল, সরিৎ আমার বালিসের নীচে হ'তে চাবি সরিয়ে এই কাজ করেছে।"

প্রণব বড়ই নিরাশ হইল। জগা আসিয়া যখন ডাকিল, "ন'টা বেজেচে, চান্ করবেন আসুন," তখনও প্রণবের ইচ্ছা হইল না যে, সে সিন্দুকের সান্নিধ্য ছাড়িয়া অন্যত্র যায়। সে সিন্দুকের ভিতর যে তাহার পিতার পত্র ছিল!

স্নানাদি সমাপন করিয়া প্রণব আহার করিতে অন্দরের দিকে গেল। রন্ধনশালার পথমুখে দেখিল, সন্ধ্যাতারা একাকিনী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। একটু দূরে রাখিও দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া প্রণবের প্রতীতি হইল; কিন্তু প্রণবকে দেখিবামাত্র সে অদৃশ্য হইল। সন্ধ্যা পথরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাচ্ছ?"

"ভাত খেতে···আজ একটু দেরী হয়ে গেছে।"

"ভাত এখনও হয় নি, নিস্তার এখনও রান্না চড়ায় নি।"

"বেলা ত অনেক হয়েছে জ্যেঠাই মা।"

"তোমার বাপের কি পাঁচটা ঝি চাকর আছে যে, তোমাকে 'টাইম' ধ'রে ভাত দেবে?"

"ভাত না হ'য়ে থাকে আমাকে কিছু খাবার টাবার দেও।"

"ওরে বাপ্‌রে! হুকুম দেখ। গরীবের ছেলে, খেতে পেতে না, তোমার অত লম্বা চওড়া হুকুম কেন?"

"যার জ্যেঠা ধনী, সে গরীবের ছেলে কেন হ'তে যাবে?"

"যা' খাচ্ছ তা' সরিৎ, তা'র মুখ থেকে কেড়ে খেতে তোমার লজ্জা করে না?"

"আমি খাচ্ছি জ্যেঠার, সরিৎ নয়।"

"একই কথা···"

"একই কথা নয়। সরিতের অংশ থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমারও অংশ আছে।"

"তোমার আবার কিসের অংশ?"

"আমি ত জ্যেঠার ছেলে,—বাপ, খুড়ো জ্যেঠা পৃথক কি?"

"তুমি তো সয়তান কম নও! এক মুঠো খেতে পেলে পথের লোককেও তুমি বাবা বল্‌তে পার।"

প্রণব এক পা পিছাইয়া গিয়া তীব্র দৃষ্টিতে জ্যেঠাইয়ের পানে চাহিল এবং উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "কি বল্‌ব তুমি আমার গুরুজন···"

"নইলে মারতে নাকি?"

"তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি কখন এ রকম কথা আমাকে বলবে না; মানুষের মেজাজ সকল সময় ঠিক থাকে না।"

"পাঁচ শ' বার বলব; তুমি আমার কি করবে কর দেখি।"

"তুমি কখন ভদ্র ঘরের মেয়ে নও।"

"কি! এত বড় গাল আমাকে দিলে! আমার যেমন কপাল, তা' নইলে পথের ভিখিরী আমার বাড়ীতে এসে আমাকে গাল দিয়ে যায়!"

"তোমার কাছে যথেষ্ট খেয়েছি, আর খেতে চাই না।"

বিন্দু, গৃহিণীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, তিনি তাহা জানিতেন না। প্রণবকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া বিন্দু কহিল, "তোমার ভাত যে দেওয়া হয়েছে দাদা।"

"আর ভাত খেতে চাই না বিন্দু।"

"তুমি না খেলে আমিও খাব না দাদা।"

প্রণব ফিরিল এবং সন্ধ্যাতারাকে অতিক্রম করিয়া রান্নামহলের দিকে অগ্রসর হইল। সন্ধ্যা ডাকিলেন,—

"দাঁড়াও, তোমাকে একটা কথা বলি, সরির বাড়ীতে তুমি আর থেকো না, সরির অন্ন তুমি আর খেও না ; যদি খাও, তুমি তোমার বাপের রক্ত খাবে।"

পদাহত সিংহের ন্যায় প্রণব চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যখন সে দীপ্ত নয়নে সন্ধ্যাতারার প্রতি চাহিল, তখন তাঁহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল ; ভাবিলেন, হয় ত বা প্রণব তাঁহার মুণ্ড এখনি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিয়া বিন্দুরও মনে এই রকম একটা আশঙ্কা হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি কহিল, "দাদা, তুমি ছোট হয়ো না।"

প্রণব কাহাকেও কিছু বলিল না ; তাহার মনের ভাব তখন ভাষার অতীত। প্রণব ক্ষণকাল তীব্র দৃষ্টিতে সন্ধ্যার পানে চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলেন না,—ঝটিতি সরিয়া পড়িলেন। বিন্দু অগ্রসর হইয়া দাদার হাত ধরিল। প্রণব যখন নয়ন ফিরাইয়া বিন্দর পানে চাহিল, তখন তাহার দৃষ্টি স্নেহকোমল। ক্রমে চক্ষু সজল হইল। প্রণব ক্ষিপ্রচরণে উপরে উঠিয়া গেল। এবং নিজের ঘরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। খানিকটা ভাবিল, তার পর একটু কাঁদিল ; অতঃপর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া কলেজ অভিমুখে প্রস্থান করিল।

ফিরিয়া আসিল বেলা তিনটায়। হরকালী বাবুর অনুসন্ধান করিল ; তিনি তখনও হাইকোর্ট হইতে ফিরেন নাই। বেলা যখন ৪টা, তখন একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিল,—"মামাবাবু, আমি বাড়ী ছাড়িয়া চলিলাম। কেন, তা' বিন্দু জানে। হাতে বেশী টাকা না থাকায় ঘড়ি চেন আংটি লইয়া চলিলাম। আপনাকে বলিয়া যাইতে পারিলাম না—বলিয়া যাইবারও তেমন ইচ্ছা ছিল না ; আপনি হয় ত আমাকে ধরিয়া রাখিতেন, কিন্তু আপনার আদেশ পালন করিতে পারিতাম না। যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পর এ বাড়ীতে আর থাকিতে পারি না। প্রণাম লইবেন, আর পারেন ত আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া প্রণব একটা স্যুটকেসে কয়েকখানা জামা কাপড় ভরিল। তার পর স্যুটকেসটি হাতে ঝুলাইয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। জগা কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিল। সকালের ঘটনার সময় সে উপস্থিত ছিল না, থাকিলে একটা-কিছু করিয়া বসিত। পরে কিছু কিছু শুনিয়া সে এতদূর ক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, গিন্নীকে কিছু বলিতে না পারিয়া রাধিকে দুই চারি ঘা লাগাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু প্রণবের কাছে ঘেঁষিতে পারিল না—সে শুষ্ক ও বিষণ্ণ মুখপানে চাহিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। প্রণবের হাত হইতে স্যুটকেসটি নীরবে কাড়িয়া লইয়া তাহার পিছন পিছন চলিতে লাগিল। একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া প্রণব তাহাতে উঠিল। জগা চালকের পাশে বসিল। প্রণব তখন কহিল, "তুমি কেন ভাই ?"

জগা কাঁদিয়া ভাসাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমিও যাব দাদাবাবু।"

"না ভাই, তুমি এখানে থাক। একখানা চিঠি টেবিলের উপর রইল, মামাবাবুকে দিও ; আর বোলো আমি জ্যেঠার কাছে যাচ্ছি। ডাইভার, চলো, হাওড়া—বেশী সময় নেই।"

অগত্যা জগা নামিয়া গেল। প্রণব নয়নে জলভার, হৃদয়ে দুঃখভার লইয়া তাহার এতকালের বাস-গৃহের নিকট বিদায় লইল।

(৯)

কেতাবে পড়িয়াছি পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে শেঠ-গৃহে একটা বৈঠক বসিয়াছিল ; তাহাতে রাণী ভবানী, মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেই রকম একটা গুপ্ত বৈঠক বসিল, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যাতারার কক্ষে। তবে এ বৈঠকে পাঁচ জন ছিলেন না—মাত্র তিন জন উপস্থিত ছিলেন, যথা,—রাধি, সরিৎ ও তাহার গর্ভধারিণী। বোধ হয় নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ করিতে তিন জনই যথেষ্ট। রাধি কহিল, "দেখলে কেমন ফন্দি করে নবুকে তাড়ালাম ; তোমরা মারধর, খুন জখম করতে চাইছিলে।"

রাণী সন্ধ্যাতারা কহিলেন, "এখন ফিরে না এলে বাঁচি।"

জগার চপেটাঘাত তখনও রাধির গণ্ডে ঝুলিতেছিল—যেমন একদিন জগৎ শেঠের 'নিরমল কুলে' জ্বলিয়াছিল। সে কহিল, "চাঁদকে আর ফিরতে হবে না। এখন ছোট-বাবু, তুমি এক কাজ কর,—জগাটাকে খুব করে মেরে তাড়িয়ে দেও।"

সরিৎ কহিল, "ও সব বাজে কথা রেখে দেও ; এখন একটু কাজ আছে।"

রাধি। কি কাজ আবার ?

সরিৎ উত্তর না করিয়া উঠিল। যে লেফাফাখানি হরকালীবাবুর সিন্দুক হইতে অপহৃত হইয়াছিল সেই খামখানি তাহার মায়ের আলমারী হইতে বাহির করিল। তাহার আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলিতে সরিৎ সঙ্কোচ করিল না। দেখিল, তাহার ভিতর দুইখানা দলীল। প্রথম দলীলখানি সরিৎ আগে পড়িল। তাহার লেখক দ্বিজনাথ—লিখিত হইয়াছে প্রণবের বরাতে। কাগজখানা পড়িতে পড়িতে সরিতের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; দ্বিতীয় কাগজ পড়িবার তাহার আর সামর্থ্য রহিল না বা প্রবৃত্তি হইল না। সন্ধ্যাতারা অধীর হইয়া কহিলেন, "কে কি লিখেছে বল্ না।"

"থামো।"

"তুই অমন ক'রে রইচিস কেন?"

সরিৎ তাহার উত্তর করিল না; সে একদৃষ্টে লেফাফা পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা কহিলেন, "বল্ না রে কি হয়েচে? তোর মুখ দেখে যে আমার ভয় হচ্ছে।"

সরিৎ সে কথারও কোন উত্তর করিল না। দলীলখানা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিল, কিন্তু সেখানা পড়িতে তাহার আর প্রবৃত্তি হইল না। কাগজপত্র সব খামের ভিতর ভরিল। বিবর্ণমুখে নীরবে মাটী পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। এবার রাধিও ভয় পাইল; কহিল, "বল না গো!"

সরিৎ উত্তর করিল না। সন্ধ্যাতারা পুনঃ পুনঃ পীড়ন করাতে কহিল, "রাধি, তুমি বাইরে যাও।"

"কেন, আমার সাম্‌নে বল্‌তে পার না?"

"না, পারি নে—তুই বাইরে যা।"

"ও রে বাপ রে! আমার কাছে আবার লুকোন! বলে, যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে—"

"তোর কথা এখন ভাল লাগ্‌ছেনা রাধি—তুই বেরো।"

ক্রোধভরে রাধি উঠিল এবং সশব্দে দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গেল বটে, কিন্তু বেশী দূরে গেল না—রুদ্ধদ্বারে কাণ লাগাইয়া মাতাপুত্রের কথাবার্ত্তা শুনিতে চেষ্টা করিল। শুনিতে পাইল কি না জানি না, কিন্তু মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়িয়া যাইতে লাগিল এবং এ অপমানের শোধ কিরূপে সরিতের উপর লইবে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার এ সাধু চিন্তায় সহসা বাধা পড়িল, ফিরিয়া দেখিল—সর্ব্বনাশ!

গোড়া হইতে কথাটা বলা ভাল। হরকালীর হাইকোর্ট হইতে ফিরিতে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল। তিনি আসিতে না আসিতে জগা কহিল, "দাদাবাবু রাগ করে বাড়ী হ'তে চ'লে গেছেন, আমাকেও সঙ্গে নিলেন না।"

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হরকালীর একটু সময় লাগিল, তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জগা ইত্যবসরে ছুটিয়া গিয়া প্রণবের পত্রখানা আনিল। হরকালী পত্র পড়িলেন—দুইবার তিনবার পড়িলেন। যখন পত্রমর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন তিনি হাঁকিলেন, "পাঁড়ে তেওয়ারি, গাড়ী মোটর।"

"দাদাবাবু হাওড়ায় গেলেন।"

"তুই ঠিক জানিস?"

"হাঁ। তিনি যে গাড়ীওয়ালাদের হুকুম দিলেন হাওড়ায় নিয়ে যেতে!"

"কোথা যাবে কিছু বলেছিল?

"কর্ত্তাবাবুর কাছে যাবেন বল্‌ছিলেন।"

"সে গাড়ীর এখনও দেরী আছে—ধরতে পারব।"

"না, দেরী নেই, গাড়ীওয়ালাকে বল্‌ছিলেন, 'সময় নেই জলদি হাঁকাও'।"

"তবে সে কোথা গেল?"

বলিয়া একটু চিন্তামগ্ন হইলেন। পরে দ্রুতপদে উপরে আসিলেন; প্রণবের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর একখানা টাইম্ টেব্‌ল পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি তাহা খুলিলেন; দেখিলেন, দিল্লী এক্সপ্রেস ট্রেণখানায় পেন্সিলের দাগ রহিয়াছে। তিনি আর কিছু দেখিলেন না—ঝটিতি নামিয়া আসিয়া মোটরে উঠিলেন এবং হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলেন, এক্সপ্রেস যথাসময়ে ছাড়িয়া গিয়াছে। সোফেয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্সপ্রেস ধরতে পার?"

"কোথা ধরতে হবে?"

"বর্দ্ধমানে।"

"কত সময় আছে?"

"চল্লিশ মিনিট—৫টা ৫৩ হয়েছে—৬টা ৩৩এ বর্দ্ধমান ছেড়ে যাবে।"

"কত মাইল পথ?"

"প্রায় সত্তর মাইল।"

"চল্লিশ মিনিটে ৬০ মাইল যাওয়া যাবে না।"

"তোমাকে যেতেই হবে—তোমার দাদাবাবুকে ধরতে হবে।"

"বেশী জোরে হাঁকালে গাড়ী উল্টে যেতে পারে।"

"তা' যাক্।"

"মিনিটে তু' মাইল—অসম্ভব!"

হরকালী সে দিকে নিরাশ হইয়া 'তার' আফিসের দিকে ছুটিলেন। বৰ্দ্ধমান ষ্টেশন মাষ্টারকে একখানা প্রিপেড টেলিগ্রাম করিলেন। 'তারে' অনুরোধ করিলেন,—"প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ২০ বৎসর বয়স্ক বালক—নাম প্রণব—দয়া করে আটকাবে—বোম্বে মেলে যাচ্ছি।"

ঘড়ির পানে চাহিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় হরকালী একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া রহিলেন। এক-একবার লাফাইয়া উঠিয়া 'তার' ঘরের দিকে ছুটিতেছেন। যখন শুনিতেছেন, উত্তর আসে নাই, তখন আবার ফিরিয়া বেঞ্চের উপর বসিতেছেন! সাড়ে ছয়টা বাজিয়া গেল, হরকালী চঞ্চল-চিত্তে আবার 'তার' ঘরের দিকে ছুটিলেন। উত্তর নাই। আর বসিতে পারিলেন না—ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সাড়ে ছয়টা বাজিয়া পাঁচ মিনিট হইল, আবার 'তার' ঘরের দিকে ছুটিলেন। সহসা দেখিলেন, দ্বিজনাথ তাঁহার পথের উপর দিয়া যাইতেছেন। দ্বিজনাথের পিছনে কয়েকটা কুলী, তাহাদের পিছনে ভজু। হরকালী কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সরিয়া যাইতেছিলেন, ভজু গোলমাল করিয়া উঠিল। দ্বিজনাথ তুই চারি পা এগাইয়া গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "এ কি, হরকালী, তুমি!"

"হুঁ আমি।"

"এখানে কেন?"

"দরকার ছিল, তাই এখানে।"

"কি দরকার?"

"তোমার ইস্তফা পাঠাতে এসেছি—এখন সর।"

বলিয়া তিনি দ্রুতপদে 'তার' ঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন, উত্তর আসিয়াছিল—কম্পিত হস্তে হরকালী খামখানা ছিঁড়িয়া পড়িলেন,—বিশ বছরের কোন ছেলে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় নাই। উত্তর পড়িয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি, কাগজখানার পানে চাহিয়া নিস্পন্দ দেহে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কত লোক তাঁহাকে কনুর গুঁতা মারিয়া চলিয়া গেল—ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া দ্বিজনাথ 'তার' পড়িলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি কালী?"

"প্রণব চ'লে গেছে।"

"চলে গেছে? কোথা?"

"তা' জান্‌লে এত ঘুরে মরছি কেন?"

"তা'র পরীক্ষা শেষ হয়েছে?"

"আজ হ'ল।"

"তাহ'লে সে আরাঙ্গাবাদে আমার কাছে গেছে।"

"ঠিক্ ঠিক্, জগাও তা'ই বলছিল। আঃ বাঁচা গেল—মাথা থেকে পাহাড় নেমে গেল। কিন্তু সে চিঠি!"

"কিসের চিঠি?"

"প্রণব একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে—"

"সেটা পরে দেখছি। ওরে ভজু' তুই এ গাড়ীতে আরাঙ্গাবাদ ফিরে যা; প্রণব সেখানে গেছে, তা'কে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।"

হরকালী ইহাতে আশ্বস্ত হইলেন না। তাঁহার মনের ভিতর কে যেন সহসা মাথা তুলিয়া চুপি চুপি বলিতে লাগিল —প্রণব আরাঙ্গাবাদে যায় নাই, সে দূরদেশে পলাইয়াছে—তোমাদের ধরা দিবে না। হরকালীর মন আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি আবার 'তার'ঘরের দিকে ছুটিলেন। একখানা ফর্ম্ম টানিয়া লইয়া আসানসোল ষ্টেশন-মাষ্টারকে একটা 'তার' করিলেন। এবার মধ্যম শ্রেণীতে প্রণবকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার টাকা পুরস্কারও হরকালী ঘোষণা করিলেন। দীর্ঘ টেলিগ্রাম লিখিয়া তৎক্ষণাৎ যাহাতে সেটা প্রেরিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। প্রণবকে ট্রেণে পাওয়া গেলে কি করিতে হইবে তাহারও উপদেশ ষ্টেশন কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইল। অতঃপর তিনি দ্বিজনাথের কাছে ফিরিয়া আসিলেন; তিনি তখন ভজুকে টাকাকড়ি ও উপদেশ দিতেছিলেন। ভজু ডাকগাড়ী ধরিতে চলিয়া গেল। উভয়ে তখন মোটরে উঠিলেন। দ্রব্যাদি লইয়া একখানা ট্যাক্সিও সঙ্গে চলিল। পথে হরকালী বাবু প্রণব সম্বন্ধে সকল কথা দ্বিজনাথকে কহিলেন। প্রণব পাঠাগার হইতে, পরে শয়নকক্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, সে কথাও

বলিলেন। লেফাফা চুরির কথা বলিতেও বিস্মৃত হইলেন না ; এবং সরিৎ যে চুরি করিয়াছে সে কথাও কহিলেন। নিস্তব্ধ হইয়া দ্বিজনাথ সকল কথা শুনিতেছিলেন। তারপর যখন তিনি প্রণবের পত্রখানা পড়িলেন, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, হরকালীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন ; এমন কি কহিলেন, "এতবড় কাণ্ডটা তোমারই দোষে ঘটেছে। তোমার মুখ দেখতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।"

হরকালী। আমি অপরাধী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমিও আর তোমাকে মুখ দেখাব না যদি তাকে না খুঁজে পাই।

গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল। উভয়ে উপরে উঠিয়া প্রণবের ঘরের দিকে গেলেন। জগা তখন দ্বারের বাহিরে বারান্দায় বসিয়া সজল-নয়নে বিন্দুকে বলিতেছিল, "দাদাবাবু কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন।"

বিন্দু কাঁদিতেছিল। আবেগভরা কণ্ঠে কহিল, "আমাকে দাদা কেন সঙ্গে নিয়ে গেলেন না।"

জগা। আমাকেই বড় সঙ্গে নিলেন!

বিন্দু। আমি এ বাড়ীতে আর থাকব না—

জগা। আমিও আর থাক্‌ব না দিদিমণি—

বিন্দু। তুই মামাবাবুকে বলে দাদার কাছে আমাকে নিয়ে চল্‌। বাবা এলে আবার আসব।

জগা। তিনি কোথা গেলেন তা' ত আমি ঠিক জানি নে দিদিমণি। আমি সঙ্গে যেতে চেয়েছিনু, তিনি আমাকে 'ভাই' 'ভাই' করে ক্ষেপিয়ে দিলেন।

এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রুত হইল। উভয়ে চমকিয়া উঠিল। বিন্দু অনেকখানি আশা লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল ; ভাবিল, হয় ত দাদা আসিয়াছেন। কিন্তু, তাহার দাদা এ বাড়ীতে আর যে আসেন ইহা তাহার অন্তরের ইচ্ছা নয় ; তবু আশা ও আনন্দ লইয়া সিঁড়ির পানে ব্যগ্রভাবে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু জলভরা। প্রথমে মানুষ চিনিতে পারিল না। চক্ষু মুছিয়া দেখিল, তাহার বাবা ও মামা আসিয়াছেন। বিন্দু বাপকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দ্বিজনাথের চিত্ত তখন এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার লক্ষ্য করিবার অনুকূল ছিল না। তিনি কঠোর বিচারকের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছিল, বল!"

বিন্দু সহসা উত্তর দিতে পারিল না। চক্ষু মুছিতে, কণ্ঠ বাষ্পমুক্ত করিতে খানিকটা সময় গেল। দ্বিজনাথ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কহিলেন, "ও সব পরে করো, এখন কি হয়েছিল শীগ্‌গির বল।"

"মা দাদাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"তা' বুঝেছি ; ঘটনাটা কি হ'য়েছিল তাই বল।"

"দাদা কলেজ যাবেন বলে ভাত খেতে এসেছিলেন, মা পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে মিছি মিছি করে বললেন ভাত হয় নি। দাদা কিছু খাবার চাইলেন—"

"বল, থামলে কেন? কেঁদো এর পরে। সে খাবার দিলে না?"

"না।"

"দিলে না? কি বল্‌লে?"

"গাল দিলেন।"

"তার পর?"

"আর আমি বলতে পারব না বাবা।"

"তোমাকে বলতেই হবে।"

"বাবা তোমার পায়ে পড়ি—"

"পায়ে পোড়ো এর পরে, এখন বল।"

"দাদাকে আমি খেতে ডাক্‌লুম, মা আসতে দিলেন না ; বললেন, সরিৎ বাড়ীতে তুমি আর থেকো না, সরিৎ অন্ন আর খেয়ো না ; যদি খাও—"

"যদি খাও, তা'হলে কি?"

"আমি তা' বলতে পারব না—তুমি আমাকে কেটে ফেললেও সে কথা আমি মুখে আন্‌তে পারব না।"

দ্বিজনাথ আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই যথেষ্ট। বাকিটুকু শুনিলে হয় ত তিনি ক্ষেপিয়া যাইতেন। ক্রোধ তখন তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল, ক্রোধের পিছনে আসিল আত্মগ্লানি। কেন তিনি প্রণবকে ফেলিয়া বিদেশে গেলেন? তুচ্ছ কয়েক হাজার টাকার জন্যে কেন তিনি দানবীর কাছে অমূল্য রত্ন রাখিয়া গেলেন? এ আত্মগ্লানি অসহ্য হইল। তিনি অন্দর মহলের দিকে ছুটিলেন। হরকালী তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "শান্ত হও।"

দ্বিজনাথ হাত ছিনাইয়া লইয়া রূঢ়ভাবে কহিলেন, "তুমি আমাকে স্পর্শ করো না, তোমার বুদ্ধির দোষে বাছা আজ

গৃহত্যাগী! হায় হায়! কেন আমি তোমার মত একটা আহাম্মুখের কথা শুনে তাকে ফেলে চলে গেলুম।"

"আমি শতবার আহাম্মুখ, সে কথা বলে আর কষ্ট পাও কেন? এখন আসানসোল হ'তে টেলিগ্রাফের জবাবটা দেখে আমি রওনা হচ্ছি। যদি কখন তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, তবেই আসব, নইলে এই শেষ দ্বিজনাথ।"

"কোথা যাচ্ছ?"

"দেখি কোথা তাকে খুঁজে পাই।"

"আগে দেখ সে ফেরে কি না।"

"সে আর ফিরবে না দ্বিজ।"

"ও কথা বলছ কেন?"

"বিন্দু কি বললে মন দিয়ে শুনেছ কি? সে আরাঙ্গাবাদ যায় নি—সে এ বাড়ী হ'তে অনেক দূরে সরে গেছে।"

"সে আমাকে চিঠি ত লিখবে।"

"লিখবে, কিন্তু ঠিকানা দেবে না।"

"পাছে আমি তা'কে ধরে আনি এই জন্যে বলছ?"

"হাঁ। এখন আমি যাই নৃসিংহকে কাগজপত্র সব বুঝিয়ে দিই গে।"

বলিয়া হরকালী প্রস্থান করিলেন। দ্বিজনাথ চিন্তিত অন্তরে বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন শোক আসিয়া তাঁহার অন্তর হ'তে ক্রোধকে তাড়াইয়াছে। যে আশা-বিহঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে বাসা বাঁধিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহা নিরাশা-ভুজঙ্গকে দেখিয়া উড়িয়া গেল। দ্বিজনাথ শোকাচ্ছন্ন অবসন্ন কণ্ঠে বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারও কি মনে হয় বিন্দু, সে আর ফিরবে না?"

বিন্দু উত্তর করিল না। দ্বিজনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন; বিন্দু তখন রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমার মনে হয় দাদা এ বাড়ীতে আর আসবেন না।"

"কেন তোমার এমন মনে হয়?"

"মা'র দিব্যি ঠেলে তিনি আসতে পারবেন বলে মনে হয় না।"

"দিব্যিটা কি এতই কঠোর?"

"তার চেয়ে কঠোর দিব্যি আর ত নেই বাবা।"

শোককে ঠেলিয়া দিয়া ক্রোধ আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। দ্বিজনাথ দ্রুতপদে অন্দরের দিকে চলিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, সন্ধ্যাতারার কক্ষদ্বারে রাধি কর্ণ সংলগ্ন করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া রাধি অনুচ্চকণ্ঠে কহিল "সর্ব্বনাশ!" সে আর তথায় দাঁড়াইল না—দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। দ্বিজনাথ ভৈরবকণ্ঠে ডাকিলেন, "রাধি!"

সে চীৎকার কক্ষমধ্যে মাতাপুত্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। ব্যাঘ্রের হুঙ্কারে তাঁহারা যতটা না চমকিত হইতেন, দ্বিজনাথের অপ্রত্যাশিত চীৎকারে তাঁহারা অধিকতর ভীত ও চমকিত হইলেন।

সরিৎ লাফাইয়া উঠিল—লেফাফাটা ঝটিতি পকেটে পুরিয়া ফেলিল। সন্ধ্যা হতবুদ্ধি হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

দ্বিজনাথ ক্ষণমধ্যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যাহারা আনন্দে বিগলিত হইবে, তাহারা কাঁপিতে লাগিল। কর্ত্তা কহিলেন, "সরিৎ, তুমি এখানে?"

সরিৎ নিরুত্তর।

"কার হুকুমে তুমি এখানে এসেছ?"

উত্তর নাই।

"জগা!"

"আজ্ঞে!"

"কতদিন হ'ল সরিৎ এখানে এসেছে?"

"আপনি যেদিন চ'লে যান তার পরদিন।"

"হুঁ। দাঁড়াও সরিৎ, পালিও না—মারব না, ভয় নেই; তোমার বাপ হ'লেও আমি পশু নই। (জগার প্রতি)—দু'জন চাকর ডাক।"

জগা প্রস্থান করিল। বিন্দু আসিয়া বাপের হাত ধরিল; কহিল, "বাবা, মাকে কিছু বোলো না।"

"বলে কি হ'বে বিন্দু? সাপ তা'র স্বভাব ছাড়তে পারে না। বলেছি অনেক, বুঝিয়েছি অনেক, কিন্তু—"

দুইজন ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তা কহিলেন, "এই ট্রাঙ্ক দুটো বাইরে নিয়ে যা—গাড়ী ডাক্—শিকদারবাগানে এদের রেখে দিয়ে আয়। (সরিতের প্রতি)—তোমাদের কিছু নেবার থাকে এই বেলা নেও—এক মিনিট সময়—হয়েছে—যাও—এ বাড়ী হ'তে তোমাদের চিরবিদায়—তোমাদের মুখ দেখতে আমার আর প্রবৃত্তি নেই; তবে খেতে না দিয়ে তোমাদের মারব না—মাসে মাসে খোরাকি পাবে—যাও।"

মাতাপুত্র বিদায় হইল। বিন্দু কাঁদিয়া ফেলিল। দ্বিজনাথ কহিলেন, "তুমি যেতে চাও বিন্দ ?"

"না, আমি তোমার কাছে থাকব।"

কর্ত্তা অন্দরমহলে চাবি বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। সদর অন্দরের মধ্যে যে দুইটা ঘরে প্রণব ও দ্বিজনাথ শয়ন করিতেন, সেই দুইটী ঘরে পিতাপুত্রী আশ্রয় লইলেন। পিতা কন্যাকে কহিলেন, "প্রণব তোমাকে বড় ভালবাসে, তুমি তা'র ঘরে শোও।"

(১১)

এ দিকে প্রণব যথাকালে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া একখানা মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কিনিল। যখন ষ্টেশনে আসিল, তখন গাড়ী ছাড়িতে বড় বেশী বিলম্ব নাই। সকল কামরা লোকে ভর্ত্তি। তৃতীয় শ্রেণীতে একটা বিড়ালেরও স্থান নাই; কেহ কেহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মধ্যম শ্রেণীতে কিছু স্থান ছিল, কিন্তু থাকিলে কি হয়? বাবুরা সব দরজা আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একটা কামরা অপেক্ষাকৃত খালি দেখিয়া প্রণব তাহাতে উঠিয়া পড়িল। কামরার ভিতর একটী বাবু বসিয়াছিলেন; তিনি কহিলেন, "এ কামরা রিজার্ভ; দেখিতে পাও না ছোক্‌রা লেবেল আট্‌কান রয়েছে?"

প্রণব তৎক্ষণাৎ নামিয়া পড়িয়া কহিল, "আমি দেখি নি—মাপ করবেন।"

পাশের কামরায় প্রণব উঠিতে গেল; দুইটী বাবু সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এখানে জায়গা নেই মশাই, অন্য গাড়ী দেখুন।" অথচ দুই জনের মত জায়গা ছিল। প্রণব তৃতীয় কামরার দ্বারে গিয়া স্থানপ্রার্থী হইল, সেখানেও পূর্ব্ববৎ সম্ভাষণ। চতুর্থ কামরার দ্বারে দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে আরোহীরা হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন। প্রণবের শুষ্ক মুখ ম্লান হইয়া গেল। পয়লা ঘণ্টা পড়িল। প্রণব ব্যস্ত হইয়া এ কামরায় সে কামরায় স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু কোথাও স্থান পাইল না।

এ দিকে রিজার্ভ কামরার বাবু হরিশঙ্কর তাঁহার স্ত্রী কৃষ্ণমতিকে কহিলেন, "ছেলেটা কোথাও জায়গা পেলে না।"

স্ত্রী। আহা! বেশ ছেলেটি! সঙ্গে আর কেউ আছে?

স্বা। না—কেউ নেই।

স্ত্রী। এ গাড়ীতে ওকে ডাক না, জায়গা ত অনেক পড়ে রয়েছে।

স্বা। তোমার যেমন কথা! রাতে আমরা ঘুমুই, আর আমাদের মেরে ধরে রেখে যাক্।

ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যা দেবরাণী পিতার পাশে বসিয়া ষ্টেশনের লোকজন দেখিতেছিল। সে কহিল, "বাবার যেমন কথা! ও রকম ছেলে কখন না কি কাউকে মারতে পারে!"

পিতা উত্তর করিল, "তোরা ত ভাবি বুঝিস দয়া করতে হয়, এই কেবল জানিস। দেখ, দেখ! ছেলেটা একটা কামরায় উঠ্‌তে যাচ্ছিল ভিতর হ'তে একটা জানোয়ার ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। ওহে ছোক্‌রা! ছোঁড়াটা মস্ত আহাম্মক—আমাকে কোন্ দু' চারবার বললে! না হয়, জিনিষগুলো সরিয়ে মেজেতে বস্‌তে একটু জায়গা করে দিতুম। তা' নয়, বিজ্ঞাস বলতে না বলতে বাবু অমনি রেগে তড়াক্ ক'রে নেমে চলে গেলেন! আমি ত আর বেশী কিছু বলি নি, ধাক্কাও মারি নি। নাঃ—ছোঁড়াটা ভোগালে দেখ্‌ছি—কোথাও জায়গা পেলে না, এ দিকেও আসছে না—নাম্‌তে হ'ল—গাড়ীও ছাড়ে ছাড়ে।—"

বলিতে বলিতে হরিশঙ্কর নামিয়া পড়িলেন; এবং চঞ্চল চরণে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া প্রণবের হাত ধরিলেন। তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন—"তুমি ত বড় বোকা হে, নাও এখন এস।" তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া নিজের গাড়ীতে উঠাইলেন। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

কামরায় চারিজন আরোহী ছিলেন।—কর্ত্তা, গিন্নী, কন্যা, ও একজন দাসী। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় অন্যান্য দাসদাসী ছিল।

প্রণব কামরায় প্রবেশ করিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কন্যা দেবরাণী তাহার স্থান ছাড়িয়া দিয়া মায়ের পাশে গিয়া বসিল। হরিশঙ্কর তাহাকে কহিলেন, "ওরে বাপ্‌রে! তুই যে এর শোবার জায়গা করছিস দেখছি! বস্‌তে জায়গা পায় না আবার শোবার স্থান। ওহে ছোক্‌রা, আমার এখানে এসে বোস।"

"আজ্ঞে না, আমি দাঁড়িয়েই থাকি।"

"দাঁড়িয়ে থাকি বললেই হ'ল! তুমি তবে এ কামরায় এলে কেন?"

"আপনাদের কেন মিছে কষ্ট দেব।"

"আমাকে প্ল্যাটফর্মে ছুট্ করিয়ে কষ্ট যা' দেবার দিয়েছ, এখন আর ভুগিও না—বসে পড়।"

প্রণব সঙ্কোচের সহিত একপাশে বসিল। হরিবাবু কহিলেন, "ভাল হ'য়ে ব'স না হে; তুমি কি এখনি নামচ?"

"আজ্ঞে না।"

"তুমি কতদূর যাবে?"

"ঠিক নেই।"

"সে কি রকম? টিকিট কেটেচ, না রেল-কোম্পানীকে ফাঁকি দিচ্ছ?"

"টিকিট কেটেচি।"

"কোন্ জায়গার?"

"কাশির।"

"কই দেখি—তোমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না, কেমন কেমন ঠেকচে। হ্যাঁ, কাশির টিকিট বটে। সেখানে তোমার কে আছে?"

"কেউ নেই।"

"তবে যাচ্ছ কেন?"

উত্তর নাই। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া হরিবাবু কহিলেন, "বুঝিচি, পালাচ্ছ। তুমি ত অতি বেয়াড়া ছেলে। লেখাপড়া কিছু করেছ? না, দেখতেই মাকাল ফল?"

"কিছু কিছু পড়েছি।"

"কতদূর শুনি?"

"আজ বি-এ পরীক্ষা শেষ হ'ল।"

"তাহ'লে ত মন্দ নয়।"

প্রণব জানালা দিয়া গাছপালা দেখিতে লাগিল। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ট্রেণ ভীষণ দৈত্যের ন্যায় দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া ছুটিল। অনেকক্ষণ পরে কৃষ্ণমতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথা বাবা?"

"কোলকাতা।"

"কি জাত?"

"ব্রাহ্মণ।"

"তোমার নাম কি?"

প্রণব এ প্রশ্নের জন্যে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। প্রকৃত পরিচয় কাহাকেও দিবে না স্থির করিয়াছিল। মিথ্যা বলিতেও প্রবৃত্তি নাই। নামটা একটু ঘুরাইয়া নতবদনে উত্তর করিল, "মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

কৃষ্ণমতি স্বামীর পানে মুহূর্ত্তের জন্যে চাহিলেন। চাহিবার একটু উদ্দেশ্যও ছিল; তাঁহারা মুখোপাধ্যায়, কন্যাও অবিবাহিতা। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাপের নাম কি?"

"ক্ষমা করবেন, এর বেশী পরিচয় আমি আপাততঃ দিতে পারব না।" তাহার কণ্ঠের দৃঢ়তা দ্বিতীয় প্রশ্নের পথ বন্ধ করিল।

গাড়ী বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌছিল। ফিরিওয়ালাদের চীৎকারে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। কৃষ্ণমতি কহিলেন, "কিছু সীতেভোগ মিহিদানা কিনে নেও।"

"রামঃ! ওগুলো আবার খাদ্য!"

"অখাদ্যগুলোই দু' টাকার কিনে নেও।"

কর্ত্তা আর প্রতিবাদ না করিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। প্রণবও নামিল। দেবরাণী এইবার মুখ ছাড়িল, কহিল, "বেশ ছেলেটি; না, মা?"

"তুই কি ওর চেয়ে বড়, যে ছেলে ছেলে করচিস?"

"তবে কি বলে ডাকব?"

"তোকে ডাকতে হবে না; রাত পোয়ালে কে কোথা যাবে তা'র ঠিক নেই। (দাসীর প্রতি)—ওরে নেত্য, সোরাইতে জল আছে?"

"একটু আছে।"

"তবে চট্ করে নেমে যা', কল থেকে জল নিয়ে আয়।"

"আমি পারব না মা। কোথা কল, কে কি বলবে—"

"মরণ আর কি! জল আনবি, তা' আবার কে কি বলবে রে?"

হরিশঙ্কর দুই হাতে দুইটা চেংড়া লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মতি কহিলেন, "ওগো, সোরাইতে জল নেই যে!"

"চাকর বেটারা কেউ নামেনি বুঝি?"

খাবারের পয়সা ধ'রে দিয়েছ, তা'রা আর নামে!"

"দাঁড়াও, কাল তাদের উপোস করিয়ে মারব।"

"কালকের কথা পরে হবে, এখন জল আন।"

"আসানসোলে জল নেব, এখানে গাড়ী দশমিনিট মাত্র থামে।"

তাঁদের গাড়ীর পাশে ১ম ও ২য় শ্রেণীর গাড়ী। প্রণব নিকটেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে শুনিল, একজন কর্ম্মচারী দ্বারে দ্বারে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেছিল, "এ গাড়ীতে প্রণব নামে কোন ছোকরা আছে?"

প্রণব বুঝিল, তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে। সে গা-ঢাকা দিল; যখন ঘণ্টা পড়িল, তখন ছুটিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

আসানসোলে গাড়ী আসিল রাত্রি নয়টায়। কৃষ্ণমতি জলের জন্যে পুনরায় তাগাদা করাতে হরিশঙ্কর সোরাই লইয়া নামিলেন; প্রণব—অতঃপর মঙ্গল—তাঁহার হাত হইতে সোরাই লইয়া জল আনিতে গেল। যখন জল লইয়া ফিরিতেছে, তখন একটা লোকের ধাক্কা লাগিয়া সোরাই হস্তচ্যুত হইল এবং ভাঙ্গিয়া তাহার জুতা কাপড় ভিজাইল। মঙ্গল হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণকাল জলের উপর দাঁড়াইয়া রহিল; তা'র পর সোরাইয়ের অন্বেষণে এ-দিক ও-দিক ছুটিতে লাগিল। এক ব্যক্তি কয়েকটা সোরাই লইয়া একধারে বসিয়া ছিল। তাহার নিকট হইতে একটা কর্করী খরিদ করিয়া মঙ্গল তাহা জলপূর্ণ করিল এবং সতর্কতার সহিত লইয়া গাড়ীতে উঠিল। হরিশঙ্কর কহিলেন, "তোমার এত দেরী হ'ল যে? এ কি! এটা যে নূতন সোরাই! সেটা কোথা গেল?"

"সেটা ভেঙ্গে গেছে।"

"বাঃ, তুমি ত বড় কাজের লোক! আমি তখুনি জানি—"

কৃষ্ণমতি বাধা দিয়া কহিলেন, "তুমি চুপ কর, দেখছ না বাছার কাপড় চোপড় ভিজে গেছে! (মঙ্গলের প্রতি)—নেও জুতো খোল, কাপড়টা বদলাও।"

মঙ্গল। থাক্ গে---

কৃষ্ণমতি। থাকবে কেন? বিদেশে ব্যারাম করে বসবে—কাপড় দেব?

মঙ্গল। না, দিতে হবে না—কাপড় আছে।

হরি। কাপড় তোমার ঢের আছে জানি—তুমি খুব বড়মানুষের ছেলে। এখন আমার একখানা কাপড় নিয়ে পর।

ম। পাশের গাড়ীতে এখন জায়গা হয়েছে, আমি ওখানে যাই।

হ। কেন, এখানে কি তোমাকে বিছে কামড়াচ্ছে?

ম। আপনাদের এখানে স্থানাভাব ঘট্‌তে পারে।

হ। আমাদের কষ্ট হয় আমরা বুঝব, তোমার লম্বা চওড়া বক্তৃতার দরকার নেই। ভারি ডেঁপো ছেলে।

কথাটার কার্কশ্য দূর করিবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণমতি একটু হাসিয়া কহিলেন, "স্পষ্ট কথায় বল না কেন, তুমি মঙ্গলকে ছেড়ে দেবে না।"

"তোমার যেমন কথা! আমি কাউকে ধরে রাখতে চাই নে। তবে কি জান, মঙ্গল একা, ছেলেমানুষ, পথে চোর ডাকাত—"

"আমিও ত তাই বলছি গো।"

"নেও, এখন খাবার বার কর।"

(১২)

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। কৃষ্ণমতি বড় বড় দুইটা টিফিন কেরিয়ার এক কোণ হইতে টানিয়া আনিলেন। মঙ্গল জানলার ধারে বসিয়া অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল। অন্ধকার এত সুন্দর তাহা সে জানিত না। অন্ধকার নিত্য বলিয়া বুঝি তাহার এত সৌন্দর্য্য! সংসারী জীব অনিত্যের অভিলাষী, তাই আলো খোঁজে। কিন্তু আলোর রূপ নাই, সে রূপ দেখায় মাত্র। মঙ্গলের এখন আলো ভাল লাগিতেছিল না, তাই সে অন্ধকার পানে চাহিয়া তাহার জ্যেঠার কথা চিন্তা করিতেছিল। সে জানিত না, একটু পূর্ব্বে দুই জন রেল কর্ম্মচারী প্রত্যেক শ্রেণীর গাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া প্রণবের অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছে। সে তখন সোরাই কিনিতে ব্যস্ত ছিল। কর্ম্মচারীরা যখন রিজার্ভ গাড়ীর দ্বারে প্রণব প্রণব বলিয়া চীৎকার ছাড়িতেছিল, তখন হরিশঙ্কর রুখিয়া উঠিয়া কহিয়াছিলেন, "এ কি অত্যাচার মশাই? একে ত ফেরিওয়ালাদের জ্বালায় কান পাতবার যো নেই, তার পর আপনাদের—" মন্তব্যের অবশিষ্টাংশ না শুনিয়া তাঁহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যাক্, ট্রেণ ত চলিতে লাগিল। মঙ্গলের সারাদিন খাওয়া হয় নাই। কিন্তু ক্ষুধাও নাই। কৃষ্ণমতি তিনখানি রেকাবিতে খাবার সাজাইয়া মঙ্গলকে ডাকিলেন। মঙ্গল তখন অন্ধকার ছাড়িয়া আলোকের পানে চাহিল। সম্মুখে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। কি সুন্দর মূর্ত্তি! কি স্নেহ, কি করুণা,

কি মাধুর্য্য সেই মুখখানিতে! মঙ্গল এতক্ষণ হরিশঙ্কর ব্যতীত আর কাহারও মুখপ্রতি চাহিয়া দেখে নাই। এক্ষণে মাতৃমূর্ত্তি পানে সহসা তাহার নয়ন পতিত হওয়ায় সে বিহ্বল হইল। আবার যখন মূর্ত্তি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ডাকিল, "মঙ্গল, বাবা, রেকাবিখানা ধর, জল দিচ্ছি।"

কি মিষ্ট সম্ভাষণ! তাহার জ্ঞান হওয়া অবধি নারীকণ্ঠে এমন মিষ্ট সম্ভাষণ সে শুনে নাই। মঙ্গলের হৃদয় স্নিগ্ধ হইল। প্রাতঃকাল হইতে তাহার বুকের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল—আহার চাহিতে গিয়া গাল খাইয়াছিল। এখন আহার চায় নাই, কিন্তু পাইল আহার ও আদর।

মঙ্গল কহিল, "আমি কিছু খাব না মা।"

মঙ্গলের অজ্ঞাতে মা-শব্দ উচ্চারিত হইল। মা বলিয়া ডাকিতে বুঝি তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ডাক তাহাকে একটু শান্তি দিল, আর যাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিল, তাঁহার হৃদয়ও আকর্ষণ করিল। তিনি কহিলেন; "খাবে বই কি বাবা, নেও—ধর।"

"আমার ক্ষুধা নেই।"

হরি। কখন খেয়েছ?

উত্তর নাই।

হরি। বল না হে।

মঙ্গ। আজ কিছু খাই নি।

হরি। (বিস্ময়ার্ত্ত কণ্ঠে) সমস্ত দিন খাও নি?

মঙ্গল উত্তর করিল না।

কৃষ্ণ। বাছার মুখখানি তাই শুক্‌।

হরি। কেন খাও নি? মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছ বুঝি?

মঙ্গ। আমার মা নেই।

কৃষ্ণ। আহা! এই বয়সেই মা হারিয়েছ?

হরি। তবে বুঝি বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছ?

মঙ্গ। আমার বাপ নেই।

হরি। তবে থাক কা'র কাছে?

মঙ্গ। জ্যেঠার কাছে।

হরি। তিনি বুঝি তোমাকে ভালবাসেন না?

মঙ্গ। খুব ভালবাসেন।

হরি। তবে তুমি ঝগড়া করলে কার সঙ্গে?

মঙ্গ। আমি ত কারুর সঙ্গে ঝগড়া করি নি।

হরি। তবে তুমি না খেয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে এলে কেন?

উত্তর নাই।

হরি। তুমি বলবে না দেখচি। আচ্ছা তুমি আসবার সময় তোমার জ্যেঠাকে ব'লে এসেছিলে?

মঙ্গ। জ্যেঠা বাড়ী ছিলেন না।

হরি। ওঃ বুঝেচি—তোমাদের ঘরে টানাটানি, তাই তুমি বিদেশে পয়সা রোজগার করতে বেরিয়েছ। নেও, এখন খাও। এর পরে—

কৃষ্ণ। তোমার যেমন বুদ্ধি! দেখচ না মঙ্গল বড়-ঘরের ছেলে।

হরি। বড়ঘরের ছেলে যদি হবে তবে খেতে পায় না কেন?

কৃষ্ণ। আচ্ছা মঙ্গল, তোমার জ্যেঠাইমা আছেন?

মঙ্গ। আছেন।

কৃষ্ণ। তিনি তোমাকে দেখতে পারেন না, না?

মঙ্গল নিরুত্তর।

কৃষ্ণ। আচ্ছা মঙ্গল, তোমার মোটর গাড়ী আছে?

মঙ্গ। জ্যেঠা একখানা আমাকে কিনে দিয়েছেন।

কৃষ্ণমতি কর্ত্তার পানে চাহিলেন। হরিশঙ্কর কহিলেন, "ও সব বাজে কথা রেখে দেও, এখন মঙ্গল খেতে বস।"

মঙ্গ। আমার খেতে ইচ্ছে নেই।

হরি। তবে জান্‌লা দিয়ে ফেলে দেও; আমিও ফেলে দি। সমস্ত দিন খেয়ে খেয়ে আমার পেট আর কিছু নিতে চাইছে না—হেউ—হেউ।

কৃষ্ণ। মঙ্গল খাবে বই কি—তুমি অমন করো না। (মঙ্গলের প্রতি)—খাও ত বাবা—আমি খাইয়ে দেব?

মঙ্গ। আমি খাচ্ছি মা।

মঙ্গল হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া ভোজনে বসিল। হরিশঙ্কর তখন কহিলেন; "আমিও যা' পারি খেয়ে নি।"

তিনি পারিলেন মন্দ নয়—গৃহিণীকে আরও কিছু যোগাইতে হইল। গৃহিণী কর্ত্তার শূন্য থালি লইয়া আহারে বসিলেন। কন্যা হাত ধুইয়া মাকে পরিবেষণ করিল। তাঁহার আহারাদি শেষ হইলে কর্ত্তা পাণ চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন, "এইবার বিছানাটা করে ফেল।"

"করছি, ব্যস্ত হ'য়ো না।"

কামরায় চারখানা ছোট বেঞ্চ। জিনিষপত্রে একখানা জোড়া ছিল। সেগুলি সরাইয়া গৃহিণী তদুপরি শয্যা বিছাইলেন। মঙ্গলের ব্যবহারার্থ এক পাশের বেঞ্চ নির্দ্দিষ্ট হইল; এবং তাহার উপর সতরঞ্চ ও বালিস পড়িল হরিশঙ্কর কহিলেন, "ওহে মঙ্গল, শুয়ে পড়।"

মঙ্গল সঙ্কুচিতভাবে কহিল, "আমার—আমার শোবার বিশেষ দরকার দেখছি নি।"

"দরকার না থাকে দাঁড়িয়ে থাক।"

"আমি পাশের গাড়ীতে যাই না কেন?"

"সেখানে কি তোমার দাঁড়াবার সুবিধেটা ভালরকম হবে?"

"এখানে আপনাদের অসুবিধা—"

কৃষ্ণমতি কহিলেন, "আমাদের অসুবিধা কি? বেঞ্চখানা পড়ে থাকৃত, না হয় তুমি শোবে।"

মঙ্গল আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না—শুইয়া পড়িল। ট্রেণ তখন সীতারামপুর ছাড়াইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। নিদ্রাদেবী কামরার ভিতর আসিলেন বটে, কিন্তু মঙ্গলের কাছে সহসা ঘেঁষিতে পারিলেন না। চিন্তা তখন তাহাকে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে; কাজেই দেবী লজ্জায় চিন্তার সম্মুখে আসিলেন না—একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ট্রেণ জামতাড়া, কর্ম্মাটার ছাড়াইল, মঙ্গল তখনও ঘুমায় নাই; তা'র পর কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তে নিদ্রাদেবী তাহাকে অধিকার করিয়া বসিলেন। মধুপুরে গাড়ী আসিল, ছাড়িল, মঙ্গল কিছুই জানিতে পারিল না।

মধুপুর ছাড়াইবার পর সহসা তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, দেবরাণী তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া নাড়া দিতেছে। মঙ্গল কহিল, "কি?"

"শীগ্‌গীর উঠুন, বাবাকে যে ওরা মেরে ফেল্‌লে।"

মঙ্গলের পাশের বেঞ্চে হরিশঙ্কর শয়ান ছিলেন। তাঁহার পদতলে এক ব্যক্তি ছোরা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অপর এক ব্যক্তি অপর পাশের দুইখানা বেঞ্চের মধ্যে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণমতির বলয় লইয়া টানাটানি করিতেছিল। মঙ্গল চকিতমধ্যে অবস্থাটা দেখিয়া লইল; তার পর সে শয়ান অবস্থাতেই খড়্গধারী দস্যুর উরুদেশে এত জোরে পদাঘাত করিল যে, সে ব্যক্তি কাষ্ঠ-প্রাচীরের উপর গিয়া সজোরে পড়িল এবং মস্তকে বিষম আহত হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি কৃষ্ণমতিকে ছাড়িয়া মঙ্গলকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। মঙ্গল হাতের গোড়ায় একটা ঘটি পাইল, তাহা লইয়া সে লাফাইয়া উঠিল এবং তদ্দ্বারা দস্যুর ললাটে সজোরে আঘাত করিল। দস্যু বসিয়া পড়িল। চকিতমধ্যে মঙ্গল সরিয়া আসিয়া শিকল ধরিয়া টানিল। ইত্যবসরে প্রথম দস্যু ছোরাখানা হস্তগত করিল এবং মঙ্গলের চরণের উপর বিপুল শক্তিতে আঘাত করিল। যদি আঘাতের সমস্ত বেগটা মঙ্গলের চরণের উপর পড়িত, তাহা হইলে বোধ হয় মঙ্গলকে চিরদিন খঞ্জ হইয়া থাকিতে হইত। বিধাতার কৃপায় আঘাতটা বেঞ্চে প্রতিহত হইয়া চরণের উপর পড়িল। আঘাত গুরুতর না হইলেও রক্ত ছুটিল। মঙ্গল সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া আঘাতকারীর নাকের উপর এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল।

এ দিকে গাড়ীর বেগ কমিয়া আসিল। দ্বিতীয় দস্যু তদ্দৃষ্টে পলায়ন-তৎপর হইল। হরিশঙ্কর সবেগে উঠিয়া তাঁহার যষ্টির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন; যষ্টি তখন বেঞ্চের তলায় গড়াগড়ি যাইতেছিল। যখন তাহা হরিবাবুর হস্তগত হইল, তখন দস্যু দ্বার খুলিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছে। পাশের কামরা হইতে চীৎকার উঠিল—একটা লোক লাফিয়ে পড়্‌ল—নিশ্চয় ডাকাত।

গাড়ী থামিল—গার্ড সাহেব আসিল। মঙ্গল সাহেবকে ঘটনাটা বলিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; প্রথম দস্যু এই সুযোগে উঠিয়া মঙ্গলকে এক ধাক্কা মারিল। মঙ্গল সবেগে গিয়া পড়িল সাহেবের টুপির উপর; তথা হইতে সাহেবকে লইয়া লম্বা ঘাসের উপর। দস্যু সেই সুযোগে বিপরীত দিকের দ্বার খুলিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িল এবং অন্ধকার মধ্যে সত্বর অদৃশ্য হইল।

(১৩)

জেসিডি ছাড়াইয়া ট্রেণ ছুটিতেছে। দেবরাণী মঙ্গলের ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগাইতেছে। হরিশঙ্করের হোমিওপ্যাথী ঔষধের একটা বাক্স ছিল; তিনি এই বাক্স ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। তিনি নাসিকার উপর চশমা লাগাইয়া ক্ষত পরীক্ষা করিলেন, তার পর ট্রাঙ্ক খুলিয়া একটা মোটা

কেতাব বাহির করিলেন, ক্ষতের কি ভাবে চিকিৎসা করিতে হয় সে সম্বন্ধে কেতাবের নিকট হইতে বিধান গ্রহণ করিলেন; কিন্তু লক্ষণাদি কেতাবের সহিত ঠিক মিলিল না। ডাকাতে ছোরা মারিলে কি ঔষধ খাওয়াইতে হয় তাহা কেতাবে লেখা নাই। অবশেষে তিনি ক্ষুণ্ণ মনে ঔষধের বাক্স খুলিয়া একটা ঔষধ রোগীকে খাওয়াইলেন। অপর একটা ঔষধ কাচ পাত্রে কিছু ঢালিয়া,তাহাতে জল মিশাইলেন; এবং প্রয়োগের ভার দিলেন দেবরাণীকে। মঙ্গল কর্ত্তা গিন্নীকে চরণ স্পর্শ করিতে দিল না, নিজেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে উদ্যত হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে কর্ত্তা এত চটিয়া উঠিয়াছিলেন যে, মঙ্গল পাখানির সমুদায় স্বত্ব দেবরাণীকে ছাড়িয়া দিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

গাড়ীতে উঠিয়া অবধি মঙ্গল দেবরাণীর মুখের দিকে চায় নাই; একবার ঘুমের ঘোরে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার মুখের উপর সহসা দৃষ্টি পড়িল। দৃষ্টি আর ফিরিতে চাহিল না। কাশ্মীরের প্রান্তে অমরনাথ দর্শনে যে গিয়াছে, সে প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া পথের দিকে আর চাইতে পারে না। শান্ত সুন্দর সলজ্জ ব্যাকুল মুখ পানে মঙ্গল চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল সে যেন বিন্দুকে দেখিতেছে, কিন্তু বিন্দু ত এত সুন্দর নয়! এ যে বড় সুন্দর, বড় মিষ্ট! মঙ্গল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিন্দুকে চিন্তা করিল; কিন্তু বিন্দুর মূর্ত্তি বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না—চন্দ্রোদয়ে নক্ষত্রের ন্যায় মলিন হইল।

পাশের বেঞ্চে কর্ত্তার পদতলে বসিয়া কৃষ্ণমতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমুলে বাবা?"

"না, মা।"

"খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"একেবারেই না।"

কর্ত্তা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন; কহিলেন, "যন্ত্রণা হ'বে কেন? এ ঔষধ লাগানোর পর কি যন্ত্রণা হ'তে পারে? সেদিন দেখলে ত নেত্যর কান কামড়াচ্ছিল; যেমন কানের ভেতর দু' ফোঁটা ওষুধ দেওয়া, আর অমনি আরাম।"

"তোমার ভয়ে নেত্য বলেছিল তার কান ভাল হয়েছে।"

"আমার ভয়ে কি রকম?"

"পাছে তুমি কেরোসিন বা আলকাৎরা দেও।"

হরিশঙ্কর স্ত্রীর মুখপ্রতি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। অতঃপর কহিলেন, "দেখ, চিকিৎসা-শাস্ত্র জান্তে হ'লে একটু লেখাপড়া জানা দরকার।"

"তুমি ব্যবসাই শিখেছ, চিকিৎসা শাস্ত্র কবে শিখলে তা' ত জানি নে।"

"আগে মঙ্গল ভাল হো'ক, তখন জান্‌বে। (গম্ভীর ভাবে দেবীর প্রতি)—ন্যাকড়া যেন শুকোয় না দেবি!"

কর্ত্তা তখন তামাক খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিত্য সাজিতে যাইতেছিল, তাহাকে সাজিতে না দিয়া গিন্নী নিজেই তামাক সাজিতে বসিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মঙ্গল, ডাকাত দুটো যখন কামরায় এসে ঢুক্‌ল, তখন তুমি জেগেছিলে?"

"না, গাড়ী কর্ম্মাটার ছাড়বার পরই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

কর্ত্তা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমি যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা' বুঝতে পারি নি; বোধ হয় মধুপুরে গাড়ী আসবার পর।"

গৃহিণী হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আসানসোল ছাড়তে না ছাড়তেই তোমার নাক ডাকছিল।"

"বটে! আমি তা' একেবারেই বুঝতে পারি নি।"

"বুঝলে যখন ডাকাত দুটো ঘরে ঢুকল, না?"

"তখন কি ছাই বুঝিছি! বুঝলাম যখন দেবী আমার মাথা নাড়া দিয়ে ডাকছে।"

"দেখছি দেবীই শুধু জেগে ছিল; ওই ত মঙ্গলকে ডেকে তোলে।"

"আমি দেখছি—বুঝেছ—ভগবান্ সত্যিই মঙ্গলময়।"

"বটে! ভগবান্ তোমার সার্টিফিকেট পেয়ে ধন্য হ'লেন।"

"আহা, ঠাট্টা করছ কেন? এই দেখ না কেন, এই ছোকরা যদি রাগ করে না আসত, তা'হলে আজ আমাদের কি সর্ব্বনাশই ঘটত!"

"রাগ করে এসেছে—সেটা কি ওর পক্ষেও মঙ্গলের?"

"নিশ্চয়ই। এখন বুঝা যাচ্ছে না, এর পরে একদিন বুঝা যাবে।"

"মঙ্গল এসেছিলেন আমাদের মঙ্গলরূপী রক্ষাকর্ত্তা হ'য়ে।"

"ছোকরার গায়ে জোর মন্দ নেই—শিক্ষাও বেশ।"

মঙ্গল, দেবরাণীকে কহিল, "ওষুধ আর লাগাতে হবে না,—তুমি শোও গে।"

প্রলোভন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ফাইন আর্ট প্রদর্শনীর ভারতীয় শিল্পকলা বিভাগে

—প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত—

হরিবাবু চটিয়া উঠিলেন ; গুড়গুড়ির নলটা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি ত ভারি ডেঁপো ছেলে! আমি বললাম দিতে হবে, আর তুমি বলছ দিতে হবে না!"

মঙ্গল। আজ্ঞে জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই আর নেই, এঁকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া—

কৃষ্ণ। তুমি ওকে দেবী বলে ডেকো, ও তোমার ছোট বোনের মত।

মঙ্গল। যদি ওষুধ লাগাবার দরকার মনে করেন, তা'হলে আমি না হয় নিজে লাগাচ্ছি।

বলিয়া মঙ্গল উঠিয়া বসিল। কৃষ্ণমতি কহিলেন, "আচ্ছা দেবি, তুই চলে আয়।"

"আমার একটুও ঘুম পায় নি মা।"

"তুই ত একটুও ঘুমস নি বাছা।"

"গাড়ীতে আমার ঘুম হয় না, তার চেয়ে কাজ পেলে আমি বেশ থাকি।"

মঙ্গল পা টানিয়া লইল। অগত্যা দেবী উঠিয়া গিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় বসিল।

পরদিন প্রভাতে হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'হলে মঙ্গল, তুমি কাশীতে যাচ্ছ?"

"সেই রকম ইচ্ছা করেছি।"

"সেখানে গিয়ে থাক্‌বে কোথা?"

"এখন গিয়ে ধর্ম্মশালায় উঠব, তার পর—"

"তার পর রাস্তায় দাঁড়াবে। যত বেটা জোচ্চোর বদমায়েস ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নেয়, আর রাহাজানি করে। দু'দিনেই ফতুর হ'য়ে তোমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

কৃষ্ণমতি মঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ত কাশীতে বিশেষ কিছু দরকার নেই বাবা!"

মঙ্গ। বিশেষ কিছু দরকার নেই বটে—

কৃষ্ণ। তবে আমাদের সঙ্গে চল না কেন?

মঙ্গ। আপনারা কোথা যাবেন?

কৃষ্ণ। বিন্ধ্যাচলে।

মঙ্গ। একবার বিশ্বেশ্বরকে দর্শন না করে কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই। ছেলে বয়েস হ'তে তাঁর কথা শুনছি—

হরিশঙ্কর কহিলেন, "আমার মনে পড়ছে, আমি একবার দেবীর কল্যাণে সঙ্কটমোচন শিবের দ্বারে পূজো 'মানৎ' করেছিলাম। সেই যে গো, দু' তিন বছর আগে দেবীর যখন খুব পেটের ব্যামো হ'ল—আমি 'মানৎ' করেছিলাম না? পূজোটা দেওয়া হয় নি। চল না কেন, আমরা এই সুযোগে পূজোটা দিয়ে আসি।"

কৃষ্ণ। সে ত ভাল কথা। তীর্থ করতে বেরিয়ে কোন তীর্থে একবারের যায়গায় দু'বার গেলে দোষ কি?

হরি। তীর্থ করতে ত বেরিয়েছি; কিন্তু হ'ল মোটে কালীঘাট, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ। বাকি ত এখন বহুত—

কৃষ্ণ। কিন্তু বরাবর আমার রিজার্ভ গাড়ী চাই, আমি ভিড়ের ভেতর ব'সে যেতে পারব না।

হরি। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দেও, এখন কাশী যাওয়াই ঠিক ত?

কৃষ্ণ। ঠিক বই কি। মঙ্গলকে তুমি কি আর ছাড়ছ?

হরি। তুমি বোকার মত বকচ—একটু লেখাপড়া জানা না থাকলে—

[হরিবাবু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যায় ছাড়িয়াছিলেন, কৃষ্ণমতি পরীক্ষাটা দেন নাই।]

কৃষ্ণ। আমি জানতাম না তুমি এর মধ্যে এত বড় পণ্ডিত হ'য়ে উঠেছ। তা' মূর্খের কথাটা দেখে নিও।

হরি। তুমি বড় বাজে কথা বল মতি। (মঙ্গলের প্রতি) তা'হ'লে কাশীতে বিশ্বেশ্বর দর্শন ছাড়া তোমার আর কোন কাজ নেই?"

"আজ্ঞে না।"

"দর্শন করে কোথা যাবে স্থির করেছ?"

"স্থির কিছু করি নি।"

"তাহলে আমাদের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করতে চল না কেন?"

"আপনারা কোথা কোথা যাবেন?"

"দ্বারকা, হরিদ্বার, রামেশ্বর, যেখানে ইচ্ছা হবে সেখানে যাব।"

"আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

উত্তর নাই।

"বল না হে।"

"আমার কাছে বেশী টাকা নেই।"

"তুমি ত বড় বোকা ছেলে! শুনছ আমরা গাড়ী রিজার্ভ করে বরাবর যাব। মানুষ ত আমরা এই তিন জন, সেকেণ্ড ক্লাস নিলে ভাড়া দিতে হবে পাঁচ জনের। তোমার

ভাড়াটা তোমাকেও দিতে হবে না, আমাকেও দিতে হবে না। বল, আমাদের সঙ্গে যাবে ত ?"

"আপনাদের অনর্থক কষ্ট দেব—"

"ঢের ঢের বেয়াড়া ছেলে দেখেছি, তোমার মত একটাও আমার চোখে পড়ে নি। আমাদের কষ্ট বোঝবার ভারটা তুমি না নিয়ে আমাদের উপর ফেলে দেও না।"

মঙ্গল হাসিতে হাসিতে কহিল, "আজ্ঞে যাব।"

হরিবাবু কহিলেন, "সোজা কথাটা বললেই ত চুকে যেত। তুমি যেতে রাজি না হ'লে তোমাকে আমি সহজে ছাড়তাম না।"

কৃষ্ণ। তা' আমি বুঝেছিলাম। মর্থের কথাটা দেখলে ত—

হরি। তা'হ'লে আমরা মোগলসরাইতে নেমে পড়ি, কি বল মতি ? লাগেজগুলা কিন্তু বিন্ধ্যাচলে যাবে। তা' যাক, ষ্টেশন মাষ্টারকে একটা 'তার' করে দিলেই চলবে।

কৃষ্ণ। কাশী হ'তে আমরা ফিরব কখন ?

হরি। আজ আর নয়—কাল সকালে। এবার সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ করব। আমরা এখন পাঁচজন হয়েছি; চারজন চাপব, আর পাঁচ জনের যে ভাড়াটা দেব, এত বোকা আমি নই। আমরা ব্যবসাদার মানুষ, কেউ যে ঠকিয়ে যাবে—

কৃষ্ণ। এতদিন চার জন চেপে আট দশ জনের যে ভাড়া দিচ্ছিলে—

হরি। তুমি বড় বাজে কথা বল। যাক্, মোগলসরাই এসে পৌছুন গেছে নেও, গুছিয়ে নেও।

(১৪)

যে সময় মঙ্গল কাশীতে বসিয়া তাহার জ্যেঠামহাশয়কে পত্র লিখিতেছিল, সে সময় দ্বিজনাথ বৈঠকখানায় বসিয়া ভজুর টেলিগ্রাম পাঠ করিতেছিলেন। ভজু 'তার' করিয়াছে, দাদাবাবু এ দিকে আসেন নাই। পুনঃ পুনঃ টেলিগ্রাম পাঠ করিবার পর তিনি দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি মনে হয় হরকালী ?"

"আমার বুদ্ধি-বিবেচনা কিছুই আর নাই, আমাকে জিজ্ঞেসা করা বৃথা।"

"সে কি পশ্চিমে গেল ?"

"হয় ত গেছে।"

"তা হলে ত বাছার বড় কষ্ট হবে—যে গরম !"

"কষ্ট হবেই ত। সে কি তা'র কষ্টের কথা ভেবে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে ? সে ভেবেছে শুধু এ বাড়ীতে তা'কে আর আসতে না হয়।"

"তা'কে আনতেই হবে হরকালী, তুমি আজই যাও।"

"একটু পরেই দিল্লী এক্সপ্রেসে আমি যাচ্ছি। নৃসিংহকে কাগজপত্র টাকা কড়ি সব বুঝিয়ে দিয়েছি—"

"চুলোয় যাক টাকা কড়ি, তুমি এখনি যাও। তোমার অপেক্ষায় আমি আট দশ দিন থাকব; যদি তুমি এর মধ্যে তা'কে নিয়ে না ফেরো, তাহলে আমিও যাব।"

পরদিন অপরাহ্ণে মঙ্গলের পত্র আসিল। দ্বিজনাথ কম্পিত হস্তে পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন,—

শ্রীচরণাম্বুজেষু

জ্যেঠামহাশয়, আপনি বাড়ী ফিরিয়াছেন মনে করিয়া বাড়ীর ঠিকানাতেই পত্র লিখিলাম।

আপনাকে না বলিয়া আমি চলিয়া আসিয়াছি, আমার মহা অপরাধ হইয়াছে, কিন্তু সে বাড়ীতে কোনমতেই আমি আর থাকিতে পারিলাম না।

আমি কাশী আসিয়াছি, কাল সকালে কাশী ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইব। হরিদ্বার, দ্বারকা, রামেশ্বর যাওয়া ঘটিতে পারে। আমি এক স্থানে স্থির থাকিব না; মাঝে মাঝে আপনাকে পত্র লিখিব, কিন্তু ঠিকানা দিতে পারিব না। সে বাড়ীতে আমি যে আর যাইতে পারিব না জ্যেঠামহাশয়।

আমি আপনাকে ছাড়িয়া বেশী দিন যে থাকিতে পারিব তাহা মনে হয় না। যদি না পারি তাহা হইলে ফিরিব। তবে কলিকাতায় না গিয়া গয়া বা পাটনায় যাইব। আপনি দয়া করিয়া দেখা দিবেন।

আমার জন্যে ভাবিবেন না—পথে মা পাইয়াছি, তাঁহারই সঙ্গে যাইতেছি।

জ্যেঠাইমাকে কিছু বলিবেন না। সরিতের সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তাহার চরিত্র বিগড়াইয়াছে, অসৎ সঙ্গে পড়িয়া সে মদ ধরিয়াছে। যাহা উচিত বিবেচনা করেন করিবেন।

মামাকে আমার প্রণাম দিয়া ক্ষমা করিতে বলিবেন।

করুণাময় জ্যেঠার কাছে চিরদিন ক্ষমা পাইয়া আসিয়াছি—আজও পাইব ইহা আমার বিশ্বাস। ইতি—

সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে

সেবকানুসেবক প্রণব।

পত্র পুনঃপুনঃ পঠিত হইল। লিপ্যাংশ কণ্ঠস্থ হইল, তখন পড়িবার আর প্রয়োজন হইল না।

পঞ্চম দিবসে হরকালীর নিকট হইতে এক পত্র আসিল। তিনি কাশী হইতে লিখিতেছেন, "প্রণব এখানে আসিয়াছিল। আমি যে ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছি সেই ধর্ম্মশালাতেই সে ছিল। তোমাকে একখানা পত্র লিখিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, আমি সে ছিন্নাংশ কুড়াইয়া পাইয়াছি। আমি যদি দেওঘরে তাহার অনুসন্ধানে সময় নষ্ট না করিয়া এখানে বরাবর চলিয়া আসিতাম, তাহা হইলে তাহাকে আমি মোগলসরাইতে ধরিতে পারিতাম। বিধাতার কি ইচ্ছা জানি না। আমি এখন প্রয়াগে চলিলাম ; যখন যেমন হয় জানাইব।"

দ্বিজনাথ বেশী দিন নিশ্চেষ্ট হইয়া কলিকাতায় থাকিতে পারিলেন না। প্রণবের অন্বেষণে বাহির হইতে তিনি ইচ্ছা করিলেন। আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া তিনি বিন্দুকে কহিলেন, "আমি তোমার দাদার খোঁজে যেতে ইচ্ছা করি, তোমার কি মত মা ?"

"মামা ত গেছেন, তুমি আর কেন যাবে বাবা ? না হয়, ভজুদাকে পাঠিয়ে দেও।"

"ভজু টজুর কাজ নয় বিন্দু, আমাকে যেতে হবে।"

"তুমি গিয়ে আর বেশী কি করবে বাবা ?"

"তাই বলে আমি যে আর ঘরে ব'সে থাকতে পারছি না। সে আমার পথে পথে বেড়াবে, আর আমি সুখে ঘরে বসে···"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বিন্দু কহিল, "তবে যাও বাবা, কিন্তু···"

"কিন্তু কি মা ? তুমি একা কি করে ঘরে থাকবে তাই বলছ ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি তার একটা ব্যবস্থা করছি। তোমাকে তোমার গর্ভধারিণীর কাছে রাখতে আমার ইচ্ছা নাই। তাদের সংসর্গ হ'তে তোমাকে দূরে রাখাই আমার অভিপ্রায়। আমি মনে করছি, তোমাকে বেথুন কালেজে ভর্ত্তি করে দি। সেইখানেই থাকবে।"

"না বাবা, সেখানে আমি যাব না।"

"কেন ?"

"আমি চোদ্দ পনর বছরের ধাড়ি, নীচের ক্লাসে ভর্ত্তি হয়ে ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে পড়তে আমার লজ্জা হ'বে।"

"তুমি নীচের ক্লাসে কেন ভর্ত্তি হবে ? এতকাল ত পড়াশুনা করেছ।"

"অত বড় কালেজে এই বিদ্যে নিয়ে যেতে আমার লজ্জা করছে। তুমি আমাকে মহাকালী পাঠশালায় বা আর কোথাও রেখে দেও।"

"আচ্ছা তাই হবে।"

তাহাই হইল। কয়েক দিনের মধ্যে বিন্দুকে এক বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। সপুত্র সন্ধ্যা-তারাকে মাসে মাসে এক শত টাকা দেওয়া হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল। ভজুকে ডাকিয়া কিছু উপদেশ দিয়া অবশেষে কহিলেন, "প্রণবের পত্র এলে তৎক্ষণাৎ আমাকে তা' পাঠিয়ে দেবে ; হরকালীর সঙ্গে যদি সে আসে আমাকে 'তার' করবে। সবিং বা তার মাকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না ; দরওয়ানকেও তা' বলে দিলাম।"

নৃসিংহকে কহিলেন, "হরকালীর হুকুম মত টাকা পাঠাবে, প্রণব যা' চাইবে তা দেবে, বিন্দুকে মাসে মাসে এক শ' টাকা দেবে, সবিংকে এক পয়সাও না।"

তাহাকে আরও কিছু উপদেশ দিয়া ভগাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিজনাথ কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

(২১)

হরিশঙ্করের বিন্ধ্যাচল বড়ই ভাল লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দুই এক দিন তথায় অবস্থান করিয়া প্রয়াগের দিকে ধাবিত হইবেন। কিন্তু বিন্ধ্যাচল তাঁহার এতই ভাল লাগিল যে, তিনি সহসা তাহার মায়া কাটাইতে পারিলেন না। বিন্ধ্যবাসিনী যে তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন এ কথা বলা যায় না ; কেন না, তিনি প্রথম দিনেই দেবীর প্রতি এতটা কুপিত হইয়াছিলেন যে, দ্বিতীয়বার দেবীকে দর্শন দিতে বা দর্শন করিতে বাসনা-রহিত হইলেন। দেবীর অপরাধ, তাঁহার পাণ্ডারা হরিবাবুকে মন্দিরের ভিতর লইয়া

গিয়া প্রশ্নাদির ছলে লম্বা দক্ষিণা প্রভৃতি স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন। বিন্ধ্যদেবীকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া হরিবাবু কূপের জল পরীক্ষায় মনঃসংযোগ করিলেন। কূপও অসংখ্য। এক একটা কূপের এক এক রকম শক্তি। ভৈরব কুণ্ডের জলে বুকের যাবতীয় রোগ সারে, সেই জল তিন দিন খাইয়া বুকটাকে ঠিক করিয়া লইলেন; সীতাকুণ্ডের জলে অজীর্ণ অম্লরোগ দূর হয় শুনিলেন, সুতরাং তাহার গুণ পরীক্ষা না করিয়া হরিবাবু বিন্ধ্যাচল ছাড়িতে পারেন না; কয়েক দিন পরীক্ষা চলিল, বুকের পর পেট ঠিক হইল। কালীকুয়ার জলে না কি বাত সারে, সুতরাং তাহার জল কয়েক দিন পান করিয়া পদদ্বয়কে সতেজ করিয়া লইলেন। তার পর তাঁহার কানে আসিল, লাঙ্গা বাবার কূপের জল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাহাতে না কি মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত যেখানে যা' রোগ থাকে সব সারিয়া যায়। হরিবাবু তখন লাঙ্গাবাবার মোহে পড়িয়া বিন্ধ্যাচলে আরও কিছু দিন রহিয়া গেলেন।

এদিকে পর্ব্বতাদি ভ্রমণ সমারোহে চলিতে লাগিল। তাহার প্রোগ্রেম স্থির করিবার ভার পড়িয়াছিল মঙ্গলের উপর। অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি দেবীর পূজার ভার লইয়াছিলেন গৃহিণী স্বয়ং। ভাণ্ডারের ভার পড়িয়াছিল দেবরাণীর উপর। কেহ কাহারও কার্য্যবিভাগে হস্তক্ষেপ করিতেন না। হরিবাবু যাহাকে যে জল যে দিন খাইতে দিতেন, তাহাকে সেইদিন সে জল খাইয়া থাকিতে হইত; কেহ যে প্রতিবাদ করিবেন এমন উপায় ছিল না। জলে গন্ধকের গন্ধ থাকিলেও তাহাকে অম্লানবদনে সেই দুর্গন্ধবিশিষ্ট জল পান করিতে হইত। কৃষ্ণমতি যে দেবীকে যে দিন কৃপা করিতেন সেই দেবী সেই দিন পাণ্ডার হস্তে পূজা পাইতেন; প্রতিবেশিনী কোন দেবী পূজা হইতে বঞ্চিতা হইলে তাহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার উপায় ছিল না। আপীলের পথ একেবারেই বন্ধ। মঙ্গল সকালে উঠিয়া ভ্রমণ সম্বন্ধে একটা প্রোগ্রেম ঠিক করিত। তাহা অবনত মস্তকে সকলে শুনিতেন; দুই একটা প্রশ্ন করা ছাড়া শ্রোতারা প্রতিবাদের ধার দিয়া যাইতেন না। দেবরাণী যখন যাহাকে যাহা খাইতে দিত, তখন তাহাকে তাহা উদরস্থ করিতে হইত। এই রূপে তাঁহারা কাজ বণ্টন করিয়া লইয়া মহানন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদা অপরাহ্ণে তাঁহারা বিন্ধ্যপর্ব্বতে উঠিবার অভিপ্রায় করিলেন। মঙ্গল বলিয়াছিল, সাড়ে তিনটায় যাত্রা করিতে হইবে; কিন্তু তখন বড় গরম · সূর্য্যের প্রখর তেজ। কর্ত্তা একটু বিলম্ব করিবার অছিলায় তামাকের হুকুম দিলেন। মঙ্গল কহিল, "দেরী করলে আমাদের ফিরতে রাত হবে·· পাহাড়ে দেশ·· বাঘ ভাল্লুকের অভাব নেই।"

বাঘের নাম শুনিয়া হরিবাবু লাফাইয়া উঠিলেন··· তামাক পড়িয়া রহিল। বাসার দ্বারে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল; তাহাতে কৃষ্ণমতি উঠিতে উদ্যত হইলে মঙ্গল কহিল, "পাহাড়ে দেশ, পথে কাঁকর পাথর···"

"আমরা ত গাড়ীতে যাব।"

"গাড়ীতে ত আর সব পথ যাব না, অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে।"

"তাহ'লে ত মুস্কিল ··"

"জুতো পরে আসুন।"

জুতা আছে মঙ্গল দেখিয়াছে; কিন্তু তিনি মঙ্গলের সাক্ষাতে একদিনও তাহা পরেন নাই। কৃষ্ণমতি ফিরিয়া গেলেন, একটু পরে জুতা পরিয়া আসিলেন। দেবী ফিরিল না, নগ্নপদেই গাড়ীতে বসিয়া রহিল। মঙ্গল নড়িল না, দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। হরিবাবু বুঝিয়া দেবীকে কহিলেন, "যাও মা, জুতো পরে এস।"

"আমার পায়ে একটুও লাগবে না বাবা।"

তখন কর্ত্তা কহিলেন, "তুমি এস মঙ্গল, ও জুতো পরবে না।"

মঙ্গল গাড়ীতে উঠিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই তাঁহারা পর্ব্বত পাদ-মূলে নামিলেন। পথ সঙ্কীর্ণ। হরি বাবু আগে আগে চলিতে লাগিলেন, তাঁর পিছনে কৃষ্ণমতি; তৃতীয় স্থান দেবীরাণীকে ছাড়িয়া দিয়া মঙ্গল সকলের পশ্চাতে চলিতে লাগিল। বন্ধুর পথ প্রস্তরাকীর্ণ, ধীরপদে সাবধানতার সহিত সকলকে উপরে উঠিতে হইল। দেবী যেমন একটু অসাবধান হইয়াছে, অমনি তাহার চরণাঙ্গুলীতে একখণ্ড প্রস্তর সজোরে লাগিল। আহত স্থান কাটিয়া তৎক্ষণাৎ রক্ত ছুটিল। দেবী জানে তাহার পিছনে মঙ্গলকুমার আসিতেছে। সে কাতরোক্তি না করিয়া পথ চলিতে লাগিল। মঙ্গল কিন্তু সে ঘটনাটি দেখিয়াছিল। সে ঝটিতি পথ-পার্শ্বস্থিত বিশল্যকরণীর পত্র ছিঁড়িয়া লইয়া

করতলে মর্দনান্তে দেবরাণীর ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিল এবং পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পিষ্ট পত্রের উপর সযত্নে বাঁধিয়া দিল। দেবরাণী আপত্তি করিল, 'কিছু হয় নি' বলিয়া পা সরাইয়া লইল; কিন্তু মঙ্গল ছাড়িল না—পা চাপিয়া ধরিয়া ঔষধি লাগাইল। কার্য্য সমাধানান্তে মঙ্গল পা ছাড়িয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেবরাণী মঙ্গলের পা ধরিল এবং পাদুকা খুলিয়া তাহার পদধূলি লইল। মঙ্গল হাসিতে লাগিল; কহিল, "কেন দেবী, সে দিন গাড়ীতে আমি ত তোমার পায়ের ধূলো নিই নি।"

"আপনি কি যে বলেন!"

"আমি সে দিনের শোধ নিলাম, কিন্তু তুমি পায়ের ধূলা নিয়ে ঋণ বাড়ালে?"

"ও রকম বললে আমি ওষুধ খুলে ফেলে দেব।"

"আমি আবার লাগাব—সেই সূত্রে ঋণ শোধ করব।"

"না, না, দেখ না —"

জননী কৃষ্ণমতি পথ দেখিয়া চলিতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, ফিরিয়া দেখিবার তাঁহার অবসর ছিল না। কন্যার আহ্বানে তিনি দাঁড়াইলেন। কন্যা ও মঙ্গল এতটা পিছনে পড়িয়াছে তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। দুই চারি পা ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই ব'সে রইছিস কেন? কি হ'য়েছে?"

"এমনি করে পা বেঁধে দিয়েছেন যে, আমি হাটতে পারছি না।"

কর্ত্তা ও গিন্নী ব্যস্ত হইয়া ফিরিলেন। সমীপস্থ হইয়া হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর পায়ে কি? কাপড় জড়িয়েছিস কেন?"

মঙ্গল উত্তর করিল, "পাথরে লেগে পা কেটে গেছে; ওষুদ বেঁধে দিয়েছি।"

হরি। য়্যা, পা কেটে গেছে? রক্ত পড়ছে? ওরে নিবে, আমার ওষুদের বাক্স—

কৃষ্ণ। নিবে কি তোমার সঙ্গে এসেছে? না ওষুদের বাক্স এসেছে? কি যে পাগলের মত বক?

হরি। তাই ত, ওষুদের বাক্স সত্যিই ত আসে নি। একটু ক্যালেণ্ডুলা লাগাতে পারলে—

কৃষ্ণ। রেখে দাও তোমার কমণ্ডুল—

হরি। দেখ, একটু লেখাপড়া জানা না থাকলে—

কৃষ্ণ। তোমার মত এতটা নিরেট হওয়া যায় না। এখন দয়া ক'রে একটু চুপ কর, কি হ'য়েছে আমাকে শুনতে দাও।

দেবী অবসর পাইয়া তখন সকল কথা বলিল; অবশেষে কহিল, "খালি খালি উনি আমার পায়ে হাত দেবেন।"

কৃষ্ণমতি বুঝিলেন, কন্যার ক্ষত কোন্ স্থানে বেশী। হাসিয়া কহিলেন, "তাতে কোন দোষ হয় নি, তুই উপরে আয়।"

"আমি যে হাঁটতে পারছি না।"

"তোর কি এতই লেগেছে?"

"লাগে নি বেশী, কিন্তু এমনি করে বেঁধে দিয়েছেন।"

"তুই বাঁধনটা খুলে ফেল।"

"তাহলে না কি আবার বেঁধে দেবেন।"

কৃষ্ণমতি হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, "মঙ্গল ত দুষ্টু কম নয়! আচ্ছা তুই খোল।"

দেবী বাঁধন খুলিয়া ফেলিল। রুমালখানা কিন্তু মালিককে ফিরাইয়া দিল না। মঙ্গল কহিল, "আমার রুমাল দেও।"

"আমি কেচে পরে দেব।"

"কাচলে কি দাগ যাবে?"

"তবে আর নিয়ে কি করবেন?"

"যাই করি, তুমি দেও।"

"আমি দেব না।"

"আচ্ছা।"

ঝগড়াটুকু কৃষ্ণমতির মিষ্ট লাগিল। তিনি মঙ্গলকে আর পরের ছেলে মনে করেন না; কয়েক দিনের মধ্যে মঙ্গল তাঁহার স্বভাব-মাধুর্য্যে পুত্রস্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন মঙ্গলের হস্তেই কন্যা দান করিবেন, কাহারও কোন আপত্তি শুনিবেন না। কৃষ্ণমতি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুই এখন ওঠ্, ঝগড়া পরে করিস। রোদ্দুরে দাঁড়ান যাচ্ছে না।"

সকলে চলিতে লাগিলেন। দেবী খোঁড়াইয়া চলিতে লাগিল। ফল এই হইল যে, ঔষধ ঠেলিয়া রক্ত ছুটিল। মঙ্গল কহিল, "মা, এই দেখুন।"

জননী ফিরিয়া দেখিলেন। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত গড়াইতেছে দেখিয়া তিনি স্বামীকে ডাকিলেন। হরিশঙ্কর

আসিয়া কহিলেন, "আমি আর কি করব বল? ওষুধের বাক্সটা যখন সঙ্গে নেই।"

"তোমার ওষুধে ত সবই হয়। (মঙ্গলের প্রতি) তুমি যা হয় কর বাবা।"

মঙ্গল আবার বিশল্যকরণীর পাতা সংগ্রহ করিল; ক্ষতস্থানে পিষ্ট পত্র লাগাইয়া আবার রুমাল বাঁধিয়া দিল। বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, "ফের যদি খোল, ফের বাঁধব।"

দেবী বিরত হইয়া পড়িল; কহিল, "মা, আমি হাঁটব কি করে?"

"আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল। এখনও রোদ্দুর দেখ। ওই গাছতলায় বড় পাথরখানার উপর বসিগে চল্।"

কর্ত্তা কথাটা শুনিলেন; তিনি ত্বরিত-পদে আগে গিয়া বৃক্ষতলে বসিলেন এবং স্ত্রী কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই যায়গায় তোমরা বসবে এস।"

কর্ত্তা মোটা মানুষ, হাঁপাইতেছিলেন। বেশী যে মোটা তা' নয়, তবে ভুঁড়িটা কিছু বড়। ছিল আরও বড়; কামাখ্যা পাহাড়ে উঠিতে নামিতে না কি কমিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণমতির ভুঁড়ি একেবারেই নাই; সে জন্যে হবিবাবু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি "খাও দাও, গায়ে সারচ না কেন বল দেখি?" কৃষ্ণ তাহার উত্তরস্বরূপ পেটের উপর কতকগুলা কাপড় জড়াইয়া কহিয়াছিলেন, "সকালে হালুয়া খেয়ে এবেলা মোটা হ'য়ে পড়েছি।" তদবধি ভুঁড়ি সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হয় নাই।

(১৬)

পর্ব্বতশিখর হইতে নামিতে দেবরাণীকে মুস্কিলে পড়িতে হইল। মায়ের দেহের উপর ভর রাখিয়া দেবী নামিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পথ স্থানে স্থানে এত সঙ্কীর্ণ যে, দুইজন মানুষ পাশাপাশি যাইতে পারে না। কৃষ্ণমতি আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, কন্যাকে বহিয়া লইয়া যাইবার শক্তি তাঁহার নাই। তিনি ক্লান্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি যা' হয় কর বাবা।"

কন্যা মায়ের স্কন্ধ ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "কাউকে কিছু করতে হবে না, আমি একা যাচ্ছি।"

মঙ্গল দেবীর পিছনেই ছিল; তাহার হাতে একটা মির্জ্জাপুরী লাঠি। বাঙ্গালী এখানে আসিয়া তাঁহার হস্তোপযোগী লাঠি কিনিয়া থাকেন; মঙ্গলও একটা কিনিয়াছিল। এক্ষণে তাহা দেবীর হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, "তুমি এর উপর ভার রেখে ধীরে ধীরে চল।"

দেবী লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া খোঁড়াইয়া চলিল। মঙ্গল লাঠিটা কুড়াইয়া লইয়া কহিল, "কোলকাতায় আমার একটা বোন আছে, তা'র নাম বিন্দু। সে তোমার বয়সী বা তোমার চেয়ে কিছু বড় হবে; কিন্তু সে তোমার মত দুষ্টু নয়।"

"আমি কি দুষ্টুমি করলুম?"

"তুমি কারুর কথা শুনতে চাও না; মনে কর নিজে খুব ভাল বোঝ। এ ভাবটা যা'র থাকে, সে শুধু দুষ্টু নয়, সে অহঙ্কারী।"

"তাই বলে কি আমাকে পুরুষের মত লাঠি নিয়ে চলতে হবে?"

"এখন যদি আমার কথা শুনে লাঠি নিয়ে না চল, এর পরে তোমাকে হয় ত কাঁধে উঠে যেতে হ'বে। দর্পহারী ভগবান্ ত আছেন।"

"দর্পটা আমি কি দেখালাম?"

"তোমাকে জুতো পরে আসতে বলা হয়েছিল, তুমি তা শুনলে না। দর্পহারী দর্প চূর্ণ করলেন; বাঁধন খুলতে নিষেধ করেছিলাম, বাঁধন খুলে ফেলে ক্ষত বাড়ালে। লাঠিটা নিতে বললুম, সেটাকে ফেলে দিয়ে খুঁড়িয়ে চললে। অন্ধকার হয়ে আসছে, এইবার কুলীর মাথায় চেপে যেতে হবে।"

দূর হইতে কৃষ্ণমতি ডাকিলেন, "তুই যে অনেকটা পেছিয়ে পড়েছিস।"

কন্যা। পড়েছি ত।

মাতা। চলে আয় না।

কন্যা। যাচ্ছি ত

মাতা। অন্ধকার হ'য়ে এল যে।

কন্যা। হয়ে এল ত।

মঙ্গল কহিল, "আমার কাঁধের উপর ভর রেখে চল দেবি।"

দেবী প্রত্যাখ্যান করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি তিরস্কৃত হওয়ায় সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। মঙ্গল পাশে আসিয়া কাঁধটা আগাইয়া দিল। হাতখানা কাঁধের উপর উঠাইতে দেবীর লজ্জা হইল, মঙ্গল হাতখানি ধরিয়া

উঠাইয়া দিল। কাঁধের উপর হাত রাখিল বটে, কিন্তু ভর দিল না। মঙ্গল কহিল, "দেখ, এখনও তোমার একটু শাস্তি দরকার।"

"কেন আমি করলুম কি?"

"তুমি আমার কাঁধে ভর দিচ্ছ না কেন?"

"আবার কি করে দেব?"

"তা' নয় দেবি, তুমি সঙ্কোচ করছ। তুমি যদি সত্যই আমাকে ভাই বলে গ্রহণ করতে তা'হলে তোমার এ লজ্জা আসত না। বিন্দুতে এ সঙ্কোচ কখন দেখি নি···"

"বিন্দু দিদিতে আমাতে তুলনা হ'তে পারে না।"

"কেন পারে না দেবী?"

দেবী সে কথার উত্তর না করিয়া কাঁধের উপর একটু জোর দিল। মঙ্গল কহিল, "কেন তুলনা হ'তে পারে না দেবী?"

"এ রকম করে যদি জ্বালাতন করেন, তাহলে আমি হাত তুলে নেব বলে রাখছি।"

"বটে! তোমার একটু শাস্তি হওয়া দরকার।"

"কি শাস্তি দেবেন?"

"এই দেখ", বলিয়া মঙ্গল চকিতমধ্যে দেবীকে পাঁজা-কোলা করিয়া উঠাইয়া লইল এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। দেবী কহিল, "আমাকে নামিয়ে দিন·"

"কিছুতেই না।"

"দেখ না মা···"

"মা অনেক দূরে চলে গেছেন।"

"শাস্তি যথেষ্ট হ'য়েছে, এখন নামিয়ে দিন।"

"না, একেবারে গাড়ীতে বসিয়ে দেব।"

"আপনি এতটা পথ আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন?"

"আমি যে একটা মানুষ নিয়ে যাচ্ছি তাই যে আমি বুঝতে পারছি না।"

"কেন, আমি কি একটা জানোয়ার?"

"জানোয়ার হ'লে এর চেয়ে তুমি ভারি হ'তে।"

"তবে আমি কি?"

"একটা ফড়িং।"

"ফড়িং বই কি! আমি যাব না এমন করে, আপনি নামিয়ে দিন বলছি।"

"এক সর্ত্তে নামাতে পারি।"

"সর্ত্তটা কি শুনি?"

"আমাকে যদি ভবিষ্যতে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলে ডাক।"

"আমি ও-সব পারব না।"

"আমিও নামাতে পারব না।"

দেবী এতক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া ছিল। তাহার মুখ হইতে মঙ্গলের মুখ বড় বেশী দূরে ছিল না···মঙ্গলের নিশ্বাস সময় সময় সে তাহার মুখের উপর অনুভব করিতেছিল। চক্ষু বন্ধ করিয়া দেবী এতক্ষণ ঝগড়া চালাইতেছিল। এক্ষণে একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিল, সে কতদূর আসিয়াছে গাড়ী, বাপ-মা দেখিতে পাইল না; দেখিল, শুধু নীলাকাশ আর সেই নীলাকাশের গায় মঙ্গলের পদ্মবিনিন্দিত সুন্দর মুখ। চক্ষু মুদ্রিত করিবার বাসনা না থাকিলেও লজ্জা আসিয়া তাহার নয়নের কবাট বন্ধ করিয়া দিল। দেবী স্থির হইয়া মঙ্গলের বাহুমধ্যে পড়িয়া রহিল।

মঙ্গল কহিল, "এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।"

"আবার কি করতে চান?"

"তোমাকে আর একটু শাস্তি দেব।"

"এ শাস্তি কি যথেষ্ট হ'ল না?"

"না।"

"আপনার হাতে পড়েছি, যা' হয় করুন।"

"তোমাকে কাঁধে উঠিয়ে নেব মনে করছি।"

"না, না, আমি কাঁধে উঠে যেতে পারব না—গায়ে পা লাগ্‌বে।"

"এক সর্ত্তে আমি সঙ্কল্প ছাড়্‌তে রাজি আছি।"

"সর্ত্তটা কি?"

"বলেছি ত।"

"'তুমি' বলতে পারব না।"

"দেখছি কাঁধে চড়্‌তে তোমার খুব সখ্‌ গেছে।"

"না, না, ক্ষমা করুন।"

"এই তুললুম।"

"আচ্ছা বলছি, এই তুমি বড় দুষ্টু।"

"ওই সঙ্গে দাদা বল।"

"একদিনে অত নয়।"

"কেন পেটের অসুখের ভয় আছে না কি?"

"আচ্ছা, আপনাকে—তোমাকে দেখে ত এত দুষ্ট বলে মনে হয় না।"

"আমি যদি কোন দুষ্ট মেয়ে দেখতে পাই তাহলে তা'র সঙ্গে আমি দুষ্টুমি করি।"

"আমি বুঝি দুষ্টু ?"

"খুব দুষ্টু, একটু আধটু নয়।"

"কিসে আপনি—তুমি তা' বুঝলে ?"

"প্রথম নম্বর, তুমি আমার সাম্‌নে জুতো পরে আসতে লজ্জা বোধ করলে।"

"অপরাধ স্বীকার করছি।"

"দ্বিতীয় নম্বর, তুমি আমার কাঁধের উপর ভর দিতে সঙ্কোচ বোধ করলে।"

"এ অপরাধও স্বীকার করছি ; কিন্তু আপনি—"

"আবার আপনি ? কাঁধের ভর রাখ না ?"

"আপনিটা নিজেই সরে পড়েছে, আর বলব না।"

"তুমি কি বলছিলে ?"

"কিন্তু তুমি এত বড় দুষ্টু যে, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তুমি আমার লজ্জা সঙ্কোচ দূর করে দিলে।"

"যা' কিছু আছে তা' আর একদিন বোঝা যাবে।"

"আবার একদিন কি আমাকে পা খোঁড়া করতে হবে ?"

"দেখা যাক্ ভগবান্ কি করেন।"

বালক বুঝিল না, সে আগুন লইয়া খেলা করিতেছে। নামিয়া আসিয়া দেখিল, কর্ত্তা গিন্নী গাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদের অপেক্ষা করিতেছেন। দেবী মঙ্গলের ক্রোড়ে আসিতেছে দেখিয়া কৃষ্ণমতি উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "তুই বড় আরামেই এলি দেবী, আমাদের পাথর ঠেলে ঠোক্কর খেতে খেতে আসতে হ'ল।"

হরিবাবু গম্ভীরবদনে কহিলেন, "আমি যদি জুতাটা খুলে আসতাম, তা'হলে বেশ হ'ত।"

কৃষ্ণ। বেশটা আর কি হ'ত ?

হরি। তা'হলে মঙ্গলের কোলে চ'লে আসতাম।

কৃষ্ণ। তোমাকে কোলে তুলতে পারত কি না ?

হরি। পারত ; ওর গায়ে অতুল শক্তি। আর এক জনের গায়ে এত জোর দেখেছিলাম—সে অনেক দিন আগে…

। কা'র কথা বলছ ? রামনাথ বাবুর ?

হরি। তোমার ভাসুরের নাম ধরা তোমার উচিত হয় নি মোটেই।

কৃষ্ণ। তিনি ত আর আমার আপন কেউ ন'ন।

হরি। তোমার এক শ' আপন ভাসুর থাকলেও রামনাথ তার চেয়েও বড়।

রামনাথ যে কে, তাহা মঙ্গল বুঝিল না।

(ক্রমশঃ)

নব বর্ষ

শ্রীপ্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ

নমি তোমায়, এসো নব বর্ষ ;
এসো নিয়ে প্রীতি প্রেম হর্ষ ;
যাক্ ধুয়ে, যাক মুছে, ক্লেদ কলুষ রাশি ;
ভাতিয়া উঠুক নবীন সূর্য্য তিমির কালিমা নাশি ;

মলিন পুরানো হউক লুপ্ত ধরার পৃষ্ঠ হ'তে,
নাহি খেদ তায়, ভাতুক তরুণ প্রেরণা নূতন মতে,
নূতন জীবন, নূতন বারতা, ছেয়ে যাক বিশ্ব মাঝে ;
নূতন শক্তি গরজি উঠুক, এই ভিক্ষা তব কাছে।

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন **স্বরলিপি—শ্রীসাহানা দেবী**

মিশ্র খাম্বাজ—কাহারবা

ভারত-ভানু কোথা লুকালে ?
পুনঃ উদিবে কবে পূরব ভালে ?
হা রে বিধাতা ! সে দেব-কান্তি
কালের গর্ভে কেন ডুবালে ?

আছে অযোধ্যা—কোথা সে রাঘব !
আছে কুরুক্ষেত্র—কোথা সে পাণ্ডব !
আছে নৈরঞ্জনা—কোথা সে মুক্তি !
আছে নবদ্বীপ—কোথা সে ভক্তি !
আছে তপোবন—কোথা তপোধন
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে !

পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে ;
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে
কোথা সে বীরেন্দ্র সুর দানবারি
কোথা সে বিদুষী তাপসী নারী !
সিংহের দেশে ফিরিছে শিবা,
বীর্য্য বিড়ম্বিত খল-কোলাহলে

নানক গৌরাঙ্গ শাক্যের জাতি,
নাহিক সাম্য ভেদে আত্মঘাতী ;
ধর্ম্মের বেশে বিহরে অধর্ম্মী !
কোথা সে ত্যাগী, প্রেমী ও কর্ম্মী !
কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব
পূজিত কালের প্রভাত কালে !

II সরা সরগমা গা গা | গা -া গা -া | মা মা -া মা | মা গা পমা
ভা - র ত ভা - নু - কো থা - লু কা - লে -

গমা | রাঃ গঃ রা পা | মগা রগা গা গমা | { পা পা -া পা |
- ভা - র ত ভা - - - নু পুনঃ উ দি - বে

পমাঃ ধপঃ পমা গরা | গমা গমা পধা পা | পগা পমা
ক - - বে - পূ - র - - - ব ভা - - -

(মগরগা গমা) } মগা রগা | II
লে - - পুনঃ লে - - -

গাঃ মঃ গরমা পধনর্সা | না না -া না | র্সা র্সা র্সা র্সা |
কা - রে - - - বি ধা - তা সে দে - ব কা

না র্রসা নর্সা ণা | না নধা পা ধপা | পগা পমা মগা রা |
- ন্তি - - - কা লে - র - গ- - র্ভে - -

গাঃ মঃ গমপধা পা | পগা পমা
কে - ন - - ডু বা - -

মগা রগা | II
লে - -

[রগা রগা রমগা গরা | সন্া]

{ সা সা -া সা | ন্া -া ন্া -া | সা নসা রগা রা |
আ ছে - অ যো - ধ্যা - কো থা - - সে
পু রু - ষ অ ব রু দ্ধ আ প - - ন
না ন - ক গৌ রা - ঙ্গ শা ক্যে - - র

\+
সা -া সা সা | গা গা -া গা | গা -া গা গা | মা গমা পধা
রা - ঘ ব আ ছে - কু রু - ক্ষে ত্র কো থা - -
দে - শে - না রী - অ ব - রু দ্ধ নি জ - -
জা - তি - না হি - ক সা - ম্য ভে দে আ - -

পা | মা মগা পমা গরা | } গা গমা পা পা | পা -া
সে পা ণ্ড - ব - - আ ছে - - নৈ র -
নি বা সে - - - - কো থা - - সে বী -
অ ধা তী - - - ধ র্ম্মে - - র বে -

পা পা | গপা পা -া পা | পর্মা ধপা ধপা মা | মা মা -া
ঞ্জ না কো থা - সে মু - - - ক্তি - আ ছে -
রে ন্দ্র সু র দা - ন বা - - রি - কো থা -
শে - বি হ রে - অ ধ - - র্ম্মা - কো থা - -

মা | মা -া মা -া | মা -া গমপধা পা | পমা গরা গা -া | }
ন ব - দ্বী প্ কো - থা - সে ভ - - ক্তি -
সে বি দু - ষী তা - প - সী না - - রী -
সে ত্যা - গী - প্রে - মী - ও ক - - র্ম্মী -

গা গমা পধা নর্সা | না না না না | নর্সা র্সা -া র্সা |
আ ছে - - - ত পো ব ন কো - থা - ত
সিং হে - - - - র দে শে - বি - চ রি ছে
- - সে জা - তি যা হা - রে

র্সাঃ নঃ র্রসা র্সণা | ণা ণধা পা ধা | পগা পমা মগা রা |
পো - ধ - ন - কো থা - - সে কা - - লা - -
শি - বা - বী - র্য্য বি - ড় - স্বি - - ত থ
বি - - শ্ব - পূ জি - - ত কা - - লে - র

গা গমা পধা পা | পগা পমা মগা রগা | II II
কা লি - - ন্দী কূ - - লে - -
ল কো - - লা হ - - লে - -
প্র ভা - - ত কা - - লে - -

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সহিত মোগলের সঙ্ঘর্ষ

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

১। রাজমহল যুদ্ধের পর

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদের পতন হয়। অতঃপর যুদ্ধের অন্যান্য নায়কগণের কি হইল, খোঁজ লওয়া আবশ্যক।

দায়ুদের পক্ষের কত্লু ও শ্রীহরি যথাক্রমে উড়িষ্যা ও যশোররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কালাপাহাড় যুদ্ধে আহত হইয়া পলাইয়াছিলেন, ইহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কালের স্বাধীনতা-সমরে আবার তাঁহার সহিত আমাদের দেখা হইবে।

পাটনা-হাজিপুরের জমীদার গজপতি দায়ুদের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। এই গজপতি প্রকৃত পক্ষে ভোজপুরের রাজা ছিলেন। গঙ্গার দক্ষিণে এবং শোন নদের পশ্চিমে বর্ত্তমান সাহাবাদ জেলায় এই ভোজপুর অবস্থিত। রেনেলের বাঙ্গালার মানচিত্রে এই ভোজপুরের অবস্থান পরিষ্কার দেখান আছে। এই ভোজপুর-রাজবংশ উজ্জয়িনীয়া রাজবংশ বলিয়া পরিচিত এবং ধারা নগরীর ভোজরাজকে ইহাঁরা পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া দাবী করেন। বর্ত্তমান ডুমরাওঁ রাজবংশ এই গজপতির বংশধর।

গজপতির বিদ্রোহ বেশ প্রবল আকারই ধারণ করিয়াছিল। সমগ্র সাহাবাদ জেলা গজপতি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। আরার জাগীরদার ফরহত্ খাঁ, তাঁহার পুত্র ফরহঙ্গ খাঁ, এবং কারাতক্ খাঁ নামক আর একজন মোগল নায়ক গজপতির সহিত যুদ্ধে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। আকবরের দূত পেশরু খাঁ রাজধানী হইতে বাঙ্গালায় খাঁজাহানের নিকট যাইবার পথে গজপতির হাতে পতিত হন এবং অনেক দিন বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেন। অবশেষে গজপতি যখন গঙ্গা পার হইয়া গাজীপুর অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন তখন আকবর-প্রেরিত শাহবাজ খাঁ গজপতির গতিরোধ করিতে অগ্রসর হ'ন। (জুন, ১৫৭৬) গঙ্গা পুনরায় পার হইয়া যুদ্ধ করিয়া হঠিতে হঠিতে গজপতি জগদীশপুরের দুর্গে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তথায়ও পরাজিত হইয়া গজপতির দল শেরগড় ও রোহতাস্ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রোহতাস্ দুর্গ এই সময়ে জুনৈদের প্রতিনিধি এক আফগান নায়কের হস্তে ছিল। জুনৈদের পতনের পরে এবং গজপতির বিদ্রোহের সময় সে এই দুর্গ শাহবাজের হস্তে সমর্পণ করিল। শেরগড়েরও পতন হইল। পেশরু খাঁ আশ্চর্য্য উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া শাহবাজের নিকট চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে মুজঃফর খাঁ রাজমহল যুদ্ধ শেষ করিয়া বিহারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং রোহ্তাস্ অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শাহবাজের হাতে রোহতাসের পতন শুনিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। গজপতির কি হইল আকবরনামাতে আর তাহার উল্লেখ পাই না।

আকবরনামাতে দেখিতে পাওয়া যায় (Vol. III. P. 277) যে এই বৎসরই ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে তোড়ল মল্ল বাঁশওরায় যাইয়া আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বঙ্গলুণ্ঠনলব্ধ ৩০৪টি হাতী ও অন্যান্য ধনদৌলত উপহার দিয়া আকবরকে খুসী করিলেন। অনতিকাল পরেই তিনি গুজরাট যুদ্ধে প্রেরিত হন।

১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শাহবাজ খাঁ যাইয়া আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাটের আদেশমত রোহতাসের দুর্গাধ্যক্ষত্ব মুহিব আলি খাঁর হস্তে অর্পিত হইল এবং বিবিধ সম্মানে সম্মানিত হইয়া শাহবাজ খাঁ অনতিবিলম্বে দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। (A. N. III. P. 280.)

এই বৎসর আগষ্ট মাসে বিহারের শাসনকর্ত্তা মুজঃফর রাজধানীতে যাইয়া আকবরের সহিত দেখা করিলেন।

আকবর তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া নানাবিধ পুরস্কার প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে তোড়লমল্ল গুজরাট জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সম্রাট আদেশ করিলেন যে মুজঃফরের তত্ত্বাবধানে তোড়লমল্ল এবং শাহ মনসুর রাজ্যের রাজস্ববিভাগ-সংস্কারে মনোনিবেশ করিবেন। বিহারের শাসনভার সুজায়েৎ খাঁ এবং অন্যান্যের হস্তে ন্যস্ত হইল।

রাজমহলের যুদ্ধ এবং তাহারই আনুষঙ্গিক অন্যান্য হাঙ্গামার নায়কগণের কাহার কি হইল, উপরে দেখাইলাম। অতঃপর খাঁ জাহান কি করিলেন, দেখা যাউক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদের পতন হয়। তখন বর্ষাকাল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাজেই এই বৎসরের বাকী কয়টা মাস বোধ হয় খাঁ জাহানের তাঁড়ায় আসিয়া বিশ্রাম করিতেই কাটিয়া গিয়াছিল। এই কয় মাসের কোন বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আবার খাঁ জাহানের বার্ত্তা পাওয়া যায়। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দের গোটা বৎসরটাই বোধ হয় তিনি তাঁড়া আশ্রয় করিয়া রাজমহল হইতে তাঁড়া পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই পারের এবং বীরভূম ও ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহবহ্নি ক্রমে ক্রমে নিভাইতেছিলেন।

১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সাতগাঁ অঞ্চলে আফগানগণ আবার গোলযোগ উপস্থিত করিল। দায়ুদের পরিবার ও পক্ষাশ্রিত লোকজন এই সময় সাতগাঁতে বাস করিতেছিল। এমন বিপদের মধ্যেও আফগানগণ আত্ম-কলহে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক পক্ষের নেতা ছিল মতি (ভাল নাম মুহম্মদ খাঁ খাসখেল), অপর পক্ষের নেতা জমশেদ। মতি দায়ুদের বাছা বাছা ধনরত্ন হস্তগত করিয়া মোগল পক্ষে যোগ দিতে উদ্যত হওয়ায় জমশেদ তাহাতে বিরোধী হয়। মতি পরাজিত হইয়া পলায়ন করে এবং মতির পক্ষের দুইজন নায়ক ষড়যন্ত্র করিয়া জমশেদকে হত্যা করে। এই সকল বার্ত্তা পাইয়া খাঁ জাহান সাতগাঁর দিকে অগ্রসর হ'ন। দায়ুদের মাতা নৌলকা সপরিজনে খাঁ জাহানের আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং সদাশয় খাঁ জাহান আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হন। বন্দোবস্ত এই হয় যে খাঁ জাহান তাঁড়ায় ফিরিয়া গেলে নৌলকা যাইয়া খাঁ জাহানের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সাতগাঁতেই আশ্রয় গ্রহণ করার পক্ষে কি বাধা ছিল, বুঝা গেল না।

১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষে অথবা মে মাসের প্রথমে যখন আকবর পঞ্জাবে ঝিলামের তীরে মৃগয়ার জন্য তাঁবুতে বাস করিতেছিলেন, তখন খাঁ জাহান প্রেরিত দূত বাঙ্গলা দেশ হইতে যাইয়া নিবেদন করিল যে, সম্রাটের আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালা দেশে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং বিদ্রোহ-বহ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কোচবিহাররাজ মল্লদেব বা নরনারায়ণ এই সঙ্গে দূত ও উপঢৌকন পাঠাইয়া **আবার** আনুগত্য স্বীকার করিলেন। প্রথমে সম্রাট সমীপে বাঙ্গালার নবাবের উপঢৌকন উপস্থিত করা হইল। ইহার মধ্যে ৫৪টি ভাল ভাল হাতী ছিল। পরে কোচবিহারের রাজার নজর উপস্থিত করা হইল। এই কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। এইখানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাঙ্গালা দেশের তিন দিকে তখন তিনটি স্বাধীন রাজ্য বিদ্যমান ছিল; যথা—উত্তরপূর্ব্বে কোচবিহার, পূর্ব্বে ত্রিপুরা এবং পূর্ব্বদক্ষিণে আরাকান রাজ্য। এই তিনটি রাজ্যের কোনটিই তখন রাজনৈতিক হিসাবে নগণ্য ছিল না, এবং তিনটিরই তৎকালীন ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত জড়াইয়া গিয়াছিল। আবুল ফজল যাহাকে আনুগত্য স্বীকার ও নজর প্রদান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজার প্রীতি-প্রার্থনা-মূলক উপঢৌকন প্রদান ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোচ-বিহাররাজ নরনারায়ণের ১৪৭৭ শক বা ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বহু মুদ্রা এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নরনারায়ণ ১৫০৯ শকাব্দ বা ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। ঐ শকাব্দে মুদ্রিত তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। স্বাধীন রাজত্বের চিহ্ন মুদ্রাপ্রচার এই বংশে ইহার পরেও অনেক কাল পর্য্যন্ত দেখা যায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে কোচবিহার অধিকার করিবার জন্য বঙ্গের সুবাদার মির জুমলাকে বেশ বড় অভিযান করিতে হইয়াছিল। কাজেই ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবরকে উপঢৌকন পাঠাইয়া নরনারায়ণ সম্রাট আকবরের প্রীতি প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন বলিয়া (Akbar-Nama, III. P. 349) উহা অধীনতা স্বীকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

আবুল ফজল লিখিয়াছেন—"কোচবিহার-রাজ **আবার** আনুগত্য স্বীকার করিলেন। প্রথমবার কবে করিয়াছিলেন,

তাহার কোন উল্লেখ আকবরনামাতে নাই। বোধ হয় পাটনার যুদ্ধের পরে কাকশালগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দায়ুদের পক্ষীয় কালাপাহাড় ইত্যাদি ঘোড়াঘাট হইতে কোচবিহার অভিমুখে যখন পলায়ন করিয়াছিলেন, (A. N. III. 169, 170) তখন আকবরের তুষ্টির জন্য কোচবিহার-রাজ সম্ভবতঃ পলায়মান পাঠানগণকে স্বীয় রাজ্যে স্থান দিতে সম্মত হন নাই,—এবং উপঢৌকনাদি দিয়া মোগল সুবাদারের প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয় প্রথমবারের আনুগত্য স্বীকার।

১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে খাঁ জাহান সম্রাট সমীপে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন যে, বাঙ্গালাদেশ একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, সমস্ত দেশ জুড়িয়া অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে, কোথাও কোন গোলমাল নাই! ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিক দিয়াই কিন্তু দেখা গেল যে, বাঙ্গালা-দেশের আবহাওয়া খাঁ জাহান তখন পর্য্যন্তও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্ব্বদিক্ আবার মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বপ্রদেশস্থ আফগান জাগীরদারগণ ভাটির জমিদার ঈশা খাঁর নেতৃত্বে মোগল প্রভুত্ব অস্বীকার করিবার আয়োজন করিতেছে।

২। ঈশা খাঁর অভ্যুদয়

এই সময়ের ইতিহাসের এক অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ এই ঈশা খাঁ! ঈশা খাঁর বংশধরগণ আজিও ময়মনসিংহ জেলায় প্রবলপ্রতাপ ভূম্যধিকারী। এই স্বনামধন্য পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য ইহাঁরা একবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন,—তাহারই ফলে মুন্সী রামচন্দ্র ঘোষ ও পণ্ডিত কালীকুমার চক্রবর্ত্তী "মসনদালি ইতিহাস" নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই পুস্তক ১২৯৮ বঙ্গাব্দে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। ঈশা খাঁ ২২ পরগণার মালিক ছিলেন, এই তথ্য সর্ব্বজন-বিদিত। ৺কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত ময়মনসিংহের ইতিহাসের ৫৭ পৃষ্ঠায় এই ২২ পরগণার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কেদারবাবু এবং অন্যান্য সকল লেখকই লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঈশা খাঁ মানসিংহের সহিত যুদ্ধে হারিয়া দিল্লী যাইয়া সম্রাট আকবরের নিকট হইতে এই ২২ পরগণার সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীর ঈশা খাঁর অদ্ভুত রাজনীতি-কৌশল ও জীবনব্যাপী স্বাধীনতা-সমরের মর্য্যাদা অনেক লেখকই এইরূপে ক্ষুণ্ণ করিয়া গিয়াছেন।

দুই একজন তীক্ষ্ণধী ঐতিহাসিক কিন্তু ঠিকই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঈশা খাঁর মস্তক প্রকৃতপক্ষে কোন দিনই আকবরের নিকট নত হয় নাই। বেভারিজ সাহেব বলেন—"(In Akbar Nama, Vol III.) we are told more than once of his making submission and sending presents. But he was never really subdued, and his swamps and creeks enabled him to preserve his independence as effectually as the Aravalli Hills protected Rana Pratap of Udaipur." J. A. S. B. 1904. P. 61.—অর্থাৎ আকবরনামার তৃতীয় খণ্ডে আকবরের নিকট ঈশা খাঁর বশ্যতা-স্বীকার ও উপঢৌকন প্রদানের একাধিকবার উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশা খাঁ কখনই বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। আরাবলী পর্ব্বত যেমন রাণা প্রতাপকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল, ঈশা খাঁও তেমনি (তাহাঁর রাজ্যের) বিল ও নদীনালার সহায়তায় ততখানি স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আইন-ই-আকবরীতে সুবে বাঙ্গালার বর্ণনায় লেখা হইয়াছে—"এই সুবার "ভাটি"নামে পরিচিত পূর্ব্বাঞ্চল এই সুবার অন্তর্গত বলিয়াই ধরা হয়। ইশা আফগান ঈশার শাসনের অধীন কিন্তু (এথায়) বর্ত্তমান সম্রাটের নামেই খুৎবা পড়া হয় এবং টাকা মুদ্রিত হয়।……এই অঞ্চলের সংলগ্নই এক বৃহৎ ভূখণ্ডে তিপ্রা জাতির বাস। (তাহাদের) রাজার নাম বিজয়মাণিক।" * (Ain-i-Akbari, II. Jarret. P. 117)

* বিজয় মাণিক্য ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারা যা'ন। আইন-ই-আকবরীর প্রণয়ন শেষ হয় ১৫৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ের মধ্যে বিজয়মাণিক্যের পরে ক্রমান্বয়ে অনন্ত (১৫৭১-৭২), উদয় (১৫৭২-৭৬) জয় (১৫৭৬ অমর (১৫৭৭-১৫৮৬) এবং রাজধর (১৫৮৬-১৬০০) এই পাঁচজন রাজা রাজত্ব করেন। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে প্রত্যন্তরাজ্যগুলির বিবরণ সংগ্রহে আইন-ই-আকবরীতে অনেক পুরানা খবর স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গলার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গেও আমরা এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতে পারিব।

ঈশা খাঁ যে ভাটি অঞ্চলে একরকম স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতেন, আইন-ই-আকবরীর উপরি উদ্ধৃত বাক্য হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। একই নিঃশ্বাসে বিজয় মাণিক্য ও ঈশা খাঁর নাম করায় এই স্বাধীনতার স্বরূপও বুঝা যাইতেছে। কিন্তু সুলেমান কররানীর মত ঈশা খাঁও অত্যন্ত হুঁসিয়ার লোক ছিলেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুনিম খাঁর মৃত্যুর পরে দায়ুদের দ্বিতীয় উদ্যমের সমকালে মোগল নাওয়াবার অধ্যক্ষ শাহবর্দ্দিকে ঈশা খাঁ মারিয়া তাড়াইয়াছিলেন. অতঃপর তাহার সম্বন্ধে আকবরনামার উক্তিগুলি দেখুন—

১৫৭৮ এর শেষে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহার বর্ণনায় লেখা হইয়াছে—

"ভাটির জমীদার ঈশা খাঁ নানাবিধ ছলনা-চাতুরী দ্বারা সময় কাটাইতে লাগিলেন।" (Akbar-Nama ; III, P. 376.)

১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহবাজ খাঁর সহিত ঈশা খাঁর সঙ্ঘর্ষের বর্ণনায় আকবরনামাতে ঈশা খাঁ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তথাকার উক্তি,—

"বিচার-শক্তির পরিপক্কতায় এবং ধীরভাবে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবার ক্ষমতায় বঙ্গের 'বার ভূঞা"র উপর ঈশা খাঁ আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দূরদর্শিতা হেতু এবং সাবধান বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ঈশা খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত কখনও দেখা করেন নাই, কিন্তু তাহাঁদিগকে সাহায্য করিতেন এবং উপঢৌকনাদি পাঠাইয়া তুষ্ট রাখিতেন। দূর হইতে ঈশা খাঁ অধীনতাদ্যোতক নম্র বাক্য প্রয়োগ করিতেন।" (A. N. III. P. 648)

আকবরনামার এই বর্ণনায় ঈশা খাঁর স্বরূপ সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈশা খাঁ পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা নানা কারণে সঙ্গত বোধ করেন নাই বটে (যেমন সুলেমান কররানীও করেন নাই) কিন্তু অধীনতাও কোন দিনই স্বীকার করেন নাই।

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে * র‍্যালফ্ ফিচ্ এই অঞ্চলে বেড়াইতে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

"এই দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশা খাঁ। ইনি এই প্রদেশস্থ অন্যান্য রাজার উপরে রাজা।" "এই সকল রাজারা তাহাঁদের অধিরাজ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। কারণ এই দেশে এত নদীনালা ও দ্বীপ আছে যে তাহারা একটা হইতে আর একটায় পলায়ন করে এবং আকবরের অশ্বারোহী সৈন্য ইহাদের সহিত পারে না।"

এই সমস্ত উল্লেখ হইতে স্বাধীন রাজারূপে এবং বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সর্ব্বপ্রধানরূপে ঈশা খাঁর মর্য্যাদা কতখানি ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মানসিংহের সহিত যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ঈশা খাঁ দিল্লী যাইয়া আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া ২২ পরগণার সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচলিত জনপ্রবাদকে কোন কোন লেখক ইতিহাসের মর্য্যাদা দিয়াছেন, সেই যুদ্ধেরও বেশ বিশদ বিবরণ আকবরনামাতে আছে। তাহার পরেও ঈশা খাঁ সম্বন্ধে অনেক কথা এবং তাহাঁর মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত আকবরনামাতে লিপিবদ্ধ আছে। কোথাও ঈশা খাঁর সম্পূর্ণ পরাজয় এবং দিল্লী গমনের বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। ঈশা খাঁর মৃত্যুর বিবরণ লিখিতে গিয়া আবুল ফজল বরং এই কথাই লিখিয়াছেন যে "ঈশা খাঁ কোন দিনই সম্রাট সমীপে উপস্থিত হন নাই।" (A. N. III. P. 1140.) এত কথা লিখিয়া আকবরনামাতে আবুল ফজল ঈশা খাঁ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব সম্পন্ন কথাটাই লিখিতে ভুলিলেন বা গোপন করিয়া গেলেন এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তাহা সত্ত্বেও যে সকল লেখক ঈশা খাঁর আকবরের অধীনতা স্বীকার ও মোগল রাজধানীতে গমনকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহাঁদের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

প্রকৃত কথা এই যে, ঈশা খাঁ স্বীয় বাহুবলে এবং রাজনীতি কৌশলে ২২ পরগণা সমন্বিত বৃহৎ রাজ্যাংশের মালিক হইয়াছিলেন এবং আকবরের সনন্দের কথা একেবারেই অলীক। কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে, ঐ রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দকে সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক প্রদত্ত জমীদারীর মূল দুই ফর্ম্মান্ আজিও কিরূপ সযত্নে রক্ষিত হইতেছে তাহার বিশদ বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। ঈশা খাঁকে আকবর ঐরূপ কোন ফর্ম্মান্ দিয়া থাকিলে তাহা বা তাহার কোন অনুলিপি বা পরবর্ত্তী কোন দলিলে তাহার

* ফিচ্ ১৫৮৬র ফেব্রুয়ারী মাসে সাতগাঁ পৌছেন এবং ২৮শে নভেম্বর শ্রীপুর হইতে ব্রহ্মদেশে রওনা হন। (Ralph Fitch. Horton Ryley, p. 99. 111. 153.

উল্লেখ ঈশা খাঁর বংশধরগণের নিকট অবশ্যই পাওয়া যাইত। কিন্তু ডাক্তার ওয়াইজ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাদের ঘরে শাহসুজার পূর্ব্বের কোন দলিল খুঁজিয়া পান নাই। (J. A. S. B. 1874. P. 214.) ঈশা খাঁ আকবরের সনন্দ-প্রাপ্ত জমীদার হইলে ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরেও ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খাঁকে ঈশা খাঁর পুত্রগণের সহিত অনবরত লড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে অগ্রসর হইতে হইত না।

মুদ্রার প্রমাণও এই স্থানে প্রণিধানযোগ্য। মোগল আমলের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে সোনার গাঁ, ফতেহাবাদ, নসরতাবাদ, মুয়াজ্জমাবাদ ইত্যাদি সহর টাঁকশালরূপে বিখ্যাত ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের নবম বৎসরে (১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে) পূর্ব্ব-বঙ্গ যখন সত্যসত্যই মোগল সম্রাটের সম্পূর্ণ পদানত হয়, তখন নূতন রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) হইতে মুদ্রা প্রচারে বিলম্ব হয় নাই। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মুদ্রা পেটিকার তালিকার দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত ৬৭৪ নং মুদ্রা জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ১২শ বৎসরে জাহাঙ্গীরনগরে মুদ্রিত মুদ্রা। জাহাঙ্গীরনগরে মুদ্রিত জাহাঙ্গীরের মুদ্রা এ যাবৎ যতগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই মুদ্রাটিই সর্ব্বপ্রাচীন। ভবিষ্যতে হয় ত ৯ম—১১শ বৎসরে মুদ্রিত মুদ্রাও পাওয়া যাইতে পারে। জাহাঙ্গীরনগর হইতে মুদ্রা প্রচারের পূর্ব্বে পূর্ব্বভারতে মুদ্রিত আকবরের যতগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের গায়ে শুধু দুইটি টাঁকশালের নাম মুদ্রিত দেখা যায়। একটি পাটনা। এই টাঁকশালে মুদ্রিত মুদ্রায় ৯৮৩ হিঃ = ১৫৭৫ খ্রীঃ হইতে আরম্ভ করিয়া (Whitehead's Catalogue of the coins in the Punjab Museum, Lahore, Vol. II. Nos. 139 and 266) আকবরের রাজত্বের শেষ বৎসরের তারিখ পর্য্যন্ত (Brown's Catalogue of coins in the Provincial Museum, Lucknow, vol. II. no. 379) পাওয়া গিয়াছে।

আকবরের আর এক শ্রেণীর মুদ্রার উদ্ভবস্থানও বাঙ্গালা দেশ। এই চতুষ্কোণ মুদ্রাগুলিতে একপীঠে ইসলামের মূল-সূত্র মুদ্রিত আছে—আর একপীঠে মুদ্রিত আছে দুই লাইন কবিতা, অনুবাদ করিলে তাহা এইরূপ দাঁড়ায়,—

বাঙ্গালার মুদ্রাখানি ধরে মূর্ত্তি সুশোভন।
আকবর শাহ যেই ইহারে করে মুদ্রণ॥

এই মুদ্রা কলিকাতা চিত্রশালায় দুইটি আছে (Wright's Catalogue, No. 317 a, 315 b dated 1009 H and 1010 H.), লাহোর চিত্রশালায় দুইটি আছে—(Whitehead. No. 259, 260) লক্ষ্ণৌ চিত্রশালায় চারিটি আছে Brown. Nos. 362-365)। রাইট সাহেব তাঁহার মুদ্রা দুইটি ঠিকমত পড়িতে পারেন নাই। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় Mr. W. Vost এই শ্রেণীর মুদ্রার একটি বর্ণনা প্রদান করেন। (J. A. S. B. 1909. P. 319-320) তিনিই দেখাইয়া দেন যে ভারতের চিত্রশালায় 'বাঙ্গালা' নামযুক্ত যতগুলি আকবরের মুদ্রা আছে, তাহাদের তারিখ (৩৯ রাজ্যা-রোহণাব্দে) ১০০২ হিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০১১ হিঃ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ ১৫৯৩ খ্রীঃ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬০২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। তিনি আরও বলেন যে 'বাঙ্গালা' গৌড়নগরেরই নামান্তর। এই সময় যে গৌড় নগর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল, Mr. Vost তাহা খেয়াল করিয়া দেখেন নাই। আর গৌড়ের মুদ্রা-প্রসিদ্ধ নাম লক্ষ্মণাবতী বা জিন্নতাবাদ পরিত্যাগ করিয়া উহাকে 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত করিবার কোন সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, এই শ্রেণীর মুদ্রার উপরে প্রাপ্ত "বাঙ্গালা" নামটি দেশের সাধারণ নামস্বরূপই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই খাস বাঙ্গালার মুদ্রা প্রথম দেখা দেয় তখন বোধ হইতেছে যে ১৫৭৫ হইতে ১৫৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের অবস্থা এমনি অশান্তিময় ছিল যে এই দেশে মুদ্রা মুদ্রনের দিকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে প্রথম মুদ্রা মুদ্রন আরব্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু তখনও মুদ্রাগুলি সাধারণ ভাবে 'বাঙ্গালা'র মুদ্রা বলিয়াই অভিহিত হইত—সোনারগাঁ, চাটগাঁ, ফতেহাবাদ ইত্যাদি পূর্ব্ববঙ্গীয় সহরে দূরে থাক্, বাঙ্গালা দেশের কোন সহরেই স্থায়ী টাঁকশাল বসান সম্ভবপর হয় নাই। মুদ্রার উপরে মুদ্রিত কবিতাটির মর্ম্মার্থেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেন বাঙ্গালা দেশে আকবর শাহের ইহাই প্রথম মুদ্রা মুদ্রন।

মানসিংহও এই কালেই বাঙ্গালা শাসনে প্রেরিত হইয়া ভৌমিক দমনে হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া স্বতঃই মনে হইতে পারে যে ১০০২ হিজরিতে 'বাঙ্গালা' নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচার বুঝি মানসিংহের সাফল্যেরই প্রথম নিদর্শন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যে তাহা নহে আকবরনামা হইতে সঙ্কলিত নিম্নলিখিত তথ্যাবলি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইবে।

১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাজা মানসিংহ বিহার হইতে জলপথে উড়িষ্যা বিজয়ে যাত্রা করেন। (A. N. III. P. 934)

১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে—আফগানদের সহিত উড়িষ্যায় যুদ্ধ। আফগানগণ জলেশ্বর সহরের দিকে পলাইয়া যায় এবং মোগলগণ পশ্চাদ্ধাবন করে। মোগলগণ "মুদ্রার বদন সমূহ বাদশাহের নামাঙ্কন দ্বারা অলঙ্কৃত করে।" (III. 940) এই মুদ্রাই বোধ হয় আমাদের আলোচ্য 'বাঙ্গালা' নামাঙ্কিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে উড়িষ্যায় মুদ্রিত, মুদ্রা। এই মুদ্রার ধারাই পরবর্ত্তীকালে বজায় রাখা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

জানুয়ারী—১৫৯৩ খৃঃ। উড়িষ্যার রাজা রামচন্দ্র ও মানসিংহের মধ্যে বিরোধ। সম্রাটের আদেশে সৌহৃদ্য পুনঃ স্থাপিত। (III. p. 968)

১৫ই জানুয়ারী—১৫৯৩ আফগানগণের সহিত ভূষণা-দুর্গের যুদ্ধে কেদাররায়ের পুত্র চাঁদরায়ের পতন। (III. 969)

মে—১৫৯৪ খ্রীঃ। মানসিংহ বঙ্গশাসনে প্রেরিত। (III. 1001)

মার্চ্চ—১৫৯৫ খৃঃ। মানসিংহ তাঁড়ায় আসিয়া বঙ্গ-শাসনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় ৪০ রাজ্যাব্দ এবং ১০০৩ হিজরি চলিতেছে। (III, 1023)

কাজেই দেখা গেল, মানসিংহের বঙ্গশাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে হইতেই এই শ্রেণীর মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল।

অধ্যাপক হোডিভালা আকবরের মুদ্রার এই 'বাঙ্গালা' সম্বন্ধে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একটি সবিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (J. A. S. B. 1920. P. 199-212)। তাঁহারও সিদ্ধান্ত এই যে আকবরের মুদ্রার 'বাঙ্গালা' কোন স্থান বিশেষের নাম নহে, (বঙ্গে মোগল প্রভুত্বের সেই অস্থৈর্য্যের কালে) যখন যেখানে রাজধানী থাকিত তাহাই বাঙ্গালা নামে অভিহিত হইত। "Briefly, there would appear to be fairly good grounds for thinking that Bangala was not the real or fixed name of any town or city but an alternative or honorific designation by which the capital of the province at the time being was known." শুধু এইটুকু লক্ষ্য করিলেই অধ্যাপক মহাশয়ের মন্তব্য সম্পূর্ণাঙ্গ হইত যে রাজমহলকে বাঙ্গালার সহর বলা যায় না এবং ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কোন স্থায়ী রাজধানীই স্থাপিত হয় নাই। বাঙ্গালা দেশ আকবরের রাজত্বে মোগলের অধিকারে কতখানি আসিয়াছিল, ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে।

কাইজার ফ্রেডরিক মিউজিয়মের চিত্রশালা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

বার্লিনে দুইটি প্রধান চিত্রশালা আছে,—কাইজার ফ্রেডরিক মিউজিয়মের চিত্রশালা ও ন্যাশনাল গ্যালারী। ন্যাশনাল গ্যালারীতে আধুনিক চিত্রকরদের চিত্র অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় ও বিশেষ করে জার্ম্মান চিত্রকরদের চিত্র আছে। কাইজার ফ্রেডরিক মিউজিয়মের চিত্রশালাতে ইয়োরোপের প্রাচীন চিত্রকরদের চিত্র অর্থাৎ

হিরোনিমুস হোলৎসুহার (ডুরার)

মধ্যযুগ হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপের নানা দেশের প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। ড্রেসডেনের চিত্রশালা বা ম্যুনসেনের চিত্রশালার মত এই চিত্রশালা সুপ্রসিদ্ধ না হইলেও এখানে বহু প্রসিদ্ধ তৈলচিত্র আছে। সকল ভাল চিত্রের কথা ছোট প্রবন্ধে বলা সম্ভব হইবে না, আমি কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর কয়েকখানি বিখ্যাত তৈলচিত্রের কথা বলিব।

জার্ম্মান চিত্রকরগণ

জার্ম্মান চিত্রকর হইতে আরম্ভ করা যাক। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর রাইন, বোহেমিয়া, বারগেণ্ডি ইত্যাদি জার্ম্মানীর নানা পদ্ধতির চিত্রকরগণের অনেক চিত্র আছে। চিত্রকলার বিবর্ত্তন ধারা পাঠ করিতে এ ছবিগুলি বিশেষ সাহায্য করে। জার্ম্মানীর পুরাতন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ডুরার ও কনিষ্ঠ হ্যান্স হলবেনের কয়েকখানি প্রসিদ্ধ চিত্র আছে, গ্রুনেভালডের কোন ছবি নাই।

জর্জ্জ গিজে (হান্স হলবেন)

আলব্রেস্ট ডুরার (১৪৭১—১৫২৮) জার্ম্মান চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ সুন্দর প্রতীক। এ বৎসরের মার্চ্চ মাসে তাঁহার মৃত্যুর চারিশত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সমস্ত জার্ম্মান জাতি ও ইয়োরোপীয় চিত্রকলা-ভক্তেরা তাঁর নাম বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়াছে। যে নুরনবের্গে তাঁর জন্ম হইয়াছিল ও তাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল, তাহার কথা আমি পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' (অগ্রহায়ণ—১৩৩৪) লিখিয়াছি।

ডূরারের পিতা নুরনবের্গের এক স্বর্ণকার ছিলেন। পুত্রকে তিনি প্রথমে তাঁর কাজই শিক্ষা দেন, কিন্তু পুত্রের মধ্যে অঙ্কন-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া নগরের প্রধান চিত্রকরের কাছে শিক্ষালাভ করিতে পাঠান। অল্প বয়সেই ডূরারের অঙ্কন প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিণতি লাভ হয়। যুবা বয়সেই তিনি ইয়োরোপে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি এক যুগসন্ধির সময় জন্মেছিলেন। তখন মধ্যযুগের গথিক পর্ব্বের

এক উচ্চ বংশীয় জেনোয়াবাসী (ভানডাইক)

শেষ হয়েছে,—রেনেসাঁসের আরম্ভ। তাঁর চিত্রকলায় জার্ম্মান গথিক আর্টের ধারা রেনেসাঁর স্থলে নব রূপ নিল বটে, কিন্তু তার মূল জার্ম্মান প্রকৃতি হারাল না। নুরনবের্গে তাঁর শিক্ষক ভোলগেমুর্গের নিকট চিত্রবিদ্যাশিক্ষা শেষ করে তিনি কোলমার, বাজেল, ভেনিস প্রভৃতি সেই সময়কার চিত্রকলার কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা সমাপ্ত করতে গেলেন। তাঁর এই ইতালী-ভ্রমণে তিনি নব প্রস্ফুটিত ইতালীয়ান রেণেসাঁ আর্টের সহিত পরিচিত হলেন। ইতালী থেকে ফিরে এসে যখন তিনি তাঁর জন্মভূমি নুরনবের্গে শিল্পী-জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলেন—গথিক শিল্পীদের বিচিত্র

পিঙ্ক ফুল হাতে একটি লোক (জন-ভান-আইক)

চিত্রশিল্পীর স্ত্রী সাসকিয়া (রেমব্রাণ্ট)

কল্পনা-প্রবণতা, প্রিমিটিভদের আবেগময় অনুভূতি ও ভাবের উচ্ছ্বাস, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও রহস্যময় ভাবের সহিত রেণেসাঁর সহজ সুন্দর রূপ-সৃষ্টির প্রয়াস, রূপকে বিশ্লেষণ করিয়া আঁকার নিয়ম গঠনের ঔৎসুক্য, ও সৌন্দর্য্যের প্রতি গ্রীক শিল্পীদের মত দৃষ্টি ডুরারের মধ্যে মিলিত হইয়া জার্ম্মান চিত্রকলার এক নব পর্ব্বের উদ্বোধন হইল। ডুরার তাঁর এই শিল্পসাধনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমার শক্তিতে যথাসম্ভব তাহা আমি করছি, কিন্তু তাতেও আমি তৃপ্ত নই, এ যথেষ্ট নয়।" প্রতি বস্তুর বিশেষ রূপ অতি সূক্ষ্মভাবে

সোণার হেলমেট পরিহিত মানুষ (রেমব্রাণ্ট)

পর্য্যবেক্ষণ করা এবং তাহা নিখুঁতভাবে সকল খুঁটিনাটির সহিত সুন্দর করিয়া সম্পূর্ণভাবে আঁকাই তাঁহার আর্টের বিশেষ উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় অপরিমেয়। সেজন্য এনগ্রেভার হিসাবে তিনি একজন অমর অতুলনীয় শিল্পী। তাঁর চোখের দেখা যেমনি তীক্ষ্ণ, তাঁর হাতের কাজ তেম্নি সূক্ষ্ম। কাইজার ফ্রেডরিক মিউজিয়মে তাঁর আঁকা পোরট্রেটগুলিতে তাঁর প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। নুরনবের্গের এক ধনী সেটেনের সভ্য "হিরোনিমুস্ হোলত্সুহারের" তৈলচিত্রখানি ডুরারের একখানি শ্রেষ্ঠ পোরট্রেট। ছবিখানি তাঁর শেষ জীবনে আঁকা। মিউজিয়াম এ ছবিখানি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সাড়ে সতেরো হাজার পাউণ্ড দিয়ে কেনেন। ছবিখানিতে নুরনবের্গের গৌরবময় যুগের এক ধনীর ব্যক্তিত্ব যেমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, তেম্নি আঁকার দক্ষতা বোঝা যাচ্ছে। চুল বা দাড়ি তুলির একটা চওড়া টান দিয়ে একসঙ্গে সাদা বা কালো ছোপের মত আঁকা নয়,—যেন প্রতি চুল একটির পর একটি নিখুঁতভাবে আঁকা, তাদের প্রতি গুচ্ছের আঁকাবাঁকা গতি সুন্দর রেখায় দেখান। কোঁকড়ান প্রতি চুলের ছন্দ, কপালের, অধরের, নয়নের কুঞ্চন, সকল খুঁটিনাটি অতি

হেনড্রিকিএ ষ্টকেল্স্ (রেমব্রাণ্ট)

সূক্ষ্মভাবে আঁকা কিন্তু সমগ্রতার ঐক্য ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই।

ডুরারের পরই হান্স হলবেন দি ইয়ংগার বা কনিষ্ঠ হলবেনের কথা মনে হয়। ইনিও পোরট্রেট আঁকিতে ওস্তাদ। তাঁর পিতা হলবেন দি এলডারও একজন নামজাদা চিত্রশিল্পী। পিতার নিকট হইতেই পুত্রের চিত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ হয়। জার্ম্মানীতে আউগ্স্বুর্গে কনিষ্ঠ হলবেনের জন্ম হয় (১৪৯৭-১৫৪৩)। আঠারো বছর বয়সের সময় তিনি সুইজারল্যাণ্ডের বাজেলে কাজের সন্ধানে আসেন। তখন

বাজেলে এরাসমুসের (Erasmus) যুগ। হলবেনের আঁকা এরাসমুসের একটি সুন্দর পোরট্রেট লুভারের চিত্রশালায় দেখেছি। এরাসমুস এই তরুণ প্রতিভাবান শিল্পীকে তাঁর নানা কাজে নিযুক্ত করিলেন,—হলবেনের শিল্প-প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ হইতে লাগিল,—অনেক লোকের নিকট হইতে ছবি আঁকার অর্ডার আসিতে লাগিল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু সেই সময়কার ইয়োরোপের রাজনৈতিক অবস্থার নানা পরিবর্ত্তনের জন্য বাজেলে থাকিয়া তাঁর যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হইতেছিল না। তিনি অর্থলাভের আশায়

ধাত্রী ও শিশু (ফ্রান্স হাল্‌স্)

ইংলণ্ডে যান,—সার টমাস মুরের নামে ইরাসমুস তাঁহাকে একটি পরিচয় লিপি দেন। ইংলণ্ডে দু'বছর থাকিয়া হলবেন যে-সব ছবি আঁকিয়াছিলেন, তার অনেক ছবি এখন উইণ্ডসর ক্যাসলে দেখা যায়। ইংলণ্ড হইতে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া আবার তিনি সুইজারল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসেন। কয়েক বৎসর পরে আবার তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং ইংলণ্ডের রাজার, রাজপরিবারের ও বহু অভিজাতগণের ছবি আঁকেন। লণ্ডনে প্লেগে তাঁহার যখন অকাল-মৃত্যু হয়, তখন তিনি ইংলণ্ড-রাজ অষ্টম হেনরীর একখানি ছবি আঁকিতে ব্যাপৃত ছিলেন।

সুন্দর পোরট্রেট আঁকার প্রতিভার জন্যই হলবেন আর্টের ইতিহাসে অমর। জার্ম্মান পোরট্রেট-আর্টের উগ্র বাস্তবতা, সব খুঁটিনাটি আঁকিবার পরম অধ্যবসায় ও দক্ষতা হলবেনের

হি ল বব্ (ফ্রান্স হাল্‌স্)
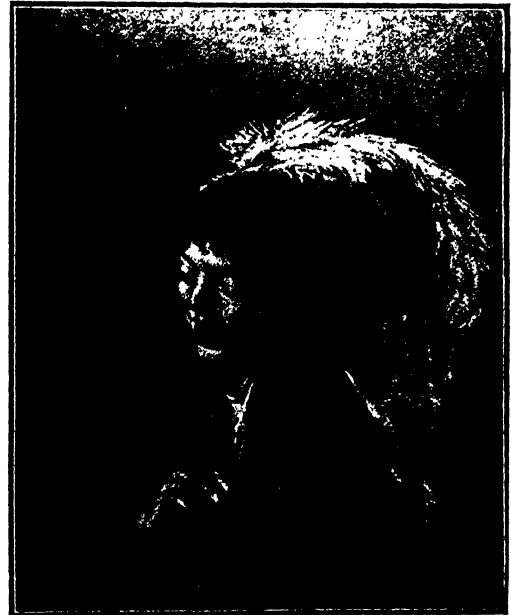
গীয়মান বালক (ফ্রান্স হাল্‌স্)

ছিল ; কিন্তু তাহার সহিত কমনীয়তা, আদর্শবাদ, বস্তুতঃ রেনেসাঁসের সৌন্দর্য্যবোধ তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। সেজন্যই
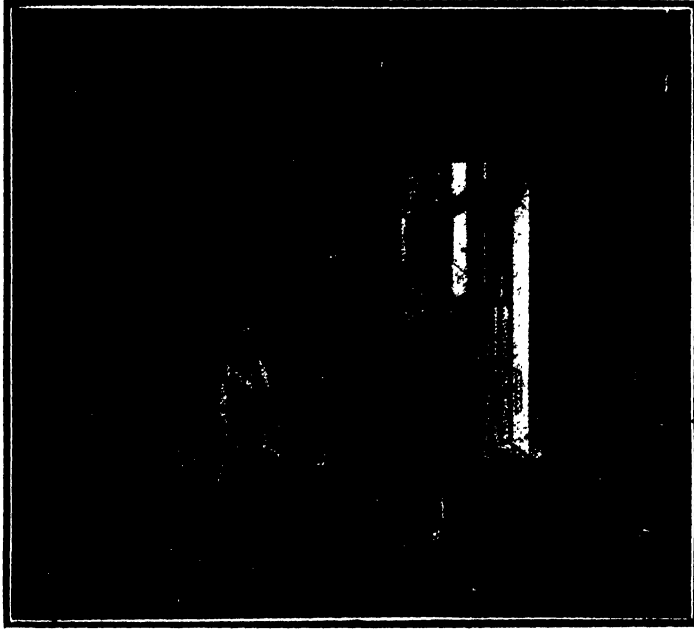
মা (পিটার ডি হোক্)

তাঁর পোর্‌ট্রেটগুলি এত সুন্দর। বার্লিনের চিত্রশালায়, হলবেনের "বণিক জর্জ গিজে"র যে পোর্‌ট্রেটখানি আছে, তাহা তাঁহার প্রতিভার একটি সুন্দর প্রকাশক। যুবক বণিক গিজে শান্ত ও একটু বিষাদমাখা মুখে টেবিলের সামনে বসিয়া আছে—হাতে খোলা চিঠি; আরব বা পারস্যের লাল কার্পেট পাতা টেবিলের ওপর দোয়াত কলম, ফুলদানিতে ফুল, টাকার বাক্স, ঘড়ি, শীল-মোহর ইত্যাদি নানা জিনিষ, পেছনে দেওয়ালে লাগান কাঠের র‍্যাকে হিসাবের খাতা, চিঠির তাড়া, একগাদা চাবি, সোনারুপা ওজনের দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি; এই সব জিনিষ পরিবৃত হইয়া সবুজ কাঠের দেওয়ালের গায়ে কালো টুপি ও কালো সাজপরা যুবক বণিকের মূর্ত্তি; চারিদিকের সকল ছোটখাট জিনিষ, সাজসজ্জার প্রতি খাঁজ নিখুঁতভাবে আঁকা বটে, কিন্তু বণিকের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির মধ্যে বণিক-মানুষটি হারাইয়া যায় নাই—এই মানুষটির মূর্ত্তিই,—তার ব্যক্তিত্ব, তার বিশেষ রূপটি প্রথমেই চোখে পড়ে। সমস্ত খুঁটিনাটি জিনিষ একটি সমগ্রতার ছন্দে বাঁধা। এইখানেই হলবেনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব।

ফ্লেমিস চিত্রকরগণ

ফ্লান্ডারসের সুবিখ্যাত শিল্পীভ্রাতৃদ্বয় হুবার্ট ও জান ভান আইক অঙ্কিত গেণ্টের অল্‌টার-পিসের (altar-piece) যে অংশগুলি কাইজার ফ্রেডরিক মিউজিয়মে আগে ছিল, এখন সেগুলি সেখানে নাই,—ভার্সাই সন্ধিপত্র অনুসারে সেই তৈলচিত্রগুলি বেলজিয়ামকে দিতে হইয়াছে (১৯২০)। তবে জান ভান আইকের আঁকা কতকগুলি ছোট ছবি আছে; আর তাঁর শ্রেষ্ঠ পোর্‌ট্রেট সুবিখ্যাত "পিঙ্ক ফুল হাতে একটি লোক" (Man with the pinks) এই তৈলচিত্রটি আছে। ভান আইক ভ্রাতাদের নামে যে গল্প ছিল যে তাঁহারাই প্রথম রঙীন
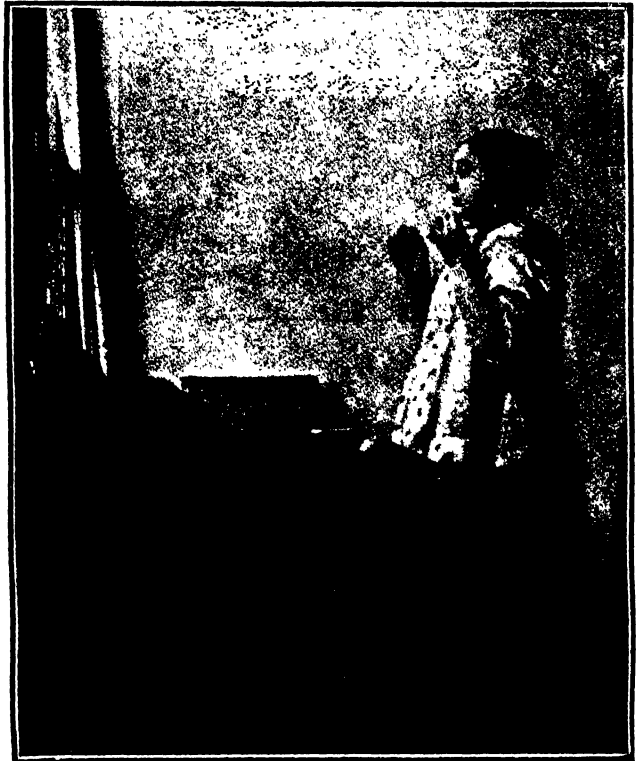
মুক্তার মালা কণ্ঠে নারী (ভান ডেয়ার মেয়ার)

তৈল দিয়ে চিত্র অঙ্কনের উদ্ভাবনকর্ত্তা, এ কথা এখন ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু তৈলচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি দশম শতাব্দীতে ইয়োরোপে জানা থাকিলেও, ভান আইক ভ্রাতারা যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষে নেদারলাণ্ডে তৈলচিত্র-কলার নব জন্ম দেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "পিঙ্ক ফুল হাতে একটি লোক" ছবিটি কেবলমাত্র তৈলচিত্রের প্রথম যুগের চিত্র রূপে নয়, পোর্ট্রেট আঁকার সুন্দর আদর্শ রূপে আর্টের ইতিহাসে চিরদিন বেঁচে থাকবে।

মাতা মেরীর শিশু যীশুর পূজা (ফ্রা লিপো লিপি)

১৬-১৭ শতাব্দীর নেদারলাণ্ডের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে রুবেন্‌স ও ভান ডাইকের অনেক চিত্র চিত্রশালায় আছে। ভান ডাইকের (১৫৯৯-১৬৪১) "এক উচ্চবংশীয় জেনোয়া-বাসীর ছবি" তাঁর জেনোয়া-পর্ব্বের পোরট্রেট-অঙ্কনরীতির একখানি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি যে তাঁর গুরু রুবেন্‌সের অঙ্কনভঙ্গীর প্রভাব কাটাইয়া নিজ প্রতিভাবলে পোরট্রেট-আর্টকে নব রূপ দিয়াছেন, তাহা বেশ বোঝা যায়। শ্বেত-শ্মশ্রু প্রৌঢ় অভিজাত তাহার বিশাল প্রাসাদের এক কোণে গম্ভীর গাঢ় রংএর পোষাকে বিপুলভাবে আবৃত হইয়া বসিয়া আছে, এই কালো ছড়ান পোষাকের রহস্যময় গাম্ভীর্য্যে সমস্ত মূর্ত্তিটি একটা বিশালতা, মহান ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ; হাতের কব্জি ও কণ্ঠ শুভ্র বলয়ের মত ফুলকাটা সাদা কাপড়ে জড়ান ; এক হাতে একতাড়া গোল করে গোটান কাগজ, আর এক হাত চেয়ারের ওপর, হাতের লম্বা আঙ্গুলগুলি কি নিপুণভাবে আঁকা,—এক উচ্চবংশীয়ের কোমল সুন্দর

ভেনাস (বতিচেলি)

হাত ; মাথায় একটি গোল ক্যাপ, মুখের মধ্যে একটি রহস্যময় ভাব, ঠোঁট দুটি চাপা যেন দৃঢ়বদ্ধ, চোখের কোণে একটু উদাসতা, ক্লান্তির একটু সন্দেহের ভাব,—সমস্ত মূর্ত্তি হইতে মনের একটা দৃঢ় শক্তির এবং তাহার সহিত সমস্ত জগৎকে একটা সন্দেহের চোখে দেখার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইতালীর এক শ্রেষ্ঠীর ব্যক্তিত্বকে ভান ডাইক সুন্দররূপে রূপ দিয়াছেন।

ডাচ চিত্রকরগণ

হলাণ্ডে প্রায় সকল বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের কয়েকখানি করিয়া চিত্র চিত্রশালায় আছে। সতেরো শতাব্দীর হলাণ্ডে চিত্রকলার বিকাশ যেমন অপূর্ব্ব, তেম্নি আশ্চর্য্যকর,—সহসা যেন মরা নদীতে ভাদ্রের বন্যা আসিল,—মাতাল দক্ষিণ বাতাসের স্পর্শে সহসা যেন সকল ঝরাপাতা শুক্‌নো গাছের শাখাপ্রশাখা পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে ভরিয়া গেল,—কতশত রংএর ফুল ফুটিয়া ফাটিয়া চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতে

একটি নারীর পোরট্রেট (বতিচেলি)

লাগিল। রেমব্রাণ্ট, ফ্রান্স হালস, ভারমেয়ার, রয়েসডাল, মেটস্থ, হবেমা, হেডা ডু, পিটার দি হোক, নিকোলাস মায়েস—কত কত শিল্পী বসন্তের কোকিলের মত উচ্ছ্বসিত ভাবে ছবির পর ছবি আঁকিতে লাগিলেন। সে ছবি যীশুর ছবি বা মেরীর ছবি বা বাইবেলের কোন ঘটনার ধর্ম্মবিষয়ক ছবি নয়, তাহা সুখদুঃখময় মানব-জীবন-ধারার কোন একটি সুন্দর রূপ। ঘরের কোন একটি সুন্দর কোণ, পথে-দেখা কোন একটি সুন্দর মুখ, আমষ্টারডামের কোন একটি দৃশ্য, হলাণ্ডের কোন প্রাকৃতিক শোভা, খাবার টেবিলের খাবার জিনিষ, পেয়ালা গেলাস, গৃহিণীর প্রতিদিন-দেখা মুখের কোন সন্ধ্যার-ক্ষণে অনুভব-করা অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, রাস্তার কোন বৃদ্ধ, ঘরের কোন প্রিয়া—এম্নি সব মানুষ ঘর বাড়ী জিনিষ শিল্পীর চোখের সামনে যাহা পড়িল, শিল্পী তাই রং লইয়া আঁকিতে বসিয়া গেল।

চিত্রশালায় রেমব্রাণ্টের ছবিগুলির মধ্যে সোনার-হেলমেট-পরিহিত মানুষ চিত্রটি বোধ হয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ, এই রকম আশ্চর্য্য শক্তির সহিত অঙ্কিত তৈলচিত্রের জন্য
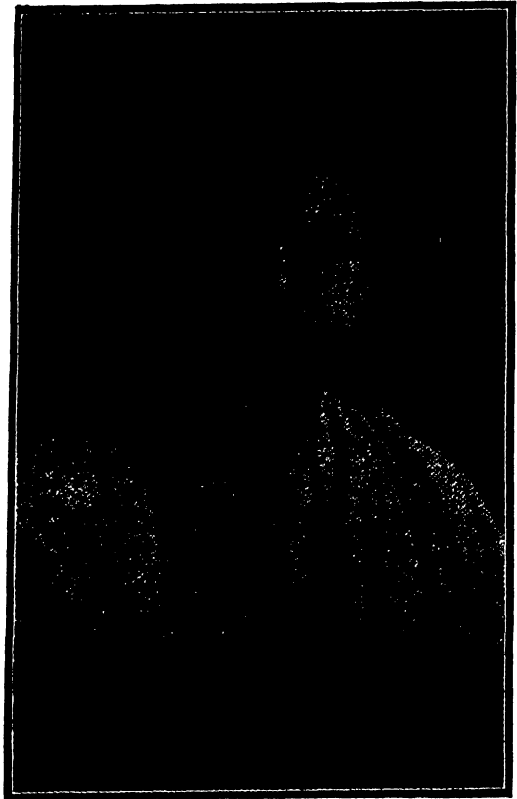
লেখক

রেমব্রাণ্টের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। অনেকের মতে, এই ছবিটি তাঁর ভাইকে মডেল করিয়া আঁকা। তাঁর ভাইকে মডেল করিয়া তিনি আর যে-সব ছবি এঁকেছেন, তার সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য আছে। ছবিটি ১৬৫০ খৃঃ অব্দে আঁকা। তখন তাঁর সুখের সৌভাগ্যের জীবনের শেষ হয়েছে,—তাঁর প্রিয়া স্ত্রী সাস্‌কিয়া মৃতা,—আমষ্টারডামের প্রধান চিত্রশিল্পী বলে তাঁর নাম নেই,—তাঁর ছবি বেশী দামে বিক্রি হয় না,—

দেউলিয়া হইয়া তাঁহার জীবন-সঞ্চিত শিল্পদ্রব্য সব, তাঁর সুন্দর বাড়ী নীলামে বিক্রি করিয়া তিনি অপমানিত দীন বন্ধুহীন ভাবে ইহুদীপাড়ায় একটি ছোট বাড়ীতে বাস করিতেছেন,—তাঁর একমাত্র সঙ্গিনী চিত্রকলা ও হেনড্রিকিএ ষ্টফেল্‌স্ নাম্নী দাসী,—হাঁ, সে তাঁর গৃহিণী আর চিত্রকলা তাঁর একমাত্র প্রিয়া। এই তাঁর জীবনশেষে পরম দৈন্যাবস্থায় তাঁর প্রতিভা সন্ধ্যার সূর্য্যের মত দীপ্ত রঙীন হইয়া উঠিল। তখন ধনের বা মানের আশা নয়, বন্ধুদের স্তুতি নয়, কেবল আপন অন্তরের আদর্শের মত ছবি আঁকা। সেই জীবনের সময় একদিন তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন,—রেমব্রাণ্টের মানসনেত্রে এক সৌন্দর্য্যকল্পনা ঝলসিয়া গেল। তাঁহার এক লতাপাতার কারুকার্য্যখচিত রেনেসাঁ হেল্‌মেট ও ধাতুময় কলার সৌভাগ্যময় জীবনের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহের একটি করুণ স্মৃতির মত অবশিষ্ট ছিল, সেই হেলমেট ও কলার তাঁর ভাইকে পরাইয়া তিনি ছবি আঁকিতে বসিলেন। সেই হেলমেট পরিহিত ভ্রাতার মূর্ত্তিতে শিল্পী কাহাকে দেখিলেন? শিল্পী এক বীর সৈনিককে দেখিলেন,—এই দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর আত্মায় যে বীর যুদ্ধ করিতেছে, হার মানিবে না, সেই দৃঢ়চিত্ত সকল-দৈন্য-তুচ্ছকারী সংগ্রামলিপ্ত যোদ্ধাকে দেখিলেন। বস্তুতঃ এই হেলমেট-পরিহিতের মূর্ত্তি বীর সৈনিকের প্রতীক,—মন্দ ভাগ্যের আঘাতে তাহার মুখ বিষন্ন কিন্তু দৃঢ়,—দুর্দ্দিনের মধ্যে তাহার চিত্ত কঠোর,—বাহিরে যে দীন বটে, কিন্তু তাহার শিরে বিজয়স্বর্ণচূড়া। এই তৈলচিত্রের অঙ্কন-দক্ষতাও রেমব্রাণ্টের মত প্রতিভাশালী চিত্রকরের পক্ষেই সম্ভব। সোণার হেলমেটকে তিনি যেমন রক্তমাংসে-গড়া দেহের মত সজীব করিয়া তুলিয়াছেন, তেম্নি মুখকে তিনি কঠোর করিয়া তুলিয়াছেন,—যেন তাহা রক্তমাংসের নয়, কোন ধাতু দিয়ে গড়া। রক্তমাংসের কোমল মুখের সঙ্গে ধাতুময় কঠোর হেলমেট ও কলার তিনি এমন ভাবে মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মুখের সহিত হেলমেট ও কলার সজীব বস্তু হইয়াছে,—সমস্ত মূর্ত্তি এক জীবন্ত ঐক্য লাভ করিয়াছে। এই আলোছায়া-মায়াবীর আলো-অন্ধকারের সমাবেশ ছবিটিতে কি সুন্দর! হেলমেটের সম্মুখভাগ, বাঁকান মুখের সম্মুখের অংশ আলোয় জলজল করিতেছে,—ডানদিকের ঘাড়ের ওপর কলার হইতে তীব্র দ্যুতি বাহির হইতেছে,—মুখের বাম অংশ হেলমেটের ছায়াতে ঢাকা,—চক্ষু দুইটি যেন খোদাই-করা,—তার দৃঢ় কঠোর দৃষ্টিতে উদাসতা ও করুণতা জড়ান,—উন্নত নাসিকার তলে দৃঢ় ওষ্ঠ,—দৃঢ় ধাতুময় চওড়া কলার কণ্ঠ ও চিবুক চাপিয়া ধরিয়াছে,—যেন একটা লোহার ফ্রেমে মুখখানিকে জোরে আঁটা হইয়াছে, বীর সৈনিক এ নিষ্পেষণ সহ্য করিতেছে বটে, কিন্তু সে হার মানে নাই, সমস্ত মূর্ত্তি ভরিয়া যেমন ভাগ্যকে ভবিতব্য বলিয়া মানিয়া লইবার বিষণ্ণতা আছে, তেম্নি দুঃখ সহ্য করিবার কঠোরতা, হার না মানিবার দৃঢ়চিত্ততা, দীপ্তি রহিয়াছে। অপূর্ব্ব এই তৈলচিত্র।

"রেমব্রাণ্টের স্ত্রী সাসকিয়া" চিত্রটি সাসকিয়ার মৃত্যুর পর অঙ্কিত,—প্রিয়া স্ত্রীর সকল মধুর স্মৃতি দিয়ে গড়া, মুখের মিষ্টি হাসিটি কি সুন্দর! সাসকিয়া এখানে সুসজ্জিতা, তাহার চুলের সুন্দর খোঁপার ওপর মণির মালা জড়ান, গলায় সোণার হার ঝুলিতেছে, লাল ভেলভেটের সাজ, রেমব্রাণ্ট গত জীবনের সুখের দিনগুলি ভাবিয়া, তাদের মূর্ত্তিমতী করিয়া, সাসকিয়াকে আপন মনের মত সাজাইয়াছেন।

স্নিগ্ধ-মিষ্ট-হাস্যময়ী সাসকিয়ার পাশে হেনড্রিকিএ ষ্টফেল্‌সের ছবিটি বড় করুণ দেখায়। তাহার বেশভূষা সাধারণ, ও সোণার অলঙ্কার নাই, হাতে শুধু একটি মুক্তার হার, কানে দুল; মুখে হাসি নাই বটে কিন্তু একটি শান্তির ভাব আছে। এ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে সে বিষাদময়ী। নগরের লোকেরা তাহাকে রক্ষিতা বলিয়া জানে, কিন্তু সে যে একটি প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীর হৃদয় পাইয়াছে, তাঁহাকে সেবা করিতে পারিতেছে তাহাতেই সে তৃপ্তা। হয় ত, কোন সন্ধ্যায় সমস্ত দিনের কাজের শেষে হেনড্রিকিএ ষ্টফেল্‌স্ জানলার ধারে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল,—রেমব্রাণ্ট তাঁর শেষ জীবনের সঙ্গিনীর সন্ধ্যার আলোর মত এই স্নিগ্ধ করুণ রূপটি অলক্ষিতে দেখিয়াছিলেন।

ফ্রান্স্ হালসের "ধাত্রী ও শিশু" ছবিটি হলাণ্ডের মাডোনার ছবি, রিনেসাঁর ইতালীর চিত্রকরেরা ছবিটির নাম মাডোনা দিতেন। দুগ্ধ-মাখন-পুষ্টা একটি চাষার মেয়ের কোলে হারলামের কোন ধনী বণিকের ছোট মেয়ে। ছোট মেয়েটির সুন্দর সাজ শিল্পী কি নিখুঁতভাবে আঁকিয়াছেন। হাতে-বোনা লেসের বনেটটি যেন একটা মুকুটের মত। ফুলওয়ালা রঙীন ফ্রক্‌পরা মেয়েটির সাদা বনেট-মণ্ডিত মুখটিতে মিষ্টি হাসি ও একটু দুষ্টুমিভরা চাউনি,—যেন একটি ননীর পুতুল; ধাত্রী

মেয়েটিকে একটি আপেল দিতেছে। ধাত্রীর সৌন্দর্য্য রূপের সৌন্দর্য্য নয়,—তাহা স্বাস্থ্যের ও মাতৃত্বের সৌন্দর্য্য। তাহার মুখের মৃদু হাসি, চোখের স্নেহময় ভাব, বেশের সরলতা তাহাকে সুন্দর করিয়াছে।

"হিলে বব" ফ্রান্স হালসের শেষ জীবনে আঁকা। শিল্পীর পাকা হাতের তুলির টান কি শক্তি, কি সৌন্দর্য্যে ভরা! মেয়েটির বেশভূষা, তাহার বনেট কলার তুলির লম্বা মোটা টানে আঁকা। ফ্রান্স হাল্‌স যেরূপ নিখুঁতভাবে সাধারণতঃ বেশভূষার খুঁটিনাটি, লেসের পাড়, জরির কাজ ইত্যাদি আঁকেন, এখানে সেরূপ খুঁটিনাটি আঁকার ভঙ্গী নেই। ফ্রকটি পিঠের কাছে ও কোমরে, তুলির আঁকা-বাঁকা টান দিয়া ঢেউএর দোলার মত আঁকা। মুখে যেরূপ হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, সেরূপ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোন সুখের তরঙ্গে প্রাণের উচ্ছ্বাসে কাঁপিতেছে, তাহা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু ক্রূর চোখের দীপ্ত চাউনিতে, গোল মুখের ঈষৎ ব্যঙ্গময় হাসিতে একটু নীচতা জড়ান। এ যেন নিছক রক্তমাংসের কুৎসিত হাসি। অন্তরের কোন গভীর আনন্দ নাই। এ যেন কোন বারাঙ্গনার লোক ভুলাইবার উচ্ছ্বাস। বাম স্কন্ধে একটি পেচা,—এ যেন কোন ডাইনী অথবা মায়াবিনী। হাঁ, এই কাফে-যুবতী নাবিকদিগের ভেনাস। হালস্ বোধ হয় তাঁর উচ্ছৃঙ্খল কাফে-কাবারে-জীবনে এই যুবতীকে দেখিয়াছিলেন, তাহার কোন রাত্রের উচ্চ ও একটু বীভৎস হাস্যকে আর্টের রাজ্যে চির-অম্লান করিয়া রাখিয়া গেলেন।

পিটার ডি হোক-অঙ্কিত (১৬৩০-১৬৭৭) 'মা' ছবিখানিতে ডাচ শিল্পীদের আসবাব-ভরা গৃহের একটি কোণ ও তাহার সহিত পারিবারিক জীবনের একটি সহজ সুন্দর দৃশ্য আঁকার আনন্দ ও নিপুণতা দেখিতে পাই। হলাণ্ডের এক মধ্যবিত্ত লোকের ঘরের একটি কোণ, সকাল বেলা, মা তাঁর ছোট মেয়েটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছেন, বিছানা সাজিয়ে ঘর পরিষ্কার করিয়া একটু শ্রান্ত হইয়া বসিয়াছেন। করিডর সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল। এক ঝলক আলো স্রোতের মত ঘরে আসিয়া পড়িয়া মায়ের মুখ হাত বুক দীপ্ত করিয়াছে।

ডেল্‌ফটের ভান্ ডেস্নার মেয়ারের "মুক্তার মালা কণ্ঠে নারী" ছবিটি আর একটি সূর্য্যকিরণস্নাত ডাচ-গৃহকোণের ছবি। একটি ডাচ যুবতী তাহার গৃহের দেওয়ালে লাগান আয়নাতে মুক্তার মালা জড়ান তাহার রূপ দেখিতেছে। জানলার কাচ দিয়া আলো তাহার মুখে বুকে ঝরিয়া পড়িয়া অলঙ্কার পরার সুখে ভরা মূর্ত্তি আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মনের খুসি চারিদিকে ঝিকিমিকি করিতেছে। আপনার রূপে সে আপনি মুগ্ধা। তলায় আসবাবের গম্ভীর মূর্ত্তি ও ছায়া ওপরে পেছনের দেওয়ালের বর্ণহীন উজ্জ্বলতাকে যেমন প্রখর করিয়াছে, তেম্নি আনন্দিতা নারীর মূর্ত্তিটিকে অন্ধকার হইতে উৎসারিত আলোর উচ্ছ্বাসের মত রূপ দিয়াছে। সুন্দর এ মুক্তার-মালা-মুগ্ধা নারীমূর্ত্তি।

ইতালীর চিত্রকরগণ

ডাচ্ শিল্পীদের ছবির ঘর হইতে ইতালীর চিত্রশিল্পীদের ছবির ঘরে যাইলে নব সৌন্দর্য্যলোক উদ্‌ঘাটিত হয়; যেন মানবজীবন-কল্লোলময় পথ হইতে গথিক চার্চ্চের স্নিগ্ধ আলো-অন্ধকার-ভরা রহস্যময় স্তব্ধ পূজার বেদীর সম্মুখে আসিলাম। বেশীর ভাগ খৃষ্টীয় ধর্ম্মমূলক ছবি,—যীশুর জন্ম, শিশু যীশু-কোলে মেরী, ক্রুশেবিদ্ধ যীশু, স্বর্গে ঈশ্বর-পিতার পাশে দেবপরী-পরিবৃতা যীশু, মাডানো ও মাডোনো।

ফ্রা লিপো লিপির (১৪০৬-১৪৬৯) "মাতা মেরী শিশু যীশুকে ভক্তিভরে পূজা করিতেছেন" (Mary adoring the child) ছবিটি সকলকে মুগ্ধ করে। সমস্ত ছবিটি যেমন ভক্তিরসাপ্লুত, তেম্নি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও শক্তির সহিত অঙ্কিত। ফ্রা লিপো লিপির আঁকা সকল ছবিতেই এমন কমনীয়তা, এমন স্বর্গীয় ভাব আছে যে, তাঁর অঙ্কন দক্ষতায় আমরা কেবল বিস্মিত মুগ্ধ হই না, আমাদের মাথা ভক্তিতে নত হয়। এই ছবিখানিতে মেরীর স্নিগ্ধ ভক্তিনত পাপকলঙ্কহীন মুখখানি সদ্যপ্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মত শুদ্ধ সুন্দর; তাঁহার নতজানু হইয়া বসিয়া করযোড় করার ভঙ্গী, তাঁর বেশের পাটের ছন্দ, খাড়া গাছভরা বনের পাশে এই আনতমূর্ত্তি রেখার একটি সঙ্গীত। ছোট ছোট ফুলে ভরা ঘাসের ওপর ছোট শিশু একটি ফুলের মত শুইয়া; বালক জন ব্যাপ্টিষ্ট, যুক্তকর সেণ্ট বার্ণার্ড ও স্বর্গীয় পিতা এই দেবশিশুর দিকে চাহিয়া। পিতার সম্মুখে "পবিত্র আত্মা" (Holy Ghost) পাখীরূপে পূজার প্রদীপের মত চারিদিকে দিব্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে। ছবিটির মধ্যে জ্যামিতি-

মূলক অঙ্কনপদ্ধতি দ্বারা যেমন সকল রেখা পরিমিত, সকল মূর্ত্তি পরস্পরের সহিত ছন্দোবদ্ধ, তেমনি অন্তরের গভীর অনুভূতিতে মানবতার ছবিটি প্রাণময়। লিপি ধর্ম্মকে মানব-অন্তরের স্পর্শে স্নিগ্ধ করিয়াছেন, স্বর্গকে মর্ত্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছেন, এইখানে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। ব্রাউনিংএর 'ফ্রা লিপো লিপি' বলিয়া সুন্দর কবিতাটি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন আচারগত শুষ্ক খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি মানব-অন্তরের সকল বাসনা-সুখ-উপভোগ-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি তাঁর মধ্যে বিদ্রোহিতা ছিল—কোন নারীকে ভালবাসিবার আনন্দ, গৃহসংসার করিবার সুখ দুঃখ ভোগ, সুন্দর মুখ দেখিবার খুসি, নিছক প্রকৃতিকে উপভোগ করিবার আনন্দ—মানব-জীবনের সকল বাসনা উপভোগের জন্য তাঁর অন্তর বুভুক্ষু ছিল। লিপি পৃথিবীর রূপ দেখিয়া, নরনারীদের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ব্রাউনিংর লিপি বলিতেছেন—

—The beauty and the wonder and the power,

The shape of things, their colours, light and shades.

Changes, surprises,—and God made it all !

Much more, the figures of man. woman and child.

সবই ত বিশ্বশিল্পীর সৃষ্টি,—চোখে যা সুন্দর দেখিয়াছেন, লিপি তাই আঁকিয়া গিয়াছেন। অঙ্কন-দক্ষতার সহিত অন্তরের উচ্ছ্বাস সৌন্দর্য্যের প্রতি তৃষ্ণা ও নিবিড় প্রেম মিলিত হইয়া তাঁর ছবিগুলিকে অতুলনীয় করিয়াছে।

বত্তিচেলির (১৪৪৪-১৫১০) শ্রেষ্ঠ ছবি ফ্লোরেন্সে আছে। তিনি ফ্রা লিপো লিপির একজন শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর চিত্র লিপি হইতে বিভিন্ন। বত্তিচেলি ইতালীর রেনেসাঁসের গৌরবময় প্রভাতের একজন প্রথম বিহঙ্গ। তাই তিনি মেরীর ছবি আঁকিতে আঁকিতে ভেনাসের ছবি আঁকিতে সুরু করিলেন। ফ্লোরেন্সে 'ভেনাসের জন্ম' নামে তাঁর যে প্রসিদ্ধ ছবিটি আছে, সেই ছবি আঁকিবার পূর্ব্বে বত্তিচেলি আর একটি যে ভেনাস আঁকিয়াছিলেন, সেই studyটি বার্লিনে আছে। বত্তিচেলি রিনেসাঁর স্পর্শ পাইয়াছেন বটে, কিন্তু মধ্যযুগের মিস্টিসিজমে তাঁর অন্তর ভরা, তাই তাঁর ভেনাস আনন্দ-উচ্ছ্বসিতা গ্রীক দেবী নন,—তাঁর মুখে, সমস্ত দেহের ছন্দে এক মধুর বিষণ্ণতা জড়ান। বস্তুতঃ বত্তিচেলির প্রায় সকল ছবিগুলির নারীমূর্ত্তির মধ্যে একটা মধুর বিষাদভাব আছে। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন কমনীয় পেলব, তেমনি একটা করুণ-ভাব মাখান; রেখার ছন্দ যেমন সুন্দর, তেমনি উদাসতায় ভরা। বত্তিচেলির এই উদাসতাময় করুণ মাধুর্য্যের জন্য ইংলণ্ডের প্রিরাফেলাইটা তাঁহার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ভেনাসের এ মূর্ত্তিটি যেমন সুন্দরী, তেমনি উদাসিনী,—কামনার সঙ্গে যে বেদনা রহিয়াছে, প্রেমের তৃষ্ণার যে তৃপ্তি নাই। এ মূর্ত্তি আমাদের মত্ত করে না, কিন্তু মুগ্ধ করে,—পদ্মের একটি দীর্ঘবৃন্তের মত মূর্ত্তিটি হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে। মুখখানি যেন একটি ফুলের কুঁড়ি, ধীরে ধীরে ফুটিতেছে,—চোখদুটি স্বপ্নে ভরা, একটু আশঙ্কা ও বেদনায় ভরা; অপর্য্যাপ্ত কেশ, পেছনের সুদীর্ঘ চুলগুলি সাপের মত বাঁকিয়া পিঠ বাহিয়া দেহ জড়াইয়াছে। দুই পাশের কেশগুচ্ছ যেন ধূমময় অগ্নির শিখা, অথবা নাগিনীর দল নীচে নামিয়া গিয়াছে, সুন্দর বেণী ঘাড়ের পাশ দিয়া বুকে স্তনের ওপর আসিয়া পড়িয়াছে,—সুখদুঃখময় মর্ত্ত্যভূমিতে স্বর্গের উর্ব্বশী মধুর উদাস ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া। বত্তিচেলির এই ভেনাস চিত্রকলার এক নবযুগের সোণার দ্বার খুলিয়া দিল, —যীশু-মাতা মেরীর পাশে গ্রীসের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অনাথেশ্বর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

(বীরভূমবাসী তাঁহাদের কালেক্টর মিঃ টি, সি, রায় বাহাদুরের উৎসাহে মেথরদিগের জন্য একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন এবং 'অনাথেশ্বর' নামক শিব ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মেথরগণ কৃতজ্ঞতায় ও ভক্তিতে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে।)

কৈলাস তব অনেক উর্দ্ধে
অনাথেরা যেতে নারে,
শ্মশান তাদের বড়ই নিকটে
বরং গৃহের ধারে।
তাই ত শ্মশানে আসন রচেছ
দীনের দেবতা তুমি,
তোমার পরশে মৃতের ধরণী
হলো অমৃতভূমি।
অস্পৃশ্যের স্পর্শপিয়াসী
বন্ধু মুমূর্ষুর।
হে নীলকণ্ঠ, পিনাকী ভয়াল
দয়াল চন্দ্রচূড়,
হিন্দু-সমাজ-সাগর মথনে
উঠেছে যে হলাহল,
নিঃশেষে তাহা পান কর তুমি
ধূর্জ্জটী মহাবল।
বাজুক ডমরু বাজুক বিষাণ
গরজি উঠুক ফণী,
জাগুক জটায় নভোগঙ্গার
কল কল্লোল ধ্বনি ;
জাগিয়া উঠুক মৃত নিদ্রিত
অসাড় মুহ্যমান,
ডাক শোনে আজ লাঞ্ছিত জনে
কাঙ্গালের ভগবান।
ডাক দাও আজি, ডাক দাও আজি
অধঃপতিত জনে,
কর পাংক্তেয় হে বিরূপাক্ষ
সুধার নিমন্ত্রণে।
জাগ্‌রে পতিত জাগ্‌রে অনাথ
পোহালো তোদের রাত
আজিকে তোদের দুয়ারে এসেছে
স্বয়ং জগন্নাথ।
ফিরে নে তোদের স্বত্বাধিকার
প্রাপ্য জন্মগত,
ওরে বিস্মৃত অমৃতপুত্র
র'বি কি মৃতের মত!
জীবন ধরিয়া ঘুচালি তোরাই
ধরার আবর্জ্জনা,
মনের ময়লা ঘুচাইতে কর
সুকঠোর উপাসনা,
সমাজের তোরা বিরাট ভিত্তি
ঋষির বংশধর,
চিত্ত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত
হউক জাতিস্মর।
তোরা যে হিন্দু, ভকতি রাজ্যে
উচু নীচু কেহ নাই
জানি কপিলের তোরা স্বগোত্র
বিদুরের তোরা ভাই।
গুহক রাজার তোরা যুবরাজ
শবরীর তোরা জ্ঞাতি,
তোদের শক্তি তোদের ভক্তি
উজল করিবে জাতি।

মেঘদূতে নারীর প্রভাব

শ্রীনরেন্দ্র দেব

শিল্পে সাহিত্যে ও স্থাপত্য-কলায় প্রাচীন ভারত চিরদিন তার কল্পলোকের আদর্শকে বাস্তবের চেয়ে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এসেছে।

সেকালের প্রাচ্য শিল্পীরা যে-কোনও কলা বিভাগে যা-কিছু সৃষ্টি করতেন তাকে তাঁরা কোনও বিশেষ দেশ কালের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্ব্ব দেশের ও সর্ব্ব কালের আদর্শ ক'রেই গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করতেন। তাঁরা ছিলেন অমৃতের পুত্র, বিশ্বে অমর কীর্ত্তি রেখে যাওয়াই ছিল তাঁদের সাধনা।

বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের অতলগর্ভস্থ মণি-রত্নের সন্ধান না ক'রে, মাত্র তার বেলাভূমে ঝিনুক সংগ্রহ করতে এলেও, এ বিশেষত্বটা যে কোন সমালোচকের চক্ষে প'ড়বেই যে, সে রাজ্যের নরনারী কেউ এ প্রত্যক্ষ জীবজগতের বাস্তব প্রাণী নয়। তারা সব কবির মানস-লোকের অনুপম মূর্ত্তি! সেখানে জাগতিক ঘটনার পরিবর্ত্তে নিয়ত ঘটছে নানা অলৌকিক ব্যাপার! তাঁরা কেউ ব্যবহারিক স্থূল কথা কিছু বলেন না, তাঁদের যা কিছু বক্তব্য, সে সমস্তই কল্পনাত্মক! অতি সামান্য কিছুর মধ্যেও তাঁরা বিরাটের স্পর্শটুকু না দিয়ে যেন তৃপ্ত হ'তে পারতেন না! তাঁদের কাব্য ও নাটকের নায়ক নায়িকাদের মধ্যে মানবের চেয়ে দেবতার রূপটাই বড় হ'য়ে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়!

মহাকবি কালিদাসের কিন্তু শিল্প-বৈশিষ্ট্য অন্যরূপ। তাঁকে ঠিক এ দলের কলাবিদ্ বলা চলে না। মেঘদূতের 'অলকা' সৃষ্টি করবার মতো তাঁর বিরাট ও মহান কল্পনা-শক্তি ও উচ্চতম আদর্শের ধ্যান ধারণা থাকলেও তিনি ঘর-সংসারের ছোটখাটো কথা এবং নরনারীর অন্তর্গূঢ় মনস্তত্ত্বটুকু বাস্তব রংয়েই যথাযথ এঁকে যাবার চেষ্টা ক'রেছেন, আবার স্বর্গের ব্যাপারকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ফুটিয়ে তুলবারই প্রয়াস পেয়েছেন। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে তিনি কোনও দিনই দিক্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়েন নি। সেই জন্যই তাঁর রচনা কোথাও অস্পষ্ট বা রহস্যময় ব'লে মনে হয় না!

কালিদাসের নায়ক নায়িকারা সবাই রক্তমাংসে গড়া জীবন্ত মানুষ। এই মানুষের মধ্যেই তিনি তাঁর দেবতাকেও দেখেছেন ব'লে, তাঁর সৃষ্ট কোনও কোনও চরিত্র দেবতুল্য হ'লেও তারা কখনও মানুষকে অবহেলা ক'রে তাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করেনি। কালিদাসের কাব্যের দেবতারাও তাই পরিপূর্ণ মানবাচারী।

এই মানবতার মহাকবি তাঁর রচনাবলীর মধ্যে তৎকালীন ভারতের সভ্যতা, সামাজিকতা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ও লৌকিক বিধি ব্যবস্থার যে অতুলনীয় ছবি রেখে গেছেন, ঐতিহাসিকেরা অনেকেই সেগুলিকে তাঁর সমসাময়িক ভারতের রূপ ব'লে স্বীকার করে নিয়েছেন।

মেঘদূতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের যে সুসমৃদ্ধ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে নাকি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুপ্ত সাম্রাজ্যের বল-বাণিজ্য-বৈভব-বিদ্যা প্রভৃতি সকল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন স্বর্ণযুগের এত বেশী সৌসাদৃশ্য আছে যে, 'ম্যাকডোনেল্' প্রভৃতি (Dr. Macdonell) পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন কালিদাস সেই গুপ্ত সম্রাটদের শাসন কালেই আবির্ভূত হ'য়েছিলেন।

গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকাল ৩২০ থেকে ৪৮৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'য়েছিল ব'লে তাঁদের মতে কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগের কবি। মহারাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যিনি গুর্জ্জর ও মালব প্রভৃতি দেশ জয় ক'রে উজ্জয়িনীতে তাঁর রাজধানী স্থাপন ক'রে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ ক'রেছিলেন, এবং যাঁর সময়ে উজ্জয়িনী সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি ও প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিল, কালিদাসের মেঘদূতে বর্ণিত উজ্জয়িনীর মধ্যে হুবহু নাকি সেই ছবিই পাওয়া যায়! অতএব একদলের মতে তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন ও তৎপুত্র কুমারগুপ্ত বা স্কন্দগুপ্তের অনুগত কবি ছিলেন।

কিন্তু, ম্যাক্স্‌মুলার ও ফারগিউসন্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা খৃষ্ট ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসের উদ্ভব হ'য়েছিল ব'লে অনুমান করেছেন। তাঁরা বলেন যে কালিদাস ছিলেন যশোধর্ম্মণ্ বিক্রমাদিত্য—যিনি 'বিক্রম সম্বৎ' প্রচলন করেন—তাঁরই

সভাকবি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ এ দেশের বহু পণ্ডিতও এই মতেরই পক্ষপাতী।

কিন্তু, সার্ উইলিয়ম জোনস্ প্রভৃতি একাধিক পণ্ডিতেরা এই ষষ্ঠ শতাব্দীকে কালিদাসের কাল ব'লে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা অসংখ্য প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা দেখিয়েছেন যে কালিদাস খৃঃ পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর কবি ছিলেন।

কালিদাসের কাল নিয়ে যে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যাচ্ছে, তার কোনও সুনির্দ্দিষ্ট মীমাংসা আজও হয় নি। তাই ও প্রত্নতত্ত্বের কণ্টক বনে না ঢুকে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও বলি—

"হায় রে, কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল,
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে ল'য়ে তারিখ সাল;
হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ
ইতিবৃত্ত আছে' স্তব্ধ
গেছে যদি, আপদ গেছে—মিথ্যা কোলাহল!"

বিশ্বসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য মেঘদূতখানিকে অনুপম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত ক'রেছে এর নানা বিচিত্র নারী-চরিত্র। কবি তাঁর এই কাব্যের মধ্যে যেখানেই প্রকৃতির চিত্তহারিণী শোভা চিত্রিত করেছেন সেখানেই সুন্দরী তরুণীর সমাবেশ করে তাঁর আলেখ্যখানিকে সুশ্রী ও সুসম্পূর্ণ ক'রে তুলেছেন। "উপমা কালিদাসস্য" ব'লে কবির যে খ্যাতি আজ অক্ষয় হ'য়ে গেছে, তার জন্য কবি যদি কারুর নিকট ঋণী থাকেন তবে সে একমাত্র নারীর কাছেই।

প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেমন নারীর সৌন্দর্য্যের সাহায্য নিয়েছেন, তেমনি আবার যেখানে রমণীর রমণীয় প্রতিমা অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার পটভূমিকা রূপে নয়নাভিরাম নিসর্গ শোভার শরণ নিয়েছেন। এমনি ক'রে এই কাব্যের মধ্যে প্রকৃতি ও নারী পরস্পর বিজড়িত হ'য়ে পরস্পরের রূপকে যেন পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে।

কবির কাছে নারী ও প্রকৃতি যেন সৃষ্টির একই রূপের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র! প্রকৃতির যত কিছু শোভা ও সৌন্দর্য্য, এই স্বভাব-কবির কাছে তা' কোনও দিনই অচেতন বা জড়পদার্থরূপে প্রতিভাত হয়নি। প্রকৃতি যেন এঁর চোখে ধরা দিয়েছিলেন সজীব ও প্রাণবন্ত মূর্ত্তিতে! তাই, আষাঢ়ের প্রথম মেঘ যেদিন শৈলসানুতে এসে সংলগ্ন হ'লো, কবির দৃষ্টিতে তাকে দেখালো যেন 'বপ্রক্রীড়া পরিণত গজ!' তারপর সেই 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাংসন্নিপাতঃ' যে মেঘ তাকেই কবি বিরহী যক্ষের দূত করেছিলেন! কারণ, তাঁর কাছে মেঘ যে "জাতংবংশে ভুবন বিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং!" সে যে কামরূপ—সে যে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান অনুচর! আর 'প্রিয়া-বিরহে সন্তপ্ত যারা—তাদের সকলের শরণ স্বরূপ! সে মেঘের সংস্পর্শে এসে বর্ষে বর্ষে রামগিরি কি করে?—না—'স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম!' উষ্ণ বাষ্প মোচন ক'রে তার স্নেহের অভিব্যক্তি জানায়! অতএব রামগিরিও কবির কাছে জড়পদার্থ নয়। দশদিকও তাঁর কাছে শূন্য নয়, কারণ যক্ষ মেঘকে সতর্ক করে দিচ্ছে "দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরণা স্থূলহস্তাবলেপান্!"

আম্রকূট পর্ব্বতও কবির কাছে সজীব, যেহেতু যক্ষ বলছে—সে তোমাকে বন্ধু বলে আদরে মাথায় করে নেবে, কারণ, তুমি যে বারিবর্ষণে তার দাবানলের জ্বালা জুড়িয়ে দাও।

রামগিরি আশ্রমের কথা ব'লতে গিয়ে কবির সর্ব্বাগ্রে মনে পড়েছিল জনকতনয়ার কথা—যাঁর অবগাহন হেতু সেখানকার নির্ঝরিণীর জল পুণ্যোদক হ'য়ে উঠেছিল।

মেঘ দেখে যক্ষের মন উদাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়লো কাদের কথা—না যারা 'কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনি জন!' তারপরই এলো পথিক-বণিতা! যারা মুখখানি তুলে কপালের উপর ঝুলে পড়া তাদের অলকদাম সরিয়ে তোমার পানে পতিসমাগম আশায় আশান্বিতা হ'য়ে চেয়ে দেখবে! তার পরই আমরা দেখতে পাই মেঘসন্দর্শনে মুগ্ধা সিদ্ধাঙ্গনারা ভাবছে—বায়ু কি গিরিশৃঙ্গ উড়িয়ে নিয়ে চলেছে?—অন্যত্র এই সিদ্ধনারীরা তাদের প্রিয় সহচরদের সঙ্গে ফুল্লমনে আকাশে উড়ে যাওয়া বলাকা শ্রেণী গণনা ক'রছে, কিম্বা, বারিবিন্দু গ্রহণে চতুরা চাতকের দলকে নিরীক্ষণ করছে; এমন সময় সহসা মেঘগর্জ্জনে ভয়চকিত হ'য়ে পার্শ্বস্থ সঙ্গীদের বুকের মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে! এই সিদ্ধ-দম্পতীরাই আবার আর একস্থলে বীণা বাজিয়ে স্কন্দ-পূজায় আসবার পথে মেঘকে দেখে সরে যাচ্ছে—পাছে বৃষ্টির জলে তাদের বীণার তন্ত্রী ভিজে যায়!

তার পর এসেছে জনপদবধূরা! যাদের প্রীতি-স্নিগ্ধ লোচন ভ্রূ-বিলাসে অনভিজ্ঞ! কারণ, তারা যে সব সরলা চাষার মেয়ে! গাঁয়ের বউ ঝী যে তারা!

তার পরই আমরা দেখতে পাই পার্ব্বত্য কুঞ্জবিহারিণী বনচর-বধূর দল!

যক্ষ ব'লছে—হে মেঘ, তুমি যখন দশার্ণ প্রদেশে যাবে সেখানে মালঞ্চের বেড়ায় কেতকীফুল ফুটে উঠে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করবে। নীড়রচনারত পাখীদের কলকূজনে গ্রাম্যপথের তরুশাখা সব মুখরিত হ'য়ে উঠবে। তোমার সাড়া পেয়ে মাটীর ভিতর থেকে ভূঁই চলাফুল মুখ তুলে চাইবে।

বিদিশায় গিয়ে তুমি চলস্রোতা বেত্রবতী নদী দেখতে পাবে—যেন ভ্রূভঙ্গ চঞ্চলা নারীর মতো সে চলেছে। তুমি সশব্দে চুম্বন ক'রে তার অধরসুধা পান কোরো।

নীচৈপর্ব্বত পুষ্পিত কদম্বতরু সম্ভারে পরিপূর্ণ! তুমি যখন তার বুকের উপর গিয়ে পড়বে, মনে হবে যেন তোমার পরশ পুলকে সে ওই কদম্বকেশর শিহরণে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে! এইখানে আমরা পণ্যস্ত্রীর উল্লেখ পাই, নীচৈ গিরির নিভৃতগুহা যাদের রতিপরিমল গন্ধ উদ্গীর্ণ করে নগরবাসীদের উদ্দাম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ঘোষণা করছে!

তার পরই এসেছে 'গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজা ক্লান্ত কর্ণোৎপলা' পুষ্পলাবী! কুসুম চয়ন ক'রতে ক'রতে যারা ক্লান্ত হ'য়ে কাণের কমলফুল দিয়ে গালের ঘাম মুছতে মুছতে পদ্মগুলিকে মলিন ক'রে ফেলেছে!

এইবার উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনীর পথে নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর সঙ্গে দেখা হবে। দেখবে তরঙ্গ সঙ্ঘাতে ক্ষুব্ধ কেলিকূজন-রত কলহংসের দল মেখলার মতো তার কটিদেশে শোভা পাচ্ছে! উপলব্যথিতগতি নির্ব্বিন্ধ্যার সলিলাবর্ত্ত দেখে মনে হবে সে যেন তোমাকে নাভি দেখিয়ে কুটিলগমনে চলেছে! রসিকারা এমনি করেই তাদের প্রিয়জনকে ইঙ্গিতে মনের কথা জানায়!

তোমার বিরহে সে নদী যেন বিরহিনীর বেণীর মতো শীর্ণকায়া! তীরজাত তরু হ'তে খ'সে পড়া শুক্‌নো পাতার অবগুণ্ঠনে তাকে বড় সুন্দর দেখতে হবে! তুমি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো। তাকে হতাশ কোরোনা!

উজ্জয়িনীতে বিকচ কমলগন্ধে সুরভিত প্রভাতের সিপ্রা সমীরণের সুখ স্পর্শ তরুণীদের নৈশ বিহারজনিত ক্লান্তি দূর করে দেয়! যেমন করে প্রিয়তমেরা তাদের প্রণয়িনীর অঙ্গসেবা ক'রে তাদের নৈশ রতিবিলাসশ্রম বিদূরিত করে। এইখানে আমরা উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনাদের সঙ্গলাভ করি। যাদের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত চকিতৈ চঞ্চলকটাক্ষ না দেখলে—কবি বলছেন তোমাদের জন্মই বৃথা হ'য়ে যাবে! যাদের কুন্তলসংস্কার ধূপের ধোঁয়ায় মেঘের কলেবর পুষ্ট হয়। যারা অবন্তীর লক্ষ্মী স্বরূপিণী! যে ললিত বনিতাদের—অলক্তরাগ-রঞ্জিত পদাঙ্ক বহন ক'রছে সেখানকার কুসুম সুরভিত হর্ম্ম্যরাজি। সেখানে জলক্রীড়ারত যুবতীগণের স্নান লীলায় গন্ধাবতীর জল তাদের অঙ্গের চন্দনপঙ্কে সুবাসিত!

তার পর মহাকালের মন্দিরে আমরা রত্নদণ্ড-চামর হস্তে লীলারঙ্গে নৃত্যপরা বারাঙ্গনা বা দেবদাসীদের দেখা পাই! এই বারবধূগণের সুদীর্ঘ কটাক্ষ কবির কাছে যেন কৃষ্ণবর্ণ অলিদলের মতো সজীব! জলদপ্রিয়া সৌদামিনী নিয়ত বিলাসলীলায় কবির চক্ষে যেন মানবীর মতোই অবসন্না হ'য়ে পড়েছে! সূর্য্য সারানিশি অন্যত্র যাপন ক'রে প্রভাতে আসে যেন তার মানময়ী নায়িকা কমলিনীর আঁখি হ'তে অভিমানের অশ্রুজল মোছাতে! এইখানে আমরা 'খণ্ডিতা' নারীর দেখা পাই! যাদের প্রিয়তমরা সারানিশি অন্যত্র যাপন ক'রে প্রভাতে ঘরে ফিরে অভিমানিনী প্রিয়ার অশ্রু মুছে দেয়।

তারপরই আমাদের দেখা দেন স্বয়ং ভবরাণী ভবানী! যিনি মেঘের ভক্তি সন্দর্শনে 'শান্তদ্বেগস্তিমিত নয়না!' যিনি পুত্রস্নেহবশে কুমার বাহনের পুচ্ছ স্খলিত বর্হ আপন কর্ণের কমলফুল পরিহার করে ধারণ করেন! যিনি ভুজগবলয় পরিত্যক্ত শম্ভুর হাত ধরে পদব্রজে বিহার অচলে গিয়ে ওঠেন!

তারপর আমরা দেখতে পাই অভিসারিকা যোষিতাদের, রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে আলোকহীন রাজপথ দিয়ে যারা বিদ্যুদ্দীপ্তির সাহায্যে পথ চিনে নিজ নিজ বল্লভের ভবনোদ্দেশে যাত্রা করেছে!

সেখানে গম্ভীরা নদী আছে। গম্ভীরা নদীর স্বচ্ছ জল দেখে কবির মনে হ'লো—সে যেন পতিপ্রাণা সরলা ললনার প্রসন্ন অন্তরের মতো সুনির্ম্মল! জলের মধ্যে কুমুদশুভ্র

শফরীর নর্ত্তন দেখে মনে হচ্ছে যেন সুন্দরী তার চটুল কটাক্ষ বাণ নিক্ষেপ ক'রছে! তার তর্ তর্ ক'রে ব'য়ে যাওয়া নীল জল দেখে মনে হ'চ্ছে যেন সে জল নয়—তার নিতম্বচ্যুত নীলবাস বাতাসে উড়ে যাচ্ছে! নদীর তীর হ'তে বেতসলতা জলের উপর নু'য়ে পড়েছে, দেখে মনে হ'চ্ছে যেন সুন্দরী তার চম্পক অঙ্গুলী প্রান্তে শ্লথ কটিবস্ত্রখানি ঈষৎ চেপে ধ'রছে!

কবির কাছে পদ্ম শুধু ফুল নয়—তারা পদ্মমুখী তরুণী! —তাদের প্রাণ আছে—মন আছে—অনুভূতি শক্তি আছে। তারা দুঃখে ম্লান হয়, আনন্দে উজ্জ্বল হয়, আঘাতে মুষড়ে পড়ে, পুলকে নৃত্য করে। তরঙ্গের তালে তালে হেলে দুলে তারা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে! হিমশিশিরতুষারপাতে তাদের অশ্রু ঝরে! রবিকরকিরণ সম্পাতে তারা হেসে ওঠে!

তার পর, দশপুর-বধূদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। ভ্রূলতার বিলাসে যারা সবিশেষ অভিজ্ঞা! যারা তাদের কাজল-আঁখির ঘনকৃষ্ণ পল্লব ক্ষেপণে তোমার পানে চেয়ে দেখবে। তাদের সেই চঞ্চল চোখের চপল চাউনি দেখে মনে হবে যেন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া একমুঠো সচল কুন্দ ফুলের পিছু পিছু ছুটে চলেছে এক ঝাঁক কালো ভোমরা!

কনখলে হিমাচল থেকে জাহ্নবী যেখানে নেমে আসছেন, পাহাড়ের ক্রমনিম্নগামী স্তরে স্তরে আছড়ে পড়ে সোপান শ্রেণীর মতো সে প্রপাত ফেনোচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছে! দেখে মনে হ'চ্ছে যেন গরবিনী জহ্নুকন্যা সতিনী গৌরীর ঈর্ষা কোপন ভ্রূকুটী ফেনাহাস্যোচ্ছ্বাসে উপহাস ক'রে হরললাট চন্দ্রমাকে তাঁর উর্ম্মী ক'রে ঢেকে ফেলে রুদ্রজটাজাল সদর্পে আকর্ষণ করছেন!

তার পর আমরা হলধর-প্রিয়া রেবতীর উল্লেখ পাই, যাঁর ললিতলোচন বিম্বিত মধুর মদিরা বলদেব নিত্য পান করতে ভালবাসেন!

তার পর এসেছে একেবারে কিন্নরীর দল! যারা মধুর কণ্ঠে ত্রিপুরবিজয় গান ক'রে দেবাদিদেব পশুপতির সম্বর্দ্ধনা ক'রছে!

তার পরেই দেখতে পাই মানব চক্ষের অগোচর যা—সেই ত্রিদিশ-বনিতাদের! চিরতুষারধবল কৈলাস যাদের প্রসাধনের দর্পণ স্বরূপ। যে সুরযুবতীরা ক্রীড়ারঙ্গে কঙ্কণাঘাত ক'রে মেঘের জল বিকীর্ণ করিয়ে ধারা-যন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

এইবার কৈলাসের তুষারাবৃত শুভ্র শৃঙ্গে ধনপতি কুবেরের অলকা নগরী! ঠিক যেন প্রিয়তমের কোলে প্রণয়িনীর মতো শোভা পাচ্ছে! অলকার পদতলে প্রবাহিতা গঙ্গা যেন সেই স্রস্তবাসা নাগরিকা নগরীর—শিথিল অঞ্চলখানির মতো লুটিয়ে পড়েছে!

সেখানকার গগনস্পর্শী সৌধমালা বর্ষার বারি-ঝর-ঝর মেঘকে যখন মাথায় তুলে ধরবে তখন মনে হবে যেন সুন্দরীদের মাথার পরে মুক্তাজাল জড়ানো কৃষ্ণকুন্তল কবরী!

অলকায় আমরা যক্ষনারীদের দেখতে পাই—যারা বিদ্যুৎবন্তঃ 'ললিত বনিতা!' সেখানে অমর-বাঞ্ছিতা কন্যারা কণকসিকতা মুষ্টি নিক্ষেপে গুপ্তমণি নিয়ে খেলা করে। সেখানে বিবুধ বনিতা বারমুখ্যারা বৈভ্রাজ উদ্যানে ধনপতিদের সঙ্গে প্রমোদে মত্ত থাকে। সেখানকার মেয়েরা—

কুরুবকের পরতো চূড়া কালো কেশের মাঝে
লীলাকমল রৈতো হাতে কি জানি কোন্ কাজে!
অলক সাজতো কুসুম ফুলে
শিরিষ প'রতো কর্ণমূলে
মেখলাতে দু'লিয়ে দিতে নবনীপের মালা!
ধারা-যন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিতে কেশে—
লোধ্র ফুলের শুভ্র রেণু—মাখত' মুখে বালা!—

এমনিতর নারীর নানা বিচিত্র রূপ ও ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে কালিদাসের মেঘদূত আজ জগতে কালজয়ী হ'য়ে উঠেছে। *

* মাজুতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৭)

মায়াবাদীর সম্মুখে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! রাজা ভরত বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের হাতে রাজ্যভার তুলিয়া দিয়া বনে গিয়াছেন। সেখানে ভগবানকে পাইবার আশায় কঠোর তপস্যা করিতেছেন। একদিন বনমধ্যে তিনি একটী হরিণ-শিশু কুড়াইয়া পাইলেন।

যিনি পুত্র, কলত্র, রাজ্য, এক কথায় সংসারের সকল আকর্ষণ ছাড়াইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন, তিনি কি না এইরূপে একটী ক্ষুদ্র হরিণ-শিশুর মায়ায় জড়াইয়া পড়িলেন। মায়ার কি প্রতাপ,—সে তপস্বীর মনও বিচলিত করিয়া তুলে,—তাহাকে তাহার কাম্য ভগবানের আরাধনা হইতে বিচ্যুত করে। যে মায়া ত্যাগ করিয়া রাজা ভরত বনে আসিলেন, সেই মায়া এখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিল।

বনের জন্তু সে, একদিন বুঝি সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার জন্যই বনে চলিয়া গেল। রাজার তখন তাহার জন্য কত না ব্যাকুলতা, কত না চোখের জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল। কোথায় রে, কোথায় চলিয়া গেল সে? ভরত বনে বনে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তাঁহার চোখ ফাটিয়া শ্রাবণের ধারার মত অশ্রুজল ঝরিতেছিল। তাঁহার তখন মনে হইতেছিল—সে দেখিতে কেমন সুন্দর ছিল, কতখানি তাঁহাকে ভালবাসিত, তাঁহার কোলে কেমন আসিত।

অবশেষে মৃত্যু। লেখক বড় সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—মৃত্যু কেমন ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। সে স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছে সে আসিতেছে। কিন্তু তপস্বী ভরতের মানসচোখের সম্মুখে ভাসিতেছিল সেই হরিণশিশু। তাঁহার বহির্দৃষ্টি তখন অল্পে অল্পে নিভিয়া আসিতেছে। তখনও সেই ঝাপসা চোখে তিনি দেখিতে চাহিতেছেন, সে আসিতেছে কি না। সে আসিল না, সে আর আসিবে না। যে একবার স্বাধীনতা-সুখ উপলব্ধি করিতে পায়, সে কি আর বন্ধনে জড়াইতে চায়? সে আর পিছন পানে ফিরিয়া চায় না, কেবল সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইয়া যায়।

বিহারীলাল সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শুনিতেছিলেন। কতবার এই উপাখ্যান বাড়ীতে কথক ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছেন, কতবার নিজে পড়িয়াছেন, তবু এ উপাখ্যান আর পুরাতন হয় না। আজ সীতার মুখে এ উপাখ্যান যেমন সুন্দর শুনাইল, এমন সুন্দর আর কোন দিন মনে হয় নাই। পড়িতে পড়িতে সীতার কণ্ঠস্বর বড় করুণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অন্তর বিলোড়িত হইয়া উঠিতেছিল।

নারায়ণ, মুক্ত কর, মুক্ত কর তোমার এ চিরসেবককে, এ জন্মের বাসনা-কামনাময় কর্ম্মফল ভোগ করিতে আবার যেন এমন পঙ্কিলতার মাঝে জন্ম লইতে না হয় প্রভু! কত রূপে কত সময় পরীক্ষা করিতেছ, কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই তাহা তো জানি। আমায় দৃঢ়তা দাও, আমায় শক্তি দাও, আমায় সাহস দাও, সত্যজ্ঞান দাও। আর যে পরীক্ষা আসিবে আমি যেন তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারি।

প্রথমটা শুনিতে শুনিতে চোখে জল আসিয়াছিল, কখন চোখ ছাপাইয়া দু' চার ফোঁটা শুষ্ক গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়াও পড়িয়াছিল। সীতা যখন পাঠ সমাপনান্তে গলায় কাপড় দিয়া উদ্দেশে কাহাকে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিল, তখন তাঁহার মুখের উপর—প্রথমে যে বিষণ্ণতা জাগিয়াছিল তাহা আর দেখিতে পাইল না। বৃদ্ধের মুখখানা তখন অস্বাভাবিক দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি তাঁহার লক্ষ্যহারা জীবনে যেন একটা লক্ষ্য স্থির করিতে পারিয়াছেন; অসীমের কোলে দাঁড়াইয়া সীমা খুঁজিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই মুহূর্ত্তে সীমায় পৌছাইবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

ক্ষীণ দৃষ্টি কোথায় ন্যস্ত ছিল কে জানে, ফিরাইয়া আনিয়া সীতার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বুঝতে পারলি কি দিদি?"

সীতা কোমল কণ্ঠে বলিল, "যতটুকু সামর্থ্য দাদু, ততটুকু বুঝতে পেরেছি। বুঝেছি—মায়ায় জড়িয়ে থাকলে এই রকমই

অবস্থা হয়, মায়াই আমাদের ঘুরে ফিরে নিয়ে আসে। পুরাণকার রাজা ভরতের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। মানুষ যখন জন্মায় দাদু, তখন সে একা রিক্ত হাতে আসে; পরণের কাপড়খানি পর্য্যন্ত হাতে করে আনে না। সংসারে এসে সংসারের সব নিয়ে তবে তারা ধনীর সাজে সজ্জিত হয়। সংসার তাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যে পিতামাতা, স্ত্রী পুত্র, ধন ঐশ্বর্য্য সব দেয়। আবার যদি তার দরকার হয়, একে একে সবই কেড়ে নেয়। এর জন্যে আমরা বুকে ব্যথা পাই, দারুণ অসুখী হই—হাহাকার করে কাঁদি! আমরা কি মনে ভাবি দাদু, আমরা রিক্ত হাতে এসেছি, আবার রিক্ত হাতে চলে যাব? এই সংসার-গণ্ডীর বাইরে ওরা কেউ আমার বাপ মা, স্ত্রী পুত্র স্বামী রূপে পাশে ছিল না,—সংসার আমায় এই সব মিথ্যে জিনিস দিয়ে মায়ায় ভুলিয়ে রেখেছে,—আবার যখন চলে যাব তখন কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। মুক্ত জীব আমি,—কেন স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়ব,—একটা দাগ বুকে নিয়ে গিয়ে আবার কেন সংসারের মায়াজালে জড়াতে আসব? সে জন্মে এ জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করতে গিয়ে নতুন কর্ম্মে হাত দেব—এ জন্মের মায়াপাশ শিথিল করতে গিয়ে নতুন মায়ায় জড়িয়ে পড়ব, ফলে মুক্তি আমার কখনই হবে না। কত জন্ম এমনি করে আসব, আঘাত সইব, আবার যাব, তা কে জানে। আমরা এই সহজ সরল সত্য কথাটা—সব জেনে-বুঝেও ভাবতে ভুলে যাই; তাই লক্ষবার আসছি আবার যাচ্ছি, কোনবারই পূর্ণতা লাভ করতে পারছিনে। এই সংসারটাকেই সার বলে চিনেছি,—এই সংসারের ওপরে আর একটা স্থান আছে—যেখানে আমাদের যেতেই হবে—তার কথা তো একটা দিনও ভাবি নে দাদা।

শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধের দীপ্তিহীন চক্ষু দুইটী প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সত্য,—সীতা যে এমন সব কথা জানে তাহা তো তিনি জানেন না। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বড় কষ্ট রইল দিদি যে তোকে—"

অনুমানেই তাঁহার বক্তব্য বুঝিয়া লইয়া সীতা মৃদু তিরস্কারের সুরে বলিল, "না; আপনার মুক্তি আর কিছুতেই হবে না দাদু,—আপনার এতখানি বয়েস হল, আপনি এখনও কিছু করতে পারলেন না। আমায় যতটা কাছে পেয়েছেন—বিয়ে দিলে কি ততটা কাছে রাখতে পারতেন? ধরুন, আপনার নাতির সঙ্গেই না হয় আমার বিয়ে দিতেন, তাতেও কি এমনভাবে আমায় পেতেন দাদু? আমার ঘাড়ে যে কর্ত্তব্যের ভার চাপিয়ে দিতেন, তা আমায় আগে পালন করতেই হতো। তাহলে এমনভাবে বই শোনা, সেবা পাওয়া কিছুই আপনার হয়ে উঠত না। ভগবান যা করেন তা ভালর জন্যেই করেন।"

"ঠিক কথা বলেছিস ভাই, ভগবান যা করেন তা ভালর জন্যেই। জানিস দিদি, বুঝি সব, জানি সব,—তবু ওই এক একবার বুকটার মধ্যে কেমন করে ওঠে, তা আমিই বুঝতে পারি নে।"

চুপ করিয়া তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন।

সীতা আস্তে আস্তে বলিল, "মা বলছিলেন পূজো এসেছে; এবার—"

চোখ তুলিয়া বিহারীলাল একটু হাসিয়া বলিলেন, "মায়ের যেমন ইচ্ছা তেমনিই পূজো হবে। তিনি ইচ্ছাময়ী, তাঁর ইচ্ছাতেই এ রকম ঘটেছে, এ তো জানা কথা দিদি। তিনি ইচ্ছা করেছেন এবার ভক্তের ঘরে বিনাড়ম্বরে আসবেন, তাই আসুন।"

সীতা বইখানা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "সে ভাল কথা, তবে খাওয়ানো দাওয়ানো—"

বিহারীলাল বলিলেন, "সেও মায়ের ইচ্ছা।"

সীতা খানিকটা গুম হইয়া বসিয়া রহিল। প্রদীপের সলিতাটা পুড়িতে পুড়িতে প্রদীপের মুখে গিয়া ঠেকিয়াছিল, একটা কাঠি দিয়া সলিতা বাড়াইয়া দিয়া সে বলিল, "আর একটা কথা দাদু; আমি পূজোর কথা আর সেই কথাটা বলবার জন্যেই এসেছিলুম। শুনতে পেলুম—প্রজাদের ওপর না কি ভারি অত্যাচার হচ্ছে—"

বিহারীলাল উদাস ভাবে বলিলেন, "সেও ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।"

অকস্মাৎ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সীতা বলিল, "না দাদু, এটাকেও ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বা শ্রীধরের ইচ্ছা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেবতা বলেন নি—তুমি দরিদ্র প্রজাদের বুকে বাঁশ দিয়ে ডল, এতে আমি ভারি খুসী হব; কারণ, এ আমার ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা—জীব যেন জীবের রক্ষণাবেক্ষণ করে,—যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ জীব যেন জীবের উপকারই করে যায়।"

একটু হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "রাগ করছিস দিদি? আমায় লক্ষ্য করেই যে কথাটা বলছিস, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, সত্যি করে বল দেখি, আমার কি শক্তি আছে? আমার পানে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ, দেখে তবে কথা বল।"

সীতা শান্ত স্বরে বলিল, "দেখেছি দাদু। কর্ম্মবীর আপনি, আপনার জীবন তো কর্ম্মশূন্য নয়, বিনাকর্ম্মে একটী মুহূর্ত্ত আপনার কেটে যেতে পারে নি। আপনি বড় আঘাত পেয়ে মুষড়ে পড়েছেন, ভাবছেন আর উঠতে পারবেন না—কিন্তু একবার উঠে দাঁড়ান দেখি—আপনার মনের ইচ্ছা আপনাকে শক্তি দেবে। আমি আপনাকে দিন-রাত লক্ষ্য করে দেখছি, কতবার কথাটা বলব ভেবেছি, কিন্তু কোন দিন মুখ ফুটে বলতে পারি নি। আপনাকে খাটতেই হবে,—যতক্ষণ দেহে জীবনীশক্তি থাকবে, আপনি বিশ্রাম নিতে পারবেন না। আমি বেশ বুঝছি, এই খাটুনীর মধ্যে দিয়েই আপনি দারুণ ব্যথার কতকটা শান্তি পাবেন। চুপ করে বসে থাকতে গেলে মানুষের মনে অনেক ভাবনাই জেগে ওঠে। একটা কোন কাযে নিযুক্ত থাকলে ভাবনা মোটেই দাঁড়াতে পার না। আপনি হয় তো ভাববেন—আমি আপনার ওপরে অন্যায় অত্যাচার করছি। কিন্তু তা নয় দাদু, আপনার অবস্থা দেখে আমি আপনাকে আবার কাযে লাগিয়ে রাখতে চাই।"

"আবার বিষয়পঙ্কে জড়িয়ে ফেলবি দিদি, একটু ভগবানের নামও করতে দিবি নে?"

সীতা গম্ভীর মুখে বলিল, "ভুল করছেন দাদা,—বিষয় আপনার নিজের ভেবে যদি কায করতে চান, তা হ'লে জড়িয়ে পড়বেন। এখন আপনার নিজের বলতে এ সংসারে কাউকে পাচ্ছেন না। বিষয়ে আত্মজ্ঞানও কখন হবে না, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। মনে করুন এ বিষয় পরের, আপনি এই বিষয়ের ম্যানেজার,—প্রভুর আদেশে আপনি খাটছেন। এই যে হাজার হাজার জীব আপনার মুখের পানে তাকিয়ে আছে দাদু, প্রত্যহ যারা এসে এসে আপনার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে কেঁদে ফিরে যায়, আপনার কি উচিত নয় এদের দেখা? আপনি কায করে যান, কাযের ফল ভগবানকে অর্পণ করুন। সে দিন গীতা তো পড়লেন দাদু, ভগবান বলছেন—"

শ্রান্তভাবে বালিসের উপর হেলিয়া পড়িয়া, একটা আড়ামোড়া দিয়া হাই তুলিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আবার সবই করব,—এবার তোকেও আমার পাশে থাকতে হবে বুঝলি দিদি। চোখে আর দেখতে পাইনে, কাণে ভাল শুনতে পাইনে; কায করতে গিয়ে অনেক দিনের অনভ্যাসের ফলে যখন শ্রান্তি আসবে, তখন তুই আমায় উৎসাহ দিবি, তুই আমায় শক্তি দিবি। দে দিদি, দেয়াল হ'তে ওই ভাঙ্গা সেতারটা পেড়ে ওতে আজ একটু সুর দে তো।"

সীতা বলিল, "এখন থাক না দাদু; আপনার পায়ে এখন মালিশটা একটু করে দি। আজ এই রাতটুকুর মধ্যে আপনাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে তো, কাল সকালেই আপনাকে ঠেলে বাইরে বার করে দেব।"

"আর আমার সঙ্গে তোকেও যেতে হবে।"

একটু হাসিয়া সীতা বলিল, "দরকার হলে যেতে হবে বই কি দাদু, আপনি যে এখন ছেলেমানুষের বাড়া হয়েছেন। সময় সময় ঠিক বুড়ো দাদুর মতই জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দেন, আবার সময় সময় একেবারেই ছেলেমানুষ হয়ে যান। তখন আমি পাশে না থাকলে আপনাকে ধমকাবে কে? সবাই আপনাকে ভয় করে চলবে, আমি তো ভয় করব না।"

বিহারীলাল স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তা করলে আমি আশ্রয় পাই কোথায় বল দেখি? আমি যে তোর কোলের নাতি দিদি, কখনও মারবি, ধমক দিবি, কখনও বা আদর করে কোলে টেনে নিবি। তোর কাছে নিজেকে হালকা করে দিয়ে আমি বাঁচি। আর আমার জুড়ানোর যায়গা কোথায় আছে ভাই?"

(১৮)

দীর্ঘকাল অন্তঃপুরের নির্জ্জনে কাটাইয়া একদিন বিহারীলাল বাহিরে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। রাখাল বৃহৎ গড়গড়ায় বৃহৎ কলিকা বসাইয়া দিয়া গেল। আমলাবর্গ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল, ম্যানেজার বাবুর নিকট খবর পাঠানো হইল।

তামাক টানিতে টানিতে বিহারীলাল গম্ভীর মুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান বীরেন্দ্র বোসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শুনলুম, ম্যানেজার বাবু না কি নিয়ম মত কাছারী করেন না, এ কথা কি সত্য?"

বীরেন বোস মাথা চুলকাইয়া অঁ্যা উঁ করিয়া উত্তর দিল "কথাটা সত্যি নয়। কাছারী করেন বই কি; তবে আজ কয় দিন ধরে তাঁর শরীরটা ভারি খারাপ যাচ্ছে শুনেছি, তাই—"

ভ্রূকুটী করিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "তার পর শুনলুম, প্রজাদের ওপরে না কি উৎপীড়ন হচ্ছে ?"

চতুর বীরেন্দ্র বোস সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "সে কি কথা! প্রজাদের ওপরে উৎপীড়ন করবে এমন ক্ষমতা কার? আমি বরং সকলকে ডেকে এক করাচ্ছি, আপনি তাদের মুখেই সে প্রমাণ পাবেন।"

বিহারীলাল বলিলেন, "থাক, তাদের ডাকতে হবে না।"

সুশীলবাবু আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটা যথার্থই বড় ভাল মানুষ ছিলেন; পল্লীগ্রামে আসিয়া এবার ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন, কিছুতেই সারিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

বিহারীলাল তাঁহার আকৃতির পানে তাকাইয়া সে সব কথা আর তুলিতে পারিলেন না, শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূজো এসে পড়ল যে সুশীল, তার কোন উপায় করছ কি ?"

বিমর্ষ মুখে সুশীলবাবু বলিলেন, "কি করব বলুন, আমি প্রায়ই জ্বরে পড়ে আছি,—যে দুদিন ভাল থাকি,—"

বাধা দিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "তা তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। উপস্থিত পূজোটা কোন রকমে সেরে ফেলে, তার পর মাস তিন চার ছুটি নিয়ে কোন স্বাস্থ্যকর যায়গায় থেকে এসো, শরীরটা সুধরে যাবে। যাক, পূজোর কি রকম ব্যবস্থা হবে বল দেখি ?"

সুশীলবাবু পার্শ্ববর্ত্তী একটা ড্রয়ার খুলিয়া একখানা ফর্দ্দের কাগজ বাহির করিয়া কর্ত্তার সম্মুখে রাখিলেন। বিহারীলাল চশমা চোখে দিয়া সেখানা পড়িলেন। তাহার পর সেখানা সুশীলবাবুকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, হয়েছে ঠিকই; তবে কতকগুলো যেন কিছু বেশী বলে বোধ হচ্ছে। ওই যাত্রা, কীর্ত্তন, এগুলো এবার বাদ পড়বে, ও সব কেটে দাও। ওতে প্রতি বছর অনেকগুলো করে টাকা বৃথা নষ্ট হয়। ও টাকাটা দেশের অন্য কাযে লাগালে উপকার হবে। অনর্থক আমোদে এত করে টাকা ব্যয় করে কোন দরকার নেই।"

বিনা বাক্য ব্যয়ে সুশীলবাবু তাঁহার নির্দ্দেশমত কতকগুলি পদ কাটিয়া দিলেন।

তাহাতে মোট কত টাকা বাঁচিল মনে মনে একটা হিসাব করিয়া বিহারীলাল একখানা কাগজে লিখিয়া রাখিলেন। সুশীলবাবুর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "একদিন বলেছিলুম, দেশের কাযে কিছু টাকা দেব, সে কথা বোধ হয় মনে আছে তোমার ?"

সুশীলবাবু বলিলেন, "এই তো মাস তিনেকের কথা হবে—পনের হাজার টাকা—"

"হ্যাঁ, সে টাকা যে দেওয়া হয়েছে তা আমার মনে আছে। আরও হাজার পাঁচেক টাকা এবার দেব। শুধু দুস্থ লোকদের জন্যেই এটা দেওয়া হবে মনে রেখ।"

সুশীলবাবু খাতা কাগজ সব সম্মুখে আনিয়া ফেলিলেন; বিহারীলাল সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ সব কি ?"

সুশীলবাবু বলিতে গেলেন, "হিসাব পত্র—"

সোজা হইয়া বসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "আমি ও সব এখন দেখতে আসি নি সুশীল। আগে কোন ক্রমে পূজোটা হয়ে যাক, তার পর ও সব দেখা শোনা যা হয় হবে।"

কুণ্ঠিতভাবে সুশীলবাবু সবগুলা সরাইয়া লইলেন।

তামাক টানিতে টানিতে বিহারীলাল বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। সন্ধ্যের দিকে—যদি তোমার শরীর ভাল থাকে তবে একবার এসো দেখি, পরামর্শ ঠিক করে ফেলব। কথাটা অনেক দিন ধরে মনে করছি, কিন্তু সময়াভাবে এতদিন বলা হয় নি।"

বেলা এগারটা পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিয়া,—যাহাতে আগামী পূজা সুশৃঙ্খলে শেষ হইয়া যায় তাহার জন্য সকলকে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিয়া বিহারীলাল উঠিলেন। রাখাল বাবুর পিছনে চলিল। স্নানান্তে শ্রীধরের পূজা সারিয়া তিনি আহার করিতে বসিলেন। ঈশানী অনতিদূরে বসিয়া রহিলেন, সীতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

মৃদুকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "বোধন বসেছে বাবা, পূজোর কয় দিন লোকজন খাওয়ানোর কি ব্যবস্থা হবে ?"

উদ্বিগ্নমুখে বধূর পাংশুমলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি দেবীর ভোগ রাঁধতে পারবে না মা ?"

সীতা বলিল, "মার যে প্রায়ই জ্বর হচ্ছে দাদু,—কাল রাত্রে খুব জ্বর এসেছিল, এখনও সামান্য একটু

আছে। মা ভোগ রাঁধতে হয় তো পারবেন না, আমি রাঁধলে হবে ?"

পরিহাসের সুরে বিহারীলাল বলিলেন, "তুই পারবি ?"

সীতা জোর করিয়া বলিল, "পারব না কেন দাদু, খুব পারব। এই তো মাঝে মাঝে বামুন ঠাকরুণের যখন অসুখ বিশুখ হয়, তখন তো আমিই রেঁধে দিই।"

বিহারীলাল মুখ তুলিয়া একবার তাহার দীপ্ত মুখখানার পানে তাকাইলেন। তাহার পর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা তো হবে না দিদিমণি।"

সীতার মুখখানা শুকাইয়া উঠিল, "কেন হবে না দাদু ?"

বিহারীলাল বলিলেন, "আমাদের নিয়ম স্বগোত্রা ভিন্ন আর কোন মেয়ে ভোগ রাঁধতে পারবে না। যদি তোমার এ বংশের কারও সঙ্গে বিয়ে হতো ভাই, তুমি সব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অধিকারও পেতে। তুমি আর সব পাবে, পাবে না শুধু ভোগ রাঁধবার অধিকার, স্বগোত্রা না হলে এ হয় না।"

আঘাত পাইয়া সীতার মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। এ বৃদ্ধকে সে কি করিয়া বুঝাইবে—দুইটা মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যে বিবাহ হইয়া যায়, তাহা নহে। তাহার যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে বাহ্যিক স্ত্রী বলিয়া স্বীকার না করুক, আর কাহাকেও সে জীবনের সহচারিণী বলিয়া গ্রহণ করুক, তথাপি সে তাহারই স্ত্রী। সে বাগ্‌দত্তা, জ্যোতির্ম্ময় তাহার স্বামী। মানুষ ইহা না মানিতে চাক,—কারণ মানুষ, বাহ্যিক অনুষ্ঠান লইয়া চলে,—যিনি ভোগ লইবেন সেই দেবী তো সবই জানেন।

একটুখানি নীরব থাকিয়া সে বলিল, "কিন্তু আপনিই তো বলেছেন দাদু, ভগবানকে ভক্তি করে যে যা দেয় তিনি তাই নেন ; তবে আমি—কেবলমাত্র আপনার স্বগোত্রা নই এই অপরাধে কেন মা আমার হাতের ভোগ নেবেন না ? মা তো শুধু আপনার একার নন দাদু, তিনি যেমন আপনার মা তেমনি আমারও মা। আপনার সেবার অধিকার আছে, আমার কেন নেই ?"

প্রবীণ বিহারীলাল শুধু একটু হাসিলেন, বলিলেন, "ঠিক কথাই বলেছিস সীতা, কিন্তু এতে আমার কোন হাত নেই ভাই। আমি সমাজে বাস করি বলেই আমায় সমাজের সকল নিয়ম মেনে চলতে হয় ; নইলে উপায় নেই। মায়ের পূজা এই হিন্দু সমাজের চিরন্তন নিয়মানুসারেই চলে আসছে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে নতুন কিছু চালানোর যোগ্যতা আমার নেই। মা সকলেরই মা, আমারও যেমন তোরও তেমনি, অন্ত্যজেরও তাই। তবে হাড়ি বাগদি ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজেরা কেন পূজোর দালানে উঠতে পারে না, কেন পূজো করতে পায় না বল দেখি ? তাদের ভক্তি আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়,—তারাও আমাদেরই মত মাকে মা বলে ডাকে, তবু কেন তারা তফাতে থাকে ? আমিও কি বুঝতে পারিনে ভাই এ নিয়ম ভাল নয়, কেন না মায়ের কাছে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান নেই ? আমি ব্রাহ্মণ বলে তাঁর কাছে বড় আর তারা অন্ত্যজ বলে যে ছোট তা নয়, মায়ের চোখে সবাই সমান ; তবু কেন এ পার্থক্য সমাজ সৃজন করেছে তা বলতে পারি নে। জানিস দিদি, এ সমাজে যখন বাস করতে হচ্ছে—হবে, তখন এর সমস্ত নিয়মই প্রতিপালন করে যেতে হবে, তা ছাড়া আর উপায় নেই।"

উষ্ণভাবে সীতা বলিল, "আপনি বলবেন দাদু, সেকালে যাঁদের হাতে সমাজ ধর্ম্ম গঠিত হয়েছে, তাঁরাই এই নিয়মটা করে গেছেন। হতে পারে দাদু, তাঁরা কেউ হয় তো এই বিধানটা দিয়ে গেছেন। কিন্তু যতটা প্রসারতা তখন ছিল এখন যে তা নেই, এ বেশ বলতে পারা যায়। আমরা দিন দিন নূতন নূতন বিধি সংস্কার নিয়ে এসে এর সঙ্গে যোগ করে এ ধর্ম্মকে আরও উন্নত—আরও মহীয়ান করছি, ভাবছি ; কিন্তু তাতে যে আরও অবনতি ঘটছে তা আমরা দেখছি নে। একটা গল্প বলছি শুনুন দাদু, এটা সত্যই গল্প নয়, আমার নিজের চোখে দেখা একটা ঘটনা। একবার বাবার সঙ্গে আমাদের দেশে গিয়েছিলুম। এখানে একটা দেবমন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিল। একদিন খুব গোলমাল শুনে বাবার সঙ্গে আমিও সেখানে গেলুম, দেখলুম, অনেকে একটা লোককে ধরে মারছে। জানতে পারলুম, এই লোকটা না কি কিছু দিন আগে স্বপ্ন দেখে—সে নিজের হাতে এই বিগ্রহটীকে পূজো করছে। এই স্বপ্ন দেখার পর সে নিজের হাতে ঠাকুর পূজো করবার জন্যে পাগল হয়ে যায়। কিন্তু সে জাতিতে ছিল অন্ত্যজ চামার, তার পূজো করা দূরে থাক, মন্দিরের দরজায় দাঁড়াবার অধিকার পর্য্যন্ত ছিল না। লোকটা না কি কতদিন মন্দিরে ঢুকে পূজো করবার প্রার্থনা কত লোকের কাছে করেছে, কিন্তু সবাই তাকে পাগল বলে

তাড়িয়ে দিয়েছে। এ দিনে কোথাও কাউকে না দেখে সে দরজা খোলা পেয়ে চুপি চুপি মন্দিরে ঢুকে পূজো করছিল, এই অপরাধে তাকে কি শাস্তিই পেতে হল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, এত মার খেয়েও তার মুখে বেদনার একটু চিহ্ন ফুটল না, তৃপ্তির আনন্দ তার মুখখানা ভরিয়ে তুলেছিল; কেন না, তার অনেক কালের সাধ পূর্ণ হয়েছে—সে পূজো করতে পেয়েছে। দাদু, এই ভক্তি ভালবাসা নিয়ে সে মন্দিরে প্রবেশ করবার অধিকারী নয়, পূজো করবার অধিকারী নয়; আর যারা ভক্তিশূন্য—পেশাদার ব্রাহ্মণ,—অনেকে হয় তো মন্ত্রটাও উচ্চারণ করতে পারে না,—নির্ব্বিষ খোলসের মত কেবলমাত্র পৈতাটা কাঁধে ফেলে রেখেছে, তারাই ধর্ম্মগত পূজো করবার যথার্থ অধিকারী? আমার মনে হয় দাদু, এদের পূজো ভগবান নেন না, ভগবান সেই জন্যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, আমরা প্রাণশূন্য পুতুল পূজোই করে যাই মাত্র। মা আসছেন,—পূজো করবে কে, মায়ের আবাহন করবে কে? যারা আবাহন করবে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে, মায়ের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে নিষ্ঠাহীন ব্রাহ্মণ—শুধু ওই সাদা সুতো গলায় রাখার জোরে? আজ তাই না আমরা দেবতার সাড়া পাই নে দাদু,—মন্দিরে প্রার্থনা জানাই, সে প্রার্থনা শূন্যে ভেসে যায়? দেবতা কোথায়—দেবতা যে অনাচারে অত্যাচারে চলে গেছেন। দেবতা চামারের অন্তরের পূজো গ্রহণ করেছিলেন, সেই দিন তাঁর যথার্থ পূজো হয়েছিল। আপনিই বলুন না দাদু, যাদের বুকে এত ভক্তি, কেন তারা পূজো করতে পারবে না?"

বিহারীলাল বিস্মিত নেত্রে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। এ কি জ্ঞানালোকে দীপ্ত সীতার মুখখানি! এমন জ্যোতি তিনি কখনই তাহার মুখে দেখেন নাই।

ধীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তোর প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না দিদি,—আমি শিরোমণি মশাইকে ডেকে পাঠাই, তিনিই উত্তর দেবেন।"

শুষ্ক হাসিয়া সীতা বলিল, "না দাদু, আর দরকার নেই তাঁকে। আপনার আদেশ আমি মাথায় করে নিলুম; সত্যই আমি আপনার স্বগোত্রা নই, আমার হাতের ভোগ মা নেবেন না; অথবা নিলেও দেওয়া যেতে পারে না।"

ঈশানী বলিলেন, "আমিই সব রেঁধে দেব বাবা, সীতা সাহায্য করবে। আরও দুই একজনকে নেওয়া যাবে, তার জন্যে কিছু ভাববেন না। বাইরের রান্নার লোক ঠিক করুন, তা হলেই সব হবে।"

বিহারীলাল আহারান্তে গণ্ডুষ করিয়া বলিলেন, "সে সব ঠিক হয়েছে মা। অনেক কাল এ সব কায নিজের হাতে না করলেও মনে ভেব না কোন দিকে ভুল হয়ে যাবে। মাকে আনা একটা উপলক্ষ মাত্র, আসল কায দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা। বিহারী মুখুয্যে কখনও ছেলে নাতির হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত না মা, সে নিজেও সব দেখাশুনা করত। তবে দায়িত্বটা ওরাই সব মাথায় নিত; সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা গিয়েছিল। তবে তোমার যে অসুখ হল মা, একবার কবিরাজ কি ডাক্তার দেখালে ভাল হত না কি?"

সীতা বলিল, "ম্যানেজার দাদার কাছে হোমিওপ্যাথী ওষুধ আছে। খবর দিয়ে পাঠিয়েছিলুম, তিনি ওষুধ দিয়ে পাঠিয়েছেন।"

মাথা নাড়িয়া বিহারীলাল বলিলেন, "উঁহু, না দেখে ওষুধ দেওয়া ঠিক নয়। আমি বলে এসেছি সন্ধ্যেবেলা সুশীল আসবে, সেই সময় মাকে দেখিয়ে ওষুধ ঠিক করে নিতে হবে।"

তিনি আসন ত্যাগ করিলেন। (ক্রমশঃ)

প্রকৃতির স্নেহ

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

বৈশাখের দ্বিপ্রহর জ্বালায়ে দিয়েছে চারিদিক।
নিভৃত নীড়ের মাঝে বসন্তের মধুকণ্ঠ পিক
পিপাসায় মূর্চ্ছাহত। অবসন্ন অধীর বাতাস
উৎকণ্ঠিত শস্য-শিরে উগারিছে মরণ নিশ্বাস
দ্বিধাভরা বেদনায়। নদীর নিবিড় তনুখানি
তীব্র জ্বর-জ্বালা ভরে তরঙ্গের নীলাঞ্চল টানি
ছুঁড়িয়া ফেলেছে দূরে—নগ্নক্ষীণ দেহে ক্ষণতরে
তবু জ্বালা নাহি ঘুচে, মুহুর্মুহু মূরছিয়া পড়ে
স্পন্দহীন স্তব্ধতায়। আসন্ন মৃত্যুর ছায়া ভরা
অনল অঞ্চল তলে ধুঁকিয়া শ্বসিছে বসুন্ধরা।

সহসা ঈশান কোণে ঘিরে' এলো ঘন মেঘরাশি।
বিদ্যুৎ-চমক-দীপ্তি অকস্মাৎ উঠিল বিকাশি
প্রসন্ন হাসির মতো; শতধার শুভ্র বারিধারা
ঝর্ঝরে পড়িল ঝ'রে গ্লানিহীন বাধাবন্ধ হারা
বিশ্বের বুকের পরে; স্নিগ্ধস্বরে সচকিত করি
নিদাঘ-পাণ্ডুর রেখা পিককণ্ঠ উঠিল শিহরি';
শ্যামলিমা ফিরে' এলো দগ্ধ ম্লান শুষ্ক শস্য-শিরে;
দুর্দ্দম আবেগে বায়ু আলিঙ্গিল উচ্ছল নদীরে।
দীর্ঘশ্বাস শেষে ধরা ধীরে ধীরে দেখিল চাহিয়া
নিজের বুকের মাঝে আপনার গ্লানিমুক্ত হিয়া।

আমি মুগ্ধ বাক্যহীন!—দূরে ব'সে ভাবিতেছি মনে
মিথ্যা জড় ব'লে এরে অবহেলা করিব কেমনে?
মানব মনের ধ্রুব দ্বিধাহীন নির্ভর নিলয়—
এ কি তারি মর্ম্ম-কোষ আঘাতিয়া পায় নি আশ্রয়?
উপবাস-ছিন্ন-পুষ্প বিধবা কন্যার পানে চাহি
মা'র বুকে যে যন্ত্রণা,—ঐ মেঘ মাঝে তা কি নাহি?
লীন দেহ বুকে তুলে' অশ্রুজলে ধু'য়ে দেওয়া ব্যথা—
ধারাপাতে নাহি কি সে জননীর মর্ম্ম কাতরতা?
কল্পনায় দেখিতেছি, বিশ্বমাতা বসি ঊর্দ্ধ লোকে
অশ্রুআর্দ্র।—দেখি আর বারিধারা ছেপে ওঠে চোখে!

রংপুরে রামমোহন রায়

(সরকারী কাগজপত্র-অবলম্বনে)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায়ের সহিত রংপুরের সংস্রব এক সময় কিছু ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তিনি রংপুর কালেক্টরীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন,—কালেক্টর জন্ ডিগবী ছিলেন তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী।—এই-সব কথার ভিত্তি বোধ হয়, ডিগবীর ১৮১৭ সালে লিখিত রামমোহনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি :—

"রামমোহন রায় জাতিতে অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, বয়স প্রায় ৪৩ বৎসর। তিনি প্রভূত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃতে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তাহার উপর আবার তিনি ফার্সী ও আর্বীও জানেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী হওয়াতে তিনি ধর্ম্ম এবং জাতি-সম্পর্কিত অন্ধ-সংস্কার সম্বন্ধে অল্প বয়স হইতেই অশ্রদ্ধা পোষণ করেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি ইংরেজী শিখিতে সুরু করেন। কিন্তু প্রথমে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর পরে যখন আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হই, তখনও তিনি কেবল নিতান্ত সাধারণ বিষয়ে কোনরূপে কাজ চালাইবার মত ইংরেজী বলিতে পারিতেন,—নির্ভুলভাবে এ ভাষা মোটেই লিখিতে পারিতেন না। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিল সার্বিসে আমি যে জেলায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া কালেক্টর ছিলাম, পরে তিনি সেই জেলার দেওয়ান, অর্থাৎ রাজস্ব আদায়-বিভাগের প্রধান দেশীয় কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার লিখিত সরকারী চিঠিপত্র যত্ন ও মনোযোগ-সহকারে অধ্যয়ন করিয়া এবং ইউরোপীয় ভদ্রলোকগণের সহিত বার্ত্তালাপে এবং পত্রাদি ব্যবহারে অবশেষে তাঁহার এমনি সঠিক ইংরেজী-জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, তিনি যথেষ্ট নির্ভুলভাবে এই ভাষা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িবার খুব অভ্যাস তাঁহার ছিল। প্রধানতঃ ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি তাঁহাকে আকর্ষণ করিত। সংবাদপত্র-পাঠের ফলে ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার বীরত্ব ও গুণ-সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। নেপোলিয়নের কার্য্যাবলীর মহিমা রামমোহনকে এতই চমক লাগাইয়াছিল যে, তদনুষ্ঠিত পাপের নিদারুণতার প্রতি না হউক, পাপাচরণ সম্বন্ধে রামমোহনের যথেষ্ট সংশয় ছিল এবং ইংরেজ জাতির উপর গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, নেপোলিয়নের রাজ্যচ্যুতিতে তিনি অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছিলেন। দুঃখের প্রথম বেগ মন্দীভূত হইলে, যে-সকল কার্য্যের ফলে নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহার সেই-সকল রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ রামমোহনের কাছে এতই দুর্ব্বলতার পরিচায়ক ও এত অধিক দুরাকাঙ্ক্ষা-প্রসূত বলিয়া মনে হইল যে, তিনি স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন, বোনাপার্টির উপর ঘৃণা তাঁহার পূর্ব্ব শ্রদ্ধার অনুরূপ হইবে।"[১]

রংপুরে রামমোহনের এই সরকারী চাকরি সম্বন্ধে তাঁহার চরিতকারেরা আরও লিখিয়াছেন,—

"কার্য্যের অনুরোধে উচ্চপদস্থ দেশীয় লোককে পর্য্যন্ত সিবিলিয়ানদের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত,—তখনকার দিনে ইউরোপীয় সিবিলিয়ানরা এই নিয়ম জোর করিয়া চালাইতেন। কালেক্টরের উপস্থিতিতে রামমোহনকে কখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে না, এবং একজন সাধারণ দেশীয় আমলা বলিয়া তাঁহাকে আদেশ প্রদান করা হইবে না,—মিঃ ডিগবীর দস্তখতে তাঁহার সহিত রামমোহনের এইরূপ একটা চুক্তি ছিল।"[২]

এই জনশ্রুতি সত্য না হইতে পারে। কিন্তু ডিগবী যে রামমোহনকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং উভয়ের মধ্যে যে অনাবিল বন্ধুত্ব ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কর্ম্মগ্রহণকালে ইংরেজী ভাষায় রামমোহনের তেমন

---

১ রামমোহন-অনূদিত কেনোপনিষদ ও বেদান্তসারের একটি বিলাতী সংস্করণ ১৮১৭ সালে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। বিলাতে অবস্থানকালে ডিগবী ইহা সম্পাদন করেন। ভূমিকায় তিনি অনুবাদক রামমোহনের এই পরিচয়টি দিয়াছেন।

২ রামমোহনের মৃত্যুর পর, ১৮৩৩, ৫ই অক্টোবর তারিখের C u t Journal-এ আর, মণ্টগোমারি মার্টিন-এর একখানি পত্রে সর্ব্বপ্রথম এই বিবরণটি প্রকাশিত হয়।
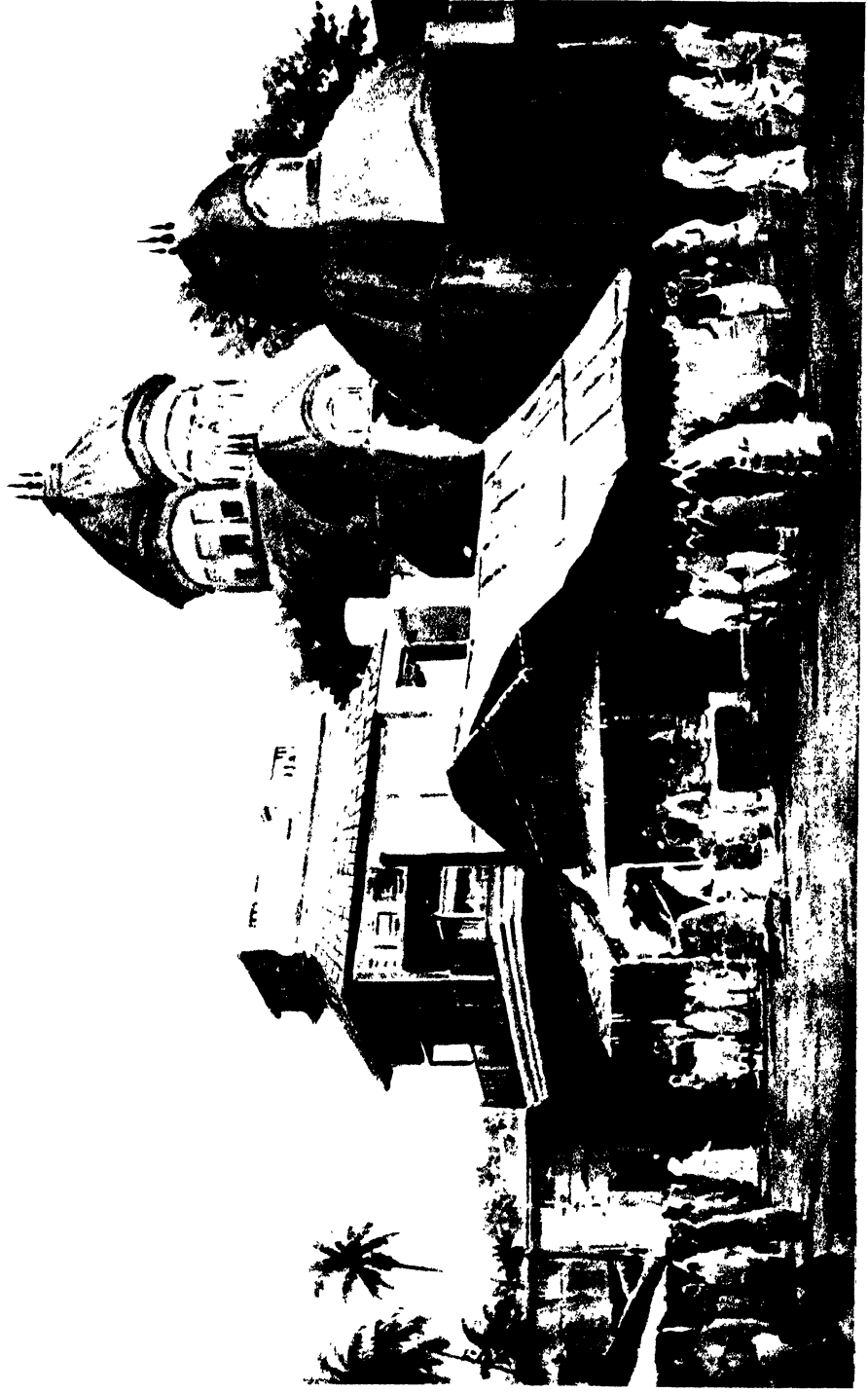
কালীঘাট

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা

দখল ছিল না। ডিগবীর ন্যায় উদারহৃদয় মহাপ্রাণ রাজ-পুরুষের সাহচর্য্যই তাঁহার ইংরেজী ভাষার জ্ঞানবর্দ্ধনে সহায়তা করিয়াছিল।

কিন্তু রামমোহন সত্যই রংপুরে দেওয়ানের পদ পাইয়াছিলেন কি না, পাইয়া থাকিলে কবে বা কতদিন এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, অথবা আর কোথাও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বা অপর কাহারও অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন কি না,—এ বিষয়ে রামমোহনের প্রচলিত কোন জীবন-চরিতই আলোকপাত করে না। সুখের বিষয়, বাংলা সরকারের দপ্তরখানায় অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি যে-সব চিঠিপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে রংপুরে রামমোহনের কর্ম্মজীবনের সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়; শুধু তাহাই নহে, রংপুরে আসিবার পূর্ব্বে রামমোহন কি কার্য্য করিতেন, তাহারও ইঙ্গিত এই চিঠিগুলিতে বর্ত্তমান। ৩

রামমোহনকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়া, রংপুরের কালেক্টর ডিগবী সাহেব বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর সেক্রেটারীকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন :—

"আপনার গত মাসের ২৩শে [নভেম্বর] তারিখের পত্রের নির্দ্দেশ-মত, এই আপিসের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান গোলাম শা'র পদত্যাগের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছি এবং বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, সেই পদে আমি রামমোহন রায়কে নিযুক্ত করিয়াছি। রামমোহন অতি সম্ভ্রান্ত বংশজাত, বিশেষ সুশিক্ষিত এবং দেওয়ানের কার্য্য পরিচালন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাঁহাকে আমি বহুকাল ধরিয়া জানি, সেই হেতু আমি মনে করি, তিনি সাধুতা, যোগ্যতা ও পরিশ্রম-সহকারে দেওয়ানের কার্য্য চালাইতে পারিবেন। আশা করি, বোর্ড তাঁহার নিয়োগ অনুমোদন করিবেন।" (১৮০৯, ৫ই ডিসেম্বর) ৪

১৮০৯, ১৪ই ডিসেম্বর, রংপুর কালেক্টরের পত্রের উত্তরে বোর্ড জানিতে চাহিলেন, কাহার অধীনে এবং কোন্ সরকারী কার্য্যে রামমোহন রায় কর্ম্ম করিয়াছেন এবং তাঁহার জামিনদাতার নামই বা কি? ৫

রংপুরের কালেক্টর হইবার (১৮০৯, ২০ অক্টোবর) পূর্ব্বে ডিগবী সাহেব সরকারী কর্ম্মে রামগড় যশোহর ও ভাগলপুরে অবস্থান করেন। ৬ রামমোহন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে কখন সরকারী, কখন বা বে-সরকারী কাজ করেন। রামগড়ে রামমোহনের কর্ম্মের কথা বোর্ডকে লিখিত ডিগবীর নিম্নলিখিত পত্রখানি হইতে জানা যায় :—

"আপনার এই মাসের ১২ই [১৪ই?] তারিখের পত্রের উত্তরে, বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে সসম্মান নিবেদন করিতেছি যে, যখন আমি রামগড় জেলায় অস্থায়িভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলাম, তখন রামমোহন রায়—এই আপিসের দেওয়ান-পদের জন্য যাঁহাকে সুপারিশ করিয়াছি—আমার অধীনে তিন মাস যাবৎ ফৌজদারী আদালতের শেরিস্তাদারের কাজ করেন। ঐ সময়ের মধ্যে, এবং আমার যশোহরের কালেক্টররূপে কার্য্য-

৩ সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন (১৩৩৫, ১৩ই শ্রাবণ; ১৯২৮, ২৯শে জুলাই), তাহার পরিশিষ্টে ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই চিঠিগুলি স্থান পাইয়াছে; কিন্তু অনেকস্থলে তারিখ প্রভৃতির ভুল আছে। ইহার পর, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় দাসগুপ্ত রংপুর কালেক্টরী হইতে নকল লইয়া চিঠিগুলি প্রকাশ করিয়াছেন (Modern Review, Septr. 1928, pp 274 78), কিন্তু প্রধানতঃ পাঠের দোষে এত ভুল থাকিয়া গিয়াছে যে, চিঠিগুলির স্থলবিশেষে অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে, অনেকাংশ বাদও পড়িয়াছে। এ বিষয়ে আমার প্রতিবাদ দ্রষ্টব্য (Modern Review, Octr. 1928, p. 434).

বাংলা সরকারের বোর্ড-অফ-রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের দপ্তর হইতে আমি মূল চিঠিগুলির যে নকল লইয়াছি, তাহারই বঙ্গানুবাদ এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইল।

৪ Board of Revenue Consultation 14 December, 1809, No. 23. ডিগবী সাহেবের চিঠিতে তারিখটি ভ্রমক্রমে ৫ই ডিসেম্বরের স্থলে ৫ই নভেম্বর আছে।

৫ Board of Revenue Procdgs 14 Decr. 1809, p 137.

৬ জন্ ডিগবীর কর্ম্মজীবনের তালিকা Dodwell and Miles-রচিত Alphabeticalt List of the Bengal Civil Servants (1780-1838), pp. 140-41, গ্রন্থে মোটামুটি এইরূপ দেওয়া আছে :—Date of Rank as Writer: Digby, John, 29 Aug. 1799 Appointments, etc: 1804, Aug. 1—Asst. to the Register of the City Court of Dacca. 1805, May 9—Register of Ramghyr. 1808, Jan. 15—Register of Bhaugulpore. 1809, Oct. 20—Collector of Rungpore. 1815—At Home. 1819, Nov. 13—Returned to India. 1821—Actg. Collector of Burdwan. 1822, Feb. 1—Collector of Burdwan. (Died March 19, 1826, at the Cape of Good Hope).

কালে, কোম্পানীর আইন-কানুন ও হিসাবপত্র সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের জ্ঞানের যে পরিচয় পাই, এবং তাঁহার সহিত পাঁচ বৎসরের পরিচয়ের ফলে তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও সাধারণ গুণাগুণ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি কালেক্টরের আপিসের দেওয়ান পদের বিশেষ উপযুক্ত।

"আপনাকে আরও জানাইতেছি যে, চাকোইয়া প্রভৃতির জমিদার—জয়রাম সেন (ইনি কোম্পানীকে বছরে ২০,৯৩৫৸৶১০ সিক্কা টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন) এবং কুলাঘাট প্রভৃতির জমিদার পরলোকগত মীর্জ্জা মহম্মদ তকীর বংশধর, মীর্জ্জা আব্বাস আলী (ইঁহার দেয় রাজস্বের পরিমাণ বছরে ৯১৭৸৶৫ সিক্কা টাকা)—উভয়েই রামমোহনের জন্য পাঁচ হাজার টাকার জামিনদার হইতে প্রস্তুত। ইহার সহিত তাঁহাদের জামিন-পত্রের একটি নকল পাঠাইলাম।" (৩০শে ডিসেম্বর, ১৮০৯) ৭

পত্রখানিতে প্রকাশ, ডিগবী যখন রামগড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন তাঁহার অধীনে রামমোহন তিন মাসের জন্য ফৌজদারী আদালতে শেরিস্তাদারের কাজ করিয়াছিলেন। কোন্ সময় ডিগবী রামগড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট হন, সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ নহে। ১৮০৫, ৯ই মে হইতে ১৮০৭ সালের শেষাশেষি পর্য্যন্ত ডিগবী প্রধানতঃ রামগড় জেলা-কোর্টের রেজিষ্টার ছিলেন। ১৮০৬ আগষ্ট মাসে রামগড়ের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট—মিলার সাহেব পীড়িত হইয়া পড়িলে, বোর্ড ২১শে আগষ্ট তারিখে রেজিষ্টার ডিগবীকে রামগড়ের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কাজ করিবারও ক্ষমতা দেন। ৮ পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে আর-থ্যাকারে (R. Thackeray) রামগড়ের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে ডিগবী ১৮ই অক্টোবর তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া, পূর্ব্বপদে কাজ করিতে থাকেন। ৯

বি-ক্রিস্‌প তখন বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর অস্থায়ী সভাপতি ও পুরাতন সদস্য। তিনি ডিগবীর প্রস্তাবে আপত্তি তুলিলেন এবং মন্তব্য করিলেন,—"শুনিয়াছি, ডিগবী যে-লোকের হইয়া সুপারিশ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে ঢাকা জলালপুরের অস্থায়ী কালেক্টর মিঃ উডফোর্ডের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। রামগড়ে শেরিস্তাদাররূপে কার্য্যকালে রামমোহনের আচরণ-সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্যও আমার কানে আসিয়াছে। এ অবস্থায় রংপুরের দেওয়ান পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবে মত দিতে আমি অনিচ্ছুক। বাস্তবিকপক্ষে, আপত্তি হিসাবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোন ফৌজদারী আদালত রাজস্ব-বিভাগীয় কার্য্যের পক্ষে জ্ঞানলাভের শিক্ষাস্থল নয়, এবং রামগড়ের আদালতে তাঁহার তিন মাস কাল শেরিস্তাদারের কার্য্য রাজস্ব-বিভাগের গুরু দায়িত্বপূর্ণ দেওয়ান পদ-প্রাপ্তির যোগ্যতারূপে নিশ্চয়ই বিবেচিত হইতে পারে না।…"

সভাপতির মন্তব্যটি হইতে অনেক নূতন কথার সন্ধান মিলিতেছে। কেন কালেক্টর ডিগবীর উচ্চপ্রশংসা উপেক্ষা করিয়া বোর্ড রামমোহনকে দেওয়ানের পদ দিতে অসম্মত হন, তাহার উত্তর কোন লেখকই দিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে। টমাস উডফোর্ডের (Thomas Woodforde) অধীনে রামমোহনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিরূপে চাকরির কথাও এতদিন কাহারও জানা ছিল না। টমাস উডফোর্ড ১৮০২, ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ১৮০৩, ১৪ই মে—এই পাঁচমাস ঢাকা জলালপুরে অস্থায়ী কালেক্টরের কাজ করেন। ১০ বিলাতে অবস্থানকালে বোধ হয় এই উডফোর্ড-পরিবারেরই সহিত রামমোহনের পত্রব্যবহার চলিয়াছিল। ১১ ১৮০৪ আগষ্ট মাসে ডিগবী সাহেব ঢাকা সিটি কোর্টের সহকারী রেজিষ্টার নিযুক্ত হন। খুব সম্ভব ঢাকাতেই রামমোহনের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়।

যাহা হোক, সভাপতির আপত্তিতে বোর্ড-অফ-রেভিনিউ রামমোহনকে দেওয়ান পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। ডিগবীকে লেখা হইল,—

"আমাকে বোর্ড-অফ-রেভিনিউ আপনার গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ইহাও জানাইতে বলিতেছেন যে, দায়িত্বপূর্ণ দেওয়ানের পদে যিনিই নিযুক্ত হউন তাঁহার এমন লোক হওয়া চাই যিনি রাজস্ব-বিভাগের খুঁটিনাটি কাজ করিতে

৭ Judicial (Civil) Procdgs. 21 Augt. 1806, No. 19.

৮ Ibid, 30 Octr. 1806, No. 18.

৯ Board of Revenue Con. 15 Jany. 1810, No, 19.

১০ Board of Revenue Con. 20 May 1803, No. 3.

১১ Life and Letters of Raja Rammohun Roy, by S. D. Collet (2nd ed.), pp. 203, 211, 218.

কিছুদিনের জন্যও অভ্যস্ত, এবং রাজস্ব-আদায়কার্য্যের আইন-কানুন ও সাধারণ পদ্ধতিতে যাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে,—বোর্ড ইহা নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে করেন।

"এই হেতু, আপনার মনোনীত ব্যক্তির নিয়োগে সম্মতি দিতে বোর্ড অপারক। এক ফৌজদারী আদালতে অস্থায়িভাবে শেরিস্তাদারের কার্য্য-সম্পাদন রামমোহন রায়কে যে দেওয়ানীর মত গুরুতর কর্ত্তব্যের পদে কোন অংশে যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে, এমন কথা কিছুতেই বিবেচনা করা যায় না, কারণ দেওয়ানের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

"এ অবস্থায় বোর্ড ইচ্ছা করেন, আপনি এমন কাহাকেও নির্ব্বাচন করুন, যাঁহার রাজস্ব-বিভাগের সাধারণ জ্ঞান, দায়িত্ব ও অন্যান্য গুণাগুণ দেখিয়া আশা করা যাইতে পাবে যে তিনি নির্ভুলভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন।

"অধিকন্তু, বোর্ডের মতে এই ব্যবস্থা সম্ভব হইলে করা উচিত, যে জেলায় দেওয়ান নিযুক্ত হইবেন সেই জেলায় যেন দেওয়ানের জামিনগণের জমিজেরাৎ না থাকে,—কারণ তাঁহারা হয়ত ঐ জেলার উপর অসঙ্গত প্রভাব পরিচালন করিতে পারেন।" (১৫ জানুয়ারী, ১৮১০) (১২)

রামমোহনের উপর ডিগবী সাহেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সহজে নিরস্ত হইলেন না,—বোর্ডের পত্রের প্রতিবাদ করিয়া, রামমোহনকে দেওয়ানী দিবার জন্য পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন,—

"আমি আপনার ১৫ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বোর্ড আমার সুপারিশ এতই তুচ্ছ মনে করেন যে, রামমোহন রায়ের চরিত্র সম্বন্ধে এমন অনুকূল মন্তব্য-প্রকাশ এবং তাঁহার অতি উচ্চ গুণগ্রামের বিবৃতি-সত্ত্বেও বোর্ড মৎকর্ত্তৃক তাঁহার দেওয়ান-পদে নিয়োগে আপত্তি করিলেন।

"আপনার পত্রের প্রথমাংশ পড়িয়া মনে হয়, প্রস্তাবিত পদে রামমোহন রায়ের নিয়োগের মঞ্জুরীতে বোর্ডের অসম্মতির একটি কারণ এই,—দেওয়ান পদ-সংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহে অনভিজ্ঞতার দরুণ তাঁহারা তাঁহাকে ঐ পদের কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অনুপযুক্ত মনে করেন। গত মাসের ৩০শে তারিখের পত্রে আমি জানাই, যশোহর জেলায় অস্থায়ী কালেক্টর হিসাবে আমি যখন কাজ করিতেছিলাম, তখন আমার ব্যক্তিগত মুন্‌শীরূপে কার্য্য করিবার কালে তিনি রাজস্ব-আদায়ের আইন-কানুন ও সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন; আমি ভাবিয়াছিলাম ইহাতেই সমস্ত আপত্তি দূর হইবে। আরও আমি না জানাইয়া পারিতেছি না, কখনও সরকারী কাজ করেন নাই এমন লোকদের কালেক্টরীর দেওয়ান পদে নিয়োগ বোর্ড সমর্থন করিয়াছেন,—এরূপ উদাহরণও বিরল নহে।

"আমি যে-লোকটির নাম প্রস্তাব করিয়াছি, তাঁহার চরিত্র ও গুণপনা সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের কাজী-উল্-কুজাৎ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফার্সীর প্রধান মুন্‌শী এবং ঐ-সকল বিভাগের অপরাপর প্রধান কর্ম্মচারীদের নিকট খোঁজ লইবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করি।

"তাঁহার গুণ ও যোগ্যতা ভালরূপে জানি বলিয়া, যে কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছি সে কাজ হইতে তাঁহাকে অপসৃত করিয়া দেশীয়দিগের চক্ষে তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করিতে আমার মনে আঘাত লাগে। আমি তাঁহাকে অস্থায়িভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম এই আশায় যে, যাঁহাদের নিকট সন্ধান লইবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছি সেই দেশীয়গণ তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যাহা জানাইবেন সেই ধারণা, এবং কাজকর্ম্মে তাঁহার যে জ্ঞান আছে বলিয়া জানাইয়াছি সেই জ্ঞান, আমার আপিসের দেওয়ানের পদ-নিয়োগ-সমর্থনে বোর্ডকে প্ররোচিত করিবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি এই কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

"জামিন-সম্বন্ধে বোর্ডকে এই কথা জানাইতে চাই যে, তিনি অন্যান্য জেলা হইতে যত টাকার হোক জামিন জোগাড় করিতে পারেন।" (৩১ জানুয়ারী, ১৮১০) (১৩)

১৮০৭, ২৩শে ডিসেম্বর ডিগবী অস্থায়িভাবে যশোহর জেলার কালেক্টরের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। (১৪) এই পদে তিনি ছয়মাস কাল—১৮০৮, ৯ই জুন পর্য্যন্ত—ছিলেন। (১৫)

(১২) Board of Revenue Procdgs. 15 Jany. 1810, pp. 135-36.

(১৩) Board of Revenue Con. 8 Feby. 1810, No. 9.

(১৪) Board of Revenue Procdgs. 29 Dec. 1807, No. 93.

(১৫) Ibid., 14 June 1808, No 34.

সুতরাং এই সময়েই রামমোহন ডিগবীর বে-সরকারী মুনশীরূপে যশোহরে অবস্থান করেন। যশোহর ত্যাগ করিয়া, ডিগবী রেজিষ্টারের পদে ভাগলপুর গমন করেন। রামমোহনও যে এই সময় (১৮০৯) ভাগলপুরে ছিলেন, সরকারী কাগজ-পত্রে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। ভাগলপুরেও রামমোহন ডিগবীর বে-সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

অধীন বাঙালী কর্ম্মচারীর অনুকূলে ইংরেজ-সিবিলিয়ানের এরূপ উচ্চ গুণগান বড় সুলভ নহে,—বিশেষতঃ সে যুগে। কিন্তু বোর্ড-অফ-রেভিনিউ তাঁহাদের পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিলেন না, অধিকন্তু চটিয়া কালেক্টর ডিগবীকে কড়া চিঠি লিখিলেন,—

"আমাকে বোর্ড-অফ-রেভিনিউ আপনার গত মাসের ৩১শে তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ইহাও জানাইতে বলিতেছেন যে, আপনার পত্রে এমন কোন কারণ দেওয়া আছে বলিয়া বোর্ড মনে করেন না যাহার জন্য আপনার জেলার দেওয়ান-পদে রামমোহন রায়ের নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে বোর্ড তাঁহাদের পূর্ব্বমত বদল করা আবশ্যক মনে করেন; এই হেতু তাঁহারা ইচ্ছা করেন, আপনি তাঁহাদের গত মাসের ১৫ই তারিখের চিঠি অনুযায়ী ঐ পদের জন্য অপর কাহাকেও মনোনীত করিবার চেষ্টা দেখুন।

"বোর্ডের ইচ্ছামত আপনাকে আরও জানাইতেছি, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনি যেরূপ ভঙ্গীতে পত্র লিখিয়াছেন বোর্ড তাহা অত্যন্ত অপছন্দ করেন; তাঁহাদের প্রতি পুনরায় এরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে, বোর্ড যে তাহা অত্যন্ত গুরুতরভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন ইহা সুনিশ্চিত।" (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮১০) (১৬)

বোর্ডের নিকট ডিগবীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল। কিন্তু তবুও তিনি শেষবার রামমোহনের নিয়োগের জন্য চেষ্টা করিতে ছাড়িলেন না। অন্ততঃ আরও কিছুদিন রামমোহনকে কাজ করিতে দিবার জন্য বোর্ডের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন:—

"এই জেলার দেওয়ান-পদে মৎকর্তৃক রামমোহন রায়ের নির্ব্বাচনের প্রস্তাব সম্পর্কিত এবং গত ৩১শে জানুয়ারী লিখিত আমার চিঠির লিখন-ভঙ্গীর প্রতি বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর বিরক্তি-প্রকাশক, আপনার গত মাসের ৮ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

"যাঁহার নাম বোর্ডের কাছে সুপারিশ করিয়াছিলাম, তাঁহার উচ্চাঙ্গের প্রতিভা, বিচার-শক্তি এবং চরিত্রবলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে বলিয়াই, এবং যে ব্যক্তি জ্ঞানের গভীরতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা হেতু আমার আপিস-সংক্রান্ত কাজে জনসাধারণের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন বোর্ড সেইরূপ ব্যক্তির নিয়োগ নামঞ্জুর করাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম বলিয়াই আমার মন্তব্যে যদি এমন-কিছু তীব্রতা প্রকাশ পাইয়া থাকে—যাহা অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমার অনবধানতার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। জানিয়া-শুনিয়া অসম্মান-প্রদর্শনের ইচ্ছা দূরে থাকুক, এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের প্রত্যাখ্যানে সম্মান-সহকারেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম এবং বোর্ড বাতিলের যে-সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই-সকল কারণ বেশী করিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও রামমোহন রায় অপেক্ষা অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগও যে মঞ্জুর করা হইয়াছে সে-সম্বন্ধে নজির আছে তাহাও বোর্ডকে মনে করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, আমি প্রার্থনা করি আপনি এ কথা বোর্ডকে বুঝাইয়া বলিবেন।

"দেওয়ানের কাজে একজন সুদক্ষ লোককে নিযুক্ত করাই বোর্ডের উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্যও আমার ইচ্ছার অনুরূপ। কিন্তু রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি কাজে অভ্যাস নাই বলিয়া যখন অনুমান-বলে ধরিয়াই লওয়া হইতেছে যে, আমার মনোনীত লোকটি রাজস্ব-আদায় ব্যাপারের সাধারণ পদ্ধতিতে অজ্ঞ, তখন আমি প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বোর্ডের নিকট আমার এই একান্ত আশা জানাইবেন যে তাঁহারা যেন রামমোহন রায়কে আরও কয়েক মাস দেওয়ানের কার্য্য করিতে দিবার অনুমতি আমাকে দেন; তাহা হইলে বোর্ড তাঁহার প্রকৃত গুণপনা ও দেওয়ান-পদে তাঁহাকে বাহাল রাখার ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবেন; যদিও আমি নিজে আশা করি যে, অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ মাসের তৌজী ও রিপোর্টগুলি দেখিয়া (এ কয় মাসে অতি অল্পই খাজনা বাকি পড়িয়াছে) বোর্ড তাঁহার গুণ ও সাধুতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই

(১৬) Board of Revenue Con. 8 Feb. 1810, No. 10.

অনুকূল মত পোষণ করিয়া থাকিবেন।" (৮ই মার্চ্চ, ১৮১০) (১৭)

এবারও বোর্ড ডিগবীর প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কালেক্টরকে লেখা হইল,—

"আপনার এই মাসের ৮ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার করিতে আমাকে আদেশ করা হইয়াছে এবং আমাকে জানাইতে বলা হইয়াছে যে, আপনি আপনার ৩১শে জানুয়ারী তারিখের পত্রের ভঙ্গী সম্বন্ধে যে জবাবদিহি করিয়াছেন, তাহাতে বোর্ড সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

"আপনার কালেক্টরীতে যে দেওয়ান-পদ খালি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে ১৫ই জানুয়ারী ও ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদত্ত বোর্ডের আদেশ, সঙ্গতি বা ঔচিত্যবোধের দিক দিয়া দেখিলে বোর্ড বদল করিতে পারেন না;—ইহার জন্য তাঁহারা দুঃখিত, এবং আপনি যেন রামমোহন রায় ছাড়া অপর কাহাকেও ঐ পদে মনোনীত করেন,—বোর্ডের এই ইচ্ছা আপনাকে জানাইবার জন্য পুনরায় আমাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"বোর্ড মনে করেন, ঠিক সময়ে সরকারী রাজস্ব-আদায়-কার্য্য সাধারণতঃ কালেক্টরেরই প্রযত্ন প্রমাণ করে—যদিও সেই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও অস্বীকার করিতে চাহেন না যে, হয়ত সেই কৃতিত্বের কতকাংশ সতর্কতা ও মনোযোগিতার জন্য দেওয়ানেরই প্রাপ্য। কিন্তু বছরের তিন মাস বা তাহার অধিক কালের অনুকূল তৌজীগুলিই শুধু ঐ পদাভিষিক্ত দেশীয় কর্ম্মচারীর প্রতিভার অথবা সাধুতার বিচারে মানদণ্ডস্বরূপ ধরিতে হইবে,—এরূপ যুক্তি বোর্ড কখনই মানিয়া লইতে পারেন না।" (১৬ই মার্চ্চ, ১৮১০) (১৮)

রামমোহনের নিয়োগ-সম্বন্ধে লেখালেখি করিয়া যে কোন ফল হইবে না, তাহা বুঝিয়া ডিগবী দেওয়ান-পদের জন্য অন্য লোকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কয়েক মাস পরে বোর্ডকে জানাইলেন,—

"বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, অদ্য আমি মুনশী হেমায়েৎ-উল্লাকে আপাততঃ অস্থায়িভাবে এই আপিসের দেওয়ানের পদে মনোনীত করিয়াছি। লোকটি সুযোগ্য ও সচ্চরিত্র, রংপুরের ফৌজদারী আদালতে বারো বৎসর, এবং দেওয়ানী আদালতে প্রায় দুই বৎসর শেরিস্তাদারের কাজ করিয়াছেন। আশা করি, বোর্ড এই ব্যবস্থা সানন্দে মঞ্জুর করিবেন।" (২৮শে মার্চ্চ, ১৮১১) (১৯)

এবার বোর্ড ডিগবীর কথায় কর্ণপাত করিলেন। ১৮১১, ১৯শে এপ্রিল তারিখের পত্রে তাঁহারা মুনশী হেমায়েৎ-উল্লাকে দেওয়ান-পদে পাকা করিলেন।

রামমোহনের দেওয়ানী লইয়া কালেক্টর ডিগবী ও বোর্ডের মধ্যে যে বাদানুবাদ চলিয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল, রামমোহন রায় প্রকৃতপক্ষে রংপুরের দেওয়ান হন নাই, তবে নূতন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় দেড় বৎসরকাল অস্থায়িভাবে এই পদে কাজ করিয়াছিলেন মাত্র। এই দেওয়ান-পদের বেতন তখনকার দিনে দেড়শত টাকার বেশী ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার ন্যায় লোকও বোর্ডের চক্ষে এই কার্য্যের উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই!

ঢাকা, রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর ও রংপুরে সিবিলিয়ানদের সংস্পর্শে আসিয়া রামমোহন রাজস্ব ও শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ের যে বহুমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন চার্টার প্রাপ্তির সময় তিনি ১৮৩১-৩২ সালে হাউস-অফ-কমন্স সভায় ভারতের শাসনতন্ত্র-সম্পর্কে যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন নিজ বাসায় সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধব লইয়া ধর্ম্মতত্ত্বের—প্রধানতঃ পৌত্তলিকতার অসারতার কথা—আলোচনা করিতেন। রংপুরে তখন বহু লোকের বসতি; বাসিন্দাদের মধ্যে জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী মারওয়াড়ী-ব্যবসায়ীও কম ছিল না। তাহাদের অনেকেই এই সান্ধ্য-সভায় যোগ দিত। এই কারণে রামমোহনকে কল্পসূত্র ও অন্যান্য জৈনধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই একদল লোক রামমোহনের ঘোরতর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নেতা—গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য ছিলেন রংপুর জজ কোর্টের দেওয়ান, ফার্সী ও সংস্কৃত

(১৭) Board of Revenue Con. 16 March 1810, No. 11.

(১৮) Ibid. No. 12.

(১৯) Board of Revenue Con. 19 April 1811, No. 18.

ভাষায় সুপণ্ডিত। "ইনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একখানি বাংলা পুস্তক লেখেন। উহা সংশোধিত হইয়া বাংলা ১২৪৫ সালে (১৮৩৮) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকখানিতে জানিতে পারা যায় যে, রামমোহন রায় রংপুরে ফার্সী ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং বেদান্তের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক লোক গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের অনুগত ছিল। তিনি তাহাদিগকে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।" (২০)

১৮১৪ সালের শেষাশেষি ডিগবী সাহেব কিছুদিনের ছুটিতে বিলাত গমন করিলেন। ঐ বৎসরে রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

(২০) নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রাজা রামমোহন রায়" (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৩১

ময়নামতীর চর

বন্দেআলী মিয়া

বরষার জল সরিয়া গিয়াছে জাগিয়া উঠেছে চর ;
গাঙ-শালিকেরা গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাঁধিতেছে সবে ঘর।

গহিণ নদীর দুই পার দিয়ে আঁখি যায় যত দূরে—
আকাশের মেঘ অতিথি যেন গো তাহার আঙিনা জুড়ে।

মাছরাঙা পাখী এক মনে চেয়ে কঞ্চিতে আছে বসি ;
ঝাড়িতেছে ডানা বন্য হংস পালক যেতেছে খসি।

তট হতে দূরে হাঁটু জলে নামি এক পায়ে করি ভর
মৎস্যের ধ্যানে বক দুটি চারি সাজিয়াছে ঋষিবর।

পাখনা মেলিয়া কচি রোদে শুয়ে উদাসী তিতির পাখী
বারে বারে দুটি ডানা ঝাপটিয়া ধূলাবালি লয় মাখি।

বিরহিণী চখী চখারে পাইয়া কত কী যে কথা কয়—
গাঙ্চিল সুধু উড়িয়া বেড়ায় সকল্ পদ্মাময়।

ডুবানো না'য়ের গলুয়ের পরে শুয়ে শুয়ে কাঁচা রোদে
ধাড়ি কচ্ছপ শিশু জলসাপ আলসে নয়ন মোদে।

বুনো ঝাউ গাছে টিট্টিভ পাখী বেঁধেচে পাতার বাসা,
বাব্লার ডালে ঘুঘু-দম্পতী জানাইছে ভালোবাসা।

ভোর না হইতে ডাহুক ডাহুকী করিতেছে জলকেলি ;
জলভরা ক্ষেতে খুঁজিচে শামুক পানিকো'ড় সারাবেলি।

কাঁচা বালু-তটে চরণ-চিহ্ন রেখে গেছে খঞ্জনা ;
পুচ্ছ নাচায় সুঁইচোর পাখী—চাহ্' একা আন্মনা ;—

ফড়িং খুঁজিছে শালিকের ঝাঁক করিতেছে কলরব ;
লক্ষ হাজার বালিয়া হাঁসের দিন ভরা উৎসব।

* * * *

দুপুরের রোদে খাঁ খাঁ করে চর—দূর গ্রামে মাথা কালী
উত্তুরে বায়ে শিশু মরু হতে উড়ে যায় সুধু বালি,

অশথের তলে জলি-ধান লাগি চাষীরা বেঁধেছে কুঁড়ে ;
কাঁচা যব-শীষ আলোর ডাকেতে এসেচে সে মাটি ফুঁড়ে।

ছায়া আর রোদে ঝিকিমিকি জলে হাজার উর্ম্মি দল
কূলে কূলে তার আছাড়িয়া পড়া দিনে রাতে কোলাহল।

দুপুরে যে-দিন নেমেছে সন্ধ্যা মেঘেতে ঢেকেছে বেলা
গাঁয়ের মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসিতে করে না হেলা।

কেহ আসে একা—দল বেঁধে কেহ—চলে তারা তাড়াতাড়ি ;
পথে যেতে যেতে খুলে দিয়ে গরু তাড়াইয়া আনে বাড়ী।

গোহালের পাশে শুকানো যে ঘুঁটে ধামায় ভরি তা লয় ;
কঞ্চির বেড়া ধরিয়া বধূরা প্রিয়-পথ চেয়ে রয়।

দোকানীর বৌ নদী পানে ধায়, কোথা গেছে নেয়ে তার
এমন বাদলে কোন্ হাটে তার বিকাইবে সম্ভার !

জাল বোনা ভুলি জেলের যুবতী বিরহ দিবস গণে,
কোথা ধরে মাছ জেলে যে তাহার এমন উতলা ক্ষণে !

কালো মেঘে ছায়—পূর্ব্ব-ঈশান জোরে জোরে বায়ু বয়,
বলাকার সারি, শকুনের ঝাঁক, উড়িচে আকাশময়।

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

২৬

আহারাদির পর দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামাবসরে উপরতলার একটা ঘরে সলিল কৌচে শুইয়া একখানা খবরের কাগজ পড়িতে-ছিল। স্বর্ণলতা আসিয়া তার পাশে বসিল। তার সঙ্গে অঙ্গ হইতে সাবানের সুগন্ধ, কেশ হইতে কেশতৈলের সুরভি, চর্ব্বিত তাম্বুল হইতে জর্দ্দার সুবাস ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। তার হাতের গোছাভরা চুড়ির সঙ্গে সোনার রুলি এবং তারের বালার সংঘর্ষ-রব মৃদুমন্দ ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। এক কথায় রূপে রসে শব্দে গন্ধে তার স্বামীগৃহ ভরপুর হইয়া গেল,—কেবল কি শুধু স্পর্শ করিতে পারিল না তার যুবক স্বামীর অধ্যয়ন-নিরত চিত্তকেই ?

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া অবশেষে স্বর্ণলতা তার স্বামীর হাত হইতে খবরের কাগজখানা টানিয়া লইয়া সাভিমান স্বরে বলিয়া উঠিল—

"কি এমন দরকারী খবর পড়চো গো ?"

সলিল ব্যগ্রভাবে কাগজখানা তার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সেখানা নিজের পাশের ছোট টিপয়ের উপর রাখিতে রাখিতে উত্তর দিল,—"থাক, থাক—ওটা দেখতে হবে, সুন্দর লিখছেন !"

স্বর্ণ একডিপে পান আনিয়াছিল, একটা স্বামীর মুখের কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে কি বলেছে গা ?"

সলিল পানটা স্বর্ণর হাত হইতে লইয়া নিজেই নিজের মুখে পুরিয়া দিয়া কহিল, "মিঃ দাস, চিত্তরঞ্জন দাসের বক্তৃতা ওটা—"

স্বর্ণ ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, পানটা সে নিজেই সলিলের মুখে দিবে এই ইচ্ছাটাই তার মনের মধ্যে ছিল,—সলিল নিজেই হাতে লওয়াতে তার মনে একটু অভিমানের উদয় হইয়াছিল ; কিন্তু সলিলের উচ্চারিত ওই কথা কয়টায় হঠাৎ সে বিস্ময়চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওমা ! তাই না কি ? আমাদের চিতে বুঝি আবার বক্তিমে দিতেও শিখেছে ! সত্যি ! কি বলেছে গো ?"

সলিলও সমান বিস্ময় ভরে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল,—"চিতে ! 'তোমাদের—চিতে' ? সে আবার কে ?"

স্বর্ণ কহিল "কেন, এই যে তুমি বল্লে চিত্তরঞ্জন বক্তিমে করেচে। ওকে যে আমরা চিতে বলেই ডাকি কি না,—ভাল নাম চিত্তরঞ্জন, যেমন তোমারও একটা ভাল নাম আছে না ? সব্বাই তো আর তাই বলে ডাকে না। বাড়ীতে আমাকেও তো আগে সবাই ঠাকুমার দেওয়া নাম নিস্তার বলেই ডাকতো—বিয়ের থেকেই না স্বর্ণলতা পাকা হয়ে গেলুম।"

সলিল অর্দ্ধ অবিশ্বাসে প্রশ্ন করিল, "ওঁদের বাড়ী কি তোমাদের দেশে ? কই, না, তো !"

স্বর্ণ এই প্রতিবাদে অসন্তুষ্ট হইয়া জবাব দিল,—"না বল্লেই হলো ! ওদের বাড়ীখানা ঠিক আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ী। চাঁপাফুল তো ওরই আপন বোন। কত ফলসা পেয়ারা কুল ও আমাদের পেড়ে পেড়ে দিয়েছে তার ঠিক আছে ! সাঁতার যা দেয়, মিত্তির পুকুরটা বর্ষার জলেও এপার ওপার করতে পারে।"

সলিলের মুখে বিদ্রূপের সহিত একটা বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে পরিত্যক্ত কাগজখানা পুনশ্চ তুলিয়া ধরিয়া তাহার সেই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্যারায় মনোযোগী হইয়া উত্তর করিল,—

"এ তোমাদের সে চিতে নয় গো—ইনি একজন মস্ত বড় পেট্রিয়ট, এঁর নামও কখনও শোননি ?"

স্বর্ণ স্বামীকে পড়ার দিকে মন দিতে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া-ছিল, তাঁহার স্বরের অসন্তুষ্টি অনুভব করিয়া মৃদু সঙ্কুচিত হইল, আস্তে আস্তে কহিল,—

"না, কই শুনিনি ত। চিত্তরঞ্জন তো ওই একজনকেই জানি।"

এই উত্তরে সলিলের গা জলিয়া গেল। সে রূঢ়কণ্ঠে "খুব জানো, যথেষ্ট জানো,—আর কিছু না জানলেও তোমার এ জন্মটায় চলে যাবে।" বলিয়া ছাড়া প্যারার উপর তীব্র

ভাবে চোখ বুলাইতে লাগিল, কিন্তু মনের ভিতরে তার যে অবমানিত ক্ষোভ গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল, সে আর তাহাকে তাহা হইতে পূর্ব্বের মত সৌন্দর্য্য আহরণ এমন কি অর্থ পরিগ্রহ পর্য্যন্ত করিতে দিল না। আহত অন্তঃকরণ কেবলই বুকের উপর ঘা মারিয়া বলিতে লাগিল, এ কি স্ত্রী! একটা রূপী বাঁদর, একটা চক্‌চকে পাখ্‌নাওলা ময়ূর, হাঁস, চন্দনা—ছ্যা! যতই দিনের পর দিন যাইতেছিল, নূতন যতই পুরাতন ও অচেনা যতই পরিচিত হইয়া উঠিতেছিল, স্বর্ণলতার শিক্ষাহীন গ্রাম্যতা দিনে দিনেই যেন সলিলকে বেশি করিয়াই পীড়িত করিতেছিল। আরতিকে সে ভুলিতে পারে নাই, আরতিকে ভুলিতে পারা তার পক্ষে সম্ভবও নয়;—কিন্তু স্বর্ণলতার রূপে সে একটুখানি আপনাকে ভুলিয়াছিল। স্বর্ণ যদি অতখানি আদরের পুতুল না হইয়া একটুখানি মানুষের মতন হইত, সে যদি তাহার মাতাপুত্রের একটুখানি মনের মতন হইতে ইচ্ছা বা চেষ্টা করিত, তাহা হইলে ভিতরে একটা অনারোগ্য রোগের অশুষ্ক ক্ষত বাকী থাকিয়া গেলেও উপরটায় তার একটা শীতল প্রলেপের ঢাকা দেওয়া শান্তি জাগিয়া উঠিতে পারিত; কিন্তু স্বর্ণলতা কোন দিনই এমন কোন শিক্ষা পায় নাই, যাহাতে সে পরের মনের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে। সে জানে সে সুন্দরী, অত্যন্ত সুন্দরী। সে শুনিয়া আসিয়াছে, তাহাকে যে লাভ করিতে পারিবে, সে ভাগ্যবান, সে তপস্যা করিতেছে। অতএব যে তাহাকে লাভ করিয়াছে, তাহাকে আপনার বলিবার, বুকে ধরিবার অধিকার পাইয়াছে, সে নিজেকে কৃতার্থম্মন্য ভাবিয়া কিসের জন্য সর্ব্বদা মুখে মুখে বুকে বুকে রাখিয়া সোহাগে আদরে ভরাইয়া দেয় না? সে কেন তাহাকে অতি সাধারণ একজনের সঙ্গে সমান ওজন করিয়াই তার কাছ হইতে তার পাওনা আদায় করিয়া লইতে চাহে? সে পান সাজিবে, রাঁধিবে, বই পড়িবে, গান গাহিবে, সেলাই করিবে, সবই করিবে,—পাঁচজনে যাহা করে তাও করিবে, তার চাইতে বেশিও করিবে, এই জন্যেই কি সে অত রূপ লইয়া জন্মিয়াছিল? না বড়লোকের বধূ হইয়াছিল? স্বর্ণলতার অভিমানী চিত্ত তার স্বামীর অবিচারে অত্যন্তই পীড়া বোধ করিতে লাগিল। তার উপর দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, স্বামীর উপর রাগ করিয়াও সে মোটে থাকিতে পারে না। তিনি অনেক সময়ই রাগ করিয়া কথা বন্ধ করেন, স্বর্ণ কাঁদিয়া কাটিয়া না খাইয়া শয্যা লইয়া শেষে যাচিয়া গিয়া ভাব করে। স্বামীকে সে একান্ত ভাবেই অত্যন্ত নিবিড় করিয়া ভালবাসিয়া বসিয়াছিল। সলিল যদি কোন বন্ধু-বাড়ীর ভোজে, নিজের বাড়ীর কাজে দেরি করিয়া বাড়ী ফেরে, তার যন্ত্রণার সীমা থাকে না। রাত্রে যদি সে তাকে এতটুকু আদর করিতে ভুলিয়া যায়, সারারাত স্বর্ণ জাগিয়া থাকে, কাঁদিয়া কাটায়। ঠাকুমা যদি তাকে দুদিনের জন্যও লইয়া যাইতে চান,—অত তো আদরের ঠাকুমা—তাও সলিলকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া স্বর্ণলতা যাইতে চাহে না। শেষে ঠাকুমাই তাকে এখানে আসিয়া দেখিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তার মা সুখের নিশ্বাস ফেলিয়াও ব্যথিত হইয়া বলেন,—

"বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিয়ে সোনা আমার একেবারেই পর হয়ে গেল! তা'হোক! জন্ম জন্ম সিথেঁয় সিদুঁর দিয়ে সেই ঘরই করুক।"

স্বর্ণ শুধু একটুখানি পছন্দ করিত সুন্দরাকে। সুন্দরার চরিত্র-মাহাত্ম্যকে সেও প্রত্যাখ্যাত করিতে পারে নাই। এই সুন্দরী নারী যখনই আসিত, তার জন্য রকমারি সৌখীন দ্রব্য আনিত। যতদিন থাকিত, তাকে নানা ছাঁদে সাজাইত, পরাইত,—ভাইকে ডাকিয়া তার নব নব সাজ ও সৌন্দর্য্য দেখাইত,—তার অনবদ্য রূপরাশির তারিফ করিত; ভাইকে দিয়া করাইত,—এবং সলিলের দিক হইতে তাহার প্রতি এতটুকু কোন ত্রুটীর আভাষ পাইলে তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া স্বর্ণর একান্ত আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া দিত। এক দিন স্বর্ণ তার অন্তরের আনন্দোচ্ছ্বাস রোধ করিতে না পারিয়া সুন্দরার গলা জড়াইয়া বলিল,—

"ঠাকুরঝিমণি! লোকে কথায় বলে 'ননদিনী রায়-বাঘিনী' কিন্তু কেন বলে ভাই? আমার তো মনে হয়, তোমার মত ননদ আমি যেন জন্মে জন্মে পাই—"

সুন্দরা গভীর স্নেহে ভ্রাতৃজায়াকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল, তার কষিত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল ললাটে প্রগাঢ় স্নেহে একটী চুম্বন করিয়া কহিল,—

"তাই যেন পাস্ সোনা! আমিও এই রকম সোনার প্রতিমা ভাজ পেয়ে ধন্য হবো। আবার পাঁচ মাস পরেই যখন একটী সোনার পুতুল ভাইপো কোলে নোব, তখন কত

আহ্লাদই হবে বল্ দেখি ? দেখ ভাই ! তোর খোকা হলে তার ভাতে আমি মাকে ধরে রূপার থালা সামাজিক করাবো। সল্লির বিয়েতে মা রূপোর সামাজিক করেন নি, এবার কিন্তু ছাড়বো না। আর তার কি নাম রাখবো জানিস্ ? সলিলের ছেলে হবে সুনীল। আর সলিলের যেমন একটা পোষাকী নাম আছে—সরোজ, তারও ওর সঙ্গে মিলিয়ে থাকবে নীরজ,—হ্যাঁ রে বউ! সে বেশ হবে না ?”

অনাগত ভাবী সন্তানের আগমনকে এমন করিয়া কোনো দিনও স্বর্ণলতা দেখিতে পায় নাই। আজ এই স্নেহময়ী ও আনন্দময়ীর চোখের দৃষ্টি দিয়া সেও ইহাকে অত্যন্ত মধুরতর করিয়া দেখিল। তার মনে মনে একটু লজ্জা বোধ হইলেও তার এসব কথা শুনিতে ভাল লাগিতেছিল।

সুন্দরা বলিতে লাগিল,—“খুব সাবধানে থাকবি, বুঝলি—সোনা ? তড়বড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামিস, সেটা ছেড়ে দে। অত করে টক খাস্নি। দুধটা জোর করে খাস, দুধ খেলে ছেলে খুব ফরসা হয়, সত্যি রে! ঐ জন্যেই তো বেদানা দুধ এই সব খেতে দেয়। যাদের জোটে না তাদের ছেলে কালো হয়ে জন্মায়। লক্ষ্মী ভাই! আমার ভাইপোটী যেন ঠিক পূর্ণিমার চাঁদের মতন হয় দেখিস্! আচ্ছা যদি তুই খুব শান্ত হয়ে, মার কথা শুনে, যা দেন খেয়েদেয়ে, কান্নাকাটী না করে (তা হলে কাঁদুনে ছেলে হয়ে তোকে জ্বালাবে) খুব সুন্দর আর শান্ত ছেলে আমায় দিস, আমি সলিলকে ধরে তোকে একটা মোটর কিনিয়ে দোব, রোজ সলিল তোকে নিয়ে তাতে করে নদীর ধারে একা একা বেড়িয়ে আনবে বুঝলি ?—আর আমি তোকে কি দোব বল ত ? তুই যা চাইবি। কি নিবি বল ?”

স্বর্ণলতার নবীন চিত্ত গভীর আনন্দে যেন দুলিয়া উঠিল, তার সুন্দর মুখে সুখোচ্ছ্বাস উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। সে নতনেত্রে কোনমতে কহিল,

“আচ্ছা দিদি! তাই হবে। তোমার কথাই শুন্‌বো।”

সুন্দরা তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল—

“কি রকম গুড্ গার্ল! কে বলে সোনাকে আমার অবাধ্য! বলুক তো দেখি!”

২৭

নিতান্ত অকালে একটা মৃত সন্তান প্রসব করিয়া স্বর্ণলতা কঠিন পীড়ায় মরণাপন্ন হইয়া পড়িল। মৃত সন্তান সহজে প্রসূত হয় নাই—তাহাকে কাটা-ছেঁড়া করিয়াই বাহিরে আনিতে হইয়াছে। ডাক্তারদের যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু দূষিত বস্তু রক্তে মিশিয়া প্রসূতিরও জীবন সংশয় হইয়া উঠিয়া-ছিল। অনেক চেষ্টা-যত্নে ও ভগবানের কৃপায় সে অবস্থাটা কাটিয়া গেলেও, স্বর্ণলতা সেই যে রোগশয্যায় পড়িল, মাসের পর মাস কাটিলেও সে আর সেখান হইতে উঠিতে পারিল না। একটার পর একটা করিয়া তার জীবনের উপর বড় বড় রোগের কঠিন ধাক্কা আসিয়া পড়িয়া তাহাকে যেন হাবুডুবু খাওয়াইতে লাগিল। দেশে থাকিয়া সুচিকিৎসা সম্ভব নয় বলিয়া রোগের প্রথম দিকেই তাহাকে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। একটা বড় অপারেসনের পর কিছু সুস্থ হইলে তাহাকে হাওয়া বদলের জন্য পাহাড়ে লইয়া যাওয়া হইল। তার পর আবার স্থানান্তরে। কিন্তু বাড়াবাড়িটা কাটিলেও তার একটুখানি রোগের গ্লানি আর কিছুতেই ঘুচিল না। অল্প একটু জ্বর, হজমশক্তির কিছু দুর্ব্বলতা, এ তার সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে। দিনে দিনে রোগে ভুগিয়া তার সেই অতুলনীয় রূপের রাশি যেন দিনের বেলার আলো লাগা চাঁদের মতই ম্লানায়মান হইয়া গেল। তাহাকে একটা কীটে-কাটা সুন্দর গোলাপের মতই সকরুণ দেখাইতে লাগিল। স্বর্ণলতা যেন নিদাঘ মধ্যাহ্নের অকরুণ রৌদ্রতাপে ঝলসাইয়া উঠিল।

মহামায়া প্রাণপণ যত্নে বধূর রোগে শুশ্রূষা করিতে-ছিলেন। চিকিৎসার ব্যয় তিনি অকুণ্ঠভাবেই বহন করিতেছেন। কিন্তু একেই তাঁর পুত্রবধূর মনটা খুব সরল নয়, তার উপর রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া সে বিশ্বের উপরেই বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তার বিশ্বাস তার সঙ্গত মতন যত্ন হয় না, ডাক্তাররা চিকিৎসার কিছুই জানে না, কেবল বড় বড় হারে ভিজিটের টাকা লইতেই জানে। কখনও সে বলে, অত্যন্ত বেশি খাওয়াইয়াই তাহাকে মারিয়া ফেলা হইতেছে ; কখনও সে তীব্র অনুযোগ করে, অল্পাহারই তার সমস্ত রোগের মূল এবং তার দুর্ব্বলতার একমাত্র কারণ। যখন পাহাড়ে ছিল, সে তার ঠাকুমার কাছে যাওয়ার জন্য ভীষণ কান্নাকাটি করিত। কলিকাতায়

ফিরিয়া ঠাকুমাকে কাছে আনানো হইলে একটুখানি খুসী হইল বটে ; কিন্তু সে সুখ তার স্থায়ী হইল না। ঠাকুমা লুকাইয়া চুরি করিয়া তাহাকে এমন সব পথ্য জোগাইয়া দিতে লাগিলেন, যে তার শক্তিহীন পাকযন্ত্র সে সব হজম করিয়া লইতে সমর্থ হইল না। ফলে এই দুর্ব্বল শরীরের উপর প্রচণ্ড 'কলিকে'র ব্যথা ধরা আরম্ভ হইয়া গেল। মহামায়া রাগ না সামলাইতে পারিয়া স্বর্ণর ঠাকুমাকে একটু তীব্র করিয়াই অনুযোগ করিলেন। ঠাকুমা তাহাতে চটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে পাঁচশো কথাই শুনাইয়া দিলেন। সে সব কথার মধ্যে কতকগুলি কথায় বেশ একটুখানি তীব্র ইঙ্গিত ছিল—অর্থাৎ তাঁর আদরের দুলালীকে তাঁর কোল হইতে ছিনাইয়া আনিয়া তার পর এতটাই অন্যায় অত্যাচার মহামায়ার না করিলেও চলিত! প্রথমাবধি তাকে ঘরে আনিয়া একদিনও সত্যকারের যত্ন করা হয় নাই। খাটাইয়া খাটাইয়া তার সোনার অঙ্গ কালি করা হইয়াছে। পড়া, সেলাই, রান্না, পূজার কাজ, নিজের সেবা সবই ঐ কচি মেয়ে, যাকে তারা কখন নড়িয়া বসিতে বলেন নাই—একসঙ্গে তার ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়াছেন, না পারিলে যা খুসী তাই বলিয়াছেন। তার পরে তার স্বামী! সেই বা কি করিয়াছে? একদিনের তরেও সে এই রূপের ডালির পানে ভাল করিয়া ফিরিয়া তাকায় নাই। নিশ্চয় স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, নহিলে আর অমন স্ত্রীকে মনে ধরে না! অন্যে হইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ওরই মুখের দিকে চাহিয়া দিনরাত পড়িয়া থাকিত, যেমন এর মনমিছরির বর তার অসুখের সময় করিয়াছিল।

—এবং এই যে আজ বৎসরের পর বৎসর যায় স্বর্ণ রোগে ভুগিতেছে, এই কি তার সেবাযত্ন চিকিৎসা কিছুই ঠিক হইতেছে? কিছু না। এ যদি তাঁর বাড়ীতে হইত, গাঁয়ের মহেশ কবিরাজের ধন্বন্তরীর মত ঔষধ পথ্যে এতদিন কোন কালে এই মেয়ে তাজা হইয়া উঠিয়া আবার এতদিনে জ্যান্ত ছেলে কোলে করিয়া খালি কোল জুড়াইত। এর চেয়ে যদি তাকে গরীবের ঘরে দিতেন তো ঠাকুমা তাকে আশ মিটাইয়া কাছে রাখিতেন, মন ভরিয়া চিকিৎসা করাইতেন, এমন করিয়া তাকে অকালে হারাইতে বসিতে হইত না। ইত্যাদি—

মহামায়ার সর্ব্ব শরীর-মন এই সকল আলোচনায় ও সমালোচনায় জ্বালা করিতে থাকিলেও, অনেক কষ্টেই তিনি আপনাকে এই ভাবিয়াই সম্বরণ করিয়া লইতেছিলেন যে, যাদের শিক্ষা, সঙ্গ এবং অভিজ্ঞতা এতই সঙ্কীর্ণ—নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় সেই ঘরের সঙ্গেই যখন কুটুম্বিতা করিয়া বসিয়াছেন, তখন দোষ তিনি তো কাহাকেও দিতে পারেন না। এ অপমান তাঁহাকে যতই না কেন পীড়া দিক, এ তাঁহাকে মাথায় করিয়া মানিয়া লইতেই হইবে। তবে দুঃখ তিনি অপরিসীম ভাবেই বোধ করিতেছিলেন তাঁর ছেলের জন্যই। সলিল যে নিরপরাধে অপরাধী হইয়া তার এই নবীন জীবন যৌবনে শুধু দুঃখই ভোগ করিতে লাগিল, এবং হয় ত এ দুঃখ তার সমস্ত জীবনব্যাপী হইয়াই থাকিল, এই কষ্ট তাঁর যেন সহনাতীত হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ, এ অসহনকেও তাঁর নিঃশব্দে সহিয়া লইতে হইবে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু তাঁদের দুজনের জন্যই এ অবস্থা আজ অপরিবর্ত্তনীয়। স্বর্ণলতার স্বভাব রোগে রোগে তার স্বাভাবিক অবাধ্যতা, সন্দেহ ও অভিমানকে শতগুণেই বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়া তাদের তার কাছে যতই অতিষ্ঠ করিয়া তুলুক, তথাপি রাত্রিদিন তারই সেবা যত্ন মঙ্গলবিধান সর্ব্বতোভাবেই তাঁদের করিতে হইবে। চিকিৎসকরা সকলেই বলিতেছেন, তার সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া বহু সময়-সাপেক্ষ, হয় ত পূর্ণভাবে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ আর সে কখনই করিতে পারিবে না। রোগ-দুষ্ট অঙ্গে অপারেসনের ফলে সন্তানের মাতা হওয়া তার এ-জন্মের মতই শেষ হইয়া গিয়াছে,—মহামায়ার সমস্ত অন্তর তীব্র, তীব্রতর অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে অহোরাত্র যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহিতে লাগিল। ওঃ ভগবান! এমন করিয়া নিজের সকল আশার মূলে নিজের হাতে কেহ কি কখন কুঠার হানিয়াছে! সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত ভুলিয়া স্বেচ্ছায় ছেলের এবং বংশের এ কি ক্ষতি তিনি করিয়াছেন?

সলিলের মনের মধ্যে তার জীবনের এতবড় বিপ্লব কিন্তু বড় বেশি বিপর্য্যয় আনিতে পারে নাই। স্বর্ণলতার প্রতি তার প্রেম না থাক, বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধ এবং স্নেহ তার নিতান্তই অপ্রচুর ছিল না। সেবা যত্ন এবং তার চিকিৎসার জন্য সে অকাতরেই অর্থ ব্যয় করিতেছিল। এমন কি মহামায়া যে অর্থব্যয় অনেক সময় অনাবশ্যক বোধে নিবারণ করিতেন, সলিল মাকে বুঝাইয়া অথবা গোপনে সে ব্যয় স্বীকার করিয়া লইত।

বাড়ীতে এক্সরে লওয়া ভীষণ ব্যয়সাধ্য। অথচ স্বর্ণলতা মেডিকেল কলেজে যাইতে একান্তই নারাজ। প্রস্তাব শুনিয়াই সে কাঁদিয়া উঠিল—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল ··

"হ্যাঁ, এইবার এই হলেই আমার চরম হয়! বড়লোকের ঘরে পড়ে ত সকল সুখই আমার হয়েছে, এইবার হাঁসপাতালে এরা আমায় বিদায় করতে পারলেই বেঁচে যায়। উঃ কি শক্ত প্রাণ আমার যে এততেও বেরুতে চাইচে না!"

সলিলের দিকে ফিরিয়া তীব্র করিয়া বলিল, "হাঁস-পাতালে না পাঠিয়ে আমায় তুমি ঠাকুমার কাছে বিদায় করে দিলেই তো পার; মরতেই তো বসেছি, শীগ্‌গিরই তো মরবো,—সে ক'টা দিন যদি ত্বর না সয়, দাও আমায় আমলাগঞ্জে পাঠিয়ে। চাইনে আমি তোমাদের এই মেহগিনির পালঙ্কে শুয়ে মরতে।"

সলিল আহত স্তব্ধ বসিয়া থাকিয়া নীরবেই উঠিয়া চলিয়া গেল, আর সে দ্বিতীয়বার তাহাকে এ বিষয়ে অনুরোধ না করিয়া বাড়ীতেই এক্সরে লইয়া আসার ব্যবস্থা করিয়া বসিল। মহামায়া খবর শুনিয়া ছেলেকে ডাকাইয়া বলিলেন,—

"হ্যাঁ রে, সে যে বিস্তর খরচ,—শুধু শুধু—ওর খেয়ালের জন্য এত টাকা জলে দিবি!"

সলিল উত্তর করিল "কি আর হবে মা, যেতে দাও, বড় শক্ত শক্ত কথা বল্লে।"

মহামায়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত পড়বে?" বধূর জন্য ন্যায়ের হিসাবে ব্যয় করিতে তিনিও অনিচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু সত্যসত্যই তো আর তাঁর ঘরে কুবেরের অক্ষয় ভাণ্ডার বাঁধা নাই! কতই বা আয় তাঁর ছেলের, যে ব্যয়ের সঙ্গে এত বড় বড় সব অপব্যয়ের সঙ্কুলান হইবে? তিনি জানিতেন, এত-দিনকার সযত্ন সঞ্চিত সমুদায় নগদ টাকাই এ কয় বৎসরে তাঁর পুত্রবধূর চিকিৎসায় প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। মনে মনে তাই একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন।

যে বিপুলভাবে ইহাতে ব্যয় হইবে, মার কাছে তাহা প্রকাশ না করিয়াই সলিল ঈষৎ ঔদাস্য-প্রদর্শনপূর্ব্বক উত্তর করিল—

"কতই আর—শ' পাঁচেকই হোক।"

মহামায়া আবার একটা নিশ্বাস ফেলিলেন,—"তাই বা কম কি? বউমা একটু চেষ্টা করলে একটীবার যেতেও তো পারতো। আমি একবার বলে কয়ে দেখি?"

সলিল কহিল "বল, কিন্তু ওকে পারবে না। উল্টে মিথ্যে কতকগুলো কথা শুনবে।"

আর একদিন মহামায়ার সাক্ষাতেই স্বর্ণলতা কাঁদিয়া সলিলকে বলিল, "আমি তোমার পায়ের বেড়ি হয়েছি। শীগ্‌গির করে মরে গেলে তাজা দেখে একটা যে বিয়ে করবে, তাও পারচো না। নিশ্চয়ই মায়ে-পোয়ে তোমরা মনে মনে আমার মৃত্যু চাইচো।"

মহামায়া আগুন হইয়া উঠিয়া কঠিনস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি ছোট মন তোমার বউমা!"

সলিল মাকে নিবৃত্ত করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"কার উপর রাগ করচো মা! ওর কি রোগে রোগে মাথার ঠিক আছে!"

মহামায়া বড় বেশি চটিয়াছিলেন,—ছেলের কথায় নিবৃত্ত না হইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"তুই জানিসনে সলিল, ওর অত ছোট মন বলেই ও—"

সলিল মার পিঠে হাত রাখিয়া অনুনয়ের স্বরে ডাকিল, —"মা! মা!—"

মহামায়া ছেলের কণ্ঠের আহত স্বরে সহসা লজ্জিত হইয়া থামিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁর সেই অর্দ্ধাভিব্যক্তি যার উদ্দেশে উহা প্রযুক্ত হইতেছিল তাহাকে একেবারে অগ্নিদীপ্ত করিয়া তুলিল। স্বর্ণ কাঁদিয়া ভাসাইল, কাঁদিতে কাঁদিতে বেদম হইয়া গিয়া অনবরতই সে বলিতে লাগিল,—

"আবার এর ওপোর আমায় তুমি শাপমন্নি দিচ্ছো! মন যে কার কত ছোট তা' যিনি দেখবার তিনিই যেন দেখেন। আমায় মরার ওপোর এম্‌নই করে তোমরা রাতদিন খাঁড়ার-ঘা দিচ্চো, দাও—ভগবান দেখচেন।"

এই অবস্থায় সলিলদের পূর্ব্বাপর পরিচিত ডাক্তার একদিন ডাক্তার সেনকে তাঁর রোগী দেখাইতে আনিলেন। ডাক্তার সেনের স্ত্রী-চিকিৎসা ও হার্ট সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইদানীং উচ্চ প্রশংসার সহিত আলোচিত হইতেছিল।

সলিলের পোষাকী নাম সরোজবন্ধু,—সেই নামেই সে তার বাড়ীর বাহিরে পরিচিত। তাই ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীও তাকে সরোজ নামেই অভিহিত করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

অজন্তার পথে

শ্রীঅমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ-ভ্রমণের ইচ্ছা চিরদিনই প্রবল; বিশেষতঃ গত বৎসর মোটরে পুণা ও নাসিক নির্ব্বিঘ্নে বেড়িয়ে এসে সাহস, আর তার সঙ্গে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে বেড়াবার লোভ খুবই বেড়ে উঠ্‌লো। এবার আরও খানিকটা বেশী দূর যাবার ইচ্ছা। কিন্তু প্রধান সমস্যা—কোথায় যাওয়া যায়? অনেক তর্কের পর স্থির করা গেল অজন্তায় যাওয়া যাক্। বম্বে থেকে অজন্তা পর্য্যন্ত ভাল মোটরের রাস্তা আছে। আর শোনা গেল, রাস্তার দৃশ্যও না কি খুব সুন্দর। কিন্তু দূরত্বটা একটু বেশী, প্রায় তিন শো মাইল। এতটা রাস্তা একখানা মোটরে পার হ'তে হবে। যদি মাঝখানে কল বিগড়ায়! মনটা একটু দমে গেল; কিন্তু সব রকম সুবিধা ত আর একসঙ্গে পাওয়া যায় না। যদি বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহ মোটরে অজন্তা যাইতে ইচ্ছুক হন, তবে দুখানা গাড়ী হ'লে অনেকটা নির্ভয়ে যাত্রা করা যায়, এই ভেবে আমরা, কেহ যাবে কি না খোঁজ নিতে লাগলাম; কিন্তু না,—সঙ্গী পাওয়া গেল না।

দাক্ষিণাত্যের পাহাড়

মন দোটানায় দুল্‌তে লাগল। একবার ভাবলাম, থাক্, দরকার নেই, সখ ক'রে কে বিপদের মুখে পা বাড়ায়? আবার মনে হ'ল, অত ভয় ক'রতে গেলে ত ডি, এল, রায়ের সেই 'নন্দলালের' মতই ঘরের ভিতর দরজা জানালা বন্ধ ক'রে জীবন ধারণ করতে হয়। বিশেষতঃ অজন্তা যাবার নামে মনটাও খুবই নেচে উঠেছিল। তাই ভাবলাম, 'যা থাকে কপালে, দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক্।'

তার পর যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হ'ল। আমরা স্থির ক'রলাম, তাড়াতাড়ি না ক'রে রাস্তায় থেমে থেমে আস্তে আস্তে যাব। তা'তে মোটরের যন্ত্র আর শরীরের যন্ত্র দুইই ভাল থাকবে, আর রাস্তা ঘাট দেখে শুনে বেড়াবার আনন্দও বেশ ভাল ক'রে উপভোগ করা যাবে। সেই অনুসারে সব ডাক বাংলোয় স্থান 'রিজার্ভ' রাখবার জন্য চিঠি দেওয়া গেল। স্থির হ'ল, ৪ঠা নভেম্বর ভোর ৬টায় রওয়ানা হ'ব। দেখতে দেখতে যাবার দিন এসে প'ড়ল। আমরা মোট ঘাট বেঁধে ঠিক ৬টার সময় ভগবানের নাম স্মরণ ক'রতে ক'রতে যাত্রা সুরু ক'রলাম।

বম্বে ছাড়াতেই এক ঘণ্টা কেটে গেল। বম্বের বাইরে যখন এসে প'ড়লাম, তখন চতুর্দ্দিকে কি চমৎকার দৃশ্য! পূব দিকে লাল হয়ে সূর্য্যদেব উঠছেন, তাঁর রাঙ্গা আলো গায়ে মেখে সবই যেন ঝলমল ক'রছে। রাস্তার দুই ধারে বিস্তৃত প্রান্তর। দূরে দূরে পশ্চিম-ঘাটের অস্পষ্ট পাহাড়-শ্রেণী যেন কোন মায়াপুরী।

ইট কাঠের কৃত্রিম গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রকৃতি দেবীর উন্মুক্ত আঙ্গিনায় এসে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে উঠল। তার পর গাড়ী যতই অগ্রসর হ'তে লাগল, ততই নূতন নূতন দৃশ্য। কত বিচিত্র আকৃতির পাহাড় যে দেখা যেতে লাগল তা বলা যায় না। অধিকাংশ পাহাড়ের চূড়া মন্দিরের মত, ঠিক যেন মানুষের তৈরী।

তার পর কত নদী, কত গ্রাম, কত প্রান্তর, কত পাহাড় যে পার হ'তে লাগলাম তা'র ইয়ত্তা নাই।

মাঠে মাঠে তখন ধান পেকেছে; কোথাও গ্রামের

মেয়েরা ধান কাট্‌ছে, কোথাও মাথায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, কোথাও বা সেই সোনার রঙ্গের ধানগুলি পাহাড়ের মত স্তূপ ক'রে রেখেছে। দেখে কেবলই মনে হ'তে লাগল, কি সুন্দর আমাদের জন্মভূমি ; ভগবান ত কোন দিকেই
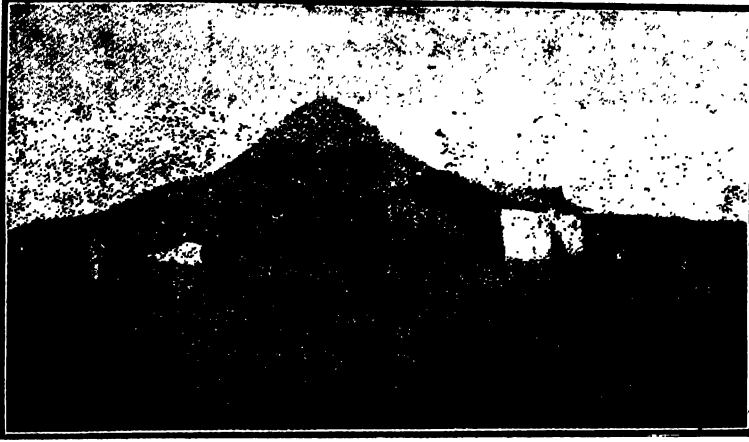
নাসিকের নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়

আমাদের কিছু দিতে কার্পণ্য করেন নি! এ দেশের তুলনা কোথায়? তবু আমাদের আজ এ দশা কেন? হতভাগ্য আমরা, অতি হতভাগ্য।

এইরূপ আনন্দ নিরানন্দের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগ-লাম। রাস্তা কখনও উঁচু, কখনও নীচু, আঁকা-বাঁকা, নির্জ্জন। এত নির্জ্জন যে এক এক যায়গায় বিশ মাইলের মধ্যেও লোকালয় চোখে পড়ে না। রাস্তায় একখানা গাড়ীর সঙ্গেও দেখা হয় না। বোধ হয় বাংলা দেশের সঙ্গে এ দেশের তফাৎ এইখানে খুব বেশী। বাংলা দেশের নিকটে এমন প্রাচীন একটা দর্শনীয় স্থান থাকলে বোধ হয় সব সময়ই এ রাস্তায় দর্শনার্থীর ভিড় লেগে থাকতো। এখানে সে সব বালাই মোটেই নেই। এক সময় যে এখানকার অধিবাসীরা শৌর্য্যে, বীর্য্যে, শিল্পে, ললিতকলায় ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রেছিল, আজ তাদের বংশধরদের দেখে সে কথা বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে হয় না। আনন্দ, স্ফূর্ত্তি, প্রাণের স্পন্দন যেন কিছুই নেই,—এক বিরাট অবসাদে আচ্ছন্ন,—কোন প্রকারে সময় মত আহার নিদ্রা সম্পন্ন হ'লেই পরিতৃপ্ত।

বেলা যত বাড়তে লাগল, তত গরম বোধ হতে লাগল। রাস্তা আর যেন শেষ হ'তে চায় না। অনেকটা রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমাগত উঠে বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা আমাদের আজকের গন্তব্য স্থান পশ্চিমঘাট-শিখরে অব-স্থিত ইগাৎপুরী ডাক বাংলোয় (বম্বে থেকে ১১০ মাইল) এসে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলাম।

আজ ৫ই নভেম্বর। ভোর ৬৷৷টায় ইগাৎপুরীর আশ্রয় স্থান পরিত্যাগ ক'রে আবার অজানা রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়লাম। কালকের মত আজ আর চড়াই নেই, একেবারে সমান রাস্তা। দূরে দূরে আকাশের কোলে মালার মত

দাক্ষিণাত্যের দেয়াল-ঘেরা গ্রাম

পাহাড়-শ্রেণী। বেলা প্রায় ৮৷৷টায় এসে নাসিক পৌছান গেল।

নাসিক হিন্দুদের একটী বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রবাদ

এই যে, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে এসে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে, এইখানেই গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে কুটীর বেঁধে সীতাদেবী ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বাস ক'রেছিলেন।

রেণুকার মন্দিরের প্রবেশ পথ

রাক্ষস-কন্যা সূর্পণখা লক্ষ্মণের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে বিয়ে ক'রতে চাইলে, লক্ষ্মণ রাগ ক'রে তার নাসিকা ছেদন করেন। সেই জন্য এখানকার নাম নাসিক। প্রবাদ যাই হোক, এ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য যে অতুলনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখানকার গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত সবেতেই যেন এক-রকম মাধুর্য্য মিশান।

নাসিক সহর অতি প্রাচীন। এখানে অসংখ্য দেব-মন্দির আছে। তার মধ্যে রামচন্দ্রের মন্দির প্রধান। গোদাবরী সেতুর উপর থেকে মন্দিরের দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

আমরা ধীরে ধীরে পুণ্যতোয়া গোদাবরী নদী পার হ'য়ে এলাম। নদীতে জল খুব কম; মনে হ'তে লাগল, এই সেই গোদাবরী, যেখানে সীতাদেবী, রামচন্দ্র অবগাহন ক'রতেন, যেখান থেকে পানীয় জল নিয়ে যেতেন! তখনও কি গোদাবরী এমনি ক'রেই বয়ে যেত? তখনও কি তার দুই ধার এমনি সুন্দর তরুরাজি-শোভিত ছিল? ঐ দূরের মৌনী ঋষির মত পাহাড়গুলি মাথা উঁচু ক'রে সেই অতীত কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সবই যেন দেখ্‌ছে, শুন্‌ছে, কিন্তু প্রকাশ ক'রবার ক্ষমতা নেই।

যা'হোক, আমরা রামচন্দ্র, সীতাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম ক'রে, তাঁদের পদরেণু-মিশ্রিত পবিত্র ভূমি পরিত্যাগ ক'রলাম।

তার পর গাড়ী ক্রমাগত অগ্রসর হ'য়ে চ'লল। সমান রাস্তা, দুই ধারে ক্ষেত। এখানে ধান ছাড়াও বাজরী, থাকরী, গম, যব প্রভৃতি অনেক রকম নূতন (অবশ্য আমাদের নিকট) তৃণ শস্যের ক্ষেত দেখা যেতে লাগল। কি উর্ব্বর প্রদেশ!

আজ অনেক ছোট ছোট গিরিনদী চোখে প'ড়তে লাগল। পাহাড়ের কোল থেকে আদুরে মেয়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আস্‌ছে। মাঝে মাঝে বেশ বড় বড় নদীও দেখা যেতে লাগল; কোন নদীতেই বেশী জল নাই।
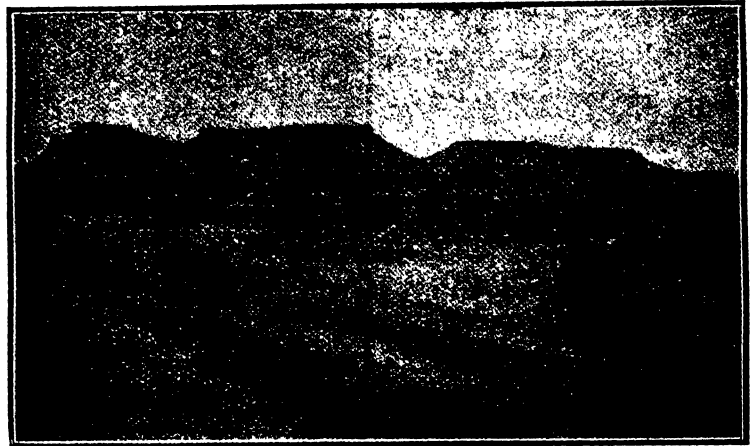
চান্দোরে অহল্যাবাই নির্ম্মিত চন্দ্রদুর্গ

নদীর ধারে ধারে অনেক প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম। আগে এ-সব যায়গায় হয় ত কত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল; এখন সেখানে অতীতের সাক্ষী কেবল

কতকগুলি মাটীর স্তূপ আর ভাঙ্গাচোরা দেয়ালের অংশ।

আরও অগ্রসর হ'য়ে আমরা চান্দোরে এসে প'ড়লাম।

মালেগাঁও দুর্গ

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে রাণী অহল্যাবাই হোলকার রাজত্ব ক'রে গিয়েছেন। তাঁর সময় এখানটা খুব সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। সামনেই পাহাড়ের মাথায় তাঁর দুর্গের দেয়াল দেখা যেতে লাগল। আমরা থেমে স্থানীয় লোকজনকে দুর্গে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিতে ব'ললাম। কিন্তু জানা গেল, এখন দুর্গে যাবার কোন রাস্তা নাই। আগে সিঁড়ি ছিল, সরকার বাহাদুর তা ভেঙ্গে দিয়েছেন। সামনের রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে খাড়া হয়ে উপরে উঠেছে। খানিক দূর উঠে অহল্যাবাইয়ের তৈরী রেণুকার মন্দির দেখতে পাওয়া গেল। আমরা রাস্তায় গাড়ী রেখে মন্দির দেখতে গেলাম।

মন্দির খুব ছোট; পাহাড়ের গা কেটে কেটে তৈরী। মন্দিরে একজন পূজারী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি আমাদের সব দেখালেন। মন্দিরের ভিতর বড়ই অন্ধকার; প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। তার পর অনেকটা ভিতরে গিয়ে প্রদীপের আলোয় প্রকাণ্ড পার্ব্বতীর মূর্ত্তি জ্বলজ্বল করছে, দেখতে পেলাম। রাণী অহল্যাবাই না কি পাহাড়ের চূড়া থেকে এতটা পথ নেমে রোজ পূজা দিতে আসতেন!

আমাদের মন্দির দেখিয়ে পূজারী তাঁর দুঃখের কাহিনি আরম্ভ করলেন। তাঁরা বংশ-পরম্পরা-ক্রমে রেণুকা দেবীর পূজা ক'রে আস্‌ছেন। আগে হিন্দু রাজত্বের সময় দেবীর নামে অনেক সম্পত্তি ছিল। তার আয়ে দেবীর সেবা ও সেবাইতের ভরণ-পোষণ বেশ ভাল ক'রেই সম্পন্ন হ'ত। এখন সব সরকারের হাতে; তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে মাসিক তিনটী টাকা বরাদ্দ করেছেন, তাতেই দেবী ও তাঁর সেবককে সন্তুষ্ট থাকতে হয়!

পূজারী তাঁর ছেঁড়া কাপড় দেখিয়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলেন। হায় ব্রাহ্মণ! হায় হিন্দু! আজ তোমাদের সে অতুল ক্ষমতা কোন্ পাপে যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। আজ আর কালকের মত গরম নেই, হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা ও শুক্‌না। আমাদের আজকের লক্ষ্য স্থল মালেগাঁও বম্বে থেকে প্রায় ২০০ মাইল।

হু হু ক'রে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ যেন

গিরণা নদী ও মন্দির
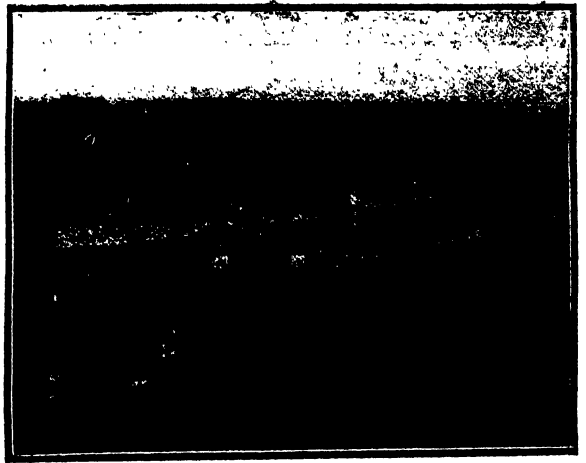
পট পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। এতক্ষণ যতদূর চোখ যায় দুধারে শস্যের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছিলাম, এবারে তুলোর ক্ষেত। ছোট ছোট গাছ, বোধ হয় এক বিঘতের বেশী লম্বা হবে না,

তাতে আগা গোড়া সাদা সাদা বরফের টুকরার মত তূলোয় ভরা। ক্ষেতে মেয়েরা সব নীচু হ'য়ে সেই তূলো উঠিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁটরী বেঁধে রাখছে।

চমৎকার! আহারের জন্য অন্ন আর তার পাশেই পরিধানের জন্য বস্ত্র। ভগবান যেন সুখী ক'রবার জন্য এ দেশকে দুহাতে তাঁর ভাণ্ডার উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছেন। আমরা নিজের দোষে সব খুইয়ে হাহাকার ক'রে মরছি।

মনে হ'তে লাগল, ভগবান যদি এতটা দয়া না ক'রতেন, জীবন ধারণের জন্য যদি প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রতে হ'ত, তাহ'লে হয় ত আজ এ দেশের লোকের অন্ন বস্ত্র থেকে আরম্ভ ক'রে জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক প্রত্যেকটী বস্তুর জন্য পরের দুয়ারে হাত পেতে ব'সে থাকতে হ'ত না। আমরা গাড়ী থেকে নেমে রাস্তার ধারের ক্ষেত থেকে দুহাত ভ'রে তূলো উঠিয়ে নিয়ে এলাম। কি সুন্দর! কি শুভ্র! আজ অনেক মোটর দেখা যেতে লাগল। ইগাৎপুরী থেকে মালেগাঁও পর্য্যন্ত বাস্ সার্ভিস্ আছে; কারণ, এদিকে রেলওয়ে লাইন নাই।

নানা যায়গায় থামতে থামতে আজ আমাদের খুব দেরি হ'য়ে গেল। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় গিরণা নদীর প্রকাণ্ড পুল পার হ'য়ে মালেগাঁও 'ট্রাভলার্স বাংলো'তে এসে পৌছলাম। আগে থাকতে বন্দোবস্ত থাকাতে কোন বেগ পেতে হ'ল না। গাড়ী থেকে নেমে আজকের মত নিজেদের পরিশ্রান্ত দেহ ও ততোধিক পরিশ্রান্ত আমাদের যন্ত্ররথকে বিশ্রাম দেওয়া গেল।

৬ই নভেম্বর। আজ আমাদের অজন্তার পথে তৃতীয় দিন। ভোর সাড়ে ৬টায় মালেগাঁও ডাক বাংলো থেকে বিদায় নিলাম। ডাক বাংলোটা সহরের একেবারে বাহিরে। সেই জন্য কাল আমাদের এখানকার কিছুই দেখা হয়নি। আজ যাত্রা আরম্ভ ক'রে প্রথমেই সহর দেখতে গেলাম। এখানে অনেক তূলোর কল দেখতে পাওয়া গেল। চারিদিকে মসজিদ আর কবরের ছড়াছড়ি। রাস্তায় পথচারীদের মধ্যেও অধিকাংশই লাল টুপীওয়ালা মুসলমান। এ দৃশ্য এ রাস্তায় এই প্রথম দেখা গেল।

হ্রদ

কাছেই একটা দুর্গের চূড়া দেখতে পেয়ে আমরা তা' দেখতে গেলাম। দুর্গটা বেশ বড় ও পুরানো ব'লে মনে হ'ল। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল এ 'বালারাম মোতিওয়ালা'র দুর্গ।

দুর্গটার—যেমন সচরাচর হয়,—চারি দিকে খাল; তার পর অসাধারণ মোটা দেয়াল। অবশ্য দেয়ালের অনেক অংশেরই এখন ভগ্নদশা। মাঝে মাঝে কামান বন্দুক ছোঁড়বার জন্য ছোট বড় অসংখ্য ছিদ্র। প্রকাণ্ড লোহার কাঁটা বসান গেট। আমরা গেট পার হয়ে ভিতরে এলাম। অনেকটা যায়গা নিয়ে সমতল একটা উঠানের মত; ইহার পর আবার একটা প্রকাণ্ড গেট। সেটা পার হ'য়ে আমরা যেখানে এলাম তাহা অন্দরমহল ব'লে মনে হ'ল। দেয়ালের ও ছাদের কারুকার্য্যের সামান্য চিহ্ন দেখা গেল। নীচের মেজে যেন চষা ক্ষেত। বোধ হয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হাতে প'ড়ে এ দশা। এক পাশে উপরে উঠবার সিঁড়ি, দারুণ অন্ধকার। সেকালের লোকের চোখের জ্যোতি বোধ হয় আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। আমাদের মত চোখ নিয়ে এ সিঁড়িতে উঠা-নামা বিষম কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার। যাক্, অতি সন্তর্পণে পা ফেলে আমরা উপরে উঠে এলাম। এখান থেকে গিরণা নদী ও তার পাশে সহরটী চমৎকার দেখা যেতে

লাগল। নদী বেশ চওড়া; কিন্তু জল খুবই কম। তখন সবে ভোর হ'য়েছে, নদী লোকে লোকারণ্য। নদীর মাঝখানে আবার ছোট্ট একটী মন্দির—ভোরের আলোয় বড়ই সুন্দর লাগল।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে আমরা সহর ছাড়িয়ে সামনে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। আজও রাস্তায় অনেক নদী, —কোনটাতে অল্প জল আছে, কোনটা একেবারে শুক্নো। তূলোর ক্ষেতও মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগল। খানিক দূর গিয়ে আমরা পাশেই একটা হ্রদের নীল জল দেখতে পেয়ে গাড়ী থেকে নামলাম। পাহাড়ের নীচে ছোট্ট হ্রদটী ভোরের আলোতে বড়ই সুন্দর দেখা যাচ্ছিল।

গিরিনদী

এর পরে রাস্তা বড়ই খারাপ। ইগাৎপুরীর আগে যেমন ক্রমাগত উপরে উঠেছিলাম, এখান থেকে তেমনি নীচে নামতে হ'ল। রাস্তা খুব ঢালু, আঁকা বাঁকা। দুই পাশে কেবলি পাহাড়। অনেকক্ষণ নেমে আমরা সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রলাম। বেলা প্রায় দশটায় গাড়ী ধূলিয়ায় এসে প'ড়ল। ধূলিয়া জি, আই, পি, রেলওয়ের একটী শাখা ষ্টেশন। রাস্তার ধারে বাজার দেখে আমরা কিছু কেনা যায় কি না দেখতে গেলাম। এখানে বেশ একটু মজা হ'য়েছিল। একজন লোক পেয়ারা বিক্রি ক'রছে দেখে দাম জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, পাঁচ পয়সা সের। আমরা এক সের পেয়ারা কিনে তাকে দিলাম একটা আনি আর একটা পয়সা। সে হাতে নিয়ে দেখে ব'লল, 'ইস্‌মে নেহি চলেগা, বড়া পয়সা মাঙ্গতা।' আমরা ত অবাক! বড়া পয়সা আবার কি! হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে দোকানদার তা'র বাক্স খুলে একটা ডবল পয়সা দেখিয়ে ব'লল, 'ইস্‌ মাফিক পয়সা মাঙ্গতা।' কি করা যায়? আমাদের কাছে ত ডবল পয়সা নেই! তা'কে এ কথা বলায় সে ব'লল, 'আচ্ছা ছোটা পয়সা দশঠো দেও।' এখানকার সব

অজন্তা গেষ্ট হাউস

হিসাবই এই 'বড়া পয়সা' অনুসারে হয়। 'যস্মিন দেশে যদাচার!'

এখান থেকে আমরা আগ্রা রোড ছেড়ে নাগপুর রোড ধরে চ'ললাম। অল্প দূর গিয়ে সামনে এক নদী, পারা-

পারের কোন ব্যবস্থা নেই। ইতিপূর্ব্বে সব নদীর উপরেই পোল পেয়েছিলাম। নদীতে জল খুব কম, আস্তে আস্তে গাড়ী জলের উপর দিয়ে পার হয়ে এল। তার পর সমান রাস্তা; খানিক দূরে আবার একটা নদী আগের মত পার হ'তে হ'ল। এ রাস্তায় অনেক দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যেতে লাগল। আজ আবার খুব গরম। একটু পর পর টোলের জন্য থামা ভারী বিরক্তিকর বোধ হচ্ছিল। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় জলগাঁও এসে আমরা আজকের মত থামলাম। মালেগাঁও থেকে এখান পর্য্যন্ত ৫ বার টোল দিতে হ'য়েছিল। জলগাঁও এসে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল; এখান থেকে অজন্তা আর মোটে ৩৭ মাইল। কাল ধীরে সুস্থে রওয়ানা হওয়া যাবে। কিন্তু বিধাতা আজ

অজন্তা গুহা (১)

কপালে সুখ লেখেন নি। নামে জলগাঁও হ'লে কি হ'বে, কাজে ঠিক বিপরীত। জলগাঁওয়ের ডাক বাংলোয় যা' জলের কষ্ট হ'য়েছিল তা' অনেক দিন মনে থাকবে।

৭ই নভেম্বর। আজ আমাদের অজন্তা যাবার দিন। মন খুসীতে ভ'রে উঠল। সকাল বেলা মোটরের কাজে অনেকটা সময় গেল। আমরা যখন রওয়ানা হ'লাম, তখন সাড়ে আটটা। জলগাঁও থেকে বেরিয়ে আজও অনেক ছোট নদী পার হ'তে হ'ল। প্রায় কুড়ি মাইল গিয়ে বৃটিশ অধিকার শেষ হ'ল। এখান থেকে নিজাম রাজ্য; কাষ্ঠ-ফলকে তাহার নিশানা দেখা গেল। আজকের রাস্তা বড়ই অসমান। দুই ধারে পাহাড়ে পতিত জমী—দর্শনীয় কিছুই নাই।

আমরা বেলা ১১টায় এসে নিজামের 'গেষ্ট হাউসে' পৌছলাম। অজন্তা গুহার চারিদিকে নিকটে কোন লোকালয় নাই। জলগাঁও থেকে প্রায় ৩০ মাইল এসে ফাবদাপুর নামে একটা গ্রাম দেখা যায়। গুহায় যে সব লোকজন কাজ করে, তা'রা এই ফারদাপুর গ্রামে থাকে। নিজাম সরকারের গেষ্ট হাউস ফারদাপুর গ্রাম ও অজন্তা গুহার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। এই বাড়ীর পাশে একটী ছোট ডাক বাংলোও আছে। পূর্ব্বের বন্দোবস্ত না থাকলেও অজন্তা-দর্শনপ্রার্থীগণ এই ডাক বাংলোয় আশ্রয় পেতে পারেন। এখানে খাবার জিনিষ কিছুই পাওয়া যায় না।

এই যায়গাটা বড়ই সুন্দর। চতুর্দ্দিকে পাহাড় আর অসীম নিস্তব্ধ ভাব। এই নির্ব্বাক নিস্তব্ধতার মাঝখানে সাদা ধবধবে প্রকাণ্ড বাড়ীটা যেন 'অচিন দেশের রাজপুরী।'

এই বাড়ী ও অজন্তা গুহা দেখা-শোনার ভার-প্রাপ্ত নিজাম সরকারের একজন কর্ম্মচারী এখানে থাকেন। তিনি আমাদের সঙ্গে ক'রে গুহা দেখাতে নিয়ে যাবেন বলায়, স্থির হ'ল, স্নান আহার শেষ ক'রে ৩টার সময় আমরা গুহা দেখতে যাব।

তিনটা বাজল, আমরাও রওয়ানা হ'লাম। কি দুর্গম রাস্তা! ক্রমশঃ ঘন পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ ক'রেছে। এখন এ রাস্তায় মোটর চলে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও না কি গরুর গাড়ী, ঘোড়া অথবা পদব্রজে ভিন্ন, যাতায়াতের অন্য উপায় ছিল না। রাস্তাটা এত সরু, আঁকা-বাঁকা ও উঁচু-নীচু যে, একটু এদিক-ওদিক হ'লেই সর্ব্বনাশ! খুব ধীরে ধীরে সন্তর্পণে গাড়ী চালিয়ে প্রায় তিন মাইল এই সঙ্কটপূর্ণ রাস্তা পার হ'য়ে আমরা প্রথম গুহার পাদদেশে এসে থামলাম।

কি সুন্দর দৃশ্য! একটা পাহাড়ের শ্রেণী, ঠিক যেন প্রতিপদের চাঁদ। তার নীচে ছোট একটী নদী পাহাড়েরই

মত আকৃতিতে বেঁকে কুলকুল ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে। চাঁদের মত পাহাড়ের গায়ে অনেক ছোট বড় গুহা। নদীর ওপারে গভীর জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়-শ্রেণী সোজা হ'য়ে উঠেছে।

চতুর্দ্দিকের একটা নিস্তব্ধ, গম্ভীর, শান্ত ভাব যেন আপনা থেকেই মনে ভক্তি জাগিয়ে দেয়। আমাদের এত কষ্ট ক'রে আসা যেন সার্থক মনে হ'তে লাগল।

অনেকক্ষণ আমরা নীচে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি-দেবীর এই বর্ণনাতীত শোভা উপভোগ ক'রলাম। তার পর সিঁড়ি বেয়ে গুহা দেখতে গেলাম।

চারটের সময় গুহার দরজা বন্ধ ক'রে লোকজন সব ফারদাপুর গ্রামে চ'লে যায়। কাজেই আজ আমাদের কিছুই দেখা হ'ল না। বাহির থেকে যতটুকু দেখা যায়, তাই দেখে আমরা আজকের মত নেমে এলাম।

৮ই নভেম্বর। তাড়াতাড়ি স্নান আহার শেষ ক'রে বেলা ১১টার সময় আমরা গুহার উদ্দেশে যাত্রা ক'রলাম।

প্রথম গুহার ভিতরে এসে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলাম। কি বিরাট কাণ্ড! কোন্ দিকে তাকাই! যে দিকে দেখি সে দিকই সুন্দর! প্রকাণ্ড একটা 'হল,' চারিদিকে সারি সারি স্তম্ভ। কিন্তু এত বড় প্রকাণ্ড 'হলটার' মাঝখানে একটাও থাম নাই। প্রত্যেকটী স্তম্ভ কি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে ভরা! স্তম্ভের পিছনে চারিদিকে সরু একটা রাস্তা, তার পর দেয়াল। দেয়ালের গায়ে আগাগোড়া রঙ্গিন চিত্রে ভরা। যদিও প্রায় সবই নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, তবুও যতটুকু আছে, তাই আশ্চর্য্য চমৎকার। কি সুন্দর রং! দু হাজার বৎসরেও একে ম্লান ক'রতে পারে নি। কি উজ্জ্বল! মনে হয় যেন কালকের তৈরী। মুখের ভাবই বা কি সুন্দর! প্রত্যেকটী চিত্র যেন জীবন্ত।

ওপারের পাহাড়
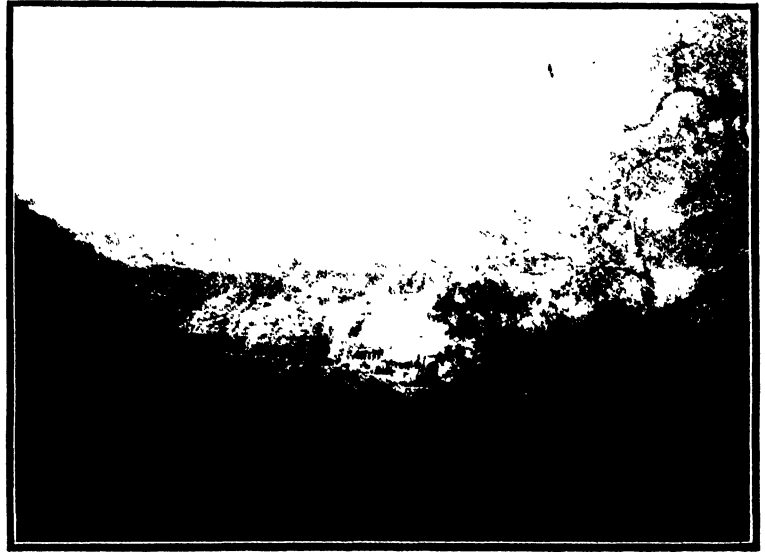
গুহা শ্রেণী

উপরের দিকে ছাতও সমস্তটা চিত্র করা। ছোট ছোট চতুষ্কোণ টুক্‌রা, প্রত্যেকটী বিভিন্ন রকম চিত্রে ভরা। দেয়ালে মানুষের ছবি আর ছাতে প্রায় সবই ফল লতা

পাতা। এক একটা লতা এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে ভরা যে দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।
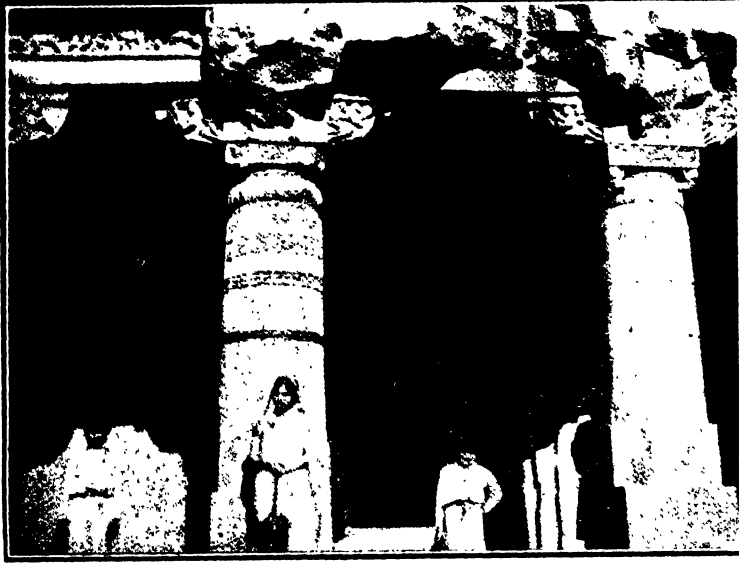
প্রথম গুহার বহির্ভাগ

দেয়ালের প্রায় সব ছবিই বৌদ্ধ যুগের এক একটা কাহিনী নিয়ে চিত্রিত। প্রত্যেকটী মানুষের চোখে যেন তার সমস্ত মনের ভাব ফুটে উঠেছে। এ কেবল চোখে দেখলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বর্ণনায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

'হলের' সামনে ভিতরের দিকে আর একটা ছোট ঘর, তাহাতে বুদ্ধদেবের বিরাট পদ্মাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তি। দুই পাশে দুইটী চামর হস্তে দণ্ডায়মান মনুষ্যের মূর্ত্তি, উপরে ফুলের মালা হাতে দুইজন পরী; যেন হাসতে হাসতে দুই দিক থেকে দুজনে বুদ্ধদেবের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে। কি সুন্দর! এই ছোট ঘরেরও আগাগোড়া চিত্র করা। বুদ্ধদেব ও অন্যান্য মূর্ত্তির গায়েও রং ছিল! যদিও প্রায় সবই নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, তবুও সব যায়গাতেই চিত্রের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের এমন প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি যে দেখলেই পায়ে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়। পাথর কেটে যে এমন জীবন্ত মূর্ত্তি তৈরী করা যায়, তা নিজের চোখে না দেখলে বোঝা অসম্ভব। আগা গোড়া সব যখন রঙ্গীন ছিল তখন না জানি কি সুন্দরই ছিল! সৌন্দর্য্যের চরম কল্পনা।

এমন একটা শিল্প যে আমাদের দেশে কি ক'রে গ'ড়ে উঠ্‌লো—আর কি করেই বা লুপ্ত হয়ে গেল, তা ভাবলে একেবারে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। এমন ভাবে লুপ্ত হয়ে গেল যে, ভারতবর্ষের লোক এর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে গেল। যা' কত লোকের কত দিনের প্রাণপাত পরিশ্রমে গ'ড়ে উঠেছিল ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে, তা' বাদুড় চামচিকা আর আরণ্য জন্তুর বাসস্থানে পরিণত হ'ল। বাদুড়, চামচিকা, মধুমক্ষিকা যে এর কি অনিষ্ট ক'রেছে তা বলা যায় না। কিছু দিন আগেও না কি চামচিকার
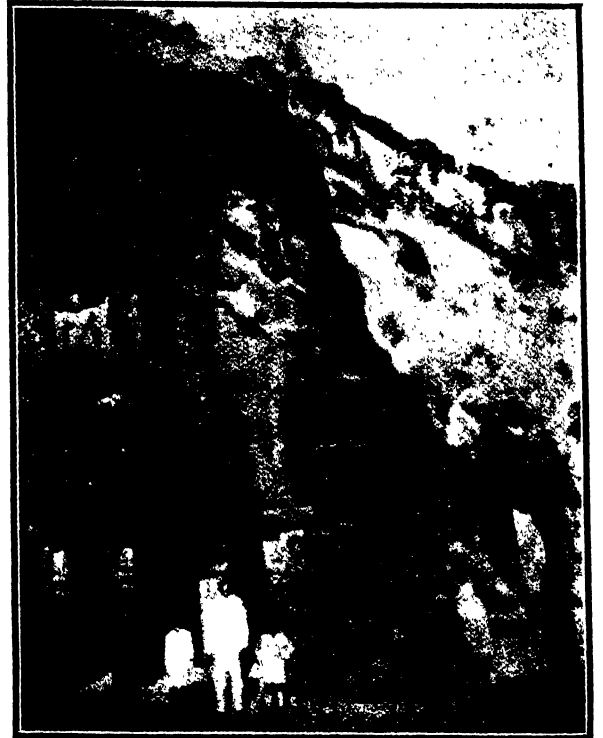
অজন্তা গুহা (৩)

গন্ধে ইহার কাছাকাছি আসাও অসম্ভব ছিল। এখনও পর্য্যন্ত কয়েকটা গুহার নাকে কাপড় না দিয়ে প্রবেশ করা যায় না। অবশেষে ইংরাজ এসে এর আবিষ্কার ক'রল। এই তাচ্ছিল্যের ফলে আমরা কি জিনিষই না হারালাম। যত্ন ক'রে রাখলে বোধ হয় আজ ইহা পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম আশ্চর্য্য জিনিষ ব'লে গণ্য হ'ত।

একটা গুহা দেখতেই আমাদের অনেক সময় কেটে গেল। এখনও ২৬টা বাকী! ভাল ক'রে দেখতে গেলে বোধ হয় একটা স্তম্ভ দেখতেই একটা দিন কেটে যায়, এমনি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। যা হোক, আমরা এর পর তাড়াতাড়ি ক'রতে লাগলাম। প্রত্যেক গুহাই এক ধরণের, কেবল চিত্র আর মূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন, আর ভিতরের প্রধান বুদ্ধ-মূর্ত্তির উপবেশন-ভঙ্গী বিভিন্ন। কয়েকটী গুহার দেয়ালে চিত্রের বদলে সব মূর্ত্তি। এগুলিও অতি সুন্দর। বুদ্ধদেবের কত রকম ভাবেরই যে মূর্ত্তি,—ছোট, বড়, বসা, দাঁড়ান অসংখ্য। দেখে মনে হ'চ্ছিল, তাঁর ভক্তদের যেন কিছুতেই আর তৃপ্তি হচ্ছিল না; তাঁকে নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ করাই যেন তাঁদের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। কত বড় অধ্যবসায়, কত বড় প্রাণের আবেগ থাকলে যে এই রকম মূর্ত্তি পাহাড় কেটে বের করা যায়, তা আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর ধারণাতীত।

কয়েকটী গুহাতে বৌদ্ধ স্তূপ দেখতে পেলাম। এই গুহাগুলির ছাত গোল খিলানের ছাতের মত। এরও চারি দিকে মূর্ত্তি, ছবি। সর্ব্বশেষ গুহার আগের গুহায় মাঝখানে বুদ্ধের স্তূপ ও এক পাশে তাঁর শায়িত নির্ব্বাণ-মূর্ত্তি। এইটাই আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগল। কি বিরাট মূর্ত্তি! এত বড় প্রকাণ্ড গুহার এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্য্যন্ত। এইরূপ বিরাট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। এই মূর্ত্তির নীচে অনেক ছোট ছোট

দাক্ষিণাত্যের প্রবেশ-দ্বার

কৈলাস মন্দির

াক-নিমগ্ন মনুষ্য-মূর্ত্তি। প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখে মনের ভাব স্পষ্ট।

এলোরা—ইন্দ্রসভা

সব গুহার ভিতরেই গাঢ় অন্ধকার। যদিও নিজাম-সরকার বড়লোকদের জন্য আলোর বন্দোবস্ত রেখেছেন, তথাপি সাধারণ দর্শনার্থীদের সঙ্গে ভাল আলোকের বন্দোবস্ত না থাকলে বড়ই অসুবিধায় পড়তে হয়। এই অন্ধকারে, শুষ্ক কঠিন পাহাড়ের গা কেটে, হাজার হাজার বছর আগে যাঁদের অধ্যবসায়ে এমন সব ছবি, মূর্ত্তি তৈরী হয়েছিল, যা দেখ্‌লে আজ এই বিংশ শতাব্দীর লোক স্তব্ধ হয়ে যায়, তাঁরা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ! এ কথা মনে ক'রতেও প্রাণ পুলকে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে; শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, নির্ব্বাক বিস্ময়ে সমস্ত অন্তঃকরণ তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায়।

৯ই নভেম্বর। আজ আমরা অজন্তা থেকে আওরঙ্গাবাদ এলাম। ইহাও হায়দ্রাবাদের মধ্যে; অজন্তা থেকে এর দূরত্ব ৬০ মাইল। আজ এই রাস্তাটুকু আসতে আমাদের বড়ই কষ্ট হ'ল। অজন্তার 'গেষ্টহাউস' থেকে বেরিয়ে যে রাস্তায় এলাম, সেটা পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠেছে। এ রাস্তাটা মন্দ নয়। ৩।৪ মাইল এসে 'দাক্ষিণাত্যের প্রবেশদ্বার' পার হ'লাম। পর পর চারটে প্রকাণ্ড ফটক। এই ফটকগুলি যেমন বড় তেমনি দেখতে সুন্দর; মুসলমানদের সময়ে তৈরী।

এর পরেই খারাপ রাস্তা আরম্ভ হ'ল। কেবলি নদীর খাত, উপরে সেতু নাই। ছোট বড় অসংখ্য নদীর খাত পার হ'তে হ'ল। ৮।১০টায় অল্প জলও পাওয়া গেল। এক একটা এত গভীর ও পাড় এত খাড়া হ'য়ে উঠেছে যে, মোটরের এঞ্জিন বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগল। যা হোক, অনেক কষ্টে আমরা এই রাস্তাটুকু পার হ'য়ে এলাম।

আওরঙ্গাবাদের ৪।৫ মাইল আগে থাকতেই অনেক দুর্গ ও বড় বড় ফটকের ভগ্নাবশেষ দেখা যেতে লাগল। তার পর কবর। মাইলের পর মাইল কবরে ঢাকা। কত লোকের মৃতদেহ যে এখানকার মাটীতে মিশে ধূলো হয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই।
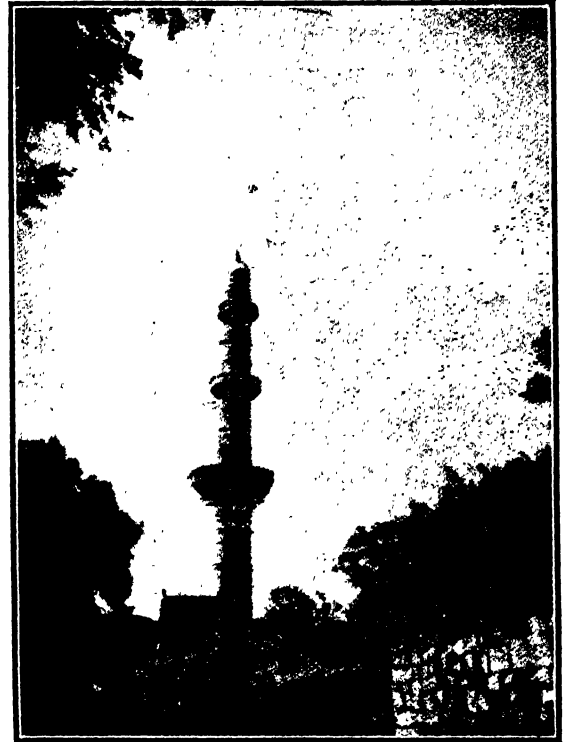
চাঁদমিনার (নিকটে)

একটা বিরাট ফটক পার হ'য়ে আমরা আওরঙ্গাবাদ সহরে প্রবেশ ক'রলাম। ইহার নাম 'দিল্লী-দরওয়াজা।' আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য জয় ক'রে এই স্থানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং আওরঙ্গাবাদ নাম দেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ইহাকে ঠিক দিল্লীর মত ক'রে তৈরী ক'রবেন। সহরের চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর এবং মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গেট দিল্লীর অনুকরণে তৈরী। সহরের ভিতর বড়ই অপরিষ্কার ও ঘন ঘন বাড়ী। আমরা দেখবার মত কিছুই পেলাম না।

বর্ত্তমান সেনানিবাস, রেলওয়ে ষ্টেশন, বড় বড় লোকের বাড়ী প্রভৃতি সহরের বাহিরে অনেক দূরে। এখানে নিজাম সরকারের একটী ডাক বাংলো আছে, আমরা সেখানেই ছিলাম।

এখানে প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান বিবি-কা-মকবারা— আওরঙ্গজেবের প্রিয়তমা পত্নী রাবেয়া বেগমের সমাধি-মন্দির।

ইহা আগ্রার তাজ মহলের হুবহু অনুকরণ। প্রভেদ কেবল আকারে— তাজ অপেক্ষা ইহা অল্প ছোট, এবং আগাগোড়া শ্বেত-প্রস্তর মণ্ডিত নয়। এখানেও সেই চারিদিকে গোলাপ ফুলের বাগান। চমৎকার ফুল ফুটে চতুর্দ্দিক সুগন্ধে আমোদিত ক'রে রেখেছে। রাস্তার দুই ধারে লম্বা লম্বা সাইপ্রেস গাছের সারি। চারি দিকে একটা গম্ভীর রমণীয় ভাব। মুসলমানদের এই স্মৃতি-সৌধগুলি জগতে অতুলনীয়। ভালবাসার কি অপূর্ব্ব নিদর্শন! আমরা ভিতরে গেলাম। শ্বেত পাথরের জালি-কাটা বেড়াগুলি বড়ই মনোরম। ভিতরেও ঠিক তাজমহলের মত গোল ক'রে শ্বেত পাথরের জালি-কাটা বেড়া। নীচের দিকে তাকিয়ে রাবেয়া বিবির কবর দেখতে পেলাম; আজও তাতে ফুল বিছানো রয়েছে! যদিও ইহা মুসলমান রাজার অধিকৃত স্থানে প্রাচীন মুসলমান কীর্ত্তি, তবুও একে রক্ষা ক'রবার কোন বিশেষ চেষ্টা দেখা গেল না। প্রত্যেক দরজার উপরে খিলানের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৌমাছির চাক সুন্দর কারুকার্য্যগুলি নষ্ট ক'রে ফেলছে; যে সব যায়গায় শ্বেত পাথরের বদলে সেই রকমই সাদা প্লাষ্টার দেওয়া ছিল সে গুলি ভেঙ্গে যাচ্ছে; অনেক যায়গা শ্যাওলা প'ড়ে কাল হয়ে আছে। চারিদিকে বাগানে ফোয়ারাতেও অযত্নের চিহ্ন সুস্পষ্ট। দেখে বড়ই দুঃখ হ'ল।
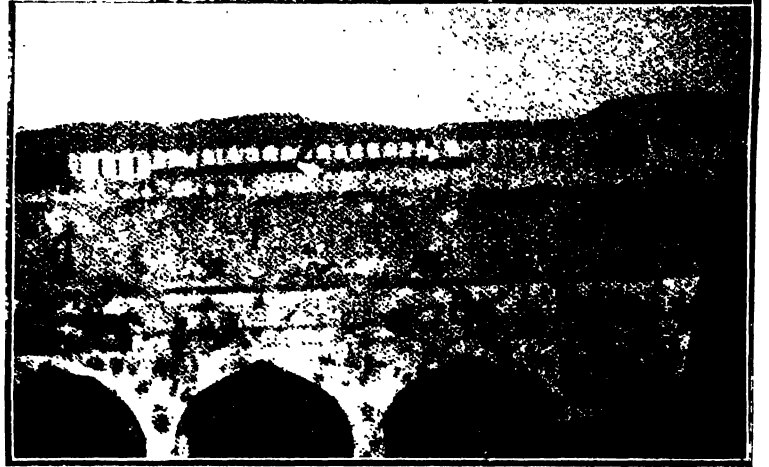
দেবগড় শিখরে

গ্রামের বহির্ভাগ ও মন্দির

আমরা বিবি-কা-মকবারা দেখে 'পান-চাক্কি' দেখতে গেলাম। যদিও শোনা গেল এও এখানকার একটী দ্রষ্টব্য

স্থান, তথাপি আমরা এখানে বিশেষ কিছুই দেখতে পেলাম না। একটা মাঝারি রকমের মসজিদ, সামনে প্রকাণ্ড এক চৌবাচ্চা; তাতে এক পাশে অনেক উঁচু থেকে সশব্দে জল পড়ছে। মাঝখানে একটা সুন্দর ফোয়ারা। শোনা গেল, আগে এর পাশে একটা 'ওয়াটার মিল' ছিল, এখন সেটা অচল।

রাত্রি হ'য়ে যাওয়াতে আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। এখান থেকে এলোরা যোল মাইল। রাস্তায় দৌলতাবাদ ফোর্ট ও খুলদাবাদে আওরঙ্গজেবের সমাধি পড়ে। স্থির
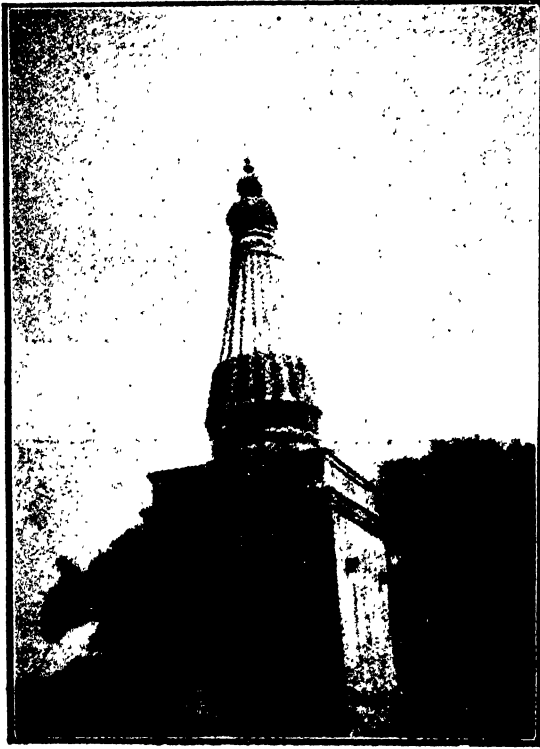
আধুনিক গ্রাম্য-মন্দির (ইয়েলো)

হ'ল, কাল প্রথমে এলোরা, তার পর খুলদাবাদ ও দৌলতাবাদ দেখে বাড়ী ফিরব।

এই ব্যবস্থা অনুসারে ১০ই নভেম্বর আহারাদি সম্পন্ন ক'রে আমরা বেলা ৯টার সময় এলোরা যাত্রা ক'রলাম। আওরঙ্গাবাদ থেকে ১২ মাইল দূরে দৌলতাবাদ, তার ২ মাইল পরে খুলদাবাদ পার হয়ে আমরা এলোরা এসে প'ড়লাম।

এখানে কৈলাসের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও বিখ্যাত। আমরা মন্দিরে প্রবেশ ক'রলাম। এখানেও অজন্তার মত পাথরে খোদা মূর্ত্তি। একটা বড় পাহাড় কেটে মাঝখানে সেই পাহাড়েরই তৈরী একটা মন্দির; কোথাও জোড়া-তালি নাই। মন্দিরটী বড়ই সুন্দর কারুকার্য্যে ভরা; ভিতরে শিবলিঙ্গ।

মন্দিরের চারিদিকে একটা অপ্রশস্ত খোলা উঠান, তার পর পাহাড়ের গায়ে বারান্দা, ভিতরে পাহাড়ের গা কেটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিব ও পার্ব্বতীর নানা অবস্থার মূর্ত্তি। বাহিরেও অনেক কারুকার্য্য, কিন্তু প্রায় সবই নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। এখান থেকে আমরা অন্যান্য গুহা দেখতে গেলাম। সব গুহাতেই হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি। কোন কোন গুহা তিন তালা, চার তালাও দেখা গেল। মানুষের কত পরিশ্রমে, কত অর্থব্যয়েই না জানি এ সব তৈরী হ'য়েছিল! গুহাগুলি সব বৌদ্ধ ধরণের; কেবল ভিতরে বুদ্ধদেবের স্থানে শিবলিঙ্গ, এবং চতুর্দ্দিকে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি।

কোন মন্দিরেই এখন আর পূজা-অর্চ্চনার ব্যবস্থা নাই, সব নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। এক সময় এই সব স্থান আলোকে, বাদ্যে, লোকজনের কোলাহলে না জানি কতই জমকাল ছিল!

হিন্দু গুহার একটু দূরেই বৌদ্ধ গুহা, অবিকল অজন্তার অনুকরণে তৈরী। তার পর জৈনদের গুহা। এগুলিও বৌদ্ধদেরই মত; কেবল ভিতরে বুদ্ধদেবের স্থানে ও চতুর্দ্দিকের দেয়ালে জৈন দেবতা পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি।

এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরের কারুকার্য্যের বিভিন্নতা লক্ষ্য করিবার জিনিষ; প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ভাব আছে। এখানে সবশুদ্ধ ৩৪টী গুহা। যদিও এখান-কার গুহাগুলি অজন্তার পরের তৈয়ারী, তথাপি একটী মূর্ত্তিও অক্ষত অবস্থায় দেখা গেল না। মুসলমানের নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রত্যেক মন্দির, প্রত্যেক মূর্ত্তি শ্রীহীন। এখান থেকে কৈলাসনাথকে প্রণাম ক'রে আমরা ফিরে চ'ললাম।

পথে খুলদাবাদ পড়ল। এখানেই সেই অতুল পরাক্রম-শালী নিষ্ঠুর দাম্ভিক সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমাধি। তাঁর কবর দেখে বড়ই নিরাশ হ'তে হ'ল। এত বড় বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের সমাধি কি না অন্য শত শত সমাধির পাশে এক কোণে অল্প একটু যায়গায়! তাও আবার অতি সাধারণ কালো পাথরের তৈরী!

শোনা গেল, বর্ত্তমান নিজাম সরকার কালো পাথরের পরিবর্ত্তে শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন, আর চারি দিকে শ্বেত পাথরের জালি-কাটা বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন। যাঁর প্রতাপে একদিন ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তি কম্পমান হ'ত, যিনি ঐশ্বর্য্যের জন্য, রাজত্বের জন্য ভ্রাতৃরক্তে হস্ত রঞ্জিত ক'রেছেন, নিজ পিতাকে পর্য্যন্ত বন্দী ক'রতে দ্বিধা করেন নি, মৃত্যুর পর তাঁর কি পরিণাম! তিনি কি সে সময় একবারও ভাবতে পেরেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হবে?

এখানে চারি দিকে অসংখ্য কবর। আমরা আর অপেক্ষা না ক'রে ফিরে চ'ললাম।

বেলা প্রায় দুইটার সময় দৌলতাবাদ আসা গেল।

রাস্তার ধারে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আমরা ফোর্ট দেখতে গেলাম। এই দুর্গ অতি প্রাচীন। হিন্দু রাজত্বের সময় ইহার নাম ছিল দেবগড়। ইহা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস-বিখ্যাত যাদব-বংশের রাজগণের রাজধানী ছিল। অবশেষে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা মুসলমান-হস্তগত হয়। এই দুর্গ এত সুরক্ষিত ও দুর্গম ছিল যে, তখনকার দিনে ইহা অধিকার করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। ইতিহাসে মুসলমান কর্ত্তৃক এই দুর্গ-বিজয়ের এক মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়।

দুর্গাধিপতি রাজা রামদেব শিকারে গিয়ে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে খবর পান যে মুসলমানরা দুর্গ আক্রমণ ক'রতে আসছে। তাড়াতাড়ি তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে দুর্গে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য্যের সংস্থান নাই। এদিকে আক্রমণকারীরা প্রায় নিকটে এসে প'ড়েছে। তিনি তখন যত শীঘ্র সম্ভব আহার্য্য সংগ্রহের আদেশ দিলেন। তাঁর সৈন্য সামন্ত দুর্গের বাহিরে এসে দেখল এক দল বণিক অনেক বড় বড় বস্তা রপ্তানীর জন্য নিয়ে যাচ্ছে। তারা সেগুলিতে চাল গম আছে ভেবে কাল বিলম্ব না ক'রে সে সব দুর্গের ভিতরে এনে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। এদিকে যথাসময়ে আহার্য্যের অভাব হ'লে সেই সব বস্তা খুলে দেখা গেল সবগুলিই লবণ-পূর্ণ। তখন অনাহারে মৃত্যু অপেক্ষা মুসলমান-হস্তে আত্ম-সমর্পণ করাই রাজা রামদেবের অধিক বাঞ্ছনীয় মনে হ'ল।

জনরব এই যে, রাজবাড়ীর পুর-মহিলাদের পূজা-অর্চ্চনার সুবিধার জন্য এখান থেকে এলোরা পর্য্যন্ত মাটীর নীচে দিয়ে এক সুড়ঙ্গ-পথ আছে। মুসলমানদের দুর্গ অধিকারের পর দুর্গাধিপতির সুন্দরী কন্যা আত্ম-রক্ষার্থ অনন্যোপায় হ'য়ে এই রাস্তায় এলোরা গিয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত লুকিয়ে থাকে। অবশেষে দুর্ভাগ্যক্রমে সেও মুসলমান-কবলে পতিত হয়।

আমরা পর পর চা'র পাঁচটা ফটক পার হ'য়ে ভিতরে একটা গগন-স্পর্শী মিনার দেখতে পেলাম। এই মিনার অনেক দূর থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। ইহার নাম চাঁদ মিনার; দেখিতে প্রায় দিল্লীর কুতব-মিনারের মত। ইহাই এখানকার মুসলমান বিজয়ের জয়-স্তম্ভ।

এইবার ক্রমাগত সিঁড়ি, সোজা উপরে উঠেছে। মাঝে একটা প্রকাণ্ড খাল; খালের পরেই পাহাড় একেবারে খাড়া। আমরা কত সিঁড়ি, কত দরজা, কত অন্ধকার রাস্তা যে পার হয়ে এলাম তা বলা যায় না। এ যেন এক বিরাট গোলকধাঁধা। সঙ্গে পথ-প্রদর্শক না থাকলে এ পথ-সমুদ্র পার হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত; এখানে কাহাকেও ফেলে দিলে একেবারে খালের জলে প'ড়ে পঞ্চত্ব লাভ। কোথাও উপরের দিকে দরজা, দরজার উপরে মোটা লোহার পাত দিয়ে ঢাকা। শত্রু-সৈন্য প্রবেশের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনায় এই পাতগুলি আগুনে লাল ক'রে রাখা হ'ত।

শত্রু যাহাতে ভিতরে প্রবেশ ক'রতে না পারে, তার জন্য যে কতই মাথা খাটান হ'য়েছে, তা বলা যায় না। যে দুর্গ এত কৌশলে, এত যত্নে, এত পরিশ্রমে তৈরী, তা কি না একেবারে বিনা যুদ্ধে, বিনা কষ্টে মুসলমান-হস্তগত হ'য়ে গেল! একেই বলে বিধি লিপি!

আমরা অনেক কষ্টে অনেক সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে একেবারে উপরে উঠলাম। এখান থেকে চতুর্দ্দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। চারিদিকে সমতল শস্য-ক্ষেত্র, দূরে দূরে পাহাড়। বড়ই মনোরম দৃশ্য!

এই পাহাড়ের চূড়ায় একটী মাঝারি রকমের মুসলমান ধরণের চক-মিলান বাড়ী; বোধ হয় রাজ পরিবারের বাস-স্থান। সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটা বড় কামান। সবই সেই আগেকার দিনের মতই সাজান আছে।

এইবার আমরা দুর্গ দেখা শেষ ক'রে বাড়ীর দিকে ফিরে চ'ললাম। আওরঙ্গাবাদে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এল।

ঘোরাফিরা আর ভাল লাগছিল না,—কাল সোজা বম্বের দিকে রওয়ানা হব স্থির হ'ল। রাত্রের আহারাদির পর আমরা আমাদের শ্রান্ত দেহগুলি সুপ্তির কোলে এলিয়ে দিলাম

১১ই নভেম্বর। আজ খুব ভোরে উঠে বাঁধাছাঁদা শেষ ক'রে বম্বের দিকে ফিরে চ'ললাম। আসবার সময় যে রাস্তায় আসা হয়েছিল, সে রাস্তায় না গিয়ে আমরা সহজ হবে ব'লে অন্য এক নূতন রাস্তা ধ'রলাম।

অনেক দূর এসে একটু মুস্কিলে প'ড়তে হ'ল; রাস্তা যেখানে দুভাগ তিন ভাগ হ'য়ে গেছে, সেখানে কোন 'সাইনবোর্ড' নেই। দুধারে মাইল-পোষ্টগুলি সব চুণ দিয়ে সাদা ক'রে রাখা হ'য়েছে; বোধ হয় কিছু লিখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাজে আর তা' হ'য়ে ওঠে নাই। আমাদের সঙ্গে যে ম্যাপের বই ছিল তাতেও, নিজাম রাজত্বে ব'লেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, এ রাস্তার কোন বিশেষ বিবরণ ছিল না। এখান থেকে ফিরে গেলেও আবার সেই অজন্তা হ'য়ে অনেক দূর ঘুরে যেতে হ'বে। সেই জন্য আমরা লোকজনকে জিজ্ঞাসা ক'রতে ক'রতে আর নিজাম রাজত্বের সুশৃঙ্খলার প্রশংসা ক'রতে ক'রতে এই রাস্তায়ই অগ্রসর হ'তে লাগলাম।

রাস্তা ভয়ানক খাবাপ; উঁচুনীচু, ঘুরান ফিরান। ২।৪টা পুল-বিহিন নদীও পার হ'তে হ'ল, কিন্তু কোথাও সাবধান-চিহ্ন নাই। আগ্রা রোডে পুলের উপর দিয়ে নদী পার হ'তে হ'লেও অনেক দূর আগে থাকতে সাবধান লেখা দেখা গিয়াছে।

যাহোক, অনেক সাবধানে গাড়ী চালাতে হ'ল। খানিক দূর এসে আবার সামনে এক নদী; এবার যা বিপদে পড়তে হ'য়েছিল, এতখানি রাস্তায় আর কখনও তা' হয়নি।

নদীর তীরে অনেক লোক ছিল; আমরা তাদের জিজ্ঞাসা ক'রলাম মোটরে এ নদী পার হওয়া যায় কি না। জবাব পাওয়া গেল, 'হরদমই ত এখান দিয়ে মোটর যাচ্ছে, এই একটু আগেও দুখানা গাড়ী পার হয়ে গেল। কোন ভয় নেই।' আমরাও গাড়ী থেকেই দেখতে পেলাম নদীতে জল খুব কম। নদীটা বেশ বড় আর পাড় ভয়ানক উঁচু, একেবারে খাড়া হয়ে উঠেছে। লোকের কথায় সাহস পেয়ে আর এতটা রাস্তা এসে সামনে যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় না থাকায় আমরা নদীতে নেমে পড়লাম। খানিকটা শুধু বালি; এখানে নেমেই মোটরের এঞ্জিন মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। তার পর জলের উপরে এসে গাড়ী আর একেবারেই চলে না। আমরা পিছনে তাকিয়ে দেখি, পিছনের চাকা ক্রমাগত নীচের দিকে ঢুকে যাচ্ছে। সকলে জলের মধ্যেই নেমে প'ড়লাম। এখানকার বালি এত নরম যে আমাদের পাগুলি পর্য্যন্ত বালির নীচে ঢুকে যেতে লাগল, আর অত বড় ভারী গাড়ীখানার ত কথাই নেই। এখন দেখা গেল, গাড়ীর চাকা অর্দ্ধেকেরও বেশী মাটীর নীচে ব'সে গেছে; এঞ্জিনেও অল্পসল্প জল ঢুকেছে। চালাবার চেষ্টা ক'রে দেখা গেল চাকাগুলি ঘুরতে ঘুরতে আরও বালির নীচে ঢুকে যায়। উপায়ান্তর না দেখে ধাক্কা দিয়ে উঠাবার জন্য তীরের লোকজনদের ডাকা হ'ল। প্রথমে শুধু ডাকতে কেহই নড়ে না, তার পর যেই বকশীস দেব বলা হ'ল, তৎক্ষণাৎ সকলে ছুটে এসে ধাক্কা দিতে দিতে নদী পার ক'রে গাড়ী উপরে উঠিয়ে দিল।

আমরা খুসী হ'য়ে তাদের পাচ টাকা বকশীস দিলাম। তার পর আরও অনেক নদী গ্রাম সহর ছাড়িয়ে, কাষ্ঠ-ফলকে নিজাম রাজত্ব শেষ হ'য়েছে, দেখতে পাওয়া গেল; আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

কি আশ্চর্য্য! ঠিক পর মুহূর্ত্তেই রাস্তার ধারের 'গাইড-পোষ্টে' পরিষ্কারভাবে নিকটবর্ত্তী সহর ইয়োলার নাম ও দূরত্বের পরিমাণ লেখা; প্রতি মাইল অন্তর মাইল-ষ্টোন-গুলিতে সাদা চূণের উপর কাল রঙ্গের মাইলের হিসাব জ্বল জ্বল ক'রে বৃটিশ রাজত্বের সুশৃঙ্খলা জ্ঞাপন ক'রছে। এই গুণেই আজ এরা পৃথিবীর অধীশ্বর!

এখান থেকে রাস্তাও বেশ ভাল। আমরা প্রায় দুইটার সময় মানমাদ হ'য়ে চান্দোরে এসে আবার পরিচিত আগ্রা-রোডে উঠলাম।

বেলা ক্রমশঃই বাড়তে লাগল; বম্বে এখনও বহু দূর। কাজেই আমরা নাসিকের কুড়ি মাইল আগে পিম্পল-গাঁও ডাক-বাংলোয় আজকের মত বিশ্রামলাভ ক'রলাম।

১২ই নভেম্বর। আজ আমাদের ভ্রমণের শেষ দিন। রাস্তায় আর না থেমে একেবারে বম্বে যাব ব'লে একটু রাত্রি থাকতেই যাত্রা করা গেল। রাস্তায় ভয়ানক শীত। নাসিকে যখন পৌছিলাম তখন ৬টা।

সবে মাত্র ভোর হ'য়েছে ; এত শীতে এই ভোরেই বহু পুণ্যার্থীকে কাঁপতে কাঁপতে গোদাবরীতে স্নান ক'রতে দেখা গেল ; কারণ আজ সূর্য্য-গ্রহণ। এখানে পেট্রল নিয়ে আবার আমরা সেই পুরানো রাস্তায় ছুটে চ'ললাম।

একেবারে বম্বে এসে যখন বাড়ীতে নামলাম, তখন তিনটা বেজে গিয়েছে। এবারকার ভ্রমণ এইখানেই শেষ। মোটরের যন্ত্রে দেখা গেল আমরা এই আট দিনে সবশুদ্ধ ৮০০ মাইল বেড়িয়েছি। বাড়ীতে ফিরে কৃতজ্ঞচিত্তে আবার শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রণাম ক'রলাম।

অচিন্ প্রিয়ার চিঠি

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ

অচিন্ প্রিয়ার গোপন্ চিঠি,—সে
মুগ্ধ করে এ মন,
প্রাণের পুলক-পদ্ম সে মোর—
নিভৃত ধ্যানের ধন !
তা'র—স্বপন হাতের সোনালী আঁখর
সোনা করে মোর বুকের কাঁকর,
মন-মহলের কল্পলোকে সে—
পেতেছে সিংহাসন।

চোখের দেখা সে দেয় না ত কভু
তবু তারে চিনি না কি ?
তা'রি মিঠা সুরে গায় ফাগুনের
উদাসী উতলা পাখী।
নিশীথ্-হিমের—ফোঁটার টুপুর
বাজায় তাহার পায়ের নূপুর,
তমালের বনে জাগে তা'র মৃদু
নিশাসের শিহরণ।

ফাগুনে ফাগুনে দখিণের হাওয়া—
বাণী তা'র ব'য়ে আনে,
সে গোপন কথা আমি জানি আর
ফুলেরা পাখীরা জানে।
কচি-পল্লবে, নতুন পাতায়,—
প্রেম-লিপি তা'র লেখা থাকে হায়,
তা'রি কথাগুলি বন-বুল্বুলী
গে'য়ে যায় অনুপম !

শ্রাবণ ধারায় কেঁদে কহে যায়,—
"বৃথা কাটে দিন মম"
ফুলের পাখায় লেখা থাকে হায়
"এস এস প্রিয়তম !"
ঝরাফুল কয়—"নিঠুর তুমি"
পাপ্ড়িতে লেখা "বুক মরুভূমি",—
বন-করবীর সুরভি-হাওয়ায়
পাঠায় সে চুম্বন।

চিঠি পাই তা'র—দিঠি মিলে না কো—
জানি না সে কোন্ পরী !
বুকের রক্তে প্রতি চিঠি তা'র—
রেখেছি নকল করি'।
দেখা সে দেয় না—আসে না সে পাশে,
তবু জানি মোরে বড় ভালবাসে,
চিঠিতে চিঠিতে পেয়েছি তাহার—
হৃদয়ের বিবরণ।

দুর্ভেদ্য ব্যূহ

শ্রীভূপতি চৌধুরী

অনাগত ভবিষ্যতের কালো পর্দ্দার আড়ালে যে বিচিত্র রহস্য অপেক্ষা করে, তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে পুণ্ডরীকের একটা অদম্য অভিলাষ ছিল। রাস্তার গণক ঠাকুর থেকে বড় সাইনবোর্ডওয়ালা জ্যোতিষীদের দরজায় ঢুঁ মারতে সে ইতস্ততঃ করত না। ফলে একদিন তার ইচ্ছা পূর্ণও হয়েছিল; কিন্তু সে এমন ভাবে যে, বোধ হয় পূর্ণ না হলেই সে খুসী হত।

বয়স তখন তার বছর বাইশ-তেইশ—কলেজের ক্লাসের চেয়ে খেলার মাঠে আর বায়স্কোপেই তাকে দেখা যেত বেশী। দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল। কোনও চিন্তা ছিল না। দিনের সাদা আলো রঙিন মনে করতে কোনও রকমের ভ্রম হচ্ছে বলে মনে করত না। কবিতা পড়তে ভাল লাগত; এমন কি খালি আকাশের দিকে চেয়ে হাওয়ায় ভেসে যাওয়া সাদা মেঘের সঙ্গে নিজেকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে একটুও দ্বিধা বোধ করত না। অবসর সময়ে আকাশের অন্ধকারে সন্ধ্যাতারার দ্যুতির সঙ্গে আভা মেয়েটার কালো চোখের তারার দৃষ্টির সে মিল খুঁজে ফিরত।

বন্ধুরা বলাবলি করতে সুরু করেছিল—পুণ্ডরীকের হল কি? অমন দুঁদে ছেলে!

কিন্তু তার যে কী হয়েছিল তা সেই জানত না। একটী নিবিড় সুখ-স্বপ্নের জাল দিয়ে সে তার দিনগুলিকে ঘিরে রাখতে চেয়েছিল। প্রতীক্ষা করত সেই লগ্নের, যে শুভক্ষণে সাহানার সুরে ধূপ দীপ গন্ধমাল্যে সমবেত উৎসব কোলাহলে দুটী লাজকম্পিত করকমলের অর্ঘ্য সে শ্রদ্ধায় ও প্রেমে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারবে।

কিন্তু এ হল তার নিতান্ত কল্পনার কামনা—কল্পলোকের কথা। ভূলোকের কথা হল বিভিন্ন। সেখানে তার ভাগ্যাকাশে উদয় হলেন স্বামী নিগমানন্দ—তার পিতার নব-লব্ধ গুরু; মহাযোগী ত্রিযুগী সিদ্ধপুরুষ। শুধু ভক্তদের কৃতার্থ করতে সংসারে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। শীঘ্রই হিমালয়ে প্রস্থান করবেন। আর ফেরবার সম্ভাবনা শুধু কম নয়, নেই বল্লেই হয়।

পুণ্ডরীকের পিতার অর্থ যত না ছিল, ভক্তি ছিল তার চেয়ে বেশী; এবং তার চেয়েও বেশী ছিল ভক্তির বহিঃপ্রকাশ। ফলে গুরুর আগমনে উৎসবের আর অন্ত ছিল না। কীর্ত্তনে ও নামগানে ভক্তেরা যত না ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, অভক্তেরা হয়েছিল তার চেয়েও বেশী। ফলে অভক্তের মধ্যে সকলের চেয়ে অসহিষ্ণু পুণ্ডরীক একদিন বোমার মতো ছিটকে গিয়ে একেবারে ভক্তদলের মধ্যে উপস্থিত। তার মুখ থেকে তীব্রস্বরে কথা বার হল—আপনাদের জ্বালায় যে নিজেদের বাড়ীতেই তিষ্ঠান দায় হল।

তখন উৎসব একেবারে সপ্তমে চড়েছিল। পুণ্ডরীকের চীৎকারে হঠাৎ সব চুপ হয়ে গেল। পুণ্ডরীকের পিতা গুরুদেবের সামনে হাত যোড় করে বললেন—বাবা, এটী আমার অবোধ পুত্র পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীক, শীগ্গির বাবার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে জীবন সার্থক কর।

পুণ্ডরীক একবার তীব্র দৃষ্টিতে স্বামী নিগমানন্দকে লক্ষ্য করে একটা শুষ্ক প্রণামে তার পিতার আদেশ পালন করবার চেষ্টা করলে। এই তাচ্ছিল্য ও অশ্রদ্ধা আর যার চক্ষু এড়াক না কেন, স্বামী নিগমানন্দের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। মানুষের দুর্ব্বল অংশটার সাহায্য নিয়ে যাদের দিন যাপন করতে হয়, এটুকু ক্ষমতা তাদের না থাকলে চলবে কেন?

স্বামীজি কোন কথা না বলে স্তিমিতনেত্রে ধ্যানাসন গ্রহণ করলেন। পুণ্ডরীককে আশীর্ব্বাদ করার জন্য তাঁর মঙ্গল-হস্ত উত্তোলিত হল না।

সকলে সাশ্চর্য্যে স্বামীজির দিকে তাকিয়ে রইল।

মুদিত-নেত্রে ধ্যান-স্থিরতার ছলনায় স্বামীজি একবার চিন্তা করে নিলেন—এই অশ্রদ্ধা ও অবমাননার কী শাস্তি তিনি ব্যবস্থা করতে পারেন?

গুরুদেবের ভাবান্তর দেখে পুণ্ডরীকের পিতা নানা আশঙ্কা-উদ্বেল কণ্ঠে বলে উঠল—গুরুদেব!

স্বামীজি তাঁর চক্ষু উন্মীলন করে, তাঁর স্থির দৃষ্টি পুণ্ডরীকের পিতার মুখের ওপর সংবদ্ধ করে বললেন—নলিনাক্ষ, এ তোমার পুত্র?

নলিনাক্ষ পুণ্ডরীকের পিতার নাম। গুরুদেবের এ প্রশ্নের উত্তরে নলিনাক্ষের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হল না। খুব পাকা অভিনেতা, তার দর্শকদের অভিভূত করার জন্যে গলার স্বরে উত্থান-পতনের যে কৌশল গ্রহণ করে, নিগমানন্দ প্রায় সেই সুযোগ গ্রহণ করে বললেন—এ তোমার পুত্র হলেও, আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এ তোমার কুলনাশন পুত্র। পুত্র, যে নিজ কর্ম্মের দ্বারা পিতার ও বংশের অবমাননার কারণ হয়, সে পুত্র, পুত্র নামের অযোগ্য, ত্যাজ্য।

সমবেত সকলেই গুরুদেবের এ অভাবনীয় ভবিষ্যৎ-বাণীতে স্তব্ধ। নলিনাক্ষ হতবাক্।

গুরুদেব বোধ হয় নলিনাক্ষের মুখ থেকে কোন রকমের কাকুতি-মিনতি শোনবার প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলেন। কিন্তু নলিনাক্ষের দিক থেকে কোন রকমের উত্তর না পেয়ে তিনি গুরুসুলভ হস্তভঙ্গী দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন—এ অপ্রিয় বাণী তাঁর মুখ থেকে নির্গত হত না, যদি না এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে তাঁর শিষ্যের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করত।

পুণ্ডরীক এতক্ষণ বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে স্বামীজির চমৎকার অভিনয় দেখছিল। তাঁর কথাগুলো শেষ হলে সে একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে তার পিতার দিকে তাকালে।

স্বামীজি, ওস্তাদ যেমন করে তার শিকারকে সম্মোহন করার জন্য তাকায়, সেই দৃষ্টিতে নলিনাক্ষের দিকে চেয়ে রইল।

নিতান্ত বিরক্ত ভাবে পুণ্ডরীক সে ঘর ত্যাগ করার জন্যে ফিরে দাঁড়াতেই নলিনাক্ষ বলে উঠল—পুণ্ডরীক, শুনে যাও—আজ থেকে তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র।

পুণ্ডরীক তাঁর কথাটা শুনে একবার ফিরে দাঁড়াল। তার পর তার পিতা ও স্বামীজির মুখের দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে অত্যন্ত হেলাভরে সে ঘর হতে বার হয়ে এল।

নলিনাক্ষের আজ্ঞাকে ধর্ম্মমত্ততার প্রলাপ মনে করে সে বেড়াতে বার হল। কিন্তু ব্যাপারটাকে সে যতটা লঘু ব'লে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কার্য্যক্ষেত্রে তারই ভার অত্যন্ত গুরু বলে মনে হল। বেড়াতে গিয়েও ঐ কথাটা তার মনের মধ্যে নিতান্ত খচ্‌খচ্ করতে লাগল। কিছুতেই আর নিজেকে সে সুস্থ বোধ করতে পারলে না।

পথ দিয়ে অসংখ্য লোক চলেছে, সাগরের উর্ম্মিমালার মতো। কারো দিকে চেয়ে দেখবার সময় যেন নেই। অতি সুদূরে পথ যেন মিলিয়ে গিয়েছে। লোক শুধু অগ্রসরই হচ্ছে, কিন্তু সীমান্ত-রেখা, যেমন নীল তেমনই অস্পষ্ট। ও শুধু হাতছানিই দেয়, কাছে টেনে আনে না।

পুণ্ডরীকের মনে হল সে যেন নিতান্ত শক্তিহীন। এ সময়ে শক্তি যোগাতে পারে শুধু একজন। আশা দিতে পারে শুধু একজনের কথা, সাহস ও সান্ত্বনা দিতে পারে শুধু একজনের সান্নিধ্য। অনর্থক ঘুরে ঘুরে সে ক্লান্ত হ'য়ে ফিরল।

আভার সঙ্গে কিছু দিন থেকে তার বিবাহের কথা হয়েছে। মেয়েটীকে বহুবার সে দেখেছে। কিন্তু কখনও কোন কথা বলবার সুযোগ তার হয় নি, এবং সুযোগ পেয়েও কথা বলবার সাহস সে সংগ্রহ করে উঠতে পারে নি। অথচ তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত ভাবে বহু সন্ধ্যাই সে কাটিয়ে এসেছে। চোখে চোখে দৃষ্টির বিনিময় যে না হয়েছে এমন নয়; কিন্তু নীরবতার স্বচ্ছ আবরণটুকু তাদের মাঝখানে একটা সীমারেখার মতো অবস্থিতি করত। হয় ত এই কারণেই, এই জানা-অজানার ছন্দেই তার মনের দোলা ক্রমাগত সামনে এগিয়ে পরমুহূর্ত্তেই পিছনের টানে ফিরত।

আজ সন্ধ্যার এই আবছা-কালো অন্ধকারেই আবার আভার কথা তার মনে পড়ল। মনে হল হয় ত আভার সঙ্গে দেখা ক'রে তাদের বাড়ীতে সময় কাটিয়ে গেলে তার মনের চঞ্চলতা দূর হবে। তার পিতার উকীল, আভার বাবার কাছ থেকে সে পরামর্শও গ্রহণ করতে পারে।

ধীরে ধীরে পথ বেয়ে আভাদের বাড়ীর সামনে এসে তার পায়ের গতি যেন রুদ্ধ হ'য়ে গেল। একটা অহেতুক দ্বিধায় গেট পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'য়েও সে থমকিয়ে দাঁড়াল। ফিরে যাবে কি ভিতরে প্রবেশ করবে ভাবছে, এমন সময় কাণের কাছে প্রশ্ন এল—কেও?

পুণ্ডরীক অত্যন্ত অস্পষ্ট স্বরে একটী জবাব দেবার চেষ্টা করলে; কিন্তু তার পূর্ব্বেই অত্যন্ত পরুষকণ্ঠে আবার প্রশ্ন হল—আরে কোন হ্যায়, ইধার আ'ও।

গলার আওয়াজে পুণ্ডরীক বুঝতে পারলে—এ আভার পিতারই গলা।

আর মুহূর্ত্তও চিন্তা না করে সে সটান প্রবেশ করলে।

আভার পিতা পুণ্ডরীককে দেখে বললে—কে, পুণ্ডরীক ? গলার স্বর বিশেষ অভ্যর্থনাসূচক বলে মনে হল না।

অত্যন্ত শুষ্কস্বরে তিনি বললেন—কী খবর ? তোমার বাবার উইলের খবর জানতে এলে ?

উইল ? পুণ্ডরীক এ কথা জানত না ; তাই অস্ফুট কণ্ঠে বললে—উইল ?

—হ্যাঁ, তোমার বাবার কাছ থেকে এই আসছি। তিনি উইলে তোমায় ত্যাজ্য পুত্র করে সমস্ত সম্পত্তি তাঁর গুরু নিগমানন্দের আশ্রমে দান করেছেন।

একটু দূরে একটা মোটরের টায়ার ফেটে ভীষণ শব্দ হয়ে গাড়ীটা থেমে গেল। পুণ্ডরীকের মনে হল—হঠাৎ যেন তার হৃৎপিণ্ডটা সজোরে তার বুকের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ফেটে বার হয়ে আসতে চায়। ব্যাপারটা যে এতটা অগ্রসর হবে এ কথা সে যে স্বপ্নেও ভাবেনি।

পুণ্ডরীক একবার চোখ টিপে সে স্থান ত্যাগ করবার উদ্যোগ করতেই, আভার পিতা আরও শুষ্কভাবে বললেন—দেখ, দরকার যদি কখনও হয়, তা'হলে গেট পার হয়ে একটা ডাক দিও। ও রকম করে ভদ্রলোকের গেটের সামনে ঘোরাঘুরি করলে, পাঁচজনে নানা কথা ভাবতে পারে। বুঝলে !

পুণ্ডরীক কথাটা বুঝলে কি না সেই জানে। সে একবার ঘুরে আভার পিতার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবার চেষ্টা করলে ; কিন্তু সে অন্ধকারে কিছু বোঝা গেল না। নিজেকে সংযত করে সে দ্রুতপদে গেটের বার হয়ে আসতেই মনে হল—সে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে স্থির করবার চেষ্টা করলে। নিজেকে ক্লিষ্ট করার উদ্দেশ্যে সে নিতান্ত অনাবশ্যক ভাবে ছুটতে আরম্ভ করলে। কিন্তু অল্প দূর গিয়েই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে যে কী করবে কিছুই স্থির করতে পারলে না। তার পায়ের কাছে একটা মাটীর ভাঁড় পড়ে ছিল, সেটাকে সে পা দিয়ে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিল—তার আর চিহ্নও রইল না। তার সমস্ত আক্রোশ একটা বিরাট রূপ ধারণ করে কোন একটা প্রলয় কাণ্ড বাধাতে চায়। আর একটা কিছু সাংঘাতিক করার জন্যে সে একবার মুখ তুলে চার পাশে ফিরে তাকাল।

অদূরেই এক সজ্জিত বিপণি তার দৃষ্টিপথে পড়ল। রূপজীবিনীর মতো কুৎসিত উন্মুখ আকর্ষণী ভঙ্গীতে যেন কে তাকে ইসারা করলে। তার রক্তে যেন মদিরার গান বেজে উঠল।

কিছুমাত্র চিন্তার অবকাশ গ্রহণ না করে সুদৃঢ় পদক্ষেপে সে দোকানের অর্দ্ধ-উন্মুক্ত দ্বারদেশ অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করলে।

যে ভবিষ্যৎকে জানবার আগ্রহের আর অন্ত ছিল না, সেই অনাগত ভবিষ্যতের বাণী তাকে শুধু ধ্বংস পথে ঠেলে দিলে।

তার পর ? সুরা ও নারী।

নারী,—হয় ত সুন্দরীর রমণীয় ও কমনীয় কান্তির ঐশ্বর্য্য তার না থাকতে পারে,—কিন্তু রমণী ত,—পুরুষকে লালসা-লুব্ধ করার ক্ষমতাও তাতে বর্ত্তমান। মদিরা-বিভোল চক্ষে এইটুকুই ত যথেষ্ট। তার বেশী চিন্তা করার ক্ষমতা ত অনেকেরই থাকে না। পুণ্ডরীকেরও ছিল না হয় ত। একের পরে দুই পাত্র গ্রহণ করে স্থির থাকার মতো ক্ষমতা অন্ততঃ আর যারই থাক পুণ্ডরীকের ছিল না। তাই সে দুইয়ের পরে তিনের স্বাদ গ্রহণে উন্মুখ হয়ে উঠল।

যার ঘরে পুণ্ডরীক অতিথি হয়েছিল, সেই মেয়েটীর চোখে তার এই অস্বাচ্ছন্দ্য ধরা পড়ে গিয়েছিল। তার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় সে এইটুকু বুঝতে শিখেছিল—যারা তাদের সান্নিধ্য কামনা করে, তারা সকলেই কিছু কামের তাড়নায় আসে না ; তারা আসে সুস্থ মনে নয়—বিকৃত মনের তাড়নায়। সান্ত্বনা ও শান্তি তাদের লক্ষ্য নয়—তারা চায় বিস্মৃতির অন্ধকারে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে। তাদের জ্বালা নারীর পাপের পঙ্কের শীতলতায় অসাড় করে ফেলার আশায়।

পুণ্ডরীকের চোখ দুটী তখন লাল হ'য়ে উঠেছে। সারা মুখে রক্তের চাপ এত বেশী, যে টস্‌টসে পাকা আঙুরের মতো তা এখুনি ফেটে যাবে।

পুণ্ডরীকের জন্যে তার মনে একটু করুণা, না করুণা ঠিক নয়—যেন সমবেদনা বোধ করলে। মনে মনে ভাবলে—বেচারী ! পুণ্ডরীকের হাতের কাছ থেকে মদের বোতলটা সে সরিয়ে রেখে দিলে। পুণ্ডরীক শুধু তার জড়িত চোখ দুটীকে বিস্ফারিত করে তার দিকে তাকাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু

সে দৃষ্টিতে কোন অর্থ ছিল না,—যেন ভাববিহ্বল নিতান্ত অনর্থক সে দৃষ্টি। সে যেন নিতান্ত অসহায়!

মেয়েটী তার দৃষ্টির উত্তরে বললে—আপনি আর ও জিনিষ খাবেন না, এ আপনার আর সইবে না। মেয়েটার কণ্ঠে যেন সমবেদনার সুধা। পুণ্ডরীক চোখ বুজে হেলান দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার যেন কিছুতেই স্বস্তি হচ্ছিল না। একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে নিজেকে সচেতন করার চেষ্টায় সে বললে—তোমার নামটা কী যেন?

মলিনা। ছোট্ট একটী কথার উত্তর।

পুণ্ডরীক আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে না। তার মনে মনে ওই নামটী বার দুই উচ্চারণ করবার চেষ্টা করলে।

মলিনা পুণ্ডরীকের দিকে ভাল করে আর একবার চেয়ে দেখলে—তার বয়স মলিনার চেয়েও কম বলে মনে হল। সে স্নেহ-মধুর স্বরে বললে—আপনি শুয়ে পড়ুন। বসে থাকবার মতো ক্ষমতা আপনার নেই। আসুন—আমার হাত ধরে বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা নয়; পুণ্ডরীক যেন অভিভূতের মতো তার আদেশ পালন করলে। তার মনে হল, কেউ যদি এমনই করে তাকে হাত ধরে নিয়ে যায়। নিতান্ত অচেতন অবস্থাতেও তার এই স্পর্শটা ভাল লেগেছিল। সে চোখ বুজে এইটাই অনুভব করার চেষ্টা করলে।

ঘরে একটা ছোট টেবিল-ফ্যান ছিল, মলিনা সেটাকে তার শিয়রের কাছে একটী ছোট তেপায়ার ওপর স্থাপন করলে। অডিকলোঁর জলে রুমাল ভিজিয়ে, সেটাকে পুণ্ডরীকের কপালে বসিয়ে, মলিনা তার মাথার চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালনা করতে লাগল।

আদরের দোলায় শিশু যেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে, পুণ্ডরীকও ঠিক তেমনই ভাবে নিদ্রিত হয়ে পড়ল।

পরদিন প্রভাতের আলোর সঙ্গে যখন তার পরিচয়, তখন কোথায় তার সেই উদ্দাম চাঞ্চল্য। বরং মনে মনে একটা গ্লানি ও লজ্জাই সে অনুভব করলে। তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করে যখন সে রাস্তায় এসে পড়েছে, তখন তার মনে হল গতরাত্রির শুশ্রূষার জন্যে মলিনাকে তার ধন্যবাদ দিয়ে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

নগরীর বিস্তৃত রাজপথে তখন জাগরণের স্রোত বয়ে চলেছে। এ স্রোতধারা যে কখনও রুদ্ধ হয়েছিল তার কোন চিহ্নই নেই। এ যেমন অনাদি, তেমনই জীবন্ত। পুণ্ডরীক তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দাঁড়াল। সে যেন নিজেকে এ থেকে বিচ্যুত রাখতে চায়।

একটা অবসাদ ও পিপাসায় তার শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করছিল। পথের ধারে একটা কল থেকে অবিরত জল ঝরে পড়ছে দেখে সে সেই শীতল জলধারার তলায় নিজের মাথাটাকে পেতে দিলে। ভারী স্নিগ্ধ বোধ হল এই শীতলতা। যেন এইটুকুই সে চেয়েছিল।

খানিকটা সুস্থ বোধ করে পুণ্ডরীক তার চলা সুরু করলে। তার মনের মধ্যে একশো রকমের চিন্তা একসঙ্গে কোলাহল সুরু করে দিয়েছিল। ভাবতে ভাবতে কখন যে সে থেমে পড়েছিল তা তার জ্ঞানই ছিল না। হঠাৎ একটা কথায় তার চমক ভেঙে গেল, কে যেন তার ললাট-লিপি সম্বন্ধে কী বলছে। চেয়ে দেখলে—তার সামনে একটা লোক বসে আছে—পাঁজীর গ্রহাচার্য্যের মতো চেহারা। রোগা শীর্ণ চেহারা, রৌদ্র-মলিন বর্ণ। মাথায় চুলের চেয়ে টাক বেশী; কিন্তু শিখাটী একটা ফুল আশ্রয় করে নিতান্ত আশ্চর্য্য ভাবে সেই মরুভূমিতে দণ্ডায়মান। অবিরত বসে থাকার ফলে পিঠের শিরদাঁড়াটা বক্র ভাব ধারণ করেছে। তার কাঁধে ভর করে একটী শতজীর্ণ ছাতা রৌদ্রকে আড়াল করার ছলে খোলা। সামনে একটী পিচ্‌বোর্ডে আঁটা কাগজের ওপর, রেখা-সমন্বিত একখানি হাত আঁকা। একপাশে একটী শ্লেট; একটা রাশিচক্র অঙ্কিত, ও কয়েকখানি অত্যন্ত জীর্ণ পুঁথির মতো পুস্তক। তার ওপরের খানিতে সাদা কাগজের ওপর কালো কালীতে মোটা মোটা অক্ষরে দেবনাগরীতে লেখা ভৃগুসংহিতা। বহুদূর থেকেও বইয়ের নামটী চোখে পড়ে।

কোন কিছু না ভেবেই, যেন অভ্যাসের বশে পুণ্ডরীক গণকের সামনে বসে তার হাতখানি বাড়িয়ে দিলে।

এক ভবিষ্যৎ-বাণীর বজ্রাঘাতে ত সে তার বর্ত্তমান আশ্রয় থেকে চ্যুত হয়ে পড়েছে,—আর একটী আঘাতে যদি এর শেষ হয়ে যায় তবে মন্দ কি? কিন্তু মনের একটী অতি গোপন কক্ষে তার একটা আশা ছিল—যদি, যদি কোন একটা আশার বাণী সে জানতে পায়। এই পথের গণক তার অক্ষম শক্তিতেও যদি তাকে এ সাহায্যটুকু করে

তা হলেও সে শক্তি পায়! সে প্রায় চোখ বুজেই তার গণনার ফল প্রত্যাশা করছিল।

জ্যোতিষী কিছুক্ষণ ধরে তার হাতখানি ধরে রইল। কিন্তু দৃষ্টি তার ঘুরতে লাগল পুণ্ডরীকের মুখের ওপর। কিন্তু সেখানে যে কী ছিল তা ধরার সাধ্য গণকঠাকুরের ছিল না। সে শুধু বাহ্য রেখা দেখেই স্থির করলে—এ লোকটা চাকুরীর প্রত্যাশী নয়; কারণ, তার বেশভূষা ঠিক ওই জাতের লোকের মতো নয়। কাজেই হাত নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করে সে বললে—বর্তমানে আপনার মন্দ সময় যাচ্ছে, কিন্তু এ বেশী দিন নয়। বৃহস্পতির দশায় আপনার জন্ম। ভাগ্যবান পুরুষ আপনি। লোকহিতেই আপনার জন্ম।

কথাটা শুনেই পুণ্ডরীকের হাসি এল। এত অস্পষ্ট বাণী সে শুনতে চায় না,—সে চায় অত্যন্ত স্পষ্ট কথা, নির্দ্দেশ,—তার জীবনের পথনির্দ্দেশ। কিন্তু সে কে বলবে? পুণ্ডরীক আশায় আশায় চুপ করে রইল।

জ্যোতিষী তার কথায় মৌন সম্মতি মনে করে বললে—সম্প্রতি আপনি মনে বড় দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু সে আপনার ভালর জন্যেই···

পুণ্ডরীকের মুখ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। সে সট্ করে হাতটা টেনে নিয়ে বললে—আর থাক্ বুজরুকি। যথেষ্ট হয়েছে···

জ্যোতিষী তার কথা শেষ না হতে দিয়েই বললে—না বাবু, সব বলা হয়নি। আপনার জীবনে সন্ন্যাস যোগ রয়েছে এবং সেইটাই আপনার বড় যোগ। এই আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি,—এ যদি সত্যি না হয়, তাহলে আমার···

জ্যোতিষী হয় ত তার অভ্যাস-মতো খুব বড় রকমের একটা শপথ করে বসত। কারণ, সে জানত যে এ শপথের কোনও মূল্য নেই এক মক্কেলকে বিশ্বাস করান ছাড়া। এবং তাই যথেষ্ট, তার ভবিষ্যতে যাই হোক।

পুণ্ডরীক তার পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে সেটা এমন ভাবে ছুঁড়ে দিলে, যে সেটা লাগল গিয়ে গণকের মুখের ওপর। আঘাত পেয়ে সে তার কথা অসমাপ্ত রেখেই চুপ করে গেল। আধুলিটাকে তুলে নিয়ে রোষ-কষায়িত নেত্রে মুখটা তুলে দেখে—পুণ্ডরীক হন হন করে বহুদূরে চলে গিয়েছে।

চলতে চলতে পুণ্ডরীকের হঠাৎ মনে হল—মন্দ নয়। লোকটা ভবিষ্যৎ বলতে পারুক না পারুক, তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা পথ বাৎলে দিয়েছে মন্দ নয়। এই অবস্থায় সন্ন্যাসীর ব্যবসা করা মন্দ নয়। বাঙলাদেশে, শুধু বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষেও এই সন্ন্যাসী জাতটার এখনও খাতির আছে; তা সে সৎই হোক্, আর অসৎই হোক। সন্ন্যাসীর গৈরিক তার কলঙ্কিত জীবনের সমস্ত কালিমাকে বিভূতির গৌরবে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। অপেয় সুরা তান্ত্রিকের কারণ রূপে ভক্তিরই উদ্রেক করে; পঞ্চমকার সাধনার বীভৎসতা নিন্দিত নয়, কীর্ত্তিত হয়ে থাকে! বেশ।

সারাদিনের রৌদ্র-ধারা তার মাথার ওপর পড়ে নিঃশেষ হল। বিদায় বেলার আলো অন্ধকারকে নীরবে ডাক দিয়ে গেল। গঙ্গার কূলে কূলে আলোর ইসারা দুলে উঠল। বাঁধানো ঘাটের চাতালে বসে পুণ্ডরীকের মনে হল—সন্ন্যাসীই যদি সে হয়। নিগমানন্দের মতো সন্ন্যাসী, তার পিতার সম্পত্তি হারিয়ে, সে শত সহস্র পুত্রের পিতার সম্পত্তি হয় ত অর্জ্জন করতে পারবে। কিন্তু—এই এক কিন্তুতেই তার চিন্তা-স্রোত ঘুরে গেল।

নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে এতক্ষণ একটা ষ্টীমার অত্যন্ত শব্দ করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিল। একটা ঘাটে লেগে সে তার গতিমুখ পরিবর্ত্তিত করে নিলে। স্রোতের পক্ষে সে ভেসে চলল।

পুণ্ডরীকের মনে তার জীবনের একটা কল্পনায় আঁকা ছবি ভেসে এল। আভাকে নিয়ে সে নীড় রচনা করবে; কত প্রেম, কত প্রীতি, কত শান্তি। কিন্তু সে আশা মিথ্যা হ'য়ে গেল। আভাকে পেল না বলে? না—এ ত ঠিক কথা নয়,—ক্ষণিকের ছাপ ত ক্ষণিক নয়—সে ত চিরদিনের।. কালকের রাত্রে সে যে স্নেহ ও প্রেমের স্বাদ পেয়েছে, তা সে ভুলবে কেমন করে?

সারাদিনের অনাহার পথশ্রম ও ক্লান্তির সম্মুখে মলিনার বিষণ্ণ সেবাতুর মূর্ত্তিটী মনে পড়ল। আর শুধু ত মনে পড়া নয়, সঙ্গে সে কী আকর্ষণ! লোহার গায়ে জড়ানো তারে বিদ্যুত-প্রবাহ ব'য়ে গেলে যেমন চৌম্বক আকর্ষণ সহসা জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, এ ঠিক তেমনি।

পুণ্ডরীক ঘাট ছেড়ে, পথের ওপর এসে দাঁড়াল; সে পথ শেষ হল তার গতরাত্রির পান্থাবাসের দ্বারে। সেখানে

তখন উৎসবের সবে সুরু হয়েছে। দরজার সামনে একটা লোক আহূত হবার আশায় দাঁড়িয়ে ছিল। পুণ্ডরীককে দেখে সে একটু চকিত ও বিরক্ত হ'য়ে উঠল। বামাকণ্ঠে আহ্বান এল—এ কি, আপনি যে, আসুন, আসুন।

পুণ্ডরীক লোকটার মুখের ওপর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিজয়-গর্ব্বে প্রবেশ করলে। মলিনাই প্রথম প্রশ্ন করলে—আপনি যে আসবেন এ আমি আশাই করি নি। কী আশ্চর্য্য! তার গলার স্বরে পুণ্ডরীক বিস্মিত হল। ভাবলে—হয় ত এখানে আসাটা অন্যায় হয়েছে। ঠিক যে কী জবাব সে দেবে তা সে ভেবেই পেলে না।

মলিনা তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাত ধরে এক খানা কৌচের সামনে এনে বললে—বসুন। আপনাকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে!

মলিনা আর কোন কথা না বলে তার সেবা-নিপুণ হস্তে পরিচর্য্যা সুরু করে দিল। গোলাপ জলের মিঠা, ভারী গন্ধ, জলের স্নিগ্ধ শীতলতা ও সেই সঙ্গে একটী নরম করকমলের পরশ তার ভারী ভাল লাগল। সে চোখ বুজে সেবাটীকে উপভোগ করে বললে—এ রকম ভাবে এসে বোধ করি তোমাকে কেউ উত্যক্ত করে নি! খুব বিরক্তি লাগে—না?

মলিনা কোনও উত্তর দিলে না। কী উত্তরই বা সে দেবে? তার মনে যে কথাটী এসেছিল সে তা বলতে পারলে না। বললে কেই বা সে কথাটী বিশ্বাস করত! এই সেবা করার সুযোগ যে তার তপ্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবনে শান্তি এনেছে, তা' শুধু তার বিগত দিনের ছায়ামুখর পল্লীজীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দিলে। কী আশ্চর্য্য, এখন সেই জীবনের প্রত্যেকটী ছবি তার চোখের ওপর যেন স্পষ্ট ভাবে ভেসে যেতে লাগল। কিন্তু সে সব স্বপন কথার মতো—তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে!

তার নাগাল আবার যদি সে পায়!

মলিনার মন মোহের দোলায় দুলতে লাগল।

বহুক্ষণ পরে পুণ্ডরীক তৃপ্তকণ্ঠে বললে—ভাগ্যি তুমি ছিলে। নইলে আশ্রয়—

মলিনার কর্ণে তার এ এ কথা গেল। পুণ্ডরীককে অপ্রতিভ করার ইচ্ছা তার ছিল না; কিন্তু তবু তার কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই উদাস কণ্ঠে সে বলে ফেললে—নইলে আশ্রয় আর একটা খুঁজে নিতেন।

পুণ্ডরীক হেসে বললে—তা অবশ্য নিতাম। গঙ্গার কোল ত আছে!

এ কথার মধ্যে ব্যথা কতটুকু ছিল তা বলা যায় না; কিন্তু মলিনার কাণে এর সব কথাটাই একটা অব্যক্ত বেদনার সুর বলে মনে হল। মলিনা সহসা কোন উত্তর দিতে পারলে না।

পুণ্ডরীক একটা তাকিয়ায় আড় হ'য়ে শুয়ে ছিল। তার মাথাটী ছিল মলিনার কোলের কাছে। মলিনা তার হাতখানি পুণ্ডরীকের কপালে বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—সংসারে একটা ঘা খেয়েই মা গঙ্গার কোলের কথা ভাবেন কেন? জীবনে হয় ত কত লোকের কত উপকার করে যেতে পারেন আপনি। কত ত উপায় আছে……

এর বেশী সে আর বলতে পারলে না। তার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হ'তে লাগল।

পুণ্ডরীক কথাটায় আবার হাসলে। বড় কাজ, উপকার, উপায়……একবার ভাবলে সে খুব একটা অট্টহাস্য করে ওঠে। কিন্তু সে ভাব দমন করে বললে—উপায় আছে বই কি! এই ত আজই এক গণকের কাছে হাত পাততেই সে বলে দিলে—আমার জীবনে সন্ন্যাস যোগটা খুব বড়। সে ত যা'হোক একটা উপায় বাৎলে দিলে। তুমিও না হয় দাও আর একটা।

কথাটা পুণ্ডরীক হয় ত ব্যঙ্গের সুরেই বললে; কিন্তু মলিনা সে কথা গায়ে না মেখে উত্তর দিলে—নাঃ, আপনি যখন গঙ্গার কোল আর সন্ন্যাস এই দুটীকে শেষ উপায় ঠিক করে রেখেছেন, তখন সংসারে আপনার বিরাগ জন্মে গেছে কোনও সন্দেহ নেই।

পুণ্ডরীক মলিনার মুখের দিকে চাইলে। তার যেন ভারী ভাল লাগল। সে বললে—সন্দেহ আমারও আর থাকত না! শুধু তুমিই আমার সন্দেহের অন্ধকারে হয় ত আলেয়া হ'য়ে আমায় ধাঁধায় ফেলেছ। বুঝতে পাচ্ছি না, এ সত্য না মূঢ়তা।

মলিনা লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে রইল। সে কী বলবে! মানুষের ক্ষতস্থানে সেবাচ্ছলে সে কী আঘাত করে বেদনার কারণ হল।

পুণ্ডরীকের গলার স্বর তখন উত্তেজনায় কম্পিত। পর্ব্বতের শিখর হতে যেমন জলধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে আসে, সেই আবেগের আতিশয্যে তার কণ্ঠ হতে স্বর বাহির হ'য়ে এল—মলিনা, তুমি হয় ত বুঝবে যে শাস্তি মানুষকে নিঃশেষ করে ফেলে, তাতে দুঃখ পেলেও ভীত বা শঙ্কিত হবার কিছু নেই। ফাঁসি হলে মানুষ হাসিমুখে সে শাস্তি নিতে পারে; কিন্তু যে শাস্তি মানুষকে পঙ্গু ক'রে রেখে দেয়, তার চেয়ে ভীষণ শাস্তি আর কী হতে পারে? শুধু পঙ্গুতার চিন্তাতেই ত সে পাগল হ'য়ে যেতে পারে।

পুণ্ডরীক একে একে সব কথা বলে গেল। আভার কথাও বাদ গেল না। অর্থ হারান তেমন কিছুই নয় যতটা ভালবাসা হারান।

মলিনা তার কথা শুনে প্রথমটা কিছুই বলতে পারলে না। তার পর খুব মৃদুস্বরে বললে—যেন সে তাকে ভালবাসা জানাচ্ছে—হয় ত এইটাই আপনার দরকার ছিল। আবার নতুন অধ্যায় সুরু করে দিন।

কী—সন্ন্যাস! পুণ্ডরীকের চোখে একটা হাসি ফুটে উঠল। সে হাসি ব্যঙ্গেরও হতে পারে, জিজ্ঞাসার হওয়াও বিচিত্র নয়।

মলিনা কিন্তু তার উত্তরে বেশ দৃঢ়ভাবেই বললে—তাই যদি মনে করেন ত সন্ন্যাসই নিন। সন্ন্যাসীর কাজও বড় কম নয়। আদর্শের নামে দেশে যে ব্যভিচার হচ্ছে, তারও ত একটা প্রতীকার হওয়া দরকার। এ ত' আপনিই প্রত্যক্ষ করেছেন, আরও অনেকে হয় ত করছেন, হয় ত আমিও তার সাক্ষ্য দিতে পারি!

—তুমি? পুণ্ডরীক একটা বিপুল আগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে রইল—যেন সে এই অতল রহস্যের একটা কূল খুঁজে পাবে!

মলিনার মুখে কান্নাহাসির দোলা দেখা দিল। কিন্তু সে অতি ক্ষণিক। অতি আশ্চর্য্যভাবে নিজেকে শান্ত করে বললে—গুরুর কারসাজিতে আপনাকে নিঃস্ব করে ফেলেছে; কিন্তু আমাকে—কী হবে সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ক'রে? শুধু আমাকে কেন, ধর্ম্মের নাম করে স্বামী, পুত্র, সংসার, সমাজ, সব থেকে দূর করে কত নারীকে যে নরকের পাঁকের মধ্যে পুঁতে ফেলা হচ্ছে তার খবর কে রাখে। এদের কে উদ্ধার করে? কে এই অত্যাচারের স্রোত রোধ করে!

কথা বলতে বলতে মলিনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল; কিন্তু তখনই সে স্থির হ'য়ে উদাস কণ্ঠে বললে—কিন্তু কীই বা হবে এ কথা বলে? কেই বা এ ব্রত মাথায় তুলে নেবে!

নিবিড় অন্ধকারে নদীর দুই পারে চকা-চকীর ডাক যেন এমনই হাহা করে মিলিয়ে যায়। পুণ্ডরীক উঠে বসল। এই মুহূর্ত্তটী তার কাছে বড় পবিত্র মনে হল। এ যেন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত,—তার নবজীবনের উষাকাল।

সে বলবার মতো কোনও কথা খুঁজে পেল না। পতিতা মলিনার মুখের দিকে তার দৃষ্টি ছুটে গেল, পঙ্কজ-পদ্মের দিকে প্রথম সূর্য্যের প্রভাত-রশ্মি যেমন ছুটে যায়।

পুণ্ডরীক বললে—মলিনা, আমি পারব, তুমি আমায় সাহায্য কর!

মলিনার চোখে জল ছাপিয়ে এল। সে বললে—আপনি একাই পারবেন। আমাকে কোন কাজে দরকার হবে না। যে গাছের শিকড় নেই তার কাছ থেকে কিছু আশা করবেন না। আমার এই অস্বাভাবিক জীবন এই ভাবেই শেষ করতে হবে। কিন্তু আমার মতো অবস্থার কেউ যদি বাঁচতে চায়, তাহলে তাকে ধরে তুলবেন।

মলিনা আর কোন কথা বললে না। তার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

পুণ্ডরীক স্থির করলে—মলিনার এই পবিত্র অশ্রুই তার সাথী হবে। তাকে শক্তি দেবে।

জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। সন্ন্যাসীর কমণ্ডলু ও গৈরিক বসন তার সাথী; মুখে একটা নির্লিপ্ততার আবরণ। নিজের ছদ্মবেশ দেখে নিজেই সে মুগ্ধ হয়ে গেল। পথে বার হ'য়ে দেখলে লোকের মূঢ়তার সীমা নেই। অত্যন্ত অসঙ্কোচে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না করে লোকে তাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দেয়। গত জীবনের কথা কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। গৈরিকের গৌরবে অতীতের কলঙ্ক-কালিমা কোথায় লুপ্ত হয়ে যায়।

পুণ্ডরীক নিজের মনে মনে একটা ছক এঁকে স্থির করলে, যেখান থেকে এর সুরু, সেখান থেকেই এর সংশোধন সুরু করতে হবে। নিগমানন্দের কথা প্রথম মনে এল। তার মনে হল, এই লোকটাই শুধু তাকে নয়, মলিনাকেও ঠকিয়েছে। তার চেহারার আবরণে যে পিশাচটী লুকিয়ে আছে, আজ যেন তাকেই সে আবিষ্কার করে ফেললে।

এই ব্যাপারটা লোকের কাছে প্রকাশ করে দিতে হবে। কী ভাবে কি করতে' হবে?

পুণ্ডরীক তার নতুন বেশে নিগমানন্দের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত। শুধু ভক্তদের উপরোধে ও কল্যাণ-কামনায় স্বামীজি হিমালয় ত্যাগ করে লোকালয়েই আশ্রম স্থাপন করেছেন। এ আশ্রমের ব্যয় ভক্তদের সাহায্যে চলে। বুদ্ধিমানের বোঝা বোকা লোকেই বয়ে দেয়।

আশ্রম চলছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো। যন্ত্রী নিগমানন্দ! কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁকে কোনও প্রশ্ন করলে তিনি শুধু আকাশের দিকে হাত তুলে বলেন—উনি। কিন্তু মুখ-চোখের ভাবে, হাত তোলার ভঙ্গীতে নিজের অহংটাই প্রকাশ পায় বেশী। আর তা যদি পেয়েই থাকে তাতেই বা আর অন্যায় কি—এতবড় আশ্রম, দেশযোড়া নাম, বিদেশ-বিভূঁই থেকে লোক এসে নির্জীব প্রস্তরের মহাদেবকে দেখে এই সজীব রক্তমাংসের মহাকালকে দেখে ধন্য হয়। কত বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার জমিদার এঁর ভক্ত ও শিষ্য।

নিগমানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আনন্দ-আশ্রমে প্রবেশ করে পুণ্ডরীক একবার চারিপাশে ভাল করে দেখে নিলে। তার পর সটান অত্যন্ত ভক্তিভাবে নিগমানন্দের পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে নিবেদন জানালে—সে গৃহত্যাগী; স্বপ্নে আদেশ পেয়েছে, মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় স্বামী নিগমানন্দের শিষ্যত্ব। তাঁর চরণাশ্রয়ই ভরসা।

তোষামোদে দেবতাও টলে যায়—এ ত মানুষ। নিগমানন্দ অত্যন্ত হেলাভরে,—এ কথা আগেই জানতেন এই ভাবে,—পুণ্ডরীককে শিষ্যত্ব দান করলেন। পুণ্ডরীকের নামকরণ হল—নির্ম্মলানন্দ। পুণ্ডরীক প্রতিশোধের প্রথম সোপান অতিক্রম করলে। নিগমানন্দের শ্যেনচক্ষুকে প্রতারিত করে নির্ম্মলানন্দ দিনে দিনে তার অনুগত সেবকদের মধ্যে পরিগণিত হল।

নির্ম্মলানন্দের চোখের সামনে এক অদ্ভুত জগতের দ্বার উন্মুক্ত হ'য়ে গেল—নিগমানন্দের প্রকৃত জীবনের ধারা। তার কল্পনা বাস্তবের কাছে পরাজিত হ'য়ে গেল।

—বিলাস, হ্যাঁ, বিলাস একেই বলে বটে।

গজদন্তের পালঙ্ক, পাখীর পালকের গদী, একহাত পুরু কাঁচা দুধের ফেনার মতো সাদা বিছানা। অগুরু ও ধূপের সৌরভে শয্যাকক্ষ আমোদিত। ঘরের দেওয়ালে নানা-প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ঝোলানো। মেঝেয় একখানি গালিচা, যেমন পুরু, তেমন নরম। তার ওপরে একটা অজিনাসন।

এ ঘরে সকলের প্রবেশ অবারিত নয়; কিন্তু নির্ম্মলানন্দ নিজের চেষ্টায় ও যত্নে এ ঘরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেছিল। নিগমানন্দের সঙ্গে ঘরে এসে সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

তার চোখের দিকে চেয়ে নিগমানন্দ বোঝালেন—পরিপূর্ণ উপকরণের ভরা ভোগের স্রোত বেয়ে যে নির্লিপ্ততার নৌকা বেয়ে যেতে পারে, সেই ত পরম যোগী।

এ কথা নির্ম্মলানন্দের কাণে নতুন নয়; কারণ, গৃহী ভক্তদের উদ্দেশে এই ধরণের ভাল ভাল আরও অনেক উপদেশ নিগমানন্দ দান করতেন। নির্ম্মলানন্দ শুধু শুনে যেত আর মনে ভাবত—লোকটা ক্রমশঃ রহস্যময় হ'য়ে পড়ছে। একে যে ধরা-ছোঁয়া যাচ্ছে না। লোকটা কি সত্যিই ভাল না কি? আমি একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ পুষে অকারণে সন্দেহ করে চলেছি! হবেও বা।

নির্ম্মলানন্দের দিন ক্রমশঃ একঘেয়ে ভাবে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার জীবন-স্রোতের গতিতে উত্তাল তরঙ্গ দেখা দিল। ঘটনার আরম্ভটা মন্দ নয়।

প্রতিদিনের মতো নিগমানন্দ ভক্তদের উপদেশ বিতরণ করছেন, এমন সময় আশ্রমের প্রাঙ্গণে একটা প্রকাণ্ড সিডান-বডী মোটর এসে থামল। মোটর এসে আশ্রমে দাঁড়ানটা নতুন কিছুই নয়; তাতে বিস্মিতও কেউ হয় না। কারণ, নিগমানন্দের বড়লোক ভক্তের সংখ্যাও কম নয়, এবং তাদের ঐশ্বর্য্যের পরিচয়ও পেতে কখনও বিলম্ব হত না। কিন্তু এই গাড়ীটির ইতিপূর্ব্বে কখনও আবির্ভাব হয়নি এবং এ গাড়ী থেকে যাঁরা অবতরণ করলেন তাঁদেরও এ আশ্রমে কখনও দেখা যায়নি।

প্রথমে নামলেন একটী ভদ্রলোক। বড়লোকের মতো ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর তার সজ্জায় যথেষ্ট ও বেশী ছিল না। শরীরটা রোঁগা, বাতাসে উড়ে যায় এমন চেহারা, চোখ দুটী অত্যন্ত বসা, তাতে দুশ্চরিত্রতার ছাপ, যাকে ভাল বাংলায় বলে, দিব্যজ্যোতিতে বিরাজমান। তার পর অবতরণ করলেন একটী মহিলা, বাঙালী-কুলবধূর ভাবলেশরেখাহীন অসীম রহস্যে ঢাকা তাঁর মুখশ্রী; এবং তাঁর সাথী বড়লোকের বাড়ীর উপযুক্ত আকারে ও আয়তনে সমান চেহারার এক দাসী।

সকলে এসে সাষ্টাঙ্গে নিগমানন্দকে প্রণাম করলে।

ভক্তবৃন্দ উৎসুকভাবে এই আগন্তুকদের লক্ষ্য করলে। স্বামীজি তাদের আশীর্ব্বাদও করলেন। সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। শুধু কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল নির্ম্মলানন্দ। সে যেন ভূত দেখেছে এমন অবস্থা। এই মেয়েটী আভা আর ঐ লোকটী তার স্বামী। তার চট্ করে মনে হল একেই যেন সে একদিন কোথায় দেখেছে। কোথায়? ওঃ—বোধ হয় সেই রাত্রে যখন সে মলিনার অতিথি। লোকটীকে ঠিক মনে নেই; কিন্তু তবুও মনে যেন হয় এ লোকটী যেন সেই। নির্ম্মলানন্দ রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল। তার ভয় হ'তে লাগল যেন এখনি তার ছদ্মবেশ উড়ে গিয়ে তার পুণ্ডরীকত্ব প্রকাশ পাবে।

যে দাসী সঙ্গে এসেছিল সেই স্বামীজিকে জানালে—বাবুর অগাধ বিষয় অথচ ভোগ করার কেউ নেই। এখন শুধু স্বামীজির ইচ্ছা। স্বামীজি ত দেবতা, শুধু একবার মনে করার যা অপেক্ষা!

স্বামীজির মুখে শুধু একটা হাসি ফুটে উঠল। সে অতি অদ্ভুত হাসি। তার পর বললেন—জননী হবার লক্ষণ ত তোমার বর্ত্তমান আছে। শুধু সামান্য একটু বাধা। তার জন্যে সাধনা প্রয়োজন। সাধনার কী নিয়ম তা আমি যথারীতি তোমায় বলে দেব। সন্ধ্যায় এসো। তখনই ব্যবস্থা করা যাবে।

নির্ম্মলানন্দ মনে মনে একটা কিছু আন্দাজে অনুমান করে নিল। ভাবলে এখনই সে তার স্বরূপ প্রকাশ করে আভাকে সাবধান করে দেয়। কিন্তু সেটা সে নিতান্ত সমীচীন বোধ করলে না। মনকে প্রবোধ দিলে—আমি ত এখানে আছি, যদি কোনও বিপদ ঘটে আমিই ত রক্ষা করতে পারব! অপেক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কি?

সারাদিন কাটাতে হবে। দিনে শত-সহস্র কাজ করেও দেখে তখনও দিনান্ত হয় নি। সময় যে এত শম্বুকগতিতে চলে তা তার জানা ছিল না।

ক্রমে সন্ধ্যা হল। সান্ধ্যবন্দনাদি যথারীতি সমাপিত হয়ে গেল। ভক্তের দলও একে একে গৃহাভিমুখী হতে লাগল। এমন সময় আভা তার স্বামী সমভিব্যাহারে এল। তারা যথারীতি সম্বর্দ্ধিত হল।

স্বামীজি তাদের বসিয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। অন্তরাল থেকে নির্ম্মলানন্দ দেখতে পেল—আভা, অতি অসঙ্কোচে তার বারব্রত উপবাসের কাহিনী এই নবলব্ধ গুরুর কাছে প্রকাশ করে যাচ্ছে। আর আভার স্বামী প্রভুটী চুপ করে বসে আছেন।

সব শুনে নিগমানন্দ বললেন—সাধনা ত শুধু একজন করলেই হবে না। দুজনেই করা চাই। একাগ্র সাধনায় কি না সম্ভব। আমি তোমাদের যুগলকেই মন্ত্রদান করব। সে মন্ত্র জপ করলে আর কোন চিন্তাই থাকবে না।

পুণ্ডরীক স্বামীজির কথাবার্ত্তা শুনে বিস্মিত হয়ে গেল। তার মনে হল—ছি, ছি, এ কী সে করছে। অকারণে কেন এ হীন সন্দেহ। কিন্তু তবুও পরক্ষণেই তার মন আবার সন্দেহ-দোলায় দুলে উঠল। একবার রাগ হল আভার স্বামীর ওপর। আবার সে রাগ পড়ল গিয়ে আভার ওপর। কিন্তু পরক্ষণেই যুক্তি দিয়ে সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলে।

প্রতি সন্ধ্যায় তারা আসে যায়। আভার স্বামীটী থাকে একটা জড় অবস্থায়; আর আভা আসে একটী পবিত্র আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে।

পুণ্ডরীক অন্তরাল থেকে শুধু লক্ষ্য করে চলে যায়।

আভা একাগ্র মনে আশ্রমের সাধন কুটীরে বসে ধ্যান করে, তার স্বামীটিও ধ্যান করে; কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়, সে ধ্যান নেশার সুখ-স্বর্গের।

পুণ্ডরীকের মনে হয়—এখুনি একটা লাথি মেরে এই লোকটীকে সে দূর করে দেয়।

মনে মনে চিন্তা করে ঐ লোকটীর স্থান ত একদিন সেই অধিকার করবে বলে আশা করেছিল। কথাটা ভাবতে ভাবতে সে তন্ময় হয়ে পড়ে। তার যৌবন-স্বপ্ন তাকে এসে অধিকার করে বসে।...

এই সন্ন্যাসীর জীবনপথ থেকে সে গৃহী জীবনের ছবি দেখে—সেখানে বর্ণ গন্ধ গানের সমাবেশ—অফুরন্ত আনন্দের লীলা-লহরী। অনন্ত সুখ-স্বপ্ন...মনে মনে সে লুব্ধ হয়ে ওঠে। সেই আকর্ষণে সে ক্রমাগত আভার দিকে লক্ষ্য করে।

চিন্তা করে—যদি একদিন আমি আত্মপ্রকাশ করি, তা হলে কী হয়।

পরক্ষণেই কিন্তু নিজেকে সংশোধন করে বলে, তা হলে আর প্রতিশোধ নেওয়া হল কি। স্বামী নিগমানন্দের কাছ

থেকে তার পূর্ণ অধিকার লাভ করে তার পরে সে প্রকাশ কর্ব্বে—সে কে? সে স্বপ্ন দেখতে লাগল—তার পরিচয় পেলে নিগমানন্দের কী রকম ভাবান্তর ঘটবে! এমনি ভাবে দিনে দিনে আভার প্রতি তার আকর্ষণ বেড়ে উঠল। সন্ধ্যায় সব কাজ ত্যাগ করে সে আভার ধ্যান-মূর্ত্তিটীর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে বেড়াত। একটা আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসায় সে ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল।

এমন সময় একদিন দেখলে আভার ধ্যান-মূর্ত্তির সামনে স্বামী নিগমানন্দ। চট্ করে পুণ্ডরীকের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে অনেক কিছু কল্পনা করে একেবারে নিগমানন্দকে আক্রমণ করে বসল। আভা চীৎকার করে উঠল।··

তার পর কিছুক্ষণ পুণ্ডরীকের জ্ঞান ছিল না—সে ক্রোধের মাথায় কী করছে। যখন জ্ঞান হল তখন দেখলে—নিগমানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। আভা বাহ্যজ্ঞানশূন্যার মতো নিষ্পলক। সমবেত ভক্তবৃন্দের মুখে চোখে একটা চাপা হাসির ইঙ্গিত। স্বামীজি সকলকে উদ্দেশ করে বললেন—আমার আশ্রমে এ জঘন্য কীর্ত্তি ঘটবে, এ আমি কখনও ভাবিনি। নির্ম্মলানন্দ, তুমি যা করেছ তাতে উচিত হচ্ছে তোমাকে পুলিশে দেওয়া। কিন্তু সে কাজ করে এই সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলাকে আমি জড়িত করতে চাই না। তুমি এখনই দূর হ'য়ে যাও।

আভার স্বামী তার মত্ততার মধ্য থেকে কী একটা প্রলাপ বকে উঠল।

স্বামীজি তাকে কোমলকণ্ঠে বললেন—তুমি উত্তেজিত হোয়ো না। এতে তোমার স্ত্রীরই কলঙ্ক হবে। যদি এর মধ্যে তাঁর কোনও দোষ থাকে, সে আমি আমার সাধনার অংশ থেকে ক্ষালন করে দেব।

নির্ম্মলানন্দের তখন ছদ্মবেশ খুলে গেছে। তার চোখে যেন তখন দিব্য দৃষ্টি এসেছে। এই সব কথার অন্তরালে যে কী আছে তা যেন সে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বলে উঠল—আভা, আমি পুণ্ডরীক। তোমার এই ক্লীব স্বামী আর পাষণ্ড গুরুর হাত থেকে যদি পরিত্রাণ পেতে চাও তা'হলে এখান থেকে পালাও। সাহায্য যদি চাও, আমি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে তোমায় সাহায্য করতে পারি।

পুণ্ডরীকের এ চীৎকার বৃথা। আভা তার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে নিগমানন্দের পায়ের তলায় পড়ে আর্ত্তকণ্ঠে বললে—গুরুদেব আমায় রক্ষা করুন।

পুণ্ডরীক পথে বার হল। তার তখন সব গোল হয়ে গেছে। সে স্থির করতে পারলে না যে, সে বাস্তবিকই কিছু প্রত্যক্ষ করেছে না সবই কল্পনা! আভাই বা কেন তার স্থির বিপদ জেনেও গুরুকেই আশ্রয় করলে?—এর মধ্যে থেকে সত্যের আলো সে আবিষ্কার করতে পারলে না।

চারিদিকেই তখন স্তব্ধ গাঢ় দুর্ভেদ্য অন্ধকার।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

পুংসবন ক্রিয়া

ডাক্তার শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

'পুং' শব্দে পুরুষ, 'সবন' শব্দে জন্ম, অর্থাৎ গর্ভস্থ ভ্রূণকে পুংজাতিতে পরিণতি করণ প্রক্রিয়াকে পুংসবন ক্রিয়া বলে।

বিশ্বাসী হিন্দুগণের মধ্যে এই শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়াটি গর্ভধারণের পর প্রথম মাসের পর হইতে দ্বিতীয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য; কেন না তৃতীয়মাসে ভ্রূণদেহের জননেন্দ্রিয়-নির্ম্মাণ ক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। জননেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি সমাহিত হইলে, তখন আর এই ক্রিয়ার কোন প্রয়োজন থাকে না।

গর্ভাধান কালে শুক্র-শোণিতের সম্মিলনে অর্থাৎ পুরুষের শুক্র-কীটাণু এবং স্ত্রীগণের ডিম্ব বা ওভম্‌এর সম্মিলনে স্রষ্টার যথাবিহিত বিধানে, পুত্রকন্যা সন্তানের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

সম্মিলনকালে পুরুষের শুক্রপদার্থের (Molecules of Sperma) আধিক্যে পুরুষ, এবং স্ত্রীদিগের ডিম্বপদার্থের (Molecu'es of Ovum) আধিক্যে কন্যা বা স্ত্রীজাতীয় সন্ততির উৎপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে। উভয় উপাদানের সামঞ্জস্যে বা সমান মাত্রায় ক্লীব বা নপুংসক জাতীয় জীবের জন্ম হইয়া থাকে—

"পুরুষস্তু তু যৎ শুক্রং শক্তেস্তত্রাধিকং যদি।
তদা কন্যাং বিজানীয়াদ্বিপরীতে পুমানভবেৎ।
উভয়োস্তুল্য শুক্রেণ ক্লীবং ভবতি নিশ্চিতম্॥
মাতৃকাভেদতন্ত্রম্।"

"রক্তাধিকাভবেদ্ নারী ভবেদ্রেতোধিকঃ পুমান।
উভয়ো সমভাবাস্তু নপুংসকমিতি স্থিতি॥
সারদাতিলকতন্ত্রম্॥

"In the female predominance of the menstrual blood,
In the male predominance of the semen,
In the Hermaphrodite there is equality of the two"

হিন্দুদিগের চিকিৎসাগ্রন্থে, আর্য্যদিগের ব্যবহারিক গার্হস্থ্যবিধানে সুশ্রুত, চরক, বাগ্‌ভট প্রভৃতি গ্রন্থে, স্পষ্টতঃ লিখিত আছে, শুক্র-শোণিতের ন্যূনাধিক্যে বা সমতায় পূর্ব্বোক্ত ফল ফলিবেই,—ইহা গণিতশাস্ত্রের গণনার সদৃশ সত্যপূর্ণ—পৃথিবীর মধ্যে অদ্যাপি কোন জাতি কোন সময়ে এতদপেক্ষা অধিক স্থিরতর মীমাংসা করিতে পারেন নাই! অরুণদত্ত প্রভৃতি মহাত্মগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, যদি পুরুষ ও স্ত্রীদিগের গর্ভাধান উৎপাদক উপাদানের (Elements) অনুপাত ২২:১৪ হয়, তাহা হইলে সে গর্ভে পুমানের জন্ম হইবেই।

De Bay বলিয়াছেন, জীবন ধাতু (Vital Constituent) বা উপাদানের সমানুপাতের সহিত ইহা ঠিক আছে যে জরায়ু নিঃস্রাবে স্ত্রীডিম্বের আধিক্যে, যদি পুরুষের শুক্র-কীটাণুর ন্যূনতা ঘটে, তবেই এইরূপ ফল ফলিবে। রসায়নবিদ্ শাস্ত্রবিচারকগণ বলেন, স্ত্রীডিম্বে বা ওভমে নাইট্রোজেন্ পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকিলে কন্যা, এবং পুরুষের শুক্রে নাইট্রোজেনের আধিক্যে পুরুষজীব বা পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে। 'A large proportion of Nitrogen in the Ovum occasions the development of a girl,"—De Bay.

মরেলো (Morello) বলিয়াছেন, শুক্রের ঘনত্ব বা তারল্য অনুসারে পুত্রকন্যাসন্তানের জন্ম হইয়া থাকে; "Thick semen produces male" - Morello.

আবার যুগ্ম ও অযুগ্ম দিবসে গর্ভাধান হওয়ার সহিত পুত্রকন্যা সন্তানের উৎপত্তির বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়; ৫ম, ৭ম, ৯ম দিবসে কন্যা, এবং ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১০ম দিবসে পুত্রসন্তান জন্মে।

ডাক্তার স্রুডারের (Schroder) অভিমতে, ঋতুস্রাবের ১০.০৮ দিবসের পরে গর্ভাধান হইলে, সে গর্ভে পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এবং ৯.৭৬ দিবসে গর্ভাধান হইলে, কন্যাসন্ততি জন্মিতে পারে।

থুরীর অভ্যুপগম (Thury's Theory)। ইহাও আর্য্যদিগের যুগ্ম ও অযুগ্ম দিনের গর্ভাধানের যুক্তির উপর সংস্থাপিত। এক দিবস অন্তর জরায়ুর স্রাবের এরূপ পরিবর্তন ঘটিতে পারে, যে, তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ জীবের জন্মের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় ("Hindu doctrine of ebb and flow on alternate even and odd number of days &c. There must be some physiological changes at work, that appear one day and disappear the very next day."

সুশ্রুত বলিয়াছেন, প্রথম হইতে দ্বাদশ দিবস কাল পর্য্যন্ত ঋতুস্রাব কাল ধরিতে পারা যায়; যেহেতু প্রথম কয়েক দিবস বাহ্যতঃ দেখা যায়, কিন্তু তাহার পরে অদৃশ্য ভাবে আর্ত্তব শোণিতের স্রাব জরায়ু মধ্যেই অবস্থিতি করে।

জীবিত মানবদেহের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন নিশ্চিতরূপে মীমাংসা করিবার জন্য কোনও বিশেষ পরীক্ষাদি করা সম্ভব নহে,—যেমন, ভ্রূণের অবস্থান, আকার-প্রকার প্রভৃতির উপর যে সকল পরীক্ষা সমাহিত হইয়াছে, তাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট বা নিশ্চিত সত্যে উপনীত হইতে পারা যায় নাই।

নাইট্রোজেনের যুক্তিও সকল স্থানে প্রমাণিত হইয়া সত্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হয় নাই। ডিম্বের রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের পরীক্ষা সম্ভব হইলেও, কার্য্যক্ষেত্রে সে পরীক্ষা সম্ভবপর নহে (Impracticable)। তবে পিতামাতার পুষ্টি, বিশেষতঃ মাতার পরিপোষণের উপর পুত্রকন্যা সন্তান হইয়া থাকে, ইহা অনেক স্থলেই পরীক্ষিত হইয়াছে। পথ্যের উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার উপর পুত্রকন্যা-জন্মের নিশ্চয়তা এবং অনিশ্চয়তা অনেকাংশে নির্ভর করে।

আর এক কথা। ইহাও বহু স্থলে পরীক্ষিত হইয়াছে, (ডাঃ হেনিকির পরীক্ষা তন্মধ্যে প্রধান) যে পুরুষের দক্ষিণ অণ্ডকোষের রেতঃ, সন্তানকে পুংজাতিতে পরিণত করিতে পারে এবং বামদিকের কোষ হইতে উৎপন্ন শুক্রধাতু কন্যাসন্ততি উৎপাদনে সমর্থ। বামাগণের দক্ষিণ ও বাম ডিম্বাধারের ডিম্বও উক্ত প্রণালীতে পুত্রকন্যা জনমের সাহায্য করে।

চরকে এক স্থলে ইহাও লিখিত হইয়াছে, যে, বামাগণের "গৌরী" অতি গভীর স্থানে থাকিয়া পুংজননে সাহায্য করে এবং "চন্দ্রমসী" তদুপরি অবস্থিতি করতঃ কন্যাজননে সহায়তা করে। আমরা যতদূর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল; ভ্রূণের নির্ম্মাণ বা আকারগত পরিবর্ত্তন এইরূপে ঘটিতে পারে—

প্রথমতঃ পেশীর আকারে অবস্থান (Muscle like shape)

দ্বিতীয়তঃ অনিয়মিত বা অর্ব্বুদ সদৃশ (Tumour like) আকারে পরিণতি

তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণরূপ ডিম্ব বা গোলাকারে পরিবর্ত্তন (Round or Oval shape) ইত্যাদি।

এই সকল আকারের এরূপ অস্থায়ী দ্রুততর পরিবর্ত্তনে বা পরিবর্ত্তনশীলতায় ভ্রূণজীবনের জাতিনির্ণয় বা জননেন্দ্রিয়ের আকার বা নির্ম্মাণ স্থিরীকরণ কিরূপে সম্ভব হইবে?

অন্যত্র—"প্রথম মাসে ভ্রূণ "কলল" (A semi fluid substance), বা অর্দ্ধতরল পদার্থ বিশেষের ন্যায়।

দ্বিতীয় মাসে শীতোত্তাপের প্রতিক্রিয়াশক্তি প্রভাবে প্রাণবায়ুর দ্বারা উক্ত অর্দ্ধতরল পদার্থকে (কললকে) ঘনপদার্থে পরিণত (Dense substance) করণ।

এক্ষণে ইহা যদি গোলাকারে পরিণত হয়, তবেই পুত্রসন্তান জন্মে;

আর যদি লম্বমান (Longitudinal) ভাব বা আকার ধারণ করে, তবেই কন্যাসন্ততি জন্মে।

ঠিক অর্ব্বুদাকার পরিগ্রহ করিলে, ক্লীব বা নপুংসক জন্মিয়া থাকে। তৃতীয় মাসে দুইটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং মস্তকের আকার বুঝা যায়। চতুর্থ মাসেই ভ্রূণের জননেন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা জানা যাইতে পারে।

"দ্রবত্বং প্রথমে মাসি কললাখ্যং প্রজায়তে।
দ্বিতীয়েতু ঘনঃ পিণ্ডঃ পেশী বা ঘনঃ অর্ব্বুদং
পুং স্ত্রীং নপুংসকানাস্ত প্রাগাবস্থাং ক্রমাদিতিঃ ইত্যাদি।"

পাশ্চাত্য ধাত্রীবিদ্যাবিশারদগণও স্থির করিয়াছেন যে ভ্রূণজীবনের প্রথমাবস্থায় জাতি বা জননেন্দ্রিয়ের গঠন শেষ হইয়া থাকে, এক্ষণে সর্ব্ববাদি সম্মত মত গ্রহণ করিলেও হিন্দুদিগের এই পুংসবন প্রথাটি বড়ই বিজ্ঞান ও সত্যপূর্ণ! এই প্রক্রিয়াটির দ্বারা যথাসময়ে ভ্রূণের জননেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তন সাধন করা যায়। পুত্রসন্তানকে কন্যাসন্তানে এবং কন্যাকে পুত্র-সন্তানে পরিবর্ত্তন করা যাউক বা না যাউক, তবে যে অবস্থা হইতে ভ্রূণকে পুংস্ত বা স্ত্রীত্বে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব, তৎপূর্ব্বাবস্থায় প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অর্থাৎ ঔষধ দ্রব্য সেবন, বা ঔষধ দ্রব্যের আঘ্রাণ বা তদ্ভূত বা হোমাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ঔষধ পদার্থের ধূমাদি আঘ্রাণ এবং অঙ্গ বিশেষে উহার সংলগন দ্বারা, আর তদুপরি গর্ভিণীর মনের গতি ফিরাইয়া দিতে পারিলে, কন্যা হইতে পুত্রে, এবং পুত্র হইতে কন্যায় পরিবর্ত্তন করা যায়। সর্ব্বস্থানে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বনিয়ন্ত্রী প্রবৃত্তির অনুকূলে যথাসময়ে ক্রিয়া যাগযজ্ঞাদি বা চিকিৎসাদির ব্যবস্থা না হইলে, অসময়ে তাহার পরে আর কিছুই করা যায় না।

ডাঃ কোয়েনের (Dr. Quain) মতে, ৭ম ও ৮ম সপ্তাহেই জননেন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা স্থির নিশ্চিতভাবে জানা যায়। তবে ভায়েনার অধ্যাপকগণ এবং অধ্যাপক Scheuk বলেন যে, তৃতীয় মাসেও কোন কোনও স্থলে তিনি পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হিন্দুদের শাস্ত্রীয় প্রথায় (চিকিৎসাদি শাস্ত্রে লিখিত) ইহা জানা যায় যে, প্রথম মাসের পর, দ্বিতীয় মাসেই জননেন্দ্রিয়ের গঠন বা নির্ম্মাণ স্থিরতর হইবার পূর্ব্বেই পরিবর্ত্তন জন্য পুংসবন ক্রিয়ার নিয়মে ঔষধদ্রব্য সেবন এবং আঘ্রাণাদির নিয়ম প্রতিপালন করান আবশ্যক।

ভ্রূণের বর্দ্ধন প্রণালী
(Fœtus development.)

ভ্রূণ প্রথম মাসে অর্দ্ধতরল পদার্থবৎ (Semifluid)। দ্বিতীয় মাসে ইহাকে অনেকটা ঘনাকার (More dense substance) পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। তৃতীয় মাসে "Nuclei of the five" উহাতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এবং উভয় শাখা (নিম্ন ও ঊর্দ্ধ) হস্তপদ এবং মস্তক স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। চতুর্থ মাসে উপরিউক্ত চিহ্ন কয়েকটীর বর্দ্ধন নিয়মিতভাবে সমাহিত হইতে থাকে। পঞ্চম মাসে মাংস এবং শোণিত জন্মিতে থাকে; ষষ্ঠ মাসে অস্থি, উপাস্থি, কণ্ডরা, নখ, কেশ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। সপ্তম মাসে বর্ণের উৎপত্তি এবং প্রাণ বা জীবনী-শক্তি (জীবাত্মা)র বিকাশ বুঝা যায়। অষ্টম মাসে ত্বক এবং ওজঃ ধাতুর সমুৎপত্তি ঘটে। ইহা যোগার্ণবতন্ত্রের মত।

বাগ্‌ভটের মতে, পঞ্চম মাসে মুখগহ্বর, কর্ণবিবর, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়, এবং পাকাশয় ও অন্ত্রাশয় (উদর ও নিম্নোদর), ষষ্ঠ মাসে মুখগহ্বর ও পদদ্বয়, সপ্তম মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, অষ্টম মাসে দেহস্থ সন্ধিস্থল, মর্ম্মস্থল (মর্ম্মস্থান) সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

এতদ্বিষয়ে বিচার—প্রথম মাসে ভ্রূণের জাতি নির্ণয় হইতে পারে না; অর্থাৎ এই ভ্রূণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শেষে পুত্রসন্তান কি কন্যাসন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তখনকার চিহ্নের অস্পষ্টতা-হেতু পার্থক্য নির্ণীত হয় না। এক মাস ও এক সপ্তাহ হইলেও তখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধতরল পদার্থ বা "কলল" অবস্থাই থাকে; সুতরাং পুংসবন ক্রিয়ার এই সময়ই উপযুক্ত কাল ধরিয়া কার্য্যারম্ভ করা কর্ত্তব্য।

আর্য্যশাস্ত্রের মতে, প্রথম মাসের অব্যবহিত পরেই (এক সপ্তাহ মধ্যেই) পুংসবন ক্রিয়া সমাধা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু ইহার পরে জননেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তখন পুংসবন ক্রিয়া করা না করা সমান। দ্বিতীয় মাস মধ্যে না করিলে, আর ইহাতে ফল হয় না।

পুংসবন ক্রিয়ায় "লক্ষণামূল" ও ঝিণ্টি এই দুই পদার্থের প্রয়োজন হয়। লক্ষণামূলটী "Mandrake" দেখিতে ঠিক্ ভ্রূণের আকার বা ছোট মানুষের মতন। গর্ভাশয় সংশোধন ও বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারণ এই ঔষধের ক্রিয়া। (ইহাকে "Signature" চিহ্নসূচক চিকিৎসা বলে।) ভেষজ দ্রব্যের আঘ্রাণ বা হোমাগ্নিতে এই সকল দ্রব্য আহুতি দিলে উহার ধূম গর্ভিণী (মাতা) আঘ্রাণ করে। কতকগুলি দ্রব্য অঙ্গে বা কটিদেশে ধারণ করিলে, গর্ভিণীর মনের ভাব আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। গর্ভিণী যখন মনে মনে চিন্তা করে যে সেই গর্ভে তাহার একটী পুত্রসন্তান জন্মিতেছে তাহাতে "যাদৃশী ভাবনা, তাদৃশী ফললাভ" ঘটিয়া থাকে।

Dr. Lotze বলেন, "Man can do, what he wills." ভূর্জ্জপত্রে কবচ লিখিয়া ধারণেও গর্ভিণী মাতার মনের প্রভাব সন্তানে বর্ত্তে, কেন না মন ও দেহের অতি নিকট সম্বন্ধ।

এতদ্ব্যতীত উক্ত পুংসবন ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক 'ব্রহ্মচর্য্য, উপবাসাদি' ভ্রূণের জাতি পরিবর্ত্তন করিতে বড়ই সহায়তা করে।

ডাঃ সরকার (Dr. Sircar) বলিতেন, "Amulets do act, but how do they act, the crude philosophy can not explain."

ডাঃ স্রোডারের পরীক্ষা। ২৪টী বুদ্ধিমতী মহিলাতে তিনি এই বিষয় পরীক্ষা করেন। যুগ্ম ও অযুগ্ম দিবসের যুক্তি মরেলোর (Morello) সহিত একত্রে সমাহিত করায়, অনেকগুলি সত্য অবগত হওয়া গিয়াছে। ইনি (Dr. Schroder) ও মরেলো পরীক্ষা করতঃ পাশ্চাত্য জগতে যাহা নূতন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, আর্য্যদিগের (চরক ও সুশ্রুত) গ্রন্থোক্ত ঋতুচর্য্যা ও গর্ভাধানে ভ্রূণের জাতির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সে সমস্ত বিষয় বহুকাল পূর্ব্বেই দৃষ্টীভূত হইয়াছে।

ভ্রূণের জাতি কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়? কিরূপে গর্ভের বিবর্দ্ধন ঘটে?

এ কথা বুঝিতে হইলে, নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জানিতে হয় ;— আমাদের দেহে ভুক্তদ্রব্যের সমীকরণ (A similation) হইলে, তাহা হইতে একপ্রকার পদার্থ বা জীবন-ধাতুর উৎপত্তি ঘটে। আর্য্যগণ তাহাকেই "ওজঃ" শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত থাকে, তেমনি মানবদেহে বা তন্তুমধ্যে ওজঃ বিদ্যমান আছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে গ্লাইকোজেন (Glycogen) বা শর্করাদি পদার্থ হইতে উৎপন্ন ওজঃ পদার্থ ভ্রূণ জীবনকে দিন দিন পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন করে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও চরকাদির মতে গ্লাইকোজেন্ এবং ওজঃ একই পদার্থ। "What reason we have in considering Glycogen and ozo, as two different names of one and the same substance &c."

মেদ ও শর্করাজাত শক্তির সহিত ওজঃধাতুর বিভিন্নতাও আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন নাই। পূর্ব্বে অণ্ডলালের (Albumen) সহ ইহার সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকের এই মত স্থির ছিল ; কিন্তু সেই মত বিংশতি শতাব্দীতে একাকার বা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সত্য নির্দ্ধারণ পথে অগ্রসর হইলে সর্ব্বত্রই এইরূপ ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তনবাদে বিশ্বাস করিতে হয়। ওজঃ ও গ্লাইকোজেনের সাদৃশ্য (Simil ritv) এবং সমতা (Identity) যাহা, হোমিওপ্যাথি ও আইসোপ্যাথী তাহাই। মহাত্মা ভন্ পুনঃ পুনঃ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

জীবদেহের সমস্ত তন্তুতে ওতপ্রোতভাবে ইহা বিরাজ করাতে জীবের জনন ও বর্দ্ধন ক্রিয়া সমাহিত হইতেছে। নামেমাত্র হৃদয়ে ইহার অবস্থান ; কিন্তু সমস্ত দেহে ইহার অবস্থিতি-হেতু কি মাংসে, কি মস্তিষ্কে, আনন্দাদি উপভোগ, এবং যকৃত ও পরিপাকযন্ত্রে অবস্থিত থাকায়, জীর্ণ ক্রিয়া ও পরিপোষণ এবং শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ওজের জন্যই জীবের পুনর্জ্জন্ম ; ওজের জন্যই গর্ভধারণ, ওজের জন্যই আবার পুত্রকন্যাদির জন্ম ঘটিতেছে।

এই ওজের অভাবেই জীবনের ধ্বংস বা মৃত্যু সংঘটিত হয়।

শারীরিক ক্রিয়া শৌর্য্যবীর্য্য, মানসিক ক্রিয়া উত্তম অধ্যাবসায় দয়ামায়া ভক্তি সমস্তই ওজঃধাতুর বিকাশ মাত্র।

মধু যেমন নানা ফুল হইতে সংগৃহীত হয়, ওজঃ ধাতুও শরীরের বিভিন্ন কোষ বা তন্তু হইতে সমুৎপন্ন হয়। গাভীর সর্ব্বশরীরে ওজঃ বিদ্যমান থাকায় স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত হইয়া স্নেহাধার বৎসাদির জন্য উক্ত স্নেহবৎ পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে, আবার সেই দুগ্ধ পানে বা দুগ্ধের দ্বারা উৎপন্ন খাদ্যে গাভীর দেহের পরিপুষ্টি সাধন হয়। এই ওজঃ ধাতু কিসে বৃদ্ধি পায়, সেই তত্ত্বানুসন্ধান জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞান দিবারাত্রি মস্তিষ্ক পদার্থ বা ওজঃ ক্ষয় করিতেছেন ! ধন্য ওজঃ ! ধন্য তোমার স্রষ্টা !!

আজ কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যের নিতান্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বঙ্গদেশবাসিগণ দিন দিন নানা কারণে স্বাস্থ্য ধন নষ্ট করিয়া ক্রমশঃ এরূপ অবস্থায় আসিতেছে, যে এ দেশবাসী শীঘ্রই "বার্ত্তাকু গাছে আঁকষী দিয়া বার্ত্তাকু তুলিতে আরম্ভ করিবে !" অসংখ্য কারণ (কত বলিব ?) হইতে বঙ্গের গৃহস্থের সুখ-শান্তি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই জলাঞ্জলি যাইতেছে ! বাস্তু বা বসুমতী কুপিতা হেতু প্রচুর শস্যোৎপাদনাভাব, বসুমতীর শক্তিলোপ কেন—তদুপরি নিক্ষিপ্ত অস্থিখণ্ড পর্য্যন্ত আমাদের উদরস্থ হইতেছে ! কৃষকের, গোমাতার খাদ্যের অভাব। নিঃস্বতা রাক্ষসীর তাড়নায়, বসুমতীতে সার প্রদান বা কর্ষণাভাবহেতু অপ্রচুর শস্যোৎপাদনে, কৃষকের স্ত্রী পুত্র গাভী খাইবে, না জমিদারকে দিবে ? যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে, তাহাও উচ্চমূল্যে বিক্রয়ার্থ দূরদেশে চলিয়া যাইতেছে ! চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপের ন্যায় বঙ্গবাসী রোদন বলের সাহায্য লইবেন কি, দেশে ম্যালেরিয়ায়, মশকে শোষকে শোণিতসর্ব্বস্ব চোষণ করাতে কি আর ওজঃ ধাতু থাকে ?

কৃষকের পরে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আরো দুর্দ্দশা ! প্রত্যেক বঙ্গবাসীর গড়পড়তায় আয়ে, একজনের চলে না,—সেখানে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। স্বর্গীয় প্রপিতামহের শিক্ষায় নিজে উপবাসী, বা অর্দ্ধাশন খাইয়া তাড়াতাড়ি ১০টা ৫টা হাড়ভাঙ্গা শ্রম করিয়া এক পেয়ালা "চা" ও বিস্কুট দ্বারা দিনযাপন করিলেন। বামাগণ, কতকগুলি পুত্রকন্যার (অধিকাংশ কন্যার) মাতা হইয়া, নিজে খাইবেন কি ? সহর ও সহরতলীবাসী শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী প্রভৃতি গুরুজনকে ভোজন করাইয়া যাহা অবশেষ থাকে, পুত্রবধূ বা কন্যাদিবর্গ সেই মৎস্যের কণিকার ঝোল, আর ডাঁটা চচ্চড়ি চিবাইয়া উঠেন, পেট না ভরিলেও মুখব্যথা করা জন্য খাওয়া বন্ধ হয়।

পল্লীবাসী পিতামাতাদি পুত্রাদির মাসকাবারে প্রেরিত কয়েকটী টাকা পাইয়া গতমাসের দেনা শোধ দিয়া যাহা থাকে, তাহাতেই সমস্ত মাস খাইতে হইবে, সুতরাং অর্দ্ধাশন ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? তদুপরি পুত্রকন্যা প্রতিপালন করিয়া বয়স্থা কন্যার বিবাহ দিতে দেহের সমস্ত ওজঃই শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়।

কুটীরবাসী কৃষক হইতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সংসারের এইরূপ চিত্র। অন্যদিকে বঙ্গবাসী (সহর ও সহরতলীবাসী বিশেষতঃ) ধনীদিগের গৃহের অস্তিনয় অন্যরূপ ! এখানে প্রধানতঃ অলসতা, বিলাসিতা, অমিতাচার, প্রমেহাদি দোষ হইতে উৎপন্ন মেদাপকর্ষ, হৃদরোগ, সন্ধিবাত রোগজন্য স্বাভাবিক যান্ত্রিক নিঃস্রবণক্রিয়া সংরুদ্ধ হইয়া, মূত্রে অণ্ডলাল বা শর্করা (বহুমূত্ররোগ) উৎপন্ন হইয়া পুরুষবন্ধ্যাত্ব এবং বামাগণের নিরক্ততা-সমুৎপন্ন মূর্চ্ছাবায়ু, ডিম্বাধাররক্ত জরায়ুর বিকৃতি জন্মিয়া স্ত্রীবন্ধ্যাত্ব জন্মে। এইরূপ দম্পতী সম্মিলনে, পুত্রকন্যা মুখ দর্শনে বঞ্চিতা বা পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিতা হওয়া কি দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে ? দেশের এই সকল দোষ বা কারণ দূরীভূত না হইলে, বর্ত্তমান দুরবস্থার অপনোদন অসম্ভব। পিতৃমাতৃ স্বাস্থ্য উন্নত না হইলে, কখনই সন্তানসন্ততির স্বাস্থ্য ভাল হয় না। স্বাস্থ্যোন্নতি না হইলে, সুস্থ পুত্রকন্যার দেহে ওজঃ হইতে সুস্থ পুত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইলে, উপায়ান্তর নাই। সুস্থ দেহেই ওজঃ সংরক্ষিত হয়। তৎপরে ভুক্ত দ্রব্যে সমীকরণ দ্বারা সমুৎপন্ন রসই ওজঃ ; ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া স্থূলাংশ দ্বারা জননক্রিয়া এবং সূক্ষ্মাংশ হইতে মেদ ; মেদ হইতে ওজঃ সমুদ্ভূত হয়। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গর্ভাধান, এবং বিশুদ্ধ হিন্দুমতে পুংসবনাদি ক্রিয়ার সম্পাদন দ্বারা (চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবস্থাদি দ্বারা) বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং ভেষজ দ্রব্যের

সেবন বা আঘ্রাণে বা কবচাদি ধারণে বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারণ এবং পুত্র সন্তান জনন চেষ্টা ও ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্যই হিন্দু বা আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে পুংসবন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যথা সময়ে করা কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে প্রবন্ধ লেখকের একটী প্রস্তাব বা নিবেদন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আধুনিক লোকসংখ্যা গণনার তালিকা পাঠে (Census Report) জানা গিয়াছে যে ভারতবর্ষের পুত্রকন্যা জন্ম সংখ্যার অনুপাত, পুত্র ১০০ স্থলে, কন্যা ৯৪টী। ইংলণ্ডে ১০৫ সংখ্যক কন্যা স্থলে, ২০০ সংখ্যক পুত্রসন্তান। মান্দ্রাজে শতকরা মাত্র এক সংখ্যক কন্যা বেশী। অযোধ্যা ও পঞ্জাবে ৭ হইতে ১৬ সংখ্যক পুত্রসন্তান অধিক। ইহার কারণতত্ত্বের বহুলতা থাকিলেও, পূজ্যপাদ মহাত্মা গান্ধী এবং শ্রদ্ধাস্পদ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশ শিরোধার্য্য করতঃ, তাঁহাদের আদেশ মত চলিলে, এবং ঋষি শ্রেষ্ঠ চরক ও সুশ্রুতাদির দিনচর্য্যা ঋতুচর্য্যা এবং ব্রহ্মচর্য্য বা সংযমাদির দ্বারা আর্য্য বা হিন্দু মতে চলিলে, এখনও ঈপ্সিত ফল নিশ্চয়ই ফলিতে পারে। যাহাতে আমাদের দেহে বিশুদ্ধ ওজঃ সংরক্ষিত হয়, যাহাতে আমাদের ভাবী পুত্রকন্যাগণের পিতামাতার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সংযম এবং নিয়মাদি হিন্দুদম্পতী সংরক্ষণ করিতে বিস্মৃত না হন, যাহাতে দেশে কন্যাপেক্ষা পুত্রসন্তানের সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়, হৃদয়ের সহিত সেই সত্য প্রতিপালন কর্ত্তব্য। এক কথায় বা সংক্ষেপে হিন্দুমতে ধর্ম্ম কর্ম্ম, হিন্দুমতে রন্ধন, ভোজন, হিন্দুমতে শয়ন, গমন, সর্ব্ববিধানে ভারতীয় নিয়ম রক্ষণ, ভারতীয় ভাব অনুসরণ করিলে, বাঞ্ছিত ফললাভে কখনই বঞ্চিত হইবে না। তাহা হইলে হারাধন পুনর্ব্বার হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দানুভব করিতে পারিব। "If we still begin to think orientally, look and eat orientally, drink and cultivate orientally, in short, orientalism in every phases of our private life, we shall find that we have lost very little, by persuing for so long the irregular life or method of the West."

ঋগ্বেদে সভ্যতা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ

(১)

ঋগ্বেদ কি? ঋগ্বেদ একখানি স্তোত্রগ্রন্থ। ইহার প্রাচীনত্বের পরিচয় আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। এই বিস্তৃত গ্রন্থ হিন্দুর আদি গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে হিন্দুদিগের আর কোন গ্রন্থ ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায় না।

ঋগ্বেদের এক একটী স্তোত্রের নাম ঋক্। কতকগুলি স্তোত্রে একটী করিয়া সূক্ত। কতকগুলি সূক্তে একটী অনুবাক। এইরূপ কতকগুলি অনুবাকে একটী মণ্ডল। এইরূপ দশটী মণ্ডলে এই গ্রন্থখানি সমাপ্ত। এক একটী মণ্ডলে অন্ততঃ হাজার বারশ' স্তোত্র আছে। ঋগ্বেদে মোট ১০২৪৭টী ঋক্ আছে। ইহাতে মোট সূক্ত ১০১৭টী। অনুবাক ৮৫টী।

ইহার সমস্ত ঋক্ ঋষিগণের রচিত, কোন কোনটী স্বতঃ স্ফুরিত (Revealed)। কোন কোন স্থলে ঋষি তন্ময় হইলে যে স্তোত্র স্ফুরিত হইয়াছে, তাহাকে সেই স্তোত্রের উদ্দিষ্ট দেবতার উক্তি বলা হইয়াছে।

ইহা পুরুষেরই একচেটিয়া নয়। বেদে ১২টী স্ত্রীলোকের নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা ঋক্ দর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহারা ঋষিকা নামে অভিহিত। এই ঋষিকার মধ্যে কাশ্যপগোত্রীয় শ্রদ্ধা, এবং অংভৃণের কন্যা বাক্ শ্রেষ্ঠা। বাক্ ব্রহ্মজ্ঞা ছিলেন। তাঁহার দৃষ্ট ৮টী ঋক্ দেবীসূক্ত নামে পরিচিত।

এই গ্রন্থে ২১৪টী ঋষির নাম পাওয়া যায়। ঋষি কে? সেই সময়ের ভাষায় (বৈদিক ভাষায়) যাঁহারা স্তোত্র রচনা করিতেন, তাঁহাদিগকে ঋষি বলা হইত। "ঋষির্মন্ত্রদ্রষ্টা"। অর্থাৎ সেই সময়ের শিক্ষিত। অবশ্য মনে রাখিবেন, তখন অক্ষর সৃষ্ট হয় নাই; ঋষিরা মুখে মুখে শিক্ষা করিতেন। এই জন্য বেদগুলির নাম শ্রুতি (যদিও তাঁহারা শ্রুতি শব্দে প্রচলিত কথা (Tradition) বলিতেন)। আর বেদগুলির নাম সংহিতা। তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহার নাম বৈদিক ভাষা। এই ভাষা হইতেই সংস্কৃত উৎপন্ন—বর্ত্তমান সময়ে যেমন বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃতের ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ও ছন্দের রীতি ঐ বৈদিক ভাষা হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঋষিদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্মই হিন্দুদিগের মূল, আদর্শ।

ইন্দ্রদেবের উক্তি—

"অরং কৃণ্বন্তু বেদিং সমগ্নিমিন্ধতাং পুরঃ।
অত্রা মৃতস্য চেতনং যজ্ঞং তে তনবাবহৈ॥

১ ম ২ অনু ৬ সূক্ত ৪ ঋক্

এই ঋকটী ইন্দ্র বলিতেছেন। হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা অগস্ত্যের আদেশ অনুসারে বেদী পরিষ্কৃত কর। সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত কর। হে অগস্ত্য! পরে তোমাতে আমাতে দেবত্বের চিহ্ন দেবত্ব লাভের উপায় যজ্ঞ বিস্তার করিব। এই ঋকের ঋষি ইন্দ্র স্বয়ং।

স্বতঃ স্ফুরিত—

"প্রসূতো ভক্ষ মকরং চরাবপি স্তোমং
চেমং প্রথমঃ সূরি রুন্মৃজে।
সুতে সাতেন যদ্যাগমং বাং প্রতি বিশ্বা-
মিত্র-জমদগ্নী দমে॥" ১০ম ১২ অনু ১৬৭ সূক্ত ৪ ঋক্

হে ইন্দ্র! আমি তোমার প্রেরণায় তোমার জন্য চরু প্রভৃতি হবি যজ্ঞে প্রস্তুত করিয়াছি, এবং স্তোতৃশ্রেষ্ঠ হইয়া তোমার জন্য উত্তম স্তোত্র বলিতেছি। ইহাতে ইন্দ্র ঋষির মনে উদিত হইয়া বলিতেছেন—হে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি! সোম প্রস্তুত হইলে আমি যখন তোমার বাটীতে তোমাদিগকে দান করিবার জন্য ধন লইয়া উপস্থিত হইব, তখন তোমরা

দুইজনে স্তব করিও। "শেষ কথাটী স্বতঃ স্ফুরিত"। এইরূপ অন্যান্য দেবগণও ঋষি মুখে বলিয়াছেন।

ঋষির রচিত—

"নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ।"

৪র্থ ২ অনু ৯ সূ ১১ ঋক্

বামদেব ঋষি ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি কর্ত্তৃক স্তুত হইতে; এক্ষণে আমি তোমার স্তব করিতেছি। যেমন জল নদীকে সমৃদ্ধ করে, সেইরূপ তুমি স্তবকারীকে—আমাকে অন্ন দিয়া বর্দ্ধিত কর। হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! তোমার জন্য অতি নূতন স্তুম-ঋক্ করিতেছি। আমরা যেন রথযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি। এই স্তোত্র বামদেব ঋষির রচিত।

ভরদ্বাজের রচিত—

"এবা তা বিশ্বা চকৃবাংস মিন্দ্রংমহামুগ্র মজুর্য্যম্।
সহোদাং সুবীরং ত্বা স্বায়ুধং সুবজ্র মা ব্রহ্ম নব্য মবসে ববৃত্যাৎ।"

৬ষ্ঠ ২ অনু ১৭ সূ ১৩ ঋক্

হে ইন্দ্র! আমাদের রক্ষার জন্য আমাদের কৃত নূতন স্তব তোমাকে ফিরাইয়া আনুক। তুমি প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববিধ কর্ম্মকারী, তুমি ঈশ্বর, মহান্, তেজস্বী, অজর, শক্তিদাতা, উত্তম অস্ত্রযুক্ত, তোমার উৎকৃষ্ট বজ্র আছে। এবং বীর মরুদ্‌গণ তোমারই। এই ঋক্ ভরদ্বাজ ঋষির রচিত।

শ্যাবাশ্ব ঋষি কৃত—

"তদ্বো যামি দ্রবিণং সদ্য-উতয়ো যেনা স্বর্ণ ততনাম নৃংরভি।
ইদং সু সে মরুতো হর্য্যতা বচো যস্য তরমে তরসা শতং হিমাঃ।"

৫ম ৪ অনু ৫৪ সূ ১৫ ঋক্

শ্যাবাশ্ব ঋষি মরুদ্‌গণের স্তব করিতেছেন—হে সদ্যো রক্ষাযুক্ত মরুদ্‌গণ! তোমাদের নিকট আমি সেইরূপ ধন প্রার্থনা করি যাহাতে আমার পুত্র ভৃত্যাদি বিস্তার করিতে পারি। যেমন সূর্য্য রশ্মি বিস্তার করেন। আমার এই মাত্র রচিত স্তোত্র তোমরা বিশেষ রূপে কামনা কর। যাহার বলে আমি একশত হেমন্ত ঋতু অতিক্রম করিতে পারি, একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারি।

ঋষিকার দৃষ্ট ঋক্—

"ময়া সো'ন্ন মত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মান্ত উপক্ষিয়ন্তি, শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি।"

১০ম ১০ অনু ১২৫ সূ ৪ ঋক্।

যে অন্ন ভক্ষণ করে, সে, খাদক রূপে অবস্থিত যে আমি, আমা দ্বারা খায়, যে অবলোকন করে, যে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া থাকে, যে এই বাক্য শ্রবণ করে; ইহা সমস্তই আমা দ্বারা করে। এইরূপ অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত আমাকে যাহারা জানে না, তাহারা হীন হইয়া সংসারে অবস্থান করে, বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া কষ্ট পায়। হে বিশ্রুত সখে, শ্রবণ কর, তোমাকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি। এইরূপ ৮টী স্তোত্র অংভৃণের কন্যা বাক্ নাম্নী ঋষিকা ব্রহ্মভাবে তন্ময় হইয়া দেখিয়াছিলেন।

স্বামী-স্ত্রীর আলাপ—

"পূর্ব্বী রহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষাবস্তো রুষসো জরয়ন্তীঃ।
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনুনা মপ্যূনু পত্নী বৃষণো জগম্যঃ"

১ম ২৩ অনু ১৫ সূ ১ ঋক্

ঋষিকা লোপামুদ্রা স্বামী অগস্ত্যকে বলিতেছেন, হে অগস্ত্য! আমি অনেক বৎসর দিন রাত তোমার সেবা করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার শরীরের সৌন্দর্য্য চলিয়া গিয়াছে। এখনও কেন আমাকে অগ্রাহ্য করিতেছ? জগতে পুরুষেরাই পত্নীর নিকট গমন করে।

স্বামীর পরিহাসের উত্তর—

"উপোপ মে পরামৃশ মা মেদভ্রাণি মন্যথাঃ।
সর্ব্বাহ মস্মি রোম শা গন্ধারীণা মিবাবিকা"

১ম ১৮ অনু ৬ সূ ৭ ঋক্

রোমশা বৃহস্পতির কন্যা—স্বামী স্বনয়ের পরিহাসের উত্তর দিতেছেন—আমার শরীরে হাত দিয়া দেখুন, আমি বয়স্থা কি না। আমার অঙ্গ অল্প রোমযুক্ত মনে করিবেন না। আমি গান্ধার দেশের মেষের ন্যায় রোমযুক্ত। স্বনয় রাজা এই স্ত্রীকে প্রৌঢ়া কি না জানিবার জন্য কিছু পরিহাস করিয়াছিলেন, তাহারই উত্তর। রোমশা ব্রহ্মবাদিনী।

অপালা ব্রহ্মবাদিনী—

"অসৌ য এষি বীরকো গৃহং গৃহং বিচাকশৎ।
ইমং জম্ভসুতং পিব ধানাবন্তং করম্ভিন মপূপবন্ত মুক্‌থিনম্॥"

৮ম ৯ অনু ৮০সূ ২ ঋক্।

অপালা অত্রিঋষির কন্যা, ব্রহ্মবাদিনী। ইনি চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। একদিন নদী হইতে স্নান করিয়া আসিবার সময় সোম পাইয়া চিবাইতে আরম্ভ করেন। ইহার শব্দকে ইন্দ্র সোম পিষার শব্দ মনে করিয়া অপালার নিকট আগমন করেন। কিন্তু ইন্দ্র যখন জানিলেন উহা সোম পিষার শব্দ নয়, সোম চিবান'র শব্দ, তখন ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে প্রগলভা অপালা বলিলেন, হে ইন্দ্র, তুমি বীর, সোমপান জন্য লোকের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াও। সুতরাং আমার এই দন্তে পিষ্ট, দধি, ছাতুমিশ্রিত সোম কেন পান করিবে না? আমি স্তব করিতেছি।

ঋষিকা শ্রদ্ধা

"শ্রদ্ধাং দেবা যজমানা বায়ুগোপা উপাসতে।
শ্রদ্ধাং হৃদয্যয়া কূত্যা শ্রদ্ধয়া বিন্দতে বসু॥"

১০ম ১১ অনু ১৫১সূ ৪ ঋক্

ব্রহ্মবাদিনী শ্রদ্ধা কাশ্যপ গোত্রে উৎপন্ন। ইনি শ্রদ্ধাদেবীর (আস্তিক্য বুদ্ধির) প্রশংসা করিতেছেন—দেবতা, যজমান, ও মনুষ্য, ইহারা বায়ুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শ্রদ্ধাদেবীর প্রার্থনা করে। হৃদয়োৎপন্ন সঙ্কল্প দ্বারা লোক

শ্রদ্ধার (আস্তিক্যবুদ্ধির) সেবা করে। কারণ শ্রদ্ধাবান্ লোক শ্রদ্ধাহেতুক ধন প্রাপ্ত হয়।

ঋষিরা বনে বাস করিতেন না। বনকে ভয় করিতেন। বনে তস্করাদি ও হিংস্র জন্তু থাকিত। তাঁহারা দিনে বন হইতে ফলমূল কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দিবসেই বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। ইহাঁরা গ্রামে বাস করিতেন। ইহাঁদের মণ্ডল (গ্রামনী) ছিল। মড়লকে বিশেষ সম্মান করিত। মড়লকে রাস্তায় দেখিলে লোকে রাস্তা ছাড়িয়া দিত।

মড়লের আদর

দক্ষিণাবান্ প্রথমো হুত এধি দক্ষিণাবান্ গ্রামণী রগ্র মেতি।
তমেব মন্যে নৃপতি জনানাং যঃ প্রথমো দক্ষিণা মাবিবায় ॥"

১০ম ৯ অনু ১০৭সূ ৫ ঋক্,

যে যজমান ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া দক্ষিণা দেয়, সে শ্রেষ্ঠ। যে দক্ষিণা দেয় সে গ্রামের নেতা (মড়ল)। আমি তাহাকে লোকের রাজা—প্রভু মনে করি।

বনকে ভয়

"ন বা অরণ্যানি র্হন্ত্যন্য শ্চেন্নাভি গচ্ছতি।
স্বাদো ফলস্য জগ্ধায় যথা কামংনি পদ্যতে ॥"

১০ম ১১ অনু ১৪৬সূ ৫ ঋক্।

অরণ্য তাহার বাসীকে মারে না। কিন্তু তস্কর হিংস্র জন্তুরা তাহাকে মারিয়া ফেলে। তাহা না হইলে সেখানে উত্তম উত্তম ফল খাইয়া স্বাধীন-ভাবে জীবন যাপন করিতে পারা যাইত। অর্থাৎ বনে বাস করার অন্য কোন বাধা নাই, সেখানে ভাল ভাল ফল খাইয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে পারা যায়; কিন্তু সেখানে হিংস্র জন্তু ও তস্করের উৎপাত আছে।

দলবদ্ধ

"ইমা ব্রহ্মেন্দ্র তুভ্যং শংসিদা নৃভ্যো নৃণাং শূর শবঃ।
তেভি র্ভব সক্রতু র্যেষু চাকন্নুত ত্রায়স্ব গৃণত উত স্তীন্ ॥"

১০ম ১১ অনু ১৪৮সূ ৪ ঋক্।

পৃথু-ঋষি ইন্দ্রকে বলিতেছেন—ইন্দ্র! তোমার জন্য এই স্তোত্র বলিলাম। হে বলবন্ ইন্দ্র! তোমার স্তোতাকে বল দাও। তুমি যাহাদের নিকট হবি আকাঙ্ক্ষা কর, তাহাদের কর্ম্মের সহায় হও, এবং দলবদ্ধ তোমার স্তবকারীকে রক্ষা কর।

হর্ম্ম্য ছিল

"ইমং ত্রিতো ভূর্য্য বিন্দ দিচ্ছন্ বৈভুবসো মূধন্যঘ্ন্যায়াঃ।
স শেবৃধো জাত আহর্ম্যেষু নাভি র্যু’বা ভবতি রোচনস্য ॥"

১০ম ৪ অনু ৫৬সূ ৩ঋক্।

বিভুবসের পুত্র ত্রিত ঋষি অনেক অগ্নি পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাহা এই পৃথিবীতেই পাইয়াছিলেন। সেই অগ্নি যজমানের পাকা বাড়ীতে মঙ্গলকর হইয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন, এই অগ্নি আমাদের স্বর্গ-ফলদাতা।

ইহাঁদের রাজা ছিল। রাজারা দিগ্‌বিজয় করিতে যাইতেন। তাঁহারা প্রজার মঙ্গল করিতেন, দুষ্ট দমন করিতেন, কোন কোন রাজা প্রজা দ্বারা মনোনীত হইতেন। রাজাদের দুত (·p) ছিল, প্রজাদিগকে সৈন্য করিতেন। লৌহ বর্ম্মা ও চর্ম্ম-বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া পৃষ্ঠে তূণীর ঝুলাইয়া টাঙ্গী প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতেন। ইহাঁদের সঙ্গে মহিধীরা থাকিতেন; তাঁহারা যুদ্ধে নিপুণা ছিলেন। স্বামীর সাহায্য করিতেন।

মনোনীত রাজা

"আ ত্বা হার্ষ মন্তরে ধি ধ্রুব স্তিষ্ঠা বিবাচলিঃ।
বিস ত্বা সর্ব্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্ব দ্রাষ্ট্রমধি ভ্রশৎ ॥"

১০ম ১২ অনু ১৭৩সূ ১ঋক্।

ধ্রুব-ঋষি রাজাকে বলিতেছেন "হে রাজন্! আমি তোমাকে আমাদের রাজ্যের প্রভু করিবার জন্য আনিয়াছি। তুমি আমাদের প্রভু হইয়া থাক। তোমাকে সমস্ত প্রজা প্রভু বলিয়া স্বীকার করুক। তোমা হইতে রাজ্য বিচ্যুত না হউক।"

কর দিত

"ধ্রুবং ধ্রুবেন হবিষা ভি সোমং মৃশামসি।
অথোত ইন্দ্রঃ কেবলী বিশো বলিহৃত স্করৎ ॥"

১০ম ১২ অনু ১৭৩সূ ১ঋক্।

ঋত্বিক্‌গণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—আমরা পিষ্টকাদি হবির্যুক্ত বিশুদ্ধ সোম দেবগণকে দান করিতেছি। ইন্দ্র প্রজাদিগকে তোমার সম্পূর্ণ অধীন করুন। তাহারা যেন তোমাকে কর দেয়।

"পবমানো অভিস্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি।
যদী মৃণ্বন্তি বেধসঃ ॥"

৯ম ১ অনু ৭সূ ৫ঋক্।

দুষ্ট প্রজাকে রাজা যেমন শাসন করেন, সেরূপ এই বিশুদ্ধ সোম, দেবগণকে দত্ত হইলে, যজ্ঞবিঘ্নকারী গর্ব্বিত রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে গমন করে।

রাজা প্রজার মঙ্গল করিতেন

"গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথাম্।
অদ্রৌ চি দস্মা অন্তর্দুরোণে বিশাং ন বিশ্বো অমৃতঃ স্বাধীঃ ॥"

১ম ১২ অনু ৭০সূ ৩ ৪ঋক্।

যে অগ্নি জলে, স্থলে, স্থাবরে জঙ্গমে, কাষ্ঠে বর্ত্তমান যাঁহাকে গৃহে, পর্ব্বতে লোক হবি দান করে, সেই বিশ্ব-হিতকর অগ্নি, প্রজামঙ্গলকারী রাজার ন্যায়, আমাদের মঙ্গল করুন।

রাজা উপদ্রব দূর করিতেন

রাজারা উপদ্রব দূর করিয়া শান্তি স্থাপিত করিতেন।

যস্যৌষধীঃ প্রসর্পথাঙ্গ মঙ্গংপরুষ্পরুঃ।
ততো যক্ষ্মং বিবাধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব ॥"

১০ম ৮ অনু ৯৭সূ ১২ ঋক্।

বলবান্ রাজা শত্রুর মধ্যে অবস্থান করিয়া উপদ্রবকারী শত্রুগণকে পদে পদে বাধা দিয়া বিনাশ করেন। সেইরূপ হে ঔষধ! তোমরা রোগীর অঙ্গে অঙ্গে ও প্রত্যেক পর্ব্বে প্রবেশ করিয়া রোগকে বাধা দিয়া বিনাশ কর।

"উপপ্রেত কুশিকা শ্চেতয়ধ্ব মশ্বং রায়ে প্রমুঞ্চতা সুদাসঃ।
রাজা বৃত্রং জঙ্ঘনৎ প্রাগপাগুদগথা যজাতে বর আপৃথিব্যাম্॥"

৩ম ৪ অমু ১৫সূ ১১ঋক্।

সুদাস রাজা বিশ্বামিত্রের যজমান। তাঁহার দিগ্বিজয় জন্য যাত্রার সময় বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে বলিতেছেন, হে কুশিকপুত্রগণ! তোমরা অশ্বের নিকট গমন কর। রক্ষীদিগকে সাবধান কর। ধনের জন্য সুদাস দিগ্বিজয় করিতে যাইতেছেন, তাঁহার অশ্ব মোচন কর। অথবা নিরাজন (আরতি) কর। ইন্দ্র পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তরের বিঘ্নকারী অসুরগণকে বিনাশ করুন। সুদাস দিগ্বিজয় করিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়া যজ্ঞভূমিতে বিশেষরূপে যজ্ঞ করিবেন।

লৌহ বর্ম্ম

রাজারা যুদ্ধের সময় লৌহ বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইতেন।

"জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্ বর্ম্মী যাতি সমদামুপস্থে।
অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং স ত্বা বর্ম্মণো মহিমা পিপর্ত্তু॥"

৬ম ৬ অমু ৭৫সূ ১ঋক্।

যুদ্ধ উপস্থিত হইলে এই রাজা বর্ম্মধারী হইয়া গমন করেন। তখন ইহাঁর রূপ মেঘের ন্যায় কাল দেখায়। হে রাজন্! তুমি অক্ষত শরীরে শত্রু জয় কর। তোমার বর্ম্মের শক্তি তোমাকে রক্ষা করুক।

প্রজাগণকে সৈন্য করণ ও চর্ম্মবর্ম্মে আচ্ছাদন

চেদীরাজ সমস্ত প্রজাকে সৈনিক করিয়া চর্ম্ম-নির্ম্মিত বর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া যুদ্ধ করিতেন।

"যো মে হিরণ্যসন্দৃশো রাজ্ঞো অসংহত।
অধস্পদা ইচ্চৈদ্যস্য কৃষ্টয় শ্চর্ম্মম্না অভিতো জনাঃ॥"

৮ম ১ অমু ৫সূ ৩৮ ঋক্।

চেদী রাজার প্রজারা সম্পূর্ণ বশীভূত ও যোদ্ধা। তাঁহার সৈনিকগণ চর্ম্মবর্ম্মে আচ্ছাদিত। তিনি আমাকে দশটী সোনার কান্তি রাজা সেবার্থ দান করিয়াছেন।

তূণীর পৃষ্ঠে বদ্ধ করিতেন

"বহ্বীনাং পিতা বহু রস্য পুত্রঃ শ্চিশ্চা কৃণোতি সমনা বগত্য।
ইষুধিঃ সঙ্কাঃ পৃতনাশ্চ সর্ব্বাঃ পৃষ্ঠে নিবদ্ধো জয়তি প্রসূতঃ॥"

৬ম ৬ অমু ৭৫সূ ৫ ঋক্।

তূণীরের বর্ণনা...তূণীর বহুবাণের রক্ষক। ইহার অনেক পুত্র। যুদ্ধে যাইয়া চিশ্ চিশ্ শব্দ করে। তূণীর পৃষ্ঠে বদ্ধ হইয়া বাণ প্রসব করতঃ সমস্ত শব্দকারী শত্রুসেনা জয় করে।

বাণ লৌহমুখ, বিষ-মাখান

শরের বাণমুখে লৌহ বসান। তাহাতে বিষ মাখাইয়া ব্যবহার করা হইত।

"আলক্তা যা রুরুশীর্ষ্ণ্যথো যস্যা অয়োমুখং।
ইদং পর্জন্যরেতস ইষ্বৈ দেব্যৈ বৃহন্নমঃ॥"

৬ম ৬ অমু ৭৫ সূ ১৫ ঋক্।

আমি সেই শরদেহ দেবী ইষুকে (বাণকে) বৃহৎ নমস্কার করি। যাহা বিষ-মাখান এবং যাহার অগ্রভাগ শত্রুনাশক ও লৌহময়।

বাণ মন্ত্রপূত

পায়ু ঋষি বাণকে মন্ত্রপূত করিয়া বলিতেছেন

"অবসৃষ্টা পরাবত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে।
গচ্ছা মিত্রান্ প্রপদ্যস্ব মামীষাং কঞ্চনোচ্ছিষঃ॥"

৬ম ৬ অমু ৭৫ সূ ১৬ ঋক্।

হে মন্ত্রপূত হিংসাকুশল বাণ! তুমি নিক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুমধ্যে পতিত হও; যাও, শত্রুকে প্রাপ্ত হও। শত্রুর কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিও না॥

ছিলায় হাত কাটিবার ভয়ে হাতে "দস্তানা" পরিতেন

বারম্বার ছিলার আকর্ষণে হাত কাটিবার ভয়ে হস্তাবরণ (দস্তানা) পরিতেন।

"অহিরিব ভোগৈঃ পর্য্যেতি বাহুং জ্যায়া হেতিং পরিবাধমানঃ।
হস্তঘ্নো বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্ পুমান্ পুমাংসং পরিপাতু বিশ্বতঃ॥"

৬ম ৬ অমু ৭৫ সূ ১৪ ঋক্।

সর্প যেমন খোলস দ্বারা আবৃত, সেইরূপ হস্তাবরণ (দস্তানা) ছিলায় হাত কাটিবার ভয়ে হস্তকে বেষ্টন করিয়া আছে। যেন পুরুষকারসম্পন্ন পুরুষ সমস্ত জানিয়া পুরুষকে সকল বিষয়ে রক্ষা করিতেছে॥

ছিলা চর্ম্ম নির্ম্মিত

ধনুকের ছিলা চর্ম্মে নির্ম্মিত হইত।

"গোভিঃ সংনদ্ধা পততি প্রসূতা॥"

৬ম ৬ অমু ৭৫ সূ ১১ ঋক্।

বাণ গোচর্ম্ম ছিলায় বদ্ধ হইয়া, নিক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুর মধ্যে পতিত হইতেছে॥

ক্যাঁচা অস্ত্র

ঋষিরা ক্যাঁচার ব্যবহার জানিতেন

"পরি-তৃন্ধি পণীনা মারয়া হৃদয়া কবে।
অথে মস্মভ্যং রন্ধয়॥" ৬ম ৫ অমু ৫৩ সূ ৫ ঋক্।

হে প্রাজ্ঞ পূষাদেব! বণিক্‌দিগের কঠিন হৃদয়কে ক্যাঁচা দ্বারা বিদ্ধ কর। তাহার পর আমাদের জন্য বশীভূত কর—তাহারা যেন আমাদিগকে দান করে॥

পরশু অস্ত্র

পরশু অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত।

"অলায্যস্য পরশু র্ননাশ ত মাপবস্ব দেব সোম।
আখুং চিদেব দেব সোম॥" ৯ম ৩ অমু ৬৭ সূ ৩০ ঋক্।

ভরদ্বাজ ঋষি সোমের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—হে সোম! শত্রুর পরশু শত্রুকেই বিনাশ করুক। আমি অপাপী আমাদিগকে যেন নাশ না করে। হে স্তুত্য সোম! সেই শত্রু সকলের বিনাশক, তাহাকে পীড়া দাও। আমাদের নিকট আগমন কর।

যুদ্ধে অশ্বও শত্রু নাশ করিত

যুদ্ধের সময় সুশিক্ষিত অশ্বও শত্রুনাশ করিত

"তীব্রান্ ঘোষান্ কৃণ্বতে বৃষপাণয়োঽশ্বা রথেভিঃ সহ বাজয়ন্তঃ।
অবক্রামন্তঃ প্রপদৈ রমিত্রান্ ক্ষিণন্তি শত্রূঁ রনপব্যয়ন্তঃ॥"

৬ম ৬ অনু ৭৫ সূ ৭ ঋক্।

অস্ত্য ঋষি তাহার অশ্বগণের প্রশংসা করিতেছেন। যুদ্ধে অশ্বগণ খুর দ্বারা ধূলি বর্ষণ করিয়া রথ লইয়া দ্রুতগমন করতঃ ভয়ানক শব্দ করিয়া থাকে। এবং পলায়ন না করিয়া হিংস্রক শত্রুদিগকে মাড়াইয়া বিনাশ করে॥

মহিষীর যুদ্ধ

মুদ্গল রাজার পত্নী মুদ্গলানী স্বামীর সাহায্যার্থে গরুর গাড়ি লইয়া যুদ্ধে গমন করেন। ইঁহার স্বামী মুদ্গল গদাযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। ইনি ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করিতেন। এই যুদ্ধে মুদ্গলানী সেনাপতির কার্য্য করেন। ইঁহাদের সহিত পতাকাবাহী সৈন্য ছিল। এই যুদ্ধের কারণ দস্যুরা মুদ্গলের গরুগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়॥

"উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রম্।
রথী রভূন্ মুদ্গলানী গবিষ্টৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা॥"

১০ম ৯ অনু ১০২ সূ ২ ঋক্।

দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত গরুর অন্বেষণে মুদ্গলের পত্নী ইঁহার রথচালক হইয়াছিলেন। সহস্রবার শত্রু জয় করিয়া পরিশ্রম দূর করিবার জন্য রথে অঞ্চল দ্বারা বাতাস খাইয়াছিলেন অথবা রথ দ্রুত চলায় তাঁহার আঁচল বাতাসে দুলিতেছিল। এই যুদ্ধে ইন্দ্রভক্ত মুদ্গলানী সেনাপতি হইয়া শত্রু হইতে গরুগুলিকে পৃথক করিয়া আনয়ন করেন॥

মুদ্গল স্ত্রীর প্রশংসা করিতেছেন···

"পরিবৃক্তেব পতিবিদ্য মানট্ পীপ্যানা কূচক্রেণেব সিঞ্চন্।
এষৈষ্যাচিদ্রথ্যা জয়েম সুমঙ্গলং সিনবদস্তু সাতম্॥"

১০ম ৯ অনু ১০২ সূ ১১ ঋক্।

বিরহিনী পতির নিকট যাইয়া যেমন সুখী হয়, মুদ্গলানী সেইরূপ পতির সারথ্য করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। বর্ষণ সময়ে মেঘের ন্যায় মুদ্গলানী শত্রু মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শত্রুরা তাঁহার বাণবর্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে বহু স্থানে অবস্থিত মনে করিয়াছিল। মুদ্গলানীর সারথ্যেই আমি গরুগুলি জয় করিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছি। আমার এই অন্নস্বরূপ গোধন মঙ্গলযুক্ত হউক॥"

যুদ্ধে ধ্বজাধারী সৈন্য

এই মুদ্গলে যুদ্ধে ধ্বজাধারী সৈন্যের ব্যবহার দেখা যায়।

"অস্মাক মিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষস্মাকং যা ইষব স্তা জয়ন্তু।
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাঁউ দেবা অবতা হবেষু॥"

১০ম ৯ অনু ১০৩ সূ ১১ ঋক্।

মুদ্গলানীর প্রার্থনা—ধ্বজাবাহী সৈন্য যুদ্ধ গমন করিলে ইন্দ্র আমাদের সহায় হউন। বাণগুলি যুদ্ধ জয় করুক। আমাদের সৈন্য শ্রেষ্ঠ হউক, জয়ী হউক। এই যুদ্ধে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মুদ্গলানী যুদ্ধে গো গাড়ি ব্যবহার করিতেন।

"ককর্দবে বৃষভো যুক্ত আসীদবাবচীৎ সারথিরস্য কেশী।
দুধের্যুক্তস্য দ্রবতঃ সহানস ঋচ্ছন্তি ষ্মা নিষ্পদো মুদ্গলানীম্॥"

১০ম ৯ অনু ১০২ সূ ৬ ঋক্।

মুদ্গল রাজা যুদ্ধের পরিচয় দিতেছেন শত্রুবধের জন্য গাড়িতে ষাঁড় যোতা হইল। সারথি রাশ ধরিয়া শত্রুর ভয়জনক শব্দ করিতে লাগিল। বৃষভ শকট লইয়া শত্রু মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন দুর্দ্ধর্ষ বৃষভের শব্দে যোদ্ধাগণ মুদ্গলানীর দিকে আসিয়া যুটল॥

একযোগে যুদ্ধ করিতে উপদেশ

মুদ্গলানী সৈনিকদিগকে একযোগে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিতেছেন

"গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্ত মোজসা।
ইমং সজাতা অনুবীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনুসংরভধ্বম্॥"

১০ম ৯ অনু ১০৩ সূ ৬ ঋক্।

হে সমবয়স্ক বন্ধুগণ! তোমরা মেঘ বিদারক, জলপ্রাপক, যুদ্ধজয়ী, বজ্রহস্ত, বিক্রমী ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধ কর। হে বন্ধুগণ! তোমরা মিলিত হইয়া একযোগে ইন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভীষণভাবে শত্রুকে আক্রমণ কর॥

সম্রাট ছিল

রাজসূয়যাজী সম্রাট ছিল।

"দ্বয়াঁ অগ্নে রথিনো বিংশতিং গা বধূমতো মঘবা মহ্যং সম্রাট্।
অভ্যাবর্ত্তী চায়মানো দদাতি দূর্নাশেয়ং দক্ষিণা পার্থবানাম্॥"

৬ম ৩ অনু ২৭ সূ ৮ ঋক্।

ভরদ্বাজ ঋষি সম্রাট্ অভ্যাবর্ত্তী কর্ত্তৃক দত্ত ধনের পরিচয় দিতেছেন—হে অগ্নে! রাজসূয়যাজী চয়নপুত্র অভ্যাবর্ত্তী নামক সম্রাট্ আমাকে কুড়িটা গো-যুগল ও স্ত্রী সহিত রথ দক্ষিণা দিয়াছেন। এই দক্ষিণা কেহ কখন অতিক্রম করিতে পারিবে না—এমন দক্ষিণা কেহ দিতে পারে না।

চর

রাজারা প্রজার কার্য্য দেখিবার জন্য গুপ্তচর রাখিতেন।

"অন্ত হ্যগ্ন ঈয়সে বিদ্বাঞ্জন্মোভয়া কবে।
দূতো জন্যেব মিত্র্যঃ॥" ২ম ১ অনু ৬ সূ ২ ঋক্।

ভার্গব ঋষি অগ্নির স্তব করিতেছেন—হে অগ্নে! রাজ-নিযুক্ত চর

যেমন প্রজার মন জানিবার জন্য বন্ধুর ও লোকের মঙ্গল করত বিচরণ করে, সেইরূপ তুমি যজমান ও দেবতার হিতকর হইয়া সমস্ত জানিবার জন্য লোক হৃদয়ে বিচরণ করিয়া থাক ॥

রাজারা বিলাসী ছিলেন

যুবতীরা যুবরাজকে অলঙ্কৃত করিত।

"ত মস্মেরা যুবতয়ো যুবানং মর্মৃজ্যমানাঃ পরিযন্ত্যাপঃ।
স শুক্রেভিঃ শিক্বভীরেব দস্মে দীদায়ানিধ্মো ঘৃত নির্নিগপ্সু॥"

২ম ৪ অনু ৩ সূ ৪ ঋক্।

গৃৎসমদ ঋষি অগ্নির বর্ণনা করিতেছেন—অহঙ্কারশূন্য যুবতীরা যেমন যুবরাজকে অলঙ্কৃত করে, সেইরূপ মন্ত্রপূত জলধারা অগ্নিকে পরিশুদ্ধ করিয়া বেষ্টন করিতেছে। সেই পরিশুদ্ধ নির্মল অগ্নি মেঘ বা সমুদ্রে কাষ্ঠ রহিত হইয়াও আমাদিগকে ধনদান করতঃ নির্মল তেজে দীপ্তি পাইতেছেন।

বার্দ্ধক্যে বনবাস

কোন কোন রাজা বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতেন।

"এষ ক্ষেতি রথবীতির্মঘবা গোমতিরনু।
পর্ব্বতেষপশ্রিতঃ॥"

৫ম ৫ অনু ৬১ সূ ১৯ ঋক্।

শ্যাবাশ্ব ঋষি আর্ষ-চক্ষুতে দেখিয়া বলিতেছেন - এই রথবীতি রাজা ধনবান্। ইনি কন্যা দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রমণীয় হিমালয় প্রদেশে নদীতীরে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন।

গৌড়ীয় পাল-সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল?

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল্

অধুনা গৌড়দেশবাসিগণ অসামরিক জাতি ও স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; কিন্তু পূর্ব্বকালে তাহাদের খ্যাতি অন্যরূপ ছিল। বঙ্গাব্দের (গৌড়াব্দের) প্রারম্ভে মহারাজাধিরাজ গৌড়পতি শশাঙ্কদেবের নেতৃত্বে তাহাদের সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বিফল হইলেও, খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষ ভাগে পালবংশীয় সম্রাটগণের নেতৃত্বে তাঁহাদের ক্ষমতা যে সমগ্র ভারতবর্ষে দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছিল, সমসাময়িক লিপি প্রমাণে তাহা স্পষ্টরূপেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পালরাজগণ তাঁহাদের তাম্রশাসনসমূহে নিজদিগকে "গৌড়েশ্বর" বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন; এবং এই পাল গৌড়েশ্বরগণের শাসন কালেই আজ হইতে সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে গৌড়বাসিগণ যে এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী ও বহু-বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বিশিষ্ট শিল্প ও রচনারীতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কৃপায় এক্ষণে আর কাহারও অবিদিত নাই। ধর্ম্মপাল দেবের খালিমপুর লিপি হইতে জানিতে পারি যে, মাৎস্য ন্যায় হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিবার জন্য গৌড়ীয় প্রকৃতিপুঞ্জ মিলিত হইয়া এই বংশীয় প্রথম নরপতি গোপাল দেবকে গৌড় রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়াছিল এবং তিনি সাগরোপকূল পর্য্যন্ত প্রদেশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার এই পালরাজবংশের মন্ত্রীবংশধর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, এই রাজবংশের দ্বিতীয় নরপতি ধর্ম্মপালদেব ভোজ, মৎস্য (পঞ্চাল), মদ্র, কুরু (দিল্লী), যদু (গুজরাট্), যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি জনপদের নরপালগণকে জয় করিয়াছিলেন, এবং তৃতীয় নরপতি দেবপালদেব দ্রাবিড়নাথ ও গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণীকৃত, উৎকলপতিকে পরাজিত, হূণগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত, এবং কাম্বোজগণকে ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতিকে পরাভূত করিয়াছিলেন; এবং হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ও বরুণ-নিকেতন [পশ্চিম সমুদ্র] হইতে লক্ষ্মীর জন্ম-নিকেতন ক্ষীরোদ সমুদ্র [পূর্ব্ব সমুদ্র] পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৌড়ের এই প্রসিদ্ধ রাজবংশে আঠারজন রাজার নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অনুমান খৃষ্টীয় ৭৭৫ অব্দ হইতে ১১৪১ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৬৭ বৎসর কাল গৌড়েশ্বর থাকিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যদিও গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে গৌড়বাসিগণের পূর্ব্বোক্ত অভ্যুদয়-কাহিনী সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছে, এবং আবিষ্কৃত নানা তাম্রশাসন ও শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে এই গৌড়েশ্বরগণের নাম, বংশপরিচয় ও কীর্ত্তিকাহিনীর সামান্য আভাষ পাওয়া যাইতেছে, তথাপি সমসাময়িক লিখিত ইতিহাসের অভাবে এই দীর্ঘকালস্থায়ী গৌরব-মণ্ডিত গৌড়-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের বিস্তৃত বিবরণ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। এমন কি, যে রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া গৌড়বাসীগণের পক্ষে এই সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল, পালরাজগণের সেই সৌভাগ্যশালী রাজধানীই বা কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহাও আমরা অবগত নহি। তাই আমাদিগকে কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এই সমস্ত গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে হয়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে পালরাজগণের রাজধানী কোথায়, কেবলমাত্র এই প্রশ্নেরই সমাধান করিতে চেষ্টা করিব।

এ পর্য্যন্ত পালরাজগণের যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনখানি "পাটলীপুত্র সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার" হইতে, কোনখানি "শ্রীমুদ্গগিরি সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার" হইতে, কোনখানি "বিলাসপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার" হইতে, কোনখানি "শ্রীরামাবতী নগর পরিসর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার" হইতে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ঐ সকল তাম্রশাসনে লিখিত আছে। 'জয়স্কন্ধাবার' শব্দের সাধারণ অর্থ 'শিবির' (Victorious Camp)। সুতরাং কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, পালরাজগণের কোন নির্দ্দিষ্ট মূল রাজধানী ছিল না—তাঁহারা দিগ্বিজয় উপলক্ষ করিয়া শিবিরে শিবিরেই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু পাল-সাম্রাজ্যের ন্যায় একটী বিশাল সাম্রাজ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট শাসন-কেন্দ্র বা রাজধানী ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্তের বিশেষ কোন মূল্য দেওয়া চলে না। হয় ত, পরবর্ত্তীকালে পাটলীপুত্র, মুদ্গগিরি ও বিলাসপুর জয়ের সঙ্গে তথায় পালরাজগণ প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করিয়া থাকিতেও পারেন; কিন্তু যে

রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া পালরাজগণ তাঁহাদের গৌড় সাম্রাজ্যের পরিধি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই মূল রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পালসম্রাটগণ নিজদিগকে গৌড়েশ্বর বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষ পাদ হইতে দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই গৌড়েশ্বরত্ব নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পাল-সাম্রাজ্যের সমসাময়িক খৃষ্টীয় একাদশ শতকের (১) কোষকার পুরুষোত্তম দেব তাঁহার ত্রিকাণ্ডশেষ নামক কোষগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গৌড়দেশ, বরেন্দ্রীদেশ ও পুণ্ড্রদেশ সমানার্থ প্রকাশক - যথা "পুণ্ড্রাঃ স্যুঃ বরেন্দ্রী গৌড় নিবৃতি"। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেকালে গৌড়দেশ বা পুণ্ড্রদেশ বলিলে মুখ্যতঃ বরেন্দ্রী দেশকেই বুঝাইত, এবং পালরাজগণের অভ্যুদয় এই বরেন্দ্রী দেশে হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা নিজদিগকে গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত করিতেন। প্রসিদ্ধ কবি সন্ধ্যাকর নন্দী খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে গৌড়েশ্বর মদনপাল দেবের সময় বর্ত্তমান ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার সভা-কবি ছিলেন। কারণ, তিনি তাঁহার 'রামচরিতম্' কাব্যে মদনপাল দেবকে "চিরং রাজ্যং কুরুতাম্" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এই সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' কাব্য হইতেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমান সমর্থিত হয়। উক্ত কাব্যে ও কুমার পালদেবের মন্ত্রী [পরে প্রাগ্জ্যোতিষাধিপ] বৈদ্য দেবের কমৌলি লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে রামপালদেব তাঁহার "জনকভূ" (পিতৃভূমি) ভীম নামক কৈবর্ত্ত নায়কের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করেন।

"রাম চরিতম্"এর টীকায় "জনকভূঃ" শব্দকে বরেন্দ্রী দেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে বরেন্দ্রী দেশই পালরাজগণের পিতৃভূমি ছিল এবং এইখানেই তাহাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং এই বরেন্দ্রী বা গৌড় দেশকে ও তন্মধ্যস্থ কোন রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়াই প্রাথমিক পালরাজগণ গৌড় সামাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের এই নির্দ্ধারণ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বরেন্দ্রীদেশের মধ্যেই পাল গৌড়েশ্বরগণের পূর্ব্বোক্ত রাজধানীর অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পাটলীপুত্র, মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) ও বিলাসপুর গৌড়দেশের বাহিরে অবস্থিত এবং উহাদিগকে জয়স্কন্ধাবার বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং পাল সাম্রাজ্যের পূর্ব্বোক্ত রাজধানী ঐ সকল স্থানে অবস্থিত ছিল বলা সঙ্গত হইবে না। সন্ধ্যাকরের "রাম চরিতম্"এ লিখিত আছে যে রামপালদেব তাঁহার জনকভূঃ উদ্ধার করিবার পর রামাবতী নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রামপালের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাথমিক পালরাজগণের সময় পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুতরাং রামাবতী নগরকেও পাল সাম্রাজ্যের মূল রাজধানী বলা চলে না। সুখের বিষয় সন্ধ্যাকর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কাব্যে নিজ "কুলস্থানের" পরিচয় প্রসঙ্গে পাল গৌড়েশ্বরগণের এই রাজধানীর একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"বসুধা শিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণিঃ কুলস্থানম্।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন পুর প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আমি এইরূপভাবে করিতে চাই—"কুলস্থান। কিম্ভূতঃ ? অত আহ বসুধা শিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণিঃ (বসুধা-শির স্বরূপং যৎ বরেন্দ্রীমণ্ডলং তস্য যা চূড়া তত্র প্রতিবদ্ধঃ মণিঃ) ইব। সঃ মণিঃ কুত্র প্রতিবদ্ধ ? শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন পুর প্রতিবদ্ধঃ (সম্বদ্ধঃ)। সঃ পুনঃ কিম্ভূতঃ ? পুণ্যভূঃ !

পুনঃ কিম্ভূতঃ ? বৃহদ্বটুঃ (বৃহন্তঃ প্রধানাঃ বটবঃ দ্বিজাঃযত্র) অর্থাৎ বরেন্দ্রীমণ্ডল বসুধার শীর্ষ স্বরূপ। এই বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়া স্বরূপ যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধ বর্দ্ধনপুর, [সন্ধ্যাকরের] কুলস্থান, সেই চূড়ায় প্রতিবদ্ধমণি স্বরূপ ; এবং তাহা পুণ্যভূমি ও শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণের আবাস ভূমি।

এস্থলে সন্ধ্যাকর বরেন্দ্রীমণ্ডলকে বসুধার শিরঃ এবং শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-পুরকে বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই বর্ণনার সার্থকতা কি ? সন্ধ্যাকর বরেন্দ্রীমণ্ডলকে বসুধার শিরঃ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন কেন ? এবং শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরকে বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়া স্বরূপ বলিতেছেন কেন ? আমার মনে হয় বরেন্দ্রীমণ্ডল পালরাজগণের "জনকভূঃ" বলিয়াই পালরাজ মদনপালদেবের সভাকবি সন্ধ্যাকর বরেন্দ্রীমণ্ডলকে বসুধার শিরোরূপে এবং বরেন্দ্রীর অন্তর্গত শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-পুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল বলিয়াই শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরকে বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়ারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সন্ধ্যাকরের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি কহ্লনমিশ্রের উক্তি হইতেও আমাদের এই মত সমর্থিত হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে বিরচিত উক্ত কহ্লনমিশ্রের রাজতরঙ্গিণীতে এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরকে "গৌড়রাজাশ্রয়" বলিয়া স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে। যথা

"গৌড় রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা।
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনং॥

(রাজতরঙ্গিণী ৪।৪২১)

এখানে "গৌড় রাজাশ্রয়" শব্দের সহজ অর্থ "গৌড়রাজ বা গৌড়েশ্বরের আশ্রয় বা রাজধানী"। সুতরাং কবি সন্ধ্যাকর ও কবি কহ্লনের উক্তি একত্র আলোচনা করিয়া এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে পাল-গৌড়েশ্বরগণের রাজধানী বরেন্দ্রীমণ্ডলের বা পৌণ্ড্রদেশের অন্তর্গত শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরে অবস্থিত ছিল। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের অস্তিত্ব ও খ্যাতি বহু প্রাচীনকাল হইতেই বর্ত্তমান আছে। ১৫৯ গুপ্তাব্দে (৪৭৯ খৃঃ) সম্রাট বুধগুপ্তের শাসনকালের একখানি তাম্রশাসন পাহাড়পুর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত তাম্রশাসনখানি এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর হইতেই প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম

(১) সর্ব্বানন্দ ১০৮১শকে (১১৫৯ খৃঃ) অমরকোষের "টীকা সর্ব্বস্ব" রচনা করেন। উক্ত টীকা সর্ব্বস্বে" তিনি পুরুষোত্তম দেবের ত্রিকাণ্ডশেষ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন (Trivendram Edition)। সুতরাং পুরুষোত্তমকে খৃষ্টীয় একাদশ শতকের গ্রন্থকার বলা চলে।

শতকে চীনা পরিব্রাজক যু-অন-চুয়ঙ এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই রাজ্য ও রাজধানীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অদ্যাপি মতদ্বৈধ চলিতেছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে নানা প্রবন্ধে ও মৎপ্রণীত "বগুড়ার ইতিহাসে" আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বগুড়া জেলার অন্তর্গত 'মহাস্থানগড়' ও তাহার চতুপার্শ্ববর্ত্তী ধ্বংসাবশেষপূর্ণ স্থান ব্যাপিয়া এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে মহাস্থানগড়ের খনন আরম্ভ হইয়াছে। আশা করি এই খননের ফলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের অবস্থিতি সম্বন্ধীয় গুরুতর প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে।

হিন্দুর পৌত্তলিকতা

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্

মুখবন্ধ

শ্রীমদ্ভগবতী গীতায় পর্ব্বতরাজ হিমালয় তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীকে এক স্থলে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন—হে শিবে! রাগদ্বেষাদি মানুষে পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? লোকে অপকার করিলে তাহা কি সহ্য করা যায়? না, লোকে উপকার করিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকা যায়? উত্তরে পার্ব্বতী বলিলেন যে, মানুষ নিজ স্বরূপ অবগত হইলেই দ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া সুখী হয়; কেন না, বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া দ্বারা অভিভূত জীবাত্মাই সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান বিচার পূর্ব্বক মোহ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবে। (শ্রীমদ্ভগবতী গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৯, ১০, ১৫, ১৯, ২৬ শ্লোক।) দৈত্য দানব কর্ত্তৃক প্রতিমা ভঙ্গ ও মন্দিরাদি অপবিত্র করণের এই দুর্দ্দিনে পার্ব্বতীর এই মহৎ উপদেশানুযায়ী কার্য্য করা কতদূর সম্ভব তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হিন্দুর পৌত্তলিকতা বা প্রতিমা-পূজা কখন, কিরূপে এবং কেনই বা আরব্ধ হইয়াছিল এই বিষয়ে আলোচনা বা অনুসন্ধান করা বোধ হয় নিতান্ত অসাময়িক হইবে না। প্রতিমা পূজা করা ভাল কি মন্দ অথবা সাকার বা নিরাকার উপাসনার তত্ত্ব-বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুর প্রতিমা পূজার কারণানুসন্ধান ও আরম্ভ কাল নির্ণয় এবং সে বিষয়ে ইতিহাসের কি সাক্ষ্য, ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। হিন্দুর প্রাচীন প্রতিমাদির আনুপূর্ব্বিক বিবরণ (iconography) ভারত গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং বিষয়টী নিতান্ত সহজ নহে। আমার প্রত্নতত্ত্বে পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্র-জ্ঞান নাই। এ অবস্থায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা দুঃসাহসিকের কার্য্য সন্দেহ নাই। মানুষের যখন হস্ত-কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়, তখন লিখিবার বলবতী স্পৃহাকে দমন করিয়া রাখা দুঃসাধ্য। গল্প, উপন্যাস ও কবিতা-প্লাবিত এই বঙ্গদেশে আমাকে লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, গল্প ইত্যাদি লেখার প্রতিভা আমার নাই। এই সামান্য প্রবন্ধ রচনার ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

ভারতবর্ষের প্রাথমিক ইতিহাস

ভারতবর্ষের প্রাথমিক ইতিহাস সাধারণতঃ তিনটী যুগে বিভাগ করা হইয়া থাকে—প্রথম বৈদিক যুগ, দ্বিতীয় বৌদ্ধযুগ, তৃতীয় পৌরাণিক যুগ। ইহার মধ্যে প্রথমটিকে ঐতিহাসিকেরা প্রাগৈতিহাসিক (pre-historic) যুগ বলিয়া থাকেন; কারণ, বুদ্ধদেবের সময়ের পূর্ব্বে একটীও নিশ্চিত তারিখ ভারতেতিহাসে পাওয়া যায় না; এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজনৈতিক ঘটনা, যাহার সম্বন্ধে প্রায় সঠিক তারিখ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সেটী হইতেছে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৪২ অব্দে মগধের সিংহাসনে শিশুনাগ বা শৈশুনাগ রাজবংশের অধিষ্ঠান। মোটামুটী ঐ তিন যুগের কাল নির্ণয় এইভাবে করা হয়। খৃঃ পূঃ ২০০০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত বৈদিক যুগ, খৃঃ পূঃ ৬০০ হইতে খৃষ্টাব্দ ৫০০ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ যুগ, ও খৃষ্টাব্দ ৫০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত পৌরাণিক যুগ। এই তিনটী যুগেই রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর সামাজিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। হিন্দুর জাতীয় বা রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত হিন্দুর ধর্ম্মেতিহাস অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রতিমা-পূজা কোন্ সময়ে এবং কিরূপে আরম্ভ হইল তাহা জানিতে হইলে ভারতবর্ষের প্রাথমিক ইতিহাস (early history) অর্থাৎ উপরিউক্ত তিন যুগের ইতিহাসের সাহায্য লইতে হইবে। এই তিন যুগের ঐতিহাসিক ঘটনার সংগ্রহ-স্থল (Sources) ঐতিহাসিকেরা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—(১) বেদ ও উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি; (২) শিলালিপি (inscriptions), শৈলানুশাসন (rock-edicts), প্রাচীন মুদ্রা (old coins) প্রভৃতি; (৩) জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শাস্ত্র-গ্রন্থ; (৪) ভারতে বৈদেশিক আগন্তুকগণ কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণ, যথা গ্রীক্ ও চৈনিক পরিব্রাজকগণের বিবরণ; (৫) হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ পুরাণাদি, ও সাহিত্য। এতগুলি বিষয় হইতে ঐতিহাসিকেরা বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের প্রাথমিক ইতিহাসের ঘটনাবলী কতক কতক সংগ্রহ করিয়া একত্রে গ্রথিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হিন্দুর প্রতিমা পূজার ইতিহাস জানিতে হইলে উপরিউক্ত কয়েকটী সংগ্রহ-স্থলের (sources) অবস্থা ও বিষয়ভেদে যথাসম্ভব সাহায্য লইতে হইবে। এই সংগ্রহ করার ব্যাপার নিতান্ত সামান্য নহে। তবে ঐতিহাসিকেরা অনেক সময়ে সামাজিক অবস্থার বিবরণ উপলক্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথার যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয় অনেকটা সুগম হইয়াছে বলিতে হইবে।

ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের প্রাথমিক ইতিহাস সম্বন্ধে দুই একটী কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। তাঁহারা এইরূপ বলেন—(১) খৃঃ পূঃ ৬০০ হইতে খৃষ্টাব্দ ৮০০ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সুদূর দক্ষিণ প্রদেশের রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে অল্পই জানা যায়; সুতরাং ভারতের প্রাথমিক ইতিহাস বলিলে উত্তর-প্রদেশের

ইতিহাসই বুঝায়। (২) কুশান ও অন্ধ্র রাজত্বের অবসান (খৃষ্টাব্দ ২২০ বা ২৩০) এবং এক শত বৎসর পরে গুপ্তবংশীয় রাজত্বের অভ্যুত্থান—এই মধ্যবর্ত্তী সময়টী তমসাচ্ছন্ন, এ সময়কার কোনও—ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায় না। (৩) খৃষ্টাব্দ ৬৫০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত এই সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা অতি অল্পই অবগত হওয়া যায়।

উপরিউক্ত কারণ বশতঃ ভারতের ইতিহাসে যে অভাব বা দোষ দৃষ্ট হয়, এই প্রবন্ধও সেই দোষে দুষ্ট বলিয়া অনুমিত হইবে তাহা বিচিত্র কি? কি করিব, উপায়ান্তর নাই, কারণ আমার বিদ্যা বুদ্ধি সামান্য, ইংরাজ লেখকদিগের সহায়তা ভিন্ন এইরূপ দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব।

হিন্দুর দেব-দেবী

হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। সুতরাং হিন্দুর নিকট তাহাদের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুর দেবায়তন (pantheon) কিরূপ অসংখ্য দেবতাপূর্ণ হইয়াছে তাহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। এই অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি হিন্দু কল্পনা করিয়াছেন। এই মূর্ত্তির অধিকাংশই মনুষ্যমূর্ত্তির পুরুষ বা স্ত্রীর অনুরূপ। তবে কোন কোনও স্থলে ভগবানের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য হস্ত অথবা মুখ, মস্তকাদির সংখ্যাধিক্য কল্পনা করা হইয়াছে। মনুষ্যমূর্ত্তির অনুরূপ এই প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিমাকে ভগবানের ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশমান রূপ বলা হয়; এবং লিঙ্গ, শালগ্রাম প্রভৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়, কেন না, লিঙ্গ ও শালগ্রামে প্রতিমার পরিবর্ত্তে ভগবানের চিহ্ন (লিঙ্গ কথাটীর প্রকৃত অর্থ হইতেছে চিহ্ন) মাত্র কল্পনা করা হয়।

প্রতিমা বা চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হিন্দু এইরূপ বলিয়া থাকেন—

"অনাধারে ধারণা নোপপদ্যতে" (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৭৮)

পুনশ্চ

"চিন্ময়স্য অদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্য অশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা ॥"

(স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কর্ত্তৃক উদ্ধৃত তন্ত্র-বচন।

রূপকল্পনার অর্থ স্মার্ত্ত এইরূপ বুঝিয়াছেন—"রূপকল্পনা রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদি কল্পনা" (দেব-প্রতিষ্ঠাতত্ত্বম্)। প্রথমে হয় ত প্রতিমাদি পটে বা ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত হইত, অথবা শালগ্রাম মাত্রই পূজিত হইত—"কুড্যে লেখ্যে চ মে কশ্চিৎ পটে কশ্চিচ্চ মানবঃ। পূজয়েদ্ যদি বা চক্রে মম তেজোহংশ সম্ভবে॥ (স্মার্ত্ত কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বরাহপুরাণের বচন)। তৎপরে হয় ত কাষ্ঠ, প্রস্তর, ও ধাতুনির্ম্মিত প্রতিমা কল্পিত হইয়াছিল—"সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী তথা। শৈলদারুময়ী বাপি লৌহশঙ্খময়ী তথা। রীতিকা ধাতুযুক্তাচ তাম্রকাংস্যময়ী তথা। শুভদারুময়ী বাপি দেবতার্চ্চা প্রশস্যতে"॥ (স্মার্ত্ত কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মৎস্যপুরাণের বচন)। ক্রমশঃ প্রতিমা-গঠন প্রণালী, প্রতিমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাণ ও প্রতিমা বা দেবতা-প্রতিষ্ঠার নিয়মাদি স্থিরীকৃত হইল। প্রতিমা-লক্ষণ সম্বন্ধে মৎস্য-পুরাণ অথবা নিম্নলিখিত পুস্তকগানি দেখা যাইতে পারে—"Elements of Hindu Iconography." By T. A. Gopinatha Rao. Madras. (1914) Vol. I. Part II Appendix C, এবং Vol. II. Part II. Appendix B; এবং দেবতা-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত "দেব-প্রতিষ্ঠা-তত্ত্বম্" বিখ্যাত গ্রন্থ। হিন্দু দেবদেবীর বর্ণমালানুসারে তালিকা দেখিতে ইচ্ছা করিলে এই পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য—"Antiquities of India.' By Lionel D. Barnett. (1913). Appendix I. p 18.

ঋগ্বেদ ও প্রতিমা-পূজা

বৈদিক যুগে প্রতিমা-পূজা হইত কি না এই বিষয় অবধাবণ করিতে হইলে আমাদিগকে যথাক্রমে নিম্নলিখিত গ্রন্থাদিতে ঐরূপ পূজার কথা আছে কি না দেখিতে হইবে; এবং যদি থাকে, তাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, তাহাও স্থির করিতে হইবে—ঋগ্বেদ ও অন্যান্য বেদ; বৈদিক সাহিত্য—ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, সূত্র ইত্যাদি; মহাকাব্য অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত; দর্শনশাস্ত্রাদি। কোন্ সময়ে প্রতিমা-পূজা আরব্ধ হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য এইরূপ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

বৈদিক যুগের প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের সময় প্রতিমা-পূজা হইত কি না? এই প্রশ্নের উত্তর ঋগ্বেদেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। পণ্ডিত Muir ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত সূক্তগুলির মধ্যে রুদ্রের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি, সুবর্ণ বর্ম্মযুক্ত বরুণ, এবং মরুত সকল ও তাহাদের প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে পার্থক্য, অনুমান করিয়া ঋগ্বেদের সময়ে প্রতিমা-পূজা হইত এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

স্থিরেভিরংগৈ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ন বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্যং ॥ ২।৩৩।৯
বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজং।
পরি স্পশো নি ষেদিরে ॥১।২৫।১৩
নূ মন্বান এষাং দেবাঁ অচ্ছা ন বক্ষণা।
দানা সচেত সূরিভির্যামশ্রুতেভিরংজিভিঃ ॥৫।৫২।১৫

Dr. Bollensen ঋগ্বেদে দেবতাগণের প্রতিমূর্ত্তির স্পষ্ট উল্লেখ দেখিয়াছেন। দেবতাগণের সাধারণ নাম দিবো-নরস্ বা নরস্ এবং নৃপেশসো (৩।৪।৫) হইতে অনুমান করিয়াছেন যে ঋগ্বেদের হিন্দুরা কেবল মনে মনে দেবতাগণের মূর্ত্তি কল্পনা করিতেন না, পরন্তু চাক্ষুষ মূর্ত্তিও গঠন করিতেন (Journal of the German Oriental Society, xxii, 587 ff)। অন্য একজন সুধী ঋগ্বেদের নিম্ন-লিখিত সূক্তে প্রতিমা-পূজা প্রমাণ করিয়াছেন—

ক ইমং দশভির্মমেন্দ্রং ক্রীণাতি ধেনুভিঃ।
যদা বৃত্রাণি জংঘনদথৈনং মে পুনর্দদৎ ॥৪।২৪।১০

দশধেনুর পরিবর্ত্তে কে আমার এই ইন্দ্র ক্রয় করিবে, বৃত্রগণকে বধ করিবার পর ক্রেতা আমার ইন্দ্র আমাকে প্রত্যর্পণ করিবে। জার্ম্মাণ পণ্ডিত Ludwigও ঋগ্বেদে প্রতিমা-পূজার সপক্ষে মত দিয়াছেন। অপর-

পক্ষে পণ্ডিতবর Max-Muller বলিয়াছেন যে ঋগ্বেদের যুগে প্রতিমা-পূজা হইত না (Chips from a German Workshop. I 35)।

মন্তব্য

পণ্ডিতগণের এইরূপ মতদ্বৈধ স্থলে আমার বক্তব্য এই ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি—

(১) প্রতিমা-পূজা বা প্রতিমার অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় উপরি উদ্ধৃত সূক্তগুলির সংখ্যা এত অল্প যে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। দশটী মণ্ডলে বিভক্ত বিশাল ঋগ্বেদের তুলনায় ঐগুলি সমুদ্রে পাত্তর্য্যের ন্যায়।

(২) জয়োৎফুল্ল ও হর্ষোৎফুল্ল ঋগ্বেদ কবির উপমাবহুল ভাষায় উপমাকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপরের ঐ সূক্তে দশ ধেনুর পরিবর্ত্তে ইন্দ্র-বিক্রেতা ফেরিওয়ালাকে বালকদের ক্রীড়নক (খেলার সামগ্রী) বিক্রেতা বলিয়াই মনে হয়। পুতুলের অস্তিত্ব থাকিলেই পুতুল-পূজা হইবে এরূপ যুক্তির সারবত্তা দেখি না।

(৩) ফরাসী পণ্ডিত A. Barthএর নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য :—"Each of the acts of the Vedic ritual is a complex whole, addressed to a great number of Gods, and if of any significance, however little, to the entire pantheon. These rites did not then admit of images; no more did they admit of holy places." (The Religions of India. By A. Barth Authorised translation by Rev. J. Wood London. (1882). p. 61.) অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রত্যেক ক্রিয়া জটিলতাপূর্ণ ও বহু দেবতার উদ্দেশে কথিত, এরূপ অবস্থায় প্রতিমা-পূজা বা তীর্থস্থান হওয়া অসম্ভব।

(৪) কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পৌত্তলিকতা ধর্ম্মচিন্তার পরিণতি, এমন কি ইহা অপেক্ষাকৃত অগ্রগামিতার পরিচায়ক—Idolatry is but a step in religious evolution, and that it even represents a comparative advance। জগতের যে সকল জাতির মধ্যে পৌত্তলিকতার অত্যধিক বাহুল্য দেখা যায়, যেমন মিশরবাসী (Egyptian), Chaldeans, Greeks,—এই সকল জাতি যখন সভ্যতায় ও শিল্পকলায় উন্নত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হইয়াছিল। আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের (aborigines) মধ্যে সুসভ্য Mexico, Peru, এবং Central America প্রদেশে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এই দুই মহাপ্রদেশের অসভ্য, বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে পৌত্তলিকতা দেখা যায় নাই। সেইরূপ, যাহারা সামাজিক, মানসিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতির প্রথম ধাপেও আসে নাই, এমন যে সকল অসভ্য জাতি যথা Bushmen, Hottentots, Fuegians, Eskimos, Akkas প্রভৃতি, তাহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা নাই। জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে জাপানের সিণ্টোধর্ম্মে পৌত্তলিকতা ছিল না; কারণ সে সময় জাপানীদিগের শিল্পকলা অতি অবনত অবস্থায় ছিল। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী পণ্ডিত Lafitau (Manners of American Savages. Paris. 1723) এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে অধিকাংশ অসভ্যজাতি পৌত্তলিক নহে। প্রাচীন Jews, Teutons, Romans প্রভৃতি জাতির অসভ্য অবস্থায় পৌত্তলিকতা ছিল না। অপর পক্ষে যে সকল জাতি ধর্ম্মচিন্তায় খুব উন্নত তাঁহাদের মধ্যেও পৌত্তলিকতা নাই। অত্যন্ত অসভ্য ও অতীব সভ্য এই দুই চরম অবস্থায় পৌত্তলিকতা নাই। এক্ষণে এই সত্যটী ঋগ্বেদ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে কিরূপ দাঁড়ায়? ঋগ্বেদের আর্য্যরা অসভ্য ছিলেন, না, সুসভ্য ছিলেন? আমি বলি তাঁহারা সুসভ্য ছিলেন; কিন্তু সেই সুসভ্যতার নিদর্শন উপরিউক্ত পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত পৌত্তলিকতা নহে। তাঁহারা সুসভ্য ছিলেন; কারণ, তাঁহাদের ধর্ম্ম-চিন্তা অতি উন্নত ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাঁহাদের সমুন্নত চিন্তাশীলতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নিম্নলিখিত মাত্র কয়েকটী সূক্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে—"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ" ইত্যাদি (১০।৮১।৩), "যো দেবানাং নামধা এক এব তং" ইত্যাদি (১০।৮২।৩), "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইত্যাদি (১০।৯০।১), "য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ" ইত্যাদি (১০।১২১।২), ও "ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব," "যো অস্যাধ্যক্ষঃ" ইত্যাদি (১০।১২৯।৭)। বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনরূপ যে উন্নত ও অত্যুচ্চ ধর্ম্মভাব ঋগ্বেদে দেখা যায় তাহাতেই মনে হয় ঋগ্বেদে পৌত্তলিকতা ছিল না। এরূপ উচ্চ ধর্ম্মচিন্তা হইবার একটী কারণ এই যে বহু শতাব্দীর পর ঋগ্বেদ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছিল। Max-Muller প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের সঙ্কলন কাল খৃঃ পূঃ ১২০০ অব্দের পূর্ব্বে দিতে ইচ্ছুক নহেন। ১৯০৩ সালে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ঋগ্বেদে জ্যোতিষিকগণের অবস্থানের, উষাস্তুতি, ও অন্যান্য যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ঋগ্বেদ খৃঃ পূঃ প্রায় ৮০০০ বৎসরের স্থির করিয়াছেন (The Arctic Home in the Vedas. Poona. 1903 P 463. ff)। তৎপরে ১৯০৯ সালে বিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত Hermann Jacobi (Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, pages 1095—1100) ঋগ্বেদের দুইটী সূক্তে সূর্য্য ও ফল্গুনী নক্ষত্রের একত্র অবস্থানের উল্লেখ দেখিয়া গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ঐরূপ সংযোগ খৃঃ পূঃ প্রায় ৪০০০ অব্দে ঘটিয়াছিল। ঋগ্বেদের ন্যায় এরূপ সুপ্রাচীন গ্রন্থে যে একেশ্বরবাদ দৃষ্ট হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? সসীম দেবতাকে অসীম ভাবে চিন্তা করার লক্ষণ উপরিউক্ত দশম মণ্ডলের সূক্তগুলিতে বেশ দেখা যায়। এইরূপ অসীম ভাবে চিন্তা করাও ধর্ম্মচিন্তার অগ্রসরত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। পণ্ডিতবর Otto Pfleiderer এইরূপ বলেন—"Certainly it was a step in the progress of the religious spirit that the Deity was no longer thought of as a finite object along with other objects, but that the thought of

infinitude, of opposition to worldly all limited existence, was taken up in earnest." (Philosophy and Development of Religion, Gifford Lectures for 1894. By Otto Pfleiderer. Vol I. P. 114)। উক্ত জার্ম্মাণ পণ্ডিত অবশ্য সাধারণভাবে ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার ঐ কথা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

(৫) পৌত্তলিকতার প্রমাণ স্বরূপ ঋগ্বেদের ঐ সূক্তগুলি যদি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহাতে কি আপত্তি উত্থিত হইতে পারে ? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তির কথা যে বিখ্যাত পুরুষ সূক্তে (১০।৯০) কথিত আছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত জ্ঞানে পাশ্চাত্য সুধিগণ Muir, Zimmer, Weber, প্রভৃতি, চতুর্ব্বর্ণের অস্তিত্ব ঋগ্বেদে অস্বীকার করিয়াছেন। অপর পক্ষে Geldner, Oldenberg, প্রভৃতি দৃঢ়তার সহিত ঋগ্বেদে বর্ণবিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই বিরুদ্ধ মতের কোন মতটী সমীচীন, তাহা স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, ঋগ্বেদের সময় বর্ণ-পার্থক্য থাকিবার আবশ্যকতা ছিল কি না। "বর্ণ" এই কথাটীতেই ঐ পার্থক্যের কথা স্বতঃই মানিয়া লইতে হয়। বিজেতা শ্বেতকায় আর্য্যদিগের সহিত বিজিত কৃষ্ণকায় আদিম নিবাসী অনার্য্যদিগের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যস্থলে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে অগ্রসর হইয়া আর্য্যরা যখন প্রভুত্ব স্থাপিত করিলেন, সেই সময়ে নানা কারণে অসংখ্য অনার্য্য কর্তৃক তাঁহাদের সভ্যতা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় ও অনার্য্যদিগের সহিত রক্তসংমিশ্রণ রোধ করিবার জন্য এইরূপ বর্ণ বিচারের একান্ত আবশ্যকতা হইয়াছিল (Antiquities of India. By Burnett. p 135 ; Cambridge History of India, vol I. P. 93)। তৎপরে আর্য্যদের নিজেদের মধ্যেও বর্ণ বিভাগ করিবার যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যেমন কতকগুলি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন (রাজ্যবিস্তৃতি বশতঃ ধনবৃদ্ধি হওয়ায় যজ্ঞ-ক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ আড়ম্বর-বহুল হইতে থাকিলে বিশেষজ্ঞের আবশ্যকতা হইল), সেইরূপ রাজ্যবিস্তারের জন্য ও বিজিত দেশে শান্তিরক্ষার জন্য একদল যোদ্ধার আবশ্যক হইয়াছিল। আবার নূতন রাজ্য লাভ করিলেই হইল না ; নবলব্ধ প্রদেশের কৃষি বাণিজ্যাদির দ্বারা (আধুনিক কালে যাহাকে শোষণ বা exploitation বলে) উন্নতি করিয়া ধনবৃদ্ধি করার জন্যও অপর কতকগুলি লোকের একান্ত প্রয়োজন ; কেন না, যাগ-যজ্ঞাদি ধন-সাপেক্ষ। এতদ্ব্যতিরিক্ত যাহারা রহিল তাহারা হয় যুদ্ধে ধৃত দাস-পদবাচ্য, নয় ত আর্য্য কর্তৃক বিজিত অনার্য্য, যাহারা আর্য্য রীতিনীতি কতক কতক নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিল ; কিন্তু বিজিত বলিয়া আর্য্যসেবা-রত হইয়া সমাজের নিম্নস্তরে রহিল। চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তির যেরূপ অনিবার্য্য কারণ ঋগ্বেদের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে সেরূপ কোনও প্রবল কারণ দেখা যায় না। অতএব প্রতিমা-পূজাসূচক ঋগ্বেদের সূক্তগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে ক্ষতি নাই।

ঋগ্বেদ ও লিঙ্গপূজা

এক্ষণে লিঙ্গপূজা সম্বন্ধে ঋগ্বেদ কি বলেন দেখা যাউক। ঋগ্বেদের দুইটী সূক্তে এইরূপ লিখিত আছে—

ন যাতব ইংদ্র জূজুবুর্নো ন বংদনা শবিষ্ঠ বেদ্যাভিঃ।
স শর্ধদর্যো বিষুণস্য জংতোর্মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতং নঃ ॥ ৭।২১।৫

স বাজং যাতাপদুষ্পদা সন্ত্স্বর্ষাতা পরিষদৎসনিষ্যন্।
অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি বর্পসা ভূৎ ॥ ১০।৯৯।৩

দুইটী সূক্তের একই দেবতা—ইন্দ্র। প্রথমোক্ত সূক্তের অর্থ এইরূপ—হে ইন্দ্র, কোনও মন্দ ভূতাদি আমাদিগকে উত্তেজিত করে নাই, কিম্বা, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, কোনও পিশাচাদি ও তাহাদের কৌশল (প্রয়োগ) করে নাই। আমাদের প্রকৃত ঈশ্বর ঐ শত্রুভাবাপন্ন অশিষ্ট জনগণকে দমন করুন, আমাদের পবিত্র যজ্ঞের নিকট ঐ অসৎপ্রবৃত্ত শিশ্নদেবেরা যেন আসিতে না পারে। দ্বিতীয় সূক্তের অর্থ এইরূপ—অতি মঙ্গলসূচক পথে তিনি যুদ্ধে যাইতেছেন ; স্বর্গের আলোক লাভের জন্য তিনি কষ্ট করিয়াছেন ; তিনি শতদ্বারযুক্ত দুর্গের ধনরত্নাদি বুদ্ধি কৌশলে অবাধে ধৃত করিয়াছেন এবং পৈশাচিক শিশ্নদেবদিগকে বধ করিয়াছেন। Dr. Muir ও Griffith—এই দুই জনের ইংরাজী অনুবাদের উহাই বঙ্গানুবাদ। ইঁহারা উভয়ে "শিশ্নদেবাঃ" কথাটী শিশ্নের যাহারা পূজা করে—এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বিখ্যাত টীকাকার সায়নাচার্য্য "শিশ্নদেবাঃ"র এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—'শিশ্নেন দীব্যংতি ক্রীড়ংত ইতি শিশ্নদেবাঃ। অব্রহ্মচর্য্যাঃ ইত্যর্থঃ।" (Vide Rig Veda with Sayana's Commentary edited by Max-Muller. Vol IV p. 7)। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গা প্রায় সায়নাচার্য্যের মতই অর্থ করিয়াছেন—'শিশ্নেন নিত্যমেব প্রকীর্ণাভিঃ স্ত্রীভিঃ সাকম্ ক্রীড়ন্তঃ আসতে শ্রৌতানি কর্ম্মাণি উৎসৃজ্য"—অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাহারা গণিকাদের সহিত শিশ্নের দ্বারা নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকে (Muir's Original Sanskrit Texts. Vol. IV, p 407. Second edition. 1873.)। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত সায়নাচার্য্যের মত অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণ এই অর্থ করিয়াছেন (রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ১৫৯৩ পৃঃ, ১৮৮৭ সাল)।

এক্ষণে যদি সায়নাচার্য্যের মত গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে ত বলিতে হয় যে ঋগ্বেদে লিঙ্গপূজা ছিল না। কিন্তু যদি ইংরাজ পণ্ডিতগণের মত প্রকৃত হয় তাহা হইলেও বলিতে হয় যে অন্ততঃ আর্য্যরা লিঙ্গপূজার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই যে যাহারা লিঙ্গপূজা করিত তাহাদের প্রতি (উদ্ধৃত ঐ দুইটী সূক্তে) অতীব ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের অন্যত্রও ইহাদিগকে "অকর্ম্মান্" "অদেবাযুঃ" "অনৃক" "অনীন্দ্র" "অন্যব্রত" "অপব্রত" "অব্রত" "অব্রহ্মান্" 'অযজ্ঞান্" এইরূপ নানা বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে।

এই কারণে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, ভারতের অনার্য্য আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল এবং অনার্য্যদিগের নিকট

হইতে আর্য্যরা পরিশেষে ঐ প্রথা গ্রহণ করিয়াছিলেন (Dr. Stevenson in the Journal of the Royal Asiatic Society, viii, p 330; Professor Lassen in the Indian Antiquary, i, 2nd edn, p. 924)। Dr. Muir কিন্তু এই মত গ্রহণে সম্মত নহেন। তিনি বলেন যে কথিত দুইটী সূক্তে "শিশ্নদেবাঃ" কথাটী রাক্ষস-দিগের সম্বন্ধেই সম্ভবতঃ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অসভ্য অনার্য্যদিগের প্রতিই ঐ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহা নিশ্চিতরূপে না জানিলে লিঙ্গ পূজার উৎপত্তিসূচক এই মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে (Muir's Original Sanskrit Texts, Vol. iv, p. 411, Second edition, 1873)। কিন্তু যাতবাঃ শব্দে যদি অনার্য্যদিগকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে তাহা হইলে কিরূপ অবস্থা দাঁড়ায়? বস্তুতঃ রাক্ষস ও অনার্য্য উভয়েই আর্য্যদিগের যজ্ঞস্থলে বিঘ্নোৎপাদক।

এক হিসাবে অসভ্য বর্ব্বরদিগের মধ্যেই লিঙ্গ পূজা প্রচলিত থাকা খুবই স্বাভাবিক, কেন না প্রকৃতির ফল, শস্য প্রভৃতির উৎপাদিকা-শক্তি অসভ্যেরা মনুষ্যের জনন-শক্তির সহিত তুলনা করিয়া উপলব্ধি করে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-বিদ্বেষী পণ্ডিচেরীর ফরাসী মিশনরি The Abbe J. A. Dubois যথার্থই বলিয়াছেন—"Without any doubt the obscene symbol contained an allegorical meaning, and was a type, in the first instance, of the reproductive forces of nature, the generative source of all living beings" (Hindu Manners, Customs and Ceremonies. By the Abbe J. A. Dubois. Translated from the French by Henry K. Beauchamp. 1897. Vol. II p. 636.)। অসভ্য সমাজে মড়ক অথবা আত্মকলহে জনসংখ্যা ক্ষয় হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নাশ লিঙ্গপূজার অন্যতম কারণ বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লিঙ্গপূজা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে পারেন—Sex Worship. By Clifford Howard. Chicago. (1902)। হিন্দুধর্ম্মে লিঙ্গপূজার উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা পরে আলোচনা করিব। উপস্থিত ইহাই দেখিতেছি যে ঋগ্বেদে লিঙ্গপূজা নাই।

অন্যান্য বেদ ও বৈদিক সাহিত্য

প্রতিমা-পূজা ও লিঙ্গ-পূজা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের কথা যাহা বলিলাম, অন্যান্য বেদ ও বৈদিক সাহিত্য—ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, সূত্র প্রভৃতি—সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিত Macdonell বলেন যে, অদ্ভুত ব্রাহ্মণে দেবতাদিগের প্রতিমার কথা বলা হইয়াছে (Macdonel's Sanskrit Literature p. 210)।

অন্যান্য ব্রাহ্মণে ঐরূপ উল্লেখ থাকিলে নিশ্চয়ই Macdonell সাহেব তাহাও দেখাইয়া দিতেন। তাহা যখন করেন নাই, তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে, অন্যান্য ব্রাহ্মণে দেব-প্রতিমার উল্লেখ নাই। তিনি সাধারণ ভাবে এই কথা বলিয়াছেন—"Material objects are occasionally mentioned in the later Vedic literature as symbols representing deities." (A. A. Macdonell's Vedic Mythology. 1897. p. 154. f)। শতপথ ব্রাহ্মণে দরমা-আবৃত দুইখানি চালাযুক্ত যে গৃহের বর্ণনা পাওয়া যায় (History of Fine art in India and Ceylon By Vincent Smith. 1911. p. 23.) তাহা মন্দির বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে।

উপনিষদ সম্বন্ধে কেহ সাহস করিয়া বলেন নাই যে, প্রতিমার উল্লেখ আছে। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কতকগুলি উপনিষদ সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট, এবং সেই সাম্প্রদায়িকতা পরবর্ত্তীকালে যখন হিন্দুধর্ম্মে পৌত্তলিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত সেই সময়ে সন্নিবেশিত (The Religions of India. By A. Barth. p 65)।

এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব দুষ্ট শৈবদিগের জাবল উপনিষদেও প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধতাসূচক কথা আছে—

শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ।
অজ্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমাঃ পরিকল্পিতাঃ॥

গৃহ্যসূত্রের ক্রিয়াকাণ্ড বৈদিক পুরাতন দেবতাদিগের উদ্দেশে কথিত, এবং তাহাতে প্রতিমা বা মন্দিরের সম্পর্ক নাই (Antiquities of India By L. D. Barnett. 1913. p 137)। গৌতম ধর্ম্মসূত্রে ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে দেব-প্রতিমা ও মন্দিরের উল্লেখ আছে। স্নাতকের কর্ত্তব্যের মধ্যে গৌতমসূত্রে বলা হইয়াছে যে বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সূর্য্য, জল, দেবতা, এবং গো সম্মুখে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিবে না, এবং দেবতার দিকে পদ প্রসারণ করিবে না, এবং দেবমন্দির ও চতুষ্পথ দক্ষিণভাগে রাখিয়া পথ চলিবে (গৌতমসূত্র, নবম অধ্যায়, ১২, ১৩, ও ৬৬ সূত্র)। বৌধায়ন সূত্রে বলা হইয়াছে যে পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, পবিত্র সমতলভূমি, ও দেবমন্দির—এই সকল স্থানে পাপ বিনষ্ট হয় (বৌধায়নসূত্র, তৃতীয় প্রশ্ন, ১০, ১২)। গৌতম ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—

(১) গৌতম সূত্রের ভাষার সহিত পাণিনি-ব্যাকরণের নিয়মের ঘনিষ্ঠভাবে মিল আছে। ইহা একটু সন্দেহজনক ব্যাপার বলিয়া পণ্ডিত Buhler মনে করেন (Sacred Books of the East. Vol. II. 1879. p. iv.)। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, গৌতম ধর্ম্মসূত্রের কোন কোন অংশ পাণিনির (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দের) পরে লিখিত হইয়াছে। (২) রাজহন্তা পিতা, শূদ্রযাজক, গ্রাম্যযাজক প্রভৃতিকে ত্যাগ করার কথা গৌতমসূত্রে পাওয়া যায় (গৌতমসূত্র, বিংশ অধ্যায়, ১ সূত্র)। ইহাতে মনে হয় দেবপ্রতিমা পূজা সমাজে প্রচলিত হয় নাই। (৩) বৌধায়ন সূত্রের প্রথম দুইটী প্রশ্ন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন শিষ্য ও প্রশিষ্য দ্বারা পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত। বিশেষতঃ চতুর্থ প্রশ্নের ভাষা ও ছন্দ মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের ন্যায়, ইহা পণ্ডিত Buhler স্বীকার করিয়াছেন (Sacred Books of the East. Vol. XIV 1882. P. xxxiv)। সুতরাং বৌধায়ন সূত্রের একটী মাত্র সূত্রে মন্দিরাদির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয় না।

(৪) গৌতম ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের প্রমাণের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যুক্তি এই যে উক্ত ধর্ম্মসূত্রদ্বয়ের পূজাবিধিতে দেবপ্রতিমা বা মন্দিরের উল্লেখ মাত্র নাই, পূজাবিধি সেই পুরাতন বৈদিক বিধি। অতএব যে যে স্থলে ঐরূপ উল্লেখ আছে, তাহাতে নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে,—সুধী Barthএর ইহাই অভিমত (The Religions of India By A. Barth p. 259.)।

নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অর্থ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম।

(৫) গৌতমসূত্রে রাজহন্তা পিতা কথাটীর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না তাহাও বিবেচ্য। অজাতশত্রু তাঁহার পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন, মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশীয় রাজাকে হত্যা করেন, ও শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র মৌর্য্যবংশীয় বৃহদ্রথ রাজাকে হত্যা করেন—এই তিনটী ঐতিহাসিক ঘটনার যে কোনটীর সহিত গৌতম কথিত বিধির সম্পর্ক আছে স্বীকার করিলে গৌতম ধর্ম্মসূত্রের প্রাচীনত্ব অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়।

ঋগ্বেদ ও বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে পশ্চাল্লিখিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বেদে ও বৈদিক সাহিত্যে প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল এই মতাবলম্বীদিগের উত্তর হিসাবে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। পণ্ডিত Ragozin বলেন—"But one thing appears sure: Vedic religion at no time, until opened to alien and grosser influences, was idolatrous. In this respect the Aryans of India were in no wise behind their brethren of Eran: nature was their temple; they did not invite the deity to dwell in houses of men's building, and if, in their poetical effusions, they described their Devas in human form and with fanciful symbolical attributions, thereby unavoidably falling into anthropomorphism, they do not seem to have transferred it into reproductions more materially tangible than the spoken word—into the eidolon (portraiture, of limner's, sculptor's, or potter's hand)—which becomes the idol." (Vedic India: as embodied principally in the Rig-Veda. By Zenaide A. Ragozin. London. 1895. p. 133)। পণ্ডিত Kroeber বলেন—"Vedic Aryan culture smacks more of the Europe of its time than of the contemporary orient...... The temples and writing, walled towns and kingdoms, district gods and royal tombs of Egypt, Babylon, Canaan, Minoan Greece, are wanting. The picture is that of the first historic Indo-Europeans elsewhere, in eastern and Central Europe; with whom the Aryans undoubtedly were or had been in connection through the centuries north of the Black and Caspian Seas." (Anthropology. By A. L. Kroeber. Professor of Anthropology, University of California. 1923. p. 479.)। পণ্ডিত Rhys Davids বলেন—(In ancient times before Buddha) "there were no temples, and probably no images. The altars were put up anew for each sacrifice in a field or garden belonging to the sacrificer." (Buddhist India. By Rhys Davids. London. Sixth impression. 1926. p. 241)। পণ্ডিত Keith বলেন—"The Vedic pantheon has none of the clearcut figures of the Greek, and unlike the Greek deities it is seldom difficult to doubt that the anthropomorphic forms but faintly veil phenomena of nature." (The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads. By A. B. Keith. in the Harvard Oriental Series. Vol. 31. p. 58. 1925.)

মহাভারত ও রামায়ণ

মহাভারত ও রামায়ণে প্রতিমা-পূজা ও শিশ্ন পূজার উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ঐরূপ উল্লেখ মহাকাব্যদ্বয়ে কোন্ সময়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল? মহাকাব্যদ্বয়ের প্রণয়নকাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন—গাথা প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত প্রকৃত মহাকাব্যের অংশ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে গ্রথিত। রামায়ণ রচনা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অব্দের পূর্ব্ব কালেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু মহাভারতের কাব্যাংশ ধর্ম্ম-তত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের দ্বারা এরূপ বিপুল ভাবে অভিভূত হইয়াছে যে, মহাভারত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে (6th. Century A. D) সম্পূর্ণ হয় নাই, যদিও ইহার অনেকাংশ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে (The Mythology of all Races. Edited by Louis Herbert Gray. Vol. VI. Indian. By A B. Keith. Boston. 1917. Introduction. p. 12)। মহাকাব্যদ্বয় খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে নহে, কিন্তু খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে এইরূপ মত অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে (Cambridge History of India. Edited by E. J. Rapson. Vol. I. Ancient India. 1922. p. 258)। এ অবস্থায় মহাকাব্যদ্বয়কে পৌত্তলিকতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ পৌরাণিক দেব-দেবতায় ও মহাকাব্যের দেব-দেবতায় বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই (The Mythology of all Races. Vol. VI. p. 162)। ইহাতে সন্দেহ হয় যে পৌরাণিক যুগেই মহাকাব্যদ্বয়ে ঐরূপ দেব-দেবতার সংযোজনা ঘটিয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাকাব্যদ্বয়ের জন্মকাল যাহা স্থির করিয়াছেন,

তাহাতে উক্ত কাব্যদ্বয়কে বৈদিক যুগের মধ্যে না ধরিয়া বৌদ্ধ বা পৌরাণিক যুগের গ্রন্থ রূপে আলোচনা করিলে চলিত; কিন্তু ৺রমেশচন্দ্র দত্ত উক্ত মহাকাব্যদ্বয়কে বৈদিক যুগের অন্তর্গত করিয়াছেন বলিয়াই আমরা বৈদিক যুগে উঁহাদের আলোচনা করিলাম।

হরিবংশ

মহাভারতের পরিশিষ্ট বলিয়া কথিত হরিবংশেই সর্ব্বপ্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা লিখিত হয়। তৎপরে বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতপুরাণে উহা আরও বিশদভাবে প্রকাশিত হয় (The Mythology of all Races. Vol. VI p. 168)। এই হরিবংশের রচনা-কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে স্থির হইয়াছে (Ibid. p. 168)। সুতরাং হরিবংশও প্রতিমা-পূজার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয় না।

যোগ-দর্শন

দর্শন শাস্ত্রাদির মধ্যে যোগ-সূত্রগুলিকে প্রতিমা-পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে কেহ কেহ প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ—কোনও বাহ্য বস্তুতে মনঃসংযোগ ধ্যানের অঙ্গ, এবং ধ্যানই যৌগিক ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ। সুতরাং যৌগিক প্রথার উদ্ভবের সহিত প্রতিমা-চিন্তনও উদ্ভূত হয়। যৌগিক প্রথা (yoga system) যে প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, অন্ততঃ মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত যোগসূত্রের বহু পূর্ব্বে যে প্রচলিত ছিল তাহা নিশ্চিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহর্ষি পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু যৌগিক প্রক্রিয়া মহাত্মা বুদ্ধেরও পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কারণ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে স্বয়ং বুদ্ধ কয়েক বৎসর ধরিয়া যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং সেই যোগাভ্যাসের ফলে তাঁহার যে মরণাপন্ন অবস্থা হইয়াছিল সেই অবস্থার প্রতিমূর্ত্তি পরবর্ত্তী গান্ধার শিল্পে কল্পিত হইয়াছিল (See History of Fine Art in India and Ceylon. By Vincent A Smith. 1911. p. 110, figure 61)। এইরূপ যুক্তির অবলম্বনে শ্রীযুক্ত T. A. Gopinatha Rao যোগের প্রাচীনত্বের সহিত পৌত্তলিকতার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন (Elements of Hindu Iconography. 1914. Vol. I. Part I General Introduction pp. 1-2)।

মন্তব্য

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি—

(১) যৌগিক প্রথার (Joga system) প্রাচীনত্ব কেহই অস্বীকার করেন না। প্রাচীন ভারতে যোগের নাম ছিল তপস্ বা তপস্যা, এবং তপস্ কথাটী ঋগ্বেদ (১০।১৫৪।২, ১০।১৬৯।২) হইতে আরম্ভ করিয়া যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদে, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তপস্ হইতেই যোগের উৎপত্তি—ইহাই পণ্ডিতগণের অভিমত। সুতরাং যৌগিক প্রথা যে মহাত্মা বুদ্ধের পূর্ব্বকালীন তাহাও নিঃসন্দেহ। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকালে যৌগিক ক্রিয়াদি যে সুপ্রচলিত ছিল তাহা জার্ম্মাণ পণ্ডিত Hermann Beckh প্রমাণ করিয়াছেন ("Buddhismus". 2 Volumes. Berlin and Leipzig 1916.) সংস্কৃত সাহিত্যে যৌগিক প্রথা ((yoga system) সাংখ্য দর্শনের শাখা বলিয়া পরিগণিত; কারণ, সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ ব্যতিরেকে আর সকল মতই যোগশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে; অধিকন্তু সমাধিই মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগসূত্রে যৌগিক প্রক্রিয়ার যেরূপ উপদেশ আছে, মৈত্রী উপনিষদেও ঠিক সেইরূপ প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে কথিত আছে। ইহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে যৌগিক ক্রিয়াদি উপনিষদের সময়েই সুসংবদ্ধ (systematised) হইয়াছিল। প্রাচীনতম প্রধান উপনিষদগুলির কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন (The Mythology of All Races. Vol XI. Introduction. p. 12)। কিন্তু উপনিষদে যে প্রতিমা পূজা হইত না ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

(২) মহর্ষি পতঞ্জলি কৃত যোগ সূত্রের কাল এখনও নিশ্চিত রূপে স্থির হয় নাই। সাধারণ হিন্দু মত এই যে, যোগ সূত্রকার পতঞ্জলি ও পাণিনির মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি—একই ব্যক্তি। বৈয়াকরণিক পতঞ্জলি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মত। কিন্তু জার্ম্মাণ পণ্ডিত Hermann Jacobi দার্শনিক ও ঐতিহাসিক যুক্তির বলে দেখাইয়াছেন যে যোগসূত্রগুলি ৪৫০ খৃষ্টাব্দের পরে পতঞ্জলি নামধেয় অপর এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল (JAOS, XXXI, 1911, p. 24 ff.) অপরপক্ষে Bruno Liebich ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনার যুক্তির বলে যোগসূত্রকার ও ভাষ্যকার পতঞ্জলি যে একই ব্যক্তি এই মতের সমর্থন করিয়াছেন (D. s K tantr ,' Heidelberg 1919, p. 7 ff)।

(৩) বাহ্যমূর্ত্তি বা প্রতিমার ধ্যানই যে একাগ্রতা সাধনের একমাত্র উপায়, ইহা ঠিক নহে। মহর্ষি পতঞ্জলি কৃত যোগসূত্রের "যথাভিমতধ্যানাদ্বা" (সমাধিপাদ, ৩৯) ও "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (বিভূতিপাদ, ১) এই দুইটী সূত্রের দ্বারা এই কথা সপ্রমাণ হয়। যে কোনও অভিমত বস্তুতে—স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক—চিত্তাভিনিবেশ করিয়া একাগ্রতাসাধন হইতে পারে, উপরিউক্ত যোগসূত্রদ্বয়ের ইহাই তাৎপর্য্য। তবে এ কথা হয় ত যথার্থ হইতে পারে যে, যখন হিন্দুধর্ম্মে প্রতিমা-পূজা প্রচলিত হইতে লাগিল, সেই সময় অন্য মনোজ্ঞ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য প্রতিমাতেই ধ্যান সম্বন্ধে লোকের মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও, প্রতিমা পূজা যৌগিক প্রথার সমকালীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

(৪) পুরাণাদি শাস্ত্রে যাহাতে প্রতিমা-পূজার নির্দ্দেশ আছে সেই সকল শাস্ত্রেও প্রতিমা-পূজার নিন্দাসূচক কথারও অভাব নাই। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—আমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সর্ব্বভূতেই সতত বিরাজমান। কোন কোন ব্যক্তি তাহাতে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমা-পূজায় পূজা-বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ আমাকে ত্যাগ করিয়া প্রতিমা-অর্চ্চনা করে তাহার কেবল ভস্মে আহুতি দেওয়া হয়

(তৃতীয় স্কন্ধ, একোনত্রিংশ অধ্যায়, ২১-২২ শ্লোক)। আবার এই সকল শাস্ত্রে স্থূলরূপে ভগবানের চিন্তা হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম বা রূপহীন চিন্তা আয়ত্ত করারও উপদেশ আছে। যথা—বিষ্ণুপুরাণ (ষষ্ঠাংশ, সপ্তম অধ্যায়, ৭৯-৯৪ শ্লোক), শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৩-১৬ শ্লোক ; তৃতীয় স্কন্ধ, অষ্টাবিংশ অধ্যায়, ১৮-৩৬ শ্লোক ; একাদশ স্কন্ধ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়, ৪০-৪৪ শ্লোক)। অথচ এই সকল গ্রন্থেই যোগাভ্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করা হইয়াছে, যথা—শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়), স্কন্দপুরাণ (কাশীখণ্ড, ৪১শ অধ্যায়)। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, যৌগিক চিন্তায় বাহ্য প্রতিমা একমাত্র অবলম্বন নহে, বিশেষতঃ যখন শ্রীমদ্ভাগবতে "মনোময়ী" প্রতিমার কথাও দেখিতে পাওয়া যায় (একাদশ স্কন্ধ, সপ্তবিংশ অধ্যায়, ১২ শ্লোক)।

বৈদিক যুগের শিল্প

আরও দুই একটী কথা বলিয়া এই বৈদিক যুগের আলোচনা শেষ করিব। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহাত্মা Ferguson বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে ভারতের বিবিধ জাতি বা ধর্ম্মের মন্দিরাদি বা স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে আমরা একেবারে কিছুই অবগত নহি ; এবং অশোকের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের স্থাপত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জানি, তাহাও কেবল অনুমান দ্বারা (History of Indian and Eastern Architecture, By J. Fergusson. Revised edition by Burgess 1910. Vol. I. p. 52)।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলিয়া কথিত, আদিম মনুষ্য দ্বারা অঙ্কিত এইরূপ অনুমিত, কয়েকটী চিত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চিত্রগুলি মধ্যভারতের রায়গড় জেলার সিঙ্গনপুর নামক স্থানে গুহা মধ্যে অঙ্কিত। চিত্রগুলির বিষয় এই—শিকার দৃশ্য, কয়েকটী মূর্ত্তি একত্রে স্থিত, চিত্র-লিখন, এবং পশু ও সরীসৃপের চিত্র। চিত্রগুলির আলোক-চিত্র নিম্নলিখিত পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে—Prehistoric India By Panchanan Mitra. Calcutta University. 1923. Plates I to XXVII. উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টে (Appendix I, p. 245) Mr. Percy Brown সিঙ্গনপুর গুহা-চিত্র সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, বহু প্রমাণ সংগৃহীত ও বিবেচিত হইলে তবে ঐ চিত্র-গুলিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। উপস্থিত প্রমাণ এইমাত্র দেখা যায় যে, উক্ত গুহাচিত্রগুলির সহিত মিশরের প্রাগৈতিহাসিক যুগের হেরা-ডোরা অঙ্কিত (cross lined) মৃন্ময় পাত্রের (pottery) বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে (Ibid. p. 254)।

Fergusson ও Percy Brown এই সাহেবদ্বয়ের মত এখানে উদ্ধৃত করিবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, বৈদিক যুগে স্থাপত্য ও চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে এমন কোনও নিশ্চিত ও নিঃসংশয়িত বাস্তব প্রমাণ আমরা অবগত নহি, যাহা দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, উক্ত যুগে পৌত্তলিকতা বা প্রতিমা-পূজা প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদ ও বৈদিক সাহিত্যে স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি বাক্য উদ্ধার করিয়া কেহ কেহ ইহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগে হিন্দু স্থাপত্য বিদ্যা খুব উন্নত আকার ধারণ করিয়াছিল ; বিশেষতঃ ঋগ্বেদে সহস্রস্তম্ভযুক্ত ত্রিতল প্রাসাদ ও "সূর্মী" কথা হইতে প্রস্তর-শিল্পের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন—(Journal of the Behar and Orrisa Research Society Vol XII. Part II June, 1926 pp. 192-215 Article on "Indian Architecture from the Vedic Period" by Manomohan Ganguli.)। তর্কের খাতিরে ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও পৌত্তলিকতার প্রমাণ সম্বন্ধে ইহা হইতে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না।

Mohenjo-daro ও Harappa.

সম্প্রতি সিন্ধুদেশের (Sind) লারকানা (Larkana) জেলায় মোহেঞ্জো-দারো (Mohenj -daro) নামক স্থানে ও উহার ৪৫০ মাইল উত্তরে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি (Montgomery) জেলায় হারাপ্পা (Harappa) নামক স্থানে খনন দ্বারা খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বৎসরের পুরাতত্ত্বের অনেক বিষয় ভূ-গর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত দুই স্থানে প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল নূতন আবিষ্কৃত তথ্যের বিবরণ Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1923 24 (pp 47-52), 1924 25 (pp. 60-80), 1925-26 (pp. 72-98) গ্রন্থগুলিতে দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধের সুবিধার্থ বোম্বাই সহরের "Times of India" (Dak Edition, Jany, 4. 1928) সংবাদ পত্রে Sir John Marshall যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছিলেন—তাহারই সার-সঙ্কলন নিম্নে দিলাম।

মোহেঞ্জো—দারো (Mohenjo-daro) নামক স্থানে যতটা স্থান খনন করা হইয়াছে তাহাতে তিনটী সহর প্রকাশিত হইয়াছে। এই সহর-গুলির গৃহগুলি অগ্নি ও রৌদ্রতপ্ত ইষ্টক নির্ম্মিত এবং একটী ছাড়া প্রায় অধিকাংশই গৃহস্থাবাস (private dwelling houses) অথবা দোকান-ঘর (shops)। ইহাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, সেই সময়ের Babylonia ও Nile নদীর ধারের অধিবাসী অপেক্ষা Mohenjo-daro সহরবাসী অধিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য (amenities of life) ভোগ করিত। উক্ত সহরগুলির বয়সকাল খৃঃ পূঃ ৩২০০ হইতে ২৫০০ মধ্যে হারাপ্পায় (Harappa) প্রাপ্ত দ্রব্যাদি Mohenjo-daro অপেক্ষা আরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের।

সিন্ধু-উপত্যকার (Indus valley) এই সভ্যতা Baluchistan, Waziristan, Sind, Punjab, Cutch, Kathiawar, Dekhan প্রভৃতি প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজপুতানায়, হিন্দুস্থানে এবং গঙ্গা উপত্যকায় এই সভ্যতা গিয়াছিল কি না তাহা এখনও সপ্রমাণ হয় নাই। এই Indus সভ্যতার বিবরণ এইরূপ—অধিবাসীরা কৃষিজীবী ছিল, এবং গমের যাহা নমুনা (Specimens) পাওয়া গিয়াছে তাহা পঞ্জাবে উৎপন্ন আধুনিক কালের গমের সদৃশ। Indus অধিবাসীরা রুটি, দুগ্ধ, গো মাংস, ভেড়ার মাংস, শূকর-মাংস, কচ্ছপ, ঘড়িয়াল, তাজা ও শুক্না

মাছ খাইত। তাহারা সূতা কাটিতে ও বুনিতে অভ্যস্ত ছিল, কার্পাস তুলাই তাহারা ব্যবহার করিত। উচ্চশ্রেণীর পুরুষের পোষাক দুইটী বস্ত্রে সাধিত হইত—একটী কটিদেশে বদ্ধ হইয়া কোমর হইতে পা অথবা হাঁটু পর্য্যন্ত থাকিত, অপরটী বামস্কন্ধের উপর হইতে দক্ষিণ স্কন্ধের নিম্ন দিয়া লম্বিত থাকিত। এই উত্তরীয়টী কখন ছক্ (patterns) দ্বারা চিত্রিত থাকিত, কখন এমনি সাদা-সিধা রকমের অচিত্রিত। তাহাদের চুল কপোল হইতে পশ্চাতে লইয়া গিয়া গ্রন্থি-বদ্ধ ভাবে রক্ষিত হইত। তাহারা দাড়ি ও গোঁফ্ ছোট করিয়া রাখিত এবং কখন কখন উপরের ঠোঁট্ কামাইয়া ফেলিত। একটী মাত্র স্ত্রীমূর্ত্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে চুল আলগা ভাবে পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত দেখা যায়। ইহাই ফ্যাসান্ ছিল কি না তাহা বলা যায় না। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে পুরুষেরা সম্ভবতঃ নগ্ন থাকিত, এবং স্ত্রীলোকেরা সরু কটি-বস্ত্র (loin cloth) পরিত। নর্ত্তকী-বালিকার একটী ছোট মূর্ত্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই কটি বস্ত্রেরও অভাব দেখা যায়। সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই প্রচুর গহনা পরিত। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই হার ও আংটী পরিত, কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেই ইয়ারীং, বালা, গোঠ, (girdle) ও মল পরিত।

অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব কিছু বিস্ময়জনক। কুড়ুল, ছোরা, তীরের অগ্রভাগ, বল্লমের অগ্রভাগ,—এই কয়টী এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। গৃহস্থের ব্যবহার্য্য সাধারণ পাত্রাদি সমস্তই মাটীর, এবং তাহারা নানা আকারের হওয়াতে প্রত্যেকটীই কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশ মৃন্ময় পাত্র লাল মাটীর ও অচিত্রিত, তবে চিত্রিত পাত্রেরও অভাব নাই। শীল বা মোহরে খোদিত লিপি দ্বারা প্রমাণ হয়, তাহারা লিখিতে জানিত। ভূর্জ্জপত্রে লিখিত কি মৃত্তিকায় (clay) লিখিত তাহা জানা যায় না। প্রায় এক হাজার শীল-মোহর (seals) উদ্ধার করা হইয়াছে। এই শীলগুলি তাহারা গলায় অথবা হাতের কব্জীতে সূতা দিয়া পরিত, এবং খুব সম্ভবতঃ পার্শেল অথবা পণ্য-দ্রব্যাদি "শীল" (মোহরাঙ্কিত) করিবার জন্য ব্যবহার করিত। হয়ত এগুলি কবচ (amulets) রূপেও ব্যবহৃত হইত, এবং উহাতে অঙ্কিত বা খোদিত পশুগুলির ধর্ম্মের সহিত কোনও সম্পর্ক ছিল।

Indus উপত্যকার এই সভ্যজাতি ইহারা কাহারা, এবং ইহাদের ধর্ম্মই বা কি ছিল? এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে এই দুই প্রশ্নের অত্যন্ত আবছায়া রকমের উত্তর (Vaguest answers) দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত স্থানে প্রাপ্ত নরকঙ্কালাদি হইতে ইহারা আর্য্যগণের পূর্ব্ববর্ত্তী আদি দ্রাবিড়ীয় জাতি বা ভূমধ্যসাগরস্থ লম্বিত মস্তক জাতি বলিয়া অনুমান হয়। সিন্ধু-নদের ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি ও ইরাক্ দেশের (Mesopotamia) ধর্ম্মমতগুলির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ ছিল। এইরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, শীল ও তাম্রখণ্ডে খোদিত কতকগুলি মূর্ত্তি Babylon দেশের Eabani মূর্ত্তির সদৃশ। অনেকগুলি terracotta figurines পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নগ্না স্ত্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। উক্ত স্ত্রীমূর্ত্তির মস্তকের আবরণ অতীব পরিপাটী, এবং এই স্ত্রীমূর্ত্তি অলঙ্কারে সজ্জিতা। Mesopotamia ও তাহার পশ্চিম দিকস্থ দেশে সুপরিচিতা মাতৃ-দেবীর মূর্ত্তি ও উপরিউক্ত স্ত্রীমূর্ত্তি এক বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা হইবে না। অপর পক্ষে এমন নিশ্চিত প্রমাণও আছে যাহা মিশরের রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মিশরের (pre-dynastic Egypt) সহিত সম্পর্কের ইঙ্গিত করে।

Sir John Marshall সর্ব্বশেষে বলিতেছেন যে গঙ্গাতীরের সমসাময়িক সভ্যতা ও সিন্ধুনদের সভ্যতা যে একেবারে একই প্রকারের বলিয়া প্রমাণিত হইবে, ইহা সম্ভব নহে। গঙ্গাতীরেও যে ঐ সময়ে এক সভ্যতা ছিল সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই।

উপরিউক্ত অবস্থায় Mohenjo-daroতে বৌদ্ধ স্তূপের নিম্নে যে প্রাচীন সহরের প্রধান মন্দির ছিল বলিয়া তিনি অনুমান করিতেছেন, সে সম্বন্ধেও 1924—25এর Annual Report of the Archaeological Survey of India. p. 61 যে উক্তি করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করিবার আমার প্রয়োজন নাই। মন্দির ও গৃহাদির প্রসঙ্গে শেষোক্ত Reportএ বলা হইয়াছে যে, যদিও মনুষ্যাকার প্রতিমূর্ত্তি (anthropomorphic images) এই সকল মন্দিরে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহা দ্বারা ঐরূপ মূর্ত্তি পূজা অজ্ঞাত ছিল বলিয়া প্রমাণ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীল বর্ণের একটী ফলকে অঙ্কিত চিত্রের কথা বলা হইয়াছে। উক্ত চিত্রে (বুদ্ধ মূর্ত্তি যেমন সিংহাসনে বসিয়া থাকেন সেই ভাবে) একটী মূর্ত্তি বসিয়া আছেন, এবং তাঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে দুই জন উপাসক জানু পাতিয়া রহিয়াছে ও তাহাদের পশ্চাতে একটি করিয়া নাগ বা সর্প রহিয়াছে। উক্ত মূর্ত্তি কোনও রাজার মূর্ত্তি হইতে পারে, কিন্তু উপাসকদ্বয়ের অবস্থানে রাজমূর্ত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিষ্যুৎবারের বারবেলায়

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রমেশ হাইকোর্টে ওকালতি করে; ভবানীপুরে বাসা। বাসায় তার তরুণী পত্নী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী; আর চাকর-বামুন আছে। কোর্টে পশার বাড়িতেছে। জীবনে পূরাপূরি বসন্তের আনন্দ-হিল্লোল! কোনো অশান্তি, কোনো অস্বাচ্ছন্দ্যের ধার সে ধারে না!

বৈশাখের মাঝামাঝি শ্বশুর চিঠি লিখিলেন,—সাম্নের সোমবারে অপর্ণার বিবাহ। হঠাৎ কথা পাকা হইয়া গেল। পাত্রটি ভালো। সময় সংক্ষেপ। কতকগুলা জিনিষের ফর্দ্দ পাঠাইলাম। সত্বর কিনিয়া মাধুরীকে লইয়া চলিয়া আসিবে। কাজ-কর্ম্মের একটা ব্যবস্থা করিয়া আসিয়ো।

শ্বশুর থাকেন ভাগলপুরে। অপর্ণা রমেশের শালী; মাধুরী পত্নী। চিঠির সঙ্গে ফর্দ্দও আসিয়াছিল। এসেন্স, তেল, সাবান, রুমাল, দেশী ধুতি, সিল্কের গেঞ্জি, পাম্প-শু প্রভৃতি বিবাহ-যৌতুক উপহারের খুঁটিনাটীর সহিত বরের ঘড়ি, আংটি, বোতাম কোনো নাম ফর্দ্দে বাদ পড়ে নাই।

মাধুরী কহিল—সকাল সকাল কাছারি থেকে ফিরো। আমাকে নিয়ে বাজারে যেতে হবে। আমি নিজে সব পছন্দ করবো।

রমেশ কহিল—তাহলে গাড়ীভাড়াতেই যে অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে।

মাধুরী কহিল—তা হোক্। আমার এই একটি বোন, তার বিয়ে। জিনিষ নিজে দেখে কিন্‌বো। গাড়ীভাড়ার খরচ তোমার এই একবারই লাগবে, আর তো নয়। শালীর বিয়ের বলে, মানুষ কত টাকা খরচ করচে।

রমেশ মনে মনে কহিল, তা বটে; শ্যালী স্ত্রীর ভগ্নী যে!

মাধুরী কহিল—ফর্দ্দখানা দাও দিকিনি···এই যে পুতুল, খেলনা, সাবান, এসেন্স,—তা এগুলো সব রাধাবাজারে পাবে,—কেমন? আর কার্পেটও তাই। ধুতি চাদর, নমস্কারীর শাড়ীটাড়ী বড়বাজারে—সমস্ত ভাগ করে ফ্যালো···তারপর ট্যাক্সি নাই নিলে—একটা সেকেণ্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ীই নিয়ো···ঘণ্টা-হিসেবে, কতই-বা তোমার পড়বে, বাবু!

রমেশ কহিল,—কিন্তু আজ একটা বড় আপীল ছিল···

মাধুরী কহিল,—আপীল রোজ আছে—আমার বোনের বিয়ে তো আর রোজ নয়!

রমেশ কহিল—তা যদি হয়, আমি পেছ-পা হবো না!

—যা বললেন! মাধুরী কহিল—বেলা চারটের মধ্যে ফিরতে চাও। আমি তৈরী থাকবো। পাঁচটার আগে বেরুবো। এর নড়চড় নয়, বুঝলে!

পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া রমেশ কহিল—অমোঘ তোমার দণ্ড কঠিন বিধান!

মাধুরী কহিল—তুমি কি দিচ্ছ, বলো?

রমেশ কহিল—তোমার আদেশ যেমন হবে।

মাধুরী কহিল—আমার আদেশ! কেন, তোমার নিজের মন থেকে কিছু দেওয়ার সখ বুঝি হবে না?···তা হবে কেন? এ যে আমার বোন্···

রমেশ কহিল—দোহাই প্রেয়সি, অনর্থক মান করোনা। মানের বহু অবসর, বহু সুযোগ এমনিতেই মেলে··তার উপর অহেতুক··

মাধুরী কহিল,—আমি একখানা সুরাটী শাড়ী আর ব্লাউশ দেবো—তা কিন্তু বলে রাখচি। তোমায় ক'বে থেকে বলে রেখেচি···

রমেশ কহিল,—কিন্তু কি রকম জরুরি তলব, দেখচো তো? এর মধ্যে হবে কেন? এ যা চিঠি, কালই বেরুলে ভালো হয়।

মাধুরী কহিল,—কাল সেই বিকেলে তো? আজ তো বেস্পতিবার—কাল না বেরুলে হবেই বা কেন? তুমি কিনে দাও, আমি কালই সব গুছিয়ে ফেলি,—তুমি কাছারি করতে হয় করো কাল—তারপর সন্ধ্যার ট্রেণে বেরুবো। শাড়ী আর ব্লাউশের জন্যে যথেষ্ট সময় পাবে। দু'পয়সা

বেশী দাম দিলে তারা বাড়ীতে শাড়ী ব্লাউশ পৌঁছে দিয়ে যাবে।

রমেশ কহিল—সে তো আবার রঙ-টং পছন্দ করার হাঙ্গাম আছে।

মাধুরী কহিল—সে হাঙ্গাম তোমায় পোয়াতে হবেনা গো··আজ সন্ধ্যায় আমায় নিয়ে যেয়ো, মিউনিসিপাল মার্কেটে সেই যে জেঠামল-ধালামলের দোকান আছে, কত রঙের রকমারি শাড়ী তাদের আছে—সেখানে আমি নিজে গিয়ে পছন্দ করে অর্ডার দিয়ে আসবো।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল, মনে-মনে সে হিসাব কষিতেছিল! বিবাহের যত মাধুরী মাধুরী তাকে চিরদিন দিয়াছে,—আর আজ?···

মাধুরী কহিল,—তুমি নিশ্চয় একখানা গহনা দিচ্ছ—না দিলে বিশ্রী দেখাবে। রোজগার করচো তো···ব্রেশলেট্ কি, ভালো সেফ্‌টী পিন্—অন্ততঃ দু'শো টাকা···তার কমে ভালো জিনিষ পাবে না!

রমেশ একটা ঢোঁক গিলিল। বিবাহের সময় যৌতুক বড় অল্প সে আদায় করে নাই। এখন হইতেই তার শোধ সুরু হইল! এখনো দু'টী শ্যালকের বিবাহ বাকী···

মাধুরী কহিল—এই কথাই তাহলে পাকা, বুঝলে! তোমার গহনাও সেই স ার সময় দেখে পছন্দ করবো। সকাল-সকাল কাছারি কে ফেরা চাই—নইলে চারিদিকে বিষম বিভ্রাট ঘটবে। তোমার উপরই বাবার ভরসা—তাঁর মান-ইজ্জৎ তোমার হাতে, এটুকু খেয়াল রেখো। মক্কেলই সব নয়,—লোক-লৌকিকতা রক্ষা না হলে ভদ্রলোকের চলে না!

কথাগুলা খুব ঠিক। কিন্তু এমন অকস্মাৎ···! তার তো পৈত্রিক সম্পত্তি তেমন কিছু নাই! পাশের জোরে ওকালতির শনদ লাভ করিয়াছে, তারপর দালালের তদ্বিরে এই ব্রীফগুলার মারফৎ যা কিছু গৃহে আসিতেছে! কিন্তু এই আমানতের পিছনে কত ব্যয় করিতে হয়, হায় অন্তঃপুরবাসিনী গৃহলক্ষ্মী, সেগুলার সংবাদ যদি রাখিতে!

কিন্তু এ লইয়া বাদানুবাদ চলে না—বিশেষ স্ত্রীর সঙ্গে। তাহা হইলে এত ছোট ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে যে পত্নীর কাছে নিজের ইজ্জৎ বাঁচাইয়া রাখা দায় ঘটিবে!······

বেলা চারিটার সময় কাছারি হইতে ফিরিতে হইল। বেদনায় সমস্ত চিত্ত ভরিয়া আছে! এতগুলা টাকা, এমন অকস্মাৎ! কিন্তু লৌকিকতা-রক্ষার কর্ত্তব্যও একটা আছে, সত্য!···তবু··এতটা না হইলেও চলিত হয়তো! ব্রেশলেট্ যথেষ্ট ··তার উপর আরো? সুরাটী শাড়ী ব্লাউশ সে'ও না কোন্ দেড়শো টাকার ধাক্কা!···নূতন উকিল ·· খবরের কাগজে নাম নিত্য ছাপা হইতেছে বটে, কিন্তু তার পিছনে কতখানি তদ্বির করিতে হয়, ক'জন সে সংবাদ রাখে! অথচ নামের সঙ্গে নেট্ দাম কতটুকুন্ ঘরে আসে···রমেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

মাধুরীর উৎসাহের সীমা নাই! অবুঝ নারী,—তোমার এ উৎসাহ রমেশের বুকে কি কঠিন বাজিতেছে!

গাড়ী আসিল। মাধুরী কহিল—কত টাকা সঙ্গে নিচ্ছ?

রমেশ কহিল,—কত নেবো বলো?

মাধুরী কহিল—পাঁচ-সাতশোর কমে হবে কি? ও সবে যা খরচ হবে, সে তো ফর্দ্দ ফেলে দেবে বাবার কাছে, বাবা দেবেন।

রমেশ কহিল—তিনি পাঁচশো টাকা পাঠিয়েচেন টেলিগ্রাফিক মণি-অর্ডারে। কোর্টে পেয়েচি।

মাধুরী কহিল—বাবা ওদিকে খুব হুঁশিয়ার। জামাই পাছে মনে ভাবে, এতগুলো টাকার ফেরে ফেলচেন! তা, পাঁচশো টাকায় বাবার বাজার হবে না?

রমেশ কহিল—দেখি!

মাধুরী কহিল,—তা হলে গহনা আর শাড়ী-ব্লাউশের জন্য শ'তিনেক তোমার তুমি সঙ্গে নাও।

রমেশ কহিল—বেশ!

গাড়ীতে বসিয়া রমেশ কহিল—চলো রাধাবাজার······

রাধাবাজারে বাজার সারিয়া গাড়ী চলিল মিউনিসিপাল মার্কেটে। ধালামলের দোকানে নানা শাড়ী দেখিয়া যেটা পছন্দ হইল, সেটার দাম তিনশো টাকা। মাধুরী শুষ্কচিত্তে কহিল,—এত দাম! এ পারবে কেন? এর চেয়ে কম দামের দিতে বলো...

তাই হইল। দেড়শো টাকায় শাড়ী-ব্লাউশ। কাপড়ে পাড় বসানো এবং ব্লাউশ তৈরী—তা, কাল বেলা দুটায় বাড়ীতে ডেলিভা দবে!...মাধুর কহিল—নিশ্চয় চাই। না হলে··

দোকানের লোক কহিল,—দাম এখন নয় দেবেন না। বাড়ীতে মাল পৌঁছুলে দাম দেবেন।

মিঠা পান এবং লিমনেড দিয়া তারা খুব খাতির অভ্যর্থনা করিল। সেখান হইতে বাহির হইয়া মাধুরী কহিল—গহনাটা নিয়ে ফ্যালো—তার পর দেশী শাড়ীগুলোর জন্য যেতে হবে তো বড়বাজার। কালকের জন্যে আর ফেলে রেখো না কিচ্ছু!

রমেশ যেন নির্জীব পুতুল বনিয়া উঠিয়াছিল! মাধুরীর ইঙ্গিতেই তার চলাফেরা। সে কহিল,—তথাস্তু!

ফর্দ্দ-মাফিক বাজার শেষ করিয়া রমেশ যখন বাড়ী ফিরিল, রাত তখন এগারোটা। দেহ-মন অত্যন্ত শ্রান্ত। গাড়ী হইতে নামিয়া মাধুরী ডাকিল,—গোট্‌লা···

গোট্‌লা ভৃত্য। মাধুরী কহিল—জিনিষপত্তরগুলো নামিয়ে নে ··

জিনিষ-পত্র নামানো হইল—বিস্তর মোট! দোতলার ঘর একেবারে জিনিষে থৈ-থৈ করিতে লাগিল। মাধুরী কহিল,—তুমি খেতে বসো গো—আমি সব মিলিয়ে নিচ্ছি ··

রমেশ কহিল—দাঁড়াও, গাড়োয়ানকে আগে বিদায় করি।

বিদায় দিতে বচনের রাশি ব্যয় করিতে হইল। শেষে নগদ সাড়ে ছ' টাকায় গাড়োয়ান চুপ করিল। মুখ-হাত ধুইয়া রমেশ আহারে বসিল, মাধুরী ফর্দ্দ ধরিয়া জিনিষ মিলাইতে সুরু করিল।

এ কি! বরের ফুলশয্যার জন্য ভালো ধুতি ও উড়ানির প্যাকেটটা?···নাই! মাধুরী ডাকিল,—গোট্‌লা···

গোট্‌লা আসিল। মাধুরী কহিল—সব জিনিষ দেখে নামিয়েছিলি?

গোট্‌লা কহিল—হাঁ, মা।

—কখ্‌খনো নয়। এই তো একটা প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে না। দামী কাপড়—কত দাম গা?

রমেশ হতভম্ব! সে কহিল,—তা ধুতিখানা এগারো টাকা আর উড়ানিটাপাঁচ টাকা চার আনা!

মাধুরী কহিল—ষোল টাকা চার আনা! দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌··· গাড়ী আছে কি না?

রমেশ কহিল,—গাড়ী চলে গেছে অনেকক্ষণ। ভাড়া পেয়েছে সে···

মাধুরী কহিল,—ওরে গোট্‌লা, দ্যাখ্ বাবা,—গাড়োয়ানকে চিনতে পারবি না?

রমেশ কহিল,—ওর কাজ নয়। গাড়ীর নম্বরও ছাই দেখে রাখিনি তো! ফ্যাশাদ!

উঠিয়া সে গায়ে জামা চড়াইল।

মাধুরী কহিল,—কোথা যাচ্ছো?

রমেশ কহিল,—গাড়ীর তল্লাসে।

মাধুরী কহিল,—এই এত ঘুরে আবার···কষ্ট হবে যে গা।

রমেশ কহিল,—কষ্ট হলে আর কি করচি, বলো?

মাধুরী কহিল,—তাও বটে! কিন্তু এতগুলো টাকার জিনিষ···অনর্থক গুণকার দেবে!

চমৎকার! এরি নাম সহানুভূতি। রমেশ দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

প্রথমেই গাড়ীর ষ্ট্যাণ্ডে। দু'খানা থার্ড ক্লাশ গাড়ী মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। তাদের প্রশ্ন করিল,—জানিস, সেকণ্ড ক্লাশ একখানা গাড়ী পাঁচটা থেকে এগারোটা অবধি হাজরে দিয়েছিল?

তারা বলিল,—না বাবু···

উপায়? রমেশ থানায় ছুটিল। ডাকাডাকি করিয়া এক কোট-পেণ্টুলান পরা বাবুর দেখা মিলিল। সব শুনিয়া তিনি কেশ লিখিলেন। প্রথমটা নানা ওজর তুলিয়াছিলেন, কিন্তু রমেশ উকিল,—পরিচয় পাইয়া নালিশ লিখিলেন, এবং তাকে লইয়া তদারকে বাহির হইলেন। দু'ঘণ্টা ধরিয়া এ আস্তাবল ও আস্তাবল ঘুরিবার পর একটা লোক খপর দিল, ঠিক, আবদুল কোচম্যান ভাড়া গিয়াছিল বটে,··· ঘণ্টা-হিসাবে, বেলা পাঁচটায়; এবং ফিরিয়াছে অনেক রাত্রে।

ইন্‌সপেক্টর কহিলেন,—আব্দুলের বাড়ী কোথায়?

লোকটা কহিল,—তিলজলায়।

তিলজলা! কিন্তু উপায় কি? নালিশ এখন রুজু হইয়াছে! আইনের চাকা যখন ঘুরিয়াছে, তখন সে এমনিতে তো থামিবে না।

ইন্‌সপেক্টর কহিলেন,—কি করবেন মশায়?

রমেশ তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে কহিল,—যখন নেমেচি, তখন একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়চি না।··· ট্যাক্সি তো আছে।

ইন্‌সপেক্টর কহিলেন,—বেশ।

ট্যাক্সি চলিল তিলজলায়। লোকটাকেও সঙ্গে লওয়া

হইল। আবদুল কোচম্যানকে মিলিল। বেচারা সবে আহার শেষ করিয়া হুঁকায় মুখ দিয়াছে! ইন্‌সপেক্টর কহিলেন,—বার কর্ কাপড়ের মোট।

আবদুল কহিল, ভাড়া লইয়া সে একবার জগুবাবুর বাজারে আসিয়াছিল, কার কাছে পাঁচ সিকা পাওনা ছিল, সে টাকা লইয়া সোজা সে গৃহে ফিরিয়াছে; গাড়ীও দেখে নাই। ঘোড়া খুলিয়াই স্নান করিয়া আহারে বসিয়াছিল। গাড়ী আস্তাবলে—পার্কিট থাকে তো সেইখানেই আছে!

আস্তাবলে গাড়ী দেখা হইল। মাল নাই। ইন্‌সপেক্টর-বাবু কহিলেন,—ব্যাটা চোর!

আবদুল কহিল, মিথ্যা তাকে গালি দেওয়া হইতেছে। সে নিরপরাধ।

তার বাড়ী তল্লাসী হইল। কাপড় মিলিল না। ইন্‌সপেক্টর কহিলেন,—চ' ব্যাটা থানায়। কাপড় দিলিনা যখন ··

তাই হইল। বেচারা আবদুল নশীবকে গালি দিয়া থানায় আসিল। তার বক্তব্য লিখিয়া ইন্‌সপেক্টর ডায়েরী শেষ করিলেন—রাত তখন দুটো বাজিয়া গিয়াছে।

উত্যক্ত প্রাণ আর বিরক্ত চিত্ত লইয়া রমেশ গৃহে ফিরিয়া ট্যাক্সির ভাড়া দিল সাত টাকার উপর। বিরক্তির মাত্রা বাড়িয়া গেল; ট্যাক্সি বিদায় লইলে গোট্‌লা দ্বার খুলিয়া দিয়া কহিল,—সে কাপড় পাওয়া গেছে।

কুণ্ঠা এবং উত্তেজনা—চিত্ত-তৃপ্তির উভয়বিধ ব্যাপারেই গোট্‌লার কণ্ঠস্বরে তোৎলামি জাগে। তার কথা শুনিয়া রমেশের পা টলিল—ভূমিকম্পের দোলা নাকি? ব্যাপারটা ঠিক ঠাহর করিয়া লইবার পূর্ব্বেই অস্থির পা দুটা তাকে টানিয়া একেবারে দোতলায় আনিয়া হাজির করিয়া দিল! পত্নী মাধুরী মেঝের উপর রাজ্যের জিনিষ ছড়াইয়া তাহা গুছাইতে ব্যস্ত! রমেশের পিঠে কে যেন চাবুক মারিল। ভাবিয়াছিল, তারি জন্য উদ্বেগে মাধুরী বুঝি নিশি জাগিতেছে, তার পরিবর্ত্তে সে যখন দেখিল, উদ্বেগের বিন্দুমাত্র নাই, মাধুরী ভগ্নীর বিবাহের জিনিষপত্র লইয়া স্বামীর কথা ভুলিয়াই গিয়াছে—সে বেচারা কোথায় কত দূরে পাড়ি দিয়া আসিল—বেলা পাঁচটা হইতে পাড়ির আর বিরাম নাই তখন···

তার সাধ হইল, এই দণ্ডে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইয়া বাহির হইয়া পড়ে! কিসের জন্য ঘর-সংসার? স্নেহ কোথায়?

তাকে দেখিয়া হাসিয়া মাধুরী কহিল,—কি রকম মানুষ বলো দিকিনি, তুমি! কাণ নে গেল কাকে তো কাকের পিছনে ছুটলে অমনি! কাণে হাত দিয়ে মানুষ দেখে আগে কাণ দুটো সত্যি গেল কিনা!

এমনি নিরুদ্দেশ নিষ্ফল ভ্রমণ—তা'ও পয়সা খরচ করিয়া, তার উপর পত্নীর মুখে এই হাসি আর হেঁয়ালি, কোনো পুরুষের তা সহ্য হয় না···পত্নী নিতান্ত নবোঢ়া হওয়া সত্ত্বেও! তপ্ত ঝাঁজালো স্বরেই সে কহিল—তার মানে?

মাধুরী কহিল,—কাপড়ের প্যাকেট সিঁড়ির নীচে পড়ে গেছলো···গোটলা বার করলে···

রমেশ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—মিছে কথা, বেটা চোর—চুরি ধরা পড়বে, সেই ভয়ে বার করে দেছে।

মাধুরী কহিল—আহা, না গো না! গোটলাকে ডেকে আমি বলছিলুম,—বাবু বেরিয়ে গেলেন, এই খাটুনি···তোমরা গাড়ী থেকে দেখে-শুনে জিনিষগুলোও নামাতে পারো না, এমন নবাব—। বলে আমি নিজেই নীচে নামছিলুম। নামতে গিয়ে দেখি, সাদা কি একটা পড়ে আছে সিঁড়ির পাশে। গোটলাকে আনতে বললুম, গোটলা আনলে দেখি, সেই ফুলশয্যার জন্য কেনা কাপড় আর উড়ানি।

মাধুরীর কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রমেশ আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, তোলা পাঞ্জাবীটা টানিয়া গায়ে চড়াইল।

মাধুরী কহিল—কোথায় আবার যেতে হবে এই রাত্রে?

রমেশ কহিল,—থানায়। বলিয়া ব্যাগটা খুলিয়া গণিয়া দেখে, চৌদ্দটা টাকা আর ক' আনা পয়সা এখনো অবশিষ্ট আছে!

মাধুরী চমকিয়া কহিল—থানায় কেন?

রমেশ কহিল,—একটা নিরীহ নির্দ্দোষ লোককে তার বিশ্রাম-শয্যা থেকে টেনে হাজতে পূরে রেখে এসেচি··· তার প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। যদি দণ্ড নিয়েও তার ক্ষমা পাই, দেখি।

মাধুরী রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল,—এত রাত্রে আর যায় না। কাল সকালেই যেয়ো গো। শরীরের উপর যে ধকল গেছে সারাদিন! শেষে কি···

রমেশ কহিল—শ্যালীর বিবাহে যদি জান্ দিতে হয়, দেবো, দিয়ে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখবো।

দুর্জ্জয় গোঁ-ভরে রমেশ দুপ্‌দাপ্ শব্দে নীচে নামিয়া গেল, ডাকিল,—গোটলা···

—আজ্ঞে!

—সদর দোর বন্ধ করে দে। আমি বাইরে যাচ্ছি।

থানায় গিয়া আবার ইন্‌সপেক্টরকে উঠানো, সে যে কি ব্যাপার! তাঁর তো শ্যালী-দায় নয়। তবে ইন্‌সপেক্টরের মনে সহসা কি ভাবের উদয় হইল, বলা যায় না! তিনিও সংবাদ পাইয়া তাঁর চিরাচরিত প্রথা ভুলিয়া থানার অফিস-ঘরে আসিয়া দেখা দিলেন।

রমেশ তাঁকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। হয়তো তাঁরো কোনোদিন শ্যালীর বিবাহে এমনি দায় ঘটিয়াছিল, কিম্বা রমেশের শ্যালীদায়ের আন্তরিকতা দেখিয়া প্রাণে মমতা জাগিয়াছিল! নহিলে এমন দরদ···তিনি শুনিয়া আবার ডায়েরি খুলিলেন এবং কি কতকগুলা লিখিয়া হাঁক দিলেন,—এ দরোয়াজা···

লাল-পাগড়ী এক সিপাহী আসিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইল। ইন্‌সপেক্টর বাবু কহিলেন,—আব্দুল কোচম্যান আসামীঠো লেআও।

সে আসিলে ইন্‌সপেক্টর কহিলেন,—তোর জামিন হবার কেউ নেই? তা, লাইসেন্স আছে, কোচম্যান, পালাবি আর কোথায়? একটা মুচলেকা সই করে আপাততঃ বাড়ী যা। কাল মোদ্দা ঠিক বেলা ন'টায় এখানে আসবি,—বুঝলি?

আব্দুল সেলাম করিয়া কহিল,—হামার কুছ্ কশুর নেহি, বাবু!

রমেশ তাকে কি বলিতে যাইতেছিল, ইন্‌সপেক্টর বাবু বাধা দিয়া বলিলেন,—আপনি একটু চুপ করুন। আদালতের ঘর ছাড়া উকিলদের বুদ্ধি খোলে না, বলে যে কথা আছে—তা ভারী ঠিক! না?

রমেশ এ কথার অর্থ বুঝিল না; চুপ করিয়া রহিল। আব্দুল মুচ্‌লেকা সহি করিয়া বিদায় লইতেছিল, রমেশ কহিল,—সেই তিলজলা অবধি হেঁটে যাবে বেচারা! ওর গাড়ীভাড়া···

ইন্‌সপেক্টর বাবু আবার কহিলেন,—আঃ, আবার! যেতে দিন না ওকে···

রমেশের বিস্ময় বাড়িল কিন্তু মাথা সারাদিনে খাটিয়াছে যে আর তার খাটিবার শক্তি ছিল না!

আব্দুল চলিয়া গেলে ইন্‌সপেক্টর কহিলেন,—ওকে এ সব কথা খুলে বলে কখনো? ও এখন তো ঐ কেঁচোটি ও কথা শুন্‌লে একেবারে কেউটের মত ফণা তুলে দাঁড়াবে ওর এই অনর্থক কর্ম্মভোগের জন্যে ওকে খুশী করতে চান্ তো বেশ, আলিপুরে কাল একবার আসবেন, ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন দশটা টাকা এমনি বখশিস্ দেবে ব্যস্! মোদ্দা, বেশ একটি কাহিনী বানিয়েচেন দেখ এ রকম গল্প কাগজে ছাপাবার মত।

রমেশ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ছাপাবার মত! একটা বিপদ আছে তাতে।

ইন্‌সপেক্টর কহিলেন,—বিপদ আবার কি?

রমেশ কহিল—আমি এমন তালকাণা, এ কথা প্রক হলে আমার এই উঠ্‌তি প্র্যাকটিশটা একদম মাটী হ লেখার শক্তি তো নেই—তা থাকলে নয় প্র্যাক খোয়ালেও একরকমে দিন গুজরাণ হতে পারতে সুতরাং·····

ইন্‌সপেক্টর হাসিলেন। রমেশ কহিল,—কিন্তু আ পুলিসের মধ্যে পুরুষোত্তম। রাত্রে কি জ্বালাতনই কর মশায়! তবু নেমে এসেচেন্, তাড়া করেন নি। থা ইতিহাসে এও বোধ হয় লিখে রাখবার মত ন কাহিনী।

গৃহের পথে রমেশের মাথার ব্যথা সারিয়া আসি ছিল। গৃহে পৌছিয়া দেখিল, মাধুরী মুখখানা ঘোরা করিয়া বসিয়া আছে।

রমেশ অপ্রতিভ। যাইবার পূর্ব্বক্ষণে যে কথাগুলা রা মাথায় বলিয়াছিল, সেগুলা শোভন তো হয়ই নাই, ে উপর তার আষ্টেপৃষ্ঠে ইতরতার ছাপ ছিল!

হাসিয়া সে ডাকিল,—প্রিয়ে চারুশীলে ··

একটা বক্র কটাক্ষে মাধুরী স্বামীর পানে চাহিল, ে পরেই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নস্বর ফুটিল; আমার বোনের বিয়েতে তোমার যে কষ্ট হলো, ে জন্যে আমি তোমার পায়ে ধরে মাপ চাইছি।

রমেশ কহিল—আঃ, কি যে বলো! ছি, শ্যালীর ি নিয়ে রসিকতা করবো না একটু?

রমেশ মাধুরীকে সস্নেহে বক্ষে টানিয়া লইল।

মাধুরী ক্রন্দনোচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল,—তা বলে জীবন-মরণের কথা!

রমেশ পত্নীর অধরে চুম্বন করিয়া কহিল,—

শুধু কি মুখের কথা শুনিবে, প্রেয়সি ?
বুঝিবেনা কত প্রেম বহিছে রহসি!

তোমার লাগিয়া, আর শ্যালিকার লাগি
সারাদিন রোদে, আর সারা রাত্রি জাগি
প্রদখিণিতে পারি ছুনিয়া বিপুল!
কি তুচ্ছ ও থানা, আর তিলজলার আব্দুল!

হাসিয়া মাধুরী কহিল,—থামো, থামো! ফের যদি এমনি কাব্যচর্চ্চা করবে তো আমি মাথা কুটে মরবো, সত্যি বলচি।

অনুতপ্ত

শ্রীবীরকুমারবধ-রচয়িত্রী

চলি যাবে জানিতাম যদি
আরো কাছে বসিতাম গিয়ে,
যত কিছু দিয়েছি বেদনা,
ভাল করে দিতাম মুছিয়ে।

যাবে যদি জানিতাম—তবে
কহিতাম আরো ক'টী কথা,
শুধিতাম নি'জনে আদরে,
ও বুকের লুকায়িত ব্যথা।

কতদিন তোমার করুণা
অভিমানে করি'নি গ্রহণ,
সেই অনাদৃত অবহেলা—
ও বুকে কি দিয়েছে বেদন!

প্রীতি-ভরা প্রিয় ব্যবহার—
ফিরায়ে দিয়াছি—প্রতিদানে,
অগ্নিময় সেই উপেক্ষায়
কি যে বাজ বেজেছিল প্রাণে!

কতবার সংসার দহন
জুড়াইতে এসেছিলে কাছে,
স'রে গেছি পরের মতন—
আমারে ব্যথিত দেখ পাছে!

কত অশ্রু ঝরেছে নয়নে,
আমি যে তা' দেখিনি' চাহিয়া',
কি যে চায় ও তৃষিত হিয়া
কোন দিন বুঝিনি বুঝিয়া!

কিন্তু কেন?—অবিশ্বাস আসি
প্রাণ মম দিয়েছে দলিয়া,
ফুলময় কুঞ্জবন মম,
নিরাশা যে ফেলেছে ভাঙিয়া!

জানিতাম হীন তুচ্ছ আমি,
তুমি উচ্চ, দেবতার মত;
তব আত্মহারা ভালবাসা
দিশাহারা আত্মদান অত।—

তুচ্ছ এক মর মানবেরে,
তত দান—বড় অসম্ভব;
ক্ষুদ্র মনে হ'ত না ধারণা
সে সৌভাগ্য সে মহা গৌরব!—

বজ্রাহত সেই যাতনায়
তোমারেও জ্বালায়েছি অত—
সব দোষ ক্ষমিয়াছ তুমি,
সে ক্ষমা যে দেবতার মত!

আজি সেই দারুণ সন্তাপে
পুড়ে গেল সমস্ত হৃদয়,
জ্বলি জ্বলি অনুতাপানল,
হৃদয় কবেছে চিতাময়!

যাবে যদি জানিতাম—তবে
আরো কাছে বসিতাম গিয়ে,
জীবনের যত অপরাধ—
তত ক্ষমা নিতাম মাগিয়ে।

যাবে যদি জানিতাম—তবে
স্নেহ বাক্য রাখিতাম ধরি—
সে যে মোর বরাভয় সুধা,
রহিত এ ভগ্ন বক্ষ ভরি।

চীন

শ্রীভারতকুমার বসু

চীনদেশে আগে যে সমস্ত বড় বড় জঙ্গল ছিল, এখন তার অস্তিত্ব একরকম বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে ব'ললেই হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, চীনবাসীরা এই জঙ্গল পুনরায় তৈরী করবার বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। এবং স্বাভাবিকই, তার ফল তারা ভোগ করে হাড়ে-হাড়ে। এক কালে যে চীন থেকে রাশি-রাশি কাঠ বিদেশে রপ্তানি করা হোতো, এখন সেই চীনই নিজের জন্য কাঠ নিয়ে আসে অপর দেশ থেকে,—একান্ত পরনির্ভরতা স্বীকার ক'রেই! ...চীনদেশে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে ধান, চা, তুলা, রেশম, মটর ইত্যাদিই

মানচুরিয়া-বাসিনী সজ্জিতা নারী।

হচ্ছে প্রধান। সেখানকার রেশমের কাজ প্রায় চার হাজার বছর ধ'রে চ'লে আসছে ব'লেই কথিত আছে। শোনা যায় না কি যে, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত চীনদেশই সমস্ত পৃথিবীকে ব্যবসার জন্য অর্দ্ধেক রেশম জু্গিয়েছিল।

খনি এবং ক্ষেতের দিক দিয়ে চীনদেশের আছে অনন্ত সম্পদ। কিন্তু একটা জিনিষের দিক দিয়ে চীনদেশ এখনো তেমন সন্তোষকর উন্নতি ক'রতে পারেনি। তা হচ্ছে মটরের ফসলের কথা। ১৯০৭ সালে সেখান থেকে যে পরিমাণের মটর বাইরে রপ্তানী করা হ'য়েছিল, তার আন্দাজ মূল্য ৬০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯১৭ সালে অবশ্য রপ্তানি-করা মটরের পরি... হ'য়েছিল বেশ সন্তোষকর। এবং তার মূল্য ছিল ১৩,০০০,০০০ পাউণ্ড।

চীনদেশের আফিং-মহিমা হচ্ছে অপার। এবং এই মহিমায় মুগ্ধ... সেখানকার লোকেরা যেন দেবীর মতোই পোস্ত-গাছকে (এই গাছ থে...
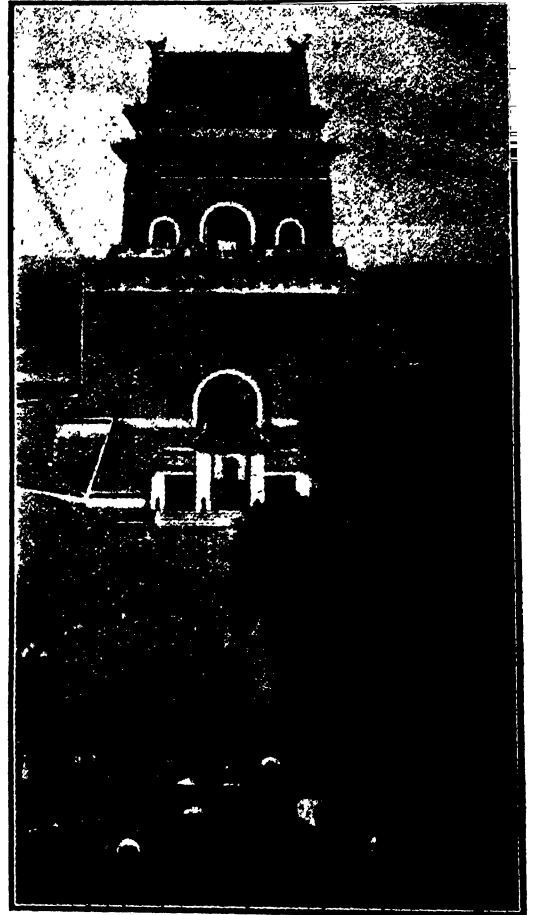
পিকিং-দেশের এইটা হচ্ছে একটা বিখ্যাত বাড়ী। এটা ... ১০০ ফিট উঁচু। প্রত্যহ রাত্রে চারবার ক'রে একটা প্রহরী এখানে বি... একটা ঘণ্টা বাজায়—সময় নির্দ্দেশ করবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে এ বা... থেকে একশ' গজ দূরে অবস্থিত Drum Tower নামে একটা বা... থেকে প্রচণ্ড শব্দে একটা ঢাক বেজে ওঠে।
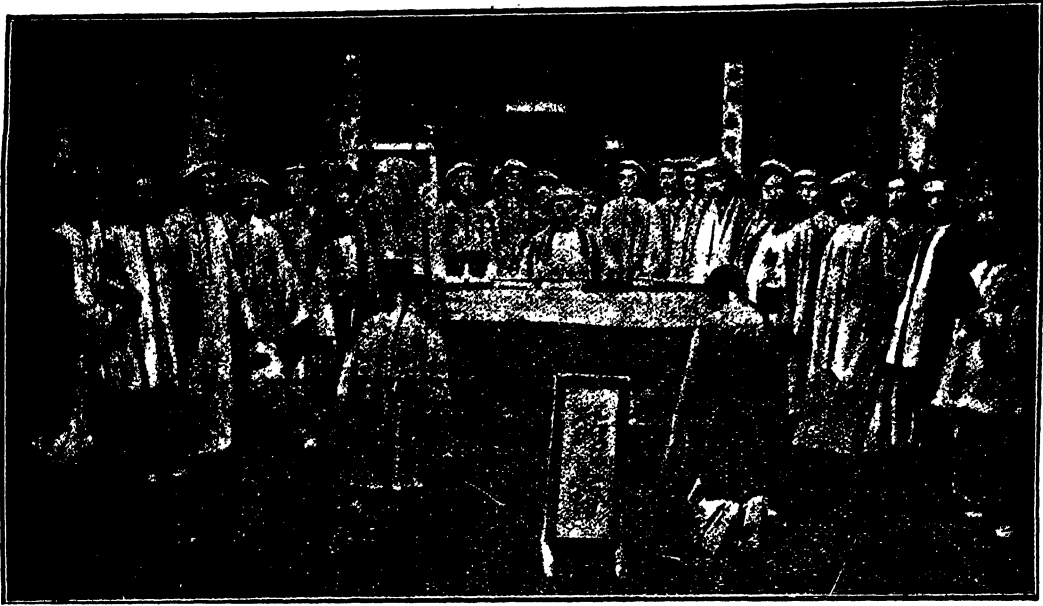
চীনা আদালতে বাদী-প্রতিবাদী পক্ষের এই দুটী সাক্ষী, বিচারকের সামনে নতজানু হ'য়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আফিং হয়) পূজা করে!…এই ব্যাপারটাই যুগ-যুগ ধ'রে চীনদেশের ইতিহাসের একটী বিশেষত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু আফিং ওষুধ-হিসাবে উপকারী হ'লেও, তা যে বাস্তবিকই দেহের পক্ষে ক্ষতিকর, অর্থাৎ বিষ, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু চীনদেশে আফিং সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারটী ক্রমে এম্নি সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল যে, শেষে ১৯০৬ সালে গভর্ণমেণ্ট প্রচার ক'রে দিলেন যে, অতঃপর সেখানকার আর কেউ আফিংয়ের ধূম পান ক'রতে পারবে না, এবং পোস্ত গাছের চারাও আর পুঁত্তে পারবে না। কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরং। প্রথম শ্রেণীর নেশাখোরদের কাছে এই প্রচারের প্রস্তাব আদৌ সঙ্গত ব'লে বোধ হ'লো না। এবং এই কারণেই বোধ করি, এখনো পৃথিবীর যে-কোনো জাতিকে নেশা করার দিক দিয়ে চীনবাসীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান ক'রতে পারে।

চীনদেশের খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লার নামই প্রথমে করা যেতে পারে। ১৯২২ সালে মাত্র আট মাসেই সেখানে যা কয়লা উঠেছিল, তার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১৯,০০০,০০০ টন্। সেখানে লোহার খনি আছে প্রচুর। তা থেকে কিন্তু যা লোহা পাওয়া যায়, তার পরিমাণ খুব প্রচুর নয়! এ কথায় এই বোঝায় না যে, ওই সব খনিতে লোহা আছে খুব কম। লোহা সেখানে আছে প্রচুরই; কিন্তু চীনবাসীরা সেই সব লোহা তোলবার কায়দা জানে না। অর্থাৎ তা তুলতে তারা কোনরকম বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে না। যা করে, তা হাতে-নাতে কাজের দ্বারা!

সেখানকার অন্যান্য প্রধান খনিজ ধাতুর মধ্যে টিন্, তামা এবং এ্যাণ্টিমণির নাম করা যেতে পারে।

নব্য বিজ্ঞানের দিক দিয়ে চীনবাসীদের জ্ঞান কিছুই নেই ব'ললেই হয়। অন্ততঃ সে বিষয়ের আজ পর্য্যন্ত তারা কোনো পরিচয় দিতে পারেনি।

চীনবাসী ও তার প্রিয়বস্তু—তামাক খাবার 'পাইপ্'।
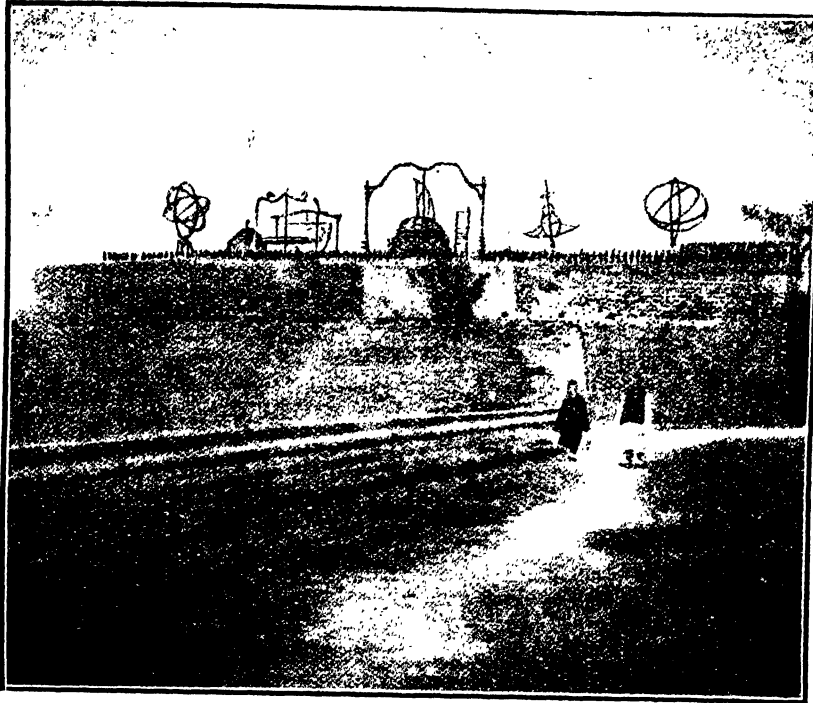
সামনের ওই উঁচু জায়গাটার উপর দাঁড়িয়ে প্রাচীন চীনা জ্যোতিষীরা নক্ষত্র গণনা ক'রতেন। এজন্য তাঁরা যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রতেন, তা এখনো সেখানে রাখা আছে। ১৩শ শতাব্দীর শেষের দিকে ওই জায়গাটা তৈরী করানো হ'য়েছিল।

অভ্যাস অনুযায়ী গাধার মতন খাটুনী খেটে' যারা আনন্দ পায়, বিজ্ঞানের দ্বারা সহজসাধ্য কাজের জন্য সরল পথটা যে তারা কষ্ট ক'রে অবলম্বন ক'রবে না, তাব আর আশ্চর্য্য কি?…

'উড্-ব্লকের' দ্বারা মুদ্রনের ব্যাপারটা চীনদেশে প্রথম প্রচলিত হয় ২০০ খৃষ্টাব্দে। তারও ৮০০ বছর পরে 'টাইপ্' ব্যবহার করা হয়। খৃষ্ট জন্মাবার ১০০০ বছর পূর্ব্বে থেকে চুম্বকের কম্পাস্ সেখানে চল্‌তি হয়। এবং খৃষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বেই পাহাড় ইত্যাদি ফাটাবার জন্য বিস্ফোরক চূর্ণের সেখানে সৃষ্টি হয়!…

বৈজ্ঞানিক উন্নতি সেখানে না থাকলেও, চীনবাসীরা বলে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০ সালে তাদের দেশ যে-রকম ছিল, তার ২০০০ বছর পরে তাদের দেশ তার চেয়ে অনেকই উন্নতি ক'রেছে। এবং তাদের ধারণা হচ্ছে এই যে, যেহেতু কুলী সেখানে হচ্ছে খুব সহজ-প্রাপ্য অর্থাৎ সস্তায় প্রাপ্য, অতএব বিজ্ঞানের দিক দিয়ে কোনো অভাবকেই (যদি তা বাস্তবিকই থাকে) তারা গ্রাহ্য ক'রবে না!—তাদের এই ধারণা যে সত্য তা প্রতিপন্ন করবার জন্য যখন তারা, রাজদূতদের বন্দী করার জন্য বক্সার্‌বাসীদের দ্বারা নিহত বিখ্যাত জার্ম্মান্ ভন্ কেট্‌লারের স্মৃতিরক্ষার্থ একটী খিলানের ছাদ তৈরী ক'রে দিতে বাধ্য হ'য়েছিল, তখন বড়-বড় চীনা কন্‌ট্রাক্টাররা তাদের 'উগ্রবুদ্ধিযুক্ত' মাথার শিখা সজোরে নাড়িয়ে অত্যন্ত কালোয়াতী-ভাবেই যথাস্থানে পর পর ১৭০০০টী শক্ত বাঁশ প্রথমেই পুঁতে ফেললে। তার পর তাদের প্রান্তগুলিতে ৬০,০০০ পাউণ্ড ওজনের দড়ী বেঁধে একটা মঞ্চের মত তৈরী ক'রে ফেললে। কারণ, তার উপরেই যে ছাদ করবার খিলানের পাথর সাজিয়ে ফেলতে হবে!…এ বিষয়ে অধিক আর না ব'ললেও চলে।

চীনদেশের একটী চমৎকার খেলনা আছে তার নাম Diabolo। এই খেলনাটী একটী বাঁশের কঞ্চি,

দোকানদারী। ক্রেতার জেনে শুনে আশ্চর্য্য রকম কম দাম বলা দেখে' বিক্রেতা অবাক হ'য়ে গেছে। ক্রেতা কিন্তু মজা ক'রে এই রকম দাম ব'লেই আনন্দ পায় প্রচুর।
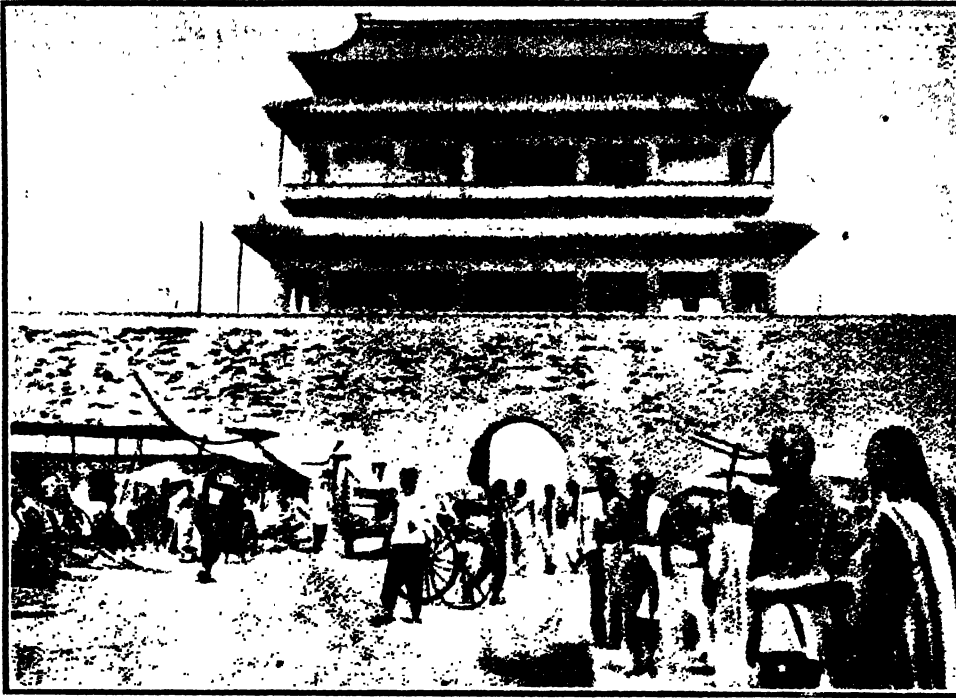
সামনের ওই প্রাচীরটী আসল চীন থেকে মান্চুরিয়া দেশকে বিভক্ত ক'রে দিচ্ছে। প্রাচীরটীর মধ্যে তিনটী 'গেট্' আছে। সামনেকার ওই 'গেট্'টীর নাম—হা-টা।

দুটো কাঠি এবং একটী সূতার দ্বারা তৈরী। এই খেলনাটী প্রথম আবিষ্কার করে পিকিং-দেশের এক বৃদ্ধ। তিরিশ বছর ধ'রে রোজ সকাল বেলায় সে এই খেলনা ব'সে ব'সে তৈরী ক'রতো, আর, বিকেলে সেগুলোকে বিক্রী ক'রতো। তার যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল মাত্র একখানা করাত, একটা ছুরী, আর একখণ্ড বালির কাগজ। কিন্তু আশ্চর্য্য, যে লোক ডাহা তিরিশ বছর ধ'রে নিজের হাতে এত খেলনা তৈরী ক'রে এসেছে, সে এ কাজের জন্য কেন একটা ছোট-খাটো কল্ তৈরী করেনি, অথবা একটা ক্ষুদ্র কারখানাও করেনি! খেলনা বেচে' তার বেশ-কিছু পয়সা হ'তো।...

চীনদেশের স্থাপত্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। কারণ, তা একেবারেই একঘেয়ে। বহু বছর পূর্ব্বে সেখানকার স্থাপত্যের যা আদর্শ ছিল, আজ পর্য্যন্ত তা হুবহু অনুকৃত হ'য়ে আসছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, উচ্চতার দিক দিয়ে পিকিং সহরের প্রত্যেক বাড়ীই এবং দোকানঘরই আগেও যেমন ছিল, এখনও ঠিক তাই আছে। সাধারণতঃ সেখানকার কোনো বাড়ীই একতালার বেশী উঁচু হয় না। এবং বাড়ীকে যদি একান্তই বাড়া'তে হয়, তা হ'লে তা বাড়া'তে হবে চওড়া-দিকে, উঁচুদিকে নয়, অর্থাৎ দোতালা তুলে নয়! বাড়ী তৈরী করবার সময় স্থপতির বিশেষ দৃষ্টি থাকে বাড়ীর ছাদের দিকে। কারণ, সকলের চেয়ে ছাদটীকেই বেশী যত্ন ক'রে তৈরী ক'রতে হবে! এই তৈরী করার মধ্যেই স্থপতি তার সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত চাতুর্য্য এবং

সূচের কাজে চীনা নারীর নির্বাক আনন্দ। চীনদেশে একটী আইন আছে যে, বাড়ীতে যদি মেয়েরা খুব আনন্দের 'হররা' তোলে, তা হ'লে তখনি তাদের সঙ্গে তাদের স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'তে পারে। এই ভয়েই, সেখানকার মেয়েরা হয় অল্পভাষী এবং আনন্দ উপভোগ করে মুখ বুজে।

ঐকান্তিকতা ঢেলে দেয়। ছাদটীতে আঁকা হয় মত চিত্র-বিচিত্র নক্সা। এই নক্সার সৌন্দর্য্য অনুসারেই গৃহস্বামীর বংশ এবং পদমর্য্যাদার কথা জানতে পারা যায়।

চীনদেশে দোতালা এবং সময়ে সময়ে তেতালা বাড়ীও তৈরী করা হয়। তবে তা খুব কম, এবং অতি বিশেষ কারণেই! পিকিংয়ের "স্বর্গ মন্দির" তাদের মধ্যে একটী। চমৎকার এই মন্দিরটী! ঈষৎ বক্র শ্বেত পাথরের 'ভিতে'র উপর এই মন্দিরটী তোলা হ'য়েছে। এর তিনটী ছাদ তৈরী হ'য়েছে উজ্জ্বল নীল রংয়ের 'টালি'র দ্বারা। এই ছাদের নীচের দিকটাও সবুজ, নীল, পিঙ্গল ইত্যাদি বিবিধ উজ্জ্বল রংঙের টালি দিয়ে তৈরী! মন্দিরের চূড়ায় একটী ছোট গোলাকার পদার্থ আছে। সেটীর সমস্তটী নিরেট সোনা দিয়ে তৈরী!

চীনদেশে এই রংয়ের ব্যাপারটী হচ্ছে একটী প্রধান ব্যাপার। কারণ, তার এক একটী নির্দ্দেশে এক একটী জিনিষ জানতে পারা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, "স্বর্গ-মন্দিরে" বছরে যে একবার ক'রে আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা হয়, সে সময়ে নীল রং হয় তার পরিচয়-চিহ্ন স্বরূপ। তখন পূজা-পাত্রের রং হয়

প্রহরী ও চীনা দম্পতী। চীনবাসীরা এমন একটী কুসংস্কারের ভক্ত, যার মান রক্ষার্থ তারা কিছুতেই নিজেদের ফটো তোলায় না। এমন কি, এই ব্যাপারটীকে তারা ভয় ক'রে। কিন্তু পথে ভ্রমণ ক'রতে বেরোবার সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা কিছুতেই ক্যামেরার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে না।

নীল! পূজারীদের পোষাক হয় নীল! এবং পূজার ঘরে যে আলো জ্বলে, তার রং হয় নীল!…

চীনদেশের স্থাপত্য একঘেয়ে হ'লেও, তা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের দুটি আশ্চর্য্য এক চীনদেশেই র'য়েছে। তাদের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে পিকিংয়ের "স্বর্গ-মন্দিরে"র পাশে "পাই টাই"—নামক বিখ্যাত এবং বিপুল একটি বেদী। আর, দ্বিতীয়টি হচ্ছে—চীনদেশের প্রাচীর। মানুষের তৈরী এই দুটি জিনিষের কাহিনী লিখে অথবা ছবি এঁকে বোঝানো যায় না।……

'প্যাক্'-করা চায়ের বাক্স বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আগ্রার 'তাজে'র সামনে দাঁড়ালে তার সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্যে, বিস্ময়ে আপ্‌না হ'তেই চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসবে! কিন্তু, কি সূর্য্যালোকে, কি চন্দ্রালোকে "পাই টাই"য়ের সামনে এসে দাঁড়ালে, অথবা, চীনের প্রাচীরের মাত্র এক অংশও দেখলে, কী এক অসীম শ্রদ্ধায় হৃদয় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে!…

"পাই টাই"—বেদীটি তৈরী হ'য়েছে শ্বেত পাথর দিয়ে। এটি চওড়ায় ২১০ ফিট। তিন সারি পাথর দিয়ে এটি তৈরী হ'য়েছে।…

আর, চীনের প্রাচীরের কথা?…এ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু ব'ললেই যথেষ্ট হবে যে, যদি কোনো ভ্রমণকারী চীনদেশে গিয়ে এই প্রাচীরটি ছাড়া সেখানকার আর কিছুই না দেখেন, তা হ'লেও তাঁর ভ্রমণের খরচ উঠে আসবে!…খৃষ্টপূর্ব্ব ২২০ সাল থেকে এই প্রাচীরটি তৈরী হ'তে আরম্ভ হয়। এটি দৈর্ঘ্যে ১৪০০ ফিট। এটি তৈরী হবার প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত এর অধিকাংশ স্থান আগেকার মতই অম্লান র'য়েছে। ধ্বংস তার একটি চিহ্নও এর বুকে এঁকে যেতে পারেনি! এটি চওড়ায় এত বড় যে, এর উপরস্থ স্থান দিয়ে পাশাপাশি দুটি গাড়ী বেশই চ'লে যেতে পারে।…চীনদেশের চিত্র-শিল্পের বিষয় আলোচনা ক'রতে গেলে, আগে অন্যান্য দেশের প্রাচীন এবং আধুনিক ছবির আর্টের কথা ভুলে যাওয়াই উচিত! কারণ, তা না হ'লেই তুলনা-মূলক সমালোচনা এসে প'ড়বে! কাজেই, তাদের ভাব নিয়েই তাদের চিত্র-শিল্পের পরিচয় দেওয়া উচিত। এইখানে ব'লে রাখা দরকার যে, চীনদেশের আর্ট সমস্ত পাশ্চাত্য আর্ট থেকে একেবারে বিভিন্ন!…

চীনদেশের আর্টিষ্ট যদি একটি বিশিষ্ট জিনিষের পরিকল্পনায় ছবি আঁকেন, এবং একটি ইংরেজ অথবা অন্য কোন বিদেশীও যদি ঠিক সেই জিনিষেরই পরিকল্পনায় ছবি আঁকেন, তা হ'লে, তাঁদের ছবি কখনই এক অভিব্যক্তিযুক্ত হবে না। কারণ, তাঁদের উভয়ের ভাব হচ্ছে বিভিন্ন। এবং এই জন্যই একটি চীনবাসী ও একটি বিদেশীর আঁকা সামান্য দুটি ঘোড়ার ছবিও—বিচার করা ত দূরের কথা, পাশাপাশি রাখাও অন্যায় এবং ঘৃণ্য (অবশ্য চীনবাসীদেরই মতে)!…

পৃথিবীর সব দেশেরই চিত্রাঙ্কনের মধ্যে আদর্শ-নির্ব্বাচন, আলো-ছায়ার বিকাশ, রসানুভূতির সূক্ষ্মতা—ইত্যাদি জিনিষগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। চীনদেশে কিন্তু এগুলি একেবারে অজ্ঞাত। এবং এই কারণেই কোনো চীনবাসী ইংরাজ-আর্টিষ্টের আঁকা কোনো আলেখ্য-চিত্র দেখলে, অত্যন্ত বিস্ময়ে ব'লবে যে, কী মুস্কিল! ও দেশের পুরুষ অথবা নারীর মুখ

কিউ-কিয়াং দেশের রাজপথ। পথটী এত সঙ্কীর্ণ যে, কোনো গাড়ী এখান দিয়ে যেতে পারে না।

"পু টো" নামক স্থানে পুরোহিতদের মঠ।

কদিকটার রং কি এই রকম কালো, এবং আর-একদিকটার রং র্সা ?···

যাই হোক, এটা স্বীকার ক'রতেই হবে যে, চীনদেশের চিত্রাঙ্কনের র্ট অন্যান্য দেশের আর্ট থেকে একেবারে বিভিন্ন হ'লেও, সম্পূর্ণ তনত্ব ও বিশেষত্বপূর্ণ ! এবং তা হচ্ছে চীনাদেরই একান্ত নিজস্ব

পিকিং-দেশের "স্বর্গ মন্দির"। এটী তেতালা। এর তিনটী ছাদ তৈরী হ'য়েছে উজ্জ্বল-নীল 'পোর্সিলেনের' টালির দ্বারা। এটী আকারে গোল। এর উচ্চতা হচ্ছে ১০০ ফিট। ১৮৮৯ সালে এটী পুড়ে যায়। কিন্তু আবার তা নতুন ক'রে তৈরী করানো হ'য়েছে।

সম্পত্তি!···ভূ-দৃশ্য আঁকবার কাজে চীনদেশ বোধ করি, আর সব দেশকেই ছাপিয়ে গেছে। তার একটি নিদর্শন—১৩০০ খৃষ্টাব্দে চাও-মেঙ্-ফু-র দ্বারা ১৭ ফিট লম্বা একখণ্ড রেশমের উপর আঁকা চমৎকার একখানি ছবি আজও ব্রিটিশ-মিউজিয়ামে সযত্নে রাখা আছে। পশু, পাখী, পতঙ্গ এবং ফুলের ছবি আঁকাতেও চীনা-আর্টিষ্টের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

রুচি এবং রসানুভূতির দিক দিয়ে চীন এবং জাপানের পার্থক্যের কথা এইখানে একটু বলা দরকার।—সাধারণতঃ চীনবাসীরা তাদের শোবার ঘরগুলি এমন সব অপ্রয়োজনীয়, কদাকার জিনিষের জঞ্জাল দিয়ে ভ'রে রাখে, যা জাপানদেশের চাষারাও ব্যবহার ক'রতে ঘৃণা বোধ করে। তার পর কখনো কখনো চীনবাসীরা তাদের ঘরগুলিতে অসংখ্য উৎকৃষ্ট চীনা ছবি সাজিয়ে রাখে। জাপানীরা কিন্তু তা করে না। তারা বেছে বেছে মাত্র একটি সুন্দর ছবি তাদের ঘরের দেওয়ালে

চীনা কুমারী।

টাঙিয়ে রাখে। এবং হয় ত প্রতিদিনই তা ব'দ্‌লে এক একটি নতুন এবং ভালো ছবি রাখে।···

চীনবাসীরা কবিতার অত্যন্ত অনুরাগী। বিশেষ ক'রে তা যদি প্রকৃতির বর্ণনা-মূলক হয়, অথবা, তাতে যদি ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত রুবাইয়াতের মতো সুরাপানের কথার ঝঙ্কার এবং জীবনের দুঃখের সুর বাজে, তাহ'লে তা হবে চীনবাসীদের কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। কথিত আছে, সেখানকার প্রাচীন গান ও কাহিনী সংগ্রহ করবার জন্য চীন-গুরু
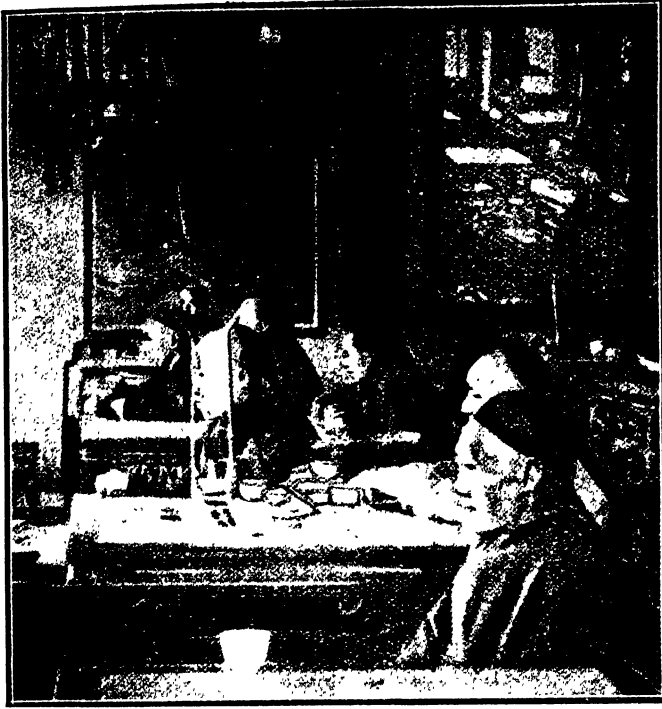
চায়ের দোকানে চা-পান। এদের সকলের মুখেই বিষণ্ণ ভাব। তার কারণ, চীনদেশের নিয়ম হচ্ছে এই যে, সেখানকার লোকেরা চা খেতে পারবে বটে, কিন্তু আমোদ-হিসাবে নয়।

কন্‌ফ্যুসিয়াসের ভ্রমণের এক হাজার বছর আগেই চীনদেশে জাতীয় গীতি-কবিতা ও জনপ্রিয় গাথা লিখিত হ'য়েছিল।

সাহিত্যের প্রতি চীনবাসীদের শ্রদ্ধা অসীম। এমন,—যে, যদি কোনো ব্যক্তি একটি খবরের কাগজে ছাপানো কোনো বিষয় পড়ে, তা হ'লে সে কখনো সেই পাতাটী কোনো জিনিষের দ্বারাই ঢেকে রাখতে পারবে না। অর্থাৎ, জাতীয় সাহিত্যকে অপমান ক'রবে না,—ঠিক যেমন ওয়েষ্টমিনষ্টার্ এ্যাবিতে কোনো ইংরাজ তার মাথা টুপী দিয়ে ঢেকে রাখতে পারবে না! অর্থাৎ, পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্রের অপমান ক'রবে না।

সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগও সেখানকার লোকদের যথেষ্ট আছে; এজন্য নানাবিধ যন্ত্রাদিও ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ সেখানে গীত-বাদ্যের ঘটা হয় জন্ম, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ইত্যাদি ব্যাপারের উপলক্ষে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে-দেশ গীত-বাদ্যের এত ভক্ত, সেখানে সখের গাইয়ে বা বাজিয়ে একেবারে নেই ব'ললেই হয়। যারা আছে, তারা হচ্ছে খাঁটী পেশাদার!...

সেখানকার রঙ্গালয়ে বাদ্য হচ্ছে একটী প্রধান জিনিষ। এবং সেখানকার দর্শকরা এমনি "মেধাযুক্ত" যে, অভিনয়ের সময়ে মাত্র বাদ্য শুনেই তারা বুঝতে পারে, অভিনেয় ব্যাপারগুলির ক্রম-পরিণতি কি হবে। অর্থাৎ নাট্যোল্লিখিত সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ ক'রবেন, কি, না। অথবা, নাটকের মধ্যে "গ্রাম্য রোমিও" তার ঈপ্সিতা "জুলিয়েটে"র সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সুখী হবে, কি, স্থানীয় ঔষধবিক্রেতার হাতে মারা যাবে!... ইত্যাদি।—

কিন্তু চীনদেশে নাটকের উৎপত্তি হয় কবে থেকে?...

সে অনেক দিন আগেকার কথা। তখন চীনদেশে ওয়াম্ সা' নামক একজন সম্রাট ছিলেন। তাঁর ছিল একটি সুন্দরী এবং তরুণী সম্রাজ্ঞী। তাঁর নাম ইয়াং কুয়িফি। সম্রাট তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন। একদিন তাঁরা দুজনে রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানের মধ্যে একটী সরোবরের উপর তৈরী একটী সেতুর উপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেতুটী তৈরী হ'য়েছিল দুটী আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকার স্মৃতি-রক্ষার্থে। সম্রাজ্ঞীর কোমল হৃদয় এই দুজনের কথাতেই ভ'রে উঠলো। ধীরে ধীরে সম্রাটের দিকে অনুরাগ-মাখা চাউনীতে চেয়ে' প্রেম-নম্র বাণীতে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত প্রীতি-আশা সমর্পণের

চীনদেশের মানচিত্র।

নিবেদন জানালেন। আত্মনিবেদিতা এই নারীর মুখের প্রেম-মধুর ছবিখানি সম্রাটের হৃদয়ে যেন অপূর্ব্ব স্বপন-সুরভি ছড়িয়ে দিলে। ধীরে ধীরে তিনি কোমল বাহুর বেষ্টনে সম্রাজ্ঞীকে নিজের দিকে টেনে নিলেন।

অক্লান্ত-কর্ম্মা চীনা কৃষক। এই রকম কাঠের তৈরী কাঁটার দ্বারাই তারা ক্ষেতের মাটী তোলে, আর, তাতে সার দেয়।

মিষ্টি খাবার বিক্রী ক'রতে বেরিয়েছে। চীনবাসীরা এ খেতে খুব ভালবাসে বটে, কিন্তু ইয়োরোপীয়দের কাছে এ-খাবার হচ্ছে অত্যন্ত অপ্রিয়।

এর পর তিনি তাঁর প্রধান মন্ত্রীর কাছে গেলেন—রাণীকে সুখী করবার জন্য নতুন এবং আনন্দদায়ক কি উৎসবের আয়োজন করা যেতে পারে,

চীনদেশের রাজধানী পিকিং সহর।

তারই পরামর্শ ক'রতে। বহুক্ষণ চিন্তার পর মন্ত্রী বললেন, "এ ত খুব সহজ কথা। আমি আপনার সভার মধ্যে সব চেয়ে বেশী নম্র ও সুদর্শন যুবাদের বেছে নেবো। তার পর তাদের রাজকীয় পোষাক প'রতে দেবো। দিয়ে, আমি ইতিহাস অন্বেষণ ক'রে তাদের শিক্ষা দেবো, কেমন ক'রে আপনার মহামান্য পূর্ব্বপুরুষদের মহিমাময় কীর্ত্তির বর্ণন্‌ভাগ আবৃত্তি ক'রতে হয়!"

তদনুসারে ফুল ও পাতার দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত বিপুল এক চন্দ্রাতপের তলে সুন্দর একটী ফলের বাগানের মধ্যে যথাসময়ে উক্ত উৎসব সম্পন্ন হ'লো। সম্রাজ্ঞী তা দেখে অত্যন্ত খুসী হ'লেন। এবং সম্রাটও এত আনন্দিত হ'লেন যে, উৎসব-ক্ষেত্রেই উৎসব-কর্ম্মীদের দলকে তিনি খেতাব দিলেন—"ফলবাগানের নাট্যরসিক-সঙ্ঘ" ব'লে। চীনদেশের নাট্য-ইতিহাসে এই সঙ্ঘের সঙ্গেই সেখানকার প্রথম-সৃষ্ট নাটকের কাহিনী জড়িয়ে আছে।

সাধারণতঃ চীনদেশে ঐতিহাসিক নাটকই হয় ঘটনা-বৈচিত্র্যে খুব চিত্তাকর্ষক। সেখানকার রঙ্গালয়ে পার্ব্বত্য পথ দেখানো হয় পর্দ্দার উপর ছবি এঁকে নয়। তা' দেখানো হয়—মঞ্চের উপর রাশীকৃত চেয়ার ও টেবিল উপরি-উপরি গাদা ক'রে রেখে'। সেখানে বিশেষ-বিশেষ অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয় বিশেষ-বিশেষ কারণে। সাধারণতঃ বাইরে থেকে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সেখানে আগমন, এবং ধান্য-শস্যের সন্তোষকর উৎপাদন হচ্ছে সেই কারণগুলির অন্যতম। এই সমস্ত অভিনয় হয় ঠিক সদর রাস্তার মাঝখানে ষ্টেজ্ বেঁধে!…অনেক সময়ে কোনো ভ্রাম্যমান চীনা-সম্প্রদায় পল্লীগ্রামে অভিনয় ক'রতে আসে। সে সময়ে সেখানকার ছেলে, মেয়ে,—এমন কি, বুড়োরাও পর্য্যন্ত এত খুসী হয় যে তা বলা যায় না। এই সম্প্রদায়ের অভিনয়ের সময়কার একটা বড় মজার কথা এইখানে বলা দরকার।…

ধরুন, অভিনয় আরম্ভ হ'তে কিছু দেরী আছে। একটী বিপুলকায় চৌৎকা দর্শকের ঠায় আর ব'সে থাকতে ভাল লাগলো না। সে তখন আস্তে আস্তে উঠে মঞ্চের পাশে গিয়ে পর্দ্দাটী তুলে খুব সন্তর্পণে ভিতরের দিকে চেয়ে' দেখতে লাগলো। অর্থাৎ, ভিতরে কি যে দেব-বাঞ্ছিত ব্যাপার হচ্ছে, তা দেখে' তার উচ্ছ্বসিত আগ্রহ মেটা'তে লাগলো। তার

পিকিংএর বাজারে মুখোসের দোকান।

দাঁতে ক'রে "চীনা বাদাম" ভাঙছে।

ব্যাপার দেখে' "পর সুখ-কাতর" অন্যান্য দর্শকদের মধ্যে ক্রমশঃ অনেকেই তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রলে। ব্যাচারী থিয়েটার-ওয়ালা ভারী মুস্কিলে প'ড়ে গেল। এবং যেন-তেন-প্রকারেণ অতি শীঘ্রই অভিনয় আরম্ভ না করিয়ে পারলে না!—এই ধরণের অভিনয় সেখানে প্রায়ই চলে সমস্ত দিন-রাত ধ'রে।

পৃথিবীর নিত্য-ব্যবহার্য্য কাগজের আবিষ্কার হয় চীনদেশেই সর্ব্ব-প্রথমে। চীনাদের কাছ থেকে আরবেরা এই কৌশল শেখে। তাদের কাছ থেকে আবার স্পেন দেশের লোকেরা এ শিখে নেয়। সে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের কথা। তার আগে ইয়োরোপে কাগজ ছিল না।

সমস্ত চীনদেশে ১৫৩২৪২০ বর্গমাইল জায়গা আছে। ১৯২২ সালে সেখানকার মোট জন-সংখ্যা ছিল প্রায় অল্লাধিক ৪০০,০০০,০০০। তার মধ্যে ১০,০০০,০০০ জন ছিল মুসলমান, ২০ ০০০০ জন ছিল রোম্যান্ ক্যাথলিক, ৬০০০০০ জন ছিল প্রোটেষ্টাণ্ট্। বাকী সব বৌদ্ধ, তেওস্ত্ ও কনফ্যুসিয়াসের ধর্ম্মাবলম্বী!

১৯১৮-১৯ সালে ১৩৪০০০টি বিদ্যালয়ের সেখানে প্রতিষ্ঠা হয়। তাতে শিক্ষক নিযুক্ত হ'য়েছিল ৪৫০০০০০ জন। সেখানে ১৩'৫০০ 'একার' জমি নিয়ে কয়লার খনি আছে। তা থেকে গড়্‌পড়্‌তা বছরে কয়লা ওঠে ১৯০০০,০০০ টন্। লোহার খনি থেকেও প্রায় বছরে ১৫০০০০০ টন্ লোহা পাওয়া যায়।

পিকিং হচ্ছে চীনদেশের রাজধানী। সেখানকার মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৯২০,০০০।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেও বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনে উপন্যাসের উপকরণের অভাব ছিল; সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁহার সমকালীন বাঙ্গালী কথা-সাহিত্য-রচয়িতৃগণকে একটু অসুবিধা বোধ করিতে হইয়াছিল। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র কোন প্রকারে এই অসুবিধা দূর করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব উপন্যাসগুলির রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু সেই বঙ্কিমযুগের সমসময়ে এমন একজন বাঙ্গালী মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহার বাস্তব জীবন-কাহিনী কাল্পনিক উপন্যাসের নায়কের অপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ—সাক্ষাৎ জীবন্ত রোম্যান্স। এই ভাগ্যবান পুরুষ আর কেহই নহেন—রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

কেবল দক্ষিণারঞ্জন কেন, তাঁহার পিতা পরমানন্দ, ওরফে জগন্মোহনের জীবন-কাহিনীও অল্প রোম্যাণ্টিক নহে।

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের ৺সূর্য্যকুমার ঠাকুর মহাশয়ের প্রথমা কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে ভট্টপল্লীনিবাসী ফুলের মুখুটী, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ বংশীয় ফুলিয়া মেল গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান মহাকুলীন ভৈরবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পরমানন্দকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া কলিকাতায় আনয়ন করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর সহিত উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। পরমানন্দ নাম তাঁহার শ্বশুর-পরিবারের মহিলাগণের মনোনীত না হওয়ায় তৎপরিবর্ত্তে জগন্মোহন নামকরণ করা হয়। দক্ষিণারঞ্জন জগন্মোহনের প্রথম পুত্র। ইং ১৮১৪ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহার জন্ম হয়। দক্ষিণারঞ্জনের জন্মের অল্পকাল পরে প্রসূতি পরলোকে গমন করিলে জগন্মোহন সূর্য্যকুমারের দ্বিতীয়া কন্যা শ্যামাসুন্দরীর পাণি গ্রহণ করেন।

শৈশবে দক্ষিণারঞ্জন হেয়ার সাহেবের স্কুলে, পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। হিন্দু কলেজে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রসিক-কৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি দক্ষিণারঞ্জনের সতীর্থ ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই ডিরোজিও-মণ্ডলীর এক একটি জ্যোতিষ্ক। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ডিরোজিও তাঁহার শিষ্যগণকে লইয়া একাডেমিক এসোসিয়েসন স্থাপন করেন। এই সভায় ডিরোজিও ছাত্রগণের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও তর্কশক্তির বিকাশের চেষ্টা করিতেন। এই সভায় ডেভিড হেয়ার এবং অন্য অন্য

প্রধান ব্যক্তিরা যোগদান করিতেন। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-মূলক আলোচনা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে দক্ষিণারঞ্জন হিন্দু কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া "জ্ঞানান্বেষণ" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে দক্ষিণারঞ্জনের ব্যয়ে উহা মুদ্রিত হইয়া ছাত্রসমাজে বিতরিত হইত। কাগজখানি তেরো বৎসর কাল চলিয়া পরে বন্ধ হইয়া যায়। এই পত্রে মধ্যে মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ বিরুদ্ধ উক্তি প্রকাশিত হইত বলিয়া দক্ষিণারঞ্জনের পিতা পুত্রকে তিরস্কার করিতেন। ফলে পিতার উপর বিরক্ত হইয়া দক্ষিণারঞ্জন সার্কুলার রোডে ডিরোজিওর বাটীর নিকটে একটি স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া লইয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি পিতার নিকট ফিরিয়া যান। ডিরোজিওর বাটীর নিকটে অবস্থান কালে তিনি প্রায়ই ডিরোজিওর বাটীতে গিয়া ডিরোজিও, তাঁহার জননী ও ভগিনীর সহিত আলাপ করিতেন। তৎকালীন হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের মধ্যে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাওয়ায়, ইহা ডিরোজিও প্রদত্ত শিক্ষার ফলে ঘটতেছে সন্দেহ করিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওর উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। সেজন্য ডিরোজিওকে বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করিলেও, হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের সহিত তাঁহার সংশ্রব ছিন্ন হয় নাই। অল্পকাল মধ্যে ডিরোজিও কলেরা রোগে পরলোকে গমন করেন। এই সময়ে দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখ ছাত্রগণ তাঁহার রোগে যথাসাধ্য সেবা করিয়াছিলেন।

এক সময়ে হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মদ্যপান, নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ তাঁহারা অত্যন্ত বাহাদুরীর কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। একদিন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে কয়েকটি ছাত্র মিলিত হইয়া এরূপ বাড়াবাড়ি করেন যে, প্রতিবাসীরা অত্যন্ত বিরক্ত হন। কৃষ্ণমোহন সে সময়ে বাসায় উপস্থিত না থাকিলেও প্রতিবাসী হিন্দুগণের আগ্রহে কৃষ্ণমোহনের মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ দৌহিত্রকে গৃহ হইতে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। সেই রাত্রিতে কৃষ্ণমোহন অন্য কোথাও আশ্রয় না পাওয়ায় দক্ষিণারঞ্জন কৃষ্ণমোহনকে আশ্রয় প্রদান করেন। কৃষ্ণমোহন তৎকালে "ইন-কোয়ারার" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে-ছিলেন। এক দিন এই পত্রে প্রকাশিত হইল যে, নব্য তন্ত্রীদলের অন্যতম অগ্রণী মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখ আরও অনেকে শীঘ্রই খৃষ্টান হইবেন। এইরূপ জনরব শুনিয়া দক্ষিণারঞ্জনের পিতা কৃষ্ণমোহনকে তাঁহার গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। কৃষ্ণমোহন চলিয়া গেলে দক্ষিণারঞ্জনও পিতার উপর রাগ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিলে দক্ষিণারঞ্জন "জ্ঞানান্বেষণে" তাঁহার অজস্র প্রশংসা করেন; এবং দেশীয় ও ইয়োরোপীয় সম্ভ্রান্ত সমাজ টাউন হলে সার চার্লস মেটকাফের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সভা আহ্বান করেন, দক্ষিণারঞ্জন সেই সভায় একটী বক্তৃতায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় সার চার্লসকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ডিরোজিওর মৃত্যুর অল্পকাল পরে তাঁহার স্থাপিত একাডেমিক এসোসিয়েসন উঠিয়া যায়। কিন্তু এরূপ একটি সভার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি 'সোসাইটি ফর দি এক্যুইজিসন অব জেনারেল নলেজ' বা সাধারণ জ্ঞানার্জ্জন সভা নামক একটি সমিতি স্থাপন করিলেন। দক্ষিণারঞ্জন পরে এই সভায় যোগদান করেন। হিন্দুকলেজে এই সভার অধিবেশন হইত। কিন্তু একদা দক্ষিণারঞ্জন এই সভায় বঙ্গদেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "আদালত ও পুলিশের অবস্থা" শীর্ষক একটি রাজনীতিমূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধ শুনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হিন্দুকলেজে সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন। সভা তখন স্থানান্তরিত হয়। দক্ষিণারঞ্জনের এই প্রবন্ধ লইয়া তৎকালে অত্যন্ত আন্দোলন হইয়াছিল। ইংরাজদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ উচ্চ প্রশংসাও করিয়াছিলেন।

এই সময়ে জর্জ্জ টমসন নামক একজন ইংরাজ ভদ্রলোক প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত এ দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সুবক্তা, রাজনীতিজ্ঞ ও অতি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। বলিতে গেলে, এতদ্দেশবাসীকে রাজনীতির আলোচনা করিতে তিনিই প্রথমে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সাধারণ

জ্ঞানার্জ্জন সভার এক অধিবেশনে তিনি সভাপতি ছিলেন। সেই সভাতেই বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামক বাঙ্গলার প্রথম রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই সভার সংশ্রবে "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" নামক একখানি সংবাদপত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণারঞ্জন উভয়ের সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

জননীর মৃত্যু উপলক্ষে দক্ষিণারঞ্জন উত্তরাধিকার সূত্রে দেড়লক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি এ যাবৎ সভা-সমিতি ও সংবাদপত্র পরিচালনে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে তিনি সদর আদালতে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হন। ছাত্রাবস্থায় হরচন্দ্র ঠাকুরের কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরীর সহিত দক্ষিণারঞ্জনের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু এই মহিলা চিররুগ্না ছিলেন। এই জন্য দক্ষিণারঞ্জনের গার্হস্থ্য জীবন বড় সুখের ছিল না।

এই সময়ে এক দিন তিনি একটা উৎসব উপলক্ষে বর্দ্ধমানে গিয়া কয়েক দিন ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের অন্যতমা বিধবা রাণী বসন্তকুমারী দক্ষিণারঞ্জনকে সদর আদালতের উকীল জানিয়া একটা বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়, এবং পরে দক্ষিণারঞ্জন বসন্তকুমারীকে একদফা হিন্দুপদ্ধতিতে শালগ্রাম শিলার সমক্ষে অগ্নি সাক্ষী করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বিবাহ করেন; আবার, এই অসবর্ণ বিধবা-বিবাহ আইন-সিদ্ধ করিবার জন্য সিবিল ম্যারেজ পদ্ধতি অনুসারেও বিবাহ করেন।

ইহার পর দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতার কালেক্টার নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী এই পদ প্রাপ্ত হন নাই।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার সাধনের জন্য দক্ষিণারঞ্জন অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন যখন নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় একটি কন্যা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তখন দক্ষিণারঞ্জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণার্থ ১২০০০ টাকা মূল্যের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেন। সেই ভূমির উপর বর্ত্তমান বেথুন কলেজ অবস্থিত। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে।

অতঃপর দক্ষিণারঞ্জন কিছু দিন ত্রিপুরার রাজসংসারে, ও মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে দেওয়ান-নিজামতে কার্য্য করেন।

ইহার পর সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে দক্ষিণারঞ্জন বিদ্রোহের কারণ ও আনুষঙ্গিক অবস্থা সম্বন্ধে লণ্ডন টাইমসে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার গভীর রাজনীতিক জ্ঞান এবং দেশের অবস্থাভিজ্ঞতা দর্শনে কি ইংরেজ, কি দেশীয় লোক, সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে। দক্ষিণারঞ্জন সৎপরামর্শ দিয়া এবং অন্যান্য প্রকারেও এই সঙ্কট কালে সরকারের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ঘোষণা-বাণী সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। দেশের অনেক স্থলেই সভা-সমিতি করিয়া মহারাণীর প্রতি ভগবানের শুভাশীস্ প্রার্থনা করা হয়। ঢাকার এইরূপ একটি সভায় দক্ষিণারঞ্জন একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া বৃটিশ শাসনের উপকারিতা জনগণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল অযোধ্যা প্রদেশের এই সময়ে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা। সেখানকার জমিদাররা প্রায়ই অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত। সদাচার ও সদ্ব্যবহার দ্বারা এই সকল জমিদারকে বশীভূত করিয়া বৃটিশ শাসনের অনুরাগী করিয়া তোলা অতি কঠিন কার্য্য। ইহাতে যেরূপ চতুরতা ও রাজনীতিকুশলতা, সেইরূপ চরিত্রবল ও ব্যক্তিত্ব আবশ্যক। কোন য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারীর দ্বারা তাহা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে তৎকালে য়ুরোপীয় মাত্রেই সাধারণতঃ দেশীয়গণের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন—শান্ত, সংযত ভাবে সুবুদ্ধির পরিচালন পূর্ব্বক কাজ করিবার প্রত্যাশা তাঁহাদের কাছে করা যাইতে পারিত না। ওদিকে 'আংরেজ লোগ' মাত্রকেই দেশবাসী তৎকালে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে বৃটিশ শাসনযন্ত্রের শীর্ষস্থানে সেই সময়ে লর্ড ক্যানিংএর ন্যায় বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিলেন, তাই রক্ষা। এক্ষণে, অযোধ্যার উৎক্ষিপ্ত জমিদারগণকে বশীভূত করিবার জন্য সেইরূপ একজন বিচক্ষণ, পদস্থ, সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত, সংযত-চরিত্র দেশীয় ভদ্রলোকের

প্রয়োজন হইল। সরকার ও দেশবাসীর সমান বিশ্বাস-ভাজন রাজনীতিকুশল এরূপ লোক তখন একমাত্র দক্ষিণারঞ্জন। লর্ড ক্যানিং-এর দৃষ্টি সহজেই তাঁহার উপর পতিত হইল। ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফও লর্ড ক্যানিংকে বুঝাইয়া দিলেন যে এই কার্য্যের জন্য দক্ষিণারঞ্জনই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। লর্ড ক্যানিং তাঁহাকেই এই গুরু কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া অযোধ্যাপ্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ অঞ্চলের শঙ্করপুরের তালুকদার রাজা বেণীমাধব বক্স বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করায় তাঁহার তালুকটি বৃটিশ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর লক্ষ্ণৌ নগরে একটি দরবার করিয়া লর্ড ক্যানিং রায় বেরিলীর অন্তর্গত শঙ্করপুরের বাজেয়াপ্ত এই তালুকটি দক্ষিণারঞ্জনকে দান করিলেন। দক্ষিণারঞ্জন যখন মুরশিদা-বাদের নবাব সরকারে কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে মুরশিদাবাদের নবাব-নাজিম ফেরেদুন জা তাঁহাকে রাজোপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এইরূপে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাটীর দৌহিত্র সন্তান রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অযোধ্যার তালুকদার বনিয়া গেলেন। লর্ড ক্যানিং জমিদারী প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনকে ঐ প্রদেশের অনারারী এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের পদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখন হইতে অযোধ্যাপ্রদেশ দক্ষিণারঞ্জনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইল। এই সময়ে তাঁহার বেশভূষা এবং কতকটা পরিমাণে আচার-ব্যবহারও ঐ প্রদেশবাসীদের মত হইয়া যায়—তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে আপনাকে ঐ প্রদেশবাসীদের সমান ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পান। তাঁহার সে চেষ্টা অনেকটা সফলও হইয়াছিল। অযোধ্যায় জমিদার রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পরে রাজা দক্ষিণারঞ্জন একবার কলিকাতায় আসিয়া বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন।

অযোধ্যায় দক্ষিণারঞ্জন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সেখানকার জমিদারগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বাঙ্গলার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের অনুকরণে একটি তালুকদার-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এই সভা এক সময়ে কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ন্যায় রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

তালুকদার-সভা স্থাপন ব্যতীত, রাজা দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যাপ্রদেশবাসী রাজপুতগণের মধ্যে শিশুকন্যা-হত্যা নিবারণ করেন। তিনি তালুকদার সভার মুখপত্র স্বরূপ "সমাচার হিন্দুস্থানী" এবং "ভারত পত্রিকা" নামক দুইখানি সংবাদপত্রও প্রতিষ্ঠিত করেন।

অযোধ্যায় দক্ষিণারঞ্জনের অপর এক কীর্ত্তি—ক্যানিং কলেজ। প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই এই কলেজ স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত, অযোধ্যায় তাঁহার আরও অনেক সৎকীর্ত্তির নিদর্শন রহিয়াছে। তাঁহার এই সকল সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ লর্ড মেয়ো তাঁহাকে নূতন করিয়া আবার রাজোপাধিতে ভূষিত করিলেন—এখন হইতে দক্ষিণারঞ্জন ডবল রাজা হইলেন। এরূপ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই ঘটিয়া থাকে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হন। ঐ বৎসর ১৫ই জুলাই তারিখে লক্ষ্ণৌ নগরে ৬৪ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

বঙ্গ-সন্তান দক্ষিণারঞ্জন স্বীয় গুণে অযোধ্যা-প্রদেশবাসীর যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া আজ আমরা তাঁহার পুণ্যস্মৃতির তর্পণ করিলাম।

মধ্য-ভারত

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

উজ্জয়িনী

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতবর্ষে' উজ্জয়িনীর ইতিহাসই লিখেছি। তা থেকে এখনকার উজ্জয়িনীর কোন ধারণাই হবার যো নেই। তবুও কালের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ ক'রে উজ্জয়িনী যা তার বুক আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে আছে, তা দেখ্‌বার মত, তার পবিত্রতা উপভোগ করবার মত, তার ভগ্নস্তূপারণ্যের সম্মুখে নতজানু হয়ে সেই সুদূর অতীতের স্মৃতিকে পূজা করবার মত,—আর সেই প্রসন্নসলিলা শিপ্রার স্ফটিক-শুভ্র জলে অবগাহন করে হৃদয় মন নির্ম্মল করবার মত। তাই আমরা উজ্জয়িনীতে ২৯শে ডিসেম্বর সারাদিন থেকে কি কি দেখে এসেছি, তারই একটা ছোটখাটো বিবরণ দিচ্ছি।

আমরা যে প্রকাণ্ড একটা দল বেঁধে উজ্জয়িনী দেখতে গিয়েছিলাম এবং সেই উপলক্ষে উজ্জয়িনীর একমাত্র প্রবাসী বাঙ্গালী, ও-অঞ্চলের সর্ব্বজনমান্য 'মাষ্টারজি' শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর চড়াও ক'রে যে অত্যাচার ক'রে এসেছিলাম, তা ভুলবার নয়।

ভোর পাঁচটা সাঁইত্রিশ মিনিটের সময় যখন উজ্জয়িনী ষ্টেসনে নামলাম, তখনও রাত্রির অন্ধকার দূর হয় নাই, কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্ন, রাস্তার আলোকগুলি গায়ে-মুখে কালী মেখে ঝিমুচ্ছিল। সেই ভয়ঙ্কর শীতে পথে জনমানবের দেখা নেই। আমাদের সঙ্গে যে সব যাত্রী সেই গাড়ী থেকে নেমেছিল, তারা বোধ হয় শীতের ভয়েই পথে না নেমে মুসাফিরখানায় আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা শীতে কম্পান্বিত-কলেবর হ'লেও ও-দেশের মুসাফিরখানায় ঢুকতে সাহসী হইনি; বিশেষতঃ, আমাদের সঙ্গী, হরিদাস বাবুর মাষ্টার মশাইরা বল্‌লেন, বাসা বেশী দূর নয়, তিনচার মিনিটের পথ। তখন আর ষ্টেসনে অপেক্ষা করতে কেউই চাইলেন না। ষ্টেসনের বাইরে এসে দেখা গেল, সেই শীতের মধ্যে একখানি টঙ্গা যাত্রীর আশায় দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রতি কৃপা-পরবশ হয়েই হোক বা আমাকে শীতে একেবারে জড়সড় দেখেই হোক, সঙ্গীরা সেই টঙ্গাওয়ালাকে ধরলেন। বেশী দূর নয়, বেশ যেতে পারব, টঙ্গার কোন দরকার নেই—কেউ সে কথা কানে তুললেন না। আমাকে টঙ্গায় চাপিয়ে দিয়ে আমাদের পথের অন্যান্য সঙ্গী খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, হরিদাস বাবুর পুত্র শ্রীমান আনন্দমোহনের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। কেহ বল্‌লেন, গাড়ী থেকে নেমেই সে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য আগে বাড়ী গিয়েছে; সঙ্গী মাষ্টার বাবুরা বল্‌লেন, সে কোন কাজের কথাই নয়, আনন্দমোহন নিশ্চয়ই গাড়ীতে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল, উজ্জয়িনী ষ্টেসনে নামতে পারে নাই, এগিয়ে চ'লে গিয়েছে; যেখানে ঘুম ভাঙ্গবে সেখান থেকে ফেরত ট্রেণে আসবে। যে অন্ধকার আর যে শীত, তাতে নিজেকেই টেনে নামানো যায় না, কোন্ গাড়ী থেকে কে নামল, কে প'ড়ে রইল, তা ঠিক করা একেবারেই অসম্ভব। তখন আর কি করা যায়, একজন মাষ্টার আমার সঙ্গী হ'লেন।

দুই তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা হরিদাস বাবুর দুয়ারে গিয়ে হাজির হ'লেম। আমরা গাড়ী থেকে নামতে না নামতেই আর সকলে এসে উপস্থিত হলেন। হরিদাস বাবু তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এসেই বল্‌লেন, সবাই ভিতরে আসুন, বাইরে বড় শীত। তাঁর বৈঠকখানার ফরাসে গিয়ে সবাই শরীর ঢেলে দেবার উপক্রম করছেন দেখে তিনি বল্‌লেন, এখন আর শয়ন নয়; এক পেয়ালা চা খেয়ে শরীরটা তাজা করে হাত মুখ ধুয়ে এসে সবাই বসুন, গরম জল তৈরী। তার পর বেশ করে চা-যোগ করলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। কে যেন একজন দয়া-পরবশ হয়ে বল্‌লেন, দাদাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন, সারারাত ঘুমুতে পারেন নি। হরিদাস বাবু হেসে বল্‌লেন, আমার এই ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে দাদার উপরই প্রয়োগ করতে হবে।

গৃহস্থেরা বোধ হয় সেই শীতে ভোর পাঁচটায় উঠেই এই সব ব্যবস্থা করতে লেগে গিয়েছিলেন।

তখনই ভৃত্য চা নিয়ে এল। হরিদাস বাবু এক পেয়ালার বরাদ্দ করেছিলেন, এক এক জন তিন চার পেয়ালা গলাধঃকরণ করে তবে হাই ছাড়লেন "আঃ, কি আরাম!" তার পর এতগুলো মানুষের হাতমুখ ধুয়ে আসতে-আস্‌তেই সাতটা বেজে গেল। তখন আবার চা আর তার সঙ্গে গরম জিলিপী। নরেন্দ্র বল্‌লেন, এত সকালেই কি দোকান খুলেচে? হরিদাস বাবু সহাস্যে বল্‌লেন, গৃহিণী আজ একটু ভোরেই দোকান খুলেছেন। এর থেকেই হরিদাস বাবুর অতিথি-সৎকারের পরিচয় সবাই পাবেন। আমাদের কারও বাড়ীতে পৌষ মাসের সেই হাড়কন্‌কনে শীতের ভোরে নূতন জামাই বা কুটুম্বোত্তম গৃহিণীর ভ্রাতার আগমন হোলেও কোন সুগৃহিণী তাঁদের জন্যও অত ভোরে জিলিপী ভাজেন কি না জানি না, অতিথি ত দূরের কথা।

ঠিক সাড়ে সাতটায় পাঁচখানি টঙ্গা হরিদাস বাবুর দ্বারে উপস্থিত হোলো, তিনি পূর্ব্বদিনই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন; এবং সাড়ে সাতটায় বেড়াতে বেরুতে হবে ব'লেই ভোরে আমাদের শয্যাগ্রহণ করতে দেন নাই।

আমরা তখনই বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের ব্যবস্থা পূর্ব্বে ঠিক হয়েছিল যে, আমরা বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে উজ্জয়িনীর যা কিছু দেখবার আছে সব দেখে শেষ করে, হরিদাসবাবুর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-আহার করে দুইটার ট্রেণ ধরব এবং সন্ধ্যার সময় ইন্দোরে পৌঁছিব। তার পর রাত্রি চারটার সময় মাণ্ডু যাত্রা করব। মাণ্ডু যাবার ব্যবস্থা আগেই করা হোয়েছিল, সে ব্যবস্থা আর উল্টাবার যো ছিল না। কাজেই যে কোরেই হোক সন্ধ্যার মধ্যে ইন্দোরে আসা চাই-ই; হরিদাস বাবুও এ ব্যবস্থার কথা জান্‌তেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কোরেও আমরা আমাদের পূর্ব্ব ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পারিনি। সে কথা ক্রমে বল্‌ছি।

প্রথমে কোন্ দিকে যেতে হবে, তার জন্য আমাদের ভাবনা রইল না, কারণ স্বয়ং হরিদাস বাবুই আমাদের পথ-প্রদর্শনের ভার নিলেন, আর তাঁর মাষ্টারেরাও সঙ্গে রইলেন। টঙ্গা চল্‌তে লাগল, আর আমরা দেখ্‌তে লাগলাম, ভাঙ্গা বাড়ী, মাটীঢাকা বড় বড় স্তূপ, গরীব গৃহস্থদের যৎসামান্য কুটীর, আর মধ্যে মধ্যে দুই একটা সন্ন্যাসীদের আশ্রম। কোথায় মহাকবির বর্ণিত সেই উজ্জয়িনী? কোথায়—

বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং

বল্‌তে গেলে সে সব কিছুই নেই। সব কালের কুক্ষিগত হয়েছে। এক বিস্তৃত মহাশ্মশানে বাতাস হায় হায় করে ফিরছে; আর অতীতের সাক্ষ্য দেবার জন্য দুই একটা ক্ষুদ্র জীর্ণ মন্দির কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে; তাও হয় ত বেশী দিন থাক্‌বে না। আছেন সুধু কালের সংগ্রামে জয়ী হয়ে মহাকাল; তিনি এখনও অসংখ্য ভক্ত নরনারীর পূজা পেয়ে আস্‌ছেন, আর আছেন শিপ্রা নদী; এঁর তরঙ্গভঙ্গ কেউ প্রতিরোধ করতে পারে নি। কিন্তু সেই শিপ্রাতে—

সুন্দরীদের স্নানলীলাতে
কেশের সুবাস উথ্‌লে তোলা,
গন্ধাবতীর গন্ধবারি
পদ্মফুলের পরাগ গোলা,——

সে সব কিছুই আর নেই। না থাক্, তবুও উজ্জয়িনী আছে—তার কালিদাস যে আছে। কালিদাসের অমৃতময় কাব্যাবলি, তাঁর নাটক যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন কালিদাস অমর—ততদিন তাঁর উজ্জয়িনী অমর!

আমাদের টঙ্গা প্রায় তিন মাইল এই সব দৃশ্য দেখাতে দেখাতে পৌঁছে দিলেন একটা মন্দিরের কাছে। মন্দিরটী মঙ্গলেশ্বরের। মন্দিরের পার্শ্বেই শিপ্রা নদী, বড় বড় সিঁড়ি বাঁধানো ঘাট। আমরা প্রথমেই সিঁড়ি নেমে জলের ধারে গেলাম। সুন্দর নদী, নির্ম্মল জল একেবারে ঢলঢল করছে। আমরা সেই জলে হাতমুখ ধুয়ে বেশ তৃপ্তি অনুভব করলাম। তার পর উপরে উঠেই মঙ্গলেশ্বর দর্শন করতে গেলাম। উজ্জয়িনীর অন্যতম বিখ্যাত দেবতা এই মঙ্গলেশ্বর। প্রত্যেক মঙ্গলবারে এই মঙ্গলেশ্বরের নিকট মঙ্গলপ্রার্থী মাত্রেই এসে পূজা দিয়ে থাকেন। ইনি চৌরাশী মহাদেবের অন্যতম। মঙ্গলেশ্বরের মন্দিরের চতুর্দ্দিক পাকা চত্বরে পরিবৃত। এই মন্দিরের ভিতরের প্রথম প্রবেশ-পথের সিঁড়িতে গেলেই দেখা যায় যে তিন দিকে তিনটি ধর্ম্মশালা আছে। এই ধর্ম্ম-শালার মধ্যস্থলেই মঙ্গলেশ্বরের মন্দির। এই মন্দির খুব বড় না হলেও খুব প্রাচীন। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই সদানন্দ মহাদেবের দর্শনে লোকে মঙ্গল অবস্থায় সুখে স্বচ্ছন্দে

দিনপাত করতে পারে। মঙ্গলেশ্বরের দক্ষিণে উত্তরেশ্বর নামে আর এক মহাদেব আছেন। এঁর মন্দিরের নীচে একটি বড় ও সুন্দর বাঁধান ঘাট আছে; সেখানে নদীতে খুব বেশী জল। প্রতি বছর পঞ্চকোশীর দিন ও অষ্টতীর্থের দিবসে মেলা বসে। এখানে গঙ্গাঘাট নামে প্রসিদ্ধ ঘাট ও গঙ্গামন্দির আছে। একটি ধর্ম্মশালা আছে, তাতেই এখানকার যাত্রীদের আশ্রয় মিলে। এই ধর্ম্মশালা সরদার কিবেন প্রস্তুত করান। গঙ্গা দশমীতে এখানে একটী উৎসব হয়। মন্দির দেখা হলে পুরোহিতকে কিছু দেওয়া গেল। পুরোহিত তখন চন্দন ঘষ্‌ছিলেন। আমি বল্‌লাম "ঠাকুর, ঐ চন্দনকাঠটুকু আমাকে দেবেন, আমি বাড়ী নিয়ে যাব।" পুরোহিত তখনই সেই কাঠখানি আমাকে দিলেন। হরিদাস বাবু বল্‌লেন এবং আমরাও মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, চারিদিকে অসংখ্য চন্দন গাছ রয়েছে।

এই মন্দিরের কাছেই আর একটা পুরাতন মন্দির দেখ্‌লাম। মন্দিরের পাণ্ডারা বল্‌লেন, এটা সান্দীপনি মুনির আশ্রম। এইখানে কৃষ্ণ-বলরাম মুনির পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মুনিবরের মূর্ত্তিরও পূজা হয়, কৃষ্ণ বলরামও পূজা পেয়ে থাকেন। আমার কিন্তু এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হোলো না।

এই মন্দিরে যাবার সময় একটি সুন্দর দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে নি, বেরিয়ে যখন টঙ্গায় উঠ্‌তে যাবো, তখন, ডান দিকে একেবারে শিপ্রার উপরে একটি অতি পুরাতন বটের গাছ দেখলাম, তার চারি পাড় পাথর দিয়ে বাঁধান। আর পাশেই শিপ্রা নদী পর্য্যন্ত সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। আমি বল্‌লাম, কালিদাসের আবাস-স্থান কোথায় ছিল তা যখন কেউই এই স্তূপারণ্যের ভিতর থেকে বার করতে পারেন নি, আমি কিন্তু তাঁর মেঘদূত লেখার ঠিক জায়গা আবিষ্কার করেছি। আমি বলছি এই সুন্দর বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে মহাকবি কালিদাস তাঁর মেঘদূত লিখেছিলেন। শ্রীমান্ নরেন্দ্র মেঘদূত নিয়ে বড়ই নাড়াচাড়া করছেন, তিনি বল্‌লেন, দাদা ভুলে যাচ্ছেন কালিদাস সৌখীন পুরুষ ছিলেন, এ জায়গায় বসে তিনি কাব্য লিখ্‌তেই পারেন না। আমি কিন্তু তাঁর কথা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নই। চারিদিকে সুবৃহৎ অসংখ্য চন্দন বৃক্ষ, তারই পাশে এই প্রস্তর-মণ্ডিত ছায়াশীতল বটবৃক্ষ আর সম্মুখেই স্বচ্ছসলিলা শিপ্রা প্রবাহিতা, এস্থানে কালিদাস দূরে থাকুন আমাদের মত খালিদাসও ছোটখাটো একটা 'কশ্চিৎকান্তা' মক্স করতে পারে—এমনই সৌন্দর্য্য এই স্থানের। প্রমাণ প্রয়োগ যখন করতে পারিনি তখন উচ্ছ্বাসের মুখে যা হয় একটু বলে ফেলা গেলো। যদিও দিব্য করে বলতে পারি, এই সুদীর্ঘ জীবনে কোনও দিন কবিতা লেখারূপ দুষ্কর্ম্ম আমার দ্বারা কৃত হয় নি। যাক্ গে সে কথা—

সেকালে যখন উজ্জয়িনী নগরী বহুদূর বিস্তৃত ছিলো—আর তার প্রমাণও এখনো যখন দেখতে পাচ্ছি, তখন নানা দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো—এখন সমস্ত সহর ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে, আর তারই মধ্যে যাঁরা এখনো মাথা তুলে বিদ্যমান আছেন, তাঁরা এই বিস্তীর্ণ শ্মশান-ক্ষেত্রের দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন! সুতরাং এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে হলে পাঁচ ছয় মাইল এই স্তূপারণ্যের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। না আছে ঘর বাড়ী, না আছে তেমন দোকান-পাট, আর কালিদাসের সে সব নৃত্যপরা বিম্বাধরা পুরাঙ্গনাগণ এখন ত আকাশ-কুসুম। সুতরাং মঙ্গলেশ্বর থেকে বেরিয়ে আর চার-পাঁচ মাইল না গেলে সিদ্ধনাথ ও পাতালেশ্বরের দর্শন পাওয়া যাবে না। টঙ্গা তখন সেই দিকেই চললো। প্রায় তিন মাইল গিয়ে আমরা সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হলাম। স্থানটি সত্যসত্যই সিদ্ধাশ্রম। দৃশ্য-শোভায় সিদ্ধাশ্রমের মত স্থান ভারতবর্ষে অতি কমই আছে। এই সিদ্ধাশ্রম সিদ্ধবটের জন্য প্রসিদ্ধ। ভৈরবগড়ে এই সিদ্ধবট। কেল্লার দক্ষিণে নদীর দিকে যাবার রাস্তার পাশে পঞ্চ-পাণ্ডবের মন্দির, আর তার পাশেই মারুতি মন্দির। শ্রীমান সরকার দৌলতরায় সিন্ধিয়া নরেশ এই মন্দির স্থাপনা করেন। এর কিছু দূরেই সরদার কিবেনজী এক ধর্ম্মশালা তৈরী করে দিয়েছেন। একশ বছরের উপর এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হয়েছে। এই ধর্ম্মশালার নীচে পাতালেশ্বর নামে মহাদেব আছেন। এই মহাদেবের চত্বর শ্বেত পাথরে বাঁধান। মহাদেবের পশ্চাতে এক গুহা আছে—এর মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি আছে। এই বিষ্ণুমূর্ত্তির পশ্চাতেও এক গুহা ছিল বলে প্রবাদ আছে—তা আর এখন দেখা যায় না। এই ধর্ম্মশালায় সব সময় লোকসমাগম হয়। এখানে মহাদেবের মন্দির পাথরে তৈরী। এই মন্দির পার্শ্বেই এক বটবৃক্ষ

আছে; সেই বৃক্ষই সিদ্ধবট নামে খ্যাত। মহাদেব মন্দিরের আশেপাশে অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে। রামচন্দ্র রায় নামে এক মহাশয় ব্যক্তি এইখানে একটি সুন্দর ঘাট তৈরী করে দিয়ে যাত্রীদের মহৎ উপকার করে গেছেন। প্রবাদ আছে ভারতবর্ষে সাড়ে তিনটি অক্ষয় বট আছে। প্রথম প্রয়াগে অক্ষয় বট, দ্বিতীয় নাসিকে পঞ্চবট, তৃতীয় উজ্জয়িনীর সিদ্ধবট; অবশিষ্ট আধখানি গয়ার গয়াবট। এই সিদ্ধবটের ছায়ায় মহাদেব ও গণপতি মূর্ত্তি আছে। দেবতাদের চত্বর সাদা কাল পাথরে বাঁধান। বটের নীচে নদীতে প্রচুর জল। এই স্থানে স্নান করলে সব পাপই ক্ষয় হয় ব'লে পাণ্ডারা শুনিয়ে থাকে। হরচতুর্দ্দশীতে এখানে স্নান করলে নাকি সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। বৈশাখী পূর্ণিমাতে এখানে একটা মেলা হয়। দ্বিতীয় মেলা হয় পিতৃপক্ষের অমাবস্যায়, তৃতীয় মেলা হয় বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশীর দিন। তৃতীয় মেলাটাই তিন দিন স্থায়ী হয় বলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধবটের নীচেই শিপ্রা নদী। প্রতিদিন শত সহস্র যাত্রী এখানে স্নান পূজা করে থাকেন। ঘাটে অসংখ্য বড় বড় মাছ খেলা করছে দেখা গেল। যাত্রীরা মুড়ী কড়াই ভাজা মাছকে খাওয়ায়। আমরা সকলেই উপর থেকে মুড়ি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম।

এইবার লম্বা পাড়ি দিতে হবে। দক্ষিণ দিকের দেবায়তন যেগুলি এখনও মাথা খাড়া করে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান কয়টী দর্শন করা হোলো, আর যে দর্শনও আমেরিকার ভ্রমণকারীদের দেখার মত। কি করব, উপায় নেই, মধ্যাহ্ন ভূইটার সময় বেলে চাপতেই হবে; সুতরাং এই অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল হ'তেই হবে। এবার তাই যেতে হবে উজ্জয়িনীর উত্তরে ভর্ত্তৃহরির গুহা দেখতে। টঙ্গাওয়ালা তখনই তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে—আলোর দরকার। পথের মধ্যেই অতি ক্ষুদ্র কয়েকখানি দোকান পাওয়া গেল। তারই এক দোকান থেকে দশবারোটা ছোট ছোট বাতি কিনে নেওয়া গেল। যাত্রীরা সর্ব্বদাই এই গুহা দেখতে যাবার সময় এই সকল দোকান থেকে বাতি কিনে নিয়ে যায়; সেই জন্য এখানে বাতির অভাব হয়না। আমরা যখন গুহার মুখ থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে, তখনই টঙ্গাওয়ালা হুকুম করল,

গোপাল মন্দির

ঐখানেই সকলকে নামতে হবে, টঙ্গা আর এগুতে পারবে না; সেখান থেকে উঁচু পাহাড়ের উৎরাই নেমে গুহামুখে

মহাকালের মন্দির

যেতে হবে। হরিদাসবাবুও বল্লেন ওদিক পর্য্যন্ত গাড়ী যেতে পারে না। কি করা যায়, এমন প্রসিদ্ধ গুহা না দেখে ফিরে যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। বেলা তখন প্রায় এগারটা। সেই প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটা থেকে এই এগারটা পর্য্যন্ত টঙ্গায় ভ্রমণ, আর মধ্যে মধ্যে নেমে অনেক স্থলেই প্রায় মাইলটাক পদব্রজে গমন। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তা ব'লে যা যা দেখবার তা ত্যাগ করা যায় না; অগত্যা পদব্রজই সই!

উজ্জয়িনীর উত্তরে শিপ্রার তীরে মাইলখানেক দূরে ভর্ত্তৃহরি গুহার অবস্থান। এই গুহার দক্ষিণে রণমুক্তেশ্বর, পশ্চিমে শিপ্রা, উত্তরে কালিকা মাতা। এই গুহায় যাবার রাস্তা দক্ষিণদিকে। প্রথম দরজায় প্রবেশ করলেই বাম দিকে প্রথমে ভর্ত্তৃহরির গুরু গোরক্ষনাথের সমাধি-স্থান দেখা যায়। দক্ষিণমুখী হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে ছোট ছোট দুটি দরজা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রথমটি পাতালেশ্বর যাবার গুহাপথ। অন্য দরজা ভর্ত্তৃহরির গুহার পথ। ঐ পথে গেলেই প্রথমে এক চত্বরে পৌছান যায়। চত্বরের পশ্চিমে একটি ছোট দরজা আছে, সেইটাই হচ্ছে গুহার রাস্তা। ঐ রাস্তার শেষে গুহার পূর্ব্ব দিকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে একটি বড় চত্বর পাওয়া যায়, তার পরেই ভর্ত্তৃহরির সমাধি। সমাধির দক্ষিণে গোপীচন্দর মূর্ত্তি আছে। পশ্চিমে কাশী যাবার গুহাপথ ছিল, এখন নাকি সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবাদ আছে যে এই গুহামধ্য থেকে চার ধামে যাবার পথ ছিলো। যাঁর গুহার কথা, সাধনা স্থানের কথা বলা হলো, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার মনে হচ্ছে। কিন্তু যে সব প্রবাদ আছে, তা থেকে সঠিক সংবাদ জ্ঞাত হবার কোন উপায়ই নাই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ভর্ত্তৃহরির মত জ্ঞানী সাধক খুবই বিরল ছিল। তাঁর ব্যাকরণের টীকা, নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক, শৃঙ্গারশতক বিশেষ

হরসিদ্ধি

প্রসিদ্ধ। ভর্তৃহরির বৈরাগ্য অবলম্বন সম্বন্ধে যেমন নানা কথা শুনা যায়, তেমনই জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধেও নানা প্রবাদ আছে। দুই-একটা প্রবাদের কথা বলা যাক্।

এক সময় এক তপস্বী শিপ্রায় স্নান করতে গিয়ে এক অপ্সরাকে দেখে মুগ্ধ হন। জ্ঞানী তপস্বীও মনশ্চাঞ্চল্য রোধ করতে অক্ষম হওয়ায় তাঁর শরীরের তেজাংশ একটি ভত্তরি মধ্যে রেখে, শিপ্রায় স্নান করে আবার তপস্যায় চ'লে যান। এদিকে উজ্জয়িনী-রাজ স্নানার্থে শিপ্রায় এসে এক বালকের রোদন-ধ্বনি শুনতে পেয়ে, অনুসন্ধানে দেখতে পেলেন যে ভত্তরি মধ্যে একটি সদ্যজাত

কালীয়দহ প্যালেশ

সুরূপ শিশু কাঁদছে। রাজা তখন তাকে সাদরে ঘরে এনে লালন-পালন করতে লাগ্‌লেন। তার নাম দিলেন ভর্তৃহরি। পরে এই ভর্তৃহরিই রাজা হন। এইরূপ আরও অনেক আজগুবি কথা ভর্তৃহরির জন্ম সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। আর তাঁর বৈরাগ্য-কথা যে সব শুনা যায় তার মধ্যে বিভিন্ন দুটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাচ্ছে। বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করবার ভার পাঠকের উপর। আমরা সেখানে যা শুনেছিলাম, তাই লিপিবদ্ধ ক'রে খালাস।

বিপুল তপস্যার পর কোন এক ঋষি দেবানুগ্রহে এক অমৃতফল প্রাপ্ত হন। ভর্তৃহরির মত সদ্‌গুণসম্পন্ন রাজার মঙ্গল কামনা ক'রে তপস্বী সেই ফল রাজাকে দান করেন। রাজা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা রাণীকে সেই অমৃতফল দেন। রাণী আবার তাঁর প্রিয়পাত্র অন্য একজনকে সেই ফল দেন—সে আবার তাঁর প্রিয়পাত্রীকে সেই অমৃতফল দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন। কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় সেই নারী বিশেষ রাজভক্ত ছিল বলেই নানা উপঢৌকনের সঙ্গে রাজাকে সেই অমৃতফল দিয়ে, তাঁকে বিশেষ করে বলেন যে, এ অমৃতফল ভক্ষণের আপনিই একমাত্র অধিকারী। এর গুণে আপনি দীর্ঘজীবী ও অশেষ গুণান্বিত হয়ে দেবরাজের সমান হতে পারবেন।

রাজা সেই নাগরিকার কথা শুনে ও তাঁর কাছ থেকে তপস্যা-লব্ধ অমৃতফল পেয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করে জান্‌লেন যে, তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার পাত্রী মহারাণীরই যখন এমন আচরণ, তখন আর এ অসার সংসারে থাকার প্রয়োজন কি? বৈরাগ্য তাঁকে এমন ভাবে সেই মুহূর্তে আশ্রয় করল যে, কোনও প্রলোভনই তাঁকে রাজসিংহাসনে আকৃষ্ট করতে পারল না; তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করলেন।

দ্বিতীয় প্রবাদ এই—ভর্তৃহরির রাণীর উপর প্রবল আসক্তি ছিল। রাণীও পরম পতিব্রতা ছিলেন। একদিন
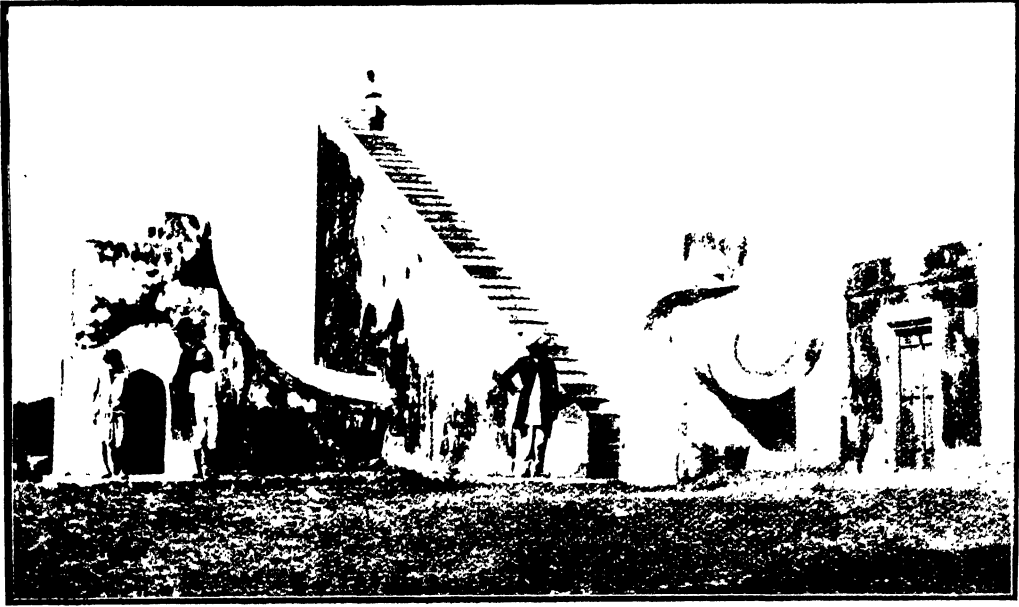
মানমন্দির

রাজা উপহাসচ্ছলে রাণীকে বলেন যে আমি মারা গেলে তুমি কি করবে? রাণী বলেন—প্রত্যেক সতী যা করে থাকে আমি তাই করবো—সহমৃতা হবার সৌভাগ্য হতে আমাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। রাজা এই কথার যাথার্থ্য পরীক্ষা করবার জন্য মনে মনে এক ফন্দী আঁটলেন। তিনি একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে একটি বাঘ মেরে সেই বাঘের রক্তে নিজ পরিচ্ছদ সিক্ত করে এক পার্শ্বরক্ষীকে দিয়ে রাণীর নিকট সংবাদ পাঠালেন, রাজাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, তাঁর এই পরিচ্ছদই তার নিদর্শন। রাণী এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই রাজপরিচ্ছদ-সহ সহমৃতা হলেন। এই দুঃসংবাদ রাজার নিকট পৌঁছিলে তিনি পাগলের মত হয়ে শ্মশানে ছুটে এসে দেখলেন, রাণীর দেহ ভস্মে পরিণত হয়েছে। ভর্তৃহরি নিজের মনকে কোনও প্রকারে শান্ত করতে না পেরে সেই শ্মশান আশ্রয় করেই দিবারাত্রি রাণীর জন্য কাঁদতে থাকেন। এদিকে রাজগুরু গোরক্ষনাথ রাজার

চব্বিশ খাম্বা

উপর দয়াপরবশ হয়ে পাগল সেজে এক মাটীর কলসী নিয়ে খেলতে খেলতে এসে, ভর্তৃহরির সম্মুখে দৈবাৎ যেন কলসী পড়ে ভেঙ্গে গেল, এমন ভাবে সেই কলসী ভেঙ্গে ফেলে, কাঁদতে লাগলেন। ভর্তৃহরি মাটীর কলসীর জন্য কাঁদতে দেখে সেই পাগলকে বল্লেন "ওরে বর্ব্বর, একটি মাটীর হাঁড়ীর জন্য কেঁদে কি করবি, তার চেয়ে মাটীর কলসী বাজারে হাজার হাজার আছে, কিনে নিয়ে তোর খেয়াল চরিতার্থ কর গিয়ে।" পাগল বল্লেন "তবে তুই রাণী রাণী করে কেঁদে মরছিস্ কেন? আমার কাছে তোর রাণীর মত হাজার রাণী আছে; তাই দেখে তুই তোর খেয়াল মিটো।" এই বলে পাগলবেশী গোরক্ষনাথ যোগবলে রাজা ভর্তৃহরিকে হাজার রাণী দেখান। তখন রাজা সেই সাধুর পায়ে পড়ে দীক্ষা প্রার্থী হন। মহাত্মা গোরক্ষনাথ তখন শোকাকুল রাজাকে যোগমার্গে যাবার মত ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে শিষ্যত্বের অধিকারী করেন, বৈরাগ্য সাধনে ব্রত করেন। সেই হতেই রাজা নিজের সুকৃতি ও সাধন বলে অতুল যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েছিলেন। কাহিনী এমন না হ'লে লাগসই হয় না। রাজা ভর্তৃহরি সম্বন্ধে এমন কাহিনী অনেক আছে; সে সব ব'লে কাজ নেই; এই দুইটাই যথেষ্ট।

এই ভর্তৃহরি গুহার মধ্যে বাতি জ্বালিয়ে যা কিছু দেখবার, সে সকল দেখে আমরা যখন বাইরে এলাম, তখন বারটা বাজতে বিলম্ব নেই। কিন্তু, এতদূর এসে কালিকা মূর্ত্তি না দেখে যাই কেমন করে? কাজেই চল মা কালী বলে! কিছুক্ষণ পরেই কালিকাদেবীর মন্দিরের নিকট টঙ্গা উপস্থিত। মহাকালীই এখানে কালিকা দেবী নামে খ্যাতা। তাঁর মন্দির উজ্জয়িনী সহর থেকে এক মাইল দূরে গড়পারে অবস্থিত। কালিকা মন্দিরের সম্পূর্ণ অংশই পাথরে তৈরী ও বহু প্রাচীন। মন্দিরটি দর্শনযোগ্য। এর চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যাবলী দেখ্‌লে মনে হয় যেন দেবী জাগ্রত অবস্থায় এখানে সব সময় অবস্থান করে দেশকাল সুপবিত্র করছেন। কোন্ সময়ে এখানে কি উপলক্ষে কে এই দেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে এবং সে সব সম্ভব অসম্ভব নানা কথা থেকে কিছুই ঠিক করা যায় না। তবে লিঙ্গ-পুরাণে এই দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে:—
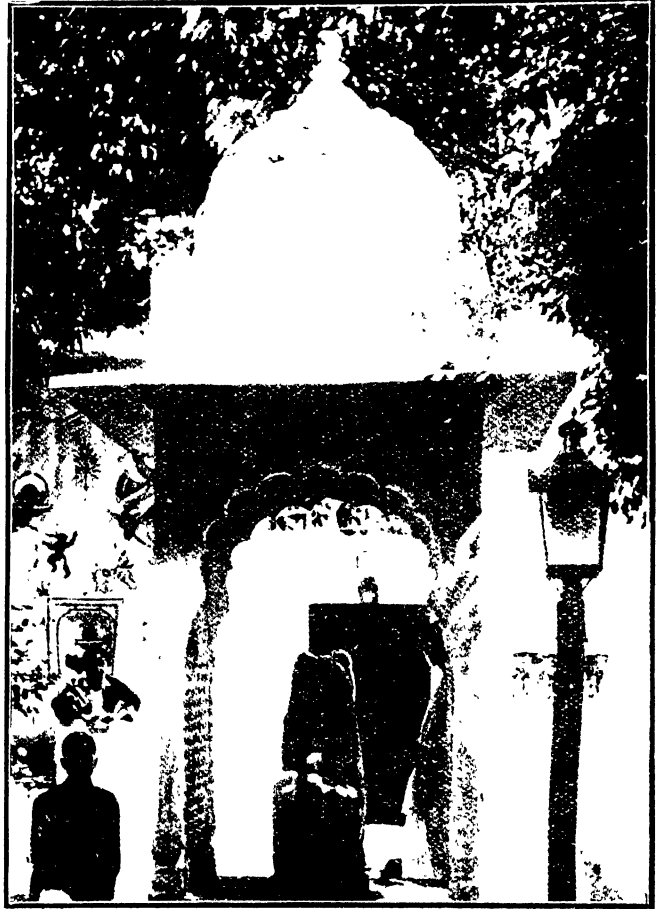
শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের পর বিশ্রাম গ্রহণ করবার জন্য কিছুদিন উজ্জয়িনীর হরসিদ্ধির পশ্চিমে অবস্থান করেন। কাজেই রামভক্ত মারুতি রুদ্রসাগরে তাঁর শয়নের স্থান ঠিক করে তাঁর বিরাট দেহ বিস্তার করে সুখ-নিদ্রায় দিন কাটাতে লাগলেন। এই সময় কালী ক্ষুধায় কাতর হয়ে তাঁর আহার্য্য দ্রব্যের অনুসন্ধানে এসে ভুল করে মারুতিকে দেখা দিয়ে ফেলতেই হনুমান আপন বদন ব্যাদান করে অপরূপ রুদ্রমূর্ত্তি দেখাতেই দুর্জ্জনকে ত্যাগ করাই উচিত বিবেচনায়

কালী মন্দির

কালিকা দেবী সে স্থান ত্যাগ করে দ্রুতবেগে যেতে লাগলেন। খানিকটা দূর যাবার পর এই কালিকা মন্দিরের নিকট তাঁর অঙ্গভূষা স্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এক কালিকা মূর্ত্তি ধারণ করে। এই মূর্ত্তিই কালিকা দেবী নামে সেই যুগ হতে অভিহিত হয়ে আস্‌ছেন। এখানে বলিদান প্রথা প্রচলিত আছে। এই মন্দিরের সম্মুখে সুগভীর এক তড়াগ আছে। এমন বিশাল জলাশয় উজ্জয়িনী সহরে আর দেখা যায় না। এর পার্শ্বেই বলিদানের স্থান। তার পাশের সিঁড়ি দিয়ে ভিতরে গেলেই দেখা যায় যে, ছয় হাত চওড়া ও পঁয়ত্রিশ হাত লম্বা দালান দুই দিকে আছে। এর সম্মুখ দিয়ে গেলেই দেবীস্থান বা বেদীতে
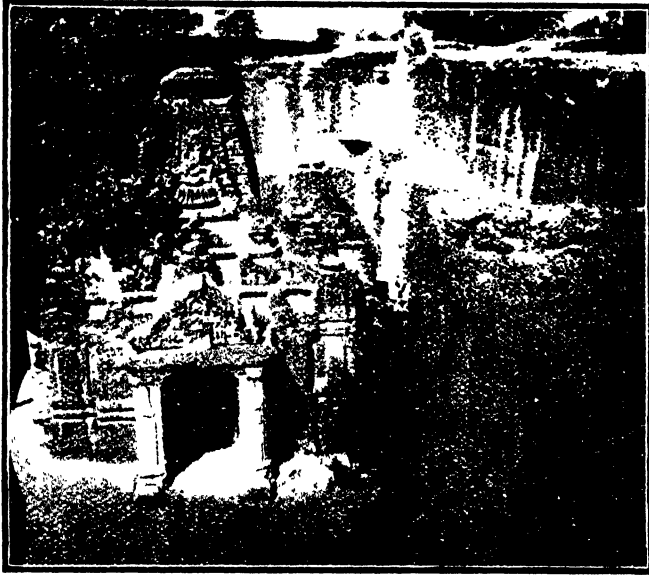
ভর্ত্তৃহরি গুহা

দেবীকে দেখা যায়। ভিতরে কালিকা দেবীর মূর্ত্তি ও চামুণ্ডা দেবী ও নব গিরীশ দেবতা আছেন। কালিকা মন্দিরের সম্মুখে এক নিম্ববৃক্ষের নীচে বিন্দুবাসিনীর এক স্থান আছে। মন্দিরের পশ্চাতে বাহিরের দিকে স্থির বিনায়কের একটি মন্দির আছে। এই মন্দির শ্রীমন্ত সরদার তৈরি করেন। এখানেও চৌরাশী মহাদেবের এক মহাদেব সিংহেশ্বর নামে অবস্থান করছেন। এরই পশ্চাতে মারুতির মন্দিরে যাবার পথ। এই পথটির মধ্যে মধ্যে সীতাফলের বৃক্ষে কুঞ্জ গঠিত হয়ে আছে। পথের পার্শ্বে একটি কুয়া আছে। সীতাফলের কুঞ্জে পথের পার্শ্ব এমন সুসজ্জিত যে, দেখলে মনে হয় যেন কোনও রমণীর উদ্যান-বাড়ীর মধ্যে এসে পড়েছি। মহাকবি কালিদাস এই কালিকা মন্দিরে সাধনা করেই বিদ্যালাভ করে সিদ্ধি পেয়েছিলেন ব'লে প্রসিদ্ধি আছে। নব-রাত্রির সময়ে এখানে এক বিরাট মেলা বসে ও বৈশাখী অষ্টমী পর্য্যন্ত সে মেলা থাকে।

কালিকা দেবীর মন্দির থেকে বেরিয়ে শিপ্রার ঘাটে এসে যখন বসা গেল, তখন বেলা একটা বেজে গিয়েছে। যদি দুইটার ট্রেণেই ইন্দোর ফিরে যেতে হয়, তা হ'লে হরিদাস বাবুর বাড়ী গিয়ে স্নান আহারের আশা ত্যাগ করতে হয়। হরিদাস বাবু বল্লেন—আমার বাড়ীতে স্নান আহার না হয় নাই করলেন; আমার আয়োজন আগ্রহ না হয় বৃথাই হোক্, কিন্তু আপনারা উজ্জয়িনীতে এসে শ্রীশ্রীমহাকাল ও শ্রীশ্রীগোপাল দেবকে দর্শন না করে দেশে ফিরে যাবেন কি করে? লোকে এ কথা শুনলে আপনাদের ধিক্কার দেবে। বিশেষ আপনারা হিন্দুর ছেলে; মনে মানুন আর না মানুন, বাইরে হিন্দুর প্রসিদ্ধ দেবদেবীর উপর ভক্তি প্রদর্শন করা আপনাদের পিতৃপুরুষের নাম স্মরণ করেও কর্ত্তব্য। অতএব আমি বলি কি, এখন আমার বাসায় চলুন; সেখানে স্নানাহার শেষ করে, অপরাহ্ণে শ্রীগোপাল, মহাকাল, ও মানমন্দির দেখে সন্ধ্যার পর আমার বাড়ীতে আবার আসুন। রাত্রি বারটায় যে ট্রেণ আছে, তাতে উঠ্‌লে দুটোর সময় ইন্দোরে পৌছবেন, তার দুঘণ্টা পরে রাত চারটায় মাণ্ডু যাত্রা করবেন। আর জানেন তো মহাকবি কালিদাস বলে গিয়েছেন,—

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকাল মাসাদ্যকালে
স্থাতব্যং তে নয়ন বিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।

মহাকবির এ আদেশ তো আপনারা উপেক্ষা করতে পারবেন না; বিশেষ আপনারা যখন তাঁকে বাঙ্গালী কবি বলে দাবী করতে বসেছেন।

সুতরাং এর উপর আর কথা নাই। আমাদের সঙ্গী বড় বড় বাক্যবাগীশেরাও হরিদাস বাবুর এই যুক্তিপূর্ণ কথার উত্তর দিতে না পেরে মৌন অবলম্বন করলেন। এবং সেই মৌনকেই সম্মতি-লক্ষণ মনে করে হরিদাস বাবু টঙ্গাওয়ালাদিগকে

তাঁর বাড়ীর দিকে যেতে আজ্ঞা দিলেন। সেখানে পৌছে, স্নানাহার শেষ করতে প্রায় তিনটা বেজে গেল। স্কুল মাষ্টারের বাড়ী হলেও আয়োজনটা বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনীকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। পাঠকগণের কেউ যদি উজ্জয়িনী বেড়াতে যান, আর হরিদাস বাবু যদি সে সংবাদ কোন রকমে পান, তা হলে আমাদের কথা ঠিক কি না জানতে পারবেন।

অপরাহ্নে বেরিয়ে প্রথমেই শ্রীগোপালের মন্দিরে যাওয়া গেল। মন্দিরের দ্বার বন্ধ, গোপালজীর তখনও নিদ্রা-ভঙ্গ হয় নাই; কাজেই তখন তিনি আর আমাদের দর্শন পেলেন না। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রায় তিন মাইল পথ অন্য রকমে নয়ন সার্থক হোত, এখন আর তা হবার যো নাই। এখন মহাকালের সন্ধ্যা-আরতি দেখে অন্ধকারেই ফিরতে হবে। সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানমন্দিরে কাটিয়ে আমরা মহাকালের মন্দির-দ্বারে এসে উপস্থিত হলাম। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্যে এই মহাকাল অন্যতম। এঁর মন্দিরের তলঘর (পাতালপুরী) সাদা পাথরে বাঁধান। তারই একটা গুহায় এঁর অবস্থান। মহাকাল গণপতি, পার্ব্বতী, ষড়ানন প্রভৃতি দেববৃন্দে পরিবৃত হয়ে এই গুহায় আছেন। এই স্থানের সম্মুখে দিয়ে একটা বড় নদী সব সময় স্বচ্ছ সলিলে নিজ বিপুল অঙ্গ শোভিত
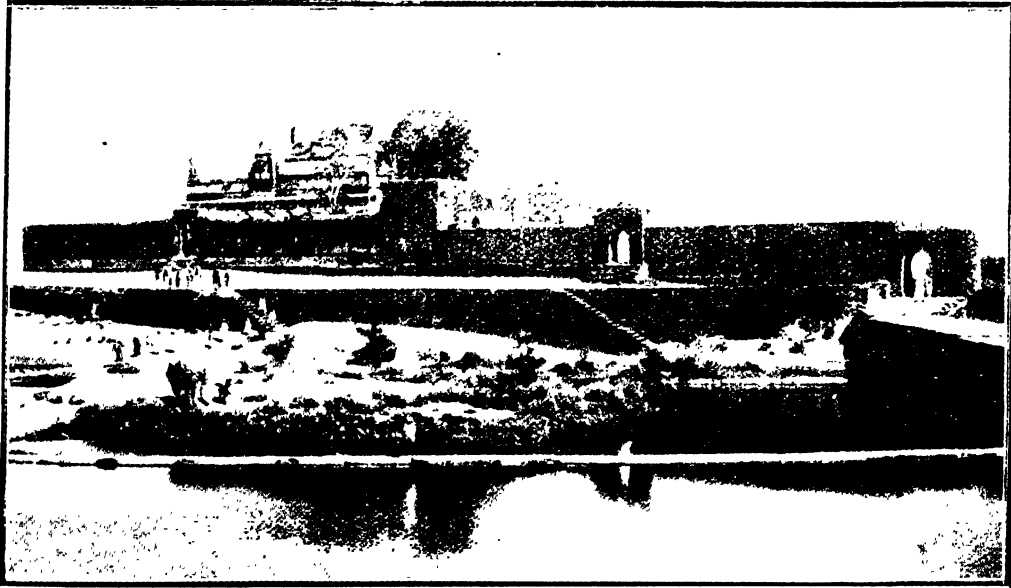
কালীয়দহ মহল

অতিক্রম করে মানমন্দিরে উপস্থিত হলাম। জয়পুরের মহারাজা এই মানমন্দির প্রথমে নির্ম্মাণ করেন; তার পর কাশী প্রভৃতি স্থানে এই ধরণের মানমন্দির নির্ম্মাণ করে দেন। দেখলাম মানমন্দিরটি অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হয়েছে। আমাদের সঙ্গে তিন চারজন বড় বড় অধ্যাপক ছিলেন, তাঁদের অনেকেই জ্যোতিষের আলোচনা করে থাকেন। তাঁরা সেই মানমন্দির থেকে বেরুতে চাইলেন না। তাঁরা বল্লেন, কালিদাসের আদেশ সন্ধ্যাবেলায় মহাকালের মন্দিরে যেতে হবে। কিন্তু বন্ধুরা ভুলে গেলেন যে, কালিদাসের আমলে সন্ধ্যাবেলায় মহাকালের মন্দিরে গেলে করে মৃদু মন্দ তরঙ্গে কলকল রবে ভাবে বিভোর হয়ে রয়েছেন ও ভক্তদের ডেকে বলছেন, তোমরাও আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে মহাকালের স্তব কর গো! এই পাতালপুরীতে প্রকাণ্ড একটি পিতলের দীপ দিবারাত্রি সমান ভাবে জ্বলে; এই দীপটিকে কখনও নিবতে দেওয়া হয় না। শাস্ত্রে লেখা আছে, মর্ত্ত্যভূমে পাঁচটি মহাকাল আছেন। যথা কেবড়েশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, (যিনি আজকাল লিঙ্গ পুরাণে মহাকাল বলে অভিহিত।) রুদ্রসাগরে এক, মহারাজবাড়ায় এক ও ওঁঙ্কারেশ্বর। মহাকালের পূর্ব্ব দিকে একটি

নহবৎখানা আছে। সেখানে সকাল সন্ধ্যা নহবৎ বাজে। এই নহবৎখানার পাশ দিয়েই ষ্টেসনে যাবার পথ। মহাকালের দক্ষিণে বৃদ্ধকালেশ্বর, পশ্চিমে রুদ্রসাগর ও হরসিদ্ধি, উত্তরে সরকারবাড়া। মহাকাল সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ বচন আছে যে,—

আকাশে তাড়কে লিঙ্গ, পাতালে হটকেশ্বরম্
মৃত্যুলোকে মহাকালে লিঙ্গত্রয় নমোস্তুতে।

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকালের মন্দির খুব প্রাচীন। কিন্তু দেখে দেড়শ বছরের আগের বলে মনে হয় না। অনেকে অনুমান করেন যে ভীমরাজ পবারকের পুত্র উদয়াদিত্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মুসলমান-ভূপতির অকীর্ত্তিও এর উপর দিয়ে নির্ব্বিবাদে বয়ে গেছে—তারও নিদর্শন বহু বহু পাওয়া যায়; এবং অনেকে বলেন যে, সম্রাট অল্‌তমশ মহাকালের উপর চড়াও হয়ে তাঁর দেবালয় ও অন্যান্য অনেক দেবালয় ভূমিসাৎ ক'রে দেন। এই সংহার থেকে মহাকালকে কতকটা উদ্ধার করে গেছেন সিন্ধিয়ার রাণীজী দীবান ও রামচন্দ্র বাবা শেণবীং। যে সব মন্দির মুসলমানেরা নষ্ট করে ফেলেছিল, তার সবই প্রায় এঁরা নূতন করে নির্ম্মাণ করে দিয়ে অবন্তীমাহাত্ম্য রক্ষা করবার চেষ্টা করে গেছেন। মহাকালের অসীম অনুগ্রহে মন্দিরের পার্শ্বে চৌরাশী কুণ্ড কোটীতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ একটি তীর্থকুণ্ড আছে। বর্ষায় এই কুণ্ডের জল বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে ব'লে শোনা গেল। পাণ্ডারা বলেন কোটীতীর্থ দর্শন-স্পর্শনে সর্ব্বপাপ মোচন হয়। এই ধারণায় বহু লোকের সমাগমে এই তীর্থ সব সময়ই জনবহুল হয়ে আছে। আরও প্রবাদ আছে যে, এই কুণ্ডের স্নিগ্ধ জলে মহাকাল নিজেও স্নান করে থাকেন।

শ্রীমন্ত মহারাজ সিন্ধে, হোলকার মহারাজ, এবং পন্বার সরকার এই তিন রাজার তরফ থেকে মহাকালের সেবার বন্দোবস্ত আছে। এই বন্দোবস্তের জন্যই মহাকালের ত্রিকালপূজা হয়। প্রাতঃকালে ভস্মপূজা, দ্বিপ্রহরে ভোগ-পূজা, আর সন্ধ্যায় পুষ্পপূজা হয়ে থাকে। মহাকালের পূজার নৈবেদ্য পূজারী গোস্বামীরাই নিয়ে থাকেন। মহাশিব রাত্রির সময় এই মহাকালদেবের নিকট বহু ভক্ত নরনারীর সমাগমে স্থানটি মনোরম দৃশ্য ধারণ করে এবং সেই উপলক্ষে তিন-দিনব্যাপী মেলা হয়। আর এই তিন দিনই নূতন নূতন সজ্জায় মহাকালকে ভূষিত করে অষ্ট প্রহরই অভিষেক ধারায় সিক্ত করা হয়। শিবরাত্রির সময় ব্যতীতও শ্রাবণ মাসের চারি সোমবারে চারি প্রকারের সেবা উপলক্ষে সমাগত ভক্ত হৃদয়ে যে ভাবে আনন্দ প্রকাশ পায় তা বর্ণনা করা যায় না।

সন্ধ্যার পর এই পবিত্র মন্দির-ভূমি ত্যাগ করে পথের মধ্যে শ্রীগোপালজি দর্শন করে হরিদাস বাবুর বাড়ীতে এসে হাত পা ছড়িয়ে বসা গেল। তখন আর এক বিভ্রাট; হরিদাস বাবু বল্‌ছেন, এই টঙ্গা পাঁচখানির সারাদিনের ভাড়া তাঁর দেয়। আমাদের সঙ্গীরা সে কথায় কিছুতেই সম্মত হতে চাচ্ছে না। সে কি কথা মাষ্টার বাবু? টঙ্গাভাড়া আমরা দেব। আপনি কিছুতেই দিতে পারবেন না। অনেক বাদ্‌বিতণ্ডার পর এই সিদ্ধান্ত হোলো যে

টঙ্গাওয়ালাদের বিদায় আমরাই করব ; আর উজ্জয়িনী থেকে ইন্দোরে ফিরবার সবাইকার রেলের টিকিট হরিদাস বাবু করে দেবেন এবং সে টিকিট একশ-এগার নম্বর গাড়ীর। তখন চা পান জলযোগ ও বিশ্রাম। পূর্ব্বদিন সারারাত্রি জাগরণ গিয়েছে, তার পর এই সারাদিন ভ্রমণ, সুমুখের রাত্রিটাও জাগরণ! ভাল কথা!

এই স্থানে শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটু সামান্য পরিচয় না দিলে উজ্জয়িনীর কথাই অসমাপ্ত থেকে যাবে। পূর্ব্বেই বলেছি, উজ্জয়িনীতে তিনিই হচ্চেন একমেবাদ্বিতীয়ম্ বাঙ্গালী। তিনি পূর্ব্বে গোয়ালিয়র স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বৎসর হোলো উজ্জয়িনী স্কুলে বদলী হয়েছেন। এখানে এসে তিনি এক নূতন প্রতিষ্ঠান খুলে বস্‌লেন। ইংরাজীতে যাকে coaching class বলে তাই আর কি ; অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য ছেলে তৈরীর ক্লাস খুল্‌বার সঙ্কল্প তাঁর মাথায় এসেছিল। তাঁরই স্কুলের কয়েকটি ছেলে নিয়ে তিনি প্রথমে সামান্য ভাবে এই ক্লাস খোলেন। এখন এই কোচিং বিদ্যালয়ে পাঁচ ছয় শত ছাত্র। বাঙ্গালী ছাড়া অন্যান্য সকল প্রদেশ থেকেই দলে দলে ছেলে হরিদাস বাবুর শিক্ষাপদ্ধতি ও তার সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসে জুটেছে। প্রবেশিকা ও আই-এ পরীক্ষার জন্যই হরিদাস বাবু ছাত্র তৈরী করেন। নাগপুর, এলাহাবাদ ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদ্যানিকেতনের ছাত্রদের তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার অধিকার প্রদান করেছেন। হরিদাসবাবু চার পাঁচটা বড় বড় বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন ; ছাত্রেরা সেখানে থাকে। এতগুলি ছাত্রকে একেলা পড়ান অসম্ভব, তাই তিনি তিনজন বাঙ্গালী ও কয়েকজন ঐ দেশী শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন তিনি দুই বৎসরের ছুটী নিয়ে তাঁর এই বিদ্যা-নিকেতনের পরিচালনায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বল্‌লেন, তাঁর বিদায়কাল শেষ হ'লে ষ্টেটের নিয়ম অনুসারে তিনি অবসর-বৃত্তির জন্য আবেদন করবেন এবং সে বৃত্তি পাবারও আশা আছে। তাঁর স্কুলে খরচ খরচা বাদে যা আয় হবে এবং তাঁর পেন্সন এই দুইটায় জড়িয়ে তাঁর বেশ চলে যাবে। আমাদের একজন সঙ্গী বল্‌লেন, বেশ চলে যাবে, যদি আমাদের মতন দল বেঁধে অতিথি বছরে দশ পনর বার না আসে। হরিদাস বাবু হাসতে হাসতে বল্‌লেন, আপনাদের আশীর্ব্বাদে তাতেও আট্‌কাবে না।

তার পর আর কি? রাত দশটার সময় মধ্যাহ্নের ব্যাপারের দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। তার পর এগারটার পরেই ষ্টেসনে গমন, শীতে কম্পন, পথে গাড়ী পরিবর্ত্তন, দুইটার সময় ইন্দোরে পুনরাগমন। স্কুলের বাড়ীতে পৌঁছিতে রাত আড়াইটে, কোন রকমে লেপের মধ্যে প্রবেশ। ভোর চারটার সময়ই ইন্দোর সাহিত্য-সম্মেলনের সদাজাগ্রত সম্পাদক শ্রীমান প্রমথ ভায়ার আহ্বান "দাদা, উঠুন, রাত চারটা বেজে গেছে ; যান প্রস্তুত। এখনই মাণ্ডু যেতে হবে।" তথাস্তু!

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের নূতন কথা—

নিউটন যে দিন তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন, সে দিন পৃথিবীর লোক যতখানি বিস্মিত হয়েছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী বিস্মিত হয়েচে মানুষ সম্প্রতি আর একটি লোকের বাণী শুনে। এই লোকটির নাম পৃথিবীর চারিদিকে প্রথম ছড়িয়ে পড়েছিল—যে দিন সম্বন্ধবাদ (Theory of Relativity) সম্বন্ধে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন। আজ থেকে অর্দ্ধ শতাব্দী আগে এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জন্ম হয়। এঁর নাম ডক্টর আইনষ্টাইন। কিছুদিন আগে আইনষ্টাইন ছ'পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা লিখে প্রমাণ করেচেন বা করতে চেয়েচেন যে, তাড়িৎ শক্তি ও মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। এতকাল আমরা এইটুকু জেনেই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, প্রত্যেক স্থূল জিনিষের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ—এই তিনটি পৃথক গুণ আছে। আইনষ্টাইন

আলবার্ট আইনষ্টাইন
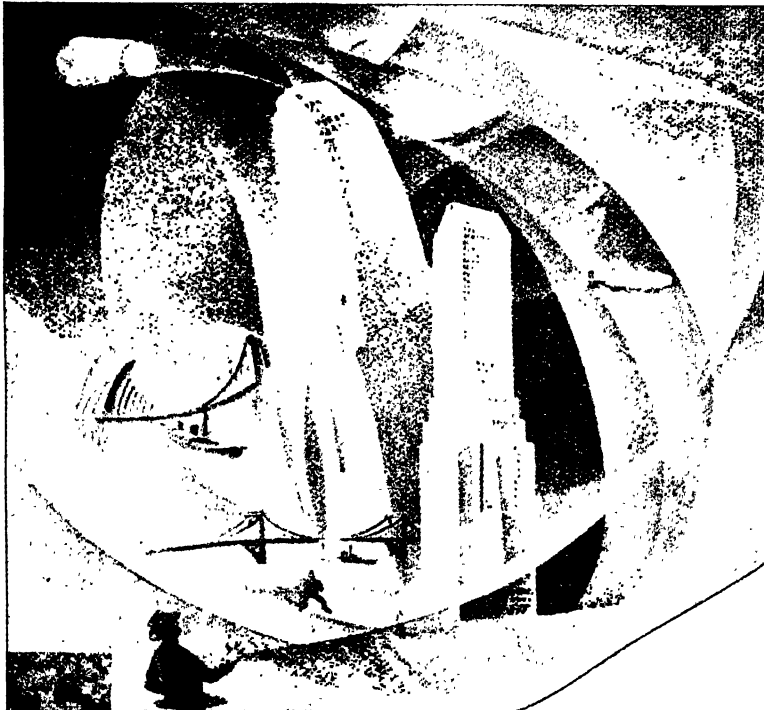
বলচেন, তা ঠিক; কিন্তু ওই তিনটি ছাড়া প্রত্যেক স্থূল বস্তুর আরও একটা কিছু আছে। এ' বস্তুর নাম অবশ্য তিনি এখনো দিতে পারেন নি, কিন্তু এই চতুর্থ বস্তু যে আছে, তা তিনি বিশ্বাস করেন এবং প্রমাণ করে দিতে পারেন। তাঁর এই সব মত প্রকাশ করার ফলে বিজ্ঞান রাজ্যে একটা ওলটপালট হ'বার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েচে। ডাক্তার আইনষ্টাইনের নূতন মতবাদ সম্বন্ধে এর চেয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা চলে না। কারণ, শোনা গেছে পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত মাত্র বারো-জন তাঁর মতের অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেচেন। সম্প্রতি কোনো পত্রিকায় বস্তুর ঐ চতুর্থ গুণটি সম্বন্ধে এক কাল্পনিক ছবি আঁকা হয়েচে। আইনষ্টাইনের চোখ দিয়ে দেখলে বস্তুজগৎকে আমরা এইভাবে দেখব।

আইনষ্টাইনের বস্তু-জগত

স্থাপত্যের বিস্ময়—

মানুষ এক দিন খোলা আকাশের তলে বাস করত। তার পর সভ্যতার জন্মের সঙ্গে মানুষ এক দিন ঘর বেঁধে বাস করতে শিখ্‌ল। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পর্ণকুটীর গেল, ইঁট-কাঠ দিয়ে মানুষ তার নীড় রচনা সুরু করল। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে সেই ইঁট কাঠের কোটরের মধ্যেই কত বিস্ময়, কত বৈচিত্র্য! আজ তার দু'একটির পরিচয় দেব। 'বিজ্ঞান-মন্দির' বলে যে ছবিটির পরিচয় দেওয়া হয়েচে, সেটিকে হঠাৎ দেখলে পুরাকালের দুর্গ, বা আলোক স্তম্ভ বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু আসলে এটি তা নয়। ডাক্তার আইনষ্টাইনের যে নূতন মতবাদের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেচি, এই অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হয়েচে জার্ম্মানীর পোট্‌সডাম সহরে,—তারি সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে। আইনষ্টাইনের মতামত নির্ভুল কি না বিচার করবার জন্যে এই বাড়ীর মধ্যে আধুনিক উন্নত প্রণালীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সমাবেশ করা হয়েচে। এর উপর থেকে পরীক্ষার কাজ চলবে।
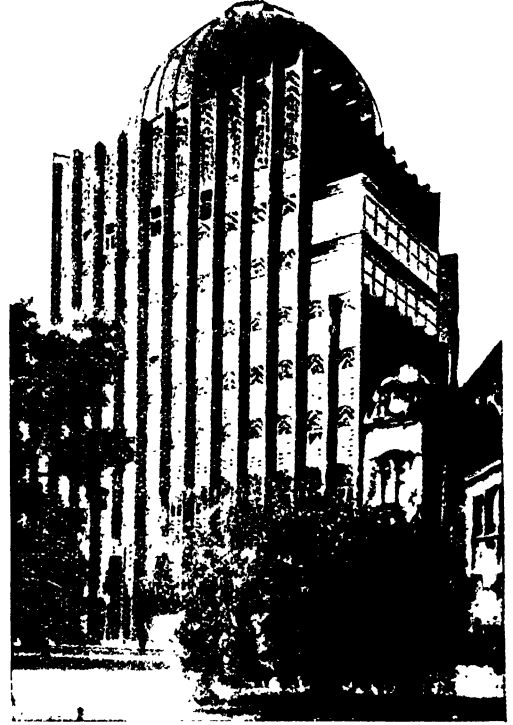
অ্যানজিগার কার্য্যালয়
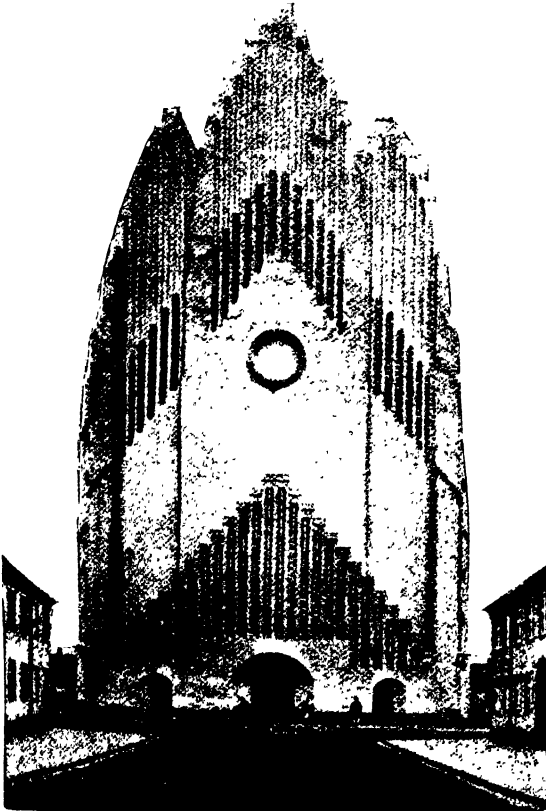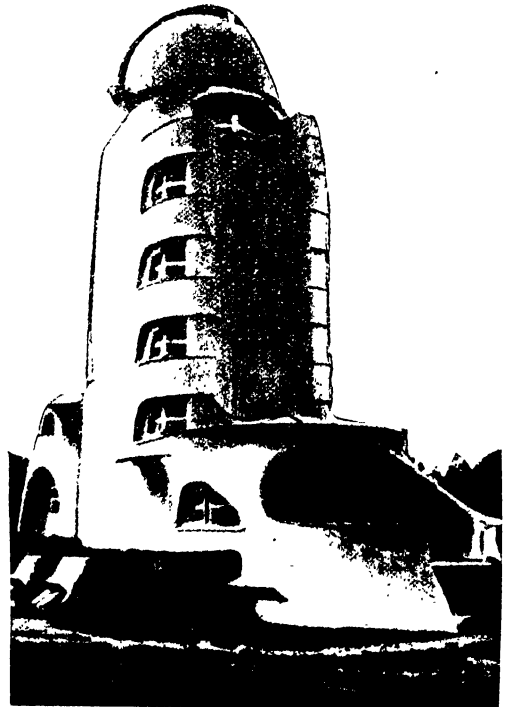
স্মৃতি-মন্দির

বিজ্ঞান-মন্দির

'স্মৃতি-মন্দির' ছবিটি ডেনমার্কের অন্তর্গত কোপেন-হেগেন সহরের একটি গির্জ্জা। এন, এফ, এস গ্রুণ্ড্ভিজ বলে এক ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্ম-নীতির সংস্কার করতে গিয়ে পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁরি স্মৃতি-রক্ষার্থে এই অদ্ভুত ও আকাশ-স্পর্শী গির্জ্জাটি নির্ম্মাণ করা হয়। এর নির্ম্মাণ-পদ্ধতি ও গঠন-ভঙ্গিমায় বিস্ময়ের অনেক উপাদান আছে। 'অ্যানজিগ্যার' একখানা সংবাদপত্র—জার্ম্মানীর হ্যানোভার সহর থেকে প্রকাশিত হয়। জার্ম্মানী তার প্রত্যেক কাজেই নূতনত্ব সঞ্চারের চেষ্টা করে। অ্যানজিগ্যার কার্য্যালয়েও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কৃত্রিম দেহ-যন্ত্র—

দেহতত্ত্ব-শিক্ষার্থী বৃটীশ ছাত্রেরা এক রকম কৃত্রিম দেহ-যন্ত্র সৃষ্টি করেছে। এখানে তার ছবি দেওয়া হ'ল। পাক-যন্ত্রের স্থলে দুটি ছোট হাপর, ফুসফুসের বদলে দুটি ভস্ত্রা (bellows), হৃদযন্ত্রের বদলে একটি ছোট পাম্পের উপযোগী ইঞ্জিন, এবং অন্যান্য অংশের বদলে আরও কয়েক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে এটা তৈরি হয়েছে। পাকযন্ত্র, ফুসফুস এবং হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়া কলাপ স্পষ্টভাবে যাতে বুঝতে পারা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই এর সৃষ্টি। উপরি উক্ত ব্যবস্থার ফলে,
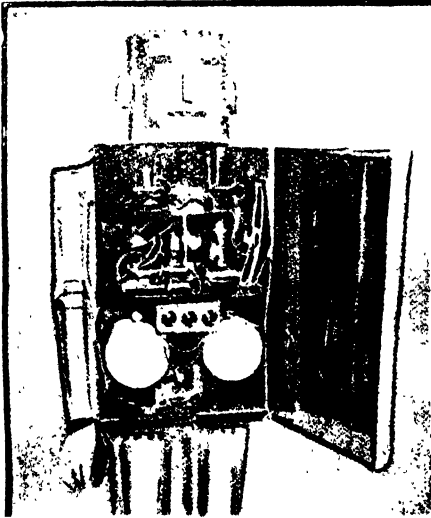
কৃত্রিম দেহযন্ত্র

এই কৃত্রিম দেহ-যন্ত্রটী ঠিক সত্যিকার মানুষের মত কাজ দিতে পারে। সশস্ত্র-যন্ত্রগুলি যখন সচল থাকে, তখন হৃদ্-স্পন্দন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস—সবই ঠিক মানুষের মত ওঠা-নামা করে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীরা এই নূতন মানুষটীকে সামনে রেখে লেখাপড়া করলে অনেক উপকার পাবেন।

দ্বিচক্র-যানের সুবিধা বৃদ্ধি—

দ্বিচক্র-যান বা বাইসাইকেল আমরা অনেকেই ব্যবহার করি। এই দ্বিচক্র-যান এক যায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে
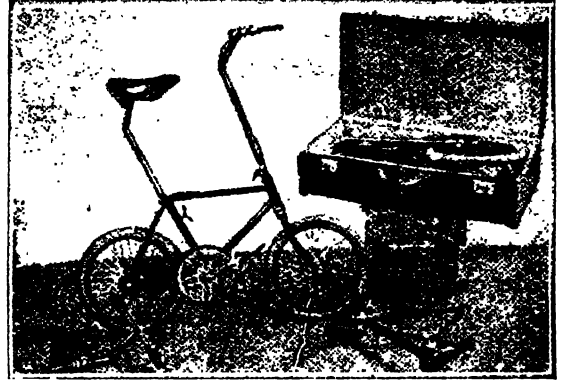
দ্বিচক্র-যানের সুবিধা বৃদ্ধি

যেতে হ'লেই বাধে মুস্কিল! দূরে যেতে হ'লে ষ্টেশনে গিয়ে 'বুক' করা ভিন্ন গতি নেই। তাতেও আবার অন্য কিছুর সংঘর্ষে ভেঙ্গে যাবার ভয় যে একেবারেই থাকে না এমন নয়। এ' অসুবিধা দূর করবার জন্যে এক নতুন রকমের দ্বি চক্র-যান সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ বাইসাইকলের মত এতে বেশ স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করা যায় এবং ট্রেণে বা অন্য কোনো গাড়িতে ওঠবার সময় সেটি খুলে ফেলে অতি অল্প আয়াসেই একটি অনতিবৃহৎ সুটকেশের মধ্যে পূরে হাতে করে নিয়ে যাওয়া চলে। যাঁদের গৃহে বেশী জায়গা নেই বা দ্বি-চক্র-যান যাঁরা 'বুক' ক'রতে চান না, এই নূতন জিনিষটি তাঁদের সুবিধা বৃদ্ধি করবে।

মালয় সরীসৃপ—

মালয় ষ্টেটের অতিকায় সরীসৃপগুলো এক একটা গোটা হরিণ মুখের মধ্যে পূরে দিতে পারে। কতকগুলি শিকারী স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখেছেন এবং হরিণটিকে শেষ করে সর্পরাজ যখন অলস দেহে পড়ে ছিলেন, সেই সময় শিকারী-দল তাকে গুলি করে মেরে ফেলে। এই অতিকায় সরীসৃপ হাঁটতে পারে, দেওয়ালের গায়ে উঠতে পারে, এমন কি সাঁতারও দিতে জানে ভাল ভাবেই। এদের প্রত্যেকের ওজন

কয়েক শত পাউণ্ড এবং দৈর্ঘ্যে এরা প্রত্যেকে তিরিশ ফিট। আফ্রিকা, এসিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার তাপ-প্রধান অংশগুলিতে এদের বাস; সেখানকার মানুষ এদের যমের মত ভয় করে। কোনো জন্তুকে খাবার পূর্ব্বে এরা দেহ-বন্ধনে বন্দী করে গুঁড়িয়ে ফেলে। তার পর তাল পাকিয়ে মুখের মধ্যে পূরে দেয়। ডিমে তা দেবার পদ্ধতিও এদের নূতন রকমের।

মালয় সরীসৃপ

প্রত্যকবার এরা প্রায় একশো দেড়শো করে ডিম প্রসব করে। তার পর সেইগুলিকে একত্র করে নিজের দেহ দিয়ে ঘিরে বসে থাকে। এইভাবে দুই মাসকাল এরা বসে থাকে—যতক্ষণ না ডিমগুলি ফোটে, এবং এই সময়ের মধ্যে তারা কোনো-প্রকার আহার্য্য গ্রহণ করে না।

বিড়ালের পুর্ব্বপুরুষ—

পল সি মিলার সিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ববিদ অধ্যাপক। বিড়ালের জন্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি বিগত তেরো বৎসর ধরে বিশেষ পরিশ্রম করে আসছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারেননি। সম্প্রতি তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়েচে। পল বলেন, আমেরিকায় যত প্রকার বিড়াল দেখা যায়, তাদের সকলগুলিরই উৎপত্তি প্রাগৈতিহাসিক যুগের একপ্রকার অতিকায় মার্জ্জার থেকে। এই মার্জ্জারগুলি ১০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল। নেবরাস্কায় এদের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েচে। এই বিড়াল-গুলির দৈর্ঘ্য ছিল প্রত্যেকের চার ফীট; এবং শিকার হত্যা করবার জন্যে মুখের মধ্যে ছিল বাঘের মত বড় বড় দাঁত।

বিড়ালের পুর্ব্বপুরুষ

লস্ এঙ্গলিসের প্রাচীনতম মোটরকার—

পঁচিশ বৎসর কেটে গেছে, কিন্তু গাড়িখানি আজো চলচে সতেজে। ১৯০৩ সালে এটি প্রথম চলতে সুরু করে ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস্ এঙ্গলিসের পথে। পূর্ব্বে যিনি গাড়ীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন তাঁকে আজকাল আর দেখা যায় না, হয় ত তাঁর মৃত্যু হয়েচে। গাড়িখানির ভিতরে অনেক প্রকার সৌখীন কারু-কার্য্যের পরিচয় আছে। লেখবার দরকার হ'লে যাত্রী যাতে লিখতে পারেন তার জন্যে একটা ডেস্কের
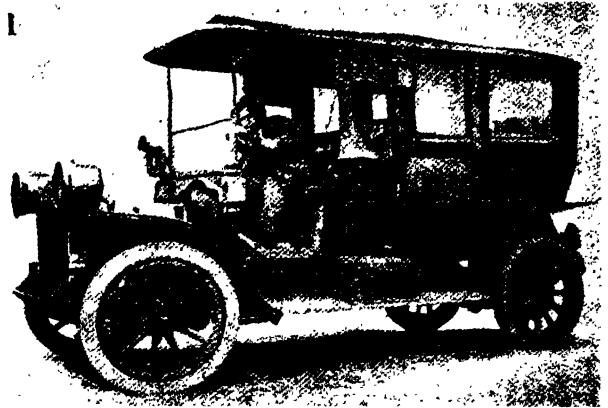
লস্ এঙ্গলিসের প্রাচীনতম মোটরকার

ব্যবস্থা করা আছে। প্রয়োজন মত সেটিকে খোলা যায়, তার পর বন্ধ করে রাখা চলে। এত দিন কাজ দেবার পর এ'টি ঠিক আগের মতই চলচে এবং এর স্বত্বাধিকারী আশা করেন আরও কিছুদিন চলবে।

নূতন টাইম টেবল —

নূতন ব্যবস্থা করেচেন। ষ্টেশনের প্রবেশ-পথেই ছটি 'ডায়াল' বা সূর্য্য-ঘড়ি এমনভাবে রাখা আছে যে কোন ট্রেণ, কোথা থেকে, কোন সময় ছাড়বে—তা স্পষ্ট দেখা যায়। এর সকলের চেয়ে বড় সুবিধা এই যে ট্রেণগুলি কোনস্থানে দাঁড়িয়ে আছে তাও এই ঘড়ির মধ্যে একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়।

নূতন টাইম টেবিল

ষ্টেশনে যাঁরা খুব বেশী যাতায়াত করেন না, বড় বড় ষ্টেশনে গেলে তাঁদের ভয়ানক মুস্কিল হয়। ক নম্বর প্লাটফর্ম্ম থেকে ট্রেণ ছাড়বে, সে প্লাটফর্ম্মই বা কত দূর এবং গাড়িই বা ছাড়বে কখন, এই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করতে করতেই অনেক সময় তাঁরা ট্রেণ ফেল করে বসেন। 'পিকাডিলির' ভূমধ্য ষ্টেশনের পরিচয় পাঠক পাঠিকাকে ইতিপূর্ব্বে দিয়েচি। এই ষ্টেশনে এত অধিক সংখ্যক যাত্রী সমাবেশ হয় যে পাছে ওই-রকম গোলযোগ ঘটে, তার জন্যে ষ্টেশনের কর্ত্তারা এই

সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মোটর—

দেখলে টরপেডো বা এরোপ্লেন মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়! আসলে কিন্তু মোটর। বিলাতের বিখ্যাত মোটর-চালক মেজর ম্যালকম্ ক্যাম্পবেল এর উদ্ভাবন-কর্ত্তা। গত বৎসর এই লোকটিই মোটর-প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর মধ্যে রেকর্ডসৃষ্টি করেছিলেন। ম্যালকম আশা করেন, এই মোটরের সাহায্যে তিনি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দ্রুত দৌড়তে পারবেন। এই গাড়িখানির গতি-শক্তি ঘণ্টায় ২০৬ মাইল।
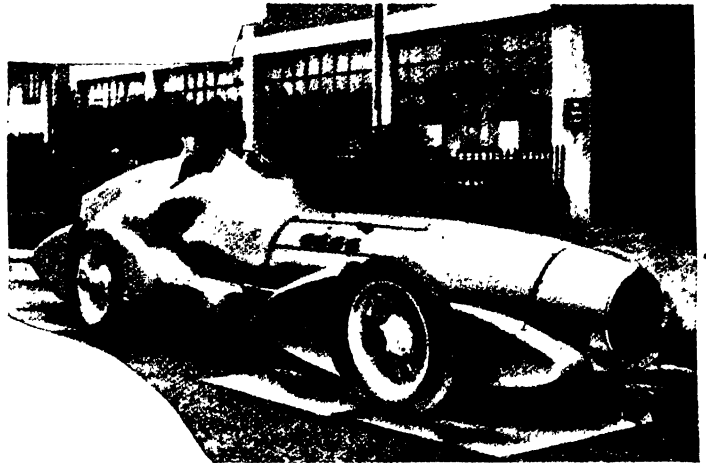
সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মোটর

শোক-সংবাদ

ভারতবর্ষের হিন্দুগণের পরমপূজ্য, সাধক-শ্রেষ্ঠ, সন্ন্যাসী-প্রবর স্বামী ভোলানন্দ গিরি এতকাল পরে দেহরক্ষা করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার ভক্ত শিষ্য অসংখ্য আছেন। যাঁহারা হরিদ্বারে তাঁহার আশ্রম দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহোদয় বর্ত্তমান সময়ে

স্বামী ভোলানন্দ গিরি

সাধু সন্ন্যাসীগণের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, সাধনপূত-জীবন, অগাধ শাস্ত্রজ্ঞ সাধু এ সময়ে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্ব জীবন ও জন্মভূমি সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানিতে পারা যায় না। দেহ-রক্ষার সময় তাঁহার বয়স দেড়শত বৎসর হইয়াছিল। তিনি বহুবার বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন। সে সময় বহু নরনারী তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে ভারতবর্ষ একজন শ্রেষ্ঠ সাধককে হারাইল। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য শিষ্যগণ চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের মনে হয়, তাঁহার সাধনাশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করিলেই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শিত হইবে।

আমরা গভীর শোক-সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, সুপরিচিতা লেখিকা শ্রীমতী সরসীবালা বসু আর ইহজগতে নাই। বৎসরাধিক কাল কঠিন দুরারোগ্য রোগে ভুগিয়া গত ৩১শে বৈশাখ, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটের সময় কলিকাতার

স্বর্গীয়া সরসীবালা বসু

বাসভবনে তাঁহার দেহাবসান ঘটিয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট সরসীবালার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। যে কয়জন বাঙ্গালী মহিলা কুণ্ঠার বাধা ঠেলিয়া বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণা হন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। সরসীবালার মত অক্লান্ত পরিশ্রমী জীবন খুব কম দেখা যায়, পতিব্রতা স্ত্রী ও স্নেহশীলা জননীর অপরিসীম কর্ত্তব্য ও দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি সাহিত্য-সেবার অবসর করিয়া লইতেন; এবং যতদিন সুস্থ শরীরে ছিলেন ততদিন কখনও তাহার কণামাত্র অবহেলা করেন নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স তেতাল্লিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার শোকাচ্ছন্ন স্বামী ও সন্তানদের চিত্তে শান্তিধারা বর্ষণ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সাময়িকী

এই মাসে 'ভারতবর্ষ' সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। আজ মনে পড়িতেছে, ষোল বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলাল অকস্মাৎ যখন পরলোকগত হইলেন, প্রথম সংখ্যাও দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, তখন 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারিগণ কেমন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; চারিদিক হইতে পরম শুভানুধ্যায়ীবর্গ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে লাগিলেন, 'ভারতবর্ষ' আর প্রকাশিত হইবে না; যদিই বা হয়, তাহা হইলেও জলবুদ্‌বুদের মত দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইবে। এই সকল কথায় ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারিগণ কর্ণপাত না

কাঙ্গাল হরিনাথের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে স্মৃতি-সভা

করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সহযোগিতা করিবার জন্য আমার ন্যায় সামান্য সাহিত্য-সেবককে আহ্বান করিলেন। আমি সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না; নিজের অযোগ্যতা ও শক্তিহীনতার কথা ভুলিয়া 'ভারতবর্ষে'র সেবায় আত্মনিয়োগ করিলাম। এক বৎসর পরে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'ভারতবর্ষে'র সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। তখন বৎসরাধিকাল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য লাভ করিয়াছিলাম। তাহার পর এই চোদ্দ বৎসর বাঙ্গালা দেশের সুধী মনস্বী সাহিত্যিকগণের অনুকম্পায় 'ভারতবর্ষ' পরিচালিত হইয়াছে. এবং ভবিষ্যতেও তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভে যে বঞ্চিত হইব না, এ বিশ্বাস আমার আছে। ত্রুটী বিচ্যুতি যথেষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার জন্য সহৃদয় সমালোচকগণের তীব্র মন্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রমণও অনেক লাভ হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কাল, বলিতে গেলে অর্দ্ধশতাব্দ-কাল আমি কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করিবার অবকাশ পাই নাই। সমালোচকগণকে আমি শত্রু বলি না, তাঁহারা পরম মিত্র। সুতরাং আমি গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি 'ভারতবর্ষে'র শত্রু কেহ নাই। তাই. আজ সপ্তদশ বর্ষের প্রবেশ দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করি, তাহার পর পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের নাম স্মরণ করি। তাহার পর সুধী লেখকলেখিকাগণ, সমালোচকগণ ও অনুগ্রাহক পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

নদীয়া জেলার পরলোকগত সাধক-প্রবর কাঙ্গাল হরিনাথ অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসর তাঁহার স্বর্গারোহণ দিনে কুমারখালীর কাঙ্গাল-কুটীরে, কাঙ্গালের স্মৃতিপূজা তাঁহার কাঙ্গাল শিষ্যেরা করিয়া থাকেন। এবারও বিগত অক্ষয়তৃতীয়ার দিন কাঙ্গাল-কুটীরে মহোৎসব হইয়াছিল। সমস্ত দিনব্যাপী সংকীর্ত্তন এই উৎসবের বিশেষত্ব। সহস্র সহস্র লোক সংকীর্ত্তনের দল সহ এবার কাঙ্গালকুটীরে সমাগত হইয়াছিল। সমস্ত দিন সংকীর্ত্তনে ও কাঙ্গালের বাউলসঙ্গীতে গ্রাম মুখর হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিগণের জন্য অন্ন-মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল; জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই কাঙ্গালকুটীরে মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণকালে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং কাঙ্গালের পবিত্র জীবনকথা আলোচিত হইয়াছিল। আমরা এই সঙ্গে সেই সভার একখানি আলোকচিত্র প্রকাশিত করিলাম।

গত ১১ই মে, ২৮শে বৈশাখ শনিবার মোহনবাগান ও ডালহৌসীর ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় গোরা সৈনিক ও বাঙ্গালী দর্শকগণের সংঘর্ষ হওয়ার ফলে পূরা সময় খেলা না হওয়ায় লীগকমিটি ঐ খেলা পুনরায় হওয়ার আদেশ দেন। তাহার উত্তরে, ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসন emergency meeting করিয়া লীগ কমিটির আদেশ নাকচ করিয়া দেন এবং উপরন্তু মোহনবাগানের গোলরক্ষক সন্তোষ দত্তকে সেই-দিনের খেলোয়াড়-বিগর্হিত আচরণের জন্য এসোসিয়েসনের ফুটবল খেলা হইতে দুই বৎসরের জন্য 'সস্পেণ্ড' করিতে আজ্ঞা জারী করেন। সন্তোষ দত্ত নাকি সেদিন ডালহৌসীর কোন খেলোয়াড়কে 'ইচ্ছাপূর্ব্বক' ঘুষি মারিয়াছিলেন। খেলার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা রেফারী সাহেব, যাঁহার 'রেফারিং'-এর জন্যই সেদিন খেলার মাঠে ঐরূপ সংঘর্ষ হইয়াছিল, তিনিও সাক্ষ্যদান কালে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে আঘাত ইচ্ছাপূর্ব্বক বলিয়া তিনি মনে করেন নাই—করিলে দত্তকে তখনি মাঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। তাহা সত্ত্বেও কর্ত্তারা যখন জিদ ধরিয়াছেন তখন দত্তকে 'সস্পেণ্ড' হইতেই হইল। একজন ইংরাজ সভ্য জিদ ধরিয়াছিলেন যে, দত্তকে চিরজীবনের জন্য 'সস্পেণ্ড' করা হউক। 'গোদের উপর বিষফোড়া'—সভাপতি মিষ্টার ল্যাম্ব ভারতীয় দর্শক-মণ্ডলীর আচরণ সম্বন্ধে নিন্দা করিয়া এক লম্বা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতীয় দর্শকদের আচরণ সেদিন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকিলে ইয়োরোপীয় দর্শকদের আচরণ তাহার তুলনায় পাশবিক হইয়াছিল; তাহারা ভারতীয়দের মারিবার জন্য কাপুরুষের ন্যায় সৈন্যদের ও পুলিসের সাহায্য লইয়াছিল।

এই অন্যায় সিদ্ধান্তে ভারতীয় দলসমূহ একযোগে আই, এফ, এ লীগ বয়কট করিয়া যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। পরে এডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত এন, এন, সরকারের মধ্যস্থতায় তাহার অবসান হইল। ৩০শে মে, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় ক্লাব সমূহের মধ্যে পুনরায় লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। আপোষের ব্যাপারে যদিও সকল দাবী রক্ষিত হয় না—আপোষ মীমাংসা হয় দু'পক্ষের কিছু লাভ, কিছু ক্ষতি স্বীকার দ্বারা, কিন্তু যেখানে একপক্ষ বিবাদের প্রধান প্রধান সর্ত্তগুলি ছাড়িয়া দিয়া ক্ষতি স্বীকার করিল, অপর পক্ষ কিছুই ত্যাগ করিল না, তাহাকে সম্মানজনক আপোষ বলে না—পক্ষান্তরে পরাজয়ই বলে। আমরা কিন্তু এই মীমাংসায় একেবারেই সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। তাহার কারণ, যে তিনটি প্রধান আপত্তিকর বিষয়—যথা, (১) লীগ কমিটির সিদ্ধান্ত রক্ষা করা (২) দত্তের সস্পেণ্ড রদ করা (৩) মিষ্টার ল্যাম্বের আপত্তিকর মন্তব্য এসোসিয়েসনের মিনিট বই হইতে একেবারে তুলে দেওয়া—তাহার কোন প্রতিকারই হয় নাই। এই তিনটির প্রথম দুইটি আপোষের সর্ত্তে একেবারেই আমরা পাই নাই; এবং তৃতীয়টির বিষয়ে—মিষ্টার ল্যাম্বের বক্তৃতার যেখানে তিনি দর্শকগণের ব্যবহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখান হইতে মাত্র 'ভারতীয়' কথাটি তুলিয়া দিতে রাজী হইয়াছেন। ইহাতে অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হইল না। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, যে সকল দর্শক ভীড় করিয়া মাঠে প্রবেশ করায় খেলা বন্ধ হইয়াছিল, তাহারা ভারতবাসী—এ কথা গোপন করিবার ভান করিয়া কোন লাভ নাই। ভারতীয়

দলদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, আগামী বৎসরের পূর্ব্বেই এসোসিয়েসনে ইংরাজ ও ভারতীয় সভ্য সংখ্যা সমান করা হইবে। মোটের উপর ইহাকে কোনরূপেই সম্মানজনক নিষ্পত্তি বলা যায় না।

আফগানিস্থানে কি হইতেছে, না হইতেছে, তাহার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। সরকারী তাড়িত বার্ত্তাবহের মারফত যে সকল সংবাদ প্রতিদিন আমাদের কাছে পৌছিতেছে, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুরূহ। তবে একটা সংবাদ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা এই যে, ভূতপূর্ব্ব আমীর আমানুল্লা এবার একেবারে রাজ্য ত্যাগ করিয়া দেশান্তরী হইলেন। সেদিন তিনি সস্ত্রীক বোম্বাই সহরে আসিয়াছিলেন। সেখানে রাণী সৌরীয়া একটী সন্তানের জননী হইয়াছেন; এবং তাহার পরই আমানুল্লা মহোদয় সস্ত্রীক কয়েকটী অনুচরসহ ইয়োরোপে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি না কি আর আফগানিস্থানের গোলযোগের মধ্যে থাকিবেন না। বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি এই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে চাহেন না, অকারণ তাঁহার প্রিয় প্রজাগণের রক্তে তাঁহার জন্মভূমি প্লাবিত করিতে চাহেন না। তাই তিনি একেবারে দেশত্যাগ করিলেন। কথাটা রাজার উপযুক্তই বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে এই মহান আদর্শ কতদূর রক্ষিত হইবে, তাহাই দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক। ওদিকে কিন্তু বিবদমান দলগুলির শান্ত হইবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। আফগানিস্থানের ভবিষ্যৎ এখনও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলর, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ভারত সম্রাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে 'সার' উপাধি-ভূষিত হইয়াছেন। অধ্যাপক সরকার মহাশয় তাঁহার অসংখ্য ছাত্রগণের নিকট হইতে এই 'সার' উপাধি সুদীর্ঘ কাল ভোগ করিয়াছেন এবং সে সম্মান গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত 'সার' হইতে কোন অংশেই কম মূল্যবান নহে। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ যেমন কার্য্যকালেই হউক বা অবসর গ্রহণের পরই হউক 'সার' হইয়া থাকেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সলেরাও তেমনই 'সার' হইয়া থাকেন। ইহা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে; সুতরাং অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের এই উপাধি লাভ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্তি বলিয়া আমরা মনে করি না; এ উপাধি বহুকাল-আচরিত প্রথারই ফল। তবুও ছাত্রদিগের বহুকালের 'সার'কে পুনরায় 'সার' উপাধি লাভের জন্য আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। আরও একজন মনীষী-বৈজ্ঞানিক-অধ্যাপক এবার 'সার' হইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কিন্তু উপরের নজির খাটে না। তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দেশে বিদেশে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, কোন গবর্ণমেণ্টই সে খ্যাতিকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক, বিশ্রুত নামা বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত রমণ মহোদয়ের এই 'সার' উপাধি লাভের জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত দেখিলে কে না আনন্দিত হয়?

উত্তর পশ্চিমের মীরাট সহরে বল্‌শেভিক ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা মামলা নহে, ইহাকে বৃষোৎসর্গ ব্যাপারের সহিতও তুলনা করা চলে না—ইহা বিপুল প্রজাসূয় যজ্ঞ। এই যজ্ঞের আহুতি প্রদান পর্য্যন্ত নাকি কোটী টাকার উপর ব্যয় হইবে। বহুদিন পূর্ব্বে এক সেকেলে বৃদ্ধা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আচ্ছা বাবা, এই হাজার টাকা দুকুড়ি দশ টাকার কম না বেশী?" আহা, বুড়ী যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহার দ্বারা ভারতগবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করাইতাম 'এই ক্রোড় টাকা দুকুড়ি দশ টাকার কম না বেশী!' দরিদ্র, অনশন-ক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ ভারতবাসী করদাতাগণের প্রদত্ত ক্রোড় টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট দুকুড়ি দশ টাকারই সমান। চারিদিকে অভাব, অনটন, কত অবশ্য কর্ত্তব্য-কার্য্য অর্থাভাবে সম্পন্ন হইতেছে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন;

অথচ এই মামলায় টাকার একেবারে হরিরলুঠ হইবে। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস এমন ভয়ানক বলশেভিক ষড়যন্ত্রের সমূলে উৎপাটন না করিলে দেশ অরাজক হইয়া যাইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এককোটীর অধিক টাকা ব্যয় করিয়া এই একত্রিশ জন লোককে দণ্ডিত করিলেই কি সব গোল মিটিয়া যাইবে? ইহার যে কি প্রয়োজন ছিল, তাহা আমরা বুঝি না। আমরা বলি বেশ ত, যাহাকে ষড়যন্ত্রকারী ভয়ানক লোক বলিয়া মনে হইবে, তাহাকে ধরিয়া লইয়া কারাগারে বা অন্তরীণে আবদ্ধ করিলে ত আর এত টাকা ন দেবায়, ন ধর্ম্মায় খরচ করিতে হইত না। লোকে বলে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম; আমরাও তাহাই বলি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে কোন অধ্যাপকপদ ছিল না। বর্ত্তমানে আশুতোষ চেয়ার সৃষ্ট হইয়া সেই অভাব দূর করিয়াছে। এই আশুতোষ চেয়ারের জন্য অধ্যাপক নির্ব্বাচনে দুই জন দেশবিশ্রুত অধ্যাপক গুণানুসারে নির্ব্বাচিত হন (১ম) ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত ও (২য়) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ ভাগবতকুমার শাস্ত্রী। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় নিয়োগের পূর্ব্বে কোন কারণে তাঁহার আবেদন পত্র তুলিয়া লন্ ও মহামহোপাধ্যায় ডাঃ ভাগবতকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করেন। ডাঃ ভাগবতকুমার শাস্ত্রী মহাশয় এই বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যার দিনে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সাক্ষ্যের প্রতি সম্মান রক্ষা করিয়া সংস্কৃতের দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিলে দেশবাসী ও সংস্কৃতানুরাগীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পাত্র হইবেন।

বিগত আশ্বিন মাসের "ভারতবর্ষে" আমরা "হিন্দু-পেট্রিয়ট" ও "বেঙ্গলী"র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা প্রকাশিত করিয়াছি। সন ১২৩৬ সালের ১৫ই আষাঢ় কলিকাতা মহানগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আজ তাঁহার শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা পুনরায় তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। গিরিশচন্দ্র বঙ্গ ইঙ্গ সংবাদপত্রের অন্যতম জন্মদাতা ছিলেন। সিপাহীযুদ্ধ ও নীলবিপ্লবের সেই অন্ধকারময় যুগে তাঁহার ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল প্রতিভালোক দেশবাসিগণকে ও শাসকসম্প্রদায়কে গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল। অযোধ্যা অধিকারের সময় তিনিই তীব্রভাষায় লর্ড ড্যালহৌসীর পররাজ্য গ্রাসিনী নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনিই কর্ত্তৃপক্ষগণকে প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত করাইয়া তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী সর্ব্বদাই অত্যাচারিত মূক দেশবাসিগণের কল্যাণকল্পে নিযুক্ত থাকিত এবং তাঁহার অনন্তকরণীয় শ্লেষপূর্ণ ভাষায় রচিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া অত্যাচারীরা লজ্জায় অধোবদন হইতেন। তিনি সর্ব্বদাই ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন, ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়া কখনও অন্যায় ভাবে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতেন না। তাঁহার গভীর ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমের কথা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের বাগ্মিতাও অসাধারণ ছিল। তিনি বহু সভার সভাপতি বা সম্পাদক ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন তাঁহার একটী বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাগ্মিতা অনেক ইংরাজ বক্তারও ঈর্ষা উদ্রিক্ত করিতে পারে। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ রাজভক্তি ও অপূর্ব্ব বাগ্মিতা স্মরণ করিয়া শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্যর হেনরি কটন, রমেশ দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ বলিয়াছিলেন, অন্য দেশে কি অন্য সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি দেশের সর্ব্বোচ্চ পদ অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি দেশসেবকরূপে যে আসন অধিকৃত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর আসন আর কি থাকিতে পারে? আজ এই শতবার্ষিক স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে আমরা প্রার্থনা করি যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়া গেলেও যেন বাঙ্গালী উদার, সত্যপ্রিয়, ন্যায়নিষ্ঠ, সাধুচরিত্র এই দেশপ্রেমিকের কথা বিস্মৃত না হয়।

বিশ্ব-সাহিত্য

মহাকালের নিত্য-সাথী

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ফ্রান্সের মহাকবি ভিক্টর হুগো যখন সপরিবারে ফ্রান্সের উপকূলের নিকটস্থ এক দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়া বন্দী-জীবন যাপন করিতেছিলেন, সেই-সময় একদিন সকালবেলা পিতা-পুত্রে ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন; —বাহিরে বৃষ্টি আসিয়াছে—ঝড়ের আহ্বানে সমুদ্রের অতল গভীর উদ্বেলিত করিয়া তরঙ্গ আকাশ স্পর্শ করিতে চলিয়াছে। পিতা-পুত্রে উভয়েই নীরবে সেই মহাদৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছেন। সহসা মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া পুত্র জিজ্ঞাসা করিল—এই নির্ব্বাসন কত কালের জন্য আপনার মনে হয়?

পিতা উত্তর দিলেন, "সম্ভবত দীর্ঘকালের জন্যই!"

"কি ভাবে আপনি এই দীর্ঘ কাল অতিবাহন করিবেন ভাবিয়াছেন?"

পিতা উত্তর দিলেন, "আমি এমনি সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিব!"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি?"

পুত্র বলিয়াছিল, "আমি শেক্‌স্‌পীয়ার অনুবাদ করিব!"

অবশ্য কথা হইতেছিল ভিক্টর হুগো ও তাঁহার পুত্রের সহিত। এই নির্ব্বাসনে ভিক্টর হুগোর পুত্র ফরাসী ভাষায় সমগ্র শেক্‌স্‌পীয়ার অনূদিত করেন এবং সেই নির্ব্বাসনে থাকিয়াই অনুবাদের ভূমিকাস্বরূপ হুগো শেক্‌সপীয়ার সম্বন্ধে একটী পুস্তক রচনা করেন। এই বইখানি নানাকারণে সমালোচনার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। নির্ব্বাসনে থাকার দরুণ উপযুক্ত বইএর অভাবে শেক্‌স্‌পীয়ার সম্বন্ধে এই পুস্তকে স্থানে স্থানে অনেক ভ্রম-উক্তি আছে সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই বইখানি হুগোর সাহিত্যিক মতামতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্পণরূপে আজিও জগতের রসবেত্তাদের নিকট হইতে সমান আদর পাইয়া আসিতেছে। এই পুস্তকেই সর্ব্বপ্রথম ললিতকলার ক্ষেত্রে নিছক রসসৃষ্টি ও কল্যাণের প্রেরণায় সৃষ্টি লইয়া বিচার দেখা যায়; এবং যে Art for art's sake লইয়া এত বাদবিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে, এই পুস্তক অনুধাবনে জানা যায় যে তাহা প্রথম হুগোর দ্বারাই ব্যবহৃত হয়। এই উক্তিটীকে যাঁহারা যুক্তিহিসাবে ব্যবহার করেন তাঁহারা হয়ত শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন তিনি ঠিক কথাটীকে আমরা যে ভাবে আজ গ্রহণ করি সে-ভাবে ব্যবহার করেন নাই। হুগো স্বয়ং এই বিষয়ে বলিতেছেন, "পঁয়ত্রিশ বছর আগে একদিন কয়েকজন কবি ও সমালোচক মিলিয়া ভল্‌টেয়ারের ট্রাজেডী লইয়া আলোচনা করিতেছিলাম। সেই সময় আমি ভলটেয়ারের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলাম যে, ট্রাজেডীগুলি আসলে নাটক নয়; তাহাতে জীবন্ত মানুষ নাই; আছে শুধু শুষ্ক নীতি-উপদেশ; ইহার চেয়ে বরঞ্চ ভাল art for art's sake. আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-কথা একদিন আমি শুধু তর্কের খাতিরে ব্যবহার করিয়াছিলাম, আজ তাহা অন্য অর্থ লইয়া একটী পুরাপুরি সাহিত্যিক-আদর্শরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।"

শেক্‌স্‌পীয়ারকে কেন্দ্র করিয়া ভিক্টর হুগো এই পুস্তকে জীবন ও কাব্যের সম্বন্ধ, পূর্ব্ব মহাকবিদের কাহিনী এবং কাব্য-সৃষ্টি ও বিশ্ব-রহস্য সম্বন্ধে নানাভাবে তাঁহার গভীর ভাষায় নানা আলোচনা করিয়াছেন।

এই সূত্রে তিনি অতীত কাল হইতে আহরণ করিয়া চোদ্দ জন মহাকবির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এখানে হুগোর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই সেই চোদ্দ জনের কাব্য-রসের আস্বাদ পাঠকদের দিতে চেষ্টা করিব।

হোমার

হোমার প্রকৃতির বিরাট কবি-শিশু। সদ্যজাতা ধরণীকে ঘিরিয়া হোমারের বীণা বাজিয়া উঠিল—হোমার ধরণীর উষালোকের প্রথম আলোর বিহঙ্গম। তাই হোমারের কাব্যকে ঘিরিয়া প্রভাতের পবিত্র দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিতেছে। সেই প্রভাত-লোকে ছায়া নাই বলিলেই হয়। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, দেবতার দেবতা, রাজা, রাজ্য, জাতি, মন্দির, সমুদ্র, জননী, জায়া, কুমারী, নারী অনন্ত রূপসী, পুরুষ অনন্ত শক্তিশালী, রাক্ষস, দানব, অধিদেবতা, দৈব, এই সমস্ত লইয়া হোমার। ডায়মিডিস্ সেখানে যুদ্ধ করিতেছে, ইউলিসিস্ অজানা সমুদ্রে রহস্যের মহা-আহ্বানে চলিয়াছে—ট্রয়ের প্রাচীরে হেলেন কাঁদিতেছে—ঘরে বসিয়া প্রবাসী স্বামীর অপেক্ষা পেনেলোপি বিমুগ্ধদের ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনের বেলায় গাঁথা তন্তুজাল রাত্রে খুলিয়া চলিয়াছে, হোমার গান গাহিতেছে। হোমার মানে যুদ্ধ আর ভ্রমণ—মনুষ্যজাতির সম্মিলনের দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিম উপাদান। হোমার মানুষকে অনবরত বৃহৎ হইতে বৃহত্তর করিয়া সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন;

এবং প্রত্যেক সৃষ্টির পর ছাঁচ বদলাইয়া নূতন ছাঁচে পুনরায় নবতর সৃষ্টি করিতেছেন। হোমারের সৃষ্টির জগৎ বৈচিত্র্যের লীলায় ভরা। আমাদের বহু পূর্ব্বে আমাদের জন্য হোমার শিল্পকলার সব চেয়ে বড় সমস্যা সমাধান করিয়া গিয়াছেন—মানবতাকে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইবার জন্য, মানবতাকে রক্ষা করিবার জন্য মানবকে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর করিয়া, মহৎ হইতে মহত্তর করিয়া সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। রূপকথায় আর ইতিকথায়, প্রজ্ঞার আর কল্পনায়, বস্তু ও আদর্শে সেই মানব-সভ্যতার ঊষা-লোকে যে অপূর্ব্ব রস-সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহাই হোমার।

হোমার সাগরের মত সুগভীর; সে-সাগরে নিয়ত তরঙ্গ উঠিতেছে, আনন্দ-উদ্বেলিত। অতীত দিনের সমস্ত সূর্য্যকিরণ হোমারের চিত্ত-সাগর-তলে মণি-মুক্তা হইয়া জ্বলিতেছে। প্রাচীন গ্রীকেরা হোমারকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত এবং তাঁহার নামে গ্রীসে একদল পুরোহিত সম্প্রদায় জাগিয়া উঠে। হোমারের প্রতি এই দেবতাসুলভ শ্রদ্ধা পৌত্তলিকতার উচ্ছেদের পরও ছিল। হোমার পড়িয়া মাইকেল এঞ্জেলো বলিয়াছিলেন, "যখনই হোমার পড়ি, তখনই নিজের দিকে চাহিয়া মনে হয় আমি পঁচিশ ফিট বাড়িয়া গিয়াছি।" সেই সময়কার লোকের ধারণা ছিল যে, ইলিয়াডের প্রথম ছত্র স্বয়ং অর্ফিয়াস আসিয়া লিখিয়া যান—হোমারের নামের সহিত স্বর্গীয় গায়ক অর্ফিয়াসের নাম সংযুক্ত হইয়া গ্রীসে হোমার-পূজাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সূর্য্যের যেমন গ্রহ, উপগ্রহ আছে, যাহারা সূর্য্যের আলো লইয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে—সেই রকম মানব চিন্তার জগতে হোমারের চারিদিকে নানা গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া ফিরিতেছে। এনিয়াডে'র কবি ভার্জিল, জেরুসালেমের কবি টাসো, রোলাণ্ডের কবি আরিয়াষ্টো, লুলিয়াডের কবি ক্যামিয়নস্, প্যারাডাইস লষ্টের কবি মিল্টন, হেনরিয়েডের কবি ভলটেয়ার সকলি সেই প্রথম সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতেছেন।

যব

যব আসিয়া নাটকের জন্মদান করিলেন। চার হাজার বছর আগে জিহোবা আর শয়তানকে মুখোমুখী দেখা করাইয়া দিয়া তিনি প্রথম নাটকের মূলসূত্র স্থাপনা করিলেন। অসত্য সত্যকে সংগ্রামে আহ্বান করিতেছে—তাহারই ফলে সংঘর্ষ ও নাটকীয়তা জাগিয়া উঠিতেছে। সমগ্র পৃথিবী সেদিন ছিল সেই নাটকের রঙ্গমঞ্চ, মানবের চিত্ত ছিল সেই সংগ্রামস্থল। মহামারী আর ব্যাধিরা ছিল সেই নাটকের প্রধান অভিনেতা। হোমারের আকাশে যে সূর্য্য উঠিয়াছিল, এখানেও সেই সূর্য্য তেমনি আছে; কিন্তু তাহার প্রভাতের স্নিগ্ধতা আর নাই; মধ্যাহ্ন-রবি দীপ্ত তেজে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধ্যাহ্নের আকাশ হইতে প্রদীপ্ত সূর্য্যকর অনন্ত বালুর সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে; তাহারই রৌদ্র-আভায় যবের সমস্ত উক্তি রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। যব আঁস্তাকুড়ের উপর বসিয়া সেই সূর্য্য করে জ্বলিয়া মরিতেছে—সারা অঙ্গের ক্ষততে মাছিরা অবিশ্রান্ত উড়িয়া বসিতেছে—আপনার ক্ষতের দিকে চাহিয়া বিলাপ করিতে গিয়া তাহার আকাশের তারার কথা মনে জাগিতেছে—অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া সে আনন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতেছে,—'তুমি আছ, সকল অন্ধকারের অন্তে, সকল রাত্রির অন্তে তুমি আছ হে চিরসূর্য্যালোক!' মানবের চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় যব প্রথম জগতে প্রকাশ করিলেন, কিন্তু প্রকাশের মধ্যে কোথাও তাঁহার আপনার জ্বালার কথা নাই;—দুঃখের মধ্য দিয়া যে দেবতা অমৃত বিলাইতেছেন যব তাঁহারই সন্ধান আপনার বেদনার মধ্য দিয়া মানব জাতিকে জানাইয়া দিলেন। যে বেদনার মহা-সঙ্গীত যুগে যুগে মানবকে এই নশ্বরতার বন্ধন হইতে দূরে অনন্ত প্রাণের বিপুল ব্যাপ্তির সম্ভাবনার দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—যব তাহার সন্ধান রাখিয়া গেলেন। যবের আঁস্তাকুঁড় পারিজাতকুঞ্জ হইয়া ফুটিয়া উঠিল; যবের বেদনা মানবকে তাহার ভগবানের সন্ধান আনিয়া দিল।

এস্কাইলাস আসিয়া আপনার অজ্ঞাতে যবের অপরিপূর্ণ আদর্শকে পরিপূর্ণ করিয়া গেলেন। যে বেদ-নায় যব আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল, সেই বেদনায় এস্কাইলাস বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। যব আঁস্তাকুড়ে বসিয়া হাসিতেছে কিন্তু এস্কাইলাসের প্রমিথিয়ুস পাহাড়ের গায়ে আবদ্ধ হইয়া স্বর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। যব মানুষকে কর্ত্তব্য-জ্ঞান শিখাইয়া গেলেন, এস্কাইলাস্ আসিয়া মানবকে অধিকার-বাদে দীক্ষা দিলেন। প্রমিথিয়ুসের সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্ত্য-মানবের আত্মবিলাসের আদিম অধিকারের বাণী জন্মগ্রহণ করিল। যব আত্মদান করিলেন। প্রজ্ঞার জগতে আত্মদান ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার বাণী সম্মিলিত হইয়া মানবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। এস্কাইলাস্ সর্ব্বপ্রথম জগতে মানুষের সত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মানব বদ্ধহস্তে ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া দেবতাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিল এবং সেই দ্বন্দ্বে দেবতাকে লাঞ্ছিত করিতে গিয়া আপনার অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে দেবতাকেই প্রতিষ্ঠিত করিল। এস্কাইলাস্ মানবের মধ্যে দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন—প্রজ্ঞার কৃপাণ-হস্তে মানব পৃথিবীকে দ্বিতীয় স্বর্গ বলিয়া ভাবিতে শিখিল। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে মেঘলোকের অনন্ত ব্যবধান জাগিয়া উঠিল। বিদ্রোহী মানুষের প্রজ্ঞায় শুধু দেবলোকের স্মৃতি জ্বলিতে লাগিল। যব আসিয়া নাটকের মূলসূত্রটী দিয়া যান, এস্কাইলাস্ আসিয়া পরিপূর্ণ নাটক দিলেন। জগতে কাব্যের নূতন রূপ হইল—বেদনার কাব্যলোক সৃষ্ট হইল—জগতে ট্রাজেডী আসিল! রসের জগতে দুইটী পৃথক দল

সৃষ্ট হইল—নব নবীনের অভিযানে বৃদ্ধরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এরিস্‌টোফানিস্‌ ব্যঙ্গ করিয়া উঠিলেন। নেস্‌টারের দল বিদ্রোহ ঘোষণা করিল—ট্রাজেডীর এই নব-রূপ মানবতার অপমান বলিয়া সেদিন বৃদ্ধরা ঘোষণা করিল। রসের ক্ষেত্রে পুরাতনে ও নবীনে দ্বন্দ্ব বাধিল। বৃদ্ধরা দেবতার বদলে মানব প্রমিথিয়ুস্‌কে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, Quid pro Baccho নাটকের অধিদেবতা বাক্‌কাসের স্থান কোথায়? বৃদ্ধরা সেদিনকার সেই নবীন, তরুণ নাট্যকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। দেবতাকে সে অপমান করিয়াছে—জুপিটারকে সে সাধারণ বিচারকের চেয়েও নির্ম্মম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। কাব্যের প্রচলিত নিয়মকানুন সে মানে নাই! অতএব তাহার বিচারের প্রয়োজন—বিচারে কঠোর শাস্তি প্রয়োজন।

আজও যেমন সেদিনও তেমনি নবীন স্রষ্টাকে জনমতের সম্মুখে বেদনায় কাঁদিতে হইয়াছিল! আজও যেমন, সেদিনও তেমনি নূতন বুঝিতে না পারিয়া লোকে নূতনকে অপমান করিয়াছিল। আজও যেমন, সেদিনও তেমনি লোকে এস্‌কাইলাসের পারিবারিক জীবন লইয়া প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করিয়াছিল; যে নারীকে এস্‌কাইলাস্‌ প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, সেই নারীই জনমতের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া এস্‌কাইলাসের বিরুদ্ধে তিক্ততম কুৎসার বাণী প্রচার করিল। সমগ্র এথেন্সবাসী তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইল। এস্‌কাইলাসের বিচার হইল। বিচারে চির-নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা বহাল হইল। ট্রাজেডীর জন্মদাতা নির্ব্বাসনে দেহত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুর পর লাইকারগাস বক্তৃতা দিলেন, "এথেন্সবাসী আজ অনুতপ্ত, এসকাইলাসের মর্ম্মরমূর্ত্তি এথেন্সকেই গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

যে এথেন্স এস্‌কাইলাসকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, সেই তাহার মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল।

এসকাইলাস্‌ তাঁহার সমগ্র কাব্য উৎসর্গ করিবার সময় শুধু লিখিয়াছিলেন, "To Time" "অনন্তকালের হাতে সমর্পণ করিলাম।" অনন্ত কাল পরম আদরে সে উৎসর্গকে গ্রহণ করিয়াছে। এস্‌কাইলাসের সমগ্র কাব্য এ্যালেক-জাণ্ড্রার বিখ্যাত লাইব্রেরী ধ্বংসের সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়—সামান্য যে কয়েকখানা বাঁচিয়া আছে, তাহাতেই সমগ্র সভ্য জগৎ আজ তাঁহাকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদি নাট্যকার হিসাবে শ্রদ্ধা করে।

চা'এর দোকানে

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু

"কি ভাবিস্‌ বল্‌ ত? এ বুড়ো বড় কেওকেটা নয়। বৌবাজারে প্রিয়বাবুর চাএর দোকানে বসে ইয়ারকি দিই বলে ভাবিস্‌ নি আমি একটা নিতান্ত যা'—তা। কত কীর্ত্তি দেখলুম, কত রাজা মহারাজার সঙ্গে দেখা হল—

"তুই ছোঁড়া ওখানে বসে হাসছিস যে? চা খাচ্ছিস্‌, খা, খেয়ে উঠে যা। আমি কি তোর ইয়ারকির যুগ্যি নাকি? তোর বয়েস বিশ বছর পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ, আর আমি বিরেশী ভর্ত্তি হয়ে তিরেশীতে পড়েছি।"

"ঠাকুর্দ্দা বলিস্‌ তা কি হয়েছে? চা খাওয়াবার বেলা নেই, ইয়ারকির বেলা খালি ঠাকুর্দ্দা।

"আরে না, না, প্রিয়বাবু, রাগ কি আমি করি। তবে এ সব ছোঁড়াদের ভব্যতা নেই, তাই বলি। ওরে বুড়ো হাবড়া আমরা দুচারটে যা আছি, আমাদের কথা শুনে না চললে আখেরে পস্তাতে হবে। অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, সময় থাকতে পরামর্শ নিয়ে দিন কিনে নে।

"আরে এস, এস, সতীশ এস, আজ দাদা তোমাকে এক পেয়ালা চা খাওয়াতে হবে। সেদিন বড় ফাঁকি দিয়েছিলে। কি রে? তোরা হাস্‌ছিস্‌ কেন? কে? অন্য লোক? সতীশ নয়? আর দাদা, বুড়ো হয়ে গেছি, চোখেও দেখি না, কানেও শুনি না, Sight gone, hearing gone, সব gone। কিছু মনে করবেন না মশাই, বুড়ো মানুষ, বাহাত্তুরে ধরেছে; আপনাকে সতীশ মনে করে বুকখান্‌ দশ হাত হয়ে উঠছিল, ভেবেছিলুম এক পেয়ালা চা মিলবে। তা যাক্‌, যাক্‌, বসুন ভাল হয়ে, এখানে যিনি আসেন তিনিই আমার ঘরের লোক।

"নিখ্‌লে! ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলছিস্‌, সব শুনতে পেয়েছি। নিজের দরকার মত দেখব শুনব, না তো কি তোর হুকুম মত দেখব শুন্‌ব? ভারি ফাজিল হয়েছিস্‌।

"ওহে প্রিয়বাবু—নতুন খদ্দের এসেছে, চা দাও, কেক্‌, বিস্কুট, চপ, কাটলেট্‌, ডিম্‌ ডেভিল কি আছে বার কর,

খাতির কর ভাল করে। মশায়ের নাম? কি বল্লেন? অপ্রকটচন্দ্র? আঃ আবার হাসে, শুনতে দে ভাল করে। কি সুপ্রকাশচন্দ্র গড়গড়ী? ব্রাহ্মণ? প্রাতঃপ্রণাম। নিবাস? রামনগর। কোন্ রামনগর? শান্তিপুরের কাছে? হ্যাঁ গিয়েছি বই কি। রামনগরের কোন্ পাড়ায় বাড়ী বলুন তো? ওঃ—উত্তর পাড়ার গোলকমল্লিক। হ্যাঁ তিনি এখন গত হয়েছেন,—তিনি যে আমার খুড়তুতো ভা'য়ের মাসতুতো ভায়েরশালা—

"না, এ ছোঁড়ারা কথায় কথায় হেসে বড় জ্বালালে দেখছি। দুনিয়া শুদ্ধু সম্পর্ক তোদের থাকলে তবে তো বলবি? আমার সম্পর্ক খুঁজে বার করবার ক্ষ্যামতা আছে, আমি করব না? এই তো একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এসেছেন, জিজ্ঞাসা কর দেখি, আত্ম-পরচে যারা দিতে পারে না, তারা কি মানুষ? তারা তো ডাহা জানোয়ারের সামিল। আহা, প্রিয়বাবু, আমি জানি কথায় বলে

মামার শালা, পিসের ভাই,
তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।

কিন্তু তা বলেই কি সত্যি সত্যি সম্পর্ক ঘোচে? বসুন ভাল হয়ে, গড়গড়ী মশাই। আপনি যখন গোলোকদাদার এক পাড়ার লোক, তখন তো আমার নিতান্তই আপনার। প্রিয়বাবু, বাবা, আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে ভদ্রলোককে চা দিলে, আমাকেও এক পেয়ালা দাও না,—তিন পেয়ালা আজকের মধ্যে হয়ে গেছে তা কি হয়েছে? দিনে বিশ পেয়ালা খেলেও আমার কিছু হবে না। পয়সা জমে যাবে? মাস-কাবারে তো পাবে—আহা গেল মাসের সব চুক্তি এ মাস-কাবারে এক সঙ্গে হবে এখন, ব্যস্ত হও কেন?

"অ্যাঃ—আপনি? আপনি কেন পয়সা দেবেন? না, না, সে কি ভাল দেখায়;—হ্যাঃ, হ্যাঃ,—তা আচ্ছা, ব্রাহ্মণ, পেড়াপিড়ি করছেন, আর কি বলব,—হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ।—এই প্রিয়বাবুর চাএর দোকানটী চিরদিনই দেখে আস্‌ছি—

এমন রাজার রাজা, কে করিল বিধি,
ঘোল খায় কৃষ্ণদাস, কড়ি দেয় নিধি।

"মশায়ের এখানে কোথা আসা হয়েছিল? কন্যাটীকে তা হলে নিয়েই যাবেন নাকি? বেয়াই পাঠালে না? আর বলবেন না, মেয়ের বিয়ে দেওয়া তো নয়, দাসী-বাঁদি যুগিয়ে দেওয়া। আমার বড় নাত্নীটীকে নিয়ে ঐ রকম হচ্ছে। কতদিন সে আসে নি; একবার আনতে চাই, তা আর কিছুতেই পাঠাবে না। মেয়ে, সে তো খাইয়ে দাইয়ে পরিয়ে গুছিয়ে পরের ঘরেই দেবার জন্যে।

"আমি? আজ্ঞে আমার নাম শ্রীগগনচাঁদ বড়াল। আমরা সুবর্ণবণিক, নিবাস এই কাছেই, মলঙ্গায় ভদ্রাসন। ওঃ, ঘিঞ্জির কথা আর বলবেন না, একে কোলকেতা, তায় বৌবাজার;—আপনারা পাড়াগাঁয়ের লোক, আপনাদের তো দম বন্ধ হয়ে আসবেই।

বেলা দুপুরের আগে আমরা সূয্যিদেবের মুখই দেখতে পাই না।

"কাজকর্ম্ম? এই শেষের বছর দশেক 'দৈনিক রত্নাকরের' প্রিণ্টার ছিলুম। আজ চার বছর হল retire করেছি। দুটী ছেলে, কাজের লায়েক হয়ে উঠেছে। 'রত্নাকরের' ওরা কি আমায় ছাড়তে চায়? কত বলে কয়ে তবে—

"থাম্, থাম্, ফাজিল কোথাকার। সত্যি কথা বলব তা ভয় কারে? 'সংবাদ রত্নাকর' যে দাঁড়িয়েছে আমারই জন্যে, সে কথা কি আমি কিছু মিথ্যে বলি, যে তা নিয়ে যখন তখন ঠাট্টা করিস্? ওরে তোরা তখন কোথায় ছিলি যখন 'বঙ্গবাসী' বেরোয়? সে কি আজকের কথা রে? কত রাজা—মহারাজার সঙ্গে তখন দহরম-মহরম ছিল, কতলোক এসে আমার কাছে ধন্না দিত!

"হ্যাঁ, তা সেকালের হুজুকের কথা সবই মনে আছে, বুড়ো ভুষুণ্ডি কাক আমি। সেই ইলবার্ট বিল, সেই তারকেশ্বরের কাণ্ড, এলোকেশীর ব্যাপার, মস্‌জিদ ভাঙ্গা নিয়ে টালার হাঙ্গামা, পেলেগ, পুনার ধরপাকড়, তারপর কলকেতার সাবাস আটাশ, কত কি। তারপর দিল্লীর দরবার, ক্রমে এই পার্টিসান, স্বদেশী হুজুক, বোমা আর প্রেস এক্ট, এসব তো সে দিনের কথা। 'সন্ধ্যা' বেরল, তাও দেখলুম, উপাধ্যায় মশাইয়ের কাছে কাজও করে এলুম। কি বুঝবি তোরা? প্রিণ্টার বলে নাক সিটকে ঠাট্টা করলেই শুধু হয় না। নইলে আসলে প্রিণ্টারি করা সোজা কাজ নয়। লিখবে অন্যলোকে, অথচ 'যত দোষ নন্দ ঘোষ', প্রিণ্টার ছাপলে; তাই তার এক পা জেলে, এক পা বাইরে।

"রত্নাকরের আমি যা করেছি, নিজের মুখে বলা শোভা পায় না। বরেন বাবু আসবার আগে রত্নাকর কি ছিল? কে পড়ত? কে কিনত? বরেন বাবু কাগজ হাতে নিয়ে আমায় ডে.ক প্রিণ্টারের ডিক্লারেসন নেওয়ালেন। এই দুজনে মিলে তখন রত্নাকর দাঁড় করাই।

"আহা, বরেন বাবু অনেক করেছেন, তা কি আমি অস্বীকার করছি, কিন্তু তা বলে আমি না থাকলে রত্নাকর যা আজ দাঁড়িয়েছে, এতখানি হোত না। বছর দুইএই এমন দাঁড় করিয়ে দিলুম, বিকেলে কাগজওয়ালাদের ঠেলাঠেলিতে দস্তুরমত মারামারি বেধে যেত, কে আগে নিয়ে বেরুতে পারবে। এই হারিসন রোডেই দেখুন না, আজ বছর আষ্টেক এমন হয়েছে যে সন্ধ্যা বেলা রাস্তার দুধারে এমন একটা দোকান পাবেন না যেখানে না দোকানদার একখানা রত্নাকর পড়ছে। বিকেলও হয় আর সবাই হা পিত্তেশ করে বসে থাকে কখন রত্নাকর আসবে।

"দোকানে দোকানে রত্নাকর পড়ার কথায় একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল। সে ভারি মজা হয়েছিল। কেন?

সব এগিয়ে আসছিস কেন? এই এতক্ষণ পেছনে লাগছিলি, আর এখন সব ঘিরে এসে বসছিস যে? কি বল্লি? গাঁজা! আমি কি গ্যাজাখোর যে গ্যাজাখুরি গল্প করি? যা দূর হ'—কিছু বলব না। ভাল সব বকাটে ছোকরা।

"মশাই শুনতে চাইছেন, বলতে আর বাধা কি? হয়েছিল কি জানেন, আমি ছেড়ে আসবার বছরখানেক আগের কথা। তখন বেলা তিনটে বাজে, বরেন বাবু বাড়ী থেকে খেয়ে দেয়ে এসেই আমায় একখানা কাগজ দিয়ে বল্লেন, "বড়াল, এই প্যারাটা আজকের টিপ্পনীর গোড়াতেই দিয়ে দাও, শেষের প্যারাটা না ধরে, উঠিয়ে দিও।" আমি বল্লুম "সে কি করে এখন হবে, কম্পোজ হয়ে চড়ান পর্য্যন্ত compl te।—চটে মটে বাবু বল্লেন, ও সব আমি শুনতে চাই না, যেমন করে পার আজকের টিপ্পনীর গোড়াতেই এটা দিতেই চাও। পাজী বেটা দোকানদারগুলোর জ্বালায় আজ একটা তরকারি মুখে করতে পারলুম না,—আর দেখ, এখানকার আশেপাশের সব দোকান্দার রোজ রত্নাকর পড়ে জান?' আমি বল্লুম, 'আজ্ঞে তাই তো রোজ দেখতে পাই।' বাবু বল্লেন, 'অন্ততঃ আজকের কাগজ যাতে সবাইয়ের হাতে, বিশেষ করে এই মসালার দোকানগুলোয় নেয়, দেখতে হবে। News boy গুলোকে বলে দিও চেঁচাতে—'বিষোম কাণ্ড—'

"ব্যাপারটা হয়েছিল কি, তা অল্পে অল্পে জানতে পারলুম। একটা মসালার দোকানদার বড় বাড়াবাড়ি করেছিল।

বরেনবাবুর চাকর আধসের গুঁড়ো হলুদ কিনে আনে। সেই হলুদ যে তরকারিতে সেদিন দেওয়া হয়, তাইতেই ধুলোর গন্ধ আর বালি কিচ্ কিচ্ করতে থাকে। শেষে বাকি হলুদগুঁড়োটুকুতে দেখা যায় যে তাতে হলুদের চেয়ে ধুলোবালির ভাগটাই বেশী! চাকর ফেরৎ দিতে নিয়ে গেল, কিন্তু কুক্ষণে দোকানদার ফেরৎ নিতে বা বদলে আস্ত হলুদ দিতে রাজি হল না। বাবু মহা চটে গেলেন।

বিকেলে টিপ্পনী বেরুল—

'এই কলিকাতা সহরে জুয়াচোর দোকানদারের অত্যন্ত আধিক্য দেখা যাইতেছে। আজ আমাদের ভৃত্য অৰ্দ্ধসের হরিদ্রাগুঁড়া ক্রয় করিয়া আনে, কিন্তু তাহাতে হরিদ্রার পরিবর্ত্তে ধূলা বালিরই আধিক্য দেখা যায়। দোকানের সত্বাধিকারীকে এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইহার পরিবর্ত্তে খাঁটি হরিদ্রা অৰ্দ্ধসের পরিমিত পাঠাইয়া দেয়, নচেৎ রত্নাকরে নামধাম প্রকাশিত করিয়া সাধারণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইবে।'

একেই তো রত্নাকর পড়তে পায় না, তার উপর কাগজ-ওয়ালার হাঁক 'বিষোম কাণ্ড—';—বারাণ্ডা থেকে দেখি প্রত্যেক দোকান থেকে ডেকে ডেকে কিনতে লাগল।

"সন্ধ্যে হতে না হতে, ও মশাই, দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করলে, প্রত্যেকের হাতে আধসের করে হলুদ! কেউ বল্লে, 'আমি গোবৰ্দ্ধন দত্তের লোক।' কেউ বল্লে, 'আজ্ঞে আমার নাম মহেশ হালদার, এই হলুদ নিন, দেখবেন গরীব যেন মারা না যায়।'

"দেখতে দেখতে প্রায় ষোল সতের সের হলুদই রত্নাকর আফিসে জমে গেল। তারপর দিন আমরা সবাই সেই হলুদ ভাগ ক'রে নিলুম,—সে একদিন গেছে।

"——আরে কে ও? মাধব না? বাড়ীর দিকে যাচ্ছ? একটু দাঁড়িয়ে যাও, আমিও যাব। তা হলে আসি মশাই, বসুন, প্রণাম।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য সচিত্র "মেঘদূত"—৪৲

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত মহাত্মা কাশীরাম দাসের "সচিত্র অষ্টাদশ পৰ্ব্ব মহাভারত"—৫৲

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "নারায়ণী—১৲

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত নাটক "নিবেদিতা"—১৲

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "পাঞ্চজন্য"—১৲

স্বামী পূর্ণানন্দ প্রণীত 'পূর্ণ-জ্যোতিঃ—২৲

শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত "কুলের বলি"—১৲ ও "অমৃতে গরল"—১৲

শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত "সমর-সঙ্গিনী"—৸৹ ও "বঙ্গের বীরকুমার"—৸৹

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "গোরাচাঁদ"—৷৵৹

শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ প্রণীত "শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মী াংসা"—২৲

ভ্রম-সংশোধন। এই মাসের 'লেখ-সূচি'র ৩০ নম্বরে 'শেষ-প্রশ্নে'র পরিবর্ত্তে 'বিশ্ব-সাহিত্য' ও 'চায়ের দোকান'হইবে

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

পূর্বরাগ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শিবপদ ভৌমিক

শ্রাবণ—১৩৩৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তদশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং *

শ্রীঅরবিন্দ

যে সত্যটি এইভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতি পদে অখণ্ড জ্ঞানের এক একটি নূতন দিক ব্যক্ত করিয়াছে এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এক-একটি অধ্যাত্ম ভাব ও কর্ম্ম, তাহার মূল্য ও সার্থকতা এইবার আমরা বুঝিব। সেইহেতু ভগবান অর্জ্জুনের মনকে জাগ্রত ও একাগ্র করিয়া তুলিবার জন্য, তিনি এখন যাহা বলিতে যাইতেছেন, তাহার গুরু প্রয়োজনীয়তার দিকে প্রথমেই তাহার অবধান আকর্ষণ করিলেন। কারণ, তিনি অর্জ্জুনের মনকে পূর্ণ-ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান ও দৃষ্টির জন্য উন্মুক্ত করিতে এবং একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন; সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা তাহার জীবনের, কর্ম্মের, লক্ষ্যের যিনি কর্ত্তা ও ভর্ত্তা, মানুষের মধ্যে ও জগতের মধ্যে যিনি ভগবান, তাঁহার সম্বন্ধে সজ্ঞান হইবে, মানুষের মধ্যে বা জগতের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে; কারণ, তাঁহা হইতেই সবের উৎপত্তি, তাঁহার অনন্ত সত্তার মধ্যেই সবার খেলা, তাঁহার ইচ্ছার দ্বারাই সব চলিতেছে, বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার দিব্যজ্ঞানের মধ্যেই সবের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তিনিই সকলের মূল ও সারবস্তু ও চরম লক্ষ্য। অর্জ্জুনকে জানিতে হইবে যে, সে নিজে ভগবানেরই মধ্যে রহিয়াছে এবং অন্তরস্থিত শক্তির দ্বারাই কাজ করিতেছে, তাহার কাজ কেবল

* গীতা—নবম অধ্যায়।

ভাগবত কর্ম্মের নিমিত্ত মাত্র, তাহার অহঙ্কৃত চেতনা কেবল একটা আচ্ছাদন, তাহার মধ্যে ভগবানের যে অমর স্ফুলিঙ্গ ও অংশ রহিয়াছে, তাহাই তাহার অজ্ঞানে বিকৃত হইয়া অহংচেতনা রূপে প্রতিভাত হইতেছে।

তাহার মনে এখনও যদি কোন সংশয় থাকে, এই বিশ্বরূপ-দর্শনই তাহা দূর করিয়া দিবে, এবং তাহাকে সেই কাজের জন্য শক্তিমান করিয়া তুলিবে, যে কাজ হইতে সে পশ্চাৎপদ হইয়াছে, সেই কাজের জন্য সে অলঙ্ঘ্য ভাবে নিয়োজিত, তাহার আর ফেরা চলে না,—কারণ ফিরিলে তাহার মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা ও আদেশকে অমান্য করা হইবে, এই আদেশ ইতিপূর্ব্বেই তাহার ব্যক্তিগত চেতনায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বিরাট বিশ্বলীলার মধ্যেও যে সে কর্ম্মের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে। কারণ এখন বিশ্ব-পুরুষ ভগবানেরই দেহরূপে অর্জ্জুনের সম্মুখে দেখা দিবেন, অনন্ত কাল সেই দেহের আত্মা, তিনি তাঁহার মহান্ ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে অর্জ্জুনকে যুদ্ধের সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিবেন। অর্জ্জুন তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইবে আত্মার মুক্তি-সাধন করিতে, এই বিশ্ব-রহস্যের মধ্যে তাহার কর্ম্ম সম্পাদন করিতে, এবং এই দুইটি—মুক্তি সাধন ও কর্ম্ম—একই সাধনা হইবে। অর্জ্জুনের সম্মুখে আত্মজ্ঞানের উচ্চতর আলোক এবং ভগবান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান যতই বেশী উদ্ঘাটিত হইতেছে, ততই তাহার বুদ্ধির সংশয় সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কেবল বুদ্ধির সংশয় পরিষ্কার হইলেই চলিবে না; তাহাকে দেখিতে হইবে অন্তর্দ্দৃষ্টির দ্বারা যাহা তাহার বহির্মুখী মানবীয় দৃষ্টিকে আলোকিত করিবে, যেন সে কর্ম্ম করিতে পারে, সমগ্র সত্তার সম্মতির সহিত, তাহার প্রতি অঙ্গের পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত, তাহার মধ্যে যে আত্মা তাহার জীবনের অধীশ্বর আবার সেই আত্মাই বিশ্বের এবং সমগ্র বিশ্বজীবনের অধীশ্বর সেই একই আত্মার প্রতি পূর্ণ ভক্তির সহিত।

ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে সব জ্ঞানের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছে, অথবা ইহার প্রথমে প্রয়োজনীয় উপাদান প্রস্তুত করিয়াছে, কিন্তু এখন কাঠামোটির পূর্ণ আকার তাহার উন্মুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে ধরা হইবে। ইহার পরে যাহা আসিবে সে-সবও খুবই প্রয়োজনীয়; কারণ, সে-সব এই কাঠামোর অংশগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবে, কোন্‌টির কি মর্ম্ম তাহা বুঝাইয়া দিবে; কিন্তু যে পুরুষ তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান মূলতঃ এখনই তাহার চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া ধরা হইবে যেন না দেখা আর তাহার পক্ষে সম্ভব না হয়। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাকে দেখান হইয়াছে, অজ্ঞান ও অহঙ্কৃত কর্ম্মের গ্রন্থিতে তাহাকে যে অবশ্যম্ভাবী-ভাবে বাঁধা থাকিতেই হইবে তাহা নহে,—এইরূপ কর্ম্মেই সে এতদিন সন্তুষ্ট ছিল, শেষে উহা আর তাহার মনকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই, উহাতে কোন সমস্যারই পূর্ণ সমাধান নাই, সংসারের কর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধী ভাব রহিয়াছে, তাহাতে তাহার মন বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কর্ম্মের জালে বদ্ধ হইয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, জীবন ও কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা ব্যতীত কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তির কোন পথই সে দেখিতে পায় নাই। তাহাকে দেখান হইয়াছে যে, কর্ম্ম ও জীবন-যাত্রার দুইটী বিরোধী পথ আছে, একটি হইতেছে অহংয়ের অজ্ঞানে, অপরটি হইতেছে সত্তার স্পষ্ট আত্মজ্ঞানে। সে কর্ম্ম করিতে পারে বাসনার সহিত, রিপুর বশে, নীচের প্রকৃতির গুণত্রয়ের দ্বারা তাড়িত "অহং"রূপে, পাপ পুণ্যের সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের অধীন হইয়া, কর্ম্মের ফল ও পরিণামের চিন্তায় জয় পরাজয়ের, শুভ ও অশুভের চিন্তায় বিভোর থাকিয়া, জগৎ-চক্রে বদ্ধ হইয়া, কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম যে পরিবর্ত্তনশীল বিরোধী ভাবের দ্বারা মানুষের হৃদয়, মন, আত্মাকে বিভ্রান্ত করে, সে সকলের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া। কিন্তু অজ্ঞানের কর্ম্মেই সে অকাট্য ভাবে বদ্ধ নহে; সে যদি ইচ্ছা করে তবে জ্ঞানের কর্ম্মও করিতে পারে। সংসারে সে কর্ম্ম করিতে পারে উচ্চ ভাবুক রূপে, জিজ্ঞাসু রূপে, যোগী রূপে, প্রথমে মুক্তি-প্রার্থী রূপে এবং পরে মুক্ত-আত্মা রূপে। এই মহান্ সম্ভাবনা উপলব্ধি করা এবং যে জ্ঞান ও আত্ম-দৃষ্টি কার্য্যতঃ উহা সম্ভব করিবে তাহাতে তাহার বুদ্ধিকে নিবিষ্ট রাখা, ইহাই তাহার দুঃখ ও মোহ হইতে মুক্তি পাইবার, মানব-জীবনের সমস্যা হইতে মুক্তি পাইবার পথ।

আমাদের মধ্যে এক অধ্যাত্ম সত্তা আছে, তাহা শান্ত কর্ম্মের অতীত, সম, এই বাহিরের কর্ম্মজালে বদ্ধ নহে, কিন্তু উহার ধাতা, উৎপত্তি-স্থল, অন্তর্যামী, সঙ্গী রূপে উহাকে

পর্য্যবেক্ষণ করে, অথচ উহাতে জড়িত হয় না। উহা অনন্ত, সবকে ভিতরে ধরিয়া রাখিয়াছে, সকলের মধ্যে এক আত্মা, প্রকৃতির সমগ্র কর্ম্মকে নিরপেক্ষ ভাবে অবলোকন করিতেছে এবং দেখিতেছে যে, এ-সব কেবল প্রকৃতির কর্ম্ম, তাহার নিজের কর্ম্ম নহে। উহা দেখে যে, অহং এবং অহংয়ের ইচ্ছা ও বুদ্ধি সবই প্রকৃতির যন্ত্র এবং ইহাদের সকল কর্ম্মই প্রকৃতির তিন গুণের জটিল ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ সনাতন অধ্যাত্ম সত্তা নিজে ঐ সব হইতে মুক্ত। এই সব হইতে সে মুক্ত, কারণ তাহার জ্ঞান আছে, সে জানে যে প্রকৃতি এবং অহং এবং এই সকল জীবের ব্যক্তিক সত্তা (the personal b ing) ইহা লইয়াই অস্তিত্ব নহে। কারণ জগতে অনবরত যে ক্ষর-লীলা চলিতেছে, মহান্ বা তুচ্ছ, চমকপ্রদ বা বিষাদজনক নিখিল পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য —কেবল ইহাই অস্তিত্বের (existence) সবটুকু নহে। এমন কিছু আছে যাহা সনাতন, অক্ষর, অক্ষয়, কালাতীত স্বয়ম্ভু সত্তা; প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সকল তাহাকে স্পর্শ করে না। উহা সে-সবের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা, কাহাকেও বিচলিত করে না, নিজেও বিচলিত হয় না, নিজে কোন কর্ম্ম করে না, কাহারও কর্ম্ম তাহাকে স্পর্শ করে না, সে পুণ্যবানও নহে, পাপীও নহে; কিন্তু নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মহান্ এবং অক্ষত। অহং ভাবাপন্ন মানব যাহাতে ব্যথিত বা আকৃষ্ট হয় উহা তাহাতে শোকান্বিত বা হর্ষান্বিত হয় না, উহা কাহারও মিত্রও নহে, কাহারও শত্রুও নহে, কিন্তু সকলের মধ্যে এক সম আত্মা। মানুষ এখন এই আত্মা সম্বন্ধে সচেতন নহে, কারণ সে বহির্ম্মুখী মনের মধ্যে জড়াইয়া রহিয়াছে, সে অন্তরের মধ্যে বাস করিতে শিখিতে চায় না, অথবা শিখে নাই; নিজের কর্ম্ম হইতে নিজেকে সে পৃথক করিয়া ধরে না, সরিয়া দাঁড়ায় না এবং ঐ কর্ম্মকে প্রকৃতির কর্ম্ম বলিয়া দেখে না। অহংই বাধা, মোহচক্রের নাভি। জীবের অন্তরাত্মায় অহংয়ের লয় করাই মুক্তির জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। অধ্যাত্ম সত্তা হওয়া, আর কেবল মন এবং অহং হইয়া না থাকা, ইহাই এই মুক্তি বাণীর প্রথম কথা।

অর্জ্জুনকে এই জন্য প্রথমেই বলা হইয়াছে তাহার কর্ম্মের সমস্ত ফল-কামনা পরিত্যাগ করিতে এবং যাহাই করিতে হউক সেই কর্ত্তব্য শুধু নিষ্কাম নিরপেক্ষ কর্ম্মী ভাবে সম্পাদন করিতে,—এই বিশ্বকর্ম্মসমূহের যিনিই ঈশ্বর হউন তাঁহার হস্তে সমস্ত ফলাফল ছাড়িয়া দিতে। কারণ, সে নিজে যে ঈশ্বর নহে তাহা খুবই সুস্পষ্ট। তাহার ব্যক্তিগত অহংয়ের তৃপ্তির জন্য প্রকৃতি আপনার পথে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাহার বাসনা, তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিশ্ব-প্রাণ জীবন-লীলা করিতেছে না; তাহার মানসিক মতামত, তাহার সিদ্ধান্ত ও আদর্শ সার্থক করিবার জন্য বিশ্ব-মন কাজ করিতেছে না, তাহার ক্ষুদ্র দরবারে বিশ্ব-মনের জাগতিক লক্ষ্য বা পার্থিব কর্ম্মধারা ও উদ্দেশ্য উপস্থিত করা হয় না। এই সব অধিকারের দাবী কেবল সেই সকল লোকে করে যাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে এবং সেই ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ প্রতিষ্ঠা হইতে সমস্ত জিনিষকে দেখে। প্রথমেই তাহাকে জগতের উপর তাহার অহঙ্কারের দাবী ছাড়িতে হইবে এবং লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে সে কেবল একজন মাত্র এই ভাবে তাহাকে কাজ করিতে হইবে। যে ফলাফল তাহার দ্বারা নির্ণীত নহে কিন্তু নিখিল কর্ম্ম ও উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, তাহাতে তাহার নিজের চেষ্টা ও সত্ত্বের অংশটুকু জোগাইতে হইবে। কিন্তু তাহাকে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু করিতে হইবে,—সে যে কর্ত্তা এই অভিমানও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সকল ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে দেখিতে হইবে যে, নিখিল বুদ্ধি, ইচ্ছা, মন, প্রাণই তার মধ্যে এবং অপর সকলের মধ্যে কর্ম্ম করিতেছে। প্রকৃতিই নিখিল কর্ত্তা; তার কর্ম্ম প্রকৃতিরই কর্ম্ম, ঠিক যেমন তার মধ্যে প্রকৃতির কর্ম্মের ফল তার চেয়ে এক মহত্তর শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মহান্ ফল-সমষ্টির অংশমাত্র। অধ্যাত্ম ভাবে সে যদি এই দুইটি জিনিষ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্মের জাল ও বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়িবে; কারণ, ঐ বন্ধনের সমস্ত গ্রন্থি রহিয়াছে তাহার অহঙ্কারের দাবীতে এবং কর্ত্তৃত্বাভিমানে। রিপুর উদ্বেগ ও পাপ এবং ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ তাহার আত্মা হইতে অদৃশ্য হইবে। তখন তাহা শুদ্ধ, মহান্, শান্ত, সকল লোক ও সকল জিনিষে সম-ভাবাপন্ন হইয়া অন্তরের মধ্যে বাস করিবে। কর্ম্ম তখন অন্তরের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিবে না, তাহার আত্মার নির্ম্মলতা ও শান্তির উপর কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিয়া যাইবে না। তাহার থাকিবে অভ্যন্তরীণ সুখ, বিরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, এবং মুক্ত অক্ষত সত্তার অটুট আনন্দ।

ভিতরে বা বাহিরে আর তাহার সেই পুরাতন ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের জের থাকিবে না; কারণ, সে তখন সজ্ঞানে উপলব্ধি করিবে যে, সে সকলের সহিত এক আত্মা,—তাহার বাহ্য প্রকৃতিও নিখিল মন, প্রাণ, ইচ্ছার অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই তাহার জ্ঞানে অনুভূত হইবে। তাহার স্বতন্ত্র অহংভাবাপন্ন সত্তা অধ্যাত্ম সত্তার নির্ব্যক্তিক ভাবের মধ্যে গৃহীত ও নির্ব্বাপিত হইবে; তাহার স্বতন্ত্র অহংভাবাপন্ন প্রকৃতি বিশ্ব-প্রকৃতির লীলার সহিত একীভূত হইবে।

কিন্তু, এই মুক্তি নির্ভর করে দুইটি যুগপৎ উপলব্ধির উপরে,—স্পষ্টভাবে আত্মদর্শন এবং স্পষ্টভাবে প্রকৃতি দর্শন। এই দুইটি উপলব্ধির সামঞ্জস্য এখনও হয় নাই। ইহা কেবল বৈজ্ঞানিকের মানসিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে, জড়বাদী দার্শনিকও, নিজের আত্মা এবং অধ্যাত্ম সত্তার উপলব্ধি না থাকিলেও শুধু প্রকৃতি সম্বন্ধেই কতকটা স্পষ্ট দৃষ্টি লাভ করিয়া এরূপ নিঃসঙ্গ হইতে পারে। ইহা ভাববাদী জ্ঞানীরও (the ideali tic sage) মানসিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে। এরূপ ব্যক্তি বুদ্ধির আলোক সহায়ে অহংয়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং বিক্ষোভকারী রূপগুলি অতিক্রম করিতে পারে। ইহা আরও বড়, আরও জীবন্ত, আরও পূর্ণ আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা। প্রকৃতির উপরে, মন-বুদ্ধির উপরে যে পরম সত্তা রহিয়াছে, তাহার দর্শন লাভ করিয়াই এই নিঃসঙ্গতা লাভ করা যায়। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতাও মুক্তির এবং স্পষ্ট জ্ঞানদৃষ্টির কেবল গোড়াকার রহস্য, ইহা দিব্য-রহস্যের সমগ্র সূত্র নহে; কারণ, শুধু এইটির দ্বারাই প্রকৃতির ব্যাখ্যা হয় না; এবং অধ্যাত্ম ও নিষ্ক্রিয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সহিত কর্ম্মজীবনের বিরোধ থাকিয়া যায়। দিব্য নিঃসঙ্গতা হইবে দিব্য কর্ম্মেরই ভিত্তি। আগে যেমন অহং-ভাবের বশে প্রকৃতির কার্য্যে যোগ দেওয়া হইত, তাহার পরিবর্ত্তে দিব্য-ভাবে প্রকৃতির কার্য্যে যোগ দিতে হইবে, দিব্য শান্তি দিব্য ক্রিয়াকে দিব্য গতিকে ধরিয়া থাকিবে। এই সত্য বরাবরই গুরুর মনে ছিল এবং সেই জন্যই তিনিই যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে, পরমপুরুষকেই আমাদের সকল কর্ম্মের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে এবং অবতারের ও দিব্য-জন্মের মর্ম্ম বুঝিতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন; কিন্তু শান্ত মুক্ত ভাবের প্রতিষ্ঠা প্রথমেই প্রয়োজন বলিয়া এই সত্যের উপর এতক্ষণ তেমন জোর দেওয়া হয় নাই। যে সকল সত্যের দ্বারা আধ্যাত্মিক শান্তি, নিঃসঙ্গতা, সমতা এবং ঐক্য লাভ করা যায়, এক কথায়, অক্ষর আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং তাহাই হওয়া যায়, সেই সকল সত্যই পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে এবং তাহাদের বৃহত্তম শক্তি ও সার্থকতা দেখান হইয়াছে। অন্য যে মহান্ প্রয়োজনীয় সত্য এই উপলব্ধিকে পূর্ণতর করিবে, সেটিকে কতকটা অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে, অল্প আলোকে দেখান হইয়াছে। পুনঃপুনঃ এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেটিকে পরিস্ফুট করা হয় নাই। এখন ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটি অধ্যায়ে সেই সত্যকে দ্রুত পরিস্ফুট করা হইতেছে।

অবতার, গুরু, জীবন-যুদ্ধে মানবাত্মার চির-সারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই নিজের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাহাই প্রকৃতির গভীরতম রহস্য। এই উদ্যোগের মধ্যে একটি সুর তিনি সকল সময়েই ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সমগ্র সত্যের বৃহত্তর চূড়ান্ত সমন্বয়ের ইঙ্গিত ও ভূমিকাস্বরূপ পুনঃপুনঃ তুলিয়াছেন। সেই সুর হইতেছে পরম ভগবানের তত্ত্ব। তিনি মানুষের মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি মানুষ ও প্রকৃতি হইতে মহত্তর, আত্মার নির্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহাকে পাইতে হয়। কিন্তু নির্ব্যক্তিক আত্মাই তাঁহার সমগ্র সত্য নহে। পুনঃপুনঃ জোরের সহিত এই সত্যের ইঙ্গিত কেন করা হইয়াছে, এখন আমরা তাহার অর্থ বুঝিতেছি। একই ভগবান যিনি বিশ্বাত্মায়, মানুষে ও প্রকৃতিতে রহিয়াছেন, তিনিই রথোপরি অবস্থিত গুরুর মুখ দিয়া উদ্যোগ করিতেছিলেন যেন, জাগ্রত দ্রষ্টা ও কর্ম্মীর সমগ্র সত্তার উপর তিনি তাঁহার একান্ত দাবী উপস্থিত করিতে পারেন। তিনি বলিতেছিলেন, "আমি তোমার অন্তরে রহিয়াছি, আমি এখানে এই মানব শরীরে রহিয়াছি। আমার জন্যই সব কিছুর অস্তিত্ব, সকলে কর্ম্ম করে, চেষ্টা করে। সেই আমিই স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মারও নিগূঢ় সত্য; আবার সেই সঙ্গে বিশ্বলীলারও নিগূঢ় সত্য। এই যে 'আমি', ইহাই মহত্তর আমি। যত বড় মানব-সত্তাই হউক না কেন, তাহা এই 'আমি'র এক ক্ষুদ্র আংশিক প্রকাশমাত্র,—প্রকৃতি নিজে ইহারই এক নীচের খেলা মাত্র। জীবাত্মার ঈশ্বর, বিশ্বের সকল কর্ম্মের ঈশ্বর, আমিই অদ্বিতীয় জ্যোতিঃ, একমাত্র শক্তি, এক মাত্র সত্তা। তোমার অন্তরে এই ভগবানই

গুরু, সবিতা,—সেই জ্ঞানের স্পষ্ট জ্যোতির প্রকাশকর্ত্তা, যাহাতে তুমি তোমার অক্ষর আত্মা এবং তোমার ক্ষর প্রকৃতির প্রভেদ দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু এই জ্যোতিরও উপরে উহার উৎসের দিকে চাহিয়া দেখ; তাহা হইলে তুমি পরম আত্মাকে জানিতে পারিবে, তাহারই মধ্যে ব্যক্তিত্বের ও প্রকৃতির অধ্যাত্ম সত্যকে ফিরিয়া পাইবে। অতএব সর্ব্বভূতের মধ্যে এক আত্মাকে দেখ, যেন এই ভাবে তুমি সর্ব্বভূতের মধ্যে আমাকে দেখিতে পার। সর্ব্বভূতকে এক অধ্যাত্ম আত্মা এবং সত্য বস্তুর মধ্যে দেখ; কারণ, সর্ব্বভূতকে আমার মধ্যে দেখিবার ইহাই পন্থা। সকলের মধ্যে এক ব্রহ্মকে অবগত হও; কারণ, এই ভাবেই তুমি পরম ব্রহ্ম ভগবানকে দেখিতে পাইবে। তোমার নিজের আত্মাকে অবগত হও, নিজের আত্মা হও, যেন এই ভাবে তুমি আমার সহিত যুক্ত হইতে পার,—এই কালাতীত আত্মা আমারই স্পষ্ট জ্যোতিঃ বা স্বচ্ছ আবরণ। ভগবান আমিই আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার চরম সত্য।"

অর্জ্জুনকে দেখিতে হইবে যে, এই একই ভগবান শুধু আত্মার উচ্চতর সত্য নহেন, পরন্তু প্রকৃতির এবং তাহার নিজের ব্যক্তিত্বেরও উচ্চতর সত্য,—একই সঙ্গে ব্যক্তির এবং বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। তাঁহারই ইচ্ছা প্রকৃতিতে সর্ব্বব্যাপী, প্রকৃতির কর্ম্মসকল তাঁহা হইতেই আসিতেছে। তিনি সেই সকল কর্ম্ম অপেক্ষা মহত্তর,—প্রকৃতির কর্ম্ম, মানুষের কর্ম্ম এবং সেই সকল কর্ম্মের ফল সবই তাঁহার। অতএব তাহাকে যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে; কারণ, সেইটিই হইতেছে তাহার কর্ম্মের, সকল কর্ম্মের প্রকৃত সত্য। প্রকৃতিই কর্ম্মী, অহং কর্ম্মী নহে; কিন্তু প্রকৃতি ভগবানের একটা শক্তিমাত্র,—ভগবানই প্রকৃতির সকল কর্ম্মের ও চেষ্টার একমাত্র প্রভু,—বিশ্বযজ্ঞের যুগযুগান্তরের একমাত্র ঈশ্বর। তাহার কর্ম্ম যখন ভগবানের, তখন তাহার মধ্যে ও জগতে যে ভগবান রহিয়াছেন, যাঁহার দ্বারাই প্রকৃতির রহস্যময় দিব্যলীলায় ঐ সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহাকেই তাহার সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হইবে। আত্মার দিব্য জন্মের জন্য, অহংয়ের এবং শরীরের মরত্ব হইতে অধ্যাত্ম ও অনন্তের মধ্যে মুক্তিলাভের জন্য এই দুইটি প্রয়োজন—প্রথমে নিজের কালাতীত অক্ষর আত্মার জ্ঞান ও ইহার ভিতর দিয়া কালাতীত ভগবানের সহিত মিলন। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই বিশ্ব-রহস্যের পশ্চাতে যিনি রহিয়াছেন, সর্ব্বভূতের মধ্যে এবং তাহাদের ক্রিয়ার মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও জ্ঞান। কেবল এইরূপেই আমরা আমাদের সমস্ত প্রকৃতি ও সত্তাকে সমর্পণ করিয়া সেই একের সহিত জীবন্তভাবে যুক্ত হইবার আশা করিতে পারি, যিনি দেশ, কালের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব হইয়াছেন। পূর্ণ আত্মমুক্তির যোগসাধনায় ভক্তির স্থান এইখানেই। অবিনাশী আত্মা বা পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি এতদুভয় অপেক্ষাও যিনি মহত্তর, তাঁহার ভজনা ও আরাধনাই এই ভক্তি। তখন সকল জ্ঞান হয় ভজনা ও আরাধনা; কিন্তু সকল কর্ম্মও হয় ভজনা ও আরাধনা। এই ভজনাতেই প্রকৃতির কর্ম্ম এবং আত্মার মুক্তি একীভূত হইয়াছে, এবং সেই এক ভগবানের উদ্দেশে এক আত্মোৎসর্গে পরিণত হইয়াছে। চরম মুক্তি, নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উপরের অধ্যাত্মভাবের মূলে যাওয়া, ইহা আত্মার নির্ব্বাণ নহে,—কেবল তাহার অহংরূপেই নির্ব্বাণ হয়। কিন্তু ইহা হইতেছে আমাদের জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রেমময় সমগ্র আত্মার পক্ষে ভগবানের বিশ্বসত্তার মধ্যে আর না থাকিয়া, বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে গমন করা,—ইহা ধ্বংস নহে, সিদ্ধি।

অর্জ্জুনের মনের কাছে এই জ্ঞানটি স্পষ্ট করিয়া ধরিবার জন্য আবশ্যক বলিয়া শ্রীগুরু বাকী দুইটি সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইলেন,—নির্ব্যক্তিক সত্তা ও মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যে বিরোধ এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই দুইটি দ্বন্দ্ব থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে ভাগবত সত্তার অস্তিত্ব অস্পষ্ট, অসঙ্গত, অবিশ্বাস্য থাকিয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে প্রকৃতি গুণসমূহের জড় শৃঙ্খলা, আত্মা এই শৃঙ্খলের অধীন অহঙ্কৃত সত্তা। কিন্তু ইহাই যদি তাহাদের সমস্ত সত্য হয়, তাহা হইলে তাহারা ভাগবত সত্তা নহে, হইতেই পারে না। জড় অজ্ঞান প্রকৃতি ভগবানের শক্তি হইতে পারে না; কারণ, ভগবানের শক্তি হইবে কর্ম্মে স্বাধীন, মূলে আধ্যাত্মিক, মহত্ত্বে আধ্যাত্মিক। প্রকৃতিতে বদ্ধ অহঙ্কৃত আত্মা, কেবল মনোময়, প্রাণময়, দেহময় আত্মা কখনই ভগবানের অংশ এবং নিজে ভাগবত সত্তা হইতে পারে না; কারণ, যাহা এইরূপ ভাগবত সত্তা হইবে, তাহা হইবে স্বরূপে ভগবানেরই

ন্যায় মুক্ত, অধ্যাত্ম, আত্মবিকাশশীল, স্বপ্রতিষ্ঠ,—তাহা হইবে মন, প্রাণ, দেহের ঊর্দ্ধে। এই দুই সংশয় এবং তাহারা যে অজ্ঞানের সৃষ্টি করে সে সব অপসৃত হয় সত্যের একটি মাত্র উজ্জ্বল দীপ্ত রশ্মির দ্বারা। জড়প্রকৃতি কেবল একটা নীচের সত্য; নীচের প্রতিভাসিক ক্রিয়াই জড়প্রকৃতি নামে অভিহিত। উপরের এক সত্য আছে, তাহা অধ্যাত্ম সত্য এবং তাহাই আমাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, আমাদের সত্য ব্যক্তিসত্তা। ভগবান একই সঙ্গে নির্ব্যক্তিক (impersonal) আবার ব্যক্তিক (personal)। আমাদের মনের অনুভূতিতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার নির্ব্যক্তিক ভাব-কালের অতীত অনন্ত সদ্‌স্বরূপ, চিদ্‌স্বরূপ, অস্তিত্বোপলব্ধির আনন্দস্বরূপ, তাঁহার ব্যক্তিক ভাব দেখা যায়—সত্তার সচেতন শক্তিরূপে, জ্ঞানের, ইচ্ছার এবং বহুধা আত্মপ্রকাশের আনন্দের সচেতন কেন্দ্ররূপে। মূল অক্ষর সত্তার আমরাও সেই একই নির্ব্যক্তিক; আমাদের অধ্যাত্ম-ব্যক্তিস্বরূপে আমরা প্রত্যেকেই সেই মূল শক্তির বহুধা রূপ। কিন্তু এই যে প্রভেদ, ইহা কেবল আত্ম প্রকাশের প্রয়োজনের জন্য। দিব্য নির্ব্যক্তিক সত্তাকে ছাড়াইয়া যাইলে দেখা যায় যে, উহাই আবার অনন্ত পুরুষ, পরমাত্মা। উহাই মহান্ অহম্—সোঽহম্, আমিই সেই,—যাঁহা হইতে সমস্ত ব্যক্তিক সত্তা ও প্রকৃতি আবির্ভূত হয়; এবং নির্ব্যক্তিকভাবে প্রতীয়মান এই যে জগৎ, ইহার মধ্যে বিচিত্রভাবে লীলা করে। যাহা কিছু রহিয়াছে সবই ব্রহ্ম,—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ইহাই উপনিষদের কথা, কারণ ব্রহ্ম এক আত্মা, নিজেকে ক্রমান্বয়ে চৈতন্যের চারি স্তরে দেখিতেছেন। বাসুদেব অনন্ত পুরুষই সব, বাসুদেব সর্ব্বম্, ইহাই গীতার কথা। তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার ঊর্দ্ধের অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে তিনি সজ্ঞানে সমস্ত উৎপাদন করিতেছেন, ধরিয়া রাখিয়াছেন। এখানে বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের বাহ্যদৃশ্য লইয়া যে অপরা প্রকৃতি, তাহার মধ্যে সকল বস্তু তিনিই সজ্ঞানে হইয়াছেন। অনন্তের সেই অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে তিনিই জীব, জীব তাঁহার সনাতন বহুরূপ, সচেতন আত্মশক্তির বহু কেন্দ্র হইতে তাঁহারই আত্মদর্শন। ভগবান, প্রকৃতি, জীব—এই তিন লইয়াই বিশ্বলীলা এবং এই তিনই এক সত্তা।

এই সত্তা নিজেকে বিশ্বের মাঝে কেমন করিয়া প্রকাশ করে? প্রথমতঃ অক্ষর কালাতীত আত্মা রূপে,—তাহা সর্ব্বব্যাপী, সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার অনন্ততায় তাহা শুধু সত্তা, তাহাতে কোন বিকাশ বা লীলা নাই। তার পর, সেই সত্তায় বিধৃত রহিয়াছে এক মূল শক্তি বা আত্মবিকাশের অধ্যাত্ম ধারা,—স্বভাব। তাহার ভিতর দিয়াই অধ্যাত্ম আত্মদৃষ্টির দ্বারা এই সত্তা সঙ্কল্প করে, বিকাশ করে,—ইহার মধ্যে যাহা কিছু অপ্রকাশিত রহিয়াছে, নিহিত রহিয়াছে, সেই সকলকে মুক্ত করিয়া দিয়া সৃষ্টি করে। এই ভাবে আত্মায় যাহা কিছু সঙ্কল্পিত হয়, সেই আত্মবিকাশের শক্তি বা তেজ বিশ্বের মাঝে সেই সবকে কর্ম্মরূপে বিসৃষ্ট করে। সকল সৃষ্টিই এই ক্রিয়া, মূল প্রকৃতির লীলা, কর্ম্ম। কিন্তু এই সংসারে উহা পরিণত হইয়া উঠিয়াছে অপরা প্রকৃতির মধ্যে,—বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূল ভূতের বাহ্য রূপের মধ্যে। তাহা পূর্ণ আলোক হইতে বস্তুতঃ বিচ্ছিন্ন এবং অজ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। সেখানে তাহার সকল ক্রিয়াই হয় প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে প্রকৃতিস্থ জীবাত্মার যজ্ঞ। অতএব পরম ভগবান সকলের মধ্যেই তাহাদের যজ্ঞের অধীশ্বর রূপে, অধিযজ্ঞ রূপে বিরাজিত। তাঁহার সান্নিধ্যে, তাঁহার শক্তিতেই সেই যজ্ঞ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁহার আত্মজ্ঞানে এবং আত্মসত্তার আনন্দে তাহা গৃহীত হয়। ইহা জানিলেই বিশ্ব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা হয়, জগৎ-মাঝে ভগবানকে দর্শন করা হয় এবং অজ্ঞান মায়া হইতে মুক্ত হইবার দ্বার খুঁজিয়া পাওয়া যায়।—কারণ, এই জ্ঞান যখন কার্য্যতঃ সত্যে পরিণত হয়, মানুষ তাহার কর্ম্ম এবং তাহার সমস্ত চেতনাকে সর্ব্বভূতস্থিত ভগবানে অর্পণ করে। তখন সেই জ্ঞানের দ্বারা সে তাহার অধ্যাত্ম সত্তায় ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হয় এবং ইহার ভিতর দিয়া এই অপরা ক্ষর প্রকৃতির উপরে অনন্ত ও ভাস্বর যে বিশ্বাতীত সত্য বস্তু রহিয়াছে, তাহাতে পৌঁছিতে সমর্থ হয়।

আমাদের মূল সত্তার এই যে নিগূঢ় সত্য, আমাদের অভ্যন্তরীণ জীবন ও বাহ্যকর্ম্ম বিকাশে কেমন করিয়া ইহা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যায়, গীতা এখন তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছে। গীতা এখন যাহা বলিতেছে তাহা সকল

রহস্যের গুহ্যতম রহস্য *। ইহাই ভগবান সম্বন্ধে সেই সমগ্র জ্ঞান,—সমগ্রম্ মাম্,—অর্জ্জুনকে যাহা দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাই সমস্ত তত্ত্বের পূর্ণ বিজ্ঞানসহ মূল জ্ঞান, যাহা জানিলে আর জানিতে কিছু বাকী থাকে না। যে অজ্ঞান তাহার মানবীয় মনকে বিমূঢ় করিয়াছে, এবং তাহার ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে তাহার ইচ্ছাকে বিমুখ করিয়াছে, সেই অজ্ঞানের গ্রন্থি ইহার দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে ছেদিত হইবে। ইহাই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সকল রহস্যের শ্রেষ্ঠ রহস্য, রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য। ইহা শুদ্ধ এবং উত্তম জ্যোতিঃ। প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধির দ্বারা মানুষ ইহার প্রমাণ পায়, নিজের মধ্যেই সত্য বলিয়া দেখিতে পারে। ইহাই প্রকৃত সত্যধর্ম্ম, জীবনের মূল নীতি।—মানুষ যখন ইহাকে ধরিতে পারে, দেখিতে পারে এবং শ্রদ্ধার সহিত এই অনুসারে জীবনকে গঠিত করিতে চায়, তখন ইহার অনুসরণ করা সহজ হয়।

কিন্তু শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধা যদি না থাকে, মানুষ যদি বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে সেই উচ্চতর জ্ঞানকে জীবনে সত্য করিয়া তোলা সম্ভব হয় না। বিচারবুদ্ধি বাহ্য ব্যাপারের অনুগমন করে, অধ্যাত্মদৃষ্টিলব্ধ জ্ঞানকে সন্দেহের সহিত যাচাই করিয়া দেখিতে চায়; কারণ, তাহা দৃশ্য প্রকৃতির দ্বন্দ্ব ও অপূর্ণতা সমূহের সহিত মিলে না,—মনে হয়, তাহা এই দ্বন্দ্বময় প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতেছে,—এমন কথা বলিতেছে, যাহা আমাদিগকে আমাদের বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যক্ষ শোক, দুঃখ, অমঙ্গল, দোষ, ভ্রান্তি ও অক্ষমতা হইতে, অশুভ হইতে উপরে লইতে চায়। যে জীব সেই উপরের সত্য ও ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহাকে মৃত্যু, ভ্রান্তি, অশুভের অধীন সাধারণ মরজীবনের পথে ফিরিতেই হইবে। যে ভাগবত সত্তাকে সে অস্বীকার করে, তাহাতে গড়িয়া উঠা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ এই যে সত্য, জীবনের মাঝে ইহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে, ইহারই অনুসরণে জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে;—আত্মার ক্রমবর্দ্ধনশীল জ্যোতিতে অনুসরণ করিতে হইবে,—মনের অন্ধকারে তর্কবুদ্ধির সহায়ে নহে।—মানুষকে এই সত্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে, এই সত্য হইতে হইবে,—ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। নীচের সত্তাকে অতিক্রম করিয়াই মানুষ প্রকৃত দিব্যসত্তা হইতে পারে এবং আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের সত্যকে জীবনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। সত্য বলিয়া যাহা কিছু ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপন করা যায় সে সমস্তই নীচের প্রকৃতির বাহ্যিক সত্য। নীচের প্রকৃতির অপূর্ণতা ও অমঙ্গল হইতে, "অশুভ" হইতে মুক্তিলাভ করা যায় কেবল এক উর্দ্ধের জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া,—যেখানে ঐ সকল বাহ্যিক অশুভ শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, আমাদেরই অজ্ঞানের সৃষ্টি বলিয়া প্রদর্শিত হয়। কিন্তু এই ভাবে দিব্য প্রকৃতির মুক্তিতে গড়িয়া উঠিতে হইলে, আমাদের বর্ত্তমান বদ্ধ প্রকৃতিতে প্রচ্ছন্নভাবে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, এই যোগাভ্যাস সম্ভব ও সহজ কেবল এই জন্যই হয় যে, আমরা স্বভাবতঃ যাহা, সে সমুদায়ের ক্রিয়াকে এই সাধনায় সেই অভ্যন্তরীণ দিব্যপুরুষের হস্তে আমরা সমর্পণ করিয়া দিই। ভগবানই আমাদের মধ্যে দিব্য জন্মের বিকাশ করিয়া দেন ক্রমবর্দ্ধনশীলভাবে, সহজভাবে, অবার্যভাবে। আমাদের সত্তাকে তাঁহারই সত্তার মধ্যে তুলিয়া লইয়া এবং ইহাকে তাঁহারই জ্ঞানে ও শক্তিতে পূর্ণ করিয়া দিয়া,—জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা,—তিনি তাঁহার কল্যাণ হাতের স্পর্শে আমাদের মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান প্রকৃতিকে তাঁহারই নিজের জ্যোতিঃ ও বিশালতায় রূপান্তরিত করিয়া দেন। আমরা পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত এবং অহংভাবশূন্য হইয়া যাহাতে বিশ্বাস করি এবং ভগবদ্‌প্রেরণায় যাহা হইতে চাই, অন্তরস্থিত ভগবান তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু এখন যে অহংভাবময় মন ও প্রাণ আমাদের প্রকৃত সত্তা বলিয়া অনুমিত হইতেছে, প্রথমেই প্রয়োজন যে সেইটি আমাদের অন্তরস্থিত গুহ্য ভগবানের হস্তে নিজেকে রূপান্তরের জন্য একান্তভাবে সমর্পণ করে। *

* ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩
গীতা, নবম অধ্যায়।

* শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে তাঁহারই অনুমত্যনুসারে অনুবাদিত। অনুবাদক—শ্রীঅনিলবরণ রায়।

প্রণবকুমার

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৭)

শিকদার বাগানের ছোট বাড়ীতে আসিয়া সরিৎ ও তাহার জননী বড়ই অসুবিধা ভোগ করিল। বাড়ীটি খোলার, ঘর মাত্র দুইটী। ঘরের কোলে স্বল্পপরিসর বারান্দা, তা'র সামনে একটু উঠান। উঠানের একপাশে কল চৌবাচ্চা ইত্যাদি। বাড়ীটি ছোট হইলেও আলো বাতাসের বড় বেশী অভাব নাই। তবে যাহারা পটলডাঙ্গার বড় বাড়ীতে বাস করিয়া আসিয়াছে, তাহারা এই ক্ষুদ্র কুটীরে থাকিতে কষ্ট অনুভব করিবে ইহা আর বিচিত্র কি?

দুইটি ঘরের একটিতে সরিৎ থাকে; সে আর হোষ্টেলে থাকে না। কলেজেও সকল দিন যায় না। কোন কোন দিন রাত্রিতেও বাড়ী আসে না। আবার হয়ত এক এক দিন অজয়কে লইয়া সন্ধ্যার সময়ই ঘরে বসিত এবং দ্বার বন্ধ করিয়া সুরাদেবীর সেবার্চ্চনা করিত। অজয় নিত্য যাতায়াত আরম্ভ করিল এবং ক্রমে সন্ধ্যাতারার সবিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিল। অজয়ের হৃদয়টা বড় মধুর, পরচিত্ত জয় করিবার শক্তি অসাধারণ। কিন্তু সে মদ্যপ, চরিত্রহীন, অমিতব্যয়ী।

নূতন বাড়ীতে আসিতে না আসিতে অর্থাভাব ঘটিল। মাসহারা যাহা পাওয়া গেল, তাহার ভূরিভাগ সরিৎ হস্তগত করিল। বাকি যাহা থাকিল, তাহাতে সংসার চলে না, কাজেই দোকানে দেনা করিতে হইল। দ্বিতীয় মাসে সংসার অচল হইল, দোকানীও ধার বন্ধ করিল। তখন একখানা হাল্কা গহনা বাঁধা দিতে হইল। দুই শত টাকার গহনা রাখি বাঁধা দিয়া আনিল পঞ্চাশ টাকা।

এদিকে সরিৎ দুই দফায় মাসহারা হইতে যাহা কাটিয়া লইল, তাহাতে তাহার খরচ কুলাইল না। উপযুক্ত পরিমাণে খরচ করিতে পারে না বলিয়া সে বন্ধু মহলে মুখ দেখাইতে পারে না। অনন্যোপায় হইয়া পটলডাঙ্গার বাড়ীতে গেল। সেখানে তেওয়ারি ঢুকিতে দিল না। তখন সরিৎ মাকে আসিয়া ধরিল; কহিল, "তোমার একখানা গয়না দেও।"

"আমার গয়না নিলে চলবে কেন? আমরা খাব কি?"

"তাহলে কালেজ ছেড়ে দিতে হয়।"

"কেন তুমি ত কালেজের খরচ বলে মাসে মাসে ষাট টাকা নিচ্ছ।"

"তা'তে কি কুলায়? তুমি যেমন বোকা! কত দিকে কত রকম খরচ—কাগজ-রে, কলম-রে, দোয়াত-রে, কালি-রে—এখন দেও।"

জননী কি করেন, একখানি ছোট গহনা বাহির করিয়া দিলেন। তাহা বেচিয়া সরিৎ কিছু টাকা পাইল। সে দিন সে কোন কুৎসিত স্থানে অজয়কে নিমন্ত্রণ করিল। দুই বন্ধুতে গলাটা ভিজাইয়া যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, তখন অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে সে কথাটা ভুলে গেছিস?"

"কোন্ কথাটা রে ?"

"সেই যে তুই বলেছিলি তোর বোন বিন্দুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিবি ?"

"বিন্দুর উপর আমার আর হাত নেই।"

"কেন, সে বোর্ডিং স্কুলে গেছে বলে ?"

"হ্যাঁ; সেখানে আমার প্রবেশাধিকার নেই।"

"খুব আছে—ভাইয়ের গতি সর্ব্বত্র অবারিত। তবে বেথুন কালেজ হ'লে স্বতন্ত্র কথা, তাদের নিয়ম বড় কঠিন।"

"আমাকে তুমি কি করতে বল ?"

"তুই বিন্দুকে দু'চার দিন দেখ্তে যাবি; কি দরকার আছে না আছে, কেমন লেখাপড়া করছে জিজ্ঞেসা করবি, বাপের কথা তুলে দাদার কথা তুলে এক আধ ফোঁটা চোখের জল ফেল্বি। মিস্ সেনকে বলবি তোর বাপ এখন বিদেশে, শীগ্‌গির ফেরবার সম্ভাবনা নেই; তাই তোকে পড়াশুনার ক্ষতি করেও বিন্দুকে দেখ্তে আসতে হচ্ছে। তা'রপর একদিন গিয়ে বলবি, তোর মার অসুখ করেছে, তিনি তাকে দেখ্তে চান্। নিয়ে এসে সেই দিনই রেখে আসবি। তা'রপরে যা' করতে হবে তা' আমি পরে ব'লে দেব। কেমন পারবি ?"

"খুব পারব।"

"দেখ্, আমার সঙ্গে যদি তা'র বিয়ে দিতে পারিস, তাহলে তোর আর টাকার অভাব রাখব না।"

"আলবৎ বিয়ে দেব, তুই নিশ্চিন্ত থাক্ অজি।"

বলিয়া সরিৎ গলাটা ভিজাইয়া লইল। অজয় তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক নিজের গলাটা একটু ভাল রকমই ভিজাইয়া লইয়া কহিল, "তুই আমার পরামর্শ মত যদি কাজ করিস তাহলে তোকে কোন কালে কষ্ট পেতে হবে না।"

"তোর পরামর্শ কবে না শুনি ?"

"তাহ'লে তোর ভাবনাও নেই—বিয়ের রাতে করকরে পাঁচ শ' টাকা তোর হাতে—"

"ভাই, তোর পায়ের ধূলো চাট্টি দে—আমি এই গেলাস ছুঁয়ে দিব্যি করছি, তুই যা' বলবি তাই করব।"

"আচ্ছা, আজ এখন ফূর্ত্তি করা যাক্।"

পরদিবস হইতে সরিৎকুমার বালিকা-বিদ্যালয়ে যাতায়াত আরম্ভ করিল এবং একদিন বিন্দুকে বাড়ীতে লইয়া আসিল। জননী কন্যাকে বহুদিন পরে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ অশ্রুবর্ষণ করিলেন এবং নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

বিন্দু মায়ের আলিঙ্গন-পাশে ক্ষণকাল আবদ্ধ থাকিয়া বাপ ও দাদাকে স্মরণ করিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিল। এবং জল-যোগান্তে বিদায় লইল। বিন্দুর আগমন নির্গমন অন্তরালে থাকিয়া অজয় দেখিল এবং পরে বন্ধুবরকে কহিল, "বিন্দু এখন বেশ বড়সড় হয়েছে, দেখতেও খুব সুন্দর হয়েছে। বিয়েটা এ মাসে যাতে হয়—"

"আমি ত ভাই যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।"

"যথাসাধ্যটাকে আর একটু উপরে উঠাতে হবে।"

"কি রকম ?"

"তোর বাপের একখানা চিঠি বিন্দুকে দেখাতে হবে।"

"বাবা ত কোন কালে আমাকে চিঠি লেখেন না।"

"তুই একটা গাধা। কথাটা বুঝলি নে ? একখানা জাল চিঠি দেখাতে হবে; তা'তে লেখা থাক্‌বে—'সরিৎ, একটী সুপাত্র দেখে অবিলম্বে বিন্দুর বিয়ে দেবে। আমার ফিরতে দেরী হবে। প্রণবকে না পেলে আমি ফিরব না। এদিকে বিন্দু বড় হ'য়ে পড়েছে, তাকে আর রাখা যায় না। তুমি ভাইয়ের কাজ কর'—ইত্যাদি! বুঝেছিস গাধা ? এই সৎপাত্র হচ্ছি আমি—শ্রীঅজয়কুমার—"

"তা' যেন হ'ল, কিন্তু চিঠি জাল করবে কে ?"

"সে ভাবনা তোর নেই; তুই তোর বাপের হাতের লেখা একটু দে।"

ইহার কয়েকদিন পরে বিন্দু তাহার মাকে দেখিতে আসিল—অবশ্য সরিৎ কালেজে গিয়া আবেদন নিবেদন করিয়া আনিল। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সন্ধ্যাতারা কন্যাকে কহিলেন, "তুই খুব বড় হ'য়ে উঠেছিস, তোর বিয়ে না দিলে নয়।"

কন্যা উত্তর করিল না। জননী পুনরায় কহিলেন, "আমি তোর বিয়ের উদ্যোগ করছি।"

বিন্দু মাথা তুলিল, কিন্তু উত্তর করিল না। জননী কহিলেন, "এই মাসেই যাতে তোর বিয়ে হয় সরি তা'র চেষ্টা করছে।"

বিন্দু দীপ্ত নয়নে জননীর পানে চাহিল; কহিল, "আমি এখন বিয়ে করব না।"

"কেন ?"

"আগে বাবা ঘরে আসুন।"

"তাঁর ফিরতে নাকি এখন অনেক দেরী।"

"কেমন করে তা' জানলে?"

"এই যে দেখ্না তিনি সরিকে চিঠি লিখেছেন।"

"কই দেখি?"

"সরি যে কোথা চিঠিখানা রাখ্লে—এই যে তাকের উপর আছে।"

চিঠি দিলেন, বিন্দু পড়িল। পাঠান্তে একটু চিন্তা করিল; পরে কহিল, "এ চিঠি বাবা লিখেছেন বলে আমার মনে হচ্ছে না।"

"কেন বল দেখি?"

"বাবা এখন আছেন হরিদ্বারে; এ চিঠি গয়া হ'তে লেখা হচ্ছে।"

"তুই কি তাঁর চিঠি পাস?"

"কখন সখন পাই। কিন্তু আমি বাবাকে চিঠি লিখ্তে পাই না।"

"কেন?"

"বাবা এক যায়গায় ত স্থির নেই; আজ এখানে, কাল সেখানে।"

"তিনি হয়ত গয়া হ'তে হরিদ্বার চলে গেছেন।"

দুই দিন পরে বিন্দু ডাকে পিতার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইল। পত্রখানি জাল। তাহাতে অন্যান্য কথার পর লেখা ছিল—"আমি বহুদিন আগে গয়া হ'তে সরিৎকে একখানা পত্র লিখেছিলাম। সেখানি সরিৎ পেয়েছে কি না জানি না এবং আমার উপদেশমত তোমার বিবাহ দিয়েছে কি না তা'ও জানি না। আমি বৃন্দাবন চলেছি; সময় পেলে তোমাদের ঠিকানা দিয়ে পত্র দেব।

পর দিবস অপরাহ্ণে সরিৎ বিদ্যালয়ে গিয়া বিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিল; কহিল, "আজ আমি দাদার চিঠি পেয়েছি, তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন।"

"দাদা চিঠি লিখেছেন? কই দেখি?"

"আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম—এই দেখ্না তাঁর চিঠি।"

"তিনি কোথা আছেন?"

"তা' জানি নে, ঠিকানা দেন নি। খামের উপর ডাকগাড়ীর ছাপ। পাছে আমরা তাঁর কোন সন্ধান পাই, তাই বোধ হয় ডাকঘরে চিঠি না ফেলে ডাক গাড়ীতে চিঠি দিয়েছেন।"

সরিৎ খাম-সমেৎ চিঠিখানা দিল। বিন্দু আগে চিঠিখানা পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল,—

"স্নেহের সরিৎ, তোমার বিজ্ঞাপন দেখেছি। কেন ভাই, এত কাতর হ'য়ে আমাকে ফিরতে অনুরোধ করেছ? আমি সে বাড়ীতে আর ফিরতে পারব না। কেন, তা' বিন্দু জানে।

"তোমার অপরাধ ভুলে গেছি, তোমার স্নেহটুকুই মনে আছে। বিন্দুর জন্যে সময় সময় আমার মন বড় চঞ্চল হয়। সে আমার বড় আদরের, তার কোন কষ্ট না হয় দেখো।

"জ্যেঠামশাইকে আমার প্রণাম দিয়া বলিও আমি যে ছেলেটির সহিত বিন্দুর বিবাহ-প্রস্তাব করেছিলাম, তা'র সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে হ'লে আমি বড় সুখী হ'ব। ছেলেটী বড় ভাল, আমার সহপাঠী—নাম অজয়কুমার—তুমিও তাকে জান। তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দাদা প্রণব।"

বিন্দু পত্রখানা পড়িয়া একটু কাঁদিল। কিন্তু এত গোপনে যে, সরিৎ তাহা বুঝিতে পারিল না। ক্ষণপরে বিন্দু মাথা তুলিয়া কহিল, "কাল্ বাবার একখানা চিঠি পেয়েছি।"

অতিশয় ব্যস্ততার সহিত সরিৎ কহিল, "বাবার চিঠি? কই দেখি?"

বিন্দু চিঠি দিল। চিঠি খুলিতে খুলিতে সরিৎ কহিল, "বাবা আমাকে আর চিঠি দেন না; সেই যে কবে গয়া হ'তে একখানা লিখেছিলেন।"

সরিতের চিঠি পড়া শেষ হইলে বিন্দু কহিল, "ছোটদা, আমার একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিতে পার?"

"কেন পারব না? লিখে দিস।"

"পরশু লিখে নিয়ে যাব, তুমি আমাকে নিতে এস।"

সরিৎ বিদায় হইল এবং বিদ্যালয় হইতে কিছু দূরে বন্ধুর সহিত মিলিত হইল। অজয় ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, কি হ'ল?"

"এবার একটুও সন্দেহ করে নি।"

"যে রকম চালাক মেয়ে—ভাবলাম এবারও বুঝি সব ফেঁসে যায়।"

"দাদার নামে সব ভুলে গেছে।"

(১৮)

বিন্ধ্যাচলের কূপোদক শীতল হইলেও বায়ু শীতল নয়। বৈশাখের দারুণ উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া হরিশঙ্কর বিন্ধ্যাচল ত্যাগ করিলেন এবং প্রয়াগে আসিয়া যমুনা কূলে আশ্রয় লইলেন। প্রয়াগের বায়ু বিশেষ অনুকূল না হইলেও বিজলীপাখা ও বরফ জল তাঁহার কষ্ট অনেকটা দূর করিল। তিনি প্রতিজ্ঞাদৃঢ় কণ্ঠে স্ত্রীকে কহিলেন, "ঠাণ্ডা না পড়্‌লে এ স্থান ছেড়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না।"

স্ত্রী হাত নাড়িয়া কহিলেন, "তোমার যেমন দেশ বেড়াবার ছিরি! লোকে তীর্থ করতে বেরোয় আশ্বিন মাসে, তুমি বেরুলে কি না ফাল্গুনের শেষে, গরম মাথায় করে—"

"তুমি বড় বাজে কথা বল মতি। তীর্থ করবার কি সময় অসময় আছে? ভক্তি যখন মনকে বিচলিত করবে—"

"দেখ ভণ্ডামি করো না, তুমি বেরিয়েছ দেশ দেখ্‌তে—"

"তুমি ত তীর্থ করতে বেরিয়েছ? তা' হ'লেই হ'ল। শাস্ত্রে বলে, অর্থাৎ যজ্ঞবল্কল বলে গেছেন, স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। একটু শাস্ত্রজ্ঞান না থাক্‌লে—"

"শাস্ত্রজ্ঞান তোমার ত বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ পর্য্যন্ত। যারা তোমার বিদ্যের পরিচয় না জানে তাদের কাছে এ সব আওড়াও গে—আমাকে জ্বালিও না।"

"তুমি বড় বাজে কথা বল।"

"তোমার কাজের কথা রেখে আমার একটা বাজে কথা শোন।"

"সে ত অহরহ শুনছি—বল।"

"মেয়েটার ভাব বুঝছ?"

"কার? দেবীর? খুব বুঝচি।"

"কি বুঝেচ বল দেখি?"

"যমুনায় রোজ স্নান করবার জন্যে—"

"তোমার ঘটে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে!"

"এত বড় কারবারটা তুমি খাড়া করেছ কি না?"

"শ্বশুর খাড়া করেছেন, তাই চলচে; তুমি আর করেছ কি?"

"তুমি বড় বাজে কথা বল; এখন আসল কথাটা কি তাই খুলে বল না কেন।"

"দেবী যে মঙ্গলকে ছেড়ে একদণ্ডও থাক্‌তে পারে না, তা' লক্ষ্য করেছ কি?"

"খুব করেছি।"

"ছাই করেছ।"

"এখন আমিও যে মঙ্গলকে ছেড়ে এক দণ্ড থাক্‌তে পারি না, তার কি? ছোঁড়াটা—"

"তুমি বড় বোকা।"

"তা' হ'তে পারি, কিন্তু তোমার চেয়ে নয়।"

"তুমি একদিন দেখ্‌বে মঙ্গলকে ছেড়ে আর কারুর সঙ্গে যদি দেবীর বিয়ে দেও, তাহলে মেয়েটা জলে ডুবে মরবে।"

"বাঁচা গেল—গঙ্গায় এখন ডুব জল নেই।"

"তোমার সঙ্গে যদি আমি আর কথা কই—"

"বড় রকমের দিব্যি করে ব'সো না, কারণ, এখুনি কথা কইবে।"

"আমার ব'য়ে গেছে।"

"দেখ, কথা কইলে কি না। আমি তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করেছি; স্বামীতে সচরাচর এতটা করে না। আমাকে স্বামী রূপে পেয়েও তুমি কৃতজ্ঞ নও।"

স্ত্রী হাসিয়া ফেলিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়—আকাশে নক্ষত্র উঠিয়াছে। ধীর সমীর যমুনার উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। যমুনা তটে বিখ্যাত দুর্গ। দুর্গ হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে এক দ্বিতল ভবনের বারান্দায় বসিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বাক্যালাপ হইতেছিল। কৃষ্ণমতি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তোমার উপর রাগ করে একটু যে গম্ভীর হয়ে থাকব, তা'রও উপায় নেই।"

"আমার শক্তি বুঝে দেখ; তবু তুমি বল কি না আমি একটা অপদার্থ—"

"মনে পড়ে তোমার সঙ্গে একবার সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম? তা'র কিছু আগে আমার ছোট বোন সদু মারা পড়েছিল। সার্কাসে একটা লোক সং সেজে যে কাণ্ডটা করলে, আমি শোকের সময়েও না হেসে থাক্‌তে পারি নি।"

"সে-ও যে একটা ক্ষমতা মতি! তোমার যে তা'ও নেই—তুমি আমাকে কখন হাসাও না, বরং সময় সময় কাঁদাও।"

"আমি ত আর তোমার মত সং নই।"

"এ খলু সংসারে সকলেই সং। এই বিশ্বমাঝে একমাত্র ভগবান্—"

"রক্ষে কর—তোমার মুখে ধর্ম্মকথা শুনতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই।"

"ভুলে যাচ্ছ আমি তোমার ধর্ম্মরক্ষক, একটু আগেই তার পরিচয় পেয়েছ।"

মতি হাসি চাপিয়া অতি গম্ভীর বদনে কহিলেন, "তুমি বড় বাজে কথা বল।"

হরি ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখপ্রতি বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "বটে! আমাকে এই কথা! আমি তোমার সব কথা বাজে করব।"

"আমি বাজে বক্‌লে তবে ত বাজে করবে। এখন আমার কথার উত্তর দেও।"

"প্রশ্ন হ'লে তবে ত উত্তর করব।"

"মেয়ের বিয়ে কোথা দেবে ঠিক করেছ?"

"কোথাও ঠিক করিনি।"

"সে দিন কোলকাতায় যে ছেলেকে দেখ্‌তে গিয়েছিলে?"

"তাকে আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি।"

"কেন? ছেলে কি কুচ্ছিৎ?"

"কুচ্ছিৎও বলতে পার, সুন্দরও বলতে পার।"

"সে কি রকম?"

"আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি নে—এই—"

"কি রকম চেহারাটা বল না।"

"বেশ গৌরবর্ণ, বড় বড় চোখ; জোড়া ভ্রূ—"

"তবে সুশ্রী বল।"

"একেবারেই নয়। তার মুখ দেখলেই মনে হয় ছেলেটা সয়তানের বাচ্ছা। আমি অলুক্ষণেই তা'কে দেখিচি। কালেজ হ'তে বেরিয়ে ট্রামে উঠ্‌ছিল; নাম ধাম জিজ্ঞেস করতে যে ভঙ্গীতে সে উত্তর দিলে, ইচ্ছে হ'ল তা'র গালে দুটো চড় কষিয়ে দি। তার সহপাঠীরা আমার দুর্দ্দশা দেখে হেসে উঠ্‌ল; একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেসা করলে, 'ওর সঙ্গে কি আপনি মেয়ে দেবার মতলব করেছেন? খুব ভাল পাত্র বার করেছেন। বাসর ঘরে দু' এক বোতল হুইস্কি রেখে দেবেন, আর গোটা দুই নাচওয়ালি।' আমি সেখানে আর দাঁড়ালেম না, ট্যাক্সিতে উঠে পড়্‌লাম।"

"তাদের বাড়ীতে গেলে না কেন?"

"আগে ত বাড়ীতেই গিছলাম। চাকর-বাকর ছাড়া বাড়ীতে পুরুষ মানুষ ছিল না। তা'রা বললে কালেজে গেছে; তাই সেখানে ছুটেছিলাম। তোমাদের ষ্টেশনে বসিয়ে রেখে গিয়েছি, বেশী দেরী ত করতে পারি না। রামঃ, ও ছেলের সঙ্গে আবার মেয়ের বিয়ে দেয়!"

"তা' হ'লে মেয়ের বিয়ে কোথা দেবে স্থির করলে?"

"আর যেখানে হয়, কিন্তু ও ছেলের সঙ্গে নয়।"

"মঙ্গলের সঙ্গে বিয়ে দিতে তোমার আপত্তি আছে?"

"আপত্তি! ও রকম ছেলে দুনিয়ায় আর একটা নেই। তবে কি জান—"

"কি বল?"

"ওর বংশ-পরিচয় জানি না; না জেনে শুনে—"

"আর বেশী কি জান্‌বে? আমাদের পাল্‌টি ঘর হলেই যথেষ্ট।"

"তা' বটে, কিন্তু—"

"তুমি 'কিন্তু'টাকে আর টেনে এনো না—আমি ও শব্দটাকে একেবারেই পছন্দ করি না।"

"তা'হ'লে আগে বলতে হয়, ভাষাকার সময়ে সাবধান হ'তে পারতেন।"

"ঠাট্টা রাখ; তা' হলে মঙ্গলের সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে স্থির?"

"স্থির একরকম; তবে—"

"আবার 'তবে'টাকে এনেছ?"

"'তবের' সম্বন্ধে তোমার মতামত এতাবৎ প্রকাশ না থাকায়—"

"এখন ত মতামত শুনলে, এইবার বল।"

"মঙ্গল যেটুকু আত্মপরিচয় দিয়েছে তা' যদি সত্য হয়, তাহলে মঙ্গলের হাতে মেয়ে দিতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

"তুমি স্থির জেনো মঙ্গল মিথ্যা বলে নি—মিথ্যে বল্‌তে সে জানে না—সোনার চাঁদ ছেলে—দেবীর যোগ্য বরই সে।"

দেবী, মা-বাপের কাছে আসিতেছিল; অন্তরাল হইতে কথা কয়টি শুনিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং আর অগ্রসর না হইয়া চুপি চুপি প্রস্থান করিল।

(১৯)

সন্ধ্যাতারার সুবুদ্ধি কোন কালে ছিল, এ কথা তিনি ছাড়া আর কেহ স্বীকার করেন না। কূটবুদ্ধি কিছু ছিল, কিন্তু তাহাও ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া তিনি বুদ্ধি বিবেচনা হারাইলেন। রাখি সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঘর ভাড়া লইয়া অন্যত্র দাসীপণা করিতেছে। সময় সময় আসিয়া তত্ত্বাদি লয় এবং গহনাদি বন্ধক দিবার প্রয়োজন হইলে ঘন ঘন যাতায়াত করে।

সন্ধ্যাতারা তাহার সাহায্য ও পরামর্শ আর পান না। এখন তাঁহার পরামর্শদাতা সরিৎ। সরিৎ যাহা বলে তিনি তাহা করেন, যাহা বোঝায় তিনি তাহা বোঝেন। না করিয়া, না বুঝিয়া তাঁহার উপায় নাই। সরিৎ ছাড়া তাঁহার সংসারে আর কেহ নাই, সে বেঁকিয়া দাঁড়াইলে তিনি অনন্যোপায়।

সরিৎ বুঝাইল অজয় সুপাত্র, তিনি তাহাই বুঝিলেন। দ্বিজনাথ ও প্রণবের লিখিত বলিয়া যে জাল চিঠি দুইখানি সন্ধ্যাকে সরিৎ দেখাইল, তিনি সে চিঠি দুইখানি প্রকৃত বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। সরিতের কথা তাঁহার নিকট বেদসত্য। সরিৎ বুঝাইল, অজয়ের অতুল ঐশ্বর্য্য, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র; সন্ধ্যা বুঝিলেন, এমন পাত্র হাতছাড়া করা উচিত নয়। কন্যাকেও তাহা বুঝাইলেন। প্রণবের পত্রমর্ম্ম স্মরণ করিয়া বিন্দু প্রতিবাদ করিল না, কিন্তু পিতার অনুপস্থিতে বিবাহ করিতে তাহার মন উঠিল না।

সংবাদপত্র মারফৎ বিন্দু তাহার দাদাকে একখানা পত্র লিখিল। সরিৎ তাহা ছাপাইল; কিন্তু এমন কাগজে ছাপাইল যে, সে কাগজ কলিকাতার বাহিরে যায় না। বিন্দু অত খবর রাখে না, সে বিজ্ঞাপন দেখিয়াই পরম তুষ্ট। কয়েকদিন বাদে যখন বিজ্ঞাপনের উত্তরে পত্র আসিল, তখন তাহার আনন্দের আর সীমা নাই। পত্র তাহার নামে পটলডাঙ্গার বাড়ীর ঠিকানায় আসিয়াছিল, সেখান হইতে ঘুরিয়া বিদ্যালয়ে আসিল। বিন্দু বহুবার পত্রখানা পড়িয়া সরিৎকে দেখাইবে বলিয়া রাখিয়া দিল।

এ দিকে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিস্ সেন, দ্বিজনাথের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। পত্রখানি অবশ্য জাল। পত্রে লেখা ছিল,—"তাঁহাকে কার্য্যব্যপদেশে বিদেশে থাকিতে হইয়াছে, এখনও কিছুকাল থাকিতে হইবে। কন্যা বিন্দুর বিবাহকাল উপস্থিত। সুপাত্র স্থির করিয়া পুত্র সরিৎকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আপনি বিন্দুকে অতঃপর মুক্তি দিবেন। তাহার স্বামী অজয়কুমার তাহাকে বিদ্যালয়ে রাখিতে ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারিবেন।"

বিন্দু মুক্তি পাইয়া ঘরে আসিল। তখন ঘোর বর্ষা। কয়েকদিনের মধ্যে পাকা দেখা, গাত্রহরিদ্রা প্রভৃতি শেষ হইল। এবং শ্রাবণের মাঝামাঝি বিনা আড়ম্বরে উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। নাপিত পুরোহিত ও কয়েকজন বরযাত্রী বিদায় হইলে বর বাসরঘরে গেল। কিন্তু তথায় 'কনে' ছাড়া বাসর জাগিতে আর কেহ ছিল না। বর নিরুপদ্রবে 'কনে'র সহিত আলাপাদি আরম্ভ করিল। সে মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া সরিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছিল। ঘন ঘন সাক্ষাতের ফলে অজয়ের পা টলিতে লাগিল, বাক্যেও জড়তা আসিল। বিস্ময়াভিহত বালিকাবধূ মনে মনে শতবার প্রশ্ন করিল, "এই কি আমার দাদার নির্ব্বাচিত সৎপাত্র?"

অজয় তাহার কার্য্য ও বাক্য দ্বারা শত রকমে বধূকে বুঝাইল, "আমি তোমার দাদার নির্ব্বাচিত পাত্র নই।" কলুষিত নিশ্বাস লইয়া বধূর নিকটে মুখ আনিয়া অজয় জড়িতকণ্ঠে কহিল, "তোমাকে পাবার জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করেছি, অনেক অর্থব্যয় করেছি বিন্দু, এখন তুমি আমার, আমার—জ্বলন্ত পাবকশিখারূপিণী সীতা এখন আমার—এস আমার হৃদয়বিহারিণী, বিদ্যুদ্দামবর্ষিণী, বহুদিনের বাঞ্ছিত কুন্দনন্দিনী, এস আমার কাছে এস, অধর সুধা দানে আমার দেহের এই নবিবন্দ (মৃতপ্রায়) দেহকে সঞ্জীবিত কর।"

নিকটে আসা দূরে থাক্, ভীতা বালিকা দূরে সরিয়া গেল। অজয় কহিল, "সরে যাওয়াটা তোমার খুব অন্যায় হয়েছে। তোমার ভেতর একটুও কাব্য নেই। তা' যদি থাক্‌ত তাহলে তুমি বলতে, 'দাসী পদতলে,' বলেই ছোরা বার করতে, আর কৎলু খাঁ—না, সে সিনটা এখানে খাটবে না। আচ্ছা এর পরে যা' হয় একটা ঠিক করা যাবে, এখন তুমি সরে এস।"

প্রাচীরগাত্রে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া বালিকা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। অজয় উঠিয়া গিয়া বরয়িত্রীর হাত ধরিল; এবং তাহাকে টানিয়া আনিয়া শয্যায় বসাইল। বালিকা মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু অজয় ছাড়িল না—তাহার

উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। বালিকার তখন ভয় গিয়াছে—সে তখন ক্রোধে ঘৃণায় ফুলিয়া উঠিয়াছে। অজয় কহিল, "অমন সুন্দর মুখখানাকে বিশ্রী করছ কেন? অসহ্য, অসহ্য। আমি ফোটাব ফুল, দোলাব দুল, ঘোটাব সিদ্ধি—খুড়ি; ঢালাব হুইস্কি, করিব নারী।"

বলিয়া বিন্দুকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। বিন্দু 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জননী সমস্ত দিন উপবাসের পর আহারাদি সমাপনান্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন, রাধি খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া গামছায় কিছু লুচি সন্দেশ বাঁধিতেছিল। সরিৎ উঠানের একপাশে মাদুর বিছাইয়া সুরা দেবীর সেবা করিতেছিল এবং বাসরের মর্য্যাদা রক্ষার্থে একটা টপ্পা ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। টপ্পা নির্ব্বাচন চলিতেছে এমন সময় বিন্দুর চীৎকার তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, সে কাচপাত্রাদি নিরাপদ স্থানে সরাইয়া রাখিয়া ত্রস্তপদে চলিয়া আসিল এবং বাসরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে বিন্দু?"

বিন্দু তখন ক্রুদ্ধা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিতেছিল। তাহার পিনদ্ধ বসনের একাংশ বরয়িতার হস্তমধ্যে নিবদ্ধ ছিল; অঙ্গাবরণ ছিন্নভিন্ন, মস্তক বসনশূন্য। বিন্দু বিদ্যুদ্দীপ্ত নয়নে সরিতের পানে চাহিয়া কহিল, "এই কি ভাইয়ের কাজ? কোন কালে তোমাকে বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তুমি যে এত নীচ হ'তে পারবে তা' কখন ভাবি নি—"

"ওকে ছেড়ে দে অজি।"

"বাঃ এত খরচের পর ছেড়ে দেব? তোর টাকাটা নিয়ে তুই বেরিয়ে যা।"

তখন রাধি আসিয়া পড়িল; পিছনে সন্ধ্যাতারাও দেখা দিলেন। জননীকে দেখিয়া বিন্দু কাঁদিয়া ফেলিল—রোষ গলিয়া চক্ষু বাহিয়া পড়িতে লাগিল—কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "মা হ'য়ে মেয়ের সর্ব্বনাশ করলে! সংসারটা ছারেখারে দিলে। বাবা দাদা মামা সকলকে তাড়ালে, শেষকালে আমার জন্যেও গলায় দড়ি জোগাড় করলে।"

"আমি তোর কি সর্ব্বনাশ করলুম বিনু? তুই আমাকে এমন করে বলছিস কেন?"

অজয় শাশুড়ীর পানে চাহিয়া কহিল, "বাসরঘরটা আপনার ঠিক উপযুক্ত নয় মা; আপনি শ্যালিকা জাতীয় হ'লে আপনাকে অভ্যর্থনা করে বসাতাম আর সুর ধরতাম, —এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বোস।"

বিন্দু এই অবসরে বস্ত্র ছিনাইয়া লইয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অজয় সরিৎকে কহিল, "তোর বোন ত চলে গেল সরি, তুই আয়, তোকে নিয়ে বাসর করি।"

"একটু অপেক্ষা কর্, কনসার্ট নিয়ে আসি।"

বলিয়া কাচপাত্রাদি আনিল।

(২০)

যমুনার কূলে বসিয়া বিরলে অপরাহ্নে দেবরাণী পার্শ্বে উপবিষ্ট মঙ্গলকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা যমুনার জল কাল কেন?"

"বড় কঠিন প্রশ্ন। বোধহয় নীলাকাশের প্রতিবিম্ব বুকে ধরে—"

"তা' যদি হয়, তা'হলে পাশে ত গঙ্গা রয়েছেন, তাঁর জল সাদা কেন?"

"আমার যুক্তিটা খাটল না স্বীকার করছি।"

"তবে বল কেন।"

"যমুনার তলে হয়ত অনেক নীল গাছ আছে।"

"তুমি বুঝি পুঁতে রেখে এসেছ?"

"হার স্বীকার করছি।"

"আমার ধারণা ছিল তুমি সব বোঝ।"

"কয়েকটা বিষয় আমি একেবারেই বুঝতে পারি না দেবি।"

"যথা—?"

"তোমার মন।"

"বুঝা বড় কঠিন বটে—অশব্দ, অস্পর্শ, অদৃশ্য—তা'কে বুঝা বড় কঠিন। তবু শুনি কোন্ খানটায় আট্‌কেছে, যদি আমি অভিধানের সাহায্য নিয়ে তোমাকে কোন রকমে বুঝিয়ে দিতে পারি কুমারবাবু।"

"তুমি আমাকে দাদা বলে ডাক না কেন?"

"সেটা আমার ইচ্ছা। দাদা বলাতে তোমারই বা এত জেদ কেন?"

"বিন্দুর জন্যে যখন আমার মন বড় চঞ্চল হয়, তখন আমার জেদ বাড়ে।"

"এখন কি বিন্দু দিদির জন্যে তোমার মনটা চঞ্চল য়েছে ?"

"আজ কয়েকদিন হতেই হয়েছে। চার পাঁচ মাস হ'ল াড়ী ছেড়ে এসেছি, কিন্তু তার জন্যে মন কখন এতটা চঞ্চল য় নি। আমার মনে হয় সে যেন আমাকে নিয়ত ডাকছে। কান বিপদে পড়ে থাকবে হয় ত।"

মঙ্গলের নয়ন সজল হইল, কণ্ঠ ভারি হইল, আর কিছু লিতে পারিল না। ক্ষণপরে দেবী কহিল, "তুমি 'তার' রে বিন্দুদিদির সংবাদ নেও না কেন ?"

"সে পথ যে নেই দেবি !"

"কেন ?"

"আমার ঠিকানা সেখানে কাউকে দিতে পারব না।"

"ঠিকানা দিতে দোষ কি ?"

"সে লজ্জার কথা আমি কাউকে বলি নি, বল্‌তেও ারব না।"

"কাউকে না বলতে পার, আমাকে বলতে হবে।"

মঙ্গল সহাস্যে,—"তোমার এত দাবী কিসের ?"

"আমি যে তোমার দেবী।"

"দেবীর আদেশে বলতে হবে ?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা ত দাবী নয়।"

"দাবীও আছে।"

"কি ?"

"তুমি যে আমাকে ভালবাস—"

"তোমার বাপ্‌-মাকেও ত ভালবাসি ; কই, তাঁদের ত লিনি।"

"তুমি যে তাঁদের চেয়েও আমাকে বেশী ভালবাস।"

"কে তোমাকে সে কথা বললে দেবি ?"

"আমার মন।"

"শুদ্ধ নির্ম্মল মন বড় একটা ভুল করে না। সত্যই তামাকে ভালবাসি দেবি !"

"তা' বলে তোমাকে আর কষ্ট পেতে হবে না ; তুমি য নিজের জীবনের চেয়েও আমাকে বেশী ভালবাস, তার রিচয় আমি পেয়েছি।"

"নিজের চেয়ে পরকে কেউ ভালবাসে না।"

"তুমি বাস। সে দিন আমি তা'র পরিচয় পেয়েছি।"

"কবে পেলে ?"

"যে দিন বর্ষাস্ফীত যমুনার গভীর জল হ'তে আমাকে টেনে তুললে।"

"সকলেই ত তা করে। একটা মানুষ ডুবে মরছে দেখে কেউ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে না।"

"তাই বলে কেউ নিজের জীবন বিপন্ন করে যমুনার খর স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে না।"

"পড়ে—"

"কই বাবা ত আমাকে রক্ষে করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন না ! তিনি ত দাঁড়িয়ে শুধু চেঁচামেচি করছিলেন আর দশ বিশ হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা করছিলেন।"

"তুমি বড় বাজে কথা বল।"

"এই ধরেছ ? আমি বাবাকে বলে দিচ্ছি—"

"দিও, আমি চলে গেলে পর।"

দেবী চমকিয়া উঠিল। কহিল, "সে কি ! তুমি যাবে কোথা ?"

"একবার বিন্দুকে দেখ্‌তে যাব, তা'র জন্যে মন বড় অস্থির হয়েছে। জ্যেঠামশাইকেও একবার দূর হ'তে দেখে আসব।"

"বাড়ী যাবে না ?"

'আমার ত বাড়ী নেই।"

"জ্যেঠার বাড়ী ?"

"সে বাড়ীতে আর যাব না।"

"কেন ?"

"আবার সেই কথা ?"

"তোমাকে বলতেই হবে।"

"নিতান্তই শুনবে ? শুনে কিন্তু সুখ পাবে না। আমার বাপ মা ভাই নেই, তা' ত তুমি জান। থাক্‌বার মধ্যে আছেন শুধু জ্যেঠামশাই। তিনি আমাকে প্রাণতুল্য ভালবাসেন ; নিজের ছেলের দিকে তাকান না, আমাকে নিয়েই থাকেন।"

"জগতে মাত্র একজনের স্নেহ ভালবাসা পেলেই ত জীবন সার্থক হ'ল।"

"সার্থক হয় নি তা' ত বলছি না। একজনের কেন, দু'জনের স্নেহপ্রেম পেয়েছি। আমার মত ভাগ্যবান্ কে ?"

রাণীর মুখখানি লাল হইল। অন্য দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর ?"

"কিন্তু জ্যেঠাই মা—"

"তাঁর ক'টি ছেলে ?"

"ছেলে একটি, আমার চেয়ে কিছু ছোট। মেয়েও একটী, সেই আমার বড় আদরের বিন্দু—তোমার চেয়ে কিছু বড়; কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

"কিন্তু সে তোমার মত সুন্দর নয়। তুমি গোলাপ, সে মল্লিকা।"

"ও-সব কথা ত তোমাকে আমি জিজ্ঞেসা করি নি।"

"বলছি, সব বলছি দেবি, তোমার নিকট কিছু লুকাব না। কি বলছিলাম ? বিন্দুর কথা উঠ্‌লে আমি সব ভুলে যাই।"

"জ্যেঠাইমার কথা বলছিলে—"

"হ্যাঁ—জ্যেঠাই মা কিন্তু আমাকে একটুও স্নেহ করেন না, জ্যেঠামশায়ের অসাক্ষাতে আমাকে পীড়ন করতেন। যে দিন আমি গৃহত্যাগ করি, সে দিন সকালে কালেজ যাব বলে ভাত খেতে যাই; পথমুখে দাঁড়িয়ে আমাকে অযথা গালি দিলেন। বিন্দুর আহ্বানে তাঁকে পাশ কাটিয়ে যেতে যাচ্ছিলাম। জ্যেঠাইমা বাধা দিয়ে বললেন—"

"কি বললেন ?"

"আমি যে সে কথা বলতে পারছি না দেবি।"

"বল্‌তে কষ্ট হয় যদি বলো না।"

"না বল্‌ব—তোমাকে সব বলব। বিন্দু শুনেছে, তুমিও শুনবে—জগতে আর কেউ শুনবে না।"

মঙ্গল সে দিনের ঘটনা বলিল। কিন্তু দিবাটা বলিতে পারিল না—তাহার কণ্ঠ কে চাপিয়া ধরিল। যাহা বলিয়াছিল তাহাই যথেষ্ট। শুনিতে শুনিতে দেবী আত্মহারা হইল—সহানুভূতিতে তাহার প্রাণ গলিয়া গেল—চক্ষুপল্লব ঠেলিয়া জল গড়াইল। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরবে পাশাপাশি বসিয়া রহিল। অতঃপর দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "সে সময় জ্যেঠামশাই বাড়ী ছিলেন না বুঝি ?"

"না, আরাঙ্গাবাদে গিয়েছিলেন।"

"আরাঙ্গাবাদে ? সেখানে কেন ?"

"তাঁর জমিদারী সেখানে আছে; গোলমাল কি হয়েছিল, তাই মেটাতে গিয়েছিলেন।"

"তাঁর নাম কি ?"

"তুমি তাঁকে চিনতে পারবে না। তিনি কোন কালে কোলকাতা ছেড়ে বিদেশে গেছেন বলে শুনি নি।"

"আরাঙ্গাবাদে বাবারও কিছু জমিদারী আছে, তাই জিজ্ঞেসা করছিলাম। আচ্ছা, তোমার নিজের বাড়ী কি কোথাও নেই ?"

"আছে কি না তা' ত জানি না।"

"বাবা কোথা থাকৃতেন ?"

"আমার বাবা ? তিনি থাকৃতেন পাটনায়।"

"পাটনায় ? আমাদের বাড়ীও যে সেখানে।"

"তা', আমি সম্প্রতি মায়ের মুখে শুনেছি।"

"তুমি যদি পরিচয় দেও, তাহলে বাবা তোমাকে নিশ্চয় চিন্‌তে পারবেন।"

"কি পরিচয় দেব রাণী ? যার চাল চুলো নেই, কাণা-কড়িও সম্বল নেই, বাপ-মা ভাই-বোন কেউ কোথাও নেই, তার আবার পরিচয় কি রাণি ?"

সন্ধ্যার ঘনছায়া যমুনার কাল জলের উপর পড়িয়া যমুনাকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিল। অদূরে হরিশঙ্কর সস্ত্রীক উপবিষ্ট ছিলেন; কৃষ্ণমতি ডাকলেন, "অন্ধকার হয়ে এল, তোরা উঠ্‌বি নি ?"

দেবী উত্তর করিল না, নড়িলও না। যমুনার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাটনায় তোমার বাড়ী আছে কি না সন্ধান নিয়েছ ?"

"লই নি, এবার নেব।"

"সে সন্ধান বাবার কাছ হ'তে নিতে পার।"

"আমি নিজেই একবার পাটনায় যাব।"

উভয়ে আবার নীরব। মঙ্গলের জুতায় কাদা লাগিয়াছিল, দেবী অঞ্চলের দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিতে লাগিল, মঙ্গল কহিল "দামী কাপড়টা কেন নষ্ট করছ ?"

সে কথার কোন উত্তর না করিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কবে কোলকাতায় যাবে ?"

"ভাদ্রমাসে মা যেতে দেবেন না, আশ্বিনের প্রথমেই যাব।"

"কবে আবার ফিরবে ?"

"ফিরব ? ফিরব আবার কোথা ?"

"কেন এখানে। প্রয়াগ বাবার খুব ভাল লেগেছে, তিনি এখন এখানে কিছুদিন থাকৃবেন।"

"তিনি এখানে থাক্‌তে পারেন, কিন্তু আমি ত আর ফিরে আসব না রাণী।"

"তুমি ও কি বলছ ?"

"আমি ত পথের পাখী রাণী ; পথে তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, আবার পথের মাঝে তোমাদের ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাব—আর ত সাক্ষাৎ হ'বার সম্ভাবনা নেই।"

রাণী নির্ব্বাক নিস্পন্দ। যমুনা পানে একবার চাহিয়া দেখিল, যমুনার জল দেখা গেল না ; আকাশ পানে চাহিল, সেখানে নিবিড় মেঘ ; আশে-পাশে চাহিল, সব অস্পষ্ট। কোথাও একটু আলো নাই—শুধু একটা বিরাট, অচ্ছিদ্র, সীমাহীন অন্ধকার। মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার প্রাণে কি বড় ব্যথা লাগ্‌ল রাণি ?"

"ব্যথা ? না—"

"তবে অমন করে রইলে কেন ?"

রাণী সে কথার উত্তর করিল না। সে বলিতে পারিত, এ ব্যথা নয়, এ বাজ। মঙ্গল কহিল, "কি করব রাণী, আমাকে যেতেই হবে। আমি কতদিন আর অলসভাবে ব'সে তোমার পিতার অন্নধ্বংস করব ? তুমি বুঝে দেখ, সেটা কি ভাল দেখায় ?"

"আমি ত তোমাকে যেতে বারণ করছি না।"

নিকটেই কৃষ্ণমতির কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি বলিলেন, "উঠে আয় দেবী, বৃষ্টি আসছে। মঙ্গল ওকে নিয়ে এস।"

মঙ্গল, দেবীকে গাড়ীতে তুলিল।

(২১)

হরকালী বাবু প্রয়াগ হইয়া লক্ষ্ণৌয়ে আসিলেন। কয়েক দিন ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু প্রণবের কোন সন্ধান পাইলেন না। সহরের ভিতরে বাহিরে, নদী-তীরে, উদ্যানে সকল স্থানে তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয়কে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার দর্শন পাইলেন না। অবশেষে তিনি নিরাশ হইয়া লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিলেন। কোথায় যাইবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ষ্টেশনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহার পাশে বেঞ্চে বসিল। বাবুর বয়স বেশী নয়, সঙ্গে আহার্য্যের চেঙ্গারি ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য-সম্ভার নাই। হরকালী তাহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না। সে তখন কয়েকবার কণ্ঠের শব্দ করিল ; কোন ফল হইল না, হরকালী তাহার পানে ফিরিয়াও দেখিলেন না। অবশেষে লোকটা অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই কোথা যাবেন ?"

"য়্যাঁ—কোথা যাব ? কোথা যে যাব এখনও তা' ঠিক করতে পারি নি।"

"তবে ষ্টেশনে এলেন কেন ?"

"এ স্থান ত্যাগ করে যেতে হবে বলে ষ্টেশনে এসেছি।"

"তাহলে আপনি সমস্ত রাত বসে চিন্তা করুন—"

"সমস্ত রাত ব'সে চিন্তা করলেও যে আমি ঠিক করতে পারব না।"

"তাহলে এক কাজ করুন, আমার সঙ্গে চলুন।"

"আপনি কোথা যাচ্ছেন ?"

"কানপুরে। সেখানে আমার বাড়ী আছে, কারবারও আছে।"

"তাই চলুন।"

"আপনি গান-টান করেন কি ?"

"আজ্ঞে না।"

"আঃ বাঁচা গেল। এখানে এক বন্ধুর বাড়ীতে এসে-ছিলাম, একটা দোকান খুলব মতলব ছিল। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই দেখি বন্ধুর বাড়ীতে বড় বড় ওস্তাদ এসে বসল। কি ভীষণ চীৎকার! কত রকম মুখভঙ্গী! আমি সহ্য করতে না পেরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। সেখানেও ঘরে ঘরে চীৎকার। তাই আজ সন্ধ্যে হ'বার আগেই বন্ধুর নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে এসেছি। বাপ্‌রে! এসব জায়গায় দোকান করে!"

রাত্রি ৯৷৷০ বাজিল। উভয়ে মধ্যশ্রেণীর টিকিট কিনিয়া কানপুর-গামী গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীখানি বড়, বগি গাড়ী বলে। গাড়ী ছাড়িতে অনেক বিলম্ব থাকায় উভয়ে আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। কামরায় যাত্রী বেশী ছিলেন না ; যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের একজনও বাঙ্গালী নয়। উভয়ে শয্যা বিছাইয়া দুইখানি পাশাপাশি বেঞ্চে শয়ন করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে আরও কয়েকজন যাত্রী উঠিল। তাহাদের মধ্যে দুইজন মেবারবাসিনী ছিলেন। তাঁহারা বোধ হয় ঝাঁসি যাইতেছিলেন। হরকালী তাঁহার ট্রাঙ্কটা বাঙ্কের উপর হইতে নামাইয়া বেঞ্চের নীচে রাখিলেন।

বাঙ্গালী সহযাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নামিয়ে রাখচেন কেন ?"

"ঘুমিয়ে পড়লে যদি কেউ নিয়ে যায়।"

"ঘুম কি আর হবে ? এখনি ত পৌঁছে যাবে; ভাল আপনার নাম কি মশাই ?"

"হরকালী রায়—ব্রাহ্মণ। আপনার নাম ?"

"সারদা চক্রবর্ত্তী। ভালই হ'ল—ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ।"

গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল, গাড়ী নড়িয়া উঠিল, তখন দুইজন লোক ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। ঘণ্টাখানেক পরে একটা ছোট ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ থামিল। প্ল্যাটফর্ম্মে দুইটী আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল; তাহারা স্পষ্টই বলিতেছিল, ষ্টেশনের কর্ত্তা তেল সঞ্চয় করিতেছেন, আমরা কি করিব ? ট্রেণ যে থামিল, তাহা অনেকেই বুঝিলেন না। যাত্রীদের কেহ তন্দ্রাচ্ছন্ন, কেহবা নিদ্রাভিভূত। মেবারবাসিনীদ্বয় নাসিকাগর্জ্জনে জানাইতেছিলেন, তাঁহারা নিদ্রাদেবীর রাজ্যে গমন করত সপত্নীর সহিত কলহ বাধাইয়াছেন। এমন সময় সহসা মানব কণ্ঠোত্থিত আর্ত্তনাদ উঠিল। যাঁহারা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন, তাঁহারা চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। অনুমানে বুঝিলেন, ট্রেণ চলিতেছে না। হরকালী উঠিয়া গবাক্ষপথে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। দেখিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহাদের কামরার নীচে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর শুইয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, ট্রেণখানি সম্পূর্ণরূপে থামিবার পূর্ব্বে লোকটা নামিতে গিয়াছিল, তাহার ফলে পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ নামিয়া আহত ব্যক্তির শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ বা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া শুশ্রূষা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং কেহ বা এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া গিয়া কে কোথায় প্রাণ হারাইয়াছিল তাহার বিবরণ শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এরই মধ্যে গাড়ীর ভিতর এক গোল উঠিল।

কামরার ভিতর যে কয়জন পুরুষ যাত্রী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই যে আহত ব্যক্তির পরিচর্য্যায় বা পরিচর্য্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নয়; কয়েক ব্যক্তি এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে মনোনিবেশ না করিয়া সহযাত্রীদিগের দ্রব্য সম্ভার সরাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ষ্টেশনের বিপরীত দিকে নিবিড় অন্ধকার; তথায় দস্যুদের কয়েকজন সহকর্ম্মী কুলির বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কামরার ভিতরের ভদ্রবেশী দস্যুরা এত লঘুহস্তে ও তৎপরতার সহিত দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতেছিল যে, মালিকরা হস্তান্তর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিলেন।

শাস্ত্রে এক নীতিবাক্য আছে,—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এ নীতিবাক্যটি অমূল্য বলিয়া স্বীকার করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে সকলে তাহার অনুসরণ করেন না। অনেক পরীক্ষার পর এই মহাবাক্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জগতে নিয়ত ইহার পরীক্ষা চলিতেছে, তথাপি মানুষ সাবধান হয় না। দস্যুরা কয়েকটি দ্রব্য সরাইয়া প্রস্থান করিলে তাহাদের আশু কোন বিপদ্ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তাহারা নীতিবাক্য বিস্মৃত হইয়া নিদ্রিতা মেবারবাসিনীর মোটা মোটা স্বর্ণালঙ্কার হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া মহিলার কণ্ঠ হইতে স্বর্ণহার ক্ষিপ্রহস্তে কাটিয়া লইল। সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া স্বর্ণবলয়ে লোভ করিল। তাহা কাটিতেছে এমন সময় মহিলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সম্ভবত তিনি আঘাত পাইয়া থাকিবেন। তস্করকে সন্নিকটে অস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া তাঁহার বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। তিনি চীৎকার করিয়া স্বামীকে ডাকিলেন। স্বামিজী তখন আহত ব্যক্তি সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ দান করিতেছিলেন। তিনি আহূত হইয়া গাড়ীর ভিতর মাথাটি যখন আনিলেন, তখন তস্কর গাড়ীর দ্বার খুলিয়া অন্ধকার মধ্যে লম্ফত্যাগে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু এক ব্যক্তি তাহার বস্ত্র ধরিয়া ফেলিল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। যে সকল যাত্রী আহত ব্যক্তির সেবায় ব্যাপৃত ছিল, তাহারা কোন রকমে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। আহত ব্যক্তি তখন উঠিয়া পড়িল এবং অন্ধকারের দিকে আত্মগোপন আশায় ছুটিল।

এ দিকে তস্কর সহজে ধরা দিল না, কিছু লড়াই করিল। যাত্রীদের কেহ কেহ রক্তাক্তও হইলেন, কিন্তু তস্কর অবশেষে পরাভূত হইল। একব্যক্তি শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইল। ষ্টেশন ছাড়িয়া গাড়ী বেশী দূর আসে নাই। গার্ড সাহেব আসিলেন, গাড়ী ফিরিয়া ষ্টেশনে আসিল; দস্যুর হস্তদ্বয় বস্ত্রদ্বারা বাঁধা হইল এবং তাহার সহকর্ম্মীদের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

হরকালী এদিকে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন, এই দস্যু তাঁহারই সঙ্গী সারদা চক্রবর্ত্তী। যাহার সঙ্গে একত্র বসিয়া ক্ষণপূর্ব্বে তিনি আহার করিয়াছেন এবং যাহার গৃহে আতিথ্য লইবার জন্যে কানপুর অভিমুখে ছুটিয়াছেন, তাহার কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া হরকালী হতবুদ্ধি হইলেন। তখনও তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার ক্ষুদ্র ট্রাঙ্কটি বন্ধুবর ইতঃপূর্ব্বে সরাইয়া ফেলিয়াছেন। যখন অন্যান্য যাত্রীরা দেখিল, তাহাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত হইয়াছে, তখন হরকালীও দেখিলেন বন্ধুবর তাঁহার কত বড় উপকার করিয়াছেন।

যখন যাত্রীরা নিজেদের ক্ষতির পরিমাণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল, তখন দস্যু সুযোগ বুঝিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল। দ্বার পূর্ব্ব হইতে খোলা ছিল, কেহ তাহা বন্ধ করিবার অবসর পায় নাই। এই মুক্ত দ্বারের নিকটেই লড়াই চলিতেছিল এবং বন্দীও এইখানে দাঁড়াইয়াছিল। লাফাইয়া পড়িয়া দস্যু মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। অন্ধকার-মধ্যে তাহার অনুসরণ করা দুরূহ ব্যাপার মনে করিয়া যাত্রীরা গাড়ী হইতে কেহ নামিলেন না—গবাক্ষ সন্নিকটে দাঁড়াইয়া চক্ষু দ্বারা যতটা অন্বেষণ করিতে পারা যায়, ততটা করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। গার্ড সাহেব তাঁহার হাতের আলোটা ঘুরাইয়া একবার এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিলেন, তার পর দস্যুর উদ্দেশে কিঞ্চিৎ গালিবর্ষণ করিয়াই নিরস্ত হইলেন।

যাত্রীরা কিন্তু হরকালীকে ছাড়িল না, তাহাদের সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল তাঁহার উপর। পুলিস তদন্ত কালে কেহ কেহ সাক্ষ্য দিলেন যে, দস্যুর সহিত হরকালী পানভোজন করিয়াছেন, বন্ধুর ন্যায় তাহার সহিত আলাপাদি করিয়াছেন। হরকালীর ট্রাঙ্ক যে অপহৃত হইয়াছে সে কথা কেহ বিশ্বাস করিল না; বরং সাক্ষীরা বলিল, তিনিও দস্যুর ন্যায় রিক্তহস্তে ভ্রমণ করিতেছিলেন। লক্ষ্ণৌ সহরে তাঁহার পরিচিত কোন ব্যক্তি আছেন বলিয়া হরকালী প্রমাণ করিতে পারিলেন না এবং উক্ত সহরে কেন যে তিনি আসিয়াছিলেন তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণও নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। কানপুরেও যে তিনি কেন যাইতেছিলেন তাহার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতেও অসমর্থ হইলেন। কাজেই পুলিস তাঁহাকে দস্যু বলিয়া স্থির করিল। হরকালীর হাতে হাতকড়া পরাইয়া দারোগা সাহেব সগর্ব্বে কহিলেন, তাঁহার এলাকামধ্যে আজও কোন ব্যক্তি চুরি করিয়া পলাইতে সমর্থ হয় নাই।

অন্যান্য দস্যুর সন্ধান চলিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। হরকালীকেই দারোগা চালান দিলেন। সময়ে মকর্দ্দমা হাকিমের কাছে উঠিল। পুলিস বড় একটা প্রমাণের অভাব অনুভব করে না, এই জন্যেই লাটবেলাটের মুখে তাহাদের এত সুখ্যাতি। হরকালীর বিরুদ্ধে বিপুল প্রমাণ-ভার আনিয়া পুলিস খাড়া করিল। তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ডাকাতির মতলবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন পুলিস তাহা প্রমাণ করিল। পুলিস আরও কত কি প্রমাণ করিয়া দেখাইল, আসামী জন্মাবধি ভারত-বর্ষময় ডাকাতি করিয়া বেড়াইতেছে এবং তাহার অধীনে বহু দস্যু নিরীহ প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ তাবৎ কোন দেশের পুলিস তাহাকে ধরিতে সমর্থ হয় নাই। সুবিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিসের কৃতিত্বের সুখ্যাতি করিয়া আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ করিলেন।

(২২)

বিবাহের পর বিন্দু শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দেখিল, তাহার জন্যে তথায় কুসুমশয্যা আস্তৃত নাই। মস্ত বাড়ী, কিন্তু মানুষ নাই। শ্বশুর শাশুড়ী ননদ আত্মীয়স্বজন কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছেন কয়েকজন দূরসম্পর্কীয়া অনাথা বিধবা, আর সাত আট জন দাসদাসী। ছিল আগে অনেক মানুষ, ছিল আগে অনেক ধন। যম লইয়াছে মানুষ, প্রবৃত্তি লইয়াছে ধন।

অজয় চাহিয়াছিল বিন্দুর দেহ, তাহা সে পাইল। হৃদয় নামে একটা জিনিষ আছে তাহার খোঁজ সে রাখে নাই; সুতরাং তাহা পাইবার জন্য সে ব্যস্ত ছিল না। বিন্দুর দৈহিক রূপযৌবন পাইয়াই তাহার হৃদয়ের ভিতর যে বাসনানল জ্বলিয়াছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইল। আকাঙ্ক্ষা মিটিলেই একটা ক্লান্তি আসে, তখন মন আবার ছুটিয়া যায় নূতনত্বের সন্ধানে। অজয় বিবাহের পর কয়েকদিন গৃহে ছিল, তার পর আবার সরিৎ প্রভৃতি বন্ধুর সহিত কুৎসিত স্থানে রাত্রি যাপন করিতে আরম্ভ করিল।

অর্থ নিঃশেষ হইয়াছে ; বহুকালের কারবার উঠিয়া গিয়াছে ; কয়েকখানা বাড়ী ভাড়া খাটিতেছিল, তাহা দেনার দায়ে বিক্রীত হইয়াছে ; বাস্তবাটী বাঁধা পড়িয়াছে ; পিতৃ-পরিত্যক্ত হীরা সোনা রূপজীবী এবং কুসীদজীবীর গৃহে গিয়াছে, তথাপি অজয়ের চৈতন্যোদয় হয় নাই। পাদো-জীবীরা একে একে সরিয়া পড়িয়াছে, ভৃত্যেরা বেতন না পাইয়া কেহ কেহ পলায়ন করিয়াছে, পাওনাদারেরা নিয়ত অপমান করিতেছে, তথাপি অজয় একবার ফিরিয়া দেখিতেছে না। প্রবৃত্তি তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। ভরসা এখন একখানি মণিহারী দোকান; তাহারই আয়ে কোন রকমে সংসার চলিতেছে।

সরিৎকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার অজয় দিতে পারিল না ; তবে কিছু দিল, একেবারে বঞ্চিত করিল না। সরিৎ বাকি টাকার জন্যে মাঝে মাঝে তাগাদা দিত। এক দিন অজয় বলিয়াছিল, "সে টাকা তোর বোনকে দিয়েছি—যা।" নির্লজ্জ সরিৎ এ কথার পরও যখন টাকা চাহিয়াছিল, তখন অজয় বলিয়াছিল, "টাকা চাইতে তোর লজ্জা করে না ? বোনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আমার মত লক্ষ্মী-ছাড়ার হাতে তা'কে তুলে দিয়েছিস, আবার টাকা! গলায় দড়ি দিয়ে মরগে যা।" এর পরে সরিৎ আর টাকা চায় নাই, তবে যাতায়াত বন্ধ করে নাই।

বিন্দু কিন্তু কিছু চায় নাই, কিছু বলেও নাই। বিবাহের পর দুই সপ্তাহ কাটিতে না কাটিতে অজয়, বিন্দুর নিকট একখানি গহনা চাহিল। বিন্দু বাক্সের চাবি ফেলিয়া দিয়া অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিতে বসিল। অজয় সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করিল। দ্বিতীয় দিন এ সঙ্কোচ রহিল না—বাক্স হইতে একখানি গহনা লইল। দুই দিন পরে আবার একখানি লইল। বিন্দু গহনার পানে বা স্বামীর পানে চাহিয়াও দেখিল না। অজয় গহনা লইয়া চোরের ন্যায় পলায়ন করিল।

কিন্তু চোরের ভাব বেশী দিন রহিল না—সত্বরই দস্যুর ভাব আসিল। একদা গভীর রাত্রিতে অজয় টলিতে টলিতে আসিয়া নিদ্রিতা স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তাহার অঙ্গ হইতে বলয় খুলিয়া লইতে উদ্যত হইল। বিন্দু জাগিয়া উঠিল ; স্বামীকে পার্শ্বে দেখিবামাত্র সে চকিতার ন্যায় লম্ফত্যাগে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অজয় জড়িত কণ্ঠে কহিল, "রাগ করলে বিন্দু ? তুমি ঘুমুচ্ছিলে, তাই না জাগিয়ে—"

"আমি একটুও রাগ করি নি, তুমি সব গয়না নিয়ে যেতে পার।"

বলিয়া বিন্দু হার চুড়ি খুলিতে লাগিল। অজয় কহিল, "এ তোমার রাগের কথা বিন্দু।"

"রাগ হয় যখন তুমি চুপি চুপি এসে আমার—আমার শয্যা স্পর্শ কর।"

বিন্দু বোধ হয় দেহ বলিতে যাইতেছিল, তাহা না বলিয়া শয্যা বলিল। অজয় কহিল, "তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল বটে তোমার ঘরে নেশা করে আমি ঢুকব না ; কিন্তু কি করব বল—বিনি বললে এখুনি তার একজোড়া বালা চাই, নইলে আমাকে অপমান করবে। নীচে চেয়ে দেখ না—গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনি আমাকে গয়না নিয়ে যেতে হবে।"

"সমস্ত গয়নাই নিয়ে যাও—গয়নায় আমার আর প্রয়োজন নেই।"

"না, না, রেখে দেও—ও গুলো আর নেবো না। আর দেখ, আমি পারি ত আজ সকাল-সকাল চলে আসব।"

"এখানে কোন দরকার আছে কি ?"

"দরকার ? দরকার কি ?"

"তবে ?"

"এই—এই তোমাকে দেখতে আজ আমার কেমন ভাল লাগচে।"

"যাও,—গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।"

"হ্যাঁ, ভাল কথা—কথাটা ভুলেই গিছলাম—"

"কি বল ?"

"এই—এই বিনি তোমাকে একবার দেখতে চায়।"

"গয়না পেয়েছ—যাও।"

"তোমাকে সেখানে যেতে বলছি না, যদি বল, তাকে এখানে নিয়ে আসি।"

"আমার অনুমতি নেবার কোন প্রয়োজন আছে কি ?"

"আছে বই কি বিন্দু ; তোমার অনুমতি না নিয়ে তা'কে কি আমি আনতে পারি ?"

"তা'হলে এনো না।"

"সে খুব ভাল মেয়ে—খাসা বাহারে চুল—দেখলেই

তাকে তোমার ভালবাসতে ইচ্ছে হবে। এমন সুন্দর নাচে—”

“আমার যা’ বলবার তা’ তোমাকে বলেছি—এখন যাও।”

অজয় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নেশাটা বোধ হয় একটু কমিয়া আসিয়াছিল, অপেক্ষাকৃত স্থিরকণ্ঠে কহিল, “দেখ বিন্দু, তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী অর্থাৎ প্রভু—তোমার দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা—আমি ইচ্ছা করলে নিজের বাড়ীতে সব করতে পারি। কিন্তু তোমার উপর জোর করতে আমার সাহস হয় না।”

“করলেই পার—”

“করলেই পারি না—তোমাকে কেমন একটু ভয় করে।”

“আমাকে ভয়? যে তোমার দাসী—যার দেহ প্রাণ তোমার করতলগত, তাকে ভয়?”

“কি জানি কেন ভয় হয়। আজ এখন চললুম—তোমার সঙ্গে বক্‌তে বক্‌তে আমার নেশা ছুটে গেল।”

অজয় প্রস্থান করিল।

(২৩)

বিন্দু সতর্ক হইয়াছে,—শয়ন কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ না করিয়া নিদ্রা যাইত না। একদা রাত্রিতে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিল, সহসা কক্ষদ্বারে করাঘাত হইল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, জিজ্ঞাসা করিল, “কে?”

“আমি অজয়—দোর খোল।”

“কেন?”

“দরকার আছে।”

“গয়না চাও?”

“না।”

“আর তবে কি দরকার?”

“আমি দাঁড়াতে পারছি না—শীগ্‌গির খোল।”

দ্বারে পুনঃপুনঃ করাঘাত। বিন্দু একটু চিন্তা করিল, পরে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার সঙ্গে কেউ আছে?”

“না।”

“সত্য বলছ?”

“আমি কি তোমার কাছে কেবল মিথ্যেই বলি—দোর খোল।”

বিন্দু দ্বার খুলিল। ঘর অন্ধকার। অজয় কহিল, “এ কি, ঘর অন্ধকার যে!”

অজয় বিজলী আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিল—আলো জ্বলিল না; কহিল, “ওঃ, বেটারা যে ইলেকট্রিকের ‘তার’ কেটে দিয়ে গেছে। নেও, এখন বাতি কি লণ্ঠন যা’ হয় একটা জ্বালো।”

“তুমি ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াও, আমি আগে দোর বন্ধ করি।”

“তুমি আগে আলো জ্বালো না—কি বিপদ্!”

হাতের গোড়ায় দীপ জ্বালিবার উপকরণ ছিল; কিন্তু বিন্দু দীপ না জ্বালিয়া দ্বারের নিকটে গেল। কক্ষ-বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, বিন্দু তীক্ষ্ণনয়নে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর পশ্চাতে আর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দুই জনই গৃহপ্রাচীর অবলম্বন করিয়া কোন রকমে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের পা টলিতেছিল। বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার সঙ্গে কে?”

“আমার সঙ্গে? কই? হ্যাঁ বিনি এসেছে—তোমাকে দেখবার জন্যে জেদ ধরলে—তাই—”

“তুমি যে বলেছিলে আমার ঘরে কাউকে আনবে না।”

“কি করব বিনি ছাড়্‌লে না। তোমাকে দেবে ব’লে কেমন এক ছড়া ‘গড়ে’ মালা এনেছে—আলোটা জ্বাল না।”

“তোমরা অন্য ঘরে যাও।”

“ছি বিনু—থুড়ি, বিন্দু।”

“তবে আমিই যাচ্ছি।”

“ইস্, যেতে দিলে ত যাবে।”

“দেখ অত্যাচার করো না—পথ ছাড়।”

“কোথা যাবে শুনি?”

“দাদার বাড়ীতে।”

“সরিতের ওখানে গেলে সে আবার ব’য়ে এনে দেবে।”

“সরিৎ আমার দাদা নয়!”

“তবে দাদা আবার কে? ওঃ বুঝেছি, প্রণবের কথা বলছ? সে দেশে থাক্‌লে কি তোমাকে আমি পেতাম? এমন গুণবান্ পাত্রের হাতে কিছুতেই সে তোমাকে দিত না। সেটাকে দেখ্‌লে ভয় করে।”

“আমি চললুম।”

অজয় তাহাকে তাড়াতাড়ি ধরিতে গিয়া পড়িয়া গেল।

বগলে একটা বোতল ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। অজয় কাঁদিয়া উঠিল—'মরে গেছি রে!' বিন্দু ঝটিতি দীপ জ্বালিল। দেখিল, অজয়ের ললাট কাটিয়া রক্ত গড়াইতেছে। জল আনিল, রক্ত ধুইয়া দিল, নিজের শয্যার উপর শোয়াইল।

এ দিকে বিনোদিনী আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না—ঘরের মধ্যে আসিয়া ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল। বোতলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে দেখিয়া কহিল, "হতভাগা ছোঁড়া, জল নেই, পেছল নেই, শুধু শুধু পড়ে গিয়ে বোতলটা ভাঙ্গলে! আধখানা মাল ছিল—এখন ফিরে যাব কি করে? ওঠ্ হতভাগা, ঢং করে পড়ে থাকতে হবে না।"

সেবাতৎপরা বিন্দুর প্রতি সহসা তাহার নয়ন পড়িল। ক্ষণেক তাহার মুখপ্রতি বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে ভাবিল, "ছোঁড়া যা' বল্ত তা' মিছে নয়—সুন্দরী বটে! কিন্তু হতভাগা এমন প্রতিমা ছেড়ে আমাদের কাছে ছুটে আসে কেন? আমাদের কাছে সেবার বদলে গাল পায়, তাই কি ওদের মিষ্টি লাগে?" প্রকাশ্যে—"নে নে, এখন উঠে পড়্ অজে; আমি রইলুম মাটীতে পড়ে, আর উনি বিছানায় শুয়ে আদর খেতে লাগলেন! ওঠ্ হতভাগা!"

মুহূর্ত্তের জন্যে বিন্দুর নয়ন জ্বলিয়া উঠিল; আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া বিনির পানে ফিরিয়া কহিল, "তুমি নীচে বসো গে।"

"কেন গো! তোমার আমি করেছি কি?"

"কর আর না কর, সে কথা হচ্ছে না।—তুমি নীচে যাও।"

"কেন আমি কি নিজে যেচে এসেছি। ও অপ্পেয়ে হতভাগা আমার পায়ে ধ'রে নিয়ে এসেছে।"

অজয় কহিল, "মিছে বলো না বিনি—"

বিন্দু দ্বারের বাহিরে আসিয়া ডাকিল, "কালী-দি, হরেকে নিয়ে একবার এখানে এস।"

পতন শব্দে কেহ কেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং ব্যাপারটা কি জানিবার জন্যে তাহারা কর্ত্রীর ঘরের আশেপাশে ঘুরিতেছিল; এক্ষণে আহূত হইয়া কালী ও বালক ভৃত্য হরে ঘরের ভিতর আসিল। বিন্দু কোন প্রকার চপলতা না দেখাইয়া গম্ভীরভাবে কহিল, "এ লোকটাকে আলো দেখিয়ে নীচে নিয়ে যাও।"

বলিতে না বলিতে হরি, বিনির হাত ধরিয়া টানিল। দাসদাসীরা কর্ত্তার অনুরাগী ছিল না; কর্ত্রীকে তাহারা ভালবাসিত, একটু ভয়ও করিত। বিন্দু দুই মাসের মধ্যেই তাহাদের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিল। জয় করিতে লাঠী-সোঁটা দরকার হয় না, একটু স্নেহ একটু দয়া অনুগতের হৃদয় জয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট। হরির একবার জ্বর হইয়াছিল, বিন্দু তাহাকে মায়ের ন্যায় যত্ন করিয়াছিল। বিন্দু তাহার মাথায় বরফ ধরিয়াছিল, গরম দুধ চামচে করিয়া খাওয়াইয়াছিল, পাত্র আনিয়া বমি ধরিয়াছিল ইত্যাদি। হরি তদবধি বিন্দুকে মা বলিয়া জানে। বিন্দুর আদেশ তাহার নিকট অন্য সকলের আদেশের উপর। তাহার হুকুমে হরি একটুও দ্বিধা না করিয়া বিনির হাত ধরিল। বিনি গর্জ্জিয়া উঠিল। হরে ছাড়িল না—হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। বিনি তখন গাল আরম্ভ করিল—বাছা বাছা বিশেষণে অজয়কে বিশেষিত করিল। বিন্দু একটু অধীরা হইয়া কহিল, "হ'রে, ওকে টেনে নিয়ে যা', একা না পারিস বোখারিকে ডাক্।"

একা পারিবে না—হরে এ অখ্যাতি সহ্য করিতে পারিল না—সে বিনিকে নির্দ্দয়ভাবে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বিনি সিঁড়ি নামিতে নামিতে গাল দিতেছিল, "ওরে হতচ্ছাড়া, তোর বউ মরবে কবে—"

শয্যায় উঠিয়া বসিয়া অজয় কহিল, "আমি যাই বিন্দু—"

"কোথা? তোমার ঘরে?"

"না; বিনিকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বিন্দু পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অজয় উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার বিন্দুর দিকে চাহিল; দেখিল, তাহার ওষ্ঠ কাঁপিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কিছু বলতে চাও বিন্দু?"

"আজ এ অবস্থায় বাইরে না গেলে ভাল হয়।"

"ওকে বিদেয় করতে ত হবে।"

বিন্দু আর কিছু বলিল না। অজয় কহিল, "ও মাগীর সঙ্গে আমি আর কোন সম্পর্ক রাখব না—ছোটলোক—তোমাকে গাল!"

"ওর কোন অপরাধ নেই।"

"তবে কার অপরাধ?"

"যে ওকে ঘরে এনেছে।"

"তাই বলে গাল দেবে ?"

"ওদের মত লোকের কাছে তুমি আর কি বেশী প্রত্যাশা করতে পার ?"

"এখন আমার ভুল বুঝচি, আর কখন আনব না— যাই, ওটাকে রেখে দিয়ে আসি, বড় মাতলামি করছে।"

"একটু দাঁড়াও—কপালে আয়ডিন লাগিয়ে দি— অনেকটা কেটেছে।"

বিন্দু তুলা ভিজাইয়া ঔষধ লাগাইল। অজয় কহিল, "বিন্দু, কখন ত তুমি আমায় এত যত্ন কর নি।"

"হরির কপাল কেটে গেলেও ত আমি এইটুকু করতুম।"

"তাই নাকি ? আমি ভেবেছিলাম—থাক্—এখন যাই।"

অজয় বিদায় লইল। বিন্দ্ একই ভাবে শয্যার উপর বসিয়া রাত্রি কাটাইল।

(২৪)

দ্বিজনাথ অনেক দেশ ঘরিলেন, কিন্তু প্রণবের কোন সন্ধান পাইলেন না। কাশী, অযোধ্যা, মথুরায় মন্দিরে মন্দিরে মাথা কুটিয়া প্রার্থনা করিলেন, ঠাকুর, প্রণবকে এনে দেও। গঙ্গা, সরযূ, যমুনায় ডুব দিয়া কামনা করিলেন, প্রণবের দর্শন যেন অচিরে পাই। তা'র পর সহসা একদিন স্মরণ হইল, প্রণব লিখিয়াছিল, সে হরিদ্বারে যাইবে। তখন তিনি হরিদ্বার অভিমুখে ছুটিলেন। কনখলে বাসা লইয়া তিনি চতুর্দ্দিকে প্রণবের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

সঙ্গে মাত্র জগা। একদা অপরাহ্নে দক্ষরাজপুরীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বসিয়া তিনি জগাকে কহিলেন, "কোথাও ত তা'কে পাচ্ছি না জগা, কি করি বল্ দেখি ?"

"আমার পরামর্শ যদি নেন, তাহলে তীর্থ ছেড়ে সহরে চলুন।"

"কেন বল্ দেখি ?"

"তিনি তীর্থিতে আসেন নি।"

"তুই কেমন করে তা' জানলি ?"

"তিনি কোন্ দুঃখে তীর্থি করতে আসবেন।"

"তা'র দুঃখু অনেক রে জগা, বুঝি সে আমার চেয়েও দুঃখী।"

"তাই বলে তীর্থি করে বেড়াবার বয়েস দাদাবাবুর হয় নি। তা' ছাড়া এসব দেশে দাদাবাবু কখনই আসবেন না।"

"এই সব দেশেই সে আসবে—কেমন পাহাড়, কেমন দৃশ্য !"

"দিশ্য নিয়ে কি হবে ? এমন কুড়ের দেশ আর কোথাও আছে ? বেটারা খাটবে না, খুটবে না—শুধু গেরুয়া পরে বেড়াবে, আর লোকের দোরে দোরে 'হরি নারায়ণ' বলে দাঁড়ালেই চার বেলার খোরাক। কি প্যাঁজ-রশুনটা এরা খায়। রামঃ, এ দেশে দাদাবাবু কখনই আসবেন না।"

"তবে কোন্ দেশে তোর দাদাবাবু যাবে, সেই দেশে আমাকে নিয়ে চল্ জগা। আমি যে আর ভাবতে পাচ্ছি না—আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব গেছে।"

সহসা সঙ্গীতধ্বনি দ্বিজনাথের কানে আসিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, এক সাধু অদূরে বসিয়া গান করিতেছেন। তিনি গাহিতেছিলেন,—

সকাল সন্ধ্যা ঘুরি ফিরি আমি, তোমার ত
ওগো পাইনা সাড়া,
আশায় আশায় দিবা রাতি যায়, নিরাশ
প্রাণে হই গো সারা।
দেখিবার আশে আছি গো বসিয়া, দেখা না
দিলে নিস্কৃতি কোথায়।
ভালবাস মোরে থাক অন্তঃপুরে, তাহাতে
আমার আসে কি যায়।
অন্তরেরি ব্যথা যদি নাহি বোঝ, তোমারে
বোঝাতে কে আছে আর।
হেসে হেসে এস, লই বুকে তুলে, জড়ায়ে
ধরি গো জীবনেরি সার।

গানটির অর্থ দ্বিজনাথ প্রণিধান করিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি উঠিয়া সাধুর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বুকের ভিতর তখন ঝঙ্কৃত হইতেছিল—আশায় আশায় দিবারাতি যায়, নিরাশ প্রাণে হই গো সারা। জগা কহিল, "আপনি ও-দিকে যাচ্ছেন কেন ?"

"একবার সাধুর কাছে গিয়ে দেখি—"

"ওখানে গিয়ে কাজ নেই বাবু। এখুনি বলবে রূপেয়া দেও, কাপড়া দেও—"

"এ সাধু কিছু চাইবে বলে মনে হয় না।"

"গেরুয়া কাপড়কে আপনি বিশ্বাস করবেন না—ওরা সব পারে।"

"ছি, সাধু নিন্দে করতে নেই। এঁদের ভেতর ভালও ত থাকে।"

বলিয়া তিনি সাধুর সমীপস্থ হইলেন। প্রণাম করিতেই সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও বাবা?"

"বাবা, আমি ছেলে হারিয়েছি, দেশে দেশে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি; আর কি তাকে পাব বাবা?"

"আমার ত সিদ্ধাই নেই বাচ্ছা, আমি কি করে বল্‌ব?"

"আপনারা সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, সব জানেন—দয়া করে বলুন।"

"খুঁজলে যখন ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, তখন তাকে পাবে না কেন?"

"তা' হ'লে পাব?"

"সময় হ'লেই পাবে।"

"বাবা, আপনি বাঁচালেন; তার সন্ধানে আমি কত দেশ ঘুরেছি।"

"এমনি করে কেন তুমি ভগবান্‌কে খুঁজে বেড়াও না?"

"আমার সে অবসর এখন নেই বাবা। আমার ছোট ভাই আমার ঘাড়ে গুরুভার চাপিয়ে গেছে। তার মৃত্যু শয্যায় যে ভার আমি গ্রহণ করেছি, তা' না নামিয়ে আমি ভগবানের চিন্তায় মন দিতে পারব না।"

"তোমার বয়েস হয়েছে, আর কি অবসর পাবে?"

"নাই বা অবসর পেলাম।"

সাধু স্তম্ভিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ভগবানের দর্শন কামনা কর না?"

"তিনি কৃপা করে দর্শন দেন ভাল, না দেন ক্ষতি নাই।"

"জীবনের উদ্দেশ্য কি তুমি জান?"

"কর্ত্তব্যপালন, আর কি?"

"জীবনের লক্ষ্য মুক্তি—"

"সেটা কি করে পাওয়া যায়?"

"বাসনার অভাব না হলে জন্মের অভাব হয় না। তোমার এখনও পূর্ণ বাসনা রয়েছে—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এই বাসনা ক্ষয় কর—"

"আমার মুক্তি দরকার নেই, আমি বাসনা নিয়ে বেশ আছি।"

"এমনি তুমি মায়াবদ্ধ—"

"আপনিই কি কম! আপনি চাচ্ছেন নিজের সুখ, আমি চাচ্ছি পরের সুখ। আপনি অভিলাষ করেন মুক্তি, আমি অভিলাষ করি ধর্ম্ম। ভগবান যদি এখনি এসে বলেন, তুমি আমাকে চাও, না তোমার পুত্রাধিক প্রণবকে চাও, তা'হলে তাঁকে আমি সাফ জবাব দিয়ে বলি, তোমার চেয়ে আমার ধর্ম্ম বড়। প্রণব হচ্ছে আমার ধর্ম্ম, তার তুলনায় মুক্তি, স্বর্গ, ভগবান্ তুচ্ছ।"

সাধুর ওষ্ঠে একটু হাসি ভাসিয়া গেল। দ্বিজনাথ সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া বিদায় হইলেন।

পরদিন দ্বিজনাথ সংবাদ পাইলেন, হরকালী লক্ষ্ণৌয়ের জেলে আবদ্ধ। তিনি স্তম্ভিত হইলেন। হরকালী ডাকাত! তিনি তল্পিতল্পা বাঁধিয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

(২৫)

প্রয়াগ—হরিশঙ্করের বাসা—আশ্বিনের শেষ।

হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি না কি কোলকাতায় যাবে মঙ্গল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হঠাৎ কোলকাতায় যাবার দরকার কি পড়্‌ল?"

"বোনটিকে দেখ্‌বার জন্যে মন বড় উতলা হয়েছে. মনে হয় সে যেন খুব বিপদে পড়েছে।"

"বেশ, যাও; কিন্তু ফিরছ কবে?"

"এখানে আর ফিরবার সঙ্কল্প নেই।"

"সে কি!"

"এখানে আবার আসবার দরকার আছে কি?"

"খুব আছে।"

"মনে করছি চাকরি বাক্‌রির একটু চেষ্টা করব।"

"চাকরি বাক্‌রি তোমাকে করতে হবে না।"

"একটা ত কিছু করতে হবে; ব্যবসা বাণিজ্যে মূল দরকার, আমার তা নেই—"

"তোমার মূলধনের অভাব হবে না মঙ্গল।"

"আমি কারুর কাছে কর্জ্জ বা দান নিতে পারবো না।"

"আহা, তোমাকে দান নিতে হ'বে না—আমি তোমাকে আমার কারবারের অংশীদার করে নেব।"

"আমি ব্যবসার কিছু বুঝি না, অংশীদার হ'য়ে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা আমার উচিত হবে না।"

"তুমি ত বড় অবাধ্য! (উচ্চ কণ্ঠে) মতি, মতি, একবার এদিকে এস।"

কৃষ্ণমতি আসিলেন। হরিবাবু কহিলেন, "শুনছ মঙ্গলের কথা? বলে কিনা—"

"আমি সব শুনেছি।"

"এখন কি করি বল?

"মঙ্গলকে সব ভেঙ্গে বল!"

"আমি অত কথা বলতে পারব না—তুমি যা' হয় কর।"

কৃষ্ণমতি, মঙ্গলের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমাকে আমাদের পরামর্শের কথা খুলে বলি।"

"বলুন মা।"

"আমাদের ইচ্ছা তোমার সঙ্গে দেবীর বিয়ে দি।"

"তা' ত হ'তে পারে না মা।"

হরিশঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"হ'তে পারে না! আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে রাজী নও?"

কৃষ্ণ। আহা, তুমি থাম না, আমি বুঝিয়ে বলছি।

হরি। বোঝাবে আর কি, সবই ত বলা হয়েছে।

কৃষ্ণ। তুমি উঠে যাও ত—

হরি। আচ্ছা, আমি আর কথা কইব না।

কৃষ্ণমতি তখন সরিয়া আসিয়া মঙ্গলের নিকটে একখানা চেয়ারে বসিলেন; অতঃপর স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে মায়ের মত মনে কর বাবা?"

"তা' নইলে মা বলে ডাকব কেন?"

"দেবীকে তুমি ভালবাস?"

"তা কি আপনি বুঝতে পারেন নি?"

"তবে তা'কে বিয়ে করতে অসম্মত কেন হচ্ছ?"

"গুরুতর বাধা আছে মা।"

হরিশঙ্কর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না—কহিলেন, "বলে বোলো মঙ্গলকুমার—"

কৃষ্ণমতি,—"আবার তুমি কথা কচ্ছ।"

ধমক খাইয়া হরিশঙ্কর নীরব হইলেন। কৃষ্ণমতি তখন মঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাধাটা কি বলতে আপত্তি আছে বাবা?"

"মায়ের কাছে বল্‌তে আপত্তি কি?"

"তবে বল বাবা, যদি আমরা কোন উপায় করতে পারি।"

"আমি জ্যেঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবা কোন ব্যক্তিকে কথা দিয়েছেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।"

"কতদিন হ'ল তোমার বাবা দেহ রেখেছেন?"

"অনেক দিন হবে।"

"সে মেয়ের কি আজও বিয়ে হয় নি?"

"তা' আমি জানি না।"

"তা'দের বাড়ী কোথা?"

"তা'ও আমি বল্‌তে পারি না।"

"মেয়েটি দেখ্‌তে শুনতে কেমন?"

"তা' ত আমি জানি না মা, জানবার দরকারও নেই।"

"কেন?"

"সে যদি কদাকার বিকলাঙ্গও হয়, তবু তা'কে আমি বিয়ে করব—আর কাউকে নয়।"

এর উপর আর কথা বলা চলে না। কৃষ্ণমতির বদন বিষাদাচ্ছন্ন হইল। তিনি অবনত বদনে নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। হরিবাবু গুড়্‌গুড়ির নলটা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "শোন মঙ্গল, দেবরাণী আমার এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; যে তা'কে বিয়ে করবে সে সমস্ত সম্পত্তি পাবে।"

"তা' জানি।"

"আমার সম্পত্তির আয় কত জান? জমিদারী ছাড়া কারবার হ'তেই বছরে পঞ্চাশ হাজার—"

"পঞ্চাশ কোটী হ'লেও যে পারব না কাকাবাবু।"

এই প্রথম 'কাকা' সম্বোধন। মঙ্গল ভাবিয়া চিন্তিয়া কাকা বলে নাই—মনের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া বাক্যে স্ফুরিত হইল। এই স্ফুরণ হরিশঙ্করের হৃদয়ে সংক্রামিত হইল। তিনি ক্ষণকাল বিস্ফারিত নেত্রে মঙ্গলের পানে চাহিয়া রহিলেন; তার পর উঠিয়া মঙ্গলকে আবেগভরে বক্ষমধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। কহিলেন, "তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না বাবা—তুমি আমার ছেলে।"

উভয়েরই চক্ষু সজল হইল। হরিশঙ্কর তাঁহার অশ্রু গোপন করিবার অভিপ্রায়ে ত্বরিতপদে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। মঙ্গলও বাহিরে যাইতেছিল, কৃষ্ণমতি ডাকিয়া কহিলেন, "একটু বসো—কথা আছে।"

মঙ্গল বসিল। কৃষ্ণমতি কহিলেন, "তুমি যদি জান্‌তে দেবীকে বিয়ে করতে পারবে না, তাহলে তা'র সঙ্গে এ ভাবে মেশামিশি করা কি তোমার ভাল হয়েছে?"

"কি করব মা?—আমি ত ইচ্ছে করে কিছু করি নি। বিন্দুর স্থানে তাকে বসিয়ে—"

"তোমার এ গভীর স্নেহ ত ভ্রাতৃ প্রেম নয়।"

"কি, তা' আমি বুঝি না, বুঝি শুধু দেবী আমার বড় প্রিয়।"

"এতটা ভালবাসা দেওয়া কি নেওয়া তোমার ভাল হয় নি। তার যে সর্ব্বনাশ হ'ল।"

"সর্ব্বনাশ হ'ল! কেন মা?"

"সে ত আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না।"

"কেন?"

"সে তোমাকে স্বামী বলে জেনেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এখন বিয়ে করলে সে দ্বিচারিণী হবে।"

মঙ্গল স্তম্ভিত হইল। কৃষ্ণমতি কহিলেন, "হ'ল এই, তা'কে বিয়ে না দিয়ে চিরদিন ঘরে রাখতে হবে—তার জীবনটাই বৃথা হ'ল।"

"মা, আমি বড় হতভাগা, যেখানে যাই সেখানে অশান্তি আনি।"

"বালাই, তুমি হতভাগা হ'বে কেন? তুমি আমার সর্ব্বগুণাধার পুত্র।"

মঙ্গল কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "মা আপনারা যা' বলবেন, জ্যেঠামশাই যা' বলবেন আমি তাই করব।"

"দেবীকে বিয়ে করবে?"

"করব—আপনারা বললে তাই করব।"

অন্তরালে থাকিয়া দেবরাণী সমস্ত শুনিয়াছিল।

(২৬)

কার্ত্তিকের প্রথম- শক্তিপূজা সমাগত।

"তোমার জন্যে কেমন পূজার কাপড় এনেছি, দেখ বিন্দু।"

বিন্দু নিজের ঘরে একখানা কৌচে উপবিষ্ট ছিল; নিকটে দাঁড়াইয়া অজয় কাপড় দেখাইতেছিল। বিন্দু কহিল, "আমার কাপড় ত অনেক আছে, কেন আবার আন্‌লে?"

"তোমার কাপড় অনেক থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমি ত তোমাকে একখানা কাপড় আজও দিই নি।"

"দরকার হয় নি, তাই দেও নি।"

"না বিন্দু, সে কথা ঠিক নয়—"

"এই টানাটানির সময় অনর্থক খরচ করা উচিত মনে কর নি, তাই হয় ত দেও নি।"

"এই টানাটানির সময় বিনিকে ত আমি গয়না কাপড় দিয়েছি।"

বিন্দু নিরুত্তর রহিল। ভৃত্য হরে আসিয়া কহিল, "সরিৎ বাবু মা ঠাকরুণের সঙ্গে একবার দেখা করতে চান্।"

বিন্দু কহিল, "বল গে আমার সময় নেই।"

অজয়,—"একবার দেখা কর না কেন।"

"না।"

"সে হয় ত তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।"

"কোথা?"

"তোমার মায়ের বাড়ী।"

"আমি যাব না।"

"পূজোর ক'দিন সেখানে তুমি থাক না কেন?"

"না।"

"এখানে তুমি একা থাক্‌বে?"

"তুমি কোথা যাচ্ছ?"

"আমরা দল বেঁধে জাহাজে চেপে বেড়াতে যাব।"

"যাও, আমি একাই থাকব।"

"সেটা কি ভাল?"

"আমি কবে না একা থাকি?"

"একা থাক সত্য বিন্দু, কিন্তু—"

"তুই বলগে না হরে, আমার দেখা করবার সময় নেই।"

হরে প্রস্থান করিল। বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কবে যাচ্ছ?"

"কাল।"

"ফিরবে কবে?"

"সাত আট দিন হ'তে পারে।"

"হার ছড়াটা খুলে দি?"

"কেন বিন্দু ?"

"তোমার টাকাকড়ি দরকার হ'তে পারে ত।"

"খরচপত্র চাঁদা করে উঠেছে—"

"তোমার অংশের টাকাটা—"

"সে তোমায় ভাবতে হবে না, আমি জোগাড় করে নেব।"

"তাই বল্‌ছিলাম টানাটানির সময় কাপড়খানা নাই কিনতে।"

অজয়ের মুখমণ্ডল বিষাদাচ্ছন্ন হইল; ব্যথিত ও কাতর-কণ্ঠে কহিল, "কেন আমাকে ব্যথা দেও বিন্দু? আমি কখন তোমাকে কিছু দিই নি—"

বিষাদমথিত কণ্ঠস্বর বিন্দুর বুকে গিয়া বাজিল। উত্তর করিল, "এত গয়না দিয়েছ—"

"এ আমার মার গয়না; যা' দিয়েছিলাম, তা'ও কেড়ে নিয়েছি।"

"দেবার সময় হ'লে আবার দেবে।"

"আর কি সময় হবে বিন্দু। ক্রমেই যে নেমে পড়্‌ছি।"

বিন্দু মুখ ফিরাইয়া গবাক্ষের বাহিরে নেত্রপাত করিল। তখন অপরাহ্ণ অতীত-প্রায়। পথ বাহিয়া অনেক লোক যাইতেছিল, বিন্দু তাহা দেখিল। অজয় সহসা কহিল, "তোমাকে বিয়ে করে আমি ভাল করি নি বিন্দু!"

বিন্দু নয়ন ফিরাইয়া শূন্য পানে চাহিল—অজয়ের পানে চাহিল না। অজয় কহিল, "আমি অধঃপাতে যাচ্ছি, কিন্তু আমার অধঃপতনের সঙ্গে তোমাকে টানবার আমার কোন অধিকার ছিল না।"

বিন্দু নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়-মধ্যে যে সর্প মাথা তুলিয়া এতদিন গর্জ্জন করিতেছিল, সে নীরব হইল।

অজয় কহিল, "কিন্তু আমি লোভ সামলাতে পারলাম না—তোমাকে দেখে তোমাকে পাবার জন্যে আমি ক্ষেপে উঠেছিলাম। চিঠি জাল করতে, প্রতারণা প্রবঞ্চনা করতে আমি পিছুই নি। আমাকে ক্ষমা করতে পারবে বিন্দু?"

বিন্দুর চক্ষু নত হইল—হৃদয়স্থিত সর্পও মাথা নামাইল।

অজয় কহিল, "আমি বুঝি সব বিন্দু, যখন আমি সহজ অবস্থায় থাকি; কিন্তু যখন আমি মত্ত হই—যাক্ সে-সব কথা। তোমাকে বলছিলাম কি, কি বলছিলাম বিন্দু?"

"তুমি স্থির হয়ে বিছানার উপর ব'সো।"

"তোমার বিছানায় বসব? অপবিত্র হবে না?"

"তুমি ত কখন অপবিত্র নও।"

"তবে যে তোমার বিছানায় বসতে আমাকে নিষেধ কর।"

"ওই—ওই গন্ধগুলো সহ্য করতে পারি না, আর ওই কাপড়-চোপড়গুলো—"

"বুঝেছি বিন্দু, আর বলতে হবে না।"

অজয় বিছানায় শুইয়া পড়িল। কহিল, "বড় আরাম হ'ল বিন্দু; এর চেয়ে নরম বিছানায় শুয়েছি, কিন্তু এত আরাম পাই নি।"

"জামাটা খুলে ফেলে শোও না কেন?"

অজয় বালকের ন্যায় হুকুম তামিল করিল। তৎপরে কহিল, "বেটারা 'তার' কেটে দিয়ে গেছে, পাখা যদি চল্‌ত—"

"'তার' কেটে দিলে কেন?"

"টাকা দিতে পারি নি বলে।"

বিন্দু পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

"থাক্ বিন্দু, তোমাকে বাতাস করতে হবে না।"

"আর কাউকে বাতাস করতে ডাকব?"

"না থাক্—এর মধ্যে আর কাউকে এনো না।"

বিন্দু বাতাস করিতে লাগিল।

"তুমি আমার পাশে বিছানায় ব'সো—দাঁড়িয়ে কেন?"

বিন্দু বসিল। উভয়ে নীরব। বিন্দু নতবদন, অজয় মুদিতনয়ন। অনেকক্ষণ পরে অজয় কহিল, "আমি পথে দাঁড়াতে বসেছি বিন্দু—"

"পথে দাঁড়াবে কেন?"

"শেষ সম্বল দোকানখানি, তা'ও বেচ্‌তে বসেছি।"

"বেচবে কেন?"

"অনেক দেনা—পাওনাদার জেলে দেবে বলে শাসাচ্ছে।"

"দেনার জন্যে জেলে দেবে?"

"আইন না কি তাই।"

"আমার গয়না বেচে দেনা শোধ হয় না?"

"দূর পাগ্‌লি, একজনকেও দিতে কুলোবে না।"

"কত টাকা দেনা?"

"এই বাড়ী বাঁধা আছে চল্লিশ হাজারে, এখন দাঁড়িয়েছে

বোধ হয় পঞ্চাশে; আরও খুচরো দেনা বিশ হাজার। সত্তর হাজার টাকার কম আমার পরিত্রাণ নাই। যাদের কাছে খুচরো দেনা, তাদেরই ভয় বেশী—তারাই পূজোর বন্ধের পর জেলে দেবে বলে শাসাচ্চে। কাজেই দোকানখানা বেচতে হবে। দোকান গেলে খাওয়া বন্ধ, বাড়ী নীলামে উঠ্‌লে পথে দাঁড়ান ভিন্ন উপায় নেই।"

উভয়ের বুকের ভিতর একটা বিষাদের ছায়া পড়িল। উভয়ে নির্ব্বাক। এমন সময় হরে আসিয়া কহিল, "নীচে বাবুরা এসেচেন—আপনাকে ডাক্‌চেন।"

"শরীর খারাপ হয়েছে, যেতে পারব না বলগে যা'।"

হরি প্রস্থান করিল। অজয় কহিল, "আমি পথে দাঁড়াই তা'তে দুঃখ নেই বিন্দু—আমার পাপের উপযুক্ত পুরস্কারই তাই, কিন্তু তোমাকে—নিরপরাধাকে এই ঘোর বিপদের মধ্যে টেনে আন্‌লুম, এ অনুতাপ আমার বুকে আজ ক'দিন হতে শেলের ন্যায় বিঁধছে।"

হরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বাবুরা কইলেন আপনি নীচে না গেলে তাঁরা উপরে এসে দেখবেন আপনার অসুখটা কি রকম হয়েছে।"

অগত্যা অজয় নীচে নামিয়া গেল। মধ্য রাত্রিতে যখন সে গৃহে ফিরিল, তখন তাহার অবস্থা ঠিক মত্ত না হইলেও স্বাভাবিক নয়। অজয় বিন্দুর দ্বারে করাঘাত করিবামাত্র বিন্দু ঝটিতি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

(২৭)

কক্ষে প্রবেশ করিয়া অজয় কহিল, "বিন্দু, আমি এসেছি।"

"দাঁড়াও, আগে আলো জ্বালি।"

বিন্দু দীপ জ্বালিল। অজয় কহিল, "আমি কোথা বসব বিন্দু?"

"আমার বিছানায় ব'স।"

"আমার কাপড়-চোপড় যে সেখানকার—"

"তা' হো'ক।"

"আমার গায়ে মুখে যে গন্ধ—"

"আমার সয়ে এয়েছে—তুমি ব'সো।"

অজয় শয্যায় আসিয়া বসিল। অজয় কহিল, "আজ কেউ আমাকে ধরে রাখতে পারলে না, এগারটা বাজতে না বাজতে আমি উঠে পড়েছি।"

"কেন, কিছু দরকার আছে কি?"

"দরকার? হ্যাঁ, একটু দরকার আছে বই কি।"

"কি?—বল—গয়না চাই?"

"তোমার গয়নায় আর হাত দেব না বিন্দু।"

"তবে দরকারটা কি?"

"কি জানি কি দরকার। সেখানে গান শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হ'ল, এখানে আমার খুব দরকার।"

"মনে করতে পার্‌ছ না বুঝি?"

"মনে করতে পারছি না? হবে।"

"জামা টামাগুলো খুলে ফেল, আমি পাখা করছি।"

"তোমার যত্নটুকু নিতে এসেছি বিন্দু; আমাকে যত্ন করে এমন ত আর কেউ নেই।"

"তুমি শুয়ে পড় না।"

"শোব? যদি বমি করি?"

"কর, করবে—তা'তে হয়েছে কি?"

"সেখানে ব'সে বিন্দু, তোমার মুখখানা কেবল মনে পড়্‌তে লাগল—তুমি একা আছ, হয় ত কাঁদছ, আর এখানে আমি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে—"

"আমি কাঁদব কেন? আমার কিসের দুঃখু?"

"তোমার দুঃখ অনেক; আমি তোমাকে দুঃখ-সাগরে টেনে এনেছি। পশু আমি, নিজের সুখ চেয়েছি, তোমার দিকে চাইনি—চাইবার অবসর পাইনি—নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত—"

"তুমি এখন ঘুমোও।"

"আমি ত ঘুমুতে আসিনি।"

"তবে কি করতে এসেছ?"

"তোমার সঙ্গে কথা কইতে এসেছি।"

"কথাও অনেক কওয়া হয়েছে, এখন ঘুমোও।"

"না বিন্দু, এ কথার আর শেষ নেই। অনেক কথা আমার বুকের ভেতর ঠেলে উঠছে—আজ বলব বলে এসেছি।"

"বলতে হবে না—আমি বুঝেছি।"

"না, বোঝনি, সে সব কথা কেউ বুঝতে পারে না। আমাকে বলতে দেও বিন্দু—বলব? না, আমি বলতে পারব না—তোমাকে শুনিয়ে তোমার প্রাণে আর আঘাত দেব না।"

বিন্দুর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল—না জানি কি আবার অপ্রীতিকর শুনিতে হইবে। ব্যাকুলতা সাধ্যমত চাপিয়া সহজকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌ছিলে, বল।"

"বলব? না বলব না। কিন্তু কা'কেই বা বলব? আমার আর কে আছে? বন্ধুরা ত ভাণ্ড রসশূন্য দেখে একে একে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তার পর যখন তাঁরা আমার বিপদের কথা শুনবেন, তখন কেউ যে আমাকে চেনেন, এ ভাবও আর দেখাবেন না।"

"বিপদ্ কি?"

"বিপদ্ কি শুনবে? শুনলে তুমি শিউরে উঠবে—এখনও যদি তোমার আমার প্রতি একটুও শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে সেটুকুও নষ্ট হবে—শুনে কাজ নেই বিন্দু।"

"তুমি বল না কেন?"

"আমি জেলে যেতে বসেছি—কাল হয় ত আমাকে কোমরে দড়ি দিয়ে ধ'রে নিয়ে যাবে।"

"কেন, দেনার জন্যে?"

"না, দেনার জন্যে নয়। আমি জাল করেছি—জাল করে একজনকে ঠকিয়ে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছি।"

বিন্দু স্তম্ভিত হইল; তাহার হাত পা অবশ হইয়া আসিল—মেজের উপর বালিকা বসিয়া পড়িল। অজয় কহিল, "তাই তোমাকে সরাতে চেয়েছিলাম বিন্দু; মিছে করে বলেছিলাম আমরা জাহাজে চ'ড়ে বেড়াতে যাচ্ছি। যাচ্ছি বটে, কিন্তু—কিন্তু আর হয় ত ফিরব না।"

বিন্দুর বুকের ভিতর কান্নার যে তুফান উঠিল, তাহা অজয় দেখিতে পাইল না; তাহার আর্ত্তনাদও অজয় শুনিতে পাইল না। অজয় কহিল, "আমি দ্রুতপদে কোথায় এসে নেমেছি বিন্দু, ভাবলে ইচ্ছা করে আত্মহত্যা করি। মান-সম্ভ্রম, ধনসম্পত্তি, বংশমর্য্যাদা সব নষ্ট করে আজ আমি জালিয়াৎ—জেলের আসামী। পূর্ব্বপুরুষের আরাধ্য দেবতা রাধামাধবের অলঙ্কার বেচে মদ কিনেছি, মায়ের গায়ের গহনা বেশ্যাকে দিয়েছি; যে গৃহ পিতা পিতামহের চরণরজে পবিত্র ছিল, আজ সে গৃহ বেশ্যার পদধূলিতে কলুষিত। মানুষের অধঃপতন আর কি হবে?"

বিন্দু উঠিয়া আসিয়া শয্যার এক প্রান্তে বসিল। কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরবে—ফিরবে না কেন বলছ?"

অজয় সে কথার কোন উত্তর করিল না—নীরবে মুদ্রিত নয়নে শয্যায় পড়িয়া রহিল। ক্ষণপরে আপন মনে কহিল, "একবার ভাবছি রাত্রির অন্ধকারে পালাই; কিন্তু কোথা পালাব; যেখানেই পালাই না কেন সেখান হ'তে টেনে আনবে। আর বুনো জন্তুর মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানর চেয়ে আন্দামানে যাওয়া ভাল; অথবা আত্ম—"

"আন্দামান কোথা?"

"সমুদ্রের মধ্যে। যারা খুন ডাকাতি করে অথবা আমার মত অপরাধ করে তারাই সেখানে যায়—ছোটখাটো চোর বদমায়েস সেখানে যায় না—জন্মভূমিতেই থাকতে পায়।"

বিন্দুর বাক্য সরিল না। অজয় কহিল, "যখন তোমাকে কথাটা বলেছি, তখন গোড়া হ'তে খুলে বলাই ভাল। তোমাকে না ব'লে আর কা'কে বলব? কয়েক মাস আগে আমার টাকার খুব দরকার পড়েছিল। আমার দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল, আমি এক কাবলিওয়ালার কাছে টাকার জন্যে হাত পাতলাম। নিজের নামে নিলাম না, আমার বন্ধু বলাইয়ের নাম জাল করে টাকা নিলাম—"

"নিজের নামে নিলে না কেন?"

"অজয়কে সে টাকা দিত না, বাজারে তা'র অনেক দেনা। বলাইয়ের দেনা নেই, তাই বলাই মিত্তির বলে পরিচয় দিয়ে টাকাটা নিলাম।"

"বলাইবাবু কিছু জানতে পারলেন না?"

"তা'র সঙ্গে পরামর্শ করেই ত এ কাজ করেছিলাম। তা'র বৈঠকখানায় কাবলিকে নিয়ে গিয়ে তার সামনে হ্যাণ্ডনোট লেখাপড়া হয়েছিল, আর আমি বলাই মিত্তির বলে সেই দলীল দস্তখত করেছিলাম। বলাই কিন্তু দলীলে সাক্ষী হয়নি—হ্যাণ্ডনোটে না কি সাক্ষী হয় না।"

"তার পর?"

"বলাই অর্দ্ধেক টাকা নিলে, বাকি অর্দ্ধেক আমি নিয়ে—"

"এখন হঠাৎ গোল হ'ল কেন?"

"কাবলি গিছল বলাইয়ের বাড়ীতে সুদ চাইতে; বলাই তাকে হাঁকিয়ে দেয়। কাবলি নালিস করতে উদ্যত হ'লে বলাই তখন তাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসে।"

"সে দিন একটা কাবলি এসে কি গোল করছিল, হরে বলছিল বটে।"

"হাঁ, একটা রফার চেষ্টা করা হচ্ছিল, কিন্তু তা' হ'ল না।"

"হ'ল না কেন?"

"বলাই অর্দ্ধেক টাকা দিতে কিছুতেই সম্মত হ'ল না—"

"কত দিতে চান?"

"এক পয়সাও নয়; একটু আগে এ কথা সে বললে। সুদে আসলে এখন আট হাজার টাকা দাঁড়িয়েছে। পুরো টাকা না পেলে কাবলি দলীল ছাড়বে না। আমার দোকানখানা বলাই পাঁচহাজার টাকায় কিনতে চায়। দোকানটা নিয়ে আমাকে এ দায় হ'তে উদ্ধার করবার জন্যে তা'কে কত বললুম, তা'র হাতে ধরলুম, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হল না।"

"দোকানখানা আর কাউকে আট হাজারে বেচা যায় না?"

"আট হাজার কেন, আরও ঢের বেশী দামে বেচা যায়, কিন্তু খদ্দের দেখ্‌বার আর সময় নেই।"

"আগে হ'তে চেষ্টা দেখ্‌লে না কেন?"

"দোকানখানা বেচ্‌তে আমার ইচ্ছা ছিল না, বড় লাভের দোকান। তা' ছাড়া কাব্‌লি আমাকে এক মাস সময় দিয়েছিল; কিন্তু আজ সকালে হঠাৎ এসে বললে যে আর আমাকে সময় দেবে না।"

"কেন, কেন?"

"কাছারি বন্ধ হয়ে যাবে না কি। কিন্তু আমার মনে হয়, এর ভেতর বলাই আছে। যাই হো'ক, অনেক কান্নাকাটির পর সে আমাকে কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময় দিয়েছে।"

"তা'হলে এখন উপায়?"

"উপায় কিছু দেখছি না বিন্দু; কারুর সঙ্গে যে পরামর্শ করব এমন বন্ধুও আমার নেই। আমার জন্যে ভাবি না, আত্মহত্যা করে এ দায় হ'তে আমি নিষ্কৃতি পেতে পারি; কিন্তু তোমাকে যে আমি পথে বসিয়ে গেলুম এ যে আমার মহা দুঃখ।"

বিন্দু সরিয়া আসিয়া অজয়ের পাশে বসিল। অজয় কহিল, "বিন্দু, আমাকে একটু মদ দিতে পার?"

"কোথা আছে?"

"নীচের ঘরে আলমারীতে।"

"আন্‌ছি, তুমি একটু অন্ধকারে থাক।"

"হরেকে বল না কেন।"

"তাকে আর উঠিয়ে কাজ নেই—আমিই আনছি।"

বিন্দু লণ্ঠন লইয়া নীচে নামিয়া গেল। অচিরে বোতল গেলাস ও জল আনিয়া স্বামীর পাশে একটা ছোট হোয়াট-নটের উপর রক্ষা করিল। অজয় কহিল, "না বিন্দু, খাব না।"

"কেন?"

"তোমার ঘর অপবিত্র করব না।"

"আমি ঢেলে দিচ্ছি।"

"বিন্দু—বিন্দু—"

"অমন করছ কেন? খাও।"

"বোতলটাও আমার হাতে দেও।"

বিন্দু গেলাস ও বোতল দুই দিল। অজয় উঠিল এবং পাশের ঘরে গিয়া নর্দ্দমার মুখে সমস্ত সুরা ঢালিয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "জীবনে এ জিনিষ আর স্পর্শ করিব না।"

(২৮)

গল্প করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। অরুণোদয় হইলে বিন্দু স্বামীকে ঘুম পাড়াইয়া স্থানান্তরে গেল। অজয় যখন শয্যাত্যাগ করিল, তখন মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়। আহারাদি সমাপন করিয়া অজয় আবার বিন্দুর ঘরে আসিয়া বসিল। কহিল, "আজ তোমাকে ছাড়্‌তে ইচ্ছা করছে না বিন্দু—"

"কোথাও যাবার দরকার না থাকে শুয়ে পড়।"

"না, আর শোব না—তোমার সঙ্গে গল্প করব। একটু পরে হয় ত কাব্‌লিটা আসবে। এ কি! হঠাৎ পাখা চল্‌ল কেন?"

বিন্দু উত্তর করিল না। অজয় হরেকে ডাকিল। হরে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ পাখা চল্‌ল কেন রে?"

"কোম্পানী থেকে মিস্ত্রী এসে এই মাত্র তার লাগিয়ে দিলে।"

"কেন লাগালে?"

"তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে।"

"কে দিলে?"

"নিসিংহ বাবু।"

"সে শুধু শুধু দিতে গেল কেন ?"

"মা ঠাক্‌রুণ তাঁর বাপের বাড়ীতে একখানা চিঠি নিয়ে কাল রাত্তিরে আমাকে যে পাঠিয়েছিলেন।"

"কার কাছে ? নৃসিংহর কাছে ?

"হ্যাঁ। তিনি আজ সকালে বললেন, টাকা জমা দিতে বেলা দশটায় লোক যাবে।"

"আজ সকালে আবার কি করতে সেখানে গিয়েছিলি ?"

"মা ঠাকরুণ আবার একখানা কি চিঠি লিখেছিলেন।"

বিন্দুর দিকে ফিরিয়া অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আবার কি লিখেছিলে ?"

হরেকে বিদায় দিয়া বিন্দু উত্তর করিল, "আট হাজার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম।"

"তার পর ? নৃসিংহ কি বললে ?"

"লিখেছে, বাবুর বিনা হুকুমে অত টাকা দিতে পারবে না।"

অজয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, "আর উপায় নেই বিন্দু।"

"মা দুর্গা উপায় করবেন—ভয় কি ?"

"নিয়তি লঙ্ঘন করবার শক্তি মা দুর্গারও নেই—আমার কর্ম্মের ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে, তোমাকে ভোগ করতেই হবে। তোমাকে চিনলুম, গৃহে যে কত সুখশান্তি তা'ও বুঝলুম, কিন্তু জীবনের শেষ দিনে—"

"তুমি ও কি বলছ ? আত্মহত্যা করবে না কি ?"

"না করে উপায় কি ? আমি জেলে গিয়ে ঘানি টান্‌তে পারব না—কেঁদো না বিন্দু—আচ্ছা কাঁদ—আমার জন্যে কাঁদবার কেউ আছে জেনেও সুখ।"

বিন্দু কান্না আর সামলাইতে পারিল না—উঠিয়া কক্ষান্তরে গেল। অনেক ডাকাডাকির পর যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ চোখ রক্তবর্ণ। অজয় কহিল, "তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে বিন্দু—এত সুন্দর আমি কাউকে দেখি নি।"

বিন্দু কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অজয় কহিল, "এই আমাদের শেষ দেখা—দুর্ল্লভ মানব জনমের এইখানেই পরিসমাপ্তি। কত সুখ সাধ নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলাম, কত আশা নিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম! জীবন আরম্ভ হ'তে না হ'তেই যবনিকা পড়ে গেল। কত সুখী হ'তে পারতাম, আর কত দুঃখের বোঝা নিয়ে চললাম।"

বিন্দু চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল। অজয় ক্ষণপরে কহিল, "দোকানখানা রেখে গেলাম তোমার জন্যে, তা'তে তোমার বেশ চলে যাবে। কিন্তু তোমার আশ্রয় রইল না। এ বাড়ী অনেক টাকায় বাঁধা, বেচে দেনা শোধ দিতে পারলে হাতে কিছু টাকা হ'ত। তুমি সরিতের কাছে যেও না—সে অতি নীচ—নিজের স্বার্থের জন্যে সে মা-বোন্‌কে বেচ্‌তে পারে। প্রণব এলে তা'র কাছে যেও—সে দেবতা। আর ত কেউ দুনিয়ায় নেই, প্রণব যতদিন না ফেরে ততদিন কোথা দাঁড়াবে ?"

বিন্দু স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল, তাহার গণ্ড বাহিয়া তখন অশ্রু গড়াইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে—বেলা তখন চারটা—অজয় কহিল, "এক উপায় ছিল বিন্দু—না, সে কথা তোমায় বলব না।"

"কি বল।"

"না, সে জঘন্য কথা বলে তোমার কান অপবিত্র করব না।"

"উপায় জঘন্য হ'তে পারে না—বল।"

"কাল রাতে আমি যখন বিনির ওখান হ'তে উঠে আসি, তখন বলাইও আমার সঙ্গে ওঠে। গাড়ীতে তুলে আমাকে তা'র বাড়ী নিয়ে গল। সেখানে আমার কাছে এক জঘন্য প্রস্তাব করলে—"

"প্রস্তাবটা কি ?"

"বলব বিন্দ ? তুমি কিছু মনে করো না—সে বললে, যদি তুমি তার কাছে ব'সে মাথার কাপড় খুলে আধ ঘণ্টা বাক্যালাপ কর, তা'হ'লে সে টাকা দেবে। আমি রাজি হই নি—ঘৃণার সহিত তা'র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি।"

বিন্দু অধোবদনে ক্ষণকাল চিন্তা করিল, পরে কহিল, "এতে ঘৃণার কথাটা কি ? আমি দেখা দেব।"

"তোমাকে সব বলি নি বিন্দু—"

"আর কি ?"

"হতভাগা বলে কি না সে ঘরে আর কেউ থাকবে না—শুধু তুমি আর সে।"

বিন্দু আবার চিন্তামগ্ন হইল। ঘড়িতে এক ঘা বাজিল, অজয় দেখিল বেলা সাড়ে চারিটা। কহিল, "বেলা পাঁচটার সময় বলাইয়ের আসবার কথা আছে—আর আধ ঘণ্টা।"

"তিনি আসবেন না কি ?"

"বলেছে ত টাকা নিয়ে আসবে। যদি আমরা তার প্রস্তাবে রাজি হই, তাহলে দোকানখানা নিয়ে সব টাকাটাই দেবে।"

"তুমি বোলো, আমি—আমি রাজি আছি।"

"তুমি রাজি থাকতে পার, কিন্তু আমি রাজি নই। আজও আমি এত নীচ হই নি যে, আত্মরক্ষার্থে আমার গৃহলক্ষ্মীকে সেই লম্পট মদ্যপ ঘৃণিত পশুর লালসাপূর্ণ দৃষ্টির সাম্‌নে দাঁড় করাব।"

"বাপের সামনে মেয়ে যাবে তা'তে দোষ কি ?"

"তার সামনে আমি তোমাকে যেতে দেব না।"

"আচ্ছা, আমি তা' বুঝে নেব, তিনি আসুন ত।"

হরে আসিয়া সংবাদ দিল, নীচে একটা কাবলি এসেছে।

অজয়,—"বলগে যা' বসতে, আমি যাচ্ছি।"

হরি বিদায় হইলে অজয় রোরুদ্যমানা বিন্দুকে কহিল, "আর কেঁদে কি হবে বিন্দু, যা ভাগ্যে আছে তা' ঘটবেই। আমাকে বিদায় দেও—একবার আমার বুকে এসে বল আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করলে।"

বিন্দুর সকল গাম্ভীর্য্য মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইল—অজয়ের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিন্দু ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অজয় তাহাকে বুকে ধরিয়া অনেক আদর করিল। আদর করিতে করিতে কহিল, "তোমার জন্যে বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে, কিন্তু—"

স্বামীর বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া বিন্দু মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর স্নেহাদরের আস্বাদ বিন্দু পাইয়াছে, সে রসানুভব তাহাকে তখন মাতাইয়া তুলিয়াছে। সে তেজের সহিত কহিল, "তোমাকে বাচতেই হবে।"

"সে বাঁচা, মরা অপেক্ষা ঘৃণিত ও দুঃখময়।"

"তুমি ভেবো না, মা দুর্গা তোমাকে রক্ষা করবেন; তিনি আমার কাতর প্রার্থনা কখন উপেক্ষা করবেন না।"

কথাটা কিন্তু অজয় উপেক্ষা করিল; কহিল, "এখন যাই, প্রস্তুত হই গে।"

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিল। উভয়ে চমকিয়া উঠিল। হরে আসিয়া সংবাদ দিল, বলাই বাবু এসেছেন।

বিন্দু কহিল, "তাঁকে সিঁড়ির পাশে ছোট ঘরে বসতে বল গে।"

হরে বিদায় হইল। অজয় কহিল, "আমি তা'র কাছে তোমাকে যেতে দেব না বিন্দু, তার চেয়ে আমার মৃত্যু শ্রেয়।"

"তুমি যাও, কাবলিটাকে একটু বসিয়ে রেখো।"

অজয় নীচে গেল না, নিজের ঘরের দিকে গেল। বিন্দু তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দেরাজ হইতে একখানা তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ক্ষিপ্রহস্তে বাহির করিয়া জ্যাকেটের নীচে লুকাইয়া রাখিল। তৎপরে চঞ্চলচরণে স্বামীর কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইল।

(২৯)

প্রয়াগ—যমুনাকূল—মহালয়া—অপরাহ্ণ।

মঙ্গল, পার্শ্বে উপবিষ্টা দেবরাণীকে কহিল, "আজ তর্পণ শেষ হ'ল রাণি।"

দেবরাণী উত্তর করিল না—যমুনা পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

"কাল আমি যাব—"

"তা' আমি অনেকবার শুনেছি—আর শোনাবার দরকার নেই।"

"কিন্তু ছুটী ত পাই নি।"

"মা ত তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন।"

"কিন্তু তোমার অনুমতি ত পাই নি—"

"আমি কে যে আমার অনুমতি—"

"তুমি আমার হৃদয়রাণী—"

"ছি! ও কথা আর বলো না।"

"কেন রাণী ?"

"তোমার সঙ্গে হয় ত আমার এ জীবনে আর দেখা হবে না।"

"নিশ্চয় হবে, আমি চার পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরব।"

"ফের ভাল, না ফের ক্ষতি নাই।"

"এ কথা বলছ কেন রাণী ?"

"তুমি ত আকাশের পাখী, পথের মাঝে হঠাৎ দেখা হয়েছিল—"

"পাখী এখন এইখানেই বাসা বাঁধবে।"

"এখানে তেমন গাছ নাই, বাসা বাঁধার সুবিধা হবে না—তুমি যেখানকার পাখী সেইখানে যাও।"

"হেঁয়ালি ছাড়, মনের কথা খুলে বল।"

"খুলে বলব দাদা?"

মঙ্গল চমকিয়া উঠিল। রাণী সহসা দাদা বলিয়া ডাকিল কেন? দাদা বলাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু রাণী দাদা বলে নাই, আজ সহসা বলিল কেন? মঙ্গল, রাণীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল; দেখিল, মুখখানি ম্লান, কিন্তু প্রতিজ্ঞাদৃঢ়।

মঙ্গল ডাকিল, "রাণি—"

"কি?"

"খুলে বল।"

"আমি বিয়ে করব না।"

মঙ্গল বিস্মিত হইল। একটু চিন্তা করিল; তৎপরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমাকে ভালবাস না রাণি?"

"তোমার কি মনে হয়?"

"বাস—আমি যত বাসি, তা'র চেয়ে তুমি আমাকে বেশী ভালবাস।"

"হবে।"

"হবে বললে চলবে না—ঔদাস্যের ভারে মনের ভাব চাপা দিলে হবে না।"

"তবে আমাকে কি বল্‌তে হবে?"

"বিয়ে কেন করবে না?"

"বিয়েতে আমার মন নেই, তাই।"

"ফাঁকা কথা।"

"পীড়ন করো না, যা' বলবার তা' বলেছি।"

"তবে কি কুমারী থাক্‌বে?"

"ইচ্ছে ত তাই।"

"সহসা এ রকম ইচ্ছেটা হ'ল কেন?"

"আবার পীড়ন করছ?"

"নিশ্চয় করব, যতক্ষণ না কারণটা বল।"

"আমি বলব না।"

"তবে যা' অনুমান করেছিলাম তাই ঠিক।"

"কি অনুমান করেছিলে?"

"তা' বলব না।"

"তুমি কিছুই বোঝ নি।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মঙ্গল বিমর্ষ মুখে বসিয়া রহিল। রাণীর তাহা সহ্য হইল না, জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে বড় আমার কথার উত্তর দিলে না?"

"তুমি ত আমাকে কিছুই জিজ্ঞেসা কর নি রাণী।"

"বল, তুমি কি অনুমান করেছ?"

"সে দিন মার সঙ্গে আমার যা' কথা হ'য়েছিল তুমি আড়াল হ'তে তা' শুনেছিলে।"

"তার পর?"

"আগে বল সত্য কি না?"

"কিছু কিছু শুনেছি।"

"তাহলে আমার বুঝতে আর কিছু বাকি নেই।"

"কি বুঝেছ বল?"

"তুমি আমার জন্যে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিচ্ছ—"

"তোমার কথার ভাবই আমি বুঝতে পারলাম না।"

"ভাব ভালরকমই বুঝেছ—"

"তবে আমি কথাটা খুলে বলি। বিয়ে হ'লে ত শ্বশুরবাড়ী যেতে হয়, আমি বাপ-মাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারব না—"

"তাই তুমি বিয়ে করতে রাজি নও, এই কথা বলতে চাও, না?"

"হ্যাঁ। আমি নিজের সুখই খুঁজছি।"

"তুমি আমাকে মস্ত বোকা ঠাউরে থাক্‌বে, নইলে এ কৈফিয়ত দিতে না।"

"তবে আমাকে কি বল্‌তে হবে?"

"সত্য কথা। কোন অবস্থায় মিথ্যা বলবে না—সত্য বলতে কখন লজ্জা বা সঙ্কোচ করবে না। তবে যদি দেখ মিথ্যা বললে পরের উপকার হয় তাহলে মিথ্যে বলতে পার।"

দেবরাণী মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল; ক্ষণ পরে কহিল, "আমার অপরাধ হয়েছে, আমি মিথ্যা বলেছি।"

"তবে সত্য বল।"

"আমি বলতে পারব না।"

"তবে আমি বলি?"

"বল।"

"পাছে আমা হতে পিতা প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হ'ন, তাই তুমি আমাকে আমার কর্ত্তব্যপথে স্থির রাখবার জন্যে বিয়ে করতে রাজি হ'চ্ছ না।"

রাণী উত্তর করিল না, অধোবদনে বসিয়া রহিল। মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল, "বল—আমার অনুমান সত্য কি না।"

"সে যাই হো'ক, আমি আজীবন কুমারী থাক্‌ব।"

মঙ্গল সহসা সে কথার উত্তর করিল না। আকাশে ছিন্ন মেঘ ভাসিয়া যাইতেছিল, তারই ছায়া বুঝি মঙ্গলের মুখের উপর পড়িয়া তাহার সদাপ্রফুল্ল বদনখানির জ্যোতিঃ ম্লান করিল। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া মঙ্গল কহিল, "আমার কপালে সুখ নেই রাণী, যাকেই আমি বিয়ে করি আমি সুখী হ'তে পারব না।"

কেন পারবে না?—যাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির আছে তিনি হয় ত পরমাসুন্দরী—"

"পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হ'লেও তিনি ত আমার রাণী ন'ন।"

"রাণী কীটাণুকীট, তার কথা ভুলে যাও।"

"ভুলতে পারছি কই? প্রথম দর্শন হ'তে এই কয় মাস নিয়ত যুঝেছি, কিন্তু ভুলতে পেরেছি কই? বিন্দুর স্থানে তোমাকে বসাতে কত চেষ্টা করেছি, পিতার প্রতিশ্রুতি স্মরণ ক'রে তোমার সান্নিধ্য হ'তে দূরে পালাবার কতবার সঙ্কল্প করেছি, কিন্তু পেরেছি কই? তুমি আমার সমস্ত শক্তি হরণ করেছ—আমাকে অসংযমী বালকে পরিণত করেছ—"

"ছি ছি, এ সব কথা আর বলো না—"

"বল্‌তে হচ্ছে যে রাণী! এতদিন তৃণখণ্ড অবলম্বন করে আমি এ দুর্ব্বার সমুদ্র অতিক্রম করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, কিন্তু যে দিন মা এই তৃণটুকু কেড়ে নিয়ে বলে দিলেন দেবরাণী তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছে, সেই দিন আমি স্রোতোমুখে দেহ মন ছেড়ে দিয়েছি। আর ত আমি ফিরে দাঁড়াতে পারছি না—আমি শক্তিহীন অবলম্বনশূন্য।"

"স্থির হও—সে দিন বাবার কাছে কি বলেছিলে মনে করে দেখ।"

"সে দিন কি বলেছিলাম তা' আমি ভুলে গেছি; সংযমের বাঁধ এখন ভেঙ্গে গেছে—রুদ্ধ বারিরাশি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। আমি এখন আমার রাণীর—"

"আর রাণী যদি মরে যায়?"

"তা' হ'লেও আমি মনে প্রাণে তা'র!"

এমন সময় হরিশঙ্কর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিলেন, "কাল তোমার যাওয়া হবে না মঙ্গল—"

"কেন?"

"আমরাও তোমার সঙ্গে যাব স্থির করেছি।"

"আপনারা ত এইখানেই এখন থাকবেন স্থির ছিল।"

"নাঃ, এ জায়গাটা আর ভাল লাগচে না। কোলকাতায় গিয়ে বায়স্কোপে "দুর্গেশনন্দিনী" দেখতে ইচ্ছে হয়েছে—বায়স্কোপ আমার বেশ লাগে।"

"তা'হলে বায়স্কোপ দেখতে কোলকাতায় যাচ্চেন?"

"ঠিক তা' নয়, আরও অনেক কাজ আছে। বাড়ীটায় এতদিন লোক ছিল; খবর পেয়েছি খালি হয়েছে। 'তার' করে দিয়েছি—আমরা যাচ্ছি। এখুনি ষ্টেশনে যাব, রিজার্ভের জন্যে—তোমরাও চল।"

মঙ্গল হাসিতে হাসিতে উঠিল। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্যের ভূমিকা

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম-এ, পি-আর-এস

(এক)

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন, কত বিভিন্নমুখী সে সাহিত্যের গতি, কত বিচিত্র তাহার প্রকাশ! তাঁহারাই আবার এ কথাও জানেন যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই বৈচিত্র্য আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে নাই। যে সাহিত্য-রূপের মধ্যে কল্পনা লইয়াই বেসাতি, মনের লীলাই যেখানে সমস্ত রাজ্য জুড়িয়া আছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও কল্পনা অপরূপ বিচিত্রতায় ফুটিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছে। কিন্তু যেখানে এই বস্তু-জগতের মানব-জীবনের ঘটনার তরঙ্গলীলা এই ইন্দ্রিয়-জগতের সকল দৃশ্য বস্তুকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে, রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভা সেই বিচিত্রতার মধ্যে বিহার করিতে পারে

নাই—সর্ব্বদাই তাহার পশ্চাতের অতীন্দ্রিয় ভাববস্তুটীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তবে তাঁহার প্রতিভা তৃপ্তি পাইয়াছে। সেইজন্যই আমার মনে হয় শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন বলিয়াছিলেন

"—রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, ছোটগল্পে, উপন্যাসে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে মূল সুর তাহার বিচিত্র খেলা আছে, বিশ্ব-মানবিকতায় তিনি বাল্‌জাক্, ব্রাউনিঙ্, হুগো প্রভৃতি কোনো লেখক হইতেই ন্যূনতর ন'ন বটে, তবে তাঁর মানবসৃষ্টিতে সেই বৈচিত্র্য কোথায়, সে বাস্তবতা কোথায়, সে অভিজ্ঞতার স্তরপর্য্যায় কোথায়, সে উত্থানপতনের তরঙ্গমালা কোথায়, সে পাপপুণ্যের ঘাতপ্রতিঘাত কোথায়, যাহা সমুদ্রের মত য়ুরোপীয় সাহিত্যকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে। এইজন্য লিরিক্ কাব্যে যেখানে বস্তুর বালাই নাই, শুধু ভাবের লীলাসঙ্গীতে তিনি ক্রন্দমান সেখানে তিনি অতুল। এইজন্য ছোটগল্পে যেখানে ঘটনার চেয়ে ঘটনার মর্ম্মনিহিত সুরটিই রচনার যোগ্য সেখানেও তাঁর তুলনা নাই; কিন্তু নাট্যোপন্যাসে নয়, অবশ্য রূপক নাট্য বাদে।"

তখন তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে রবীন্দ্রনাথ ঠিক্ বাল্‌জাক্ ব্রাউনিঙ্ বা হুগোর যুগের লেখক নহেন—পৃথিবীর চিন্তা-ধারা, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শ সে যুগ হইতে অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে। ঘটনার স্তর-পর্য্যায় উত্থান-পতনের তরঙ্গমালা মানব-হৃদয়কে বিচিত্র দোলায় দোলায়, চিত্তকে সংক্ষুব্ধ করে এ কথা সত্য; কিন্তু য়ুরোপীয় সাহিত্যও উন-বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যখন সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, বাস্তব ঘটনার তরঙ্গলীলার মধ্যে মানুষের জীবনের সংক্ষুব্ধ সংগ্রামের আপাত-অভিভবের মধ্যে সাহিত্যকে নিবদ্ধ হইতে দিলে চলিবে না—তাহাকে বুঝিতে হইবে সকল ঘটনার সকল সংগ্রামের মর্ম্মার্থটিকে—ভারতবর্ষের প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধান ও সাহিত্যাশীলন যেমন করিয়া সকল ঘটনা সকল সংগ্রামের পশ্চাতে খুঁজিয়াছে, সন্ধান লাভ করিয়াছে একটি চরম সত্যের, একটী গোপন রহস্যের। সেইজন্যই কি ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, কি ইব্‌সেন, কি মেটারলিঙ্ক, সকলের রচনার মধ্যেই পাই একটা নীরবতার সাধনা, একটী মুখর স্তব্ধতার পূজা—ইঁহাদের, বিশেষ করিয়া মেটারলিঙ্কের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে আছে একটী মগ্নচৈতন্যের রাজ্য যেখানে একটী মানবাত্মা অপর একটী মানবাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে বাক্যহীন ভাষায় কথা বলে। কর্ম্ম-ক্লান্ত সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধ য়ুরোপের মর্ম্মস্থল হইতে একটি আর্ত্তনাদ ইঁহাদের শ্রুতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল··সে আর্ত্তনাদের সান্ত্বনা ইঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে সুরু করিয়া য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই জিনিষটাই শিল্পরূপ পাইতেছে, যে, শান্তি ও নীরবতার মধ্যেই মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে ও জানিতে পারে—উত্থান-পতনের ঘাত প্রতিঘাতের তরঙ্গমালার মধ্যে নয়, মানুষের একটুখানি শান্ত দৃষ্টির মধ্যে, একটী মুহূর্ত্তের নীরব পরিচয়ের মধ্যে, একটী মহেন্দ্রক্ষণের হস্তস্পর্শের মধ্যেই সমস্ত জীবনের রহস্য নিহিত আছে—সেই একটী মুহূর্ত্তেই যাহা জানিবার, বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার, তাহা আমরা জানিতে, বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারি। ইহাই হইতেছে নবীন য়ুরোপীয় সাহিত্যের মূল সুর—য়ুরোপে ইহার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের সাহিত্য নায়কেরা। মেটারলিঙ্ক নিজেই তাঁহার এক প্রবন্ধে এই সুরের আভাস প্রদান করিয়াছেন—

"Indeed it is not in the actions but in the words that are found the beauty and greatness of tragedies that are truly beautiful and great; and this is not solely in the words that accompany and explain the action, for there must perforce be another dialogue beside the one which is superficially necessary. And, indeed, the only words that count in the play are those that at first seemed useless, for it is there-in that the essence lies. Side by side with the necessary dialogue will you almost find another dialogue that seems superfluous; but examine it carefully, and it will be borne home to you that this is the only one that the soul can listen to profoundly, for here alone is it the soul that is being addressed."

("The Treasure of the Humble"—
The tragical in daily life Pp 111)

এই মেটারলিঙ্কই অন্যত্র বলিয়াছেন—

"It is no longer a violent, exceptional moment that passes before our eyes—it is life itself. Thousands and thousands of law's there are, mightier and more venerable than those of passion. ..It is only in the twilight they can be seen and heard, in the meditation that comes to us at tranquil moments of life."

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই নবোদ্বোধন-যুগের কবি—অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক। কিন্তু সাহিত্যের এই যে বিশিষ্ট সুর, ইহা রবীন্দ্রনাথের কাছে নূতন নয়, য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভিতর হইতে তিনি এই আদর্শের সন্ধান লাভ করেন নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সমস্ত মর্ম্মকে উদ্ঘাটন করিয়া এই আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—উপনিষদের ইহাই মর্ম্মকথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সত্যকেই জীবনে সাধনা করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের আদিপর্ব্বের সমস্ত সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার ভিতর হইতে এই চিরন্তন সত্যটিকেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। Factsএর ভিতর তাঁহার কবিধর্ম্ম ততটা বিকশিত হয় নাই, যতটা হইয়াছে abstraction এর ভিতর—যখন পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যানুভূতির মধ্যেও ডুবিয়া আছেন তখনও যাহা দৃশ্য যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে ভোগ করিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে তিনি আনন্দসৃষ্টি করিতে পারেন নাই; খুঁজিয়াছেন symbolকে, অরূপকে, রূপাতীতকে—প্রমাণ—"উর্ব্বশী"; জীবনের দৈনন্দিন অসংখ্য অসংখ্য ঘটনার উপর দিয়া শুধু চোখ বুলাইয়াছেন কিন্তু মন ডুবিয়া গিয়াছে তাহাদের অনেক নীচে—সেই অন্তরের তলদেশে যে কোনো কথা বলেনা, কোনো কাজ করেনা, প্রশান্ত স্থির যোগাসনে শুধু বসিয়া থাকে—প্রমাণ—তাঁহার অসংখ্য ছোট গল্প।

গান ও কবিতা, নাট্য ও নিবন্ধ, শিল্প ও উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ অজস্র রচনা করিয়াছেন; কিন্তু আজ যদি কেহ প্রশ্ন করে—কোন্ বিষয়ে প্রতিভা তাঁহার সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে হঠাৎ তাহার কিছু জবাব দিতে পারা যায়না। তবে একটা জিনিষ খুবই সত্য বলিয়া মনে হয় যে মানব-চিত্তের দ্বন্দ্ব যেখানে যত নিবিড় ও প্রবল, সংগ্রাম যত সূক্ষ্ম ও বিচিত্র, অথচ কার্য্যের মধ্যে, বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে, দৃশ্য ঘটনার মধ্যে যাহার প্রকাশ খুব কম এবং সেই অনুপাতে হৃদয়ের মধ্যে যাহার অনুভূতি খুব তীব্র মানব-চিত্তের সেই রহস্যের শিল্পরূপ যাহার মধ্যে যত বেশী, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেইখানে তত বেশী ফুটিয়াছে। সেইজন্য দেখি যেখানে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত খুব বেশী, জগৎ ও জীবনের উত্থান-পতনের তরঙ্গমালা যেখানে ঠেলাঠেলি করিয়া মরিতেছে, শতকণ্ঠের কোলাহল যেখানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেইখানে মূক হইয়া গিয়াছেন। সেই কলহের মধ্যে, সেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, সেই উত্থান-পতনের তরঙ্গ-লীলার মধ্যে তিনি নিজকে কখনো জড়াইতে পারেন নাই—দূরে থাকিয়া এ সকলের অন্তরের মধ্যে যে মূল সুরটি তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্যই নাটক বলিতে সাধারণত যে ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যবহুল সাহিত্যের রূপ আমরা বুঝিয়া থাকি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সে নাটকের সৃষ্টি নাই। তাঁহার হাতে নাটক যে-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা মোটেই ঘটনাগত নহে, ভাবগত। এবং এইজন্য রবীন্দ্রনাট্যের একটা বিশেষ রূপ আছে, যাহা বাংলা নাট্য-সাহিত্যে তো নাইই—সংস্কৃত নাট্যেও ঠিক্ তেমনটি দেখা যায়না। কিন্তু ঘটনার লীলাবৈচিত্র্যই যাহার প্রাণ, যেমন সাধারণ নাট্য ও উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেইখানে সার্থক হইতে পারে নাই। সেইজন্যই উপন্যাস তাঁহার হাতে ততটা জমিয়া উঠে নাই, যতটা জমিয়াছে ছোটগল্প, যেখানে বস্তুর ঠেলাঠেলি নাই, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত নাই, আছে শুধু বস্তুর পশ্চাতে ঘটনার পশ্চাতে বস্তুর ও ঘটনার ছায়ারূপ। সেইজন্যই গীতিকাব্যে, ভাবনাট্যে, ছোটগল্পে বিশ্বসাহিত্যে সত্যই রবীন্দ্রনাথের তুলনা নাই। উপন্যাসেও সেইখানেই তিনি সার্থকতা লাভ করিয়াছেন যেখানে একটী একটী চরিত্রের মধ্যে মানবচিত্তের অতি সূক্ষ্ম সুকঠিন ভাবরহস্যকে তিনি রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। সেখানেও তিনি অতুল। তেমন দু'টী উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ'। কিন্তু এই যে উপন্যাস দু'টি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা উহাদের স্পষ্ট চরিত্রের বৈচিত্র্যের জন্য নহে, বাস্তব ঘটনার তরঙ্গপর্য্যায়ের জন্য নহে,—বরং উহাদের কিছুই ঐ উপন্যাস দুইটিতে নাই; সার্থক হইয়াছে

উহাদের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে মানবচিত্তের যে অতিসূক্ষ্ম সুতীব্র সুনিবিড় ভাবরহস্য অতি নিপুণ ভাবে অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে তাহারই জন্য। কিন্তু এই ভাবে উপন্যাসকে সার্থক করিতে তুলিতে গিয়া কবিকে উপন্যাসের এক নূতন রূপ, এক অভিনব ভঙ্গিমার আশ্রয় লইতে হইয়াছে—যাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রাচীন ও আধুনিক খুব কম সাহিত্যেই আছে। 'চতুরঙ্গ' বা 'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে দামিনী শ্রীবিলাস, নিখিলেশ, বিমলার জীবনের ঘটনার ও কার্য্যলীলার মধ্য দিয়া তাহাদের পরিচয় আমরা ততটা পাইনা—যতটা পাই তাহাদের চরিত্রের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট রেখাগুলিকে অনুসরণ করিয়া। উপন্যাসের এই ভঙ্গিমা ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন এখন তুলিব না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ভঙ্গিমাকেই তাঁহার ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। এবং এইজন্যই এই দুইটি পুস্তকের কোনোটিতেই পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া যান্ নাই, একটী চিত্তের ভাবচ্ছায়ায় আর একটী চিত্তের ভাবচ্ছায়াকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। উপন্যাসের ন্যায় রূপক-নাট্যেও তাঁহার বিশিষ্ট ভাবের বিশিষ্ট প্রকাশের জন্যই একটা বিশিষ্ট রূপসৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল—বাহির হইতে কোনো কিছুর প্রভাব তাঁহাকে এই নাট্যভঙ্গিমা দান করে নাই।

আমার তো মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাব ও চিন্তাকে যখন একটা রূপক রহস্যের ভিতরে নাট্যরূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহার মধ্যে তিনি শিলাময় জীবনকে ততটা স্থান দিতে চাহেন নাই, যতটা চাহিয়াছেন সমস্ত জীবনকে একটা পরিপূর্ণ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করিতে; আমাদের প্রতিদিনের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের, আমাদের কাল্পনিক ও ব্যবহারিক জগতের পশ্চাতে, আমাদের দৃশ্য ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির পশ্চাতে যে সুমহান্ সত্য নিরন্তর বিচিত্র ছন্দে আন্দোলিত হইতেছে তাহাকেই রূপ দান করিতে। তাঁহার কবিতাগুলিতে আমরা দেখি জীবনের নানান্ বিচিত্র দুঃখ ও বেদনা, তৃপ্তি ও আনন্দের অনুভূতিকে তিনি খণ্ড খণ্ড ভাবে উপভোগ করিয়াছেন, এক ভাবলোক হইতে অন্য ভাবলোকের মধ্যে ধীরে ধীরে আপনার রসতৃষ্ণাকে রূপায়িত করিয়াছেন, কিন্তু নাটকের মধ্যে ঠিক্ এই জিনিষটির অভিজ্ঞতা আমরা খুব কমই পাই। সেখানে আমরা পাই, জীবনের যে ভাবলোকের মধ্যে যখন তিনি বাস করিয়াছেন তাহার সমস্ত খণ্ড ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ও অনুভব এক হইয়া গিয়া একটা পরিপূর্ণ সত্যকে ব্যক্ত করিতেছে। ডাকঘর হইতে আরম্ভ করিয়া কি শারদোৎসব, কি ফাল্গুনী, কি মুক্তধারা, কি রক্তকরবী সর্ব্বত্রই এই জিনিষটা কেমন করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে আমরা ক্রমে তাহা প্রত্যক্ষ করি।

(দুই)

নাটক বলিতে সাহিত্যের একটা বিশেষ ভঙ্গিমাকে আমরা বুঝিয়া থাকি যাহা কাব্য কিংবা উপন্যাস হইতে পৃথক। কবি যখন কাব্য রচনা করেন, তখন তিনি নিজেই নিজের কাছে আপন মনে কথার পরে কথা বিচিত্রছন্দে গাঁথিয়া তোলেন—প্রাচীন মহাকাব্য ছিল আবৃত্তির জন্য, এখনকার গীতিকাব্যও ঠিক্ আবৃত্তির জন্য না হইলেও, আপন মনে পাঠ করিবার জন্য। তাহার রস ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধির জন্য কবিকে কিংবা পাঠককে তাঁহার সঙ্গে আর কাহারো উপস্থিতিকে কল্পনা করিতে হয়না। উপন্যাসও তাহাই—বরং কাব্যের চাইতেও বেশী, স্বয়ং সম্পূর্ণ, ইংরাজীতে যাহাকে বলি Self-contained। লেখক তাঁহার কল্পনা ও সৃষ্ট চরিত্রের সার্থকতার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন মনে করেন উপন্যাসের মধ্যে সবটুকুই বলিবার ও প্রকাশ করিবার সুযোগ যথেষ্ট। কিন্তু নাটকে কিছুতেই তাহা সম্ভবপর নয়—কাব্যে উপন্যাসে ভাবের ও ঘটনার বিবৃত্তি আছে, বর্ণনা আছে; কিন্তু নাটকে আছে কথার ও কাজের সাহায্যে বাস্তব ঘটনার অনুবৃত্তি বা অনুকরণ, অভিনেতার সাহায্যে নাটকে বর্ণিত কথা ও সৃষ্ট চরিত্রকে পূর্ণতর করিয়া দর্শকের আঁখির দৃষ্টি ও মনের অনুভবের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। নাটকের মধ্যে সব কথা বলিবার স্থান নাই, সব চরিত্রকে পরিপূর্ণ করিয়া ফুটাইবার সুযোগ নাই—তাহার জন্য নির্ভর করিতে হয় অভিনেতার উপর, রঙ্গমঞ্চের উপর। সেই জন্যই সাহিত্যের এই বিশেষ ভঙ্গিমা অভিনেতা, অভিনয়-মঞ্চ ও দর্শকের সঙ্গে একান্ত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত—শুধু পুস্তকের মধ্যে তাহার সমস্ত কথা ও ঘটনার বিবৃতি পাঠ করিয়া নাট্যরসের সম্পূর্ণ উপলব্ধি কিছুতেই হয়না। নাটক পড়িবার সময় কল্পনাকে সর্ব্বদাই

এমন করিয়া সজাগ রাখিতে হয় যে তার বর্ণিত সমস্ত বস্তু ও দৃশ্য যেন চোখের উপর অভিনীত হইতেছে কিন্তু উপন্যাসে ইহার ততটা প্রয়োজন অনুভব করা যায়না। নাটকের এই বিশেষ ভঙ্গিমা, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ও য়ুরোপের প্রাচীন গ্রীক নাটক হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে—আমাদের কালিদাস, ভবভূতির নাটক, গ্রীসের য়্যাটিক্ ট্রাজেডি, ইংলণ্ডের ক্লাসিক ট্রাজেডি, অথবা তার পরেও রোমান্টিক যুগের নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের নাটকের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট; অভিনয়ের পাত্রপাত্রীর, রঙ্গমঞ্চের ও প্রেক্ষাগৃহের সজ্জা ও ব্যবস্থা এবং সর্ব্বোপরি নাট্যরীতির আদর্শ দেশে দেশে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিতও হইয়াছে; কিন্তু নাটকের এই মূল সূত্রটিকে এ পর্য্যন্ত কেহ অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু গত অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাটকের এক নূতন রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি হঠাৎ হয় নাই—ইহার পশ্চাতে একটু ইতিহাস আছে। ইংরাজী সাহিত্যে হ্বার্ড্‌স-হ্বার্থ, শেলি, ফরাসী সাহিত্যে বদ্‌লেয়ার, পো, হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষকে তাহার সমস্ত কথা ও কর্ম্মকে, প্রকৃতিকে, তাহার সমস্ত প্রকাশকে একটা অপরূপ অবাস্তব রহস্যের দিক্ হইতে—ইংরাজীতে যাহাকে বলি symbolical বা mystical দিক্ হইতে—বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে। এই প্রয়াস সব চাইতে বেশী করিয়া ফুটিয়াছে নাট্যে, কবিতায় ও ছোট গল্পে; তাহারই ফল মেটারলিঙ্ক, ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ, ইয়েটস্, আন্দ্রিদের রূপক-নাট্য। এই রূপক-নাট্য অভিনয়-মঞ্চ বা দর্শককে যেন কতকটা অবজ্ঞা করিয়াই চলিয়াছে—নাটক বলিতে আমরা এতদিন যাহা বুঝিয়া আসিয়াছি, রূপক-নাট্যের মধ্যে তাহার সবটুকু যেন কিছুতেই পাই না। অভিনীত না হইলেও ইহার মর্ম্মকথাটিকে বুঝিবার, ইহার রস ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সুযোগের কিছু অভাব হয় না। না হইবার কারণও আছে। পূর্ব্বে যে মগ্ন-চৈতন্যের রাজ্যের কথা, নীরবতার সাধনা স্তব্ধতার পূজার কথা বলিয়াছি, রূপক-নাট্য মনের সেই অরূপ বা রূপাতীত রাজ্যের সৃষ্টি। সে সৃষ্টির মধ্যে বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব নরনারীর সত্যকার কোনো স্থান নাই; নাটকের প্লটের, তাহার নরনারীর গতির বা কর্ম্মের কোনো প্রাধান্য সেইখানে নাই বলিলেও চলে। কোনো চরিত্র হয় ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভিনয়-মঞ্চের উপর চুপ করিয়াই কাটাইয়া দেয়; কেহ হয়ত দুটি একটির বেশী কথা বলে না, কেহ হয়ত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুপস্থিতই থাকিয়া যায়, কেহ হয় ত গানের পর গান গাহিয়াই চলে—খুব একটা সচল গতি, একটা দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম মঞ্চের উপর মুখর হইয়া উঠিয়া দর্শকের দৃষ্টি ও চিত্তকে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে একান্ত ভাবে সজাগ করিয়া তুলিবার সুযোগ সেখানে খুব কমই পাওয়া যায়। সেই জন্যই দেখা গিয়াছে রূপক-নাট্য অভিনয়ের জন্য সব সময় একটা অভিনয়-মঞ্চেরও দরকার হয়না, যে কোনো গৃহকে অথবা মুক্ত আকাশের নীচে একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আগাগোড়া একই দৃশ্যপটের সাম্‌নে সবটুকু অভিনয় করা যাইতে পারে,—রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' 'শারদোৎসব' 'ডাকঘর' সব নাটকের অভিনয়-সজ্জা সেইজন্যই এত সহজ সরল নিরলঙ্কার। না হইবেই বা কেন; রূপক-নাট্য প্রথম হইতেই বাস্তব-ঘটনাকে, চরিত্রকে কিছুটা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে—মানিয়া লইয়াছে ঘটনার ও চরিত্রের যাহা রূপ তাহার পশ্চাতে অরূপ অপ্রকাশকে, ইন্দ্রিয়-প্রকাশের পশ্চাতে অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিতকে; এই অরূপ অতীন্দ্রিয় জগৎই রূপক-নাট্যের জগৎ। সেই হেতুই দর্শক ও অভিনয়-মঞ্চ কতকটা লেখকের বিচার-বিবেচনার পশ্চাতে গড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে এবং নাটকের মধ্যে যে-সত্য ও যে ভাবের অনুভূতির প্রকাশ কবির উদ্দেশ্য, সেই সত্যটাই সমস্ত ঘটনার, সমস্ত কথাবার্ত্তা চালচলনের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার Geshart Hauptmannএর কথায় এই রূপক-নাট্যের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে—

"Action upon the stage will, I think, give way to the analysis of character and to the exhaustive consideration of the motives which prompt men to act. Possion does not move at such headlong speed as in Shakespeare's day, so that we present not the actions themselves, but the psychological states which cause them." বার্ণার্ড শ'র জীবনীলেখক সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক Archibald Henderson তাঁহার "European Dramatists" পুস্তকে August Strindbergএর একাঙ্ক নাটিকা সম্বন্ধে যাহা

বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্য সম্বন্ধেও তাহা সত্য— "His method of focal concentration of magnification of interest through intensiveness of treatment impartic to even his briefest efforts the most complete illusion of reality. In his esthetic creed, the dramatist must be magician, a hypnotist, weaving about the spectator a spell of atmospheric illusion which holds his attention with the utmost fixity, By elimination of all superfluity in the stages sets and the scenery, the dramatic figures appear as integral, organic parts of their surroundings." "They are essentially psychological even physical or fantastic in tone; they may present an allegory or a realistic glimpse of life at a crucial point. The "Stage business" of the mechanical order is virtually eliminated, the play of emotion, the movements in the depths of character, are portrayed less by outcries or by violent gestures, than by the play of facial expression, indicative through nobility." (Pp 56-57)

ইহাই রূপকনাট্যের রূপ, ভঙ্গিমা। রবীন্দ্রনাথের নাটক এই রূপ, এই ভঙ্গিমার ভিতর দিয়াই রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এক হিসাবে এই রূপকনাট্যগুলি ছোটগল্পেরই নাট্যরূপান্তর মাত্র। মেটারলিঙ্কের L 'Intruse, Les Sept Princes, L 'Interieur প্রভৃতি নাটকগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর অচলায়তন রক্তকরবী প্রভৃতি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের নাটকগুলির সত্যিকার কোনো প্লট নাই, কোনো গল্প নাই—শুধু আছে একটা অনুভূতিকে প্রকাশ করা। য়ুরোপীয় সাহিত্য-সমালোচকেরা তো এই ধরণের নাটককে সোজা no-plot plays বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন! কিন্তু এই যে রূপকের কথা বলিতেছি, অরূপের ব্যঞ্জনার কথা বলিতেছি, ইহার অর্থ কি— symbolism or mysticism বলিতে আমরা বুঝিয়াছি কি, এ কথাটি না জানিলে রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকে বুঝিবার সুবিধা হইবে না।

আমাদের মনে এক এক সময়ে এমন এক একটা চিন্তাধারা খেলিয়া যায়, এমন একটা রাজ্যের আভাস পাই, যে চিন্তাকে এই বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আনিয়া কিছুতেই কার্য্যে পরিণত করা যায় না, যে রাজ্যের সঙ্গে আমাদের এই প্রতিদিনের সংসারের কোনো মিল নাই, কোনো যোগ নাই —অথচ মনের মধ্যে তাহার অনুভূতি এত তীব্র, এত প্রবল, এত সত্য যে, তাহাকে কিছুতেই এড়ানো যায় না, তাহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই যে চিন্তাধারা, এই যে স্বপ্নরাজ্য, ইহার আভাস মানুষকে দিতে হইবে; কাজেই কবিকে, লেখককে আমাদের বাস্তব জগতের ভাষায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কবি যখন এই আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনই বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে অন্তরের অধ্যাত্ম-চিন্তাধারার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহাতেও কবির অতৃপ্তি থাকিয়াই যায়, কারণ যে-কথার যে-ভাষার আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেন, সে-কথা সে-ভাষা কিছুতেই তাঁহার সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতিকে পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। কাজেই কথাগুলি তাঁহার নিকট শুধু ছায়ামাত্র, আভাসমাত্র, গভীরতর অর্থের দিকে শুধু ইঙ্গিত করে মাত্র, তাহাকে পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে পারে না। প্রায়ই দেখা যায় এই ধরণের লেখার মধ্যে অতি ছোট একটা কথা, অতি সাধারণ একটা আলাপ, নগণ্য ক্ষুদ্র একটা প্রাণী, একটা অতীন্দ্রিয় অবাস্তব গভীরতর জগতের আভাস দেয় অথচ কিছুতেই তাহাকে সুনির্দ্দিষ্টভাবে বুঝা যায় না, ধরা যায় না। সেই জন্যই কি রূপক-কবিতায়, কি রূপক-নাট্যে, সমগ্র সাহিত্য বস্তুটী জুড়িয়া একটা মায়াময় কুহেলিকা যেন সব-কিছুকে ঢাকিয়া রাখে, পাঠকের চিত্তের উপর একটা মায়াস্পর্শ বুলাইয়া দেয় এবং মনের মধ্যে একটা স্বপ্নরাজ্য গড়িয়া তুলে। 'ফাল্গুনী'র কিম্বা 'শারদোৎসবে'র কিংবা 'ডাকঘরে'র হঠাৎ-বলা অনেকগুলি কথা আমরা ধরিতে পারি না বা বুঝিতে পারি না—বাস্তবিক পক্ষে সে কথাগুলি ধরিবার বা বুঝিবার জন্য নয়, অনেকগুলি কথা মিলিয়া একটা অনুভূতির আভাস-মাত্র মনের মধ্যে জাগাইবার জন্য। "মহারাজ আমার কথা বুঝবার জন্য নয়,—বাজ্‌বার জন্য" (ফাল্গুনী) এ কথাটার

একটা অর্থ আছে। সত্যই, রূপক-রচনায় সব কথা বুঝিবার জন্য নয়—শুধু মনের মধ্যে একটা সুরকে বাজাইবার জন্য—এই সুরই রূপক-রচনার সবখানি। 'ডাকঘরে'র 'ঠাকুর্দ্দা' অথবা 'অমল', অথবা ডাকহরকরা প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রায়ই কতকটা হেঁয়ালি, 'রক্তকরবী'র রঞ্জন, রাজা, নন্দিনী, এদের কিছুতেই ভালো করিয়া বোঝা যায় না, কারণ সমগ্র রচনাটী কোথাও ইহাদের ব্যক্তিত্বের দিকে, ইহাদের কর্ম্মকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে না, করে আমাদের দৃশ্য বস্তুর ও জগতের প্রত্যন্ত প্রদেশের সীমা ছাড়াইয়া একটা স্বপ্ন-জগতের দিকে। রঞ্জন, নন্দিনী, অমল, এরা সবই সেই স্বপ্নজগতের অধিবাসী, কাজেই এদের ভাষা রাজা অথবা কবিরাজ মশায় বা ঠাকুর্দ্দা ইহারা সহজে বুঝিতে পারে না, আর আমরা পাঠকেরাও তাহাদের কথার সুরটুকু শুধু ধরিতে পারি, কথাটিকে পারি না, ছায়াটিকে পারি, কায়াটী ছায়ার মত মিলাইয়া যায়। তাঁহার সব রূপক-নাট্যেই, পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রে যাহাকে বলে action তাহা নাই বলিলেই চলে, শুধু একটু কাঠামো মাত্র আছে, তাহারি ভিতর দিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া মানব মনের প্রকৃতি ও জগতের একটা সুমহান্ সুমধুর সত্য আবিষ্কার করি। মানুষ যে অনির্ব্বচনীয় অন্ধকারের মধ্যে তাহার অন্তরের মণিটিকে হারাইয়াছে, কবি যেন একটু আলোর আভাসে, একটু জ্যোতির ইঙ্গিতে সকলকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে চাহেন। কবিরাজ আসিয়া চরক-সুশ্রুত হইতে শ্লোক উচ্চারণ করে, রাজা শারদোৎসব করিতে বাহির হ'ন্, অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়ে, লোহার জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া রাজা ইহাদের উৎসবে যোগদান করেন, ঘটনা হিসাবে ইহাদের মূল্য কতটুকু? ইহারা তো মায়াছায়া মাত্র, কিন্তু ইহারাই একটা অমূল্য সত্যকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে—অমল মরিয়া যায়, উপনন্দ বসিয়া বসিয়া প্রভুর ঋণ-শোধ করে, আর নন্দিনী-রঞ্জন প্রাণ দেয়, কিন্তু ইহারা যে সত্যের আভাস দিয়া যায় সেই আভাস, সেই অনুভূতিই নিত্য, শাশ্বত। ইহারা যাহা করে তাহা একটা চঞ্চল মুহূর্ত্তের প্রকাশ মাত্র—ইহাদের কর্ম্মকে বুঝি অন্তরের নিত্য অনুভব দিয়া। ইহাদের রূপের মধ্যে, ইহাদের সীমার মধ্যে একটা অরূপের অসীমের আভাস। সাহিত্যের কোনো বিভাগ যে এই রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহার কারণ এই যে মানুষের ভাষা কিছুতেই মানব-মনের সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতিকে ভালো করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, লেখক অথবা কবিকে বাধ্য হইয়াই তখন অন্য কিছুর আশ্রয় খুঁজিতে হয়, অথচ তাহা সৃষ্টি করিবার উপায় নাই। ব্রাউনিঙ্ তাঁহার "The Ring and the book" কবিতায় ভাষার এই দীনতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"Art may tell a truth,
Obliquely, do the thing shall breed
the thought
Nor wrong the thought, missing
the mediate word.
So may you paint your p cture,
twice show truth
Beyond mere imagery on the wall—
So, note by note, bring music from
your mind
Deeper than ever e'en Bethoveu did."

রূপক-নাট্য কি রূপক-কবিতায় যে একটা অস্পষ্টতা, একটা কুয়াসার জাল আচ্ছন্ন হইয়া থাকে তাহার কারণ ইহাই। অথচ আমরা জানি, কি স্বদেশে কি বিদেশে এই যুগে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ভাষাসম্পদ্ আর কাহারই বা আছে! সকল যুগের সকল দেশের মানব-প্রকৃতির মনের কত সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতিকে তিনি তাঁর অনির্ব্বচনীয় ভাষায় রূপায়িত করিয়াছেন, কত বাক্যহীন মূককে ভাষা দিয়াছেন, কিন্তু এমন সূক্ষ্মতর অনুভূতিও কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে যাহা ফুটাইয়া তুলিতে তিনিও ভাষা পা'ন্ নাই, মূক হইয়া গিয়াছেন—এবং আকার-ইঙ্গিতে তাহার আভাসমাত্র দিয়াছেন। অমল কি তাহার দূরের অজানার অনুভূতিকে ভাষা দিতে পারিয়াছে, রঞ্জন কি তাহার ভালবাসাকে কথায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছে, নন্দিনী কি তাহার জটিল অনুভূতিকে ফুটাইতে পারিয়াছে? কবির মনে ইহাদের প্রত্যেকের অনুভূতি অতি তীব্র, অতি একান্ত ভাবে সত্য—কিন্তু সেই সুতীব্র অনুভূতি, সুনিবিড় সত্যের সম্মুখে কবির ভাষা মূক হইয়া যায়; শুধু অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি জাগিয়া থাকে!

& PRINTING WORKS

(তিন)

ইহাই রূপকের রূপ। কিন্তু এ রূপ রবীন্দ্রনাথ পাইলেন কোথায়? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ রূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে নূতন নয়। এ কথা সত্য যে আমাদের বাংলা সাহিত্যে রূপকের এই বিশেষ অভিব্যক্তি কোথাও দেখা যায় নাই, সংস্কৃত সাহিত্যেও খুব কমই আছে; কিন্তু আমাদের দেশের ভাব ও চিন্তাধারার মধ্যে এই রূপকের সন্ধান আমরা যথেষ্ট পাই। ইন্দ্রিয়-জগতের পশ্চাতে অতীন্দ্রিয় জগৎকে জানিবার সাধনা, ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তির অন্তরাত্মার সন্ধান লইবার ব্যগ্রতা, সকল কর্ম্মের পশ্চাতে চরম সত্যকে পাইবার চেষ্টা ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনার সর্ব্বোত্তম আদর্শ— ভারতবর্ষের ইতিহাসের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে, আদর্শকে জানিয়াছেন। যৌবনকাল হইতে তাঁহার প্রবন্ধে কবিতায় এই অরূপকে অতীন্দ্রিয়কে জানিবার একটা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে এবং মনের মধ্যে সত্যের আভাস ও ভাবের অনুভূতি ক্রমে যতই তীব্র ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এই অরূপ অতীন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি ততই আরো অস্পষ্ট—আরো কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে। "সোণার তরী" হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্যের এই রূপক অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতি আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে—মনের এই অতিসূক্ষ্ম, সুতীব্র একান্ত সত্যভাব ও অনুভূতিই তাঁহাকে সাহিত্যের এই রূপক-রাজ্যের জগতে আনিয়া পৌঁছাইয়াছে; বিদেশী সাহিত্য-জগতের অধিবাসী হইয়া তাহাদের লিপিকৌশলটীকে জানিয়া পরের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা সঞ্চয় করিয়া এই রূপক-রাজ্যের সন্ধান তিনি লাভ করেন নাই।

কিন্তু রূপক-নাট্যের যে-রূপ, অর্থাৎ তাঁহার 'ডাকঘরে' 'অচলায়তনে' 'শারদোৎসবে' 'ফাল্গুনীতে' 'মুক্তধারায়' 'রক্তকরবী'তে নাটকের যে রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও কি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি? হঠাৎ এ কথার কি যে জবাব দিতে হইবে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। খুবই দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের কি প্রাচীন কি আধুনিক কোনো সাহিত্যেই এই রূপের নাটকের সাক্ষাৎ আমরা পাইনা; দেশের অতীত ও বর্ত্তমান কোনো নাট্যরূপের সঙ্গেই কবিগুরুর রূপক-নাট্যগুলির একটা আত্মীয়তা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। সংস্কৃত নাটকের যে রূপ ও অভিনয়-রীতি আমরা জানি, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা যে নাট্য-রীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, রবীন্দ্রনাট্যের রূপ ও অভিনয়রীতি তাহার সহিত কোনই যোগ স্থাপন করিতে পারেনা— আমাদের দেশের যাত্রাভিনয় বা কথকতার নাট্যরীতির সঙ্গেও যে কোনো গভীর সাদৃশ্য আছে তাহা মনে হয়না। এমতাবস্থায় যদি বলি, রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট নাট্যরূপ সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজস্ব সৃষ্টি নহে, কতকটা পাশ্চাত্য রূপ দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহা হইলে খুব ভুল করিব কি? মনে রাখিতে হইবে, আমি রূপকের রূপের কথা বলিতেছিনা, রচনারীতির কথা বলিতেছিনা, ভাব বা অনুভূতির স্বরূপের কথা বলিতেছিনা—বলিতেছি শুধু নাট্যরূপের কথা, ইংরেজীতে যাহাকে বলে Form এর কথা—Spirit এর কথা নয়। কথাটাকে ভাল করিয়া খুলিয়াই বলিতেছি।

য়ুরোপে সেক্সপীয়র হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত নাট্যের একটা নির্দিষ্ট রচনানীতি এবং একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমা চলিয়া আসিতেছিল। এখনও যে তাহা চলেনা, এমন কিছুতেই বলা যায়না, তবে তাহার আদর কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্র-পূর্ব্ব বাঙ্লা নাটকে আমরা কতকটা প্রাচীন সংস্কৃত নাটক এবং পাশ্চাত্য নাটক রচনারীতির ও অভিনয়-পদ্ধতিরই প্রভাব দেখিতে পাই। কিন্তু সেক্সপীয়র অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী নাট্যকারেরা মানুষের ইন্দ্রিয়-সংগ্রামকে অভিনয়-মঞ্চে নানান্ ঘটনার সাহায্যে যেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যেমন করিয়া সে সংগ্রামকে ভাষা দিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পাশ্চাত্য নটগুরুরা সে ভাষা ও সে রূপ লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা, বিশেষ করিয়া ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, মেটারলিঙ্ক্, আন্দ্রিক্, হাউটম্যান্ প্রভৃতি সাহিত্য-নায়কেরা নটরীতির একটা আমূল পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন বর্ত্তমান মানবের ভাব ও চিন্তাধারা উন্নত, মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে এবং জীবনের দৈনন্দিন ইন্দ্রিয়-সংগ্রামের ধারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে—এই নবলব্ধ জীবনের সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতিকে ফুটাইবার জন্য নাটকের নূতন রচনা-রীতি, নূতন প্রয়োগপদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইবে। শুধু কাব্যেই নয়, নাটকরচনা ও অভিনয়ের মধ্যেও অসীমের

অতীন্দ্রিয়ের আভাস ও প্রকাশকে ফুটাইতে হইবে; বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জন্য ইন্দ্রিয়ের যে সংগ্রাম তাহাকে নয়, অসীমকে জানিবার, অরূপকে বুঝিবার, অতীন্দ্রিয়ের আস্বাদন লাভের জন্য আত্মার যে নিরন্তর সংগ্রাম, তাহাকে রূপ দিতে হইবে। 'হ্যামলেট' অথবা 'ওথেলো'র মধ্যে অরূপ আত্মার যে চিরন্তন সংগ্রামের অস্পষ্ট আভাস, তাহাকেই সমগ্র নাটকটির ভাবে ও ভাষায় পরিপূর্ণ করিয়া রূপায়িত করিতে হইবে—বহিরিন্দ্রিয়ের যে সংগ্রাম 'ওথেলো' অথবা 'হ্যামলেটে'র কর্ম্মকৃতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে নয়। ভাবের মধ্যে, চিন্তাধারার মধ্যে এই পরিবর্ত্তনের ফলেই য়ুরোপের রূপক-নাট্যের যে রূপ তাহার সৃষ্টি। তাহারই ফলে মেটারলিঙ্কের যত একাঙ্ক নাটক, ষ্ট্রীণ্ডবার্গের নাটক, আন্দ্রিকের নাটক, ইয়েট্‌স্‌এর নাটক প্রভৃতির সৃষ্টি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রূপ অপেক্ষা অরূপ, রূপের abstraction, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অতীন্দ্রিয়ের আভাস বিকাশ রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে দোলাইয়াছে, কবিতায় তাহার প্রকাশ বহুদিন দেখা গিয়াছিল, কিন্তু নাটকে এই অরূপের যে প্রকাশরীতি ও ভঙ্গিমা তাহা সহজে দেখা যায় নাই। একটা রূপকে একটা ভঙ্গিমাকে হয়ত তিনি খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু তাহা সহজে তিনি পান নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম রূপকনাট্য 'শারদোৎসব' রচিত হইয়াছিল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। তাহার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য, কাব্য-নাট্য অনেক রচনা করিয়াছিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'মায়ার খেলা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিসর্জ্জন' 'মালিনী' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নাটকের যে রূপকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে কিছুতেই 'শারদোৎসব' 'ডাকঘর' 'মুক্তধারা' 'রক্তকবরী'র রচনা-রূপের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান দিতে পারা যায়না। 'মায়ার খেলা' 'বাল্মীকি-প্রতিভা' একেবারেই গীতি-নাট্য। তাহার রূপ আমাদের দেশে কিছুতেই অজানা ও অভিনব নয় এবং তাহার মধ্যে কবিগুরুর শিল্পজীবন যতটা অভিব্যক্ত হইয়াছে, কোনো সত্য, কোনো অনুভূতি ততটা প্রকাশ পায় নাই। ইহাদের পর পরিপূর্ণ একটা নাট্যরূপের সন্ধান পাই, বিশেষ করিয়া 'রাজা ও রাণী' 'বিসর্জ্জন', 'মালিনী'তে এবং 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি নাটিকাগুলিতে। কিন্তু ইহাদেরও নাট্যরূপ আমাদের কাছে একান্ত পরিচিত, সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যে এইরূপ আমরা দেখিয়াছি। তবে এ কথা সত্য যে এমন শিল্পরূপ এমন সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তিতে দেখি নাই। রসের এবং সৌন্দর্য্যের এমন অনাবিল এমন স্বচ্ছন্দ প্রকাশ আর কাহারই বা আছে! 'বিসর্জ্জন' যে অভিনয় সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ 'বিসর্জ্জন'এর এই সহজ নাট্যরূপ, যে রূপের মধ্যে ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বন্দ্ব, দৃশ্য জগতের দৈনন্দিন ইতিহাসের লীলা এবং একটি সহজ সত্য অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরসে অভিষিক্ত হইয়া ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু 'শারদোৎসব' হইতে আরম্ভ করিয়াই এই নাট্যরূপ হঠাৎ একেবারে বদলাইয়া গেল। এই নব-নাট্যরূপ যে কি বস্তু তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার মনে হয় এই বিশিষ্ট নাট্যরূপের বিকাশ একেবারে আপনা হইতে হয় নাই। 'মালিনী'র পর 'শারদোৎসব'এর আগে রবীন্দ্রনাথ আর কোনো উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেন নাই। 'মালিনী' রচিত হইয়াছিল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে; 'শারদোৎসব' রচিত হইয়াছিল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে—এই সুদীর্ঘ বারো তেরো বৎসর কবি কোনো নাটকই রচনা করেন নাই, এবং তাহার পর 'শারদোৎসবে' যে রূপক নাট্যের রূপ দেখা দিল তাহা পূর্ব্বতন নাট্যরূপ হইতে একেবারেই পৃথক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাটকের মধ্যে অরূপের অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ কি রূপে কি অভিপ্রায়ে ব্যক্ত করা যায় তাহা হয়ত তিনি খুঁজিতেছিলেন—এই সুদীর্ঘ বারো বৎসরের নীরবতার অবকাশে তিনি তাহার সন্ধান লাভ করিলেন দেশের অতীত সাহিত্য-সাধনার মধ্যে নয়, নিজের সৃষ্টি প্রচেষ্টার মধ্যে বসিয়াও মনে হয়না, পাইলেন পাশ্চাত্য সাধনার নাট্যরূপের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই এই বিশিষ্ট নাট্যরূপ সেখানে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যরূপ দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারেন নাই। নহিলে সুদীর্ঘ একযুগ পরে 'শারদোৎসবে' 'অচলায়তনে' 'ডাকঘরে' হঠাৎ 'রাজা ও রাণী' 'বিসর্জ্জন'এর নাট্যরূপ বদলাইয়া গিয়া নূতন রূপ অবলম্বনের কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইনা।

(চার)

আমি সমস্ত জিনিসটাকে সাহিত্য-ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া ভুল করিলাম কি না জানিনা; ইহাও তো

হইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই নবনাট্যরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন, পাশ্চাত্য নাট্যরূপ দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। এ সম্ভাবনাকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করিবনা, তবে বিশ্ব-সাহিত্যের ধারাস্রোতের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যগুলির রূপ ও ভঙ্গিমা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমার কাছে এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, নব-নাট্যরূপের প্রভাবই রবীন্দ্রনাট্যকে সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত করিতে পারে নাই; তিনি সেই রূপের আভাস মাত্র পাইয়াছিলেন, ছায়াটিকে মাত্র জানিয়াছিলেন, কায়া তাঁহাকে নিজে সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, এবং তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের পথ তিনি নিজেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কারণ য়ুরোপীয় রূপকনাট্যের রূপ ও রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যের রূপ এই দু'য়ের মধ্যে কতকটা পার্থক্য একটু মনোযোগী পাঠকের চোখে ধরা না পড়িয়াই পারেনা। একটী দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। আমি একবার বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো রূপক-নাটকের অভিনয়ের জন্য একেবারেই কোনো বিশেষ অভিনয়-মঞ্চের প্রয়োজন হয়না—'শারদোৎসব', 'অচলায়তন' 'বসন্ত' প্রভৃতি নাটককে ধরা যাইতে পারে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে কয়েকবারই ইহাদের অভিনয় হইয়াছে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে উদার আকাশের তলে গাছপালা লতাপাতার প্রকৃতির চিরসুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে। শুধু নাটকবর্ণিত চিত্রচরিত্রগুলিই সেই অভিনয়কে সমৃদ্ধ করেনা,—উদার আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর, প্রকৃতির আপন দুলাল পত্রপুষ্পগুলিও সেই অভিনয়ে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যোগদান করে, নহিলে কিছুতেই অভিনয়টি সার্থক হইয়া উঠেনা। প্রকৃতির মধ্যে নাটকের এই যে ভাষা আবিষ্কার, এই যে একটা সত্যকার যোগ, ইহা পাশ্চাত্য নাট্য রূপ ও রীতির মধ্যে খুব কমই পাই। ভারতবর্ষের ইহা নিজস্ব। 'শকুন্তলা' নাটকের শকুন্তলার পতিগৃহ গমনের দৃশ্যটি একবার সকলকে স্মরণ করিতে বলি—আশ্রমের বৃক্ষলতা, আশ্রম মৃগটি সেখানে না থাকিলে সে দৃশ্যটি এমন করিয়া ফুটিতে পারিত কি? রবীন্দ্রনাথ এই বস্তুটিকে একান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নাট্যরীতির মধ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত শ্রদ্ধেয় ৺অজিতবাবু অন্য সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-নাট্যের রূপকের এবং পাশ্চাত্য নাট্যের রূপকের ভাবধারার কতখানি পার্থক্য তাহার একটু আভাস মাত্র দিবার জন্য এই সম্পর্কে তাহা অজিতবাবুর ভাষাতেই উল্লেখ করিতেছি। "মেটারলিঙ্কের Intruder পড়ি, আর রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' পড়ি—Intruder' এ মৃত্যুর আগমনের যে সব রূপক দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিতান্তই বাহ্যিক, কখনো কখনো বালসুলভ কল্পনাত্মক! আজ কেমন একটা শিরশিরে হাওয়া দিয়াছে, বাগানে মালীর কাস্তের কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ শুনা যাইতেছে, এ সব সূচনার মধ্যে মৃত্যুর বাহ্যভীতির দিকটা আছে, তার গভীরতর মাধুরী নাই। 'ডাকঘরে'র মৃত্যু সমস্ত জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্য্যকে সুদূরে বিলম্বিত করিয়া সেই সুদূরের আহ্বানকে মৃত্যুর আহ্বান করিয়াছে, এবং 'তমশঃ পরস্তাৎ' মৃত্যু-রাজকে বালসখা করিয়া তাঁর আবির্ভাবকে অত্যন্ত আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে।" 'রক্তকরবী'র মধ্যে দেখি, নাটকীয় চিত্রে চরিত্রে রঞ্জনের স্থান কোথাও নাই, একবারও তার দেখা আমরা কোথাও পাই না। অথচ যতক্ষণ নাটকটি পাঠ করি অথবা অভিনীত হইতে দেখি আমাদের সমস্ত মনটা পড়িয়া থাকে রঞ্জনের উপর, সে-ই নন্দিনীর এবং আমাদের সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে। 'ডাকঘরে'ও দেখি ডাকহরকরা কোথাও নাই, রাজা কোথাও দেখা দেন্ না, অথচ তাহারাই অমলের মনকে আমাদের মনকে টানে। এই যে নাটকের কেন্দ্র বস্তুটীকে এমন করিয়া নাটক হইতে বাহির করিয়া দিয়া দূরে নাগালের সীমার বাহিরে বসাইয়া রাখিয়া আমাদের মনকে টানা, এই ভঙ্গিমাটিও যেন রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব। দূরের অসীমের তৃষ্ণাকে এমন সুন্দর করিয়া ফুটাইবার কৌশলটি পাশ্চাত্য রূপনাট্য রচয়িতাদের কাহারও মধ্যে থাকিলেও এমন তীব্র হইয়া কোথাও বোধ হয় নাই। এই রকম ছোটখাট অথচ কুশলী দৃষ্টান্ত আরো হয়ত দেওয়া যাইতে পারে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, রূপনাট্যের বিশেষ ভঙ্গিমার ছায়াটিকে হয়ত রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য নাটক হইতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু কায়া তাঁহাকে নিজে সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, এবং তাহার বিকাশের পথ তিনি নিজেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এই ধরণের নাটককে সত্যিকার নাটক বলিতে কাহারো কাহারো আপত্তি আছে। বিদেশেও হইয়াছে—আমাদের

দেশেও রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে এ আপত্তি কেহ কেহ তুলিয়াছেন। সাহিত্য-কথার প্রসঙ্গে কবিগুরুর কাছে এ আপত্তির কথা একদিন বলিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপকনাট্যের অভিনয় সাফল্যের প্রশ্নও উঠিয়াছিল। প্রথম কথাটির উত্তর আমার মনে আছে। তাহার মর্ম্মকথা এই, 'নাটক বলিতে আপত্তি যদি কাহারো থাকে, তাহার উত্তরে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। তুমি ইহাকে 'নাটক' না বলিয়া যদি বল 'কবিতা' অথবা 'কবিতা' না বলিয়া যদি বল আর কিছু, তাহাতে আমি আপত্তি করিবনা—'নাটক' নামের প্রতি এমন কিছু মায়া আমার নাই। আমি যদি আমার মনের ভাব ও অনুভূতিকে মধুর করিয়া সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলেই আমার সৃষ্টি সার্থক, তুমি ইহাকে কি নামে অভিহিত করিবে সে ভাবনা আমার নয়।' এমন সুন্দর সহজ সম্পূর্ণ কবি-জনোচিত উত্তর আর কি হইতে পারে! তবু সাহিত্য সমালোচকের বিশ্লেষণ দৃষ্টি দিয়া দেখিলেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিশেষ রূপকে 'নাটক' বলিয়া অভিহিত করিতে আমার কোনো দ্বিধাবোধ নাই। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে কোনো উত্তর পাইবার সুযোগ সেদিন হয় নাই, কিন্তু আমার মনে হয় সে সম্ভাবনা যদি অল্পও হয়, তাহা হইলেও রবীন্দ্র-নাট্যের শিল্পমূল্যের, তাহার রস ও সৌন্দর্য্যের কিছু হ্রাস হইবে না। এ কথা সত্য যে কবিগুরুর প্রায় নাট্যেই দু'টী একটী চরিত্রের কথায় ও ভঙ্গিমায় এমন কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ থাকে, যাহা অভিনয়ের সময় দর্শক ও শ্রোতার দৃষ্টি ও শ্রবণকে এড়াইয়া যায়—গভীরতর অনুভূতিকে স্পর্শ করিবার অবসর পায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কি শান্তি-নিকেতনে, কি কলিকাতায় কবিগুরুর নির্দ্দেশে অভিনীত রূপক-নাট্যের অভিনয় যখনই দেখিয়াছি, তখনই ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, সমগ্র সত্তাটি, সমগ্র রহস্যটি কথনই দর্শকের অনুভূতিকে স্পর্শ এবং তাহার প্রয়োগ কলা ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন দর্শকের শিল্প ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধিকে উদ্রিক্ত না করিয়া পারেনা। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে আজো কবিগুরুর কোনো রূপকনাট্যই সার্থকতায় অভিনীত হইতে পারে নাই, আমার মনে হয় তাহার কারণ নাটকের সূক্ষ্ম এবং জটিল রীতি ও ভঙ্গিমা ততটা নয়, যতটা অভিনেতাদের মধ্যে সূক্ষ্মভাব ও অনুভূতিকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতার অভাব, অল্প কথা ও নীরবতার মধ্য দিয়া, অতি তুচ্ছ ঘটনা-পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া অন্তরের অত্যন্ত তীব্র অথচ অস্পষ্ট ভাবাভাষকে রূপদান করিবার নিপুণতার অভাব এবং অভিনয়ের মধ্যে তাহার কথার মধ্যে ঘটনার মধ্যে উত্থান-পতনের তরঙ্গ-লীলার মধ্যে শুধু বহিরিন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির শুধু দৃশ্য জগতের ইন্দ্রিয় সংগ্রামের লীলার আস্বাদন লাভের ইচ্ছা। আমাদের জীবনে অজ্ঞাত রাজ্যের অজানা রহস্যের বিচিত্র দ্বন্দ্বের পরিচয় লাভের প্রয়োজন যদি থাকে, অরূপের অতীন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি যদি আমাদের মহত্তর রস ও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধিকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে, এই কথা যদি আমাদের দেশের অভিনেতা ও দর্শকেরা কখনো উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যের অভিনয় সাফল্য লাভ না করিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। অন্ততঃ রবীন্দ্র রূপক-নাট্যের মধ্যে অভিনয়-ব্যর্থতার কোনো কারণ আছে বলিয়া তো আজো বুঝিতে পারিতেছি না।

পাঁচ

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে এই যুগের রূপক-নাট্য-রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন ও থাকিবেন, তাহা তাঁহার রূপক সাহিত্যের জন্য না, কিম্বা তাহার এই নবনাট্যরূপের জন্যও নয়। তাঁহার নাটকের শিল্প সৌন্দর্য্য কথার অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা, ভাষার সরল সৌন্দর্য্য, এগুলিও তাঁহাকে রূপক-নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমরত্ব দিবে না। তিনি অমর হইবেন, নাটকের মধ্যে তিনি আমাদের জীবনকে যে পূর্ণ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার জন্য, যে অরূপ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আভাস দিয়াছেন তাহার জন্য। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, নাট্যের মধ্যে তিনি শিল্পময় সৌন্দর্য্যময় জীবনকে ততটা স্থান দেন নাই, যতটা চাহিয়াছেন সৌন্দর্য্যের উৎসটিকে জানিতে, আত্মার আকাঙ্ক্ষার বস্তুটিকে লাভ করিতে। অরূপ রূপের, অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সন্ধানে কবি-চিত্তের এই যে যাত্রা, আত্মার বিচিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধির যে ইতিহাস তাহাই রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যগুলিকে অমরত্ব দান করিবে। এতক্ষণ যাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছি, তাহা শুধু নাটকগুলির রূপ লইয়া, কাঠামো লইয়া—কিন্তু আসল বস্তুটি বাকীই রহিয়া গেল,—সেটী হইতেছে রবীন্দ্র-রূপকনাট্যের অন্তর-রহস্য। সেটীকে না বুঝিলে না জানিলে

কবিগুরুর নাটক পাঠ কিছুই সার্থক হইল না। কারণ রবীন্দ্রনাথ তো শুধু রূপের বা ভঙ্গিমার কুশলী কারু নহেন, তিনি যে প্রাণরসের স্রষ্টা, তিনি যে মানব ও প্রকৃতির রহস্যকে উদ্ঘাটিত করেন। তিনি সেই সত্যের সন্ধানে তাঁহার সাহিত্য-সাধনাকে চিরকাল নিয়োগ করিয়াছেন, যে সত্য শিব ও সুন্দর। তাঁহার খুব অস্পষ্ট মায়াময় কাব্য অথবা নাট্যরূপের মধ্যেও এমন একটা সহজ সরল রস ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়, যাহা মনকে একটু দোলা না দিয়ে পারে না। বড় বড় কথায় বহু বাক্যবিন্যাসের সাহায্যে সুকঠিন তত্ত্ব বা উপদেশ প্রচারের চেষ্টা তাঁহার কাব্যে অথবা নাট্যে কোথাও নাই—তবু একটা সুন্দর সত্যের পূর্ণ পরিণতির ইঙ্গিত তাঁহার সবগুলি রূপক-নাট্যের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই সত্যের ইঙ্গিত, এই পরিণতির আভাসই রবীন্দ্রনাট্যের অন্তর রহস্য।

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, 'ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন' —মেধা দ্বারা নয়, বহু পরিমিত জ্ঞান দ্বারা নয়—এ সব কিছু দ্বারাই মানুষ দেবতার রহস্যকে জানিতে পারেনা। আমার মনে হয় কোনো শিল্প বা সাহিত্য বস্তুর রহস্যকেও মানুষ 'মেধয়া বা শ্রুতেন' জানিতে বা বুঝিতে পারেনা—তাহার একমাত্র উপায় তাহার কাছে একান্ত ভাবে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের দ্বারাই মানুষ অনেক সময় অনেক সুবৃহৎ সত্যের মর্ম্মকথাটিকে ধরিতে পারে। যথার্থ শিল্প বা সাহিত্যবস্তুর মর্ম্মকথাটি ধরিতে হইলেও মনকে একান্ত ভাবে নম্র ও বিনত করিয়া, সমস্ত হৃদয়কে শ্রদ্ধায় অবনত করিয়া তাহার রহস্য-রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'—আর্টের রহস্য বুঝিতে এ কথা যে কত বড় সত্য, তাহা সে রহস্যের সন্ধানের প্রয়াস যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। কোনো সাহিত্য বস্তুর রূপ লইয়া যখন তুমি আলোচনা করিতেছ, তখন তুমি তোমার সমস্ত বিশ্লেষণী বুদ্ধিকে জাগাইয়া রাখিতে পার, তাহার রসের অভিব্যক্তির স্বরূপটি যখন তুমি বুঝিতে চাহিতেছ তখন তুমি তোমার হৃদয়বৃত্তি ও বিচারবুদ্ধির মাপকাঠিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার, সাহিত্য সমা-লোচনার সকল কষ্টিপাথরে ঘষিয়া তাহার মূল্য যাচাই করিতে পার, দেশবিদেশের বিভিন্ন যুগের সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহার প্রভাব ও আবেষ্টনকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে পার, তাহার বিষয়বস্তুর সত্য-মিথ্যা নবত্ব-প্রাচীনত্ব সব কিছুই জানিবার প্রয়াস করিতে পার—কিন্তু তাহার অন্তর-রহস্যটি যদি বুঝিতে চাও, তবে তোমার অন্তর দিয়াই তাহাকে বুঝিতে হইবে, সমস্ত মনকে সকল সংস্কার হইতে বিমুক্ত করিয়া, চিত্তের সকল বিচার ও বিশ্লেষণ বুদ্ধির মুখর কোলাহলকে শুদ্ধ করিয়া তবে সেই রহস্য-মন্দিরের সম্মুখীন হইতে হইবে। ফুলের মধ্যে পাতার মধ্যে প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে যে রহস্য, তাহার মর্ম্ম উদ্ভিদ্ অথবা পদার্থতত্ত্ববিদেরা জানে না, কিন্তু সে রহস্য কালিদাস জানেন, হ্বার্ডসহ্বার্থ জানেন, শেলি জানেন, রবীন্দ্রনাথ জানেন। সাহিত্যসৃষ্টির রহস্যকে বুঝিতে হইলেও কবির সঙ্গে কতকটা একস্তরে আসিয়া দাঁড়ানো চাই, তাঁহার আঁখির দৃষ্টির সঙ্গে, মনের ভাবনার গতির সঙ্গে, কল্পনার ভঙ্গিমা কতকটা এক হওয়া চাই। বিনত না হইলে শ্রদ্ধাবান্ না হইলে এই এক হওয়া হয় না। William Lyon Phelps তাঁহার "Essays on Modern Dramatists" গ্রন্থে J. M. Barrie'র নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "Perhaps the most intelligent attitude to take toward the plays of J. M. Barrie is unconditional surrender. If one unreservedly yields one's mind and heart to their enfolding charm, then one will understand them. Otherwise never. Understanding of many things comes only through submission. A work of Art is as sublime as a work of nature: No one can appreciate natural scenery without yielding to it. Men with beam eyes are always looking for motes." আমার মনে হয় রবীন্দ্র-নাথের নাটক সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। এই শ্রদ্ধা এই বিনতি, এই আত্মসমর্পণের ভাবটি হৃদয়ে রাখিয়া রবীন্দ্র-নাথের কাব্য অথবা নাট্যের রহস্যের মধ্যে ঢুকিবার প্রয়াস করিলে আমাদের রস ও সৌন্দর্য্যবোধ তৃপ্ত হইবে, এবং কবিহৃদয়ের সোনার কাঠিটির সন্ধান লাভ আমাদের সহজ হইবে—ইহাই আমার বিশ্বাস।

জুরিক্ থেকে মনত্রো

(Zurich to Montreux)

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

শরতের সুন্দর প্রভাত। রৌদ্র-ঝলমল নীল হ্রদের ধার থেকে সমুদ্রের একটা ঢেউএর মত পাহাড় উঠে গেছে। দূরে শুভ্র চির-তুষারাবৃত যে টোডি-পর্ব্বতচূড়ার শ্রেণী দেখা যাচ্ছে, তাদের বরফের হ্রদ থেকে লিম্‌মাট নদী এঁকে-বেঁকে ঘুরে ঘুরে এই জুরিক হ্রদে এসে পড়ছে। এই লিম্‌মাট ও সিল্ দুটি নদীর তীর জুড়ে ও উচ্ছ্বসিত পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজান সুন্দর জুরিক সহর। সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে জুরিক সবচেয়ে বড় সহর,—লোকসংখ্যা দু' লক্ষের ওপর,—ইয়োরোপের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু সহরটির চারিদিকে প্রকৃতির মনোহর আবেষ্টনে সহরটিকে শিল্পবাণিজ্যের সহর বলে মনে হয় না,—তার কলের সব চিমনী শুভ্র-স্তব্ধ পর্ব্বতমালার শিখরগুলির তলে কোথায় হারিয়ে গেছে।

লিম্‌মাট নদী যেখানে হ্রদে গিয়ে পড়েছে তারি মুখে ম্যুনষ্টার সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে শরৎ-প্রভাতের জুরিক-সহরটি বড় সুন্দর লাগলো। জুরিকের ইতিহাস বহু পুরাতন ও দীর্ঘ। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই হ্রদের তীরে পৃথিবীর আদিম যুগের মানুষেরা বাস করত। সেই গুহা-যুগের মানুষদের গুহা জুরিকের কাছে পাহাড়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে।

নীল হ্রদের দিকে মুখ করে পোলের ওপর দাঁড়ালুম। পঁচিশ মাইল দীর্ঘ হ্রদটি এঁকে-বেঁকে দূরে চলে গেছে। তার তীরে ছোট ছোট সহরের গির্জ্জার চূড়াগুলি দেখা যাচ্ছে। তাদের পেছনে সবুজ পাহাড়ের সারি। তাদের পেছনে আর এক সার নীল পাহাড়। তাদের পেছনে বরফ-ঢাকা পর্ব্বতমালা। ওই টোডি (৩৬২৩ মিটার উচ্চ), ওই সিয়ারহর্ণ (৩২৯৬ মিটার উচ্চ), দিগন্ত জুড়ে রৌদ্রদীপ্ত পর্ব্বতমালার শিখরগুলি নীলাকাশের বুকে মুক্তার হারের মত ঝকঝক করছে। ঘুরে সহরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালুম। নদী এঁকে-বেঁকে চলে গেছে, তার ওপর পোলের পর পোল। নদীর এক ধারে পুরান দিনের বাড়ীর সারি ঝুঁকে পড়েছে। আর এক ধারে জনকল্লোলময় প্রশস্ত রাস্তা। তার ওপর বড় বড় হোটেল ও দোকানের সারি। আমার ডান-দিকে গ্রোস-ম্যুনষ্টার (Gross-Munster) বা বৃহৎ ম্যুনষ্টার গির্জ্জা। তাহার পেছনে ঢেউ-খেলান পাহাড়ের গায়ে বাড়ীর পর বাড়ী, বাড়ীর পর বাড়ী গায়ে গায়ে লেগে ঝুঁকে মিশে বহু দূরে ওপরে উঠে গেছে। এই বৃহৎ পাহাড়-জোড়া বাড়ীর স্তূপের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেক-নিকুমের সুবৃহৎ বাড়ী ও কাণ্টোনের প্রকাণ্ড হাস্পাতাল-বাড়ী বিশেষভাবে বোঝা যাচ্ছে। জুরিকের ফেডেরাল পলিটেক-নিকুম্ সমস্ত ইয়োরোপের মধ্যে প্রসিদ্ধ। আমার বাঁদিকে ফ্রাউ ম্যুনষ্টার, আর একটি পুরাতন গির্জ্জা। তার পর সমতলভূমিতে হোটেল দোকান বাড়ীর সারি। তাদের পেছনে সিল নদীর শীর্ণ স্রোত। গ্রোস্ ম্যুনষ্টার ও ফ্রাউ ম্যুনষ্টার এই দু'টি প্রধান গির্জ্জা ঘিরেই প্রথম সহর-গড়ে উঠেছিল। ফ্রাউ ম্যুনষ্টার ৮৫৩ খৃঃ অব্দে খৃষ্টান মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীদের জন্য স্থাপিত হয়েছিল; এবং এই সন্ন্যাসিনী মঠ-কর্ত্রীর অনেক বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার ছিল সহরের অধিবাসীদের ওপর। বৃহৎ ম্যুনষ্টার গির্জ্জা নানা সময়ের তৈরী। তার কোন অংশ এগারো শতাব্দীর, কোন অংশ বারো, তেরো শতাব্দীর। তোরণ দু'টি পনেরো শতাব্দীর।

ম্যুনষ্টার-সেতু পার হয়ে নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে হ্রদের দিকে এগিয়ে চল্লুম,—সবশেষের সেতুটিতে এসে পৌঁছুলুম। এই সেতুটির নাম হচ্ছে "ঘাটের পোল" (Quai-Brucke), তার পর উন্মুক্ত প্রশস্ত হ্রদ। হ্রদের বাঁ তীর দিয়ে সুন্দর একটি প্রশস্ত রাস্তা গাছের ছায়ায় ছায়ায় বহু দূর চলে গেছে। এটি হচ্ছে পায়ে হেঁটে বেড়াবার রাস্তা,—হ্রদের নির্ম্মল বাতাস খাবার রাস্তা। এই বেড়াবার প্রশস্ত রাস্তার পর গাড়ী মোটরের রাস্তা, তার পর হোটেলের সারি। সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরা যেমন নানা দেশের

ভ্রমণকারীদের নিকট হতে প্রচুর অর্থলাভ করে, তেম্নি তাদের সুখ-সুবিধা, তাদের আমোদ-প্রমোদ, তাদের স্বাস্থ্য ও আরামের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থাও করে। সুইজার-ল্যাণ্ডের সব হ্রদের তীরের সহরগুলিতে এরূপ হ্রদের তীরে তীরে বাগান কেবলমাত্র হেঁটে বেড়াবার প্রশস্ত সুন্দর পথ আছে। এখানে সমস্ত দিন ভ্রমণকারীরা হ্রদের নির্ম্মল বায়ু সেবন করতে পারে, দল বেঁধে বেড়াতে পারে।

এই তরুচ্ছায়া-স্নিগ্ধ হ্রদের তীরের পথটি দিয়ে চল্লুম। পথটির মাঝখানে একসারি গাছ পথটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে,—যেন এক দিকে যাবার পথ আর এক দিকে আসবার পথ। গাছের তলায় মাঝে মাঝে লম্বা বেঞ্চি—বসবার জায়গা।

পথ দিয়ে এগিয়ে চল্লুম। শান্ত পথটি। চারি দিকে অবসর-মধুর মন্দগতি জীবনলীলার ধারা। একটি মা তাঁর ছোট খুকীকে পারাম্বুলেটারে ঠেলে ধীরে চলেছেন। খুকীটি ঘুমোচ্ছে। মা সেই ঘুমন্ত খুকীর দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে প্যারামবুলেটার থামাচ্ছেন। আর একটি মা তীরের বেঞ্চে বসে পশমের জামা সেলাই করছেন। তাঁর কাছে দু'টি ছোট ছেলেমেয়ে ধূলা নিয়ে খেলা করছে। আর এক বেঞ্চে এক বুড়ী বসে। তাঁকে ঘিরে নাতী-নাতনীর দল ছুটোছুটি করছে। একজন আমেরিকান ভ্রমণকারী তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের ফটো নিচ্ছেন। মেয়েটি বাবার সঙ্গে ফটো তোলাতে চায়, সুতরাং দ্বিতীয়বার ফোটো তোলা হচ্ছে, মহিলাটি নিচ্ছেন। মেয়েটি আবার নিজে ফটো তুলতে চায়। সুতরাং বাবা ও মাকে হাসিমুখে পাশাপাশি দাঁড়াতে হল, মেয়েটি তাঁদের ফটো নিল। একটা কোডাক্ ব্রাউনি, সুতরাং ফটো নেবার কোন হাঙ্গাম নেই।

হ্রদের তীরে অনেক স্নানের ঘাট,—কোনটি কেবল পুরুষদের জন্য, কোনটি নারীদের জন্য, কোনটি পুরুষ নারী উভয়ের। স্নান করবার যায়গার সামনে ভাসমান কাঠের ঘর। টিকিট কিনে সিঁড়ি দিয়ে এই ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে স্নানের সাজ পরে' সবাই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চারিদিকে ছোট ছোট বয়া ভাসছে,—কেউ বয়ার ওপর বসে রোদ পোয়াচ্ছে। স্নানের ঘাটগুলিতে কি হল্লা, হাসি, আনন্দধ্বনি। যুবতীরা জল ছোঁড়াছুড়ি করছে, যুবকেরা পাল্লা দিয়ে সাঁতার দিচ্ছে। কেউ ঘাটের ওপর জলে-ভেজা গায়ে রোদ পোয়াচ্ছে,—ইংরাজ, আমেরিকান, জার্ম্মাণ নানা দেশের ভ্রমণকারীর দল। এরা যেমন কাজের সময় কাজ করে, তেম্নি ছুটির সময় পূর্ণরূপে উপভোগ করে। সব কেজো লোকই বছরে একবার ছুটিতে বাহির হয়। তখন তাদের স্বাস্থ্য-চর্চ্চার, প্রকৃতিকে নানা ক্রীড়াব মধ্যে উপভোগের ধুম পড়ে যায়।

একটি খেয়াঘাট রয়েছে, সেখানে একগাদা ছোট নৌকা বাধা। এই নৌকাগুলি ভাড়া পাওয়া যায়। ভ্রমণকারীর দল এসে ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া করে হ্রদে নৌকা চালায়। একটি স্বামী তার স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে নিয়ে একটি নৌকা ভাড়া করে দাঁড় বেয়ে চল্ল। একদল যুবক হল্লা করতে করতে এল, দু'টো নৌকা নিয়ে পাল্লা দিয়ে চল্ল। একটি যুবক ও যুবতী—বোধ হয় প্রেমিক-প্রেমিকা আর একটি ছোট বোট ভাড়া করে হ্রদের জলে ভেসে গেল। সকলের মুখে কি প্রাণ-খোলা হাসি, সকলের অন্তরে কি উচ্ছ্বসিত আনন্দ! ক্রীড়া-আনন্দিত নরনারী ঘিরে সূর্য্যের আলোর ঝলমলানি, দূরে বরফ-ঢাকা পাহাড়ে আলো ঝক্‌মক্ করছে, স্বচ্ছ হ্রদের জলে ঝিলমিল করছে, স্নানরত নরনারীদের গায়ে ঝিক্‌মিক্ করছে। আকাশভরা আলোর হাসির সঙ্গে এই জলক্রীড়ামত্ত নরনারীদের হাসির ধ্বনি।

মেয়েদের এই ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে খোলা পথে বেড়ান, হ্রদের ধারে বসে রৌদ্র উপভোগ করতে করতে বই পড়া, শীতল জলে সাঁতার কাঁটা, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে নৌকা নিয়ে দাঁড় বাহিতে বাহিতে জলে ভেসে যাওয়া—নারীদের এই স্বাধীনতার সুখসম্ভোগ দেখে আমার দেশের গৃহে চিরবন্দিনী নারীদের নিরানন্দময় জীবনের কথা, ভগ্নস্বাস্থ্য দেহ ও স্ফূর্ত্তিহীন প্রাণের কথা ভেবে মন ব্যথিত হয়ে উঠল। এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক, অমানুষিক পর্দ্দা-প্রথা দিয়ে আমরা আমাদের নারীদের যে কত সুখ, কত আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছি, তাহা আমরা বুঝি না; এবং হায়, নারীরাও বুঝিতে পারেন না। এই শরতের সুন্দর দিনে নিজের শিশুসন্তান নিয়ে খোলা পথে বেড়ানর আনন্দ, গাছের ছায়ায় বসে জলে মেঘের ছায়া রোদের ঝিকিমিকি দেখার আনন্দ, এই নৌকা বেয়ে প্রাণ খুলে হাসার আনন্দ, উন্মুক্ত স্থানে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখার আনন্দ—কত শত শত আনন্দ হতে আমাদের নারীরা বঞ্চিতা। বংশের পর

বংশ তাঁদের গৃহসর্ব্বস্বা করে তাঁদের স্বাস্থ্যকে ভগ্ন, তাঁদের মনকে সঙ্কীর্ণ, তাঁদের জীবনকে যেমন পঙ্গু করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরও দিনের পর দিন সমস্ত জাতীয় জীবনে করতে হচ্ছে। এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে মন ভারী হয়ে এল, এই রৌদ্রঝলমল হ্রদের শোভা যেন ম্লান হয়ে এল।

হ্রদের ধারে ধারে এক মাইলের ওপর চলে এসেছি। এইখানে হ্রদটি বেঁকে গেছে। যায়গাটির নাম জুরিক-হর্ণ বা জুরিকের শিং। এই শিংএর মাথায় অর্থাৎ বাঁকের মোড়ে তীরভূমি যেখানে সূচাল হয়ে ঘুরে গেছে, সেখানে একটি সুন্দর হোটেল রেস্তোরাঁ। হোটেলের সামনে হ্রদের তীরে সুন্দর বাগান। সেই বাগানের গাছের তলায় তলায় টেবিল চেয়ার পাতা। রাতের সময় এখানে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট হয়। গাছের তলায় একটি টেবিলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য বসা গেল। রেস্তোরাঁর মেড এসে টেবিলের ওপর টেবল্ ক্লথ পেতে টেবিল সাজালে। তার পর খাবার নিয়ে এল। ওই সাদা মেঘভরা নীলাকাশ, পাহাড়ের সারি হ্রদের জলের দিকে চেয়ে মিষ্টিবাতাসভরা বাগানের মধ্যে বসে খাওয়া বড় সুন্দর লাগল। চারিদিকে শান্তি স্তব্ধতা ও একটা মধুর উদাসতা,—মধ্যাহ্নের আলো চারিধারে রিমঝিম করছে।

(২)

জুরিক থেকে লুত্সেয়ার্ণ ঘণ্টা দু'য়েকের পথ। দুপুরের ট্রেণে জুরিক ছেড়ে তুসুগ্ হ্রদের পাশ দিয়ে বিকেল বেলা লুত্সেয়ার্ণে এসে পৌছুলুম। লুত্সেয়ার্ণ জুরিকের মত বড় নয়; কিন্তু জুরিকের চেয়ে অনেক সুন্দর লাগল। সুইজার-ল্যাণ্ডের সকল হ্রদের তীরের সহরগুলির মধ্যে লুত্সেয়ার্ণকে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। লুত্সেয়ার্ণকে অনেকেরই খুব ভাল লাগে; তাহার কারণ, লুত্সেয়ার্ণ গম্ভীর পর্ব্বত-মালা-বেষ্টিত নির্জ্জন হ্রদের তীরে প্রতিষ্ঠিত। এই ছোট সহরটিতে আসিলে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যকে বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। জুরিকের মত লুত্সেয়ার্ণও একটি নদী ও হ্রদের সঙ্গমের মুখে স্থাপিত। রেউস্ নদীটি লুত্সেয়ার্ণ হ্রদে যেখানে পড়েছে তাহারি তীরে আট শত শতাব্দীতে বেনেডিক্টিয়ান খৃষ্টান্ সন্ন্যাসীরা যে ধর্ম্মমঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই মঠের পাশে নদীর তীরে যে ছোট গ্রাম গড়িয়া ওঠে, তাহাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাড়িয়া বর্ত্তমান লুত্সেয়ার্ণ। শিল্প-বাণিজ্য-জীবনধারা-বিবর্জ্জিত, কলকারখানা-বিহীন এই পুরাতন সুন্দর সহরটিতে যেমন প্রাচীনদিগের গন্ধ পাওয়া যায়, তেম্নি ইহার চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভায়, চিরতুষারাবৃত শিখরমালার গাম্ভীর্য্যে, পর্ব্বতশ্রেণীবেষ্টিত হ্রদের উদাসতায়, নগ্ন প্রকৃতির আদিম কালের স্পর্শ পাওয়া যায়।

ষ্টেসন থেকে বাহির হয়ে দেখি, সামনে নদী ও হ্রদের সঙ্গমস্থল। নদীর দিকে একটি সুন্দর কাঠের সেতু দেখে সে দিকে চল্লুম। অতি পুরাতন দিনের একটি কাঠের সেতু,—ঠিক সোজা যায়নি, দ'র মত বেঁকে ছোট নদীটি পার হয়েছে। সেতুটি লাল টালি দিয়ে ছাওয়া। মাঝে একটি তোরণ আছে। 'জল-তোরণ' (Wasser-turm) চোদ্দ শতাব্দীতে গড়া এই 'কাপেলব্রুকে'টি বড় সুন্দর লাগল। সেতুর ভেতর দেওয়ালে লুত্সেয়ার্ণ ও সুইজারল্যাণ্ডের নানা পুরাতন ঐতিহাসিক ঘটনা চিত্রিত,—এক শতের ওপর চিত্র হবে। সহরের আরও ওপরে নদীর ওপর আর একটি পুরাতন কাঠের সেতু আছে। কিন্তু এইটেই সবচেয়ে সুন্দর। মধ্য-যুগের এই কাঠের পোল পার হয়ে নদীর তীরের একটি হোটেলে রাতে থাকবার একটি ঘর ঠিক করে লুত্সেয়ার্ণ দেখতে বাহির হলুম।

লুত্সেয়ার্ণের সহরতলীতে গুট্স্ (Gutsch) বলে একটি যায়গা আছে; অর্থাৎ ভ্রমণকারীদের জন্য কয়েকটি বড় হোটেল আছে। যায়গাটি লুত্সেয়ার্ণ থেকে কিছু উঁচু, একটি ছোট পাহাড়ের মাথায়। ওঠবার জন্যে একটি ফিউনিকুলেয়ার (funiculaire) আছে। এই ফিউনিকুলেয়ারে করে গুট্সের মাথায় ওঠা গেল। ফিউনিকুলেয়ার থেকে নেমেই সামনে একটি হোটেল, তার সম্মুখে খোলা বসবার যায়গা, টেবিল চেয়ার পাতা, রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিংএর ধারে একটি চেয়ারে বসলুম। পায়ের নীচে পাহাড় খাড়া নেমে গেছে, লুত্সেয়ার্ণের পথে গিয়ে ঠেকেছে। তলায় আঁকাবাঁকা রেউস-নদীর দুই তীর জুড়ে ছোট সহর বিচিত্র দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন আরব্য উপন্যাসের দৈত্য এই সহরটি কোথা থেকে তুলে এনে এই পাহাড়ঘেরা হ্রদের তীরে বসিয়ে দিয়েছে,—কিছুক্ষণ পরেই বোধ হয় আর কোথাও তুলে নিয়ে যাবে।

এইখানেই সান্ধ্যভোজন করে নিলে ভাল হবে বুঝে

আলোগুলি শত শত চক্ষুর মত চেয়ে। পথ বা গোলগুলি [illegible] হয়েছে। কিন্তু তাহাদের উচ্ছৃসিত যৌবন তারা দেখা যায় না, শুধু তাহাদের আলোর সারি [illegible] [illegible] বাহির [illegible], [illegible] কাসিনোতে মত ঝুলছে। তলায় কোন সংব আছে [illegible] [illegible] বা

না,—মনে হচ্ছে, হ্রদের [illegible] কারের কোলে বনের ঘন অন্ধকারের ধারে মণিমাণিক্যবিজড়িত কোন বৃহৎ দৈত্য অথবা পৃথিবীর আদিম যুগের কোন অতিকায় জন্তু স্থির হয়ে পড়ে আছে,—তার গায়ে গায়ে হীরার মালা জড়ান।

অন্ধকার পথ দিয়ে লুত্সেয়ার্নে নেমে যখন তাহার হ্রদের ধারের বেড়াবার পথে গিয়ে পৌঁছুলুম, তখন এই বেড়াবার পথটি দেশবিদেশের নরনারীদের গল্প-গুঞ্জরণে হাস্য-কলরবে মুখর। সবাই সান্ধ্য-ভোজ শেষ করে হ্রদের হাওয়া খেতে বাহির

নৌকা বেয়ে তাদের শ্রান্তি বা অবসরের আনন্দের পরিপূর্ণতা হয়নি, রাতে নৃত্যটা চাই।

(৩)

পরদিন সকালে লুৎসেয়ার্ণ ছেড়ে চল্লম ইন্টারলাকেনের দিকে। লুৎসেয়ার্ণ হতে ইন্টারলাকেন যাবার রেলের পথটি চমৎকার। এমন অপূর্ব্ব সুন্দর প্রাকৃতিক-দৃশ্য-ভরা রেলপথ আমি খুব কম দেখেছি।
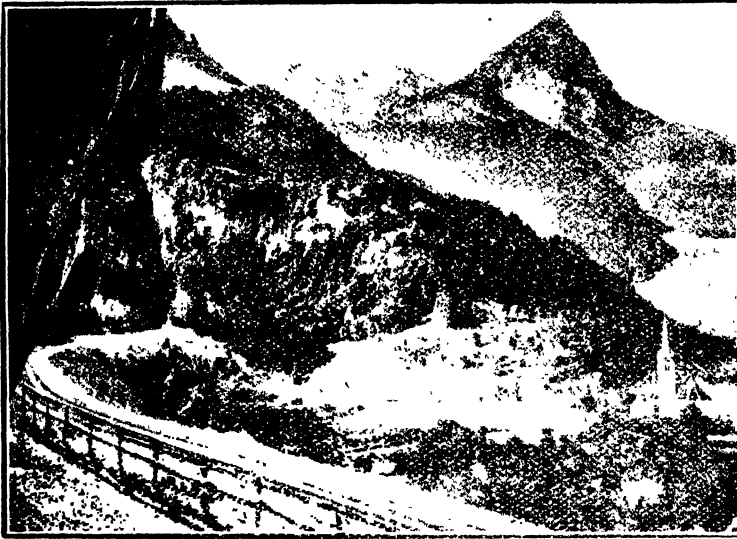
রেল-লাইন হ্রদের তীরের পাশ দিয়ে চলেছে। শরতের উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে হ্রদের জল ঝলমল করছে। দূরে পাহাড়ের সারিগুলিও ঝিকমিক্ করছে।
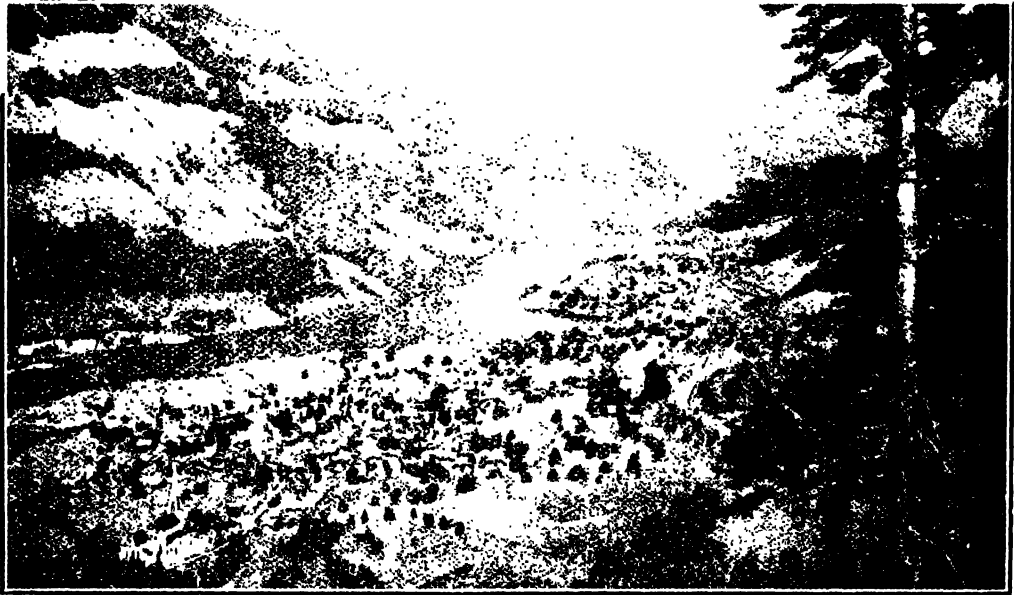
পিলাটস্ পর্ব্বতকে ডাইনে রেখে, লুৎসেয়ার্ণ হ্রদকে বামে ছাড়িয়ে ট্রেন একটি টানেলে প্রবেশ করল। দীর্ঘ টানেল। টানেলের অন্ধকার থেকে যখন ট্রেন বাহির হল, নীলাকাশকে আরও মধুর, বনের উজ্জ্বল শ্যামলতাকে আরও প্রিয় মনে হল। আর একটি ছোট হ্রদের পাশ দিয়ে ট্রেন চলেছে। দু'পাশে পাহাড়ের চূড়ার পর পাহাড়ের চূড়া। পাহাড়গুলি খুব উঁচু নয়; কিন্তু প্রতি চূড়াটির বিশেষ মূর্ত্তি চোখকে মুগ্ধ করছে। ধীরে ধীরে ট্রেন চলেছে।

সারনেন বলে একটি ছোট ষ্টেসন, হ্রদের ধারে একটি

ছোট সহর কয়েকটি হোটেল ও কতকগুলির সালের সারিতে গড়া। বাড়ীগুলির ছায়া হ্রদের জলে ঝিলমিল করছে। তাদের পাশে পাহাড়ের সারির কালো ছায়া।

সারনেন হ্রদের তীর দিয়ে গাড়ী চলেছে। কি স্নিগ্ধ নীল এ হ্রদের জল,—যেন কোন সুন্দরীর নয়নের নীল তারার অনিমেষ চাউনি। নীল জলের ওপর সবুজ বনের ছায়া নীল পর্ব্বতের ছায়া পড়েছে,—যেন তারা ওই নীল চোখের দিক মগ্ন হয়ে চেয়ে আছে। ছোট ছোট পাহাড়গুলি, কিন্তু প্রতি

লুনগেরার্ন হ্রদ

পাহাড়ের বিশেষ রূপ। কোন পাহাড় খাড়া উঠে গেছে, চূড়াটা একটা টোপরের মত। কোন পাহাড় উঠে গেছে দুলতে দুলতে, শিখরটা একটা ফেনা ভরা তরঙ্গের মত। কোন পাহাড় উঠে গেছে এঁকে বেঁকে সঙ্কুচিত ভাবে, তার রূপ সবুজ-শাড়ি-পরা সলজ্জা বধূর মত।

হ্রদ শেষ হল, গিসভিল বলে একটি ছোট ষ্টেসনে ট্রেন থামল। এবার ট্রেন ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা দিয়ে উঠে চলেছে। ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে উঠে চলেছে। সহর নদী বন সব তলায় পড়ে রইল, পাহাড়ের উচ্চ শিখরের দিকে আমাদের যাত্রা। সামনে উচ্চ গিরিবর্ত্ম আছে, সেটি পেরিয়ে যেতে হবে।

অপূর্ব্ব এ গিরিপথ। আমাদের এক দিকে ঘন পাইন-বন-ছাওয়া খাড়া পাহাড়। এই পাহাড়ের গা দিয়ে উঠে চলেছি। অপর দিকে উজ্জ্বল আলোভরা নীলাকাশ; বহু নিম্নে একটি হ্রদ এঁকে বেঁকে চলেছে। একে হ্রদ বলা চলে না, নদী বল্লে ঠিক হয়। তার তীরে তীরে মাঝে মাঝে ছোট ছোট লাল নীল হলদে নানা রং-এর সালের সারি ছড়ান। তার

ব্রনিগ-গিরিবর্ত্ম

পাশ দিয়ে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। নগ্ন পাহাড়, মাঝে মাঝে বনে ছাওয়া। এই সব পাহাড়ের পেছনে চিরতুষারাবৃত শুভ্র পর্ব্বতশ্রেণী। চারি দিকে কি রং-এর উচ্ছ্বাস, মাদকতা আকাশ যেন নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা, আলো যে গলান হীরার স্রোত, তুষার-ঢাকা পর্ব্বতশিখরশ্রেণী যে রূপালি জরির ঝলমল পাড় করে নীল অঞ্চলে লাগান হ্রদটি কি গভীর নীল, যেন কাপড় রং করবার জন্যে ে নীল রং গুলেছে; তার তীরের পাহাড়ের সবুজ বনের ছো

মখমলের মত ঝিকমিক্ করছে। তলার বাড়ীগুলি রঙীন তাসের ঘরের মত দেখাচ্ছে। তাদের চারি দিকে সবুজ মাঠ ভেলভেটের মত পাতা। এই আকাশ, এই আলো, এই যাত্রীর মনে চঞ্চল আনন্দ, মুখে দীপ্ত খুসি। এক আমেরিকান যুবক দম্পতী নীরব থাকতে পারল না, গান ধরেছে। সবাই মাঝে মাঝে বলে উঠছে, কি সুন্দর! কি

ইন্টারলাকেন

ইন্টারলাকেন ও ইউংফ্রাউ
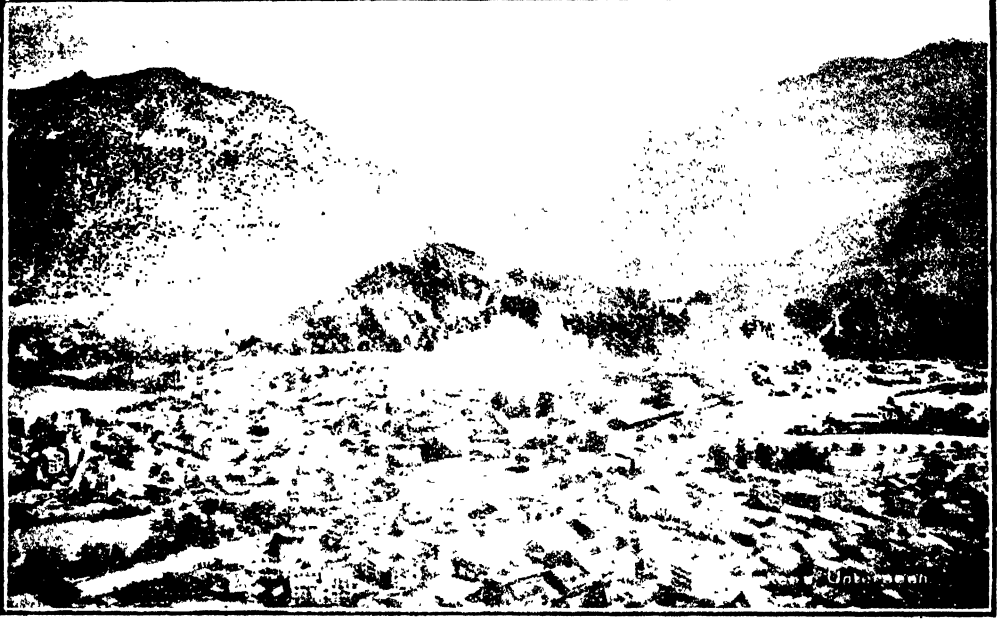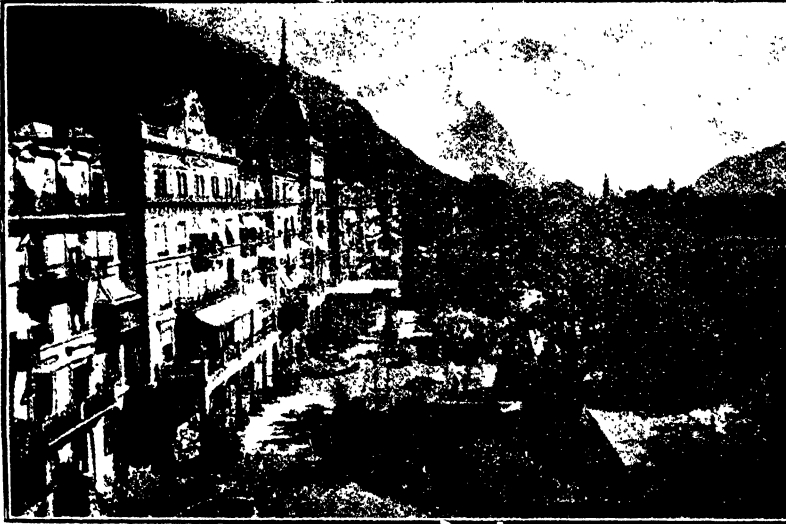
সুন্দর! মন সভাই বলতে চাইছে, হে মনোমোহন, তোমাকে আমি দু'চোখ ভরে দেখলুম, কি সুন্দর তোমার রূপ। শেলীর Hymn to Intellectual Beauty কবিতাটি মনে পড়ছে। হয় ত এইরূপ কোন সুন্দর উজ্জ্বল দিনে সুইজারল্যাণ্ডের কোন গিরিপথে হ্রদের সামনে বসে শেলী এই কবিতাটি লিখেছিলেন,—এই আলো-ঝলমল সৌন্দর্য্য-লোকের মধ্যে Spirit of Beauty'র স্পর্শ, বিশ্বরূপের একটি অপূর্ব্ব রূপ ক্ষণিকের জন্য পাহাড়ের রজতরেখা, এই বনের সবুজ হ্রদের নীল, এই জল-স্থলের মায়া আমাদের দেহে মনে চোখে প্রাণে মিশে গেছে, আমাদের অন্তরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ট্রেনের সকল অন্তর ঝলসিয়া যায়।

ছোট কনিগ ষ্টেসনে এসে ট্রেন থামল। এই যায়গাটা হাজার মিটার উঁচু। সাবনেন থেকে আমরা পাঁচশ মিটার

উঁচুতে উঠে এসেছি। সামনে ব্রুনিগ গিরিবর্ত্ম (Brunig Pass)। এই গিরিপথ পার হবার জন্যে ইঞ্জিন তৈরি হতে লাগল।

ব্রুনিগ-পাস্, দুধারে খাড়া পাহাড়, পেছনে বরফ ঢাকা পর্ব্বতশৃঙ্গ, সম্মুখে সরু গিরিপথ, ঝক-ঝক গর্জ্জন করতে করতে ট্রেন চলেছে।

ব্রুনিগ-গিরিপথ পেরিয়ে ট্রেন এবার নেমে চলেছে। পাইন-বনের ঘন অন্ধকার ছাড়িয়ে সমতল-ভূমির সবুজ উদারতার দিকে, হ্রদের জলের স্বচ্ছ নীলিমার দিকে ট্রেন নেমে চলেছে। মেরিনগেন ষ্টেসন ছাড়িয়ে আরও নেমে চলেছে, একেবারে ব্রিন্‌ত্‌স হ্রদের ধারে এসে থামল। কি সবুজ এ হ্রদের জল! যেন সবুজ রং দেখিনি। যেন সবুজ ঘাসের রস নিংড়ে হ্রদটি তৈরী, যেন কে হোলিখেলা করবে বলে সবুজ রং গুলেছে। এই সবুজ হ্রদের তীরে সবুজ পাড়, যেন কে একটা সবুজ শাড়ি হ্রদের জলে রং করে শুকোতে দিয়েছে। চারি দিক ঝিক্‌মিক্ করছে। এই অপূর্ব্ব সবুজ হ্রদের তীর দিয়ে দিয়ে হ্রদের শেষে ইন্‌টারলাকেনে যখন এসে পৌঁছুলুম, তখন দুপুর একটা হবে। ইন্‌টারলাকেনে বিশেষ কিছুই দেখবার নেই, অবশ্য চারি দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া। এক গাদা হোটেলের সহর। ব্রিন্‌ত্‌স-হ্রদ ও থুন-হ্রদ এই

ইউং-ফ্রাউ-এর পথের বৈদ্যুতিক ট্রেন
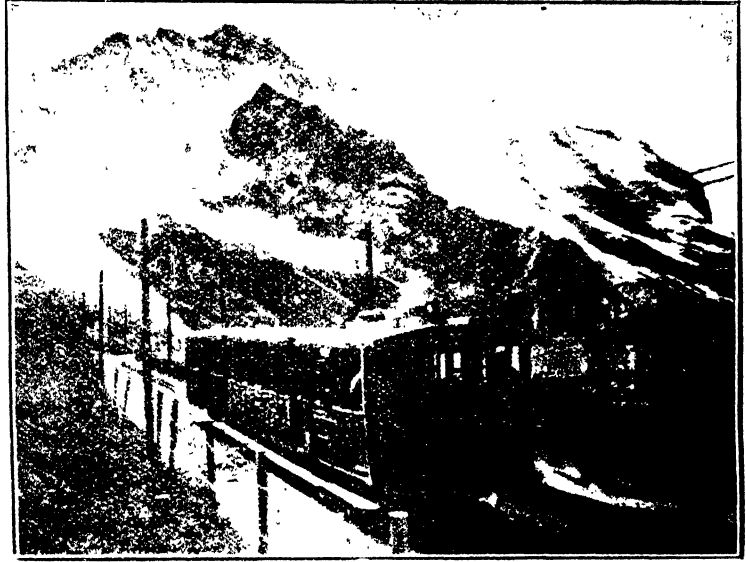
দুই হ্রদের মধ্যের সমতল-ভূমিতে সহরটি প্রতিষ্ঠিত। দুই হ্রদের মধ্যের যায়গায় স্থাপিত বলে যায়গাটির নাম হয়েছে ইন্‌টার-লাকেন বা দুই হ্রদের মধ্যের সহর। সহরটি টুরিষ্টদের খুব প্রিয়। এখান হতে ইউংফ্রাউ, সিলবারহর্ণ, মিটাগহর্ণ, গ্রোস হর্ণ, মনস্, ভেটারহর্ণ ইত্যাদি বহু পর্ব্বত-শিখরে যেতে পারা যায় বলে যায়গাটি ভ্রমণকারীদের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইউংফ্রাউর রজতশুভ্র সুন্দর শিখর সহরের সকল স্থান হতে দেখা যায়। ইন্‌টারলাকেন থেকে একটি ছোট বৈদ্যুতিক ট্রেন ইউংফ্রাউতে গেছে। এই

ইউং-ফ্রাউ ষ্টেসন

চিরতুষারাবৃত ইউংফ্রাউ ষ্টেসন ইয়োরোপের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ষ্টেসন, ১১,৫০০ ফিট। এ ষ্টেসন থেকে গাইড সঙ্গে নিয়ে আরও উঁচুতে যাওয়া যায়। ইউংফ্রাউ হচ্ছে ৪১৬৭ মিটার উঁচু।

একটি রেস্তোরাঁতে ল্যাঞ্চ খেয়ে সহরটি ঘুরে বিকেলের ট্রেনে ইনটারলাকেন ছেড়ে বাহির হলুম। জেনেভ হ্রদের তীরে মনট্রোর দিকে যাত্রা। থুন হ্রদ ও জেনেভ হ্রদের মাঝে দুর্গম পর্ব্বতের শ্রেণী, উচ্চ অধিত্যকা—Oberland। এই ওবারল্যাণ্ডের প্রাকৃত শোভাও খুব চমৎকার। স্পিত্‌স্ ষ্টেসনে এসে ট্রেন বদল। এতক্ষণ হ্রদের তীরে তীরে পশ্চিম-মুখো চলেছিল, এবার দক্ষিণমুখে চলা। ওবারল্যাণ্ড অতিক্রম করা আরম্ভ হল। একটি গিরিনদীর সঙ্গ নিয়ে ট্রেনটি এঁকে বেঁকে উঠে চলেছে। তার দুধারে বিচিত্র বিভিন্ন মূর্ত্তির পাহাড়ের সারি ঝুঁকে পড়েছে। জাইসমানে এ ট্রেন ছেড়ে যখন ছোট্ট বৈদ্যুতিক ট্রেনে চড়লুম তখন ইনটারলাকেন হতে চার শত মিটারের ওপরে উঠে এসেছি।

সন্ধ্যেবেলা। ওবারল্যাণ্ড পার হয়ে পাহাড়ের মাথা থেকে ট্রেন গড়গড়িয়ে নেমে চলেছে। পাহাড়ের তলায় মনট্রো। সহর, বাড়ী কিছু দেখা যাচ্ছে না। তলায় সন্ধ্যার রাঙা আলোর ঝলমল জেনেভ হ্রদ দুধে-আলতা রংএর মায়া সরোবরের মত। আমাদের পেছনে ঘন অন্ধকারময় বন। সামনে সন্ধ্যার উদার আকাশ। নীল পর্দ্দার মত তাতে রঙীন মেঘগুলি নানা রঙের ফুলের মত আঁকা। কোন মেঘ টুকটুকে, কোন মেঘ কাঁচা সোনার মত, কোন মেঘ ধূসর বর্ণের। হ্রদের ওপারে পাহাড়ের সারি অপূর্ব্ব দেখাচ্ছে। দূরের পাহাড়, কাছের পাহাড় সব মিলে মিশে এক হয়ে গেছে, যেন এক-খানা চক্রবাল পরিপূর্ণ সোনার দেওয়াল। তার অগণিত তোরণের চূড়ার সারি ঝলমল করছে। এই পাহাড়ের সম্মিলিত শিখরশ্রেণীর সোনার গতিরেখা শত তরঙ্গের স্তব্ধ শাখের মত আকাশের গায়ে আঁকা। এদিকে দাসোমিদি পঞ্চস্বর্ণচূড়ামণ্ডিত শিবের মহান মন্দিরের মত, যেন একটা

মনট্রো

বিরাট গগনভেদী গোপুরম। এই সোনালি রুপালি সুনীল সবুজ হরিত গৈরিক, সাদা কালোর অপরূপ রংএর মায়ালোকের বর্ণনা কে করতে পারে? এ অপূর্ব্ব পার্ব্বত্য সন্ধ্যাকে কথাতে বা তুলিতে আঁকা যায় না। লুত্‌সেয়ার্নে সন্ধ্যার যে উদাসিনী রূপ দেখেছিলুম, এখানে তার সে রূপ নয়। এ যেন রাঙা চেলি পরে গোধূলি লগনে বিবাহের বধূ দাঁড়িয়ে আছে। Spirit of Beauty ক্ষণকালের জন্য মূর্ত্তিমতী হয়েছে।

যখন মনট্রো এসে পৌঁছুলুম, রঙীন মায়া মিশিয়ে গেছে। চারি দিকে স্নিগ্ধ অন্ধকারের পর্দ্দা টানা; কিন্তু মনের মধ্যে সমস্ত দিনের সৌন্দর্য্যস্মৃতি ঝলমল করতে লাগল।

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৯)

নির্ব্বিবাদে পূজা শেষ হইয়া গেল।

পূজার কয় দিন ঈশানীর সামান্য একটু করিয়া জর হইলেও তিনি তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই। তাঁহার সম্মুখে কর্ত্তব্য জাগিয়াছিল, নিজের শক্তিহীনতা তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কার্য্যে সীতা এতটুকু সাহায্য করিতে পারিল না; দূরে দাঁড়াইয়া বিষণ্ন মুখে সে শুধু চাহিয়া দেখিতেছিল। পূজায় আত্মীয়-আত্মীয়াগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা যে কায হইল সীতার দ্বারা তাহাও হইল না।

তাহার বিষণ্ন মুখখানা ঈশানীর বুকে দারুণ ব্যথা জাগাইয়া দিতেছিল। হায় অভাগিনী, তুই ই যে এই গৃহের বধূ হইবার জন্য আসিয়াছিলি, আজ কোথায় উজ্জ্বল সিন্দূর তোর ললাটে দগ্ দগ্ করিয়া জ্বলিবে, কোথায় এই পূজার ভোগ তুই আজ স্বহস্তে মায়ের সম্মুখে দিবি, তাহা হইল না, কি ঘটিতে কি ঘটিয়া গেল।

তিনি বড় আশা করিয়াছিলেন, এ বৎসর পুত্র, পুত্রবধূ লইয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিবেন। তাঁহার সে আশা সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। আজ তাঁহার পুত্র থাকিয়াও নাই, সে ধর্ম্মত্যাগী, অন্যের স্বামী। যাহাকে বধূরূপে নির্ব্বাচন করিয়া আনিয়াছিলেন, সে কুমারীরূপে তাঁহার কাছেই পড়িয়া রহিল। সে পুত্র জীবিত থাকিয়াও তাঁহার নিকটে মৃত। তিনি শ্বশুরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাকে এ ভিটায় কিছুতেই পদার্পণ করিতে দিবেন না।

সে যদি আসে—

মায়ের হৃদয় দুলিয়া উঠিত,—না, সে কি আর ফিরিয়া আসিবে? যদি ফিরিয়া আসার ইচ্ছা তাহার থাকিত, তাহা হইলে সে কি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিত? সে তো জানে সমাজ যদিও কোন দিন তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া কোলে টানিয়া লইতে চায়, দাদু লইবেন না। দাদু যে বড় কঠিন বিচারক। যদিও সে তাঁহার আদরের দুলাল বংশধর, তথাপি তাহার এতটুকু ত্রুটী তিনি ক্ষমার চোখে দেখিবেন না। এ সমাজে তাহার স্থান হইলেও এ গৃহে তাহার আর স্থান নাই,—এ দ্বার তাহার সম্মুখে চির অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

পূজা শেষ হইল, ঈশানীও শয্যা লইলেন।

সুশীলবাবু চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন। তিনি বরাবরই জমীদারের অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেন, ঈশানীকে তিনি মা বলিতেন, সীতা তাঁহার সম্পর্কীয়া ভগিনী হইত। এই মেয়েটীকে সুশীলবাবু বড় স্নেহ করিতেন।

সীতার পিতা দরিদ্র সুশীলবাবুকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, নিজের ভাগিনেয়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন সীতা ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র। তাহার পর তাঁহারই একান্ত অনুরোধে সুশীলবাবু বিহারীলালের ম্যানেজার হইতে পারিয়াছিলেন।

কার্ত্তিক মাসও কাটিয়া আসিল, শীতের আভাস চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ঈশানীর জর দুই এক দিন থাকে না, আবার দশ বার দিন প্রায় লাগিয়াই থাকে। সীতা প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতেছিল। তাহার সেই চির-অক্লান্ত সেবায় বিচলিতা ঈশানী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন, "কেন মা, আর আমায় বিছানা হতে তোলবার চেষ্টা করছিস? এই শোওয়াই আমার জন্মের মত হোক। শ্রীধরের কাছে তাই প্রার্থনা কর,—আমায় যেন আর না উঠতে হয়।

সীতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ও কথা বলবেন না মা, আমার বড় কষ্ট হয়।"

সেদিন জরটা খুব জোরে আসিয়াছিল। ঈশানী নিজের বিছানায় লেপে আগাগোড়া ঢাকিয়া পড়িয়া ছিলেন। জরের সময় অসহ্য যন্ত্রণা হইলেও একটী শব্দ তাঁহার মুখে ফুটিত না। জর আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখ বন্ধ করিতেন, আর একটী শব্দও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত না। আজও জরের প্রবল যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি মুখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন, একটা আঃ উঃ শব্দও তাঁহার মুখে ফুটিল না।

সীতা পূজার যোগাড় করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহাকে আপাদ মস্তক লেপ-মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বুঝিল, তাঁহার আজিকার জরটা প্রবল ভাবে আসিয়াছে। সকালে জর খুব সামান্যই ছিল। সুশীলবাবু প্রাতে দেখিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, আজ সম্ভবতঃ জরটা ছাড়িয়া যাইবে; কেন না, কাল ও পরশু দুই দিন সামান্য করিয়া জর হইয়াছিল। আজ নয় দিন হইয়া গিয়াছে, জর আর প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে না, ইহা সকলেরই বিশ্বাস ছিল; কিন্তু বিশ্বাস করা মিথ্যা হইয়া গেল।

সীতা লেপ সরাইয়া তাঁহার গায়ে হাত দিতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন,—"কে, সীতা?"

সীতা উত্তর করিল, "হ্যাঁ মা, আমি। আজও আপনার এতটা জর এল মা, গা যে আগুন হয়ে উঠেছে।"

"হোক,—হোক মা, অন্তরের চাপা আগুন এবার বাইরে ফুটে বার হচ্ছে, হতে দে মা। এই এতটা আগুন আমি মনের মধ্যে চেপে রেখেছিলুম রে, সেটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে—তাই দেখতে পাচ্ছিস। উঃ, বুকের এই যায়গাটা আমার জলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। এখানে আর কিছু নেই রে, সব পুড়িয়ে এ আগুন এখন বাইরে প্রকাশ হতে পেরেছে। এখন দেহটা পুড়িয়ে ছাই করলেই হয়। দে মা, তোর ঠাণ্ডা হাতখানা আমার বুকের ওপর দে,—বুকের মধ্যে বড্ড হু হু করছে।"

মুখের আবরণটা তিনি তুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুখখানা তখন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, দুই চোখের কোণ বাহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। সীতা তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ঈশানী তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া ছলেন। নিঃশব্দে তাঁহার চোখ দিয়া জলধারা বাহির হইয়া উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল।

চিন্তামগ্না সীতা হঠাৎ এক সময় চোখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল, চিন্তা তাহার দূর হইয়া গেল। আপনার অঞ্চলে তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কাঁদছেন মা——"

তাহার কণ্ঠস্বর যে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সেদিকে তাহার নিজেরই দৃষ্টি ছিল না।

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈশানী বলিলেন, "বড় কষ্টে চোখ ফেটে আপনিই যে জল বার হয়ে পড়ে মা,—এ জল আমি যে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছি নে।"

সীতা সান্ত্বনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ওই আপনার বড় দোষ মা,—আপনি কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না। আপনি মানুষ, আপনার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, আপনি কেন সামান্য মনোবৃত্তির বশে চলবেন? চেষ্টা করলে যাদের চাকরের মত খাটিয়ে নিতে পারেন, তাদের বশ হয়ে আপনি কেন চলবেন? দেখুন, দাদু অনেকটা জোর করে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। কষ্ট তো মা আপনার চেয়ে তাঁর বড় কম হয় নি।"

ঈশানী কম্পিত হস্তে চোখের জল মুছিতে গেলেন। সীতা নিজের হাতে মুছাইয়া দিল। বেদনাভরা কণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "ভুল বুঝেছিস মা। নিজের জন্যেই নিজে ব্যথা পেয়ে কাঁদছি, তা ভাবিস নে। আমার তবু সান্ত্বনা আছে —আমি সব পেয়েছিলুম, অদৃষ্টের দোষে রাখতে পারলুম না, তাই হারিয়ে ফেললুম। আমি যে তোর কথা ভেবে কাঁদি মা,—ভাবি, তোর জীবনটা একেবারেই এমন করে ব্যর্থ হয়ে গেল। সংসারে আশা আনন্দ সাধ নিয়ে উৎসাহপূর্ণ প্রাণে প্রবেশ করবার মুখে এমন ব্যর্থতার আঘাত পেলি, যাতে জীবনটাই তোর মিছে হয়ে গেল। তোর সে হাসি মিলিয়ে গেছে, সে আনন্দ আর নেই। সদানন্দময়ী মা আমার,—আমার পরিবর্ত্তন তোর চোখে পড়েছে, তোর পরিবর্ত্তন কি আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে? আমি পুরুষ নই, আমি তোর বুড়ো দাদু নই যে, অতি কষ্টে হাসি মুখে এনে আমায় ভুলাতে পারবি। ওরে মা, এ কথাটা একবার ভাবিস নি,—আমি নারী,—নারীর কথা, নারীর ব্যথা নারীই বোঝে, আর কেউ বোঝে না।"

হঠাৎ বড় আঘাত পাইয়া মানুষের মুখ যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, সীতার মুখখানা তেমনই বিবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তে সে ভাব সামলাইয়া লইয়া সে হাসিয়া ফেলিল,—"আপনি পাগল হয়েছেন মা,—কি আমার ছিল,—কি আমার গেছে? সংসারে সংসারীরূপে বাস করবার ইচ্ছা আমি কোন দিন করিনি, কখনও করব না। এই তো সংসার মা,—লোকে বলে বড় সুখের। কিন্তু আমি দেখছি, বড় দুঃখের। যেখানে অনবরত আঘাত পেয়ে বুকের হাড়গুলো গুঁড়িয়ে যায়, দিনরাত যেখানে দীর্ঘশ্বাস আর চোখের

জল ফেলতে হয়, এমন সংসারে বাস করার চেয়ে না বাস করাই ভাল মা। মাকাল ফল দূর হতে দেখতে ভারি সুন্দর, সাজিয়ে রাখার উপযুক্ত; কিন্তু ব্যবহার করতে গেলেই তার ভেতরের অসারত্ব ফুটে বার হয়। এই সংসারের অসারত্ব জেনেই, যাঁরা বাস্তবিক জ্ঞানী, তাঁরা জড়িয়ে পড়তে চান না,—অনেক দূর হতে দেখে যান মাত্র।"

নিজের সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছিল সীতা যে তাহা এড়াইয়া গেল, তাহা ঈশানী বেশ বুঝিতে পারিলেন। একটু-খানি নীরব থাকিয়া তিনি বলিতে গেলেন, "আমার বড় ইচ্ছা ছিল মা—"

তিনি যে কি ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করিবেন, তাহা অনুভবে বুঝিয়া লইয়া, সীতা বিবর্ণ মুখে ধমক দিয়া আগেই বলিয়া উঠিল, "বেশী কথা বলবেন না মা। জ্বরটা বড় বেশী রকম এসেছে, যা তা বকছেন। আমি ম্যানেজার দাদাকে ডাকতে পাঠাই,—তিনি এসে মাথা যদি ধুইয়ে দিতে বলেন তাই দেব।"

সে জনৈক দাসীকে বাহিরে বৈঠকখানায় দাদুর কাছে সংবাদ দিয়া পাঠাইল। কাছারীর কাজ স্থগিত রাখিয়া বিহারীলাল তখনই সুশীলবাবুকে ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন। সুশীলবাবু রোগিনীর দেহের তাপ লইয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "আমার ঔষধে কোন ফল হবে না সীতা। এতদিন এলোপ্যাথি ব্যবহার করলে মা ভাল হয়ে যেতেন। আগেই মাকে বলেছিলুম—নৃপেন বাবুকে এনে দেখানো হোক। তিনি বড় ডাক্তার, হাতযশ যথেষ্ট আছে,—তাঁকে দেখালে জ্বর এতদিন কবে ভাল হয়ে যেত। কর্ত্তাবাবুও তাই বলেছিলেন, কিন্তু মার অসম্মতিতেই শুধু হল না। যাই হোক, এখন মাথাটা বেশ করে ধুইয়ে দাও। উপস্থিত আমি ওষুধ নিয়ে আসছি। তার পর বিকেলে আজ নৃপেন বাবুকে আমি নিজেই ডেকে নিয়ে আসব—মায়ের আপত্তি আজ শুনব না।"

সীতা বলিল, "কখন শোনা হবে না। এমন ভাবে ইচ্ছা করে ভুগে ভুগে শেষটায় মারা পড়বেন, এইটাই মায়ের মন। তার পর আমাদের উপায় যে কি হবে, তা তো ভাবছেন না।"

তাহার গলার কাছে কান্না ঠেলিয়া আসিতেছিল। জোর করিয়া সে তাহা চাপিয়া রাখিল। মুখখানা এই চেষ্টায় বিকৃত হইয়া উঠিল। মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া রাখিয়া, সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া, সে স্বাভাবিক সুরে বলিল, "একটু বসুন দাদা, আমি মার মাথাটা ধুইয়ে দিই, তার পর গিয়ে ওষুধ আনবেন।"

সে ঈশানীর মাথা ধোয়াইয়া দিল। সুশীলবাবু ঔষধ লইয়া আসিলেন। ঔষধ খাওয়াইয়া বাতাস দিতে দিতে ঈশানী ঘুমাইয়া পড়িলেন। সম্পর্কীয়া পিসীমা ও ক্ষান্ত দাসীকে তাঁহার কাছে রাখিয়া সীতা বাহির হইল।

বিহারীলাল আহারে বসিয়াছিলেন। আজ সীতা বা ঈশানী কেহই কাছে ছিলেন না। বৃদ্ধের আহার্য্য মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। রাঁধুনী মোক্ষদা ঠাকুরাণী তরকারী ভাল না হওয়ার জন্য অনর্থক তিরস্কৃত হইতেছিল। সীতা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে একটু হাসিয়া বলিল, "সুক্তো হওয়ার জন্যে ওকে বকছেন কেন দাদু,—আপনি কাল খেতে চেয়েছিলেন বলে আমিই করতে বলেছিলুম। তুমি যাও বামুন পিসী, যদি আর কিছু দরকার হয়, আমি তোমায় ডাকাব এখন; আমি এখানে দাদুর কাছে থাকছি।"

বামন ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি কর্ত্তাবাবুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সীতা দাদুর পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "আজ ভাল করে কিছুই খাননি যে দাদু, সব পাতে পড়ে রয়েছে।"

বৃদ্ধ অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কি করে খাই বল দেখি? চিরকাল আমার পাতের কাছে কেউ না বসলে আমার খাওয়া হয় না। কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। আগে মা থাকতে তিনি বসতেন। তার পর পিসীমা ছিলেন। ক্রমে তোর ঠাকুর মা, আমার বউমা, তুই—এক এক করে মায়ের সে ভারটা তোরাই নিয়েছিস। খাব কি করে বল দেখি,—খেতে গিয়ে গলা যেন চেপে ধরছিল।"

সীতা হাসি চাপিয়া বলিল, "তাইতেই এমন সাধের সুক্তো ফেলে দিয়েছেন তা বুঝেছি। এ তরকারীগুলো যেন ফেলবেন না দাদু,—সব আপনাকে কুড়িয়ে খেতে হবে। একটু দেরী হয়েছিল দাদু,—মার বড় জ্বর এসেছে,—তাঁর মাথা ধুইয়ে, ওষুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলুম। জানি—আপনার কাছে না এলে আপনার খাওয়া হবে না—।"

বিহারীলাল ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জ্বর এসেছে? খুব বেশী—?"

সীতা বিষণ্ণমুখে বলিল, "খুব বেশী; এত গা গরম কোন দিন-এর মধ্যে হয় নি। দাদা তাই বলছিলেন, তাঁর ওষুধে যখন কোন ফল হল না, তখন হোমিওপ্যাথি আর না দিয়ে নৃপেনবাবুকে একবার ডেকে এনে দেখানো ভাল।"

বিহারীলাল ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে যাওয়ার আগে আমায় বলেছিল বটে। আমি বলেছি—দেখি বউমাকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কি বলেন, তার পর যা ভাল হয় তা করা যাবে। মা কি সে ওষুধ খাবেন?"

সীতা বলিল, "খাবেন না তো কি? আপনি ওষুধ আনিয়ে দিন, দেখুন আমি খাওয়াতে পারি কি না। আপনার মত তো সবাই নয় দাদু যে—"

হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "ঠিক কথা বলছিস ভাই, আমি নিজে কখনও ডাক্তারী ওষুধ খাই নি। যদিই ওষুধ খেতে হয়, কবিরাজিটাই ব্যবহার করি। আমি নিজে খেতে পারিনে বলে মনে হয়—ও ওষুধ আর কেউ খেতে পারবে না। যাক, যদি মাকে খাওয়াতে পারিস, আমি নৃপেনকে ডেকে মাকে দেখিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করি। তা তুই এখন যা, আমার খাওয়া হয়ে এসেছে। মার কাছে তুই না থাকলে তাঁর ভারি কষ্ট হবে।"

সীতা বলিল, "তিনি ঘুমোচ্ছেন দাদু, পিসীমা বসে আছেন, ক্ষ্যান্ত মাথায় বাতাস দিচ্ছে।

বিহারীলাল সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উঁহু, ওরা কি তেমনভাবে সেবা করতে পারবে মা—যেমনটী তুমি করবে? কমলা বসে থাকলেই বা কি,—সে যেমন মানুষ, তাতে কাউকেই ছোঁবে না। তুই যা ভাই, আমার হয়ে গেছে।"

বিরক্তভাব দেখাইয়া সীতা বলিল, "অত তাড়াতাড়ি করে খাচ্ছেন কেন দাদু। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে এমন বিষম খাবেন, যার ধাক্কা সামলাতে আপনার ছুইটী ঘণ্টা কেটে যাবে। আপনি যেমন আস্তে আস্তে খান, তাই করুন। আপনার খাওয়া শেষ হলে আমি আপনাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে তার পর যাব।"

বিহারীলাল আর কথা বলিলেন না। তিনি বেশ জানিতেন, সীতা যাহা ধরিবে, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িবে না, এমনই কঠোর পণ তাহার। সে তাহার নিত্য নৈমিত্তিক কাযগুলি এমনই করিয়া একান্ত জেদের সহিত নিক্তির মাপে মাপিয়া লয় যেন একতিল কমবেশী না হয়।

দুধের বাটীতে ভাত ফেলিয়া মাখিতে মাখিতে অন্যমনস্ক-ভাবে তিনি বলিলেন, "বউমার নামে একখানা পত্র এসেছে, রাখাল সেখানা কোথায় রাখলে জিজ্ঞাসা কর তো দিদি।"

রাখাল দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে পত্রখানা আনিয়া সীতার কাছে দিল।

বিহারীলাল বলিলেন, "মায়ের কাছে পত্রখানা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, তাঁর বড় জ্বর এসেছে দেখে রাখাল পত্র বুঝি দিতে পারে নি। তুমি পড় তো দিদি, ছোট বউমা লিখেছেন তা বুঝতে পেরেছি। কি লিখেছেন তা শোনা যাক।"

এখানি জয়ন্তীর সেই পত্র, যেখানিতে তিনি এখানে আসিবার কথা লিখিয়াছিলেন।

পত্র শুনিতে শুনিতে বিহারীলালের মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল। চক্ষু ছুইটী মুহূর্ত্তের তরে দীপ্ত হইয়া উঠিয়া তখনই নিভিয়া গেল। তিনি নীরবে দুধের বাটিতে চুমুক দিতে লাগিলেন।

সীতার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বিহারীলালের গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিল না,—মনটা ভারি দমিয়া গেল।

অনেকক্ষণ বিহারীলাল একটী কথাও কহিলেন না। নীরবে আচমন শেষ করিয়া বিছানার উপর বসিলেন। রাখাল তামাক সাজিয়া গড়গড়ায় কলিকা বসাইয়া দিয়া গেল।

"দাদু—"

বিহারীলাল তাহার উদ্দেশ্য বুঝিলেন। তামাক টানিতে টানিতে মাথা নাড়িলেন,—"না—ওসব ফেঁসাদে আমি আর জড়িয়ে পড়ব না সীতা, আমি ওদের এখানে আসতে দিতে রাজি নই।"

শান্তকণ্ঠে সীতা বলিল, "তা কি হয় দাদু? মনে করুন, তিনি আপনারই পুত্রবধূ, মা আর তিনি ছুই-ই এক,—পার্থক্য কিছুই নেই। মানুষের মন তো চিরকাল সমান থাকে না দাদু! একদিন তিনি যে পল্লীগ্রামকে ঘৃণা করে গেছেন, শত অনুনয়েও যেখানে আসতে চান নি,—আজ নিজে যেচে সেধে সেখানে আসতে চাচ্ছেন। এতেই

বুঝুন, তাঁর মনের ভাবের কতখানি পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। না—না, দাদু, আপনি মুখ ভার করবেন না। তাঁরা আসতে চাচ্ছেন, আসুন। আপনার কাছে কোন দিন কিছু প্রার্থনা করিনি; আজ এই প্রার্থনাটী করছি,—তাঁদের ঘরে তাঁদের আসবার অনুমতি দিন। আমাদের অন্ধকার ঘর আবার আলোয় ভরে উঠুক, বিষাদ চলে যাক,—আনন্দ আসুক।"

"আলো,—আনন্দ ?"

বৃদ্ধের মুখে বড় মলিন একটু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, "তুই বলছিস কি পাগলী ? যে ঘরে একদিন বিদ্যুতের আলো জ্বলেছে, সেই ঘরে জোনাকীর আলো! সে নিজেকেই আলো দিতে পারে না, চারিদিক আলো করে তোলবার ক্ষমতা কি তার ? সেই আলোতে কতটুকু আনন্দ পাবি দিদি ? ক্ষুদ্র জোনাকী—তার নিজের দেহটাই অন্ধকারে থেকে যায়। যেটুকু তার সীমা, সেই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার কই ? সেই আলো ঘরে এনে তুই আনন্দ পেতে চাস পাগলী ? আনন্দ যেখান হতে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে, সেখানে এই আনন্দের উদ্যম করা বিষাদের মর্ম্মান্তিক পরিহাস তা জানিস ভাই ? কিন্তু না, আমি তোর এ উদ্যমে বাধা দেব না। একবার দেখতে চেয়েছিলি, আমি দেখাতে পারি নি;—ভগবান আপনিই তোকে দেখবার সুযোগ যখন দিচ্ছেন—দেখে নে। তারা আসুক—কিন্তু এইটুকু সতর্ক থাকিস ভাই, আমার এ ঘরে যেন তারা কেউ না আসে,—আমি তাদের দেখতে চাইনে।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন।

একটু পরে বলিলেন, "কেন তারা এখানে আসছে এইটুকু যদি ভেবে দেখতিস সীতা, তবে তাদের আনতে চাইতিস নে। তারা জানে—আমি জ্যোতিকে ত্যাগ করেছি। পাছে এই বিশাল সম্পত্তি—যা আমি আমার বুকের রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করে দিয়ে বাড়িয়েছি—এই সম্পত্তি কাউকে দিয়ে ফেলি, সেই দেওয়া বন্ধ করতেই তারা আসছে। আমি তোর ঠাকুরদা দিদি,—ঠেকে অনেক শিখেছি,—সহজে কেউ চোখে ধূলো দিতে পারে না। তোদের চোখে ধূলো দিতে যে-সে পারে,—আমার চোখে ধূলো দেওয়া ভারি শক্ত। দু'দিন বড় আঘাত পেয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলুম,—আবার দাঁড়িয়েছি, আবার শক্ত হয়েছি। কর্ত্তব্য হারিয়ে ফেলেছিলুম,—এর পর কি করতে হবে তা ভুলে গিয়েছিলুম,—আমার সামনে হারানো কর্ত্তব্যজ্ঞান আবার জেগে উঠেছে,—কি করতে হবে তা আমি ঠিক করে নিয়েছি।"

সীতা পত্রখানা হাতে লইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

(২০)

অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি একদিন বৈকালে জয়ন্তী কন্যাসহ রামনগরে আসিয়া পৌছিলেন।

তাঁহার কন্যা যে পল্লীগ্রামবাসিনী অশিক্ষিতা নারী নহে, সে যে সহরবাসিনী এবং শিক্ষিতা, প্রথম দৃষ্টিতেই ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিবার জন্য জয়ন্তী কন্যাকে বিশেষরূপ সাজাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ইভার পায়ে উচ্চ গোড়ালীযুক্ত জুতা, ষ্টকিং, পরণে বিচিত্রভাবের শাড়ী, বাঁকা সিঁথা; রেশমের মত কোমল চিক্কণ কালো চুলগুলি মুখের, ললাটের উপর দিয়া ঢেউ তুলিয়া গিয়াছিল।

এ সজ্জা যদিও ইভার পক্ষে কিছুতেই অতিরিক্ত হইতে পারে না, তথাপি সে তাহার প্রচলিত এই সজ্জার দারুণ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। এই শাড়ীখানাই সে স্বাভাবিক ভাবে পরিয়াছিল, এবং পায়ের জুতাও খুলিয়াছিল। তবে একটাতে সে ভুল করিয়াছিল। পল্লীগ্রামের মেয়েরা যে এখনও বাঁকা সিঁথা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন, তাহা সে একবারও ভাবে নাই। সেইজন্য সিঁথার দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

মেয়ের এই স্বাভাবিক সহজ বেশ জয়ন্তীর চোখে কাঁটা বিঁধাইয়া দিয়াছিল। তিনি তিরস্কার করিয়া তাহাকে নিজের হাতে নিজের মনের মত সাজাইয়া দিলেন। ইভা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিল,—মায়ের কার্য্যের একটী প্রতিবাদ করিল না।

সঙ্গে আসিয়াছিল বাজার সরকার শম্ভু। সে প্রথমতঃ ক্ষুদ্র গ্রাম্য ষ্টেসন দেখিয়া খুব একচোট হাসিয়া লইল। তাহার পর গরুর গাড়ী দেখিয়াই চক্ষু কপালে তুলিল।

জয়ন্তী ভারী অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। রাগও যথেষ্ট হইতেছিল—কেন না, তিনি আগেই জানাইয়াছিলেন, তিনি এই ট্রেনে আজ এখানে আসিবেন। ষ্টেসনে দুখানা, অন্ততঃ

পক্ষে একখানা পালকী রাখাও কি উচিত ছিল না? বাড়ীর সকলেই তো বেশ জানেন—জয়ন্তী কখনও গরুর গাড়ীতে উঠেন নাই। আত্ম-অভিমান মনে জাগিয়া উঠিল,—না, এখানে আসা তাঁহার কোন মতে উচিত হয় নাই। দাদা বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা অমান্য করিয়া আসা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। বেশ ছিলেন সেখানে,—অনর্থক ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিবার কোন কারণ ছিল না। এই—যাচিয়া সাধিয়া অপমান বরিয়া লওয়া তাঁহারই নিজের জেদের জন্য হইল। যদি পরে কলিকাতাগামী কোন ট্রেন থাকিত,—জয়ন্তী আর রামনগরে যাইতেন না,—আবার কলিকাতায় ফিরিতেন, সেও ভাল ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আর ট্রেন ছিল না,—বাধ্য হইয়া তাহাকে রামনগরেই যাইতে হইবে।

মুখখানার উপর বিরাট অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। তিনি একবার গরুর গাড়ীর দিকে, একবার পল্লীগ্রামের স্বল্পপরিসর—দুধারে ঝোপজঙ্গলাবৃত উঁচু-নীচু পথের দিকে তাকাইয়া অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন।

ইভা মায়ের ভাব দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "ভাবছ কি মা, ওঠ গাড়ীতে।"

তিরস্কারের সুরে জয়ন্তী বলিলেন, "সে তো উঠতেই হবে। তোর জেদে পড়েই না আজ আমার এই দুর্দ্দশা! দিব্য ছিলুম বাপু,—এই পাড়াগাঁয়ে সাধ করে এসে,—এই উঁচু-নীচু কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ীতে বসে যেতেই হবে।"

যদিও নিজের ইচ্ছাও জাগিয়াছিল, তথাপি আজ বেকায়দায় পড়িয়া জয়ন্তী সব দোষটা ইভার ঘাড়েই চাপাইয়া দিলেন,—তিনি যেন নেহাৎ তাহার জেদে পড়িয়াই আসিয়াছেন, নহিলে কখনও আসিতেন না।

ইভা হাসিয়া ফেলিল। রাগ করিবার কথা হইলেও রাগ করিল না; বলিল, "সে কথা ভেবে আর কি করবে মা? আর যখন উপায় নেই, তখন এই গরুর গাড়ীতে উঠে যেতেই হবে। শম্ভুদা, হাঁ করে তুমিও তো বেশ দাঁড়িয়ে রয়েছ! একখানা গাড়ী ঠিক করে ফেল। না হয় আমিই—"

মেয়ের জ্যেঠামীতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিকৃত মুখে জয়ন্তী বলিলেন,"থাক থাক,—আর অতটা বাহাদুরী তোকে করতে হবে না। আগে যদি পত্র না দিতুম—তা' হলেও না হয় মনকে প্রবোধ দিতে পারতুম। আসলে কথা হচ্ছে এই—ওঁদের কারও ইচ্ছে নয় যে আমরা এখানে আসি বা থাকি। বোঝা গেছে সব। কিন্তু এসে পড়েছি যখন—আর তো উপায় নেই। তুমি দেখ শম্ভু, ওদেরই মধ্যে ভাল দেখে একখানা গাড়ী ঠিক করে ফেল।"

শম্ভু গাড়ী দেখিতে গেল।

ইভা বলিল, "হয় তো বাড়ীর কাযে সব ব্যস্ত হয়ে আছেন, তাই অতটা ঠিক করতে পারেন নি। দাদার মুখে শুনেছি, এ বাড়ীর মেয়েরা আমাদের মত বাইরে বেরুতে পায় না,—বাইরের সঙ্গে তাদের এতটুকু সম্পর্ক নেই। ভেতরটার মধ্যেই তারা চলাফেরা করে,—সেইখানকার খবরটুকুই তারা রাখে। দাদু বাইরে থাকেন, হয় তো জ্যেঠিমা সময় মত তাঁকে আমাদের আসার খবর দিতে ভুলে গেছেন, নচেৎ দেখতে—"

বাধা দিয়া অভিমানভরা কণ্ঠে জয়ন্তী বলিলেন, "তুই আর ও কথাটা বলিসনে ইভু। আমি বেশ জানি—সব কথাই সকলে জানে,—জেনেও আমায় সবাই অবহেলা করছে। যাক গিয়ে, করুক ওরা অবহেলা,—আমি দুদিনের জন্যে এসেছি বই তো নয়, পরশু তরশু ঠিক চলে আসব। শম্ভুকে এ দুটো দিন ছেড়ে দিচ্ছিনে। একে তো এই ভূতের দেশ,—কিছু নেই,—এখানে না কি মানুষ বাস করতে পারে। চল, তোর সখটা খুব বেশী কি না, দুদিন থেকে দেখে শুনে চল। এর পর আর কখনো আসতে চাইবিনে —এ আমি বলে দিচ্ছি।"

গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া শম্ভু ফিরিল। মেয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইল। মা যেন নেহাৎ বাধ্য হইয়াই তাহার পশ্চাৎ চলিলেন।

গাড়ীর মধ্যে উঠিতে উঠিতে ইভা হাসিমুখে বলিল, "এই তো বেশ বসবার যায়গা আছে মা। আমরা দু'জনে এই দিকটায় বসি, শম্ভুদা সামনে বসুক, বেশ যাওয়া যাবে।"

কেন আসিয়াছেন ভাবিয়া জয়ন্তীর অন্তর অনুতাপে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। তিনি উঠিবার আগেই ইভা ভিতরে উঠিয়া গেল এবং বড় আরামে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল।

জয়ন্তী বিকৃতমুখে গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "তবে তাই বসো শম্ভু, এইখানটায় বসো। ছাতা নেই,

যে কাঠফাটা রোদ—ভারি কষ্ট হবে তোমার। আমার এই গায়ের কাপড়খানা না হয়,—"

শম্ভু বাধা দিয়া বলিল, "না মা, আমার কিছু দরকার নেই,—আমি বেশ যেতে পারব এখন। এই মাঠটা ছাড়ালে ওদিকে বেশ গাছের ছায়া পাওয়া যাবে।"

গ্রাম্য পথে গাড়ী চলিল। চালকের মাঝে মাঝে গরুর লেজ আকর্ষণ, গ্রাম্য ভাষায় গরুর উদ্দেশে গালাগালি—ইভা যতই শুনিতেছিল, গাড়ীর মধ্যে ততই সে হাসিয়া লুটাপুটি খাইতেছিল।

কাঁচা রাস্তা। বহুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় এবং অনবরত গরুর গাড়ী যাতায়াত করায় পথে প্রচুর ধূলা জমিয়াছিল। গরুর পায়ে, চাকায় সেই ধূলা উড়িতে লাগিল। জয়ন্তীর নাকে মুখে ধূলা আসায় তিনি অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন।

পথের দূরত্ব তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না। বহুকালের কথা সে—যে দিন এই পথখানি তিনি পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন দারুণ ঘৃণায় বলিয়া গিয়াছিলেন, "এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক আমার এই শেষ,—আর কখনও এ পথে আসিব না।" আজ সেই দিনের কথা মনে করিতে তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন।

ইভা গাড়ীর পিছনের ফাঁক দিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতেছিল। বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত দেশে আসিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মনের অনেক ভাবপূর্ণ কবিত্বময় কথা ফুটিয়া উঠিবার জন্য গলার নিকট আসিয়াছিল; কিন্তু মায়ের গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া সে সাহস করিয়া একটা কথাও বলিতে পারে নাই। শম্ভু গাড়ীর সম্মুখে গাড়োয়ানের পার্শ্বে বসিয়া কুঞ্চিতমুখে তীব্র ভাষায় গ্রামের বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল; আর মা তাহার সমর্থন করিয়া যাইতেছিলেন। এ সব কথা শুনিতে ইভার ভাল লাগিল না,—সে বাহিরের দিকে মন নিবিষ্ট করিল।

খানিক বাদে আবার তাহার মনটা মায়ের কথার উপর গিয়া পড়িল। মা তখন সদুঃখে বলিতেছিলেন, "মেয়ে যেমন জিদ করে এসেছে, তেমনি মজা বুঝবে। সে হচ্ছে সেকেলে ধরণের জমীদার-বাড়ী,—ওদের প্রাণের চেয়ে মান আগে,—চন্দ্র সূর্য্যে ওদের মেয়ের মুখ দেখতে পায় না। সাতমহল পার হয়ে তবে অন্দর,—বাইরের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক নেই। মরবে—নিজেই কষ্ট পাবে। চিরকাল ফাঁকা যায়গায় থেকেছে,—কখনও এমন করে নবাবদের বাড়ীর মত সাত দেউড়ীর পরে ঘরের মধ্যে বাস করে নি। এবার বাস করে দেখুক—কি রকম সুখে থাকতে হয়। রোজ বিকেলে আর হাওয়া খাওয়াও চলবে না, যখন খুসি তখন ছুটে বেরুনোও চলবে না।"

ইভার বড় হাসি পাইতেছিল। এখনি মা একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিবেন—এই ভয়ে হাসি চাপিয়া সে গম্ভীর ভাবে বলিল, "তা হোক না মা; দুদিনের জন্যে বই তো নয়; আমরা তো চিরকাল বাস করতে যাচ্ছিনে।"

জয়ন্তী মুখখানা অতিরিক্ত রকম ভার করিয়া বলিলেন, "দুদিনের জন্যে? ধর,—যদি চিরকালই থাকতে হয়?"

ইভার হাসি চাপা রহিল না; তবে উচ্ছ্বসিত হইয়াও উঠিতে পাইল না। সে বলিল, "চিরকাল তোমায় এই জঙ্গলা পাড়াগাঁয়ে আটক করে রাখবার শক্তি কার আছে মা? বাবা স্বামীর দাবী নিয়ে যা করতে পারেন নি, দাদু কি শ্বশুরের দাবী নিয়ে তা পারবেন? তুমি যে এখানে থাকবেই না সে জানা কথা। আর তাঁরাও আমাদের জোর করে এখানে রাখতে চাইবেন না; কারণ, তুমি যে সহরের আলোয় মানুষ, তা তাঁরা বেশই জানেন। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি মা, যে, আমায় এখানে চিরকাল কখনো থাকতে হবে না।"

"থাক,—তুই আর হাসিস নে ইভা,—সকল সময় তোর ওই হাসি আমার ভাল লাগে না বাপু,—দেখে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়।"

মুখে জয়ন্তী তাহাকে ধমক দিলেন বটে, কিন্তু সত্যই তাহার কথাগুলা তাঁহার মনে একটা কঠিন আঘাত দিয়াছিল, তাই তাঁহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি আর কথা বলিলেন না।

দীর্ঘ পর্য্যটনে পথের দীর্ঘতা ফুরাইল,—জমীদার-বাড়ীর বৃহৎ সদর-দ্বারে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। রামসিং দ্বারোয়ান দরজার পার্শ্বে তাহার মাদুরখানা বিছাইয়া জাঁকিয়া বসিয়া একখানা রামায়ণ খুলিবার উদ্যোগ করিতেছিল, দরজার বাহিরে একখানা গাড়ী দাঁড়াইতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী কোথায় যাবে?"

শম্ভু উত্তর দিল, "এই বাড়ীতেই এসেছে।"

রামসিং অনুমানে বুঝিল বাবুর আত্মীয় কেহ আসিয়াছেন। সে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হতে আসছেন ?"

শম্ভু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, "আসছে ষ্টেসন হতে,—ছোট মা এসেছেন,—বাবুকে খবর দাও।"

"ছোট মা!—" রামসিং রামায়ণ ফেলিয়া উঠিল।

এই পরিবারে সে মাথায় চুল পাকাইয়াছে। যদিও সে সামান্য দ্বারোয়ান, বাহিরের সঙ্গেই তাহার সম্পর্ক, তথাপি অন্দর সম্পর্কীয় অনেক কথাই সে জানিত। সসম্ভ্রমে মাথা নত করিয়া সে বাবুকে সংবাদ দিতে ছুটিল।

বিহারীলাল পুত্রবধূ ও পৌত্রীর আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া বিচলিত হইলেন না, স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "সদর দরজা দিয়ে গেলে এই কাছারী ঘর সামনে পড়বে। এদিক দিয়ে নিয়ে যেতে নিষেধ কর। খিড়কীর দরজায় গাড়ী নিয়ে যেতে বলে দাও, আমি সীতাকে খবর পাঠাচ্ছি।"

বাবুর আদেশে গাড়ী অনেকটা ঘুরিয়া খিড়কীর দরজায় চলিল। অসহিষ্ণু জয়ন্তী নির্ব্বিষ সর্পিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন, "সবই বাড়াবাড়ি; পাছে কেউ ওঁর বাড়ীর মেয়েদের দেখে ফেলে তাই কি ভীষণ ব্যবস্থা! তুই একটু বেশ করে দেখ ইভা, ভাল করে দেখে নে।"

ইভা চুপ করিয়া রহিল। সে জানিত, কথা বলিতে গেলে এখনি একটা প্রলয় কাণ্ড বাধিয়া যাইবে,—মায়ের এই অতি-কষ্টে-সংযত কণ্ঠস্বর সীমা অতিক্রম করিয়া সপ্তমে চড়িয়া বসিবে। দরকার নাই অতটা কাণ্ড বাধাইয়া,—চুপচাপ থাকাই সব চেয়ে ভাল। সে-কলিকাতায় যখন মা তাহাকে নিজের ইচ্ছামত সাজাইয়া দিতেছিলেন, তখন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাঁহার কথা যতই কঠোর হোক না কেন, সবই নীরবে সহিয়া যাইবে,—উত্তরটা যাহাতে না দিতে হয়, প্রাণপণে তাহাই করিবে।

পিছনের দরজায় আসিয়া গাড়ী থামিল। শম্ভু আগে নামিয়া পড়িল। জয়ন্তী নিতান্ত অপ্রসন্ন মুখে নামিলেন। সব শেষে ইভা নামিল।

অনেক কালের পুরাতন ও পরিচিত দাসী ক্ষমা দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে ছোটমায়ের পায়ের ধূলা মাথায় দিল। ইভাকে প্রণাম করিল, বলিল, "আসুন মা, ভেতরে চলুন।"

দিদি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইতে পারেন নাই, সামান্য একটা দাসী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল,—এ ব্যাপারটা জয়ন্তীর মর্ম্মে বিঁধিয়া গেল। কোন কথা না বলিয়া ইভা তাহার পশ্চাদনুবর্ত্তিনী হইল। অগত্যা জয়ন্তী তাহার পিছনে চলিতে চলিতে শম্ভুর পানে ফিরিয়া বলিলেন, "তা হলে শম্ভু—তুমি,—"

রামসিং সসম্ভ্রমে বলিল, "আমি বাইরে নিয়ে যাচ্ছি মা।"

শম্ভুর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া জয়ন্তী ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ভিতরে দরজার পার্শ্বে সীতা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পানে চোখ পড়িতে ইভা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। জয়ন্তী মুগ্ধ বিস্ময়ে এই মেয়েটীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার পানে চাহিয়া রহিলেন। সীতার সজ্জায় অভিনবত্ব কিছুই ছিল না। একটী সাদা সেমিজ ও একখানা কালা ফিতাপাড় ধুতি মাত্র তাহার পোষাক। প্রকোষ্ঠে তিনগাছি করিয়া সরু সোণার চুড়ী। এই সাদাসিধা সজ্জায় তাহার সৌন্দর্য্য যেন উছলাইয়া পড়িতেছিল।

সে জয়ন্তীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। ইভাকে আদর করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার সুন্দর ললাটে একটী স্নেহের চুম্বন দিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "আসুন কাকিমা, এসো ভাই ইভা, উপরে চল। মায়ের বড্ড অসুখ হয়েছিল। এখন একটু ভাল হলেও তাঁকে নীচে নামতে দেই নে; কেন না, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে গেলে তাঁর বুক বড্ড ধড়ফড় করে।"

জয়ন্তী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন,—"তুমি,—তুমি, সীতা ?"

মৃদু হাসি সীতার আরক্তিম অধরোষ্ঠের উপর দিয়া খেলিয়া গেল। সে মাথা নত করিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ কাকি মা, আমিই সীতা।"

বিস্ময়ে গালে হাত দিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "এমন প্রতিমা অবহেলা করে জ্যোতি চলে গেল,—এর চেয়ে যে অনেক নিকৃষ্ট তাকে বরণ করে নিলে ? এ যে সেই গল্পটার মত হয়েছে রে ইভু—"

ইভা সীতার আরক্ত মুখখানার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "তুমি কি বলছ মা,—চুপ কর এখন, ও সব কথা পরে হবে। চল, আগে জেঠিমার সঙ্গে দেখা করি।"

সীতা ইভার পাশাপাশি সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বলিল, "আমি আজ মাত্র পত্রখানা পেয়ে মাকে পড়ে শুনালুম। দাদুর কাছে ঘণ্টাখানেক আগে মাত্র সেখানা দেওয়া হয়েছে। পত্রখানা কাল আমাদের পাওয়ার কথা ছিল, ডাকের গোলমালে একটা দিন দেরী হয়ে গেছে। রামসিংকে পালকী বেহারা নিয়ে ষ্টেসনে পাঠানোর কথা প্রথমে হয়েছিল। তার পর বোঝা গেল সেটা অনর্থক হয়ে যাবে। তোমরা ষ্টেসনে এসেছ বেলা প্রায় বারটার সময়ে, আর এই চার পাঁচ ক্রোশ গরুর গাড়ীতে আসতে বেলা পাঁচটা বেজে গেছে। খাওয়া-দাওয়াও আজ হয় নি বোধ হয় ভাই ?"

এই মেয়েটীর সঙ্কোচহীন আলাপে, বাধাশূন্য সরল ব্যবহারে ইভা তাহার বিশেষ অনুরক্তা হইয়া উঠিল। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, ভাত আজ খাই নি, তবে চা খাবার খেয়ে এসেছি।"

সীতা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ, সমস্ত দিনটা কেটে গেছে—খাওয়া হয় নি ? তার পরের ট্রেনে এলে কলকাতা হতে একেবারে খেয়ে দেয়ে আসতে পারতে। এখানে পৌছাতে না হয় একটু সন্ধ্যেই হয়ে যেত, তবু শরীর তো ঠাণ্ডা থাকত। সেই কোন্ সকালে চা খাবার খেয়েছ,—এতক্ষণ সব হজম হয়ে গেছে। চল, তোমাদের মায়ের কাছে পৌছে দিয়ে আমি খাবার যোগাড় করি গিয়ে।"

ঈশানীর ঘরে তিনি শুধু একাই ছিলেন না। বিহারী-লালের ভাগিনেয়ী ঈশানীর ননদিনী কমলা, আর দুই একটী আত্মীয়া সেখানে ছিলেন। জুতা পায়ে দিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিতে ইভা ভারি সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিল। মেয়েরা সকলেই যেন বিশেষভাবে তাহার পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া আছেন, ইহাই ভাবিয়া সে মুখখানা লাল করিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়ন্তী ঈশানীকে প্রণাম করিলেন। ঈশানী আত্মীয়াদের পরিচয় দিলে, তাঁহাদের কাহাকেও প্রণাম করিলেন, কাহারও নিকট হইতে প্রণাম পাইলেন।

বহুকাল পরে আজ দুইটী জায়ে সাক্ষাৎ ; আজ কোথায় সে দিন,—স্বামী বর্ত্তমান না থাকিলেও যে দিন ঈশানী আজকার মত অভাগিনী ছিলেন না! লক্ষ্মণের মত দেবর, সোণার চাঁদ ছেলে, আজ তাহারা কেহ নাই। ঈশানী মুখ ফিরাইয়া নীরবে চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। জয়ন্তী দুই বাহুর মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তে ঈশানী প্রকৃতিস্থা হইলেন। ইভার পানে তাকাইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন মা, ঘরের মধ্যে এস।"

সীতা মুখ নত করিয়া তাঁহার কাণে কি বলিল। ঈশানী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "পায়ে জুতো আছে তাই আসতে পাচ্ছ না মা ? তা থাক না পায়ে জুতো, জেঠিমার কাছে আসতে কোন দোষ নেই। তোমার জেঠিমা এমন শুচি-গ্রস্তা নয় যে তোমাদের ছুঁতে দ্বিধা বোধ করবে। তোমার দাদাও জুতো খুলে রেখে কোন দিন তার মায়ের কোলে আসবে বলে পবিত্র হয়ে আসে নি। কত সময় তাকে এই বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছি। সে যে অনেক সময় অপবিত্র হয়ে আছে, তাও কোন দিন ভাবতে পারি নি। আজ তোমাকেও তেমনি করে বুকে পেতে চাই মা, সকল দ্বিধা দূর করে তুমি এস।"

পুত্রের কথা বলিতে আবার চোখে জল আসে।

জয়ন্তী চোখ মুখ মুছিয়া মুখ তুলিলেন। শুষ্ক কণ্ঠে ডাকিলেন, "জেঠিমা ডাকছেন, ঘরে আয় ইভু।"

ইভা কুণ্ঠিতভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। ঈশানীকে প্রণাম করিতে যাইতে, তিনি তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। দুই চোখের জল তাহার মাথার উপরে গড়াইয়া পড়িল। বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ছোট বউ, ঠাকুর পো আর একটীবার ইভুকে দেখবার ইচ্ছা করেছিল। মা আমার আবার সেই ভিটেয় এল, কিন্তু ঠাকুর পো আজ কোথায় ?"

সীতা সেখানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি করিয়া অভুক্তদের আহার্য্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। আজ আনন্দ তাহার ক্ষুদ্র বুকে ধরিতেছিল না ; তাই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কায হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম-এ

কালী

হরপ্রিয়া পার্ব্বতী আর এক মূর্ত্তিতে করাল-বদনা কালী। এই মূর্ত্তিতে ভয়মিশ্রিত ভক্তির উদ্রেক হয়,—সেখানে হাস্যরসের স্থান নাই। সেজন্য প্রাচীন কবিগণ কালিকা দেবীকে স্তবে তুষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া অন্য দেব-দেবীর মত হাস্যকৌতুক করিবার সাহস করেন নাই। কিন্তু ভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন এই করাল মূর্ত্তির অন্তরালে অনন্ত-স্নেহ-মণ্ডিত মাতৃমূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতাকে সজীব জাগ্রত মাতৃরূপেই দেখিয়াছেন; এবং অসীম নির্ভরতার সহিত আপনার সুখ-দুঃখের সকল কথা অকপটে নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বহু-সংখ্যক পদাবলীতে জননীর প্রতি সন্তানের মনোভাব নিতান্ত সরল, সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের ভিতর দিয়া এমন একটা সরস কৌতুকের ধারা প্রবাহিত, যাহা রাম-প্রসাদী সঙ্গীতকে এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য দান করিয়া চির-নবীন করিয়া রাখিয়াছে।

রামপ্রসাদের পদাবলী

রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের আদুরে ছেলে। মাতার স্নেহাধিক্যে তিনি এতদূর আবদারে হইয়া উঠিয়াছেন যে, কোন কিছু চাহিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। তাই একেবারে বলিয়া বসিয়াছেন,—"আমায় দেও মা তবিলদারী।" আবার চাহিয়া না পাইলে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিতেও ছাড়েন না—

"কারে দিলে ধন জন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই?

*　　*　　*　　*

কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই।
মাগো, আমি কি তোর পাকা ক্ষেতে,
দিয়াছিলাম মই

মায়ের উপর ষোল আনা স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য রাম-প্রসাদ নিতান্ত ব্যস্ত। মাতার চরণযুগলে তাঁহারই অধিকার,—শিব তাহা বক্ষে ধারণ করিলেও, তাহা যে নিতান্ত বে-আইনী, এবং তাহাতে যে সন্তানের স্বত্বের হানি হইতে পারে না, এ কথা তিনি বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন;—

"এবার আমি বুঝ্‌ব হরে।
মায়ের ধর্‌ব চরণ লব জোরে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌ব এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ
হৃদে ধরে কোন বিচারে॥"

ভোলানাথ তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলে কেবল যে সন্তানকে দখল ছাড়িয়া দিবেন তাহাই নহে, স্বত্ব সাব্যস্তের ডিক্রী পর্য্যন্ত দিবেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং রামপ্রসাদের আর ভাবনা কি? মাতা যদি দখল না দেন, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত! তাই মাতাকে শাসাইতেছেন,—

"আমি কি আটাশে ছেলে।
ভয়ে ভুল্‌ব না কো চোখ রাঙ্গালে॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃৎকমলে।
ওমা, আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে॥
শিবের দলিল সই-মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার কর্‌ব নালিশ নাথের আগে,
ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল কালে॥
মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়
শান্ত করে লবে কোলে॥"

করালবদনার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হওয়া ত দূরের কথা, রামপ্রসাদ দুরন্ত বালকের ন্যায় দুর্ব্বাক্য ও পীড়নের দ্বারা মাতাকে বিব্রত করিয়া তোলেন। মাতার স্নেহ তিনি

আদায় করিতে চাহেন নিতান্ত গায়ের জোরে! কখনও রাগ করিয়া বলিতেছেন,—

"জন্ম-জন্মান্তরে মা কত দুঃখ আমায় দিলে।
রামপ্রসাদ বলে, এবার মলে, ডাক্‌বো সর্ব্বনাশী বলে॥"

কখনও ভয় দেখাইতেছেন—

"এবার কালী তোমায় খাব।
(তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার)
গণ্ডযোগে জন্ম হ'লে,
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
হয় তুমি খাও কি আমি খাই মা
দুটোর একটা করে যাব॥"

আবার কখনও দুর্জ্জয় অভিমান ভরে মুখ দিয়া অলক্ষণে কথা বাহির হইয়া পড়িতেছে—

"মা বলে ডাকিস নে রে মন, মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাক্‌লে এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তলি দাহন করে।
ওরে, অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই॥"

কিন্তু মাঝে মাঝে এরূপ কুবাক্য প্রয়োগ করিলেও, মাতার অপার স্নেহ ও করুণার উপর দুরন্ত শিশুটী সম্পূর্ণ আস্থাবান। এবং সেই সাহসে তিনি সকল ভয় ভাবনাকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন। রামপ্রসাদের মৃত্যুভয় আদৌ নাই। যমদূতকে ত তিনি চোখ রাঙ্গাইয়াই তাড়াইয়া দেন!

"দব হয়ে [illegible] যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বলগে যা তোর যমরাজারে,
আমার মত নিছে কটা।
আমি যমের যম হতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥"

এ হেন যমের যম যিনি, তিনি যে স্বয়ং যমরাজেরও তোয়াক্কা রাখেন না তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"যা রে শমন যা রে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥
* * * *
শমন-দমন শ্রীনাথচরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা
চলে যাব কৈলাসপুরী॥"

রামপ্রসাদ শক্তি-উপাসক হইলেও, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তাঁহার ছিল না। উপাসনার আনুষ্ঠানিক অংশ যে অত্যাবশ্যক নয়, তাহার যে কোন প্রকৃত মূল্য নাই, এবং আন্তরিক ভক্তিই যে সকল পূজার একমাত্র উপকরণ, এ কথা রামপ্রসাদ বেশ সরস ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন—

"ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি,
জেনেও কি তাই জান না?
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা॥
ত্রিজগৎ সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে, কোন লাজে সাজাতে চাস তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে, কোন লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়
আলোচাল আর বুট ভিজানা॥
ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে, তাঁর আগে কি পর ভাবনা।
ওরে, কেমনে দিতে চাস বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগল-ছানা॥
প্রসাদ বলে ভক্তিমন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানো করবে পূজা, মা ত আমার
ঘুষ খাবে না॥"

রামপ্রসাদের ভক্তির অকৃত্রিম আন্তরিকতা তাঁহার পদাবলী হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান। তাঁহার এই ভক্তি কেবল আন্তরিক নয়, অহৈতুকী, তাহার পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। ভক্তি তাঁহার নিকট মুক্তিলাভের উপায় মাত্র নয়। তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি চাহেন না, বরং তাহাতে তাঁহার আপত্তি আছে। তাই তিনি বলিয়াছেন,—

"কাশীতে মলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে, চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।"

আমি চিনির মধুর রস উপভোগ করিতে চাই, স্বয়ং চিনি হইলে ত তাহা হইবে না, তবে চিনি হইয়া লাভ কি?

রামপ্রসাদ এই তীব্র ভক্তিরসে বিভোর, আত্মহারা! তাই সাধারণ্যে তাঁহার মাতাল বলিয়া অখ্যাতি। তিনি যে নেশায় মাতাল, লোকে তাহা বুঝিত না। তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে ;
মন মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায়-ভাটি, পান করে মোর
মন-মাতালে॥"

হনুমান

দেবতা না হইলেও দেবতার সমান সম্মান পাইয়া আসিয়াছেন, পবন-নন্দন হনুমান। ইনি রামের অনুচর বলিয়া বিশেষ ভাবে পরিচিত এবং পূজিত,—বিশেষতঃ উত্তর-ভারতে। রামায়ণে তাঁহার অসাধারণ শক্তির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। বানর জাতীয় বলিয়া ইনি যে স্বভাবতঃ একটু কৌতুকপ্রিয়, এ কথা ধরিয়া লইয়া ইঁহার সাহায্যে অনেক কৌতুককর ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে। রামযাত্রার কুশীলবগণের মধ্যে হনুমানের স্থান অতি উচ্চে। আর এই হনুমানের জন্য সেকালের গ্রাম্য শ্রোতৃগণের আসরে কৃষ্ণ-যাত্রা অপেক্ষা রামযাত্রাই জমিত ভাল।

কিন্তু রামায়ণ ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাহিত্যেও মধ্যে মধ্যে হনুমানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেথানে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে অসাধ্য সাধন করিবার আবশ্যকতা হয় সেখানেই হনুমান কিম্বা তাঁহার গুরু বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া আনিতে হয়। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থায় যখন তাহা ধর্ম্মপূজায় রূপান্তরিত, তখনও হনুমানকে ধর্ম্মের মন্দিরে দ্বারী-বেশে দেখিতে পাওয়া যায়—

পশ্চিমে কোটালচন্দ্র দক্ষিণেতে হনুমন্ত
পূবর দিকে সুজ্জ অধিকার,
(রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ)

গোপীচন্দ্রের গানে হাড়ি সিদ্ধা হনুমান এবং তাঁহার অনুচরগণকে বহুদূর হইতে বৃক্ষ ও প্রস্তর বহিয়া আনিবার আদেশ দিয়া বিস্তর খাটাইয়া লইয়াছেন। ধর্ম্ম-মঙ্গলেও হনুমানকে দিয়া অনেক বেগার খাটাইয়া লওয়া হইয়াছে। একবার যখন বেশ্যা সুরিক্ষার হাতে পড়িয়া লাউসেনের ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন কিরূপে রাত্রি কাটিবে এই চিন্তায় আকুল হইয়া তিনি "নিরাকার নিরঞ্জনের" স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্ত-বৎসল লাউসেনের উদ্ধারের জন্য হনুমানকে আদেশ দিলেন, রাত্রিমধ্যেই সূর্য্যোদয় ঘটাইতে হইবে। হনুমান তৎক্ষণাৎ সূর্য্যের নিকট গিয়া এই অসম্ভব অনুরোধ করিলে,

"সূর্য্য বলে অকালে উদয় দিতে নারি।
বীর বলে তবে পূর্ব্ব পরাক্রম ধরি॥
যখন আমার দশা ছিল অতি ছেলে।
প্রভাতে তোমাকে পাকা তেলাকুচা বলে॥
ধরে খেতে যেতে পথে ইন্দ্র হল হতা।
তুমি কোন না জান সে সব পূর্ব্ব কথা॥
* * *
সেই হনুমান আমি এখন বাঁচাই।
সূর্য্য বলে কার্য্য নাই চল বাপু যাই॥"
(ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল)

মঙ্গলকাব্যে হনুমান

চণ্ডী-মঙ্গলে হনুমান চণ্ডীর আদেশে সমুদ্রে ঝড় তুলিয়া ধনপতি সদাগরের ছয়খানি ডিঙ্গা ডুবাইয়াছেন। মনসা-মঙ্গলেও চাঁদ সদাগরের নৌকাও হনুমানই ডুবাইয়াছেন। নৌকা-ডুবির পর চাঁদ সদাগর যখন মনসাদেবীর হস্তে নানা নিগ্রহ ভোগ করিতেছিলেন, তখন এক সময়ে তিনি বনে প্রবেশ করিয়া কাঠুরিয়াদিগের সহিত কাঠ কাটিয়া মাথায় কাঠের বোঝা লইয়া যাইতেছিলেন। পদ্মা হনুমানকে আদেশ দিলেন—

"তুমি গিয়া চাপ উহার কাঠের বোঝায়॥
* * *
দেবীর আজ্ঞায় তবে হনুমান যায়।
আসিয়া বসিল চাঁদের কাঠের বোঝায়॥
কাষ্ঠ-বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ধনপাকে।
ঘাড়ে হস্ত দিয়া সাধু বাপ বাপ ডাকে॥"
(ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল)

চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরের পুত্র শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রার জন্য ডিঙ্গা গড়িতে আসিলেন স্বয়ং ছদ্মবেশী বিশ্বকর্ম্মা, তাঁহার পুত্র দারুব্রহ্মা এবং শিষ্য হনুমান। হনুমানের কাজ এইরূপ—

"হনূমান মহাবীর, নখে করে দুইচির,
কাঁঠাল পিয়াল শাল তাল।
গাম্ভারী তমাল ডহু, নখে চিরে দিল বহু,
দারুব্রহ্মা গড়য়ে গজাল॥"
(কবিকঙ্কন চণ্ডী)

হনূমানের মাতা অঞ্জনার আক্ষেপ

লঙ্কা-যুদ্ধে হনূমানের কীর্ত্তি-কলাপ বর্ণনা করিবার স্থান নাই, এবং বোধ হয় প্রয়োজনও নাই। পাঠক-পাঠিকা এই অলৌকিক শক্তিশালী পবন-নন্দনের কার্য্যাবলী পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও আমোদ অনুভব করিয়া থাকিবেন। কিন্তু হনূমানের গর্ভধারিণী অঞ্জনা এই বীর পুত্রের গৌরবে তেমন সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে হনূমানের শারীরিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে পায় নাই। কারণ তিনি শৈশবে মাতৃ-স্তন্য পান করেন নাই, সুতরাং তাঁহার দেহের সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ ঘটিবে কিরূপে? বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার এ আক্ষেপ ঘুচিল না! সীতা উদ্ধারের পর হনূমান বহুকাল পরে তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, অঞ্জনা প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। হনূমান পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলে,

"চক্ষু মেলিআ বানরী পুত্র পানে চাই।
বানরী বলেন আমার পুত্র কেহ নাই॥
হনূমান বলে বটে একটী পুত্র ছিল।
না জানি নির্ব্বলী বেটা কোথা গিয়া মৈল॥
হনূ বলে মরি নাই বাঁচ্যা আছি প্রাণে।
অঞ্জনা বলে মাথায় তবে চুল নাই কেনে॥
হনূমান মাত্র কহেন করযোড় হঞা।
মাথার কেশ উঠ্যা গেছে গাছ-পাথর বঞা॥
এত শুনি অঞ্জনা চান হনূর পানে।
আচম্বিতে গাছ পাথর বৈলে কি কারণে॥"
(কৃত্তিবাসের রামায়ণ)

হনূমান তখন রামের বনবাস, সীতাহরণ ও লঙ্কা-যুদ্ধের বৃত্তান্ত বলিলেন। শুনিয়া,

"বানরীর ক্রোধ তখন কে বলিতে পারে।
অসার্থক আমি তোরে ধর্য্যাছি উদরে॥
ধিক তোরে বৃথা বাঁচ্যা আছ হনূমান।
এক ধার দুগ্ধ মোর কর নাই পান॥
এক ধার দুগ্ধ যদি এক দিন খাত্যে।
তবে কেন এত শ্রম পাবে রঘুনাথে॥
সাগরের মাঝে যদি পড়িতে নারা্য যুর‍্যা আড়।
কটক লয়ে তোমার পৃষ্ঠে রাম হৈতেন পার॥
বজ্রঠাট মারিতে নাব্যাজু লঙ্কার উপরে।
রাক্ষস সহিত দশানন যাত্য যমের ঘরে॥
পৃষ্ঠে করি সীতা আনিতে রামের সদনে।
রণ করি রঘুনাথ শ্রম পাবেন কেনে॥" (ঐ)

তাহার পর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অঞ্জনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রামের শ্যাম অঙ্গে রাক্ষসের অস্ত্র-চিহ্ন দেখিয়া অঞ্জনা তাঁহার অকর্ম্মণ্য পুত্রের উপর ভয়ানক চটিয়া গেলেন—

"অঞ্জনা কটাক্ষে চায় হনূমানের পানে।
এমন ইচ্ছা নাই তোরে দেখিবে নয়নে॥
হয়্যা কেনে না মৈলি নির্ব্বলী হনূমান।
তোঁ থাকিতে শ্যাম অঙ্গে বাজে দুষ্টের বাণ॥
এক ধার দুগ্ধ মোর না খাসি কখন।
তেঞি এত শ্রম পান শ্রীমধুসূদন॥" (ঐ)

গোদাযম

গোপীচন্দ্রের গানে রাণী ময়নামতীর হস্তে গোদাযমের যে সকল লাঞ্ছনা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা স্থূল গ্রাম্য-রসিকতার পরিচায়ক হইলেও অতি প্রাচীন (খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর) বাঙ্গালী কবির হাস্যরস-জ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করি।

মাণিকচন্দ্র রাজার মৃত্যু হইবে, তাঁহার প্রাণ লইয়া যাইবার জন্য বিধাতা গোদাযমকে "তলপ-চিঠি" বা পরোয়ানা লিখিয়া দিলেন। এই গোদাযম পুরাণাদি-বর্ণিত মহিষ-বাহন, ধর্ম্মরাজ যম নহেন। বিধাতার বিচারালয়ের পরোয়ানা জারি করিবার জন্য কতকগুলি পেয়াদা আছে, গোদাযম এই পালের গোদা বা সর্দ্দার। গোদাযম পরোয়ানা জারি করিতে চলিল, কিন্তু রাণী ময়নামতী ডাকিনী বিদ্যার বলে দিনের পর দিন তাহাকে ফিরাইতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক কৌশলে রাজার প্রাণ লইয়া গোদাযম প্রস্থান করিল। ময়নামতী জানিতে পারিয়া তাহাকে অনুসরণ করিয়া ধরিলেন। গোদাযম কায়া বদলাইয়া নানা রূপ ধারণ

করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, ময়নামতীও ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া উভয়ে যম-পুরীতে গিয়া পঁহুছিল। গোদাযম তাহার স্ত্রী জমরাণীকে অনুনয় করিয়া কহিল,—

"হাত ধরি জমরাণি পাও ধরি তোর।
তোমার ধম্মের দোহাই নাগে আমার প্রাণ রক্‌খা কর॥"

সুযোগ পাইয়া জমরাণী মুখের মত জবাব দিল,—

"এক কল্‌কি তামু জদি আমি নাই দেই সাজেয়া।
তার জন্যে মারছিস আমাক নোহার মুদ্গর দিয়া॥
তার সাজা দেউক এখন ডাহিনি মএনা আসিয়া॥
তবু আরো গোদাজম কান্দিতে নাগিল।
গোদার কান্দন দেখি জমরাণির দয়া হৈল॥
বিছানার খ্যাড় দিয়া জমকে কোনা বাড়িত
ঢাকিয়া রাখিল॥"

এদিকে ময়নামতীও আসিয়া উপস্থিত। তিনি জমরাণীকে ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিয়া বলিলেন,—

"ওগো দিদি
বালক কালে বাপ মায়ে বেছেয়া খাইছে অন্য ঘরে।
বৈনে বৈনে দেখা নাহি হয় এ ভব সংসারে॥
অবোধ কালে তোমার ভগ্নিপতি গেইছে মরিয়া।
গএনা পত্র নি বেড়াই আমি ঝোলঙ্গাত ভরিয়া॥
বৈনের মত মানুস না পাই তাক দেই ক্যালেয়া॥
জখন জংলানি গএনার নাম শুনিল।
মএনাক নি গিয়া ভিতর অন্দরে খাগনাত
বসিবার দিল॥" *

তখন গোদাযমের সন্ধান পাইয়া ময়নামতী তাহার উপর আবার অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। অবশেষে "কৈলাস হোতে শিব গোরেকনাথ" আসিয়া গোদাযমকে উদ্ধার করিলেন।

ঋষিগণকে উপলক্ষ করিয়া কৌতুক

দেব-সমাজ ছাড়িয়া মর্ত্তে নামিবার পূর্ব্বে একবার মুনি-ঋষিগণের সংবাদ লওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালী কবিগণ যখন ছোট-বড় সকল দেবতাকে লইয়াই রঙ্গ-কৌতুক করিয়াছেন, তখন তাঁহারা যে মুনি-ঋষিগণকে অব্যাহতি দিবেন এরূপ আশা করা যায় না। ইঁহারা যতই জ্ঞানী ও পুণ্যবান হউন, সকলেরই ভিতর কিছু না কিছু গলদ আছে। ছিদ্রান্বেষী বাঙ্গালী কবিগণ সুযোগ পাইলেই ইহাদের নানা দুর্ব্বলতাকে উপলক্ষ করিয়া মধ্যে মধ্যে বেশ হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন।

নারদ

এ সম্বন্ধে ঋষি-সমাজের অগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ। ইনি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। দক্ষ প্রজাপতির শাপে ইনি কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না, ঢেঁকি-বাহনে "দিবি ভূমৌ রসাতলে" নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার বরে ইনি বীণাবাদনপটু,—বীণাবাদ্য-সহকারে সর্ব্বদা হরিগুণ গান করিয়া থাকেন। "নারদ-কীর্ত্তন-পুলকিত-মাধব-বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া" পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার উৎপত্তি।

নারদ চির-ভ্রাম্যমান এবং সর্ব্বত্র অপ্রতিহত-গতি। কিন্তু বিনা কার্য্যে নিয়ত ঘুরিয়া বেড়ানও চলে না। তাই নারদঋষি এমন দুটী কাজ বাছিয়া লইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার বেশ সময়ও কাটে এবং একটু আমোদও পাওয়া যায়। ইঁহার কার্য্য দেব-সমাজে ঘটকালি করা এবং রামের কথা শ্যামকে, ও শ্যামের কথা রামকে বলিয়া বিবাদের সূচনা করিয়া দেওয়া। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে এরূপ স্বার্থশূন্য পর-হিতৈষী পুরুষের প্রভাব প্রতিপত্তি পূর্ব্বকালে বিলক্ষণ ছিল এবং এখনও কিছু কিছু আছে, বাঙ্গালার গ্রাম্য দলাদলি, সামাজিক ঘোঁট, এবং অবসর মত বিবাহের ঘটকালি বা মুমূর্ষুর গঙ্গাযাত্রা করায় যথেষ্ট হাতযশ আছে! নারদঋষি ইহাদের আদর্শস্থানীয় বলিয়া বাঙ্গালী কবিগণ ইহার চরিত্র-চিত্রণে সিদ্ধহস্ত। ব্রহ্মার বরে নারদ চির-যৌবন। তথাপি কেন যে ইঁহার শ্বেত-শ্মশ্রু-মণ্ডিত বৃদ্ধ রূপ পরিকল্পিত হইয়া থাকে বলিতে পারি না। বোধ হয়, ইঁহাকে লইয়া রঙ্গ-রস করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ইঁহাকে পিতামহ-মূর্ত্তিতে উপস্থিত করা হয়।

নারদের বাহন

নারদ-ঋষির যেমন গুণপনা, তাহারই উপযুক্ত বাহন পাইয়াছেন,—ঢেঁকি। আর সেই ঢেঁকির কি অপূর্ব্ব সজ্জা!

* বেছেয়া খাইছে=বেচিয়া খাইয়াছে, অর্থাৎ পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছে। মানুষ না পাই=মানুষ যদি পাই; 'না' শব্দের এখানে কোন অর্থ নাই, ইহা কথার মাত্রা বিশেষ। জংলানি=যমরাণী।

"সাজাব অপূর্ব্ব সাজ যত আছে মনে।
বলি ঋষি বাহনে বাহির করি আনে॥
* * * *
কুন্দলের ধূকড়ি ঢেঁকির পিঠে জিন।
কসনি কুশের দড়ি লাগাম বিহীন॥
* * * *
দুটি চক্ষু দান দিল দিয়া চুণ কালী॥
পুরাতন কুলার করিয়া দুই কাণ।
হরষিত হয়ে ঋষি হেসে পাক খান॥"
(রামেশ্বরের শিবায়ণ)

এমন বিচিত্র বাহনে আরোহণ করিয়া ঋষিবর যখন যেদিকে যান, কিরূপ তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যায় দেখুন—

"ঢক ঢক করি ঢেঁকি উঠাইল রাগ।
দোকাঠি বাজারে চলে বলে লাগ লাগ॥
পাড়াগাঁয়ে পড়ি গেল কুন্দলের গুঁড়া।
নগরের ভিতরে ভাঙ্গিয়া দিল পুড়া॥
ঝটাপট ঝগড়া বহিয়া যায় ঝড়।
চলে যেতে চৌদিকে চালের উড়ে খড়॥
গুণবান পুরুষ প্রবেশে যেই পাড়া।
বাপে পোয়ে গণ্ডগোল স্ত্রীপুরুষে ছাড়া॥
বেনাগাছে ঝুটি বেঁধে করায় কন্দল।
নখে নখে বাদ্য করে হাসে খল খল॥" (ঐ)

দক্ষযজ্ঞের মূল নারদ

নারদ শিবের ভাগিনেয়। তিনি এই ভোলানাথ মামাটীকে লইয়া বিস্তর রঙ্গরস করিয়াছেন। তাহার ফলে শিব ঠাকুরকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞে যে তুমুল কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল,—যাহার পরিণামে সৃষ্টি রসাতলে যাইবার যোগাড় হইয়াছিল,—তাহা উপযুক্ত ভাগিনেয় নারদেরই কীর্ত্তি!

দক্ষ যখন শিব কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তখন নারদ আসিলেন।

"নারদ বলেন তার প্রতিকার কর।
মন্দধীর মত মিছা মনস্তাপে মর॥
যে যেমন করে তারে তেমতি উচিত।
তুমি যজ্ঞ কর তিনি বসে গান গীত॥"
(রামেশ্বরের শিবায়ণ)

এইরূপে দক্ষকে শিবহীন যজ্ঞ করিবার পরামর্শ দিয়া নারদ শিবের কাণ ভারি করিতে কৈলাসে চলিলেন। যেন কিছুই জানেন না এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিলেন,—

"শ্বশুরের ঘরে যজ্ঞ যাও নাই মামা।
বিশ্বনাথ বলে বাপু বলে নাই আমা॥
কি বল কি বল বলি কর্ণে দিল হাত।
বৃথা যজ্ঞ করে বলি বসিল নির্ঘাত॥
মূলে মারি কুঠারি পল্লবে ঢালে জল।
শিবের কি ক্ষতি ক্ষতি দক্ষের কেবল॥
কিন্তু সব কন্যারা আসিছে বাপ ঘর।
দাক্ষায়ণী গেলে দেখা হৈত পরস্পর॥
* * * *
দিন দুই দেখাশুনা নায়রের সাথে।
কথনীয় নয় কত প্রীতি হয় তাতে॥
* * * *
সতীরে শুনায়ে শিবে সব কথা বল্যা।
দেব-ঋষি দক্ষযজ্ঞ দরশনে আইলা॥
দক্ষের দুহিতা দুয়ারের পাশে রয়ে।
শুনিলেন সব কথা সাবধান হয়ে॥" (ঐ)

তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

নারদের ঘট্‌কালি

শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে নারদই ঘটক। কিন্তু বরের যে রূপ গুণ দেখা গেল তাহার উপযুক্ত ঘটক-বিদায়েরও আয়োজন হইয়াছিল। দরিদ্র ও বৃদ্ধ বর হইলে কন্যার মাতা যেরূপ প্রাণ ভরিয়া গালি দেন, মেনকা রাণীও ঠিক তাহাই করিলেন—

"ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যাজি লাজ ভয়।
হাত লাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়॥
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদের কথায় করিল হেন কাজ॥"
(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

কিন্তু ঘটক-চূড়ামণির ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই। এদিকে যখন,—

"কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥" (ঐ)

নারদ দেখিলেন এক স্থানে এতগুলি মেয়ে (এয়ো) জুটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার এমন সুযোগ ছাড়া ঠিক নয়। তখন,—

"দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥
আয়রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
* * * *
এক ঠাই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোর আয় আয় আয়॥
নারদের মন্ত্রতন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল॥" (ঐ)

তাহারা এ উহাকে নির্লজ্জ বলিয়া তুমুল ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল।

নারদ ঋষির ঘটকালি ব্যবসায় কেবল দেবসমাজেই সীমাবদ্ধ নয়। এ কার্য্যে তাঁহার যেরূপ হাতযশ, তাহাতে মধ্যে মধ্যে মর্ত্ত্যলোকেও তাঁহার ডাক পড়িয়াছে। রাজা গোপীচন্দ্রের বিবাহের জন্য তাঁহার মাতা ময়নামতী নারদকেই সম্বন্ধ স্থির করিবার ভার দিয়াছিলেন। (গোপীচন্দ্রের গান)

নারদের পৌরোহিত্য

আবার শুধু ঘটকালি নয়, নারদকে সময় বিশেষে বিবাহের পৌরোহিত্যও করিতে হইয়াছে। সিমুলার রাজা হরিপালের সুন্দরী কন্যা কানড়ার পাণিপ্রার্থী হইয়া গৌড়ের সম্রাট ব্রাহ্মণ ও ভাট পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা অবমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে গৌড়েশ্বর হরিপালের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। কানড়া ও তাঁহার দাসী ধূমসীর বিক্রমে গৌড়রাজের সেনা পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। তখন গৌড়েশ্বরের প্রিয়পাত্র লাউসেন যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কিন্তু কানড়া লাউসেনকেই পতিরূপে পাইবার জন্য হর-পার্ব্বতীর নিত্যপূজা করিয়া আসিতেছিলেন; তিনি লাউ-সেনকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই বরমাল্য দিতে চাহিলেন। কিন্তু লাউসেন এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কারণ তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতকতা হয়। অবশেষে একটা রফা হইল; লাউসেন বলিলেন,—"উভয়ে যুদ্ধ করি, তোমার পরাজয় হইলে গৌড়েশ্বরের নিকট ধরিয়া লইয়া যাইব, আর আমি পরাজিত হইলে তোমাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইব।"

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু কেহ কাহাকেও হারাইতে পারিলেন না। তখন শিব ও পার্ব্বতী তাঁহাদের সেবিকা কানড়ার সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন এবং কৌশলে লাউসেনের গলে বরমাল্য অর্পণ করাইলেন। তখনই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, কিন্তু পুরোহিত কোথা? ঠিক সেই তালে নারদের আগমন!

"হেন কালে নারদ গোসাই উপস্থিত॥
হরষিত হৈমবতী হর হরিদাস।
রণস্থলে কন্যার করিল অধিবাস।
মহামুনি নারদ হৈল পুরোহিত।
ঈশ্বরী দিলেন বিভা বেদের বিহিত॥"
(ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল)

নারদের উপদেশে পার্ব্বতীর বাগদিনী-বেশ ধারণ

নারদের কীর্ত্তির কথা বলিতে হইলে আবার শিব ঠাকুরের প্রসঙ্গ তুলিতে হয়। শিব গৌরীকে বিবাহ করিয়া যখন কৈলাসে নূতন করিয়া সংসার পাতিলেন, তখনও তাঁহাদের দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে উপযুক্ত ভাগিনেয় নারদের শুভাগমন প্রায়ই হইত। কিন্তু আসিলেই একটা না একটা গোলযোগ বাধিয়া যাইত।

শিব যখন কৃষিকার্য্যে ডুবিয়া আছেন, গৃহে আসিবার নাম করেন না, তখন একদিন নারদ আসিয়া উপস্থিত। মাতুল গৃহে নাই শুনিয়া, তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে এমন একটা ইঙ্গিত করিয়া পার্ব্বতীর কৌতূহল জাগাইয়া তুলিলেন, যে তিনি সকল কথা না শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। নারদ বলিলেন,—

"কহিবার কথা নয় কি কহিব মামী।
মামার চরিত্র শুনে মগ্ন হবে তুমি॥
জগন্মাতা যত্ন করে কহ কহ শুনি।
কুন্দলের ধুকড়ি আলাইয়া দিল মুনি॥
অগো মামী মামা তো মজিল আদিরসে।
নারিলে রাখিতে তুমি আপনার বশে॥
মামাকে করেছে বশ গোটা দশ মেয়ে।
রাত্রি দিন বুলে মামা তার পিছু ধেয়ে॥
* * * *

ধন্য মামী তুমি অন্য মেয়ে যদি হৈতে।
খাড়ু মুড়া মারি তারে দূর করে দিতে॥"
(রামেশ্বরের শিবায়ণ)

পার্ব্বতীর মাথায় ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন,—

"কেমন প্রকারে হরে ঘরে আনি ছলি।
ভব্য ভাগিনেয় ভাল বুদ্ধি দেহ বলি॥" (ঐ)

পরকে বুদ্ধি দেওয়াই ত নারদের কাজ। তিনি এবার মামীকে যে বুদ্ধি দিয়া গেলেন, তদনুসারেই পার্ব্বতী বাগ্‌দিনী-বেশে শিবকে প্রলুব্ধ করিতে গিয়াছিলেন।

নারদের মন্ত্রণায় শিবের শাঁখারি বেশ

তাহার পর শিব যখন গৃহে ফিরিয়া বাগ্‌দিনী সংক্রান্ত ঘটনা লইয়া ভগবতীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত, তখনও ঠিক সেই তালে (Psychological Moment !) নারদ আবার আসিয়া জুটিলেন। শিব তাঁহার উপযুক্ত ভাগিনার সম্মুখে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন দেখিয়া নারদই আবার তাঁহাকে প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত করিলেন—

"বাগ্‌দিনী-বেশে যত দুঃখ দিল উমা।
তার দাদ দিতে পার তবে মোর মামা॥" (ঐ)

এই বলিয়া তিনি মামাকে পরামর্শ দিলেন,—"আমি মামীকে তোমার নিকট শাঁখা চাহিতে বলিব, তুমি তাহাকে পাঁচটা কটু কথা শুনাইয়া দিবে। মামী তখন রাগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে। তাহার পর তুমি শাঁখারি বেশে যাইয়া তাঁহাকে ছলনা করিবে।"

শিবকে এইরূপ দুষ্ট পরামর্শ দিয়া নারদ পার্ব্বতীর নিকট গিয়া, বাগ্‌দিনী বেশে শিবকে প্রতারণা করার জন্য বিস্তর ভৎসনা করিলেন,—যদিও কাণ্ডটা তিনিই ঘটাইয়াছিলেন—

"কহে মুনি কর্ম্মটী করেছ অসম্ভব॥
বাগ্‌দিনী বেশে বটে বিড়ম্বেছ বড়।
মত্ত হয়ে মেয়ে যে মর্দ্দের কাঁধে চড়॥
* * *
নগেন্দ্রনন্দিনী বলে নারদ যেমন।
তখন তেমন কথা এখন এমন॥" (ঐ)

সে যাহাই হউক, এখন উপায় কি? স্বামীর অনুরাগ কিরূপে আবার ফিরাইয়া পাইবেন, এই চিন্তায় পার্ব্বতী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। নারদ তখন স্বামী বশ করিবার সহজ উপায় বলিয়া দিলেন,—

"সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সর্ব্ব অলঙ্কার পরে।
শঙ্খ বিনা সেত কেহ শোভা নাই করে॥
শঙ্খ পরি সবাই স্বামীকে করে বশ।
ভুলাইল ভামিনী ভুবন চতুর্দ্দশ॥
* * *
যদি শঙ্খ পর তো যেরূপ তুমি মেয়ে।
তিন চক্ষে ত্রিনয়ন থাকিবেন চেয়ে॥
মুনির মন্ত্রণা শুনি শঙ্খের নিমিত্ত।
চঞ্চল হইল বড় চণ্ডিকার চিত্ত॥" (ঐ)

তাহার পরে এই শাঁখা পরা লইয়া যে কাণ্ডটা ঘটিল তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

নারদের অঘটন-ঘটন-কুশলতা

নারদ ঋষি এক-একটা সামান্য ব্যাপারকে ঘনাইয়া তুলিয়া অনর্থ ঘটাইতে কিরূপ সিদ্ধহস্ত, তাহার একটু পরিচয় দিয়া, এই ঢেঁকি-বাহন দেবর্ষিটীর নিকট ভালয় ভালয় বিদায় লওয়া যাক।

একবার নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে গিয়া সংবাদ দিলেন যে হরিণ্যকশিপু-বংশীয় দৈত্য নিবাত কবচ শিবের উপাসনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে এমন পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে যে একদিন স্বর্গরাজ্যও অধিকার করিয়া বসিতে পারে। দেবরাজ ভুক্তভোগী; নারদের কথায় ভীত হইয়া তিনিও তাড়াতাড়ি শিবের পূজা করিয়া আশুতোষকে তুষ্ট করিবার উদ্যোগ করিলেন। ফলে ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকে শিবের শাপে কালকেতু ব্যাধ রূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। (কবিকঙ্কন চণ্ডী)

নারদের প্ররোচনায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পারিজাত হরণ

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত রৈবতকে পরম সুখে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন নারদ তথায় আসিলেন। তিনি ইন্দ্রের নিকট পারিজাত মালা পাইয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিয়া রুক্মিণীর গলায় পরাইয়া দিলেন। তাঁহার এই কার্য্যটুকু

দাম্পত্য জীবনের অতি সাধারণ ও তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু নারদ এই তিলটুকুকেই তাল করিয়া তুলিলেন। সেখান হইতে বিদায় লইয়া—

"নারদ মুনি গেলা দ্বারকা নগরী ॥
সত্যভামার ঘরে গিয়া বসিলা মুনিবর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল সতী করিল আদর ॥
সত্যভামা দেবীরে বসি কহে মুনিবর।
রুক্মিণীরে পারিজাত দিল গদাধর ॥
পারিজাত মালা পাইল ভিষ্মকনন্দিনী।
সৌভাগ্যশালিনী হৈল জিনিয়া সতিনী ॥
আমি জানি তুমি বড় সবার ভিতরে।
তবে কেন পারিজাত দিলেন তাঁহারে ॥
তোমার শরীরে কিছু নাহি দেখি দোষ।
তবে কেন কৃষ্ণের তোমাতে অভিরোষ ॥
* * *
তোমারে না দিয়া তারে দিল গদাধর।
তোমারে নিঠুর এত ত্রিদশ ঈশ্বর ॥
কহত আমারে দেবী স্বরূপ উত্তর।
কত দিন নিন্দয় তোমারে গদাধর ॥
* * *
শুনিয়া মূর্চ্ছিতা দেবী পড়িলা ধরণী।
সখী সব আসি তার মুখে দিল পানি ॥"
(মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়)

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া, সত্যভামাকে এই অবস্থায় রাখিয়া তখনই আবার—

"সত্বরে কৃষ্ণের ঠাই গেলা মুনিবর।
সত্যভামার দুঃখ যত করিল গোচর ॥
তোমার বিরহে দেবী তেজি অন্ন পানি।
জিয়ন্তে দেখিবে যবে চল চক্রপাণি ॥
নারদের বচন শুনি ব্যস্ত গদাধর।
রুক্মিণী সহিত আইলা দ্বারকা নগর ॥" (ঐ)

সত্যভামার অনুযোগ শুনিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন,—

"এক গোটা পুষ্পমাত্র পাইলা রুক্মিণী।
বৃক্ষ সমেৎ পারিজাত দিব তোমায় আনি ॥
* * *
কৃষ্ণের বচন শুনি হাসে মনে মনে।
সত্যভঙ্গ না করিহ পড়হু চরণে ॥" (ঐ)

কৃষ্ণ নারদকেই দূত করিয়া ইন্দ্রের নিকট পাঠাইলেন।

"ইন্দ্রেরে বলিহ মোর বিনয় বিস্তর।
তোমার কনিষ্ঠ কৃষ্ণ শুন সুরেশ্বর ॥
বিস্তর বিনয় করি পাঠাল আমারে।
দেহত আমারে পারিজাত তরুবরে ॥
* * *
যদিস্যাৎ কৃষ্ণেরে নাহি দেহ পারিজাত।
তোমার বসতি নাহি হবে সুরনাথ ॥
* * *
শচী আলিঙ্গন স্থান হৃদয় উপরে।
গদা মারি অবশ্য আনিব তরুবরে ॥" (ঐ)

ইন্দ্র পারিজাত দিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি যে উত্তর দিলেন নারদ তাহার উপর একটু রং ফলাইয়া কৃষ্ণকে আসিয়া বলিলেন

"বিস্তর বড়াই তোমার কৈল পুরন্দরে।
মানুষ হইয়া পারিজাত চাহে মোরে ॥
তুমি ত নারদ মুনি তেকারণে সই।
অন্য জন হলে পাঠাতাম যম ঠাঁই ॥" (ঐ)

নারদের এই দৌত্যের ফল হইল এই যে কৃষ্ণ স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং দেবরাজকে রণে পরাস্ত করিয়া পারিজাত বৃক্ষ হরণ করিয়া আনিলেন।

দুর্ব্বাসা

দেবর্ষি নারদের আর যে দোষই থাকুক, তিনি শান্ত, সদানন্দ, কৌতুকপ্রিয়। কথায় কথায় রাগ করিয়া শাপ দিবার অভ্যাস সকল ঋষিরই দেখা যায়,—কিন্তু নারদের তাহা আদৌ ছিল না। এ বিষয়ে সকলের উপর টেক্কা দিয়াছেন মহর্ষি দুর্ব্বাসা। তিনি যেন ক্রোধের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ; যাহাকে-তাহাকে কারণে-অকারণে অভিশাপ বিতরণ করিয়া বেড়ান ছাড়া যেন তাঁহার আর অন্য কোন কাজ নাই। দুর্ব্বাসার হস্তে পড়িলে কাহারও নিস্তার নাই। ইনি আপন পত্নী কন্দলীকে ভস্ম করিয়াছিলেন। ইঁহার শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হন। লক্ষ্মণ-বর্জ্জনেরও ইনিই কারণ। ইঁহারই শাপে যদুবংশ ধ্বংস হয়। একবার কি খেয়াল

হইল. কৃষ্ণকে আপন প্রসাদী তপ্ত পায়স গায়ে মাখিতে আদেশ দিলেন। কৃষ্ণ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই করিলেন, কেবল ব্রাহ্মণের প্রসাদ বলিয়া, ভয়ে তাহা পায়ে মাখেন নাই। কিন্তু দুর্ব্বাসার বিবেচনায় এই ক্রটিটুকু গুরুতর অপরাধ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি শাপ দিলেন যে ঐ পদতলেই বাণ বিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের মৃত্যু হইবে। পরিশেষে সরলা বালিকা শকুন্তলাও বিনা অপরাধে দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও অবমানিত হইয়াছিলেন।

দ্রৌপদীর নিকট দুর্ব্বাসার পরাজয়

এ হেন দুর্ব্বাসাকেও হার মানিতে হইয়াছিল দ্রৌপদীর নিকট। দ্যুতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া পাণ্ডবগণ যখন অরণ্যবাস করিতেছিলেন, তখন দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় দুর্ব্বাসা একবার পাণ্ডবগণকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন। বনবাস কালে দ্রৌপদী দিবাভাগে সূর্য্যের তাপে রন্ধন করিতেন, রাত্রে রন্ধন করিবার উপায় ছিল না। রাত্রিকালে যখন সকলের আহার শেষ হইয়াছে তখন দূরে দুর্ব্বাসাকে দশ সহস্র শিষ্যসহ আসিতে দেখিয়া,

"চিন্তাযুক্ত পঞ্চভাই করেন বিচার।
এতরাত্রে কি হেতু মুনির আগুসার॥
বিশেষ দুর্ব্বাসা মুনি আর কেহ নয়।
অল্পদোষে মহারোষে করিবে প্রলয়॥
(কাশীরাম দাসের মহাভারত)

মুনি আসিয়া বলিলেন,—

পথশ্রমে ক্ষুধাতুর আছি সর্ব্বজন॥
রন্ধন করিতে কহ যাহ শীঘ্রগামী।
তাবৎ প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি॥" (ঐ)

এই রাত্রে দশহাজার অতিথিকে আহার দিতে হইবে শুনিয়া দ্রৌপদীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—কারণ রাত্রে রন্ধন অসম্ভব। নিরুপায় হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। তিনি আসিয়া অন্নব্যঞ্জন যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল চাহিয়া লইলেন।

শাকের সহিত এক অন্ন মাত্র ছিল।
ঈশ্বরে প্রদান হেতু অনন্ত হইল॥
ভোজন করিয়া তৃপ্ত দেব দামোদর।
জলপান করিলেন ভরিয়া উদর॥
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
উদ্গার তুলিয়া দেন উদরেতে হাত॥
* * *
সর্ব্বভূতে আত্মারূপী যেই নারায়ণ।
তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন॥
হেথায় দুর্ব্বাসা ঋষি সহ শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারে কিছু ইহার কারণ॥
উদর পূরিল মন্দানলে সবাকার!
সঘনে নিশ্বাস বহে উঠয়ে উদ্গার॥" (ঐ)

দুর্ব্বাসা ভাবিলেন যুধিষ্ঠিরকে ভোজনের আয়োজন করিতে বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু

"আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ।
উঠিতে শকতি নাই কে করে ভোজন॥" (ঐ)

কাজেই সে রাত্রে দুর্ব্বাসার আর যাওয়া হইল না,—পাণ্ডবগণও এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। এইরূপে শাপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াও দুর্ব্বাসার এবার হার হইল।

অষ্টাবক্র

অষ্টাবক্র মুনিও বড় কম যান না। তবে ইঁহার বেলায় একটা কারণও আছে। তাঁহার "অষ্ট অঙ্গ বাঁকা" বলিয়া, কেবলই মনে হয় সকলে তাঁহাকে দেখিয়া উপহাস করিতেছে,—সুতরাং রাগ হইবারই কথা। দিলীপ রাজার পুত্র ভগীরথ শৈশবে মাংসপিণ্ড মাত্র ছিলেন, অস্থির দৃঢ়তা না হওয়ায় ইনি কখনও সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না। একদা অষ্টাবক্রকে দেখিয়া ভগীরথ তাঁহার সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে তাঁহার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া মুনি ভাবিলেন, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য রাজা এইরূপ করিতেছেন। ইহাতে কোপাবিষ্ট হইয়া তিনি ভগীরথকে অভিশাপ দিলেন,—"যদি আমাকে বিদ্রূপ করিয়া থাক তবে আমার ন্যায় বিকলাঙ্গ হও, নচেৎ উত্তমাঙ্গ হও।" ভগীরথের পক্ষে শাপে বর হইল,—তিনি উত্তমাঙ্গ হইলেন।

শিব দুহিতা পদ্মার (মনসা) বিবাহ হয় জরৎকারু মুনির সহিত। বর যখন বিবাহ করিতে আসিলেন, তখন রাজ্যের যত মুনি-ঋষি বরযাত্রী হইয়া আসিলেন। কনে'র ভাই কার্ত্তিক এবং ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত তাঁহাদের পথ রোধ করিলেন;

—'বেথইর গুয়া' * না পাইলে যাইতে দিবেন না। তখন "হুড়াহুড়ি মুনিদেরে ঠেলাঠেলি লাগে।" ভীড়ের ভিতর হইতে মুনিগণের মুখপাত্র হইয়া ঝগড়া করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন,—অষ্টাবক্র। দুর্ব্বাসা বোধ হয় বরের সঙ্গে আসেন নাই, কিম্বা শুভকার্য্যে পাছে একটা বিভ্রাট বাধাইয়া বসেন এই ভয়ে হয় ত তাঁহাকে আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল। নতুবা তিনি থাকিলে কার্ত্তিকের ছয় মুণ্ডের ভার লাঘব করিয়া দিতেন। যাহা হউক,

"অষ্টাবক্র নাম মুনি অঙ্গিরার পুত্র।
অষ্ট অঙ্গ বাঁকা তার কাঁধে যজ্ঞসূত্র॥
বাঁকা কাঁকালি গলা বাঁকা হাত পাও।
নাক মুখ চক্ষু বাঁকা বাঁকা কাড়ে রাও॥
খঞ্জিয়া খঞ্জিয়া আসি কার্ত্তিকের আগে।
লড়ি ভরে উভা হৈয়া কহিবারে লাগে॥
কি চাস্ পার্ব্বতী পুত্র ক আমার ঠাঁই।
মো সবার আগে তোর এতেক বড়াই॥
বাপ তোর ভাঙ্গড় সে স্বভাব ভিখারী।
মাথায় বহিয়া ফিরে আপনার নারী॥

* * * *

কার্ত্তিকের পাছে দেখি জয়ন্ত কুমার।
কোপ করি মহামুনি লাগে বলিবার॥
তোর মাও যেবা জন তারে জানি আমি।
যেই বেটা ইন্দ্র হয় তারে বলে স্বামী॥
তোর বাপে হরেছিল বশিষ্ঠের নারী।
মুনি শাপে কুষ্ঠ হৈল সর্ব্ব অঙ্গ ভরি॥
আর বার দুর্ব্বাসা করিল লক্ষ্মীনাশ।
হেন মুনি আগে আইস মরিবার আশ॥
হাত পাও বাঁকা দেখি অপজ্ঞান মনে।
সর্ব্ব দেব বিনাশিব ইন্দ্র আদি সনে॥
এত শুনি জয়ন্ত উঠিয়া দিল লড়।
কাৰ্ত্তিক হইল সব দেবের আওড়॥"

(বংশীদাসের পদ্মপুরাণ)

* পান-গুপারী খাইবার জন্য বরপক্ষের নিকট হইতে তাহার মূল্য আদায় করিয়া লইবার পূর্ব্ববঙ্গ-প্রচলিত প্রাচীন লোকাচার।

ঋষ্যশৃঙ্গ

আর এক শ্রেণীর মুনি আছেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ সংসার-জ্ঞান-বর্জ্জিত এবং নিতান্ত সরল প্রকৃতির। ইঁহাদেরও এক-একজনকে লইয়া প্রাচীন কবিগণ নানা কৌতুককর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ কখনও নারীমূর্ত্তি দেখেন নাই,—তিনি স্ত্রী-পুরুষ-জ্ঞান-রহিত। অঙ্গরাজ লোমপাদ স্বীয় রাজ্যে অনাবৃষ্টির প্রতিকারার্থ যে কৌশলে নারীর আকর্ষণে ফেলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনাইয়াছিলেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে,—এখানে তাহার আর পুনরাবৃত্তি করা চলে না।

ব্যাস

সহজবুদ্ধির অভাবে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন—বেদব্যাস। অথচ, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া ইনি জগদ্বিখ্যাত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিব পার্ব্বতীর হস্তে ইঁহার যে দুর্গতির বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে করুণার উদ্রেক হয়।

ব্যাসদেব প্রথমে গোড়া হরিভক্ত ছিলেন। তখন ইঁহার আকৃতি এইরূপ—

"কপালে চড়ক ফোঁটা, গলে উপবীত মোটা,
বাহুমূলে শঙ্খচক্র রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা, কলি মৃগ বাঘথাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা॥"

একদা নৈমিষারণ্যে যাইয়া ব্যাস দেখিলেন, ঋষিগণ শিবের উপাসনায় নিযুক্ত। তিনি নানা শাস্ত্র হইতে অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে শিবের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুর উপাসনা করা উচিত। ব্যাসদেবের উপর কথা কহিতে কাহারও সাহস হইল না। সকলে তাঁহাকে শৈব-ধর্ম্মের কেন্দ্র বারাণসীতে যাইয়া স্বীয় মত প্রচার করিতে পরামর্শ দিলেন। ব্যাস অমনি বারাণসী চলিলেন। সৌনকাদি মুনিগণও কৌতূহলী হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

কাশীতে আসিয়া ব্যাস তুমুল উৎসাহে শৈব-ধর্ম্মের নিন্দা এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইহাতে শিবের ক্রোধ হইল, তাঁহার শাপে ব্যাস পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইলেন। পরে বিষ্ণু আসিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিলেন

এবং বুঝাইলেন যে, হর ও হরি অভিন্ন, একের সহিত বিবাদ করিয়া অপরের পূজা করা মহা ভ্রম।

ব্যাস এবার একেবারে গোঁড়া শৈব হইলেন। শিব আবার চটিয়া গিয়া বলিলেন ;—

"দেখ দেখ ওহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥
যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল॥

* * * *

অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস।
উচিত না হয় সে কাশীতে করে বাস॥
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা।
কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈল মানা॥"

শিব এবং তাঁহার কাশীর উপর হাড়ে চটিয়া, ব্যাস দ্বিতীয় কাশী প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিলেন। তীর্থ-স্থানে গঙ্গা না হইলে চলে না ; তাই ব্যাস গঙ্গাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নূতন কাশীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি পতির বিরুদ্ধাচরণে সহায়তা করিবেন কেন ? দুজনে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হইয়া গেল। তাঁহারা যেরূপ ভাষায় পরস্পরের কুৎসা-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন তাহা শুনিলে কাণে আঙুল দিতে হয়!

ব্যাস তখন বিশ্বকর্ম্মাকে অনেক লোভ দেখাইয়া দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করিলেন ; বলিলেন,—"তোমাকে দেব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব ; সে ত আমার হাতেই,—তোমার নামে একখানা নূতন পুরাণ লিখিয়া দিলেই হইল!" কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার সাহসে কুলাইল না।

ব্যাসদেব এবার আর অন্য বাজে চেষ্টা না করিয়া স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। পিতামহ ব্যাসের কথা শুনিয়া ত ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। বলিলেন,—"বাপ রে, শঙ্করের সঙ্গে বিবাদ! আমি ইহাতে নাই। এককালে আমার পাঁচটা মাথা ছিল, শঙ্করের কোপদৃষ্টিতে একটী উড়িয়া গিয়াছে। ঘাড়ে এখন চারিটার বেশী মাথা নাই ; শিবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া এই বয়সে আবার একটা মাথা হারাইব!"

ব্রহ্মাও চলিয়া গেলেন দেখিয়া ব্যাসদেব এবার একটু দমিলেন, কিন্তু হাল ছাড়িলেন না। নিজেই নূতন কাশীর প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, শিষ্যগণ সহ একস্থানে আড্ডা গাড়িলেন এবং এই দ্বিতীয় কাশীর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া দল ভারি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই এখানে বাস করিতে আসিল না। দেখিয়া শুনিয়া ব্যাসের বড় দুশ্চিন্তা হইল। ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল যে কাশীতে যখন শিবের শাপে তাঁহার ভিক্ষা বন্ধ হইয়াছিল, তখন দুদিন অনাহারের পর অন্নপূর্ণা তাঁহাকে সমাদরে আহার করাইয়াছিলেন। তিনি তখন অন্নপূর্ণার ধ্যান করিতে বসিলেন।

দেবীর আসন টলিল, তিনি আসিলেন। কিন্তু শিব-দ্রোহীকে ত সাহায্য করিতে পারেন না,—তিনি ব্যাসের সংকল্প বিফল করিবার জন্য জরতী বেশে ছলনা করিতে আসিলেন। ব্যাস তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, এতদিনে বুঝি তাঁহার কাশীতে বাস করিবার জন্য একটা প্রাণী পাওয়া গেল। তিনি বৃদ্ধাকে পরম উৎসাহে নব-বারাণসীর মহিমা শুনাইয়া বলিলেন, এখানে যাহার মৃত্যু হইবে তাহার সদ্য মুক্তি। চণ্ডী দেবী বধিরতার ভান করিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "এখানে মরিলে কি হয়? ভাল বুঝিতে পারিলাম না।" বার বার একই প্রশ্ন শুনিয়া শেষে ব্যাসের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—

"ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ি এখানে যে মরে॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কাণ।
তথাস্তু বলিয়া দেবী হৈলা অন্তর্ধান॥"

ব্যাসের এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় একেবারে পণ্ড হইয়া গেল। ব্যাস-কাশীতে মরিলে গাধা হয়, এই প্রবাদ আজও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবের প্রচণ্ড স্পর্দ্ধা ও অবিবেচনার সাক্ষ্য দিতেছে!

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

২৮

দেখা গেল সলিলের হিসাবেই ভুল ছিল, ডাক্তার সেনের অভিজ্ঞতা তার চেয়ে ঢের বেশি। খব বেশি গোপনীয় করিয়াই সলিল তার স্ত্রীর কাছে ডাক্তার সেনের প্রস্তাবটাকে উত্থাপন করিলেও, তার ফল সেই এক্সরে'র সঙ্গেই সমান ভাবে ফলিয়া গেল। স্বর্ণলতা কথাটা শুনিয়াই বিরক্তি-বিরস শুষ্ক হাস্যে কহিয়া উঠিল,—

"বুঝেছি, এই জন্যেই তা'হলে যুক্তি করে ওই ডাক্তার-টাকে এখানে আনা হয়েচে! তা' এত সব ফন্দিবাজির দরকার কি ছিল? তার চাইতে সাদা কথায় বল্লেই হতো যে তোমায় নিয়ে আমরা আর পেরে উঠচিনি, তুমি এইবার গঙ্গে ফিরে যাও—"

এই পর্য্যন্ত সহজ স্বরে বলিয়াই স্বর্ণলতা কাঁদিয়া ফেলিল, "তোমাদের দোষ নেই,—বার মাস আর কার রোগীর ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে! তবে তাদের কথা আলাদা, যারা পেটে ঠাঁই দিয়েছে তারা হাঁড়িতেও একটু দেবে। আর তাই বা আমি কতটাই বা খাই,—সে দিতে হাজারও গরীব হলেও তারা পারবে।"

সলিল অপ্রতিভ মুখে বিমর্ষ হইয়া কহিল, "এমন সব কথা কি করেই তুমি বলতে পারো স্বর্ণ? আমরা কি সেই জন্যেই বলছি? যাতে তুমি সেরে ওঠো, আবার যেমন ছিলে তেমনই হও—তারই জন্যেই না এই নূতন ডাক্তারটা এই ব্যবস্থা করতে চাইচেন। আচ্ছা এক মাস নাই হোক, তুমি এক হপ্তা পরীক্ষা করে দেখ, ভাল না লাগে,—ভাল হচ্চো মনে না হয়—চলে এসো—"

স্বর্ণলতার রোগশীর্ণ ক্লিষ্ট অধরে একফোঁটা তীব্র হাস্য তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের শিখার মতই খেলিয়া গেল। বৃষ্টির মধ্যে করকাপাতের মতই সে তার অশ্রুজলে ভেজা কালো চোখে বজ্রের মত কঠোর দৃষ্টি স্থির করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল,—

"আমায় যখন আগুন সাক্ষী করে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেচ, এ ঘর ছাড়াতে আর তোমার সাধ্যি নেই,—না মরলে আমায় এ ঘর থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও এক পা বার করতে পারবে না,—তুমি তো তুমি,—আর তোমার ডাক্তার তো সামান্য একজন ডাক্তার।"

সলিল শুধু একবার সকরুণ ব্যথিত দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিল। ইহার পর আর কোন কথা বলিতেই তার ভরসা হইল না।

স্বর্ণলতা, যতক্ষণ সলিল কাছে রহিল, তার জ্বালাময় দীপ্ত নেত্র অন্যত্র মেলিয়া ধরিয়া অভিমানের তীব্রদাহে নীরবে দগ্ধ হইতে থাকিল। আর যেই সে উঠিয়া গিয়াছে, অমনই তার সকল ব্যথা বন্যাধারার মতই বেগে উত্থিত হইয়া বাহিরের অভিমুখে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। বালিসে মুখ গুঁজিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়াই কাঁদিল। নীরব অভিযোগে তার ক্রন্দন-বিবশ চিত্ত তার অপহৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—তুমি আমায় কোন দিনই ভালবাস নি,—আজ তো আমার রূপ গেছে, এই বয়সে আমি বুড়ো হয়ে গেছি,—রোগে রোগে তোমায় জ্বালাতন করচি,—আজ কি আর তুমি আমায় ভালবাসতে পারবে! জানি তা', আমি বুঝি সবই,—কিন্তু তোমায় ছেড়ে যে আমি মরতে পারবো না,—আমি যে তোমায় এখনও ভাল করে পাইনি,—পেয়েও পাইনি,—আমার যে তোমায় ছেড়ে স্বর্গেও যেতে লোভ নেই। ওগো ঠাকুর। হে মা কালী! আমায় মেরো না গো, আমায় বাঁচিয়ে রেখ, আমায় ভাল করো,—আমি ওকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না।"

তার পর কাঁদিতে কাঁদিতে তার মনে হইল, আচ্ছা যদিই তাকে মরিতে হয়, তা হ'লে সলিল কি আবার বিবাহ করিবে? এ কথা মনে হইতেই তার সমস্ত শরীরের রক্ত তর তর করিয়া বেগে তার মাথার মধ্যে ছুটিয়া উঠিতে লাগিল, তার হাত পা যেন এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই অবসন্ন

হইয়া আসিল,—অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি করিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ডাক্তার সেন সমস্ত শুনিয়া অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া সলিল ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"তবে কি আপনি চিকিৎসা করবেন না ?"

ডাক্তার কহিলেন, "উচিত তাই ছিল বটে ; কারণ, আমি যার চিকিৎসা করি, ভাল কর্ব্বো মনে করেই করি। এ ক্ষেত্রে যেমন ভাবে এঁর দিন চলচে, সে ভাবে থাকলে এঁকে আমি ভাল করতে পার্ব্বো এমন আশা আমার নেই ; কিন্তু—" বলিয়া একটুখানি জোরের সহিত বলিলেন,—"মেয়েটিকে দেখে আমার একটু মমতা জন্মেছে। ইচ্ছা হচ্চে, ওঁর জন্য একবার চেষ্টা করে দেখি। আচ্ছা, আর একটা কাজ করতে পারেন। উনি না হয় এই বাড়ীতেই থাকুন, কিন্তু আপনি আর আপনার মা দুজনে যদি কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও, -এই কলকাতাতেই অন্য কোন বাড়ীতে থাকতে পারেন না ?"

এই প্রস্তাবে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সলিল কহিয়া উঠিল,—"কেন পার্ব্বো না! বেশ তাই হবে। আমরা আমার দিদির বাড়ীতেই তো থাকতে পারি।"

তার পর একটু কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু শুধু নার্স দিয়ে কি সমস্ত দেখাশোনার সুবিধা হবে ? মা না থাকলে চলবে কি ?"

ডাক্তার সেন একটু হাসিয়া কহিলেন,—"আমার নার্স, সেটাকে আমি আপনার স্ত্রীর ভার দেব, তিনি একাই ওঁর সমস্ত দেখতে এবং শুনতে পারবেন। সে রকম সহায় আমার না থাকলে এত বড় ভার আমি কোন মতেই নিতে ভরসা করতাম না।"

সলিল আনন্দের সহিতই ডাক্তার সেনের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিল। কথা রহিল, প্রথম হপ্তায় সলিল বা সলিলের কোন আত্মীয়-আত্মীয়া রোগীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবে না, শুধু বাহির হইতেই তার সংবাদ জানিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে। দ্বিতীয় হপ্তায় ডাক্তার অনুমতি দিলে, তাঁহার সাক্ষাতেই সলিল স্ত্রীর সহিত পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করিবে। তার পর হইতে অবস্থা বুঝিয়া ডাক্তার নিজেই যেমন হয় ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

২৯

স্বর্ণলতা অবশ্য খুব সহজভাবেই এ প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই, কিন্তু শেষকালে ডাক্তার সেনের অনেক প্রলোভনে ভুলিয়া সে কোনমতে তাঁর অনুরোধ সম্মত হইল।

কিন্তু প্রথম দিনেই যখন সলিলরা মাতা পুত্রে চলিয়া যাওয়ার স্বল্পক্ষণ পরেই প্রায় তারই সমবয়সী একটী অতিশয় সুশ্রী মেয়ে তার নার্স বলিয়া পরিচয় দিয়া তার কাছে আসিয়া বসিল, তখনই তার মনে হইল, শাশুড়ীর সঙ্গের চেয়ে তার নিশ্চয়ই ইহাকে ভাল লাগিবে।

যে আসিল তার বয়স অল্প। দেখিতে সে স্বর্ণলতার মত নাই হোক—সুন্দরী। মুখে তার গভীর একটী মৌনতার মিশ্রিত স্নিগ্ধ শ্রী অবতীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে তার সুমিষ্ট স্বরে জানাইল—মালতী রায়।

একটী দিনের ভিতরেই স্বর্ণলতার মালতীর সহিত অনেকখানি সৌহার্দ্দ জন্মিয়া গেল। একটী পুরা সপ্তাহের মধ্যেই, তার সমস্ত মন দিয়াই সে ইহাকে তাহার 'সখী' বলিয়াই আঁকড়াইয়া ধরিল। মনিব-ভৃত্য, বা রোগী ও নার্সের অঙ্গত্ব সম্পর্কের একটু লেশও তাদের মধ্যে রহিল না।

মালতী তার রোগীর ঔষধ-পথ্য ঘড়ির কাঁটায় মিলাইয়া খাওয়ায়, তার রুক্ষ চুল পরিপাটী করিয়া বাঁধিয়া দেয়, শীর্ণ হাত দুখানি সুগন্ধি গরম জলে সযত্নে সাফ করিয়া দেয়, তাহার রূপের প্রশংসা করিয়া তাহাকে পুলকিত করিয়া তোলে, তার অদূর-ভবিষ্যতে পুনঃ-প্রত্যাবৃত্ত স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের আলোচনায় তার নিরাশাহত চিত্তকে নূতন আশায় প্রোৎসাহিত করে, তার পক্ষে অনাস্বাদিত ভাল ভাল নাটক নভেল পড়িয়া তাহার রস গ্রহণ করায়।

স্বর্ণলতার জীবনে এ ধরণের আনন্দ সে যেন পায়ই নাই। তার সুন্দরাকে মনে পড়ে। তবে সুন্দরাকে এমন করিয়া সে সর্ব্বদাই তো কাছে পায় না। তাই তার সঙ্গটা তার পক্ষে নিমন্ত্রণ খাওয়ার মতই কদাচিৎ। কিন্তু মালতীকে সে যে একান্ত নিজের করিয়াই পাইল, এই জন্যই তার মধ্যে সে যেন একেবারে গলিয়া গেল। তার মনে হইল, এই রকম একজনকে আপনার এত কাছে পাইলেই যে যেন বাঁচিয়া উঠিতে পারিবে।

ডাক্তারকে সে দুবেলাই এই কথা জানাইতে ত্রুটী করিত না। একদিন বলিয়া বসিল, "আপনার বয়েস কম না হলে

আমি আপনাকে বাবা বলে ডাকতুম। আপনিই আমার মালতীকে দিয়ে বাঁচিয়ে দিলেন,—নৈলে এদ্দিনে হয় ত আমি মরে ছাই হয়ে যেতুম।"

রোগীর চেহারাতেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল। তার রক্তহীন পাংশু ওষ্ঠ আগের মত নাই হৌক, অনেকখানিই যেন গোলাপী আভা ফিরিয়া পাইয়াছে; জ্যোতিহীন নিষ্প্রভ সুবৃহৎ চক্ষু দুটাতে জীবনের জ্যোতি আত্মচ্ছায়া পুনর্বিকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার সেই ভুবন-ভুলান হাসি, যে হাসি এতদিন অশ্রু-সাগরে গলিয়া মিশিয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, আবার তাহা ক্ষণে-ক্ষণে উচ্চকিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাক্তারের বুক গৌরবের সুখে স্ফীত হইয়া উঠিল। আড়ালে আসিয়া তিনি মালতীকে বলিলেন,---

"তোমার ম্যাজিক-পাওয়ার এবারও তো খুব খাটলো দেখছি, মিস্ রায়! আমি তা' জানতাম বলেই না এতটা দুঃসাহস করতে পেরেছি। এঁর মূল রোগ হচ্চে, দারুণ অভিমান। মন এর যত ঠাণ্ডা রাখতে পারবে, আরোগ্যের আশা ততই নিশ্চিত।

প্রথম সপ্তাহের শেষের সন্ধ্যায় স্বর্ণলতার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। বৈকালিক বেশ-ভূষার পর সেদিন মালতী তাহাকে হাত-আয়নায় তার মুখ দেখিতে দিয়াছিল। অনেক দিনের পর নিজের মুখ দেখিয়া স্বর্ণ তৃপ্ত না হইলেও, একটুখানি আশ্বস্ত হইয়াছিল। তবে আবার হয় ত তার পূর্ব্বের স্বাস্থ্য, পূর্ব্বের রূপ ফিরিয়া আসিবে!

মালতী লাইট জ্বালাইয়া অনতিদূরে আসিয়া বসিল। হাতে তার নৌকাডুবি। জিজ্ঞাসা করিল—

"এখন কি বইখানা শেষ করবো, শুনবেন?"

স্বর্ণলতা একগাদা বালিশে হেলান দিয়া আধ-বসা অবস্থায় খোলা জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল, চোখ ফিরাইয়া লইয়া সে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল,—

"না ভাই, আজ আমার কেতাব শুনতে ইচ্ছে করচে না, কথা বলতে ইচ্ছে করচে। তুমিই বরঞ্চ শোন তো কিছু বলি,—শুনবে?"

মালতী বইখানা মুড়িয়া নিকটস্থ টেবিলে রাখিয়া দিল। নিজের চেয়ারখানা স্বর্ণর বিছানার কাছে সরাইয়া আনিয়া বলিল,—

"বলুন, শুনি।"

স্বর্ণ তার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "অত দূরে নয়, কাছে এস,—আমার এই বিছানার উপর এসে বসো। দূরে দূরে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি,—তুমি শুদ্ধু আর দূরে থেকো না।"

মালতী সস্মিতমুখে উঠিয়া আসিয়া স্বর্ণলতার কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া তার মৃণালের মত হাতখানি হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সাদরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সহাস্যে কহিল,—

"হ্যাঁ, এই আজকের রাতটা। তা'পরে কাছের মানুষটীকে যেই কাল্ কাছে পাবেন,—আর কি না মালতীকে কাছে পেতে ভাল লাগবে।"

এই টিপ্পনী শুনিয়া স্বর্ণলতা মৃদু হাসিল। তার সেই হাসিতে অনেকখানি বিষাদ ছড়াইয়া পড়িল। তার পর সে হাসিয়া কহিল, "তোমার বিদ্যে আছে, কিন্তু বুদ্ধি নেই। দুধ যদি জোটে, তা'হলে কি কেউ দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে চায়?"

মালতী কথা না কহিয়া নীরব রহিল। স্বর্ণলতার কথার ধরণেই বোধ হইল, তার স্বামী তাকে বুঝি ভালবাসেন না।

মালতীকে নীরব দেখিয়া স্বর্ণ কহিল,—"তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্চে না? মনে করচো, এ সব আমার মনের খেয়াল? না ভাই! সত্যি করেই বলচি তোমায়, দুধ আমি খাঁটিই পেয়েছি; কিন্তু দুধ খাওয়া আমার ভাগ্যে সাধ মিটিয়ে ঘটেনি। জানি না, এ কার দোষে,—আমার কোন্ পাপে এত পেয়েও আমার কপালে সুখ হলো না,—উনি আমার ভালবাসলেন না।" স্বর্ণ একটা নিশ্বাস জোর করিয়াই ফেলিল।

মালতী দেখিল, কথাটা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক উঠিয়া পড়িয়াছে। এ অপ্রিয় আলোচনা তার রোগীর পক্ষে একান্তই ক্ষতিকারক। তাই সে তাড়াতাড়ি আলোচনাটা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে হাসিবার ভাবে বলিয়া উঠিল,—

"কি যে বলেন! আপনি এমন সুন্দরী, তিনিও শুনেছি চরিত্রবান,—আপনাকে ভালবাসেন না তো কি? ডাক্তার সেন বলছিলেন, আপনার চিকিৎসায় না কি এ-পর্য্যন্ত তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর খরচ হয়ে গ্যাছে এবং তাতেও তিনি এখনও কিছুমাত্র খরচ করতে কুণ্ঠিত নন,—"
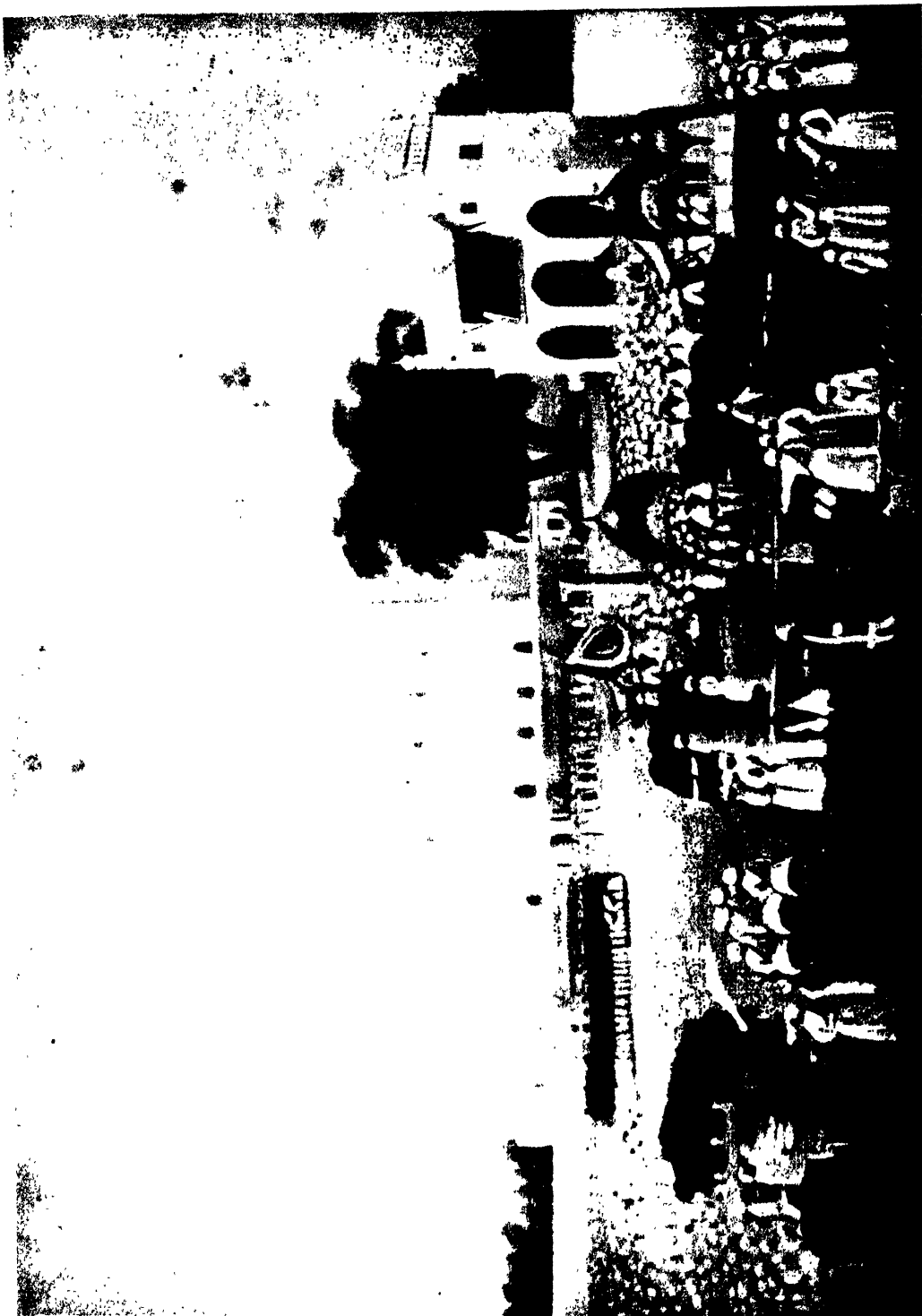
পুরাতন চিত্র হইতে

ঈদের মিছিল

মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম ফেরেদুন জাঁর সময়ের (১৮৫৮)

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সৈয়দ নাজির আলি মজুমদার

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS

স্বর্ণলতা হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল,—"জানো মালতী! আমার মটুক থেকে পাঁচটা আংটী-শুদ্ধ হীরের স্লুট গয়না আছে, মতিরমালা, মুক্ত, সাতনল, কণ্ঠী, কলার, নেকলেশ, শোলী নিয়ে বালা, তাগা, চুড়ি, কাণ পুরো সেট আছে। শাশুড়ীর দরুণ সেকেলে সোনার চুড়ি-স্যুট, বাউটী-স্যুটও পেয়েছি। উনি দেখতে যে কত সুন্দর, তা'—আমার চোখে তো মনে হয়, পৃথিবীতে অত সুন্দর পুরুষ আর একজনও বুঝি নেই! স্বভাব দেবতার মতনই পবিত্র,—কোনখানেই তার কোন দাগ, কোন ময়লা নেই,—সবই ঠিক। তবু আমি তোমায় বলচি,—এই তোমার গা-ছুঁয়ে দিব্যি করে বলচি,—উনি আমায় সত্যি করে মনের থেকে ভালবাসেন না। এ সব যা কিছু সবই বাইরে বাইরে করতে হয় বলে করা।"

বলিতে বলিতে সোজা হইয়া বসিল, ঈষৎ উচ্চ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "শুনলে তুমি হয় ত আমায় বেহায়া বলে হাসবে,—কিন্তু কি জানি কেন, কারুকে যা কোন দিন বলতে পারি নি, আজ তোমায় সেই সব কথা বলতে ইচ্ছে করচে—উনি আপনা হতে ইচ্ছে করে আমায় একটা দিনের জন্যেও এতটুকু আদর করেন নি। যেচে, চেয়ে, মান খুইয়ে তবে ওঁর কাছ থেকে যতটুকু পারি ছিনিয়ে নিয়েচি। আচ্ছা, বিয়ে না হয় করো নি,—মেয়েমানুষ তো বটে,—ভেবে দেখে বল তো,—স্বামী যদি স্ত্রীকে ভালবাসে, তা'হলে সেই ফুলশয্যের রাত থেকে আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তার সঙ্গে ডেকে কথা কইতে হয়,—গায়ে পড়েও সে স্বামীর সোহাগ পায় না?"

মালতী এ যুক্তির অকাট্যতায় চুপ করিয়া রহিল।

স্বর্ণলতার মন তখন উচ্ছ্বাসে ভরা, সে আপন মনেই বলিতে লাগিল—

"এই যে আমার অত রূপ সব চলে গেছে,—অনেক সময় মনে হয় এই যদি সব গেলই,—বিয়ের আগেই কেন যায় নি? তা'হলে কোন গরীবের হাতে পড়ে আমার হয় ত সুখ হতো। আর মনে সুখ পেলে হয় ত আমি এমন করে ভুগতুম না। ডাক্তার বলে আমায় স্ফূর্ত্তি করতে,—তা স্ফূর্ত্তি আমার হবে কি করে?"

এবার মালতী নীরব থাকা ভাল দেখায় না ভাবিয়া শুষ্কভাবে কহিল, "তিনি বুঝি আপনার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেছিলেন?"

স্বর্ণ হাসিয়া জবাব দিল,—"না গো না, আমার তিনি রূপে ভোলবার পাত্রই নন। ওঁর মা সেটা ভুলেছিলেন বটে, সেই হলো আমার কাল। তীর্থ করতে গিয়ে আমায় দেখে আমার শাশুড়ী একেবারে ভুলে যান। তক্ষনি আমার ঠাকুরমার কাছে সত্যি করেন যে আমায় বউ করবেন। শুনেচি উনি না কি আমায় বিয়ে করতে চাননি,—হয় ত গরীবের ঘর বলে, নয় ত আমি মুখ্যু বলে, তা জানি না কেন,—শেষে মায়ের জেদে মত দেন। তাই হয় ত আমাদের শুভদৃষ্টি ঠিক মতন হয় নি। অবশ্য আমার দিক থেকে নয়। আমার তিনি সর্ব্বস্ব। তাঁর মুখে একটু হাসি দেখলে আমি মরতেও ভুলে যাই—"

মালতী স্তব্ধ অনড় হইয়া গেল। তার সেবাপরায়ণ হাতখানি স্বর্ণলতার হাতের উপর শিথিল হইয়া পড়িল। স্বর্ণ খেয়াল করিল না; সে বলিয়া যাইতে লাগিল,—

"এখন তবু অনেকটাই সয়ে গ্যাছে,—মনেও আর ততটা লাগে না, নিজেকেও রোগে ধরেচে,—না হলে ওঁর রকম দেখে যেন অবাক হয়ে যেতুম ভাই! হয় ত অনেক চেষ্টা করে আমার দিকে মনটা একটু ফিরিয়েছি,—একটু কাছাকাছি রয়েছি,—বেশ কথাটথা কইছেন,—হঠাৎ কি মনে হলো,—একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলে পিছন ফিরলেন। ডাকতে গেলুম, বললেন, 'ভাল লাগছে না স্বর্ণ, আমায় একটু ঘুমতে দাও।'—আচ্ছা, কি তখন মনে হয় বল তো? আমার একটা সন্দ হয় মালতী! আচ্ছা, তুমিই বল তো, তুমি হলে কি হতো না? আমার বোধ হয় উনি আগে থেকে আর কারুকে ভালবাসতেন,—তাকে হয় ত কি জন্যে জানি না, পান্ নি,—তাই আমায় আর ভালবাসতে পারচেন না,—যেমন ঐ প্রতাপ-শৈবলিনীদের, নরেন্দ্র-হেমলতার হয়েছিল না? তুমিই তো চন্দ্রশেখর আর মাধবী-কঙ্কনে পড়ে শোনালে!"

মালতী কোন সাড়া দিল না।

স্বর্ণ বলিতে লাগিল, "আমি দেখেছি, প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে কথা কইতে গেলেই কেবল নিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন,—অনেক সময় এমন কি চোখ পর্য্যন্ত ছলছল করেচে। ঠাকুর-ঝিমণি—ওঁর বোন সুন্দরা দিদি বড্ড ভাল ভাই,—তাঁকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে,—কিন্তু বলতে পারি নে। আর জিজ্ঞেস করলেই কি তিনি বলবেন! ও কি মালতী! তুমি কিচ্ছু শুনচো না। ঐ দেখ,

তোমাকেও সেই রোগে ধরেচে! কি যেন ভাবতে বসে গ্যাচো!"

মালতী সহসা এই কথায় চট্‌কাভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া, তাহার দিকে চাহিল। তার চোখে মুখে একটা গভীর বিভীষিকা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তার সেই শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন তার পার্শ্ববর্ত্তিনীর প্রতি ভয়ার্ত্তের মতই অস্থির ভাবে পতিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া "মাপ করবেন, আমি একটু দরকারে যাচ্চি"—বলিয়াই তাড়াতাড়ি ঘর হইতে পলাইয়া গেল।

স্বর্ণলতা কিছু ক্ষুব্ধ, কিছু বিস্মিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

বেণুদাদার "বেণুবন" *

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

১

ওগো, বেণুর বন,
তোমায় দেখে মনে পড়ে
অতীতের স্বপন।
রাখাল-সনে বাজিয়ে বেণু—
গোপাল বনে চরা'ত ধেনু
নীরব হ'ত বিহগ-গীত,
শিহরি' নীপ করিত পীত
পরাগ বরিষণ।
ওগো, বেণুর বন।

২

ওগো, বেণুর বন,—
তোমার বেণু বাজিত যবে,
গোপীর মন হরিত রবে,
আকুল রাধা পথের পানে
চাহিত ঘন-ঘন!
একটী সুর বাঁশীতে সাধা
বাজিত কেবল—'রাধা রাধা'—
উদাস করি মন।

৩

ওগো, বেণুর বন,—
মাঠের শেষে দীঘির পাড়ে
কাঁপিত পাতা সবুজ ঝাড়ে,
দক্ষিণ বায়ে মর্ম্মরিয়া
উঠিত কত স্বন।
বাদল দিনে মেঘের ছায়া
আঁধারি' দিত তোমার কায়া,
চিক্‌মিকিয়ে মেঘে তড়িৎ
করিত গরজন।

৪

ওগো, বেণুর বন,—
চৈত্রে তব ঝরেছে পাতা,
নিয়ে তারি শয়ন পাতা;
লুটাবে কবে ফেলিয়া ভূমে—
তাহারি আয়োজন!
শেষ যাত্রার তুমি মিতা,
বহিবে শবে যেথায় চিতা,
হরিধ্বনি—মরণ-ভেরী
কাঁপিয়ে দিবে মন!

৫

দ্বাপরে তুমি বংশীরূপে
গোপীর মন ভুলাতে চুপে;
কলিতে তুমি একদা ছিলে
যষ্টি-প্রহরণ।
বাঁশীতে মজি করুণ সুরে,
সাপটি লাঠি এখনো পূরে
শক্তি-কাঙাল বাঙালীর
গর্ব্বে তনু মন!

* বেণুদাদার বেণুবন কাব্য পড়িয়া।

সিংহল দ্বীপ

কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

সিংহলী বিবাহ

বৌদ্ধ বিবাহ। সিংহলীদের মধ্যে উচ্চ জাতি নিম্ন জাতির সহিত বিবাহ অপমানজনক বলিয়া মনে করে। তাহাদের নিজ নিজ জাতির মধ্যে বিবাহ আবদ্ধ রাখিতে চাহে। কচিৎ কখনও উচ্চ জাতীয় ব্যক্তি নিম্ন জাতীয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহার অনুমোদন করেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কান্দীর রাজার মাতুল-বংশীয় জনৈক যুবক এক ধনী মুদেনিয়ারের কন্যাকে বিবাহ করিতে সমুৎসুক হয়। পুত্রের দৃঢ়তায় মাতা ক্রুদ্ধা হইয়া তাহার নিকট একগাছি নারিকেল দড়ি পাঠাইয়া দেন। তাহার মর্ম্ম—সে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে; এমন কি রজ্জুর মূল্যের অনুরূপ অর্থও পাইবে না। অবাধ্য পুত্র বিবাহ করিল বটে, কিন্তু মাতা তাহাকে ক্ষমা করিলেন না; পুত্রবধূও সংসারে গৃহীত হইল না। অধিকন্তু তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হইল।

কলম্বো সহর

হয়। মুদেনিয়ার উচ্চ জাতিভুক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইংরাজের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। রাজবংশের সহিত নিঃসম্পর্কীয় বলিয়া যুবকের মাতা মুদেনিয়ারের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। পুত্র কিন্তু বহু মুদ্রা যৌতুকের লোভেই হউক অথবা কন্যার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই হউক, বিবাহ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প

উচ্চবংশীয় কন্যার সহিত নিম্নবংশীয় পুরুষের অবৈধ প্রণয় অতি গুরুতর অপরাধ। আত্মীয়দের হস্তে উভয়েরই প্রাণ বধের ব্যবস্থা ছিল। গৃহকর্ত্তা স্বয়ং কন্যা হত্যা করিয়া বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। ইংরাজ আদালতে এরূপ কন্যা-হত্যাকারী জনৈক আসামী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে আপত্তি করিয়া বলে যে, তাহার সাংসারিক ব্যাপারে ইংরাজ

আদালতের কোনও অধিকার থাকিতে পারে না। সিংহলে জাতিভেদের এত কড়াকড়ি যে, দেশীয় রাজাদের আমলে ক্রীতদাসীরা তাহাদের অপেক্ষা নিম্নজাতি হইতে প্রণয়-পাত্র গ্রহণ বা বিবাহ করিতে পারিত না। করিলে কঠোর শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিতা হইত।

হস্তী-স্নান

সিংহলে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে। ষোল বৎসরের কম বয়স্ক বালক পিতা-মাতার অসম্মতিতে কোনও বালিকাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, তাহা অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু ষোল বৎসর পূর্ণ হইলে সে যথেচ্ছ ভাবে বিবাহ করিতে পারে। কন্যা বিবাহোপযুক্তা হইলেই তাহার অভিভাবকগণ অবস্থানুযায়ী একটা ভোজের আয়োজন করেন। তাহাতে সব শ্রেণীর আত্মীয়-স্বজনগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কন্যা সুন্দরী হইলে বা অধিক যৌতুক প্রাপ্তির আশা থাকিলে বিবাহার্থী যুবকগণ নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য অত্যধিক আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে।

সিংহলে বৌদ্ধদের মধ্যে তিব্বতের ন্যায় বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রীস দেশে বিশেষতঃ স্পার্টা নগরীতে স্ত্রীলোকেরা বহু স্বামী গ্রহণ করিত। সুতরাং এ প্রথা নূতন নহে। তবে বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে ইহা অতি বিসদৃশ ও বীভৎস বলিয়াই মনে হয়। সিংহলের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণও ইহার সমর্থনে বলেন, অর্থনৈতিক হিসাবে এ প্রথা অতি সুন্দর। ইহাতে মামলা মোকর্দ্দমার সংখ্যা হ্রাস হয়, সম্ভ্রান্ত বংশে সম্পত্তি-বণ্টন হয় না এবং কেন্দ্রীভূত বংশের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। দরিদ্রের মধ্যে ইহা পরম উপকারী। বহু ভ্রাতা থাকিলে প্রত্যেকের পৃথক স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু এক স্ত্রী হইলে যৌথভাবে ব্যয় প্রতি অংশে অতি সামান্যই পড়িয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে এক স্ত্রী পরিবারস্থ সকল ভ্রাতাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া থাকে। সেখানে আট নয় ভ্রাতার এক স্ত্রী থাকা বিচিত্র নহে। আবার স্ত্রীর সম্মতি লইয়া নিঃসম্পর্কীয় লোককেও স্বামীর পূর্ণ অধিকার দিয়া সহযোগী স্বামী করিয়া লওয়ারও প্রথা আছে। প্রথম স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে যথেচ্ছ সংখ্যক সহযোগী স্বামী গৃহীত হইতে পারে। তদ্দেশীয় আইনে তাহাতে বাধা নাই। ভ্রাতা স্বামীর সন্তান সকলকেই পিতৃ সম্ভাষণ

তালকুঞ্জ—পেরাদেনিয়া বোটানিক্যাল গার্ডেন

করিয়া থাকে এবং সমভাগে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে। সম্পত্তি-ঘটিত মামলা হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পৈতৃক পিতা বলিয়া দাবী করিলে কান্দীর আইনে তাহা গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বৌদ্ধগণের মধ্যে শুনা যায় না। সিংহলের আবর অধিবাসীগণই বহুবিবাহ করিয়া থাকে।

কান্দীতে দুই প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে—"বীণা" ও "দীগা।" বীণা বিবাহে স্বামী স্ত্রীর পিত্রালয়ে ঘরজামাই থাকে। সে স্থলে কন্যা ভ্রাতাদের মত পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পাইয়া থাকে। স্ত্রীর পিতৃগৃহে 'বীণা' স্বামীর খাতির নাই। ত্রুটী হইলে গৃহকর্ত্তা তাহাকে চিরকালের মত বিতাড়িত করিতে পারেন। ঘরজামাইয়ের অবস্থা সকল স্থানেই শোচনীয়। আমাদের দেশে সে সম্বন্ধে অনেক প্রবচন আছে। সিংহলেও এইরূপ একটী

ওয়ার্ড ষ্ট্রীট -কান্দী

প্রবচনের ভাবার্থ হইতেছে—"বীণা" স্বামী দিবসে বা রাত্রিতে দূরীভূত হইলে কেবল মাত্র চারিটী দ্রব্য সঙ্গে লইবার অধিকারী—পদদ্বয় রক্ষার জন্য এক জোড়া সাণ্ডাল বিনামা, রৌদ্রতাপ-ক্লেশ নিবারণ জন্য তাল বৃন্তের ছত্র, পীড়িতাবস্থায় দেহ বহন জন্য একগাছি লাঠি এবং আলোকের জন্য একটী লণ্ঠন।

"দীগা" বিবাহে স্ত্রীকে স্বামীর ঘর করিতে যাইতে হয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার কোনও অধিকার থাকে না;

রবার বৃক্ষ

কিন্তু স্বামীর উত্তরাধিকারিত্বের একাংশে সে স্বত্ববতী হয়। দীগা বিবাহে স্বামীর স্ত্রীর উপর আধিপত্য চলে; বীণা বিবাহে তাহার উল্টা। "দীগা" বিবাহে স্বামী সম্পূর্ণ মত না দিলে উদ্বাহ-বন্ধন ছেদ হয় না; বীণা বিবাহে তাহারই বিপরীত—স্বামীর আপত্তি গ্রাহ্যই হয় না। অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীরাই সামান্য ছুতা-নাতা ধরিয়া আইনমতে দাম্পত্য সম্বন্ধ বিচ্ছেদের প্রার্থী হয়—এবং সহজেই তাহা মঞ্জুর হইয়া থাকে। তবে তাহাতে বিবাহকালে প্রাপ্ত উপহার কেতা-দুরস্ত-মত প্রত্যর্পণ করিতে হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের দিন হইতে নয় মাস পূর্ব্বে সন্তান গর্ভস্থ হইলে, শিশুর বয়ঃক্রম তিন বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীকে তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। তাহার পর পিতা শিশুর মাতার নিকট হইতে সন্তান লইয়া আসিবার অধিকারী হয়। স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী হইলে, স্বামী স্বচক্ষে স্ত্রীকে

পরপুরুষের সহিত ব্যভিচার করিতে দেখিলে, কান্দীয়ান আইন অনুসারে স্বামী উপপতিকে নিহত করিতে পারিত। স্ত্রীর ব্যভিচারের জন্য স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রার্থী হইলে স্বামীর সম্পত্তি হইতে স্ত্রী বঞ্চিত তো হইতই; অধিকন্তু তাহার ঔরস-জাত হইলেও সমস্ত সন্তানকে সে উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিত। সিংহলে ইংরাজের আদালতে দাম্পত্য স্বত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা নাই। কোনও স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করিয়া গেলে স্বামী আদালতে তাহার কোনও প্রতিকার পাইতে পারে না। সিংহলীদের ধারণা—

ভিক্টোরিয়া সেতুর নিকট দৃশ্য—কলম্বো

গলফেস্ হোটেল কলম্বো

স্ত্রী মাত্রেই অবিশ্বাসিনী। তাহা তাহাদের বহু কবিতা ও প্রবচনে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী কবিতার ভাবার্থ এখানে দেওয়া হইল—"উদুম্ব তরুতে পুষ্প উদ্গত, কাকের শ্বেত বর্ণের পক্ষ, জোয়ার ভাটার সময় অতল জলধি-তলে মৎস্যের পদচিহ্ন যদি কেহ দেখিয়াছে বলে, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু স্ত্রী-লোকের কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। সে যাহা বলে, তাহা কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র।" "উদুম্ব," বট জাতীয় বৃক্ষ-বিশেষ। সিংহলীদের ধারণা—সে বৃক্ষ কোনও মরণধর্মশীল জীব কখনও দেখে নাই। স্ত্রী উচ্চজাতীয় ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার করিলে স্বামী স্ত্রীর অপরাধ প্রায় উপেক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু নিম্ন জাতির সহিত সংঘটন হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। এই সকল কারণে সিংহলে খুন জখমের সংখ্যা অত্যধিক। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রের ভাঁজের সহিত তীক্ষ্ণধার ছুরিকা থাকে। অতি সামান্য উত্তেজনাতেই ছুরীর ব্যবহার চলিয়া থাকে। সিংহলে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। যদি কেহ করে, সে ফৌজদারী আইনানুসারে দণ্ডিত হয়।

বিবাহে পাত্রীর মতামত লওয়া হয় না—তাহার পিতামাতা তাঁহাদের ইচ্ছামত পাত্র মনোনয়ন করেন। পূর্ব্বোক্ত ভোজের পর বিবাহার্থী যুবকের কোনও বন্ধু বা আত্মীয় কন্যার পিত্রালয়ে গিয়া কৌশলে বা প্রকারান্তরে জানায় যে, প্রস্তাবিত বিবাহের সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কন্যাকর্ত্তা যদি রুষ্ট ভাবে সে কথা উড়াইয়া দেন, ঘটক ভাব গতিক বুঝিয়া সরিয়া পড়ে। কিন্তু যদি অসন্তোষ প্রকাশের

পেট্টার রাস্তা —কলম্বো

তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্রকে কল্পিত নাম লইয়া গোপনে কন্যা দেখিবার অনুমতি প্রদান করেন। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রের কন্যা দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিলেও তাহার সহিত বাক্যালাপ একেবারে নিষিদ্ধ। যুবক কন্যা চাক্ষুষ করিয়া ও তাহার পিত্রালয়ের হাল চাল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে, সে কন্যার নিকট পান প্রেরণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকে। ভৃত্যসহ জনৈক আত্মীয় পান লইয়া যান। পান গৃহীত হইলে বিবাহের প্রস্তাব পাকা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। তখন জ্যোতিষী বিবাহের শুভকাল

পরিবর্ত্তে ভদ্রভাবে অল্প-স্বল্প রহস্য করেন, তাহা হইলে ঘটক পাত্রের পিতাকে এই সংবাদ জানাইবার অনুমতি গ্রহণ করে। দু'এক দিনের মধ্যে পাত্রের পিতা কন্যাপক্ষের গৃহে আসিয়া বিবাহের যৌতুকের পরিমাণ ইত্যাদি কয়েকটা বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। উত্তর তাঁহার মনোমত হইলে কন্যাপক্ষকে স্বীয় গৃহে যাইবার জন্য তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। সেখানে কন্যার পিতা ভাবী জামাতার উত্তরাধিকারিত্বের অংশ, সাংসারিক অবস্থা এবং তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান লন। সংগৃহীত সংবাদে তুষ্ট হইলে তিনি কন্যা দেখিবার জন্য বরপক্ষকে নিমন্ত্রণ করেন। পাত্রের পিতা মাতা কন্যা দেখিতে যান। পাত্রের পিতা বহির্বাটীতে বসিয়া ভাবী বৈবাহিকের সহিত আলাপ করিতে থাকেন; আর পাত্রের মাতা অন্দরে গিয়া কন্যাকে, একান্তে লইয়া দৈহিক পরীক্ষা করেন। কন্যার কোনও রূপ ক্ষত বা চর্ম্মরোগ বা দৈহিক অসম্পূর্ণতা আছে কি না, তাহাই তাঁহার পরীক্ষার প্রধান বিষয়। যদি তিনি পরীক্ষাতে সন্তোষ লাভ করেন, তাহা হইলে, কন্যাকে, পরে তাহার মাতাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া শীঘ্রই সে বাটীতে একজন অপরিচিত ব্যক্তির আগমনের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া তিনি বহির্বাটীতে স্বামী সকাশে আগমন করেন। তার পর

বিজয় স্তম্ভ—কলম্বো

নির্ণয় করিয়া দেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি পাত্র পাত্রীর কোষ্ঠীর বিচার করেন। কোষ্ঠী গণনার চতুর্ব্বিধ প্রণালী আছে। কোনও না কোনও প্রণালী অনুসারে গণনার মিল হইলে তাহা উত্তম যোটক বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি কোনও মতেই কোষ্ঠীর যোটক না হয় তাহা হইলে পাত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা নিকট আত্মীয়ের কোষ্ঠীর সহিত মিল করিয়া যোটন করিতে হয়। বিবাহের ভোজে যে ব্যক্তির সহিত কোষ্ঠীর মিল হয় সে পাত্রের স্থলে ভোজে বসিয়া থাকে। তাহা হইলে সব দোষ খণ্ডন হইয়া যায়। বিবাহ সাধারণতঃ কন্যার বাড়ীতেই হইয়া থাকে।

কান্দী হ্রদ

প্রধান রাস্তা

কন্যার পিত্রালয়ের প্রাঙ্গণে বংশ নির্ম্মিত মণ্ডপ প্রস্তুত করা হয়। মণ্ডপতলে পুরুষ বরযাত্রী এবং স্ত্রীলোকেরা ঘরের ভিতর শ্বেত চন্দ্রাতপতলে আহার করে। বিবাহের দিন পাত্রের সহিত তাহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও ভৃত্যগণ বরযাত্রীরূপে কন্যার গৃহে যায়। ভৃত্যেরা কন্যার জন্য রত্নালঙ্কার পরিচ্ছদাদি ও বস্ত্রাবৃত ঝোড়াতে করিয়া ফল ও রন্ধন করা আহার্য্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া লইয়া যায়। দূরে তাহাদের দেখিবামাত্র কন্যাপক্ষীয় লোকেরা বাহিরে আসিয়া বরযাত্রীগণকে অভ্যর্থনা করিতে যায়। তাহাদের সঙ্গে থাকে শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদিত দুইখানি ট্রে। তাহাতে পাত্রপক্ষের জন্য পান সাজান থাকে। পান বিলি হইবার পর দুই পক্ষ কন্যার গৃহাভিমুখে যাইতে থাকে। কন্যাপক্ষের লোক প্রথমে গৃহে প্রবেশ করে। পাত্র সম্ভ্রান্তবংশীয় বা ধনবান হইলে একজন ভৃত্য আসিয়া তাহার পদ প্রক্ষালন করে। জলে একটী রৌপ্যমুদ্রা ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহা সেই ভৃত্যেরই প্রাপ্য। নিম্নজাতি বা দরিদ্র হইলে পাত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা নিকট কুটুম্ব ঐ কার্য্য করিয়া থাকে।

গৃহকর্ত্তা তখন পাত্র এবং পুরুষ অতিথিগণকে মণ্ডপে যথাযোগ্য পদোচিত স্থানে উপবেশন জন্য এবং গৃহকর্ত্রী মহিলাগণকে অন্দরে গিয়া বসিবার জন্য অনুরোধ করেন। সকলের আহার সমাপ্ত হইলে পাত্রের যে কোনও অবিবাহিত নিকট আত্মীয় অন্দরে প্রবেশ করিয়া কন্যার জন্য আনীত দ্রব্যাদি তথায় আনিবার অনুমতি ভিক্ষা করে। অনুমতি

প্রাপ্তির পর পাত্র বন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়া অন্দরে প্রবেশ করে। বন্ধুরাই উপহারের দ্রব্যগুলি বহন করিয়া লইয়া যায়। গৃহের মধ্যস্থলে কাঁঠাল তক্তার দ্বারা একটী বেদী নির্ম্মিত করিয়া তাহা শ্বেত বস্ত্রে মণ্ডিত করা হয়। বেদীর মধ্যস্থলে কোণাকৃতি অন্নস্তূপ করিয়া তাহার উপরে চতুর্দ্দিকে ছড়া সমেত রম্ভা এবং পান ও স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা দ্বারা সজ্জিত করা হয়। জ্যোতিষী শুভ মুহূর্ত্ত জ্ঞাপন করিবামাত্র একটী নারিকেল ছোট কাটারীর মত অস্ত্রের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তাহার পর কন্যাকে তাহার মাতা এবং একজন বহু-সন্তানের মাতা সেই অন্নস্তূপের সান্নিধ্যে লইয়া যান। জ্যোতিষীর নির্দ্দেশ মত কন্যাকে তাহার পক্ষে শুভগ্রহের দিকে আকাশ পানে তাকাইয়া থাকিতে হয়। পাত্র তখন কন্যা-ভরণের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি সহ অগ্রসর হয়। পাত্রীর মাতা কন্যার কুমারী অবস্থার যৎসামান্য অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া লন। মস্তকস্থিত কেশগুচ্ছের কাঁটাও তাহাতে বাদ পড়ে না। তার পর পাত্র প্রদত্ত অলঙ্কারে কন্যাকে ভূষিত করা হয়। কন্যার জন্য আনীত পরিচ্ছদ কন্যা পরিধান করে না। তাহা তাহার মাতাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়—ইহা তাঁহারই প্রা । তবে ভবিষ্যতে ব্যভিচারিতা অপরাধে জামাতা স্ত্রী ত্যাগ করিলে এই পরিচ্ছদের মূল্য আদায় করিয়া লইবার জামাতার অধিকার থাকে। বিবাহের সময় কন্যাকে যে অলঙ্কার দেওয়া হয়, তাহা তাহারই স্ত্রীধন স্বরূপ থাকে; স্বামী তাহা কস্মিন কালে ফেরৎ লইতে পারে না। কন্যাকে বিবাহকালীন যৌতুকস্বরূপ সাধারণতঃ নগদ টাকা, গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য দ্রব্য এবং গৃহ-পালিত পশু দেওয়া হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থলে ভূমি দানও করা হয়। কন্যা পাত্র প্রদত্ত অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার পর প্রত্যেক অতিথিকে পান দিবার নিয়ম আছে। তাহার পর পাত্র কন্যার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার মস্তকে চন্দন তৈল বা দারুচিনির জল

কুইন্স হোটেল—কান্দী

কান্দীর গ্রন্থ সাহেব

ঢালিয়া দেয় এবং তাহার পরিহিত বস্ত্র হইতে একগাছি সূতা বাহির করিয়া লয়। সেই সূতা কন্যা বা পাত্রের পিতা বা নিকট পুরুষ আত্মীয় তাহাদের উভয়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে বন্ধন করিয়া দিয়া থাকেন। পাত্র তখন কন্যার হাত ধরিয়া কাঁঠালতক্তার বেদী হইতে নামিয়া আসে ও ছয় পদ অগ্রসর হয়। তাহার পর সেই সূতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পৃথক হয়। কোনও কোনও স্থলে সূতা বন্ধনের পরিবর্ত্তে অঙ্গুরী বিনিময়ও হইয়া থাকে। তবে সূত্র দ্বারা বন্ধনই সাধারণ নিয়ম। পাত্র তখন কন্যাকে অন্য প্রকোষ্ঠে লইয়া যায়। সেখানে আহার্য্য প্রস্তুত থাকে। অতি নিকট আত্মীয় ভিন্ন অপরের সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এক পাত্রে পাত্র কন্যা আহার করে। তদ্দ্বারা উভয়েই সমপদ বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। আহার শেষে পাত্র সেই ভোজন-পাত্রে কিছু অর্থ ফেলিয়া দেয়। আত্মীয়েরাও কিছু কিছু মুদ্রা টেবিল ক্লথের উপর ছড়াইয়া দিয়া থাকে। সেই কাপড় ও মুদ্রা কন্যার পিত্রালয়ের রজকের প্রাপ্য।

কলম্বো বন্দর

নববর্ষোৎসব

কান্দী সমাজে দীগা ও বীণা বিবাহের সমধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। দীগা বিবাহ হইলে কন্যাকে সমারোহের সহিত স্বামী-গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু বীণা বিবাহে নিমন্ত্রিতগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন—পাত্র শ্বশুরালয়ে থাকিয়া যায়। বিবাহের পর বর কন্যা তিন দিন এবং গোঁড়া বৌদ্ধ হইলে সাত দিন বিবাহ পরিচ্ছদ ত্যাগ করে না—কয় দিনই দিবা-রাত্রি একই পরিচ্ছদ পরিহিত থাকে। তৃতীয় বা সপ্তম দিনে কন্যার আত্মীয়েরা ফল, অন্ন-ব্যঞ্জন এবং পুষ্প লইয়া আসিয়া পুনরায় বিবাহ-বেদী সজ্জিত করে। তাহাতে বিবাহ-পরিচ্ছদ-পরিহিত থাকিয়া পাত্র-পাত্রী পাশাপাশি উপবেশন করিলে, একজন আত্মীয় উভয়ের মস্তকে জল ঢালিয়া দেয়। তখন প্রকোষ্ঠান্তরে গিয়া তাহারা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে। পরদিন যথা নিয়মে স্নাত হইতে কন্যার বন্ধুগণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। তাহার শিষ্টাচার বিনিময় করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে পর বৌ

বিবাহ সংক্রান্ত বিধি ব্যাপার শেষ হয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-মাত্রেই প্রায় একরূপ বিধি-নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তাহাতে ব্যয়-বাহুল্য হইয়া থাকে। অবস্থা হীন হইলে বাধ্য হইয়া অনেক বিধি-ব্যাপার বাদ দিয়াও বিবাহ চলে। আবার কোনও আচার অনুষ্ঠান না মানিয়া কেবল একরাত্রি একত্র অবস্থান করিলেও সে বিবাহ সিদ্ধ ও বাধ্যকর হয়। নিম্ন জাতি অবস্থাপন্ন হইলেও সম্ভ্রান্ত বংশের আচার অনুষ্ঠান অনুকরণ করিবার তাহাদের অধিকার নাই। তাহাদের জন্য সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা আছে।

খৃষ্টান বিবাহ। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সিংহলীদের বিবাহে বৌদ্ধ বিবাহের অনুরূপ বিধি-ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে —তা পক্ষগণ রোমান্ ক্যাথলিক বা প্রোটেষ্টাট যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বিবাহটা অবশ্য গির্জ্জায় প্রাতে সম্পন্ন হয়; কিন্তু সন্ধ্যায় বৌদ্ধ বিবাহের যত কিছু খুঁটিনাটী আচার অনুষ্ঠান কিছু বাকী থাকে না। বিবাহের দিন অন্য পুরুষের সহিত কথা কহা কন্যার পক্ষে নিষিদ্ধ। বিবাহে নিমন্ত্রিতগণ প্রায় উপহার সহ আসিয়া থাকেন। আশীর্ব্বাদকালে তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"সদা আনন্দে থাক ও সুখী হও"। তদুত্তরে কন্যা মহিলাদের বলে "আমি কৃতজ্ঞ থাকিলাম।" কিন্তু পুরুষদের বেলা একটী কথাও বলে না, নীরব থাকে। ভোজের টেবিল সজ্জিত হইলে পাত্র পাত্রীর সম্মুখের আসনে বসিয়া এক পাত্রে আহার করে। আহার শেষ হইলে চাউলগুঁড়ি ও নারিকেল দুগ্ধে প্রস্তুত পিষ্টক টেবিলের উপর মধ্যস্থলে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বলের মত আকৃতি জমাট অন্ন রক্ষিত হয়। টেবিলের বাকী অংশে নানা রসনা-তৃপ্তিকর ব্যঞ্জন, নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফল রাখা হয়। টেবিল পুষ্প ও কচি তালপত্র দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। ভোজের সময় মদ্যও হাতে হাতে ফিরিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে পাত্র আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় ও সর্ব্বাপেক্ষা বড় পিষ্টকটী নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া দ্বিখণ্ডিত করে ও এক খণ্ড পাত্রীর হাতে দেয়। পাত্রী তাহা পরিচারিকা দ্বারা মহিলাদের ভোজের টেবিলে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। বাকী অর্দ্ধাংশ পাত্র পরিচারকের হস্তে পুরুষদের মধ্যে বণ্টন জন্য দিয়া থাকে। পিষ্টক বিলির পর পাত্র একটী অন্নের ডেলা দুই ভাগে ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধাংশ পাত্রীকে দিতে উদ্যত হইলে, পাত্রী তাহা লইবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। ইত্যবসরে অন্নের ডেলা ভাঙ্গিয়া নিমন্ত্রিতগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলেন, আর পাত্র তাড়াতাড়ি কন্যার বস্ত্র হইতে সুতা টানিয়া বাহির করে। কন্যার পিতা সেই সুতা লইয়া পাত্র-পাত্রীর কনিষ্ঠাঙ্গুলী যুক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেন। পাত্রপাত্রী তখন বেদীর নিকট গমন করে ও হেঁচ্‌কা টান দিয়া সূত্রটী ছিন্ন করে। অঙ্গুরী বিনিময় হইলেও দেশী খৃষ্টানগণ সূত্র বন্ধন উদ্বাহ বন্ধনের পক্ষে অতি শুভজনক বলিয়া মনে করে। অনেক উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী বেশী খাতির পাইবে এই ভ্রান্ত ধারণায় সখ করিয়া খৃষ্টান হয়।

ভিক্টোরিয়া পার্ক—কলম্বো

খৃষ্টান হওয়া একটা ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু বুদ্ধ-মন্দিরে পূজা দেয় না—সিংহলে এমন একজনও খৃষ্টান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্ব সংস্কার যাইবে কোথায়? এই জেলার চব্বিশ পরগণার মধ্যে মগরাহাট থানার অন্তর্গত লেখকের জমিদারী মরাপাই, লক্ষ্মীকান্তপুর প্রভৃতি গ্রামে বহু খৃষ্টান প্রজা আছে—গির্জ্জাও অনেকগুলি। রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট, প্রেস্‌বিটিরিয়ান প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়-ভুক্ত খৃষ্টান আছে। তাহারা উপাসনার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গির্জ্জায় যায়; কিন্তু আচার ব্যবহার সব হিন্দুর মত। মেয়েরা ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় পূজা ও দেবোদ্দেশে মানসিক ও বিবাহাদিতে অনেক বিধি ব্যাপার মানিয়া চলে। জনৈক পাদ্‌রী একবার তাহাদের এরূপ করিতে নিষেধ করায় জনৈক খৃষ্টান মহিলা বলিয়াছিল, "খৃষ্টান হইয়াছি, গির্জ্জায় যাই বাস্—তা বলিয়া তো নিজের ধর্ম্ম ছাড়িতে পারি না।"

সমুদ্র তীর—কলম্বো

বোটানিক্যাল উদ্যান—পেরাদেনিয়া

সিংহলে খৃষ্টান পরিবারেও বিবাহ উপলক্ষে অবস্থাপন্নের গৃহে নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে। মালাবার উপকূলের দল অভিনয়পটু বলিয়া অধিকাংশ স্থলে তাহাদের বায়না দেওয়া হয়। পুরুষ অভিনেতারাই অভিনেত্রীর ভূমিকাও অভিনয় করে। প্রত্যেক অভিনেতা শুষ্ক নারিকেলপত্রের মশাল হস্তে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয় ও সুর লয় সংযোগে নিজ পরিচয় দেয়। তাহাদের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারেরও বেশ পারিপাট্য আছে। বিবাহ উপলক্ষে কিরূপ নাটক অভিনীত হয় তাহার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল। প্রথমে জনৈক সহচরী সহ রাণী আগমন করেন। পুরুষে অভিনেত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করায় কেহ কেহ গুম্ফযুক্ত থাকে। এ ক্ষেত্রে রাণী তাঁহার ঘন গুম্ফের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। রাণী দর্শকগণের উদ্দেশে জ্ঞাপন করেন যে, রাজমন্ত্রী তাঁহাকে বিবাহ করিয়া স্বয়ং রাজা হইবার জন্য রাজাকে হত্যা করিয়াছে। তিনি স্বামী ঘাতককে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহার পর এক জন ভাঁড় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়। তাহার কিম্ভুত-কিমাকার পোষাক ও রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। ভাঁড় রাণীর বাক্য উড়াইয়া দিয়া বলে যে, রাণীই হউন আর যতই উচ্চ-

পদস্থা হউন না কেন, স্ত্রীলোকের প্রকৃতির কোনও বিভিন্নতা নাই। তাহারা জীবিত স্বামী না পাওয়া পর্য্যন্ত মৃত স্বামীকে ভালবাসিয়া থাকে। তাহার বাক্য-বিন্যাসের ভঙ্গিমায় শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে হাসির তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে। তাহা বন্ধ হইতে অনেকটা সময় কাটিয়া যায়। ভাঁড় তাহার পর একটা ঝুলী বাহির করিয়া বলে, এ ঝুলীতে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ দিবে, সে নামমাত্র অভিবাদন পাইবার অধিকারী হইবে। তার পর রাণীর সহচরী রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া মন্ত্রীর প্রতি তাহার প্রেমের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলে যে, মন্ত্রী কর্তৃক রাজ-হত্যার সংবাদ সে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, রাণী স্বয়ং স্বামী ঘাতিনী; মন্ত্রী তাঁহার প্রণয়াস্পদ। মন্ত্রীকে বিবাহ করিবার জন্য রাণীর স্বয়ং বা লোক দ্বারা এই কুকার্য্য করাই সম্ভব। ভাঁড় পুনরায় আসিয়া রঙ্গভঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। প্রত্যেক নট-নটীর বক্তৃতা বা গানের পর একবার করিয়া ভাঁড়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই অভিনয়ে ছয় জন অভিনেতা নট ও নটীর ভূমিকা গ্রহণ করে—রাণী, তাঁহার সহচরী, ধাত্রী, মন্ত্রী, তাঁহার ভ্রাতা ও ভাঁড়। অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ বিরক্তিকর হইবে বলিয়া কেবল শেষাঙ্কের গল্পাংশ বলিতেছি। শেষে প্রমাণিত হয় যে, রাজাকে কেহ হত্যা করেই নাই—তিনি জলমগ্ন হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাণী মন্ত্রীকে বিবাহ করিতে সম্মত হন। তাঁহার সহচরী তাহার প্রেম মন্ত্রীর ভ্রাতার প্রতি অর্পণ করে। ভাঁড় আর কি করিবে—নাটকটী মিলনান্ত করিবার জন্য ধাত্রীর সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়। ধাত্রী বৃদ্ধা, কুৎসিত ও কোপনস্বভাববিশিষ্ট; কিন্তু রাজ-দরবারে তাহার অতিশয় প্রতিপত্তি; আর সে প্রচুর অর্থেরও মালিক। ভাঁড় ব্যক্ত করে যে তাহার বৃদ্ধা স্ত্রীর পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাহার শেষ নিঃশ্বাস পড়িবামাত্র সে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইবে। তখন অর্থবলে সে অনায়াসেই সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে। পরিশেষে ভাঁড় বলে যে, দেখিয়া শুনিয়া সে বেশ বুঝিয়াছে যে, নারী-হৃদয় প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত। তাহাতে যত কীট-পতঙ্গ আসিয়া পড়ুক না কেন, সে সকলকেই গ্রহণ করিয়া থাকে। নারী অব্যবস্থিত-চিত্ত ও প্রবঞ্চক ইহা সকলেই জানে; অথচ দুর্ব্বল-চিত্ত মানব সুন্দরী নারীকে বিবাহ করিতে বা ভালবাসিতে ইতস্ততঃ করে না। অভিনয় মোটের উপর সুন্দর হইয়া থাকে। গান দুর্ব্বোধ্য হইলেও শ্রুতিসুখকর।

অভিনয়ের পর বড় রকম ভোজের ব্যবস্থা হয়। তাহার পর নিমন্ত্রিত মহিলাগণকে বিবাহ প্রকোষ্ঠ দেখিবার জন্য আহ্বান করা হইয়া থাকে। প্রকোষ্ঠটী জীবজন্তু, বৃক্ষ, পুষ্প, লতা-পাতা অঙ্কিত শ্বেত বস্ত্রে আবৃত থাকে। বহু ডালবিশিষ্ট অনেকগুলি ঝাড়ে আলো জ্বলিতে থাকে। নারিকেল তৈলের আলো বলিয়া ধূম অনেক সময় অসহনীয় হইয়া পড়ে। একটী টেবিলে পাত্রীর অলঙ্কার ও বিবাহের উপহারগুলি সজ্জিত রাখা হয়। অন্য একটী বড় সিন্ধুকে বিবাহের পরিচ্ছদ ও নব বস্ত্রাদি বেশ সুন্দরভাবে সাজান থাকে। দ্রব্যাদি দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে থাকে। দু'এক জন মহিলা কতকটা ঈর্ষার ভাবও চাপিতে পারে না। নবদম্পতির শয্যাও শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়। পর্য্যঙ্ক কচি তালবৃন্ত ও পুষ্প দ্বারা সজ্জিত থাকে। মস্তক স্থাপনের উপাধানের উপরিভাগে সিংহলী ভাষায় লিখিত হয়, "তোমরা বহু সন্তানের পিতামাতা হও।" এইরূপ একটী বিবাহে পাত্রের পিতা কিছুদিন মত দেওয়া স্থগিত রাখিয়াছিলেন। কন্যাপক্ষ জাত্যংশে উচ্চ শ্রেণীস্থ হইলেও পাত্রের মত এত পুরাতন ও খাঁটী মুদেনিয়া বংশ-সম্ভূত ছিল না। যৌতুকের পরিমাণও অল্প ছিল। বিবাহে পাত্রের পিতা উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পত্নী উপস্থিত হইয়া বিবাহ মানিয়া লইতে একেবারে অস্বীকৃত হন। অথচ পাত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও অতি প্রিয় পুত্র ছিল। শাশুড়ী আসিয়া বধূকে স্বীয় গৃহে না লইয়া গেলে কন্যা পিত্রালয়ে থাকিয়া যায়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশে দীগা বা বীণা বিবাহ প্রচলিত নাই। এটা হইল প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানের বিবাহ। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের বিবাহেও এই সব অনুষ্ঠানই হইয়া থাকে।

বন্ধু

রাণী শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণী

সেবারে ছুটিতে অনিতা স্বামীর সঙ্গে কলিকাতার গোলমেলে আবহাওয়া হইতে একেবারে আগ্রার যমুনা-তটে উপস্থিত হইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সহর ছাড়িয়া কিছু দূরে যমুনার ধারেই একটী ছোট্ট বাঙ্গলো গোছ বাড়ী ভাড়া করিয়া দু'তিন মাসের মত তাহারা সেখানে কায়েমী হইয়া বসিল।

সুনীল রায় নূতন ব্যারিষ্টার—সবে আজ চার বৎসর কোর্টে প্র্যাকটিস করিতেছে। তাহার পিতা বেশ নামজাদা বড় ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। অবস্থা বেশ ভালই রাখিয়া তিনি দু' বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সুনীল পিতার একমাত্র বংশধর। বিবাহ হইয়াছে মাত্র এক বৎসর। কিন্তু নব পরিণীত দম্পতির আকাঙ্ক্ষিত মিলন ভোগ করিতে কেহই পারে নাই—নানারকম কাজের ভিড়ে; কারণ, একমাত্র সুনীলকেই সবদিক্ সামলাইতে হইত। সেইজন্য সে তাহার নববধূর ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটাইবার অবসর খুব কমই পাইয়াছে। আরো তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে একটী নিভৃত স্থান বেদনায় ভরিয়া উঠিত এবং একটী মুখ সেখানে উঁকি মারিয়া মাঝে মাঝে তাহার বুক কাঁপাইয়া দিত। সে মুখ তাহার বাল্য-সঙ্গিনী—বাল্য ও যৌবনের সহচরী যমুনার। এ কথা সে ইষ্টমন্ত্রের মতন নিজের মনের ভিতর চাপিয়া রাখিয়াছিল; কাহাকেও বলে নাই। এমন কি, তাহার নিজের কাণও তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত এ বিষয়ে একটী কথাও শোনে নাই। কিন্তু তবু সে অনিতাকে অনাদর করিত না।

অনিতা সারাদিন ধরিয়া ঘর সংসার গুছাইতে ব্যস্ত ছিল—সন্ধ্যার পর মুখ হাত ধুইয়া বারান্দায় আসিয়া স্বামীর পাশে বসিয়া পড়িল। সুনীল তখন দূরে শ্রান্ত দৃষ্টি মেলিয়া ইজিচেয়ারে অবশ ভাবে শুইয়া ছিল। অনিতা খানিকক্ষণ বনবীথির কোলে নীল যমুনার খেলা দেখিয়া স্বামীকে বলিল "এখানে এসেও তোমার ভাবনার শেষ হ'ল না?"

সুনীল অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া বলিল "ওঃ তুমি? তোমার গুছোনো শেষ হয়ে গেল? ভাবনা তো করছি না আমি—কেমন সুন্দর দৃশ্য তাই দেখ্ছিলুম চুপটী ক'রে। তুমি তো তোমার সংসার নিয়ে ব্যস্ত, আমি আর করি কি?"

অনিতা—"সংসার একটু আধটু দেখতে হয় বৈ কি! তা সে সময়টা তুমি না হয় কষ্ট ক'রে আমার কথা ভেবো।"

সুনীল—"তোমার কথাই তো ভাবি অনু।" তার পরে বলিল "একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

অনিতা জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ দিকে যাবে? চল না তাজ দেখে আসি—যা দেখ্তে এতদূরে ছুটে এলুম। আজ অন্য কিছু দেখবার আগে তাই দেখি।"

সুনীল গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া বলিল "তুমি যাবে না কি?"

অনিতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "বাঃ! তুমি একাই যাবে?"

সুনীল—"তাই তো ইচ্ছা ছিল।"

অনিতা অভিমান ভরে বলিল "নিজে যেতে পার, আর আমিই বুঝি তোমার বোঝা? বেশ তো, আমাকে না হয় নিয়ো না। তাহলে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে এলেই বা কেন?"

সুনীল—"তা নেহাৎ যাবে তো চল।"

অনিতা পিছন ফিরিয়া বলিল "না থাক—আমি যাবো না।"

সুনীল হাসিয়া উঠিয়া আসিয়া জোর করিয়া অনিতার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল "ওগো শুনচ? চলো—"

অনিতা জোর করিয়া মুখ ছাড়াইতে গিয়া হারিয়া গেল। শেষে টপ্টপ্ করিয়া চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়িল। সুনীল তাড়াতাড়ি চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল "ছি! অনু, একেবারে কেঁদে ফেল্লে? only a joke—ঠাট্টা করছিলুম, সত্যি! তোমাকে রাগ অভিমান করতে দেখতে আমার বড় ভাল লাগে তাই। লক্ষ্মীটী, চলো চলো, ওঠ—"

অনিতা সজল চোখে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "যাও, তুমি ভারি দুষ্টু।"

সুনীল তাহাকে ধরিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া যাইতে যাইতে বলিল "আচ্ছা দুষ্টু আছি তো আছি—এখন তুমি like an angel কাপড় ছেড়ে তৈরী হবে চল। রাত হয়ে যাচ্ছে।"

এমনি হাসি-তামাসায় খেলাচ্ছলে তাহাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। অনিতা আগ্রায় আসিয়া খুব খুসী হইয়াছে। নূতন দেশ দেখার আনন্দ তো আছেই ; তার উপর সুনীলকে সে দেহ-মন-প্রাণে একলা পাইয়াছে—আর কি চায় সে!

একদিন সুনীল কি কাজে দুপুর বেলা বাহিরে গিয়াছে,—বাড়ী ফিরিতেই অনিতা একখানা টেলিগ্রাম লইয়া হাসিমুখে সুনীলের সামনে ধরিয়া বলিল "তোমার বন্ধু আসছে গো!"

সুনীল—"কে বন্ধু? সতীশ?" টেলিগ্রাম হাতে লইয়া বলিল "না—না, এ দেখছি বিনোদ, বহুদিন পরে—বা, বেশ হয়েছে। এই বিদেশে একটা সঙ্গী না পেলে কি ভাল লাগে?" বলিয়া অনিতার দিকে আনন্দাতিশয্যে ফিরিয়া তাহাকে একটী চুম্বন করিয়া ফেলিল। অনিতার কিন্তু মুখটী নিমেষে গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—"কেন, আমি কি এতদিন তোমার সঙ্গীর অভাব দূর করতে পারি নি? এতদিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম বলে বিরক্ত হ'তে নিশ্চয়!"

সুনীল—"বস্! ঐ তোমার রাগ হয়ে গেল? আরে আমি কি তাই বলছি? বন্ধু এক, আর তুমি এক!"

অনিতা—"বিনোদ বাবু এলে তো তোমার টিকিটি দেখতে পাব না। তুমি তোমার বন্ধু নিয়ে থাকবে—আর আমি এদিকে একলা ব'সে ব'সে গাছের পাতা গুণি আর কি!"

সুনীল "ও তাই! আচ্ছা তোমাকেও আমরা আমাদের partner ক'রে নেবো—সেজন্য ভেবো না। বিনোদের সঙ্গে আলাপ করে খুসী হবে। আর বিনোদ তোমার গান শুনলে enamoured তো হয়ে যাবেই। তুমি তো জান না,—তাকে দেখ নি—সে খুব ভাল—"

অনিতা—"না—না, গানটান গাইতে বলো না আমাকে অন্যের সামনে—"

সুনীল—"ঐ তো দোষ! শিক্ষিতা হ'লে কি হয়—বাঙ্গালী তো বাঙ্গালী। কেন গান গাইতে দোষ কি?"

অনিতা—"না, সে হবে না—"

সুনীল—"আচ্ছা, দেখা যাবে তখন। আপাততঃ আমাকে একটী শুনিয়ে দেবে এসো। এতে আপত্তি নেই তো?"

অনিতা হাসিয়া বলিল "আছে বৈ কি—"

সুনীল তাহার গালে একটী শাস্তির চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া বলিল "তাহলে এই তার শাস্তি—"

অনিতা এদিক ওদিক চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া হারমোনিয়ামের কাছে যাইতে যাইতে বলিল "ছি! কি তুমি! কেউ দেখে ফেলে যদি?" তার পরে হারমোনিয়ামের চাবিতে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি গাইব?"

সুনীল একটী চেয়ারে বসিয়া একটী সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিল "সেইটে গাও—

এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?
মধুনিশি পূর্ণিমার আসে যায় বার বার
সেজন ফিরে না আর যে গেছে চলে"—

২

পরদিন সন্ধ্যার সময় বিনোদ আসিয়া পৌঁছিল। ষ্টেসনে সুনীল বন্ধুকে আগাইয়া আনিতে গিয়াছিল। বিনোদ এতদিন বিদেশে কাজ করিতেছিল। এখন একটী কারবার করিবে। সুনীল যদি তার অংশী হয় তাই সে আসিয়াছিল। বাড়ী আসিয়াই সুনীল ডাকিল "অনু! অনু! বেরিয়ে এসে আমাদের welcome কর।"

অনিতা বাহির হইয়া আসিতে সুনীল বলিল "এই যে বিনোদ, আর এই আমার wife। অনু চা দেবার ব্যবস্থা কর।"

অনিতা বিনোদকে একটী ছোট নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই চা ও নানারকম জলখাবার থালা ভরিয়া বেয়ারা দুইজনকে দিয়া বারান্দায় টেবিলে সাজাইয়া দিয়া গেল। খাইতে খাইতে দুই বন্ধু গত জীবনের স্মৃতি তুমুল আলোড়িত করিয়া তুলিল। অনেকক্ষণ বকিয়া বকিয়া তাহাদের দুইজনেরই চমক ভাঙিতে বুঝিল রাত তখন ৯টা। সুনীল বলিল—"তাই তো—আজ তোমাকে নিয়ে আর কোথাও বেড়ানো হ'ল না—রাত হয়ে গেল—"

বিনোদ বলিল—"তা হোক না—রাত্রেই তো তাজ দেখবার সময় ভায়া! তোমরা বোধ হয় রোজ তাজে বেড়াতে যাও? সেখানে romanceটা বেশ জমে— না?"

সুনীল—"তাজ তোমরা যাই বল না কেন আমার ততটা মনে হয় না। As an architecture, it is grand তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু ওর allusionটা মনে হয় কবির কল্পনায় শুধু বড় হয়ে উঠেছে।"

বিনোদ—"বলো কি সুনীল!—এই তাজের রাজ্যে বসে তোমার এ কথা মুখ থেকে বেরোলো?"

সুনীল—"কেন নয়? ও তো সাজাহান প্রেমকে immortal করবার জন্য তৈরী করে নি—করেছে নিজেকে famous করতে।"

বিনোদ—"নিজেকে famous করতে ভারত-সম্রাট ইচ্ছা করলে তাজ তৈরী করবার বহু আগে অনেক কিছু তৈরী করতে পারতেন। তবে তাজ বেগমের উদ্দেশে না করলেও তো পারতেন—"

সুনীল—"সেও another way of making himself known—rather popular,—লোকে বলবে, অত বড় সম্রাট—অত বেগম থাকতেও একজনকে এতটা love দেখিয়েছে। এটা কি sublime something to think of নয়?"

বিনোদ—"কি জানি তোমার শাস্ত্র,—theory আমরা অত বুঝি না,—আমার কিন্তু মনে হয় ওর মত প্রেমের পবিত্র তীর্থ পৃথিবীতে আর দুটী নেই। মনে হয় প্রত্যেক প্রেমিক প্রেমিকার একবার তাজের ধূলি মাথায় ক'রে নেওয়া উচিত।"

সুনীল—"খালি superstition and sentiment নিয়েই তো গেলে তোমরা। There you commit a falacy। যেহেতু অন্যেরা বলে গেছে, তাই বলে আমাকেও তা স্বীকার করতে হবে and without any reasoning of my own?"

বিনোদ—"থাক—এখন তর্ক ক'রে কাজ নেই। আমি একাই তাজ দেখে আসবো,—তোমার মত অরসিককে নিয়ে গিয়ে আমি তাজের পবিত্রতা নষ্ট করতে পারবো না।"

সুনীল—"তাই ভালো! হ্যাঁ—তোমার জুড়িদার আর একজন আছেন,—তিনি হচ্ছেন অনিতা—she is mad after the তাজ। সেখানে গিয়ে হাঁ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে চায়—which I don't like. আচ্ছা! অনিতা গেল কোথায়। এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলুম—আমি ডেকে আনি—তুমি একটু বসো।"

বলিয়া সুনীল উঠিয়া খানিক পরে অনিতাকে লইয়া প্রবেশ করিল। বিনোদ দাঁড়াইল। সুনীল বলিল—"অনু! বড় অন্যায় হয়ে গেছে। এই বিনোদটা নানারকম গল্পে আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল—বিনোদ, বসো বসো। অনিতা বেশ গান গায়—আজ যখন বেড়ানো হ'ল না, তখন let us enjoy her sweet voice."

অনিতা বলিল—"রান্না হয়ে গেছে—আজ খাবে না না কি? এমন ক'রে বুঝি অভ্যাগতকে কষ্ট দিতে হয়?"

সুনীল—"আরে রাখো! বিনোদ আবার অভ্যাগত! দুটো গান শুনিয়ে দাও—appetite এখুনি 50 degrees বেড়ে যাবে।"

বিনোদ—"আমারও সেই মত ভায়া—"

অনিতার মৃদু আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া সুনীল তাহাকে জোর করিয়া হারমোনিয়ামের সামনে বসাইয়া দিল। অনিতা অগত্যা গান ধরিল—

"নীল আকাশের অসীম ছেয়ে
ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো"—

বিনোদ দেখিল অনিতা সুন্দরী, বিনীতা, সুকণ্ঠী। সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উঠিল।

গান শেষ হইলে সুনীল বলিল "কি গান গাইলে বল তো? এ রকম death song গাইছ কেন? সেইটে গাও—

কে আবার বাজায় বাঁশী
আমার এ ভাঙা কুঞ্জবনে—"

আবার অনিতা বাজনায় সুর মিশাইয়া রস ঢালিয়া গাহিল—

"হৃদি মোর উঠলো কাঁপি
চরণের সেই রণনে—"

পরদিন অনিতা, সুনীল ও বিনোদ তিনজনে আগ্রা ফোর্ট, তাজমহল ইত্যাদি ঘুরিয়া বেড়াইল। সেখানে কত সাহিত্য, কত ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে অনিতা কল্পনার ঢেউ বহাইয়া দিল। আগের দিনের লজ্জার ঘোমটা যেন কোথায় খসিয়া পড়িয়াছে। আগ্রা ফোর্টে যেখান হইতে

যমুনার ওপারে তাজমহল দেখা যাইতেছিল,—দূরে এত যুগের গলিত, স্বরিত প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ, পাষাণ স্তূপের আবরণে, অনন্ত অমৃত বুকে লইয়া ঐ যে রহস্য-যবনিকা পড়িয়া আছে—ওর অন্তরালে কি আছে? কত কাহিনী আছে, কত ভাষা আছে, কত গল্প আছে। অনিতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল "এই যায়গাটীতে এলে যেন আমি কি হয়ে যাই। মনে হয়, এইখানে সাজাহান তাঁর প্রেমাস্পদার স্মৃতি-মন্দিরখানি দেখে দেখে কত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন,—তা কি আজো এখানে খেলে বেড়াচ্ছে না? সে কাতর ডাক—সে প্রাণফাটা চীৎকার যেন আমি এখানে শুনতে পাই। ঐ গরম নিশ্বাস-গুলো যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে যায়। আমারও গলা ছেড়ে ডাকতে ইচ্ছা করে—প্রেমিকা-শিরোমণি মমতাজ, আজ তুমি কোথায়? এখানে তুমি সম্রাজ্ঞী নও, ধনী নও, সুন্দরী নও—শুধু তুমি প্রেমিকা ও প্রেমাস্পদা—কি বল?" এই বলিয়া সে তাহার স্বামীর উদ্দেশে ফিরিয়া দেখিল, সুনীল অদূরে একটা দাড়িওয়ালা মোল্লার সহিত কি লইয়া তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে; আর বিনোদ তাহার একটু পিছনে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাদের দিকে চাহিয়া আছে। অনিতা হঠাৎ এই রকম ভাবোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া ফেলায়, অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া সুনীলের কাছে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কিছুদিন এই ভাবে চলিয়া গেল। এখন আর অনিতা বিনোদের কাছে লজ্জা করে না; সে বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ আলোচনা করে। বিনোদ ইতিমধ্যে যাইবার তাগাদা দিয়াছে; কিন্তু সুনীল ও অনিতা তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই।

সেদিন বিনোদ তাহার এক দাদার নিকট হইতে চিঠি পাইয়াছে যে, তিনি সপরিবারে কোন জরুরী কাজে আগ্রায় আসিতেছেন। অতএব বিনোদ তাহার জন্য কয়েক দিন আগ্রায় অপেক্ষা করিলে ভাল হয়। বিনোদ ক্রমে ক্রমে অনিতার বেজায় ভক্ত হইয়া উঠিতেছিল। অনিতার সবই তাহার ভাল লাগিত। সে তাহাকে নাম ধরিয়াই ডাকে; কারণ, সে বৌদি বলিয়া ডাকিতে চাহিলে, সুনীল ঘোর আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল "ও সব পাড়াগেঁয়ে বৌদি টৌদি ভাল লাগে না। সবচেয়ে এ বিষয়ে Europeanরা ভাল,—সোজাসুজি নাম ধ'রে ডাকে। তুমি অনিতা বলেই ডেকো—I won't mind a bit; rather I would like it much better than বৌদি।" প্রথমটা নাম ধরিতে বিনোদের বাধো-বাধো ঠেকিলেও আজকাল বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

৩

বিনোদের দাদা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহারা কিছু দূরে আর একটী বাড়ী লইয়াছিল। বিনোদ সেদিন তাহাদের সহিত দেখাশুনা করিয়া আসিয়া সুনীলকে বলিল "তোমার সঙ্গে দাদা business সম্বন্ধে আলাপ করতে চান। কাল পাঁচটায় আমি সময় ঠিক করে এসেছি—যেতে হবে। বৌদিও বেশ লোক। তাঁর সঙ্গে তাঁর একটা বোনও এসেছে।"

সুনীল খুসী হইয়া বলিল "বেশ তো। Besides I never hesitate to meet young girls." বিনোদ কৃত্রিম রাগ করিয়া বলিল "চুপ্ হতভাগা! ও-সব সাহেবিয়ানা ছেড়ে দে না এখন, যখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছিস।"

পরদিন সাড়ে চারিটা হইতে তাগিদ দিয়া বিনোদ সুনীলকে তাহার দাদার বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া বহুক্ষণ আলাপের পর বিনোদ বাড়ীর ভিতর হইতে একবার ঘুরিয়া আসিয়া সুনীলকে বলিল "চল হে, বৌদি তোমাকে ডাকছেন, একটু মিষ্টি মুখ করবে।" সুনীল উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মন্মথও উঠিয়া চলিল। বাড়ীর ভিতর একটী ঘরে পরিপাটী করিয়া আসন ও জলখাবারের থালা সাজানো। সুনীল সেদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল "ঈস্! এতো তো খেতো পারবো না।"

বিনোদ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আসনের উপর বসাইয়া দিয়া বলিল "হয়েছে! জ্যাঠামো করতে হবে না—চুপটী ক'রে খেতে বসো।"

একটু পরেই মন্মথর স্ত্রী বাহির হইয়া আসিল। বিনোদ তাহার পরিচয় দিল। তাহার পশ্চাতে ছিল আর একটী তরুণী,—হাতে একটী পানভরা কৌটা। বিনোদ তাহার সহিত যেমন সুনীলের পরিচয় করিয়া দিবার জন্য ফিরিয়াছে, অমনি তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। সে দেখিল, সুনীল অবাক হইয়া তরুণীর দিকে চাহিয়া আছে! আর তরুণীরও বিস্মিত দৃষ্টি সুনীলের মুখের উপর স্থাপিত! বিনোদ বলিয়া উঠিল "সুনীল! ও বৌদির মাস্তুতো বোন যমুনা।"

সুনীল একটু অপ্রতিভ হইয়া নিজেকে সামলাইয়া

লইল। সকলে এর পর অন্য কথার-বার্তার মাতিয়া উঠিল; কিন্তু সুনীল কিছুতেই যোগ দিতে পারিল না। তাহার কেবলি মনে হইতেছিল—তাহার বিহ্বল ভাব কেহ লক্ষ্য করিয়াছে না কি? কিন্তু তাহার এই ভাব আর কেহ লক্ষ্য না করিলেও একজন করিয়াছিল—সে বিনোদ। বাড়ী ফিরিয়া বিনোদ নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি যমুনাকে চেন না কি হে?"

সুনীল—"না—হ্যাঁ—না—সে বহুদিন আগে দেখা হয়েছিল।"

বিনোদ—"অত ইতস্ততঃ করছ কেন বল তো? চিনলে তো দোষ নেই! লুকোচ্ছ কেন?"

সুনীল—"না—লুকোবো কেন? তবে তেমন কিছু নয়, এক আধবার দেখা হয়েছিল এই মাত্র।"

কিন্তু লুকাইবার ছিল অনেক কিছু। সুনীলের পিতা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা সময়ে, রাঁচিতে যমুনার পিতাও কি একটা কাজ করিতেন। তখন সুনীল ১৮।১৯ বছরের যুবক; আর যমুনা ১৪।১৫ বছরের। সেইখানে তাহাদের ভিতর খুবই অন্তরঙ্গতা জমিয়া উঠিয়াছিল। বাড়ীও কাছাকাছি ছিল—সারা দিন-রাত মেলামেশা করিত দুইজনে। অবশেষে সুনীল জিদ ধরিয়া বসিল—যমুনাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু সুনীলের পিতার আশা ছিল আরো বেশী। তিনি ভাবিয়াছিলেন পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া, পরে কোন ধনীর কাছে চড়া দরে বিকাইবেন। সেইজন্য পুত্রকে সেই অবধি কড়া পাহারায় রাখিয়া, ধমক দিয়া, অবশেষে নিজে সেখান হইতে বদলির দরখাস্ত দিলেন। পরে পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া, অনিতাকে বধূ করিবেন, স্থির করিয়া রাখিলেন।

যাহা হউক, গত কথা সুনীল ভুলে নাই। যমুনাকে সেইদিন অধিকতর রূপলাবণ্যমণ্ডিতা দেখিয়া তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি, পূর্ব্ব ভাব ঘন ঘন উঁকি মারিতে লাগিল। সে ক্রমে মন্মথর সঙ্গে একটু বেশী মেশামেশি আরম্ভ করিল। যমুনাও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিল না—সে কয়েক দিন পরেই সুনীলের সঙ্গে সপ্রতিভ ভাবে আলাপ আরম্ভ করিল। নিত্য নিমন্ত্রণ, চা-পান চলিতে লাগিল। সেদিন যমুনা নিজে হাতে কচুরী ভাজিবে বলিয়া সুনীলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। মন্মথ কাজের লোক—ছেলে-ছোকরার দলে বড় মিশিতে চাহিত না। আর তাহার স্ত্রী কাচ্চা বাচ্চা লইয়া ও সংসার লইয়া সারা দিন-রাত ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিত। সেইজন্য তাহারা যে যাহার কাজে সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিত। যমুনাকে শাসন করিবার অধিকারও তাহাদের কাহারো ছিল না; কারণ, যমুনা তাহাদের বাড়ীতে অভ্যাগত মাত্র। সেইজন্য তাহারা এইরূপ ঘনিষ্ঠতায় মনে মনে বিরক্ত হইলেও, বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। সুনীল ও যমুনা সেইজন্য প্রায় একলা থাকিবার সুযোগ পাইত। সেদিনও যমুনা সুনীলকে চা ও কচুরিতে পরিতৃপ্ত করিয়া অত্যন্ত কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়াছে। সুনীল বলিল—"যমুনা, সেই আগেকার সব কথা তোমার মনে আছে?"

যমুনা রুদ্ধস্বরে বলিল—"নিশ্চয় মনে আছে সুনীল, তাই নিয়ে তো আমি বেঁচে আছি।"

সুনীল—"কেন যমুনা? আর আমি কি তাই নিয়ে বেঁচে নেই?"

যমুনা বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"তুমি বেঁচে আছ সুনীল, তা তোমার বাঁচার অভাব কি? তোমার স্ত্রী আছে, ঘর আছে, সংসার আছে; কিন্তু আমার কি আছে?"

সুনীল—"আর খোঁটা দিও না যমুনা! আমি নাচার ছিলুম। বাবার আদেশ। তা'ছাড়া যমুনা—তোমার বাবার দিক থেকে তো কোন কথা আসে নি। আর আমি কি করবো? আমার বয়স তখন ১৮।১৯এর বেশী ছিল না। তখন আমি কি করবো কিছু ঠিক করতে পারিনি।"

যমুনা—"তা তুমি তখন ঠিক করতে পার নি,—কিন্তু তার জন্য আমি কি চির-জীবন ভুগবো সুনীল? আজ তুমি ব্যারিষ্টার হয়েছ, টাকা আছে, পয়সা আছে,—তার উপর তোমার ভালবাসার মানুষ আছে। সুনীল, তোমার সব আছে, আমার কেউ নেই।"

সুনীল—"কেন বার-বার আপশোষ করছ যমুনা? বল এখনো আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?"

যমুনা—"কি করবে সুনীল? করবার যা কিছু ছিল, সব ফুরিয়ে গেছে।"

সুনীল যমুনার হাত দুইটী চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিল—"না—না, ফুরোয় নি যমুনা! হিন্দুর তো দুই বিয়ে হ'তে পারে—তোমাকে আমি যদি বিয়ে করি?"

যমুনা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল "সত্যি সুনীল?"—তার পরেই হতাশ ভাবে বলিল—"কিন্তু তোমার যে স্ত্রী আছে।"

সুনীল—"থাক্ যমুনা!—এতদিন তোমার অভাব নিত্যই ভোগ করতুম ; কিন্তু এখন তোমার দেখা পেয়ে মনে হচ্ছে, তুমি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে না থাকলে আমি বাচতে পারবো না। যমুনা তুমি আমার হও!—অনিতাকে বিয়ে করেছি বাবার কথায়, কিন্তু তোমায় আমি চাই।"

খানিক পরেই স্থির হইল সুনীল যমুনাকে গোপনে বিবাহ করিয়া আপাততঃ সেইখানে রাখিবে ; পরে ধীরে সুস্থে কথাটী প্রচার করিলেই ফুরাইয়া যাইবে। সেদিন সুনীল বহু রাত্রে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল।

কয়েক দিন হইতে অনিতার মনে সন্দেহ জাল বুনিতেছিল। সুনীল আজকাল অনিতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলে না। সারাদিন অত্যন্ত আনমনা থাকে ; কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না। আগে অনিতা একটু মুখ ভার করিলে সুনীল শত রকমে তাহার মান ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিত। এখন কিন্তু অনিতার চোখের জলে মাটি ভিজিয়া গেলেও সুনীল ভ্রূক্ষেপ করে না। বাড়ীতে সন্ধ্যার পরে সুনীল একদিনও থাকে না—রোজ মন্মথর বাড়ীতে আড্ডা আছেই। তার উপর কোন কোন দিন দুপুর বেলাও সেখান হইতে ডাক আসিয়া হাজির হয়। অনিতা সারাদিন মনে মনে গুমরিয়া মরিত। একদিন সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল—"রোজ রোজ মন্মথ বাবুর ওখানে নাই বা গেলে?"

সুনীল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিল "কেন?"

অনিতা—"ভদ্রলোকের বাড়ী রোজ গেলে তারা কি মনে করবে? অথচ আমাকে একদিনও নিয়ে গেলে না, আর ওরাও একদিনও এলো না—"

সুনীল—"সে জন্য তো তোমায় আমি ভাবতে বলি নি। আমি যা ভাল বুঝি তাই করি।"

অনিতা—"কিন্তু শুনেছি, ওখানে কে একটী অবিবাহিতা মেয়ে আছে—তার সঙ্গে না কি তুমি খুব মেশ?"

সুনীল—"তুমি আমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছ?"

অনিতা—"সন্দেহ কিছু নয়। তবে এটী তোমার অন্যায়—"

সুনীল—"দেখ অনিতা, অত্যন্ত তোমার স্পর্দ্ধা—ন্যায়-অন্যায় আমার বিচার করতে বসো। তুমি আদরে আদরে মাথায় উঠেছ—থাক্—আর নয়—আমি চল্লুম—ফিরতে রাত হ'তে পারে।"

অনিতার গাল বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সুনীল একবার আড়চোখে দেখিয়া সেখান হইতে দ্রুতপদে যেন পলাইয়া বাঁচিল।

বিনোদ বহুদিন অনিতা ও তাহার বৌদির মধ্যে আলাপ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু সুনীল আজ-কাল করিয়া কেবল দিন পিছাইয়া দিতেছিল।

বিনোদ সেদিন আসিয়া পূর্ব্বের মত নিজের ঘরে না গিয়া ড্রইং রুমে বসিল। তখন রাত ১০টার উপর হইয়াছে। অনিতা তখনও স্বামীর জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ঘর-বাহির করিতেছিল। বিনোদকে দেখিয়া সে অদূরে একটী চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিনোদ বলিল—"এখনো ঘুমোও নি?"

অনিতা—"না—ঘুম আসছে না।"

বিনোদ—"ঘুমের অপরাধ কি? সব বুঝতে পারি—সুনীলেরও কথা আমি সব জানি। কিন্তু এর উপায় কি?"

অনিতা হঠাৎ এ রকম খোলাখুলি কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। আরো, নিজের দুর্দ্দশার কথা অন্যে জানিয়া অযাচিত কৃপা বর্ষণ করুক,—এমনতর অনুগ্রহ, যাহারা এককালে সৌভাগ্যের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, তাহারা কোন দিনই আকাঙ্ক্ষা করে না। তাই অনিতা শুধু বলিল—"আপনি কি ক'রে জানলেন?"

বিনোদ—"আমার জানতে কিছু বাকি নেই ; আর তা জানতে আমিও যে কিছু চেষ্টা না করেছি তা নয়,—আমার স্বার্থ ছিল এতে। অনিতা, আমার স্বার্থ অন্য কিছুই নয়—শুধু মনের তৃপ্তি, আত্ম-সান্ত্বনা। তা ছাড়া, আমি বাস্তব কিছু লাভের প্রত্যাশী নই—তবে খোলাখুলি ভাবে বলি—আমি তোমাকে ভালবাসি—চমকে উঠ না,—উঠে যেও না—আমি পিশাচ নই—এ ভালবাসায় আমি তোমায় মা রূপে দেখতে পারবো—এটুকু মনে জোর আছে। কিন্তু দেখছি, তোমার কপাল ভেঙ্গেছে। সুনীল বাস্তবিকই বিগড়ে গেছে। তাকে, তোমাকে, রক্ষা করবার একমাত্র উপায়—ঐ যমুনাকে সরানো—"

অনিতার সামনে সব যেন দিনের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। এতক্ষণে সে সব বুঝিতে পারিল। তার হাত-পা কাঁপিতেছিল ; কিন্তু সে কোন মতে আত্মদমন করিয়া বলিল, "তা কি ক'রে হতে পারে?"

বিনোদ—"হতে পারে অনিতা। আমি এখনও

অবিবাহিত। আমি যমুনাকে যাতে বিয়ে করতে পারি, সাত দিনের ভিতর তার উপায় দেখবো; আমি চেষ্টা করলেই তা পারবো—নিশ্চয়। কিন্তু অনিতা! আমার পণ ছিল—জীবনে বিয়ে করবো না,—তা ভাঙ্গতে হ'ল তোমার জন্য। আজীবন ঐ কলঙ্কিনীকে পত্নী ব'লে স্বীকার করবো তাও ভাল, কিন্তু তোমার দুঃখ দেখতে পারবো না—অনিতা! আর আজ আমি বিদায় নিতে এসেছি। অনিতা, জীবনে খুব বড় বোঝা বহন করতে চললুম। এক প্রার্থনা—মাঝে মাঝে মনে করো।"

অনিতার মুখে আর উত্তর যোগাইল না। সে স্তব্ধ, প্রশংস ও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে শুধু তাহার উপকারীর প্রতি চাহিয়া রহিল অনেকক্ষণ। তার পরে সামনে গিয়া বিনোদের পায়ের কাছে প্রণাম করিল,—যেন ঐটুকু প্রণামের ভিতর দিয়া কতখানি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ সে নীরবে ঢালিয়া দিল। তার পরে ধীরপদে ড্রয়িংরুম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যে অনিতা বাক্য-স্রোতে সকলকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত, তাহার মুখে কোন কথা না শুনিয়া বিনোদ বিস্মিত হইল। আর অনিতা—তাহার ভিতরটা শুকাইয়া গিয়াছিল,—এমন কি, তাহার সদা-সজল চক্ষুও আজ শুকনো,—সেখানে এক-বিন্দু জলের আভাষ ছিল না।

পরদিন বিনোদের পাত্তা পাওয়া গেল না। পাঁচ দিন পরে সে ফিরিয়া আসিল হাসিমুখে। সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে? কোথায় ছিলে ক'দিন?"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "থাকবো আবার কোথায়,—ঘটকালী করতে গিয়েছিলুম যে—"

সুনীল—"কার?"

বিনোদ—"আমার, আবার কার?"

সুনীল—"তাই না কি? কনেটী কে?"

বিনোদ—"কনে? কেন? এই তো কাছেই শ্রীমতী যমুনাসুন্দরী—যার সঙ্গে এতদিন আমার Courtship চলছিল।"

বিনোদ বক্রদৃষ্টিতে সুনীলের দিকে চাহিল। সুনীল যেন বজ্রাহত হইয়াছে, এমনি ভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পরে বলিল—"বল কি? কই, তোমরা তো এতদিন কেউ আমাকে কিছু বল নি?"

বিনোদ—"বলবো কি? একটা surprise দেবো আমরা ভেবে রেখেছিলুম। এস তো ভাই, দুজনে মিলে নিমন্ত্রিতদের list করে ফেলি। যমুনার মাও যে কাল এসে পড়ছেন।"

সুনীলের মুখে কে যেন কালি মাখিয়া দিয়াছে,—সে বলিল, "বিয়ে কবে?"

বিনোদ—"এই তো মোট চার দিন হাতে ভাই, সময় আর কই?"

সেদিন বিনোদ তাহার বিষাদকে ঢাকিতে গিয়া খুব হাসিয়া কাটাইল। আর সুনীল শত চেষ্টা সত্ত্বেও উল্লসিত হইতে পারিল না,—বার-বার তাহার অন্তরের কথা ভাবে-ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতেছিল।

সুনীল পরদিন উঠিয়াই বাড়ীতে হুকুম প্রচার করিল, সেই দিনই সে চলিয়া যাইবে। অনিতা কাপড় চোপড় গোছাইতে লাগিয়া গেল। বিনোদ কিন্তু সুনীলকে ধরিয়া বসিল, সে কিছুতেই যাইতে দিবে না। কিন্তু সুনীল জিদ করিয়া বসিল, সে যাইবেই। অগত্যা বিনোদ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। যাত্রা করিবার সময় অনিতাকে একলা পাইয়া বিনোদ বলিল, "অনিতা, একটু বিশ্বাসঘাতকতা করেছি; কারণ, যমুনা এ-বিয়েতে একেবারে নারাজ,—কেঁদে কেটে অনর্থ করছে; কিন্তু অন্য সকলে খুসী হয়েছে। ওর মায়ের মত আনতেই কলিকাতায় গিয়েছিলুম,—তিনি আজ আসছেন—তা জানো। কিন্তু আমি সুনীলকে বুঝিয়েছি, যমুনার আর আমার আগে থেকে প্রণয় ছিল। সে যাই হোক, সুনীল আমার বন্ধু, তার জন্য ও তোমার জন্য এটুকু করতে পেরেছি, এই আমার চরম সার্থকতা। আশীর্ব্বাদ করি স্বামী নিয়ে সুখী হও।"

অনিতা শুধু বলিল—"বিনোদবাবু, স্বামী যে এবারে আপনারই দান এ কথা কোন দিন ভুলবো না।"

সুনীল ও অনিতা Motorএ উঠিলে সিঁড়িতে বিনোদ দাঁড়াইয়া স্থির কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল—যেন তাহার সব আজ শূন্য হইয়া গিয়াছে। অনিতার চোখ আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল, আর সুনীল চোখে জ্বলন্ত বিদ্বেষ মিশাইয়া বিনোদের দিকে একবার চাহিল। তার পরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া একটী বুক-কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অনিতার একটী হাত সাদরে নিজের হাতে টানিয়া লইল। তখন মোটর ষ্টেসন অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

"হে মোর অপরিচিতা—"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

হে মোর অপরিচিতা,
তোমায় কখনো দেখিনি গো, শুনি
মরমীর তুমি মিতা !
শুধাইনি কভু কিবা পরিচয় ?
জানি ও হৃদয় চিনিবার নয়,
ক্ষণে ক্ষণে তবু যেন মনে হয়—
যারে চাই তুমি কি তা ?
জেগে আছো এই অন্তরময়
তুমি কি আকাঙ্ক্ষিতা ?

হে মোর অপরিচিতা,
কোন অলকার শুকতারা তুমি
আজো আমি জানিনি তা !
কত কি যে তবু ভাবি নির্জ্জনে
কল্পনা-পটে রঙীন স্বপনে
তোমার ছবিটি আঁকি মনে মনে
এ জীবনে বিজড়িতা !
ধ্যানের গোলোকে প্রেমগুঞ্জনে
গাহি তব গুণ-গীতা।

হে মোর অপরিচিতা,
কোন্ দেবযানী তোমার জননী
বিধাতা কি তব পিতা ?
দক্ষ-দুহিতা তুমি কি গো সতী
যারে বুকে ধ'রে গৃহী হলো যতি
পতির গরবে গরবিনী অতি
উদাসীর পরিণীতা,
শিব-নিন্দায় গণেছিলে ক্ষতি
তুমি কি অনিন্দিতা ?

হে মোর অপরিচিতা,
রাজ-রাজর্ষি জনকের মেয়ে
তুমি কি গো সেই সীতা ?
দৃঢ় রাঘবের গাঢ় অনুরাগে
হাসি মুখে বনে গেল যে সোহাগে
অশোক কাননে অবরোধে জাগে
দুখিনী যে অপহৃতা,
নারী মহিমার গৌরব আগে
পাতালে কি সমাহিতা ?

হে মোর অপরিচিতা,
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তুমি কি
সাগর সমুত্থিতা ?
তোমার অমৃত করি আহরণ
অমর হ'য়েছে বুঝি দেবগণ ?
পরশি প্রথম তোমার চরণ
কমল কি বিকশিতা ?
বেঁধেছো কি প্রেমে তুমি নারায়ণ
হৃষীকেশ-বন্দিতা ?

হে মোর অপরিচিতা,
তুমি কি বনের রূপসী-তাপসী
নৃপতি-উপেক্ষিতা ?
মুগ্ধ করিয়া দেবতা-দানবে,
যুদ্ধ জাগায়ে অসুরে মানবে—
এসেছো কি ওগো উর্ব্বশী ভবে
পুরুরবা-ঈপ্সিতা ?
বিশ্ব-বিদ্বেষ হিংসা আহবে
তুমি কি অকুণ্ঠিতা ?

হে মোর অপরিচিতা,
তুমি বিশ্বের বল্লভী কি গো
যৌবন-বাঞ্ছিতা ?
আনো এ ধরায় ধ্বংস ও ক্ষয়
হেলায় ত্রিলোক ক'রে দাও লয়
স্বর্গে মর্ত্ত্যে জয়-পরাজয়
ঘটাও অপরাজিতা !
নিখিলের তুমি চির-বিস্ময়
চিত্ত-চমৎকৃতা !

হে মোর অপরিচিতা,
নবীনা নূতন নবোঢ়া কি তুমি
নব অবগুণ্ঠিতা ?
তরুণ তনুর অরুণ মুকুলে
আবরি' প্রথম সরম দুকূলে
বধূ হ'য়ে গৃহে এসেছো কি ভুলে
অরণ্য-আশ্রিতা ?
কল্যাণ-দীপ অন্তর মূলে
উজলি' শুচিস্মিতা ?

হে মোর অপরিচিতা,
এই ধরণীর রাণী কি গো তুমি
মহামহিমান্বিতা ?
তুমি কি সোহাগে স্নেহে নিরুপমা
সখী ও সজনী প্রিয়া প্রিয়তমা,
পরমাত্মীয়া বান্ধবী সমা
প্রেম-প্রীতি-পরিবৃতা ?
চির-মনোরমা—ওগো অনুপমা,
সুষমা বিমণ্ডিতা ?

হে মোর অপরিচিতা,
রচিছো কি প্রেমে নিতি ইতিহাস
জীবনের সংহিতা ?
তোমারে ঘেরিয়া চলে কি সৃষ্টি
জাগে সভ্যতা মানব কৃষ্টি
করে কি তোমার মধুর দৃষ্টি
মেদিনী দীপান্বিতা ?
মর্ত্ত্যে কি তব অমৃত বৃষ্টি
চির-সুধা-সঞ্চিতা ?

হে মোর অপরিচিতা,
কে তুমি নীরবে সহি' নিপীড়ন
চলো চির-বঞ্চিতা ?
তোমার মায়ার মোহন পরশ
অখিল-হৃদয় করে যে সরস,
মানে পরাজয় ঋষি ও তাপস
মুনি-জন-মন-জিতা !
ভুবন-বিজয়ী চরণে কি বশ ?
রূপ যশ-গর্ব্বিতা !

হে মোর অপরিচিতা,
দেবী কি দানবী—কে তুমি মানবী
সুর-নর-অর্চ্চিতা ?
লোকে লোকে হেরি আরতি তোমার
কবি কলাবিদ্ কুবের সবার
জীবন অর্ঘ্য—প্রাণ উপহার
তোমারে করিছে প্রীতা !
তুমি কি সৃজন-মন্থন সার
অনন্তে নিবেদিতা ?

বিবিধ-প্রসঙ্গ

দু' চার কথা *

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, এম-এ, বি-টি, ডিপ্-এড্ (এডিনবরা ও ডবলিন)

গত ২৮ই মে রাজবাড়ী ষ্টেশনে বসে ট্রেনের প্রতীক্ষা করছি। এক জন চাকুরে মুসলমান ছুটীতে দেশে ফিরছেন। তিনি বললেন যে মাসিক বেতন ২২ টাকা ও থাকা খাওয়া দাওয়া দিয়েও 'মুনিষ' মিলছে না। লোকে চাষ-বাসের কাজ যে কি করে চালাবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। আমি বললাম, ২২্ টাকা বেতন ও খাওয়া—এ ত আজকাল দুটো তিনটে পাশ করেও জোটে না। তিনি বললেন—তাই হয়ে পড়েছে। এখন আবার চাষের দিকেই সকলকে যেতে হবে। আরও বললেন, আমার পিতার অবস্থা একটু ভাল হওয়ায় তিনি চাষাবাদ ছেড়ে দেন ও আমায় একটু লেখাপড়া শিখিয়ে চাকুরীতে ঢুকিয়ে দেন। আমি আর এখন রোদ-জল সইতে পারি না। যে রকম ভাবগতিক, তাতে মনে হয়, আমার ছেলেকে ফের ঐ চাষের দিকেই ঝুঁকতে হবে। আমি বললাম, অবশ্য লেখাপড়া শিখে কিচ্ছু হচ্ছে না বলে লেখাপড়া ছাড়া ঠিক হবে না। তবে সকলেই যাতে কিছু কিছু লেখা-পড়া শেখে ও সেই সঙ্গে চাষ বা অন্য কিছু হাতের কাজ শেখে তো ঠিক হয়। এই কথা বলতে গিয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটী কথা মনে হ'ল। তিনি আমার ছাত্রাবস্থাতে আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে দু' একবার পদার্পণ করেছিলেন। আমাদের সব ভাই ক'টীই তখন আর্টস বা সাহিত্য পড়ে। শুনে তিনি বলেছিলেন "রেখে দে তোদের কেতাবী বিদ্যে।"

এই আলোচনাটী শেষ হওয়ার পরই ফরিদপুরে পৌছিয়া বৈশাখ মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত হলধর বর্দ্ধন মহাশয়ের লিখিত "আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অন্ন-সমস্যা মীমাংসা" শীর্ষক প্রবন্ধ চোখে পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গে চৈত্রের "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত আচার্য্য দেবের "কৃষি ব্যবসায় ও বাঙ্গালী যুবকের অন্ন-সমস্যা" প্রবন্ধ মনোযোগ সহকারে পড়লুম। প্রবন্ধের পাদটীকা (Foot note) পড়িয়া জানিলাম যে ইহা আচার্য্য দেবের ফরিদপুর কৃষি-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে বক্তৃতার অনুলিখন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার কোনও শিরোনামা দিয়াছিলেন কি না জানি না ; কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ পড়ে মনে হয়, তিনি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন সম্পর্কে সময়োপযুক্ত দু' দশ কথা বলিয়াছিলেন ; এবং পরে প্রবন্ধের নামকরণ তাঁহার দ্বারা কিম্বা অন্য কাহারও দ্বারা হইয়াছিল। প্রবন্ধের এই শিরোনামা না থাকিলে বোধ হয় বর্দ্ধন মহাশয় কোনও অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, আচার্য্যদেবের প্রবন্ধ পড়ে আমার ফরিদপুর কৃষি-শালার কাজ ভাল করে দেখবার ইচ্ছা হ'ল। আমি কৃষি-শালায় উপস্থিত হয়ে শিক্ষিত যুবকদের কাজ নিজ চোখে দেখলাম। দেখে মনে খুবই আনন্দ ও আশা হ'ল—এ জন্য নয় যে, এতে বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যার একেবারে সমাধান হ'ল। তবে কি জন্য ? না—পথ-প্রদর্শক ভাবে অন্ততঃ বৎসরে পাঁচটী করিয়া ভদ্র যুবক হাতে-কলমে চাষের কাজ শিখে বেকার বিভীষিকার ভয় কতকটা ভেঙে দিতে সাহায্য করছেন এবং সাধারণের চোখে কায়িক পরিশ্রমের মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। বলতে সঙ্কোচ হয়—অবস্থা এমনই সঙ্কটময় হয়েছে যে, একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক বাজার হ'তে একটী ইলিশ্ মাছ কিনে আনতে মুটের খোঁজ করেন। একদিন এক বিলাত ফেরতা বেচারী কপি হাতে করে বাড়ী ফিরছিলেন বলে তাঁকে উপহাসাস্পদ হ'তে হয়েছিল—ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া-ছিলাম। এইরূপ সভ্যতার দিনে ভদ্র শ্রেণীর যুবকদের সাধারণ মজুরদের সহিত একত্র মাঠে লাঙ্গল দিতে দেখলে কাহার না আনন্দ ও উৎসাহ বাড়ে ?

আচার্য্যদেবের অভিভাষণ পড়ে বর্দ্ধন মহাশয় যে অভিযোগগুলি করেছেন, সে সম্বন্ধে দু' চার কথা বলতে ইচ্ছা করি। তিনি আশঙ্কা করেছেন যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুবকেরা নিজ হাতে লাঙ্গল ধরলে তারা চাষীর জমিতে ভাগ বসাবে—সবাই লাঙ্গলে গেলে চাষারাই বা যাবে কোথায় ? আচার্য্যদেবের অভিভাষণ ভাল করে পড়ে দেখেছি, তিনি তাহার কোনও স্থানেই ত বলেন নাই যে "কল কব্জা বসিয়ে" বড় আকারে, বেশী মূলধন নিয়ে, পাঁয়তারা ভেঁজে, বিজ্ঞাপন দিয়ে চাষবাস আরম্ভ করতে হবে ! বরং তিনি ইহার উল্টোই বলেছেন "বিলাতী চাষের প্রণালী ও আদর্শ এখানে চালানো যায় না"। তিনি সামান্য আয়োজনের, অল্প মূলধনের চাষাবাদের কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন "প্রত্যেক বাড়ীতেই অন্ততঃ ২।৪ কাঠা, এমন কি, স্থানে স্থানে ২।১ বিঘা করিয়া জমি খালি পড়িয়া আছে ! আপনাদের বাড়ীর সঙ্গে যে ২।৪ কাঠা জমি পড়ে আছে, তার কি ব্যবহার আপনারা করছেন ?" এইরূপ ২।১ কাঠা জমির বাগান গৃহস্থের কত উপকার করে তাহার উদাহরণ স্বরূপ তিনি ফরিদপুরের S. D. O. অভয় বাবুর, Supdt. of Police Mr. Huqএর ও

---

* ফরিদপুর কৃষি-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণ সম্বন্ধে।

ফরিদপুরের ব্যবসায়ী সখীচরণ বাবুর বাগিচার কথা বলেছেন। বারাকপুরের হানেফ ৩০।৪০ বিঘা জমি নিয়ে তাঁর তরকারী উৎপাদন করে কিরূপ লাভ করছে তাও বলেছেন। আমাদের সকলেরই জানা আছে—কত কত পরিবার আজ সহরবাসী—পল্লীগ্রামে তাঁদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু যায়গা জমি আছে। কিন্তু সেই সব যায়গা জমি থেকে তাঁরা বিশেষ কিছুই পান না। হয় ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, নয় ত বর্গা চাষীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়েছে। তারা দয়া করে যা' দেয় তাই মাথা পেতে নিতে হবে। কিন্তু সহরের মায়া কাটিয়ে বাড়ীর যদি ২।১ জনও পল্লীগ্রামে নিজ নিজ বাড়ীতে অবস্থান করে এই সমস্ত যায়গা জমির তত্ত্বাবধারণ করবার চেষ্টা করেন, তা' হলে গ্রামের শ্রী ত ফিরবেই—আয়ের পথও খুলবে। সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা থাকলে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে ছোটখাটো তরি তরকারীর, ফলমূলের বাগান নিজেই ত অনায়াসে করতে পারেন; এবং বর্গা চাষীর দ্বারা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ভাবে জমি প্রস্তুত করাইয়া উন্নত শ্রেণীর ফসল বপন করাইয়া উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বাড়াইতে পারেন। বর্দ্ধন মহাশয় কৃষিকাজের যে প্রতিবন্ধকগুলির কথা বলিয়াছেন (অভিজ্ঞতার অভাব, মূলধনের অভাব, সুবিধাজনক জমির অভাব, সদ্য উপার্জ্জনের প্রয়োজন, কৃষি-জাত দ্রব্যের বিক্রয়ের অসুবিধা ইত্যাদি)—এইরূপ সামান্য আকারের চাষবাসে ত এই প্রতিবন্ধকগুলি বিশেষ বাধা দিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। আমারই জানা কয়েকটী যুবক অনেক দিন কলিকাতায় চাকরীর সন্ধানে এ-আপিস, ও-আপিস হাঁটাহাঁটী করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া দেশে ফিরিয়া কৃষি-কাজে হাত দেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছুই ছিল না। অথচ কিছু দিন গ্রামে থেকে "চাসাভুসোর" সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করে তাঁহারা সামান্য আকারের কৃষিকার্য্যোপযোগী অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে এখন নিজের জোত জমা থেকে আয়ের পথ সুগম করে নিয়েছেন—এবং প্রত্যেকেরই অবস্থা সচ্ছল হয়েছে—দু' পয়সার মালিক হয়েছেন—বাড়ী ঘরগুলোর সংস্কার করেছেন—যা' তাঁরা ৩০।৩২৲ টাকা মাহিনার কেরাণী হ'লে করতে পারতেন না। কলিকাতায় ৩০।৩৫৲ টাকা আয়ের চাকুরের মেসখরচা, 1st class tram ও Bus খরচা, বরফজল, ইত্যাদিতে কত যায় ও কি বাঁচে তাহার হিসাব নিকাশ বর্দ্ধন মহাশয় বোধ হয় জানেন। এই সব কাজে চাই চাকরীর মোহ ত্যাগ, কায়িক পরিশ্রম, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়। বর্দ্ধন মহাশয় ত নিজেই স্বীকার করেছেন যে "চাসে নেমে লেগে থাকলে ধীরে ধীরে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।" প্রবন্ধের অবতারণায় যে আলোচনার কথার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও এই ক্ষেত্রে ভাবিবার বিষয়। এই প্রসঙ্গে "হিন্দু মিশন" পত্রিকায় (বাসন্তী পূর্ণিমা বিশেষ সংখ্যা) প্রকাশিত রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ "আমাদের অবস্থা" বর্দ্ধন মহাশয়কে একবার পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আচার্য্য দেবের কলমের এক খোঁচায় বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যার একটী উপায় উদ্ভাবন করে দিলেন—এত বড় দুরাশা স্বয়ং আচার্য্য মহাশয়ও করেন নি। তবে তিনি এইরূপে নানা ধারে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের চক্ষু উন্মীলনের চেষ্টা করছেন মাত্র। তাঁর কথা মেনে চললেও মন্ত্রের মত জাতীয় সমস্যার সমাধান নাও হ'তে পারে। এই যে বলডুইন সাহেব ইংল্যাণ্ডের বেকার-বিভ্রাটের সমস্যার ঔষধ আবিষ্কার করতে পারছেন না বলে বিপক্ষগণ তাঁর গায়ে ধূলা দিচ্ছে—যেন জাগতিক সকল অবস্থাই ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের করায়ত্ত; কোনও একটী অবস্থাকে ঘুরিয়ে আনতে সমগ্র দেশের সমবেত চেষ্টাও হার মানতে পারে। কিন্তু তাই বলে জাতীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা সম্পর্কে দু' একটী প্রস্তাব যদি কেউ কোনও উপলক্ষে করেন, তা' উপেক্ষা করা শোভন নহে।

ফরিদপুর কৃষি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কৃষি-জ্ঞান লাভ করে যে সকল ভদ্র যুবক চাষবাসে লেগেছেন, তাঁদের অন্ততঃ দু' চার জনের নাম ধাম ও চাষের একটা সঠিক লাভালাভের" হিসাব আচার্য্যদেবের প্রবন্ধে নাই বলে বর্দ্ধন মহাশয় অভিযোগ করেছেন। কিন্তু সে হিসাব দেবার সময় ত এখনও আসে নি; ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে প্রথম পাঁচটী যুবককে ফরিদপুর কৃষি-ক্ষেত্রে এক বৎসরের জন্য শিক্ষার্থীভাবে লওয়া হয়। সুতরাং আচার্য্যদেব যখন কৃষি-শালা পরিদর্শন করেন, তখন এই পাঁচটী যুবক শিক্ষাধীন ছিলেন—কৃষি-ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী হিসাবে তাঁদের কার্য্যাবলীর কথাই আচার্য্যদেব বলিয়াছেন। এই পাঁচটী যুবক গত এপ্রিল মাসে সরকার হইতে প্রত্যেকে ২০০৲ টাকা অগ্রিম ও ১৫ বিঘা করিয়া খাসমহল জমি পাইয়াছেন। ইঁহারা সবেমাত্র কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় দল গত মে মাস হইতে এই কৃষি ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিয়াছেন। ফরিদপুর কৃষি শালার সম্পর্কে আসিয়া ও তদ্দ্বারা উৎসাহিত হইয়া জন-কয়েক ভদ্রসন্তান নিজ নিজ ব্যবসার সহিত কৃষি-কাজ করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে সখীচরণ বাবুর ক্ষেতই আচার্য্য-দেব পরিদর্শন করেন ও তাঁহার অভিভাষণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি চাষবাসে কিরূপ লাভবান হইতেছেন, তাহার হিসাব নিকাশ অভিভাষণের মধ্যে দেওয়া সম্ভব নয়—বর্দ্ধন মহাশয় ইচ্ছা করিলে সখীচরণ বাবুকে কিম্বা ফরিদপুর জেলার কৃষি-কর্ম্মচারী মহাশয়কে লিখিলে সমস্ত তথ্যই অবগত হইতে পারিবেন।

বর্দ্ধন মহাশয় আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির দোষ দিয়াছেন। তিনি বলেছেন—"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেরাণীই তৈরী হয়—কৃষিজীবী তৈরী হয় না"। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠানে কৃষি-জীবী তৈরীর প্রচেষ্টা চলিতেছে (যেমন ফরিদপুর কৃষি-শালা) সেই সকল প্রতিষ্ঠান সকলেরই উৎসাহ ও প্রশংসা পাইবার অধিকারী বলিয়া মনে হয়। এই প্রচেষ্টার জন্য ফরিদপুর কৃষি-শালা যে সকলের অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক এই কথা বলিতেই হইবে। আমি যে পাঁচটী যুবকের কাজ দেখিয়াছিলাম, তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া বেশ বুঝিতেও পারিলাম—তাঁহারা এই কাজ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন,—মাঠের প্রত্যেক কাজ আনন্দ সহকারে করিতেছেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন, এই এক বৎসর মাঠে রোদে-জলে দৈনিক ৬।৭ ঘণ্টা করে খেটে শরীরটাকে শক্ত মজবুত করে নিয়ে যাবো। ভবিষ্যতে আর কোনও প্রকার কায়িক পরিশ্রম করতে লজ্জা

না কষ্ট হবে না ; এইটেই হচ্ছে এই শিক্ষার বিশেষত্ব। আর এই শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তক হচ্ছেন—দেবেন্দ্র বাবু (কৃষি-ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক)। তিনিই ত এই যুবকদের আনন্দের মধ্যে, উৎসাহের মধ্যে রেখেছেন। তিনি কি ভাবে এই যুবকদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন তা' না দেখলে বোঝা যাবে না।

আর এক কথা। হলধর বাবু কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত কৃষি ক্ষেত্রগুলিকে "শ্বেত হস্তী" আখ্যা দিয়েছেন। এই সকল শ্বেত হস্তীর দ্বারা যে কিছুই কাজ পাওয়া যাইতেছে না, এ কথা বলিলে চলিবে কেন? এই শ্বেত হস্তীগুলিই উন্নত শ্রেণীর ধান, পাট, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি প্রসব করিয়াছে—এবং তাহার ফলে কৃষকেরা যথেষ্ট লাভবান হইতেছে। একমাত্র ফরিদপুর জেলাতেই বৎসরে গড়ে ৪০।৫০ হাজার টাকার কৃষি-বিভাগের আবিষ্কৃত পাটের বীজ বিক্রয় হইতেছে। অথচ, এই পাটের বীজের মূল্য স্থানীয় পাটের বীজের মূল্য অপেক্ষা চারিগুণ অধিক। ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাতেও কৃষি-বিভাগের আবিষ্কৃত পাট, ধান, ইক্ষুর বীজের চাহিদা খুবই বেশী। ইহা হইতে কি প্রতিপন্ন হয় না যে, এই সকল উন্নত শ্রেণীর ফসল আবিষ্কৃত হওয়াতে ও কৃষি-ক্ষেত্রগুলিতে উহার চাষাবাদের ফলে কৃষকেরা লাভবান হইয়াছে? সুতরাং কৃষি-ক্ষেত্রগুলিকে শ্বেত হস্তী বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? প্রত্যেক কৃষি-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরীণ কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তাহার সমালোচনা করিলেই দেশের ও দশের মঙ্গল হয়। সাদা হাতীর মাহুত বিশেষও তো সুনিপুণ ও সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হ'তে পারেন' গভর্ণমেণ্টের অধীনেও দেশের সেবাব্রতী কর্ম্মচারী থাকা কিছু অসম্ভব নয়। যদি এইরূপ কাউকে আমাদের দেশনেতা অনুষ্ঠান-বিশেষের উপলক্ষ্য করে' তাঁর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করে প্রশংসাই করে থাকেন—তা' ব্যক্তিগত চোখে দেখা উচিত নয়—নেতার যা' ভিতরকার উদ্দেশ্য তাই গ্রহণ করা উচিত। যেখানে দেখেন একটু প্রাণের লক্ষণ সেখানেই উৎসাহের বাক্যে জীবনী শক্তি বদ্ধনের চেষ্টা বই ত আর কিছুই নয়।

শিক্ষিত যুবকদের "কটু নিন্দা" করেছেন বলে আচার্য্যদেবের উপর বর্দ্ধন মহাশয় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু শিক্ষিত যুবকদের সম্বন্ধে তিনি যা' বলেছেন, তা' বোধ হয় বর্দ্ধন মহাশয় নিজেও অস্বীকার করতে পারবেন না। এই বিষয়ে কিছু না লেখাই ভাল।

উপসংহারে বলি, যে কোনও সাধু চেষ্টাকে—তা' হাজার ছোট হ'লেও—আমরা যতই ভাল চোখে দেখি, ততই আমাদের মঙ্গল। আমরা একেবারেই জাতীয় সমস্যার সমাধানের স্বপ্ন না দেখে ফেলি। আচার্য্যের প্রদত্ত বা যে কারও দেওয়া এই ধরণের শিক্ষাটাই যেন গ্রহণ করে অগ্রসর হ'তে পারি। নূতন পথ দেখাতে এরা বলেছেন মাত্র। অনেকবার হয় ত ভ্রান্ত হ'তে হবে। তা' বলে বিজ্ঞ হয়ে বসে মাথা নাড়লে তো চলবে না।

ঋগ্বেদে সভ্যতা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ

[২]

নগর

ধনীরা নগরে বাস করিতেন—

"বিস্পর্দ্ধসো নরাং ন শংসে রস্মাকা সদিন্দ্রো বজ্রহস্তঃ।
মিত্রায়ুবো ন পূর্পতিং সুশিষ্টৌ মধ্যায়ুব উপ শিক্ষন্তি যজ্ঞৈঃ।"

১ম ২৩ অনু ৯সূ ১০ ঋক্

বন্ধুরা যেমন স্পর্দ্ধাকারীকে স্পর্দ্ধাশূন্য, অনুকূল করে, সেইরূপ বীরের শিক্ষার জন্য বজ্রধারী ইন্দ্র আমার স্তবে অনুকূল হউন। হিতৈষীরা যেমন নগরস্বামীকে তাঁহার অভিমত দিয়া তুষ্ট করে, সেইরূপ আমাদের যশ ও সম্পদের মধ্যস্থ অধ্বর্য্যুগণ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রকে পূজা করেন—তুষ্ট করেন। অর্থাৎ মন্ত্রী প্রভৃতি বন্ধুগণ যেমন নগরস্বামীর অর্থপ্রাপ্তির কারণ, সেইরূপ মধ্যস্থ অধ্বর্য্যুগণ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করিয়া আমাদের যশ ও সম্পদের কারণ হইতেছেন—অধ্বর্য্যুগণের পূজায় তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র আমাদিগকে যশ ও সম্পদ দান করেন।

আচার ব্যবহার

ঋষিরা বিবাহ করিতেন। আপন ভগ্নী বিবাহ যম ঋষি নিষিদ্ধ করেন। দেবর বিবাহ ছিল। নিযুক্তিতে সন্তান উৎপন্ন করিতেন। ব্যভিচার, অসতী স্ত্রীলোক ছিল। সাধারণ্যার অসদ্ভাব ছিল না। কানীন পুত্রেরও আদর ছিল। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে বিবাহ হইত। জাতিভেদ ছিল না। একটী মাত্র স্তোত্রে বৈশ্য শূদ্রের নাম পাওয়া যায়। তাহাদের কার্য্য বিভাগের উল্লেখ দেখা যায় না। একজনে অনেক স্ত্রী রাখিতেন। বিধবা বিবাহ হইত। যুবতী বিবাহ ছিল। বিধবা পিত্রালয়ে [illegible] [illegible]। [illegible] ছিল না।

বিবাহ

ঋষিদিগের ধারণা—অবিবাহিত বালিকাকে বিশ্বাবসু নামক দেবতা ভোগ করেন। সেই জন্য এক বিবাহিতা যুবতী নারী হইতে [illegible] চলিয়া যাইতে বলা হইতেছে—

"উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীড়ে।
অন্যা মিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি।"

১০ম ৭ অনু ৮৫ সূ ২১ ঋক্

হে বিশ্বাবসো! এই কন্যাকে ছাড়িয়া যাও। এই নারী স্বামীযুক্ত—ইহার বিবাহ হইয়াছে। আমি তোমায় স্তব করিতেছি। ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? তাহা বলিতেছেন—যে নারীর স্ত্রী-চিহ্ন হয় নাই, পিত্রালয়ে থাকে, তাহাকে ইচ্ছা কর। 'উহা তোমার ভাগ' জানিবে, বিবাহিত নারী তোমার ভাগ নয়।

অলঙ্কৃতা হইয়া স্বামীর নিকট গমন

কন্যার পিতা থাকিলে অলঙ্কৃতা হইয়া স্বামীর কাছে যাইত—কন্যা ভূষিতা হইয়া স্বয়ম্বরা হইত।

"পরিষ্কৃতা ইন্দবো যোষেব পিত্র্যাবতী।

বায়ুং সোমা অসৃক্ষত।" ৯ম ২ অনু ৪৬ সূ ২ ঋক্

বিশুদ্ধ সোম যজ্ঞে বায়ুর পানের জন্য যাইতেছে—যেমন পিতৃমতী কন্যা বিভূষিতা হইয়া বরের নিকট যায়—স্বয়ম্বরা হয়।

ভগ্নী বিবাহ নিষিদ্ধ

ভগ্নী যমী ভাই যমকে বিবাহ করিয়া উত্তম পুত্র উৎপাদন করিবার প্রার্থনা করিতেছেন—

'ওচিৎ সখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃপুরু চিদর্ণবং জগন্বান্।

পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধিক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ।"

১০ম ১ অনু ১০ সূ ১ ঋক্

আমরা নির্জন বিস্তীর্ণ সমুদ্র ধারে আসিয়াছি। আমি তোমাকে (যমকে) শ্রেষ্ঠ বন্ধুত্বের জন্য প্রসন্ন করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া শ্রেষ্ঠ বন্ধু হও। বিধাতা চিন্তা করিয়া আমাদের অনুরূপ উত্তম পুত্র তোমার ঔরসে আমার গর্ভে স্থাপিত করুন।

ভাই যম ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

"আ ঘা তা গচ্ছা নুত্তরা যুগানি জাময়ঃ কৃণবন্নজামি।

উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ।"

১০ম ১ অনু ১০ সূ ১০ ঋক্

যে কালে ভগ্নী ভাই ভিন্ন অন্যকে বিবাহ করিবে, সেই কাল পরে আসিতেছে। হে ভাগ্যবতি! আমাকে ছাড়িয়া অন্য পতি ইচ্ছা কর। তোমার বাহু সেই যুবকের বালিশ হউক।

দেবর পতি

ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা ঋষিকা অশ্বিনীর স্তব করিতেছেন—

কুহস্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।

কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ।"

১০ম ৩ অনু ৪০ সূ ২ ঋক্

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা দিন রাত কোথায় থাক? কোথায় তোমাদের লাভ হয়? তোমরা কোথায় বাস কর? বেদীতে তোমাদিগকে কে সেবা করে? আমায় বল। অর্থাৎ আমি তোমাদের সেবা করিতে ইচ্ছা করি। ইহার দুটী উপমা। কিরূপ সেবা?—"শয়ুত্রা বিধবা দেবরং ইব" বিধবা যেমন শুশ্রূষা করিতে দেবরকে শয্যায় টানিয়া লয়। দ্বিতীয় উপমা "যোষা মর্য্যং" পত্নী যেমন স্বামীকে লয়। দেবর শব্দের সায়ন ব্যাখ্যা করেন দ্বিতীয় বর।

নিযুক্তি

কক্ষীবান্ নিযুক্তার পুত্র। সায়ন ইতিহাস—কলিঙ্গরাজ বৃদ্ধ পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া দীর্ঘতমস্ ঋষিকে পুত্রোৎপাদন জন্য অনুরোধ করিয়া নিজ মহিষীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। মহিষী ঋষিকে অতি বৃদ্ধ দেখিয়া লজ্জা বোধ করেন। তখন তাঁহার দাসী উশিক্‌কে নিজ বস্ত্রাভরণে সজ্জিত করিয়া ঋষি সমীপে পাঠাইয়া দেন। ইহার গর্ভে কক্ষীবান্ উৎপন্ন। স্বনয় রাজা ইঁহার (কক্ষীবানের) রূপে মুগ্ধ হইয়া নিজের দশটী কন্যা ও বহু রত্নাদি ইঁহাকে দান করেন॥ ১ম ১৮ অনু ৫ সূ ১ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়।

আর একটী নিযুক্তি। ইহা স্ত্রীর ইচ্ছায়। রাজা ত্রসদস্যু বলিতেছেন—

"অস্মাক মত্র পিতরস্ত আসন্‌ৎ সপ্ত ঋষয়ো দৌর্গহে বধ্যমানে।

ত আযজন্ত ত্রসদস্যু মস্যা ইন্দ্রং ন বৃত্রতুর মর্ধদেবম্।"

৪ম ৪ অনু ১০ সূ ৮ ঋক্

পুরুকুৎস মহিষী, স্বামী দুর্গহপুত্র পুরুকুৎস শত্রু কর্তৃক আবদ্ধ হইলে, রাজ্য অরাজক দেখিয়া, পুত্র কামনায় সেই সময়ে উপস্থিত সপ্তর্ষিগণের পূজা করেন। তাঁহারা তুষ্ট হইয়া এই পুত্র ত্রসদস্যুকে উৎপন্ন করেন।

দুর্গহপুত্র পুরুকুৎস বাধা পড়িলে আমাদের পিতা প্রসিদ্ধ সেই সাতজন এই অরাজক দেশে আগমন করেন। তাঁহারা পুরুকুৎস মহিষীকে শত্রুনাশক ইন্দ্র তুল্য দেব সদৃশ ত্রসদস্যু নামক আমাকে উৎপন্ন করেন॥

অসতী

গোপনে ব্যভিচার ছিল—

"বায়ুর্যুঙ্ক্তে রোহিতা বায়ুরুরুণা বায়ূ রথে

অজিরা ধুরি বোঢ়বে বহিষ্ঠা ধুরি বোঢ়বে।

প্রবোধয়া পুরন্ধিং জার আসসতীমিব প্রচক্ষয়

রোদসী বাসয়োষসঃ শ্রবসে বাসয়োষসঃ।"

১ম ২০ অনু ৬ সূ ৩ ঋক্

পুরুচ্ছেপ ঋষি বায়ুর স্তব করিতেছেন—

বায়ু দেবতা কখন বহন জন্য রথের যুয়ালে রোহিত অশ্বদ্বয় যুক্ত করেন। কখন বা স্বয়ং লোহিতবর্ণ, কখন শীঘ্রগামী, কোন সময় বহন সমর্থ অশ্বদ্বয় রথের ধুরিতে (যুয়ালে) যুক্ত করেন। হে বায়ো! উপপতির চিন্তায় অল্প নিদ্রিতা সুন্দরীকে যেমন উপপতি সঙ্কেত স্থানে যাইবার জন্য জাগায় সেই রূপ তুমি বহু জ্ঞানী যজমানকে হবি গ্রহণ জন্য জাগ্রত কর—জাগাইয়া দাও। অসতী সুন্দরী উপপতির জন্য কপট নিদ্রায় থাকিত। উপপতি আসিয়া তাহাকে অন্যত্র লইয়া যাইত।

গর্ভপাত

সমাজ ভয় ছিল। অসতীরা গর্ভপাত করিয়া দূরে ফেলিয়া দিত।

"ধৃতব্রতা আদিত্যা ইষিরা আরে মৎ কর্ত রহসূরিবাগঃ।

শৃণ্বতো বো বরুণ মিত্র দেবা ভদ্রস্য বিদ্বাঁ অবসে হুবে বঃ॥"

২ ম ৩ অনু ৭ সূ ১ ঋক্

হে কর্ম্মী অথবা গমনশীল, সকলের প্রার্থনীয় অদিতি পুত্র দেবগণ! তোমরা আমার অন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য অপরাধ দূর কর যেমন ব্যভিচারিণী গর্ভপাত করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়।

হে বরুণ! হে মিত্রদেব! হে দেবগণ! তোমরা আমাদের মঙ্গ

কর, আমি জানি। আমার স্তব শ্রবণ কর। আমাদের রক্ষার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

লাম্পট্য

বৈদিক সমাজে বন্ধুর স্ত্রীতে লাম্পট্য ছিল—

"প্রাস্য ধারা বৃহতী রসৃগ্রন্নক্তো গোভিঃ কলশাঁ আবিবেশ।
সাম কৃণ্বন্‌ সামান্যো বিপশ্চিৎ ক্রন্দন্নেত্যভি সখ্যুর্ন জামিম্‌॥

৯ ম ৫ অনু ৯৬ সূ ২২ ঋক্

এই সোমের প্রবল ধারা বাহির হইতেছে। পরে দুগ্ধ মিশ্রিত হইয়া কলশে আশ্রয় লইবে। সোম সর্ব্বজ্ঞ, দেবগণের আহ্বাতা, শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া, পান পাত্রে আসিয়া পড়িতেছে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত—লম্পট যেমন বন্ধুর স্ত্রীকে নির্ভয়ে বলাৎকার করে॥

অসতী লইয়া বিবাদ

অসতী লইয়া বিবাদ হইত।

"অপঘ্নন্নেষি পবমান শত্রূন্‌ প্রিয়াং জারো অভিগীত ইন্দুঃ।
সীদন্‌ বনেষু শকুনো ন পত্বা সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সত্তা॥

৯ ম ৫ অনু ৯৬ সূ ২৩ ঋক্

রাজর্ষি প্রতর্দ্দ সোমের স্তব করিতেছেন—হে বিশুদ্ধ সোম! তুমি সকল পাত্রে ক্ষরিত ও স্তুত। উপপতি যেমন অন্য উপপতিগণকে পরাভব করিয়া প্রিয়াকে লাভ করে, সেইরূপ তুমি শত্রুনাশ করিয়া থাক। উড্ডয়নকুশল পক্ষী যেমন বৃক্ষে যাইয়া বসে, সেইরূপ তুমি পবিত্রকারী হইয়া বা পবিত্র হইয়া কলশে অবস্থান করিতেছ॥

ব্যভিচার

দীর্ঘ তমস্‌ ঋষির জন্ম। সায়ণধৃত ইতিহাস—

"উচথ্য বৃহস্পতি নামানৌ দ্বাবৃষী আস্তাং। তত্রোবথ্যস্য মমতা নাম ভার্য্যা। সা চ গর্ভিণী, তাং বৃহস্পতি গৃহীত্বা রময়ৎ। শুক্রনির্গমনাবসরে প্রাপ্তে গর্ভস্থং রেতঃপ্রাবাদীৎ। হে মুনে! রেতো মা ত্যাক্ষীঃ। পূর্ব্বমহং বসামি। রেতঃ সংকরংমাকার্ষী রিতি। এব মুক্তো বৃহস্পতি র্বলাৎপ্রতিরুদ্ধ-রেতস্কঃ সন্‌ শশাপ—হে গর্ভ! ত্বং যতো রেতো নিরোধ মকরোঃ। অত ত্বং দীর্ঘতমঃ প্রাপ্নুহি জাত্যন্ধো ভব ইতি এবং শপ্তো মমতায়াং দীর্ঘতমো অজায়ত। স চ উৎপন্নঃ তমো ব্যথয়া অগ্নিমস্তৌৎ, স চ স্তুত্যা প্রীতঃ আন্ধ্যাং পর্য্যহরৎ ইতি। ১ ম ২১ অনু ৮ সূ ৩ ঋকের ভাবার্থ।—উচথ্য বৃহস্পতি নামে দুই ঋষি ছিলেন। বৃহস্পতি উচথ্যের গর্ভিণী মমতা নাম্নী স্ত্রীতে উপগত হন। শুক্রপাত সময়ে গর্ভস্থ শুক্র বৃহস্পতিকে শুক্রসঙ্কর করিতে নিষেধ করে। বৃহস্পতি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জন্মান্ধ হও বলিয়া শাপ দেন। দীর্ঘতমস্‌ অগ্নির উপাসনায় পরে চক্ষুষ্মান্‌ হন।

অভিসারিকা

স্ত্রীলোক উপপতির নিকট গোপনে যাইত—

"অপ্সরা জার মুপ সিষ্মিয়াণা যোষা বিভর্ত্তি পরমে ব্যোমন্‌।
চরৎ প্রিয়স্য যোনিষু প্রিয়ঃ সনৎসীদৎ পক্ষে হিরণ্যয়ে বেনঃ॥

১০ ম ১০ অনু ১২৩ সূ ৫ ঋক্

যেমন কোন রূপবতী নারী উপপতির নিকট যাইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ তাহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া আনন্দিত করে, সেইরূপ বিদ্যুৎ অন্তরিক্ষে বেনদেবের (অন্তরীক্ষ দেবতার) নিকটে যাইয়া ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে আমোদিত করিতেছে। বেনও ইহার অতি অনুকূল হইয়া দীপ্তিমৎ মেঘে বিদ্যুতের সহিত উপবেশন করিতেছেন।

সাধারণ্যা

সভ্যতার চিহ্ন সাধারণ্যার (বেশ্যার) অভাব ছিল না।

"পরা শুভ্রা অয়াসো যব্যা সাধারণ্যেব মরুতো মিমিক্ষুঃ।
ন রোদসী অপনুদন্ত ঘোরা জুষন্ত বৃধং সখ্যায় দেবাঃ॥

১ ম ২৩ অনু ৩ সূ ৪ ঋক্

অগস্ত্য ঋষি মরুতের বর্ণনা করিয়াছেন—

যুবকগণ যেমন সাধারণ্যার সহিত মিলিত হয় সেইরূপ মরুত্‌গণ শোভন অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বিদ্যুতের নিকট যাইয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া জল বর্ষণ করিতেছে। এই সময়ে ভয়ঙ্কর হইলেও পৃথিবীকে তিরস্কার করিতেছে না—অতিবৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর অনিষ্ট করিতেছে না। বরং লোকের সহিত তাহার বন্ধুতার জন্য (লোকবৃদ্ধির জন্য) তাহাকে (পৃথিবীকে) বর্দ্ধিত করিতেছে।

জারের প্রশংসা

নারীরা জারের প্রশংসা করিত—

"অভিগাবো অনূষত যোষা জার মিব প্রিয়ম্‌। অগন্নাজিং যথা হিতম্‌।"

৯ ম ২ অনু ৩২ সূ ৫ ঋক্

নারীরা যেমন প্রিয় উপপতির প্রশংসা করে, সেইরূপ হে সোম্‌! আমাদের স্তব তোমার প্রশংসা করিতেছে। এবং বীর যেমন লাভকর যুদ্ধে গমন করে, সেইরূপ সোম পাত্রে যাইতেছে। অথবা বন্ধু যেমন নিজ মঙ্গলের জন্য বন্ধুর নিকট যায়, সেইরূপ সোম হোমের জন্য পাত্রে যাইতেছে।

কানীন

ঋষি সমাজে কানীনের আদর ছিল—

"অধ স্যা যোষণা মহী প্রতীচী বশ মশ্ব্যম্‌, অধি রুক্মা বিনীয়তে॥

৮ ম ৬ অনু ৪৬ সূ ৩৩ ঋক্

বশ নামক ঋষি কানীন পৃথুশ্রবার কন্যাকে পত্নীরূপে পাইয়া আনন্দে বায়ুকে বলিতেছেন—হে বায়ো! তোমার অনুগ্রহে এক্ষণে সেই মহানাম্নী রাজকন্যা আমার অনুকূল। ইনি সুবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পত্নীরূপে আমার কাছে আসিতেছেন।

পতিব্রতার আদর

পতিব্রতার আদর ছিল। তাঁহারা দৈবাদি কর্ম্মে সহায় হইতেন—

"দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা।
পুরঃ-সদঃ শর্ম্ম-সদো ন বীরা অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী॥

১ ম ১২ অনু ৭৩ সূ ৩ ঋক্

দীপ্তিমান অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় জগতের ধারক (সূর্য্য যেমন বৃষ্টি দিয়া জগৎকে ধারণ করেন, অগ্নিও সেইরূপ যজ্ঞ দ্বারা সমস্ত জগৎকে ধারণ করিতেছেন)।

তিনটী উপমা। অনুকূল মিত্র লইয়া রাজা যেমন সুখে বাস করেন, পিতা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পুত্র যেমন পিতৃগৃহে অবস্থান করে। তৃতীয় উপমা—পতি-রক্ষিতা সুন্দরী পতিব্রতা নারী যেমন তাহার পাতিব্রত্যের জন্য পরিশুদ্ধ হইয়া সমস্ত দৈব কর্ম্মে যোগ্যা হয়, সেইরূপ অগ্নি সকলের প্রিয় হইয়া যজ্ঞগৃহে অবস্থান করিতেছেন।

যুবতী কন্যা

যুবতী কন্যা পিত্রালয়ে চরিত্র ভাল রাখিতে পারিত না—পুরুষ ডাকিত।

"অভি স্ব যোষণো দশ জারং ন কন্যা নূষত। মৃজ্যসে সোম সাতয়ে॥

৯ ম ২ অনু ৫৭ সূ ৩ ঋক্

পিত্রালয়ে স্থিতা যুবতী কন্যা যেমন জার ডাকে, সেইরূপ হে সোম! তোমাকে দশ অঙ্গুলি ডাকিতেছে। এবং আমাদের ধনলাভের জন্য ইন্দ্রকে পান করাইতে শোধন করিতেছে।

যুবতী বিবাহ

যুবকেরা পত্নী খুঁজিয়া বিবাহ করিত—

"জনিষ্ট যোষা পত্যৎ কনীনকো বিবারুহন্ বীরুধো দংসনা অনু।

আস্মৈ রীয়ন্তে নিবনেব সিন্ধবো স্মা অহ্নে ভবতি তৎপতিত্বনম্॥

১০ ম ৩ অনু ৪০ সূ ৯ ঋক্

কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা অশ্বিনীকুমারকে বলিতেছেন—হে অশ্বিন্! তোমাদের কৃপায় ঘোষা আজ ভাগ্যবতী। আমার কাছে বর আসিতেছে। তোমাদের অনুগ্রহে শস্য হইক।

নিম্নগামী নদীর ন্যায় শস্য আমার বরের হউক। তাহাকে কেহ যেন হত্যা করিতে না পারে—তিনি অতি বলবান্ হউন। অর্থাৎ ঘোষা অশ্বিনীকুমারের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—আমি যুবতী হইয়াছি, আমাকে বিবাহ করিতে যুবক আসিতেছে। আমার পতি যেন যুবা, ধনবান্ ও বীর হন।

বহু পত্নী

ঋষিরা বহু বিবাহ করিতেন—

"চকার তা কৃণবন্নূন মন্যা যানি ব্রুবন্তি বেধসঃ সুতেষু।

জনীরিব পতি রেকঃ সমানো নি মামৃজে পুর ইন্দ্রঃ সু সর্ব্বাঃ।"

৭ম ২ অনু ২৬ সূ ৩ ঋক্

স্তোতৃগণ সোম পরিষ্কারের সময় ইন্দ্রের যে সমস্ত কার্য্যের বর্ণনা করেন, তাহা ইন্দ্র পূর্ব্বকালে করিয়াছেন। এখনও ইন্দ্র অন্য কর্ম্ম করিতে পারেন। এক স্বামী যেমন বহু স্ত্রীকে সমান চক্ষে দেখে, সমান ব্যবহারে তুষ্ট করে, সেইরূপ ইন্দ্র একলাই শত্রুপুরীগুলিকে ভূমিসাৎ—সমান করিয়াছেন।

স্ত্রী গৃহের অলঙ্কার

ঋষিরা স্ত্রীকে গৃহের অলঙ্কার মনে করিতেন—

"দুরোক-শোচিঃ ক্রতুর্ন নিত্যো জায়েব যোনাবরং বিশ্বস্মৈ। (৫)

চিত্রো যদভ্রাট্ শ্বেতো ন বিক্ষুরথো ন রুক্মী ত্বেষঃ সমৎসু॥ (৬)

১ম ১২অনু ৬৬সূ ৫, ৬ঋক্

এই অগ্নি, অতি তেজস্বী কর্ম্মকর্ত্তার ন্যায় অপ্রমত্ত অর্থাৎ অতি তেজস্বী কর্ম্মকর্ত্তা যেমন কর্ম্ম বিঘ্ন ভয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, সেইরূপ এই অগ্নি রাক্ষস বিনাশ করিতে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকেন। স্ত্রীর ন্যায় গৃহের শোভাকর, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, এবং সুবর্ণরথের ন্যায় প্রজার মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন। এই অগ্নি যুদ্ধে শোভা পান॥

বিধবারা পিতৃগৃহে আশ্রয় লইত

বিধবারা পিতৃগৃহে আশ্রয় লইত।

"অভ্রাতরো যোষণো ব্যন্তঃ পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ।

পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যা ইদং পদং জনয়তা গভীরম্।"

৪ম ১ অনু ৫ সূ ৫ ঋক্

বিধবা যেমন স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গমন করে, সেইরূপ যাহারা যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অমার্গে গমন করে, এবং পতিদ্বেষিণী নারীর ন্যায় যাহারা পাপাচারী হয়, তাহারা পাপী হইয়া মানসিক ও বাচিক অসত্যপরায়ণ হয়, এবং গভীর নরকের পথ পরিষ্কার করে।

ঋষির ক্ষত্রিয়া বিবাহ

জাতিভেদ না থাকায় সৌভরি ঋষি ক্ষত্রিয়রাজ ত্রসদস্যুর ৫০টী কন্যা বিবাহ করেন—

"অদান্ মে পৌরুকুৎস্যঃ পঞ্চাশতং ত্রসদস্যু র্বধূনাম্।

মংহিষ্ঠো অর্যঃ সৎপতিঃ॥"

৮ম ৩অনু ১৯সূ ৩৬ঋক্

ঋষি সৌভরি ক্ষত্রিয়রাজ ত্রসদস্যুর ৫০টী কন্যা বিবাহ করিয়া তাঁহা (রাজার) প্রশংসা করিতেছেন—উপগন্তব্য, দাতা, সতের পালক, পু কুৎসপুত্র ত্রসদস্যু আমাকে পঞ্চাশটী কন্যা বধূরূপে দান করিয়াছেন।

বধূ দক্ষিণা

ভরদ্বাজ ঋষি, সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী দত্ত বধূ ও ধন অগ্নির নিকট পরি দিতেছেন—

"দ্বয়াঁ অগ্নে রথিনো বিংশতিং গা বধূমতো মঘবা মহ্যং সম্রাট্।

অভ্যাবর্ত্তী চায়মানো দদাতি দূণাশেয়ং দক্ষিণা পার্থবানাম্॥"

৬ম ৩অনু ২৭সূ ৮ঋক্

হে অগ্নে! ধনবান্, চয়মানের পুত্র, রাজসূয় যজ্ঞকারী, র অভ্যাবর্ত্তী আমাকে রথ, স্ত্রী এবং কুড়িটা গো-মিথুন দান করিয়াছে পৃথুবংশজাত অভ্যাবর্ত্তীর এই দক্ষিণা কেহ লোপ করিতে পারিবে ন এই স্ত্রী দক্ষিণা দাসীরূপে নয়, বধূরূপে।

ঋষির রাজকন্যা বিবাহ

দাল্‌ভ রথবীতিনামক ক্ষত্রিয় রাজা ঋষি শ্যাবাশ্বকে কন্যা দান করেন—

৫ম ৫অনু ৫সূ ১৯ঋক্

ইহার ইতিহাস—শ্যাবাশ্বের পিতা দাল্‌ভ রাজার যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে প্রার্থনা করেন। দাল্‌ভপত্নী ঋষি ভিন্ন অন্যকে কন্যা দান করিতে স্বীকৃত নন। ইহা জানিয়া শ্যাবাশ্ব তপস্যা করেন এবং ঋষি হন। তখন তাঁহাকে দাল্‌ভ সেই কন্যা দান করেন ॥

বধূকে আশীর্ব্বাদ মুখদেখানি

নববধূকে বাড়ী আনিয়া গুরুজনেরা আশীর্ব্বাদ করিতেন। নব পাড়া-প্রতিবাসীরা দেখিতে আসিত, মুখদেখানি দিত।

"সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্বা যথাস্তং বিপরেতন ॥"

১০ম ৭অনু ৮৫সূ ৩৩ঋক্

ইহা গৃহস্বামিনী সমবেত জনমণ্ডলীকে—যাহারা বধূ দেখিতে আসিয়াছে, বলিতেছেন—এই বধূটী সুলক্ষণা। আপনারা সমবেত হইয়া ইহাকে দর্শন করুন। ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মুখদেখানি দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ঋষিরা নববধূ বাড়ী আনিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। পাড়াপড়শিরাও আসিয়া বধূর মুখদেখানি দিত ॥

নববধূকে উপদেশ

বধূকে বাড়ী আনিয়া উপদেশ দিতেন—

"অঘোর চক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবাপশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।
বীরসূর্দ্দেবকামা স্যোনা শন্নোভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ॥"

১০ম ৭অনু ৮৫সূ ৪৪ঋক্

ইহা শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ—হে বধূ! ক্রোধে চক্ষু লাল করিও না। স্বামীকে নাশ করিও না—এয়োস্ত্রী থাক। ভৃত্য ও পশুগণের মঙ্গলকর হও। উন্নতমনা ও তেজস্বিনী হও। বীর পুত্র প্রসব কর। দেবভক্ত ও সুখকর হও।

বধূকে আশীর্ব্বাদ

বধূর উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন—

"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু ॥"

১০ম ৭অনু ৮৫সূ ৪৬ঋক্

হে বধূ! তুমি শ্বশুর শাশুড়ী, ননদ, ও দেবরের উপর আধিপত্য কর। অর্থাৎ ইহাদের ভার তোমার উপর।

বধূর মঙ্গল প্রার্থনা

দেবতার নিকট বধূর মঙ্গল প্রার্থনা—

"আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি রাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা।
অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোক মাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥"

১০ম ৭অনু ৮৫সূ ৪৩ঋক্

প্রজাপতি দেব আমাদের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করুন। অর্য্যমা দেব আমাদিগকে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত রাখুন। হে বধূ! তুমি মঙ্গলযুক্ত হইয়া স্বামীর নিকট গমন কর—স্বামীর মঙ্গলকর হও। আমাদের ভৃত্যাদি ও পশুগণের মঙ্গলকর হও। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি তুমি বিশেষ যত্নপর হইবে, তাহারা যেন তোমাকে পাইয়া সুখী হয় ॥

মঙ্গল প্রার্থনা

শাশুড়ী সূর্য্যা দেবগণের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন—

"সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।"

১০ম ৭ অনু ৮৫ সূ ৪৭ ঋক্

সমস্ত দেবতা আমাদের দুজনের হৃদয়কে দুঃখ-ক্লেশ-শূন্য করিয়া লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মে অভিজ্ঞ করুন, অর্থাৎ আমরা যেন অক্লেশে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম সুন্দর রূপে নিবাহ করিতে পারি। সেইরূপ জলদেবতাও করুন। বায়ু দেবতা ও বিধাতা আমাদের দুজনের বুদ্ধিকে অনুকূল করুন। ফলদাত্রী সরস্বতী দেবী আমাদের হৃদয়কে অনুকূল করুন।

আচার—বধূর ময়লা কাপড়

বধূর ময়লা কাপড় পরিয়া স্বামীর কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

"পরা দেহি শামুল্যং ব্রহ্মভ্যো বিভজা বসু।
কৃত্যৈষা পদ্বতী ভূত্বা জায়া বিশতে পতিং।"

১০ম ৭ অনু ৮৫ সূ ২৯ ঋক্

শাশুড়ী সূর্য্যা তাহার নব বধূকে বলিতেছেন—হে বধূ! ময়লা কাপড় পরিত্যাগ কর। ঐ কাপড় অমঙ্গলকর। উহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রাহ্মণকে ধন দাও। বধূর কাপড় ত্যাগের কারণ কি? এই বধূর ময়লা কাপড় পাদচারী রাক্ষসী, স্ত্রীরূপে পতিতে প্রবেশ করে অর্থাৎ ঐ কাপড়, পতি স্পর্শ করিলে পতির অমঙ্গল হইবে, সুতরাং উহাকে ত্যাগ কর।

স্ত্রী-ভোগে রোগ

ঋষিরা স্ত্রী-ভোগে রোগ হয় মনে করিতেন, সেইজন্য নূতন বধূ আনিয়া ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

"যে বধ্ব শ্চন্দ্রং বহস্তু যক্ষ্মা যন্তি জনা দনু।
পুন স্তান যজ্ঞিয়া দেবা নয়ন্তু যত আগতাঃ।"

১০ম ৭ অনু ৮৫ সূ ৩১ ঋক্

বধূরা সুন্দর রূপ ধারণ করুক—আনন্দকর হউক। ব্যাধি যম হইতে আসিয়া থাকে। ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্যাধিকে যমের নিকট ফিরাইয়া দিন তাহারা—ব্যাধিগুলি যে স্থান হইতে আসিয়াছিল সেই স্থানে চলিয়া যাউক

ঘোমটা ছিল না

নারীরা দুই অঙ্গ আবৃত করিত—

"অধঃ পশ্যস্ব মোপরি সংতরাং পাদকৌ হর।
মা তে কশপ্লকৌ দৃশনৎ স্ত্রী হি ব্রহ্মা বভূবিথ।"

৮ম ৫ অনু ৩৩ সূ ১৯ ঋক্

ইন্দ্র স্ত্রীরূপী প্রায়োগিকে উপদেশ দিতেছেন—হে প্রায়োগে! তুমি স্ত্রীলোক, নিম্ন দিকে দেখ—মাথা নীচু করিয়া চল। মস্তক উঁচু করিয়া চলিও না। পদদ্বয় জড়াইয়া হাঁট—পা ফাঁক্ করিয়া পুরুষের ন্যায় হাঁটিও না। তোমার দুই অঙ্গ পুরুষে যেন না দেখে—তাহা বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখ। তুমি ব্রাহ্মণ নারী, (ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রী) সর্ব্বদা লজ্জাশীলা হইবে!

নারীর মন হাল্‌কা

স্ত্রীলোকের বুদ্ধি লঘু। তাহাদের মন অদম্য—

"ইন্দ্র শ্চিদ্‌ঘা তদব্রবীৎ স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ।

উতো অহ ক্রতুং রঘুম্।" ৮ম ৫ অনু ৩৩ সূ ১৭ ঋক্।

প্রায়োগি আসঙ্গ নামক রাজা—গৌরীর শাপে স্ত্রীলোক হন। সেই সময় ইন্দ্র স্বয়ং যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই—স্ত্রীলোকের মন পুরুষে দমন করিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি লঘু—হাল্কা।

সহমরণ ছিল না

সঙ্কুসুক্ ঋষি একটা নারীকে মৃত স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া আসিতে বলিতেছেন—

"উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকং গতাসু মেত মুপ শেষ এহি।

হস্তগ্রাভস্য দিধিষো স্তবেদং পত্যুর্জনিত্ব মভি সং বভূথ।"

১০ম ২ অনু ১৮ সূ ৮ ঋক্

হে মৃতের পত্নি! বাড়ী যাইবার জন্য উঠ। তুমি মৃতের নিকট শুইয়া আছ। গর্ভকারী স্বামীর প্রাণ তোমাতে সঞ্চারিত হওয়ায় তুমি প্রকৃত জায়া হইয়াছ। অর্থাৎ তোমার স্বামীর জীব তোমাতে রহিয়াছে তবে তাহার জন্য দুঃখ কি?

চারি জাতি

বিরাট্ পুরুষ হইতে চারি জাতির উৎপত্তি—

"ব্রাহ্মণো স্য মুখ মাসী দ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।

উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।"

১০ম ৭ অনু ৯০ সূ ১২ ঋক্

এই বিরাট্ পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় বৈশ্য। এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্তোত্র ভিন্ন অন্যত্র বৈশ্য শূদ্রের নাম দেখা যায় না।

স্বর্ণলালী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

বীরভূমের সদর সিউড়ি হইতে কম-বেশী দুই ক্রোশ দূরে মল্লিকপুর গ্রাম। বীরভূমে মল্লিকপুরের সে কালে খুব প্রসিদ্ধি ছিল। সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাসভূমি বলিয়া আজও এই গ্রামের নাম আছে! মহিলা কবি স্বর্ণলালী দেবী এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। মল্লিকপুরের সর্ব্বানন্দ সরস্বতী নিকটবর্ত্তী কচুজোড় গ্রামের জমিদার রাজা রুদ্রচরণ রায়ের সভাসদ ছিলেন। শুনিয়াছি সরস্বতী মহাশয়ের সঙ্গে স্বর্ণলালীর ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এই সম্বন্ধ সহোদর সম্পর্কিত কি না নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। রাজা রুদ্রচরণের গুরুদেব সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা 'যাদবেন্দ্র' বা 'যাদবিন্দ' স্বর্ণলালীর পাণিগ্রহণ করেন। উপযুক্ত পতির সাহচর্য্যে এই কবিত্বশালিনী নারী আপনার শক্তির অনুশীলনে যথাযথ সহায়তা পাইয়াছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়।

স্বর্ণলালী, মঞ্জুলালী প্রভৃতি নাম বীরভূমে তথা পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থানে আজিও প্রচলিত আছে। ব্রজভাষায় বালককে যেমন আদর করিয়া লাল বা লালা বলে, বালিকাকে তেমনি লালী বলে। দুলালীর সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ আছে কি না, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা বলিতে পারেন।

রাজা রুদ্রচরণ সামান্য জমিদার ছিলেন, স্থানীয় লোকে তাঁহাকে রাজা বলিত। তবে সেকালের প্রথা অনুসারে ইঁহার আবাসবাটী পরিখা-প্রাকার পরিবেষ্টিত ছিল, নিজের সৈন্য ও সেনাপতি ছিল। লোকে ইঁহাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া মনে করিত। রাজার কুলদেবী কচ্চিকার পাষাণ-বেদিকা কচুজোড়ের গড়ের (রাজা বেড়ার) ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আজিও বিদ্যমান আছে। দেবীর কোনো মূর্ত্তি নাই। যাদবিন্দ বা যাদবেন্দ্র ইঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। রাজা পরে এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজা বালগোপাল মন্ত্রের উপাসক এবং গোপাল বিগ্রহের সেবক ছিলেন। সন্ন্যাসী ইঁহাকে ধাতুময়ী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি দান করেন। রাজা মহা সমারোহে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তদবধি নিজেই তাহার সেবা-পূজায় নিযুক্ত হন। রাজার প্রতিষ্ঠিতা এই দেবী এবং তাঁহার তান্ত্রিক সাধনার সিদ্ধিস্থান আজিও লোকের নিকট পূজা পাইতেছে। প্রজা সাধারণের কৃষি-কার্য্যের সুবিধার জন্য রাজা আমাজোলার বাঁধ নামে একটী সুবৃহৎ জলাধার প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই বাঁধের সঙ্গে গড়ের জলাশয়গুলির যোগ ছিল, এবং মধ্যবর্ত্তী নালার সাহায্যে পার্শ্ববর্ত্তী শস্যক্ষেত্র-সমূহে জল সেচনের যথেষ্ট সুব্যবস্থা ছিল। প্রবাদ আছে, এই বাঁধ প্রতিষ্ঠার উৎসবে পুষ্কর-মেঘ ব্রাহ্মণ বেশে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই প্রবাদ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, বাঁধের জলে প্রজা সাধারণের কৃষি-কার্য্যের কিরূপ সুবিধা হইত। পুষ্কর বর দিয়াছিলেন, আমার অধিকারেও রাজার প্রজাগণকে অনাবৃষ্টি অজন্মার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। অর্থাৎ আমাজোলার জলের প্রাচুর্য্যে "পুষ্করে দুষ্করো বারি" প্রবচনও অর্থহীন প্রতিপন্ন হইবে। এই বাঁধ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর কৃপায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া মজিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে। রেলপথের অনিষ্ট হইবে বলিয়া রেল কোম্পানী সর্ব্বদাই বাঁধ কাটিয়া রাখেন, সুতরাং বাঁধের জলে গ্রামের পুষ্করিণী ভরিয়া লইবার বা ক্ষেতে জল সেচিবার যে সুবিধা ছিল তাহাও আর নাই। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে আসিয়া বণিকের দল বীরভূমের অনেক গ্রামেরই এই রূপ উপকার করিয়াছেন। (অণ্ডাল সাঁইথিয়া) "শাখা" রেলপথেই এত, না জানি "কাণ্ড" রেলপথে কি কাণ্ড কারখানাই না হইয়াছে!

বর্গীর হাঙ্গামায় রাজা হত হন,—মারাঠা ভাস্কর পণ্ডিত রাজাকে হত্যা করেন। এ সম্বন্ধে একটা ছড়া আছে—

যাদবিন্দ সর্ব্বানন্দ। মল্লশরণ রামভদ্র॥
আর কচ্চিকাচরণ। পাঁচে রুদ্রচরণ॥
বর্গীরে হলেন সদয়া, রুদ্রে হলেন বৈমুখী।
ভাস্কর কল্লে ব্রহ্মহত্যা, কাঁদলো গাছপালা পশুপক্ষী॥

বাঙ্গালা সন ১১৪৯ সালে বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। বাঙ্গালার মসনদে তখন প্রবল আলিবর্দ্দী নবাবী করিতেছিলেন। তিনি বর্গীদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। বর্গীর দল বিষ্ণুপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া বীরভূম বর্দ্ধমানে ছড়াইয়া পড়ে। এতদঞ্চলের বহু জমিদার সম্মুখ যুদ্ধে বর্গীদের বাধা দিয়াছিলেন। বীরভূমের কয়েকজন জমিদারের এইরূপ বাধা প্রদানের ফলেই রাজধানী রাজনগর আক্রান্ত হয় নাই। ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে রুদ্রচরণের যেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থান আজিও সংগ্রামপুর নামে পরিচিত। অনুমান হয় ১১৫০ সালে রাজা রুদ্রচরণের মৃত্যু হইয়াছিল। একখানি সনন্দ হইতে রাজা রুদ্রচরণের সময় আন্দাজ করিতে পারা যায়। সনন্দখানি রুদ্রচরণের পৌত্র প্রেমনারায়ণ রায়ের দাতব্য পত্র; নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

দাতব্য পত্র

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য ওলদে ৺দেবীচরণ ভট্টাচার্য্য, ইবনে ৺যাদবিন্দ ভট্টাচার্য্য শ্রীচরণ কমলেষু—

লিখিতং শ্রীপ্রেমনারায়ণ রায়, ওলদে ৺দর্পনারায়ণ রায়, ইবনে রুদ্রচরণ রায় সাং ঈশানপুর

কস্য দাতব্য পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগণে জন্নুজাল সামাল মৌজে আড়াডাঙ্গালী ও লখড়িহিতে আমার পৌত্রিক জলদান বিত্তি আছে, নবশাখ লোক সকলে পির্তির মাতৃরি ও অন্যান্য কৃয়াদিতে ৺দানাদি করে তন্মধ্যে জলদান পাওনা আমার বিত্তি আছে, বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি এবং মৌজে আড়াডাঙ্গালীতে গ্রামের উত্তর শ্রীশ্রী৺ তলার ঈশান কোনে লাগাও কড়চাঙ্গ নামক এক পুষ্করিণী আন্দাজ ৪ বিঘা ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব্ব ঈশান লাগাও নয়াপুষ্করিণী নামক এক পুষ্করিণী ৩ বিঘা আমার পৌত্রিক স্বখাদ আছে এবং শ্রী৺ মন্দিরও আমার পৌত্রিক নিজ ভদ্রাসন বাউস্ত বাটী আন্দাজ ৭ বিঘা যাহাতে আমার পুর্ব্বপুরুষের বাস ছিল এবং শ্রী৺ মন্দির প্রস্তুত আছে আমি বহুকাল হইতে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি এক্ষণে আপনি আমার ইষ্ট দেবতা এ প্রযুক্ত আমি উক্ত বিষয় সকলের আপন স্বসত্তা ত্যাগ করিয়া মহাশয়কে দান করিলাম আপনি উক্ত বস্তু সকলের দান বিক্রয়ের সত্তাধিকারি হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তসরুপাত করিবেন ইহাতে কাল কালা আমার কিম্বা আমার ওয়ারিশানের কোনো দাবী দাওয়া নাই যদি করি কিম্বা করে সে বাতিল ও মিথ্যা এতদর্থে আপন সেৎসা পূর্ব্বক ভুস বহাল তবিয়তে সুস্থ শরীরে দান করিয়া এই দানপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১২৫ সাল তারিখ ২২ ফাল্গুন

বর্গীর হাঙ্গামায় রুদ্রচরণ হত হইলে পুত্র দর্পনারায়ণ ঈশানপুরে পলাইয়া যান। তাঁহারই পুত্র প্রেমনারায়ণ কুলগুরু যাদবিন্দের পৌত্র জগদীশ্বরকে দানপত্র লিখিয়া দিতেছেন। রুদ্রচরণ ব্রাহ্মণ ভূস্বামী বলিয়া এতদঞ্চলের শূদ্র প্রজাগণের ক্রিয়াকাণ্ডে প্রদত্ত জলদানের অধিকারী ছিলেন। দূর হইতে এ সমস্ত আদায় করার অসুবিধার জন্যই হউক অথবা শ্রদ্ধাবশতঃই হউক প্রেমনারায়ণ সে অধিকার গুরুকে দান করেন। এই দানপত্রের হিসাবে রুদ্রচরণ এবং তাঁহার গুরু যাদবিন্দকে সন ১১৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে পাওয়া যাইতেছে।

রুদ্রচরণের পরলোক গমনের অল্প দিন পরেই যাদবিন্দও পরলোকগত হন। বর্গীর হাঙ্গামায় তাঁহারও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছিল। যাদবিন্দের পুত্র দেবীচরণ লক্ষ্মী-জনার্দ্দন শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া সন ১১৬৬ সালে রাজনগর মুসলমান রাজদরবারে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়- বর্গীর হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, অথবা রাজা রুদ্রচরণের মৃত্যুতে আশ্রয়হীন হইয়া ইঁহারা কিরূপ অভাবে পড়িয়াছিলেন। এই সনন্দ হইতে আর একটী বিষয় জানা যায় যে, সন ১১৬৬ সালের পূর্ব্বে যাদবিন্দ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সনন্দখানিরও প্রতিলিপি দিলাম।

হুকুম শ্রীযুত রাজাসাহেব বাহাদুর লক্ষ্মীজনার্দ্দনের—

ইঃ গোবিন্দরাম শিকদার পরগণে জন্নুজাল সুচরিতেষু আগে সাং হরিষপুরের শ্রীদেবীচরণ ভট্টাচার্য্য জাহির করিলেক জে ৺ঠাকুরের সেবা প্রকাশ করিয়াছি সেবা পূজা চলেনা মৌজে হরিষপুরের ডাঙ্গালে ধর্ম্মতালা বঞ্জর পতিত ৭ বিঘা ও সংগ্রামপুরের বঙ্কিবাদের পূর্ব্ব জঙ্গল পতিত ১২ বিঘা হামগী ১৯ বিঘা দেবত্তর হুকুম হয় তবে তৈয়ার ও আবাদ করিয়া সেবা পূজার খরচ করি অতএব সেবা পূজার কারণ মৌজে হরিষপুরের ডাঙ্গালে ৺ধর্ম্মতালার বঞ্জর পতিত ৭ বিঘা ও মৌজে সংরামপুরের বঙ্কিবাদের পূর্ব্ব জঙ্গল পতিত ১২ বিঘা হামগী ১৯ উনিশ বিঘা দেবত্তর হুকুম করিয়া নিষদা করিয়া দিই জেন ভট্টাচার্য্য মজকুর জমি তৈয়ার ও আবাদ করিয়া সেবা পূজার খরচ করিতে থাকে ইতি সন ১১৬৬ সাল তাং ১৪ বৈশাখ।

হরিষপুর কচুজোড়ের নিকটবর্ত্তী একটী পল্লী। এই পল্লী এখন বসতিশূন্য। যাদবিন্দের বংশধরগণ সম্প্রতি সংগ্রামপুরে বাস করিতেছেন। এই বংশে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমান ভোলাপদ কাব্যতীর্থ বর্ত্তমান আছেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া অধ্যাপনায় ব্রতী হইয়াছেন।

যাদবিন্দ ধর্ম্মে বৈষ্ণব ছিলেন কি না ঠিক জানা যায় না। তাঁহার বংশধরগণ তো নিজেদের শাক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যাদবিন্দ যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন তিনি প্রকৃত কবি ছিলেন, তাঁহার পদগুলি বাস্তবিকই বড় সুন্দর। যাদবিন্দের গোষ্ঠগানের প্রসিদ্ধি বহুজনবিদিত। তাঁহার মধুররসাত্মক পদগুলিও চমৎকার।

যাদবিন্দের একটী গোষ্ঠের পদ—

গহন-গমন কালে ভাসি নয়নের জলে
হরি মুখ করি নিরীক্ষণ

বলরামের করে ধরি সমর্পণ করি হরি
পুন রাণী কহেন বচন
আমার শপতি লাগে না যাইহ কারু আগে
তুমি মোর প্রাণ নীলমণি
নিকটে রাখিহ ধেনু বাজায়ে মোহন বেণু
ঘরে বসি যেন রব শুনি
বলাই সভার আগে আর শিশু পাশভাগে
শ্রীদাম সুদাম যাবে পাছে
তুমি সভার মাঝে যাবে কারু আগে না ধাইবে
বনে বড় রিপু ভয় আছে
ধীরে পদ বাড়াইও পথ পানে চেয়ে যেও
তৃণাঙ্কুর অতিশয় পথে
কার বোলে বড় ধেনু ফিরাতে না যেও কানু
হাত তুলি দেহ মায়ের মাথে
রোদ্দুর লাগিলে গায় বসিও তরুর ছায়
বসন ভিজায়ে দিও গায়
গোবিন্দ সঙ্গে লেহ বাধা পথে হাতে দেহ
সময় বুঝে দিবে রাঙ্গা পায়

গোবিন্দ বহু পদে এই ভাবে নিজের দাস্যাভিমান প্রকাশ করিয়াছেন। কচিৎ কোনো পদে সৌখ্যভাবের আভাস পাওয়া যায়। স্বর্ণলালীর তিনটী পদের প্রত্যেকটীতেই কিন্তু সখীভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে ; স্বর্ণলালী নিজেকে বৃন্দারূপে পরিচিতা করিয়াছেন। স্বর্ণলালীর তিনটী পদই তুলিয়া দিলাম। (১ম) রূপানুরাগ—

অসকালে গেলাম যমুনার কুলে
বঁধুরে হেরিলাম নীপ তরুমূলে
দলিতাঞ্জন চিকণ রূপ
আমরি মরি রসের কূপ
কেনে সে রূপে সখি দিলাম আঁখি
নয়ন মন মোর হইল পাখী
উড়িয়া বসিলাম সে রস কূপে
আঁখি প্রাণ মোর হারাইল রূপে
নবীন মেঘেতে বিদ্যুৎ ছটা
হস্তে পদে দেখি চাঁদের ঘটা
মুখানি দেখিলাম পুণিমের চাদ
স্বর্ণলালীর মন নয়ন ফাঁদ
ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়ে আছে
পাঁজর কাটিয়া হৃদয়ে নাচে
মন মুরছি মরিয়াছিল
কাখের কলসী খসিয়া গেল
অস্থির ঘরেতে আসিতে নারি
আঁধুলী হইয়া পথেতে ফিরি
কেহ সঙ্গে নাই মাত্র একাকি
অসকাল হইল করিব কি
অনুসারে যদি আইলাম ঘরে
কলসী না দেখি ভৎর্সন করে
গেহ হইল মোর দুর্গম বন
কি করি সখি ঘরে না রহে মন
দুগম বনেতে সব জন্তু রয়
গেহবনে মোর গুরুজনার ভয়
সে কালা বিনে মোর প্রাণ না রহে
ফুকারি কহিতে অন্তরে ভয়ে
স্বর্ণলালী কহে শোনহে ধনি
কানুর প্রেমে তুমি হও শিরোমণি
চল অভিসারে রাজারি বালা
যতনে আনিয়া মিলাইব কালা

এই একটী মাত্র কবিতা হইতেই স্বর্ণলালীর কবিত্ব অনুভূত হইতে পারে। কবিতাটীর প্রকাশ-ভঙ্গীতে এমন একটী চির-পরিচিত সুর কাণে বাজে যাহা বাঙ্গালারই নিজস্ব। ইহার ছন্দে এবং কথায় রমণী-হৃদয়ের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। কবিতায় বেদনা ব্যাকুলতা এবং সহানুভূতি যেমন প্রগাঢ় তেমনি স্বাভাবিক। কবিতার কোনো কোনো ছত্রে সেকালের গ্রাম্য গাথার অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনার কথা মনে পড়ে। মনে হয়, কবি আমাদের সম্মুখে বসিয়া ভাব-বিহ্বল প্রাণে, লয়-বিলম্বিত কণ্ঠে কবিতাটীর আবৃত্তি করিতেছেন। যেন সেকালের একটী স্বপ্নচিত্র! সখি কেন সে রূপে আঁখি দিলাম, মনোপাখী নয়নময় হইয়া উড়িয়া গিয়া সে রূপের কূপে বসিল। আঁখি প্রাণ দুই-ই হারাইলাম। সে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মনে হইল—আমার পাঁজর কাটিয়া হৃদয়ে পশিয়া নাচিতেছে। তাহার দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা আমার প্রাণে এমনই তরঙ্গ তুলিয়াছে। মন মূর্চ্ছিত হৈল, কাখের কলসী খসিয়া পড়িল। নয়ন ফিরিল না, পথ হারাইলাম, অন্ধের মত পথে পথে ঘুরিতে লাগিলাম। কুলবধুর স্বভাব অনুসারে ঘরে ফিরিলাম বটে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা বন আমার পক্ষে ভাল ছিল। কালা বিনে যে আমি প্রাণে বাঁচিব না, এ কথা ফুকারি বলিবারও যেখানে উপায় নাই, সে গেহ দুর্গম বন নয় তো আর কি? স্বর্ণলালী বলিতেছেন—রাজবালা অভিসারে চল কালাকে আনিয়া মিলাইয়া দিব।

ইহার পরের পদটী অভিসারের—

এখানে সেখানে একই দেখি
যুগল পীরিতির এই সে সাখী
উঠিয়া চলহ অভিসারে যাই
শুনি ধনী উৎকণ্ঠায় ধাই
দুই সখী দুই পাশেতে রয়
প্রেম অনুরাগে চলিয়া যায়

কতদূরে যেয়ে পাইল বৃন্দাবন
নয়ানে দেখিল কৃষ্ণ প্রাণধন
মন্দির দ্বারেতে দাঁড়াইল কিশোরী
শ্যামচাঁদ উঠিয়া আইল আগুসারি
আহা মরি মরি প্যারী আইল
বিষময় তনু অমৃত হইল
তবে শ্যাম নিলেন করেতে ধরি
ধরি বসাইলা পালঙ্কোপরি
নিজবাসে দুটী চরণ ঝাড়ে
কত আলিঙ্গন চুম্বন করে
মনের বিরহ গেল সব দূরে
হাসিয়া বসিলা বঁধুর কোড়ে
বঁধুর অঙ্গে হেলান দিল
দোঁহ তনু দোঁহ একই হইল
হাস্য পরিহাস কতেক রঙ্গ
অনঙ্গ মাতিল রসের তরঙ্গ
দুজনে ঢালিল পালঙ্কে গা
স্বর্ণলালী ছন্দে করিছে বা
পথের শ্রম মনেতে জানি
উরুপরে ধরে চরণ দুখানি
দুজনে দেখিয়া আলসে ভোর
চরণ রাখিয়া উঠিলা সত্বর
সত্বরে আসিয়া দাঁড়াইল পাশে
দুজনা বিলাস সুখেরি আসে

তৃতীয় পদটী যুগল-মিলনের বর্ণনা। এই পদ দুইটীতে যেরূপ কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও কবিত্ব বর্জ্জিত নহে।

দেখ দেখ সখি নিকুঞ্জ কুটীরে
বিনোদ বিনোদী রঙ্গ
নবীন কিশোরী নবীন প্রেম
নবীন মদন সঙ্গ
আধশিরে শোভে বেণী ভুজঙ্গিনী
খেলিছে কতেক রঙ্গে
আধ শিরেতে ময়ূর নৃত্য করে
ময়ূরিণী করি সঙ্গে
আধ বদনে কমল প্রকাশ
আধ বদন চন্দ
ভ্রমরা চকোর আসিয়া মিলল
দোঁহে করে মহাদ্বন্দ
ভ্রমরা কহয়ে চাঁদের উদয়
চকোর কহিছে চন্দ
যাহার যেমন ভাবের উদয়
সে দেখে তেমন রঙ্গ
আধ গলায় মোতিম হার
দীপ্ত করিছে অঙ্গ
আধ গলাতে বিনোদ মালা
দুলিছে কতেক রঙ্গে
এক করেতে নীলমণি চুরি
এক করে শোভে বালা
দোঁহ অঙ্গ আধ আধ হইল
এ কি বিষম জ্বালা
আধ কটীতে পীতবাস শোভে
নীল সাড়ী আধ বেড়া
নবীন তমালে জাম্বুনদ লতা
জানুর উপরে জড়া
এক চরণে ঝুমকা বাজয়ে
যাবক অতি সাজে
এক চরণে সোনার নূপুর
রুণ ঝুনু ঝুনু বাজে
দেখিয়া সখীর বিস্ময় হইল
রসবতী রসরাজে
ডালেতে বসিয়া শুক শারী দোঁহে
আনন্দে মগন গরজে
স্বর্ণলালী কয় রাই শ্যামের
প্রেম সুখ রস আশে
দোঁহার বিলাস দেখয়ে রঙ্গে
রসের তরঙ্গে ভাসে

রূপানুরাগ, অভিসার এবং মিলন পদের এইরূপ ক্রম পর্য্যায় দেখিয়া মনে হয়, স্বর্ণলালী পূর্ব্বরাগ প্রভৃতির পদও রচনা করিয়াছিলেন। উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে এমন কত কবির কবিতা নষ্ট হইয়া গেল, কত কবির নাম অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

স্ত্রীশিক্ষার সাধারণ প্রচলন না থাকিলেও পশ্চিমবঙ্গে সেকালে শিক্ষিতা মহিলার অসদ্ভাব ছিল না। কবীন্দ্র রমাপতির স্ত্রীর পরিচয় অনেকেই জানেন। বাঁকুড়ায় তাঁহার পিত্রালয় ছিল। স্বর্ণলালী বীরভূমের কবি। খুঁজিলে পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক কবির সন্ধান মিলিতে পারে। সেকালে অনেক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের পত্নী কন্যা ভগিনী অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে ছাত্রদের পাঠ দিতেন, পাঠ গ্রহণ করিতেন। পশ্চিমবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া হারাধন সূত্রধর তাঁহার পিতৃষ্বসার নিকট জটিল তালমান ও আখরসহ পালাবন্দী কীর্ত্তনের গান শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সে দিনও তথাকথিতা ইতর জাতীয়া রমণী যজ্ঞেশ্বরী অকাবাই প্রভৃতি কবির দলের নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন। ইঁহাদের রচিত অনেক গান আজিও কবিওয়ালাদের এবং জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরিতেছে। দেশে প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধান ও আলোচনা এই সবে সুরু হইয়াছে মাত্র। দেশের তরুণের দলকে কি এদিকে মনোযোগ দানের অনুরোধ করিতে পারি?

বৎসদেশ—কৌশাম্বী

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি

প্রাচীন মধ্যভারতে যে সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতি বাস করিত তাহাদিগের মধ্যে বৎসগণ উল্লেখযোগ্য। ঋগ্‌বেদে বৎসদের কথা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও বৎসগণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'বশ' শব্দ একজন লোকের নাম স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে বশ এবং বংশ অভিন্ন জাতি। পালি ধর্ম্মগ্রন্থে বৎসরাজ উদেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাহাতে দেখা যায় যে তিনি বুদ্ধের পরেও জীবিত ছিলেন। পালি বৌদ্ধ সাহিত্য ও ব্রাহ্মণ সংস্কৃত সাহিত্য এই উভয় সাহিত্যেই এই উদেনের গল্প দেখা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে উদেন বংশরাজ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পুরাণ এবং সংস্কৃত নাটকে তিনি বৎসরাজ উদয়ন নামে পরিচিত। উভয় রাজ্যের রাজধানী এক এবং তাহার নাম কৌশাম্বী বা কোশম্বী। জৈন গ্রন্থ সমূহে এই জাতি 'বচ্ছ' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আমরা কৌশাম্বীর কথা কিছু বলিব।

বংশ অথবা বৎসদেশ যে কৌশাম্বীকে পরিবেষ্টন করিয়াই অবস্থিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এলাহাবাদের অদূর বর্ত্তী কোসাম নামক স্থান প্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বৎস প্রদেশ যমুনার তীরে অবন্তির উত্তর-পূর্ব্বে, কোশলের দক্ষিণে (Buddhist India, p. 3) এবং এলাহাবাদের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া মনে হয় (N. L. Dey, Geographical Dictionary, p. 100)। বৃহৎ-সংহিতার মতে বৎসরাজ্য মধ্যদেশে অবস্থিত ছিল (Watters on Yuan Chwang, Vol. I. p. 368)। হিউয়েন সঙ্ বৎসদেশকে কৌশাম্বীদেশ রূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহার পরিধি ছিল ৬০০০ লি (Ibid, p. 365)।

মহাভারতে বৎসদের প্রসঙ্গ

মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেখা যায়, রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে ভীমসেন যখন জয়যাত্রার অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন তখন তিনি পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া বৎসভূমি জয় করিয়াছিলেন (ch. 30, pp. 241-242)। মহাভারতের বনপর্ব্বে কর্ণ বৎস দেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (Ch. 253, pp. 513-514)। অনুশাসনপর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই যে, হৈহয়েরা হর্য্যশ্বকে নিহত করিয়া বৎসদের নগর অধিকার করিয়াছিল (Ch. 30., p. 1899)। ভীষ্মপর্ব্বে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বৎসসৈন্য পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। নকুল এবং সহদেব বৎস এবং অন্যান্য স্থানের সৈন্যদের সঙ্গে পাণ্ডব-সৈন্যের বামপার্শ্ব রক্ষা করিয়াছিলেন (Ch. 50, p. 924)।

উৎপন্ন দ্রব্য

অঙ্গুত্তর নিকায় (Anguttara Nikaya, P. T. S. Vol. IV. pp. 252, 256, 260) হইতে জানিতে পারা যায়, বংশ অথবা বৎসদেশে সাত রকমের রত্ন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত এবং সেই জন্য এ দেশ অত্যন্ত সম্পদশালী দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মথুরা, বৎস, অপরান্ত, কাশী, বঙ্গ এবং আরও কয়েকটি স্থানের তুলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (Shamsastri, Tr. p. 94)। কৌশাম্বী অত্যন্ত উর্ব্বর দেশ ছিল এবং তাহার আবহাওয়া উষ্ণ ছিল। ইহার জমিতে উচ্চস্থানোপযোগী ধান এবং ইক্ষুদণ্ড উৎপন্ন হইত (Watters on Yuan Chwang)। সি-য়ু-কিতে অসাধারণ উৎপাদিকা শক্তির জন্য ইহা বিখ্যাত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার ভূমিতে ধান, এবং ইক্ষুদণ্ড প্রচুর উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমান সময়ের মতই ইহার আবহাওয়া তখনও উষ্ণ ছিল (Beal, Records of the Western World. Vol. I. p. 235)।

হিউয়েন সঙ্ বৎসদেশের অধিবাসীদিগকে উদ্যোগী, শিল্পের প্রতি অনুরক্ত, এবং ধর্ম্মানুশীলন-নিরত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Watters, on Yuan Chwang Vol. I. 366)। অধিবাসীদের ব্যবহার ছিল কঠোর এবং রূঢ়। তাহারা জ্ঞানের চর্চ্চা করিত এবং ধর্ম্মজীবন ও পুণ্য কর্ম্মের

প্রতি তাহাদের গভীর নিষ্ঠা ছিল। তাহারা হীনযান সম্বন্ধে আলোচনা করিত (Beal, Records of the Western World, Vol. I. p, 235)।

শাসন প্রণালী

শাসনভার রাজার হাতে ন্যস্ত ছিল। তিনি তাহার ইচ্ছানুসারে শাসন করিতেন। কারণ বৎসের শাসন-প্রণালী রাজতন্ত্র ছিল। (Carmichael Lectures, 1918, p. 114) জন্মের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য বৎসরাজ্যে অগ্নিপরীক্ষা করা হইত। আগুনের ভিতর দিয়া অক্ষত দেহে গমন করিতে পারিলে জন্মের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিত না (Cambridge History. Vol, I, p. 134)।

বৎস রাজধানী এবং তাহার অবস্থান

কানিংহাম কোসামকে বৎস রাজধানী কৌশাম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোসাম যমুনার তীরে এলাহাবাদ হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। র‍্যাপসন বলেন কৌশাম্বীকে কোসম বলিয়া সনাক্ত করা হয় বটে কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। এলাহাবাদ জেলায় দুইটি পাশাপাশি গ্রাম উক্ত নামে অভিহিত হয় (কোসম্ ইনাম্, কোসম্ খিরাজ) (Rapson's Ancient India, p. 170)। সেণ্ট মার্টিন মনে করেন যে কৌশাম্বী প্রয়াগের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল (Watters, on Yuan Chwang, Vol. I, p. 366)। ফাহিয়ানের মতে কৌশাম্বী বারাণসী হইতে উত্তরে মৃগোদ্যানের উত্তর-পশ্চিমে ১৩ যোজন (প্রায় ৯০ মাইল) দূরে অবস্থিত ছিল (Ibid, p. 367)। এই মত অনুসারে কোশম্বীর অবস্থান প্রয়াগের উত্তরে নির্দ্দেশ করিতে হয় (Ibid, p. 367)। কৌশাম্বীর অবস্থান সম্বন্ধে যে এত বাদানুবাদ পরিলক্ষিত হয় তাহার কারণ কানিংহামের নির্দ্দেশ (কোসম্ যমুনার তীরে যুক্ত প্রদেশের এলাহাবাদ জেলায় অবস্থিত) এবং চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের বিবরণের ভিতর কোনই মিল খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। এই বাদানুবাদের আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা একটা বড় কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। কথাটি এই যে, এরূপ বিবরণে যেমন গোড়াতেও ভুল হওয়া অসম্ভব নহে, আবার পরেও ইহাতে তেমনি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বস্তুতঃ যে সব প্রমাণের উপর নির্ভর করা যায় তাহা কোসম্ এবং কৌশাম্বী এক স্থান বলিয়াই নির্দ্দেশ করে (Cambridge History, Vol. I, p. 524)। মনে হয়, উহা যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। উজ্জয়িনী হইতে ইহার দূরত্ব ছিল স্থলপথে ৪০০ মাইল এবং বাণারসী হইতে জলপথে উপরের দিকে প্রায় ২৩০ মাইল। উজ্জয়িনী হইতে কোশম্বী যাইবার একটি পথ বেদিস এবং অন্যান্য স্থানের ভিতর দিয়া ছিল। এই সব স্থানের নাম পাওয়া যায় কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না (Cambridge History, Vol. I, pp. 187-188)।

ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, কোসম কোশম্বীরই হ্রস্বাকার মাত্র এবং এখন পর্য্যন্তও জৈনদের কাছে স্থানটি কোশম্বিনগর নামে পরিচিত (J. R. A. S, 1898, pp. 503-504)। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহেও সাধারণতঃ গঙ্গার উপরে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কোশম্বী অবস্থিত ছিল বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। খর দুর্গের দ্বারদেশে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে কোশম্বীমণ্ডল নামের উল্লেখও এই সাধারণ বিশ্বাসটারই সমর্থন করে। কিন্তু হিউয়েন সঙ্-এর মত অনুসারে প্রয়াগ বা এলাহাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কোশম্বীর অবস্থান মানিয়া লইলে স্থানটি যে যমুনার উপর অবস্থিত ছিল সে সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ থাকে না। স্পেন্স হার্ডি তাঁহার Manual of Buddhism নামক গ্রন্থে বক্কুল সম্পর্কে একটি অদ্ভুত উপাখ্যানের বর্ণনা করিয়াছেন। এই উপাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া কানিংহাম বলেন যে, কোশম্বীনগর যমুনার উপরে অবস্থিত ছিল (Ancient Geography, p. 395)। কোশম্বী যমুনার উপরে, নদীপথে বারাণসী হইতে ৩০ লিগ (প্রায় ২৩০ মাইল) দূরে অবস্থিত (Commentary on the Anguttara Nikaya, I. p. 25 ; Buddhist India p. 36)। দীঘনিকায়ে কোশম্বী একটি মহানগর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এ গ্রন্থে এই স্থানই বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভেরও স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখা যায় (Digha Nikaya, Vol II. pp. 146, 169)।

কৌশাম্বীর বিপুল সৈন্য-বল ছিল। কোসম্-এর ধ্বংস-স্তূপের ভিতর একটি প্রকাণ্ড দুর্গ পূর্ব্বদিকে প্রাকার এবং

বুরুজসহ এখনও বিদ্যমান আছে। এই দুর্গটির পরিধি চার মাইল, মাটির সাধারণ সমতা হইতে ইহার উচ্চতা গড়পড়তায় ৩০ হইতে ৩৫ ফিট। নগরটি যে একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল, তাহার প্রমাণ এই স্থানে আবিষ্কৃত নানা রকমের মুদ্রা হইতেই পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে যে স্থানটির নাম কৌশাম্বী হইয়াছিল এই স্থানে আবিষ্কৃত অন্ততঃ দুইটি শিলা-লিপি হইতে তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে (Cambridge History, Vol. I ; p. 524)। তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে কৌশাম্বী, অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি রাজ্য হইতে ঢালাই মুদ্রার প্রবর্ত্তন হয়। এই সব মুদ্রার কতকগুলিতে ব্রাহ্মী অক্ষরে স্থানীয় রাজাদের নাম লিখিত ছিল (Brown's Coin of India, p. 19)। এইসব ছাঁচে ঢালাই করা মুদ্রায় সামান্য পরিমাণে বৈদেশিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গড়নের দিক দিয়া এই সমস্ত মুদ্রা খৃঃ পূঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে পঞ্চাল, অযোধ্যা, কৌশাম্বী এবং মথুরা হইতে যে সমস্ত মুদ্রা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাদেরই অনুরূপ। কতকগুলি মুদ্রায় ব্রাহ্মী লিপি দেখা যায়। কৌশাম্বীর মুদ্রাগুলিতে যে পৃষ্ঠে মুখ থাকে সেই পৃষ্ঠে বেড়ের ভিতর একটি বৃক্ষ আছে (Ibid, p. 20)। কৌশাম্বীর ধ্বংস স্তূপের ভিতর নানা ছাঁচের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলিতে লেখা একেবারেই নাই (Prachina Mudra, p. 105)। কৌশাম্বীর রাজাদের মুদ্রা প্রবর্ত্তন খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে আরম্ভ হইয়া প্রায় তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় (Cambridge History Vol. I, p. 525)। দেবতা এবং মানুষ উভয়কেই দক্ষিণ এবং পশ্চিম হইতে কোশল এবং মগধে আসিতে হইলে কৌশাম্বীতে আশ্রয় লইতে হইত। কৌশাম্বী হইতে রাজগৃহে আসিবার রাস্তা নদীপথে নিম্ন দিকে ছিল (Buddhist India, p. 36)। শ্রাবস্তী হইতে প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের রাস্তায় কৌশাম্বী ছিল প্রধান বিশ্রাম-স্থানগুলির অন্যতম। উত্তর-ভারতে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বাণিজ্যের প্রধান পথ ছিল নদীপথ। বড় বড় নদীগুলিতে পণ্যপূর্ণ নৌকার দ্বারা বাণিজ্য চলিত। এজন্য নৌকা ভাড়া পাওয়া যাইত। পশ্চিমে কৌশাম্বী পর্য্যন্ত যমুনার ধারে ধারে উপরের দিকের নদীগুলি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (Ibid, P. 103)।

বৌদ্ধ কেন্দ্ররূপে কৌশাম্বী

বুদ্ধের সময়ে কৌশাম্বীতে অথবা কৌশাম্বীর নিকটে সঙ্ঘের চারটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই বৃক্ষের নিম্নে কতকগুলি কুটীর ছিল। একটি প্রতিষ্ঠান ছিল ঘোসিতের আরামের ভিতর, অনুরূপ আর দুইটি উদ্যানে দুইটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। চতুর্থটি ছিল পাবারিয়ের আম্রকুঞ্জে। এই সব বিহারের একটি বা অন্যটিতে বুদ্ধ প্রায়ই বাস করিতেন। এই বাসের সময় তিনি যে সব আলোচনা করিতেন বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাহাই রক্ষিত হইয়াছে (Cambridge. History Vol. I. p. 188)। সুত্তনিপাত ভাষ্যে (II. p. 584) দেখা যায়, জটিল নেতা বাবরির শিষ্যবর্গ এবং কতিপয় ভিক্ষু কৌশাম্বীতে গমন করিয়াছিলেন। হিউয়েন সংএর সময় কোশম্বীতে ১০টিরও বেশী বৌদ্ধ বিহার ছিল। কিন্তু সমস্তগুলিরই ধ্বংসাবশেষ অবস্থা। এই সব বিহারে প্রায় ৩০০ ভিক্ষু বাস করিত। তাহারা হীনযানপন্থী ছিল। সেখানে দেবমন্দিরের সংখ্যা ছিল ৫০টিরও বেশী এবং এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বহু লোক সেখানে বাস করিত (Watters on Yuan Chwang, Vol. I p. 366)। সি—যু—কি বলেন, কৌশাম্বী নগরে পুরাতন রাজপ্রাসাদের ভিতর একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল। এই বিহারের উচ্চতা ছিল প্রায় ৬০ ফিট। বিহারে চন্দন কাষ্ঠে খোদিত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল। তাহার উপরে ছিল একটি প্রস্তরনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ। ইহা রাজা উ তো-এয়ন-ন-(উদয়নের) এর কীর্ত্তি। দৈবশক্তি প্রভাবে (অথবা ইহার আধ্যাত্মিক চিহ্নগুলির ভিতর দিয়া) সময়ে সময়ে ইহার ভিতর দিয়া স্বর্গীয় আলোক নির্গত হইত। নানা দেশের রাজা এই মূর্ত্তিটিকে লইয়া যাইবার জন্য বিপুল শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু বহু লোক চেষ্টা করিয়াও ইহাকে নড়াইতে পারে নাই। এই জন্য তাঁহারা এই মূর্ত্তির অনুরূপ মূর্ত্তি গড়িয়া তাহারই পূজা করিতেন এবং বলিতেন যে এই অনুকৃতিই আদত মূর্ত্তি, এবং ইহাই এই ধরণের অন্য মূর্ত্তি-গুলির আদর্শ (Beal, Record of the Western World, vol. 1. p. 235)। এই নগরের ভিতর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটি বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এইটিই ঘোসিতের (ঘোসির) আবাসগৃহ। মধ্যস্থলে

একটি বৌদ্ধ বিহার এবং স্তূপ। এই স্তূপের ভিতর বুদ্ধের কেশ এবং নখর সংরক্ষিত ছিল। তথাগতের স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। অনতি দূরে এই নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি প্রাচীন সঙ্ঘারাম ছিল। পূর্ব্বে এই স্থানে ঘোসিতের উদ্যান ছিল। ইহার ভিতর অশোক রাজা ২০০ ফিট উচ্চ একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এইখানে তথাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশাসন প্রচার করেন। সঙ্ঘারামের দক্ষিণ-পূর্ব্বে দ্বিতল দুর্গের উপরে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ছিল। এই গৃহে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব বাস করিতেন (Beal, Record of the Western World, vol I. p. 236)। কৌশাম্বীতে ভিক্ষুদের একটি সঙ্ঘ ছিল, ইঁহাদের অধিকাংশই হীনযান-পন্থী ছিলেন (Legge, Fa-Hien, p. 96)। যে অশোক-স্তম্ভের উপর সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার রাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ প্রথমে বিখ্যাত নগর কৌশাম্বীতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। উজ্জয়িনী হইতে উত্তর-ভারতে গমনের জন্য যে রাজপথ আছে কৌশাম্বী তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত। অশোক যে এই নগরে আসিয়া সময়ে সময়ে বাস করিতেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই (Smith, Early History. p. 293)। বুদ্ধ তাঁহার শেষ জন্মে কোন্ বংশ পবিত্র করিবেন, ইহাই লইয়া তুষিত স্বর্গে একটি আলোচনা উপস্থিত হয়। Golden Mass নামে একজন দেবপুত্র কহিলেন, "বংস দেশে কৌশাম্বী নগরে সিয়েন-সিং (সহস্র সদ্‌গুণ) নামে একজন রাজা আছেন। তাঁহার পুত্রের নাম পিহ-সিং (শত সদ্‌গুণ)। এই রাজার হস্তী, অশ্ব, সাত প্রকারের রত্ন এবং প্রচুর সৈন্য (চারি প্রকারের সৈন্য) আছে। সেখানে জন্মগ্রহণ করিলে কি আপনি আনন্দিত হইবেন?" প্রভা পাল উত্তর দিলেন "যদিও তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য, তথাপি বংস রাজার মাতা অজ্ঞাত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পুত্র বিশুদ্ধ বংশোদ্ভব নহেন, তোমাকে অন্য স্থান অন্বেষণ করিতে হইবে (The Romantic Legend of Sakya Buddha, p. 28)। ললিত বিস্তারেও এইরূপ একটি বিবরণ পাওয়া যায়। তুষিত স্বর্গে কোনও কোনও দেবপুত্র বলেন যে, বংশ-রাজ-কুলই বোধিসত্ত্বের জন্মগ্রহণের উপযোগী স্থান। কিন্তু অন্যান্য দেবপুত্রেরা বংশদের ত্রুটি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে, তাহারা রূঢ় এবং অভদ্র, তাহাদের রাজা উচ্ছেদবাদী ইত্যাদি। সুতরাং তাহাদের পরিবার বোধিসত্ত্বের শেষ জন্মগ্রহণের পক্ষে অযোগ্য (Lalita Vistara, Ed. Lefmenn, P. 21)। বুদ্ধের তিরোধান সম্পর্কে আনন্দ বলিয়াছিলেন, কুশিনগরের মত ক্ষুদ্র সহর তথাগতের দেহ রক্ষার উপযুক্ত স্থান নহে। তিনি তথাগতের পরিনির্ব্বাণের উপযোগী ছয়টি বড় সহরেরও নাম করিয়াছিলেন। এই ছয়টি সহরের ভিতর কৌশাম্বী ছিল একটি (Kern, Indian Buddhism, P. 44)। Kern বলেন, কৌশাম্বী, মথুরা-প্রমুখ উত্তর ভারতের অনেকগুলি সহর বুদ্ধের কেশ, নখ প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত স্তূপের দ্বারা সমৃদ্ধ বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে (Ibid, P. 88)।

পালি ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায়, পিণ্ডোল ভরদ্বাজ কৌশাম্বীর ঘোসিতারামে বাস করিতেন। তিনি কৌশাম্বীর রাজা উদেনের পুরোহিত-পুত্র ছিলেন। তিনি তিন বেদ পাঠ করিয়াছিলেন এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ যুবককে বেদ-স্তোত্রে শিক্ষাদান করিতেন। একদা তিনি রাজগৃহতে গমন করেন এবং সেখানে ভগবান বুদ্ধের সঙ্ঘে দান এবং অনুগ্রহ বর্ষণের প্রাচুর্য্য প্রত্যক্ষ করেন। ইহার পর তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। খাদ্যের সংযম সম্পর্কে তিনি গুরুদেবের আদেশ অনুসরণ করিতেন। তিনি ছয় প্রকারের অভিজ্ঞা অর্জ্জন করিয়াছিলেন (Psalms of the Brethren, p. 111)। রাজা উদেন একবার পিণ্ডোল ভরদ্বাজের নিকট গমন করিয়া মস্তকে কৃষ্ণ কেশ পরিশোভিত তরুণ ভিক্ষুদের দ্বারা পবিত্র ব্রহ্মচারীর ব্রত পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ভরদ্বাজ উত্তর দিয়াছিলেন—"ভগবান বুদ্ধের আদেশ, যে মহিলা জননীর বয়স প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভিক্ষুদিগকে তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিতে হইবে; যাঁহার বয়স ভগ্নীর মত, তাঁহার সহিত ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে; যাঁহার বয়স কন্যার ন্যায়, তাঁহার সহিত কন্যার মত ব্যবহার করিতে হইবে।" ইহার পর রাজা ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষ যখন কোনও জিনিষ লাভ করিতে চায়, তখন তাহার মনের স্থিরতা থাকে না। এই জন্য উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর রমণীকে লাভ করবার জন্যই মন প্রলুব্ধ হইতে পারে। ভিক্ষুর ব্রহ্মচারী জীবন যাপনের অন্য কোনও যুক্তি আছে কি?" ভরদ্বাজ উত্তর দিলেন—"দেহ অপবিত্রতার দ্বারা

পরিপূর্ণ। বুদ্ধ এই দেহ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার নিমিত্ত ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।" রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাহারা দেহের অশুচিতা সম্বন্ধে চিন্তা করে না, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করা কি দুঃসাধ্য?" ভরদ্বাজ উত্তর দিলেন—"ভিক্ষুদিগকে ইন্দ্রিয় দমন করিবার জন্য উপদেশ দান করা হইয়াছে।" ইহার পর রাজা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, যখন তিনি ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিয়াই অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার মনে নানা রকমের কামতৃষ্ণার উদ্রেক হয়। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া প্রবেশ করেন, তখন কামোপচারের কথা চিন্তা করিবারই সুযোগ পাওয়া যায় না (S. N. iv. pp. 110-112)। প্রথমে উদেন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন, এমন কি, বিরূপ ছিলেন। তিনি একবার মদ্য পান করিয়া ভরদ্বাজকে উৎপীড়ন করিবার জন্য তাঁহার দেহে তাম্রবর্ণের পিপীলিকা পূর্ণ একটি ঝুড়ি বাধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে এই পিণ্ডোলের সহিত আলোচনা করিয়াই তিনি তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাজা উদেন সাধনার পথে যে খুব বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি অদ্ভুত উপায়ে বৌদ্ধ বিবরণে তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ হইয়া আছে। কথিত আছে, তিনি বুদ্ধের জন্য মনের ভিতর সপ্রেম শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন, এবং তাঁহার একটি সুবর্ণ মূর্ত্তিও প্রস্তুত করিয়াছিলেন (Edkins, Chinese Buddhism, p. 49, Second Edition)। হিউয়েন-সঙ্ অনেক জিনিষ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই সব জিনিষের ভিতর স্বচ্ছপাদ-পীঠের উপর চন্দন কাষ্ঠে খোদাই করা একটি বুদ্ধমূর্ত্তিও ছিল। এই মূর্ত্তিটি কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রতিরূপ বলিয়াই মনে হয় (Beal, Records of Western World, vol. 1, Intro. p. xx)।

বুদ্ধ বহুবার কৌশাম্বীর ঘোসিতারামে ভিক্ষুদের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া বাস করিয়াছেন। ভিক্ষুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত পাপের আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্ম্ম, বিনয় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি উপদেশ প্রদান করিতেন (Vinaya Texts, pt. II p. 285; Ibid. pt. III, p. 233)।

মহানারদ কস্সপ জাতকে বোধিসত্ত্ব বংশ দেশের কৌশাম্বী নামক বৃহৎ উন্নতিশীল, ঐশ্বর্য্যশালী একটি নগরে এক বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বণিকের একমাত্র পুত্র ছিলেন। সুতরাং সর্ব্বদা আদর যত্ন ও সম্মান লাভ করিতেন। সেখানে তিনি একটি সৎ বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। এই বন্ধুটি মহাজ্ঞানী এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই বন্ধুটির দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি সৎকর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিতেন (Cowell, Jataka, vol. vi. P. 120)।

সুরাপান জাতকে দেখা যায়, বুদ্ধ দীর্ঘকাল ভদ্দবতিকাতে অবস্থান করার পর কোশম্বীতে গমন করিয়াছিলেন। এখানে নাগরিকেরা সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তাহারা ভগবান তথাগতকে আহারের জন্যও নিমন্ত্রণ করে। কোশম্বীতে ভিক্ষুদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াই যে সব দ্রব্য পানের দ্বারা নেশা হয় তাহার ব্যবহার ভগবান বুদ্ধ নিষিদ্ধ করেন এবং সেজন্য দোষ স্বীকার এবং প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন (Jataka, Cowell, Vol. I pp. 206-207)। তিনি কোশম্বীর বদরিক বিহারে যখন বাস করিতেছিলেন, তখনই জ্যেষ্ঠ রাহুল সম্বন্ধে তিপল্লত্থমিগ জাতকের কথা বিবৃত করিয়াছিলেন (Jataka, Cowell, Vol I, p. 47; Vol III, p. 43)।

মজ্ঝিম নিকায় গ্রন্থে দেখা যায়, ভগবান তথাগত একবার যখন কোশম্বীর ঘোসিতারামে বাস করিতেছিলেন, তখনই কোশম্বীর ভিক্ষুরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সহিত বিবাদে রত হন। বুদ্ধ তাহাদিগকে বিবাদ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাহারা এই ব্যাপারে তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে মানা করায় তিনি স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন (Vol. III, p. 153; Majjhima Nikaya Vol. I. p. 320 foll.)।

যখন বুদ্ধ কোশম্বীর ঘোসিতারামে ছিলেন, সেই সময়ে সন্দক পরিব্রাজকও ৫০০ শিষ্য সমভিব্যাহারে পিলক্ষ গুহায় বাস করিতেছিলেন। আনন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অজ্ঞাতবাদের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাহাকে উপদেশ প্রদান করেন (Majjhima Nikaya. Vol. I. p. 513 foll.)। সংযুত্ত নিকায়ে দেখা যায়, বুদ্ধ কোশম্বীর ঘোসিতারামে বাস করিয়াছিলেন। প্রভাতে তিনি ভিক্ষার জন্য কোশম্বীতে প্রবেশ করেন। ইহার পর তিনি পারিলেয্যক বন পরিত্যাগ করেন (Samyutta Nikaya, Vol. III pp. 94-95)।

কোশম্বীতে বাস কালে বুদ্ধ ঘোসিতারামে বহু সেট্‌ঠি পরিবৃত লোকের সম্মুখে জালিয় সুত্ত প্রচার করিয়াছিলেন। সেট্‌ঠিদের ভিতর কুক্কুট, পাবারিয় সেট্‌ঠি, ঘোসক সেট্‌ঠিও ছিলেন। ইঁহারা বুদ্ধের নামে তিনটি আরাম প্রস্তুত করিয়া দেন। ঘোসক প্রস্তুত করেন ঘোসিতারাম, কুক্কুট প্রস্তুত করেন কুক্কুটারাম, এবং পাবারিয় প্রস্তুত করেন পাবারিক অম্ববন (Sumangala Vilasini, pt. I, pp. 317-319)।

একদা বুদ্ধ যখন কোশম্বীর ঘোসিতারামে বাস করিতেছিলেন, তখন মণ্ডিস্‌স এবং জালিয় নামক দুইজন পরিব্রাজক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, আত্মা এবং দেহ এক অথবা ভিন্ন? বুদ্ধ তাঁহাদিগকে উত্তর দিয়াছিলেন —'তাহারা একও নহে, ভিন্নও নহে।" তিনি এই সম্পর্কে তাহাদের নিকট যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা দীর্ঘনিকায়ের সমন্নফল সুত্তন্তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (Digh Nikaya, I, p. 157, cf. Ibid. Jaliya Sutta pp. 159-160)। সংযুক্ত নিকায়ে দেখা যায়, কোশম্বীর ঘোসিতারামে অবস্থান কালে পিণ্ডোল ভরদ্বাজ বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অর্হত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহার পর কতিপয় ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অর্হত্ব লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ তাঁহাদিকে বলিয়াছিলেন যে, যতি ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও পঞ্ঞিন্দ্রিয় এই তিন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তিনি অর্হত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। (Vol. v. p. 224)। এই নিকায়েতেই দেখা যায় যে, বুদ্ধ কোশম্বীর ঘোসিতারামে অবস্থান কালেই 'শেখ' এবং 'অশেখ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন (pp. 229-230)। চুল্লবগ্‌গে (Vinaya texts, pt, II, p. 370 foll.) দেখা যায়, বুদ্ধ যখন ঘোসিতারামে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে ছন্নের অপরাধের কথা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু ছন্ন তাহার অপরাধ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। বুদ্ধ একটি ভিক্ষু সঙ্ঘের সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ধম্মপদথ কথায় কোশম্বীর একটি গৃহস্থ-পুত্রের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই কোশম্বীবাসী তিস্‌স থের বুদ্ধের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিস্‌সের পৃষ্ঠপোষক তাঁহার সাত বৎসর বয়স্ক পুত্রকে তিস্‌সের হাতে [illegible]ণ করেন। তাহার কাছে দীক্ষা লইয়া সে সামনের হয়। পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সে অর্হত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল (Vol. II. pp. 182-185)।

আনন্দ যখন কোশম্বীর ঘোসিতারামে বাস করিতেছিলেন, তখন ছন্ন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কিছু উপদেশ দানের জন্য অনুরোধ করেন। আনন্দ বলেন, —"পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহার সম্যক জ্ঞান আছে তাহার মিথ্যা শূন্যতাবাদের উপরে কোনও রকমের আস্থা থাকিতে পারে না এবং পৃথিবীর ধ্বংস সম্বন্ধে যাহার সম্যক উপলব্ধি আছে, অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধেও সে কোনও রূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইতে পারে না (Samyutta Nikaya, pt. III, p. 133 foll.)।

বারো রকমের নিদান, নির্ব্বাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আনন্দ কয়েকটি বক্তৃতা দান করেন (Samyutta Nikaya, Vol. II, p. 115 foll)। ধাতুর পার্থক্য সম্বন্ধে ঘোসিত নামক একজন গৃহস্থের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন (Samyutta Nikaya, Vol. IV. pp. 113-114)

সংযুক্ত নিকায়ে দেখা যায়, সারিপুত্ত এবং উপবান কোশম্বীর ঘোসিতারামে বাস করিয়াছিলেন (Vol. v. pp. 76-77)। যে সাত রকমের বোজ্ঝাঙ্গের উপলব্ধির দ্বারা মানুষ বর্ত্তমান জীবনে সুখী হইতে পারে, ইঁহারা সেই বোজ্ঝাঙ্গের সম্বন্ধেই আলোচনা করেন।

কোশম্বীর ভিক্ষুরা জেতবনে বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া তাঁহার উপদেশ পালন না করার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"ভিক্ষুগণ, তোমরা ন্যায়তঃ আমারই পুত্র। আমার মুখের বাণী হইতে তোমরা উদ্ভূত হইয়াছ। পিতার উপদেশ-বাক্যকে পদতলে দলিত করা পুত্রের পক্ষে সঙ্গত নহে। কিন্তু তোমরা আমার উপদেশ-বাক্য পালন কর নাই।" এই বলিয়া উদাহরণ স্বরূপ বুদ্ধ দীঘাব এবং বারাণসীর রাজার গল্প তাহাদের কাছে বিবৃত করিয়াছিলেন (Buddhist Parables, Burligame, p. 28)। কোশম্বীর লোকদের উপরে বুদ্ধের বাণী ও তাঁহার শিষ্যদের অসাধারণ প্রভাব ছিল। কোশম্বীর অনেকে বুদ্ধ এবং তাঁহার ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিত এবং অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষাও গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া অনেকে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ গোবচ্ছের নাম উল্লেখ করা যায়। ইনি কোশম্বীর ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ভগবান তথাগতের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সঙ্ঘে

প্রবেশ করেন। এই সময়ে কোশম্বীর ভিক্ষুরা বিবাদপরায়ণ হইয়া উঠে। গোবচ্ছ দুই পক্ষের কোনও পক্ষেই যোগদান করেন না। তিনি ভগবান তথাগতের প্রশংসা করিয়া অন্তর্দৃষ্টি অর্জ্জন এবং অরহত্ব লাভ করিয়াছিলেন (Psalms of the Brethren, p. 16)।

বুদ্ধের সময় কোশম্বীর সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থ পরিবারে সামাবতী থেরীর জন্ম হয়। এই সামাবতী রাজা উদেনের পত্নী সামাবতীর প্রিয় সখী ছিলেন। রাণীর মৃত্যুর পর তিনি অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন এবং ভিক্ষুণী হন। তাঁহার শোক এত গভীর ছিল যে, অরিয়মগ্‌গ লাভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু পরে থের আনন্দের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এই শোকের হাত হইতে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করিয়া অরহত্ব লাভ করিয়াছিলেন (Therigatha commy, P. T. S. p. 44)।

থেরী গাথা ভাষ্যে আর একজন সামাথেরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময় কোশম্বীর কোনও গৃহস্থ-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও রাণী সামাবতীর সঙ্গিনী ছিলেন। রাণীর মৃত্যুর পর তিনি এতই শোকাভিভূত হইয়া পড়েন যে ২৫ বৎসর চেষ্টা করিয়াও তিনি অরিয়মগ্‌গ লাভে সমর্থ হন না। পরে বুদ্ধের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন এবং পটিসম্ভিদা (বিশ্লেষণীশক্তি) সহকারে অরহত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন (Therigatha commy. P. T. S. p. 45)। বুদ্ধের তিরোধানের পর প্রথম মহা সভা শেষ হইয়া গেলে মহাকচ্চায়ন ১২ জন ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া কোশম্বীর নিকট একটি আরণ্য কুটীরে বাস করিতে থাকেন। এই সময় রাজা উদেনের স্থাপত্য বিভাগের ভার-প্রাপ্ত একজন কর্ম্মচারীর মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র উত্তর পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন। একদা নগর সংস্কারের কাষ্ঠ আহরণের জন্য মিস্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিয়া উত্তর মহাকচ্চায়নের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করেন। ইহার পর তিনি ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাকচ্চায়ন এবং ভিক্ষুদিগকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি থেরকে এবং ভিক্ষুদিগকে নানারূপ দান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যহ তাঁহার গৃহে ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আত্মীয়দিগকেও তিনি তাঁহার পথ অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। একটি বিহারও তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মাতা ব্যয়কুণ্ঠা এবং মিথ্যাধর্ম্মে বিশ্বাসবতী ছিলেন। তিনি এই বলিয়া পুত্রকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, "তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সন্ন্যাসীদিগকে যাহা দান করিতেছ তাহা যেন পরজগতে রক্তে পরিণত হয়।" কিন্তু এক মহোৎসবের দিনে তিনি ময়ূর পালকে বিনির্ম্মিত একখানি পাখা বিহারে দান করার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর এই মাতা প্রেত জন্ম লাভ করেন। ময়ূরপালকে নির্ম্মিত পাখা দানের প্রস্তাব অনুমোদন করা জন্য প্রেত জীবনে তাঁহার মাথার চুল নীলবর্ণ, দীর্ঘ, মসৃণ ও সুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দুষ্কর্ম্মের ফল স্বরূপ যেমন তিনি গঙ্গার জল পান করিতে চেষ্টা করিতেন, অমনি তাহা রক্তে পরিণত হইত। এইরূপ দুর্দ্দশায় তিনি ৫৫ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অবশেষে একদিন থের কঙ্খারেবত যখন গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট ছিলেন, প্রেতিনী তখনই তাঁহার নিকটে আসিয়া কিঞ্চিৎ পানীয় প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার দুষ্কর্ম্মের কথা বলিয়া তাঁহার দুঃসহ দুঃখের কথাও তাঁহার কাছে নিবেদন করেন। দয়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া থের রেবত ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রেতিনীর মুক্তি কামনায় পানীয়, খাদ্য এবং বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। ফলে প্রেতিনী অবিলম্বে দুঃখের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন (Paramattha dipani on the Petavatthu, pp. 140-141, এবং আমার Buddhist Conception of Spirits. পৃঃ ৬৮-৬৯ দ্রষ্টব্য)।

ভজ্জির ভিক্ষুরা যখন যসকে একঘরে করিয়াছিলেন, তখন যস আকাশে উঠিয়া কৌশাম্বীতে অবতরণ করেন (Kern, Indian Buddhism, p. 104)। কিন্তু মহাবংশে দেখা যায় যে, বহুমানাস্পদ যস দ্বিতীয় বৌদ্ধসভার অধিবেশনের পূর্ব্বে বৈশালী হইতে পলায়ন করিয়া কোশম্বীতে গমন করিয়াছিলেন (Turnour's Mahavamsa, p. 16)। কাকণ্ডকের পুত্র বহুমানাস্পদ যস কোশম্বীতে আগমন করেন। সেখানে ভিক্ষুদের একটি সভা আহ্বান করিয়া ধর্ম্ম, বিনয় প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন (Vinaya Texts, pt. III, p. 394)।

নগর প্রতিষ্ঠার উপাখ্যান এবং প্রাচীন রাজগণ

কথিত আছে, কৌরব উপরিচর বসুর পুত্র কুশাম্বের দ্বারা কোশম্বী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (Visnupurana, 4th Amsa, ch. 19)। রামায়ণে দেখা যায়, ব্রহ্মার পুত্র কুশের ঔরসে তাঁহার পত্নী বিদর্ভীর গর্ভে চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই পুত্র-চতুষ্টয়ের একজনের নাম ছিল কুশাম্ব। পিতার উপদেশ অনুসারে এই কুশাম্বের দ্বারা কৌশাম্বী নগর প্রতিষ্ঠিত হয় (Adikanda, 32nd Svarga, 6-7)। অশ্বঘোষ তাঁহার সৌন্দরনন্দ কাব্যে কুশাম্বের আশ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। এই আশ্রমের উপরেই কৌশাম্বী নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল (সৌন্দরনন্দ-কাব্য—আমার অনুবাদ পৃঃ ৯)। গঙ্গার বন্যায় হস্তিনাপুর ধ্বংস হইলে পৌরবেরা (কুরু) তাঁহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া এইখানে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন যুগ পর্য্যন্ত কৌশাম্বীর ইতিহাসের অনুসরণ করা যায় (Cambridge History of India, vol. 1, p. 526)। মধ্যভারতে যমুনা তীরস্থ একটি বিখ্যাত নগররূপে কৌশাম্বী খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। গঙ্গার বানে হস্তিনাপুর ভাসিয়া যাওয়ার পর এইখানেই পাণ্ডবেরা তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। বুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র মূর্ত্তির মন্দির রূপেও ইহা বিখ্যাত হয় (Ancient India as described by Ptolemy Mc. Crindle. p. 72)। চক্রের রাজত্বকাল হইতেই এই নগরের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার লাভ করে। পাণ্ডব অর্জ্জুনের পর হইতে চক্র অধস্তন অষ্টম পুরুষ (Cunningham, Ancient Geography, p. 391)। পুরাণে দেখা যায়, অধিসাম কৃষ্ণের তিন পুত্র—নির্বক্ত, নেমিচক্র এবং বিবক্ষু, গঙ্গার বন্যায় হস্তিনাপুর ধ্বংস হইলে কৌশাম্বীতে বাস করিয়াছিলেন (Matsya Purana, ch. 50, cf. Vayupurana and Bhagavata purana)।

জাতকে (Cowel, vol. IV. pp. 17 19) বংস রাজ্যের কোশম্বী নগর কোসম্বিক নামক রাজার দ্বারা শাসিত হইত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। একদা একটি তস্কর চুরী করার পর অনুসৃত হইলে মণ্ডব্য নামক একজন ঋষির দ্বারদেশে তাহার বোঝা রাখিয়া পলায়ন করে। অপহৃত বস্তুর অধিকারী মণ্ডব্যের দ্বারে তাঁহার জিনিষ দেখিতে পাইয়া ঋষিকেই চোর বলিয়া মনে করে এবং তাঁহাকে রাজার কাছে আনিয়া হাজির করে। রাজা অনুসন্ধান না করিয়াই তাঁহাকে শূলে চড়াইবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু কাষ্ঠের শূলদণ্ড তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিতে পারে না। অতঃপর নিম্ব কাষ্ঠের শূলদণ্ড আনা হয়। কিন্তু তাহাও তাঁহার দেহকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এইবার রাজা তাঁহাকে নির্দোষ জানিতে পারিয়া শূলদণ্ডটি তাঁহার দেহ হইতে খসাইয়া লইবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার পর মণ্ডব্যের নির্দ্দেশ অনুসারে চর্ম্ম ছেদন করিয়া তাঁহার দেহ হইতে শূলদণ্ডটি ভিন্ন করা হয়। এই ব্যাপারের পর মণ্ডব্যের নাম হয় কীলকধারী মণ্ডব্য। রাজা ঋষির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে নিজের উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত ঘটনাটি হইতে অপরাধীদের দণ্ড সম্বন্ধে সে যুগের ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ফাঁসী নহে, শূলদণ্ডই ছিল তখনকার দিনে চরম দণ্ড এবং সামান্য অপরাধেও রাজা অপরাধীকে এই দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন।

স্কন্দ পুরাণে দেখা যায়, রাজা শতানীক কোশম্বীতে রাজত্ব করিতেন (ch. 5 Brahma Khanda)। তিনি অর্জ্জুনের বংশোদ্ভব। তিনি শক্তিমান এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন এবং প্রজারা তাঁহাকে ভালবাসিত। দেবাসুরের এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর সহস্রানীক কৌশাম্বীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অযোধ্যার রাজা কৃতবর্ম্মার পৌত্রী মৃগাবতীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। কথিত আছে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এই মৃগাবতী একটি বিহগের দ্বারা আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত হন এবং মহামুনি জমদগ্নি তাঁহাকে কুটীরে আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন করেন। এই মৃগাবতীর পুত্রের নামই উদয়ন। উদয়ন একটি নাগকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই বিবাহের ফলে তিনি তম্বলিমাল এবং বীণা ঘোসবতীকে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। উদয়ন একজন শিকারীকে একটি বলয় দান করিয়াছিলেন। এই বলয়ে সহস্রানীকের নাম লিখিত ছিল। সহস্রানীক এই বলয় দেখিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে জমদগ্নির কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে স্ত্রী, পুত্র এবং পৌত্রকে দেখিয়া

তিনি পরম আনন্দানুভব করেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উদয়নকে কোশম্বীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া চক্রতীর্থে স্নান করার পুণ্যফলে রাজা সহস্রানীক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন (cf Svapna-vasavadatta by Bhasa)।

বুদ্ধঘোসের ধম্মপদত্থ কথাতেও (vol. I pt. II) একটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে যাহার সহিত উপরিউক্ত পৌরাণিক গল্পটির প্রচুর সাদৃশ্য আছে। কোশম্বীতে পরন্তপ নামে একজন রাজা বাস করিতেন। একদিন তিনি তাঁহার রাণীর সহিত রৌদ্রে বসিয়া ছিলেন। রাণীর গায়ে একখানা লাল রঙের কম্বল ছিল। এই সময়ে হত্থিলিঙ্গ নামে একটি পাখী রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত রাণীকে একখণ্ড মাংস মনে করিয়া তাঁহাকে থাবায় তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করে। এই পাখীটির দৈহিক শক্তি পাঁচটি হস্তীর দৈহিক বলের অনুরূপ ছিল। রাণী মনে করিলেন, তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে যদি তিনি চীৎকার করেন, তবে হয় ত পাখী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। বস্তুতঃ রাণী চীৎকার করিতেই পাখীটি সত্য সত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তখন ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল, এবং সমস্ত রাত্রির ভিতর তাহার বিরাম হইল না। রাণী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, প্রভাতে সূর্য্য উঠিতেই তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। এই সময় রাণীর যেখানে পুত্র হইয়াছিল সেইখানে একজন সন্ন্যাসী আগমন করিলেন। রাণী সন্ন্যাসীর কুটীর হইতে অদূরে একটি নিগ্রোধ বৃক্ষের উপরে অবস্থান করিতেছিলেন। রাণী যখন আপনাকে একজন ক্ষত্রিয়ানী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন তখন সন্ন্যাসী গাছের উপর হইতে শিশুটিকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর রাণী ঋষির কুটীরে গমন করেন। সেখানে তিনি ঋষিকে প্রলুব্ধ করিয়া স্বামী স্ত্রীর মত বাস করিতে থাকেন। একদিন ঋষি নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, পরন্তপের নক্ষত্র শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতঃপর ঋষি রাণীকে পরন্তপের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "পরন্তপ আমার স্বামী ছিলেন এবং আমি তাঁহার রাণী ছিলাম। আমার পুত্র যদি সেখানে বাস করিত তবে সে রাজা হইত। ঋষি শপথ করিলেন যে তিনি তাঁহার পুত্রকে রাজ্যলাভে সাহায্য করিবেন। এই রাণীর পুত্রই পরে রাজা হইয়াছিলেন এবং ইনিই উদয়ন নামে পরিচিত। নূতন রাজা কোশম্বীর কোষাধ্যক্ষের কন্যা সামাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ভাসের বাসবদত্তায় উদয়নের সহিত বাসবদত্তার পলায়নের যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, সেই গল্প বুদ্ধঘোষেও পাওয়া যায়। উদয়নের মাগন্দিয়া নামে আরও একটি পত্নী ছিলেন। মাগন্দিয়া কুরুরাজ্যের জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যা (Udena vatthu p. 161 foll)।

কোশম্বীর উদয়নের উপাখ্যান মেঘদূত এবং সোমদেবের কথা-সরিৎ-সাগরেও পাওয়া যায়। বৎসরাজার রাজধানী কোশম্বী রত্নাবলী নামক নাটকখানির ঘটনাস্থল। রত্নাবলী রাজা হর্ষদেবের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। ললিতবিস্তারে কোশাম্বীরাজ শতানীকের পুত্র উদয়ন বৎসের জন্মদিন বুদ্ধের জন্মদিনের সহিত এক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (Faucaux, Tr. of the Tibetan Version of the Lalita Vistara)। তিব্বতীয়দের কাছে উদয়ন বৎস কোশম্বীর রাজা রূপেই পরিচিত। রত্নাবলীতে তিনি বৎসরাজ নামে অভিহিত। তাঁহার রাজধানীর নাম বৎসপত্তন (বৎসপত্তন কোশম্বীরই আর একটি নাম)। তাঁহার রাণীর নাম বাসবদত্তা এবং তাঁহার মন্ত্রীর নাম যৌগন্ধরায়ণ। উদয়ন সিংহলের রাজকুমারী সাগরিকার পাণিগ্রহণ করেন। এই সাগরিকা জাহাজ ডুবির পর উদয়নের রাজপ্রাসাদে নীত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে ভালবাসেন এবং বিবাহ করিতেও প্রস্তুত আছেন জানিতে পারিয়া বাসবদত্তা সাগরিকাকে কোনও গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। স্বপ্ন-বাসবদত্তা এবং প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, উদয়নের বাসবদত্তা এবং পদ্মাবতী নামে দুইটি পত্নী ছিলেন।

প্রচলিত বৌদ্ধ উপাখ্যান সমূহে উদেন এবং তাহার তিন পত্নীর দুঃসাহসিকতা এক দীর্ঘ গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। পালি গ্রন্থ উদেন বত্থু এবং সংস্কৃত গ্রন্থ মাকণ্ডিক অবদানের সংশোধিত সংস্করণ দুইটিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। গল্পটি বেশ ভাল, কিন্তু ইহার প্রত্যেকটি অংশ কতটুকু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বলা যায় না (Cambridge History of India, Vol. I. p. 187)।

স্বপ্ন-বাসবদত্তায় দেখা যায় যে আরুণী নামক একজন লোক উদয়নকে বিতাড়িত করিয়া বৎস সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন (Translation by Dr. Sukthankar, p. 64)।

নিহিত

মিশ্র কীর্ত্তন—ঝম্পক তাল।*

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

কুসুমের বুকে ফুটে যে সুবাস কুসুম তারে না দেখিতে পায়!
অসীমের ছায়া প্রতিফলি' নিখি অসীমের বাণী নিতি শুধায়!
কার লাগি অলি বসন্তে 'চ্ছ্বাস'
উতলা,—গোপনে সুরভি পরশি'?—
নিয়ত আকুল বাসনা বরষি'
গাহে কার স্মৃতি মলয়-বায়?
কম্প্র নিশীথে অম্বর-তলে
চাঁদিমা তারায় কার দীপ জ্বলে?—
ঊষালোকে কার শুভতা ঝলে
কাহারে বা সদা বরিতে চায়?
নভোনীলে যুগ যুগ রবি' শশী
কার মহিমার স্তবে উচ্ছল?—
নদ-নদী, গিরি-নির্ঝর কল-
তানে কাহার বা মিলনে ধায়?—

---

* ঝম্পক তালে তেওরার মতনই ঝোঁক পড়ে, কেবল তেওরার মাত্রা ৩ মাত্রা + ২ মাত্রা + ২ মাত্রা = ৭, ঝম্পকের—৩ মাত্রা + ২ মাত্রা + ৩ মাত্রা = ৮। আসলে এ তেওরারই ছন্দ; কেবল শেষ পদে একমাত্রা বেশি টেনে রাখা হয় তালটিকে একটু বিলম্বিত করার জন্যে। এতে সঙ্গীতশিক্ষার্থীর শুধু যে কোনো অসুবিধা হওয়ারও কারণ নেই তা নয়, শেষে একমাত্রা বেশি টেনে রাখার জন্যে তান প্রভৃতির নেবার সুবিধেই হবে। এ তালটি সচরাচর বাংলা গানে ব্যবহৃত না হ'লেও রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের এ তালে গান আছে। আমার যতদূর স্মরণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের "জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা" এই তালেই গাইতে শুনেছি। অতুলপ্রসাদের "এ বনেতে বনমালী"—এই তাল। —রচয়িতা।

তরু-লতা-তৃণে কার পরিমল
অণুতে অণুতে চির-চঞ্চল ?—
লুটাইলে কার শ্যাম অঞ্চল
সাঁঝ-ছায়া প্রিয়-ব্যথা জাগায় ?
ফুটিবে না যদি শূন্যতা মাঝে,
কেন নিতি নব সুন্দর সাজে
নিখিলে তোমার কিঙ্কিণী বাজে
আলেয়ার মোহমায়া বিছায় ?—
(প্রভু) অন্তরে রাজ, তবু অন্তর চাহে সে বারতা ভুলিতে হায় !
(কেন) চাহে সে বারতা ভুলিতে হায় !

\+ ১ ৩ ০ ১ ৩
মা গমপা পা | পা -া | ধপা ধপা মা | মা মপধা পা | পমা পা | মা গা মা |
কু সু মে র - বু কে - ঝু রে যে সু - বা স -

মা গমপধা ধপা | পা -া | ধপা ধপা মা | পা পা ধা | পধা নসা | ধনা পধা -া |
কু সু ম ভা রে না - দে খি তে পা - - - য়

পধা পসা সা | সা -া | র্সা র্সা না | না র্সা না | ধা ণা | ধা ণা পা |
অ সী মে র - ছা য়া - প্র তি ফ লি - নি খি -

পধা মপা পা | পা -া | পধা ধনা পা | পা পা ধা | গমা পধা | নর্সা র্রা -া |
অ সী মে র - বা ণী - - নি তি স্ব ধা - -

II সা না ধপধা | পক্ষা পা | ধনা না ধপা | II
কু সু মে র - - বু কে

না না নর্সা | নধা না | ধপা পা ধা | ধা না -া | নর্রা সর্রসনা | র্সা না -া |
কা র লা গি - অ লি - ব স ন্ তে - চ্ছু সি -

পা না র্সা | র্রা -া | র্রা র্রগা ধা | ধা ধা না -া | র্রগা র্রগা | র্সা না পা |
উ ত লা গো - প ন - সু র ভি প - র শি -

গ্রীস্

শ্রীভারতকুমার বসু

প্রাচীন গ্রীসের অমূল্য সম্পদ হচ্ছে—সেখানকার হেলাস্-বাসীদের সাহিত্য, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তির অমর অভিজ্ঞান। ·কিন্তু আধুনিক গ্রীসে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা সেই স্বনামধন্য হেলাসবাসীদের বংশধর নন। খৃষ্ট জন্মাবার চার শত বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রাচীন গ্রীসের গৌরব-রশ্মি ক্রমশঃ স্তিমিত হ'য়ে আসতে লাগলো, তখন সেই দেশ অর্থাৎ গ্রীস্ 'শ্লাভ্'-বংশীয়দের দ্বারা অধিকৃত হ'লো। আধুনিক গ্রীসের অধিবাসীরা হচ্ছেন সেই 'শ্লাভ'দেরই বংশধর।

কিন্তু গ্রীস বহু বছর ধরে বহু জাতির দ্বারা অধিকৃত হ'য়েছিল। এই জন্য, আধুনিক গ্রীকদের মধ্যে যে বহু জাতির রক্ত আছে, তা বেশ-ই বলা চ'লতে পারে। কিন্তু তবুও গ্রীকদের মধ্যে সেই প্রাচীন কালের হেলস্-বংশধর-দেরই চরিত্র সংযুক্ত আছে। এবং তা অপর সমস্ত প্রভাবকেই ছাপিয়ে ওঠে।··

তুর্ক শক্তি যখন দীর্ঘকাল ধ'রে বিজিত গ্রীকদের উপর অন্যায় শাসনের অত্যাচার সুরু ক'রেছিল, তখন একমাত্র সেই প্রাচীন গ্রীকদেরই বীরত্বমণ্ডিত আদর্শ এই নিপীড়িত জাতিকে মুক্তির পথে আনতে সমর্থ হ'য়েছিল। ১৮২৮ সালে অত্যাচারী তুর্কদের পদানত ক'রে, গ্রীসের মধ্যে আবার ফুটে উঠলো স্বাধীনতার একটি নব-জাগরণ।..পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।··

গ্রীক পুরোহিত। এঁদের হাতে সুন্দরভাবে বাঁধাই করা এক একটা ধর্মপুস্তক র'য়েছে।

স্বাধীন গ্রীসের মধ্যে আছে—চমৎকার অমায়িকতা, সুন্দর সামাজিকতা এবং সুশ্লীল ব্যবহারের বিশেষত্ব !··· বর্ণভেদ সেখানে একেবারেই নেই। আভিজাত্যের গর্ব্বকে গ্রীকরা ঘৃণা করে। পৃথিবীর একাধিক দেশে দেখা যায় যে, হয় ত এক ভাই ব্যবসায়ের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপায় ক'রছে ; কিন্তু অপর ভাইরা অক্লান্ত পরিশ্রমে কৃষিকাজের দ্বারা কোন প্রকারে দুবেলার জন্য অন্নের সংস্থান ক'রছে। কিম্বা হয় ত, এক ভাই আইন-ব্যবসায়ের দ্বারা দু'হাতে অর্থ উপায় ক'রে, তা রাখবার স্থান পাচ্ছে না ; অথচ তারই

অন্যান্য ভাইরা গৃহপালিত পশু ইত্যাদির রক্ষকের কাজ নিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে !·· কিন্তু গ্রীসে এ সব নেই। সেখানে সব সমান। কি ধনী, কি দরিদ্র,—কি অভিজাত কি নিম্নজাত,—সকলেরই সমান সম্মান! এদিক দিয়ে মনোবৃত্তির নীচতা সেখানে অপরিজ্ঞাত। সেখানকার একটী বাগানের মালী তার মনিবের কর মর্দ্দন ক'রে প্রীতির পরিচয় দিতে পারে। এবং যেহেতু সম্মানের দাবী রাখে সেখানকার প্রত্যেকেই, সেই কারণে, তবুও কোন নবনিযুক্তা বৃদ্ধা পাচিকার যে কোনো মুহূর্ত্তেই কাজ ছেড়ে চ'লে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, যদি না সে ইতোমধ্যেই ভদ্রোচিত ব্যবহারের দ্বারা একটী মহিলার মতো সম্মান ব'লে কোন কথাই সেখানে নেই) ব্যক্তির সঙ্গে ভোজন ক'রতে বসে, তা হ'লে, সে এমন আদব-কায়দায় এবং শিষ্টাচারের সঙ্গে পানাহার ক'রবে যে, তা সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রণালীর সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। কখন কখনও বা তা এই প্রণালীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ এবং মার্জ্জিতও হ'তে পারে।·· সেখানকার সংবাদপত্র বিক্রেতারা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে সুচিন্তিত কথাবার্ত্তা এমন তরলভাবে ক'য়ে যেতে পারে যে, তা শুনলে বাস্তবিকই অবাক হ'য়ে যেতে হয়!·

নবীন গ্রীসে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার কথ্য এবং লেখ্য ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন

জাতীয় ছুটীর দিনে নৃত্যের উৎসব।

পায়!·· সেখানকার কোনো ব্যক্তি যদি একটি আফিসে অল্প বেতনের কাজ পায়, তা হ'লে সে কখনই নিজেকে নিম্নপদস্থ চাকুরে ব'লতে রাজী হবে না; কারণ, মাইনে সে কম পেলেও, সম্মানের দাবী আছে তার অন্যান্যদের মতোই সমানভাবে। এবং এই সম্মান সে আপিসের কর্ত্তাদের কাছ থেকে যথারীতি পায়ও!··

কিন্তু সকলের চেয়ে লক্ষ্য করবার মতো জিনিষ হচ্ছে—সেখানে যারা ছোট কাজ করে তাদের ভদ্র ব্যবহার এবং সুচিন্তিত কথাবার্ত্তা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, হ'য়েছে। ইউরিপাইড্‌স্ এবং প্লেটো যে ভাষা ব্যবহার ক'রতেন আজ তা সেখানে অচল।···আধুনিক গ্রীক ভাষার সঙ্গে অনেক বিদেশী ভাষা সংযুক্ত হ'য়েছে। এবং তার মধ্যে ব্যাকরণের কসরৎ ঠাঁই পায় খুব কম। এদিক দিয়ে একটী চমৎকার ট্র্যাজেডির করুণতা আছে—

সেখানকার যাঁরা পুরানোপন্থী, তাঁরা ফতোয়া দিলেন যে, না, গ্রীসের প্রাচীন ভাষাকে 'বয়কট্' ক'রলে চ'লবে না। তা ভালো হোক, বা, মন্দ হোক, তাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে। সুতরাং—

পার্ণেসাস্ পর্ব্বতচূড়া থেকে সূর্য্যোদয় দেখ্‌ছে। এককালে এই স্থান এ্যাপোলো দেবতার মাহাত্ম্যে পুণ্যময় ছিল।
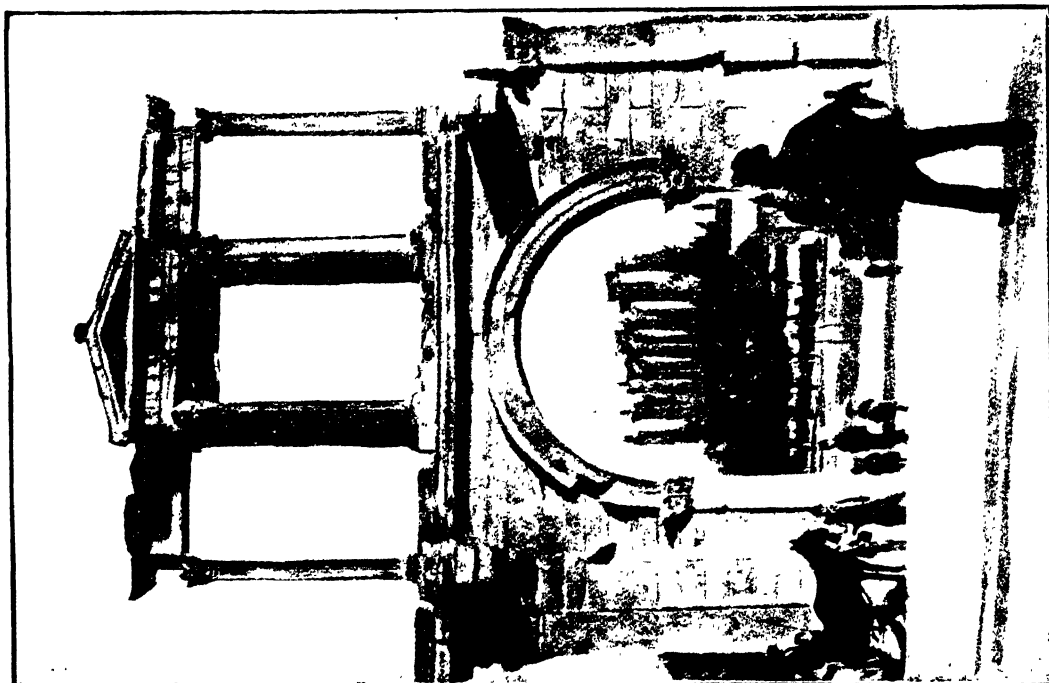
প্রাচীন ওলিম্পিয়া দেশের 'জিয়াস্' দেবতার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

তাতে আন্দোলনটি বেশই ঘনিয়ে উঠলো। শেষে, প্রাচীন ভাষাই গ্রাহ্য হ'লো।—কিন্তু ১৯০০ সালে উক্ত আন্দোলন আবার ভীষণ ভাব ধারণ ক'রলে। এবং তার ফলে পুরাতন ও নব্যপন্থীদের মধ্যে যে কেবল মুখে ও লিখেই তর্কাতর্কি চ'লতে লাগলো তা নয়, খুব শীঘ্রই এথেন্স্ সহরে এজন্য একটা দাঙ্গা সুরু হ'লো। এবং গ্রীক ভাষার

গ্রীক রমণী।

নব অলঙ্কার-দাতা পণ্ডিতেরা বিপক্ষ পক্ষের দ্বারা রীতিমত আক্রান্ত হ'লেন শুধু এইজন্য যে, তাঁরা কেবল যে 'যা-তা' পণ্ডিত, তা নন,—দেশের অপকারীও বটে!...

নব্যপন্থীরা কিন্তু এই আক্রমণের শোধ নিতে ছাড়লেন না। তাঁহাদের একজন নেতা অবিলম্বেই বিপক্ষদের এমন একটী গুরুতর প্রত্যুত্তর দিলেন যে, বেচারীদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ ক'রতে হয়েছিল অনেককেই। যাই হোক, আধুনিক গ্রীসের যা ভাষা, তা প্রাচীন গ্রীসের ভাষা নয়। এবং তা নতুন হোক বা নাই হোক, অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ।
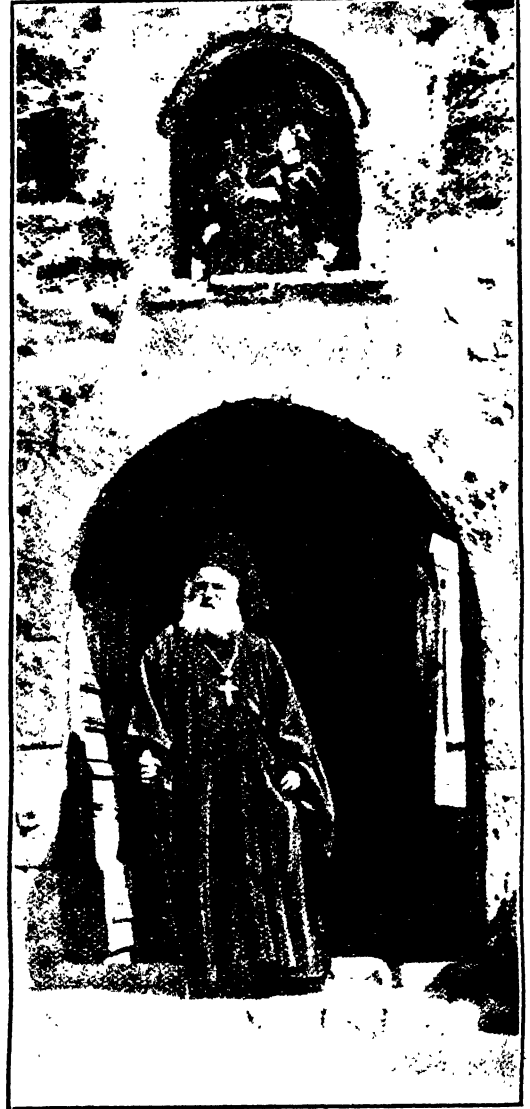
মঠের সাধু। গ্রীস দেশে নবাগতরা এঁদের কাছে অর্থাৎ মঠের মধ্যে এসে দিনকতক বেশই আশ্রয় পেতে পারেন। এ বিষয়ে কোনো বাধা সেখানে নেই।

গ্রীসদেশের লোকদের চরিত্রের একটি সুন্দর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, কোনো কিছু ব্যাপার জানবার জন্য তারা

কৌতূহলী হ'য়ে পড়ে অত্যধিক। এই জন্য যদি কোনো বিদেশী ভ্রমণকারী সেখানে যান, তা হ'লে প্রথমেই আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে একটা প্রশ্ন করা হবে যে, কোথা থেকে তিনি এসেছেন?… বিদেশীও খুব সরল-হৃদয় হ'লে তাঁর ভ্রমণের কথা, এবং ক্রমে আনন্দের সঙ্গে তাঁর দেশ, সমাজ, ব্যবসায় এমন কি নিজের সংসারের কথারও গল্প ব'লতে আরম্ভ ক'রবেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে কৌতূহলী শ্রোতার দল এসে বিদেশীকে ঘিরে দাঁড়াবে, এবং তার একটা কথাও যাতে না কোনদিকে যায়, এ জন্য স্থিরকর্ণে তা শুনতে থাকবে। বিদেশী যদি তাঁর গল্পের মধ্যে কোন কথা বাদ দেবার চেষ্টা করেন, তা'হলে গ্রীক শ্রোতারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ভোড়কে যাবে এবং ভেবেই পাবে না যে, বিদেশী ভ্রমণকারীর এইভাবে কথা চাপবার প্রয়োজন কি!—প্রয়োজনটার বিষয় তলিয়ে বোঝবার জন্য তারা অবশ্য তৎক্ষণাৎ তাদের মস্তিষ্কের রীতিমত ব্যায়াম ক'রতে ভুল করে না।…

গ্রীকেরা হচ্ছে অত্যন্ত সঙ্গী-প্রিয়। মানুষের সঙ্গে ভাব ক'রতে তারা ভালবাসে যেমনি, তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন ক'রতে আনন্দও পায় তেমনি। এইজন্য গ্রীসদেশে
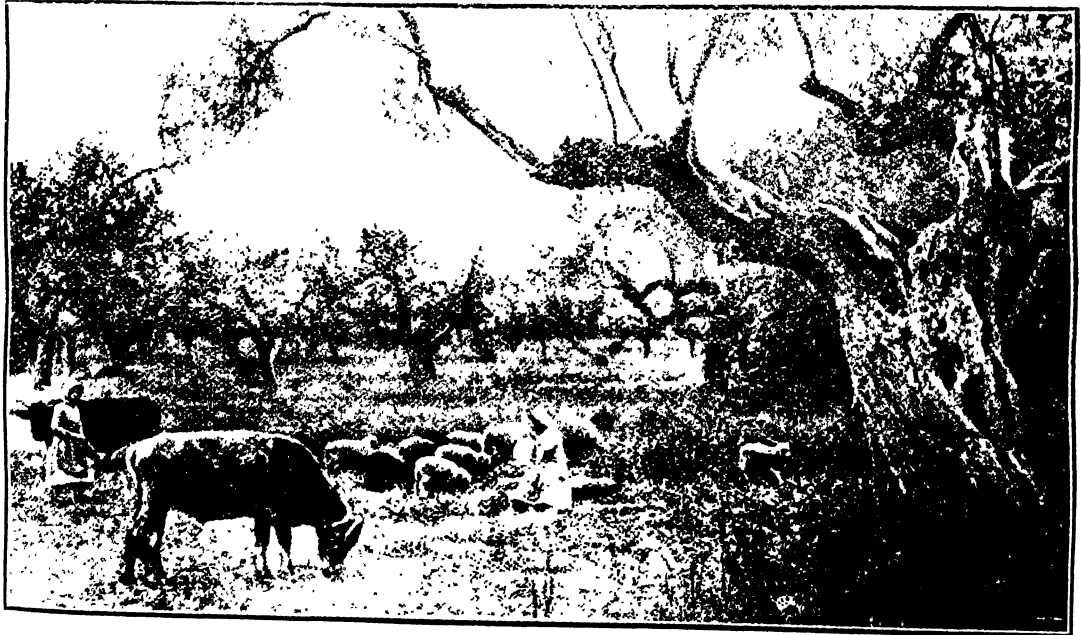
প্রাচীন স্পার্টা দেশের এই স্থান এক কালে তরুলতাকুঞ্জে মনোরম ছিল
এখন সেখানে কুমারীরা গৃহপালিত পশুদের চরাচ্ছে।

আগত কোনো বিদেশী ভ্রমণকারী নিজের দিনগুলিকে বেশ প্রীতিময় ক'রে তুলতে পারেন, যদি তিনি সঙ্গী-প্রিয়, সরলহৃদয় গ্রীকদের সঙ্গে বেমালুম মিশে যেতে পারেন। গ্রীসদেশে অতিথি-সৎকার জিনিষটা কেবল যে কর্ত্তব্য হিসাবে গণ্য হয়, তা নয়—একটা যথার্থ আনন্দের বস্তু হিসাবেও! কিন্তু আশ্চর্য্য, গ্রীসদেশের বাইরে অনেকেরই মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, গ্রীকেরা মোটেই অতিথি-সৎকার-পরায়ণ নয়। কিন্তু ও হচ্ছে একেবারে অনভিজ্ঞ অথবা বিদ্বেষীর কথা। গ্রীকজাতি যে কত উদার, কত শিষ্টাচারী, তা গ্রীসের মধ্যে একটীবার গেলেই বুঝতে পারা যাবে! সেখানে যদি কোন ভ্রমণকারী তাঁর উপকারককে উপকারের মূল্য দিতে যান, তা হ'লে, সেই উপকারক গ্রীক কখনই সে মূল্য নিতে রাজি হবে না। কারণ, গ্রীকদের অভিমত হচ্ছে এই যে, তারা উপকার করে পবিত্র আন্তরিকতার সঙ্গে। এবং মূল্যের বিনিময়ে তা গ্রাহ্য অথবা দেয় হ'লে তার সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হবে।...

মাসিডোনিয়ার উদ্বাহ-বিধি। মাসিডোনিয়ায় বিবাহ উৎসব উপলক্ষে বিরাট ভোজ ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। বিবাহ উৎসবে প্রাত:কালীন ভোজই সর্ব্বপ্রধান ব্যাপার! এই সময়ে একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। আমাদের বৌভাত বা পাকস্পর্শের সময় যেমন 'কনে'কে খাদ্য পরিবেষণ করতে হয়, এই ভোজে মাসিডোনিয়ান 'কনে'ও অতিথিদের খাদ্য পরিবেষণ করে। চিত্রের 'কনে'টি প্রত্যেক বর ও কন্যাযাত্রীকে এক-একখানি রুমাল উপহার দিচ্ছে। অতিথিদের মধ্যে যিনি যত সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ তাঁকে তত উৎকৃষ্ট রুমাল [illegible]।

এথেন্স্ সহরের রাজপ্রাসাদের রক্ষী।

স্বদেশ-সেবক গ্রীক যুবকদের প্রীতির শোভাযাত্রা।

কূপ থেকে জল তুলছে।
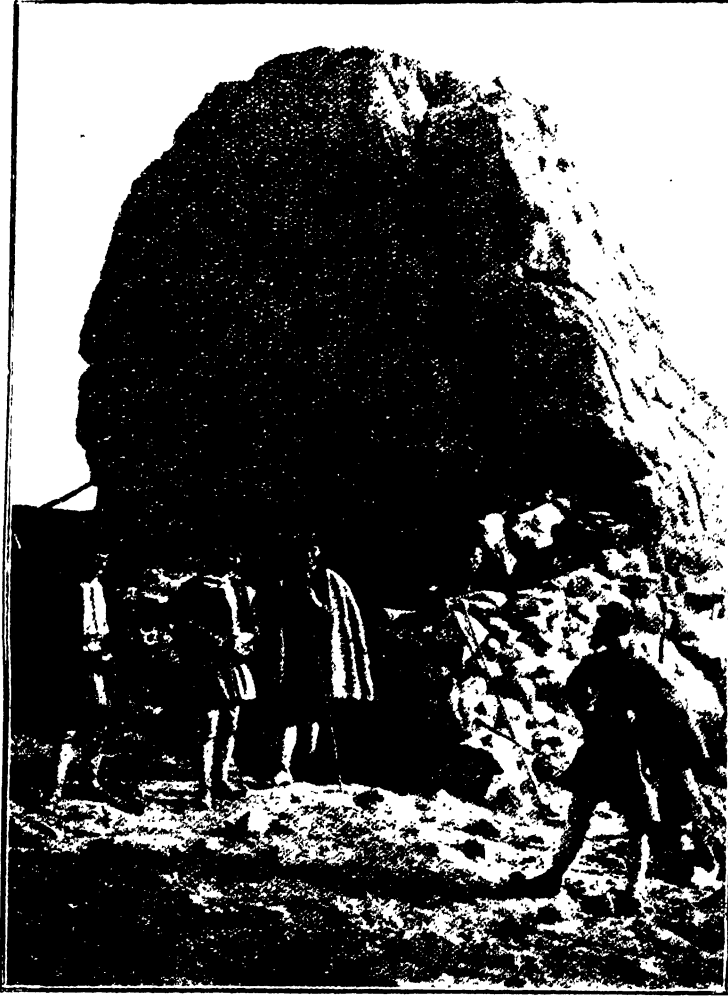
গ্রীসের পার্নেসাস্ পর্ব্বত। বহু বর্ষ ধ'রে ঝড়-ঝাপটার এবং বৃষ্টির ধারায় বহু অংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে, এই পর্ব্বতটা এখন দস্যুদের আশ্রয় স্থল হ'য়ে উঠেছে।

নৃত্য।

গ্রীসদেশের একটি জিনিষ কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য ব্যক্তি বরদাস্ত ক'রতে পারেন না। তা হচ্ছে দোকানদারীর ব্যাপার। সাধারণতঃ সেখানকার দোকানদারেরা তাদের জিনিষ-পত্তরের এত বেশী দাম বলে যে, বাস্তবিক সে-সব জিনিষের দাম মোটেই তা নয়। কিন্তু এই ব্যাপারটা গ্রীকদের কাছে একেবারেই বে-তালা ঠেকে না। ইংরাজ ভদ্রলোকেরা কিন্তু এই জিনিষটিকে রীতিমত ঘৃণা করেন। একবারকার একটী ঘটনা—

একটী ইংরাজ ভদ্রলোক একদিন সেখানে এক গ্রীক দোকানদারের কাছে কতকগুলি জিনিষ কিনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিক্রেতা জিনিষগুলির দাম হাঁকলেন—আসল দামের দ্বিগুণ, হয় ত তিন গুণ-ও! ইংরাজ ভদ্রলোকটী এই অসঙ্গত দর শুনে অত্যধিক বিস্মিত হ'য়ে গেলেন এবং অবিলম্বেই গুরুতর ভাবে খাপ্পা হ'য়ে উঠলেন।...তাঁর ব্যাপার দেখে, দোকানদার রীতিমত বিস্মিত হ'য়ে গেল। সে কেবলই ভাবতে লাগলো যে, তার এই ক্রেতাটীর হঠাৎ এ-হেন 'চটিতং' হবার কারণ কি?...

রাজনীতি হচ্ছে গ্রীকদের অন্যতম প্রধান এবং প্রয়োজনীয় চর্চ্চার বস্তু। অনেকে বলেন যে, রাজনীতির জন্যে গ্রীকেরা যত আন্তরিকতা এবং উৎসাহ ঢেলে দেয়, তত উৎসাহ এবং আন্তরিকতা যদি তারা ব্যবসা এবং কৃষিকাজ ইত্যাদির ব্যাপারে দেখাতে পারে, তা হ'লে অদূর-ভবিষ্যতে গ্রীস সব দিক দিয়েই নিশ্চয়ই সুসমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে! কিন্তু আশ্চর্য্য, খৃষ্ট জন্মাবার

চার শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসের যে উপত্যকায় এবং যে নদীর তীরে প্রাচীন কবিদের দ্বারা গৌরবান্বিত কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান হ'তো, এখন সেগুলি দেখলে, আর যেন

প্রাচীন গ্রীক বীর থিসিয়াসের কবরের উপর স্মৃতিমন্দির। গ্রীক স্থাপত্যের অদ্ভুত এই নিদর্শনটা পৃথিবীর কাছে "থিসিয়াস্" -নামে পরিচিত।

কাটা-শস্য থেকে আবর্জ্জনা সরিয়ে ফেলবার জন্য শস্যগুলি ওই জাল্‌তির উপর রাখছে। ওই জাল্‌তির ফাঁকের ভিতর-দিয়ে-পড়া আবর্জ্জনাগুলা পরে ওই বালকের হাতের পাখার হাওয়ার দ্বারা দূর হ'য়ে যাবে।

সে-রকম আনন্দ পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা যেন অনেকটা জোর ক'রে আনা! ..এক কালে ওলিম্পিয়ার যে স্থানে বিখ্যাত ক্রীড়া-কৌতুকের আসর ব'সতো এবং ডেল্‌ফির যে স্থানে বিস্ময়কর দৈববাণী উচ্চারিত হ'তো, এখন তার স্মৃতি-চিহ্নের দিকে দৃষ্টি ফেরালে হৃদয়ে কতটুকুই বা পুলকের সঞ্চার হয়?···তবু ওই স্থানগুলি পূর্ব্ব গৌরবের জন্য আজও অমর, অক্ষয় হ'য়ে আছে! ··

ওলিম্পিয়ার কাটাকোলো নামক একটী বন্দর থেকে ট্রেনে ক'রে এলে, প্রথমে একটী শস্যশ্যামল মাঠে আসা যায়। আরও কিছু দূর এগুলে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে ছোট্ট একটী ষ্টেশন পাওয়া যায়। এই ষ্টেশন থেকে হাঁটা-পথে খানিক দূর এলেই চমৎকার একটী পল্লীর ভিতরে নীল নদীর তীরে নির্দ্দিষ্ট একটী স্থানে পড়া যায়। এই স্থানটাই হচ্ছে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ! ওলিম্পিয়ার বিখ্যাত ক্রীড়া কৌতুকের আসর ব'সতো এইখানেই!·· এখানে দাঁড়ালে, একটুখানি চিন্তা ক'রলেই যে-কোনো ব্যক্তির মনে একটীর পর একটী ক'রে পূর্ব্বেকার সমস্ত ঘটনাগুলিই যেন জেগে উঠবে। তার চোখের সামনে যেন ফুটে উঠবে সুন্দর একটী দৃশ্য –

চারিধার ঘিরে কৌতূহলী দর্শকের সারি দাঁড়িয়ে র'য়েছে। তাদের মাঝখানে লীলা-মঞ্চে শক্তির কসরৎ চ'লেছে! সেই সমস্ত শক্তিধরের দেহ কখনো এগুচ্ছে, কখনো পেছুচ্ছে। দুই চোখে তাদের সে কী অনন্ত উৎসাহ! অবশেষে বিজয়ী বীর আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে পত্রপুষ্পমালায় বিভূষিত হ'লে

কিন্তু হায়, ওলিম্পিয়ার এই যে মধুর স্মৃতি-বিজড়িত স্থান, যেখানে এক কালে অনন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সৌন্দর্য্য ও শক্তি-দেবতার পূজা করা হ'তো, আজ সেখানে তার ধ্বংসটুকু প'ড়ে আছে মাত্র!

···কালের করাল কোলে পৃথিবীর ইতিহাসের একখানি উজ্জ্বল পাতা জন্মের মতো মুছে গেছে ধীরে ধীরে! ··

কিন্তু এই পল্লীতে একটী সুন্দর মিউজিয়াম আছে।

সেখানে একটী বালকের এমন চমৎকার একটী মূর্ত্তি আছে, যা পৃথিবীর কাছে একটী নিখুঁত শিল্প-অভিজ্ঞানের গৌরবের দাবী করে। মূর্ত্তিটী তৈরী হ'য়েছিল প্রায় ২৫০৭ বৎসর পূর্ব্বে! কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এটীর কোনো অংশ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি!...

সেখানে প্রায়ই দেখা যায়, মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত রৌদ্রে কাতর হ'য়ে পল্লবিত তরুর শীতল ছায়াতলে ব'সে, রাখালেরা তাদের মাঠে-চরা গৃহপালিত পশুদের সাড়া দিয়ে আপন মনে অতি করুণ সুরে বাঁশী বাজাচ্ছে! এই জিনিষটীর মধ্যেই আছে খাঁটী প্রাচীন গ্রীসের ছাপ! যুগের প্রভাব এটীর পরিবর্ত্তন ক'রতে পারেনি কখনো!...

ডেল্‌ফিতে ইটিয়া নামক একটী বন্দর আছে। এই বন্দর থেকে বেরিয়ে পল্লীপথের ভিতর দিয়ে বরাবর এলে একটী চমৎকার উপত্যকা পাওয়া যায়। এই উপত্যকার এক ধারে একটী পাহাড়ের গায়ে একটী স্থান আছে। গ্রীসের ইতিহাসে এটী একটী বিখ্যাত স্থান। এই স্থানেই প্রাচীন কালে দৈববাণী উচ্চারিত হ'তো। এই স্থানটিকে উপর থেকে আবরণ দিয়ে আছে—পার্ণেসাস পর্ব্বত এবং এটীকে রাত-দিনই পুণ্য-শীতল ক'রে রেখেছে—কাষ্টালিয়ান্ ঝর্ণার সুস্নিগ্ধ ধারা! এই স্থানের পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি হৃদয়ে নিয়ে এখনো অনেক ব্যক্তি এখানে তীর্থযাত্রীর মতো উপস্থিত হন! কিন্তু হায়, এ্যাপোলো-পূজারিণীর দ্বারা কথিত হবার জন্য আজ আর সেখানে সেই দৈববাণীর ইঙ্গিত জাগে না!...আন্ত-রিকতা ও পুণ্যের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি বা তার মহিমাও ক্রমশঃ লুপ্ত হ'য়ে গেছে।...

কিন্তু সঙ্গীত-দেবীর প্রতি আজো গ্রীকেরা অটুট শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখে। যান-চালক, মেষ-রক্ষক, কৃষক—ইত্যাদি যে

গাধার পিঠের উপর চ'ড়লেও কোনো রকম অসুবিধা বিবেচনা না ক'রে, গ্রীক-রমণীর প্রিয় কার্য্য—সুতা পাকানো।

জেমেনন্ দেশের পুরোহিতদের সারল্যভরা গৃহ-জীবন।

যেখানে যে কাজেই থাকুক না কেন, গান হচ্ছে তাদের প্রীতির একটী অন্যতম প্রধান বস্তু!...

গ্রীসদেশের অন্যতম দ্রষ্টব্য জিনিষ হচ্ছে—এথেন্‌সের কতকগুলি প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল এথেন্‌সের অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে। পৃথিবীর কাছে এই মন্দিরগুলি আজও তাদের স্থাপত্য-গৌরবের দাবী রাখে! সুনীল নীলিমার তলে রবির আলো যখন এসে সেগুলির উপর লুটিয়ে পড়ে, তখন তার মর্ম্মর-বক্ষ থেকে যে উজ্জ্বল আলোর ঝিকিমিকি ফুটে ওঠে, তা দেখে মনে হয়, যেন পঁচিশটী শতাব্দীর পুঞ্জীভূত স্বর্ণ-রশ্মি তা থেকে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে! কিন্তু এই মন্দিরগুলিই যে কেবল গ্রীসের প্রাচীন গৌরব, তা নয়। মন্দিরগুলির সঙ্গে ডায়োনিসসের যে নাটমন্দিরটী সংযুক্ত আছে, সেটীও এথেন্‌সের একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু! ··

এথেন্‌স্ সহরে কোনো একটী সুন্দর অপরাহ্নে পথের উপর দিয়ে বেড়াতে বেরুলে, প্রথমেই পথিককে জ্বালাতন ক'রে তুলবে—কতকগুলি ছবি ফুল ইত্যাদি জিনিষ বিক্রয়েচ্ছু ফেরীওয়ালা। এদিক দিয়ে গ্রীকেরা আগেও যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনই আছে। কিন্তু পূর্ব্বতন গ্রীসের পতনের একমাত্র কারণ ছিল —প্রতিবেশীর জীবন ধারণের মধ্যে আন্তরিকতার

ক্ষেতে চাষ ক'রছে।

একান্ত অভাব।—এ সম্বন্ধে কিছু বছর পূর্ব্বে একখানি গ্রীক সংবাদপত্রে যা লিখিত হ'য়েছিল, তা হচ্ছে এই—

"যদি আমাদের কাগজে গ্রীসের ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা সাধারণ বিষয়ের উন্নতির কথা প্রকাশ করা হয়, তা হ'লে আমাদের কাগজ হয় ত প্রত্যহ মাত্র ষাটখানি ক'রে বিক্রী হবে। কিন্তু যদি আমাদের কাগজে এমন সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে থাকবে পার্লামেণ্ট্‌কে পরাজিত

গ্রীক সৈনিক।

করবার কথা, অথবা, দুটী পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকে একদলভুক্ত করবার পরামর্শ, তা হ'লে আমাদের কাগজের প্রচার দিন-দিন প্রচুর পরিমাণে বাড়বে!"

এথেন্‌স্ সহরের দোকানে কোনো কিছু জিনিষ কিন্‌তে যাওয়া যে কী রকম বিস্ময়কর মজার কথা, তা পূর্ব্বেই লিখেছি। সেখানকার জেলখানা দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটী কিন্তু ওর চেয়েও বেশী বিস্ময়কর এবং কৌতুকাবহ! ··প্রাচীন এথেন্‌সের যেখানে প্রবেশ-দ্বার ছিল, তারই নিকটস্থ এক অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়ে গেলে, প্রথমেই দেখতে পাওয়া যাবে, পাশেই একটা বাড়ীর লোহার গরাদযুক্ত একটা ঘরের ভিতর থেকে গরাদের ফাঁক দিয়ে কতকগুলি জীবন্ত হাত বেরিয়ে র'য়েছে!···

ওইগুলিই হচ্ছে দুর্ভাগ্য কয়েদীদের হাত। এবং সেই বাড়ীটাই হচ্ছে জেলখানা।···

এই জেলখানা দেখবার ইচ্ছা হ'লে, জেলখানার ফটকের রক্ষক যিনি তাঁর কাছে আবেদন পেশ ক'রতে হবে।

পল্লীবাসিনী গ্রীক রমণীরা এই রকম বিপুল উই-ঢিপির মতো চুল্লীর ভিতরে তাদের রুটি স্যাঁকে।

কারণ, প্রবেশপত্র দেওয়ার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাঁর উদার মেহেরবাণীর উপর নির্ভর করে। সুতরাং—

কোনো বিশিষ্ট বস্তুর দ্বারা বন্ধ ক'রে দিয়ে ভিতরে আসতে ভুল করেন না।···

বাস্তবিকই জেলখানার ঘরগুলা যেন এক একটা লোহার গরাদযুক্ত খাঁচা। এই সব খাঁচার ভিতরে কয়েদীরা—বাইরে-থেকে-আসা পরিদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিদের দেখ-লেই, হাতের ইঙ্গিত ক'রে এবং চীৎকারের দ্বারা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। এই কয়েদীদের সকলেরই যে কোর্ট থেকে বিচার হ'য়ে গেছে, তা নয়। হয় ত অনেকের হ'য়েছে, আবার হয় ত অনেকের হয়ও নি। এমন কখন কখনও হয় যে, বিচারের পূর্ব্বেই আসামীরা এইভাবে কারা-বন্দী হ'য়ে থাকে প্রায় আট মাস পর্য্যন্ত! কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কারণ, গ্রীসদেশে সামান্য একটা ব্যাপারেরও প্রায়ই বিচার হ'য়ে থাকে—ন' মাস, দশ মাস,—এমন কি, এক বছর পরেও!··

সেখানকার কয়েদীদের প্রতি যা ব্যবহার করা হয়, তাকে ভালো বলা যায় না কখনও। তাদের জন্য যা খাবার দেওয়া হয়, তা একেবারেই অখাদ্য। কাজেই, জেলখানায় ব'সে ব'সেই তারা এক প্রকার খেলনা তৈরী করে (এটুকুর অধিকার কর্ত্তৃপক্ষ তাদের দিয়েছেন)। সেই সব খেলনা তারা—জেলখানা পরিদর্শনকারী ব্যক্তিদের কাছে বিক্রী

Lycabettus পর্ব্বতের উপর থেকে এথেন্স্ সহরের দৃশ্য।

সুতরাং প্রবেশপ্রার্থীরা ন-অতি-বিলম্বেন দ্বার-রক্ষক-প্রভুর উন্মুক্ত করতল কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল এবং আকর্ষণকর

করে। সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থেই তাদের ওরই মধ্যে একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয়। এমন কি, তারা সম্ভবপর

যে-কোনো জিনিষই চাইলে, তাই-ই এনে দেওয়া হয়।… কিন্তু তা হ'লেও, সমগ্রভাবে ধ'রলে, সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা কয়েদীদের জন্য যে সব হীন ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, তা অন্ততঃ সভ্য গ্রীসের কাছে আশা করা যায় না। সেখানকার কয়েদীদের শোবার জন্য খান কয়েক চট্-ও কি দিতে নেই? এবং এ-ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গ্রীক সভ্যতার পরিচয় দেয় না।…

এ সম্বন্ধে অনেক বিদেশী ভ্রমণকারীর ভ্রূকুটিপূর্ণ আলোচনা যে বহুবার গ্রীকদের লক্ষ্যীভূত হয়নি, তা নয়। কিন্তু উক্ত ব্যাপারের দিক দিয়ে গ্রীস যথা পূর্ব্বং তথা পরং। আশ্চর্য্য!…

কাম্য

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

এই দুনিয়া—পাগলাদহের ভাঙ্গনধরা 'তটের' পর
হায় দেওয়ানা, সাধ ক'রে তুই আশার বাসা বাঁধতে চাস্!
(তোর) পায়ের তলে প্রলয় তুফান উচ্ছ্বসিত নিরন্তর,
বজ্রভরা কাল বোশেখী ঊর্দ্ধে হাসে অট্টহাস।
হেথায় বাসা বাঁধতে চাস্!

বন্ধ্যা আশায় অন্ধ হ'য়ে যেথানে তুই গড়বি ভিত্,
অলক্ষিতে সেথায় বসি প্লাবন হাঁকে সিংহনাদ,
যেথানে তুই রাখ্‌বি চরণ, শরণ ভাবি সুনিশ্চিত,
সেইখানেতে দেখ্‌বি পাতা তোরই তরে মরণ-ফাঁদ॥

এই দুনিয়ার মুদিখানায় বেচা-কেনার হট্টগোল,
হায় দেওয়ানা, এই হাটে তুই বুকের বোঝা বেচ্‌তে চাস্!
সবাই দেখি সাফাই হাতে আপন পাতে টানছে ঝোল—
ওষ্ঠপুটে কিন্তু লুটে মিষ্ট হাসি, শিষ্ট ভাষ!
হেথায় ব্যথা বেচ্‌তে চাস্!

হাস্য সেথা সুলভ অতি, অশ্রুভারি আক্রাদর,
ব্যথার-ভরা পশরা তোর, হেথায় ক্রেতা মেলাই দায়,
চাস্ কি নিতে শুষ্ক হাসি, অর্থরাশি অতঃপর
হৃদয়-ভাঙ্গা, রক্ত-রাঙ্গা অর্ঘ্যডালি অর্পি পায়?

* * * *

রচুক বসি' বালুস্তূপে, বাসনা যা'র বাঁধতে নীড়,
দেহমনের কোন কোণে সে কামনার চিহ্ন নাই,
মর্ম্মরেরও বিনির্ম্মিত হর্ম্ম্যমালা উচ্চ শির
তুচ্ছ করি, মর্ম্মপুরে পাই যদি গো বিন্দু ঠাঁই॥
ইহার বেশী কাম্য নাই॥

চাইনে আমি মরীচিকার মায়ায়-ভরা মিথ্যা হাস,
চাইনে আমি মণি-মাণিক সোনা-রূপার জগদ্দল,
পাই যদি গো দিল্ দরদীর মর্ম্মভেদি দীর্ঘশ্বাস,
পাই যদি গো সিন্ধু-সেচা শুক্তি-আঁখির মুক্তা-ফল॥
এ ছাড়া কি চাইব বল্!

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ

রাজনীতিতে প্রগাঢ় জ্ঞান, স্বদেশসেবায় প্রবল উৎসাহ, সত্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকল্পে অক্লান্ত চেষ্টা, যে সকল প্রতিভাশালী স্বদেশপ্রেমিকের নাম বাঙ্গালীর নিকট চির-স্মরণীয় করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি উমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান অতি উচ্চে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই দিবসে ক্রয়ডনে খিদিরপুর হৌসে তিনি দেহরক্ষা করেন। আজি তেইশ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু-বাসরে 'ভারতবর্ষ' তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ পিতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কলি-কাতার একজন সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা ও খিদিরপুরে তাঁহার বহু ভূসম্পত্তি ছিল। পিতামহের খিদিরপুরস্থ উদ্যানবাটিকাতেই ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের উনত্রিংশ দিবসে উমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন এটর্ণি মেসার্স কলিয়ার বার্ড এণ্ড কোম্পানীর অফিসে মুৎসুদ্দী ছিলেন। অনেক অর্থোপার্জ্জন করিলেও মৃত্যুকালে তিনি বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতা গিরিশচন্দ্র হিন্দু-কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমে পিতার অফিসে কেরাণী-রূপে প্রবিষ্ট হন এবং পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এটর্ণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্ণির ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ইনি পরে 'জজ এবং ব্যানার্জী' নামক প্রসিদ্ধ এটর্ণির অফিসের অন্যতম অংশীদার হন। উমেশচন্দ্রের জননী সরস্বতী দেবী ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় কুলই প্রতিভা ও স্মৃতি-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ হইলেও উমেশচন্দ্রের বাল্য-জীবনের ঘটনাবলী তাঁহার ভবিষ্যৎ অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার কোনও আশার সূচনা করে নাই। বাল্যকালে সিমুলিয়ায় হরেরাম নামক জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু পাঠে তিনি অত্যন্ত অবহেলা করিতেন। যাত্রা ও থিয়েটারের তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন এবং কৈশোরে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে তিনি সিংহ মহো-দয়ের সহিত অভিনয় করিতেন। সুন্দর আকৃতি এবং সরল ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে কালীপ্রসন্নের বিশেষ প্রীতিভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। পুত্রের এই পাঠে অমনোযোগিতা ও অভিনয়ে আসক্তি দেখিয়া পিতা শঙ্কিত হইলেন এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে মিঃ ডব্লিউ-পি-ডাউনিং নামক জনৈক এটর্ণির অফিসে তাঁহাকে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। এখানে কিছুদিন কায করিবার পর উমেশচন্দ্র মিষ্টার ডব্লিউ-এফ-গিল্যাণ্ডার্স নামক আর একজন এটর্ণির অফিসে প্রবেশ করেন। পুত্রকে উত্তমরূপে ইংরাজীবিদ্যায় পারদর্শী করিবার জন্য অতঃপর পিতা আর এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার পরম বন্ধু সিমুলিয়া নিবাসী গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইংরাজীতে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট উপদেশ পাইলে পুত্র ইংরাজী শিখিতে পারিবেন বলিয়া পুত্রকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। গিরিশচন্দ্র এই সময়ে 'বেঙ্গলী' নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র অনধিক কুড়ি টাকা মাসিক বেতনে তাঁহার অধীনে 'বেঙ্গলী' অফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন—এবং উক্ত পত্রের প্রথমেই যে সকল সংবাদ প্রদত্ত হইত উমেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তাহা সঙ্কলন করিতেন। ক্রমে ক্রমে গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজী প্রস্তাব রচনা করিতে শিক্ষা দান করেন। উমেশচন্দ্র (তখনকার ডাক নাম মতিবাবু) প্রত্যহ গিরিশ-চন্দ্রের বাটীতে আসিয়া রচনা সংশোধন করিয়া লইতেন। পরিণত বয়সেও উমেশচন্দ্র স্বীকার করিতেন যে গিরিশচন্দ্রের নিকট তিনি ইংরাজী মক্স করিতেন। গিরিশচন্দ্রের সহবাসে উমেশচন্দ্রের অসাধারণ উন্নতি হয়। তিনি গিরিশচন্দ্রের নিকট কেবল বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতেই শিখেন নাই, তাঁহার নিকট স্বদেশ-সেবার দীক্ষাও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীর প্রসিদ্ধ ক্রোরপতি রোস্তমজী জেমসেটজী জিজিভাই ইংলণ্ডে ব্যবস্থাশাস্ত্র-শিক্ষাভিলাষী ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণকে পাঁচটী ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টকে তিনলক্ষ টাকা দেন। এই ছাত্রবৃত্তির মধ্যে তিনটী বোম্বাইপ্রদেশবাসী, একটী বঙ্গবাসী ও একটী মাদ্রাজবাসী পাইবেন—দানের এই সর্ত্ত ছিল। যথাযোগ্য স্থানে গিরিশচন্দ্র সুপারিস করিলে উমেশচন্দ্র বাঙ্গালার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছাত্রবৃত্তিটি প্রাপ্ত হন এবং উক্ত বৎসর ১৬ই অক্টোবর ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

ইংলণ্ডে উমেশচন্দ্র মিড্‌ল্ টেম্প্‌লে আইন অধ্যয়ন করেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে স্যর ফিরোজসাহ মেটা এবং বদরুদ্দীন তায়েবজীর নাম ভারতবাসীমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে উমেশচন্দ্র কেবল টি-এইচ-ডার্ট, সি-এডওয়ার্ড ফ্রাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞদিগের নিকট ব্যবস্থাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াই সময় অতিবাহিত করেন নাই, ছাত্রাবস্থাতেই স্বদেশের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটী নামক একটি সভা স্থাপন করেন এবং বন্ধুগণের সহযোগে ভারতীয় বিষয় সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই এই সভায় তৎকর্ত্তৃক পঠিত "ভারত-বর্ষের জন্য নির্ব্বাচনপ্রথা ও গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সভা পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। এটর্ণি পিতা জীবিত থাকিলে উমেশচন্দ্র আরও দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু পিতার মৃত্যুসত্ত্বেও এবং তৎকালীন সমাজে বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে সাধারণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও উমেশচন্দ্র স্বাভাবিক প্রতিভার গুণে অল্পকালের মধ্যেই ব্যারিষ্টাররূপে বিলক্ষণ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে তাঁহার এই অসাধারণ প্রতিপত্তির কারণ তিনটী। প্রথম কারণ, বহু এটর্ণি তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করেন। দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তি এবং তথ্য সংগ্রহে নিপুণতা। তৃতীয় কারণ, সরলভাবে প্রকৃত তথ্যগুলি বিচারককে বুঝাইয়া দিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

ব্যারিষ্টাররূপে তিনি যে অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। তবে মোহন্ত মাধবগিরি ও নবীনের মোকদ্দমা, সুরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক নরিসের মানহানির মোকদ্দমা এবং রবার্ট নাইটের মোকদ্দমা প্রভৃতিতে তিনি যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিচারবুদ্ধি ও তর্কশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য।

কি আদিম বিভাগে, কি আপীল বিভাগে, উমেশচন্দ্র এতাদৃশী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন যে, ১৮৮১ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি অন্যূন চারিবার ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সেলের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে এই পদ আর কোনও বাঙ্গালী পান নাই। ১৮৮২ এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া-ছিলেন, কিন্তু তিনি উক্ত পদ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তাঁহার মাসিক আয় অন্যূন দশহাজার টাকা।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ল ফ্যাকাল্টির সভাপতি হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৩, ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত সভায় তিনি স্বদেশবাসীর পক্ষ হইয়া অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইলবার্ট বিলের মহা আন্দোলনের পর উমেশচন্দ্রের মনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সংকল্প জাগিয়া উঠে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উমেশচন্দ্রই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে উমেশচন্দ্র দ্বিতীয়বার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথের মৃত্যুর পর কিছুকাল তিনি কংগ্রেসের সেক্রেটারী এবং সেই জাতীয় মহাসমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। কংগ্রেসে অনেকে হয় ত উমেশচন্দ্রকে বাগ্মিতায় বা উৎসাহে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু রাজনীতিক জ্ঞানের গভীরতায় এবং স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতায় কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে স্বাস্থ্যানুরোধে প্রতি বৎসর উমেশচন্দ্র পূজার ছুটীতে ইংলণ্ডে যাইতেন। তিনি ক্রয়ডনে একটি বাটী

ক্রয় করিয়া 'খিদিরপুর হাউস' নাম দিয়াছিলেন এবং তথায় বাস করিতেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র স্বাস্থ্যান্বেষণে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আলস্যে কালযাপন করেন নাই। দাদাভাই নৌরোজী, মিঃ ডিগ্‌বী প্রভৃতি বন্ধুগণের সহায়তায় তিনি ইংলণ্ডে একটী রাজনীতিক সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংলণ্ডের নানা স্থানে "ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট," "আমাদের অভাব ও অভিযোগ," "ভারত সংস্কার" প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ভারত শাসনসংস্কার বিষয়ে ইংলণ্ডবাসীদিগের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। তাঁহার যুক্তিতর্ক-সমন্বিত সরলভাবে বিবৃত বক্তৃতাগুলি সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিণী হইত।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রিভিকাউন্সিলের বিচারালয়ে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার আস্‌কুইথ এবং লর্ড হ্যালডেনের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া কতবার তাঁহাকে তর্কযুদ্ধ চালাইতে হইয়াছে!

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এসেক্সের অন্তর্গত ওয়ালথামষ্টো বিভাগে উদারনীতিক দল তাঁহাকে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভগ্ন হওয়ায় তিনি পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিয়া লন। ভারতবাসীদের মধ্যে দাদাভাই নৌরোজী এবং সার মাঞ্চারজী ভবনগরী—এই দুইজন বোম্বাই প্রদেশবাসী মাত্র পার্লামেণ্টে এ পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছেন। লালমোহন ঘোষ ও মন্মথ মল্লিক দুইজন বাঙ্গালীই অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আর উমেশচন্দ্র সাফল্যলাভের আশা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যানুরোধে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী হইয়াও এখনও এই ক্ষেত্রে তাহার প্রতিভা দেখাইবার অবসর পায় নাই।

উমেশচন্দ্র দুশ্চিকিৎস্য ব্রাইট্‌স্ ডিজীজে ভুগিতেছিলেন এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ক্রয়ডনে খিদিরপুর হৌসেই দেহরক্ষা করেন। তাঁহার শেষ অভিপ্রায় মত তাঁহার শব দাহ করা হয় এবং চিতাভস্ম একটি পাত্রে রক্ষিত হইয়া ক্রয়ডনের বাটীর এক কোণে প্রোথিত হয়। উহার উপর যে স্মৃতিফলক স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে "হিন্দু ব্রাহ্মণ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের" নাম উপযুক্ত পরিচয় সহ উৎকীর্ণ আছে।

উমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যথিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং ইংলণ্ডেও গোখ্‌লে, রমেশ দত্ত প্রভৃতি বন্ধুগণের চেষ্টায় স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টে লর্ড সিংহ প্রভৃতি ব্যবহারাজীবগণ উপযুক্ত ভাষায় শোকপ্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন।

উমেশচন্দ্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সন্তান, প্রেমময় স্বামী ও স্নেহময় পিতা ছিলেন। তাঁহার জননীকে তিনি দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন। মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনী বহুবাজারনিবাসী নীলমণি মতিলালের কন্যা ছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার পাতিব্রত্য, উদারতা, আতিথেয়তা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের সুখ্যাতি করিয়াছেন। উমেশচন্দ্রের চারি পুত্র ও চারি কন্যা হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলকৃষ্ণ শেলী বনার্জ্জী ব্যারিষ্টার এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টে অফিসিয়াল রিসিভারের সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। শোভাবাজারের মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর উমেশচন্দ্রের কর্ম্মজীবনে প্রবেশ কালে যথেষ্ট সাহায্য করেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া উমেশচন্দ্র তাঁহার নামানুসারে পুত্রের নামকরণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র কালীকৃষ্ণ উড বনার্জ্জীর নামও শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণের নামানুসারে রাখা হয়। ইনি রেঙ্গুনে ব্যারিষ্টারী করেন। তৃতীয় পুত্র সরলকৃষ্ণ কীট্‌স্ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পিতার জীবদ্দশাতেই গতাসু হন। কনিষ্ঠ রতনকৃষ্ণ কারান কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন, ইংরাজীতে সুলেখকরূপেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। উমেশচন্দ্রের কন্যারাও সকলে সুশিক্ষিতা এবং লণ্ডনের এম্‌-বি উপাধিধারিণী। দ্বিতীয়া কন্যা সুশীলা এম্‌-ডি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কুমারী অবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন এবং লাহোর হাসপাতালের জন্য প্রভূত অর্থ দান করিয়া যান। জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনী লিভারপুলের ব্যারিষ্টার মিষ্টার ব্লেয়ার নামক একজন ইংরাজকে বিবাহ করিয়াছেন। লিভারপুলে ইনি ভারতবর্ষের রাজনীতিক উন্নতিকল্পে একটী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উমেশচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যার সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার এ-এন্‌-চৌধুরীর সহিত এবং চতুর্থা কন্যার ব্যারিষ্টার পি-কে-মজুমদারের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়

শ্রীসুনীলকুমার ধর

রজনী একটু একটু করিয়া ধরণীর মুখের উপর তাহার কাল ওড়নার ঘোমটা টানিয়া দিতেছে—

বাহিরে আর দৃষ্টি চলে না,—খানিক আগাইয়া গিয়া অন্ধকারে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসে। পশ্চিম-আকাশের শেষ হাসিটুকুও ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের বিদায়-বেলার এক এক ফোঁটা অশ্রু যেন ঐ আকাশের এক একটা তারা!

ক্লান্ত পৃথিবী যেন সেই দিকে তাকাইয়া বলিতেছে— 'আরো কোথা—আরো কতদূর'......

গভীর নৈরাশ্যের একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া মা বলিলেন—ফির্‌তে তোকে আমি বলিনে আশিস্, কিন্তু যে মনটা এতদিন ভীরু, পঙ্গু হ'য়েছিল তার উপর কি এত জুলুম সইবে ...

বাহিরের অন্ধকার ঘরের ভিতর আরো জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, কিছুই নজরে আসে না। কেবল সাদা দেওয়ালের বুকে আবছা ছবির সারি; আর আশপাশের চেয়ারের কোন কোন অংশ।

আশিস্ এতক্ষণ খোলা জানলা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। সামনের ঐ ছোট একফালি নির্ম্মল আকাশ ই যেন তার কত বড় সান্ত্বনা...

ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—তোমাদের শুভাশিস্, আর আমাদের রক্ত ও কি এর পক্ষে যথেষ্ট নয় ..

ছেলের মাথার উপর হাত রাখিয়া গাঢ় স্বরে মা বলিলেন —তাই হোক্...কিন্তু...

মাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া আশিস্ বলিল—আমরা একে একে তোমাদের কোল ছেড়ে গেলে যত বড় ব্যথাই তোমরা পাও না কেন মা—তাকে এই 'কিন্তু' দিয়ে ঘিরে রেখ' না...

আবার দুই জনেই নীরব।

মা ভাবেন, যেদিন আশিস্ প্রথম এই পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করিয়াছিল—সেদিন হইতে তাহাকে লইয়া তাঁহার কত আশা—কত-ই না আশঙ্কা! ..

তাহার পূর্ব্বে যে তিনটি অতিথি একে একে আসিয়া তাঁহার ঘর আলো করিয়াছিল, তাহাদের কাহাকেও তিনি মায়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই—

শুধু নিজের বঞ্চিত চিত্তকে বার বার ক্ষণিকের জন্য আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া যে অন্ধকার হইতে আসিয়াছিল সেই অন্ধকারেই লুকাইয়া পড়িয়াছে— পিছনে রাখিয়া গেছে একটুখানি হাসি-কান্নার স্মৃতি-সৌরভ!

তাহাদের সেই পথ বাহিয়াই তো এ আসিয়াছে, তাই তাঁহার উৎকণ্ঠার আর সীমা ছিল না! ভয়ে ভয়ে দুদিনের দিন ই নাম রাখিলেন, আশিস্।

দেবতার নিকট শুধু একটু আয়ু তিনি আশিস্ চাহেন... আর কিছু নয়—

কিন্তু ঐ ছোট মুখখানিকে ঘিরিয়া সেই মুহূর্ত্ত হইতে কল্পনা ও আশার যে রঙীন জাল একটা খেই-এর পর আর একটা খেই করিয়া বুনিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহার আজও শেষ হয় নাই।

মনের পটে ঐ জালের আশে পাশে সময় অসময় যে ভীষণ ছবির আভাস ফুটিয়া ওঠে—তাহা যেমনি বেদনা-দায়ক, তেমনি অপ্রতিহত—

শুধু দু'খানি কাল হাতের ছায়া...

শাশুড়ীঠাকুরাণী চার পাঁচটা মাদুলি আনিয়া দিয়া বলিলেন, এ-গুলো ওর হাতে গলায় ঝুলিয়ে দেও তো বৌমা—

কিন্তু মনকে আঁখি ঠারিতে তাঁহার আর সাহস হয় নাই। তাই শাশুড়ী ঠাকুরাণী যখন মাদুলিগুলো একে একে আগাইয়া দিতে লাগিলেন, তখন তিনি শুধু এই ছোট মুখ-খানির দিকে তাকাইয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, ও-সব আর কেন মা, মাদুলির আড়াল দিয়ে আগের তিনটিকেও তো ধরে রাখ্‌তে পারিনি......

একটি কথা না বলিয়া মাদুলিগুলো নাড়াচাড়া করিতে করিতে শাশুড়ী ঠাকুরাণী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—

কিন্তু তাঁহার সে বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া মা যে কত কষ্টে মাদুলির মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা শুধু তিনিই জানেন।

জীবনের প্রথম দিন হইতে তাহাকে লইয়া এই যে ভয়, এই যে হারাই হারাই আশঙ্কা, তাহার গণ্ডীকে আজ-ও সে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই।

তিন বছর বয়সের সময়, এক সন্ন্যাসীকে তাহার হাত দেখান হয়। সমস্ত রেখা তখনও হয় নাই, যাহা ছিল তাহাও অস্পষ্ট; তবুও তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন—সে মানুষ হবে······

এই একটি আশাকেই মা আজ বাইশ বছরের আয়ু দিয়া মানুষ করিতেছেন!

আর আশিস্ ভাবিতেছে—এই তো আমাদের শক্তি, এই তো আমাদের মূল্য! কাল যে বন্ধু আমাদের ভিতর ছিল, আজ সে আর আমাদের ভিতর নাই—

অথচ যমও তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া যায়নি! এইটুকু ক্ষমতা লইয়া, মানুষ বলিয়া আমাদের কতই না গর্ব্ব—কতই না অহঙ্কার···

এইটুকু শক্তি লইয়াই আমরা মাটির বুকে পা পাতিয়া হাঁটি, আর মনে করি, পৃথিবীর কতখানি জমীই না আমরা জয় করিয়াছি! অথচ নিজের ইচ্ছামত হাত-পাগুলোকে একটু খেলাইয়া লইবার শক্তি আমাদের নাই!

ভাবিতে থাকে,—বাহিরে যে প্রণবের উচ্ছলতা ধরিত না—তাহার সব আশা আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত জীবনটারই অবসান হইবে ঐ আট হাত পিঁজ্‌রার ভিতর······

খানিক পরে আলো আনিবার জন্য মা উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

আশিস্ সেইখানে বসিয়াই ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনার আদিও ছিল না, অন্তও ছিল না।

এত বছর ভারতের ভীরু সাধু পুরুষেরা নির্ব্বিবাদে যে আলস্য জমা করিয়া রাখিয়াছে—তাহার কুয়াশা কাটাইয়া বাঁশীর যে ক্ষীণ সুরের ধারা ভাসিয়া আসিতেছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিয়াছে।

কিন্তু পায়-পায় কতই না বাধা!

মাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছে,—আমি যদি মরি, মনে কোর না যে আমি চলে গেলাম। আমার বয়সের ছেলেদের ভিতর আমায় খুঁজো—তোমার এক ফোঁটা অশ্রু-আশীর্ব্বাদ তাদের মাথার উপর ঢেলে দিয়ে বলো—ভারতের শ্যামল মাটির মত ঘুমাবার এমন স্নিগ্ধ যায়গা আর পাবি না···

আজ তাহার বন্ধুকে ধরিয়া নিয়া গেছে, কাল হয় তো তাহাকে যাইতে হইবে—

কিন্তু কারাগারের অন্ধকারে একটু একটু করিয়া কুঁকড়াইয়া মরিতে সে রাজী নয়—

যতটুকু আয়ু তাহার আছে, সেটুকু সে উদার আকাশের নীচে, উন্মুক্ত বাতাসের ভিতর পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করিয়া লইতে চায়!

পাশের বাড়ীতে প্রণবের স্ত্রী প্রতিমা গান গাহিতেছে—

"আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে
কোরব নিবেদন—
আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন—"

যাবার সময় স্বামী শুধু বলিয়া গেছে—আসি।

এই একটা কথা কত লোকেই তো বলিয়া গেছে, কিন্তু তাহাদের ভিতর অনেকেই তো মরণকে এড়াইয়া ফিরিয়া আসে নাই!!······

আর এই যে মেয়েটি সর্ব্বস্ব পরের হাতে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া-ও শুধু একটা কথার উপর নির্ভর করিয়া ভগবানের স্তব গান করিতেছে—আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন, কিন্তু সে তো জানে না যে ভবিষ্যতের কতগুলো দিন তাহাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় চোখের জল মুছিয়া মুছিয়া কাটাইতে হইবে!

তাহার সেই অশ্রু-বাদলের দিনে ভগবানের সাড়া একটুও আসিবে না!

রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই আশিস্ পলাইবার আয়োজন করিতে লাগিল।

মা আসিয়া বলিলেন—যতদিন বেঁচে থাকিস্ মাঝে মাঝে দু এক ছত্রে জানাস কেমন আছিস্······

অশ্রু আর কোন মতেই বাধা মানিল না··· মায়ের সেই অশ্রু-সজল মহিমময়ী আঁখির দিকে তাকাইয়া আশিস্ বলিল—আবার আমি ফিরে আস্‌বো—

দরজার পাশে যে মেয়েটি এতক্ষণ দৃষ্টি নত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সাহস ও আশ্বাস পাইয়া এইবার মুখ তুলিয়া আশিসের দিকে তাকাইল।

আশিস্ বলিল—তুমিও কাঁদছ সু—তাহার পর বিদায়ের পালা!

নিজের পরিচিত নীড়টি ছাড়িয়া যাইবার সময় দুরন্ত পাখীও বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া আসে—

তবুও তাহার আকাশের সহিত নাড়ির সম্পর্ক! আর এ তো মানুষ······

দরজার বাহিরে পা বাড়াইয়া সু'র দিকে ফিরিয়া বলিল—এমনি অদৃষ্ট, যে, নিজের ঘরে একটু শান্তিতে থাকবার ভাগ্যটাও আমরা বিদেশীর কাছে বিক্রী করে ফেলেছি—

সু'র হাতখানা, হাতের ভিতর লইয়া আবেগ ভরে আশিস্ বলিল—হয় তো এই শেষ····· মাকে আমি তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি ···

হাত ছাড়াইয়া চলিতে লাগিল।

পিছন হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে সু জিজ্ঞাসা করিল, আর কিছু নয়?—

একটু একটু করিয়া আশিস্ তখন অনেক দূরে আগাইয়া পড়িয়াছে—সেইখান হইতেই বলিল—আমার যে সন্তান তোমার কাছে আছে—তাকেও একদিন আমার এই পথে পাঠিয়ে দিও—

সামনের অন্ধকারকে ডিঙাইয়া সু আর একবার আশিস্‌কে দেখিবার চেষ্টা করিল—

কিন্তু অশ্রুতে দৃষ্টি তাহার ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে······ আশিস্‌ও কয়েক পা আগাইয়া গিয়া একবার পিছনে ফিরিয়া তাকাইল, কিন্তু বাড়ীর অস্পষ্ট কঙ্কালটা ছাড়া আর কিছু নজরে আসিল না······

পূজার ঘরে মা তখন ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছেন!

শেষ প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৯)

ইনফ্লুয়েঞ্জা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাধি নহে, 'ডেঙ্গু' বলিয়া মানুষে কতকটা অবজ্ঞা ও উপহাসের চক্ষেই দেখিত। দিন দুইতিন দুঃখ দেওয়া ভিন্ন ইহার আর কোন গভীর উদ্দেশ্য নাই ইহাই ছিল লোকের ধারণা। কিন্তু সহসা এমন দুর্নিবার মহামারী রূপেও সে যে দেখা দিতে পারে এ কেহ কল্পনাও করিতনা। সুতরাং এবার অকস্মাৎ ইহার অপরিমেয় শক্তির সুনিশ্চিত কঠোরতায় প্রথমটা লোকে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তাহার পরেই যে যেখানে পারিল পলাইতে সুরু করিল। আত্মীয়-পরে বিশেষ প্রভেদ রহিল-না, রোগে শুশ্রূষা করিবে কি মৃত্যুকালে মুখে জল দিবার লোকও অনেকের ভাগ্যে জুটিলনা। সহর ও পল্লী সর্ব্বত্র একই দশা, আগ্রার অদৃষ্টেও ইহার অন্যথা ঘটিলনা,—এই সমৃদ্ধ, জনবহুল প্রাচীন নগরের মূর্ত্তি যেন দিন কয়েকের মধ্যেই একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইস্কুল-কলেজ বন্ধ, হাটে-বাজারে দোকানের কবাট অবরুদ্ধ, নদী-তীর শূন্য প্রায়, শুধু হিন্দু ও মুসলমান শববাহকের শঙ্কাকুল ত্রস্ত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে রাজপথ নিঃশব্দ জনহীন, যে-কোন দিকে চাহিলেই মনে হয় শুধু কেবল মানুষ-জনই নয়, গাছ-পালা, বাড়ী ঘর-দ্বারের চেহারা পর্য্যন্ত যেন ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি যখন সহরের অবস্থা, তখন চিন্তা, দুঃখ ও শোকের দাহনে অনেকের সঙ্গেই অনেকের একটা রফা হইয়া গেছে। চেষ্টা করিয়া, আলোচনা করিয়া, মধ্যস্থ মানিয়া নয়,—আপনিই হইয়াছে। আজও যাহারা বাঁচিয়া আছে, এখনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই তাহারা সকলেই যেন সকলের পরমাত্মীয়। বহুদিন ধরিয়া যেখানে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, সহসা পথে দেখা হইতে উভয়ের চোখেই জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিয়াছে,—কাহারও ভাই, কাহারও পুত্র-কন্যা, কাহারও বা স্ত্রী ইতিমধ্যে মরিয়াছে,—রাগ করিয়া মুখ ফিরাইবার মত জোর আর মনে নাই,—কখনও কথা হইয়াছে, কখনও তাহাও হয় নাই—নিঃশব্দে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বিদায় লইয়াছে।

মুচিদের পাড়ায় লোক আর বেশি নাই। যত বা

মরিয়াছে তত বা পলাইয়াছে। অবশিষ্টদের জন্য রাজেন একাই যথেষ্ট। তাহাদের গতি-মুক্তির ভার সে-ই গ্রহণ করিয়াছে। সহকারিণী হিসাবে কমল যোগ দিতে আসিয়াছিল। ছেলে বয়সে চা বাগানে সে পীড়িত কুলীদের সেবা করিয়াছিল, সেই ছিল তাহার ভরসা। কিন্তু, দিন দুই তিনেই বুঝিল সে সম্বল এখানে চলেনা। মুচীদের সে কি অবস্থা! ভাষায় বর্ণনা করিয়া বিবরণ দিতে যাওয়া বৃথা। কুটীরে পা দেওয়া অবধি সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিত, কোথাও বসিবার দাঁড়াইবার স্থান নাই, এবং আবর্জ্জনা যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে এখানে আসিবার পূর্ব্বে কমল তাহা জানিতনা। অথচ এই সকলেরই মাঝখানে অহরহ থাকিয়া আপনাকে সাবধানে রাখিয়া কি করিয়া যে রোগীর সেবা করা সম্ভব এ কল্পনা সে মনে স্থান দিতেও পারিলনা। অনেক দর্প করিয়া সে রাজেনের সঙ্গে আসিয়াছিল, দুঃসাহসিকতায় সে কাহারও ন্যূন নয়, জগতে কোন-কিছুকেই সে ভয় করেনা, মৃত্যুকেও না। নিতান্ত মিথ্যা সে বলে নাই, কিন্তু আসিয়া বুঝিল ইহারও সীমা আছে। দিনকয়েকেই ভয়ে তাহার দেহের রক্ত শুকাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। তথাপি, সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া ঘরে ফিরিবার প্রাক্কালে রাজেন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া বারবার বলিতে লাগিল, এমন নির্ভীকতা আমি জন্মে দেখিনি। আসল ঝড়ের মুখটাই আপনি সাম্‌লে দিয়ে গেলেন। কিন্তু আর আবশ্যক নেই,—আপনি দিনকতক বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুনগে। এদের যা করে গেলেন সে ঋণ এরা জীবনে শুধ্‌তে পারবেনা।

আর, তুমি?

রাজেন বলিল, এই ক'টাকে যাত্রা করে দিয়ে আমিও পালাবো। নইলে কি ম'রব বল্‌তে চান?

কমল জবাব খুঁজিয়া পাইলনা, নির্নিমেষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। কিন্তু তাই বলিয়া এমন নয় যে সে এ কয়দিন একেবারেই বাসায় আসিতে পারে নাই। রাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া খাবার লইয়া যাইতে প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাকে আসিতেই হইত। কিন্তু আজ আর সেই ভয়ানক যায়গায় ফিরিতে হইবেনা মনে করিয়া একদিকে যেমন সে স্বস্তি অনুভব করিল, আর একদিকে তেমনি অব্যক্ত উদ্বেগে সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া রহিল। কমল রাজেন্দ্রর খাবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে ভুলিয়াছিল। কিন্তু এই ত্রুটি যতই হোক্, যেখানে তাহাকে সে ফেলিয়া রাখিয়া আসিল তাহার সমতুল্য কিছুই তাহার মনে পড়িলনা।

স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইতে হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমও বন্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মচারী বালকদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধারণের ভার লইয়া সতীশ সঙ্গে গিয়াছে। হরেন নিজে যাইতে পারে নাই অবিনাশের অসুখের জন্য। আজ সে আসিয়া উপস্থিত হইল। নমস্কার করিয়া কহিল, পাঁচ ছ' দিন রোজ আস্‌চি আপনাকে ধরতে পারিনে। কোথায় ছিলেন?

কমল মুচিদের পল্লীর নাম করিলে হরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, সেখানে? সেখানে তো ভয়ানক লোক মরেচে শুন্‌তে পাই। এ মৎলব আপনাকে দিলে কে? যে-ই দিয়ে থাক্ কাজটা ভালো করেননি।

কেন?

কেন কি? সেখানে যাওয়া মানে তো প্রায় আত্মহত্যা করা। বরঞ্চ, আমরা তো ভেবেছিলাম শিবনাথবাবু চলে যাবার পরে আপনিও নিশ্চয় অন্যত্র গেছেন। অবশ্য দিন কয়েকের জন্যে—নইলে বাসাটা রেখে যেতেননা,—আচ্ছা, রাজেনের খবর কিছু জানেন? সে কি আগ্রায় আছে না আর কোথাও চলে গেছে? হঠাৎ এমন ডুব মেরেছে যে কোন খবরই পাবার যো নেই।

তাঁকে কি আপনার বিশেষ প্রয়োজন?

না, প্রয়োজন বল্‌তে সচরাচর লোকে যা' বোঝে তা নেই। তবুও প্রয়োজনই বটে। কারণ, আমিও যদি তার খোঁজ নেওয়া বন্ধ করি তো একা পুলিশ ছাড়া আর তার আত্মীয় থাকেনা। আমার বিশ্বাস আপনি জানেন সে কোথায় আছে।

কমল বলিল, জানি। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই। বাড়ী থেকে যাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, বেরিয়ে গিয়ে সে কোথায় আছে সন্ধান নেওয়া শুধু নিষ্ফল কৌতূহল।

হরেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু সে আমার বাড়ী নয়, আমাদের আশ্রম। সেখানে স্থান দিতে তাকে পারিনি, কিন্তু তাই বলে সে নালিশ আর একজনের মুখ থেকেও আমার সয়না। বেশ, আমি চল্‌লাম। তাকে

পূর্ব্বেও অনেকবার খুঁজে বার করেচি, এবারও বার করতে পারবো, আপনি ঢেকে রাখতে পারবেননা।

তাহার কথা শুনিয়া কমল হাসিল, কহিল তাঁকে ঢেকে যে রাখ্‌বো হরেনবাবু, রাখ্‌তে পারলে কি আমার দুঃখ ঘুচবে আপনি মনে করেন? নইলে বলুন, প্রাণপণে একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

হরেন নিজেও হাসিল, কিন্তু সে হাসির আশেপাশে অনেকখানি ফাঁক রহিল। কহিল, আমি ছাড়া এ প্রশ্নের জবাব দেবার লোক আগ্রায় অনেকে আছেন। তাঁরা কি বল্‌বেন জানেন? বল্‌বেন, কমল, মানুষের দুঃখ ত একটাই নয়, বহু প্রকারের। তার প্রকৃতিও আলাদা, ঘোচাবার পন্থাও বিভিন্ন। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়, আলোচনার দ্বারা একটা মোকাবিলা করে নেবেন। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আসলেই আপনার ভুল হচ্চে। আমি সে দলের নই। অযথা উত্যক্ত করতে আমি আসিনি, কারণ, সংসারে যত লোকে আপনাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন।

কমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কবিল, আমাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করেন আপনি কোন্ নীতিতে? আমাব মত বা আচরণ কোনটার সঙ্গেই তো আপনাদের মিল নেই।

হরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, না, নেই। কিন্তু তবুও গভীর শ্রদ্ধা কবি। আর এই আশ্চর্য্য কথাটাই আমি নিজেকে নিজে বারম্বার জিজ্ঞাসা করি।

কোন উত্তর পান্‌নি?

না। কিন্তু ভরসা হয় একদিন নিশ্চয় পাবো। একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনার ইতিহাস কতক আপনার নিজের মুখ থেকেও শুনেচি, কতক অজিতবাবুর কাছেও শুনেচি,—ভাল কথা, জানেন বোধ হয় তিনি এখন আমাদের আশ্রমে গিয়ে আছেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানি।

হরেন বলিল, আপনার জীবন-ইতিহাসের অধ্যায়গুলি এমন স্পষ্ট এবং এতই নিঃসঙ্কোচ যে তার বিরুদ্ধে সরাসরি রায় দিতে আমার নিজেরই ভয় হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, এতকাল যা-কিছু মন্দ বলে বিশ্বাস করতে শিখেচি সে তো একতরফা শিক্ষা, কিন্তু আপনার জীবনটা যেন তাব প্রতিবাদে দাঁড়িয়ে মাম্‌লা রুজু করে দিয়েছে। এর বিচারক কোথায় মিল্‌বে, কবে মিল্‌বে, তার ফলই বা কি হবে কিছুই জানিনে, কিন্তু এমন কোরে যে নির্ভয়ে সকলের চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে তাঁকে শ্রদ্ধা না করেই বা পারা যায় কি করে?

কমল ঈষৎ একটু হাসিয়া বলিল, নির্ভয়ে চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়ানোটাই কি একটা বড় কাজ হরেনবাবু? দু-কান-কাটার গল্প শোনেননি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে। আপনি দেখেননি, কিন্তু আমি চা-বাগানের সাহেবদের দেখেচি। তাদের নিভয় নিঃসঙ্কোচ বেহায়াপণা জগতের কোন লজ্জাকেই আমল দেয়না,—ধিক্কার দিয়ে দূর করে দেয়। তাদের দুঃসাহসের সীমা নেই। কিন্তু সে কি মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু?

হরেন এরূপ প্রত্যুত্তর আর যাহার কাছেই হোক্ এই স্ত্রীলোকটির কাছে আশা করে নাই। হঠাৎ কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু কহিল, সে আলাদা জিনিস।

কমল কহিল, কি ক'রে জান্‌লেন আলাদা? বাইরে থেকে আমার বাবাকেও লোকে এদেরই একজন বলে ভাব্‌তো। অথচ, আমি জানি তা' সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি ত কেবল আমার জানার পরেই নির্ভর করে না,—জগতের কাছে তার প্রমাণ কই?

হরেন্দ্র এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিল।

কমল বলিতে লাগিল, আমার ইতিহাস আপনারা সবাই শুনেছেন, খুব সম্ভব সে কাহিনী পরমানন্দে উপভোগ করেছেন। কাজগুলো আমার ভাল কি মন্দ, জীবনটা আমার পবিত্র কি কলুষিত সে বিষয়ে আপনি নির্ব্বাক, কিন্তু সে যে গোপনে না হয়ে লোকের চোখের সুমুখে সকলকে উপেক্ষা করেই ঘটে চলেচে এই হয়েচে আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার আকর্ষণ। হরেনবাবু, পৃথিবীতে মানুষের শ্রদ্ধা আমি এত বেশি পাইনি যে অবহেলায় না বলে অপমান করতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে যেমন অনেক জেনেছেন, তেম্‌নি এটাও জেনে রাখুন যে অক্ষয়-বাবুদের অশ্রদ্ধার চেয়েও এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। সে আমার সয়, কিন্তু এর বোঝা দুঃসহ।

হরেন্দ্র পূর্ব্বের মতই ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল।

কমলের বাক্য, বিশেষ করিয়া তাহার কণ্ঠস্বরের শান্ত কঠোরতায় সে অন্তরে অপমান বোধ করিল। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, মত এবং আচরণের অনৈক্য সত্ত্বেও যে একজনকে শ্রদ্ধা করা যায়, অন্ততঃ, আমি পারি, এ আপনার বিশ্বাস হয় না ?

কমল অতিশয় সহজে তখনই জবাব দিল, বিশ্বাস হয়না এ তো আমি বলিনি হরেনবাবু, আমি বলেচি এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, মত এবং নীতির দিক দিয়ে অক্ষয় বাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তাঁর বহুস্থলে অনাবশ্যক ও অত্যধিক রূঢ়তা না থাক্‌লে আপনারা সকলেই এক। অশ্রদ্ধার দিক দিয়েও এক। শুধু, আমি যে নিজের লজ্জায় সঙ্কোচে লুকিয়ে বেড়াইনে এই সাহসটুকুই আমার আপনাদের সমাদর লাভ করেচে। এর কতটুকু দাম হরেন-বাবু? বরঞ্চ, ভেবে দেখ্‌লে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণাই আসে যে এর জন্যেই আমাকে এতদিন বাহবা দিয়ে আস্‌ছিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, বাহবা যদি দিয়েই থাকি সে কি অসঙ্গত ? সাহস জিনিসটা কি সংসারে কিছুই নয় ?

কমল কহিল, আপনারা সকল প্রশ্নকেই এমন একান্ত করে জিজ্ঞাসা করেন কেন? কিছুই নয় এ কথা তো বলিনি। আমি বল্‌ছিলাম এ বস্তু সংসারে দুর্লভ, এবং দুর্লভ বলেই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু, এর চেয়েও বড় বস্তু আছে। বাইরে থেকে তাকে সাহসের অভাব বলেই হয়ত দেখ্‌তে লাগে, কিন্তু, সে বস্তু আরও দুর্লভ।

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, বুঝ্‌তে পার্‌লামনা। আপনার অনেক কথাই অনেক সময়ে হেঁয়ালির মত ঠেকে, কিন্তু আজকের কথাগুলো যেন তাদেরও ডিঙিয়ে গেল। হঠাৎ মনে হয় যেন আজ আপনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক। কার জবাব কাকে দিয়ে যাচ্চেন ঠিক তার খেয়াল নেই।

কমল মৃদু হাসিয়া কহিল, তাই বটে।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হবেও বা। সত্যকার শ্রদ্ধা পাওয়া যে কি জিনিস সে হয়ত এতকাল নিজেও জানতামনা। সেদিন হঠাৎ যেন চম্‌কে গেলাম। হরেন-বাবু, আপনি দুঃখ করবেননা, কিন্তু তার সঙ্গে তুলনা করলে আর সমস্তই যেন পরিহাস বলে মনে লাগে। বলিতে বলিতে তাহার চোখের প্রখর দৃষ্টি ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিল, এবং সমস্ত মুখের পরে এমনই একটা স্নিগ্ধ সজলতা ভাসিয়া আসিল যে কমলের সে মূর্ত্তি হরেন্দ্র কোনদিন দেখে নাই। আর তাহার সংশয়মাত্র রহিলনা যে অনুদ্দিষ্ট আর কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কমল এই সকল বলিতেছে। সে শুধু উপলক্ষ। একটি বাক্যও তাহার জন্য নয়, এবং এই জন্যই আগাগোড়া সমস্তই আজ তাহার হেঁয়ালির মত ঠেকিয়াছে। মনের মধ্যে আর তাহার ক্ষোভ রহিলনা, নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া কেবল চাহিয়া রহিল।

কমল বলিতে লাগিল, আপনি এইমাত্র আমার দুর্ম্মদ নির্ভীকতার প্রশংসা করছিলেন,—ভাল কথা, শুনেছেন শিবনাথ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন ?

হরেন্দ্র লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিল, হাঁ।

কমল কহিল, আমাদের মনে মনে একটা সর্ত্ত ছিল ছাড়বার দিন যদি কখনো আসে যেন আমরা সহজেই ছেড়ে যেতে পারি। না না, চুক্তি-পত্রে লেখাপড়া ক'রে নয়, এম্‌নিই।

হরেন্দ্র কহিল, ক্রুট্।

কমল হাসিয়া কহিল, সে তো আপনার বন্ধু অক্ষয় বাবু। শিবনাথ গুণী মানুষ, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কিন্তু নিজের খুব বেশি নালিশ নেই। নালিশ করেই বা লাভ কি হরেন-বাবু? হৃদয়ের আদালতে একতরফা বিচারই একমাত্র বিচার, তার তো আর আপিল কোর্ট নেই।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে ভালবাসার অতিরিক্ত আর কোন বাঁধনই আপনি স্বীকার করেননা ?

কমল কহিল, একে তো আমাদের ব্যাপারে আর কোন বাঁধন ছিলনা, আর থাক্‌লেই বা তাকে স্বীকার করে ফল কি? দেহের যে অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায় তার বাইরের বাঁধনই মস্ত বোঝা। তাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলেই সব চেয়ে বেশি বাজে। এই বলিয়া একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, আপনি ভাবচেন, সত্যিকার বিবাহ হয়নি বলেই এমন কথা মুখে আন্‌তে পারচি, হলে পারতাম না। হলেও পারতাম, শুধু এত সহজে এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতামনা। বিবশ অঙ্গটা হয়ত এ দেহে সংলগ্ন হয়েই থাক্‌তো, এবং অধিকাংশ রমণীর যেমন ঘটে, আমরণ তার দুঃখের বোঝা বয়েই এ জীবন কাট্‌তো। আমি বেঁচে গেছি হরেনবাবু, দৈবাৎ নিষ্কৃতির দোর খোলা ছিল বলে আমি মুক্তি পেয়েছি।

হরেন্দ্র কহিল, আপনি হয়ত মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু এম্‌নিধারা মুক্তির দ্বার যদি সবাই খোলা রাখ্‌তে চাইতো জগতে বিবাহ বলে জিনিসটাই তো নিন্দিত হয়ে উঠে যেতো।

কমল বলিল, কি জানি, হয়তো যাবেও একদিন। পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা আজও শেষ হয়নি হরেনবাবু।

বিবাহ বস্তুটাই তা'হলে আপনার মতে ভালো নয়?

না। একদিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে মানুষের অব্যাহতির পথ যদি সারাজীবনের মত অবরুদ্ধ হয়ে যায় তাকে আমি মানুষের শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নিতে পারিনে। পৃথিবীতে সকল ভুল-চুকের সংশোধনের বিধি আছে, কেউ তাকে মন্দ বলেনা, কিন্তু যেখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, আর তার নিরাকরণের প্রয়োজনও তেম্‌নিই অধিক সেইখানেই লোকে সমস্ত উপায় স্বেচ্ছায় স্বহস্তে বন্ধ করে দিয়েছে। এই তো আপনার বিবাহ-অনুষ্ঠান, একে ভালো বলে মান্‌বো কি করে বলুন?

এই মেয়েটির নানাবিধ দুর্দ্দশায় হরেন্দ্রর মনের মধ্যে গভীর সমবেদনা ছিল; বিরুদ্ধ আলোচনায় সহজে যোগ দিতনা, এবং বিপক্ষদল যখন নানাবিধ সাক্ষ্য-প্রমাণের বলে তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত সে প্রতিবাদ করিত। তাহারা কমলের প্রকাশ্য আচরণ ও তেম্‌নি নির্লজ্জ উক্তিগুলার নজির দেখাইয়া যখন ধিক্কার দিতে থাকিত, হরেন তর্ক-যুদ্ধে হারিয়াও হার মানিতনা, প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, কমলের জীবনে কিছুতেই ইহা সত্য নয়। কোথায় একটা নিগূঢ় রহস্য আছে একদিন তাহা ব্যক্ত হইবেই হইবে। তাহারা বিদ্রূপ করিয়া কহিত, দয়া করে সেইটে তিনি ব্যক্ত করলে প্রবাসী বাঙালী-সমাজে আমরা যে বাঁচি। অক্ষয় উপস্থিত থাকিলে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত, আপনারা সবাই সমান। আমার মত আপনাদের কারও বিশ্বাসের জোর নেই, আপনারা নিতেও পারেননা ফেল্‌তেও চান্‌না। আধুনিক কালের কতকগুলো বিলিতি চোখা-চোখা বুলি আপনাদের যেন মোহগ্রস্ত করে রেখেচে।

অবিনাশ বলিতেন, বুলিগুলো কমলের কাছ থেকে নতুন শোনা গেল তা' নয় হে অক্ষয়, পূর্ব্বে থেকেই শোনা আছে। আজকালের খান দুই তিন ইংরিজি তর্জ্জমার বই পড়্‌লেই জানা যায়। বুলির মোহ নয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিত, তবে কিসের মোহ এটা? কমলের রূপের? অবিনাশ বাবু, হরেন অবিবাহিত, ছোক্‌রা,—ওকে মাপ করা যায়, কিন্তু বুড়োবয়সে আপনাদের চোখেও যে ঘোর লাগিয়েছে এই আশ্চর্য্য! এই বলিয়া সে কটাক্ষে আশুবাবুর প্রতিও একবার চাহিয়া লইয়া বলিত, কিন্তু এ আলেয়ার আলো অবিনাশবাবু, পচা পাঁকের মধ্যে এর জন্ম। পাঁকের মধ্যেই একদিন অনেককে টেনে নামাবে তা' স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। শুধু অক্ষয়কে এ সব ভোলাতে পারেনা,—সে আসল নকল চেনে।

আশুবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতেন, কিন্তু অবিনাশ ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেন। হরেন্দ্র বলিত, আপনি মস্ত বাহাদুর অক্ষয় বাবু, আপনার জয়-জয়কার হোক্। আমরা সবাই মিলে পাঁকের মধ্যে পড়ে যেদিন হাবুডুবু খাবো, আপনি সেদিন তীরে দাঁড়িয়ে বগল বাজিয়ে পরমানন্দে নৃত্য করবেন, আমরা কেউ নিন্দে করবনা।

অক্ষয় জবাব দিত, নিন্দের কাজ আমি করিনে হরেন। গৃহস্থ মানুষ, সহজ সোজা বুদ্ধিতে সমাজকে মেনে চলি। বিবাহের নতুন ব্যাখ্যা দিতেও চাইনে, বিশ্ব বথাটে একপাল ছেলে জুটিয়ে ব্রহ্মচারী-গিরি করেও বেড়াইনে। আশ্রমে পায়ের ধূলো ত তাঁর আগেই পড়েছে, ওই ধূলোর পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করগে ভায়া, সাধন-ভজনের জন্যে ভাব্‌তে হবেনা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত আশ্রম বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে। এবং হয়ত চিরকালের মত তোমার একটা কীর্ত্তি থেকে যাবে।

অবিনাশ ক্রোধ ভুলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিতেন, এবং নির্ম্মল চাপা-হাসিতে আশুবাবুর মুখখানিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। হরেন্দ্রর আশ্রমের প্রতি কাহারও বিশেষ কোন আস্থা ছিলনা, ও একটা ব্যক্তিগত খেয়াল বলিয়াই তাঁহারা লইয়াছিলেন।

প্রত্যুত্তরে হরেন্দ্র বলিত, ব্রুট্। ক্রোধে আরক্ত হইয়া কহিত, জানোয়ারের সঙ্গে ত যুক্তি-তর্ক চলেনা তার অন্য বিধি আছে। কিন্তু, সে ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনা বলেই আপনি যাকে-তাকে গুঁতিয়ে বেড়ান। ইতর-ভদ্র, মহিলা-পুরুষ কিছুই বাদ যায়না। এই বলিয়া সে অপর দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া কহিত, কিন্তু আপনারা প্রশ্রয় দেন কি বলে? এতবড় একটা কুৎসিত ইঙ্গিতও যেন ভারি একটা পরিহাসের ব্যাপার!

অবিনাশ অপ্রতিভ হইয়া কহিতেন, না না, প্রশ্রয় দেব কেন, কিন্তু জানই তো অক্ষয়ের কাণ্ড-জ্ঞান নেই।

হরেন কহিত, কাণ্ড-জ্ঞান ওঁর চেয়ে আপনাদের আরও কম। মানুষের মনের চেহারা তো দেখতে পাওয়া যায়না সেজদা, নইলে হাসি-তামাসা কম লোকের মুখেই শোভা পেতো। বিবাহের ছলনায় কমলকে শিবনাথ ঠকিয়েছেন, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সেই ঠকাটাও কমল সত্যের মতই মেনে নিয়েছিলেন, সংসারের দেনা-পাওনায় লাভ-ক্ষতির বিবাদ বাধিয়ে তাঁকে লোকচক্ষে ছোট করতে চান্‌নি। কিন্তু তিনি না চাইলেই বা আপনারা ছাড়বেন কেন? শিবনাথ তাঁর অসীম স্নেহের বস্তু, কিন্তু আপনাদের সে কে? ক্ষমার অপব্যবহার আপনারা সইবেন কেন? সেজদা, এই তো তোমাদের ঘৃণা আর বিদ্বেষের মূলধন? একে ভাঙিয়ে যতকাল পারো স্বচ্ছন্দে খাওগে, আমি বিদায় নিলাম। এই বলিয়া হরেন্দ্র সেদিন রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের এই প্রত্যয় সুদৃঢ় ছিল যে কমলের মুখ দিয়াই একদিন এ কথা ব্যক্ত হইবে যে শৈব-বিবাহকে সত্যকার বিবাহ জানিয়াই সে প্রতারিত হইয়াছে, স্বেচ্ছায়, সমস্ত জানিয়া গণিকার মত শিবনাথকে আশ্রয় করে নাই। কিন্তু আজ তাহার বিশ্বাসের ভিত্তিটাই ধূলিসাৎ হইল। হরেন্দ্র অক্ষয় বা অবিনাশ নহে, নর-নারী নির্বিশেষে সকলের পরেই তাহার একটা বিস্তৃত ও গভীর উদারতা ছিল,—মানুষের ভালোটাকেই সে কায়মনে গ্রহণ করিতে চাহিত। এই জন্যই দেশের ও দশের কল্যাণে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল অনুষ্ঠানেই সে ছেলেবেলা হইতে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া রাখিত। এই যে তাহার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, এই যে তাহার অকৃপণ দান, এই যে সকলের সাথে তাহার সব-কিছু ভাগ করিয়া লওয়া এ সকলের মূলেই ছিল ঐ একটি মাত্র কথা। তাহার এই প্রবৃত্তিই তাহাকে গোড়া হইতেই কমলের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল। সে নিশ্চয় জানিত আসল কথাটা একদিন প্রকাশিত হইবেই। তাহা সৎ ও সাধু,—সে যে তাহারই মুখের পরে, তাহারই জিজ্ঞাসায় এমন কদর্য্য নগ্নতায় বাহির হইয়া আসিবে সে ভাবিতে পারে নাই। ভারতের ধর্ম্ম, নীতি, আচার, ইহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সভ্যতার প্রতি হরেনের অচ্ছেদ্য স্নেহ ও অপরিমেয় শ্রদ্ধা ছিল। অথচ, সুদীর্ঘ অধীনতা ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্ব্বলতায় ইহার ব্যতিক্রমগুলাকেও সে অস্বীকার করিতনা, কিন্তু এমন স্পর্দ্ধিত অবজ্ঞায় ইহার মূলসূত্রকেই অপমানিত করায় তাহার দুঃখ ও বেদনার সীমা রহিলনা। কমলের পিতা ইউরোপীয়, মাতা কুলটা,—তাহার শিরার রক্তে ব্যভিচার প্রবহমান, এ কথা স্মরণ করিয়া তাহার বিতৃষ্ণায় মন কালো হইয়া উঠিল। মিনিট দুই তিন নিঃশব্দে থাকিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, এখন তা'হলে যাই—

কমল হরেন্দ্রর মনের ভাবটা ঠিক অনুমান করিতে পারিলনা, শুধু একটা সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যে জন্যে এসেছিলেন তার তো কিছু করলেননা।

হরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কহিল, কি সে?

কমল বলিল, রাজেনের খবর জান্‌তে এসেছিলেন, কিন্তু না জেনেই চলে যাচ্ছেন। আচ্ছা, সে যে আমার কাছে একলা আছে এ নিয়ে আপনাদের খুব বিশ্রী আলোচনা হয়? সত্যি বল্‌বেন?

হরেন্দ্র বলিল, সে আলোচনায় কিন্তু আমি যোগ দিইনে। রাজেন পুলিশের জিম্মায় না থাক্‌লেই যথেষ্ট। আর আমার দুশ্চিন্তা থাকেনা। তাকে আমি চিনি।

কিন্তু আমাকে?

হরেন্দ্র ঘা দিবার জন্যই জবাব দিল,—কিন্তু আপনি তো সে সব কিছু মানেননা!

কমল একমুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া সহাস্যে কহিল, অনেকটা তাই বটে। অর্থাৎ, মান্‌তেই হবে এমন কোন কঠিন শপথ নেই আমার। শুধু বন্ধুকে জানলেই হয়না হরেনবাবু, আর একজনকেও জানা দরকার।

হরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বাহুল্য মনে করি। বহু-দিনের বহু কাজে-কর্ম্মে যাকে নিঃসংশয়ে চিনেছি বলেই জানি, তার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা নেই। তার যেখানে অভিরুচি সে থাক, আমি নিশ্চিন্ত।

কমল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল, কহিল, মানুষকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয় হরেনবাবু, তার একটা দিনের আগের প্রশ্ন হয়ত তার পরের দিনের উত্তরের সঙ্গেই মেলেনা। কারও সম্বন্ধেই বিচার অমন শেষ করে দিয়ে রাখ্‌তে নেই, ঠক্‌তে হয়। এমন আঘাত লাগে যে হঠাৎ সইতে পারা যায়না।

কথাগুলা যে শুধু তত্ত্ব হিসাবেই কমল বলে নাই কি-একটা ইঙ্গিত করিয়াছে হরেন তাহা বুঝিল। আশঙ্কায় অন্তরটা একবার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা ইহাকে স্পষ্টতর করিতেও তাহার ভরসা হইলনা। রাজেন্দ্রর প্রসঙ্গটা বন্ধ করিয়া দিয়া হঠাৎ অন্য কথার অবতারণা করিল। কহিল, আমরা স্থির করেছি শিবনাথকে যথোচিত শাস্তি দেব।

কমল সত্যই বিস্মিত হইল। মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কারা?

হরেন্দ্র বলিল, যারাই হোক্, তার আমি একজন। আশুবাবু পীড়িত, ভাল হয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি পীড়িত?

হাঁ, সাত-আট দিন অসুস্থ। এর পূর্ব্বেই মনোরমা চলে গেছেন। আশুবাবুর খুড়ো কাশীবাসী; তিনি এসে নিয়ে গেছেন।

শুনিয়া কমল চুপ করিয়া রহিল। হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, শিবনাথ জানে আইনের দড়ি তার নাগাল পাবেনা, এই জোরে সে তার মৃত বন্ধুর পত্নীকে বঞ্চিত করেছে, নিজের রুগ্না-স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে এবং নির্ভয়ে আপনার সর্ব্বনাশ করেছে। আইন সে খুব ভালই জানে, শুধু জানেনা যে দুনিয়ায় এই-ই সব নয়, এর ওপরেও কিছু বিদ্যমান আছে। যেখানেই যাক্ তার হাত থেকে সে নিস্তার পাবেনা। কিছুতেই না।

কমল অনেকক্ষণ কথা কহিলনা, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝা গেল বক্তার গভীর সমবেদনা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে। খানিক পরে সে যেন জোর করিয়া এই ভাবটা কাটাইয়া দিয়া সহাস্য কৌতুকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু শাস্তিটা তাঁর কি স্থির করেছেন? ধরে এনে আর একবার আমার সঙ্গে জুড়ে দেবেন? এই বলিয়া সে একটু হাসিল। প্রস্তাবটা হরেন্দ্রের কাছেও হঠাৎ এম্‌নি হাস্যকর ঠেকিল যে সেও হাসিয়া ফেলিল। কহিল, কিন্তু দায়িত্বটা যে এইভাবে নিজের খেয়াল মত নির্ব্বিঘ্নে এড়িয়ে যাবে সেও তো হতে পারেনা? আর আপনার সঙ্গে জুড়েই যে দিতে হবে তারও তো মানে নেই?

কমল বলিল, তা'হলে হবে কি এনে? আমাকে পাহারা দেবার কাজে লাগাবেন, না, ঘাড়ে ধরে খেসারত আদায় করে আমাকে পাইয়ে দেবেন? প্রথমতঃ, টাকা আমি নেবোনা, দ্বিতীয়তঃ, সে তাঁর নেই। শিবনাথ যে কত গরীব সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।

তবে কি এতবড় অপরাধের কোন দণ্ডই হবেনা? আর কিছু না হোক্, বাজারে যে আজও চাবুক কিনতে পাওয়া যায় এ খবর তাঁকে জানানো দরকার?

কমল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, না না, সে করবেননা। ওতে আমার এতবড় অপমান যে সে আমি সইতে পারবোনা। সহসা তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কহিল, এতদিন এই রাগেই শুধু জ্বলে মরছিলাম যে এমন চোরের মত পালিয়ে বেড়াবার কি প্রয়োজন ছিল। স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলেই তো হোতো। আমার নিজের মনের যে নির্ভীকতার আপনি এত প্রশংসা করছিলেন, সেই জোরে কেবলি ভাবতাম তাঁর এই ভীরুতার মত হীন বস্তু বুঝি জগতে নেই। আমার অসম্মান যেন এইখানে পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে দেখা দিত। হঠাৎ একদিন মৃত্যুর পল্লী থেকে আহ্বান এলো, সেখানে কত মরণই চোখে দেখ্‌লাম তার সংখ্যা নেই। আজ ভাবনার ধারা আমার আর একপথ দিয়ে নেমে এসেছে। ভাবি, তাঁর বলে যাবার সাহস যে ছিলনা সেই আমার পরম লাভ। লুকোচুরি, ছলনা, তাঁর সমস্ত মিথ্যাচার আমাকেই যেন বৃহৎ মর্য্যাদা দিয়ে গেছে। পাবার দিনে আমাকে ফাঁকি দিয়েই পেয়েছিলেন, কিন্তু যাবার দিনে আমাকে সুদে-আসলে পরিশোধ করে গেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই, আমার সমস্ত আদায় হয়েছে। আশুবাবুকে আমার প্রণাম জানিয়ে বল্‌বেন, আমার ভালো করবার বাসনায় আর আমার ক্ষতি করবেননা।

হরেন্দ্র একটা কথাও বুঝিলনা, অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কমল একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিল, সংসারের সব জিনিস সকলের বোঝবার নয়, হরেনবাবু, আপনি ক্ষুণ্ণ হবেননা। কিন্তু আমার কথা আর না। দুনিয়ায় কেবল শিবনাথ আর আমি আছি তাই নয়। আরও পাঁচ জন বাস করে; তাদেরও সুখ দুঃখ আছে। বিশেষতঃ, আজ-কালের এই ভয়ানক দিনে। এই বলিয়া সে এবার সত্য সত্যই নির্ম্মল ও প্রশান্ত হাসি দিয়া যেন দুঃখ ও বেদনার ঘন বাষ্প এক মুহূর্ত্তে দূর করিয়া দিল। কহিল, কে কেমন আছে খবর দিন।

হরেন্দ্র কহিল, জিজ্ঞাসা করুন ?

বেশ। আগে বলুন অবিনাশবাবুর কথা। তিনি অসুস্থ শুনেছিলাম, ভাল হয়েছেন ?

হাঁ। সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা ভালো। তাঁর কে এক জাট্‌তুতো দাদা থাকেন লাহোরে, আরোগ্য লাভের জন্য ছেলেকে নিয়ে সেইখানে চলে গেছেন। ফিরতে বোধকরি দু' একমাস দেরি হবে।

আর নীলিমা ? তিনিও কি সঙ্গে গেছেন ?

না, তিনি এখানেই আছেন।

কমল আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এখানে ? একলা ঐ খালি বাসায় ?

হরেন্দ্র প্রথমে একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, পরে কহিল, বৌদির সমস্যাটা সত্যিই একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভগবান রক্ষে করেছেন। আশুবাবুর শুশ্রূষার জন্যে ঐখানে তাঁকে রেখে গেছেন।

এই খবরটা এম্‌নি খাপ্‌ছাড়া যে কমল আর প্রশ্ন করিল না, শুধু বিস্তারিত বিবরণের আশায় জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্রর দ্বিধা কাটিয়া গেল, এবং বলিতে গিয়া কণ্ঠস্বরে গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কারণ, এই ব্যাপারে অবিনাশের সহিত তাহার সামান্য একটু কলহের মতও হইয়া গিয়াছিল। হরেন্দ্র কহিল, বিদেশে নিজের বাসায় যা' ইচ্ছে' করা যায় কিন্তু তাই বলে বয়স্থা বিধবা শালী নিয়ে তো জাট্‌তুতো ভায়ের বাড়ী ওঠা যায় না। বললেন, হরেন, তুমিও তো আত্মীয় তোমার বাসাতে কি—আমি জবাব দিলাম, প্রথমতঃ, আমি তোমারই আত্মীয়, তাও অত্যন্ত দূরের,—কিন্তু তাঁর কেউ নয়। দ্বিতীয়তঃ, ওটা আমার বাসা নয়, আমাদের আশ্রম ; ওখানে রাখবার বিধি নেই। তৃতীয়তঃ, সম্প্রতি ছেলেরা অন্যত্র গেছে, আমি একাকী আছি। শুনে সেজদার বিপদের অবধি রইল না। আগ্রাতেও থাকা যায় না, লোক মরছে চারিদিকে, দাদার বাড়ী থেকে চিঠি এবং টেলিগ্রাফে ঘন ঘন আমন্ত্রণ আস্‌তে লাগ্‌লো,—সেজদার সে কি অবস্থা !

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু নীলিমার বাপের বাড়ী তো আছে শুনেচি ?

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে ! একটা বড় রকম শ্বশুরবাড়ীও আছে শুনেচি, কিন্তু সে সকলের কোন উল্লেখই হলনা। হঠাৎ একদিন অদ্ভুত সমাধান হয়ে গেল। প্রস্তাব কোন্ পক্ষ থেকে উঠেছিল জানিনে, কিন্তু, পীড়িত আশু-বাবুর সেবার ভার নিলেন বৌদি। মনোরমা নেই সে তো শুনেছেন।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, তবে আশা আছে বৌদির চাকরিটা যাবে না। তাঁরা ফিরে এলেই আবার গৃহিণীপণার সাবেক কাজে লেগে যেতে পারবেন।

কমল এই শ্লেষেরও কোন উত্তর দিল না, তেমনই মৌন হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমি জানি, বৌদি সত্যিই সাধু চরিত্রের মেয়ে। সেজদার দারুণ দুর্দিনে আগ্রায় এসেছিলেন বোধ হয় ভায়েদের অমতে। এই আসা এবং থাকার জন্যই হয়ত ও-দিকের সকল পথ বন্ধ হয়েছে। অথচ এদিকেরও দেখ্‌লাম বিপদের দিনে পথ খোলা নেই। তাই ভাবি, বিনা দোষেও এ দেশের বিধবারা কত বড় নিরুপায়।

কমল তেম্‌নি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এই সব শুনে আপনি হয়ত মনে মনে হাস্‌চেন, না ?

কমল হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

হরেন্দ্র বলিল, আমি প্রায়ই যাই আশুবাবুকে দেখ্‌তে। ওঁরা দুজনেই আপনার খবর জান্‌তে চাচ্ছিলেন। বৌদির তো আগ্রহের সীমা নেই, একদিন যাবেন ওখানে ?

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আজই চলুননা হরেনবাবু, তাঁদের দেখে আসি।

আজই যাবেন ? চলুন। আমি একটা গাড়ী নিয়ে আসি। অবশ্য যদি পাই। এই বলিয়া হরেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, কমল তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিল, গাড়ীতে দুজনে একসঙ্গে গেলে বৌদি হয়ত' রাগ করবেন। হেঁটেই যাই চলুন।

হরেন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এর মানে ?

মানে নেই,—এম্‌নি। এই বলিয়া কমল হাসিমুখে কহিল, চলুন যাই।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

বিশ্বকবি, জগদ্বরেণ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদেশ ভ্রমণ শেষ করিয়া সুস্থ শরীরে দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন; আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। এই ভ্রমণ-উপলক্ষে তিনি আমেরিকায় যে অভদ্র ব্যবহার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য সুধু ভারত কেন, সমস্ত শিক্ষিত জগৎই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ সহসা আমেরিকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদায়-বিশেষের অভদ্র ব্যবহারের অনেক উচ্চ অবস্থিত; তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে, ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি তাহা তুচ্ছ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি এই ব্যবহারকে প্রাচ্যের প্রতি প্রতীচ্যের অবমাননা মনে করিয়াই ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং সেই কারণেই সমগ্র এসিয়াবাসীর সম্মান রক্ষার জন্য আমেরিকা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বাংশেই কবিবরের উপযুক্ত হইয়াছে।

কথাটা একটু বিস্তৃতভাবেই বলা কর্ত্তব্য মনে করি। আমেরিকার 'সান্‌ফ্রান্সিস্কো নিউজ' পত্রে আমেরিকবাসী শ্রীযুক্ত বেরি মহোদয় 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি অভদ্রতা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম আমরা নিয়ে দিলাম; তাহা হইতেই সমস্ত ঘটনা উপলব্ধ হইবে। মিঃ বেরি লিখিয়াছেন—কবি ও দার্শনিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি আধুনিক ভারতের গৌরব; সুতরাং তাঁহার মত লোকের প্রতি আমেরিকান কর্ত্তৃপক্ষ যদি অতি সামান্য অবহেলার ভাবও প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তথাপি তাহা জনসাধারণের সমালোচনার যোগ্য। এই চাঞ্চল্যকর সংবাদের কাহিনী সংক্ষেপে এই—ভ্যাঙ্কুভার আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত হইবার জন্য কানাডা সরকার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে পৌঁছিলেন, তখন কোবির আমেরিকান কন্‌সাল তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহাকে আনন্দ ও আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থনা করা হইবে। ভ্যাঙ্কুভারে ও ভিক্টোরিয়াতে রবীন্দ্রনাথ অগণিত শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। কানাডা হইতে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, ছয় সপ্তাহ কাল তিনি দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন এবং কালিফোর্ণিয়া যাইবার পথে কিছুকালের জন্য স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে থাকিবেন। তিনি লস্ এঞ্জেলে বক্তৃতা দিয়া পানামা খাল হইয়া ইংলণ্ডে যাইবেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলি বক্তৃতা দিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সব ব্যবস্থা আর বাস্তবে পরিণত হইবার সুযোগ পাইল না। তিনি কানাডা সীমান্ত অতিক্রম করিতে গিয়া যেরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইলেন, তাহাতেই তাঁহার পূর্ব্বকৃত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথকে এই জানান হইয়াছিল যে, কানাডা সীমান্ত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ভ্যাঙ্কুভারের ইমিগ্রেসন আফিসে আসিতে হইবে। তাঁহার বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃপক্ষকে জানান যে, তিনি অতিশয় দুর্ব্বল ও ব্যস্ত, সুতরাং সাক্ষাৎকারের নির্দ্দিষ্ট সময় দেওয়া উচিত। ইহার উত্তরে ইমিগ্রেসন আফিসের একজন কর্ম্মচারী বলে, "বিকালে আসিতে বলিও, আমরা কি করিতে পারি দেখিব।" যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথ ইমিগ্রেশন আফিসে পৌঁছিলেন। যদিও ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইল, তথাপি তাঁহাকে অর্দ্ধঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল এবং উক্ত কর্ম্মচারী নানাপ্রকার সামান্য বিষয়ে অপরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সময় কাটাইল, অথচ ভুলক্রমেও আফিসের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। অতঃপর উক্ত কর্ম্মচারী রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "এস"। তারপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে একখানি চেয়ার দেখাইয়া বলিল, "ওখানে বস।" তারপর কর্ম্মচারীটি তাঁহাকে এরূপ ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, যাহা বড়ই অপমানজনক। সেই অভদ্র লোকটা কবিবরকে জিজ্ঞাসা করিল, কে তোমার আসিবার ভাড়া দিয়াছে? তুমি কি কখনো জেলে ছিলে? তুমি কি যুক্তরাষ্ট্রে চিরস্থায়ী ভাবে বাস করিবে? এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া ক্ষণিকের জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে উত্তেজনার সঞ্চার হইল। কিন্তু ধীরভাবে

তিনি উত্তর দিলেন, "না, না, কখনই নয়।" অন্যান্য সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও তিনি অতিশয় শান্তভাবে দিয়াছিলেন। যিনি আধুনিক সভ্যতার একজন শ্রেষ্ঠ যুগান্তকারী পুরুষ-প্রবর বলিয়া গণ্য, তাঁহার প্রতি এইরূপ অপমান আমাদের দেশে বোধ হয় আর হয় নাই। ইহাতে জগতের সম্মুখে আমাদের অভদ্রতা ও অবিবেচনার পরিচয় প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্দারা আন্তর্জ্জাতিক সদ্ভাবের বৃদ্ধি হইবে না। তদুপরি যিনি আমেরিকান আদর্শের প্রতি অনুরাগী, তাঁহাকে এরূপভাবে অপমানিত করা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী হিন্দুসভ্যতার মূর্ত্ত প্রতীক্। ইঁহারাই নিজেদের লোকের নিকট যুক্তরাজ্যকে সাম্যতন্ত্র ও উদারতার আদর্শস্থল বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। মিঃ বেরির এই বর্ণনা হইতেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারা যায়।

—

মাইকেল মধুসূদনের সমাধি-পার্শ্বে

মাইকেলের সহধর্ম্মিণী হেন্‌রিএটার সমাধি-পার্শ্বে

বিগত ২৯শে জুন কবিবর মাইকেল মধুসূদনের স্বর্গারোহণ দিবসে তাঁহার স্মৃতি-চর্চ্চা ও লোয়ার সারকুলার রোডের সমাধিস্থানে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে দিন প্রাতঃকালে মাইকেলের সমাধি-পার্শ্বে অনেক সাহিত্য-সেবীর সমাগম হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী লিখিত একটী কবিতা পঠিত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্য-সেবকগণ মাইকেলের কবিপ্রতিভার বর্ণনা করিয়া প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করেন; সভাপতি মহাশয়ও সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলেন। সমাধি-পার্শ্বে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই একবাক্যে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, মাইকেলের সমাধির পার্শ্বেই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর যে সমাধি রহিয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকে লৌহ-নির্ম্মিত বেষ্টনী নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করা হউক। ইহা বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে। আমরা ভরসা করি অবিলম্বেই আমাদের দেশবাসীবৃন্দ এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে অবহিত হইবেন। সেদিন সমাধিস্থানে যে দুইখানি আলোকচিত্র শ্রীমান্ সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

—

সেইদিনই অপরাহ্ণ ছয়টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রমেশভবনের বিস্তৃত কক্ষে মাইকেলের স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে বহু সাহিত্যিকের সমাগম হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মাইকেলের প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া একটী অতি সুন্দর প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ২৪শে জানুয়ারী তারিখে মাইকেল যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেই দিনে প্রতিবৎসর সাগরদাঁড়িতে একটা মহোৎসবের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রস্তাব সকলেই সাগ্রহে অনুমোদন করেন। সাগরদাঁড়ির সমীপবর্ত্তী ধানদিয়া গ্রাম নিবাসী, যশোহর ঝিকরগাছা হইতে কপিলমুনি পর্য্যন্ত যাতায়াতকারী স্বদেশী ষ্টীমার কোম্পানীর প্রধান পরিচালক ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরম উৎসাহে এই মহোৎসব-যাত্রীদিগের যাতায়াতের সুব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম প্রভৃতি বক্তৃতা করেন; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় মাইকেলের কবিতা আবৃত্তি করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় কবিবর হেমচন্দ্রের লিখিত মাইকেলের 'স্বর্গারোহণ' কবিতা পাঠ করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন।

মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলার শুনানি আরম্ভ হইয়াছে। সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ লংফোর্ড জেম্‌স কয়েকদিন ধরিয়া মামলার বিবরণ বর্ণনা করিয়া প্রাথমিক বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতায় তিনি না বলিয়াছেন এমন কথাই নাই; মীরাট ষড়যন্ত্রের সহিত পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানের বল্‌শেভিক দলের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, ইহাই তাঁহার বক্তৃতার সার কথা। তাহার পরই আসামী পক্ষ হইতে মোকদ্দমা মীরাট হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিবার উদ্দেশ্যে সময় গ্রহণ করা হয়। সেদিন এলাহাবাদ হাইকোর্টে এই স্থানান্তরিতের আবেদন উপস্থিত করা হইলে প্রধান বিচারপতি বলেন যে, মাত্র কয়েকজন আসামী মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করিবার আবেদন করিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা আইনসঙ্গত হইবে না; সকল আসামী একত্রযোগে আবেদন না করিলে কোন মত প্রকাশ করা হইবে না। আসামী পক্ষের ব্যবহারাজীবগণ সত্বরই সংশোধিত আবেদন উপস্থিত করিবেন এবং যে কয়দিন এই আবেদনের নিষ্পত্তি না হয়, সে কয়দিন মীরাটের বিচার কার্য্য বন্ধ থাকিবে।

বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন ও মনোনয়ন শেষ হইয়া গিয়াছে। দুই দিনের জন্য কাউন্সিলের অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম দিনে সরকারী বেসরকারী, নির্ব্বাচিত মনোনীত সদস্যগণ ভারত সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যেই সেদিনের সমস্ত সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনে কাউন্সিলের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং এই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই প্রচলিত প্রথা অনুসারে মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি নির্ব্বাচন পাঁচ মিনিটেই শেষ হইয়াছিল। সভাপতি পদের জন্য তিনজন প্রার্থী ছিলেন,—শ্রীযুক্ত রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় ও শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম; কিন্তু নির্ব্বাচন সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেই শেষোক্ত দুইজন সরিয়া দাঁড়াইবার ফলে আর ভোট সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই; মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ই দ্বিতীয় বার সভাপতি হইলেন। এই নির্ব্বাচনে সকল সদস্যই সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সহকারী সভাপতির পদের জন্য মিঃ রেজায়ুর রহমান ও সৈয়দ মাজিদ বক্স মহোদয়দ্বয় প্রার্থী ছিলেন। উভয়েই শেষ পর্য্যন্ত ভোট যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ভোটের ফলও উভয়পক্ষে সমান-সমান হইয়াছিল। অবশেষে সভাপতি মহাশয়ের অতিরিক্ত ভোটের ফলে (Casting vote) মিঃ রেজায়ুর রহমান ডেপুটী সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইলেন; স্বদেশী দলভুক্ত প্রার্থী সৈয়দ মাজিদবক্স মহোদয় পরাজিত হইলেন। সভার কার্য্যও শেষ হইল। আগামী আগষ্ট মাসে সভার পুনরধিবেশন হইবে। তখন মন্ত্রী-নিয়োগের অভিনয় বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বজেট আলোচনা-উপলক্ষে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় পোষ্ট গ্রাডুয়েট বিভাগ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত বিভাগের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে ; এই বিভাগের আয়ের পথ অতি সঙ্কীর্ণ। উক্ত বিভাগের ছাত্রদত্ত বেতন হইতে বৎসরে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া যায় ; ফি-ফণ্ডের তহবিল হইতে পোষ্ট গ্রাডুয়েট বিভাগের সাহায্যের জন্য একলক্ষ টাকা মাত্র পাওয়া যাইবে। বজেটে ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের জন্য উক্ত বিভাগের ব্যয়ের বরাদ্দ সাত লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা। আয় ও ব্যয়ের হিসাব খতাইয়া দেখিলে পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ঘাট্‌তি হইবে। এতদ্ব্যতীত পোষ্ট গ্রাডুয়েট বিভাগের অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৎসরে ত্রিশ হাজার টাকা বাড়িবে। এই সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যতীত অন্যান্য সাময়িক ব্যয়ও যে পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে না, তাহা বলা যায় না। তাহা হইলেই মোটের উপর ছয় লক্ষ টাকা কম পড়িবে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই বিভাগের আয় বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। পোষ্ট গ্রাডুয়েট বিভাগের ছাত্রদিগের বেতন অল্পদিন পূর্ব্বেই বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ; যদি আবার তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলেই বা কয়টী টাকা আয় বাড়িবে ? সুতরাং ছাত্রদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া বিশেষ লাভের সম্ভাবনা নাই এবং বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের বেতন পুনরায় বৃদ্ধি করা কিছুতেই কর্ত্তব্য হইবে না। এক আছেন আইন কলেজ ; কিন্তু যে প্রকার অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আইন কলেজ হইতে বিশেষ কিছু পাইবার আশা মোটেই নাই। কাজেই এই ঘাট্‌তি ছয় লক্ষ টাকা যদি গবর্ণমেণ্ট সাহায্য না করেন, তাহা হইলে পোষ্ট-গ্রাডুয়েট বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে চলা দূরে থাকুক, অনেকটা অচলই হইয়া পড়িবে। পোষ্ট গ্রাডুয়েট বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ যথেষ্ট করা হইয়াছে ; এখন আরও ব্যয় কমাইতে গেলে উক্ত বিভাগের কোন কোন বিষয়ের অধ্যাপনা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। আমাদের মতে তাহা সমিচীন হইবে না। এই বিভাগের অঙ্গচ্ছেদ কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব, গবর্ণমেণ্ট যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অভাব পূরণের ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে এতবড় একটা প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি হইবে, তাহা আর পূরণ হইবে না।

কন্‌গ্রেসে আবার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে। কন্‌গ্রেসের প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি হইতে সভাপতি মতিলাল নেহেরু মহোদয় আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলসমূহে যে সকল স্বরাজী সদস্য আছেন, তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে। এই ব্যাপার লইয়া বিশেষ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে ; বাঙ্গালা দেশের স্বরাজীগণ এ আদেশ কিছুতেই মানিবেন না, কারণ দ্বৈতশাসন অচল করিবার জন্যই তাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রথম যখন এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে কাউন্সিল গঠিত হয়, তখন স্বরাজীদল ইহাতে যোগ দেন নাই। কিন্তু তিন বৎসর পরে যখন পুনরায় কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা হইল, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বাহির হইতে দ্বৈত শাসনকে অচল করা সম্ভবপর হইবে না, কাউন্সিলের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। তখন অনেক বাদানুবাদের পর দেশবন্ধুর প্রস্তাবই গৃহীত হয় এবং স্বরাজীদল অনেক স্থানেই দ্বৈত-শাসন অচল করিয়া দেন। বিশেষতঃ, বাঙ্গালা দেশে ত কিছুতেই এতকাল নির্ব্বিবাদে মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইতেই পারে নাই। এই যে সেদিন বাঙ্গালা দেশের কাউন্সিলের পুনরায় নির্ব্বাচন হইল, ইহাতে স্বরাজীদল মন্ত্রী নিয়োগের বিরোধিতা করিবেন বলিয়াই ত ভোট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা কি বলিয়া কাউন্সিল হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন ? সুতরাং বাঙ্গালা দেশের স্বরাজীদল মূল পরিষদের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, কাউন্সিল বর্জ্জনের আদেশ হইতে তাঁহাদিগকে রেহাই দিতে হইবে। যেরূপ অবস্থা তাহাতে অন্যান্য প্রদেশ হইতেও এই প্রকার প্রতিবাদ উপস্থিত হইবে। এ সময়ে ঐ আদেশ প্রত্যাহার না করিলে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইবে। এ অবস্থায় আপাততঃ উক্ত আদেশ রদ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ না কি উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করিবার কোন বিশেষ যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তবে, আমাদের মনে হয়, এ আদেশ প্রত্যাহার করিতেই হইবে, নতুবা কন্‌গ্রেসের মধ্যে পুনরায় দলাদলি হইয়া তাহার কার্য্যশক্তি ব্যাহত হইবে।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডাঃ বিনয়লাল মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার এম, এ, আই, সি, এস্ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে "অর্থনীতিশাস্ত্রে" ট্রাইপস্ (tripos) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বি, এ ও এম, এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে বিলাতে কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন।

শোক-সংবাদ

পরলোকগত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীব, স্বদেশের অগ্রণী, পণ্ডিত-প্রবর ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোক গমনে আমরা মর্ম্মাহত

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

হইয়াছি। বিগত ৭ই আষাঢ়, ১৩৩৬, (২১শে জুন, ১৯২৯,) শুক্রবার প্রাতঃকালে তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য হাজারীবাগে গমন করেন। সেখানে তাঁহার উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আত্মীয় স্বজনগণ তখন তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। এখানে তাঁহার অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে থাকে। অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়াছে। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে কেবল কলিকাতা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার ছিলেন তাহা নহে, দেশের উন্নতির জন্য যখন যে আয়োজন হইয়াছে, যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেইখানেই সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্যোমকেশ অগ্রণী-দিগের অন্যতম ছিলেন; রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, জাতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণ দিয়া খাটিয়াছিলেন, নিজের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের জন্য তিনি যে কি চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিনি একবাব কয়েকদিনের জন্য মন্ত্রীও হইয়া-ছিলেন, কিন্তু সে পদ অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তিনিই বাঙ্গালা দেশে জমিদার সভা, (Landho'der's Association) স্থাপিত করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার বিপুল প্রসার ছিল; তাহারই মধ্যে সময় করিয়া লইয়া তিনি সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থে অভিনিবিষ্ট হইতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। শেষ বয়সে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তিনি বিশেষ মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য তাঁহার চিত্ত এমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনে বাঙ্গালা দেশ যে একজন কৃতী সুসন্তান হারাইয়াছে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব-গণের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

পরলোকগত অমৃতলাল বসু

বাঙ্গালা দেশের রঙ্গমঞ্চের অন্যতম দিক্‌পাল, বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, রঙ্গরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার রসরাজ অমৃতলাল বসু আর ইহজগতে নাই; বিগত ১৮ই আষাঢ়, ১৩৩৬, (২রা জুলাই, ১৯২৯,) মঙ্গলবার অপরাহ্নে তাঁহার নশ্বর দেহের অবসান হইয়াছে। পরলোক গমনের তিন চার দিন পূর্ব্বে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিছুদিন হইতে মধ্যে মধ্যেই তাঁহাব শরীর অসুস্থ হইত; আবার দুই দশ দিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হইতেন, আবার তাঁহার পূর্ব্বের মত সদানন্দ ভাব ফিরিয়া আসিত, সাতাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আবার যুবকের ন্যায় স্ফূর্ত্তিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, আবার তাঁহার সরস বাক্যচ্ছটায় সকলের প্রাণে রসধারা প্রবাহিত হইত, হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার হইত। এবারও আমরা তাহাই মনে করিয়াছিলাম, সাতাত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ হইলেও তাঁহাকে আমরা শত বৎসরের সুদীর্ঘ জীবন-কাল দিয়া রাখিয়াছিলাম—দেশের লোকের এমনই ভক্তি প্রীতি তাঁহার উপর ছিল। কিন্তু এতকালের আত্মীয়তা, বান্ধবতা সমস্ত মায়াপাশ ছেদন করিয়া রসরাজ রসলোকে প্রস্থিত হইয়াছেন; দেশের বৈঠকী মজ্‌লিস অন্ধকার হইয়া গেল, বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের একটী জ্যোতিষ্ক খড়িয়া পড়িল, হাস্য-রসের একটা প্রস্রবণ শুকাইয়া গেল, বক্তৃতামঞ্চ আর সে রসলহরী শুনিতে পাইবে না; আর 'তরুবালা' 'সাবাস আটাশ' 'বিবাহ-বিভ্রাট' দেখিতে পাইব না, আর 'is the'র বুক্‌নি শুনিতে পাইব না। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রের এক দিকে অমৃতলালের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না; বাঙ্গালা দেশে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অমৃতলালই অবশিষ্ট ছিলেন। তিনিও চলিয়া গেলেন। আমাদের সান্ত্বনার কথা এই যে, আমরা তাঁহার জীবিত-কালে তাঁহার উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে ক্রটী করি নাই; তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন; বাঙ্গালী সাহিত্যিকের সর্ব্বপ্রধান সম্মান সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিত্ব তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিল; দেশের সামাজিক, রাজনীতিক প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। এমন একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক, রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, রসরচনায় সিদ্ধহস্ত, হাস্যরসিক অমৃতলালের পরলোক গমনে দেশের একটা দিক যে শূন্য হইল, তাহার আর পরিপূরণ হইবে না। আমরা ভগবানের চরণে অমৃতলালের চির শান্তি লাভ প্রার্থনা করি।

স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু

পরলোকগত মহারাজাধিরাজ রামেশ্বর সিং বাহাদুর

দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ রামেশ্বর সিং বাহাদুর জি-সি-আই-ই, কে-বি-ই মহোদয় বিগত ২০শে আষাঢ়, ১৩৩৬, ৪ঠা জুলাই, ১৯২৯, মধ্যাহ্নে দ্বারবঙ্গের রাজনগর প্রাসাদে পরলোকগত হইয়াছেন। দেহত্যাগের সময় তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। কিঞ্চিদধিক ছয় মাস হইতে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর নানা পুরাতন পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর যেমন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, তেমনই অন্য ধর্ম্মাবলম্বী-

স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ রামেশ্বর সিং বাহাদুর

দিগের প্রতি তাঁহার উদারতার সীমা ছিল না। তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যাহাতে হিন্দুজাতির উন্নতি হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় অতুল গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের একান্ত কামনা ছিল। তিনি যখন যে সভায় গমন করিয়াছেন সেখানেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্ম্ম-মহাসভা, নিখিল-ভারত হিন্দুসভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল, কলিকাতা করপোরেসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁহার দানের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেশের উন্নতিকল্পে যে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কামাখ্যার প্রসিদ্ধ মন্দিরের জীর্ণসংস্কারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন; বিহারের বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দানবীর, উদারচেতা মহাশয়ের পরলোক-গমনে বাঙ্গালা বিহারের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবে না। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজ্যাধিকারী মহারাজাধিরাজকুমার কামেশ্বর সিং বাহাদুর পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজ্যের সুনাম রক্ষা করুন।

পরলোকগত হেমেন্দ্রনাথ সেন

কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব সর্ব্বজনপ্রিয়, মহানুভব হেমেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের

স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ সেন

অকালে পরলোক গমনে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি বহরমপুরের সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় পরলোকগত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠের ন্যায় তিনিও দেশের লোকের কাছে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার

সংশ্রবে যিনি একবার আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহারে, তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। বরাবরই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল। বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ তিনি যথারীতি কাজকর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং নানা স্থানে গমন করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে একটু অসুস্থ বোধ করায় আর বাহির হন নাই। পরদিন প্রভাতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার উদরাময় রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তখন হইতেই ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে থাকেন। তাহার পরই তাঁহার দেহাবসান হয়। হেমেন্দ্রবাবু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩৬ অব্দের ৬ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার দেহাবসান হয়।

পরলোকে ললিতমোহন ঘোষাল

আমরা অতীব শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, স্বদেশসেবক, প্রসিদ্ধ বাগ্মী, আমাদের পরম বন্ধু ললিতমোহন আর ইহজগতে নাই; বিগত ২০শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ললিতমোহন সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। স্বদেশী যুগে এমন সভাসমিতি ছিল না যাহাতে ললিতমোহনের বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। তিনি সার সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। স্বদেশীর সেই বিপুল আন্দোলন কম পড়িলেও ললিতমোহনের কণ্ঠ নীরব হয় নাই; তিনি সেই স্বদেশী আমলে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে ব্রত ত্যাগ করেন নাই। শরীর অসুস্থ হওয়ায় কিছুদিন হইতে তিনি কখন পুরী, কখনও কাশীতে বাস করিতেছিলেন। বিগত ২৮শে জুন তিনি কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পরদিন ২৯শে জুন প্রাতঃকালে যখন মহাকবি মাইকেলের সমাধি-পার্শ্বে তাঁহার সহিত দেখা হইল, তখন বলিলেন যে, মাইকেলের স্মৃতিপূজার জন্যই তিনি কাশী হইতে আসিয়াছেন; দুই একদিন পরেই কাশী যাইবেন। সেদিন সাহিত্য-পরিষদেও মাইকেলের স্মৃতিসভায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার পরই ৪ঠা জুলাই তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতা কাশীতে রহিয়াছেন, পিতার শেষ শয্যা-পার্শ্বে তিনি উপস্থিত থাকিতেও পারিলেন না। বিশ্ববিধাতা ললিতমোহনের আত্মার সদ্গতি বিধান করুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "পঙ্কদশী"—২৲

মন্মথ রায় এম-এ প্রণীত নাটক "শ্রীবৎস"—১৲

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এল এম-এস প্রণীত "ফিজিওলজি"—৪॥০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "প্রতারক"—১৸০

শ্রীমতী নীহারমালা দেবী প্রণীত "আদর্শ রন্ধনশিক্ষা"—১॥০

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "পরশমণি"—১॥০

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "মানিনী"—১।০

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "রক্ত-কমল"—১৲

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "পরিণয়"—১৲

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যলহরী সিরিজের "ঝোপে-ঝোপে নেকড়ে" ও "জলে-জঙ্গলে যুদ্ধ" প্রত্যেক—৸০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত "মহাভারতের গল্পগুচ্ছ" ও "দিগ্বিজয়ী বীর" প্রত্যেক—॥০

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভেল্কী"—।৵০

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

মঙ্গল ঘট

শিল্পী— শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS

ভাদ্র—১৩৩৬

প্রথম খণ্ড } সপ্তদশ বর্ষ } তৃতীয় সংখ্যা

ষড়্‌জগীতা

রায় শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর বি-এল্

শ্রীমন্মহাভারত নানা উজ্জ্বল রত্নের আকর। তন্মধ্যে ষড়্‌জগীতা একটী। উহা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধকে গীতা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। গীতা বলিলে আমরা সচরাচর শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সপ্তশত-শ্লোকযুক্ত জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধকে বুঝিয়া থাকি। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের মধ্যে উহার প্রাধান্য। কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধও গীতা নামে আখ্যাত। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষপর্ব্বাধ্যায়ে অনেক প্রবন্ধ গীতা নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—পিঙ্গল-গীতা, শম্পাক-গীতা, মঙ্কি-গীতা, হারীত-গীতা, বৃত্রগীতা, পরাশর-গীতা, হংস-গীতা প্রভৃতি। কূর্ম্মপুরাণের কতক অংশ ঈশ্বর-গীতা নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত রামগীতা, পাণ্ডবগীতা, অষ্টাবক্রগীতা প্রভৃতি। অনেক "গীতা" বর্ত্তমান আছে। সকলগুলিই জ্ঞানগর্ভ।

শ্রীমদ্ভাগবত-গীতায় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন এই দুইজনের কথোপকথন কথিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে ষড়্‌জ-গীতার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বক্তা বিদুর ও পঞ্চপাণ্ডব এই ছয়জন। এই ছয়জনের কথোপকথনমূলক প্রবন্ধ ষড়্‌জগীতা নামে অভিহিত। শ্রীমন্মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে ১৬৭ অধ্যায়ে এই মনোরম গীতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গীতারত্নের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

ভীষ্ম শরশয্যাগত। তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতির ধর্ম্ম এবং প্রসঙ্গতঃ অর্থ ও কাম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রোতা বিদুর পঞ্চপাণ্ডবগণ ও নৃপতিগণ। বিশ্রামার্থ ভীষ্ম মৌনভাব অবলম্বন করিলে বিদুরের সহিত পঞ্চপাণ্ডব নিজ শিবিরে গমন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই

তিনের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, কোন্‌টী মধ্যম এবং কোন্‌টী নিকৃষ্ট। এবং কাম, ক্রোধ ও লোভের জয়ের জন্য কোন্ বিষয়ে মনঃসমাধান কর্ত্তব্য।

প্রশ্নটী অতি গুরুতর। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রশ্ন লইয়া নানা তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, ৪০০০।৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের প্রথম প্রশ্ন—অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ইহার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, কোন্‌টী মধ্যম, কোন্‌টী নিকৃষ্ট, ইহা লইয়া সমাজ কম আলোড়িত হইতেছে না। কথা উঠিয়াছে, সাহিত্যে ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম থাকে ভাল, না থাকে ক্ষতি কি? পাঠকের ভোগস্পৃহার চরিতার্থতা ও গ্রন্থকারের অর্থলাভ হইলেই হইল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কথা উঠিয়াছে যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া দেশ উৎসন্নে গিয়াছে, ধর্ম্মের প্রাধান্যের প্রয়োজন নাই। সমাজে অর্থের প্রাধান্য ও ধর্ম্মের হীনতা লক্ষিত হইতেছে। কে আধিপত্য করিবে তাহা প্রশ্নের স্থল। কাম্য বস্তু লাভের জন্য ধর্ম্ম ও অর্থ নানা স্থানে বিসর্জ্জিত হইতেছে। এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সাধু কার্য্যের নামে চলিয়া যাইতেছে। নানা জটিল ও কঠিন সমস্যা সমাজের সর্ব্বত্র উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপ চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই জানা উচিত।

টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন যে, এই আখ্যায়িকা-মুখে বেদব্যাস ঠাকুর দেখাইয়াছেন যে, একই গুরুর নিকট ভিন্ন-ভিন্ন শিষ্য একই উপদেশ শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুযায়ী সেই উপদেশের অর্থ করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে বিদুর কহিলেন, "বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, তপস্যা, অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচরণ, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞক্রিয়া, ক্ষমা, ভাবশুদ্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, এই ছয়টী, ধর্ম্মের সম্পদ। ধর্ম্ম ও অর্থ এই সকলের মূল। আমি ইহাদিগকে অভিন্ন মনে করি। এবং অর্থ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।" বিদুরের মতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, অর্থ মধ্যম এবং কাম নিকৃষ্ট।

অর্জ্জুন বলিলেন, এই পৃথিবী কর্ম্মভূমি; অতএব ইহাতে প্রবৃত্তি-বিধায়ক কর্ম্মই প্রধান। কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, বিবিধ শিল্পকর্ম্ম—সকলের ব্যতিক্রম না করিলেই অর্থ হয়। অর্থ ব্যতীত ধর্ম্ম ও কাম তিষ্ঠিতে পারে না। অর্থ সিদ্ধি না হইলে ধর্ম্ম ও কাম নিবৃত্ত হইবে। অর্থবান পুরুষকে সকলেই সেবা করিয়া থাকেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণেরও অর্থাভিলাষ করিতে হয়। সন্ন্যাসীরাও অর্থার্থী। অনেকে স্বর্গ-কামনায় ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন। আস্তিক ও নাস্তিক সকলেই অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

নকুল ও সহদেব কহিলেন, অর্থোপার্জ্জন জন্য সকলের সতত চেষ্টা করা আবশ্যক। উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা কাম্য বস্তুর ভোগ হয়, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। আমাদের মতে ধর্ম্মের সহিত অর্থ ও অর্থের সহিত ধর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে অমৃত তুল্য। অর্থহীন মানবের কাম্য বস্তুর ভোগ হয় না, এবং ধর্ম্মহীন জনের অর্থ কোথা হইতে হইবে? এজন্য যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, লোক সকল তাহা হইতে উদ্বেজিত হয়। অতএব অসংযত-চিত্ত ব্যক্তির ধর্ম্মকে প্রধান করিয়া অর্থ সাধন করা উচিত।

সুধিগণ দেখিবেন, বিদুরের মতের সঙ্গে নকুল ও সহদেবের মতের পার্থক্য অতি সামান্য।

তৎপর ভীমসেন কহিলেন "কামনাশূন্য পুরুষ অর্থ-কামনা করেন না। কামনাহীন ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হয় না; এবং যাহার কামনা নাই, সে ত কোনও বিষয় কামনা করে না। কামই শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ কামনাবশতঃ ফল, মূল, পত্র প্রভৃতি ও বায়ু ভক্ষণ করতঃ নিতান্ত সংযত হইয়া তপস্যার জন্য সমাহিত হইয়া থাকেন। অপরে স্বাধ্যায়-পরায়ণ হইয়াও কামনাবশতঃ বেদবেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রানুশীলনে নিরত হন। কেহ কেহ শ্রদ্ধা-সম্পাদিত যজ্ঞক্রিয়াতে কামনাবশতঃ দান ও প্রতিগ্রহ করেন। বণিক, কৃষক, পশুপালক, কারু, শিল্পী এবং যাঁহারা দেবকর্ম্ম করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই কামানুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কোন কোন মানব কামনাযুক্ত হইয়া সাগর-গর্ভে প্রবেশ করে। কাম বহু রূপে সমস্ত পদার্থেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে মহারাজ! কাম হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, ছিল না, ও হইবে না। ইহাই সার পদার্থ। ধর্ম্ম ও অর্থ ইহাতে অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন দধি হইতে নবনীত, পিণ্যাক ফল হইতে তৈল, তক্র হইতে ঘৃত, কাষ্ঠ হইতে পুষ্প ও ফল এবং পুষ্প হইতে মধু শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে কাম শ্রেষ্ঠ। কামই ধর্ম্ম ও অর্থের কারণ এবং কামই ধর্ম্ম ও অর্থের আত্মাস্বরূপ। কামনা না থাকিলে ব্রাহ্মণগন ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ ও অর্থ প্রদান করেন না এবং জনগণের বিবিধ চেষ্টা সম্পন্ন হয় না। অতএব ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে কাম প্রধান।

বিদুর ও চারি পাণ্ডবের বক্তব্য শেষ হইবার পর যুধিষ্ঠিরের মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হইল। তাঁহার বক্তব্য বলিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তাঁহার দুইটী প্রশ্ন ছিল। প্রথম প্রশ্ন, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, কোন্‌টী মধ্যম ও কোন্‌টী নিকৃষ্ট। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কাম, ক্রোধ ও লোভ বিজয়ের জন্য কোন্ বিষয়ে মনঃসমাধান কর্ত্তব্য। বিদুর ও চারি পাণ্ডব প্রথম প্রশ্নের যথামতি উত্তর দিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির পূর্ব্বোক্ত পাঁচজনের কাহারও কথা অগ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, আপনারা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় নির্ণয় করিয়াছেন এবং সমস্ত প্রমাণ বিদিত হইয়াছেন, ইহাতে সংশয় নাই। আমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহার সিদ্ধান্ত-বাক্য শ্রবণ করিলাম। আপনারা যাহা কহিলেন, তাহা অবশ্যই নিশ্চিত বাক্য বটে।

এ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের নিজ মন্তব্য এই যে—"যে মনুষ্য পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অর্থ, এবং কামে নিরত নহেন, যিনি দোষহীন এবং কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে সমদর্শী, তিনি সুখ, দুঃখ ও অর্থসিদ্ধি হইতে বিমুক্ত হন। জাতিস্মর ও জরা-বিকার সমন্বিত মানবগণ ভূয়োভূয়ঃ সুখ দুঃখাদি দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া মোক্ষের প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা মোক্ষের বিষয় কিছুই অবগত নহি। ভগবান স্বয়ম্ভু বলিয়াছেন, রাগদ্বেষাদিবিশিষ্ট স্নেহযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি হয় না। মমত্ব-জ্ঞানরহিত পণ্ডিতগণই নির্ব্বাণপরায়ণ হন। অতএব প্রিয় ও অপ্রিয় কোনও কার্য্য করিবে না। মোক্ষ সাধনের উৎকৃষ্ট উপায় এই যে, বিধাতা আমাকে যে বিষয়ে যেরূপে নিযুক্ত করেন, আমি সেই বিষয়ে সেইরূপ করিতেছি। বিধাতা প্রাণিগণকে সমস্ত বিষয়ে নিযুক্ত করিতেছেন। অতএব বিধিই বলবান ইহা সকলেরই অবগত হওয়া উচিত। অপ্রাপ্য অর্থ কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা অবগত থাকা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গবিহীন মানবও অর্থ লাভ করে। বৈশম্পায়ন জানাইয়াছেন যে, যুধিষ্ঠিরের বাক্য অন্য পাণ্ডবগণের ও নৃপতিবর্গের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

ষড়্‌জ গীতা এইখানেই শেষ হইল। ইহাতে বিভিন্ন মতই প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার চেষ্টা হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,—কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন্ কর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম, আর কোন্‌টী অবিহিত কর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণংতে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

ষোড়শ অধ্যায়ে ২৩।২৪ শ্লোক। ইহার ভাবার্থ এই যে, যে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছ কর্ম্ম করে, তাহার কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না; এবং সুখ ও পরকালে সদ্গতিও হয় না। সেইজন্য কোন্‌টী বিহিত কার্য্য, কোন্‌টী অবিহিত কার্য্য, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। সুতরাং শাস্ত্রবিধি অবগত হইয়া কর্ম্ম করিবে।

এখন শাস্ত্র অনেক, বিধিও অনেক। ধর্ম্মশাস্ত্র একমাত্র শাস্ত্র নহে; রাজনীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, যুদ্ধশাস্ত্র, কৃষিশাস্ত্র, বাণিজ্যশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্র আছে। যেখানে কার্য্য সিদ্ধ হয় না অথবা লোকের অপকারজনক হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, কোন না কোন শাস্ত্রবিধি বিধানবিরুদ্ধ হইয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ জয় করিয়া, আত্মবশে আনিবার প্রধান উপায় যথাশাস্ত্র কর্ত্তব্যানুষ্ঠান।

আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতি-শাস্ত্র প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে কোনও বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। উন্নত না হইয়া অবনত হইতেছি। মহামতি অর্জ্জুনের বর্ণিত অর্থহীন ব্যক্তির ন্যায় অবশ্যম্ভাবী দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। প্রাজ্ঞ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মের সহিত অর্থ ও কামের সেবা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সুধিগণের বিশেষ বিবেচনার স্থল।

বোধ হয় এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমরা সাহসযুক্ত হইয়াছি ও ভীরুতাশূন্য হইয়াছি বলিয়া অনেকে গর্ব্ব করি। ব্যবহারতত্ত্ব পূজ্য ও সম্মাননীয় ব্যক্তিকে কর্কশ ভাষায় গালাগালি, চৌর্য্য প্রভৃতি কার্য্য ও ধর্ম্মবিবর্জ্জিত অনেক দুষ্কার্য্যকে সাহস, ও তাহা দণ্ডনীয়, বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা কি সেই অর্থে সাহসী হইতেছি? এবং ভীরুতাশূন্য ইহা দেখাইতে যাইয়া অধর্ম্ম কার্য্য নিঃসঙ্কোচে করিয়া ধর্ম্মভীরুতার অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি? ইহাও সুধিগণের চিন্তনীয়।—নিবেদন ইতি

প্রণবকুমার

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৩০)

হরিশঙ্কর সপরিবারে যখন তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা এগারটা। হাওড়ায় পৌছিতে ট্রেণের না কি বিলম্ব হইয়াছিল। তাঁর বাড়ী কলিকাতার এক প্রান্তে—শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের উপর। বাড়ীতে আসিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিতে বেলা প্রায় তিনটা হইল। তখন প্রণবকুমার তাঁহার জ্যেঠামশাইকে দেখিতে পটলডাঙ্গা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে কত আনন্দ, কত উদ্বেগ। বাড়ীটাকে দূর হইতে দেখিয়া জ্যেঠার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন!

বাড়ীর নিকট আসিয়া এমন একটা স্থানে দাঁড়াইলেন, যে স্থান হইতে বাড়ীর একদিকের জানালাগুলি বেশ দেখা যায়। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সব জানালা বন্ধ। বিস্মিত হইলেন। বাড়ীর অপরপার্শ্বে সরিয়া গিয়া দেখিলেন—সেদিকের জানালাও বন্ধ। তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। প্রণব ত্বরিত পদে দেউড়ি.ত আসিলেন, ভিতরেও দুই এক পা গেলেন। তেওয়ারি দ্বারপার্শ্বে একখানা খাটিয়ার উপর বসিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছিল। প্রণবকে দেখিবামাত্র আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—'দাদাবাবু মহারাজ আ গিয়া।' তাহার চীৎকার শুনিয়া ভজু ছুটিয়া আসিল, দুই এক জন কর্ম্মচারী আসিল, নৃসিংহ আসিল। প্রণামাদি সম্পন্ন হইলে প্রণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যেঠা-মশাই কোথা?"

নৃসিংহ উত্তর করিল, "আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।"

"আমায় খুঁজতে? কবে গেছেন?"

"আপনি চলে যাবার পরই।"

প্রণবের নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া গেল। কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "এমন স্নেহময় পিতা বহু ভাগ্যে লোকে পায়—আমি কত কষ্ট তাঁকে দিয়েছি। তিনি এখন কোথা আছেন?"

"লক্ষ্ণৌয়ে—"

"আমি সেখানে কালই যাব।"

"কোন্ ট্রেণে যাবেন?"

"দেরাদুন এক্সপ্রেসে যাওয়াই সুবিধা; তাঁর ঠিকানাটা আমাকে লিখে দেও।"

"আপনি এখন উপরে চলুন।"

"উপরে? না।"

"কেন, এ ত আপনার বাড়ী।"

"আমার বাড়ী?"

"হাঁ, এটা আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি—কর্ত্তাবাবুর নয়।"

"তুমি এ কি বলছ নৃসিংহ ?"

নৃসিংহ পিতৃমাতৃহীন অনাথ যুবক। পনর বৎসর পূর্ব্বে হরকালী তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়া গৃহে স্থান দিয়াছিলেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, অবশেষে সেরেস্তায় কাজ দিয়াছিলেন। সততা ও বুদ্ধিবলে সে অত্যল্প সময় মধ্যে সকলের স্নেহ ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছিল এবং খাজাঞ্জি পদ লাভ করিয়াছিল। নৃসিংহ উত্তর করিল, "এ কথা কর্ত্তাবাবু আপনাকে বলতে অনুমতি দিয়ে গেছেন, তাই এত কাল পরে আপনাকে জানাচ্ছি। আপনার নামে বরাবর টেক্স খাজনা চল্‌ছে—"

ভজু কহিল, "আরে কর্ত্তাবাবুকে এ কথা বলতে হবে কেন, আমি ত জানি ছোটকর্ত্তা যখন নিজে দেখেশুনে এ বাড়ী খরিদ করেন।"

প্রণব চিন্তামগ্ন হইলেন। নৃসিংহ তাঁহার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। যাইতে যাইতে প্রণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা কোথা ? হাইকোর্ট গেছেন বুঝি ?"

"বসবেন চলুন, বলছি।"

প্রণব তাঁহার সেই পুরাতন ঘরে আসিয়া বসিলেন। ঘরের যে জিনিষটি যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে জিনিষটি সেইখানে আছে—কেহ সরায় নাই—কর্ত্তাবাবুর হুকুমে কেহ কোন দ্রব্য নড়ায় নাই; ভজু দুই বেলা ঝাড়িত মুছিত, আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিত। প্রণব একবার ঘরের চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া তাঁহার চিরপরিচিত চেয়ারখানিতে বসিলেন। নৃসিংহ তখন সমস্ত পরিচয় দিল। হরকালীর বিপদের কথা শুনিয়া প্রণব স্তম্ভিত হইলেন। নৃসিংহ কহিল, মকর্দ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে—পূজার বন্ধের পর দায়রায় বিচার আরম্ভ হইবে। জামিনের চেষ্টা চলিতেছে, কি হইয়াছে জানি না।

প্রণবের প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল। তাঁহারই জন্যে মামাবাবুর এই লাঞ্ছনা! কেন সে গৃহত্যাগ করিল ? ত্যাগ করিল যদি, কেন পত্রাদি লেখা বন্ধ করিল ? অনুতাপে প্রণব দগ্ধ হইলেন। স্থির করিলেন, লক্ষ্ণৌয়ে গিয়া মামাবাবুকে মুক্ত করিবেন। তার পর বিন্দুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নৃসিংহ কহিল, "দিদিমণির বিয়ে হয়ে গেছে ?"

"কার সঙ্গে হ'ল ? আমি জান্‌তে পারলাম না।"

"অজয় বাবুর সঙ্গে। কর্ত্তা তখন এখানে ছিলেন না।"

"তবে বিয়ে দিলে কে ?

"সরিৎবাবু।"

"বটে! অজয়টা কে ? সরিতের কাছে যে যাওয়া আসা করত সেই কি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সে ত অতি দুশ্চরিত্র।"

"আমরা পরে তা' শুনেছি। বিয়ের কোন খবরই আমরা পাই নি, কলেজে টাকা দিতে গিয়ে শুনলুম বিয়ে হয়ে গেছে, আরও জান্‌লুম, জাল চিঠি লিখে দিদিমণিকে কালেজ হ'তে আনা হয়েছিল। দিদিমণি বিয়ে করতে একেবারেই রাজি ছিলেন না, আপনার চিঠি পেয়ে—"

"আমার চিঠি কি রকম ?"

"জাল চিঠি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।"

নৃসিংহ যাহা জানিত সব বলিল। শুনিয়া প্রণব কহিলেন, "সরিৎ তাহলে নিজের বোনের সর্ব্বনাশ করতেও পিছায় নি।"

"সর্ব্বনাশই করেছেন বটে।"

"কি রকম ?"

"দেনার দায়ে অজয় বাবুর সব বিক্রি হয়ে গেছে—এমন কি বাস্তবাড়ীও যেতে বসেছে। হয় ত বা তাঁকে জেলে যেতে হয়।"

"কি সর্ব্বনাশ! কি করেছে সে ?"

"তা' ঠিক জানি না। তবে একটা ফ্যাসাদে পড়েছেন বলে মনে হয়। আমার কাছে আজ সকালে দিদিমণি আট হাজার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন—"

"তুমি দিয়েছ ?"

"না।"

"কেন দেও নি ?"

"কর্ত্তার বা আপনার বিনা হুকুমে অত টাকা দিতে সাহস পেলাম না।"

"আমার হুকুমে দিতে পার ?"

"নিশ্চয় পারি।"

"তবে টাকাটা নিয়ে আমার সঙ্গে চল। ভজুদা, একখানা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাও।"

নৃসিংহ,—"আপনার মোটর গাড়ী ঠিক আছে—"

"আজও যত্ন করে তা'কে রেখেছ ?"

"আপনার সকল জিনিষ যত্নে রক্ষিত আছে।"

ভজু গাড়ী আনিতে ছুটিল; নৃসিংহ একটা জরুরি 'তার' লিখিয়া ডাকঘরে পাঠাইল। দ্বিজনাথকে জানাইল, প্রণব আগামী কল্য দেরাডুন এক্সপ্রেসে লক্ষ্ণৌ যাইতেছেন।

(৩১)

অজয়ের শয়ন ঘর।

বিন্দু শাণিত অস্ত্রখানা জামার নীচে লুকাইয়া রাখিয়া স্বামীর ঘরে আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "প্রস্তুত হয়েছ?"

"এখনও হ'তে পারি নি বিন্দু—একটু বসো।"

"কেন? চিঠি আর লিখতে হবে না—"

"আর দু'চার কথা—"

"উইল পরে লিখো, এখন আমার সঙ্গে এস।"

"কোথা যাব?"

"নীচে।"

"তোমাকে আমি তার কাছে যেতে দেব না।"

"তুমি চলই না কেন?"

"বিন্দু, কেন তুমি আমার অবাধ্য হ'চ্ছ?"

"তুমিই বা আমার কথা শুনছ না কেন?"

"বিন্দু, আজ শেষ দিনে আমার এই মিনতি—"

"তুমি যদি আমাকে সাথী করতে সম্মত হও, তাহলে আমি তোমার কথা শুনতে রাজি আছি।"

"সাথী, কোন্ পথে?"

"যেখানে তুমি যাবে বলে স্থির করেছ।"

"পরপারে?"

"তাতেই বা ক্ষতি কি?"

একটু চিন্তা করিয়া অজয় কহিল, "না বিন্দু, আমি তোমাকে সাথী করতে পারব না।"

"আমার অপরাধ?"

"তোমার এই বয়স—এই রূপ—"

"তোমার অবর্ত্তমানে আমি রূপ যৌবন নিয়ে কি করব?"

"তা বটে।"

"তবে অর্দ্ধেক দেও।"

অজয় দেরাজ হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিল, কিন্তু তাহা বিন্দুকে দিতে ইতস্ততঃ করিল। বিন্দু কহিল, "দেখ, খাওয়া যাবে কি না?"

বলিয়া সে অজয়ের হাত হইতে মোড়কটা লইল—এক রকম কাড়িয়াই লইল। সরিয়া গিয়া জানালার ধারে আসিল এবং মোড়কটা খুলিয়া তদভ্যন্তরস্থ সাদা গুঁড়া জানালার বাহিরে রাস্তার উপর ফেলিয়া দিল। অজয় বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিল। বিন্দু ফিরিয়া টেবিলের ধারে আসিলে অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি ইচ্ছা আমি জেল খাটি?"

"আমার কি ইচ্ছা তুমি এখুনি জানতে পারবে।"

বিন্দু দ্বার খুলিয়া হরেকে ডাকিল; সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার এনেছিস?"

"হ্যাঁ। একখানা থালায় সাজিয়ে রেখেচি।"

"তুই জল নিয়ে চল্, আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি।"

হরে প্রস্থান করিল। অজয় কহিল, "এ কি বিন্দু?"

"আমি খাবার নিয়ে আমার ছেলেকে খাওয়াতে যাচ্ছি। তুমি কাবুলির কাছে যাও; তাকে আধঘণ্টা বসিয়ে রেখো।"

"তবু যাবে বিন্দু?"

"আমার জন্যে কোন চিন্তা করো না; আমার সহায় মা দুর্গা আর এই অস্ত্র।"

বলিয়া অস্ত্রখানা দেখাইল। অজয় চমকিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "অস্ত্র কেন? আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে—"

"না, আত্মরক্ষার্থে—"

অজয় বিস্ময়াভিহত নয়নে বিন্দুর পানে চাহিয়া কহিল, "তুমি কি সেই বিন্দু?"

"হ্যাঁ, আমি বাসরঘরের সেই বিন্দু; এর মধ্যে ভুলে গেলে?"

"তোমার এ সাহস, এ তেজ—"

"সকল কুলবধূরই আছে—এখন ওঠ।"

উভয়ে কক্ষত্যাগ করিল। কম্পিতচরণে সিঁড়ি নামিয়া অজয় কাবুলির কাছে গেল। বিন্দু ফিরিয়া নিজের ঘরে আসিল। মা দুর্গার একখানি ছবি প্রাচীর-গাত্রে বিলম্বিত ছিল, বিন্দু তাঁহার চরণতলে মুদিত নয়নে যুক্তকরে বসিয়া রহিল।

(৩২)

সদরে বৈঠকখানায় একখানা চেয়ারের উপর প্রায় একঘণ্টা একাকী বসিয়া থাকিয়া কাবুলী মহাবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অজয় কক্ষে প্রবেশ করিতে না করিতে কাবুলী

আখ্‌রোট-খেগো গলায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—"রুপেয়া দেও।"

"দিচ্ছি, লেখা পড়া কর।"

"কেয়া লিখনে হোগা ?"

"তোমার মাথা আর মুণ্ডু।"

"ও কোন্ চিজ ?"

"বিলকুল রুপেয়া তোমার মিন্ গিয়া ও বাৎ লিখ্ দেনে হোগা।"

"আগাড়ি রুপেয়া দেও।"

"হামরা হ্যাণ্ডনোট লে আয়া ?"

"জরুর লে আয়া।"

"দেখ্‌লাও।"

দলীল বাহির করিতেছে এমন সময় প্রণবের মোটর আসিয়া দ্বারে লাগিল। প্রণব, নৃসিংহ, ভজু গাড়ী হইতে নামিয়া বরাবর বৈঠকখানা ঘরে আসিল। প্রণবকে দেখিবামাত্র অজয় ভয়ে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল। প্রণব অতি সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাবলিটা এখানে কেন অজয় ?"

"আমার কাছে টাকা পাবে, ভাই—তাই নিতে এসেছে।"

"কত টাকা ?"

"নিয়েছিলাম পাঁচ হাজার, এখন দাঁড়িয়েছে আট হাজারে।"

"টাকার জোগাড় হয়েছে ?"

"ঠিক হয় নি, তবে—"

প্রণব,—(কাবুলীর প্রতি) "কাগজ নিকালো।"

কাবলী কাগজ দেখাইল। প্রণব দেখিলেন, কাগজে স্বাক্ষর করিয়াছে বলাই। অজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দস্তখত দেখছি না ত।"

অজয়,—"আপনি একটু এ পাশে আসুন, বলছি।"

প্রণব ঘরের কোণে সরিয়া আসিলেন। অজয় সমস্ত ঘটনাটি খুলিয়া বলিল। অবশেষে প্রণবের চরণধূলি মাথায় লইয়া কহিল, "দাদা, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন না, দয়া করবেন না—আমি মহাপাপী, ঘৃণার পাত্র—"

"আচ্ছা সে সব কথা পরে শোনা যাবে;—এখন টাকাটা শোধ দেবার কি উপায় করেছ ?"

"উপায় আরও ঘৃণিত—পশুতেও সে উপায় গ্রহণ করে না। আমি মরতে চেয়েছিলাম, বিন্দু মরতে দিলে না—"

"উপায়টা কি শুনি ?"

অজয় বলিল—কিছুই লুকাইল না। প্রণব শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নৃসিংহকে আদেশ করিলেন, "তুমি টাকা গুণে দিয়ে কাগজটা ফিরিয়ে নেও—আমি আসছি।"

বলিয়া প্রণব দ্রুতপদে অন্দরের দিকে ধাবিত হইলেন। দুইটা ঘর অতিক্রম করত উপরে উঠিবার সিঁড়ির পাদমূলে আসিয়া দেখিলেন, একথালা খাবার লইয়া বিন্দু সিঁড়ি নামিতেছে। প্রণবকে দেখিবামাত্র বিন্দু চীৎকার করিয়া উঠিল, "দাদা!" হাতের থালা সশব্দে সিঁড়ির উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আহার্য্য চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। বিন্দু ছুটিয়া আসিয়া প্রণবের চরণতলে পড়িল; ভাবস্তব্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার মা দুর্গা।" প্রণব তাহাকে উঠাইয়া আদর করিলেন, শান্ত করিলেন। হরে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। সে ব্যাপারটা বুঝিয়া হাতের গেলাস মাটীতে রাখিল এবং প্রণবের চরণতলে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল। প্রণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

"আমি হরে—মার ছেলে।"

"বটে! তবে তুমি আমার বুকে এস।"

হরে বুকে যাইতে সাহস পাইল না—মায়ের মুখের দিকে চাহিল। প্রণব তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিলেন, "বিন্দুর ছেলে আমার বুকে আসবে বই কি।"

অনাথ বালক এ আদর কখন পায় নাই—সে কাঁদিয়া ফেলিল। প্রণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লোকটা কোথা আছে হরি ?"

"তুমি উপরে এসো দাদা।"

"যাচ্ছি; তুই এখন উপরে যা।"

হরি পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে পাশের ঘর দেখাইয়া দিল।

এ দিকে পাশের ঘরে বলাই একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল। একবার ভাবিল, 'প্রণবকে আমার ভয় কি ? আমি ত কোন দোষ করি নি। আমার প্রস্তাবে অজয় রাজি হয় ভাল, নইলে টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে যাব।' মন কিন্তু এ যুক্তিতে শান্ত হইল না, সে প্রণবের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

অথচ সে প্রণবের চেয়ে কয়েক বছর বয়সে বড়। কিন্তু প্রণব যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন বলাই দ্বিতীয় শ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কালেজের অনেকেই প্রণবকে ভালবাসিত, কিন্তু যাহারা হীনচরিত্র তাহারা প্রণবকে ভয় করিত ও পশ্চাতে তাহারা কুৎসা গাহিত। বলাই যখন শুনিল, প্রণব তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, তখন সে নাকে কাণে খৎ দিয়া মনে মনে কহিল, "এ যাত্রা মা দুর্গা আমাকে রক্ষে কর, আর কখন এমন কাজ করব না।"

কৈলাসে মা দুর্গার কর্ণে প্রার্থনা পৌছিবার পূর্ব্বে প্রণব কঠোর নিয়তির ন্যায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী কাঁপিয়া উঠিল এবং চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রণব কহিলেন, "বসো বলাই বাবু।"

বলাই না বসিয়া প্রণবের চরণের উপর পড়িল ; কহিল, "আমাকে ক্ষমা করুন প্রণব বাবু, আমি এ কাজ আর কখন করব না।"

"কোন্ কাজ করবে না বলাই বাবু ?"

"এই—এই—অজয় বোধ হয় আপনাকে কিছু বলে থাকবে—"

"হাঁা, সে বলেছে।"

"তার কথা সব ঠিক নয়—"

"তুমি ত জান না সে আমাকে কি বলেছে।"

"এই—তবে কি জানেন, সে বড় মিছে কথা কয়।"

"অজয়কে ডাকি ?"

"না, ডাকৃতে হবে না ; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

ডাকিতে হইল না, অজয় আসিয়া উপস্থিত হইল। বলাই ব্যস্ততার সহিত কহিল, "শাস্তি দিতে হয় আপনি দিন—"

"আমি ত তোমাকে শাস্তি দিতে আসিনি বলাই বাবু।"

"আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন না ?"

"না ; আমি তোমাকে জিজ্ঞেসা করতে এসেছি, যে প্রস্তাব তুমি অজয়ের কাছে করেছিলে, সে প্রস্তাব অজয় তোমার কাছে করলে তুমি কি তা' গ্রহণ করতে ?"

"না।"

"কিন্তু অজয় গ্রহণ করেছে। তুমি তা'র স্ত্রীকে দেখতে চেয়েছিলে, অজয় তোমাকে তার স্ত্রীর কাছে ডেকে নিয়ে যেতে এসেছে।"

বলাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; সে ভাবিল প্রণব তাহার সহিত রহস্য করিতেছেন। প্রণব তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন, "অজয়, বলাইকে নিয়ে তুমি উপরে যাও। বিন্দু তা'কে খাওয়াতে চেয়েছিল, বলছিল, বলাই আমার ছেলে।"

বলাই চুপ করিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল ; তার পর মোটা গলায় কহিল, "আজ হ'তে তিনি আমার মা।"

"সত্যি বলছ বলাই বাবু ?"

"শুধু তিনি কেন, কুলবধূমাত্রেই আজ হ'তে আমার মা।"

"তবে উপরে চল, তোমার মাকে প্রণাম করবে—".

"না, আমি আর উপরে যাব না—এ শাস্তি আমাকে দেবেন না—"

"এ শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে।"

"আমি তাঁর সাম্‌নে যাবার আগে যোগ্য হই, তার পর যাব। এখন মায়ের প্রণামী-স্বরূপ এই আট হাজার টাকা রেখে যাচ্ছি—"

প্রণব কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে এস।"

বলাই আর প্রতিবাদ করিল না। প্রণব তাহার হাত ধরিয়া কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং হরিকে কহিলেন, "তোমার মাকে বলগে আমরা উপরে যাচ্ছি।"

বলাই দাঁড়াইল, উপরে উঠিতে তাহার পা সরিল না—কহিল, "আমাকে ক্ষমা করুন প্রণব বাবু, আমি মার কাছে যেতে পারব না।"

"তুমি যে তা'কে প্রণাম করতে চেয়েছিলে ?"

"আমি এইখান থেকেই তাঁকে প্রণাম করছি—"

"তা' কি হয়—উপরে চল।"

প্রণব তাহার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। বিন্দু যখন দেখিল, তাহার দাদা, বলাইকে হাত ধরিয়া উপরে আনিতেছেন, তখন সে একটুও সঙ্কোচ না করিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিল ; বেশ সহজ গলায় কহিল, "ছেলেকে নিয়ে আমার ঘরে এসো দাদা।"

বলাই মাথা তুলিল না, নড়িলও না। প্রণব একটু সরিয়া গিয়া বিন্দুকে চুপি চুপি কি বলিলেন। তার পর

বলাইকে কহিলেন, "ঘরে বসবে এস, বিন্দু তার ছেলেকে খাওয়াবে বলে খাবার সাজিয়ে রেখেছে।"

বলাই কহিল, "আমাকে ক্ষমা করুন—এর পরে একদিন আসব—আজ এইখান হ'তে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছি।"

বলিয়া দূর হইতে বিন্দুকে প্রণাম করিল এবং এক তাড়া নোট মাটীর উপর রাখিয়া কহিল, "মাকে প্রণামী স্বরূপ এই টাকা—"

বিন্দু কহিল, "আমি ছেলের প্রণাম ও প্রণামী গ্রহণ করিলাম; কিন্তু ছেলেকে আমার আশীর্ব্বাদ ও আশীর্ব্বাদী গ্রহণ করিতে হইবে। অর্দ্ধেক আমি লইলাম, অর্দ্ধেক ছেলেকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ দিলাম।"

বলাই বুঝিল, প্রণবের শিক্ষামত বিন্দু এ কথা বলিল। সে প্রতিবাদ না করিয়া অর্দ্ধেক লইল এবং পুনরায় প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। জলযোগ করিল না—অজয়ের সহিত বাক্যালাপও করিল না।

(৩১)

বলাই বিদায় হইলে বিন্দু কহিল, "মা দুর্গা তোমার রূপ ধরে এসেছেন দাদা।"

"দূর পাগ্‌লি। তুই এখন টাকাটা তোল্।"

"টাকা আমি নেব কেন? তুমি যে কাব্‌লিকে—"

"তুই যা' প্রণামী পেয়েছিস, তা' তোর প্রাপ্য।"

"তুমি কি করে দাদা, এমন দুরন্তকে শাসন করলে?"

"মানুষের ভিতর সব ভাব আছে, টেনে বার্ করতে পারলেই হ'ল। আমি এখন জ্যেঠাইমার কাছে চললুম।"

"সেখানে নাই বা গেলে দাদা।"

"কর্ত্তব্য ত একটা আছে—"

বলিয়া প্রণব প্রস্থান করিলেন; এবং গাড়ীতে উঠিয়া নৃসিংহ-সহ শিকদার বাগানের ছোট বাড়ীতে আসিলেন। নৃসিংহ পথ দেখাইয়া গলির ভিতর লইয়া গেল। প্রণব দুই তিন বার মাত্র এ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। দ্বার ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ভিতর হইতে সন্ধ্যাতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, সরি এলি?"

প্রণব উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ধ্যাতারা বারান্দায় একাকী উপবিষ্ট ছিলেন। অদূরে একটা ময়লা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। বাড়ীতে বড় কেহ আসে না; একজন ঠিকা ঝি কাজ করিয়া দিয়া যায়, সন্ধ্যাতারা কোন দিন রাঁধেন, কোন দিন রাঁধেন না। সরিৎ কোন দিন ঘরে আসে, কোন দিন আসে না। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি একাই পড়িয়া থাকেন। সরিৎ কোন দিন মধ্যাহ্নে গৃহে আসিয়া আহার করে, কোন দিন তাহার আসিবার মোটেই অবসর হয় না। সন্ধ্যাতারা সকল সময় দ্বার ভেজাইয়া সরিতের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন। কোন দিন রাত্রিতেও দ্বার অর্গলবদ্ধ হয় না, কি জানি যদি সরিৎ আসিয়া দ্বার খোলা না পায়! কেহ দ্বার ঠেলিলে, কোন শব্দ হইলে, কেহ ডাকিলে তাঁহার মনে হইত সরিৎ আসিয়াছে। প্রণবকে সরিৎ মনে করিয়া স্নেহোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সন্ধ্যাতারা কহিলেন, "আয় বাবা আয়, অনেকদিন তোকে দেখিনি।"

"আমি সরিৎ নই জ্যেঠাইমা।"

"তুই তবে কে?"

"আমি প্রণব।"

"মিছে কথা, প্রণব অনেকদিন মরে গেছে।"

"আমি ত মরিনি।"

"বেঁচে আছিস আজও? সরিকে জ্বালাতে আবার এইচিস?"

প্রণব উত্তর করিলেন না। তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগিলেও তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন না। নৃসিংহ কহিল, "আপনি চলে আসুন দাদাবাবু।"

প্রণব নড়িলেন না; সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরিৎ কোথা?"

"সে চাক্‌রি করতে গেছে, টাকা আন্‌বে তবে ত খাব।"

"চাকরি ত সে করে না; শুনছি মদ খেয়ে পথে পথে বেড়ায়।"

"তা' একটু বেড়াক, শরীর তার ভাল থাক্‌বে।"

"তুমিই ত আদর দিয়ে তার সর্ব্বনাশ করেছ।"

"সব্বনাশ করতে পেরেছি! বাঃ! তবে ত ভালই হয়েছে। ভাবলুম বুঝি তার সব্বনাশ করা হ'ল না।"

"তুমি ও কি বকচ?"

"কি বক্‌চি তা' বুঝি তুই বুঝতে পারচিস না? আমি সব্বনাশের কথা বক্‌চি। মেয়ে বিয়ের দিন বললে আমি তার সব্বনাশ করেচি, কর্ত্তা যাবার সময় বলে গেলেন, আমি তাঁর সব্বনাশ করেচি, আর সেই কালনেমিটা—সেটা

আমার দু'চক্ষের বিষ—সেও বলে গেছে আমি না কি স্বারও কার কার সব্বনাশ করেছি।"

নৃসিংহ কহিল, "আপনি চলে আসুন দাদাবাবু।"

সন্ধ্যার কাণে কথাটা গেল; তিনি কহিলেন, "এর মধ্যে যাবে কেন? বসুক, দেখুক, আমি ওর সব্বনাশ করতে পারি কি না। সব্বনাশ করতে আমার খুব ভাল লাগে। আয় বাছা আয়—"

প্রণব—"কাল একটা দাসী পাঠিয়ে দেব; সে তোমাকে খাওয়াবে, চান্ করাবে—"

"তা' দিও, বেশ হবে—আমরা দু'জনে তোমার সব্বনাশ করবার পরামর্শ করব।"

প্রণব প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। শ্যামবাজারের বাড়ীতে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। তার একটু আগে হরিশঙ্কর উপরের বারান্দায় বসিয়া কৃষ্ণমতিকে বলিতেছিলেন, "মঙ্গল এখনও এল না কেন?"

কৃষ্ণমতি,—"আপনার লোকেদের সঙ্গে গল্পগুজব করচে—"

"আপনার লোক ত ভারি আছে, থাক্‌লে আর তাড়িয়ে দেয়!"

"তুমিই যত তা'র আপনার লোক, না? সাত মাস দেখেছ কি না দেখেছ—"

"তুমি বড় বাজে কথা বল মতি।"

"তুমি যে বড় বায়স্কোপ দেখ্‌তে গেলে না?"

"আমার যদি ইচ্ছে না হয়—"

"আমিও তাই বলছি। প্রয়াগ থেকে এলে বায়স্কোপ দেখ্‌তে—"

"দেখ, একটু লেখাপড়া জানা—"

"লেখাপড়া জানা থাকলে তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতাম না; তাহ'লে বলতে পারতাম, তুমি মঙ্গলকে চোখের আড়াল করবে না ব'লে তার সঙ্গে কোলকাতায় এসেছ, আর এখন তারই প্রতীক্ষায় রাস্তার দিকে চেয়ে ব'সে আছ; কাজেই বায়স্কোপ দেখতে যাওয়া ঘটেনি।"

"আমি যদি তোমার সঙ্গে কথা কই—"

"দিব্যি করো না—এখনি কথা কইবে—"

"বটে!"

"এই দেখ কথা কইলে; আমি তোমার ধর্ম্ম রক্ষে করেছি।"

"আমার কথাগুলো পাল্টে বলা হচ্ছে—"

"মুর্খের মতই ত বলব।"

হরিশঙ্কর কি বলিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না; সে অবস্থায় তাঁহাকে রক্ষা করিল দেবরাণী। সে ব্যস্ত হইয়া কহিল, "দেখ বাবা, কেমন সুন্দর একখানা মোটর আমাদের দোরে এসে লেগেছে।"

হরিশঙ্করও সরিয়া আসিয়া দেখিলেন; কহিলেন, সত্যিই ত বেশ মোটর। কিন্তু কে এলো? এ যে মঙ্গল—"

মোটর বিদায় দিয়া মঙ্গল উপরে আসিলেন। হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মোটরখানা কা'র মঙ্গল?"

"জ্যেঠামশায় আমাকে দিয়েছেন।"

"তাহ'লে তোমার বলা বেশ গাড়ী—মিনার্ভা বুঝি?"

কৃষ্ণমতি কহিলেন, "ও সব বাজে কথা এখন রাখ। হ্যাঁ মঙ্গল, তোমার জ্যেঠার সঙ্গে দেখা হ'ল?"

"না—তিনি এখানে নেই।"

"কোথা তবে?"

"আমাকে কয়মাস ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—এখন তিনি লক্ষ্ণৌয়ে।"

"আহা, বুড়ো মানুষ কত কষ্ট পাচ্ছেন! তিনি তোমাকে খুব ভালবাসেন।"

মঙ্গল সে কথার কোন উত্তর না করিয়া অশ্রুভারাবনত নয়নে মৃত্তিকাপানে চাহিয়া রহিলেন। দেবরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "বিন্দু দিদি ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ; তার বিয়ে হয়ে গেছে।"

"তুমি জান্‌লে না—তা'র বিয়ে হয়ে গেল!"

"সে অনেক কথা, ফিরে এসে একদিন বলব।"

হরিশঙ্কর চমকিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আবার কোথা যাবে?"

"লক্ষ্ণৌয়ে, জ্যেঠার কাছে।"

বাধা দিবার বিশেষ কোন হেতু খুঁজিয়া না পাইয়া হরিবাবু কহিলেন, "তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিলে হয় না?"

"না। সেখানে আর একটু আমার কাজ আছে।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে যাবে ?"

"কাল বিকেলে—তিনটের ট্রেণে।"

"ফিরতে কত দেরী হবে ?"

"এক সপ্তাহের বেশী হবে বলে মনে হয় না।"

"তোমার যেখানে ইচ্ছে থাকগে না—আমার কি !"

কৃষ্ণমতি,—"তুমিও কেন মঙ্গলের সঙ্গে যাও না : ছেলেমানুষ, একা, পথে চোর ডাকাতের ভয়—"

হরিশঙ্কর,—"ওর জ্যেঠা সেখানে আছে, আমি ত পর।"

বলিয়া হরিশঙ্কর উঠিয়া গেলেন।

(৩৪)

পরদিবস প্রভাতে প্রণব যখন দর্জ্জিপাড়ায় বিন্দুর বাড়ীতে আসিলেন, তখন অজয় তাহার ঘরে বসিয়া দোকানের হিসাব দেখিতেছিল। বহুকাল হিসাব দেখে নাই, অনেক গোল বাধিয়াছে। তাহার পিতার আমলে দোকান হইতে বৎসরে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া যাইত। অজয় চতুর ও বুদ্ধিমান্। অল্প সময়ের মধ্যে ধরিয়া ফেলিল, কে কত টাকা চুরি করিয়াছে। কক্ষে প্রণব প্রবেশ করিবামাত্র অজয় কাগজপত্র ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং তাঁহাকে আসনে বসাইয়া বিন্দুকে সংবাদ দিতে ছুটিল, গিয়া কহিল, "বিন্দু, দাদা এসেছেন।"

"তা' তোমার মুখ দেখেই বুঝছি—"

"কিসে বুঝলে ?"

"তোমার সমস্ত মুখখানা হাসিতে ভরা।"

"ভয়ও আছে—তুমি চল।"

"দাদা ত কাউকে তিরস্কার করেন না—কোন ভয় নেই।"

"তুমি ত এখন চল।"

"তুমি এগোও, আমি যাচ্ছি—একত্রে যেতে পারব না।"

অজয় তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করবে স্থির করেছ ?"

"বাড়ীটা যদি রাখ্‌তে পারতাম তাহলে এক রকম করে চল্‌ত।"

"বাড়ীটা কত টাকায় বাঁধা আছে ?"

"অনেক টাকা।"

"জ্যেঠামশায় শোধ করে দেবেন ; তুমি এখন বাড়ীটা মেরামত করে ফেল।"

"টাকা নেই।"

"বিন্দু ত কাল চার হাজার টাকা প্রণামী পেয়েছে—"

"সে টাকা খরচ করব ?"

"সে ত বিন্দুরই টাকা। তা'র পর তোমার কারবার ; তা'র অবস্থা কেমন ?"

"ভাল নয়। লোকেরা চুরি করে—"

"তা'ত করবেই। এখন যা'তে কারবারটা পূর্ব্বের মত লাভজনক হয়, তা'র চেষ্টা কর। কিছু টাকা লাগে জ্যেঠামশায় দেবেন।"

বিন্দু দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া ছিল, এক্ষণে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথা ?"

"কে, জ্যেঠামশাই ? তিনি লক্ষ্ণৌয়ে আছেন। আমি আজ তাঁর কাছে যাচ্ছি।"

"তিনি লক্ষ্ণৌয়ে গেলেন কেন ?"

"সে অনেক কথা, পরে শুনো। এখন তুমি এক কাজ কর, জ্যেঠাইমার মাথাটা খারাপ হয়েছে বলে মনে হয়। তাঁর চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। প্রত্যহ তোমরা যাবে—আমার মোটর রইল।"

"আমরা আগে যেতাম, কিন্তু মা যে কি বকেন—"

"যখন মা বলেছ, তখন সব সহ্য করতে হবে। ভাল কথা, তোমার আর দেনা আছে ?"

"আছে, তবে বড় বেশী নয়।"

"যা' দেনা আছে শোধ কর—নৃসিংহ টাকা দেবে। বিন্দুর চিঠি পেলেই সে টাকা দিয়ে যাবে।"

অজয় উত্তর করিল না—ভাবিতে লাগিল। বিন্দু ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিল—পাছে তাহার চোখের জল দেখা যায়।

এমন সময় হ'রে হাসিমুখে ছুটিয়া আসিয়া প্রণবের চরণতলে পড়িল। প্রণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর হরি ?"

"নীচে ভজু এসেছে।"

"তাকে উপরে নিয়ে এস। আর দেখ, তা'কে ভজু মামা বলে ডাকবে—সে তোমার মার দাদা।"

"আচ্ছা" বলিয়া হরে ছুটিল। এবং অচিরে ভজুকে লইয়া ফিরিল। ভজুর কাঁধে কাপড়ের একটা পুঁটুলি ছিল। তাহা খোলা হইলে প্রণব কহিলেন, "তোমাদের জন্যে অজয় কিছু কাপড় এনেছি, জ্যেঠামশাই এখানে থাক্‌লে আরও বেশী আন্‌তে পারতাম। জ্যেঠাইমার কাপড় নেই দেখে এসেছি, তাঁকে কয়েকখানা শাড়ী দিও, আর তোমাদের বাড়ীর লোকজনদের দিও। আর আমি দেব নিজের হাতে একজনকে।"

বলিয়া তিনি কয়েকখানা কাপড়, জামা, গেঞ্জি বাছিয়া লইয়া হরেকে কহিলেন, "আমি এ সব কার জন্যে এনেছি বল দেখি ?"

হরি তাহার মায়ের দিকে চাহিল। বিন্দু মিটি মিটি হাসিতেছিলেন। সেখানে কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া হরে বড় মুস্কিলে পড়িল। একবার এ পায়ে ভর করে দাঁড়ায়, আবার ও পায়ে ভর রেখে দাঁড়ায়। হরির হাতে কাপড় জামা দিয়া প্রণব কহিলেন, "আমি তোমার মামা—কি বল হরি ? আর আমাদের এই ভজুদা তোমার বড় মামা।"

ভজু—"আমার এই দাদা বাবুকে আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি।"

প্রণ—"হ্যাঁ ভজুদা, বাবার না কি পাটনায় একখানা বাড়ী ছিল ?"

ভজু—"আজও ত আছে।"

প্রণ—"তুমি দেখেছ ?"

ভজু—"এই ত সে দিন আমি দেখে এসেচি। খুব মস্ত বাড়ী—কোলকাতার বাড়ীর চেয়ে বড়।"

প্রণ—"আচ্ছা ভজুদা, তুমি বলতে পার কোন্ মেয়ের সঙ্গে—"

ভজু—"ছোট কর্ত্তার মেয়ে টেয়ে হয় নি—তোমার বোনও নেই ভাইও নেই ?"

প্রণ,—"বাঃ! এই যে আমার বোন, এই যে আমার ভাই।"

বলিয়া বিন্দু ও অজয়কে দেখাইলেন। অজয়ের নয়ন সজল হইল, সে সরিয়া জানালার নিকটে গেল। প্রণব তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তিনি পুনরায় ভজুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমাকে ভাই বোনের কথা জিজ্ঞেসা করছি না—"

"তবে কি জমিদারীর কথা জিজ্ঞাসা করছ ? তা'ও তোমার আছে দাদাবাবু—"

"আমার জমিদারী ? কোথা আছে ? না, বোলো না—জ্যেঠামশাই যখন এ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলেন নি, তখন আমার জান্‌বার দরকার নেই। সময় হ'লে তিনিই জানাবেন।"

বাগ্‌দত্তা কন্যা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রণবের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে কৌতূহলও তিনি এক্ষণে দমন করিলেন। ইতোমধ্যে হরি এক পেয়ালা চা লইয়া আসিল। প্রণব চায়ের পিয়ালা অজয়কে দিয়া কহিলেন, "আমি সকালে চা খাই না হরি। তুমি যদি আমাকে একটা সন্দেশ আর এক গেলাস জল খাওয়াও—"

হরি চঞ্চল হইয়া পড়িল, মায়ের পানে চাহিল ; মা ও চঞ্চল হইলেন। প্রণব তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার কাছে চেয়েছি হরি, তোমার মায়ের কাছে নয়।"

হরি তখন আর কাহারও পানে চাহিল না—সে ছুটিল—কাপড়ের তাড়া ফেলিয়া ছুটিল। তাহার নিজের কিছু পুঁজি ছিল, তাহা হইতে একটা টাকা লইয়া মোটরের গতিতে খাবারের দোকানের দিকে ছুটিল। এক টাকার সন্দেশ কিনিয়া অচিরে বাড়ী ফিরিল এবং একখানা থালায় ঢালিয়া এক গেলাস জলসহ প্রণবের সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রণব আনন্দ সহকারে থালা গ্রহণ করিলেন। একটা সন্দেশ উঠাইয়া লইয়া বিন্দুর হাতে থালা দিলেন। হরের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া প্রণব কহিলেন, "আরও খেতে হবে হরি ? আচ্ছা খাচ্ছি।"

আরও কয়েকটা সন্দেশ লইয়া প্রণব কহিলেন, "ভাগ্‌নে আজ আমাকে খাইয়েছে—আমার বড় তৃপ্তি হ'ল, আমিও আজ ভাগনেকে খাওয়াব।" বলিয়া প্রণব তাহার হাতে দশটা টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

হরি এতগুলো টাকা এক সঙ্গে পূর্ব্বে দেখে নাই। তাহার বয়স যখন চারি বৎসর তখন তাহার মা এই সংসারে দাসীরূপে প্রবেশ করে। আট বৎসর পরে তাহার মা দেহত্যাগ করিলে সে এ সংসারেই থাকিয়া যায়। বেতনাদি কখন পাইত না, তবে কেহ কেহ দয়া করিয়া তাহাকে কখন কিছু দিতেন। হরি টাকা কয়টা লইয়া তাহার মায়ের

কাছে দিল—এত টাকা নিজের কাছে রাখিতে সাহস পাইল না।

প্রণব কহিলেন, "বেলা ৩টায় গাড়ী, আমি আর দেরী করতে পারছি না।"

বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন; কিন্তু বিন্দু তাঁহাকে ছাড়িল না—হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল এবং নিজের ঘরে আনিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি পটলডাঙ্গার বাড়ীতে গিয়েছিলে দাদা?"

"গিয়েছিলাম। কেন?"

"মা যে দিব্যি দিয়েছিলেন—"

"বাড়ী সরিতের নয়। জেনেছি বাবা বাড়ীটা আমার নামে বহুপূর্ব্বে খরিদ করেছিলেন।"

"শুনে বড় আনন্দ হল দাদা। সরিতের বাড়ী হ'লে আমি সেখানে যেতাম না—যাবার অনুমতিও পেতাম না।"

"সরিৎ কোথা?"

"এ বাড়ীতে বড় একটা আর আসে না; কোথায় থাকে কিছুই জানি না।"

"আমি এখন যাই—একটা বাজে।"

(৩৫)

পরদিন অপরাহ্নে দেরাদুন এক্সপ্রেস যখন লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। প্রণব গাড়ী হইতে নামিতে না নামিতে দ্বিজনাথের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইলেন। প্রণব জ্যেঠার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ক্ষমা না চাহিতেই ক্ষমা মিলিল। দ্বিজনাথের নয়নযুগল অশ্রুভারাকুল হইল। অতঃপর তাঁহারা প্ল্যাটফর্ম্মের উপর হাঙ্গামা না করিয়া মালপত্রসহ একখানা ঘোড়াগাড়ীতে উঠিলেন এবং বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

পথে এক দুর্ব্বিপাক ঘটিল। পশ্চাৎ হইতে একখানা মোটর আসিয়া গাড়ীকে ধাক্কা মারিল। মোটরখানা পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইল না—গাড়ীর দক্ষিণদিকের চাকায় সজোরে ধাক্কা মারিল। চাকা কোথায় উড়িয়া গেল, গাড়ীও ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে দিকের চাকা ভাঙ্গিয়া গেল সে দিকে দ্বিজনাথ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বিশেষরূপে আহত হইয়া রাস্তার উপর সজোরে গিয়া পড়িলেন, গোধূলির আলো তখনও একটু আছে। প্রণব নিজে আহত হইলেও চকিতমধ্যে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং দ্বিজনাথকে বুকের উপর উঠাইয়া লইলেন। যে মোটরখানা ধাক্কা দিয়াছিল, সে মোটরে দুই জন ইংরাজ আরোহী ছিলেন, একজন সাহেব আর একজন মেম। তাঁহারা গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পড়িলেন এবং আহত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রণবকে প্রশ্নাদি করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে মোটরে উঠিলেন এবং হাঁসপাতাল-অভিমুখে গাড়ী ছুটাইলেন।

হাঁসপাতালের ডাক্তার দ্বিজনাথকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "আঘাতটা মাথাতেই বেশী লেগেছে—কি হবে না হবে আমি এখন সঠিক কিছু বলতে পারি না।"

দণ্ড দুই পরে দ্বিজনাথের চৈতন্যোদয় হইল। তখন একটা "কটেজ" ভাড়া লওয়া হইল। রোগীকে সেইখানে আনা হইল, দুই জন নার্স নিযুক্ত করা হইল এবং সমস্ত রাত্রি রোগীকে দেখাশুনা করিবার জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত হইল। রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সাহেব তখন প্রণবকে বলিলেন, "আমরা এখন যাই বাবু?"

"আপনি যথেষ্ট করেছেন—আপনাকে ধন্যবাদ।"

"আমি তোমাদের যথেষ্ট অনিষ্ট করেছি—আমি ধন্যবাদের পাত্র নই।"

"সাহেব, আমরা হিন্দু, অদৃষ্টবাদী—কর্ম্মফল মানি; কেহ কাহারও অনিষ্ট করতে পারে বলে মনে হয় না।"

"সে যাই হোক, তুমি এখন আমার কার্ডখানা নিয়ে রাখ—"

"কার্ড নিয়ে কি করব?"

"তুমি আমার নামে মোকদ্দমা আনবে ত—"

"ছি ছি, আপনি ও কথা বলবেন না।"

"কেন বল্‌ব না? আমার দোষেই এ দুর্ঘটনা—"

"আপনার অপরাধ কি? ঘটনাচক্রে—"

"আমার অপরাধ নয় ত কার অপরাধ?"

"আপনি ত ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু করেন নি।"

"আমার অসাবধানতায়—"

"অসাবধানতা অপরাধ নয়।"

"আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ।"

"আমি আইন জানি না, জানিতেও চাই না। জানি

শুধু আপনি কৃপা না করিলে আমাকে এই অপরিচিত স্থানে বড়ই বিপন্ন হইতে হইত।"

সাহেব বিস্মিত হইয়া প্রণবের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মেম সাহেব কহিলেন, "বাবু, তোমার আত্মীয়ের চিকিৎসায় যা' কিছু ব্যয় হ'বে, আমাদের তা' বহন করতে দেও।"

"ধন্যবাদ; কিন্তু আপনাদের এ ভার বহন করতে হবে না। যিনি আহত হয়েছেন তিনি একজন বড় জমীদার।"

"উনি আপনার কে?"

"আমার জ্যেঠা।"

"আজ এই পর্য্যন্ত। কাল সকালে আমরা রোগীর সংবাদ নিতে আসব; তখন তোমার আরও পরিচয় নেব।"

সাহেবরা বিদায় হইলে প্রণব একখানা ট্যাক্সি লইয়া দ্বিজনাথের বাসায় আসিলেন। ঠিকানা তিনি নৃসিংহের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাসায় আসিয়া দেখিলেন, জগা চিন্তিত অন্তরে কর্ত্তার প্রতীক্ষায় দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রণব জগাকে লইয়া হাঁসপাতালে অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন বেলা নয়টার সময় সাহেব আসিলেন। তখন দ্বিজনাথ সজ্ঞান, প্রণব চরণতলে উপবিষ্ট। হাঁসপাতালের অধ্যক্ষকে অন্তরালে ডাকিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগীর অবস্থা কিরূপ মনে হইতেছে?"

"বড় সুবিধা নয়। প্রাণের আশঙ্কা আপাততঃ নেই বটে, কিন্তু রোগী যে উঠে হেঁটে আর বেড়াতে পারবেন তা' মনে হয় না।"

"কেন?"

"পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।"

প্রণব আসিয়া পড়িলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলছিলেন ডাক্তার সাহেব?"

"বলছিলাম রোগীর অবস্থা বড় সুবিধাজনক নয়।"

প্রণব স্তম্ভিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি পরামর্শ দেন?"

"কলিকাতায় নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়।"

"এ অবস্থায় কলিকাতায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে?"

"এখনও পারে; এর পরে হয় ত অসম্ভব হবে।

প্রণব বিমর্ষ বদনে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাহেব অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাত ধরিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমার কোন উপকার করতে পারি বাবু?"

প্রণব। আমার মামা এখানকার জেলে আবদ্ধ আছেন, তাঁর মকর্দ্দমা তদ্বির করতেই আমাদের এখানে আসা। কিন্তু তাঁর উকীল কে আমি জানি না।

সাহেব। আমি তাঁর সন্ধান করে তোমাকে সন্ধ্যার পর জানাব। তুমি একটু কাগজে আমাকে মোকর্দ্দমার বিবরণটা লিখে দেও। আমার নাম বেল—আমি একজন ব্যারিষ্টার।

প্রণব। তবে আপনাকে মোকর্দ্দমার ভার নিতে হবে—

সাহেব। সে পরে দেখা যাবে, আগে সন্ধান লই।

প্রণব। আমি ভাবছিলাম আজ সন্ধ্যার ট্রেণে কলিকাতায় যাব।

সাহেব। আজ যেও না, রিজার্ভ গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে কিছু সময় লাগ্‌বে।

এই ব্যবস্থা মতই প্রণবকে কাজ করিতে হইল। সন্ধ্যার পর বেল্ সাহেব উকীলকে লইয়া আসিলেন। মকর্দ্দমার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করিয়া প্রণব কলিকাতায় নৃসিংহ ও অজয়ের নিকট তার করিলেন এবং পরদিবস জ্যেঠাকে লইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(৩৬)

কলিকাতা—শ্যামবাজার—হরিশঙ্করের বাটী।

একদা প্রাতঃকালে শিবপূজা করিতে বসিয়া দেবরাণী দেখিল, তাহার পুষ্পপাত্রে মালতী, শেফালিকা, টগর, জবা প্রভৃতি কয়েকটি নিষিদ্ধ ফুল। শঙ্করজির অস্পৃশ্য ফুলগুলি বাছিয়া লইয়া রাণী মাটীতে ফেলিয়া দিল। কৃষ্ণমতি আসিয়া ভাল ভাল ফুলগুলির দুর্দ্দশা দেখিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুলগুলো যে বড় ফেলে দিলি?"

"ও-সব ফুলে শিবপূজা হয় না।"

"তুই কেমন করে তা' জান্‌লি?"

"আমি কেতাবে দেখেছি।"

"কেতাবের চেয়ে একটা বড় জিনিস আছে।"

"সেটা কি মা?"

"মন। যে ফুলটিকে তুমি ভালবাস সেই ফুল দিয়ে তুমি দেবতার পূজা স্বচ্ছন্দে করতে পার; যে জিনিষটি তুমি খেতে ভালবাস, সে জিনিষটি তুমি দেবতাকে নিবেদন ক

দিতে পার—কাহারও নিষেধ শুনবে না। মল্লিকা-মালতী তোমার প্রিয়, সুতরাং তাই দিয়ে তুমি শিবপূজা করবে। তোমার আনন্দে দেবতার প্রীতি।"

"ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করতে আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

"তা'হলে কর কেন?—ছেড়ে দিও। বাহ্যপূজা নিকৃষ্ট, মানসী-পূজাই শ্রেষ্ঠ।"

"কিন্তু মা, মানস-পূজায় এক বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে।"

"কি?"

"চোখ বুঁজে মহাদেবের ধ্যান করতে বসলে তিনি—ম—মঙ্গলদাদা আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ান—মহাদেব সরে যান। আমি কি করব মা, চেষ্টা করেও যে অন্য মূর্ত্তি ধ্যানে আন্‌তে পারি না।"

জননী ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "যাঁহাকে ধ্যানে পাবে তাঁহারই ধ্যান করে যাবে।"

"মা!"

"কি মা?"

"আমি ত বিয়ে করব না।"

"বিয়ে কর বা না কর, তুমি মঙ্গলের ধ্যান করে যাবে—সেই তোমার স্বামী।"

"আর তাঁর সঙ্গে যদি—যদি অন্য—"

"তা' হলেও সে তোর স্বামী।"

বালিকা নিরুত্তর। কৃষ্ণমতি কহিলেন, "মায়ের কথা বিশ্বাস কর দেবী, তারই সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।"

দ্বার সন্নিকটে পদশব্দ শ্রুত হইল—উভয়ে থামিয়া গেলেন। হরিশঙ্কর ব্যস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "আমি স্নান করতে চললুম—ভাত দিতে বল।"

"কেন বল দেখি?"

"আমি লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি।"

"সেখানে দরকারটা কি?"

"দরকার কিছু নেই—সহরটা দেখতে যাচ্ছি। শুনেছি সেটা চমৎকার সহর—কৈশরবাগ, দিলখুস, ইমামবারা, বারদ্বারী, রেসিডেন্সি—"

"ও সব কথা রাখ, আসল কথাটা খুলে বল দেখি।"

"খুলেই ত বলছি গা। আজ সকালে একজন মারওয়ারীর সঙ্গে দেখা হ'ল, সে বললে লক্ষ্ণৌ খুব ভাল যায়গা—ছত্রমঞ্জিল, ক্লকটাওয়ার—"

"আবার ঐ কথা! তোমার মতলব কি তাই বল।"

"লক্ষ্ণৌ অতি পবিত্র স্থান—শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ লক্ষ্মণচন্দ্রের রাজধানী—"

"সে পবিত্র স্থানে যাবার তোমার কোন দরকার নেই।"

"কোলকাতা আর ভাল লাগছে না, একবার একটু ঘুরে আসি।"

"তুমি কি মঙ্গলকে খুঁজতে যাচ্ছ?"

"রামঃ! যেখানে হয় সে যাক্ না, আমি তাকে খুঁজতে যাব কেন?"

"অনেক দিন বাছা গেছে, কোন খবর ত দিলে না।"

"নাই দিক্ গে, কে তা'র খবরের জন্যে ব্যস্ত?"

"কোন বিপদ্ আপদ্ হ'ল না ত?

"বিপদ্? হ'তে যাবে কেন? যাই আমি স্নান করি গে—"

"এখনও ন'টা বাজে নি, এর মধ্যে—"

"শেষকালে কি ট্রেণ ফেল হ'ব?"

"তুমি কি সত্যি লক্ষ্ণৌ যাচ্ছ?"

"সত্যি নয় ত কি মুখের কথায় যাচ্ছি!"

"ট্রেণ কখন শুনি?"

"এরা কে বল্‌ছিল বেলা ৩টায় নাকি।"

"তা' এখুনি যাবে কেন?"

"তুমি কি চাও গাড়ী ফেল্ করে মেড়োদের মত ষ্টেশনে পড়ে থাক্‌ব?"

"তা' তুমি যাও, ছেলেটার খবর—"

"আমি কি তা'র খবর নিতে যাচ্ছি!"

উত্তর না করিয়া কৃষ্ণমতি শুধু একটু হাসিলেন। এমন সময় জনৈক ভৃত্য আসিয়া কর্ত্তার হাতে একখানি পত্র দিল।

পত্রখানা লিখিয়াছিল প্রণব। তাহাতে লেখা ছিল,—কয়েকদিন হ'ল কলিকাতায় এসেছি; কিন্তু এমন বিপদে পড়েছি যে, আপনাদের ওখানে যাবার অবসর করতে পারি নি—সময় পেলেই ছুটে যাব। আপনি ও কাকিমা প্রণাম জানবেন। বেশী কিছু লিখ্‌তে পারলাম না—ক্ষমা করবেন।

পত্র পড়িয়া হরিশঙ্কর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিলেন। কৃষ্ণমতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? কার চিঠি? মঙ্গলের হাতের লেখার মত দেখছি। কোথা হতে লিখ্ছে?"

"ছোঁড়াটা কি বোকা দেখ দেখি! বিপদে পড়েছে, তা' কি বিপদ্ সেটা আমাকে খুলে লেখ—"

"মঙ্গল লিখ্ছে ত?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কিছু না লিখে লিখচেন কি না বেশী কিছু লিখ্তে পারলাম না—ক্ষমা করবেন। কি লিখ্লে বাবা, যে আমি চরিতার্থ হ'য়ে গেলাম! বিপদে পড়ে থাকিস আমাকে জানা—বিপদ্ দূর করতে পারি কি না দেখ্—দু' এক লাখ টাকা—"

"কোথা থেকে চিঠি লিখেছে?"

"তা' বল্তে পারি না, বোধ হয় কোলকাতা হ'তে—"

"ডাকঘরের ছাপ খামের উপর দেখছি নি, তা'হলে লোকের হাতে এসেছে।"

"হ্যাঁ।"

"যে লোক চিঠি এনেছে, তা'কে ধ'রে ঠিকানা জেনে নেও।"

"ঠিক বলেছ। (ভৃত্যের প্রতি) হ্যাঁ রে গোবিন্দ, কে চিঠি এনেছে রে?"

"একজন দরওয়ান।"

"সে ব'সে আছে?"

"না; চিঠি দিয়েই সে চলে গেছে।"

"আরে ধর্ ধর্—তা'র পিছনে ছুটে যা—গাড়ী নিয়ে যা'—যত ভাড়া লাগে—ট্যাক্সি নিয়ে যা'—

"সে কোন্ দিকে গেল—"

"তুই সব দিকে যা—ছোট্ ছোট্—হতভাগা এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্? যা' যা' আমিও আর একখানা ট্যাক্সিতে যাচ্ছি।"

হরিশঙ্কর ভৃত্যের অনুসরণোদ্যত হইলে কৃষ্ণমতি কহিলেন, "তুমি কোথা যাচ্ছ? তুমি কি দরওয়ানকে চেন যে তার খোঁজে ছুটেছ?"

"তা' বটে।"

"তুমি চান্ করে এসে এখন ভাত খাও।"

"ভাত? ভাত এখুনি খাব কেন?"

"তুমি লক্ষ্ণৌ যাবে যে—"

"লক্ষ্ণৌ? না, আজ আর যাব না—শরীরটা ভাল নয়।" বলিয়া হরিশঙ্কর দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

(৩৭)

কয়েকদিন পরে—

কৃষ্ণমতি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, গোবিন্দ কি আর বাড়ীতে আসবে না? সমস্ত দিনই কি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?"

"সে একটা কাজে ব্যস্ত আছে।"

"কাজ ত ভারি, সেই দরওয়ানটাকে খুঁজে বেড়ান ত? তা' এই কোলকাতা সহরের মধ্যে কোথা তাকে খুঁজে পাবে?"

"দেখ, একটু লেখাপড়া জানা না থাক্লে—"

"রেখে দেও তোমার লেখাপড়া, আজ ক'দিন ধরে চাকরটাকে পথে পথে ঘুরিয়ে মারলে!"

"আমি কি ঘোরাচ্চি? কি আপদ! সে চিড়িয়াখানা দেখ্তে চেয়েছিল—সেই যে গো—প্রয়াগে বললে না কোলকাতায় গিয়ে চিড়িয়াখানা দেখব? তুমি বড় ভুলে যাও।"

গৃহিণী হাসি চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজকে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছ কি?"

"আজকে? না।"

"কবে যাবে তবে?"

"তার ঠিক নেই।"

"তখনই যে ভাত খেয়ে বেরুচ্ছিলে।"

"তুমি যেতে দিলে কই?"

"বটে! আমার দোষ হ'ল? আর আমি যে আজ ক'দিন ধ'রে তোমাকে তাগাদা দিচ্ছি।"

"তুমি বড় বাজে কথা বল; এখন শোন—"

"বল, আমার কান্ আছে।"

"বায়স্কোপ দেখ্তে যাবে? আজ শঙ্করাচার্য্য।"

"এখন যে আটটা বেজে গেছে।"

"রাত্রি সাড়ে ন'টায় একবার দেখান হয়।"

"তবে চল। দেবীকে বলি।"

সকলে সাজগোজ করিয়া বায়স্কোপ দেখিতে চলিলেন। যখন ফিরিলেন, তখন রাত্রি সাড়ে এগারটা। ট্যাক্সি তাঁহাদের নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ভৃত্য দ্বার খুলিয়া

মনিবের প্রতীক্ষা করিতেছিল ; তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় অদূরে একটা গোলমাল শুনা গেল। এক ব্যক্তি নগ্নপদে ছুটিয়া আসিতেছিল, আর তাহার পিছনে কয়েক ব্যক্তি 'চোর' 'চোর' বলিয়া ছুটিতেছিল। হরিশঙ্কর স্ত্রী-কন্যা লইয়া সত্বর দ্বারপথে উঠিলেন। পলায়মান ব্যক্তি তাঁহার গৃহের দিকেই আসিতেছিল। যখন সমীপবর্ত্তী, তখন সে ধরা পড়িল। যাহারা ধরিল, তাহারা ইতর জাতীয়—কেন না তাহাদের ভাষা অসংযত। তাহারা চোরকে ধরিয়া মারপিট করিতে উদ্যত হইলে হরিশঙ্কর নামিয়া গিয়া তাহাদের নিরস্ত করিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে মারছ কেন ? এ করেছে কি ?"

"একটা বেশ্যেকে খুন করে তার গয়নাপত্র নিয়ে পালিয়েচে।"

তস্কর, হরিশঙ্করের পানে ফিরিয়া কহিল, "দেখুন মশাই, এদের কথা মিথ্যে। আমি খুন করি নি, চুরিও করি নি।"

"সমস্ত পথ গয়না ফেল্‌তে ফেল্‌তে এয়েছে, বেটা এখন বলে কি না চুরি করি নি !"

চোর (হরিশঙ্করের প্রতি)—"মশাই, দয়া করে আমাকে রক্ষে করুন—এদের কথা বিশ্বেস করবেন না।"

হরি—"এত লোক কখন মিথ্যে বলবে না,—তুমি নিশ্চয় চুরি করে পালাচ্ছিলে।"

চোর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "মশাই, দয়া করে আমার একটা উপকার করবেন ?"

"দেখছি, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে,—বল কি করতে হবে ?"

"আমার বাড়ীতে একটা খবর দেবেন ?"

"তোমার বাড়ী কোথা ?"

চোর একটু ভাবিয়া আপন মনে অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, "কোথায় বা বলি।"

কথা কয়টি হরিশঙ্করের কাণে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, বাড়ী নেই না কি ?"

"না থাকারই মধ্যে।"

"তোমার বাপ আছে ?"

"আছে।"

"তার ঠিকানাটাই বল।"

তস্কর ইতস্ততঃ করিয়া বলিল ; তবে ইংরাজীতে ও মৃদুকণ্ঠে বলিল। হরিশঙ্কর চমকিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "দেখি দেখি, তোমার মুখখানা ভাল করে দেখি।"

তস্কর মাথা হেঁট করিল। হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বিজনাথ তাহলে তোমার বাবা ?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক বলছ ?"

"বাপের নাম কেউ ভাঁড়ায় না।"

"ভাঁড়ায়—তুমি একদিন ভাঁড়িয়েছিলে—রামনাথের ছেলে বলে আমার কাছে পরিচয় দিয়েছিলে—মনে করে দেখ—কালেজের সাম্‌নে—"

চোরের মাথা আরও হেঁট হইল। হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

"সরিৎ কুমার।"

"প্রণব তোমার দাদা ?"

"হ্যাঁ।"

"তার বিয়ে হয়েছে ?"

"না।"

"সে কোথা ?"

"বাড়ীতে থাক্‌তে পারে, আমি ঠিক জানি না।"

"তুমি কি বাড়ীতে থাক না ?"

"আমি শিকদারবাগানে মার কাছে থাকি।"

"কাকে খবর দিতে হবে বল ?"

"কাউকে না—আমার কেউ নেই।"

"কেন, তোমার বাপ ?"

"তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন।"

"বড় অন্যায় করেন নি। তোমার দাদাকে সংবাদ দেব ?"

"না, সে আমার চিরশত্রু।"

"তুমিই তোমার শত্রু। যাক্‌, ও সব কথায় আর কাজ নেই। তোমার সঙ্গে কথা কইতে বা তোমাকে সাহায্য করতে আমার প্রবৃত্তি নেই।"

"আমিও আপনার সাহায্যপ্রার্থী নই।"

"তুমি জেলে যাও, কারুর ক্ষতি নেই ; তোমার বাপ ভাই কেউ তোমার জন্যে কাঁদবে না। তুমি রামনাথের বংশে জন্ম নিয়ে এতদূর অধঃপাতে গেছ ! কোথা হ'তে কোথা নেমে এসেছ ভেবে দেখেছ কি ? ছি ছি, বেশ্যার গহনা চুরি !"

এমন সময় এক পাহারাওয়ালা আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি এক পানওয়ালীর দোকানে বসিয়া রসালাপ করিতেছিলেন। হাল্লা দেখিয়া তিনি দোকানের ভিতর ঢুকিয়া পড়িবেন কি না চিন্তা করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, দাঙ্গাহাঙ্গামার কোন আশঙ্কাই নাই, তখন তিনি রুল দোলাইয়া সদর্পে অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যা হুয়া ?"

এক ব্যক্তি ঘটনাটা বলিল। তখন পাহারাওয়ালা গহনা দেখিতে চাহিল ; এক ব্যক্তি দেখাইল। অনেকগুলি গহনা ছিল, তবে এক ব্যক্তির কাছে সব ছিল না। সুতরাং শান্তিরক্ষক সকলগুলি দেখিতে পাইলেন না। যাহা পাইলেন, তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া পকেটস্থ করিলেন এবং আসামীর কর ধারণ করিয়া কহিলেন, "থানে মে চল্।"

যে ব্যক্তি পাহারাওয়ালার হাতে গহনা দিয়াছিল, সে ব্যক্তি সেগুলির প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "গয়নাগুলি হুজুর দেবেন কি ?"

সাহেব দাঁত খিঁচাইয়া উত্তর করিলেন, "এ সব চিজ তোম্হারা হ্যায় ?"

সাহসী ব্যক্তি আর উত্তর করিতে পারিলেন না। হুজুর আসামীকে বাঁধিয়া সদর্পে থানাভিমুখে চলিলেন।

(৩৮)

হরিশঙ্কর অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাতে তাঁহাকে বহির্গমনোদ্যোগী দেখিয়া কৃষ্ণমতি জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা যাচ্ছ ?"

"রামনাথ দার ছেলেকে দেখ্‌তে।"

"যেতে হবে না।"

"কেন বল দেখি ?"

"আমি প্রণবের হাতে মেয়ে দেব না।"

"দিতেই হবে যে মতি ; তবে যদি সরিতের মত—"

"দেবতার মত নির্ম্মল হ'লেও তা'র হাতে মেয়ে দেব না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিশঙ্কর কহিলেন, "তুমি আর আমাকে দুর্ব্বল করো না মতি। প্রণবকে মেয়ে দিতেই হবে।"

"কেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছ বলে ?"

"কতকটা তাই বটে।"

"তুমি মঙ্গলকেও ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছ।"

সহসা সে কথার উত্তর না দিয়া হরিশঙ্কর একটু ভাবিলেন ; পরে কহিলেন, "রামনাথ-দা আমার কে ছিল, তা'ত তুমি জান মতি। তা'র ছেলেকে আমি কোন মতেই উপেক্ষা করতে পারব না।"

"তুমি কি মঙ্গলকুমারকে উপেক্ষা করছ না ? সে দরিদ্র নিরাশ্রয়, আর তোমার প্রণব ধনবান্—"

"ছি ছি, মঙ্গলের সঙ্গে অর্থের তুলনা! মঙ্গল আমার রাজরাজেশ্বর, তা'র তুলনায় প্রণব ভিখারী। সে মঙ্গলকেও আমি ত্যাগ করতে সঙ্কল্প করেছি—"

"মেয়েটা তা' হলে মরে যাবে।"

"যায় যাক্—পৃথিবীর সব যাক্, কিন্তু রামনাথের কাছে যে কথা দিয়েছি, সে কথা নড়্‌বে না।"

বলিয়া হরিশঙ্কর প্রস্থান করিলেন। এবং পটলডাঙ্গায় প্রণবের বাড়ীতে আসিয়া জনৈক ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু কোথা ?"

"কোন্ বাবু ?"

"কোন্ বাবু আবার ? দ্বিজ বাবু।"

"তিনি ত অনেক দিন থেকে বিছানায় পড়ে।"

"কি হয়েছে ?"

"কে জানে ? উঠতেও পারেন না, কথা কইতেও পারেন না—শুধু শুয়ে পড়ে আছেন। ডাক্তার বদ্যি গাড়ী গাড়ী দু'বেলা আসচে, রোগও হুহু শব্দে বেড়ে উঠ্‌ছে ; এরা আসবার আগে কর্ত্তাবাবু বরং ছিলেন ভাল।"

"বটে! আচ্ছা, প্র—প্রণবকুমার কোথা ?"

"তিনি উপরে কর্ত্তাবাবুর কাছে আছেন।"

"তাঁকে একবার ডেকে আন দেখি।"

"তিনি আসতে পারবেন না।"

"কেন হে, তিনিও কি উঠ্‌তে পারেন না ?"

"উঠ্‌তে পারেন, কিন্তু উঠেন না।"

এমন সময় নৃসিংহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কা'কে খুঁজচেন ?"

"প্রণবকুমারকে।"

"আচ্ছা, আমি তাঁর কাছে খবর পাঠাচ্ছি, আপনি বৈঠকখানায় এসে বসুন।"

হরিশঙ্কর বৈঠকখানায় বসিয়া নৃসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বিজবাবুর হয়েছে কি ?"

"পক্ষাঘাত।"

"আহা! কতদিন হ'ল ?"

"বেশী দিন নয়—দেড় মাস হবে।"

"হরকালী কোথা ?"

"তিনি লক্ষ্ণৌয়ে।"

"সেখানে কি করতে গেল ?"

"বড় বাবুর মুখে তা' শুনবেন।"

"বড় বাবুটী কে ?"

"প্রণব বাবু।"

"ছেলেটী কেমন ?"

"এমন ছেলে ভূভারতে জন্মায় না।"

"বল কি ?"

প্রণব আসিয়া পড়িল। বিস্ফারিত নয়নে হরিশঙ্কর তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন—বিস্মিত, স্তব্ধ, স্তম্ভিত। প্রণব একটু হাসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। হরিশঙ্কর কহিলেন, "তুমি—তুমি—"

"আমি প্রণব কাকাবাবু।"

"মঙ্গল নও ?"

প্রণব একটু হাসিয়া কহিল, "প্রণব, ওঙ্কার, মঙ্গল একই ত কাকাবাবু।"

হরিশঙ্কর বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া প্রণবকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন। সে আবেশ, সে উচ্ছ্বাস প্রণবকে বিগলিত করিল—তাহার চক্ষু সজল হইল; কহিল, "আপনি বাবাকে কত ভালবাসতেন—"

"ভালবাসতাম কি বলছ মঙ্গল—প্রণব! সে যে আমার সব ছিল।"

"বাবাকে যখন এতটা ভালবাসতেন, তখন তাঁর ছেলেও ত আপনার স্নেহের একটু দাবী করতে পারে।"

"এতদিন তোমার খোঁজখবর লই নি, তাই বোধ হয় এ অনুযোগ! তবে শোন, স্পষ্ট কথা বলি। তোমার বাবা আমাকে তোমার অছি না করে দ্বিজবাবুকে অছি করেছিলেন বলে আমার অভিমান হয়েছিল। কিছুদিন তোমার খোঁজ খবর লই নি। তার পর যখন স্নেহ, অভিমানকে পরাভূত করলে, তখন দ্বিজবাবুকে একখানা চিঠি লিখলাম। পত্রে তোমার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন ছিল। তিনি আমাকে কড়া উত্তর দিয়া জানাইলেন, "তিনি তাঁর ভাইপোর অভিভাবক, অন্য কেহ নয়—তিনি ভাইপোর সম্বন্ধে যাহা উচিত বিবেচনা করিতেছেন, তাহাই করিতেছেন।" আমার অভিমান আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। কয়েক বৎসর নীরব রহিলাম। দুই বৎসর আগে আমার মেয়ের পরিচয় দিয়ে দ্বিতীয় পত্র লিখিলাম। তিনি পুনরায় কড়া উত্তর দিলেন। তার পর আর পত্র লিখি নি। গত চৈত্র মাসে—যে দিন তোমার সঙ্গে রেলে আমার দেখা হয়—আমি এ বাড়ীতে এসেছিলাম; কাউকে দেখতে পেলাম না। চাকরের কাছে সন্ধান নিয়ে কালেজে গেলাম। ফটকের কাছে আসতে না আসতে দেখি অনেকগুলি ছেলে বেরিয়ে আসছে। একজন ছাত্রকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলাম, সে সরিৎকে দেখিয়ে দিলে। সরিৎ নিজেকে প্রণব বলে পরিচয় দিলে এবং অতি অসভ্যের ন্যায় আমার সঙ্গে ব্যবহার করলে। আমি বিরক্ত হয়ে চলে গেলাম, এবং প্রতিজ্ঞা করলাম, এমন অসভ্য ছেলের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখব না। সব কথা ত শুন্‌লে, এখন বল আমার অপরাধ কি ?"

"আমি ত অপরাধের কথা বলি নি কাকাবাবু!"

"কিন্তু তুমি কি বলে আমার খোঁজখবর এতদিন লও নি ?"

"আমি ত কিছুই জানতাম না—আমাকে কেউ কিছু বলে নি; বলা না কি নিষেধ ছিল। আজ তিন দিন হ'ল মামার এক পত্র পেয়েছি, তিনি সব কথা খুলে লিখেছেন।"

"এখন তুমি আমাদের ওখানে চল।"

"আমার ত নড়বার অবসর নেই কাকাবাবু।"

"কেন, কি এত ব্যস্ত ?"

প্রণব সকল কথা আদ্যন্ত বলিল। মামা জেলে, জ্যেঠা রোগশয্যায়। এ সকলের মূল সে, তাহাও জানাইল। অনেক কথার আলোচনা হইল। অবশেষে প্রণব বলিল, "জ্যেঠার অনুমতি নিয়ে সন্ধ্যার পর এক সময়ে যাব।"

"খেয়ে আসতে হ'বে কিন্তু—"

"তা' হলে যে অনেক দেরী হয়ে যাবে; জ্যেঠাকে ছেড়ে—"

"তুমি যে অনেক দিন আমার সঙ্গে বসে খাও নি বাবা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা—"

"এখন তুমি আমার জামাই, সন্তান—"

বলিয়া হরিশঙ্কর প্রস্থান করিলেন। সরিতের কথাটা বলিতে একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।

পথে আসিতে আসিতে সহসা তাঁহার খেয়াল হইল, এই ঘটনা লইয়া কৃষ্ণমতির সঙ্গে তিনি একটা বড় রকম রসিকতা করিবেন। অর্থাৎ মঙ্গল যে প্রণব তাহা তিনি এক্ষণে তাঁহাকে জানিতে দিবেন না। মতলবটা স্থির করিয়া তিনি গৃহে আসিলেন, এবং পত্নীকে কহিলেন, "প্রণব আজ রাতে আসবে ও খাওয়া দাওয়া করবে।"

"কোথা আসবে? এখানে?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ।"

"তুমি তাকে নীচে বসিও।"

"প্রণব বেশ ছেলে, তাকে দেখলেই তুমি ভালবাসবে। ওরে দেবী, কোথা রে?"

"এই যে বাবা।"

"আমার ঘরে তার বিছানা করে রাখ। ভাল করে খাবার দাবার যোগাড় কর্। আমি বিকেলে বেরুব, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বড় বাজার, নতুন বাজার, সিমলে যেখানে যা' ভাল জিনিষ পাওয়া যায়—"

"কেন বাবা?"

"প্রণব আসচে।"

"প্রণব কে বাবা?"

"দেখবি রে দেখ্‌বি। কি সুন্দর ছেলে—"

"সুন্দর ব'লে তাকে খাওয়াতে হবে?"

"তা'র সঙ্গে যে তোর বিয়ে—আমি কথা দিয়েছি।"

বালিকা সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শেষের কথাটা শুনিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল এবং আরও কিছু শুনিবার আশায় বাপের দিকে চাহিল। হরিশঙ্কর কহিলেন, "প্রায় বিশ বছর আগে আমি কথা দিয়ে রেখেছি প্রণবের সঙ্গে আমার প্রথম কন্যার বিয়ে দেব। এতদিন প্রণবের খোঁজ পাইনি, এইবার আমার সত্য পালন করব।"

দেবী প্রস্থান করিল। কৃষ্ণমতি কহিলেন, "দেখ, তোমাকে আমি ব'লে রাখছি, মঙ্গল ছাড়া কারুর হাতে আমি মেয়ে দেব না।"

হরিশঙ্করের ইচ্ছা হইতেছিল, একবার চীৎকার করিয়া বলেন, "ওগো প্রণবই তোমার মঙ্গল।" কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করিয়া কহিলেন, "প্রণবকে দেখে তার পর ও-কথা বলো—চমৎকার ছেলে।"

"প্রণব কোন্ ছার, আকাশের দেবতা হ'লেও তার হাতে আমি মেয়ে দেব না—মেয়েও আর কাউকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করবে না।"

"আমিও বলে রাখ্‌ছি, প্রণব ছাড়া আর কারুর হাতে মেয়ে দেব না।"

"আমি তা' হলে বিষ খেয়ে মরব।"

"আমি ডাক্তার ডেকে ভাল করব।"

"দেখ, আমাকে জ্বালিও না।"

"তুমি আমাকে পুড়িও না।"

"আমি আজ রাতেই মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাব।"

"আমি প্রণবকে নিয়ে পেছু পেছু ছুটব।"

"আচ্ছা দেখব, কেমন করে তুমি প্রণবের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেও।"

"আমিও দেখব, কেমন করে তুমি মঙ্গলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেও।"

"আমি যদি সতী হই—"

"এত বড় পরীক্ষায় নিজেকে ফেলো না—ঠ'কে যাবে—দুর্নাম হবে।"

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, স্নানের জল দেওয়া হইয়াছে। হরিশঙ্কর স্নান, ভোজন সম্পন্ন করিয়া নিদ্রা দিলেন এবং অপরাহ্ণে বাজার করিতে বাহির হইলেন।

(৩৯)

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রণব আসিল—আসিবার জন্য সে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্যেঠার নিকট অকপট চিত্তে গোড়া হইতে—অর্থাৎ যে দিন হাওড়ায় রেলগাড়ীতে হরিশঙ্করের সহিত প্রথম দেখা হয়, সেই দিন হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিল। শুনিয়া দ্বিজনাথ আনন্দ-প্রফুল্ল নয়নে প্রণবকে হরিশঙ্করের বাড়ীতে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। যুবক তাহার গুপ্ত প্রেম বৃদ্ধের নিকট লুকাইতে পারে নাই—তাহার কথার ভাবেই বৃদ্ধ বুঝিয়াছিলেন, প্রণব

হরিশঙ্করের কন্যাকে ভালবাসিয়াছে। এই কন্যাই তাহার বাগ্‌দত্তা বধূ, দ্বিজনাথ তাহা জানিতেন, প্রণবও সম্প্রতি তাহার মামার পত্রে জানিয়াছে।

প্রণব যখন শ্যামবাজারে আসিল, তখন হরিশঙ্কর গৃহে ছিলেন না—বাজার হইতে তখনও ঘরে ফিরেন নাই। প্রণব বরাবর উপরে উঠিয়া গেল। মঙ্গলের পক্ষে সকল স্থান অবারিত। জনৈক দাসী জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল, কৃষ্ণমতি স্নানাগারে, দেবরাণী তাহার কক্ষে। প্রণব দেবরাণীর ঘরে আসিল। দেখিল, রাণী মাটীতে বসিয়া আদ্যাস্তব আবৃত্তি করিতেছে। স্তোত্র তাহার কণ্ঠস্থ ছিল, পুস্তক দেখিবার প্রয়োজন ছিল না। বালিকা মুদিতনয়নে স্তব আবৃত্তি করিতেছিল—অশ্রুধারায় তাহার গণ্ড বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতেছিল। অবশেষে বালিকা যুক্তকরে আদ্যা দেবীকে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে যখন চক্ষু খুলিল, তখন দেখিল তাহার সম্মুখে আদ্যা দেবীর চেয়ে প্রিয় ও প্রত্যক্ষ দেবতা মঙ্গলকুমার দণ্ডায়মান। আনন্দজ্যোতিতে তাহার বদন উদ্ভাসিত হইল—বর্ষণের পর বিদ্যুৎ চমকাইল। কিন্তু পরক্ষণেই নিবিয়া গেল। দেবরাণী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রণব নিকটে আসিয়া ডাকিল, "রাণি!"

"এতদিন পরে স্মরণ হ'ল?"

"স্মরণ ত রোজই হ'ত রাণী—"

"তাই বুঝি কলকাতা থেকেও একবার দেখা দিতে আসতে পার নি।"

"দেখ্‌তে আসব রোজই মনে করতাম, কিন্তু—"

"কিন্তু কি তা' আমি বুঝতে পারছি, তোমার সময় হ'ত না।"

"সত্যিই আমার সময় হ'ত না, রাণী।"

"এখুনি ত চলে যাবে?"

"যেতে হবে যে।"

"বেশ; আমি ধরে রাখব না—ধরে রাখবার অধিকার আমার নেই।"

"অধিকার তোমার খুব আছে, তুমি যে আমার হৃদয়রাণী।"

"ছি, ও কথা বলো না। যাকে তুমি বিয়ে করেছ বা বিয়ে করবে তা'কে তুমি হৃদয়রাণী—"

"তোমাকেই আমি বিয়ে করব—তুমি ছাড়া আমার হৃদয়-রাণী আর কেউ নয়।"

"কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'য়ো না মঙ্গল-দা—"

প্রণব বিস্মিত হইল; ভাবিল, এ কথা রাণী এখন বলে কেন? তবে কি সে প্রকৃত পরিচয় এখনও পায় নাই? কহিল, "আমি কর্ত্তব্যই পালন করছি রাণী।"

বলিয়া রাণীর হাত ধরিল; রাণী হাত ছাড়াইয়া লইল না—বিস্মিত নয়নে প্রণবের পানে চাহিয়া রহিল। প্রণব কহিল, "কর্ত্তব্যটা তবে ভাল রকমই পালন করি।—" বলিয়া বালিকাকে বুকের উপর টানিয়া লইল এবং চুম্বনে চুম্বনে তাহার মুখখানি লাল করিয়া তুলিল। এই প্রথম চুম্বন, এই প্রথম আলিঙ্গন—তুফানে বালিকা ভাসিয়া চলিল। তরঙ্গ যখন সরিয়া গেল, তখন বালিকা কথঞ্চিৎ স্থির হইয়া কহিল, "কাজটা ভাল হ'ল না—আমাকে ছেড়ে দেও।"

"আগে আমার অপরাধটা দেখিয়ে দেও।"

"তোমাকে যখন আর কাউকে বিয়ে করতেই হ'বে তখন—"

"আর কাউকে বিয়ে করতেই হবে কেন?"

"তোমার বাগ্‌দত্তা বধূ আছে—"

প্রণব বুঝিল, রাণী তাহার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত নহে—হরিশঙ্কর তাহাকে কিছু বলেন নাই। প্রণব বড় কৌতুক অনুভব করিল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা' থাকে থাক্, লোকে ত দু' চারটে বিয়ে করে—"

"তোমার মুখে এই কথা!" বলিয়া রাণী প্রণবের বাহু-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। প্রণব কহিল, "তা' তুমি সরে যাচ্ছ কেন? আমি ছাড়া তোমার ত আর দ্বিতীয় স্বামী নেই।"

"কে বল্‌লে নেই?"

"কি রকম?"

"প্রণব বলে কে একটা ছেলে আছে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আছে; আমি শুনেছি সে অতি বদ্‌ ছেলে।"

"তারই সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে বাবা প্রতিশ্রুত আছেন।"

"এ ত তাঁর ভারি অন্যায়!"

"অন্যায় একটুও নয়,—বাবা না কি আমার জন্মের পূর্ব্ব হ'তে কথা দিয়ে রেখেছেন।"

"তা'হলে তুমি বিয়ে করবে?"

"মা আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবেন স্থির করেছেন।"

এমন সময় মা আসিয়া পড়িলেন। প্রণব তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাণীকে ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণমতি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সরে এস মঙ্গল, দেবী আয়—শীগ্‌গির আয়—তিনি হয় ত এখুনি এসে পড়বেন।"

বলিতে বলিতে তিনি উভয়ের হাত ধরিলেন। দেবী কহিল, "কি করছ মা? বাবা যে কা'কে কথা দিয়েছেন।"

"তবে কি তুই প্রণবকে বিয়ে করবি?"

"বাবার ধর্ম্ম রক্ষা করতে হবে ত মা!"

"তবে কি তুই দ্বিচারিণী হ'বি?"

"তোমার গর্ভের সন্তান কখন ত তা' হ'তে পারে না।"

"তবে করবি কি? বিষ খাবি?"

"দানের আগে নয়।"

"তার আগে তোকে আমি মঙ্গলের হাতে দান করি।"

বলিয়া তাহার হাত দুইখানি লইয়া মঙ্গলের হস্তোপরি রক্ষা করিলেন; কহিলেন, "মঙ্গল, তোমার হাতে আমার একমাত্র সন্তান দেবরাণীকে—"

দেবী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "ক্ষমা কর মা—"

"তুই আমার অবাধ্য হ'বি?"

"ক্ষমা কর মা—তোমার অবাধ্য আমাকে হ'তেই হবে।"

"আমি যে ভয়ানক দিব্যি করেছি মঙ্গলের হাতে তোকে দেব বলে—"

"কি করলে মা!"

প্রণব চুপ করিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল এবং বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। যখন দেখিল, মা ও কন্যা উভয়ের মুখ মলিন হইয়া গেল, তখন সে কহিল, "মা, আপনি একটুও চিন্তা করবেন না; যা'তে আপনাদের তিনজনের জিদ বজায় থাকে, আমি সেই ব্যবস্থা করছি। রাণী, সরে এস—মা, আমি নারায়ণ ও অগ্নি সাক্ষী করে (ঘরে তখন বিদ্যুতের আলো জ্বলছে) আপনার দান মঙ্গলের পক্ষ হ'তে গ্রহণ করলাম; আর—"

পশ্চাতে হরিশঙ্কর বাবু আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই; তিনি আচম্বিতে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি থাম, বাকিটা আমি বল্‌ব।"

বলিতে বলিতে তিনি সবেগে অগ্রসর হইলেন এবং বালক-বালিকার হাত একত্র করিয়া কহিলেন, "তোমার হাতে প্রণব, দেবরাণীকে সম্প্রদান করিয়া আমি সত্য রক্ষা করিলাম।"

প্রণব, হরিশঙ্করের পায়ের ধূলা লইল। দেবী নড়িল না—আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কৃষ্ণমতি কহিলেন, "এই—এই প্রণব?"

"হ্যাঁ, এই প্রণব মতি।"

"মঙ্গল নয়?"

"এদের বংশে কখন কেউ মঙ্গল বলে ছিল না। তোমার যদি একটু লেখাপড়া জানা থাক্‌ত, তাহলে গোড়াতেই বুঝতে পারতে মঙ্গল নামটা ছদ্ম—"

কৃষ্ণমতি তখন আনন্দে উন্মত্ত—লেখাপড়া সম্বন্ধে মন্তব্য তাঁহার কাণেই উঠিল না।

(৪০)

সরিতের অপরাধ গুরুতর,—সে নরহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সরিৎ নিজের নাম ছাড়া আর কোন পরিচয় দিল না। পুলিস তজ্জন্য তাহাকে কিছু পীড়ন করিল। সরিৎ কহিল, "আমার বাড়ী ঘর নাই, জগতে আমার কেউ নাই, আমি কি পরিচয় দেব? আপনাদের যা' ইচ্ছা হয় করুন।"

পুলিস তাহার পরিচয় জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিল; সহরের বিভিন্ন থানায় তাহার প্রতিকৃতি, টিপসহি ইত্যাদি পাঠাইল।

বড় আফিসেও তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিল; কিন্তু সরিৎ যেটুকু বলিয়াছিল, তাহা ছাড়া কোথাও কিছু পাইল না। যে বেশ্যা এই মকর্দ্দমার কেন্দ্রস্থল, সে হাসপাতাল হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, সরিৎ তাহাকে মদের সঙ্গে কি একটা গুঁড়া খাওয়াইয়াছিল; সে তদ্ধেতু অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সরিৎ এই সুযোগে তাহার গহনাপত্র লইয়া চম্পট দিয়াছিল। সরিৎ মাঝে মাঝে তাহার নিকট যাতায়াত করিত এবং তাহার বিশ্বাস অর্জ্জন

করিয়াছিল। অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়া পুলিস তদন্ত শেষ করিল এবং চার্জসিট দাখিল করিল।

যথাকালে মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মকর্দ্দমা উঠিল। বিচারক একজন ইংরাজ। তিনি মকর্দ্দমা ধরিলেন, দিবসের শেষ-ভাগে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসামীর উকিল কে?"

কোর্টবাবু কহিলেন, "কাউকে ত দেখছি না।"

হাকিম আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার উকীল কই?"

"আমার উকীল নাই।"

"একজনকে দেও।"

"আমি উকীল দেব না।"

"তুমি কি পয়সার অভাবে উকীল দিচ্ছ না?"

আসামী উত্তর করিল না। হাকিম তখন উকীল-মণ্ডলীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "আপনারা কেহ বিনা পয়সায় এই ব্যক্তির মকর্দ্দমা নিতে রাজি আছেন?"

একজন নবীন উকীল উঠিয়া কহিলেন, "আমি সম্মত আছি।"

"বেশ, আপনি আসামীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করুন —মকর্দ্দমা কাল হ'বে।"

আসামী। কোন উকীল আমি চাই না।

হাকিম। কেন?

আসামী। আমি জেলে যেতে চাই।

হাকিম। এ ইচ্ছা কেন?

আসামী নীরব রহিল। হাকিম উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "বেশ, জেলেই যেও।" বলিয়া তিনি কোর্ট ত্যাগ করিলেন।

পরদিন বেলা ১২টায় আবার মকর্দ্দমা উঠিল। সে দিন আদালত-কক্ষে বহু লোক। হাইকোর্ট হইতে একজন বড় সাহেব-ব্যারিষ্টার আসিয়া হাকিমকে কহিলেন, "আমি আসামীর পক্ষ সমর্থন করতে এসেছি।"

হাকিম ও উকীল সকলেই বিস্মিত হইলেন। যে ব্যক্তির এক পয়সার সম্বল নাই সে এতবড় কৌঁসিলি নিযুক্ত করিল কিরূপে? শুধু যে তাঁহারাই বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহা নয়, আসামীও অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, তাহার কোন্ শুভেচ্ছু বন্ধু এই কৌঁসিলিকে আনিয়াছেন। কোনও পরিচিত মূর্ত্তি তাহার নয়নে পড়িল না।

উকীল-সরকার মকর্দ্দমা আরম্ভ করিলেন; আগে ঘটনাটির একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলেন। সে জঘন্য ইতিহাসে আমাদের প্রয়োজন নাই। ঘটনাটি বলা শেষ হইলে প্রধান সাক্ষী বেশ্যা কাদম্বিনীর ডাক পড়িল। সে আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইল। উকীল-সরকার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিবার পর প্রশ্ন করিলেন, "এই আসামীকে তুমি চেন?"

"না।"

"এর নাম তুমি জান?"

"না।"

"তোমার বাড়ীতে কখন গিয়েছিল?"

"না।"

"তুমি এ কি বলছ?"

"কি বল্‌তে হবে বলে দিন।"

"আমি আবার কি বলে দেব? তুমি যা' জান তাই বল।"

"আমি ত কিছুই জানি না; পুলিস যা' বলতে বলে দিয়েছিল তা আমি ভুলে গেছি।"

"তোমার গহনা চুরি গিয়েছিল?"

"না। গয়না ত আমার গায়েই রয়েছে।"

বলিয়া হাত গলা দেখাইল; নূতন গহনা ঝক্‌ঝক্ করিয়া বিস্মিত উকীল-সরকারের মাথা ঘুরাইয়া দিল। উকীল প্রশ্ন করিলেন, "তুমি ঘটনার দিন অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলে?"

"ঘটনাটা কি বলুন।"

"কি জ্বালা! তুমি কোন দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে?"

"প্রায়ই ত অজ্ঞান হয়ে পড়ি।"

"অজ্ঞান হও কেন?"

"বেশী মদ খেয়ে।"

"তুমি হাসপাতালে গিছলে?"

"গিছলাম।"

"কেন?"

"বেশী মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম বলে।"

"কেউ খাইয়ে দিয়েছিল?"

"তা' আমার স্মরণ নাই।"

"এই আসামী কি সে দিন তোমার ঘরে ছিল ?"

"একে কোন কালেই আমি দেখি নি।"

উকীল বাবু হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "এ মকর্দ্দমা আর চালাইতে ইচ্ছা করি না।"

ব্যারিষ্টার সাহেব তখন হাসিতে হাসিতে উঠিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন ; তিনি মোটা টাকা পাইয়াছেন, সুতরাং কিছু বলিতে হইবে। তিনি হাকিমকে কহিলেন, "হুজুর বুঝিতেই পারিতেছেন, পুলিস ষড়যন্ত্র করিয়া এই নিরপরাধ যুবকের বিরুদ্ধে এই জঘন্য মকর্দ্দমা আনিয়াছে। আসামী অতি সচ্চরিত্র, একজন ভাল ফুটবল খেলওয়াড় (হাকিম ফুটবল-প্রিয় ছিলেন), একজন গ্রাজুয়েট এবং সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। তাহার নিষ্কলঙ্ক নামে এই কুৎসিত অভিযোগ উপস্থাপিত হওয়ায় তাহার মনে বড় আঘাত লাগিয়াছে এবং জীবনে এতটা ধিক্কার জন্মিয়াছে যে, বংশের পরিচয় দিতে বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। হুজুর দয়া করে রায়ে এ সব কথা লিখে তাহাকে কলঙ্কমুক্ত করবেন।"

হাকিম রায়ে লিখিলেন, "আসামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। পুলিস অনর্থক ইহাকে হায়রাণ করিয়াছে। আসামীর ভাব দেখিয়া পূর্ব্বেই আমি বুঝিয়াছিলাম, সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

মুক্ত হইয়া সরিৎকুমার যখন আদালতের বাহিরে যাইতেছিল, তখন দেখিল তাহার দাদা প্রণবকুমার হরি-শঙ্করের সহিত বারান্দা-পথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন। তখন সে বুঝিল, কে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া এই খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারকে নিযুক্ত করিয়াছেন, আর কেই বা বেশ্যাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাকে দিয়া মিথ্যা বলাইয়াছেন। বুঝিয়া সরিৎ দাঁড়াইল। সত্যই কি তাহার চিরশত্রু তাহার জন্য এতটা করিয়াছে ? বলাইয়ের কথা মনে পড়িল, অজয় যাহা বলিয়াছিল তাহা স্মরণ হইল। ভাবিল, সত্যই কি তাহার দাদা এত বড় ? সরিৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল।

(৪১)

আদালত-প্রাঙ্গণে কত সময় সরিৎ দাঁড়াইয়া ছিল তাহা সে অবগত নহে। কত লোককে পুলিস কোমরে দড়ি বাঁধিয়া, হাতে লোহার বালা পরাইয়া ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া গেল, সরিৎ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। ক্রমে আদালত জনশূন্য হইয়া আসিল—হাকিম, উকীল, পুলিস, আসামী সকলেই চলিয়া গেল। কিন্তু সরিৎ নড়িল না। একজন পাহারাওয়ালা আসিয়া যখন তাহাকে মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিল, তখন সে আদালত-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া বিডন উদ্যানে আসিল। সেখানে একধারে একখানি বেঞ্চের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে অন্ধকার হইল। তখন সে উদরে জ্বালা অনুভব করিল ; মনে হইল, সে সমস্ত দিন কিছু খায় নাই। মনে হইবামাত্র উদরের জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু নিবৃত্তির উপায় কি ? একটী পয়সাও তাহার নিকট ছিল না। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া উঠিল এবং শিকদারবাগানের পথ ধরিল।

বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, তাহার মা সেখানে নাই। একজন ভৃত্য ছিল, তাহার নিকট শুনিল, প্রণব আসিয়া তাঁহাকে পটলডাঙ্গায় লইয়া গিয়াছে। সরিৎ হতাশ হইয়া পড়িল। ভৃত্য কহিল, "আপনি চান টান করে নিন্।"

"আমাকে কিছু খেতে দিতে পার মধু ?"

"বড় বাবু আপনার জন্যে খাবার দাবার ঠিক করে রেখে গেছেন, ঐ ঘরে ঢাকা আছে। আপনি গাটা ধুয়ে ফেলুন।"

"চান করবার দরকার কি ?"

"তা' জানি নে, বড় বাবু বলতে বলেছেন তাই বলছি।"

"কাপড় একখানা দিতে পার মধু ?"

"কাপড় জামা জুতো সব ঠিক আছে—বড় বাবু কিনে এনে রেখে গেছেন।"

সরিৎ চমকিয়া উঠিল। তৎপরতার সহিত স্নানাদি সম্পন্ন করিল। অবশেষে কহিল, "আমি এখন পটলডাঙ্গায় চললুম মধু—"

"কয়েকটা টাকা আপনাকে দেবার জন্যে বড়বাবু রেখে গেছেন—"

"কেন ?"

"গাড়ীভাড়া বা আর কিছু যদি দরকার হয়—"

সরিৎ টাকা কয়টী লইয়া গৃহত্যাগ করিল এবং অচিরে পটলডাঙ্গার বাড়ীতে আসিল। উপরে গেল না, নীচের একটা ঘরে বসিয়া রহিল—উপরে যাইতে বোধ হয় সঙ্কোচ হইল। প্রণব খবর পাইয়া নীচে আসিলেন ; সরিৎ ঝটিতি উঠিয়া দাদার চরণে প্রণত হইল—চরণে মাথা ঠেকাইল। প্রণব তাহাকে উঠাইয়া তাহার মুখপ্রতি চাহিলেন। সরিৎ

মাথা নীচু করিল। প্রণব তাহার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন।

যে ঘরে দ্বিজনাথ হর্ম্ম্যতলে শয়ান ছিলেন, সেই ঘরে প্রণব সরিৎকে লইয়া আসিলেন। ঘরটি বেশ বড়, খাট আলমারি সরাইয়া লওয়া হইয়াছে—মেজের উপর বিস্তীর্ণ শয্যা আস্তৃত হইয়াছে। রোগীর এক পাশে প্রণব, অপর পার্শ্বে বিন্দু শয়ন করিত। রোগীর অবস্থা বড় সুবিধাজনক নয়। ডাক্তার বৈদ্য দুই মাস ধরিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। রোগী পূর্ব্ববৎ অসহায় অবস্থায় শয্যার উপর পড়িয়া থাকিতেন—নড়িবার শক্তি ছিল না। শুধু নড়িবার নয়, কথা কহিবারও শক্তি ছিল না; কিন্তু তাই বলে যে তিনি জ্ঞানবুদ্ধিহীন তা' একেবারেই নয়—রোগ, বুদ্ধি নষ্ট করিতে পারে নাই। চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন, বুঝিতেও পারিতেন।

সরিৎ যখন আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল, তখন তাহাকে চিনিবার কোনই অসুবিধা হইল না—মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে চিনিয়া লইয়া দ্বিজনাথ চক্ষু মুদিত করিলেন। সরিৎ তাহা লক্ষ্য করিল। সে আরও লক্ষ্য করিল, তাহার ভগিনী বিন্দু তাহার পানে না চাহিয়া পিতার সেবায় নিবিষ্টচিত্ত রহিল; এবং গায়ে মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। সরিতের ধারণা হইল, তাহার পিতা ও ভগিনী, তাহাকে এই ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার সংসর্গ অপছন্দ করিতেছেন। যদি তাই করেন, তাহা হইলে কিছু যে অন্যায় হইবে, তাহা সরিতের মনে হইল না। তবে সে বিশেষ লজ্জা অনুভব করিল। তাহার অনুতাপ হইল, কেন সে জাহ্নবী-গর্ভে দেহ বিসর্জ্জন না করিয়া এখানে আসিল। তাহার মনের অবস্থা প্রণবের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিল না। প্রণব তাহাকে চুপি চুপি কহিলেন, "কেহ কিছু জানে না—জানবেও না।"

সরিৎ অতি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রণবের পানে চাহিল। প্রণব কহিলেন, "যাও, জ্যেঠামশাইয়ের পা টিপে দেও।"

সরিৎ অতি সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হইয়া পিতৃপদতলে বসিল এবং ধীরে ধীরে পা দু'খানি উঠাইয়া নিজের কোলের উপর রাখিল। কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাহার চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পিতার চরণের উপর পড়িল। প্রণব তাহা লক্ষ্য করিলেন; তিনি সরিয়া আসিয়া সরিতের মাথায় হাত দিলেন; তখন জলভরা বৃক্ষশাখা নাড়া দিলে যেমন জল ঝরিয়া পড়ে, তেমনই সরিতের নয়ন বাহিয়া জল ঝরিতে লাগিল। দ্বিজনাথ তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারও নয়ন-কোণে যেন একটু জল দেখা দিল।

এমন সময় জগা আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম প্রণবের হাতে দিল। তাহা পাঠ করিয়া প্রণব আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন, ভাঙ্গা গলায় জ্যেঠাকে কহিলেন, "মামা খালাস পেয়েছেন, অজয় 'তার' করেছে—কাল তাঁরা রওনা হবেন—পরশু সকালে এখানে এসে পৌঁছবেন।"

কক্ষমধ্যে সহসা সন্ধ্যাতারা প্রবেশ করিল। তাহার বেশ আলুথালু, চক্ষু অত্যুজ্জ্বল, বদন রক্তবর্ণ। জিজ্ঞাসা করিল, "কে এসে পৌঁছবে বলচিস? সরি?"

"না—মামা; তিনি খালাস পেয়েছেন।"

"সে জেলে গেল না? খালাস পেলে? আমি যে মা কালীর কাছে যোড়া পাঁঠা 'মানৎ' করেছিলাম। কালী যেমন 'একচোখো'।—এই যে সরিৎ এসেচিস। আয়, বোস; এ তোর বাড়ী। এবার কে তোকে তাড়ায় দেখ্‌ব; আমি মা কালীর খাঁড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।"

সরিৎ পিতার চরণ ছাড়িয়া মায়ের কাছে আসিল এবং তাহার হাত ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল; মাঝের দ্বারটাও বন্ধ করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া আবার পিতার চরণতলে বসিল এবং সমস্ত রাত্রি তদবস্থায় কাটাইল। প্রণব নিজের শয্যাপার্শ্বে তাহার বিছানা করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু সরিৎ শুইল না, কহিল, "আজকের রাতটা দাদা, আমাকে এইভাবে ব'সে কাটাতে দেও।" প্রণব আর কোন আপত্তি করিলেন না। পরদিবসও সরিৎ পিতৃচরণতলে বসিয়া দিবা-যামিনী কাটাইল। প্রণবের আনন্দের সীমা নাই।

পরদিবস যথাকালে হরকালী ও অজয় আসিলেন। গৃহে মহা আনন্দ পড়িয়া গেল। কিন্তু পাষাণীর হৃদয়ে আনন্দ নাই, শুধু অন্ধকার, শুধু গরল। সে আপন মনে বকিতে লাগিল, কখন বা দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিল। সরিৎ তাহার জননীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিল।

হরকালী যখন শুনিলেন, দ্বিজনাথের রোগমুক্তির সম্ভাবনা একেবারেই নাই, তখন তিনি প্রণবকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবার উইল পেয়েছ?"

"না।"

"না-দাবিখানাও না ?"

"না-দাবি কিসের ?"

"তোমার জ্যেঠার মুখে শুনেছিলাম—তিনি একখানা না-দাবি লিখে তোমাকে সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেখানা উইলের সঙ্গে ছিল।"

"আপনার পত্রে জেনেছিলাম, সমস্ত সম্পত্তি বাবার, জ্যেঠার নয়। তা' বাবারই হো'ক আর জ্যেঠারই হো'ক—"

"তোমার জ্যেঠার হ'লে সম্পত্তি তুমি পাবে না—সরিৎ পাবে। সে দলীল দু'খানা পাওয়া চাই।"

"আমি ত জানি না—কাগজ দু'খানা কোথা আছে।"

"ব্যাপার বড় গুরুতর হ'য়ে উঠ্ল। সরিতের হাতে এ বিষয় পড়্লে দু' দিনে সব উড়ে যাবে ; এ দিকে দ্বিজনাথেরও এমন অবস্থা নয় যে, নূতন দলীলের ব্যবস্থা হ'তে পারে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মামাবাবু, বিষয় আমার হ'লে আমি পাব।"

(৪২)

পর দিবস বিন্দু তাহার নিজের বাড়ীতে গেল। প্রণবই তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। বিন্দুর অভাব অনুভূত হইল না, কেন না, সরিৎ তাহার স্থান পাইয়াছে। পরিচর্য্যার সম্পূর্ণ ভার সে লইয়াছে, এমন কি প্রণবকেও অবসর দিয়াছে।

দুই ভাই পাশাপাশি শুইয়া থাকিতেন। কখন প্রণব, কখন বা সরিৎ রাত্রি জাগিয়া রোগীর পরিচর্য্যা করিতেন। কখন বা দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িতেন।

গভীর রাত্রি। কক্ষে নীল আধারের মধ্যে বিদ্যুতালোক জ্বলিতেছিল। প্রণব নিদ্রিত। দ্বিজনাথ নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন ; তিনি জাগিয়া থাকিলে প্রণব যে ঘুমাইবে না! সরিৎও নিদ্রাশূন্য। সে মুদিত নয়নে শয্যায় শুইয়া ভাবিতেছিল, "এ ভাবে রাত্রি-জাগরণ কত সুখের! এতে কত তৃপ্তি, কত আনন্দ! বাবার পায়ের তলায় কত শান্তি লুকান ছিল। আর এই দেবতার চেয়ে বড়—"

সহসা অনুচ্চ কণ্ঠে চাপা গলায় কে কহিল, "জয় মা কালী!"

সরিৎ চমকিয়া উঠিল ; চাহিয়া দেখিল, তাহার গর্ভধারিণী খড়্গহস্তে প্রণবের শিয়রে দণ্ডায়মানা। খড়্গ পতনোন্মুখ ; উঠিয়া মায়ের হাত ধরিবে সে অবসরও সরিৎ পাইল না—অনন্যোপায় হইয়া নিজের দেহ দ্বারা প্রণবের দেহ আচ্ছাদিত করিল—খড়্গ সরিতের পৃষ্ঠের উপর পড়িল। প্রণবের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

এ দিকে আর এক ব্যাপার সংঘটিত হইল। দ্বিজনাথ জাগ্রত ছিলেন। "জয় মা কালী" তিনিও শুনিয়াছিলেন। চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন ; দেখিলেন, দানবী খড়্গ তুলিয়া প্রণবের শিয়রে দণ্ডায়মানা। যখন খড়্গ পতনোন্মুখ, তখন তাঁহার দেহমধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল—প্রত্যেক শিরা কাঁপিয়া উঠিল—তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "প্রণব, প্রণব!" দেহটাকেও টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। খড়্গ তখন পড়িয়া গিয়াছে, রক্তের ধারা ছুটিয়াছে, উন্মাদিনী খড়্গ হস্তে নৃত্য করিতেছে। তখনও দানবী বুঝে নাই—খড়্গ প্রণবের উপর না পড়িয়া সরিতের উপর পড়িয়াছে। যখন সে তাহা বুঝিল, যখন দেখিল প্রণব আহতকে বুকে করিয়া কক্ষের বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছে, তখন সে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইল—ক্রমে বসিল, তার পর শুইয়া পড়িল।

প্রণব তখন মোটরে উঠিয়া হাসপাতালের দিকে ছুটিয়াছেন। তিনি জানিতেন, সে সময় ডাক্তার পাওয়া কঠিন। তাই মামাকে জ্যেঠার কাছে পাঠাইয়া দিয়া তিনি হাসপাতালের আশ্রয় লইলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আঘাত সাংঘাতিক নয়। তবে অত্যধিক রক্তস্রাব হেতু রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রণব দুই হাজার টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বাবুর ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল,—তিনি তৎক্ষণাৎ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বল্পকাল পরে রোগীর জ্ঞান-সঞ্চার হইল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, তাহার দাদা কাতর নয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছেন। তিন দিন প্রণব সরিতের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্ত্রীর ন্যায়, পুত্রের ন্যায়, ভৃত্যের ন্যায়, তাহার সেবা করিল। চতুর্থ দিবসে ডাক্তারের অনুমতি লইয়া প্রণব রোগীকে বাড়ীতে আনিল। তখন সে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে ; তবে চলাফিরা করিতে পারে না—শয্যায়

নিঃসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকে। প্রণবকে দিবাযামিনী সরিতের শয্যাপার্শ্বে অতিবাহিত করিতে হইত। তাহার সেবা করিতে, বা পরিচর্য্যা করিতে স্বেচ্ছায় অন্য কেহ আসিত না—প্রণবের ইচ্ছানুক্রমে কখন কখন ভজু বা জগা আসিত। প্রণব জানিত, সরিৎ সকলের অপ্রিয়। তাই সে সরিৎকে ছাড়িয়া বড় একটা উঠিত না, এমন কি দ্বিজনাথকেও দেখিতে যাইত না,—তাঁহার সকল ভার মামা ও অজয়ের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিল।

একদা অপরাহ্নে সরিৎ নির্জ্জনে প্রণবকে কহিল, "দাদা, একটা কথা তোমাকে বলব ব'লে আজ দু' দিন হ'তে মনে করচি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি ভাই ?"

"কিন্তু বড় সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"দাদার কাছে সঙ্কোচ কি ? স্বচ্ছন্দে বল।"

"দাদা, আমাকে ক্ষমা করবে ?"

"তুমি ত তোমার দাদার কাছে এমন কোন অপরাধ করতে পার না যা' ক্ষমার অতীত।"

বলিয়া প্রণব সরিৎকে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিল। সরিৎ কহিল, "আমি জানি, তুমি ক্ষমার সাগর। তবু মনে হয়, আমার অপরাধের কথা শুন্‌লে তুমিও ঘৃণায় মুখ ফেরাবে।"

"ভাই কি কখন ভাইকে ঘৃণা করে? ছি, ও কথা বলো না।"

"তবে শোন দাদা, আমি কি করেছি। কাকা বাবুর উইল, বাবার লেখা দলীল আমি চুরি করেছি।"

"হুঁ।"

"কিন্তু দাদা, নষ্ট করি নি—রেখে দিয়েছি।"

"কোথা আছে ?"

"শিকদারবাগানের বাড়ীতে, আন্‌তে আমি লোক পাঠিয়েছি।—এই যে এনেছে।"

একটা ছোট তোরঙ্গের ভিতর দলীল দুইখানা ছিল। যখন তাহা হস্তগত হইল, তখন তিনি কয়েক দিন পূর্ব্বে হরকালীকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, বিষয় আমার হ'লে আমি তা নিশ্চয়ই পাব।

প্রণব প্রথমে তাহার পিতার হাতের লেখা উইল পড়িতে প্রবৃত্ত হইল। রামনাথ পুত্রের জন্য বিপুল সম্পত্তি ও কয়েক লক্ষ টাকার 'কোম্পানীর কাগজ' রাখিয়া গিয়াছেন। পাটনায় বাড়ী, জমিদারী, আরাঙ্গাবাদে বিশাল কারবার, কলিকাতায় বাড়ী প্রভৃতি বহু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দ্বিজনাথকে অছি, রক্ষক ও একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। পিতৃহীন বালকের কুড়ি বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তাহার হাতে এই উইল দেওয়া হইবে, তৎপূর্ব্বে নয়,—উইলে এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। বোধ হয় রামনাথের এইরূপ ধারণা ছিল যে, বালক এই বিপুল সম্পত্তির অস্তিত্ব অল্প বয়সে জানিতে পারিলে হয় ত সে চরিত্রহীন বা পাঠে অমনোযোগী হইবে। উইলে আরও লেখা ছিল যে, তাঁহার প্রাণসম বন্ধু হরিশঙ্করকে বাক্য দান করিয়াছেন যে, উইলের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার কন্যা জন্মাইলে, আর সেই কন্যা বিকলাঙ্গ না হইলে, তাহার সহিত প্রণবের বিবাহ দেওয়া হইবে। উইলে এক স্থানে এই বন্ধুর অনেক সুখ্যাতি করিয়া রামনাথ লিখিয়াছেন যে, হরিশঙ্করকেই তিনি নাবালকের অছি নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিতে তিনি আর কাহারও উপর সে ভার দিতে পারেন না।

দ্বিতীয় দলিল, না-দাবি পত্র। সেখানি দ্বিজনাথ সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি তাহাতে বলিতেছেন, আমার কোন সম্পত্তি নাই, সকলই আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামনাথের উপার্জ্জিত। এক্ষণে রামনাথের একমাত্র সন্তান প্রণবকুমার এই সম্পত্তির অধিকারী—আমি অছি মাত্র। অছিস্বরূপ তাহার সম্পত্তির এ তাবৎকাল রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি। আমি দরিদ্র কেরাণী ছিলাম; ভাই আমাকে শিকদারবাগানের বাড়ীখানি কিনিয়া দিয়াছিল। সেই বাড়ীখানি ছাড়া আমার কোথাও কিছুই নাই। স্নেহময় ভাই আমার, তাহার মৃত্যুশয্যায় প্রণবকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। প্রণবের সহিত বিপুল সম্পত্তির ভারও আমার হাতে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত অর্পণ করিয়াছিল। জগদীশ্বর জানেন, আমি সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছি কি না।

দলীল দুইখানির পাঠ শেষ করিয়া প্রণব অনেক কথা মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নীরবতার পর সরিৎ কহিল, "দাদা আমাকে ক্ষমা করলে ?"

"ক্ষমা ত আগেই করেছি ভাই।"

"দাদা, বিষয় তোমার, আমি তোমাকে বঞ্চনা—"

"বিষয় শুধু আমার নয়, বিষয় তোমারও ; আমরা যে দু' ভাই।"

সরিৎ মুখ ফিরাইয়া লইল।

এমন সময় জগা আসিয়া সংবাদ দিল, "নীচে কয়েকজন পুলিস এসেছে—আপনাকে ডাকছে।"

(৪৩)

প্রণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিস ? কেন ?"

"কিছুই ত বললে না।"

"মামাকে খবর নিতে বল্।"

ক্ষণপরে হরকালী ব্যস্ততার সহিত আসিয়া কহিলেন, "পুলিস না কি সংবাদ পেয়েছে, সরিৎ খুন হয়েছে, আর তার মা-ই তাকে খুন করেছে! তাই দারোগা তদন্ত করতে এসেছে।"

"পুলিসকে কে সংবাদ দিল তা' বললে কি ?"

"না। তবে দারোগা এইটুকু বললে যে, সে স্ত্রীলোক।"

"আচ্ছা, আমি বার করে নিচ্ছি ; আপনি দয়া করে দারোগাকে একবার উপরে পাঠিয়ে দিন—আমি সরিৎকে ছেড়ে নীচে যেতে পারছি না।"

অচিরে দারোগা বাবু সরিতের ঘরে আসিলেন। প্রণব সাদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একখানা চেয়ারে বসাইলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, "জানতে পারি কি, কি জন্যে আপনার এখানে পদার্পণ হয়েছে ?"

"সংবাদ পেয়েছি—দ্বিজবাবুর ছেলে সরিৎ না কি খুন হয়েছে।"

"ভুল শুনেছেন। এরই নাম সরিৎ—আমার ভাই।"

"তাহ'লে খুন হয় নি, খুন করবার চেষ্টা হয়েছিল।"

"অনুমানটা আপনার ঠিক নয়।"

"ঠিক কি বেঠিক, তা' আহত ব্যক্তিকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করলেই জানা যাবে।"

"আমার বিনানুমতিতে পারবেন না, এ ক্ষেত্রে বাদী কেউ নেই।"

"সে আমি পরে বুঝব, এখন আমি সরিতের মায়ের এজাহার নিতে চাই।"

"তা'ও নিতে আমি দেব না।"

"আপনি অনর্থক সরকারি কাজে বাধা দেবেন না। আমরা সংবাদ পেয়েছি—সরিতের মা সরিৎকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলেন।"

"আপনি ভুল সংবাদ পেয়েছেন—সরিৎকে আমি মেরেছি, তা'র মা মারেন নি।"

"আপনি মেরেছেন ?"

"হ্যাঁ। আমার এজাহার নিতে হয় বা আমাকে চালান দিতে হয় যা' ইচ্ছা হয় করুন।"

সরিৎ কহিল, "দাদা মূল কারণ বটে, কিন্তু তাঁর বিশেষ কোন দোষ ছিল না। রাতে আমরা পাশাপাশি বাবার কাছে শুয়েছিলাম ; আমার প্রস্রাব-পীড়া হ'ল, আমি উঠে বাইরে গেলাম ; দাদাকে ব'লে গেলাম বাইরের আলোটা জ্বেলে দিতে। তিনি তা' দিলেন না, আমি ঠোক্কর খেয়ে একটা বঁটির উপর পড়ে যাই, পিঠে আঘাত লাগল, রক্তও পড়্‌ল। তখন দাদা উঠে এলেন, ভয় খেয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন—এই যে ডাক্তার বাবু এসেছেন—এঁরই যত্নে হাসপাতালে আমি দু'দিনের মধ্যে সেরে উঠেছি। কেমন ডাক্তার বাবু, আমার আঘাত সামান্য নয় কি ?"

ডাক্তার বাবু সম্প্রতি দুই হাজার টাকা পাইয়াছেন, এখনও কিছু পাইবার আশা রাখেন। তিনি উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, আঘাত সামান্য।"

"বঁটিটা খুব জোরে লাগে নি, না ডাক্তার বাবু ?"

বঁটি ? বঁটি আবার কোথা হ'তে এল ? তা' যাই হো'ক ডাক্তার বাবু অম্লানবদনে কহিলেন, "মোটেই জোরে নয়।"

দারোগা সাহেব তখন ডাক্তার বাবুর পরিচয় গ্রহণ করিলেন। যখন শুনিলেন, তিনি হাসপাতালের সার্জ্জন, তখন তিনি প্রণবকে কহিলেন, "আপনাদের অনর্থক বিরক্ত করিলাম, কিছু মনে করিবেন না। কিন্তু মাগীটা—"

"তার নাম কি ?"

"সে একটা ছদ্ম নাম বলেছিল বলে মনে হয়। নাম বল্‌বার সময় ইতস্ততঃ করেছিল।"

"আচ্ছা, আপনি একটু বসুন—আমি আসছি।"

বলিয়া প্রণব অন্দরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্ষণপরে তিনি দাসী রাধিকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাধি দারোগাকে দেখিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু পিছনে জগা, পলাইবার সুবিধা হইল না। দারোগা কহিলেন,

"হ্যাঁ, এই মাগীটাই আমাকে সংবাদ দিয়েছিল ; বলেছিল, সরিৎকে তার মা খুন করেছে।"

প্রণব কঠোর দৃষ্টিতে দাসীর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এ কাজ করেছিস রাধি ?"

উত্তর নাই। রাধি কাঁপিতে লাগিল।

প্রণব কহিল, "জ্যেঠাইমা তোর কি করেছেন রাধি, যে তুই তাঁর সর্ব্বনাশ করতে চেষ্টা করেছিলি ? আজীবন তিনি তোকে ভালবেসে এসেছেন, তুই যা' বলেছিস তিনি তাই করেছেন, যা' চেয়েছিস তিনি তাই দিয়েছেন, তবু তাঁকে বিপদে ফেল্‌তে তোর এই প্রবৃত্তি ? তুই মানুষ, না রাক্ষসী ?"

দাসী নিরুত্তর রহিল ; মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল— বুঝি কাঁদিতেছিল। দারোগা কহিল, "এইবার তুমি থানায় চল রাধি। খুনী মামলায় মিথ্যে সাক্ষ্য দিলে কি হয়, এইবার তা' বুঝবে—চল।"

রাধি প্রণবের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল ; কিছু বলিতে পারিল না—শুধু কাঁদিতে লাগিল। প্রণব কহিলেন, "দারোগা বাবু, আপনি একে ছেড়ে দিন। যা'র প্রবৃত্তি স্বভাবতই নীচ তাকে শাস্তি দিয়ে কোন ফল নেই—সাপ চিরদিনই সাপ থাক্‌বে।"

"আমি ওকে কিছুতেই ছাড়্‌তে পারব না। এতবড় নিমকহারাম—"

"নিমকহারামি যদি করে থাকে, তা'হলে সে আমাদেরই সঙ্গে করেছে। আমি ক্ষমা করছি, আপনিও ওকে ক্ষমা করুন।"

"আপনি এত বড় পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করলেন ?"

"জ্যেঠা বলেন, দয়া ও ক্ষমার চেয়ে আর ধর্ম্ম নাই।"

দারোগা বিস্মিত নয়নে প্রণবের পানে চাহিয়া রহিল। প্রণব দাসীর পানে চাহিয়া কহিল, "তুই যা' রাধি, দারোগা বাবু তোকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু এ বাড়ীতে আর নয়— জগা, একে বিদেয় করে দে।"

রাধি ও জগা প্রস্থান করিল।

দারোগা কহিল, "প্রণব বাবু, আপনার উদারতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনার অনুরোধে আমি মাগীটাকে ছেড়ে দিলাম।"

"তা'হলে আমার আর একটা অনুরোধ রক্ষা করুন।"

"আজ্ঞে করুন।"

"একটু জলযোগ ক'রে যেতে হবে।"

"সেটা কি মাপ হয় না ?"

"হয়, যদি আপনি গাড়ীতে ক'রে খাদ্যাদি নিয়ে যান।"

"আমার ত গাড়ী নেই।"

"আমার গাড়ী আপনার বাহন হ'বে।"

"আপত্তির পথ আপনি বন্ধ করলেন।"

দারোগা বাবু নীচে নামিয়া আসিয়া অনুচরদিগকে বিদায় দিলেন। হরকালী বাবু তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসাইয়া লক্ষ্ণৌয়ের ডাকাতি মকদ্দমার গল্প আরম্ভ করিলেন। সে বিচিত্র আখ্যায়িকা শুনিতে শুনিতে দারোগা তন্ময় হইলেন। প্রণবের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া ব্যারিষ্টার বেল সাহেব তাহার সহিত যে সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। তিনি একটীও টাকা না লইয়া আসামীর পক্ষে মকদ্দমা চালাইয়াছেন। চীফ কোর্টের জজ রায়ে পুলিশের বিরুদ্ধে যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় ডাক্তার বাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া হরকালীকে কহিলেন, "আমি দ্বিজবাবুকে দেখে এলাম। তিনি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য লাভ করেছেন। আমি তাঁহার রোগের কথা কার্ণাডো সাহেবের মুখে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা—ভয়ের বা আনন্দের—অকস্মাৎ সংঘটিত হ'লে রোগী আরোগ্য লাভ করতে পারেন।' কিন্তু সে রকম কিছু না হ'য়েই রোগী যে আরোগ্যের পথে চলেছেন, এইটেই আশ্চর্য্যের কথা। রোগটা বেশী দিনের নয় এই যা', হাত পাও ক্রমে ঠিক হবে।"

প্রণব আসিয়া ডাক্তারের পকেটে কয়েকখানা নোট গুঁজিয়া দিলেন। ডাক্তার বিশটা দাঁত দেখাইয়া কহিলেন, "থ্যাঙ্কস" ; এবং বিদায় হইলেন।

জগা আসিয়া সংবাদ দিল—মোটর প্রস্তুত। দারোগা উঠিলেন। গাড়ীর নিকটে আসিয়া দেখিলেন, শকট দ্রব্য-সম্ভারে পূর্ণ। দ্রব্যগুলি খুব লোভনীয় হইলেও দারোগা ফিরিয়া আসিয়া প্রণবকে কহিলেন, "গাড়ীতে যা' দিয়েছেন, তা' ত জলখাবার নয়—ঘুষ।"

"আপনাকে আমি ঘুষ দিতে যাব কেন ?—ছেলেদের কিছু খেতে দিয়েছি।"

"আমি আপনার নিকট ঘুষ নিতেই এসেছিলাম; উদ্দেশ্য ছিল মোচড় দিয়ে যদি কিছু নিতে পারি। কিন্তু—কিন্তু আপনার নিকট কখন কিছু নেব না।"

"আমার প্রীতিও কি নেবেন না?"

"আমার মত কঠিনকেও আপনি গলিয়ে দিলেন।"

"যদি গ'লে গিয়ে থাকেন তা' হলে আর কঠিন হবেন না—দয়া করে প্রীতি-উপহার গ্রহণ করুন।"

দারোগা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বিদায় হইলেন।

(৪৪)

অন্তঃপুরে গিয়া প্রণব দেখিলেন, বিন্দু হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বিন্দু কহিল, "কে এয়েছে দেখ্‌বে এস দাদা।"

"কে এয়েছে বল্ না।"

"তুমি দেখবে এস না।"

"কাবুলিওয়ালা নয় ত?"

"তা'র বোন টোন হবে।"

"কি করতে এসেছে?"

"কাবুলি আসে আবার কি করতে?—পাওনা আদায় করতে—তুমি এস না কেন।"

"আজও কি বিন্দু, তুই যা' বলবি আমাকে তাই করতে হবে?"

"হ্যাঁ হবে—চিরদিন করতে হবে; আমি এ দাবী ছাড়্‌তে পারব না।"

"ছেড়ে দিস্ নে দিদি—"

"তবে চল।"

বিন্দুর গলাটা মোটা, চক্ষুও সজল। নীরবে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে প্রণব কহিলেন, "আমি বুঝেছি—তুই কি দেখাবি।"

"বল দেখি?"

"দেবরাণী এসেছে।"

"ঠিক বলেছ। কি সুন্দর প্রতিমাখানি—"

"আমি জানি; এখন আমাকে ছেড়ে দে।"

"না, তোমাকে দেখ্‌তে হবে।"

"আমি অনেকবার দেখিছি।"

"তুমি রাণীকে দেখেছ, দেবীকে দেখ নি।"

সহসা উভয়ে দেবরাণীর দর্শন পাইল। প্রণবকে দেখিয়া রাণী একটু সঙ্কুচিত হইল। প্রণব দেখিলেন, রাণী আজ অভিনব বেশে সজ্জিত। কর্ণে হীরক-দুল, কণ্ঠে হীরক-খচিত হার, প্রকোষ্ঠে হীরক-বলয়, ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা; চরণ অলক্তকরঞ্জিত। চরণচুম্বিত কেশরাশি আলুলায়িত, আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নে সূক্ষ্ম কজ্জল রেখা; পরিধানে একখানি নীলবস্ত্র। প্রণব মুগ্ধ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। বিন্দু কহিল, "দেখ্‌লে দাদা দেবীকে? দেবী হ'লেও তোমার উপযুক্ত হবে কি না জানি না।" বলিয়া সরিয়া পড়িল।

প্রণব কহিলেন, "তোমাকে এ বেশে কখন ত দেখিনি রাণি! তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।"

রাণী অধোমুখে টিপি টিপি হাসিতে লাগিল, কোন উত্তর করিল না। প্রণব কহিলেন, "আজ এত সঙ্কোচ কেন রাণি? মঙ্গলের বাড়ীতে না গিয়ে প্রণবের বাড়ীতে এসেছ বলে বুঝি? প্রণবকে তোমার ভাল লাগে না, না? যে দুষ্ট ছেলে তোমাকে পাহাড় থেকে কোলে করে নামিয়ে এনেছিল, তাকে তোমার ভাল লাগে, না?"

"সে দিনের কথা আমি কখন ভুলব না।"

"আমিও না। সেদিন আমি সঙ্কল্প করেছিলাম—তোমাদের কাছে আর থাকব না।"

"কেন?"

"তুমি যে আমার সকল সংযম ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিলে।"

"যাক্, এখন পথের পাখী বাসা বেঁধেছে।"

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া প্রণবকে কহিল, "মা-ঠাকুরুণ আপনাকে ডাকুচে, শীগ্‌গির যান।"

প্রণব তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

* * * *

এ দিকে দ্বিজনাথ তাঁহার কক্ষে শুইয়া হরিশঙ্করকে কহিতেছিলেন, "তুমি রাগ করেছিলে তা' জানি; আমি তোমাকে তফাতে রাখ্‌বার উদ্দেশ্যেই কড়া চিঠি লিখে-ছিলাম। তুমি কেমন তোমার সন্তানকে শিক্ষা দেও, আর আমি কেমন আমার সন্তানকে শিক্ষা দি, তা' উপযুক্ত সময়ে মিলিয়ে দেখবার আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রণবের

কাছে তোমাকে আসতে দিই নি, আমিও তোমার মেয়ের কাছে যাই নি। আজ বিধাতার ইচ্ছায় উপযুক্ত সময় হয়েছে, তাই তোমার মেয়েকে দেখতে চেয়েছিলাম। তুমি দয়া করে তাকে নিয়ে এসেছ, আমার প্রার্থনা শুনেছ—"

"তুমি এ কি বলছ দ্বিজ-দা। রামনাথের বাড়ীতে আমার মেয়ে আসবে, এ আর বেশী কথা কি ?"

"বেশ। মেয়েও যা' দেখ্‌লাম তা' চমৎকার—প্রণবের উপযুক্ত বটে।"

"প্রণবের উপযুক্ত কি বলছ দ্বিজ-দা! তার উপযুক্ত মেয়ে ত্রিভুবনে নেই।"

দ্বিজনাথ প্রীত হইলেন; হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমি সেরে উঠি, তখন বিয়ের ব্যবস্থা হ'বে। এখন তুমি মন থেকে সব ক্ষোভ দূর কর, আমাকে ক্ষমা কর।"

জনৈক দাসী আসিয়া কহিল, "আপনি গিন্নীমার ঘরে একবার যান।"

"কেন ?"

"তাঁর বোধ হয় আর দেরী নেই—বড় দাদাবাবু সেখানে আছেন, আপনাকে তিনি যেতে বল্লেন।"

"যাচ্ছি। জগা, ভজুকে চৌকী নিয়ে আনতে বল।"

* * * *

সন্ধ্যাতারা শয্যাশায়িত। ঘটনার পর সেই যে তিনি পুত্রের রক্তের উপর শুইয়া পড়িয়াছিলেন, তার পর আর তিনি উঠেন নাই। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পাশের ঘরে শয্যার উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল; সে শয্যা হইতে তিনি আর উঠেন নাই; কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, আহারাদিও করেন নাই। প্রণব এক একবার হাসপাতাল হইতে ছুটিয়া আসিতেন, আর জ্যেঠামহাশয়কে দেখিয়া যাইতেন। জ্যেঠাইমার ঘরেও একবার আসিতেন এবং তাঁহাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া যাইতেন। প্রণব ছাড়া আর কেহ তাঁহাকে কিছু খাওয়াইতে পারিত না। প্রণব খাওয়াইতে আসিলে তিনি তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিতেন।

অপরাহ্ণ—সন্ধ্যাতারা আকাশে উঠিতে বড় বেশী বিলম্ব নাই। প্রণব, সন্ধ্যাতারার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান। প্রণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরিৎকে ডাক্‌ব ?"

"না।"

"বিন্দুকে ?"

"না।"

"জ্যেঠামশাইকে ?"

"ডাক্‌বে, ডাক।"

প্রণবের ইঙ্গিতে জনৈক দাসী ছুটিল।

প্রণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কিছু বলতে চাও জ্যেঠাই-মা ?"

"বলব, বসো।"

প্রণব শয্যাপ্রান্তে বসিলেন। সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারোগা এসেছিল কেন ?"

"এই একটু দেখা শোনা করতে।"

"লুকিও না, আমি শুনেছি।"

জ্যেঠাইমার স্পষ্ট ও সহজ কথা শুনিয়া প্রণব বিস্মিত হইল। মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ঘটনার পর হইতে তিনি কাহারও সহিত বড় একটা বাক্যালাপ করেন নাই, সুতরাং এতদিন ঠিক কিছু বুঝা যায় নাই। প্রণব এক্ষণে বুঝিলেন, জ্যেঠাইমা মৃত্যুশয্যায় নিজেকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। উত্তর করিলেন, "কার কাছে কি শুনেছ জ্যেঠাই-মা ?"

"আমি জগার কাছে শুনেছি, পুলিশ আমাকে ধরতে এসেছিল।"

"জগা ঠিক বলতে পারে নি; দারোগা তোমাকে দু'টো কথা জিজ্ঞেস করবে বলছিল বটে।"

"না, আমাকে ধরতে এসেছিল; তুমি নিজের ঘাড়ে সব দোষ নিয়ে আমাকে রক্ষে করেছ।"

"তাহ'লে কি পুলিস আমাকে ধরে নিয়ে যেত না ?"

"আজ আমার কাছে কোন কথা লুকুতে পারবে না প্রণব! জীবনের শেষ দিনে আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেছে। আমি শুধু ভাবছি,—না, সে কথায় আর কাজ নেই।"

সেই সময় দ্বিজনাথ বাহক-স্কন্ধে বাহিত হইয়া কক্ষে দর্শন দিলেন। একখানা আরাম-চৌকিতে (ইন্‌ভ্যালিড চেয়ারে) তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। কহিলেন, "কি বলছিলে বল তারা; আর বলবার হয় ত সময় পাবে না।"

সন্ধ্যা। আমি এত করেছি তবু ত প্রণব—

দ্বিজ। তবু ত প্রণব তোমাকে ক্ষমা করেছে, এই কথা বলছ? কেন করেছে জান? প্রণব প্রতিহিংসা

শিখে নাই, শিখেছে শুধু ক্ষমা, হৃদয়ে আছে শুধু দয়া। দয়া ও ক্ষমার চেয়ে ধর্ম্ম নেই; কিন্তু আমরা সন্তানকে ক্ষমা শিখাই না—প্রতিহিংসা শিখাই। শৈশবে শিশু মাটীতে পড়ে গেলে আমরা মাটীতে পদাঘাত করে তা'কে সান্ত্বনা দি, অন্য বালক তা'কে প্রহার করলে আমরা সেই বালককে মেরে তা'র চোখের জল নিবারণ করি। আমি প্রণবকে প্রতিহিংসা শিখাই নি, ক্ষমা শিখিয়েছি; তুমি বিন্দুকে ক্ষমা না শিখিয়ে প্রতিহিংসা শিখিয়েছ, তাই সে তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কয় না। আর সরিৎকে যা' শিখিয়েছ তা' বুঝতেই পারছ। যাক্, ও সব কথার আলোচনা করে তোমাকে এ সময়ে ব্যথা দেব না।

*   *   *   *

তবে যাও সন্ধ্যা, অনুতাপানলে পুড়িতে পুড়িতে মহাবিচারকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াও। তথায় চিত্রগুপ্ত তোমাকে বলিয়া দিবে, তোমার জন্মটা বৃথা গিয়াছে—হিংসা তোমাকে পতি-পুত্রের স্নেহ-শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি সুখ শান্তি নষ্ট করিয়াছে। যাও, দুর্ল্লভ মানব-জন্ম হারাইয়া পশু-যোনিতে অব-তীর্ণ হও।

(সমাপ্ত)

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সহিত মোগলের সংঘর্ষ

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্-এ

৩। ঈশা খাঁর রাজ্য

আবুল ফজল সর্ব্বত্রই ঈশা খাঁকে ভাটির জমীদার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আকবরনামাতে এই ভাটির এক অবোধ্য বর্ণনা আছে। আইন-ই-আকবরী মতে সমগ্র সুবে বাঙ্গালার আয়তন চাটগাঁ হইতে তেলিয়াগরী পর্য্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর সীমানার পর্ব্বতমালা হইতে সরকার মাদারণের (বর্ত্তমান হুগলী জেলা—মোটামোটি) দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত ২০০ ক্রোশ (Jarret, II. P, 116)। এ দিকে কিন্তু ভাটির বর্ণনায় দেখা যায়, (Akbarnama, III. P. 646) ইহাও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪০০ ক্রোশ বিস্তৃত এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩০০ ক্রোশ বিস্তৃত। অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষাও ইহা বড় দেশ! এই অদ্ভুত দেশের চৌহদ্দিও অদ্ভুত। পূর্ব্বে সমুদ্র ও হাবসিদের দেশ। পশ্চিমে খ্যান জাতির আবাস। দক্ষিণে তাঁড়া। উত্তরে আবার সমুদ্র এবং তিব্বতের সীমান্ত! অনেক লেখকই অনুমান করিয়াছেন যে নকলকারীর ভ্রমে, অথবা যেরূপেই হউক, এই বর্ণনা উলট্‌পালট হইয়া গিয়াছে এবং ইহাতে ভুল ঢুকিয়াছে। আইন-ই-আকবরীর পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যায়, ভাটি সুবে বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চল এবং ইহার পরেই তিপ্রাদের দেশ। ইহা হইতেই এই দেশ যে ঢাকা-ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ এবং ত্রিপুরা-শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঈশা খাঁর পূর্ণ গৌরবের সময় তিনি ২২ পরগণার মালিক হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বজন বিদিত কথা। প্রজাসাধারণের স্মৃতি এই বিষয়ে মোটামোটি অভ্রান্ত হইবারই কথা। এই ২২ পরগণার দুইটি তালিকা আমরা পাইয়াছি। একটি ৺কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার ময়মনসিংহের ইতিহাসের ৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। আর একটি ময়মনসিংহ গীতিকার দ্বিতীয়খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে "দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি" নামক এক পালাগান প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার ৩৬৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া গিয়াছে। এই উভয় তালিকা নিম্নে পাশাপাশি দেওয়া গেল।

কেদারবাবু-প্রদত্ত তালিকা	ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রাপ্ত তালিকা
১। আলেপ সাহি	আলাপ সিংহ
২। মমিন সাহি	ময়মন সিংহ
৩। হুসেন সাহি	হুসেন শাহী
৪। বড় বাজু	
৫। মেরাউনা	

৬। হেরানা	
৭। খরানা	
৮। সেরালি	
৯। ভাওয়াল বাজু	ভাওয়াল
১০। দশ কাহনিয়া বাজু	সেরপুর
১১। সায়র জলকর	
১২। সিংধা মৈন	সিংধা
১৩। সিং নছরত উজিয়াল	নসিরুজিয়াল
১৪। দরজি বাজু	দরজি বাজু
১৫। হাজরাদি	হাজরাদি
১৬। জাফর সাহি	জয়রে সাই
১৭। বলদা খাল	বরদা খাত
১৮। সোনার গাঁ	স্বর্ণগ্রাম
১৯। মহেশ্বর দি	মহেশ্বর দি
২০। পাইট কাড়া	পাইট কাড়া
২১। কাটরাব	কাটরাব
২২। গঙ্গামণ্ডল	গঙ্গামণ্ডল
	বরদাখাত
	মনরা
	কুড়িখাই
	জোয়ান শাহী
	খাল্যাজুড়ি
	জোয়ার হুসেনপুর

এই দুই তালিকার যে বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহার সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ময়মনসিংহ-গীতিকায় বরদাখাতের নাম দুইবার দেখা যায়—উহাদের একটা বড়বাজু হইবে বলিয়া বোধ হয়। আর কেদারবাবুর তালিকায় বড়বাজুর পরে মেরাউনা, হেরানা, খরানা এবং শের আলি এই যে চারিটি পরগণার নাম দেখা যায়, এই স্থানগুলি বড়বাজুরই অংশ। বর্ত্তমানে ইহাদের কতক অংশ নবোদ্ভূত যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদীর পূর্ব্বপার, কতক পশ্চিমপারে পড়িয়াছে। (ময়মনসিংহের ইতিহাস—৬০ পৃষ্ঠা ও ময়মনসিংহের বিবরণ, ২৩ পৃষ্ঠা)। প্রথম তালিকায় সায়র জলকর ও দ্বিতীয় তালিকায় জোয়ানশাহী ও খালিয়াজুড়ি পরগণা একই ভূভাগের বিভিন্ন নাম (ইতিহাস—পৃষ্ঠা ৬১, বিবরণ, পৃষ্ঠা ৩৪)। বাকী রহিল মনরা ও কুড়িখাই। কুড়িখাই বরদাখাত পরগণার অন্তর্গত (ময়মনসিংহের বিবরণ, ৩৭ পৃষ্ঠা। ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত রাজমালা, ৪৪৩ পৃষ্ঠা)। মনরা কোথায়, স্থির করিতে পারিলাম না। বরদাখাতেরই অন্তর্গত মনরা-বাজার নামক একটি স্থান আছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে; কিন্তু কোন প্রমাণ দিতে পারিলাম না।

উপরের দুই তালিকার এক তালিকায়ও ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগণার নাম নাই। ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে পরবর্ত্তীকালে দেওয়ান মজলিস গাজি নামক ঈশা খাঁর জনৈক বংশধর সমগ্র সরাইল পরগণার মালিক হন। (রাজমালা—৪৪৯ পৃষ্ঠ)। ঈশা খাঁর বংশাবলি বর্ত্তমানে যাহা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে মজলিস গাজির নাম কোথাও নাই। কেদারবাবুর "ময়মনসিংহের বিবরণ"এ ঈশা খাঁর তিরোধানের পরে নসরৎ-উজিয়াল পরগণার মালিক ঈশা খাঁর পারিষদ একজন মসজিদ জালালের নাম পাওয়া যায় এবং খালিয়াজুড়ির মালিক স্বরূপ এক মজলিস বংশের নাম পাওয়া যায় (বিবরণ, পৃঃ ২৮ ও ৩২)। খালিয়াজুড়িও সরাইল সংলগ্ন পরগণা। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শাঁজাহানের সহিত ঈশা খাঁর প্রথম সংঘর্ষ বর্ণনায় আকবরনামাতে ঠিক এই অঞ্চলেই মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ নামক দুইজন জমীদারের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা ঈশা খাঁর পক্ষাবলম্বন করাতেই যুদ্ধের গতি ফিরিয়া যায়। এই দুই মজলিস সরাইল, খালিয়াজুড়ি ও জোয়ানশাহী অঞ্চলেই জমীদারী করিতেন বলিয়া মনে হইতেছে। কৈলাসবাবুর রাজমালা, ৪৫০ পৃষ্ঠায় সরাইলের মজলিস গাজির একটি বংশাবলি প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হৃতসম্পত্তি দেওয়ান ছমদদ আলি মজলিস গাজির অধস্তন ১৩শ পুরুষ। কাজেই সরাইলের মালিক মজলিস গাজি ঈশা খাঁর সমসাময়িকই হইবেন বলিয়া ধরা যায়। (১) সরাইল পরগণার আদি মালিক যে ঈশা খাঁ

(১) "About the time of Isa Khan, Sarail Pargana passed into the hands of the Dewan family, the first Zamindar Majlis Gazi, being of Isa Khan's family." Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Tippera, 1915-1919. P. 76, para 139.

ছিলেন, পদ্যে বিরচিত ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায় তাহার অনেক প্রমাণ আছে, যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

এইবার ঈশা খাঁর বিশাল জমীদারীর পরগণাগুলির একটা ধারণা করা যাউক। এই ক্ষেত্রে মনে রাখা আবশ্যক যে, ত্রিপুরা জেলার পরগণাগুলি প্রায়ই একলপ্ত পরগণা; ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশের পরগণাগুলিও অনেকটা সেই রকমের। কিন্তু ঢাকা জেলার এবং ময়মনসিংহের পশ্চিমাংশের পরগণাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত (চল্‌তি কথায় 'ছিটা') পরগণা।

১। আলাপসাহি বা আলাপ সিংহ। আয়তন ৫৬০ বর্গ মাইল। মুক্তাগাছার আচার্য্য চৌধুরীগণের অধিকৃত বিখ্যাত পরগণা। ঢাকা—বাহাদুরাবাদ রেল-লাইনের ধলা ষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া ময়মনসিংহ পার হইয়া পিয়ারপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত অংশের পশ্চিমে, বর্ত্তমান কালের পুলিশ ষ্টেশন মুক্তাগাছা, ফুলবেড়িয়া ও ত্রিশালের প্রায় সমস্তটা জুড়িয়া এই পরগণা অবস্থিত। Final Repo t on the Survey and Settlement Operations in the District of Mymensing, Appendix C. Parg na map of the proposed central District দ্রষ্টব্য।

২। মমিনসাহি। এই পরগণা আলাপসিংহ হইতে বৃহত্তর। পরিমাণফল প্রায় ৬০৪ বর্গ মাইল। ইহা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে, ব্রহ্মপুত্রতীর হইতে পূর্ব্ব-উত্তরে এবং পরে সোজা পূর্ব্বে প্রায় শ্রীহট্টের সীমা পর্য্যন্ত ৪০।৪৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গৌরীপুর, গোপালপুর, কেল্লা বোকাই নগর ইত্যাদি বিখ্যাত স্থান ইহার মধ্যে পড়িয়াছে।

৩। হুসেনসাহি। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে মমিনসাহির দক্ষিণস্থ পরগণা। ইহার কতক অংশ জোয়ার হুসেনপুর নামে পরিচিত।

৪। বড় বাজু

৫। মেরাউনা

৬। হেরানা

৭। খরানা

৮। শের আলি

এই পাচ পরগণা বর্ত্তমানে বড়বাজু, আটিয়া ও কাগমারী বলিয়া পরিচিত (ময়মনসিংহের ইতিহাস, ৬০ পৃষ্ঠা)। এক সময়ে আটিয়া, কাগমারী ইত্যাদিও বড়বাজু নামে পরিচিত সরকার বাজুহার অন্তর্গত বৃহত্তম পরগণারই অন্তর্ভুক্ত ছিল, পৃথক নামে পরিচিত ছিল না। বর্ত্তমানে নূতন ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) নদীর উদ্ভব হওয়ায় ইহাদের অনেক জমী যমুনার পশ্চিমপারে পড়িয়াছে। বর্ত্তমান টাঙ্গাইল সব-ডিভিশন মোটামুটি এই তিন পরগণা লইয়া গঠিত। তিনটিই ছিটা পরগণা,—মোটামুটি, উত্তরাংশে কাগমারি, মধ্যে বড়বাজু ও দক্ষিণে, অনেকটা একলপ্তে, আটিয়া পরগণা। আটিয়া পরগণার কিছু জমী ঢাকা জেলায়ও পড়িয়াছে। কাগমারীর উত্তরে পুখরিয়া নামক একটি বড় পরগণা দেখা যায়। ইহাও বড়বাজুর অন্তর্গত কি না, এই বিষয়ে কোন প্রমাণ পাইলাম না। তবে ইহা ঈশা খাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কারণ, ইহার উত্তরে জাফরসাহি এবং দক্ষিণে প্রকাণ্ড পরগণা বড়বাজু উভয়ই ঈশা খাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল।

৯। ভাওয়াল বাজু। ইহার নাম প্রকৃতপক্ষে রণ-ভাওয়াল হওয়া উচিত। ইহার সীমানা—পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে ঢাকা জেলার সীমানা বাণার নদী, উত্তরে আলাপ-সিংহ পরগণা এবং পশ্চিমে আটিয়া পরগণা।

১০। দশ কাহনীয়া বা শেরপুর। ইহার সীমানা, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ, উত্তরে গারো পাহাড়, পূর্ব্বে সুসঙ্গ পরগণা।

১১। সায়র জলকর-পরগণা জোয়ানশাহী ও খালিয়া-জুড়ি। এই দুই পরগণা জলাভূমিতে পরিপূর্ণ—ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। জোয়ানশাহী ধনু নদী এবং মেঘনা নদীর অভ্যন্তরস্থ সুবৃহৎ পরগণা, অষ্টগ্রাম, ঢাকী,

---

এই মজলিস গাজির পৌত্র নুর মহম্মদের স্ত্রীর নির্ম্মিত একটি মসজিদ সরাইলে আছে। উহার শিলালিপির ইংরেজী অনুবাদ এই—'In the reign of Badshah Aurangzeb known as Alamgir this mosque was built by the wife of Nur Muhammad, son of Majlis Shahbaz in the auspicious month of Ramzan in the year 1080H." Ibid. P. 77. হিজরি ১০৮০ সন খ্রীষ্টাব্দের ১৬৬৯ এর ১লা জুন আরম্ভ হইয়াছিল। সাধারণতঃ তিন পুরুষে ১০০ বছর ধরা হয়। কাজেই ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত নুর মহম্মদের পিতামহকে ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈশা খাঁর অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় জীবিত বলিয়া সঙ্গতরূপেই ধরা যায়। ইনি আকবরনামা কথিত দুই মজলিসের একজনের পুত্রও হইতে পারেন।

ইটনা ইত্যাদি স্থান ইহার অন্তর্গত। দক্ষিণে ইহা ভৈরববাজারের ৪ মাইল উত্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। খালিয়াজুড়ির আয়তন ১৩০ বর্গমাইল। ইহার সমস্তটাই প্রায় জলাভূমি। এই পরগণা জোয়ানশাহীর উত্তরে অবস্থিত এবং ধনু নদী দ্বারা দ্বিখণ্ডীকৃত। ইহার উত্তরে ও পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জেলা, দক্ষিণে জোয়ানশাহী পরগণা, পশ্চিমে নসিরুজিয়াল পরগণা।

১২। সিংধা মৈন। ইহা মমিনসাহি ও নসিরুজিয়াল পরগণার অন্তর্গত ছিটা তপ্পা, বর্ত্তমান পুলিশ ষ্টেশন বারহাট্টা, আটপাড়া ও কেন্দুয়ার অন্তর্গত। আচার্য্য চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ ৺শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী যখন মমিনসাহি পরগণা দখল করেন, তখন সিংধার মুসলমান জমীদারের সহিত তাঁহার অনেক বিরোধ করিতে হইয়াছিল।

১৩। নসিরুজিয়াল। এই পরগণা মোটামুটি বর্ত্তমান কেন্দুয়া থানা।

১৪। দরজীবাজু। পরগণা দরজিবাজুর অনেকখানি সিংধা তপ্পা নামে পরিচিত। পূর্ব্বোল্লিখিত ময়মনসিংহ জেলার Final R port এ Proposed Easte n District-এর পরগণা-মানচিত্রে কিশোরগঞ্জ মহকুমা সহরের উত্তরে এক রেখায় দরজীবাজু নামে অনেকগুলি ছিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাল দেখা যায়।

১৫। হাজরাদি। পরিমাণ ফল ৩২২ বর্গমাইল। মহকুমা সহর কিশোরগঞ্জের ৬।৭ মাইল উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

১৬। জাফরসাহি। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে প্রায় সমগ্র জামালপুর মহকুমা লইয়া এই পরগণা গঠিত। তোড়লমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তে ইহা সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত।

১৭। বরদাখাত। ইহা ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত বিখ্যাত এবং বৃহৎ পরগণা। এই পরগণার কতক অংশ ময়মনসিংহ জেলার মধ্যেও পড়িয়াছে। কুড়িখাই ইহার অন্তর্গত বৃহৎ তপ্পা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সঙ্গম-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে এবং পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে বিস্তৃত। বিখ্যাত ভৈরববাজার ইহার অন্তর্গত। ভৈরববাজারের দক্ষিণেও বরদাখাত পরগণা ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ৩৬ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মোটামোটি ১২ মাইল প্রশস্ত। উত্তর-পূর্ব্বে ত্রিপুরার মহারাজার সম্পত্তি চাকলে রোশেনাবাদ, এবং তাহার উত্তরে আবার ত্রিপুরা জেলার অন্যতম বৃহৎ পরগণা সরাইল-সতর খণ্ডল, ত্রিপুরা জেলার শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

১৮। সোণার গাঁ

১৯। কাট্‌রাব

২০। মহেশ্বর দি

ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় শীতল লক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর অভ্যন্তরে সোণার গাঁ ও মহেশ্বর দি পরগণা অবস্থিত। কাটরাব সোনার-গাঁরই অন্তর্গত বৃহৎ তপ্পা। লক্ষ্যার পশ্চিম পারে বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জ সহরের উত্তরাংশ কাটরাব তপ্পার অন্তর্গত। লক্ষ্যার তীরে তীরে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত ও লক্ষ্যার অভ্যন্তরে নারায়ণগঞ্জ হইতে উত্তরেও এই তপ্পা ৮।১০ মাইল বিস্তৃত। সোণার গাঁর উত্তরে মহেশ্বর দি পরগণা। ইহার উত্তর সীমানা লাখপুর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত (যাহা অনেক Survey Map এ ভুলক্রমে লক্ষ্যার প্রাচীন খাত বলিয়া লিখিত হইয়াছে)। (১)

২১। পাটিকাড়া। প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। ত্রিপুরা জেলার প্রধান নগর কুমিল্লার ৫ মাইল পশ্চিমে যে ময়নামতী ও লালমাই পাহাড় নামে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১২ মাইল লম্বা অনুচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, তাহার পশ্চিমে স্থিত প্রায় ৮ মাইল প্রশস্ত নাতি-বৃহৎ পরগণা।

২২। গঙ্গামণ্ডল। নাতি-বৃহৎ পরগণা, পাটিকাড়ার অব্যবহিত উত্তরে এবং বরদাখাতের দক্ষিণাংশের পূর্ব্বে অবস্থিত।

এই বিশাল জমীদারী অর্জ্জন করিতে সময় লাগিয়াছিল

---

(১) ঢাকা জেলায় যখন জরিপ চলিতেছিল (১৯১৬ খৃঃ) তখন Settlement Officer শ্রীযুক্ত এস্‌লি সাহেবকে এই ভুল দেখাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু সম্ভবতঃ এই ভুল মুদ্রিত ম্যাপগুলি হইতে দূর করিতে হইলে বিস্তর ব্যয়বাহুল্য হইবে বলিয়া তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ময়মনসিংহের গেজেটিয়ার প্রণয়নকারী Mr. F. A. Sachse মহোদয়ও দেখিলাম এই ভুল লক্ষ্য করিয়াছেন—"The dried up bed between Aralia and Lakhpur (*Sic* Lakhipur) is wrongly called the Lakshya in the Revenue Maps. This river (i.e., Lakhya) branches off from the Brahmaputra at Lakhpur." Mymensing Gazetteer. 1917. P. 7.

এবং এই জমীদারীর সমস্তটাকে লক্ষ্য করিয়া আবুলফজল "ভাটি" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। পরগণা জোয়ানশাহি, খালিয়াজুড়ি সরাইল ও বরদাখাতকে লক্ষ্য করিয়া ঈশা খাঁকে ভাটির অধীশ্বর বলা হইয়া থাকিবে। ঢাকা জেলায় ভাটি বলিতে বরিশালকে বুঝায়। ময়মনসিংহে খালিয়াজুড়ি পরগণাকে ভাটি বলে।

৪। ঈশা খাঁর বংশ-পরিচয়

প্রকৃতি দেবী যাঁহাকে অনন্যসাধারণ গুণাবলি দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁহার প্রতি প্রসন্না হন, আমাদের দেশে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার জীবন-কালেই কত কাহিনী রচিত হইয়া যায়, তাঁহার মৃত্যুর পরে তো কথাই নাই। পূর্ব্ব-ভারতে আকবরের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রবলতম প্রতিবন্ধক, আমরণ স্বাধীনতা-সমরে লিপ্ত ঈশা খাঁ সম্বন্ধেও যে নানাবিধ গাল-গল্প দেশমধ্যে প্রচারিত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। গ্রাম্য কবিগণ গাথা রচনা করিয়া ঈশা খাঁর শৌর্য্য বীর্য্যের পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। সারাদিন মাঠের কাঠফাটা রোদে কাজ করিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরে কৃষকগণ সেই সকল গাথা সামান্য বাদ্যযন্ত্র-যোগে গান করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিত। এমনি একটি গাথার খবর 'প্রতিভা' পত্রিকার ১৩২৪, আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায় ২৫২—২৫৯ পৃষ্ঠায় "বীরাঙ্গনা স্বর্ণময়ী" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনও ময়মনসিংহ-গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় 'দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি' নামে এইরূপ একটি গাথা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সকল গাথার একটিও প্রাচীন নহে। জন-প্রবাদের ঈশা খাঁকে ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইতিহাসের ঈশা খাঁ ইহাদের মধ্যে নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যে ইতিহাস-চর্চ্চা মুসলমান সভ্যতার একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় অঙ্গ ছিল, বাঙ্গালা দেশে আসিয়া মুসলমান সভ্যতা যেন সেই অঙ্গ বর্জ্জন করিয়া বসিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে কত বড় বড় সুলতান উদ্ভূত হইয়া সমগ্র পূর্ব্ব-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়া গেলেন,—কিন্তু তাঁহাদের একখানিও সমসাময়িক ইতিহাস বঙ্গদেশে লিখিত হয় নাই। আকবর সাহের সহিত ঈশা খাঁ মসনদালির আজীবন বিরোধের ইতিহাসও আমাদিগকে জানিতে হয় আকবরের সভাসদ্ ও বন্ধু আবুল ফজলের আকবর-নামা পড়িয়া! বাঙ্গালার গ্রাম্য কবিগণ ঈশা খাঁ সম্বন্ধে গাথা লিখিয়াই তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, সমসাময়িক কোন বাঙ্গালী ঐতিহাসিক তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া অমর হইয়া যান নাই।

ঈশা খাঁর বংশ-পরিচয়ের প্রারম্ভেও সেই আকবর-নামাই আমাদের অবলম্বনীয়।

আবুল ফজল বলেন—(A. N. III. 647) "এই ভূঞার পিতার জন্ম রাজপুত জাতির 'বাইশ' শাখায়। এই ভাটি অঞ্চলে সর্ব্বদাই তিনি আস্পর্দ্ধা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করিতেন। ইসলাম খাঁর রাজত্বকালে তাজ খাঁ কররাণী ও দরিয়া খাঁ নামক দুই জন সেনাপতি তাঁহাকে দমন করিতে বহু সৈন্য লইয়া ঐ দেশে যান। অনেক যুদ্ধের পর ঈশা খাঁর পিতা পরাজিত হন এবং বশ্যতা স্বীকার করেন। কিছু দিন পরে আবার তিনি বিদ্রোহী হন। অবশেষে এক কৌশলে তিনি ধরা পড়েন এবং নিহত হন। ঈশা এবং ইসমাইল নামে তাঁহার দুই পুত্র দাসরূপে বিক্রীত হন। ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পরে যখন বাঙ্গালা দেশে তাজ খাঁর প্রভুত্ব, তখন ঈশা খাঁর খুড়া কুতবউদ্দিন ভাল কাজ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং অনেক খোঁজ করিয়া দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকেই তুরাণ দেশ হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। বিচার-বুদ্ধির পরিপক্কতায় এবং অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া কাজ করিবার ফলে ঈশা খাঁ খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং বাঙ্গালা দেশের বারভূঞার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন।"

এই বিবরণে ঈশা খাঁর পিতার নাম দেওয়া নাই। ঈশা খাঁর বংশধর জঙ্গলবাড়ী ও হয়বত নগরের জমীদার দেওয়ান সাহেবগণের মতে এবং লোকপরম্পরাগত স্মৃতি অনুসারে তাঁহার নাম ছিল কালিদাস গজদানী। (৩) ওয়াইজ

(৩) জন-প্রবাদ মতে, কালিদাসের রামদাস নামে এক ভ্রাতা ছিল। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের কোন কোন কায়স্থ পরিবার রামদাস গজদানীর বংশধর বলিয়া দাবী করেন। এইরূপ একজন রামদাস গজদানীর বংশধর প্রসিদ্ধ চিত্র-পুস্তক-প্রণেতা শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় আমাকে এই বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সাহেব যখন ঈশা খাঁর ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য দেওয়ান-পরিবারে খোঁজ খবর করেন, তখন তিনি জানিয়াছিলেন যে, কালিদাস গজদানী হুসেন শাহের এক কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তীকালে দেওয়ান সাহেবদের আদেশে বিরচিত 'মসনদালি ইতিহাসে' লিখিত আছে যে কালিদাস সুলতান জালাল শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ডাঃ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত পালা গানটিতে 'গিয়াসুদ্দিন' এবং "জালাল শাহে" গোল বাধিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। যদি তৎকালীন বঙ্গদেশের সুলতানের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া কালিদাসের মুসলমান হওয়ার কথাটার মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকে, তবে এই সুলতান কে হওয়া সম্ভব তাহা নিম্নলিখিত কাল-পর্য্যায় পর্য্যালোচনা করিলেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

১৪৯৩ খ্রীঃ—হুসেন শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫১৮ খ্রীঃ—তৎপুত্র নসরৎ শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫৩২ খ্রীঃ—তৎপুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫৩২ খ্রীঃ—হুসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫৩৭ খ্রীঃ—শের খাঁর গৌড় আক্রমণ।

১৫৩৮ খ্রীঃ—মামুদ শাহের পরাজয়, পলায়ন, হুমায়ুনের আশ্রয় গ্রহণ ও মৃত্যু।

১৫৪০ খ্রীঃ—শের শাহ ভারত সম্রাট।

১৫৪৫ খ্রীঃ—ইসলাম শাহ ভারত সম্রাট। বিহারে রাজপ্রতিনিধি সুলেমান কররাণী—বঙ্গে মুহম্মদ খাঁ শূর।

১৫৫২ খ্রীঃ—ইসলাম শাহের মৃত্যু। মহম্মদ আদিল শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫৫২ খ্রীঃ—বঙ্গে ইসলাম শাহের প্রতিনিধি মুহম্মদ খাঁ শূরের মুহম্মদ শাহ গাজী নামে স্বাধীনতা ঘোষণা, আদিলের সহিত যুদ্ধ, পরাজয় ও মৃত্যু। তাজ খাঁ কররাণীর আদিলের সভা হইতে পলায়ন।

১৫৫৪ খ্রীঃ— মুহম্মদ শাহ গাজীর পুত্র গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহের রাজ্য প্রাপ্তি। সুলেমান কররাণীর সহায়তায় আদিলের সহিত যুদ্ধ—আদিলের পরাজয় ও মৃত্যু।

"আমি আমার পিতা ও খুল্লতাত মহাশয়ের কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছি নিম্নে তাহাই লিখিতেছি।

"রামদাস গজদানী ও কালিদাস গজদানী দুই ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ রামদাস বাদশাহের বড় কার্য্যকারক (দেওয়ান) ছিলেন—দৈনিক পূজায় গজ দান করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তজ্জন্যই গজদানী উপাধিতে ভূষিত হন। কতক দিন পরে বাদশাহের বিরাগভাজন হইয়া [উভয়কে] দেশত্যাগী হইতে হয়। দুই ভ্রাতা সপরিবারে কিছুকাল বীরভূম জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে নিজ গুরুর সহ বাস করেন। হরিপুরেও নিশ্চিন্ত না হইতে পারিয়া গুরুকে সেখানে রাখিয়াই ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বর দি পরগণাস্থিত কেট্টাব গ্রামে আসিয়া বাসস্থান স্থির করেন। কিন্তু উহাতেও সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারেন নাই। জ্যেষ্ঠ রামদাস ও কনিষ্ঠ কালিদাস দুই ভ্রাতারই আকৃতি প্রকৃতি এক প্রকার ছিল এবং সুপুরুষ ছিলেন। সেই সময়ে অনুসন্ধানে রামদাস কোথায় আছেন জানিতে পারিয়া গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হয় এবং কালিদাসকে রামদাস মনে করিয়া ধরিয়া দিল্লী নিয়া যায়। তখনই রামদাস পুনঃ কেট্টাব পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহের নসরুজ্জিয়াল পরগণার খাগুরিয়া গ্রামে বাস নির্দ্দেশ করেন।......রামদাস হইতে আমি ১৬ পুরুষ। কথিত আছে রামদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালিদাস দিল্লীতেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কোন বাদশাহের মেয়ে বিবাহ করিয়া রহিয়া গেলেন। তাঁহারই পুত্র ঈশা খাঁ।......ঈশা খাঁ বাঙ্গালা জয় করিয়া কিশোরগঞ্জের নিকট জঙ্গলবাড়ী বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন।

"মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত যখন ময়মনসিংহে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন ঈশা খাঁ বংশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া ইতিহাস লিখিতে বলেন। তখনই রামদাস গজদানীর নাম উল্লেখ না করিয়াই [ইতিহাসে] শুধু কালী গজদানীর বংশধরদের নামই লিখা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আমাদের বংশ ও জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান-বংশ যে এক বংশ তাহা ঐ বংশের সকলেই অম্লানবদনে স্বীকার করিতেন এবং প্রাচীন লোকদের মধ্যে সকলেই জ্ঞাত ছিল।"

আকবরনামাতেও কালিদাস গজদানীর ভাটি অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া বিদ্রোহী হইবার কথা আছে। খালিয়াজুড়ী পরগণার সংলগ্ন পশ্চিমেই নসিরুজ্জিয়াল পরগণা।

কালিদাস মুসলমান হইয়া সুলেমান খাঁ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। আকবরনামা মতে ঈশা খাঁ ও ইসমাইলের উদ্ধারকারী তাহার কুতবুদ্দিন নামে আর এক ভ্রাতা ছিল। কালিদাসের রামদাস নামে ভাইএর কথা সত্য হইলে, দেখা যাইতেছে ইঁহারা তিন ভাই ছিলেন।

কায়স্থ পত্রিকায় ১৩২২ সনের আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস মহলানবীশ মহাশয় 'গজদানীবংশ' নামক একটি প্রবন্ধে কালিদাসকে কালাপাহাড়ের সহিত অভিন্ন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।—এই একত্ব একেবারেই অসম্ভব। এই প্রবন্ধ মতে কালিদাস জ্যেষ্ঠ, রামদাস কনিষ্ঠ। খাগুরিয়া গ্রাম এবং গজদানীবংশের গুরুবংশ পূর্ণানন্দবংশের অধিষ্ঠান খাগুরিয়ার সংলগ্ন কাইটাইল গ্রাম থানা কেন্দুয়া হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে।

১৫৬০ খ্রীঃ—বাহাদুরের ভ্রাতা গিয়াসুদ্দিন জালাল শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫৬৩ খ্রীঃ—জালাল শাহের মৃত্যু। সুলেমান কররাণীর বঙ্গ অধিকার।

১৫৬৩—১৫৬৪ খ্রীঃ—বঙ্গে তাজ খাঁর শাসন। তাজ খাঁর মৃত্যু। বঙ্গে ও বিহারে সুলেমান কররাণীর একাধিপত্য।

১৫৭২, অক্টোবর। সুলেমান কররাণীর মৃত্যু (A. N. III ; P. 6. F.n.)

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, শেষভাগ। মোগল নৌবহরের অধ্যক্ষ শাহবর্দ্দির সহিত ঈশা খাঁর সংঘর্ষ। শাহবর্দ্দির পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ।

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে ১৫৪৫—৫২ খ্রীষ্টাব্দ সাত বৎসর ইসলাম খাঁর রাজত্ব। এই সময়ের মধ্যেই কালিদাস গজদানী তুইবার বিদ্রোহী হন এবং শেষবারে ধৃত ও নিহত হন ও তাঁহার পুত্রদ্বয় দাসরূপে বিক্রীত হন। জালাল শাহের রাজত্ব ইহার অনেক পরের ঘটনা, কাজেই কালিদাস গজদানীর জালাল শাহের কন্যা বিবাহ করার কথা একেবারেই অলীক।

ইসলাম শাহের রাজত্বকালে কালিদাস বিদ্রোহী হন কেন? বার বার বিদ্রোহী হওয়াতে মনে হয় যেন এই নবোদিত শূর বংশের বিরুদ্ধে তাঁহার অদম্য ক্রোধ ছিল। হুসেন শাহের বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ শাহকে তাড়াইয়া শের সাহ বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন। ইহা ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। তাহার পর ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন। ইহার পরেই ইসলাম খাঁর রাজত্বে কালিদাস গজদানীর বিদ্রোহ। মাহমদ শাহের পূর্ণ নাম গিয়াসুদ্দিন মাহমদ শাহ। ইহাতে স্বতঃই মনে হয় যে গিয়াসুদ্দিন নামক বঙ্গের কোন সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করিয়া যদি কালিদাস গজদানী মসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার দেওয়ান পদে বৃত হইয়া থাকেন, তবে তাহা এই গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ।

সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর নসরত্ শাহ বাঙ্গালার সুলতান হন। মুদ্রার প্রমাণে জানা যায় যে, তিনি ১৫১৮ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ফিরোজ শাহ কয়েক মাস রাজত্ব করেন। তাহার পরেই মাহমুদ শাহের রাজত্ব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে নসরত শাহের রাজত্ব শেষ হইবার পূর্ব্বেই মাহমদ শাহের মুদ্রা দেখা দিয়াছে। একটি তুইটি নহে, এই রকম বহু সংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই হুসেনী যুগের শেষ অধ্যায় এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। মুদ্রার প্রমাণে এই মনে হয় যে নসরত শাহের রাজত্বের শেষ দিকে রাজ্য তুই ভাগ হইয়া গিয়াছিল এবং মাহমুদ শাহ পূর্ব্বাংশের অধিপতি হইয়াছিলেন। মাহমুদ শাহের পতনের পরে, যিনি পতন ঘটাইয়াছিলেন সেই শের শাহের বিরুদ্ধে বাঙ্গালা দেশে অন্ততঃ তুইবার বিদ্রোহের আভাস আমরা পাই। শের শাহ খিজির খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পশ্চিম ভারত বিজয়ে অগ্রসর হন। এই খিজির খাঁ মাহমদ শাহের এক কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কিরূপে খিজির খাঁ বিদ্রোহোন্মুখ হইলে শের শাহ গাক্কার বিজয় অসমাপ্ত রাখিয়া দ্রুত বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া খিজির খাঁকে দমন করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে বারভূঞার আমলের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের আলোচনায় দেখিয়াছি। ইহা ৯৪৮ হিজরি—১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। ইহার অব্যবহিত পরেই, কালিদাস গজদানী যে অঞ্চলে পরবর্ত্তী কালে হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই পূর্ব্ব ময়মনসিংহ—শ্রীহট্ট অঞ্চলেই যে বিদ্রোহীগণ দলবদ্ধ হইয়া পলায়িত হুমায়ুনের এক ছেলের নামে মুদ্রা পর্য্যন্ত মুদ্রিত করিয়াছিল, এই ব্যাপারটি এই পর্য্যন্ত কেহই লক্ষ্য করেন নাই। এই বিদ্রোহের তুইটি সাক্ষ্য বর্ত্তমান আছে—তুইটি মুদ্রা। একটি পাওয়া যায় এই আমলের বহু মুদ্রার সহিত ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার যশোদল গ্রামে—উহাই ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম মুদ্রাপেটিকার বিবরণীর ২য় খণ্ডে ১৮২ পৃষ্ঠায় ২৩৯নং রূপে বর্ণিত হইয়াছে (J. A. S. B. 1910. P. 150)। আর একটি পাওয়া যায় শ্রীহট্ট জেলার সোণাখিরা গ্রামে। এই মুদ্রাটি শিলং মুদ্রাপেটিকার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬০ পৃষ্ঠায় ২৪নং রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই মুদ্রায় মুদ্রিত রাজার নাম—"বরবক্-উদ্দুনিয়া-উদ্দিন আবুল মুজঃফর বরবক্ শাহ্ বিন্ হুমায়ুন সাহ খালিত্তুল্লাহ্ মুলক্হ্ ও সুলতানত্"। ইহার তারিখ স্পষ্ট ৯৪৯ হিজরি। যশোদলে প্রাপ্ত মুদ্রাটির তারিখের অঙ্কের ৯৪—বেশ স্পষ্ট, কিন্তু শেষের অঙ্কটি কাটিয়া গিয়াছে। মুদ্রা তুইটি তুলনা

করিয়া একই ছাঁচের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয় না। ৯৪৯ হিজরীতে শের শাহের পূর্ণপ্রতাপ রাজত্ব—তথাপি ময়মনসিংহ শ্রীহট্টে এই রকম মুদ্রার প্রচার দেখিয়া মনে হয়, শের শাহের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দলের এই স্থানে একটা আড্ডা ছিল। শের শাহের মৃত্যুর পরে ঠিক এই অঞ্চলেই কালিদাস গজদানীর বিদ্রোহ দেখিয়া মনে হয়, উহাও একই কারণ সম্ভূত এবং একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মাহমুদ শাহের এক কন্যা বিবাহ করিয়া খিজির খাঁ শের শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জোগাড় করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কালিদাস আর এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া শের পুত্র ইসলাম খাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।

১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম শাহ ভারত সম্রাট হন। তিনি সুলেমান কররাণীকে বিহারের শাসনকর্ত্তা এবং মুহম্মদ খাঁ শূরকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা করেন। এই সময় কালিদাস গজদানীর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১৫৪৬ অথবা ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবতঃ কালিদাস গজদানীর পতন হয়, এবং ঈশা খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা ইসমাইল দাসরূপে বিক্রীত হন। তখন ইহাদের বয়স ১০।১২ বছর হইবার কথা। (৪) ১৫৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে তাজ খাঁ কররাণীর শাসন। এই সময় ঈশা খাঁর খুড়া অনেক খুঁজিয়া দুই ভাইকে তুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। এই সময় ঈশা খাঁর বয়স মোটামোটি ২৭।২৮ বৎসর। পৈত্রিক জমিদারীর আশ্রয়ে ঈশা খাঁ স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমশঃ এতটাই ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন যে, ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯।৪০ বছর বয়সে তিনি বঙ্গীয় ভৌমিকগণের এক ভৌমিক রূপে পরিগণিত হইয়াছেন এবং বাদশাহী নাওয়ারা আক্রমণ করিবারও সাহস রাখেন।

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার প্রকাশিত ময়মনসিংহ-গীতিকার ভূমিকায় ঈশা খাঁর এই যুগের ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান সম্বন্ধে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ঐতিহাসিকগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই উপাদান পদ্যে রচিত ত্রিপুরার ইতিহাস "রাজমালা।" এই রাজমালা এবং অন্যান্য উপাদান অবলম্বনে এই সময়কার ত্রিপুরারাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে।

(৪) এই হিসাবে ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন বছর, অর্থাৎ গিয়াসুদ্দিন মামুদশাহের রাজত্বের শেষ ভাগে ঈশা খাঁর জন্ম হইয়াছিল। কালিদাস গজদানী গিয়াসুদ্দিনের কন্যা বিবাহ করিয়া থাকিলে ঈশা খাঁর জন্ম ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন বৎসরই হইয়াছিল,—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সখা

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কত প্রিয় আশা, কত ভালবাসা,
রেখেছি হে সখা! গোপনে,
জানি, পাব হে তোমায়, নিভৃত হিয়ায়,
কোন একদিন জীবনে।
মনেরি আঁধার হয় গাঢ়তম,
কোথা তব আলো ওহে প্রিয়তম
অমলিন জ্যোতি স্নিগ্ধ মনোরম,
খেলিবে না কি হে পরাণে।
জানি আমি সখা তুমি সর্ব্বাধার
আত্মায় স্বজন যা কিছু আমার,
(তাই) ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি উপহার,
আমি, ঢেলে দেছি তব চরণে।
জীবন-বিপিনে দুরাকাঙ্ক্ষা ফণী
সদা বিষময় করেছি পরাণি
তবু, আমি সখা তোমারে ভুলিনি,
রেখেছি আসন হৃদয় কোণে।
হৃদয়ে যখন অশান্তি ঝটিকা
পরাণে যখন গাঢ় প্রহেলিকা,
সংসার অর্ণবে দেখি বিভীষিকা,
তুমি, প্রিয়তম! ভুলো না,
সে দিনে!

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২১)

একটা কথাই আছে, আর মানুষ আপনার মন দিয়াও বুঝিতে পারে—আজন্মকাল একত্র থাকিয়াও যে প্রীতি অন্তরে জাগিয়া উঠে না, হয় তো দু'দণ্ডের আলাপেই সেই প্রীতি জাগিয়া যায়। এই জন্যই ইভা দু'দণ্ডের আলাপে সীতাকে গভীরভাবে ভালবাসিয়া ফেলিল, এবং ভালবাসিয়া হৃদয়ে বড় তৃপ্তি পাইল। সে মনে করিয়া দেখিল, তাহার এই ক্ষণিকের সাথীটীকে সে যতটা ভালবাসিতে পারিয়াছে, এতটা ভালবাসিতে অন্য কোন মেয়েকে পারে নাই।

আসল কথা সীতার মধ্যে এমন একটা সরল ভাব ছিল, যাহাতে তাহাকে ভাল না বাসিয়া কেহই থাকিতে পারিত না; তাহার আকর্ষণে সকলকেই জড়াইয়া পড়িতে হইত। সে সরলা বলিয়া যে জ্ঞানহীনা, আত্মমর্য্যাদাবোধহীনা তাহা নয়; নিজের মর্য্যাদা অটুট রাখিয়া সে ছোট বড় সকলের সহিতই মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারিত। বাড়ীর দাসী চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং রুক্ষস্বভাব বিহারীলাল পর্য্যন্ত তাহার কথার অবাধ্য হইতে পারিতেন না। সীতার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এ সংসারের অতি ক্ষুদ্র প্রাণীটি পর্য্যন্ত তাহার সদা-সতর্ক চোখের সম্মুখ দিয়া এড়াইয়া যাইতে পারিত না।

বাড়ীর দাসদাসীরা তাহাকে কর্ত্তার চেয়েও বেশী সম্মান করিত, বেশী ভালবাসিত। কর্ত্তার সহিত তাহাদের শুধু বেতনের সম্পর্ক। সীতার সহিত অন্তরের সম্পর্ক। কাহারও অসুখ বিসুখ হইলে সীতা ব্যতীত দেখিতে কেহ নাই। সে নিজের হাতে পথ্য করিবে, খাওয়াইবে, ঔষধ নিয়মিত ভাবে দিবে, কথার অবাধ্য হইলে তিরস্কার করিবে, আবার মায়ের মত সস্নেহে চোখের জল মুছাইয়া দিবে। মেয়েটী সামান্য কয়টি মাসের মধ্যে সকলের অন্তর স্নেহ ভালবাসা দিয়া জয় করিয়া লইয়াছিল। যতদিন সে বিবাহের পাত্রীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া এখানে ছিল, ততদিন বিহারীলাল তাহাকে স্বাধীনতা দেন নাই, কারণ সে তাঁহার বংশের বধূ হইবে। জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া গেলে, তিনি সীতাকে আর আবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, যাহা জমিদার বাড়ীর মেয়েদের পক্ষে একেবারেই স্বপ্ন সমান ছিল। চিরঘৃণিত মেয়েদের স্বাধীনতার পক্ষপাতী বিহারীলাল কেন যে হইয়াছিলেন, তাহা আর কেহ জানিতে পারে নাই। ইদানীং তাঁহার জমিদারি সংক্রান্ত কাগজপত্র নিজে না দেখিয়া তিনি সব সীতাকে দেখাইতেন। সীতাকে তিনি বুঝাইতেন—"কবে আছি, কবে নেই, কে বলতে পারে দিদি, একটু আধটু জেনে রাখো, কাযে লাগবে। এর পরে যাকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করে রেখে যাব, তাকে সব বুঝিয়ে দিতে হবে তো।"

সে দিনে সকালে স্নানান্তে পূজার যোগাড় করিয়া আসিয়া সীতা বিধবাদের রন্ধনের যোগাড় করিতেছিল। ঈশানী রন্ধন করিতে বসিয়াছিলেন। দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তিনি রন্ধন ছাড়িতে পারেন না, রন্ধন তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। আজ সীতা প্রথমে তাঁহাকে কিছুতেই রন্ধন করিতে দিবে না বলিয়া পিসী মা কমলাকে রন্ধনার্থে ডাকিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু ঈশানী তাঁহাকে কিছুতেই অগ্রসর হইতে দিলেন না। সীতার দিকে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তুই কি আমায় কোন কাজ করতে না দিয়ে মেরে ফেলতে চাস সীতা,—আমার বেঁচে থাকা যে তোর ইচ্ছে নয় তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। যদি আমার কায আমায় না করতে দিস, তবে আমি নিশ্চয় বলছি কখনও তোর একটী কথা আমি শুনব না।"

সীতা অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, আর বাধা দিতে পারিল না। মহানন্দে ঈশানী রাঁধিতে বসিলেন।

বাড়ীর দাসী বৃদ্ধা রামহরির মা আজ কয়দিন জ্বর হইয়া পড়িয়া আছে। সকালে সীতার আদেশে গৌরীদাসীকে

তাহার কাছে থাকিতে হইয়াছিল। সে বিকৃতমুখে আসিয়া সংবাদ দিল, রামহরির মা বিছানায় বমন করিয়া ফেলিয়াছে। গৌরী দিদিমণির আদেশে তাহার কাছে বসিয়া থাকিলেও বমন পরিষ্কার করিতে সে কখনই পারিবে না।

সীতা ব্যস্তভাবে উঠিয়া গেল।

ইভা খানিকবাদে তাহাকে খুঁজিতে নীচে একটা ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিস্মিত চোখে দেখিল, সে দুই হাতে বৃদ্ধা দাসীর বমন পরিষ্কার করিতেছে। অপ্রস্তুত গৌরী দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতেছে "আপনি সরে যান দিদিমণি, আমিই না হয় এ কায করছি। আপনি নিজের হাতে যে করবেন তা তো আমি জানি নে; তাই তো বলেছি পারব না। আপনি সরুন আমি করি।"

সীতা প্রসন্ন মুখে বলিল, "এতে তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন গৌরী? অবশ্য পরিষ্কার করতে সকলেরই একটু ঘৃণা হয়, আমার হয় না কাযেই আমি করতে পারি। তুমি কিছু মনে করো না, এই ত হয়ে গেল, এ আর কতক্ষণের কায।"

ক্ষিপ্রহস্তে সব পরিষ্কার করিয়া গৌরীকে বৃদ্ধা দাসীর পরিচর্য্যায় বসাইয়া দিয়া সে বলিল, "তুমি এখানেই থেকো, ওদিকে যা কায পড়বে, আমি বিন্দি, ক্ষমা এদের দিয়ে করিয়ে নেব এখন। বুড়ো মানুষ—বড্ড জ্বর এসেছে, যদি তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়—চেঁচাতে পারবে না। তুমি এখানে থাক, যখন যা দরকার হবে তা দিয়ো।"

বাহিরে আসিতেই সে ইভাকে দেখিতে পাইল,—ইভা বিস্ময়ে তাহার পানে তাকাইয়া ছিল।

সীতা একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি এখানে কি করতে এসেছ ইভা? নীচেটা বড় সেঁতসেঁতে, এ সব যায়গায়—"

বাধা দিয়া ইভা বলিল, "আমার আসা উচিত নয়—কেমন? কিন্তু তুমি তো এসেছ দিদি।"

সীতা তেমনি হাসিভরা মুখে বলিল, "আমার সঙ্গে তোমার কথা স্বতন্ত্র বোন। আমি হচ্ছি দুনিয়ার বাইরের জীব, সংসারে বাস করেও আমি সংসারের কেউ নই; এখানকার কারও সঙ্গে আমার কখনও মিশ খায় নি, খাবেও না।"

ইভা একটু রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল, "মিশ যে খায় নি তা দেখতেই পাচ্ছি। এখানে এসে পর্য্যন্ত তোমার কায দেখে বুঝতে পারছি, তুমি কেমন দুনিয়াছাড়া মানুষ। সংসারে তুমি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছ, অথচ জোর করে বলতে চাও তুমি সংসারের কেউ নও।"

অন্যমনস্ক ভাবে সীতা বলিল, "তাই বটে, কিন্তু এ যে খাপছাড়া মেশা তা তো জানো না বোন। নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেমন করে মিশে যেতে এগিয়েছিলুম, প্রাণটা যেমন ভাবে ঢেলে দিতে চেয়েছিলুম—তা পেরেছি কি?"

জোর করিয়া ইভা বলিল, "খুব পেরেছ। এই তোমার নিঃস্বার্থ কায দিদি; ভগবান তোমায় দিয়ে অনেক কায করিয়ে নেবেন বলে, তোমায় কোন বাঁধনে বাঁধেন নি; একের মধ্যে তোমায় আটক করে রাখেন নি,—তোমায় সকলের মাঝে জড়িয়ে দিয়েছেন। তোমার ইচ্ছাশক্তি বাতাসের মত লঘু, স্বাধীন; তোমার দেহ তারই মত স্বাধীনতা পেয়েছে; কাজেই তোমার গতি অবাধ, তোমার কায অতি সুন্দর, সব তাইতেই তুমি সার্থকতা লাভ কর।"

"সেটা বুঝি বড় ভাল ভেবেছিস ইভু—"

হঠাৎ জয়ন্তীর কথা শুনিয়া উভয়েই চমকাইয়া পিছন ফিরিল। খিড়কীর পুকুরে স্নান করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জয়ন্তী ফিরিতেছিলেন। বরাবর বাথরুমের মধ্যে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা তাঁহার অভ্যাস, শীতকালে জলটা একটু বেশী রকম উষ্ণ হইলেই ভাল হয়। সীতা ইভার নিকট তাঁহার সম্বন্ধে যাবতীয় কথা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া লইয়া সকাল বেলা আগে গরমজল করিয়া দিয়াছিল। জনৈক দাসী গরমজলের বালতী ও কাপড় নির্জ্জন ঘাটে লইয়া গিয়াছিল; বাধ্য হইয়া বাথরুম অভাবে ঘাটেই জয়ন্তীকে স্নান সারিয়া লইতে হইয়াছে।

স্নান করিতে যাইবার সময় তিনি একবার উঁকি দিয়া সীতাকে দাসীর বমন পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছিলেন। ঘৃণায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এমন ভাবে লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তখন দাঁড়াইয়া আর একটী কথাও বলিতে পারেন নাই। এখন ফিরিবার সময় সীতা ও ইভাকে এই ধরণের কথা বলিতে শুনিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, উত্তেজনায় কাঁপুনিটাও একটু নরম পড়িয়া গেল; তিনি একটু তীব্র সুরেই বলিলেন, স্বাধীন থাকা বুঝি বড় ভাল; দেশের অশিক্ষিতা মেয়েগুলো সবাই যদি স্বাধীন থাকতে চায়, তাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করবে কে? শিক্ষিতা মেয়েরা

বিয়ে না করলেও তাদের চলে, কেন না নিজেদের জীবিকার জন্যে তাদের কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয় না। আমি বলি সীতার শীগ্‌গিরই বিয়ে করা উচিত ; কেন না, এর পরে ওকে পরের গলগ্রহ হয়ে জীবন কাটাতে হবে। বাবা যে আর বেশী দিন বাঁচবেন তা নয়, এর পরে যে বিষয় সম্পত্তির মালিক হবে, সে যদি এরকমভাবে ওকে না রাখতে চায়, তখন ওর উপায় কি হবে আমি তাই কেবল ভাবি। বয়েস বেশী হয়ে গেলে মাথার ওপর কেউ না থাকলে এর পর কি আর কেউ বিয়ে করতে চাইবে ?”

ইভা আর সহ্য করিতে পারিল না। এ পর্য্যন্ত মায়ের অনেক কথাই সে সহ্য করিয়া আসিয়াছে, আর কত সহ্য করিতে পারা যায় ? সে বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল, মা আদৌ সীতাকে সুচোখে দেখিতে পারেন না, বাড়ীতে সীতার এই একাধিপত্য, তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। সীতার প্রতি বিহারীলালের অগাধ স্নেহ, অনন্ত বিশ্বাস তাঁহার মনে একটা তীব্র জ্বালার দহন দিয়াছিল। বৃদ্ধ হয় তো সকলকে সব হইতে বঞ্চিত করিয়া সীতাকেই সব দিয়া যাইবেন, এমনি একটা আশঙ্কা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। সেই জন্যই তাঁহার বাক্যে, চলা ফিরায় প্রত্যেক কার্য্যে সীতার প্রতি দারুণ অবজ্ঞা, নিদারুণ বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রথমটায় সীতার অনিন্দ্য রূপ চোখে পড়িতে, তিনি কেমন যেন থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—এই মেয়েটী এতখানি সৌন্দর্য্য লইয়াও যে অভাগ্যবতী, ইহাই ভাবিয়া তাঁহার অন্তরটা একটু কোমল হইয়া আসিতেছিল। যেইমাত্র দেখিলেন, সে সংসারের কতখানি জুড়িয়া লইয়া বসিয়াছে, সে সকলের কতখানি আদরের পাত্রী, সে সকলের —এমন কি রূঢ়প্রকৃতি বিহারীলালের উপরেও তাহার আদেশ বিস্তার করে, তখনই তাঁহার মন হইতে করুণাটুকু কর্পূরের ন্যায় উপিয়া গেল। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন যে, এই আদর পাইবার যথার্থ অধিকারিণী তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিতা করিয়া সীতা সবটা আত্মসাৎ করিয়াছে। কাল রাত্রে কন্যার পার্শ্বে শুইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত সরোষে এই—“উড়ে এসেছে চিল—জুড়ে বসেছে বিল” এর সম্বন্ধে অনেক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংসারের ছোট বড় যাহার উপর যত বিদ্বেষ ছিল, সব নিমেষে এক হইয়া এই নিরপরাধিনী বালিকার উপর পড়িয়াছে।

ইভা সীতার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, “কি কথা হচ্ছিল আর তুমি কি কথা বলতে এলে মা ? তোমার ওই যে কি দস্তুর হয়েছে—মাঝখান হতে কিছু না জেনে না শুনে ফস করে এমন এক একটা কথা বল, যা লোকের বুকে বাজের মত পড়ে। তোমায় আমরা কেউ তো কথা বলতে ডাকিনি যে তুমি—”

বাধা দিয়া মিষ্টকণ্ঠে সীতা বলিল, “ছি ইভা, মাকে ও রকম কড়া করে কথা বলতে নেই। মা আছেন বলে, মা যে কি জিনিস তা বুঝতে পারছ না ইভা, আমার মা নেই বলেই, মায়ের স্নেহ আদর যে কি জিনিস, তা আমি বুঝতে পেরেছি। ভগবান আমায় একটী মা এনে দিয়েছেন, আমার ব্যর্থ জীবনখানা সফলতায় ভরে দিয়েছেন। মাকে ব্যথা দিয়ো না, শিক্ষার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার কোরো। কাকি-মা যা বলেছেন, সে খাঁটি কথা জেনো। আমাদের মত অশিক্ষিতা মেয়েরা বিয়ে না করে যে স্বাধীনভাবে থাকতে চাইচে, আমাদের খাওয়া পরা যোগাবে কে ? অশিক্ষিতা মেয়েদের কোন পথ নেই, সব দরজা তাদের বন্ধ। মাথার উপরে অভিভাবক থাকা চাই, তাই সকল মেয়েকেই বিয়ে করতে হয়, নইলে পেট চলবে না তো। আজকালকার দিনে কেউ অক্ষম মা বাপ, ভাই বোন এদেরই পুসতে চায় না, আমার ভার নেবে কে—কাযেই কাকি-মা ঠিকই বলছেন।”

অত্যন্ত প্রীতা হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, “দেখ তো ; যদিও সীতা তোর মত উচ্চ শিক্ষা পায় নি, তবু ওর যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নেই। এই তো তোর শিক্ষা হচ্ছে। দিদি বলছিলেন, তুমি না কি বিয়ে করতে চাও না,—এও কি একটা কথা হতে পারে ? মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছ, নিজের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করবার মত উপযুক্ত শিক্ষা যখন পাও নি, তখন বিয়ে করব না বললেই তো চলবে না। এখানে যদি নাই টিকতে পার,—পরের ঘরে বামণী হয়ে থাকতে হবে, কি মন যুগিয়ে দাসীবৃত্তি করতে হবে। কেন না, তার বেশী যোগ্যতা অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা মেয়ের থাকতে পারে না। সত্যি কথা বলছি, এতে রাগ করো না যেন মা।”

সীতার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "না মা, রাগ করব কেন; আপনি ঠিক কথাই বলছেন, ভবিষ্যৎটা আমায় স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন।"

জয়ন্তী কন্যার মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ইভু যথেষ্ট লেখাপড়া শিখলেও বুদ্ধিটা ওর ভারি কম, তাইতেই ভয় হয়—কি জানি—কখন কি হবে, কি করে বসবে।"

ইভা দন্তে অধর চাপিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, মায়ের কথার উপর আর কথা কহিবে না বলিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; এইবার মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কলকাতায় কবে ফিরবে মা?"

জয়ন্তী যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন,—"সে কি, তুই এসেই যে "যাই যাই" রব তুললি?"

ইভা বলিল, "তুমি কাল ফিরবে বলেছ না?"

একটু হাসিয়া কন্যার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মা বলিলেন, "বলেছি বলে কি কালই যেতে হবে পাগলী? এসেছি যখন—দুদিন থেকে যাই, কি বল সীতা?"

অসহিষ্ণুভাবে ইভা বলিল, "শম্ভুদাকে কেন আটক করে রাখছ অনর্থক? যেতে যদি হয়—চল, না হয় শম্ভুদাকে বলে দেই, সে চলে যাক।"

রাগ করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তাই বল গিয়ে, সে আজই চলে যাক। বাপ রে, মেয়ে আসার জন্যে তখন এক পা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন যাওয়ার জন্যে আবার তেমনি ব্যস্ত। আমায় কি তোর হুকুমে চালাতে চাস ইভা? আমায় কেউ আনতে যায়নি, নিজের ইচ্ছেয় এসেছি, আবার নিজের ইচ্ছেয় যখন হয় চলেও যাব। আমায় সেখানে রেখে আসবার একটা লোকও কি এই এতবড় জমিদার-বাড়ীটায় পাব না? তোর এ যায়গা ভাল না লাগে, শম্ভুর সঙ্গে তুইও চলে যা, আমি এখন যাব না।"

ইভা মুখ ভার করিয়া গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সীতার শুষ্কমুখে হাসি আসিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "কেন ইভা, কলকাতায় যাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছো, এ যায়গা কি তোমার ভাল লাগছে না? এই তোমার নিজের বাড়ী, নিজের ঘর, এই তোমার সব আপনার জন। আমরা যে ভাই, পর বই তো নই। তুমি এতদিন এসনি, তোমার দায়িত্ব আমি নিয়েছি, তোমার কায আমি করেছি; এখন তোমার কায তুমি নাও, আমায় মুক্তি দাও।"

জয়ন্তী হৃষ্ট গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বল তো মা, বোকা মেয়েটাকে সেই কথাটাই বুঝিয়ে বল তো। আমার একটা কথা শোনে না, উল্টে ধমক দিয়ে ভয় দেখায়। তোমাদের কথায় যদি ওর জ্ঞানটা ফেরে তা হলে আমি যে বাঁচি।"

মনের আগুন নেভার সঙ্গে সঙ্গে শীতটাও আবার জাঁকিয়া ধরিল,—কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি উপরে চলিয়া গেলেন।

সীতা তাঁহার গতির দিকে তাকাইয়া ছিল, চোখ ফিরাইয়া যখন ইভার পানে চাহিল, তখন দেখিতে পাইল তাহার দুটী চোখ অকস্মাৎ সজল হইয়া উঠিয়াছে।

ইভার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সান্ত্বনার সুরে সীতা বলিল, "মায়ের কথায় রাগ হয়েছে, দুঃখ হয়েছে ভাই; ছিঃ রাগ করতে নেই। মা যা বলেন তা ভালর জন্যেই; মা কখনও সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, তা তো জানো?"

ইভার আরক্তিম ঠোঁট দুখানা একবার কাঁপিয়া উঠিল; কি বলিতে গিয়া সে সামলাইয়া গেল, রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলিল, "এখনও কিছু জানতে পার নি দিদি। ভগবান সব জানাবার জন্যেই যখন আমাদের এনেছেন তখন সবাই জানতে পারবে।"

সীতার হাত হইতে হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া সে আর একটীও কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। সীতা তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপর হইতে ঈশানীর ক্ষীণকণ্ঠের আহ্বান ভাসিয়া আসিল, "সীতা!"

মনে পড়িল তাহাকে মসলা পিষিয়া দিতে হইবে। ঈশানীর ডাল ভাত বোধ হয় হইয়া আসিল।

তাড়াতাড়ি করিয়া ঘাটে গিয়া একবার প্রাতঃস্নান করা সত্ত্বেও আবার গোটা দুই ডুব দিয়া উপরে চলিয়া গেল। তাহাকে আবার স্নান করিয়া আসিতে দেখিয়া ঈশানী রাগ করিলেন, বলিলেন, "এই শীতে আবার স্নান করে এলে সীতা, কাপড় ছেড়ে ফেললে হতো না? দুবার স্নান সহ্য হবে?"

সীতা একটু হাসিয়া বলিল, "কি করব মা? ঘরে বিধবা আছেন, ঠাকুর আছেন, ঝির বমি মুক্ত করেছি, স্নান না করে কিছু ছোঁব কি করে? আপনি কিছু না বললেও আমার সংস্কার যে মনের মধ্যে কাঁটার মতন বিঁধ্‌বে মা?"

মুখখানা অত্যন্ত ভার করিয়া ডালে ফোড়ন দিতে দিতে ঈশানী বলিলেন, "তোমাদের যা বারণ করব, তোমরা তাই করে বসবে। আজ বাবাকে বলে দেব, তুমি এমনি অত্যাচার করতে স্বরু করেছ, যাতে একটা ব্যারাম না ঘটিয়ে ছাড়বে না।"

সীতা আবার হাসিল, "দাদু কিছু বলতে পারবেন না মা! আপনার শাসনে যা ফল হবে, দাদুর শাসনে সে ফল হবে না।"

ঈশানী হাসিয়া বলিলেন, "আমার শাসনে তোমায় কষ্ট সইতে হবে বড় কম নয়—তা জেনে রেখো।"

সীতা নিঃশব্দে হাসিয়া মসলা পিষিতে বসিল।

জয়ন্তী কাছেই বসিয়া তরকারী কুটিয়া দিতেছিলেন, এই স্নেহপূর্ণ কথাবার্ত্তাগুলা তাঁহার যে একটুও ভাল লাগে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার মুখে বিরক্তির চিহ্নগুলা সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছিল, একটা কাযের অছিলা করিয়া তিনি সেখান হইতে সরিয়া গেলেন।

(২২)

দিন যেমন আসিতেছিল, তেমনিই কাটিয়া যাইতেছিল। বাড়ীতে আরও যে দুইটী নিতান্ত আপনার জন আসিয়াছে, এ খবরটা বিহারীলালের কাছে যেন অজ্ঞাত রহিয়া গেল। তিনি নিত্য যেমন সময় মত খানিকক্ষণের জন্য অন্দরে আসিতেন, তেমনিই আসিতেছিলেন, তাঁহার সেবার ভার আগে সীতার হাতে যেমন ছিল, তেমনই রহিয়া গেল।

ইভা সীতার সহিত তাঁহার আহারের সময় এক এক দিন আসিত, বৃদ্ধ তাহার পানে একদিনও চোখ তুলিয়া চাহেন নাই। জয়ন্তী একদিন অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ঈশানীর পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন, বৃদ্ধ নিমেষের দৃষ্টিপাতে মুখখানা দারুণ ঘৃণায় বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, একবার একটা কথাও বলেন নাই। তাঁহার যা কিছু কথাবার্ত্তা সবই চলিয়াছিল সীতার সহিত—আর সে সবই জমীদারী সম্পর্কীয়।

তিনি সেদিন জয়ন্তীর সম্মুখেই সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংসার খরচের আর টাকা কি হাতে আছে দিদি, না সব ফুরিয়েছে?"

সীতা বলিল, "আর নেই দাদু, গোটা দশেক টাকা মাত্র পড়ে রয়েছে।"

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে কথাটা আমাকে জানাতে পারিস্ নি ভাই? আজ সুনীলকে বলে দেব, সে তোর হাতে টাকা দিয়ে যাবে এখন।"

সীতার হাতে সংসারের সমস্ত খরচপত্রের ভার, জয়ন্তীর বুকে অসহ্য জ্বালা ধরাইয়া দিতেছিল। বিহারীলাল আহার সমাপ্তে নিজের শয়নগৃহে যখন চলিয়া গেলেন, সীতাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। তখন ঈশানী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে এই মেয়েটীকে পেয়েছিলেন ছোট বউ, তাই ওই বুড়ো এখনও বেঁচে আছেন। নইলে কি যে হতো তাই ভাবছি।"

মুখখানা অত্যন্ত কালো করিয়াই জয়ন্তী বলিলেন, "পরের মেয়েকে এ ভাবে রাখা আমি কোনমতেই ভাল বলতে পারি নে ভাই দিদি! ওর কি এ জগতে কেউ নেই?"

আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈশানী বলিলেন, "আছে, মাসীমা মাসতুতো ভাই সবই। তারা নিয়ে যেতেও চায়; কিন্তু ও যেতে চায় না, আমরাও ছাড়তে চাই নে। মাসীমার এক দেওর-পো আছে, ছেলেটী বেশ শিক্ষিত। তার সঙ্গে সীতার বিয়ে দেওয়ার কথা তারা বলেছে। কিন্তু তা কি আর হতে পারে ভাই? সেদিন মা আমার কেঁদে আমার দুটি পা জড়িয়ে ধরে বললে—"মা, আমার বিয়ে হয়ে গেছে, আপনারা আর আমার বিয়ে দেবার কথা মুখেও আনবেন না, আমি বিবাহিতা তাই মনে করুন। কথাটা শুনে—সত্যি ভাই ছোটবউ, আমিও আর চোখের জল সামলাতে পারলুম না। যে ওকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে চলে গেছে, সেই হতভাগা ছেলেকে অভিশাপ না দিয়ে থাকতে পারলুম না। সে কি সুখী হবে ছোট বউ? আমার আর বাবার শেষ জীবনটাই না হয় কষ্ট দিলে, আর এই যে মেয়েটী, এই তরুণ বয়সে সব সুখ আহ্লাদ সব হারিয়ে—"

বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখ ছাপাইয়া দুইটী ফোঁটা জল হঠাৎ উপছাইয়া পড়িয়া গেল।

জয়ন্তী খানিকটা আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন, একটু

পরে শুধু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু দিদি, জ্যোতির যে বউ হয়েছে তাকে যদি একবার দেখতে—তা হলে বলতে বটে, হ্যাঁ, জ্যোতি পছন্দ করে বিয়ে করেছে বটে।"

ঘৃণাপূর্ণকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "থাক ভাই ছোটবউ, আমায় যেন আর না দেখতে হয়, ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করি। শিক্ষা বলতে তোমরা যা বোঝ ভাই ছোট বউ, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তা বুঝি নে। যে শিক্ষা সংসারের কোন দরকারে লাগে না, যে শিক্ষায় মানুষকে কর্ম্মিষ্ঠ করে তুলতে পারে না,—অকর্ম্মণ্য করে শুধু দামী আসবাবের মত সযত্নে তুলে রেখে দেয়, সে শিক্ষাকে কি যথার্থ শিক্ষা বলি? রাগ করো না ভাই ছোটবউ, দু'পাতা ইংরাজী পড়লে তোমরা মনে কর সব হ'ল, আমরা তা মনে করি নে। আমরা বলি সিন্দুরশূন্য সিঁথের চেয়ে সিঁন্দুরভরা সিঁথে দেখতে ভাল; হিলতোলা জুতোর বদলে আলতাপরা পা দুখানা দেখতে ভাল। চেয়ারে বসে বই পড়া কি সব সময়ে সাজে ভাই ছোটবউ,—রান্নাঘরে মাতৃমূর্ত্তিতে হাতা বেড়ি নিয়ে বসলে আরও ভাল দেখায়। সন্তানের পালনের ভার ঝি চাকরের হাতে না দিয়ে নিজে তাদের লালনপালন করা আরও দেখতে ভাল দেখায়। এই জন্যেই সীতাকে আমার বড় ভাল লাগে,—আমি তার মধ্যে আমার জগৎজননী মাতৃ-মূর্ত্তি দেখতে পাই।"

আঘাত পাইয়া বিবর্ণমুখে জয়ন্তী চুপ করিয়া গেলেন।

বৈকালে সুশীলবাবু কর্ত্তাবাবুর আদেশে সীতাকে খানকতক নোট দিয়া গেলেন। সীতা সেগুলা নিজের বাক্সে তুলিয়া রাখিল।

ঈশানীর শরীরটা আজ তত ভাল বোধ হইতেছিল না। সন্ধ্যা হইতেই তিনি শুইয়া পড়িলেন। জয়ন্তী তাঁহার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তোমার যে রকম দেহ হয়েছে দিদি, তাতে দিন কতক অন্য যায়গায় গিয়ে থাকলে খুব ভাল হয়। এ রকম দেহ নিয়ে বেঁচে থাকাও ঝকমারী। সামান্য একটু হাওয়া বদল করলেই যদি ভাল হয়ে যাও দিদি, কেন তবে সাধ করে আর অসুখে ভোগো বল?"

ঈশানী মলিন হাসিয়া বলিলেন, "দরকারই বা কি ভাই ছোট বউ! আর এ দেহ টেনে নিয়ে বেড়াতে পারছিনে। ক্ষয় হতে হতে একদিন একেবারেই যায়, আমি তাই প্রার্থনা করি। ভাল হওয়ার প্রার্থনা আমি একদিনও করি নি—করবও না। যাদের বেঁচে থাকায় সুখ আছে, তারাই বেঁচে থাক ভাই। আমার বেঁচে থেকে কেবল দুঃখভোগ করা—অশান্তি টেনে আনা বই তো নয় ভাই ছোট বউ। যার কেউ নেই,—স্বামী নেই, ছেলে নেই, সে আর কোন্ সখের আশায় বেঁচে থাকবে বোন?"

আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। তিনি মুখখানা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন।

অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "বালাই, ষাট,—ছেলে নেই ও কথা মনেও ভেব না দিদি। সোণার চাঁদ ছেলে তোমার; কয়টী মা এমন ছেলে পায় বল দেখি? তোমার পুত্র-সৌভাগ্য দেখে সকলেই হিংসে করে, বলে,—অনেক পুণ্য করলে তবে এমন ছেলে পাওয়া যায়। অমন রূপ, অমন গুণ, অমন দৃঢ়তা—সাহস আর একটী ছেলের দেখাও দেখি। যা তা বলো না দিদি, আপনার মনে বুঝে তবে কথা বল। ঝোঁকের বশে সে না হয় যাকে ভালবাসে তাকেই বিয়ে করেছে, না হয় বিলেতেই গেছে। তবু তো সে তোমারই ছেলে। শুধু খেয়ালের বশে সে যে কাজগুলো করেছে তাই দোষ বলে ধরছো, তার গুণগুলো দেখতে ভুলে যাচ্ছো।"

ঈশানী মুদিতনেত্রে অনেকক্ষণ নীরবে পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "সব ধরেছি ভাই, দোষ গুণ দুটোই দেখেছি। গুণের চেয়ে দোষের পরিমাণ বড় বেশী হয়ে গেছে! সে যে কাম করেছে তাতে কোনদিনই যে তাকে আর কাছে পাব না—এই বড় দুঃখ।"

জয়ন্তী তীব্রস্বরে বলিলেন, "ওই তোমাদের বড় দোষ দিদি! অমনি তাকে কাছে নেবে না বলে ঠিক করে রেখেছ? সে এমন কি অপরাধ করেছে যে তাকে আর কাছে নেবে না—চিরকালের জন্যে দূরেই রাখবে?"

"অপরাধ?" ঈশানী উঠিয়া বসিলেন। ক্ষীণ চোখ দুইটী তাহার বড় তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কি অপরাধ করেছে তা এখনও জানতে চাচ্ছো জয়ন্তী? তার জীবনের সব চেয়ে বড় অপরাধ—সে ধর্ম্ম ত্যাগ করেছে। এটাকে "কিছুঃনয়" ব'লে উড়িয়ে দিতে চেয়ো না। ধর্ম্ম ছেলেখেলার জিনিষ নয় যে একবার দেওয়া যায়, আবার কুড়িয়ে নেওয়া যায়। তুমি বলবে সে প্রায়শ্চিত্ত

করে আবার হিন্দু হতে পারে। কিন্তু কি দরকার তার সে প্রায়শ্চিত্তে? এই ধর্ম্মের উপর মানুষের মনুষ্যত্ব, দৃঢ়তা সব নির্ভর করছে, তা বোধ হয় ভাব নি? যে এককথায় ধর্ম্ম-ত্যাগ করতে পারে সে তো সবই করতে পারে! তাকে কি আর বিশ্বাস করা যায় কখনও?"

কথা কয়টী বলিয়াই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

জয়ন্তী আর সে বিষয়ে কথা বলা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না; নীরবে বসিয়া যেমন তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন তেমনি দিতে লাগিলেন।

সীতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, "এ কি মা, এই সন্ধ্যেবেলা শুয়েছেন কেন বলুন দেখি? উঠে বসুন, একটু বাদে শোবেন।"

ঈশানী উঠিলেন না। জয়ন্তী একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "সন্ধ্যেবেলা বলে' শরীর খারাপ হয়েছে যার তারও উঠে বসে থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই সীতা। দিদি খানিকটা শুয়ে আছেন থাকুন।"

সীতা বলিল, "সন্ধ্যেবেলা শুয়ে কাজ নেই কাকীমা। উঠুন বলছি মা, এখন কিছুতেই আপনি শুতে পাবেন না।"

ঈশানী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। মুখখানা দেখিতে পাইয়া পাছে সীতা আবার এক কথা বলিয়া বসে এই ভয়ে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বৃথা হইল, সীতা তাঁহার সজল চোখ দুইটী দেখিতে পাইল।

"বেশ আক্কেল তো আপনার মা, এই সন্ধ্যেবেলা আপনি চোখের জল ফেলছেন? আপনি কি জানেন না, সন্ধ্যেবেলা গৃহস্থের বাড়ী চোখের জল ফেললে অমঙ্গল হয়?"

ঈশানীর মুখখানা শুকাইয়া উঠিল। থতমত খাইয়া তিনি বলিলেন, "কই চোখের জল ফেলেছি সীতা? তুমি ভাল করে না দেখেই আমায় এত বলছ।"

ঈশানীর ভয়ার্ত্তভাব আর সীতার অবাধ প্রভুত্ব জয়ন্তীর বড় অসহ্য বোধ হইতেছিল। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আর কার জন্যে মঙ্গল অমঙ্গল বেছে চলবে সীতা? একটী মাত্র ছেলে চলে গেলে সকল মায়েই কেঁদে থাকে। সকাল-সন্ধ্যে বেছে, মঙ্গলামঙ্গল বুঝে কাঁদতে পারে কয়জন? মা তো হও নি বাছা, মায়ের যে কত জ্বালা সইতে হয় তাও জানো না। মায়ের বুকে যখন ঘা লাগে, তখন আর সময় অসময়? পোষাকি কান্না যাদের, তারাই বেছে—সময় করে লোক-দেখানো কাঁদতে পারে। মায়ের কান্না তো সে রকম নয় বাছা।"

এমন ভাবে গুছাইয়া কথা বলিবার ক্ষমতা ঈশানীর ছিল না; মনের কথাই জয়ন্তীর মুখে প্রকাশ হইতে শুনিয়া তিনি ভারি খুসি হইয়া উঠিলেন। সীতা তাঁহার মুখের পানে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "তবে আপনি খুব কাঁদুন মা; কেঁদে কেঁদে সত্যি যখন জ্বর আসবে, তখন একলাটী এই ঘরে পড়ে থাকতে হবে। আমি কখনো আপনার কাছেও আর আসব না, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি।"

জয়ন্তী ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়া ঈশানীর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা ওকে বড্ড স্পর্দ্ধা দিচ্ছ দিদি, তোমাদের পর্য্যন্ত যা না তাই শুনিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না, তা দেখতে পাচ্ছি। যদি শিক্ষা জিনিসটা এর মধ্যে থাকত, তবে এ রকম ব্যবহার করতে পারত না। শিক্ষা নেই বলেই একটু স্পর্দ্ধা পেলে মাথায় উঠতে চায়।"

ক্ষীণ স্বরে ঈশানী বলিলেন, "কি করব ভাই ছোট বউ, বাবা—"

বাধা দিয়া উগ্রভাবে জয়ন্তী বলিলেন, "হাঁ, বাবাই যে একে এতটা বাড়িয়ে তুলেছেন, তা আমি একবার দেখেই বুঝতে পেরেছি। সীতা নইলে একটী মিনিট তাঁর চলবার যো নেই, এমনিই তাঁর ভাব। আচ্ছা, এই যে জমীদারীর কাযকর্ম্ম ওকে সব দেখাচ্ছেন শিখাচ্ছেন, এ সব বুঝলে-শিখলেও সে বোঝা-শেখায় ওর লাভ হবে কি? আর এক কথা—দেখছি, তোমাদের সব বাক্স সিন্দুকের চাবি সব ওর হাতে, সংসারের খরচপত্র সব ওর হাতে। এগুলো তোমার নিজের হাতে রাখলে কি হতো ভাই দিদি?"

ঈশানী উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথার বালিশের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া দিলেন। সীতার বিরুদ্ধে যে কেহ কোন কথা বলিতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

জয়ন্তী বলিয়া চলিলেন, "শুনছি আজ ওর মাসতুতো ভাই এসেছে। তুমি কি মনে কর দিদি, এই খরচের মধ্যে থেকে মন করলে কিছু সরিয়ে সীতা তার হাতে দিতে পারে না? হাজার হোক সে ওর আপনার। আজ যদি তোমাদের এখানে যায়গা না হয়, কাল ওকে মাসীর বাড়ী গিয়ে থাকতেই হবে। এই সব খরচপত্রের যে একটা হিসেব

রাখা—তাও তোমাদের নেই। আমি বলি দিদি, ইভুর হাতে খরচ দিলেই হয়। আমার দাদা সংসারের খরচপত্র করবার ভার ইভুর হাতে দিয়েছিলেন, সেখানে ও ই যা যতক্ষণে করবে, হিসেবের এতটুকু ভুল কখনও হয় নি। হাজার হোক সে শিক্ষা পেয়েছে আর এ সব তার নিজেরই জিনিস, সে কি অনর্থক একটা পয়সা ব্যয় করতে পারে? টানটা তার যতটা হবে, তুমি আমি ছাড়া আর কারও কি তেমনটা হবে বলে মনে কর ভাই দিদি?"

ঈশানী নিস্তব্ধে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার কোন সাড়া না পাইয়া জয়ন্তী মনে করিলেন, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দাসী খানিক আগে দেয়ালে আলো জ্বালাইয়া খুব কম করিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষীণ আলোতে তাকাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না—ঈশানী ঘুমাইয়াছেন অথবা জাগিয়া আছেন।

একবার ডাকিলেন, "দিদি,—"

ঈশানী উত্তর দিলেন না, একবারও নড়িলেন না। তাঁহার নিদ্রা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া জয়ন্তী তাঁহার শয্যাত্যাগ করিলেন।

সে রাত্রিটা কাটিয়া গেল; সীতা যেমন হাসিমুখে কর্ত্তব্য কায করিত তেমনি করিয়া যাইতে লাগিল।

সকালে সে কি মনে করিয়া একবার ইভার ঘরে প্রবেশ করিল। ইভা তখন ষ্টোভে চায়ের জল বসাইয়াছে, জয়ন্তী ও সে উভয়ে চা খাইবেন। এ বাড়ীতে চায়ের চলন ছিল না, জ্যোতির্ম্ময় যখন আসিত, তখন তাহার জন্য মাত্র চা হইত।

অসময়ে সীতাকে আসিতে দেখিয়া ইভা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "আজ সীতাদি সকালবেলাই এ ঘরে যে? চা খাবে একটু,—দেব?"

সীতা হাসিয়া বলিল, "না ভাই, এখানে এসে পর্য্যন্ত চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আর ওসব না খাওয়াই ভাল। ভারি বদ্ অভ্যাস।"

ইভা বিস্ময়ে বলিল, "ছাড়তে কষ্ট হল না তোমার?"

সীতা বলিল, "কষ্ট কি ভাই? মনে করলে সামান্য একটু কষ্টকে বিরাট কষ্ট বলে ধরা যায়; আবার মনে করলে কিছু কষ্টবোধ হয় না। আমার এই ছোট্ট ত্যাগটীতে একটুও কষ্ট হয়নি ভাই, এর চেয়ে আরও বড় ত্যাগ আমার করতে হবে। কাযেই ছোটর দুঃখে অভিভূত থাকলে আমার চলবে কেন? এ জীবনে অনেক অভ্যাস ছিল ভাই, একে একে সব ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি খুব সহজের ওপর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারি। যাক ও সব কথা। আমি যে চা খেতে আসিনি এ ঠিক জেনো। সুতরাং তোমায় আমার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি একটা দরকারে এসেছি,—তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।"

কৌতূহলাক্রান্তা ইভা বলিল, "তোমার আবার কি বিশেষ কায আছে সীতাদি,—তোমার হাতে ও সব কি?"

সীতা নোটের গোছা তাহার সামনে মাটীতে রাখিয়া বলিল, "তোমার মাথায় একটা দারিদ্র চাপাতে এসেছি ভাই, কিছু মনে কর না। আমি একা মানুষ, কোন্ দিকে কি করি বল। একদণ্ড হাঁফ ছাড়বার যো আমার নেই। ভাবলুম, আমার বোঝার খানিকটা ভাগ তোমায় দেই। তাই অনেক ভেবে ঠিক করে সংসারের খরচটা তোমার হাতে দিতে এসেছি। শুনেছি, তুমি মামার বাড়ীতে খরচ হাতে রাখতে; এখানেও সেই কায তোমায় করতে হবে।"

ইভা সগর্জ্জনে মাথা নাড়িল। ব্যাপারটা সে চকিতে বুঝিয়া লইল। এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই তাহার মায়ের কটাক্ষপাত আছে। নহিলে হঠাৎ কেন আজ সীতা এগুলি আনিয়া তাহাকে হাতে লইবার জন্য জোর করিতেছে? আজ দুই তিন মাস তাহারা এখানে আসিয়াছে,—একদিনও সীতা তো তাহাকে একখানা কাযের ভার দিতে চায় নাই।

সে বলিল, "ও ভার আমি নিতে পারব না দিদি। শুধু দাদুর ভার নেওয়া আর এই ভারটা ছাড়া আমি সব কাযের ভার নেব। তোমার পোষা জন্তুদের দেখব, জেঠিমাকে দেখব, তাঁর রান্নার যোগাড় করে দেব; আর যা কিছু তোমার কায সব আমি করব; করতে পারব না শুধু এই দুটো কায।"

সীতা একটু হাসিয়া বলিল, "দাদুর ভার নেবে না কেন?"

ইভা উত্তর দিল, "তোমার মত করে দাদুর সেবা আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।"

"আমি চলে গেলে তো এ সব ভার তোমাকেই নিতে হবে ইভা, তখন তোমারই তো দাদুকে দেখতে হবে।"

সীতার কণ্ঠস্বর বড় কোমল।

ইভা দুইটা চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া বিস্ময়ে বলিল, "তুমি কোথায় যাবে দিদি ?"

সীতা বলিল, "আমার দাদা আমায় নিতে এসেছেন, তা জানো তো ? আমি দিন কতক সেখানে যাব ভাবছি, আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। আমি গেলে, এই সব কাজই তো তোমায় করতে হবে ইভা ?"

ইভা তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া সগর্ব্বে বলিল, "হ্যাঁ, তুমি যাবে বই কি ? তোমায় আমরা যেতে দিলে তবে তো যেতে পারবে দিদি, জোর করে তো যেতে পারবে না। আমি তোমায় এই দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখব, —কার ক্ষমতা তোমায় আমার কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাই দেখব।"

সে দুই হাতে সীতার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার স্কন্ধের উপর মুখখানা রাখিল; দুইজনের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া তাহার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া জোর করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া সীতা বলিল, ভাল; "যেতেও দেবে না, শক্ত যে দুটো কায তার একটাও নেবে না,—তবে আমি পারব কি করে ?"

ইভা বলিল, "বেশ, খরচপত্রের ভার আমি নিচ্ছি। তা বলে দাদুর ভার আমি কক্ষনো নিতে পারব না—এ ঠিক করে বলে দিচ্ছি।"

"তবে দাদুর গিন্নি কি করে হবে ইভু ?"

বলিয়া হাসিতে হাসিতে সীতা ইভার গণ্ডে টোকা দিল।

ইভা মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমি ওই সত্তর বছরের বুড়োর গিন্নি হতে চাই নে দিদি, তুমিই জন্ম জন্ম গিন্নি হয়ে থাক।"

সীতা বলিল, "তা বেশ, আমিই গিন্নি হয়ে থাকব। তুমি এই নোটগুলো তুলে রাখ তো ইভা। তারপর দুপুর বেলায় আমাদের গল্প হবে এখন।"

সীতা বাহির হইতেছিল, সেই সময়ে জয়ন্তী ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে মেঝের উপর কতকগুলি নোট দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ টাকা এল কোথা হতে, কে নিয়ে এল ?"

সীতা উত্তর দিল, "আমিই এনেছি কাকীমা। আমি কাল দাদুকে বলেছিলুম আমার দাদা এসেছেন, দিনকতক মাসীমার কাছে কল্যাণপুরে যাব। দাদু তাই শুনে এখন হতে খরচপত্রের ভার ইভার হাতে দেওয়ার কথা বলেছেন। ম্যানেজার দাদা যখন টাকা এনে দিলেন, তখন ইভু কাছে ছিল না, আমারও ভারি তাড়াতাড়ি ছিল—কাযেই ওর হাতে তখনই দিতে পারিনি। আজ সকালেই আগে দিতে এনেছি। সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে গেলুম, এখন হতে ইভাই সংসারের খরচপত্র চালাবে।"

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "ঠিক ব্যবস্থা করেছ মা। ইভা আমার—হাজার হোক, শিক্ষিতা মেয়ে। বে-আন্দাজি খরচ যে সে করে না, তা এক মাস ওর হাতে খরচ দিয়েই বাবা বুঝতে পারবেন। খরচ এলোমেলো ভাবে করে গেলেই তো হয় না মা, ওর আবার ঠিকঠাক হিসেবও দেওয়া চাই, নইলে কি হয় ? তুমি মা—খরচ শুধু করেই যাও, হিসেবপত্র রাখবার যোগ্য বিদ্যা তোমার নেই। সামান্য বিদ্যায় কি হিসেব রাখা চলে বাছা ? হ্যাঁ,—তুমি বাছা নিশ্চয়ই আমাদেরই মত মোটামুটি পড়াশুনা করেছ, সে দেখলেই জানা যায়।"

সীতা শান্ত মুখে বলিল, "তাই নয় তো কি কাকীমা, আমাদের মত লোকের ঘরে মেয়েরা আর কত খানিই বা লেখাপড়া করতে পারে ? মোটামুটি পত্র পড়তে লিখতে পারি,—ওই আমাদের পক্ষে খুব বেশী। হিসেবপত্র রাখা কি এই বিদ্যায় চলে ? ইভা যে ঠিক হিসেব রাখবে এ আমি ঠিক জানি।"

সীতার এই নিছক অজ্ঞতার ভান ইভার বড় অসহ্য বোধ হইতেছিল। সীতা যে কতখানি পড়িয়াছে, অঙ্কশাস্ত্রে কতখানি তাহার দখল আছে, তাহার পরিচয় ইভা পাইয়াছিল। মা জানেন না—এই ম্যাট্রিক পাস মেয়েটী ঘরে বসিয়া যে পড়া করিয়াছে, তাহাতে সে তাঁহার কন্যাকে বি-এ ক্লাস পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারে। সে অনেকবার কথাটা বলিতে গিয়াছিল; কিন্তু সীতা মাথার দিব্য দেওয়ায় সে একটা কথা বলিতে পারে নাই। আজও সে গুম হইয়া রহিল, একটা কথা কহিল না। হাসিভরা একটা উজ্জ্বল কটাক্ষ তাহার মুখের উপর বুলাইয়া দিয়া সীতা ভারি নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালী বিদ্যাপতি

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আজিও তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। আবার যে দুই চারিজন শিক্ষিত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা মত বা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া এমন সব কথা বলেন, যাহা সত্য-প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা সংশয়কেই বাড়াইয়া তুলে; এবং সরল-বুদ্ধি সাধারণ পাঠকগণকে বিপথে পরিচালিত করে। কোনও বিষয়েই শেষ কথা বলিবার পূর্ব্বে অনুসন্ধানের গণ্ডীটির দীর্ঘ-প্রস্থের কথাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। কবি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের সম্বন্ধে এ কথা যে কত সত্য,—অতি সাধারণ বুদ্ধিতেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। নিরবধি-কাল এবং বিপুলা-পৃথিবীর কথা মনে রাখিলে অন্ততঃ অহং-মুখ বলিয়া পরিচিত হইতে হয় না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বিদ্যাপতি সম্পাদনের পর অনেকগুলি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। অনেক পুরানো মত বদলাইয়াছে, নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু নগেনবাবু আজিও পূর্ব্ব মতেই অবিচলিত আছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন—আজকালকার দিনে আপ্তবাক্য বড় একটা কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না; এবং আমি অমুক বিষয় জানি বলিলেও লোকে তাহা যাচাই করিয়া লইতে চায়। সুতরাং তালপত্রের পুঁথি, মৈথিল-ভাষা যদি কেহ সামনাসামনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে, তবে তাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। তাহার পর 'শেখর', 'কবিরঞ্জন', 'ভূপতি সিংহ', 'চম্পতিপতি' প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত পদ যে মিথিলার বিদ্যাপতি ভিন্ন আর কাহারো হইতে পারে না, এ কথাও জোর করিয়া বলা চলে কি না সন্দেহ। আবার বিদ্যাপতিও যে দুই জন ছিলেন না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি আছে? বরঞ্চ আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালায় একজন বিদ্যাপতি ছিলেন এবং মিথিলার বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁহার পদের কিছু গোলমালও ঘটিয়াছে। কি কারণে এরূপ সন্দেহ করিয়াছি, কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। ভণিতার গোলযোগের কথা আর একদিন বলিব।

একখানি পুঁথি পাইয়াছি, পুঁথিখানি খণ্ডিত। ৪২ পাতা হইতে ৫০ এবং ৫৬ পাতা হইতে ৬০, মোট এই ১৬ খানি পাতা আছে। পদাবলীর পুঁথি,—পুঁথির মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, যদুনাথ, জ্ঞানদাস, শ্যামানন্দ ও লোচন এই ছয়জন পদকর্ত্তার পদ আছে। নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগাদি অবস্থার লক্ষণ বর্ণনার পর তাহারই উদাহরণ স্বরূপ এক একজন পদকর্ত্তার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সংকলয়িতা বা লিপিকরের কোনো পরিচয় নাই। পুঁথির আরম্ভ এইরূপ—

প্রাপ্তি সন্দভ চাহ্লাদ ভাব চেষ্টাভিশারিকা।
ঐ কান্তিক স্থির চর বাসক সর্য্যা সমুচ্যতে॥
ঐ দাম্ভৎ কল্পিতা কান্তাঃ চাপল্য কিল কথ্যতে।
নৈরাস্ত বিকলশ্চৈব বিপ্রলব্ধাচ নাইকাঃ॥
বিষবত খণ্ডিতা কান্তা সাম্য চেষ্টা প্রলভ্যতে।
উৎকণ্ঠো বৈপরিত্যোপি কলহন্তরিতা মত॥
নিমগ্ন স্বাদনং ভাব চেষ্টা স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।
অসাধ্য ভাবনা যস্ত মিত্যু চেষ্টা বিধীয়তে॥
অথ নায়েক নাইকা সম্ভেদ।
উৎকন্ঠিতা ধীরদাত্ত পূর্ব্বরাগ চ বর্ত্ততে।
কলহান্তরীতা কান্তা মানে সাটক সম্ভব॥
বিপ্রলব্ধা ধীর শান্ত প্রেম বৈচিত্র লক্ষণে।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা কান্তা প্রবাসেচ ধীরর্দ্ধত॥
বিপ্রলব্ধ এই চারি॥ অথ অভিসারিকা॥
অভিসারিকা সংক্ষিপ্তে নায়েক দক্ষিণে স্তথা।
বাসক শয্যাচ সংকির্ণে স্বানুকুল র্ণ সংশ্বয়॥
সমপর্ণে খণ্ডিতা ধৃষ্ট ক্রমেণ ইতি লভ্যন্তে।
সমিধ্যে ললিত ধীর স্তথা স্বাধীন ভর্ত্তৃকা॥

শব্দাদি পঞ্চগুণব্‌ভঃ শৃঙ্গার রস জায়তে।
শব্দ রূপে উত্রিসাত্বং হর্ষ পর্শাদি কথ্যতে॥
কৃষ্ণ স্থেতে গুণাপঞ্চ বর্ত্তন্তে রাধিকাদিষুঃ।
পরস্পর সুখ দুখ্‌খো ভুঞ্জিতৈ ক্রম এবচ॥
শ্রুতি নেত্রে শব্দ রূপৈ স্পর্শাঙ্গেচ রসাধরে।
নাশায়াং গন্ধ মাধুর্য্যং পঞ্চস্থানে গুণেশ্বর॥
শ্রবণাৎ কৃষ্ণ মানাচ দর্শনাদ্রাগ বিদ্যতে।
ততৎ কণ্ঠা মহৎ পীড়া নিবিত্তো মিলিতো যথা।
অথ রসভুঞ্জিত ক্রমানুসারে লিখ্যতে।
প্রথমে পূর্ব্বরাগশ্চ সংক্ষিপ্তো দ্বিতীয়ে ভবেৎ॥
তৃতীয়ে মান মাহাত্যং সংকিস্তেপি চতুর্থকে।
পঞ্চমে প্রেম বৈচিত্রং সম্পূর্ণ ভব ষষ্টমে॥
প্রবাস সপ্তমশ্চৈব সামিৰ্দ্ধি চাষ্টমে স্মৃত।
অথ পূর্ব্বরাগ তল্লক্ষণং। শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ইত্যাদি।

উৎকণ্ঠিতা তল্লক্ষণং। উৎকণ্ঠিতা মহৎকাণ্ঠাত্যাদি॥ অত্র পদং॥

(লেখাগুলি সোজাসুজি সারি দেওয়া। আমরা বুঝিবার সুবিধার জন্য শ্লোকগুলি পর পর নীচে লিখিলাম। বাণানের কোনও রূপ পরিবর্ত্তন করি নাই।)

অত্র পদং বলিয়া প্রথমেই এই পদটী আছে,—শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ॥

"অম্বর হেরি রহল ধনি সম্বিত কম্পিত ঘন ঘন অঙ্গ।
বাহু পশারি ধাই ধরু কাকরু কো বুঝে মরম তরঙ্গ॥
সুন্দরী হাসি বচন কঁহু থোর।
নিল অঞ্চল লই সঘনে আলিঙ্গই নয়নে অঝরো ঝরো লোর॥
কি শুনিলুঁ কি পেখলুঁ কো জানে কৈছন ঐছন পুন কহে বাত।
দরশন পরশে সরস মন মানস কোই করব হাত হাত॥
অধমুখ হোই রহই কুল কামিনি ভাবিনি ভাব গভীর।
বিদ্যাপতি ভণ মরমহি জাগত অদভূত শ্যাম শরির॥ ১॥
তত্রৈব॥

নিশি দিশী ভাবি ভবনে ধনি রহই।
দারুণ মদন দহনে তনু দহই॥
সুন্দরী আকুল পরাণ।
মরম কি দুখথ কোই নাহি জান॥
ঘন তনু কম্পই ঝম্পই কাম।
মনে মনে সঘনে জপয়ে প্রিয় নাম॥
কানু কমল তনু অতুল উজোর।
স্মঙরিতে মনোহি নয়নে বহে লোর॥
সখিগণ পরশে সরস যদি হোই।
মনোমথ হৃদয়ে বিদারই সোই॥
রেণু পর পতই সোতই খিতি মাঝ।
উঠইতে লোটই ঘটই বহু লাজ॥
সখিগণ দেখি নিমিখ নাহি ছোড়।
বিদ্যাপতি ভণ ঘন তনু মোড়॥ ২॥

ইহার পর গোবিন্দ দাসের বিখ্যাত,—"ঢল ঢল সজল জলদ তনু সোহন মোহন অভরণ সাজ" এই পদটী আছে।

অথ কৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগ॥ পদং॥ "রতন মন্দির মাছে বৈঠল সুন্দরী" গোবিন্দ দাসের পদ॥ ইহার পরই বিদ্যাপতির পদ।

রাই কো পেখি উপেখি জগ ভাবিনি ভাবি রহই হৃদি মাঝ।
এ অপরূপণী কো নিরমায়ল কো বিধি বিদগধ রাজ॥
মাধব মদন দহনে তনু ভোর।
ক্ষেনে ক্ষেনে উঠই মুরুছি তনু লোটই সুবল সখা করু কোর॥
মরম সখাসনে সকল নিবেদন কিয়ে ভেল পাপ পরাণ।
গোপী মুখ নিরখি তরখি জীউ জায়ত কতহিঁ করব সমাধান॥
অরুণিম অধরে সুধাকত বরিখত বচন অমিয়া তছু মাঝ।
হেন মনে হোই চরণে ধরি রোদই পরিহরি পৌরস লাজ॥
সো নাহি পায়ল বিধি না ঘটায়ল পুন যদি অনুকুল হোয়।
বিদ্যাপতি ভণ এই নিবেদন আনি মিলায়ই মোয়॥ ৫॥

এ পদগুলি হয়তো সন্দেহ জনক, অর্থাৎ জানি না টানিয়া বুনিয়া মিথিলার কবির বলা চলিতে পারে কিনা; কিন্তু নীচের পদটীতে সেরূপ সন্দেহের অবকাশ বা কোনো পরিবর্ত্তনের সুযোগ নাই।

শুনহে সুবল সখা আর কি হইব দেখা
পাষরিতে নারি সুধামুখি।
এ কথা কহিব কায় কেবা পরতীত যায়
মোর প্রাণ আমি তার সাথি॥
সখা হে ভাবিতে গুণিতে তনু শেষ।
না জানি কি করে বিধি যদি কার্য্য নহে সিদ্ধি
আনলে করিব পরবেশ॥
সুনিয়া সুবল কয় কিছু না করিহ ভয়
অবিলম্বে আনি দিব তারে।

পুরাব তোমার আশ তবে সে জানিবে দাস
বিলাশ করিবে রসভরে ॥
কর যোড় করি শ্যাম সখায় করে পরনাম
ইহ লোকে তুমি মোর বন্ধু।
বিদ্যাপতি বোলে রাখ রাঙ্গা পদতলে
এইবার তরাহ ভবসিন্ধু ॥

পদগুলি একই বিদ্যাপতির লেখা। একই পুঁথিতে এইরূপ উদাহরণের মধ্যে ইহাই স্বাভাবিক। এই সমস্ত পদ নগেনবাবুর "বিদ্যাপতি" অথবা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পদকল্পতরুর সঙ্গে মাত্র একটী পদের মিল আছে। পদগুলি মিথিলার বিদ্যাপতির নহে। ইহাও সম্ভব নয় যে কোনো "জয়গোপাল" নিজের রচনা বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া দিয়াছে। কারণ বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে অনুকরণ চলিতে পারে না। পরিচয় থাকিলে অন্ততঃ ব্রজবুলিতে পদ লিখিয়া ভণিতা জুড়িবার চেষ্টাই স্বাভাবিক। বাঙ্গালায় পদ লিখিয়া বিদ্যাপতির নামে চালাইতে চেষ্টা করিবার মত নির্বুদ্ধি জয়গোপালেরা নহেন। বাঙ্গালায় লেখা আরো অনেক পদ বিদ্যাপতির ভণিতায় আছে। সহজ সাধনের পদের অনুরূপ পদও বিদ্যাপতির ভণিতায় পাওয়া যায়। এই সমস্ত পদ আলোচনা করিয়া মনে হয় বিদ্যাপতি উপাধিযুক্ত কোনো বাঙ্গালী পদকর্তা ছিলেন। এ অনুমানের বেশ বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণও আছে। প্রমাণ এই—

শ্রীখণ্ডের রামগোপাল চৌধুরী বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁর 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থের নাম রসজ্ঞ সমাজে সুপরিচিত। ইনি শ্রীখণ্ডের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য। ইহাঁরই পুত্র পীতাম্বর দাস রসকল্পবল্লীর কোরক লইয়া রসমঞ্জরী রচনা করেন। রামগোপাল দাস (দাস ইহাঁদের বৈষ্ণবোচিত দীনতার পরিচায়ক) "বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নবপতি শাকে" রসকল্পবল্লী রচনা শেষ করিয়াছিলেন। অঙ্গ শব্দে ষড়ঙ্গ, অষ্টাঙ্গ এমন কি নবধা ভক্তি-লক্ষণ ধরিয়া নবাঙ্গও বুঝাইতে পারে। আমরা বৈদ্য-প্রধান খণ্ডের বৈদ্য-কবির লেখায় অঙ্গ অর্থে অষ্টাঙ্গই গ্রহণ করিয়াছি। এই হিসাবে ১৫৮৫ শকাব্দা হয়। ইহাঁর রচিত "শ্রীখণ্ডের (নরহরি সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দন সরকার ঠাকুরের) শাখা নির্ণয়" নামে একখানি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে— শ্রীরঘুনন্দনের শাখা গণনায় ইনি লিখিয়াছেন—

'কবিরঞ্জন' বৈদ্য আছিলা খণ্ড বাসি।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি ॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দড় ॥

পদং যথা—

শ্যাম গৌরবরণ এক দেহ ইত্যাদি।

গীতেষু বিদ্যাপতি বদ্‌বিলাসঃ।
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি কালিদাসঃ ॥
রূপেষু নির্ভর্ৎসিত পঞ্চবানঃ।
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্বকলা নিধানং ॥

ইহা হইতে বুঝা যায় শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বৈদ্য সুকবি ছিলেন, এবং তাঁহার বিদ্যাপতি উপাধি ছিল। লোকে তাঁহাকে ছোট বিদ্যাপতি বলিত। মিথিলার বিদ্যাপতিরও নব জয়দেব উপাধি ছিল এবং কবিতায় তিনি সে উপাধি ব্যবহার করিতেন। "সুকবি নব-জয়দেব ভণিওরে" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, শ্রীখণ্ডের কবি বিদ্যাপতি উপাধি ব্যবহার করিতেন বলিয়াই লোকে তাঁহাকে ছোট-বিদ্যাপতি বলিত। অবশ্য নব-জয়দেবের মত কবিতায় কিছু নিজে নিজে ছোট বিদ্যাপতি ভণিতা দেওয়া যায় না। ইহাঁর নাম 'কবিরঞ্জন' অথবা কবি—রঞ্জন অর্থাৎ নাম শুধুই রঞ্জন, লেখক বলিবার সময় কবিরঞ্জন বৈদ্য বলিয়াছেন—সন্দেহ হয়। শ্লোকে কবিরঞ্জন বলিতে গেলে ছন্দ-ভঙ্গ হয়, তাই বোধ হয় শ্রীরঞ্জন বলা হইয়াছে। ইহাঁর অনেক গানে কিন্তু কবিরঞ্জন ভণিতা আছে। 'শ্যাম গৌরবরণ এক দেহ' পদটী উদ্ধৃত করিতেছি।

"শ্যাম গৌরবরণ একদেহ।
পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ ॥
সৌরভে আগর মুরতি রস সার।
পাকল ভেল জনু ফল সহকার ॥
গোপ জনম পুন দ্বিজ অবতার।
নিগমে না জানয়ে নিগুঢ় অবতার ॥
প্রকট করিল হরিনাম বাখান।
নারি পুরুষ মুখে না শুনিয়ে আন ॥
ত্রিপুরাচরণ কমল মধুপান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান"।

কোন কোন পুঁথিতে এই পদ কবিশেখরের নামে আছে। কবিশেখরও শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য, সুতরাং কোনো লিপিকর কর্তৃক এরূপ পরিবর্ত্তন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পদটা পদকল্পতরুতে আছে।

যে বিখ্যাত পদটার ব্যাখ্যা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদের আর অন্ত নাই—সেই "চরণ নখ রমণি রঞ্জন ছাঁদ" পদটী এই শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের। নগেনবাবু তাঁহার বিদ্যাপতি পুস্তকে পদটী "চরণ-নখর মণি রঞ্জন ছাঁদ" এই আকারে গ্রহণ করিয়া বিদ্যাপতির ভণিতা জুড়িয়া দিয়াছেন এবং বহুবিধ ব্যাখ্যা বিস্তার করিয়াছেন। রামগোপাল দাস—সংক্ষেপে গোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাস তাঁহার 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে এই পদ কবিরঞ্জনের ভণিতায় গ্রহণ করিয়াছেন। রসমঞ্জরীর ভণিতা—

"কহ কবিরঞ্জন শুন বরনারি।
প্রেম অমিয়-রসে লুবুধ মুরারি"॥

পিতা যে কবিরঞ্জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন, পুত্রের পুঁথিতে তাঁহারই পদ উদ্ধৃত হইয়াছে,—অন্ততঃ এই কবিরঞ্জনের ভণিতায় এইরূপই মনে হয়। উভয়েই শ্রীখণ্ড-বাসী। মিথিলার বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন ভণিতার কোনো পদ পাওয়া যায় না। তাছাড়া এমনও হইতে পারে যে শ্রীখণ্ডের কোনো অনুরক্ত লিপিকর কবিরঞ্জন নাম ভুলিয়া ভণিতায় বিদ্যাপতি উপাধি জুড়িয়া দিয়াছে। নগেন বাবু অমনি ধরিয়া লইয়াছেন, ইহা মিথিলার বিদ্যাপতির রচিত। এ পদ তিনি কোন তালপাতায় পাইয়াছেন, পুঁথিতে তাহার কোনো উল্লেখ রাখেন নাই।

পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতায় এই কয়েকটী পদ আছে—

১। আর কবে হবে মোর শুভখন দিন
২। কি কহব রে সখি আজুক বিচার
৩। কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ
৪। পুরুষ রতন হেরি মন ভেল ভোর
৫। উদসল কুন্তল ভারা
৬। কি কব রাইয়ের গুণের কথা
৭। আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যাওব

নগেন বাবু ইহার মধ্যে 'কি কহব রে সখি আজুক বিচার' পদটী বিদ্যাপতির নামে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কোথা হইতে গৃহীত তাহা বলেন নাই। 'কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ' পদটী লইয়াছেন কীর্ত্তনানন্দ হইতে। আর 'উদসল কুন্তল ভারা' পদ পদকল্পতরু হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। নগেন বাবু পদকল্পতরু দেখিয়াছেন, কবিরঞ্জন ভণিতার ঐ পদটী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কবিরঞ্জন ভণিতার যে আর পদগুলি,—সেগুলি তাহা হইলে কাহার কই সে সম্বন্ধে তো কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই? একই পুঁথি হইতে একই ভণিতার কতকগুলি পদের মধ্যে একটী বিদ্যাপতির নামে লইলাম, কিন্তু বাকীগুলি কাহাকে দিলাম, তাহার কোনো কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। আর কবিরঞ্জন যে বিদ্যাপতির উপাধি তারও তো কোনো প্রমাণ নাই। কোনো তালপাতা তাহার সমর্থন করে না। নগেন বাবু পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলনের কবিতা "চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল" দেখিয়া কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির উপাধি ইহা ধরিয়া লইয়াছেন। অথচ ঐ মিলন যে প্রকৃত নয়,—কবি-কল্পনা মাত্র, বিদ্যাপতির ভূমিকায় সে কথাও বলিয়াছেন। মূলে ব্যাপারটাই যদি কবি-কল্পনা হইল, তবে কবিরঞ্জন উপাধিটাই বা কবি-কল্পনা হইবে না কেন?

আমার পুঁথিতে—

১। সুরচন বেশ বয়েস নব কৈশোর
২। শুন গো রাজার ঝি
৩। শুন ধনি রমণি শিরোমণি রাধে
৪। যতন করিয়া হরি
৫। সখিগণ আপন করু
৬। শ্যাম নাম যবে
৭। ধনি ভেল মানিনী
৮। সুন্দরি দূরে কর মান দুরন্ত
৯। বিমুখ দেব যব
১০। নিরসল চিত ভীত মানি
১১। সহচরি বচন শ্রবণে যব শুনল
১২। কেনে বা পোহাল্য নিশি
১৩। হোর দেখ বরজ-রাজ-কুলনন্দন
১৪। মাধব বিপিনে গমন

১৫। বেলি অবসানে বসিল ধনি
১৬। হরি যব রথপর
১৭। হোর দেখ গকুল
১৮। মাধব করে ধরি বহুত
১৯। মাধব রথপর যব
২০। তীন কারণ তীন খোঁয়াওলু
২১। শ্যামরু শোকে সিন্ধু নিরমাওল

এই কয়টী পদ আছে। 'শুন গো রাজার ঝি' পদটী পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতির ভণিতায় থাকা সত্ত্বেও নগেন বাবু গ্রহণ করেন নাই। কেন করেন নাই তাহার কোনো কারণ দেখান্ নাই। বাস্তবিকই পদটী মিথিলার বিদ্যাপতির নহে। এ পদ কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির, পদ দেখিলেই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। পদটী উদ্ধৃত করিতেছি। এই পদটী ভিন্ন আমার পুঁথির বাকী পদগুলি নূতন।

অথ কৃষ্ণস্য দূতী গমনং—

শুন গো রাজার ঝি কহিতে আসিঞাছি।
কানু হেন ধনে বধিলে পরাণে এ কাজ করিলে কি॥
বেলি অবসান বেলে তুমি গিঞাছিল জলে।
তাহারে দেখিঞা মুচকি হাসিঞা ধরিলে সখির গলে॥
দেখি তুয়া মুখ ছান্দে স্থির নাহি প্রাণ কান্দে (বান্ধে ?)
ভুরিতে গমন চিনিতে নারিলাম উহাই বলিয়া কান্দে॥
গোপতে বরত সেবি বর দিল দেবাদেবী।
থুরি দরশনে আস না পুরল ভনে বিদ্যাপতি কবি॥ *

আমরা প্রবন্ধের নাম দিয়াছি 'বাঙ্গালী বিদ্যাপতি'। বলা বাহুল্য যে কালিদাসকে বাঙ্গালী করার মত আমাদের কোনো বাতিক নাই। "গৌরী-গুরোর্গহ্বর মাবিবেশ" শ্লোকাংশের প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া "গৌরী হইয়াছে গুরু যার" এই অর্থে সিংহের গহ্বর হইতে "সিংড়ী গড্ডায়"ও যাইতে চাহি না। আমাদের বহুদিনের সন্দেহ ছিল—বিদ্যাপতি দুইজন। নইলে বিদ্যাপতির নামে এই বাঙ্গালা পদ বা তথাকথিত ব্রজবুলির পদগুলি কে রচনা করিল? তারপর রামগোপাল দাসের শাখা নির্ণয় দেখিয়া এই সন্দেহ দৃঢ় হয়। এখন বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এই পদগুলি দেখিয়া প্রতীতি হইয়াছে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতিই এই সমস্ত পদের রচয়িতা। কবিরঞ্জন ভণিতার পদগুলিও আমাদের অনুমানের সমর্থন করিতেছে। পদাবলী-সাহিত্যে কবিরঞ্জন নামধারী বা উপাধিধারী কোনো দ্বিতীয় কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। এই কবি ঠাকুর রঘুনন্দনের সমসাময়িক। এই সময়েই রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণ বর্ত্তমান ছিলেন। সে আজ প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

কবির কবিত্ব-পরিচয় হিসাবে আর কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দু'তিন রকমের পদ, কোনটাই বাছাই নয়।

অথ সখি ভর্ৎসন।

সখিগণ আপন কহি হাম জান।
অন্তর বাহির না কহিল ভাণ॥
স্ত্রীবধে যা কর ভয় নাহি হোয়।
তা কর আগে সোঁপিল মোয়॥
পহিলহি আদর নয়ন বিভঙ্গ।
করইতে কোর আনল ভেও রঙ্গ॥
এ সকল হামে সহ নাহি জায়।
পিরিতি পুরুখ সনে কো করু চায়॥
বিদ্যাপতি কহ অব নাহি জান।
সুপুরুখ লাগি তেজবি নিজ প্রাণ॥

ভবন বিরহ—

কেনে বা পোহাল্য নিশি দিশা কেনে আইল।
ভাবিয়া মরিব কত বিপরিত হৈল॥
সখি হে কি কহিব কহ।
প্রবোধ না মানে চিত করে দহ দহ॥
গুরু গরবিত কত কহে কুবচন।
না করে আঁখির আড় নিজ পতি জন॥

* পদকল্পতরুতে এই পদটী যে আকারে আছে—
শুনলো রাজার ঝি, তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলে এ কাজ করিলে কি॥
বেলি অবসান কালে কবে গিয়াছিলে জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া ধরিলি সখির গলে॥
দেখাইয়া বয়ান চান্দে তারে ফেলিলি বিষম ফান্দে।
তুঁহু তুরিতে আওলি লখিতে নারিল ওই ওই করি কান্দে॥
হৃদয় দরশি ঘোর, তার মন করি চোর।
বিদ্যাপতি কহে শুনলো সুন্দরি কানু জিয়ায়বি মোর॥

বিহানে যাইব বন্ধু আসিব জামিনি।
কত না চাহিব পথ কুলের কামিনি॥
বিদ্যাপতি কহে এই মোর মনে।
করহ যুগতি বন্ধু না জাও বিপিনে॥

ভবন বিরহ—(মাথুর)

বেলি অবসানে বসিল ধনি।
কেনে বা কি লাগি আকুল প্রাণি॥
যেন কেহু কার করিল চুরি।
মারিতে আইসে তরাসে মরি॥
জন ধন গৃহ না লয় মনে।
কি জানি কি লাগি এমনি কেনে॥
হেনই সময়ে বাজিল ঢেড়ি।
ফুকারি'গণ কহে সকল বাড়ি॥
প্রভাতে উঠিয়া গকুল বাসি।
দধি দুগ্ধ ঘৃত পুরিঞা রাসি॥
কৃষ্ণ বলরাম লইয়া সঙ্গ।
মথুরা যাইবে না হয় ভঙ্গ॥
সুনিঞা বজর পড়িল শিরে।
বষন ভিজিল আঁখের নীরে॥
পিছলে চলিতে পড়িয়া গেল।
জনু হৃদিমাঝে রহিল শেল॥
বহিয়া যাইতে ডুবিল তরী।
ঐছন জানব বরজ নারী॥
কি হবে কি হবে ক্রন্দন ধনি।
মুরুছি পড়ল রমনি মনি॥
চেতন পাইঞা উঠিল রাই।
কহিছে কিরূপে রহে মাধাই॥
বুক মুখ বাঞা পড়িছে লোর।
কবি বিদ্যাপতি কান্দিয়া ভোর॥

শ্যামক শোকে সিন্ধু নিরমাওল তথিপর আনল ডারি।
সব গুণে হারল যো কছু রহি গেল হৃদি কম্পিত বর নারী॥
সখি হে অব নাহি মিলব কান।
গোপতি নন্দন সো কাহে মারব আপহি তেজব পরাণ॥
গিরি তনয়াধর কতহিঁ নাম লব জপি জপি জীবন শেষ।
নিজ বসন লাগে আগি সব রজনী দশমি দশা পরবেশ॥
অমরাবতি পতি ঘরণি গুণদ্বয় যদি মঝু হোয়ত মাই।
বিদ্যাপতি ভণ ভাবি মরব কাহে না মিলন নিঠুর মাধাই॥

গোপতি নন্দন ইত্যাদির ব্যাখ্যা বোধ হয় এইরূপ হইবে—"সেই রাখালের হাতে কেন মরিব, আপনিই প্রাণত্যাগ করিব। (কামের ভয়ে কামারি) গঙ্গাধরের নাম আর কত লইব, জপিতে জপিতে প্রাণ শেষ হইয়া গেল। (অমরাবতীর পতি ইন্দ্র, তাহার ঘরণী শচীদেবী। গুণদ্বয় অর্থাৎ দ্বিতীয় গুণ রজঃ, লেখক রজ ধরিয়াছেন) শচীরজ অর্থাৎ শচী-অঙ্গজ শ্রীগৌরাঙ্গদেব যদি আমার হন (তবে) বিদ্যাপতি কহিতেছেন নিঠুর মাধাই না-ই বা মিলিল, কি জন্য ভাবিয়া মরিব।"

এই পদ হইতে বুঝিতে পারা যায় এই বিদ্যাপতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কবি। সুতরাং আমরা যে আন্দাজ করিয়াছি, এই বিদ্যাপতিই শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি,—এ পদে তাহারও কিছু সমর্থন পাইতেছি।

পুঁথির বয়স এক-দেড়শত বৎসরের বেশী হইবে না। পুঁথির প্রকৃতি বিচারে মনে হয় ইহা "রসকল্পবল্লী" 'রসমঞ্জরী' প্রভৃতির সমজাতীয়। 'রসকল্পবল্লী' হাতের কাছে থাকিলে মিলাইয়া দেখিতাম ইহার সঙ্গে মিল অমিলের পরিমাণ কত। ইহা শ্রীখণ্ডের কোনো কবি বা পণ্ডিত বা ভক্তের সংগ্রহ হইলে হইতে পারে। কবিরঞ্জনের ভণিতার 'ত্রিপুরা' কাহার নাম? অথবা আর কোনো পাঠান্তর আছে? শ্রীখণ্ডের ঠাকুর মহাশয়গণের এই সব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমরাই সর্ব্বপ্রথম এই ভারতবর্ষে 'দীন চণ্ডীদাসের' পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলাম। সেই সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধানের ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনচণ্ডীদাসের পদের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ভরসা করি এবারও কোনো অনুসন্ধিৎসু সহৃদয় এ পথে অগ্রসর হইবেন এবং ফলস্বরূপ নিজের সুচিন্তিত মত প্রকাশে অনুগৃহীত করিবেন।

কয়েকখানি ফ্লেমিশ চিত্র

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ফ্লেমিশ চিত্রকলা অতি প্রাচীন ও বিচিত্র। মধ্যযুগের গথিক-গির্জ্জার ছায়ায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রেরণাতে তাহার জন্ম ও বিকাশ। ব্রুজ, ঘেণ্ট, আণ্টওয়ার্প, মালিন, ব্রাসেলস্ প্রভৃতি প্রাচীন সহরের চার্চ্চের, রাজসভার, মিউনিসিপ্যালিটির, গিল্ডের, ধনিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার বৃদ্ধি ও পরিণতি। ইতালীয়ান আর্টের রেনেসাঁসের স্পর্শে তাহার শ্রীবৃদ্ধি। শতাব্দীর পর শতাব্দী তাহার নব নব রূপ—ফ্লেমিশ চিত্রকলার এই দীর্ঘ অপরূপ ইতিহাস অগণিত চিত্রশিল্পীর প্রাণের সাধনায় গঠিত। মধ্যযুগের চিত্রকলা-উদ্বোধনকারীদের (Primitives) নিকট ছবি আঁকা নিছক সৌন্দর্য্যচর্চ্চা ছিল না, তাহা ধর্ম্মসাধনার অঙ্গ ছিল,—প্রতি চিত্র ঈশ্বরের নিকট ভক্তের দীন-সাধনাপূর্ণ স্তব ছিল, মেরী ও যিশুর প্রতি প্রার্থনা ছিল; এই ভক্তি-রসপূত চিত্রকলার পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাই—পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভান আইক (Van Eyck) ভ্রাতৃদ্বয়, মেমলিং (Memling) জেরোম বস্ (Jerome Bosch) প্রভৃতি শিল্পীদের চিত্রে। ষোড়শ শতাব্দীতে কান্তিন মাত্সাইস (Quentin Metsys) বার্ণাড ভান অরলে (Bernard van Orley) প্রমুখ চিত্রকরগণের চিত্রে মধ্যযুগের মিষ্টিসিজম্ আর নাই। তাঁহাদের ছবির বিষয় ধর্ম্মমূলক বটে, কিন্তু গভীর ধর্ম্মভাব অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রয়াসই প্রবল। তাঁহারা রেনেসাঁর ইতালীর চিত্রকরদের অনুকরণে তাঁহাদের প্রভাবে ছবি আঁকিতেছেন। এ শতাব্দীর শেষে দেখি, চিত্রকরেরা কেবলমাত্র ধর্ম্মবিষয়ক ছবি আঁকিতেছেন না, তাঁরা নিছক পোর্ট্রেট আঁকিতেছেন, আপন দেশের প্রাকৃতিক শোভার ছবি আঁকিতেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শিল্পীদের ইতালীয়ান চিত্রকরদের অনুকরণ-চেষ্টা ও ফ্লেমিশ প্রতিভার স্বতন্ত্র বিকাশের সাধনা সপ্তদশ শতাব্দীতে পিয়ার-পল, রুবেন্সে পরিপূর্ণতা, সার্থকতা লাভ করিল। রুবেন্সের মধ্যে ফ্লেমিশ আর্ট ও রেনেসাঁস-ইতালীর আর্ট মিলিত হইয়া ফ্লেমিশ চিত্রকলার এক গৌরবময় যুগ আরম্ভ হইল; তাঁহার শিষ্য ভান ডাইক (Van Dyck), জ্যাক জর্দা (Jacques Jordaens), তেনিআরস (Teniers) প্রভৃতি সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্পীগণ আর চার্চ্চের বন্ধনে বা ধর্ম্মের প্রভাবে নাই, তাঁহারা সুন্দর নরনারী, জীবিত বা মৃত পশুপক্ষী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, মানব-জীবনের সুখের দুঃখের ঘটনা ইত্যাদি আঁকিতে লাগিলেন। সৌন্দর্য্যের সহিত রস সৃষ্টি করা তাঁদের লক্ষ্য। তার পর উনবিংশ শতাব্দীর ব্রেকলেয়ার (Brackeleer) ষ্টিভন্স্ (Stevens) প্রভৃতি চিত্রকরদের সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই একমাত্র সাধনা,—ধর্ম্মের জন্য চিত্রকলা নয়, আর্টই একমাত্র ধর্ম্ম। মধ্যযুগের ধর্ম্ম-মরমী 'প্রিমিটিভগণ' হইতে বর্ত্তমান কালের সৌন্দর্য্য-মরমী ইম্প্রেসনিষ্ট পর্য্যন্ত ফ্লেমিশ চিত্রকলার এই অপূর্ব্ব বিচিত্র-কথা বলিবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা অবশ্য আমার নাই। বেলজিয়ামে ব্রাসেল্সে আণ্টওয়ার্পে ব্রুজে ঘেণ্টে যে সব ছবি দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি প্রসিদ্ধ ছবির কথা বলিব মাত্র।

মধ্যযুগের ফ্লেমিশ চিত্রশিল্পীদের সাধনা যাঁহাদের মধ্যে সার্থকতা লাভ করে, ফ্লেমিশ আর্টের প্রথম গৌরবময় পর্ব্বের স্বর্ণদ্বার যাঁদের তুলিকার স্পর্শে উন্মুক্ত হয়, সেই ভান আইক ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা প্রথমে বলি। তৈলচিত্র অঙ্কন-পদ্ধতিকে তাঁরা এরূপ পূর্ণতা দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তৈলচিত্র অঙ্কনের উদ্ভাবনকর্ত্তা বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের ছবিগুলি দেখিলে বুঝা যায়, সত্যই তাঁহারা তৈলচিত্রকলার নবজন্ম দান করিয়াছিলেন। হুবার্ট ও জন ভান আইক ভ্রাতৃদ্বয়ের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি "মিষ্টিক মেষশাবক" (L'Agneau mystique) ঘেণ্টে (Ghent) ক্যাথিড্রাল সেণ্ট-বাভোঁতে আছে। হুবার্ট ভান আইক এটি আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁর ভাই জন ভান আইক ইহা শেষ করেন। 'মিষ্টিক মেষশাবক' একখানি polyptsch বা কতকগুলি বিভিন্ন চিত্র

অঙ্কিত পানেল (panels) এক সঙ্গে সংলগ্ন করা। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কতকগুলি অংশ বার্লিনের কাইজার ফ্রেডরিক মিউজিয়মের চিত্রশালায় ছিল। ভার্সাই সন্ধিপত্র অনুসারে, যুক্ত-চিত্রের সেই অংশগুলি জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট বেলজিয়াম গভর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। ১৪৩২ খৃঃ অব্দে জন ভান আইক polyptschটি শেষ করিয়া সেণ্ট বাভোঁর পূজা-বেদীতে যেরূপ সম্পূর্ণভাবে রাখিয়াছিলেন, এখন আবার সেইরূপভাবে চিত্রটি রাখা হইয়াছে। কোন্ ছবি কোন্ ভ্রাতার অঙ্কিত সে সম্বন্ধে নানা মত আছে।

ওপরের সারিতে ঠিক মধ্যের পানেলে বিশ্বের পিতা ভগবানের চিত্র। এই বিশ্বেশ্বরের চিত্রটি একটু গথিক-ভাবাপন্ন হইলেও বাইজেনটাইন পোপের মত সাজ,—যেন কোন সম্রাট মহান গৌরবে বসিয়া, তাঁহার মস্তকে স্বর্ণকিরীট, হস্তে রাজদণ্ড, পদতলে মণিমাণিক্যখচিত মুকুট, অতি মূল্যবান সাজ-সজ্জা, গম্ভীর কিন্তু করুণাময় রাজরাজেশ্বরের রূপ। বিশ্বপিতার এক দিকে সন্ন্যাসীর মত দীনসাজ বাইবেল-ক্রোড়ে সেণ্ট জন—করুণা ও বিষাদে ভরা। অপর দিকে চিরকুমারী মেরী (Virgin) রাণীর মত বসিয়া,—তাঁর স্নিগ্ধ নীল সাজ, মস্তকে মণিমাণিক্য-বিজড়িত মুকুট, মুখখানি কমনীয়, স্নিগ্ধ, ভক্তিপূর্ণ। সেণ্টজনের পাশের ছবিটি বাদ্যযন্ত্র-বাদিনী দেবপরীগণ; মেরীর পাশের ছবিটি গায়িকা দেবপরীগণ। এই ছবি দু'টি অতি সুন্দর। ভান আইকরা রংএর সহিত তৈল মিশাইয়া আঁকিবার নবপদ্ধতি জানার নবলব্ধ আনন্দে যেমন রংএর জাঁকজমক আঁকিতে আকুল, তেম্নি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের সহিত সকল জিনিষ দেখিয়া ছবিকে বাস্তব সত্য করিতে পরম অধ্যবসায়ী। "গায়িকা দেবপরীদের" ছবিখানি কি স্বাভাবিক সুন্দর! কোন ধর্ম্মোৎসবের দিনে গির্জ্জাতে ভক্তিমতী সুন্দরী ফ্লেমিশ নারীগণ যেরূপ প্রাণের আবেগ ও তন্ময়তার সহিত যিশুর উদ্দেশে গান গাহিয়াছেন, তাহারি চিত্রে মুগ্ধ হইয়া ভান আইকরা সেই শুদ্ধ-সুন্দর স্মৃতি হইতে ছবিটি আঁকিয়াছেন। প্রতি মুখের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব আছে। গান গাহিবার ভাবাবেগের সহিত গাহিবার শ্রমের চিত্রও প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু পূজার প্রদীপ-শিখার মত ভক্তিসঙ্গীতসুরদীপ্ত মুখগুলি দেখিলে আমাদেরও অন্তর ওই স্তবগানে যোগ দিতে উৎসুক হয়। এই ছবিখানির মধ্যে ভান আইক-আর্টের মর্ম্মকথা জানিতে পারি—তাঁদের এই ছবি আঁকা রেখা ও রংএর সঙ্গীতে বিশ্বপিতার স্তবগান।

ওপরের সারির দুই প্রান্তশেষে এক-দিকে আডাম অপর দিকে ইভ। আদাম ও ইভের ছবি দুটি বাস্তবতা ও মানবতাতে ভরা। আদাম যেন ফ্লেমিশ চাষার সুন্দর নগ্ন মূর্ত্তি। তাহার ঈষৎ শীর্ণ দীর্ঘ দেহ কোন তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর মত। ইভ এক গর্ভবতী ফ্লেমিশ নারী; তাহার নিরাবরণা নিরাভরণা তনুলতা কুসুমভারাবনত মৃণালের মত।

তলার সারিতে মধ্যের বৃহৎ ছবিখানি "মিষ্টিক মেষ-শাবকের জয়" (Triomphe de Agncan mystique) —খৃষ্টান ধর্ম্মের এক নিগূঢ় সত্যের রূপক। য়ুরোপীয় চিত্রকলার সকল খৃষ্টানধর্ম্মমূলক চিত্রগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে কেবল আর্টের দিক দিয়া, সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া দেখিলে হইবে না,—খৃষ্টান ভক্ত যে চোখে দেখে সেই চোখেও দেখিতে হইবে। প্রতিমার অন্তরালে দেবীকে যে দেখিল না তাহার প্রতিমা-দর্শন যেমন ব্যর্থ হইল, তেম্নি এই যিশু বা মেরীর বা বাইবেলের ঘটনার ছবিগুলির অন্তরে খৃষ্টান-ধর্ম্মের মর্ম্মকথা-প্রকাশ-প্রয়াসী শিল্পীর ভক্তিনত আত্মার রূপকে যে দেখিল না, সে এই চিত্রগুলির সত্য সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিল না। এই ছবিগুলি বুঝিতে কেবল সৌন্দর্য্যপিপাসু ভাবে নয়—ধর্ম্মপিপাসু ভক্তভাবে আসিতে হইবে। "মিষ্টিক মেষশাবকের জয়" ছবিটি মানবের উদ্ধারের জন্য যিশুখৃষ্টের ক্রুশে প্রাণোৎসর্গের একটি রূপক। আদাম ও ইভ যে পাপের জন্য স্বর্গ হারাইয়াছে, যিশু আপন রক্ত দিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। এক পুষ্পিত রমণীয় উদ্যানের মুক্ত স্থানে এক কারুকার্য্যময় বেদিকার ওপর আকাশ হইতে দিব্যালোকস্নাত শুদ্ধ শুভ্র মেষশাবক স্থির দাঁড়াইয়া। তাহার বক্ষ হইতে রক্ত-ধারা এক স্বর্ণপাত্রে ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার দুই দিকে দেবপরীরা জয়গান করিতেছে। তাহার সম্মুখে নবজীবনের অনন্ত উৎস; পিছনে শ্যামল বনভূমি উদার আকাশে মিশিয়াছে। উৎসের দুই ধারে পুরাতন টেষ্টমেণ্ট ও নব টেষ্টমেণ্টের ঋষিরা, খৃষ্টান সাধক ভক্তরা, জ্ঞানীরা, সেণ্টরা সমবেত। কেহ করযোড়ে নতজানু, কেহ এই স্বর্গীয় অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে মুগ্ধ, ভক্তিনত। দূরে বনের ধারে ভক্তিমতী পূজারিণীগণ, পোপগণ। প্রতি সাধক, সাধ্বীর মুখ, দাঁড়াইবার

ভঙ্গী স্বতন্ত্র, বিশেষত্বে ভরা, বাস্তব। কিন্তু সমস্ত ছবির রেখায় ছন্দে একটি সুর—এই অলৌকিক স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনে বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ উপাসনা।

ব্রুজেতে জন ভান আইকের আর একখানি চমৎকার তৈলচিত্র দেখিয়াছি। ছবিটি 'ভার্জ্জিন মেরীর উপাসনা'—সেণ্ট জর্জ্জ, সেণ্ট দোনা ও পুরোহিত ভান দেয়ার পাল শিশুক্রোড়ে ভার্জ্জিনকে উপাসনা করিতেছেন। রঙীন কার্পেট-পাতা মন্দিরের এক কোণে কারুকার্য্যময় সুন্দর সিংহাসনে রং-ঝলমল মহার্ঘ বসনে আবৃতা মেরী রাজরাজেশ্বরীর মত বসিয়া। তাঁহার কোলে উলঙ্গ শিশু একটু হাস্য-ভরা, একটু বিস্মিত উদ্বিগ্ন মুখে নতজানু উপাসক ভান দেয়ার পালের দিকে চাহিয়া। সদ্যপ্রস্ফুটিত ছোট একটি ফুলের মত এই শিশুর পাশে অতিবৃদ্ধ বনস্পতি বটবৃক্ষের মত এই নতজানু উপাসকের রেখাঙ্কিত মুখ, ভক্তিগম্ভীর মূর্ত্তি। মেরীর মুখ মধুর,—যেন কোন আলুলায়িতকুন্তলা স্নেহময়ী ফ্লেমিশ মাতা পুত্রগর্ব্ব-উৎফুল্লা হইয়া স্নিগ্ধ চোখে চাহিয়া। এক দিকে মধ্য-যুগের লৌহবর্ম্মাবৃত নাইটের বেশে সেণ্ট জর্জ্জ জয়পতাকা হস্তে খৃষ্টান ধর্ম্মের বীর রক্ষক যোদ্ধারূপে দাঁড়াইয়া। অপর দিকে চার্চ্চের পুরোহিত-প্রধানের জাঁকজমকওয়ালা সজ্জায় সেণ্ট দোনা খৃষ্টধর্ম্মের সাধক প্রচারকরূপে দাঁড়াইয়া। সেণ্ট জর্জ্জের পাশে নতজানু জর্জ্জ ভান দেয়ার পাল (Canon George Van der Paele)। এঁর আদেশে চিত্রখানি অঙ্কিত হইয়াছিল। ভান দেয়ার পালের পোরট্রেটটি কি সত্য জীবন্ত! এই বৃদ্ধ পুরোহিতের জরাজীর্ণ ধ্যান-গম্ভীর মুখের প্রতি রেখা, গিরিনদীমালাবিধৃত বনহীন নগ্ন পর্ব্বতশিখরের মত কেশহীন মস্তকের শিরা উপশিরা যেমন নিখুঁত নিপুণ-ভাবে অঙ্কিত, তেমি পুণ্য-বাইবেল হস্তে মাতৃরূপদর্শনকৃতার্থ

নবজাত যিশুখৃষ্টের পূজা (রুবেন্‌স্)

"গায়িকা দেবপরীগণ" (জন ভান আইক)

সমস্ত মূর্ত্তিটি অতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আর্টের সহিত পরিকল্পিত। জন ভান আইক যদি কেবলমাত্র এই ছবিটি আঁকিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও আর্টের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হইয়া থাকিত। অঙ্কন-নৈপুণ্যে যেমন প্রতি মূর্ত্তি সজীব, পাথরের মূর্ত্তির মত স্থূল দৃঢ়, তেম্নি রংএর সমাবেশে ছবিটি জ্বলজ্বল করিতেছে; নানা বিচিত্র বর্ণের তীব্রদ্যুতির কি ঝলমলানি! ইহার লাল শরৎ-উষার পূর্ব্বাকাশের গলিত স্বর্ণ, ইহার নীল শরৎ-মধ্যাহ্নের আকাশের গভীর নীলিমা, ইহার শুভ্রতা—রৌদ্রালোকদীপ্ত তুষারের তীব্র শুভ্রতা, ইহার কালো বৈশাখী ঝড়ের মেঘের কালো;—মনে হয়,ফ্লাণ্ডার্সের এই আদিম তৈল-চিত্রকরগণ বর্ত্তমান ইম্প্রেসনিষ্টদের মত অমিশ্রিত বিশুদ্ধ রং ব্যবহার করিয়াছিলেন; নবলব্ধ তৈল-চিত্র-অঙ্কন-জ্ঞানে উৎফুল্ল হইয়া রং লইয়া লীলা করিয়াছিলেন। এই ছবিখানির রং এত শতাব্দী পরেও কিছু ম্লান হয় নাই। মেরীর হাতের ফুলগুলি চির-অম্লান। লেশের পাড়ের মণিমুক্তাগুলি সত্যই হীরা নীলা মুক্তার মত জ্বলজ্বল করিতেছে, সেণ্ট জর্জ্জের লৌহসজ্জার ঝিকিমিকি, সেণ্ট দোনার পুষ্পিত ভেলভেট সাজের দীপ্তি চিরউজ্জ্বল রহিয়াছে। এরূপ বর্ণদ্যুতিময় চিত্র খুব কমই দেখিয়াছি।

ফসল (জরদা)

রাজার মদ্যপান (জরদা)

হান্স মেমলিং এর (১৪৩০—১৪৯৪) শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি "সেণ্ট উরজুলার পুণ্যাস্থি-আধার" (The Shrine of St. Ursula)

ভলকানের কামারশালায় ভেনাস (রুবেন্‌স্‌)

ব্রুজে সেণ্টজন হাস্পাতালের মিউজিয়ামে আছে। বারো শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টান-সন্ন্যাসিনী সেবিত এই সেণ্টজন আশ্রমে শ্রান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য মেমলিং একদিন আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তাহারি চিরকৃতজ্ঞতা-চিহ্নরূপে এই সুন্দর আর্টের জিনিষটি হাস্পাতালে রহিয়াছে। এই পুণ্যাস্থি-আধার ঘেরিয়া সাধ্বী উরজুলার জীবনের চিত্রগুলি যেমন নিখুঁতভাবে তেম্নি ভক্তির সহিত অঙ্কিত। এখানেও অঙ্কন-নৈপুণ্যের সহিত বর্ণের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। হাস্পাতাল-মিউজিয়ামে ব্রুজের বুর্গোমাষ্টার "মারতিন ভান নিভেনওভোর পোরট্রেট" (Portrait of Martin Van Nieuwenhove)

পঞ্চ ইন্দ্রিয় (দেভিদ তেনিয়ার)

মেমলিং এর একটি শ্রেষ্ঠ পোরট্রেট। কিন্তু সেই সময়ের উত্তর-ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ বণিক-নগরীর বুর্গোমাষ্টার প্রার্থনা-রত ভক্ত রূপে অঙ্কিত,—ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য বা শক্তির দম্ভের মধ্যে নয়,—গথিক চার্চ্চের এক কোণে সাধারণ সাজে করযোড়ে দীন সেবক রূপে অঙ্কিত। এখনও মধ্যযুগের ধর্ম্মভাব আর্টকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে,—বুঝা যাইতেছে, শিল্পী নিছক পোরট্রেট আঁকেন নাই,—তাহাকে প্রার্থনা-রত ভক্ত করিয়া আঁকিয়াছেন। এই পোরট্রেটের

জাকলিন ভান গাসতার (রুবেন্‌স্)

সহিত বা ভান আইক অঙ্কিত ভান দেয়ার পালের পোরট্রেটের সহিত রুবেন্স, ভান ডাইক প্রভৃতি সপ্তদশ শতাব্দীর চিত্র-শিল্পী-অঙ্কিত পোরট্রেটগুলি তুলনা করিলে প্রভেদটি বুঝা যায়। এ পঞ্চদশ শতাব্দীর শিল্পীরা যখন মেরী আঁকিয়াছেন বা যিশুখৃষ্ট, খৃষ্টান সাধু, চার্চ্চে দেবপরী, ইত্যাদি আঁকিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের চারিদিকের এই পৃথিবীর নরনারীদের দেখিয়াই, তাহাদের মডেল করিয়াই ছবি আঁকিয়াছেন। কিন্তু নরনারীদের নিছক নরনারীরূপে দেহের সৌন্দর্য্য বা রূপের প্রতিমারূপে আঁকেন নাই,—তাহাদের ধর্ম্মরসাপ্লুত করিয়া স্বর্গীয় ভাব দিয়া আঁকিয়াছেন।

পিয়ের-পল রুবেন্‌সের জগতে আসিলে বুঝিতে পারি, এখানে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই প্রধান লক্ষ্য। সুন্দর রূপ আঁকা, মানব-অন্তরের বিচিত্র ভাব-বেদনাকে রংএ রেখায় মূর্ত্তিমতী করা শিল্পীর সাধনা,—কোন ধর্ম্মবিষয় তাহার সহায় মাত্র। রুবেন্স ফ্লেমিশ আর্টের শীর্ণধারায় রেনেসাঁসের জোয়ার আনিলেন, ফ্লেমিশ ধর্ম্মভাবের সহিত গ্রীসের সৌন্দর্য্য-আদর্শ, ইতালীয়ানদের সাধনালব্ধ নব চিত্রকলা তাঁহার মধ্যে মিলিত হইল—রাফাএলের বিশুদ্ধ অঙ্কনরীতি, স্নিগ্ধ মাধুর্য্য; মাইকেল আঞ্জিলোর বিরাট ভাবোচ্ছ্বাস, রুদ্ধ গাম্ভীর্য্য;

মারতিন ভান নিভেনওভো (হান্স মেমলিং)

ভেনিস চিত্রকরদের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত দৃশ্য, রংএর মাতলামি। সেজন্য দেখি, কোন হৃদয়াবেগপূর্ণ সুখদুঃখের সংঘাতক্ষুব্ধ ঘটনাকে কোন পরমাবেদনাকে বা সুগভীর আনন্দকে বহুজনপূর্ণ বিরাট দৃশ্যে আবেগকম্পিত রেখার সুন্দর ছন্দে নানা-বর্ণের উচ্ছ্বাসে আঁকিতে এই "ফ্লেমিশ মাইকেল আঞ্জিলো"র প্রতিভা আনন্দিত, চরম পরিপূর্ণতায় বিকশিত। এইরূপ সংগ্রামের বা আনন্দের বিরাট দৃশ্যে নরনারীদের আবেগময় মূর্ত্তিগুলিকে সাজান, আলোছায়াকে ছোটবড় ছোপে লীলায়িত করিয়া দেওয়া, রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত রক্তমাংসপূর্ণ সবল মাংসপেশীবহুল বিপুল নরনারীদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছন্দে নানা ভাবের তরঙ্গ তোলা, বৃহৎ একটা প্রাণের আবেগে

কম্পিত জীবনকল্লোলময় বৃহৎ দৃশ্য আঁকা—এইখানেই রুবেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব।

"Adoration of the Magi" বা পূর্ব্বদেশের তিনজন জ্ঞানীর শিশু যিশুখৃষ্টকে পূজা, এই বিষয়টি রুবেন্সের শিল্পী মনকে বারবার অনুপ্রাণিত করিয়াছে,—এই বিষয় লইয়া তিনি অনেকগুলি ছবি আঁকিয়াছেন। মাদ্রিদ্ চিত্রশালায় এই বিষয় লইয়া এক বৃহৎ চিত্র আছে—লম্বায় সতেরো ফিট ও চওড়ায় বারো ফিট। তাহাতে আটাশজন মানুষ-প্রমাণ নরনারীমূর্ত্তি আছে। আণ্টওয়ার্পে যে ছবিটি আছে সেটিও বৃহৎ ও সুন্দর। এটি তাঁর তৃতীয় ছবি—পাকা হাতে আঁকা। লালবসনাবৃতা মেরী নগ্ন শুভ্র শিশুটিকে দুই হাতে ধরিয়া একটু নত হইয়া দাঁড়াইয়া। শিশুটির অঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে,—যেন একখণ্ড হীরক জ্বলজ্বল করিতেছে, মেরীর পেছনে জোসেফ ব্রাউন সজ্জায়। সম্মুখে প্রথমে নৃপতি রক্তবর্ণ কুসানের উপর নতজানু হইয়া দেবশিশুকে একটি ধূপাধার নিবেদন করিতেছে। রাজার রঙীন পোষাকের ওপর একটি শুভ্র উত্তরীয় জড়ান,—দীপ্ত মুখে দ্যুতিময় শিশুর দিকে চাহিয়া আছে। তাহার এক পার্শ্বে ইথোপিয়ার রাজা জ্বলজ্বলে চোখে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া। তাহার সবুজ সজ্জার ওপর কালো ওভারকোট, কালো দাড়ি, মাথায় মোটা পাগড়ি;—তাহাকে অনেকটা ওথেলোর মত দেখাইতেছে। অপর দিকে তৃতীয় নৃপতি, শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ, বৃহৎ রক্তবাসাবৃত; হস্তে এক সোণার ফুলদানি। তাহাদের পেছনে জ্ঞানিগণ বিমুগ্ধভাবে দেবশিশুর দিকে চাহিয়া। আস্তাবলের দরজার গোড়ায় বর্ম্মাবৃত হেলমেট-পরিহিত সৈনিকেরা, দরজার খুঁটি ধরিয়া ঝুঁকিয়া ভৃত্যেরা। সব পেছনে দুই উঠের পিঠে নগ্নবক্ষ উঠ-চালকেরা উৎসুক বিস্মিতভাবে ঘাড়ে ঘাড়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া শিশুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে। সমস্ত ছবিটি যেমন বিচিত্র রংএর একটি অপূর্ব্ব সঙ্গীত, তেম্নি বিভিন্ন মূর্ত্তির ভাবদীপ্ত রূপের সজ্জিত সমাবেশে সুন্দর ঐক্যে গড়া। ছবির প্রান্তে গরুর মুখটিও কি সুন্দর!

"ক্রুশ হইতে অবতরণ" চিত্রটি আণ্টওয়ার্পের ক্যাথিড্রেলে আছে। এরূপ চিত্র গির্জ্জার মধ্যে রাখাই ঠিক। চিত্রটি একটি অতলস্পর্শ মানবঅন্তরবেদনার রূপ। সেখানে ভাষা নীরব, হৃদয় মূক। রুবেন্সের যিশুখৃষ্ট তপঃক্লিষ্ট দীর্ণদেহ নন; তিনি সুঠাম সবল দৃঢ়মাংসপেশীবহুল। যিশুখৃষ্টকে রুবেন্স কত রূপে আঁকিয়াছেন,—বিশেষ করিয়া যিশু-জীবনের পরমা বেদনাময় দৃশ্যগুলি! নীরব বীরের মত জীবন উৎসর্গের চিত্র ক্রুশে যিশু, যিশুর ক্রুশে আরোহণ, ক্রুশ হইতে অবতরণ।

ক্রুস হইতে অবতরণ (রুবেন্স্)

"ক্রুশ হইতে অবতরণ" চিত্রটি কি গভীর অনুভূতির সহিত অঙ্কিত! এই পরম ড্রামাটিক দৃশ্যের মধ্যে কোন থিয়েটারী ঢং নাই। সকলের মুখে করুণ, গম্ভীর; সকলের মূর্ত্তি শান্ত, নির্ব্বাক। যিশুর সুঠাম সুন্দর দেহ ক্রুশকাষ্ঠ হইতে ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িতেছে—প্রচণ্ড ঝড়ের পর ভগ্ন দীর্ঘ শালবৃক্ষ বাতাসের আঘাতে যেমন অতি ধীরে পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়া যায়। তাঁহার ডান হাত খসিয়া বাঁকিয়া গেছে—যেন

একটি মৃণাল ভাঙিয়া পড়িতেছে। ঘাড়ের ওপর মাথাটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। শান্ত মুখটি সুখসুপ্ত শিশুর শুদ্ধ মুখের মত। বাম হস্ত এখনও ক্রুশে পেরেকে বিদ্ধ। উপরে একটি লোক পা সিঁড়িতে রাখিয়া খসিয়া-পড়া গুরুর পবিত্র দেহ শ্রদ্ধার সহিত ধরিয়া আছেন। তাঁহার পাশে সাধ্বী মাদালেন নতজানু হইয়া সুন্দর পা চুম্বন করিতে উদ্যতা। সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া জোসেফ ধীরে নামিতেছেন। উদাসিনী মেরী শোকাকুল শূন্য নয়নে স্খলিত দেহের দিকে চাহিয়া তাঁহার বক্ষে টানিয়া লইবার জন্য দুই বাহু বাড়াইয়াছেন। সমস্ত দৃশ্যটি কি বিশুদ্ধতা, গাম্ভীর্য্যের সহিত আঁকা! শিল্পী যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী ব্যক্ত করেন নাই। কি শুদ্ধ সংযত রেখাগুলি! এরূপ দৃশ্যের বেদনা অনুভূতির অতলতাকে কে প্রকাশ করিতে পারে!

"মিষ্টিক মেষশাবক" (জন ও হুবার্ট ভান আইক)

ব্রাসেল্‌সের চিত্রশালায় রুবেন্‌সের অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে। তাদের মধ্যে তিনখানি ছবির কথা বলিব।

"ভল্‌কানের কামারশালায় ভেনাস" একটি সুন্দর লিরিক, —সৌন্দর্য্যদেবী ভেনাস নগ্ন শিশু কিউপিড্‌কে হাতে ধরিয়া অগ্নিদেব ভলকানের কামারশালার সম্মুখে দাড়াইয়া। ভাদ্রের ভরা নদীর পর যৌবনরসপূর্ণ নিটোল সুন্দরী ভেনাসের মূর্ত্তি অন্ধকার কামারশালার মুখে জ্বলজ্বল করিতেছে, যেন দগ্ধীভূত লৌহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি জমাট বাঁধিয়া এই রমণীরূপলাবণ্য হইয়াছে; ভেনাসের পাশে এক বলিষ্ঠ মাংসপেশীবহুল নর-ছাগ্ বনদেবতা (satyre) বনের সকল সুমিষ্ট ফলের অর্ঘ্য লইয়া নতজানু; ভেনাসের পেছনে দুই অনাবৃতবক্ষ নিম্ফ, মস্তকে ধান্যমঞ্জরীর মুকুট, একজনের

চারিটি নিগ্রোর মাথা (রুবেন্‌স)

শ্লথ বস্ত্রভাগ দাঁত দিয়া আটকাইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। রক্তবস্ত্রপরিহিত আর একজন লোক পেছনের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া ঝুলিয়া-পড়া হাতটি ধরিয়াছে। তলায় সেণ্ট জন এক

স্কন্ধে ফলপরিপূর্ণ ডালি। অগ্নিদেবের কামারশালাতে নারীরূপের বহ্নি সকল অগ্নিদীপ্তিকে ম্লান করিয়াছে। এরূপ দ্যুতিময় দেহকে এরূপ রক্তমাংস-ফাটিয়া-পড়া রমণী-রূপলাবণ্যকে রুবেন্‌সের মত আর কোন্ চিত্রশিল্পী আঁকিতে পারিয়াছেন?

"জাকলিন ভান গাসতার" চিত্রটিতে রুবেন্‌সের নিখুঁত নিপুণভাবে কাজ করিবার ও পোরট্রেট আঁকিবার ক্ষমতার পরিচয় পাই। ফ্লেমিশ-লেস-সুন্দর ফ্লেমিশ-বেশ-পরিহিতা এই ফ্লেমিশ নারীর পোরট্রেটে রেমব্রাণ্টের পোরট্রেটের মত আত্মার কোন রহস্য-উদ্ঘাটন নাই বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বাস্তব কাজের দিক দিয়া ছবিটি চমৎকার।

চেয়ে ফ্লেমিশ। রুবেন্‌স্ যে চিত্রকরের নিকট চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, জরদাঁও সেই ভান নুর্টের শিষ্য। তিনি কখনও ইতালী যান নাই। রেনেসাঁসের প্রভাব এড়াইতে না পারিলেও তিনি ফ্লেমিশ আর্টের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। রুবেন্‌সের মত জরদাঁও মানবজীবনের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরা, তবে তিনি সংগ্রামক্ষুব্ধ বা বেদনাময় দৃশ্য আঁকেন নাই। তাঁহার ছবি সব নিছক সুখসম্ভোগের দৃশ্য, pastoral, হাস্যে খুসিতে ভরা। ব্রাসেল্‌সের চিত্রশালায় তাঁর "রাজা মদ্যপান করিতেছেন" ছবিটি কি স্ফূর্তির উচ্ছ্বাসে ভরা! কিন্তু তাহা মাত্‌লামীর বীভৎসতা হয় নাই। ভান আইকরা এ ছবিখানি দেখিলে কি বলিতেন! নিছক

জর্জ্জ ভান দেয়ার পাল (জন ভান আইক)

ম্যাডোনার উপাসনা (জন ভান আইক)

"চারিটি নিগ্রোর মাথা"র ছবিটি হইতেও রুবেন্‌সের পোরট্রেট আঁকার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কি জীবন্ত, কি ব্যক্তিত্বে ভরা প্রতি মুখ! অথচ এই মুখগুলি নিছক ফটোগ্রাফি নয়—তাহারা একটি সৌন্দর্য্যপিপাসু চিত্রশিল্পীর চোখ দিয়ে দেখা। মানবজীবনকে আঁকা,—তাহার উল্লাস, তাহার সৌন্দর্য্য-ভোগ-সুখ, তাহার কামনা, বেদনা, আনন্দকে আঁকা রুবেন্‌সের আর্টের সাধনা। এই 'চারিটি নিগ্রোর মাথা' ছবিতে তাহারই একটি রূপ দেখিতে পাই।

জাক জরদাঁ (Jacques Jordaens)—(১৫৯৩ ১৬৭৮) রুবেন্‌সের মত শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী না হইলেও, তিনি রুবেন্‌সের

মদ খাওয়ার তীব্র সুখকে, মানবের একটি ইন্দ্রিয়ের পরমা তৃপ্তিকে কি উল্লসিত ভাবে আঁকা!

কনিষ্ঠ দেভিদ তেনিয়ার (David Teniers the younger, ১৬১০-১৬৯০)এর ব্রাসেল্‌সের চিত্রশালায় "পঞ্চ ইন্দ্রিয়" ছবিটি এইরূপ একটি জীবনের সুখ-সম্ভোগের চিত্র। তেনিএ ব্রাসেল্‌সেই বাস করিতেন। তাঁর মধ্যে ফ্লেমিশ আর্টের একটি সুন্দর বিকাশ দেখা যায়। 'প্রিমিটিভ'দের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও সত্যকে আঁকিবার অধ্যবসায়, ষোড়শ শতাব্দীর ফ্লেমিশ চিত্রকরগণের জীবনের হাস্য-পরিহাস দৃশ্য আঁকার সুখ তাঁহার মধ্যে নব রূপ লাভ করিয়াছে। কোন রূপকবে

বা রুবেন্‌সের মত কোন বিরাট মহান দৃশ্যকে আঁকা নয়, সাধারণ জীবনের ক্ষণিক সুখের মুহূর্ত্তকে তাহার সহজ হাস্য-পরিহাসকে, গ্রামের কোন অনাড়ম্বর উৎসবকে, গরীব লোকদের সরল হাসিখুসিময় জীবনলীলাকে খুঁটিনাটির সহিত ও অন্তরের প্রেম মানবতার সহিত আঁকাতেই তাঁর প্রতিভা গৌরবান্বিত। 'পঞ্চ ইন্দ্রিয়' ছবিটি এক মধ্যবিত্তের গৃহে সন্ধ্যার সহজ সরল উৎসবের কি সুন্দর শান্ত দৃশ্য। একজন উৎফুল্ল হইয়া গান ধরিয়াছে, একজন সন্ধ্যার কাগজ পড়িতেছে, একজন খাওয়াতেই মত্ত, একজনের মদ খাওয়ার তৃষ্ণার বিরাম নাই, আর কোণে দু'জন একটু প্রেমালাপ করিতেছে; এক ফ্লেমিশ পরিবারের পারিবারিক উৎসব-সন্ধ্যার কি জীবন্ত মধুর ছবি!

জরদাঁর 'ভরা ফসল' ছবিটির কথা বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। সুফলা ফ্লান্ডার্সের ভূমিলক্ষ্মীর প্রতি উচ্ছ্বসিত জয়সঙ্গীত এই চিত্রখানি দেখিয়া বুঝিতে পারি, জরদাঁকে কেন ফ্লেমিশ-প্রাণের চিত্রকর বলা হয়। এ যেন ফ্লান্ডারস শরৎলক্ষ্মীর ফলাবনত বৃক্ষ ফসল-ভরা ক্ষেত্রের উৎসব। ছবিটিতে এক দিকে একটি হৃষ্টপুষ্ট কৃষক তাহার শ্রমলব্ধ সম্পদ অপর্য্যাপ্ত ফলমূল শস্যের বৃহৎ ডালি পৃষ্ঠে বহন করিয়া বসিয়া আছে, অপর দিকে এক নরছাগ আঙুর-মঞ্জরী মাথায় জড়াইয়া আঙুর-গুচ্ছ-হাতে এক উল্লসিত উলঙ্গ কৃষক বালককে পৃষ্ঠে লইয়া উৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছে। মধ্যে ভূমি লক্ষ্মী তাঁর সকল সম্পদ কৃষকদের গৃহে গৃহে দান করিয়া আপনাকে নিরাভরণ নিরাবরণ করিয়া রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষাগুচ্ছবক্ষ কৃষক-রমণীর প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া। তাঁর অমল অঙ্গ অরুণ কিরণে ঝলমল। ঘাসের ওপর এক স্খলিত-বসনা বনদেবী আঙুরের রূপদর্শনমুগ্ধা। এই সৃষ্টির প্রাচুর্য্য, আলোর উজ্জ্বলতার মধ্যে বনদেবীদের সহিত কৃষকরমণীদের মধ্যে কৃষকদের সহিত উপ-দেবতাদের সম্মিলনে, উপকথার সহিত গ্রামের ফসলের উৎসব মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। সুন্দর এই চিত্রখানি।

অজানা

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল

অস্ফুট ভাবের ভাষা, অজানায় প্রকাশিতে চায়;
আকুল আকাঙ্ক্ষা তাই ঘুরে ঘুরে ঠাঁই নাহি পায়।
ছায়াপথে যেন নীহারিকা,—এ ভাবের কোথায় বিকাশ?
শূন্যে শুনি প্রতিধ্বনি,—বিশ্ব যেন করে উপহাস।
কল্পনার দীপ্ত বিম্ব অসীমায় ফুৎকারে উড়াই;
নিশ্বসিত উষ্ণ তাপ ছায়া-লাগা বিশ্বাসে পুড়াই।
সরায়ে আঁধার ধাঁধা এস সত্য আত্ম মহিমায়;
ফুটায়ে ভাবের ভাষা ছুটে যাই স্নিগ্ধ অসীমায়।

অবিরাম বিশ্বগতি নিরবধি কি খুঁজিতে যোঝে?
বনের মর্ম্মর-বাণী উদাস বাতাস নাহি বোঝে।
আলোকের খরস্রোত কেন দূর-দূরান্তে সন্তরে?
আপন প্লাবনে প্রেম ভেসে যায় আপন অন্তরে।
কি ভবিষ্য বিকাশের সূচনায় অজানার ছুটি;
উল্লাসের কি আশ্বাসে ত্রাসে-ভরা উৎসবেতে জুটি!
চেতন বা অচেতন ভেসে যায় একই তীব্র টানে;
প্রকাশিত হও সত্য একবার বুঝি তার মানে।

দুঃখ আসি করে সিক্ত আমাদের জীবনের ভূমি;
রোপিছ অশেষ শস্য, হে অদৃশ্য, সেথা নিত্য তুমি।
পরিপুষ্ট দুঃখ-রসে অলস আনন্দ ওঠে বেড়ে;
অফুরন্ত অনুরাগে প্রাণ জাগে বিশ্বে মাথা নেড়ে।
মরণের চরণের প্রান্তে গিয়ে সকলে দাঁড়ায়;
শ্রান্তি এসে তার পাশে স্নিগ্ধ মন্ত্রে ঘুমটি পাড়ায়।
দুঃস্বপ্নে তবুও কেঁপে দুঃখ চেপে কেঁদে ওঠে প্রাণ।
হে সত্য, কর গো ব্যক্ত কি স্বার্থে আসে সে অবসান।

অঙ্গে অঙ্গে বিশ্ব বাঁধা, প্রাণ যেন প্রাণে গাঁথা আছে;
তবু যেন দূর হতে ভাসা-স্রোতে যেতে চাই কাছে।
আকাঙ্ক্ষার রক্ত বর্ণে রঞ্জি' ভাষা—প্রাণের নিশান;
এই ধ্বজা বিশ্ব মাঝে তুমি নিজে উড়াও ঈশান।
দুঃখ-চেনা হে অজানা, ফুটে ওঠ ব্যক্ত বেদনায়;
আলিঙ্গিব সারা ধরা প্রাণ-ভরা পূর্ণ চেতনায়।
বোধ্য কর রুদ্ধ বাণী, মুক্ত উৎসে যুক্ত কর প্রাণ;
এস সত্য নিত্য ব্যাপ্ত, সুপ্ত জড়ে জাগ ভগবান।

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

৩০

যে নার্স স্বর্ণলতার সেবার ভার লইয়াছিল সে আরতি। ডাক্তার সেনের সাহায্যে সে ডাক্তারী পড়িতেছিল, কিন্তু পরীক্ষা পাস করিবার মত তার মানসিক শক্তি আর বাকি ছিল না, তাই লেডি ডাক্তারের পরিবর্ত্তে সে একজন শিক্ষিতা নার্স পর্য্যন্তই হইতে পারিয়াছিল ; আর সে হইয়াছিল, ডাক্তার সেনের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। তাঁর নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতির সেই ছিল যেন প্রধান সহায়। এবারও এই শক্ত কেসটা তিনি ইহার উপরে নির্ভর করিয়াই হাতে লইয়াছিলেন। আরতি কিন্তু স্বপ্নেও জানিত না যে কোন্ বাড়ীতে কাহার সেবা তাহাকে করিতে হইবে।

সেদিন অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিত রূপে স্বর্ণলতার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিয়াই সে যেন অস্থির হইয়া উঠিল। তার সর্ব্বত্যাগী মন যে তার নূতন জীবনে আজও কিছুমাত্র অভ্যস্ত হয় নাই, তার পরিত্যক্ত অতীত আজও যে তার জীবন-খাতার পাতা হইতে মুছিয়া যায় নাই, এই একটী মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে যেন তাহা স্পষ্ট করিয়াই দেখিতে পাইল। এই যে আত্মকাহিনী এই মেয়েটী তাহাকে অতি বিশ্বাস করিয়া শুনাইল, এ তো তার কাছে অজানা রহস্য নয়! ওই যে সুন্দরী যুবতী পত্নীর নৈশ-শয্যায় বিমনা পুরুষের চিত্র সে আঁকিয়া দেখাইল, সেই অশ্রুত দীর্ঘশ্বাসের আতপ্ত বায়ু আরতির চিত্তকে যে এক মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া দিল। তার বহু বহু পূর্ব্বের সেই এক শীত-রাত্রির নৈশ আবিষ্কার মনে পড়িয়া গেল—

"I love you love you, dear Fanny!" তার মনে পড়িয়া গেল, বিমুখী নারীর পদপ্রান্তে নতজানু প্রত্যাখ্যাত পুরুষের করুণ কাতর কণ্ঠস্বর ; তার মনে পড়িল, তার জীবন-মৃত্যুর মহাযুদ্ধের সেই একক যোদ্ধা,—সেই ত্যাগ পূত তাপস। অসহ্য যন্ত্রণার সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করিয়া আরতি স্থান কাল পাত্র বিস্মরণ হইয়া গিয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিল।

সে যে তাঁর জন্যই তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছে! সে কি রকম ছাড়িয়া আসা,—অতি হৃদয়হীন নীচ কৃতঘ্নের মতই ছাড়িয়া আসা! পাছে তিনি জানিতে পারেন, তাই প্রাণ বাহির হইতে চাহিলেও, এ তিন বৎসর ধরিয়া তার পৃথিবীর শেষ বন্ধন মঞ্জুকে শুদ্ধ সে চোখে দেখিতে চেষ্টা করে নাই, তার একটু সংবাদও লয় নাই—সে কি এই জন্যে? তার সেই কর্ম্মফলে তিনি তো সুখী হইলেনই না, মাঝে হইতে এই আর একটা নিরপরাধা নারী গভীর দুঃখে ডুবিয়া মরিতে বসিয়াছে! আর এই সমস্তর মাঝখানে এমন করিয়া সে কি না আবার কোথা দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া জড়াইয়া পড়িল।

আরতি তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। কখন আসিয়া জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল—আবার উঠিয়া তৎক্ষণাৎ অস্থির পদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া অকারণেও সে চমকিয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছিল,—কে যেন আসিবে,—কি যেন ঘটিবে—অথচ কিছুই যেন তার সুস্পষ্ট নয়।

জলের কুঁজা ঘরেই ছিল, আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া সে জল পান করিল, তৃষ্ণা গেল না ; ভিতরটা যেন শুকাইয়া উঠিতেছে, সমস্ত দেহের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতেছে— বাহিরের জলে তার দাহজ্বালা নিবৃত্ত হইবে কেমন করিয়া?

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বাহিরে শীতের জড়তা বাতাসের গায়ে ঈষৎ লাগিয়া রহিয়াছিল ; কিন্তু মানুষের মনে তার একটু কণাও সে স্পর্শ করাইতে পারে নাই। দোকানে দোকানে শীতের পোষাক ঝুলিতেছে, তাদের চমৎকার রংয়ে স্বতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু দোকানীর নিজের গায়ে কলিকাতার শীতে একটা খাকি সার্টই যথেষ্ট হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ বাড়ীর বারান্দায় অপূর্ব্ব সাজসজ্জায় সজ্জিতারা শীতের রাত্রিকে উপেক্ষা করিয়া পাতলা রংদার হাল্কা ব্লাউস-শাড়ীতে নিজেদের পরীটি করিয়া তুলিতে প্রাণপণ করিয়াছে। আরতি দেখিল, কতকগুলি ছোট মেয়ে নিকটস্থ কোন

পার্কের ফেরৎ চাকরের সঙ্গে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে হাত দোলাইয়া পরস্পর হাসাহাসি করিতেছে। তার এমন দিনের কথা—চট্ করিয়া তার মনে পড়িয়া গেল। হায় রে!—

ফেরিওয়ালারা মাথায় করিয়া হাতে বহিয়া কতরকম জিনিষ বিক্রি করিয়া বেড়াইতেছে। কাহারও পিঠে বই কাগজের বা কাপড়ের বোঝা, গলায় রকমারি সুর। বিচিত্র বর্ণের এবং বিবিধ নামযুক্ত মোটরবাসগুলা খন্‌খন্ শব্দ করিয়া দেখিতে দেখিতে কোথায় যেন দৈত্যের মতন উধাও হইয়া যাইতেছে।

* * * *

মোড়ের কাছে আসিয়া রাস্তা ক্রশ করিতে গিয়া সে একখানা ছয় সিলিণ্ডারের নেপিয়ার চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। ক্রুদ্ধ তর্জ্জনে তাহাকে তিরস্কার করিয়া সে যেন তাহাকে এই কথাটী বলিয়া গেল,—'বিজ্ঞানের প্রভাবে আমার সৃষ্টি—ধনীর সুখের জন্য এর মাঝখানে, হে পাদচারী পথচারী পথিক! তোমাদের স্থান কোথায়? তোমরা হয় আমার গতিপথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া যাও—নতুবা মর!'

ডাক্তারের সহিত সে দেখা করিল। তিনি তাহাকে এমন অসময়ে নিজের কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া এখানে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তার মুখ দেখিয়া একটা কিছু বিশেষ অশুভ আশঙ্কা করিলেন। বলিলেন, "ফোন না করে নিজে চলে এলে কেন?"

আরতি কহিল, "ফোন করে সে কথা বলবার নয় বলেই এসেছি। আপনি যে আমায় বলেছিলেন সরোজবন্ধু গুপ্তর স্ত্রীর সেবার ভার আমায় দিচ্চেন, সরোজবন্ধু গুপ্তর বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমায় থাকতে হবে, তা তো নয়। উনি তো সরোজবন্ধুর স্ত্রী নন, ও বাড়ী তো সরোজবন্ধু গুপ্তর নয়।"

ডাক্তার সেন মনে মনে ঈষৎ বিস্মিত হইলেন। আরতিকে এরূপ উত্তেজিত হইতে তিনি একদিনও দেখেন নাই। প্রকাশ্যে মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন "বাড়ী কার তা' ঠিক আমি অবশ্য জানি না,—তবে স্ত্রী যে উনি সরোজবন্ধু গুপ্তেরই তা' আমি তোমায় হলপ করেই বলতে পারি। এই দেখ বরঞ্চ তোমার রোগীর স্বামী এই কতক্ষণ মাত্র পূর্ব্বে আমায় যে চিঠি লিখেছেন তা' এই তো টেবিলেই পড়ে রয়েছে—"

এই বলিয়া ডাক্তার তাঁর সাম্‌নের টেবিলের উপরকার ছড়ান রাশি রাশি কাগজপত্রের উপর হইতে একখানা খাম-খোলা চিঠি তুলিয়া লইয়া আরতির সামনে ধরিলেন—

"এই দেখ মালতী! তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই, সরোজবন্ধুবাবু নিজেই লিখচেন—My wife Sarnalata ইত্যাদি—উনি যখন নিজেই ওঁকে তাঁর স্ত্রী বলে স্বীকার করে নিচ্চেন, তখন, তুমি আমিই বা অস্বীকার করতে যাই কেন? যাক্ এখন বোধ করি তোমার বিশ্বাস হলো।"

আরতি আকৃষ্ট চক্ষে সেই বহুদিন পরে দেখা সলিলের পরিচিত চির-অবিস্মৃত হস্তাক্ষরের প্রতি চাহিয়া ছিল। এ লেখা নিশ্চয়ই তাহারই; কিন্তু নাম সই রহিয়াছে, সরোজবন্ধু বলিয়া! সে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তবে কি তার বুঝিবার ভুল? স্বর্ণলতার কাহিনীর সহিত তার সম্পর্কিত কথার সাদৃশ্য থাকিলেও, আসলে এ দুইটা বিভিন্ন? সে তার মিথ্যা মনের উত্তেজনায় অনর্থক তার আশ্রয়দাতা স্নেহশীল প্রভুকে দোষারোপ করিতে আসিয়াছে?

কিন্তু না, সুন্দরাদিদি বলিয়াও তো স্বর্ণলতা তার ননদের উল্লেখ করিয়াছিল! হয় ত সরোজ নামই সলিলের আসল নাম—সম্ভব!

ডাক্তার সেন তীক্ষ্ণনেত্রে তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে-ছিলেন। আরতি চোখ তুলিয়া চাহিতেই তিনি পুনশ্চ মৃদু হাস্যের সহিত কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছুতেই ঠিক বিশ্বাস হচ্চে না, না? কিন্তু কেন?"

আরতি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই ঈষদ্দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—

"কিন্তু দেখুন, আমায় আপনি আপনার সেবা-ভবনের ভারই দেবেন বলেছিলেন, প্রাইভেট নার্সিং কর্ব্বার তো কোনই কথা ছিল না। তবে কেন আমায় ওখানে দিলেন?"

ডাক্তার এবার হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'গিলটী অর্ নট গিলটী' বিচার তুমি আমার করবেই! কেমন? কিন্তু মালতী! তোমার হাতে না দিলে, মিসেস্ গুপ্তর আজ এই সাত দিনে যে উন্নতিটা হয়েচে, আর কারুর দ্বারা তা হতে পারতো? কাজেই করি কি বল না, তোমায় ওখানে না দিয়ে? না হলে তোমায় এখানে না রাখায় আমার কি না ভারি লাভ! সমস্ত ভারই তো এসে আমার ঘাড়েই পড়েছে। আচ্ছা কেন বল দেখি? মেয়েটী বুঝি তোমায় কিছু বলেছে? কিন্তু সে রকম যে

হতে পারে, সে ত তুমি প্রথম থেকেই জানতে, আমি ত তোমায় সে কথা বলেছিলাম—"

বাধা দিয়া আরতি প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না, সে কিছুই বলেনি, বরঞ্চ সে আমায় আশাতিরিক্ত ভালবেসেছে, বিশ্বাস করেছে; কিন্তু আপনার কাছে হাজার-বার ক্ষমা চাইচি ডাক্তার সেন! দয়া করে অন্য কারুকে ওখানে পাঠান, আমি ওখানে কিছুতেই থাকবো না।"

ডাক্তার সেন আরতির আবেগ-আরক্ত উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সাশ্চর্য্যে ডাকিলেন—"মালতী!"

আরতি ম্লানভাবে চাহিল, উত্তর করিল—"আজ্ঞে!"

ডাক্তার কহিলেন,—"মালতী! তুমি জানো আমি তোমায় আমার নিজের ছোট বোনের মত দেখি,—সেই রকমই স্নেহ করি।—কিন্তু তুমি মুখে যতই বলো, কাজে আমায় সে ভাবে দেখ না। তা' দেখলে আমার কাছ থেকে নিজেকে অতখানি ঢাকা দিয়ে আড়াল করে রাখতে পারতে না।—আমি জানি, তোমার জীবনে কোন একটা কিছু গোপন রহস্য আছে। তুমি তা' আমায় বলোনি, আমিও কোনদিন জানতে চাইনি, আজও চাইবো না। কিন্তু আজও আবার তোমায় বলে রাখছি,—বলা যখনই দরকার বোধ করবে, তোমার বড় ভাইকে, তোমার বিশ্বস্ত বন্ধুকে—অসঙ্কোচেই তা' বলো,—দরকার না থাকে, আমারও জানবার কোন কৌতূহল নেই।—কিন্তু এই সরোজবন্ধুর স্ত্রীর চিকিৎসার ভার যখন আমি নিয়েছি, এখন ছাড়া আমার পক্ষে অসাধ্য! অসম্ভব! এ আমি পারবো না—এর জন্য আমার প্রাণপণ করতে হবে।—কিন্তু তোমার উপরই আমার সমস্ত ভরসা,—সেই একমাত্র ভরসাতেই অত বড় রোগী আমি হাতে নিয়েছি। মেয়েটীর কি অবস্থা জানো? ওর হার্টের এমন অবস্থা যে এতটুকু সামান্য উত্তেজনাতেই ওর হার্টফেল করতে পারে। আমি যতদূর বুঝেছি, ওঁর স্বামীর সঙ্গে ওঁর ততদূর সদ্ভাব নেই, এবং তার জন্য দায়ী ওঁর স্বামী। তিনি হয় ত যতদূর উচিত, ততটা ভালবাসতে পারেন নি, অথচ মেয়েটীও অত্যন্ত বেশী ভাব-প্রবণ এবং অভিমানী। এতটুকু ত্রুটী ওঁর সয় না। আমি সেই জন্যেই ওঁকে ওঁর শরীরের এ অবস্থায় ওঁর স্বামীর সঙ্গে স্বতন্ত্র থাকাই সঙ্গত বোধ করে এই ব্যবস্থা করেছি। এদিকে শাশুড়ীকেও মেয়েটী ঠিক ভাল চোখে দেখে মনে হলো না। এখন তুমি ভিন্ন কে ওকে স্নেহে, আদরে, সেবায়, সাহচর্য্যে, ভুলিয়ে আশা দিয়ে, উৎসাহিত করে—আরোগ্যের পথে ঠেলে দিতে পারবে, বল? ওর যে জিনিষটীর দরকার ঠিক সেইটীই যে ভগবান তোমার মধ্যে দিয়ে পাঠিয়েছেন, সব্বাইকে তো তিনি অতটা দয়া দেখান নি। বুদ্ধি বিদ্যা ও সহানুভূতি এর একত্র সমাবেশ আর আমি কোথায় পাবো মালতী?"

আরতি আর একটীও কথা বলিতে পারিল না। এই যে দৃঢ় নির্ভরতা, অপরিসীম বিশ্বাস, এর কাছে নিজের কোন লাভ-ক্ষতির হিসাব করিতে বসা কি যায়? এ পৃথিবীতে সর্ব্বহারা সে,—এই যে মহচ্চরিত্রের আশ্রয় ও শ্রদ্ধালাভ করিয়াছে—এটুকু হারাইলে আর তার এই ছন্নছাড়া অভাগা-জীবনে বাকি রইলই বা কি?

ডাক্তার সেন উৎসুক নেত্রে তার চিন্তা-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন; তাহার চলচ্চিত্ততা তিনি বুঝিতে পারিলেন, উঠিয়া আসিয়া সস্নেহে তার অবনত মুখের উপর নিজের সহানুভূতিভরা দৃষ্টি রাখিলেন। কহিলেন—"যদি বেশি ক্ষতি হবে মনে করো, তবে না হয় থাক,—কিন্তু তোমার উপরেই ওর মরা-বাঁচা—নির্ভর করছি।"

আরতি তথাপি কথা কহিল না।

ডাক্তার সেন ডাকিলেন, "মালতী!"

আরতি তার গভীর বিষাদপূর্ণ মুখ তুলিল।—

ডাক্তার বলিলেন, "থাক, আমি অন্য ব্যবস্থা করবো,—তুমি এইখানেই ফিরে এস—"

আরতি তখন মনস্থির করিয়াছে, ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল,—"না, সে হয় না, আমাকেই থাকতে হবে।"

ডাক্তার মুখে আর কিছুই বলিলেন না, শুধু সশ্রদ্ধ প্রশংসার সহিত তার সেই অতি ম্লান অথচ স্থির প্রতিজ্ঞায় অবিচল মুখের দিকে বারেক মাত্র চাহিয়া দেখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৩১

সলিল আসিয়া স্ত্রীকে দেখিয়া খুসী হইল। স্বর্ণলতার সেই অস্বাভাবিক রক্তহীন শ্বেত মূর্ত্তি ইহারই ভিতর যেন একটুখানি স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তার চেয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তার মুখভাব। সেই

সদা-অপ্রসন্ন রুক্ষ শুষ্ক ভাব আজ আর তাহাতে আদৌ নাই। অভিমানাশ্রু-পরিপ্লুত দুর্ব্বলতা-ক্লান্ত চক্ষে আজ তার সহজ সানন্দ দৃষ্টি। সলিলকে দেখিয়া তাহা অভিমানভরে নিমীলিত না হইয়া পূর্ণানন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে তার সমুদায় রোগ-দুর্ব্বলতা পরিহার পূর্ব্বক সহজ ভাবেই উঠিয়া বসিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। প্রফুল্ল-হাসিমুখে মিষ্টস্বরে কহিল, "এসো—এসো—"

কণ্ঠে তার সুপ্রচুর হৃদয়ানন্দ উছলিয়া পড়িল। সলিল দেখিয়া একান্ত বিস্মিত ও প্রীত হইল। ডাক্তার সেন কি কোন যাদুবিদ্যা জানেন না কি? সেও সহাস্যে কাছে আসিয়া তাহাকে সস্নেহে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিল,— "এইবারে তুমি সেরে উঠবে সোনা!—"

"কই, তুমি আমায় তো এতখানি ভাল থাকার জন্যে কোন প্রাইজ দিলে না?"

"কে বল্লে দিলুম না!"—বলিয়া সলিল তাহাকে হাসিয়া চুম্বন করিল।

স্বর্ণলতা স্বামীর আদরের দ্বিগুণ প্রতিদান করিয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি বড্ড বেশি হিসেবী।—"

সলিল এবার তার শীর্ণ কপোল আদরে চুম্বনে ভরাইয়া দিয়া তার দুর্ব্বল হস্ত নিজের উভয় হস্তে তুলিয়া লইয়া সস্মিত মুখে কহিল, "হিসেবী নই, সোনা! বরং সাবধানী বলতে পারো। যাহোক লতি! ডাক্তার সেন লোকটী যেন যাদুকর! না?"

স্বর্ণলতা নিজের আর একখানি অস্থিসার শীর্ণ হস্ত দিয়া তার সুস্থ সুন্দর যুবক স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার গরদের পাঞ্জাবী পরা কাঁধের উপর নিজের সুদৃশ্য কবরী রচিত মাথাটী রাখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল—"ডাক্তার সেন নন, তাঁর অনুচরীটী তাই বটে! তাকেই বরঞ্চ একটী যাদুকরী বলতে পারো।"

সলিল ঈষৎ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "সে আবার কে?"

স্বর্ণলতা কহিল, "সেই তো সব। তোমার ডাক্তার আমার কি করেছে? এমন চমৎকার মানুষ আমি আর কক্ষনো দেখিনি। দেখবে তুমি? ডাকবো তাকে? মালতী?"

সলিল ব্যস্ত হইয়া নিজের কণ্ঠ হইতে তার স্ত্রীর সেই শীর্ণ হাতের—বাসি হওয়া ফুলের মালার মতই বাহুপাশ খুলিয়া ফেলিয়া ঈষৎ সরিয়া বসিতে গেল, ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল— "না, না, পাগল না কি! তাকে কেন? আমি তাকে দেখে কি করবো?"

স্বর্ণ স্বামীর কাছে সরিয়া আসিয়া তার কোলের উপর নিজেকে এলাইয়া দিয়া ব্যাকুলভাবে কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা থাক, ডাকবো না, তুমি আমার কাছে—খুব কাছে থাক।—"

কিন্তু তার সেই একবারের ডাকেই মালতী আসিয়াছিল, দ্বারের কাছে পরদার পিছনে গভীর দ্বিধা লজ্জা ও একান্ত বিরক্তিপূর্ণ অনিচ্ছার সঙ্গেই সে দাঁড়াইল। তার মন যেন তখন গভীর সন্দেহের ঘূর্ণাবর্ত্তে সঘনে পাক খাইতেছিল। সত্যই এ ব্যক্তি সলিল কি না? যদি তার সন্দেহই সত্য হয়, যদি এ সলিল হয়, তবে কোন্ মুখে সে তার সামনে গিয়া দাঁড়াইবে? এবং তার সেই দাঁড়ানর ফলও যে কি ভাবে ফলিবে তাই বা জানে কে? ডাক্তার সেনের প্রতি তার একটা মর্ম্মান্তিক রাগ হইতে লাগিল। এমন সময় তার সামনের ঘরে পর্দ্দার পিছনের দিক হইতে একটা সশব্দ চুম্বনের শব্দের সহিত তার পরিচিত সেই অবিস্মৃত কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শুনিল—

"কাছেই তো রয়েছি সোনা! ভগবান তোমায় ভাল করে দিন, চিরদিন আমার কাছেই থাকবে।"

স্বর্ণ কহিল,—"তুমি যদি এম্নি করে আমায় আদর করো, এম্নি করে আমায় কথা বলো, আমি কেন ভাল হবো না? আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

"কি?"

"তুমি কি বিয়ের আগে আর কারুকে ভালবাসতে?"

আরতি নিজের কাণে আঙ্গুল গুঁজিয়া দিতে গেল, তার হাত যেন অবশ হইয়া গিয়াছে,—সরিয়া যাইতেও চেষ্টা করিল, পা তার উঠিল না। এমন সময় সে শুনিতে পাইল, স্বর্ণলতা বলিতেছে,—"ওই দেখ, তুমি চমকে উঠলে! তোমার মুখ কি রকম হয়ে গেল! না না, রাগ করো না, সত্যি লক্ষ্মীটি! আমায় মাপ করো, আমার যেন মনে হয়, তুমি যেন আমায় নিয়ে সুখী হওনি, তাই বলে ফেলেছি, আর বলবো না। আমার চেয়ে তুমি আর কারুকে বেশি ভালবাস, এ আমি ভাবতেই পারি নে। এ যদি সত্যি হয় —আমি মরে যাব।"

"ছিঃ সোনা!—"

আরতি এই ব্যথাহত কণ্ঠও যে অনেকবারই শুনিয়াছে।

ডাক্তার আসিলে তাঁর রোগী একান্ত আনন্দিত চিত্তে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, "আবার আমি কবে ওঁকে দেখতে পাবো বলুন না?"

ডাক্তার একটুখানি স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "এই রকম দেরি করে করে দেখলেই তো ভাল হয়।"

ঈষৎ দুঃখিত হইয়া স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তা হলে খুব ভাল লাগে।"

স্বর্ণ একটু লজ্জা পাইল। তার ডাক্তারের সঙ্গে প্রথম দেখার দিনটা মনে পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে লজ্জা সম্বরণ করিয়া মৃদু মৃদু উত্তর করিল, "না হলেও লাগবে।"

ডাক্তার নিজের পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষার খাতিরে ভিতরের ব্যঙ্গহাস্য রুদ্ধ করিয়া বাহ্য গাম্ভীর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি বেশি বেশি এলে, কথাবার্ত্তা বেশি কয়ে শরীর অসুস্থ করবেন না?"

স্বর্ণ ডাক্তারকে এ সব কথা বলিতে লজ্জা বোধ করিতে থাকিলেও, স্বামীকে কাছে পাওয়ার দুরন্ত লোভে লজ্জা জয় করিয়া লইয়া উত্তর দিল, "তা' কেন করবো,—রোজ যদি একবার করে আসেন, আমি শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে যাব।"

ডাক্তারের মন হয় ত উত্তর দিল, তাই যদি, তবে এতদিন ভাল হয়ে যাওনি কেন? কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি উত্তর করিলেন,—

"বেশ, ক্রমশ তাই-ই হবে। তবে এখন আপাততঃ হপ্তায় দুদিন করে তিনি আপনাকে দেখতে আসতে পারবেন। আচ্ছা আর কোন আত্মীয়কে দেখতে চান কি?"

স্বর্ণলতা একটুখানি কি ভাবিল, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল,—"সে এখন না হয় থাক, আসচে হপ্তায় একদিন সুন্দরা দিদিকে আসতে বলবেন। এবার বরং তার বদলে ওঁকেই আর একদিন যেন দেখতে পাই।"

"বেশ—"বলিয়া ডাক্তার গম্ভীরমুখে বাহিরে আসিলেন, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে একরাশি কৌতুকহাস্য চাপা দেওয়া ছিল। মনে মনে কহিলেন, "তোমার পক্ষে এই ঔষধই ধন্বন্তরী হবে।"

এদিকে আরতি আসিয়া কঠিনমুখে দাঁড়াইল। মুখ দেখিয়াই ডাক্তার সেন তাহার বার্ত্তা বুঝিয়াছিলেন; স্মিত-হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবর কি?"

আরতি আরক্ত মুখে কহিল,—"আপনি যে বলেছিলেন, এ বাড়ীতে কোন পুরুষ থাকবে না, তা ওঁকে তো ওঁর স্বামীর নিত্য আসার অনুমতি দিয়ে এলেন। তা হলে আমার ব্যবস্থাটা কি রকম করা স্থির করেছেন?"

ডাক্তার সেন ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি কি অতটাই পর্দ্দানশীন?"

আরতি এই প্রশ্নাঘাতে ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া পুনশ্চ দৃঢ়ভাবে উত্তর করিল,—"নয়ই বা কেন? যার তার কার সাম্‌নেই বা আমি বার হয়ে থাকি, যে আপনার এই স—স—সরোজবাবুর সাম্‌নেই আমাকে বেরুতে হবে? না, আমি সে পারবো না।"

ডাক্তার সেন তার উত্তেজনার আরক্ত ও প্রদীপ্ত মুখের দিকে বিস্ময়ভরে চাহিয়া দেখিলেন। তার পর স্নিগ্ধকণ্ঠে ধীর-ভাবে কহিলেন, "আমি এখন তোমার হাতের মুঠোয় এসে পড়েছি,—যা তোমার ভাল বোধ হয় করো, তোমাকে না হলে যে এর চলবে না, সে ত তুমিও দেখতে পাচ্ছো? না, না? একটা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে চাও, না মরতে দিতে ইচ্ছা করো? যা তোমার পছন্দ হয় তাই করো, আমি আর বেশি কি বলবো?"

আরতির উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই রাস্তায় তাঁর চলন্ত মটরের গতিশব্দ গর্জ্জিত হইয়া উঠিল। উপরের ঘর হইতে ডাক আসিল—

"মালতী! ও ভাই মালতী! তুমি কোথা ভাই?—"

আরতির বোধ হইল সে যেন চিরদাসত্বপণে আত্ম-বিক্রয়ের চুক্তি-পত্র সই করিয়া দিয়াছে, এখান হইতে তার মুক্তির কোন উপায় নাই। [ক্রমশঃ]

বিবিধ-প্রসঙ্গ

নিরীশ্বরবাদ ও ধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ

মানব-চিন্তার ধারাগুলি নানা প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। অন্ততঃ এই দেশে যতগুলি ধর্ম্মবিষয়ক এবং দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহারা, হয় উহাদের প্রবর্ত্তকের ব্যক্তিগত সংস্কার, না হয় জাতিগত সংস্কার, না হয় কোন একটি বিশেষ প্রতিভাশালী দার্শনিকের অলৌকিক প্রতিভাসম্ভূত বলিয়াই এখনও এতদ্দেশীয় মানব-মণ্ডলীর ভাব-জগৎ অধিকার করিয়া আছে ; এবং ব্যক্তিগত, জাতিগত প্রভৃতি সংস্কারের প্রভাব ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক প্রভাব সেই ধারাগুলিকে এইরূপ বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে যে, তাহাদিগকে উন্মূলিত করা এবং তাহাদিগের স্থলে কোনও নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা যে শুধু এই দেশে এবং এই সময়েই মাত্র খাটে তাহা নহে, ইহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসময়েই সত্য। কারণ, মানব-মন ও চিন্তাশক্তি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসময়ে কয়েকটি স্থূল বিষয়ে সাধারণভাবাপন্ন এবং এই কারণেই কোন নূতন চিন্তার ধারা পুরাতনের সম্পর্কে আসিলেই একটি বিষম অসামঞ্জস্য বা বিরোধ প্রতিভাত হয়। হয় ত ঐ অসামঞ্জস্য বা বিরোধ বাস্তবিক নহে, প্রতিভাস মাত্র। কিন্তু চিন্তা-স্বভাব বা চিন্তাভ্যাস অন্যান্য অভ্যাসের মত দুরতিক্রম্য ; সেইজন্যই অভ্যস্ত চিন্তার বিরুদ্ধ কোনও ভাব প্রকৃত সত্য হইলেও সহজে, এবং দুঃসাহসিকতা ব্যতিরেকে, আমাদের নিকট আদর পায় না। আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়টিও সেই অভ্যস্ত চিন্তাধারার আপাত-বিরোধী মাত্র ; কিন্তু যাঁহারা অভ্যস্ত চিন্তার জড়তার হাত হইতে মুক্তির জন্য প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের নিকট নিরীশ্বরবাদ ও ধর্ম্ম এই দুইটি শব্দ, জল ও অগ্নি, আলোক ও অন্ধকার অথবা জড় ও চেতন এই শব্দযুগ্মের মত অপরিহার্য্য বিরোধিভাবের পরিচায়ক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব যে, কোন দার্শনিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদকে কোনও বিশিষ্ট কাল বা দেশ বা অপরিহার্য্য চিন্তাভ্যাসের দ্বারা বিকৃত বা সীমাবদ্ধ হইতে দেওয়া প্রকৃত দার্শনিকতার পরিচায়ক নহে। এবং এইরূপ দূরদৃষ্টির সহিত দেখিলে, নিরীশ্বরবাদ ও ধর্ম্ম এই দুইটির মধ্যে প্রকৃত বিরোধ নাই ; অর্থাৎ যেখানে সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর ও তদ্বিষয়ক ভক্তির প্রসর নাই তথায় ধর্ম্ম হইতে পারে না এইরূপ নহে। ঈশ্বরবাদে ধর্ম্ম হইতে পারে ; কিন্তু অনীশ্বরবাদেও ধর্ম্মের অপ্রসক্তি নাই।

উক্ত কথাটির মর্ম্ম বুঝিতে গেলে প্রথমতঃ দার্শনিক মতবাদের সহিত ধর্ম্মজীবনের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনীয়। পক্ষান্তরে কোন কোন দর্শন ধর্ম্মের সহিত এমনই ওতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, ধর্ম্ম বাদ দিলে উক্ত দার্শনিক মতবাদের কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না। আবার ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যেখানেই ধর্ম্মজীবনকে প্রাবল্য বা আধিপত্য দেওয়া হইয়াছে, সেইখানেই ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের ন্যায় মৌলিক দার্শনিকতার অভাব হইয়াছে। আবার কোন কোন সময়ে দর্শনের ক্ষেত্র হইতে ধর্ম্মের ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিয়া পরস্পরকে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল কথা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক মতবাদ ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ উক্ত দার্শনিক ও ধর্ম্ম-সাহিত্যে কিরূপে আলোচিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। এবং উহা করিতে হইলে ধর্ম্ম শব্দটি কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও দেখিতে হইবে,—দেখিতে হইবে যে কি কি উপাদান বা গুণ অথবা অবস্থার সমবায়কে ধর্ম্ম নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম এই কথাটি আমাদের নিকট এতই পরিচিত যে আমরা উহার মর্ম্ম বুঝিবার প্রয়াস করার আবশ্যকতা ততটা বুঝিতে চেষ্টা করি না। বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্ম শব্দটি ভারতীয় মানস-ক্ষেত্রকে এরূপ ভাবে অধিকার করিয়া আছে যে, উহাকে বিশেষ ভাবে বুঝিবার জন্য ব্যতিরেকী ন্যায়ের (Law of contradiction) সাহায্য লইয়া উহা হইতে অন্য বা পৃথক্ বস্তু বা অধর্ম্ম কি তাহা বুঝিবার প্রয়াস যথোচিত পরিমাণে লওয়া হয় না। ধর্ম্ম শব্দের ব্যাপক অর্থ সকল সময়ে লওয়া হয় নাই। কোন কোন স্থলে উহাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া লইয়া কেবল এক সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎকর্ত্তা বিরাট পুরুষের প্রতি ভক্তি ও উপাসনাকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধরা হইয়াছে। যে যে স্থলে এই শেষোক্ত অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই সেই স্থলের সত্যাসত্যতা নির্ণয় করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

এক্ষণে ধর্ম্ম এই শব্দটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন ও ধর্ম্ম-সাহিত্যে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা যাউক। ইংরাজীতে সাধারণতঃ Religion এই কথাটি ধর্ম্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়। Religion কথাটির সাধারণ লক্ষণ এই যে, এক অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান্ চেতন জগৎকর্ত্তা বিরাট পুরুষ বিদ্যমান্ আছেন, যাঁহার প্রতি আমাদের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই বৃত্তিনিচয় নিয়োজিত করিতে হইবে। কিন্তু এই Religion শব্দটিও সঙ্কীর্ণ বা একদেশদর্শী ; সুতরাং উহাকে "উপধর্ম্ম" এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। মীমাংসাদর্শনকার ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষং স্যাৎ" (পূর্ব্ব মীমাংসা

১।৩।১) অর্থাৎ ধর্ম্ম, শব্দ বা বেদমূলক, যাহা বেদ-বিরুদ্ধ অর্থাৎ যাহা বেদে নাই তাহা অনপেক্ষ অর্থাৎ পরিত্যাজ্য। কিন্তু ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ঐকমত্য দেখা যায় না। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে কতকগুলিতে ঈশ্বরাস্তিত্ব এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও উপাসনা পর্য্যালোচিত হইয়াছে। ঐগুলিকে ভক্তিবাদী দর্শন বলা যায়। আবার কতকগুলিতে ঈশ্বর-স্বরূপ প্রমাণিত হয় নাই বা ঈশ্বর নিরাকৃত হইয়াছেন অথবা একটি নিম্নস্তরে অবস্থাপিত হইয়াছেন। এইরূপে পাশ্চাত্য দর্শনের কতকগুলিতে ঈশ্বরবাদ প্রবল যুক্তিসহকারে স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে, আবার যাঁহারা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন,—ইঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় এখন প্রাচীনপন্থীদের অপেক্ষা বেশী বই কম নহে,—ইঁহাদের মতে ঈশ্বর ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবন থাকিতে পারে এবং ভালরূপেই থাকিতে পারে। ভারতীয় দর্শন যাঁহারা পর্য্যালোচনা করেন তাঁহাদের ইহা অবিদিত নাই যে, ন্যায়-দর্শনকার গৌতম জগৎ-রচনা-কৌশল দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বকারী জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর আছেন ইহা প্রমাণ করেন। ভক্তিবাদী বেদান্ত-ব্যাখ্যাতৃগণ যথা, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি ঈশ্বরোপাসনাই ধর্ম্ম-জীবনের সার প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু সাংখ্যকার সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয় না বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার দর্শন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু জীবাত্মার উপর প্রকৃতির প্রভাবে কিরূপ আবর্জ্জনা পড়িয়া উহার নিজস্ব স্বচ্ছ চিন্ময় স্বরূপকে কলুষিত করে এবং কিরূপে আত্মা ও প্রকৃতির পার্থক্যজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কলুষের বিনাশ সাধন হয়, এই সমস্ত ব্যাপার যোগশাস্ত্র-কথিত ধ্যান ধারণা, আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাদি এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতির সহিত মিলিয়া একটি প্রকাণ্ড জ্ঞান ও কর্ম্ম-জীবনের আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছে। শঙ্করও জ্ঞানের আদর্শ লইয়া একটি প্রকাণ্ড সাধনার জীবনের আদর্শ আমাদিগকে দিয়াছেন। তিনি জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরকে একেবারে নির্ব্বাসিত না করিলেও একটি নিম্নস্তরে স্থান দিয়াছেন,—তাঁহাকে তিনি অন্যান্য অবিদ্যাপ্রসূত বস্তুর ন্যায় মায়াসৃষ্ট রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পারমার্থিক সত্যের চক্ষে ঈশ্বরের স্থান শাঙ্কর-দর্শনে নাই। অথচ শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধন-সিদ্ধ ব্যক্তি নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তায় ধর্ম্ম-জীবনের চরম উৎকর্ষ লাভ করেন। এখানে ধর্ম্ম জ্ঞানের আদর্শে অনুপ্রাণিত। অবশ্য ভক্তিবাদী ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাতৃগণ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর অথবা বিষ্ণু ও নারায়ণকে ভক্তি ও উপাসনার লক্ষ্য রূপে নির্দ্দেশ করিয়া মানবের মনোজগতে অপর একটি আদর্শ অর্থাৎ ভক্তির আদর্শ পরিস্ফুট করিয়াছেন মাত্র। এইরূপে যেমন সাংখ্য ও শাঙ্কর বেদান্তে প্রধানতঃ জ্ঞানের আদর্শকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ রামানুজ প্রভৃতি দর্শনকার ভক্তির আদর্শকে চরম স্থান অধিকার করিতে দিয়াছেন।

এইরূপে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন,—যাহাকে আমরা নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী আখ্যা দিয়া থাকি,—তাহাতে ঈশ্বরের প্রকৃতি, গুণাবলী ও উপাসনার ব্যবস্থা না থাকিলেও মানব-জীবনের একটি তৃতীয় মহান্ আদর্শ পূজিত হইয়া থাকে। সে আদর্শ কর্ম্মের বা চরিত্রের আদর্শ। বৌদ্ধ ও জৈনের প্রধান লক্ষ্য হইল কিরূপে সাধু-জীবন গঠন করা যায় এবং উহা জীব-জগতের হিত-সাধনে কিরূপে নিয়োজিত করা যায়। বৌদ্ধ দেখাইতেছেন যে, কোন বস্তুরই নিরবচ্ছিন্ন সত্তা নাই। সকল বস্তুই আকাশে ভাসমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় ক্ষণিক এবং আমাদের এই জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ আমাদের অবিদ্যা ও বাসনার ফল মাত্র। সুতরাং এই অবিদ্যা ও বাসনার হাত এড়াইয়া জন্মমৃত্যু-প্রবাহ ও এই জগৎপ্রপঞ্চ দূরীভূত করিয়া যাহাতে নির্ব্বাণ লাভ হয় তজ্জন্য অহিংসা মৈত্রী মুদিতা প্রভৃতির দ্বারা মানবজাতির সেবায় নিযুক্ত থাকাই ধর্ম্মের চরিতার্থতা। জৈন বলেন, আমাদের কর্ম্মই জীবাত্মার কলুষের কারণ এবং সেই কলুষ ধ্বংস করিয়া জীনত্ব লাভ করিতে হইবে। জীনত্ব আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও উহা কর্ম্মের জড়ত্ব ও আবর্জ্জনায় আবিল ভাব ধারণ করে, এবং সেই আবিলতা ধ্বংস করিয়া স্বাভাবিকী অনাবিলতা অর্জ্জন করিতে হইবে। উহা জীবাত্মার সাধ্যাতীত নহে; কিন্তু সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র রূপ ত্রিরত্নের সাধনে উহা লাভ করা যায়। ফল কথা বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের স্থান নাই বটে, কিন্তু উহাতে মানব-জীবনের কর্ম্মের বা চরিত্রের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই হেতুই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম মানবজাতির একটি সুবৃহৎ অংশকে এক সময়ে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যাহার প্রভাব এখনও স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায়।

পাশ্চাত্য দর্শনগুলিরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাহাকে পাশ্চাত্য ভাষায় Theistic Religions অর্থাৎ সেশ্বর ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা পাশ্চাত্যে সকল সময়ে ও সকল দেশে ছিল না, বর্ত্তমানেও অনেক মনীষীর মতে উহা অস্বীকৃত হইতেছে। সেশ্বর ধর্ম্ম পাশ্চাত্য দেশে যীশুখৃষ্টের প্রভাবেই প্রচার লাভ করে, তাহার পূর্ব্বে গ্রীক ও রোমান আমলে সেশ্বর ধর্ম্ম, অর্থাৎ যাহাতে ঈশ্বর এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শক্তি, যাহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য ও উপাসনা নিয়োজিত করিতে হইবে,—এরূপ ধর্ম্মের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। মহামতি প্লেটোর মতে ভগবান্ বিরাট পুরুষ নহেন, তিনি মানব-হৃদয়ের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের আদর্শের সমবায় মাত্র। Marcus Aurelius-এর মতে জ্ঞান-সহকৃত কর্ম্মের আদর্শই ধর্ম্ম। Spinoza-র ন্যায় গভীর দার্শনিকও সর্ব্বশক্তিমান বিরাট পুরুষ রূপে ঈশ্বরকে ভাবিতে না পারিলে ধর্ম্মজীবনের চরিতার্থতা হয় না, এ কথা কোনও স্থলেই বলেন নাই। অনেক সময়ে এই কারণেই ঈশ্বরবাদী দার্শনিকেরা তাঁহার Pantheism-কে Atheism অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদ এই আখ্যা দিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই—যেন তাঁহার দর্শন ব্যক্তিত্ববান্ ঈশ্বরের স্থান না রাখায় ধর্ম্ম-জীবনের পরিপন্থী। অথচ তাঁহার দর্শন, যাহাকে তিনি "Ethicus" অর্থাৎ মানব-জীবনের কর্ম্মের আদর্শ বলিয়া বুঝিয়াছেন,—তাহা একটি প্রকাণ্ড জ্ঞানকর্ম্মের অর্চ্চনা মাত্র। তাঁহার দর্শনে ধর্ম্মের অভাব বলা ও শাঙ্কর বেদান্তে ধর্ম্মের অভাব বলা বোধ হয় একই কথা। এইরূপে Kant যুক্তিজালে যাবতীয় ঈশ্বরাস্তিত্ববিধায়ক প্রমাণগুলিকে একে একে খণ্ডন করিয়া ফলনিরপেক্ষ কর্ম্ম-জীবনই যে মানবের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম স্থূলতঃ তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। Fichte,

কান্টের আদর্শকে আরও বড় করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। তাঁহার মতে এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে একটি কর্ম্মের আধার আছে, যাহার উপর উহা প্রতিষ্ঠিত। এইরকম খুব আধুনিক কয়েকজন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতবাদ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কেহ কেহ জ্ঞানের আদর্শকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া তথাকথিত ঈশ্বরের নির্ব্বাসন বিধান করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, যদি মানুষকে ঈশ্বর বলিয়া কাহারও উপাসনা করিতে হয় তাহা হইলে সে ঈশ্বর তাহার নিজের মানস-সম্ভূত মঙ্গলের আদর্শ ভিন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎকর্ত্তা রূপ অপর কোন অস্তিত্ববান বিরাট পুরুষ নহেন (Russell's Mysticism and Logic p. 50)। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি ক্রমবিকাশের নিয়মের ফলস্বরূপ। সেই ক্রমবিকাশ ধারাবাহিক নহে, এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় আসিতে যেন একরূপ আকস্মিকতা দেখা যায়। তাঁহারা এই ক্রমবিকাশের নাম দিয়াছেন Emergent Evolution। এই মতে প্রতি বস্তু ও অবস্থা তাহার পূর্ব্বতন অবস্থার অপেক্ষা কোনও বিশেষ গুণ আহরণ করিয়াছে। স্থাবর অবস্থা হইতে জীব-জগৎ, জীব-জগৎ হইতে চেতন-জগৎ—এইরূপে এই Emergent Evolution এর ফলে আবির্ভূত হইয়াছে। আবার চেতন জগতের পরবর্ত্তী বিকাশ হইলেন ভগবান্। সুতরাং এই মতে ভগবান্ জগৎস্রষ্টা নন; কিন্তু এ জগতের অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তিনি অন্যতম। (Alexander's Space, Time and Deity)। এ স্থলে যে কয়েকটি পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতবাদ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নিরীশ্বরবাদ প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম-জীবনের বিরোধী নহে। ঈশ্বর ব্যতিরেকে ধর্ম্মজীবন চলিতে পারে, অনীশ্বরবাদেও ততটা ধর্ম্মের স্থান আছে যতটা সেশ্বর মতবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান যুগে নিরীশ্বরবাদে অপর একটি চরম ভাব লক্ষিত হইতেছে। মার্কিন দেশে, যাহাকে আমরা নূতন জগৎ বলি,—যাহা কি মনস্তত্ত্বে, কি সমাজতত্ত্বে, কি বিজ্ঞানে, কি ধর্ম্মতত্ত্বে, নূতনত্বের আকর—সেই মার্কিন দেশে উক্ত চরম প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে; যাহার ফলে মার্কিন দেশীয় অনেক দার্শনিক এই প্রশ্ন তুলিতেছেন যে, ধর্ম্ম-জীবনের সঙ্গে তথাকথিত ভগবান্ বা ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ আছে কি না। ভগবানের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াই তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি বা উপাসনা নিয়োজিত করিতে হইবে? অথবা আমাদের জীবন-যাত্রার কতকগুলি আবশ্যকতা বা অভাব পূরণের নিমিত্ত অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ঈশ্বররূপ একটি বস্তুর কল্পনা করিতে হইবে? যাঁহারা আধুনিক মার্কিন চিন্তার গতি পর্য্যালোচনা করেন তাঁহারা আমাদের উক্ত বাক্যের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হইবেন। এমন কি এইরূপ পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার প্রতিপাদ্য বিষয়—Mischiefs which Religion has done to mankind অর্থাৎ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মভাব মানব-জাতির কি কি অনিষ্ট করিয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এই যে, মানব মন যদি কোন একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম-প্রবণতার বশীভূত হইয়া তাহার অনুপ্রাণনা অনুসারে যাবতীয় বস্তুনিচয়, কার্য্য-কারণভাব, সামাজিক ও নৈতিক সম্বন্ধ-বিনিময়ের মূলে একটি অলৌকিক তত্ত্বকে জড়াইয়া ধরিয়া উহাদের সমাধান করিতে চায়,—এবং এ পর্য্যন্ত যেভাবে করিয়া আসিয়াছে,—তাহা হইলে কোনও বস্তুরই নিরপেক্ষ লৌকিক জ্ঞান সম্ভবপর হয় না, মানবও তাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুতরাং অলঙ্ঘনীয় সত্যপ্রকাশক জগতের স্বরূপ ও তদন্তর্গত বস্তু-নিচয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে একেবারে অন্ধ থাকিতে বাধ্য হওয়ায় প্রকৃত ছবি দেখিতে পায় না, কেবল উহার বিকৃত ভাবই নয়নের সমক্ষে উপস্থিত হয়। যদি এইরূপ একদেশদর্শিতা ও অতীতপ্রিয়তা মানব-মনকে গণ্ডীবদ্ধ না করিয়া ফেলিত, তাহা হইলে হয় ত দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য ও কলা ভাবান্তর ধারণ করিয়া জগতের একটি পৃথক্ ছবি আমাদিগকে দেখাইত।

প্রতিক্রিয়ার এইরূপ চরম অবস্থা স্বীকার না করিয়াও, উহার মূলে যে মনস্তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানবীয় বৃত্তিগুলির বিকাশ ও পরিপুষ্টি মানবের অস্তিত্ব ও জীবন-যাত্রার অনুকূল ভাবের উপর নির্ভর করে। এই আনুকূল্য তাহার সামাজিক, নৈতিক, সাহিত্যিক ও কলা-বিষয়ক আদর্শের দ্বার দিয়া বিকাশ লাভ করে; এবং ঠিক এইরূপেই ঐ প্রকার আনুকূল্যই তাহার ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলে। মানব-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিকের অভাব ও আবশ্যকতা পূরণের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের সংগঠন মানব-জীবন নিজেই করিয়া লয়। সুতরাং মানবের উপাস্য দেবতা বা ভগবান্ তাহারই নিজের গড়া আদর্শের প্রতিচ্ছবি মাত্র। মনস্তত্ত্ববিদেরা মোটামুটি মানবের মনো-জীবনের তিনটি বিভাগ অনুসারে তিনটি আদর্শ স্বীকার করেন; যথা, জ্ঞানের আদর্শ, ভক্তির আদর্শ ও কর্ম্মের আদর্শ। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই সূচিত করিয়াছি। অতএব এই কথাটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর-বাদ অর্থাৎ যে বাদে সর্ব্বশক্তিমান জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর মানবের ধর্ম্ম-জীবনের উপাস্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন তাহাতে কেবল মানব-জীবনের আদর্শত্রয়ের কোন একটি বিশিষ্ট আদর্শ অর্থাৎ ভক্তির আদর্শ বিগ্রহ লাভ করিয়াছে মাত্র। সুতরাং যে বাদে ঈশ্বরের স্থান নাই অথবা থাকিলেও নিম্নস্তরে আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্ম নাই, এ কথা বলিলে মনোবিজ্ঞানের একটি প্রসিদ্ধ তথ্যের বিরুদ্ধতাচরণ করা হয়। অদ্বৈত বেদান্ত বা সাংখ্য বোধ হয় এই মনস্তত্ত্বের অনুসরণ করিয়াই সর্ব্বশক্তিমান জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের স্থান অতি নিম্নে দিয়াছেন অথবা একেবারেই দেন নাই। এই মনস্তত্ত্ব অনুসারেই প্রতীচ্য জগতের বহু মনীষী জ্ঞানের আদর্শকে ঈশ্বর স্থানে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকেই ভগবদ্ভাবে পূজা করেন। এই মনস্তত্ত্ব অনুসারেই আমাদের দেশে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় কর্ম্ম বা চরিত্রের আদর্শকে ভগবানের আসনে বসাইয়া তথাকথিত আস্তিক ও ব্রাহ্মণ্য দর্শন ব্যাখ্যাতৃগণের নিকট নাস্তিক এই গ্লানিকর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে; অথচ অন্যান্য তথাকথিত সেশ্বর ও আস্তিক মতবাদ-গুলির অপেক্ষা তাহাদের সাধন বা ধর্ম্ম-জীবনের বিবরণ কোন অংশে ন্যূন নহে। এই বিষয়ে আরও অনেক বক্তব্য সত্ত্বেও আমরা আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার এই বলিয়া করিতে পারি যে, ধর্ম্ম শব্দটি একটি ব্যাপক শব্দ। ইহার দ্বারা মাত্র ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা বুঝিতে হইবে না; ইহা আধিভৌতিক ও অধ্যাত্ম জগতের আদান-প্রদানে

সমুদ্ভাসিত মানব-জীবনের আদর্শগুলির সম্যক্ অনুসরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ঈশ্বর-ভক্তি ধর্ম্মের সমস্তটাই অধিকার করিতে পারে না। উহা বহু আদর্শের মধ্যে অন্যতম আদর্শমাত্র। বোধ হয় অনেকটা এইরূপ অর্থ লক্ষ্য করিয়াই "তৈত্তিরীয় আরণ্যক" ধর্ম্মের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা········ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্"। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের এইপ্রকার ধর্ম্মলক্ষণে ঈশ্বরভক্তি রূপ সঙ্কীর্ণ বা একদেশদর্শী আদর্শের ছায়াও নাই; বরং নিখিল স্থাবরজঙ্গমাত্মক জাগতিক সত্তানিচয়ের যাহাতে প্রতিষ্ঠা বা সার্থকতা সেইরূপ আদর্শের ছবি পরিলক্ষিত হয়। অতএব আমরা বলিতে পারি, ঈশ্বরভক্তি ব্যতিরেকেও ধর্ম্মজীবনের সম্ভাবনা আছে, যেমন ঈশ্বর-ভক্তিতেও ধর্ম্ম হইতে পারে। এবং আরও বলিতে পারি যে, মানবের মনো-জীবনের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি রূপ আদর্শত্রয়ের সম্যক্ উদ্ভাবন ও অনুশীলনই প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-জগতের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং ঐ প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকল বস্তুরই সেবায় পরিণত হয়। উহা অধুনাতন Democracy of S cial Righteousness অর্থাৎ সার্ব্বজনীন সামাজিক নীতিপরায়ণতা—এইরূপ আদর্শ অতিক্রম করিয়া আরও উর্দ্ধে অবস্থিত। ঐ ধর্ম্মের নাম আমরা দিতে পারি বিশ্বসেবা, এবং সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদগণ লক্ষ্য করিবেন যে, এই প্রকার ধর্ম্মই যুগধর্ম্ম। ইহারই নাম বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা।

বাঙ্গালীর রান্নাঘরের সমস্যা

শ্রীমুকুলরাণী রায়

অনেকেই বলিয়া থাকেন—রান্নাঘরের সাজ-সরঞ্জাম ও সুব্যবস্থা যথেষ্ট আয়ের উপর নির্ভর করে। তাহা আংশিকভাবে সত্য। রান্নাঘরের জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারেই গিন্নীর কার্য্যতৎপরতা ও মানসিক শিক্ষা ও সংস্কার প্রকাশ পায়। রান্নাঘরের কাযগুলি শিক্ষা ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ এবং মহাদায়িত্বপূর্ণ। এই জন্য ঠাকুর চাকরের উপর নিজেদের ও ছেলেমেয়েদের জীবন-রক্ষার ভার দিয়া কোন গিন্নীই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। রান্নাঘরের কাজগুলি যদি অনায়াসে ও অল্প সময়ে সম্পন্ন করা যায়, তবে অনেক গিন্নীই উহা আনন্দের সহিত করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে সকল কাজে, সময় ও পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। আমাদের রান্নাঘরের কাজেও যদি পরিশ্রম ও সময়ের লাঘবতা হয়, তবে আমাদের ঘর-সংসার আরো সুখের হইবে। এ বিষয়ে অনেক ভাববার আছে। বাঙ্গালী ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের লোকদের খাওয়ায় বিশেষ জটিলতা নাই। তাহারা সাধারণতঃ খিচুড়ি কিম্বা রুটির সহিত ডাল বা একটী তরকারী (ভাজি) আহার করে। আর বাঙ্গালীর রান্নাঘরে নানা জিনিস প্রস্তুত করিতে বাঙ্গালী গিন্নীকে সকাল হইতে দুপুর, এবং রাত্রিতে প্রায় ৮।১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। অথচ বাঙ্গালীর খাদ্য মুখরোচক হইলেও স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। পাঞ্জাবীদের সাদাসিদা খাদ্য পৃথিবীতে আদর্শস্থানীয়। প্রকৃতপক্ষে রান্নাঘরের সমস্যাই আমাদের বাঙ্গালীর জাতীয় সমস্যা।

খাদ্য—আহারের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ শরীরের উত্তাপ-রক্ষা, শক্তি-উৎপাদন, শরীর-বৃদ্ধি, ক্ষুধা-নিবৃত্তি এবং শরীরের অপচয় নিবারণ। সাধারণতঃ এই পাঁচটী উদ্দেশ্য সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের খাদ্য নির্ব্বাচন করিলে—আমরা অল্প খরচে ও অল্পায়াসে উপযুক্ত খাদ্য পাইতে পারি। বিভিন্ন খাদ্যের বিভিন্ন গুণ। কোন খাদ্য বেশী উত্তাপজনক, কোনটা বা বেশী শক্তি উৎপাদক, আবার কোন কোন খাদ্যে শরীরের বৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ নানাপ্রকার জিনিসের মিশ্রিত উপাদেয় খাদ্যে উক্ত পাঁচটী উদ্দেশ্য সফল হয়।

নিম্নলিখিত ছয় প্রকার খাদ্যের সাধারণতঃ আমাদের প্রয়োজন। ১। কার্ব্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার বা চাউল আটা জাতীয় খাদ্য। ২। প্রোটীন বা মাছ, মাংস, ডাল, ডিম, দুধ। ৩। স্নেহজাতীয় খাদ্য, যথা, তেল ঘি মাখন। ৪। জল। ৫। লবণ। ৬। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ—শাক-সব্জি, তরকারী ও ফল। ইহাদের পরিমাণ—প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, পেশা, আকৃতি এবং ঋতু ভেদে বিভিন্ন প্রকার হয়। যাঁহারা সর্ব্বদা বসিয়া বসিয়া মানসিক পরিশ্রম করেন—তাঁহাদের জন্য উত্তাপ উৎপাদক মাছ মাংস যেমন দরকার—আবার কয়লা মিস্ত্রি ঝি চাকর মালী মজুর প্রভৃতি শারীরিক শ্রমজীবীদের জন্য মাছ মাংস তত দরকারী নয়। কেন না শারীরিক পরিশ্রম হেতু শ্রমজীবীদের মাংসপেশীতে যত উত্তাপ জন্মে, শারীরিক শ্রমবিহীন মানসিক শ্রমজীবীদের শরীরে তত তাপ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং তাহাদের জন্য তাপ উৎপাদক মাংস জাতীয় খাদ্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। শীতকালে মাংস জাতীয় খাদ্যের অধিক দরকার। শিশুদের শরীর বৃদ্ধির জন্য খাদ্য দরকার; কিন্তু বৃদ্ধের শরীর রক্ষার জন্য মাত্র খাদ্যের প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে খাদ্যের "ভিটামিন" বিষয়ে খুব আলোচনা হইতেছে। শরীর পুষ্ট রাখিতে "ভিটামিন" খুব দরকার। এই ভিটামিন দুধ দই ক্ষীর মাখনে, মাছ মাংস ডিমে, মোটা আটা চাউল ডালে, নানা তরকারী বিলাতি বেগুন পিয়াজ আলু বিশেষতঃ বাঁধা কপিতে, ছোলা মুগের অঙ্কুরে, লেবু আপেল কলা নারিকেল প্রভৃতি ফলে, বর্ত্তমান থাকে। দুধই বিশেষ ভাবে সুখাদ্য—প্রত্যেকেরই প্রত্যহ দুধ খাওয়া উচিত। যে পরিবারে ৬।৭ জন লোক আছে, তাহাদের পক্ষে বাড়ীতে গাই রাখা বিশেষ কষ্টকর নয়।

উনুন ও ধোঁয়া

বড় বড় সহরে গ্যাস ও ইলেক্ট্রিক ষ্টোভে এবং কোন কোন গ্রামে কাঠের আগুনে রান্না হইলেও কয়লাই এখন আমাদের প্রধান ইন্ধন। কয়লার আগুন করিবার সময় ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয় এবং রান্নাঘরের ছাদ দেওয়াল জানালা ঝুলে ভরিয়া যায়। তাহাতে ধূলা ও রোগ-বীজাণু জমিয়া স্বাস্থ্যের বড়ই অপকার করে। সে জন্য চিমনি-সংযুক্ত রান্নাঘরের বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাড়ীওয়ালাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে ভাড়া

দারের অনেক অসুবিধা দূর হয়। রান্নাঘরের অনেক জানালা থাকা ভাল, তাহাতে ধোঁয়া সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে। রান্নাঘর সকল ঘরের উপরে থাকিলে কয়লার ধোঁয়া শোবার ও বসবার ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না।

রান্নাঘরের ধূলা ও ময়লা।

আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ধূলা ও ময়লা বড়ই অপকারী। উহাতে রোগ-বীজাণু জন্মে—তাহার দ্বারা আমরা পীড়িত হই। এ বিষয়ে গ্রামগুলি সহর হইতে ভাল। গ্রামে ধূলা কম হওয়ায় স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সহরে বর্ত্তমান সময়ে মোটর গাড়ীর চলাচল হেতু রাস্তার পাশের ঘরগুলি ধূলায় আচ্ছন্ন হয়। ঘরের মধ্যে একটী পরিষ্কার কাগজ রাখিয়া দিলে কত ধূলা জমে দেখিতে পাওয়া যায। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা ধূলা পরীক্ষা করিলে দেখা যায়—ধূলা শুধু শুষ্ক কফ, বিষ্ঠা গোবর জন্তুর মাংস চুল প্রভৃতি ঘৃণিত পদার্থ মিশ্রিত শুষ্ক মৃত্তিকা ও তৃণের সমষ্টি মাত্র। রান্নাঘরের দেওয়ালে, মেজেয়, আঢাকা খাবারের উপর এই ঘৃণিত ধূলা, বায়ু সহযোগে পতিত হয়। কেহ কেহ নোংরা অভ্যাস বশতঃ সে সকল খাবার খাইয়া পীড়িত হয়। যক্ষ্মা রোগ এইরূপে ধূলা দ্বারা বিস্তৃত হয়। যক্ষ্মার বীজাণুগুলি ধূলার সহিত মিশিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। ছোট ছোট ছেলেরা ধূলা মিশ্রিত খাবার খাইয়া সর্দ্দিতে আক্রান্ত হয়। সর্ব্বদা রান্নাঘরের দেওয়ালগুলি ঝাড়িয়া ও রান্নাঘর ধুইয়া না রাখিলে, নানা ব্যারাম হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য রান্নাঘর পাকা ও মেজে সিমেণ্ট করা দরকার। তাহা হইলে রান্নাঘর সর্ব্বদা ধুইয়া পরিষ্কার রাখা যায়।

অনেক গৃহস্থ ঘরে রান্না-ঘরের ভিতর কয়লা ও ঘুঁটে এক-কোণে স্তূপাকার করিয়া রাখা হয়। সেই কয়লা ও ঘুঁটের গুঁড়া খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়া ভোক্তার উদরস্থ হয়। কয়লা ও ঘুঁটে রান্না-ঘরে না রাখিয়া অন্যত্র রাখা উচিত।

মাছি দ্বারা রোগ-বীজাণুযুক্ত ময়লা খাবারে মিশ্রিত হইয়া রোগ উৎপন্ন করে। দেখা গিয়াছে—মাছি দ্বারা আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত রোগ বিস্তৃত হয়। যদি রান্নাঘর পরিষ্কৃত থাকে, তবে তথায় মাছির সমাগম হয় না। কারণ সব প্রাণীই খাদ্যের অন্বেষণে রান্নাঘরে যায়। খাবারের লোভেই বিড়াল, কুকুর, ইঁদুর, আরসুলা রান্নাঘরে আনাগোনা করে ও নানা রোগের সৃষ্টি করে। বিড়াল দ্বারা ছেলেদের মধ্যে ডিপথেরিয়া ব্যারাম সংক্রামিত হয়। ডিপথেরিয়া রোগীর বমি ইত্যাদি চাটিয়া সেই বিড়াল ছেলেদের খাবারের দুধে ও অন্যান্য খাবারে মুখ দিলে কিংবা ছেলেরা সে বিড়াল লইয়া খেলিবার সময় ডিপথেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। ইঁদুর প্লেগ রোগের বাহন বলিয়া খ্যাত। এই সকল মাছি কুকুর বিড়াল ইঁদুর আরসোলা প্রভৃতি নোংরা প্রাণীদের মুখ হইতে খাদ্য বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে, রান্নাঘর বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া খাবারগুলি টুকরি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। ধূলা নিবারণের জন্য জালের আলমারী (meat safe) হইতেও টুকরি দ্বারা খাবার ঢাকা ভাল। কেন না ভাল টুকরির ভিতর দিয়া বায়ুর সহিত ধূলা যাইয়া খাদ্যে পড়িতে পারে না। টুকরিগুলি মাঝে মাঝে ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। বাজারে লোহার ঢাকনাও পাওয়া যায়। সেগুলি মাজিয়া বেশ পরিষ্কার রাখা যায়।

অনেকের রান্নাঘরে জলের কলসীর নীচে বিঁড়া প্রায়ই পচা দুর্গন্ধময় দেখা যায়। তৃণাদি নির্ম্মিত বিঁড়া কিছুদিন পরে পচিয়া যায়। যদি কাঠের বিঁড়া কিম্বা পোড়া মাটীর বিঁড়া কিম্বা বেতের বিঁড়া ব্যবহার করা যায়, তবে কলসীর জল পরিষ্কৃত থাকে। জলের সহিত কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড ব্যারাম সংক্রামিত হয়। সুতরাং পানীয় জল বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করিতে হয়। পানীয় জল সিদ্ধ করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দিবে। ঠাণ্ডা হইলে এই জল অতিশয় সুস্বাদু হয়। যাহারা জল সিদ্ধ করিয়া পান করে—তাহারা কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড ব্যারাম হইতে রক্ষা পায়।

রান্নাঘরের তৈজসপত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার না রাখিলে ব্যারাম হইতে পারে। আমাদের দেশে প্রচলিত ধাতু মধ্যে লৌহ পাত্রই শ্রেষ্ঠ। কেন না উহাতে খাদ্যের এসিডের ক্রিয়া বিশেষ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এলুমিনিয়াম পাত্রের দোষ গুণ দুইই শুনা যায়। কেহ কেহ ইহাকেই শ্রেষ্ঠ রন্ধন পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

আপরুচি খানা।

হোটেল ও পরান্নভোজী ভিন্ন সকলেই আপন রুচি অনুসারে আহার করে। শুধু স্মরণ রাখা উচিত—খাবারের দোষেই অনেক সময় আমাদের শরীর রোগগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে স্বল্পাহারী অপেক্ষা অত্যাহারী অধিক অত্যাচারী।

দেশ পাত্র ভেদে যেরূপ খাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী, সেরূপ খাদ্যে আপন ছেলে-মেয়েদিগকে শিশুকাল হইতেই অভ্যস্ত করা উচিত—যেন ভবিষ্যতে তাহারা খাদ্যের দোষে অজীর্ণ, হাঁপানি, বহুমূত্র, অর্শ, পিত্তশূল প্রভৃতি খাদ্য-ঘটিত রোগে আক্রান্ত না হয়।

অনেকে নিম্ন মুখে (গোগ্রাসে) আহার করে। তাহা অনিষ্টকর। পদ্মাসনে আহারে বসিয়া প্রসন্ন চিত্তে ধীরে ধীরে চিবাইয়া খাইতে ছেলেদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

কেফিন্ ও টেনিন্ নামক দুইটী পদার্থ চায় মধ্যে বিদ্যমান আছে। কেফিন্ ও টেনিন্ যদি পৃথক ভাবে প্রস্তুত হয়, তবে তাহা গাঁজা আফিং ভাঙ্গের মত নেশার জন্য ব্যবহৃত হয়। কেফিনের ক্রমাগত ব্যবহারে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার স্নায়ু মণ্ডলীর অবসাদ আনয়ন করে। টেনিন পরিপাক শক্তি হ্রাস করে। (Oxford Medical Publcation) হইতে অনুবাদিত। অনেকেই চা পানের অপকারিতা বুঝিতে পারেন। এবং চা পান পরিত্যাগও করিতে চান। কিন্তু "কম্বলি ছোড়্‌তা নেই।" চা পান অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইলে—মনের বিশেষ দৃঢ়তা আবশ্যক।

ওমর খৈয়াম

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

এই দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সংসার-বক্ষে জগৎজোড়া বিবর্তের মাঝখানে, জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-ক্লান্ত মানুষের প্রাণে একটা নিরুদ্বেগ আমোদ বা একটু অনাবিল সুখ-সম্ভোগের স্পৃহা স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠে। সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের বৈচিত্র্যহীনতার অবসাদ ও ক্লান্তিকে যতদূর সম্ভব লঘু করিয়া আনিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। কিন্তু সংসারে যাহা কিছু আছে, সমস্তই সীমাবদ্ধ, এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা। আজ যাহা নূতন, কাল তাহা পুরাতন, আজ যাহা দেখিয়া প্রাণ আনন্দ-চঞ্চল, দু'দিন বাদে তাহাই বিশেষত্বহীন। এইজন্যই, যখন চঞ্চল যৌবনের উদ্দাম গতিবেগে ভাঁটা পড়ে, প্রভাতের সোনালি স্বপ্ন গোধূলির অন্ধকারে ধূসর হইয়া আইসে—চিন্তাপ্রবণ ভাবুক হৃদয় মাত্রেই সে সময় কতকগুলি চিরন্তন প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। পৃথিবী কি,—আত্মা কি—জীবন কি—জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি? কোথা হইতে, কেমন করিয়া আসিয়াছি—কেন আসিয়াছি—আবার কোন্‌খানেই বা যাইতে হইবে? জীবন-পথের আরম্ভ কোথায়—পরিসমাপ্তিই বা কোথায়? এই চিরপ্রশ্নগুলি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই বারংবার মানব-চিত্তে উঠিতেছে—অথচ এই দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকার, এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া মানব-মন বিভ্রান্ত, অবসন্ন, এমন কি, পথ-ভ্রষ্টও হইয়া পড়িতেছে। পারস্যের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, জ্যোতিষিক কবি ওমর খৈয়াম তাঁহার অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও মনীষার ভিতর দিয়াও এই সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এবং সেগুলির সহজ সমাধানে পাঠক সাধারণের বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন।

তাঁহার শ্রুতি-মধুর ও যুক্তি-নিপুণ চতুষ্পদীগুলি কখনও করুণ সুরে, কখনও বা হাস্য-কৌতুকের ভিতর দিয়া, জীবন ও জগতের বিরাট দারিদ্র্য-কথা অতি উজ্জ্বলভাবে চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। মানুষ অতি দীন, নিঃসম্বল ও অসহায়—অথচ এই মানুষই আবার বিশ্ব-বিজয়ী, নির্ভীক ও বিশ্ব-প্রেমিক; কেন না 'আত্মা' বলিয়া একটী অমূল্য সম্পদ তাহার নিজস্ব; আর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ঐ 'আত্মার' অনুশাসনে পরিচালিত। প্রাণী-জগতে, উদ্ভিদ-জগতে, পর্ব্বত-নির্ঝরে, এক কথায়, দৃশ্যমান তাবৎ বস্তুতেই আত্মার সত্তা ও তাহার অপ্রতিহত প্রভাব দেদীপ্যমান। আত্মার অনুভূতিই একমাত্র সত্য। অন্য সমস্তই অনিত্য, অলীক।

ওমর খৈয়ামের দার্শনিক দৃষ্টি এই আত্মার সত্তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিল, তাই সংসারের মোহজালে আবদ্ধ হইয়া ধরণীকেই আবাস স্থল মনে করায় তিনি আপন আত্মাকে তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে 'আত্মা' এক অপার্থিব শক্তি, যাহা পার্থিব আধারের বিলোপে মুক্ত হইয়া উচ্চতর পরিণতি লাভ করিবে। কিন্তু এই আত্মাকে জানিতে হইলে, প্রথমেই সর্ব্বতোভাবে আত্মত্যাগ আবশ্যক। ত্যাগের সাধনা ছাড়া ইষ্টলাভ অসম্ভব। আর আত্মত্যাগে অক্ষম হইলে আত্মারও বিনাশ সুনিশ্চিত।

খৈয়ামের আত্ম-অনুভূতি কোনো নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম বা সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—উহা সেই মূল সত্যকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত, যাহা প্রচলিত ধর্ম্মের যে কোনো আকারে সমানভাবে প্রযুজ্য। কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—কি জড়-বিজ্ঞান-বিষয়ক—সকল ব্যাপার ও অবস্থাতেই উহা খাপ খায়।

আত্মার বিভূতি হয় সত্যে, অথবা মিথ্যায়, অথবা অবস্থা-বিশেষে ঐ দু'য়েরই সংমিশ্রণে স্বপ্রকাশ। প্রত্যেক বৃহৎ ব্যক্তিত্ব, প্রত্যেক শক্তিদৃপ্ত অস্তিত্ব হয় সত্য, না হয় মিথ্যার প্রতিমূর্ত্তি এবং পরিণামে ঐ আত্মারই একান্ত দ্যোতক। এই আত্মা নশ্বর দেহের পরিসমাপ্তিতে আপন প্রবণতা অনুরূপ হয় 'ধর্ম্মরাজ'—আর না হয় "পাপহারীর" হস্তে আত্মসমর্পণ করে। ওমর খৈয়ামের মতে ঐ দুইই সেই এক সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর;

ওমর খৈয়াম

তিনিই ইষ্ট তিনিই অনিষ্ট; তিনিই মঙ্গল ও অমঙ্গল এই উভয়েরই আধার। এই ব্যাপারে কবি অতি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চান যে, ভগবৎ-ইচ্ছা ব্যতীত বৃক্ষের শুষ্ক পত্রটী পর্য্যন্ত পড়িতে পারে না এবং মানুষের প্রবণতাও সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছারই অধীন। অতএব দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনা, মঙ্গল-অমঙ্গল যাহাই দেখা দিক না কেন, সমস্তই ভগবানের আশীর্ব্বাদের দান মনে করিয়া অবনত মস্তকে ও নিরুদ্বেগ চিত্তে গ্রহণ করাই শ্রেয়।

পাপ পুণ্যের ঈশ্বরের উপর খৈয়ামের এই একান্ত নির্ভরতা তাঁহার সঙ্গীতকে অমর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। অনুতপ্ত হৃদয়ের গভীরতম তলদেশ হইতে আপন বিমুগ্ধ হৃদয়-মণির জন্য তিনি ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন এবং নিষিদ্ধ সুধান্বেষণে ধাবমান চরণ ও পান-পাত্র-বিধৃতকরটীকে কঠোর বিচার দৃষ্টিতে না দেখিবার জন্যই আবেদন জানাইয়াছেন।

মানুষের সহায়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতাই ওমর খৈয়ামের সর্ব্বোচ্চ বিশেষত্ব। দেশবাসী ও ধর্ম্মান্ধ মোল্লা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পদে পদে প্রপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াও, কখনও তিনি মানুষকে ধর্ম্মগুরুরূপে স্বীকার করেন নাই। সত্যকে তিনি অতি নিবিড়ভাবে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একমাত্র ভগবানের অধিকারেই উহাকে দেখিয়াছিলেন। মানুষের জীবন পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী, তাহার শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি নিতান্তই নশ্বর—তাই কবির বিদ্রোহী কণ্ঠ বারংবার প্রবল বিক্রমে ঘোষণা করিয়াছে যে কখনই তিনি মানুষের দ্বারে সাহায্য লাভের আশায় হাত পাতিবেন না—পরন্তু, শুধু তাঁহারই আশায় থাকিবেন, যিনি চিরন্তন, অবিনশ্বর, সর্ব্ববিধ সাহায্যদানে চির-প্রসারিত-কর ও অনাদি আনন্দের সত্যতম—ও নিত্যতম উৎস।

সাধারণ, নিত্য-প্রত্যক্ষ বস্তুগুলিকে উপলক্ষ করিয়া কবি যে চমৎকার দার্শনিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য পরম

ওমর খৈয়ামের সমাধি

উপভোগের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। মৃৎপাত্রের প্রতি বালুকণায় লোকান্তরিতা রূপসীগণের মোহন হাস্য ও মধুর আস্য—প্রতি ইষ্টকখণ্ডে কোনো না কোনো সম্রাটের মস্তক—রূপযৌবনের গরিমা, ক্ষমতা-প্রতিপত্তির মহা পরিণাম, ঐ ধূলিকণা। এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সীমাহারা ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকেই ভাঙা-গড়ার এক তাণ্ডব লীলা চলিয়াছে—'আমার' বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিবার কিছুই নাই—যেদিকে চাওয়া যায়—সেই দিকেই ধ্বংস ও বিরাট শূন্যতার মূর্ত্তিমান অট্টহাস্য! এখানে বাঁচিয়া থাকে শুধু সৎকার্য্য।

মানুষ যখন পরিণত বয়সে আপনার যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই বিশ্বব্যাপারের আলোচনা করিয়া এবং সংস্কারাচ্ছন্ন সমসাময়িক জনমণ্ডলীর অন্ধ মতামত ও আপন পরিবেষ্টনীর বৈচিত্র্যপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া জাগতিক বস্তুনিচয়ের অনিশ্চয়তার বিষয় চিন্তা করিতে বসে—তখন তাহার প্রাণের বেদনাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার উপযোগী যে কোনপ্রকারের একটা তরল উৎসব-আয়োজনের দিকে বুঝি বা স্বভাবতই ঝুঁকিয়া পড়ে। শেষে পার্থিব আমোদ-প্রমোদেও যখন সান্ত্বনা পায় না তখন সে সর্ব্ব শোকতাপহারী ভগবৎচিন্তায় আপনার প্রাণ মনকে সমর্পণ করে। তাই বলিয়া প্রত্যেক মনীষীরও স্বাভাবিক প্রবণতা যে ভাগবত-সন্ন্যাসে ভরিয়া উঠে, তাহা নহে। যিনি একটু অধিক মাত্রায় সংসার-নিবদ্ধদৃষ্টি, তিনি চিত্ত-সন্তাপহারী সুরাকেও জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে জীবনের ও আত্ম-চিন্তা প্রকাশের আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়া বসেন। সুরাই যেন তাঁহার জীবন-লক্ষ্মী, সুরাই যেন তাঁহার আদর্শ বন্ধু। সংসারীই হউন, আর সন্ন্যাসীই হউন, সুরাকে কাব্য-বিকাশের উৎসরূপে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ওমর খৈয়াম সম্বন্ধেও, তাঁহার অনেক স্বদেশবাসীর মত, এই শেষোক্ত ঘটনাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার রুবাইগুলিতে সুরা ও সাকীর প্রতি অত্যুগ্র আকর্ষণ ও আনুরক্তি দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে যথার্থই মদ্যপ স্থির করিয়াছেন—কিন্তু পারস্যের তৎকালীন আচার ব্যবহার ও চিন্তাধারার সহিত পরিচিত অপর একজন চিন্তাশীল ওমরের "সুরাকে" নিছক ভগবৎপ্রেমের রূপক ছাড়া অন্য কোনোরূপে দেখেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার সুরা-বিষয়ক চতুষ্পদিগুলির অধিকাংশই রূপক-জাতীয় এ কথা সত্য হইলেও, কয়েকটীর বিশেষ ভঙ্গী হইতে সেগুলির বস্তু-তান্ত্রিকতা অস্বীকার করা যায় না। অথবা তাহা করার প্রয়োজনও নাই। পারস্যের তৎকালীন কাব্য প্রকাশ প্রণালীর প্রচলিত রূপক ছিল, সুরা ও সাকী,—এ কথা যেমন সত্য—সুধী ও মনীষিগণের মধ্যে সুরার ব্যবহারও অনিন্দনীয় ছিল, এ কথাও সেইরূপই সত্য।

ভগবৎ-চিন্তা ও দর্শনবিজ্ঞানের অনুশীলনে আধ্যাত্মিক জটিল প্রশ্নগুলির গভীরতা উপলব্ধ হয় মাত্র, কিন্তু জন্মমৃত্যুর রহস্য তৎসত্ত্বেও মানুষের নিকট প্রহেলিকাবৎই থাকিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান ও দর্শনে খৈয়ামের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সে যুগে তাঁহাকে জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য করিয়া তুলিলেও, এই জগৎ-সংসার ও তাঁহার স্রষ্টা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণধী হইলেও, আপনার অজ্ঞতার বিষয়েই তিনি বারংবার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ মানুষের অজ্ঞতা যে কত শোচনীয়, আপন জীবনব্যাপী সাধনা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে ওমর খৈয়াম তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। পারস্যের জাগ্রত প্রজ্ঞা হইয়াও জন্মমৃত্যুর কোনো মীমাংসাই তিনি করিতে পারেন নাই—দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র সমস্তই এই স্থানে আসিয়া মূক হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই খৈয়ামের ঐকান্তিক ভগবৎ-নির্ভরতা অপর

সমস্তকেই ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এই ভগবৎ-শক্তি সম্বন্ধে ওমর খৈয়াম সম্পূর্ণ সচেতন এবং তাঁহার এতদ্বিষয়ক উক্তিগুলি অপরের পথি-প্রদর্শক। ভগবৎ-করুণা-ভিক্ষায় অবিমিশ্র সুখ ও পরমা পরিতৃপ্তি লাভ করিবার জন্য ওমর খৈয়াম যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। আপনার সমগ্র শক্তি বিনিয়োগে ভগবৎ-সান্নিধ্য কামনা করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্ব-প্রকৃতির বদান্যতা নিশ্চয়ই অপব্যয়িত হয় নাই—তিনি আপনাকে স্বদেশের সুযোগ্য সন্তান ও জগৎবাসীর আদরের বন্ধুরূপেই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

ওমর খৈয়ামের দর্শন, করুণ ও বিষণ্ন সুরে, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যে ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছে, তাহা নির্দ্দোষ ও জাঁক-জমকে উদাসীন। গর্ব্বিত ধনিসম্প্রদায়ের সহিত বাধ্য-বাধক সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্মসন্তোষের আকারেই তাহা দেখা দিয়াছে। অনাড়ম্বর জীবন-যাপন, মার্জ্জিত উচ্চচিন্তা, মহৎ-পরিণতির জন্য লক্ষ্য, উদরান্নের দুর্ভাবনায় কাতর না হওয়া (কারণ ভগবানই উহা যোগাইয়া থাকেন) এবং সত্যানুসন্ধিৎসায় অকাতর পরিশ্রম—এইগুলিই ওমর দর্শনের প্রচার্য্য। ভান ও মিথ্যাচার, ওমরের চক্ষে একান্তই জঘন্য ও বিষবৎ পরিত্যাজ্য। নিষ্ঠা ও অনুরাগই সত্যে পৌঁছিবার সোপান—আর ঐ সত্য, ওমর খৈয়ামের প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে, একমাত্র ঈশ্বরেই বিদ্যমান—অন্য কোথাও নহে, অন্য কোথাও নহে। যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তাহাই ভ্রান্তি-উৎপাদক ও মিথ্যা। এক কথায়, একেশ্বর-ধ্যানকে অধিকাংশ লোকের প্রভূত কল্যাণসাধনের উপায়-স্বরূপে প্রয়োগ করাই ওমর দর্শনের চরম লক্ষ্য—আর এই জন্যই তাঁহার চরমকথা—

"গাঁথেনিকো মাল্য ওমর, পুণ্যকাজের মুক্তা দিয়া
পাপ আগাছাও হৃদয় হ'তে ফেলেনি সে উৎপাটিয়া ;
বিভুর কৃপার 'পরে দাবী নয়কো তাহার অল্প তবু,
'এক'কে যখন ভুলেও কভু পড়েনি সে দুই ভাবিয়া।"

প্রামাণ্যবাদ

(মীমাংসা)

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম-এ

পূর্ব্বে প্রামাণ্যবাদের কিয়দংশ পাঠকমহাশয়গণের নিকট উপস্থিত করিয়াছি। প্রামাণ্যবাদের মোটামুটিভাবে সকল কথা বলা—দুই একবারে সম্ভব নয়। এই সংখ্যায় প্রামাণ্যবাদের অপর একটী দিক্ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আমার একটী জ্ঞান হলো। এই জ্ঞানটী ঠিক্ কি না বুঝি কি করে? জ্ঞান কি আপনা আপনিই বলে দেয় যে এই জ্ঞানটী ঠিক্? না অন্য কাহারও সাহায্য নিয়ে বুঝি যে এই জ্ঞানটী ঠিক্ হয়েছে। জ্ঞান যদি নিজের থেকেই বলে দেয় যে সে ঠিক্ হয়েছে, তাহ হলে ভুলই বা হয় কি করে, আর সন্দেহই বা হয় কি করে যে, সে জ্ঞানটী ঠিক্ হয়েছে কি না। এই হচ্ছে প্রশ্ন। এই বিষয়টীর এই প্রবন্ধে বিচার করা যাবে। যাঁরা বলেন যে জ্ঞান ঠিক্ হয়েছে, এটা জ্ঞানই বলে দেয়, তাঁরা হচ্ছেন—স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী। আর যাঁরা বলেন যে জ্ঞান যে ঠিক্ হয়েছে তাহা অন্য কাহারও দ্বারা বুঝতে হয়, তাঁরা হচ্ছেন—পরতঃ প্রামাণ্যবাদী। কি করে জানা যায় যে জ্ঞান ঠিক্ হয়েছে—এই নিয়ে প্রামাণ্যবাদের দ্বিতীয় অংশ। এই দ্বিতীয় অংশের সকল কথা বলাও সম্ভবপর নয়। নানা মুনির নানা মত—নানা কথা-কাটাকাটি। এই প্রবন্ধে মোটামুটি ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করবো—জ্ঞান কি করে নিজে নিজেই বুঝিয়ে দেয় যে সে ঠিক্। এই ব্যাপারটী বোঝাতে গিয়ে আগে দেখাবো যাঁরা এই মত মানেন না তাঁদের মত ঠিক্ নয়।

জ্ঞান যদি নিজের থেকে বুঝতে না পারে যে সে ঠিক্, তাহা হ'লে তার আর কাহারও দ্বারস্থ হ'তে হবে, যে বলে দেবে যে সে ঠিক্। এখন দেখা যাক্ এই ব্যাপারে জ্ঞানের কার কার দ্বারস্থ হবার সম্ভাবনা আছে। সে তিনটির দ্বারস্থ হ'তে পারে। জ্ঞানকে ঠিক্ বলে নেওয়া যেতে পারে যদি তার কারণ চোখ্ প্রভৃতি ভাল বলে (গুণ আছে) জানা যায় ; কিংবা যদি পরের কোন জ্ঞানের তাকে খেলো করে দেবার ভয় না থাকে, কিংবা যদি সে অন্য কোন চেনা শুনা জ্ঞানের সঙ্গে বেশ খাপ্ খায়। এখন বেয়ে-চেয়ে দেখা যাক্ এই ভরসাস্থল তিনটী কেমন ধারা। চোখ্, কাণকে যে ভাল বলা হয় তার হেতু কি? তাদের কি একটা বিশেষ গুণ থাকে বলে, তাদের ভাল বলা হয়, না—তাদের যখন কোন রোগ থাকে না তখন তাদের ভাল বলা হয়? এই নিয়ে ন্যায়-মীমাংসায় মহা ঝগড়া। নৈয়ায়িকেরা কবিরাজি পুঁথি খুলে দেখাতে লাগলেন যে ইন্দ্রিয়ের নীরোগ অবস্থাতেও গুণের কমবেশী হ'তে পারে—এক কথায় চোখ্ প্রভৃতির গুণ আছে। আর মীমাংসকদের দলও হটিবার পাত্র নন্, তাঁরা বলেন যে গুণটুন্ আলাদা কিছু নয়, রোগ না থাকলেই আমরা বলে থাকি যে চোখটা ভাল, কাণটা বেশ ইত্যাদি। মীমাংসকরা বলেন যে গুণ মানিলেও এখানে বিশেষ কিছু আসে যায় না। এই গুণের জ্ঞান হবে কি করে? কারণ এই গুণ চোখ্, কাণ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না। আর এ কথা নৈয়ায়িকেরাও মানিয়া লন্।

এখন দেখা যাক্ অন্য কোন রকমে এই গুণের জ্ঞান হ'তে পারে কি না? বলা যেতে পারে যে ঠিক্ জ্ঞানের দ্বারা গুণের খবর মিলতে পারে। কিন্তু একটা ফ্যাসাদ দাঁড়াচ্ছে এই যে যাঁর ঠিক্ জ্ঞান হবে, তিনি যদি যার জ্ঞান হয়েছে তার সঙ্গে জ্ঞানের ঠিক্ মিল্ হয়েছে কি না দেখতে আগুয়ান না হন্, তাহলে জ্ঞানটী ঠিক্ হলো কি না বুঝা যায় না। আর জ্ঞানটী যে ঠিক্ আগে না বুঝলে মানুষ কি আর মিলাতে যায়। তাহলেই ত হলো যে জ্ঞান আপনিই বলে দেয় যে সে ঠিক্।

আর যদি কোন লোক জ্ঞান ঠিক্ কি না না জেনেই যে জিনিসের (বিষয়ের) জ্ঞান তা পাবার জন্য ছুটে, তাহলে তার জ্ঞান ঠিক্ কি না পরে জেনেই বা কি হ'বে। আর যদি সে জ্ঞান ঠিক্ জেনে আগুয়ান হয়, গুণ প্রভৃতি জানে ও ঠিক্ করে যে, এই গুণ জানার ফলেই সে জানতে পেরেছে যে, তার জ্ঞানটী ঠিক্, তাহ'লে তার যুক্তি তর্ক গোলকধাঁধায় ঢুকে কেবল চরকীর ন্যায় ঘুরবে ও ফাঁকির বেড়া কাটাতে পারবে না। আগুয়ান

হলে বুঝ্‌তে পারে যে জ্ঞানটী ঠিক্—জ্ঞানটী ঠিক্ বুঝতে পার্‌লে—কারণ গুণের জ্ঞান হয়—কারণ গুণের জ্ঞান হলে জ্ঞানটী ঠিক্ বুঝা যায়, আর জ্ঞানটী ঠিক্ বুঝ্‌তে পারলে লোকে আগুয়ান হয় এই রকমে ঘোরার শেষ থাকে না। সুতরাং প্রথম খুঁটাটী দুর্ব্বল তার উপর ভর দেওয়া যায় না।

এখন দ্বিতীয় মতটী নেড়েচেড়ে দেখা যাক্। দ্বিতীয় মতে হচ্ছে যে, আগে যে জ্ঞানটী হয়েছে সেটী যদি পরের কোন জ্ঞান দ্বারা খেলো না হয় তাহলে ঠিক্ বলে সাব্যস্ত হ'বে। এখন দুই এক কথা বুঝে পড়ে নেওয়া যাক্। কিছু পরের জ্ঞান আগের জ্ঞানকে খেলো করে না দিলেই আগের জ্ঞান ঠিক্ হবে, না, অনেক পরের জ্ঞানও যদি খেলো করে না দেয় তবেই আগেকার জ্ঞানকে ঠিক্ বলে ধরতে হবে? যদি প্রথমকার কথা ধরা যায় তাহলে অনেক ভুল জ্ঞানও ঠিক্ হয়ে পড়ে, যেমন, আমি খুব উঁচু পাহাড়ে উঠেছি, সেখান থেকে তলায় দেখ্‌লাম অনেক কড়ি সাজান রয়েছে—এই জ্ঞানটী ঠিক্ হবে কি না? পাহাড়ে যত সময় র'হিলাম তখন এমন কোন আমার জ্ঞান হলো না, যার দ্বারা আমার ঐ জ্ঞানটী ভুল বলে সাব্যস্ত হবে; কিন্তু আমি পাহাড় থেকে নেবে এসে দেখলাম একদল সাদা গরু চরছে। এই গরুর জ্ঞান আমার কড়ির জ্ঞানকে খেলো করে দিলে; কিন্তু এই গরুর জ্ঞান কড়ির জ্ঞানের ঠিক্ পরে হয় নাই, সুতরাং আগের পক্ষ নিলে চলিবে না।

দ্বিতীয় পক্ষ প্রায় সব সময়ই সুখের হয় না; এখানেও তাহাই হবে। সব জান্‌তা লোক কখনও পাওয়া যায় না (এখন কিন্তু দুদশটীর নাম শুনা যায়); সুতরাং তার এখন যে জ্ঞানের ভুল ধরা পড়ছে না, কোন কালেই যে পড়্‌বে না, এমন কথা জোর করে বলা চলে না। কাজে কাজেই এ মাপকাঠি দিয়ে স্বর মাপ্‌লে চল্‌বে না।

এখন শেষের পালা পড়িয়াছে। দেখা যাক্, অন্য জ্ঞানের সহিত খাপ্ খেলেই এখনকার জ্ঞান ঠিক্ বলে সার্টিফিকেট্ পাবে,—এই মতটী কতখানি ধোপে টেঁকে। কোন রকম জ্ঞানের সহিত খাপ খেলে কোন একটী জ্ঞান ঠিক্ বলে বুঝা যাবে? যে বিষয়ের জ্ঞান হয়েছে, সেই বিষয়ের পরে যদি একটী জ্ঞান হয়, তাহলে আগেকার জ্ঞানকে ঠিক্ বলে বুঝা যায়। এই যদি মত হয় তাহলে আগের আর পরের তফাৎ কোনখানে যে পরের পরের জ্ঞানের সঙ্গে খাপ্ খেলে আগের আগের জ্ঞান ঠিক্ বলে বুঝা যাবে। এই রকম একটী মত শুনতে বেশ ভাল কিন্তু আসল বিচারের ধার দিয়াও যায় না। খানিক পরে গিয়ে যদি কোনও জ্ঞানকে ঠিক্ বলে মেনে নেওয়া যায়, তাকে আগেই ঠিক্ বলে মান্‌লে যে কি দোষ হয় বুঝা যায় না। কাজে কাজেই এরকম একটী খামখেয়ালী মত মানা যেতে পারে না। কেউ কেউ বলেন যে কোন জ্ঞান হওয়ার পর যদি অন্য বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাহলে সে জ্ঞানকে ঠিক্ বলা যেতে পারে। এরকম একটী মত সৃষ্টিছাড়া। গরুর জ্ঞান হলো, তার পর চেয়ারের জ্ঞান হলো। চেয়ারের জ্ঞান কোন কালেই গরুর জ্ঞানের সহিত খাপ খায় না, সুতরাং সেই জ্ঞান কি করে প্রথম জ্ঞানটী যে ঠিক্ তাহা জানিয়ে দিবে?

পরতঃ, প্রামাণ্যবাদীর মাত্র শেষ অস্ত্র বাকি আছে। এই অস্ত্রটী শুধু ভারতে নয়, পাশ্চাত্যদেশেও অব্যর্থ বলে মনে করা হয়। এই মতে জ্ঞান যে ঠিক্ তাহা জানা যায় যদি সেই জ্ঞানের তার বিষয়ের কাজের জ্ঞানের সহিত গরমিল না হয়, যেমন আমার জলের জ্ঞান হইল তার পর জলের যে সমস্ত কাজ তাহার যদি জ্ঞান হয় (নাওয়া, গা ভিজা প্রভৃতির জ্ঞান) তাহ'লে আগেকার জ্ঞানকে ঠিক্ বলে ধরে নিতে হ'বে। এই কাজের জ্ঞান যে ঠিক্ তা কে বলিল? এই কাজের জ্ঞানের বিশেষত্ব যে তার প্রতি কারো সন্দেহ হয় না। দুপুর বেলায় রোদকে জল বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু সেই জল বলে যে বোধ হয়, তাকে কেউ ঠিক্ বলে ধরে নেয় না, কিন্তু কেউ নদীতে নেবে জল খেলে বা নাইলে যে নাইবার বা জল-খাবার জ্ঞান হয় তাকে কেউ ভুল বল্‌তে পারে না। কারণ, এই রকম জ্ঞানের ভুল কেউ কখনও দেখে নাই সুতরাং এই জাতীয় জ্ঞানকে জ্ঞান ঠিক্ বলে বুঝবার মাপকাঠি বলে ধরে নেওয়া চল্‌তে পারে।

ভাল করে তলিয়ে দেখ্‌তে গেলে এরকম মতও ভাল বলে মনে হয় না। স্বপ্নে ত আমাদের জলে নাওয়ার জ্ঞান হয়, এই জ্ঞানকে কে ঠিক্ বল্‌তে পারে? আর যাঁদের স্বপ্নবিকার আছে, তাঁরা ত বেশ ভাল করেই জানেন যে ঐ জাতীয় জ্ঞান কতটা ঠিক্। সুতরাং সেই কাজের জ্ঞান ঠিক্ কিনা জান্‌তে হলে অন্য জ্ঞানের সাহায্য নিতে হ'বে। এই রকম করে জ্ঞানের গুষ্টির পর গুষ্টির দ্বারস্থ হ'তে হ'বে—কিন্তু সমুদ্রের বালু-কণার মত অসংখ্য জ্ঞানের আশ্রয়ই নিতে হবে—জ্ঞান ঠিক্ কি না আর বুঝা হবে না।

কোন একটা জ্ঞান হ'লে সেই জ্ঞানের বিষয় পাবার জন্য না ছুটিলে ত আর সেই জ্ঞানের বিষয়ের কাজের জ্ঞান হয় না; আর জ্ঞান ঠিক্ জেনে ছুটলে আগেকার গোলকধাঁধার হাত থেকে নিস্তার নাই। আর ঠিক্ না জেনে ছুট্‌লে পরে জানা না জানা একই হয়ে পড়ে।

এখন একটা কথা তুলা যেতে পারে যে মানুষের কোন কাজে নামা দুরকম। (১) কোন জিনিস আলোচনার জন্য নামা; আর (২) কোন জিনিসের জন্য আগের দেখে নামা। যেমন চাষারা বীজের শক্তি বুঝবার জন্য বীজ পুঁতে দেয়; আর বীজ থেকে গাছ হবার পর চাষারা নির্ভয়ে মাঠে সেই সমস্ত বীজ পুঁতে দেয়, এই হলো দ্বিতীয় ধরণের নামা। আমরা ত সেই একটী জ্ঞান ঠিক্ কি না যাচাই করে নিব, তার সেই রকম জ্ঞান হলেই বুঝে নেব যে সেই জ্ঞান ঠিক্। বীজ বুঝা এক রকম আর জ্ঞানের জাতি বুঝা আর এক রকম। বীজ দেখে তার জাতি ধরা যায়, কিন্তু জ্ঞানের কাজ বা কারণ দেখে জ্ঞানের জাতি ধরা হয়। আর জ্ঞানের কাজ দেখে জ্ঞানের জাতি ঠিক্ করতে গেলে যে বিড়ম্বনা হয়, তা আগেই বলা হয়েছে। আর জ্ঞানের কারণ চোখাদির দ্বারা দেখা যায় না, কারণ তাহারা ইন্দ্রিয়। কারণ সফল কি না জেনে যাঁরা জ্ঞান ঠিক্ কি না জানতে চান, তাঁরাও বিয়ের পর লগ্ন খোঁজ করার মত তামাসার পাত্র মাত্র হ'ন। আর এক কথা—লোকে চেষ্টা না করে জান্‌তে পারে না, জ্ঞানের হেতু দুষ্ট না ভাল। চেষ্টা করার পর জ্ঞানের হেতু ঠিক্ কি না জেনে জ্ঞানর ঠিক্ কি না জানা একটা বাজে কাজ। আর চেষ্টা কর্‌তে গেলে জ্ঞান যে ঠিক্ তা আগে জান্‌তে হয় আর চেষ্টা হ'লে জানা যায় যে জ্ঞান ঠিক্।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জ্ঞান যে ঠিক্ আপনা আপনি না জান্‌তে পার্‌লে অনেক কিছু দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়।

সুতরাং দেখা গেল যে যথার্থ জ্ঞান আপনাকে ঠিক্ বলে জানাতে কাহারও অপেক্ষা রাখে না, তাহার স্বতঃ প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় না। সমস্ত যথার্থ জ্ঞানগুলির নিজেরা যে খাঁটি তাহা আপনারাই বুঝাইয়া দেয়। যদি তাহাদের এইরূপ বোঝাবার ক্ষমতা না থাকিত তাহা হইলে তারা কোনকালেই বুঝাইতে পারিত না।

স্বতঃ সর্ব্ব প্রমাণানাং প্রামাণ্যমিতি গৃহ্যতাম্।
নহি স্বতোঽসতী শক্তিঃ কর্ত্তুমন্যেনপার্য্যতে॥

এই মতের উপর একটী আপত্তি উঠে এই, বিষয়ের প্রকাশ হচ্ছে, যথার্থ জ্ঞানের কাজ। এই প্রকাশ ভুল ও ঠিক্ জ্ঞানের সাধারণ কাজ; সুতরাং প্রথমে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। এর উত্তরে মীমাংসকেরা বলেন যে আপত্তিকারীর কথা সত্য, কিন্তু বিষয় প্রকাশকালে কোনও সন্দেহের গন্ধ পাওয়া যায় না; সুতরাং সামান্য নিয়মানুসারে তাকে ঠিক্ বলেই নিতে হবে। যখন সেটা ভুল বলে পরে জানা যাবে, তখন তাকে আর ঠিক্ বলা চল্‌বে না; কিন্তু তা বলে আগে সেটাকে ঠিক্ বলা চল্‌বে না কে বলিল?

দুইটী কারণে জ্ঞানকে ভুল বলে ধরা যায়—যদি পরে আর একটী জ্ঞান হয়ে আগেকার জ্ঞানকে ভুল বলে দেয়, অথবা যদি বুঝা যায় কারণের কোন দোষ আছে।

জ্ঞান হইলেই যদি সেটী সংশয়ের ঘরে পড়ে তাহলে কোন কাজ করা চলে না—সর্ব্বদাই মনে হবে এটা না ওটা। মানুষের মনকে জিজ্ঞাসা করলে বেশ বুঝা যায় যে সে সংশয় নিয়ে কোনও কাজে নাবে না। আর গীতাও বলেছেন "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।"

যদি কোথাও প্রথম একটী জ্ঞান হইল, তার পর তার উল্টা দ্বিতীয় জ্ঞান হয়, তাহলে সংশয় হয়, তার পর তৃতীয় জ্ঞান হয়ে এক পক্ষ ঠিক্ কিনা জানিয়ে দেয়। এর দ্বারা ঠিক্ বুঝার অভাবও হয় না স্বতঃপ্রামাণ্য-বাদের হানিও হয় না। কারণ তৃতীয় জ্ঞান প্রথম বা দ্বিতীয় জ্ঞানের ভুল ধরে দিয়েই ক্ষান্ত। প্রথম বা দ্বিতীয় জ্ঞান সাধারণ নিয়মানুসারেই আপনি যে সাচ্চা তা জানিয়ে দেয়।

এই নিয়ম সর্ব্বত্র মানা যেতে পারবে, তিন চারিটী পরস্পর অমিল জ্ঞানের যায়গায়ও এই নিয়মেই কাজ হবে।

আমার দেশ

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

(রুশ দেশের জাতীয় সঙ্গীত)

ভালবাসি আমি আমার এ দেশ ভালবাসি অতিশয়;
যুদ্ধজয়ের যত সুখ তাহা এ সুখের সম নয়।
রক্ত দিয়া ও রক্ত লইয়া স্বদেশের যত মান,
স্বীয় শক্তি ও মহিমায় তার মূর্ত্তি যে গরীয়ান,
তাহার অতীত বল-কীর্ত্তির পুণ্য যে ইতিহাস,
তাহাতে আমার নহে তত সুখ, নহে তত উল্লাস।
আমি ভালবাসি, কেন নাহি জানি, ভালবাসি গিরি তার,
তুষার-আধার বন্ধুর গিরি গম্ভীর অনিবার।
বায়ু-চঞ্চল অরণ্য তার রাশি রাশি নাহি শেষ,
ভালবাসি ভরা উদ্দাম নদী চলে ছাপি' দেশ দেশ।
গ্রামে গ্রামে তার আঁকাবাঁকা পথে চলিবারে ভালবাসি,
দৃষ্টির বাণে করিবারে ভেদ অন্ধকারের রাশি;
যেতে যেতে খুঁজি রাত্রি-আবাস, বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে
দূর পল্লীর ক্ষীণ আলো-রেখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ডাকে।

দূরে ও অদূরে চিম্‌নির ধোঁয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠে;
শস্য বোঝাই গাড়ীগুলি যায়, মেঠো পথে গরু ছুটে।
পাহাড়ের গায়ে, সোণালি মাঠের মাঝে মাঝে বাহু তুলি'
দাঁড়ায় পাদপ—তাহাদের সাথে প্রাণ করে কোলাকুলি।
জানে কয় জনা, কি সুখ আমার হেরিতে পৌষ মাসে
খামারে খামারে ধানের পাহাড় চাষীর কুঁড়ের পাশে।
খড়ের গাদায় কুঁড়ে পড়ে ঢাকা, পথ নাই ধানে ধানে;
চাষী হাসে আর চাষীর বালক আকাশ মাতায় গানে।
প্রভাত হইতে রাত্রি গভীর হাসি-হর্ষের বান
পল্লীরে করে মুখর উতল, নাচে যেন তারি প্রাণ।
ভালবাসি আমি এই দেশ মোর ভালবাসি অতিশয়,
যুদ্ধজয়ের যত সুখ তাহা এ সুখের সম নয়।

সম্বন্ধ বাদ

(Theory of Relativity)

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল

(৩)

আমরা বলিয়াছি যে, "সরল ও সমগতি-বিশিষ্ট দুইটী co-ordinate শ্রেণী হইতে [১] প্রাকৃতিক ঘটনা সকল একরূপই প্রতিভাত হইয়া থাকে।" সুতরাং ঐ সকল প্রাকৃতিক ঘটনা যে যে নিয়মাধীনে ঘটিতেছে, তাহাও উল্লিখিত দুইটী co-ordinate হইতে একরূপই প্রতীয়মান হয়। ইহাই আয়েন্‌ষ্টাইনের উদ্ভাবিত সম্বন্ধবাদের বিশেষ বিধি। কিন্তু তাঁহার সাধারণ বিধি সরল গতি, বৃত্তাকার-গতি, বৃত্তাভাস-গতি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গতির সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; কেবলমাত্র সরল ও সমগতি-বিশিষ্ট বেগের প্রতিই প্রযোজ্য, এমন নহে।

গতি বলিতেই কোন একটী স্থির পদার্থের সহিত তুলনায় অপর পদার্থের গতি বুঝায়; অর্থাৎ গতিশীল পদার্থ মাত্রই কোন স্থির পদার্থ সম্বন্ধে গতিশীল। ইহাই গতির সরল ও মৌলিক ধারণা। এ ধারণা মানবের চিরদিনই আছে। এতটুকু "সম্বন্ধবাদ" আমরা সকলেই জানিতাম। উহা আয়েন্‌ষ্টাইনের উদ্ভাবিত বিশেষ সম্বন্ধবাদ নহে। দুইটী সরল ও সমগতি-বিশিষ্ট পদার্থ হইতেই জাগতিক অপর ঘটনার নিয়ম সকল একই প্রতিভাত হয়, ইহাই তাঁহার নব-উদ্ভাবিত বিশেষ সম্বন্ধবাদ।

এই বিশেষ বিধির মূল ভিত্তি দুইটী—

(১) অন্য কোন বাধক কারণ না থাকিলে বস্তু পদার্থ এক স্থানেই থাকিবে অথবা সরল রেখা ক্রমে সমগতিতে যাইবে। ইহা নিউটন-কল্পিত গতি-বিষয়ক তিনটী নিয়মের প্রথমটী।

(২) সূর্য্য-রশ্মির গতি-বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। উহা জগতের সমস্ত গতি অপেক্ষা দ্রুততম। এই দ্বিতীয় কথাটী কোন নিয়ম নহে; ইহা জ্যামিতির স্বীকার্য্যের ন্যায় মানিয়া লইলে সম্বন্ধবাদের বিশেষ বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিন্তু এই দুইটীর একটীও প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বস্থলে বিচার-সহ নহে। আয়েন্‌ষ্টাইনের উদ্ভাবিত অথবা কল্পিত সম্বন্ধ-বাদের সাধারণ বিধি দেখাইয়া দিতেছে যে, ঐ দুইটীকে সর্ব্বস্থলে প্রযোজ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও, প্রথমতঃ বিশেষ বিধি উদ্ভাবিত না হইলে সাধারণ বিধি উদ্ভাবিত হইতে পারিত না। যেমন স্থির-তড়িৎ-বিজ্ঞানের (Electrc-statics) নিয়ম সকল কল্পিত না হইলে সাধারণ গতিশীল-তড়িৎ-বিজ্ঞানের (Electro-dynamics) নিয়ম সকল উদ্ভাবিত হইতে পারিত না, এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। শেষোক্ত নিয়ম সকলের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম আছে। সম্বন্ধবাদের সাধারণ বিধির মধ্যেই বিশেষ বিধি আছে। কিন্তু সে বিধি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সর্ব্বত্র নহে। আয়েন্‌ষ্টাইন ইহাকেই 'limiting case' বলিয়াছেন।

সম্বন্ধবাদের সাধারণ বিধির কথা পরে বলিব। তৎপূর্ব্বে বিশেষ বিধির সংস্পৃষ্ট আরও কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, গতি বুঝিতে কোন এক স্থির পদার্থের সহিত তুলনায় বুঝিতে হয়। সেই পদার্থের কোনও স্থানে co-ordinate কল্পনা করাও যায়; অথবা সেই পদার্থটীকেই body of reference মনে করা যাইতে পারে।

সময় অর্থাৎ কাল বুঝিতে কি কোন body of referenceএর আবশ্যক হয় না? কাল কি স্বয়ংসিদ্ধ (absolute)? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সকলেই চট্‌

---

১ দুইটী পদার্থ ভাবিলেও co-ordinate ভাবার ন্যায়ই ফল হইবে। কারণ পদার্থের সকল স্থান হইতেই co-ordinate কল্পনা করা যায়। কিন্তু যে পদার্থ ভাবিবেন, তাহাকে গতিহীন মনে করিয়া অপর গতিশীল পদার্থের গতি বিষয়ক নিয়ম অনুসন্ধান করিতে হইবে। সুতরাং ঐ পদার্থকে body of reference গণ্য করিতে হইবে।

মধু যামিনী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস

করিয়া বলিবেন "হাঁ"। কিন্তু দণ্ডায়মান ব্যক্তি ও গতিশীল ব্যক্তি উভয়ের সম্বন্ধেই কাল স্বয়ংসিদ্ধ কি না তাহা বিবেচনা করিতে হইলে দুইটী ব্যক্তি ও দুইটী ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক। এক দণ্ডায়মান ব্যক্তি তাহার ঘড়িতে ৯টা বাজিবার সময় রেল-পার্শ্বস্থ ক খ নামক পথের ক ও খ স্থানে দুইটি বাতি জ্বলিতে দেখিল। ঐ ব্যক্তি ক খ-র মধ্য-বিন্দু গ স্থানে দাঁড়াইয়া আছে।

গ
ক ———— খ
(পার্শ্বস্থ পথ)

গ১
ক১ ———— খ১
(ট্রেণ)

অপর এক ব্যক্তি ক১ খ১ স্থানব্যাপী একটী ট্রেণের একখানি গাড়ীর মধ্যে গ১ স্থানে বসিয়া আছে। ঐ স্থান ক১ খ১ ট্রেণের মধ্য বিন্দু। ক১ খ১ = ক খ; এবং পরস্পরের অতি নিকট। ট্রেণ চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় গ স্থানে দণ্ডায়মান ব্যক্তি যদি ক ও খ-র দিকে না তাকাইয়া গ স্থানেই একাধিক আয়নার সাহায্যে ঐ আয়নার মধ্যে ঐ দুইটী বাতি ঠিক নয়টার সময় জ্বলিতে দেখিতে পায়, তবে সেই ব্যক্তি বলিবে যে ঐ দুইটী আলো সমকালেই জ্বলিয়াছে। সমকাল বলিতে ইহার অধিক অন্য কোন অর্থ হয় না। কিন্তু রেলগাড়ীর আরোহী ব্যক্তি ক১ হইতে খ১এর দিকে যাইতেছে। সুতরাং যে আলোক-রশ্মি খ১ হইতে ঐ আরোহীর দিকে আসিতেছে, তাহা সে কম সময়েই দেখিতে পাইবে; অর্থাৎ আরোহী গ১-স্থানে স্থির থাকিলে, ঐ রশ্মিটী খ১ স্থান হইতে গ১-স্থানে যত সময়ে আসিয়া তাহার চক্ষে পড়িত, সে খ১ এর দিকে চলিতে থাকায়, তদপেক্ষা কম সময়েই ঐ রশ্মি তাহার চক্ষে পড়িবে। কিন্তু ক১ স্থান হইতে যে রশ্মি ঐ আরোহীর দিকে আসিতেছে তাহা আরোহী গ১ স্থানে স্থির থাকিলে যত সময়ে আসিয়া তাহার চক্ষে পড়িত, সে গ১ স্থান হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে বিধায় তদপেক্ষা অধিক সময়ে ঐ রশ্মি আসিয়া তাহার চক্ষে পড়িবে। সুতরাং ঐ চলমান আরোহী ৯টার একটু পূর্ব্বে খ১ স্থানের বাতি এবং ৯টার কিছু পরে ক১ স্থানের বাতি জ্বলিতে দেখিবে।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গ স্থানের ব্যক্তি বলিবে যে, দুইটী বাতিই সমকালে (৯টার সময়) জ্বলিল; কিন্তু চলমান রেলগাড়ীর আরোহী বলিবে যে, দুইটী বাতি সমকালে জ্বলে নাই। খ১এর বাতি ৯টার কিছু পূর্ব্বে এবং ক১-এর বাতি ৯টার কিছু পরে জ্বলিয়াছিল। এই তারতম্য যত ক্ষুদ্রই হউক, কিন্তু দণ্ডায়মান ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা সমকালিক ঘটনা, চলমান ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহা সমকালিক ঘটনা নহে, কিঞ্চিৎ অগ্র-পশ্চাতের ঘটনা। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, কাল একটা স্বয়ংসিদ্ধ (absolute) পদার্থ নহে। ঐ দুই ব্যক্তিকে দুইটী reference body মনে করিয়া মোটা কথায় বলা যায় যে, কাল reference body'র সহিত সম্বন্ধ রাখে। এক reference bodyর সম্বন্ধে যে ঘটনাদ্বয়ের সময় ৯টা, অপর reference bodyর সম্বন্ধে ঐ ঘটনাদ্বয়ের সময় ৯টার কিছু পূর্ব্বে ও কিছু পরে; ফলতঃ ঠিক ৯টা নহে।

দেশ অর্থাৎ স্থান সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, উহাও একটী স্বয়ংসিদ্ধ (absolute) পদার্থ নহে। উহাও অপর কিছুর সহিত সম্বন্ধ রাখে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, "মোটামুটি গতি-বিষয়ক সম্বন্ধবাদ" কিরূপ। নৌকার গতির সাহায্যে ঐ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; এবং দেখাইয়াছিলাম যে, নৌকার গতি অথবা গতিহীনতা আরোহীর সম্বন্ধে এবং নদীতীরস্থ দণ্ডায়মান ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথক পদার্থ। পরে দেখাইব যে, বস্তুর দৈর্ঘ্য ঐ বস্তুর গতি-বেগের উপর নিভর করে। কোন বস্তু যত অধিক বেগে চলে, ততই দ্রষ্টার নিকট তাহার দৈর্ঘ্য কম হওয়া প্রতীয়মান হয়। (২) এ স্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উপরি-উক্ত রেলপথ ও গতিশীল ট্রেণের ক খ স্থানের এবং ক১ খ১ স্থানের দূরত্ব মাপিলে সমান নাও হইতে পারে। ট্রেণ গতিশীল বিধায় ক১ খ১-এর দৈর্ঘ্য এবং পথ গতিহীন বিধায় ক খ-এর দৈর্ঘ্য সমান বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। (৩) কিন্তু কাহার নিকট (সম্বন্ধে) "প্রতীয়মান হইবে না?" গতিহীন পথের উপর দণ্ডায়মান ব্যক্তি যদি চলমান ট্রেণের ক১ খ১-এর দূরত্ব মাপ করে এবং চলমান ট্রেণের আরোহী যদি ঐ ক১ খ১-এর দূরত্ব

---

২ The rod is thus shorter when in motion than when at rest and the more quickly it is moving, the shorter is the rod. p. 35.

৩ Thus the length of the train as measured from the embankment may be different from that obtained by measuring in the train itse'f. p. 29. For both c. f. Einstein's Theory of Relativity. Tr. by Lawson, 5th. Ed.

মাপ করে, তবে ঐ উভয় মাপ সমান বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না।

এক্ষণে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে হইবে। ট্রেণ আরোহীর সম্বন্ধে স্থির; পার্শ্বস্থ পথ, দণ্ডায়মান ব্যক্তির সম্বন্ধে স্থির। কিন্তু ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে ট্রেণ সচল এবং আরোহীর সম্বন্ধে পার্শ্বস্থ পথও সচল (বিপরীত দিকে)। পূর্ব্বে বলিয়াছি, একটী স্থূল পদার্থকেই co-ordinate system ভাবা যায়। পার্শ্বস্থ পথকে অচল co-ordinate system ভাবিলাম এবং ট্রেণকে সচল co-ordinate system ভাবিলাম। প্রথমোক্ত co-ordinateকে কো' এবং শেষোক্ত co ordinateকে কো^{স} বলিব। (৪) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিনটী দেশের ধর্ম্ম। গ্যালিলিও, ইউক্লিড্ ও নিউটনের সময় হইতেই এ কথা পরিজ্ঞাত আছে। তাঁহারা দেশকে ত্রিমাপ (Three dimensional) গণ্য করিতেন। কিন্তু আয়েনষ্টাইন কালকেও একটা মাপ গণ্য করিয়াছেন। গ্যালিলিও প্রভৃতি জাগতিক ঘটনার নিয়ম আবিষ্কার করিতে দেশ ও কালকে পৃথক ধরিয়াছেন। কিন্তু আয়েনষ্টাইন তৎসহ কালকে মিশাইয়া জাগতিক ঘটনার নিয়ম সকল বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ সকল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, স্থির (অচল) co-ordinateএর চতুর্মাপ দ্বারা কোন ঘটনার দেশ ও কাল জানা থাকিলে, সচল co-ordinateএর সম্বন্ধে ঐ চতুর্মাপ কিরূপে জানা যাইতে পারে? অচল co-ordinateএর চারিটী মাপের তিনটী দেশ সম্বন্ধীয় এবং একটী কাল সম্বন্ধীয়। সচল co-ordinateএরও তাহাই। সম্বন্ধবাদ (Theory of Relativity) অজ্ঞাত থাকা কালের প্রথামত দেশ ও কালকে স্বয়ং-সিদ্ধ (absolute) এবং পরস্পর নিরপেক্ষ মনে করিলে উভয় co-ordinate হইতে দেশ ও কাল যেরূপ সমীকরণ (equation) দ্বারা সম্বন্ধ হইতে পারে তাহা এইরূপ—

$$x' = x - vt$$
$$y' = y$$
$$z' = z$$
$$t' = t$$

ইহাকে বঙ্গাক্ষরে ব্যক্ত করিলে সমীকরণ চতুষ্টয় নিম্নলিখিত মত দাঁড়াইতেছে—x, y, z দেশের তিনটী মাপ; t কালের একটী মাপ। কিন্তু এই মাপ চতুষ্টয় কো'র সহিত অর্থাৎ অচল co-ordinateএর সহিত সম্বন্ধ রাখে। ঐরূপ x', y', z' এবং t' দেশের তিনটী ও কালের একটী মাপ। কিন্তু তাহা কো^{স} অর্থাৎ সচল co-ordinateএর সহিত সম্বন্ধ রাখে। এই কয়েকটী চিহ্ন স্মরণ রাখিয়া উপরের লিখিত সমীকরণ চতুষ্টয়কে বঙ্গাক্ষরে এইরূপে ব্যক্ত করা যায়—

$$\left.\begin{array}{l} দে'_{১} = দে_{১} - বে \times কা \\ দে'_{২} = দে_{২} \\ দে'_{৩} = দে_{৩} \\ কা' = কা \end{array}\right\} গ্যা$$

এ স্থলে দেশকে দে' বলিলাম, এবং দেশের তিনটী মাপকে দে'$_{১}$, দে'$_{২}$ ও দে'$_{৩}$ বলিলাম এবং কালকে কা' বলিলাম। এই চতুষ্টয় কো^{স}র সহিত সম্বন্ধ রাখে। আর দে$_{১}$, দে$_{২}$, দে$_{৩}$ দেশের তিন মাপ। কালকে কা বলিলাম। এই চতুষ্টয় কো'র সহিত সম্বন্ধ রাখে। সচল co-ordinateএর গতির বেগকে "বে" বলিলাম। স্মরণ করিবেন, এই সমস্ত চিহ্নই দেশ ও কালকে পৃথক করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দেশ-কাল-সংহতি (continuum) ধরিয়া উপরের সমীকরণ চতুষ্টয় এইরূপ দাঁড়ায়।

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{.....(1)}$$

$$y' = y \quad \text{.....(2)}$$

$$z' = z \quad \text{.....(3)}$$

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{.....(4)}$$

C সূর্য্যরশ্মির বেগ। সূর্য্যরশ্মি ব্যতীত কোন ঘটনাই দেখা যায় না।

৪ প্রথমোক্ত Co-ordinate অচল; সুতরাং "কো"র মাথায় শূন্য দেওয়া গেল; শেষোক্ত Co-ordinate সচল সুতরাং "কো"র মাথায় দন্ত্য স দেওয়া গেল।

বঙ্গাক্ষরে সমীকরণ কয়েকটী এইরূপ দাঁড়ায়——

$$\text{লো}\begin{cases} \text{দে}'_১ = \dfrac{\text{দে}_১ — \text{বে} \times \text{কা}}{\sqrt{১ — \dfrac{\text{বে}^২}{\text{সি}^২}}} & \cdots\cdots(১) \\ \text{দে}'_২ = \text{দে}_২ & \cdots\cdots(২) \\ \text{দে}'_৩ = \text{দে}_৩ & \cdots\cdots(৩) \\ \text{কা}' = \dfrac{\text{কা} — \dfrac{\text{বে}}{\text{সি}^২}\text{দে}}{\sqrt{১ — \dfrac{\text{বে}^২}{\text{সি}^২}}} & \cdots\cdots(৪) \end{cases}$$

উপরের গ্যা চিহ্নিত সমীকরণ চতুষ্টয়কে গ্যালিলিয়ান্ co-ordinate বলে। তাহার পরিচায়ক "গ্যা" অক্ষর ব্যবহার করিয়াছি। তৎপরে যে চারিটী সমীকরণ "লো" অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছি, উহাদিগকে লোরেন্স্ (Lorentz) সমীকরণ বলা যায়।

গ্যালিলিয়ান্ সমীকরণ চতুষ্টয় দেশ কালকে পৃথক করিয়া প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; এবং লোরেন্স্ সমীকরণ চতুষ্টয় দেশ-কাল-সংহতি অনুসারে পাওয়া গিয়াছে।

এক্ষণে আমাদিগের উপরের লিখিত প্রশ্নের উত্তর এইরূপ হইতেছে—অচল co-ordinateএর সম্বন্ধে গ্যালিলিয়ান্ সমীকরণ চতুষ্টয় জানা থাকিলে সচল co-ordinateএর সম্বন্ধে লোরেন্স্ সমীকরণ জানিলেই ঐ প্রশ্নের উত্তরও জানা হইল।

এই কথাই আরও সংক্ষেপে বলিলে বলিতে হয় যে "গ্যা" সমীকরণ চতুষ্টয় জানা থাকিলে "লো" সমীকরণ চতুষ্টয়ও জানা গেল, যদি সচল co-ordinateএর গতিবেগ জানা থাকে এবং সি (c অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির বেগ) জানা থাকে। ঐ রশ্মির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। "লো" সমীকরণ চতুষ্টয় মধ্যে (১) এবং (৪) সমীকরণদ্বয় পণ্ডিতবর লোরেন্স্ প্রথম প্রাপ্ত হন। এ নিমিত্ত ইহাদিগকে লোরেন্স্ সমীকরণ বলে। গ্যালিলিয়ান্ সমীকরণ চারিটী রূপান্তরিত করিলেই লোরেন্স্ সমীকরণ পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত ইহাকে লোরেন্স্ রূপান্তর (Lorentz transformation) বলে। গ্যালিলিয়ান্ সমীকরণ চতুষ্টয় দেশ ও কালকে পৃথক গণ্য করিয়া এবং লোরেন্স্ সমীকরণ চতুষ্টয় দেশ-কাল-সংহতি (continuum) মান্য করিয়া গণনা করা হইয়াছে। সে গণনা অত্যন্ত জটিল।

উপরে বলিয়াছি যে সূর্য্যরশ্মির বেগের তুলনায় মনুষ্যকৃত বেগ অতীব ক্ষুদ্র। এই কথা স্মরণ রাখিয়া একটী হাতকাঠি মাপিতে হইবে। এক ব্যক্তি ঐ হাতকাঠিকে ১৮ ইঞ্চি= ১ হাত মাপিয়া তাহার উপর ঘোড়ায় চড়ার মত বসিলেন। অপর একজন দণ্ডায়মান দর্শক কোন অদ্ভুত মন্ত্রবলে ঐ কাঠিখানিকে বেগে চালাইয়া দিলেন। ঐ বেগের পরিমাণ "বে"। চলমান অবস্থায় ঐ দণ্ডায়মান দর্শকের নিকট হাতকাঠিখানির মাপ এক হাত অথবা তদপেক্ষা কম কি বেশী হইবে? এই প্রশ্নই অন্য ভাবেও জিজ্ঞাসা করা যায়। চলমান co-ordinateএর সম্বন্ধে যাহা এক হাত দীর্ঘ, তাহা স্থির co-ordinateএর সম্বন্ধে কত? উপরের লিখিত লোরেন্স্ রূপান্তরের প্রথম (১) সমীকরণের ইংরাজি (1) চিহ্নিত সমীকরণের দিকে দৃষ্টি করুন এবং স্থির co-ordinate সম্বন্ধে হাতকাঠির মাপ কত হইবে তাহা বিবেচনা করুন। হাতকাঠি যে সময়ে চলিতে আরম্ভ করে নাই, সে সময় ঐ সমীকরণের t=o। হাতকাঠির আরম্ভ স্থান ও=o; কিন্তু হাতকাঠির শেষস্থান=১ অর্থাৎ এক হাত। সুতরাং ঐ প্রথম সমীকরণ মধ্যে t কে শূন্য ধরিলে হাতকাঠির আরম্ভ-স্থান হইতেছে $= 0\sqrt{1-\frac{b^2}{c^2}}$ এবং শেষস্থান হইতেছে $=1\sqrt{1-\frac{b^2}{c^2}}$ 1 সুতরাং বিয়োগ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ঐ দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান অর্থাৎ হাতকাঠির দৈর্ঘ্য $=\sqrt{1-\frac{b^2}{c^2}}$ 1 পূর্ব্বের ন্যায় বঙ্গাক্ষরে লিখিলে হাতকাঠির দৈর্ঘ্য হইতেছে $=\sqrt{১-\frac{\text{বে}^২}{\text{সি}^২}}$। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, হাতকাঠি যে দিকে লম্বা অর্থাৎ হাতকাঠির দৈর্ঘ্য যে দিকে সেই দিকে হাতকাঠিটী সরল গতিতে ও সমগতিতে "বে"-বেগে চলিতে থাকিলে স্থির co-ordinate হইতে অর্থাৎ দণ্ডায়মান দর্শকের নিকট উহার দৈর্ঘ্য এক হাতের কম প্রতীয়মান হইবে। $১-\frac{\text{বে}^২}{\text{সি}^২}$ এই অঙ্কটীর অর্থ কি? অর্থ এই যে ১ (এক) হইতে কিছু বাদ দিতে হইবে; এবং বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই চলমান কাঠিটীর

দৈর্ঘ্য। "সি" অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির বেগ "বে" অপেক্ষা অনেক বেশী। "বে" নিতান্তই ক্ষুদ্র; উহা "সি"র তুলনায় = ০ গণ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং অতি অল্প বেগে কাঠি চলিতে থাকিলে উহাকে দণ্ডায়মান দর্শক এক হাতই মনে করিবেন। কিন্তু ঐ বেগ "বে" যত অধিক বাড়িতে থাকিবে ততই $\frac{বে^2}{সি^2}$ = ০ মনে করা যাইবে না। তখন ক্রমেই $\frac{বে^2}{সি^2}$ বাড়িতে থাকিবে। সুতরাং কাঠিটীর দৈর্ঘ্য ক্রমেই কমিতে থাকিবে। অবশেষে যদি $বে^2 সি^2$ হইতে পারিত, অর্থাৎ ঐ কাঠিটী যদি সূর্য্যরশ্মির তুল্য বেগে চলিতে পারিত তাহা হইলে $\frac{বে^2}{সি^2}$ = ১ (এক) হইত। সে অবস্থায় $১ - \frac{বে^2}{সি^2} = 0$ হইত; অর্থাৎ তখন দণ্ডায়মান দর্শকের নিকট কাঠিটীর দৈর্ঘ্যই থাকিত না। সুতরাং ঐ দর্শকের সম্বন্ধে কাঠিটীর বেগ যতই বাড়ে ততই তাহার দৈর্ঘ্য কমে; শেষে ঐ বেগ যদি সূর্য্যরশ্মির বেগের তুল্য হইতে পারে তখন তাহার দৈর্ঘ্য থাকিবে না।

এক্ষণে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, দেশের পরিমাপ সম্বন্ধবাদের অধীন এবং সমবেগবিশিষ্ট সরল গতির বেগ যতই বাড়ে সরল দীর্ঘ পদার্থের দৈর্ঘ্য অচল অর্থাৎ স্থির দর্শকের সম্বন্ধে ততই কমে। আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত সঙ্কেতের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যদি $কো^{স}$ = ১ (এক), তবে $কো^{০}$ = এক অপেক্ষা কম।

আয়েনষ্টাইন্ আমাদিগকে কোথায় লইয়া চলিলেন! বস্তুর দৈর্ঘ্যও অবস্থানুসারে কমিয়া গেল! অবস্থানুসারে কালেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া পড়ে! তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভাসমান দ্বীপ—

প্রয়োজন হ'লে সমুদ্রের মাঝখানেও যাতে উড়োজাহাজ নির্ব্বিঘ্নে অবতরণ করতে পারে, তার জন্যে নিউইয়র্ক ও বারমুডার মাঝামাঝি সমুদ্রের বুকে এক বিশাল দ্বীপ নির্ম্মিত হ'চ্চে। দ্বীপ বলতে এখানে কৃত্রিম দ্বীপ বুঝতে হ'বে। ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর আর কোথাও উড়ো জাহাজ অবতরণের জন্য সমুদ্রের মাঝখানে কোন দ্বীপ তৈরী হয়েচে বলে শোনা যায় নি। দ্বীপটি তৈরী হ'বে লোহা ও ইস্পাত দিয়ে। যে ভাবে এর পরিকল্পনা হয়েচে, তাতে মনে হয়, এর দৈর্ঘ্য হবে বারো হাজার ফিট, আর বিস্তার চার শ' ফিট। একুশ হাজার এক শ' পঞ্চাশ ফিট দৈর্ঘ্যের ছ'টি শেকল দিয়ে এই লৌহনির্ম্মিত ভাসমান দ্বীপটিকে বেঁধে রাখা হ'বে কূলের সঙ্গে—যেন ভেসে যেতে না
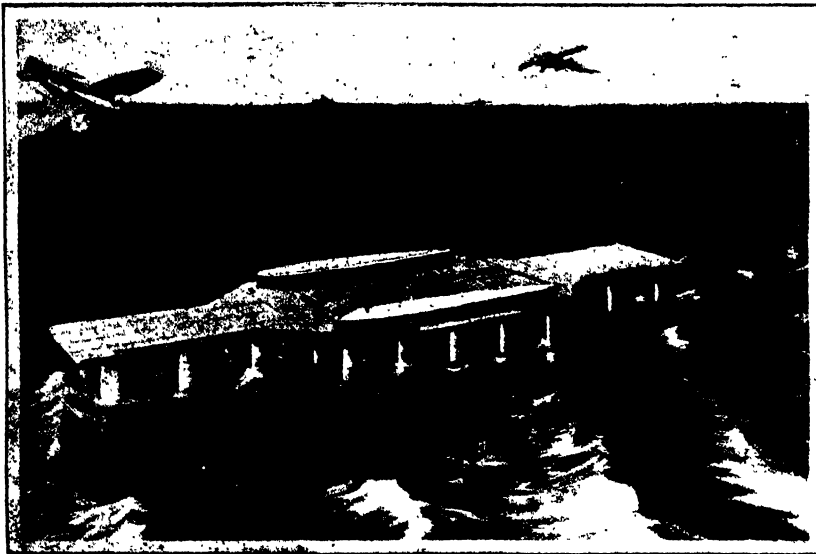
ভাসমান দ্বীপ

পারে। এই সমস্তর জন্য ইস্পাত লাগবে ছ' হাজার টন আর লোহা দু' হাজার টন। খরচ পড়বে আনুমানিক পনেরো লক্ষ ডলার। এই দ্বীপটির উপর হোটেল এবং রেডিয়োর ব্যবস্থাও থাকবে।

গাছ ছাঁটাইবার সহজ উপায়—

বাগান প্রভৃতিকে সুদৃশ্য রাখবার জন্যে মধ্যে মধ্যে গাছ-পালাগুলো ছাঁটবার প্রয়োজন হয়। ছোট গাছগুলির সংস্কার সাধন করা শক্ত নয়; কারণ, সহজে তাদের নাগাল পাওয়া যায়; কিন্তু গাছগুলি একটু উঁচু হয়ে পড়লেই মইয়ের
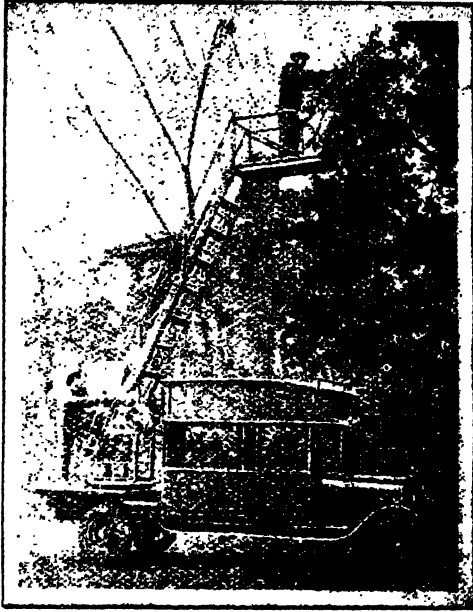
গাছ ছাঁটিবার মোটর ও সিঁড়ি

বন্দোবস্ত করতে হয়। কিন্তু 'মই'এর অসুবিধে অনেক,—এতে ইচ্ছামত সকল যায়গার নাগাল পাওয়া যায় না। এই অসুবিধার হাত এড়াবার জন্যে আমেরিকার কোথাও কোথাও এক প্রকার গাড়ীর প্রচলন হয়েচে। গাড়ীর সঙ্গে আছে লোহার সিঁড়ি; সিঁড়ির উপর আছে একটি মাচা। এটির সাহায্যে ইচ্ছেমত গাছের যে কোনো যায়গায় পৌঁছান যায়। এর আরো একটা সুবিধে এই যে পথের ধারে কোনো গাছের সংস্কার করতে হ'লে, তার দরুণ যান-বাহনের চলাচল রোধ করতে হয় না। কারণ সিঁড়িটি এমন ভাবে গাছের সঙ্গে লাগানো হয় যে, তার তলা দিয়ে গাড়ী ঘোড়া নির্ব্বিঘ্নেই যাতায়াত করতে পারে। সিঁড়ির উপর যেমন উঁচু করা যেতে পারে, আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে তেমনি নামিয়ে রাখাও যেতে পারে।

অদৃশ্য টেলিফোন—

টেলিফোন যন্ত্রটা সকল সময় চোখের সামনেই থাকবে—আমেরিকার মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে তা' পছন্দ করেন না। এই জন্যে কোথাও কোথাও দেখা যায়, টেলিফোন ও তার আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জামগুলিকে দৃষ্টির আড়ালে রাখবার জন্যে, এই রকম ব্যবস্থা করা হয়েচে। মাঝের থাকটিতে থাকে

টেলিফোঁ যন্ত্রের কুঠরী

টেলিফোন যন্ত্র; আবার নীচের থাকে দরকারি বই প্রভৃতিও সাজিয়ে রাখা চলে। মাথার উপরে ঘণ্টার বাক্সটিও দৃষ্টির আড়ালে রাখা থাকে। আমেরিকার গৃহিণীরা এই ব্যবস্থাকে বিশেষ সুবিধাজনক মনে করেন।

মৃত্যু সঙ্কেত—

ডেট্রয়টের পথে মোটর-চালকদের সতর্কভাবে গাড়ি চালানোর জন্যে এক নতুন রকমের সঙ্কেত ব্যবহার করা হ'চ্চে। রক্ত-আলোয় নর-কপালের মূর্ত্তি পরিস্ফুট হয়ে উঠে দূর থেকেই বিপদের বার্ত্তা জ্ঞাপন কর্ত্তে থাকে। এই পথের দু'ধারে লৌহ-নির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণী থাকায়, অনেক

মোটর সেগুলির সহিত সংঘর্ষের ফলে চূর্ণ হয়ে গেছে। সেই জন্যেই এ নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েচে। ওই নর-

মোটর চালককে সতর্ক করিবার জন্য
বিপদসূচক লাল আলো

কপালট দেখলেই বুঝতে হ'বে, সাবধানে যেতে না পারলেই মৃত্যু অনিবার্য্য।

সোয়ানী টেইলার—

'বেতার' সঙ্গীত বা অভিনয় জিনিষটা খুব সম্প্রতি সমুদ্র পার হয়ে এসে এ দেশের মাটিতে ছড়িয়ে পড়েচে। এখানকার বেতার অভিনয়ের মধ্যে নাটকোক্ত চরিত্রের কথাবার্ত্তা ছাড়া অন্য কিছুর শব্দ প্রায়ই শোনা যায় না। কিন্তু বিদেশে বেতার-অভিনয়ে অনেক প্রকারের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। যেমন, অশ্ব-পদধ্বনি, কামানের শব্দ, সিংহ বা অন্য কোনো হিংস্র পশুর গর্জ্জন। মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, অভিনয়ের সময় সত্যই ঘোড়া ছোটানো হয় বা কামান দাগা হয়। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে সে সব কিছুই করা হয় না। খুব সহজ-প্রাপ্য সাধারণ কতকগুলি জিনিষের সংস্পর্শে এই সমস্ত শব্দের অনুকরণ করা হয়। কুকুর, বাঘ বা হিংস্র জন্তুর স্বরের জন্য প্রায়ই বেতার-অভিনয়-গৃহে এক একজন লোক নিযুক্ত থাকেন। এঁরা সেইগুলির অনুকরণ করেন। ঠিক অনুকরণ হয় ত বলা চলে না, কারণ তাঁরা এমন ভাবে শব্দ করেন যা বেতার অভিনয়ের শ্রোতাদের কাণে প্রয়োজন অনুরূপ হয়ে

সোয়ানী টেলর
(ইনি ষোল রকম নাসিকা-ধ্বনি করিতে পারেন।)

পৌঁছোয়। সোয়ানী টেইলার এই ধরণের লোক। ইনি ষোলো প্রকার জন্তুর স্বরানুকরণ করতে পারেন।

সাপের প্রতিবেশী—

পাহাড়ের গর্ত্তের মধ্যে এই পাখীগুলির বাস। জাতিতে এদের পেঁচা বলা যেতে পারে, কিন্তু শুধু ঐটুকু বললেই এদের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। আল্‌পস ও পাইরিনিজ পাহাড়ের গহ্বরে ইঁদুর জাতীয় এক প্রকার জন্তু বাস করে; এরা তাদেরি বাসস্থান অধিকার করে সাধারণতঃ বাস করে থাকে। উত্তর আমেরিকাতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। সে দেশে এক প্রকার বিষাক্ত সরীসৃপ আছে; তাদের লেজের দিকটা গাঁঠ গাঁঠ আর শক্ত হাড়ের মত। ছুটোছুটি করবার সময় লেজের সেই হাড় থেকে এক প্রকার শব্দ

হয় এবং সেই অনুসারেই এদের নাম র‍্যাট্‌ল সাপ। এই পাখীগুলিকে সময় সময় এই সাপের গর্ত্তের মধ্যে তাদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করতে দেখা যায়।

বন্য কুকুরের বিবর-বাসী পেচক-দম্পতি

বে-তারের ক্রম-বিকাশ—

নিম্নের ছবিটিতে বে-তার-যন্ত্রের ভূত, ভবিষ্যৎ, এবং বর্ত্তমান—এই তিন অবস্থাই দেখানো হয়েচে। প্রথমটি বে-তারের ১৯২২ সালের অবস্থা, দ্বিতীয়টি ১৯২৪ সালের, তৃতীয়টি ১৯২৮ সালের এবং চতুর্থটি ১৯৩০ সালে যা হ'তে পারে। ক্রমশঃ বে-তারের সুবিধা কি ভাবে বৃদ্ধি হয়েচে—এই ছবিগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, ১৯৩০ সালে বে-তারের অভিনয় শুনতে শুনতে হয় ত অভিনেতাকেও দেখা যাবে; অর্থাৎ বে-তারের সঙ্গে টেলিভিশনের যোগ স্থাপিত হ'বে। চতুর্থ ছবিটিতে ১৯৩০ সালের অবস্থা দেখাতে গিয়ে সেই জিনিষটারও উল্লেখ করা হয়েচে। একজন মেয়ে বে-তারে খেলার মাঠের খবর শুনছেন এবং সেই সঙ্গে প্রধান খেলোয়াড়ের ছবিও তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠেচে।

'র‍্যাডিও'র কুলজী (র‍্যাডিওর ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার পরিচয়)

উন্নত সংস্করণের টেনিস র‍্যাকেট

টেনিস র‍্যাকেটের সুবিধা বৃদ্ধি—

টেনিস খেলাটা এখনও ফুটবলের মত জনপ্রিয় না হ'লেও, বেশ প্রচলিত হয়েচে তাতে আর সন্দেহ নেই। টেনিস খেলার একটা অসুবিধে এই যে, এটা ফুটবলের মত অল্প খরচায় হয় না। একখানা ভাল টেনিস র‍্যাকেটের দাম এত বেশী যে সাধারণ লোকের পক্ষে তা কেনা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া, আরও একটা অসুবিধে এই যে, তারগুলি একটু বেশী কড়া ভাবে বাঁধা থাকলেই তা চট্ করে ছিঁড়ে যায়। সম্প্রতি আমেরিকায় যে নতুন টেনিস র‍্যাকেট বেরিয়েচে, তাতে একটা করে হ্যাণ্ডেল যোগ করে দেওয়া হয়েচে। এইটি ঘুরিয়ে তারগুলিকে ইচ্ছামত কড়া বা আল্‌গা করে নেওয়া যায়; সুতরাং ছেঁড়বার ভয় থাকে না।

আহ্বান

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

অনেকগুলো ভারী কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে ব'সেছিলাম —ঠিক সেই সময় রঙ্গপুর জেলার ছাত্র-সম্মিলনীর পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ পেলাম, এই সভার নেতৃত্ব ক'রতে।

এ নিমন্ত্রণে আমি উল্লসিত হ'লাম।

কিছুদিন থেকে আমার মনটা ব্যাকুল হ'য়েছিল, বাঙ্গালার যুবকদেরকে সামনাসামনি কতকগুলো কথা বলবার জন্য;—সে কথা এমন ভাবে বলবার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ হ'য়ে গেলাম। কাজ থেকে অবসরের প্রতীক্ষা ক'রতে ইচ্ছা হ'ল না।

বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছ ব'লে আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তা' আর বেশী ব'লবার দরকার নেই।

অনেকগুলো কথা মনের ভিতর ভীড় ক'রে আসছে; আমার অনেক স্বপ্ন, অনেক আকাঙ্ক্ষা তোমাদের জীবনের ভিতর মূর্ত্তি গ্রহণের আশায় প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছে। সব কথা বলবার সময় নেই—দিনের পর দিন চ'লে গেলেও সব কথা বিশদ ক'রে হ'য় তো ব'লে উঠতে পারবো না।

আমি তোমাদেরকে সুধু ছাত্ররূপে, সুধু রঙ্গপুর জেলার যুবকরূপে দেখছিনে, আমি দেখছি তোমরা বাংলাদেশের যুবক, ভারতের যুবক—ভারতের ভাবী জাতির একটা অংশ, বিশ্বমানবের ভবিষ্যতের আংশিক ন্যাসধারী!

এই কথাটা সম্যক তোমরা আয়ত্ত ক'রতে পার কি? এই চিন্তা তোমাদের জীবনের ভাঙ্গাগড়ার স্বপ্নে, তোমাদের কর্ম্মে, তোমাদের চিন্তায় তোমাদের সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ করে কি?

আমি চাই বাঙ্গালাদেশের যুবক সমাজের ভিতর এই আত্মজ্ঞান। ভারতের সুদূর অতীতে মহামনস্বী তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা ব'লে গেছেন, তুমি মানব—যত ছোটই হও, তুমি ছোট নও, তুমি ব্রহ্ম। ছোট ব'লে তুমি যে আপনাকে ভাব, সে তোমার মায়া। সেই মায়াকে যত ভাঙ্গবে, যতই

আপনাকে ব্রহ্ম ব'লে জানবে, ততই তুমি বড় হবে, ততই মোক্ষের পক্ষে অগ্রসর হবে। তোমার ভিতর তোমার ছোট্ট ব্যক্তিত্ব আছে, সেখানে তুমি ছোট ; কিন্তু তোমার ভিতর—তোমার এই সসীম ব্যক্তিত্বের ভিতরই প্রকাশ হ'চ্ছে অসীম ;—সেইখানে তুমি বড়—সেই কথা তোমায় জানতে হ'বে, সেই জ্ঞানে তুমি মহীয়ান হবে, সেই জ্ঞানে শক্তিমান হবে!

ছোট্ট মানুষ আমরা, ক্ষুদ্র আমাদের পরমায়ু—সঙ্কীর্ণ আমাদের শক্তি—কতটুকুই বা ক'রতে পারি আমরা! কিন্তু আমাদের দৃষ্টির এই ক্ষুণ্ন সঙ্কুচিত পরিসরের সীমা ভঙ্গ ক'রে যদি বিশ্বজীবনের ভিতর আমাদের স্থান আমরা আয়ত্ত ক'রতে পারি, যদি চ'খের সামনে ধ'রে দেখতে পারি আমাদের এই বিশ্বজীবনের ভিতর functionএর প্রকৃত স্বরূপ, তবে আর আমাদের এ ক্ষুদ্রত্ব বোধ থাকবে না।

কোথায় কে কোন্ দিন এক মুষ্টি water hyacinthএর বীজ এনে তার ছোট জলাশয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, তার ফুলের শোভায় মুগ্ধ হ'য়ে! অযত্নে অনাদরে সে ফেলে দিয়েছিল গাছগুলো, যখন শুকিয়ে গেল ফুল। কোথায় সে তুচ্ছ বীজ গেল, কেউ তো খোঁজ নেয়নি, নেবার দরকার মনে করে নি। হাওয়ায় সে উড়ে গেল, জলে ভেসে গেল—দেখতে দেখতে সে বীজ কচুরী পানায় ছেয়ে ফেল্লে বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ পল্লীর বিল দীঘি জলাশয়,—বন্ধ ক'রে দিলে তার নদীর স্রোত! জীবনের এমনি স্বভাব ;—এর প্রত্যেকটি অংশ জীবন্ত। জীবন থেকে জীবন প্রসূত হয়, ছোট ক্রমে বড় হয়, বীজ হ'য়ে পড়ে গাছ।

আমাদের দেহটাই যে সুধু সজীব তা নয়, আমাদের মনটা তার চেয়েও বেশী সজীব। আমাদের প্রত্যেকটা কথা, প্রত্যেকটি কাজ সজীব—প্রত্যেকটি এক একটি কচুরী পানার বীজের মত অদৃষ্ট পথে ছড়িয়ে বিচিত্র প্রণালীতে বিকাশ লাভ করে। যাঁরা বড়লোক, তাঁদের বড় বড় কথা যে বিশ্বের জীবনে কত বড় ফল প্রসব করে তার প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু অতি ছোট মানুষের অতি ক্ষুদ্র কথা—অবহেলায় আমরা যা করি বা বলি, সেই সব তুচ্ছ কথা, সেও যে অমনি নষ্ট হ'য়ে যায় না, সে কথাটা আমরা সব সময় স্মরণ করি না।

আমাদের প্রত্যেকের জীবন সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ক'রলে দেখতে পাব যে, আমাদের মানসিক জীবনটা কত বেশী পরিমাণে এই সব তুচ্ছ, অবহেলায় উচ্চারিত কথা—অবহেলায় করি যে কাজ, তাই দিয়ে নিয়মিত হ'য়েছে। একজন যে কথা ব'লে শেষ ক'রে দিলেন, একজনের ভিতর যে প্রবৃত্তিটা কাজে সমাপ্ত হ'য়ে গেল, দ্রষ্টা ও শ্রোতার মনের ভিতর গিয়ে তার নূতন জীবন আরম্ভ হ'ল,—হয় তো বা সেই কথাই তার জীবনটা গ'ড়ে তুললো ;—তার ফল তার মুখের কথায়, আচরণে চার দিকে ছড়িয়ে প'ড়লো। ছড়িয়ে পড়লো, হয় তো কোনও একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নয়—তার সূত্র ধ'রে যদি আমরা যেতে পারি, তবে হয় তো দেখতে পাব যে সেই তুচ্ছ কথার অগণিত বংশ যুগযুগান্তর ধ'রে দেশ হ'তে দেশান্তরে ছ'ড়িয়ে প'ড়ে বিশ্বমানবের জীবনে নানা বিচিত্র ধারায় ফুটে উঠেছে।

বুদ্ধ, প্লেটো, খৃষ্ট, মহম্মদ—এঁরা তাঁদের ক্ষুদ্র জীবনে কটাই বা কথা ব'লে গিয়েছিলেন ;—সেই কথা থেকে প্রসূত হ'য়েছে বর্ত্তমান জগতের অধ্যাত্ম-জীবনের, ব্যবহারিক-জীবনের, চিন্তা-জীবনের ও কর্ম্ম-জীবনের বিরাট মূর্ত্তি! এ কথা কে না জানে? কিন্তু যেটা কেউ জানে না, সেটা হ'চ্ছে সেই সব তুচ্ছ লোকের তুচ্ছ কথা যাতে ক'রে এই সব মহাপুরুষদের জীবন ও চিন্তাধারা গঠিত হ'য়ে উঠেছিল। কোন এক অজানা সারথী জরাগ্রস্ত এক বৃদ্ধকে দেখে বৃদ্ধকে ব'লেছিল কি একটা সাধারণ কথা ;—মহাপুরুষের বৃহৎ আত্মায় সেই তুচ্ছ কথার প্রতিঘাতে যে বিরাট চিন্তার ধারা প্রবাহিত হ'য়েছিল, তার ফল বর্ত্তমান বিশ্বজীবনের একটা প্রকাণ্ড অংশ। আমরা বুদ্ধের কাছে জগতের এ ঋণের সংবাদ জানি ; কিন্তু সেই সারথীর কথা ও কাজ, সেই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের তুচ্ছ জীবন, এই সব তুচ্ছ কর্ম্মের কাছে আমাদের ঋণটা না জানি, না স্বীকার করি।

এই সব ছোট ছোট কথায় বড় বড় ফল যে শুধু মহাপুরুষদেরই জীবনে ঘটে তা নয়, আমাদের প্রত্যেকের নগণ্য জীবনের তলায় ডুবুরী হ'য়ে নামতে পারলে আমরা দেখতে পাব যে আমাদের জীবন, চিন্তা ও কর্ম্ম কত আশ্চর্য্য রকমে নিয়ন্ত্রিত হ'য়েছে এমনি সব ছোট-খাট কথা দিয়ে। আমাদের মানব জীবনের বিকাশ হ'চ্ছে বাইরে থেকে অবিশ্রান্ত ভাবে উপকরণ সংগ্রহ ও সমীকরণ ক'রে ; জীবনের বিকাশের পক্ষে তার কোনওটাই একেবারে নিষ্ফল নয়।

হয় তো, যে কথা আমি শুনিইই নি, কিম্বা শুনে থাকলেও তখনি ভুলে গেছি ব'লে মনে হয়, সে কথাটাও যে আমার জীবন-স্রোত থেকে বেরিয়ে যায় নি, আমার অসংবিদের ভিতর নিষ্পিষ্ট থেকে সে আমার জীবন ও চিন্তাকে নিয়মিত ক'রেছে—তার বিস্ময়কর প্রমাণ বের ক'রেছেন আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকেরা। কিন্তু কথাটা স্বীকার করবার জন্য মনোবিজ্ঞানের কোনও গুহাস্থিত তত্ত্বের সহায়তার দরকার নেই, আমাদের সংবিদের ইতিহাস আলোচনা ক'রলেই আমরা সেটা প্রত্যেকেই জানতে পারবো।

আমার জীবন থেকে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমি যখন বেহারের একটা সামান্য স্কুলে থার্ড ক্লাস থেকে প্রমোশন পেয়ে উঠলাম, তখন আমি গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে আমার এক আত্মীয়কে ব'লেছিলাম "আমি ফার্ষ্ট হ'য়েছি।" তিনি কথাটা শুনে ব'ল্লেন, "মোতিহারী স্কুলে ফার্ষ্ট হ'য়েছ তো ব'য়ে গেছে। হ'তে হবে ইউনিভারসিটিতে ফার্ষ্ট—তবে বুঝবো।" আমার সে আত্মীয় সামান্য কেরাণী—এণ্ট্রান্স ফেল। তিনি সেই যে সেদিন কথাটা ব'লেছিলেন, তা হয় তো ভুলেও গেছেন। কিন্তু আমি ভুলি নি—কথাটা আমার জীবনে খুব প্রকাণ্ড ফল সৃষ্টি ক'রেছে। সেই দিন আমার দৃষ্টিটা সঙ্কীর্ণ মোতিহারী স্কুলের সীমা উত্তীর্ণ হ'য়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ব্যাপ্ত হ'য়ে প'ড়েছিল; তার পর সে দৃষ্টি আরও প্রসারিত হ'য়ে গেছে। জীবনে হয় তো আমি কিছু ক'রতে পারি নি, পারবো না; কিন্তু এ কথা আমি স্পর্দ্ধা ক'রে বলতে পারি যে, আমার জীবনের কাজের পরিমাণ আমি কোনও ছোট আদর্শ দিয়ে বিচার করি না—বিশ্বের সাধারণ যে মানদণ্ড তাই দিয়ে পরিমাপ ক'রতে হ'বে আমার কথা ও কাজ; সে মানে যদি তা বড় হয়, তবেই বড়, তাতে ছোট হ'লে তা ছোট। এই অনুভূতি আমার সমগ্র জীবনকে নিয়মিত ক'রেছে—কিন্তু আমার ভিতর যে এই অনুভূতি ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত ও বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, তার মূল আমার আত্মীয়ের সেদিনকার সেই ছোট্ট কথা। আর আজ যদি আমি তোমাদেরকে এমন কোনও কথা বলি যাতে হয় তো তোমরা ভাবতে থাকবে, সে কথা তোমাদের বিভিন্ন চিত্তে বিভিন্ন চিন্তা-প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে বিচিত্র পরিণতি লাভ ক'রে নানা ধারায় হয় তো তোমাদের বন্ধু বান্ধব সন্তান সন্ততি, প্রতিবেশী পরিজন থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে সকলের অজ্ঞাত সূত্র ধারণ ক'রে বিশ্বের চিন্তা-প্রবাহের ভিতর স্থান পেয়ে যাবে, তবে জানবে যে সে কথার সুদূর একটি উৎস আছে সেদিনকার সেই তুচ্ছ কথায়।

বিশ্বমানবের মনোজীবনকে খুব ব্যাপক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে এ কথা খুব স্পষ্ট ক'রেই মনে হবে যে, দেখতে যদিও আমরা বহু; অসংখ্য সীমাবদ্ধ দেহের ভিতর আটকে র'য়েছে আমাদের কোটি কোটি বিচ্ছিন্ন মন; তবু সব মিলে সেটা একটাই বৃহৎ মন। সে মনের বিরাট যুগ যুগান্তরব্যাপী জীবনের ভিতর ভেদ আছে, কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ কোথাও নাই। এ একটা বিরাট প্রবাহ, যা সৃষ্টির আদি থেকে চলছে—অনন্ত কাল চলবে; যার ভিতর ধারা এসে প'ড়ছে নানা দিক দিয়ে; নানা ধার দিয়ে আবার সে প্রবাহ ভেঙ্গে যাচ্ছে—কিন্তু চলেছে একটা অবিশ্রান্ত স্রোত। সেই চিত্ত-প্রবাহের ভিতর আমরা এক একটা বিশিষ্ট প্রবাহ। আপনাকে মনে ক'রছি সীমাবদ্ধ জলাশয়, কিন্তু, আদিতে অন্তেতে মধ্যে সব কটা ইন্দ্রিয়ের সহস্র ছিদ্র দিয়ে অজ্ঞাতসারে রক্ষা করছি সেই বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে সংযোগ। পঞ্চদশীকার ব'লেছেন, মায়া ও অবিদ্যায় আচ্ছন্ন ব্রহ্মের দুটি রূপ,—ব্যষ্টিভাবে তিনি পুরুষ, সমষ্টিভাবে মহেশ্বর। বিশ্বের এই বিরাট জীবন-প্রবাহ সেই মহেশ্বর। লোষ্ট্রস্তূপের মত সমষ্টি এ নয়—এ ঠিক সেই রকম সমষ্টি যেমন সমষ্টি আমার দেহ। শারীর-তত্ত্ববিদেরা জানেন যে আমাদের এই দেহ কোটি কোটি জীবাণুর সমবায়। প্রত্যেকটি সজীব cell-এর একটা স্বতন্ত্র জীবন আছে; কিন্তু তাদের সমবেত জীবনেই আমাদের জীবন। আমরা এই মহেশ্বরের জীবনের এমনি সব cell—মহা-জীবনের জীবাণু!

এই অনুভূতি যদি তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে জাগ্রত ক'রে তুলতে পার, তবে তোমাদের জীবন থেকে নির্ব্বাসিত হবে ক্ষুদ্রত্ববোধ—প্রত্যেকে আপনার জীবনকে খুব বড় ক'রে দেখতে পারবে। তখন বুঝতে পারবে, যত ছোট, যত নগণ্য কেন হই না আমরা, আমরা সবাই আমাদের সমাজ-জীবনের, বিশ্ব-জীবনের অপরিহার্য্য অংশ। আমরা প্রত্যেকে আমাদের প্রতিদিনের প্রতি কার্য্য প্রতি কথায় সমাজের জীবন, বিশ্বের জীবন প্রকাশ ক'রছি, আর তার ভবিষ্যৎ নিয়মিত ক'রছি। ব্যর্থ হয় তো মনে হ'চ্ছে আমার কাজ—একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে হয় তো আমার

জীবন, কিন্তু বিশ্ব-জীবনের ভিতর তা' কত বিচিত্ররূপে সার্থক হ'চ্ছে, তা আমরা জানিনে—জানবার উপায় আমাদের নেই—কিন্তু তা' যে হ'চ্ছে সে নিশ্চয়।

এই অনুভূতি তোমাদেরকে আপনার চ'খে মহৎ ক'রে তুলবে, মহৎ কাজে প্রেরণা দেবে, নীচতায় তোমাদেরকে পরাঙ্মুখ ক'রবে!—নিজের জীবনটাকে তুচ্ছ ব'লে নষ্ট করা আর চ'লবে না; এ কথা বলা চলবে না যে আমি আমার নিজেকে নিয়ে যাই করি তাতে কার কি ব'য়ে যায়! এই অনুভূতি তোমাদেরকে প্রবুদ্ধ ক'রবে সমাজ-জীবনের অনুকূল ক'রে জীবনযাপন করবার জন্য। এই অনুভূতিই ব্যবহারিক জীবনের মহাবাক্য—তত্ত্বমসি—ছোট নও তুমি, তুচ্ছ নও;—তুমি মহেশ্বর। এই অনুভূতি তোমাদের জীবনকে নূতন অর্থ, নূতন সম্পদে গরীয়ান ক'রে তুলবে।

এ কেবল মন-ভুলান কথা নয়, কাব্য-কথা নয়—অনুভবের অতীত গভীর তত্ত্বও নয়। এটা আমার সাক্ষাৎ অনুভূতি;—আর যে কেউ এই কথা আয়ত্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রবে সেই এটা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি ক'রতে পারবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এটা এমন একটা তত্ত্ব-কথা নয় যেটা পোষাকী কাপড়ের মত তাকে তুলে রেখে নিশ্চিন্ত ভাবে কাজ করা যেতে পারে। এটা আটপৌরে জীবনের একটা নীতি, রোজকার ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োজন আছে। দুঃখ দৈন্যের ভিতর এই চিন্তায় পাবে শান্তি, নৈরাশ্যের ভিতর এতে পাবে উৎসাহ। এই অনুভূতি মনে জাগ্রত থাকলে বুঝতে পারবে যে—

> জীবনে যত পূজা হয় নি সারা
> জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
> যে ফুল না ফুটিতে, লুটাল ধরণীতে
> যে নদী গিরিপথে হারাল ধারা,
> জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।

বিশ্বের জীবনের দিকে চেয়ে দেখ, বিশ্ব-জীবনের এই একত্ববোধ প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ হ'য়ে কত বিচিত্রভাবে কর্ম্মে মূর্ত্তিমান হ'য়ে উঠছে। Internationalism কথাটা সবাই শুনেছ। রাজনীতির ভিতর এই বিশ্ব-জাতীয়তার আদর্শ বেশী করে ফুটিয়ে তোলবার জন্য একটা চেষ্টার কথা আজ অনেক শোনা যাচ্ছে। সেটা হয় তো কথার কথা। সন্দেহবাদী ব'লবে যে এ সব ভুয়ো;—মুখে মুখে যারা এই বিশ্ব-জাতীয়তার কথা বলছে, কাজে তারা ক'রছে আন্তর্জাতিক বিরোধ! হয় তো তা' হ'তে পারে—হয় তো League of Nations-এর পোনেরো আনাই ফাঁকি—হয় তো রাজনীতিক্ষেত্রে বিশ্ব-জাতীয়তার আবির্ভাব এখনও সুদূরপরাহত। কিন্তু রাজনীতির বাইরের জীবনের দিকে চেয়ে দেখলে আর সন্দেহ থাকবে না যে, বিশ্বজীবনের ভিতর জাতীয়তার গণ্ডী অনেক দিনই ভেঙ্গে গেছে—সুধু রাজনীতির ভিতর সেই অসত্য অতীত আপনার নষ্ট সত্তা আজও স্বীকার ক'রতে চাচ্ছে না। কিন্তু অন্নবস্ত্রের সমস্যা পূরণে আজ বিশ্বের ভিতর জাতীয়তার ছেদ নাই, ভাব ও চিন্তা জগতে এ গণ্ডী কোনও দিনই ছিল না। যতই দিন যাচ্ছে, রেল, মোটর, এয়ারোপ্লেনে জগতটা যতই পরস্পরের কাছাকাছি হ'য়ে প'ড়ছে, এ বিষয়ে জগতের আদান-প্রদান ততই নিবিড়তর হ'চ্ছে। বিশ্ব-জীবনের এই সুনিবিড় একীকরণের দিনে আমরা এখনও, কি ভাবরাজ্যে, কি কর্ম্মরাজ্যে, আমাদের কূপমণ্ডুকের স্বভাব ছাড়তে পারি নি। সমস্ত বিশ্বজুড়ে যে একটা প্রকাণ্ড ভাব ও কর্ম্মপ্রবাহ চলছে, যাতে সমস্ত জগৎটার চেহারা ফিরিয়ে দেবার জন্য সব দেশের লোক উঠে-প'ড়ে লেগে গেছে, তার ভিতর কোমর বেঁধে কাজে লাগবার আগ্রহ আমাদের বড় কম। কাজে লাগা দূরে থাক, তার খবর রাখাও আমাদের বড় একটা অভ্যাস নেই। বাইরের জগতে যেখানে ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, তার একটা মৃদু স্পর্শমাত্র আমাদের দেশে এসে পৌঁছায় না; বাইরে যেখানে প্রকাণ্ড হট্টগোল, তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিটুকুও আমাদের বধির কর্ণে প্রবেশ করে না। সমস্ত বিশ্বের যে সব সাধারণ সমস্যা সমাধানের বিচিত্র চেষ্টা নানা দেশে হ'চ্ছে, তার নিঃশ্বাসমাত্রও আমাদের দেশে আসতে পায় না।

কথাটা ব'লতে আমার বড় দুঃখ হয়—স্বীকার ক'রতে লজ্জা হয়, কিন্তু কথাটা সত্য যে, আমাদের সমস্ত জাতটার দৃষ্টিক্ষেত্র এখনও সীমাবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে এই ছোট্ট দেশটার মধ্যে। আমাদের দেশে কোনও কিছুর চরম গালাগাল হ'চ্ছে এই যে সেটা বিদেশী। আমাদের চিন্তারাজ্যে বিদেশী মালের আমদানী একেবারে না হ'চ্ছে তা নয়—আসছে পচা মাল। বিলাতে যেটা পুরোণো হ'য়ে জীর্ণ ব'লে পরিত্যক্ত হ'য়ে গেছে, সেইটা পরম সমাদরে অঙ্গের ভূষণ ক'রে নিতে আমাদের বাধে না; কিন্তু নূতন টাট্‌কা কিছু

আমদানী ক'রলেই তার বিদেশী গন্ধে আমাদের নাক টাটিয়ে ওঠে।

জ্ঞানে, ভাবে, কর্ম্মে আমরা যে এমনি ক'রে আমাদের মনটাকে দেশের চৌহদ্দী দিয়ে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছি, তাতে আমাদের দেশের চিত্ত যে কতটা দরিদ্র হ'য়ে যাচ্ছে, সেটা, বাইরের খবর যে কেউ রাখে, সেই অনুভব ক'রতে পারে। আমার একটি বন্ধু একজন লোকের কথা গল্প করেন, তিনি থাকতেন এই উত্তর বাঙ্গলারই একটা সহরে—ক'লকাতায় কোনও দিন যান নি। কেউ যদি তাঁকে ব'লতো, "আপনি একবার গিয়ে ক'লকাতা দেখে আসুন," তিনি ব'লতেন, "কি আর দেখবো ক'লকাতায়? এখানে পাঁচখানা বাড়ী আছে, ক'লকাতায় না হয় একশোখানা আছে, এখানে দশখানা পাকা বাড়ী আছে, ক'লকাতায় হয় তো একশো খানা আছে—এই তো?" আর একটি লোক পাড়াগাঁ থেকে ক'লকাতায় গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার চেষ্টা সুধু হ'ল ক'লকাতার তুলনায় তার দেশটাকে খাটো না করা। একদিন মিউজিয়াম দেখিয়ে তাকে বলা হ'ল, "তোদের দেশে এত বড় বাড়ী আছে?" সে অমনি বল্লে, "কি বলেন? আমাদের জমীদার-বাড়ী এর চেয়ে ছোট নয়।" আর গাড়ী ঘোড়া মোটর গাড়ী যা' কিছু তাকে দেখান যেতো, সবই সে উড়িয়ে দিত—যেন ও সব তুচ্ছ!

আমাদের সমস্ত দেশটার বিশ্ব সম্বন্ধে মনের ভাব কতকটা এই দুজনের মত। হয় আমরা জানতেই চাই না, না হয় তো জেনে তাকে দেশের কাছে খাটো করবার জন্য প্রাণপণ করি। এর নাম কি patriotism। এই জাতীয় patriotism আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ ক'রতে ব'সেছে। ভাবতে আমার কান্না পায় যে, যে দেশের লোক সভ্যতার শৈশবে দেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে গ্রীস থেকে জাপান পর্য্যন্ত নিজের সভ্যতা ছড়িয়ে দিয়েছিল, সেই দেশের লোক আমরা—আজ জগৎকে দেবার আমাদের কিছুই নেই, কোনও নূতন বার্ত্তা তাদের শোনাবার শক্তি আমাদের নেই। সুধু তাই নয়, বাইরে থেকে গ্রহণ করবার শক্তি পর্য্যন্ত আমরা হারিয়ে ব'সেছি। এখন বিশ্বের দরবারে আমাদের দেখাবার জিনিষ মিউজিয়াম থেকে সংগ্রহ ক'রতে হয়, মাটির তলা থেকে খুঁড়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মৃতদেহ দেখিয়ে আমাদের কোনও মতে মুখরক্ষা ক'রতে হয়।

আমার যদি শক্তি থাকতো, তবে আমি সমস্ত জাতটার মাথা ধ'রে মোচড় দিয়ে তার চোখ ফিরিয়ে দিতাম বিশ্বের দিকে।

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে নোয়াই মাথা।"—

কথাটা ভাল। কিন্তু তার উপর মাথা নুইয়ে প'ড়ে থাকলেই তো সে মাটির উপকার হ'বে না। দেশের পূজা ক'রতে হ'লে উপচার আহরণ ক'রতে হ'বে সমস্ত বিশ্ব থেকে—প্রসাদ বিতরণ ক'রতে হবে সমস্ত বিশ্বে। সমস্ত বিশ্ব যে দিন দেশের পূজা-মন্দিরে প্রসাদপ্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াবে, সেই দিনই বুঝবো যে আমাদের পূজা সার্থক হ'য়েছে।

তার জন্য সবার আগে এই প্রয়োজন যে, আমাদের সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ সাধন ক'রতে হবে। দুনিয়ার কোথায় কি হ'চ্ছে তার সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক সন্ধান রাখতে হবে; যেখানে যে রত্ন আবিষ্কৃত হ'য়েছে তাকে আহরণ ক'রতে হবে, যাচাই ক'রতে হ'বে; বিচার ক'রে তাকে দেশমাতৃকার মুকুটে বসাতে হ'বে।

সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে আমাদের;—বিশ্বের জ্ঞানী, গুণী, কর্ম্মীদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হবে অশ্রান্তগতিতে অনির্দ্দিষ্ট সুদূরের লক্ষ্য লাভের চেষ্টায়;—তবেই না আমরা দেশের সেবায় গৌরব লাভ ক'রবো।

কিন্তু, বিশ্বের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াবার চেষ্টা দূরে থাক, তার যথেষ্ট খবরও আমরা রাখা আবশ্যক মনে করি না। আমাদের গভর্ণমেণ্ট থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের মাঠের চাষী পর্য্যন্ত সবাই যেন প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছে যে, যেটা জোর ক'রে চোখের সামনে এসে না দাঁড়াবে তাকে দেখবো না, জানবো না। তাই আমাদের দেশের সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতি বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানদানে এত কৃপণ; তাই আমাদের শিক্ষিত দেশবাসী অন্ধের মত অন্ধ নেতাদের অনুসরণ করে; আর দেশের দরিদ্রের দল সুনিবার্য্য কারণে দলে দলে তাদের তুচ্ছ জীবন বিসর্জ্জন ক'রে, ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে দেশকে হতশ্রী ক'রে তুলছে।

দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করা একটা সাধারণ ফ্যাসান। হাটে মাটে ঘাটে এর সমালোচনা শুনতে পাওয়া যায়; বিশেষ ক'রে তাদেরই কাছে যাদের ভাল

শিক্ষা-পদ্ধতির সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণাই নেই। আর বিরুদ্ধ সমালোচনা সব চেয়ে বেশী হয় সেই সব নূতন জিনিষের, যা বাস্তবিক ভাল। আমাদের শিক্ষার আমি যে সমালোচনা ক'রলাম, আশা করি কেউ এ সমালোচনা ঠিক সেই পর্য্যায়ে ফেলবেন না। আমার অভিযোগ এই যে, আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে বড় অল্পে তুষ্ট। স্কুল কলেজের পাঠ্য নির্দ্ধারণ ক'রতে গিয়ে, পরীক্ষার বিষয় নির্দ্ধারণ ক'রতে গিয়ে আমরা সুকুমার বালকবালিকাদের সৌকুমার্য্যের উপর অতি-মাত্র দরদী হ'য়ে পড়ি। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি জানি, যে ভাল বই—যে বই ছেলেদের পড়া নিতান্ত দরকার সে সব বই কঠিন ব'লে পাঠ্য তালিকা থেকে পরিত্যক্ত হয়। আর কলেজে—বিশেষতঃ স্কুলে এমন শিক্ষক কমই আছেন যাঁরা ছাত্রদের পরীক্ষার নির্দ্ধারিত বিষয়ের চেয়ে বেশী কিছু ছেলেদের পড়তে বাধ্য করেন। এতে দাঁড়িয়েছে এই যে, আমাদের স্কুল ও কলেজ থেকে ছেলে মেয়েরা শেষ পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এলে যা কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করে, তা' বিশ্বের অগ্রসর জাতগুলির ছাত্রদের তুলনায় কিছুই নয়।

তার পরিচয় আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ছেলে পায় বিদেশে গেলে। আমার ছেলে যখন বিলাতে যায় তখন সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে I. Sc প'ড়ছিল। তার স্কুলের পাঠ্যের বাহিরে অনেক বই পড়বার বাতিক ছিল ; তার ফলে সে এখানে থাকতে যত জিনিষ জানতো আর যা শিখেছিল, তা তার সহপাঠী ও অগ্রপাঠীদের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়ে সে কয়েক দিন পরে আমাকে যে চিঠি লিখেছিল তাতে সে লিখেছিল যে, সেখানকার স্কুলের ১৩।১৪ বছরের ছেলে মেয়েরা এত বিষয় জানে, বিশ্বের এত সংবাদ রাখে, আর এত বই তারা প'ড়েছে যে, তাদের পাশে তার নিজেকে ভয়ানক অজ্ঞ ব'লে মনে হয়। তার এ অভিজ্ঞতা যে কিছু অসাধারণ নয়, সে কথা যে কেউ বিলেতে পড়তে গেছে সেই ব'লতে পারবে। এর হেতু এ নয় যে, আমাদের ছেলেদের বুদ্ধি-সুদ্ধি সে দেশের ছেলেদের চেয়ে কম! এর হেতু এই যে, তারা তাদের ছাত্রজীবনের সময়ের সদ্ব্যবহার করে না, বা করবার অবসর পায় না। ক'টা স্কুল বা কলেজ আছে আমাদের দেশে যাতে একটা ভাল লাইব্রেরী আছে? ক'খানা সাময়িক পত্র আছে আমাদের, যাতে বিচিত্র রকমের জ্ঞান প্রসারিত করবার চেষ্টা হয়? বিদেশের যে সব কাগজে এই সব আছে তার ক'খানা এ দেশে আসে, ক'জনে তা প'ড়তে পায়? আবার যে লাইব্রেরী বা ল্যাবরেটারী আছে, তার সদ্ব্যবহার করে কয়জন? বিচিত্র জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য দেশব্যাপী সে একাগ্র আকাঙ্ক্ষা কোথায়? সে চেষ্টা সে সহিষ্ণুতা কোথায়?

নাই—বড় দুঃখে ব'লতে হয়, নাই সে চেষ্টা, নাই সে একাগ্রতা। সমস্ত জাতটা মারা যেতে ব'সেছে আমাদের একটা আড়ষ্ট নিশ্চেষ্টতায়! অসাড় নিস্পন্দ হ'য়ে আমরা প'ড়ে র'য়েছি Tennysonএর Lotus Eatersদের মত। পরিশ্রম ক'রছি—কিন্তু বাটখারার ওজনে যতটুকু নইলে নয় তার বেশী নয় ; চলছিও পথে—গরুর গাড়ীর চালে। বিশ্বের অগ্রসর যে সব জাত তারা চলছে এয়ারোপ্লেনে—তারা পরিশ্রম ক'রছে সে পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই—তুষ্টি নাই। আমরা তাদের দিকে চেয়ে দেখি না, তাই গরুর গাড়ীর চালেই তুষ্ট হ'য়ে ব'সে আছি। চেষ্টা আমাদের পরিমিত, কেন না বেশী চেষ্টার কোনও প্রয়োজন অনুভব করি না।

সময়ের যে কি বিরাট অপচয় আমরা ক'রছি, তার পরিচয় আমি দেখতে পাই চারিদিকে। স্কুলে আট দশ বৎসর কাটায় ছেলেরা। সে সময়ের সদ্ব্যবহারে তারা যা শিখতে পারে তার চার ভাগের এক ভাগ তারা শেখে না। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে দুলতে দুলতে তারা অগ্রসর হয় জ্ঞান-রাজ্যে—যেখানে অন্য দেশের লোকে দুহাতে টেনে সাঁতার কেটে দ্রুত অগ্রসর হ'চ্ছে। শিক্ষকেরা যে সময়ে তাদের পণ্ডিত ক'রে তুলতে পারেন, সে সময়টা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে তাদের পাঠশালার প'ড়ো ক'রেই রাখেন। স্কুল কলেজ ছেড়ে আমরা নিই একটা জীবনব্যাপী ছুটি। পড়া-শুনোর সঙ্গে বিদায় নিয়ে ঢিমে চালে সংসারধর্ম্ম ক'রতে আরম্ভ করি,—সে ধর্ম্মের মূল সূত্র ছুকুড়ি সাত বজায় রেখে কোনও মতে জীবন কাটান।

আমার প্রা। একটা প্রশ্ন শুনতে হয়,—খোসামুদী ক'রে সবাই সে কথা জিজ্ঞাসা করে না, বিস্মিত হ'য়েই অনেকে জিজ্ঞাসা করে—আমি এত কাজ করি কি ক'রে? প্রশ্ন শুনে আমার লজ্জা হয়। আমি জানি যে, আমি যত কাজ করি—পৃথিবীর বড় বড়, চাই কি মাঝারি বা চলনসই কর্ম্মীদের তুলনায় সে কত তুচ্ছ! কিন্তু সেই সামান্য কাজও তাঁদের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে!

কাজ করবার শক্তি অভ্যাসের সঙ্গে বেড়ে যায়। প্রথমে যে কাজটা ক্লেশকর থাকে, পরে সেটা সহজসাধ্য হ'য়ে পড়ে। তাই কর্ম্মী যে, তার কর্ম্মশক্তি ক্রমশঃই বেড়ে যায়, আর যে কর্ম্মী নয়, তার কর্ম্মশক্তি সঙ্কীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে,—কর্ম্মীর কাজ দেখে তখন তার আশ্চর্য্য বোধ হয়। তফাৎটা একটা বিশেষ শক্তি থেকে ততটা হয় না, যতটা অভ্যাস থেকে হয়। আমাদের কাজের অভ্যাস নেই, তাই বিশ্বের লোকের কাজ দেখে অবাক্ হ'য়ে যাই। নিজের সাধ্য ও শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োগ ক'রে যদি সবাই কাজে নেমে পড়ি, তখন আর বিস্ময়মুগ্ধ হ'য়ে আমাদের সুধু চেয়ে থাকতে হবে না, বিশ্বের কর্ম্মী সম্প্রদায়ের মাঝে আমাদের ন্যায্য স্থান নিতে আমাদের এতটুকুও বাধবে না।

তোমাদের কাছে—বাঙ্গলার শিক্ষান্বেষী যুবকদের কাছে আমার আজ এই আবেদন—তোমরা আমাদের দেশকে মুক্ত ক'রবে এই মরণকল্প নিশ্চেষ্টতা থেকে। ভেঙ্গে দেবে এর যুগযুগান্তের সঞ্চিত আলস্য, এই প্রতিজ্ঞা ক'রে জীবনের পথে অগ্রসর হও। ক্লান্তিহীন চেষ্টা ও শান্তিহীন পরিশ্রম ক'রে তোমরা দেশের এই নেশার ঘোর কাটিয়ে দেশের জীবনকে বিশ্বের জীবনের সঙ্গে এক সূত্রে গেঁথে দেবে;—বিশ্বের তালে চলবে তার গতি, বিশ্বের জীবনের সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে তার জীবন। চোখ কাণের উপর যে পরদা আছে সেটা নিঃশেষে সরিয়ে দিয়ে তোমরা সমস্ত বিশ্বের পরে সব ইন্দ্রিয়গুলো ফিরিয়ে দাও; যেখানে যেটুকু জানবার আছে নিঃশেষে সঞ্চয় ক'রে নিয়ে এসো;—সেই জ্ঞানের আলোতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক তোমাদের চিত্ত;—সে আলোর দীপ্তিতে ফুটে উঠুক চিত্তে নব নব জ্ঞানের ক্ষেত্র, নব নব কর্ম্মের প্রেরণা।

আমাদের দেশে একটা মনোভাব অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠেছে আজকাল যে, দেশের সেবার জন্য আজকাল আর কোনও কিছু জানবার দরকার নেই, অনুসন্ধান করবার নেই—দেশকে প্রাণপণে ভালবাসাটাই সুধু দরকার। দেশকে ভালবাসতে হবে—তার জন্য ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত হ'তে হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অজ্ঞানের ভালবাসা, অজ্ঞানের ত্যাগেই সব চেয়ে বেশী উপকার হয় না। সেবা ক'রবার আকাঙ্ক্ষা থাকলেই ভাল ক'রে সেবা করা যায় না, সেবা ক'রতে জানা চাই। আর সেই জানার সীমা নেই। এমন কোনও কাজই আমি কল্পনা ক'রতে পারি না যার সম্বন্ধে পড়াশুনো ক'রে জ্ঞানলাভ ক'রে কর্ম্মশক্তি বাড়ান যায় না। আর এমন কাজ অনেক আছে যাতে না জেনে কাজে হাত দেওয়া ভয়াবহ। মুমূর্ষু রোগীর শুশ্রূষা ক'রতে অনেকেই ব্যস্ত হ'তে পারে, কিন্তু শুশ্রূষা যে জানে না তার সেবায় হিতে বিপরীত হ'তে পারে।

নদীর জল তৃপ্তি দেয়, স্বাস্থ্য দেয়;—সেই জল যখন খানা ডোবার বাঁধা পড়ে তখন তা' যেমন হয় দুর্গন্ধ, তেমনি হয় বিষাক্ত। আমাদের দেশের জীবন বিশ্বের গতিশীল জীবন-প্রবাহের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হ'য়ে তেমনি অশেষ আবর্জ্জনা ও কলুষে ভরে উঠেছে। খাল কেটে বিশ্বপ্রবাহ থেকে জীবন-স্রোত টেনে এনে একে মুক্তি দিতে হবে। সেই মুক্তি তোমাদের ব্রত—সেই তোমাদের সাধনা, এই কথা স্মরণ ক'রে যদি তোমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তবেই দেশের চরম কল্যাণ, বিশ্বের পরম উপকার সাধন ক'রবে—বিশ্বের জাগ্রত মহেশ্বরের সেবা ক'রে অমরতা বরের অধিকারী হবে।

আমাদের জীবনের সঙ্কীর্ণতার একটা সব চেয়ে বিষময় ফল হ'চ্ছে আমাদের আদর্শের সঙ্কীর্ণতা। বড় অল্পে আমরা তুষ্ট;—কি অর্থ, কি বিদ্যা, কি কর্ম্ম, কি চরিত্র, সব দিক দিয়ে আমরা আদর্শকে আমাদের দেশের গজকাঠির মাপে কেটে-ছেটে খাটো ক'রে নিয়েছি। তাই আমরা ছোটখাট একটা যা কিছু ক'রতে পারলেই আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পড়ি; মাটির মন্দির গড়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, যেন একটা তাজমহল গড়ে' ব'সেছি। বিশ্বের মানদণ্ডে আমাদের সে চেষ্টার পরিমাণ কতটুকু, সেটা বিচার করবার অবসর আমাদের নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই; যা পেয়েছি সেইটুকু নিয়ে উৎসব ক'রতেই বেশী ব্যস্ত।

আদর্শের এই সঙ্কীর্ণতা আমাদের চেষ্টার পরিধিকেও সঙ্কীর্ণ ক'রে দেয়। খুব একটা বড় চেষ্টার জ্যোতিতে বিশ্ব-মানবের চোখে ধাঁধা লাগাবার মত কিছু করবার স্বপ্ন আমাদের মনে জাগে না; আমরা একটা ছোট চকমকিতে ছোট্ট একটা আগুনের দানা বের ক'রেই তুষ্ট।

এই তুষ্টি নিয়ে আমাদের বড়াইয়ের অন্ত নেই। সমস্ত বিশ্বের আত্মোন্নতির অশ্রান্ত চেষ্টাকে আমরা materialistic ব'লে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এই তামসিক তুষ্টিকে একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ ব'লে গর্ব্ব ক'রে মরি। কেন না,

পূর্ব্বে এ দেশে এমন সব লোক জন্মেছিলেন, যাঁরা আধ্যাত্মিক গৌরবে জগতের সব জাতকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। তত্ত্বজ্ঞান থেকে যে তৃপ্তি ও অনাসক্তি আসে এই তামসিক তুষ্টির সঙ্গে যে তার কোনও সম্পর্ক নেই, সেটা আমাদের জানবার অবসর হয় না।

এই মোহ-ঘোর ভাঙ্গতে হবে, আদর্শকে বড় ক'রে বিশ্বের সাধারণ মানদণ্ডে মাপ-জোখ ক'রে সব জিনিষ আমাদের পরখ ক'রে নিতে হবে ;—আর কোনও ছোট মাপ আমরা মানবো না। বিশ্বের দিকে চেয়ে, জগতের অগ্রসর জাতিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে যদি আমরা সঙ্কল্প করি, তবে আপনা আপনি আমাদের শক্তির সব অসংশয়িত উৎস খুলে যাবে, জীবনের নূতন ধারায় জাতি উজ্জীবিত হ'য়ে উঠবে।

বিশ্ব-জীবনের দিকে সজাগ দৃষ্টিতে চেয়ে যদি আমরা জীবন নিয়মিত করি, বিশ্বের জ্ঞানধারা যদি নিঃশেষ ক'রে আমরা আয়ত্ত ক'রতে পারি, বিশ্বের কর্ম্মচেষ্টার সুরে যদি আমাদের কর্ম্মশক্তিকে বেঁধে ফেলি, তবে আমরা দেখতে দেখতে জ্ঞানে গরীয়ান, কর্ম্মে মহীয়ান, সাধনায় অতুলনীয় হ'য়ে উঠতে পারবো। আমাদের চোখের সামনে দেখতে দেখতে জাপান তার ঘুম ঘোর ছেড়ে জেগে উঠে সব জাতের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ;—তারও পরে তুর্কী জেগে উঠেছে ; চীন উঠছে জেগে ; আমরা জেগে উঠতে পারবো না? জাপান তুর্কী বা চীন যে জেগে উঠে হঠাৎ বড় হ'য়ে উঠেছে এটা কোনও ভেল্কীর খেলা নয়—এর পেছনে আছে একটা তীব্র একাগ্র মুক্তিকামনা, উন্নতির এক প্রচণ্ড সাধনা। সেই সাধনার ইতিহাস আমাদের আলোচনা ক'রতে হবে—তাদের সেই পথ আমাদের নিতে হবে। বহুমুখী হবে আমাদের সে চেষ্টা ; কিন্তু যে পথেই আমরা চলি না কেন, সব পথেই বিশ্বের জীবনের সঙ্গে যোগ রাখতে হ'বে।

দেশের সেবা করবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের যুবকদের মধ্যে খুব ব্যাপক ভাবে আছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা আছে, উৎসাহ আছে, কিন্তু উপযুক্ত চেষ্টা নেই। আমার এ কথায় অনেকে মনঃক্ষুণ্ণ হবে জানি, তবু কথাটা বলবার দরকার আছে। এত বড় একটা জাতকে এত গভীর দুর্দ্দশার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবার জন্যে যে কত বড় চেষ্টার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে যাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নেই তারাই কেবল আমাদের সামান্য চেষ্টা নিয়ে বাহবা দিতে পারে। যাঁরা দেশের সেবার জন্য আত্মসমর্পণ ক'রেছেন, যাঁরা দেশের উন্নতির জন্য যা' কিছু হ'ক ক'রছেন, কাউকে আমি অশ্রদ্ধা করি না, তাঁদের চেষ্টার বিন্দুমাত্র অসম্মান করা আমার অভিপ্রায় নয় ; কিন্তু কত দূর যে করা সম্ভব, কত দূর যে করা যেতে পারে, সেটা জেনে শুনে আমি তাঁদের এই চেষ্টায় পরিতৃপ্ত হ'য়ে থাকতে পারি নে।

এমনি একটা অধঃপতিত প্রকাণ্ড দেশকে তার দুর্দ্দশা থেকে টেনে তোলবার জন্য একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা এতদিনে ফল প্রসব ক'রেছে। সন ইয়াট্ সেনের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে চীন আজ অগ্রসর জাতিদের মধ্যে স্থান নেবার জন্য এগিয়ে এসেছে। তার যে সফলতার জয়গান করছি আজ আমরা, সেটা সম্ভব হ'য়েছে যে বিরাট চেষ্টায়, তার খবর আমরা খুব বেশী রাখি না। ত্রিশ হাজার চীন যুবক অক্লান্ত চেষ্টায়, লোকচক্ষুর অগোচরে, বহু বৎসর ধ'রে লোক শিক্ষায় আত্মনিয়োগ ক'রেছিল। আজ যে চীন বন্ধনের নিগড় ভেঙ্গে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়েছে, তার জন্য চীন সেনাপতিদের সমর কৌশলের কৃতিত্ব যতখানি, এই ত্রিশ হাজার বীরের বহু বৎসরের একাগ্র চেষ্টার কৃতিত্ব তার চেয়ে কম নয়।

এমনি চেষ্টার প্রয়োজন আজ আমাদের দেশে। নগদ বিদায়ের আশা না ক'রে, হাততালি বা বাহবা পাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যে সব কর্ম্মী লোকচক্ষুর অগোচরে, সাময়িক উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনার অপেক্ষা না ক'রে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অশ্রান্ত চেষ্টায়, অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত কাজ ক'রে যাবেন, তেমনি কর্ম্মী শত শত সহস্র সহস্র প্রয়োজন। যাঁদের আদর্শ হ'বে চরম সফলতা ; বিলম্বে অসহিষ্ণু না হ'য়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হবার জন্য যাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রবেন, আর লক্ষ্য স্থির ক'রে অপরিশ্রান্ত উদ্যমের সঙ্গে কাজ ক'রে যাবেন এমনি সহস্র সহস্র কর্ম্মীর প্রয়োজন।

তোমরা যুবক—তোমরা শিক্ষালাভ ক'রছো ;—তোমাদের সেই বিরাট কর্ম্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে, যা' দেশকে বর্ত্তমান দুরবস্থার থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে চরম উন্নতির পথে দাঁড় করিয়ে দেবে।

বাঙ্গলার বর্ত্তমান মেঘাচ্ছন্ন—তার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ক'রে গড়ে তোলবার ভার তোমাদের।

দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে যদি তোমরা আপনি মানুষ হও, দেশের লোককে মানুষ ক'রে গড়ে তোলবার সঙ্কল্প কর।

মানুষ হব আমরা, সমস্ত দেশটাকে মানুষ ক'রবো, এর চেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা, বড় ব্রত আমি কল্পনা ক'রতে পারি না।

দেশ দরিদ্র, তাকে ধনী ক'রতে হ'বে; দেশের লোক রুগ্ন, তাদের নিরাময় ক'রতে হবে; দেশের লোক দৈব দুর্বিপাকে বিপন্ন হ'য়ে পড়লে তাদের সহায়তা ক'রতে হ'বে—এ সব ভাল কথা—কিন্তু এ সব ছোট কথা। সব চেয়ে বড় কথা মানুষ হ'তে হবে—যাকে বলে 100 per cent He-man—তাই হ'তে হ'বে। তার ভিতর এ সব আপনা আপনি এসে পড়বে।

যুবক তোমরা, জীবনের বন্যা তোমাদের মধ্যে উথলে উঠবে; দুই কূল ছাপিয়ে ব'য়ে যাবে তোমাদের জীবন। শরীর হবে শক্তিমান, মন হবে দৃঢ়। কষ্টকে কষ্ট ব'লে জ্ঞান ক'রবে না। বিপদকে খেলার ছলে আলিঙ্গন ক'রবে; জীবনটাকে খেলোয়াড়ের মত খেলে যাবে। শক্তি—দেহের শক্তি, মনের শক্তি—তোমাদের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবে। এই হ'ল যৌবনের লক্ষণ,—জীবনের লক্ষণ! যাদের ভিতর জীবন এমনি পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে তারা কোনও নীচ কাজ ক'রতে পারবে না, জগতে কারও কাছে মাথা নুইয়ে থাকতে পারবে না; আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার স্বাধীন চিন্তা বিলিয়ে দিয়ে কারও আজ্ঞা-দাস হ'তে পারবে না,—কেন না, তারা হবে মানুষ।

আমাদের দেশের চারিদিকে যখন চাই—যখন দেখি জীর্ণ শীর্ণ ভঙ্গুর দেহ নিয়ে শিশু থেকে যুবকের দল কেবল টায়-টোয় জীবনটাকে ব'য়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; যখন দেখতে পাই তাদের কর্ম্মের চেষ্টা নাই, কষ্ট সহিবার উৎসাহ নাই, নিরুপদ্রবে দিন কাটানই তাদের পরম পরমার্থ, যখন দেখতে পাই শিক্ষাভিমানী লক্ষ লক্ষ লোক তাদের স্বাধীন বিচারের জন্মগত অধিকার বর্জ্জন ক'রে আজ একে, কাল ওকে নেতা ব'লে মেনে নিয়ে নির্ব্বিচারে ভেড়ার পালের মত তাদের আদেশে কর্ম্ম বা অকর্ম্ম ক'রছে—তখন মনে হয় যে এইটাই আমাদের দেশে সব চেয়ে বড় অভাব;—আমাদের দেশে মানুষ নেই—পুরুষ নেই।

তোমাদের কাছে আমার এই প্রধান আবেদন—তোমরা গড়ে তোল আপনাদেরকে মনুষ্যত্বের, পুরুষত্বের এই দুর্লভ আদর্শে। দেশের কাছে তোমাদের অনেক দায়িত্ব আছে, অনেক পথে দেশের সেবা ক'রতে হবে তোমাদের; কিন্তু এই কথা মনে রেখো যে, দেশের সব চেয়ে বড় দাবী এইটা যে, যাই কর তোমরা, যে পথেই যাও—তোমরা মানুষ হবে। বিশ্বের দরবারে আর সব জাতের মানুষের পাশে তোমরা সঙ্কুচিত হয়ে, আপনার খর্ব্বতায় লজ্জিত হ'য়ে ব'সে থাকবে না; তাদের মুখোমুখী হ'য়ে, পৌরুষে তাদের সমকক্ষ হ'য়ে তাদের সমান আসন দাবী করবে—বাঙ্গলা দেশ তার বীর সন্তানদের দিকে চেয়ে যেন Grachi মাতা Cornelia-র মত গর্ব্বের সহিত বিশ্বের কাছে ব'লতে পারেন যে, অলঙ্কার নেই আমার, হীরা জহরত নেই—কিন্তু আছে আমার এই সব সন্তান—এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ কারো নেই!

আমরা পরাধীন জাতি। কিন্তু আমরা যে পরাধীন, এই আমাদের একমাত্র লজ্জা নয়, এ কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। একটা কোনও ইন্দ্রজাল-বলে, কিম্বা কৌশলে যদি আমাদের এ লজ্জা হঠাৎ একদিন কেটে যায় তাতেই আমাদের দেশের লজ্জা কেটে যাবে না, তাতেই অধিকার হবে না আমাদের বিশ্ব-পরিষদে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়াবার। আরও অনেক বিষয়ে আমরা খাটো আছি;—সব চেয়ে বড় লজ্জার কথা এই যে মনুষ্যত্বে আমরা জগতের লোকের কাছে খাটো। কি শরীরের বল, কি কৌশল, কি জ্ঞান, কি চিত্তের বল, কোনও বিষয়েই আমরা গর্ব্ব ক'রে জগৎকে ব'লতে পারি না যে, আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের এই ছোট্ট দেশটার মধ্যে আমি একটা মাতব্বর লোক হব এ আকাঙ্ক্ষা অনেকের আছে। কিন্তু বামনদের দলে এক ইঞ্চি বেশী লম্বা হ'য়ে গৌরব করে তো কোনও লাভ নেই। আমাদের দেশের প্রাচীর যে আজ ভেঙ্গে গেছে;—আমরা এসে দাঁড়িয়েছি—সমস্ত বিশ্বের হাটের মাঝখানে। আমাদের পাল্লা দিতে হবে, আপনা-আপনির মধ্যে নয়, বিশ্বের সমস্ত জাতের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে ছেলে'খেলার দাবী করার চেয়ে লজ্জার কথা আর নেই।

তাই ব'লছিলাম, তোমাদের দৃষ্টিটা এই দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে একেবারে সমস্ত বিশ্বের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

মানুষ হ'তে হবে তোমাদের,—আমাদের এই এই বালখিল্য দলের মাপে নয়, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আর এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বের পাঠশালায় পেছনের বেঞ্চীতে একটা স্থান পেয়ে কৃতার্থ হ'লে চলবে না। এ কথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের দেশ একটা ছোট দেশ নয়—বিশ্বের দরবারে হাজারীর দলে স্থান পাবার দাবী আমাদের নয়—আমাদের স্থান হ'চ্ছে মন্‌সবদারের প্রথম শ্রেণীতে—জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে। সেইখানে স্থান ক'রে নিতে হবে আমাদের; দেশের জন্য সেই পদবী লাভ করবার দায় তোমাদের—হয় তো তোমাদের ছেলেদের। সেই মহিমামণ্ডিত লক্ষ্যের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হ'তে হবে, সেই আদর্শে নিয়মিত ক'রতে হবে সমস্ত জীবন। অক্লান্ত চেষ্টা, অদম্য উৎসাহ ও ক্লান্তিহীন, অবসাদহীন উদ্যোগ নিয়ে যদি তোমরা আপনাদের জীবনে এই মহৎব্রত উদ্যাপনে ব্রতী হও—তবে লক্ষ্য লাভ হোক বা না হোক, গৌরবে মণ্ডিত ক'রবে তোমরা দেশকে, গৌরবে মণ্ডিত হবে তোমরা আপনারা।

মানুষ যদি হ'তে চাও, দেশের সেবা যদি সত্য সত্য ক'রতে চাও, তবে দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে দেও সেই দূর দিগন্তের পানে—যেখানে বিজয়-লক্ষ্মীর গৌরবময় আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। বিনিদ্র চেষ্টার সহিত জীবনের প্রতি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার ক'রে অগ্রসর হও;—যতদূর সাধ্য ও শক্তি ততদূর ছুটে চলে—হাতে তুলে নাও পতাকা; তার ভিতর মন্ত্র লেখ Excelsior! তৃপ্তির অবসাদ চিত্তে আস্‌তে দিও না, তুষ্টিতে আপনাকে অভিভূত ক'র না—সদাজাগ্রত হ'য়ে এই আদর্শের অনুশীলন ক'রে যাও! সফল হও, নিষ্ফল হও, তাতে দুঃখ নাই, যদি তুমি জীবনের অবসানে তোমার সেই পতাকা অম্লান রেখে দিয়ে যেতে পার তোমাদের সন্তানদের হাতে; তাদেরকে প্রেরণা দিয়ে যেতে পার ঠিক এমনি উৎসাহের সঙ্গে সেই চরম লক্ষ্যের অনুশীলন ক'রতে।

তাই আজ বলি ভাই, ঘুম-ঘোর ভেঙ্গে ওঠ—বৃথা স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আসল কাজে আলস্য ক'রো না। এ কথা মন থেকে দূর ক'রে দেও যে, কোনও অসম্ভব ইন্দ্রজাল একদিন হঠাৎ তোমার দেশকে মুক্তি দেবে, গৌরব দেবে। মুক্তি যদি পেতে হয়, গৌরব যদি লাভ ক'রতে হয় দেশকে আদ্যোপান্ত মানুষ হ'তে হবে—প্রাণপণ ক'রে সবাইকে মনুষ্যত্বের সাধনা ক'রতে হবে,—স্বপ্নের নয়, ইন্দ্রজালের নয়! সেই মনুষ্যত্ব সাধনায় আত্মসমর্পণ কর। আপনাদেরকে ঝাঁকা দিয়ে জাগিয়ে তোল। আফিমের নেশায় বিভোর হ'য়ে আছ—জেগে ওঠ—ছুটে চল—আলস্যের অবসর নাই, সময়-ক্ষেপের অবসর নাই, বিরামের সময় নাই, অক্লান্ত চেষ্টায় অবিরাম পদক্ষেপে অগ্রসর হও—আর—

"প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

* রঙ্গপুর জেলা ছাত্র-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ।

মধ্য-ভারত

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

মাণ্ডু

এবার মাঁণ্ডুর কথা বল্‌তে হবে। ইন্দোরে যাবার আগেই প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের কর্ম্মী মহাশয়গণ একখানি পত্র ছাপিয়ে সকলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাতে তাঁরা লিখেছিলেন যে, যাঁরা ইন্দোরের সাহিত্য-সম্মেলনে যাবেন, তাঁরা যদি মাণ্ডু দেখ্‌তে যেতে চান, তা হ'লে সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পূর্ব্বেই জানাবেন, কারণ মাণ্ডু ইন্দোর থেকে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। আগে থাকৃতে যান-বাহনের ব্যবস্থা না করলে মাণ্ডু দেখা সম্ভবপর হবে না। মাণ্ডুর ইতিহাসও তাঁরা অতি সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন। মাণ্ডু দেখ্‌তে যেতে হ'লে গাড়ী-ভাড়া হিসাবে প্রত্যেককে পাঁচ টাকা দিতে হবে, এ কথাও তাঁরা লিখেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে আমরা কলিকাতা

থেকেই লিখে পাঠিয়েছিলাম যে, আমরা তিনজন মাণ্ডু দেখতে যাব এবং তার জন্য যে যান-বাহনের ব্যবস্থা করতে হয় তা যেন প্রমথবাবু করে রাখেন।

ইন্দোরে গিয়ে প্রমথবাবুকে জানালাম যে, আমাদের এক-জন অর্থাৎ শ্রীমান সুধাংশুশেখর ভায়া আসেন নাই, সুতরাং আমাদের জন্য দুইটা 'সিট' যেন রিজার্ভ করা হয়—শ্রীমান নরেন্দ্র আর আমি যাব; আর তখনই ভাড়া হিসাবে দশ টাকা দিয়ে দিলাম। সেখানেই শুনলাম যে, ৩০ শে ডিসেম্বর রবিবার অতি প্রত্যূষে মাণ্ডু যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ২৯ শে তারিখটায় ইন্দোরে কোন কাজই ছিল না; এদিকে আমাদেরও সময় কম। সেইজন্য আমরা ২৮ শে শুক্রবার রাত্রিতেই উজ্জয়িনী যাবার ব্যবস্থা করে-ছিলাম। ২৯ শে সন্ধ্যার সময় উজ্জয়িনী থেকে ইন্দোরে ফিরে আসব, আর পরদিন প্রত্যূষে মাণ্ডু যাব। তারপর উজ্জয়িনীতে বিলম্ব হয়ে যাওয়ায় আমরা সেদিন রাত দুইটার সময় ইন্দোরে ফিরে আসি, আর রাত না পোহাতেই মাণ্ডু যাবার জন্য প্রস্তুত হই; এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। তাই, ভোর চারটে বাজতে না বাজতেই যখন সদা-জাগ্রত প্রমথবাবু এসে ডাকলেন "দাদা উঠুন, এখনই মাণ্ডু যেতে হবে," তখন বাক্যব্যয় না করে উঠে পড়লাম এবং সেই দারুণ শীতের মধ্যে তন্দ্রা-জড়িত অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি আমাদের জন্য একখানি 'বাস' দাঁড়িয়ে আছে। এ ত্রিশে ডিসেম্বর ভোর বেলার কথা।

একে ভয়ানক শীত, তাতে সারারাত্রি নিদ্রা হয় নাই; বাসের মধ্যে আর কে কে আছেন, সেই অন্ধকারে তা বুঝতে পারলাম না। বাসে উঠে এক পাশে ব'সে পড়লাম। পাঁচটা বাজবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছেড়ে দিল। মনে করেছিলাম, গাড়ীর মধ্যে একটু চোক বুঁজে বসব; কিন্তু তা কি হবার যো আছে; যে ঝাঁকুনি, তাতে মরা মানুষও জেগে ওঠে।

জুম্মা মস্‌জিদ

যেতে হবে ষাট মাইল পথ। মাইল দুই তিন যাবার পরই পূর্ব্বদিক একটু ফরসা হোলো। তখন দেখলাম 'বাসে'র আরোহী চোদ্দ জন। এই চোদ্দ জনের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন, তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। মণীন্দ্রবাবুও যে আমাদের সঙ্গী, সে কথা না বললেও হয়।

এই ত আমরা চোদ্দ জন মাত্র যাত্রী; কিন্তু শুনেছিলাম

আরও অনেকে যাবেন। তাঁরা কোথায়? আমাদের কেদার দাদা (শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ও তাঁর সঙ্গী অর্থাৎ ২৯ শে ডিসেম্বর শনিবার মধ্যাহ্নকালেই প্রকাণ্ড একদল তিন চারখানা 'বাস' বোঝাই হ'য়ে মাণ্ডু যাত্রা
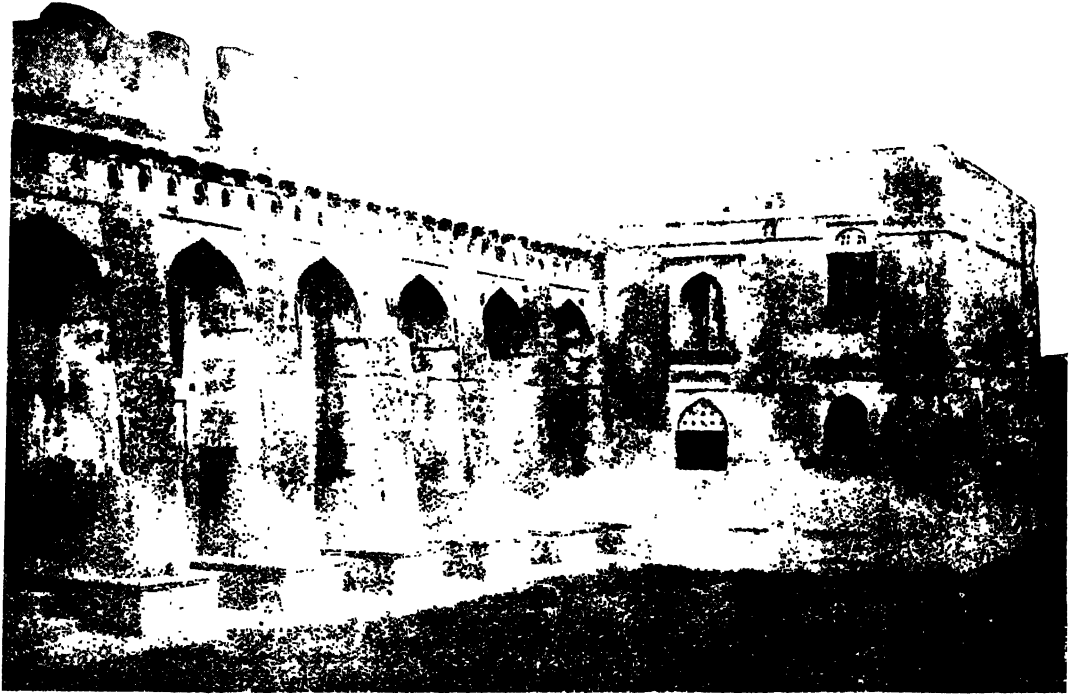
হিন্দোলা মহল (দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের দৃশ্য)

জাহাজ মহল

শ্রীমান সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীরও যে মাণ্ডু দেখতে যাওয়ার কথা ছিল; তাঁরা কৈ? তখন জান্‌তে পারা গেল যে, পূর্ব্বদিন করেছেন। তাঁরা রাত্রিতে ধারের ডাক-বাংলায় থাকবেন এবং খুব ভোরে সেখান থেকে যাত্রা করে মাণ্ডু দেখে দিবা

দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ইন্দোরে ফিরে আসবেন। ইন্দোর থেকে ধার বা ধারা নগরী চল্লিশ মাইল; আর ধার থেকে মাণ্ডু কুড়ি মাইল।

আমরা যখন ধারে পৌঁছিলাম, তখন সাড়ে সাতটা। ডাক-বাংলার সম্মুখে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা দল মাণ্ডু যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁরা সংখ্যায় প্রায় ত্রিশজন। আমাদের কেদার দাদাও সেই দলে আছেন; পাঁচ ছয়টী মহিলাকেও দেখলাম। তাঁরা সবাই পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় করতে হোলো না। আমাদের সঙ্গী চিত্র-শিল্পী গুপ্ত মহাশয় ও তাঁর সহধর্ম্মিণী, যে 'বাসে' মহিলারা ছিলেন, তাইতে গেলেন। তাতে আমাদের ভার লাঘব হোলো না; আমরা ধার থেকে আর একটী সঙ্গী সংগ্রহ করলাম। ইনি ধার ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ঘোষ মহাশয়। ধারে তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী। সত্যবাবুকে সঙ্গী পেয়ে আমাদের ভারী সুবিধা হয়েছিল—এমন 'গাইড' কিন্তু আর কেউ পান নাই। সত্যবাবু অনেকদিন এই দেশে

গিন্দোলা মহল (অভ্যন্তর-ভাগের দৃশ্য)

এসে এই ডাক-বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং এখানেই রাত্রির ভোজন শেষ করেছিলেন। খুব ভোরে উঠেই তাঁদের মাণ্ডু যাবার কথা ছিল, কিন্তু প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে করতে তাঁদের বেলা হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা কিন্তু সে কথা স্বীকার করলেন না; কেদার দাদা বল্লেন "আগের দিন এগিয়ে আছি ব'লেই কি আপনাদের ফেলে মাণ্ডু যেতে পারি দাদা; তাই এতক্ষণ পথের দিকে চেয়ে আছি।" তাঁরা তখন যাত্রামুখী; সুতরাং আমাদেরও সেখানে আর অপেক্ষা আছেন। তাঁকে দেখ্‌লে বাঙ্গালী ব'লেই মনে হয় না—চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ সব মারাঠীর মত। তা ব'লে বাঙ্গালা ভাষা ভুলে যান নি। তাঁকে সঙ্গী পেয়ে আরও একটা বিশেষ সুবিধা হয়েছিল, তিনি ঐ অঞ্চলের ইতিহাস একেবারে কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলেছিলেন। দেশের ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ-পরবশ হয়েই যে তিনি এ দেশের ইতিহাস পড়ে ফেলেছেন, তা নয়—বাধ্য হয়ে তাঁকে সমস্ত ইতিহাসের খোঁজ নিতে হয়েছিল, ধার ও মাণ্ডুর প্রত্যেক ইষ্টক-খণ্ডের সহিত

পরিচিত হ'তে হয়েছিল। আমাদের মাণ্ডু যাওয়ার মাস চারেক পূর্ব্বে ভারতের বড়লাট বাহাদুর মাণ্ডুর ভগ্নাংবশেষ দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। তাঁকে মাণ্ডুর ইতিহাস শোনাবার এবং সমস্ত দেখাবার ভার সত্যচরণবাবুর উপর পড়েছিল।

মামুদ শাহের সমাধি-মন্দির ও পার্শ্বে আস্‌রফি মহল

মামুদ খিলিজির সমাধি-মন্দির

তারই জন্য ভদ্রলোককে অনেক দিন আগে থেকে যেখানে যা জান্‌তে পারা সম্ভব, সে সমস্তই জান্‌তে হয়েছিল, আর সেই বহু ক্রোশ পরিধি বিশিষ্ট হিংস্র-জন্তু-সমাকুল মাণ্ডুর ধ্বংসাবশেষের প্রত্যেক স্থানটী পাঁচ সাতবার ক'রে দেখে ঠিক রাখ্‌তে হয়েছিল। সেই যে ইতিহাস পড়া হয়েছিল এবং মাণ্ডুর সব স্থান দেখা হয়েছিল, তা যেমন লাট সাহেবের কাজে লেগেছিল, তেমনি আমাদেরও কাজে লেগে গেল; সুতরাং সত্যবাবুর মত সঙ্গী পেয়ে আমাদের খুব লাভ হয়েছিল; আমরা মাণ্ডুর অনেক স্থান দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। হাতে-মুখে জল দেবারও অবসর হয় নাই। তারপর এই চল্লিশ মাইল 'বাসে' আগমন। এতে একটু চা এই শীতে মধ্যে হাতের কাছে এলে যে খুব ভাল হোতো, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, যে রকম অবস্থা সেই ডাক-বাংলার তখন দেখ্‌লাম, তাতে চায়ের নাম করবারও ভরসা হোলো না; বেশ বুঝতে পারা গেল বাংলায় যা কিছু ছিল, সব এই পূর্ব্বাগন্তুকের দল শেষ করে দিয়েছেন; কাজেই প্রাতরাশ দূরে থাক, এক পেয়ালা চাও পাওয়া গেল না। আমরা মাণ্ডুর দিকে যাত্রা করলাম।
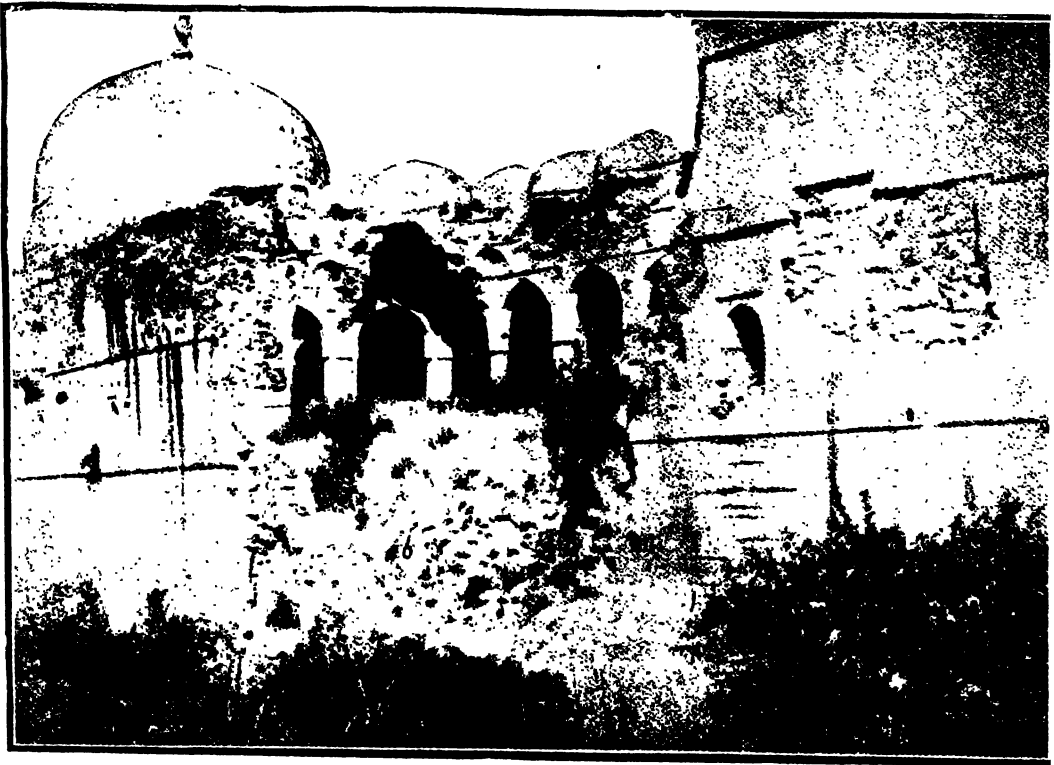
জামি মসজিদ

আগের দিন যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা যখন বেরিয়ে গেলেন, তখন আমরা আর অপেক্ষা করে কি করব। গোপন ক'রে কাজ নেই, আমাদের একটু চা-পান করবার ইচ্ছা হয়েছিল। এ ইচ্ছারও অপরাধ নেই। সেই পূর্ব্ব রাত্রি দশটার সময় উজ্জয়িনীতে হরিদাসবাবুর বাড়ীতে আহার করে যাত্রা করেছি; তারপর বল্‌তে গেলে সমস্ত রাত্রি জেগে রেলে এসেছি; শেষ রাত্রিতে ইন্দোরে পৌঁছে একটু বিশ্রামের চেষ্টা করছি, আর অমনি মাণ্ডু যাত্রা; চা-পান ত দূরে থাক,

সঙ্গী সত্যচরণবাবু বল্লেন যে, এখনই যাবার পথে, ধারে যা দ্রষ্টব্য আছে, তা দেখে যাওয়া ভাল, কারণ ফিরে এসে হয় ত সময়ও না থাক্‌তে পারে, ক্লান্তিবোধও হ'তে পারে। আমাদের সঙ্গীরা কেউই এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না, তাঁরা আর পথের মধ্যে অপেক্ষা করতে চান না। তাঁদের অসম্মতিতে বিশেষ কর্ণপাত না ক'রে সত্যবাবু আমাদের নিয়ে গেলেন ভোজ রাজার শিক্ষালয় ও ঠাকুরবাড়ী দেখাতে। শিক্ষালয় বা বিদ্যালয় এখনও ভেঙ্গে পড়ে নাই, তবে জীর্ণ

হয়ে গেছে; ঠাকুরবাড়ী ঠিকই আছে; বোধ হয় এগুলি বর্ত্তমান ধার দরবার থেকে সংস্কৃত হয়েছে। ধারে আর যা যা দেখ্‌বার আছে ফিরবার পথে সে সব দেখা যাবে বলে, আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম;—সম্মুখে তখন কুড়ি মাইল পথ, বেলা তখন আটটা বেজে গিয়েছে এবং শুনলাম এই কুড়ি মাইল সমতল পথ নয়, পাহাড় উঠ্‌তে হবে, চড়াই উৎরাই অনেক আছে।

এইখানে মাণ্ডুর একটু অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস না বল্‌লে চল্‌ছে না। এ ইতিহাসের গোড়ার দিকটা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ-পরিবর্ত্তনের কথা থাক্‌লেও শেষের দিকে বেশ একটা প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার আছে। সুতরাং, ইতিহাসটা মোটেই নীরস হবে না, এ ভরসা পাঠকদিগকে দিতে পারি।

ফেরিস্তা বলেন, অশোক যখন উজ্জয়িনীর রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন, তখন মাণ্ডু রাজ্য স্থাপিত হয়; তার পূর্ব্বেও যে মালব দেশের অস্তিত্ব ছিল, এ কথা অনেক ঐতিহাসিক ব'লে থাকেন। যশোধর্ম্মদেবের সময় মালব দেশের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এ কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়। তারপরই এলেন প্রমার রাজপুতগণ। এই রাজবংশের মধ্যে খুব নামওয়ালা রাজা ছিলেন ভোজদেব। ধার নগরে এখনও ভোজ রাজার অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান এবং এই ভোজরাজার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী এখনও শুন্‌তে পাওয়া যায়। তারপরই এদেশে মুসলমানের আগমন। দিল্লীর বাদশা আল্‌তামস্‌ ভিল্‌সা ও উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করেন। বাদশা আলাউদ্দীন এই প্রদেশ অধিকার করে একে একেবারে দিল্লী সাম্রাজ্যের একটা বড় রকম সুবা করে দেন এবং দিলাওয়ার খাঁ এই প্রদেশের সুবাদার হয়ে ১৪০১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন এবং নিজেই স্বাধীন নরপতি হয়ে বসেন; এবং সেই থেকে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ প্রদেশ স্বাধীনতা ভোগ করে। পরে ১৫৩৪ অব্দে গুজরাটের বাহাদুর শাহ এই প্রদেশ দখল করেন; মোগল সম্রাট হুমায়ুন এসে বাহাদুর শাকে তাড়িয়ে দেন; শেষে হুমায়ুনকেও স্থির থাক্‌তে দিলেন না শের শাহ। শের শাহ মালোয়া জয় করে একেবারে মাণ্ডুতে এসে পড়লেন এবং তাঁর একজন প্রধান সেনাপতি সুজায়াত খাঁকে মাণ্ডুর সুবাদারী পদে অভিষিক্ত করে দিল্লী চ'লে গেলেন। হুমায়ুন পরে যখন পুনরায় দিল্লীর বাদশাহী পেলেন, তখন আর মাণ্ডুর দিকে দৃষ্টি করবার তাঁর সময় হোলো না, রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই তাঁর দেহান্ত হয়। এদিকে সুজায়াত খাঁই মাণ্ডু রাজ্যের কর্ত্তা

হিন্দোলা মহল (উত্তর প্রান্তের দৃশ্য)

হয়ে বসেন, দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন। তাঁহারই পুত্রের নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাজিদ। তিনি বাজ বাহাদুর নামেই পরিচিত। এই বাজ বাহাদুরের সময়ই মাণ্ডুর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু, এ শ্রী বেশী দিন স্থায়ী হোলো না; দিল্লীশ্বর আকবর বাজ বাহাদুরকে পরাজিত করে মাণ্ডু রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলেন। তার পর মোগল রাজ্য যখন পতনের দিকে গেল, সেই সময়

গিরিধর বাহাদুর নামে একজন নাগর ব্রাহ্মণ কিছুদিন মাণ্ডুতে রাজত্ব করেন। তাঁর হাত থেকে মারাঠারা এই রাজ্য কেড়ে নেন এবং এখন পর্য্যন্তও মাণ্ডু ধার রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে রয়েছে। মোট কথা এই যে, বাজ বাহাদুরের পরলোক গমনের পরই মাণ্ডু রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই মাণ্ডুর সমস্ত গরিমা ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়; বড় বড় অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, মস্‌জিদ ভেঙ্গে পড়তে থাকে, আর

হিন্দোলা মহল (দক্ষিণ প্রান্তের দৃশ্য)

মানুষের স্থান পশুরা দখল করে বসেন। মাণ্ডু এমন জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং সেখানে হিংস্র জন্তুর এমন প্রাদুর্ভাব হয় যে, এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রবেশ করতে কেহ সাহসী হ'তেন না।

মাণ্ডুর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হ'তে থাকল; সেখানে যারা বাস করত তারা হিংস্রজন্তুর ভয়ে পালিয়ে গেল; চারিদিক জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে গেল; এতকালের রাজধানীর বড় বড় প্রাসাদ সব ভেঙ্গে পড়তে লাগল। কারও দৃষ্টি সেদিকে পড়ল না; মাণ্ডু রাজধানী মহাশ্মশানে পরিণত হ'য়ে গেল।

শুভক্ষণে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন বড় লাট লর্ড নর্থব্রুকের দৃষ্টি মাণ্ডুর দিকে আকৃষ্ট হোলো; বাজ বাহাদুর ও রূপমতীর লীলাস্থল দেখ্‌বার বাসনা তাঁর জাগ্রত হোলো। তিনি মাণ্ডুতে গেলেন। বাইরে থেকে এই বিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি ব্যথিত হলেন। তাঁর আদেশে ধার দরবার অন্ততঃ কিছু কিঞ্চিৎ রক্ষা করতে অগ্রসর হলেন, দরবার থেকে ত্রিশ হাজার টাকা খরচও করা হোলো; কিন্তু জঙ্গল পরিষ্কার ও জীর্ণসংস্কার সামান্য মাত্রই অগ্রসর হোলো। তার পর আবার জঙ্গল বাড়তে লাগল, প্রাসাদ মস্‌জিদ ভেঙ্গে পড়তে লাগল। মাণ্ডুর সংস্কার ও রক্ষণ কার্য্য বেশ জোরে আরম্ভ হোলো লর্ড কার্জ্জনের সময় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। ভারত গবর্ণমেণ্ট তখন প্রথমে কুড়ি হাজার টাকা মাণ্ডুর জন্য মঞ্জুর করলেন, তার পরের বৎসর গবর্ণমেণ্ট আরও চল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হাতে এই জীর্ণোদ্ধারের ভার পড়েছিল। সেই সময় যে কয়েকটা প্রাসাদ ও মস্‌জিদের সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তারই কয়েকখানির আলোকচিত্র আমরা Archaeological Survey of India ১৯০৩-৪ অব্দের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে তুলে দিলাম। তার পর আমরা যখন মাণ্ডু দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, তার কয়েক মাস পূর্ব্বে আগষ্ট মাসে (১৯২৮) বর্ত্তমান বড় লাট লর্ড আরউইন বাহাদুর মাণ্ডু দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। সেই সময় রাস্তা ঘাট ও প্রাসাদগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছিল। তাই আমাদেরও মাণ্ডু দেখ্‌বার অনেক সুবিধা হয়েছিল।

মাণ্ডুর আসল কথাই কিন্তু বলা হয় নি। সেটী হচ্ছে রূপমতীর কথা! রূপমতীর সম্বন্ধে ঐ প্রদেশে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত কাহিনী থেকে বেছে নিয়ে

দুইটীর সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই। কেহ কেহ বলেন, রূপমতী সারঙ্গপুরের এক ব্রাহ্মণের কন্যা। বাজ বাহাদুর রাজা হবার পূর্ব্বেই রূপমতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হন এবং যখন তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হন, তখন রূপমতীর পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি তাকে বিবাহ করেন।

এ কাহিনীটি নানা কারণে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার মধ্যে প্রধান কারণ হচ্চে এই যে, রূপমতীর ব্রাহ্মণ পিতা, কন্যা রাজরাণী হবে এই লোভে মুসলমানের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে কিছুতেই রাজী হতে পারেন না। বড়মানুষ বা রাজারাজড়ার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু গরীব ব্রাহ্মণ কিছুতেই এমন কাজ করতে পারেন না। সুতরাং, দ্বিতীয় যে কাহিনীটি বল্‌ব, তা সব রকমেই রাজরাজড়ার মত এবং যাকে ইংরাজীতে romance বলে অর্থাৎ উপন্যাসের ঘটনা, এই কাহিনীতে তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সে কাহিনী এই—

ধরমপুরী নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে থান সিং নামে একজন রাঠোর রাজপুত বাস করতেন। তিনি সম্পত্তিশালী না হ'লেও মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল; কন্যাটীর অলোক-সামান্য রূপ দেখে তার নাম রাখা হয়েছিল রূপমতী।

রূপমতীদের বাড়ীর কাছেই একটা অরণ্য ছিল। অনেকে সেই অরণ্যে শিকার করতে আস্‌ত। সেই অরণ্যের মধ্যে, রূপমতীদের বাড়ীর অনতিদূরেই একটা ঝরণা ছিল। রূপমতী ও তার সঙ্গিনীরা অনেক সময় সেই ঝরণার তীরে বেড়াতে আস্‌ত।

একদিন তারা যখন ঐ ঝরণার কাছে ব'সে আছে, তখন এক রাজপুত্র তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সেই জঙ্গলে শীকার করতে এসে ঘটনাক্রমে সেই ঝরণার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। এই রাজপুত্র আর কেহই নন, মাণ্ডুর সুবাদার বাজ বাহাদুর। অরণ্যের মধ্যে এমন অতুলনীয়া সুন্দরী কিশোরীকে দেখে বাজ বাহাদুরের সঙ্গীরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে উৎসুক হোলো। কিন্তু বাজ বাহাদুর তাদের নিষেধ করলেন। তিনি এই পরমাসুন্দরী কিশোরীর রূপ দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বাজ বাহাদুরও অতি রূপবান যুবক ছিলেন, রূপমতীও তাঁহার দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলেন।

বাজ বাহাদুর তখন ধীরে ধীরে রূপমতীর কাছে গিয়ে প্রেম-নিবেদন করলেন এবং আত্মপরিচয়ও দিলেন। কুমারী যদি সম্মত হয়, তা হ'লে তাকে মাণ্ডুতে নিয়ে গিয়ে পরম সমাদরে রাখ্‌বেন, এ কথাও বাজ বাহাদুর বল্‌লেন। রূপমতী তখন বল্‌ল "যদি আপনি ঐ পবিত্র রেওয়া নদীর জলধারাকে আপনার রাজধানী মাণ্ডুর মধ্যে প্রবাহিত করতে পারেন, তা হ'লে আমি আপনার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত

একটী মস্‌জিদের স্তূপাবশেষ

হ'তে পারি।" এই অসম্ভব প্রস্তাব শুনে বাজ বাহাদুর ক্ষণকাল নীরব হ'য়ে রইলেন; তাঁর উত্তর দিবার কোন কথাই মনে হোলো না। আর এমন অসম্ভব আব্‌দার যে একটী পল্লী-বাসিনী কিশোরী করবে, তা তিনি মনেও করেন নাই। তাকে জোর করে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে যেতেও তাঁর মত সদাশয় রাজার অভিপ্রায় হোলো না। তিনি তখন সসম্ভ্রমে রূপমতীকে অভিবাদন ক'রে নিরাশ হৃদয়ে মাণ্ডুতে চ'লে গেলেন।

বিধর্ম্মী বাজ বাহাদুর রাঠোর কুমারীর মুখ দেখ্‌তে পেয়েছে; সুধু দেখাই নয়, রূপমতী তার সঙ্গে কথা বলেছে, তাকে কঠিন সর্ত্তে বিবাহ করবে বলে কথা দিয়েছে, এ সংবাদ গোপন থাক্‌ল না; তার সঙ্গিনীরা গ্রামে গিয়ে কথাটা প্রচার করে দিল। রূপমতীর পিতা এমন অপমানকর ব্যাপার শুনে রাগে অধীর হয়ে পড়লেন। তখনই পঞ্চায়েত ডাকা হোলো। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত হোলো যে, রূপমতীকে সেই দিনই বিষপানে আত্মহত্যা ক'রে এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সেদিন আবার গ্রামে বসন্তোৎসব ছিল। রূপমতীকে বিষদানে হত্যা করা হবে, এই কথা শুনে গ্রামের পুরোহিত তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হ'লেন এবং রূপমতীর পিতা ও অন্যান্য সকলকে অনুরোধ করলেন যে, এই বসন্তোৎসবের দিনে গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীকে এমন ভাবে শাস্তি দিয়ে কাজ নেই। সেদিনের মত বিষদান বন্ধ থাকুক, পরদিন রূপমতী বিষপানে প্রাণত্যাগ করবে। বৃদ্ধ পুরোহিতের আদেশ কেহই অমান্য করতে পারলেন না; সেদিনের মত বিষদানের ব্যাপার বন্ধ থাক্‌ল।

জামি মস্‌জিদের উপাসনার আসন

সেই রাত্রিতে রূপমতী স্বপ্ন দেখ্‌ল, রেওয়া দেবী তার সম্মুখে আবির্ভূতা হ'য়ে তাকে বল্‌ছেন "তোর উপর আমার দয়া হয়েছে। তোর কথা রক্ষা করেছি। মাণ্ডু রাজধানীর মধ্যে অমুক তেঁতুল গাছতলায় আমার পবিত্র জল ধারাকারে বাহির হচ্চে। তুই বাজ বাহাদুরের কাছে যে কথা বলেছিস্ আমি তা পূর্ণ করেছি। এখন তুই বাজ বাহাদুরকে আত্মসমর্পণ কর। তোর প্রতিজ্ঞা তুই পালন কর।"

রেওয়া দেবী সুধু রূপমতীকেই স্বপ্নে এ আদেশ দেন নাই, বাজ বাহাদুরকেও সেই রাত্রে দর্শন দিয়ে ঐ কথা বলেন। বাজ বাহাদুর প্রাতঃকালে উঠেই দেবী-নির্দ্দিষ্ট সেই তেঁতুলতলায় গিয়ে দেখেন, পবিত্র জলধারা সেই তেঁতুল গাছের পাশ দিয়ে উৎসারিত হচ্চে। তিনি তখনই ঘোড়ায় চ'ড়ে রূপমতীর গ্রামে উপস্থিত হলেন। সকলেই এই আশ্চর্য্য কাহিনী শুন্‌ল। দেবীর আদেশ, আর সে আদেশের প্রত্যক্ষ নিদর্শনও রয়েছে। তখন কেহ আর কোন আপত্তি করতে পারল না; রূপমতী তার সত্য রক্ষার জন্য বাজ বাহাদুরের সঙ্গে মাণ্ডুতে চলে গেল।

তার পরেও কিছু আছে। এই প্রণয়ীযুগল মহাসুখে বাস করতে লাগ্‌লেন। উভয়েই কবি ছিলেন, উভয়েই গীতবাদ্যে অনুরক্ত ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, বাজ বাহাদুর তাঁর প্রাসাদ থেকে কবিতা লিখে রূপমতীর প্রাসাদে পাঠিয়ে দিতেন, রূপমতী আবার তার উত্তরে কবিতা লিখে পাঠাতেন। সে সকল কবিতার অনেকগুলো এখনও শুন্‌তে পাওয়া যায়। যাঁরা বাজ বাহাদুর ও রূপমতীর এই সকল কবিতা পড়তে চান, তাঁরা Mr. L. M. Crump C. I. E. মহোদয়ের লিখিত পুস্তক পাঠ করলে সমস্ত বিবরণ জান্‌তে পারবেন।

যেদিন আকবর বাদশাহের সেনাপতি আদম খাঁ বাজ বাহাদুরকে পরাজিত করলেন, সেই দিন বাজ বাহাদুর

রূপমতীকে সংবাদ পাঠালেন যে, আর কোন উপায় নেই, রূপমতী যেন তাঁর প্রাসাদ থেকে কোথাও পলায়ন করেন। এই সংবাদ পেয়ে রূপমতী বাজ বাহাদুরকে ব'লে পাঠালেন, তিনি যেন রূপমতীর প্রাসাদে একবার আসেন। বাজ বাহাদুর কালবিলম্ব না করে রূপমতীর প্রাসাদে গিয়ে দেখেন, রূপমতী হীরকচূর্ণ সেবন ক'রে প্রাণত্যাগ করেছেন। তাঁর দেহ শয্যার উপর পড়ে রয়েছে। রূপমতীর কথা এইখানেই শেষ!

এইবার আমাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলি। ধার থেকে মাণ্ডু কুড়ি মাইল পথ। এই কুড়ি মাইল পথ যেতে আমাদের দুই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। আর এই দুই ঘণ্টাকাল সত্যচরণ বাবু মাণ্ডু ও ধারের ইতিহাস অবিশ্রান্ত বল্‌তে বল্‌তে গিয়েছিলেন। আমরা অনেকেই শুনেছিলাম, কিন্তু আমি ত বল্‌তে পারি, তাঁর বর্ণিত এই ইতিহাসের সামান্য দুইচারিটী কথা মাত্র মনে আছে।

মাণ্ডুতে যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা দশটা। গাড়ী থেকে নেমে সেই যে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করলাম, তার আর অন্ত পেলাম না; শুধু প্রাসাদ আর মস্‌জিদের ছড়াছড়ি; আর সে সবের কতক বা একেবারে ভূমিসাৎ হয়েছে, কতকগুলো বা অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে; গুটিকয়েকমাত্র প্রত্নতত্ত্ববিভাগের চেষ্টায় মৃৎসমাধি থেকে মাথা তুলেছেন। ক্রোশের পর ক্রোশব্যাপী স্থান জুড়ে সুধু প্রাসাদ আর মস্‌জিদ, মন্দির আর জলাশয়, আর দূরবিস্তৃত নিবিড় জঙ্গল, তার ভিতরে সাপ বাঘ ও হিংস্রজন্তুর অবাধ রাজত্ব!

এখনও মাণ্ডুতে যা দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং যেগুলির মধ্যে প্রবেশ করবার সাহস হয়, তার মধ্যে গুটিকয়েকের নাম বল্‌ছি; যথা—হিন্দোলামহল, জাহাজমহল (জলাশয়ের মধ্যে নির্ম্মিত ব'লে এই নাম হয়েছে), হাবেলীমহল, ধাইমহল, চম্পা বাউড়ি, জমি মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, মহম্মদ খিলিজির সমাধি, হোসেন শাহের সমাধি, বাজ বাহাদুর ও রূপমতীর প্রাসাদ, আস্‌রফি মহল। এইগুলিই প্রধান এবং গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে এগুলি এখনও দাঁড়িয়ে আছে এবং এগুলির মধ্যে প্রবেশ করবারও পথ আছে। এ ছাড়া ছোটখাটো আরও অনেক প্রাসাদ আছে। তাদের কয়েকটীর নাম বল্‌ছি, যথা—সাতকুঠুরী, চোরকুঠুরী, এক খাম্বা, রেবা কুণ্ড, সাগর-তালাও, নীলকণ্ঠেশ্বর শিবের মন্দির, ইত্যাদি। চম্পা বাউড়ি মাটীর নীচের একটী প্রসাদ; উপর থেকে ছোট ছোট সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। প্রথমে ত আমরা নামতে সাহস পেলাম না, যদি কোন হিংস্র জন্তু সেখানে থাকে। সত্যচরণবাবু অভয় দিলেন, নীচের মহলে সে সব কিছু নেই; লাট সাহেবের ভয়ে তাঁরা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই সাহস ক'রে নীচে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড চক-মিলানো প্রাসাদ; দারুণ গ্রীষ্মের সময় বাদশারা এখানে আশ্রয় নিতেন। এই চক-মিলানো প্রাসাদের চত্বরে
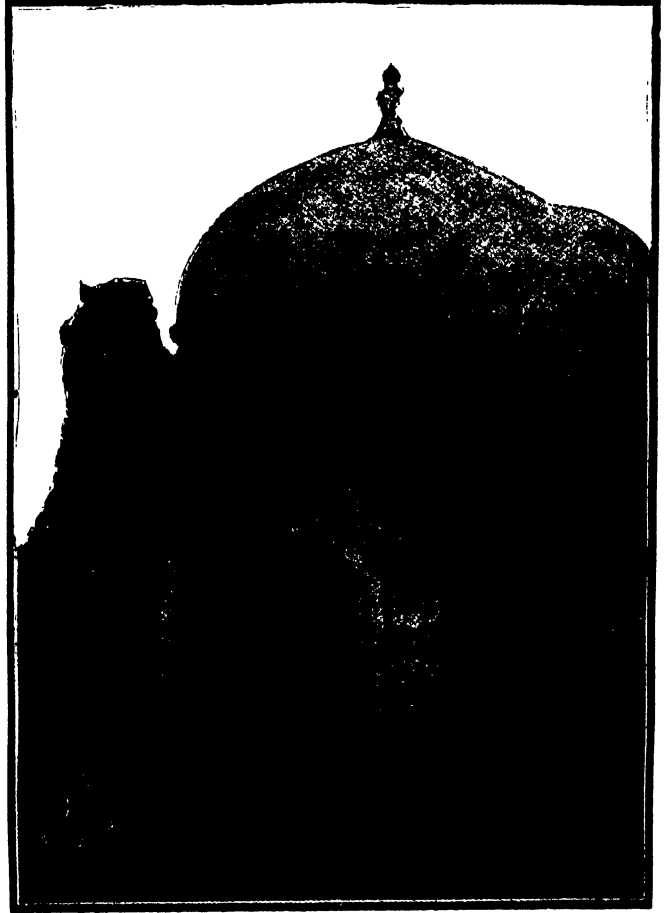
জামি মস্‌জিদের অবস্থা (সংস্করণের পূর্ব্বে)

আবার একটা সরোবর আছে। সেকালে বোধ হয় জল যাতায়াতের পথ ছিল। এখন আর তার সন্ধান পেলাম না, জল একেবারে কৃষ্ণবর্ণ।

আর একটা ছোট প্রাসাদ দেখলাম, তার নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি—ধাই মহল। এই অট্টালিকাটি রাস্তা থেকে নীচে এবং একটু দূরে। এই ধাই মহলের একটা বিশেষত্ব
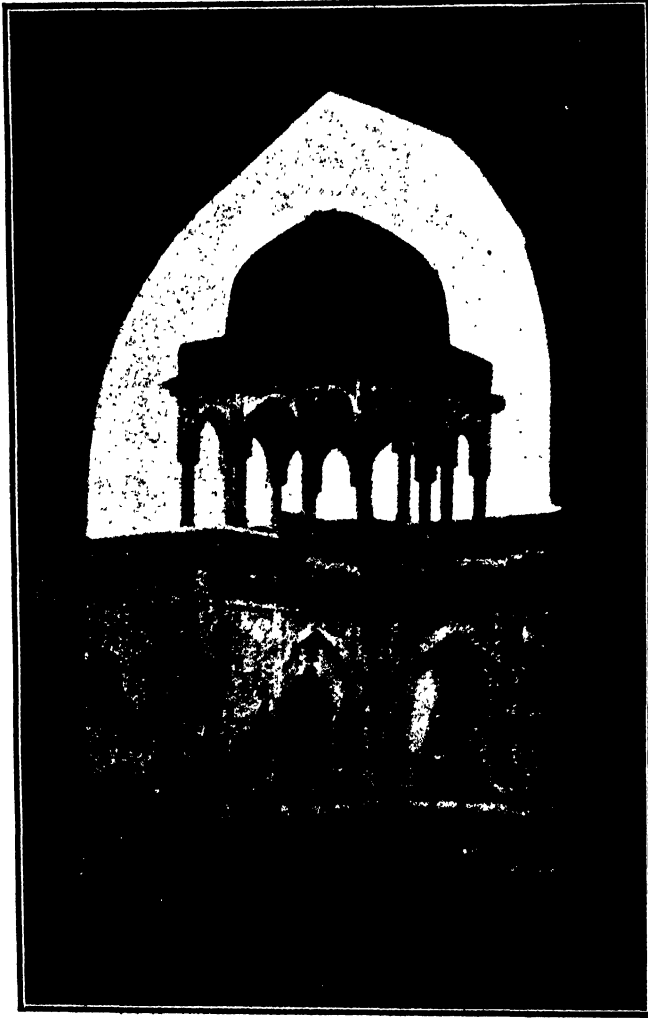
রূপমতীর প্রাসাদ

আছে। রাস্তার উপর এক স্থানে একটা কাষ্ঠ-ফলক রয়েছে। তাতে লেখা আছে 'Echo point'। এই স্থান থেকে ধাই মহল পর্য্যন্ত সরলরেখা-পথের যেখানে ইচ্ছা সেখানে দাঁড়িয়ে কোন কথা বল্লে তখনই দ্বিগুণ উচ্চ স্বরে তার প্রতিধ্বনি হয়; এই সরলরেখা-পথ ছেড়ে বাঁয়ে কি ডাইনে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে কথা বল্লেও তার আর প্রতিধ্বনি হয় না। আমরা এই প্রতিধ্বনি-রেখায় দাঁড়িয়ে যে কথা বল্লাম, তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম।

উপরে যতগুলি স্থানের নাম বল্লাম সেগুলি দেখতে দেখতেই বেলা প্রায় একটা বেজে গেল; এখনও কিন্তু রূপমতী প্রাসাদ দেখা হয় নাই। সে-প্রাসাদ মাণ্ডুর একেবারে শেষ প্রান্তে একটা অনতিউচ্চ শৈলের উপর অবস্থিত। আমরা তখন 'বাসে' উঠে রূপমতীর প্রাসাদ দেখতে গেলাম। জুম্মা মসজিদের নিকট থেকে আমরা 'বাসে' উঠলাম। দুই মাইল পথ অতিবাহিত করে একস্থানে 'বাস' দাঁড়িয়ে গেল। সেখান থেকে চড়াই আরম্ভ; সে চড়াইতে বাস উঠতে পারবে না; ভাল মোটর যেতে পারে। তাই ত, এখন এই ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে এতটা পথ উঠি কি করে। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় আমাদেরই বন্ধু, কাশীর সর্ব্বজনপরিচিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন মহাশয় তাঁর একটী মেয়ে নিয়ে একখানি মোটরে চড়ে সেই চড়াইয়ের মুখে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মোটরে একটু স্থান ছিল। তিনি আমাকে দেখে তাঁর মোটরে তুলে নিলেন। রূপমতীর প্রাসাদের দুয়ারের কাছে আমরা নামলাম। প্রাসাদটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। একতলা বাড়ী। সিঁড়ি দিয়ে উপরে গিয়ে দেখা গেল চারি কোণে চারটী গম্বুজ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, এই গম্বুজে ব'সে রূপমতী সেতার বাজিয়ে গান করতেন এবং দুই মাইল দূরে প্রাসাদের উপর ব'সে বাজ বাহাদুর সেই গানের উত্তর দিতেন। কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন—দূরত্ব যে দুই মাইল! তখন রেডিয়ো ছিল কি?

রূপমতীর প্রাসাদ থেকে যখন নামলাম, তখন বেলা প্রায় আড়াইটে। এতক্ষণের মধ্যে মুখে একটু জলও দিতে পারি নাই; ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আর পথশ্রমে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখন সত্যবাবু বল্লেন, জুম্মা মসজিদের কাছে যে কালীবাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে বিশ্রাম ও জলযোগ করা যাবে। জলযোগ যে কি হবে, তা ভেবে

পেলাম না। তা না হোক, হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করতে পারলেই বাঁচি।

আধঘণ্টা পরেই আমরা কালীবাড়ীতে এলাম। সেখানে দ্বিতলে আমাদের বিশ্রামের জন্য একখানি সতরঞ্চ পাতা ছিল। তাইতে শুয়ে পড়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল, আমাদের সঙ্গী দুইজন 'বাস' থেকে একটা ঝুড়ি আর একটা হাঁড়ি নিয়ে এলেন। ঝুড়িতে কতকগুলি লুচি আর হাঁড়িতে তরকারী ছিল। সকলে মিলে তাই প্রসাদ পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমাদের যে রকম ক্ষুধার উদ্রেক ত্যাগ করেছিলেন; আমাদের কেদার দাদাও সেই সঙ্গে ছিলেন।

মাণ্ডুকে দণ্ডবৎ করে আমরা যখন যাত্রা করলাম তখন প্রায় চারটে। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই ধারে পৌঁছিলাম। সত্যবাবু তখন ধ'রে বসলেন যে, ধারের দুর্গটা দেখতেই হবে। কি করা যায়! দুর্গে যাওয়া গেল। বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নেই; অল্প কয়েকটা কামান বন্দুক আছে, আর কয়েকজন সান্ত্রী আছে। সেখান থেকে নেমে ডাক বাংলায় এসে এক একজন দুই তিন পেয়ালা চা পান করে একটু যেন সজীব হওয়া গেল।

ওঁকারনাথ

হয়েছিল, তাতে ঐ রসদ পাঁচজনেরই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে না; তাতেই চোদ্দজন মানুষ কিঞ্চিৎ জলযোগ করে এবং একটু বিশ্রাম ক'রে প্রায় চারটার সময় বেরিয়ে পড়া গেল। সত্যবাবু তখনও বলেন "আরে, আরও যে অনেক দেখতে বাকী রইলো।" রইলো ত রইলো মশাই! যেতে হবে ষাট মাইল পথ। একটী কথা বলা হয় নাই; আমাদের অগ্রাগত দলের দুই একখানি বাসের সঙ্গে অনেক আগে একবার মাত্র দেখা হয়েছিল; তার পরেই তাঁরা ইন্দোরে চ'লে গিয়েছিলেন এবং অপরাহ্ণ দুইটার সময়ই ইন্দোরে পৌঁছেছিলেন। অনেকে সেই সন্ধ্যার গাড়ীতেই ইন্দোর

ধার থেকে যখন যাত্রা করা গেল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সারথি বললেন, এই সাড়ে আটটার মধ্যে অর্থাৎ দেড় ঘণ্টায় তিনি এই চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করবেন। ভাল কথা। মাইল পনর এসেই 'বাস' অচল! নিকটে আশ্রয়-স্থান নেই, দুপাশে ধু, ধু মাঠ। অনেক কষ্টে, অনেক তোয়াজ করে যান যখন পুনরায় গতিশীল হলেন, তখন সাড়ে নয়টা রাত্রি। ইন্দোরের স্কুলে যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি এগারটা। দেখি শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ আমাদের অপেক্ষায় ব'সে আছেন। সেই রাত্রিতে শৈলেন্দ্রের বাড়ীতে আমার আর নরেন্দ্রের অবস্থানের

ব্যবস্থা হয়েছে ; সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির ব্যবস্থা সেইদিন প্রাতঃকালেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন সেই রাত্রি এগারটার পর জিনিসপত্র নিয়ে টঙ্গায় আরোহণ করে রেসিডেন্সির সীমানার মধ্যে শ্রীমান শৈলেন্দ্রের বাসায় যাওয়া গেল। তারপর প্রচুর আহারের পর নিদ্রা—বল্‌তে গেলে দুই রাত্রির পর এই নিদ্রা!

কথা ছিল পরদিন প্রাতঃকালে আহারাদি শেষ করে আমরা ওঁকারনাথ দেখ্‌তে যাব এবং সেখান থেকে অজন্তায় যাব। আমরা দুইজন ছাড়া আরও দুইজন আমাদের সঙ্গী হবেন বলেছিলেন ; তাঁরা আমাদের সঙ্গে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাবেন। তাঁরা মাণ্ডুতেও আমাদের সঙ্গী ছিলেন। ইন্দোরে এসে তাঁরা অন্য স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা গোরক্ষপুর থেকে এসেছিলেন। তাঁদের নাম শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ ও শ্রীযুক্ত দিবাকর মখোপাধ্যায় এম-এ।

বলেছি, পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর সোমবার ইংরাজী বৎসরের শেষ দিন আমরা ইন্দোর ত্যাগ করব। কিন্তু ইন্দোরের বন্ধুদের ষড়যন্ত্রে তা হোলো না। সকলেই বল্‌লেন, একটা দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করলে দাদা নাকি নিশ্চয়ই মারা যাবেন ; সুতরাং তাঁরা আমাদের কিছুতেই সেদিন ছাড়লেন না—আমাদের সারাটা দিন রাত ইন্দোরে থাক্‌তে হলো। ওঁকারনাথ দেখ্‌বার বাসনা ত্যাগ করতে হলো। দেখা হলো না, কিন্তু দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না—ওঁকারনাথের একখানি আ লো ক চি ত্র ছাপিয়ে দিলাম।

ইন্দোরেই ইংরাজী ১৯২৮ অব্দের শেষ দিন বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে মহানন্দে কাটানো গেল। পরের দিন ১লা জানুয়ারী ১৯২৯ ইন্দোর ত্যাগ। তার পরের কথা এবার আর নয়।

সুন্দর

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সুন্দর, সুন্দর, কত সুন্দর!
মাধুরীতে ভরা তনু, ভরা অন্তর!
তুমি এলে চঞ্চলা,
বিদ্যুৎ-অঞ্চলা,
বিভাময়ি, ভরি' দিলে হৃদি-কন্দর!
অয়ি সুন্দরী, তুমি কত সুন্দর!

তুমি এলে গুন্ গুন্ মধুগীতি গুঞ্জরি'
সাথে এল ফাল্গুন—মল্লিকা মঞ্জরী!
নৃত্যের ভঙ্গেতে,
অঙ্গেতে, অঙ্গেতে,
উচ্ছল ফুলদল ঝরে ঝর্ঝর!
লীলায়িত রঙ্গেতে তুমি সুন্দর!

এ জীবনে এলে, অয়ি, রচি' মৌ-বন!
রঙ্গিলা করি' মম নব-যৌবন!
দিলে মধু, সঙ্গীতে—
সুধা, তনু-ভঙ্গীতে
নয়নের ইঙ্গিতে সুখ কম্পন!
সুন্দরতম হ'ল মম যৌবন!

তুমি কত সুন্দর অন্তরে অন্তরে!
যত হয় পরিচয় বিস্ময়ে মন ভরে!
হিয়াখানি ফোটা ফুল,
সৌরভে টুল্ টুল্!
কভু লীলা-মঞ্জুল, কভু মন্থর!
হাসি কান্নায় তুমি কত সুন্দর!

মা

শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ, বিএল্

নূতন হাকিম হয়েছি।

কাব্য ও গান, আনন্দও হাসি মিথ্যার আবহাওয়ায় পিষ্ট হয়ে যায় যায়।

যারা সাক্ষ্য দেয়, তাদের জলজ্যান্ত মিথ্যা শুনে শুনে প্রাণ হয়রাণ হয়; আর ভাবি, বুঝি মিথ্যাটাই মানুষের সব।

কিন্তু সেদিন একটা অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হল। সত্য ঘটনা, তাই এটা উপন্যাসের চেয়ে বাস্তব।

কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল শুভ্রবাস-পরা বর্ষীয়সী বিধবা;—তার দারিদ্র্যের নগ্নতা স্পষ্টভাবেই বিদ্যমান। তথাকথিত ছোট লোকের মেয়ে, কিন্তু তবু তার পাণ্ডুর মুখে কি যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ।

চোখ দুটী তার ছল ছল করছিল। প্রতিহত কান্না পথহারা হয়ে তার চোখকে চঞ্চল ও বেপমান করে তুলেছিল।

ঘটনা—তার ছেলে খুনের দায়ে আসামী,—তার একমাত্র সন্তান মৃত্যুর দ্বারে। পুলিসের রিপোর্ট, ছেলেটী পাড়ার একটা মেয়েকে ভালবাসে। মেয়ের বাপ প্রথমে তার মেয়েকে কালুর সঙ্গেই বিয়ে দেবে বলে। এজন্য কিছু টাকাও সে কালুর কাছ থেকে নিয়েছিল।

কিন্তু মানুষের তৃষ্ণার শেষ কোথায়? কিছুদিন পরে নূতন পাত্র কন্যার পাণিপ্রার্থী হইল। রূপে, গুণে ও অর্থে সে কালুর চেয়ে বিশেষ প্রকারেই ভালো।

কাজেই যাহা ঘটবার তাহাই ঘটিল। পাত্রীর পিতা বাকিয়া বসিল। ছাগমাংস-লোলুপ ঈশপের সেই জন-প্রসিদ্ধ নেকড়ের মত মানুষেরও ছলের অভাব হয় না। নানা অজুহাতে বিবাহ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু, কালু কিছুতেই আপন দাবী ত্যাগ করিতে চায় না। এই নিয়ে নানা গণ্ডগোল চলিতে লাগিল।

কালু গ্রাম্য সালিসের শরণাপন্ন হইল। সালিসের বিচারে সে জিতিল। কিন্তু হইলে কি হয়, প্রতিপক্ষ বলে কালুর ভাবী বধূকে তারা চায়ই চায়।

বিষ্ণুশর্ম্মার বচনে যে আছে, যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা চতুষ্টয় যেখানে মিলিত হয়, সেখানে কি না অনর্থই ঘটিতে পারে, তাহা কাজিপাড়ার হারুর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সত্য।

নৌকা করে বেড়াতে বেড়াতে স্নানার্থিনী ত্রয়োদশী মধুমালাকে দেখে সে আত্মহারাই হয়েছিল।

কাজেই নাছোড়বান্দা হারু এসে বলল—নূতন সালিশ চাই। আবার সালিশ বসিল। সে সালিশদের অনেককেই টাকায় বশ করে হারু জয়লাভ করিল। সেই সালিশী-সভায় হারু ও কালুর যথেষ্ট বচসা হয়। বচসা প্রায় হাতা-হাতির মতই হয়েছিল।

সেইদিন থেকেই হারুর উপর কালুর মহা আক্রোশ রহিয়া যায়।

ইহার পর মহাসমারোহে হারুর বিবাহ হইল। বিবাহের পর আপন জয়গর্ব্ব প্রকাশের জন্য নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া কালুর মাকে প্রণাম করিবার অছিলায় হারু যাইয়া ঝগড়া বাধায়। এ দৃশ্য কালুর পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল; তাহার পরে কলহ উপস্থিত হওয়ায় কালুর ধৈর্য্য রহিল না।

কালু ঝোঁকের মাথায় হাতের কাছের রাম-দা লইয়া হারুকে আঘাত করিল। সেই সবল বাহুর প্রাণপণ শক্তির আঘাতে হারু ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া গেল। হারুর নববধূ ব্যাধভীতা হরিণীর ন্যায় বচসার আরম্ভেই পলাইয়া প্রাণ বাচাইয়াছিল, নইলে হয় ত তারও প্রাণরক্ষা হইত না।

এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী কালুর মা। পুলিশের নিকট কালু নিজের হত্যা-কাহিনী স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু পরে আইনের সাহায্য পাওয়ায় মোক্তারের উপদেশ-মতে সে সমস্তই অস্বীকার করিয়া বসিল। এই হত্যাকাণ্ড দিনে দুপুরে হইলেও সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশেষ ছিল না; কাজেই মামলায় কি হইবে না হইবে ভাবিয়া পুলিশের লোক বিশেষ উৎকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল বর্ষীয়সী বিধবা ;—বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে—আসামীর মুখ হইতে অস্ফুট স্বর বাহির হইল "মা"। জননী পুত্রের দিকে চাহিল ; কান্নায় যেন তার বুক ভরিয়া উঠিতেছিল।

জেরা চলিতে লাগিল।

প্রশ্ন—এই আসামী কি সত্যই খুন করিয়াছে?

মাতা উত্তর দিল "হাঁ।"

আমি আগ্রহে জননীর মুখের দিকে চাহিলাম। সেখানে তখন মানসিক দ্বন্দ্বের কাল-বৈশাখীর ঝড় বহিতেছিল।

মাতার স্নেহ ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির মধ্যে যেন ভীষণ লড়াই চলিতেছে।

"তুমি কি স্বচক্ষে খুন করতে দেখেছ?"

পুনরায় সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিল "হাঁ।"

"তুমি যা বলছ', তার ফল কি ভীষণ তা কি জান?"

"জানি।"

"তোমার ছেলের ফাঁসী হবে, তা কি ভেবেছ?"

এবার নিদ্রিতা মাতা জাগিয়া উঠিল। বিধবা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল "হুজুর, রাগের মাথায় খুন করেছে, ওকে ক্ষমা করুন।"

হায় অন্ধ নারী, সে জানে না যে আইন নিয়ম ও নিষ্ঠুর।

পুনরায় জেরা চলিল।

"এখনও ঠিক করে বল, পুলিসের লোক তোমায় ভয় দেখিয়ে এই সব কথা বলতে বলেছে—ঠিক কিনা বল?"

"পুলিসের লোক, যা জানি তাই বলতে বলেছে।"

"তা হলে তুমি মিথ্যা বলছ না?"

"না।"

"তোমার ছেলেই তা হলে খুনী।"

"হাঁ।"

আসামীর আর সহ্য হইল না—কোর্টের মধ্যেই চেঁচাইয়া উঠিল "রাক্ষুসী, তুই আমায় একটুও ভালবাসিস না।"

বেলা শেষের পড়ন্ত রৌদ্র কোর্টের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছিল ; সে আলো নারের মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

কাঠগড়া হইতে নামিতে নামিতে মা বলিল, "তোকে যা ভালবাসি বাবা, তার চেয়ে ধর্ম্মকে বেশী ভালবাসি। ধর্ম্মের চেয়ে বড় ত আর কিছু নেই।"

হাতের কলম ফেলিয়া সেই ছোটলোকের মেয়ের দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

আমার মনে হইল যেন বেলাশেষের রৌদ্রে সেদিন এক নূতন জ্যোতিঃ জাগিয়া উঠিল।

নীরব নিস্পন্দ আদালত যেন অপরিচিত আবহাওয়ায় ভরিয়া উঠিল।

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শেলীর শেষ দিন

বহুদিন ধরিয়া শেলী ভাবিতেছিলেন—কেমন করিয়া তাঁহার কবি-বন্ধু হান্টকে ইংলণ্ড হইতে সরাইয়া ইতালীতে আনা যায়। কারণ ইংলণ্ডে হান্টের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। হান্টের পাওনাদার এবং রাজনৈতিক শত্রুরা কবি বলিয়া তাঁহাকে কিছুমাত্র রেহাই দেয় নাই—বোধ হয় কোন কালে কোন লোক দেয় না। তবে ইংলণ্ড এ বিষয়ে একটা বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। শেলী, বায়রণ, কীট্‌স্, ব্রাউনিঙ্‌, সুইনবার্ণ ইংলণ্ডের সন্তান নয়। ইংলণ্ডের সন্তান, কিপলিঙ আর টেনিসন, সাদে আর পোপ। শেক্‌স্‌পীয়ার তাঁহার জীবদ্দশায়, এমন কি মৃত্যুর একশো বছর পর্য্যন্ত, যে অপমান ও নিন্দা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রসিক-বর্গের (?) নিকট হইতে পাইয়াছেন, এবং তাঁহার লেখার কুৎসা ও ধারাবাহিক জঘন্য সমালোচনা ইংরাজী সাহিত্যের পাতায় যতখানি আছে, বোধ হয় ততখানি আর কোনও কবি সম্বন্ধে কোথাও নাই। জনসনের বিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডা হইতেই প্রথম ইংলণ্ডের লোক শোনে যে, "শেক্‌স্‌-

পীয়ার একটা চোর, একটা দাঁড়কাক, শুধু ময়ুর-পুচ্ছ দিয়া লোক ভুলাইতে চায়।" ওথেলো পড়িয়া টমাস রাইমার বলিয়াছিলেন যে, "এ বই অবশ্য খুবই ভাল—খুব নীতি-মূলক; কারণ, আসল কথা যা এই বইতে বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে মেয়েরা যে যার রুমাল সামলাও।" ইংলণ্ড শুধু কবিকে চায় না—চায় রাজ-কবিকে।

হাণ্টের ব্যাপার লইয়া শেলী বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। হাণ্টের পরিবারটীও সুবৃহৎ—সাত সাতটী ছেলে। বায়রণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শেলী ঠিক করিলেন যে, ইতালীতে একখানি কাগজ বাহির করা হইবে এবং হাণ্টকেই তাহার সকল স্বত্ব দিয়া দেওয়া হইবে এবং শেলীর অনুরোধে বায়রণ তাঁহার সকল লেখা প্রথম সেই কাগজেই প্রকাশ করিবেন স্থির হইল। বায়রণ আপনার বাসভবনের খানিকটা হাণ্টের বসবাসের জন্য ছাড়িয়াও দিলেন। ওধারে ইংলণ্ড হইতে হাণ্ট-পরিবার ইতালীর অভিমুখে রওয়ানা হইল।

হাণ্টের সহিত বায়রণের সাক্ষাৎ পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য শেলী ও উইলিয়াম্‌স্ লেগহর্নে আসিয়া হাণ্টের সহিত মিলিত হইলেন এবং সেখান হইতে হাণ্ট-পরিবারকে লইয়া শেলী ও ট্রেলনী পিসা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। উইলিয়াম্‌স্ বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষায় লেগহর্নেই থাকিয়া গেলেন।

বায়রণের সহিত বোঝাপড়া শেষ করিয়া শেলী ও ট্রেলনী পুনরায় লেগহর্নে ফিরিয়া আসিলেন। সে বৎসর জুলাই মাসে সহসা ভয়ানক গরম পড়ে। আকাশ অগ্নিকুণ্ডের মত অনল বর্ষণ করিত। চাষারা মাঠের কাজ ফেলিয়া ঘরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। রাজপথে পুরোহিতরা নানা রকম মূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিত —যদি মেঘের দেবতা মাটীর মানুষের দিকে করুণায় চায়।

উইলিয়াম্‌স্ গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই শেলী আসিবামাত্রই তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। ট্রেলনীর নৌকার অংশবিশেষ খারাপ হইয়া যাওয়ার দরুণ তাঁহাকে দুই তিন দিনের জন্য লেগহর্নে থাকিয়া যাইতে হইল। শেলী তাঁহার নৌকা করিয়া যাত্রা করিলেন। ঈশান কোণে তখন কোথা হইতে স্তরে স্তরে শ্যামল কোমল মেঘ জমা হইয়া উঠিতেছিল —কোন্ অদৃশ্য রন্ধ্রপথ হইতে এতদিনের নিরুদ্ধ বাষ্প ঝড়ের মূর্ত্তিতে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল।

ট্রেলনী দুরবীণ লইয়া বন্ধুর নৌকার দিকে চাহিয়া রহিল। দূরে শেলীর নৌকাখানি ধূসর হইয়া আসিয়াছে। যেন দিক্-রেখার সন্ধ্যার নীড়ে শ্রান্ত-পক্ষ বিহঙ্গম ফিরিয়া চলিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাও আর দেখা গেল না। প্রমত্ত অন্ধকারে দিক্ রেখা অদৃশ্য হইয়া গেল। সমুদ্র আকাশকে স্পর্শ করিবার জন্য তরঙ্গ বাহু উত্তোলন করিল। মাথার উপরে বজ্র মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিয়া উঠিতে লাগিল। যেন নাগকন্যারা আজ সমুদ্রের প্রবাল-শয্যা ত্যাগ করিয়া শঙ্খ-ধ্বনি করিতে করিতে পৃথিবী ভ্রমণে আসিয়াছে—অতল রহস্যের অসীম রাজ্য হইতে আজ রাজদূতেরা বাহির হইয়াছে —অতল রহস্যের অধিবাসী এক প্রবাসী আত্মাকে পুনরায় অতলের মহাঙ্গনে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া।

* * * *

ওধারে উপসাগরের অপর কূলে দুইটী বিষণ্ন নারী-মূর্ত্তি প্রভাতে, সন্ধ্যায়, নিশীথে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকে। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই; কেন যেন সহসা তাহারা মৌনী হইয়া উঠিয়াছে। দুইজনে দুইজনার চোখের দিকে চায়—আর কোথা হইতে অশ্রু-বাষ্পে তাহাদের চোখ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। সমুদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সমুদ্র যেন তাহাদের নয়নে আসিয়া বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। দিন যায়, শেলীর নৌকা তো দেখা যায় না। মেরী ও জেন পাগল হইয়া উঠিল। প্রতিদিন ঝড়, বৃষ্টি—অবিশ্রান্ত, অবিরাম। মেরী ও জেন ঠিক করিল এই ঝড়ের মধ্যে তাহারা বাহির হইবে—কোথায় কোন্ অন্ধকারে বন্ধু তিমির-তরঙ্গ ভেদ করিয়া আসিতেছে—তাহারা আগাইয়া গিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ঝড়ে কোনও নাবিক নৌকা ছাড়িল না।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে এক চিঠি আসিল। হাণ্ট শেলীকে লিখিয়াছেন, "তোমার পৌঁছান সংবাদ না পাইয়া বড়ই চিন্তিত আছি। আজ পাঁচ দিন হইল এখান হইতে যাত্রা করিয়াছ, অথচ তোমার কোনও খবর নাই—কি ব্যাপার?"

বাহিরে তখনও ঝড় বহিতেছিল। চিঠিখানি মেরীর অবশ হস্ত হইতে মাটীতে পড়িয়া গেল। শুধু মেরী জেনের দিকে চাহিল—জেন মেরীর দিকে চাহিল। দুজনার অশ্রুজলে কে যেন লিখিয়া দিল—সে বন্ধু নাই; আকাশের সে—তাই আকাশ তাহাকে ডাকিয়া লইয়াছে; সাগরের

সে—সাগর তাই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছে; ঝড়ের সে—তাই ঝড় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে।

* * * *

পাঁচ ছ' দিনের অনুসন্ধানের পর উপসাগরের বালুচরে এক বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া গেল। সমুদ্রের মাছে তাহার দেহের উন্মুক্ত অংশ খাইয়া ফেলিয়াছে। ট্রেলনী মৃত দেহ দেখিলেন। জামার পকেটে হাত দিয়া দেখেন এক পকেটে শফোক্লিস্, আর পকেটে কীট্‌সের কবিতার বই—কে যেন তাড়াতাড়ি পড়িতে পড়িতে উল্টাইয়া পকেটে ভরিয়া রাখিয়াছে—আবার তুলিয়া পড়িবে বলিয়া। ট্রেলনী বন্ধুকে চিনিলেন—কিছু দূরে উইলিয়াম্‌সেরও মৃতদেহ পাওয়া গেল। ধীরে তীরের বালু খুঁড়িয়া সমুদ্রের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা হইতে রক্ষা করিবার জন্য মৃতদেহ দুইটী বালুর মধ্যে রাখিয়া মেরীকে সংবাদ দিবার জন্য আসিলেন।

মেরীর বাড়ীতে আসিয়া ট্রেলনীর পা অবশ হইয়া আসিল। অবশের মত তিনি বাড়ীতে ঢুকিলেন—নির্জ্জন, নিস্তব্ধ ঘরে শুধু একটী দীপ জ্বলিতেছে। মৃদু, ধীর, স্তিমিত তাহার কম্পন, যেন মেরীর হৃদয়। পায়ের শব্দ পাইয়া মেরী ছুটিয়া আসিয়া ট্রেলনীর মুখের দিকে চাহিলেন। "কিছু খবর কি পেলেন?" ট্রেলনী কোনও উত্তর না দিয়া তেমনি নতমস্তকে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। দীপ-শিখাটী তখন নিভিয়া গিয়াছিল।

* * * *

সমুদ্রের ধারে চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। প্রাচীন গ্রীকদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যে ভাবে সম্পন্ন করা হইত, সেই ভাবে উইলিয়াম্‌স্ ও শেলীর শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

প্রথম দিন উইলিয়াম্‌সের মৃত-দেহ বালু হইতে বাহির করা হইল। কতকগুলি হাড় আর মাংসের পিণ্ড। সমুদ্র-তীরে চিতা সাজান হইল। বায়রণ রাশি রাশি পাইন আর চন্দন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। চন্দন-কাষ্ঠের শয্যায় উইলিয়াম্‌স্‌কে শায়িত করা হইল।

যে কবি মানবকে বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছে সে কবিরও চোখে জল দেখা দিল। অশ্রু লুকাইবার জন্য বায়রণ উন্মত্তের মত হাসিয়া উঠিলেন।

চন্দন কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করা হইল। সমুদ্রের হাওয়ায় চিতা জ্বলিয়া উঠিল। বায়রণ সেই চিতাগ্নিতে পুরানো কালের গ্রীক পুরোহিতদের মত সুরা আর সুগন্ধ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। শিখা আকাশের দিকে উঠিল। সেই চিতাগ্নিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বায়রণের বিদ্রোহী মন কিসের বিরুদ্ধে যেন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সমুদ্র হইতে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

* * * *

দ্বিতীয় দিন শেলীর মৃত-দেহ সৎকার করা হইল। স্বচ্ছ আকাশ হইতে সুন্দর আলো আসিয়া সমুদ্রের কালো আবরণকে স্বচ্ছ নীল করিয়া তুলিল। তীরের বালুগুলি হীরক-চূর্ণের মত জ্বলিতে লাগিল। তীরে তীরে শান্ত সমুদ্র মৃদু মর্ম্মর-ধ্বনি তুলিতেছিল। দূরে পাইন-বনের পারে পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গলিয়া পড়িতেছিল। পাইন-বন শান্ত, নিস্তব্ধ, মধুর।

শেলীর দেহাবশেষের দিকে চাহিয়া বায়রণের বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। বায়রণের সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল,—"হায়, প্রমিথিয়ুস্!"

আবার সমুদ্র-তীরে চন্দন-কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠিল—আবার সুরায় আর সুগন্ধে ইতালীর অখ্যাত সাগর-কূল ভরিয়া উঠিল। মৃতদেহ যখন জ্বলিয়া শেষ হইয়া আসিতেছিল, তখনও হৃদয়টুকু পোড়ে নাই - পুড়িতে দেরী হইতেছিল। ট্রেলনী উন্মাদের মত আগুনের মধ্য হইতে হৃদয়টুকু তুলিয়া লইলেন। সমস্ত হাতখানি ঝলসিয়া গেল।

ট্রেলনী দেহাবশেষরূপে যাহা কিছু রহিল তাহা সংগ্রহ করিয়া একটী চন্দন-পেটিকায় রাখিয়া দিলেন। কৌতূহলী শিশুর দল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিল। চলিয়া যাইবার সময় তাহারা আপনারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, এই হাড়গুলি যখন ইংলণ্ডে পৌঁছিবে—তখনই আবার এই লোকটি বাঁচিয়া উঠিবে।

* * * *

সেদিন ইতালীর সমুদ্র-কূলে যে চিতাগ্নি জ্বলে, তাহার আভায় ইংলণ্ডের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল—তবে সে বেদনায় নয়—লজ্জায়!

ছুঁলে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কথা, সুর ও স্বরলিপি—

মিশ্র কেদারা ছায়ানট—তাল তেতালা

চাহি নি তবুও কেন দিলে হাতে তুলে ?
খুঁজি নি তবুও প্রিয়, কেন বল ছুঁলে ?
চির-চেনা সাথে নিতি   এ কী পরিচয় রীতি !
বিমুখতা মাঝে বল, কী নেশার ভুল এ !
তাই বুঝি সোণার কাটিটি দিয়া ছুঁলে ?

চেয়েছি যত না কিছু—ভেবেছি এ তৃষা
মিটিবে গো তাহে বুঝি—মিলিবে বা দিশা ;
হেথা নিতি চেয়েছি যা—   পেয়েও কি পেয়েছি তা
সেঁচেছি পীযূষ ভাবি যারে প্রাণমূলে,—
বুঝাতে তা মরীচিকা আজি কি গো ছুঁলে ?

তোমারে চেয়েছি যদি নিথর নিমেষে,—
নিমেষে গেছে সে-চাওয়া কলরবে ভেসে ;—
তোমারে না চাহি মিছে   আলেয়ার পিছে পিছে
চ'লেছিনু ধাই জীবনের পথভুলে !
ভাঙিবে সে-ভুল প্রিয়, বুঝি মোরে ছুঁলে ?

এ-ছলে শিখালে ছলী বরিতে কি তাহে
রহে যা নিহিত দিঠি-আড়ালে লুকায়ে ?
নারে মন ছুঁতে যারে   রাজে যা তমসা-পারে
তারি অভিসার লাগি এ মরু-অকূলে
পাঠাতে চাহিলে মোরে—তাই বুঝি ছুঁলে ?

। । সা ণা | -া ধা পা -া | পা হ্মা ধপা হ্মপা | হ্মপা রা রা রা |

- - চা হি - নি ত - বু - ও - - - কে ন

II -া -া হ্মগা রগা | -া -া গমধা হ্মপা | মা গা মা রগা | সরা -া সা -া | II

- - দি লে - - হা তে তু - - - - - লে -

। । সা সা | -া রা রা -া | সরা গা রা গা | রগা -া মা পা |

- - খুঁ জি - নি ত - ব - ও - - - প্রি য়

-া -া পা হ্মপা | ধনা র্সরা নর্সা ণপা | হ্মা পা হ্মপা ধহ্মপা | মা গা মা রা | II II

- - কে ন - - ব ল ছুঁ - - - লে - - -

চাহি নি তবুও······ভুলে

। । পা পা | -া হ্মপা ধনা র্সরা | র্সা -া র্সা নর্সা | ধনা পধা ধর্সা -া |

- - চি র - চে - না সা - থে - - - নি তি

- - হে থা - নি - - তি চে য়ে - - - ছি যা

- - তো মা - রে - না চা - হি - - - মি ছে

- - না রে - ম - ন ছুঁ - তে - - - যা রে

নর্সা ধা ধা না | -া র্সা র্রা -া | র্সা না র্সনা র্সধা | ণা ধা পা -া |

- - এ কী - প রি - চ - য় - - রী তি -

- - পে য়ে - ও কি - পে - য়ে - - ছি তা -

- - আ লে - য়া র - পি - ছে - - পি ছে -

- - রা জে - যা ত - ম - সা - - পা রে -

। -া পা র্সা | -া র্সনা র্রর্সা নর্সা | ণা ধণা পধা সণা | ধণা ধা পা রা |

- - বি মু - খ তা - মা - ঝে - - ব ল -

- - সেঁ চে - ছি পী - যূ - ষো - - ভা বি -

- - চ' লে - ছি মু - ধা - ই - - জী ব -

- - তা রি - অ ভি - সা - র - - লা গি -

-ী -া রা গা [illegible] গা মা পা | পা হ্মপা ধা ধপা | পা -া -া -া |

- - কি নে শা রো - ভু - - ল এ - - -

- - যা রে - প্রা ণ - মৃ - - - লে - - -

- - নে র - প থ - ভু - - - লে - - -

- - এ ম - কু অ - কূ - - - লে - - -

-া -া হ্মপা ধনা | র্সর্রা র্সা নর্সা ধা | ধা ণা পধা র্সণা | ধণা ধা পা রা
- - তা - ই বু ঝি - সো - না - - র কা -
- বু ঝা - - তে তা - ম - রী - - চি কা -
- ভা ঙি - - তে সে - ভু - ল - - প্রি য় -
- পা ঠা - - তে চা - হি - লে - - মো রে -

-া -া রা গা | -া মা ধপা হ্মপা | হ্মা গা হ্মা রগা | সরা -া সা -া |
- - টি টি - দি য়া - ছুঁ - - - - - লে -
- - আ জি - কি গো - ছুঁ - - - - - লে -
- - বু ঝি - মো রে - ছুঁ - - - - - লে -
- - তা ই - বু ঝি - ছুঁ - - - - - লে -

চাহি নি তবুও

া া সা মা | -া মা মা -া | মা গা পা -া | -া পা পা -া |
- - চে য়ে - ছি য - ত - না - - কি ছু -
- - তো মা - রে চে - য়ে ছি - - য দি -
- - এ ছ - লে শে - খা - লে - - ছ লী -

-া -া পা পা | -া পা মপা ধণা | ধা পা হ্মা পা | ধা পমা মা -া |
- - ভে বে - ছি এ - তৃ - - - - ষা - -
- - নি থ - র নি - মে - - - - ষে - -
- - ব রি - তে কি - তা - - - - হে - -

-া মা মা গা | পা পা পা -া | পা -র্সা হ্মপা ধনা | র্সা না ধপা হ্মপা |
- মি টি - - বে গো - তা - হে - - বু ঝি -
- নি মে - - ষে গে - ছে - সে - - চাও য়া -
- র হে - - যা গো - প - নে - - দি ঠি -

পমা -া মা -া | -া -া ধা পহ্মা | পা মা গমা রা | গা রসা -া -া |
মি - লি - - - বে বা - দি - - - শা - -
ক - ল - - - র বে - ভে - - - সে - -
আ - ড়া - - - লে লু - কা - - - য়ে - -

মরু-মায়া

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

মাঝে মাঝে নিজের মনেও বিশ্বাস হয় না—

কেমন কোরে চিকিৎসার অভাবে বাবা মারা গেলেন; কেমন কোরে খুড়ো-মশায় আমার বিষয়টা শুদ্ধ তদারক করতে লাগলেন; কেমন কোরে পৈতৃক বাড়ীটার এক-কোণে দুফোঁটা চোখের জল জমা রেখে মায়ের হাত ধরে' পথে পা দিলুম—

সে সবের জন্যে না; সে সব অন্য গল্প। ভাবি—জগতে কি না-করতে পারতুম?

এত লেখা-পড়া, এত মেধা, এত জ্ঞান—সবই ব্যর্থ হোয়ে গেল—!

আজ আমি কি না—

পথ চল্‌তে চল্‌তে থমকে দাঁড়াই—মাঝে মাঝে নিজের মনেও বিশ্বাস হয় না। পরক্ষণেই আবার চলা সুরু করি।

সময়ে সময়ে মনের মধ্যে ভারী একটা আরাম অনুভব করি—

মায়ের শেষ-ইচ্ছা পালন করতে পেরেছিলুম।

কুল-প্লাবিনী ভাগীরথীর বুকের ওপর তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর তৃপ্তির সেই স্তিমিত আভাসটুকু, চোখের সামনে ভাসে নিত্য-নিয়ত।

সর্ব্বস্ব-রিক্ত পথযাত্রীর সেইটুকুই আজ একমাত্র সম্বল—

আর আছে—নিজের-রচা বইখানা; আর এই ডায়েরী!

গেল বছর—

চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখে সাহেবের সঙ্গে দেখা করি; আমার কথা-বার্ত্তা শুনে সাহেব সিগারেট অফার করলে—

চাকরী দিলে না।

তার ছোট আপিস; আমার মত 'ট্যালেন্‌টেড্‌' স্কলারের যোগ্য নয়…।

কম্‌প্লিমেন্‌টের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্থান করলুম।

তার পর আরও দু' এক যায়গায় এগিয়েছিলুম—দরওয়ানদের ডিপার্ট্‌মেণ্ট্‌ পার হতে পারি নি।

বছর ঘুরে যায়। আমি চলি।

পাশ দিয়ে দু'-ধারি পথিকের দল ক্ষিপ্র-বেগে চলে। কিন্তু ওদের আর আমার চলার মধ্যে কত প্রভেদ—বাড়ীতে পৌঁছলেই ওদের সারা অঙ্গের সমস্ত ক্লেদ নিবিড় স্নেহ-ধারায় স্নাত হয়ে ধুয়ে যাবে। আর আমার…?

সুবিপুল সান্ত্বনার মত বৃষ্টি নেমে আসে। দু'-ধারি লোক পথের পাশে আশ্রম খোঁজে—আমি চলি।

শহরের মলিন সন্ধ্যা।

চলিতে চলিতে সহসা পথ ভুলে দাঁড়াই—ক্ষণেকের জন্য ক্ষুধার প্রচণ্ড রাক্ষসটা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে—

রাস্তার ধারের চওড়া-বাড়ীখানার খোলা-জান্‌লা দিয়ে এস্রাজের পথ হারা সুর ভেসে আসে—কান্নার মত করুণ উদাস!

মনে হয়—ও যেন নিষ্ঠুর বিশ্বের দ্বারে অশ্রুমুখী প্রকৃতি সজল কাকুতি—

শুনিতে শুনিতে সারা অন্তর বিপুল স্নিগ্ধতায় আ… হয়ে ওঠে!

সহসা জান্‌লার কাছ থেকে একটা মোটা গলা শো… যায়—এই কোন্‌ হায়; ভাগ হিঁয়াসে…

সঙ্গে সঙ্গে কতকটা পানের-পিচ্‌ গায়ে এসে পড়ে।

মুহূর্ত্তে সচেতন হয়ে উঠি—

ধন্যবাদ,—চলিতে সুরু করি।

সুরের একটা ক্ষীণ রেশ পিছু পিছু আসে অনেক… অবধি,—পথের বাঁকে দমকা বাতাসটা না-আসা পর্য্যন্ত

রাস্তার আধ-খানায় ছায়া পড়েছে।

সারি সারি বই-এর দোকানের পাশ দিয়ে চলেছি, পূর্ব্বেকার অভ্যাস-মত আজও দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে দোকা… ভিতর গিয়ে পড়ছে—একটা দোকানে নতুন বই এর বিজ্ঞা… টাঙ্গানো—"Hunger" by Knut Hamsum…

সুদূর-চারী সতীর্থ পিডার সেন,—তোমায় নমস্কার সারা মর্ম্ম দিয়ে আজ তোমাকে উপলব্ধি করছি—

সমস্ত দিন পেটে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত যায় নি।

কলেজের ছুটি হয়েছে। দলে দলে ছেলেরা বাড়ী-মুখো চলেছে। য়ুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে একটি মেয়ে বুকের ওপর এক-গোছা বই নিয়ে বাগানের ধার দিয়ে চলেছে।—তার কিছু দূর দিয়ে চার পাঁচ জন ছেলে হাঁটার পাল্লা দিচ্ছে।—মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য প্রত্যেকের প্রাণপণ চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে।—মেয়েটীর কোন ভ্রূক্ষেপই নেই,—আয়ত ছুই চোখের কোণে উদার উপেক্ষা নিয়ে দোদুল ভঙ্গীতে ও চলেছে।—ওর মন কোথায় বাঁধা—কে জানে!

পাকস্থলীর সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির যে একটা অচ্ছেদ্য যোগ আছে, জীবনে আজ তা প্রথম অনুভব করলুম। পাত্‌লা, ঘোলাটে মেঘ চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে, অনবরত,—তার পিছনে অগ্রগামী পথিককে দেখতে পাচ্ছি তখন, যখন তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে ঠিকরে গিয়ে পড়ছি—

তিন দিন ধরে' পথের কল থেকে আঁজলা-ভরা গরম জল ছাড়া পেটে আর কিছুই যায় নি!

ওদিককার ফুটপাথের ওপর খোঁট্টা খাবার-ওলা খাবার-গুলো সাজিয়ে রাখছে—নানা রকম বিচিত্র!

দূর থেকে খাবারগুলো আমায় লুব্ধ করতে লাগল,—পকেটটা বৃথায় একবার নেড়ে চেড়ে দেখলুম।

খাবারগুলো আমায় আকর্ষণ করছে, দুর্নিবার;—যাই ওখানে, হয়ত হিন্দুস্থানীটা কিছু দিতেও পারে।

কিন্তু যদি না দেয়,—ক্ষুধার তাড়নায় বুভুক্ষু খাবার জিনিষ চুরী করেছে,—এ তো আর নতুন নয়,—বড় বড় গ্রন্থকার তাঁদের বই-এ অবধি লিখে গেছেন,—হ্যুগো থেকে খামস্যুন,—জিন ভলজিন থেকে ন্যুট পিডারসেন!

ফুটপাথ থেকে নেমে দু চার পা এগিয়েছি,—সহসা পিছন থেকে একটা হৈ হৈ রব উঠ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়লুম,—

মনে হল—মাথার শিরগুলো কে যেন একসঙ্গে টেনে ছিঁড়ছে,—

চোখের সাম্‌নে নিশ্চল অন্ধকার—!

অবচেতনার ঘোরে আধ-ফুটন্ত কত কি অদ্ভুত ছবি, জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল,—কিছুতেই আর তাদের স্মরণ করতে পারলুম না।

সমস্ত শরীরটা যেন লোহা দিয়ে তৈরী,—তেমনি ভারী আর নিঃসাড়,—চেষ্টা করেও এতটুকু নড়াতে পারলুম না।

জিভ থেকে আরম্ভ করে' পেটের তলা অবধি খাঁ খাঁ করছে,—শুকিয়ে একেবারে সাহারা হয়ে' গেছে!

মুখ নাড়লুম,—কথা বার হ'ল না। জিভ বার করে' পাশের লোকটাকে প্রাণপণে ইঙ্গিত করলুম,—লোকটা একটা বড় ঘটি করে' জল এনে দিলে।

মৃত্যুর প্রান্তর থেকে আবার জীবন্তের রাজ্যে ফিরে এলুম—

কিন্তু সে পথটুকু কি ভীষণ!

সকালের দিকে জ্বরটা একটু কম পড়ল,—মাথার যন্ত্রণাটাও।

ডাক্তারবাবু এসে বল্লেন—শুনছ, কাল থেকে এ ডিস্‌পেনসারির কর্ত্তারা তোমায় আর থাক্‌তে দিতে চাইছেন না; আমি কি করব বল—ওঁরা বলছেন—

মাথায় হাত ঠেকিয়ে বল্লুম—আপনাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ; কাল বোধ হয় উঠে দাঁড়াতে পারব।

এমন সময়ে কালকের সেই ভদ্রলোকটি এসে ডাক্তারকে শুধোলেন—কি হে, তোমার পেশেন্ট্‌ কেমন?

ডাক্তারবাবু উত্তর করলেন—মাচ্‌ বেটার! পরশু রাতটায় বড্ড ক্রাইসিস্‌ গেছল,—যাক, সে ভয় আর নেই!

জান্‌লুম—এই ভদ্রলোকেরই ড্যাম্‌লার-কারের প্রসাদে আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি;—সেই জন্যই উনি দয়া-পরবশ হ'য়ে আমার খোঁজ নিতে এসেছেন!

দু হাত তুলে নমস্কার করলুম!

উনি আমার বিছানার কাছে এসে মাথার শিয়র থেকে বইখানা তুলে নিয়ে বল্লেন—এ বইখানা তোমার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—নাম কার?

—আমারই নাম।

—তুমি বই লিখেছ!—আশ্চর্য্য হলেন বোধ হয়।

—কোথায় তোমার বাড়ী?

বল্লুম।—শুনে লোকটি যেন চম্‌কে উঠ্‌ল—আপন মনে কি যেন বল্লে,—বুঝলুম না।

তার পর ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলে' চলে গেল, আমার দিকে আর একবারও ফিরেও দেখ্‌লে না—!

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এসে দুচারপা হাঁটতেই বুকে হাঁপ ধরল। পথের পাশে একটা রকের ওপর বসে খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোকটি ব্যস্ত হয়ে এসে বল্লেন—এই যে তুমি এখানে,—আমি তোমায় খুঁজে হাল্লাক হচ্ছি। চল আমার সঙ্গে!

অবাক হয়ে গেলুম,—কোথায় যাব?—

—চল চল, আমার বাড়ীতে!

আমাকে আর কোন কথা বলবার অবকাশ দিলেন না, —আমার হাত ধরে' বিস্মিত জন সঙ্ঘের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হয়ে নিজের প্রকাণ্ড জুড়িটায় উঠে বসলেন।

তার পর সটান তাঁর বাড়ীতে,—ফটক-ওয়ালা চক-মেলান চৌতালা অট্টালিকা,—হলঘরের মেঝেয় মুখ দেখা যায়—এমনি পরিষ্কার!

ঘরের দরজা থেকে হাঁক দিলেন—ওগো, শীগ্‌গির নেমে এস…

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে চটুল-চরণ-ছন্দ বেজে উঠ্‌ল—

—এস এস ঘরের ভেতর, কাকে এনেছি দেখ।

মুখ ফিরিয়ে অপার বিস্ময়ে দেখলাম—রেখা!!

দীর্ঘ চার বছর পরে আজ আবার ওর সঙ্গে মুখোমুখী দেখা—

আজ ওর অন্তর-বাহিরের বিপুল পরিবর্ত্তন আমায় স্তব্ধ করে দিলে—

ক্ষিপ্র উদ্দাম স্রোতস্বিনী আজ ভরা-বর্ষার পূর্ণা নদীটির মত,—সুস্নিগ্ধ, অচঞ্চল!

ওর সারা অঙ্গ ঘিরে ভোগ-শেষের একটা মধুর পরিতৃপ্তি,—দুটি চোখের মৌন দৃষ্টি আজ দুরবগাহ!

একদিন যে ছিল আমার খেলার সামগ্রী,—প্রথম যৌবনের অবিচল অনুপ্রেরণা—আজ তারই কাছে আমি দাঁড়িয়েছি, সমস্ত বিগত জয়-গৌরবরিক্ত দীন ভিখারীর মত —নিঃসম্বল!

জীবনের অতীত দিনগুলোর স্মৃতি আজ আর ওর চোখের কোণে ধরা দিল না—

নীরব-আঁখির ভাষা ফুটে উঠ্‌ল—ছিঃ, তুমি এই হয়েছ!

মুখে বল্লে—শুনেছি সমস্তই, যতদিন না সেরে ওঠ, ততদিন এইখানেই থাক!

উত্তরে, ধন্যবাদের ভাষাটা এলোমেলো হয়ে গেল—!

দিন-চারেক হ'ল, রেখার বাড়ীতে আছি।

সুবোধ বাবুর কাজ করবার ক্ষমতা দেখে অবাক হ'য়ে যাই,—সারা দিন ধরে' কাজের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে এমন করে ডুবিয়ে রাখতে আমি আর কারুকে দেখিনি!

তাঁর বন্ধু অসিতবাবু একদিন এসে বল্লেন—ওহে চল, চল, একটু থিয়েটার দেখে আসা যাক!

উত্তরে বল্লেন—না ভাই, সন্ধ্যের সময় আমায় পড়াতে হবে…

—থাকগে পড়ানো,—সমস্ত দিন খাট্‌বার পর একটু আরাম চাই তো!

—এই আমার আরাম বন্ধু,—কাজ ছিল, তাই বেঁচে আছি!—বলে, আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন!

এমন-ধারা হাসি আমি কারুর মুখে দেখিনি,—যেমনি দুর্ব্বোধ, তেমনি করুণ!

সুবোধ-বাবুকে সময়ে সময়ে বুঝতে পারতুম না।

দিন দুই পরে—।

অসহ্য গরম,—রাত্রে উঠে পায়চারী করছি,—নিশুতি রাত।

সহসা মনে হল—বাইরে খোলা-ছাদে দাঁড়িয়ে কারা যেন কথা কইছে—ক্ষীণ, অকম্প্র কণ্ঠস্বর!

দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম,—হ্যাঁ, এ তো রেখারই গলা—

"…কি দরকার…এক হপ্তা হয়ে গেল, তবুও নড়তে চায় না… সেরে সুরে উঠেছে তো, এইবার যাক্ না… কোথাকার কে তার ঠিক নেই কাল খাওয়া-দাওয়ার পর বিদেয় করে' দিও…"

বুকের ভিতরটা সহসা মুচ্‌ড়ে উঠ্‌ল!

কি জানি—হয় ত সমস্ত জীবন-ব্যাপী প্রগাঢ় নৈরাশ্যের

ভরা নদীর

অন্তরালে একটা সুকোমল সান্ত্বনার লতা স্মৃতির বুকে জড়িয়ে ছিল,—আজ সেটা ছিঁড়ে পড়ল—

অন্তরের মধ্যে বুঝি তারই টন্‌টনানি!

দুঃখের মাঝে মানুষের যেটুকু আত্মপ্রসাদ, যেটুকু তৃপ্তি মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে,—তাকে যখন বাইরে টেনে এনে মানুষ উপহাস করে, সেই ক্ষীণ আশার কোমল স্থানটুকু দলিত মথিত করে চলে যায়—তার চেয়ে বড় ট্রাজেডি আর নেই!

মনে পড়ল—ওকে উদ্দেশ করেই একদিন লিখেছিলুম—

ব্যর্থ এ-পথে চলিতে চলিতে দীর্ণ রিক্ত বেশে
যদি বা কখনো আর্ত্ত-পথিক উঠি তব দ্বার-দেশে,
আমারে দিবে না আসি
একটুকু জল পিপাসা মিটাতে, তারই সাথে চেনা-হাসি?
বলিবে না তারে, শ্রান্ত পথিক—থাকিতে দাও গো ওকে,
মৌন আকুতি ভাসিবে না তব আনীল ও-দুটী চোখে?

মনে হল—মরু পথিকের লুব্ধ চোখের সম্মুখে মরীচিকার মায়ার মত, এ-কটা লাইন জীবনের চরম-তম বিড়ম্বনা!

পরের দিন সুবোধ বাবুকে বল্লুম—আপনার ঋণ জীবন-ভোর মাথায় নিয়ে বহন করে' বেড়াবো, এ জন্মে তার শোধ হবে না; কিন্তু আজই আমি যাব।

—আজই! না না; এখনো,—আর দু'চার দিন—

—আজ্ঞে না, আজই যাব।

আমার দৃঢ়তা দেখে উনি বোধ করি বিস্মিত হলেন,—বল্লেন—আচ্ছা, চলুন আমার বাইরের ঘরে।

নিজের টেবিলে বসে, নীচের দেরাজ থেকে খবরের-কাগজ-মোড়া একখানা খাতার মতো বের করে' আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—দেখুন তো, জিনিষটে আপনার কি না!

অতর্কিত বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেলুম—

এ কি! এ যে আমারই কবিতা-লেখা খাতা! প্রথম-যৌবনের বসন্ত-বাতাসে মনের বাগিচায় যে ফুলগুলি ফুটে উঠেছিল—এ যে তাদেরই চয়ন-করা, হারিয়ে-যাওয়া সঞ্চয়!

এ জিনিষ এখানে কেমন করে এলো?

সহসা, ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণ উদয়-রেখার মত একটা অভাবনীয় অনুভূতির আলোয় প্রহেলিকার অন্ধকার ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল!

এত দুঃখের মাঝেও ওঁর মুখ থেকে কথাটা শোনবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না—

জিগ্‌গেস্ করলুম—খাতাটা পেলেন কোথায়, জিগ্‌গেস করতে পারি কি?

—রেখার বাক্সে ছিল; চুরী করেছি!

ওঁর পানে চেয়ে দেখলুম—অনির্ব্বাণ ঈর্ষার দাহ শেষ হ'য়ে গিয়ে, অবসাদ-পূর্ণ নিবিড় নৈরাশ্য মুখের ওপর গভীর রেখা টেনে দিয়েছে—

মেঘ-মুক্ত সূর্য্যের মত, এক-নিমেষে ওঁর জীবনের সত্যকার রূপটী আমার চোখের সুমুখে উদ্ভাসিত হয়ে' উঠ্‌ল!

খানিক পরে বল্লেন—আজ এর মালিক পেয়েছি, তাই একে ফিরিয়ে দেব বলেই এর আত্ম-প্রকাশ! নইলে এ-জীবনে হয় ত এ-খাতার সমাধির অবসান হ'ত না!

খাতাখানা হাতে নিয়ে মনে হল—জগতে এর প্রয়োজন আজ একেবারেই শেষ হ'য়ে গেছে,—এ আজ একেবারেই মূল্যহীন।

বল্লুম—ওর কোন প্রয়োজন, বা কোন দামই আজ আমার কাছে নেই; এতদিন যদি ওখানা আপনার কাছে থাকতে পেরে থাকে, তাহলে বাকী দিনগুলোও—

খাতাখানা টেবিলের এক-ধারে রেখে উঠে দাঁড়ালুম।

—না, না; এ একজনের প্রাণের রক্ত-চোঁয়া সৃষ্টি—আমার কাছে এর মর্য্যাদা…

নমস্কার করে', আহ্বান-ভরা উন্মুক্ত পথে বেরিয়ে পড়লুম—সীমাহীন, উদাস!

ওঁর শেষ অশ্রুত কথাটা ঘরের মধ্যে গুম্‌রে মরে গেল।

মধুসূদনের স্মৃতি

শ্রীপ্রিয়নাথ কর

বড় নাতি আমার কার কাছ থেকে একটা রেডিও ক্রষ্টেল সেট চেয়ে এনে ক'দিন ধ'রে ভাইবোনেদের নিয়ে মহাধূম লাগিয়েচে। তা'র মা বাপ ঠাকুরমা পর্য্যন্ত তা'তে যোগ দিয়েচে। আমিও ক'দিন একটু আধটু শুনেচি ; কিন্তু কাণের ত এখন তত জোর নেই, আর শোনবার অভ্যাসও নেই। তা' ছাড়া, বিষয়গুলি বা গান তেমন আমার মনের মতন নয়, সেইজন্য ভালও লাগে নি। আজ ৮০র ওপারে দাঁড়িয়ে নূতন কথা শোন্‌বার মতন আমার মনের অবস্থা হয় কৈ? কিন্তু কাল যখন শুনলুম মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু-দিন, আর সেই উপলক্ষে তাঁ'র সম্বন্ধে রেডিওতে কিছু বলা হ'বে, তখন আমার অনেক দিনের স্মৃতি যেন ফুটেই উঠ্‌লো, অনেক কথাই মনে এসে পড়্‌লো। এর আগে রেডিও শুন্‌তে কোন আগ্রহ দেখাইনি বলেই সেদিন কেহ আর আমায় কিছু বল্লে না, কিন্তু আমি আর থাক্‌তে পাল্লুম না, নিজেই নাতিকে বল্লুম আমি শুন্‌বো।

শুন্‌তে বিশেষ কিছু পেলুন না, তা' রেডিও বা ক্রষ্টেলের দোষ নয়, দোষ আমার। কাণে যখন শোন্‌বার চেষ্টা কচ্ছিলুম, মনে তখন স্মৃতির পাথারে তুফান বইছিল। মন শুন্‌বে না স্মরণ কর্‌বে? তাই তা' কাণের সাহায্যে শোনবার চেয়ে আপনার পুরান স্মৃতিতে বিভোর হয়ে উঠ্‌লো। রেডিও ছেড়ে দিলুম।

মধুসূদনকে প্রথম আমি দেখি মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। আমি তখন ছোট। একদিন সকালবেলা রাজেন্দ্র লালা মিত্রের সঙ্গে তিনি আস্‌ছিলেন, আমি, জানি না কেন, তাড়াতাড়ি রামগোপালের কাছে গিয়ে বল্লুম,—"লালা একটা কালো লোক সঙ্গে ক'রে আস্‌চেন।" সে তাড়াতাড়িটা বোধ হয় প্রতিভার অজ্ঞাত আকর্ষণের বালকসুলভ সাড়া। সেই আমার প্রথম মধুসূদন-দর্শন। মধুসূদন আসিয়া সাহেবের মত ইংরাজী বল্‌তে লাগ্‌লেন। কি বল্লেন তা' আমার বিশেষ বোঝবার ক্ষমতা ছিল না, তবে মনে আছে সাহেবরা যেমন উচ্চারণ করে ঠিক সেই রকম করেই কথা কইলেন। লালা (আমরা তখন সকলেই তাঁ'কে লালাই বলতুম) বল্লেন যে রামগোপাল ঘোষের কাছে আর ইংরাজী বল্‌তে হবে না হে। তথাপি কথা যা হ'ল, ইংরাজীতেই হ'ল। সে দিন মধুসূদন character certificate নিতে গেছ্‌লেন।

তার পর মধুসূদনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ আমাকে তাঁ'র সহিত পরিচিত ক'রে দেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর Loudon ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যেতুম। মধুসূদন বল্‌তেন যে বাঙ্গলায় কাশীরাম দাসের মত কবি জন্মায় নি। এত রকমের ভাব এমন ক'রে সহজ কথায় আর কেউ প্রকাশ কত্তে পারে নি। একদিন বল্লেন "তেতলায়ও পড়চে, গাছতলায়ও পড়চে।" আর ভারতচন্দ্রকে তিনি বকুল ফুলের কবি বলতেন। তাঁর নিজের কবিতা, তিনি বল্‌তেন, যে বার আনা গ্রীক—"My writings are three-fourths Greek." রেভারেণ্ড গোপালচন্দ্র মিত্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা কত্তেন। আমি একদিন কথায় কথায় (Prof.) Tawney সাহেবের classical পাণ্ডিত্যের কথা বলেছিলুম। তিনি বল্লেন "গোপাল মিত্রের কাছে? Tawney কি পড়েচে? গোপাল মিত্র হচ্চে—The profoundest Greek Scholar in India."

একদিন তাঁ'র কাছে গিয়ে দেখি, একটি ক্ল্যারেট গ্ল্যাসে সুরা ঢালা আছে, আর তা'তে একটি মাছি পড়ে মরে গেছে। তিনি তারই উপর একটি কবিতা লিখেচেন। আমি যা'বা মাত্রই সেটি হাতে দিয়ে বল্লেন "পড়।" তাঁ'র বাঙ্গালা লেখা আমি ভাল পড়তে পাল্লুম না। এমন সময়ে একটি ফিরিঙ্গি সেখানে এলেন। মধুসূদন তাঁ'কে সেটা পড়তে দেওয়াতে আমি বল্লুন, উনি কি পড়বেন? তিনি বেশ একটু জোর দিয়েই বল্লেন যে, উনি একজন পণ্ডিত। আগন্তুক সত্যিই সুন্দর রূপে তা' পড়ে শোনালেন। আমি বল্লুম, এই কবিতার গোটা কতক কথা বাঁকা বাঁকা ঠেক্‌ছে। তিনি বল্লেন যে তাঁ'রা বাঙ্গাল, তাঁরা আমাদের চেয়ে শুদ্ধ বাঙ্গালা বলেন ও লেখেন। কবিতাটি কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি, আর তার খোঁজ আমি কখন করিনি।

এখানে প্রথিতযশা ব্যারিষ্টার ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কংগ্রেসের সভাপতি ডবলিউ, সি, ব্যানার্জ্জির সহিত দেখা হ'ত। মধুসূদন একদিন আমার তারিফ ক'রে তাঁ'কে বল্লেন, See how the boy speaks.

একবার একটি যুবককে সঙ্গে ক'রে নিয়ে মধুসূদনের নিকটে যাই। সে ইংরাজী রীতি-নীতিতে তত অভ্যস্ত ছিল না, কাজেই সে বিষয়ে কিছু গোলমাল হয়েছিল। আসবার সময় মধুসূদন আমায় আড়ালে ডেকে বল্লেন যে, একে কোন বড় সাহেবদের কাছে নিয়ে যেও না। তা'রা একে দেখেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর নমুনা স্বরূপ ধ'রে নেবে। These are the specimen of educated Bangalees. শিক্ষিত বাঙ্গালী যে সাহেবদের চেয়ে কোন অংশে কম, এ কথা মধুসূদনের পক্ষে বড় লজ্জার কথা ব'লে মনে হ'ত। তা' সে ইংরাজী আচার-ব্যবহারেই হ'ক, আর ইংরাজী লেখাপড়াতেই হ'ক।

বাঙ্গলা ভাষা তখন শিক্ষিত সমাজের ভাষা ছিল না। মধুসূদনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, একে শিক্ষিত সমাজের উপযুক্ত করিয়া গঠন করেন। "রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"—যা'তে এটা language of the cultured people হয়। যাঁ'রা ইংরাজীতে বক্তৃতা কত্তেন বা ইংরাজীতে লিখতেন, তাঁরা বাঙ্গলা লিখ্‌লেন না ব'লে বড় কষ্ট বোধ কত্তেন। প্রায়ই আপশোষ ক'রে বল্‌তেন যে, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ মুখুর্জ্জের মতন লোক বাঙ্গলা লিখলেন না। Hindoo Patriot পত্রিকার জন্মদাতা ও সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের ইংরাজী লেখার প্রশংসার কথা লইয়া মধুসূদন বল্‌তেন যে বাঙ্গালী যত ভালই ইংরাজী লিখুক তা' থাক্‌বে না। England does not want black Macaulay or black Shakespeare.

তিনি বল্‌তেন, If my remains remain in any country, it will be in my own country. "দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে"—তাঁরই লিখিত. আজ তা' তাঁ'র নিজের দেশে তাঁর কবরের উপর শোভা পাচ্চে।

মধুসূদনের কথা কয়বার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। যেমন ওজস্বিনী ভাষা, তেমনি ভাব প্রকাশের শক্তি, তেমনি জ্ঞান—তাঁ'র কাছে যখন যেতুম, মুগ্ধ হয়েই থাকতুম। ইচ্ছা ক'রে তিনি কথা কয়বার অবসর না দিলে কথা কয়বার সুযোগ ঘটে উঠতো না। কিন্তু সুধু কাশীরাম দাস সম্বন্ধে "তেতলা আর গাছতলা" ভিন্ন কখন তাঁ'র মুখে আর একটি বাঙ্গলা কথা শুনি নি।

এত কথা মনে পড়্‌লো, তাঁ'র চেহারা মনে পড়লো, স্বর, চাল চলন আরও কত কি—এততে কি আর রেডিও কাণে যায় ?

মেঘদূত

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

সম্প্রতি গত "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে," কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্"—কর্ত্তৃক কালিদাসের অক্ষয় মেঘদূত-কাব্য মনোহর চিত্রাবলীতে সুসজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সুকবি নরেন্দ্র দেব সুললিত বাংলা কবিতায় উহার অনুবাদ করিয়াছেন এবং কতিপয় সুনিপুণ শিল্পী, প্রতি কবিতার প্রতিপাদ্য বস্তুকে,—কবির কল্পিত ও সহৃদয় পাঠকের অনুভব মাত্র-বেদ্য পদার্থকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া লোক লোচনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। আর অন্যতম একজন শিল্পী বিরহী যক্ষ-কথিত "মেঘদূতের পথরেখা" অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থশেষে, গ্রন্থকর্ত্তা একটি হৃদয়-স্পর্শী "ইঙ্গিত" সংযুক্ত করিয়া দিয়া, গ্রন্থগত যত কিছু অবশ্য-জ্ঞেয় অথচ দুরূহ বিষয়, বস্তু, স্থান বা পারিভাষিক শব্দ, তাহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে, কালিদাসের মূল মেঘদূতখানির কবিতাগুলি দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধানো,—সমস্তই উত্তম ; ছাপা এবং কাগজকে সর্ব্বোত্তমও বলা যাইতে পারে। এক কথায়,—এমন ছাপা, এমন কাগজ ও এমন ছবির বহর লইয়া, বাংলাভাষায় ইতিপূর্ব্বে আর কোনো বই এমনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ত মনে পড়ে না ; অন্ততঃ আমি ত দেখি নাই। ছবি-ছাপা কাগজ-বাঁধানো ও সর্ব্বোপরি প্রচুর ও মনোহর চিত্রগুলির দিকে চাহিলে, গ্রন্থের নির্দ্ধারিত মূল্য চারিটি টাকা কিছুই নহে বলিয়া মনে হয়। সুললিত বাংলা কবিতায় নরেন্দ্র দেব যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাও অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। মূল্যে তাহার মাহাত্ম্য

নির্দ্ধারণ হয় না। ঐ কবিতানুবাদ বাদ দিয়া যদি শুধু ছবিগুলি, অথবা ছবি বাদ দিয়া যদি শুধু বাংলা কবিতাগুলি "মেঘদূত" বলিয়া প্রচারিত হইত, তবে তাহার পক্ষেও ঐ মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহার উপর আবার অনুবাদকর্ত্তার নাতিদীর্ঘ ও পরম উপাদেয় মুখবন্ধ আছে। ঐ এক মুখবন্ধে তিনি সত্যসত্যই গ্রন্থের মুখ খুলিয়া দিয়াছেন, বন্ধ করেন নাই।

কিছু দিন পূর্ব্বে, "চিত্রে চন্দ্রশেখর" যখন প্রকাশিত হয়, তারপর, অমর "ওমর খৈয়াম" যখন নরেন্দ্র দেবের মানসী প্রতিমা বক্ষে লইয়া বাংলার সারস্বত মন্দিরের দেউলে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন হইতেই ভাবিতেছিলাম, এইভাবে কালিদাসের অমরা কবিতার প্রতিবিম্বে আমার মাতৃভাষাকে কত দিনে সুসজ্জিত দেখিব? সারা জীবন, প্রতিদিন প্রতিক্ষণে, যে কবিতার বাঁশীর সুর জাগ্রত-স্বপ্ন সুষুপ্তির মধ্যেও শুনিতে পাই, যে কবিতার প্রসাদে,—সংসারের,—এই দুঃসহ জীবনের সকল দুঃখ, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া অপার আনন্দরসে নিশিদিন ডুবিয়া আছি, তাহা কি,—যেমনটি হইলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, তেমনভাবে আমার মাতৃভাষায় কোনো দিন দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিব না? বহুকাল পূর্ব্বে—যখন মেঘদূত বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য ছিল, উহা ক্লাশে পড়াইতাম, তখন হইতে এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি। শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথের কৃপায়, যৌবনের সেই কমনীয় এবং প্রৌঢ়ের সেই দুর্দ্দমনীয় অভিলাষ, আজ জীবনের এই সায়াহ্নে পূর্ণ হইল দেখিয়া যে কি আনন্দ হইতেছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করার যোগ্যতা আমার নাই।

চিত্র

মেঘদূতে পূর্ব্ব ও উত্তর লইয়া যথাক্রমে ৬৪ এবং ৫৫টি কবিতা আছে। দেশ-ভেদের পুস্তকানুসারে ইহার দু'একটি কমবেশীও দেখা যায়। এই— চিত্রে মেঘদূত—মানে—যদি কেহ বোঝেন যে, ঐ কবিতাগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়, যাহা চিত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেখাইবার মত, কেবল তৎতৎ বস্তুই, অর্থাৎ সেই সেই কবিতারই তাৎপর্য্য ছবিতে প্রকাশ করা হইয়াছে, তবে তিনি মস্ত ভুল করিবেন। ইহা আদৌ তাহা নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, বোম্বাই হইতে, ডাক্তার পারাঞ্জপের উপদেশানুসারে, ঠিক মনে নাই,—কালিদাসের শকুন্তলা, রঘুবংশ প্রভৃতির কয়েকটি করিয়া চিত্রণযোগ্য কবিতা লইয়া, তাহার তাৎপর্য্যার্থ বা ভাবের ছবি ও তন্নিম্নে ইংরাজি অনুবাদ সহ চারিখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা অতীব সংক্ষিপ্ত এবং ছবিগুলিও, 'ফটো' কাটিয়া ছাঁটিয়া আঠা দিয়া জুড়িয়া দেওয়া। তাহার বহুপূর্ব্বে, প্রায় ২২।২৩ বৎসর গত হইল, একজন ফরাসী পণ্ডিত, নাম বোধ হয় তাঁহার 'পুলে,' কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলে, তাঁহার হাতে ফরাসীভাষায় অনূদিত একখানি মেঘদূত দেখিয়াছিলাম। তাহাতে উক্ত মহোদয়ের স্বকর-চিত্রিত দু'একখানি ছবি ছিল। ঐ সময়েই ঠাকুরচাঁদ নামে একটি নবীন শিল্পী, কালিদাসের কবিতা ছবিতে ফলাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া, সবে দু'চারখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন, এমন সময়ে তাহার অকালমৃত্যু ঘটে। শিল্পীশ্রেষ্ঠ ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তিনি ছাত্র ও আমার পরম প্রিয় ছিলেন। তাঁহারই চিত্রিত "রামগিরিতে বিরহী যক্ষ," "নিশীথে অযোধ্যার অধিদেবতা ও মহারাজ কুশ," "পঞ্চবটীবন, গোদাবরীতট, রাম-সীতা ও লক্ষ্মণ"—প্রভৃতি কতিপয় মনোরম চিত্র, আমি "কালিদাস" গ্রন্থে দিয়াছিলাম। তাদৃশ চিত্রকরের অকালে তিরোধানে, শিল্পি-সমাজ একটি অবিদ্ধ রত্ন হারাইয়াছেন। ইহা ছাড়া, মেঘদূতের কবিতা লইয়া দু'-একখানি ছবি আঁকিয়া, এম-এ ক্লাশের দু'একজন ছাত্র-ছাত্রী আমাকে দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা, বোধ হয়, প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গভাষার চিরসেবক, সরলপ্রকৃতি, রায় সাহেব ৺হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা মেঘদূতের অনুবাদ করিয়াছেন। রায় সাহেবের বাসনা, তাহাতে ছবি দেন। কিন্তু তাহা হইয়াছিল কি না, জানি না। কালিদাসের কবিতা, তাহাতে আবার মেঘদূত, উহা যে সহৃদয় পাঠকই পাঠ করিবেন, তাঁহার হৃদয়ে, প্রতি শ্লোক-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে, স্বতই একখানি করিয়া ছবি ভাসিয়া উঠিবে। সেই পাঠক যদি আবার বিধাতার কৃপায় স্বয়ং একজন শিল্পী হন্,—তবে তিনি হৃদয়ের ঐ অরূপ ভাব রূপে আনিবার চেষ্টা যে করিবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তবে ঐ কার্য্য অতীব কঠিন।

কালিদাসের প্রায় প্রত্যেক কবিতাই এক-একখানি ছবি,—"ফ্রেমে" আঁটিয়া রাখিবার মত ছবি। সেই অরূপ ছবিকে সত্যই যদি স-রূপ করিয়া তোলা যায়, তবে যে তাহা কত উপাদেয় হয়, তাহা সহৃদয় রসিক সামাজিককে বুঝাইতে হইবে না। আলোচ্য "মেঘদূত" গ্রন্থে সেই প্রয়াস সুচারুরূপে সার্থক হইয়াছে—দেখিয়া বড়ই প্রীতি অনুভব করিতেছি। ইহার ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা কালিদাসের কবিতার শুধু অনুবাদমূলক চিত্র নহে; যে সময়ের যে কথা, যে ভাবে কবি বলিয়াছেন, প্রথমতঃ, আলেখ্য-গাত্র সেই সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিত্রে সমুল্লসিত করা হইয়াছে; পরে, কবির সেই কথা,—যাহা ব্যঞ্জনার দর্পণে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, তাহা তৎতদ্ ভাবের অভিব্যক্তির দ্বারা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। সুকবি নরেন্দ্র দেবের মনোহর কবিতানুবাদ বাদ দিয়া, কোন রসিক পাঠক যদি ঐ ছবিগুলিমাত্র পর্য্যায়ক্রমে ও নিবিষ্ট-দৃষ্টিতে দেখিয়া যান্, তাহা হইলেই তিনি মেঘদূতের তৎতৎ শ্লোকের অরূপ ভাবের স-রূপ মূর্ত্তি,—ফুটন্ত ছবি—দেখিতে পাইবেন। সেই জন্যই প্রথমে ইহাকে "চিত্রে মেঘদূত" বলিয়াছি। বঙ্গ-সাহিত্যে এতবড় উদ্যম ইহার পূর্ব্বে আর হয় নাই। তবে, প্রথম পথিকের পায় পায় যে বিপদ, তাহার হাত হইতে এই চিত্রকরগণও অব্যাহতি পান নাই। অবশ্য বারান্তরের মুদ্রণে সে বিপদ কাটিয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ,—পূর্ব্বমেঘের অষ্টম ও উত্তরমেঘের চুয়াল্লিশ কবিতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অষ্টমে "উচ্ছ্বসীতালকান্তা" ও চুয়াল্লিশে "ত্বামালিখ্য প্রণয়-কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্"—ইহাদের প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বমেঘের চতুর্থ শ্লোকের চিত্রে যক্ষের এক হাতে বালা নাই ও মুখে দাড়ি নাই। ইহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু উত্তরমেঘের শেষে—অর্থাৎ চুয়ান্ন শ্লোকের চিত্রে যক্ষের মুখ ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুতে পরিপূর্ণ ও দুইটি হস্তই বলয় শোভিত। ইহাও প্রকৃত-বিরোধী হইয়াছে। এবম্ভূত স্থলে, বিভিন্ন

শিল্পীর একই বিষয়ে তুল্যাভিনিবেশ অনেকটা অসম্ভব এবং সেই কারণেই উপক্রম-উপসংহারে এই ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। এক হাতের চিত্র হইলে, বোধ হয়, এতটা হইত না। তবে এতবড় একটা ব্যাপারে ওটুকু দর্ত্তব্যই নহে।

বিরহিণী সরল জনপদ-বধূরা কেমন করিয়া আকাশে নবমেঘ সন্দর্শন করে ও তাহাদের প্রবাসী প্রিয়তমের প্রত্যাগমন-সম্ভাবনা-স্মরণে তাহাদের পাণ্ডুর গণ্ডস্থল কেমন আরক্ত হইয়া উঠে, তাহা, সেই কবিতার ছবিখানি দেখিলেই দর্শক বুঝিতে পারিবেন। এতদিন কালিদাসের কবিতায় যে গানের স্বরলিপি ছিল, আজ ছবিতে তাহা তান-লয়-সহযোগে সুকণ্ঠে গীত হইতেছে। বইখানির আদ্যন্ত এইরূপ। এই চিত্রাবলী দর্শনে মনে হইতেছে, হয় ত সেদিনের আর বেশী দেরি নাই, যখন কালিদাসের অন্যান্য পুস্তকগুলির চিত্রণযোগ্য কবিতানিচয়ের কেবল যথাক্রমে ছবিই দেখিতে পাইব এবং তদ্দ্বারাই কবির কবিতার ভাব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিব। ঐ চিত্রাবলীর শেষে, হয়ত, মূল কবিতা যথাসম্ভবভাবে মুদ্রিত থাকিবে।

এই চিত্রাবলী দেখিবার কালে নিবিষ্ট পাঠকের হৃদয়ে, ক্রমে, ধীরে ধীরে, সেই সেই সময়ের যত কিছু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, তাহা প্রথমে উদিত হয়, পরে সেই বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বিরহ-কৃশা যক্ষপ্রিয়া কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে, কেমন করিয়া তাহার বিরহ-দীর্ঘ দিনগুলি কাটিতেছে, তাহা চিত্রে উল্লসিত দেখিয়া অতুল আনন্দ জন্মে। যাঁহারা পাঞ্জাব মেলে রওনা হইবেন, হাতে সময় অতি কম, অথচ তাহার মধ্যেই এই জাতীয় পুস্তক পড়িতে চান, তাঁহারা যেন ইহা স্পর্শ না করেন। "তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।" যাঁহারা কালিদাসকে ভালোবাসেন, কালিদাসের ভারতবর্ষের অধিবাসী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন, তাঁহারা একবার পড়ুন, দেখুন, তৃপ্তি পাইবেন। নতুবা—খণ্ডিত-হৃদয়ে ও খণ্ডিত-নয়নে এই ছবি দেখিলে রসগ্রহ হইবে না। "খণ্ডিতা"-দৃষ্টি ছাড়িয়া অখণ্ডিতা দৃষ্টির সহিত যিনি দেখিবেন, তাঁহার প্রীতিও 'অখণ্ডিতাই" হইবে। বঙ্গ সাহিত্যের এই অপূর্ব্ব সম্পদ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক, এই কামনা করি।

কবিতানুবাদ

বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া যাঁহারা নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং বাঙ্গলা ভাষাকেও সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই মেঘদূত সম্বন্ধে, পাকে-প্রকারে কিছু-না-কিছু বলিয়াছেনই। আবার অনেকে,-- কেহ বা কবিতায়, কেহ বা প্রবন্ধে, মেঘদূতের সৌন্দর্য্য মাতৃভাষায় ফুটাইতে যত্ন করিয়াছেন। যিনি রসগ্রহপূর্ব্বক পড়িয়াছেন, তিনি মেঘদূত সম্বন্ধে, ও যিনি জ্যোৎস্নায় বিগলিত আগ্রার তাজমহল দেখিয়াছেন, তিনি তাজ-সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিবার অভিলাষ চাপিতে পারিয়াছেন, এমন সংযমী লেখক বা ভাবুক অতি কম। মেঘদূতে যাহা কবিতায়, তাজে তাহাই মর্ম্মর-প্রস্তরে চিত্রিত। দুই-ই অতুল। তাহার মধ্যে আবার বহুকাল পূর্ব্বে, "প্রবাসী যক্ষের আপন বাসস্থলী বর্ণন" শীর্ষক কবিতায়—বাংলারই একজন প্রেমিক কবি যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, বোধ হয় সরল বাংলা কবিতায় মেঘদূতের অনুবাদের প্রথম রেখাপাত তাহাই। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে,—ঐ বাংলা কবিতা সংস্কৃতানভিজ্ঞ অনেক বাঙ্গালীর মুখেই শোনা যাইত। যক্ষালয়ের সেই মরকত-শিলা-সোপানবদ্ধ বাপীর তীরবর্ত্তী ক্রীড়াপর্ব্বতের সানুদেশে সোণার "বাস-যষ্টিতে" স্ফটিকনির্ম্মিত যে "ফলক" বা দাঁড় ছিল, তাহাতে সন্ধ্যাকালে যখন নীলকণ্ঠ আসিয়া বসিত, ও যক্ষ-প্রিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া করতালিকাদ্বারা তাহাকে নাচাইত, ময়ুর নাচিত,—তাহার ছবি ঐ বাংলা কবিতায় এমনই ফুটিয়াছিল, যে আজও তাহা অনেক মাতৃভাষার সেবক মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া শান্তি পান। সেই—

"শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি—
আনন্দেতে উচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া
রুণু রুণু বাজে তার বালা।
স্মরিলে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা ॥"

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিগুলি এখনও মনে পড়ে। বহুদিন তেমনটি আর হয় নাই। তার পর আরও দু'চারজনে কবিতায় যক্ষের বিরহ-সঙ্গীত গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শেষে জগদ্বরেণ্য, কবি-কেশরী রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রকৃতি-সিদ্ধ অক্ষয়-তুলিকায় বিরহাতুর যক্ষ-হৃদয়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আকল্পস্থায়ী। তাহার তুলনা নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে, সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক, বিদ্যোদয়-সম্পাদক, ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় সরল বাংলা কবিতায় মেঘদূতের অনুবাদ করেন। তাহাও সুখ-পাঠ্য হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, পরবর্ত্তীকালে গদ্যে মেঘদূতের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণমূলক যে সমুদয় পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এই বিশেষজ্ঞদের প্রধানাংশে "কালিদাস ব্যাখ্যা" নামে মেঘদূতের এক অতি উপাদেয় কবিত্ব-বিশ্লেষণাত্মিকা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উহার পূর্ব্বে বা পরে এখন পর্য্যন্ত, অমন "অনুপম" এবং রস-ভাব-মধুর এবং অমন ভাষার ঝঙ্কার বাংলা গদ্যে আর বাহির হয় নাই। বঙ্গভাষার সে এক পরম সম্পদ্ ছিল। কিন্তু এক বিষম চক্রান্তের ফলে, গ্রন্থকর্ত্তাকে বাধ্য হইয়া ঐ মনোহর এবং সকলজনপ্রিয় ব্যাখ্যা-পুস্তিকার প্রচার প্রতিসংহৃত করিতে হয়। বঙ্গের তথা বাংলা ভাষার পক্ষে সে এক বিষম দুর্দ্দিন গিয়াছে। প্রধানতঃ, মেঘদূত সম্বন্ধে এইটুকুই জানি। সম্প্রতি বঙ্গভাষার নবোদিত অরুণ, সুকবি— নরেন্দ্র দেব কৃত এই কবিতায় মেঘদূত পড়িলাম। একটু সামান্য সংস্কৃত জানি, সুতরাং হৃদয়ের অপরিহেয় পক্ষপাতিতা নিবন্ধন ইহা এত ভালো লাগিবারই কথা— ভাবিয়া পুরন্ধ্রীদিগকেও ইহা পড়িতে দিয়াছিলাম। তাহারা সকলেই এই কবিতায় মেঘদূত পড়িয়া অবাক্ হইয়াছেন। আমিও দুইবার সমগ্র কবিতাগুলি পড়িয়াছি। আমার ধ্রুব ধারণা, যাঁহারা সংস্কৃত মেঘদূত দেখেন নাই, বা সংস্কৃতের স—ও জানেন না, তাঁহারাও, নরেন্দ্র দেবের এই কবিতা পাঠে কালিদাসের কবিত্ব-সৌন্দর্য্য উপলব্ধ করিয়া প্রীতি অনুভব করিবেন।

বহুপূর্ব্বে, কবিবর নবীনচন্দ্র দাস, বাংলা কবিতায় রঘুবংশের এক অতি মনোরম অনুবাদ করিয়াছিলেন। রঘুবংশ সম্বন্ধে তেমনটি আর কেহই করিতে পারেন নাই। আর আজ এই মেঘদূতের কবিতার অনুবাদ পড়িলাম, এমনটিও ইতিপূর্ব্বে কেহ করিতে পারেন নাই। অনুবাদক কবির কবিতাগুলি এতই মধুর ও প্রকৃত কাব্যের অনুগত হইয়াছে যে, যাঁহারা মূল মেঘদূত পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই সত্য সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই বাংলা কবিতাগুলির একটা প্রধান গুণ এই যে, মূল মেঘদূত ভাষান্তরে অপ্রতিপাদ্য ও অননুকরণীয় এবং এক গম্ভীর অথচ সুমধুর বেদনার ভাষায় সমলঙ্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে উপনিবদ্ধ হইলেও, এই বাংলা কবিতা কোনো এক নির্দ্দিষ্ট ছন্দে গ্রথিত হয় নাই। ইহাতে, হৃদয়ে যখন যে রাগরাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে, কবিতা পড়িতে পড়িতে পাঠকের মর্ম্মমধ্যে যে সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে, সেই সেই কবিতার ছন্দও ঠিক তেমনই সুরের অনুকূল করিয়া গ্রথিত হইয়াছে।

যখন উন্মত্ত ও চতুর যক্ষ মেঘকে দৌত্যে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রলোভিত করিতেছে, তখনকার—

"ফুলবিলাসী সুন্দরীদের
ফুলচয়নে ক্লান্ত কায়া
তাদের মুখে বিছিও তোমার—
স্নিগ্ধ-শীতল সজল ছায়া ;
মুছতে গালের স্বেদের কণা
মলিন যাদের কাণের দুল,
তাদের সনে ক্ষণেক যেন
পরিচয়ের হয় না ভুল। (পূর্ব্বমেঘ, ২৭)

কবিতাটি যখন পড়ি, তখন, এই বঙ্গীয় কবির শব্দ-বিন্যাস-কৌশলে এবং ছন্দের সৌষ্ঠবে, হৃদয়দর্পণে বসন্তরাগের পত্নী গুর্জ্জরীর ছবি ভাসিয়া উঠে। সেই—

"মধ্যে নিষণ্ণা মৃদু পল্লবানাং
শ্যাম-দ্যুতি র্মন্মথ-ভাব-যুক্তা।
বিচিত্র পুষ্পাঙ্কিত-চারু-তল্পা
প্রেমাভিলাষা খলু গুর্জ্জরীয়ম্ ॥"—

কামিনীর মদালসা মূর্ত্তি মনে জাগিতে থাকে। আবার যখন,—

"হয়ত হেরিবে কৃশতনু প্রিয়া
বিরহ-শয়নে লীন,
পূবের আকাশে একপাশে যেন
চাঁদের কলাটি ক্ষীণ !
যে নিশি নিমিষে নিঃশেষ হ'তো
মিলন-স্বপন-তলে,
বিরহ-তপ্ত দীর্ঘ সে রাতি
যাপিতেছে আঁখি জলে !" (উত্তরমেঘ ২৮)

কবিতার বিরহ-শয়ন পতিতা কৃশাঙ্গী যক্ষ-প্রিয়ার ম্লান মূর্ত্তি দর্শন করি, তখন, কবির শব্দকৌশলে এবং ছন্দের মাহাত্ম্যে, ঐ বসন্তরাগেরই বিরহিণী পত্নী মালবীর মূর্ত্তি নয়নে প্রতিবিম্বিত হয়। সেই—

"বিয়োগ-দুঃখেন বিধূসরাঙ্গী,
চিরং প্রিয়-ধ্যান-বিনিদ্র-নেত্রা।
কান্তৈকচিত্তা স্ফুট-গৌর-কান্তিঃ
সা মালবী সংকথিতা কবীন্দ্রৈঃ ॥"

ছবি হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। এ অংশে সুকবি নরেন্দ্র দেবের লেখনী সাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছে। ভাষা এবং ছন্দের দিক্ দিয়া দেখিলে, উহা যে সেই সেই সংস্কৃত কবিতার তাৎপর্য্য-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যথাযথ চিত্রের সহিত এতাদৃশী কবিতার আবির্ভাব বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে মণি-কাঞ্চন সংযোগ বলিতে হইবে। চিত্রকর, অনুবাদক নরেন্দ্র দেব এবং প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—ইঁহারা সকলেই অকৃপণভাবে স্ব স্ব সামর্থ্য ব্যয়ে যে অপূর্ব্ব বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা বঙ্গভারতীর কণ্ঠহারে অন্যতম উজ্জ্বল মণির ন্যায় শোভা পাইবে, এবং বাংলার ঘরে ঘরে তৃপ্তি বর্ষণ করিবে। কবি নরেন্দ্র দেবের সুললিত হৃদয় এবং তীক্ষ্নদর্শন কালিদাসের রঘু, শকুন্তলার দিকে একটু প্রণিহিত হইলে পরম আনন্দের দিন আসিবে।

আনন্দমোহন বসু

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

একটি পুরাতন বিস্মৃত কাহিনী মনে পড়িতেছে। প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা—আমরা সিটি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া কয়েকজন মিলিয়া ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন নামে একটি ছাত্রসভা স্থাপন করিলাম। সপ্তাহে একদিন—শনিবার শনিবার সভার অধিবেশন হইত। এক একজন অধ্যাপক এক এক অধিবেশনে সভাপতি হইতেন। একজন করিয়া ছাত্র একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া সভায় পাঠ করিতেন, এবং তাহা লইয়া আলোচনা হইত। সভাটি অনেকটা ডিবেটিং সোসাইটির মত। আমার মনে আছে, আমার পালা যেদিন আসিল সেদিন আমি 'ইণ্ডিয়া পাষ্ট এণ্ড প্রেজেন্ট' নামে একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। অন্যান্য ছাত্রগণের কে কি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন তাহা এখন

আর ঠিক মনে পড়ে না। তবে একজন যে 'ফিমেল ইম্যান-সিপেসন' নামক একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, তাহা বেশ মনে আছে। আমাদের পূর্ব্বে সিটি কলেজে এরূপ কোন ডিবেটিং সোসাইটি ছিল কি না, তাহা মনে পড়ে না। আমরা কিন্তু বেশ নিয়মিত ভাবে প্রতি শনিবার সভা করিতাম। এইরূপে এক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বার্ষিক অধিবেশনের সময় আসিল। ছাত্রদের উৎসাহে অধ্যাপক মহাশয়গণও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সানন্দে সভা-সজ্জার আদেশ দিলেন।

ত্রিতলের সুবৃহৎ হলটি কাঠের বেড়া দিয়া কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত হইয়াছিল, প্রত্যেক কক্ষে ক্লাস হইত। বেড়া খুলিয়া বেঞ্চি চেয়ার সাজাইয়া সভার স্থান করা হইল, এবং পত্র-পুষ্প-লতায় সমগ্র হলটি সুসজ্জিত হইল। আমরা যাইয়া স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে সভাপতি হইবার জন্য এবং স্বর্গীয় কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বক্তা হইবার জন্য অনুরোধ করিতেই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া সভার বিজ্ঞাপন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সভাস্থল লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সিটি কলেজের ছাত্রগণ ত ছিলেনই, অন্যান্য কলেজেরও সহস্র সহস্র ছাত্র সভায় সমাগত হইলেন। খুব একটা সমারোহের ব্যাপার হইয়া উঠিল। তৎকালে এত বড় ছাত্রসভা আর কোথাও কখনও হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। সভার কার্য্যারম্ভ হইলে সেক্রেটারী মহাশয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। কোন্ দিন কোন্ ছাত্র কোন্ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, রিপোর্টে তাহার উল্লেখ ছিল। সভাপতি মহাশয় যখন তাহার অভিভাষণ প্রদান করেন, তখন কতকগুলি প্রবন্ধের নামোল্লেখ করিয়া বলেন, বিষয়গুলি সুনির্ব্বাচিত ও ছাত্র সমাজের আলোচনার যোগ্য। আর কতকগুলির সম্বন্ধে তিনি বলেন, এইগুলি ছাত্রগণের আলোচ্য বিষয় নহে। সভাপতি এবং বক্তা উভয় মহোদয়ই দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এক কথায়, সভা বিলক্ষণ সফল হইয়াছিল।

ছাত্রসভায় এরূপ জনসমারোহের কারণ—সভাপতি ও বক্তা মহাশয়দ্বয়ের ছাত্রপ্রিয়তা। একে আনন্দমোহন সভাপতি, তাহার উপর কালিচরণ বক্তা—এই দুইজন কলিকাতার ছাত্রসমাজকে আকর্ষণের পক্ষে প্রচুর হইয়াছিল। এই ঘটনায় বেশ বুঝা যায়, তাঁহারা উভয়েই ছাত্রসমাজকে কত ভালবাসিতেন, এবং ছাত্রসমাজও তাঁহাদিগকে কত শ্রদ্ধা করিতেন। ছাত্র-নেতা ও ছাত্র-সমাজের মধ্যে এরূপ মধুর প্রীতির সম্বন্ধে আজকাল আর দেখিতে পাই না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আজ সেই আনন্দমোহনের জীবনী আলোচনার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। আজ যদি আমার লেখনী-মুখে একটু আধটু অবান্তর উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, আশা করি, তাহা নিতান্ত অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

বঙ্গদেশের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চল বহু সুসন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সেই পূর্ব্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর (বঙ্গাব্দ ১২৫৪, ৮ই আশ্বিন) আনন্দমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পদ্মলোচন বসু বর্দ্ধিষ্ণু সম্পন্ন গৃহস্থ—কিছু ভূসম্পত্তিও তাঁহার ছিল। তিনি মৈমনসিংহ জেলায় আদালতের কর্ম্মচারী ছিলেন, বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। আনন্দমোহন তখন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক মাত্র। আনন্দমোহনের জননী উমাকিশোরী দেবী বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি পিতৃহীন সন্তানগণের শিক্ষাবিধান ও চরিত্র গঠনে অবহিতা ছিলেন। বিষয়বুদ্ধিও তাঁহার অল্প ছিল না। পতি-পরিত্যক্ত সম্পত্তির সুপরিচালন করিয়া তিনি পুত্রগণের কলিকাতার শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন, দেশেও ক্রিয়া-কর্ম্ম বজায় রাখিয়া সংসারধর্ম্ম করিতেন।

মৈমনসিংহ নগরে চাকুরী উপলক্ষে বাস করিবার জন্য পদ্মলোচন সেখানে একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আনন্দমোহনরা তিন ভাই ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম হর-মোহন, মধ্যম আনন্দমোহন, কনিষ্ঠ মোহিনীমোহন। তিন ভ্রাতাই অতি শৈশবে বাসগ্রাম জয়সিদ্ধি হইতে মৈমনসিংহে আসিয়া ঐ বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। আনন্দ-মোহন মৈমনসিংহ নগরের হার্ডিং ভার্ণাকুলার স্কুল হইতে মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চারি টাকা করিয়া জলপানি পান। তথা হইতে তিনি মৈমনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। এইখানে একটি তর্কসভা ছিল। এই সভাতেই

আনন্দমোহনের বক্তৃতায় হাতে-খড়ি হয়, যাহার প্রভাবে পর-জীবনে তিনি অসাধারণ বাগ্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। কিন্তু পরীক্ষার ছয়মাস পূর্ব্বে সহসা তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পড়াশুনায় বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। তথাপি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে তিনি নবম স্থান গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। অতঃপর আনন্দমোহন এফ-এ, বি-এ ও এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আনন্দমোহন গণিতে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এম-এ পাশ করিবার পরই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে গণিতের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হয়। তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর মাত্র। ইহার পর বৎসর অধ্যাপকতা করিতে করিতে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন। কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়দ্বয় এই পরীক্ষায় তাঁহার প্রতিযোগী ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কালিচরণ পরীক্ষাদানে বিরত হন। অবশিষ্ট দুইজনের মধ্যে আনন্দমোহন বৃত্তি লাভ করেন। মৈমনসিংহ জেলা স্কুলে যখন আনন্দমোহন অধ্যয়ন করিতেন, তখন ঐ বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার ছিলেন ভগবানচন্দ্র বসু। ইনি বিশ্ব-বরেণ্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা। পরে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ইনি যখন ফরিদপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তখন, এম-এ পরীক্ষার কিছু দিন পূর্ব্বে, আনন্দমোহন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ভগবানচন্দ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন। স্কুলে অধ্যয়ন কালেই আনন্দমোহন হেড মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় প্রায়ই যোগদান করিতেন। কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসিবার পর তিনি ব্রাহ্মসমাজের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আদি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, আনন্দমোহন তখন তাঁহার সহিত যোগদান করেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশহাজার টাকা পুরস্কার লাভ করিয়া আনন্দমোহন বিলাত যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিলাত যাত্রার পথে অনেক বাধাবিঘ্ন ছিল। সে সমস্ত অতি কষ্টে অতিক্রম করিয়া আনন্দমোহন, কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার বন্ধুগণের সহিত বিলাত গমন করিলেন। কয়েক মাস পরে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেন। কিন্তু সেখানে মিস সোফিয়া ডবসন কলেট নাম্নী একটি ইংরেজ মহিলার যত্নে আনন্দমোহনের প্রবাস-বাস-ক্লেশ অনেকটা দূরীভূত হইয়াছিল। বিলাতে কেম্ব্রিজে ক্রাইষ্ট কলেজে তিনি গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। যথাসময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি নবম স্থান অধিকার করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম কেম্ব্রিজের গণিতের র‍্যাঙ্গলার হন। কেম্ব্রিজে অবস্থান কালে অধ্যাপক হেনরী ফসেটের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। গণিতের ট্রিপোজের জন্য প্রস্তুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বসু আইন পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইতেছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রেল তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসর ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন।

পাঁচ বৎসর প্রবাস-যাপন করিবার পর মিঃ বসু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা নবেম্বর পুনরায় তাঁহার জন্মভূমিতে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার খ্যাতি এ দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় আরম্ভ করিতে আনন্দমোহন অযথা বিলম্ব করেন নাই। এমন কি, কলিকাতায় পদার্পণের কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি একটি মোকদ্দমা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তিনি কোন দিনই অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির দাবী তাঁহার উপর বড় অল্প ছিল না। এই সকল কার্য্যের জন্য যথেষ্ট অবসর পাইবেন ভাবিয়াই তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেশের মঙ্গলের জন্য অনেক রকম কাজ করিবার তাঁহার কল্পনা ছিল। আইন ব্যবসায় এবং দেশের কাজ উভয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি মফস্বলের আদালতে প্র্যাকটিস করিতে গমন করেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। আইন ব্যবসায় পরিচালন উপলক্ষেও জনহিতকর কার্য্যের সুযোগের অভাব ঘটিত না। অত্যাচারিত ব্যক্তিগণকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করা, নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণকে আইনের কবল হইতে উদ্ধার করা অল্প মহত্ত্বের কার্য্য নহে। আনন্দমোহনকে এরূপ অনেক মামলা পরিচালন করিতে হইয়াছিল,

এবং সেই সকল মোকদ্দমায় আসামীদিগকে তিনি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি যথনই যেখানে যাইতেন, স্থানীয় লোকদিগের ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ, এবং তাহার কোনরূপ উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর কি না, তাহার সন্ধান লইতে তিনি বিরত থাকিতেন না। এবং এই সকল বিষয়ে তাঁহার কোন কাজ করিবার থাকিলে তাহাও তিনি সম্পাদন করিতেন। এইরূপে তাঁহার চেষ্টায় অনেক স্থলে লোক-শিক্ষার্থ বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশের কাজে আনন্দমোহন কয়েকজন কর্ম্মীকে সহযোগী রূপে পাইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার চিরসঙ্গী ছিলেন। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতি-ক্ষেত্রে চিরদিন আনন্দমোহনের সঙ্গে কাজ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার কুচবিহারের নাবালক মহারাজের সহিত বিবাহিতা হইবার পর ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে; বিবাহের বিরোধী ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেন। পরলোকগত শিবচন্দ্র দেব, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি নব সমাজ গঠনে অগ্রণী ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে সুরেন্দ্রনাথের সহিত আনন্দমোহনের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ যথন সিবিল সার্ব্বিস হইতে বিচ্যুত হন, তখন তাঁহার প্রতি যাহাতে সুবিচার হয় সে পক্ষে আনন্দমোহন অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর উভয়ে একত্র প্রাণ ঢালিয়া দেশমাতৃকার সেবায় প্রবৃত্ত হন। সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা, ছাত্র-সভা গঠন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপারে উভয়ে একত্র কার্য্য করিয়াছিলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে উমেশচন্দ্র দত্ত, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্ম্মবীরগণকে পাইয়া আনন্দমোহন পরমোৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আনন্দমোহনের কার্য্যক্ষেত্র কেবল এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার সমসাময়িক প্রত্যেক সাধারণ কার্য্যে তাঁহার কোন না কোন রূপ যোগ ছিল। দেশীয় সংবাদপত্র-দমন আইন, শিক্ষা কমিশন, ইলবার্ট বিল ঘটিত আন্দোলন বা সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক আন্দোলন—সকল ক্ষেত্রেই তিনি অন্যতম প্রধান কর্ম্মীরূপে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বাঙ্গলার তদানীন্তন ছোট লাট আনন্দমোহনকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে মনোনীত করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে চাহেন। অনেক চিন্তার পর আনন্দমোহন বিবেচনা করিলেন, এই পদ গ্রহণ করিলে তিনি দেশসেবার অধিকতর সুযোগ পাইবেন। এই জন্য তিনি এই পদ গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি দুইবার শিক্ষিত জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মদ্যপান তৎকালের শিক্ষিত সমাজে উন্নতির একটা প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অনেক আন্দোলন করিয়াছিলেন। আনন্দমোহনও মদ্যপান প্রথার বিরোধী ছিলেন, এবং পানদোষ নিবারণ কল্পে অনেক কিছুই করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি 'মেট্রোপলিট্যান টেম্পারেন্স এণ্ড পিউরিটি এসোসিয়েসনে'র সভাপতি ছিলেন।

আনন্দমোহনের জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল রাজনীতি-ক্ষেত্র। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে প্রধানতঃ তাঁহার উৎসাহে ও আগ্রহে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান লীগ নামে একটি রাজনীতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আনন্দমোহন তাহার সদস্য ছিলেন। কিন্তু এই সভা স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন কেবল যে স্থায়ী হইয়াছিল তাহা নহে, ইহার প্রভাব ক্রমশই দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আনন্দমোহন প্রথম দশ বৎসর ইহার সম্পাদক ছিলেন। আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড স্যালিসবেরী যথন সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন, তখন এই ভারত-সভার চেষ্টায় সমগ্র ভারতে প্রতিবাদমূলক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। লালমোহন ঘোষ মহাশয় সভার প্রতিনিধিরূপে ইংল্যাণ্ডে গিয়া আন্দোলন চালাইয়াছিলেন।

পর বৎসর দেশীয় সংবাদপত্র-দমন আইন পাশ হয়। ইহার প্রতিবাদ কল্পে মিঃ এ, এম, বসুর আগ্রহে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রেল টাউনহলে একটি বিরাট সভা হয়।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন। সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এই আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। মিঃ বসু সেই সকল পত্রের সার মর্ম্ম সভাকে জ্ঞাপন করেন। আইনের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে আবেদন করিবার উদ্দেশ্যে দরখাস্তের খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কমিটি গঠিত হয়। মিঃ এ, এম, বসু তাহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। যথাসময়ে পার্লামেণ্টে আবেদন উপস্থাপন করা হয়, এই বিষয় লইয়া আলোচনাও হয়, কিন্তু বিশেষ কোন ফল ফলে নাই, আইন রদ হয় নাই। সেইজন্য আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনও চলিতে থাকে।

রাজনীতিক আন্দোলনে সফলতা লাভ করিতে হইলে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের আন্দোলনে কোন ফল হয় না,—জনসাধারণের সহযোগিতাও আবশ্যক। এবং তাহা করিতে হইলে লোকশিক্ষার বিস্তৃতি সাধন করা দরকার। ভারত-সভা লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আন্দোলন চালাইবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইল, এবং আনন্দমোহন তাহার সম্পাদক হইলেন। এতদ্ব্যতীত ধীরে ধীরে স্থানীয় বা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের জন্যও আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল আন্দোলন কিয়ৎ পরিমাণে সফলতাও লাভ করিয়াছিল। আন্দোলনের ফলেই অবশেষে দেশীয় সংবাদপত্র-দমন আইন উঠিয়া গিয়াছিল।

তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ ইলবার্ট বিলের আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেশীয় ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে প্রবল বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। এই সময়ে আদালতের অবমাননার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই মাসের জেল হয়। তাহার ফলে আন্দোলন চরমে উঠে। আনন্দমোহন এই সকল আন্দোলনের প্রাণ ছিলেন বলিলেও চলে।

১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনী (জুবার্ট একজিবিশন) বসে। তদুপলক্ষে ভারতের সকল স্থান হইতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কলিকাতায় আসিয়া সমবেত হন। এই সুযোগে ভারত-সভার কমিটি নেতৃবৃন্দকে লইয়া একটি জাতীয় পরামর্শ সভার অধিবেশন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাপক সভা, জাতীয় সভা, ইলবার্ট বিল প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হয়। এই সভাকেই কংগ্রেসের জন্মদাতা বলিতে পারা যায়।

ভারত-সভার সৃষ্টি হইতে ৮ বৎসরের অধিক কাল আনন্দমোহন ঐ সভার সম্পাদক ছিলেন। এক্ষণে অন্য লোক যাহাতে ঐ পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন সেই সুযোগ দিবার জন্য আনন্দমোহন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বেচ্ছায় এই পদ ত্যাগ করেন। পরে তিনি এই সভার সহকারী সভাপতি, এবং অবশেষে সভাপতিও হইয়াছিলেন। ন্যাশনাল কংগ্রেস বা রাষ্ট্রীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাহাতেও তিনি কায়মনোবাক্যে যোগদান করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের প্রকৃত প্রথম প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভার অধিবেশন বহরমপুরে বসে। আনন্দমোহন তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্র অপেক্ষা শিক্ষা-ক্ষেত্রে আনন্দমোহনের কার্য্য অধিকতর উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আনন্দমোহন কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো পদে নির্ব্বাচিত হন। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। বহুবার তিনি সিণ্ডিকেটের মেম্বার হইয়াছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্রবে তাঁহার কার্য্য এত প্রশংসনীয় হইয়াছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য প্রেরণের অধিকার লাভ করেন, তখন, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আনন্দমোহনই সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। শিক্ষা ব্যাপারে আনন্দমোহনের সৎকার্য্যের পরিচয় পাইয়া ভারত গবর্ন্মেণ্ট ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে শিক্ষা কমিশনের সদস্য পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে আনন্দমোহনের উৎসাহ বিশ্ব-বিদ্যালয় ও শিক্ষা কমিশনের সদস্য পদেই পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই, তিনি স্বয়ং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া কার্য্যতঃ শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি উচ্চ ইংরাজীবিদ্যালয় স্থাপন করেন। শীঘ্রই তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। ইহাই বর্ত্তমান সিটি কলেজ। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের নামে ইহার অনুষ্ঠানপত্র প্রথম প্রচারিত হয়। আনন্দমোহন ইহার জন্য অর্থ-সরবরাহ করেন, এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উহার সম্পাদক ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় উহার অন্যতম শিক্ষক পদে বৃত হন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারেও তাঁহার সমান উৎসাহ ছিল। মিঃ বসু, মিঃ ডি, এম, দাস, ও মিঃ ডি, এন, গাঙ্গুলীর সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আনন্দমোহনের পিতা মৈমনসিংহে যে বাড়ীতে বাস করিতেন, যে বাড়ীতে থাকিয়া আনন্দমোহন ও তাঁহার দুই ভ্রাতা শৈশবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, মৈমনসিংহের সেই বাড়ীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আনন্দমোহন বাড়ীটি বিদ্যালয়কে দান করেন। প্রথমে বিদ্যালয়টির নাম ছিল মৈমনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসন। পরে তাহা কলেজে উন্নীত হয়। এক্ষণে তাহা আনন্দমোহন কলেজ নামে পরিচিত হইয়া মৈমনসিংহ নগরে আনন্দমোহনের স্মৃতি বহন করিতেছে।

কুড়ি বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে স্বদেশ ও স্ব সমাজের সেবা করিবার পর আনন্দমোহনের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হয়—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় তিনি বাতরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকদিগের পরামর্শে ঐ বৎসর এপ্রেল মাসের ৪ঠা তারিখে তিনি ইয়োরোপে যাত্রা করেন। কয়েক মাস তিনি ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপের স্থানে স্থানে বাস করেন। আট মাস পরে ঐ বৎসর ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর দুই পুত্রকে লইয়া তিনি আবার ইংল্যাণ্ড গমন করেন। সেখানে পুত্রদ্বয়কে কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়া তিনি ভারতের প্রতি বৃটিশ জাতির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গ্রেট বৃটেনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলনের তরঙ্গ তুলেন। দশ মাস ধরিয়া অগণ্য সভায় অসংখ্য বক্তৃতা করিয়া আনন্দমোহন বৃটিশ জনসাধারণকে ভারতের প্রতি অবহিত করিয়া তুলেন। তৎপরে তিনি আবার ভারতে ফিরিয়া আসেন। আর একবার তাঁহার ইংল্যাণ্ড, এবং সুবিধা হইলে আমেরিকা ভ্রমণে যাইবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বোম্বাইনগরে পদার্পণ করিবার দিবসেই সন্ধ্যাকালে বোম্বায়ের নভেল্‌টি থিয়েটারে সমগ্র বোম্বাইবাসী আনন্দমোহনের অভ্যর্থনা করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। অসংখ্য লোক হাওড়া ষ্টেসনে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিল। চতুরশ্ব-বাহিত যানে দুই ঘণ্টা সময়ব্যাপী মিছিল করিয়া আনন্দমোহনকে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে আনয়ন করা হয়। নানা-স্থানে সভা-সমিতি করিয়া কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার পর ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে টাউনহলে তাঁহার সার্ব্বজনীন অভিনন্দন হইয়াছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তাঁহাকে এত বেশী পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যে, তিনি অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে বক্তৃতা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এই-জন্য সভা অসময়ে ভাঙ্গিয়া যায়।

ইহার পরবর্ত্তী কংগ্রেসের অধিবেশন মান্দ্রাজ নগরে হয়। আনন্দমোহন একবাক্যে এই অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলিয়া, কংগ্রেসের সভাপতির গুরু শ্রম তাঁহার সহিবে কি না, এই ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। আনন্দমোহনের নিজের মনেও সংশয় থাকায় তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবার জন্য তাঁহার এক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় আনন্দমোহন স্বয়ং মান্দ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধানের জন্য ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় বরাবর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

আনন্দমোহনের শরীর এই সময় হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। কিন্তু তথাপি, তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইলেন না—দেশমাতৃকার আহ্বানে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সাড়া দিতেই হইত। রাজনীতিক সঙ্কটমাত্রেই নেতারা তাঁহার পরামর্শ লইতে যাইতেন। অবশেষে লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গলাদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, দেশব্যাপী আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সমগ্র দেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলাদেশকে যত খণ্ডে ইচ্ছা ভাগ করুন না কেন, বাঙ্গলাদেশ যে অখণ্ড এবং এক তাহার প্রমাণ দিবার জন্য সার্কুলার রোডে ফেডারেশন হল নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর, ১৩১৩ সালের ৩০এ আশ্বিন এই ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপনের দিন স্থির করা হইল। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আনন্দমোহনকে প্রয়োজন হইল। ১৫ই অক্টোবর দ্বিপ্রহরকালে একটি ডেপুটেশন আসিয়া আনন্দমোহনকে সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি তখন অত্যন্ত পীড়িত; কিন্তু দেশমাতৃকার আহ্বান আনন্দমোহন কোন দিন উপেক্ষা

করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে সম্মতি দিতেই হইল। তৎকালীন প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গও নেতৃবৃন্দের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না—অনুমোদন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৬ই ডিসেম্বর নির্দ্ধারিত সময়ে একখানি চেয়ারে করিয়া আনন্দমোহনকে সভাস্থলে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। চিকিৎসকরা তাঁহার উভয় পার্শ্বে রহিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে নাড়ী টিপিতে লাগিলেন। সেই সভায় অর্দ্ধলক্ষাধিক লোক উপস্থিত ছিল। আমরাও সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। আনন্দমোহন সময়োচিত দুই চারি কথা বলিয়া ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বদিন শেষ কয়েক ঘণ্টায় তাঁহার উক্তি অনুসারে ছোট একটি বক্তৃতা লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল, আনন্দমোহনের অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিলেন।

ফেডারেসন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইল। কিন্তু ফেডারেশন হল নির্ম্মিত হইল না। সে দিনের সেই জ্বলন্ত উৎসাহ অল্পকালের মধ্যেই নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ফেডারেশন হল নির্ম্মাণের জন্য যে ভূমি ক্রয়ের বায়না পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইল না। সেই নির্ব্বাচিত স্থানে এখন এক ব্যবসায়ীর কারখানা স্থাপিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির কর্ত্তব্য বিমুখতার কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে।

ইহার পর আনন্দমোহন আর অধিক দিন এ মরজগতে বর্ত্তমান থাকেন নাই। এই সময়ে তিনি প্রায় দমদমায় থাকিয়া বিশ্রাম করিতেন, কালে ভদ্রে দুই এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিতেন মাত্র। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তিনি কলিকাতায় তাঁহার ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের নিজ বাটীতে গিয়া বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদনুসারে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। ১৩ই আগষ্ট তারিখে তিনি তাঁহার আত্মীয় ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর সার্কুলার রোডের বাটীতে আগমনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে তাঁহাকে তথায় আনা হয়। সেইখানে ১৯০৬, ২০শে আগষ্ট, ১৩১৩, ৪ঠা ভাদ্র তারিখে তিনি লোকান্তরিত হন।

মৈমনসিংহ নগরে আনন্দমোহন কলেজ ব্যতীত, তাঁহার সমগ্র জীবনের এই প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতিচিহ্ন নাই। সিটি কলেজ আছে বটে, তাহা কিন্তু পর্য্যাপ্ত নহে—সিটি কলেজের ইতিহাস বা আনন্দমোহনের জীবনী আলোচনা না করিলে সিটি কলেজের সহিত আনন্দমোহনের স্মৃতি কতখানি বিজড়িত তাহা জানিতে পারা যায় না—দুই এক পুরুষ পরে সে কথা লোকে ভুলিয়া যাইবে। আজ আমরা "ভারতবর্ষে" তাঁহার জীবনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া ও নিচোলে তাঁহার চিত্র প্রকাশ করিয়া সেই স্বদেশপ্রাণ কর্ম্মবীরের বিরাট স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

দরদী

শ্রীসুকুমার সরকার

ফুল আপনার দরদ নাহিক জানে
যে হয় মধুপ সেই বোঝে তার দাম ;
তাই সোহাগের কত্ কথা কানে কানে
গুঞ্জন গানে ঢেলে দেয় অবিরাম !

নিজ কাজলের আবেশ না জানে মেঘে
বায়ু এসে তারে বক্ষে ভাসায়ে লয়,
উষা নাহি জানে তাহারি শান্তি লেগে
বিহগের মুখ কূজনে মুখর হয় !

ঢেউ নাহি জানে নিজেরি পরশ দিয়ে
কি ক'রে সে কূল স্নিগ্ধ সরস করে ;
কূলের হিয়াই ধীরে ওঠে উছসিয়ে
হৃদয় ভেঙেও সে তারে হৃদয়ে ধরে !

তুমিও তেমনি তোমারে চিনিতে নারো
জানোনা মানসী ? কতখানি তব আছে ;
মোর চোখে তবু কভু ফাকি দিতে পারো
ধরা প'ড়ে গেছ এই মরমের কাছে !

গ্রীস

শ্রীভারতকুমার বসু

(২)

প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে আধুনিক গ্রীসের যেন আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসখানি উজ্জ্বল হ'য়ে আছে মানুষোচিত গুণের কাহিনীতে—মানুষোচিত শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের তাদের লজ্জার এবং অগৌরবের কাহিনী স্বরূপ উজ্জ্বলভাবে সাক্ষ্য দেবে!...

প্রায়ই দেখা যায়, সেখানকার রাজপথ দিয়ে পিঁজ্‌রা-

ক্ষেতের দিকে যাচ্ছে।

প্রত্যেক গ্রীক-কৃষক ভোর হ'তে-না-হ'তেই ক্ষেতে কাজ করবার জন্য এইভাবে বেরিয়ে পড়ে এবং তার পরিবারবর্গও কাজ ক'রতে এত ভালবাসে যে, তারাও তার সঙ্গে সঙ্গে যায়।

দৃষ্টান্তের গৌরবে। কিন্তু আধুনিক গ্রীসে আছে কি? যাই থাক, এটা স্বীকার ক'রতেই হবে যে, সেখানকার লোকেরা হচ্ছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর! এবং এই নিষ্ঠুরতাটুকুই গাড়ী ক'রে অসংখ্য কুকুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—বিক্রী করবার জন্য। পিঁজ্‌রাটার মধ্যে আর এতটুকুও স্থান নেই,—এম্‌নি গাদাগাদি ক'রে কুকুরগুলোকে বোঝাই করা হ'য়েছে

তার মধ্যে! ব্যাচারী কুকুরগুলো সেই অত্যধিক চাপে যেন হাঁপিয়ে উঠছে। এবং নিঃশ্বাস নেবার জন্য একটু হাওয়া পেতে ছট্‌ফট্‌ ক'রছে। কিন্তু হায়, মূক তারা। তারা ত তাদের প্রাণের যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ ক'রতে পারছে

দামী এবং জম্‌কালো পোষাক-পরিহিতা গ্রীক রমণী।

না। আর পারলেও, সেটা মানুষের কাছে নগণ্য—তাদের প্রাণের মূল্যই বা কতটুকু? তাই বোধ হয় পথচারী ভদ্র ব্যক্তিরা পিঁজ্‌রার মধ্যে সেই অর্দ্ধমৃতপ্রায় কুকুরগুলার দিকে তাকিয়ে নিজেদের চপল কৌতূহল মেটাবার জন্য ছড়ির দ্বারা তাদের গায়ে খোঁচা দিতে কিছুমাত্র দুঃখ বোধ না ক'রে তাঁদের তথা-কথিত সভ্যতা দেখিয়ে চ'লে যেতে আদৌ দ্বিধা বোধ করেন না। ধরণীর বুকে মানুষের এই নিষ্ঠুরতা, মানুষ ক্ষমা ক'রলেও, তা ক'রবেন না—একজন। তিনি হচ্ছেন নির্ম্মমের শাসক, এবং ওই হতভাগ্য, নিরীহ কুকুরগুলারই পিতা, পালক ও স্রষ্টা!... এবং শুধু গ্রীস নয়, পৃথিবীর যত

সম্মান জ্ঞানী গ্রীক রমণীর ব্যক্তিত্ব।
রমণীর মুখে গর্ব্ব ও স্বাধীনতার তেজস্বিতা ফুটে র'য়েছে।

দেশে দুর্ব্বলের প্রতি এই রকম যত অত্যাচারী আছে, তাদের সকলেরই বিচার হবে সেই মহাপুরুষের বিচারালয়ে। উৎপীড়নের শাস্তি সেখানে উৎপীড়ন-ই! পার্থিব সভ্যতা, আইন অথবা অন্য কোনো কিছুর মূল্যই সেখানে নেই!...

এথেন্‌স্‌ সহরের 'কন্‌স্‌টিটিউসন্‌ স্কোয়ারে' কতকগুলি হোটেল আছে। সাধারণতঃ সেখানে যাঁরা আসেন, তাঁরা

মঠের অভ্যন্তর ভাগ।

সন্ন্যাসীদের অন্তরকে উৎফুল্ল রাখবার জন্য এখানে অগুন্তি পিপে ভরা মদ রেখে দেওয়া হ'য়েছে।

গৃহপালিত পশুদের বিচরণে মনোরম এই স্থানটী।

হচ্ছেন সৈন্যবিভাগের কর্তা অথবা রাজনৈতিক ব্যক্তি কিম্বা ব্যবসায়জীবী। মাঝে মাঝে অনেক ব্যক্তির পরিবারবর্গও এখানে এসে ভোজনাদি ক'রে যান। এইখানে ব'লে রাখা উচিত যে, হোটেলে ভোজনের ব্যাপারটা হচ্ছে গ্রীক-পরিবার-বর্গের কাছে রীতিমত একটা আনন্দদায়ক ব্যাপার। এবং গ্রীসের প্রত্যেক সহরের মধ্যেই এর বিশেষত্ব বেশ ভাল ভাবেই দেখতে পাওয়া যায়।··

সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে এই পুণ্যাত্মা পুরুষ, স্বজন বিচ্ছেদ-কাতর ব্যক্তিদের শান্তিতে থাকবার জন্য বোঝাচ্ছেন।

এথেন্সের 'হার্মানি স্কোয়ারের' হোটেলগুলিতে যাঁরা আসেন, তাঁরা কিন্তু একটু অন্য ধরণের ব্যক্তি। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ছাপ পাওয়া যায় যথেষ্ট। এইজন্যই খাঁটী ইংরেজের পরিচ্ছদ সেখানে দৃষ্ট হয় কদাচ। এবং পরিচ্ছদের বিশেষত্ব সেখানে যা দেখা যায়, তার বেশ একটু রকম-ফের আছে। যথা;—রাজপ্রহরীর সাদা 'পেটিকোট্' এবং মাথায় স্বাধীনতা-জ্ঞাপক টুপী; এ্যাল্‌বেনীয়াবাসীর থাক্ করা ঘাঘ্‌রা এবং নীল জ্যাকেট্, ও মাথায় লোমের টুপী; এবং বোয়িয়োসিয়াবাসী চাষার ঝল্‌ঝলে সাদা ফ্ল্যানেলের জামা, ও পায়ে মুখ-তোলা জাতীয় জুতা—ইত্যাদি।···

গ্রীস যখন তুর্ক শক্তির প্রভাবাধীন ছিল, তখনকার

শ্রদ্ধেয় ও সম্মাননীয় পুরোহিত।

তুলনায় আধুনিক গ্রীসের রাজপথগুলিকে অপেক্ষাকৃত ভালোই ব'লতে হবে। বড় বড় রাস্তাগুলি বেশ ভালো ভাবে বাঁধানো হ'য়েছে, এবং সেখানে আলোরও সুবন্দোবস্ত করা হ'য়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সব হচ্ছে সহরের ভিতরকার কথা। সহরের বাইরে একবার মাত্র পা দিলেই

শস্যকর্ত্তন। অশ্ব ও অশ্বতরের সাহায্যে কলের দ্বারা ক্ষেত থেকে শস্য কাটছে।

একটী গ্রীক-কৃষাণের মৃতদেহ। গ্রীসদেশে এইরকম নিয়ম আছে যে, সেখানে কোনো লোক মারা গেলে, তার মৃতদেহটীকে সব চেয়ে ভাল পোষাক পরিয়ে আর ফুলে ঢেকে খোলা একটা 'কফিনে' ক'রে গির্জ্জাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

যা দেখা যাবে, তাতে মন একেবারেই আনন্দে ভ'রে ওঠে না। সেখানে ইতস্ততঃ প'ড়ে আছে—ভাঙা-বাড়ীর 'রাবিশে'র স্তূপ,—করুণ একটী ছবি হৃদয়ে নিয়ে। তা যেন সেই গৌরবান্বিত প্রাচীন গ্রীসের ধ্বংসের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়!...

গ্রীসদেশের সৎপ্রকৃতি লোকের পরিচয় পেতে হ'লে, সেখানকার পল্লীতে যাওয়া উচিত। এই পল্লীতেই গ্রীসের যথার্থ সন্তানেরা বাস করে। তারা তাদের অন্ন অর্জ্জন করে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে; সহরবাসী ঘোর রাজনৈতিকদের মতো আলোচনা সংগ্রামের দ্বারা নয়! তারা হচ্ছে শ্যামল ক্ষেতের ভক্ত পূজারী সরলপ্রাণ কৃষক। তারা জমি কর্ষণ করে এবং সঙ্গী-ভাইদের মানুষ হ'তে শিক্ষা দেয়। অনেক পল্লীবাসী আবার ক্ষেতের কাজ না ক'রে, মাছ অথবা ভেড়ার ব্যবসাও করে। শারীরিক স্বাস্থ্য এবং নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে তারা, সহরের আওতায় মনুষ্যত্ববর্জ্জিত এবং সরলতাহীন ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক উন্নত। কিন্তু সেখানকার কৃষকদের ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ, কারণ, লক্ষ্মীদেবী তাদের উপর বড় একটা সন্তুষ্ট হ'তে চান না। কাজেই, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রে এবং কেউ কেউ দক্ষিণ আফ্রিকায় চ'লে যেতে বাধ্য হয়।...
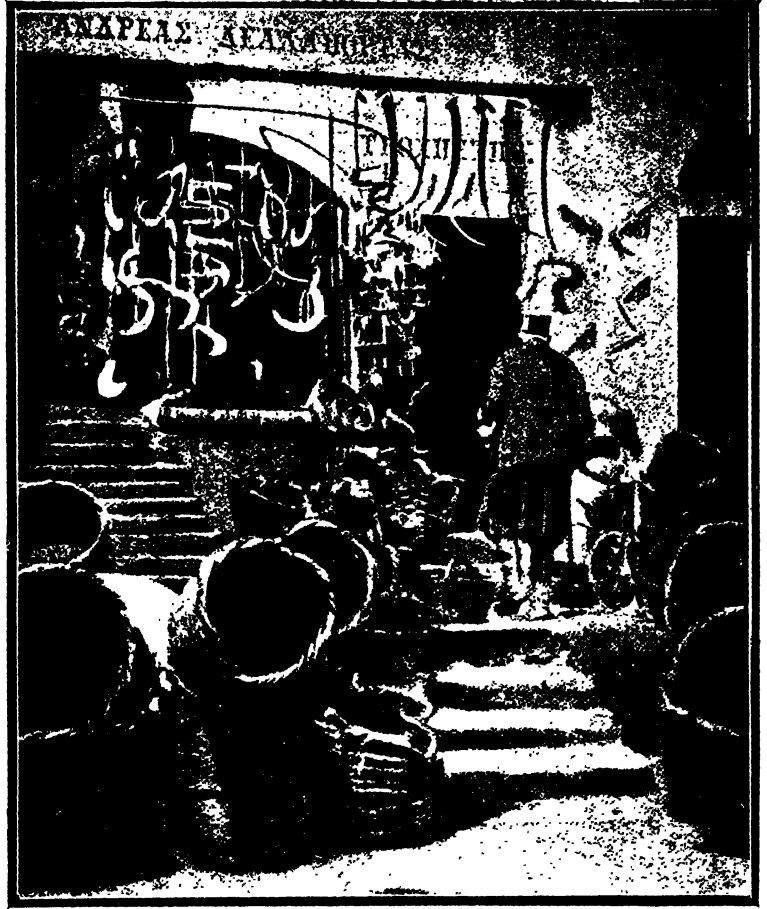
কৃষি সরঞ্জাম। বাগান ও ক্ষেতের কাজে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি বিক্রী করবার দোকান এখানে বিভিন্ন প্রকারের কাস্তে, কাটারী ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায়।

ভজনালয়ের ফটকের সামনে ভিখারী বালকের ভিক্ষা প্রার্থনা

গ্রীসদেশের মধ্যে থেসালি নামক স্থানেই চাষের কাজ সব চেয়ে ভাল ভাবে হয়। এবং তা থেকে বেশ দু পয়সা আয় হয়। গ্রাস দেশের অন্য কয়েকটী স্থানে পাতি লেবু এবং কমলা লেবু এত বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, মাত্র তার আয় থেকেই সেখানকার লোকদের জীবিকা চলে। সেখানকার লোকেরা সাধারণতঃ বাস করে—মাটীর তৈরী কুটীরের মধ্যে। এই সমস্ত কুটীর প্রায়ই একতালা। সেগুলায় কাচের জানলা একেবারেই থাকে না। অবশ্য রাত্রিতে বাড়ী নিরাপদ রাখবার জন্য একটা 'ঝাঁপি' ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত বাড়ীর যারা অধিকারী, তাদের শূকর পোষার সখ আছে। উক্ত বাড়ীগুলি যদি দোতালা হয়, তা হ'লে শূকর-গুলিকে একতালায় রেখে দেওয়া হয়। এবং বাড়ীগুলি যদি একতালা হয়, তা হ'লে শূকরগুলিকে পাশেই একটা ঘেরা যায়গার মধ্যে থাকতে দেওয়া হয়। মোট কথা, উক্ত গৃহস্থেরা—একতালা অথবা দোতালা, যেখানেই থাকুক, শূকরগুলি কখনোই তাদের কাছছাড়া হবে না, এম্নি গভীর তাদের শূকর-প্রীতি!···

পাথর খনন করার কাজের অবসরে গ্রীক-কর্ম্মীদের বিশ্রাম।
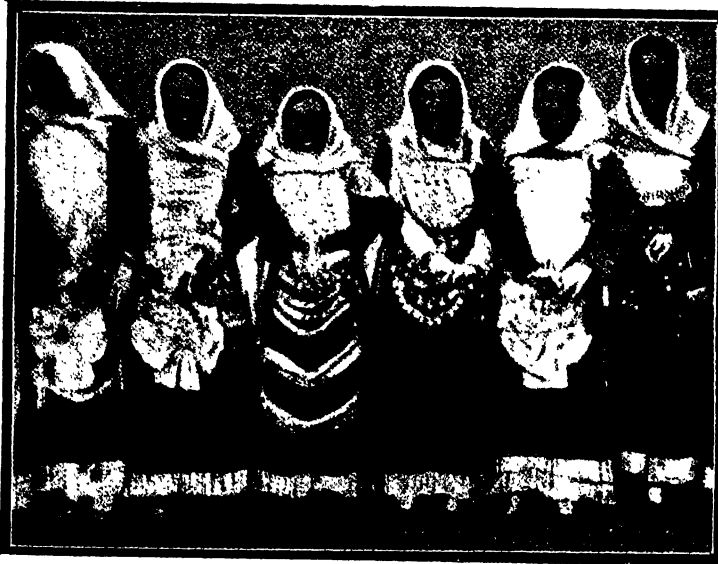
কৃষক রমণীদের হাত-ধরাধরি ক'রে আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে চলা।

সেখানকার বাড়ী অর্থাৎ কুটীরগুলি সর্ব্বদাই পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখা হয়। এবং যেহেতু গৃহস্বামীরা হচ্ছে যার-পর-নাই সম্মান-জ্ঞানী পুরুষ, সেই কারণে, তারা তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করে খুব সাবধানে এবং যত্নের সঙ্গে। উক্ত কুটীরের মধ্যে দেওয়ালে মহাপুরুষদের ছবি অথবা যিশু-জননীর পবিত্র প্রতিকৃতি টাঙিয়ে রাখা হয়। এবং প্রত্যেক লোক বাড়ী থেকে বেরোবার সময় অথবা বাড়ীতে ঢোকবার সময় সেই ছবিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন ক'রে যায়।

গ্রীসদেশের গোঁড়া ভক্তদের গির্জ্জার যাঁরা পুরোহিত, তাঁদের একটু ইতিহাস আছে।—এই সমস্ত পুরোহিত সুদীর্ঘ শ্মশ্রু রাখেন, এবং মাথায় কালো রঙের উঁচু টুপী ব্যবহার করেন। প্রকৃতির দিক দিয়ে তাঁরা অত্যন্ত নিরীহ এবং আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে অত্যন্ত গরীব। সাধারণতঃ তাঁদের জীবিকা চলে—তাঁদের দ্বারা সম্পন্ন

ধর্ম্মাভিষেক, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি ব্যাপারের জন্য পাওয়া দক্ষিণার দ্বারা !···"ইষ্টারে"র দিনে অনেকের কাছ থেকে অর্থ উপহার পেয়েও তাঁদের অনেক উপকার হয়।

গ্রীসদেশের নিয়মানুসারে, মঠের মধ্যে অবিবাহিত পুরোহিতের প্রবেশাধিকার নেই। এইজন্য, মঠে যাবার পূর্ব্বেই সেখানকার প্রত্যেক পুরোহিতই বিবাহ ক'রতে বাধ্য !···

সাধারণতঃ সেখানকার পুরোহিতরা হচ্ছেন কৃষক-বংশজাত। এবং অনেক পুরোহিত, নিজেদের ও পরিবারবর্গের ব্যয় চালাবার জন্য আপন আপন যায়গা-জমি চাষ করাবার ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। এই সমস্ত পুরোহিত যদিও সাধারণের কাছ থেকে খাতির পেয়ে থাকেন এবং যদিও অনেকে আশীর্ব্বাদ পাবার জন্য তাঁদের হাত চুম্বন ক'রে থাকেন, তবুও বাস্তবিক পক্ষে তাঁরা কখনো কারুর কাছে আন্তরিক ভাবে সম্মান পান না। কিন্তু গ্রীকরা এই সমস্ত পুরোহিতকে আন্তরিক ভাবে সম্মান না ক'রলেও, গির্জ্জার আদেশ ও নিয়মাবলীকে তারা সম্মান করে—শুধু আন্তরিক ভাবে নয়,—রীতিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, গ্রীকেরা "লেন্টেন্" উপবাস করে পাকা ছ'টী সপ্তাহ ধ'রে, এবং আরও তিন সপ্তাহ মাছ, মাংস ডিম, তেল, মাখন ইত্যাদি স্পর্শও করে না। অবশ্য উপবাসের দিন কয়টী তারা রুটি, শাক-সব্জী ফল ইত্যাদির দ্বারা চালিয়ে দেয়। গ্রীকেরা এই রকম উপবাস বা প্রায়শ্চিত্ত উপবাস, ব্রত পালন করে ব'লেই তারা সাধারণতঃ মিতাহারী।

পল্লীবাসী গ্রীকেরা মাংস একরকম খায় না বললেই

জমকালো পোষাক-পরিহিতা 'থেসালোনিয়ান' রমণী

সমাধিক্ষেত্রের উপর দাঁড়িয়ে কথা কইছে। ডানদিকের রমণীর মাথার টুপী একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ।
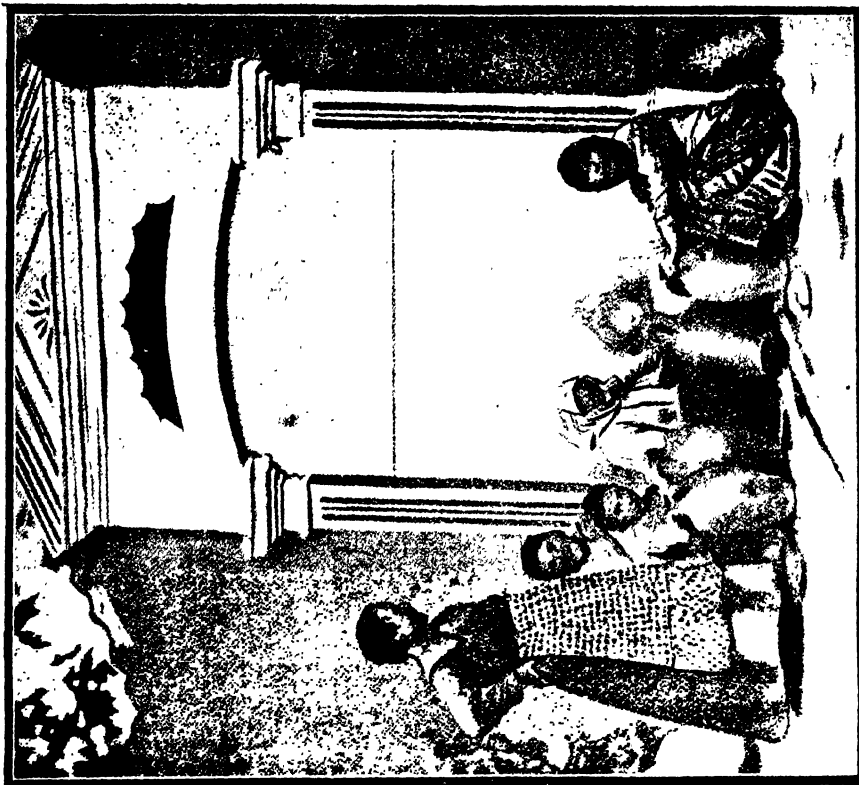
গৃহস্থ-রমণী বসন ধোলাই ক'রছে।

জল আহরণ

ঝর্‌ণা-তলায় কল্‌সীতে জল ভ'রতে এসে মেয়েদের গল্প। ঝর্ণাটার গায়েই সামনেকার ওই দেওয়ালে কতকগুলি হরফ লেখা র'য়েছে। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, "অমুক লোকহিতৈষী ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব ব্যয়ে এইটী তৈরী করিয়েছেন।"

হয়। এবং তারা যা তা-সহ রুটি আহারকেই যথেষ্ট আহার ব'লে মেনে নেয়। তারা মদ খায়। কিন্তু বাড়ীর তৈরী ছাড়া অন্য কোনো প্রকারেরই মদ স্পর্শও করে না। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে তারা মদের সঙ্গে জল মিশিয়ে নেয়; কারণ, মদ খেয়ে মাতাল হওয়াকে তারা ঘৃণা করে। তারা আমোদ-প্রমোদ করে ফাঁকা হাওয়ার মধ্যে এবং নিতান্ত সরল প্রাণেই।

গ্রীসদেশে সর্ব্বসাধারণের ছুটী হয়—জাতীয় অথবা ধর্ম্ম- সংক্রান্ত কারণে। যে স্মরণীয় দিনটীতে অনন্ত উৎসাহের সঙ্গে দেশাত্ম বোধ নিয়ে গ্রীসদেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের সুরু হ'য়েছিল, সেই দিনটীর স্মরণে আজও সেখানে উৎসবাদি হ'য়ে থাকে। পূর্ব্ব অত্যাচারী এবং আইনের নামে ভণ্ড অনুশাসকদের প্রতি এইটাই হচ্ছে মুখের মতো উত্তর! এবং এই উত্তর আজ গ্রীকেরা দিতে পেরেছে, কারণ, তারা কথার নয়, কাজের লোক ব'লে। তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯১২ সালে যখন অত্যাচার পীড়িত গ্রীকেরা তুর্ক শক্তির উপর ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো, তখন পৃথিবীর যত দেশে যত গ্রীক ছড়িয়ে ছিল, সব এক সঙ্গে ফিরে এল তাদের জন্মভূমিতে, এবং পরপদানত দেশজননীর ধূলায়-মলিন মুখের অশ্রু মুছিয়ে দেবার জন্য অসীম উৎসাহে সমর-সজ্জা ক'রতে লাগলো। এবং তার ফলে, ১৮৯৭ সাল থেকে যে

দূর-পাহাড়ের দিকে চেয়ে' আছে

ভারোত্তোলন
মঠের মধ্যে ভারী জিনিষ ওপরে তোলবার জন্য চড়কি-কল্ ঘোরাচ্ছে

তুর্কশক্তি অমানুষিক অত্যাচারের দ্বারা গৌরবান্বিত গ্রীকজাতিকে ক'রে রেখেছিল অত্যন্ত দুর্ব্বল, অত্যন্ত ক্ষীণ.—সেই যথেচ্ছাচারী তুর্কশক্তি অবিলম্বেই সমস্ত গ্রীসের সীমা থেকে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেল জন্মের মতো। গ্রীক্‌বীরত্বের আর একটী কাহিনী জড়িয়ে আছে—১৯১৩ সালে ঠিক এই ভাবে তাদের বুলগেরিয়া-বিজয়ের উজ্জ্বল ইতিহাসখানির মধ্যে।···

গ্রীসদেশের নৌ-শক্তি খুব প্রবল নয়। কিন্তু তবুও গ্রীক-জাহাজের নাবিকরা হচ্ছে খুব চতুর। এই সমস্ত নাবিক কাজের জন্য আসে—চিয়স্, স্যাক্‌সস্, এ্যাণ্ড্রস্, মিলস্ ইত্যাদি দ্বীপ থেকে। এই দ্বীপগুলি অতি মনোহর। অমর কবি ব্রাউনিং তাঁর সুছন্দ কবিতার মধ্যে এদের প্রশংসা ক'রে গেছেন এই ভাবে,—

"Lily on lily, that o'erlace
the sea."

বাস্তবিকই অসীম সাগরের অনন্ত বিস্তৃতির উপর থেকে তাকালে, এই দ্বীপগুলিকে অধিকতর সুন্দর দেখায়। এবং কোনো এক আলো-ঝলমল দিনে এ-গুলার দিকে দৃষ্টি ফেরালে, প্রথমেই চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে উঠবে, তা অতুলনীয়! ছোট্ট কতকগুলি দেশ; তাদের মধ্যে কতক-গুলি বাড়ী মাথা তুলে র'য়েছে। তাদের চূড়ায় যেন রবির আলো রূপার মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে। তাদের আশে পাশে ইতস্ততঃ দেখা যাচ্ছে—জলপাই-তরুর পুঞ্জ এবং সুষম লতার কুঞ্জ। এ-দৃশ্যের সার্থকতা কেবল দর্শনের মধ্যেই। অর্থের দ্বারা এর মূল্য-নির্দ্ধারণ হ'তে পারে না।··

সমাধিক্ষেত্রে কবরের উপর একটী রমণী তার মৃত আত্মীয়ের জন্য শোক প্রকাশ ক'রছে। বছরে একবার ক'রে এই রকম একটী শোক প্রকাশ করবার দিন ধার্য্য হ'য়ে থাকে।

গরুর গাড়ী চালালেও, লোকটীর মুখে আত্ম-সম্ভ্রমবোধের ভাব বেশই ফুটে র'য়েছে।

এই সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীরা সাধারণতঃ খুব নম্র-প্রকৃতির ; ভীরুতা তাদের কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই দেশের অধিবাসীরা এক বিষয়ে অত্যন্ত উৎপীড়িত হ'য়ে থাকে। এই উৎপীড়ন তারা পায় সেই সমস্ত যথেচ্ছাচারী, লজ্জা-ভয়হীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে, যাদের উপর খাজনা আদায় করবার রাজকীয় অধিকার দেওয়া আছে। কিন্তু এই অধিকারের সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, কি, বজায় থাকছে, সে চিন্তা কর্ত্তৃপক্ষ কখনো করেন না। অর্থাৎ তা করবার উপযুক্ত সময় তাঁরা ঠিক ক'রে উঠতে পারেন না, যেহেতু, এই ব্যাপারটীর জন্য অযথা মস্তিষ্কের ব্যায়াম না ক'রে, সেই সময়টুকুতে তাঁরা তাঁদের মূল্যবান রাজনীতির চর্চ্চা করাটাকেই বেশী প্রয়োজনীয় ব'লে বোধ করেন।

তাঁতশালা

বাঁ দিকের রমণীটী তাঁত চালাচ্ছে এবং ডান দিককার মেয়েটী তা দেখছে। অপর দিককার মেয়েটীও সূতার কাজ ক'রছে।

কিন্তু বাস্তবিক রাজনীতির এই অত্যধিক চর্চ্চাই গ্রীসদেশে অমনুষ্যত্ব এনে দিয়েছে। রাজনৈতিক জীবনে গ্রীকেরা সাধুতা ভুলে গেছে। এবং তার ফলে তারা হ'য়ে প'ড়েছে অত্যন্ত স্বার্থপর। তার একটীমাত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সেখানকার সরকারী কাজে যদি কতকগুলি লোকের প্রয়োজন হয়, তা হ'লে, সেই সমস্ত কাজ পাবে একমাত্র তারাই, যারা গোঁড়া রাজনীতির স্বপক্ষে ভোট দেয় এবং রাজনৈতিকদের অন্ধ ভক্ত এবং অনুচর ব'লে নিজেদের

গ্রীসদেশের মানচিত্র।

জাহির করে। কিন্তু শুধু এই ই নয়। প্রত্যেক গ্রীক রাজনৈতিকই এই ধারণা মনে মনে পোষণ করেন যে, তিনি হচ্ছেন 'একা একা সব্সে বড়'। কাজেই, অভিমত প্রদানের সময় তিনি নির্ভয়ে নিজের স্বার্থটী বজায় রেখে চ'লতে ভুল ক'রেন না। কিন্তু তার জন্য সকলের চেয়ে বেশী মুস্কিলে যারা পড়ে, তারা হচ্ছে নিরীহ প্রজারা! আধুনিক গ্রীসের এই রাজনীতিবাদ-অন্ধকারের ভিতর থেকে প্রাচীন গ্রীসের গৌরব দীপ্তির দিকে ফিরে তাকালে, কোন্ কোন্ জিনিষ সকলের আগে মনের উপর বেশী রেখাপাত ক'রবে?—তখনকার হোমারের মহাকাব্যের কাহিনী; এথিনিয়ান্ অমর নাট্যের কথা; প্লেটো ও এ্যারিস্‌ট'ট্‌ল্-এর দার্শনিকতা ও বৈজ্ঞানিকতার ইতিহাস; ইত্যাদি। কিন্তু সে যুগেও গ্রীকেরা রাজনীতির দিক দিয়ে পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। আর আজকাল আধুনিক গ্রীসের মধ্যে সব ছাপিয়ে মাত্র একটা ঢেউ উঠেছে। আর, তা হচ্ছে—রাজনীতি! রাজনীতি!...

গ্রীকেরা যদি এই মাত্র রাজনীতির অন্ধ ভক্ত না হ'তো, তা হ'লে গ্রীস অধিকতর সম্পদ ও শান্তিতে ভ'রে উঠতে পারতো। এই রাজনীতি লোকদের অন্তরকে অবিশ্বাসী ক'রে তুলছে। এবং এই রাজনীতির জন্যই সেখানে হাতের-কাছে পাওয়া কাজ আগে সম্পন্ন হচ্ছে না। যা হচ্ছে, তা—অসম্ভাবিত অথবা দুঃসম্ভাবিত অনেক কিছুর কল্পনা-আকাশের কুসুম চয়ন মাত্র! কিন্তু সকলের চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, সেখানকার যে সমস্ত ব্যক্তি রাজনীতির নামে এই রকম তীব্র আন্দোলন তুলেছেন, তাঁদের কারুরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ব'লতে কোনো জিনিষই নেই। প্রয়োজন হ'লে, উৎসাহী দেশবাসীর অন্তরকে যে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুগ্ধ ক'রতে পারেন, এই রকম শক্তি তাঁদের কারুরই মধ্যে নেই! থাকলে, গ্রীস আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির গৌরবের দাবী করতে পারতো।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সমস্ত গ্রীসদেশে মোট ৪১৯৩৩ বর্গ মাইল যায়গা ছিল। এবং তখন তার মোট জন-সংখ্যা ছিল ৫,০০০,০০০।

সৈনিকের বৃত্তি শিক্ষা সেখানে বাধ্যতামূলক। কুড়ি বছর বয়স থেকে আরম্ভ ক'রে একত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত এই শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে হয়।...

চাষের কাজ সেখানকার প্রধান ব্যবসা। সেখানকার প্রধান শস্য হচ্ছে—গম, বার্লি, আঙুর, তামাক, তূলা, যই ইত্যাদি। বাদাম, পাতিলেবু, কমলালেবু, ধান ইত্যাদিও সেখানে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকারের খনিজ ধাতু সেখানে আছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সেখানে মোট ৬৬,৯৪৪,৭৭৬ পাউণ্ড মূল্যের মাল আমদানী হ'য়েছিল এবং ৩২,৬৭৯,৬৪৭ পাউণ্ড মূল্যের মাল সেখান থেকে রপ্তানী হ'য়েছিল। ব্যবসার জন্য সেখানে প্রায় ২,০০০ জাহাজ আছে। সেখানে রেলপথ আছে প্রায় ১,৪৭০ মাইল, টেলিগ্রাফের লাইন আছে ১০,৫৬০ মাইল এবং টেলিফোনের লাইন আছে ৭,৭৪০ মাইল পর্য্যন্ত। সেখানকার কোরিন্থ্ যোজকের বুকের উপর দিয়ে চার মাইল দীর্ঘ একটী খাল কাটানো আছে।...

ছ বছর থেকে বারো বছর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা সেখানে বাধ্যতা-মূলক। শিক্ষার খরচ সরকার বহন করেন। সেখানকার প্রাথমিক শিক্ষালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬,৮০০টী; উচ্চ শিক্ষালয়ের সংখ্যা প্রায় ৭৬টী; মধ্য শিক্ষালয়ের সংখ্যা ৪২৫টী; কৃষি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২টী এবং গভর্ণমেণ্ট কমার্সিয়াল স্কুলের সংখ্যা একটী। মোট দুটী বিশ্ব বিদ্যালয় সেখানে আছে।

এথেন্স্ হচ্ছে গ্রীসের রাজধানী। এথেন্সের মোট জন-সংখ্যা হচ্ছে ৩০০৭০০।

সালোনিকা, পাইরেয়াস্, পাট্রাস্, ভোলো, কর্ফু, ক্যান্ডিয়া, কেনিয়া, ক্যাভেলা, ল্যারিসা এবং কালামাটা হচ্ছে গ্রীসের প্রধান সহর। এবং এখানকার যথাক্রমে মোট জন সংখ্যা হচ্ছে,—১৭০১৯০; ১৩৩৪৮০; ৫২১৩০; ৩০০৬০; ২৭০৮০; ২৪৬৯০; ২৩৯৩০; ২২৯৬০; ২০৭০০ এবং ২০৫৯০।

প্লাবনের মুখে শ্রীহট্ট ও কাছাড়

শ্রীসুবোধকুমার রায়

করিমগঞ্জ—১০ই জুন—প্রতাপ জয়ন্তী-উৎসব শেষ করিয়া যখন ঘরে ফিরিতেছিলাম, তখন খুব জোরে বৃষ্টি পড়িতেছিল। বৃষ্টির জোর এত বেশী ছিল যে অনেকেই প্লাবনের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

১০ই জুন সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া প্রবল বারি পাত আরম্ভ হইল; প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল সমস্ত মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ়-আকাশের বুকে কোথায় যেন একটা মস্ত ফুটা হইয়া গিয়াছে, ছাপাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল। বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেলাম। এ যে অপরূপ সাজসজ্জা! হয় তো এখনই না পলায়ন করিলে রাত্রির অন্ধকারে প্লাবনের মুখে ভাসিয়া যাইতে হইবে। তাড়াতাড়ি রাত্রি ১২টার মধ্যেই আমার বন্ধু রেভারেণ্ড ডি, কে, বাদ্‌শার সৌজন্যে তাঁর বাংলো-সংলগ্ন একটি খালি ছাত্রাবাসে পরিজনবর্গসহ আশ্রয় লইলাম।

শিলচর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের নিকটে রাস্তার উপর নৌকা চলিতেছে। দূরে গ্রামগুলির গাছপালার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে।

আর তাহারই মধ্য দিয়া প্রবল বারি-ধারা সমস্ত ধরিত্রীকে প্লাবিত করিয়া তুলিতেছে।

১১ই জুন ভোর বেলায়ও বৃষ্টির বিরাম নাই, বিরহীর অশ্রুজলের মত ঝর্ ঝর্ করিয়া অবিরল ধারে পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সহরের খাল-নালা জলে পরিপূর্ণ হইয়া জল ক্রমে রাজ-পথ স্পর্শ করিল। আমরা রাত্রির আহার শেষ করিতে না করিতেই বন্যার জল গৃহ-প্রাঙ্গণ

পরদিন প্রভাত হইতেই দেখিতে পাইলাম উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত আমাদের ছাত্রাবাস ও তৎসংলগ্ন রেভারেণ্ডের বাংলোকে ঠিক দ্বীপের মত দেখাইতেছে। আমাদের বাসা সহরের বাহিরে। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম রাজপথের চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই। যেদিকে দৃষ্টি দিই শুধু শুভ্র জলরাশি থই থই করিতেছে। মনে হইল ধরিত্রীর শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত বুকের উপর কে যেন একখানা শুভ্র আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে।

পূর্ণ দুই দিন আমাদিগকে সেই নূতন 'দ্বীপে' আবদ্ধ থাকিতে হইল। ভেলা বা নৌকা ছাড়া বাহির হইবার যো নাই! প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মনে হইতেছিল, আমরা যেন

করিমগঞ্জ কংগ্রেস কমিটি বন্যাপীড়িত গ্রামবাসীদিগের মধ্যে চাউল বিতরণ করিতেছেন।

অন্তরীণের বন্দী। ১৪ই জুন অতি কষ্টে ভেলার সাহায্যে রাজপথে উঠিলাম,—রাজপথের উপর তখন প্রায় ২।৩ হাত জল,—প্রবল স্রোত-রাশি সমস্ত পথকে প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। সে এক কল্পনাতীত দৃশ্য! যে রাস্তা দিয়া মোটরবাস্ ইত্যাদি চলাচল করিত, আজ সেখান দিয়া বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতেছে।

রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতেই আমার পূজনীয় দাদামহাশয় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত এম-এল্-এ, শ্রীযুক্ত রমণী-মোহন রায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব প্রভৃতি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা কংগ্রেসের কর্ম্মিগণ ও জাতীয় স্কুলের ছাত্রদলসহ সহরের পরিবারবর্গের সাহায্যে চলিয়াছেন। সকলেই আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

সহরের প্রতি মহল্লার খবর কংগ্রেস সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সুরেশ বাবুর নিকট হইতে জানিতে পারিলাম। শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় Congre-s Relief Boat সাহায্যে আমাদের 'অন্তরীণ' হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার অস্থায়ী আবাসগৃহের মধ্যেই আশ্রয় লইতে আহ্বান করিলেন। পরিবার পরিজনবর্গ সহ তিনি অতি কষ্টে বাস করিতেছিলেন। এমন অবস্থায় তাঁহার সৌজন্যে অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিলাম।

ডাকঘরে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলাম, সেখানে অসম্ভব ভিড়; সকলেই টেলিগ্রাম করিয়া বিদেশস্থ আত্মীয় স্বজনের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ব্যগ্র, কিন্তু টেলিগ্রাফের লাইন বন্ধ; স্থানে স্থানে বন্যার জলে বহু টেলিগ্রাফের খুঁটি বসিয়া পড়িয়াছে। কয়েকটি রেল-সেতু ভাঙ্গিয়া পড়ায় ট্রেণ চলাচলও বন্ধ, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে করিমগঞ্জ সভ্য-জগৎ হইতে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আমার মনে হইতে লাগিল, যদি সমস্ত মহকুমাও আজ প্লাবনের মুখে ভাসিয়া যায়, তবু এ ধ্বংসের খবর সভ্য-জগৎ শীঘ্র জানিতে পারিবে না। জনৈক প্রিয়া-বিরহ-বিধুর বন্ধু দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "না, এবার দেখ্‌ছি মেঘদূতের যক্ষের মত মেঘ-মুখেই বার্ত্তা পাঠাতে

করিমগঞ্জ মুন্সেফী আদালতের অবস্থা।

হবে।" আমিও রহস্যভরে সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের ভাষায় উত্তর করিলাম "'অর্ঘ্য রচি কুর্চ্চিফুলে,' তুমি তা হ'লে মেঘকে আহ্বান কর।"

সমস্ত সহর যথাসম্ভব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, সহরময় একটা বিরাট ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। এই ভীষণ প্লাবনের মুখেও কয়েকজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোককে নৌকা-বিহারে আমোদ-প্রমোদে রত দেখিয়া আমার মনে হইল যে "When Rome was burning Nero Was fiddling" কথাটা মিথ্যা নহে।

বন্যার সময়ে করিমগঞ্জ ডাকবাংলার দৃশ্য।

বন্যার সময়ে করিমগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাই-স্কুলের দৃশ্য।

১৬ই জুন রবিবারে আমাদের 'অন্তরীণ' স্থানে অতি ভোরে হঠাৎ একখানা নৌকা আসিয়া ভিড়িল। নৌকা হইতে একটি লোক অবতরণ করিয়াই আমাকে নমস্কারাদি করিয়া সঙ্কোচে বলিল যে, সে তার কর্ত্তব্য করিতে আসিয়াছে। অনুমানে বুঝিতে পারিলাম পুলিশের লোক। প্রবন্ধ-লেখক এবং তাহার অগ্রজদ্বয় স্থানীয় রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের (Political Suspect) মধ্যে অন্যতম। পুলিশ-বিভাগের দায়িত্বজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হইল। সমস্ত সহর এবং মহকুমা যখন জলমগ্ন, তখনও ইহারা কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। প্লাবন-পীড়িতদের দিকে তাহাদের মমতা-লেশহীন কঠোর দৃষ্টি তখনও পড়ে নাই।

এই লোকটির নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, এক গ্রামে প্লাবিত গৃহে মা তার দুইটি শিশু সন্তান সহ বাঁশের মাচার উপর ঘুমাইতেছিলেন; হঠাৎ রাত্রিতে জননীর বাহু-পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি শিশুই জলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই ভয়াবহ খবর শুনিয়া সমস্ত মনটা বেদনার আঘাতে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি অতি সত্বর তৎপরতার সহিত প্লাবন-সাহায্য-সমিতি গঠন করিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন। মহকুমার সর্ব্বত্র ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা-বাহী বহু Relief Boat কর্ম্মী ও চাউল সহ দিকে দিকে প্রেরিত হইল। কর্ম্মিগণ প্রদত্ত বিবরণী হইতে প্লাবিত অঞ্চল সমূহের প্রকৃত অবস্থা ক্রমে অবগত হইতে লাগিলাম। প্রবন্ধ লেখককে কংগ্রেস-প্রচার সংসদের সম্পাদকরূপে প্রত্যহ রাশি রাশি বিবরণীর চুম্বক প্রস্তুত করিতে হয়। রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিলাম যে, বিভিন্ন পরগণার প্রায় চারি শত গ্রামের অধিবাসী আজ গৃহহীন ও বিপন্ন। পাথারকান্দি, জলঢুবা ও হাকালুকি অঞ্চলের কাহিনী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। কারণ এই সমস্ত অঞ্চলের অবস্থা হইতেই এই

মহকুমার ভয়াবহ রূপ দেশবাসী সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব মহাশয় হাকালুকি অঞ্চলের যে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম প্রদান করিলাম। "এখানকার অধিবাসীদের অবস্থা কল্পনাতীত। হাওরের নিকটে জনমানব এবং গৃহাদির চিহ্নও নাই; কেবল স্থানে স্থানে পশুদেহ ও ভগ্ন ঘর দরজা জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ অতি কষ্টে কোনরকমে প্রাণ লইয়া নিকটস্থ রেল-পথের ধারে এবং পাহাড়ের টিপাসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বহু নরনারী ও বহু গলিত পশুদেহ জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিলাম। এই অঞ্চলের অধিবাসিগন নিকটস্থ পাহাড় ও টিলা সমূহে স্ব স্ব গবাদি পশুসহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।"

অনেকেই জানেন যে জলঢুপ সুমিষ্ট আনারসের জন্য দেশ-বিখ্যাত। আমরা জানি যে এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ আনারস ও কমলার চাষ করিয়া সচ্ছলতার সহিত বাস করিতেছে; কিন্তু এবারকার প্রবল বন্যায় তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। শ্রীহট্ট জেলায় বিখ্যাত খাদিকর্ম্মী শ্রীযুক্ত অবলাকান্ত গুপ্ত এ অঞ্চলের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

শিলচর তারাপুর মহল্লার দৃশ্য।
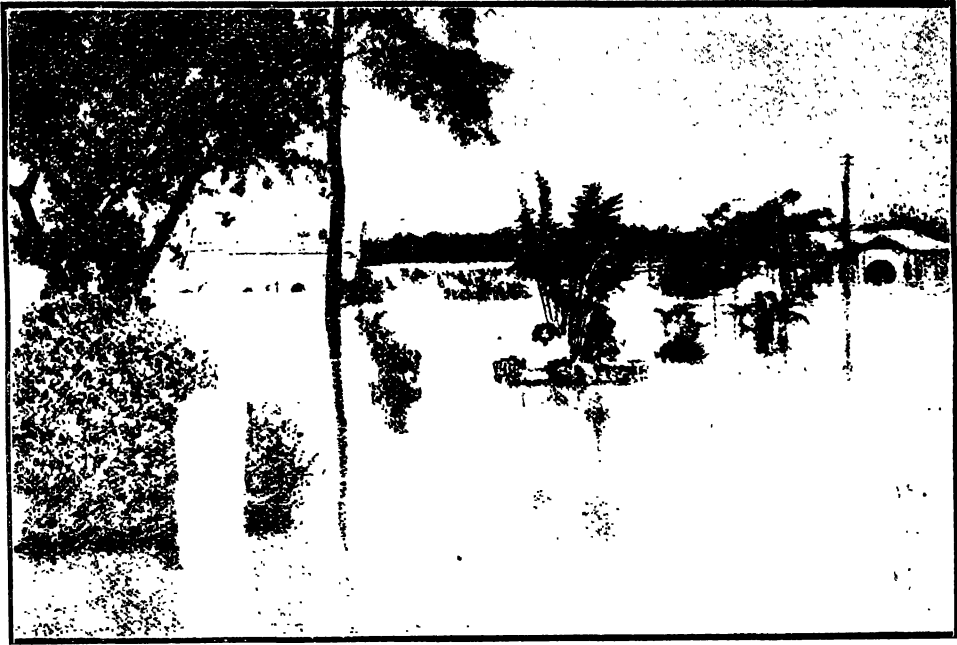
"বন্যায় লোকের যথাসর্ব্বস্ব ভাসাইয়া নিয়া গিয়াছে। তাহাদের যে সামান্য মূলধন ছিল তাহাও এতদিনে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ঘর-দরজা বাসোপযোগী করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে অনেক দিনের প্রয়োজন। কি করিয়া তাহাদিগকে এতদিন বাঁচান যায় তাহাই বিবেচ্য। মহাজনরাও সময় বুঝিয়া অত্যাচারের মাত্রা দিনদিনই বর্দ্ধিত করিতেছে। দুর্ভিক্ষ প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পিতামাতা ছেলেমেয়ের মুখ হইতে আহার্য্য কাড়িয়া খাইতেছে। গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া খাওয়া

ও শিশুবর্গ স্ব স্ব পরিজনবর্গ হইতে আজ বিচ্যুত এবং গৃহহীন।"

প্লাবন-সাহায্য সভার রিলিফকর্ম্মী শ্রীযুক্ত স্বদেশরঞ্জন দত্ত মহাশয় পাথারকান্দি হাতিখিরা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমন করিয়া যে বিবরণী দিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—

"এ অঞ্চলের বহু পরিবার আজ গৃহহীন। বহু গ্রামের অধিকাংশ ঘর-দরজা প্লাবনের মুখে ভাসিয়া গিয়াছে। নব-নির্ম্মিত রেল-পথের চিহ্নও নাই। কয়েকটি মৃত মনুষ্য-দেহ

আরম্ভ করিয়াছে। মহামারীও শীঘ্রই দেখা দিবে। এই সব বিপন্ন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে

বন্যা-আক্রান্ত গ্রামবাসিগণ রেলপথের পার্শ্বে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

সাহায্য করিয়াছেন তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। জনসাধারণ হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি শীঘ্রই দেখা দিবে। এখন এখানের জন্য প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ১২৫৲ মণ চাউলের একান্ত প্রয়োজন। গৃহশিল্প প্রচলন করার জন্য মূলধন স্বরূপ অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। এখানে পাটি, ধাড়িয়া, তাঁত, চরকা, মাছধরার জালবুনা, ধানভানা ইত্যাদি গৃহশিল্প প্রচলিত আছে। তাহা দ্বারা প্রায় অর্দ্ধেক লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে।”

এই ত গেল করিমগঞ্জ মহকুমার অবস্থা। কিন্তু ইহার তুলনায় কাছাড় জেলার অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ডাক ও তার-বিভাগ এবং রেলগাড়ী যাতায়াত বহুদিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকায় আমরা কাছাড় জেলার কোনও সঠিক সংবাদ পাই নাই। কিন্তু যে সব উড়ো সংবাদ আমরা পাইতে লাগিলাম, তাহাতে দুশ্চিন্তা ও ভয়ের অবধি রহিল না। যখন করিমগঞ্জ হইতে শিলচর ফেরী ষ্টীমার যাতায়াত আরম্ভ করিল, তখন হইতেই শিলচরের সহিত বহির্জ্জগতের যেন নূতন করিয়া পরিচয় আরম্ভ হইল। লোকমুখে প্লাবিত হেড়ম্বের যে মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিতে পাইলাম, তাহাতে করিমগঞ্জের বন্যা সে জেলার বন্যার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্রদ্ধেয় বান্ধব ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র দত্ত, এম-বির নিকট হইতে সহরের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলাম। তিনি আমার নিকট যে লিখিত বিবরণী প্রদান করেন তাহার প্রতিলিপি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।
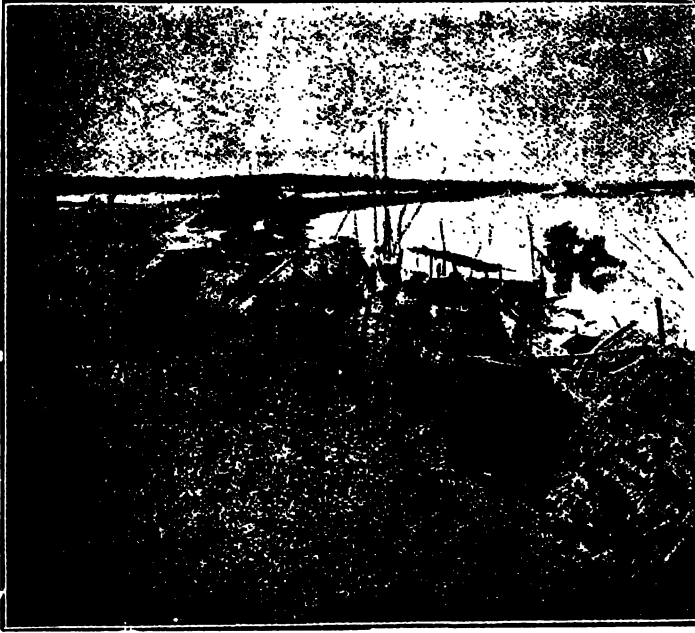
“শিলচরে পা দিয়াই মনে হইল এ যেন এক অজানা যায়গা। আশৈশব যেখানে লালিত-পালিত হইয়াছি, সেই নগরীর দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে চিনিয়া লইতে কষ্ট বোধ

শিলচর সেণ্ট্রাল রোডের একটি দৃশ্য।

হইল। মনে হইল সমস্ত নগরী যেন বন্যার জলে আকণ্ঠ স্নান করিয়া উঠিয়াছে। বহু গৃহের ছাদে কচুরী-পানা সংলগ্ন রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, বন্যার জল প্রত্যেক গৃহের ছাদ প্লাবিত করিয়া গিয়াছে। লোক জন সহরের উচ্চ স্থানে এবং দোতালাগুলিতে আশ্রয় লইয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। সহরের রাস্তাগুলির উপর দিয়া বড় বড় নৌকা এবং মোটর লাঞ্চ অক্লেশে যাতায়াত করিয়াছে। প্লাবনে কয়েকটি মানুষ ও বহু পশু মারা গিয়াছে। সুর্ম্মা উপত্যকার ঋষিতুল্য সাংবাদিক জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড় বিপন্ন। বন্যায় তাঁর আবাসস্থল ভীষণভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ দারুণ বিপদের সময় প্রায় একপক্ষ কাল পর্য্যন্ত ডাক ও তার চলাচল বন্ধ থাকায় এখানকার অবস্থা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ প্লাবিত শ্রীভূমি ও হেড়ম্বের অগণিত ক্ষুধিত জনসঙ্ঘ দেশবাসীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। গলিত পশুদেহের দুর্গন্ধে ও বিপন্নের কাতর ক্রন্দনে শ্রীভূমি ও হেড়ম্বের আকাশ বাতাস আজ দূষিত ও ভারাক্রান্ত। আজ তাহাদের জীবন-মরণ দেশবাসীর দান-শীলতার উপর নির্ভর করিতেছে।"

ছুটীর অবকাশে ছাত্রদের কর্ত্তব্য*

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

গ্রীষ্মের বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে তোমাদের আর তোমাদের শিক্ষক মহাশয়গণের সঙ্গে আমার যে দেখা হ'লো তাতে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ কর্‌লাম। গত দুই মাসে আমি বহু পথ পর্য্যটন ক'রেছি, প্রায় তিন হাজার মাইল ইতিমধ্যে আমার বেড়ান হ'য়েছে। কল্‌কাতা থেকে বম্বে ও বাঙ্গালোর হ'য়ে আবার কল্‌কেতায় ফিরেছি। বম্বে থেকে আবার কল্‌কাতায় আসা যাওয়া ক'রেছি। এ ছাড়া আমাকে আবার শরৎবাবুর অনুরোধে টাকী শ্রীপুর স্কুলে যেতে হ'য়েছিল। শ্রীপুরের শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে এখানকার সকলেই জানেন, তিনি হ'চ্ছেন ঐ স্কুলের সেক্রেটারী, আর আমি প্রেসিডেন্ট। এ ছাড়া আমাকে রংপুরে এবং বসিরহাটে যেতে হ'য়েছিল। এ দিকে আবার নৈহাটীতে তিন দিন ছিলাম, বাগেরহাট কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে চার দিন ছিলাম। এর পর আবার যেতে হবে বুধহাটা, আশাশুনি, সোদকণা প্রভৃতি যায়গায়। এই ভাবে ঘুরে ঘুরে আমি আর নিজের কাজে বেশী সময় দিতে পার্‌ছি না। যারা পরের চিন্তায় ব্যাকুল তাদের নিজের বিষয়ে এমনি হ'য়ে থাকে। কথায় বলে 'ঘরামির চালে খড় থাকে না।'

কতকগুলি বিষয় নিয়ে আমি কিছুদিন থেকে কাগজে পত্রে লিখ্‌ছি এবং সর্ব্বত্রই ব'লে বেড়াচ্ছি। আজ তোমাদের গ্রীষ্মের ছুটি হবে, দীর্ঘ এক মাস তোমাদের অবকাশ থাক্‌বে। তাই সেই সব বিষয়ের দু' একটী তোমাদের কাছেও বল্‌বো। বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই আমি বলে থাকি যে, কেবল স্কুলের পাঠ্যপুস্তক পড়ে সেই পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে আর কিছু হবে না। আর তা থেকে প্রকৃত লেখাপড়াও শেখা যায় না। জ্ঞানলাভ ক'র্‌তে হ'লে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ছাড়া বাইরের বইও অনেক পড়া চাই। তা না হ'লে তোমাদের শিক্ষা কিছুমাত্র ফলবতী হবে না। এই যে আই-এ, বি-এ পাশকরা ছেলেদের দেখ্‌তে পাও, যারা পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ ক'রে পাশ করে, তাদের প্রকৃত শিক্ষা প্রায় কিছুই হয় না। প্রকৃত জ্ঞান কিসে লাভ হ'তে পারে, সে চিন্তাও তাদের মনে আসে না। আজ একশ বছর এই ভাব চল্‌ছে। বাঙালীর ছেলের একমাত্র

* গ্রীষ্মের বন্ধ হইবার দিন রাড়ুলী কাটীপাড়া (খুলনা) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে প্রদত্ত মৌখিক উপদেশের সারাংশ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ, বি-টি, শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক অনুদিত

উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—পাশ ক'রে চাকরী কর্ব্বো,—যেন এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

কিন্তু পৃথিবীতে যত বড় বড় লোক জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁদের অনেকেরই এমন কি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যাবারও সুবিধা বা অবসর ঘটে নি। তাঁদের দু'একজনের নাম তোমাদের কাছে ক'র্ব্বো। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লে বুঝ্‌তে পার্ব্বে যে নিজের চেষ্টা এবং যত্নের দ্বারা মানুষ জীবনে কিরূপ সাফল্য লাভ ক'র্ত্তে পারে। পৃথিবীর বিখ্যাত মনস্বিগণের অনেকেই নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন।

তোমরা গ্রামোফোন দেখেছ এবং তার গানও শুনেছ। এখানে তোমরা বহু ছাত্র উপস্থিত আছ। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয় তো এই গ্রামোফোনের আবিষ্কর্ত্তার নাম জান না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস্ এডিসন্ এই গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন।

তিনি এক দরিদ্র বিধবার পুত্র। বাল্যকালে তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এরূপ ক্ষুণ্ণ ছিল যে বিদ্যালাভ করিবার কোন সুযোগই তিনি পান নাই। ছেলে বেলায় তাঁর মা তাঁকে পাঠশালে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর বুদ্ধি-শুদ্ধি দেখে তাঁর গুরু মশায় আবিষ্কার ক'ল্লেন যে তাঁর মাথার মধ্যে গোময় ভিন্ন অন্য কিছু নেই। এবং লেখা-পড়া শেখা সেরূপ হাঁদা ছেলের কর্ম্ম নয়। তাঁকে পাঠশাল ছাড়তে হ'লো। এর পর এডিসন রেলওয়ে ষ্টেসনের ধারে ফেরিওয়ালার কাজ কর্ত্তেন। তার পর তোমরা দেখ যে নিজের চেষ্টা এবং যত্নের দ্বারা কিরূপে তিনি এইরূপ আশ্চর্য্য আবিষ্কার ক'রেছেন; বিজ্ঞান-জগতে 'যাদুকর' ব'লে খ্যাতিলাভ ক'রেছেন। এ তো গেল বড় বৈজ্ঞানিকের কথা।

তার পর দেখা যাক্ বর্ত্তমানে পৃথিবীর সব চেয়ে ধনী ব্যক্তিকে। পূর্ব্বে ছিলেন 'রক্‌ফেলার'। আর এখন যিনি শ্রেষ্ঠ ধনী তাঁর নাম হেনরি ফোর্ড। ফোর্ডও ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। বাল্যে হেনরিকে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠান হ'লো, তাঁর শিক্ষকগণও তাঁকে একটী গর্দ্দভ ব'লে সাব্যস্ত ক'র্‌লেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, স্কুলের শিক্ষা ফোর্ডের কিছুই হয় নাই। চোদ্দ বছর বয়সের সময় হেনরিকে তাঁর পিতা জমাজমির কাজ দেখতে বল্‌লেন; কিন্তু হেনরির সে কাজ পছন্দ হ'লো না। তিনি তাঁর পিতার নিকট তাঁর অনিচ্ছা জ্ঞাপন ক'রে ব'ল্‌লেন, "বাবা, আমাকে কোন বৈদ্যুতিক কারখানায় শিক্ষানবিশী ক'র্ব্বার ব্যবস্থা ক'রে দেও।" পিতা পুত্রের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁকে এক কারখানায় ঢুকিয়ে দিলেন। সেই হেনরি ফোর্ডের বিশাল কারখানা আজ জগৎ-বিখ্যাত। পৃথিবীর অনেক দেশেই তাঁর মোটরের কারখানা স্থাপিত হ'য়েছে, প্রতি দিন চার হাজার মোটর এই সব কারখানা থেকে তৈরী হ'য়ে বেরুচ্ছে। তাঁর ধন আজ অপরিমেয়। গড়ে তাঁর বার্ষিক আয় ত্রিশ চল্লিশ কোটী টাকা—অর্থাৎ দৈনিক দশ লক্ষেরও অধিক। আমাদের এই সমগ্র জেলাটার ভিতর, তাই বা কেন, সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বোধ হয়—আর বোধ হয় কেন, এমন একজন জমিদারও নেই যার বার্ষিক আয় দশ লক্ষ টাকা। তা হ'লে তোমরা দেখ, যে বালককে পাঠশালে পণ্ডিত মশায়রা গর্দ্দভ ব'লে নির্দ্দেশ ক'রেছেন, তিনি আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী।

এ প্রসঙ্গে তোমাদের কাছে আমি আর একটী লোকের নাম ক'র্ব্ব। তাঁর নাম হচ্ছে চার্লস সিক্রুক। ইনিও স্কুলের পাঠ্য পুস্তক প'ড়ে লেখা-পড়া শিখেন নাই। পাঁচ বছর বয়স থেকে চার্লি ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করেন। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি একজন জোয়ানের কাজ ক'র্ত্তে পারতেন। বাল্যকাল থেকেই তরী-তরকারীর ক্ষেতে কাজ ক'র্‌তে ভালবাস্‌তেন। এখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। তাঁর ক্ষেত হ'তে উৎপন্ন তরীতরকারী বছরে বিক্রী হয় প্রায় পনর লাখ টাকার। আমরা কি চেষ্টা কর্‌লে পনর হাজার টাকার জিনিষও উৎপাদন করতে পারি না? তোমরা হয় তো বলবে যে, তিনি কলেজে পড়ে কৃষি বিদ্যা লাভ করে এরূপ ক'র্‌ছেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি কোন স্কুল কলেজে প'ড়ে শিক্ষালাভ করেন নি। নিজে নিজের ক্ষেতে কাজ কর্ত্তেন আর অবসর সময়ে কৃষিবিদ্যা বিষয়ক নানাবিধ পুস্তক প'ড়তেন। কিছু দিন চাষ-আবাদের পর চার্লি দেখলেন যে, জমিতে নিয়মিত ফসল উৎপাদন ক'র্ত্তে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত সার দেওয়া দরকার। নিয়মিত সার না পড়লে ক্রমে ক্রমে জমির উৎপাদন-শক্তি নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই তিনি এক এক একর অর্থাৎ তিন তিন বিঘা জমিতে প্রায় দুশ টন (২৮ মণে এক টন) সার দেন। চার্লস কৃষি কার্য্য ক'রে এরূপ উন্নতি লাভ ক'রেছেন,

ক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন ক'রেছেন। আমাদের দেশে এক বছর বৃষ্টি না হ'লে আমরা মারা যাই। হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার এই দোষ। বেহারে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এবং আরও অনেক স্থানে ক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য গুরুতর পরিশ্রম ক'রতে হয়। আমরা যদি পরিশ্রম না করি, কেবলমাত্র অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে নিরুদ্বেগে ব'সে থাকি, তবে আমরা অন্নহীন হবো না তো হবে কে? আবার কেবল লোকজনের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাক্‌লে কৃষি কাজ হয় না। লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও খাটতে হবে। সেই জন্যে কথায় আছে—খাটে খাটায় পূরো পায়। না হ'লে সুযোগ পেলেই তারা কাজে ফাঁকি দেবে,—কথায় বলে 'বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর'।

তোমরা হয় তো বল্‌বে আমাদের দেশে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতেই প্রচুর দ্রব্য প্রস্তুত হ'তে পারে, এ আমি নিজে দেখেছি। পল্‌তায় আমাদের এনামেলের কারখানা আছে। সেখানে একটা লাউ গাছ হ'য়েছিল, তাতে প্রায় ২০০ লাউ হ'য়েছিল। এরূপ ঘটনা বিরল নয়। এ ছাড়া বারাকপুরে দেখেছি যে ছোট ছোট জমিতে তরিতরকারি ক'রে সেখানকার কোন কোন পশ্চিমা শ্রমজীবী বেশ গৃহস্থ হ'য়ে উঠ্‌ছে। তারা এই সব জমিতে ঝিঙে, উচ্ছে, কাঁকুড়, পটল, বেগুন প্রভৃতি নানা প্রকার তরিতরকারি প্রস্তুত করে, এবং ক'ল্‌কাতায় অথবা ঐখানেই পাইকারের নিকট বিক্রয় করে। বছর বছর তারা জমিতে সার দেয়। জাপানে এই সার অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। জাপানে কৃষকেরা গৃহস্থের বাটী থেকে মলমূত্র অতি যত্নের সঙ্গে নিয়ে যায়। এছাড়া গোবর, ঘোড়ার মল তো আছেই। চীনেও এরূপ চল্‌ছে। আর যদি তোমরা কৃষিবিদ্যার কথা তোলো তাহ'লে আমি বল্‌বো যে, যাঁরা যাঁরা এ পর্য্যন্ত সরকারী ব্যয়ে বিদেশে গিয়ে এ বিদ্যা অর্জ্জন ক'রেছেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁরা কিছুই ক'র্ত্তে পারেন নি।

এ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত। তোমাদের ভেতর যারা খবরের কাগজ পড়, তারা বর্ত্তমান চীন সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত আছ। এই চীন একটা মস্ত দেশ। এ দেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটী। এ যাবৎ চীন আমাদেরই মত পরপদানত ছিল। কিন্তু এখন সে তার তিন হাজার বছরের জড়তা দূর ক'রে পৃথিবীর বুকে সদর্পে মাথা উঁচু ক'রে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে তরুণ চীন দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। এখন দেখা যাক্, কি ক'রে চীন এতখানি উন্নতি লাভ ক'র্‌লে। চীনে বিভিন্ন ধর্ম্মের বহু লোক বাস করে। চীনের অধিবাসী মুসলমানের সংখ্যাই প্রায় এক কোটী। কিন্তু এই সকল বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে 'ছুৎমার্গ' ব'লে কোন কুসংস্কার নেই। কিন্তু এ জিনিষটা আমাদের উন্নতির পথে একটা মস্ত বিঘ্ন। আর আমাদের দেশের ব্রাহ্মণেরাই বেশী গোঁড়া। তাঁরা যখন মুসলমানের হাতে প্রস্তুত গোলাপ জল, কেওড়া জল, লেমনেড, সোডা পান করেন, তখন তাঁদের জাতি বিচার থাকে না। কিন্তু যদি কোন নমঃশূদ্র ঘরের চৌকাঠ মাড়ায়, তা' হ'লে বিশ হাত দূরের খাদ্য তাঁদের নিকট অস্পৃশ্য হ'য়ে যায়। জানি না হিন্দুশাস্ত্রের কোথায় এরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে। হাঁ, চীনের কথা বল্‌ছিলাম। এ যাবৎ গৃহবিবাদই চীনের সমস্ত অবনতির মূল কারণ ছিল। কিন্তু চীন এক্ষণে নববলে বলীয়ান হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। চীনের এই একতা এবং উন্নতির প্রধান কারণ চীনের যুবক ও ছাত্রসঙ্ঘের অক্লান্ত চেষ্টা। দেশের সাধারণ লোকের অজ্ঞতা দূর করবার জন্য চীনের 'যুবকসঙ্ঘ' উঠে পড়ে লেগেছে। এই যেমন তোমাদের গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুল বন্ধ হ'চ্ছে, সেই রকম চীনে যখন সময় সময় স্কুল কলেজ বন্ধ হয়, তখন কলেজের ও স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা দলে দলে নিজের নিজের গ্রামে ফিরে গিয়ে পাঠশালা খুলে বসে। এই সব পাঠশালে হাজার হাজার চীন বালকবালিকা লেখাপড়া শিখে। এ ছাড়া তারা নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করে। এবং বয়স্ক লোকেরাও কলেজের ছেলের নিকট লিখ্‌তে পড়্‌তে শেখে। চীন-জাপান যুদ্ধে চীন যখন তার দুর্ব্বল অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌লে, তখন প্রথমে প্রায় ১০।১৫ হাজার ছাত্র চীন থেকে বেরিয়ে বিদেশে শিক্ষালাভ ক'রে ফিরে এলো। তার পর থেকে এই ভাবে চীনে জ্ঞানের বিস্তার হ'চ্ছে। যে সব ছাত্র দেশের ভেতর গিয়ে লোককে লেখাপড়া শিখায়, তারা সহর থেকে যাবার সময় সঙ্গে কিছু কিছু মনোহারী দ্রব্যাদি নিয়ে যায়। সেই সব সামগ্রী বিক্রী ক'রে তারা তাদের জীবিকার সংস্থান করে। এই ভাবে

তোমরাও দেশের যথেষ্ট কাজ ক'র্ত্তে পার। যারা উচ্চশ্রেণীর ছাত্র তারা নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সহজে লেখাপড়া শেখাতে পার। মাঝে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। ঢাকা সহরে প্রায় ১১টী হাই স্কুল আছে। তা ছাড়া কলেজের ছাত্র ২০০০এর বেশী হবে। এই সব স্কুলের প্রত্যেকটীতে গড়ে প্রায় চারশত ছাত্র আছে। সর্ব্বসমেত প্রায় সাড়ে চার হাজার ছেলে পড়ে। তাদের ভেতর নীচের চার ক্লাস বাদ দিয়ে ধর্ল্লি বাইশশ'। এই বাইশশ' ছেলে গ্রীষ্মের বন্ধে একটু দিনে কম ঘুমিয়ে এবং পূজার ছুটিতে কম আমোদ ক'রে, দলে দলে ভাগ হ'য়ে গিয়ে দেশের ভেতর যদি এমনি ভাবে ছোট ছোট বালক বালিকাদের লেখাপড়া শেখায়, তা হ'লে কি ব্যাপার হয় ভাব দেখি। আর এমনি ক'র্লে সাম্প্রদায়িক বিবাদও অনেক কমে আসে, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কি আর বল্‌বো—এ বিষয়ে আমাদের মুসলমান ভাইরাও বিশেষ পশ্চাৎপদ। তোমরা যদি রোজ নয় ঘণ্টা ক'রেও ঘুমাও, তাহ'লেও কাজ ক'র্ব্বার ও পড়বার যথেষ্ট সময় থাকে। এই যে টেনিশ ফুটবল তোমরা খেল, এসব বিলিতি খেলা আমাদের মত গরীব লোকের শোভা পায় না। তোমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে,—তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে কিছু না কিছু জমী জমা আছে। তোমরা যদি সেখানে দু'টো তরকারীর বীজও পোঁত, কোদাল হাতে কাজ কর, তা হ'লে তোমাদের সংসারের কত আসান হয়। কেউ কেউ অবশ্য আজ কাল কিছু কিছু কর্‌ছে; কিন্তু তেমন আশাপ্রদ কাজ কর্ম্ম কারুরই দেখা যায় না। তোমরা সব এই দীর্ঘ ছুটীতে যতদূর সম্ভব এই সব কাজ ক'র্ব্বে। আমি পূর্ব্বে বলেছি এবং আবার বল্‌ছি যে কেবল স্কলারশিপ্ আর মেডেল পেলেই চল্‌বে না। তোমাদের উদ্দেশ্য হবে মানুষ হওয়া,—স্কলারশিপ্ এবং মেডেল পাওয়া নয়।

প্রশ্ন

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ীর নীচের তলাটা খালিই পড়িয়া ছিল। ভাড়া দেব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে দিতে হইল।

দিলাম শুধু স্ত্রীর অনুরোধে।

স্ত্রী বলিলেন—তুমি বেরিয়ে যাও, আমি একা থাকি। ভাল মেয়েমানুষ ভাড়াটে যদি পাওয়া যায় ত' মন্দ কি?

পরামর্শ মন্দ নয়।

সেই দিন হইতে ভাড়াটের খোঁজে লাগিলাম। স্ত্রী বলিলেন—মোটা একটি কাগজে লিখে দড়ি দিয়ে জানালায় ঝুলিয়ে দাও না, সেই যেমন দেয় অন্য লোকে।

বলিলাম—তা হ'লে ত' পুরুষ মানুষ আসবে। তুমি চাও মেয়ে ভাড়াটে, তারা কি অত সব পড়তে জানে?

সুতরাং স্ত্রীর সে প্রস্তাব টিকিল না।

সেদিন বাড়ী ফিরিয়া শুনি, স্ত্রী বলিলেন—এসেছিল দুটি মেয়ে মানুষ; কিন্তু বাপু কাশীর মেয়ে, আমার কি জানি কেমন-কেমন মনে হ'ল।

—কি বলে বিদেয় করলে?

—বল্‌লুম, বাবু বাড়ী নেই, কাল আস্‌বেন!

কিন্তু তাঁহারা আর আসিলেন না।

যাই হউক, সন্ধান চলিতে লাগিল। জানালার কাছে বসিয়া থাকি। আমার বাড়ীর দিকে তাকাইয়া পথ-যাত্রী কেহ পার হইয়া গেলেই ভাবি, বুঝি বাড়ীর সন্ধান করিতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় না, কেমন যেন লজ্জায় বাধে।

অবশেষে ভাড়াটে মিলিল।

সেদিন সন্ধ্যায় তেমনি জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছি, নীচে আমার সদর-দরজার সুমুখেই মনে হইল, কাহারা যেন ফিস্-ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে। উঁকি মারিয়া দেখি, ভাল দেখা গেল না; শাড়ীর কিয়দংশ দেখিয়া মনে হইল হয় ত বা কোন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু গলার আওয়াজে টের পাইলাম, সহযাত্রী বোধ করি কোন পুরুষ। আমার দরজায় দাঁড়াইয়া উভয়ের বচসা

বাধিয়াছে। এ বলিতেছে—তুমি ডাকো না?—ও বলিতেছে—তুমি ডাকো!

অবশেষে স্ত্রীলোকটি বোধ করি রাগ করিয়াই বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা মানুষ ত', পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মেছো কি জন্যি? না, আমি তবে চল্লুম, পারবো না ডাক্‌তি, মরো তুমি!

অভিমান-ক্ষুব্ধস্বরে পুরুষটি বলিয়া উঠিল—বটে, 'মরো তুমি' বল্লে? ও-কথা বল্‌তি আছে বুঝি? আমি বলেছিলাম কি—আহা, হা এ কথাটা বুঝতি পারলে না? যদি কোন স্ত্রীলোক থাকেন, আমি পুরুষ মানুষ—ডাকাটা কি উচিত?

এবার ভাবিলাম, আমার আর চুপ্ করিয়া থাকাটা উচিত হয় না। ডাকিলাম—কে?

থতমত খাইয়া পুরুষটি জবাব দিলেন—এই আমি—শ্রীশম্ভুনাথ সেন, কবিরত্ন, কাব্যভূষণ। একবার আসবেন নীচে?

কবিরত্ন! কাব্যভূষণ!

ভাবিলাম, ব্যাপার কি? নীচে গিয়া শুনি, ভদ্রলোক বিদেশী, বাড়ী যশোর, সস্ত্রীক কাশীবাস করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু এমন এক অভদ্র স্থানে গিয়া উঠিয়াছেন, যেখানে যুবতী স্ত্রী লইয়া বাস করা অসম্ভব। যাক্—সে সব অনেক কথা। সম্প্রতি তিনি কোন ভদ্রলোকের আশ্রয়ে উঠিয়া আসিতে চান।

স্ত্রী তাঁহার রাস্তার উপরেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলাম—ওঁকে নিয়ে আপনি ভেতরে আসুন, আমার স্ত্রী আছেন, ওঁকে ওপরে পাঠিয়ে দিন।

ভিতরে আসিলেন। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি ব্রাহ্মণ?

বলিলাম—হ্যাঁ!

তৎক্ষণাৎ কাব্যরত্ন, কাব্যভূষণ মহাশয় হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া আমার পদধূলি মাথায় লইলেন, স্ত্রীর দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—যাও না, ওপরে যাও না, প্রণাম করো কিন্তু, পায়ের ধূলো নিও!

তাঁহার স্ত্রী উপরে উঠিয়া গেলে তাঁহাকে নীচের ঘরগুলি দেখাইলাম। ঘর দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, বুঝিলাম, যিনি উপরে গিয়াছেন তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে মত দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

বলিলেন—স্ত্রী আমার অত্যন্ত সচ্চরিত্রা, সদ্‌গুণসম্পন্না, অত্যন্ত মৃদু কোমল স্বভাবা। আপনার গো ডর পাতি হবে না।

ভাবিলাম—কাব্যরত্নই বটেন্।

উপরের দিকে তাকাইয়া তিনি মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন——আস।

স্ত্রী নীচে নামিয়া আসিলেন।

আমার স্ত্রী সঙ্গে আছেন, সুতরাং তাঁহাদের ঘর দেখিতে বলিয়া আমি উপরে উঠিয়া গেলাম।

আরও প্রায় মিনিট পনের কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল, ঘর তাঁহারা লইলেন এবং আগামী কল্য সকালেই এখানে তাঁহাদের শুভাগমন হইবে। যাইবার সময় কাব্যরত্ন মহাশয় আর আমার পদধূলি গ্রহণ করিলেন না বটে, নমস্কার করিয়া বলিয়া গেলেন---আজ্ঞ তা'হলে আসি।

বিদেশ হইতে আসিয়াছেন, লট-বহরের বালাই নাই। না আছে পুত্র, না আছে কন্যা; স্ত্রী এবং নিজে। দু'জনে ধরাধরি করিয়া পথের উপর দিয়া বহুলোকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে টীনের একটি বড় তোরঙ্গ আনিয়া রাখিলেন। পরে স্ত্রীকে তাঁহার বাক্সের উপর বসাইয়া রাখিয়া হাঁড়ি, কলসী, উনান ইত্যাদি যৎসামান্য জিনিস-পত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেই বহন করিয়া আনিলেন।

উপরে বসিয়া ছিলাম। কাব্যরত্ন মহাশয়ের কণ্ঠস্বরে সহসা চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখি, তিনি উপরে উঠিয়া আসিয়াছেন, বলিলেন—আমরা আসছি, আপনাদের বলি গেলাম।

বলিয়াই ত্বরিৎপদে তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

এতদিন এ বাড়ীতে একাকী স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিয়াছি। আজ নীচে নামিতে গিয়া দেখি কলের নীচে বালতি লইয়া কাব্যরত্ন মহাশয়ের স্ত্রী জল ধরিতেছিলেন; তৎক্ষণাৎ আমায় উপরে উঠিয়া আসিতে হইল। স্নান করিতে গিয়া দেখি, কাব্যরত্ন মহাশয় গামছা লইয়া পা ঘষিতেছেন; সুতরাং আমার আর স্নান করা হইল না। এমনি নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন সুবিধা অসুবিধার মধ্যে দিন চলিতে লাগিল।

ভাবিয়াছিলাম, ভালই হইল, আমাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের হউক অসুবিধা, আমার স্ত্রী হয় ত আর একটি

স্ত্রীলোকের সাহচর্য্য লাভ করিয়া খুশী হইবেন ; কিন্তু প্রথম দিন কতক দেখিলাম, বৈকালে যে সময়টায় আমি বাহির হইয়া যাই, ঠিক সেই সময়ে তিনিও সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে সান্ধ্য-ভ্রমণে বহির্গত হন।

সেদিন দুপুরে আমি আমার দোতলার ঘরে বসিয়া আছি, স্ত্রী হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া পাশের দেওয়ালের সঙ্গে এক হইয়া গিয়া ঘোম্‌টা টানিলেন। ব্যাপার কি !

দেখি, দরজায় গলার শব্দ করিয়া কাব্যরত্ন মহাশয় উপস্থিত ! হাসিয়া কহিলেন, ব্যাঘাত ঘটালাম। আমায় একটা বই-টই দিন—যাহোক কিছু। সময় আর কাট্‌তি চায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বই ?

যা হোক কিছু। যাতে জ্ঞান পাতি পারি।

জ্ঞান পাইবার মত পুস্তক কিই-বা আছে! নভেল ছিল একখানা, তাহাই দিলাম। তার পর প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা এবং দুপুর আমার নীচেকার ঘরখানি তাঁহার কল-গুঞ্জনে সর্ব্বদাই মুখরিত হইয়া থাকিত।

ভাগবৎ পাঠ কিম্বা এমনি একটা কিছু হইতেছে ভাবিয়া, জানালার ধারে বসিয়া দেখিতাম ; রাস্তার লোক প্রায়ই এই ঘরের সুমুখে একবার দাঁড়াইয়া জানালার পথে উঁকি মারিয়া যাইতেছে। নিজে শুনিলাম, স্ত্রীকে ডাকিয়া শুনাইলাম। স্ত্রী ত' তাঁহার পড়া শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির।

বলিলাম—চুপ্! ভদ্রলোক জ্ঞান পাইতেছেন, আর তোমরা বিশ্বশুদ্ধ লোক যদি তাঁহাকে অমনি করিয়া জ্বালাতন কর তাহা হইলে আর কেমন করিয়া চলে।

তিন দিন পরে বইখানি তিনি ফেরৎ দিয়া বলিলেন—আর একখানি বাবু!

জিজ্ঞাসা করিলাম—কেমন বই ? জ্ঞানটান্ পেলেন কিছু ?

ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন—আজ্ঞে না, ই ত' নভেল, জ্ঞান পাতি হলি অন্য পুস্তক পাঠ করা উচিত। তা ইটা মন্দ না,—বলিয়া তিনি সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়াই গল্পটির প্রায় আগাগোড়াই আমায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—একটা ছুরী বার হইয়া আইছিল একটা ছোরার সঙ্গে, তার পর হেনা তেনা হাবি-জাবি অনেক কর্ম্মই ত' করল ; কইরা শ্যাষখানে মরল মাগী গঙ্গায় ঝাপ দিয়া। উচিত কর্ম্মই করল। তার পর আর কি করল, ভাসি ভাসি কোথায় গিয়ি লাগ্‌ল, না ডুবি মরল, আর কিছু পাত্তাই ত' পাওয়া গেল না।—

বলিয়া হতাশ হইয়া ভদ্রলোক আমার মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন—সত্যি কথা বল্‌তি কি, গঙ্গায় যখন ঝাপ্ দিল মেয়েটা, তখন আমি কাঁদি ফেল্‌ছি।

ঘরের মধ্যে স্ত্রীর হাসির শব্দ পাইয়া আর একদিন বই দিব বলিয়া তাঁহাকে তখন বিদায় করিলাম।

পরে শুনিলাম, তিনি না কি এখানে কবিরাজি করিবেন এবং গত কয়েক দিন হইতে তাহারি আয়োজন চলিতেছে। সাইন্‌বোর্ড লিখিতে দেওয়া হইয়াছে। ঔষধপত্র জোগাড় করিতেছেন। শীঘ্র একখানা হ্যাণ্ডবিল্ ছাপিতে দেবেন এ কথাও আমাকে বলিলেন। বলিলেন, একটা কিছু কাজ কর্ম্ম করি খাতি হবে ত, কি বলেন ?

বলিলাম—নিশ্চয়ই।

স্ত্রী তাঁহার কবিরাজির কথা শুনিয়া বলিলেন—কবরেজি উনি করবেন কখন, ওঁর সময় কোথায় ?

জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন ?

তিনি আর কোন কথা না বলিয়া নীচে উঠানের উপর আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইয়া কহিলেন—ঐ ত' করছেন চব্বিশ ঘণ্টা! দেখিলাম—কাব্যরত্ন মহাশয় উঠানের মাঝখানে উবু হইয়া বসিয়া মাছ বাছিতেছেন। ব্যাপারটা এতদিন লক্ষ্য করি নাই। এইবার প্রায় প্রত্যহই দেখিতে লাগিলাম কাব্যরত্ন মহাশয় যে শুধু কাব্যেই সুপণ্ডিত তাহা নয় ; ঘর-কন্নার কাজেও হাত তাঁহার পাকা। কখনো দেখি, বাজার হইতে ফিরিয়া বঁটি লইয়া তরকারী কুটিতে বসিয়াছেন, কখনো দেখি বাসন মাজিতেছেন, কখনো বা দেখি রীতিমত হাতাখুন্তি হাতে লইয়া মাথায় গামছা জড়াইয়া তিনি রন্ধন-কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

সত্যই ত, ভদ্রলোকের কবিরাজি করিবার সময় কোথায় ?

সেদিন দেখি, আমাদের নীচের তালায় সাড়াশব্দ কিছুই নাই। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি ?

স্ত্রী বলিলেন—কই! কিছুই ত' নয়।

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—না, তুমি দেখে এসো !

কল হইতে জল আনিবার নাম করিয়া স্ত্রী দেখিয়া আসিলেন। আসিয়া বলিলেন—দু'জনেই ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে আছেন। একজন তক্তপোষের ওপরে; একজন নীচে মাদুরে। ব্যাপার একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছুই ত' বুঝিলাম না।

কিয়ৎক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া স্ত্রী আবার আমার কাছে আসিয়া বলিলেন—দেখই না জিজ্ঞেস করে ?

ডাকিলাম—শম্ভু বাবু !

এক ডাকে সাড়া পাইলাম না। দু'তিন ডাকের পর কাব্যরত্ন মহাশয় জবাব দিলেন—কি বল্‌তিছেন ?

বলিয়া বাহিরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াই উপরের দিকে তাকাইলেন।

বলিলাম—শুনুন্।

উপরে উঠিয়া আসিয়া আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন তাহা সত্যই নিদারুণ। নিতান্ত কাঁদো কাঁদো মুখে অত্যন্ত কাতর হইয়া তিনি জানাইলেন যে, গত রাত্রি হইতে স্ত্রী তাঁহার অসুস্থ, মাথা ধরিয়া জ্বর হইয়াছে, এখনো পর্য্যন্ত উঠিতে পারেন নাই। এই পর্য্যন্ত।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি খাবেন না ?

জবাবে তিনি প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—আজ্ঞে না, আপনি জানেন্ না ত' ওর জ্বর কেমন; বাবারে! ক্ষ্যাপা জ্বর মশাই, আজ সারা দিনের মধ্যে জলটুকুন পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারব না।

—আর আপনি ?

—আমি যাহা হউক কিছু এমনি দুটি—বলিয়াই চুপ্ করিয়া উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

বলিলাম—আমার এখানেই খাবেন চারটে।

ঘাড় নাড়িয়া, হাত যোড় করিয়া তিনি অস্বীকার করিলেন। বলিলেন—মাপ্ করবেন্ দাদা, ওটি হচ্ছে না ·· বলিয়াই তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া উঠিলেন। সারাদিন দেখিলাম তাঁহারা শুইয়াই কাটাইয়াছেন। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতেই দেখি—কাব্যরত্ন মহাশয় দরজায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া।

জিজ্ঞাসা করিলাম—স্ত্রী কেমন আছেন ?

—আছেন বেঁচে—বলিয়া ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকাইয়া তিনি অন্ধকার পথের উপর আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বলিলেন—কথাবার্ত্তা হয়নি সারাদিন, বুঝলেন ?

বলিয়াই গলা খাটো করিয়া নিতান্ত চুপি চুপি আমার মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন—তবে শুন্‌বেন আসল কথাটি, রাগ করছেন !

সর্ব্বনাশ! এমন রাগও ত' কখনো দেখিনি! সমস্ত দিন খাওয়া নাই দাওয়া নাই, রাগ করিয়া অমনি আগাগোড়া মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছেন !

ইহা যে কেমন করিয়া সম্ভব কে জানে ?

তিনি আরও বলিলেন—বল্‌ব আপনাকে একদিন।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। নীচে হঠাৎ চীৎকার সুরু হইল। ঘরে যেন ডাকাত পড়িয়াছে। জাগিয়া উঠিয়া শুনি, কাব্যরত্ন মহাশয় এবং তাঁহার স্ত্রীর ঝগড়া সুরু হইয়াছে। ভীষণ ঝগড়া। বৌ কাঁদিয়া কাঁদিয়া কি যেন বলিতেছে, আর কাব্যরত্ন মহাশয় রুখিয়া রুখিয়া তাহার জবাব দিতেছেন। ঝগড়ার সময় ঐ দেশীয় ব্যক্তিদের কথা যে এত বেশী দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে, জানিতাম না। ভাবিলাম নীচে নামিয়া গিয়া ঝগড়া মিটাইয়া দিয়া আসি। স্ত্রী বলিলেন—হাঁ যাও, আর জেনে এসো কিসের ঝগড়া। বাবা! জ্বর-গায়ে মানুষ এত চেঁচাতেও পারে!

হাতে লণ্ঠন লইয়া জুতা পায় দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতেছিলাম। আমার পায়ের শব্দ পাইয়াই বোধ করি কাব্যরত্ন মহাশয় সশব্দে দরজা খুলিয়া এদিকের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়াই কহিলেন—আসবেন না মশাই, এখানে আমাদের একটুখানি প্রাইভেট্ হ'চ্ছে। নীচে কি আপনার কোন কাজ আছে ?

বলিলাম—না।

—তবে যান্।

কি করিব, বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল। কিন্তু এমন প্রাইভেট্ ত' জীবনে কখনো শুনি নাই। প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিতেই দেখি সেই অত প্রত্যুষে কাব্যরত্ন মহাশয় বাজার করিয়া আসিয়া উনান ধরাইয়া একটা বঁটি লইয়া আলু কুটিতেছিলেন। মুখে তাঁহার রাগের কোন চিহ্নমাত্র

নাই। হাসিয়া বলিলেন—কাল থেকে—বলিয়াই ইসারায় তাঁহার স্থূল উদর এবং শুষ্ক মুখ দেখাইয়া ছোট ছেলের মত হাত নাড়িয়া বলিলেন—নেই, তাই সকাল-সকাল।

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইতেছি, কাব্যরত্ন মহাশয় তাঁহার সেই কাল রংএর চটি যোড়াটি পায় দিয়া চাদর গায়ে দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন—যাই আপনার সাথে, কয়েকটা কথা আছে।

—কি কথা ?

—চলুন, পথে যাতি যাতি হবে না। গঙ্গার ধারে এক যায়গায় নিরালায় বসি কইব। কাল আপনি রাগ করেছেন ?

বলিলাম—না।

গঙ্গার ধারে নিরালায় গিয়া বসিতেই তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আমার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন! হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিলাম, কিছুতেই তিনি শুনিবেন না। বলিলেন—প্রথমে বলুন, আমার কথা শুনে আপনি আমায় তাড়িয়ে দেবেন না ত' ?

বলিলাম—তাড়াবার কি আছে ?

তিনি বলিলেন—আছে, কিন্তু দোহাই বাবু, আপনার পায়ে ধরছি।

বলিয়াই তিনি আরম্ভ করিলেন—ভেবে দেখলাম, আর আপনার কাছে লুকিয়ে রাখা চলে না দাদা!—এই যে দেখছেন, আমার স্ত্রী—উনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, সদ্বংশের মেয়ে—আপনাদেরই জাত। আমাদের দেশের এক ঘর ভদ্র গৃহস্থের ঘরের মেয়ে। ওর শাশুড়ীর অসুখের আমি চিকিৎসা করতে যাই।"

একটুখানি থামিয়া বলিলেন—আমার সঙ্গে মেয়েটার কেমন করে ভাব হলো জিজ্ঞেস করতিছেন ?—সে সব অনেক কথা বাবু—আর একদিন বলব। আজ আর বেশী কিছু বলছি না। মেয়েটির সঙ্গে আমার ভাব হলো, আলাপ হলো, পরিচয় হলো, কথা-বার্ত্তা পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গেল যে আমরা পালাব।—বাস্। একদিন রাত তখন অনেক। চুপি চুপি আমরা ঠিক চোরের মতন বাড়ী ছাড়ি চলে' এলাম। এলাম প্রথমে একটা শহরে, তার পর—কাশী। দেখলাম, আমাদের জন্যি কাশীই উপযুক্ত যায়গা। কিন্তু এসেছি ত আজ দু'বচ্ছর। এমন ঝগড়াঝাঁটি আমাদের হতো না। বড় সুখেই ছিলাম বাবু। হলো শুধু একটা ছেলের জন্যি! বলিয়া তিনি চুপ করিয়া গঙ্গার দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ছেলেটা বুঝি পিছু লেগেছিল ? একটু সাবধানে থাকবেন মশাই। কাশী বড় খারাপ যায়গা।

কাব্যরত্ন মহাশয় হাসিলেন। সে বড় নীরস হাসি। বলিলেন—পিছু কেউ লাগেনি দাদা! ছেলে ছেলে—পেটের সন্তান একটা চায়। সে ত ভগবানের হাত, কি বলেন ? 'ও বলেছে আমি আর এমন করি' থাকব না, আমার ভাল লাগ্‌ছে না, আমি চলি যাব।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন ?

—কাঁদে। বলে, 'আমার এখানেও যা সেখানেও তা। সেখানে ভাল ছিলাম।'

—মশায়! এই কথাডা আমি সহ্য করতি পারি না। বলে কি না—ভাল ছিলাম! ভাল খুব ছিলি। বুড়ো হাবড়া স্বামী, ট্যাক্‌টেঁকে শাশুড়ী—যাক্! মাসের মধ্যে যখন তখন মশাই—অম্‌নি চুপ্ করে পড়ে থাক্‌বে, খাবে না রাঁধবে না, শুধু কাঁদবে আর ঝগড়া করবে। বলি—যা, তাই যা—তোর যেখানে খুসী! তখন ঝগড়া করে। বলে—যাব কোথা ? যাবার পথ কি আর তুই রেখেছিস্ পোড়ারমুখো! এখন কি করি বলুন ত' দাদা!

এই বলিয়া তিনি এমনি অসহায়ভাবে আমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন যে, আমি না পারিলাম তাঁহার উপর রাগ করিতে, না পারিলাম কথা কহিতে।

কাব্যরত্ন মশাই সস্ত্রীক এখনও রহিয়াছেন। ঝগড়াও হয়—দিনও চলে।

তবে মাঝে মাঝে নিতান্ত নিরুপায়ের মত কাব্যরত্ন মহাশয় আমায় যখন প্রশ্ন করিয়া বসেন—কি করি বলুন ত'—তখন আর তাহার জবাব খুঁজিয়া পাই না।

বলেন—আপনি ব্রাহ্মণ, জ্ঞানী-গুণী মানুষ—আপনি একটা উপায় আমায় বলে দিন দাদা!

কি উপায় বলিয়া দিব নিরুপায়ের মত তাহাই ভাবি।

সাময়িকী

আগামী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন কলিকাতা ভবানীপুরে হইবে স্থির হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরে প্রায়ই চৈত্র বৈশাখ মাসে অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারিত হইত; ভবানীপুরের সাহিত্যিকগণ সে প্রথার অনুসরণ না করিয়া আগামী মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার সময় (২রা, ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী) সম্মেলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ ব্যবস্থা যে কলিকাতা, ভবানীপুর ও নিকটবর্ত্তী স্থানগুলির সাহিত্যিকগণের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মফস্বলের হিন্দু সাহিত্যিকগণ নিজ নিজ গৃহে বাগ্দেবীর অর্চ্চনা ত্যাগ করিয়া সম্মেলনে উপস্থিত হইতে হয়ত একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন। তাহা হইলেও বড়দিন কি ঈষ্টারের অবকাশ সময়ে সম্মেলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা না করিয়া সরস্বতী পূজার সময় অধিবেশনের ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। মাঘ মাসের অনেক বিলম্ব আছে; কিন্তু ভবানীপুরের সাহিত্যিকগণ এখন হইতেই উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিয়াছেন, প্রবন্ধ প্রার্থনা করিয়াছেন, চাঁদা আদায় আরম্ভ করিয়াছেন এবং একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত করিয়াছেন। এই সমিতির সভাপতি হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়; সহকারী সভাপতি হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীমতী কামিনী রায় ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয়গণ; সম্পাদক হইয়াছেন, মাননীয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষাল। উপযুক্ত ব্যক্তিগণের উপরই কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু এই কার্য্যকরী সমিতিতে তিনটী নাম না দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি; তাঁহারা নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শশধর রায় ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন। ইঁহারা তিনজনই ভবানীপুরের প্রবাসী অথবা অধিবাসী বলিলেও হয়; বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে এই তিনজনই খ্যাতনামা। ইঁহাদিগকে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ছিল।

বিগত শ্রাবণ মাসে কলিকাতায় ও বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও লোকমান্য তিলক মহারাজের স্বর্গারোহন দিনের কথা স্মরণ করিয়া সভাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি নানা সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও লোকমান্য তিলক মহারাজের অশেষ গুণবর্ণনা করিয়াছিলেন। লোকমান্য তিলক মহারাজের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার প্রদেশবাসী ভক্তগণ [illegible] অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কত প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য তেমন কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে? আছে মাত্র তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার দ্বারাই পরিপুষ্ট একটী কলেজ— বিদ্যাসাগর কলেজ, আর আছে গোলদীঘিতে একটা মূর্ত্তি; এতদ্ব্যতীত এখানে ওখানে সামান্য দুই একটা লাইব্রেরী। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালী সেই পুরুষসিংহের জন্য আর কি করিয়াছে? তাঁহার কলিকাতার আবাসগৃহ কয়েক হাজার টাকার জন্য বিক্রয় হইয়া গেল। সে বাড়ীটিতে বিদ্যাসাগরের আবাস বলিয়া লিখিত যে প্রস্তরফলক ছিল, নূতন ক্রেতা তাহা অপসারিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী—বিদ্যাসাগরের তথাকথিত ভক্তগণের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যাসাগরের গৃহ— বাঙ্গালীর পবিত্র তীর্থ, কয়েক সহস্র মুদ্রার জন্য পরহস্তগত হইল, আর বাঙ্গালী চাহিয়া দেখিল। তাহারা কি বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-চর্চ্চার অধিকারী?

১৯২৮ অব্দের যে পুলিস রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের জ্ঞাতব্য কয়েকটী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে ৪১ খানা নূতন নাটকের অভিনয় হইয়াছে। এই নাটকগুলির ১২ খানার মধ্যে আপত্তিকর অংশ পাওয়া গিয়াছিল, ঐ অংশগুলি অভিনয়ের পূর্ব্বে বাদ দিয়া দেওয়া হয়। "মাদার ইণ্ডিয়া" ও "আয়ুষ্মতী সুশীলা" নামক দুইখানা নাটক অভিনয়ের জন্য অনুমোদন করা হয় নাই। কলিকাতা ও সহরতলীতে ২৮ খানা দৈনিক, ১

খানা ট্রাই-উইকলী, ৩ খানা বাইউইকলী ৮১ খানা সাপ্তাহিক ১৩০ খানা পাক্ষিক, ২৪২ খানা মাসিক, ৩ খানা দ্বৈমাসিক, বৎসরে ৫ বার প্রকাশিত হয় এরূপ একখানা, ত্রৈমাসিক ৪১ খানা ৪ মাস পর প্রকাশিত হয় এরূপ ৫ খানা ২ খানা, ষাণ্মাষিক ও ৪ খানা বার্ষিক কাগজ ও ৬৮৬৫৮টী ছাপাখানা আছে। ৫৬ জন প্রেসের মালিক ও ১৬ খানা কাগজের প্রকাশককে ১৮৬৭ সনের ২৫ আইন অনুসারে দণ্ডিত করা হয়। ভারতী[illegible]বিধি আইনানুসারে (১) বাঙ্গলার কথা, (২) ফরোয়ার্ড (২টী মামলা) (৩) ক্ষত্রিয় সংসার (২টী মামলা) হইয়া গি[illegible]। সবগুলি মামলায়ই সাজা হইয়া গিয়াছে। 'রণভেরী' নামে একখানা রাজদ্রোহকর পুস্তিকার বিরুদ্ধে দুইদফা মামলা হয় ও লেখক দণ্ডপ্রাপ্ত হন। অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের অভিযোগ 'হিন্দুনারী' নামক কাগজের সম্পাদককে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। 'তরুণ বাঙ্গালী' নামে ব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায়ের একখানা পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হয়। 'গণবাণী' নামে সাম্যবাদী পত্রিকাখানা পূজার পূর্ব্বে বন্ধ হইয়া যায়। 'প্রজার কথা' ও 'পল্টন' নামে কাগজ দুইখানা সাম্যবাদ প্রচার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত (১) আনন্দ বাজার পত্রিকা (২) বাঙ্গলার কথা, (৩) 'ব্লাডি সাইমন গো ব্যাক' নামে কাগজগুলিও অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছে। একখানা পোষ্টার লেখারও জন্য জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী দণ্ডিত হইয়াছেন।

আমাদের দেশের কাপড়ের কলসমূহে সাধারণতঃ মোটা সূতায় প্রচুর কাপড় উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়া জন-সাধারণের মধ্যে বহুলোকের বদ্ধমূল ধারণা যে, আমাদের দেশীয় কল-কারখানায় সরু সূতা তৈরী করিয়া তাহার দ্বারা মিহি কাপড় প্রস্তুত করা যায় না এবং সেইজন্য সরু সূতায় প্রস্তুত কলের মিহি কাপড়ের অভাব আমাদের দেশের লোক বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি কুষ্টিয়া মোহিনী মিল আধুনিক উৎকৃষ্ট প্রণালীর সূতার কল আনাইয়া ৬০ নম্বর পর্য্যন্ত সূতা কাটাইয়া মিহি বস্ত্রের অভাব দূর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মোহিনী মিল এ জন্য যে সমস্ত নূতন কল আনাইয়াছেন, তাহা এখনও এ দেশে আর কেহ আনাইয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। এই মিল এখন যে রকম মিহি কাপড় প্রস্তুত করিতেছেন, তাহাতে সাধারণের কলের কাপড় মাত্রকেই মোটা কাপড় বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবার আর উপায় নাই। মোহিনী মিলের এই প্রচেষ্টার সাফল্য আমরা কামনা করি।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মরণের পরে"—১।০
প্রভাস চন্দ্র দে প্রণীত জীবনী "জয়দেব"—১৲
বিহারীলাল সরকার প্রণীত "সিদ্ধান্তসার"—১৲
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত নাটক "ধূপের ধোঁয়ায়"—১।০
ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "তরুণের অভিযান"—১৲
বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত নাটক "সুভদ্রা"—১৲
জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "প্রাণের দাবী"—১৲
সুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "শক্তিকুমার"—।০
শিবকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত "রবীন্দ্র সাধনা"—১৲
মতিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "ইরাণী"—১৲
উমা দেবী প্রণীত "সনাতন পাক-প্রণালী"—৷৷০
ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নিখিলের শান্তি"—১৷৷০
মণীন্দ্রনাথ সাহা প্রণীত "গীতা কাব্য"—৷৷০
রাণী কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া দেবী প্রণীত "ভক্তিকথা"—১৲
দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "জোয়ার ভাটা"—১৲
সুরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত "ওমর খৈয়াম" (জীবন যুগ ও কাব্যালোচনা)—১৷৷০

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আগামী আশ্বিন মাসের 'ভারতবর্ষ' ২৬শে ভাদ্র এবং কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষ' ১৪ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতৃগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের বিজ্ঞাপন ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে প্রেরণ করিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ—'ভারতবর্ষ'

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

শারী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS

আশ্বিন—১৩৩৬

প্রথম খণ্ড } সপ্তদশ বর্ষ { চতুর্থ সংখ্যা

গীতা ও ব্রহ্ম

অধ্যাপক শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ এম্-এ

ঈশ্বর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহেন—বৃক্ষ, নদী, সূর্য্য, চন্দ্র, গো, মনুষ্য প্রভৃতির ন্যায় এই চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ হইবার বস্তু নহেন। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান ব্যক্তিগত বিদ্যা ও জ্ঞানলাভের উপর প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকে। অধীত বিদ্যা সম্পূর্ণতার দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ জ্ঞানের উদয় হইলে দেহাত্মবৃদ্ধ বদ্ধ জীবাত্মা মুক্তাবস্থায় পরমাত্মার সহিত আপনার কি সম্বন্ধ, যৌগিক প্রক্রিয়ায় সাধনার সিদ্ধি অবস্থায় তাহা প্রত্যক্ষীভূতের বিষয় করিতে পারে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞান নহে। সুতরাং তাহা এ নশ্বর পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বাত্মক নশ্বর জীবদেহে আত্মজ্ঞান না হইলে সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য এই নশ্বর জীবদেহে ঈশ্বরজ্ঞান অনুমান সাপেক্ষ। তাহা অনুভূতির বিষয়। এই অনুভূতি উদ্বুদ্ধ করিতে পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের যাথার্থ্য জানা আবশ্যক। অনুভূতি ও অনুমান এক বস্তু নহে; তথাপি অনুমানের উপর অনেকাংশে অনুভূতি নির্ভর করিয়া থাকে। যাহা প্রত্যক্ষ নহে, তাহা অনুমেয়। এবং যাহা অনুমিত তাহা অনুভূত হইয়া থাকে। কল্পনা করিতে করিতে যখন একাগ্রতায় লক্ষ্য স্থির হ'য়, তখন তাহা অনুমান না বলিয়া অনুভূতির গোচরীভূত হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃ আস্তিকতা ও নাস্তিকতা ভেদে ঈশ্বর-প্রতীতি সম্বন্ধীয় ভারতীয় আর্য্য-দর্শনশাস্ত্র দ্বাদশভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আস্তিক দর্শনে যে প্রকার জ্ঞানে ঈশ্বর-প্রতীতি হইতে পারে, তাহার অনুমানভেদ বিশেষভাবে লক্ষিত হয় এবং তাহাতে বিভিন্নভাবে ঈশ্বর ও তাঁহার

ঈষণা বিধায় সৃষ্টি ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধ ও সৃষ্টি ব্যাপারের ভিতর দিয়া তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান নির্ণয় করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। জৈমিনি, কণাদ, পাতঞ্জল প্রভৃতি ব্রহ্মদৃগ্‌গণ সেই কারণে ঈশ্বরের ঈষণা সম্বন্ধে নানা ভাবে নানা কথা প্রচার করিয়া চিন্তাশক্তির প্রখরতা দেখাইয়া গিয়াছেন। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত যে বস্তু তাহা সম্পূর্ণ অনুমেয়, তাহাই দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু যখন এই অনুমানসাপেক্ষ দৃঢ় পরিণত কল্পনালোকে স্থিরমূর্ত্তি দৃষ্ট ভগবান্ মানসচক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত হন, তখন তিনি অব্যক্ত মহান্, সত্ত্বরজস্তমো গুণের অতীত অতীন্দ্রিয় বস্তু। ব্রহ্ম নিরুপাধি, সুতরাং এমন কোন পরিচয় নাই যাহার দ্বারা তাঁহার সত্তা অনুভব করা যাইতে পারে। তিনি স্বতঃ-প্রকাশ। এমন কোন নাম নাই যাহা উচ্চারণ করিলে তাঁহার শক্তি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। লতা গুল্ম বৃক্ষাদি যে ভাবে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া বুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে, সে ভাবে "একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি"— ইত্যাকার জ্ঞান হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি বদ্ধ বুদ্ধির অতীত, মুক্ত বুদ্ধি ব্যতীত তাঁহাকে অনুভব করা অসম্ভব। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় জীবের মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারের পৃথক্ কোন অস্তিত্বই নাই। সুতরাং জীবে বদ্ধ অপরা বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীত হওয়া সম্ভব নহে। পরা বিদ্যা বা আপ্তজ্ঞান ব্যতীত তাহা কখন হইতে পারে না। কিন্তু পরা ও অপরা বিদ্যার যে কোন পরস্পর অনুবন্ধি সম্বন্ধ নাই তাহা নহে। অপরা বিদ্যাকে অনিত্য এবং ধ্বংসোন্মুখী বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত, এ কথা যে সকল দার্শনিক পণ্ডিত বলেন, তাহা সম্যক্ পরিপোষণ করা যাইতে পারে না। অনিত্য অর্থে যে এ সকল প্রত্যক্ষ পদার্থের কোন আবশ্যকতাই নাই তাহা মনে করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কেন না, স্থূল ধরিয়া জীব সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকে। স্থূলের যদি অস্তিত্ব স্বীকার না করা যায়, তদনুবন্ধি সূক্ষ্মের অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? অতএব স্থূল ও সূক্ষ্ম অপরা ও পরা বিদ্যা ইহাদের যে কোন পরম্পরা সম্বন্ধ নাই তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না। পাঞ্চভৌতিক দেহের সমন্বয়ের বিনাশ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার উপাদান সমূহের বিনাশিত্ব স্বীকৃত নহে। এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট দেদীপ্যমান অগ্নির সমগ্র ধর্ম্মবিশিষ্ট ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গও আবার সকল দগ্ধ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভীষণ অগ্নিতে পরিণত হইয়া থাকে। তবে বদ্ধ ও মুক্ত এই অবস্থার ভেদমাত্র। এই বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা জীবের কি ভাবে হইয়া থাকে তাহাই গীতার উপজীব্য বস্তু—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিনির্ণয়ের প্রচেষ্টা। আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, কেন আসিলাম, কি করিতে আসিলাম, আমার সহিত অপর স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সৃষ্টির সম্বন্ধ কি, এই সকল তত্ত্ব গীতার প্রথম হইতে ষষ্ঠ অবধি অধ্যায়গুলিতে ভগবানের মুখে অর্জ্জুন-রূপ শ্রোতার নিকটে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দেহবুদ্ধ 'আমি' আত্মা কি না, আত্মা ও আমি বিভিন্ন পদার্থ কি না, তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া প্রকৃত আত্মতত্ত্ব কি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বর কে, তিনি কোন্ কোন্ গুণাত্মক, নির্গুণ কি সগুণ, নিরুপাধি, কি সোপাধি, ইত্যাদি তত্ত্ব সকল সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় অবধি পূর্ব্বোক্ত বক্তা এবং শ্রোতার রূপে বিচারিত হইয়াছে। এবং পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় অবধি পূর্ব্বোক্ত আমিত্ব বিনাশে আত্মার মুক্ত অবস্থায় আত্মা যে ঈশ্বর তাহার সম্যক্ প্রতীতি উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গীতা ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়াছে।

তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয় প্রভৃতি উপনিষদে বেদান্ত-প্রতিপাদিত আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি পর্য্যায়ে পঞ্চমহাভূতের অস্তিত্ব এবং মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদে ব্রহ্মের স্বরূপের অভিব্যক্তিতে পৌর্ব্বাপর্য্যের কোনরূপ বিরোধভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পঞ্চ মহাভূত শ্রুতিতে দেবতাভিজ্ঞানে পরিচিত। ইহারা সূক্ষ্মভূত বলিয়া গৃহীত। এই সূক্ষ্মভূতের একের অর্দ্ধাংশ ও অপর চারিটির প্রত্যেকের এক-অষ্টমাংশ লইয়া পঞ্চীকরণে এক এক করিয়া পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এবং মূর্ত্তব্রহ্ম—অগ্নি, অপ্, ও ভূমি ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা স্থূলভূতের উৎপাদন করিয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহারা তিন দেবতা এবং স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালদেশের সৃষ্টির কারণ তাহা বলা হইয়াছে। অতএব বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই পঞ্চীকরণ ও ত্রিবৃৎকরণে ভূতগণের বীজ নিহিত রহিয়াছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক অহঙ্কারের পরিচালনায় তন্মধ্যস্থিত আত্মা জীবদেহে বদ্ধ হইয়া "আমি"—ইত্যাকার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এই তিন প্রকার অহঙ্কারের

ভিতর রাজসিক অহঙ্কার ক্রিয়া করায় বলিয়া সাত্ত্বিক ও তামসিক অহঙ্কারের উপর তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। ব্যষ্টিভাবে না ধরিয়া সমষ্টিভাবে দেখা যায় যে ইহা বিজ্ঞানময় কোষস্থ আত্মা বা অপর নামে ব্রহ্ম। ইহা সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম। হিরণ্যগর্ভ এই সূক্ষ্মশরীরাভিমানিনী দেবতা। উল্লিখিত পঞ্চভূত এই হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কারের ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই অহঙ্কারের প্রভু বা কারণ বুদ্ধি। এই বুদ্ধির স্রষ্টা কার্য্যে যাহা আপনাকে প্রকাশ করে না, তাহা অব্যক্ত। ইহা সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক। এই অব্যক্ত সকলের কারণ, কিন্তু কার্য্য রূপে কাহারও নিকট প্রকাশ নহে। গীতার অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবানের মুখে উক্ত হইয়াছে যে, এই অব্যক্ত হইতে সকল প্রকাশ পাইয়াছে। সেই কারণে ইহাকে মূল প্রকৃতি বলা যায়। এই মূল প্রকৃতিই প্রধান, এবং ইহা কার্য্য রূপে যাঁহার, তিনি অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত, প্রধান হইতে প্রধান, স্বয়ং গুণাতীত নিরুপাধি ব্রহ্ম। সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও বিকৃতি পরিচয়ে প্রধানের ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবের ভিতর সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য স্থাপন করতঃ বিকৃতির সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বলিয়া প্রকৃতির বেদান্ত মতে পরমেশ্বরের পরাশক্তি বা মায়ার অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহার সহিত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের একবাক্যতা রক্ষিত হইয়াছে। পৌর্ব্বাপর্য্যের একবাক্যতা না থাকিলে তাহা প্রমাণীকৃত হয় নাই বলিয়া প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং শ্রুতির সহিত একবাক্যতা হেতু সাংখ্য ও বেদান্তমতের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণরূপে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে প্রধান বুদ্ধি ইত্যাদি বেদান্তেও অব্যক্ত বুদ্ধি ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকার করায় উভয়ের ভিতর স্বাতন্ত্র্য নাই। উভয় শাস্ত্রেই প্রকৃতি, বা প্রধান, বা অব্যক্ত স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও ভগবচ্ছক্তির অভি-ব্যক্তি ভিন্ন কিছুই নহে।

উপর্য্যুক্ত পঞ্চমহাভূতের সমন্বয়ে যে জড়জগৎ সৃষ্ট হয় তাহা ক্ষেত্র নামে পরিচিত। "বহু স্যাং প্রজায়েয়"—এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদোক্ত ব্রহ্মের বহু ভাবে প্রকাশ হইবার ঈষণায় এই জগৎ তাঁহার প্রকাশাত্মক। সুতরাং এ জগৎ তাঁহার শরীর-স্বরূপ, এ কথা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে। ইহার ভোগ্য বস্তু রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ। চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ ও কর্ণ—যথাক্রমে ঐ সকল ভোগ্যবস্তুর বাহ্যকরণস্বরূপ। এই বাহ্যকরণের নিয়ন্তা বুদ্ধি;—বুদ্ধি ও মন এই দু'য়ের পরিচালক অহঙ্কার। বেদান্তধৃত ব্রহ্ম যে শব্দস্বরূপ তাহা হইতে ঐ সকল ভোগ্য বস্তুর বাহ্য প্রকাশ-স্বরূপ আকাশাদি সৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা জ্ঞানের বিষয়, অতএব ইহা জ্ঞেয়। সুতরাং প্রভুপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতে ইহা ক্ষেত্র; অতএব যাহা ক্ষেত্র তাহা ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানের বিষয়ীভূত। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই পরমজ্ঞান—কেন না স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। এই ক্ষেত্র ভোগের স্থল; এই ক্ষেত্র, অর্থাৎ শরীরকে আশ্রয় করিয়া বদ্ধ আত্মা জীবরূপ প্রতীত হইয়া ভোগের করণীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং বদ্ধ আত্মা শরীর সম্বন্ধে ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু এই বদ্ধ আত্মার মুক্ত অবস্থাকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। অতএব ক্ষেত্র হইতে প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহা পরম জ্ঞান—পরমাত্মার জ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য চতুর্দশ তত্ত্বে এই যে জগৎ সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বুঝা যায়। নিত্য—তাহা ব্রাহ্মীমায়ার অতীত বস্তু, অর্থাৎ সে স্বয়ং ব্রহ্ম। অনিত্য যাহা, তাহা অবিদ্যা; সুতরাং তাহা যখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবৎপ্রতীতির সাপেক্ষ নহে, তখন তাহার পরজ্ঞানের মত সার্থকতাহীনতায় অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বৈদান্তিক মতবাদিগণ সিদ্ধান্ত করেন। তাহাই গীতায় অতি স্পষ্টভাবে ভগবৎপ্রমুখাৎ বলা হইতেছে যে এই ক্ষেত্র অর্থাৎ অবিদ্যা লইয়া সমস্ত জীবনটা কাটাইবার চেষ্টা করিলে পরজ্ঞানের অর্জ্জনে ব্যাঘাত হইয়া থাকে। তজ্জন্য জীবের অর্থাৎ ক্ষেত্রে বদ্ধ আত্মার উর্দ্ধগতি না হওয়ায় তাহা পরমাত্মাতে পর্য্যবসিত হইবার সুবিধা পায় না। এই যে ক্ষেত্রে বদ্ধ অমুক্ত আত্মা যে পরমাত্মার অংশ অথচ পূর্ণ অবস্থান্তর তাহা সে ভুলিয়া যায়, এবং এই বদ্ধ অনভ্যর্চ্চিত আত্মাকেই "অহং"—ইত্যাকার জ্ঞান করিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া শরীরী পরজ্ঞানের কথা ভুলিয়া যায়। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই-খানেই ভস্মে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। অতএব ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি যেমন বাহ্যতঃ দাহিকাশক্তিহীন হইয়া পদদলিত হয়, তেমনি অগ্নিস্বরূপ এই বদ্ধ আত্মা বাহ্যকরণে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "হে অর্জ্জুন, তুমি

কাহার কি করিতে পার? আমিই ত তাহা সব করিতেছি, বা করিয়া রাখিয়াছি। তুমি বিষণ্ণ হইও না। তুমি আপনার অগ্নিস্বরূপতা ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি যে আমি, তাহা আমারই মায়াতে বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি যে আমি হইয়া এই সকল করিতেছ তাহা বুঝিতেছ না। তুমি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইয়া জগৎ দগ্ধ করিতে পার, তাহা ভুলিতেছ কেন? কেন তুমি মনে করিতেছ যে আমি তুমি ভিন্ন?" তাই তাঁহার স্বরূপ দেখাইয়া তিনি অর্জ্জুনের বদ্ধ আত্মাতে নিজের সত্তা সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। বদ্ধ আত্মা মন্ত্রার্পিতের মত স্বকর্ম্মে নিয়োজিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বা ব্রহ্মের আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির প্রভাব স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়িল। অতএব ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যোজনায় ব্রাহ্মী মায়ার অন্তর্দ্ধান হইল। এই মায়া চতুর্দ্দশ-তত্ত্বাত্মক সংসারকে একেবারে কিছুই নহে তাহা বলে না—ইহা অবিদ্যা বা অনিত্য শব্দের অর্থ নহে। ইহার অর্থ এই যে, বহ্নি ভস্মে আচ্ছাদিত হইয়া আছে, ফুৎকারে ভস্মকে উড়াইয়া দিতে হইবে—আত্মা হইতে বদ্ধ শরীরনিষ্ঠ 'অহং'-ভাব দূর করিতে হইবে; তাহা হইলে আত্মার সার্ব্বজনীনত্ব লাভ হইবে। অর্থের গূঢ়ত্ব না বুঝিয়া মায়া অর্থে একেবারে অলীকতার কল্পনা বিজ্ঞজনোচিত নহে। গীতার প্রথম হইতে শেষ অবধি ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন, যাবতীয়ের ভিতর আমাকেই প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও। ভগবান্ প্রত্যেক বস্তুতে প্রাণরূপে অবস্থান করিতেছেন—ইহাই ঐ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। যাহাতে ভগবান্ ওতপ্রোত-ভাবে বর্ত্তমান তাহা অলীক, কিছুই নহে হইতে পারে না। যাহা ভগবানের প্রকাশস্বরূপ তাহা কখনই মরুভূমিতে মরীচিকার জলের মত ভ্রমাত্মক নহে। কিন্তু ব্রাহ্মীমায়া এমত প্রবল যে, তাহার আবরণে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের ভিতর দিয়া শরীরবদ্ধ আত্মা ভগবচ্ছক্তির সত্তা অনুভব করিতে পারে না। এই মায়া ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত। যখন বদ্ধ আত্মা অমুক্ত অবস্থায় বিরক্ত হইয়া আপনার ভিতরে মুক্ত হইবার প্রেরণা জাগাইয়া তোলে, তখন সে সৃষ্টিপ্রপঞ্চকেই নিমিত্ত করিয়া ভগবচ্ছক্তির স্বরূপ দেখিতে পায়। আস্তিক ও নাস্তিক একাদশ দর্শনশাস্ত্রের মতামতের ঐক্য স্থাপন করিতে বৈদান্তিকগণ সকলের ভিতরে ব্রহ্ম স্বয়ং বর্ত্তমান অথচ অলক্ষ্য, তাহার বিবৃতি করিতে গিয়া এই মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মাত্ম বস্তুতে ব্রহ্মের স্বরূপতঃ প্রতীতি না হইবার অন্য কি কারণ হইতে পারে? ইহাই মায়ার নিগূঢ় তত্ত্ব। মায়ার অনিত্যতা এই যে, সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিকর্ষণী শক্তির আশ্রিত হইয়া বদ্ধ আত্মাকে তাঁহাকে বুঝিতে দেয় না। বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে অগ্নি হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ভেদ কল্পনা ধর্ম্মতঃ করা যায় না। এই বৈদান্তিক মায়া বুঝাইবার জন্যই যেন গীতার সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রহ্মাত্মক প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্মের প্রতীতি হয় না কেন, তাহা ভগবান্ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপদর্শনযোগাধ্যায়ে স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন, এবং আত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ এক হইলেও ভেদ কোথায় তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন—যে ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ এক নহে, শরীর আর শরীরী এক নহে—এই দেহাত্মক 'অহং'-ভাবই শরীরীর বদ্ধ অবস্থা! এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সৃষ্টি-প্রপঞ্চে ভগবানের শরীর এবং তিনি স্বয়ং। অতএব তাঁহার শরীরভূত এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ তাঁহারই মায়াতে আশ্রিত, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ যখন তিনি স্বয়ং ক্ষেত্রে বদ্ধ আপনাকে মুক্ত অবস্থায় বিরাট্ মহান্ পুরুষে পরিণত করেন, তখন যাহাতে তিনি সন্নিবিষ্ট, যাহা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আবার স্বরূপ ত্রিগুণাতীত অনুভূতির বিষয়ীভূত, তাহা মায়া অর্থাৎ তাঁহার শরীরাত্মক সৃষ্টিপ্রপঞ্চ অনিত্য কিছুই নহে তাহা নহে, তাহা আত্মার বদ্ধ অবস্থা! ব্রহ্ম এক, কিন্তু তিনি স্বতঃ উদ্ভূত ঈষণায় বহু ভাবে প্রকাশিত হইতেছেন, উপনিষদের এই তত্ত্ব গীতাতে সরল ছন্দে প্রচারিত হইতেছে। ঋগ্বেদের সায়ণা-চার্য্যের ব্যাখ্যাতে পূর্ব্বমীমাংসকদিগের মতানুসারে এই যে ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি, সকলই তাঁহার প্রকাশ—বিভিন্ন রূপ! সুতরাং তাহা অলীক নহে। যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অতীত, তিনি প্রবৃত্তির ভিতর প্রচ্ছন্ন অথচ ব্যক্ত, নিবৃত্তির পরে তিনি অব্যক্ত মহান্। অর্জ্জুন ভগবানের স্বরূপ দেখার পূর্ব্বে সর্ব্বভূতে তাঁহাকে ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত ভাবিতেছিলেন; কিন্তু স্বরূপ দেখিবার পর তাঁহাকে শুদ্ধ অব্যক্তই ভাবিলেন। এই যে ব্যক্তাব্যক্তের ভাব, তাহাই মায়া নামে পরিচিত। তাহা চিরন্তন স্থায়ী নয় বলিয়া তাহার অনিত্যত্ব। অব্যক্তের ভাব সনাতন, তাই তাহা নিত্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য "শিবোঽহম্" এই বীজমন্ত্রে এই গীতোক্ত ব্রহ্মের ব্যক্তাব্যক্ত ভাবের অবসানকালে অব্যক্ত মহান্ আবেশের সমাবেশ উপদেশ দিয়াছেন। তাহা গীতার প্রত্যেক যোগাধ্যায়ে

প্রত্যেক মন্ত্রে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, ষোড়শ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যোগাধ্যায়ে এই কথাই বার বার উক্ত হইয়াছে যে, তিনি অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত হইয়া প্রত্যেক অনুপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন; তিনিই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞরূপে নিখিল সংসার ধারণ করেন। পরম দার্শনিক রামানুজের মতে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান স্বরূপেই বদ্ধ আত্মার মুক্তাবস্থাতে ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য জ্ঞাপন করে। তখন জ্ঞানী আত্মা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত একত্র হইয়া পুরুষার্থ লাভ করে। ইহাই আত্মার মুক্তাবস্থা। শ্রুতিতে এবং ব্রহ্মসূত্রে ইহার নির্দ্দেশ স্পষ্টই রহিয়াছে যে, পরমাত্মা অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া বদ্ধ সংসারী ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া পড়েন, এবং ঐ অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ার ত্যাগে, সংসার যাঁহার সৃষ্টি তাঁহার শক্তি কত অধিক এই জ্ঞান লাভ হইলে শুদ্ধ ভাব লাভ করেন। ইহাই সর্ব্বক্ষেত্রে ভগবানের ক্ষেত্রজ্ঞ নামের অভিধান। এই কারণে গীতাতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, সংসার—শরীরক্ষেত্র এবং তাহার প্রবর্ত্তয়িতা ক্ষেত্রজ্ঞ, এই উভয়ের জ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে,এবং পরজ্ঞান লাভ হইলে সংসারবদ্ধ পরমাত্মার দশান্তর জীবাত্মা মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত অভেদ সমন্বয়ে "তুমি" "আমি" এই পার্থক্যবিনাশে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া উঠে। তখন "অ" "উ" "ম্" এই ত্র্যক্ষরের বীজী ও বীজ তদ্‌যোনিতে মিলনে ব্রহ্মা—বিষ্ণু—মহেশ্বর এই দেবতাত্রয়ের একীকরণে "ওম্"—ইত্যাকার শব্দ ধ্বনিত হইতে থাকে এবং বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া দেবতাত্রয়ের একীকরণে ব্রহ্মত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

সেই একদিন

শ্রীমানকুমারী বসু

১

সে দিনের কথা সেই—বিভীষিকাময়
ধরা খুলি সৌম্য আবরণ,
দেখাইল রুদ্ররূপে ভয়ানক ভয়,
আজিও চমকি উঠে মন।

২

ভীষণ মরণ মূর্ত্তি! ভুলিব না আর,
হতাশ আকুল কোলাহল,
নির্ব্বাপিত দীপ্ত আলো, অবনী আঁধার,
ক্ষিপ্ত আর্ত্তনাদ অশ্রুজল!

৩

ভীরু আমি, ত্রস্ত আমি, প্রসন্ন বদনে
তুমি দিলে পসারিয়া কর,
বিপদের মরণের অতীত নিজ'নে
বেঁধে দিলে শান্তিময় ঘর।

৪

ও উদার বুকে মুখ লুকাইনু যবে—
—সে দুর্গ অজেয় ভূমণ্ডলে—
ভুলিলাম ভয় শোক, আরামে নীরবে
কি অমৃত দিলে এ দুর্ব্বলে?—

৫

সেই দিন প্রাণে প্রাণে হয়েছিল দেখা
মিলন মঙ্গল সুমধুর—
অমর অক্ষরে সে যে চিরতরে লেখা,
হোক্ না অতীত বহুদূর।

৬

বুঝেছি, জেনেছি তুমি নেবে হাতে ধরি,
স্নেহভরা শান্তিময় ধামে,
অভয় আশ্বাসে দিবে দীন হিয়া ভরি,
জুড়াইবে প্রেমামৃত নামে।

৭

টল টল ছল ছল উছলে শ্রাবণ
আমি ভাবি সেই একদিন—
আশ্বাস বিশ্বাসে, মোরে (বরষা মতন)
তোমাতেই করিবে বিলীন।

সর্ব্বহারা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(১)

স্কুলের থার্ড ক্লাসে হঠাৎ হরিচরণের ভারি খ্যাতি রটিয়া গেল। সেবার স্কুলের সরস্বতী পূজার ঠাকুর সে নিজ হাতে গড়িয়াছিল। শিক্ষক ছাত্র সবাই অবাক্ হইয়া দেখিল—তার কৃতিত্ব অসামান্য।

ইহার পর হইতে তার কাণে সবাই মন্ত্র জপিতে লাগিল, কলিকাতায় গিয়া ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা শিক্ষা করিলে সে একটা বড় লোক হইতে পারিবে। হরিচরণও ক্রমে সেই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

গোয়াড়ির একটি মেয়ে, নয় দশ বছর বয়স হইবে, বেশ সুন্দর—তার সঙ্গে ইতিমধ্যে হরিচরণের বিবাহ হইয়া গেল। বউয়ের নাম বিশ্বেশ্বরী,—ডাক-নাম বিশে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া হরিচরণ বায়না ধরিল সে কলিকাতায় গিয়া আর্ট শিখিবে।

তার বড় ভাই চৈতন ভাবিয়াই পাইল না যে, পুতুল গড়িবে, পট আঁকিবে, তার জন্য কলিকাতায় যাওয়ার কি প্রয়োজন। রাজ্যের লোক কৃষ্ণনগরে আসে পুতুল কিনিতে, আর কৃষ্ণনগরের গদাই পালের নাতি যাইবে কলিকাতায় পুতুল গড়া শিখিতে—এ কথায় তার আত্ম-মর্য্যাদায় ঘা পড়িল।

মেজ ভাই ভুবন বলিল, "ও কি একটা কথা হ'ল?

গোয়াড়ির প্রায় গায়-গায় ঘূর্ণী—সেখানে খ'ড়ে নদীর ধারে পালেদের বাড়ী। তারা হাঁড়ি গড়ে, খেলনা গড়ে, ঠাকুর গড়ে।

হরিচরণের ঠাকুরদাদা ছিল একজন নামজাদা লোক; তার মত মূর্ত্তি গড়িতে কেউ জানিত না। সারা বাঙ্গলা জুড়িয়া তার খরিদ্দার ছিল। বিস্তর পয়সা খরচ করিয়া তাকে বাঙ্গলার সব জেলার বড়লোক লইয়া যাইতেন মূর্ত্তি গড়িতে। গদাই পালের হাতের মূর্ত্তি ছিল নামজাদা।

গদাই পাল দুখানা পাকা ঘর করিয়াছিল, টাকাকড়িও করিয়াছিল মন্দ নয়। কিন্তু এখন তার অবশিষ্ট আছে সুধু সেই জীর্ণ বাড়ী। তবু তাদের ঘরে এখন তিনখানা চাক চলে; পুতুলের ব্যবসায়ে এখনও তারা বেশ দু পয়সা রোজগার করে।

হরিচরণের যখন জন্ম হইয়াছিল, তখন গদাইয়ের সম্পদের কতকটা অবশিষ্ট ছিল। তাই তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল—তার বাপের মনে ছিল হরিকে সে একটা ডেপুটী কি উকীল করিবে।

স্কুলে ভাল ছেলে বলিয়া হরিচরণের নাম ছিল। তাই তার ভাইয়েদের অবস্থা ফিরিয়া গেলেও হরিচরণকে তারা স্কুল ছাড়ায় নাই।

পুতুলই যদি শেষে গড়বি, তো এতদিন টাকাগুলো গুণে দিয়ে লেখাপড়া শিখতে গেলি কেন? ও সব কিছু নয়, তুই বি-এ পাশ কর যাতে বাপ-পিতামো'র মুখ উঁচু হয়।"

হরিচরণ কিছুতে শুনিল না।

তার পর ঝগড়াঝাঁটি রাগারাগি হইল। চৈতন বলিল, "আমি টাকা দিব না, যা কেনে কেমনে যাবি!"

হরিচরণও রাগিয়া বলিল, "আমি বাড়ী বেচে খাব—এ বাড়ীতে আমারও তো ভাগ আছে বটে।"

ভুবন বলিল, "ঈস্, বড় মরদ—বেচ গা না, কার কত মুরোদ দেখি। গদাই পালের বাড়ী কিনবে এত বড় বুকের পাটাখানা কার একবার দেখে নি। আসে যেন কিনে এ তুয়োরে—দেইখে নিব।"

হরিচরণের বয়স তখন আঠার বছর হইয়াছিল কি না তাহা ঠিক বলা যায় না। তবু একজন তার কাছে জলের দরে তার বাড়ীর অংশ কবালা করিয়া লইল। যা কিছু পাইল তাই লইয়া হরিচরণ কলিকাতায় আসিল। শপথ করিয়া আসিল আর বাড়ী ফিরিবে না।

তার বউকে চৈতন পাল রাগ করিয়া বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল। বেচারী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তখন বিশের বয়স বারো বছর।

ইহাই হরিচরণের কলিকাতা আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাড়ী-ঘর বেচিয়া ছবি আঁকা শিখিতে আসা কাজটাকে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া কোনও বুদ্ধিমান স্বীকার করিবেন না। কাজেই হরিচরণকে বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু সুধু এই ঝোঁকটা বাদ দিলে হরিচরণের মোটের উপর বিষয়-বুদ্ধি বেশ ভালই ছিল। কত ধানে কত চাল হয় সে তার জানা ছিল। তার জমা পুঁজি যা সে সেভিং ব্যাঙ্কের বইয়ে জমা রাখিয়াছিল, তাহা দিয়া যে যথেষ্ট পয়সা খরচ করিয়া রীতিমত ভাবে শিক্ষালাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হইবে না, তা সে জানিত। তাই সে আর্ট স্কুলের আসে-পাশে দুই চার দিন ঘুরিয়া তার আশা পরিত্যাগ করিল। সে খুঁজিতে লাগিল কোনও আর্টিষ্ট তাকে সাগ্‌রেদ করিয়া কাজ শিখাইতে রাজী হন কি না। সুতরাং কলিকাতায় আসিয়া প্রথম কয়েক মাস তার কাটিল বড় বড় আর্টিষ্টদের কাছে ঘোরা-ফেরায়;—বিশেষ সুবিধা হইবার মত দেখা গেল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় হতাশ হইয়া হরিচরণ বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সে বড় জাঁক করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে আর্টিষ্ট হইয়া মানুষ হইবে বলিয়া। তার সে বড় আশা পূর্ণ করিবার পথের প্রথম ধাপেই এত বাধা—কে জানে সে সফল হইতে পারিবে কি না। নিষ্ফলতার বোঝা মাথায় করিয়া সে কি ফিরিয়া যাইবে তার ভাইয়ের কাছে করুণার ভিখারী হইয়া! যদি ফিরিয়া যায় সে, তখন চৈতন ও ভুবন তাকে গালি দিয়া ভূত ঝাড়িয়া দিবে, বউ-ঠাকরুণেরা হয় তো ঝাড়ু লইয়া তাড়া করিবে! নয় তো তারা খুব অনুগ্রহ করিয়া তাকে আশ্রয় দিবে, আর দিন-রাত তাকে আর বিশে'কে শুনাইবে যে তারা দয়া করিয়া তাদের আশ্রয় দিয়াছে।

"কখনই না" বলিয়া শেষে সে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। জীবনের যুদ্ধে পরাজয় সে মানিবে না। না হয় মরিবে।

"কি হে ভায়া, রাক্কুসে বেলায় শুয়ে' প'ড়েছ, ব্যাপার-খানা কি?" বলিয়া অসীম তার ঘরে ঢুকিয়া তার তক্ত-পোষের উপর আসিয়া বসিল।

অসীম কলেজে বি-এ পড়ে। খুব মেধাবী ছাত্র সে, কিন্তু কলেজের বই পড়ার চেয়ে রাজ্যের অদরকারী বই পড়াই তার বাতিক। আর এক বাতিক লেখা।

তার অবস্থা বিশেষ ভাল নয় বলিয়া হরিচরণ জানে। বাড়ীতে কিছু সামান্য আয়ের সম্পত্তি আছে, তাহা হইতে তার এক দূর সম্পর্কের জ্যেঠতুত ভাই তাকে কিছু খরচ পাঠান। কিন্তু অসীমের চালচলন মোটেই গরীবের মত নয়। যে দিন সে টাকা পায় সেই দিন মেসের টাকা দিয়া যা বাকী থাকে তা' সে দুই হাতে খরচ করে। এক সপ্তাহ পরে তার জলখাবার খাইবার সঙ্গতি থাকে না। সে তখন ঘরে বন্ধ হইয়া থাকে; ক্ষিদে পাইলে বিছানায় পড়িয়া প্রাণপণ করিয়া লিখিতে থাকে।

দু' একখানা মাসিক পত্র মাঝে মাঝে অনুগ্রহ করিয়া তার লেখা ছাপে।

কিন্তু অসীমের মত আনন্দে ভরা যুবক, এমন প্রাণখোলা হাসিভরা রসিক, জগতে দেখা যায় না।

যেদিন হরিচরণ প্রথম মেসে আসিল, সেই দিনই অসীম তাকে আত্মীয় করিয়া লইয়াছিল। হরিচরণের পক্ষে অত

সহজে তাকে পরিপূর্ণ রূপে আত্মীয় করা সহজ হয় নাই, কিন্তু অসীমের বন্ধুত্বের জোয়ারের মুখে তাকে ক্রমে ভাসিয়া যাইতে হইয়াছিল।

অসীমের প্রশ্ন শুনিয়া হরিচরণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এমন কিছু নয় অসীমদা'।"

"এমন কিছু নয়, কিন্তু মনটা বিষম ভার—কেমন? যেমন সদাসর্ব্বদাই হ'য়ে থাকে পৃথিবীতে।"

হরিচরণকে শেষে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইল।

হাসিয়া অসীম বলিল, "ওঃ এই—এর জন্য এত চিন্তা! তুমি যদি আমার মত হ'তে।"

"তোমার মত! তোমার পায়ের ধুলোর মত হ'লে বর্ত্তে যেতাম দাদা। তোমার দুঃখু কি? আজ বাদে কাল বি-এ পাশ ক'রলে তোমার বড় চাকরী হ'বে"—

"যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! অসীমচন্দ্র ক'রবে চাকরী। জান, Aristotle ব'লেছেন জগতের লোক দুই শ্রেণীর, জাত প্রভু ও জাত দাস, master and slave; চাকরী ক'রবে তারা যারা জন্মদাস। আমার ভিতর কোনওখানে কি জন্মদাসের ছাপ দেখেছো কোনও দিন?"

"চাকরীর মধ্যে তো বড় ছোট আছে—"

"আছে—কিন্তু সবাই slave—servant class। চাকরী মানে কি? মাথার ঘাম পায় ফেলে লেখাপড়া শিখে, যত সব ফ'করে নফরার দোরে দোরে মাথা ঠুকে মরা, শেষে বরাত যদি খুললো, তাদের হুকুম-বরদারী করা,—উঠতে ব'সতে তাদের ধমক খাওয়া—সে কাজ আমার নয় ভাই।"

"না হয় চাকরী নাই ক'রলে—ওকালতি ক'রলে তোমার পায় কে? মুখের যা জোর!"

"কিন্তু মুখের এ জোর কি এমন সস্তা জিনিস যে রাস্তার মুটে মজুরের কাছে তাকে বেচতে হ'বে। ভগবানের এত বড় একটা দান কি বিলিয়ে দেব রামা শ্যামার দায়ে হাকিমের কাছে হুজুর হুজুর ক'রে? 'এহ বাহ্য এহ বাহ্য আগে কহ আর'।"

"চুলোয় যাকগে, কিছু না হ'ক, তুমি একটা কিছু ক'রে খেতে পাবেই। নিদেন বি-এ পাশ তো হবে। আর আমি—"

"তুমি চুলোর পাঁশ—কিন্তু তারও তো কাজ আছে।"

"হাঁ—ও-সব নীতিশাস্ত্রের বুকনি শোনা আছে। থাকবে না কেন দরকার? নিমতলা ঘাটের মুদ্দোফরাসদের চাকরী বজায় রাখবার হয়তো একটু সহায়তা হবে আমাকে দিয়ে।"

"ঈস্, একদৌড়ে নিমতলায় গিয়ে পৌঁছেছো এই আঠার উনিশ বছর বয়সে! তোমার অবস্থা ভাল বোধ হ'চ্ছে না ভায়া; তোমাকে একটু দাওয়াই দিতে হ'চ্ছে। শোন—যদি সুখী হ'তে চাও, দুনিয়াটাকে অত seriously নিও না। জীবন, এ একটা প্রকাণ্ড joke। এতে কাঁদবার কি আছে? না হয় তামাসাটা তোমার ওপর দিয়েই হ'চ্ছে—তাতে কি? কাঁদতে হ'বে—

'ছিঁচ্ কাঁদুনে নাকে ঘা!'—

"তামাসা বটে! বুঝতে যদি আমার মত তোমার অবস্থা হ'ত দাদা।"

"কেন ভায়া, তোমার অবস্থাটা মন্দ কিসে? শুনেছি কয়েক শ' টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে আছে—আর আমার—এই দুনিয়া আমার সেভিংস ব্যাঙ্ক—

'আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে'—

বস্ ঐ পর্য্যন্ত!"

"কিন্তু তোমার বিষয় আশয় আছে।"—

"আছে নয়, ছিল। সে পাপ চুকে গেছে। কাল চিঠি পেয়েছি—নিলাম-খরিদ্দার বিষয়-সম্পত্তি, মায় ভদ্রাসন, দখল করেছে। তাতেও তার দেনা শোধ হয় নি ব'লে, যে দুখানা ভাঙ্গা বাসন বাড়ীতে ছিল, তাও ক্রোক ক'রে নিয়ে গেছে। এখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে।"

হরিচরণ অবাক্ হইয়া অসীমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বস্বহারা হইয়া তার এ আনন্দ হরিচরণের কল্পনার অতীত।

অসীম বলিল, "বাঁচা গেছে। এতদিন ঐ বিষয়টুকু ছিল আমার গলার বোঝা। যত দিন ছিল তত দিন একটু না ভেবে পারি নি। এমন দুর্দ্ধর্ষ আশাও ছিল যে, ঐ ছাই পাঁশ পাওনাদারের হাত থেকে হয় তো উদ্ধার ক'রতে পারবো। এখন গেছে, আর চিন্তা নেই—একেবারে পুরোপুরী লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে ভাগ্যদেবীর সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে সংগ্রাম ঘোষণা করছি।"

বিস্ময়-বিহ্বল হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তা' হ'লে তোমার এখন চ'লবে কিসে ?"

"হয় তো চলবে, নয় তো চলবে না। সে কি আমার হাত ? ওরে ভাই, এই পাপটা মন থেকে দূর কর যে, তোমার কি হ'বে না হবে সেটা তোমার হাত। মানুষ দিন-রাত তাই ভাবে—তাই ভাবনার তার অন্ত নেই।

বানের মুখে কাঠ
বাছাই ক'রে ভেবে মরে
এঘাট ওঘাট—
কোথায় একটু আরাম ক'রে
হ'তে পারবে কাত
যেন তারই হাত।
বানের জল ছোটে
ফেলে এঘাট ওঘাট
তেপান্তরের মাঠে
বানের মুখের কাঠ
তখন বড়ই চটে।

কি হাসির কাণ্ড ভেবে দেখ! এই মানুষ! তার কতটুকুই বা শক্তি, কিই বা সে ক'রতে পারে। আধ ঘণ্টা বাদে কি হ'বে তার উপর তার হাত নেই। সেদিন আমার সামনে একটা লোক একটা ইলিস মাছ কিনে ঘরে ফিরছিল —হয় তো মনে ভাবছিল, ক'খানা মাছ ভাজা হ'বে—কে ক'খানা খাবে। এলো একখানা মোটর লরি হুস ক'রে— ব্যস্, সব ঠাণ্ডা। এই তো তোমার ভাবনা-চিন্তার দাম। ঝাড়ু মারো ভাবনার কপালে।"

হরিচরণের মাথার ভিতর কথাগুলি টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সার সত্যটা খুব সহজে মনে বসিয়া গেল।

অসীম বলিয়া গেল, "অথচ ভেবে দেখ, আমাদের স্পর্দ্ধার অন্ত নেই। আমার প্রপিতামহ ছিলেন প্রকাণ্ড ধনী। তিনি নিজে বড়লোক হ'য়েই খুসী হ'তে পারলেন না—প্রতিজ্ঞা ক'রলেন, আমাদেরও বংশানুক্রমে বড়লোক ক'রে রেখে যাবেন। মস্ত বড় জমীদারী কিনলেন, প্রকাণ্ড ঘর বাড়ী ক'রলেন ; আর একখানা উইল ক'রে সম্পত্তি এমন ক'রে বেঁধে দিলেন, যাতে আমরা হাজার চেষ্টা ক'রেও গরীব না হ'তে পারি। তিনি যেই চোখ বুজলেন—লেগে গেল মামলা। মামলা মিটে ঠাকুর্দ্দা যখন ঘরে ঢুকবেন, পদ্মার জলে বাড়ী গেল ভেসে,—আর জমীদারী কতক ডুবে গেল, কতক বিক্রী হ'য়ে গেল। ব্যস্, ঠাণ্ডা। তবু মানুষ হ'তে চায় ভবিষ্যতের বিধাতা।"

হরিচরণ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—তার মনে হইল যে, তারও এত বড় আশার প্রাসাদখানা বুঝি এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে দুর্ভাগ্যের জোয়ারে। আকাশ-ব্যাপী আশা তার, সীমাশূন্য তার স্পর্দ্ধা—ইহার পরিণতি হইবে কি শেষে একটা অজানা-অচেনা দীন-ভিখারীর দেহের ভস্মস্তূপে ?

তার মনটা খুব ভার হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত আগে সে তার হতাশা ঝাড়িয়া উঠিয়াছিল,—বীরের মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে জয়ী হইবে। এখন আবার সে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অর্থ কি তার এ প্রতিজ্ঞার ?—জয়-পরাজয়ের কতটুকুর উপর তার হাত ?—ঐ যে অসীম বলিল, বানের মুখে কাঠ—ঐ তো মানুষের জীবন। কাঠ যতই ভাবুক, চলিতে হইবে তার স্রোতের বেগে !

অসীম হঠাৎ তার পিঠ চাপড়াইয়া হরিচরণকে চমকাইয়া দিল। সে বলিল, "ওরে হতভাগা, আমি যে এতগুলো ফিলসফি কপ্‌চালাম, সে কি তোর মুখ ভার করবার জন্য ?

তত্ত্বকথা শোন হে অর্জ্জুন
ক্লৈব্য তব কর পরিহার,
সত্য বলি মান বর্ত্তমান
যুদ্ধ হের সম্মুখে তোমার !

নূতন গীতার বার্ত্তা শোন—অতীত মরে গেছে, ভবিষ্যৎ জন্মায় নি, জন্মাবে কি না তা কেউ জানে না। সত্য এক বর্ত্তমান—মরা অতীত বা অভাবী ভবিষ্যতের জন্য জ্যান্ত বর্ত্তমানটাকে নষ্ট করা বুদ্ধির কাজ নয়। কেন ভাববে ? এখন তো তোমার দুঃখ নেই। পয়সা আছে—খরচ কর, খাও দাও আনন্দ কর—পরে না হয় নাই খাবে, দুঃখ নয় পাবেই—তাই বলে আগাম কতকগুলো কষ্ট সইবে কেন ?" বলিয়াই সে গাহিল,

"হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয় !"

এমনি দু চার লাইন গান, দু' চার লাইন extempore কবিতা অসীমের কথায় প্রায় ছড়ান থাকিত।

হরিচরণ এ কথায় সায় দিতে পারিল না। সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "হাসি আসে কই—সামনে রাক্ষসটা দেখছি হাঁ ক'রে এগুচ্ছে, তাঁকে দেখে বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে—তখন যে কাতুকুতু দিলেও হাসি আসে না।"

"কিন্তু আমার আসে; কেন না, আমি দেখতে পাই, এর ভেতর একটা প্রকাণ্ড পরিহাস। একটা লোক গম্ভীর ভাবে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলছে,—ছিমছাম ফিটফাট বাবুটি—যেন ধরাখানা সরা মনে ক'রছে—সে যদি পা পিছলে দড়াম ক'রে আছাড় খেয়ে পড়ে কাদার ভিতর, তাতে হাসি পায় না? এ তেমনি। কেমন মজার দুনিয়া দেখ দেখি। সবাই ভাবছে এক, আর দিন-রাত হ'চ্ছে তার উল্টো, তবু সবাই ভেবেই চ'লেছে—মনে মনে ভাঙ্গছে গড়ছে। সবাই তো নাচের পুতুল, পেছন থেকে তার টানছে আর কেউ, তাই নাচছেন—তবু কেউ ভাবছেন আমি রাজা, কেউ ভাবছেন আমি উজীর—ভারী চালে চ'লছেন যেন কত বড় মাতব্বর। ঠিক যেন একখানা ফার্স!"

হরিচরণ ইহাতে খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল না। অসীমের কথাটায় জীবনের নিষ্মম পরিহাসটা তার চোখে যেন জল্‌জলে হইয়া ভাসিয়া উঠিল। সে কঠোর মূর্ত্তিতে তার হাসি পাইল না,—সে আরও মুশড়াইয়া পড়িল।

তখন অসীম হঠাৎ আর এক সুর ধরিল। তার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, একটা প্রশান্ত জ্যোতিঃ তার ভিতর ফুটিয়া উঠিল; সে দরদ দিয়া গাহিল,

"ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার,
হালের কাছে মাঝি আছে, ক'রবে তরী পার।"

হঠাৎ চমক লাগিয়া যেন হরিচরণের মনটা তাজা হইয়া উঠিল। সে মুগ্ধ হইয়া অসীমের কণ্ঠের এ আশার বাণী সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিল।

গান শেষ হইলে সে বলিল, "কি চমৎকার গাও তুমি অসীম দা', তোমার মুখে গানের কথাগুলো যেন জ্যান্ত হ'য়ে ওঠে।"

"জ্যান্ত গান হ'লেই গেয়ে তাকে জ্যান্ত করা যায় ভাই। এ গানটা শুকনো তত্ত্ব নয়, একটা জ্যান্ত হৃদয়ের টাট্‌কা অনুভূতি—তাই এটা প্রাণের ভিতর সোজা গিয়ে বেঁধে। এই কথাটা তো কত লোকে কতবার কত তাকে ব'লেছে, কিন্তু এমনি ক'রে প্রাণের ভিতর পৌছুবার মত ক'রে কে কবে ব'লেছে!"

হরিচরণ গুণ গুণ করিয়া গাহিল, "হালের কাছে মাঝি আছে, ক'রবে তরী পার"—তার পর বলিল, "এই কথাই ঠিক দাদা, তুমি আগে যা' বলছিলে সব ভুল। বর্ত্তমানে কাজ ক'রতে হ'বে, দাঁড় টেনে চ'লতে হবে সেটা ঠিক,—সে সুধু এই ভরসায় যে হালে মাঝি আছে, তরী পার হবে। নইলে সুধু দাঁড় টেনে হাতে ব্যথা করবার মত বুকের পাটা আছে কার?"

"আছে, আমার। কেন না, আমার তরীখান খেয়া-ঘাটের নৌকোও নয়, সওদাগরী জাহাজও নয়, যার একটা বন্দরে পৌছুতেই হবে—এ সুধু Rowing club এর ডিঙ্গি। পারে যাবার কোনও তাড়া নেই এর, দাঁড় টানাই এর সুধু দরকার—তাতেই সুখ! মাঝির ভরসা এতে নেই, কেন না, ভেসে চলাই এর কাজ।"

"কিন্তু 'তুফান যদি এসে পড়ে'—"

"'কিসের তোমার ভয়?' কিন্তু মাঝির ভরসায় নয়। ভয় নেই, কেন না, ভাবনা নেই। ভাসাটা চিরদিন চলবে না, ডুবতে হবেই শেষে—সেই ডোবা কোথায় কেমন ক'রে হ'বে সে সম্বন্ধে কোনও বাছ-বিচার নেই আমার। তাই আমার তরীতে মাঝি নেই।"

"মাঝি নেই?"

"জানি নে, আছে কি নেই সে খোঁজের দরকার বোধ করি না। জানি ভাসছি—ভাসতে হ'বে—মনের সুখে দাঁড় টেনে চ'লেছি—কোথায় পৌছুব জানি না। জানি সেটা আমার হাত নয়, তাই তার জন্য ভাবনা নেই।"

"তুমি ভগবান মান না তা' হ'লে?

"ব'লতে পারি না, কেন না বিষয়টা ভেবে দেখবার কোনও দরকার বোধ করি নি। আমি জানি জীবন সত্য, এই জীবনটা চালিয়ে নিতে হবে যদ্দূর চলে। ব্যস্, এইটুকু আমার সঙ্গে জগতের সম্পর্ক। এর পেছনে কোথাও কোনও বুড়ো ভদ্রলোক আছেন কি না, সে খোঁজের কি দরকার?"

"বুড়ো ভদ্রলোক?"

"ওই তোমরা যাকে বল ভগবান। কথাটা ঠিক নয়

কি? তোমার ভগবান একটি বুড়ো—যিনি সব জেনে-শুনে খাতের জমা হ'য়ে ব'সে আছেন, সমস্ত জগৎকে হুকুম দিচ্ছেন, খাটাচ্ছেন, শাসন ক'রছেন—আর যিনি নিরতিশয় ভালমানুষ, বিন্দুমাত্র বদখেয়াল যাঁর নেই, আর দুটো কান্না-কাটি ক'রলে কথা রাখেন, ঘুস নিতেও নারাজ নন—তোমার ভগবানের কথা শুনলে আমার মনে পড়ে আমার ঠাকুর্দ্দার কথা।"

"ছি, ছি, কি সব ব'লছো অসীম দা'। ঠাট্টা তামাসার একটা সীমা আছে। এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যার সম্বন্ধে ঠাট্টা করা চলে না।"

"তামাসাটা কোথায় দেখলে? এ নিদারুণ সত্যি। তোমার ভগবানকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখ, দেখবে তাঁর চেহারা এই—এ ভগবানের সঙ্গে আমার কোনও কারবার নেই।"

"কোনও কিছুই কি মান না তুমি? এই পৃথিবীটা চলছে কিসে?"

"বলেইছি তো—সে কথা ভেবে দেখি নি। কিন্তু একটা কথা জানি, যে, বিজ্ঞান অণু-পরমাণু থেকে বিশাল আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র খুঁটিনাটি ক'রে সন্ধান ক'রেও তোমার ঐ বুড়ো ভদ্রলোকের সন্ধান পায় নি। তিনি যদি সবার দৃষ্টি এড়িয়ে এমন ভাবে লুকিয়ে থাকেন, তবে থাকুন তিনি—আমার তাঁর সঙ্গে কোনও কারবার নেই।"

"তোমার কারবার বুঝি আগাগোড়া শয়তানের সঙ্গে?"

"সে ভদ্রলোকটিরও দেখা পাইনি আমি, আর কেউ পেয়েছে ব'লে জানি নে। ব'লেইছি তো—আমার কারবার এই জ্যান্ত ভগবানের সঙ্গে, যাকে রোজ চক্ষের সামনে দেখতে পাচ্ছি, রোজ যার সঙ্গে কুস্তি লড়ছি—সে এই বিরাট বিশ্বপ্রবাহ।"

"তা' হ'লে একটা কেউ আছে এই বিশ্বপ্রবাহের ভিতর তা' স্বীকার কর?"

"স্বীকার করি এই বিরাট প্রবাহকে—এর তলায় লুকোনো কোনও কিছুকে নয়। দেখতে পাচ্ছি—এ একটা প্রকাণ্ড জ্যান্ত জিনিষ, একেবারে concrete। এর সঙ্গে বোঝা-পড়া রোজ ক'রতে হয়। এর বেশী কিছু আমার জানবারও দরকার নেই, মানবারও দরকার নেই।"

"তবে যে বড় গাইলে, 'হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার'?"

"এই সে মাঝি। তরী সে হয় তো পার ক'রবে—কিন্তু ঠিক আমি যে ঘাটে যেতে চাই সেখানেই যে তার যাবার মতলব, তা নাও হ'তে পারে। আর আমি চাই বা না চাই, যে ঘাটে তার নেবার সেখানে সে নেবেই। তাই ভাবনা নেই, ভয়ও নেই।"

কথায় কথায় রাত্রি হইয়া গেল, মেসের ঝি আসিয়া খবর দিল রান্না হইয়াছে। অসীম ও হরিচরণ উঠিল।

২

রাত্রে অনেকক্ষণ শুইয়া শুইয়া হরিচরণ অসীমের কথাগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভাবিল। তার মনের ভিতর অসীম যেন একটা প্রকাণ্ড তুফান উঠাইয়া তার তলা পর্য্যন্ত সব ওলট পালট করিয়া দিল।

জীবনে প্রথম আজ সে জীবনটাকে সমগ্র ভাবে আলোচনা করিল—এত দিন এ সব বড় কথা তার মনেই আসে নাই। সে আর্টিষ্ট হইবে, ছবি আঁকিয়া খ্যাতি লাভ করিবে, পয়সা রোজগার করিবে, বড়লোক হইবে, এ স্বপ্ন দেখিয়াছে, এই স্বপ্ন সফল করিবার আয়োজন করিয়াছে; কিন্তু এমন গোড়া হইতে জীবনের সমস্যাটার সামনা-সামনি কখনও হয় নাই। তাই সে যেন একটা গোলকধাঁধায় পড়িয়া কেবলি ঘুরপাক খাইতে লাগিল, কোনও কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

পরের দিন সকালে সে মুখ ধুইয়া দুটো গুড়-ছোলা খাইয়া যখন তার নিত্যকার্য্য—নিষ্ফল সন্ধানে বাহির হইবার উদ্যোগ করিল, তখন পূর্ব্বরাত্রের ভাবনা-চিন্তা তার মন হইতে প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। আজ কার সঙ্গে দেখা করিবে, কি কথা কহিবে, এই সব সামান্য কথা লইয়া তার মনটা ব্যস্ত রহিল। সকাল বেলাটা আশা করিবার সময়, নিরাশা আসে ব্যর্থ দিবসের শ্রান্ত সন্ধ্যায়। তাই, এখন সে আশায় বুক বাঁধিয়াই বাহির হইল।

বাড়ীর সদর দরজায় পৌঁছিয়া দেখিল, অসীম দাঁড়াইয়া আছে।

"এই যে ভায়া, কোন্ দিকে যাচ্ছ আজ?"

হরিচরণ বলিল, "বৌবাজারে একবার যাব ভাবছি।"

অসীম অমনি তার হাতটা বগলদাবা করিয়া বলিল, "চল যাই।"

"তুমি কোথায় যাচ্ছ অসীমদা' ?"

"ওই বউবাজারেই। দেখি একবার সেখানে কেমন বউ পাওয়া যায়।"

অসীম আজ আর তার ফিলসফি বলিল না; সে খুব হাল্কা ভাবে হাল্কা কথা বলিতে বলিতে চলিল। হরিচরণের মনটা তাতে বেশ পাতলা হইয়া গেল।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটা বাড়ীর সামনে আসিয়া অসীম বলিল, "চল না ভায়া একবার, একটা লোকের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

হরিচরণের কোনও তাড়া ছিল না, সে অসীমের সঙ্গে সে বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

যে ঘরে অসীম তাকে লইয়া গেল, সেখানে বেশ একটা ছোটখাট মজ্‌লিশ বসিয়াছিল। ঘরখানা অপরিচ্ছন্ন—তার এক পাশে একখানা তক্তপোষ, এক ধারে দুখানা চেয়ার, একটা আলমারী ভরা বই—আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হরেক রকমের জিনিষ—ছবি, Statuette, curio, চায়ের বাসন, খাবারের ঠোঙ্গা প্রভৃতি।

তক্তপোষের উপর শুইয়া একজন খবরের কাগজ পড়িতেছিল, তার পাশে বসিয়া আর একজন চা খাইতেছিল। চেয়ার দু'খানা দখল করিয়া বসিয়াছিল আর দুজন, তাদের হাতে চায়ের পেয়ালা, কিন্তু মুখে একজনের সিগারেট আর একজনের—বক্তৃতা।

অসীম আসিতেই সবাই কোলাহল করিয়া তার সম্বর্দ্ধনা করিল। তার পশ্চাতে হরিচরণকে দেখিয়া তাদের উচ্ছ্বাস কতকটা শমতা প্রাপ্ত হইল।

তক্তপোষে বসিয়া যে চা খাইতেছিল, সে হরিচরণের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চাহিল। অসীম পরিচয় দিল, "ইনি আমার তরুণ বন্ধু হরিচরণ পাল, কৃষ্ণনগরের সুবিখ্যাত শিল্পী গদাই পালের পৌত্র—আমাদেরই একজন। ওঁর মনে বাসনা—উনি artist হবেন, তাই তোমার কাছে নিয়ে এলাম সুরেন দা'।"

সুরেন বলিল, "মাপ ক'রবেন ম'শায়, প্রথম পরিচয়, কিন্তু—মরবার কি আর পথ পেলে না? এমন বেয়াড়া বাসনা কেন হ'ল বল দিকিনি।"

হরিচরন এ সম্ভাষণে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল, সে কিছু বলিতে পারিল না।

অসীম বলিল, "এ আর বুঝছো না, এ তোমার সেই বুড়ো ভদ্রলোকের কারসাজী। এর প্রতিকার নেই।"

সুরেন। কিন্তু বিনা চেষ্টায় হাল ছাড়তে পারছি না ভাই। শোন ভায়া, সত্যি সত্যি আর্টিষ্ট যদি হও তুমি, তবে তোমার এ ঘাটে মরতেই হবে, তার চারা নেই। কিন্তু সাবধান ক'রে দিচ্ছি—এতে খেতে পাবে না।

হরিচরণ এ কথায় বিষম দমিয়া গেল।

অসীম হাসিয়া বলিল, "দেখ সুরেন দা' এতটা হিংসে ভাল নয়। পাছে ও তোমার পসার কেড়ে নেয় তাই মিছে ভাঙ্‌চি দিচ্ছ! ওকে বিশ্বাস ক'রো না হরিচরণ। দাদার আমার সত্যি কথা বলাটা বেশী আসে না।"

সুরেন। যদিচ কথাটা অস্বীকার ক'রতে পারছি না, তব্ এ কথাও স্বীকার করো অসীম, যে, মাঝে মাঝে সত্যি কথা ব'লে থাকি—এ বিষয়ে আমার কোনও ধরা বাঁধা নিয়ম নেই।

অসীম। সে যাই হোক, একে তোমার সাগ্‌রেদ ক'রে নিতে হবে।

সুরেন। বেশ, লক্ষ্মীছাড়ার দল পুরু করবার মতলব থাকে তো এসো। আজ থেকেই ভর্ত্তি হ'য়ে পড়। একেবারে চা' থেকে সুরু করা যাক, কি বল? অসীম, ওই টি-পটটায় আছে দু পেয়ালা আন্দাজ, ঢেলে নেও ভাই।

অসীম দু পেয়ালা চা ঢালিয়া একটা নিজে লইল একটা হরিচরণকে দিতে গেল। হরিচরণ বলিল, "আমি চা খাইনে।"

অসীম। ওরে বাপ রে, ও পাপ কথা সুরেনদা'র ঘরের আশে-পাশে কোথাও ব'লো না, ও খুন ক'রে বসবে।

হরিচরণ চায়ের পেয়ালা লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

সুরেন একজন প্রতিভাশালী চিত্রকর, কিন্তু তার চিত্র অর্থকর নয়। সে তার আর্টকে খাটো করিয়া সস্তা পয়সা রোজগার করিতে চায় না, তাই সে বাজে ছবি আঁকে না, নিরবচ্ছিন্ন কলালক্ষ্মীর অনুশীলন করে। এক দিন এক বন্ধু তাকে এক বড়লোকের কাছে লইয়া গিয়াছিল। বড়লোকটি তাকে তাঁর প্রতিকৃতি আঁকিতে বলিয়াছিলেন। বিস্তর পয়সা পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সুরেন তাঁর ছবি আঁকিতে স্বীকার করে নাই।

তার বন্ধু অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেললে ?"

সুরেন বলিল, "প্রাণের দায়ে।"

"কি রকম ?"

"ভদ্রলোকের চেহারা যেমন, তাতে ঠিক মানানসই ক'রে ছবি আঁকলে ভদ্রলোক ভাবতেন সেটা caricature। তখন লক্ষ্মী আসা দূরে থাক, প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ পেতাম না।"

"কেন ? কুৎসিত মূর্ত্তির কি ছবি হয় না ?"

"হবে না কেন ? কিন্তু তাতে পরিকল্পনা ক'রতে হয় একটা দানব দৈত্য বা রাক্ষসের। ছবি তো সুধু ফটোগ্রাফ নয়, এর ভিতর ফুটিয়ে তুলতে হবে character—ওই চেহারায় আমি যে character ফোটাতে পারি, সে একটা খুনে'র। তা' হ'লে ছবিখানা হ'ত ভাল, কিন্তু বেচতে হ'ত ওঁর শত্রুর কাছে।"

তা ছাড়া সুরেনের আর একটা দোষ ছিল এই যে, বাজারে যে সব আর্টিষ্টের খুব বেশী খ্যাতি, তাদের সে দু চক্ষে দেখিতে পারিত না। তাদের আদর্শ বা অঙ্কন-পদ্ধতির সঙ্গে তার সহানুভূতি ছিল না। সে তার ছবি আঁকিত একটা স্বতন্ত্র বিশিষ্ট পদ্ধতিতে, তার আদর দেশে ছিল না।

তাই সুরেনের ছবির আদর বেশী ছিল না, তার রোজগারও ছিল সামান্য। কোনও মতে কায়ক্লেশে তার জীবনযাত্রা চলিয়া যাইত।

সুরেনের বয়স ত্রিশের উপর, কিন্তু সে ছিল রাজ্যের ছোকরাদের বন্ধু। তার মধ্যে কেউ বা ছাত্র, কেউ বা কেরাণী, কেউ বা প্রাইভেট টিউটার—সবাই সমান লক্ষ্মী-ছাড়া। টেঁকে কড়ি তাদের প্রায় থাকে না, আহারটাও যে নিয়ম করিয়া তিন শ পঁয়ষট্টি দিনই হয় এমন নয়। কিন্তু সে জন্য কারও উদ্বেগ নাই। সুরেনের এই ঘরটিতে বসিয়া তারা পেয়ালার পর পেয়ালা চা উজাড় করে, আর কথা কয় সব বড় বড়। কেউ বা আর্টিষ্ট, কেউ বা কবি, কেউ বা কথা-সাহিত্যিক, আর সবাই সমালোচক—কিন্তু তাদের বিপুল প্রতিভার প্রতিষ্ঠার জন্য সবাই চাহিয়া আছে ভবিষ্যতের পানে।

সুরেনের তরুণ বন্ধুদের মধ্যে রমেশের অবস্থা সব চেয়ে ভাল, আর বয়সে সে সব চেয়ে ছোট। সে খুব ভাল খেলোয়াড়,—ফুটবল, হকি ও টেনিসে তার সমান অধিকার। তার খেলা কাজেই সারা বছর ধরিয়াই চলে, আর খেলার জন্য সে বেশ দু পয়সা রোজগার করে। তার একটা চাকরী আছে—মাসে পঞ্চাশ টাকা তার মাহিনা; কিন্তু আফিসের চেয়ে মাঠেই সে বেশী দিন কাটায়। এ চাকরী তাকে দিয়াছেন এক খেলার মুরুব্বি, তাঁর ক্লাবে সে খেলিবে বলিয়া। তা ছাড়া মাঝে মাঝে সে বেশ মোটা টাকা লইয়া এদিক সেদিক খেলিতে যায়—তাতেও তার মনিবের আপত্তি নাই।

এতগুলি লক্ষ্মীছাড়ার বন্ধু রমেশের রোজগারের টাকা তার সিন্দুকে উঠিবার বা ব্যাঙ্কে জমা হইবার অবসর পাইত না। বন্ধুদের খাওয়ান দাওয়ান, তাহাদিগকে লইয়া excursion-এ যাওয়া, সিনেমা দেখান, এমনি সব খরচের অঙ্ক তার বাঁধাই ছিল। তা ছাড়া, অভাবে পড়িলে বন্ধুরা তার কাছে হাত পাতিতে কোনও দ্বিধা করিত না। রমেশও ইহাতে কোনও দিন কোনও কুণ্ঠা বোধ করিত না। সুধু দুহাতে এমনি করিয়া টাকা ছড়াইবার আনন্দই ছিল তার কাছে টাকা রোজগারের একমাত্র প্রয়োজন।

নামজাদা খেলোয়াড় হইয়া কিন্তু রমেশের তৃপ্তি ছিল না। তার এই খেলার খ্যাতিতে সে রীতিমত চটিত। খবরের কাগজে যে দিন তার খেলার সুখ্যাতি সহ তার ছবি ছাপা হইত, সেদিন সে প্রাণ খুলিয়া দেশের লোককে গালাগালি দিত। সে বলিত, "বেটারা আহ্লাদে আটখানা হ'য়েছে, আমায় মাথায় তুলে নাচতে লেগেছে, কি না আমি লম্বা লম্বা কিক্ ক'রতে পারি। হতভাগারা চেয়ে দেখবে না একবার যে, এত বড় একটা কবি এই খেলোয়াড়ের ভিতর মাঠে মারা যাচ্ছে।" সে কবিতা লেখে, আর তার মনে আশা আছে যে, এক দিন লোকে তার কবিত্বের যোগ্য সমাদর করিবে। সেই সমাদরের আগমনীর সুরের জন্য সে কাণ পাতিয়া থাকে, শুনিতে পায় সে সুধু তার খেলার জয়ধ্বনি—রাগে সে ফুলিতে থাকে। তাই সে খেলোয়াড়দের প্রশংসামুখর সঙ্গ ছাড়িয়া ছুটিয়া আসে সুরেনের এই শান্ত কুলায়ে—এখানে সে তার কবিতা পড়ে, আর কবিতার প্রশংসা শুনিতে পায়।

আজ একটু আগে সে তার "নির্ঝর" নামে একটি নূতন

কবিতা পাঠ করিয়াছিল, তারই আলোচনা চলিতেছিল। হরিচরণ সহ অসীমের হঠাৎ আবির্ভাবে আলোচনাটা স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। সে হাঙ্গামা চুকিলে সুরেন বলিল, "ওহে, রমেশ আজ যে একটা কবিতা লিখেছে—চমৎকার। দেখ।" বলিয়া কাগজখানা অসীমের হাতে দিল। অসীম পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "Fine—extraordinary! নির্ঝরের এ কল্পনা অপূর্ব্ব!

ভিখারী নিঝর
জলকণা মাগি ফিরে
এ-ঘর ও-ঘর
অকরুণ মেঘ তায়
করুণায় পড়ে ঝরি
তুষার গলিয়া দেয়
কূলে কুলে বুক ভরি।
ছোট সে নিঝর!
পুলকেতে সারা অঙ্গ
কাঁপে থর থর—
শিলার ডিঙ্গায় যায়
টিলা ভাঙ্গে পায়
ধরণীর বুকে পড়ি
সকলি বিলায়।

সুধু দিয়েই তার আনন্দ! কি সুন্দর!—a perfect Bohemian! ধন্য কবি, ধন্য তোমার এ কল্পনা!" বলিয়া অসীম রমেশকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল।

রাজীব রায় একজন ভাবী ঔপন্যাসিক—সে বলিল, "নির্ঝরের এমন কল্পনা কোনও দেশে কোনও কবি করে নি। এর পাশে রবি বাবুর "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' একেবারে Flat।"

ভূপেন মুখার্জ্জি বাঙ্গলার ভবিষ্য Taine, সম্প্রতি একটি খবরের কাগজের প্রুফ সংশোধন করে। সে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের সঙ্গে তুলনা করিল—ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ভাসিয়া গেল।

এমনি করিয়া ক্রমে সাব্যস্ত হইল যে, এমন কবিতা ন ভূত ন ভবিষ্যতি।

সুরেন বলিল, "কিন্তু কাল যদি এ কবিতা কাগজে বেরোয়, তবে শুনবে, মাসিক সাহিত্য সমালোচনার প্রাজ্ঞ সমালোচক এক কথায় একে বলবেন—রাবিশ! এই আমাদের দেশ!"

ভূপেন বলিল, "ঐসা দিন নহী রহেগা। এই সমালোচনার ধারা একদম উল্টে দেব দাদা! কোনও ভয় নেই ভায়া, লিখে যাও, ভবিষ্যতের কবি তুমি, আমি হব তোমার সমালোচক—অন্ধ দেশকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছাড়বো। ক'দিন আমাদের চেপে রাখবে এই বুড়োর দল।"

গল্পে গল্পে অনেক বেলা হইয়া গেল। সুরেন অসীমকে বলিল, "কি হে, তোমার কলেজের তাড়া নেই বড় আজ?"

অসীম শান্ত ভাবে হাসিয়া বলিল, "না দাদা, সে পাট উঠেছে।"

"তার মানে?"

"মানে অত্যন্ত সোজা, কলেজ ছাড়লাম আজ থেকে।"

"কেন?"

"রেস্ত নেই ব'লে। দেশে যে বিপুল সম্পত্তির জোরে কলেজে যাওয়া-আসার অভিনয় চলছিল, সেটা চুকে গেছে। এখন রোজগার না ক'রলে, মেসের পাঠও ওঠাতে হবে।"

সবাই ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অসীম অবস্থাটা তাদের খুলিয়া বলিল। সকলেই দুঃখিত হইল, কিন্তু অসীম বলিল, "আমি যে ভাই, এতে কি আরাম বোধ ক'রছি, কি ব'লবো। ঐ বিষয়টুকু যেন আমায় বন্দী ক'রে রেখেছিল। ওর থেকে দুটো টাকা আসতো, তাই কলেজে গিয়ে কতকগুলি প্রফেসারের অনর্থক বক্তৃতা শুনতে হ'ত। এখন সে উৎপাত চুকে গেল—এখন আমি স্বাধীন, যা খুসী ক'র্‌বো, যেখানে খুসী যাব।"

সুরেন বলিল, "সে হ'তে পারতো, যদি তোমার বিষয়-টুকুর সঙ্গে উদরটুকু যেত। সেটা ভরবার কি উপায়?"

"সে ঠিক ক'রে ফেলেছি। আমার গল্পগুলো এক সঙ্গে ক'রে ছাপাব ঠিক ক'রেছি।"

"তোমাকে discourage ক'রতে চাই না, কিন্তু সেগুলো পয়সা দিয়ে ছাপবে এমন পাবলিশার বাঙ্গলা দেশে আছে কি?"

"না থাকে তাদের দুর্ভাগ্য!" বলিয়া অসীম দারুণ ঔদাস্যের সহিত ভূপেনকে বলিল, "ওহে, শুনলাম, তোমার কাগজ না কি উঠে যাচ্ছে?"

"এই রকম একটা গুজব শুনছি বটে।"

"তার পর ?"

"তার পর ঠিক তোমার মত।"

"উত্তম, সুরেন দা', তোমার লক্ষীছাড়ার দল দেখ্‌ছি ষোলকলায় পূর্ণ হ'য়ে উঠছে।"

ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া হরিচরণের তাক লাগিয়া গেল। বিষয় বিশেষ না থাকিলেও হরিচরণ অন্তরে অন্তরে বিষয়ী লোক। হিসাব করিয়া খরচ করা সে শিখিয়াছে শৈশব হইতে, আর অনাগতের হিসাব খতাইয়া বর্ত্তমানকে গড়া তার জীবনের প্রথম নীতি। কিন্তু এই একদল লোক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে বেপরোয়া, কাল কি হইবে আজ সে সম্বন্ধে চিন্তা করে না। অনশনের স্পষ্ট সম্ভাবনা সম্মুখে করিয়া ইহারা পরম আনন্দে কাব্যালোচনা করে—ইহাদের চরিত্র সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু এদের, বিশেষতঃ অসীমের এই নির্ব্বিকার বর্ত্তমানপরতা তাহাকে ভারী মুগ্ধ করিল। এ এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাস, আশ্চর্য্য বৈরাগ্য! সে মনে মনে বুঝিল ইহা নিছক বেকুবী, কিন্তু জিনিষটা জোরে তার মনটা আঁকড়িয়া ধরিল।

ইহার পর সে দেখিল অসীমের বইখানা সত্য সত্যই একজন প্রকাশক—জলের দরে হইলেও—নগদ দাম দিয়া কিনিয়া লইল। আর ভূপেনের কাগজ উঠিয়া গেলেও তার অন্যত্র চাকরী জুটিল। সে ভাবিয়া মরিত কবে বা ইহারা না খাইয়া মরে; কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, তাদের অর্থকষ্ট অনেক হইল, কিন্তু তবু তাদের দিন এমনি একরকম চলিয়া গেল।

সে এই ব্যাপার দেখিয়া দেখিয়া অবাক্ হইল।

বছর দুই পরে একদিন সে অসীমকে বলিল, "যতই বল দাদা, ভগবান আছেন, আর তিনি ঠিক তোমার বুড়ো ভদ্রলোক নন।"

"তাই না কি? কোন্ অকাট্য যুক্তির বলে এ কথা ঠিক ক'রলে ভাই? সৃষ্টির আদি থেকে এ পর্য্যন্ত অনেক লোকেই কথাটা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা ক'রেছে, আমার মত এই যে তাদের কোনও যুক্তিই টেঁকসই নয়। তুমি কি নূতন যুক্তি বের ক'রলে শুনি।"

"ভগবান যদি নেই, তবে তোমার চ'লে যাচ্ছে কেমন ক'রে? ওই যে বলে 'ভাগ্যবানের ভার ভগবান বয়' সে কথা আমি যে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।"

"ওঃ, এই—তা বেশ, এ যুক্তির মৌলিকতা আছে। কিন্তু ভায়া, ভগবানকে বুড়ো ভদ্রলোক ক'রতে বরং রাজী আছি, কিন্তু আমার বোঝা বইবার গাধা ক'রতে প্রস্তুত নই। আমার যে চলে যাচ্ছে তার জন্য এমন অসম্ভব কল্পনা করবার দরকার নেই, কেন না তার প্রত্যক্ষ হেতু হ'চ্ছেন রায় কোম্পানী। তাঁরা আমার বই ছেপে ছেপে দেউলে হ'য়ে যেতে পারেন—আর তার পরও যদি আমার চলে তার হেতু হবে হয় তো এই যে আর একটা বোস কোম্পানী কি ঘোষ কোম্পানী গজাবে। ভগবানের হাত এর ভিতর দেখতে পাচ্ছি না ভায়া।"

ভূপেন তখন তক্তপোষে পড়িয়া ঘুমের জোগাড় করিতেছিল। সে উঠিয়া বসিল, বলিল, "শুনহ অসীম রায়—তোমার যুক্তি আমি মানি না—ভগবান আছেন, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হ'য়েছে।"

"So glad to hear। তাঁর ঠিকানা টুকে রেখেছ? একবার call ক'রতাম।"

"সেই তো মুস্কিল, ভদ্রলোক ঠিকানা রেখে যান না, কিন্তু তবু আছেন তিনি নিশ্চয়—সেটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।"

"যথা"—

"দেখ, এই ছাব্বিশ বছর বয়স হ'তে চ'ল্ল—এর ভিতর কত রকম প্ল্যান ক'রেছি, কত জোগাড়-জাগাড় ক'রে সব প্রায় ঠিক ক'রে এনেছি, এমনও দিন হ'য়েছে যখন মনে হ'য়েছে আর কেউ ঠেকাতে পারলে না—কিন্তু নিয়ম ক'রে সবগুলি প্ল্যান শেষ মুহূর্ত্তে ভণ্ডুল হ'য়ে গেছে। কেন? তুমি ব'লবে accident। কিন্তু আমার বেলায়ই এই accidentগুলো নিয়ম ক'রে হ'চ্ছে কেন? এর ভিতর একটা কুচক্রীর গভীর ষড়যন্ত্র আছে—আর সে কুচক্রী মানুষ নয় এটা ঠিক। সুতরাং ভগবান আছেন, আর তাঁর কাজ হ'চ্ছে আমাদের সব সঙ্কল্প ব্যর্থ করা।"

"ওহে হরিচরণ, দেখ, এ পাপিষ্ঠ আমার চেয়ে তোমার ভগবানের বড় শত্রু—আমি সুধু তাকে বধ ক'রেছি—এ তাকে গাল দিচ্ছে—ভগবান কি না এত বড় পাপিষ্ঠ যে অনর্থক একটা নিরপরাধ লোককে এমনি ক'রে ঠকায়।"

হরিচরণ বলিল, "তা' করেন তিনি। জান না দাদা, তিনি দর্পহারী! যখন মানুষ নিজেকে বড় শক্তিমান্ মনে করে, ভাবে—সব ভাঙ্গাগড়া তার হাত, তখন তিনি এমনি ক'রে তা'র দর্পচূর্ণ ক'রে তাকে মনে করিয়ে দেন সে কত ছোট।"

"তাই যদি তাঁর অভিসন্ধি, তবে আমার বেলায় তাঁর এ পক্ষপাত কেন?"

"সে কথা তিনি জানেন। কিন্তু নাই বা হবে কেন? তোমার তো অহঙ্কার নেই—তুমি তো নিজেকে ভাঙ্গাগড়ার মালিক ব'লে ভাব না—তুমি যে বানের মুখে কাঠ।"

হরিচরণের কথার ভিতর এমন একটা গভীর বিশ্বাসের সুর বাজিয়া উঠিল যে অসীম মুগ্ধ হইয়া তার দিকে চাহিল; দেখিল, হরিচরণের চক্ষু ছল ছল করিতেছে, আবেগে তার মুখ ছাইয়া গিয়াছে।

অসীম হাসিয়া বলিল, "বেশ ভাই বেশ!—না, আর তোমার কাছে ভগবানকে নিয়ে তামাসা করা চলবে না। তোমার এ বিশ্বাসটা এমন সুন্দর যে এতে ঘা দিতে মায়া হয়।"

(৩)

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সুরেনের একখানা ছবিতে তার নাম ফাটিয়া পড়িল। অনেক টাকায় ছবিখানা বিক্রী হইল, আর কয়েক মাস যাইতে না যাইতে এক স্বাধীন রাজ্যের কলাভবনে তার একটা মোটা মাইনার চাকরী জুটিয়া গেল।

হরিচরণের সঙ্গে সাক্ষাতের তিন বৎসর পর সুরেন তাহাদের কাছে বিদায় লইয়া, তার সকল বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তার কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। তার লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুর দল সকলেই তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে সেই দেশে যাত্রা করিত, কিন্তু সুরেন যাইবার পূর্ব্বে একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিল, তাতে বন্ধুরা থামিয়া গেল।

একটি বড়লোকের মেয়েকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার ওজুহাতে সুরেন কয়েক মাস হইল তাঁর বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিতেছিল। হঠাৎ তার যাইবার তিন দিন আগে সুরেন সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। সুরেনের লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুরা অবশিষ্ট তিন দিন এই মহিলাটির সঙ্গে যেটুকু আলাপের সুযোগ পাইল, তার ভিতরই তারা আবিষ্কার করিল যে, সুরেন সম্বন্ধে তাঁর যে মতই থাকুক, সাধারণভাবে লক্ষ্মীছাড়াদের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত নাই। কাজেই তারা থামিয়া গেল।

হরিচরণ তিন বৎসরে সুরেনের কাছে যাহা শিখিয়াছিল তাহা সামান্য নয়। তার জমা পুঁজি যাহা ছিল, এ দুই বৎসরে তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, আর বেশী শিক্ষালাভের কোনও চেষ্টা না করিয়া, সে স্বয়ং চর্চ্চা করিয়া ক্রমে সুবিধামত কিছু রোজগার করিবে স্থির করিল।

সে প্রথম গুরুর শিক্ষা শিরোধার্য্য করিয়া টাকা রোজগারের সহজ পন্থা অনুসরণ না করিয়া ভাল ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিল। অনেক কষ্ট করিয়া তিন চার-খানা ছবি আঁকিয়া সে দ্বারে দ্বারে ঘুরিল—তার খরিদ্দার জুটিল না। তার পর সে পেটের দায়ে বাজারের চাহিদা অনুসারে মাসিকপত্রের অঙ্গবর্দ্ধনের উপযোগী ছবি আঁকিতে লাগিল। ইহাতেও সে বেশী সুবিধা করিতে পারিল না। মাসিকপত্রের সম্পাদক যাঁরা ছবি বাছাই করেন, তাঁরা খুব বড় কলাবিদ্ নন। কাজেই তাঁরা হয় নাম দেখিয়া ছবি নেন, না হয় একেবারে যা' তা' ছাপেন। কাজেই তাঁদের কাছে হরিচরণ চট্ করিয়া জামায়ের আদর পাইল না, ইহা বলা বাহুল্য।

অনেকগুলি ছবি লইয়া ফিরিবার পর একদিন হঠাৎ হরিচরণের একখানা ছবি "উদাসী" সম্পাদকের চোখে লাগিয়া গেল। তিনি নগদ পাঁচ টাকা মূল্যে ছবিখানি কিনিলেন, আর উপরি দিলেন ছবির প্রশংসা।

সেদিন হরিচরণকে পায় কে। এই পাঁচ টাকা সে পাইয়াছে ভাগ্যদেবীর ভাণ্ডারে সিঁধ কাটিয়া। এখন সিঁধের ফাঁকটা বড় হইতে যা' সময়। তার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না যে, লক্ষ্মীর পুরীতে তার এই প্রথম পদক্ষেপ তার চির-সৌভাগ্যের সূত্রপাত মাত্র। সম্পাদক যে ছবির এত সমাদর করিলেন, তার চেয়ে অনেক ভাল ছবি আঁকিবার শক্তি তার আছে। তার প্রতিভার যখন পূর্ণ-বিকাশ হইবে, তখন সমস্ত দেশ তার সমাদর করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিবে, দিকে দিকে বাজিয়া উঠিবে তার প্রশংসার দুন্দুভিনিনাদ। সেই ভাবী সুরের আভাস

তার কাণে আজই ধ্বনিত হইয়া উঠিল—সে পাঁচটি টাকা হাতে করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল।

পর মুহূর্ত্তেই তার প্রাণটা দমিয়া গেল দেশের কয়েকখানা চিঠি পড়িয়া।

বাড়ী হইতে হরিচরণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছিল মানুষ না হইয়া দেশে ফিরিবে না। সে প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা করিয়াছিল। মাঝে মাঝে স্ত্রীর খবর নেওয়া ছাড়া সে দেশে কাহাকেও চিঠিও লিখিত না। তার অবস্থা সে কাহাকেও জানাইত না, ভাইয়েদের অবস্থাও জানিতে চেষ্টা করিত না।

সে সংবাদ পাইয়াছিল, কয়েক মাস পূর্ব্বে তার শ্বশুর মারা গিয়াছেন। তার পর শাশুড়ীও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তার দুই শ্যালক চৈতন পালকে খবর পাঠাইয়াছিল, তোমাদের বউ তোমরা লইয়া যাও, আমরা তাকে রাখিতে পারিব না। চৈতন তার উত্তরে লিখিল, 'যার বউ সে নিক গে, আমরা তার কি জানি ?'

এই ব্যাপার লইয়া বাদানুবাদ মন-কষাকষি কিছুদিন চলিল। আর বিশের কোনও দিন শ্বশুরবাড়ী যাইবার সম্ভাবনা যতই সুদূর পরাহত মনে হইতে লাগিল, ততই ভাইয়ের ঘরে তার বাস সুকঠিন হইয়া উঠিল। তার দুই ভাজ সুধু তাকে নিরন্তর বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, সুধু তাকে কেনা দাসীর মত সংসারে খাটাইয়া খুসী হইতেন না, ক্রমে ঠোনাটা চড়টা চাপড়টা লাগাইতে লাগিলেন।

এক দিন বড়ভাজের অত্যাচারের আতিশয্যে বিশে রাগ সামলাইতে পারে নাই—সে তার বাপ তুলিয়া গালি দিয়াছিল। বড় বউ তো তাতে সপ্তমে চড়িয়া গেলেনই, বড় ভাই সেই কথা শুনিয়া আসিয়া বিশেকে খুব ক' ঘা দিয়া তাকে যা নয় তাই বলিয়া গালি দিয়া গেল।

বিশে' তখন নিজে জোগাড় করিয়া শ্বশুরবাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, শ্বশুরের ভিটায় পড়িয়া জায়ের দাসীত্ব করিয়া খাইবে তবু ভাইয়ের ঘরে আর সে আসিবে না।

চৈতন তাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল, যে সঙ্গে আসিয়াছিল তাকে বলিল, "ওকে এখেনে এনেছো কেন? বাবুর কাছে ক'লকেতায় নিয়ে যাও—যেখানে বাবু গেছেন বড়লোক হ'তে সেখানে নিয়ে যাও।"

বিশের বড় যা' কিন্তু তাকে আদর করিয়া ঘরে তুলিল, বলিল "নইলে অকল্যাণ হবে।"

চৈতন তার স্ত্রীকে ভয় করিত। তার কাজে প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কিন্তু সে হরির কাছে একখানা কড়া চিঠি লিখিয়া দিল যে, চৈতন হরির স্ত্রীর ভার বহিতে পারিবে না। সে যখন স্বাধীন হইয়াছে, তখন তার স্ত্রীকে লইয়া যা'ক। বিশেও অনেকগুলি কলম ভাঙ্গিয়া তার দুর্দ্দশার কথা খোলসা করিয়া হরিচরণকে লিখিল। শেষে লিখিল "তুমি যদি আমাকে তিন দিনের মধ্যে নিয়ে না যাও তো গলায় দড়ি দিব।"

হরিচরণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনও দ্বিধা হইল না। পত্র দু'খানা পড়িয়া সে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং স্ত্রীকে কলিকাতায় আনিবার সঙ্কল্প করিতে তার এক মুহূর্ত্তও সময় লাগে নাই। কিন্তু সে তার সমস্ত জমাপুঁজীর হিসাব করিয়া দেখিল যে কৃষ্ণনগর যাতায়াতের খরচ বাদে তার হাতে মাত্র পাঁচসিকা অবশিষ্ট থাকে। এই পাঁচসিকার ভরসায় স্ত্রীকে আনিয়া সংসার পাতিবার কল্পনা তার কাছে বাতুলতা বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু ভাবিবার সময় ছিল না। অসীমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল একখানা ঘরের সন্ধানে। অনেক খুঁজিয়া একখানা ঘর পাইল একটু অপেক্ষাকৃত ভাল ধরণের একটা বস্তীতে। টিনের ঘর, পাকা মেঝেওয়ালা ছোট্ট একখানা ঘর—কিন্তু ঘরখানা নূতন, আর পাশে যে সব ভাড়াটিয়া তারা গৃহস্থ গোছের ভাল লোক। মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় ঘর ঠিক করিয়া, একটি টাকা অগ্রিম দিয়া সে কৃষ্ণনগরে চলিয়া গেল।

সেখানে তার কিছু বাসন-পত্র সিন্ধুক খাট প্রভৃতি আসবাব ছিল। তার সামান্য কিছু সঙ্গে আনিল, বাকী সে দশ টাকায় বিক্রী করিল। তার পর সে বিশেকে লইয়া, নগদ দশ টাকা হাতে করিয়া কলিকাতায় ফিরিল।

খুব রাগারাগি করিয়া সে চলিয়া আসিল, কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়াই তার রাগ পড়িয়া গেল, তার স্ত্রীর ভরা যৌবনের অপূর্ব্ব লাবণ্যরাশির দিকে চাহিয়া। দুঃখ দুর্ভাবনার কথা

ভাবিবার সময় হইল না, ভবিষ্যতের কথা মনে হইল না, একটা পরম লোভনীয় রমণীয় বর্ত্তমান তাকে অভিভূত করিল। সে চট্ করিয়া বিশেকে তার বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আর দুঃখ নেই তো ছোট বউ?"

ছোট বউ লজ্জানত মুখে মৃদুস্বরে সুধু বলিল, "না।"

কলিকাতায় তার ছোট ঘরে বিশে' মনের আনন্দে তার সুখের সংসার পাতিল।

(৪)

বড় আনন্দে তাদের কয়েক দিন কাটিল। বিশে'র ভরা যৌবন, ঢলঢল রূপ, হাসিভরা মুখ, কৌতুকভরা চিত্ত। হরিচরণের মন চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তি পাইত না।

আকাশের বিদ্যুতের মত চঞ্চল বিশে', দুষ্ট শিশুর মত কৌতুকে ভরা। সে এত দিক দিয়া হরিচরণের মনে আনন্দের ফোয়ারা ছাড়িতে লাগিল যে বেচারী একেবারে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

হরিচরণ ছবি আঁকিতে বসে, বিশে' যায় রান্না করিতে—একই ঘরের দুই কোণায় দুইজন। হরিচরণের চোখ ছবি হইতে ফিরিয়া উনুনের পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ডালে কাটি দিতে দিতে বিশে' আড়নয়নে স্বামীর দিকে চায়। চোখে চোখে দেখা হয়, ফিক করিয়া হাসিয়া বিশে' ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ফেলে।

ছবি পড়িয়া থাকে। হরিচরণ উঠিয়া আসে, জোর করিয়া মুখের কাপড় সরাইতে। বিশে' প্রাণপণে মুখের উপর কাপড় চাপিয়া ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসে। শেষে হাত ছাড়িয়া দেয়—আবার হাসে।

ডাল ফুটিয়া উপচাইয়া পড়ে, চকিত হরিণীর মত বিশে হরিচরণের হাত ছাড়িয়া সেদিকে নজর দেয়। হরিচরণ হাসিতে হাসিতে পটের কাছে ফিরিয়া যায়।

ফোঁড়নের ঝাঁঝে হরিচরণ কাসে, বিশে খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। তার পর ডালটা কড়াইয়ে ছাড়িয়া দিয়া সে পা টিপিয়া পিছন হইতে রঙের বাক্সটা আঁচলের তলায় লুকাইয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত ডালের দিকে নজর দেয়। হরিচরণ রঙ না পাইয়া বিরক্ত হয়। বলে, "দেখ তো, যত নষ্টামী, কাজের সময়। রঙ কোথায় রাখলে?"

"বা রে, আমি কি জানি, আমি এখান থেকে উঠলাম কখন?" খুব গম্ভীরভাবে বিশে' বলে।

হরিচরণ উঠিয়া বিশে'কে টানিয়া তোলে। কোঁচড় হইতে রঙের বাক্স গড়াইয়া পড়ে। হরিচরণ তার টুকটুকে গাল দুটি টিপিয়া বলে, "তবে রে চোর!"

রান্না সারিয়া বিশে' আসিয়া হরিচরণের পিছনে বসে। অনেকক্ষণ মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া থাকে। তার পর রঙের উপর তুলি বুলাইয়া এক রঙের সঙ্গে আর এক রঙ মিশাইয়া একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করিয়া ফেলে। তবু হরিচরণের ধ্যানভঙ্গ হয় না। তখন বিশে' ছোঁ মারিয়া তুলিটি কাড়িয়া লইয়া ঘরের অপর কোণে লুকায়।

অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর হরিচরণ তুলিটি উদ্ধার করে। তখন বিশে আসিয়া পটখানা উল্টাইয়া রাখিয়া বলে, "এখন ভালমানুষের মত নাইতে যাবে না কি যাও। যে রাজভোগ খাবে তা' আর ঠাণ্ডা করে' কাজ নেই।"

হরিচরণ স্নান করিতে যায়।

এমনি করিয়া হাসি খেলার ভিতর দিয়া তাদের দিন-রাতগুলি কেমন করিয়া কাটিয়া যায়, তাহা তারা টেরই পায় না।

মাসিকপত্রে একখানা ছবি বেচিয়া পাঁচ টাকা পাইয়া সে চট্ করিয়া হিসাব করিয়াছিল যে, মাসে এমন বিশখানা ছবি সে আঁকিতে পারে। সুতরাং মাসে একশো টাকা তার নেয় কে? সেই ভরসায় ছাতি ফুলাইয়া সে বউ আনিতে গিয়াছিল, খুব তেজ দেখাইয়াই তাকে লইয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু সেই যে একখানা ছবি বেচিয়াছিল, তার পর কম হইলেও একশোখানা ছবি আঁকিয়া সে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেচিতে পারে নাই। কেবল খান দুই ছবি এ পর্য্যন্ত তিন টাকা দরে বিক্রী হইয়াছিল।

কাজেই হরিচরণ অন্ধকার দেখিল। কিন্তু সে অল্পক্ষণ। ছাতি ফুলাইয়া সে বলিল, "ঐসা দিন নহী রহেগা। আজ দেশের লোক আমাকে আদর করছে না, একদিন তাদের চিনতে হবে, আদর ক'রতে হবে। একদিন আমার ছবির জন্য কাড়াকাড়ি লেগে যাবে।"

বিশে' দেশের লোকের উপর বড্ড চটিয়া গিয়াছিল। তাদের কি চোখ নাই?—এমন সুন্দর সুন্দর ছবি তারা

নেয় না? এ তাদের নিছক শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধারে কিছু দিন চলিল। দুই মাস ঘরের ভাড়া বাকী পড়িতে বাড়ীওয়ালা কিছু কড়া তাগাদা করিলেন, এমন কথাও বলিয়া গেলেন যে ভাড়া না দিলে ঘর ছাড়িতে হইবে।

বাড়ীওয়ালা চলিয়া গেলে বিশে' মুখ চূণ করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তার পাশে বসিয়া রহিল। তার বুক-ভরা সহানুভূতি নীরব দৃষ্টি দিয়া তার স্বামীর অন্তরের ভিতর ঢালিয়া দিল।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া বিশে' বলিল, "কি উপায় হ'বে?"

অনেকক্ষণ অপমানে, লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া হরিচরণ বসিয়া ছিল। বিশে'র কথা শুনিয়া মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়া সে বলিল, "কি আবার হবে। ভয় পাসনে বিশে', আর কটা দিন, সব বেটার মুখনাড়া একবার দেখে নেবো।"

বিশে' ম্লানমুখে বলিল, "কিন্তু—আজ—আজ চাল যে বাড়ন্ত!"

"কেন মুদী"—

"সে ব'লেছে আর ধার দেবে না।" বিশের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

হরিচরণ বিশে'কে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কোনও ভাবনা করিসনে ছোট বউ, এমন দিন থাকবে না।"

বিশে স্বামীর বুকের ভিতর লতাইয়া রহিল, তার চক্ষের জল বাধা মানিল না।

অনেকক্ষণ তাকে আদর করিয়া হরিচরণ তাকে শান্ত করিল। তার চোখ দুইটা পড়িয়া রহিল বিশে'র হাতের তাবিজের উপর—কিন্তু যে কথা তার মনে হইল সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার কথায় তার বুক ফাটিতে লাগিল।

হরিচরণ বলিল, "একটা কথা বলবো ছোট বউ, তোর মনে দুঃখ হবে না তো?"

"কি কথা?"

"আমাকে তোর এই তাবিজ জোড়া ধার দিবি?"

গদাই পালের নাতিবউ সে—তার গা ভরা গয়না। গদাই পাল নিজে এ গয়নার বেশীর ভাগ গড়াইয়া রাখিয়াছিল হরিচরণের জন্মের কয়েকদিন পর। সেই অবধি সেগুলি তোলা ছিল। ছোট বউ আসিয়া সে গয়না পাইয়াছিল। তা ছাড়া তার বাপও দুখানা গয়না দিয়াছিল। কাজেই তার গা-ভরা সোণার গয়না।

গয়না দেওয়ার কথা শুনিয়া বিশে'র বুকের ভিতর ছ্যাং করিয়া উঠিল—তার এত আদরের গয়না! সে ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, "ওমা সে কি! গয়না বেচবে না কি? সে আমি দেব না।"

হরিচরণের বুকে কথা কয়টা ছুরীর মত গিয়া বিঁধিল। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "না, থাক; চাইনে।" তার বুক ভাঙ্গিয়া কান্না পাইল—দেশের লোক তো তাকে চিনিলই না, তার সহধর্ম্মিণী চিরসঙ্গিনী আদরিণী পত্নীও তাকে একখানা গয়না দিয়া বিশ্বাস পায় না। গয়নাই কি এত বড়? তার এত কষ্ট, কিছুই না। তা ছাড়া গয়না তো একেবারে লইবে না—ধার সুধু—তার পয়সা হইলেই ফিরাইয়া দিবে—এইটুকু বিশ্বাস নাই তার।

নীরবে উঠিয়া হরিচরণ তার রং তুলি লইয়া বসিল ছবি আঁকিতে। একখানা ছবি আঁকা প্রায় শেষ হইয়াছিল; তার উপর দুই চারবার তুলি বুলাইয়া শেষ করিয়া যত্নের সহিত সে তাহাকে কাগজে জড়াইয়া বাঁধিল—তার পর জামা পরিতে লাগিল।

কথাটা বলিয়াই বিশে'র মনে হইয়াছিল যে কথাটা ভাল হয় নাই। স্বামীর মুখের চেহারা ও রকম-সকম দেখিয়া সে ভয়ও পাইল, কষ্টও পাইল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া আর কোনও কথা বলিতে তার সাহস হইল না। সে মুখ ফিরাইয়া ঘর গুছাইতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে অতি সঙ্গোপনে আঁচল তুলিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল।

জামা ও চাদর লইয়া হরিচরণ বাহির হয় দেখিয়া সে গোপনে তাবিজ দুগাছা খুলিয়া হাতে করিল। তার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"যাই দেখি 'উদাসী' আফিসে—এ ছবিখানা বেচে কিছু পাই কি না?"

"ওমা, এত বেলায় সেখানে কোথায় যাবে? কখন বা ফিরবে, কখন বা খাবে?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "খাব আর কি ছোট বউ? ছবি বেচলেই না খাওয়া।"

মাথা নীচু করিয়া হরিচরণের হাত ধরিয়া বিশে তাবি

রাখিয়া বলিল, "ও থাক, এখন এইটে বেচে কিছু কিনে নিয়ে এসো।"

হরিচরণ বলিল, "না থাক, এ ছবি তারা নেবে, এতেই চ'লে যাবে।"

ধপ করিয়া হরিচরণের পায়ের উপর পড়িয়া বিশে' বলিল, "রাগ ক'রো না আমার উপর, আমার বড় ঘাট হ'য়ে গেছে। পায় পড়ি, এটা নিয়ে যাও।"

হরিচরণ চুপ করিয়া রহিল। মাথা নীচু করিয়া বিশে' তার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শেষে হরিচরণ তাকে বুকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল, দুজনের অশ্রু মিলিয়া গেল।

দুইদিন পর হরিচরণ পাঁচ টাকায় একখানা ছবি বেচিল। ফিরিবার পথে সে এক টাকার ফুলের গহনা কিনিয়া আনিল, বিশে'কে সাজাইবে বলিয়া।

বাড়ী ফিরিয়া হাসিমুখে সে বিশে'কে বলিল, "মার দিয়া কেল্লা ছোট বউ, ছবি নিয়েছে—পাঁচ টাকা। তা ছাড়া দু'খানা ছবির অর্ডার দিয়েছে!"

আনন্দে অধীর বিশের মুখখানা হাসিতে ভরিয়া গেল। সে হাত পাতিয়া বলিল, "কই, দেখি টাকা!"

হরি পকেট হইতে চার টাকা ঝনাৎ করিয়া তার হাতে ফেলিয়া দিল।

বিশে' বলিল, "আর এক টাকা?"

হাসিয়া হরিচরণ বলিল. "খরচ ক'রেছি,—এই মদ খেয়েছি।"

"ঈস্‌" বলিয়া বিশে কৌতুকভরা ভ্রূকুটি করিল, কিন্তু তার বুকের ভিতর একটু কাঁপিয়া উঠিল—একবার মনে হইল সত্য নয় তো?

"না ছোট বউ, মদ খাইনি, তবু অমনি নেশার ঝোঁকে খরচ ক'রেছি, তোর জন্যে।"

"আমার জন্যে? কি এনেছ দেখি?"

কাপড়ের তলা হইতে কলাপাতার মোড়ক বাহির করিয়া হাসিমুখে হরিচরণ গহনাগুলি বিশে'র সামনে ধরিল।

বিশের মনটা প্রসন্ন হইল, কিন্তু সে এখন টাকার কদর বুঝিয়াছে, তাই অমনি বলিয়া ফেলিল, "ছি, এতগুলো পয়সার সুধু ফুল কিনে ফেললে! তোমার যদি একটু পয়সার দরদ থাকে!"

হরিচরণ এ কথায় বড় আঘাত পাইল। সে সারা পথ মনে মনে কত কল্পনা করিতে করিতে আসিয়াছিল, ফুলের গয়না পাইয়া বিশে' না জানি কত খুসী হইবে—গয়না পরিলে তাকে কি সুন্দর দেখাইবে—কত আদর সে করিবে। আর বিশে কি না বলিল এই কথা!

ফুলগুলি সুদ্ধ কলাপাতটা ধপ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে জামা খুলিতে লাগিল। স্বামীর ভাবান্তর বিশে'র চক্ষু এড়াইল না। সে বুঝিল তার স্বামীর এত আদরের উপহার পাইয়া তার খরচের কথাটা তোলা অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু কোনও কথা বলিতে তার সঙ্কোচ বোধ হইল।

সে নীরবে ফুলগুলি শুঁকিল, অতি সঙ্গোপনে সে গুলিকে চুম্বন করিল। তার পর সেগুলি তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া স্বামীর হাতে গামছা তুলিয়া দিল। হরিচরণ স্নান করিতে গেল। রোজ সন্ধ্যাবেলায় সে স্নান করিত।

সেই অবসরে বিশে' তার সোণার গয়না খুলিয়া আদ্যোপান্ত ফুলের গহনাগুলি পরিল। একটা মালা সে সুধু রাখিয়া দিল।

হরিচরণ স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তার পুষ্পময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। বিশে' মাথা নীচু করিয়া লজ্জিত শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। হরিচরণের মুখের উপর হইতে মেঘের পরদা সরিয়া গেল দেখিয়া ভরসা করিয়া সে মালাটা হরিচরণকে পরাইয়া দিয়া গড় হইয়া তাকে প্রণাম করিল। হরিচরণ তাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

তার পর বিশে' নিজে স্বামীর চুল আঁচড়াইয়া দিল। একখানা কম্বলের আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া তার সামনে ভাত বাড়িয়া দিল।

আর এক দিন বিশে আবদার ধরিল, সে গঙ্গা নাইতে যাইবে। হরিচরণ মানা করিল।

বিশে' অভিমান করিয়া শুইয়া পড়িল।

হরিচরণ তখন বলিল, "আচ্ছা, চল যাচ্ছি।"

বিশে বলিল, "না, থাক।"

হরিচরণ বলিল, "ঘাট হ'য়েছে ছোট বউ, চল্‌।"

"না না, আমি যাব না।"

"না যাবি," বলিয়া হরিচরণ তাকে টানিয়া তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল, বিশে' চক্ষু বুজিয়া রহিল।

হরিচরণ তার মুখে চুমো দিতে গেল, বিশে মুখ ঘুরাইয়া লইল।

অনেকক্ষণ হরিচরণ সাধ্য-সাধনা করিল, আদরে সোহাগে বিশেকে ভরিয়া দিল, কিন্তু বিশে'র ঐ এক কথা—"না, যাবো না।"

হরিচরণ তাকে ছাড়িয়া দিল, বিশে শুইয়া পড়িল।

হরিচরণ মুখ ভার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—তখনও তার স্নান আহার হয় নাই।

শঙ্কিত হইয়া বিশে' মুখ তুলিয়া চাহিল। তার পর উঠিয়া বসিল। তার পর দ্বারের কাছে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল।

হরিচরণ রাস্তায় বাহির হইয়া গেল, বিশে' গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

আবার মুখ বাড়াইয়া দেখিল, হরিচরণ ফিরিতেছে। সে তাড়াতাড়ি গামছা ও তেল আনিয়া কলতলায় রাখিল। হরিচরণ আসিয়া স্নান আরম্ভ করিল।

বিশে' ত্রস্তেব্যস্তে ভাত বাড়িতে লাগিল। হরিচরণ ঘরে ফিরিয়া দেখিল, অন্ন প্রস্তুত। সে খাইতে বসিল।

এক গ্রাস মুখে দিয়া হরিচরণ বলিল, "মিথ্যে আমার উপর রাগ করলি ছোট বউ, আমি কিই বা ব'লেছিলাম।"

মুখ নীচু করিয়া বিশে' বলিল, "থাক সে কথায় আর কাজ নেই।"

কিন্তু হরিচরণ কথা তুলিল। শেষে স্থির হইল, পরের দিন ভোরে গিয়া তারা স্নান করিয়া আসিবে। মাস কয়েক পর এক দিন একসঙ্গে দশটা টাকা পাইয়া স্বামী স্ত্রীর আর আনন্দ ধরে না।

খাওয়া দাওয়ার পর তারা বসিয়া আছে, এমন সময় অসীম আসিয়া উপস্থিত হইল। তার সদা-প্রসন্ন মুখখানা শুকনো হইয়া গিয়াছে।

অসীম বলিল, "ভায়া, এইবার বিদায় হ'লাম। ক'লকাতা আমার সইলো না। গিরিমাটি কিনেছি—টিনটেও একটা যোগাড় ক'রেছি, এইবার ভেসে পড়বো।"

হরিচরণ বলিল, "শুনেছি ও ব্যবসাটা বেশ লাভজনক।"

"ওরে ভাই, লাভের ব্যবসা অনেক আছে—অনেকগুলো ক'রেওছি। আমার এই যে বই লেখা ব্যবসা, এতে বঙ্কিম-বাবু শরৎ চাটুজ্জে বড়লোক হ'য়ে গেছে।—কিন্তু অভাগার সব সমান—

'সাগর সেচিনু যতন করিনু
রতন লভিবার আশে,
সাগর শুকালো রতন লুকাল
অভাগীর করম দোষে।'"

অসীম সুরসিক, সুকণ্ঠ—তার কথার ভিতর এমন গানের বুকনি প্রায় থাকে। এমন সুললিত কণ্ঠে তান লয় সহকারে অসীম গানটির এই পদ গাহিয়া গেল যে, বিশে অবাক্ হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার ইচ্ছা হইল আর একটু শোনে—কিন্তু সে তো অসীমের সঙ্গে কথা কয় না।

অসীম বলিল, "কিছু মনে করো না বউমা, আমার কথার মাঝে মাঝে এক একটা গান ছিটকে ওঠে—সহজ মানুষের হেঁচকীর মত।"

হরিচরণ ম্লান মুখে বলিল, "কেন, তুমি তো সেদিন দুশো' টাকা পেলে একখানা বই লিখে। তোমার মন্দ চলছে কি?"

"ওরে ভায়া, সে কি দুশো' টাকা—সে একটা মায়া। আত্মারাম সরকারের একটা ভেল্কী। বইওয়ালার দোকান থেকে নিয়ে এলাম কর্‌করে বিশখানা নোট, কি আনন্দ—দুশো' টাকার মালিক আমি! মেসে ফিরে দেখি, খবর বোধ হয় বেতারে পৌঁছে গেছে; বাড়ীর ফটক থেকে ঘরের দোর পর্য্যন্ত সার বেঁধে তারা ব'সে আছে।"

"কারা?"

"আমার সাত জন্মের কুটুম্বেরা। একজনের কাছে দরকার মত কয়েকটা টাকা নিয়েছিলাম, শালা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়েছিল। তাতেও খুসী নয়, আবার টাকা চায়। মেসের ম্যানেজার হেঁড়ে গলায় হাঁকছে 'তিন মাসের টাকা বাকী প'ড়েছে অসীমবাবু—এমন ক'রে চলবে না।' এক বেটা খবরের কাগজ দেয়, সে বলে, তারও না কি দুমাসের পাওনা। এমনি সব। আমি খোস মেজাজে ছিলাম, চটপট্ বেটাদের মুখের উপর সব নোট ছুঁড়ে মারতে লাগলাম। ঘরে গিয়ে দেখি, পকেটে আর একখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে—

Solitary Reaper
Behold her single in the field
Your solitary highland lass—
*   *   *
Alone she cuts and binds the grain
And sings a melancholy strain.

ভারী চটে গেলাম।.. এমনি গলদঘর্ম্ম হ'য়ে বইখানা লিখলাম—সে কি এই সব হতচ্ছাড়াদের জন্যে। নোটখানা আর পকেটে তুললাম না—এক বোতল জলি ওয়াকার আনালাম। দুশো টাকা! ওরে ভায়া, আমরা হচ্ছি লক্ষীছাড়ার খাস পল্টন, আমাদের স্পর্শে—

মহাসিন্ধু মরুভূমি হয়
হিমালয় যায় যমালয়—
দুশো' টাকা তো কোন্ ছার!"

"তাই বুঝি হাল ছেড়ে বিরাগী হ'চ্ছ! ভীরু!"

"ভীরু! আমি ভীরু? ভাগ্যদেবীর ভ্রূকুটিকে আমি ভয় করি না ভায়', ওর সঙ্গে অনেক দিন ঘর-বসত ক'রছি। কিন্তু—উপস্থিত ওইটাই হ'চ্ছে একমাত্র পথ।"

"কেন? কি হ'য়েছে? কিসের জন্য বিবাগী হ'বার খেয়াল হ'য়েছে।"

"পাঁচ টাকার জন্য। পাঁচ টাকার এক কাবুলীওয়ালা পাওনাদার দেখলুম আমার দোর-গোড়ায় তার মোটা লাঠীখানা নিয়ে ব'সে আছে, আর আমাকে নানারকম প্রিয় সম্ভাষণ ক'রছে। বাড়ী ফিরবার উপায় নেই—তাই পথে বেরুচ্ছি।"

"ওঃ, এই কথা, মাত্র পাচ টাকার জন্যে এতখানি!"

"মাত্র পাচ টাকা! পাচ টাকা একটা মাত্র হ'ল। ভায়া, আমার সন্দেহ হয় তুমি কিঞ্চিৎ বড়লোক হ'য়েছ, ওই কথাটার ভিতর একটু টাকার গন্ধ পাচ্ছি। মাত্র, পাঁচ টাকা—ছাড়তে পারবে?"

সামান্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরিচরণ বিশে'কে বলিল, "পাচ টাকা বের ক'রে দেও ছোট বউ।"

"Bravo! বেঁচে থাক ভাই আমার—বউমা, কিছু মনে ক'রবেন না—এক গুণে দিলে লক্ষ গুণে পাবে মা—জয় শ্রীরাধে!"

বউমা কিন্তু ইতস্ততঃ করিতেছিল। সে একবার স্বামীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া চাহিল—মাত্র দশটি টাকা, ত ভিতর হইতে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া দিতে তার গ সরিল না।

হরিচরণ তার মনের ভাবটা আঁচ করিয়া নিজে উঠি বাক্স হইতে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া দিল। ছোট বৌ ভার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অসীম তার পিছু পিছু বলিল, "কিছু মনে ক'রো বউমা—টাকা জিনিষটা ঐ রকমই, থাকবার জন্যে আসে না

অসীম চলিয়া গেলে বিশে' আসিয়া বলিল, "দশ টাকা তো এতদিন বাদে পেয়েছিলে, তার থেকে পাঁচ টা ওকে দিলে কি ব'লে?"

হরিচরণ একটু চটিয়া বলিল, "আমার খুসী আ দিলাম।"

বিশে মুখ গম্ভীর করিয়া একটা ঝটকা মারিয়া উঠি বলিল, "তবে আর ও ছাই-পাশ আমার হাতে দিও আমি তোমার টাকা ছোঁব না।"

"ছুঁয়ো না, বয়ে গেল্।"

"তা যাবে কেন? আমার কিসেই বা তোমার যায়। বয়ে' যায় যত বদমাইস মাতালদের মেকী কান্নায়।"

"দেখ্ ছোট বউ, মুখ সামলে কথা ক'স। ওকে এব যা' তা' ঠাউরেছিস। ওর মত লেখক বাঙ্গলা দেশে দু নেই। অভাগা দেশ চিনলে না তাই, নইলে ওর অ হওয়া উচিত ছিল লক্ষপতি—সোনার সিংহাসনে বসি ওকে লোকের পূজা করা উচিত।"

"তাই কর গে তুমি পূজো।" বলিয়া গম্ভীর হইয়া বি গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

হরিচরণও রাগে গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তার ম হইল কি ছোট নজর বউটার, পাঁচটা টাকার এত মায়া!

খাওয়া-দাওয়ার পর হরিচরণের রাগ পড়িয়া গেল, বিশেকে কোলের কাছে টানিয়া বসাইতে গেল, ছিটকাইয়া দূরে গেল। হরিচরণ তাকে আদর কি আবার টানিয়া আনিল।

হরিচরণ বলিল, "শোন ছোট বউ, একটা গল্প বলি একটা ফকীর ছিল, সে কোনও দিন আধ-পেটার বেশী খে পেতো না। হাজার ঘুরে ভিক্ষে করুক, সেই আধ পেটা ক্ষিধে তার মেটে না। একদিন সে কেঁদে ভগবানকে ব

ভগবান, একটা দিন সুধু পেট ভরে' খেতে দেও—সারা জন্ম আমার জন্য যা মাপিয়েছ তাই না হয় একসঙ্গে একদিন দেও, আমি একবার প্রাণ ভরে' খেয়ে নি—তার পর আর খাব না।' ভগবান বল্লেন, 'আচ্ছা'। সেইদিন ফকীর অনেকগুলো টাকা পেলে—তার সারা জীবনের আধ পেটা খাওয়ার বরাদ্দ! খুসী হ'য়ে ফকীর বাজার থেকে অনেক খাবার নিয়ে এলো, রাজ্যি সুদ্ধ লোক নেমতন্ন ক'রে এনে খুব হৈ চৈ ক'রে পেট ভরে' খেলে। তার পর বল্লে—ব্যস্ আর আমার দুঃখ নেই ভগবান, একদিন পেট ভরে খেতে পেয়েছি।' পরের দিন কিন্তু সে অভ্যাস মত ভিক্ষেয় বেরোলো—মনে মনে ভাবলে, আজ আর কিছু পাব না—জীবনের বরাদ্দ তো খেয়ে নিয়েছি। কিন্তু অবাক হ'য়ে গেল সে যে সেদিনও সে ভিক্ষে পেল, অন্য দিনের চেয়ে বেশী। সেদিন সে ভগবানকে বল্লে, 'মিথ্যাবাদী তুমি ভগবান। আমায় না তুমি সারা জীবনের বরাদ্দ একদিনে দিয়েছিলে?' ভগবান বল্লেন, 'সে তো দিয়েছিলাম বাপু—কিন্তু তুমি তো একা খাওনি, আমাকে যে খাইয়েছ। সে খাওয়ার দেনা তো শোধ ক'রতে হবে—আমি তো তোমার কাছে দেনদার থাকতে পারি নে।' ফকীর অবাক হ'য়ে ব'ল্লে, 'তোমাকে খাইয়েছি! কবে প্রভু?' 'কেন সেদিন যে রাজ্যি শুদ্ধ লোক ডেকে খাওয়ালে, সে কাকে দিয়েছ? আমি ছাড়া দুনিয়ায় কেউ আছে কি?' ফকীর তখন মাথা নীচু ক'রে কেঁদে বল্লে, 'ভগবান, তাই তো লোকে তোমায় বলে দয়াময়।'"

গল্পটি শুনিয়া বিশের চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। হরিচরণ বলিল, "পাঁচটা টাকার জন্য দুঃখ ক'রছিস ছোট বউ—ও ভগবানকে ধার দিয়েছি। এ দেনদার ঠকাবে না।"

বিশে চক্ষু মুছিল; কিছু বলিতে পারিল না।

হরিচরণ বলিল, "ভেবে দেখ ছোট বউ, অমন অবস্থা আমার কতদিন হয়—তাতে কি দুঃখ পাই! অসীমের আজকের কষ্ট যদি আমরা না বুঝবো তো কে বুঝবে বল!"

স্বামীর কথায় বিশের মনের গ্লানি ধুইয়া গেল, গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠিল—এমন দেবতা স্বামী তার। সে চট্ করিয়া স্বামীর পায়ের ধুলো লইয়া বলিল, "আমায় মাপ কর। মেয়েমানুষ আমি—ও-সব বড় কথার আমি কিই বা বুঝি!"

তার পর আবার তাদের ঘরে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল।

(৬)

এমনি করিয়া দিন চলিতে লাগিল। হরিচরণের ছবি রাশি রাশি ঘরে মজুত হইতে লাগিল। তার খরিদ্দার জোটে না। মাঝে মাঝে যখন সে প্রায় হতাশ হইয়া ওঠে, তখন হঠাৎ একদিন হয় তো পাঁচ টাকা কি সাত টাকায় একখানা ছবি বেচিয়া সে আবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া ওঠে—স্থির করে, এইবার তার দুঃখের দিন কাটিয়াছে, এইবার তার ছবি কাটিবে। কিন্তু তার পর আবার দিনের পর দিন যায়, ছবির পর ছবি ঘুরিয়া আসে।

একদিন হরিচরণ তার সব ছবি বাঁধিয়া বাহির হইয়া গেল। রাস্তার ধারে একটা ফাঁকা যায়গায় সে ছবিগুলি সাজাইয়া বসিল—চার পয়সা হইতে চার আনায় এক একখানা ছবি বেচিয়া সে অনেকগুলি ছবি কাটাইল। বাড়ী ফিরিবার সময় পয়সা গুণিয়া দেখিল তিন টাকা হইয়াছে। মনটা ভার হইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া হাত পা ছড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

খানিকটা কাদা-মাটি লইয়া বিশে উনান গড়িতেছিল—হরিচরণের একটা খেয়াল হইল। সে সেই মাটি লইয়া পুতুল গড়িতে বসিয়া গেল। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন পদ্ম-পুকুরের মেলায় সে গোটা কয়েক কৃষ্ণনগরী পুতুল বেচিয়া পাঁচ টাকা পাইল। এমনি করিয়া টায়-টোয় তার দিন চলিতে লাগিল।

ক্রমে এক এক করিয়া বিশে'র গয়না নিঃশেষ হইয়া গেল। তার হাতে রহিল সুধু এক জোড়া বালা।

হরিচরণের বরাবরই মনে মনে আশা ছিল একটা বড় কিছু করিবে—এমন একখানা ছবি আঁকিবে যাহাতে সুরেনের মত তার নামে ঢী ঢী পড়িয়া যাইবে—তার পর আর তাকে পায় কে? কিন্তু সে অবসর সে পায় না। রোজ রোজ অভাবের তাড়ায় সে চুটকী ছবি আঁকে, কি সাইন বোর্ড লেখে—দিনের অন্ন রোজগারের আশায়। বড় কাজে হাত দিবার সময় সে পায় না।

শেষে মরিয়া হইয়া একদিন যথাসর্ব্বস্ব খরচ করিয়া সে একখানা বড় ক্যানভাস ফ্রেমে আঁটিয়া লইয়া আসিল। তার উপর খড়ির প্রলেপ দিয়া তাকে দশ দিন ফেলিয়া রাখিতে হইল। তার পর সে দিনের পর দিন, কোনও দিন এক পোঁচড়, কোনও দিন দুই পোঁচড় রং লাগাইতে

লাগিল। অনেক সময় লাগে তাতে। অনেকক্ষণ ক্যান-ভাসখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয় চাহিয়া সে হয় তো ঠিক রেখাটির সন্ধান পায়, আর তুলির লেখায় তাকে ফুটাইয়া তোলে—আবার ভুল হয় আর সংশোধন করে। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে তার ছবি অগ্রসর হইতে লাগিল।

তার পর আর একটা খেয়াল হইল তার, একটা প্রতিমূর্ত্তি গড়িবে—বিশে'র। একটা বৃহৎ মূর্ত্তি ফাঁদিয়া মাটির তাল লইয়া সে বসিল, বিশে' তার সামনে বসিয়া রহিল।

সে কাজও অত্যন্ত ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাইন-বোর্ডের তাগাদায় মূর্ত্তি ও ছবি ছাড়িয়া তাকে কাজ করিতে হইত।

এমনি করিয়া দিন চলিতে লাগিল।

বিশে'র প্রতিমূর্ত্তিখানি শেষ হইল, বিশে'র একখানা শাড়ী তাকে পরান হইল।—বিশে' দেখিয়া অবাক, মুগ্ধ হইয়া গেল। হরিচরণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া রহিল, আর পরম সমাদরে তার শেষ আঁচরগুলি লাগাইতে লাগিল। কাজ শেষ করিয়া সে আনন্দের আতিশয্যে বিশেকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

বাহিরে রমেশের সাড়া পাওয়া গেল। হরিচরণ তাড়াতাড়ি বিশে'কে ঘরের বাহিরে পাঠাইয়া দিল, মূর্ত্তিটার মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিল। তার পর রমেশ আসিল।

হরিচরণ বলিল, "এসো ভাই, ব'সো, আমি একটু মুখ-হাত ধুয়ে আসি—ততক্ষণ তুমি ছোট বউর সঙ্গে কথা কও," বলিয়া মূর্ত্তিটিকে দেখাইয়া দিয়া বাহিরে দরজার আড়ালে দাঁড়াইল। বিশে'ও তখন সেখান হইতে উঁকি মারিতেছিল।

রমেশ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ অনর্গল কথা বলিয়া গেল। শেষে বলিল, "বা রে, আমি কেবলই ব'কেই যাচ্ছি আর তুমি বোবা হ'য়ে ব'সে র'য়েছ—ব্যাপারখানা কি?"

মূর্ত্তির মুখে বিশে'র চাপা দুষ্ট হাসি আঁকা হইয়াছিল, তাই দেখিয়া রমেশ বলিল, "বুঝেছি, একটা মতলব আছে কিছু,—কোনও রসিকতা হ'চ্ছে। কি ব্যাপারখানা বলই না ছাই বউদি"—

হো, হো, খিল খিল করিয়া হাসিয়া হরিচরণ ও বিশে' ঘরে প্রবেশ করিল।

বিশে বলিল, "কেমন জব্দ ঠাকুরপো!"

অবাক হইয়া রমেশ একবার বিশে ও একবার তার প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিল। আনন্দে তার মুখ ভরিয়া উঠিল।

"বলিহারি ভাই, কি মূর্ত্তিই বানিয়েছ—চেনে কার সাধ্য? এটা বেচলে দুশো টাকা বে-ওজর পাবে।"

ঘাড় নাড়িয়া হরিচরণ বলিল, "বেচবার জন্যে তো গড়ি নি এটা।"

"বেচবে না, বল কি? আমার কথা শোন—এইটাকে একজিবিশনে পাঠিয়ে দেও—পাঁচশো টাকা এর দাম না হ'য়ে যায় না।"

হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "তার চেয়ে বরং ছোট বউকে বেচে দি, অন্ততঃ হাজার খানেক টাকা আসবে।"

বিশে বলিল, "আ মরণ! ঢংয়ের কথা শোন।"

হরি। কেন তাতেই বা অন্যায় কি—তোমার চেয়ে ও মূর্ত্তির উপর আমার দরদ বেশী, তুমি যতই যা হও, আমার হাতে গড়া তো নও।

একটা ভ্রূকুটি করিয়া মনোরম ভঙ্গীতে বিশে মুখ ফিরাইল।

রমেশ ও হরিচরণ হাসিয়া উঠিল।

আবার মুখ ফিরাইয়া বিশে' বলিল, "আহা, কি রসিকতাই হ'ল! আবার হাসতে লেগেছেন!"

রমেশ। আরে চট কেন বউদি, মুখে ব'ল্লে বলেই তো হরিদা' তোমায় সত্যি সত্যি বেচে ফেল্‌ছে না।

"থাম, ও কথা আর মুখে এনো না বলছি—নইলে দেখাব মজা।"

পরে রমেশ বলিল, "হরিদা' তোমার ছবি টবি কি আছে দেও দিকিনি খানকয়েক—একজনকে দেখিয়ে আনি।"

"কেন? কাকে দেখাবে?"

"মহারাজা প্রমোদনারায়ণকে।"—

"মহারাজা প্রমোদনারায়ণ, তার সঙ্গে আবার তোমার কবে আলাপ হ'ল?"

গোঁফে চাড়া দিয়া রমেশ বলিল, "বোঝ, এখন আর আমি বড় কেও কেটা নই—মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী।"

"তাই না কি? কবে থেকে?"

"তিন দিন। সেদিন মহারাজা মাঠে খেলা দেখতে

গিয়েছিলেন ; আমার খেলা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। অমনি চাকরী—তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে খেলবার নেমন্তন্ন !"

তার পিঠে একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া হরিচরণ বলিল, "বলিহারি! তবে আর আমাদের পায় কে? তা' কবে খাওয়াচ্ছ শুনি?"

"এক্ষুনি, কিন্তু টাকাটা ধার দিতে হ'বে—আমার টেঁক ফরসা।"

"তা হ'লে খেতে দেরী আছে। আমার ঘরে লক্ষ্মীর কোনও ধরাবাঁধা আস্তানা নেই জান তো।"

"দেখ্‌লে বউদি, রাস্কেল তোমার অপমান ক'রছে। আরে মূর্খ, তোর এমন লক্ষ্মী থাকতে তোর ঘরে লক্ষ্মী নেই।"

মুখখানা একটু ভার করিয়া বিশে' বলিল, "লক্ষ্মী না আর কিছু—আমার মত পোড়াকপালী আর আছে?"

"শুনলে? এটা তোমায় ঠেঁস দিয়ে বলা হ'ল দাদা! তুমিই ওঁর পোড়াকপাল—বুঝলে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস হরিচরণের হাসির ভিতর দিয়া ভেদ করিয়া উঠিল। কিন্তু রমেশ তাহাকে আমল দিল না। সে বলিল, "নেও, ছবিগুলি বের কর চট্‌পট্‌। মহারাজার ছবির কি বাতিক জান তো? নজরে লাগলে চাই কি বউদির পোড়াকপালও ফিরতে পারে।"

ছবিগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে হরিচরণ বলিল, "ভাল কিছু নেই—সব জলের দরে বেচে ফেলেছি।" তার পর খুঁজিয়া পাতিয়া চার পাঁচখানা ছোট ওয়াটার্‌-কলার ছবি বাঁধিয়া রমেশকে দিল।

তিন দিন পর রমেশের সঙ্গে হরিচরণের আবার দেখা। সে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ছবিগুলো দেখিয়েছিলে?"

"হাঁ"।

"কি খবর?"

"খোস খবর হ'লে বাড়ী বয়ে' দিয়ে আসতাম দাদা! খবর ভাল নয়।"

"তবু?"

"বেটা গাড়ল। আর্টের সমজ্‌দার ব'লে শালার ভারি জাঁক—আর বেটা বলে কি না—এ যে কালীঘাটের পট!"

হরিচরণের মুখ চূণ হইয়া গেল। মহারাজা প্রমোদনারায়ণ চিত্ররসজ্ঞ এবং স্বয়ং একজন চিত্রকর বলিয়া তার জানা ছিল। তাঁর কাছে পরিচিত হইবার অবসর পাইয়া সে অনেক আশা করিয়াছিল। এ খবর শুনিয়া তাই সে মুশড়াইয়া গেল।

রমেশ বলিল, "Buck up old chap! প্রমোদনারায়ণ ছাড়াও জগতে আর্টের সমজ্‌দার আছে। একদিন তারা তোমায় চিনবে। মুশড়ে যেও না—হিম্মত মৎ ছোড়না।"

এ দুঃসংবাদটা হরিচরণ বিশে'র কাছে গোপন করিল। ভাবিল, এ দুঃখটা সে না হয় নাই পাইল।

হরিচরণ তার পর কিছুদিন কেবলি সাইনবোর্ড লিখিল, ছবির ধার দিয়াও গেল না।

(৭)

একদিন বাহির হইতে ফিরিয়া হরিচরণ দেখিল বিশে' তার সেই অসমাপ্ত বড় ছবিখানার ঢাকনা খুলিয়া অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিতেছে।

হরিচরণ দ্বারের কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সেদিকে চাহিয়া দেখিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল, "কি দেখছো ছোট বউ?"

বিশে' যেন একটু চমকাইয়া উঠিল। সে বলিল, "দেখছি—কি সুন্দর হ'চ্ছে ছবিখানা! মেয়েটার মুখ যেন কথা কইছে।"

"আমার ছবিকে সুন্দর সুধু তুই-ই দেখিস ছোট বউ! আর কেউ দেখে না।" বলিয়া হরিচরণ বসিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল।

স্বামীর বুকভরা নিস্ফলতার ব্যথায় বিশের প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল। সে তার দুঃখ চাপিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি এ ছবি শেষ ক'রে দেখ, নিশ্চয় সবাই সুন্দর ব'লবে—তোমার এ ছবির আদর না হ'য়ে যায় না।"

"ঠিক এই কথা প্রত্যেকটা ছবির সম্বন্ধেই ভেবেছি ছোট বউ—এখন আর মনকে ঠকাতে পারছিনে এ কথায়।"

"কিন্তু এমন ছবি তো তুমি আর আঁক নি। আচ্ছা, তুমি রমেশ ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা কর না, তিনি কি বলেন।"

"সেও যে তোমারই মত অন্ধ! তার কথার দাম কি সে তো সেই দিনই"—হরিচরণ থামিয়া গেল। সেদিনকার কথাটা যে বিশে'র কাছে গোপন আছে।

"আচ্ছা, এই একটিবার আমার কথা শোনই না।

আঁক তুমি ছবিখানা, সবাই ভাল না বলে, আমার কাণ কেটে দিও।"

"তোর নাক কাণের কি কিছু বাকী রেখেছি ছোট বউ যে কাণ কাটবো আবার! কি ছিলি তুই, কি হ'য়েছিস! গদাই পালের নাতিবউ, তার আধ-পেটা বই খাওয়া জোটে না।"

অসীমের সাড়া পাওয়া গেল। সঙ্গে যেন আর কে।

বিশে' সরিয়া দাঁড়াইল। অসীম সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে এক বইয়ের দোকানদার। অসীমের একখানা বই ছাপা হইবে, তাতে চারখানা ছবি থাকিবে। চারখানায় চল্লিশ টাকা—দর ঠিক হইয়া গেল।

দোকানদার বাহির হইয়া গেলে হরিচরণ অসীমকে বলিল, "সঙ্গে নগদ কিছু আছে ভাই?"

অসীম একটা নোটের তাড়া বাহির করিয়া একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল।

"তিনশো টাকা পেয়েছি ভাই বইখানায়।"

"তবে তো তোমার জয় জয়কার!"

"না ভাই, পাওনাদারের দল হাঁ ক'রে ব'সে আছে—সবটাই গিলবে বোধ হ'চ্ছে।"

হরিচরণ চট্ পট্ ছবি আঁকিতে বসিয়া গেল। কাগজের উপর পেনসিলের আঁচড় চড়্ চড়্ করিয়া পড়িতে লাগিল, ঘস্ ঘস্ করিয়া রবার চলিতে লাগিল। সময়ের জ্ঞান তার চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর বিশে' আসিয়া তার পেনসিল রবার সব কাড়িয়া লইল, বলিল, "নাও গে যাও।"

"এইটা সেরে যাই লক্ষীটি," বলিয়া হরিচরণ পেনসিলের জন্য আবেদন করিল।

"আর সারতে হ'বে না। খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে সেরো।"

অগত্যা হরিচরণ উঠিল। তেল মাখিতে মাখিতে সে বলিল, "তোর কথাই ঠিক ছোট বউ। ওই ছবিখানা ঠিক দাঁড়াবে। অসীমের এই ছবি ক'খানা সেরেই ওতে হাত দেবো।"

কাজ পাইয়া হরিচরণের লুপ্ত উৎসাহ ও আশা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া বিশে' আনন্দিত হইল।

কিন্তু যখন হরিচরণ স্নান করিতে গেল তখন তার কান্না পাইতে লাগিল। আজ সে রাঁধিয়াছে সুধু নিম ঝোল আর আলু ভাতে। কেমন করিয়া স্বামীর সামনে এই খাদ্য পরিবেষণ করিবে তাই ভাবিয়া তার কান্না পাইতে লাগিল।

অসীম যে নোটখানা দিয়া গিয়াছিল, হরিচরণ তার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল—সেখানা সেইখানেই পড়িয়া ছিল। হঠাৎ তার উপর দৃষ্টি পড়িতেই বিশে' উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া বাহিরে গিয়া কিছু দই ও দুটো হাঁসের ডিম কিনিয়া আনিল। ডিম দুইটা চট্ পট ভাজিয়া ফেলিল।

* * * *

বড় ছবিখানা শেষ হইল।

একটা বড় এক্‌জিবিশন হইতেছিল বাছা বাছা চিত্রকরদের ছবির। খুব বাছিয়া বিচার করিয়া তার জন্য ছবি লওয়া হইতেছিল।

হরিচরণ কম্পিত বক্ষে তার ছবিখানা মুটের মাথায় চাপাইয়া লইয়া গেল রাজা প্রমোদনারায়ণের বাড়ী—সেখানেই বিচারক-সমিতির আফিস।

তিন দিন হাঁটাহাঁটি করিয়া হরিচরণ কোনও খবর পাইল না। রমেশ তখন এক্‌জিবিশন লইয়া বড় ব্যস্ত, তার দেখা পাওয়াই দায়। তিন দিন পর রমেশের সঙ্গে দেখা হইল।

রমেশ বলিল, "তুমি বেহদ্দ বেহায়া হরিদা,' নইলে আবার ঐ গাড়লটার কাছে ছবি নিয়ে এসেছ?"

শুষ্ক মুখে হরিচরণ বলিল, "ছবি ফেরত হ'য়েছে?"

"না, ঠিক তা হয় নি, সে কেবল বউদিদির বরাত জোর। মহারাজা তো একেবারে তুচ্ছ ক'রেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বরদাবাবু, ঐ আর্ট স্কুলের মাষ্টার ব'ল্লেন, ছবিখানায় promise আছে। মহারাজা তো তাকে এই মারে তো এই মারে। কিন্তু বরদাবাবু তাকে চেনেন। সে সব কথায় ঘাড় নেড়ে হাঁ হাঁ ব'লে শেষে ব'ল্লে 'থাক ওটা'। তাই বেঁচে গেলে। ছবি দেখান হ'বে তোমার।"

আর কোনও কথা শুনিবার অবসর হরিচরণের হইল না! সে নাচিতে নাচিতে বাড়ী ছুটিয়া চলিল। বরদা বাবুর চোখে লাগিয়াছে তার ছবি—এক্‌জিবিশনে তাহা যাইবে—আর চাই কি? ছোট বউ ধরিয়াছিল ঠিক।

বাড়ী ফিরিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিশে'র গলা

জড়াইয়া ধরিল। বিশে' ক্লিষ্ট শুষ্ক মুখে বসিয়া ছিল। তার গায় হাত দিতেই হরিচরণ দেখিল, ভারী জর। সে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বিশে বলিল, "একটু জর দেখে কৃষ্ণনগরের লোকের অত ডরাতে হয় না। যাও—নেয়ে এসে খাও।"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া বিশে'র শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। জর ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পেট ব্যথা।

অস্থির হইয়া হরিচরণ ছুটিয়া গেল ডাক্তার আনিতে।

তিন দিন পর ডাক্তার বলিলেন, "উপসর্গ ভাল নয়, পেটের ভিতর বোধ হয় একটা টিউমার হ'য়েছে—অপারেশন দরকার হ'তে পারে।"

হরিচরণ বসিয়া পড়িল।

তার পর তার বন্ধুদের পরামর্শ ও চেষ্টায় বিশেকে হাস-পাতালে পাঠান হইল। সেখানে দেখা গেল, অবস্থা বাস্তবিকই গুরুতর, অপারেশন ছাড়া গতি নাই—কিন্তু তাতেও ফলাফল অনিশ্চিত।

(৮)

হরিচরণ হাসপাতালে যায় আসে, যতক্ষণ পারে বিশে'র কাছে থাকে। বাকী সময় ঘরে বিশে'র প্রতিমূর্ত্তির কাছে বসিয়া ছট্ ফট্ করে।

যেদিন অস্ত্র প্রয়োগ হইল সেদিন হরিচরণ হাসপাতালে গিয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। অনেক বেলায় তার বন্ধুরা তাকে ফিরাইয়া আনিল। তখন অপারেশন শেষ হইয়াছে, কিন্তু রোগিনীর জ্ঞান হয় নাই।

বাড়ী ফিরিয়া হরিচরণ মাটিতে শুইয়া পড়িয়া বিশে'র মূর্ত্তির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তার দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর বামাকণ্ঠে কথা শোনা গেল "আমি আসতে পারি।"

হরিচরণ উঠিয়া বসিল, বলিল "আসুন।"

একটি তন্বঙ্গী যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিয়া হরিচরণ চিনিতে পারিল—ইনি নার্স, ইঁহারই হেফাজতে আছে বিশে'। ইঁহার সঙ্গে তার অনেক আলাপ হইয়াছে। সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

ব্যস্ত হইয়া হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি, খবর কি? আমাকে যেতে হ'বে?"

"না, খবর ভাল। আপনার স্ত্রীর জ্ঞান হ'য়েছে। এখন অবস্থা ভাল। তিনি আপনাকে একটা খবর দিতে বল্লেন, তাই খবর দিতে এসেছি।"

হরিচরণ একটা স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল।

নার্স লতিকা ঘরের চারিদিক চাহিয়া দেখিল। তার পর সে বলিল, "আপনার বোধ হয় নাওয়া খাওয়া কিছু হয় নি।"

হরিচরন লজ্জিত হইয়া বলিল. "না—এবেলায় আর কিছু খাব না।"

হাসিয়া লতিকা বলিল, "সেই কথাই আপনার স্ত্রী বলছিলেন। তিনি বল্‌ছিলেন, তাঁর হয় তো নাওয়া খাওয়া কিছুই হয় নি। আমি তাঁকে ব'লে এসেছি, আমি আপনার নাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তবে বাড়ী যাব—তবে বেচারী ঘুমিয়েছে। যান, উঠুন, নেয়ে আসুন। ও হরি, রান্না বোধ হয় কিছু হয় নি। কি খাবেন?"

হরিচরণ বলিল, "রান্না আর করি নি—খেতে ইচ্ছে নেই!"

"সে কি কথা। খেতে হবেই—আমি যে তাঁকে কথা দিয়ে এসেছি। নিন—হাঁড়ি চড়ান। আমার হাতে খেতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

"না—কিছু না, কিন্তু আপনার কষ্ট করবার দরকার নেই, আমি যা হয় কিছু খাব'খন—আপনি তাকে ব'লবেন।"

হাসিয়া লতিকা বলিল, "কিন্তু মিথ্যে কথা তাঁকে বলতে পারবো না। দেখুন,—আপনি স্নান ক'রে কিছু খান—আমি দেখে যাই।"

হরিচরণ বড় বিপদে পড়িল। সে খাওয়ার কোনও জোগাড়ই করে নাই, হাতেও তার একটি পয়সা নাই। এ কয়দিন ঘর আর হাসপাতাল করিয়া সে পয়সা সংগ্রহের অবসরও পায় নাই। কিন্তু সে কথা তো এই অপরিচিতাকে বলা যায় না। সে খানিকক্ষণ হুমহাম করিয়া উপায় চিন্তা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

স্নান করিয়া সে মুদীর দোকান হইতে দুই পয়সার মুড়ী ধার করিয়া আনিয়া লতিকাকে বলিল, "এই তো আমি

খাবার এনেছি, আপনি আর কষ্ট ক'রে দেরী ক'রবেন না—তাকে ব'লবেন।"

খাবারের নমুনাটা লতিকা আঁচ করিয়াছিল। আর কেন যে খাবার সম্বন্ধে এমন সংক্ষিপ্ত আয়োজন হইয়াছে, তাহাও সে কতকটা সন্দেহ করিয়াছিল। কাজেই সে আর বসিয়া থাকিয়া হরিচরণের লজ্জা বাড়াইল না। তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল।

লতিকা চলিয়া গেলে হরিচরণ গোটাকয়েক মুড়ি মুখে ফেলিয়া অবশিষ্ট সরাইয়া রাখিল। তার পর অন্যমনস্ক ভাবে সে তার অসম্পূর্ণ একখানা ছবি লইয়া তাতে রং বুলাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে একটি ঝি আসিয়া ঝাড়নে বাঁধা একটা পুঁটুলী নামাইয়া তাকে একখানা চিঠি দিল।

চিঠি লিখিয়াছে লতিকা। সে লিখিয়াছে,

"আপনার আজ কিছু খাওয়া হয় নি। আমি কিছু খাবার পাঠালাম, দয়া ক'রে খাবেন। নইলে আপনার স্ত্রীর কাছে আমি কথাটা গোপন ক'রতে পারবো না, আর বেচারা ভেবে ভেবে সারা হ'বে। সে বলছিল, আপনি না কি বড় তাল ভোলা, নিজে নিজের কিছুই ক'রতে পারেন না, কাজেই স্ত্রী না থাকায় বড় কষ্ট পাবেন। দয়া ক'রে যতদিন সে হাসপাতালে থাকে, নিজের একটু যত্ন নেবেন। আমি দুবেলা আপনাকে খবর দেব।"

চিঠি পড়িয়া হরিচরণের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে খাবারের সদ্ব্যবহার করিয়া চিঠির উত্তর লিখিল,

"আমি আপনার খাবার পরিতোষ পূর্ব্বক খেয়েছি। আমি আজ থেকে খাওয়া দাওয়ার উপর বিশেষ নজর দেব—আপনি ছোটবউকে আশ্বস্ত ক'রবেন। আপনার দয়া ও সহৃদয়তার জন্য কি ব'লে ধন্যবাদ দেব জানি না।"

সেদিন সে ছবিখানা সম্পূর্ণ করিয়া বাহির হইল, নগদ তিন টাকা পকেটে করিয়া বাড়ী ফিরিল। মুদীর দোকানে দুইটা টাকা দিয়া কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিল। বহু কষ্টে উনান ধরাইয়া রান্নার উদ্যোগ করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

নার্স লতিকা তখন আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিচরণ তরকারী কুটিতেছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল।

লতিকা বলিল, "উনি এ বেলাও ভালই আছেন, তবে অতবড় ভারী অপারেশন, বড্ড টন্ টন্ ক'রছে। কিন্তু নিজের ব্যথার কথার জ্ঞান নেই তাঁ'র—খালি ভাবছেন আপনার কথা।"

হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "এই তো দেখছেন আমি রান্নার আয়োজন ক'রে নিয়েছি।"

"তা তো দেখছি, কি রাঁধবেন?"

"কি আর রাঁধবো, ডাল, ভাত, আর দুটো ভাজা।"

"রাঁধতে জানেন তো?" লতিকা হাসিল।

"জানি! একেবারে ওস্তাদ! দেখুন না—আয়োজন দেখেই বুঝতে পারবেন।"

লতিকা জিনিবপত্রগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। মুগের ডাল আছে, কিন্তু তার উপযুক্ত ফোড়নের কোনও ব্যবস্থা নাই, তেলও অপ্রচুর। বুঝিল বিশে' মিথ্যা বলে নাই, লোকটি নিজের ভার বইবার যোগ্য নয়।

সে বলিল, "হ'য়েছে, এই দিয়ে মুগের ডাল রাঁধবেন? মসলা কই, ফোড়ন কই?"

ফোড়ন বাবদ দুটো শুকনো লঙ্কা দেখাইয়া হরিচরণ বলিল, "এতেই হবে।"

হাসিয়া লতিকা বলিল, "ছাই হবে।" তার পর সে আবশ্যক জিনিষের ফর্দ্দ দিয়া হরিচরণকে আবার দোকানে পাঠাইল।

হরিচরণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, চাল ডাল একসঙ্গে হাঁড়িতে চড়ান হইয়াছে, লতিকা মসলা বাঁটিতেছে।

"এ কি, এ ভারী অন্যায়—আপনি এত কষ্ট ক'রছেন। ছি!"

"কি ক'রবো, নইলে আমার রুগী ভাল ক'রে তুলবো কেমন ক'রে? দুদিন আপনাকে রান্না শিখিয়ে যাই।"

সে বেলায় হরিচরণ খিচুড়ী বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাইল, লতিকাকেও কিছু খাইতে হইল।

তার পর লতিকা রোজ দু বেলা আসে, হরিচরণ ত্রস্তে ব্যস্তে তার আসিবার আগেই যা হ'ক কিছু রাঁধিয়া রাখে—পাছে সে আবার রাঁধিতে লাগিয়া যায়।

হাসপাতালে যতক্ষণ সে বিশের কাছে থাকে, ততক্ষণ লতিকাও প্রায় থাকে।

সেবা দিয়া দরদ দিয়া মেয়েটি তাকে তেমনি করিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিল যেমন পাখী তার ডিমটিকে রাখে।

(৯)

পরের দিন হাসপাতালে গিয়া হরিচরণ দেখিল, বিশে'র জ্বর হইয়াছে!—বেশ গরম গা।

ব্যস্ত হইয়া সে লতিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, লতিকা বলিল, "অপারেশনের পরে অমন এক আধটুকু হয়—ব্যস্ত হবেন না।" কিন্তু সে বেশী কথা বলিল না, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। হরিচরণ ব্যাকুল নয়ন স্ত্রীর ক্লিষ্ট মুখের উপর বসাইয়া দিয়া বসিয়া রহিল।

বিশে' বলিল, "তুমি এ বালা জোড়া খুলে নিয়ে যাও।"

"কেন?"

"হাসপাতাল! কে জানে কখন বেহুঁস হ'য়ে থাকবো—"

"পাগল, এখানে কোনও ভয় নেই।"

একটু পরে বিশে বলিল, "আর ছবি বেচেছ?"

"হাঁ একখানা বেচেছি, তিন টাকায়।"

"তবে?"

"তবে কি?"

"তোমার চলবে কেমন ক'রে, ছবি তুমি এখন যা আঁকবে সে আমি জানি।"

"না ছোট বউ, আমি রোজ ছবি আঁকবো—আর এখন আমার ছবি নেবে সবাই—এক্‌জিবিশনে ছবি নিয়েছে কি না।"

"তা' হোক, বালা জোড়া তুমি নিয়ে যাও।"

হরিচরণের বুক ফাটিয়া কান্না পাইল। সে বলিল, "কক্ষনো না। তোর সব তো খেয়েছি, এটা আর নেব না।"

মধুর হাসি হাসিয়া বিশে' বলিল, "একজিবিশনের ছবি বিক্রী হ'লেই তো আবার হ'বে—তবে দোষ কি?"

"তা হয় হোক, কিন্তু তোর হাতের বালা আমি এখন বেচবো না।"

"নাই বেচলে, বাঁধা দেও গে।"

কিছুতেই সে হরিচরণকে রাজী করিতে পারিল না।

নিরূপিত সময় উত্তীর্ণ হইলে হরিচরণ মন ভার করিয়া বাড়ী গেল,—লতিকার আশ্বাসে তার মন ভরিল না।

দ্বিপ্রহরে লতিকা হরিচরণের কাছে আসিয়া বলিল, "এই নিন, বউ বালা জোড়া পাঠিয়ে দিয়েছে, কিছুতেই শুনলে না।"

হরিচরণের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। লতিকারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

শেষে লতিকা বলিল, "মিথ্যে অত ভাবছেন আপনি, বউ ভাল হবে—আবার আপনার ঘরে ফিরে আসবে। বালা জোড়া রেখেই দিন না হয়।"

"আমার কি আছে, কোথায়ই বা রাখবো—তার চেয়ে ওটা আপনার কাছেই থাক।"

তাই রহিল।

লতিকা বলিল, "আমার খাবার ঘরের জন্য একখানা মানানসই ছবি দেবেন আমায়। খুব বেশী দামী না হয়——পাঁচ ছ' টাকার মধ্যে।"

হরিচরণ বলিল, "আচ্ছা দেব এঁকে—কাল পাবেন।"

ছবিখানা সন্ধ্যার সময় শেষ হইয়া গেল। লতিকা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। বলিল "কি চমৎকার হ'য়েছে! আর বেশ বড় হ'য়েছে। কিন্তু দাম বেশী হ'বে না?"

হরিচরণ বলিল, "এ ছবির দাম নেই—অমূল্য!—এ তো সুধু ছবি নয়—আমার মূর্ত্ত কৃতজ্ঞতা। দাম এর নিতে পারবো না আমি।"

লতিকা একটু বিব্রত হইয়া বলিল, "কিন্তু তা' আমি কেমন ক'রে নেব, আপনার কিছু দাম নিতে হ'বে।"

"বেশ—দাম দেবেন ছোট বউকে—তাকে যা ভালবাসছেন তার চেয়েও যদি পারেন তো বেশী ভালবাসবেন।—হাঁ সে এ বেলা কেমন আছে?"

"একই রকম! জ্বরটা ছাড়ছে না।" লতিকার মুখটা খুব প্রফুল্ল দেখা গেল না।

ব্যগ্রভাবে হরিচরণ বলিল, "ভয় আছে কিছু?"

"বিশেষ নয়—একটু সেপ্টিক হবে তা ডাক্তার আগেই ব'লেছিলেন—কিন্তু জ্বরটা না বাড়লেই ভাল।"

"তবে ভয় যথেষ্টই আছে!" বলিয়া হরিচরণ হাত পা ছাড়িয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে লতিকা বলিল, "দেখুন, আপনি অতটা এলিয়ে পড়বেন না। এতটা ভয় পাবার কিছু হয় নি।"

বাষ্পাকুল কণ্ঠে হরিচরণ বলিল, "কিন্তু আমার মন বলছে, সিষ্টার,—ছোটবউ আমায় ছেড়ে যাচ্ছে।"

একটু হাসিয়া লতিকা বলিল, "অমন অনেক দেখেছি হরিচরণ বাবু—রোগীর স্বামী বা স্ত্রীর মন ব'লেছে বুঝি

রোগী বাঁচবে না, অথচ এখন তারা দিব্যি সুস্থ হ'য়ে সংসার ক'রছে। সামান্য একটু সেপ্টিস্—এতে এত ভয় পাবার কিছু নেই।"

আজ হরিচরণ খাবারের জোগাড় করিতে ভুলিয়াছিল। লতিকা তার আহারের উদ্যোগ করিয়া দিয়া একটু বেশী রাত্রে বাড়ী ফিরিল। ছবিখানা যত্ন করিয়া সে লইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে হরিচরণ দেখিল বিছানার উপর পাঁচটা টাকা রহিয়াছে।

হরিচরণ স্থির করিল টাকা পাঁচটা ফিরাইয়া দিবে। এই দেবীর কাছে টাকা লওয়া তার পক্ষে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে।

কিন্তু যখন বাড়ীওয়ালা ভাড়ার জন্য কড়া তাগাদা লাগাইল, তখন তাকে সেই টাকা পাঁচটা দিয়াই নিরস্ত করিতে হইল।

* * * *

সকালে উঠিয়াই হরিচরণ হাসপাতালে যায়—সেখানে অনেকক্ষণ বসিয়া তবে সে বিশে'র কাছে যাইতে পায়।

সেদিন তার পাশে এক ভদ্রলোক একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। হরিচরণ দেখিতে পাইল, তাতে একজিবিশনের ছবির সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ আছে। অমনি উদ্‌গ্রীব হইয়া মুখ বাড়াইয়া সে তাহা পড়িতে চেষ্টা করিল। ভদ্রলোক তখন পাতা উল্টাইলেন—আর পড়া হইল না। হরিচরণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। একটু পরে ভদ্রলোক কাগজখানা মুড়াইয়া পাশে রাখিয়া দিলেন, হরিচরণ বলিল, "কাগজখানা একবার দেখতে পারি?"

ভদ্রলোক ভ্রূকুটি করিয়া তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না।"

মুখ চুণ করিয়া হরিচরণ বসিয়া রহিল।

তার সঙ্গে পয়সা নাই—কাগজ কিনিবার সঙ্গতি নাই।

একটু পরে আর এক ভদ্রলোক একটু তফাৎ হইতে উঠিয়া আসিয়া হরিচরণকে একখানা কাগজ দিয়া বলিলেন, "নিন, পড়ুন।" ইনি তফাৎ হইতে অপর ব্যক্তির অভদ্র আচরণ দেখিয়াছিলেন।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হরিচরণ কাগজখানা উল্টাইয়া একজিবিশনের বিবরণ পড়িতে লাগিল। প্রবন্ধে "উল্লেখযোগ্য" ছবিগুলির একটা বিবরণ ছিল। একে একে সেগুলি হরিচরণ পড়িল। কয়েকজন নামজাদা চিত্রকরের কয়েকখানা ছবির বিস্তৃত প্রশংসা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করিয়া সে পড়িল, "এবার নূতন যারা আসরে নামিয়াছে তাদের মধ্যে—" তার বুক দুড়্‌দুড়্ করিতে লাগিল—অনেকগুলি চিত্রকরের নাম ও সংক্ষিপ্ত প্রশংসা আছে—কিন্তু তার মধ্যে হরিচরণের নাম নাই। শেষের প্যারাগ্রাফে 'অপরাপর চিত্র' বলিয়া কতকগুলি ছবির নামমাত্র উল্লেখ হইয়াছে—তার ভিতরও হরিচরণের ছবির উল্লেখ নাই।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিচরণ কাগজখানা ফিরাইয়া দিল। তার মনটা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। এই তবে সাধারণের অভিমত! যে ছবি আঁকিয়া সে খ্যাতি অর্জ্জনের পথ পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল—সে ছবির এই মর্য্যাদা!

অনেকক্ষণ পর সে মাথা নাড়া দিয়া মনে মনে বলিল, "চুলোয় যা'ক ও অলক্ষুণে ছবি। বিশে যদি ভাল হ'য়ে ওঠে তবে ও ছবি যা'ক!"

তখন তাদের রোগীদের সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। হরিচরণ ত্রস্ত পদক্ষেপে হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করিল।

বিশে বিছানায় পড়িয়া ছিল—শুকনো একটা লতার মত। তার গাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটি কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; আর তার চার পাশে একটা গভীর কালো ছায়া পড়িয়াছে। হরিচরণ বিছানার পাশে আসিতে, বিশে কষ্টে তার ক্লান্ত চক্ষের পাতা টানিয়া তুলিয়া তৃষিত নয়নে তার দিকে চাহিল—হরিচরণ বসিয়া তার মুখের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বিশে' বলিল, "এখন ভালই আছি।"

লতিকা আসিয়া হরিচরণের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বিশের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল—সে অশ্রুরোধ করিতে পারিল না।

বিশে এক মুহূর্ত্ত আগে অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। হরিচরণ আসিতেছে শুনিয়াই সে চুপ করিয়াছিল—আর এখন স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে শান্তভাবে বলিল, "ভালই আছি।" পতিপ্রাণা বালিকার এ করুণ

ছলনায় লতিকার বুক ঠেলিয়া কান্না পাইল। নার্স সে—রোগী ঘাঁটাই তার ব্যবসা—কত রোগীই তো তার হাতে মরিয়াছে—কিন্তু এমন বিচলিত সে কোনও দিন হয় নাই।

লতিকা তাড়াতাড়ি অন্য রোগী লইয়া ব্যস্ত হইল।

হঠাৎ বিশের মুখখানা শক্ত হইয়া উঠিল, একটা বিষম বেদনার ছায়া তার মুখ ছাইয়া ফেলিল। হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি হ'য়েছে ছোট বউ? অমন ক'র্‌ছো কেন?"

বিশের ব্যথাটা তখন ভয়ানক চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল—একটা প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিয়া সে সেই বেদনার প্রকাশটা দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এক মুহূর্ত্ত সে কথা কহিতে পারিল না—হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া লতিকাকে ডাকিল, "নার্স, দেখুন তো কি হ'ল?"

তখন বিশের ব্যথার বেগটা একটু কমিয়াছিল—সে বলিল, "না, ও কিছু না—তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না।"

লতিকা দেখিয়া ব্যাপার বুঝিল। সেও সংক্ষেপে বলিল, "ও কিছু নয়।" বলিয়া মুখ ফিরাইল। এই বালিকার স্বামীর কাছে তার দুঃখ-কষ্ট গোপন করিবার মর্ম্মান্তিক চেষ্টার করুণ দৃশ্য সে কিছুতেই শান্ত হইয়া দেখিতে পারিতেছিল না।

বিশে বলিল, "তোমার ছবির কি হ'ল?"

"ছাই ছবি! সে সব কোন কথাই ভাবতে পারছি না ছোট বউ, যতক্ষণ তুই না ফিরছিস।"

"এমন পাগল তুমি। খবরটা নিও, আমার ভারি শুনতে ইচ্ছে ক'রছে।"

"আচ্ছা জেনে তোকে জানাব।" হরিচরণের অন্তরের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিল। কি শুনাইবে সে বিশেকে—তার অশ্লাঘ্য পরাজয়ের কথা শুনিলে যে বিশের বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে!

"আর ছবি এঁকেছ?"

"হাঁ।"

"কত পেলে?"

"পাঁচ টাকা।" এ কথা বলিতেও হরিচরণের বুকে ব্যথা বাজিল। এই পাঁচ টাকা সে নিতে বাধ্য হইয়াছে লতিকার কাছে। এটা যে তার কাছে কতদূর অকৃতজ্ঞতার কাজ হইয়াছে, সেই কথা স্মরণ করিয়া সে মর্ম্মে মরিয়া ছিল।

হরিচরণ বলিল, "সে যা'ক গে, তুমি কেমন আছ? কালকের চেয়ে আজ একটু ভাল?"

হঠাৎ আবার ব্যথার বেগ হইয়া বিশে'র মুখ সাদা এবং শক্ত হইয়া গেল। সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "না।"

হরিচরণের মন একেবারে কালিতে ভরিয়া গেল। ভয়ানক আশঙ্কায় তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তার বুক ঠেলিয়া কান্না উঠিতে লাগিল—বিশে কি তবে বাঁচিবে না?

খানিকক্ষণ পরে বিশে বলিল, "যাক গে, আমার কথা থাক, তোমার কথা বল। নার্স বলছিল, তুমি না কি ভারি মনমরা হ'য়ে থাক।"

হরিচরণ কথা বলিল না, মাথা নীচু করিয়া রহিল।

বিশে আবার বলিল, "ছি, বেটাছেলের কি একটা মেয়েমানুষের জন্য অত ভাবতে আছে?"

"তোর জন্য ভাবব না ছোট বউ, এই না হ'লে যদি বেটাছেলে না হওয়া যায়, তবে আমি বেটাছেলে নই, চাই না হ'তে।"

বিশে তার অস্থিচর্ম্মসার হাতখানা হরিচরণের হাতের উপর রাখিয়া বলিল "ছি।" কিন্তু এ কথায় তার মুখে একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তি ফুটিয়া উঠিল, ক্ষীণ চক্ষু তার বুকভরা প্রেম, প্রাণভরা কৃতজ্ঞতায় সজীব হইয়া উঠিল।

হরিচরণ বিশের হাতখানা দুহাতে চাপিয়া ধরিল। সে অনুভব করিল বিশের আঙ্গুলের ডগাগুলি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সেই কম্পনে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ যেন তার হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর দিয়া গিয়া তাহা অসাড় করিয়া দিল। তার বড় ভয় হইল।

সে উঠিয়া লতিকাকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নার্স, ওর আঙ্গুলগুলো অমন কাঁপছে কেন?"

লতিকা হাসিয়া বলিল "ও কিছু নয়, দুর্ব্বল কি না?" কিন্তু চট করিয়া সে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

লতিকা জানিত এ কাঁপনের অর্থ কি—তাই সে এড়াইয়া গেল।

হরিচরণ আবার আসিয়া বিশের কাছে বসিল। বিশে তখন ঘুমের মত হইয়া পড়িয়া ছিল। হরিচরণ কথা কহিল না, নীরবে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর তার নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে সে চলিয়া গেল।

হরিচরণ চলিয়া গেলে লতিকা আসিয়া বিশেকে দেখিল।

হরিচরণ যাকে ঘুম মনে করিয়াছিল—সে ঘুম নয় মোহ। দেখিয়া লতিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তার পর সে লতিকার নাড়ী দেখিয়া মুখ ভার করিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিল।

এমনি ভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল। বিশের মোহ মাঝে মাঝে একটু কাটে—কিন্তু কথা তার বড় এলোমেলো। শুনিয়া হরিচরণের প্রাণ হাহাকার করিয়া ওঠে। সে দুহাতে মুখ চাপিয়া বাহিরে চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে। এ দৃশ্য দেখিতে তার বুক ফাটিয়া যায়, তবু বার বার দেখিতে চায়—সর্ব্বদা দেখিতে পায় না বলিয়া সে আকুল হয়।

সাত দিন পর সকাল বেলায় বিশে চোখ মেলিয়া এদিক ওদিক চাহিল—আজ তার দৃষ্টি স্পষ্ট, অর্থপূর্ণ। লতিকা নাড়ী দেখিয়া খুসী হইল। সে হরিচরণকে ডাকিয়া আনিল।

হরিচরণকে বিশে বলিল, "আজ ভাল আছি।"

এতদিন পর তার মুখে সহজ কথা শুনিয়া হরিচরণ উৎফুল্ল হইল।

লতিকা বলিল, "বেশী কথা কয়ো না বোন, ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়বে।"

বিশের মুখে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত একটা শীর্ণ হাসি খেলিয়া গেল। সে সলজ্জ ভাবে বলিল, "আচ্ছা।" তার পর হরিচরণকে বলিল, "সকালে কিছু খেয়েছ ?"

হরিচরণ বলিল, "না।"

"তবে তুমি সকাল সকাল গিয়ে খাওগে। তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে।—বাসা বেচেছ ?"

"না ছোটবউ, এমনি চ'লে যাচ্ছে তো।"

"আচ্ছা, ওটা ভাল ক'রে রেখে দিও। হাঁ—সে ছবির কি হ'ল ?"

"এখনও কিছু হয় নি। কিন্তু তুমি আর কথা বলো না, তার চেয়ে আমি সব কথা বলি শোন। দাদা এসেছেন, বউদি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রতে—ব'লে দিয়েছেন তোমাকে ভাল ক'রে বাড়ী নিয়ে যেতে।"

"কৃষ্ণনগর ?—সেখানে আর যাব না।"

"কেন ?"

"মনে নেই তারা তোমার কি অপমান ক'রেছে ? সেখানে আর যেও না।"

"আচ্ছা যাক, সে কথা পরে হবে। তুমি তো আগে ভাল হও।"

সেদিন হরিচরণ বেশ উৎফুল্ল চিত্তে বাড়ী ফিরিল। চৈতন বাসায় বসিয়া ছিল, তার কাছে বলিল, "ছোট বউ বেশ ভাল আছে।"

চৈতন রাঁধিয়া বসিয়া ছিল। বেশ তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া আজ সাত দিন পর হরিচরণ একটু শান্তভাবে ঘুমাইল।

বেলা তিনটার সময় হঠাৎ লতিকা ছুটিয়া তার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "শীগ্‌গীর আসুন।"

অগ্রসর হইতে হইতে হরিচরণ বলিল, "কেন, কি হ'য়েছে ?"

—"দেখুন, এখন একটু সুস্থির হ'য়ে থাকবেন—আপনার স্ত্রীর অবস্থা ভাল নয়।"

চৈতন চমকাইয়া উঠিল, হরিচরণের পা যেন মাটিতে বসিয়া গেল। তারা দুজনেই লতিকার পিছু পিছু ছুটিল।

লতিকা ট্যাক্সি করিয়া আসিয়াছিল, তারা তার উপর চড়িয়া বসিল।

হাসপাতালে গিয়া তারা দেখিল, বিশের শেষ সন্নিকট।

একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া সাধ্বী জন্মের মত চক্ষু বুজিল।

চৈতন ও হরিচরণ হাহাকার করিয়া উঠিল।

১০

পরের দিন সকালবেলায় চৈতন সাশ্রুনয়নে বলিল, "ভাই, যা' হ'বার তা তো হ'য়ে গেছে—এখন তুই ঘরে ফিরে চল্।"

হরিচরণ শুষ্ক উদাস দৃষ্টিতে বিশে'র মৃন্ময়ী মূর্ত্তিখানার দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। সে কোনও কথা কহিল না—সুধু ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

চৈতন বলিল, "লক্ষ্মী ভাই আমার, আর রাগ ক'রে থাকিস না ; আমাদের বড় ঘাট হ'য়েছে ভাই, তার শাস্তি বউমা দিয়ে গেল, তুই আমাদের মাপ ক'রে ঘরে চল্!"

হরিচরণ কোনও কথা বলিল না। চৈতন বলিয়া গেল,

মন্দির তোরণ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা
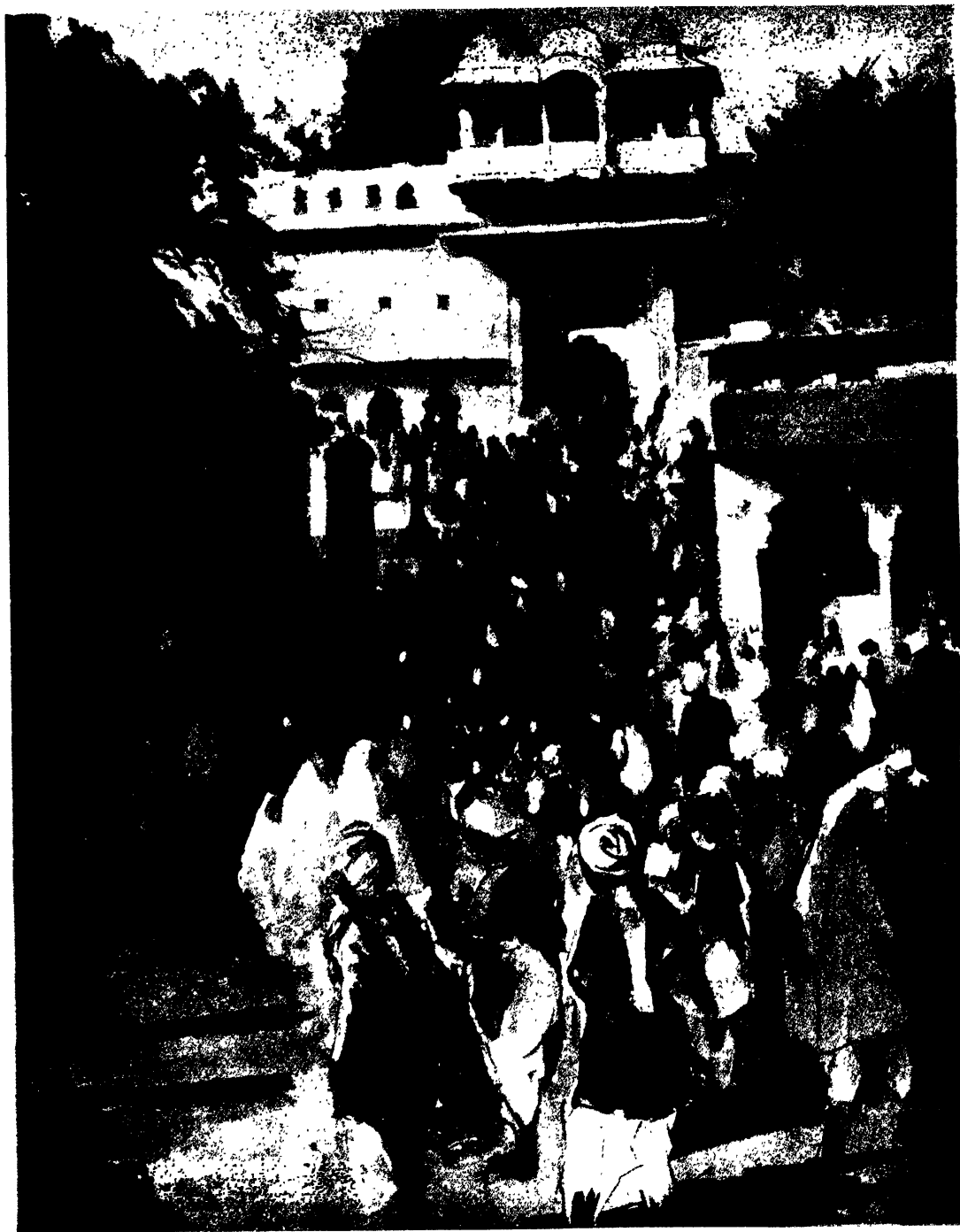
"আর, আমরাই না হয় দোষ ক'রেছি, বড় বউ তো কোনও দোষ করে নি। সে যে তোদের দুজনের জন্যে দিনরাত হেদিয়ে ম'রছে। সে যে আশা ক'রে ব'সে আছে—আমি বউমাকে ফিরিয়ে নেব। তুই যদি না যাস্, তবে আমি কেমন ক'রে ঘরে উঠে তার কাছে মুখ দেখাব।"

হরিচরণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার তো কাউকে মুখ দেখাবার পথ নেই দাদা—আমাকে আর ডেকো না।"

তার পর সে বলিয়া গেল, "বড় দেমাক ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম—বড় তেজ ক'রে ছোট বউকে নিয়ে এসেছিলাম। তাকে খেতে দিতে পারি নি। তার গয়না বেচে খেয়েছি, তার পর তাকে না খাইয়ে মেরেছি। কোন্ মুখে ফিরে যাব?" হরিচরণ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চৈতনও তার চক্ষু মুছিয়া বলিল, "যা' হ'য়েছে তার তো চারা নেই ভাই। এখন ঘরের ছেলে ঘরে চল—আবার বে' থা কর—দেখে আমরা চক্ষু জুড়োই।"

হঠাৎ হরিচরণ ক্ষেপিয়া উঠিল—সে বলিল, "কি সাহসে তুমি আজ আমাকে এ কথা ব'লছো? বে' ক'রবো—ছোট বউকে না খাইয়ে মেরেছি—আবার আমি বে করবো। ওঃ! ছোট বউ সাধে কি মরবার আগে শেষ কথা আমায় ব'লেছিল, 'তুমি আর সেখানে যেও না।'—সে চিনেছিল তোমরা কত ছোটলোক।"

চৈতন মনে বাস্তবিকই খুব আঘাত পাইয়াছিল; আর বিশের মৃত্যুতে তার অসহায় হরিচরণের প্রতি পুরাতন স্নেহ আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ছোট ভাই তাকে মুখের উপর ছোটলোক বলিবে,—কি না সে দু পাতা বই পড়িয়াছে, আর দু-বছর কলিকাতায় থাকিয়াছে—এতটা তার সহ্য হইবে, এতবড় মহাপুরুষ চৈতন নয়। কাজেই হরিচরণের কথায় চটিয়া সে গালমন্দ করিল। হরিচরণও চটিয়া উঠিল—সে অম্লানবদনে চৈতনকে বিশে'র হত্যাকারী বলিয়া গেল। বলিল, "অমন সতীলক্ষ্মী বউকে মেরে ফেলেছ তুমি—আজ আবার মায়াকান্না গাইতে এসেছ? লজ্জা করে না? যাও বেরোও।"

চৈতন ফুলিতে ফুলিতে বাহির হইয়া গেল। হরিচরণ গুম হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তার মাথার ভিতর রাজ্যের কথা তোলপাড় করিতে লাগিল, বুকের ভিতর বিশ্বের ব্যথা হাতুড়ি পিটিতে লাগিল।

তার পর সে মুখ তুলিল। ঘরের কোণায় কড়াই চাটু হাতা পড়িয়া ছিল—তার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল একে একে বিশের বহুচিত্র—ওইখানে বসিয়া ওই বাসনে সে রাঁধিত—কি অপরূপ সুন্দর সে মূর্ত্তি। কতদিন রাঁধিতে রাঁধিতে সে কত না কৌতুক করিয়াছে, কত প্রেমের অভিনয় হইয়া গেছে। একটি একটি করিয়া সেই সব তার মনে পড়িল। সে হাহাকার করিয়া উঠিল—চীৎকার করিয়া বলিল, "ছোট বউ, এ কি করলি?"

আবার সে চাহিল বিশে'র মৃন্ময়ী মূর্ত্তির উপর—তার ঠোঁটের উপর বিশের সেই কৌতুকের হাসি তখনও লাগিয়া আছে! অতৃপ্ত নয়নে হরিচরণ তার দিকে চাহিয়া রহিল।

মনে পড়িল, একদিন কৌতুক করিয়া সে বিশেকে বলিয়াছিল—বিশের চেয়ে তার এই মূর্ত্তির উপর তার দরদ বেশী। এ মূর্ত্তি সে বেচিতে পারিবে না, বরং বিশে'কে বেচিয়া দিবে। বুকের ভিতর এ কথায় যেন তপ্ত লোহার শলা বিঁধিয়া গেল। হায়, আজ সে বিশেকে সত্যই বিলাইয়া দিয়াছে,—পোড়াইয়া ছাই করিয়াছে,—আজ আছে তার সুধু এই মাটির ঢেলা। কোন দুষ্ট ভগবান কি আড়ালে বসিয়া তার কৌতুকের কথাটা কাড়িয়া তাকে এমনি শাস্তি দিয়াছেন। মনে পড়িল একদিন ভূপেন বলিয়াছিল, ভগবান আছেন কেবল মানুষকে কষ্ট দিবার জন্য—আজ তার মনে হইল সেই কথাই ঠিক। মিছাই মানুষ ভাবে ভগবান দয়াময়—নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর ভগবান—মানুষের ব্যথা তাঁর কাছে শুধু খেলার ঘুঁটি!

না—ভগবান নাই—আছে সুধু একটা নির্ম্মম বিশ্বপ্রবাহ —অসীম বলে ঠিক! নহিলে যদি বিশ্বের গোড়ায় এক ফোঁটা করুণা থাকিত—তবে কি বিশেকে এমন করিয়া তার বুক হইতে ছিঁড়িয়া লইতে পারিত—তার বাইশ বৎসর মাত্র বয়সে! যদি ন্যায়-ধর্ম্ম থাকিত, তবে কি নিরপরাধা পুণ্যবতী সতী বিশেশ্বরী এত কষ্ট পায়। আর হরিচরণ নিজে—জ্ঞানে সে কোনও পাপ করে নাই, কখনও কারও অনিষ্ট-চিন্তা করে নাই—তারই বা এ শাস্তি কিসে? মিছা কথা—ভগবান নাই!

দারুণ বেদনায় হরিচরণ মুশড়াইয়া পড়িল। দরজা দিয়া বাহিরের দিকে সে চাহিয়া দেখিল—একটা ভাঙ্গা হাঁড়িতে

বিশে একটা তুলসী গাছ পুঁতিয়াছিল। সে রোজ তাতে জল দিত, গলবস্ত্র হইয়া তার কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিত। প্রায়ই সে এক পয়সার বাতাসা আনিয়া তুলসীতলায় হরির লুট দিত। এতদিন হরিচরণ সে দিকে চাহে নাই, গাছটি শুকাইয়া গিয়াছে। হরিচরণের চোখে ভাসিয়া উঠিল তুলসী-তলায় বিশে'র প্রণত মূর্ত্তি—এক মুহূর্ত্ত সে মুগ্ধ হইয়া সে মূর্ত্তির ধ্যান করিল। তার পর কঠোর শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, কাকে প্রণাম করতিস ছোট বউ—ওই দেখ সে সুধু শুকনো কাঠ! তুলসীতে নারায়ণ থাকেন—থাকতো যদি তবে তোর এমন পূজোর এমনি পুরস্কার হয়? কচি মেয়ে—সাদা মন তার—তার পূজো নিয়ে এমনি বেইমানি মানুষে ক'রতে পারে না।—নারায়ণ কি মানুষের অধম?"

যেদিকে চায় হরিচরণ, সেই দিকে তার চোখে পড়ে এমনি ছোট-খাট কত জিনিষ, যার প্রত্যেকটির সঙ্গে বিশের বিষাক্ত মধুর স্মৃতি জড়ান আছে। চাহিয়া চাহিয়া হরিচরণের মনের ভিতর আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে মেঝের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া চালের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া পড়িয়া রহিল।

অসীম আসিল। হরিচরণকে একলা দেখিয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তারা সবকটি বন্ধু সারারাত্রি হরিচরণের কাছে ছিল, সকাল বেলায় তারা তাকে চৈতনের কাছে রাখিয়া গিয়াছিল।

অসীম বলিল, "এ কি? তুমি একলা? তোমার দাদা গেল কোথা?"

হরিচরণ বলিল, "চ'লে গেছে—বেঁচেছি।"

অসীম তার শিয়রের কাছে বসিয়া অশেষ করুণার সহিত তার মুখের দিকে চাহিল। হরিচরণ চালের দিকেই চাহিয়া রহিল। কেহ কোনও কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পর হরিচরণ বেগের সহিত উঠিয়া বসিল। উত্তেজিত ভাবে অসীমকে বলিল, "অসীমদা, তোমার কথা ঠিক—ভগবান নেই।"

কথাটা অসীমের হৃদয়ে ব্যথা দিল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "না ভাই, ভগবান আছেন। তিনি আমাদের মনের মত ভগবান নন,—আমরা যা চাই, ঠিক তাই তিনি করেন না—কিন্তু তিনি আছেন।"

"থাকুন তিনি—তাঁকে দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই। যে ভগবানের করুণা নেই, ন্যায় বিচার নেই, মানুষ দুঃখে যার কাছে অভয় পাবে না, সেই কঠোর নির্ম্মম পাথরের ভগবান তোমার—থাকুন তিনি, তিনি আমার কেউ নন।"

অসীম কিছুক্ষণ কোনও কথা বলিল না, হরিচরণের মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল। তার পর সে হাসিয়া উঠিল। হরিচরণের এ হাসি ভাল লাগিল না। সে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিল।

অসীম হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেল,

কাঠ খড় মাটি দিয়ে গড়িনু দেবতা,
নিবেদিনু তারে মোর দুখের বারতা।
কাঁদিলাম তার পায়, খুঁড়িলাম মাথা—
কাণা বোবা দেখিল না শুনিল না কথা।
ছুঁড়ে ফেলে কাঠ খড়, ডুবায়ে পাথর,
মনোমাঝে গড়িলাম দেবতা অমর।
মনগড়া গুণ দিয়ে সাজাইনু তারে
কাঁদিনু তাহার কাছে—সেও শোনে না রে।
আমারি দেবতা হ'য়ে মোরে অপমান!
কহিনু অলীক দেব, মানুষের দান—
মিছে তারে মনে ক'রে মনেরে ভুলাই।—
দেবতা কহিল, "সত্য! সে দেবতা নাই!
যারে তুমি ভাঙ্গ গড় আপনার করে
জগতের ভাঙ্গা গড়া সে তো নাহি করে।"

হরিচরণ শুনিল, কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পর সে বলিল, "মিথ্যে? সব মিথ্যে? জগতে যা কিছু আমাদের কাছে খুব বড় সে সব মিছে? ভালবাসা মিছে? ওঃ! কি ভীষণ একটা ছলনা এ পৃথিবী?"

"মিথ্যে কিছুই নয় ভাই, সব সত্যি, যদি ঠিক ক'রে তাকে বোঝ। একটা তামার পয়সা হাতে ক'রে যদি তাকে মোহর ভাবতে থাক, তবে সেটা মিথ্যে—আর আজ হ'ক কাল হ'ক সে মিথ্যেটা ধরা প'ড়ে যাবে। কিন্তু যদি তাকে ঠিক তামা ব'লেই জান, তবে সেটা সত্যি। মানুষের ভুলটা এইখানে। যে সব fact নিয়ে আমরা কারবার করি, তার একটাও মিথ্যে নয়, সব সত্যি। কিন্তু সেই ফ্যাক্টটুকু নিয়ে আমাদের মন খুসী নয়—আমরা তাকে মায়ার রঙে রঙিয়ে তার ভিতর কত কিছু দেখি। ভালবাসাটা সত্যি,—তাতে

আমরা সুখ পাই দুঃখ পাই, সেও সত্যি। সুধু সেইটুকু নিয়ে যদি খুসী হই, তবে আমরা কোনও দিন ঠকবো না। কিন্তু তা' তো করি না আমরা। আমরা বর্ত্তমানের ফ্যাক্টটাকে দুধারে লম্বা ক'রে বাড়িয়ে একেবারে অনন্ত পর্য্যন্ত ঠেলে নিই। এমন একটা মোহ আমাদের হয় যে, এটা চিরদিন ছিল, চিরদিনই থাকবে—তাই আমরা ঠকি। দোষটা ভাই ভগবানের নয়, আমাদেরই। আমাদের স্বভাবই এই। হাতে একটা সুখ পেলে তাতে খুসী নই—তখনই ভয়ে মরি পাছে এ সুখ যায়—প্রাণপাত চেষ্টা করি সেই সুখটুকু বজায় রাখবার জন্য। তাকে ভোগ করার চেয়ে ব্যাঙ্কে জমা রাখবার গরজ আমাদের বেশী। অথচ, এ জগতে সুখের fixed deposit যে সত্যি হয় না, সেটা আমরা দেখেও দেখি নে।"

হরিচরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওরে ভাই, তোমার এ বর্ত্তমানবাদ হয় তো খুব সত্যি হ'তে পারে, কিন্তু ওতে মন ভরে না। যে দিন যা পেলাম সেইটুকু যে ভোগ করে সে না বুদ্ধিমান না সুখী। সুখ পেতে হ'লে তা'র কতকটা পুঁজি ক'রতে হয়। এই পুঁজি করবার জন্যই সমাজ, এর অসংখ্য ছোট বড় আয়োজন। নইলে একটা গোরুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ কোথায় ?"

"ঠিক ! মন ভরে না। পুঁজি করাটাই আমাদের স্বভাব। আর সেই স্বভাবের তাড়নায় সমাজ গড়ে উঠেছে। এটা আমি দোষের বলি নে। সম্ভব মত হিসাব ক'রে খরচ করাটার সার্থকতা আছে। কিন্তু যে চিরজীবন না খেয়ে লাখ-লাখ টাকা জমা ক'রেই গেল, তার ছেলে নাতিদের টাকা ওড়াবার জন্য,—সে পণ্ডিত নয়। সুখের পুঁজির হিসাবে একটা সময়ের সীমা আছে—সেই সীমাটা ছাড়িয়ে গেলেই মূর্খতা হয়। যে শেয়ালটা রাশি রাশি খাবার সামনে দেখে 'অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ' স্থির ক'রেছিল, তার ঠিক সেই ধনুর্গুণ খেয়ে মরাটাই উপযুক্ত শাস্তি। ছোট্ট মানুষ, এতটুকু তার পরমায়ু ; অথচ সে ঘর বাঁধতে চায় চিরদিনের জন্য। মৃত্যু এসে তার সব হিসাব চুরমার ক'রে দেয়। তখন সে কাঁদে, না হয় এই ব'লে বুক বাঁধে যে সে ম'রেও মরবে না—এই অসম্ভব অভিমানের গান,

> জীবনে যত পূজা হয় নি সারা
> জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।

Rot! সুখ চাও, তাতে আমার আপত্তি নেই, সম্ভব মত হিসাব ক'রে সুখের অপচয় কর,—কতকটা speculation জীবনে চাই-ই। কিন্তু আমরা করি কি? জীবন-সর্ব্বস্ব পণ ক'রে জীবনের সঙ্গে জুয়া খেলি। জিতলে ফুলে উঠি, হারলে কেঁদে মরি। রেস্ খেল্‌তে গিয়ে যে জুয়ারী সর্ব্বস্ব বাজী রেখে খেলে সেই মরে। যে খেলোয়াড়, সে ভারী বাজী রাখে না, অল্প হারে বা অল্প জেতে। জিতে সে অতিরিক্ত খুসী হয় না, হেরেও গলায় দড়ি দেয় না। আমার কথা এই, জীবনটাকে খেলোয়াড়ের মত খেলতে হ'বে, জুয়ারীর মত নয়।"

হরিচরণ উঠিয়া বসিল। এ সব তত্ত্বকথা তার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় সে খুব স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে বা আয়ত্ত করিতে পারিল না। কিন্তু কথাগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া তার মাথার ভিতর খেলিতে লাগিল। জীবনের জুয়া খেলা ! তার এই বাইশ বছরের জীবনেই সে কত বাজি রাখিয়া খেলিয়াছে—আগাগোড়াই সে হারিয়া আসিয়াছে। আজ সে একেবারেই নিঃস্ব হইয়া বসিয়াছে,—আর তার বিন্দুমাত্র সম্বল নাই এ খেলা খেলিবার। একটি ছোট্ট মেয়ে তার জীবনের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে—সারাজীবন ভরিয়া সে তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না। তার পর? মরণের পর?—তখন সে কি দেখা দিবে না তার পরিপূর্ণ মাধুরী লইয়া—ধন্য করিয়া দিবে না তার এত দিনের সাধনা,—সে কি পাইবে না তার দীর্ঘ বিরহের পূর্ণ পুরস্কার?

অনেকক্ষণ পর সে অসীমকে বলিল, "এ হ'তেই পারে না যে এইখানেই সব শেষ। জীবনের আজ যে অধ্যায় শেষ হ'ল ভাই, সেটা সত্যি সত্যিই শেষ অধ্যায় নয়—এর একটা পরিশিষ্ট আছে মরণের পর?"

অশেষ ব্যথার সহিত অসীম তার করুণ, ক্ষণিক আশা দীপ্ত মুখের দিকে চাহিল।

"আছে, কিন্তু সেটা ঠিক তোমার মনের মত নয়। বিশ্বপ্রবাহের ভিতর কোথাও পূর্ণচ্ছেদ নেই। একটার যা' শেষ, সেটা সুধু আর একটার আরম্ভ। গাছের পাতা ঝরে পড়ে, মাটিতে সেটা পচে, তাতে জমীতে সার হয়, নূতন চারা তাতে খাবার পায় ;—পাকা ফলটি পড়ে যায়, তার আঁটি থেকে নূতন গাছ গজায়। আজ যে শেষটা তোমার মনকে পীড়া দিচ্ছে, সেটা তোমার মনের

ভিতরই একটা নূতন আরম্ভের সৃষ্টি ক'রছে। তোমার জীবন তাতে ক'রে নূতন ধারায় গড়ে উঠবে। হয় তো এ আগুন সুধু তোমার মনটা পুড়িয়ে ছাই-ই ক'রবে, নয় তো সেই ছাই থেকে তোমার মনের ভূমি উর্ব্বর হ'য়ে নূতন ফসল জন্মাবে। একটি মেয়ে, তার কোলে একটি শিশু এলো—সমস্ত অন্তর তার সরস হ'য়ে উঠলো। তার পর শিশু চ'লে গেল। কিন্তু মায়ের মনটি সে সরল ক'রে রেখেই গেল—তার ফল পাবে আর কেউ। এমনি জগতের নিয়ম।"

হরিচরণ ভাবিল ঠিক, ইহাই সত্য। মৃত্যুর পর আর জীবন নাই। বৃথা এ আশায় মন ভোলান। সে অবসন্ন হৃদয়ে আবার শুইয়া পড়িল।

অসীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "একজন মাড়োয়ারী ধনী, চিনির speculation-এ যথাসর্ব্বস্ব পণ করেছিল—তার সব গেল। কোটি টাকার চিনি তার, মাটির সমান হ'য়ে গেল—সে তবু তাই আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে রইলো—সে একেবারে গেল। আর একজন তারি মত, চিনির বাজারে সর্ব্বস্ব হারাল,—কিন্তু সে ছেড়ে দিয়ে ধ'রলে পাটের দালালি। দেখতে দেখতে সে আবার বড় লোক হ'ল। সর্ব্বস্ব পণ ক'রে জীবনের খেলায় এক বাজি হেরেই থাক, তবে সেই হারা-বাজির ঘুঁটিগুলো আঁকড়ে ধ'রে থেকে কিছু পাবে না। আর এক বাজী খেলতে হবে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিচরণ বলিল, "আর খেলবার সম্বল নেই ভাই আমার।"

(আগামীবারে সমাপ্য)

মাধুকরী

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

ভিক্ষার ছলে করে ফিরো নিতি অদ্ভুত মাধুকরী,
ধিক তোমা ধিক সুখ-ভিক্ষুক আহা কিবা যাদুকরী!
ছলনার তব বাহাদুরি ভাই,
যে চায় যে টোপ, তারে দাও তাই!
সযতনে অতি মোলায়েম ভাবে, মহা সুস্বাদু করি'—
ছলে না হইলে বলে নিবে তুমি, এই তব মাধুকরী!

কে কোথায় পেল সুখের কণিকা তোমারে এড়ানো দায়,
যোজন হইতে শিকারী যেমন মৃগের গন্ধ পায়!
হিংস্রের মত রক্তের লাগি'—
ওৎ পেতে রও দিবারাত জাগি'
যুৎ পেলে তারে সাবাড় করিছ সীমাহীন ছলনায়!
সাধ্য কি আর?—শ্যেনের দৃষ্টি, তোমারে এড়ানো দায়!

বিশ্ব ভরিয়া তীর্থ কাকেরে আশার-জিয়ানে রাখো!
মাংস কাটিয়া দুম্বা মেষের জোড়াতাড়া দিয়া ঢাকো!
যায় যে দু'দিন শুকাইতে ক্ষত—
প্রলেপ তাহাতে দাও কত মত!
ভক্ত বলিবে, আহা কিবা দয়া! ভুলিতে যে পারি নাকো!
হে দয়াল! তব দয়া অদ্ভুত, ক্ষমা দাও, দূরে থাকো!

নদীর বক্ষে পড়ে বালুচর, ডাকে সমুদ্রে বান!
রচিছে ওষধি মরণ-শয্যা রাখিতে ফলের মান!
অগ্নির মুখে যত দাও খড়—
জ্বালা হ'বে তার ততই প্রখর!
খড় হ'ল ছাই, হাসিছে আগুন দ্বিগুণ নাচিছে প্রাণ!
ধরা হ'ল ছাই, তব প্রাণে তাই, ডাকিছে পুলক বান।

তাই যবে হেরি মলয়োৎসব মন্দির জ্যোৎস্নাকুলে,
মরীচিকা-মূঢ় পান্থের মত যাই দুনিয়াটা ভুলে!
তাই কেন বলি? জ্ঞানের আকরে—
কালকূট দিয়ে ভুলা'লে কি করে?
আয়! আয়! চাঁদ, বলি' বুঝি দিলে সুধাকর
টিপ্ ভুলে';—
প্রদীপের দোষ বলা কিগো যায়?—পতঙ্গ গেলে ভুলে!

কত আর নিবে? কৈফৎ কেটে দেখো তা' হয়েছে ঢের—
যুগ যুগ ধরি' চলিতেছে তব এই মাধুকরী জের!
বেশ জমিদারী খুলিয়াছ ভাই,—
'মাট' জোগাইতে প্রাণ আই ঢাই!
তবু ক্ষণে ভাবি, এক ফসলেই ঠিক করে নেব ফের;—
সেই আশা দিয়ে রেখেছ বাঁচায়ে, বিদ্যা তোমার ঢের!

সমাজে দারিদ্র্য-সমস্যা ও স্ত্রী-সমস্যা

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণী-এট্-ল

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে (১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভারতবর্ষে) দেখিয়াছি, ব্যক্তি-তান্ত্রিক সমাজে দরিদ্রদিগের ও স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ দুর্দ্দশা হয় ; এবং আমাদের এই গরীব দেশে সেই আদর্শে সমাজ গঠিত হইলে দরিদ্র ও স্ত্রীলোকদিগের দুর্দ্দশা অতি ভীষণ হইতে বাধ্য। এখন দেখা যাউক, এ কালের নূতন সমাজতত্ত্ববিদ্‌দিগের আদর্শ বা কিরূপ এবং তাঁহারা কি করিতে চান ; এবং এখানে সেই আদর্শের কতটুকু অবলম্বিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা আমাদের কিরূপ সুবিধা হইতে পারে। এই নূতন সমাজতত্ত্ববিদেরা মোটামুটি দুই শ্রেণীভুক্ত—একদল সমাজ-তান্ত্রিক (Socialists) ; আর একদল তুল্যাধিকারবাদী (Communists)। সমাজ-তান্ত্রিকরা দেশের প্রধান ব্যবসা সকল রাজশক্তির অধিকারে আনিতে চান ; সমস্ত জমিও সেইরূপ রাজশক্তির অধিকারে আনিতে চান। তবে এক দমে তাহা না করিয়া কখন বর্ত্তমান অধিকারীদিগকে খেসারৎ দিয়া, কখন বা তাহাদিগকে বহু টেক্স দিতে বাধ্য করিয়া, সেই জমির উৎপন্ন আয় দেশের সকলের—বিশেষতঃ গরীবদের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিতে চান। যাহারা অধিক ধনী তাহাদিগকে অধিক হারে টেক্স দিতে বাধ্য করিয়া, এবং তাহারা মরিয়া গেলে তাহাদের ত্যক্ত সম্পত্তির বহু অংশ টেক্স হিসাবে লইতে চান। যেখানে আয় বৃদ্ধি আপনা হইতেই হয়—যেমন কোথাও একটী নগর স্থাপিত হইলে বা রেল হইলে খাজনা বৃদ্ধি হয়—দর বাড়িয়া যায়—সেইখানে প্রভূত হারে টেক্স আদায় করিয়া বা অন্য উপায়ে তাহা রাজশক্তির প্রাপ্য করিতে চান। এই রূপে রাজকোষে বহু টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে বিনা বেতনে সকলকে লেখাপড়া শেখাইতে চান ; সকল লোকেই যাহাতে নানারূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে—শিক্ষাবিস্তার হয়—দেশের লোক যাহাতে স্বাস্থ্যকর আহার ও আবাস পায়,—বিনা অর্থে বা স্বল্প খরচায় উত্তমরূপে চিকিৎসা হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে চান ; অসহায় ও বৃদ্ধদিগকে নানারূপ সাহায্য দান করিয়া প্রতিপালন করিতে চান। দেখা গেল, ইহার মূল উদ্দেশ্য—যাহাদের প্রভূত ধন আছে, তাহার বহু অংশ কর হিসাবে কাড়িয়া লইয়া, যাহারা গরীব তাহাদের সুবিধার্থে ব্যয় করা। আমাদের দেশে জমি চিরকালই রাজশক্তির অধিকৃত ছিল। কেবল বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার কতকাংশে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে জমিদারবর্গ কতকাংশে মালিক হইয়াছেন। তাহাদিগকে প্রজাদের নিকট আদায়ী করের মোটামুটী হিসাবে অর্দ্ধেকের কিছু অধিক খাজনা হিসাবে দিতে হয়। আর কতকাংশ রথ্যা-কর প্রভৃতি হিসাবে দিতে হয়। এবং প্রজাদিগের করের অতি বৃদ্ধি অনেক আইন দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে। বাঙ্গালায় জমির খাজনা হিসাবে গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক তিন কোটী টাকা পান। যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আরও অনেক আয় বৃদ্ধি হইতে পারে। Simon Commissionএ রাজস্ব-সচিব Marr সাহেবের ও স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিলে গভর্ণমেণ্টের আর এক কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে। আমাদের হস্তে রাজশক্তি না আসিবার পূর্ব্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিলে, আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের বেশি কিছু সুবিধা হইবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই সেখানে প্রজাদের অবস্থা বাঙ্গলার প্রজাদের অপেক্ষা অনেক মন্দ। আমরা পরাধীন বলিয়া এই টাকা Law and orderএর দোহাই দিয়া রাজপুরুষদিগের সুবিধার্থে অধিকাংশ ব্যয় হইত—দেশের লোকের সুবিধার

জন্য সে অর্থ আসিত না ও তাহার অতি অল্প অংশই তাহাদের মঙ্গলের জন্য ব্যয় হইত। তাহার পর এই সকল সমাজতত্ত্ববিদেরা দেশের বড় বড় কলকারখানা ও বাণিজ্য-প্রধান আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করা রাজশক্তির হস্তে রাখিতে চান (Nationalisation of basic Industries)। আমাদের দেশে পোষ্ট আফিস, খাল ও প্রায় সকল রেলওয়ে রাজশক্তির অন্তর্গত আছে। বক্রীগুলি রাজশক্তির তত্ত্বাবধানে আনার কথা। যাবৎ রাজশক্তি অধিকৃত না হয় তাবৎ তাহার বিষয়ে ভাবিবারই আবশ্যকতা নাই; কারণ, তাহাতে আমাদের সুবিধা হইবার কোন প্রত্যাশাই নাই। নগর রাস্তা বা রেল হইলে যে আয় বৃদ্ধি হয় আমাদের গভর্ণমেণ্ট অনেক দিন হইতেই তাহা রাজকোষে আনিবার উপায় করিয়াছেন। আমাদের গভর্ণমেণ্ট ধনীদের উপর অধিক হারে টেক্স লইতেও আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন না রাজশক্তি আমাদের সম্পূর্ণ অধিকারে আসে, এবং তাহা দেশের মঙ্গলের জন্য একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত হয়, এবং আমরা রাজশক্তির দ্বারা বা যৌথ বা সমবায় প্রথার (Joint stock or Co-operative methods) দ্বারা প্রধান ব্যবসা সকল সুচারুরূপে চালাইবার উপযুক্ত হই, ততদিন ধনীদের উপর অধিক হারে নানারূপ টেক্স বসাইয়া কাড়িয়া লওয়ায় আমাদের উপকার হইবে কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। কোন বড় কলকারখানা বা কোন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে বহু মূলধন আবশ্যক। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ ধনীদের অর্থ কাড়িয়া লইলে আমাদের এই গরীব দেশে অধিক মূলধন একত্র থাকিতে পাইবে না; সুতরাং কোন বড় কলকারখানা বা ব্যবসা বা দেশজ নূতন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব হইবে। পাশ্চাত্যের প্রভৃত ধনীরাই সেই সকল অধিকার করিয়া বসিবে ও আমাদের দুর্দ্দশার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইবে। মনে রাখিতে হইবে, টাটা সাহেব প্রভৃত ধনী ছিলেন বলিয়াই লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, কাপড়ের কল প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। রাজশক্তি দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা বাণিজ্য ও কলকারখানায় চিরকালই অপব্যয় হয়। অনেক সময়ে অনেক অকর্ম্মণ্য লোকের দ্বারা এই সকল পরিচালিত হয়। যতদিন না সাধারণ লোকদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা, বিদ্যা, চরিত্র বিশেষ ভাবে উন্নত হয়, ততদিন রাজশক্তির দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা বাণিজ্য ও কলকারখানায় বিশেষ সুবিধা হয় না। এই জন্য রুষিয়া অন্য দেশের লোকদিগকেও বড় কলকারখানা কতক কতক অংশে চালাইতে দিতে বাধ্য হইয়াছেন—যদিও এরূপ করিতে দেওয়া তাহাদের আদর্শের সহিত অসমঞ্জস। সুতরাং সমাজতান্ত্রিকদের মতানুবর্ত্তনে আমাদের বিশেষ কোন সুবিধা হইতে পারে না—বিশেষতঃ যতদিন রাজশক্তি আমাদের অধিকারে না আসে। তাঁহারা যে সকল উপায়ে গরীবদের দুর্দ্দশা মোচন করিতে চান, তাহা আমাদের অর্থাভাবে ও দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টাভাবে কিছুই হইবার প্রত্যাশা নাই। আমাদের দেশের গরীবের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অর্থ সমাগম কোথা হইতে হইতে পারে তাহা দেখা যায় না। তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতায় সকল কর্ম্মেরই অধিকার দিতে চান। কিন্তু সকলকেই নিজের চেষ্টার উপর নিজের জীবনোপায় করিয়া লইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে হইবে। তাহার যে বিষময় ফলের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, তাহার কোন প্রতিকার হয় না—কেবলমাত্র অর্থাগমের পথ সামান্য প্রশস্ত হয়; এবং তজ্জন্য অবিবাহিত অবস্থায় কাম উপভোগের মন্দ ফলের ঈষৎ হ্রাস হয় এবং ব্যভিচারের সামাজিক শাসন সামান্যই থাকে। কিন্তু জারজ সন্তানের ভার তাহাকে একাই বহিতে হয়—অপত্যেরা পিতামাতা দুই জনার স্নেহ যত্ন হইতে বঞ্চিত হয়—মাতৃত্বের প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে—তৎসঙ্গে পারিবারিক জীবনের সুখ, শান্তি, তৃপ্তি, পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা লোপ পায়—গৃহ আর গৃহ থাকে না—বাসায় পরিণত হয়—ক্ষণিকের কামজ মোহ প্রেমের স্থান অধিকার করে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিষ ব্যক্তিগত ভালবাসা বিকাশের পথ সঙ্কুচিত হয়—পাশ্চাত্যে এখনই এই সকল অনেকাংশে হইয়াছে। জীবন উত্তেজনা ও আমোদপ্রবণ হয়—স্ত্রীলোকদিগের জীবন প্রকৃতিগত অভাব মোচনাভাবে সুখ ও শান্তিহীন হয়। অপত্যেরাও পিতামাতার আন্তরিক স্নেহ ও যত্ন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি-গুলির সম্যক বিকাশ হইতে পায় না।

তাহার পর তুল্যাধিকারবাদীদের কথা। তাঁহারা ধন-

বৈষম্য একেবারেই যাহাতে হইতে না পায়,—সকলেই সমহারে যাহাতে খাইতে পরিতে ও আবশ্যক দ্রব্যাদি পায়, —সকলেই লেখাপড়া শিখে, স্বাস্থ্যকর আবাসে বাস করিতে পারে, তাহাই করিতে চান। রুষিয়ায় বলশেভিকরা বড় লোকদিগের সমস্তই—মায় ঘর বাড়ী পর্য্যন্ত—অধিকাংশ স্থলে বাজেয়াপ্ত করিয়া দেশের লোকদের ভিতর বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সমস্ত ধনই দেশের—তাহা সকলেই সম হারে ভোগ করিবে। বড় বড় সকল কল কারখানা—সকল বাণিজ্যই তাঁহারা রাজশক্তির অধিকারে আনিতে চান। সকলই দেশের সকলের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য—মোটামুটি বলিতে গেলে নিজস্ব বলিয়া কিছুই থাকা উচিত নয়—সকলেই সমান। এমন কি দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা লেনিন সাহেব সামান্য কুলি-মজুররা, সৈনিকরা যেরূপ হারে খাইতে পরিতে পায়, যেরূপ পারিশ্রমিক পায়—তাহাই পাইতেন ও লইতেন। তাঁহাদের জীবনের আদর্শ এই যে, প্রত্যেকে তাঁহার যতদূর শক্তি আছে তাহা সকলের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করিবেন এবং তাঁহার যাহা আবশ্যক তাহা সমাজ হইতে পাইবেন (From ea h according to his ability to each according to his needs.)। সমাজতান্ত্রিকদেরও এই আদর্শ বটে—কিন্তু তাহা তাঁহারা এখন কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তত নন বা অসম্ভব বিবেচনা করেন। এই জীবনাদর্শের মহত্ত্ব সকলেই স্বীকার করে। এবং যে দেশে যতটা উহা কার্য্যে পরিণত হয় ততটা দেশের শান্তি স্বাস্থ্য ও সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়। তুল্যাধিকারিগণ মনে করেন যে, যখন কোথাও আয়ের তারতম্য থাকিবে না, ধনের বৈষম্য থাকিবে না—সকলে তাহার আহার পরিচ্ছদাদি পাইবে—সকলে শিক্ষিত হইবে ও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে—তখন পৃথিবী নূতন রূপ ধরিবে—কোন গভর্ণমেণ্টেরই আবশ্যকতা থাকিবে না। ঈর্ষা, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতি অসদ্‌গুণের লোপ হইবে—মারামারি, কাটাকাটি, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা আর থাকিবে না। আমাদের পুরাতন কথায়, আবার সত্যযুগ আসিবে।

তুল্যাধিকারীরা যে সকল উপায় করিতে চান; তাহাও রাজশক্তি সম্পূর্ণ অধিকৃত না হইলে বড় কিছুই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। এই রাজশক্তি অধিকার করার চেষ্টা কতক হইতেছে এবং সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে বহু ধনী পাশ্চাত্য শিল্পীদের হস্ত হইতে বাঁচাইয়া আমাদের দেশীয় শিল্পকে পুনর্গঠন করিবার কিছু সুবিধা হইতে পারে—তাহাতে কতক গরীবদের অবস্থা সামান্য ভাল হইতে পারে। কিন্তু রাজশক্তি অধিকৃত হইলেও, আমরা যে পুরামাত্রায় ব্যক্তি-তান্ত্রিক আদর্শে পারিবারিক জীবন যাপন করি তাহা হইলেও গরীবদের ও স্ত্রীলোকদের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। কারণ, সেরূপ আদর্শে গঠিত প্রভূত শক্তি ও ধনশালী পাশ্চাত্যদেশে তাহাদের দুর্দ্দশা ভয়ানক ছিল—এবং এখনও সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শে কতকটা সেই আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইলেও এখন গরীবদের ও বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের দুর্দ্দশা যথেষ্ট আছে আমরা দেখিয়াছি। রাজশক্তি অধিকার করাও সহজে হয় না। কেবল গলাবাজী করিয়া, কদাচ কখনও বা খাদি পরিয়া মহাত্মা গান্ধীর মাথা কিনিলে ও বন্দে মাতরম্ বলিয়া চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিলে—কেবল নিজের বা নিজের স্ত্রী ও অপত্যদের সুখ আয়াস ও বিলাসিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এমন কি মাতা পিতা ভাই ভগিনী প্রভৃতির দিকে একেবারে না চাহিয়া কর্ম্ম করিলে, কোন কালেই রাজশক্তি পক্ক ফলের ন্যায় আকাশ হইতে পড়িয়া আমাদের হস্তগত হইবে না। রাজশক্তি অধিকার করিতে হইলে সকলকেই দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে—প্রত্যেক-কেই আমার দ্বারায় কতটা কাহার জীবনের কষ্ট লাঘব হইতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে ও চেষ্টা করিতে হইবে। সকলেরই প্রাণপণ ত্যাগ-স্বীকার চাই—নিয়মানুবর্ত্তিতা চাই —সত্যসন্ধ হওয়া চাই—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা চাই—আসল স্বদেশ-প্রেম চাই। এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সত্য-সন্ধতার অভাবেই আমাদের দেশীয় শিল্প ও ব্যবসার সুবিধা হইতেছে না। যিনি মাষ্টারি করিবেন তাঁহাকে—যাহাতে ছাত্রেরা ভাল লেখাপড়া শিখে—তাহাদের ভিতরকার সকল শক্তির উদ্বোধন হয়—উচ্চ আদর্শে তাহারা অনুপ্রাণিত হয় —তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে—ইহাই প্রধানতঃ আবশ্যক। যাহার ধন আছে তাহার দেশের মঙ্গলের জন্য প্রভূত পরিমাণে সেই ধন দেওয়া চাই—নিজের আরাম ও বিলাসিতার আতিশয্যে তাহা ব্যয় করিলে চলিবে না। যিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, তাঁহার সেই শাস্ত্রে যতদূর সম্ভব পারদর্শী হইবার চেষ্টা থাকা চাই—

যাহাতে রোগী বাঁচে ও তাহার কষ্টের উপশম হয় ও লোকদের স্বাস্থ্যহানি না হয় তাহার চেষ্টা করা চাই—কেবল নিজের পারিশ্রমিকের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে চলিবে না। যিনি উকিল তাঁহারও যাহাতে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয় তাহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া চাই। যিনি চাষী তাঁহারও যাহাতে তাঁহার জমী হইতে অধিক শস্য উৎপন্ন হয় তাহা শিখিতে ও করিতে হইবে। যিনি মুদী তাঁহাকে যাহাতে লোকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য অল্প পয়সায় পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে—ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর আহার্য্য বিক্রয় করিয়া দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিলে চলিবে না। যাহার গায়ে জোর আছে তাহার দুর্ব্বলদের উপর অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করা চাই। সকলেরই কি উপায়ে দেশের মঙ্গল সাধন করা যায় তাহা ভাবিতে হইবে—অন্য যাহারা ভাবিয়াছে তাহাদের মত কি জানিতে হইবে—তাহা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিতে হইবে—তাহার দোষ বা ভুল থাকিলে তাহা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে হইবে—তাহাকে কেবল গালি দিলে চলিবে না। যাহা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে—কেবল মুখে বাগাড়ম্বর, কার্য্যে অষ্টরম্ভা হইলে চলিবে না। মোট কথা, তুল্যাধিকারবাদীদের সেই মহৎ আদর্শ—যাহার যতদূর শক্তি আছে তাহা সকলের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে—ও যাহার যাহা আবশ্যক সে তাহা সমাজ হইতে পাইবে—এই আদর্শটায় আমাদের জীবন অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

তুল্যাধিকারবাদীরা স্ত্রীলোকদিগের আর্থিক কষ্টের অনেক লাঘব করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মাতৃত্ব উপভোগের আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে বড় কিছুই এখনও করিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রথমে তাঁহারা বিবাহ-বন্ধন একেবারেই উঠাইয়া দিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা নিয়ম করিয়াছিলেন—যতদিন দুই জনই একত্র স্বামী-স্ত্রী রূপে থাকিতে চান ততদিন তাঁহারা স্বামী স্ত্রী—একজন ইচ্ছা করিলেই বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে পারিত—একত্র থাকিলেই স্বামী স্ত্রী বলিয়া সমাজে গণ্য হইত। ইহার ফল বড় বিষময় হয় দেখিয়া—পুরুষরা স্ত্রীলোকদিগের সহিত কিছুদিন উপগত হইয়া সরিয়া পড়ে দেখিয়া—এখন বিবাহ রেজিষ্টারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতেও নানারূপ অসুবিধা হইতেছে। ইতিমধ্যে বিবাহ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলি তিনবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোনরূপ স্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে এখনও বহুকাল যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ব্যভিচার ভয়ানক বাড়িয়াছে। মহাত্মা লেনিন তজ্জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিরূপে তাহা বন্ধ হইতে পারে—সমাজ-বন্ধন কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সকলের মত চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকদিগের একা অপত্য প্রতিপালনের ভার লাঘব করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে শিশু আশ্রম (mothers' establishment) করিতে উপদেশ দিয়াছেন—যাহাতে সেখানে শিশুরা সমস্ত দিন অন্য স্ত্রীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিতে পায়, এবং মাতারা অন্য কাজ করিবার অবকাশ পায়—গ্রামে গ্রামে এক যায়গায় রাঁধিবার বন্দোবস্ত থাকিবে—যাহাতে সকলে সেখানে গিয়া স্বাস্থ্যকর খাদ্য অল্প খরচায় পায়—এবং মাতারা কার্য্য করিবার অবকাশ পায়। তাহা ছাড়া পরিত্যক্ত ও পিতৃমাতৃহীন শিশুদের প্রতিপালনের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান হইয়াছে ও হইতেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ এরূপ সহজ হওয়ার ফলে দেখা যায় যে, শিশুরা মাতাপিতার কাহারও ঐকান্তিক যত্ন, তত্ত্বাবধান, ভালবাসা পাইতে পারে না। সুতরাং তাহাদেরও পিতৃমাতৃ-ভক্তি উদ্দীপিত হয় না। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে শরীর অকর্ম্মণ্য হইলে সকলের জীবন মরুময় হয়—কাহারও প্রাণের টানের ঐকান্তিক যত্ন ও ভালবাসা পাইতে পারে না। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে একজনের কঠিন পীড়া হইলে হাসপাতাল ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। অনেক স্থলেই যে এরূপ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পৃথক হইয়া পড়িবেন তাহা সহজেই অনুমেয়। গৃহে প্রত্যেকে যে রুচিকর ও তৃপ্তিকর আহার পাইতে পারে তাহা কখনই অন্য কোন প্রকারে হইতে পারে না—সকলকেই প্রায় আজীবন মেসে থাকার মতন জীবন যাপন করিতে হয়। সুগঠিত পারিবারিক জীবনের সে সুখ, শান্তি, তৃপ্তি, ব্যক্তিগত ভালবাসা, পিতামাতা ও অপত্য, স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগিনী ইত্যাদির ভিতর ভালবাসার বিকাশে জীবনের যে শ্রেষ্ঠ উপভোগ—যাহাতে পৃথিবীতেই স্বর্গ টানিয়া আনে—তাহা একান্তই দুর্ল্লভ হয়। জীব-জগতের ক্রম-বিকাশে মানুষেই কেবল বৃদ্ধ বয়সে ও শরীর অসমর্থ হইলে অপত্য ও অন্য আত্মীয়ের ঐকান্তিক ভালবাসা, সেবা ও যত্ন পায়; এবং

পায় বলিয়াই তখনও জীবন উপভোগ্য থাকে—এরূপ সমাজ গঠনে তাহা একান্ত দুষ্প্রাপ্য হয়। আমার মনে হয়, রুষিয়ায় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বহুকাল হইতেই ভয়ানক ভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছিল,—তাহারা কখনই সুপরিচালিত পারিবারিক জীবনের সুখ, শান্তি, তৃপ্তি, ভালবাসা উপভোগ করে নাই। সুতরাং তাহার আস্বাদনই তাহারা জানে না। সেই নির্য্যাতিতেরাই এখন সমাজের নেতা হইয়াছে—সমাজ গঠন করিতেছে। সুতরাং সে আদর্শটা তাহারা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহা ছাড়া, এই বিপ্লবে ও যুদ্ধে তাহাদের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিবার জন্যই তাহারা ব্যস্ত,—অন্য দিকে মন দিবার তাহাদের সময় নাই। যখন আর্থিক অবস্থা অনেক উন্নত হইবে, জীবনে অবকাশ উপভোগ করিবার সময় আসিবে, তখন আবার যাহাতে এইরূপ ভালবাসা বিকাশের পথ উন্মোচিত হয় তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে তাহারা হয় ত চেষ্টা করিবে।

সমাজতান্ত্রিক ও তুল্যাধিকারবাদীদের সমাজে আর দুইটি প্রধান দোষ আছে। এই দুই সমাজেই সকল জীবনের উপর রাজশক্তির প্রভাব ভয়ানক বাড়িয়া যায়। রাজশক্তি মানুষের দ্বারাই পরিচালিত হয়। সুতরাং পরিচালকদিগের অসীম ক্ষমতা হইবে। কেহই সর্ব্বজ্ঞ নয়, সুতরাং তাহারা সকলেই ভুল করিবেই। অতএব পরিচালকদিগের ভুল জ্ঞান ও বিশ্বাস সকলের উপর পরিচালিত হইবে—সকলেই তদনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইবে। তাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার লোপ পাইতে থাকিবে—সব একঘেয়ে হইয়া যাইবে—সকলে যেন মন্ত্র-চালিত হইবে। তাহার ফলে ক্রমে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ হইবে। আবার কিছুদিন পরে প্রতিযোগিতার ও অভাবের অভাবে উন্নতির পথও সঙ্কুচিত হইবে। সমাজতান্ত্রিক ও তুল্যাধিকারবাদীরা দুই পক্ষই এই আপত্তিগুলি স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, প্রথমে এইরূপ হইতে বাধ্য। কালে কোন এক রূপে —কিরূপে তাহা এখনও কিছু ঠিক হয় নাই—রাজশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation) প্রথা উদ্ভাবিত হইয়া এই সকল দোষ অপনোদিত হইবে। তুল্যাধিকারবাদীরা মনে করেন যে, সকল দেশের সকলেই যখন তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিবে এবং সেইরূপে অনুপ্রাণিত হইবে তখন আর রাজশক্তিরই আবশ্যকতা থাকিবে না। রাজশক্তির মানেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্ব্বতা, অত্যাচার। রাজশক্তিই কমিয়া যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু কি উপায়ে কিরূপে তাহা হইতে পারে তাহার নির্দ্ধারণ এখনও হয় নাই।

আমরা দেখিলাম, এই দুই প্রকার সমাজতত্ত্ববিদ্‌দিগের আদর্শে কেবল আর্থিক সচ্ছলতার দিকেই সকলের প্রধান লক্ষ্য। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কাহারও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপভোগের জিনিস—ব্যক্তিগত ভালবাসার বিকাশের দিকে কোন লক্ষ্য নাই—সমষ্টিগত ভালবাসার দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য আছে বটে।

সমাজতান্ত্রিক ও তুল্যাধিকারবাদীদের প্রদর্শিত উপায়ে যত দিন না রাজশক্তি অধিকৃত হয় ততদিন বড় বেশী কিছু এখন করা যাইতে পারে না। তুল্যাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া রুষিয়াতে ভয়ানক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। লোকেদেরও কত ভীষণ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাদের বিপ্লবের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এবং সেইজন্যই সমাজতান্ত্রিকও তুল্যাধিকারবাদীদের অনেক মত, মত হিসাবে মান্য করিয়াও তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিতে চাহেন না। এ কথাগুলি আমাদেরও বিবেচ্য। আমাদের গরীবদের দুর্দ্দশা কিন্তু এত শোচনীয় ও ভীষণ হইয়াছে যে, রাজশক্তি পূর্ণমাত্রায় অধিকৃত হওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে আমাদের চলে না। এখন দেখা যাউক, আমাদের পুরাতন সমাজগঠন কিরূপ ছিল—এতকাল আমাদের সমাজ মানুষের মুখ্য অভাবগুলি কিরূপে পূরণ করিত—গরীবদের দুর্দ্দশা মোচন কি উপায়ে সম্পাদিত হইত এবং আমরা নিজেরা কিরূপে তাহাদের দুর্দ্দশা মোচন করিতে পারি।

আমাদের সমাজ প্রধানতঃ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল —ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাহাদের ভিতর আবার বহু শাখা ছিল। এই সমাজ-বিভাগ মূলতঃ গুণকর্ম্মানুযায়ী। 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।' গীতা ৪ অধ্যায়। এই চারি বিভাগ সকল সমাজেই আছে এবং চিরকালই থাকিবে। আমাদের সমাজে এই জাতিবিভাগ বহুকাল হইতেই বংশগত হইয়াছে এবং বিবাহ সেই জাতির ভিতর নিবদ্ধ ছিল ও আছে। পূর্ব্বকালে কর্ম্ম-সমুদায় সচরাচর বংশগত থাকায়—এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শিক্ষার সুবিধা হওয়ায় প্রত্যেক জাতির জীবিকা উপার্জ্জনের

আবশ্যক গুণ সকলও অনেকটা বংশগত হইয়া পড়িয়াছিল। এই জাতিবিভাগ বংশগত রাখিবার ও স্বজাতির ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ রাখিবার জীববিজ্ঞান-শাস্ত্র-অনুমোদিত অনেক কারণ আছে। তাহা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সেই সকল কথার বিচার না করিয়া এই জাতি-বিভাগের দ্বারা কিরূপে দারিদ্র্য-সমস্যা ও স্ত্রী-সমস্যা পূরণের সহায়তা হয়, তাহাই এখন দেখাইতেছি।

অল্প কথায় বলা যায়, ব্রাহ্মণের প্রধান কাজ—সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা দান ও ধর্ম্ম প্রতিপালন। পূর্ব্বে সমস্ত শিল্পের বিজ্ঞানাংশ (Science portion of every art) তাঁহাদের শিক্ষাদানের অন্তর্গত ছিল। দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ—অথচ যুদ্ধ-বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। নারদ সঙ্গীত শাস্ত্রী। রাজনীতি, আইন (Social and political philosophy) জ্যোতিষ, গণিত, পূর্ত্ত কার্য্য সকলই ব্রাহ্মণের শিক্ষার বিষয় ছিল। কিন্তু তাঁহারা কেবল সেই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন না—তাঁহারা যেন সকল শিল্প সম্বন্ধে technical adviser and expert ছিলেন—মোটামুটি চাল ও উচ্চ চিন্তা (Plain living and high thinking) ব্রাহ্মণের জীবনাদর্শ। লোকদিগকে সকল বিষয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া তাহাদের কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্ত তাঁহারা পারিশ্রমিক লইতেন না। রাজা বা অন্য ধনী লোক তাঁহাদিগকে জমি দান করিতেন, বৃত্তি দিতেন। তাহাতেই তাঁহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তাঁহাদের প্রভূত মান্য ছিল, কিন্তু অর্থাধিক্যও ছিল না, অর্থাগমের পথও প্রশস্ত ছিল না। এইরূপে গরীবরাও মেধাবী হইলে উচ্চ শিক্ষা পাইবার সুবিধা পাইত। তাঁহারা পুরাণ পাঠ কথকতা করিয়া সাধারণ লোকদের নীতি শিক্ষা দিতেন।

ক্ষত্রিয়রা রাজা হইত, দেশরক্ষা করিত (and executive function Military) যুদ্ধ, দেশ রক্ষণ ও শাসন (Police), সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল। ব্রাহ্মণরা আইন করিতেন, জজিয়তী করিতেন। এইরূপ পূর্ণ মাত্রায় আইন ও শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মের বিভাগ (Separation of legislative, judicial and executive functions) সম্পন্ন হইত।

বৈশ্যদের কর্ম্ম ছিল কৃষি, বাণিজ্য, খনি, পশুপালন সমাজের আহার্য্য ও আবশ্যক দ্রব্য যোগান ইত্যাদি। শূদ্রদের কর্ম্ম উক্ত তিন শ্রেণীর আদেশমত আবশ্যক কার্য্য করা। তাহাদিগকে একালের কথায় কায়-শ্রমিক বলা যাইতে পারে।

ক্ষত্রিয়দের আদর্শ দেশ ও আর্ত্ত রক্ষার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করা। বৈশ্যদের আদর্শ দেশের লোকেদের আবশ্যক আহার্য্য ও দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সুবিধামত পাওয়ার সুবিধা করা—দেশের লোকেদের সকল সাংসারিক অভাব মোচন করা। তাঁহারা লাভ পাইবেন বটে—তবে তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য নয়—উদ্দেশ্য যাহাতে দেশের লোক উৎকৃষ্ট আহার্য্যাদি সহজে ও সুলভে সুবিধা মত পাইতে পারে—ভোজন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লোক ঠকান তাঁহাদের আদর্শের বিপরীত। Ruskin সাহেব তাঁহার—Unto the Last নামক পুস্তকে যে প্রকার জীবিকা—যে প্রকার আদর্শ থাকা উচিত লিখিয়াছেন—তাহাই আমাদের পুরাতন আদর্শ—সেইরূপ আদর্শই এই জাতিগত জীবিকা থাকার প্রথা দ্বারা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। অবাধ প্রতিযোগিতা না থাকায় প্রত্যেক ব্যবসা এক এক জাতিগত থাকার ফলে জীবিকার নিমিত্ত কোন লোককে অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইতে হয় নাই।

এক একটী মুখ্য জাতির শাখা সকল সেই জাতির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসমূহের মধ্যে কতক কতক কর্ম্ম করিত। পূর্ব্বকালে গমনাগমনের সুবিধা না থাকায়, লোকেরা যে প্রদেশে বাস করিত, সেই প্রদেশের উপযোগী কর্ম্মেই নিযুক্ত ছিল। কালক্রমে জীবিকা ও আচার ব্যবহার তাহাদের ভিতর বিভিন্ন হওয়ায় জীবনাদর্শ ও আশা ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তাহারা পৃথক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে ও তাহাদের ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ এক একটী জাতি শাখার ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ থাকার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সেই জাতি শাখার ভিতর অনেক আত্মীয় কুটুম্ব থাকিত ও থাকে। তাহাদের জীবিকাও প্রায় এক উপায়ে নির্ব্বাহ হইত। এইরূপ এক একটী জাতি শাখার এক একটী নির্দ্দিষ্ট জীবিকোপায় থাকাতে তাহাদের জীবনাদর্শ ও জীবনের আশাও প্রায় একরূপ ছিল ও এখনও কতক পরিমাণে আছে। এইরূপ জীবনাদর্শ ও আশা এক হওয়াতে ও আত্মীয় ও কুটুম্বতা থাকাতে এক একটি জাতি শাখার অন্তর্গত লোকেদের ভিতর সহানুভূতির টান থাকিত এবং

তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে সহজেই অনেক সাহায্য পাইত এবং তাহারা যে উপায়ে ধনোপার্জ্জন করে সেই উপায়ের উপযুক্ত দক্ষতা পাইবার ও সেই উপায়ে ধনোপার্জ্জন করিবার সুবিধা পাইত। ব্যবসা সংঘ ও শ্রমিক সংঘ (Trade union and Labour union) করিয়া একালে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ ও শ্রমিকগণ তাহাদের ব্যবসা ও জীবিকার সুবিধার নিমিত্ত যে সকল কার্য্য সম্পাদন করে, আমাদের এই জাতি ও জাতি শাখা বিভাগ দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদিত হইত। এই জাতি শাখা বিভাগের দ্বারা ব্যবসায়ী সংঘ ও শ্রমিক সংঘ পাশ্চাত্যে যে সকল কর্ম্ম করে, তাহা ছাড়া আরও অনেক আবশ্যক সামাজিক কর্ম্ম ও নিয়মাদি সম্পাদিত হইত। এইরূপে ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য্য আমাদের জাতি শাখা বিভাগের দ্বারা বহুকাল হইতে সম্পাদিত হইত বলিয়াই আমাদের দেশের গরীবরা, শ্রমিকরা কোন কালেই পাশ্চাত্যের গরীব ও শ্রমিকদিগের মতন দুর্দ্দশাপন্ন ও নির্য্যাতিত হয় নাই এবং তাহারা তাহাদের মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে পারিত—কখনও একেবারে মানুষের সাহায্য ভালবাসা সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া পশুত্বে নীত হয় নাই। আমাদের সংস্কারকরা মনে রাখিবেন যে, যতদিন পাশ্চাত্যে Trade union ও Labour unions (ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সংঘ) প্রথা উদ্ভাবিত হয় নাই ইহার প্রথম উন্মেষ পাশ্চাত্যে সবে এক শত বৎসর হইয়াছে—ততদিন তাহাদের দুর্দ্দশা কি ভীষণ ছিল—chartists agitationএর সময়ের ইতিহাস পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। এই ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সংঘ করিয়াই পাশ্চাত্যে শ্রমিকরা ও গরীবরা তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। যতদিন তাহারা সেরূপে সংঘবদ্ধ হয় নাই, ততদিন তাহারা ধনী সম্প্রদায় দ্বারা ভীষণভাবে নির্য্যাতিত হইত এবং এইরূপ সংঘবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মঘট (strike) করিয়াই সমাজের পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তিতান্ত্রিক আদর্শ ভাঙ্গিয়া সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শ প্রবর্ত্তিত করিতে ও তাহাদের অবস্থা উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের জাতি শাখা বিভাগের দ্বারাই এই কার্য্য এতাবৎ কাল করা হইত ; এবং শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়া তাহাদের প্রতিকূল নিয়মাদির উচ্ছেদ ও পরিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি ও অনুকূল প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পারিত। এই জাতি বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আবার তাহাদের উপযোগী সামাজিক নিয়মাদিও করিবার ক্ষমতা ছিল ও পঞ্চায়ৎ প্রথা দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইত। এইরূপ থাকাতে আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রাজশক্তির অত্যাচার কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। ইহার দ্বারাই রাজশক্তির কতকাংশে বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation) করা হইয়াছিল এবং ইহাই আমাদের উদ্ভাবিত বিকেন্দ্রীকরণের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। প্রত্যেক জাতি শাখার এইরূপ আবশ্যক নিয়মাদি করিবার ক্ষমতা থাকায় আমরা হিন্দু সমাজে নানা জাতি শাখার নানারূপ আচার নিয়মাদি দেখিতে পাই। সেইজন্য কোন কোন জাতি শাখার ভিতর দেখা যায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে—কোথাও বা নাই। আজকাল অনেকেই বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী। এইরূপ বিধবা বিবাহ প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাকায় ইহা হিন্দুদের স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচারের নিদর্শন মনে করেন। কিন্তু এইরূপ প্রথা সব সমাজে সর্ব্বকালে প্রচলিত থাকা বিধেয় তাহা বলা যায় না। যেখানে স্ত্রী-সংখ্যা পুরুষ-সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী,—যেমন ইংলণ্ডাদি দেশে এখন হইয়াছে,—সেখানে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত ; কারণ, তাহা বন্ধ না হইলে ধনী বিধবারা অনেকবার বিবাহিত হইতে পায়, কিন্তু গরীব কুমারী স্ত্রীলোকরা একবারও বিবাহিত হইতে পায় না ও তৎফলে তাহারা ভালবাসা ও মাতৃত্বের সুখ হইতে একেবারেই বঞ্চিত হয়। এইরূপ স্থলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকা কি স্ত্রীজাতির প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন,না গরীব স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সহানুভূতির অভাবের নিদর্শন ? এইজন্য আমাদের উচ্চ শ্রেণীর জাতিদের যেখানে কন্যাদায় দুর্ব্বহ হইয়াছে সেখানে বিধবা বিবাহ বাঞ্ছনীয় নয়—নীচ শ্রেণীতে যেখানে কন্যাপণ আছে সেখানে বাঞ্ছনীয়। কায়শ্রমিকদিগের ভিতর সকল দেশেই স্ত্রী-সংখ্যা কম হয়। সেইজন্যই আমাদের নীচ শ্রেণীর ভিতর বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। অপত্যবতী বিধবাদিগের বিবাহ হইলে সেই পুত্র কন্যাদের অনেক সময়েই দুর্দ্দশার একশেষ হয়। সেইজন্য হিন্দুর আদর্শ মাতারা পুত্রদের মুখ চাহিয়াই নিজেদের সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। অনেক বিধবা পুনরায় বিবাহ না করাতে বিবাহের একটা উচ্চ আদর্শও দেশে স্থান পায়। সে আদর্শ উঠাইয়া দেওয়া যে সব সময়ে বাঞ্ছনীয়, তাহা মনে হয় না।

পাশ্চাত্য দেশে nunএরা, sisters of mercyরা যে আদর্শের বশবর্ত্তী হইয়া জীবন যাপন করেন, আমাদের পুরাতন সমাজ উচ্চ শ্রেণীর বিধবাদের সেই আদর্শেই জীবন যাপন করাইতে চাহিতেন। তাহাই তাহাদের সামাজিক (function) কর্ত্তব্য। পূজা উপবাস নিরামিষ আহার ব্রতাদি পালন প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা কামকে ভগবানাভিমুখ করিয়া মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণকারীদের কথায় sublimate করিয়া, উচ্চ শ্রেণীর বিধবাদের সর্ব্বভূতের হিতার্থে জীবন যাপন করান হিন্দু ধর্ম্মের হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শ। তাহাদিগকে আত্মসুখ ও ভোগেচ্ছা ত্যাগ করান এই উচ্চ আদর্শের উপযোগী করাইবার শিক্ষার (cultural discipline) অন্তর্গত। পূজা ব্রত উপবাসাদি দ্বারাই ইচ্ছাশক্তির প্রকৃত শিক্ষা ও বিকাশ সম্ভব হয়। (training, development of will)। ইহা তাহাদের উপর অত্যাচারের নিদর্শন মনে করা ভুল। এই ইচ্ছাশক্তির বিকাশের জন্যই রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীদের (মেয়ে ও পুরুষ) ভিতরও এইরূপ নিয়মাদি আছে—কেহ তো তাহা তাহাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার বলেন না। তবে উচ্চ শ্রেণীর বিধবাদের এইরূপ করানটাকে তাহাদের উপর অত্যাচার বলাটা কি সঙ্গত? অনেকে বলিবেন, ইহার ভিতর অনেক প্রভেদ আছে। এক স্থলে স্বাধীন ইচ্ছায় সে এইরূপ জীবন যাপন করিতেছে—অন্য স্থলে তাহাদিগকে বাধ্য করা হইতেছে। কথাটা সত্য বটে। কিন্তু যদি সমাজের মঙ্গলের জন্য সমাজের নিয়ম করিবার ক্ষমতা থাকে এবং তাহা সকলেই স্বীকার করেন—এবং তজ্জন্যই পাশ্চাত্যে প্রাথমিক শিক্ষা সকলকেই বাধ্য করিয়া দেওয়া হয়—সকলকেই সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়—বসন্ত রোগের টীকা দেওয়া হয়—তাহা হইলে হিন্দু সমাজ দেশের মঙ্গলের জন্য, অন্য স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলের জন্য, দেশে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, সেই বিধবাদের ত্যাগমূলক উচ্চতর জীবনের আস্বাদ দিবার জন্য, কামকে উচ্চশ্রেণীর ভগবানাভিমুখ করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর হিতার্থে কেবল দেশের গণ্য মান্য উচ্চশ্রেণীর লোকেদের বিধবাদের জন্য, ভোগ ত্যাগ ও ইচ্ছাশক্তির প্রকৃত বিকাশের পন্থা স্বরূপ একাহার বা মধ্যে মধ্যে উপবাস পূজা ব্রত নিয়মাদি করাতে কেন হিন্দু সমাজকে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারী বলা হয়? এইরূপ ব্রত উপবাসাদি বিধবাদের উপর অত্যাচার নয়—শিক্ষারই অন্তর্গত। তাহা উচ্চ আদর্শানুকূল। এবং এই সকল যে তাহাদের মঙ্গলের জন্য—আমাদের বিধবাদের স্বাস্থ্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, কর্ম্মক্ষমতা, দীর্ঘ জীবন তাহার অকাট্য সাক্ষ্য দিতেছে। দুঃখের বিষয় যে আমাদের সহিত সহানুভূতিহীন তিলকে তাল করিয়া দোষদর্শী পাশ্চাত্য বন্ধুদের কথায় ও নিজেদের স্নেহাধিক্য বশতঃ বিধবাদের জীবনের উচ্চ আদর্শের উপযুক্ত শিক্ষার অন্তর্গত এই সকল নিয়মাদি আপাত-কষ্টদায়ক দেখিয়া অনেকে আর তাহা পালন করে না। তাহার ফল যে ভাল হইয়াছে তাহাও দেখা যায় না। ব্যায়ামারম্ভ কালেও কষ্ট হয়—সেই জন্য কি ব্যায়াম করিতে বলায় বালকদিগের উপর অত্যাচার করা হয় বলা উচিত? উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হইবার একটা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব-জ্ঞানেই, সেই আদর্শের নিমিত্তই মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজে পুনরায় বিবাহ করেন নাই ও অল্প বয়সে বৈধব্যগ্রস্ত কন্যা বিয়াট্রিসকে পুনরায় বিবাহ করিতে দেন নাই। হিন্দু সমাজ কেবল উচ্চশ্রেণীভুক্তদের পক্ষেই সেই নিয়ম করিয়াছিল—মেথর কাহারদের তো করে নাই। আমরা যদি উচ্চশ্রেণীভুক্তদের মান্য লই, উচ্চশ্রেণীর উচ্চ জীবনাদর্শটাও তো লওয়া চাই।

আমাদের প্রত্যেক জাতি শাখার ভিতর এইরূপ নিয়ম করিবার ক্ষমতা থাকায় সময়ের গতিতে প্রত্যেক জাতি শাখার অন্তর্ভুক্ত লোকদের কিরূপ করিলে তাহাদের সুবিধা হয়—কি আবশ্যক, তাহা পঞ্চায়ৎ প্রথা দ্বারায় নির্দ্ধারণ করিয়া এবং তৎকালীন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া সহজেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় ও সাময়িক আবশ্যকীয় নিয়মাদি পরিচালিত ও প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। এই জাতিগত পঞ্চায়ৎ প্রথা দ্বারা কিরূপ উপকার হয় তাহা নিম্নলিখিত প্রকৃত ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। আমাদের এক বিহারী কাহার চাকর ছিল। তাহার এক ভাই ও মা বর্ত্তমান ছিল এবং তাহার প্রথম পক্ষের মৃতা স্ত্রীর গর্ভজাত এক সাবালক পুত্র ছিল। সে পুনরায় এক সপুত্রা বিধবাকে বিবাহ করে। তাহার ভ্রাতা ও প্রথম পক্ষের পুত্র সকলেই পৃথক হয়—কেবল তাহার বৃদ্ধা মাতা তাহার সহিত একত্র রহিল। তাহার পর তাহার ঔরসজাত আর একটী পুত্র হয় ও তাহাদের রাখিয়া সে মরিয়া যায়। তাহাতে তাহার মাতা ও স্ত্রীর একান্ত দুর্দ্দশা হয় এবং তাহাদের

ব্যবস্থা করিবার জন্য এক পঞ্চায়ৎ হয়।—পঞ্চায়তের হুকুম হইল যে, তাহার ভ্রাতা তাহার মাকে প্রতিপালন করিবে এবং তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র তাহার বিমাতা ও তাহার গর্ভজাত দুই নাবালককে প্রতিপালন করিবে, যাবৎ সেই বিধবার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্রটি উপার্জ্জন-ক্ষম না হয়। এবং সেই হুকুম তাহারা আমাদের মতন শিক্ষিত হয় নাই বলিয়া মানিয়া লইল এবং তজ্জন্য-ই সেই বৃদ্ধা মাতা ও বিধবাটির অসীম দুর্দ্দশার মোচন হইল।

আমরা "শিক্ষিত" হইয়া আমাদের জাতিগত পঞ্চায়ৎ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছি, জাতীয় পদস্থ পণ্ডিত বয়োবৃদ্ধদিগকে সম্মান করি না—পাশ্চাত্য ভাবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধ্বজা তুলিয়া সামাজিক নিয়ম ভাঙ্গিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করি ; কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য আদর্শে নিয়মাবদ্ধ হইতে শিখি নাই। দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখাইতেছি কায়স্থ সভায় কন্যা বিবাহের পণ নিবারণের নিয়ম হইল—কিন্তু অল্প লোকেই তাহা পালন করিল। ইহার ফলে এই "শিক্ষিত" উচ্চ শ্রেণীগত ধনী কায়স্থ সমাজ দ্রুতবেগে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে দেখিতেছি। এই জাতিগত স্বাধীনতা থাকার ফলে-ই রাজশক্তির অতিবৃদ্ধি হইতে পায় নাই—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রাজশক্তির অত্যাচার সহ্য করিতে হয় নাই।

এই জাতি বিভাগ থাকায়—এক একটী মুখ্য জাতির বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন জীবনোপায় থাকায়—সকলে খাইতে পরিতে পাইত এবং এই বিভিন্ন জাতি শাখার অন্তর্গত লোকদের জীবনাদর্শ,—জীবনের আশা, চরিত্রের ধাঁজ প্রায় এক রূপ হইত। এক মুখ্য জাতির ভিতর কতকের যখন জীবিকা পৃথক হইত, জীবনাদর্শ যখন ভিন্ন হইত, কোন সামাজিক নিয়মে বিশেষ পার্থক্য উপস্থিত হইত, তখন তাহারা পৃথক শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইত ; যেমন দেখা যায় মাহিষ্য ও জেলে কৈবর্ত্ত ;—চাষী গোয়ালা (সদ্‌গোপ) ও দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালা। এবং তাহাদের ভিতর বিবাহও ক্রমে নিষিদ্ধ হয়। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর আমাদের পূর্ব্বকালের জীবনাদর্শের বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। বিলাতফেরৎ ব্রাহ্মণ কৌন্সিলি আর টুলো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের জীবনাদর্শের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখে যাইতেছে। তাহাদের পৃথক শ্রেণীভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং তাহাদের ভিতর বিবাহও বাঞ্ছনীয় নয়—তাহাতে বিবাহ সুখ ও শান্তিময় হওয়া দুর্ঘট হয়। নিজের বংশের প্রথা ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী (environment) হইতে আমাদের সকলেরই কিরূপ ব্যবহার অন্যের নিকট আমাদের প্রাপ্য, কিরূপ ব্যবহার তাহারা আমাদের নিকট প্রত্যাশা করিতে পারে, তাহার একটা অপরিস্ফুট অঙ্কপাত আমাদের হৃদয়ে হইয়া যায়। বিবাহ হইবার পর আমরা আমাদের স্ত্রী বা স্বামীর নিকট আমার নিজের সহিত বা অন্য সকলের সহিত সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি। যদি এইরূপ প্রত্যাশিত প্রাপ্য বা দেয় ব্যবহার সম্বন্ধে দুই জনের বিশেষ পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কলহ অবশ্যম্ভাবী হয়। বেশী বয়সে বিবাহ হইলে যখন আমাদের পরিবর্ত্তনশীলতা ও নমনীয়তা প্রকৃতির নিয়মে কমিয়া যায়, তখন সেইরূপ কলহ ভীষণ মূর্ত্তি ধরে এবং বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি নষ্ট করে। স্বামী স্ত্রী দুই জনের জীবনাদর্শ, জীবনের আশা, চরিত্রের ধাঁজ একরূপ হইলেই বিবাহিত জীবন সুখকর ও শান্তিময় হয়। বিভিন্ন জাতি শাখার ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায় জীবন প্রায় একরূপ হওয়ায় এক ধরণের জীবনাশা, জীবনাদর্শ একরূপ হওয়া প্রায় সর্ব্বত্র সম্ভব হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে—এই জাতি শাখার অন্তর্গত লোকেদের ভিতর আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা থাকায় সকলের অবস্থা ও চরিত্র বিদ্যা বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রায় সকলের জানাশোনা থাকিত। সুতরাং কাহাকেও অজ্ঞাত হইতে হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ হওয়ায় ও অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় যখন দুই জনেরই অপরের সহিত মিশিবার ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে—বিশেষতঃ কন্যাটি বয়স ১০, ১২ বৎসরের বেশী না হওয়ায় কন্যাটি স্বামী-গৃহে থাকিয়া সেই পরিবারভুক্তদের সহিত সম শিক্ষা, সম আশা, সম জীবনাদর্শ, সম চাল-চলন হইয়া তাহাদের সহিত একীভূত হইয়া যায়। এইরূপ হয় বলিয়াই বিখ্যাত উপন্যাস "অনাথ বালকে"র "জ্ঞানদা" অশেষ দৈন্যের কষ্ট স্বীকার করিয়াও শ্বশুরের ভিটা ও ভাসুর পুত্রকে ত্যাগ করিয়া ধনী পিতৃগৃহে যায় নাই এবং সেইরূপ মহিলা এখনও আমাদের দেশে সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন। তজ্জন্যই স্বামী-স্ত্রীতে ও পরিবারভুক্ত অন্যান্য লোকদের সহিত কলহ যতদূর সম্ভব নিবারিত হইত, বিবাহেও পরস্পরের প্রতি প্রীতি, ভালবাসা সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় উদ্দীপিত হইবার অবকাশ পাইত,

এবং তজ্জন্যই হিন্দুদের স্বামী স্ত্রীর ভিতর কোনও কালেই বিশেষ বিরোধ হয় নাই এবং বিবাহ বিচ্ছেদের আইনের আবশ্যকতা হয় নাই। দম্পতির ভিতর কলহ যতই হউক না কেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গানের' 'বুড়াবুড়ির' মতন তাহাদের একটা ভালবাসার টান থাকিয়া যাইত, যাহার নিমিত্ত তাহাদেরও একেবারে বিচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় হয় নাই। পাশ্চাত্যেও যখন একরূপ জাতি বিভাগ ছিল এবং তাহাদের ভিতর বিবাহ সচরাচর নিবদ্ধ ছিল (Clergy, noblemen and commoners) ও অল্প বয়সে বিবাহ হইত, তখন সেখানেও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন ছিল না। এখন যতই বিবাহ যথেচ্ছার হইতেছে, যতই বিবাহের বয়স বাড়িতেছে, ততই বিবাহ বিচ্ছেদ পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্র বাড়িতেছে। আমাদের দেশেও সংস্কারক সম্প্রদায়ের ভিতরও ইহার প্রকাশ হইয়াছে—সংক্রামক ব্যাধির মতন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। অজ্ঞাতকুলশীল, অজ্ঞাতপূর্ব্ব জীবন, অজ্ঞাত-চরিত্র—পরের চরিত্র বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে না থাকিলে জানা প্রায় অসম্ভব—কেবল রূপ, অর্থসচ্ছলতা বা অন্য কোন বাহ্যিক গুণের (যথা বিদ্যা বা অন্য কোনরূপ পারদর্শিতার) মোহে আকৃষ্ট হইয়া বেশী বয়সে বিবাহ করায় যে কত বিপদ কত দোষ এবং তাহা কত বেশী, তাহা পাশ্চাত্যের বহু উপন্যাসে বিবৃত আছে। এই জন্যই বোধ হয় মুসলমান-দিগের ভিতর স্বসম্পর্কীয় লোকদের ভিতর যথা খুড়তুত, মামাত, পিসতুত ইত্যাদি ভাই-বোনের ভিতর বিবাহ সচরাচর প্রচলিত। তরুণ-তরুণীরা আজকাল সকলেই রূপ বা ফরসা চামড়া চান—বিদ্যা বা অন্য কোনরূপ পারদর্শিতা বা কোন বাহ্যিক গুণ চান। রূপের মোহ অল্প দিন সম্ভোগেই কাটিয়া যায়—স্থায়ী হয় না। চরিত্র, জীবনাদর্শ, জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন হইলে বিবাহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রূপ বা উক্ত প্রকার বাহ্যিক গুণ বেশী দিন আকৃষ্ট রাখিতে পারে না ; বিবাহিত ও পরিবারিক জীবন অশান্তিময় হয়। তরুণ-তরুণীদের সে অভিজ্ঞতা লাভের সময় ও অবকাশ হয় নাই। বিবাহিত জীবন নূতন ধরণের ও অবিবাহিত জীবনের সহিত ইহার যে অনেক পার্থক্য আছে, তাহার দুঃখ অন্য প্রকারের—কিছুকাল বিবাহিত না হইলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রায় দুঃসাধ্য। সুতরাং বিবাহিত জীবনের সুখ দুঃখ কিসে নির্ভর করে তাহা তাঁহারা ভাল জানেন না। সুতরাং বয়োবৃদ্ধরা যাহারা সে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহাদের কথা শুনা উচিত। তরুণ-তরুণীরা (অনেক বৃদ্ধরাও) পাশ্চাত্যের মোহে অন্ধ। পাশ্চাত্য অনেক বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা উন্নত, অনেক বিষয়ে সফলকাম (Successful) ; সুতরাং তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং দেশীয় বৃদ্ধদের কথা অবজ্ঞা করেন। পাশ্চাত্য যাহা করে তাহাই শ্রেষ্ঠ, ইহাই তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে। কিন্তু পরিবারিক জীবনের—বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি স্থাপন বিষয়ে পাশ্চাত্য যে সম্পূর্ণ বিফলকাম (unsuccessful) তাহা তাঁহাদের দেখিবার অবকাশ হয় নাই—উত্তরোত্তর বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি তাহার যে প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা তাঁহারা ভাবেন নাই। সুতরাং বিধবা বিবাহ বিষয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা যে বিফলতারই অনুকরণে করা হইতেছে এবং তাহার ফলে আমরাও বিফলকাম হইতে বাধ্য তাহা তাঁহারা দেখেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এইরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ও প্রগতির (progress) চিহ্ন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে মঙ্গলকর, তাহাদের স্বত্বাধিকার বৃদ্ধির চিহ্ন এইরূপ বলিতে শুনা যায়। এইরূপ বিবাহ বিচ্ছেদে এইরূপ গৃহ ভগ্ন হওয়ায় ভালবাসাপ্রবণ স্ত্রীলোকেরাই অধিক মর্ম্মাহত হয়! পাশ্চাত্যে তাহারা নিজেরাই পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছিল—সেই অভীপ্সিত স্থানে বিবাহিত হইয়া তাহারা তৎকালে কত সুখের আশা করিয়াছিল—কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিল—তাহার সেই সকল আশা ভগ্ন, সেই সকল স্বপ্নের পরিবর্ত্তে অহরহঃ কলহ প্রবঞ্চনা—পরিত্যাগ,—কত মর্ম্মন্তুদ তাহা দেখেন না। তাহার উপর যদি অপত্য থাকে তাহা হইলে তাহার পিতামাতা একজনের অভাবে তাহাদের অবশ্যম্ভাবী কষ্টও তাহাদিগকে অনুক্ষণই অধিকতর পীড়া দেয়। ইহা যে—

সুখের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সায়রে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল ॥

তাহা বুঝেন না। এ গৃহ-দাহের পর হৃদয়ের ক্ষত গোপন করিয়া তাহাদিগকে আবার নূতন করিয়া মনের মানুষ খুঁজিতে হইবে—আবার নূতন করিয়া গৃহ বাঁধিবার চেষ্টা করিতে হইবে—ইহা যদি প্রগতির চিহ্ন হয়—তাহা হইলে দুর্গতির চিহ্ন কি তাহা তো বোঝা যায় না। ইহা যদি তাহাদের স্বত্বাধিকারের প্রসার হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের স্ত্রী

লোকেরা যেন চিরকালই এরূপ হৃদয়ঘাতী স্বত্বাধিকার লাভ হইতে বঞ্চিত থাকে। প্রাচ্যেই সভ্যতার বিকাশ হয়। তাহারা বহুকালের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছে যে,বেশী বয়সে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলে—যত্রতত্র বিবাহ করিলে তাহা ক্ষণিকের মোহের বশেই হয়। তাহাতে বিবাহিত জীবন সচরাচর সুখকর হয় না। সেই জন্য আমাদের দেশে বহু প্রাচীন বৈদিক যুগে এইরূপ বিবাহের যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা পরিত্যক্ত হইয়া অল্প বয়সে বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে যে মুষ্টিমেয় লোক পাশ্চাত্যের অনুকরণে জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের ভিতর অনেকেরই পারিবারিক জীবন সুখকর হয় নাই, বিশেষভাবে অনুসন্ধানে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে। তাঁহাদের ভিতর ইতিমধ্যেই যত বিবাহ-বিচ্ছেদ মকদ্দমা হইয়াছে ও হইবার সূত্রপাত হইয়া আছে, তাহাও পাশ্চাত্য অনুকরণের বিফলতা প্রমাণ করিতেছে। বিবাহিত জীবনের বিশেষ বিরোধ কিরূপ মর্ম্মঘাতী, তাহাতে জীবন কিরূপ বিষময় করে, পাশ্চাত্যে তাহা কত বেশী—স্বামী-স্ত্রীতে ভালবাসা সহানুভূতি আমাদের জীবনের সুখের যে প্রধান উপকরণ এবং তাহার তুলনায় অর্থ-সচ্ছলতা কত অকিঞ্চিৎকর এবং অর্থসচ্ছলতা পাইবার আশায় তাহার বিনিময় কত ভুল—তরুণ-তরুণীরা বোধ হয় জীবনের শেষ অংশের সুখ দুঃখের বিষয়ে জ্ঞানাভাবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। জীবনের প্রায় সকলের ভোগ্য অবশ্যম্ভাবী অপ্রত্যাশিত শোক দুঃখ দৈন্য কষ্ট আশাভঙ্গ, আকাঙ্ক্ষার বিফলতা, স্বাস্থ্য-হানি যখন আসে, তখন পারিবারিক জীবনের পরস্পরের সহানুভূতি ভালবাসা, যত্ন, সেবা ইত্যাদি তাহা অনেকাংশে অপনোদন করিতে সমর্থ। অর্থসচ্ছলতা প্রভৃতির উপর জীবনের সুখ ও শান্তি কত অল্প নির্ভর করে তাহা তাহাদের পক্ষে বুঝা প্রায় দুঃসাধ্য। যৌবনে এ সকল অবশ্যভোগ্য দুঃখ অনেককেই ভোগ করিতে হয় না। তখন ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে—ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগেচ্ছা প্রবল থাকে। অর্থ দ্বারা তাহা প্রভূত পরিমাণে পূরণ হয় বলিয়া আমরা তখন অর্থ সচ্ছলতার জন্য অধিক মাত্রায় ব্যগ্র হই। কিন্তু যখন অর্থের ঐকান্তিক অভাব মিটিয়া যায় এবং অবশ্যম্ভাবী শোক দুঃখ কষ্ট ব্যাধি সকল আসে তখনই বুঝা যায় জীবনের প্রকৃত শান্তি দিবার ক্ষমতা অর্থসচ্ছলতার কত কম এবং বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের পরস্পরের ঐকান্তিক সহানুভূতি ভালবাসা যত্নের মূল্য কত বেশী ; এবং ঐরূপ ভালবাসা সহানুভূতি যত্ন পাইবার সম্ভাবনা যাহাতে কমিয়া যায় তাহা করা (যেমন অর্থ বা রূপ বা অন্য কোন বাহ্যিক গুণের মোহে বেশী বয়সে বিবাহ করা) কত আহাম্মকী। ভালবাসা বিকাশের—দুই জনের একীভূত হইয়া যাওয়ার প্রশস্ত সময় প্রথম যৌবন। তাহা কাটিয়া গেলে অজ্ঞাতকুলশীল, অজ্ঞাতপূর্ব্বচরিত্র—যাহাদের জীবনেব আদর্শ ও আশা ভিন্ন প্রকারের--তাহাদের ভিতর বিবাহ হইলে সেইরূপ ভালবাসা সহানুভূতি পাইবার আশা—জীবনের প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাইবার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায় এবং জাতিগত বিবাহ প্রচলিত থাকিলে তাহার সম্ভাবনা বেশী থাকে। ইহা জাতি বিভাগের অন্যতম সুফল ও ইহাতে তাহার আবশ্যকতা প্রমাণিত হইতেছে। যেখানে বংশগত জাতিবিভাগ নাই, সেখানে প্রায় সর্ব্বত্র অর্থই শ্রেণী-বিভাগ করে- এবং আর্থিক অবস্থায় সমভাবাপন্নরাই একত্র মেলা-মেশা করেন এবং তাহাদেরই ভিতর সচরাচর বিবাহ হয়। যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ, তাহাদের সহিত তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। গরীবরা তাঁহাদের সহিত মিশিবার অবকাশ পান না—সহানুভূতি বিকাশেরও অবকাশ হয় না। তাহাদের সুখ দুঃখ ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না ও গরীবরা তাঁহাদের সাহায্য পায় না—তাহাতে গরীবরা অবস্থার উন্নতি করিবার সুবিধা পায় না ; এবং একবার ভাগ্য বিপর্য্যয়ে অবস্থা মন্দ হইলে উত্তরোত্তর দ্রুততর বেগে দৈন্যের শেষ সীমায় নীত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সমাজে অর্থেরই প্রাধান্য হয় ; অর্থ-সচ্ছলতার উপর সমাজে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সুবিধা প্রধানতঃ নির্ভর করে। তজ্জন্য অর্থসচ্ছলতা পাইবার জন্য লোকে অত্যন্ত লোলুপ হওয়া, অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি প্রকট ভাব ধারণ করে এবং সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহ হয়—সমজীবনাদর্শ, চরিত্রের আকর্ষণ কমিয়া যায়। তজ্জন্যও আবার বিবাহটা সুখ ও শান্তিময় হয় না।

আমাদের জাতিভেদ প্রথার দ্বারা জাতিগত ও গ্রাম্য-পঞ্চায়ৎ দ্বারা সামাজিক শাসন সহজেই সুসম্পন্ন হইত। কোন জাতিভুক্ত কোন লোক বিশেষ দুষ্কর্ম্ম করিলে, সেই জাতির পক্ষে বা হিন্দু সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর কোন কার্য্য করিলে, সেই জাতিগত পঞ্চায়ৎ বা গ্রামের পঞ্চায়ৎ

দ্বারা অতি সহজে তাহাকে শাসন করা যাইতে পারিত। তন্নিমিত্ত যতদিন আমাদের ভিতর মনুষ্যত্ব ছিল (মনুষ্যত্বের লোপ হইয়াছে বলিয়াই শরৎ বাবুর পল্লীসমাজের বর্ণিত গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ কীর্ত্তি সম্ভব হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরীর মতন নেতা থাকিলে ফল ঠিক উল্টা হয়), ততদিন লোকেরা এরূপ অধার্ম্মিক হইতে পারে নাই। তাহাদেরই হুকুম মত দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত—দুস্থ আত্মীয়দের প্রতিপালন করিতে হইত; কেহ বিশেষ কোন অন্যায় কার্য্য করিতে পারিত না। অন্যায়ের প্রতিকার করিতে বহুব্যয়সাধ্য ও গরীবের পক্ষে অসাধ্য আইন আদালতের আশ্রয় লইতে হইত না ও সেখানে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। এই সকল শাসন হইত তাহার সহিত আহার ব্যবহার বিবাহাদি বন্ধ করিয়া—তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া—এ কালের কথায় তাহাকে boycott করিয়া—তাহার সহিত অসহযোগনীতি অবলম্বন করিয়া। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-নীতি দেশের সাধারণ অশিক্ষিত লোকেরাও এত সহজে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কারণ—এই অসহযোগ প্রথাই ভারতবর্ষের উদ্ভাবিত সকল অত্যাচার নিবারণের বহুকাল ও বহুস্থলে পরীক্ষিত আশু ফলপ্রদ খাঁটি স্বদেশী উপায়। পাশ্চাত্য অনুকরণে meeting করা, resolution পাশ করা, petition করা—এ সকলের উপকারিতা আমাদের সাধারণ লোকেরা বুঝে না। তাহাদের শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর—তাহারা বক্তৃতাও বুঝে না—সভাতেও যায় না। ইহাতে যে কি করিয়া উপকার হইবে তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গমই করিতে পারে না। এ সকল উপায়ে আমাদের দেশে বিশেষ কিছু উপকার হইবারও কোন কালে সম্ভাবনা নাই—বিশেষতঃ যখন রাজপুরুষরা মনে করিলেই এই সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দিতে পারে। বঙ্গব্যবচ্ছেদকালীন বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলনে মহাত্মা ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁহার মহান্ চরিত্র বলে যখন জাতিভেদ প্রথায় সুসাধ্য ধোপা নাপিত ইত্যাদি বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন, তখন রাজপুরুষদের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বরিশাল ও অন্যান্য বাজারে বিলাতী কাপড় ও লবণ বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। এখনও যদি অসহযোগনীতি অধিক মাত্রায় অবলম্বন করিতে হয়, তবে এই জাতিভেদ প্রথায় সাহায্য লইলে তাহা সহজে সুসাধ্য হইতে পারে। মেথর ধাঙ্গড় প্রভৃতি যাহাদের জীবিকা বংশগতই আছে এবং যাহারা পুরাতন পঞ্চায়ৎ প্রথা মানে, তাহারা ধর্ম্মঘট করিলে লাট-সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত সকলকেই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়; সকল কাজ ছাড়িয়া কর্ত্তারা তাহাদের কথা শুনিতে বাধ্য হন। আইন-কানুন সব ভাসিয়া যায়—'It must come through proper channel' 'the matter is being investigated or will be referred to a committee' প্রভৃতি বাঁধা গৎ সকল আর খাটে না। জজ ম্যাজিষ্ট্রেটরাও তাহাদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। আর আমাদের সমস্ত দেশের গণ্য-মান্য লোকদের কথা—Congress এর কথা অগ্রাহ্য হয়—ইহা হইতেও কি আমাদের চৈতন্য উদয় হয় না? এই জাতিভেদপ্রথা সমাজ-শক্তি প্রকাশের কিরূপ সহায়ক—লোকদের দুষ্প্রবৃত্তিগুলি ইহা কিরূপে দমনে রাখিতে পারে—দারিদ্র্যমোচনের কিরূপ সহায়তা করে—রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ইহার উপকারিতা কত এবং সম্যক পরিচালিত হইলে ইহার দ্বারা আরও কত শুভফল পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও কি আমরা দেখিবও না, ভাবিবও না? কেবল বলিয়া যাইব—জাতিভেদ প্রথা না ভাঙ্গিলে আমাদের মুক্তি নাই? আমরা মুখে যাহাই বলি না কেন, যেমন কোন জিনিসে "made in England" বা 'made in Germany' বা 'made in U. S. A' ছাপ না থাকিলে তাহা ভাল নয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, তেমনই কোন সামাজিক প্রথা পাশ্চাত্যের অনুমোদিত হয় নাই জানিলেই তাহা ভাল হইতে পারে না—এই সংস্কারটি আমাদের মনের অন্তঃস্থলে সুপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু যেমন এখনও বারাণসী কাপড় প্রস্তুত করিবার বাঁশ ইট ও দড়িতে নির্ম্মিত স্বল্পব্যয়সাধ্য দেশী তাঁত বিলাতী বহুব্যয়সাধ্য dobby loom অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, এবং তাহার দ্বারা যে উচ্চ অঙ্গের কারুকার্য্যখচিত কাপড় প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা এখনও dobby loomএ হইতে পারে না; তেমনই আমাদের সমাজ-সংহতি বিলাতী আদর্শে গঠিত সমাজসংহতি অপেক্ষা জনসাধারণের হিতসাধন পক্ষে অনেক বেশী উপকারী—তাহা আমাদের কি সমাজ-সংস্কারকেরা কি রাজনীতি অনুশীলনকারীরা দেখেন না। আমাদের সমাজযন্ত্র কতক মেরামৎ করিয়া লইলে যত উৎকৃষ্ট ফল দিতে পারে, তাহা বিলাত হইতে বহু ব্যয়ে আমদানী করা যন্ত্রে সম্ভবে না—তাহা আনিবার শক্তিও যে আমাদের নাই, তাহা আমরা দেখি না।

জীবন সুখ ও শান্তিময় করিবার ক্ষমতা জাতি-বিভাগের আছে বলিয়াই আমরা ভারত ইতিহাসে দেখিতে পাই বৌদ্ধ-যুগে একবার জাতি-বিভাগ-প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল এবং এই জাতি-বিভাগ প্রথা থাকা এবং না থাকায় কি সুবিধা, কি অসুবিধা, তাহা দেখিয়া আবার ভারতে জাতিভেদ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই জন্যই দেখিতে পাই যে কবীর চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষরা জাতিভেদ-প্রথা না মানা সত্ত্বেও, তাহার বিপক্ষে অনেক কথা বলা সত্ত্বেও, তাঁহাদের মতাবলম্বীরা জাতিভেদ মানিয়া আসিয়াছে এবং এখনও দেশীয় খৃষ্টানেরা—তাহারা যখন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তখন যে জাতিভুক্ত ছিল, সেই জাতির ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ রাখিতে বিশেষ উৎসুক দেখা যায়। জাতি-বিভাগের দ্বারা জীবনের সুখ ও শান্তির পথ প্রশস্ত হয় বলিয়াই ইহার আবশ্যকতা আছে—এবং তজ্জন্যই ইহা এতকাল রহিয়াছে। ইহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা (Cultural inheritance)। যখন জাতিভেদ-প্রথায় বহুকাল সময়োপযোগী পরিবর্ত্তনাভাবে বহু দোষ আসে—যখন ইহার মূলতত্ত্ব (principle) ও সামাজিক উদ্দেশ্য ও কার্য্য (object and function) বিস্মৃত হওয়ায় ইহা কঠিন ও কঠোর প্রতিষ্ঠানে পর্য্যবসিত হয়—যখন উচ্চশ্রেণীর লোকেরা তাহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য সকল না করিয়া বা করিতে অপারগ হইয়াও তাহার মান, প্রতিপত্তি বা লাভ পাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন—অন্যান্য জাতি-ভুক্ত-দিগকে অবজ্ঞা করেন—তখনই ইহার সামাজিক উদ্দেশ্য ও কার্য্য স্মরণ রাখিয়া সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এখন পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হইয়াছে; কিন্তু ইহা সমূলে উৎপাটন করিলে আমাদের কোন সুবিধা হইবে না; বরং আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তই হইব। মুসলমানদের তো জাতিবিভাগ নাই; অথচ তাহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা মন্দ, তাহা দেখিতে হইবে। রাজপুরুষদের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ফিরিঙ্গিদের ভয়ানক দুর্দ্দশা হইয়াছে—তাহাদেরও তো জাতিবিভাগ নাই, তাহাও দেখিতে হইবে। মুসলমানেরাই দেশের রাজা ছিল। তাহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। অথচ এই দেড়শত বৎসরের ভিতর তাহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা অনেক হীন হইয়াছে। আমাদের সমাজ সংস্কারকেরা আজ পঞ্চাশ বৎসরের উপর আমাদের সমাজের তিনটী দোষের কথা বলিয়া আসিতেছেন—জাতিবিভাগ, বাল্য-বিবাহ ও বিধবা বিবাহ নিষেধ; এবং এই তিনটি উঠিয়া গেলেই আমাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে বলেন। কিন্তু মুসলমানদের সে সকল দোষ না থাকা সত্ত্বেও যে তাহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক দ্রুতবেগে অবনতির পথে চলিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখেন না। ব্রহ্মদেশে এই তিনটি দোষের একটিও নাই—সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রায় সকলেই পায়। অথচ তাহাদের অবস্থা এই ৪০ বৎসরের ভিতর অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। তাহাদের শিশু-মৃত্যুর হার আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। মুসলমানদের শিশু-মৃত্যুর হার আমাদের অপেক্ষা বেশী বই কম নয়। ইহা দেখিয়া তাঁহারা কিসে এইরূপ আশা করেন তাহা বুঝা যায় না। আমাদের জাতিবিভাগ আমাদের যৌথ পরিবার-প্রথা যে আমাদের পরাধীনতার নিমিত্ত অবনতির গতি অনেক পরিমাণে রোধ করিতেছে, মুসলমান আমলেও করিয়া আসিয়াছে—দারিদ্র্য-সমস্যা-পূরণের যে প্রধান সহায়ক, তাহা তাঁহারা দেখেন না। বাল্যবিবাহ না থাকিলে জাতি-বিভাগ ও যৌথ পরিবার-প্রথা থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহারও আবশ্যকতা আছে—ইহাতে কোনরূপেই স্বাস্থ্য হানি হয় না, তাহা আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

৩২

এই যে দ্বিতীয় হপ্তার তিনটী দিন, এ দিন কয়টীও স্বর্ণলতার যেন স্বপ্নের মতই সুখ সম্ভোগে কাটিয়া গেল। সে যদি প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তার স্বামীর সহিত আগত মিলনের ভবিষ্য স্বপ্নে অতটাই না বিভোর হইয়া থাকিত, তো আরতির মধ্যে যে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল, তাহার অস্পষ্ট আভাষ মাত্রই নয়, সুস্পষ্টরূপেই তাহা ধরিতে পারিয়া বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইত; কিন্তু সে অবসর তার তখন ছিলনা; সলিল তার চুলের উপর কেমন করিয়া আঙ্গুল দিয়া খেলা করিতেছিল, তার জন্য কত বড় ফুলের তোড়া কিনিয়া আনিয়াছে; তার চুম্বনে আর যেন সেই আগের মত অনাগ্রহ শিথিলতা দেখা যায় না! এবার যে দিন সে আসিবে, স্বর্ণলতা কি রঙ্গের সাড়ী পরিবে? কাণে কোন্ দুলটী তাকে বেশি মানায়? মালতী তাকে যেমন সাজায়, তার ভাল দিনেও তাকে এর চেয়ে বেশি ভাল কেহ সাজাইতে পারে নাই!

স্বামীর সহিত বিচ্ছেদে সে যে স্বামীপ্রেম ফিরিয়া পাইতেছে এই সুখেই সে অধিকতর তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিল। "তা হলে স্বামী তাকে ভালই বাসে? একসঙ্গে সর্ব্বদা থাকিলে অতটা বোঝা যায় না; এই জন্তেই গানে বলিয়াছে 'বিরহে বাড়ালো প্রেম'!—হ্যাঁ এ বেশ বোঝা যাইতেছে!"—

আরতি এ কয়দিনই চেষ্টা করিয়া করিয়া সলিলের দৃষ্টি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। পাছে সে যতক্ষণ তার স্ত্রীর কাছে থাকে, তার মধ্যে তাকে কোন দরকার পড়ে, তাই সে সকাল হইতে পরপর সমস্ত কর্ত্তব্যগুলি একমন হইয়া সম্পন্ন করিয়া রাখিয়া দিত। স্বর্ণলতার ঔষধ পথ্য, মসলার কোটা, সেন্টের শিশি, স্মেলিং সল্ট, যে কিছু তার হঠাৎ দরকার হইতে পারে, সমস্তই হাতের কাছে দিয়া, ঝিকে কাছাকাছি রাখিয়া সে আসিয়া তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিত। জানালা দিয়া যখন সলিলের মোটর চলিয়া যাওয়ার শব্দ আসিত, তার পর সে তার বিশৃঙ্খল চিন্তা ভারকে সংযত করিয়া লইয়া অবসন্ন মন-প্রাণকে চেতাইয়া লইয়া কর্ত্তব্যের ভার বহিতে বাহির হইয়া আসিত। স্বর্ণলতা তার সুখভরা মনে মন খুলিয়া তার স্বামীর কথা অনর্গলই বলিয়া যাইতে থাকিত,—সে নীরব, নিস্পন্দ থাকিয়া কিছু শুনিত, কিছু বা শুনিত না। অনেক সময় শুনিতে শুনিতে তার বুকটা যেন পাথর চাপানর মতন ভারী হইয়া উঠিতে থাকিত। তার দিক হইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সাড়া না থাকিলে হঠাৎ এক সময় সংযত হইয়া উঠিয়া স্বর্ণলতা তাহাকে অনুযোগ করিত, "ও কি ভাই মালতী! তুমি কিছু শুনচো না,—তুমি ঘুমোচ্চ!"

আরতি চট্‌কভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সচমকে উত্তর করিত, "কই না, এই তো শুনচি!" তার পর হয় ত ঈষৎ টানিয়া আনা হাসির সহিত ফিরিয়া অনুযোগ করিত।

"দেখচেন তো, উনি আপনাকে ভালবাসেন কি না?—আপনি বলতেন, ভালবাসেন না।"

স্বর্ণ আহ্লাদে গলিয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উত্তর দিত, "তখন সত্যিই বাসতেন না, এখন বাসচেন ভাই!"

তৃতীয় হপ্তায় সলিলের প্রতি প্রত্যহ তার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের আদেশ হইল; কিন্তু সে সাক্ষাতের অবসর-কালকে তিনি ঘড়ির হিসাবে আরও একটু খর্ব্ব করিয়া দিলেন। কোন দিন প্রাতে, কোন দিন অপরাহ্ণে আধঘণ্টা কাল সলিল তার স্ত্রীর কাছে থাকিতে পারিবে, এইরূপই ব্যবস্থা হইল।

স্বর্ণ বলিল, "দেখ দেখি ডাক্তার সেনের অন্যায়! উনি বুঝি বিয়ে করেন নি?"

আরতি চুপ করিয়া রহিল। তখন স্বর্ণ সখেদে কহিয়া উঠিল—"হায় রে! কার কাছেই বা বল্‌চি! উনিও তো এক আইবুড়ী! আচ্ছা ভাই মালতী দিদি! তুমি কি কক্ষনোই বিয়ে করবে না?"

আরতি মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, না—

স্বর্ণ কহিল, "কেন ভাই? বিয়ে করা কি মন্দ? আচ্ছা ওঁর মতন সুন্দর দেখতে যদি তোমার বরটী হয়, তাহলেও কি তুমি বিয়ে করো না? অবশ্য আমারটীর কথা বলচি না, ওই রকম আর একটী?"

আরতির সমস্ত চোখ-মুখ এ কথায় অস্বাভাবিক রূপেই আরক্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে হইল, তার উত্তপ্ত শোণিত স্রোত যাহা সবেগে তার মুখের উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে, হয় ত, এখনই তাহা তার উপরকার আবরণ বিদীর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইয়া পড়িবে! কষ্টে সে আত্মদমন চেষ্টা করিতে করিতে তার প্রকৃতি-বহির্ভূত রূঢ় কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল "না, তাহলেও করি না,—কিছুতেই করি না,—কিছুতেই নয়!"

স্বর্ণলতা তার উত্তেজনার অর্থ বোধই করিতে পারিল না। সে অবিশ্বাসে মৃদু মৃদু হাসিয়া শুধু প্রতিবাদ করিল, "হুঁ গো! অমনটী পেলে কি না ছেড়ে দাও—"

আরতির উত্যক্ত অপমানিত চিত্ত এক মুহূর্ত্তের জন্য অসহ্য উত্তাপে তাতিয়া উঠিয়া প্রবলভাবে বিদ্রোহ করিয়া উঠিতে গেল। এক নিমেষের জন্য তার ব্যথা বিপর্য্যস্ত অন্তরাত্মা উদ্দাম আর্ত্তনাদে চীৎকার করিয়া বলিতে চাহিল, 'ওগো সুন্দরী! ওগো স্বামী-গরবিণী! আজ কার প্রসাদে, কার দয়ার দানে ঐ স্বামীকে তুমি পেয়েছ তা' কি জানো? আমি তাকে তোমার হ'তে দিয়েছি বলেই আজ সে তোমার।'

কিন্তু, না—না···না, একদিন যাহা গর্ব্বভরে সে হেলায় ফেলিয়া গিয়াছে, আজ তাহারই জন্য এ কাঙ্গালপনা দেখান, এ গায়ের জ্বালা ধরা—এ তার সাজে না। সে প্রাণপণে আত্ম-সম্বরণ করিয়া আপনাকে স্তব্ধ স্থির রাখিল।

স্বর্ণর ইহা ভাল লাগিল না। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা মালতী! তোমার সে হাসিখুসী গল্পসল্প গেল কোথায়? তুমি ভাই, আজকাল বড্ড মন ভার ভার করে থাক। কেন ভাই কি করেছি? বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত ওই রকম মন ভার ভার দেখে দেখে আমার হাড় অবধি জ্বলে আছে, আর ভাই ও দেখতে আমার রুচি নেই।"

একটুখানি থামিয়া থাকিয়া আবার বলিল,—"আগে ত তুমি অমন ছিলে না, এ বাড়ীর বাতাস লাগলো না কি?"

আরতি একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "হবেও বা"—তার পর বলিল "শরীরটা তেমন ভাল নেই মিসেস্ গুপ্ত!"

স্বর্ণলতা ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল "কেন ভাই! কি হয়েছে?"

আরতি একটু ইতস্ততঃ করিল, "এই মাথাটা প্রায়ই ধরে—"

স্বর্ণ কহিল, "ও মা! তা একদিনও তো কই বলো নি! এস মাথায় একটু অডিকলোন দিয়ে দিই, স্মেলিং সল্টটা নিয়ে শোঁক দেখি, বড্ড শীগ্‌গির কমে যায়—"

আরতি ক্ষীণভাবে প্রতিবাদ করিতে গেল,—"না—না, ও সব কি হবে!—"

"আহা, দেখই না একটু—তুমি বড় অবাধ্য মালতী! আমি দেখ তোমার কত কথা শুনি, এমন কিন্তু আর কারও কখন শুনতুম না—"

আরতি উঠিয়া তার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া স্মেলিং সল্ট শোঁকার অভিনয় করিল! তার দু'চোখ দিয়া তখন অসম্বরণীয় অশ্রুজলের ধারা দরদর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

সলিল সকালে স্ত্রীকে দেখিতে আসিয়াছিল, তখন মনে পড়ে নাই, এ বেলায় একটা দরকারী জিনিষের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে আবারও আসিতে হইল। ড্রাইভার উপস্থিত ছিল না, ট্রামে করিয়া আসিয়াই রাস্তায় নামিয়া একটু পায়ে হাঁটিয়া সে বাড়ী ঢুকিল। লোকজন কেহ কোথাও নাই। সে একেবারে তার নিজের ঘরে—যেখানে তার দরকার সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। এ ক'দিন এ ঘরটা সে বন্ধ থাকিতে দেখে,—আজ দরজা খোলাই ছিল। এ ঘরে যে কেহ বাস করে, তাও সে জানিত না—দ্বিধাহীন চিত্তেই ঘরে ঢুকিয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া সলিল দেখিল, দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া একটা ছোট ডেস্কের কাছে বসিয়া একজন স্ত্রীলোক একটা কাগজে কি লিখিতেছে। বাহিরের আলোকের একটা ঝলক খোলা দরজা দিয়া তার মাথার উপর আসিয়া পড়িয়া তার কালো ও ঈষৎ তরঙ্গায়িত চুলের মধ্যে সোনার ছটা বিস্তার করিয়া দিয়াছিল। তার গলাখোলা জামার উপরকার একটু-খানি ফাঁক দিয়া তার নিটোল স্কন্ধের উপর খুব সরু এক ন'র

সোনার হারের সামান্য অংশ সেই আলোতে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছিল। তার এলো খোঁপার দু'পাশ দিয়া ছোট ছোট সুগঠিত দুটী অলঙ্কারশূন্য কাণের আকার দৃষ্ট হইতেছিল। সলিল দরজার কাছেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তার পা যেন হঠাৎ সেইখানেই আটকাইয়া গেল। তার বোধ হইল,—মুখ না দেখিয়াই তার সন্দেহ হইল, একে যে চেনে,—খুব যেন তার পরিচিত ঐ চুল, কাণ এবং ঘাড়ের ঐ খোলা অংশটুকু।

তার গলা দিয়া হয় ত একটুখানি বিস্ময় ধ্বনি, নয় ত আর কোন রকম কিছুর শব্দে লেখায় নিবিষ্ট-চিত্ত মেয়েটা ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত মুখ ফিরাইল। তার সামনে দ্বারের দিকে সলিলকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কলম ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সলিলের দিকে সসম্ভ্রমে বারেক চাহিয়া নমস্কার করিল।

তখন সলিল দেখিল, হাঁ্যা—সে আরতিই বটে!

আরতিকে এত সুন্দর সে যেন আর কখন দেখে নাই। তার পূর্ণ সুখ ও গৌরবোজ্জ্বল প্রথম পরিচয়ের দিনেও যেন নয়। আত্মসংযত, ত্যাগনিষ্ঠ দুঃখদাহনির্ম্মল নিষ্কলুষ স্বর্ণখণ্ডের মতই তাহাকে যেন পবিত্র ও উজ্জ্বলতর দেখাইতেছিল। সলিলের বুকের মধ্যে একসঙ্গে সহস্র প্রশ্ন যেন বর্ষণোন্মত বর্ষাধারার মতই উদ্যত হইয়া উঠিল। তার সমস্ত অন্তরাকাশ ভরিয়া যেন একটা গভীর আনন্দ, প্রগাঢ় অভিমান, এবং তার সঙ্গে সমান ওজনে মাপিয়া তার প্রতি তার চিরসঞ্চিত অগাধ ভালবাসা একত্র হইয়া জাগিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া আরতির হাত নিজের এই আগ্রহ-স্পন্দিত দুই হাতে দৃঢ় বলে চাপিয়া ধরিয়া অন্তরের সমুদায় আবেগ ঢালিয়া দিয়া উচ্চকণ্ঠে এখনই ডাকিয়া উঠে "আরতি! আরতি।"—

আরতির দুই নিথর চরণের উপর আপনাকে আছড়াইয়া দিয়া তার অকাল-ভগ্ন হৃদয়ের বিষাদ-বেদনা-হতাশায় ফাটিয়া-পড়া আর্ত্ত রবে—'নিষ্ঠুর! এই তোমার কৃতজ্ঞতা?' অন্ততঃ এই কথাটাও বলিয়া উঠিয়া তার অন্তরের হাহাকারকে কথঞ্চিৎ লাঘব করিয়া লইবার জন্য তার নিজের মধ্যে একটা বিপুল বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ফলে সে কিছুই করিল না। শুধু প্রাণপণ বলে আত্ম-সংযত হইবার জন্যই আপনার সহিত আপনিই যুদ্ধ করিতে লাগিল। আরতিকে না পরিচিতের না অপরিচিতের কোন সম্ভাষণই সে জানাইতে পারিল না।

এ বিস্ময়ের তরঙ্গ আরতির দিকে ছিল না। সে মনে মনে জানিত,—একদিন না একদিন এ দিন তার আসিবেই। তাই সে শান্ত সংযত ভাবে এক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে একটা পাশের দরজা দিয়া চলিয়া গেল। আর সলিল ভূতাহত আড়ষ্ট হইয়া বহু বহুক্ষণ সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া থাকিয়া, যখন পারিল স্খলিত শ্লথ পদে নীচে নামিয়া একেবারে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া আসিল। তার ধরণে বোধ হইল, সে যেন ভুল করিয়া নিজের বাড়ী বোধে অন্যের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন ভয় পাইয়া পলাইতেছে।

৩৩

এর পর তিন দিন কাটিয়া গেল, সলিল আসিল না। অনেক করিয়া প্রত্যহ স্বামী দর্শনের যে অনুমতি স্বর্ণলতা ডাক্তারের কাছে আদায় করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা হইয়া গেল। দিন রাত প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া শেষকালে স্বর্ণলতা কাঁদিয়া কাটিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। আরতি তাহাকে বুঝাইতে পারে না,—সে খাওয়া ছাড়িয়া দিল, ঘুম তার বন্ধ হইয়া গেল। যখন তখন কেবল বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া মোটরের শব্দের জন্য কাণ পাতিয়া থাকে, আবার নূতন করিয়া আর একবার কাঁদিতে বসে। আরতির সকল বিদ্যাই এইবার শেষ হইয়া গেল। তা'ছাড়া, তার নিজের শক্তির সঞ্চয়েও যে টান ধরিয়াছিল—সে ত জানিত, সলিল কিসের জন্য স্ত্রীর কাছে আসা বন্ধ করিয়াছে। সে আর একবার তার মুক্তির জন্য ডাক্তারের সহিত তর্ক তুলিল। তিনি তার আবেদন কিছুতেই মঞ্জুর করিলেন না, বলিলেন, তোমার একটা মিথ্যা খেয়ালের দায়ে আমি আর একটা জীবন নষ্ট হতে দিতে পারি না। মিসেস গুপ্ত এই তিন হপ্তায় দু'সের ওজনে বেড়েছেন। এর আগে ওঁর রোগের হোল হিষ্ট্রীতে ও-রকম ঘটনা ঘটেনি।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনিচ্ছুক বিরক্তিভরে আরতি তার নিত্যকার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু যত্ন সে সমানই করিতে থাকিলেও ফল আর সমান ফলানো সম্ভব হইল না। যে আগ্রহ এবং আনন্দ লইয়া সে এই মৃত্যুমুখী তরুণীর সেবার

ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সে আজ আর তার মধ্যে নাই। এর আরোগ্য সে কায়-মনে কামনা করে, কিন্তু এই গৃহ, এই পারিপার্শ্বিকতা তার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল এবং ক্রমশই সে যেন এখানে থাকিতে একটা আশঙ্কা বোধ করিতেছিল। ডাক্তার যে ভুল করিতেছেন তাহা সে সম্পূর্ণ-রূপেই বুঝিতেছে, অথচ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সত্য কথা বলিবার সাহস তার ছিল না, মিথ্যা রচনা করিতেও সে জানে না। তাই অষ্ট-বদ্ধ হইয়াই সে রহিয়া গেল।

সলিল সেদিন অতর্কিতে যাহা দেখিয়া গেল, তার পর আর এ বাড়ীতে—তার নিজেরই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে তার সাহস হইতেছিল না। প্রথমে সে আরতিকে এত কাল পরে এ ভাবে এই তার নিজের বাড়ীতে তার নিজের শয্যা-গৃহে দেখিয়া যেন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। এমন অসদৃশ—বিসদৃশ ঘটনা কেমন করিয়াই ঘটা যে সম্ভবপর হইল, তাহা যে তার কল্পনার অতীত। তার পর এ কয় দিনে দিনরাত ভাবিয়া ভাবিয়া এইটুকু সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল যে, এই আরতিই সেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদা নার্স যাহাকে 'মালতী' নামে স্বর্ণলতা তাহার কাছে উল্লেখ করিয়াছিল। কিন্তু তাই যদি হয়, তথাপি এমন কাণ্ড হইল কেমন করিয়া? আরতি—যে আরতি তাহাকে তার একখানা জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতই তুচ্ছ করিয়া ছাড়িয়া গিয়াছিল, সে এত কাল পরে নার্স রূপে সেবা করিতে আসিল তারই স্ত্রীকে এবং তারই বাড়ীতে—যে বাড়ীতে সে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে প্রবেশ করিতে পারিত!

এ কি সে না জানিয়া আসিয়াছে? অথবা এ আসা তার কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত? এই গূঢ় রহস্য তার কাছে হেঁয়ালীর মত ঠেকিতেছিল, এর কোনই মীমাংসা সে খুঁজিয়া পায় নাই।

এমন সময় ডাক্তার সেনের নিকট হইতে পত্র আসিল যে তার এই নিশ্চেষ্ট নির্লিপ্ততায় তাঁর রোগী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তার নিশ্চিত আরোগ্যের মুখে এমন করিয়া বাধা দান করা মিঃ গুপ্তর পক্ষে একটু অসঙ্গত হইয়াছে। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি যেন অবিলম্বে আসিয়া তাঁহার পেসেণ্টকে শান্ত করেন, এবং ভবিষ্যতেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন যে, তাঁর এতটুকু ভুলের বা আলস্যের উপরই এই বালিকার জীবন-মরণ একান্তভাবে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় অক্লান্ত স্নেহ এবং আত্মবিস্মৃত প্রেম।

ওঃ—জগতে কর্ত্তব্যের বন্ধনের মত দৃঢ় অচ্ছেদ্য অবিস্মৃত কোন বস্তু নাই! এর কাছে নিজের এতটুকু লাভ-ক্ষতির জন্য অবসর পাওয়া যায় না! অস্থির ও অনিশ্চিত চিত্ত-প্রাণ লইয়া সলিল গিয়া দেখিল, স্বর্ণলতা শয্যালীন থাকিয়া প্রবল ভাবে তার আহারে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছে; আর আরতি তার বিছানার পাশে বসিয়া তাহাকে এক পাত্র দুধ লইয়া পান করিবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিতেছে। সলিল ঘরে ঢুকিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিল; কিন্তু স্বর্ণলতা তাহাকে দেখিতে পাইয়াই একটা মৃদু আনন্দ-ধ্বনি করিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, উল্লসিত কণ্ঠে উচ্চ করিয়া বলিল,—

"তুমি এসেছ! ভাল আছ! বাঁচলুম!—আমার এমন ভাবনা হচ্ছিল। যাচ্চো কেন? ও তো নার্স—মালতী। মালতী! তুমিই বা হঠাৎ চল্লে কেন? বাঃ! আমি দুধ খাবো না বুঝি? এখন তুমি যদি দশ সের দুধ এনে দাও—আমি খেতে রাজী আছি!"

অগত্যা সলিলকে প্রত্যহ একবার করিয়া তার স্ত্রীর কাছে হাজ্‌রী দিতে আসিতেই হইতে লাগিল। কিন্তু এ আসা আর তার আগের সেই চারটী দিনের আসার মত শুভাগমন সূচিত হইল না। এ যেন আবার তাদের সেই পুরাতন যুগেরই পূর্ব্ব-সূচনার মত ছাড়া-ছাড়া, ধার-করা অশ্রু সজল, অভিমান-দুর্ব্বল দিনেরই পুনরাবর্ত্তন! সলিল আর মন দিয়া তার স্ত্রীকে আদর দেখাইতে পারে না। আসন্ন মৃত্যু-ভয় যে বাধাকে তার কাছে শ্লথ করিয়া দিয়াছিল, আরতির আবির্ভাব তাহাকে যেন আবার নূতন করিয়া বাঁধিয়া দিল। কোন একটা সোহাগের বাণী তার মুখে আসিলেও সে যেন আর সেটাকে প্রকাশ করিতে পারিত না, তার মনে হইত,—যদি আরতির কাণে যায়, সে হয় ত মনে মনে হাসিবে,—ভাবিবে পুরুষ কতবড় লঘুচিত্ত! আরতিকে যে সব কথা সে বলিতে পারিত, আজ অনায়াসেই তা স্বর্ণলতাকে বলিতে তার কোথাও বাধিতেছে না! তাই স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার তার অনিচ্ছা বিরস এবং কৃত্রিমতায় যতই পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, স্বর্ণলতার পক্ষ হইতে অভিমানের

অশ্রুবাণ এবং বাক্যবাণ দুই-ই তত প্রবলবেগে বর্ষণারম্ভ হইল। ফলে আবার তাদের মধ্যের ঐ কয়টী মাত্র দিনের সুখের আভাষ দেখা দিয়াই সেই পুরাতন দিনই জয়ীর বেশে ফিরিয়া আসিল।

আরতির প্রতিও আর স্বর্ণলতার সে শ্রদ্ধা ছিল না। ইদানীং সলিলের উপস্থিতি কালেও সে মালতীকে ডাকিয়া ফাই-ফরমাইস করিত; এবং তাদের দুজনকার দুজনের প্রতি সন্ত্রস্ত ভাব দেখিয়া উপহাসও করিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ সে একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, ঐ ত্রস্ত ভাবটা তাদের বাহিক। আসলে সলিল তার সমস্ত মন এবং চক্ষু দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ঐ তার নার্সকেই অনুভব করিয়া থাকে। উহাকে দেখিলে তার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। ও যদি ঘর হইতে চলিয়া যায়, সলিলও যাই যাই করিতে থাকে; থাকিলেও আর তার মুখের সে ভাব থাকে না। তখন তার মনে পড়িল, প্রথম যেদিন এই ঘরে তাদের দেখা হয়, তাদের দুজনকার মুখেই সে কি একটা অদ্ভুত রকমের আর্ত্ত ভাব, সন্ত্রস্ত ভাব ফুটিয়া উঠিতে সে দেখিয়াছিল। অবশ্য তখন তার কোনই সন্দেহ হয় নাই। অতি তীব্র ঈর্ষার বৃশ্চিক-দংশনে স্বর্ণলতার মনের ভিতরটা জ্বলিয়া গেল। তার মনে হইল, তাকে উপলক্ষ্য করিয়া হয় ত তার স্বামী এই সুস্থ সুন্দরী তরুণীটী নার্সটাকে নিজের জন্যই বাছাই করিয়া আনাইয়াছেন। হয় ত সে এই ঘরের মধ্যে পড়িয়া থাকে,—কোথায় কি হইতেছে তার খবর কে জানে? তার তখন মনে হইল, ভাড়া করা নার্স আবার এত সুন্দরী হয়? সে কি এত বিপ্তে পড়ে থাকে? নিশ্চয় তার ভাঙ্গা কপাল পুরাপুরিই ভাঙ্গিয়াছে।

প্রকাশ্যে এতবড় অপবাদ স্বামীকে জানাইতে তার ভরসা হইল না; কিন্তু ছুতায়-নতায় কাঁদিয়া রাগিয়া সে তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়াই তুলিল। অথচ ডাক্তারের আদেশ—না আসিবারও উপায় নাই। সলিল যেন দুই দিক হইতেই হাঁপাইয়া উঠিল। তার রাগ হইল বেশি আরতিরই উপরে। সে কেন তার এতবড় দুঃসময়ে আবার তার এত কাছে আসিয়া দাঁড়াইল? তার দুর্ভাগ্য সে তো কোন রকম করিয়া বহিতেছিল—এমন অসময়ে তার অতি কষ্টে বহু আয়াসে বাঁধিয়া রাখা মনের বাঁধ ধ্বসাইয়া তাহাকে কোন্ প্লাবনের মুখে ভাসাইয়া দিতে তার এই অসম্ভব আগমন? সে কেন আসিল? এই একটী প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সে মনের মধ্যে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে তার ভরসা হইল না।

৩৪

সুন্দরা আসিয়া দেখিল, স্বর্ণলতা উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে দ্বারের দিকেই চাহিয়া আছে। আজ তাকে সেই আসিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া তার চক্ষে একটুখানি আনন্দের আবেগ ফুটিয়া উঠিল। কাছে আসিতেই সে তার একটী হাত বাড়াইয়া দিয়া সুন্দরার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে একটু আকর্ষণ করিল। সুন্দরা তার বিছানার ধারে আসন গ্রহণ করিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে ঈষৎ প্রসন্ন-স্মিত মুখে কহিয়া উঠিল "এই তো! বেশ সেরে উঠেছিস তো বউ! বাঃ—অনেকখানিই উন্নতি হয়েচে দেখছি যে।"

স্বর্ণ তার হাত ধরিয়া থাকিয়া একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল; সবিষাদে কহিল "ভাল হবো আশা করছিলুম, কিন্তু বোধ হয় আর তা আমায় হ'তে দিলে না, ভাই ঠাকুরঝি মণি!"

সুন্দরা সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল "সে কি! কেন রে?" ও কথা বলছিস কেন? কে ভাল হতে দিচ্চে না তোকে?

স্বর্ণলতা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় এক কাপ গরম দুধ হাতে করিয়া সেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল আরতি। দ্বারখোলার মৃদু শব্দে মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়াই সুন্দরা বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তার মুখ দিয়া আচম্বিতে একটা কথা বাহির হইতে গিয়াও সহসা বাহির হইল না। সে শুধু অবাক হইয়া তার অগ্রসর হওয়া মূর্ত্তির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

আরতি প্রথমে তার মুখ দেখে নাই; যখন দেখিতে পাইল, তখন সেও বারেকের জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তার তখন এমনও মনে হইয়াছিল যে, দুধের বাটী ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া এইক্ষণেই সে তার এই স্নেহময়ী দিদির কোলের উপর উপুড় হইয়া লুটাইয়া পড়ে। তার নীরব কণ্ঠ, নির্ব্বাক জিহ্বা উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিয়া একবার তার সেই প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক ভাইটীর কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণ

শক্তি দিয়া, যে শক্তিতে সে এ জীবনে অনেক কিছুই অসাধ্য সাধন করিয়া চলিয়াছে, সেই শক্তির বলেই পুটপাক মধ্যস্থ ধাতুদ্রবের মতই নিজের অন্তরের সহসা-দ্রব তরলাগ্নিকে চাপিয়া রাখিয়া ঘনস্ফুরিত অধরের উপর দাঁত দিয়া চাপিয়া স্থির পদে রোগীর অপর পার্শ্বে আসিয়া পৌঁছিল। দুধের বাটিটা তার কাছে ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে শুধু কহিল—"জুড়িয়ে গ্যাছে, খেয়ে নিন,—"

স্বর্ণ সুন্দরার সুস্পষ্ট চমক টের পাইয়াছিল। তার হাত সেই চমকে স্বর্ণলতার মুষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। অতি বিস্ময়াবেগে সুন্দরা তাহা না জানিলেও স্বর্ণ জানিয়াছিল। সে এক একবার দুজনকারই মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বিরক্তিভরে সসার শুদ্ধ দুধের কাপটা ঠেলিয়া দিয়া কহিয়া উঠিল,—"আঃ নার্স? কেন, ক্রমাগত জ্বালাতন কর। যাও—আমি খাবো না।" ইচ্ছা করিয়াই সে তাহাকে মালতী না বলিয়া নার্স বলিল। এখন সে প্রায়ই এই রকম বলে।

আরতি মৃদু কণ্ঠে কোন মতে দুচারবার অনুরোধ করিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। ততক্ষণে আপনাকে ঈষৎ সামলাইয়া লইয়া সুন্দরা ভাজের দিকে ফিরিয়া সস্নেহে কহিল, "ছি, দুষ্টুমী করে কি! নাও লক্ষ্মীটী, খেয়ে নাও।"

এবার আরতি ফিরিয়া দুধ মুখে ধরিতেই স্বর্ণ নিঃশব্দে দুধটুকু পান করিল। এই স্নেহ-মধুর অনুযোগটুকুকেই যে তার ক্ষুধিত চিত্ত অহোরাত্র হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিল এবং ঠিক সে যেটুকু চাহিতেছিল পাইতেছিল না।

আরতি নীরবে ফিরিয়া গেল, সুন্দরা তার সঙ্গে একটীও কথা কহিল না। স্বর্ণ তাহাকে নার্স বলিয়া সম্বোধন করায় তার প্রকৃত পরিচয় যে তার কাছে অজ্ঞাত, সে খবর সে পাইয়াছিল। ভিতরে এর কি যে রহস্য কিছুই সে জানে না, আরতিও তাহাকে না চেনার ভান করিল। কাজেই সেও তার অদম্য ইচ্ছাকে জোর করিয়া দমন করিয়া স্থাণুর মতই বসিয়া রহিল। কিন্তু মন তার নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। এত দীর্ঘকাল পরে আরতিকে আজ এই অজ্ঞাত পরিচয়ে ইহারই পাশে দেখিয়া সে মনে মনে কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল। তার মন যেন তার কাণে কাণে বলিল "এ তো ভাল ঠেকছে না, এ কি সলিল জানে?—" তার পর আপনিই বলিল "জানে বই কি, সেও মধ্যে মধ্যে এখানে আসে,—এ কি তবে জেনে-শুনেই হতে দিয়েছে? ইচ্ছে করে?"

আরতি ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলে স্বর্ণ ডাকিল "দিদি!"

সুন্দরা ভাল করিয়া ফিরিয়া বসিল "কি, সোনা?"

স্বর্ণ কহিল, "দিদি! ও' কে, আমায় তুমি বল।"

সুন্দরা তার কথার ভাবে, তার চেয়ে বেশি তার গলার স্বরে চমকিত হইল। তার পর সহজ ভাব দেখাইয়াই উত্তর করিল,—"কে' কে রে?"

স্বর্ণ তেমনই অনুচ্চ দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে উত্তর করিল, "কেন ঐ নার্সটা। তোমরা ওকে চেন, দুজনেই চেনো। ও-ও প্রথম দিন ওকে এই ঘরে দেখে তোমার মত করেই চমকে উঠেছিল। তারপর থেকে আঃ—তার পর থেকে যখনই আসে, তার চোখ আর কোন দিকে যেন ফেরে না; শুধু ঐ নার্সকেই দেখে! ও যদি তখন ঘরে না থাকে, ক্রমাগত অন্যমনস্ক হয়ে হয়ে ঐ দোরের দিকেই চায়। যতক্ষণ নার্স থাকে, বেশ কথাবার্ত্তা কয়,—যেই নার্স চলে যায়, অমনি একটা কিছু ছুতো করে পালায়, এ সবের মানে কি দিদি? আমায় তুমি বলো,—লুকিও না। আমি ভাল হচ্ছিলুম; কিন্তু যেদিন থেকে এই সব দেখচি, সেই দিন থেকেই আবার আমি মরতে বসেচি। আমায় এরা বাঁচতে দিতে চায় না! আমায় এরা মারবে, খুন করবে।"

সুন্দরা এই অনুযোগের মূলে সত্যের আভাষ পাইয়া পাইয়া শুধু উদ্বিগ্নই নয়, শঙ্কানুভবও করিল। সলিল এবং আরতি দুজনের উপরই তার রাগ হইল। কেন তারা এই বেচারার প্রাণটিকে লইয়া এমন অনাবশ্যক নিষ্ঠুর খেলা খেলিতে বসিল! এর কি প্রয়োজন ছিল? এর জন্য দুজনকেই অনুযোগ করিবে স্থির করিয়া স্বর্ণকে সান্ত্বনা দিয়া প্রকাশ্যে কহিল,

"তোর মুণ্ডু! ও সব তোর মনের খেয়াল। তোর যে চিরকেলে একটা বাতিক আছে না, সেইটের ভূত ফের তোর ঘাড়ে চেপেছে।"

বিষণ্ণ মুখে ঘাড় নাড়িয়া স্বর্ণ ম্লান হাস্যের সহিত জবাব করিল "না, দিদি, না,—আমার খেয়াল নয়,—এ সত্যি! ওর দিকে যখন চায়, তোমার ভাইএর চোখ দিয়ে যেন আগুন

জ্বলে ওঠে। ওর গলার শব্দ, জুতোর শব্দ কাণ পেতে শোনে। আর শুনতে পেলে মুখ যেন আহ্লাদে চকচকে হয়ে ওঠে। কই আমার দিকে ত কক্ষনো অমন চোখেও চায় না,—কোন দিনই তো চায় নি! ওকে নিশ্চয় ও ভালবাসে,—হয় ত আগে থেকেই ওদের মধ্যে ভালবাসা ছিল। না হলে কি"—

সুন্দরা শুষ্ককণ্ঠে বাধা দিল, "স্বর্ণ! ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে অমন যা তা কথা মুখে এনো না। তোমার ওকে ভাল না লাগে, ওকে বদলে দাও।—"

স্বর্ণ আবার তেমনই বিষাদিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ওকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল,—বলতে গেলে ওই আমায় বাঁচিয়ে তুলেছে। কিন্তু যেদিন থেকে ওদের দুজনকার দেখা হলো, সেই দিন থেকে আবার ও-ই আমায় খুন করচে। আমি পারচি না,—আমি সইতে পারচি না—তার চোখের সে চাউনি, সেই সেই—সে যে কি, তা' আমি বলতে পারবো না, কিন্তু সে যে খুব বেশি কিছু সে আমি ঠিক বুঝতে পারি। সে কেন হবে? সে কেন থাকবে? আমি যা পাই নি ও তা কেন পাবে? আর কেউ কেন পাবে?"

স্বর্ণলতা যে ঠিক বোকা নয়, সুন্দরাও তা জানিত। তবে সে যে এতটাই দেখে, বোঝে ও এমন তীব্র করিয়া অনুভব করে, এটা তাকে কিছু বিস্মিত করিল। তথাপি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া সে ভ্রাতৃজায়াকে ধমকাইল,—

"নে, নে, রঙ্গ রাখ। তুই কি বলতে চাস যে সলিল তোকে ভালবাসে না? তাই ছায়ার পেছনে ছুটে দুঃখ পাচ্ছিস?"

স্বর্ণ হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল,—

"দুঃখ আমি পাচ্চি, খুবই পাচ্চি, কিন্তু সে ছায়া নয় বোন, সত্যিকারের মস্ত দুঃক্ষু! তোমার ভাই আমায় যে ভালবাসে না, সে তুমি তার ওই নার্সের দিকে চাওয়া দেখলেই জানতে পারতে দিদি! সে ভালবাসে ওই ওকে—"

"স্বর্ণ! এ কি কথা! আমার ভায়ের কি সেই চরিত্র?"

স্বর্ণ এ তিরস্কারে অপ্রতিভ না হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল—

"তা নয় বলেই তো বলচি ওকে ভালবাসে,—আগে থেকেই হয় ত বা বাসতো। স্বভাব যদি মন্দ হতো, তা হলে তো জানতুম, ওর স্বভাবই ওই—কিন্তু যে কারুর দিকে চায় না, এমন কি ভাল করে কোন দিন আমাকেই যে চেয়ে দেখে নি, সেই সে কেন,—সে কেন—ওকে—সে কেন ওকে অমন আপনা ভুলে চেয়ে দেখবে! কেন সে ওর—"

দুঃখে অভিমানে স্বর্ণলতার ক্ষীণ স্বর একেবারে গভীর নিখাদে ডুবিয়া গেল। তার বড় বড় চোখ দুটি দিয়া এবার অশ্রুর দুটী ধারা নামিল। ইহার পর সুন্দরাও আর তাদের সঙ্গে আরতির পূর্ব্ব পরিচয়ের সংবাদ কোনমতেই দেওয়া সঙ্গত বোধ করিল না। মনে মনে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হইয়া উঠিল।

"দিদি! তুমিও কিন্তু আমায় লুকোলে! তুমিও তো ওকে দেখে চমকে উঠেছিলে। ও কি কখন তোমাদের বাড়ী নার্স ছিল? তোমার ভাইএর সঙ্গে বুঝি ওর—"

সহসা আড়ষ্ট অভিভূত সুন্দরাকে মুক্তি দিতে মুক্তি-দূতের মতই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া আরতি নম্রস্বরে কহিল—

""ম্যাডাম! ডক্টর আসচেন, এ সময় অন্যের থাকা নিয়ম নয়—"

সুন্দরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল,—"আচ্ছা আমি তাহলে যাচ্চি," রুমালে চোখ মুছিতে ব্যস্ত স্বর্ণকে বলিল, "চল্লুম সোনা! এবার যেদিন আসবো, তোমায় এসব প্রলাপ বকতে যেন শুনি না, তাহলে ভারী রাগ করবো কিন্তু তা' বলে রাখছি,—আর আসবো না।"

স্বর্ণলতা মৃদু গুঞ্জনে শুধু আপনা আপনি বলিল—

"পেরলাপ! আমার যেন জ্বর-বিকার হয়েচে!"

ডাক্তার আসিয়া রোগীর মুখের দিকে চাহিতেই সেখানে প্রচুর বর্ষণ-চিহ্ন পাইয়া ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—

"এই যে আজও আবার কেঁদেচেন দেখচি! কেন? বেশ ভালই তো আছেন? তবে আবার কান্নাকাটী কেন? এ কান্নাটা আপনি থামাবেন কবে বলুন তো?"

স্বর্ণ কান্না থামানর চেষ্টাই করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তারের এই অনুযোগে সে আর আত্মদমন করিতে পারিল না, হঠাৎ একান্ত উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া সে বেড-কভার টানিয়া মুখ ঢাকা দিল, কান্না-ধরা গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,

"কান্না আমার থামবে সেই একেবারেই,—তার আগে আর থেমেচে।"

ডাক্তার সেন অপ্রসন্ন মুখে নির্ব্বাক ম্লানমূর্ত্তি আরতির দিকে ফিরিলেন,—

"মিস রায়! তোমার রোগীকে প্রফুল্ল রাখতে না পারা তোমারই কর্ত্তব্যের ত্রুটী বলে আমি মনে করি। পূর্ব্বের মত এ বিষয়ে তুমি হয় ত মন দিতে পারচো না। তোমার কাছে আমি এ-রকম আশা করি নি।"

তিরস্কৃতা আরতি তার নত মুখ আরও খানিকটা নত করিল মাত্র, উত্তর বা কৈফিয়ৎ সে দিতে চেষ্টাও করিল না; চেষ্টা করিবারও তার বিশেষ কিছু ছিল না।

ত্রুটী? হ্যাঁ, ত্রুটী বই কি! তার না হোক, তার অদৃষ্টের এ মহা ত্রুটী, মহা অপরাধ, তা'তে আর সন্দেহ কি? নাঃ, এতবড় ভাগ্যবিড়ম্বনা সংসারে প্রায় দেখা যায় না বটে।

কিন্তু তার বুক যে অবর্ষিত অশ্রুভারে গভীর ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছিল, সেখানে নূতন বেদনায় আর যেন জমিবার যায়গা ছিল না, স্তব্ধ অচল অনড় হইয়া সে নত নেত্রে যেমন তেমনই দাঁড়াইয়া এই অযথা অভিযোগে নিজেকে অভিযুক্ত হইতে সায় দিয়া গেল। বলিল না, আমি তো আপনাকে এ কথা অনেকবারই জানিয়েছি।

স্বর্ণলতার কান্না কিন্তু আরতিকে তিরস্কৃত হইতে দেখিয়া এবার সহজেই থামিল, সে মনে মনে কিছু যেন তৃপ্ত হইল। আরতির প্রতি সকল ভালবাসাই তার একটা প্রচণ্ড ঈর্ষায় নিঃশেষ হইয়া গিয়া তার স্থানে তীব্র একটা জ্বালাময় বিদ্বেষ দেখা দিয়াছিল। সে বিদ্বেষটা এতই প্রবল যে যদি তার সাধ্য থাকিত তো, হয় ত সে আরতিকে নিজের হাতে খুন করিতেও পারিত। আরতি যেন তার চক্ষুশূল, তার চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল। মনে মনে সে স্থির করিল, একবার ভাল করে পরীক্ষা করি, তার পর ডাক্তারকে বলে দিচ্ছি পাপটাকে দূর করে। (ক্রমশঃ)

খাড়িমণ্ডল

শ্রীকালিদাস দত্ত

এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন দেবের যে পাঁচখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম খানি বর্ত্তমান সময়ে সুন্দরবন তাম্রশাসন নামে প্রসিদ্ধ। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মজিলপুরনিবাসী স্বর্গীয় হরিদাস দত্ত জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অধীন মথুরাপুর থানার অন্তর্গত ২২নং লাট বকুলতলায় একটী পুষ্করিণী খনন কালে উহা প্রাপ্ত হন। উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখন কিছুই জানা যায় না। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" রচনাকালে উহার একখানি প্রতিলিপি হরিদাস বাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রকাশ করেন। তিনিও ঐ সময় আসল তাম্রলিপিখানি দেখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহার সন্ধান পান নাই। তাঁহার পুস্তকে প্রদত্ত প্রতিলিপি পাঠে জানা যায় যে, উহার দ্বারা মহারাজা লক্ষ্মণ সেন দেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী খাড়িমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত তল্লপুরচতুরকে, মণ্ডল গ্রামে ৩ দ্রোণ ভূমি শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উহাতে প্রদত্ত ভূমির যে চতুঃসীমা দেওয়া আছে তাহা এই—

পূর্ব্বে—শান্তশাবিক প্রভাশাসন সীমা।

দক্ষিণে—চিতাড়ী খাতার্দ্ধ সীমা।

পশ্চিমে—শান্তশাবিক রামদেব শাসন পূর্ব্ব সীমা।

উত্তরে—বিষ্ণুপাণী গাড়োলী ও কেশব গাড়োলীর ভূমি সীমা।

অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায়, তাহাতে প্রতীতি হয় যে, ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অধীন ২২নং লাটের উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্বে মথুরাপুর থানার অন্তর্গত খাড়ি আবাদের মধ্যে, খাড়ি নামক যে স্থান আছে, উহারই নামানুসারে উক্ত খাড়িমণ্ডল প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানের নামানুসারে এখনও খাড়ি পরগণা প্রসিদ্ধ। আজিও এখানে চিতাড়ীর খাল নামে একটী খাল দেখা যায়। আমাদের বোধ হয় উহাই উক্ত তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমির

দক্ষিণ সীমায় উল্লিখিত চিতাড়ীর খাত, এবং উহারই উপর তাম্রশাসনোক্ত মণ্ডলগ্রাম বর্ত্তমান ছিল। মিত্রোদয় সম্পাদক হিরণ্ময় বাবুও কিছু দিন পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ঐরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (১)। বর্ত্তমান সময়ে এই খাড়ি আবাদের পশ্চিম দিকে গঙ্গার বাদা নামে এক বিস্তৃত নিম্নভূমি বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে ভাগীরথী নদীর মূল স্রোত কালীঘাট, রসা, বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, মালঞ্চ,

খাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি

মাহিনগর, বারুইপুর, সূর্য্যপুর, মূলটি, দক্ষিণ বারাশত, জয়নগর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ প্রভৃতি জনপদের উপর দিয়া খাড়িতে আসিয়া এই নিম্নভূমির উপর দিয়াই সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইত। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসান, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্য, কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল প্রভৃতি বহু পুরাতন গ্রন্থে চৈতন্যদেবের নীলাচল গমন, ও চাঁদ, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরগণের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে এই ভাগীরথী প্রবাহের ও তৎসঙ্গে ইহার উভয় তীরবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত জনপদ সমূহের উল্লেখ আছে। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ডি, ব্যারোর মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, তৎকালে ইহা খাড়ির উপর দিয়া দক্ষিণমুখে গিয়া পরে ক্রমশঃ পশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইত। কিছুদিন পূর্ব্বে আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত সোনারপুর থানার অধীন, দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে লক্ষ্মণ সেন দেবের যে অন্য একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা, ও বকুলতলায় প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসনখানি পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, সেন রাজত্ব কালে এই ভাগীরথী নদীর পূর্ব্ব তীরস্থ প্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির, ও পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। গোবিন্দপুরের তাম্রশাসন দেখিয়া রাখালদাস বাবুও ভাগীরথী নদীর পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি এ বিষয় যাহা বলিয়াছেন তাহা এই :—

"গঙ্গার দক্ষিণে ও ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত ভূখণ্ডের নাম বর্দ্ধমানভুক্তি। এই তাম্রশাসনে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ প্রদত্ত ভূমির পূর্ব্ব সীমায় জাহ্নবী নদী" (২)। উহা হইতে বুঝা যায় যে বকুলতলার তাম্রশাসনে উল্লিখিত খাড়িমণ্ডলই সেন রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণ পশ্চিমাংশের শেষ মণ্ডল ছিল। ব্যারাকপুরে প্রাপ্ত বিজয় সেনের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে "খাড়ি বিষয়" নামেও একটী "বিষয়" ছিল (৩)। উক্ত খাড়ি বিষয়ের সহিত এই খাড়িমণ্ডলের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা ঐ তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় না। আমাদের বোধ হয় উহা এই খাড়িমণ্ডলেরই অন্তর্গত একটী "বিষয়" ছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলি পর্য্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে শাসন সৌকর্য্যার্থ বঙ্গদেশ "ভুক্তি" নামক কয়েকটী বড় বড় প্রাদেশিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল ভুক্তি পুনরায় "মণ্ডল" নামে কতকগুলি উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বিভাগে ও ঐ সকল মণ্ডল আবার "বিষয়" নামক উহা অপেক্ষা বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রতর

(১) মিত্রোদয় প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

(২) বাঙ্গলার ইতিহাস। ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৫, পরিশিষ্ট (ঞ)

(৩) Inscriptions of Bengal, Vol. III, pages 57-67.

বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন বিবরণাদিতে দেখা যায় যে ঐ সকল ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত মণ্ডলের শাসনকর্তৃগণ পরমেশ্বর পরমভট্টারক রাজাধিরাজের সামন্ত রূপে পরিগণিত ছিলেন; এবং মণ্ডলেশ, মণ্ডলেশ্বর, মণ্ডলাধিপতি প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। কামন্দকীয় নীতিসারের অষ্টম সর্গের মণ্ডলযোনী অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে মণ্ডলাধিপগণ কোষ ও দণ্ডযুক্ত হইয়া অমাত্য ও মন্ত্রিগণের সহিত দুর্গে অবস্থান করিয়া মণ্ডল শাসন করিতেন (৪)। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৮৬ অধ্যায়ে দেখা যায় যে মণ্ডলেশ্বরগণ রাজপদবাচ্য ছিলেন এবং চারি শত যোজন অর্থাৎ ১৬ শত ক্রোশ ভূমি তাঁহাদের শাসনাধীন থাকিত (৫)। উহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন কালের ভুক্তির অধীন মণ্ডল বিভাগ দ্বারা আমাদের দেশের বর্তমান কালের ডিভিসানের অধীন জিলার ন্যায় এক একটী বড় প্রাদেশিক বিভাগকেই বুঝাইত, এবং বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত পুরাতন ভাগীরথী প্রবাহের পূর্ব্ব তীরস্থ সমগ্র সুন্দরবন সেন রাজত্বকালে পূর্ব্বোল্লিখিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যান্তঃপাতি খাড়িমণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল

ইদানিংও এই প্রদেশের অরণ্য হাসিলের পর অরণ্য মধ্য হইতে ও ভূগর্ভ হইতে প্রাচীন মনুষ্যাবাসের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় দুই শত কাল প্রস্তরের ও ১০।১২টী ব্রঞ্জের হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ দেব দেবীর নানা রূপ মনোরম মূর্ত্তি আছে। উহাদের গঠন-পদ্ধতি ও ভাব-ভঙ্গী হইতে ঐ গুলিকে পাল ও সেন রাজত্ব কালের বলিয়াই জানা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত এদিকে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। ঐ সকল মূল্যবান্ মূর্ত্তির মধ্যে কতকগুলি অযত্নে পড়িয়া থাকিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও কয়েকটী বিদেশে স্থানান্তরিত হইয়াছে। গত বৎসর আমার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কয়েকটী সুন্দর মূর্ত্তি কলিকাতা মিউজিয়ামে লইয়া গিয়াছেন। এখনও এখানকার নানা স্থানে যে সকল মূর্ত্তি অযত্নে পড়িয়া আছে, তাহারও সংখ্যা শতাধিক হইবে। উহা ব্যতীত এই প্রদেশে কয়েকখানি প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রপট্ট লিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে গুলিরও অধিকাংশ এখন নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। এই প্রবন্ধে আমি আপনাদিগকে ঐ সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনের কতকগুলির বিবরণ প্রদান করিব। ঐ গুলি হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন কালে উক্ত খাড়িমণ্ডল বহু সমৃদ্ধ জনপদে সুশোভিত ছিল। আমাদের বোধ

কয়েকটি প্রস্তর স্তম্ভ

(৪) উপেতঃ কোষ দণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দুর্গস্থশ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ॥"

(৫) "চতুর্যোজন পর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ।
যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ॥"

হয়, পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নদী এই প্রদেশের উপর দিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছিল বলিয়াই প্রাচীন কালে উহা ঐরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আমি এখানে সর্ব্বাগ্রে খাড়ির কথা বলিব, এবং তৎপরে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিক হইতে উহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের ও ঐ সকল নিদর্শনের যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিব।

খাড়ি।

খাড়ি বর্ত্তমান সময় মথুরাপুর থানার অধীন, এবং ২৪

ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি

পরগণা কালেক্টারির ৯৩নং তৌজীর অন্তর্ভুক্ত, ও খাড়ি, গজমুড়ী প্রভৃতি নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী রূপে পরিচিত। প্রায় এক শত বৎসর হইল এই স্থান হাসিল হইয়াছে। প্রবাদ—এখানকার অরণ্য কাটাইতে হয় নাই, দাবানলে পুড়িয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের মুখে শুনা যায় যে, অরণ্য হাসিল কালে এখানে বহুসংখ্যক ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, ও অনেক গুলি মজা পুষ্করিণী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পুরাতন রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে উল্লিখিত আছে যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেও উহার দক্ষিণে অরণ্য মধ্যে ঐরূপ কয়েকটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও জঙ্গলে পূর্ণ দুইটী প্রকাণ্ড মজা দীর্ঘিকা বিদ্যমান ছিল। ঐ দীর্ঘিকা দুইটির চতুর্দ্দিকে তখনও প্রায় ৩০।৪০ ফিট উচ্চ মাটীর বাঁধ ছিল। Hunter's Statistical Accountএ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা এই—

প্রথম জৈনতীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্ত্তি

"In the Sunderban jungles just south of this fiscal division (Khari) are the remains of several temples; and the Revenue Surveyor in 1857 found the sites of two very large tanks dry and over-grown with jungles, and surrounded by mounds or embankments from

thirty to forty f et in height. No clue c uld be obtained from the surrounding vill gers as to their histor ." Vol. 1. Pages 235

এখনও ইহার উত্তর পশ্চিম দিকে কয়েকটি নাতিবৃহৎ ইষ্টক স্তূপ বিদ্যমান আছে। কথিত আছে যে, আলিপুর মহকুমার অধীন জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর ও দুর্গাপুর গ্রামে এখন রাধাবল্লভ ও শ্যামসুন্দর নামে যে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছেন, প্রাচীন কালে খাড়িতেই তাঁহাদের মন্দির ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে তথাকার ভগ্ন মন্দির হইতে বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য উক্ত বিগ্রহগুলি স্থানান্তরিত করিয়া জয়নগর ও দুর্গাপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন (৬)। ইহার দক্ষিণাংশে গজমুড়ী পল্লীতে যদুনাথ ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে একটী প্রায় তিন ফিট উচ্চ কাল প্রস্তরের সুন্দর বিষ্ণু-মূর্ত্তি আছে। উহা সেখানে একটী পুষ্করিণী খনন কালে পাওয়া যায়। উহার দক্ষিণাধঃ হস্তে শঙ্খ, দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে পদ্ম, বামোর্দ্ধ হস্তে গদা ও বামাধঃ হস্তে চক্র আছে। অগ্নিপুরাণ অনুসারে উহার নাম নারায়ণ। উহা ব্যতীত এখানে কয়েকটী সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট কাল প্রস্তরের থাম ও দরজার চৌকাট প্রভৃতি দ্রব্যাদিও পাওয়া গিয়াছে।

২৩ নং লাট বাড়ীভাঙ্গা

বর্ত্তমান সময়ে খাড়ি আবাদের দক্ষিণে ২৩নং লাট বাড়ীভাঙ্গা আবাদ অবস্থিত। অরণ্য হাসিল কালে এখানে বহুসংখ্যক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই জন্যই ইহার নাম বাড়ীভাঙ্গা হইয়াছে। এখানেও একটী সুন্দর দশভুজা-মূর্ত্তি ও তিনটী বিষ্ণু-মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে। শুনা যায়, আরও কয়েকটী কাল প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু সেগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখন কিছুই জানা যায় না।

২৪ নং লাট রায়দীঘি

এই বাড়ীভাঙ্গা আবাদের দক্ষিণে ২৪ নং লাট রায়দীঘি আবাদ। রায়দীঘি আবাদের পশ্চিমেই পূর্ব্বোক্ত ২২ নং লাট বকুলতলা অবস্থিত। এই রায়দীঘিতে প্রাচীন লোকালয়ের যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটী প্রকাণ্ড জলাশয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত বৎসর সেটেলমেণ্টের জরিপে ইহার পরিমাণ ১১০ বিঘা স্থির হইয়াছে। আজিও ইহার অধিকাংশ স্থান দামে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শুনা যায় ২।৩টা বড় বড় কুমীর বহুকাল যাবৎ ইহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। অনেকে এই দীঘিকেই রায়দীঘি বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা—ইহারই নাম হইতে এই লাটের নাম রায়দীঘি।
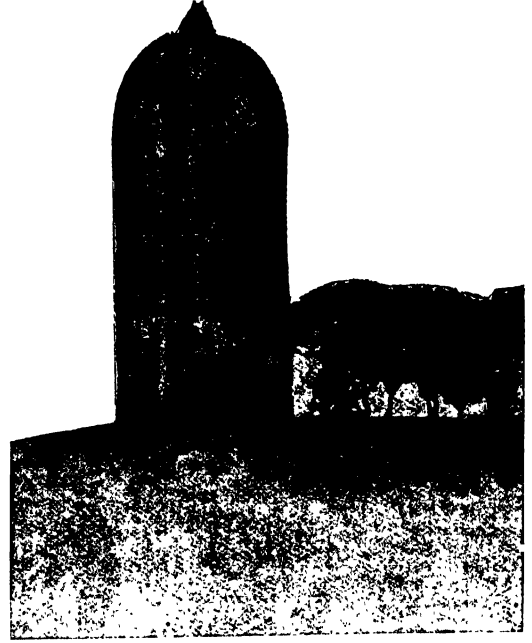
জটার দেউল

জটার দেউলের তলস্থ ভূমি খনন কালে প্রাপ্ত খোদিত ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড

(৬) List of Ancient Monuments in the Presidency Division. Pp. 2, 3, 4.

হইয়াছে। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে এই লাটের নাম কেন রায়দীঘি হইয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত ইহার মালিক জমিদার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তিনি বলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ সীতারাম রায় ঐ লাট আবাদ করাইবার সময় জলাভাব দূরীকরণার্থ তথায় আবিষ্কৃত ঐ সুবৃহৎ জলাশয়ের বকচরে এখন যে দীঘি দেখা যায় তাহা খনন করাইয়াছিলেন। সে কারণ ঐ খনিত দীঘিটী তাঁহার রায় উপাধি হইতে রায়দীঘি নামে প্রসিদ্ধ হয়। তদবধি ঐ লাটও উক্ত নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃত পক্ষে উহা তথায় আবিষ্কৃত ঐ দীঘিটীর নাম নহে। উহা হইতে বুঝা যায় যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার যশোহর খুলনার ইতিহাসে এই রায়দীঘি প্রতাপাদিত্যের রায়গড় দুর্গাপতির সহিত সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিতেছে বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন (৭)। বরদা বাবুর নিকট আরও অবগত হইয়াছি যে, কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ দীঘির মধ্য হইতে একটা সংস্কৃত অক্ষর-খোদিত প্রস্তর-ফলক পাওয়া গিয়াছিল। কালীঘাটের নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেনস্থ শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহা দেখিয়াছিলেন। তাহাতে অরণ্য মধ্য হইতে আবিষ্কৃত উক্ত প্রকাণ্ড দীঘিটীর প্রতিষ্ঠার কথা লিখিত ছিল। নকুলেশ্বর বাবু তাঁহার কুমুদানন্দ নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। বরদা বাবু উহা খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু যে ব্যক্তি উহা পাইয়াছিল, সে উহার অত্যধিক মূল্য চাওয়ায় তিনি উহা খরিদ করেন নাই। এখন ঐ ফলকখানি কোথায় আছে, তাহা জানা যায় না। এই ২৪নং লাটের পূর্ব্ব সীমায় রায়দীঘির গাং নামে একটী নদী প্রবাহিত আছে। উহা মানি নদী হইতে উঠিয়া দক্ষিণ মুখে গিয়া ছাটুয়া নদীতে মিশিয়াছে। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে মাতলা থানার অন্তর্গত বোলবামনী গ্রামের জনৈক ধীবর মাছ ধরিতে গিয়া এই নদীর মধ্য হইতে একটী প্রায় তিন ফিট উচ্চ কাল প্রস্তরের বহু প্রাচীন জৈনতীর্থঙ্কর মূর্ত্তি পাইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তিটী এখন বোলবামনী গ্রামের ধীবর পল্লীতে একটী তেঁতুল বৃক্ষের নিম্নে রক্ষিত আছে। তথাকার ধীবরগণ ধর্ম্মঠাকুর বলিয়া উহার পূজা করিয়া থাকে। মূর্ত্তিটী নগ্ন, দিগম্বর সম্প্রদায়ের। ইহার মস্তকোপরি ছত্র আছে, ছত্রের দুই পার্শ্বে দুইটী ঢক্কা, তন্নিম্নে বাদ্যযন্ত্র হস্তে দুইটী অপ্সরী মূর্ত্তি। ইহাদের নিম্নে তীর্থঙ্করের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে চামরধারী দুইটী পুরুষ মূর্ত্তি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। তীর্থঙ্করের দক্ষিণ ও বাম হস্তের দুই পার্শ্বে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের বিশেষ লাঞ্ছন দুইটী সর্প আছে। পাদপীঠের উপরও একটী সর্প খোদিত আছে। রায়দীঘির প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মথুরাপুর থানার অধীন (ই) প্লট শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের ঐরূপ একটী একবিংশ তীর্থঙ্কর নেমীনাথের ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। রায়-

২৯ নম্বর লাট নলগোড়ায় আবিষ্কৃত মঠবাড়ী নামক ইষ্টকস্তূপের একাংশ

(৭) যশোহর খুলনার ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০১।

দীঘির প্রায় ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ঘাটেশ্বরা নামক গ্রামে একটী পুষ্করিণী খনন কালে একটী বহু প্রাচীন দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রথম জৈনতীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে তিন ফিট পাঁচ ইঞ্চি ও প্রস্থে এক ফট নয় ইঞ্চি। মূর্ত্তিটীর দুই পার্শ্বে বার জন হিসাবে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ডায়মান মূর্ত্তি ও তন্নিম্নে দুই পার্শ্বে ছয় জন হিসাবে বার জন তীর্থঙ্করের যোগাসনে উপবিষ্ট ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি খোদিত আছে। আদিনাথের মূর্ত্তিটীর পাদপীঠের উপর আদিনাথের বিশেষ লাঞ্ছন একটী উপবিষ্ট বৃষমূর্ত্তি দেখা যায়। উহা ব্যতীত রায়দীঘিতে লাটের দক্ষিণাংশ অরণ্যাবৃত হইয়া আছে। ইহার উত্তরাংশে রায়দীঘি গাংএর অনতিদূরে তিনটী জঙ্গলাবৃত বড় বড় ইষ্টক স্তূপ আছে। স্থানীয় লোকের নিকট ঐগুলি গজগিরির বাটী, পিলখানার বাটী ও শ্বেতরাজার বাটী নামে পরিচিত। উহাদের মধ্যে শ্বেতরাজার বাটী নামক স্তূপটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানও প্রাচীন ইষ্টক সমাকীর্ণ। অনেক অংশ খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে তথায় বহুসংখ্যক গৃহের ভিত্তি শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত আছে। ঐরূপ বহু ভিত্তির উপর তথাকার লোক গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহা ব্যতীত তথায় বহু সংখ্যক

২৮ নম্বর লাট মনিরটাটে আবিষ্কৃত প্রথন গড়

একটী বুদ্ধমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছিল। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখায় "বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন; তাহাতে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটীর এখন আর কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় না। উহার পাদপীঠের উপর কতকগুলি লিপি খোদিত ছিল।

২৬নং লাট কঙ্কনদীঘি

রায়দীঘির পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্বোল্লিখিত রায়দীঘি গাংএর উপর ২৬নং লাট কঙ্কনদীঘি অবস্থিত। আজিও এই বড় বড় মজা দীঘি, একটী পোস্তাবাধা পুষ্করিণী ও অনেক-গুলি কাল প্রস্তরের থাম, দরজার চৌকাট ও দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও একটী নবগ্রহ মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুমূর্ত্তিটী প্রায় ৫ ফিট উচ্চ এবং বহু কারুকার্য্য-মণ্ডিত। উহা এখন রায়দীঘিতে শ্রীফলতলী নামক স্থানে একজন কৃষকের বাটীতে আছে। নবগ্রহ মূর্ত্তিটীও খুব সুন্দর। উহা আমার নিকট আছে। সমগ্র প্রস্তরটী যাহার উপর নবগ্রহের মূর্ত্তি খোদিত আছে উচ্চতায় ১ ফুট ৭½ ইঞ্চি ও

দৈর্ঘ্যে ৩ ফিট ৩½ ইঞ্চি। প্রাচীন স্থাপত্যাদির নিদর্শন হইতে জানা যায় যে, এইরূপ নবগ্রহ-মূর্ত্তি প্রস্তর-খণ্ডে খোদিত করিয়া প্রাচীন কালে মন্দির ও তৎসংলগ্ন মণ্ডপাদির প্রবেশদ্বারের সরদাল রূপে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান কালে এই লাটের পশ্চিমে পূর্ব্বোক্ত রায়দীঘি গাংএর মধ্য হইতেও ভগ্ন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ, বালিপাথরের থালা, বাটী প্রভৃতি বহু দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও উহার পূর্ব্বতীরে স্থানে স্থানে প্রাচীন ইষ্টকরাশি বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া আছে।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত ও সংস্কৃত হইয়াছে। এখন ইহার যে চূড়া দেখা যায় উহা সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে Smith নামক জনৈক ইংরাজ সর্ব্বপ্রথম এই লাট হাসিল করিবার চেষ্টা করেন। প্রবাদ—তিনিই না কি গুপ্ত ধনের আশায় ইহার চূড়াটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। মন্দিরটী আটকোণা এবং এখনও প্রায় ৯০।৯৫ ফিট উচ্চ। ইহার প্রবেশ-পথটী পূর্ব্বমুখী এবং প্রায় ৯॥ ফিট বিস্তৃত। ইহাতে যে খিলান দেখা যায়, তাহা বর্ত্তমান

২৮ নম্বর লাট মনিরটাটে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় গড়

১১৬নং লাট জটার দেউল

কঙ্কনদীঘির পূর্ব্ব পার্শ্বে এই লাট অবস্থিত। ইহার মধ্যভাগ এখনও হাসিল হয় নাই। এখানে যে সকল প্রাচীন জনপদের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহার উত্তরাংশে অবস্থিত একটী উত্তুঙ্গ মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাই বর্ত্তমান সময় জটার দেউল নামে প্রসিদ্ধ। নিম্নবঙ্গে এ পর্য্যন্ত যে কয়টী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অথচ নূতন ধরণের মন্দির আছে ইহা তন্মধ্যে অন্যতম। বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী উচ্চ ভূমির উপর দণ্ডায়মান। সে কারণ বহু দূর হইতে লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল Ancient Monument Actএর বিধানানুসারে ইহা

কালের গির্জ্জার খিলানের ন্যায়। ইহার দেওয়ালের পরিসর প্রায় দশ ফিট্। অভ্যন্তর ভাগ প্রায় ৬।৭ ফিট্ নিম্নে অবস্থিত। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া তন্মধ্যে যাইতে হয়। ভিতরের দেওয়ালের গায়ে কয়েকটী গাঁথা ব্র্যাকেট্ আছে, ঐগুলির উপরে আলোর শিখার দাগ দেখা যায়। বোধ হয় ঐগুলির উপর প্রদীপ থাকিত। সমগ্র দেউলটী একপ্রকার কাল সিমেণ্ট দ্বারা পাত্‌লা ইটে গাঁথা। সাধারণ মন্দিরের ন্যায় ইহার পীঠ নাই, একেবারেই গর্ভগৃহের প্রাচীর প্রাঙ্গণ হইতে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার উপরে নানারূপ কারুকার্য্য ছিল; নানা স্থানের ইঁট খসিয়া গিয়া এখন ঐগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার

ক্ষুধিত পাষাণ

শিল্পী— শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দাস দস্তিদার

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS

উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী বড় কূয়ার চিহ্ন ও উত্তরাংশে অনেকগুলি পুরাতন ইঁট স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। পূর্ব্বে সেখানে ভূগর্ভে একটী গৃহের ভগ্নাবশেষ ছিল। ইহা বৌদ্ধ কি হিন্দু মন্দির তাহা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে ইহা হিন্দু মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু হাণ্টার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে বৌদ্ধ মন্দির বলিয়া স্থির করিয়াছেন (৮)। ইহা পূর্ব্বদ্বারী বলিয়া অনেকে ইহাকে হিন্দু মন্দির বলিতে রাজী নহেন। কিন্তু হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে দেখা যায় যে, হিন্দু দেব-মন্দিরও পূর্ব্বদ্বারী হইতে পারে। ইহার নাম জটার দেউল কেন এবং এখানে প্রতিষ্ঠিত শিবের নাম ছিল জটাধারী। সে কারণ ঐ নাম হইতে ইহার নাম জটার দেউল হইয়াছে। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত List of Ancient Monuments in the Presidency Division নামক পুস্তকে এই দ্বিতীয় প্রবাদের কথা লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার যশোহর খুলনার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, এই দেউলটীর বয়স ৪।৫ শত বৎসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহা একটী বিজয়-স্তম্ভ এবং সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্যের (৯)। তিনি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পুস্তক হইতে

২৭ নম্বর লাট রাধাকান্তপুরে আবিষ্কৃত তৃতীয় গড়

হইল তাহা ঠিক জানা যায় নাই। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে যে দুইটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এই—(১ম) ১১৬নং লাটের উত্তরাংশ যখন অরণ্যময় ছিল, সেই সময় সেখানে সময় সময় একটী ব্যাঘ্র দেখা যাইত; তাহার গায়ে জটা ছিল, সে কারণ উক্ত স্থান জটা নামে প্রসিদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য তথায় আবিষ্কৃত দেউলও জটার দেউল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (২য়)—এই মন্দির শিবের মন্দির ছিল জানা যায় না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহার সন্নিকটস্থ ভূমি খনন-কালে এই স্থানের তৎকালীন ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী সংস্কৃত অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রফলক প্রাপ্ত হন। তাহা পাঠে জানা গিয়াছে যে, ৮৯৭ শকাব্দে ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তচন্দ্র নামক একজন নৃপতি কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত তাম্রফলকখানির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখন কিছু জানা না গেলেও এই প্রদেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি

(৮) "In lot no 116 the ruins are said to be Buddhistic." Statistical Account. Vol. I. p. 381

(৯) যশোহর খুলনার ইতিহাস। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০১

ঐ সময় উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। List of Ancient Monuments in the Presidency Div'sion নামক পুস্তকেও উহার কথা আছে। উহাতে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এই—"The Deputy Collector of Diamond Harbour reported in 1875 that a copper plate discovered in a place little to the north of Jatar Deul fixes the date of the erection of this temple by Raja Jayantachandra in the year 897 of the Bengali Sak era corresponding to A. D. 975. The copper plate was discovered at the clearing of the jungle by the grantee Durgaprosad Chaudhury. The inscription is in Sanskrit and the date as usual was given in an enigma with the name of the founder". P. 2 Qes 3. বাঙ্গালার ইতিহাসে এই রাজা জয়ন্তচন্দ্রের নাম নূতন। ইতিপূর্ব্বে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে, বা খোদিত লিপিতে ইঁহার নাম পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই জয়ন্তচন্দ্র কে তাহা এখন জানিবার কোন উপায় নাই। প্রাচীন বিবরণাদি দেখিলে বোধ হয় ঐ সময় এই প্রদেশ দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পাল রাজত্বকালের প্রথম হইতেই এই প্রদেশ পাল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সময় আসমুদ্র বাঙ্গালার বদ্বীপ গোপাল দেব জয় করিয়াছিলেন। উহাতে লিখিত আছে যে, তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিবার পর আর যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজন নাই বলিয়া মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। উক্ত লিপি হইতে ইহাও জানা যায় যে, ঐ সময় গোপাল দেবের ভৃত্যবর্গ এই প্রদেশে অবস্থিত গঙ্গাসাগর সঙ্গমেও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (১০)। দক্ষিণ রাঢ়ে অজয় নদের তটে এই পাল রাজত্বকালে নির্ম্মিত একটী উত্তুঙ্গ মন্দির এখনও ইছাই ঘোষের দেউল নামে বর্ত্তমান আছে। তাহার সহিতও এই জটার দেউলের গঠন-প্রণালীর খুবই আশ্চর্য্য রূপ সাদৃশ্য দেখা যায়। ঐতিহাসিকগণের মতে উক্ত ইছাই ঘোষ প্রথম ধর্ম্মপালের পুত্রের সমসাময়িক ছিলেন (১১)। প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে, উক্ত পাল নরপতিগণের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে স্থাপত্যের খুবই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই জটার দেউল ও ইছাই ঘোষের দেউল প্রভৃতি ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরগুলি উহার চাক্ষুষ নিদর্শন। এই মন্দিরগুলির গঠন পদ্ধতির সহিত উড়িষ্যার প্রস্তর-নির্ম্মিত লিঙ্গরাজ মন্দির প্রভৃতি মন্দিরগুলির গঠনের যেরূপ মিল দেখা যায়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সময় বঙ্গদেশে মন্দিরগুলি কতকটা উড়িষ্যার মন্দিরের অনুকরণেই নির্ম্মিত হইত। জটার দেউলটী উড়িষ্যার মন্দিরের আকারে গঠিত হইলেও, ইহার কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। ইহার প্রবেশ-পথে যে খিলান দেখিতে পাওয়া যায়,

২৯ নম্বর লাট নলগোড়ার মঠবাড়ীর সন্নিকটে প্রাপ্ত অষ্টধাতু-নির্ম্মিত তিনটী মূর্ত্তি

(১০) গৌড় লেখমালা পৃষ্ঠা ৪২

(১১) শ্যামরূপা গড় নামক প্রবন্ধ। ৮ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

তাহা উড়িষ্যার মন্দিরগুলির প্রবেশ-পথের খিলানের ন্যায় নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উহা আকারে বর্ত্তমান কালের গীর্জ্জার খিলানের ন্যায়। হ্যাভেল্ সাহেব বলেন যে, বঙ্গীয় স্থপতিগণ প্রস্তরের পরিবর্ত্তে ইষ্টক ব্যবহার করিতেন বলিয়াই ঐরূপ খিলান নির্ম্মাণ করিতেন। আমাদের বোধ হয় ইদানীং চৌচালা পর্ণশালার অনুকরণে বঙ্গদেশে যে সকল মন্দির দেখা যায়, ঐরূপ আকারে মন্দির গঠনের প্রথা তৎকালে এ দেশে ছিল না, এবং উহার সূত্রপাত এতদ্দেশে পাল রাজত্ব-কালের পরে হইয়াছিল। গত বৎসর এই মন্দিরের সন্নিকটে কতকগুলি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি আকারে কতকটা হরতনের টেক্কার ন্যায়, এবং এক একটা ওজনে এক ভরি সাড়ে তিন আনা। ঐগুলির এক

২৮ নম্বর লাট মনিরটাটের দ্বিতীয় গড়ের নিকটে আবিষ্কৃত তিনটি প্রস্তর মূর্ত্তি

দিকে একটী হস্তীর ও তদুপরি একটী আরোহীর মূর্ত্তি, ও অন্য দিকে একরূপ Punch markএর ন্যায় চিহ্ন দেখা যায়। মুদ্রাগুলি মাটীর নিম্নে একটী হাঁড়ির মধ্যে রক্ষিত ছিল। ঐগুলির অবস্থা দেখিলে বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এরূপ মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আর অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এই দেউলের সন্নিকটস্থ ভূমি খননকালে দুইখানি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড বাহির হইয়াছে। একটীর উপরে লতাপাতার ন্যায় কারুকার্য্য ও কয়েকটী স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি খোদিত ছিল। এখনও উহাতে দুইটী স্ত্রীলোকের মূর্ত্তির কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা এতদিন তথাকার জমিদারের কাছারী বাটীতে পড়িয়া ছিল। গত বৎসর উহার উপরে খোদিত-লিপি আছে এই ধারণায় উহার একখানি ২৪ পরগণার সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ বার্জ্জ গভর্ণমেণ্ট Epigraphistকে দেখাইবার জন্য লইয়া গিয়াছেন। উহা ব্যতীত এই লাটে দুইটী বড় বড় ইষ্টক স্তূপও বাহির হইয়াছে। একটী স্তূপ এই লাটের পশ্চিম দিকে ছাটুয়া নামক খালের পূর্ব্বপারে ও অপরটী উক্ত দেউলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত আছে। প্রত্যেক স্তূপ প্রায় ২৫ ফিট উচ্চ হইবে এবং ২।৩ বিঘা ভূমির উপর দণ্ডায়মান। ইহাদের মধ্য হইতে যে ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে তাহা আকারে আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের ইঁট অপেক্ষা অনেক বড়।

১১৭।১২২নং লাট মইপিঠ, মাধবপুর ও দেলবাড়ী।

১১৬নং লাটের পূর্ব্ব সীমায় ঠাকুরাণী নদী প্রবাহিত। এই নদী পার হইলে ১১৭নং লাট মইপিঠে উপনীত হওয়া যায়। এখানকার সকল স্থান এখনও হাসিল হয় নাই। সম্প্রতি এখানে ঠাকুরাণী নদীর সন্নিকটে একটী বড় ইষ্টক-স্তূপ বাহির হইয়াছে। এই লাটের উত্তরে ১২২নং লাট অবস্থিত। ইহার নানা অংশে কয়েকটী ইষ্টক স্তূপ, মজা পুষ্করিণী, ও কূয়ার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ স্তূপগুলির মধ্যে মাধবপুর নামক স্থানে আবিষ্কৃত

একটী স্তূপই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই স্তূপটী হইতে একটী ব্রঞ্জের সুন্দর জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি, ও কয়েকটী প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা ব্যতীত দেলবাড়ী নামক স্থানে দুইটী ভগ্ন মন্দির ও একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাটের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দির দুইটীর মধ্যে একটী মন্দির প্রায় ভূমিসাৎ হইয়াছে, ও অন্যটী অর্দ্ধ-ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। উহাদের গঠন আমাদের দেশের সাধারণ মন্দিরের ন্যায়।

২৮নং ও ২৯নং লাট মনিরটাট্ ও নলগোঁড়া।

১২২নং লাটের পশ্চিমে ও পূর্ব্বোক্ত ১১৬নং লাটের উত্তরে ২৯নং লাট নলগোঁড়া ও তদুত্তরে ২৮নং লাট মনিরটাট্ অবস্থিত। এই লাট দুইটীর পশ্চিম সীমায় মনি নদী প্রবাহিত। এখানকারও নানা স্থানে বহু সংখ্যক ইষ্টক-স্তূপ বাহির হইয়াছে। ঐ সকল স্তূপের ইষ্টকগুলি আকারে আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের ইষ্টকের প্রায় দ্বিগুণ হইবে। ঐ সকল স্তূপের মধ্যে ২৯নং লাটে নলগোঁড়ায় মঠবাড়ী নামে যে স্তূপটী দেখা যায় উহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখনও উহা উচ্চে প্রায় ৩০ ফিট ও প্রায় তিন বিঘা ভূমির উপর দণ্ডায়মান। কিছুদিন পূর্ব্বে রাখাল হালদার নামক এক ব্যক্তি ইহার একাংশ খনন করিয়া কতকগুলি ইষ্টক গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ফলে ইহার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ভিতের কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উহা ব্যতীত এখানে একটী প্রকাণ্ড দীঘিও এই লাট হাসিলকালে অরণ্য মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দীঘিটার অধিকাংশ স্থান মজিয়া গিয়াছে। উহার পরিমাণ প্রায় ৪০ বিঘা হইবে। এখনও উহার চতুর্দ্দিকে প্রায় ৩০ ফিট উচ্চ মাটীর বাঁধ আছে। ইহার উত্তরে ২৮নং লাট মনিরটাটে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপ এখনও বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে একটা গড় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা বর্ত্তমান সময়ে তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ মাইল, প্রস্থে ১৩৫ ফিট ও উচ্চে প্রায় ২৫ ফিট। ইহা ধসভাঙ্গা নামক স্থানে মনি নদীর উপর আসিয়া শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশ উক্ত ধসভাঙ্গা নামক স্থানে মনি নদীর দক্ষিণ তীর হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বোক্ত ২৯নং লাটের উত্তরে নলগোঁড়া নামক স্থানের উত্তর সীমায় আসিয়া শেষ হইয়াছে। ইহাও দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল, প্রস্থে ১৪৫ ফিট ও উচ্চে প্রায় ৩০ ফিট হইবে। ইহার তৃতীয়াংশ এখন মনি নদীর পশ্চিমে খাড়ি আবাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ১৪নং লাট রাধাকান্তপুরের মধ্যে অবস্থিত। ইহাও দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল, প্রস্থে ১৪৫ ফিট ও উচ্চে ৪০ ফিট হইবে। ২নং গড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত মঠবাড়ী নামক স্থানের সন্নিকটস্থ ভূমি খনন কালে ৫টী ব্রঞ্জের, ও দুইটী কাল প্রস্তরের-মূর্ত্তি, ও একটী কাল প্রস্তরের কারুকার্য্য খোদিত নূতন রকমের হংসাসন পাওয়া গিয়াছে। ঐ ব্রঞ্জের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে দুইটী বিষ্ণু, দুইটী বৌদ্ধ দেবী হারিতীর ও একটী উমা মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে। প্রবাদ—অরণ্য হাসিলের পর ঐ গড় ৩টীর উপর বহু পুরাতন হরিতকী, বট প্রভৃতি বৃক্ষের সারি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। স্থানীয় লোকে এই গড়টীকে জয়নারাণ হাতীর গড় বলে। উক্ত ধসভাঙ্গা নামক স্থানের অবস্থা ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে এই গড় ৩টী একখণ্ড ছিল। পরবর্ত্তী কালে কোন সময় মনি নদীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উহা ভাঙ্গিয়া গিয়া ঐরূপ ৩ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার যশোহর-খুলনার ইতিহাসে এই গড়কে প্রতাপাদিত্যের একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এবং কল্পনা-বলে উক্ত মনি নদীর নাম হইতে ইহার মনিদুর্গ নাম দিয়াছেন। গড় ৩টীর অবস্থা দেখিলে এবং দ্বিতীয় গড়ের সন্নিকটস্থ স্থানে আবিষ্কৃত উক্ত মূর্ত্তিগুলি দেখিলে ইহা প্রতাপাদিত্যের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

১২৭নং লাট গরাণবস্থ ও ১২৮নং লাট ভরতগড়

১২২ নং লাটের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ৪২ ও ৪৩ নম্বর লাট অবস্থিত। এই লাট দুইটীর পূর্ব্ব দিকে মাতলা নদী প্রবাহিত। মাতলা নদী হইতে ১২৮ ও ১২৭ নম্বর লাটের মধ্য দিয়া গরাণবস্থ বা শিয়ালফেলী নামক একটী খাল দক্ষিণ দিকে গিয়া ১২৮ নম্বর লাটের পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমায় প্রবাহিত বিদ্যা নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। এই খালের দক্ষিণ ধারে ১২৭ নম্বর লাটে একটী বৃহৎ ইষ্টক-স্তূপ অরণ্য মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানীয় লোকের নিকট ইহা বিরিঞ্চির মন্দির নামে পরিচিত। ১২৭ নম্বর লাটের মধ্যভাগ এখনও গভীর অরণ্যাবৃত হইয়া আছে। এই

সকল স্থান এখন বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত সন্দেশখালি থানার অধীন। উক্ত গরাণবসু বা শিয়ালফেলী খালের পূর্ব্ব দিকে ১২৮ নম্বর লাট। এই লাটেরও দক্ষিণাংশ এখনও হাসিল হয় নাই। এখানে ঐ শিয়ালফেলী খালের পূর্ব্ব দিকে একটী স্থানকে ভরতগড় বলে। এই স্থানটী পূর্ব্বে ইষ্টক-প্রাচীরও পরিখা-বেষ্টিত ছিল। স্থানে স্থানে উহার নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। খাল হইতে কিছু দূরে গমন করিলে একটী প্রকাণ্ড ইষ্টক-স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তূপটী আকারে প্রায় নলগোড়ার পূর্ব্বোল্লিখিত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন যে, পাল রাজত্বের প্রাক্কালে মাৎস্যন্যায়ের সময় এই প্রদেশে ভরত নামে না কি একজন নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি অনুমান করেন যে, সেই ভরত রাজা ও এই ভরত রাজা সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি (১২)। তাঁহার এই উক্তি কতদূর প্রামাণ্য তাহা বিবেচনা-সাপেক্ষ। এখানে একটী ছোট বুদ্ধমূর্ত্তি ভূগর্ভ খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উহা একটী বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই স্থান বর্ত্তমান সময়ে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত সন্দেশখালি

৩০।৩২।৩৩ নম্বর লাট বাইশহাট্টায় আবিষ্কৃত মঠবাড়ী নামক সুবৃহৎ ইষ্টক স্তূপ

মঠবাড়ীর ন্যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে এখানেও ২।৩টী কাল প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ মূর্ত্তিগুলি এখন তথায় নাই, স্থানান্তরিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকে এখানকার উক্ত স্তূপটাকে ভরত রাজার মন্দির বলে। খুলনা জিলাতে দৌলতপুরের ১২।১৩ মাইল দক্ষিণে ভদ্রনদের কূলে ভরত রাজার দেউল নামক প্রসিদ্ধ একটী প্রকাণ্ড ইষ্টক-স্তূপ আছে। ইহার সহিত উক্ত ভরত রাজার দেউলের কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। শ্রীযুত থানার অধীন। এই সকল স্থান হইতে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হাড়োয়া থানার অধীন বালাণ্ডা পরগণা অধিক দূরবর্ত্তী নহে। এই বালাণ্ডা পরগণা খুবই প্রাচীন স্থান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এখানে বঙ্গের পঞ্চ বিভাগের অন্যতম বাগড়ী বা বাল বল্লভীর প্রধান নগরী ছিল (১৩)। তিনি বলেন, "প্রায়

(১২) যশোহর খুলনার ইতিহাস। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯

(১৩) Introduction to Sandhyakar Nandi's Ram-

হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ২৪-পরগণার নানা স্থানে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা তখন সেখানে পুঁথি পাঁজি লিখিতেন ও ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এমন কি এখন যে হাতীয়াঘর ও বালাণ্ডা পরগণা নগণ্য পরগণার মধ্যে গণ্য, সেখানেও বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল ও পণ্ডিতেরা তথায় প্রজ্ঞাপারমিতার চর্চ্চা করিতেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।" এই ১২৮ নম্বর লাটের উত্তরে ১২৯ নম্বর লাট হাড়ভাঙ্গা আবাদ। তথায় একটা প্রকাণ্ড দীঘি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার পরিমাণ প্রায় ৩০ বিঘা হইবে। উহার পূর্ব্ব দিকে ১৩০ নম্বর লাট। তথায়ও একটি পোস্তা-বাঁধা পুষ্করিণী অরণ্য মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে। উহাকে স্থানীয় লোকে গলার দড়িয়ার পুকুর বলে।

নেতিধোপানী নদী

এই সকল স্থানের দক্ষিণে উক্ত সন্দেশখালি থানার অধীন ১২৭নং লাটের নিম্নে নেতিধোপানী নামে একটা নদী দেখা যায়। উহা পূর্ব্ব-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত রেনেলের মানচিত্রে ও তৎপরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত Ellison এর সুন্দরবনের মানচিত্রে উক্ত নেতিধোপানী নদী ঐ স্থানেই অঙ্কিত আছে। পদ্মপুরাণোক্ত মনসা-মঙ্গল লইয়া বেহুলার কথা অনেক প্রাচীন কবি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দীনেশ বাবু মনসার ভাসান রচয়িতা ৬২ জন কবির নাম করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সকল মনসার ভাসান রচয়িতৃগণ তিন শত হইতে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই উপাখ্যানগুলি রচনা করিয়াছিলেন (১৯)। এই সকল উপাখ্যানরচয়িতাদিগের মধ্যে ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রাচীন কালে চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গা সুন্দরবনে বাণিজ্য করিতে আসিত। এই সকল পুস্তকে দেখা যায় যে, নেতি-ধোপানীর ঘাটে মনসার পূজা প্রথম প্রচারিত হয়। উক্ত নেতিধোপানী নদীর নিকট উক্ত নেতিধোপানীর ঘাট নামক প্রাচীন স্থান থাকা অসম্ভব নহে।

৩০।৩২।৩৩নং লাট বাইশহাট্টা

ইতঃপূর্ব্বে আমরা, এই সকল স্থানের পশ্চিমে ২৮নং লাট মনিরটাটে যে প্রকাণ্ড গড় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কথা বলিয়াছি। এই ২৮নং লাটের উত্তরাংশে ৩০।৩২।৩৩ নং লাট বাইশহাট্টা আবাদ অবস্থিত। এখানে নালুয়া গাঙ্গের উত্তরে ঘোষের চক নামক স্থানে দুইটা ইষ্টক-স্তূপ আছে। ঐ দুইটা স্তূপ বর্ত্তমান সময়ে মঠবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। উহাদের মধ্যে একটা স্তূপ প্রায় ৮০ফিট উচ্চ ও প্রায় ৪।৫ বিঘা ভূমির উপর দণ্ডায়মান। ইহার উপর এখন অনেকগুলি বড় বড় বৃক্ষ দেখা যায়। ইহার পশ্চিমে আর যে একটা স্তূপ আছে, উহা ইহা অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট। কিছুদিন পূর্ব্বে মজিলপুর-নিবাসী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ ইহার উপরিভাগের একাংশ খনন করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি তন্মধ্য হইতে ২।৩টী ছোট প্রস্তর মূর্ত্তি ও কয়েকটা প্রস্তরের চৌকাট পাইয়াছিলেন। ঐ চৌকাটগুলির মধ্যে একটার পশ্চাতে লিপি উৎকীর্ণ ছিল। সেই লিপিযুক্ত প্রস্তরফলকটী এখন তাঁহার কাছারী বাটীর পুষ্করিণীতে আছে। আমি গত বৎসর বৈশাখ মাসে উহা তোলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম ; কিন্তু উহা জলের মধ্যে এরূপ গভীর ভাবে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐ সময় উহা তুলিতে পারা যায় নাই। রেনেলের ১৭৭৮।৭৯ খৃষ্টাব্দের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের মানচিত্রে নালুয়া গাঙ্গের উপর অরণ্য মধ্যে প্যাগোডা বলিয়া এই স্তূপ দুইটার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় বড় স্তূপটী জটার দেউলের ন্যায় একটা উত্তুঙ্গ মন্দির ছিল। এবং রেনেলের জরিপকালে উহা বর্ত্তমান সময়ের মত একবারে ভূমিসাৎ না হইয়া তখনও মন্দিরাকারে অরণ্য মধ্যে ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। সম্ভবতঃ সেই জন্য তাঁহার মানচিত্রে Pagoda বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল। ইহার অনতিদূরে ২।৩টী পুরাতন কূয়ার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ঐ স্তূপ দুইটীর সন্নিকটে কৃষ্ণনগর নামক স্থানেও পূর্ব্বে অরণ্য মধ্য হইতে একটী বড় ইষ্টক-স্তূপ বাহির হইয়াছিল। উহার নিম্নাংশ এখনও বিদ্যমান আছে। উহার উপরিভাগের ইট লইয়া মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুত শিবদাস দত্ত মহাশয়ের কাছারী-বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। শিবদাস বাবু বলেন যে, ঐ স্তূপ খনন কালে উহার মধ্য হইতে কয়েকটী কাল প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি, চৌকাট, থালা ও কতকগুলি স্বর্ণ-নির্ম্মিত

Charit, By M. M. Haraprosad Sastri. Memoirs of the Asiatic Society. Vol. III. page 14.

(১৯) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ৩৮০।৩৮৪

দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। ঐ সকল দ্রব্য এখন কোথায় আছে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতার সময় ঐ স্তূপ খনন কালে ঐ সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। ৩০।৩২।৩৩ নম্বর লাটের উত্তরে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে খনিয়া সাহাজাদাপুর নামক একটী স্থান আছে। প্রাচীন কালে গঙ্গা ইহার পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। এখানে মুসলমান আমলের পূর্ব্বে

সরিষাদহে প্রাপ্ত প্রস্তর স্তম্ভ

৪।৫ শত ঘর চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণের বাস ছিল। প্রবাদ, তাঁহাদেরই বংশধরগণ উক্ত স্থানের খনিয়া নামানুসারে আজিও বঙ্গদেশে "খনের চাটুয্যে" নামে প্রসিদ্ধ। এখানেও কয়েকটী প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি ও অনেকগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত পূজার দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তারক সর্দ্দার নামক এক ব্যক্তি একটী বাগান খনন কালে ঐগুলি পাইয়াছে।

সরিষাদহ

এই স্থানের ২।৩ ক্রোশ উত্তরে সরিষাদহ নামক আর একটি প্রাচীন স্থান আছে। ভাগীরথী নদীর মজাগর্ভ গঙ্গার বাদা ইহারও পশ্চিমে অবস্থিত। কিছু দিন পূর্ব্বে এই স্থানের দক্ষিণাংশে উক্ত গঙ্গার বাদার সন্নিকটে ভূমি খনন কালে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী প্রায় চারি ফিট উচ্চ সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা এখন কলিকাতার মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ইহার এক দক্ষিণ হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম, বাম হস্তে শঙ্খ, অন্যতর দক্ষিণ হস্ত একটী দেবী-মূর্ত্তির মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গদার উপর ও অন্যতর বাম হস্ত একটী দেবমূর্ত্তির পশ্চাৎস্থিত চক্রোপরি স্থাপিত। এই দেবমূর্ত্তিটী একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান ও বহু অলঙ্কারে সজ্জিত। দক্ষিণ দিকস্থ পূর্ব্বোক্ত দেবীমূর্ত্তিটীও ঐ ভাবে একটী প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা ও বহু অলঙ্কারে ভূষিতা। ইহাদের দুইদিকে দুইটী দণ্ডায়মানা সহচরীর মূর্ত্তি আছে। বিষ্ণুমূর্ত্তিটীও বহু অলঙ্কারে ভূষিত ও একটী বড় প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দণ্ডায়মান। উহার মস্তকের চতুর্দ্দিকে গোলাকারে তেজপুঞ্জ। গলদেশে আজানুলম্বিনী বনমালা ও নাভিদেশাবলম্বী যজ্ঞোপবীত। পাদপীঠে মধ্যস্থলে গরুড় সব্যজানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় উপবিষ্ট। গরুড়ের উভয় পার্শ্বে পাদপীঠের উপর প্রস্ফুটিত পদ্মশ্রেণী। প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থাদির মধ্যে কেবল মাত্র হেমাদ্রি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই এই রূপ বিষ্ণুমূর্ত্তির পরিচয় দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থের নির্দ্দেশানুসারে ইহার নাম বাসুদেব এবং বামপার্শ্বস্থ দেবমূর্ত্তিটী স্বয়ং চক্র, উহার নাম লম্বোদর, ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দেবীমূর্ত্তিটী গদাদেবী, তাঁহার নাম সুলোচনা। যে স্থানে ঐ মূর্ত্তিটী পাওয়া যায়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তথায় ভূগর্ভ খনন কালে একটী কারুকার্য্য-খোদিত প্রায় ১০ ফিট উচ্চ কাল প্রস্তর-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজিও উহা সেখানে একটী বট বৃক্ষের নিম্নে পড়িয়া আছে। উহার সমগ্র অংশটী একটী প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া নির্ম্মিত। শুনা যায়, ঐ সময় তথাকার ভূগর্ভে ঐ রূপ ৩।৪টী প্রস্তর-স্তম্ভের অংশ দেখা গিয়াছিল। আমাদের বোধ হয় ঐ থামগুলি উক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির যে মন্দির ছিল, তাহারই অঙ্গীভূত ছিল। ইহার সন্নিকটে এক স্থানে ইষ্টক-নির্ম্মিত একটী পুরাতন ঘাটের ভগ্নাংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ—সেখানে

ভূগর্ভে বহু সংখ্যক ইষ্টকরাশি প্রোথিত আছে। স্থানটীর অবস্থা দেখিলে উক্ত প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয় না। এই স্থানের উত্তর দিকে মজিলপুরের জমিদার স্বর্গীয় সুরেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাছারী বাটী অবস্থিত। এই কাছারী-বাটীর সংলগ্ন একটী পুষ্করিণী সংস্কার কালে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী কাল পাথরের প্রায় ২ ফিট উচ্চ সুন্দর নৃসিংহ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ১৩৩৪ সালে উহা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আমার নিকট হইতে কলিকাতা মিউজিয়ামে লইয়া গিয়াছেন। উহা ব্যতীত এই স্থানে একটী প্রায় তিন ফিট উচ্চ কাল প্রস্তরের পেনেট সহ শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নিম্নাংশ ছয়কোণা। এই স্থানের উত্তর দিকে কাজির ডাঙ্গা নামক একটী জঙ্গলাবৃত স্থান দেখা যায়। এখানেও কিছু দিন পূর্ব্বে একটী নূতন ধরণের বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আজও অন্য কোথাও এরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। লতা পাতার ন্যায় গুটান কারুকার্য্য-খোদিত একটী চক্র মধ্যে দ্বাদশটী অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত পদ্মপল্লব। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রূপ কারুকার্য্য-খোদিত একটী ক্ষুদ্রতর চক্র মধ্যে গরুড়োপরি দণ্ডায়মান একটী ক্ষুদ্র বিষ্ণুমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটীর পাদদ্বয় গরুড়ের দুইটী পক্ষোপরি স্থাপিত। দক্ষিণোর্দ্ধ ও বামোর্দ্ধ হস্তদ্বয় মস্তকোপরি অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় ন্যস্ত এবং দক্ষিণাধঃ হস্তে গদা ও বামাধঃ হস্তে চক্র। গলে আজানুলম্বিত বনমালা, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তচতুষ্টয়ে বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার ও মস্তকে পাগড়ী। নিম্নে গরুড় দক্ষিণ ও বামজানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় উপবিষ্ট। সমগ্র চক্রটী দ্বাদশটী প্রস্ফুটিত পদ্মশোভিত একটী কীলকের উপর রক্ষিত। উহা বসাইবার জন্য একটী স্বতন্ত্র গোলাকার পদ্মাসন আছে। উহারও উপরিভাগে দ্বাদশটী প্রস্ফুটিত পদ্মের পল্লব। মূর্ত্তিটীর বিশেষত্ব এই যে, উহার উভয় দিকই সমভাবে খোদিত। উহা দেখিলে বোধ হয় যে উহা একটী স্তম্ভোপরি স্থাপিত ছিল এবং উভয় দিক হইতেই লোকে সমভাবে দেবদর্শন করিত। এই কাজির ডাঙ্গা নামক স্থানটী বহু প্রাচীন ইষ্টকে সমাকীর্ণ। আমার বিশ্বাস, এই স্থান খনন করিলে এখনও প্রাচীন দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। ইহার উপর মুসলমানগণের কবর আছে বলিয়াই লোকে এই স্থানটী এখনও খনন করিতে সমর্থ হয় নাই।

দ্বারির জাঙ্গাল

সরিষাদহের পূর্ব্বদিকে দ্বারির জাঙ্গাল নামক একটী প্রাচীন পথ দেখা যায়। ঐ পথটীও অরণ্য মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালে ইহা কালীঘাট হইতে ছত্রভোগ দিয়া রায়দীঘির সন্নিকট পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ইহা লালুয়া পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে ও তাহার পর ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে লোকে ইহারই উপর দিয়া গঙ্গাসাগরে আসিত। তখন ইহাই

চক্রমধ্যস্থ গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তি

এতদঞ্চলে আসিবার একমাত্র পথ ছিল। ইংরাজ আমলে কুল্পী রোড নামক প্রসিদ্ধ রাস্তা নির্ম্মিত হইবার পর ইহা ক্রমশঃ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে ও মেরামত অভাবে নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচীন কালে ইহাই হরিদ্বার-গঙ্গাসাগর রাস্তা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রবাদ—তখন হরিদ্বার হইতে লোকে ছত্রভোগ দিয়া এই পথেই গঙ্গাসাগরে যাইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজেরা ইহাকে Pilgrims' Track বলিত। পূর্ব্বে ইহাই কালীঘাট হইতে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাত্রী-পথ রূপে উত্তর দিকে বর্ত্তমান কলিকাতা সহরের উত্তরাংশে অবস্থিত চিৎপুর রোড অভিমুখে গিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে ইহার এই উত্তর অংশেরই উপর বর্ত্তমান কালের কলিকাতা সহরের ট্রাম-নিনাদিত চৌরঙ্গী রোড ও চিৎপুর রোড নির্ম্মিত হইয়াছে (১৫)।

১৫) কলিকাতা—সেকালের ও একালের।
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠা—২১৮। ২১৯

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত ও কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরণামৃত পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইহারই উপর দিয়া জাহ্নবীর তীরে তীরে চৈতন্যদেব আটিসারা গ্রাম হইতে নীলাচল যাইবার জন্য ছত্রভোগে আসিয়াছিলেন; যথা—

"গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে॥" চৈ চঃ

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৩)

প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত এক ক্লাসেই পড়িয়াছে। সে যে সীতার ভাই, সে পরিচয় জ্যোতির্ম্ময় কখনও পায় নাই, প্রশান্তও দেয় নাই। সে মনে মনে একটা কৌতুককর কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। যখন বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা আসিবে, এবং তাহার পর বররূপে জ্যোতির্ম্ময় যখন সীতাকে বিবাহ করিতে বসিবে তখন অকস্মাৎ সে শ্যালকরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভগিনীপতিকে আশ্চর্য্য করিয়া দিবে, এই ছিল তাহার অভিপ্রায়।

এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্যই সে এত কাল রামনগরে সীতাকে একবার দেখিতেও যায় নাই। তবে পত্রাদি কখনও বন্ধ থাকে নাই; এবং সেই সব পত্রে সে তাহার ডাকনাম একটা ব্যবহার করিত,—সেই পোষাকি ভব্যযুক্ত নামটা ব্যবহার করিত না।

দেবযানীর সহিত জ্যোতির্ম্ময়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সীতার পিতার মৃত্যুর পরেই যখন বিহারীলাল সীতাকে রামনগরে লইয়া যাইবার জন্য নিজের ম্যানেজার এবং সীতার সম্পর্কীয় দাদা সুশীল বাবুকে পাঠাইয়া দিলেন, তখন প্রশান্ত বা তাহার মাতা আপত্তি করিতে পারিলেন না। বাগ্‌দত্তা এই মেয়েটীর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তাঁহারা জানিতেন; সেই জন্যই প্রশান্ত নিজে উদ্যোগী হইয়া সীতাকে রামনগরে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

দেবযানীর সহিত জ্যোতির্ম্ময়ের বিবাহের পত্রখানা প্রশান্তের বুকে একটা অননুভূত যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রশান্ত দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। আজ তাহার মনে পড়িল—মা বলিয়াছিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে সীতাকে রামনগরে পাঠানো উচিত নয়। তিনি প্রথমটায় তাহাকে যাইতে দিতে রাজি হন নাই,—কেবলমাত্র প্রশান্তের জেদে পড়িয়া তিনি মত দিয়াছিলেন। সীতাকে প্রত্যাখ্যান করার অপমান আর কাহারও প্রাপ্য নয়, একমাত্র তাহারই। সীতা বালিকা মাত্র,—তাহাকে যাহা বলা হইয়াছে, সে তাহাই করিয়াছে। প্রশান্ত যদি বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া তাহাকে না পাঠাইয়া দিত, সীতা যাইত না,—এই দারুণ অপমান তাহা হইলে কাহাকেও সহ্য করিতে হইত না।

এ বিবাহে প্রশান্ত যে উপস্থিত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। নিদারুণ অপমানে মর্ম্মাহত প্রশান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, জীবনে সে আর কখনও জ্যোতির্ম্ময়ের মুখদর্শন করিবে না। বিবাহের পরে বিলাত যাইবার আগে জ্যোতির্ম্ময় তাহার প্রিয়তম বন্ধুকে ডাকিবার জন্য দুবার লোক

পাঠাইয়াছিল; অবশেষে নিজে একদিন তাহার মেসে গিয়াছিল,—প্রশান্ত তাহার সহিত দেখা করে নাই। এই বর্ব্বর প্রকৃতির লোকটার সহিত সে বন্ধুত্ব করিয়াছিল, এবং ইহারই বাড়ীতে সে নিজের বোনকে পাঠাইয়া দিয়াছে, ইহাই ভাবিয়া সে ভারি অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা পাইয়াই সে সীতাকে এক পত্র দিল—তোমার আর ওখানে থাকার আবশ্যকতা নাই, আমি শীঘ্রই তোমাকে লইয়া আসিব।

এই পত্র পাইয়া সীতা উত্তর দিল, সে এখন যাইতে পারিবে না; কারণ, জ্যোতির্ম্ময়ের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ও বিলাত যাওয়ার কথা শুনিয়া তাহার মা ও দাদু অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা একটু সুস্থ না হইলে সে যাইতে পারিতেছে না।

এই পত্র পাইয়া প্রশান্ত ভারি চটিয়া গিয়াছিল। যাহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদের জন্য সীতার এ মাথা-ব্যথা কেন?

সে সীতার বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। তাহার এমন বোন, ইহার না কি পাত্রের অভাব। জ্যোতির্ম্ময়ের চেয়ে অনেক ভাল ছেলে আছে যাহারা সীতার মত মেয়েকে পত্নীরূপে পাইলে নিজেদের জীবন সার্থক মনে করে।

প্রশান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রণব প্রশান্তের সহিত প্রায়ই বিনয়বাবুর বাড়ী যাতায়াত করিত,—সেই সময়ে সে সীতাকে দেখিয়াছিল। একদিন প্রশান্তের মুখে সে শুনিয়াছিল সীতা বাগ্‌দত্তা; তাহাতেই সে সাহস করিয়া কোন কথা একদিনও বলিতে পারে নাই। প্রশান্তের মুখে সীতার বিবাহ-ভঙ্গের কথা শুনিয়া সে প্রথমটা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার পর সব ব্যাপার শুনিয়া সে প্রথমে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে জ্যোতির্ম্ময়কে গালাগালি করিল। তাহার পর সলজ্জ ভাবে জানাইল, সে সীতাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। যদি প্রশান্তের মত হয়, তবে সে আগামী মাসের প্রথমেই এই বিবাহ কার্য্যটা শেষ করিয়া ছুটি লইয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশান্ত ভারি খুসি হইয়া বন্ধুকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। প্রণব ধনীর সন্তান, সংসারে মা ব্যতীত আর কেহ নাই। মায়ের অত্যন্ত আদরের সন্তান বলিয়া তাহার আবদারও যথেষ্ট ছিল, সে যাহা ধরিত তাহা করিতই।

প্রণবের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া ফেলিয়া, প্রশান্ত সীতাকে আর একখানা পত্র দিয়া, তাহার উত্তর পাইবার প্রতীক্ষা না করিয়াই প্রণবকে লইয়া রামনগরে রওনা হইল।

তাহাদের দুইটী বন্ধুকে দেখিয়া বিহারীলালের মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি একটী কথাও বলিতে পারিলেন না নির্ব্বাকে শুধু চাহিয়া রহিলেন। প্রশান্ত তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেও ভুলিয়া গেলেন।

খানিক বাদে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন, "সীতা দিদি কাল তোমার পত্র পাওয়া মাত্র উত্তর দিয়েছে, সে পত্র বোধ হয় তুমি পাও নি প্রশান্ত?"

প্রশান্ত নম্রভাবে বলিল, "না; আপনাদের এখান হতে পত্র যায় তিন দিনে,—সম্ভবতঃ সে পত্র কাল পাওয়া যাবে। কিন্তু পত্র দেওয়ার আর দরকার ছিল না, —আমি লিখেছিলুম তো যে আজ আমরা এখানে এসে পৌঁছাব?"

বিবর্ণ মুখে বিহারীলাল বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ,—তাই বটে, তাই বটে। আচ্ছা, বস তোমরা,—আমি ভেতরে যাচ্ছি, দিদিকে খবর দেব এখন।"

আদেশের প্রতীক্ষায় রাখাল দরজার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাড়াতাড়ি সে অগ্রসর হইয়া আসিল। কিন্তু বিহারীলাল তাহাকে আদেশ না দিয়া নিজেই উঠিলেন। আসল কথা—সীতা চলিয়া যাইবে এই কথাটা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি খানিক নির্জ্জনে থাকিয়া অশান্ত মনকে সান্ত্বনা দিতে চান, মুখ-চোখের বিকৃত ভাবটা বদলাইয়া ফেলিতে চান।

রাখাল তাড়াতাড়ি খড়ম-যোড়া ফিরাইয়া দিল,—তিনি খড়ম পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। * * *

বেলা তখনও নয়টা বাজে নাই; সীতা সবেমাত্র স্নান সমাপ্ত করিয়া সাজি ভরিয়া বাগান হইতে পূজার ফুল তুলিয়া আনিতেছিল। আজ ঘুম হইতে উঠিতে তাহার অন্য দিন অপেক্ষা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—বাড়ীর একটী ভৃত্যের অসুখ লইয়া কাল তাহাকে রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হইয়াছিল। আজ যখন সে শয্যাত্যাগ করিয়াছিল, তখন বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। ঈশানীর আদেশে কেহ

তাহাকে ডাকে নাই,—কর্ত্তাবাবুও আজ প্রাতে সীতার দেখা পান নাই।

সম্মুখেই বিহারীলালকে দেখিয়া সীতা থমকিয়া দাঁড়াইল, —"এ কি দাদু, আপনি আজ এখনিই চলে—" বলিতে বলিতে সে থমকিয়া গিয়া তাঁহার মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিল; উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আপনার মুখখানা ও-রকম দেখাচ্ছে কেন দাদু, অসুখ হয় নি তো?"

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "না ভাই, অসুখ করে নি,—তোর দাদা তোকে এখান হতে নিয়ে যেতে এসেছে সীতা, তাই বলতে এসেছি।"

"আমার দাদা—"

চকিতে সীতা যেন সব বুঝিতে পারিল,—কেন যে দাদুর মুখখানা অতটা অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল। সীতার মুখখানা বড় মলিন হইয়া উঠিল। হাতের সাজি নামাইতে ভুলিয়া গিয়া সে উদাস দৃষ্টিতে কোন্ দিকে তাকাইয়া রহিল।

বেদনাভরা সুরে বৃদ্ধ বলিলেন, "হয় তো কালই তোকে নিয়ে যাবে ভাই,—কাল হতে আর তোকে পূজোর যোগাড় করতে হবে না, বুড়োর সেবাও করতে হবে না। তুই অনেক কাযের দায় হতে মুক্তি পাবি ভাই, কিন্তু আমি থাকব কি নিয়ে একবার ভাব দেখি? আমার বলতে যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে, সবই যদি তুই নিয়ে যাস দিদি, কি করে এই শূন্যতা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব?"

সুরটা বড় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল,—বিহারীলাল তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

"বলতে পারিস সীতা, কত মহাপাপ করেছি, কার বুক হতে শ্রেষ্ঠ ধন ছিনিয়ে নিয়েছি, যার শাস্তি আমায় এমন করে বইতে হচ্ছে? সে মহাপাপ আমার এ জন্মের, না পূর্ব্বজন্মের, একবার বলে দে তো ভাই। কত পাপ করেছি যার ফলে আমায় নিজের হাতে বুকের এক-একখানি পাঁজরা খসিয়ে দিতে হচ্ছে? আমার বলে যাকে ধরি, সেই ফাঁকি দিয়ে চলে যায়,—রেখে যায় দগ্ধ করবার জন্যে স্মৃতিখানা। ওরে ভাই, যদি তোদের সব নিয়েই তোরা চলে যাবি, স্মৃতি কেন দিয়ে যাস বল্ দেখি? তোদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোদের পায়ের দাগও মুছে নিয়ে চলে যা। আমায় যেন সেই দাগ দেখে জীবনান্ত-কাল পর্য্যন্ত হাহাকার করে কেঁদে না বলতে হয়—আমিই একা পড়ে আছি। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পূর্ণতা, সব চলে গেছে,—এখন যা পড়ে আছে সব শূন্য—বিরাট ফাঁকি। ওরে, তোরা তোদের সব নিয়ে চলে যা, সব নিয়ে যা,—আমি একলা পড়ে থাকব আপনাকে নিয়ে।"

বৃদ্ধের চোখের জল আর কিছুতেই আটক রহিল না, হঠাৎ তাহা উপচাইয়া শুষ্ক গণ্ড বাহিয়া পড়িল। আত্মগোপন মানসে তিনি তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্ত্তী নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেই ভাঙ্গা বুকের বেদনাভরা কথাগুলা বাতাসে ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়া সীতার বুকে আঘাত করিতে লাগিল। অন্যমনা সীতার হাত হইতে ফুলভরা সাজি মাটীতে কখন পড়িয়া গিয়া চারিদিকে ফুলগুলি ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সীতা ডাকিল,—"দাদু—"

দাদু তখন দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর শুইয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া ছিলেন। যদি তিনি দুর্ব্বলচিত্তা নারী হইতেন, কাঁদিয়া মনের ভার কতকটা হাল্কা করিতে পারিতেন। হায় রে, বুক ফাটিয়া যায়, তথাপি তিনি তো মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে পারিলেন না!

আজ অনেক দিনের পুরাতন কথা মনে পড়িতেছিল—আমিই শুধু রইনু বাকি। বুকের হাহাকার গোপন থাকিতে চাহিতেছিল না, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছিল। দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষটা চাপিয়া ধরিয়া মুক্তকণ্ঠে তিনি ডাকিতে লাগিলেন—"ওরে, তোরা কেউ এতটুকু দয়া করলি নে, সবাই আমায় ফেলে একে একে পালিয়ে গেলি? বুড়ো বাপকে তোদের এখানে ফেলে রেখে গেলি—সে কি শুধু এই জ্বালা-যন্ত্রণাগুলো সইবার জন্যেই? এখন আমায় ডেকে নে তোরা,—তোদের পাশে আমায় নে,—আমি আর সইতে পারছি নে।"

হায় রে, তিনি তো তাহাদের কোন দিন এতটুকু পীড়ন করেন নাই। কত পিতা সন্তানকে তিরস্কার করেন, প্রহার করেন,—তিনি কোন দিনই তাহাদের একটা কথাও বলেন নাই। তবে কেন তাহারা চলিয়া গেল? বুকের যত স্নেহ, যত ভালবাসা, সবই নিঃশেষে তাহাদের উপর ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তখন স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই—তাহারাই তাঁহাকে এমন করিয়া ফাঁকি দিয়া পলাইবে।

আজ তাঁহার অন্তরের অন্তরতম স্থানে ধ্বনিত হইতেছিল—

আমার বলে ছিল যারা
আর তো তারা দেয় না সাড়া
কোথায় তারা—কোথায় তা'রা
বারে বারে কারে ডাকি ?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, এগারটা প্রায় বাজে, এখনও পূজার যোগাড়ও হয় নাই, তিনি পূজা করিবেন কখন? এ বাড়ীতে এ রকম তো কখনও হয় নাই! আজ সীতা মা কি এখানে নাই ?

সীতা ধড়্ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাই তো—এ ফুল সব যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—দেবপূজায় আর লাগিবে না। সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আবার ফুল তুলিতে ছুটিল। তাড়াতাড়ি কতকগুলা ফুল তুলিয়া আনিয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে পূজার যোগাড় করিয়া দিল।

বৃদ্ধ যদুনাথ ভট্টাচার্য্য আসনের উপর বসিয়া প্রীত মনে শিখা দুলাইয়া বলিলেন, "তাই তো বলি, সীতা মা ভিন্ন এমন পরিপাটী করে পূজোর যোগাড় করতে কি কেউ পারে? কর্ত্তাবাবু বলেন, সীতা মার হাত দুখানি ভারি সুন্দর, তাই হাতের কাযগুলো অত সুন্দর হয়ে ওঠে—সে কথা খুব সত্য। কাল অনেক রাত জেগে চাকরটাকে বাঁচিয়ে তুলেছ মা,—নইলে তার যে কি হতো, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। জানো মা, মানুষ চেনা যায় অন্তর দিয়ে, বাইরের রূপ কিছুই নয়। অন্তর যার কালো, তার বাহিরটা সুন্দর হলেও, তার তুলনা হতে পারে নির্গন্ধ শিমূলফুলের সঙ্গে, আর কিছুর সঙ্গে নয়। তুমি অত জড়সড় হয়ে পড়লে কেন মা লক্ষ্মী, আমি তোমার প্রশংসা করছি বলে কি? জোতি হেলায় রত্ন হারালে। হীরে ফেলে কাচ তুলে নিয়েছে। এর জন্যে যদি একদিন তাকে অনুতাপ না করতে হয়, তবে আমি ব্রাহ্মণের সন্তান নই।"

মুখখানা লাল করিয়া ফেলিয়া সীতা বাহির হইয়া গেল।

বিহারীলালের রুদ্ধ দরজায় আঘাত করিয়া সে ডাকিতে লাগিল—"দাদু, দরজাটা একবার খুলে দিন।"

বিহারীলাল উত্তর দিলেন না।

সীতা উদ্বিগ্ন ভাবে আবার ডাকিল, "দরজাটা একবার খুলে দিন দাদু, বড় দরকার আমার।"

তথাপি তিনি নীরব।

অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া সীতা চলিয়া গেল। রাখালকে ডাকিয়া বলিল, "আমার দাদাকে আমার নাম করে এ ঘরে ডেকে নিয়ে এসো রাখাল।"

রাখাল বলিল, "আর একটী বাবু এসেছেন, তাঁকেও আনব কি ?"

সীতা বলিল, "না, শুধু দাদাকে ভেতরে ডেকে আন। তাঁর ভাল ভাবে থাকবার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে তো ?"

রাখাল বলিল, "কর্ত্তাবাবু ম্যানেজার বাবুকে সব বলে দিয়েছেন,—ম্যানেজার বাবু বন্দোবস্ত করে দেবেন।"

সীতার আদেশে রাখাল প্রশান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল।

বহুদিনের পর প্রশান্ত সীতাকে দেখিতে পাইল। দুই বৎসর পূর্ব্বে সে যে সীতাকে দেখিয়াছিল, এ যেন সে সীতা নয়। দুই বৎসর পূর্ব্বে সীতা ছিল লঘুপ্রকৃতির বালিকা, —তাহার মুখখানি নির্ম্মল হাসিতে পূর্ণ ছিল। আজ সীতার মুখে সে হাসি নাই,—তাহার ললাটে যেন চিন্তার রেখা পড়িয়াছে। সে চপলতা নাই,—সে অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। এই বয়সেই সে যেন অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন সময়কেই দেখিয়াছে,—বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা করিতেছে। প্রশান্ত একটা নিঃশ্বাসকে কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিল না,—তাহার সমস্ত বুকখানা দলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়া গেল।

সীতা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা মাথায় দিল; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্নেহভরা দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছিস সীতা ?"

সীতা একটু হাসিল, বলিল, "হ্যাঁ; তুমি ভাল আছ, মাসীমা ভাল আছেন ?"

প্রশান্ত উত্তর দিল, "আমরা বেশ আছি। কিন্তু তুই যে বললি ভাল আছি,—এটা আমার বিশ্বাস হ'ল না। বছর দুই আগে তোকে যেদিন আমি ট্রেণে উঠিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম, সে দিন তোর যে চেহারা ছিল, আজ তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। আমি যদি তোর নাম এখন না জানতে পারতুম, তা হলে হয় তো চিনতেও পারতুম না। তুই আগেকার চেয়ে একহাত লম্বা হয়েছিস, বড়

রোগা হয়ে গেছিস। তোর চোখ দুটো শুধু মুখখানার ওপরে ভাসছে। মুখখানা লম্বা হয়ে গেছে। গায়ের গোলাপের মত রংও ময়লা হয়ে গেছে। নিজের মুখখানা কখনও দেখেছিস কি সীতা ?"

সলজ্জভাবে সীতা বলিল, "বাঃ, মানুষ লম্বা হলে রোগা হয়ে যায়, এ কথা বুঝি তুমি জানো না। আমি আগেকার চেয়ে কতখানি লম্বা হয়েছি দেখেছ তো ?"

প্রশান্ত মাথা দুলাইয়া বলিল, "তা বেশ দেখছি। আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি, তা বোধ হয় জেনেছিস ? এখানে তোকে রাখার জন্যে অনেকে অনেক কথা বলছে। জ্যোতির সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, এই কথা জেনেই তোকে এখানে পাঠিয়েছিলুম। তার তো কিছুই হল না। সে যখন অন্যকে বিয়ে করে চলে গেল, তখন তোকে এখানে ফেলে রেখে লোকের ঠাট্টা বিদ্রূপ সইবার দরকার আমার নেই। মাও এর জন্যে আমায় খুব বকছেন। এবার তোকে সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে, তিনি আমায় বাড়ী ঢুকতে দেবেন না, আমার মুখও দেখবেন না। দরকারই বা কি পরের বাড়ী থেকে বোন ? এমন নয় যে আমরা তোকে দুটো খেতে দিতে পারব না,—তোর বিয়ে দিতে পারব না। এখানে থেকে অপমান কি কম সইছিস ভাই ? আমার পর্য্যন্ত লোকে যা না তাই বলছে। না, আর আমি তোকে এখানে রাখব না,—কারও কথা শুনব না,—তোকে জোর করে নিয়ে যাব।"

সীতা নতমুখে বলিল, "সন্ধ্যের পর সে সব কথা হবে এখন দাদা, এখন জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বস। আমি মাকে জানিয়েছি তুমি এসেছ। শুনে তিনি ভারি আনন্দ পেয়েছেন। তোমার সঙ্গে প্রণব দাও এসেছেন, না দাদা ?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, তাকেও সঙ্গে আনলুম। যে পথ,—একা আসতে সাহস হয় না।"

সীতা বলিল, "যদি ঠিক করে লিখতে—তোমরা এই ট্রেণে আসবে, তা হলে গাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হত, এতটা কষ্ট পেতে হত না।"

প্রশান্ত বলিল, "রক্ষা কর সীতা,—এই কত মাইল রাস্তা গরুর গাড়ীতে আসা যে কি ঝকমারি, তা আমি অনুভবেই বুঝতে পারছি। দেহ তা হলে আস্ত থাকত না,—গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে সব হাড় গুঁড়িয়ে এক যায়গায় জমা হতো।"

সীতা বলিতে গেল,—"না হয় পাল্‌কী—"

প্রশান্ত বাধা দিয়া বলিল, "না হয় আর একটু বে[illegible] মান তার। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে পাল্‌কীতে বোঁচকার মত প[illegible] থাকার চেয়ে সোজা হাঁটতেই ভালবাসি। আমার হাঁ[illegible] অভ্যাস আছে, বিশেষ কষ্ট হয় নি। কিন্তু কষ্ট বেজায় হয়ে[illegible] প্রণবের। তার হাঁটা মোটেই অভ্যাস নেই। বেচা[illegible] ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়েছে। তোদের যদি চা থাকে, তা[illegible] দু কাপ চা খাইয়ে দে, নইলে সে কিছুতেই উঠবে না।

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সীতা বলিল, "এখনি চা করে দিচ্ছি তুমিও তো খাবে দাদা, তোমাকেও দিই ?"

প্রশান্ত ফিরিয়া চলিতে চলিতে বলিল, "না, আমা[illegible] আর দরকার নেই। তাকে আগে পাঠিয়ে দে, সে খে[illegible] একটু চাঙ্গা হয়ে উঠুক।"

সীতা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

(২৪)

শরীর বড় অসুস্থ হওয়ায় বিহারীলাল ঘরের বাহির হইতে পারিলেন না। দিনটাও একাদশী ছিল,—এ দিনটা তি[illegible] ফল দুধ খাইয়াই কাটাইতেন। আজ সকাল হইতে সত্যই তাঁহার শরীরটা বড় খারাপ বোধ হইতেছিল। সে[illegible] জন্যই তিনি বাহির না হইলেও কেহ কিছু সন্দেহ করিতে পারিল না। একটু সন্দেহ করিয়াছিল সীতা। সে বুঝিয়া ছিল, যে পর্য্যন্ত তাহার চলিয়া যাইবার কথা হইয়াছে, সে[illegible] পর্য্যন্ত তাঁহার অসুস্থতা বড় বেশী রকম বাড়িয়া গিয়াছে তিনি না বাহির হইলেও, যাহাতে অতিথি আত্মীয় দুইটী[illegible] উপযুক্ত আহার ও বিশ্রামের স্থান হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে ছিলেন। রাখালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, জ্যোতির্ম্ম[illegible] যে বড় ঘরটায় থাকিত, সীতা সেই ঘরটা অতিথিদ্বয়ের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, এবং সুশীলবাবু নিজে থাকিয়া ভৃত্যদের দিয়া ঘরটীতে শয্যাদি ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

কর্ত্তাবাবুর আদেশে ঈশানীকে তাহাদের আহারের স্থানে আসিয়া বসিতে হইল।

সীতা একে একে ভাত তরকারী আনিয়া দু'খানি আসনের সম্মুখে সাজাইয়া দিল। পাচিকাকে না দেখিতে পাইয়া বিহারীলাল বলিলেন, "বামনি কোথায় গেল সীতা, তুই এ সব আনছিস কেন ?"

সীতা একটু কুণ্ঠিতা হইয়া বলিল, "কাল রাত্রে বামুণ ঠাকরুণের বড্ড জ্বর হয়েছে দাদু, সে জ্বর এখনও অল্প রয়েছে। বুড়ো মানুষ সেই জ্বর নিয়ে তবু দুই উনানে ভাত ডাল বসিয়েছিল, নামাতে আর পারছিল না। আমি পূজার যোগাড় করে দিয়ে গিয়ে দেখি, রান্না তখনও হয় নি। তার বড় কষ্ট হচ্ছে দেখে তাকে সরিয়ে দিলুম।"

দাদু স্থির নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। সীতা একটী দাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দাদাদের ডেকে নিয়ে এসো, বল গিয়ে ভাত দেওয়া হয়েছে।"

বিহারীলাল বলিলেন, "তা তুই রান্নার দিকে না গেলেও পারতিস সীতা,—তোর এদিকে কায তো বড় কম নয় দিদি। বাড়ীতে আরও জ্ঞাতি কুটুম্ব, ছোট বউ মা, ইভা, সবাই তো রয়েছে,—কেউ কি রান্নার দিকে যেতে পারতো না?"

সীতা কোমল স্বরেই বলিল, "কাকিমার কি রান্নার অভ্যাস আছে দাদু? বরং আমি যা পারি, তিনি তাও পারেন না।"

প্রণবকে সঙ্গে করিয়া প্রশান্ত আহার করিতে বসিয়া গেল। ঈশানী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া বিহারীলালের খাটের পাশে বসিয়া রহিলেন, সীতা পরিবেষণ করিতে লাগিল।

প্রশান্তের পানে তাকাইয়া বিহারীলাল বলিলেন, "হঠাৎ চলে এসেছিলুম বলে মনে কিছু কর না দাদা,—বাড়ীর মধ্যে এসেই শুয়ে পড়েছিলুম—আর উঠতে পারি নি। দিদি জোর করে খানিক দুধ, গোটাকতক ফল খাওয়ালে, তবে যেন গায়ে একটু বল পেলুম। আমি এতকাল জানতে পারি নি তুমিই জ্যোতির বন্ধু প্রশান্ত। তোমার কথা অনেকবার তার মুখে শুনেছি। সেবার মেসে থাকতে তার যখন বসন্ত হয়েছিল, তখন তুমি বই তাকে আর কেউ দেখেনি,—কেউ মায়ের মত করে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারে নি। তুমি যদি তাকে না দেখতে দাদা, আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ হত তা কি করে বলব। এই খানিক আগে দিদি তোমার পরিচয় দিলে। তাতে জানতে পারলুম—তুমি শুধু তার ভাই-ই নও, জ্যোতির প্রাণদাতা বন্ধু। মরণের মুখ হতে তাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিলে দাদা,—এবার তাকে ফিরিয়ে এনে আমার বুকে দিতে পারলে না, এই বড় কষ্ট রয়ে গেল।"

প্রশান্ত শান্তকণ্ঠে বলিল, "কিছু জানতে পারি নি দাদা, জানলে তাকে প্রাণপণে ফিরাবার চেষ্টা করতুম। তার বিয়ের দিনে যখন নিমন্ত্রণ-পত্রখানা পেলুম, তখন আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তবু তার কর্ত্তব্য তাকে মনে করিয়ে দিতে আমি সুরেশ বাবুর বাড়ী গিয়েছিলুম, কিন্তু তার দেখা পাই নি।"

বিহারীলাল কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "যাক গিয়ে। বন্ধুর জন্যে বন্ধু যা করে তুমি তার বেশী করেছ। তাকে মরণের হাত থেকে টেনে এনেছিলে,—সে যদি অন্ততঃ পক্ষে তোমার কাছেও আত্মগোপন না করত, তা হলে নিশ্চয়ই তাকে এই উৎকট উচ্চাকাঙ্ক্ষার হাত হতে বাঁচাতে পারতে। কিন্তু,—না,—যাক সে সব কথা, বলে আর দরকার নেই; তার নাম মুখে আনাও এখন মহাপাপ বলে আমার মনে হয়। আমি জোর করে ভাবতে চেষ্টা করছি—সে নেই, সে মরে গেছে। যার হাতের এক গণ্ডুষ জল পিতৃ-পুরুষ পেতে পারবেন না, সে বেঁচে থাকলেও মরে গেছে বলে ভাবতে হবে।"

বাটীতে যে ডালটা ছিল, প্রশান্ত তাহা নিঃশেষে ভাতের মধ্যে ঢালিয়া লইল। শূন্য বাটীর পানে তাকাইয়া ব্যস্ত ভাবে বিহারীলাল বলিলেন, "আর একটু ডাল এনে দে সীতা, প্রণব বাবুকেও—"

প্রশান্ত হাসিয়া বলিল, "ওকে আর বাবু বলবেন না। এ-ও আপনার নাতির বন্ধু, সুতরাং নাতি বলেই জানুন। ও যে আর কিছু নেবে না, তা আমি বলে দিচ্ছি। ওরা ক্যালকেশিয়ান ভদ্রলোক, আমাদের মত ভাত খেতে বসে থালাকে থালা উজাড় করে দেয় না। দেখুন দাদা, ওর ভাত খাওয়া দেখুন, আর আমার খাওয়া দেখুন।"

বিহারীলাল এই ছেলেটীর সরল কথাবার্ত্তায় ভারি খুসী হইয়া উঠিতেছিলেন। অনেক দিনের পরে তাঁহার হৃদয়ের জমাট-বাধা বেদনাটা যেন হাল্কা হইয়া গেল। এই ছেলেটীর বলিষ্ঠ উন্নত দেহ, কথাবার্ত্তা—সবই যেন তাঁহার পরলোকগত পুত্র প্রতাপের মত। স্নেহে তাঁহার দুইটী চোখের দৃষ্টি বড় কোমল হইয়া আসিল। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "যে যা খায়, তার ওপরে তো হাত চলে না দাদা। যে কম খায়,—বেছে বেছে এতটুকু করে মুখে দিয়ে শুধু স্বাদটুকু নেয়,—আমি সে রকম লোককে পছন্দ করি নে। কেন করি নে,

তা শুনলে অবশ্য তোমরা আমার নিন্দে করতে পারবে না। এককালে আমারও তোমাদের মত যৌবন ছিল। গায়ে এত জোর ছিল, যা শুনলে অবাক্ হয়ে যাবে। খেতুমও তেমনি—অর্থাৎ এখনকার মত একবেলা খেয়ে তিনবেলা ধরে হজম করতে হত না। সেই খাওয়া, আর উপযুক্ত পরিশ্রম করেছি বলেই, আজও এই সত্তর বৎসর বয়সেও উঠতে পারছি, খাটতে পারছি। প্রণবের মত ছেলে যারা, তারা চল্লিশ না যেতে আমার এখনকার মত অবস্থায় পড়বে,—এমনি করে জরা এসে ওদের ঘিরবে।"

উৎসাহিত প্রশান্ত সীতার আনীত ডাল ভাতের মধ্যে ঢালিয়া লইয়া, প্রণবের দিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তাই বটে। দেখুন দাদু, বেচারা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে নেহাৎ বাধ্য হয়েই সব তরকারী খাচ্ছে। ওহে ভাল ছেলে, ও রকম বাধ্যতামূলক খাওয়া খেও না। এর পরে এর ফলটা হয় তো দাদুকে ভোগ করতে হবে।"

সীতা একটু হাসিয়া বলিল, "তোমারই অন্যায় দাদা, তুমি যাকে যখন ধরবে, তাকে আর আস্ত রাখবে না। সত্যি —আপনি অমন করে খাবেন না প্রণব দা, যা তা খেলে আপনার সহ্য হবে না।"

প্রণব অপ্রস্তুতের ভাবে হাসিয়া বলিল, "সহ্য হবে না কেন, বেশ সহ্য হবে।"

প্রশান্ত গম্ভীর মুখে বলিল, "দাদা, মা, আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন—আমার একটুও দোষ নেই; কেন না আমিও সাবধান করেছি, সীতাও অনেক বললে। এর পর যদি প্রণব কোন কথা বলে—"

প্রণব তাড়া দিয়া উঠিল,—"হয়েছে,—ঢের বলেছ। এই গরীবটার কথা ছেড়ে দিয়ে এখন অন্য কথাবার্ত্তা চলুক। দাদু তোমার দিকে হলেও, মা যে আমার দিকে হবেন, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। এ জানা কথা—যে ছেলেটি দুর্ব্বল হয়, মায়ের অনুগ্রহ-দৃষ্টিটা তার ওপরেই বেশি রকম পড়ে। মায়ের স্নেহ তোমার চেয়ে আমারই বেশি পাওয়ার কথা।"

ঈশানী শান্ত হাসি হাসিলেন; তাঁহার দুইটী চোখে স্নেহ যেন উথলাইয়া উঠিতেছিল।—আজ এই মুহূর্ত্তে নিজের ছেলেটীর কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। হায় রে, সেও যদি আজ এখানে থাকিত, এই স্থানটী কি মনোরমই না হইয়া উঠিত।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে দুই বন্ধু উঠিয়া গেল।

কপট আনন্দও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শ্রান্ত ভাবে বিহারীলাল বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। আজ সীতা রন্ধনের ও-দিকে থাকায় আসিতে পারিল না। রাখাল আজ সীতার কাজগুলি করিয়া দিল। (ক্রমশঃ)

মধ্য-ভারত

শ্রীনরেন্দ্র দেব

— অজন্তার পথে —

অজন্তাগুহা সম্বন্ধে গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের প্রসিদ্ধ বইখানিই (The paintings in the Budhist Caves at Ajanta) সর্ব্বপ্রথম আমার মনে 'অজন্তা' দেখে আসবার একটা অদম্য আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু, ইচ্ছামাত্রই তো আর সব কাজ হ'য়ে ওঠেনা, ইংরাজীতে একটা কথা আছে বটে, যে—'যেখানে ইচ্ছা আছে—সেখানে উপায়ও আছে!' কিন্তু আমার বেলা এ কথাটা অনেকদিন কাজে খাটেনি। কারণ, ইচ্ছা আমার প্রবল থাকা সত্বেও সঙ্গী, সময় ও অর্থ এই ত্রিবিধ অভাবের প্রতিবন্ধকতা বহুকাল আমার অজন্তা যাওয়ার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল।

গত বৎসর বড়দিনের ছুটীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে জলধরদাদার সঙ্গে সেই সুদূর ইন্দোরে যাবার প্রতিশ্রুতি যে আমি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা ক'রতে পেরেছিলুম, তার প্রধান কারণই হ'চ্ছে এই 'অজন্তা' ও 'ইলোরা' গুহা দেখে আসবার সুযোগ পাবো ব'লে! অবশ্য,

রেবার রূপতরঙ্গ দেখবার এবং উজ্জয়িনীর শিপ্রা তটে ঘুরে আসবার লোভটাও যে বড় কম ছিল তা নয়। কত ইতিহাস ও কাব্যবিশ্রুত মালব রাজ্য—সেখানকার চাঁদের আলোর সৌন্দর্য্য জগতে অতুলনীয় ব'লেই শোনা ছিল—সেখানে যাবার আকর্ষণ যে আমাদের একেবারেই ছিলনা—এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। ইন্দোর অভিমুখে যে আমরা রওনা হ'য়েছিলুম অনেকগুলি উদ্দেশ্য নিয়েই, শুধু নিছক্ সাহিত্য সেবার জন্য নয়—এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কলকাতা থেকে বেরিয়ে জব্বলপুর হ'য়ে ইন্দোর পর্য্যন্ত পৌঁছানো এবং সেখান থেকে আবার উজ্জয়িনী ও মাণ্ডু ঘুরে পুনরায় ইন্দোরে ফিরে আসার যা কিছু কাহিনী সে সমস্তই শ্রদ্ধেয় জলধরদাদা তাঁর অননুকরণীয় বর্ণনা-কৌশলে আনুপূর্ব্বিক আপনাদের শুনিয়েছেন। এইবার, ইন্দোর থেকে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাওয়াব গল্পটুকু আপনাদের শোনাবার ভার দাদা আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

আমি কখন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিনি সুতরাং পথের খবর যে দাদার মতো সরস ক'রে আপনাদের শোনাতে পারবো সে স্পর্দ্ধা আমার নেই। তবু যে লিখতে বসেছি সে শুধু দাদার হুকুম তামিল করবার জন্যে।

পয়লা জানুয়ারী বেলা বারোটার সময় আমরা ইন্দোর ছেড়ে অজন্তা অভিমুখে রওনা হলুম। ইন্দোর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ধর, যাঁর গৃহে আমরা সম্মিলনান্তে দিন দুই আশ্রয় নিয়েছিলুম তিনি, বারোটার মধ্যেই আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য বহুবিধ আয়োজন ক'রেছিলেন। এবং রাত্রে পথের প্রয়োজনের জন্য তাঁর স্নেহময়ী জননী প্রচুর খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত ক'রে আমাদের সঙ্গে দিয়েছিলেন। যে দু'দিন আমরা শৈলেনবাবুর অতিথি হ'য়েছিলুম, সে দু'দিন তাঁর মাতাঠাকুরাণী আমাদের এমন আদর যত্ন করেছিলেন যে, আমরা যে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে এসে আছি, এ কথা একবারও মনে হয়নি।

আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে যাবার জন্য ইন্দোরের বাঙালী বন্ধুরা অনেকেই ষ্টেশন পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। শৈলেন বাবু তো সঙ্গে ছিলেনই; তা ছাড়া পি, ডব্লিউ, ডির নীলমণি বাবু, সম্মেলনের সম্পাদক প্রমথবাবু, ওখানকার পণ্ডিতমশাই এবং ডাক্তার রুদ্রেন্দ্র পাল প্রভৃতি একাধিক ভদ্রলোক এসে আমাদের জিনিসপত্র সব গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমাদের সাদর বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন।

বি, বি, সি, আই রেলের খাণ্ডোয়া-আজমীর লাইনে সব মিটার গেজের ছোট গাড়ী। কাজেই তার কামরাগুলিও খুব ছোট। আমরা একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী একেবারে খালি পেয়েছিলুম। দু'জনে গল্প ক'রতে ক'রতে যাচ্ছিলুম, ইন্দোর উজ্জয়িনী ও মাণ্ডুর কথা। মাণ্ডুর হেড মাষ্টার মশাইয়ের গল্প, উজ্জয়িনীর হরিদাসবাবুর দেবতুল্য আদর্শ চরিত্র, ইন্দোরের প্রবাসী বাঙালী বন্ধুদের আতিথেয়তার আলোচনা। এঁদের কথা যেন আমরা ব'লে আর শেষ ক'রতে পারছিলুম না! দেখতে দেখতে গাড়ী মাও ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো। মাও ইন্দোর থেকে মাত্র চৌদ্দ মাইল দূরে। এটি একটি মিলিটারী ষ্টেশন। সুতরাং ইংরাজ গভর্মেণ্টের খাশ অধিকারভুক্ত হ'য়ে আছে। মাও হোল্‌কার রাজ্যের অন্তর্গত হ'লেও এস্থানে আর তাঁর কিছু মাত্র স্বত্ব নেই। গাড়ী মাও ষ্টেশনে প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা ক'রবে জেনে প্ল্যাটফর্মে নেমে খানিকটা পায়চারী ক'রে নেওয়া গেল। ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে ও গাড়ীতে মারহাট্টি যাত্রীই অধিকাংশ চোখে পড়তে লাগলো। বম্বেওয়ালা মুসলমান, গুজরাটি ও পার্শীও দেখলুম বটে,—কিন্তু খুব কম। তাঁদের সংখ্যা শতকরা দু'তিনজনের বেশী হবেনা। ষ্টেশনে চা, খাবার, ফলমূল ও পান সিগারেট বিক্রয় হ'চ্ছে। রেল-যাত্রীদের কিছুমাত্র অসুবিধা নেই।

গাড়ীর ঘণ্টা পড়তেই প্ল্যাটফর্ম থেকে কামরায় গিয়ে দেখি আরও দুজন সহযাত্রী পাওয়া গেছে! এঁরা আমাদের সঙ্গে খাণ্ডোয়া পর্য্যন্ত যাবেন। তারপর আমাদের পথ বিপরীত।

মাও থেকে আমরা খানকয়েক খবরের কাগজ কিনে নিয়েছিলুম। কলকাতার কংগ্রেস আর একজিবিশনের খবর পড়তে পড়তে আমরা এগিয়ে চলেছিলুম খাণ্ডোয়ার দিকে। কলকাতা তখন আমাদের কাছ থেকে এক হাজার তিরাশী মাইল দূরে।

গাড়ীর নূতন সহযাত্রী দুটির মধ্যে একজন তরুণ মুসলমান যুবক ও অন্যজন বোম্বাইয়ের এক বৃদ্ধ হিন্দু উকীল; দু'জনেই গৌরকান্তি, সুশ্রী ও সুপুরুষ। তরুণ মুসলমান যুবকটির আপাদ-মস্তক য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে ঢাকা; কিন্তু বৃদ্ধ হিন্দু

উকীলটির গায়ে লম্বা পার্শী কোট ও পরনে গরম কাপড়ের ঢিলে পায়জামা ছিল। তিনিও আমাদের মতো একমনে খবরের কাগজ প'ড়ছিলেন। মুসলমান যুবকটির সঙ্গেও খবরের কাগজ ইংরাজী ম্যাগাজিন ও রেলওয়ে টাইমটেবল্ ছিল, কিন্তু, তিনি চুপ করে ব'সে একটির পর একটি সিগারেট অবিরাম টেনে যাচ্ছিলেন। যেন এ পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধ নেই এমনিই একটা ভাব!

অল্পক্ষণ পরেই দেখি বোম্বাইয়ের বৃদ্ধ উকীলটির সঙ্গে মুসলমান যুবকটি হঠাৎ আলাপ পরিচয় করে নিয়ে খুব গল্প জুড়ে দিয়েছেন। কথাবার্ত্তা তাঁদের ইংরাজীতেই হচ্ছিল। মুসলমান যুবকটি য়ুরোপ ঘুরে এসেছেন এবং বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে তিনি ইংরাজপক্ষের সৈনিক হ'য়ে ফ্রান্সের সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, এই সব কথাই তিনি বৃদ্ধকে বলছিলেন।

খানিক তাদের গল্প শুনতে শুনতে, খানিক বা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এবং মাঝে মাঝে ইন্দোর রেলপথের দুধারে চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে শীতের স্বল্লায়ু দিন কখন যে বিদায়োন্মুখ হয়ে উঠেছিল টের পাইনি।

বেশ একটু ক্ষুধাবোধ হচ্ছিল। ঘড়ী খুলে দেখি তখনও পাঁচটা বাজেনি। সঙ্গে খাবার ছিল, কিন্তু সে রাত্রের জন্য রিজার্ভ, কাজেই পরের ষ্টেশনে কিছু জলযোগের উপযোগী আহার্য্য সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে স্থির করলুম। রাম্‌ওয়াহা ষ্টেশনে বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ চা খাওয়া হ'য়েছিল বটে, কিন্তু খাবার কিছু নেওয়া হয়নি। ট্রেনের 'কোষ্ঠীপত্র' খুলে দেখা গেল আগামী ষ্টেশন হ'চ্ছে 'মোড়টাক্কা'। মনে পড়ে গেল যে এই 'মোড়টাক্কা' ষ্টেশন থেকে আমাদের তিনটি বন্ধুর এই ট্রেন ধরবার কথা আছে। তাঁদের মধ্যে গোরক্ষপুরের শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ ও দিবাকর মুখোপাধ্যায় এম-এ আমাদের সঙ্গে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাবেন এবং নাগপুরের ডাক্তার সতীশচন্দ্র দাশ এম-বি ভুসাওয়াল থেকে নাগপুরে ফিরে যাবেন। খাণ্ডোয়া থেকে ভুসাওয়াল প্রায় ৭৪ মাইল। সতীশবাবুর অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল আমাদের সঙ্গে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাবার, কিন্তু, নাগপুরের মেডিক্যাল ইস্কুলের হাসপাতালে যে তারিখ থেকে তাঁর 'ডিউটি' পড়বে, সেই তারিখের মধ্যে তিনি ফিরতে পারবেন না ব'লে যেতে সাহস করলেন না।

বেলা চারটে পঞ্চাশ মিনিটের সময় আমাদের ট্রেন মোড়টাক্কায় এসে দাঁড়ালো। দিবাকরবাবু, বঙ্কিমবাবু ও সতীশবাবু ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে তাঁরা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলেন। আমরাও তাঁদের দেখতে পেয়ে আনন্দধ্বনি করে উঠলুম। ট্রেন থেকে নেমে প'ড়ে তাঁদের গাড়ীতে তুলে নিলুম। তাঁরা মহা-উৎসাহে তাঁদের পূর্ব্বদিনের এ্যাড্‌ভেঞ্চারের বিষয় গল্প ক'রতে লাগলেন। তাঁদের কথা শুনতে শুনতে গাড়ী ছাড়বার সময় হ'য়ে গেল। আমরা আমাদের কামরায় ফিরে এলুম। তাঁরা ঠিক আমাদের পাশেই আর একখানি কামরায় উঠেছিলেন। আমাদের আসবার একদিন আগে তাঁরা ইন্দোর থেকে বেরিয়ে মণ্ডলেশ্বর ও ওঙ্কারেশ্বর বেড়াতে এসেছিলেন। নর্ম্মদা বক্ষে পর্ব্বতের উপর 'ছিন্নমস্তার' বিরাট মূর্ত্তি ও মণ্ডলেশ্বরে বিগ্রহ এবং রাণী অহল্যাবাঈয়ের রেবাঘাট ও আশ্রম ওখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান বলে পরিগণিত। আমাদেরও ইচ্ছা ছিল এ যায়গাগুলি দেখে যাবো, কিন্তু মাণ্ডু-প্রত্যাগত দাদাকে পথশ্রান্ত দেখে অধ্যাপক শৈলেনবাবু ও ডাক্তার রুদ্রেন্দ্র পাল কিছুতেই তাঁকে ইন্দোর থেকে বেরুতে দেননি। দু'দিন বিশ্রাম নেবার জন্য জোর করে ধ'রে রেখেছিলেন। অতএব আমাকেও তাঁর সঙ্গে থাকতে হ'য়েছিল।

এতক্ষণ হৈচৈয়ের মধ্যে কিছু মনে ছিল না, কিন্তু গাড়ী 'মোড়টাক্কা' ছাড়তেই জলখাবারের কথা স্মরণ হ'লো। খাবার কিনতে ভুল হ'য়ে গেল ব'লে আক্ষেপ ক'রছি শুনে জলধরদা' বললেন "খাবার ত সঙ্গেই রয়েছে, বার করোনা, খাওয়া যাক্। আমারও ক্ষুধা বোধ হ'চ্ছে।" আমি একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে ব'ললুম—"ও যে তাঁরা রাত্রে খাবার জন্য দিয়েছেন!" দাদা বললেন—"রাত্রের আর দেরী কি? তুমি খাবারটা পাড়ো, রাত্রিভোজ এই বেলা সেরে নেওয়া যাক।"

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে খাবার নিয়ে বসা গেল। সঙ্গে যে এত প্রচুর খাদ্য ছিল তা জানতুম না। লুচি, তরকারী, ভাজা, মাছ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি। এ মাছ সমুদ্রের। বোম্বে থেকে ইন্দোরে চালান আসে। খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু দামও অত্যন্ত বেশী। শৈলেনবাবুর মাতাঠাকুরাণী আমাদের দু'জনের জন্য এত অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য সামগ্রী দিয়েছিলেন যে আমরা ভরপেট খেয়েও ফুরুতে পারছিলুম না।

খাওয়ার পর ট্রেনের জানালা থেকে হাত বাড়িয়ে আমি যখন হাত ধুয়ে ফেলছি, সেই সময় আমার আঙুল থেকে একটি আংটি কেমন করে খুলে গিয়ে রেল লাইনের ধারে ছিট্‌কে পড়ে গেল! ট্রেন তখন ঘণ্টায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ মাইল ছুটচে!

তাড়াতাড়ি জলধরদাদাকে ও সহযাত্রীদের ব্যাপারটা জানিয়ে ট্রেন থামাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে আমি গাড়ীর 'এলার্ম্‌ চেইন্‌' ধরে টানতে যাচ্ছিলুম; বোম্বাইয়ের বৃদ্ধ উকীলটি আমাকে বাধা দিয়ে ব'ললেন—এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আপনার আংটির দাম কতো? পঞ্চাশ টাকার বেশী কি?

আমি বললুম—বাজারে আংটির দাম পঞ্চাশের ঢের কম, কিন্তু আমার কাছে ওর দাম অনেক!

বৃদ্ধ উকীলটি মৃদু হেসে বললেন, আংটিটি পড়ে যাওয়ায় সেন্টিমেণ্টের বা ভাবের দিক থেকে আপনি হয়ত' খুব ক্ষতি বোধ করছেন স্বীকার করি, কিন্তু মেটিরিয়্যাল বা আর্থিক ক্ষতি আপনার পঞ্চাশ টাকা জরিমানার চেয়ে যখন অনেক কম বলছেন, তখন গাড়ী থামিয়ে অনর্থক কেন অর্থ-দণ্ড দেবেন? এই সন্ধ্যার অন্ধকারে চলন্ত ট্রেণ থেকে আপনার আংটি ছিট্‌কে পড়ে কোথায় জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে তার ঠিক কি? ট্রেণ ছুটছে, সুতরাং ঠিক কোন্‌ যায়গায় পড়েছে আন্দাজ করতেও পারা যাবে না! অতএব বুঝতেই পাচ্ছেন ছোট একটি আংটিকে এই অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর থেকে এখন খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কত কম! এদিকে এ ট্রেণখানি থামিয়ে রাখার ফলে গাড়ী যথাসময়ে খাণ্ডোয়ায় গিয়ে পৌছুতে পারবে না। খাণ্ডোয়া একটি মস্ত জংসন। বহু যাত্রী, যারা খাণ্ডোয়ায় গাড়ী বদল করে অন্য গাড়ী ধরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, এ ট্রেণ বিলম্বে গিয়ে সেখানে পৌছুলে তাঁরা সব আর গাড়ী পাবেন না। এই শীতের রাত্রে পথের মধ্যে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বেন! সেটা কি হ'তে দেওয়া আপনার উচিত? বিবেচনা করে দেখুন।

বৃদ্ধ উকীলটির কথাগুলি আমার কাছে খুব সমীচীন বলে মনে হওয়াতে আমি শিকল টেনে গাড়ী থামানো থেকে নিরস্ত হলুম। কিন্তু আংটিটার জন্য আমার অত্যন্ত মন খারাপ হ'য়ে রইল। আমি চুপটি করে বিষণ্ণমুখে গাড়ীর এককোণে নিরুপায়ের মতো বসে রইলুম।

আমার অবস্থা দেখে তরুণ মুসলমান যুবকটি সহানুভূতি-পূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লেন—"আপনার এই আকস্মিক ক্ষতিতে আমি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করছি বন্ধু! আংটিটির কথা আপনি আর ভাববেন না। তবে, খাণ্ডোয়ায় পৌছে রেলওয়ে পুলিশকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখবেন। কিছু পুরস্কারের আশা দিলে তারা হয়ত খুঁজে দেখতে পারে এবং আপনার ভাগ্য যদি খুব সুপ্রসন্ন হয় তাহ'লে হয়ত আংটিটি পাওয়া গেলেও যেতে পারে!"

সারাটা পথ মুসলমান যুবকটির মুখ থেকে সুরার উগ্র সৌরভ পাওয়া যাচ্ছিল ব'লে আমি তার এ পরামর্শটাকে মোটেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রতে পারলুম না। মাতালের প্রলাপউক্তি হিসাবে অগ্রাহ্য করলুম। কিন্তু, বৃদ্ধ উকীলটি মহা উৎসাহিত হ'য়ে বললেন "ও ঠিক বলেছে। আপনি অতি অবশ্য অবশ্য খাণ্ডোয়ায় পৌছে পুলিশকে আপনার এই ক্ষতির কথা জানিয়ে রাখবেন। যদি ওই আংটি উদ্ধার হওয়া সম্ভব হয় তবে ওদের দ্বারাই হ'তে পারে।"

জলধরদাদাও তাঁদের এ পরামর্শ সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেন দেখে আমি টাইম্‌টেবল্‌ খুলে আমার পকেট বইয়ে নোট করে রাখলুম যে 'সীরবান' থেকে 'আজান্তী' ষ্টেশনের মধ্যে সন্ধ্যে ছটা নাগাদ "31 Up" প্যাসেঞ্জারের দক্ষিণ দিকের জানালা গলে বি, বি, সি, আই, রেল লাইনের ধারে আমার আংটিটি প'ড়ে গেছে।

আংটি-হারানোর ব্যাপারে সহযাত্রীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ খুব জমে উঠলো। আমরা অজন্তা ও ইলোরা দেখতে যাবো শুনে মুসলমান যুবকটি উপযাচক হ'য়ে আমাদের পথের সন্ধান সমস্ত বলে দিলেন এবং জালগাঁও ষ্টেশনের ধারেই ওখানকার লাইব্রেরীতে তাঁর এক বন্ধু থাকেন; তাঁর মোটর ও পেট্রলের কারবার আছে। তিনি আমাদের সস্তায় মোটর ঠিক করে দেবেন ব'লে মুসলমান যুবকটি তাঁর নামে একখানি চিঠি লিখে দিলেন আমাদের কাছে।

সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ গাড়ী খাণ্ডোয়া ষ্টেশনে এসে পৌছালো। খাণ্ডোয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোরে এঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'য়েছিল। ইনি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে খাণ্ডোয়ার প্রতিনিধি স্বরূপ যোগদান ক'রেছিলেন। লোকটি অতি ভদ্র ও সুজন।

গাড়ী থেকে মোটঘাট সব নামিয়ে বোম্বাই যাবার গাড়ীতে তুলে দেবার জন্য কুলি ঠিক করে, জলধরদাদা, দিবাকর, বঙ্কিম ও সতীশ ডাক্তারকে মালপত্রের তত্ত্বাবধানে রেখে, আমি কুমারেন্দ্রবাবুকে ধ'রে নিয়ে রেলওয়ে পুলিশের অফিসে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে গিয়ে দেখি 'ইন্স্পেক্‌টার' হাজির নেই। একজন নির্ব্বোধ কনষ্টেবল্ দাঁড়িয়ে ছিল। সে কিছু বুঝতে পারলেনা এবং ইন্স্পেক্‌টার সাহেব কখন আসবে তাও সে জানেনা বললে।

অগত্যা, অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে আংটি সম্বন্ধে যা কিছু করা দরকার তার সমস্ত ভার আমি কুমারেন্দ্রবাবুর স্কন্ধে তুলে দিয়ে যখন ফিরতে উদ্যত হয়েছি, সেই সময় ইন্স্পেক্টার সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললুম। তিনি অত্যন্ত ভদ্রলোক। পাঞ্জাবী বলে মনে হ'লো। তিনি হেসে বললেন—আপনার আংটি যখন রেলে কেউ চুরি করেনি, আপনাদেরই অসাবধানতা বশতঃ জানলা দিয়ে প'ড়ে গেছে, তখন পুলিশ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে, আপনি যখন দশটাকা পুরস্কার দেবেন বলছেন, তখন আমি পি, ডব্লিউ, ডির লোকদের বলে দেবো। তারা কাল ভোরে ওইখানে লাইনের কাজ ক'রতে যাবে—খুঁজে দেখবে —যদি আংটি পায়।

আমি বললুম—যদি পায় তবে তাদের বলবেন এই কুমারেন্দ্রবাবুকে এনে দিতে। ইনি খুব অনুগ্রহ ক'রে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন। এঁর কাছে যে কেউ আংটিটি নিয়ে আসবে তাকেই ইনি আমার প্রতিশ্রুত দশটাকা পুরস্কার দেবেন।

পুলিশ ইন্স্পেক্টার এই মর্ম্মে আমার কাছ থেকে একখানি চিঠি চেয়ে নিলেন। তাঁকে চিঠি দিয়ে ফিরে এসে খবর পেলুম আমাদের গাড়ী আসতে এখনও দেড় ঘণ্টা দেরী। অর্থাৎ সাড়ে আটটার আগে আর কোনও গাড়ী পাওয়া যাবেনা। ইতিমধ্যে কুমারেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারা ও খাণ্ডোয়ার জনৈক প্রসিদ্ধ উকীল ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য কয়েকজন খাণ্ডোয়া প্রবাসী বাঙ্গালীরা ফুলের মালাটালা নিয়ে ষ্টেশনে সমবেত হ'য়ে শ্রীযুক্ত জলধরদাদা ও সেইসঙ্গে ল্যাঙ্‌বোট্ আমাদেরও একটি ছোট খাটো অভ্যর্থনার আয়োজন করে তুলেছিলেন। কুমারেন্দ্রবাবুর সুযোগ্যা সুহাসিনী বিদুষী পত্নীর ও খাণ্ডোয়ার সেই উকীলবাবুর কন্যা সুশীলা ইলা দেবীর আদর অভ্যর্থনায় আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করেছিলুম। ইন্দোরের প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন-সভা কুমারী ইলা দেবীর কোকিল-কণ্ঠের কলগীতে কয়দিনই মুখরিত হ'য়েছিল।

সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও গল্প ক'রতে ক'রতে কখন যে সময় কেটে গেছল কিছুই টের পাইনি। হুস্ হুস্ ক'রে ট্রেন এসে পড়তে আমাদের হুঁস্ হ'লো। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে মোটঘাট নিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়লুম। গাড়ীতে খুব ভীড় ছিল। আমরা হয়ত বসবার যায়গা পেতুম না, কিন্তু, খাণ্ডোয়ার কুমারবাবু প্রমুখ বাঙ্গালীদের দেওয়া আমাদের গলায় বড় বড় ফুলের মালা দেখে যাত্রীরা আমাদের সসম্ভ্রমে যায়গা ছেড়ে দিলে!

গাড়ী খাণ্ডোয়া ষ্টেশন না-ছাড়া পর্য্যন্ত ওখানকার সকলেই আমাদের কামরার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যথাসময়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে। তখন দেখা গেল যে আমার দামী টুপীটা খাণ্ডোয়া ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমেই পড়ে আছে। সেটাকে আসবার সময় আর তুলে আনা হয়নি!

জলধর দাদা আমার টুপী হারানোর কথা শুনে খুব বকলেন এবং আমার হাতে আর একটা আংটি রয়েছে দেখে সেটাকে খুলে তুলে রাখতে বললেন, নইলে ওটাও না কি আমি হারাবো! গুরুজনের আদেশ অবহেলা করা উচিত নয়, বিশেষ একটা আংটি ও টুপী যখন হারালো, তখন এটার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা ক'রে আমি তৎক্ষণাৎ সে আংটিটি খুলে কাগজে মুড়ে আমার ওভার-কোটের ভিতর দিকের বুকপকেটে রেখে দিলুম। এইখানেই ব'লে রাখি, ভ্রমণ-শেষে কলিকাতায় ফিরবার পর খাণ্ডোয়ার পুলিশের কার্য্যতৎপরতায় আমার সে আংটিটি পাওয়া গিয়াছিল, আমিও প্রতিশ্রুত দশটা টাকা খাণ্ডোয়ার পুলিশ ইন্স্পেক্টর মহাশয়কে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু জলধরদা'র কথায়, হারাবার ভয়ে যে দ্বিতীয় আংটিটি পকেটে রেখেছিলাম, তিনি যে কবে, কোথায়, কেমন করে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, সে আজও জান্‌তে পারিনি।

রাত্রি প্রায় এগারোটা নাগাদ গাড়ী ভুসাওয়াল জংসনে এসে পৌছালো। ডাক্তার সতীশদাস আমাদের নিকট বিদায় নিয়ে অতি ক্ষুণ্ণমনে চলে গেলেন। এই

সদানন্দ সরল বিনয়ী বন্ধুটির সঙ্গ ছাড়তে হ'লো ব'লে আমাদের সকলেরই মন বেশ একটু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো।

ভুসাওয়ালের কয়েকটি ষ্টেশন পরেই জালগাঁও জংসন। অজন্তার যাত্রীদের এইখানেই নামতে হয়। আমরা রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ জালগাঁও জংশনে এসে নামলুম। রাত্রের মতো ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমেই থাকার ব্যবস্থা করা গেল। স্থির হ'লো, পরদিন অতি প্রত্যূষে একখানি মোটর নিয়ে আমরা অজন্তা দেখতে যাবো। অজন্তা এখান থেকে মাত্র সাঁইত্রিশ মাইল দূরে।

ষ্টেশনের ধারে খাবারের দোকানে যা পাওয়া গেল তাই কিছু কিছু কিনে এনে বঙ্কিমবাবু ও দিবাকরবাবু তাঁদের রাত্রিভোজ সমাপ্ত করলেন। আমি ও জলধরদাদা শুধু দু'কাপ চা ও সামান্য কিছু মিষ্টান্ন খেলুম। তারপর ওয়েটিং রুমের বড় বড় বেতের বেঞ্চি ও ইজিচেয়ারগুলিতে কম্বল বিছিয়ে যে যার শুয়ে পড়লুম। জলধরদাদা বললেন পাদুটো বড় কামড়াচ্ছে হে নরেন, কাউকে ধরে একটু টিপিয়ে নিতে পারলে হ'তো। আমি ষ্টেশনের একজন কুলীকে কিছু দিয়ে দাদার পা টেপাবার ব্যবস্থা করে দিলুম।

একটি বর্ম্মাচুরুট টানতে টানতে পা টেপানোর আরাম পেয়ে দাদা ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি কুলিটিকে বিদায় করে ওয়েটিং রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলোটি কমিয়ে শুয়ে পড়লুম এবং অজন্তার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম কিছুই টের পাইনি।

পরদিন ভোর পাঁচটায় দাদা আমাদের ডেকে তুলে দিলেন। সবাই উঠে প'ড়ে মুখহাত ধুয়ে, চা ও জলযোগ সেরে অজন্তা যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে সেই মুসলমান যুবকটির নির্দ্দেশমত ঠিকানায় ষ্টেশনের একজন চাপরাশীকে মোটর আনতে পাঠিয়ে দিলুম। অবিলম্বে সে একখানি সুন্দর মোটর গাড়ী এনে হাজির করলে। কিন্তু সে গাড়ীখানি অজন্তায় যেতে আসতে চল্লিশ টাকা ভাড়া চাইলে ব'লে, তাকে বিদায় করে দিয়ে আমরা অন্য মোটরের সন্ধান করতে বেরুলেম। কারণ, আমরা শুনেছিলুম জালগাঁও থেকে কুড়ি টাকায় অজন্তা যাতায়াতের জন্য মোটর পাওয়া যায়। পেলুমও তাই।

আমাদের বাক্স বিছানা প্রভৃতি মালপত্র সমস্ত ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মায় রেখে, আমরা বেলা সাতটার মধ্যেই অজন্তায় রওনা হলুম। পথে একটি হোটেল দেখতে পেয়ে সেখান থেকে কিছু পাঁউরুটী কলা ও মিষ্টান্ন কিনে নিলুম। সারাদিন অজন্তা-গুহায় কাটাতে হবে। সুতরাং আজকে এই পাঁওরুটি ও কলার সাহায্যেই মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিতে হবে স্থির হ'লো। এখানকার 'মিষ্টান্ন' দেখলুম 'পেঁড়া' জাতীয়, কিন্তু, তাতে ক্ষীরের পরিবর্ত্তে চিনির প্রাধান্যই খুব বেশী।

আমাদের মোটর শীঘ্রই সহর ছাড়িয়ে এসে মাঠের রাস্তা ধরলে। জালগাঁও সহরটি ছোট হ'লেও রাস্তাঘাট বেশ ভালো। বড় বড় বাড়ীঘরও যথেষ্ট। দোকানপাট ও হাটবাজারেরও অভাব নেই দেখলুম। পথে দু'একটি তুলোর কলও চোখে পড়লো।

এখানকার মোটর ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই মুসলমান এবং অতিশয় ভদ্র। আমাদের গাড়ী একটু জোরে চালিয়ে নিয়ে যেতে বলায় তৎক্ষণাৎ তারা গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিলে। টানা চব্বিশ মাইল চলে এসে আমাদের গাড়ী কিছুক্ষণের জন্য পাহুরে থামলো। পাহুর থেকে অজন্তার দূরত্ব আর তেরো মাইল মাত্র। যে পথে মোটর বাস যাত্রী নিয়ে অনবরত যাতায়াত করে, পাহুর সেই পথের একটা মস্ত ঘাঁটি। এইখানে উত্তর বা দক্ষিণ দিকের দূরের যাত্রীদের বাস্ বদল করতে হয়। আমাদের মোটর গাড়ীর চালক ও পরিচারক পাহুর থেকে তাদের নিজেদের জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে নিলে দেখলুম।

পাহুর একেবারে ইংরাজ অধিকারের সীমানায়। এর পর থেকেই নিজাম রাজ্য আরম্ভ হ'য়েছে। অজন্তা নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। জালগাঁও থেকে অজন্তা যাবার পথে পথিকদের জন্য রাস্তার ধারে বরাবর দণ্ডসংলগ্ন কাষ্ঠফলকে পথনির্দ্দেশ জ্ঞাপন করা রয়েছে দেখা গেল। এক যায়গায় আমরা দেখলুম একটি কাষ্ঠফলকে লেখা রয়েছে 'The Ghat begins'; খানিকদূর এগিয়ে দেখি আর একখানি কাষ্ঠফলকে লেখা রয়েছে 'The Ghat ends', আমরা এটাকে সুনিশ্চিত ভারতের পশ্চিম ঘাট বলেই ধ'রে নিলুম। নিজাম রাজ্য যেখান থেকে সুরু হ'য়েছে সেখানেও একটি কাষ্ঠফলকে সে কথা লিখে পথিকদের বিজ্ঞাপিত করা হ'য়েছে।

অজন্তা যাবার পথে দু'ধারে কেবল তুলোর চাষই চ'খে

পড়লো। কাজল-ডেলার মতো কুচকুচে কালো মাটির ক্ষেত। পথে ঘাটে যে সব মেয়েদের দেখা গেল তাদের আকৃতি ও পরিচ্ছদের সঙ্গে অজন্তা গুহায় চিত্রিত মেয়েদের যেন কোথায় একটু ক্ষীণ অস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে হ'তে লাগলো। এ অঞ্চলের মেয়েরা কেউ গৌরাঙ্গী নয়। সকলেই প্রায় শ্যামা! কিন্তু, তাদের সুগঠিত দেহে পরিপুষ্ট যৌবন ও অটুট স্বাস্থ্য এমন একটি সুন্দর শ্রী দান করেছে যে তা পথিকের দৃষ্টিকে প্রীত করে, পীড়িত করে না। অজন্তার পথের কথা বলেই এবার বিদায় নিচ্ছি; অজন্তার কথা আসচে বারে বল্‌ব। (ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাঙ্গালী কবিরাজ গোবিন্দদাস

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে এক অভিনব মত প্রচার করিতেছেন যে সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজ মিথিলাবাসী। তাহার প্রকৃত নাম গোবিন্দ ঝা, কবিরাজ হইতেছে কবির পরিচায়ক উপাধি। আর বাঙ্গলায় যে গোবিন্দ কবিরাজ ছিলেন তিনি মোটেই ভাল কবি ছিলেন না, বাঙ্গালীরা না জানিয়া মিথিলার কবিকে বাঙ্গালী বলিয়া ভুল করিয়াছে—ইত্যাদি। এই মর্ম্মে তিনি গত ১৩৩১ সালের মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লেখেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় সন ১৩৩৩ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় 'মহাকবি গোবিন্দ দাস কি মৈথিল' এই নাম দিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন। রায় মহাশয়ের প্রবন্ধটী 'ভারতীর' আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র এই তিন সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে প্রচুর যুক্তি ও প্রমাণ দিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, গোবিন্দ কবিরাজ মৈথিল নহেন বাঙ্গালী। নগেনবাবু সে সম্বন্ধে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া গত বৎসর সেই একই কথা একটু এদিক্ ওদিক্ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পাঠাইয়া দেন। লেখাটী পরিষদের কোনো অধিবেশনে পঠিত হয়। নগেনবাবু সম্প্রতি আবার সেই কথাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গত আষাঢ়ের 'প্রবাসী' পত্রে 'বৈষ্ণব কবিতার শব্দ ও ভাষা' প্রবন্ধে তিনি গোবিন্দ কবিরাজকে মৈথিল বলিয়া কয়েকটা পদের আলোচনায় নিজ পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন। এ প্রবন্ধেও রায় মহাশয়ের প্রতিবাদের কোনো আলোচনা নাই। এই সমস্ত কারণে আমরা 'গোবিন্দ দাস' সম্বন্ধে পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, এই লেখাটী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, এবং গোবিন্দ কবিরাজের বাঙ্গালীত্বের পক্ষে আমরা যাহা নিবেদন করিতেছি, উপযুক্ত যুক্তি প্রমাণে তিনি তাহা খণ্ডন করিবেন। কারণ, মূলে গোবিন্দ কবিরাজ যদি মৈথিল না হন, তাহা হইলে একটা নির্জ্জলা ভুলের এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রচার কোনো ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। নগেনবাবু প্রবীণ ব্যক্তি, সুতরাং নিজের কথা ষোল কাহন না করিয়া অপরে কি বলিতেছে সে দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রতিবাদ যেই করুক, সত্য থাকিলে তাহা উপেক্ষা করা সঙ্গত কি না সেটাও ভাবিবার কথা। অবশ্য পাঠ-বিকৃতির আলোচনায় বা ব্যাখ্যায় কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে না। কবি যে দেশেরই হউন, ভুল পাঠ কেহই সমর্থন করিবে না। আমরা এ বিষয়েও যাহা বলিবার নিবেদন করিতেছি।

নগেনবাবু বসুমতীর প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—"এই গোবিন্দ দাস মিথিলা-বাসী। হরিনারায়ণ মিথিলার রাজার উপাধি। অন্য পদের ভণিতায় রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ ও রায় চম্পতির নাম আছে।" ইত্যাদি (গোবিন্দ-দাসের একটী পদে 'হরিনারায়ণ দেবা' এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়)।

উত্তরে রায় মহাশয় ভারতীর প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—

(১) গোবিন্দদাস নাম মিথিলার ঝা কবির ছিল না। ভণিতায় দাস শব্দের ব্যবহার মিথিলার কবিতায় পাওয়া যায় না। উহা শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণেরই দৈন্য-পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য। দরভাঙ্গার অন্তর্গত শুভঙ্করপুর গ্রামের অধিবাসী ও দরভাঙ্গা-রাজের জনৈক পারিষদ শ্রীযুক্ত ভোলা ঝা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'মিথিলা গীত সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডে গোবিন্দ ঠাকুরের "সুমু ভুবনেশ্বর নাথ" এই একটী পদ আছে। তাহার ভণিতা 'কহ গোবিন্দ কর জোরি বিনয় প্রভু মানিয়' ইত্যাদি। ইহাতে দাস ভণিতা নাই। এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড পাওয়া যায় নাই।

(২) মিথিলার কোন্ কোন্ প্রামাণ্য পুঁথিতে গোবিন্দদাস ভণিতায় কি কি পদ পাওয়া গিয়াছে, নগেনবাবুর প্রবন্ধে তাহার কোনো উল্লেখ নাই। "শিব সিংহ সরোজ" নামক হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যের প্রামাণিক গবেষণাপূর্ণ ইতিহাসে অথবা সার গ্রিয়ার্সনের Hindi Literature, বা Maithil chrestomathy গ্রন্থে গোবিন্দদাস কবির কোনো প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না।

(৩) পদকল্পতরু গ্রন্থে বৈষ্ণবদাস যে গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুরের নাম করিয়াছেন, তিনি সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাস। কারণ ভক্তমাল,

প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, শ্রীনিবাস চরিত, সারাবলী, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে বাঙ্গালী গোবিন্দ দাসই কবিরাজ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। মৈথিল কবি গোবিন্দ ঝার যে কবিরাজ উপাধি ছিল মিথিলার বা বাঙ্গালার কোনো গ্রন্থে তাহার প্রমাণ নাই।

(৪) পদকল্পতরুতে 'জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন' এই যে পদটী আছে, ইহা বাঙ্গালী গোবিন্দ কবিরাজের রচনা। জয়দেব-কৃত দশাবতার বর্ণনার পদটী পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার সপ্তবিংশতি পল্লবে (ঐ পদের ১১টী কলি) ১১টী পদ রূপে সন্নিবেশিত করিয়া বৈষ্ণবদাস ১২শ পদরূপে "শ্রিত কমলাকুচমণ্ডল" পদটী সঙ্কলন করিয়াছেন। এই পদে কবি জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণনায় শ্রীগীতগোবিন্দের ভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন। মাধুর্য্যের—রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ বর্ণনের জন্য এই ভূমিকার প্রয়োজন ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণের প্রেম-কথায় পদের আরম্ভ ও শেষ,—"শ্রিত কমলাকুচমণ্ডল * * * শ্রীমুখচন্দ্র চকোর।" কিন্তু কৃষ্ণলীলার—সর্ব্বোত্তম নরলীলার কথাই—শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার বর্ণনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী কবিগণের একমাত্র লক্ষ্য। তাই "জনকসুতাকৃতভূষণ জিত-দূষণ সমর শমিত দশকণ্ঠ" জয়দেব কথিত এই কলিটীর বিস্তৃতি হিসাবে—রাধাকৃষ্ণ-লীলা বর্ণনের পূর্ব্ব ভূমিকায় নরলীলার সূচনা স্বরূপে আদর্শ মানব দম্পতি শ্রীসীতারামের প্রণয়-কাহিনীর আভাস দিবার জন্য বৈষ্ণবদাসকে "জয় জয় শ্রীল রামরঘুনন্দন" পদটী উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। এই পদটী এখানে আরো শোভন হইয়াছে এই জন্য যে 'কবি গোবিন্দদাস হরিনারায়ণ দেবকে হৃদয়ে অবধারণ করিয়াছেন (অর্থাৎ দশাবতার বর্ণনায় যিনি হরে সম্বোধিত হইয়াছেন সেই হরি নারায়ণ লক্ষ্মীপতি, এবং রামচন্দ্রে কোনো ভেদ নাই। বৈষ্ণবগণ শ্রীনাথে জানকীনাথে এবং শ্রীনাথে রাধানাথে সিদ্ধান্ততঃ কোনো ভেদ দেখেন না। তবে রসোৎকর্ষের জন্য কেহ কেহ রুচি বশতঃ কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন। যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়) 'জয় জয় শ্রীল রামরঘুনন্দন' পদের ভণিতা এইরূপ "গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল হরিনারায়ণ দেবা।" ইহা হইতে এরূপ বুঝায় না যে এই হরিনারায়ণ মিথিলার রাজা। হরিনারায়ণ কাহারো উপাধি নহে, উহা মিথিলার রাজা ভৈরবসিংহের নামান্তর। কিন্তু এ পদের লক্ষ্য তিনি নহেন।

(৫) চম্পতি যে বিদ্যাপতির উপাধি ছিল তাহার কোনো প্রমাণ নাই। রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্রের স্বপ্রণীত টীকায় ইঁহাকে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের একজন পাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চম্পতি ভণিতার বাঙ্গালা পদও আছে। অনেক স্থলে রায় চম্পতি স্থলে প্রাত-আদিত পাঠ পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের কোনো কোনো পদে এই প্রাতআদিত, ও রায় বসন্তের নাম আছে। এই দুইজন কি মিথিলার কেহ, অথবা এই দুইটীও বিদ্যাপতির উপাধি? রায় বসন্তের ভণিতাযুক্ত পদ আছে, উদয়াদিত্য ভণিতার পদ পদকল্পলতিকায় আছে,—খুঁজিলে হয় তো প্রাতআদিত বা প্রতাপাদিত্যের পদও মিলিতে পারে। প্রতাপ নারায়ণ ভণিতার পদ পাওয়া গিয়াছে।

(৬) স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় নরসিংহকে পক পল্লীর (পাক'পাড়া) রাজা এবং রূপনারায়ণকে তাঁহার সভাসদ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (গৌরপদ তরঙ্গিনীর ভূমিকা)। পদকল্পতরুতে নৃসিংহদেব ভণিতার (১১৫৯ ও ১৩২৪) দুইটী পদ আছে। অপর—"আকাশ ভরিয়া উঠে জয় জয় ধ্বনি" পদে 'নরসিংহ দেব' ভণিতা পাওয়া যায়—'নরসিংহদেব মাগে চরণে শরণ'। (১৫১৪ সংপদ) নরসিংহদাস ভণিতার পদও আছে। উদ্ধৃত করিতেছি—

ভাটিয়ারি

মরি বাছা ছাড়রে বসন।
কলসী উলাইয়া তোমারে লইব এখন॥
মরি তোমার বালাই লইয়া আগে আগে চল ধাইয়া
ধাগর নূপুর কেমন বাজে শুনি।
রাঙ্গা লাঠী দিব হাতে খেলাইও ছিদামের সাথে
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী॥
মুই রইনু তোমা লইয়া গৃহ কর্ম্ম গেল বইয়া
মোর হইবে কেমন উপায়।
কলসী লাগিল কাঁখে ছাড়হ অভাগী মাকে
হের দেখ ধবলী পলায়॥
মায়ের করুণা ভাষ শুনিয়া ছাড়িল বাস
আগে আগে চলে ব্রজরায়।
কিঙ্কিনী কাছনি ধ্বনি অতি সুমধুর শুনি
রাণী বলে সোণার বাছা যায়॥
ভুবন মোহিয়া উরে বাঘ নখ শোভা করে
সোনায় জড়িত ধোপা তায়।
ধাইয়া যাইতে পিঠে অধিক আনন্দ উঠে
নরসিংহ দাস গুণ গায়॥ (পদকল্পলতিকা)

এই নৃসিংহ দেব, নরসিংহ দেব এবং নরসিংহ দাস যে বাঙ্গালী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। গোবিন্দদাস যদি বাঙ্গালী বন্ধু বসন্ত রায়ের মত স্বীয় পদে ইঁহারও নাম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মিথিলার নরসিংহকে মিথিলায় রাখিতে হইবে।

(৭) রূপনারায়ণও বাঙ্গালী কেহ হইতে পারেন। আমরা কবি-রঞ্জন বিদ্যাপতি ও দীন চণ্ডীদাসের মিলনের পদে একজন রূপনারায়ণের উল্লেখ পাই। কবিরঞ্জন উপাধি মিথিলার বিদ্যাপতির ছিল না। পক্ষান্তরে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন।

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে, পদকল্পতরুতে এবং অন্যান্য প্রাচীন পুঁথিতে আজ পর্য্যন্ত কবিরঞ্জন ভণিতার যতগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে, সবগুলিই এই কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির রচিত। ইঁহার বিদ্যাপতি ভণিতার ব্রজবুলিও বাঙ্গালায় অনেক পদে পাওয়া যায়। এই কবিরঞ্জনের রূপনারায়ণ নামে একজন বন্ধু ছিলেন। বসন্ত ও নরসিংহের মত ইঁহারও পদ আছে। খুব সম্ভব গোবিন্দদাস নিজের পদে এই রূপনারায়ণের নামই উল্লেখ করিয়াছেন। মিথিলার গোবিন্দ ঝা বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী ব্যক্তি;

ইনি স্বীয় পদে ভূতপূর্ব্ব রাজাদের নাম করিলেন কেন, নগেন বাবু তাহার কোনো সঙ্গত কারণ দেখান নাই। আমরা রূপনারায়ণ ভণিতার পদটী উদ্ধৃত করিতেছি—

শারদ পূর্ণিমা হিমকর বয়নে।
চঞ্চল নীল নলিনী দল নয়নে॥
প্রাতরুদিত রবি সিন্দুর কাঁতি।
সাজল দশন মুকুতা ফল ভাঁতি॥
বঙ্ক বিলোকনী কাজর রঙ্গি।
কাম কামান কুটীল ভ্রুভঙ্গি॥
শ্রীফল সুফলিত কৃত কুচ কলসে।
মত্ত ময়ূরী গতি জিতিয়া অলসে॥
মৃগমদ চন্দন চর্চ্চিত দেহা।
তরল ঘনাতট দামিনী রেহা॥
রূপনারায়ণ সঙ্গীতভণিতম।
রমণী শিরোমণি রাধার চরিতম্॥

(৮) মিথিলার গোবিন্দ ঝা ব্রজবুলিতে পদরচনা করেন নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গলায় প্রচলিত গোবিন্দদাস ভণিতার প্রায় তিন শত প্রসিদ্ধ পদ বাঙ্গালা ভাষা এবং ব্রজবুলিতে রচিত। ইহার মধ্যে কতকগুলি পদ আবার বিদগ্ধ মাধব, উজ্জ্বল নীলমণি, উদ্ধবসন্দেশ, হংস দূত ইত্যাদি গ্রন্থের শ্লোক বিশেষের মর্ম্মানুবাদ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় এইরূপ পদের উদাহরণ স্বরূপ ভারতী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—

(ক) পদকল্পতরুর ১৩৯ সং পদ 'সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি', এই পদ বিদগ্ধ মাধবের 'একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং' ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

(খ) পদকল্পতরুর ৬৪৬ সং পদ 'মধুমুখ বিমল কমলবর পরিমলে', এই পদ উদ্ধবসন্দেশের 'মদ্বক্ত্রাম্ভোরুহ পরিমলোন্মত্ত সেবানুবন্ধে' ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

(গ) পদকল্পতরুর ৭১৬ সং পদ "সজনি কি কহব রাইক সোহাগি" এই পদ উজ্জ্বল নীলমণির "সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

(ঘ) পদকল্পতরুর ১৬৯১ সং পদ 'মাথুর দূত করি গরুতহি মানি' এই পদ হংসদূতের অনুসরণে রচিত।

এই সমস্ত পদ মিথিলার ঝার হইতে পারে না। তা ছাড়া যে সমস্ত পদে সখীভাবের বা সেবাভাবের ভণিতা আছে, সে গুলিও বাঙ্গালী কবিরাজ গোবিন্দদাসের। যথা—

গোবিন্দদাস পন্থ দরশায়ত, গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়, বীজন করতহিঁ গোবিন্দদাস, চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস, জল সেবন করু গোবিন্দদাস, চরণ সেবন করু গোবিন্দ দাস, ইত্যাদি।

(৯) 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থখানি প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। 'ভক্তিরত্নাকর' বৈষ্ণব ইতিহাস বিষয়ে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থোক্ত গোবিন্দ কবিরাজের পরিচয় এইরূপ—

দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেঁহো মহাকবি নামে বিদিত জগতে॥

*　　*　　*　　*

বিপ্র বরে সুনন্দা নামেতে হৈল কন্যা।
দিনে দিনে বাড়ে মহা রূপে গুণে ধন্যা॥
দামোদর কবিরাজ মহা ভাগ্যবান।
চিরঞ্জীব সেনে কৈল কন্যা সম্প্রদান॥
ভাগীরথী তীরে গ্রাম কুমার নগর।
অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর॥
সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি॥

*　　*　　*　　*

রামচন্দ্র গোবিন্দ এই দুই সহোদর।
পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর॥

এই গোবিন্দই শ্রীবৃন্দাবনস্থিত আচার্য্যপাদগণের নিকট হইতে 'কবিরাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন। 'ভক্তিরত্নাকরে' এই উপাধির বিষয়ে লিখিত আছে—

শ্রীগোবিন্দ রামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ কবি সবে প্রশংসয়॥
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে॥
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাই॥

যথা—

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র চন্দন গিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলে
নানীতঃ কবিতাবলী পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধ ভাক্।
শ্রীমজ্জীব সুরাজি পাশ্রয় জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎ কৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরং॥

গোবিন্দের কবিত্ব সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে অন্যত্র আছে—শ্রীনিত্যানন্দ তনয় বীরভদ্র প্রভু খেতরীর মহোৎসবে গোবিন্দ-রচিত পদ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া—

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটী করে ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লইয়া মরি॥"

এই সমস্ত বিবরণে অবিশ্বাস করিবার কোনো হেতু নাই। বাহুল্য ভয়ে 'গৌরগণোদ্দেশ' "নরোত্তমবিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল না।

(১০) শ্রীখণ্ডের কবিরাজ গোবিন্দদাস জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র সহ বুধুরি গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইনি 'বুধুরিবাসী' রূপেও অনেক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় গোবিন্দ কবিরাজ মাত্র একজনই ছিলেন।

(১১) কবিরাজ গোবিন্দদাস, শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, কবি রায়শেখর, ইঁহারা প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি। রায় বসন্ত, নরসিংহ, রূপনারায়ণ প্রভৃতিকেও এই সময়েই পাওয়া যায়। শ্রদ্ধাবশতই হৌক বা অন্য যে কোনো কারণেই হৌক একজনের পদে অন্যজনের নামোল্লেখ

কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গোবিন্দদাস যে বিদ্যাপতির কোনো কোনো পদ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় তাহা বলিয়া গিয়াছেন। লোকে জানিত, এই পদ বিদ্যাপতির, কিন্তু সব কলিগুলি জানিত না। এইরূপ কোনো পদ পূরণ করিয়া গোবিন্দদাস হয় তো তাহাতে বিদ্যাপতির সঙ্গে নিজের নামও ভণিতায় উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। সেকালে অধিকাংশ স্থলেই গুরু অপেক্ষা শিষ্যের বয়স বেশী হইত। সুতরাং রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া রায়শেখর ও কবিরঞ্জন যে কম বয়সী ছিলেন এমন অনুমানের কোনো হেতু নাই। হয় তো সমান বয়স ছিল। সুতরাং গোবিন্দদাস কবিশেখর ও কবিরঞ্জন অপেক্ষা বয়সে কম ছিলেন এমনও হইতে পারে। তিনি এই অগ্রজ কবিগণের নিকট কিছু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তাহাও জানা যায় না। এই সব কারণে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের নাম কোনো পদে একসঙ্গে পাওয়া গেলেই তাহা মিথিলায় পৌছাইয়া দেওয়ার পূর্ব্বে সাত-পাঁচ বিবেচনা করা উচিত। একটী পদে ভণিতা আছে—

"বণিত রাস বিদ্যাপতি শূর।
রাধামোহন দাস রসপূর॥"

এ ক্ষেত্রে কি বলিব,—রাধামোহন বিদ্যাপতির উপাধি? যেমন চম্পতি? অথবা রাধামোহন মিথিলার কবি, যেহেতু তাঁহার সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম একত্র পাইতেছি?

এইবার পাঠ বিচারের কথা। তৎপূর্ব্বে বলিয়া রাখা ভাল যে, নগেন বাবু যে সব পদের পাঠ বিচার করিয়াছেন, তার কোনোটাই গোবিন্দ ঝার নহে। ভাবে ভাষায় একটা পদও মিথিলার ধার দিয়া যায় না। ব্রজবুলি কোনো প্রদেশের ভাষা নহে। ইহা মৈথিল, হিন্দী, বাঙ্গালা মিলাইয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের সৃষ্ট এক কৃত্রিম ভাষা। তার মধ্যে এক আধটা মিথিলার শব্দ বা মৈথিল ব্যাকরণের খেই পাওয়া গেলেই গোটা পদটাই গোবিন্দ ঝার হইবে না। আর যে বাঙ্গালীরা মিথিলায় গিয়া গৌতম সূত্রের মত জটিল দর্শন অর্থসহ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা যদি মৈথিল ভাষায় দুটা একটা পদ লিখিয়াই থাকে তো তাহাদিগকে দোষ দিবার কি আছে?

'কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল' বাঙ্গালী গোবিন্দ কবিরাজের একটী বিখ্যাত পদ। এই পদের একটী কলি "কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন শিখই ভুজগ গুরু পাশে"। নগেনবাবু ১৩৩১ সালের মাসিক বসুমতী পত্রিকায় এই কলিটীর একটী শুদ্ধ পাঠ দিয়াছিলেন—"কর কঙ্কণ পুনু মণিমুখ বন্ধন শিখই ভুজগ গরুঅ পাশে"। অর্থ করিয়াছিলেন—"আবার কর কঙ্কণের মুখমণির বন্ধনে ভুজঙ্গের গুরু পাশ শিক্ষা করে"। কর কঙ্কণের মুখমণির বন্ধনটা কিরূপ তিনি বুঝাইয়া দেন নাই। এই মুখমণিটা কি বস্তু, কোথায় কি ভাবে বাঁধিলে ভুজঙ্গের গরুঅ পাশ শেখা যায়, সে সব সন্ধান এবং গরুর উপরে স্বয়ে অ প্রত্যয় করিলে ভাষাটা কিরূপে মৈথিলে গিয়া দাঁড়ায় তাহার হদিস্ আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তবু যা হোক, এ ভাবে ছন্দটা এক রকমে বজায় ছিল। এবার প্রবাসী পত্রে এই কলিরই তিনি আর একটা অধিকতর শুদ্ধ—বোধ হয় বি-শুদ্ধ পাঠ দিয়াছেন। যথা—

"কর কঙ্কণ পরশন ফণিমুখ বন্ধন শিখই ভুজগ গুরুঅ পাশে"। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি—আমরা যে বেজায় ধাঁধায় পড়িলাম! নগেনবাবুর এই দুই রকম পাঠের মধ্যে কোন্‌টা আসল বলিয়া গ্রহণ করিব? অথবা দুইটাই আসল মনে করিব? তার পর সমগ্র পদটী যে ভাবে আবৃত্তি করিয়া আসিলাম, এ কলিটা তো সে ভাবে আবৃত্তি চলে না। এবার তিনি অর্থ দিয়াছেন—"রাধা নিজের কর কঙ্কণ চরণে স্পর্শ করাইয়া ভুজঙ্গের কঠিন বন্ধন শিক্ষা করিতেছেন"। হাতের কাঁকন পায়ে ঠেকাইয়া—অর্থাৎ সুড়সুড়ি লাগাইয়া ভুজঙ্গের কঠিন বন্ধন শিক্ষা করা যায় কি না জানি না।

সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যের কথা আমরা মৈথিল জানি না বলিয়া তিনি গুরু-গম্ভীর ভাবে ভাষাতত্ত্ব লইয়াই অধিক আলোচনা করিতেছেন। দেখিতেছি—গোবিন্দ ঝাকে লইয়া তিনি একটু বিব্রত হইয়াও পড়িয়াছেন। ভাষা তত্ত্বের উদাহরণটা লউন। পদকল্পতরুর ৯৯১ সং "অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাপ" পদ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিতেছেন (বসুমতী ১৩৩১) "আর একটা পদে পাঠ বিকৃতি নহে, ভাষার বিশিষ্টতা প্রমাণিত হয়"। পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন; তার মধ্যে দুইটী কলি এইরূপ—

"ভ্রমর ভুজঙ্গ মনিসি আঁধিয়ার।
তঁহি বরিখত অবিরত জলধার"॥

ব্যাখ্যা দিতেছেন—"মনিসি শব্দের অর্থ মনে করিতেছি, অনুমান করিতেছি। এই আকারে এই শব্দের প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না"।

কত বড় মনীষী হইলে তবে এইরূপে অর্থ-সঙ্গতি নিরূপিত হয়। গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন—এই আকারে প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না। অর্থাৎ কি না—প্রায় দেখা যায় না, তবে দেখা যায়। এবং বোধ হয় তিনিও দেখিয়াছেন? অথবা এটা তাঁহারই অর্থ! অবশ্য মনিসির অর্থ 'অনুমান করিতেছি' ধরিয়া ঐ দুইটী চরণের অর্থ কিরূপ হইবে তিনি তাহা বলেন নাই। 'ভ্রময়' (ভ্রময়ে, ভ্রমই) যে লিপিকর প্রমাদে ভ্রমর হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি "ভুজঙ্গম নিসি আঁধিয়ার" কে 'ভুজঙ্গ মনিসি' পাঠ করিয়াছেন "অনুমানেও" তাহা "মনে করিতে" পারেন নাই। একটা নূতন মত খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে যিনি এতটুকু ধৈর্য্য ধরিয়া একটা সামান্য পাঠের সঙ্গতি অসঙ্গতির দিকে নজর দিবার অবসর পান না, পদাবলী সাহিত্যের আলোচনা তাঁহার পক্ষে কতখানি নিরাপদ, সে বিচারের ভার সাধারণের উপর রহিল।

শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধান

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম-এ

বিগত ফাল্গুন সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান সম্বন্ধে ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমার এক বন্ধুবর গত বৈশাখ মাসের উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমাকে ঐ প্রবন্ধটী পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং উহার স্থূল সিদ্ধান্তগুলি আমাকে

উহার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে চরিতামৃতের রচনার কাল ১৫১৫ শকের পূর্ব্বে হয় না। আমি কিন্তু এ বিষয় দীনেশবাবুরই মতাবলম্বী। কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাব ও কর্ণানন্দ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এজন্যও বনবিষ্ণুপুরের পুঁথির সময় অপ্রামাণ্য হইতেছে। বসন্তবাবু স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের মন্দির অথবা গুণ্ডিচাবাড়ী হইতে অন্তর্হিত হয়েন নাই। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের সহিত আমার কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। ইহাও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরোধী। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহ বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং বলরাম ও সুভদ্রা সমন্বিত দারুব্রহ্ম জগন্নাথ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইলেও এখানে তিনি দ্বারকাধীশ বাসুদেব। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবিষ্টাবস্থায় জগন্নাথদেবকে ব্রজেন্দ্রনন্দন দেখিতেন; কিন্তু বাহ্যজ্ঞান হইলে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন। তাঁহার মনে হইত যে তিনি কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছেন। রথযাত্রার সময় তাঁহার আনন্দ যে তিনি তাঁহার প্রাণনাথকে শ্রীবৃন্দাবন লইয়া যাইতেছেন। রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের তখন মানসিক অবস্থা যথা—"সেই তো পরাণনাথে মুঁই পাইনু। যার লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু"। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে শ্রীশ্রীরাধামাধব মিলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথদেবে বিলীন হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই উক্তি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর ও ঈশান নাগর মহাশয় তাঁহাদের গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত বিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধক। তাঁহারা যে কেন এই জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা সুকঠিন। বরং যাঁহারা শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহে বিলীন হইয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সে সিদ্ধান্ত তত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরোধী নহে। এখন দেখা যাউক, ইহার কোন ভিত্তি আছে কি না। বসন্তবাবু জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য "টোটার" মধ্য হইতে লীলাসম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত এ বিষয়েও আমি কোন মতভেদের কারণ দেখি না। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন জয়ানন্দের বর্ণিত টোটা—কাশী মিশ্রের ভবন বা গাম্ভীরা; এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "অহিটোটা"ও ঐ স্থানকে লক্ষ্য করিতেছে। এই স্থানেই তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারিতেছি না এবং এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জয়ানন্দের গ্রন্থে সর্ব্বত্রই "টোটা" শব্দের লক্ষ্য "গদাধরের টোটা বা শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দির" বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহার গ্রন্থে কাশী মিশ্রের বাড়ীর বা গাম্ভীরার কোন উল্লেখই দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের পর নীলাচলে উপনীত হইলে জগন্নাথদেবের উক্তি, যথা—জয়ানন্দের উৎকলখণ্ডে—

"সিন্ধু তটে চৈতন্য বিশ্রাম স্থান টোটা।
তাহারে পাঠাও ভোগ অন্ন ব্যঞ্জন পিঠা॥
সিন্ধুতটে রহুমত মহান্ত বৈষ্ণব।
নীলাচলে দেখে যত মোর মহোৎসব॥
আমি কৃষ্ণচৈতন্য অভেদ করি জান।
সচল জগন্নাথ এই ব্রহ্ম করি মান॥
এই আজ্ঞা পাইঞা পরিছা সবধাএ।
টোটারে চৈতন্য গোসাঞি সংহতি জাএ॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি দেখিঞা সম্মুখে।
জগন্নাথের আকাজ্ঞত কহি একে একে॥"

এখানে এই "টোটা" স্পষ্টই সিন্ধুতটের সন্নিকট গদাধরের আশ্রমকে বুঝাইতেছে, যে স্থলে পরে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীচরিতামৃতের মতেও এখন কাশী মিশ্রের বাড়ী তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনের পর ঐ স্থান তাঁহার আবাসরূপে নির্ণীত হয়। কিন্তু জয়ানন্দের মতে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও গদাধরের টোটায় অবস্থান করিয়াছিলেন। যথা জয়ানন্দে—

"জগন্নাথের আজ্ঞা টোটা চল গৌরচন্দ্র।
একশত মালা আবীর চোআ গন্ধ॥"

এইরূপে দেখা যাইবে, জয়ানন্দের মতে টোটা অর্থে সর্ব্বত্র গদাধরের টোটা। বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করা গেল না। লীলাবসানের পূর্ব্বে জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যকে টোটার মধ্যে রাখিযাছেন এবং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যথা জয়ানন্দে—

"পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা।
কালি দশদণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥"

যদিও গাম্ভীরায় তাঁহার শেষ অষ্টাদশ বৎসরের লীলা অভিনীত হইয়াছিল সত্য, তথাপি আমাদের বিবেচ্য—জয়ানন্দ "টোটা" শব্দে কোন্ স্থানকে লক্ষ্য করিয়াছেন? আমরা দেখাইলাম যে, তাঁহার বর্ণিত টোটা সমুদ্রতীরস্থ গদাধরের টোটা। চরিতামৃত গ্রন্থে গাম্ভীরাকে কোন স্থলে টোটা বা বাগান অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই; কারণ, উহা কাশী মিশ্রের বাড়ী; বাগান-বাড়ী নহে। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত "অহিটোটা" ও "গদাধরের টোটা"কেই বুঝাইতেছে: কারণ, এইখান হইতেই সমুদ্র স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কাশী মিশ্রের বাড়ী বা বর্ত্তমান রাধাকান্ত মঠ যদিও সমুদ্র ও গুণ্ডিচাবাড়ীর মধ্যস্থলে অবস্থিত, তথাপি উক্ত স্থান হইতে সমুদ্র অনেক দূর। শ্রীচৈতন্যের সময়েও ঐ স্থান হইতে সমুদ্র পরিলক্ষিত হইত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ "চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রম" এই চরিতামৃত-বর্ণিত অংশও গদাধরের টোটাকে বুঝাইতেছে। শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দিরের সন্নিকটস্থ বালুকাপ্রদেশজাত বনস্পতি দ্বারা সুশোভিত পর্ব্বতাকারে বর্ত্তমান বালীর স্তূপই এই চটক পর্ব্বতের লক্ষ্য, এবং ইহারই দক্ষিণে নীল জলরাশি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনে কালিন্দীর ভাব জাগাইয়া দিত। গদাধরের টোটা অর্থে জয়ানন্দের বর্ণিত টোটা ধরিলে প্রাচীন কিম্বদন্তী যে শ্রীচৈতন্য গোপী-নাথ জীউর শ্রীবিগ্রহে বিলীন হইয়াছিলেন, তাহাও সুসঙ্গত হয়। শ্রীমন্মহা-প্রভু নিজ লীলাবসানের কাল সন্নিকটস্থ বুঝিয়া পঞ্চমীর দিবস গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দকে বিদায় দিলেন। তৎপর তাঁহার চিরসুহৃদ প্রাণপ্রিয়তম শ্রীল গদাধরের আশ্রমের শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর সম্মুখে লীলাসম্বরণের অভিপ্রায়ে গাম্ভীরা ত্যাগ করিয়া ঐ টোটায় গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। স্বরূপাদি নিত্যসহচরগণও এই স্থানে তাঁহার নিকটে ছিলেন বুঝিতে হইবে।

দক্ষিণে অনন্তবিস্তৃত নীলপয়োধি, পার্শ্বে চটক পর্ব্বত গোবর্দ্ধনের ন্যায় বিরাজিত এবং সম্মুখে শ্রীরাধার প্রাণনাথ শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর শ্রীবিগ্রহ—সমস্তই তাঁহার মনে বৃন্দাবনের স্মৃতিই জাগাইয়া দিতেছিল। মহাভাবস্বরূপিণী উন্মাদিনী শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলাবসানের পক্ষে এই স্থানটী প্রশস্ত বলিয়া মনে হয় না কি? জয়ানন্দ পরে বলিতেছেন—"মায়ার শরীর তথা রহিল পড়িয়া"। এই স্থানেই বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার বিরোধ। এইজন্যই তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করাও বৈষ্ণবের নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু জয়ানন্দ "মায়া" শব্দে "যোগমায়া" অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ধরিয়া লইলেই সকল গোল মিটিয়া যায়—আর কোন বিদ্বেষের কারণই থাকে না। বৈষ্ণব গ্রন্থেই পাওয়া যায় যে, স্বয়ং ভগবান যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তিনি তাঁহার শ্রীবিগ্রহকে অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখেন। এজন্য প্রেমিক ভক্তগণ, যাঁহাদের জন্য তাঁহার অবতরণ, লীলা, তাঁহারা ভিন্ন অপরে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন না। এজন্য এই অবতারবাদও ঠিক ইতিহাসের বিষয় নহে। যথা শ্রীগীতা—

"নাহং প্রকাশ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভি জানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্॥" (৭ম অধ্যায়)
"অবজানন্তিমাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরং॥" (৯ম অধ্যায়)

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও কবিরাজ গোস্বামী পাদ বার বার বলিতেছেন, তিনি না জানাইলে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য"। প্রিয়ই প্রিয়কে বরণ করিতে দেখা যায় - এজন্য গীতাতে বলিতেছেন—

"তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" (১০ম অধ্যায়)

অতএব অবতারবাদেও যোগমায়ার আবরণ স্বীকার্য্যই হইতেছে। নচেৎ মানবোচিত লীলাই হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য—এই আবরণের কি হইল? জয়ানন্দ এ সম্বন্ধে একবারে নীরব। যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন যে মহামতি যিশু খৃষ্টের সমাধি হইতে অথবা গুরু নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণের দেহের ন্যায় এই শ্রীবিগ্রহ সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিল—তাঁহার তাহা অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারেন। উহার সহিত জড় জগতের ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই; সুতরাং তাহাদের কথার আলোচনার কোন প্রয়োজনও দেখা যায় না। জয়ানন্দ সন্ন্যাসিগণের দাহন করাও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা উত্তরখণ্ডে—

"হরীতকী কাষ্ঠে মৈলা মহেন্দ্র ভারতী।
মুখে অগ্নি দিল তার তিনশত যতি॥"

মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ পক্ষে ইহা অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। এখন বাকী রহিল (১ম) সমুদ্রে সমর্পণ (২য়) সমাহিত করণ। যাহাই হউক না কেন উহা রাত্রির মধ্যেই সমাধা করা হইয়াছিল। যদি তাঁহাকে সমাহিত করাই হইয়া থাকে, তাহা হইতে জিজ্ঞাস্য সমাধি কোথায় সম্ভব? বসন্তবাবু অনুমান করিয়াছেন—গান্তী রায়। আমার অনুমান—শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর মন্দির-সংলগ্ন তাঁহার বামভাগে অবস্থিত কুঠারীর মধ্যে যেস্থলে এখন শ্রীশ্রীগৌর গদাধর বিগ্রহ যুগল প্রতিষ্ঠিত। ঐ সমাধির পার্শ্বে শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তম গদাধর স্বীয় প্রাণনাথের বিরহে প্রায় দুই বৎসর কাল অঝোর নয়নে ঝুরিয়া পরিশেষে তাঁহারই পার্শ্বে বিশ্রাম করিতেছেন এবং উভয় সমাধির উপর পরে শ্রীশ্রীগৌর গদাধর যুগল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য পূজা গ্রহণ করিতেছেন। যখন সমস্তই অনুমানের উপর নির্ভর তখন এ বিষয়ের আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দীনেশবাবু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর শেষ লীলা বর্ণিত হয় নাই বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কবিরাজের অনিপুণা বাণী আর চলে নাই—তাঁহার লেখনীর গতিও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা চৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃত গ্রন্থদ্বয়কে সাধারণ ইতিহাসের গণ্ডীতে আনিয়া বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত সাধক তাঁহারা ঐ দুই গ্রন্থ একত্র পাঠ করিলে কোন অভাবই মনে হইবে না; বরং তাঁহারা পরিপূর্ণকাম হইবেন। আত্মা জন্মাবধি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাধনাঙ্গের মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ ন্যায়ানুসারে অভিব্যক্তি লাভ করিয়া কিরূপে বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের অধিকারী হয় এবং ঐ প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বত্যাগ করিয়া কিরূপে প্রিয়তমের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করে এবং ঐ প্রেমের বিবিধ অবস্থার মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া পরিশেষে স্বীয় অংশিনীরূপা মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার চরণে আত্ম-নিবেদন পূর্ব্বক পরাশক্তির মধ্যে চিরদিনের জন্য আশ্রয় লাভ করিয়া নিজের পূর্ণাভিব্যক্তি অনুভব করে, তাহাই এই দুই অমূল্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। চৈতন্য ভাগবতে আত্ম-নিবেদনের পূর্ব্বাবস্থা বাহ্য সাধনাঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই শ্রীশ্রীনবদ্বীপলীলা; এবং চরিতামৃত গ্রন্থে অভ্যন্তর সাধনাঙ্গ দেখানো হইয়াছে। গৌড়ীয় ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের মধ্য দিয়া চরিতামৃতের আদি লীলার ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যলীলার অষ্টম অধ্যায়ে সাধনাঙ্গের ক্রম দেখানো হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ের শেষে শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্বের স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া "ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর" বলা হইয়াছে। চৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃত গ্রন্থ একত্র পড়িলে সাধক বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যেক অবস্থারই সাধক এবং প্রত্যেক সাধনাঙ্গেই সিদ্ধ; অর্থাৎ জীব যে অবস্থায় অবস্থিত হউন না কেন তিনি সেই অবস্থার সাধকের গুরু বা আদর্শ স্থানীয়।

ইহার পর পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শেষ দ্বাদশ বৎসরের লীলায় রাধা-প্রেমের বিভিন্নাবস্থার অভিব্যক্তি দেখাইয়া পরিশেষে ১৯শ পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে শ্রীশ্রীরাধার মূর্ত্তাবস্থা প্রকট করিয়া জীবব্রহ্মের অপর পরব্রহ্ম ও পরাশক্তির আত্যন্তিক মিলন ঘটাইয়া গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উন্মাদিনী রাধার মুখ দিয়া কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ ও তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে Growing Human soul এবং পরিশেষে Ideal Human Soul ধরিয়া এই দুই গ্রন্থ কোন সাধক পড়েন, তিনি কি এই Complete Union of God in Man with Man in God এর পরও আর কোন অভাব অনুভব করিতে পারেন? এই আত্যন্তিক মিলন ভঙ্গ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের

প্রদান করেন। আমি পূর্ব্বে দীনেশ বাবুর নব সংস্করণের "গোবিন্দদাসের করচার" ভূমিকা পাঠ করিয়া প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলাম। যদিও উক্ত ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল, তথাপি বিনা কারণে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদকে অযথা ভাবে আক্রমণ করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রাণে আঘাত দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ অংশগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেও উক্ত ভূমিকায় তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের কোন প্রকার ক্ষতি হইত না। বরং বৈষ্ণবগণ, যাঁহারা গোবিন্দদাসের করচা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, তাঁহারা আদর করিয়া পড়িতেন ও তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতেন। বর্ত্তমান করচার মৌলিকত্ব প্রমাণে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নহে। আমি নিজেও উক্ত করচা সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম এবং উক্ত করচার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে নানা স্থানে অনেক অনুসন্ধানও করিয়াছিলাম। আমার এই প্রবন্ধ যদি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়, পরে তদ্বিষয়ে একটী প্রবন্ধ আমারও লিখিবার ইচ্ছা রহিল। উপরউক্ত কারণে এতাবৎকাল আমি উক্ত প্রবন্ধটী আগ্রহ করিয়া পড়ি নাই। সম্প্রতি আমার কয়েকজন বন্ধু পুনরায় ঐ প্রবন্ধটী আমাকে পড়িবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন এবং আবশ্যক বুঝিলে উহার একটী প্রতিবাদও লিখিতে বলেন। তাঁহাদের অনুরোধে এখন আমি ঐ প্রবন্ধটী পড়িয়াছি। যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, প্রবন্ধ খুলিয়াই ঠিক তাহাই দেখিলাম। এই প্রবন্ধেও তিনি উক্ত গ্রন্থকারদ্বয়কে পুনরায় কটাক্ষ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে কটাক্ষ না করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় বোধ হয় ৩৪ পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি সমাধা করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি যে কেন এই শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিলেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। ইহার সহিত তাঁহার মূল প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধও নাই। তাঁহার মতে গ্রন্থকারদ্বয়ের প্রধান দোষ যে তাঁহারা কেবল অলৌকিক লীলারই বর্ণন করিয়াছেন; অথচ মহাপ্রভুর দেহের শেষ কি হইল তাঁহারা বর্ণন করেন নাই। তাঁহাদের ইহা দোষ কি গুণ তাহা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব। বহু প্রাচীন কাল হইতে দুই শ্রেণীর সাধক দেখা যায়। একদল অবতারবাদী এবং অপর তদ্বিরুদ্ধমতাবলম্বী। যাঁহারা অবতারবাদী তাঁহারা ভাগবতধর্ম্মাবলম্বী। অপর দলের মধ্যে হয় কেহ কিছুই মানেন না অথবা জ্ঞানবাদী। ভাগবতধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীভগবানের আবেশাবতার, কেহ বা অংশাবতার এবং কেহ বা পূর্ণাবতার বিশ্বাস করেন এবং ইঁহাদের মধ্যেও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধক বা সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকে কটাক্ষ করা কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য সংখ্যার পাতাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিতে পাইলাম যে গত বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম,-এ মহাশয় দীনেশ বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে উক্ত প্রতিবাদটী পাঠ করিলাম। তিনি পয়ারগুলির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অতি সঙ্গত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তাঁহার প্রতিবাদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। একটী বিষয় ভিন্ন তাঁহার সহিত আমার কোন মতভেদ নাই। তিনি আমার পরিশ্রমের অনেক লাঘব করিয়াছেন দেখিয়া আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম ও মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। দীনেশবাবু বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির রচনার সময় নিদ্ধারণ করিয়াছেন—দেখিলাম; তন্মধ্যে কতকগুলির সহিত আমার মতের মিল হইল না। বিশেষতঃ জয়ানন্দের রচিত চৈতন্যমঙ্গলের সময় ১৫৪০ খৃঃ অঃ অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের মাত্র ৭ বৎসর পরে বলিয়াছেন এবং বসন্তবাবুও তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। যখন কেবল এই গ্রন্থেই মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ বর্ণিত আছে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য কোন গ্রন্থেই নাই, তখন এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি। অন্যান্য গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক হইলেও কিছু ক্ষতি নাই। এজন্য প্রথমতঃ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের রচনার কাল স্থির করিয়া পরে যে অংশে বসন্তবাবুর সহিত আমার কিঞ্চিৎ মতভেদ হইয়াছে তাহার অবতারণা করিব।

যে সকল শ্রীচৈতন্যের লীলাগ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল— তাহার একটী তালিকা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রিত পুস্তকের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়। ঐ পৃষ্ঠার শেষ ভাগে কবি জয়ানন্দ বলিতেছেন—

"আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড করি।
বৃন্দাবনদাস প্রচারিলা সর্ব্বোপরি॥

* * * * *

হবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।
জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে॥"

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এই গ্রন্থ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের রচিত চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের পরে রচিত হইয়াছিল। জয়ানন্দের গ্রন্থখানি পড়িলেও তাহাই বোধ হয়। বৃন্দাবনদাস যে সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে তাঁহার অমর গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন, জয়ানন্দ সেইগুলি কেবল সূত্রাকারে গ্রন্থের শেষে উত্তর খণ্ডে উল্লেখ করিয়াছেন। যে ঘটনাগুলি জয়ানন্দ পরে জানিতে পারিয়াছিলেন অথবা যেগুলি গীত-ছন্দে ভাল শুনাইবে বুঝিয়াছিলেন, তিনি কেবল সেইগুলি বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পড়িলে শ্রীচৈতন্যলীলার ভক্তভাবের ক্রমবিকাশ কিছুই বুঝা যাইবে না—বরং অনেক স্থলে ভুলই বুঝা হইবে বলিয়া আমার ধারণা। তবে এই গ্রন্থখানিকে চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্টরূপে গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি নাই। অনেকগুলি ঐতিহাসিক ও জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে আছে; যথা, নবদ্বীপের অবস্থা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে; লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সর্পাঘাতে লীলাক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ; হরিদাস ঠাকুরের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত; মহাপ্রভুর সহিত সন্ন্যাসের পূর্ব্ব রাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়াজীর কথোপকথন, এবং পরিশেষে শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণ বর্ণন, যাহার জন্য তিনি বৈষ্ণব সমাজে অনাদৃত। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটী

বিষয় আছে, যেমন ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত গয়াধাম পঁহুছিবার পূর্ব্বে রাজগৃহে মিলন।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থ পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ঐ গ্রন্থ তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পর রচনা করিয়াছিলেন। এখন দেখানো যাইতেছে যে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের আট বৎসর পরে—অর্থাৎ ১৫৪১ খৃঃ অব্দে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংকীর্ত্তন মধ্য হইতে নিত্যানন্দ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। কেবল যে মহাপ্রভু সম্বন্ধেই এই প্রবাদ আছে তাহা নহে—সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা ঈশান নাগরও তাঁহার গ্রন্থে নিত্যানন্দপ্রভুর ও অদ্বৈতপ্রভুর অন্তর্দ্ধানও ঐরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—যথা অদ্বৈত প্রকাশে (২২শ অধ্যায়)—

"কেবল গৌরাঙ্গ নামে উল্লাস অন্তর।
হেন মতে গত হইল অষ্টম বৎসর॥
* * * * *
একদিন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।
গৌর গুণ স্মরি প্রেমে হইলা অধৈর্য্য॥
হেনকালে পত্রী আইল খড়দহ হৈতে।
লিখিলা শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্যে যাইতে॥"

এই পত্র পাইবামাত্র অদ্বৈতপ্রভু খড়দহে শিষ্যগণ সহ উপনীত হইলেন। সাতদিন উভয়ের মধ্যে নির্জ্জনে কি কথাবার্ত্তা হইল। অষ্টম দিবসে অদ্বৈত-প্রভুর আজ্ঞায় গৌর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তৎপর, যথা অদ্বৈত প্রকাশে—

"যতেক মহান্তপ্রেমে বাহ্য পাসরিলা।
অলক্ষেতে নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধান হইলা॥"

অদ্বৈত প্রকাশের মতে নিত্যানন্দ ১৩৯৫ শকের মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—অতএব তিনি শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ১২ বৎসরের বড় ছিলেন এবং মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের ৮ বৎসর পরে তিনি অপ্রকট হয়েন। অতএব দেখা গেল শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনার কাল ১৫৪৫ হইতে ১৫৫০ খৃঃ অব্দ অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল যে কেবল নিত্যানন্দপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর রচিত হইয়াছিল তাহাই নহে; এই গ্রন্থের রচনার কাল অদ্বৈতপ্রভুর অপ্রকটের পর অর্থাৎ ১৪৮০ শকের পর। এখন তাহা দেখানো যাইতেছে; যথা, জয়ানন্দের শেষ পৃষ্ঠায়—

"আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি॥
* * * * *
আচার্য্য গোসাঞি কথোদিন বঞ্চিলা।
পৃথিবী ছাড়িব ইহা সভারে কহিলা॥
পৌষমাসে শুক্লা ত্রয়োদশী হইলা।
আচার্য্য গোসাঞি বৈকুণ্ঠে গমন করিলা॥"

এখন বুঝা গেল যে জয়ানন্দ তাহার গ্রন্থ অদ্বৈত প্রভুর তিরোভাবের পরে রচনা করিয়াছিলেন। অতএব দেখা আবশ্যক এই ঘটনা কবে হইয়াছিল। যথা—

অদ্বৈতপ্রকাশে বালক গৌরাঙ্গের প্রতি অদ্বৈতাচার্য্যের উক্তি—

"অহে বিভু আতি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল।
তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আইল॥"

অতএব সিদ্ধান্ত হইল অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু অপেক্ষা ৫২ বৎসর বড়; অর্থাৎ যখন তাঁহার ৫২ বৎসর বয়ঃক্রম তখন শ্রীচৈতন্য ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েন। অদ্বৈতপ্রভুর অপ্রকট বর্ণনা করিয়া ঈশান নাগর বলিতেছেন—

"সওয়াশতবর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে॥"

এখন জানা গেল অদ্বৈতপ্রভু ১২৫ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪৮০ শকে ইংরাজী ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে পৌষমাসের শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে অপ্রকট হয়েন। ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কখনও ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইতে পারে না। এখন একপ্রকার মোটামুটি শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের কালনিরূপিত হইল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রচনাকাল ১৫০৩ শক দীনেশবাবু বলিয়াছেন। যদি শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি আনয়ন করিবার সময় এই গ্রন্থ আনা হইয়া থাকে যাহা সম্ভবপর, তাহা হইলে ১৫০৩ শকে এই গ্রন্থের রচনার কাল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে এই গ্রন্থখানি যে আচার্য্য প্রভুর তিরোভাবের বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তদ্বিষয় কোন সন্দেহ নাই। যদুনন্দন দাস ১৫২৯ শকে কর্ণানন্দ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে বহু স্থলে চরিতামৃতের পয়ার-গুলির উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে জাহ্নবী মাতার আদেশে নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাস রচনা করেন; কারণ প্রেমবিলাসের নাম কর্ণানন্দে আছে। প্রেমবিলাসের রচনা কাল এজন্য ১৫২৪ শকে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কর্ণানন্দ গ্রন্থে চরিতামৃতের পয়ারগুলি অবিকল উদ্ধৃত করা আছে। সুতরাং ঐ সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। যদি আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব ১৫২০ শকে হইয়াছিল ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে চরিতামৃত গ্রন্থ তাহার বহু পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। বনবিষ্ণুপুরের গ্রন্থাগারে চরিতামৃতের এক হস্তলিখিত পুঁথি আছে; তাহাতে ১৫৩৬ শকে গ্রন্থ রচনার কাল লিপিত আছে। উক্ত কর্ণানন্দের প্রমাণ হইতে উহা একবারেই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বোধ হয় উহা ঐ প্রতিলিপির লিখিবার কাল। গোপালচম্পূর উল্লেখ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরচম্পূ যে আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে আনা হয় নাই এবং উহা যে ১৫০৩ শকের বহু পরে রচিত তাহাও কর্ণানন্দ পাঠে জানা যায়। উত্তরচম্পূর রচনার কাল ১৫০৯ শকাব্দা। যদি চরিতামৃত গ্রন্থে উল্লিখিত চম্পূ গ্রন্থ কেবল পূর্ব্বভাগকে বুঝায় তাহা হইলেই দীনেশবাবুর অনুমান সঙ্গত হয়। আর যদি সমগ্র গ্রন্থ

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সহিত মোগলের সংঘর্ষ

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

সমসাময়িক ত্রিপুরার ইতিহাস

১৪৬২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১) অবিলম্বে তাঁহার জয়ন্তিয়া রাজ্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল এবং জয়ন্তিয়া জয় করিতে হাড়ী সৈন্যের বৃহৎ এক দল পাঠান হইল। পরে কাছাড়ের রাজার মধ্যস্থতায় এই বিরোধের মীমাংসা হয়। এই ঘটনা ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া ধার্য্য করা যায়। জয়ন্তিয়া যুদ্ধের পরে বিজয় মাণিক্য চট্টগ্রাম বিজয়ে চলিলেন; কিন্তু তাঁহার অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য বঙ্গদেশীয় পাঠানগণের সহিত যোগ দিয়া বিদ্রোহোন্মুখ হইলে পাঠানগণকে ধরিয়া [illegible] হইয়াছিল। তৎপরে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি দেওয়া হইল। এই সংবাদ শুনিয়া গৌড়েশ্বর সেনা পাঠাইয়া চট্টগ্রাম দখল করিলেন। এই ঘটনা কবে হইয়াছিল জানিবার উপায় নাই; তবে ১৫৪৩ হইতে ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাই ইহা মুহম্মদ খাঁ শূর বা তাঁহার পুত্র বাহাদুর শাহ এবং জালাল শাহের আমলের ঘটনা। ইহার পরে বিজয় মাণিক্য চাটগাঁ বিজয় করিলেন এবং পাঠান সেনাপতি গৌড়েশ্বরের শালা মমারক খাঁকে ধরিয়া আনিয়া চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি দিলেন। এই সময় বঙ্গদেশে মহা গোলমাল চলিতেছিল। মুহম্মদ শাহ দিল্লীর সম্রাট আদিলের সহিত যুদ্ধে মারা গিয়াছেন, তাঁহার পুত্র বাহাদুরের সহিত যুদ্ধে আবার আদিল মারা পড়িলেন, ইত্যাদি। এই সুযোগে

করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত [illegible] পাওয়া যায়—বাসুদে[illegible]

বিজয় মাণিক্য বঙ্গদেশ বিজয়ে চলিলেন। পাঁচ হাজার নৌকার এক বৃহৎ বহর লইয়া অনেক সৈন্য সহিত তিনি সম্ভবতঃ সরাইল হইতে যাত্রা করিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া স্নান দান ও সহস্র স্বুবর্ণ ধ্বজ উৎসর্গ করিলেন। ঐ দেশের জমীদারের নিকট হইতে পাঁচ দ্রোণ ভূমি ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিলেন। এই স্থান আজিও পাঁচদোনা নামে বিখ্যাত,—মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ একটি বিখ্যাত গ্রাম। প্রাচীন কাগজপত্রে আজিও পাঁচদোনার অনেক তালুক "তালুক ত্রিপুরাপতি" বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। লোকে কিন্তু ত্রিপুরাপতি বিজয় মাণিক্যের নাম ভুলিয়া গিয়াছে। (২) এই দান ত্রিপুরারাজের কোন সেনাপতির বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

বিজয় মাণিক্যের এই পূর্ব্ববঙ্গাভিযানের সময় সৌভাগ্য ক্রমে সঠিকরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। রাজমালায় দেখা যায়, ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া ঐ ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বিজয় মাণিক্য মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ঐ রকমে লক্ষ্যা নদীতে স্নান করিয়া এবং পদ্মা নদীতে স্নান করিয়াও বিজয় মাণিক্য মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই রকম একটি মুদ্রা

---

(১) এই শকাব্দ রাজমালায় স্পষ্ট ভাবে কোথাও উল্লিখিত নাই। এই সনাঙ্ক এই ভাবে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—

"যুবক হইল রাজা ষোড়শ বৎসরে।
রাজনীতি কর্ম্ম দৈত্য নারায়ণের বরে॥" (নারায়ণে করে?)

রাজমালা—১২৯ পৃঃ

ইহা রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কথা। কাজেই ১৫।১৬ বছর বয়সেই বিজয় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইহার পূর্ব্বে বিজয়ের ছোট ভাই ইন্দ্র মাণিক্যকে রাজা করা হইয়াছিল।

সেইকালে নৃপে পাত্রে পুত্র সমর্পিল।
সাতচল্লিশ বর্ষে নৃপের বয়স হৈয়াছিল॥
সাতচল্লিশ বর্ষ রাজা রাজ্য ভোগ করে।
দৈবগতি বসন্ত নৃপের হৈল শরীরে॥

তৃতীয় ছত্রের "সাতচল্লিশ বর্ষ" 'সাতচল্লিশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত' অর্থে ধরিতে হইবে। নচেৎ ৪৭ বর্ষে ৪৭ বর্ষই রাজ্যভোগ ধরিলে ১ বছর বয়সে রাজ্য প্রাপ্তি বুঝায়—বিজয়ের রাজ্য প্রাপ্তির বিবরণে কিন্তু তাহা বুঝায় না। বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর অনন্ত মাণিক্য দেড় বছর রাজত্ব করেন—তাঁহাকে মারিয়া তাঁহার শ্বশুর ১৪৯৪ শকাব্দে রাজা হন। (রাজমালা—১৬৫ পৃঃ) কাজেই বিজয় মাণিক্য ১৪৯৩ শকে মারা গিয়াছিলেন এবং ১৪৯৩—(৪৭—১৬)=১৪৬২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

(২) প্রতিভা, চতুর্থ বর্ষ, ২৪৩ পৃষ্ঠা—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র নন্দী লিখিত "পাঁচদোনার দেওয়ান দর্পনারায়ণ" নামক প্রবন্ধ।

পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাটি ত্রিপুরারাজের মুদ্রা-সংগ্রহের মধ্যে ছিল। ত্রিপুরার মহারাজার ব্যয়ে "রাজমালার" যে নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, তাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আগরতলায় যে সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এই মুদ্রার পাঠ সম্বলিত একখণ্ড কাগজও দেখিয়া আসিয়াছি। ইহা ১৪৮১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা এবং ইহাতে লেখা আছে "লক্ষ্যান্নায়ী শ্রীশ্রীবিজয় মাণিক্য দেবঃ।" বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মুদ্রার প্রচার পরবর্ত্তী প্রতাপশালী রাজা অমর মাণিক্যের রাজত্বেও দেখা যাইবে।

এই ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দ বাঙ্গালার বড় দুর্দ্দিন। বাহাদুর শাহ তখন বঙ্গের সুলতান; কিন্তু এক দিকে দিল্লীর সম্রাটের সহিত বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, অপর দিকে তিনি দিল্লীর সম্রাটের নিযুক্ত গৌড়ের শাসনকর্ত্তার সহিত রোধ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সময় অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহ। এদিকে বিহারের অধিপতি লেমান কররাণী বাঙ্গালা দেশের দিকে লোলুপ দৃষ্টি ক্ষেপ করিতেছেন। বিজয় মাণিক্য এই সুযোগে ইচ্ছামতী দী বাহিয়া পদ্মানদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং সোনার ঁ ও বিক্রমপুরে নানা উৎপাত করিয়া অবশেষে দেশে ফিরিলেন। কেনাগড় হইয়া শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে ও ইটাতে মণ করিয়া উনকোটী তীর্থ হইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। হার পর আর বিজয় মাণিক্যের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া ায় না। ১৪৯৩ শক বা ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বসন্ত রোগে পরলোকে গমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র অনন্ত মাণিক্য দেড় বৎসর রাজত্ব করেন। ১৪৯৪ শকে বা ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে অনন্তকে বধ করিয়া অনন্তের শ্বশুর সিংহাসন অপহরণ করেন এবং উদয় মাণিক্য নাম ধারণ করিয়া ত্রিপুরার রাজা হইয়া বসেন। তাঁহার সময়েই রাজধানীর নাম রাঙ্গামাটির পরিবর্ত্তে উদয়পুর রাখা হয়। এই বৎসর বাঙ্গালায় সুলেমান কররাণীর মৃত্যু হয় এবং বায়াজিদ ও পরে দায়ুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় চট্টগ্রাম লইয়া ত্রিপুরে পাঠানে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যায়। গৌড়েশ্বরের সৈন্যগণ চট্টগ্রাম যাইবার পথে ত্রিপুর সৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং ত্রিপুর সৈন্যগণ শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়। পীরোজ খাঁ অন্নি এবং জামাল খাঁ পন্নি নামক পাঠান সেনাপতিদ্বয়ের নেতৃত্বে মেহারকুলগড়ে অর্থাৎ বর্ত্তমান কুমিল্লা সহরের নিকটে ত্রিপুরগণ আবার পরাজিত হয়। এইরূপে পাঁচ বৎসর যুদ্ধের পরে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উদয়মাণিক্য মৃত্যুমুখে পতিত হন। এদিকে রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদেরও পতন হয়। ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়মাণিক্যের সৎভ্রাতা অমরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সিংহাসনারোহণ বৎসরাঙ্কের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। আগরতলার মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মন মহোদয়ের নিকট অমর মাণিক্যের দুইটী রৌপ্য মুদ্রা আছে। উহাদের মধ্যে একটির উপর লিখিত আছে—"শ্রীশ্রীযুতামরমাণিক্যদেব শ্রীঅমরাবতী মহাদেব্যোঃ শক ১৪৯৯"। এই শকাব্দ রাজমালা মতেও (রাজমালা, ১৮৬ পৃষ্ঠা) অমর মাণিক্যের রাজ্যারোহণের বৎসর।

এই অমর মাণিক্যের সহিত ঈশা খাঁর উত্থানযুগের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। এই অমর মাণিক্যের রাজত্ববিবরণ রাজমালার যে খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাও পুরাতন 'রাজমালার' অন্তর্গত এবং পরবর্ত্তী খণ্ডের মুখবন্ধ মতে—

পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত,
প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত।
পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্ব্বে কত।
সেই ত কারণে লোকে নাহি বুঝে যত।
রাজমালা—২৭১ পৃষ্ঠা।

এই জন্যই অমর মাণিক্যের রাজত্বের বিবরণে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ থাকিলেও—কোন কোন স্থানে—"পূর্ব্বপ্রসঙ্গ পরে,—পর পূর্ব্বে কত" হইয়া গিয়াছে। আমরা অমর মাণিক্যের রাজত্বের ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য যেমন বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি তেমনই সাজাইয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

১৫৭৭ খ্রীঃ [১৪৯৯ শক] অমর মাণিক্যের ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ।

১৫৭৮ খ্রীঃ—ভুলুয়ার রাজা গন্ধর্ব্বমাণিক্যের সহিত যুদ্ধ ও ভুলুয়ারাজের পরাজয়। বাকলা আক্রমণ। বাকলার রাজা কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যু।

১৫৭৮ খ্রীঃ—দিল্লীর ওমরাহের বঙ্গ আক্রমণ। সরাইলে ঈশা খাঁর পরাজয় ও ত্রিপুরার রাজার সাহায্য প্রার্থনা।

ন্যায় সিদ্ধ পুরুষ কি পুনরায় প্রাকৃতিক জগতে অবতরণ করিতে পারেন, না তাহা সম্ভবপর? অষ্টম অধ্যায়ে (মধ্যলীলা) পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, "ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর"—এখন যে তাঁহার অনিপুণা বাণী সহজেই বিরত হইবে, এবং ইহার পর কোন সাধক কিছু যে আর জানিতে চাহিবেন না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আমি পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক বলি—তথাস্তু।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম

শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নবদ্বীপ বঙ্গের একটা অতি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ নগরী। পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গ ও অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মগুণে বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এই নবদ্বীপে মহারাজা বল্লালসেনের রাজসভায় যে প্রসিদ্ধ কৌলিন্য-প্রথার সৃষ্টি হয়, বঙ্গের সকল স্থানেই অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে। মহাপরাক্রান্ত বারাণসী-বিজয়ী মহারাজ লক্ষ্মণ সেন জীবনের শেষ বয়সে এই স্থানেই গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। পণ্ডিত পশুপতি, হলায়ুধ প্রভৃতির লীলাক্ষেত্র এই নবদ্বীপ। হিন্দু-রাজগণের অধীনে নবদ্বীপ সকল বিষয়ে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। তৎপরে তুর্ক-বিপ্লবে নগরী-রত্ন নবদ্বীপ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; এই সময়ে নবদ্বীপের সারস্বত ভাণ্ডারও যবন-সৈন্য কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তার পর মধ্যযুগে বৈষ্ণব চূড়ামণি গৌরাঙ্গ-তনু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে নবদ্বীপ একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। এইখানেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে অঙ্কুর উদ্গত হয়, কালক্রমে তাহাই বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার বহু 'সংসার তাপে তাপিত' পথিককে শান্তিছায়া প্রদান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাত্মগণের পদধূলিত নবদ্বীপ ধন্য হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত যাঁহার সামজিক বিধি বঙ্গসমাজ অবনত মস্তকে পালন করিতেছে, সেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের কীর্ত্তি-স্থল এই নবদ্বীপ। মিথিলার অধ্যাপকদিগের কবল হইতে যিনি ন্যায়শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন, সেই নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জীবনী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশের কোন রাজার, কোন পণ্ডিতের অথবা কোন বিখ্যাত ব্যক্তির অথবা কোন স্থানের ইতিহাস লিখিতে বসিলেই লেখনী কাঁপিয়া উঠে। তাহার কারণ এই যে, মনে সতত একটা ভয় হয় "কি লিখিতে কি লিখিব", "রচনা ঠিক্ হইল কি না" ইত্যাদি। বাস্তবিক আমাদের দেশের প্রকৃত এবং ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। জনপ্রবাদ, কুলগ্রন্থ, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসন, ও প্রাচীন প্রাসাদ-স্তূপাদির ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত এ দেশের ইতিবৃত্ত রচনার অন্য কোন উপাদান নাই। কোনও প্রাচীন ব্যক্তির জীবন-কাহিনী সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব-গ্রন্থ ও দুই একজন ঐতিহাসিকের পুস্তক হইতে সার্ব্বভৌমের জীবনী যতদূর সম্ভব সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল।

সেকালে ন্যায়াদি শাস্ত্র চর্চ্চার নিমিত্ত মিথিলা প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতের সকল স্থান হইতে নানা জাতীয় ছাত্রগণ ন্যায়শা[স্ত্র] অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় আগমন করিতেন। অধ্যাপকগণ পাঠে[র] জন্য ছাত্রগণকে পুঁথি দিতেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে পুঁথিগুলি আবা[র] ফিরাইয়া লইতেন এবং যাহাতে ঐ পুঁথি মিথিলার বাহিরে না যাইতে পারে সেই জন্য প্রত্যেক স্বদেশ গমনেচ্ছু ছাত্রের পেটিকা প্রভৃতি বিশে[ষ] রূপে পরীক্ষা করিতেন। অধ্যাপকদিগের এই সতর্কতা হেতু কোন ছা[ত্র] ন্যায়শাস্ত্র মিথিলা হইতে স্বদেশে লইয়া যাইতে পারেন নাই। মিথিলা[র] কবল হইতে ন্যায়শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া নবদ্বীপে প্রচলনের জ[ন্য] বাসুদেবের জন্ম হয়।

"নদীয়া কাহিনী" প্রণেতা কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ের মতে খৃষ্টী[য়] চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। বাসুদেবে[র] পিতামহের নাম নরহরি। তিনি প্রথম যৌবনে অত্যন্ত মূর্খ ছিলেন পরে গুরুর কৃপায় মহাপণ্ডিত ও সাধক হন। তদানীন্তন নবদ্বীপে[র] অন্তর্গত চীনে-ডাঙ্গা নামক স্থানে তাঁহার আবাস ছিল। তাঁহার একমা[ত্র] পুত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি মহাপণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদ। পঞ্চদ[শ] শকাব্দার প্রথম দিকে ইনি ও অন্যান্য পণ্ডিত নবদ্বীপে টোল স্থাপ[ন] করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যার সন্ধান পাওয়া যায়;—বাসুদে[ব] সার্ব্বভৌম, বিদ্যাধর বিদ্যাবাচস্পতি ও রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি—এই তি[ন] ব্যক্তি তাঁহার পুত্র। কন্যার নাম অজ্ঞাত। চীনে-ডাঙ্গায় পৈতৃক বা[টী] থাকিলেও টোল পরিচালনের নিমিত্ত বিশারদ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে[ই] বাস করিতে হইত।

তৎকালোচিত প্রথানুসারে বাসুদেব পিতার নিকটেই ব্যাকরণ, কা[ব্য] ও স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং অল্প কাল মধ্যেই ঐ সকল শাস্ত্রে বিশে[ষ] ব্যুৎপন্ন হন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অন্যান্য শিক্ষার্থীদিগে[র] ন্যায় তিনিও মিথিলায় গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্রে[র] নিকটে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা বাসুদেবের মেধাশক্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। অল্পকালের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, শলাকা পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হন শলাকা পরীক্ষার অর্থ এই যে একটি সূচ্যগ্র শলাকা নানা পুঁথির উপর নিক্ষেপ করিলে যেখানে শেষ দাগ পড়িবে, সেই স্থান হইতে পরীক্ষা করা হইত। বাসুদেব এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া 'সার্ব্বভৌম' উপাধি লাভ করেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে, যখন অধ্যাপকগণ তাঁহাদের চিরপ্রচলিত রীত্যনুসারে তাঁহার পেটিকা ও পোষাকাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগকে বলেন—"পুঁথিতে আমার প্রয়োজন কি? গুরুর কৃপায় সবই স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে।" ইহাতে অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। পাছে অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক তাঁহার জীবনহানি হয়, এই ভয়ে বাসুদেব নবদ্বীপে না যাইয়া হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান তীর্থ কাশীধামে গোপনে গমন করেন। সেখানে বেদান্ত শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন।

তার পর নবদ্বীপে এক নব যুগ উপস্থিত হয়। নবদ্বীপের প্রাচীন নিঃস্ব সারস্বত ভাণ্ডার পুনরায় বিদ্যা ধনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম সর্ব্বপ্রথমে এখানে ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। তাঁহার অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া দলে দলে শিক্ষার্থী আসিয়া তাঁহার টোলে ভর্ত্তি হইতে লাগিলেন। নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও 'অনুমান মণিব্যাখ্যা' রচয়িতা কনাদ তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে শ্রীচৈতন্যও তাঁহার শিষ্য ছিলেন। স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার 'Literature of Bengal' নামক গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠায় বলেন—"* * * Chaitanya Raghunath and Raghunandan—all received their instruction in their early days from this prince of teachers." কিন্তু এ কথা বোধ হয় ঠিক নহে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিতেছি। অসাধারণ স্মৃতিশক্তিবলে বাসুদেব গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্বচিন্তামণি' চারি খণ্ড ও মূল 'কুসুমাঞ্জলি' অবিকল লিখিয়া ফেলিলেন। ইহার পূর্ব্বে ঐসকল বহুমূল্য গ্রন্থ বঙ্গদেশে অপ্রকাশিত ছিল। রঘুনাথের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজের টোলে ভর্ত্তি করিয়া ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন রঘুনাথের দুঃখিনী মাতাও দয়ার্দ্রচিত্ত বাসুদেবের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। এই একচক্ষুহীন রঘুনাথ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। ন্যায় অধ্যয়ন করিতে করিতে রঘুনাথ জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সময়ে সময়ে গুরু বাসুদেবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। এক সময়ে পক্ষধর মিশ্রের সহিত তর্কে পরাস্ত হওয়ায় সার্ব্বভৌম মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে স্বীয় শিষ্য দ্বারা মিশ্র পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করাইয়া, প্রতিশোধ লইবেন। এক্ষণে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রঘুনাথকে পূর্ব্ব উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মিথিলায় প্রেরণ করেন। সার্ব্বভৌম ন্যায়ের টোল স্থাপন করিলে বিদ্যানগরের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। নবদ্বীপ বিদ্যানগরের চতুষ্পাঠীতে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া কিয়ৎকাল পরে তিনি উড়িষ্যায় রাজপণ্ডিত হইয়া যান। বাসুদেব উড়িষ্যায় প্রস্থান করিলে তাঁহার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি বিদ্যানগরের টোল চালাইয়া ছিলেন। তিনিও মহাপণ্ডিত ছিলেন। সনাতন গোস্বামী তাঁহারই ছাত্র। 'বৈষ্ণব-তোষিণী' টীকার নমস্কারে "বিদ্যাবাচস্পতিন্ গুরুন্" কথা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে সার্ব্বভৌম যবনের ভয়ে উৎকলে পলাইয়া যান। এ কথা বোধ হয় ঠিক নহে। কারণ সার্ব্বভৌম প্রস্থান করিলে, তাঁহার ভ্রাতা ও অন্যান্য বহু পণ্ডিত নবদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন। যবনেরা কি তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করে নাই? রাজা পুরুষোত্তম দেবের পুত্র মহাপরাক্রমশালী রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের অনুরোধে সভাপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম জীবনের শেষভাগে (ইং ১৫২০ খৃঃ অব্দে) শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। গজপতি রাজগণ উড়িষ্যায় ১০৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৪৩১ খৃঃ অব্দে রাজা কপিলেন্দ্র দেব কর্ত্তৃক এই বংশ স্থাপিত হয় এবং ১৫৪২ খৃঃ অব্দে তেলিঙ্গা রাজবংশ কর্ত্তৃক ইহার উচ্ছেদ সাধিত হয়। কপিলেন্দ্র দেবের পুত্র পুরুষোত্তম যুদ্ধজয় দ্বারা স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করেন। তাঁহার পুত্র প্রতাপরুদ্র প্রাচীন বৈষ্ণবকাব্যগ্রন্থে অমর হইয়া আছেন। এই প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় উড়িষ্যা প্লাবিত হইয়া যায়। রাজা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্যদেব ৺জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি দর্শনে প্রেমবিহ্বল হইয়া অচৈতন্য হইয়া যান। সহসা সার্ব্বভৌম তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গদেবের অলৌকিক রূপসম্পন্ন দেহ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন; এবং স্বীয় শিষ্য অথবা ভৃত্য দ্বারা শ্রীচৈতন্যের চৈতন্যহীন দেহ নিজগৃহে আনিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। এ দিকে প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে সার্ব্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে বিশারদ পণ্ডিতের জামাতা গোপীনাথ আচার্য্য শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শিষ্য মুকুন্দের সহিত তথায় আসিলেন। বহুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর প্রভুর চৈতন্য সম্পাদিত হইলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম আনন্দে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বাসুদেব গোপীনাথকে শ্রীচৈতন্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, গোপীনাথ বলেন—"ইনি নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র।" ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলেন—"নীলাম্বর আমার পিতা বিশারদ পণ্ডিতের সহপাঠী ছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রও পিতৃতুল্য। ইনি সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ। অতএব ইনি আমার পূজনীয়।"

রঘুনাথ ও রঘুনন্দন তাঁহার (বাসুদেবের) শিষ্য ছিলেন—সন্দেহ নাই; কিন্তু সার্ব্বভৌম যে চৈতন্যদেবেরও গুরু ছিলেন—সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। সার্ব্বভৌম যদি চৈতন্যের গুরু হইবেন, তাহা হইলে পদধূলি লইলেন কেন? শ্রীক্ষেত্রে সাক্ষাতের পূর্ব্বে উভয়ে বোধ হয় পরিচিত ছিলেন না। পরিচিত থাকিলে সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে চৈতন্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন কেন?

বাসুদেব কিন্তু সহজে বৈষ্ণব হইতে রাজী হন নাই। চৈতন্যের সহিত তাঁহার তুমুল তর্ক হয় এবং পরিশেষে তিনি পরাস্ত হইয়া চৈতন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। 'Orissa and her remains' গ্রন্থে বাসুদেবের বিশেষ কিছু বিবরণ পাইলাম না। তাহাতে কেবল শ্রীচৈতন্যের নিকট বাসুদেবের পরাস্ত হইবার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। "The Vaishnavas recall to mind with a sense of thrilling joy the victory of love over knowledge in the defeat by Chaitanya of Pandit Vasudeb Sarbabhauma, a scholar of the orthodox school and of Ramgiri, a Bauddha Sramana"—মাত্র এই কথা ওই পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

সার্ব্বভৌম অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে 'সার্ব্বভৌম-নিরুক্তি' প্রধান। এই মহাত্মার কোন্ সময়ে তিরোভাব ঘটে—তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি নদীয়ার নানা অংশে বাস করিতেছেন।

'নদীয়া-কাহিনী', 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি। এইজন্য ঐ সকল পুস্তকের লেখকগণের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কন্যাটি জ্যেষ্ঠা, মধ্যমা কিংবা কনিষ্ঠা ছিল তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

মহারাণীর স্তনধৌত জল খাইয়া মহারাণীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া মহারাজা ও মহারাণীর নিকট ঈশা খাঁর পুত্রস্নেহ লাভ। ঈশা খাঁর উপঢৌকন ও মসনদালি আখ্যা প্রাপ্তি। ত্রিপুরাসৈন্য ঈশা খাঁর সাহায্যার্থে সরাইলে অগ্রসর হইল এবং এই খবর পাইয়াই বঙ্গসৈন্য পলায়ন করিল।

[১৫৭৮ খ্রীঃ—১৫৮০ খ্রীঃ] অমর সাগর খনন। বঙ্গদেশীয় মজুরের সাহায্যে অমর সাগর খনন আরব্ধ হয়। ত্রিপুরা মহারাজের অনুরোধে পূর্ব্ববঙ্গের জমীদারবর্গ নিম্নলিখিত মত মজুর পাঠাইয়া অমর সাগর খননে সাহায্য করিয়াছিলেন।

১।	বিক্রমপুরের জমীদার চাঁদ রায়	৭০০
২।	বাকলার বপু	৭০০
৩।	সলৈ গোয়ালপাড়ার গাজি	৭০০
৪।	ভাওয়ালের জমীদার (গাজি ?)	১০০০
৫।	অষ্টগ্রামের জমীদার	৫০০
৬।	বানিয়াচুঙ্গের জমীদার	৫০০
৭।	রণভাওয়ালের জমীদার	১০০০
৮।	সরাইলের ঈশা খাঁ	১০০০
৯।	ভুলুয়ার জমীদার	১০০০
	মোট	৭১০০

এই তালিকায় পূর্ব্ববঙ্গের তৎকালীন প্রধান জমীদারগণের একটা ধারণা পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের সহিত ত্রিপুরা রাজ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহারও একটা আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"ত্রিপুরা রাজার আমল বঙ্গদেশ যত,"

* * *

কেহ ভয়ে, কেহ প্রীতে কেহ মান্যে দিল।
বারবাঙ্গালায় দিছে তরপে না দিল॥

আমল মানে "অধিকার" ধরিলে ভুল করা হইবে। আমল মানে এখানে "প্রভাব"। এই সকল জমীদারের কেহ ত্রিপুরারাজকে ভয় করিত, কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার প্রীতি ছিল, আর সরাইল, ভুলুয়া ইত্যাদি ত্রিপুরা-রাজের এক রকম অধীনই ছিল বলিতে হইবে। আরও লক্ষ্যের বিষয় এই যে, ঈশা খাঁ এই সময় সরাইলের ঈশা খাঁ নামেই পরিচিত।

১৫৮১ খ্রীঃ [১৫০৩ শক] ত্রিপুরারাজের তরপ আক্রমণ এবং তরপের জমীদার ফতে খাঁকে বন্দী অবস্থায় উদয়পুরে আনয়ন। এই যুদ্ধে ঈশা খাঁ ত্রিপুরারাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণের নিকট এই শ্রীহট্ট যুদ্ধের স্মৃতি, অমর মাণিক্যের একটি মুদ্রা রক্ষিত আছে। উহার লিপির পাঠ—"শ্রীহট্টবিজয়ি শ্রীশ্রীযুতামরমাণিক্য দেব শ্রীঅমরাবতি দেব্যৌঃ শক ১৫০৩"। (৩) রাজমালায় আছে ১৫০৪ শকের পৌষ মাসের শেষে ফতে খাঁকে লইয়া কুমার রাজধর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। অমর মাণিক্যের কঠিন পীড়া ও আরোগ্য লাভ।

১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। আরাকানের সহিত যুদ্ধ। চট্টগ্রাম ও রামু অধিকার। ফিরিঙ্গিগণের আরাকানের সহিত যোগদান। রামুতে ত্রিপুরা সৈন্যের পরাজয় এবং কর্ণফুলীর উত্তর পারে আশ্রয় গ্রহণ।

১৫৮৬ খ্রীঃ—আরাকান-রাজ সেকান্দর শাহার (সিংহাসনারোহণ—১৫৭১ খ্রীঃ) ত্রিপুরা আক্রমণ ও চট্টগ্রাম অধিকার। ত্রিপুরা সৈন্যের পরাজয়। কুমার জুঝার সিংহের রণে পতন। অমর মাণিক্যের নিজে যুদ্ধে গমন ও পরাজয়। আরাকান রাজের উদয়পুর লুণ্ঠন। অমর মাণিক্যের আত্মহত্যা। রাজধরের সিংহাসনারোহণ। রাজধরের ১৫০৮ শকাব্দে মুদ্রিত মুদ্রা আমার নিকট আছে।

শেষের বৎসরের ঘটনা কয়েকটির সহিত আপাততঃ আমাদের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু এই ঘটনাগুলি আরাকানের ইতিহাসের লুপ্ত পত্র—Phayreএর পুস্তকে অথবা নবপ্রকাশিত Mr. Harvey প্রণীত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এই সকল ঘটনার কোন উল্লেখ নাই—এইজন্য উপরে সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। পরে বঙ্গের সুবাদার শাহাবাজ খাঁর আমলের ঘটনা বিবৃত করিবার সময়ও এই ত্রিপুরা-মঘ-দ্বন্দ্বের আলোচনা করা আবশ্যক হইবে।

খাঁ জাহানের সঙ্গে ঈশা খাঁর কাস্তলে মেঘনা তীরে

(৩) ত্রিপুরারাজের রাজস্বসচীব শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহারাজ-কুমারের অনুমতিক্রমে অমর মাণিক্যের মুদ্রা দুইটির ছাপ আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমি এই অবকাশে উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সরাইল-জোয়ানশাহীর সীমানায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই কাস্তল জোয়ানশাহী পরগণায় মেঘনাতীরস্থ বিখ্যাত গ্রাম অষ্টগ্রামের অল্প দক্ষিণ-পশ্চিমে। (Akbarnama—III. P. 377)। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াই ঈশা খাঁ ত্রিপুরারাজের শরণাপন্ন হন। রাজমালায় লিখিত আছে—

তার কত দিন পর বঙ্গেতে উৎপাত।
দিল্লীর উমরা সৈন্য আইসে অকস্মাৎ॥
ভঙ্গ দিল ইছা খাঁ সরাইল হইতে।
নৃপতি সাক্ষাতে আইসে মেহারকুল পথে॥
শুভদিনে ইছা খাঁ যে মিলে নৃপ স্থান।
যোড়হস্তে কহিলেক রাজা বিদ্যমান॥
দিল্লীর উমরা যত সরাইলে আইসে।
রাজসৈন্য দিয়া রক্ষা করহ বিশেষে॥

রাজমালা—১৯১ পৃষ্ঠা।

কাজেই খাঁ জাহানের সহিত দ্বন্দ্ব যে সরাইলে হইয়াছিল এই বিষয়ে আকবরনামা ও রাজমালা পরস্পরকে সমর্থন করিতেছে; এবং রাজমালায় যে ঈশা খাঁকে সরাইলের ঈশা খাঁ বলিয়া বিশেসিত করিয়াছে, এবং সরাইল পরগণার সীমায় গিয়া খাঁ জাহানের ঈশা খাঁকে যে পাইতে হইয়াছিল, ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, ঈশা খাঁর অভ্যুদয় সরাইলেই হইয়াছিল। রাজমালায় দেখা যায়, এই সময় অষ্টগ্রামে অর্থাৎ জোয়ানশাহী পরগণায় ভিন্ন জমীদার ছিলেন; এবং তিনি ৫০০ শত মজুর পাঠাইয়া অমর সাগর খননে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ঈশা খাঁর মসনদ-ই-আলি, সাধারণ কথায় মসনদালি বা মসনদালি উপাধিটি যে আকবর প্রদত্ত নহে,—জনপ্রবাদ মতে যেই সময়ে আকবর এই উপাধি ঈশা খাঁকে দিয়াছিলেন তাহার পূর্ব্ব হইতেই ঈশা খাঁর এই উপাধি ছিল—খাঁ বাহাদুর আওলাদ হাসান সাহেবও এই অনুমান করিয়া গিয়াছেন। (৪) এই শ্রেণীর উপাধি তখন আফগানগণের মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল। সুলেমান কররাণী হজরত-ই-আলা উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বৎসারসের জন্য বঙ্গাধিপতি তাজ খাঁর উপাধি ছিল মসনদ-ই-আলি। (J. B. O. R. S. Vol IV—P. 188) ৺মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় তাঁহার প্রশংসনীয় "হিজলীর মসনদ-ই-আলা" নামক গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে এই সময়ের আরও কয়েকটি মসনদ-ই আলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সময় আফগান জাতীয় বা পক্ষীয় কেহ ক্ষমতাশালী হইলেই এই শ্রেণীর উপাধি ধারণ করিতেন। তবে ঈশা খাঁ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, রাজমালায় যখন স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, ঈশা খাঁর এই উপাধি ত্রিপুরারাজ অমর মাণিক্যের প্রদত্ত, তখন এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। ঈশা খাঁ তখন ত্রিপুরা মহারাজার খর্পরগত সরাইল পরগণার ক্ষুদ্র জমীদার মাত্র—বিপদে আপদে ত্রিপুরা মহারাজার অনুগ্রহ ভিখারী। প্রবল প্রতাপান্বিত স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি অমর মাণিক্য যে এক রকম তাঁহার অধীনস্থ জমীদার ঈশা খাঁকে আফগানদের মধ্যে চলতি উপাধি দিয়া সম্মানিত করিবেন, ইহাতে অসঙ্গত, অশোভন বা অসম্ভব কিছুই নাই।

ঈশা খাঁর দেওয়ান উপাধি তাঁহার দেওয়ান বাগে প্রাপ্ত কামানের লিপিতে ব্যবহৃত হয় নাই—তথায় তাঁহার আখ্যা শুধু "মসনদালি"। এই উপাধি সম্ভবতঃ তাঁহার পৈত্রিক এবং জনপরম্পরাগত,—সরকারী দলিল পত্রে ইহার ব্যবহার ছিল না।

(৫) "The balance of probabilities, therefore lies in favour of the theory that the guns were cast before the battle (i.e. the battle with Manasinha, defeated in which Isa Khan is believed to have been taken to Delhi and given the Sanad for 24 Parganas and the title of Masnad i-Ali. N. K. B.) and that Isa Khan possessed the titles of Dewan and Masnad-i-Ali—then. * * * The title of Masnad i-Ali must have been assumed by Isa Khan on his declaring his independence, just as the title Hazrat-i-Ala was assumed by one of his predecessors "Sulaiman Karrani." Dacca Review, 1911, P. 222.
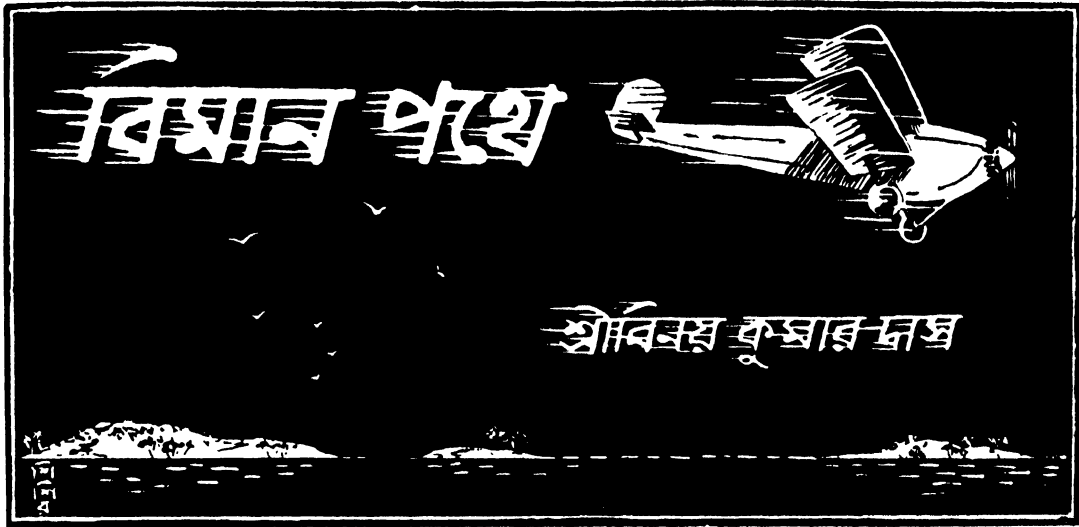
দমদম এরোড্রোম।

স্নিগ্ধ প্রভাতের মৃদুমন্দ দখিণ হাওয়ায় 'এয়ার সার্ভে কোম্পানি'র হেঙ্গারের (১) ওপরে ঝোলান Wind coneটী আস্তে আস্তে দুলছে। প্রকাণ্ড সবুজ মাঠটির চারিদিক ঘন সবুজ গাছপালায় ঘেরা। দূরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে নোনা জলের স্বচ্ছ হ্রদগুলি যেন আকাশের মেঘ-সীমায় গিয়ে মিশেছে। তার আরও ও-পারে—বহুদূরে, সুন্দরবন।

বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের শিক্ষক মিঃ লিটের মোটরখানি ধীরে ধীরে এরোড্রোমে এসে দাঁড়াল। মিষ্ট হাসিটি সদাই তাঁর মুখে লেগে আছে। প্রাতঃসম্ভাষণ জানিয়ে বল্‌লেন—Now. Mr. Das, three more good take offs and three beautiful landings—then off you go solo! অর্থাৎ আমাকে আজ একা আকাশে উঠ্‌তে হবে।

যদিও তাঁর শিক্ষাধীনে গত আড়াই মাস আকাশে উড়্‌ছি—কিন্তু আজকার দিনটা জীবনের এক বিশেষ দিন বলে মনে হচ্ছে। আজ সাম্‌নের ককপিটে (২) আমার শিক্ষক, আমার সঙ্গী, আমার বিপদ কালের সহায়টী ওঠ্‌বার সময় আর সঙ্গে থাক্‌বেন না। সে স্থানটী শূন্য থাক্‌বে।

প্রথমে হাতেখড়ির সময়, পৃথিবীর অনেক ওপরে তিনি টেলিফোন যন্ত্রের ভেতর দিয়ে—কত দিন কত ধম্‌কানি, কত উপদেশ, কত নূতন জ্ঞান দিয়েছেন কাণে কাণে—আজ সে স্বর নীরব থাক্‌বে। আজ নিজেই নিজের কর্ণধার! একাই উঠ্‌তে হবে উচ্চে—বহু উচ্চে—ঐ মেঘগুলোর কোলে; আবার—একাই নাম্‌তে হবে।

Landing বা নামাটাই হচ্ছে ওড়া বিদ্যার সব চেয়ে শক্ত অধ্যায়। এই নামবার সময়ই নূতন শিক্ষানবীশদের মধ্যে অনেকে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন—কেহ কেহ হাত পা বা মাথা ভেঙ্গে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছেন। কারণ, নামবার সময়ও এরোপ্লেনের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৪০।৪৫ মাইল থাকে।

অল্প দিনের কথা। একজন ইংরাজ ছাত্র Solo (একলা) উঠ্‌লেন। উঠ্‌লেন তো বেশ, কিন্তু বেচারী কোনমতে আর Land কর্‌তে পারেন না। শিক্ষক ও আমরা সকলে তাঁর অসহায় অবস্থা দেখে প্রমাদ গুণছি ও তাঁর মনের দুরবস্থাটা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করে বড়ই অস্বচ্ছন্দতা অনুভব কর্‌ছি। এ সময় মনে হচ্ছে, আকাশে শিক্ষকের সঙ্গ কত মূল্যবান। এখন তাঁর কাণের কাছে চুপি চুপি একটি কথা বলে দিতে পার্‌লেই তাঁর নামাটা কত সহজ হয়ে আসে। কিন্তু বলে কে?

বড় প্যাসেঞ্জার বিমান-পোতে তারহীন টেলিফোন থাকে;

---

(১) হেঙ্গার—এরোপ্লেন রাখিবার ঘর।

(২) ককপিট—ছোট এরোপ্লেনে পাইলট ও যাত্রীর বসিবার স্থান।

কিন্তু আমাদের এই ছোট পোতে যে যন্ত্র নেই। যা' হক, বেচারী প্রাণপণে ৯।১০ বার নাম্‌বার বৃথা চেষ্টা করে শেষে সফল হলেন। তখন মিঃ লিট ও আমাদের কি আনন্দ!

আমি শিক্ষকের সঙ্গে বহু কষ্টে তিনটি ভাল Landing কর্‌বার পর মিঃ লিট কতকগুলি অতি দরকারি উপদেশ দিয়ে ও পিঠ্‌টা চাপ্‌ড়ে বল্‌লেন—"Be a good pilot, fly like a bird, and land nicely!"
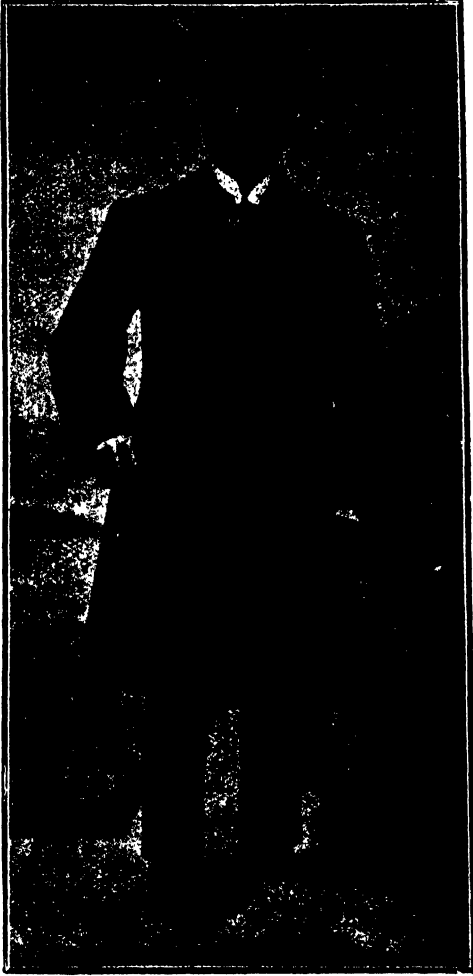
লেখক

ছেলেবেলা থেকে কত উপদেশই কত জনের কাছ থেকে শুনেছি। কোনটা কাণে পৌছায়নি, কোনটা "এক কাণ দিয়ে প্রবেশ করে অন্য কাণ দিয়ে বেরিয়েছে"—কিন্তু আজকের এই উপদেশ—খালি কাণে নয়—মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে রাখবার জন্য মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা কর্‌ছি। কারণ, আজকের এই উপদেশ তুচ্ছ কর্‌লে—তার পরিণাম যে অতি ভয়াবহ!!

সাবধানে Safety Beltটা বুকের ওপর, ব্রাউন ক্রোম চামড়ার কাণঢাকা হেল্‌মেট্‌টা মাথায় ও ট্রিপ্লেক্স্ কাচের Goggles জোড়া চোখে আঁট্‌ছি—এমন সময় মিঃ লিট চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—"Contact"। সুইচ দুটী লাগিয়ে দিলাম—তিনি প্রপেলারটা ঘুরিয়ে এঞ্জিন চালিয়ে দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সহাস্য বিদায়-সম্ভাষণ!

কল্ টিপ্‌তেই, ভীষণ শব্দে ও ঘণ্টায় ৬০।৬৫ মাইল বেগে প্রশস্ত এরোড্রোমের ওপর দিয়ে আমার এরোপ্লেনখানি Taxi (৩) করে ছুট্‌ল। তার পর ধীরে ধীরে, মাঠ ছেড়ে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে—বিশ, পঞ্চাশ, একশ, দু'শো ফিট ওপরে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্লেনখানি ৭।৮ মাইল দূরের নোনা হ্রদগুলির উপরে এসে হাজির হ'ল। এবার দক্ষিণ দিক ছেড়ে পশ্চিম দিকে উড়ে চল্‌লাম ও ক্রমে কয়েক মিনিটের মধ্যে ৪০০০ ফিট উপরে উঠে পড়া গেল। এখনও উঠ্‌ছি।

দূরের গাছপালা, কলকাতা সহর যেন ছোট হতেও ছোট হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। পৃথিবীটি একটি গোল মস্ত সবুজ লাল্‌চে—ঘরবাড়ী, পথ ঘাট, খাল বিল, ও মাঠ ময়দানগুলি তার ওপর যেন নিপুণ শিল্পীর অপরূপ কারুকার্য্য। ও-পাশে ভাগীরথী যেন একটি সাপের মত পড়ে আছে এঁকে-বেঁকে। জাহাজ, নৌকাগুলি কাল-কাল পোকার মত দেখাচ্ছে। হাওড়ার পুলটি যেন ছোটদের খেলাঘরের ছোট্ট একটি সাঁকো। ক্রমে ৫০০০, ৫৫০০ ফিট। তার পর ধীরে ৬০০০ ফিটে উঠ্‌লাম।

মাথার উপরে দিগন্ত-বিস্তৃত নীল আকাশখানি দূর-দূরান্তরে Horizonটির কাছে গিয়ে মিশেছে। আর সেই বিশাল শূন্যতার ভিতর দিয়ে—অতি উচ্চে—রূপালি ডানা দুটী মেলে ঘণ্টায় প্রায় ৯০ মাইল বেগে, আমার "জিপ্‌সী মথ্" পাখীটি আমায় নিয়ে উড়ে চলেছে।

উচ্চতা-নিরূপণ যন্ত্রে দেখা যাচ্ছে—এবার প্রায় ৭০০০ ফিট উপরে উঠে পড়া গেছে—অর্থাৎ দার্জ্জিলিং পাহাড়ের চূড়ায়। আর বেশ ঠাণ্ডাও অনুভব কর্‌ছি। প্রপেলারের

(৩) এরোপ্লেনের আকাশে ওঠ্‌বার পূর্ব্বের ছোটাকে Taxi করা বলে।

ঝোড়ো হাওয়া (Slip Stream) ও এয়ার স্পীড-ইন্‌ডিকেটার ছাড়া এরোপ্লেনের গতি মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে—যেন এটি স্থিরভাবে এক যায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

বড় নির্জ্জন লাগ্‌ছে। যেন দুনিয়ায় বুঝি আর কেউ নেই—আমি একা! পৃথিবী কোথায় পড়ে আছে। মাঝে মাঝে তার কথা একেবারেই ভুলে যাচ্ছি। খালি আমি, দূরের Horizon—সাম্‌নের Instrument Boardএ যন্ত্রের কাঁটাগুলি। *কেউ থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে—কেউ ধীরে ধীরে নড়্‌ছে—কেউ বা স্থির হয়ে রয়েছে। আর পোতের তিন হাজার ফিট নীচে দিয়ে পথ-ভোলা যাত্রী মেঘের দল উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটোছুটী কর্‌ছে।

Tachometreএ এঞ্জিনের পরিভ্রমণ,, Altimetreএ পৃথিবী থেকে উচ্চতা, Air Speed Indicatorএ এরোপ্লেনের বেগ, Turn and Bank Indicatorএ পোতের আবর্ত্তন ও বক্রগতি, Oil Pressure Gaugeএ এঞ্জিনে তেলের চাপ ও চলাচল, এবং Compassএ দিক্‌ নির্ণয় করে যাচ্ছে—নীরবে।

পোত চালাবার controls-গুলি হাত ও পায়ের সঙ্গে মিশে যেন এক হয়ে গেছে—এবং মনের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সব ইন্দ্রিয়গুলির মত যেন স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

চালানোর ফাঁকে ফাঁকে আবার অনেক রকম চিন্তা মনে আস্‌ছে। বীর লিণ্ডবার্গের কথা—২৫ বছরের যুবা—একটি Land Planeএ প্রথমে একাকী আটল্যান্টিক মহাসাগর পার হয়েছিলেন। কি অসমসাহসিক কাজ! জগৎকে দেখিয়েছেন—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে চেষ্টা কর্‌লে, দুনিয়ায় কোন কাজই মানুষের আট্‌কায় না। ঠিক তার কিছু দিন পূর্ব্বে ফ্রান্সের মুসিয়ে Coli ও Nungesser এই মহাসাগর উড়ে পার হতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। সুতরাং লিণ্ডবার্গের এই সৎসাহসকে বাতুলতা আখ্যা দিয়ে, অনেকে তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত হতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি অটল!

শেষে ৩৩½ ঘণ্টায় ৩৬০০ মাইল অতিক্রম করে যখন তিনি প্যারীর "লি বোর্গে" এরোড্রোমে গিয়ে পৌঁছলেন—তখন তারহীন বার্ত্তায় সারা আকাশ কেঁপে উঠ্‌ল। সারা বিশ্বে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল।

সে রাত্রে "লি বোর্গেতে" ফরাসীরা—স্বদেশবাসিদ্বয়ের পরাজয়ের পরও—লিণ্ডবার্গকে কি রকম উন্মত্তভাবে যে সম্বর্দ্ধনা করেছিলেন—তা তাঁর লেখা We pilot and plane বইখানি পড়্‌লে বেশ বোঝা যায়। ইংলণ্ডও এই বিমান-বীরকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার জন্য কয়েকখানি এরোপ্লেন পাঠিয়েছিলেন। শেষে আমেরিকা থেকে—তাঁর নিজের দেশ থেকে যে সসম্মান সাদর আহ্বান এল ও যে ভাবে তাঁকে তাঁর দেশবাসীরা গ্রহণ কর্‌লেন, সে রকম বিরাট ও মর্ম্মস্পর্শী সম্বর্দ্ধনা আজ পর্য্যন্ত কোনও বীর পেয়েছেন কি না সন্দেহ। প্রেসিডেণ্ট কুলিজ্‌ তাঁকে দেশে নিয়ে যাবার জন্য—একখানি ক্রুইসার ("Mempis") ফ্রান্সে পাঠিয়েছিলেন।
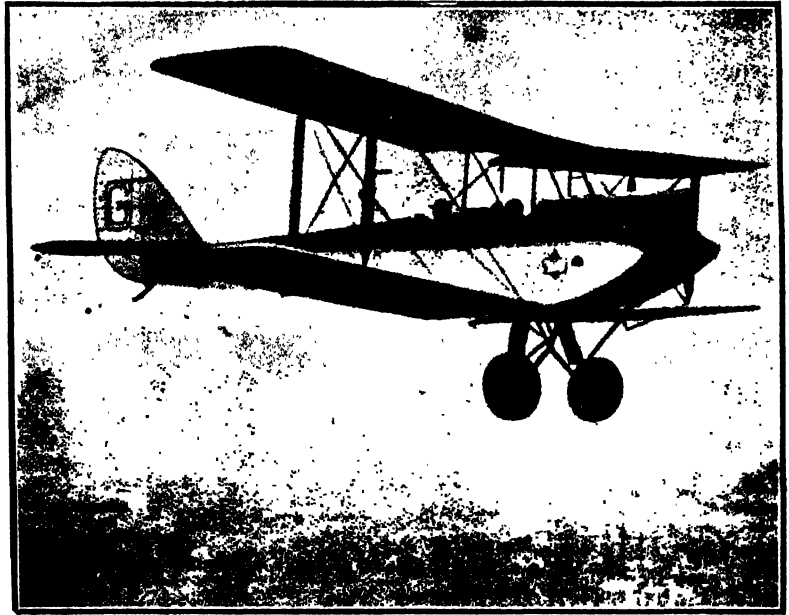
বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের "জিপ্‌সি মথ" এরোপ্লেন। পিছনের কক্‌পিটে ছাত্র, সাম্‌নে শিক্ষক।

ওয়াসিংটন, নিউইয়র্ক, ও সেণ্ট লাউইস্‌ সহরের ছেলে মেয়ে থেকে বুড়ো বুড়ী পর্য্যন্ত তাঁকে দেখে—আনন্দাতিশয্যে পাগলের মত কেঁদে উঠেছিল। New York Times লিখেছিল—

"After all, the greater was behind—the young fellow's keeping his own head when millions hailed him as hero, when all the women lost their hearts to him, and when decorations were pinned on his coat by admiring Governments. Lindbergh had the world at his feet, and he blushed like a girl! A more modest bearing, a more unaffected presence, a manlier, kindlier, simpler
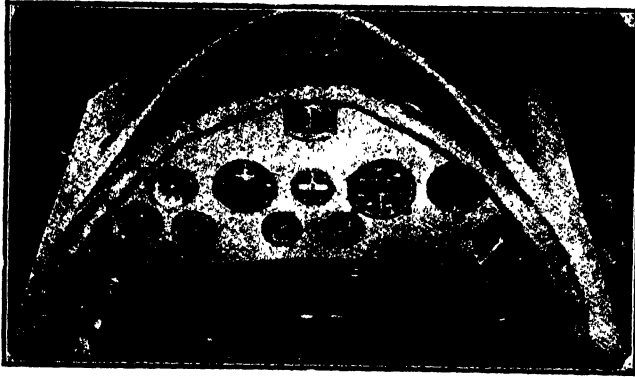
এরোপ্লেনের Instrument Board

character no idol of the multitude ever displayed. Never was America prouder of a son."

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সারা বিশ্বজন যখন গর্ব্বে, আকুলভাবে তাঁর দিকে চেয়ে—বীরের বিজয়-তিলক-আঁকা কপালখানি তখন বিনয়ে অবনত। কত লক্ষ লক্ষ ডলার—বহু উচ্চপদ—* * * দেশদেশান্তর থেকে লোকে প্রস্তাব করেছিল—কিন্তু কিছুতেই কেহ লিণ্ডবার্গের মাথা খারাপ কর্‌তে পারে নি। তিনি বলেছিলেন—"Please remember, this expedition was not organized for money, but to advance aviation."

আজ সেই অসমসাহসী বীরের কথা মনে করে—গভীর আনন্দে প্রাণ ভরে উঠ্‌ছে ও তাঁর সাহসের কথা স্মরণ করে আজ এই অসহায় অবস্থায় প্রাণে অনেক বল সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌ছি।

ক্রমে নাম্‌বার সময় হয়ে আস্‌ছে ও এবার এরোড্রোমের দিকে চলেছি। দু'হাজার ফিট নামবার পর, দূরে—অনেক দূরে হেঙ্গারগুলি বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। পূর্ব্বকোণে Bengal Air Transport Coyর হেঙ্গার দুটীও অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে।

আরও এক হাজার ফিটে নেমে এঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম। এবার 'প্লেনটী' Glide করে—চিলের মত ঘুরে ঘুরে নাম্‌ছে। ওড়ার মধ্যে সব চেয়ে মজা হচ্ছে—বাতাসে ভেসে নামা।

এঞ্জিনের হুঙ্কার, প্রপেলারের গর্জ্জন বা কোন রূপ কম্পন (vibration) নেই। বিস্তৃত ডানা দুটীর উপর ভর দিয়ে নিস্তব্ধে আস্তে আস্তে নামা বড় আরামদায়ক! ইচ্ছা হয় এই রকম ভাবে—পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উড়ে চলে যাই। গাইতে গেলাম—"নাহি সাড়া নাহি শব্দ মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ।" দুষ্ট্‌ হাওয়া গলাটা চেপে ধরে বল্‌ল—চুপ্‌!

এবার আমার একা Landingএর পালা। পূর্ব্বেই বলেছি—নামাটাই সব চেয়ে শক্ত ব্যাপার। আকাশ ছেড়ে এরোপ্লেনটা ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল বেগে মাটীর দিকে একটা উল্কার মত ছুটেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে—পৃথিবীটাই ভীষণ বেগে পিছনের দিকে চলেছে—আর এই—এই বুঝি শক্ত মাঠটার সঙ্গে বজ্রের মত ধাক্কা খেয়ে এরোপ্লেনটা ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথাটাও এবার চূর্ণ হয়ে যায়!

তখন সব Ground course, এতদিনের Flying Instruction, গাদা গাদা বইপড়া বিদ্যে, সব গুলিয়ে তাল পাকিয়ে মাথাটা যেন কি রকম কিম্ভূতকিমাকার করে দেয়। তখন আর কি—নিরুপায়ের উপায়কে—মনপ্রাণ সমর্পণ করে দিয়ে ডাকা,—আর বলা—"তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার? এ যাত্রাটা রক্ষে কর বাবা—আর—আর উঠ্‌ব না!!"

তার পর যাকে বলে "Taking the heart between the teeth" সেই রকম ভাবে প্রাণের দায়ে দম বন্ধ করে

প্রাণায়াম যোগ সাধন কর্‌তে কর্‌তে নেমে পড়া। "আণ্ডার ক্যারেজের" চাকা ছুটী ও Tail skidটী যখন ঘর্ ঘর্ শব্দে মাটীর ওপর দিয়ে সমান ভাবে গড়াতে থাকে, তখন শিক্ষক সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলেন। ছাত্রী-ছাত্রেরা বলে ওঠেন— "That's beautiful landing"। শেষে প্লেনটা আবার ট্যাক্সি করে ৪।৫ শো ফিট দূরে গিয়ে যখন দাঁড়ায়—তখন প্রথম Soloist একটা দম্ ফেলে বলেন—তাহলে—"আবার আসিন্থ হায়"!!

Formation flying. (দল-বেঁধে ওড়া)

বিমান-বিহারের আর এক চমৎকার ব্যাপার হচ্ছে formation flying বা অনেকগুলি এরোপ্লেন দল-বেঁধে কাছাকাছি ওড়া। অনেকগুলির সঙ্গে একসঙ্গে ওড়বার সুযোগ হয় নি বটে, তবে বেঙ্গল এয়ার ট্র্যান্সপোর্ট কোং'র একখানি এরোপ্লেনের সঙ্গে সেদিন ওড়বার সুযোগ হয়েছিল।

একটি মনোপ্লেনে (৪) পাইলট মেজর ভেচ্ একটি "আনন্দ যাত্রী" (Joy-Rider) নিয়ে উঠেছিলেন— এমন সময় আমিও ক্লাবের একখানি বায়প্লেন (৫) নিয়ে উঠ্‌লাম। অবশ্য বলা বাহুল্য—তখন আমাদের শিক্ষক মিঃ লিটও সঙ্গে ছিলেন।

প্রায় হাজার ফিট উপরে দু'খানা সেদিন একেবারে পাশাপাশি উড়তে লাগ্‌ল। আমরা চারজনে ইসারায় অনেক কিছু কথাবার্ত্তা ও আমোদ-আহ্লাদ চালাতে লাগ্‌লাম। এমন সময়ে মিঃ লিট সঙ্কেত করে আমাকে Control ছেড়ে দিতে বল্‌লেন (শিক্ষা-বিমানপোতে Dual control থাকে, যাতে দুটো ককৃপিটের আরোহিদ্বয়ই ইচ্ছামত চালাতে পারেন)।

মিঃ লিট অন্ত পোতটীর ৫০০ ফিট উপরে হঠাৎ উঠে পড়লেন ও ভীষণবেগে Dive করে মেজর ভেচের মনো-প্লেনটীকে আক্রমণ কর্‌লেন। মেজরও পাকা পাইলট—তিনি এঁর ব্যাপার দেখে, একটু মুচ্‌কে হেসে, নিমেষে বেজায় রকম কাৎ হয়ে ঘুরে (Vertical Turn)—দূরে সরে পড়লেন। তার পর দু'জনে রীতিমত বিমান-দ্বন্দ্ব আরম্ভ হ'ল। গত মহাযুদ্ধের সময় দুজনেই Royal Air Forceএ পাইলট ছিলেন—সুতরাং ও বিদ্যাতে দু'জনেই বিশেষ দক্ষ। তা ছাড়া, অনেকের হয় ত স্মরণ আছে, মিঃ লিট কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে একটি 'জিপ্‌সী মথ' এরোপ্লেনে উড়ে এসেছিলেন। সিনেমায় Wings ছবিখানি যাঁরা দেখেছেন—বা পড়েছেন, বিমান-যুদ্ধটা যে কি ভয়ঙ্কর, তা আর তাঁদের বিশদভাবে বোঝাতে হবে না।

কোন্ দিকে আকাশ, কোন্ দিকে পৃথিবী—আর

লিণ্ডবার্গ—মাতা ও পুত্র

কোথায় Horizon—সব হারিয়ে গেল। কখনও Stalling কখনও looping, কখনও Spinning, কখনও ঘণ্টায় ১২০।২৫ মাইল বেগে Nose Diving সুরু হ'ল। যদিও মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে এর পূর্ব্বে এসব Nerve Testing Flight কিছু কিছু হয়েছে—কিন্তু ঐ দিনের ব্যাপারখানা বড় সঙ্গীন বলে মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে মিঃ লিট জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন—Well Mr. Das, how are you feeling? আমার "Feeling" তখন আমার মনই জানে—কিন্তু ঢোঁক গিলে—গলাটা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করে নিয়ে বল্‌লাম—Oh

(৪) এক জোড়া পাখাযুক্ত এরোপ্লেন।

(৫) দু' জোড়া পাখাযুক্ত এরোপ্লেন।

Fine ! ! ! কিন্তু বুকের ভেতরের কলকারখানাগুলো তখন দেখ্‌লাম বেজায় জোরে জোরে চল্‌ছে—হাত দুটো তখন কক্‌পিটের দেওয়ালটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে আছে ! চক্ষু দুটী অর্দ্ধনিমীলিত অবস্থায় ও প্রাতরাশের উপাদেয় দ্রব্যগুলি—কণ্ঠ সন্নিকটে—আগত !

"নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ"

এতদিন ওড়ার পর আমার এ অবস্থা—না জানি, মেজর ভেচের সঙ্গী ও প্যাসেঞ্জারের অবস্থা কি রকম ? তাঁর বোধ হয় এই প্রথম দিন। যা হ'ক, মেজর হয় ত তাঁর যাত্রীর কথা ভেবে যুদ্ধ ভঙ্গ করে (পৃষ্ঠ ভঙ্গ নয় !) কল্‌কাতার দিকে পাড়ী দিলেন ও আমরা ২০০০ ফিট ওপর থেকে বেগে নেমে—হঠাৎ এক চাষীদের ক্ষেতের ১৫।২০ ফিট উপরে এসে হাজির হলাম।

লাঙ্গল ছেড়ে চাষী ভায়ারা তো ভয়ে প্রায় শুয়ে পড়ল—গরুগুলো হঠাৎ মাথার ওপর অস্বাভাবিক রকমের একটা গর্জ্জন হয়ে ওঠাতে—লাঙ্গলের দড়ি ছিঁড়ে—লাঙ্গুলটী তুলে গ্রামের দিকে দৌড় মারাই শ্রেয়ঃ মনে কর্‌লে !

তার পর অনেকক্ষণ অসম্ভব রকম নীচে দিয়ে, ছাত্রের কতকটা "জমীর ভয়" ভাঙ্গিয়ে দিয়ে—তিনি এরোড্রোমে ফিরলেন।

* * * * * *

উপস্থিত—বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে প্রায় ৩০০ জন সভ্য। তার মধ্যে প্রায় ৩৫ জন উড়তে শিখছেন। এই ৩৫ জনের মধ্যে উপস্থিত আমরা—বাঙ্গালী ২ জন মাত্র। ১টী ইংরাজ মহিলা—মিস্ পেজ। শ্রীযুত জে, পি, গাঙ্গুলী পাইলটের A লাইসেন্স নিয়ে অল্প দিন হ'ল ইংলণ্ড যাত্রা করেছেন। (A লাইসেন্স কতকটা মোটরের মালিকদের মোটর চালাবার লাইসেন্সের মত। A লাইসেন্স নিয়ে কোন চাক্‌রী বা টাকা নিয়ে ওড়ার কোন কাজ কর্‌তে পারা যায় না।) সেখানে ডি হ্যাভিল্যাণ্ড ফ্লাইং স্কুলে B লাইসেন্স নেবার জন্য গিয়েছেন। আশা করি তিনি শ্রীযুত কাবালির মত খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেখানের সব শিক্ষা শেষ করে—দেশে ফিরে বাঙ্গালীদের মুখোজ্জ্বল কর্‌বেন।

Commercial B লাইসেন্স নেবার জন্য ভাবী পাইলট ছাত্রদের এরোপ্লেন ও এরো-এঞ্জিন বিষয়ে তো বিশদভাবে শিক্ষা কর্‌তেই হবে ; তা ছাড়া Air Navigation. Meteorology, Airology, Night Flying ইত্যাদি অনেক কিছু শিখ্‌তে হয়। উপরন্তু International Air Traffic Rules, Commercial Regulations for Flying, ইত্যাদিতে পরীক্ষা দিতে হয়।

পাইলেটের B লাইসেন্স নেবার সময় অনেকগুলি কঠিন "ওড়া পরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হওয়ারও প্রয়োজন—কারণ, এতে

নাগি পাইলটের নিজের নয়,—সাধারণের নিরাপদাবস্থাও পুরো মাত্রায় নির্ভর কর্‌ছে। ভবিষ্যতে তাঁরাই যে যাত্রী ও ডাকবাহী বিমানপোতের কর্ণধার হবেন।

ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্ত B লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা বা সে বিষয়ে শিক্ষা দেবার কোন স্কুল নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইয়োরোপ মহাদেশে অনেকগুলি ফ্লাইং স্কুল আছে। ইংলণ্ডের কোন ভাল স্কুলে B লাইসেন্স courseএর জন্য প্রায় ৫০০ পাউণ্ড বা মোটামুটি ৭০০০৲ টাকা লাগে। তার ওপর অন্যান্য খরচ আছে। এ দেশ থেকে কতকটা শিখে A লাইসেন্স নিয়ে গেলে—প্রায় পনেরো মাসের মধ্যে B লাইসেন্সের পাঠ ও অন্যান্য শিক্ষা শেষ করা যেতে পারে—মনে হয়। Commercial B লাইসেন্স-ধারী পাইলটরা ওদেশে এবং এদেশেও উপস্থিত মাসিক ৭০০৲ টাকা থেকে আরম্ভ করে ১৫০০।২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা পেয়ে থাকেন। তবে শিক্ষার ব্যয়ও যথেষ্ট। উপরন্তু সুস্থ সবল দেহ, সূক্ষ্ম ও প্রবল দৃষ্টিশক্তি ও অতিরিক্ত দৃঢ় মন থাকার প্রয়োজন। স্কুলে ভর্ত্তি হবার পূর্ব্বে —ভাবী ছাত্রদের খুব শক্ত রকম ডাক্তারী পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হতে হয়।

এবার আমার ৫০০ মাইল (Cross Country Flight) দেশান্তরে ওড়ার বিষয় কিছু লিখে এ প্রবন্ধ শেষ কর্‌ব।

বিমান-পথে রাঁচি

ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য ঘড়ীটাতে এলার্ম দিয়েছিলাম তিনটায়; কিন্তু এলার্ম বাজবার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখি—ঘন অন্ধকার। মাটীর দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম—মনে হ'ল রাত্রে দুই-চার পশ্‌লা বৃষ্টি ঝরেছিল। তাই ত!

ছয়টায় তৈরী হয়ে গেলাম এরোড্রোমে। আবার সুরু হ'ল ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌। মিঃ লিট্‌ বল্লেন—নাই বা আজ গেলে?

মনটা তাঁর কথায় সায় দিলে না বটে, তবে যাত্রাটা স্থগিত রাখ্‌তেই হ'ল।

কালো মেঘগুলো বড্ড নীচু দিয়ে ছুটোছুটী কর্‌ছে। আমাদের উড়্‌তে হবে তার ওপর দিয়ে। সুতরাং উপরে ফাঁকা আকাশ, আর নীচে কালো—কিস্‌কিন্ধ্যে মেঘগুলো। তিন চার ঘণ্টা যদি নাগাড় এই দৃশ্যই দেখ্‌তে হয়—হয়েছে আর কি। থাক্‌গে আজ।

মা সঙ্গে গিয়েছিলেন। ফের্‌বার সময় দেখ্‌লাম মনটা তাঁর ভারি খুসি। ও বুঝেছি, আমার যাওয়া হ'ল না ব'লে
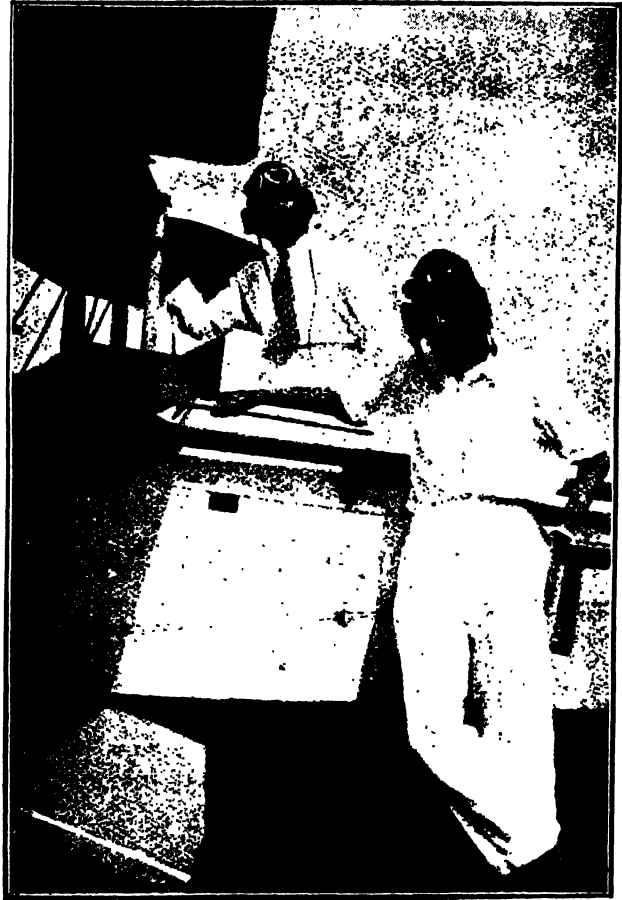
Solo Landingএর পর লেখক ও মিঃ ডয়

কেন তোমার এত আনন্দ! তবে কি আড়াই মাস আগে শিখ্‌বার জন্যে যেদিন তোমার মত চেয়েছিলাম—সেদিন মত যদিও দিয়েছিলে, কিন্তু তোমার প্রাণটা চেয়েছিল অন্যরূপ?

* * *

তার পর পাঁচ দিন কেটে গেছে।

১৩ই জুন—বৃহস্পতিবার—সকাল ৯টা। সকালের

সোনালী রোদ অনেকক্ষণ হ'ল—নীল আকাশে ও শিশির-ভেজা সবুজ মাঠটার ওপর খেলা সুরু করে দিয়েছে, এমন সময় বেঙ্গল এয়ার ট্রান্সপোর্ট কোং'র একটি দু'সীট্ওয়ালা

Formation Flying বা দল-বেঁধে ওড়া

মনোপ্লেন—"ওয়েষ্টল্যাণ্ড উইজন" গয়ার মাঠে—সুমুখে মেজর ভেচ্

Avro-Avian এরোপ্লেনে আমি ও পাইলট মেজর ভেচ্ দমদম এরোড্রোম ছাড়লাম।

আকাশে উঠে দেখা গেল—আমাদের দু'জনের দুটো সুট-কেস, যন্ত্রপাতি, দুটো থারমো ফ্লাস্ক, রাঁচীতে ছেলে-মেয়েদের জন্য চকলেট, টফি, লজেন্স, সন্দেশ ইত্যাদির ভারে বেজায় রকম Tail Heavy হয়ে পড়েছে। প্লেনটাকে কোনমতে সিধে ওড়ান যাচ্ছে না।
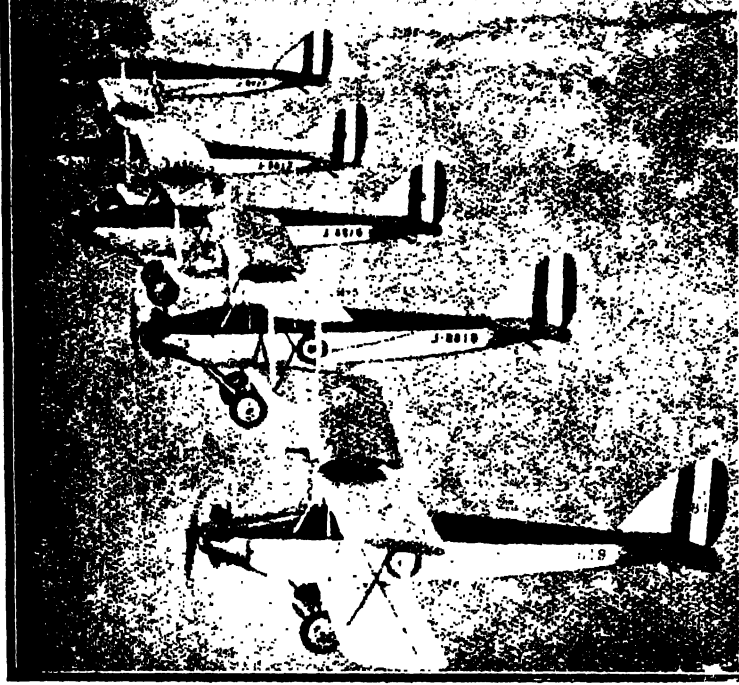
নেমে পড়া গেল। মেজার ভেচ্ বল্লেন—"মিঃ দাস, তোমার কক্‌পিটের Dual controlটা খুলে ফেল্লে একটা সুট-কেশ ওখানে যেতে পারে।" আমি বল্লাম—"মেজর, এক-বস্ত্রে 'মথুরাপুরী' যেতে হয় সেও ভাল,—কিন্তু Dual control খুলে ফেলে এই ২৫০ মাইল চালাবার সুযোগটা ছাড়তে আমি কোনমতে রাজী নই।" তিনি মুচকে হাস্‌লেন। খুব স্ফূর্ত্তিবাজ লোক!

যা'হক আমার সুট-কেস ও কতকগুলি জিনিষ বাদ দিয়ে—বাকি জিনিষগুলি কাগজে মুড়ে, কয়েকটি ছোট ছোট বাণ্ডিল করে—পেছনের 'লকার' ও সাম্‌নের কক্‌পিটে ভাগ করে নেওয়া হ'ল।

পরীক্ষা করবার জন্য আবার ওঠা গেল—দেখা গেল বিশেষ কিছু ভার কমেনি। ভাবলাম এবার মেজর সাহেবের সুট-কেসটা, আর তাঁর কিছু কিছু জিনিষ কমাবার কথা বলি—কিন্তু জান্‌তাম তিনি একটু সৌখিন গোছের লোক, সুতরাং সখের জিনিষ কমিয়ে তাঁর প্রাণে ব্যথা দিতে শেষটা আর ইচ্ছা হল না। চল্লাম।

নীচে একপাশে লক্ষপতি আমেরিকান মিঃ ভ্যান ব্ল্যাকের সুবৃহৎ ও সুন্দর এরোপ্লেনখানি চুরমার হয়ে পড়ে আছে দেখ্‌লাম, কিন্তু আজ সেদিকে যেন চাইতে ইচ্ছা কর্‌ছে না।

দেশ-দেশান্তর, কত হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে এসে এই দমদমে তাকে এ-রকম ভাবে যাত্রা শেষ কর্‌তে হবে, কে জানত? মিঃ ব্ল্যাকের সব আশা সব উৎসাহ তাঁর এরোপ্লেনখানির সঙ্গে সমাধি-লাভ কর্‌ল। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে সদলে দেশে ফির্‌লেন। ভবিতব্য!

দম্‌দম ছেড়ে মেজর আমাকে control দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে টালার জলের ট্যাঙ্ক, গঙ্গা, হাওড়া ষ্টেশন পার হয়ে ব্যাটরায় আমাদের বাড়ীর ওপর দিয়ে চল্‌লাম।

বন্ধুরা, যাঁরা আমার যাওয়ার খবর জান্‌তেন, খুব উৎসাহের সহিত রুমাল নাড়লেন। যাঁরা জান্‌তেন না, তাঁরা হয় ত উৎসুক দৃষ্টিতে রূপালি পাখীটার দিকে চেয়ে রইলেন। বাড়ীর ছাতে ছাতে—পাড়ার মাঠে মাঠে ছোট ছেলেমেয়ের দল এরোপ্লেনের শব্দে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। অবশ্য ওপর থেকে তাদের আনন্দ ধ্বনি কোন দিন কাণে পৌঁছয় নি, কিন্তু নীচে দিয়ে ওড়্‌বার সময় তাদের আনন্দ-নৃত্য Goggles আঁটা চোখ দিয়ে অনেক দিন দেখেছি।

অনেক সময় ইচ্ছা হয় তাদের সবগুলিকে একসঙ্গে উপরে এনে আকাশ থেকে পৃথিবীর মনোহর শোভা একবার দেখাই ও তাদের সুরে সুর মিলিয়ে গাই—
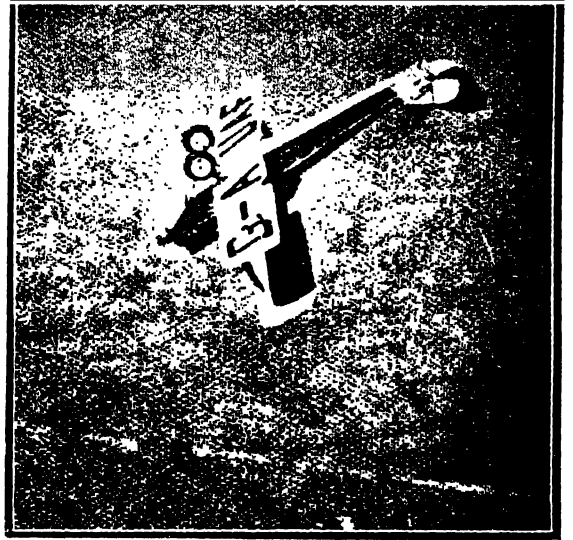
Looping the Loop বা "ডিগ্‌বাজী"
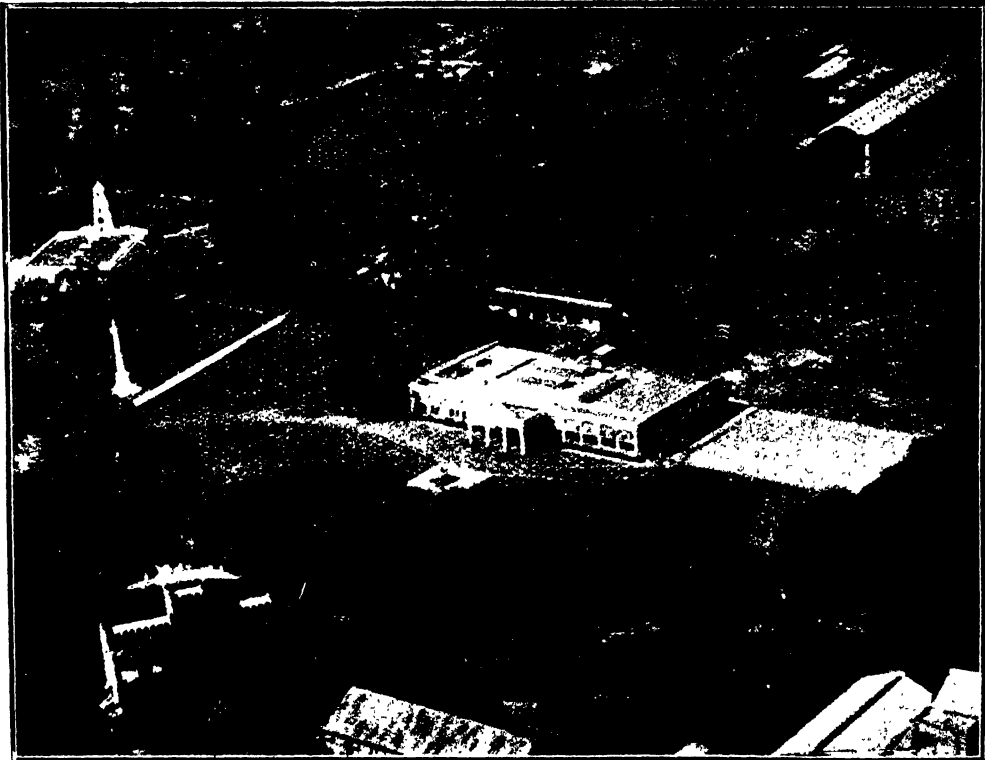
বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব

"সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে—
* * *
আঁখি মেলে তোমার আলো,
যেদিন আমার চোখ জুড়াল
এই আলোতেই নয়ন রেখে
আমি মুদ্‌ব নয়ন শেষে।"

না জানি তাহ'লে তাদের কত আনন্দ হবে; তাদের নির্ম্মল প্রাণের সরস হাস্যধ্বনিতে আকাশ ভরে উঠ্‌বে।

কম্পাস্‌টা পেছনের কক্‌পিটে আঁটা; সুতরাং বি, এন, খড়্গাপুর ফেলে মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে, মৌচাকের মত সহরটা—জেলখানা—সরু ফিতার মত লাল রাস্তা ইত্যাদি দেখতে দেখ্‌তে আমরা চল্‌লাম্‌। এ এরোপ্লেনটাতে টেলিফোন না থাকায় মেজর ভেচ্‌ কাগজে লিখে ও সঙ্কেত করে পোতের গম্যপথ দেখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

তিনি নিলেন মানচিত্র ও দিকনির্ণয় যন্ত্র—আমি নিলাম Flying controls।

কাঁশাই নদীর বাঁকে বাঁকে, শালবনের পাগ্‌লা হাওয়ার তালে তালে, নেচে নেচে—হেলে দুলে আমাদের হাওয়ার-ভাসা নৌকাখানি 'ওজোন' ঠেলে এগুতে লাগ্‌ল!
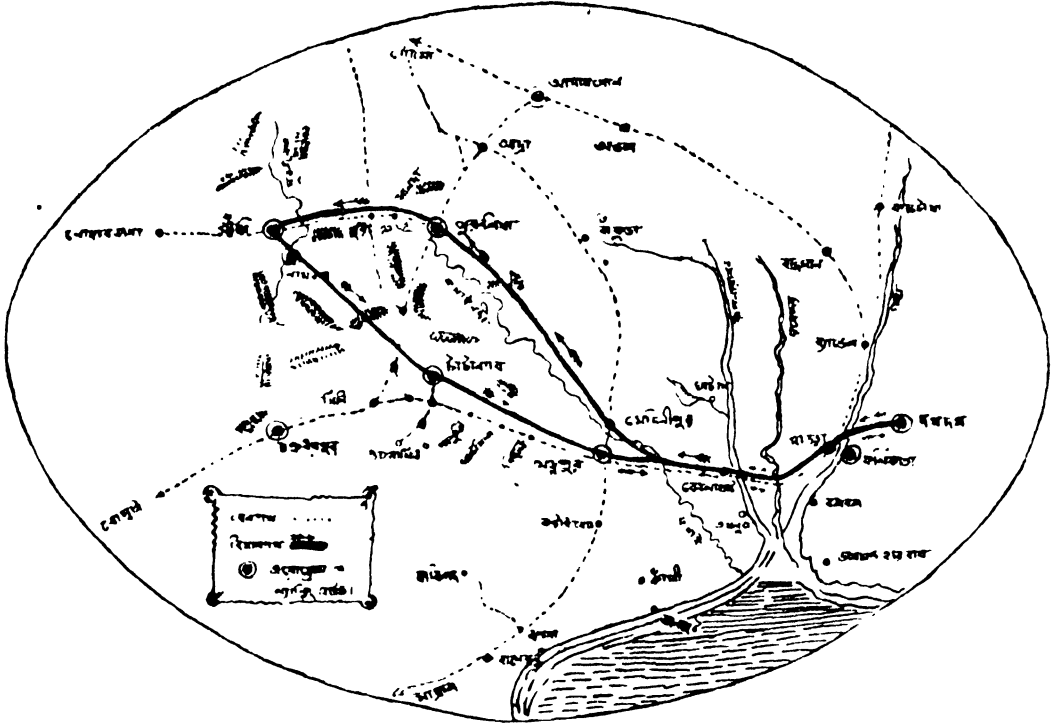
রেলপথ তথা বিমান-পথ

রেল লাইন ধরে এগোনোই সুবিধা মনে হচ্ছে। তিন হাজার ফিট ওপর দিয়ে চলেছি। প্রায় সাঁতরাগাছির পর থেকেই ৩০ মাইল দূরের রূপনারায়ণ নদের জলটা দিঙ্‌মণ্ডলে দেখা দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে বাঁয়ে বাউরিয়া, চেঙ্গাইল ইত্যাদি স্থানের চট্‌ কল্‌, গঙ্গার ওপারে বজ্‌বজের তেলের ডিপো, উলুবেড়িয়া, বাগ্‌নান ইত্যাদি যায়গা অতিক্রম করে কোলাঘাটে এসে হাজির হলাম।

আরও আধ ঘণ্টার মধ্যে ৩৩ মাইল উড়ে বাঁয়ে দূরে

মাথায় আঙুলের সুড়সুড়ি দিয়ে মেজর এক-টুক্‌রা কাগজ হাতে দিলেন। দেখ্‌লাম লেখা আছে—"জোর প্রতিকূল বাতাসের জন্য আমরা এগুতে পার্‌ছি না। দেড়ঘণ্টায় মাত্র ৯০ মাইল এসেছি। এবার ঐ হল্‌দে নদীটা ধরে—সি... চালাও—পুরুলিয়ার দিকে।"

হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম বাস্তবিক স... হিসাবে আমরা অল্পই এগিয়েছি। উপায় নাই। ভয়ান... জোর হাওয়া ঠেলে দমদম থেকে এখান পর্য্যন্ত বরা...

আমাদের আস্‌তে হয়েছে। তার ওপর মালের অতিরিক্ত ভার। চালাতে বড় কষ্ট হচ্ছে।

বেলা পৌনে এগারটা। বাতাস বাড়তেই চল্‌ল। প্রায় ৩৫০০ ফিট ওপর দিয়ে চলেছি। নীচে ঘন শালবন ও অল্প অল্প পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। বেলা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে লাল-মাটি ও কাল-পাহাড় তেতে উঠে হাওয়াটাকেও তাতিয়ে তুল্‌ছে।

খানি বেজায় রকম হায়রান হতে লাগ্‌ল ও নূতন পাইলটকেও ভয়ানক অস্থির ও উদ্‌ভ্রান্ত করে তুল্‌ল। তবে মনে একটা মস্ত ভরসা—সঙ্গে পাকা পাইলট, মেজর ভেচ্‌!

ক্রমে মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেল্‌লে। সাড়ে তিন হাজার ফিট নীচের ধূলা উড়িয়ে অন্ধকার করে, অল্প অল্প বৃষ্টি ও ভীষণ ঝড় সুরু হ'ল। মনে হ'চ্ছে—ভগবান, প্রথম দিনের দূর পাড়িটী জমাবার আগেই—তোমার এ কি পরীক্ষা?

কলিকাতা ও হাওড়া (বিমান হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ)

প্লেন্‌টাকে দু'মিনিটের জন্যও স্থির রাখা যাচ্ছে না। ঝোড়ো দম্‌কা হাওয়ায়—কখনও হঠাৎ ২০ ফিট ওপরে, কখনও ঝপ্‌ করে ৩০ ফিট নীচে, কখনও ডানা দু'টাকে প্রায় ৪৫ ডিগ্রি কাৎ করে দিচ্ছে। হাওয়ার তুফানে পড়ে পোত-

ঝড়ের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে ভয়ানক পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছে কোন মতে মাইল পঁচিশ অতিক্রম কর্‌তে পার্‌লেই পুরুলিয়া। সেখানেই নামা যাবে।

নাঃ—আর বুঝি পার্‌লাম না। শরীর অবসন্ন হয়ে

আসতে লাগল। মাথায় সকাল থেকে চামড়ার হেলমেট্ আঁটা, তার ওপর সামনের এঞ্জিনের গরম হাওয়া ও এরোপ্লেনের তাণ্ডব নৃত্য !

উনিশ বৎসর বয়সে জাপান লাইনের "এ্যরাটুন আপকার" জাহাজে Ship Engineerএর কাজ করবার সময় চীন সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের কত ভীষণ 'টাইফোন'—কত 'হারিকেন' ঝড় খেয়েছি। তার পর আজ পর্য্যন্ত কত হাজার হাজার মাইল, কত রকম ঝড় তুফানের ভিতর দিয়ে কত সমুদ্রেই যাতায়াত করেছি। কিন্তু আজকের মত এ-রকম "বেজায় কাৎ" করতে পারে নি—কোনো ঝড়ে! মেজর ভেচ্ও বলেছিলেন—এ পাহাড়ে ঝড়টা না কি বড় ভয়ানক গোছের !

কুমারী গুনা মজুমদার—রাঁচী।

যা'হক, খুব ইচ্ছা সত্ত্বেও, শরীরের এ-রকম অবস্থায় আর চালানো যখন নিরাপদ মনে করলাম না—তখন পিছনের দিকে তাকাতেই, মেজর ভেচ্ বুঝতে পেরে Control নিলেন। আমি হেলমেট ও গগ্‌লস্ খুলে—ককপিটে এলিয়ে প'ড়লাম।

কতক্ষণ এ-রকম ভাবে ছিলাম জানি না,—মাথায় টোকা দিতে চোখ চেয়ে দেখলাম—সামনে মেজরের সাদা হাতখানি ও হাতে বরফজল-ভরা থার্মোফ্লাস্ক। নড়াচড়া করা বা কিছু খাবার ইচ্ছা তখন ছিল না ; ইসারায় ধন্যবাদ দিয়ে ফ্লাস্ক ফেরৎ দিলাম। তখন ঝড় অনেকটা কমে এসেছে।

পরের বারে যখন চোখ খুললাম, দেখি—পুরুলিয়ার "ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডের" ওপর আমরা Circle করছি। দু'তিন মিনিটের মধ্যে মেজর প্লেনখানিকে সুন্দরভাবে 'ল্যাণ্ড' করলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে, পঙ্গপালের মত লোকের ভীড়, চারিদিক থেকে ছুটে এসে—আমাদের ঘিরে ফেললে। পাদ্রী সর্টের (Shorts) বাংলো সুমুখেই। মেজরের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বের পরিচয় ছিল। কয়েকজন লোককে এরোপ্লেনের

মিস্ সোয়েন, মেজর ভেচ্, তাঁহার বান্ধবীগন

পাহারায় রেখে, তিনি আমাদের সাদরে তাঁর বাংলোয় নিয়ে গেলেন ও চা স্যাণ্ডউইচ্ দিয়ে আমাদের পরিতুষ্ট করলেন। আমি দেখেই সুখী হলাম— খেয়ে নয় ; কারণ, আমার তখন খাবার মত অবস্থা নয়—অবস্থাটা শোবার মত ছিল !

যা'হক, চোখে মুখে জল দিতে অনেকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠা গেল ও কয়েক মিনিটের মধ্যে সামনের মাঠে গিয়ে—ভীড় ঠেলে—পেট্রল বোঝাই করতে সুরু করে দিলাম।

স্থানীয় কয়েকটী লোক এসে আমার সঙ্গে আলাপ

জমিয়ে ফেল্‌লেন্; বল্‌লেন্—"হ্যাঁ—আপনি বাঙ্গালী, এ কার্য্য শিখে ভাল কোর্‌ছোন বটে।" "এই সব কর্‌লে দেশের উন্নতি হবে বটে।"

পাদ্রী সাহেব বেশ বাঙ্গলা শিখেছেন। তিনিও তাদের কথায় সায় দিলেন। আমাকে কিছু পূর্ব্বে তাঁর বাংলোয় বল্‌ছিলেন—"I think the Indians will be very good pilots if they get the opportunity."

বেলা প্রায় এগারটা। All clear, switches off, contact. এঞ্জিন চল্‌ল—প্রপেলার ঘুরল্—রুমাল নড়্‌ল, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা পুরুলিয়া-রাঁচী সরু রেল লাইনের 'রুদ্র' ষ্টেশনের ওপর দিয়ে উড়ে চল্‌লাম।

রাঁচীর মাঠে—Avro-Avian

Sea-Plane বা সমুদ্র-প্লেন

*　　*　　*　　*

রেলের প্রায় পাশ দিয়ে পুরুলিয়া-রাঁচি পথ। বড়দি'র কাছে শুনেছি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন রেলপথ ছিল না. তখন এই পঁচাত্তর মাইল রাস্তা তাঁরা না কি মানুষে-টানা পুস্-পুস্ গাড়ীতে যাতায়াত কর্‌তেন—দুই-তিন দিন ধরে। এই জঙ্গলে পার্ব্বত্য পথের ধারে কত রাত্রি, আগুন জ্বেলে—বাঘ তাড়িয়ে, তাঁদের কাটাতে হয়েছে। দুই-এক জন কুলীও মাঝে মাঝে বাঘের পেটে যেত; কিন্তু আজকাল সেই পথটা রেলে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টায় পৌঁছে দিচ্ছে। আর এরোপ্লেনে—এক ঘণ্টায়!

*　　*　　*　　*

পাহাড়ের উপত্যকায় ঐটে ঝাল্‌দা ষ্টেশন না? হ্যাঁ, তাই ত!

নেবার অনুমতি না পেয়ে, পাশের এক গাছতলায় সেই কাট-ফাটা রোদের সময় ক্ষুণ্ণমনে আশ্রয় নিয়েছিলাম।
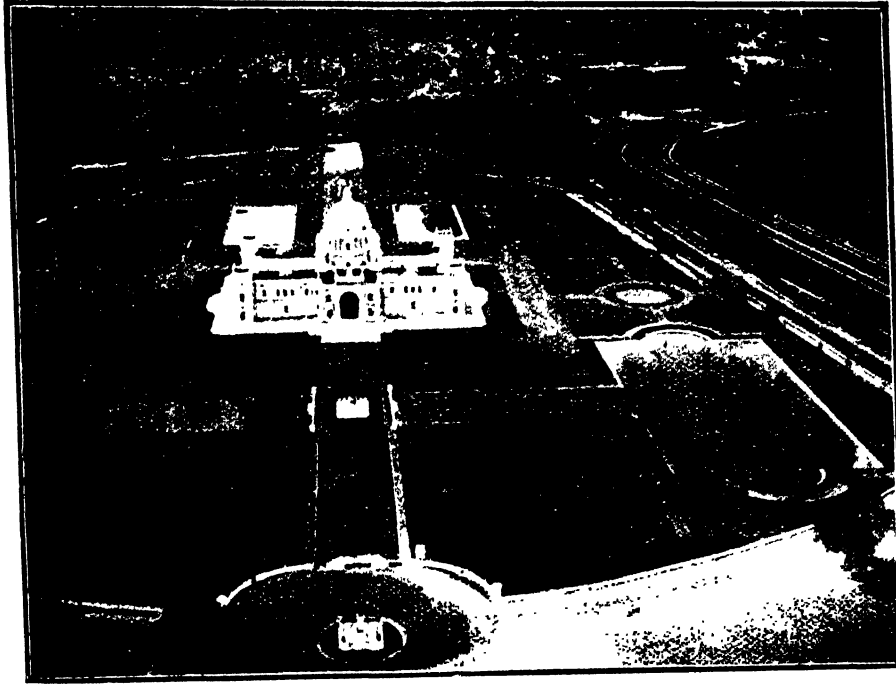
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল—কলিকাতা

সেদিন ছিল জামাই-ষষ্ঠী। ষ্টেশন-মাষ্টার মশায়ের জামাই খেলেন পোলাও কালিয়া, পেলেন কত আদর—আর আমরা ২৪০ মাইল ছুটে এসে আমার—বাড়ীর এত কাছে এসেও দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে, গাছতলায় বসে চিড়ে-দই ফলার কর্‌লাম। বিধাতার এ কি পরিহাস!

আজও জামাই-ষষ্ঠী। ইচ্ছে কর্‌ছে বুড়ো মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে, একটু মুচ্‌কে হেসে—
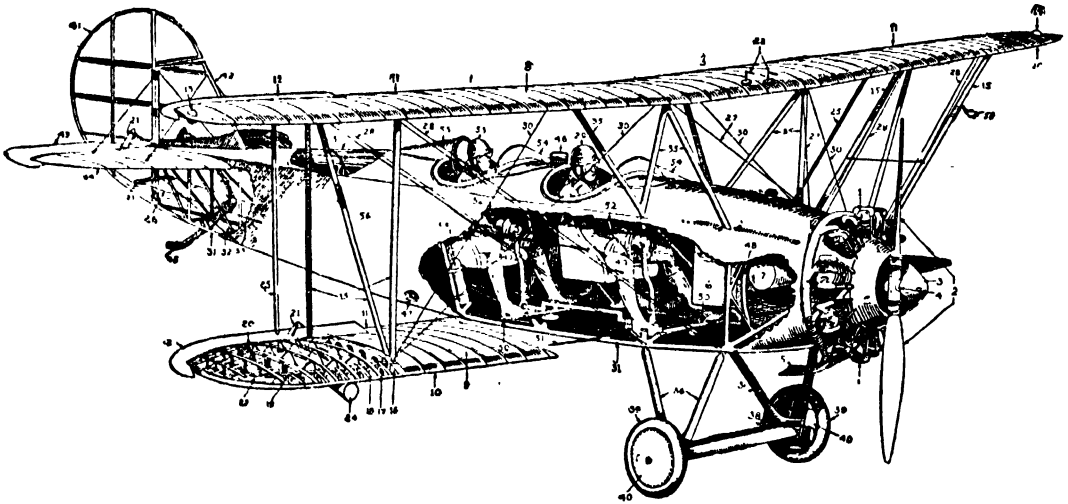
এয়ারো-যন্ত্র

প্রায় নয়-দশ বছর পূর্ব্বের এই রকম একটি দুপুরের কথা আজ মনে পড়ছে। তিন জনে মিলে মোটরে রাঁচী যাচ্ছিলাম। বড়ই পরিশ্রান্ত। ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে আশ্রয়

ছোট একটা নমস্কার করে চলে যাই! জানি না তিনি আজ কোন্‌ ষ্টেশনে! হয় ত বা শেষ ষ্টেশনে! কে জানে!

আজও বিধাতার একটু পরিহাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। ১-১৫ মিনিটে রাঁচিতে নাম্‌লাম গিয়ে মোরাবাদির কাছে ঘোড়দৌড় ও পোলো-খেলার মাঠে—আর ওদিকে "নব-পাইলট"-প্রিয়া ও অন্যান্য সব পরমাত্মীয় ও আত্মীয়রা—মোটরে চেয়ার টেবল, বিবিধ খাদ্য ও পানীয়-সম্ভার ও লোক লস্কর বোঝাই করে—ছয় মাইল দূরে হিন্নুর পোলো গ্রাউণ্ডে গিয়ে, আকাশের দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বসে আছেন।

অবশ্য এটা কতকটা আমার দোষেই ঘটেছিল। টেলিগ্রামে কোন্ পোলো মাঠে নামব, তা জানানো হয় নি। আর রাঁচীর মত যায়গায় যে আবার দু'টো পোলো গ্রাউণ্ড থাক্‌তে পারে—সে ধারণাই ছিল না।

যা'হক একটার পর ডাক্তার মজুমদার সাহেব তাঁর নাম-কুম অফিসে ফোন করে জান্‌লেন—কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এরোপ্লেন নামকুমের ওপর দিয়ে মোরাবাদির দিকে গিয়েছে। আবার ছোট্ ছোট্ মোটর নিয়ে। মোরাবাদিতে গিয়ে দেখেন—মাঠে হাজার হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ভীড়, আর তার মাঝে পুলিশ-ঘেরা এরোপ্লেনটা। কিন্তু পাইলটরা কই?

পাইলটরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, এদিকে বি, এন, রেলওয়ে হোটেলে এসে হাজির। সেখানে মেজরের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। খবর পেয়ে তাঁরা সেখানে এসে উপস্থিত—কিন্তু যাঃ আমি তখন ট্যাক্সি করে—অন্য রাস্তা দিয়ে··· "···পুরীর" দিকে রওনা করেছি। ঘণ্টা দেড়েক এই রকম লুকোচুরীর পর—নামকুমে বাংলোয় এসে সকলের সঙ্গে দেখা-শোনা আমোদ আহ্লাদ!

লাভের মধ্যে হ'ল মেজরের সুন্দর মালা ছড়াটীও জামাই পাইলটের গলায় পড়ল! আর পাইলট এদিক-ওদিক চেয়ে চাপা-গলা ও মোটা-মিহি সুরে গেয়ে উঠল—

"আর তো ব্রেজে যাব না ভাই, সেথা যেতে প্রাণ নাহি চায়
ওরে ব্রেজের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি মথুরায়"—

বৈমানিকের জামাই-ষষ্ঠীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তার আইবুড়ো বন্ধুবান্ধবদের মনে আর খেদ জাগিয়ে তোল্‌বার ইচ্ছে নেই। অতএব থাক্।

চার দিন রাঁচীতে ছিলাম। দু'দিন ধরে প্রায় ৩৫ জন রাঁচী-বাসী-বাসিনী আমাদের এরোপ্লেনে Joy Ride কর্‌লেন; কিন্তু অবসর-প্রাপ্ত প্রবীণ ডেপুটী মিঃ সুকুমার হালদার মহাশয় ও আমার এক আত্মীয়া—কুমারী খনা মজুমদার ছাড়া বাঙ্গালীদের মধ্যে আর কেউ চাপলেন না। চেপেছিলেন ইংরাজ ও মাড়োয়ারীরা। অবশ্য ইংরাজই বেশী।

রাঁচীতে অনেকে অনেক আদর, আপ্যায়িত ও উৎসাহিত করেছিলেন—সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। আস্‌বার পূর্ব্বে তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আস্‌বার সুবিধা হয় নাই; সেজন্য তাঁদের সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌ছি।

যে ক'দিন রাঁচীতে ছিলাম—মোরাবাদির মাঠে যেন একটি ছোটখাট মেলা বসে গিয়েছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নানা রকমের ছোটখাট দোকানপাট বসে গেল। সারাদিন, এমন কি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাঙ্গালী, ইংরাজ, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, কোল, ভিল, সাঁওতাল, ওরাঁও—হাজার হাজার লোকের ভীড়। এরোপ্লেন দেখতে পনর-কুড়ি মাইল দূরের গ্রাম থেকে অনেকে এসেছিল—তার মধ্যে স্ত্রীলোকই বেশী। কন্‌ভেণ্ট থেকে নান্‌রাও এসেছিল। রাঁচীতে না কি এই দ্বিতীয়বার এরোপ্লেন গিয়েছিল—তাই এত ভীড়।

মেজর ভেচের ওখানে এক ছাত্রী ছিলেন—মিস্ সোয়েন্। আমরা ওখানে যে চার দিন ছিলাম, তিনি প্রায় সারাক্ষণই সঙ্গে থেকে আমাদের অনেক বিষয়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন। মেজর তাঁকে দু'দিন Flying Instruction দিয়েছিলেন। ফ্লাইং শেখবার জন্য তাঁর খুব ঝোঁক ও অদম্য উৎসাহ।

*   *   *   *

এবার কল্‌কাতা ফেরবার পালা। সকালেই পেট্রল ও এঞ্জিনে তেল বোঝাই করে নেওয়া হ'ল। Dual controlটা যাত্রি নেবার জন্য খুলে ফেলা হয়েছিল—সেটা তাড়াতাড়ি লাগিয়ে নিলাম।

১৭ই জুন সোমবার বেলা ১০টা ১০ মিনিটে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে Take off করা গেল। আমি এরোপ্লেনের ভার লাঘবের জন্য আমার সমস্ত জিনিষপত্র রেলে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর্‌লাম। মাল কম্‌তে ওঠবার খুব সুবিধা হ'ল।

৫।৩ মিনিটের মধ্যে ছয় মাইল দূরে নামকুমে আমার আত্মীয়দের বাড়ী ও কন্‌ভেণ্টের ওপর দিয়ে কয়েকবার চক্কর দিয়ে বুণ্ডুর পথ ধর্‌লাম। রাঁচী-পুরুলিয়া পথটা যদিও আমার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল—কিন্তু মেজর রেল লাইন ধরে না গিয়ে—সিধে compass course নিতে বল্লেন।

কম্পাস যদিও তাঁর কক্‌পিটে ছিল, কিন্তু ওঠবার পূর্ব্বে ম্যাপটা দেখিয়ে ঠিক কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে, মোটামুটী বুঝিয়ে দিলেন। তার পর ওড়্‌বার সময় দূরের পাহাড় বা নদী দেখিয়ে, কখনও এঞ্জিন বন্ধ করে ও বলে আমায় Direction বাতলে দিতে লাগলেন—আধঘণ্টা অন্তর।

নামকুম ছেড়ে প্রায় আধঘণ্টা বুণ্ডুর পথ ধরে ৫০০০ ফিট ওপর দিয়ে চল্‌লাম। আশে-পাশে নীচে অনেক ছোট বড় পাহাড় দেখা দিলে। কিছু পরে সিনি-পুরুলিয়া রেল লাইন দূরে দেখা গেল। খালি পাহাড় আর বন। দু'-একটা শীর্ণকায়া পাহাড়ে নদী—উপত্যকার মাঝ দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। অনেক চেষ্টা করেও—খালি চোখে গ্রামের কোন প্রাণীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

এরোপ্লেনের চেয়ে মোটরে 'টুর' কর্‌লে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেন ভাল রকম করে উপভোগ করা যায় মনে হচ্ছে। এতে ঘণ্টা দুয়েক অর্থাৎ প্রায় দেড়শো মাইল ওড়্‌বার পর দৃশ্য যেন কতকটা একঘেয়ে হয়ে আসে। কিন্তু মোটরে বেড়ালে —রাস্তার মোড়ে মোড়ে, নদীর কূলে কূলে, উপত্যকার শান্তিময় বুকে, গভীর অরণ্যানীর ভিতর—যে মন-ভুলান, চোখ-জুড়ান সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করা যায়, এতে তো তত কিছু পাচ্ছি না?

এখানটা মোটরে গেলে, ঐ পাহাড়ের গা ঘুরে যে রাস্তাটী এঁকে-বেঁকে চলে গেছে—সে পথের ধারে কত বন-ফুলের সৌরভ, কত পাখীর মিষ্টি কাকলি, কত অচেনা মুখের হাসিরাশি। পাহাড়ের কোলে নিশ্চিন্ত গ্রামগুলি—"নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা পরিধান"—এতে এ সব কোথায়? যেন মহা স্বার্থপরের মত, মহা দাম্ভিকের মত, একা—মহারবে, ভীমবেগে—চলেছি। নীচের জগতের জন্য যেন "কোন তোয়াক্কাই রাখি না।"

সে মেঘগুলোকে, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বের জন্য, আমরা কত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি—ওড়্‌বার সময় তাদের কিন্তু বলি—"আমার পথ ছাড়, নইলে আমার ঘূর্ণ্যমান প্রপেলার-চক্রে তোমায় খণ্ড খণ্ড করে কোথায় উড়িয়ে দেব।"

তবে বিমান-পথে ভ্রমণেরও অন্য একটা দিক আছে। আশ্চর্য্যরূপ অল্প সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে, ভীড়ের হাত থেকে বেঁচে, স্নিগ্ধ ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কর্‌তে কর্‌তে ভ্রমণ—এ সব সুবিধা আর কোন খানেই পাওয়া যায় না—তা সে রেলেই হোক, মোটরেই হোক, আর জাহাজেই হোক। আর নীচে প্রশস্ত নদী, হ্রদ বা সমুদ্রকূল থাক্‌লে বোধ হয় এত একঘেয়ে লাগে না।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে "খারসোয়ান" ষ্টেটের পাশ দিয়ে, ৩০০০ ফিট পাহাড়গুলোর গা ঘেঁসে জামসেদপুরের দিকে এগুতে লাগ্‌লাম। দূরে টাটা কোম্পানীর কার-খানার বয়লার রেঞ্জ, ব্লাষ্ট ফারনেস্, কোক ওভেনস্, ওপন হার্থ ইত্যাদির বড় কাল কাল চিম্‌নিগুলি দৃষ্টি-গোচর হ'ল। তার কয়েক মিনিট পরেই, আমরা সহরের ওপর এসে হাজির হলাম। এত বড় প্রকাণ্ড যায়গা ও বিরাট কারখানাগুলি উপর থেকে যেন ছোট স্কেলের সার্ভে ম্যাপের মত দেখাচ্ছিল। দু'একটি সুন্দর বড় মাঠ রয়েছে দেখে নামবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু সময় অল্প বলে, বি, এন, রেল লাইন ধরে—খড়্গপুরের দিকে চল্‌লাম।

শালবোনি, গালুডি, ঘাটশিলা, গিড্‌নি, সারদিয়া ইত্যাদি ষ্টেশন ও গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। এরোপ্লেনের শব্দে, যে যার কাজ ফেলে—দলবেঁধে, সব বাইরে এসে উপস্থিত। এ যেন—"বাঁশীর রবে ঘরে থাকা হল দায়।"

বেলা ১২টার পরই খড়্গপুরে পৌছিলাম। সেখানের 'ল্যাণ্ডিং' গ্রাউণ্ডটা ভাল করে দেখ্‌বার কথা ছিল। তাই খুব নীচু দিয়ে উড়ে সেটা দেখে নেওয়া গেল, ভবিষ্যতে নামবার আশায়।

খড়্গপুর ছেড়ে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে জাকপুর, মাধপুর, ও বালিচক এল। এখান থেকে দূরে রূপনারায়ণের জলটা রূপার মত চক চক কর্‌ছে—দেখ্‌লাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে নদীর ওপর দিয়ে চলেছি। এতবড় পুলটা যেন অদ্ভুত রকমের ছোট দেখাচ্ছে। ডাইনে গঙ্গা-রূপনারায়ণের সঙ্গম-স্থানটা বেশ দেখা গেল। বাঁয়ে দূরে,—বহুদূরে ঘাটালের

আশ পাশের গ্রামগুলি অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। ও-ধারে বেশ ঘনঘটা করে বৃষ্টি হচ্ছে—এ-ধারটার বেশ পরিষ্কার নীল আকাশ। দু'চারটে সাদা ধব্‌ধবে মেঘের রাশ পোতের ঠিক নীচে দিয়ে ভেসে চলেছে—আপনার মনে।

দেখতে দেখতে ডান দিকে আঁকা-বাঁকা গঙ্গা, চটকলের সার, আর বহুদূরে কল্‌কাতার "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটী" সবুজ Landscape-এ একটি শ্বেত বিন্দুর মত দেখা গেল।

ক্রমে ক্রমে রাজগঞ্জের ইটখোলা, King George's dock, ওদিকে বড় ডাকঘরের গম্বুজ, মনুমেণ্ট, হাওড়া ষ্টেশন ইত্যাদি। পরে সমস্ত কলকাতা সহরটা একটা সুন্দর মাটীর সহরের মডেলের মত দেখাতে লাগল।

তার পর সাঁতরাগাছি ছাড়তে না ছাড়তে ব্যাটরায় আমাদের বাড়ী—ও আমাদের কারখানা—"ব্যাটরা এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের" উপর, খুব নীচু দিয়ে উড়ে এরো-ড্রোমে মোটর পাঠাবার জন্য সঙ্কেত করে দিলাম।

বাড়ীর সকলে তখন ছাতের ওপর এসে হাজির। এত নীচু দিয়ে যাচ্ছিলাম যে, উপর থেকে প্রায় সকলকেই চিন্‌তে পার্‌লাম। খালি দেখতে পেলাম না তাঁদের, যাঁদের এই ঘণ্টা তিনেক আগে—রাঁচার 'পোলো প্রান্তরে'—ছেড়ে এসেছি!

৭।৮ মিনিটের মধ্যে হাওড়া ফেলে গঙ্গা পেরিয়ে, বাগ-বাজার টালা হয়ে—দম্‌দম্ এরোড্রোমে এসে উপস্থিত হলাম। তখন বেলা ১—১৫ অর্থাৎ মোট ৩ ঘণ্টা ৫ মিনিটে এই দীর্ঘ ২৪০ মাইল পথটা এসে পড়া গেছে। রেলে সেটা প্রায় ১২ ঘণ্টা লাগে। মনে হচ্ছে—এ যেন একটা ভোজবাজি।

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই ভ্রমণ-কথা লিখলে হয় ত আপনারা আমাকে রেলের একটা খালি কাম্‌রায় চাপিয়ে, চাবি বন্ধ করে, আবার রাঁচীর (কাঁকের) দিকে ফেরৎ পাঠাতেন; কিন্তু আজ আশা করি, কেউ সে ভরসা করবেন না?

আমি যে এরোপ্লেনটিতে গিয়েছিলাম—সেটা Avro Avian প্লেন। তাতে এক লাইনে ৪ সিলিণ্ডার যুক্ত ৮৫।৯০ ঘোড়ার জোর, হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয় এরূপ "সিরাস" এঞ্জিন লাগান ছিল। এ সেদিনের cruising speed ঘণ্টায় ৮০।৮৫ মাইল ও maximum speed প্রায় ঘণ্টায় ১১৯ মাইল; এবং প্রায় ২০,০০০ ফিট ওপরে উঠতে পারে।

পেট্রল—এক গ্যালনে কুড়ি মাইল যায়, অর্থাৎ সাধারণ মোটর গাড়ীর পেট্রল খরচের মত। ট্যাঙ্কে প্রায় কুড়ি গ্যালন ধরে—অর্থাৎ প্রায় চারশো মাইল যাওয়া চলে ঐ পেট্রলে।

ফিউসিলেজে (৮) দুটী কক্‌পিট আছে এক লাইনে। দুটীতেই চালাবার ব্যবস্থা থাকে তা পূর্ব্বেই বলেছি। Dual Control থাকাতে শেখ্‌বার পক্ষে খুব সুবিধা ও খুব নিরাপদ। তা ছাড়া এ-রকম লম্বা পাড়ীর সময় একজন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়্‌লে, যায়গা না বদ্‌লে দুজনেই ইচ্ছা-মত চালাতে পারে একে একে।

এরোপ্লেনের বিষয় একটু ভাল করে জান্‌লে ও বুঝ্‌লে—এ যানটী খুব নিরাপদ যান বলে মনে হয়। অবশ্য কাগজে সে সব Crashএর কথা সচরাচর পড়া যায়, তা অল্প বিস্তর পাইলটদের দোষে হয়ে থাকে। ইদানিং কলের দোষে বিপদ ঘটে খুব কম।

অতি প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে অবশ্য অনেক সময় বিমান-পোতকে গম্য পথ থেকে বহু দূরে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়; কিন্তু পাকা বৈমানিকরা তাতে সহজে হাল ছাড়েন না। কারণ প্রচুর পেট্রল থাক্‌লে তাঁরা খালি যন্ত্রের সাহায্যে—দু'পাঁচ ঘণ্টা মেঘ ও কুয়াসার ভিতর দিয়ে উড়তে পারেন, কোন Land Markএর সাহায্য না নিয়ে।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার সহরে সহরে ও প্রতি কুড়ি-পঁচিশ মাইল অন্তর বিমান পোত-বন্দর, ও সেখানে বেতার টেলিফোন ইত্যাদি অনেক রকম যন্ত্র আছে। যাত্রার প্রারম্ভে বৈমানিকেরা সাম্‌নের পথের জলহাওয়ার খবরটা আগে থেকে সংগ্রহ করেন ও সেই অনুসারে পোতের course ঠিক করেন। অনেক সময় দু'চার মাইল ঘুরে গেলে স্থানীয় ঝড়-জলের প্রকোপ থেকে পোতকে বাঁচিয়ে ওড়া যেতে পারে।

তা'ছাড়া, রাত্রে মেলবাহী পোতের কর্ণধারদের পথ দেখাবার জন্য, মাঝে মাঝে Beacon light এর ব্যবস্থা আছে এবং রাত্রে 'ল্যাণ্ড' কর্‌বার জন্য এরোড্রোমে লক্ষবাতি-জোর Landing Lights বসান আছে—যাতে ভয়ানক অন্ধকার রাতকেও দিনে পরিণত করে ফেলে—নিমেষে!

অল্প দিনের মধ্যে এ দেশেও এরোপ্লেনের ব্যবহার নিশ্চয়ই

---

(৮) এরোপ্লেনের বডিকে ফিউসিলেজ (Fusilage) বলে।

খুব বাড়বে। সুতরাং আমাদের দেশের মুনিসিপ্যালিটী, জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ড, এই সময় থেকে সহর বা বড় গ্রামের কাছে কাছে Landing Ground ইত্যাদি প্রস্তুতের দিকে মন দিলে দেশের অনেক উপকার সাধিত হবে। কারণ, Aviationটা আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ও উৎসাহী যুবকদলের, এই ভীষণ অন্নসমস্যার দিনে ভবিষ্যৎ জীবনের অন্যতম একটি সম্বল হবে মনে হয়।

Aviationএ যে খালি পাইলটের দরকার হবে তা নয়—Ground Engineer অর্থাৎ Mechanic, Airport Manager, Wireless Operator, Air Navigator, Meteorologist, Rigger, Air Surveyor, Photographer, Ground Crews ইত্যাদি কাজের জন্য ভবিষ্যতে হাজার হাজার যুবকের প্রয়োজন হবে। সুতরাং দেশের যুবকবৃন্দকে—অতি আরামপ্রদ কিন্তু চিরদুঃখবৃদ্ধিকর কলম-পেশার মোহ ত্যাগ করে—এই সব কাজ শেখবার জন্য এই সময় থেকে প্রস্তুত হতে হবে ও সেই রকম ভাবে শরীর মন গঠন ও তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

* * *

বেলা আড়াইটার সময় বাড়ী ফিরে বাবা মাকে যখন প্রণাম করে দাঁড়ালাম—দেখি মায়ের হাতখানি তখনও আমার মাথার উপরে রয়েছে।

মাগো, তোমার হাতখানি যেন চিরদিনই তোমার এই অবোধ ও অবাধ্য সন্তানের মাথার উপরে এই রকম ভাবেই থাকে—এই প্রার্থনা!

রামগতি ন্যায়রত্ন

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্

আমাদের বাসভূমি হুগলী জেলার অন্তর্গত ইলছোবা গ্রাম। আমার পিতামহ ঠাকুর ৺হলধর চূড়ামণি মহাশয় শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। পূজনীয় পিতৃদেব ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় আমার পিতামহ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। ১২৩৮ সালের ২১এ আষাঢ় পিতৃদেবের জন্ম হয়।

পিতামহ ঠাকুরের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার নাম ৺দিগম্বর ন্যায়বাগীশ। উভয় ভ্রাতায় বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। পিতামহ ঠাকুর উঁহাদিগকে বড়ই স্নেহ করিতেন, এবং নিজের সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন।

খুল্লপিতামহ পিতৃদেবকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থায় খুল্লপিতামহী কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আমার উপায় কি করিয়া যাইতেছেন।" তাহাতে খুল্লপিতামহ পিতৃদেবকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই গতি রহিল। গতি তোমাকে দেখিবে। তুমি কষ্ট পাইবে না।" খুল্লপিতামহ আমার পিতাকে রামগতি না বলিয়া "গতি" বলিয়া ডাকিতেন।

দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পিতৃদেব গ্রামের পাঠশালায় পড়িয়া উপনয়নের পর গ্রামস্থ অধ্যাপক কালিদাস ঘটকের নিকট প্রায় দুই বৎসর কাল ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৪ অব্দের জানুয়ারী মাসে তের বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীতে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। কলেজে ভর্ত্তি হইয়া তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিতে থাকেন; এবং প্রতি পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল দেখাইয়া প্রশংসা ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ধাতুপাঠ তাঁহার আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ ছিল; এবং যাহাতে উহা ভুলিয়া না যান তজ্জন্য পঠদ্দশায় প্রত্যহ বাসা হইতে গঙ্গাস্নানে যাওয়া ও তথা হইতে বাসায় ফিরিয়া আসার সময়ে ভ্বাদিগ আবৃত্তির ন্যায় পথে সমগ্র ধাতুপাঠের আবৃত্তি করিতেন। সংস্কৃত কলেজে পিতৃদেব ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন পাঠ্য সমুদয় এবং কিছু ইংরাজিও অধ্যয়ন করেন।

১৮৫০-৫১ অব্দে পিতৃদেব সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে সংস্কৃত কলেজে আটটি পনর টাকার এবং

চারিটি কুড়ি টাকার সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি ছিল। যে সকল ছাত্র সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া ১৫ টাকা বৃত্তি পাইত, তাহাদের মধ্যে কেহ বিশেষ যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে দু'তিন বৎসর পরে কুড়ি টাকার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইত। কিন্তু পিতৃদেবকে একেবারেই ঐ কুড়ি টাকার বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। কাপ্তেন, জি, টি, মার্শেল সাহেব ঐ বৎসরে পরীক্ষক ছিলেন। তিনি পিতৃদেবের যোগ্যতা দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় রিপোর্টে বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কেবল মার্শেল সাহেব বলিয়া নয়, প্রতি পরীক্ষাতেই পরীক্ষকেরা নিজেদের লিখিত মন্তব্যে বিশেষভাবে পিতৃদেবের প্রশংসা করিতেন। কলেজের যে যে অধ্যাপকের নিকট তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, সকলেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির ও স্বভাব চরিত্রের জন্য তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীত ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এই সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেব "ন্যায়রত্ন" উপাধি প্রাপ্ত হন।

সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পাইতে হইলে ছাত্রকে ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। ঐ ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেলেও কলেজের অধ্যক্ষ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে গভর্ণমেণ্টে লিখিয়া পিতৃদেবের জন্য আরও দুই বৎসর সময় বাড়াইয়া দিবেন এবং সেই কাল মধ্যে তাঁহাকে ইংরাজী বিদ্যায় অধিকতর শিক্ষিত করিবেন। কিন্তু নানা কারণে পিতৃদেবের আর কলেজে থাকিয়া অধ্যয়নের সুবিধা না হওয়ায় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই হিতকর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না।

১৮৫৬ অব্দে হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। ঐ পদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ উপাধিধারীও কেহ কেহ আবেদন করিয়াছিলেন, পিতৃদেবও আবেদন করেন। মাসিক ৫০ টাকা বেতনে তাঁহাকেই ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। এই উপলক্ষে উক্ত বৎসর ২৫ শে আগষ্ট তিনি হুগলীতে আসেন। এই খানেই পিতৃদেবের জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হয়। ইতঃপূর্ব্বে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। পিতৃদেবের বিদ্যা ও গুণ তাঁহার নিকট অপ্রকাশ রহিল না। উভয়ের মধ্যে অচিরেই বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল। কি সরকারী, কি সাংসারিক অধিকাংশ বিষয়েই পরস্পরে পরামর্শ না করিয়া কার্য্য করিতেন না। মণিকাঞ্চন-সংযোগের ন্যায় উভয়ের সম্মিলনে হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয় ঐ সময়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

পিতৃদেব ও পূজ্যপাদ ভূদেব বাবুর মধ্যে প্রথম হইতেই যে সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল আজীবন তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষাবস্থায় উভয়েই অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হইলে, একদিন ভূদেব বাবুকে তাঁহার ইচ্ছামত একখানি চৌকিতে বসাইয়া আমাদের বাড়ীর ফটকের নিকট আনা হইলে আমরাও পিতৃদেবকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া আনিলাম। ভূদেব বাবু কয়েকটি যুঁই ফুল লইয়া আসিয়াছিলেন। সেগুলি পিতৃদেবের হাতে দিলেন। উভয়ের পরস্পর সন্দর্শনে কাহারও মুখ দিয়া একটিও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কেবল পরস্পর পরস্পরের মুখ চাহিয়া অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিলেন। কথা কওয়া অপেক্ষাও যেন গভীর একটী ভাব ইহাতে প্রকাশিত হইল। অতঃপর ভূদেব বাবু চৌকি উঠাইতে আদেশ দিলেন। পিতৃদেবকে আমরা গৃহ মধ্যে লইয়া গেলাম। উভয়ের মধ্যে এই শেষ দেখা।

১৮৫৮ অব্দে পিতৃদেব কাপ্তেন রিচার্ডসন প্রণীত "হিষ্টরী অফ্ দি ব্ল্যাক হোল" নামক ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তকের বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া "অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ অব্দের শেষে ইনি "বস্তুবিচার" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বস্তুবিদ্যা বিষয়ক কোন পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। বিষয়গুলি এমন হৃদয়গ্রাহী ভাবে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে যে, শৈশবাবস্থায় এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিণত বয়সেও ইহার সকল কথাই স্মরণ রাখিতে পারিয়াছেন এমন লোক এখনও অনেকেই আছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে ১৮৫৯ অব্দে তিনি বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগ ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই ইতিহাস পুস্তকখানি বালক পাঠার্থীদিগের পক্ষে এত উপযোগী হয় যে, পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় এইখানিকেই বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগ স্বীকার করিয়া পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ অবলম্বনে বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন

এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বনে পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত ইতিহাসের তৃতীয় ভাগ রচনা করিয়াছেন। এই তিনখানি পুস্তক একত্রে একখানি সম্পূর্ণ এবং অতি সুন্দর বাঙ্গালার ইতিহাস পুস্তক হইয়াছে।

১৮৬২ অব্দে প্রথমে তাঁহার 'রোমাবতী' প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই তিনি এক শত টাকা বেতনে বর্দ্ধমান (লাকুড্ডি) গুরু ট্রেণিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে তিনি বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে উন্নীত হন।

বহরমপুরে যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নী মহামায়া দেবীর মৃত্যু হয়। তাঁহার নামানুসারে তিনি "মায়া ভাণ্ডার" নাম দিয়া এক ক্ষুদ্র পেটকে অর্থ-সঞ্চয় করিতেন এবং ঐ সঞ্চিত অর্থ অতি সঙ্গোপনে বিতরণ করিতেন। পিতামহের মৃত্যুও পিতৃদেবের বহরমপুরে যাইবার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

বহরমপুরে অবস্থানকালেই তিনি ১৮৬৬ অব্দে ঋজুব্যাখ্যা, ১৮৬৯ অব্দে দময়ন্তী এবং ১৮৭২ অব্দে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ এবং ১৮৭৩ অব্দে 'শিশুপাঠ' ও "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশ করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি তাঁহার প্রধানতম কীর্ত্তি। বঙ্গভাষায় এই ধরণের এই প্রথম পুস্তক। এরূপ পুস্তক প্রণয়নের চেষ্টা ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই ; এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনা স্থলে পিতৃদেবের এই পুস্তকখানি বিশেষ অবলম্বন স্বরূপই হইয়া আছে। এই পুস্তকখানির প্রণয়ন সময়ে পিতৃদেবকে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় ও যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অন্যের পক্ষে সহজ নহে। এই উপলক্ষে তিনি ছোট বড় অনেক গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিয়াছেন। কত পাণ্ডুলিপি, কত গ্রাম ও প্রদেশের কত স্থান যে সন্ধান করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পঠদ্দশাতেই ইনি কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া নিজ বাসগ্রামে একটী বাঙ্গালা ও ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী ডাক্তারখানা ও একটী পোষ্টাফিস সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; ঐ বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের নানা কারণে ভারতবর্ষীয় ইতিহাস পাঠের অসুবিধা হয় দেখিয়া ১৮৭৪ অব্দে ইনি ভারতবর্ষের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন ও তৎপরে 'গোষ্ঠিকথা' (মজলিসি গল্প) প্রকাশ করেন।

পিতৃদেব বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে এক বৎসর কার্য্য করিবার পর ৺স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৬ অব্দে উক্ত কলেজের আইন অধ্যাপক হইয়া যান। তাঁহাদের পরস্পরের পরিচয় ও সৌহার্দ্দ হয় এবং গুরুদাস বাবু পিতৃদেবের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস বাবুর মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হিসাবে নিমন্ত্রিত হইয়া, গুরুদাস বাবু বিদায় দিতে চাহিলে, পিতৃদেব, আমি সরকারি চাকরি করি, ও-সকল পবিত্র জিনিষ গ্রহণে আমি অধিকারী নহি, বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে তাঁহার নির্লোভতা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাই।

বহরমপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ রামদাস সেন পিতৃদেবের ছাত্র ছিলেন এবং পিতৃদেবের অক্ষয় কীর্ত্তি 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক গ্রন্থ রচনা কালে তাঁহার উৎকৃষ্ট পুস্তকাগার পিতৃদেবের হস্তে ন্যস্ত করেন। এ কথা তিনি উক্ত পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। উহাও মৎ-সম্পাদিত উক্ত পুস্তকের ৩৬৪ পৃষ্ঠায় 'রামদাস সেন' শীর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রসিদ্ধ 'সোম প্রকাশ' নামক পত্রিকার পিতৃদেব একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দের ২৯ শে জানুয়ারী পিতৃদেব হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ভবভূতি প্রণীত সংস্কৃত মহাবীর চরিতের অনুবাদ 'রাম-চরিত' প্রকাশিত হয়। পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'মহাবীর চরিত' পাঠে বড়ই আনন্দানুভব করিতেন। তিনি এক সময়ে পিতৃদেবকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ নাটকের উচ্চ, উদার, বিশুদ্ধ এবং মানব-চরিত্রের পরমোৎকর্ষ প্রদর্শক সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ ভাব-পরম্পরা বাঙ্গালা ভাষায় অবতারিত হইলে, এই নীতি-বিপ্লবের সময়ে উপকারের সম্ভাবনা আছে। এই কথায় প্রোৎসাহিত হইয়াই পিতৃদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পুস্তকখানি ভূদেববাবুর নামেই উৎসর্গ করা হইয়াছে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি "নীতিপথ" নামক পুস্তক রচনা করেন। অতি সুললিত ভাষায়, কেবল শিশু বলিয়া নয়, সকলেরই শিক্ষণীয় এবং সদালাপের বিষয়ীভূত প্রকৃত আখ্যান লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।

১৮৮৮ অব্দে পিতৃদেব "ইলছোবা" নামক একখানি উপন্যাস রচনা করেন। পুস্তকখানির নাম "ইলছোবা বা স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান"। কোন প্রকৃত নায়ক নায়িকা বা ঘটনা লইয়া পুস্তকখানি রচিত না হইলেও ইহাতে পিতৃদেবের স্বগ্রাম ইলছোবার (ইলাসভার) ইতিবৃত্তের ছায়া পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানির সমালোচনা উপলক্ষে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিচালিত এডুকেশন্ গেজেট পত্রিকায় লেখা হইয়াছে—"যিনি বস্তুতত্ত্ববিৎ, ইতিবৃত্ত লেখক, বৈয়াকরণ, নাটককার, কাদম্বরীর ধরণের উপন্যাস রচয়িতা, তিনি একখানা ইংরাজী ধরণের নভেল লিখিবেন বিচিত্র নয়। পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশদ।"

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই পিতৃদেব সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করাতে তাঁহার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছিল। তিন বৎসর তিন মাস মাত্র পেন্‌সন্ ভোগ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালের ২৪শে আশ্বিন (১৮৯৪ সালের ৯ই অক্টোবর) বিজয়া দশমীর দিন চুঁচুড়ার বাটীতে প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবাত্মা অনন্ত কাল-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছে।

মেঘদূত

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

বাগ্‌দেবীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাসের অনুপম কবিত্ব রস আস্বাদন করিতে হইলে, সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি থাকা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা কোন সহৃদয় ব্যক্তির অবিদিত নহে; তথাপি সংস্কৃত ভাষায় অব্যুৎপন্ন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে কালিদাসের কবিতা-রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্য বহু প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যে বা পদ্যে কালিদাসের কাব্য-গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট তাঁহারা ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন—তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে উদীয়মান প্রতিভাবান্ কবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব যে বাঙ্গালী পাঠক ও পাঠিকাগণের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। সম্প্রতি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের প্রকাশিত 'মেঘদূত'খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আশা হয় যে, এতকাল পরে শিক্ষিত বাঙ্গালী সত্য সত্য মহাকবি কালিদাসের স্মৃতি-পূজার অনুকূল সামগ্রী-সম্ভার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাহা না হইলে এই সর্ব্বাংশে অনুপম শোভাসম্পন্ন মেঘদূত পাঠ করিয়া বাঙ্গালী নর-নারীর পক্ষে এমন অনাবিল রসাস্বাদজনিত অমল আনন্দ অনুভব করিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইত না। এই একই ধরণের তথাকথিত উপন্যাস ও রসবিহীন কবিতার একটানা প্রচণ্ড নিদাঘ সন্তাপে শুষ্কপ্রায় বঙ্গ-সাহিত্য-কুঞ্জে এই বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রধনু-বিরাজিত মনোহর ছবি 'মেঘদূতে'র মধুর শীতল রসধারা বর্ষণ যে নব-জীবন সঞ্চারে বিশেষ আনুকূল্য করিবে তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। এই মেঘদূতের নানা বর্ণের চিত্র শিল্প যেমন ভাবানুগত ও সুরুচি-সমন্বিত হইয়াছে, আবার তেমনই প্রাচীন ভারতের চির বিস্মৃত নর নারী, হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, বৃক্ষ-বাটিকা, দেবমন্দির, রাজধানী, অধিত্যকা, উপত্যকা তদানীন্তন বেশ পরিচ্ছদ প্রভৃতির স্মরণীয় দৃশ্যাবলীর সমুদ্‌বোধক হইয়াছে। চিত্রগুলি এমনই কৌশলের সহিত যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, দেখিবামাত্রই মেঘদূতের সেই সেই কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব ও দৃশ্যনিচয় আপনা হইতেই পাঠকের মানস-পটে ফুটিয়া উঠিতে থাকে! ভাষায় যাহা ফুটে না—চিত্রে তাহা অনায়াসে ব্যক্ত হইয়া যায়; সুতরাং এপক্ষে এই মেঘদূত অতুলনীয় হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীমান নরেন্দ্র দেবের সুললিত কবিতাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বত্রই মূল কবিতার অনুগত হইয়াছে, এবং সকল অনুবাদ-কবিতার সুরই মূল কবিতার সুরের সহিত মিশিয়া গিয়া এক অভিনব আসাদ্য সুরের সৃষ্টি করিয়াছে—ইহাই নরেন্দ্র-বাবুর এই মেঘদূতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল এবং বাঙ্গালার অনুবাদ-সাহিত্যে ইহা এক অনুসরণীয় নূতন পথ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই মনে হয়, কালিদাসের কাব্যের এমন সুন্দর ও সরল অথচ গাম্ভীর্য্যময় অনুবাদ কবিতা পূর্ব্বে বুঝি আর পড়ি নাই। বইখানির যেমন সুন্দর কাগজ, তেমনই সুন্দর ছাপা, আবার বাঁধুনিও সেইরূপ—এমন মণিকাঞ্চন-যোগ বাঙ্গলা সাহিত্যের বাজারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিরূপ অনুবাদ, কি প্রকার চিত্র-সম্পদ ও কেমন গ্রন্থের সাহায্যে মহাকবি কালিদাসের কবিতা-রসাস্বাদ জনসাধারণের পক্ষে অনায়াসলভ্য হইতে পারে, তাহাই বুঝাইবার জন্য নরেন্দ্রবাবুর এই প্রয়াস যে সর্ব্বথা সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে, তাহা কে না স্বীকার করিবে?।

কলম্বিয়া

শ্রীভারতকুমার বসু

কলম্বিয়াকে "সোনার দেশ" বলা হয়। তার একটু ইতিহাস আছে।

আগে সেখানকার বোগোটা নামক স্থানে (উপস্থিত কলম্বিয়ার রাজধানীতে) তথাকার অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদের শাসনকর্ত্তা রূপে যখনি কোনও নতুন লোক আসতেন, তখনি তাঁর সম্বর্দ্ধনার জন্য এক সাড়ম্বর উৎসবের আয়োজন করা হ'তো। এই উৎসবের পূর্ব্বে উক্ত শাসনকর্ত্তা তাঁর সমস্ত গায়ে সোনার গুঁড়ো মেখে সেখানকার পবিত্র সরোবর—"গুয়েটাভিটা"তে স্নান ক'রতে নামতেন। সেই সময়ে ইণ্ডিয়ানরা উক্ত সরোবরের মধ্যে সোনা এবং দামী পাথরের খণ্ড সেই স্থানের দেবতার উদ্দেশে অঞ্জলি স্বরূপ নিক্ষেপ ক'রে একমনে প্রার্থনা করতো, যেন তাদের শাসন-কর্ত্তা সব দিক দিয়েই নিরাপদে তাঁর কার্য্য সমাধা ক'রে যেতে পারেন!...এই সোনার ব্যাপার জড়ানো কাহিনী থেকেই কলম্বিয়ার অপর নামকরণ হ'য়েছে—"The land of EL Dorado" (The golden one) অর্থাৎ সোনার দেশ!...

বাস্তবিকই তাই। সেখানকার জল-হাওয়া মাটীর উর্ব্বরতা, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির দিক দিয়ে প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ সেখানে এত বেশী বর্ষিত হয়েছে যে, কলম্বিয়াকে "সোনার দেশ" বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এবং অনেকে বলেন, এদিক দিয়ে না কি পৃথিবীর কোনো দেশই কলম্বিয়ার কাছে দাঁড়াতেই পারে না!...এ সবের জন্য কলম্বিয়া সমৃদ্ধ হ'লেও,এক বিষয়ে তা এখনো পর্য্যন্ত তেমন সন্তোষজনক কিছু দেখাতে পারে নি। তা হচ্ছে সেখানকার শাসন-প্রণালীর কথা। ১৮৩০ সাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ পর্য্যন্ত কলম্বিয়ার মধ্যে দেখা দিয়েছিল দুটী আন্তর্জাতিক যুদ্ধ, ন'টী ঘরোয়া যুদ্ধ, চৌদ্দটী স্থানীয় বিদ্রোহ এবং অনেক-গুলি কুটিল চক্রান্ত। এই সব হাঙ্গামার জন্যই কলম্বিয়ার খরচ হ'য়ে গিয়েছিল প্রচুর পরিমাণ অর্থ। এবং তার ফলে সেখানকার ব্যবসা-ইত্যাদির ব্যাপারেও অনেক অসুবিধা এসে পড়েছিলো। অবশ্য এখন সেখানকার অবস্থা অনেক উন্নত। কিন্তু তবুও অনেকে বলেন যে, হয় ত কলম্বিয়া আরও অনেক সমৃদ্ধিশালী দেশ হ'তে পারতো, যদি না তাকে উপরি-উক্ত আঘাতগুলি সহ্য ক'রতে হ'তো। কল-ম্বিয়ার একটা জিনিস কিন্তু চোখে যেন কেমনতরো লাগে। সেখানকার লোকেরা কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটাকে ধারণা করে আমেরিকার মধ্যে (কলম্বিয়া হচ্ছে আমে-রিকারই অন্তর্ভূত দেশ) এথেন্স্ সহর রূপে। এবং এইজন্যই, অর্থাৎ এথেন্সের বিশেষত্ব ফোটাবার জন্যই বোগোটা-বাসী অনেক লোক—দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে একেবারে মন না দিয়ে, গভীর ভাবে সাহিত্য-সাধনার মধ্যেই ডুবে থাকতে চায়! এবং অনেকে তাদের দেশের কাব্যের মধ্যে কতগুলি নূতনত্ব এবং বিশেষত্ব আছে, তারই আলোচনা ক'রতে ভালবাসে। এই সব কারণে, দেশের প্রকৃত হিতকর কাজে কলম্বিয়া এখনো পেছিয়ে আছে। সেখানকার অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদের অধঃপতিত অবস্থা হয় ত রীতিমতই উন্নত হ'তে পারতো এবং নিগ্রোরা শিক্ষা, সহানুভূতি ও সাহায্যের দ্বারা হয় ত ব্যক্তিগত ও দেশগত অনেক-কিছুরই উন্নতি ক'রতে পারতো; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সে সহানুভূতি, সে সাহায্য এবং সর্ব্বোপরি সে শিক্ষা তাদের কখনো জীবনের পথে পরিচালিত করে নি! প্রাথমিক শিক্ষা দেবার জন্য সেখানে বন্দোবস্ত আছে বটে, কিন্তু সে শিক্ষা বিনা মূল্যে লাভ করা গেলেও, বাধ্যতামূলক নয়! এবং এই শিক্ষা সেখানে আর কেউ তত পা'ক বা নাই পা'ক, শ্বেতাঙ্গ অথবা অর্দ্ধ শ্বেতাঙ্গদের জন্য তার ব্যবস্থা আছে বিশেষ রকম। এই শ্বেতাঙ্গেরা ব্যবসা-ইত্যাদির গোলমেলে ব্যাপারকে ঘৃণা করে এবং একান্তভাবে ইচ্ছা করে, কি ক'রে অর্থ জমা দিয়ে কোনো আপিসে রীতিমত দক্ষিণা-পুষ্ট একটী জমকালো চাকরী

পাওয়া যায়। অনেকে আবার (যাঁরা অধিকতর 'মাথা-ওলা' এবং কাজের লোক) রাজনৈতিক কাজে মাথা ঘামিয়ে অর্থকে পকেট-গত ক'রতে চান। আবার এমন

কিন্তু কলম্বিয়া দেশের রাজ্য-শাসন-প্রণালীটী হচ্ছে সকলের চেয়ে বিশ্রী রকম। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সেখানকার এক রাজস্ব সচিব ব'লেছিলেন যে, "উক্ত শাসন-প্রণালীই কলম্বিয়া

মাঠের মধ্যে ব'সে আনন্দ-আগ্রহের সঙ্গে আকাশের বুকে খ-পোত পরিচালনের বিচিত্র এবং বিভিন্ন নৈপুণ্য দেখছে

ঝর্ণার জল তুলছে এবং জল তুলতে আসছে

লোকও আছেন, যাঁরা রাজা-উজীর হবার কল্পনা না ক'রে সামান্য কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চান।…

দেশের সামাজিক ক্ষতি নিয়ে এসেছে।"—বাস্তবিকই তাই। উক্ত শাসন-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী যাঁরা,

তাঁরাই হচ্ছেন এই ক্ষতির মূল। তাঁদের যে পরিমাণ মাহিনা দেওয়া হয়, তা বোধ হয় তাঁরা কখনো অন্য যে-কোনো কাজ ক'রে অর্জ্জন ক'রতে পারতেন কি না সন্দেহ! কিন্তু এম্‌নি অকৃতজ্ঞ তাঁরা যে, উক্ত পরিপুষ্ট দক্ষিণার অনুপাতে

রপ্তানী করবার জন্য নৌকার মধ্যে 'কফি'র বস্তা পূর্ণ ক'রছে

বোগোটা নগরের একটী সুন্দর এবং প্রাচীন গির্জ্জা। এর সামনে কলম্বিয়ার বিখ্যাত জেনারল্ বোলিভারের একটী চমৎকার ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি আছে।

তাঁরা উপযুক্ত কাজ মোটেই করেন না। এবং এইজন্য অর্থাৎ সাধারণকে ফাঁকী দেওয়ার জন্য তাঁরা কিছুমাত্র লজ্জা বা কুণ্ঠাও বোধ করেন না।

কলম্বিয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এখন বেশ ভাল। এ বিষয়ে সকলের চেয়ে বেশী সাহায্য ক'রেছে যে জিনিষটী, তা হচ্ছে—পানামা খাল। কিন্তু রেলপথের প্রসার সেখানে খুব সুবিধাজনক নয়। আগেও সেখানে রেলপথের অস্তিত্ব এক-রকম ছিল না বললেই চলে। তখন কোনো দেশ থেকে সেখানকার রাজধানীতে যেতে হ'লে রীতিমত একটী হাঙ্গামা পোহাতে হ'তো। কারণ, নদী পার হবার সময় প্রত্যেক লোককেই মন্থর গতিশীল 'ষ্টীন-বোটে'র এক-ঘেয়েমী সহ্য ক'রতে হ'তো; পাহাড় পার হবার সময় অশ্বতরের পিঠের উপর ব'সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ ক'রতে হতো; এবং বেয়াড়া পথগুলি পার হবার সময় কুলীদের দ্বারা বাহিত চেয়ারের উপর ব'সে, শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে প্রতি পদেই অনাগত 'ফাঁড়া'র জন্য ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকতে হ'তো। যাই হোক, এ-সব অসুবিধা এখনও সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত না হ'লেও, কতকটা উন্নতি হ'য়েছে ব'লেই শোনা যায়। কিন্তু রেলপথের প্রসার এখনো সেখানে আশানুরূপ হয় নি। যা হ'য়েছে, তা খুবই সামান্য। এবং তা মাত্র কয়েক শ' মাইল পর্য্যন্ত!···

কলম্বিয়ার জল হাওয়া খুব ভাল। এত ভাল যে, বলা হয় না কি, পৃথিবীর কোনো দেশেই ও-রকম চমৎকার জলহাওয়া নেই। সেখানে বর্ষার বিকাশ হয় মার্চ থেকে মে মাস পর্য্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্য্যন্ত। আর, গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয় বাকী মাসগুলিতে। বর্ষা কিন্তু সেখানে অতিবর্ষণ নিয়ে আসে না। এইটীই সেখানকার প্রকৃতির অন্যতম

বিশেষত্ব। এবং এইজন্যই কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটা হচ্ছে সেই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে একটী আরামদায়ক স্থান, যারা আনন্দ-হাসির মধ্যে থেকে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে চান!···

সেখানকার একটা জিনিস কিন্তু বড় চোখে লাগে। সেখানকার রাজপথগুলি বেশ চওড়া এবং তরু-বীথিতে

ফলন্ত প’প’ (Papaw) গাছের দিকে চেয়ে’ দেখছে। এই গাছের ফল, শাক-সজ্জীর সঙ্গে খেতে চমৎকার লাগে।

শোভন্‌ হ’লেও, সেগুলি অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে বাঁধানো হ’য়েছে। কিন্তু সেখানকার বাড়ীগুলির দিকে তাকালে বাস্তবিকই মুগ্ধ হ’তে হয়। এই বাড়ীগুলি তৈরী হ’য়েছে প্রাচীন স্পেনীয় আদর্শে। কিন্তু সেগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক বাড়ীই হচ্ছে একতালা। কদাচিৎ দু-একখানা বাড়ী দোতালা হয়। এবং অধিকাংশ বাড়ীই হচ্ছে বাংলো ধরণের। এই সমস্ত বাড়ীর সবগুলির ছাদ-ই ‘টালি’র দ্বারা তৈরী। এবং তার মধ্যে শিল্প-নৈপুণ্যের এমন একটী মনোহরত্ব আছে যে, তা দুই চোখকে তাদের দিকে তাকাতে বাধ্য ক’রবে এবং ওষ্ঠকে বাধ্য ক’রবে—আন্তরিক প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করবার জন্য।···
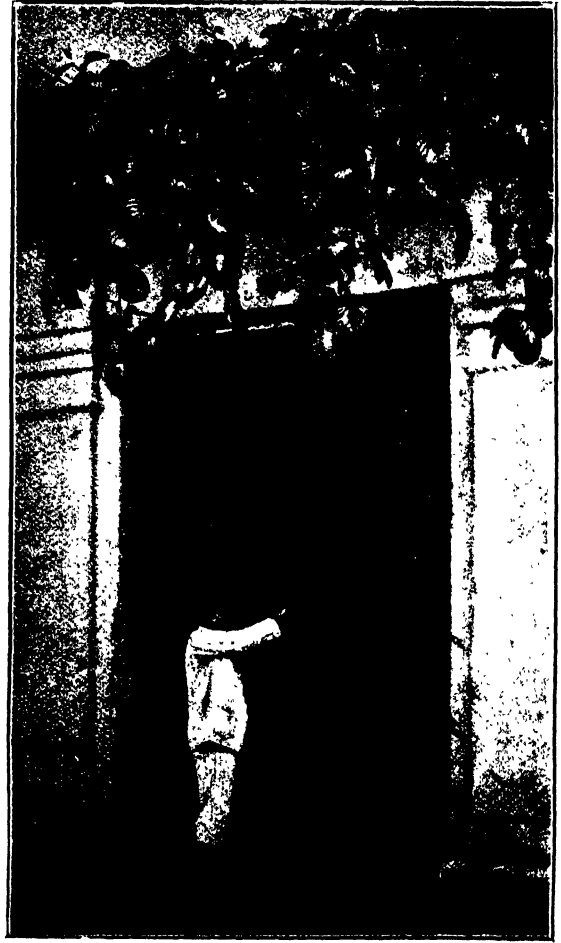
বাগানের দরজার উপর রঙীন ফুল এবং মনোহর ফলে ভরা ঘন-লতার দৃশ্য।

বোগোটা নগরটির চারি দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মধুর। একদিকে গাডেলিউপ্‌ এবং মন্ট্‌সেরাটো পাহাড় মাথা তুলে র’য়েছে। স্বচ্ছ দিবালোকে দূর হ’তে তাদের আলো-ঝলমল শৃঙ্গগুলি দেখা যাচ্ছে!···আর এক দিকে “মেসর-ডি-হার্‌ভস্‌” পাহাড়ের শিখরে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল

বিস্তৃত একটী সমতল-ভূমি দেখা যাচ্ছে। অরুণ আলোর আল্‌পনা মাখা সেই সমতলের দিকে তাকালে মনে হবে, যেন একটা শুভ্র পাথরের টেবিল সেখানে পাতা র'য়েছে; আর, ঢালু পাহাড়ের গা দিয়ে নীচে হাজার হাজার ফিট পর্য্যন্ত স্থানে যে অজস্র তুষার-খণ্ডের মুগ্ধকর একটী শ্বেত-শ্রী জেগে র'য়েছে, তা যেন ওই টেবিলের পাশ দিয়ে পরিষ্কার, নতুন এবং নিখুঁত একটী আস্তরণ কে যেন ঝুলিয়ে দিয়েছে!···

কলম্বিয়ানরা তাদের জাতীয় প্রমোদ—ষাঁড়ের লড়াই দেখছে। এই লড়াই দেখবার জন্য যে ইচ্ছে করে সে-ই কর্ম্মস্থল থেকে ছুটী পেতে পারে।

বোগোটা নগরের অনতিদূরেই একটী জল-প্রপাত আছে। তার নাম টিকোয়েনডামা। উচ্চতায় এটা নায়েগ্রার তিন গুণ। রোডেশিয়া দেশের বিখ্যাত "ভিক্টোরিয়া ফল্‌সে"র সঙ্গে এর বেশ-ই তুলনা করা চ'লতে পারে।···কলম্বিয়া দেশে প্রকৃতির এই সব অনিন্দ্য সম্পদ আছে ব'লেই, কলম্বিয়াকে অনেকে "দক্ষিণ আমেরিকার এথেন্‌স্" ব'লে অভিহিত করেন।—কিন্তু সেখানকার প্রাকৃতিক বিশেষত্ব এত সুন্দর হ'লেও, সেখানকার লোকদের মানসিক বিশেষত্ব একেবারেই প্রশংসা করবার মতন নয়। কারণ, সেখানকার প্রত্যেক লোকই হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর কুঁড়ে। এত কুঁড়ে, যে, সুন্দর জল-হাওয়ার গুণে মনের মধ্যে রীতিমত স্ফূর্ত্তি এবং উৎসাহ এলেও, তাঁরা দিনের মধ্যে পাঁচ ঘণ্টার পর আরও মাত্র এক মিনিট সময় কাজ ক'রতে গেলেই, হাঁপিয়ে, এলিয়ে এবং আরও কত কি হ'য়ে একেবারে কাবু হ'য়ে পড়েন। এবং এইজন্যই পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমের প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে তাঁদের কাছে অত্যন্ত এবং একান্ত ভাবে!···

রপ্তানী করবার জন্য ক্ষেত থেকে টাট্‌কা 'কফি'-র মটর (coffee beans) অশ্বতরের পিঠে বোঝাই ক'রে পাঠানো হচ্ছে।

রাত্তির হ'লেই সেখানকার রাজপথগুলি একেবারে ফাঁকা হ'য়ে যায়। কেবল মাঝে মাঝে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটবার সময়েই, রাত-জাগা প্রহরীদের বাঁশীর শব্দ শোনা যায় মাত্র!···

সেখানকার প্রহরীদের উপর কেবল রাত্রির বেলাতেই কাজ পড়ে। রাত ছাড়া আর-সব সময়েই তারা স্বাধীন! কিন্তু সেখানকার রাতের নিস্তব্ধতার সম্বন্ধে এব বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, কেউই,—যত বড় লোব

আতা-ফলের চুপড়ী হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্যাক্টরীর মেয়ে ছোট ছোট প্যাকিং-কেস্ তৈরী ক'রছে
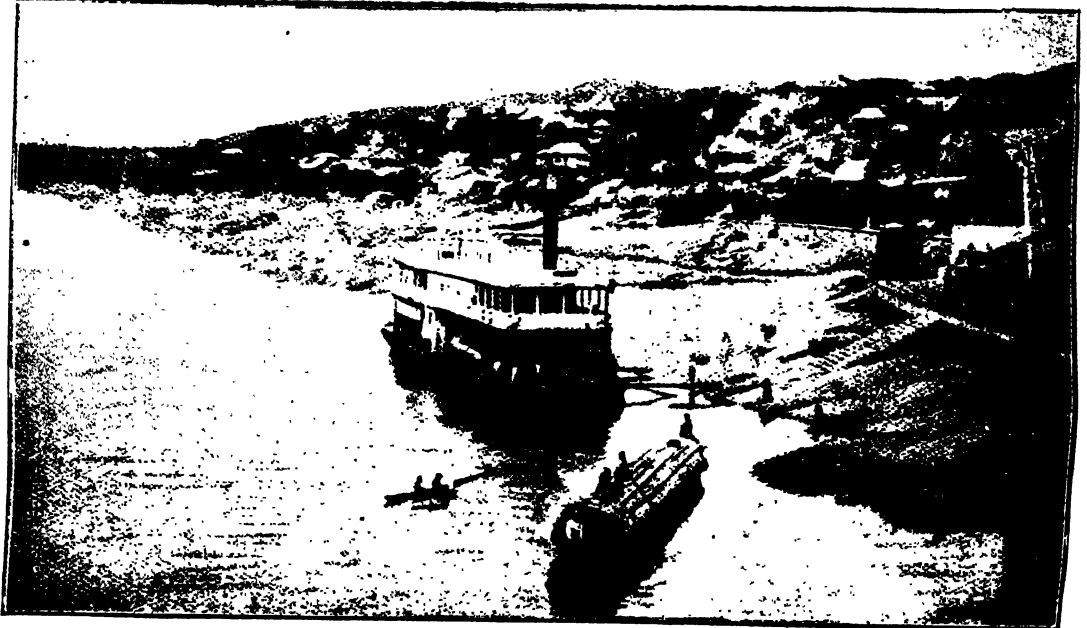
কলম্বিয়ার বিখ্যাত নদী ম্যাগ্‌ডেলেনা ও তার পারিপার্শ্বিক স্থানের দৃশ্য।

বোগোটার বাজারে মাটীর তৈরী ভাঁড় ইত্যাদির কেনা-বেচা হচ্ছে

বোগোটার রাজপথ। নিয়মানুযায়ী সন্ধ্যাবেলায় এখানকার ত্বধারের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হ'য়ে গেছে। দু-একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলাফেরা ক'রছে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা অত্যল্প। অবিলম্বেই পথটী একেবারে নির্জ্জন হ'য়ে যাবে।

তিনি হোন না কেন,—সামান্য কোনো বাদ্য-যন্ত্রের সাহায্যেও সেই নীরবতাকে ক্ষুণ্ণ ক'রতে পারবেন না। এবং এই জন্যই যদি দেশের কোনো স্থানে গান অথবা বাদ্যের মজ্‌লিশ বসে, ত তা নিশ্চয়ভাবে শেষ হ'য়ে যায় রাত্রির পূর্ব্বেই!...কিন্তু তা ব'লে এ থেকে প্রমাণ হয় না যে, সে দেশের অধিবাসীরা গান-বাজনার ভক্ত নন। ভক্ত তাঁরা রীতিমতই। কিন্তু এই ভক্তির অজুহাতে আইনকে তাঁরা অমান্য ক'রতে মোটেই রাজী নন!....

কলম্বিয়া দেশের প্রায় সব লোকই অল্প-বিস্তর সাহিত্যের ভক্ত। অর্থাৎ তাঁরা গদ্য এবং পদ্য লিখে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে ভুল করেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য, সেখানকার সংবাদপত্র-সেবীরা এদিক দিয়ে একেবারেই যান না। তাঁরা চান রাজনীতি,—প্রখর উর্ব্বর এবং গম্ভীর রাজনীতি। কাজেই তাঁদের সংবাদপত্রগুলিকে রাজনীতির এক একটী সূতিকা গৃহ বললে ভুল বলা হয় না। এই সংবাদপত্রগুলি তাদেরই সহযোগী দক্ষিণ আমেরিকার পত্রিকা-গুলির আদর্শ থেকে একেবারে ভিন্ন। কারণ, শেষোক্ত পত্রিকাগুলি অনেক দামী জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা ক'রে থাকে। কিন্তু প্রথমোক্ত- গুলি এই জ্ঞাতব্য বিষয় গুলিকে অর্থাৎ এই ধরণের পার্থিব প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকে একেবারে 'বয়কট্' ক'রে চলে। এবং এই জন্যই, তাদের ঘাড় থেকে রাজ-নীতি-ভূত যে বড় সহজেই ছেড়ে দেবে, এ কথা আজও কেউ জোরের সঙ্গে বলতে পারেন না।

অনেকে বলেন যে, কলম্বিয়াবাসীদের

চাল-চলনের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ছাপ আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। উক্ত চাল-চলনের মধ্যে ফরাসীদেরই বিশেষত্ব পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। প্রমাণ স্বরূপ ব'লতে পারা যায় যে, অনেক শিক্ষিত কলম্বিয়াবাসীই ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা ক'ন্ (অবশ্য স্পেনীয় ভাষাও তাঁদের একটী কথ্য ভাষা।) তার পর তাঁদের আদবকায়দা এবং বিলাসিতার মধ্যেও ফরাসীদের গন্ধ পাওয়া যায়।

এই—একবার বোগোটা নগরে নতুন আসা কতকগুলি প্রোটেষ্ট্যান্ট, ধর্ম্মাবলম্বী বদ্ লোক একটা খোলা বারান্দার উপর ব'সে খৃষ্ট দেহের শোভাযাত্রা (Corpus Christi procession) দেখছিল। কিন্তু তা দে'খেও তারা তাদের মাথা থেকে টুপী নামিয়ে রাখবার কোনো প্রয়োজন বোধ ক'রলে না। এবং এইটাই হ'লো যত মুস্কিলের মূল কারণ, ধর্ম্মপ্রাণ কলম্বিয়ানরা তাদের দেবতার প্রতি এই

এই স্থানটী কলাগাছের প্রাচুর্য্যের জন্যই বিশেষত্বপূর্ণ। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখা যাবে, পথের দুধারে কেবল সারি সারি কলাগাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ক্ষেত-থেকে-তোলা বয়বটি জাতীয় শস্য হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলম্বিয়ার প্রত্যেক সহরের বাজারেই এই রকম শস্যের কাট্‌তি আছে যথেষ্ট। এবং তা থেকে লাভও বেশ দু পয়সা হয়।

ধর্ম্মের প্রতি কলম্বিয়াবাসীদের অসীম শ্রদ্ধা আছে। এ সম্বন্ধে একবার সেখানকার একটী কাগজে শোনবার মত একটী সত্য ঘটনার কথা প্রকাশিত হ'য়েছিল। ঘটনাটী

অসম্মান বরদাস্ত ক'তে পারলে না এবং বেতরো রকম খাপ্পা হ'য়ে উক্ত ব্যক্তিদের একযোগে আক্রমণ ক'রলে।···

ব্যাপারটা হয় ত সামান্যই। কিন্তু অনেক সময়ে

্যান্য ব্যাপারের মধ্যেই অনেক বড় অর্থাৎ উন্নত জিনিসের রিচয় পাওয়া যায়। এবং এই পরিচয়ের দিক দিয়ে ্লম্বিয়াবাসীরা বাস্তবিকই সকলের কাছে শ্রদ্ধেয়!······

কলম্বিয়া দেশটী কলম্বাসের দ্বারা আবিষ্কৃত হ'য়েছে লই শোনা যায়। কিন্তু এটী ভুল কথা। কলম্বিয়ার বিষ্কারক যিনি, তাঁর নাম প্র্যালন্‌সো-ডি-ওজেডা। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে, আয়তনের দিক দিয়ে যতগুলি বড় বড় দেশ আছে, কলম্বিয়া হচ্ছে সেগুলির অন্যতম। সেখানকার আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তীরস্থ স্থানগুলি হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর এবং গ্রীষ্মপ্রধান। সেখানকার পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলি কিন্তু বেশ আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর যায়গা। কারণ, পর্ব্বতের গায়ে জড়িয়ে থাকা তুষার-বিন্দু যখন সূর্য্যের আলো লেগে গ'লতে থাকে, এবং সেই জল-মাখা হাওয়া যখন চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, তখন তার শীকর স্নিগ্ধ স্পর্শে হৃদয়-মন বাস্তবিকই কি এক পুলক-শান্তিতে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে! এই পুলক এবং শান্তিই স্বাস্থ্যবানের সমস্ত আশীর্ব্বাদ এনে দেয়।

মোটর কিম্বা যানের দ্বারা দুরতিক্রম্য স্থানে অশ্বতরের পিঠের উপর ব'সে আসতে আসতে এইখানে একটু বিশ্রাম ক'রছে।

সেখানে এখনো প্রচুর জঙ্গলপূর্ণ স্থান প'ড়ে আছে! সেগুলিকে অসভ্য ইণ্ডিয়ানরা তাদের কায়েমী বাসস্থান ক'রে নিয়েছে। এই অসভ্য ইণ্ডিয়ানরা একেবারেই ধরা ছোঁয়া দিতে চায় না। এমন কি, তাদের খুঁজে বার করবার জন্য অনেকবার অনেক চেষ্টা করা হ'লেও, কেউই কোনো দিন তাদের কোনো পাত্তাই পান নি!—এমনি চতুর এবং সতর্ক ওই বুনো ইণ্ডিয়ানগুলো!

বাজারের মধ্যে আনারস, কলা, কমলালেবু, লেবু ইত্যাদি ফলের দোকানে ব'সে 'ফোড়েরা' ক্রেতার অপেক্ষা ক'রছে।

সেখানকার পর্ব্বতের সংখ্যা হচ্ছে প্রচুর। এবং এই-গুলিই সেখানকার অনেক ক্ষতি ক'রেছে। প্রমাণ স্বরূপ প্রথমতঃ বলা যেতে পারে যে, ও-গুলোর জন্য রেলপথের কাজ বেশী দূর এগোতে পারছে না। এবং দ্বিতীয়তঃ বলা যেতে

পারে যে, ওইগুলোই সেখানকার লোকদের অনেকগুলি ছোট-ছোট দলে বিভক্ত ক'রে দিয়েছে। এবং এই ব্যাপারটী সেখানকার জাতীয় জীবনের পক্ষে নিশ্চয়ই কোনো শুভ জ্ঞাপন করে না।

সেখান থেকে 'কফি' রপ্তানি করা হয় প্রচুর পরিমাণে। রবার্ এবং কাঁচা চাম্ড়াও অনেক বাইরে পাঠানো হয়। সেখানকার খনিজ বস্তুগুলির মধ্যে সোণা আর রূপা ত

খাদ্যপাতি বিক্রী করবার জন্য ব'সে আছে।

বটেই, প্লাটিনাম্ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এমারাল্ড্-ও পাওয়া যায় আশ্চর্য্য রকম বেশী পরিমাণে। এই সমস্ত জিনিস সাধারণতঃ খনি থেকে তোলা ...র টানা তিন মাস ধ'রে। সে সময়ে খনিতে সমস্ত রাত ধ'রেই কাজ চলে। কুলীরাও বেশ মন দিয়ে তাদের কর্ত্তব্য ক'রে যায়; কারণ, তা না করবার মতন ...র্ব্যবহার তারা তাদের মনিবদের কাছ থেকে একেবারেই পায় না!

কলম্বিয়াবাসী ইণ্ডিয়ানরা সাধারণতঃ যতই শ্রমসাধ্য কাজ হোক না কেন, অম্লান মুখে ক'রে যেতে পারে। এবং তা ক'রে যেতে পারে আশ্চর্য্যভাবে—ক্লান্তির কথা একেবারেই মনে না ক'রে অসীম ধৈর্য্য নিয়ে! তারা ভালবাসে শান্তির জীবন। তাদের শ্যামল ক্ষেতের উপর প্রকৃতির দেওয়া সোনার শস্যগুলিকে তারা শ্রদ্ধা ক'রে যেম্নি, সেগুলিকে যত্ন ক'রেও ঠিক তেম্নি। তাদের সংসারের প্রতি তাদের স্নেহ ও অনুরাগ

প্যাষ্টো-ল'-কোর্টের অলিন্দ। কলম্বিয়ার কতকগুলি বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারী এখানে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন।

অসীম। অনেকে বলেন যে, তারা হচ্ছে রীতিমত ভীরু এবং সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক। কিন্তু একটু লক্ষ্য ক'রলে বেশই বোঝা যাবে যে, তাদের ওই রকম প্রকৃতিযুক্ত হ'তে বাধ্য করে—তথাকার অধিবাসী একমাত্র শ্বেতাঙ্গরাই!...

উক্ত ইণ্ডিয়ানদের আর একটী বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে,

তারা হচ্ছে সংস্কারের ভক্ত। ধর্ম্ম ব্যাপারের মধ্যে শোভা-যাত্রাগুলিকেই তারা বেশী পছন্দ করে। তারা ধর্ম্ম-বিষয়ক আজগুবি গল্পের প্রতি এমন অখণ্ড বিশ্বাস পোষণ করে যে, তা শুনলে বাস্তবিকই অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। এই ধরণের গল্পের একটী নমুনা—

প্রায় তিনশ' বছর আগে একজন 'পোপ্' কলম্বিয়ার কার্টাগেনা নামক স্থানের একটী 'ক্যাথিড্রালে' রাখবার জন্য চমৎকার একটি শ্বেত-পাথরের বক্তৃতা-মঞ্চ (পুরোহিতদের জন্য) জাহাজে ক'রে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগাবশতঃ জাহাজখানি পথের মধ্যেই ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হ'লো। ডাকাতরা মঞ্চটীকে (অপ্রয়োজন বোধে) জলের উপর ফেলে দিলে এবং দরকারী জিনিস-পত্তর লুট ক'রে পালালো। শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমায় মঞ্চটী কিন্তু জলের মধ্যে ডুবে গেল না,—ভাসতে লাগলো। এবং সেটীকে যথাসময়ে আবার সেই জাহাজেই তোলা হ'লো। কিন্তু দুর্ভাগ্য একবার আসতে আরম্ভ হ'লে, বড় সহজে ছাড়ে না।

ফসল বোনা ক্ষেতের দৃশ্য।

সামনে ঝর্ণা এবং পিছনে একটী ছোট্ট গির্জ্জা দেখা যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টিতে বাস্তবিকই এই দৃশ্যটী অতি মনোরম।

জাহাজখানা আবার আর এক দল ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত হ'লো। এবং তারা জাহাজটাকে জ্বালিয়ে দিলে। অবিলম্বেই জাহাজখানা ডুবে গেল। কিন্তু শ্রীভগবানের আগেকার মতোই মহিমায় মঞ্চটী ভাসতে লাগলো। এইভাবে ভাসতে ভাসতে' এসে সেটী সাগরের তীরে অনেক বছর ধ'রে প'ড়ে রইল। শেষে এক স্পেনগামী জাহাজের কাপ্তেন সেটীকে দেখতে পান এবং সেটীকে তুলে নিয়ে স্পেনের উদ্দেশে যেতে থাকেন। ঠিক এই সময়েই ঘটনাটী কার্টাগেনা দেশের ক্যাথিড্রালের পুরোহিতের কাণে ওঠে। তিনি মঞ্চটীকে তাঁদের মন্দিরের সম্পত্তি ব'লে জানিয়ে, উক্ত কাপ্তেনকে সেটী ফেরৎ দিয়ে যেতে বলেন। কাপ্তেন কিন্তু সে কথা একেবারেই না শুনে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। কিন্তু পূর্ব্ব-কথিত ভগবানের কি অপার মহিমা! জাহাজখানা খানিক দূর এগিয়েই এক প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতে ভেঙে চুরমার হ'য়ে ডুবে গেল। মঞ্চটী এবারও কিন্তু ডুবলো না। সেটী ভাসতে ভাসতে এসে হাজির হ'লো ঠিক কার্টাগেনার তীরেই! এবং সেটীকে অবিলম্বেই ক্যাথিড্রালের মধ্যে যথাস্থানে এনে রাখা হ'লো!…

এ হেন দেব-মাহাত্ম্যের কথা ধর্ম্মপ্রাণ কলম্বিয়াবাসী ইণ্ডিয়ানরা কি বিশ্বাস না ক'রে পারে?…

কলম্বিয়া দেশের পুরোহিতদের দেহে সাধারণতঃ ত্রি বিভিন্ন জাতের রক্ত আছে। ব্যক্তিগত সম্মানের দিক দি

দেশের লোকের কাছ থেকে তাঁদের প্রাপ্য খুব বেশী পরিমাণ নেই ব'লেই শোনা যায়।...

সেখানে আজকাল আফ্রিকা থেকে আসা অসংখ্য কাফ্রী বসবাস ক'রছে। তাদের আফ্রিকা থেকে আনা হ'য়েছে ; কারণ, তারা এমন সব কঠিন এবং অতি-শ্রমসাধ্য কাজ ক'রতে পারে, যা ক'রতে বাস্তবিক পক্ষেই কলম্বিয়ার অধিবাসীদের উৎসাহে এবং শক্তিতে কুলোয় না !... ওই সমস্ত কাফ্রী হচ্ছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, চতুর এবং সংস্কার-ভক্ত লোক। তারা চরিত্র-নীতির ধার ধারে না এবং তাদের স্বভাব হচ্ছে অত্যন্ত কদর্য্য ! এবং তারা শাসনের এমনি বিদ্রোহী যে, তাদের ভদ্র করবার চেষ্টা করা একেবারেই বৃথা ! নইলে, হয় ত তারা অনেক আত্মোন্নতি ক'রলেও ক'রতে পারতো !...

সেখানকার প্রধান নদী হচ্ছে ম্যাগ্‌ডেলেনা নদী। নদীটা কিন্তু অত্যন্ত বিশ্রীভাবে পাঁক এবং কুমীরে ভরা। এইজন্য তার উপর দিয়ে জাহাজ চলা-ফেরা করবার বিষয়ে অসুবিধা আছে অত্যন্ত। এবং তার মধ্যে কুমীরের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, সেগুলো তীরের উপর সারি সারি এমনভাবে প'ড়ে থাকে যে, তাদের উপর দিয়ে টানা অনেক মাইল পথ, মাটী স্পর্শ না ক'রেই, বেশই যাওয়া যেতে পারে (অবশ্য দংশনের অপকারের কথা বাদ দিয়েই এ কথা বলা হচ্ছে)।

ম্যাগ্‌ডেলেনা নদীর হাওয়া একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ, তার মধ্যে এত প্রচুর এবং রোগের বীজাণুপূর্ণ এত বিপুল মশা উড়ে বেড়ায় যে, অভিজ্ঞেরা বলেন, সেগুলোর সাদর সম্ভাষণ একেবারেই হজম ক'রতে পারা যায় না। তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে,—একবার ঐ নদীর উপর দিয়ে একটা ষ্টীমারে কতকগুলি গৃহপালিত জন্তু স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য রেখে দেওয়া হ'য়েছিল। হঠাৎ মশক-প্রভুদের উক্ত "সাদর সম্ভাষণ" ! অসহায় জন্তুগুলা সে "সম্ভাষণ" তেমন পরিপাক ক'রতে পারলে না এবং অত্যন্ত ছট্‌ফট্‌ ক'রতে ক'রতে শেষে নিরুপায় হ'য়ে, যেন-তেন প্রকারেণ মুক্ত হ'য়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তখনকার মতো রেহাই পেলে !...এই ব্যাপারটী কলম্বিয়া দেশের বিখ্যাত নদীটার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা প্রচার করে না। কিন্তু আশ্চর্য্য, কলম্বিয়ার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা যাঁরা, তাঁরা এর প্রতিবিধানের বিষয়ে একেবারেই উদাসীন !...

সেখানে উৎপন্ন জিনিসগুলির মধ্যে কফি, সিঙ্কোনা, চাল, ইক্ষু, কলা, তামাক, তূলা ইত্যাদিই প্রধান। রবারের গাছ সেখানে প্রচুর হয়। আলুর চাষের সাফল্য

কলম্বিয়ার মানচিত্র।

সেখানে আশাতীত রকম পাওয়া যায়। খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে লোহা, তামা, দস্তা, সীসা, কয়লা, প্লাটিনাম, গন্ধক, সোনা, রূপা এবং মূল্যবান পাথর ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষালয় আছে ৫৩০০টী ; মধ্যশিক্ষালয় আছে ৭৩টী এবং আর্ট ও ব্যবসা-সংক্রান্ত শিক্ষালয় আছে মোট ৩৫টী। সবশুদ্ধ পাঁচটী বিশ্ব-বিদ্যালয় সেখানে আছে। বোগোটা হচ্ছে কলম্বিয়ার রাজধানী। সেখানকার জনসংখ্যা প্রায় ১৫০,০০০।

অভিমান ?

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি-এ

ভরা দুদিনের বাদ্‌লার পর আজ সকাল হ'তে আকাশ বেশ রোদ-ভরা ছিল। দুদিনের কান্নার জোয়ারের ভিতর দিয়ে যেন প্রকৃতি বেশ একটু হেসে উঠেছিল আজ। কিন্তু সে হাসি তার কান্নার জোয়ারেই ডুবে গেছে। পাগলামির পূর্ণ মাত্রায় উঠে ক্ষণিক জ্ঞানের একটু আভাসের মত তার সে হাসি চকিতে মিশিয়ে গেছে আবার সেই পূর্ণ বিকৃতিতে। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই কালো কালো মেঘের পাহাড়গুলো চারিদিকে গাঢ় হ'য়ে জমে' দাঁড়িয়েছে। বেদনার আসন্ন অশ্রুভারে সব যেন থম্‌থম্‌ ক'র্‌ছে। আকাশ আঁধার হ'য়ে এলো। মেঘের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে জোর হাওয়ার দোলা এসে পড়্‌লো; সেই সঙ্গে আবার প্রবল বৃষ্টিও নাম্‌লো। এই ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির যুদ্ধে প্রকৃতি যেন ভীতা হ'য়ে অন্ধকারের কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁপে উঠ্‌লো। ক্রমেই দুর্য্যোগ প্রলয়ের মূর্ত্তিতে নেচে উঠ্‌লো।

বহির্জ্জগতের এ দুর্য্যোগের সঙ্গে আমার যেন কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। চেয়ারখানা টেনে নিয়ে জানালার পাশে গিয়ে ব'স্‌লাম। অন্ধকারে বাহিরের কিছুই দেখা যায় না। শুধু ঘরের আলোয় যা একটু আধটু দেখা যাচ্ছিল, সে কেবল জানালার কাঁচের বুকে লাফিয়ে পড়া বৃষ্টির এলো-মেলো ছাঁট্‌গুলো। আমি নির্ব্বাক্‌ হ'য়ে সেই দিকেই চেয়ে রইলাম। ঝড় একে একে স্মৃতির খাতার পাতাগুলো উল্‌টে উল্‌টে চোখের সাম্‌নে ধ'র্‌তে লাগ্‌লো। দুর্য্যোগ তার অতীতের কুড়িয়ে-পাওয়া বার্ত্তাগুলি বর্ত্তমানের সঙ্গে মিশিয়ে কি যেন এক অভিনব সুরে কাণের কাছ দিয়ে গেয়ে গেল—আমারই অন্তরের গোপন বেহাগ। সেই সেদিনের কথা যেদিন বেলা তার বৃদ্ধ দাদামশায়ের শয্যা-পার্শ্বে একা বসে' আপন মনে কত কি না জানি ভাবছিল। বাহিরে দুর্য্যোগ সারা প্রকৃতিকে কাঁপিয়ে ফির্‌ছিল, গাছপালাগুলোকে সব প্রলয়ের দোলায় দুলিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু নিশ্চল ছিল একা বেলা।

সেদিনও সন্ধ্যা হ'তে এমনি আঁধার ক'রে মেঘ জমেছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীর পথে ফির্‌তে রাস্তার মাঝেই ভীষণ জল-ঝড় আরম্ভ হ'য়ে গেল। আর চল্‌তে পার্‌লাম না, বাধ্য হ'য়ে পার্শ্বস্থ গৃহস্থের দ্বার-প্রান্তে আশ্রয় নিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সমভাবেই কেটে গেল। ঝড়-বৃষ্টি থাম্‌লো না, বরং বেড়ে উঠ্‌লো। একবার ইচ্ছা হ'য়েছিল বটে, গৃহস্থের আশ্রয় ভিক্ষা করি। কিন্তু অনধিকার চর্চ্চার সঙ্কোচ;—সভ্যতার দাবী—পার্‌লাম না। এমন ভাবে আর কতক্ষণ থাকা যায়! একে জমাট অন্ধকারে নিজেকেই ভালো ক'রে দেখা যায় না, তার উপর এই ভীষণ দুর্য্যোগের সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিও গভীর হ'য়ে আস্‌ছে। মনে ক'রলাম্‌ রাস্তায় নেমে পড়ি; কিন্তু দুর্য্যোগের সে মূর্ত্তি দেখে সাহস হ'ল না; এই জল-ঝড় মাথায় নিয়ে প্রায় দুই মাইল পথ অতিবাহন করা। কর্ত্তব্য স্থির কর্‌তে না পেরে শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলাম।

আতিথেয়তা ও বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া যে এ দেশের আদর্শ ধর্ম্ম; তা না হ'লেও হয় তো আমার এ দুর্গতি গৃহস্থের করুণার দ্বারে আঘাত ক'রেছিল। ঘুমে জড়িয়ে আসা চোখ দুটোকে সজোরে মর্দ্দন ক'র্‌তে ক'র্‌তে চাকর এসে আমায় অভিবাদন ক'রলে—"বাবু ডাকুচি"। তাজা ঘুম ভাঙানোর বিরক্তিটা তার স্বরের মধ্যে এত স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছিল যে, আমাকেও বেশ এক ঝলক ছোঁয়াচ দিয়ে গেল। কিন্তু "ভিক্ষের চা'ল কাঁড়া আর আকাঁড়া!" প্রতিবাদ না ক'রে ধীরে ধীরে তার অনুসরণ ক'রে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ ক'রলাম।

* * * *

বেশ তাঁদের ঘরখানি। অল্পের মধ্যেই বেশ সাজানো-গোছানো। এক পাশে একটা টেবিল ও দুখানা চেয়ার পাতা আছে। টেবিলের দুই দিকে দেয়ালের কোলে কোলে সাজানো বইএর কয়েকটা আল্‌মারি। অন্য দিকে

একখানি কৌচের উপর শুয়ে আছেন এক বৃদ্ধ। আমি ভিতরে যেতেই তিনি চোখ মেলে আমার পানে চাইলেন; বল্লেন—"এসো"

মাথা নুইয়ে তাঁকে সম্মান দেখালাম।

তিনি ক্ষীণ স্বরে বল্লেন—"বেলা, বস্তে দাও।"

বুঝলাম তিনি অসুস্থ। বেলা তাঁর শয্যাপার্শ্ব হ'তে উঠ্তে না উঠ্তেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে' পড়্'লাম্। বেলা পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে পাশের ঘরে চলে' গেল। আশ্রয় পাওয়ার সোয়াস্তিটা যেন অতৃপ্তিতে ভ'রে উঠ্লো। অসুস্থ ও বিপন্ন গৃহস্থের আতিথ্য নেওয়া শুধু তাঁদের বিব্রত করা।

একখানা কাপড়, একটা আলোয়ান আর তোয়ালে নিয়ে এসে চেয়ারের আর্মটার উপর নামিয়ে রেখে বেলা বল্লো—'জামা কাপড়টা বদ্লে মাথা মুছে ফেলুন। অনেকক্ষণ ধ'রে ও-অবস্থায় আপনার হয় তো খুবই কষ্ট হয়েছে! অনুগ্রহ ক'রে আমাদের একটু ডাক্লেই পার্তেন—"

কৈফিয়ৎ দেবার কিছুই নাই। বল্'লাম—"বিশেষ কষ্ট হয় নি; জামা কাপড় যা' ভিজেছিল, তা শুকিয়ে গেছে।"

সে কি একটা কৈফিয়ৎ! বেলা হেসে উঠে বল্লো—"ভিজে কাপড় জামাটাকে গায়ের উপর শুকিয়ে নেওয়াকেও যদি কষ্ট না বল্তে চান্, তবে কষ্ট কা'কে বলেন্ তা জানি না! শরীরের উপর এই ছোটখাটো অত্যাচারগুলোকে আপনারা অবহেলা ক'রে চলেন বটে, কিন্তু অসুখে পড়্লে যে এর জন্য কতখানি ভুগ্তে হয়, সে দিকে আদৌ খেয়াল রাখেন না।" কাপড়গুলো আমার সাম্নে রেখে সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে' গেল। আমিও আর আপত্তি করা সঙ্গত নয় ভেবে জামা কাপড় বদ্লে ফেল্লাম।

আমি চিরদিনই বাচাল। চুপ্টি ক'রে মৌন ব্রত নিয়ে বসে' থাকা আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ছিল। সন্ধ্যা হ'তে এই ব্রতপালনটাই যেন আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর হ'য়ে উঠেছিল। চুপ ক'রে থাকা আমার মস্ত একটা শাস্তি ব'লেই মনে হ'ত। ইচ্ছা হ'ল একবার রোগীর পাশে গিয়ে বসে' একটু আলাপ করি। আমার প্রতি এ অযাচিত আতিথেয়তার জন্য আমি মনে মনে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পার্লাম না। বুকটা কৌতূহলে ভ'রে উঠ্লো। তাঁদের পরিচয় জান্তে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হ'ল। চেয়ার ছেড়ে গিয়ে রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়ালাম। তিনি ধীরে হাতখানি তুলে' আমায় বস্তে ইসারা ক'র্লেন। আমি তাঁর বিছানার একটী পাশে বসে' পড়্'লাম। তিনি আমার আস্তে আস্তে পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্তে লাগ্লেন।

বেলা একখানি ডিসে কতকটা হালুয়া ও এক পেয়ালা চা এনে আমার সাম্নে ধর্লো। আমি অনিচ্ছা জানালাম। নীরবে সেগুলি আমার সাম্নে নামিয়ে দিয়ে সে তার পূর্ব্ব-অধিকৃত স্থানে গিয়ে বসে' পড়্লো।

আমি উঠিয়ে নিতে বাধ্য হ'লাম।

আমার মনটা যেন আপনাআপনিই বেলার কাছে ঋণী হ'য়ে পড়্লো।

*　　*　　*

রাত দুটো পর্য্যন্ত বিনিদ্র অবস্থাতেই কেটে গেল। রোগী অত্যন্ত ছট্‌ফট্ কর্'তে আরম্ভ করেছেন। কিছুক্ষণ হ'ল জ্বর অনেক বেড়ে উঠেছে। নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হ'য়ে তাঁর পায়ের তলে কি জানি আপন্ মনে কি ভাব্ছে বসে' বেলা! তার মুখে চিন্তার একটা গভীর ছায়া।

রোগীর যন্ত্রণা ক্রমেই বেড়ে উঠ্লো। জলের পটীটা ভিজিয়ে দিয়ে আমি মাথায় বাতাস দিতে লাগ্লাম্। সহসা তিনি ক্ষীণ স্বরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্লেন—"উঃ বেলা!" বেলা—"দাদা মশায়!" বলে তার বড় বড় চোখ দুটী সকরুণ দৃষ্টিতে আমার পানে তুল্তেই ছল্ ছল্ ক'রে জলে ভ'রে উঠ্লো। বেলার সে দৃষ্টি আমার বুকের তল পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো। সে দৃষ্টির ভিতর কি এক বিরাট শূন্যতা! যেন কূলহীন সাগরের মধ্যে তার সন্তরণ-অপটু হাত দুটো দিয়ে একটা আশ্রয়কে আঁক্‌ড়ে ধ'র্‌বার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছে। আমি সস্নেহে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বল্লাম 'ভয় কি? শুধু জ্বর একটু বেড়েছে—এখনই ক'মে যাবে।' মুখ ফিরিয়ে আসন্ন অশ্রুর বেগটা সম্বরণ ক'রে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে?"

"না" বলে' শিশিটা এনে সে আমার হাতে দিল। আমি এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিয়ে মাথায় হাওয়া দিতে লাগ্‌লাম। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর রোগীর একটু তন্দ্রাভাব এলো। আমি বেলাকে একটু ঘুমোবার জন্য অনুরোধ ক'রলাম্। সে রাজী হ'ল না।

*　　*　　*　　*

ঝড় থেমে গেছে। শুধু ছিম্ ছিম্ ক'রে বৃষ্টি পড়্ছে। প্রকৃতি অনেক শান্ত হ'য়ে এসেছে। বেলা জানালার গরাদে ধ'রে ধ'রে বাহিরের দিকে চেয়ে কি ভাবছিল আনমনে। আমার লুব্ধ দৃষ্টি অবসর পেয়ে তার সে স্নিগ্ধ ছবিখানির দিকে অজ্ঞাতে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়্লো। নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম তার সেই সরল সুন্দর মূর্ত্তিখানির দিকে। যুদ্ধ-শ্রান্ত প্রকৃতির দিকে বুকভরা স্নেহ বিলিয়ে দিয়ে চেয়ে থাকা—কি সে এক অপূর্ব্ব রূপ! বুদ্ধিমত্তার ও শিক্ষার এক আশ্চর্য্য দীপ্তি খেলে বেড়াচ্ছিল তার শান্ত মুখখানির উপর।

এতদিন শুধু নিজের অন্ধ ধারণা নিয়েই নিজেকে তোষা-মোদ ক'রে চ'লেছি। সমাজের গণ্ডী-ভাঙা—কালি-কলমের ছাপমারা এই সৌখীন মেয়েদের যেন সত্যই কখনো এমন সুন্দর দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে দেখি নি।

* * *

সকালে বেলা ও দাদা মশায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফির্লাম। তাঁরা অনুরোধ ক'রে বলে' দিলেন মাঝে মাঝে সেখানে যাবার জন্য।

বাড়ী এসে মনটা অত্যন্ত ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'তে লাগ্ল। পড়াশুনা কিছুই কর্'তে পার্লাম না। রাত্রি জাগরণে শরীরটা ক্লান্ত বোধ হওয়ায় আজ আর কলেজেও গেলাম না।

সেদিন হ'তে তাঁদের অনুরোধেই হোক আর আমার প্রবল ইচ্ছার আবেগেই হোক্, রোজই বেলার দাদা মশায়কে দেখ্তে যেতাম। আমার সাধ্যমত আমি তাঁর সেবা-যত্ন ক'র্তে কোনই ক্রটী করি নি। দিন পনেরর মধ্যেই দাদা-মশায় বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠ্লেন। দাদামশায়ের স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের আকর্ষণ আমাকে খুবই আপনার ক'রে নিয়েছিল। রক্তের সম্বন্ধ অপেক্ষাও হৃদয়ের সম্বন্ধেই যে মানুষ বেশী আত্মীয় হয়, তা দাদামশায়ের কাছ থেকেই ভাল ক'রে বুঝেছিলাম। গভীর ঘনিষ্ঠতা ও দাদামশায়ের অকৃত্রিম স্নেহ-আবেষ্টনের ভিতর যে সুশীতলতার স্পর্শ পেয়েছিলাম, তা সত্যই কল্পনাতীত।

দাদামশায় আমার পিতামহের সতীর্থ—এই দোহায়ে আমার সঙ্গেও একটা সম্বন্ধ পাকিয়ে ফেলেছিলেন। আমিও সে সম্বন্ধের মর্য্যাদা উপযুক্ত ভাবেই রক্ষা ক'র্তে লাগলাম। তাঁদের সঙ্গে আমার বৈকালিক চা-পান ও ভ্রমণের পালাটা যেন পাকাপাকি স্বত্বে দাঁড়িয়ে গেল।

* * *

সেদিন কলেজ বন্ধ ছিল। দুপুর বেলা একটু ঘুমের চেষ্টায় শুয়ে পড়্লাম। অনেকক্ষণ একভাবে চুপ ক'রে পড়ে' থেকেও চোখে কোনমতেই ঘুম ধর্লো না। বিশ্রামের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে পড়'লো। নানা খণ্ড চিন্তায় মনটা উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্লো। শয্যা-কণ্টক রোগীর মত ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম। উঠে পড়ার ঘরে গেলাম, সেখানেও শান্তি পেলাম না। অগত্যা আজ রোদ না পড়'তেই দাদামশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য বাহির হ'য়ে পড়'লাম। অন্যান্য রবিবারের মত আজকের ছুটীটাও তাদের বাড়ীতেই কাটানোর জন্য বেলা কাল বিশেষ অনুরোধ ক'রেই ব'লেছিলো। জানি না কেন তখন অমত প্রকাশ ক'রেছিলাম।

* * * *

বেলা আমায় নিয়ে গিয়ে তার ড্রয়িং-রুমে বসিয়ে কাগজের মোড়ক থেকে খুলে' একখানা ফটো আমার হাতে দিলে। আমি অবাক্ হ'য়ে গেলাম হঠাৎ সে ফটোখানা দেখে। আমাদেরই ফ্রেণ্ড গ্রূপ সেখানা।

ফটোর কথা বেলাকে জিজ্ঞাসা ক'রতেই সে শুধু আঙুল দিয়ে একটা চেহারা দেখিয়ে ব'লে উঠ্লো—"দাদা—"

বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠ্লো। বেলা আমার পরলোকগত প্রিয় সহপাঠী অপরেশের বোন্। আমার মুখে আর কোন কথা সরল না, একদৃষ্টে সেই ছবিখানির দিকে চেয়ে রইলাম। দেখ্লাম—আমার ও অপরেশের চেহারার নীচে গোটা গোটা অক্ষরে দুজনের নাম লেখা। বুঝ্লাম সে অক্ষর বেলার হাতের।

মনটাকে দৃঢ় ক'রে নিয়ে গম্ভীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম্—"কি বেলা, কথা বল্‌ছো না যে?"

"কি বল্‌বো?" বলেই বেলা চুপটী ক'রে আমার হাতের বোতামটা খুঁট্‌তে লাগ্‌লো। বাক্-পটিয়সী বেলার এরূপ নিস্তব্ধতা দেখে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারলাম্ তার মন আজ বড় বেদনায় ভ'রে উঠেছে। মুখপানে চা'ইতেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। এ যেন তার বহু দিনের সঞ্চিত বেদনার ভার। তাই সে আজ শুধু তার দাদার ফটোখানি দেখাবার জন্যই আমায় তার ঘরে ডেকে এনেছে। আপনার বলতে এ জগতে দাদামশায় ছাড়া তার আর কেউ নাই। বেলার

জীবনের কথা মনে ক'রে আমিও অশ্রু সম্বরণ ক'রতে পারলাম না। সস্নেহে তার মাথায় হাত দিতেই সে আমার কোলের উপর লুটিয়ে পড়্‌লো। অনেকক্ষণ শুধু নীরব অশ্রু বিসর্জ্জনেই কেটে গেল। বেলাকে অনেক ক'রে সান্ত্বনা দিয়ে বসালাম। তখন বেলা প্রায় অবসান হ'য়ে এসেছে। দিনান্তের শেষ রক্তিম আভাটুকু পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে এসে বিদায়ের নমস্কার জানিয়ে গেল। আমিও ধীরে ধীরে উঠে বেলাকে বিদায়ের কথা জানালাম।

সে টেবিল-ক্লথটার সুতো ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে দু তিনবার ঢোঁক গিলে আস্তে আস্তে বল্‌লো—"আপনার বিয়ে হ'য়েছে?"

আমি নিজেকে একটু সংযত ক'রে নিয়ে বলে' ফেল্‌লাম—"হাঁ"।

বেলা আর কোন কথা না ব'লে দ্রুতগতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সহসা কৃত্রিম দৃঢ় সে মনটা ভেঙে চুরমার হ'য়ে বুকের তলায় ঝ'রে পড়'লো।

* * * *

পরদিন বিকালে গিয়ে দেখ্‌লাম—বাড়ী চাবীবন্ধ। সেদিন হ'তে প্রত্যহই গিয়ে ফিরে এসেছি। দেখা পাইনি আর কোথাও সে বেলার। সেদিনের সেই গোধূলি বেলার সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত গেছে বেলা আমার চোখ থেকে। অন্ধকার বুক নিয়ে অনেক খুঁজে বেড়িয়েছি, কোথাও তার সন্ধান পাই নি। দিনের পর দিন গিয়ে গোটা দুই বৎসর কেটে গেছে, দুর্যোগের ঝঞ্ঝা তুলে' বুকের উপর দিয়ে, সেই সেদিনের বাদল বেলা হ'তে আরম্ভ ক'রে।

একে একে সব চলে' গেছে, শুধু প্রলয়ের গভীর দাগ বুকের উপর এঁকে দিয়ে। মা বাপের বড় সাধের হাতে-তুলে-দেওয়া জীবনের চিরসাথী পারুল গেছে, শুধু তার বুকের রক্ত দিয়ে তৈরী স্মৃতির একটা কণা অণিমাকে আমার কোলে দিয়ে। এখন শুধু পিসীমা আর অণুই আমায় সংসারে বেঁধে রেখেছে।

এম্ বি পাশ করার পর বাড়ীতেই ব'সে আছি। পিসীমা আবার নূতন ক'রে সংসার পাতার জন্য অনেক অনুরোধ ক'রেও আমায় রাজী ক'রতে পারেন নি। পারুল তার যৌবন-নাটকের যবনিকার সঙ্গে সঙ্গে দুফোঁটা চোখের জল দিয়ে আমায় যা বুঝিয়ে দিয়ে গেল—তা আজও ভাল ক'রে ভাবতে পারি না। বুকের তীব্র বেদনায় প্রাণটা যখন হাহাকার ক'রে ওঠে, শুধু অণিমার মুখখানির দিকে চেয়েই অপার শান্তি পাই এ শূন্য জীবনে।

* * * *

পিসীমা কোন মতেই আমায় আর সংসারী ক'রতে পারলেন না দেখে' কাশীবাসের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলেন! তাঁকে নিয়ে কাশী গিয়েছিলাম। পাঁচ মাস কাশীবাস করার পর আজ সাতদিন হ'ল বাড়ী ফিরেছি অণিমাকে অসুস্থ নিয়ে। আজ তার জ্বর অত্যন্ত প্রবল। তাই এ দুর্য্যোগ রাত্রিতে জীবনের সব স্মৃতিগুলো আমার অবশ মনটার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একটু শান্তির আশায় নির্জ্জনে জানালায় এসে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে' ছিলাম। অন্ধকার বিদ্রূপ ক'রে সেই ভাঙা স্মৃতিগুলোকে ছুঁড়ে মারছিল আমার বুকের উপর। আমি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে বুক পেতে সহ্য ক'রছিলাম তার সে বিদ্রোহ।

আচম্বিতে বেলা এসে আমার হাত ধ'রে ভগ্ন কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—"এ কি গো! তুমি যে চুপটী ক'রে এখানে বসে' রয়েছ! অণি যে আমার ঘোর হ'য়ে পড়ে আছে, বাছার সর্ব্বাঙ্গ যে হিম হ'য়ে এলো।"

বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌লো। ওঃ—এও বুঝি অভিমানের শাস্তি! নিঃসঙ্গ জীবনটাকে কোন রকমে অবলম্বন দিয়ে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখ্‌বার আশায় হারিয়ে-যাওয়া বেলাকে সাথী ক'রে কুড়িয়ে আন্‌লাম কাশী হ'তে—তাই বুঝি সহ্য হ'ল না।

আমি নির্ব্বাক্, মন্ত্রচালিতের মত তার পিছু পিছু উঠে চল্‌লাম।

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

রমাঁ রলাঁ ও আন্তর্জাতিকতা

১৯১৪ সালে য়ুরোপ মহাযুদ্ধে মাতিয়া উঠে; এক ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া য়ুরোপীয় শক্তিসমূহ স্ব স্ব শক্তি পরীক্ষার জন্য আপনাদের অন্তরের আসল রূপ প্রকট করিয়া তোলেন। এতদিন ধরিয়া যে পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শিখা হাতে করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাচীতে সভ্যতার দৈব-প্রেরিত মিশনারী-রূপে আত্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেছিল—১৯১৪ সালের পর অগণিত মৃত্যুর মশাল-আলোকে দেখা গেল যে, সে তাহার ছদ্মবেশ। প্রচারকের ক্রসের আড়ালে সঙ্গীনের মুখ বাহির হইয়া পড়িল। প্রাচী পশ্চিমকে ভাল করিয়া, স্পষ্ট করিয়া চিনিল এবং এই চেনার ফলে প্রাচী অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে পশ্চিমকে ঘৃণা করিতে লাগিল। এই ঘৃণা ক্রমশঃ জাতিকে ছাড়াইয়া তাহার সভ্যতা ও আদর্শকে স্পর্শ করিতে চলিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বলির পশুর মত য়ুরোপীয় শক্তিরা ১৯১৪ সালের রণক্ষেত্রে জবাই করিয়াছিল এবং হত্যাকারীদের অমানুষিকতা এবং হত্যাজনিত বর্ব্বরোচিত উল্লাস দেখিয়া প্রাচী মনে করিয়াছিল—যে সভ্যতাকে হত্যা করা হইল তাহা হত্যারই উপযুক্ত—পশুশক্তির উপরে যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার চরম ভাগ্য ইহা বই আর কি হইতে পারে?

এই সময়, মানব-সভ্যতা অথবা মানব-সম্বন্ধের এই সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে কয়েকজন ঋষিকল্প মানব য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের জীবন ও বাণী দিয়া এই আন্তর্জাতিক ঘৃণার মধ্যে মানবতার যে সুন্দর কল্যাণমূর্ত্তি তিরোহিত হইয়া যাইতেছিল, তাহাকে আপনাদের অন্তরের ভাঙ্গা দেউলে সে দারুণ দুর্য্যোগের দিনে বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই সাধনার বলে নূতন করিয়া মানব-চেতনার মধ্যে বিশ্ব-কল্যাণের রম্য মূর্ত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। সুইজারল্যাণ্ডের ভিলা ওলগাবাসী রমাঁ রলাঁ তাঁহাদের অন্যতম। বাহিরের পশু-শক্তির সেই জঘন্য আত্ম-প্রকাশের মধ্যে, যখন এক জাতি অপর জাতিকে শুধু কামানের আলোকে চিনিতেছিল, যখন এক সভ্যতা আর এক সভ্যতাকে তুচ্ছ ও নগণ্য বলিয়া দম্ভভরে লাঞ্ছিত করিতেছিল, যখন সত্যসত্যই রক্ত-ধূমের মধ্যে গ্যেটের জার্ম্মানী, রইল্যাণ্ডের জার্ম্মানী, সেক্‌সপীয়ার শেলীর ইংলণ্ড, দান্তের ইতালী, সকলে ডুবিয়া যাইতেছিল—মানব-চিন্তার যে সমস্ত ফুলগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নানা কবি, দার্শনিক, প্রেমিক ও সাধকের বুকের রক্তে মানব-চেতনার সায়রে অমল-ধবল শতদলের মত ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেগুলি অশ্বারোহী সৈনিকের পদতলে বিমর্দ্দিত হইতে চলিয়াছিল—তখন এমন কতকগুলি ঋষির প্রয়োজন ছিল, যাঁহারা আপাত লাভ-লোকসানের বাহিরে, সদ্য-জাগ্রত তিক্ত জাতি-বিদ্বেষের উর্দ্ধে, মানবের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য, মানব-সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে আপনাদের নিবিড় ধ্যানের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখিবে। প্রত্যেক জাতিকে যেমন তাহার দেশের সীমানা রক্ষা করিতে হয়, ঠিক সেই রকমই তাহার চিন্তাগুলিকেও রক্ষা করিতে হয়। য়ুরোপের জাতিরা তাহাদের দেশের সীমা রক্ষা করিতে গিয়া তাহাদের চিন্তাগুলি হারাইতে বসিয়াছিল। যুদ্ধ-বিরতির পর শান্তির জন্য যেমন আন্তর্জাতিক বৈঠকের প্রয়োজন হইয়াছিল, ঠিক সেই রকম যুদ্ধের পরে চিন্তার জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজনের তাগিদ্ স্থূল ও প্রত্যক্ষ নয় বলিয়া সাধারণ লোকে ইহাকে সকল দেশে অল্পবিস্তর অশ্রদ্ধা করে এবং সেই কারণে যে-সমস্ত ব্যক্তি সেদিন চিন্তার জগতে আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও সাধারণের সে অশ্রদ্ধার গৌরবময় লাঞ্ছনা পরিপূর্ণ-মাত্রায় পাইয়াছিলেন— রমাঁ রলাঁকে ফ্রান্স নির্ব্বাসিত করিয়াছিল—রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার স্বদেশবাসী "বিশ্ব-প্রেমিক" বলিয়া ব্যঙ্গ করে। মৌর্য্যবংশ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—বিরাট মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সীমারেখা আজ শুধু ইতিহাসের

নজীরের মধ্যে পড়িয়া আছে—যে মহারাজ অশোক কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন জগৎ আজ তাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব করে না—কল্যাণাধর্ম্ম-উদ্বুদ্ধ যে অশোক কলিঙ্গ-বিজয়কে তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সেই শুদ্ধ-মাত্র-আমলকীসম্বল অশোককে জগৎ আজ শ্রদ্ধায় স্মরণ করিতেছে। বিশ্ব-মৈত্রীর প্রথম রাজ-প্রচারক অশোকের যুদ্ধ-বিরতির অমর-বাণী আজ পাহাড় খুঁড়িয়া মানব সন্ধান করিতেছে। কত শত বর্ষ আগে এক ভিক্ষু মহারাজের সেই বাণীই আজ দেখিতেছি নানা রূপে নানা দিকে সাম্যবাদ হইতে লীগ অব নেশন্‌সের মূলে শক্তি জোগাইতেছে। ভিলা ওল্‌গাবাসী বিংশ-শতাব্দীর ঋষির দিকে চাহিয়া মনে পড়ে অতীত কালের আর এক মহাদৃশ্য,—কলিঙ্গের রণক্ষেত্রে নিহত অগণিত মানবের শবদেহের মধ্যে মহারাজ অশোকের আত্ম-ত্রুটী-স্বীকার। এত বড় ত্রুটী-স্বীকার জগতের ইতিহাসে বিরল।

বলিতেছিলাম যে, বিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপের সভ্যতাকে য়ুরোপের জাতিরা যখন পদদলিত করিতেছিল, তখন রমাঁ রলাঁ সেই আদর্শকে মরণের হাত হইতে বাঁচাইয়া নিজের ধ্যানের মধ্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিলেন। পুরাকালে যুদ্ধের সময় নগর-লক্ষ্মীরা নগরের প্রধান মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিত, সেই রকম মহাযুদ্ধের সময় য়ুরোপের সভ্যতা রলাঁর বাণী-মন্দিরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে; এবং সভ্যতার একনিষ্ঠ পুরোহিত সকল রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার ও ভয়ের অতীত হইয়া বিনিদ্র রজনী চির-প্রহরীর মত সেই সভ্যতাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার এক দিক সেদিন য়ুরোপের রণক্ষেত্রে জগৎ স্পষ্ট করিয়া দেখিয়াছে এবং দেখিয়া পশ্চিমকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে; পাশ্চাত্য সভ্যতার আর একদিক, যাহার বলে সত্যসত্যই সে আজ জগতে নবযুগের চেতনা আনিয়াছে, রহস্যকে অতিক্রম করিবার জন্য যেখানে তাহার চিন্তার ও সাধনার সপ্ত অশ্ব তীব্রবেগে চলিয়াছে, যেখানে এখনো প্রমিথিয়ুসের আত্মা আত্ম-প্রতিষ্ঠার সবল তেজে দেদীপ্যমান, সেইদিক রলাঁর সাহিত্যে ও সাধনায় জাগ্রত রহিল। যে ঘৃণা য়ুরোপীয় জাতিরা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা রলাঁর সাহিত্য ও সাধনা পুনরায় প্রেম ও সৌহার্দ্দ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিল। কাইজার, হিণ্ডেন-বার্গ, কিচনারের নামের উপরে জাঁ ক্রিসতফের নাম অনাগত মানব অধিকতর শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করিবে—কারণ ঐ নামের আড়ালে তাহারা অধিকতর প্রয়োজনীয় জিনিষ পাইবে।

কিন্তু, সেই মহাযুদ্ধের সময়, যখন প্রত্যেক য়ুরোপীয় জাতি তাহার শেষ যুবকটী পর্য্যন্ত রণক্ষেত্রে বলি দিতে প্রস্তুত, সেই উগ্র ও অন্ধ মৃত্যু-মাদকতার মধ্যে বিশ্ব-জনীনতার আদর্শ প্রচার করা এবং এই যুদ্ধকে পশু-শক্তির লীলা বলিয়া দিনের পর দিন মানব-চেতনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা রলাঁর পক্ষে নিরাপদ তো ছিলই না—এত বড় যাতনার সংগ্রাম বোধ হয় সেদিন য়ুরোপের রণক্ষেত্রে আর কাহাকেও ভুগিতে হয় নাই। প্রত্যেক জাতিই রলাঁর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল;—ফ্রান্স তো বেশী;—প্রত্যেক দেশের কাগজ তাঁহার লেখা ফিরাইয়া দিতে লাগিল। কেহ কেহ ছাপিল বটে, কিন্তু আগাগোড়া বাদ দিয়া প্রবন্ধের মানে পর্য্যন্ত বদলাইয়া। অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি ও চিন্তানায়কদের নিকট তিনি আবেদন করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহারা অন্ততঃ এই হিংসা ও দ্বেষের মধ্যে যোগ না দিয়া যাহাতে সভ্যতার মূল আদর্শগুলি অব্যাহত থাকে এবং এই যুদ্ধের ফলাফল যাহাতে জাতির অনাগত ভাগ্য-বিধাতাদের মধ্যে বিষময় ফল না ফুটাইয়া তোলে, তাহার জন্য চিন্তার জগতে আর এক সংগ্রাম করিতে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাহাও বিফল হইল। আনাতোল ফ্রান্স তখন ফরাসী সৈনিকদের উত্তেজিত করিবার জন্য যুদ্ধের সীমান্ত-প্রদেশে নিত্য-নূতন উত্তেজনা-মূলক লেখা লিখিয়া পাঠাইতেছেন; জার্ম্মাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার কবি হাউটম্যান তখন জার্ম্মাণ-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য "ফাদারল্যাণ্ডের" নব-তন আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন। য়ুরোপের প্রত্যেক দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরা প্রত্যেকেই প্রচার করিতে লাগিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের জাতি, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করিতেছে; আর বিপক্ষর অন্যায় ও অধর্ম্মের জন্য নিপাত যাইবে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নোবেল-প্রাইজের অধিকারী, বিশ্বমানব-কল্যাণের বার্ত্তাবহ। কিপলিঙ, দ্যন্থুন্‌জিও, দেহ্‌মেল, দ্যরেণিয়ে যুদ্ধের জয়-গান গাহিতে লাগিলেন;—যে কবি নীল পাখীর সন্ধানে মানব-চেতনার স্বপ্ন লোকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন, সেই মেত্যার-লিঙ্কের কলমের ডগায় বিষ-বিদ্বেষ ছড়াইয়া পড়িল,—অশীতি-পর জগৎমান্য বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক Wundt জার্ম্মাণ যুবকদের বক্তৃতা দিলেন, যুদ্ধে যাও—এ যুদ্ধ পবিত্র! বার্গসোঁ ও-ধারে ফ্রান্সে

moral scienceএর academyর প্রেসিডেণ্ট রূপে ফরাসী যুবকদের বলিলেন,—যুদ্ধে যাও—এই যুদ্ধ জার্ম্মাণ বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয়! ইংলণ্ডের পাদ্রীরা গির্জ্জায় আসিয়া ক্রশ্-বিদ্ধ যিশুর সম্মুখে জার্ম্মাণ বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের জয়লাভ প্রার্থনা করিল; জার্ম্মাণ পুরোহিতরা গির্জ্জায় আসিয়া সেই ক্রশ-বিদ্ধ যিশুর সম্মুখে বৃটীশ-সাম্রাজ্যবাদের নিপাত কামনা করিল! গির্জ্জার অভ্যন্তরের ভারাক্রান্ত অন্ধকারে ক্রশ-বিদ্ধ মহামানবের অঙ্গে আরও একটী লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করা হইল।

১৯১৪ সালে ২৯ শে আগষ্ট জার্ম্মাণ সৈন্যরা লুভাঁ নগর ধ্বংস করিয়া ফেলে। লুভাঁ নগর প্রাচীনকাল হইতে য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র ও শিল্পকলার সংরক্ষণাগার ছিল। এই নগর ধ্বংসের সহিত এতদিনের সমস্ত সংরক্ষিত সাধনার ধন বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই সংবাদ পাইয়া রোঁলা জার্ম্মাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি Gerhart Homptmannএর নিকট এক পত্র লেখেন। অশোকের শিলালিপির মত একদিন এই পত্র-খানি কোন্ এক অদূর ভবিষ্য যুগে, যখন আবার স্বার্থে স্বার্থে আঘাত লাগিবে, জাতি-প্রেম যখন উদগ্র হইয়া আবার মানব-রক্তে নব দীক্ষা গ্রহণ করিবে, এক জাতিকে ধ্বংস করিয়া অপর জাতি যখন আত্মপ্রসার করিয়া সভ্যতার দম্ভ করিবে,—সেই অন্ধকার কালে এই পত্রখানি হয় ত তখনকার আর কোনও তরুণ হৃদয়ে কল্পনার মহা-স্পর্শে ভাবের নব-শক্তি জাগ্রত করিয়া দিবে। আজিকার এই বাণী সেদিন হয় ত বাণীরূপ হইতে কর্ম্মরূপে পরিণত হইবে; আজিকার কল্পনা যাহাকে অলস বলিয়া উড়াইয়া দিলে প্রতিবাদ করিবার কিছুই থাকে না—সেদিন তাহা বাস্তবে রূপ গ্রহণ করিবে, বুদ্ধের বাণী একদিন যেমন অশোকের কর্ম্মে জাগ্রত মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছিল। জার্ম্মাণ সৈনিক কর্ত্তৃক লুভাঁ শহর ধ্বংসের সংবাদ শুনিয়া রঁম্যা রলাঁ জার্ম্মাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন। পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, অনুবাদের মধ্য দিয়া মূলের শক্তি ও তেজকে কিছুমাত্র আনা যায় নাই,—এ ত্রুটী স্বীকার করিতে অনুবাদক লজ্জিত নহেন।

"গেরহার্ট হাউটম্যান, যে সমস্ত ফরাসীরা জার্ম্মাণদের বর্ব্বর মনে করে, আমি তাহাদের কেহই নই। আপনার জাতির গৌরব ও সাধনার কাহিনী আমি অন্তর দিয়া জানি। পুরাতন জার্ম্মাণীর চিন্তা-নায়কদের নিকট আমি যে কত ঋণী, সে আমি বিশেষ ভাবেই জানি। আপনাদের দেশের,—আপনাদের দেশের কেন, সকল দেশের মহাকবি গ্যেটের অমর বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি 'আজ আমরা এমন যায়গায় আসিয়াছি যেখানে এক জাতিকে অপর জাতির দুঃখ বেদনা বুঝিতেই হইবে।' আমি আজীবন ধরিয়া আপনার ও আমার এই দুই জাতির অন্তরের সাধনার সমন্বয় ঘটাইবার জন্য সকল মুহূর্ত্ত উৎসর্গীকৃত করিয়াছি এবং এই ভয়াবহ যুদ্ধের কোনও ফলাফল আমার অন্তরের সেই সমন্বয়-প্রেরণাকে ঘৃণায় কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

"আজ জার্ম্মাণী আমার অন্তরে যতই তীব্রতম বেদনার শিহরণ জাগাইয়া তুলুক না কেন, জার্ম্মাণ নীতিকে আজ পশুর নীতি বলিয়া বিবেচনা করিবার যতই কেন যুক্তি থাকুক, আমি কখনই জার্ম্মাণ জাতিকে—যে জাতির উপরে আজ কয়েকজন শক্তি-মদমত্ত রাজপুরুষ আপনাদের বাসনার বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে—সেই জার্ম্মাণ জাতিকে এই মহাযুদ্ধের কোনও পাপের জন্য আমি দায়ী করি না। আপনাদের মত আমি যুদ্ধকে দৈবভাগ্য বলিয়া মনে করি না। ফরাসীরা অন্ধ ভাগ্যকে স্বীকার করে না। দৈব শুধু কাপুরুষতার আবরণ মাত্র—আত্মাহীন মনের অলস ছলনা। জাতির নির্ব্বুদ্ধিতা ও অন্ধ অহমিকা হইতেই যুদ্ধের উদ্ভব। তাই এই মহাযুদ্ধ দেখিয়া ঘৃণা করা অপেক্ষা করুণা করা শ্রেয়। আমাদের দুঃখের জন্য তোমাদের দায়ী করিব না, কারণ তোমাদেরও দুঃখ ও দৈন্য কম হইবে না। ফ্রান্স যদি আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, জার্ম্মাণীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তোমাদের সৈন্যরা যখন বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া সেখানে প্রবেশ করিল, তখনও আমি প্রতিবাদ করি নাই। এই স্বেচ্ছাকৃত জাতিগত সম্মানের অপমান করা, আমি জানি, জার্ম্মাণ রাজাদের বহুকালের অর্জ্জিত গুণ। তাই তাহাতে আমি বিস্মিত হই নাই।

"বেলজিয়ামের ধ্বংস করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট হও নাই,—তোমরা জগতের সব চেয়ে জঘন্য ও কাপুরুষতার কাজ করিয়াছ। তোমরা মৃতদের উপর যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছ—একটা জাতির অতীত কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছ। লুভাঁ শহর আজ তাহার সকল কীর্ত্তির সহিত ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। বহু যুগের বহু মানবের পবিত্র সাধনা আজ

তোমরা জগৎ থেকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিলে! হাউটম্যান, অতঃপর তোমরা যদি আপনাদের বর্ব্বর বলিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলে জগৎকে জানাইয়া দাও কি বিশেষণে তোমাদের অভিহিত করা যাইতে পারে? তোমরা গ্যেটের না আটিলা হুনের পুত্র-প্রপৌত্র? তোমরা তোমাদের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, না মানবাত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছ? যত খুসী মানুষ মার, কিন্তু মানুষের কীর্ত্তির গায়ে আঘাত করিও না। একটা জাতির কীর্ত্তি সকল মানবের দৈব-সম্পত্তি। প্রত্যেকেই সেই দৈব-সম্পত্তির সরীক্ এবং রক্ষক। তাই আমার অনুরোধ, সেই রক্ষকের পবিত্রতা হইতে চ্যুত হইয়া তোমরা তোমাদের জাতির উপর এত বড় কলঙ্ক আনিতে দিও না। য়ুরোপের সভ্যতার নামে, যুগযুগবাহী মানব সভ্যতার নামে, তোমার জাতির গৌরবের নামে, গারহার্ট হাউটম্যান, আমি তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে জার্ম্মাণীর সকল কবি, দার্শনিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিককে এই ভীষণ অপরাধে অপরাধী করিয়া যাইব—যদি তোমরা এই বর্ব্বরতার প্রতিবাদ না কর।

"তোমার নিকট হইতে উত্তরের আশায় রহিলাম। মনে রাখিও এই সময় নীরবতা মানে নিরপেক্ষতা নয়।"

কিন্তু, জগতের অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, জার্ম্মণীর কবি অবশ্য নিরুত্তর থাকেন নাই, তবে যে উত্তর রঁলা চাহিয়াছিলেন, সে উত্তর হাউটম্যান দিতে পারেন নাই। সমস্ত জার্ম্মাণ প্রেস রঁলার এই চিঠিকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল। একটী কাগজ স্পষ্ট লিখিয়াছিল—Perish every chef-d' œnore rather then one German soldier। টমাস ম্যান নামক একজন জার্ম্মাণ কবি যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া বলিলেন, "শান্তিতে মানুষের সকল শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। অলস বিশ্রাম শক্তির সমাধি স্থান। আইন-কানুন শুধু দুর্ব্বলের বন্ধু, যে আত্মরক্ষা করিতে পারে না তাহারই সহায়ক। একমাত্র যুদ্ধ অলস শান্ত জীবন চূর্ণ করিয়া শক্তির নব নব স্ফুরণ আনিয়া দেয়।" স্পেনের গৌরব, বর্ত্তমান জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক Miguel de Unamuns এই সমস্ত জার্ম্মাণ লেখকদের 'pedants of barbarism' নামে অভিহিত করেন।

মহাযুদ্ধের অগ্নি-শিখা থামিয়া গিয়াছে, অনেকের ধারণা পুনরায় আরও ভীষণ মূর্ত্তিতে জ্বলিয়া উঠিবে বলিয়া। আজ আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য নানা দিক দিয়া, নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া কোনও দিন শক্তি-মদ-মত্ত জাতিরা আপনাদের অদম্য লোভের বাসনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। জাতির অন্তরকে আজ শোধন করা প্রয়োজন এবং সে কাজ পারে একমাত্র জাতির কাব্য-সাহিত্য। সুখের বিষয় আজ জগতের সকল সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই বিরাট সাধনা সজাগ ভাবে চলিতেছে, এবং প্রত্যেক জাতির যৌবন আজ এক বৃহত্তর জাগতিক কল্যাণের স্পৃহার মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। ১৯১৪ সালের রণ-হুংকারের মধ্যে ভিলা ওল্গার ঋষি একদিন মানবের প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে যে চির-মিলনের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আজ ধীরে ধীরে য়ুরোপ ছাড়াইয়া, এশিয়া ছাড়াইয়া, জগৎ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছে। Peer Holmএর আদর্শ আজ ধীরে ধীরে খণ্ড ভাবে প্রত্যেক যুদ্ধ জীবন-রসে রসিক যুবকের মনে জাগিয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশে সে বিরাট আদর্শ আনিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার কাব্যালোকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে এক নূতন ভারত জাগিয়া উঠিতেছে। যে পিপাসাকে গ্রীকেরা Divine বলিয়া শ্রদ্ধা করিত, সেই পিপাসা বাঙ্গলার যৌবনের বুকে আবার জমা হইয়া উঠিতেছে—বহু দিনের অলস তন্ত্রীগুলি আবার স্পর্শের আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর হইয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষার বেদী প্রস্তুত হইতেছে—তাহাতেই তো কর্ম্মের মহীরুহ জাগিয়া উঠিবে।

শাশুড়ী—বৌ

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি-এ

এ-পিট

এ কি হ'ল ? ছেলে বেশী বয়সে বিয়ে করলে বলে আমি অনেক কষ্টে ভাল ঘরের লেখাপড়া-জানা বেশী বয়সের বড় মেয়ে দেখে বিয়ে দিলাম—কিন্তু বৌমাকে ত আপনার করতে পারলাম না! নিজের মেয়েকে পরের ঘরে পাঠিয়ে ভেবেছিলাম যে পরের মেয়ে দিয়ে সে অভাব পূরণ করব; কিন্তু কৈ বৌমা ত আমার বুক ভরে দিলে না? কার দোষ?

আমার যখন বিয়ে হয়েছিল—তখন আমার বয়স ছিল ন' বছর। এ বাড়ীতে এসেই আমার শাশুড়ীর কোলে বসেছিলাম—বড় ননদকে দিদির মতই ভালবাসতাম—ভয় করতাম; আমার সমবয়সী ননদ ও দেওরের সঙ্গে খেলা করতাম। শাশুড়ীর আদর পেতাম আবার বকুনীও খেতাম —মনে হত' এক মা'র কোল হতে আর এক মা'র কোলে এসেছি। কৈ কখন ত এমন পর-পর মনে হয় নি। যখন নিজের মা-বোনের জন্য মন-কেমন করত, তখন শাশুড়ীর কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতাম। তখন এ'টা কখনও মনে হয় নি যে, আমি যেন অন্য বাগানের পোঁতা গাছ—শিকড়-সুদ্ধ কে আমাকে তুলে এদের বাগানে পুঁতে দিয়েছে—মনে হ'ত মা'র কোল হ'তে খ'সে এদের মাটীতে পড়ে ফুল হ'য়ে ফুটে উঠছি।

আজকাল সকলেই বলছে যে বাল্য-বিবাহ বড় খারাপ; কেন না শারীরিক ও মানসিক পূর্ণতা পাওয়ার আগে স্ত্রী বা মা হওয়াতেই না কি আমাদের দেশের এতটা অবনতি। কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে তা' বলতে পারি না; কেন না, দিন-কাল একেবারেই বদলে গেছে—আমাদের সেকালের পুরুষ-দের শিক্ষা-দীক্ষা, ধরণ-ধারণ, চাল-চলন, আর সেই সেকালের গৃহিণীদের যে শাসন, তা' নেই। এখন ছেলে-মেয়েদের ভাবই আলাদা। আজকালকার ছেলেদের 'শিক্ষা'ই অন্য রকম হয়ে পড়েছে। তারা কলেজে পড়ে, বড় বড় নাটক নভেল কাব্য পড়ে—তারা বিয়ে হ'তে না হ'তে জীবনে কাব্যের অনুসন্ধান করে এবং নব-বিবাহিতা বালিকার নিকট সে কাব্যের জীবন্ত মূর্ত্তি আশা করে। আমরা ছিলাম অন্য রকম। আমাদের সময় কর্ত্তারা এত কাব্য জানতেন না। তাঁদের শিক্ষার ভিতর এমন একটা সংযম, এমন একটা স্বাভাবিক ও শোভন ভব্যতা ও লজ্জাশীলতা ছিল যে, তাহাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা কখন বিকৃত হয় নাই—গোপন চারিতা তাঁদের স্বভাবের মধ্যে তখন প্রবেশ করে নাই। যা'ক এ-সব কথা—আমি ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত গাহিতেছি। বলিতে গিয়াছিলাম আমার সঙ্গে বৌমার ব্যবহার, আরম্ভ করিয়া দিলাম সামাজিক সমস্যা! বুড়া হ'লে মানুষ বকতেই ভালবাসে—আর ভালবাসে তাদের সেই পুরান দিন-কালের কথা। আর সেই জন্যই বোধ হয় এ-কালের ছেলেপুলেরা আমাদের সুনজরে দেখতে পারে না।

যা'ক—এখন আমি যা' বলছিলাম, তা' গোড়া হ'তেই বলি! ছেলে বিয়ে করে বৌ নিয়ে এল—আমি কত আহ্লাদে বৌকে কোলে করে পাল্কী হতে নাবাতে গেলাম। ও মা! সতের-আঠার বছরের মেয়েকে কোলে করি সে সাধ্য কি আর আমার আছে! আর বৌমা আমার অবস্থা দেখে যেন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলেন,—তাড়াতাড়ি বলে ফেল্লেন, "থাক্ মা, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।"—কথাটা কিছুই নয়—তবু তাই শুনে পাড়ার বর্ষীয়সীরা অবাক্ হয়ে গালে হাত দিলেন। আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। বৌমার কিন্তু অপ্রতিভ হওয়ার কোন ভাবই দেখলাম না। বৌমার সুন্দর মুখখানিতে এমন একটা সরল লজ্জাশীলতা ছিল, যা'তে আমার মনে কোন ক্ষোভ হয় নাই। তার কথা বলার ভঙ্গীতেও কোন বেহায়াপনা ত' ছিল না, বরং সরলতা ছিল—কিন্তু তবু যেন কেমন খট্‌কা লাগল।

তার পর যখন শুভ আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম্ম সেরে আমার বড় মেয়ে মাধুরী বৌমাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড়-চোপড় বদ্‌লোবার সাহায্য করতে গেল, তখন বৌমা বেশ সপ্রতিভ সরল ভাবেই বল্লেন—"দিদি, আপনি কষ্ট করবেন না! আমাকে নাবার ঘরটা দেখিয়ে দিন—আমি কাপড় ছেড়ে নিচ্ছি!" মাধুরী একটু থমকে গেল। আমাদের পাড়াগাঁয়ের সেকেলে বাড়ী—নাবার ঘর বলে কোন বালাই নাই। মাধুরী চালাক মেয়ে—সে ঝিকে বৌমার কাপড়ের বাক্সটা সুদ্ধ প্রাচীরঘেরা কুয়াতলায় পৌঁছে দিলে। দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই বৌমা কাপড় বদ্‌লে এলেন; কিন্তু নূতন বৌয়ের এই স্বাধীনতাটা সকলের যে ভাল লাগল তা বলতে পারি নে।

প্রথম দিনের এই সামান্য ঘটনা এত করে বলবার মানে—আমাদের কালের ছোট্ট ক'নে-বৌটি ও আজকালকার মেয়েদের ধরণ-ধারণের পার্থক্য দেখান মাত্র। আর এই সামান্য ঘটনাতেই আমার সেকেলে মনে কি হয়েছিল তাই দেখান। তার পর, বিয়ের পর বৌমা আমাদের বাড়ী সাত দিন ছিলেন। এক দিকে তাঁর সরল ব্যবহার, বাধ্যতা ও গৃহকর্ম্মে দক্ষতা দেখে আমার যেমন আহ্লাদ হ'ত, অন্য দিকে তাঁর স্বাধীন ব্যবহারে মনটাতে তেমনি আঘাত লাগত। এক দিকে পাড়ার গৃহিণীরা যেমন বৌমাকে 'বেহায়া' বল্লেন, পক্ষান্তরে একালের মেয়েরা তেমনি তাঁর সুখ্যাতিতে চতুর্ম্মুখ হয়ে উঠল,—একাল ও সেকালের বিরোধ যেন মূর্ত্তি লাভ করলে।

কর্ত্তাকে বল্লাম,—তিনি হেসে উঠে বল্লেন, "পাগল! আমাদের সেকাল কি আর আছে? তোমার ভয় হচ্ছে—হাত চেয়ে আম বড় হ'ল। হাতে করে ছোট মেয়েকে মানুষ করবার, ছোট হ'তে বড় করে তোলবার যে সুখ তা' পেলে না। তার জন্যে দুঃখু করো না। ছেলে বড় হয়েছে—এখনও কি তোমার আঁচল ধরে বেড়াবে। এখন ওরা আপনার আইডিয়া মত জীবনটাকে গড়ে তুলুক—বুড়াবুড়ীদের এখন পেন্‌সেন্‌। তা' ছাড়া, আমরা যদি আমাদের পঞ্চাশ বছর আগেকার আইডিয়া ওদের ঘাড়ে চাপাতে চাই, তাতে ওদেরও সুখ হবে না, আর আমরাও ভাল করতে গিয়ে নিজেরাই অসুখী হ'ব—আর হয় ত ওদের শ্রদ্ধাও হারাব।"

আমি শুনে চুপ করে রইলাম। কথাটা ভাববার বটে। কিন্তু অনভ্যস্ত বলে মনটাতে খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল—কোথায় ছেলে-বৌ নিয়ে পুতুল-খেলা করে সুখী হ'ব, না—নিজের সারা জীবনের সংস্কারগুলোকে আবার ভেঙ্গে গড়তে হবে!

বৌমাকে বিয়ের পর "ধূলো পায়ে বসত" করিয়ে রেখেছিলাম। মাস ছয়েক পরেই শুভদিন দেখে আনিয়ে নিলাম। বৌমাকে যতই দেখছি—দুটো বিরুদ্ধ ভাব আমার মনের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। দেখছি, বৌমার মা তাঁকে গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম, শিল্প-কাজ এবং গৃহস্থ ঘরের চলনসই লেখাপড়া বেশই শিখিয়েছেন। যা শেখাতে পারেন নাই বা শেখান নি, সেটা হচ্ছে—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কতটা লজ্জা করতে হয়, এবং কি পরিমাণ লজ্জা করলে মেয়েরা গিন্নি-বান্নীদের সুখ্যাতি পেতে পারে। বোধ হয় সে দোষটা আমার বেহাইমশায়ের কৃত।

বৌমা এখানে এসেই আমাকে ত রান্নাঘর হতে বিদায় করতে চা'ন। তা দেখলাম—বৌমা রান্নাটি বেশ করতে শিখেছেন; তবে আমাদের ঘরের যতটা শুচিতা, তা' জানেন না। দু'চার দিনেই ভাঁড়ার-ঘরটাকে ঝেড়েঝুড়ে তক্‌তকে করে তুল্লেন। সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ের কাছে আমি এতটা আশা করি নাই। নিজের ঘরটিকে এমন পরিপাটী করে' সামান্য জিনিসেই সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলেন যে, আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার লজ্জাও হ'ল। এমনি করে বৌমাটি—আমার এতকালের অধিকৃত রান্নাঘর ও ভাঁড়ারে নিজের একটা যায়গা করে নিলেন দেখে আনন্দ যে হ'ল না তা' নয়। তবে কি একটা বেদনায় মনটা টন্‌টন্‌ করে উঠল—ভগবানই জানেন সেটা ঈর্ষা কি না। বৌ-কাঁট্‌কী হওয়ার মত স্বভাব বা শিক্ষা ত আমার নয়—তবু এ কি হল! মনে হ'তে লাগল যে গৃহস্থালী আমি এত বৎসর ধরে ধীরে ধীরে ছোট ছেলেকে মানুষ করার মত গড়ে তুলেছি—তা কি প্রাণ ধরে আর কারো হাতে সঁপে দিতে পারি। একদিন দিতে হবে তা জানি—কিন্তু আজই! কর্ত্তাকে আমি মাঝে মাঝে বলি। তিনি হেসে উঠেন। কিন্তু আমি সব কথা ঠিক করে বুঝাইতে পারি না। বৌমার গুণপনা নিয়ে কি নালিশ চলে! তবু বেদনা ত রয়েই যায়।

আর, আমার ছেলে! ওরে অকৃতজ্ঞ, এত দিন কোথায়

ছিল তোর বৌ। আমি বুকের রক্ত দিয়ে তোকে এত বড় করেছি। আমার হাতের রান্না না খেলে—নিজে সাম্‌নে বসে না খাওয়ালে যে তোর পেট ভরত না। আর আজ! ছেলে এখনও আফিস হ'তে এসে "মা খেতে দাও, ক্ষিদে পেয়েছে" বলিয়া দাঁড়ায়; কিন্তু সেটা যে কতটা অভ্যাসের বশে, আর কতটা দরকারের টানে তার পার্থক্য আমি বুঝি! বলি—"বৌমা, সতুর চা'টা করে নিয়ে এস—খাবার ঐ আলমারীতে আছে"—বলি, কিন্তু একটা অজ্ঞাত বেদনায় বুকটা টন্ টন্ করে উঠে; কেন না, মায়ের মন ঠিক বোঝে আর ছেলের মা'কে দরকার নেই—ওকে দেখবার আর একজন লোক হয়েছে। কর্ত্তাকে আমার মনের ভাবটা বল্লাম। তিনি হেসে বল্লেন—"এখন ওদের জীবন—'সোনার ধানে গিয়েছি ভরি' আর ওদের ছোট তরীতে আমাদের স্থান নেই।"

কিন্তু মার অবুঝ মন! এমনি করেই বুঝি পরের মেয়ের উপর পুত্র স্নেহান্ধ মাতৃহৃদয় বিমুখ হয়ে উঠে। নারীর হৃদয় এমনি দুর্বোধ্য। বৌ-কাঁটকীর বুঝি এমনি করিয়া সৃষ্টি হয়। কর্ত্তা দেখেন আর হাসেন। পুরুষগুলা ছাই বোঝে!

ও-পিঠ

মা গো! এ কি হল! আমার নূতন জীবনের রঙ্গিন কল্পনা—বাস্তবের আঘাতে কোথায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। জীবন-প্রভাতে আকাশে যে রংএর মেলা আমার জীবনকে রঙিয়ে দিয়েছিল, সংসারের ফুৎকারে সে সব কোথায় মিলিয়ে যেতে বসল।

আমি প্রবাসী বাঙ্গালীর মেয়ে—বাঙ্গলা দেশের আব-হাওয়া ত কিছুই জানতাম না। এতদিন আমি পিতা-মাতার স্নেহ-বেষ্টনের মধ্যে মানুষ হয়েছি—বাহিরের আঘাত পাই নাই। আমার মা জননী আমাকে বড় যত্নে সব-রকম শিক্ষা দিয়াছিলেন—বাবা আমাকে একটা উঁচু আদর্শে গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। বাবার অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না; তিনি জানতেন যে আমাকে গৃহস্থ-ঘরেই পড়তে হবে। কিন্তু সব জেনেও বাবা বা মা আমাকে কোন প্রকার নীচতার দিক দিয়ে যাইতে দেন নাই। বাবা ত আমাকে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষার কোন পার্থক্য করেন নাই—আমি যে বড় হইতেছি, সে কথা আমাদের সেই দূর-প্রবাসে কেহ জানাইয়া দেয় নাই। বাহিরের সঙ্গে আমার ত কোনই যোগ ছিল না। কাজেই পুরান কালের লোকের ও পাড়াগাঁয়ের সমাজের সঙ্গে আমার যে কোথায় ঠেকিবে, তাহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। পিতামাতা আমার শিক্ষার এই যায়গাতেই ভুল করেছিলেন।

তার পর আমার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। শুনিলাম—স্বামী বেশ সুশিক্ষিত, শ্বশুর বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ; শাশুড়ীও শুনিলাম খুব ভাল লোক। পিতামাতার আনন্দ ধরে না,—সবই ত বেশ ভাল হইল! কিন্তু লোক-লোচনের অজ্ঞাতে কোথায় যে ছিদ্র রহিয়া গিয়াছিল, তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আমার এ কাহিনী পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন—আমি অসুখী হইয়াছি। আমার মহাদেবের মত শ্বশুর, অন্নপূর্ণার মত শাশুড়ী এবং সুশিক্ষিত উদার-হৃদয় স্বামী—আমার মত সুখী কয়জন? কিন্তু—তবু এ কি হইল!

বাস্তব জগতের আঘাত অনুভব করিলাম প্রথম যে দিন বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ী গেলাম। আমার আনন্দময়ী শাশুড়ী-ঠাকুরাণ বড় আদর করিয়া কনে-বৌকে চিরাগত প্রথা-মত কোলে করিয়া পাল্কী হইতে নাগাইতে আসিয়া, ধেড়ে বৌ দেখিয়া থমকিয়া গেলেন। আমি তাঁর অবস্থা বুঝিয়া, আমি যে নূতন বৌ সে কথা ভুলিয়া, বলিয়া ফেলিলাম—"মা, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।" কথাটা বলিয়াই বুঝিলাম, ভুল করিয়াছি—'কনে বৌ'-সুলভ লজ্জা দেখান উচিত ছিল। এ কথা সমাগতা বর্ষিয়সীদের মুখের বাঁকা হাসি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কি করিব?—এ বিষয়ে যে লজ্জা করিতে হয়—সে কথা আমায় ত কেহ শিখায় নাই। আমার 'বালিকা-সুলভ' স্বভাবের মধ্যে এ রকম অকারণ লজ্জার স্থান কোথায় ছিল! আমার এই বেহায়াপনায় শাশুড়ী-ঠাকুরাণী কষ্ট পাইলেন—তাহা বুঝিতে পারিলাম। তিনি চিরকালের প্রথা-মত কনে-বৌকে কোলে করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁরা ত জানতেন যে আমার বয়স ষোল-সতের; বাবা ত আমার বয়স লুকান নাই। আর তাঁরা ত বড় মেয়ে দেখেই বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। তবে লাল-চেলী-মোড়া গৌরীকে কোলে করিবার আশা কেন করিয়াছিলেন!

শ্বশুরবাড়ীর এই প্রথম অভিজ্ঞতাটা উভয় পক্ষেরই যে ভুল বোঝার সূত্রপাত করিল, তাহা আমরা দু'জনেই বুঝিলাম। এমনি করিয়া এ-কাল ও সে-কালের আইডিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইল।

এঁদের সেকেলে বৃহৎ বাড়ী—সব ব্যবস্থাই সেকালের বড় গৃহস্থের মত—আমাদের প্রবাসী জীবন-যাত্রার সঙ্গে অনেক স্থলে মেলে না। এঁরা বোধ হয় চাহিয়াছিলেন একটি ছোট্ট মেয়ে যাহাকে তাঁরা ভাঙ্গিয়া নিজেদের আদর্শে গড়িয়া তুলিবেন। আর পেলেন একটা ধাড়ী মেয়ে যা'র শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—আর ভাঙ্গিয়া গড়া চলিবে না। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী—দেখতে যেমন অন্নপূর্ণার মত, স্বভাবটি তেমনি কোমল। তিনি ন'বছর বয়সে এখানে এসেছিলেন—আর এতদিন তিনি সকলের সমানভাবে সেবা করিয়া আসিতেছেন। এত বড় গৃহস্থালীটা তিনি তাঁর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর হইতে একলাই চালাইয়া আসিতেছেন। —রান্না ও ভাঁড়ার ঘর তাঁহার রাজত্ব, আর এখানে তিনি একছত্র-সম্রাজ্ঞী। তিনি যে 'মা'—এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না—তিনি সমস্ত সংসারটার একমাত্র পালয়িত্রী। তাঁর সামনে আমার শ্বশুরকে ভিখারী মহাদেবের মত মনে হইত।

তিনি যে লেখাপড়া না জানেন তাও নয়। তবে কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের পর বঙ্কিম ও হেমচন্দ্র ছাড়া আর কোন লেখকের অস্তিত্ব তাঁর অজ্ঞাত ছিল। তাঁর ছেলে-মেয়েগুলি—তাঁর কাছে এখনও যেন শিশু—এখনও তারা ছেলেবেলাকার মত—"মা ক্ষিদে পেয়েছে—খেতে দাও" বলিয়া দাঁড়ায়। আমার দেখে কেমন মনে হয়! আবার তাঁকে দেখিলে আমার মাকে মনে পড়ে—আমিও নিজের অজ্ঞাতসারে—বালিকার মতই তাঁর কাছে খাবার চেয়ে বসি! সেও কি আমার দোষ! নূতন বৌ খাবার চেয়ে খায়—এটা যে কত বড় বেহায়াপনা—সেটা ত আমি বুঝতে পারি নাই! এটা যে একটা লজ্জার কথা, তা ত আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি ত দেখতে পাই—বাংলার পাড়া-গাঁয়ের মেয়েদের এমন কতকগুলা ব্যবহার আছে—এমন সব রসিকতা আছে—যা' দেখলে বা শুনলে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে। আর আমার সে লজ্জা দেখলে তারা হাসে। অথচ তারাই আবার আমি মা'র কাছে খাবার চেয়েছিলাম বলে আমাকে লজ্জাহীনা বলে। যাক ও সব কথা—আমি আমার শাশুড়ীর কথা বলছিলাম। গৃহস্থালীতে তিনি একমাত্র সম্রাজ্ঞী। সেখানে যে তাঁর কতটা গৌরবের অধিকার তা আগে অনুভব করলেও—সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই। মা আমাকে গৃহকর্ম্ম ভাল করিয়াই শিখাইয়াছিলেন; আর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যেন আমি শাশুড়ীকে সকল বিষয়ে সাহায্য করি। আমি তাই অতশত না বুঝিয়া শাশুড়ীকে বলিলাম—"মা, আমাকে দিন, আমি ভাঁড়ারটা ঠিক করিয়া গোছাই" শুনিয়া শাশুড়ী চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁর মুখটা প্রথমে যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। তার পর একটু সামলাইয়া বলিলেন—"বেশ ত' বৌমা—এস, আমি ততক্ষণ রান্নাঘরের কাজটা সেরে নিই।" আমি দু'তিন দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ভাঁড়ারটাকে ঝকঝকে তকতকে করিয়া ফেলিলাম। দেখিয়া শাশুড়ীর একদিকে যেমন আনন্দ হইল—অন্যদিকে যেন মনটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তিনি মুখে বলিলেন "আর আমার ভাবনা নেই—এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।" কিন্তু শেষের দিকের কথার মধ্যে যে একটু বেদনা ছিল তাহা আমারো বুঝিতে দেরী হ'ল না। এ যেন রাজরাণীকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টার মত তাঁর মনে হ'ল। আমি নির্ব্বোধ—তবুও সাবধান হলাম না। তার পর কুটনা-কোটা নিয়ে পড়লাম। শাশুড়ীকে শুধু জিজ্ঞাসা করতাম—কি কি রান্না হ'বে। বাকী লোকজনের আন্দাজ করিয়া ঠিকমত কুট্‌না কুটিয়া রান্নাঘরে পৌছাইতাম। একদিন কি একটা পর্ব্ব ছিল। শাশুড়ীকে ব্যস্ত দেখিয়া বলিলাম—"মা আমাকে বলে দিন—আমি রাঁধবো।" তিনি বল্লেন "বেশ ত", কিন্তু তাঁর সহজ হাসিটুকু যেন একটু ম্লান হইয়া গেল। সেদিনকার রান্না বোধ হয় ভালই হয়েছিল—সকলে সুখ্যাতি করিলেন—বিশেষতঃ শ্বশুরের মুখে ত আর সুখ্যাতি ধরে না। কিন্তু হায়! আমার শিক্ষার দোষই হোক আর অদৃষ্টের দোষই হোক—শাশুড়ীকে দেখে মনে হ'ল যে, তিনি যেন আমার অনধিকার-চর্চ্চাটা ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তার পর আমার শ্বশুর মহাশয়ের আজ্ঞায় আমাকে মধ্যে মধ্যে রাঁধিতে ও খাবার তৈয়ার করিতে হইত। একদিন আমি কি একটা জিনিষ লইয়া আসিতেছিলাম—শুনিলাম, শ্বশুর মহাশয় আমার কাজ-কর্ম্মের সুখ্যাতি করিতেছেন। শাশুড়ীও তাঁর

কথায় সায় দিলেন; আর বল্লেন—"আর আমার ভাবনা নাই—এখন বৌমার উপর তোমাদের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবো।" বুঝিলাম—আমার শাশুড়ীর কোথায় বেদনা। আমার কপাল—আমি চেষ্টা করি যে, বাপের বাড়ীতে মা'কে যেমন সাহায্য করিতাম—শাশুড়ীর খাটুনিটাও তেমনি করিয়া লঘু করব—তাঁকে এ বয়সে আর বেশী খাটতে দেব না। কিন্তু এ কি হ'ল! তিনি যে অন্নপূর্ণার সিংহাসনে আছেন—আমি কি তাঁকে তা হতে বঞ্চিত করব! শাশুড়ী এ কথা কেন মনে করিলেন! আজ তাঁর বড় মেয়ে যদি এ সব কাজ করে দিত, তা হলে তিনি কি এ কথা ভাবতে পারতেন? আমার বেলায় তিনি এ পার্থক্য কেন করলেন! আমি পরের মেয়ে বলে। আমি আগে পরের ছিলাম—এখন ত আমি তাঁর কন্যাস্থানীয়! বোধ হয় এই বুড়ো-ধাড়ী বৌকে তিনি আপনার বুকে ঠিক স্থান দিতে পারছেন না। আমি দেখিতাম—তিনি নিজের ছেলেকে নিয়েও বড় মুস্কিলে পড়েছেন। যাকে তিনি এত দিন তাঁর মাতৃ হৃদয়ের সমগ্র ভালবাসা দিয়ে এত বড় করেছেন—আজ কেমন করে তাকে পরের মেয়ের হাতে ছেড়ে দেবেন! যাকে তিনি এক মুহূর্ত্ত না সামলাইলে চলিত না, আজ তাঁর সেই ছেলে যে মাতৃ-অঞ্চল ছাড়িয়া এই নব-অভ্যাগতের আঁচলে বাঁধা পড়িবে—এটা যেন তিনি ঠিক ভাবে নিতে পারছেন না। তাঁর ছেলে তেমনি করেই আগেকার মত—"মা খেতে দাও", বলে দাঁড়ায়; কিন্তু তিনি যেন কোন্‌খানে একটা পার্থক্য দেখিতে পাইতেন—তাই তিনি আমার হাতেই ছেলের ভার ছাড়িতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু এত কালের স্নেহের অধিকার কি মনে করলেই ছাড়া যায়! আমি যখন বড় হয়ে মা হব—আমিও বোধ হয় পারব না।

এমনি করে আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা ভুল বোঝার মেঘ জমিয়া উঠিতেছে। আর আমার শ্বশুর বোধ হয় কতকটা বুঝিয়াও হাসিয়া উড়াইয়া দেন। আর আমার স্বামী—তাঁকে কি এ-সব কথা বলা যায়! বলিলেও তিনি আমাকে দোষী ঠাওরাইবেন। বাস্তবিকই তাঁর দেবীর মত মা—তাঁর মনে কি কোন সঙ্কীর্ণতা আসতে পারে!

কোনও পুরুষ আমার কথা বুঝিবে না। আর মেয়েদের মধ্যেও শতকরা নব্বই জন আমাকে ভুল বুঝিবেন—কেহ বলিবেন, আমার শাশুড়ী 'বৌ কাঁটকী'; আর কেহ বলিবেন, আমিই সব গোলযোগের মূল!

মিতা

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

'মিতা' বলি ডেকেছো আদরে;
কেবল অধরে
ওই প্রিয় সম্বোধন শেষ যদি হয়,
হৃদয়ের মধুভরা কোনো পরিচয়
তার মাঝে নাহি যদি থাকে,
মিনতি তোমাকে
'মিতা'-নামে ডাকি আর
অগৌরব কোরো না আমার!

* * *

মনে রেখো, ভালোবাসা দিয়া—
রেখেছি রচিয়া
দেবতার যে আসন হৃদয়ের মাঝে,
করুণার দম্ভ তাহা কভু সবে না যে;
দূর হ'তে সম্পদেরে, তার
দিয়া নমস্কার
চির পুণ্য পদধূলি
সোহাগের, সে লইবে তুলি।

* * *

যদি তব পরাণের প্রীতি
রাখে ধরি নিতি
আমাদের মিতালির অক্ষয় হরষ
তার প্রতি বাণী আর বিমুগ্ধ পরশ
তার শুভ স্নেহ-বিনিময়,
যেন নাহি হয়
ওগো, মিতায় মিতায়
এই যোগ, সমাপ্ত চিতায়।

দর্পণ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

চৈত্র-সন্ধ্যার উতলা বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় মোটরের পরিচিত বাঁশী শুনা গেল। শুভ্রা ও সুন্দরী-মোহন ব্যস্ত হইয়া গেটের দিকে আগাইয়া গেল। জ্ঞানদাসকে একা নামিতে দেখিয়া সুন্দরীমোহন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ কি, একা যে!

জ্ঞানদাস লজ্জিত হইয়া বলিল—তিনি—এলেন না।

মাঝখানে 'কিছুতে' কথাটা জ্ঞানদাস প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছিল। অতি কষ্টে সাম্‌লাইয়া গেল।

সুন্দরীমোহনের মুখ ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু আর কিছু সে বলিল না।

শুভ্রা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—যান্, আপনার সঙ্গে আজ থেকে আমি কথাই কইব না।

সুন্দর মুখের অভিমানটুকু জ্ঞানদাসের বড়ই মধুর লাগিল। সে বলিল—আমার কোন দোষ নেই, আমি চেষ্টার ক্রুটি করিনি। তাঁর পূজা-অর্চ্চনা—বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ সেরে বেরুনোই দুষ্কর।

কথা বলিতে বলিতে তিনজনে দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষে আসিয়া পৌছিল।

সুন্দরীমোহনের উৎসাহ অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছিল। একটা আসনে বসিয়া পড়িয়া সে বলিল—তুমি কোন কাজের নও, জ্ঞান।

জ্ঞান নিরাশার ভান করিয়া বলিল—সত্যি।

শুভ্রা হাসিয়া মাথা দুলাইয়া বলিল—

তুফানে পতিত কিন্তু 'ছাড়িওনা' হাল,
আজকে বিফল হলে হ'তে পারে কাল।

সুন্দরীমোহন চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল—এসব জ্ঞানের দুষ্টামি বা চেষ্টার ক্রুটি। আচ্ছা, আমরাও আজ থেকে দেখ্‌ছি তোমার 'দুষ্টামি-ব্যূহ' ভেদ করে তাঁর কাছে পৌছুতে পারি কি না। কি বল শুভ্রা?

শুভ্রা দুষ্টামি করিয়া বলিল—নিশ্চয়ই, আমি এ বিষয়ে তোমাকে সর্ব্বক্ষণ ও সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তোমার ম্লান মুখ আমি আর দেখতে পারিনে।

সুন্দরীমোহন আশ্চর্য্য বোধ করিয়া বলিল—বটে, এ বুঝি একা আমারই ইচ্ছা। তুমি বুঝি কাল তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাও নি?

শুভ্রা বলিল—নিশ্চয় চেইছি। তবে, তোমার যতটা চাড়, আমার ততটা নয়। কি বল?

সুন্দরীমোহন ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল—না, এ তোমার বড় অন্যায়।

শুভ্রা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—কি অন্যায়? তোমার মনের এই গোপন কথাটা বলে দেওয়া?

সুন্দরীমোহন হতাশ হইয়া বলিল—না, তোমায় পেরে ওঠা অসম্ভব। আমি হার মানলাম।

শুভ্রা বলিল—'তাহলে এবার সন্ধি।' বলিয়া চট্ করিয়া স্বামীর কাছ হইতে খানিকটা দূরে সরিয়া বসিল।

সুন্দরীমোহন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কি, সরে গেলে যে? সন্ধির কি এই নিয়ম না কি?

শুভ্রা চোখ বড় করিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—লোকে বলে হার মান্‌লে 'কিসে' ছোঁয় না? আমি কি তার চেয়েও অধম?

জ্ঞানদাস স্বামী-স্ত্রীর বাক্ যুদ্ধে বাধা দিয়া বলিল—এমন বসন্ত সন্ধ্যাটা আপনারা কি বিগ্রহেই কাটাবেন? এ হচ্চে সঙ্গীতের সন্ধ্যা, কবিতার কাল।

শুভ্রা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জ্ঞানদাসের পানে চাহিয়া বলিল—আপনি অপ্রেমিক ও অকবি।

জ্ঞানদাস বিস্মিত হইয়া শুভ্রার পরিহাস-গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—এ অভিযোগের কারণ?

শুভ্রা বলিল—কারণ, প্রেমিক বা কবি হ'লে আপনি আমার এই বিবদমান্ কণ্ঠের মধ্যে সঙ্গীতও পেতেন, কাব্যেরও অভাব হ'ত না। যা হোক্, আপনার কর্ণের যখন তৃপ্তি দিতে পারলাম না—দেখা যাক্, আপনার রসনার তৃপ্তি দিতে পারি কি না।

বলিয়া শুভ্রা উঠিয়া শুভ্র, সুন্দর ও নৃত্যশীল ঢেউয়ের মত বাহির হইয়া গেল ও পরক্ষণে দুইটি রৌপ্য-পাত্রে মনোরম

ভোজ্য-দ্রব্য লইয়া প্রবেশ করিল। একটু পরেই পরিচারক আসিয়া সম্মুখস্থ একটি টিপয়ে চায়ের সরঞ্জমাদি স্থাপিত করিল।

শুভ্রা তাহার শুভ্র সুন্দর হস্তে চা প্রস্তুত করিয়া দুজনের দিকে আগাইয়া দিল। জ্ঞানদাস একবার সেই ধূমায়মান গোলাপী বর্ণের উষ্ণ পানীয়ের পানে আর একবার পানীয়-দাত্রীর অতি সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত কহিল, বাঃ, কি সুন্দর!

সুন্দরীমোহন তৎক্ষণাৎ বন্ধুর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি সুন্দর হে—চা, না চা-দাত্রী?

শুভ্রা কৃত্রিম কোপ-দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল।

জ্ঞানদাস বলিল—দুইই।

শুভ্রা কৃত্রিম কোপ বজায় রাখিয়া বলিল—তোমরা দুজনেই দুষ্ট!

কিন্তু শাস্ত্রে বলে,—অতিথি সর্ব্বথা ক্ষমার্হ অতিথির উপর ক্রোধ করিতে নাই, তাহাকে মিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট করিতে হয় ও গান শুনাইতে হয়—বলিয়া জ্ঞানদাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে শুভ্রার পানে চাহিল।

শুভ্রা কুন্দের মত শুভ্র ও ক্ষুদ্র দন্তে তাহার রক্তাভ জিহ্বা একটিবার মাত্র চাপিয়া বলিল—ঈস্, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। বলিয়া পিয়ানোর কাছে গিয়া মুখখানি যেন আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া গাহিল—

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশি ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ সেহ করি আননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকুল হোয়ল
টুটল সব সন্দেহা।
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।

গান শেষ হইয়া গেল। গান ভঙ্গের কিছুক্ষণ পরে জ্ঞানদাসের চমক ভাঙ্গিল। গান থামিয়া গেল? আহা, এমন গানকে কি এত শীঘ্র থামাতে হয়?

জ্ঞান হইলে জ্ঞানদাস সুন্দরীমোহনকে বলিল—এবার তুমি একটা গাও।

সুন্দরীমোহন ম্লান মুখে বলিল—এটা লৌকিকতা, জ্ঞান। অন্তরের অনুশাসন মানিয়া চল! আমার এই কঠোর কণ্ঠের গান শোনবার জন্য কি তুমি বাগবাজার থেকে বালিগঞ্জ এসেছ?

শুভ্রা কোন সঙ্কোচ না করিয়া বলিল—যে কণ্ঠের গান শোনবার জন্য এসেছেন, সেই কণ্ঠই না হয় গাইছে। উনি আবার যখন বালিগঞ্জ থেকে বাগবাজার যাবেন, তখন গাইবেন। কি বল?

বলিয়া স্বামীর দিকে একবার কটাক্ষ করিয়া শুভ্রা আরও দুইটি গান গাহিল। দুইটিই প্রেমের গান। কিন্তু জ্ঞানদাসের কাছে প্রথম গানটির তুলনা হয় না।

তার পর বিদায়ের পালা। দুজনে আসিয়া জ্ঞানদাসকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল। আসিবার সময়ে জ্ঞানদাস নিজেই সাগ্রহে গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছিল। যাইবার সময়ে সোফারকে চালাইবার ভার ছাড়িয়া দিয়া সে ভিতরের আসনে এক কোণে হেলান দিয়া বসিল।

গাড়ী ছুটিল।

(২)

পথ নিতান্ত কম নহে। জ্ঞানদাসের মনে হইল যেন সে এক মুহূর্ত্তে বালিগঞ্জ হইতে বাগবাজার আসিয়া পৌঁছিল। শুভ্রা গাহিয়াছে,—

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখচন্দা।

এত গান থাকিতে সে বাছিয়া বাছিয়া এ গানটি গাহিল কেন? ইহার কি কোন গূঢ় অর্থ ছিল? কে প্রিয়া? কাহার মুখচন্দ্র দেখিল? সে কি—?

'আমি' কথাটা সে মনের মধ্যেও যেন প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। ঐটুকু ভাবিতেই তাহার বক্ষ দুরু-দুরু করিয়া উঠিল।

গান গাহিবার সময়ে সে বড় মধুর দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়াছিল। কাহার মুখচন্দ্র শুভ্রা দেখিয়াছে সে কথা কি

তাহাতেই বলিয়া দেওয়া হয় নাই? এসব কথা কি অত প্রকাশ করিয়া বলিতে হয়?—না, বলিলে তাহার মাধুর্য্য থাকে?

গাড়ীতে মাত্র এই কটি কথা সে ভাবিয়াছে, আর ইহারি মধ্যে সে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল! এত শীঘ্র! এই চলন্ত গাড়ীর মধ্যে বসিয়া ঐ চিন্তাটুকুতে সে যেন পূরা একটা যুগ কাটাইয়া দিতে পারিত! শুভ্রার চিন্তা ত্যাগ করা শুভ্রার সঙ্গ ত্যাগ করার মতই তাহার কাছে তখন কঠিন হইয়াছিল। অত্যন্ত অনিচ্ছায় সে উঠিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সরস্বতী—জ্ঞানদাসের স্ত্রী—আলোকিত কক্ষে বসিয়া সন্তান-পালন ও সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক পড়িতেছিল। পার্শ্বে শয্যার উপর তাহার দুই বৎসরের শিশু পুত্র ঘুমাইতেছে। স্বামীর আসিবার শব্দ পাইয়া সে বইখানি বন্ধ করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময় জ্ঞানদাস কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

স্বামীকে দেখিয়া সরস্বতীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল—এত দেরী হ'ল যে?

জ্ঞানদাস। কি কর্ব্ব বল?—তুমি তো কোনখানে যাবে না—তোমার ত্রুটি আমাকেই সেরে নিতে হয়।

সরস্বতী। তোমার সঙ্গে আমি কোথায় যেতে রাজী নই বল? কিন্তু সন্ধ্যা হলেই খোকা যে ঘুমিয়ে পড়ে। সে সময়ে ওকে একা ফেলে যেতে আমার ভাল লাগে না—যাওয়া উচিতও নয়।

জ্ঞানদাস। কেন উচিত নয়? কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে যে ছেলে হলে একেবারে বন্দী হয়ে থাক্‌তে হবে? হারান তো কত দিনের বিশ্বাসী চাকর, তার কাছে রেখে গেলে কি ক্ষতি হয়? তার পর ঝিও রয়েছে। তুমি না গেলে এক দণ্ড চল্‌বে না, এমন তো কোন কথা নেই।

সরস্বতী। তোমাকে তো বলেছি, খোকাকে ফেলে কোথাও যেতে আমার মন সরে না। তার পর মনে কর, মা তো আস্‌তে দিতেই চান্ না; কত করে আমাকে বলে দিয়েছেন—ছেলের যেন কোন অযত্ন না হয়।

জ্ঞানদাস। আজকাল সমাজে থাক্‌তে গেলে একেবারে অত কুণো হলে চলে না। সুন্দরীমোহন একজন ভাল ব্যারিষ্টার, তার স্ত্রী শুভ্রা এক জন গ্র্যাজুয়েট্ ও সত্যিকার বিদুষী। আর হাজার হলেও আমি পাড়াগেঁয়ে জমীদার। ওদের সঙ্গে মিশ্‌লে আমাদের লাভ বই লোক্‌সান নেই।

সরস্বতী। লাভ কি তাও তো বুঝতে পারি নে। অন্ততঃ এমন কোন লাভের আশা নেই, যার জন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা করা যেতে পারে। আর তুমি পাঁড়াগায়ের জমীদার হলেও এম্-এ, বি-এল্ জমীদার। সুধু যদি তোমারই সঙ্গে থাকি, একেবারে মুখ্যু হয়ে থাক্‌বার আশঙ্কা নেই। তা ছাড়া, সত্য কথা বল্‌তে কি, আমার এখানে যেন হাঁফ বন্ধ হয়ে আসে। তুমি কল্‌কাতা আস্‌তে ভালবাস তাই আসি।

জ্ঞানদাস। আচ্ছা, তোমাকে একটা সাদা কথা জিজ্ঞাসা করি—ওদের ওখানে যেতে, শুভ্রাদের সঙ্গে আলাপ করতে তোমার কি আপত্তি?

সরস্বতী। যেতে কোন আপত্তি নেই। বেশ ত, নিয়ে চল না একদিন দুপুর বেলা, যখন তোমার বন্ধু কোর্টে থাক্‌বেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে আস্‌ব।

জ্ঞানদাস। আর আমার বন্ধু থাক্‌লেই বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

সরস্বতী। তা তো আমি বল্‌ছি নে।

জ্ঞানদাস। বল্‌ছ না? তবে কি বলছ? তোমার আপত্তিটা কি শুনি?

সরস্বতী। তা আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পার্‌ব না—আমার সংস্কারে বাধে।

জ্ঞানদাস। সুন্দরীমোহনের স্ত্রী কি করে আমার সঙ্গে কথা কন্? তিনি পারেন—তুমি পার্‌বে না কেন?

সরস্বতী। দুজন মানুষ তো এক রকম নয়। তাঁদের সংস্কারও আলাদা। তা ছাড়া আমি তো বলেছি—এতে কোন লাভ নেই।

জ্ঞানদাস। লাভ নেই? পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান—মনের একটা বিমল আনন্দ;—সে কি কম লাভ?

সরস্বতী। 'বিমল আনন্দের' কথা ছেড়ে দাও। তোমাদের কাছে থেকে সে আনন্দের আজ পর্য্যন্ত অভাব হয় নি, কখন যেন হয়ও না। আর তুমি যে ভাবে বল্‌ছ, সে ভাবে না মিশ্‌লে কি ভাবের আদান-প্রদান হয় না? তাঁর

স্ত্রী ও আমি দুজনে মিশ্‌ব, তোমরা দু'জন মিশ্‌বে। তাহলেই পরস্পরের মনোভাব জান্‌তে কোনই বাধা থাক্‌বে না। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী জগতের নরের পরিচয় পাবে, স্ত্রীর কাছে স্বামী নারীর অন্তরের রহস্য জান্‌বে।

জ্ঞানদাস। তোমার সঙ্গে তর্কে আমি পারব না; তুমি তর্কপঞ্চাননী—

সরস্বতী। তা কেন হব না?—আমি ন্যায়ের অধ্যাপকের মেয়ে ও এম্‌-এ, বি-এল্‌'এর স্ত্রী।

জ্ঞানদাস। আমার একান্ত অনুরোধ তুমি সুন্দরী-মোহনের সঙ্গে কথা কও। কইবে না? আমাকে এর জন্য বড়ই অপদস্থ হতে হয়।

সরস্বতী। আমি দু'এক দিন পরে এর উত্তর দেব।

জ্ঞানদাস। এটা এমন কি কঠিন সমস্যা যে এর জন্য তোমাকে দু'এক দিন ভাব্‌তে হবে?

সরস্বতী। তুমি রাগ কোরো না! এত দিন যদি আমার ত্রুটি ক্ষমার চক্ষে দেখে থাক, আর কটা দিনও দেখ।

জ্ঞানদাস। কোথায় চল্লে?

সরস্বতী। তোমার খাবারটা চট্‌ করে তৈরি করে নিয়ে আসি। সে খাবার একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

জ্ঞানদাস। তুমি এখন রাঁধতে যাবে—তবে আমি খাব?

সরস্বতী। রান্না তো ভারি—সব তৈরি কেবল খান-কতক লুচি ভেজে দেব। তাও আমি ষ্টোভ জ্বেলে পাশের ঘরে বসে করে আন্‌ছি।

জ্ঞানদাস। আমার একেবারে ক্ষিদে নেই—কিছু খেতে পারব না।

সরস্বতী। কি এমন অমৃত খেয়ে এলে বন্ধুদের বাড়ী থেকে যে ক্ষিদে একেবারে গেল?

জ্ঞানদাস। অমৃত খাইনি, খেয়েছি খাবার। তার উপর শরীরটা ভাল নেই—আজ আর খাব না।

সরস্বতী অগ্রসর হইয়া স্বামীর ললাটে হাত রাখিয়া শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিল। পরে বলিল, ও কিছু নয়, সমস্ত দিন ঘুরোঘুরি করেছ, তাই শরীর একটু বেভাব হয়ে থাক্‌বে। দুখানা হিংয়ের কচুরি আর এক পেয়ালা চা করে আনি।

হিংয়ের কচুরি জ্ঞানদাসের প্রিয় খাদ্য। সে আর আপত্তি করিল না। সরস্বতী চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সরস্বতী চা ও কচুরি আনিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিল। 'ক্ষুধা না থাকিলেও' সব কয়খানি কচুরি ও চা খাইতে হইল।

সরস্বতী তখন অন্য ঘরে গিয়া শীঘ্র ভোজন সমাধা করিয়া স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিল। তুমি ঘুমুতে চেষ্টা কর, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

জ্ঞানদাস বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। সরস্বতী আলো নিভাইয়া দিয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিল ও কোমল হস্তে ধীরে ধীরে স্বামীর কুঞ্চিত কেশের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল।

আর জ্ঞানদাস সাধ্বী স্ত্রীর সেবা ভোগ করিতে করিতে চক্ষু মুদিয়া পর-স্ত্রী শুভ্রার রূপ ও অপূর্ব্ব ভঙ্গী ভাবিতে লাগিল। শুভ্রার মধুর কণ্ঠের গান ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার কাণের ও প্রাণের কাছে রঙীন প্রজাপতির মত নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

(৩)

সব শুনিয়া লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—এইজন্যে তুই ভেবে সারা হচ্ছিস্‌ সতী। এ তো কিছুই নয়।

লক্ষ্মী সরস্বতীর দিদি। চুঁচুড়ায় শ্বশুরবাড়ী। স্বামী সেখানকার উকিল। স্বামিসোহাগিনী ও শ্বশুর শাশুড়ীর বড়ই প্রিয়পাত্রী। সরস্বতী চিঠি লিখিয়াছিল—সে বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। চিঠি পাইয়া স্বামীর সঙ্গে লক্ষ্মী কাল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। স্বামী রাত্রিটা থাকিয়া সকালে চলিয়া গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে—চার দিন পরে রবিবারে আসিয়া লইয়া যাইবে।

সরস্বতী বলিল—কি জানি, দিদি, আমার বুদ্ধি কম, ও সব ভাল লাগে না।

লক্ষ্মী মনে মনে বলিল—তোর মত বুদ্ধি যেন সব মেয়ে মানুষের হয়।

প্রকাশ্যে বলিল—কিছু ভাবিস্‌ নে। জ্ঞান বাবুর যখন ঝোঁক চেপেছে তোকে বন্ধুর সাম্‌নে বার কর্‌বে, তুই যত বাধা দিবি ঝোঁক তত বেড়ে যাবে। একবার তার সাম্‌নে বেরো তো। তার পর কেমন মানুষ বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে।

সরস্বতী। তা হলে তুমিও দিদি সঙ্গে চল।

লক্ষ্মী। বেশ—চ; জ্ঞানকে বল তাহলে আজই বিকেলে আমাদের নিয়ে চলুক্।

স্ত্রীর কাছে এ কথা শুনিয়া জ্ঞান বড়ই আনন্দিত হইল। দ্বিপ্রহরে ফোন করিয়া দিয়া সেই দিনই অপরাহ্নে দুজনকে লইয়া জ্ঞানদাস বালিগঞ্জে পৌঁছিল।

সুন্দরীমোহন কৃতার্থ হইয়া গেল। বলিল, হাঁ, বান্ধবী সুন্দরী বটে। মুখখানি যেন ভাস্করে খোদাই করিয়া গড়িয়াছে।

শুভ্রা হাসিয়া বলিল—জগতে যত সুন্দরীর সংখ্যা বাড়ে, ততই তোমার লাভ,—কারণ তুমি সুন্দরীমোহন—

সরস্বতীর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মী কৌতুক-হাস্যের সহিত শুভ্রার মুখপানে চাহিয়া বলিল—বাঃ, আপনি তো খুব উদার!

সুন্দরীমোহন বলিল—না, এ সম্বন্ধে শুভ্রার বিশেষ উদার হবার দরকার হয় নি; কারণ, আমি নামে সুন্দরীমোহন হলেও এ পর্য্যন্ত কোন সুন্দরীকে 'মোহন' করতে পারিনি। 'কারণ যেটার যতই অভাব ততই সেটা বল্‌তে হবে'—এই হিসাবেই বোধ হয় আমার নামকরণ হয়েছিল।

লক্ষ্মী বলিল—আপনার এ ক্ষোভ নিরর্থক। কারণ, অন্ততঃ একজন সুন্দরীকে 'মোহন' করতে পেরেছেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তো বলে গেছেন যে বাঙালীর কাছে সব চেয়ে সুন্দরী—তার স্ত্রী। সে হিসাবে আপনারা সবাই—এক একজন সুন্দরীমোহন। আপনার স্ত্রীর কথা স্বতন্ত্র; কারণ ইনি তো যথার্থই সুন্দরী।

সুন্দরীমোহন কৃত্রিম ক্ষোভের সহিত বলিল—তাই বা হ'ল কই? সাম্‌নেই তো রয়েছেন, জিজ্ঞাসা করুন না!

সুন্দরীমোহনের কথার ভঙ্গীতে সবাই হাসিয়া উঠিল।

জ্ঞানদাস আজ তেমন সুবিধা করিতে পারিল না।

শুভ্রা আজ মাঝে মাঝে হঠাৎ কেমন গম্ভীর হইতে লাগিল। জ্ঞানদাসের পানে বিশেষ কোন দৃষ্টিই ছিল না—কৃপা-দৃষ্টি তো নয়ই।

গান গাহিতে বলিলে শুভ্রা গাহিয়া বসিল একটা ব্রাহ্ম-সঙ্গীত। যেন তাহারা মন্দিরে আসিয়াছে।

বাসায় ফিরিয়া লক্ষ্মী বলিল—সতী, তুই অতি বোকা।

সরস্বতী বিস্ময়ের সহিত বলিল—কেন ভাই, দিদি?

—জ্ঞানের সঙ্গে তুই যেতে চাস্‌নে তাই।

বোকা হওয়া আর স্বামীর সঙ্গে না যাওয়ার সম্বন্ধটা সরস্বতী বুঝিল না।

লক্ষ্মী বুঝাইয়া বলিল—জ্ঞান মাঝে মাঝে শুভ্রার পানে কি ভাবে চাইছিল দেখিস্ নি?

সরস্বতীর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল।

লক্ষ্মী তাহা দেখিয়া বলিল—ওটা সুধু মোহ সতী, ওর জন্য ভাবিস্ নে। মোহ প্রেম নয়—শীঘ্রই কেটে যাবে। আর যে সুন্দরীমোহন—বেশী দেরী লাগবে না।

—কেন দিদি?

—সুন্দরীমোহন তোর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা কর্‌তে চায়। পুরুষদের সঙ্গে যখন পর-স্ত্রীরা রহস্য-আলাপ করে তখন তাদের বড় মিষ্টি লাগে; কিন্তু যখনি দেখে অপর পুরুষ তাদের স্ত্রীর সঙ্গে সেই রকম আলাপ করছে—তখনই তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। জ্ঞানের চোখে শুভ্রার নেশা একটু লেগেছে, কিন্তু সুন্দরীমোহন তোর দিকে একটু এগুলেই দেখিস্ সে ভাব চলে যাবে।

সরস্বতী আর কিছু বলিল না; কিন্তু তাহার মনটা ভার হইয়া রহিল।

(৪)

ইহার পর সুন্দরীমোহন বারকয়েক সস্ত্রীক জ্ঞানদাসের বাসায় আসিল। জ্ঞানদাসও সরস্বতীকে লইয়া সুন্দরী-মোহনের বাসায় গেল। কিন্তু শুভ্রা ও সরস্বতীর মধ্যে কোন অন্তরের যোগ ঘটিল না। সুন্দরীমোহনের সম্মুখেও সরস্বতী কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিত।

একটা ছুটির দিন। জ্ঞানদাস একা সুন্দরীমোহনের বাসায় পৌঁছিল। শুভ্রা তখন একটা কৌচে হেলান দিয়া একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতেছিল। হর্ণের শব্দে শুভ্রা উঠিয়া জানালা দিয়া দেখিল—জ্ঞানদাস। অন্য দিনের মত নীচে নামিয়া না আসিয়া বইখানি সেখানে রাখিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। সুন্দরীমোহন তখন বাসায় ছিল না।

জ্ঞানদাস নীচে একটু অপেক্ষা করিয়া দেখিল, কেহ নামিয়া আসিল না; তখন সোজা উপরে উঠিয়া আসিল।

খানসামা সংবাদ দিল, মেম সাহেব নিজের ঘরে আছেন, সাহেব একটু আগে বাহিরে গিয়াছেন।

জ্ঞানদাসের বুকটা একবার দুরু দুরু করিয়া উঠিল। মনের মধ্যে একটা আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল।

শুভ্রার কক্ষের সম্মুখে আসিয়া জ্ঞানদাস হাঁকিল—জেগে আছেন?—ভিতরে আস্‌তে পারি কি এখন?

ভিতর হইতে উত্তর আসিল—নিশ্চয়ই—সর্ব্বক্ষণ।

জ্ঞানদাস ভিতরে আসিয়া বলিল—সুন্দরীমোহন নেই—তা জানতাম না।

শুভ্রা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—সুন্দরীমোহন না থাকলে সুন্দরীর আস্‌তে বাধা থাকতে পারে; সুন্দরের তাতে কি? এসেছেন যখন, দয়া করে বসুন।

বলিয়া শুভ্রা শয্যার নিকটস্থ একটি আসন দেখাইয়া দিল।

জ্ঞানদাস লজ্জিত হইয়া সেই আসনে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আপনি অসময়ে শুয়ে কেন?

—ভাল লাগ্‌ছে না।

—কেন?—শরীর ভাল নেই বুঝি?

—না—ভাল নেই।

—তাহলে আপনি শুয়ে থাকুন, আরাম করুন—আমি না হয় উঠি।

শুভ্রা শয্যায় শুইয়া পড়িয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল—উঠ্‌বেন বৈ কি—কারুর বাড়ী এসে তাকে অসুস্থ দেখ্‌লে আর সেখানে থাক্‌তে আছে? তার আরামের জন্য তখুনি চলে যাওয়া উচিত। আচ্ছা, আমি কি বলেছি—আপনি থাক্‌লে আমার আরামের ব্যাঘাত হবে?

আমার কথার ভুল অর্থ করবেন না। আমি সে ভেবে বলি নি।

শুভ্রা কিছু বলিল না। জ্ঞানদাসের পানে একবার সুধু চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

জ্ঞানদাস জিজ্ঞাসা করিল—আপনার জ্বর হয়নি তো?

অবহেলার সুরে শুভ্রা বলিল—কি জানি?

—দেখি—আপনার গা দেখি?

জ্ঞানদাস সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া শুভ্রার মুখের উপরকার চূর্ণ কুন্তলগুলি সরাইয়া তাহার ললাটের উপর আপনার রক্তবর্ণ করতল রাখিল।

দুজনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ।

শুভ্রা চক্ষু মুদিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কয়েক বিন্দু জল তাহার চক্ষুপ্রান্ত দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সুন্দরীর চক্ষে জল—যাহা মুনি-ঋষির চিত্তবিভ্রম জন্মাইয়া দেয়! জ্ঞানদাস তো সংযমশূন্য মানুষ—তাহার চিত্তের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

জ্ঞানদাস কম্পিত হস্তে শুভ্রার চক্ষের জল মুছাইয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিল—আপনার চোখে জল—আমি কখন এমন ভাবি নি।

জ্ঞানদাসের ইচ্ছা হইতেছিল চুম্বনে চুম্বনে শুভ্রার অশ্রু মুছাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু তাহার সাহসে কুলাইল না।

অশ্রু মুছাইয়া দিতে না দিতে আবার কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

জ্ঞানদাস বিকল হইয়া বলিল—আপনি দয়া করে স্থির হোন্! আপনার কিসের দুঃখ আমাকে বলুন্।

শুভ্রা বলিল,—আমি হাসি বলে আপনারা আমাকে বুঝ্‌তে পারেন না। অন্তরে আমি একেবারে নিঃস্ব—কাঙাল, একেবারে একা! সুধু ভোগ নিয়ে মানুষের কাটে না। তাই কাটাতে চেয়েছিলাম, সেজন্য আমার এই দুঃখ।

জ্ঞানদাস বিস্মিত হইয়া বলিল—আমি তো ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে!

—আপনারা বুঝ্‌বেন না। আপনাদের সন্তান আছে, তাকে নিয়ে আপনাদের অবসর কাট্‌তে পারে। আপনি কাছে না থাক্‌লে আপনার স্ত্রী তাকে নিয়ে ভুলে থাকবেন। আমি কি নিয়ে, কিসের আশ্বাসে থাকি? ওঃ—

একটা মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া শুভ্রা বালিশে মুখ লুকাইল।

জ্ঞানদাস কম্পিত কণ্ঠে বলিল—আপনি হতাশ হবেন না। আপনার সন্তান হবার সময় যায় নি।

—আপনি জানেন না—সে হবার নয়। আপনারা যে আজকাল সভ্য হয়েছেন, আপনাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান হয়েছে—তারি ফলে আমার এ দশা হয়েছে। আমি যে জেনে-শুনে আমার নিজের সর্ব্বনাশ কর্‌তে দিয়েছি।

কথা কয়টা বলিয়া শুভ্রা গভীর লজ্জা ও অপরিসীম অনুশোচনায় শয্যা হইতে উঠিয়া ত্রস্ত পদে কক্ষান্তরে ছুটিয়া গেল।

জ্ঞানদাস বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। নীচে নামিয়া যখন গাড়ীতে উঠিল, তাহার মনে হইল, তখনও যেন হাতে শুভ্রার তপ্ত অশ্রু লাগিয়া আছে। সে আজ নিজেই গাড়ী

চালাইয়া আসিয়াছিল। শুভ্রার আজিকার কথা ও অদ্ভুত আচরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞানদাস গাড়ী চালাইয়া দিল।

বাসার কাছাকাছি আসিয়া হর্ণ দিতে যাইবে, এমন সময় জ্ঞানদাস দেখিল, গেটের মধ্যে সুন্দরীমোহনের মোটর দাঁড়াইয়া! তবে কি সুন্দরীমোহন তাহারি মত নির্জ্জনে বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে!

হর্ণ না দিয়াই সে গেটের মধ্যে গাড়ী আনিয়া, গাড়ী চালকের জিম্মা করিয়া দিয়া, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল।

তবে কি সুন্দরীমোহনও—সে আর ভাবিতে পারিল না। তাহার নাক কাণ দিয়া যেন অগ্নির উত্তাপ বাহির হইতে লাগিল।

সিঁড়ির কাছেই যে কক্ষটি, তাহার কাছে আসিতেই জ্ঞানদাস শুনিল, সুন্দরীমোহন বলিতেছে—আচ্ছা, আপনি আমার কাছে এত লজ্জা করেন কেন? এখন তো কলাবৌ ও ছুঁৎমার্গের দিন কেটে গেছে।

সরস্বতী মৃদুস্বরে বলিল—আমি আধুনিক সভ্যতা মোটেই পাই নি। সম্পূর্ণ অন্য ভাবে আমি মানুষ হয়েছি; সেজন্য সেই ভাবে থাক্‌তেই ভালবাসি।

—থাক্‌তে চাইলেই বা থাক্‌তে দেব কেন আপনাকে? মেঘের আড়ালে চাঁদ চিরকাল থাকে না। চাঁদ মেঘের নয়—জগতের।

সরস্বতী বিরক্ত হইয়া বলিল—আমি এ রকম কথা শুন্‌তে অভ্যস্ত নই—ভালও বাসি না। আমাকে ও-সব বল্‌বেন না।

সরস্বতীর বিরক্তি গায়ে না মাখিয়া সুন্দরীমোহন বলিল—আপনি ও কথাটা যদি না সইতে পারেন, এত সুন্দর হলেন কেন?

সরস্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—আমি সুন্দর কি অসুন্দর, সে কথা আমার স্বামী ছাড়া আর কারও বল্‌বার অধিকার নেই।

সুন্দরীমোহন সরস্বতীর মুখের পানে চাহিয়া মুগ্ধ কণ্ঠে কহিল—আপনার স্বামীর বন্ধুরও নেই?—কিন্তু রাগ করলে আপনার মুখে কি অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে!

সরস্বতী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—আপনি আমার স্বামীর বন্ধু নন্—তা'হলে এ ভাবে আমাকে অপমান করতেন না। পরে আবার উত্তেজনা দমন করিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল—আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, তিনি এলেন বলে। আমার একটু অন্যত্র কাজ আছে।

সরস্বতী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

—দোহাই আপনার—যাবেন না; আমি আমার শরণাগত।

বলিয়া সুন্দরীমোহন সরস্বতীর গমনোদ্যত দেহের পানে চাহিয়া, তাহার চম্পক-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট সুন্দর কোমল দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিতে গেল।

মুহূর্ত্তে সরিয়া দাঁড়াইয়া সরস্বতী দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল—আপনি এত নীচ, তা জান্‌তাম না। সরে যান্—শেষটা চাকরদের ডাক্‌তে বাধ্য কর্‌বেন না।

বলিয়া সরস্বতী মহিয়সী সম্রাজ্ঞীর মত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

দ্বারপ্রান্তে নীরবে দাঁড়াইয়া জ্ঞানদাসের ইচ্ছা হইতেছিল—ছুটিয়া গিয়া সুন্দরীমোহনের গলা ধরিয়া নীচে ঠেলিয়া দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, সেও কি ঠিক এই হেয়, এই নীচ কাজ করিয়া আসে নাই? সুন্দরীমোহন যদি তাহার বিশ্বাস নষ্ট করিয়া থাকে—সেও কি তাহা করে নাই? সুন্দরীমোহনকে কিছু বলিবার অধিকার তাহার কোথায়?

জ্ঞানদাস যেন এত দিন পরে দর্পণে আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিল। ক্রোধের পরিবর্ত্তে আপনার প্রতি ঘৃণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

আহত কুকুরের মত জ্ঞানদাস সিঁড়ি বাহিয়া খানিক নীচে নামিয়া আসিল। তার পর জুতার শব্দ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। যখন উপরে আসিল, দেখিল—সম্মুখে সুন্দরীমোহন দাঁড়াইয়া।

সুন্দরীমোহন বলিল—বেশ লোক তো! ছুটি ব'লে তোমার এখানে এলাম, তোমার দেখা নেই।

জ্ঞানদাস উত্তরে বলিল—আমি তো তোমার ওখানেই গিছ্‌লাম; তোমাকে না দেখতে পেয়ে ফিরে আসছি।

—তবে তো শোধ বোধ; এখন আসি—আর বস্‌বার সময় নেই।

বলিয়া সুন্দরীমোহন দ্রুতবেগে নামিয়া গেল। জ্ঞানদাস

তাহার দিকে আর চাহিয়া দেখিল না পর্য্যন্ত। যে কক্ষে সরস্বতী ছিল ধীরে ধীরে সে কক্ষে প্রবেশ করিল।

হঠাৎ কক্ষের মধ্যে স্বামীকে দেখিয়া সরস্বতীর মুখে প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিতে চাহিল। পরক্ষণে মুখখানি আবার ম্লান হইয়া আসিল। ছুটিয়া স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সরস্বতী কাঁদিয়া উঠিল।

অশ্রু মুছাইয়া দিয়া জ্ঞানদাস বলিল—সুন্দরীমোহনকে আমি এইমাত্র যেতে দেখ্‌লাম। আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, কিছু শুন্‌তে পেয়েছি। আমার দোষেই তোমাকে এসব সইতে হয়েছে। আমায় তুমি ক্ষমা কর।

সরস্বতী স্বামীর বক্ষে অশ্রুপ্লাবিত মুখ রাখিয়া বলিল—কাল আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। আমি এখানে আর থাক্‌ব না। আর তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও থেক না।

পরদিন জ্ঞানদাস স্ত্রী ও পুত্রকে লইয়া সত্য সত্যই দেশে ফিরিয়া গেল।

ডেঙ্গো ডোখ্‌লা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

ফুল ফুটায়ে আমরা ফিরি
মোদের ফুলই ফুটলো না ক,
আমরা সবার সুখের সাথী,
মোদের সাথী জুটলো না ক।
কেনা-বেচা নেইক মোদের
আনাগোণা কিন্তু হাটে,
হুলু দিয়ে পরের বিয়েয়
দিন ত মোদের সুখেই কাটে।
আমরা স্বাধীন পরিব্রাজক
দেখেই শুধু যাচ্ছি চলে,
সুখের দেশের হোয়েস্থ সাঙ—
রই না বাঁধা রঙমহলে।
তোমরা জানো আমরা নেহাৎ
হাওয়ার চেয়ে হাল্কা ওজন,
উল্লাসেরি উড়ো জাহাজ
আমরা ডেঙ্গো ডোখ্‌লা কজন।
দুখের নীরে আমরা ডুবি
সলিল-কণা রয় না গায়ে

সুখের সুরা আকণ্ঠ খাই
মাদকতা নাইক তাহে।
অভাগা নই, ভাগ্যবন্ত—
কর্ত্তা মোদের চন্দ্রচূড়ই ;
মদন থাকে মোহিত হয়ে
শিখীর পিঠে আমরা উড়ি'।
আমরা নাগের মান্য পরি
সিংহ শিরে চরণ ফেলাই,
হাউই ধরাই দাবাগ্নিতে
যমের সাথে পাশা খেলাই।
নিমন্ত্রণ হায় থাকুক বা থাক
ভোজের ঘৃতের গন্ধে নাচি ;
সুধা না পাই আনন্দেরি,
শিশির পিয়ে আমরা বাঁচি।
বিল্বপত্র না হই মোরা
কলার পাতা আমরা বটি,
নাই অধিকার পূজায় তবু
পূজার আমোদ আমরা লুটি।

মা

শ্রীরমলা বসু

রাগের বশে প্রতিবাসী এক যুবককে ছেলে তার খুন করে বসেছিল। এতো দিন পরে সব ঘটনাটা যদিও আমার মনে নেই, তবে এইটুকু স্পষ্ট স্মরণ আছে যে, বচসা হতে হতে রাগের বশেই মারতে গিয়ে সে তাকে হঠাৎ খুন করে ফেলে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। আইনের চক্ষে কিন্তু তবু সে খুনীই। তার শাস্তির সীমা নেই। তবে সে শাস্তির জন্য চাক্ষুস প্রমাণ চাই, সাক্ষী চাই। পুলিশ তাকে সম্পূর্ণ সন্দেহ করলেও অন্ততঃ একটী সাক্ষীর অভাবে বিচারাধীন করতে পারছিল না।

একমাত্র সম্ভব সাক্ষী ছিল তার মা। পুলিশ তাকেই শেষে আদালতে হাজির করলে। মা তার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বাইবেল শপথ করে দীপ্ত জ্বলন্ত চক্ষে হাকিমের দিকে তাকিয়ে অকম্পিত কণ্ঠে বলে এলো—ছেলে তার নির্দ্দোষ। সেদিন জ্বরের ঘোরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে সারাদিন সে না কি ঘরে পড়েছিল—বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে নি।

রাগের বশেই হোক আর যে কারণেই হোক তবু সে যুবক হত্যাকারী। জগতের বিচারশালায় প্রাপ্য দণ্ড তার পাওয়াই উচিত। জীবনে অনেক জটিল মীমাংসার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমার মনও তাই বলছিল।

তবে এর বিহিত আমাকেই করতে হবে। পাপ-পুণ্যের অস্তিত্বের আমরাই যে প্রচারক। টমাস্ মণ্ডলের মাকে বাগে আমাকেই আনতে হবে। আর আমিই তা পারব একমাত্র। আমি যে তার পুরোহিত। দিন কতক থেকে সে আমার কাছে "পাপ কবুল" (confession) করতে আসে নি মোটে। সেদিন তাই গির্জ্জা হবার পর তাকে ধরলাম। পরের শুক্রবার সে আসবে বলে প্রতিশ্রুত হোল।

অকপটেই সে সব কথা আমাকে বলে গেল। এ কয় দিনের রুদ্ধ অশান্তির জ্বালা সে আমার কাণে ঢেলে যেতে লাগল। আর কাঁদতে কাঁদতে বল্লে "পাদ্রী সাহেব! টমাস্ আমার অজ্ঞানে রাগের বশে এই কাণ্ড করে বসেছে। মানুষের ভয় তো রয়েছেই তার; কিন্তু দয়াল যিশুকে বলো, তিনি তো সব বুঝতে পারেন, তিনি যেন তাকে ক্ষমা

তখন নূতন পাদ্রী হয়েছি।

রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক কি? তাই বলে ভেবো না—সংসার আমাদের রেহাই দেয়। কত মনের কত সঞ্চিত ধূলিমলার গ্লানি, কত ছদ্ম পাপের কাহিনীর সাক্ষী হয়ে আমাদেরই মৌন থাকতে হয়। আবার কত অশ্রু-ঝরা নিষ্ঠুর মর্ম্ম-কাহিনীরও শ্রোতা হয়ে এই নির্ব্বিকার মনটাও পিষ্ট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্ম্মের নিয়মই এই। যজমান-কৃত যত পাপের বোঝা, তা বহন করতে হয় এই পাদ্রী বেচারাদেরই। তারা তো বলেই খালাস। সপ্তাহান্তে পাপ স্বীকার করেই তাদের প্রায়শ্চিত্ত। তখন তাদের বিশ্বাস,—তা যত কুকার্য্যই তারা করে থাকুক না কেন,—খুন ডাকাতি পর্য্যন্ত,—সব মুছে যাবে। আমরা শুধু তাদের উপদেশ দিতে পারি, অনুতাপ করতে বলতে পারি; আর যিশুর কাছে তাদের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। জগতের লোকের কাছে তাদের কুকার্য্য প্রকাশ করার বেলা মুখ আমাদের একেবারেই বন্ধ—তা যতই সে আইনসঙ্গত শাস্তি পাবার উপযুক্তই হোক না কেন।

এখন আসল কথা। সে আজ অনেক দিনের কথা; তাই নাম-ধাম বদলে দিয়ে ঘটনাটা প্রকাশ করতে আমার মনে এখন কোন দ্বিধা বোধ নেই। সে একটী অশিক্ষিত গ্রাম্য ছোটলোক মেয়ের কথা। আমারই একজন যজমান। সেই রকম শিক্ষা-দীক্ষায় তৈয়ারী মেয়ে, যারা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের বর্ণিত ভয়ঙ্কর নরকের বর্ণনায় মনে একটা পরলোক ও পাপ-পুণ্যের বিচার সম্বন্ধে বিভীষিকা গড়ে রাখে; যারা সেই নরক থেকে নিজের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা পৃথিবীর আর সব প্রবৃত্তির ও আকাঙ্ক্ষার বাড়া করে তোলে। নরকের ভয় তাদের এমনই প্রবল আর স্বর্গের লোভ তাদের এতোই বেশী।

এই রকম আবহাওয়ায় মানুষ হয়েও সেই মেয়েটীর এ-রকম সহজ প্রবৃত্তির বশে পাপ-পুণ্যের ভয় আর স্বর্গের লোভকে এড়িয়ে ওঠা আমাকে সত্যই স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। সেই জন্যই আজ সেই কাহিনী লিখতে বসেছি।

করেন, দোষ তার না নেন। বিপদ তার কেটে যায় যেন, মনে সে যেন শান্তি পায়। মেরী মাকে পূজো দেব ভাল করে।"

"তুমি নিজের চক্ষে সেই কাণ্ড দেখেছ টমাসের মা ?"

"হ্যাঁ সাহেব, আমি নিজের চক্ষেই দেখেছি বই কি। চক্ষের নিমেষে দিশেহারা হয়ে টমাস্ করে ফেল্লে এই কাজ; নইলে তো আমি মাঝে এসে ছাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলুম। তার পর সন্ধ্যের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দুজনে ধরাধরি করে আমরা দেহটাকে পঞ্চানন ঘাটের ওধারের জঙ্গলে মধ্যে ফেলে দিয়ে আসি। সে কি আর দিবানিশি একবারও ভুলতে পারি সাহেব ?"

"তবে তুমি যে এতোবড় মিথ্যে কথাটা বলে এলে টমাসের মা ?"

"মিথ্যে বলব না তো কি সাহেব ? টমাস্ যে আমার ছেলে গো।"

"হলেই বা ছেলে। জান, তুমি বাইবেল সাক্ষী করে শপথ করেছ ?"

"জানি সাহেব। উপায় ছিল না তাই।"

"বাইবেল সাক্ষী করে মিথ্যে বল্লে কি হয় জান ? আত্মা তোমার অনন্ত কাল ধরে নরকের আগুনে দগ্ধে দগ্ধে মরবে। নরকের কীট তাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। যমদূতরা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পিটবে। ত্রাণকর্ত্তা যিশুরও সাধ্যি থাকবে না তা থেকে তোমাকে বাঁচাতে। মেরী মাও তোমার পূজো নেবেন না, তা জান ?"

সে একটু শিউরে উঠল মনে হোল। তার পর বল্লে, "হোক সাহেব। টমাস্ যে আমার ছেলে তবু।"

"ছেলে হলেও তাকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি এতো বড় পাপটা করবে ? ইহকাল আর কয় দিনের ? অনন্ত পরকাল আর আত্মাটা ক্ষয় করে বসবে ?" সে মৌন হয়েই বসে রইল। ভাবে তার মন বদলাবার কোন চিহ্নই দেখলাম না।

তার পর সেই গ্রামেরই কিছু দিন পূর্ব্বের একটা ঘটনা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। সে ব্যাপার নিয়ে আদালতের হাকিম থেকে সহরের কাগজগুলায় পর্য্যন্ত "ধন্যি, ধন্যি" পড়ে গিয়েছিল। ধন্য ছোটলোকের মেয়ে, এতো তার ধর্ম্মজ্ঞান, এতো তার সত্যের আদর, অপত্যস্নেহের কত ওপরে! নিজের আত্মার অক্ষয় স্বর্গলাভের কাছে পৃথিবীর আর সব তুচ্ছ,—এমন আর হয় কি ?

সেও আর এক অভাগী মা। ভাগ্যের দোষে সন্তানের হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে পড়ে। সেখানেও দ্বিতীয় সাক্ষী ছিল না। প্রমাণাভাবে ছেলে তার খালাস পেতেই যাচ্ছিল, এমন সময় তার মাকে সাক্ষী মানা হয়। মায়ের ধর্ম্মবুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানের কাছে ছেলের প্রাণ তুচ্ছ হয়ে পড়ে। তাকে ফের ফাঁসী কাঠে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু মায়ের নামে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞান!

"আর তুমিও এক মা বটে, আর সমান বিপদেই পড়েছ বটে। তোমারও ধর্ম্মবুদ্ধি আর পরকালের ভয় অন্ধ স্নেহ থেকে তোমায় রক্ষা করবে না টমাসের মা ? স্বর্গ-নরকের তফাৎ ভুলে যাবে ?" এ কথা শুনেই confession-কুঠুরীর, আমার ও তার মধ্যিখানের পর্দ্দা ঠেলে ফেলে দিয়ে সে আমার দিকে দীপ্ত নয়নে চেয়ে দেখলে। তার পর তেমনই চোখাচোখি করে মাথা তুলে বলে উঠল, "সাহেব, ভেবেছ কি—আমার এই তুচ্ছ আত্মাটার দাম আমার বুকের রক্তচেরা ধন—ছেলের প্রাণের চেয়েও বেশী ? জন্ম জন্ম আমার আত্মা নরকে ডুবে দগ্ধে পচতে থাকুক, যত ইচ্ছা পাপের বোঝা আমার নামে স্বর্গদূতের খাতায় লেখা থাকুক, তবু তার মাথার একটা চুলেরও হানি আমি নিজে থেকে হতে দিতে পারি না সাহেব। সে যে আমার ছেলে, তা কি ভুলে যাও ? আর আমি যে তার মা। আমি কি কখন তাকে আমার এ তুচ্ছ আত্মাটার সদ্গতির জন্যে অন্ধকার মরণের পথে পাঠিয়ে দিতে পারি—যে আমি তাকে জন্ম দিয়েছি ?

"সাহেব! তুমি বুঝবে না, কিন্তু মেরী মা আমার প্রাণের মর্ম্ম বুঝবেন। তিনিও যে 'মা'।"

ঠিক সেই সময় দিন-শেষের এক ঝলক আলো গির্জ্জার রঙ্গীন কাচের মধ্যে দিয়ে সেই গ্রাম্য অশিক্ষিত মেয়েটীর মুখের চারিধারে এসে ছড়িয়ে পড়ল—ক্ষণেকের জন্যে ঠিক যেন যিশু মাতার মুখজ্যোতিঃর মত। আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম। আমার মত সংস্কারবদ্ধ পাদ্রীর মন থেকেও যেন এতোদিনের রীতি-নীতির বোঝা কিছুক্ষণের জন্যও জীর্ণ খোলসের মত খসে পড়ল। ইতি

গৃহ-নির্ম্মাণের কয়েকটী ইঙ্গিত

শ্রীভূপতিনাথ চৌধুরী বি-ই

কলকাতায় আজকাল নতুন রাস্তা তৈরি করার কল্যাণে যে রকম বাড়ী-ভাঙার ধুম পড়ে গেছে, তাতে অনেককেই কলকাতা ছেড়ে সহরতলীতে বাসা বাঁধতে হচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বালীগঞ্জ, টালিগঞ্জ, আলিপুর, টাশা, কড়েয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতিদিনই নতুন নতুন গৃহ নির্ম্মিত হচ্ছে। সুতরাং এই সময়ে গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে কয়েকটী ইঙ্গিত অসময়োপযোগী হবে বলে মনে হয় না।

এই স্থানে প্রথমেই একটা কথা বলা দরকার বলে মনে করছি ;—ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাষ্ট গৃহীত জমিতে বাড়ী তৈয়ারী করতে হ'লে কর্পোরেশনের গৃহনির্ম্মাণ-সম্পর্কিত আইন-কানুন মানতে হবে। এই সব নিয়মের মধ্যে ন্যায়ের ফাঁকির অভাব নেই। সে সকল কূট-কচালে কথা ছেড়ে দিয়ে—দুই পাশে ৪´ ফিট জমি ও পিছনে ১০´ ফিট জমি রেখে মোট এক-তৃতীয়াংশ খোলা জমি রাখার যে নিয়মটী আছে, সেটী পালন করলে বাড়ীতে আলো ও হাওয়ার অপ্রাচুর্য্য ঘটবে না। স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটী বড় কম কথা নয়।

এইবার গৃহ-নির্ম্মাণের কথা। সাধারণত দু'তিন তলা বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য লোকে সুশিক্ষিত পূর্ত্তবিদের পরামর্শ গ্রহণ করা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। তার কারণ দু'তিনতলা বাড়ী সাবেকি ধাঁচে তৈরি করা একজন মিস্ত্রির পক্ষেও নিতান্ত সুসাধ্য। এজন্য গৃহস্বামী তাঁর নিজের ধারণা অনুযায়ী একটা নক্সা ক'রে একজন ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান দ্বারা বাড়ীর প্ল্যান আঁকিয়ে, রাজমিস্ত্রির সহায়তায় বাড়ী তৈয়ারী করিয়ে নেন। ফলে খরচ অনেক কম হল বলে অনেকের বিশ্বাস ; এবং সত্য বলতে কি গৃহস্বামী নিজে যদি এ কাজে সামান্য খুঁটিনাটীর দিকেও নজর রাখতে পারেন, তাহলে খরচ কম না হবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু অনেক সময়েই অভিজ্ঞতার ও শিক্ষার অভাবে এ তথ্য সত্যে পরিণত হয় না। এ গেল আপাততঃ লাভের কথা ; কিন্তু ভবিষ্যতের কথাও বাদ দেওয়া যায় না। এই-ভাবে মিস্ত্রির সাহায্যে নির্ম্মিত অনেক গৃহেই কয়েক বৎসর পরেই নানা ত্রুটী দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। খিলান ও ছাদ ফেটে যাওয়া এই সকল ত্রুটীর একটা অতি সাধারণ উদাহরণ। উপযুক্ত পরিমাণে ও রীতিমত ভাবে চুণ, সুরকি, সিমেণ্ট প্রভৃতি মশলা মিশ্রিত না হলে ঐ সকল ত্রুটী হওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য বাড়ীর ভিত্তির কোন অংশ বসে গেলেও এই দোষ হতে পারে। ছাদ ফাটার আরও অন্য কারণ আছে, সে কারণ পরে ব্যক্ত করছি। এখন বাড়ীর গোড়ার কথা বলি। বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করার পূর্ব্বে জমিটীকে পরীক্ষা করে দেখা ভাল। জমির যে অংশে বাড়ী তৈয়ারী করা হবে, সে অংশ আগাগোড়া ভাল জমি বা মন্দ জমি অর্থাৎ পুকুর-বোজান বা ভরাট-করা এক জাতের জমি হওয়া উচিত, কারণ তা হলে অংশ-বিশেষের "বসে" যাবার ভয় থাকে না। তা না হ'য়ে যদি জমির খানিকটা ভাল ও খানিকটা মন্দ জমি হয়, তা হ'লে ভিত্তি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত এবং এজন্যে শিক্ষিত এঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

ভিত্তির কথা ছেড়ে দিলেও বাড়ীর উপরের অংশ নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও অবহেলা করা বা সনাতন প্রথা মতো মিস্ত্রির নির্দ্দেশ অনুসারে যা' তা' ভাবে চুণ সুরকি মিশিয়ে ইট গেঁথে যাওয়া সমীচীন নয়। চুণ সুরকি ও বালি মিশিয়ে যে মশলা তৈরি করা হয়, সেই মশলার চাপ সহ্য করবার একটা সীমা আছে। বিভিন্ন পরিমাপে মশলা মিশান হলে, এই মিশ্রণের শক্তিরও তারতম্য ঘটে। যদি মাত্র ইটের ও মেঝের ভারের কথা হত, তা হ'লে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করার কোনও কারণ থাকত না ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাস্তাগুলিতে ভারী লরী ও 'বাস' যাওয়ার ফলে রাস্তার দুধারি বাড়ীগুলি কাঁপতে থাকে। সুতরাং বাড়ীগুলির এই কম্পন সহ্য করার ক্ষমতা থাকা দরকার। এই কারণে চুণ, সুরকি, সিমেণ্ট, বালি প্রভৃতি মশলাগুলি একটী বিশেষ পরিমাপে মিশ্রিত করে তার সহন-শক্তির পরীক্ষা করে, তবে এই পরিমাপ অনুসারে বাড়ী নির্ম্মাণ করা উচিত। চুণ, বালি, সিমেণ্ট প্রভৃতির

গুণাগুণ ও শক্তি সম্বন্ধে একটী অনুমোদিত নিয়ম (standard specification) অনুসরণ করা দরকার। সাধারণ বাড়ী-নির্ম্মাণের সময় এ বিষয়ে বিশেষ অবহেলা করা হয়। ফলে বাড়ীর জীবনী-শক্তি হ্রাস পায়।

আজকালকার বাড়ীর সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ ত্রুটীর প্রায়ই উল্লেখ করা হয়;—সে ত্রুটী বাড়ীর ছাদ সম্পর্কিত। এখনকার লোহার বীম ও টী বসান জলছাদ প্রায়ই ফেটে যায়। অথচ আগেকার কালে যখন কাঠের কড়ি ও বরগার ব্যবহার ছিল, তখন এ দোষ বিশেষ লক্ষিত হত না। এর কারণ কি? লোহার বীম কাঠের তুলনায় অনেক ছোট। ফলে অনেকখানি ভার একটুখানি ছোট জায়গায় এসে পড়ে। এখন লোহার বীমখানি যদি একখানি লোহার চাদরের (Bed-plate) ওপর স্থাপন করা হয়, তা হ'লে মেঝের ও ছাদের ভার ছড়িয়ে পড়বার সুবিধা পায়; কিন্তু সাধারণ-ক্ষেত্রে এ নিয়মের অনুসরণ করা হয় না। লোহার বীমখানি হয় ত একখানি ইটের ওপর বসান হয়; এবং লোহার বীমের ওপর যতটা ভার আসছে ততটা ভার যদি ইটখানি সহ্য করতে না পারে, তা হ'লে ইটখানি অনেক সময় ভেঙে যায়। ফলে লোহার বীমখানি একদিকে নেমে পড়ায় ছাদের বা মেঝের ভার-ক্ষমতা বিচলিত হয় এবং ছাদে ফাট ধরে। অনেক সময় আবার বেড-প্লেট ব্যবহার করা সত্ত্বেও ছাদে ফাট ধরে। তার কারণ কি? এ সম্বন্ধে অনেক মত আছে; তার মধ্যে আমি যে মতটী সমীচীন মনে করি, তা বলছি। সাধারণতঃ বীমের উপর টী বিছিয়ে তার উপর এক থাক বা দুই থাক টালি সাজানো হয়। এর উপর ৫" খোয়া বিছিয়ে চূণ বালি মিশিয়ে ভাল করে পিটিয়ে ছাদ তৈয়ারি হয়! ছাদের ভাল মন্দ অনেকটা এই পিটানর ওপর নির্ভর করে। ভাল করে পিটান হ'লে জল চুঁইয়ে পড়বার ভয় থাকে না; এবং যে চূণ ব্যবহার করা হবে, সেই চূণও ভাল করে ভিজান হওয়া উচিত। নতুবা চূণে ডেলা থাকলে বর্ষার সময়ে জল প'ড়ে চূণের ডেলা ফুটে ছাদ ফেটে যেতে পারে। এই দুই কারণ ব্যতীত আরও কারণ আছে। যেভাবে টীগুলি বীমের ওপর সাজান হয়, তাতে টীগুলির কিছু অংশ চূণ ও খোয়ার সম্পর্কে আসে। এই খোয়ার আস্তরণ ভেদ করে লোহার টীতে কোন ক্রমে জল লাগলেই টীতে নোচুট (rust) ধরে। তার পর উত্তাপে ছাদ গরম হয়ে যতটা বিস্তার করে নোচুট-ধরা টী বিস্তার (expand) করে তার চেয়ে বেশী। এবং এই বিস্তৃতির জন্যই ছাদ ফেটে যায়। এর উপায় কি? এর এক উপায় হচ্ছে টীগুলিকে বীমের ওপর উল্টো ভাবে সাজানো। এইভাবে টী সাজানোর আরও একটা সুবিধা আছে; টীগুলি অদল-বদল করার প্রয়োজন হলে ছাদের কোনও ক্ষতি না করে অতি সহজেই এ কাজ করা যাবে; কিন্তু সাধারণতঃ যে ভাবে সাজানো হয়, তাতে এ ব্যাপার সম্ভব নয়! আজকাল অবশ্য অনেকে পুরাতন পন্থা ছেড়ে রী ইন-ফোর্সড কংক্রীটের (Re-inforced concrete) বা রী-ইন ফোর্সড ইটের (Re-inforced brick) ওপর ৩" থেকে ৫" পুরু চূণ-খোয়া বিছিয়ে জলছাদ করছেন। প্রথমোক্ত উপায়ের চেয়ে এ উপায় অবশ্য অনেক ভাল, কিন্তু এ কাজ শিক্ষিত লোকের পরিচালনা ভিন্ন হওয়ার উপায় নেই। ঠিক মতো লোহার শিক (rod) বসান, বাক্স তৈরী করা (centering) ও উচিত মাপে মেশান মশলা সতর্কতার সহিত ঢালাই হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে একটুখানি ত্রুটী হ'লে সমস্ত জিনিষটাই নষ্ট হয়। জলছাদ ফাটার পর আর একটা ত্রুটী যা একটু চেষ্টা করলেই সংশোধন করা যায়, তা হচ্ছে পেটেণ্ট অর্থাৎ পাথর-কুচি ও সিমেণ্ট জমানো মেঝে ফাটা। আজকাল সব জিনিষই যেমন একটু বাড়ে, এই জমান পাথরের মেঝেও সে গুণের অধিকারী। সুতরাং এই জমানো পাথরের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অনুসারে তার বিস্তৃতির ব্যবস্থা করলে মেঝে ফাটবার আর কোনও কারণ থাকতে পারে না।

এইবার আমি আমাদের সাধারণ বাস-গৃহের দুটী অসাধারণ ত্রুটীর উল্লেখ করব;—একটী রান্নাঘর-সম্পর্কিত, অপরটী ডেন-সম্পর্কিত। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দেখতে গেলে এ দুটী জিনিস খুব বড়; অথচ অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা এই যে আমরা এই দুটী বিষয়ে অত্যন্ত বেশী অসাবধান। কলকাতার স্বাস্থ্য যে দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে—টাইফয়েড ও যক্ষ্মার প্রকোপ যে দিনে দিনে বর্দ্ধিতই হয়ে চলেছে তার কারণ রান্নাঘরে যথোপযুক্ত ধূম-নিকাশের ব্যবস্থা নেই এবং বাস-গৃহের ড্রেণ-সম্পর্কিত ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক।

রান্নাঘরে আমাদের বাঙালীর বাড়ীতে সাধারণতঃ

কয়লার চুল্লী ব্যবহার করা হয়। কয়লার চুল্লীর সমস্ত ধোঁয়া বাইরে যাবার সোজা পথ না পেয়ে বাড়ীর ঘরের মধ্যে ঢুকে বাড়ীর দেওয়াল ও আস্বাবপত্রের অবস্থা মলিন করে দেয় ও অধিবাসীদেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। এবং এই স্বাস্থ্যহানি বিশেষ করে ঘটে বাঙালীর অন্তঃপুরিকাদের; কারণ দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁদের কাটে রান্নাঘরের কাজে। ধোঁয়ার হাত থেকে উদ্ধার পাবার দুটী উপায় আছে—একটী হচ্ছে যথোচিতভাবে নির্ম্মিত চিমনির ব্যবস্থা করা, কিংবা গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভ ব্যবহার করা। গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভ ব্যবহারের প্রধান আপত্তি—ব্যয়বাহুল্য। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়; কিন্তু তবুও আমার মনে হয় যে স্বাস্থ্যের ও সুবিধার দিক থেকে দেখলে এই বর্দ্ধিত ব্যয়ের স্বপক্ষেই মত দিতে হয়। এবং আমার বিশ্বাস ব্যয়বাহুল্য সত্বেও ইলেক্‌ট্রিকের আলো যেমন ধীরে ধীরে আলোক-সমস্যা সমাধানের পুরাতন উপায়গুলিকে বাতিল করে নিজের অধিকার বিস্তার করছে, তেমনি সুখ-সুবিধা ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিকের ষ্টোভ কয়লার চুল্লীর স্থান অধিকার করবে। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা; বর্ত্তমানে কয়লার ধোঁয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে যথোচিত ভাবে পরিকল্পিত চিমনি নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। অনেকে এমন ভাবে চিমনি নির্ম্মাণ করিয়েছেন যে, তাতে সুফলের চেয়ে কুফলই ঘটেছে বেশী,—চিমনি দিয়ে ঠিক মতো ধোঁয়া নির্গত হয় না, অধিকন্তু চুল্লীর অনেকখানি তাপ নষ্ট হয়ে যায়। কার্য্যক্ষম চিমনি (efficient) নির্ম্মাণ করতে হলে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। তা নয় ত যা তা ভাবে চিমনি নির্ম্মাণ করে তার থেকে পুরামাত্রায় সুবিধা উপভোগ করার কোন অর্থ থাকতে পারে না, কারণ চিমনি জিনিসটী ত সখের নয়, প্রয়োজনের। বাড়ীর ছাদ থেকে চিমনির মুখ ন্যূনপক্ষে দশফুট উঁচু হওয়া উচিত। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার নির্ণয় করে এ উচ্চতার কমবেশী হওয়া দরকার। এ বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

এইবার ড্রেণের কথা। বাড়ীর স্বাস্থ্য ভাল রাখবার এই প্রধান উপায় সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত উদাসীন। আমাদের যত ঝোঁক বাড়ীর বহিরাবরণটীর দিকে, মাটীর তলায় বা আমাদের চক্ষের আড়ালে দূষিত দ্রব্যাদি বাহী ড্রেণের অবস্থার কথা আমরা অতি অল্পই চিন্তা করি। বাড়ীর সাজসজ্জার দিকে গৃহস্বামীর অচল দৃষ্টি থাকে, কিন্তু এই ড্রেণ-সমস্যার সমাধান করার ভার থাকে অতি অজ্ঞ লাইসেন্স-প্রাপ্ত একজন প্লাম্বার মিস্ত্রীর ওপর। সে তার নিজের খুসী মতো পাইপ বসিয়ে কোন রকমে জোড়াতোড়া দিয়ে কাজ সেরে যায়। ফলে দুদিন বাদে যেখানে পাইপ জোড়া দেওয়া হয়েছে, সেখান দিয়ে দূষিত জল ফুটে বার হয়। ড্রেণে যথোচিত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায় একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ বার হয়। এবং সময়ে অসময়ে ড্রেণ বন্ধ হয়ে বাড়ীতে নরক সৃষ্টি হয়। এই সকল ত্রুটীর যথোচিত প্রতিবিধান করতে গেলে আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত এঞ্জিনিয়ারের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য এই কার্য্যে বিশেষজ্ঞ ও বিচক্ষণ যথেষ্ট লোকের অভাব আছে। সন্তোষ-জনক কাজ করাতে হ'লে নিজেই যদি একটু ভাল করে তত্ত্বাবধান করা যায়, তাহলে কাজ অনেকটা ভাল হবে এবং এজন্য এই কয়েকটী বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখলেই চলবে—ড্রেণের পাইপ ঢালু করে কংক্রীটের উপর বসান হবে; মাষ্টার ট্র্যাপ অর্থাৎ যার সঙ্গে রাস্তার ড্রেণের সংযোগ হয়েছে, সেইখানে ফ্রেস এয়ার মাইকা ভাল্‌ভ (fresh air mica valve) দ্বারা বাতাস আসবার ব্যবস্থা করা উচিত। ম্যান-হোলের উপর বেশ ভারী ওয়াটার সীল (water seal) যুক্ত লোহার ঢাকনী ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক এবং যে লোহার পাইপ ব্যবহার করা হবে সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পুরু হওয়া প্রয়োজন। পাইপ যেখানে জোড়া দেওয়া হয়েছে, সেই জোড়ের মুখ প্রথমে আলকাতরা মাখান দড়ি দিয়ে বন্ধ করে সীসা গলিয়ে ঢেলে দেওয়া উচিত। বাড়ীর শেষ ইন্‌সপেক্‌সন পিট (Inspection pit) থেকে দূষিত বাতাস বাইরে যাবার জন্যে বাড়ীর ছাদের ৬' ফিট ওপর পর্য্যন্ত পাইপের (ventilation pipe) ব্যবস্থা হওয়া নিতান্ত দরকার। অবশ্য পাইপ প্রভৃতির আয়তন ও পাইপের ঢাল একজন বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

আমি অত্যন্ত মোটামুটী ভাবে আমাদের গৃহনির্ম্মাণ-সম্পর্কিত দোষ-ত্রুটীর উল্লেখ করে গেলাম। এ-বিষয়ে আমাদের একটু অবহিত হওয়া উচিত; এই জন্য সাধারণ ভাবে দু'একটী ত্রুটী সংশোধনের উপায়ও উল্লেখ করলাম।

কিন্তু এইখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি যে সকল ত্রুটীর উল্লেখ করেছি তার মধ্যে এমন অনেক জটিলতা থাকা সম্ভব যে ক্ষেত্র-বিশেষে ত্রুটীর সংশোধনের বিশেষ উপায় অবলম্বন করা দরকার।

পঞ্চাশ বৎসর আগে গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারটী নিতান্ত জটিল ছিল না বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে গাড়ীমোটরের যুগে ও জীবন-যাত্রা প্রণালীর পরিবর্ত্তনের ফলে সমস্ত ব্যাপারটী শুধু যে বিরাট আকারই গ্রহণ করেছে তা নয়, এর মধ্যে অসাধারণ জটিলতাও বেড়ে গিয়েছে।

সাময়িকী

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বিগত দশ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করায় বেতন স্বরূপ যে টাকা তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছিল, তাহার এক কপর্দ্দকও তিনি নিজে গ্রহণ করেন নাই; সমস্ত টাকা মজুত ছিল। সে টাকার পরিমাণও কম নহে—নব্বই হাজার টাকা। আচার্য্যদেব এই নব্বই হাজার টাকাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের উন্নতি সাধিত হইবে, রসায়ন-গবেষণার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন এই টাকা হইতে তাহা সরবরাহ করা হইবে; বিজ্ঞান কলেজে আরও একটা রসায়নাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে। অনেক দানের কথা শোনা গিয়াছে, অনেক দাতার কথা শোনা গিয়াছে, কিন্তু আচার্য্যদেব প্রফুল্লচন্দ্রের এ দানের তুলনা নাই। ইহা তাঁহার ন্যায় দেবপ্রতিম বৈজ্ঞানিকেরই উপযুক্ত। এই কি তাঁহার একমাত্র দান? তাহা নহে। এতদ্ব্যতীত এতকাল তিনি নীরবে কত দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার ব্যয়-ভার বহন করিয়াছেন, কত অনাথ-অনাথার মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের গৌরবের পাত্র—আর দানশীল, পরদুঃখকাতর, ঋষিপ্রতিম প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

গগনচন্দ্র হোম

আমরা গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি যে, বিগত ৯ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার রাত্রি বারটার সময় শ্রদ্ধেয় গগনচন্দ্র হোম মহাশয় তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ সবডিবিজনে তাঁহার

বাড়ী ছিল। ময়মনসিংহে অধ্যয়নকালেই তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাহার পর তিনি যখন প্রকাশ্যে উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার উপর যে কত অত্যাচার, কত নির্য্যাতন হইয়াছিল, তাহা এখনকার যুবকেরা বুঝিতেও পারিবেন না। এই সকল নির্য্যাতনে কাতর না হইয়া গগনবাবু ভগবানের নামে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সে নিষ্ঠা, সে ভগবদ্‌প্রেমের লাঘব হয় নাই। কলিকাতা সিটি কলেজে তিনি কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন; 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং জীবনের বিশিষ্ট অংশ তিনি 'সঞ্জীবনীর' সেবায় কাটাইয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি কোর্ট অব-ওয়ার্ডসে ম্যানেজারী করিতেন। গগনবাবুর ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সুখী ব্যক্তি অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান অমল হোম বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত; তিনি এখন কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক; অন্যান্য পুত্রেরাও পিতার উপযুক্ত সন্তান। আমরা গগনবাবুর বিধবা সহধর্ম্মিণী, পুত্রকন্যা ও আত্মীয়গণের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ কবিতেছি।

সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশের স্কুল কলেজে ছাত্র-ধর্ম্মঘটের কথা প্রায়ই শোনা যাইতেছে। কেন এরূপ হইতেছে? ইহার জন্য ছাত্র বা শিক্ষক কাহারা দায়ী? একদল লোকের মতে ছাত্রেরাই এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। তাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিয়াছে, শিক্ষকদের তাহারা শ্রদ্ধা করে না, কোনরূপ শাসন তাহারা মানিতে চায় না; যে কোন একটা তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া বসে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এ বিষয়ে ছেলেদের চেয়ে শিক্ষকদের দোষই বেশী। তাঁহারা হৃদয় অপেক্ষা বেতের চাষ করিতে অনেক বেশী পটু। ছেলেদের সঙ্গে একটু সহৃদয় ব্যবহার করিলে, তাহাদের মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্য্যাদার উপর আঘাত না করিলে, ছেলেরা এমন বিগড়াইতে পারে না। এই দুইটী মতের কোন্‌টী ঠিক, আমরা সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে চাই না। বর্ত্তমানে কলিকাতায় দুইটি বড় কলেজে যে ছাত্র-ধর্ম্মঘট চলিতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই সমস্যা অনেকটা পরিষ্কার হইবে।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ কলিকাতার অন্যতম খ্যাতনামা কলেজ। বহু ভারতীয় ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। বেলজিয়ান মিশনারী সঙ্ঘ ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। সুতরাং কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি, তাহাদের মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আশা করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয়, সে ভাব আমরা দেখিতে পাইতেছি না। কয়েকদিন পূর্ব্বে "রেক্টর দিবস" উৎসবে ছাত্রেরা কলেজের রেক্টরকে (মিশনারী ফাদার) যে লিখিত অভিভাষণ দিবে কথা ছিল, তাহাতে স্বদেশপ্রেমের উল্লেখ ছিল। ইহাতেই রেক্টর অসন্তুষ্ট ও ধৈর্য্যচ্যুত হন এবং স্বদেশপ্রেমসূচক ঐ কথা কয়টী অভিভাষণ হইতে বাদ দিতে বলেন। ছেলেরা তাহা করিতে অস্বীকৃত হয় এবং অভিভাষণ বন্ধ রাখিতে চায়। রেক্টর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং কাহার ইঙ্গিতে বলিতে পারি না, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাত্রেরা ভারতীয় ছাত্রদিগকে দোরস্ত করিতে উদ্যত হয়। কলেজ-প্রাঙ্গণে পুলিশ ডাকিয়া আনিয়া ছেলেদের বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। একেবারে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। ইহার ফলে ভারতীয় ছাত্রেরা একযোগে কলেজে যাওয়া ত্যাগ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছেলেদের পক্ষ হইতে সম্মানজনক আপোষের চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেন না রেক্টর জিদ ধরিয়া বসিয়াছেন, ছেলেদের নিজেদের কার্য্যের জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে, নতুবা কলেজে পুনরায় যোগ দিতে দেওয়া তো দূরের কথা, অন্য কলেজে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে না। যে শিক্ষক ছাত্রদের স্বদেশ-প্রেমের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তাহাদের সঙ্গে জবরদস্ত পুলিশ সাহেবের মত ব্যবহার করেন, তাহাদিগকে চোর ডাকাতের মত বিতাড়িত করিবার জন্য পুলিশ ডাকিয়া আনেন, তিনি রেক্টর পদের যোগ্য কি না ভাবিয়া দেখা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ প্রেসিডেন্সী কলেজের কথা। ইহা সরকারী কলেজ,—বাঙ্গালা-দেশের প্রধানতম কলেজ। কিন্তু এখানে এত ঘন ঘন ধর্ম্মঘট হইতেছে কেন? গতবার মিঃ ষ্টেপল্‌টনের অধ্যক্ষতার আমলে যে ছাত্র-ধর্ম্মঘট হয়, তাহার

কারণ ও ফলাফল আমরা সকলেই অবগত আছি। এবারকার ধর্ম্মঘটের সূচনা—ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের একটী অপ্রীতিকর ঘটনা লইয়া। সেই ব্যাপারে ছাত্রেরা বালক-সুলভ কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার জন্য প্রিন্সিপাল মিঃ বারো মহাশয়ের সশরীরে রণক্ষেত্রে অবতরণ, ওয়ার্ড হিসাবে ছেলেদের গুরুতর জরিমানা, পুলিশ ডাকা, অবশেষে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ৪১ জন ছাত্রকে অবিলম্বে হোষ্টেল ত্যাগে বাধ্য করা, কলেজ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা,—একজন কলেজের অধ্যক্ষের পক্ষে এ সব প্রশংসনীয় কাজ নহে! এ ক্ষেত্রেও মিঃ বারো পুলিশ কমিশনারের অথবা জবরদস্ত সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন, ছেলেদের বন্ধু এবং উপদেষ্টা-রূপে কাজ করেন নাই। অনেক বাদানুবাদের পর মিঃ বারো ৪১ জন ছাত্রের মধ্যে ২৮ জনকে কলেজে পুনরায় লইতে সম্মত হইয়াছেন; কিন্তু ১৩ জনকে কিছুতেই লইবেন না বলিয়াছেন। অধ্যক্ষের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ প্রেসিডেন্সী কলেজের সমস্ত ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ফলে মিঃ বারো আরও চটিয়া গিয়াছেন; এবং হিন্দু-হোষ্টেল ও প্রেসিডেন্সী কলেজ বন্ধ করিয়া দিবেন ভয় দেখাইতেছেন। ইহা ছাত্র শাসনের রীতি নহে। এ যুগে ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের বিকাশ হইয়াছে, জাতীয় আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ জাগিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারে নূতন নীতি চাই; সেকালের বেত্রহস্ত গুরুমহাশয় অথবা একালের জবরদস্ত সিভিলিয়ান অথবা একালের পুলিশ কমিশনার সাজিলে চলিবে না। যে ১৩ জন ছাত্রকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে; কলেজের দ্বারে পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছে; এবং যতদিন ঐ ১৩ জনকে কলেজে গ্রহণ করা না হইবে, ততদিন তাহারা কলেজে যাইবে না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। সুতরাং এ গোলযোগ যে সহজে মিটিবে, তাহা মনে হয় না। আমরা গবর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করি, তাঁহারা সেণ্টজেভিয়ার্স ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র-ধর্ম্মঘটের ব্যাপারের যথোচিত তদন্ত করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বনে জঙ্গলে নানা জাতীয় গাছগাছড়া জন্মিয়া থাকে, যাহা হইতে অনেক বলকারী খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। পাড়াগাঁয়ের উৎসাহী যুবকগণ ইচ্ছা করিলে সামান্যমাত্র মূলধন লইয়া এই সমস্ত কারবারে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন। শটী একটা বলকারী শিশুখাদ্য ও রোগীর পথ্য। ইহার গাছগুলি অনেকটা হলুদের মত দেখিতে এবং স্বভাবতঃ রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। মুথাগুলি তুলিয়া উহা হইতে শটী প্রস্তুত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। জার্ম্মাণি হইতে সম্প্রতি একপ্রকার হস্ত-চালিত কল আসিয়াছে, যাহা দ্বারা অতি কম মূলধনে শটী প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বেকার সমস্যার দিনে শত শত যুবক এই কার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। তাঁহারা জঙ্গল হইতে মুথা সংগ্রহ করিয়া আনিলে ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত এই কলের সাহায্যে বাজারে বিক্রয়োপযোগী শটী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। কাগজে মোড়ক করিয়া বা টীনে বন্ধ করিয়া আর এক দল যুবক উহা বাজারে বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। বেকার যুবকের সমস্যা যে প্রকার গুরুতর হইয়াছে, তাহাতে এই সকল দিকে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা, এম্-এ, বি-এল, পি এইচ-ডি প্রণীত "বৌদ্ধ রমণী"—২॥•

জসীমউদ্দীন প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "নক্সী কাঁথার মাঠ"—১৲

অনন্তকুমার বসু প্রণীত "উল্কা"—১৶•; "নিঠুর নিমাই"—১৲

রাজকুমার বসু বি-এল ভারতী বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "তদন্ত কাহিনী" প্রথম খণ্ড—২।•

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্য-লহরী সিরিজের "নেক্ড়ের আস্ফালন" ও "কলির ভীমের কাণ্ড" প্রত্যেকখানি—৸•

অনিলচন্দ্র রায় প্রণীত "জাগ্রত পারস্য"—১॥•

জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত "পঞ্চকণা"—৸•

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—আগামী কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষ' ১৪ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"ভারতবর্ষ"

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Bharatvarsha Halftone & Printing Works
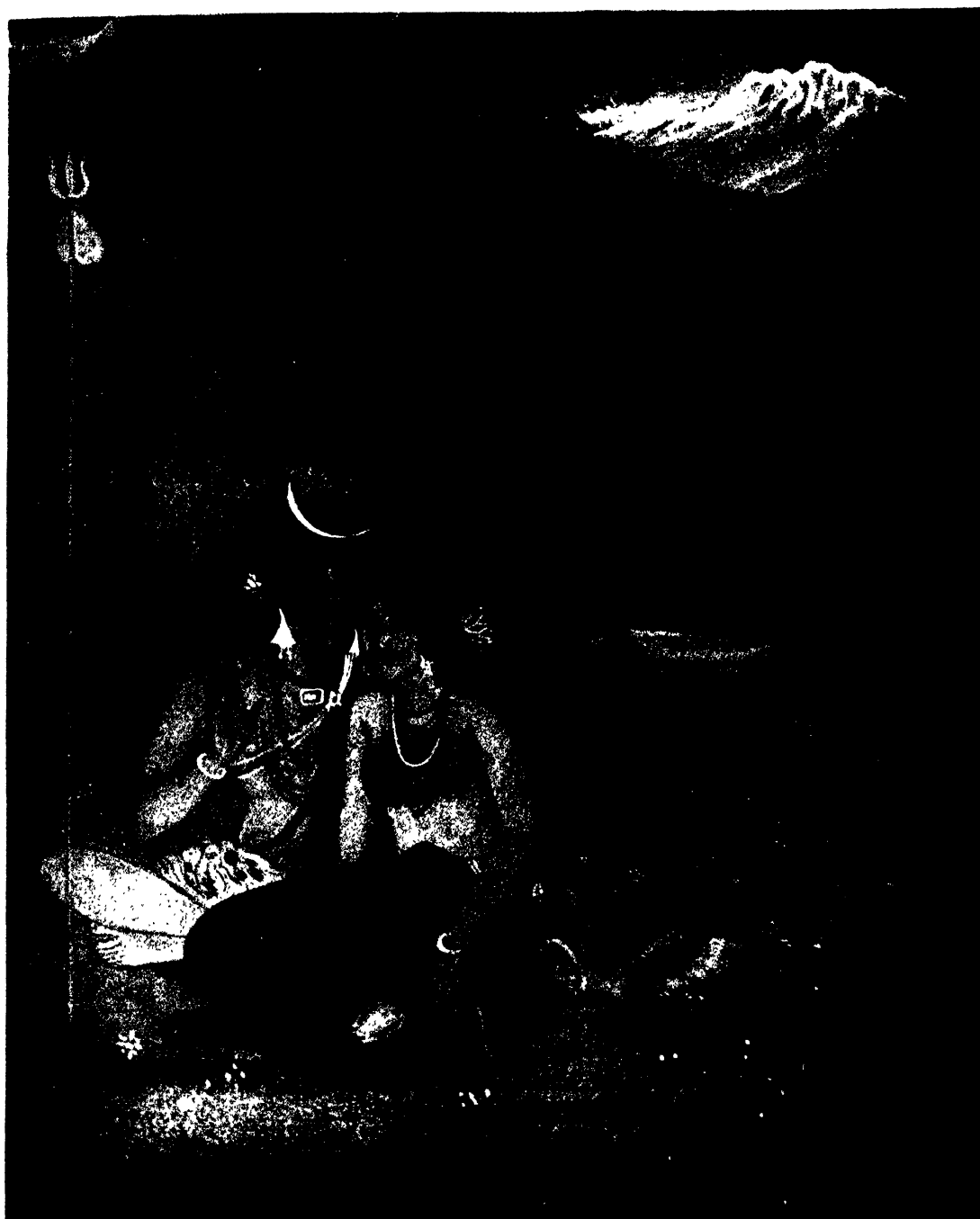
ভারতবর্ষ

কার্ত্তিক—১৩৩৬

প্রথম খণ্ড } সপ্তদশ বর্ষ } পঞ্চম সংখ্যা

রবীন্দ্র-প্রতিভার উৎস

("জীবনদেবতা")

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম এ, পি-আর-এস

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রায় দুইটি কবিতা আছে, একটী 'অন্তর্যামী', আর একটী 'জীবনদেবতা'। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের সুমধুর একটী রহস্য এই কবিতা দুইটিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

এ কি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা' বলাও আমি বলি তাই
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে। (চিত্রা)

এই কৌতুকময়ীটি কে? কে এই রহস্যময়ী কবির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া গানে কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতেছে; কবির নিজের কোনো কথা নাই, কোনো ভাষা নাই, সব এই কৌতুকময়ীর রহস্য লীলা! অথবা—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?
দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম— (চিত্রা)

এই অন্তরতমই বা কে? কাহাকে তিনি দলিত দ্রাক্ষার মতন সমস্ত বুক নিঙড়াইয়া দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারা পাত্র ভরিয়া পান করাইয়াছেন। কবি বলিয়াছেন এই অন্তরতম, এই কৌতুকময়ীই তাঁহার অন্তর্যামী, তাঁহার জীবনদেবতা! কবির অনুভূতি সত্যই একটু অদ্ভুত! এই কৌতুকময়ী অন্তর্যামীকে তিনি নিজে খুঁজিয়া বাহির করেন নাই, অন্তরতম জীবনদেবতা নিজে তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। অথচ কবির যাহা কিছু নর্ম্ম কর্ম্ম সকল কিছুর দেবতা এই অন্তরতম; কবির গানে কবিতায় যাহা ফুল হইয়া ফুটিয়াছে তাহা এই অন্তরতমেরই পূজার জন্য। কবির জীবনটি যেন একটি বীণা; সে বীণার সুর বাঁধিয়া দিয়াছেন জীবনদেবতা, রাগিণী রচনা করিয়া দিয়াছেন তিনি, কিন্তু গান ফুটাইয়া তুলিতে দিয়াছেন কবিকে। তবে কি এই 'জীবনদেবতা' 'অন্তরতমে'র অধিষ্ঠান কবির মনের মধ্যে—তিনিই কি কবির সমস্ত অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ভাষায় কবিতায় ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছেন, গানের সুরে ঝঙ্কৃত হইতে চাহিতেছেন? তাঁহার ক্ষণিক খেলার লাগিয়াই কি প্রতি দিন বাসনার সোনা গলাইয়া গলাইয়া নিত্যনূতন মূর্ত্তি রচনা করিতেছেন? বুঝি বা তাহাই হইবে—বুঝি বা অন্তরের মধ্যে সুতীব্র একটা অনুভূতি দেবতার রূপে তাঁহার সমগ্র জীবনের অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছে। বুঝি তিনিই আবার কখনও দেবীর রূপ ধরিয়া কবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং কবি তাঁহারই চরণে দীন ভক্তের অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছেন—

* * দেবি, নিশিদিন করি পরাণপণ
চরণে দিতেছি আনি
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধন খানি।

* * * * *

তুমি যদি দেবি পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ সুকোমল
একটি বিন্দু ফেল আঁখি জল
করুণা মানি।
সব হ'তে তবে সার্থক হ'বে
ব্যর্থ সাধন খানি।

'জীবনদেবতা'র আর এক রূপ সন্দেহ নাই, তবু জীবনদেবতা-ই বলিতে হইবে এই দেবীকেও; কবিজীবনের যত অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান, বিফল যত বাসনা সমস্তই তাঁহার চরণে উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাঁহারই কৃপায় সমস্ত সার্থক হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই জীবন দেবতা কে?

মানুষের মনে একটা সৃষ্টির প্রেরণা আছে। মানুষ গানে কবিতায় চিত্রে ভাস্কর্য্যে শিল্পে সাহিত্যে চিন্তায় কর্ম্মে যাহা কিছু প্রকাশ করে তাহার মূলে রহিয়াছে এই সৃষ্টির প্রেরণা। এই প্রেরণাই তাহাকে সমস্ত কর্ম্মে সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করে—ইংরেজীতে ইহাকে বলা হইয়াছে creative impulse। জীবনের মূলে সৃষ্টির এই প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ এক এক সময় অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে তিনটি কবিতার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এই অনুভূতিটিই রসে ও সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির এই প্রেরণাই তাঁহাকে সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, সমস্ত কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করে;—এই প্রেরণাই নিরন্তর তাঁহার অন্তরের মধ্যে বসিয়া মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া লইয়া আপনাকে ব্যক্ত করে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, সৃষ্টির এই যে প্রেরণা, এই যে creative impulse, ইহা কি একেবারেই স্বয়ংসিদ্ধ? এই প্রেরণা কি আপনিই মনের মধ্যে জাগে? বাহির হইতে কিছুই কি এ প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করেনা? রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সৃষ্টির যে এই প্রেরণা, যে প্রেরণাকেই তিনি বলিয়াছেন কৌতুকময়ী অন্তর্যামী, সে প্রেরণা কি আপনা হইতে তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, বাহিরের কিছু কি তাহাকে উদ্বুদ্ধ করে নাই? মনে হয় তাহা নহে। তত্ত্বের দিক্ হইতে কোন্‌টা সত্য, বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হয়, সৃষ্টির এই প্রেরণা আপনা হইতে মনের মধ্যে জাগে না;—মন যে শুধু আপনা আপনি বাহিরের এই বিশ্বজীবনের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্যকে দেখিয়া ও ভোগ করিয়া তৃপ্ত হয় তাহা নয়; বাহিরের এই

বিশ্বজীবনের মধ্যেও এমন কিছু আছে, যাহা মনের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যানুভূতিকে উদ্রিক্ত করে। মানুষের মন এবং বাহিরের এই বিশ্বজীবন এই দু'য়ের মিলনালিঙ্গনেই মানুষের মনে সৃষ্টি-প্রেরণা উদ্বুদ্ধ হয়। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই প্রেরণা বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাই যেন মনে হয়। বাহিরের বিশ্বজীবনের যে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে মনের মধ্যে আমরা একটী অখণ্ডরূপে ভোগ করি, সেই ভোগানুভূতিটীই যেন আমরা ভাবে ও কথায় ফুটাইয়া তুলিতে চাই।

তাহা হইলে দেখিতেছি, সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে একটা উৎস আছে; এই সৃষ্টি-প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে একটা অনুভূতি—এই অনুভূতিকেই কবি যেন তাঁহার জীবনের অধীশ্বর বলিয়া মনে করিতেছেন। তিনি মনে করেন, যে গান তিনি রচনা করেন, যে কথা তিনি বলেন, যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করেন, তাহা এই অনুভূতির—এই creative impulse-এর কৃপায়! এই অনুভূতিকেই তিনি সুখ-দুঃখের লক্ষ ধারা পাত্র ভরিয়া পান করাইয়াছেন; তাহারই চরণে তিনি জীবনের যত শ্রেষ্ঠ সাধের ধন উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং সর্ব্বশেষে তাহাকেই প্রশ্ন করিয়াছেন, এত যে তোমায় দিলাম, এত যে তোমার পূজা করিলাম, হে আমার অন্তরতম, তুমি তৃপ্ত হইয়াছ কি? এই অনুভূতিই আবার তাঁহাকে নিত্যনূতন লীলায় প্রবৃত্ত করিয়াছে, নিত্যনূতন কৌতুকে মাতাইয়াছে—ইহাকেই তিনি কৌতুকময়ী অন্তর্যামী বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই অনুভূতি যখন প্রবল হইয়াছে, যে মুহূর্ত্তে মনে হইয়াছে আমার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একজন অন্তরতম বসিয়া আছেন, তিনি অন্তরের ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতেছেন সকল কথায় ও কর্ম্মে—সেই মুহূর্ত্তে কবি তাহার খেলার পুতুল হইয়া গিয়াছেন, একান্ত দীন ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। জীবনের তেমন বহু মুহূর্ত্তের একটি সুদীর্ঘ মুহূর্ত্ত চিত্রার কয়েকটি কবিতায় ধরা পড়িয়া আছে।

এ কথা আমি বলিতেছি না যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিশ্ব-জীবনের অনুভূতি ও সৃষ্টি-প্রেরণা একই বস্তু। আমার কথা হইতেছে এই যে, বিশ্ব-জীবনের অনুভূতিই তাঁহাকে সৃষ্টির মূলে প্রেরণা দান করিয়াছিল—এবং সৃষ্টির এই প্রেরণা তিনি যৌবনের প্রথম উন্মেষ হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন। এই অনুভূতি জীবনের এক এক স্তরে এক এক বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; একটি প্রবাহ এক স্থানে আসিয়া বাধা পাইয়া, আর এক দিকে স্রোতের গতি ফিরাইয়াছে, আর এক মুখে বাধা পাইয়া ভিন্ন মুখে গিয়াছে—কখনো শীতের শুষ্ক রেখায়, কখনো বর্ষার মত্ত ধারায়। আমার মনে হয়, সৃষ্টির এই প্রেরণা, এই creative impulse প্রথম হইতেই বিচিত্র গানে ও সুরে, গল্পে ও কবিতায়, ভাবে ও কর্ম্মে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, এখনও করিতেছে—এবং এই সৃষ্টি-প্রেরণা বিশ্ব-জীবনের অনুভূতি দ্বারা উদ্বোধিত। অবান্তর হইলেও এখানেই এ কথা বলিতে চাই যে, এই অনুভূতিকেই কবি উত্তরকালে 'জীবনদেবতা' বলিয়াছেন।

কবিগুরুর অনেক পত্রাংশে ও জীবন-স্মৃতিতে বাল্যজীবনে এই অনুভূতির প্রথম অস্পষ্ট আভাস আমরা জানিতে পারি। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সদর-ষ্ট্রীটের রাস্তার পূর্ব্ব প্রান্তে ফ্রী স্কুলের বাগানের দিকে চাহিয়া যে অপূর্ব্ব অনুভূতির স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস সকলেরই জানা আছে; সে-কথা এখানে আর নাই উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু আর দু'টি লেখাংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে।

"আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে, কিন্তু সে এতো অপরিস্ফুট যে ভাল করে ধরতে পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে এক একদিন সকালবেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠ্‌তো! তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। গোলাবাড়ীতে একটা বাঁখারী দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তাম, মনে করতাম কি একটা রহস্য আবিষ্কৃত হবে। * * * পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ীর ভেতরের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অদ্ধপরিচিত প্রাণী নানান মূর্ত্তিতে আমায় সঙ্গদান করত।"

আর একটী পত্রাংশ এইরূপ—

"প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব ক'রে। এই তৃণ গুল্মলতা, জলধারা বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্ত্তন, জ্যোতিষ্কদলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণী পর্য্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়ছে, যেখানে ঝঙ্কার উঠ্‌ছে, সেইখানেই আমাদের মনের ভেতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। জগতের সমস্ত অণু-পরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হতো, যদি প্রাণে ও আনন্দে অনন্ত দেশ-

কাল স্পন্দমান হয়ে না থাক্‌তো, তা'হলে কখনই এই বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হতোনা। যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই বলেই আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী হ'য়ে উঠ্‌ত।"

প্রকৃতির মধ্যে একটা গভীর আনন্দ বহু কবিই অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই আনন্দ একটা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি প্রকৃতির সব কিছু রূপের সঙ্গে একটা 'নিগূঢ় আত্মীয়তা' অনুভব করিয়াছেন। এই বিশ্ব-প্রকৃতির যত কিছু রূপ, যত কিছু বিচিত্র প্রকাশ, সব কিছু যেন এক অখণ্ড রূপে তাঁহার অন্তরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে ; এবং সেই অখণ্ড রূপের সঙ্গে বাহিরের যত খণ্ড বিচিত্র রূপ সব কিছু'র একটা নিবিড় নাড়ী চলাচলের যোগ আছে। এই যে একটা অপূর্ব্ব রহস্যের অনুভূতি—বলা নাই কহা নাই, এক একদিন হঠাৎ অকারণে মনের মধ্যে এই অনুভূতির স্পর্শ পাইয়া সমস্ত অন্তরাত্মা যেন একটা চঞ্চল পুলকে নাচিয়া উঠিত। অন্তরের সীমার মধ্যে বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতি যে একটা অনুভূতির স্পর্শদান করিয়াছে সেই অনুভূতিটাই আবার বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র রূপের মধ্যে নিজকে খুঁজিয়া পাইতে চায় ; সেই অনুভূতি যে কি বস্তু, কি যে তার স্বরূপ কিছুই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছেনা, অথচ ভিতর হইতে কি যে একটা 'অর্দ্ধ পরিচিত প্রাণী' ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। এই যে অপূর্ব্ব রহস্য, মনে হয় প্রকৃতির প্রত্যেক প্রকাশের মধ্যে বুঝি এই রহস্য আত্মগোপন করিয়া আছে ; কিন্তু সত্য কথাটা এই যে সে অপূর্ব্ব রহস্য তাঁহার মনের মধ্যেই, অন্য কোথাও নয় ; সেইখানেই এই রহস্যানুভূতি 'একটা বৃহৎ অর্দ্ধ পরিচিত প্রাণীর মূর্ত্তি ধরিয়া' নিরন্তর তাহাকে সঙ্গদান করিতেছে। এই অর্দ্ধপরিচিত প্রাণীটির অনুভূতিই বিশ্ব-জীবনের অখণ্ড অনুভূতির প্রথম অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

প্রভাত-সঙ্গীতের অনেক কবিতায়, বিশেষ করিয়া 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতে এই ইঙ্গিত সর্ব্বপ্রথম একটা সৌন্দর্য্যময় প্রকাশ লাভ করিল। যে অনুভূতির স্পর্শে সমস্ত দেহ-মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, যে অনুভূতি অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া মরিতেছে, সেই অনুভূতি একদিন সমস্ত অন্তর ভেদ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া বিশ্ব-প্রকৃতির অপূর্ব্ব অসীম অফুরন্ত প্রকাশের মধ্যে নিজকে বিসর্জ্জন করিয়া দিয়া সার্থক হইতে চাহিল। যে বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র খণ্ড খণ্ড প্রকাশকে কবি নিগূঢ় আত্মবোধের বলে এক অখণ্ড রূপে নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, সেই অনুভূতিটিই আবার 'একটা বৃহৎ অর্দ্ধপরিচিত প্রাণীর মূর্ত্তি ধরিয়া' তাঁহার ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া বিশ্ব-প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে নিজকে পুনরায় ফিরিয়া পাইল।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি

* * * * * *
* * * * * *

পরাণ পুরে গেল হরষে হ'ল ভোর
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর। (প্রভাত-সঙ্গীত)

অথবা— "আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ॥ (প্রভাত সঙ্গীত)

সর্ব্বত্রই এই অনুভূতির ইঙ্গিতটুকু আমরা পাই। এই যে অনুভূতি, ইহাকেই কবি উত্তরকালে 'জীবনদেবতা' বলিয়াছেন, এবং এই অনুভূতিই চিরকাল 'নানান্ মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে সঙ্গদান করিয়াছে'। "প্রভাত-সঙ্গীতে" যখন দেখিতেছি তখনও এই অনুভূতি অত্যন্ত অস্পষ্ট,—তখনও তাহার একটা রূপ বা মূর্ত্তি কবির মনের মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই।

এই অনুভূতির মধ্যে একটা তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া খুব কঠিন নয়, এবং সে তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত ; এবং বহু কথায় ও কবিতায় কবি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশের ও বিদেশের কোনো কোনো চিন্তাধারার মধ্যেও সে তত্ত্বটি প্রকাশ পাইয়াছে। বাহিরের এই যে বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতির সীমাহীন অগণন প্রকাশ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হইয়া আছে, এই বিশ্ব-প্রকৃতি যখন আমাদের অন্তরের মধ্যে ধরা দেয়, তখন তাহা একটা সীমার

মধ্যে অখণ্ড অনুভূতির রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু এই অখণ্ড অনুভূতি কিছুতেই অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না—আপন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আপনি চঞ্চল হইয়া উঠে; এবং আকুল আবেগে সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির অসীমতার মধ্যে বিচিত্র রূপে নিজকে উপলব্ধি করিতে চায়। আসল কথা হইতেছে, যাহা অসীম তাহা কিছুতেই সত্য অথবা সার্থক নহে—তাহার কোনো রূপ নাই,—সীমার মধ্যে ধরা দিয়া তবে তাহার রূপ, তবে তাহার সার্থকতা;—এই সীমার মধ্যে ধরা না দিলে অসীমকে কিছুতেই উপলব্ধি করা যায় না। আবার যাহা কিছু সীমার মধ্যে আবদ্ধ, যাহা কিছু সীমার মধ্যে একটা রূপ গ্রহণ করিয়াছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা সেই সীমার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া অসীম অরূপের মধ্যে নিজকে বিসর্জ্জন না দিল এবং উপলব্ধি করিতে না পারিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা সার্থক হইল না। সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ, অংশ ও সম্পূর্ণ এম্‌নি করিয়া পাশাপাশি বাস করে; আমাদের মরণশীল ব্যক্তিগত জীবন ও বাহিরের বিশ্ব-প্রকৃতির শাশ্বত জীবন—এ দুইয়ের মধ্যেও এমনি একটা 'নাড়ী চলাচলের যোগ' আছে। এই ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধ অনুভূতির মধ্যেই আমরা বিশ্ব-প্রকৃতির সীমাহীন শাশ্বত জীবনের সীমা প্রত্যক্ষ করি—সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা আমাদের অন্তরের অনুভূতির মধ্যে ধরা দেয় না; তাহা না হইলে কি ব্যক্তিগত জীবন, কি বিশ্ব-জীবন কিছুরই কোন সার্থকতা থাকিত না।*

* কবির কাব্যে জীবন-দেবতার যে তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে খুব সংক্ষেপে সে তত্ত্বের ব্যাখ্যা এইখানে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টম্‌সনের বহি'—সমালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ তত্ত্বের খুব সুন্দর একটু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার ব্যাখ্যার মূলগত কোনই পার্থক্য নাই; তবু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাখ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একমত জানি বলিয়াই সে ব্যাখ্যাটি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কবির কাব্যে জীবন-দেবতার যে আইডিয়া নানাস্থানে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যে তিনি (টম্‌সন্ সাহেব) বুঝিতে পারেন নাই, একথা স্বীকার করিলে ক্ষতি ছিলনা। ভারতবর্ষে আমরা গ্রামদেবতা, কুলদেবতা, গৃহদেবতা, ইষ্টদেবতাকে মানি। সে মানা Fetish মানা নয়। আমাদের ভক্তিতত্ত্বে সীমাশূন্যতাকে অসীম বলেনা। সকল সীমার মধ্যেই তিনি অসীম, এই জন্য ভক্তগণ সীমায় সীমায় তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হন। অসীম আকাশ আমার গৃহসীমার মধ্যে বদ্ধ আকাশ রূপেই আমার বিশেষ প্রিয়—অথচ পরমার্থত সে আকাশ সীমা-ধর্ম্মী নহে—পরমাকাশ অসীম না হইলে প্রত্যেক গৃহেরই মধ্যে তাহা খণ্ডাকাশ হইতেই পারিতনা। তেমনি পরমাত্মা অসীম বলিয়াই প্রত্যেক জীবাত্মায় তিনি বিশেষ—সেই কারণেই বিশেষ আত্মায় পরমাত্মার সহিত বিশেষ মিলনেই,—সুতরাং সীমাবদ্ধ মিলনেই আমাদের আনন্দ। * * * ঘনিষ্ঠ আশ্রয় প্রত্যাশায় অনন্ত আকাশকে আমরা গৃহমধ্যে খণ্ড আকাশ করিয়া ধরিয়াছি, কিন্তু নিজের সীমার দোষে সেই খণ্ডতাকে আমরা বিকৃত করিতে পারি। আকাশকে একান্ত অবরুদ্ধ করিয়া কারাগারের আকাশ করা অসম্ভব নহে, তাহাকে আলোকহীন আকাশ করিতে পারি, তাহাকে বিরূপের মধ্যে বদ্ধ করিয়া অসুন্দর আকাশ করিতে পারি। কবি তাই তাঁহার কাব্যে মাঝে মাঝে বলিয়াছেন "হে আমার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমাকে কি আমার জীবনের 'বিকৃতির' দ্বারা পীড়িত করিয়াছি? যদি করিয়া থাকি আমার এই জীবনের সীমাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া ইহাকে নূতন রূপ দাও।" অর্থাৎ আমার জীবনের সীমার মধ্যে যদি ছন্দের সুষমা থাকে, তবে যিনি অসীম তাঁহাকে সুন্দর করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া আমারই জীবনে প্রকাশ করিতে পারি। সেই প্রকাশেই আমার চরিতার্থতা। আর জীবনে যদি ছন্দের বিকার ঘটে তবে অসীমের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়।

"এই জীবনদেবতাকে কবি কখনো পুরুষ-ভাবে কখনো স্ত্রী-ভাবে দেখিয়াছেন। * * * যেমন গাছের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, এমন কি অচেতন বিশ্ববস্তুর সঙ্গে পরস্পর নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধি করিতে ভারতীয় বুদ্ধিতে বাধে না, তেমনি ভগবানের স্বরূপের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ-প্রকৃতিকে একই সত্যের প্রকাশ বলিয়া অনুভব করিতে সে আতঙ্কিত হয় না। কবিও নিজে জীবনের মধ্যে যে সকল পরম আবির্ভাব, যে সকল নিবিড় রস নানা উপলক্ষ্যে অনুভব করিয়াছেন, নিঃসন্দেহেই তাহার মধ্যে কখনো পুরুষের কখনো নারীর ভাব পাইয়াছেন। সেই উভয় ভাবের মধ্যেই আনন্দের অসীমতা। এই জন্যই জীবনদেবতাকে তাঁহার পক্ষে প্রিয়তম বলাও যত সহজ, প্রেয়সী বলাও তত সহজ।" (প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৩৪; পৃঃ ৫১৫-১৬)

পরিণত বয়সের একটী কবিতায় এই তত্ত্বটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

> ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
> গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে
> সুর আপনারে যোগ দিতে চাহে ছন্দে
> ছন্দ আপনি ফিরে যেতে চায় সুরে।
> ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
> রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া
> অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
> সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

প্রলয় সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

প্রথম যখন একটা অনুভূতির স্পর্শ লাভ করা যায়, তখন অন্তরের মধ্যে হঠাৎ একটা খুব আকুল চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে; স্পষ্ট একটা কিছু ধারণা হয় না, অথচ অনুভূতির তীব্রতা এত বেশী যে, নিজকে কিছুতেই ধরিয়া রাখাও যায় না। 'প্রভাত সঙ্গীতে' অন্তরের এই আকুল চঞ্চলতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এবং ক্রমে দেখিব, বিশ্ব-জীবনের সঙ্গে কবি-চিত্তের নিগূঢ় আত্মীয়তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যতই বাড়িতে লাগিল, ততই এই অনুভূতি আরো তীব্র, আরো স্পষ্ট হইয়া সমস্ত কবি-জীবনকে অধিকার করিয়া বসিল। 'প্রভাত-সঙ্গীতে' এই অনুভূতির যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত, 'ছবি ও গানের' দু' একটী কবিতায়ও তাহার আভাস আছে। 'রাহুর প্রেম' কবিতাটিতে এই অনুভূতি যেন একটা মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, যেন একটা রূপের মধ্যে ধরা দিতে চাহিতেছে এবং তাহার সঙ্গে কবি একটা প্রেম-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছেন।

শুনেছি আমারে ভাল লাগেনা
নাই বা লাগিল তোর,
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহ শৃঙ্খলের ডোর!
তুই ত আমার সঙ্গী অভাগিনী,
বাঁধিয়াছি কারাগারে
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।

* * * * * *

জগৎ মাঝারে যেথায় বেড়াবি
যেথায় বসিবি যেথায় দাঁড়াবি
কি বসন্তে শীতে, দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধরে
একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে!

(ছবি ও গান)

স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, 'প্রভাত সঙ্গীতে'র কুয়াসাচ্ছন্ন অনুভূতি যেন ক্রমে স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, মনের মধ্যে বেশ একটী রূপ লইতেছে এবং সেই রূপের সঙ্গে যোগ একটু একটু করিয়া নিবিড় হইতেছে। এ যেন একটা প্রাণের মধ্যে একটা জীবনের মধ্যে আর একটা প্রাণ আর একটা জীবন নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিতেছে; একটা চিরন্তন জীবন যেন একটা ক্ষণিক জীবনের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিবার প্রয়াস করিতেছে। এই ক্ষণিক জীবন যে দিকেই আঁখি মেলিয়া তাকায়, দেখিতে পায় কি শীতে কি বসন্তে, কি দিবসে কি নিশীথে, কি রোদনে কি হাসিতে, কি সম্মুখে কি পশ্চাতে, সর্ব্বত্র যেন এই চিরন্তন জীবনের মূর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে, তাহারই আড়ালে সমস্ত ঢাকা পড়িয়াছে, সমস্ত জগৎ বিশ্বপ্রকৃতি যেন সেই 'অনন্তকালের সঙ্গীর' মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই চিরন্তন জীবন এই অনন্তকালের সঙ্গী, বিশ্বজীবন যেন ইহারই মধ্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে—

অনন্তকালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে তোর ছায়া
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে
দেখিতে পাইবে কখন পাশেতে
কখন সমুখে কখন পশ্চাতে
আমার আঁধার কায়া

* * * * * *

যে দিকে চাহিবি, আকাশে আমার
আঁধার মূরতি আঁকা
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে
জগৎ পড়িবে ঢাকা।

(ছবি ও গান)

এর পরে 'ছবি ও গানে'র যে কবিতাটি আমি উল্লেখ করিতে চাই, তাহা শুধু এই অনুভূতির বিকাশ হিসাবে নয়, রসাভিব্যক্তি হিসাবেও মধুর এবং সুন্দর। 'নিশীথ জগৎ' সমগ্র কবিতাটির মধ্যে যেন একটা তীব্র আবেগ-কম্পিত বেদনাক্ষুব্ধ ছবি প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, নিবিড় মেঘের প্রান্তসীমায় বিদ্যুৎ থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে, মাথার উপর দিয়া 'উড়িছে বাদুড় কাঁদিছে পেচক'—এই ভীষণ দুর্য্যোগে শিশু মা'র হাত ধরিয়া গহন বনের পথে যাত্রা করিয়াছে। হঠাৎ 'খেলিবার তরে' মার হাত যেই ছাড়িয়া দিল অমনি পিছনে পড়িয়া গেল—'বাছা বাছা' বলিয়া ডাকিয়া মা আর বাছার

সন্ধান কোথাও পাইলেন না। মাতৃহারা শিশু এদিকে গহনবনের মধ্যে বসিয়া আছে—

সহসা সমুখ দিয়ে কে গেল ছায়ার মত,
লাগিল তরাস!
কে জানে সহসা যেন কোথা কোন্ দিক হ'তে
শুনি দীর্ঘশ্বাস।
কে বসে রয়েছে পাশে? কে ছুঁইল দেহ মোর
হিম হস্তে তার?
(ছবি ও গান)

এই অদৃশ্য পুরুষটি কে? অন্ধকারে যত অদৃশ্য প্রাণী এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি সকলের মধ্যে যে সে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, শিশু নিজেও যে সেই অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, অন্ধকারে নিজকেও ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছে না;—কি করিয়াই বা পাইবে, তাহার আপন যে তাহার নিজের মধ্যেই ডুবিয়া আছে! এই গুপ্ত আপনাকে কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

অন্ধকারে আপনারে দেখিতে না পাই যত,
তত ভালবাসি,
তত তারে বুকে করে বাহুতে বাঁধিয়া লয়ে
হরষেতে ভাসি!
তত যেন মনে হয় পাছে রে চলিতে পথে
তৃণ ফুটে পায়,
যতনের ধন পাছে চমকি কাঁদিয়া উঠে
কুসুমের ঘায়!

এই 'যতনের ধন'কে সখা বলিয়া মনে হয়, তাহাকে দেখিতে সাধ যায়—

সখারে কাঁদিয়া বলে—'বড় সাধ যায় সখা
দেখি ভাল কোরে
তুই শৈশবের বঁধু চিরজন্ম কেটে গেল
দেখিনু না তোরে
বুঝি তুমি দূরে আছ, একবার কাছে এসে
দেখাও তোমায়!'
সে অমনি কেঁদে বলে—'আপনারে দেখি নাই
কি দেখাব হায়'— (ছবি ও গান)

দেখাই যদি পাওয়া যাইত তবে তো সে অনুভূতি কবেই হাওয়ায় উড়িয়া যাইত—দেখা যায় না চেনা যায় না বলিয়াই ত তাহার যত রহস্য, তাহাকে দেখিবার জন্য চিনিবার জন্য আগ্রহের তীব্র আকুলতা!

আমি যে বলিয়াছি 'জীবনদেবতা'র অনুভূতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বজীবনের অনুভূতি'র একটা নিবিড় যোগ আছে, 'মানসী'র প্রথম কবিতাটিতে তাহার প্রমাণ আছে। এই যে অসংখ্য গানে ও কবিতায় মনের ভাবনা কামনাগুলি ফুলের মতন বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, ইহারা কি? কবির কথায় ইহারা প্রত্যেকটি এক একটা 'আনন্দ ক্ষণের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ'। এই আনন্দক্ষণটির প্রাণের সর্ব্বোত্তম মুহূর্ত্তটির স্পর্শ মনের মধ্যে কখন আমরা লাভ করি? 'উপহার' কবিতাটিতে কবি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই চিত্তের প্রান্তদেশে প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে, মুহূর্ত্ত তার বিরাম নাই; দুঃখ-সুখের বিচিত্র সুর প্রতি মুহূর্ত্তে অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তোলে, 'বিচিত্র দুরাশা জাগাইয়া' চঞ্চল করিয়া দেয়। তখন কবি বাহিরের এই তরঙ্গাঘাতক্ষুব্ধ বিচিত্র সুর-ধ্বনিত অসীম বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজের অন্তরের অনুভূতির সীমার মধ্যে একান্ত আপনার করিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহাকে আশা দিয়া ভাষা দিয়া ভালবাসা দিয়া অর্থাৎ তাঁহার নিজের সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি দিয়া অভিষিক্ত করিয়া নিজের 'মানসী প্রতিমা' রূপে গড়িয়া তোলেন। এই মানসী প্রতিমাই কখনও সখা রূপে, কখনও প্রিয়তমা নারীর রূপে, কখনও অন্তরের দেবতা, কখনও জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তাঁহাকে নিরন্তর সঙ্গ দান করে। বাহিরে এই বিশ্ব বিচিত্র গান, বিচিত্র দৃশ্য, বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়া আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া আছে; কিন্তু সে সঙ্গীহারা বিরহী; একান্ত ব্যথায় সে কবির হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য কাঁদিয়া মরিতেছে। কবির মনেও তখন বিরহ জাগিয়া উঠে; তখন তাঁহার মর্ম্মের মূর্ত্তিমতী কামনা অন্তঃপুরবাস ছাড়িয়া সলজ্জ চরণে আসিয়া বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গদান করে। অন্তরের সঙ্গে বাহিরের এই ব্যাকুলিত মিলনের যে মুহূর্ত্ত এই মুহূর্ত্তটিই একটি আনন্দক্ষণের 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশে'র মুহূর্ত্ত। এমনি মুহূর্ত্তেই যত গান, যত কবিতা মনের কুঁড়ির ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হয়।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্য্যের বেশে,

বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে উঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি' অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্ত্তিমতী মর্ম্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস
সে আনন্দক্ষণ গুলি তব করে দিনু তুলি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ। (মানসী)

'মানসী'র শেষ কবিতাটিও খুব লক্ষ্য করিবার। কবি মনে করিতেছেন, তাঁহার অন্তরের মধ্যে নিত্য যে তাঁহাকে সঙ্গদান করিতেছে, তাহার উপর তিনি জয়ী হইয়াছেন; তিনি যে মাধুরী এ জীবনে পাইয়াছেন সে তাহা পায় নাই। এই অলস সকাল বেলায়, অলস মেঘের মেলায় সারাদিনের জলের আলোর খেলার মধ্যে সর্ব্বত্র যেন সেই অন্তর-সঙ্গীর 'ওই মুখ ওই হাসি ওই দু'নয়নে' ভাসিয়া উঠিতেছে, কাছে দূরে সর্ব্বত্র মধুর কোমল সুরে তাহার ডাক শুনা যাইতেছে। কবি তো তাই ভাবেন, এ জীবনে তিনি যাহা পাইলেন তাহার অন্তর-সঙ্গী তাহা পাইল না। কবি যে ভাবেন, তাঁহার নিজের কোনো সীমা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের মধ্যে তিনি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন—কিন্তু যাহার প্রসাদে তাঁহার এই অপূর্ব্ব অনুভূতি তাহাকেই তিনি শুধাইয়াছেন,—

তুমি কি করেছ মনে দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ ক'রে
পড়া পুঁথি সম?
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারে-ও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভ'রে।
আমাতে ও স্থান পেত অবাধে, সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখ এ পরাণ ধরিয়াছে
কত ভালবাসা। (মানসী)

কিন্তু সেই সীমাহীন ভালবাসায় ভরা 'পরাণ' কি দেখিতে তুমি পাইবে—হঠাৎ কোনো শুভ-মুহূর্ত্তে যে তাহার দেখা মেলে?

সহসা কি শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে
দেখিতে পাওনি যদি দেখিতে পাবেনা আর
মিছে মরি বকে'!
* * * *
আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম সই
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা' কই!" (মানসী)

কিন্তু 'সোণার তরী'তেই সর্ব্বপ্রথম এই অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেল। 'মানসী'তে কবি যে 'মানসী-প্রতিমা' গড়িয়া তুলিয়াছেন, 'সোনার তরী'তে তাহাই 'মানস-সুন্দরী' হইয়া দেখা দিল। এই কবিতাটিই আমি সর্ব্ব-প্রথম উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রেরণার রহস্যময়ীকে যেন আমরা দেখিতে পাই। আমরা দেখিয়াছি, পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, নড়াচড়া আন্দোলন, বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র প্রকাশ, সব জড়াইয়া একটি 'অর্দ্ধপরিচিত প্রাণী' তাঁহাকে নিরন্তর সঙ্গদান করিত—এই প্রাণীটির সঙ্গে তখন ভাল করিয়া পরিচয় ছিল না, তবু কি সন্ধ্যায় কি প্রভাতে, কি গৃহকোণে, কি জনশূন্য গৃহছাদে, আকাশের তলে এই আধ-চেনাশোনা সঙ্গীটির সঙ্গে তাঁহার দেখা হইত, নানান্ বিচিত্র কথা বলিয়া সে তাঁহাকে ভুলাইত। বাল্যকালে এই সঙ্গীটি তাঁহার কাছে আসিয়াছিল নবীন বালিকা মূর্ত্তি ধরিয়া—কবি জীবনের এই প্রথম প্রেয়সীকে, তাঁহার ভাগ্যগগনের সৌন্দর্য্যের শশীকে—তাঁহার যৌবনের মানসসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

মনে আছে কবে কোন্ ফুল্ল যূথী বনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হ'তো দুই জনে
আধ চেনা-শোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে; ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখি, আসিতে হাসিয়া তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা মূর্ত্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি'
উষার কিরণ-ধারে সদ্যস্নান করি

বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি'
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব কর্ত্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথি পত্র, কেড়ে নিয়ে খ'ড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারা হ'তে; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জ্জনেতে রহস্য ভবনে;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে,
কি করিতে খেলা, কি বিচিত্র কথা বলে
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্যমিথ্যা তুমি জান তার। (সোণার তরী)

কিন্তু সে বাল্যজীবন কবির এখন আর নাই—তাঁহার বালিকা সঙ্গিনীও শৈশবের খেলাক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। কবির জীবনের বনে যৌবন-বসন্তের প্রথম মলয় বায়ু আজ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, মনের মধ্যে নূতন নূতন আশা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বজীবনের অনুভূতি আজ নূতন মোহে নূতন রূপে তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। কোন দিনে কবি হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার শৈশবের সঙ্গিনী

—খেলাক্ষেত্র হ'তে
কখন্ অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে,
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মত। * *

* * * *

ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছে মোর মর্ম্মের গৃহিণী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

বাল্যের সঙ্গিনী আজ অন্তরের প্রিয়ারূপে দেখা দিয়াছে—বাল্য যাহার মধ্যে বিধৃত হইয়াছিল, আজিকার যৌবনও তাহারই মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে—অনুভূতি একই রহিয়া গিয়াছে, শুধু তাহার রূপ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্তরের এই প্রিয়া সে তো অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই, সে যে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে অনন্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মাঝে। হয় ত কবি-জীবনের এই প্রিয়া পূর্ব্বজন্মেও কবির অন্তরের মধ্যে সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া ছিল—মৃত্যু-বিরহে সে মিলন-বন্ধন টুটিয়া গিয়া প্রিয়া তাহার সমস্ত বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই কবি এই বিশ্ব-প্রকৃতির যে দিকেই তাকাইতেছেন, প্রিয়ারই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ তিনি দেখিতে পাইতেছেন—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি; বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনা ব্যথা সুগন্ধ নিঃশ্বাসে
করিছ প্রকাশ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জ্জন-গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধ শুভ্র বিরহ শয়ন! (সোণার তরী)

কিন্তু অন্তরের মধ্যে প্রিয়ার এই অনুভূতির স্পর্শ লাভ করিয়াই কবি যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না; বাস্তব মূর্ত্তিতে এই মানসী প্রিয়াকে তিনি দেখিতে চাহিতেছেন—তাহাকে তিনি তাই শুধাইতেছেন,

সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্ব ঠাঁই হ'তে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি? (সোণার তরী)

এই সর্ব্বময়ী বিশ্বপ্রকৃতির অনুভূতি কোনো বাস্তব মূর্ত্তি ধরিয়া কোনো দিনই দেখা দেয় নাই, কিন্তু কতরূপে যে এই অনুভূতির স্পর্শ কবি লাভ করিয়াছেন, কত ভাবে যে তাঁহার মানস-সুন্দরী তাঁহাকে দেখা দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিন এই অন্তর প্রিয়ার সঙ্গে তাঁহার ঝুলনমেলা, সেদিন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার 'পরাণ' তাঁহার বুকের কাছে বসিয়া আছে, থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া সে কবির বক্ষ চাপিয়া ধরিতেছে, এই নিষ্ঠুর নিবিড়বন্ধনসুখে কবির হৃদয় নাচিতেছে, তাঁহার বুকের কাছে 'পরাণ' তাঁহার 'আকুলি ব্যাকুলি' করিতেছে। এতকাল তিনি ভয়ে ভয়ে এই পরাণসম মানসসুন্দরীকে যতনে পালন করিয়াছেন, পাছে তার ব্যথা লাগে, পাছে দুঃখ জাগে; সোহাগে তাহাকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়া দিয়াছেন, যাহা কিছু

মধুর সুন্দর তাহাই দু'হাত পূর্ণ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এত সুখ আজ তাহার প্রিয়াকে আলস্যরসের আবেশে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে; স্পর্শ করিলে আজ আর সে সাড়া দেয় না, কুসুমের হার তাহার গুরুভার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এমন করিলে আমার মধুর বধূরে যে হারাইব, অতল স্বপ্নসাগরে ডুবিয়া খুঁজিয়া যে মরিব? তাহাকে যে আজ আবার নূতন করিয়া পাইতে হইবে—

ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রি বেলা
মরণ দোলায় ধরি রসি গাছি
বসিব দু'জনে বড় কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা।
দে দোল দোল!
দে দোল দোল!
এ মহাসাগরে তুফান তোল্
বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল্।

*   *   *

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল
দে দোল্ দোল্! (সোনার তরী)

আজ দেখিলাম অন্তরে এ কি কল্লোল, আকাশে বাতাসে কি অট্টরোল—মানস-সুন্দরীর সঙ্গে কি অপূর্ব্ব ঝুলনমেলা। কিন্তু আর একদিন দেখিতেছি এই মানস-সুন্দরীই তাঁহাকে কোন্ নিরুদ্দেশ-যাত্রায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে তার কোনো ঠিকানাই নাই—কিসের অন্বেষণে যে এই যাত্রা কবি নিজেই তাহা জানেন না; অথচ তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে অন্তরলক্ষ্মী, সেই আজ তাঁহাকে নিরুদ্দেশ পথে ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে। পথের মধ্যে অন্তরের সুন্দরীকে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন,

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?
যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী
তুমি হাস শুধু মধুর হাসিনী
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে
তোমার মনে?
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি'
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন কোণে
কি আছে হেথায় চলেছি কিসের
অন্বেষণে। (সোনার তরী)

আবার এ কথাও কবি জানেন, যত বিচিত্র হোক অন্তরের মধ্যে অনুভূতির এই প্রকাশ, বিশ্বপ্রকৃতির যত বিচিত্রতার মধ্যেই সে আপনাকে বিকশিত করিয়া সার্থক করিয়া তুলুক, অন্তরের মধ্যে সকল বৈচিত্র্য এক হইয়া গিয়া একটী মাত্র অখণ্ড রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে তাহার বিচ্ছিন্ন পৃথক আর কিছুই নাই। এই একটীমাত্র অখণ্ড রূপ তাঁহার মানস-সুন্দরীর রূপ, অন্তরতমের রূপ, জীবনদেবতার রূপ। জগতের মধ্যে এ রূপের প্রকাশ বিচিত্র—সুদূর নীলগগনে নীহারিকাপুঞ্জের অযুত আলোকে তার রূপ ঝলসিয়া উঠিতেছে, ফুলকাননে সে আকুল পুলকে উল্লাসে মাতিয়া উঠিতেছে, দ্যুলোকে ভূলোকে সর্ব্বত্র সেই চঞ্চল গামিনী চিত্রা চঞ্চলচল চরণে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মুখর নূপুর সুদূর আকাশে থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠে; মধুর মন্দবাতাসে অলকগন্ধ উড়িয়া যায়, নৃত্যের তালে তালে মঙ্গল রাগিণী ঝঙ্কারিয়া উঠে। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে এত বিচিত্র যাহার লীলা, সে কিনা কবির অন্তরের মধ্যে দেখা দিল তার সমস্ত বিচিত্র প্রকাশকে এক করিয়া অখণ্ড রূপ ধরিয়া—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিনী!

*   *   *   *

(কিন্তু)

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী! (চিত্রা)

দেখিলাম, বিশ্ব-প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের এক অখণ্ড অনুভূতি মানস-সুন্দরীর রূপ ধরিয়া কবির অন্তরকে

পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেই সুন্দরীকেই বাহিরে তিনি বিশ্বজীবনের সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে দেখিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন, এই সুন্দরীই তাঁহার জীবনকে বিকশিত করিতেছে; নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—পদে পদে তাঁহাকে দিক্ ভুলাইতেছে, অজানা পথে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে,—কবির নিজের কোনো কথা নাই, ভাষা নাই, তাহারই কথা লইয়া ভাষা লইয়া তাঁহারই মানসসুন্দরী জীবনদেবতা তাঁহার অন্তরের সকল কথা সকল ভাষা ফুটাইয়া তুলিতেছে। এ কি অপূর্ব্ব রহস্য, এ কি অদ্ভুত কৌতুক—এর কি কোনো অর্থ আছে, কোনো শেষ আছে?

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?

শুধুই কি তাই? শুধুই কি আমার কথা লইয়া সুর লইয়া গান লইয়া ভাষা লইয়া তোমার এই কৌতুক—আমার জীবন লইয়াও যে তোমার অর্থহীন কৌতুকলীলা রাত্রিদিন;—আমি চলিতে চাহি এক পথে তুমি যে চলাও অন্য পথে, আমাকে যে তুমি তোমার খেলার পুতুল করিয়া গড়িয়া তুলিলে—

একদা প্রথম প্রভাত বেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়
মনে ছিল দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।

(কিন্তু)

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক
কোথা যাবো আজ নাহি পাই ঠিক্
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে! (চিত্রা)

কিন্তু এত করিয়া যে তুমি আমাকে নিজেই বরণ করিলে, আমার অন্তরের মধ্যে বাস করিয়া আমাকে লইয়াই এত যে কৌতুক করিলে, তোমার হাতের পুতুল করিয়া এত যে খেলাইলে, আমার সমস্ত জীবনকে যে তুমি তোমার পূজার ফুল বলিয়া গ্রহণ করিলে—এত কিছু করিয়া আমাকে লইয়া তুমি তৃপ্তি পাইয়াছ কি? এ প্রশ্ন তো না করিয়া উপায় নাই—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম? (চিত্রা)

আমাকে নিঃশেষে যদি তুমি লইয়া থাক, আমার যত শোভা যত গান যত প্রাণ সব যদি আজ শেষ হইয়া থাকে, আমার জীবনকুঞ্জে তোমার অভিসার-নিশা যদি ভোর হইয়া থাকে—তবে আমাকে আবার তুমি নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লও, আমার মধ্যে আবার নূতন করিয়া তোমার অভিসার আরম্ভ হউক—তুমি তো নিজেই নিত্য নূতন, আমার অনিত্যর মধ্যে তোমার নিত্য লীলা নিত্য বিকশিত হউক—

ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা
আন নব রূপ আন নব শোভা
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে। (চিত্রা)

কিন্তু এ নব নব রূপের যে আর শেষ নাই, সীমা নাই—আর এই নব-নব-রূপ নব-নব শোভার আবাহনেরও শেষ নাই। অন্তরের মধ্যে অন্তরতমের স্পর্শ নূতন নূতন ভাবে একবার অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই না কবি-জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জবন আজ গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে—সেই নিকুঞ্জনিবাসে আবার অন্তরতমের আবাহন—

তুমি এস নিকুঞ্জ নিবাসে
এস মোর সার্থক সাধন!
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব্ব সমর্পণ;
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন নিবেদন। (চৈতালী)

'প্রভাত সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চৈতালী' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের মধ্যে বিশ্বজীবনের যে অনুভূতি তাহার প্রকাশ ও পরিচয়টুকু আমরা লইতে চেষ্টা করিলাম। বহু কবিতার মধ্যে এই অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু যে কবিতাগুলিতে সেই আভাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট, সেই কবিতাগুলি হইতেই কবিজীবনের এই অপূর্ব্ব রহস্যটীকে বুঝিতে চেষ্টা করা সহজ। দেখিলাম, কবিজীবনের প্রথম হইতেই বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে কবিহৃদয়ের একটা নিবিড় নাড়ী চলাচলের যোগ—তাহার সঙ্গে কবির কি যেন

একটা আত্মীয়তা আছে। শুধু তাই নয়, যাহা কিছু তিনি চোখের ও মনের দৃষ্টির মধ্যে দেখিতেছেন, কানে শুনিতেছেন, স্পর্শে অনুভব করিতেছেন, এই পাখীর গান, বাতাসের শব্দ, আকাশের সূর্য্যচন্দ্র তারা, মানুষের চলা বলা, গাছ পালা, নদ-নদী যত কিছু, সব মিলিয়া যেন একটা অখণ্ড রূপ লইয়া তাঁহার অন্তরের মধ্যে ধরা দিয়াছে—এই রূপ তাঁহার অর্দ্ধপরিচিত এবং এই অর্দ্ধপরিচিত প্রাণীটি যেন নিরন্তর তাঁহাকে সঙ্গদান করিতেছে। কিন্তু অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সে নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না, ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িতে চায় এবং বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত প্রকাশের মধ্যে নিজকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে চায়। 'প্রভাত-সঙ্গীতে'এই কামনাটা প্রকাশ পাইয়াছে। বলিয়াছি, অন্তরের মধ্যে এই যে প্রাণীটি ইহার পরিচয় প্রথম স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু ক্রমে যেন তাহার অস্তিত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে দেখা গেল, বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচ্ছিন্ন বিচিত্র খণ্ড খণ্ড প্রকাশ যে অখণ্ড অনুভূতির রূপ লইয়া কবির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে কবি একটা নিবিড় বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছেন—সে তাঁহার খেলার সাথী। কিন্তু এই বন্ধন নিবিড় হইতে যতই নিবিড়তর হইতে লাগিল এবং কবির বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, ততই যেন তাঁহার সখি কবির প্রাণের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া কবির প্রেমের কারাগারে বন্দী হইতে লাগিল এবং ক্রমে বাল্যের সখি কৈশোরের সঙ্গিনী যৌবনে অন্তরলক্ষ্মী হইয়া মর্ম্মের গৃহিণী হইয়া অন্তর মন্দিরে প্রবেশ করিল। তখন তাহার সঙ্গে কবির কত মিলন-বিরহের লীলা, কত সোহাগ-চুম্বন,—এ যেন প্রায় প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনের দাম্পত্য-প্রেমের লীলা! এ লীলার মধ্যেও আবার মাঝে মাঝে অবসাদ দেখা দেয়, প্রতিদিনের স্পর্শে মাধুর্য্য তাহার নূতনত্ব হারায়। তখন আবার নূতন করিয়া পাইবার ইচ্ছা জাগে। মাঝে মাঝে আবার তাহাকে একটী গভীরতম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তুমি কি আমাকে লইয়া তৃপ্ত হইয়াছ, আমার কথিত ও অকথিত যত বাসনা, কৃত ও অকৃত যত কর্ম্ম সব কিছু তুমি গ্রহণ করিয়াছ কি? কিন্তু এই প্রিয়তমার রূপ ছাড়া এই মানসসুন্দরীরই আর একটা রহস্যরূপ আমরা দেখিতে পাই। সে রূপ শুধু প্রিয়তমারই রূপ নয়—সেখানে যেন এই প্রিয়তমাই আবার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে দেখা দিয়াছে; আগে যাহা বলিয়াছি এ যেন ব্যক্তি জীবনের মাঝখানে আর একটা জীবন এবং সেই আর একটা জীবনই যেন ব্যক্তি-জীবনের অধীশ্বর। মানসসুন্দরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সে এক কৌতুকময়ীর রূপ রহস্যময়ীর রূপ—কবি নিজে যাহা বলেন তাহা এই রহস্যময়ীর কথা, যে পথে চলেন সে পথের নির্দ্দেশও করে এই কৌতুকময়ী, সেই তাহাকে অজানা নিরুদ্দেশ পথে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এই রহস্যময়ী কৌতুকময়ী মানসসুন্দরীই জীবনদেবতা—বাল্যে যে সখি, যৌবনে যে প্রিয়তমা। সকলেই এই বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের এক অখণ্ড রূপ। ইহার অনুভূতিই অন্তরপুরুষের অনুভূতি—জীবনদেবতার অনুভূতি! ইনিই কবিজীবনের অধীশ্বর—ইনিই কবির অসংখ্য কথায় ও কবিতায় গানে ও সুরে নিজকে সার্থক অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন।

বস্তুতঃ কবিজীবনের এই অধীশ্বরের, এই জীবনদেবতার অনুভূতি অত্যন্ত রস ও রহস্যময় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় অনুভূতি না হইয়াই পারে না। কারণ, যাহাকে জীবনদেবতার অনুভূতি বলিতেছি তাহার মধ্যে বিশ্বজীবনের যত রূপ যত রস, যত বর্ণ যত গন্ধ, যত বিচিত্র প্রকাশ যত রহস্য যত সৌন্দর্য্য, সব কিছুর অনুভূতি এক হইয়া অন্তর ব্যাপিয়া একটি মাত্র অনুভূতির রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং সে প্রতি মুহূর্ত্তে বাহিরের বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া মরিতেছে। আর যে কবির মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নাড়ী-চলাচলের যোগ এত সত্য, যিনি অতি তুচ্ছতম পদার্থের মধ্যেও অপূর্ব্ব রস ও সৌন্দর্য্যের আস্বাদন লাভ করেন, আকাশের নীহারিকাপুঞ্জ, উপরকার ছায়ালোক, বাড়ীর বাগানের নারিকেল গাছ সব কিছুর মধ্যে যিনি অনির্ব্বচনীয় রস ও রহস্যের আভাস পাইতেন, তাঁহার কাছে এই জীবনদেবতার অনুভূতি যে অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় রস রহস্য ও সৌন্দর্য্যের উৎস হইয়া সমস্ত জীবনকে কবিতার কুসুমে কুসুমে ফুটাইয়া তুলিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। হইয়াছেও তাহাই। 'প্রভাত-সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'কথা ও কাহিনী' 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা' পর্য্যন্ত সমস্ত জীবন গানে গানে কবিতায় কবিতায় একেবারে ছাইয়া গিয়াছে—কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। আর সে গান ও কবিতা উভয়ই অপূর্ব্ব, কোনো তত্ত্ব নাই, কোনো কথা নাই, যেন

একটি অফুরন্ত রস ও সৌন্দর্য্যের প্রবাহ! বাহিরের সঙ্গে অন্তরের, মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের সম্পূর্ণ মিলনের যে আনন্দ, সে আনন্দ যেন এই সময়কার কবিতাগুলির ভিতর হইতে আপনি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। সমস্ত জীবন যেন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রসে ও সৌন্দর্য্যে, ভোগে ও প্রেমে একেবারে ডুবিয়া আছে—বিশ্বজীবনের অফুরন্ত রস উৎসের মধ্যে নিজকে বিসর্জ্জন করিয়া দিয়া তাহার মধ্যে নিজকে ভাল করিয়া ভোগ করিবার, সার্থক করিবার একটা চঞ্চল আকুলতা মনের মধ্যে আবেগে কম্পিত হইতেছে। 'বসুন্ধরা', 'যেতে নাহি দিব', 'সমুদ্রের প্রতি', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' 'প্রবাসী' ইত্যাদি অনেক কবিতায় সেই আকুলতার আবেগ-কম্পন প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি সত্যই অপূর্ব্ব রহস্যময়।

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে
সে আমাকে ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা' কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণ জলে
সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে
বাহির হ'য়েছি ভ্রমণে!

* * * *

এ সাতমহলা ভবনে আমার
চির জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে।" (সোনার তরী)

এ কথা সকলেই জানেন যে বিভিন্ন ভাব বিকাশ সত্ত্বেও 'প্রভাত-সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন একান্তই রূপমাধুর্য্য রস-সৌন্দর্য্যানুভূতির জীবন। ইহার পরে 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' হইতে কবিজীবনের যে নূতন অধ্যায় সুরু হইল তাহার মুখে এই মাধুর্য্যরসপূর্ণ জীবনের কাছে কবিকে বিদায় লইতে হইল। এই বিদায়ের একটা বেদনা আছে, সে বেদনার ক্রন্দন 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা'র অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু জীবনদেবতার অনুভূতি এখনও যেন অন্তরের মধ্যে তার স্পর্শ বুলাইয়া রাখিয়াছে। তবু উপায় নাই, এই মানসসুন্দরী প্রিয়তমার কাছ হইতে বিদায় লইতে হইবে—যত নিষ্ঠুর যত কঠোর হোক তাহা—

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নির্ম্মম আমি আজি
আর নাহি দেরী ভৈরব ভেরী
বাহিরে উঠিছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীল নয়নে
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহ শয়নে
প্রভাতে উঠিয়া শূন্য নয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে—

কবি তাহা জানেন, তবু—

সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। (কল্পনা)

কবি তো বাঁধন ছিঁড়িতে চান; কিন্তু পিছন হইতে যে তাঁহাকে ডাকে;—তিনি তো মনে করিতেছেন, কাজ তাঁহার শেষ হইয়াছে, দীর্ঘ দিনমান কাটিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে, এখন তাঁহার বিদায়ের সময়—কিন্তু এমন সময় অন্তরের মধ্যে কে ডাকিয়া উঠে, কার আহ্বান শুনা যায়—এ কি জীবনদেবতার?

'রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোরা স্বামিনী
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী।
জগতে সবারি আছে সংসার সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ
কেন আসে মর্ম্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ।
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একলার স্থান
কোথা হ'তে তারো মাঝে বিদ্যুতের মত বাজে
তোমার আহ্বান? (কল্পনা)

যাহা হোক, 'নৈবেদ্য' হইতে সুরু করিয়াই এই রসমাধুর্য্য পূর্ণ জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ পূর্ণ হইল। বিশ্বজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে কবির সেই নাড়ী-চলাচলের যোগ আর অনুভব করা যাইবে না, অতি তুচ্ছতম ক্ষুদ্র বস্তুটিতেও সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করিবার, ভূমাকে প্রত্যক্ষ করিবার সহজ আনন্দ, to see a world in a grain of sand আ

দেখা যাইবে না, সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় ভরা এই পৃথিবী তা'র নানান্ রূপে কবির প্রাণে আর দোলা দিবে না—বহুদিনের জন্য এই অনুভূতি স্তব্ধ হইয়া গেল! 'নৈবেদ্যে' যে জীবনের আরম্ভ, 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যে' সেই জীবনের পূর্ণতা। এই জীবনের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির নয়, ক্রমশঃ বিশ্ব-প্রকৃতির যিনি অধীশ্বর তাঁহার অনুভূতিই সমস্ত অন্তরের মধ্যে মায়া-স্পর্শ বুলাইয়া দিল। বিশ্বজীবনের সমস্ত বিকাশের মূলে যিনি তিনিই এই সময়ের কবিজীবনকে আর এক সার্থকতায় ভরিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ভাবধারার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন, কাজেই সবিস্তারে তাহা এখানে বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। তবে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, ভাবধারার এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনদেবতার যে অপূর্ব্ব রসরহস্যময় অনুভূতি তাহারও অনেকখানি পরিবর্ত্তন হইল। আর না হইয়া উপায়ই বা কি? বিশ্বজীবনের সঙ্গে গভীর নিগূঢ় আত্মীয়তা বোধ অপেক্ষাও গভীরতর রহস্যের মধ্যে মন যেখানে মগ্ন হইয়া গিয়াছে, সেখানে জীবনদেবতার অনুভূতি তো কতকটা বিদায় লইতে বাধ্য; কারণ জীবন-দেবতা রহস্যের সমস্ত অনুভূতিটুকু তো প্রতিষ্ঠিতই ছিল বিশ্বজীবনের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা-বোধের উপর, তাহার বিচিত্র প্রকাশকে এক অখণ্ড রূপে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার উপর।

এইখানে এই কথাটা বুঝা সহজ হইবে যে, বিশ্বজীবনের অনুভূতি এবং বিশ্বদেবতার অনুভূতি এক নহে। হইতে পারে যে বিশ্বজীবনের অনুভূতিই ক্রমে বিশ্বদেবতার অনুভূতির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, হয় তো বা দু'য়ের মধ্যে একটু সত্য সম্বন্ধও রহিয়াছে। সে যাহাই হোক্, এ কথা ঠিক্ যে এই দুই অনুভূতিকে আমরা এক বলিয়া কিছুতেই ভুল করিতে পারি না। জীবনদেবতার প্রকাশ বিশ্বজীবনের মধ্যে নয়, আমার মধ্যে অর্থাৎ আমি এই বিশেষ ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে—এইখানে তাহার লীলা এবং সেই লীলাকে আমি উপলব্ধি করি আমার অন্তরের বাহিরে বিশ্বজীবনের মধ্যে। 'আমি' এই ব্যক্তির ক্ষণিক জীবনকে জীবনদেবতার প্রসাদে উপলব্ধি করি বিশ্ব-প্রকৃতির চিরন্তন জীবনের মধ্যে;—কারণ আমার সঙ্গে যে বিশ্বজীবনের নাড়ীর যোগ, 'আমরা যে একই ছন্দে বসানো', সেই জন্যই তো বিশ্বজীবনের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের মধ্যেও স্পন্দন অনুভব করি; সেই জন্যই তো সমস্ত বিশ্ব-প্রাণের আনন্দকে আমি নিজের প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতে পারি। এই হিসাবে জীবন-দেবতা কবিজীবনেরই একটা বৃহত্তর গভীরতর জীবন। বিশ্বদেবতা বা ভগবান্ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি আর যাহাই হোক ঠিক ইহা নহে। তবে এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় যে, জীবনদেবতার অনুভূতি ক্রমে বিশ্বদেবতার বৃহত্তর গভীরতর অনুভূতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিল, ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে বিশ্বজীবনের যে উপলব্ধি তাহা বিশ্বজীবনে বিশ্বদেবতার উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। কারণ, 'খেয়া' 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' প্রভৃতির কোনো কোনো কবিতায় দেখা যায়, কবিজীবনের মধ্যে যে বৃহত্তর গভীরতর জীবনের অনুভূতি, সেই অনুভূতিই যেন কোথাও কোথাও বিশ্বদেবতার ভগবানের অনুভূতি বলিয়া মনে হইয়াছে—অবশ্য ক্ষণিক একটা মুহূর্ত্তে!

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের রহস্যকে যে ভাবে আমি এখানে উপস্থিত করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটা তত্ত্ব আপনি প্রকাশ পাইয়াছে, একটা সত্য আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে;—এই সত্যের একটু আভাস আমি দিতে চেষ্টাও করিয়াছি। হয় ত রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার যে অপূর্ব্ব রহস্য তাহা এই সত্যকে কতকটা আশ্রয়ও করিয়াছে। কিন্তু এ কথাটাকে কিছুতেই আমি একান্ত করিয়া দেখিতে চাই না—ইহার মধ্যে বৈষ্ণব ভেদাভেদ দর্শন, অথবা উপনিষদের বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব কিংবা হেগেলীয় দর্শন কতখানি স্থান পাইয়াছে, কতখানি পায় নাই, সে বিচারের মধ্যেও ঢুকিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। এ রহস্য একান্তই অনুভূতির কথা—অনুভব দ্বারাই এ রহস্যকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এ রহস্যের সঙ্গে যে অনুভূতি, যে কল্পনা জড়াইয়া আছে, তাহা একান্তই কবিচিত্তের একটা সহজ ভাববিলাস। আমি আগেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ কবি—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত নহেন; তাঁহার কবিজীবনের উৎস কোনো নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব অথবা সত্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান নহে, সে উৎস তাঁহার কবিচিত্তের অতি সহজ এবং অতি আশ্চর্য্য অনুভূতির ক্ষমতা। এই অদ্ভুত ক্ষমতার বলেই তিনি জগৎ ও জীবনের যত দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মণিকোঠার সন্ধান পাইয়াছেন—ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন। সেই জন্যই এই

জীবনদেবতার রহস্যের মধ্যে কোনো তত্ত্বের সন্ধান লইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না—কবিকে কিংবা কবির কাব্যকে বুঝিবার পক্ষে সে তত্ত্বজ্ঞান আমাদের কিছু সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু প্রসঙ্গের সূত্রটিকে আবার ধরিতে চাই। 'কল্পনা-ক্ষণিকা'র সঙ্গে সঙ্গেই কি কবির অন্তরের মধ্যে তাঁহার জীবনদেবতার মানসসুন্দরীর এই রহস্যময় অনুভূতিটি স্তব্ধ হইয়া গেল—আর কি তাহা কবিচিত্তকে রস ও সৌন্দর্য্যের গন্ধে বর্ণে পুষ্পে পত্রে ভরিয়া দিবে না? আপাত-দৃষ্টিতে কিন্তু তাহাই মনে হয়,—মনে হয়, সত্য সত্যই বুঝি কবি এই অনুভূতিটিকে হারাইলেন। যে মানসী প্রিয়া একবার অন্তরতম হইয়া অন্তরবেদীটি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি কি সত্যই চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইবেন, আর কি কোনো দিনই তাঁহার দেখা মিলিবে না? বিশ্বদেবতাই কি জীবনদেবতার আসন জুড়িয়া থাকিবেন?

এ কথা সকলেই জানেন যে, 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালীর' কবি রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'য় এক নূতন জীবনে জন্মলাভ করিয়াছেন—এই নব জন্মলাভ বাস্তবিকই একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আমরা এক সময় ভাবিয়াছিলাম, 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে'র রসবোধে সকল বিচিত্র রসবোধ বিলীন করিয়া দিয়া অনন্যশরণ বিশ্বদেবতার চরণে আত্ম-সমর্পণই বুঝি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের শেষ আশ্রয় হইল। তাহা হইলে মানবচিত্তের যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহাই হইত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাহা হইল না। কেন হইল না, কি করিয়া 'বলাকা'য় এই নবজন্মলাভ সম্ভব হইল, তাহা আমি অন্যত্র বলিয়াছি, এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না। 'বলাকা' চঞ্চল গতিবেগের কাব্য—প্রেম যৌবন ও সৌন্দর্য্যের জয়গান খুব উঁচুদরের একটা intellectual appeal লইয়া সেই কাব্যের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের এই গতিবেগ, প্রেমাবেগ, সৌন্দর্য্যাবেগ ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা আবার সেই জীবনদেবতার রহস্যের সুস্পষ্ট আভাস একটু ফিরিয়া পাইতেছি। 'মত্ত সাগর পাড়ি দিল গহন রাত্রিকালে, ঐ যে আমার নেয়ে', এই কবিতাটির মধ্যে বোধ হয় এই অপরিচিত অন্তরপুরুষটির অতি অস্পষ্ট পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, 'বলাকা'র পরেই আসিয়াছে পলাতকা'। 'পলাতকা'য় দেখিতেছি বিশ্বজীবনের একটি অংশ মানবজীবনের তুচ্ছ সুখ দুঃখ, তুচ্ছ ঘরকন্নার ইতিহাস আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া দোলা দিতে সুরু করিয়াছে। মনে হয়, 'পলাতকা'র কবিতা-গুলিতে শুধু নানান ভাবে নানান ছলে গল্পকথায় মানবচিত্তের নানান্ অনুভূতির ভিতর দিয়া সংসারের বিচিত্র মাধুর্য্য-রসপূর্ণ জীবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার চেষ্টাই প্রকাশ পাই-য়াছে। বুঝিতে পারিতেছি বাল্যের সখি, কৈশোরের সঙ্গিনী, যৌবনের মানসসুন্দরী যে অনুভূতির রূপে রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছিল সে রহস্য সে অনুভূতি বুঝি ধীর পদসঞ্চারে অন্তর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে বুঝি আসে, আসে, আসে!

'পূরবী'তে সে সত্য সত্যই আসিয়া পড়িল—বিশ্বদেবতার গভীরতর অনুভূতি বুঝি তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। কি করিয়াই বা পারিবে—বিশ্বজীবন যে বিশ্বদেবতার চাইতে প্রিয়তর, রবীন্দ্রনাথ যে মানবজীবনের কবি, প্রকৃতি জীবনের কবি! 'পূরবী'র ভাব রহস্য আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু এখানে তাহার একটু পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। যে কারণেই হোক, যে গভীর অধ্যাত্মানুভূতির ভিতর রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ডুব মারিয়া-ছিল সে জীবন তাঁহার ভাল লাগিল না; কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায় তিনি ফিরিয়া আসিলেন, পুণ্য ধরার ধূলোমাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে আবার নিবিড় নাড়ী চলাচলের যোগ প্রতিষ্ঠিত হইল।

> এই যা দেখা এই যা ছোঁয়া, এই ভালো এই ভালো
> এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
> ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘট ভরেছি নিয়েছি বিদায়।
> এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে।
> পুণ্য ধরার ধূলোমাটী ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে। (পূরবী)

এই ইচ্ছা যখন জাগিল তখন কবি সহজেই অনুভব করিলেন—

> আজ ধরণী আপন হাতে
> অন্ন দিলেন আমার পাতে
> ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে
> আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
> নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
> কোথায় আছ বিশ্বজনের প্রাণ! (পূরবী)

এ যেন আবার সেই প্রথম যৌবনের অনুভূতি, বিশ্বজনের প্রাণকে নিজের প্রাণের মধ্যে অনুভব করিবার আকূতি! আর এ আকূতি এ অনুভূতিই যদি ফিরিয়া আসিল তবে সেই লীলাসঙ্গিনী মানসসুন্দরীর স্পর্শ লাভের আর দেরী কত? সত্যই তো সেও ফিরিয়া আসিল—

দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হ'লো যেন চিনি
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা
ছিলে লীলা সঙ্গিনী? (পূরবী)

এই লীলা সঙ্গিনী অতীতের সেই মধুর দিনগুলিতে কতদিন কত লীলার ছলে আসিয়া কবিকে বারবার দেখা দিয়া গিয়াছে—তার কঙ্কন ঝঙ্কারে কবির বন্ধ দুয়ার কতদিন খুলিয়া গিয়াছে, বাতাসে বাতাসে তার ইসারা ভাসিয়া আসিয়াছে, কখনও আমের নবমুকুলের বেশে, কখনও নব মেঘভারে, কত বিচিত্র রূপে চঞ্চল চাহনিতে কবিকে বারেবারে ভুলাইয়াছে। আজ সে আবার পুরাতন চেনাসুরে কবিকে ডাকিয়াছে, কিঙ্কিনী বাজাইয়াছে। কিন্তু এতদিন পরে জীবনসন্ধ্যায় সে যে আসিল তাহাকে আমি বরণ করিয়া ধরে লইতে পারিব কি—পারিলেই আর কতদিন!

দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায়
সারা হ'য়ে এলো দিন
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশী
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়
সারা হ'য়ে এল দিন! (পূরবী)

এই যে মানসী প্রিয়ার জীবনদেবতার অনুভূতিকে ফিরিয়া পাওয়া—এই কথাটি 'পূরবী'র অনেক কবিতাতেই খুব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আনন্দে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে এক সময় যে জীবন পরিপ্লুত হইয়াছিল জীবনের সেই আনন্দ ও সৌন্দর্য্য কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম—আজ তাহা জীবন-সন্ধ্যায় অতি ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আবার আসিয়া গোপনে কবির ভাবের ও অনুভূতির রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বড় দ্রুত ক্ষণিকার মতন সেদিনের আমার প্রিয়তমার ত্রস্ত আঁখিযুগল সুনিবিড় তিমিরের তলে ডুবিয়া গিয়াছিল, দুজনের জীবনের চরম অভিপ্রায় সেদিন পূর্ণ হয় নাই। হে আকাশ, আজ তোমার স্তব্ধ নীল যবনিকা তুমি তুলিয়া দাও, আমার মানস প্রিয়াকে খুঁজিয়া লইতে দাও। একদিন আমার অন্তর ব্যাপিয়া তার রাজ্যপাট বিস্তৃত ছিল, আর একদিন এক গোধূলি বেলায় সে তার ভীরু দীপশিখাটি লইয়া কোথায় কোন্ দিগন্তে যে মিলাইয়া গেল, কিছুই জানি না। আজ আবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করিছে অধিকার,
দেখি তার অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্ন অশ্রু সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি। (পূরবী)

কোন্ অতীত দিনে কবেকার সেই প্রিয়া কবিকে তার শেষ চুম্বন দিয়া গিয়াছে। কবি সুদীর্ঘ বিচ্ছেদে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আজ যখন আবার তাহাকে মনে পড়িয়াছে তখন বড় আকুল হৃদয়ে এই বিস্মৃতির জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। সেই শেষ চুম্বনের পরে কত মাধবী মঞ্জরী থরে থরে শুকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, কত কপোতকূজন-মুখরিত মধ্যাহ্ন, কত সন্ধ্যা সোনার বিস্মৃতি আঁকিয়া দিয়া, কত রাত্রি অস্পষ্ট রেখার জালে আপন লিখন আচ্ছন্ন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত বিস্মৃতির জাল বুনিয়া দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে কবি যদি তাঁর প্রিয়াকে ভুলিয়াই থাকেন—আজ তার জন্য তিনি ক্ষমা চাহিতেছেন। কিন্তু এ কথা তিনি জানেন সেই প্রিয়ার, সেই জীবন-দেবতার স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন সোনা হইয়া গিয়াছে।

তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসলে মোর এ জীবন উঠেছিল ফলে
আজো নাই শেষ; * * * *
* * * * * * *
* * * তোমার পরশ নাহি আর
কিন্তু কি পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার
বিশ্বের অমৃত ছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। (পূরবী)

কিন্তু আরো উল্লেখের প্রয়োজন আছে কি? কবি নিজেই স্বীকার করিলেন, এই মানসসুন্দরীর অন্তরপ্রিয়ার স্পর্শলাভ ঘটিয়াছিল বলিয়াই—গানের ফসলে এ জীবন

ভরিয়া উঠিয়াছিল, আজো তার শেষ নাই। সত্যই 'আজো নাই শেষ।' দিন শেষের সায়াহ্নের গোধূলি আলোকে সেই অন্তরতম আবার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, আবার অন্তরের মধ্যে জীবনদেবতার রাজ্যপাট বিস্তৃত হইয়াছে, সেইজন্যই তো সত্তর বৎসর বয়সেও গানের ফসলের আর শেষ নাই—অফুরন্ত গান, অফুরন্ত কবিতা, অফুরন্ত রস, অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ধারাস্রোতের মতন নিরন্তর আমাদের সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে—সেই ধারাস্রোত হইতে ঘট ভরিয়া কলসী ভরিয়া সৌন্দর্য্যসুধা আমরা ঘরে লইয়া যাইতেছি। বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে কবির ব্যক্তিজীবন যে নূতন করিয়া জীবনদেবতার অনুভূতি—ইহার জন্য কি কোনো প্রমাণের আবশ্যক আছে? দিনের পর দিন মাসের পর মাস ঋতুর পর ঋতুতে কি আমরা দেখিতেছি না অফুরন্ত গানের অফুরন্ত কবিতার ফোয়ারা—আর সে গান সে কবিতাই কি—সে ফুলে সে ফসলে বিশ্বদেবতার অভিনন্দন নয়, বিশ্বজীবনের অভিনন্দন। সেই জন্যই তো গ্রীষ্মে বর্ষায় শরতে শীতে বসন্তে ঋতু উৎসবের গান, সেই জন্যই তো 'শেষের কবিতা'র মতন সাহিত্য-সৃষ্টিতেও মানব-চিত্তের প্রেমানুভূতির গোপনতম রহস্যের অন্বেষণ, মানব-জীবনের অভিনন্দন!

আমি যে ভাবে বুঝিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা রহস্যের পরিচয় সেইভাবে আমি উপস্থিত করিলাম। আমার এ পরিচয় সত্য না-ও হইতে পারে। কিন্তু যে কথাটি অস্বীকার করিবার উপায় নাই সেই কথাটি বলিয়াই এ প্রবন্ধের শেষ করিব।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন যে ভাবধারার মধ্যে নানা বর্ণে নানা গন্ধে বিচিত্ররূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সে ভাবধারার উৎস বিশ্বজীবনের অপূর্ব্ব রসরহস্যময় অনুভূতি; এই অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের বাল্য কৈশোর ও যৌবনকে নানান্ রঙে রঙাইয়াছে, জীবনের সায়াহ্ন বেলাকেও এই অনুভূতিই বিচিত্র গোধুলি রঙে রাঙাইতেছে।*

---

* প্রেসিডেন্সি-কলেজের 'রবীন্দ্রসাহিত্য পরিষদে' লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মায়া

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

পরাণ-প্রিয় স্বামীর শোকে
দারুণ-চিতা আলিঙ্গিয়া,
দূর দ্যুলোকে মিলন আশে
পতিব্রতা পুড়লো গিয়া।
ভ্রম বল, আর মোহই বল,
বুক যে আমার উঠ্‌ছে ভিজে,
এ মায়ারি মধ্যে হেরি
মহামায়ার মাধুরী যে।

মাতৃহীনা ওই বালিকা
পালিত যে পিতার ক্রোড়ে,
পিতার বেদন-ব্যথিত বদন
হেরি জীবন ত্যজিল রে।
ভক্তি, না বাৎসল্য এটা,
কিম্বা দুয়ের মাখামাখি,
'উমা' হবে এ মেয়ে হয়ে
কিম্বা হবে 'যশোদা' কি?

এ সব মায়া, এ সব মোহ—
চিরদিনই সবাই বলে,
আমি জানি পূজার জিনিষ
মায়া পাঁকের শতদল এ।
বুকের খাতায় মূল্য কসে'
অবাক হয়ে ভাবি নিজে,
এ মায়ারি মধ্যে হেরি
মহামায়ার মাধুরী যে।

এদের বুকেই দেবতা নামে
এ দবদেব মূল্য জানে,
এরা'ই ধরার কবিত্বরে,
মহাভাবের বন্যা আনে।
পারিজাতের ফসল ফলে
হাওয়ার ভাসা ফুলের বীজে,
এ মায়ারি মধ্যে হেরি
মহামায়ার মাধুরী যে।

সর্ব্বহারা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ, ডি-এল

(১১)

রমেশ অনেকক্ষণ আসিয়া বসিয়া ছিল। চুপ করিয়া সে অসীমের বক্তৃতা শুনিতেছিল—মুগ্ধ হইয়া সে শুনিতেছিল। অদ্ভুত লোক এই অসীম। তার গোটা জীবনটাই সৃষ্টি-ছাড়া। জীবনটাকে সে সত্যসত্যই একটা খেলার মত চালায়। মনের আনন্দের তার কখনও অভাব হয় না। যত বড় দুঃখই আসুক, সে হাসিমুখে তাকে বরণ করে। বন্ধুরা আশ্চর্য্য হ'লে বলে, "তোমরা আশ্চর্য্য হ'চ্ছ; কেন না, তোমরা সুধু এইটুকুই দেখছো, আর মনে হ'চ্ছে এটা একটা tragedy। কিন্তু আমি দেখছি, এটা বিশ্বব্যাপী farceএর একটা অধ্যায় মাত্র। তাই আমি কাঁদতে পারি না—হাসি।" আজ অসীম যে সব কথা বলিতেছিল, রমেশের মনে হইল সে সব অসীমের নিজের অদ্ভুত জীবনের ব্যাখ্যা।

অসীম মদ খায়—সে মাতাল নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে মদ খায়। রমেশ একদিন তাকে বলিয়াছিল, "ও ছাই খাও কেন?" অসীম বলিল, "তোমরা জগতের সব জিনিসকে ভাল ও মন্দ দুটো ভাগ ক'রে নিয়েছ। বাস্তবিক তোমাদের সে ভাগের কোনও মানে নেই। সেইটা প্রমাণ করবার জন্যে আমি তোমাদের মন্দ জিনিসগুলো সব ব্যবহার করি।

অসীমের—যাকে চলতি কথায় বলে স্বভাব-চরিত্র—মোটেই ভালো নয়। নারীর মন মাতাইবার তার আশ্চর্য্য শক্তি আছে। আর সেও নারীর মাধুরীতে সহজে মাতিয়া উঠে—বলে, প্রেমের চেয়ে বড় আনন্দ কি আছে? কিন্তু এক যায়গায় স্থির হইয়া থাকা তার স্বভাব নয়; তাই তার প্রেমও বেশী দিন এক আধারে স্থায়ী হয় না। একটা মেয়ের সঙ্গে তার ভালবাসা বড় জমিয়া উঠিয়াছিল,—সবাই ভাবিল, বুঝি অসীম এতদিনে বাঁধা পড়িল। কিছুদিন বাদে সে সেই মেয়েটির চেহারা সম্বন্ধে এমন একটা স্পষ্ট কথা বলিয়া ফেলিল যে, সে নারী একেবারে বিমুখ হইয়া বসিল। সবাই অবাক হইয়া দেখিল, অসীম একটিবার তাকে সাধিল না—সে ঠিক পূর্ব্বের মত হাসি মুখেই জীবন যাপন করিতে লাগিল। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমার নগদ কারবার ভাই, বাকী বকেয়া রাখি না, Speculation করি না। চলতি ব্যবসার লাভ নি, লোকসান লোকসান বলেই ধরে নি। যতদিন ভালবাসা পেয়েছি নিয়েছি—এখন তা ফুরিয়ে গেছে—সে খতেনে শূন্য লিখে নূতন খাতা আরম্ভ করেছি।"

রমেশ আজ অসীমের মুখে তার অদ্ভুত জীবনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা মোহাবিষ্টের মত শুনিল।—যেমন অদ্ভুত অসীম,

তেমনি অদ্ভুত তার জীবনতত্ত্ব! কথাগুলি মনকে চমক লাগাইয়া দেয়, মনের উপর একটা জোর টান দেয়।

অবশেষে রমেশের খেয়াল হইল অসীমের কথাগুলি সত্য হোক মিথ্যা হোক খুব স্পষ্ট স্পষ্ট। হরিচরণের মনের বর্ত্তমান অবস্থায় তার এই সব কথায় খুব সান্ত্বনা লাভ করিবার কথা নয়। তাই রমেশ বলিল, "অসীমদা' থাম। ওসব তত্ত্বকথা এখন তাকে তুলে রাখ। হরিদা, ভাই, আমার একটা কথা শুনবে? আমার সঙ্গে কিছুদিন বেড়াতে যাবে?"

হরিচরণ একবার বিশে'র মৃন্ময়ী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না ভাই, আমায় আর টানাটানি ক'রো না।"

অসীম বলিল, "কোথায় নিতে চাচ্ছ ওকে?"

"পাতিয়ালা।"

"পাতিয়ালা—সেখানে কি?"

"একটা চাকরী পেয়েছি দাদা।—বলা বাহুল্য, খেলার জোরে। কিন্তু চাকরীটা ভাল। আমি বলছিলাম—হরিদা যদি সঙ্গে যেতো, তবে ওরও মনটা ভাল হ'ত, আমারও কয়েকটা দিন কাটতো ভাল।"

অসীম বলিল, "যাও না ভাই—গেলে ভাল হবে।"

হরিচরণের দু'চক্ষু বাহিয়া জল ঝরিতে লাগিল, "আমার আর ভাল কি ভাই? সব ভাল আমার ফুরিয়েছে!"

নার্স লতিকা তখন আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সে সকলকে নমস্কার করিয়া আসিয়া হরিচরণের পাশে বসিল। কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা কহিল না। হরিচরণ নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিল—লতিকাও কোনও কথা বলিল না, সুধু তার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। রমেশ মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। অসীম লতিকার মুখের দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিল—তার মনে হইল লতিকা মূর্ত্তিমতী করুণা।

অনেকক্ষণ পর চক্ষু মুছিয়া লতিকা বলিল, "দেখুন, উঠুন আপনি, একটু কিছু খান।"

হরিচরণ উঠিয়া বলিল, "আর কেন ব'লছেন নার্স? আর তো আমি না খেলে রোগশয্যায় পড়ে কেউ কেঁদে ভাসাবে না? তবে আর কেন?—আমি এখন খাব না।"

লতিকা আবার চক্ষু মুছিল। সে বলিল, "তিনি মুক্তি পেয়ে গেছেন, কিন্তু এ কথা ঠিক জানবেন হরিচরণবাবু, যে, আপনি যদি না খেয়ে কষ্ট পান, তবে পরলোকে ব'সেও তিনি তেমনি কষ্ট পাবেন। আমি যে এখনও চোখে চোখে দেখতে পাচ্ছি—ছলছল চোখে তিনি ব'লছেন 'নার্স, উনি নিজে কিছু ক'রতে পারেন না, আপনি একবার তাঁকে দেখে যাবেন—তিনি হয় তো আমার জন্য ভেবে ভেবে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে ব'সে আছেন।' আমি যখন বল্লাম, আমি আপনাকে খাইয়ে তবে ফিরবো, তবে বেচারা নিশ্চিন্ত হ'ল। আর রোজ দুবেলা এ খবর তাঁর নেওয়াই চাই—এমনি ছিল তাঁর ভালবাসা। আজ তিনি মুখ ফুটে সে কথা ব'লতে পারছেন না ব'লে ভাববেন না যে তিনি এখনও ঠিক তেমনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনার জন্য তেমনি ভেবে মরছেন না।"

হরিচরণ উঠিয়া বসিল, তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "ও-সব মিছে কথা নার্স! পরলোক নেই—সে নেই—থাকলে সে আমায় দেখা না দিয়ে পারতো না। অসীমদা' যা ব'লেছে ঠিক—পরলোক নেই।"

লতিকা একবার তীব্রদৃষ্টিতে অসীমের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি ব'লেছেন উনি জানি না। কিন্তু আমি জানি—ওঁর কথা ভুল।" তার পর অসীমকে সে বলিল—

"আপনি কি বুঝেন তা জানি না; কিন্তু পরলোক যদি না থাকে, তবে মানুষ বেঁচে থাকে কিসের আশায়, কাজ করে, ভালবাসে কিসের ভরসায়? মানুষের এত বড় ভরসাটাকে আপনি কেড়ে নিতে চান? আপনি ভয়ানক লোক।" তার পর হরিচরণকে সে বলিল, "কিন্তু দেখুন, এটা তো সত্যি আপনার খাওয়া-দাওয়া আরাম যত্ন সম্বন্ধে আপনার স্ত্রীর ভাবনার অন্ত ছিল না। জীবনে আপনার সুখের চেয়ে বড় ইচ্ছে তাঁর ছিল না। সে ইচ্ছাটা আপনি তাঁর পূর্ণ ক'রবেন না, এই কি আপনার ভালবাসা? আর আপনি চান বা না চান আমি আপনাকে ছাড়বো না। তিনি আমায় এ ভার দিয়ে গেছেন,—আমি দেখছি, পরলোক থেকে তিনি আজও আমায় তেমনি ক'রে অনুরোধ করছেন। আমি তাঁর এ কাজ না ক'রে পারবো না।" লতিকার চক্ষু আবার সজল হইয়া উঠিল। "নিন উঠুন।" বলিয়া সে হরিচরণকে টানিয়া উঠাইল।

অসীম নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেল। তার মুখরতা লতিকার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া গেল। লতিকার গভীর সহানুভূতি আর সহজ সেবা তার মনটা ভরিয়া ফেলিল।

হরিচরণকে যখন লতিকা জোর করিয়া স্নান করিতে পাঠাইল, তখন রমেশ তাকে অনুরোধ করিল যে হরিচরণকে বুঝাইয়া পাতিয়ালা যাইতে সম্মত করিতে হইবে। লতিকা এ প্রস্তাব শুনিয়া সুখী হইল—সে বলিল, "আচ্ছা আমি দেখি।" বলিয়া সে হরিচরণের আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

হরিচরণের খাওয়া হইলে লতিকা বলিল, "যান না আপনি—বেড়িয়ে আসুন গে কিছুদিন পাতিয়ালায়!"

এইবার হরিচরণ একটু তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কি ব'লছেন নার্স! এইখানে আমার স্ত্রী, দুঃখে কষ্টে অনাহারে অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গেছে—আর আমি আজ আরাম ক রে হাওয়া খেতে যাবো পাতিয়ালায়? আপনারা জানেন না কত কষ্ট পেয়েছে সে আমার জন্য—আমি তাকে কত দুঃখ দিয়েছি। আমরা বড়লোক নই; কিন্তু দেশে আমাদের খাবার পরবার অভাব ছিল না। একটা নিদারুণ অহঙ্কারে সে সব ফেলে এসেছিলাম আমি ক'লকাতায়—তাকে নিয়ে এসেছিলাম। নিজে তাকে একদিন কিছু দিতে পারি নি, তার বড় আদরের গহনাগুলি একটি একটি ক'রে কেড়ে নিয়েছি, তবু তাকে দুটো ভাল জিনিস একদিনের তরে খেতে দিতে পারি নি—তার ক্ষিদেই মিটাতে পারি নি। এমনি ক'রে তার সর্ব্বনাশ ক'রেছি আমি!—আমি আজ যাব ক'লকেতা ছেড়ে আরাম ক'রতে?—মন ভাল ক'রতে? মন ভাল করবো কেন? তাকে যত দুঃখ দিয়েছি সেই সব দুঃখ আগুনের মত হ'য়ে তিল তিল করে আমাকে পুড়িয়ে মারলে তবেই আমার শান্তি। সে সব ভুলবো? বলুন নার্স, আজ সে না ম'রে যদি আমি ম'রতাম, সে কি ভুলতে পারতো?" হরিচরণ আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

লতিকা কথা বলিতে পারিল না। তারও বুক ঠেলিয়া কান্না পাইল। অনেকক্ষণ পর সে বলিল, "যা ব'ল্লেন ঠিক, কিন্তু একবার ভাবুন দেখি, সে যদি আজ এসে কথা বলতে পারতো, সে আপনাকে কি ব'লতো? ব'লতো না কি, যে এমনি ক'রে আমার কথা ভেবে যদি তুমি নিজেকে কষ্ট দেও, তবে আমি বাঁচবো কেমন ক'রে? আজ সে এখানে নেই, কিন্তু পরলোক থেকে সে যে দেখে দেখে ঠিক এই কথাই বলছে।"

অনেকক্ষণ পীড়াপীড়ির পর হরিচরণ শেষে বলিল, "দেখুন, মাপ করুন, আমাকে অনুরোধ ক'রবেন না।"

লতিকা তখন বলিল, "আচ্ছা, আর একটা কথা বলি, আপনি যদি এমনি ক'রে নিজেকে মেরে ফেলেন, সে আমি দেখে কেমন ক'রে থাকবো? আমি তো ভুলতে পারি নে—আপনার স্ত্রী আমাকে কত কাতর হ'য়ে ব'লেছিলো আপনার দেখা শোনা ক'রতে। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম আমার যা সাধ্য করবো। সে কথা যদি রাখতে না পারি তবে আমি শান্তি পাব কেমন ক'রে? আমার উপর কি আপনার একটু মায়া-দয়া নেই?"

হরিচরণ বলিল, "দেখুন, আপনি অমন ক'রে আমাকে অপরাধী ক'রবেন না। আপনি ছোট বউর জন্য যা' ক'রেছেন, তাতে আপনার জন্য আমি প্রাণ দিলেও আমার দেনা শোধ হবে না।"

"তবে আমার অনুরোধেই এ কথাটা রাখুন।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরিচরণ বলিল, "আচ্ছা বেশ, আপনার যদি সেই আদেশই হয়, তাতেই যদি আপনার মন খুসী হয়, তাই হোক!" বলিয়া সে মুখ ফিরাইল—তার চোখ পড়িল বিশে'র মৃন্ময়ী মূর্ত্তির উপর—সে থমকিয়া গেল। তার পর বলিল, "দেখুন, এ অনুরোধ আমায় ক'রবেন না। আমি যেতে পারবো না। ছোট-বউর এ মূর্ত্তি—এই আমার এখন সব। আমি তাকে সামনে বসিয়ে এটা গ'ড়েছিলাম—সে তিল তিল ক'রে এই মূর্ত্তির ভিতর তার সমস্ত প্রাণটা বসিয়ে দিয়ে গেছে, এর যত্ন ক'রে—একে আমি কোথায় রেখে যাব—কে এর যত্ন ক'রবে?"

লতিকা বলিল, "আমার কাছে রেখে যান, একে আমি মন্দিরে প্রতিমার মত যত্ন ক'রে রাখবো। আর আপনি ফিরে এলেই আপনার কাছে পৌঁছে দেব।—এর জন্য কোনও ভাবনা ক'রবেন না।"

তাই স্থির হইল। দুই দিন পর হরিচরণ পাতিয়ালা যাত্রা করিল।

(১২)

অসীম লতিকার কাছে আসিয়াছিল।

সেই দিন হইতে সে প্রায় আসে—যতক্ষণ পারে, বসে, গল্পসল্প করে, চলিয়া যায়।

বন্ধুরা জানে অসীম এখানে একটা নূতন টোপ ফেলিয়াছে। লতিকাকে লইয়া তারা ঠাট্টা তামাসা করে।

অসীম হাসিয়া বলে, "কি জানি ভাই, টোপ ফেলেছি কি গিলেছি বুঝতে পারছি না।"

বন্ধুরা বলে, "এমন আজগুবী কথা শুনেছে কেউ কখনও ?"

অসীম বলে, "রোজই এই আজগুবী কাণ্ড হ'চ্ছে—পুকুরের ধারে নয়, সংসারে। হামেষাই দেখতে পাই, দুটো প্রাণ একটা সুতো দিয়ে যোড়া র'য়েছে—কে যে কাকে গেঁথেছে ঠিক বোঝা যায় না, যতক্ষণ না,—যতক্ষণ না একটা হেঁচকা টান পড়ে। আর টানটা প'ড়লে অনেক সময়েই দেখা যায়—দুদিকেই বড়সী বিঁধেছে।"

মেয়েমানুষ সম্বন্ধে অসীমের কোনও কথা কেউ ঠিক বিশ্বাস করে না, এখানেও করিল না।

অসীম প্রায়ই আসে। আসিয়া সে তার অভ্যাস মত গল্প বলে, লতিকা হাসিয়া গড়াগড়ি যায়।

লতিকা বলে, "আপনি বড় রস দিয়ে কথা ব'লতে পারেন। বাস্তবিক আপনার কথাগুলো এত অদ্ভুত যে শুনতে ভারী ভাল লাগে।"

এ কথায় অসীম যেন আরও উৎসাহিত হইয়া তার কথায় রস ঢালিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করে। এইখানেই অসীমের ব্যবহারের একটু অস্বাভাবিকতা। সে সবার কাছেই এমন সব কথা বলে, যা সবার অদ্ভুত লাগে ; আর বিষয় যতই গুরুতর হউক তাকে সে হাল্কা করিয়া তার উপর হাসির পালিস লাগাইয়া দেয়। ইহা তার স্বভাব—সে কোনও দিন চেষ্টা করিয়া এমন করে না। কিন্তু লতিকার কাছে সে তার কথাগুলিকে ঝক্‌ঝকে করিবার জন্য একটু বিশেষ চেষ্টা করে, লতিকার মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য একটু বিশিষ্ট আয়োজন করে।

কেন ?

লতিকা সুন্দরী নয়—কালো তার রং, যদিও বেশ গোল গাল চেহারা, আর মুখখানির ভিতর যথেষ্ট লাবণ্য আছে। এমনও নয় যে লতিকা অসাধারণ বুদ্ধিমতী। অসীম তাকে টোকা দিয়া দেখিয়াছে,—সে দু'দিনেই বুঝিয়াছে, লতিকার খুব পড়াশুনাও নাই, বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ নয়। সে এমন সব কথা বলে, এমন কাজ অনেক সময় করে, যা কোনও বুদ্ধিমতী মেয়ে একজন অপর পুরুষের সামনে বলে না বা করে না। অনেক সময়-তার কথায় ও কাজে মাজা-ঘষার বিশেষ অভাব দেখা যায়।

তবু অসীম লতিকাকে খুসী করিবার জন্য বেশ একটু চেষ্টা করে। লতিকার হাসিটি বেশ মিষ্টি, কিন্তু এমন কিছু ভয়ানক সুন্দর নয়। কিন্তু সেই হাসি দেখিবার জন্য অসীমের যেন বেশ একটু আকাঙ্ক্ষা আছে—তাই সে তাকে হাসায়।

প্রথমে লতিকার কাছে সে যেদিন আসিল, সেদিন লতিকা তাকে সহজ শিষ্টতার বর্ম্ম পরিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিল। অসীম কথা পাড়িয়াছিল হরিচরণ ও তার স্ত্রীর সেই কথায় লতিকা একেবারে গলিয়া গেল। তাদের কথা বলিতে বলিতে বার বার লতিকা চক্ষু মুছিল। এটা অসীমের বড় ভাল লাগিল।

তার পরই অসীম চট্ করিয়া বলিল, "আপনি ভালবেসেছেন কাউকে ?"

লতিকা 'হাঁ' বা 'না' কিছু বলিল না। সে একটু লাল হইয়া উঠিল।

অসীম বলিল, "দেখুন, আমার পরামর্শ যদি শোনেন তবে ওদের মত ক'রে ভালবাসবেন না, ওতে সুখ নেই।"

"কিন্তু সুখের ওজন ক'রে কি ভালবাসা যায় অসীমবাবু ?"

"সবাই পারে না,—যার তত্ত্বজ্ঞান হ'য়েছে সে পারে। সে জানে—ভালবাসা একটা ক্ষণিক ব্যাপার—যতদিন আছে, তার ভিতর থেকে যতটা সুখ আদায় ক'রতে পারা যায়, ক'রতে হ'বে। তার পর সব চুকে গেলে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হ'বে।"

লতিকা যেন চমকাইয়া উঠিল—সে বলিল, "কি ভয়ানক লোক আপনি ? আপনার কথার সোজা মানে এই যে, ভালবাসায় আপনার বিশ্বাস নেই।"

অসীম হাসিয়া বলিল, "তা নয়। এর মানে এই যে ভালবাসার খাঁটি আদর সুধু আমিই জানি।"

এমনি করিয়া লতিকাকে কেবল ধাক্কা দিতে দিতে অসীম তার শিষ্টতার বর্ম্ম খুলিয়া ফেলিল। ক্রমে লতিকা তার কাছে সম্পূর্ণ সহজ মানুষ হইয়া প্রকাশ পাইল।

তখন অসীম দেখিল, লতিকা একটি কাদার মত মানুষ। তাকে অসীম ইচ্ছা করিলে যে ছাঁচে ইচ্ছা সেই ছাঁচে ঢালিতে

পারে। তার কোনও ধরা-বাঁধা বিশ্বাস নাই,—মতামতের কোনও এমন বিশেষ দৃঢ়তা নাই, যাতে অসীমের পক্ষে তার মত বদলান কঠিন।

কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ বুঝিয়াও অসীম সেই কাদার মানুষকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িবার কোনও বিশেষ চেষ্টাই করিল না। সে ঠিক যেমন তেমনিই তাকে অসীমের ভাল লাগিল,—তাই সে লতিকাকে মেরামত করিয়া লইবার কোনও চেষ্টা করিল না। এমন কি ভালবাসার প্রকৃতি সম্বন্ধে লতিকার মত বদলাইবারও সে কোনও চেষ্টা করিল না।

তার পর হইতে অসীম সুধু এমনি সব কথা বলে, যার সঙ্গে তাদের দুজনের জীবনের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। আর সেই সব কথা সে যত্ন করিয়া বাছিয়া ব্যবহার করে, যাতে লতিকার মনে তার কথার অদ্ভুতত্বে একটা ধাক্কাও লাগে, আবার হাসিও পায়!

একদিন সে বলিল, "সত্যি কথা বলা একটা বাতিক বিশেষ। এক একজনের যেমন শুচিবাই থাকে, তেমনি এক একজনের মিথ্যা কথা বিষয়ে শুচিবাই আছে।"

লতিকা বলিল, "সে কি? সত্যি কথা বলবে না লোকে?"

"বলুক, তাতে আমার মানা নেই,—সত্যি কোনও জিনিসেই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাই ব'লে মিথ্যে বল্লেই জাত যাবে এ কেমন কথা? কেবল নিছক সত্যবাদী-দের নিয়ে যদি পৃথিবী চলতো, তবে কি ভয়ানক অসহ্য হ'য়ে উঠতো পৃথিবীটা? মিথ্যেটা হ'চ্ছে চাটনী, সেটা আছে ব'লেই সত্যির ভিতর রস আছে।"

"তবে আপনি বোধ হয় কখনই সত্যি কথা বলেন না।"

"বলি; না বল্লে তো চলে না। ক্ষিদে র'য়েছে, খেতে ব'সেছি, ঠাকুর জিজ্ঞাসা ক'রলে 'ভাত চাই কি?' সেখানে যদি মিথ্যা ক'রে বলি 'না চাই না', তবে, মেসে থাকি আমরা, আমাদের যে উপোস ক'রে থাকতে হ'ত। অথচ এটা যদি মেস না হ'য়ে শ্বশুরবাড়ী হ'ত, তাহ'লে আমি না'ও ব'লতাম, পেট ভ'রে খেতেও পেতাম। শাশুড়ী ঠাকরুণ না খাইয়ে ছাড়তেন না। সেখানে মিথ্যে বলা যে শুধু চলে তাই নয়, তাই আমাদের শিষ্টাচার। নইলে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে জামাই যদি সত্যি ক'রে বলে 'ক্ষিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দাও' অমনি সবাই তাকে ছি ছি ক'রে বলবে, লোকটা কি বেহায়া।"

"যাহ'ক, আপনি মিথ্যে বলেন মাঝে মাঝে?"

"হাঁ, অনেক সময় বলি। এই ধরুন, কাল আপনি জিগ্‌গেস ক'রলেন—আমি খেয়ে এয়েছি কি না? আমি বল্লাম—হাঁ। যদি সত্য কথা ব'লতাম, তবে আপনি হয় তো এখানে আমাকে খেতে ব'লতেন। সেটা আমার ইচ্ছা ছিল না। কাজেই আপনার অনুরোধ এবং আমার সেটা কাটান, এই নিয়ে অনেকটা বাজে সময় কেটে যেত।"

"কি অদ্ভুত লোক আপনি।"

"কিন্তু কথাটা যা ব'ল্লাম সেটা ঠিক। কেমন?"

"সেই রকম তো ঠেকছে—কিন্তু মানতে ইচ্ছা করে না।"

"ওই তো গোল। সত্যি কথা বলতে হবে ব'লে ব'লে লোকে এমন একটা আবহাওয়া তৈরী ক'রেছে যে, সেটা না মানলেও, মানছি না ব'লতে লোকে চায় না। পৃথিবীতে যত রকম অত্যাচার আছে, তার ভিতর এই সত্যবাদীদের অত্যাচারটা সব চেয়ে বেশী। আমার এত রাগ হয় যে, অনেক দিন ইচ্ছা হ'য়েছে যে, একটা মিথ্যাবাদী সমাজ তৈরী করি।"

"ওমা, কি অদ্ভুত খেয়াল?" বলিয়া লতিকা হাসিল।

"আমি কথাটা অনেক ভেবে দেখেছি, বেশ চলে। মনে করুন, আমরা দশজন কি বিশজন সে সমাজের সভ্য হ'লাম। আমাদের নিয়ম রইলো আমরা কখনও পরস্পরের কাছে সত্যি কথা বলবো না, সব সময়েই মিথ্যা বলবো। তাহ'লে কি মজা হয় ভাবুন তো?"

"ওমা, তাহ'লে চলবে কি ক'রে? তাহ'লে সে সমাজের সভ্যদের মধ্যে কেউ কারো মনের কথা জানতে পারবে না,"—

"কত বড় সুবিধে বলুন তো। মনের কথা, গোপন জিনিস,—সেটা লোকের কাছে প্রকাশ হ'য়ে যাওয়াটা কি ভাল?"

এমন গম্ভীর ভাবে অসীম কথাটা বলিল যে লতিকা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "কিন্তু এমন কতক-গুলি মনের কথা তো আছে, যা পরস্পরের কাছে প্রকাশ হওয়া দরকার। তাও তো জানা যাবে না। আমি যদি

আপনাকে বলি কাছে আসুন, তখন বুঝতে হবে যে দূরে যান"—

"সে তো এখনও হ'চ্ছে। বরং এখন সত্য ও মিথ্যায় ভেজাল হ'য়ে মনের কথা জানাটা ভয়ানক কঠিন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনি যাকে খুব ভালবাসেন তাকে বল্লেন, 'তুমি চ'লে যাও, আর আমার কাছে এসো না।' তখন সে বেচারা মুস্কিলে প'ড়ে যাবে,—ঠিক বুঝতে পারবে না যে, তার চ'লে যাওয়াটাই আপনার ইচ্ছা, না তার উল্টোটা। আমাদের মিথ্যাবাদী সমাজে সেখানে কোনও মুস্কিলই হবে না। সে তখনি চট ক'রে এসে আপনার কোল জুড়ে ব'সবে।"

"তবে আর লাভ কি হ'ল আপনার? সবার সব মনের কথা ঠিক বোঝাই যদি গেল, তবে আর মিথ্যের মানে রইলো কি? তখন যে আপনারা আমাদের মত সত্যবাদীর চেয়ে বেশী সত্যবাদী হ'য়ে উঠবেন।"

"কিন্তু তা' হবে না। সব সময় যা ব'ল্লাম সেটা মিথ্যে হ'লেই যে সত্যি কথাটা বোঝাই যাবে তা হবে না। মনে করুন, আমি বল্লাম ইলিস মাছ খাব—আপনি বুঝলেন কথাটা মিথ্যে,—কিন্তু আমি মাছ খাব, না মাংস খাব, না ছানা খাব—কিছু বোঝা যাবে না। এইখানেই এর মজা।"

এ ব্যাপারটা লতিকার কাছে ভারী কৌতুকের বলিয়া মনে হইল। সে বলিল, "তা বটে,—আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, তা' হ'লে আপনাদের কেমন ক'রে চলবে।"

"আমার বিশ্বাস, চলবে ঠিক সমস্ত পৃথিবী যেমন ভাবে চলছে তেমনি। কেন না, আমরা কেউই কারও কথা ঠিক বিশ্বাস করি না। ধ'রেই নি—সবাই কিছু কিছু মিথ্যে ব'লছে। তার পর তার উদ্দেশ্যটা আঁচ ক'রে নিজের বুদ্ধিমত কাজ করি। মিথ্যাবাদী সমাজেও তাই ক'রতে হবে।"

"এমন সব অদ্ভুত খেয়ালও আপনার মাথায় আসে! হাঁ—তা আপনার সমাজ কি আরম্ভ হ'য়ে গেছে?"

"না, হবার জো কি? মেম্বারই পাওয়া যাচ্ছে না। যারা সব নামজাদা মিথ্যাবাদী, তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি—কেউ রাজী নয়—বলে 'ওরে বাপ রে!' ভাবটা এই যে, মিথ্যা কথা বলতে তারা যদিও সর্ব্বদাই রাজী, তবু খাতায় নাম লিখিয়ে তারা মিথ্যেবাদী হ'তে রাজী নয়। ধরতে গেলে তারা ঠিকই ক'রছে; কেন না, তা' হ'লে সেইখানেই তো তাদের একটা সত্যি কথা বলতে হয়!"

"তা' মিথ্যাবাদীদের ছেড়ে একবার সত্যবাদীদের ধ'রে দেখুন না,—তারা হয় তো রাজী হ'তে পারে।"

"ওরে বাপ রে! তারা কেবল মারতে বাকী রাখে। সত্যবাদী জাতটার sense of humour বড় নেই কি না?"

"কেন? এতে তাঁদের চটবার কি আছে—একটা মজা করা বই তো নয়? আমি মেম্বার হ'তে রাজী আছি!"

অসীম হাসিল। লতিকাকে সে যে অনায়াসে সব করিতে রাজী করাইতে পারে, তার এই কথা তার একটা সামান্য নিদর্শন। এমন পরিচয় সে অনেক পাইয়াছে।

এমনি করিয়া তাদের ভিতর ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল।

তাদের প্রথম সাক্ষাতের পর ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে, আজও অসীম আসিয়াছে।

অসীম বলিল, "আপনারা যে ভাল আর মন্দ এই দুটোকে দাগ কেটে তফাৎ ক'রে দেন, এর কোনও মানে নেই। অমুক কাজ ভাল, অমুক কাজ মন্দ, অমুক লোক ভাল, অমুক মন্দ—এ কোনও কাজের কথাই নয়। সবই ভালো, সবই মন্দ।"

"ওমা, বলেন কি? ভাল মন্দ নেই—চুরী, ডাকাতি, দান, ধ্যান সবই এক?"

"অনেকটা নয় কি? চুরী করা কি সব সময়ই মন্দ? ধরুন—আমি আপনাকে গোপনে ভালবাসি। আপনার একখানা ছবি পাবার আমার বড় ইচ্ছা। অথচ তা পাবার উপায় আমার নেই। আমি যদি সে স্থলে একখানা ছবি চুরী ক'রেই নি—সেটা কি খারাপ? তবে ভালবাসাও খারাপ?"

লতিকা বলিল, "এ বুঝি চুরী হ'ল?"

"নয় কেন? ছবিখানার দাম তুচ্ছ ব'লে? আচ্ছা ধরুন, যদি ঠিক এই কারণে আমি আপনার হীরার আংটীটাই চুরী করি।"

"তবু, এ কথা আলাদা, এর মধ্যে কোনও খারাপ উদ্দেশ্য তো নেই।"

"তা' হ'লেই তো হ'ল, কোনও কিছুই অমনি ছাপ মেরে ভাল বা মন্দ বলা যায় না—সেটা ভাল না মন্দ সেটা

নির্ভর করে অনেকগুলো অবস্থার উপর।—এই ধরুন আমি মদ খাই"—

"তাই না কি ?" লতিকা একটু চমকাইয়া উঠিল।

হাসিয়া অসীম বলিল, "পৃথিবীর বার আনা লোক অমনি আপনারই মত চমকে ওঠে। কিন্তু এতে দোষ কি ?"

"দোষ নেই ? মদ খাওয়া! বলেন কি আপনি ? দেখুন, আপনি আর খাবেন না।"

"অথচ, আপনি নিজে হাতে কত লোককে মদ খাইয়েছেন !"

উত্তপ্ত ভাবে লতিকা বলিল, "কক্ষনও না,—এ কথা আপনাকে যে ব'লেছে সে মিথ্যাবাদী ! আমি কখনও মদ খেতে দি'নি। লোকে যদি খায় তবে আমি কি ক'রবো ?"

হাসিয়া অসীম বলিল, "একজনকে আপনি অন্ততঃ দু বোতল ব্রাণ্ডি খাইয়েছেন—ধরুন হরির স্ত্রীকে।"

লতিকার মন হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল, সে বলিল, "ও—সেই কথা ব'লছেন। সে তো ওষুধ।"

"কিন্তু জিনিসটা মদ।"

"কিন্তু আপনি তো আর ওষুধ ব'লে খান না—মাতাল হওয়ার জন্য খান।"

"আপনি ভুল ক'রলেন,— ওষুধ ব'লে খাইনে ঠিক, কিন্তু মাতাল আমি কোনও দিন হইনি। হোক, ধরুন আমি মাতালই হই, তাতে কার কি ক্ষতি ? আমি আমার নিজের ঘরে ব'সে যদি খানিকটা আবোল তাবোল বকি কিম্বা পাগলের মত কাজ করি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কারও অনিষ্ট না করি ততক্ষণ তাতে দোষ কি ?"

"কিন্তু অমনি ক'রে আপনি আপনার নিজের সর্ব্বনাশ ক'রচেন।"

"তাতেই বা কি ? আচ্ছা ধরলাম তাতে ক্ষতি আছে—মেনে নিলাম যে মাতাল যদি আমি হই তবে সেটা খারাপ—কিন্তু মাতাল না হই যদি, যদি মদ খেয়ে একটু সুধু বেশী ফূর্ত্তি পাই, একটু বেশী কাজ ক'রতে পারি—মাথায় অনেক কথা খেলে যায়—তবে ?"

"তবেও খারাপ—মদকে বিশ্বাস নেই—এমন বেশী দিন চলে না। আমি নিজ চক্ষে দেখেছি।"

"তা হ'লেও আপনি এটা স্বীকার ক'রছেন, যে মদ খাওয়াটাই দোষের নয়, কেন না, ওষুধ ক'রে তাকে খাওয়া যেতে পারে। সেটা দোষের হয় অবস্থা অনুসারে।"

"তা কে অস্বীকার ক'রছে ?"

"এমনি সব জিনিস। সব সময় ভাল বা সব সময় মন্দ কিছু নেই। মার্কা মারা ভাল-মন্দ-বিচার মানুষের একটা জবরদস্তী বই কিছুই নয়। আর এ জবরদস্তীটা সব চেয়ে বেশী দেখা যায় সেইখানে, যেখানে একটা লোককে ভাল বা মন্দ ব'লে মার্কা মেরে দেওয়া হয়। অথচ, ছাপ-মারা ভাল বা মন্দ জগতে নেই। অনেক চোর আছে যারা স্ত্রী পুত্রকে ভয়ানক ভালবাসে, হয় তো তারা লোকের দুঃখে কষ্টে প্রাণ দিয়ে খাটে—তারা ভাল না মন্দ।"

"তবু ভালো লোক আর মন্দ লোকের তফাৎ আছে।"

"আছে কি ? আচ্ছা ধরুন আপনি নিজে—আপনি নিশ্চয় ভালো লোক।"

"আহা, আমি কি আমার নিজের কথা বলছি।"

"আপনি না বলুন আমি বলবো। আপনার মত ভাল লোক আমি খুব বেশী দেখিনি। আজ হরি যদি এখানে থাকতো, সে এই কথা আরও জোর গলায় ব'লতো।"

সলজ্জ হাসি হাসিয়া লতিকা বলিল, "যান, আপনি কি যে বলেন ! এ বুঝি আপনার মিথ্যাবাদী সমাজ পেয়েছেন ?"

"না, আমি সত্যি কথাই বলছি। বরং আপনিই শিষ্টাচার নামক মিথ্যাবাদী সমাজের নিয়মে কথাটা অস্বীকার ক'রছেন—অথচ, মনে মনে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনি ভাল লোক।"

"যান, আপনি বড় দুষ্টু। লোককে বড় লজ্জা দিতে পারেন। ছি !"

"আচ্ছা আপনি ভালো লোক, অথচ দেখুন আপনার দোষও আছে—লোকের চক্ষে খুব বড় দোষ—আপনার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়।"

লতিকা এ কথার স্পর্দ্ধায় নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। ক্রোধে অন্ধ হইয়া সে অসীমের দিকে সুধু কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অসীম শান্তভাবে বলিয়া গেল, "আপনি বিয়ে করেন নি, অথচ পুরুষের সংসর্গ আপনার অজানা নয়।"

লতিকা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "মিথ্যে কথা ! কে বল্লে আপনাকে ?"

শান্তভাবে অসীম বলিল, "কেন ? আপনি নিজেই তো স্বীকার ক'রলেন, সে ভদ্রলোক মদ খান, কিন্তু আপনি খেতে দেন না।"

লতিকা বলিল, "বেশ। তাতে আপনার কি ?

হাসিয়া অসীম বলিল, "কিছুই না—তাতে আপনাকে আমি ভাল ব'লতে ছাড়বো না—সুধু এই কথা।—কাজেই"—

"আপনি কি সাহসে আমার ঘরে ব'সে ব'সে আমাকে অপমান ক'রছেন বলুন তো ?"

"অপমান ? কই ?"—

"যান, আর বিনিয়ে বিনিয়ে কথা ব'লতে হবে না। আপনি যান চলে—উঠুন—চ'লে যান।"

অসীম উঠিল না, কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

লতিকা রাগ করিয়া সে ঘর হইতে অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

অসীম অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিল। বর্ত্তমানবাদী অসীম ভাবিল। আরও অনেক নারী তাকে এমনি বিদায় করিয়াছে, তাতে সে ভাবে নাই। আজ ভাবিল।

অন্য স্থানে অসীম সুধু তল্পীতল্পা গুটাইয়া সে অঞ্চলের কারবার উঠাইয়া চলিয়া আসিয়াছে—মনের ভিতর ব্যথার আঁচড়টিও তার পড়িতে পারে নাই। কিন্তু আজ তার মনে ব্যথা লাগিল। এখানকার কারবার গুটাইতে তার ইচ্ছা হইল না।

তার চক্ষের সামনে কেবলি ভাসিয়া উঠিল হরিচরণের শিয়রে বসা করুণাময়ী লতিকার মূর্ত্তি—সে মূর্ত্তি সে একদিনের তরেও মনের চিত্রপট হইতে মুছিতে পারে নাই। সে ব্যথিত হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া সে চলিয়া গেল।

(১৩)

ছয় মাস পর হরিচরণ কলিকাতায় ফিরিল।

তার চেহারা ফিরিয়াছে, কিন্তু অদৃষ্ট ফিরে নাই। পাতিয়ালায় সে কয়েকখানা বড়লোকের ছবি আঁকিয়া কিছু টাকা পাইয়াছিল—সে টাকা সে সেখানেই খরচ করিয়া আসিয়াছে। যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সে ফিরিবার পথে দিল্লী আগ্রা জয়পুর লক্ষ্ণৌ কাশী প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া যেখানে যা কিছু সুন্দর দেখিয়াছে, সব কিনিয়া খরচ করিয়া ফিরিয়াছে।

কলিকাতায় ফিরিয়া সে প্রথমেই মালপত্র সুদ্ধ গাড়ী লইয়া গেল লতিকার কাছে।

লতিকা তখন হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া সবে খাবার আয়োজন করিতেছে। একখানা আধময়লা কাপড় পরিয়া সে উহুনে ভাত চড়াইয়া তখন তরকারী কুটিতে বসিয়াছে।

হরিচরণ ডাকিল, "নার্স বাড়ী আছেন ?"

লতিকা যেন চমকাইয়া উঠিল। সে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বলিল, "কে ?"

হরিচরণ বলিল, "আমি হরিচরণ।"

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া লতিকা ছুটিল তার ঘরের দিকে—তার পর ফিরিয়া হাঁকিল, "একটু দাঁড়ান, আমি দোর খুলছি।"

"সে তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া ভাল কাপড়চোপড় পরিল। আরসী ধরিয়া চুলটা একটু ফিরাইল, মুখটা একবার মুছিল। তার পর ছুটিয়া গিয়া দুয়ার খুলিল। হরিচরণকে দেখিয়া তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সে ত্রস্তে ব্যস্তে হরিচরণকে ভিতরে বসাইয়া বলিল, "কবে এলেন ?"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল, "এই মাত্র, এখনও আসা শেষ হয় নি, ষ্টেশন থেকেই এখানে আসছি।"

লতিকা এ কথায় অযথা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "ওঃ, একেবারে সোজা এইখানে—কি ভাগ্য আমার। একটু চা ক'রে দেব ?"

"না, থাক। চা' আমি বেশী খাইনে; তা' আপনি ভাল আছেন ?"

"হাঁ।—আপনার ভারী উপকার হ'য়েছে কিন্তু,—কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে আপনাকে !"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল, "আমাকে সুন্দর দেখাতে পারে এ সুধু আপনি বল্লেন—আর—সে ব'লতো।" বলিয়া হরিচরণ একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

লতিকা ভারি লজ্জিত হইল—লজ্জায় সে হাসিল।

একটু পরে হরিচরণ বলিল, "যাবার পথেই এলাম, ভাবলাম, গাড়ী তো হামেষাই আমি চড়ি না, একেবারে মূর্ত্তিটা নিয়ে যাই।"

লতিকা একটু অপ্রসন্ন হইল। সে যাহা ভাবিয়াছিল,

তাহা তবে নয়। লতিকার সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই হরিচরণ ষ্টেশন হইতে আসে নাই, আসিয়াছে বিশে'র ওই মাটির মূর্ত্তির জন্য। একটা মাটির মূর্ত্তির কাছে এমনি খেলো হইয়া গিয়া সে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিল।

সে বলিল, "ও, তাই,—আমি ভেবেছিলাম বুঝি আমার সঙ্গে দেখা ক'রতেই এসেছেন।"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল, "রথ দেখতে এসেছি ব'লে যে কলা বেচবার কথা ভাবিনি এ কথা কেন মনে ক'রছেন?"

"তা' কোথায় যাবেন এখন, বাসা ঠিক ক'রেছেন?"

"না—এখন অসীমের মেসে যাব ভাবছি—তার পর একটা আস্তানা ঠিক করা যাবে। অসীমের মেসে থাকবো এতটা সঙ্গতি তো আমার নেই।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া লতিকা বলিল, "তা যতদিন একটা ঠিক না হয় ততদিন এখানেই থাকুন না।" এ কথা বলিতে লতিকা লজ্জায় অযথা লাল হইয়া উঠিল।

হরিচরণ বলিল, "না, না, আপনাকে আর অসুবিধায় ফেলতে চাই নে।—অসীমের ওখানেই ক'দিন থাকা যাবে।"

"কেন? অসীম বাবু আপনার বন্ধু, আর আমি কেউ না—কেমন?"

গম্ভীর ভাবে হরিচরণ বলিল, "আপনি আমার কত বড় বন্ধু তা জানেন শুধু ভগবান। গরীব অসহায় আমি, আপনি আমার না ক'রেছেন কি? আপনি ভুল বুঝবেন না দয়া ক'রে। আমি আপনার এখানে থাকতে চাই না, তার শুধু এই কারণ যে, আপনার এত দয়ার পর আর আপনাকে ভারাক্রান্ত ক'রতে চাই নে।"

"কিন্তু আমি যদি না ছাড়ি—আমি যদি ঐ মূর্ত্তি আপনাকে নিতে না দি?" বলিয়া লতিকা একটু দুষ্টু হাসি হাসিল।

হরিচরণ অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল, "কেন আপনি এ অভাগার বোঝা ঘাড়ে টেনে নিচ্ছেন বলুন। আপনি জানেন না আমি কত বড় অভাগা। আমার সংস্পর্শে হয় তো আপনারও অমঙ্গল হ'তে পারে। আমায় ছেড়ে দিন।"

"হয় হোক" বলিয়া লতিকা গাড়োয়ানকে মাল নামাইতে বলিল।

হরিচরণ মিনতি করিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি আমাকে বড় লজ্জা দিচ্ছেন, আমাকে"—

লতিকা বলিল, "বেশ তো—না হয় যাবেনই। এখন এখানে স্নান ক'রে খেয়ে নিতে তো কোনও বাধা নেই।"

হরিচরণ বাধ্য হইয়া সেখানেই রহিয়া গেল।

লতিকার বাড়ীতে তিনটি ঘর। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। আসবাবপত্রও যা আছে বেশ সুন্দর। সে তাড়াতাড়ি একটা ঘর হইতে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিয়া হরিচরণের বাসের যোগ্য করিয়া ফেলিল। তার পর সে ছুটিয়া রান্না করিতে গেল। হরিচরণের নাওয়া খাওয়া হইয়া গেলে, সে তার বিছানা পাতিয়া তাকে একটু শুইতে বলিল। নিজে সে বাহিরে চলিয়া গেল।

অসীমের মেসের কাছে গিয়া সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মেসে ঢুকিয়া অসীমের সন্ধান করিতে সে সঙ্কুচিত হইল; সে রাস্তার অপর পাশে দাঁড়াইয়া পায়চারী করিতে লাগিল।

হঠাৎ তার সামনেই অসীম আসিয়া উপস্থিত হইল।—সে বাড়ী ছিল না, এতক্ষণে ফিরিতেছে। লতিকাকে দেখিয়া সে হাসিমুখে তাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, "এই যে—আপনি এখানে?"

লতিকা চাহিয়া ছিল মেসের দিকে—সে হঠাৎ এই সম্ভাষণে চমকিত হইল। তার পর অসীমকে দেখিয়া খুসী হইল।

লতিকা বলিল, "হরি বাবু এসেছেন—তাই আপনাকে খবর দিতে এসেছি।"

"ওঃ, হরিচরণ দেখি ভারী বড়মানুষ হ'য়ে এসেছে,—আপনি না এসে খবর পাঠিয়েছে আপনাকে দিয়ে?"

"না, না, তিনি পাঠান নি, আমি এই পথে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনাকে খবর দিয়ে যাই।"

অসীম এমন কৌতূহলী দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চাহিল যে লতিকা লজ্জিতা হইয়া উঠিল।

অসীম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আছে সে?"

লতিকা একটু বিব্রতভাবে বলিল, "আমার ওখানেই রেখেছি তাঁকে আপাততঃ।"

অসীম বলিল, "ও!"—বলিয়া একটু হাসিল।

লতিকা আরও বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া বলিল, "যা ভাবছেন তা নয়।"

"আমি কি ভাবছি তা' আপনাকে কে বল্ল?"

"সে বুঝতে পারি।"

"কি বুঝেছেন বলুন দিকিনি।"

"না—সে আমি ব'লতে পারবো না। সে সব কিছু নয়—তিনি তেমন লোক নন।"

"তার মানে তিনি তেমন লোক হ'লে যা ভাবছি তাই হ'তে আপনার পক্ষে কোনও বাধা ছিল না। কেমন?"

"যান, আপনি ভয়ানক দুষ্টু। কি যে বলেন সব আমাকে তার ঠিক নেই।"

"ব'লতাম না সিষ্টার, যদি আমার মিথ্যা মিলনীটা হ'ত। সংসারের অত্যাচারে সত্যি কথাটা বড্ড বেশী ব'লে ফেলি, ওই আমার দোষ।"

"আচ্ছা থামুন। শুনুন, আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।"

"নিশ্চয়ই আছে, সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি।"

"কেমন করে বুঝলেন?"

"সে বুঝতে হয় যে! আপনারা আমাদের মিথ্যা-মিলনীর সভ্য না হ'লেও মেয়েমানুষ, মনের কথাটা চট্ ক'রে মুখে বলা আপনাদের অভ্যাস নেই। তাই আপনাদের সঙ্গে কারবারে আমাদের সর্ব্বদাই আসল কথাটা আন্দাজ ক'রেই নিতে হয়। হরি ভায়া এসেছে সেই খবরটুকু দেবার জন্যই যে আপনি এই দুপুরে আমার সন্ধানে আসেন নি, তা' আমি আঁচ ক'রেছি।"

"কি কথা ব'লতে এসেছি বলুন তো তবে?"

"না—সে বলছি না। বলতে গেলে হয় তো আসল কথাটাই ব'লে ফেলবো, আর আপনি চট্ ক'রে বলবেন তা নয়—আর সেই জন্য হয় তো কথাটা বলাই হবে না। আর যদি ভুল ক'রে অন্য একটা কিছু বলি, তবে হয় তো আপনি চটেই যাবেন।"

হাসিয়া লতিকা বলিল, "আচ্ছা নাই বল্লেন, শুনুন। কথাটা এই—ইয়ে—এই বলছিলাম কি? আমার বিষয় আপনি যা' জানেন সেটা ওঁকে—হরিবাবুকে দয়া ক'রে বলবেন না।"

অসীম গম্ভীর হইয়া বলিল, "হুঁম।"

ব্যস্ত হইয়া লতিকা বলিল, "ব'লবেন না বলুন?"

অসীম বলিল, "আমি হয় তো কোনও দিনই কাউকে ব'লতাম না। কিন্তু আপনার এতটা গরজ দেখে ব'লতে ইচ্ছা ক'রছে—হয় তো বল্লে কিছু মজা হ'তে পারে।"

"না দেখুন, এখন অমন ক্ষেপামো ক'রবেন না। বলবেন না দয়া করে। কেনই বা বলবেন? কি লাভ বলুন? সে সব তো হ'য়ে ব'য়ে গেছে,—এখন তো আর কিছু নেই। মিছেমিছি ওঁকে ব'লে ওঁর মন ভার ক'রে কি লাভ?"

"রসুন, আগে আমার একটা কথার জবাব দিন; বঁড়শী কি দু'দিকেই বিঁধেছে?"

"ওমা, কিসের বঁড়শী?"

"বলছি—আপনিই একা ম'রেছেন না সেও ম'রেছে?"

"কি ব'লছেন আপনি?"

"যাক, বুঝতে পারবেন না আপনি, আমারই দেখে শুনে নিতে হবে। তা বেশ, এখন তবে আমি আসি।"

"ও কি? যাচ্ছেন বড়? ব'লে যান আমাকে—"

"যাচ্ছি, বিশেষ একটু তাড়া আছে—এখন পর্য্যন্ত পেটে কিছু পড়ে নি কি না?"

"ওমা, তাই না কি? এতক্ষণ না খেয়ে আছেন,—দুটো যে বাজে!"

"কাজেই বুঝতে পারছেন—"

"তা যান—কিন্তু ব'লবেন না বলুন? আপনার পায়ে পড়ি,—মিছে আমাকে দুঃখ দিয়ে কি লাভ হবে আপনার?"

"দুঃখ দেওয়াটাই যে মানুষের কাজ। সে কথা আপনি জানেন না?"

লতিকা হতাশ হইয়া বলিল, "কিছুতেই কি আপনার দয়া হবে না?"

অসীম হাসিয়া বলিল, "মিছে ব্যস্ত হ'চ্ছেন সিষ্টার। আমি একটু মদ খাই ব'লেই আমাকে ছোট লোক ভাববেন না। তা' ছাড়া কিই বা আমি জানি যে বলবো। আমি হলপ ক'রে ব'লতে পারি, আপনি ঠিক যে ক'টা কথা বল্লেন, এর বেশী এক বিন্দুও আমি জানি না, আর জানলেও ব'লতাম না। যান—আপনাকে আর আটকে রাখবো না।" বলিয়া অসীম হঠাৎ হন হন করিয়া তার মেসে ঢুকিল।

তার মুখের চিরস্থায়ী হাসিটী হঠাৎ যেন কোথায় মিলাইয়া গেল।

হরিচরণ লতিকার বাড়ীতে থাকে আর ঘর খুঁজিয়া বেড়ায়। একবার সে একজিবিশনের ছবিখানার খোঁজ করিয়াছিল।

সে শুনিল ছবিখানা ৫০ টাকায় বিক্রী হইয়া গিয়াছে। একশো টাকা তার দাম ধরা হইয়াছিল; কিন্তু বিক্রী হয় না, আর হরিচরণও লইতে আসে না দেখিয়া, রাজা বাহাদুর সেটা ৫০৲ টাকায় কিনিয়া রাখিয়াছেন। প্রাইজ কিছু পায় নাই, উল্লেখযোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেটও পায় নাই।

মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এই একজিবিশনে কত ছবি হাজার দু হাজার টাকায় বিক্রী হইয়াছে—নিতান্ত ছোট সাধারণ ছবিও পঞ্চাশ টাকায় বিক্রী হইয়াছে; আর তার ঐ বড় তৈলচিত্রের পঞ্চাশ টাকার বেশী দাম হইল না। হরিচরণ ভয়ানক দমিয়া গেল।

যাক, পঞ্চাশ টাকা তার কাছে তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়। টাকা কয়টা হাতে করিয়া সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ফিরিল।

পরের দিন সন্ধান করিয়া সন্ধ্যা বেলায় হরিচরণ লতিকাকে বলিল, "ঘর ঠিক হইয়াছে, ভাড়া চার টাকা—এবার খোলাঘর।"

লতিকা বলিল, "ঘর তো ঠিক ক'রলেন, কিন্তু খাবেন কি? আপনার রান্না যা জানা আছে সে তো আমি জানি। তা ছাড়া আপনার স্ত্রী তো সাধে বলে নি যে আপনি একেবারে তালভোলা—আপনি আপনার কাজ-কর্ম্ম কেমন ক'রে ক'রবেন?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিচরণ বলিল, "কি ক'রবো বলুন, —ভাঙ্গা কপাল নিয়ে জন্মালে এমন কত দুঃখ ক'রতে হয়! নইলে ছোট বউ যাবে কেন?"

লতিকা বলিল, "আচ্ছা যাবার অত তাড়া কি? থাকুনই না দুটো দিন আরও।"

"না, সে হয় না। আপনার এখানে থাকা আর ভাল দেখায় না।"

লতিকা একটু অপ্রস্তত হইল। সে বলিল, "দেখুন, তাতে যা লজ্জা সে আমার—আমি তা' বইতে প্রস্তত আছি।"

হরিচরণ এ অর্থে কথাটা বলে নাই, সে বিব্রতভাবে তাড়াতাড়ি বলিল, "না—সে ভাবে আমি বলি নি। আমি বলছিলাম কি—সমর্থ বেটাছেলের পক্ষে পরের গলগ্রহ হ'য়ে থাকাটা গৌরবের কথা নয়।"

"দরকার কি গলগ্রহ হবার? আপনি কাজ করুন, আমাকে টাকা দেবেন, ঘরভাড়া আর খাওয়ার দরুণ। ধরুন, আমি আপনার landlady। আমার এ ঘরখানা অমনি পড়ে থাকে, একজন এমনি ভাড়াটে পেলে আমারও একটু সাশ্রয় হয়, আর আপনিও নিজেকে দেখাশোনার দায় থেকে নিস্তার পান।"

এটা বিলাতী বন্দোবস্ত। লতিকা খৃষ্টান, অনাথাশ্রমে মানুষ হইয়াছে, তার পর দু এক যায়গায় paying guest হইয়া থাকিয়াছে—তার কাছে এ ব্যবস্থাটা যত সহজ মনে হইল, হরিচরণের কাছে তাহা তত সহজ নয়। এ ব্যবস্থাটা তার কাছে বড় দৃষ্টিকটু মনে হইল। সে কাজেই আপত্তি করিল।

লতিকা বলিল, "কেন? এতে আপত্তি কি?"

হরিচরণ সুধু বলিল, "সে আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না।"

লতিকা বলিল, "তবে বুঝেছি—আচ্ছা যান।" বলিয়া সে মুখ ভার করিয়া উঠিয়া গেল।

হরিচরণ বড় বিপদে পড়িল। লতিকার মনে ব্যথা দিতে সে চায় না; কিন্তু এমনি করিয়া থাকাও তো তার পক্ষে অসম্ভব! সে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

তখনকার মত কথাটা মুলতবী রহিল।

পরের দিন বৈকালে অসীম আসিল। হরিচরণ তখন বাহিরে গিয়াছে, লতিকা একা ছিল।

লতিকার চোখে জল।

অসীম ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পাশে বসিয়া বলিল, "ও কি? আপনি কাঁদছেন?"

চক্ষু মুছিয়া লতিকা বলিল, "না কাঁদবো কেন? কাঁদাটা যে মেয়েমানষের স্বভাব-ধর্ম্ম!"

"তা জানি না, কিন্তু আপনার পক্ষে এটা খুব স্বাভাবিক ঠেকছে না। কেন না, মেয়েমানুষের যে সব বালাই থাকে, যার জন্য তার কাঁদতে হয়—স্বামী, পুত্র, কন্যা—ইত্যাদি, তা' আপনার নেই। স্বাধীন মানুষ আপনি—রোজগার ক'রছেন, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন—"

"আর রুগী ঘাঁটছেন! বড় সুখের জীবন, না? যদি এমনি ক'রতে হ'ত আপনার তবে বুঝতেন। কি শূন্য, কি ফাঁকা এ জীবন—একটা এমন কেউ নেই যার জন্য দুটো রাঁধবো, যাকে খাওয়াব বা যত্ন ক'রবো। সুধু রুগী, রুগী, রুগী—দিনের পর দিন তাদের কাতরাণি, তাদের ঘ্যাঙানি, তাদের রোগ! যে গেরস্থর বাড়ীতে মাসে দশ দিন কারো অসুখ যায় সে হাঁপিয়ে ওঠে—আর আমাদের জীবনটাই সুধু রুগী ঘাঁটা।"

"একটু তফাৎ আছে সিষ্টার,—গেরস্থর ব্যারাম ঘরে—আপনার বাইরে। এতে সুধু আপনাকে খাটুনির কষ্টই পেতে হয়—প্রাণের কষ্ট তো নেই।"

"তাইতেই তো সবচেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে প্রাণ। আপনার জনের যদি অসুখ হয়, তবে প্রাণ দিয়ে তার সেবা করা যায়—তাতে ক্লান্তি হয় না। কিন্তু কোথাকার কে পথে-কুড়োনো রুগী, যার সঙ্গে আমার জানা-শোনাই নেই, তার রোগ ঘাঁটা যে কেবলি গা খাটান—কুলী মজুরের মত কাজ—কেবল খাটুনী, রস কিছু নেই। আপনার লোকের সেবা ক'রতে প্রাণের কষ্ট যে পেতে হয়, সে যে আমার মাথার মাণিক। হোক কষ্ট—তবু সেটা আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছা করে।"

"এ দুঃখের জন্য এত লোভ আপনার? তা সেও তো জুটেছে। হরির বউকে যে সেবা ক'রেছেন, তার ভেতর তো আপনার চোখ বড় একটা শুকনো থাকে নি।"

"ঐ একটি। ঐ একটি মেয়েকেই আমার আপনার জন ব'লে মনে হ'য়েছিল। কি সুন্দর মেয়েটি—আর কি ভালবাসা তার! আহা, তার কথা শুনে আমার মনে হ'ত, এমনি ক'রে ভালবাসতে পারলে ম'রেও সুখ। তার সেবা যে ক'টা দিন ক'রেছি, সে ক'দিন কষ্টকে কষ্ট ব'লে মনে হয় নি।"

"তা যাক গে, বালাইয়ের উপর যদি আপনার এত টান তবে আর দুঃখ কই। বালাই তো ঘরে ব'য়ে এনেছেন। ভাল তো বেসে ফেলেছেন।"

"কে বল্লে? কোথায় ভালবাসা? আর ভালবাসলেই কি? আমি দেখতে ভাল, না আমার কোনও গুণ আছে, না টাকা আছে যে লোকে আমায় ভালবাসবে?"

হাসিয়া অসীম বলিল, "কিন্তু এমন বেকুব সুধু একটা নয় অনেক আছে, যারা এ সত্বেও ভালবাসে আপনাকে হয় তো। যেমন আমার বন্ধু হরি।"

"ভালবাসে না ছাই। ওঁর স্ত্রীকে একটু সেবা ক'রে-ছিলাম, তাই একটুখানি ভাল চক্ষে দেখেন। তা ছাড়া দেখেন গরীব আমি, আপনার জন কেউ নেই, একটু হয় তো দয়া করেন, এই। ভাল আমাকে বাসবেন কি দেখে? চুলোয় যা'ক, ভালবাসা আমি চাই না, নিজের সুখ-সুবিধাটুকু যদি উনি বোঝেন তবেই বর্ত্তে যাই। বেতাল মানুষ, নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানগোচর কিছুই নেই—জলটি গড়িয়ে খেতে পারেন না ভাল ক'রে। স্ত্রী ছিল তাই চ'লে গেছে। এখন আছেন এখানে—আমি দেখি শুনি তবু বেঁচে আছেন। তাতেও মন উঠছে না, এসে অবধি উড়ু উড়ু ক'রছেন। আজ কোথায় আবার ঘর ঠিক ক'রে এসেছেন।" বলিয়া লতিকা ভয়ানক মুখ ভার করিল।

"ও, এই কথা! তা' এতক্ষণ কথাটা খোলসা ক'রে ব'ল্লেই হ'ত। ও আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

"দেখুন, দিন তো ঠিক ক'রে। কি বেয়াড়া খেয়াল দেখুন। আমার এখানে থাকলে না কি ওঁর পৌরুষ খর্ব্ব হবে। আমি বল্লাম, বেশ তো থাকুন না paying guest হ'য়ে। তাতেও না কি তাঁর লজ্জা! কি করি বলুন তো?"

হাসিয়া অসীম স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কোনও ভয় নেই, আমি আপনার love কে ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

"ও কি কথা হ'ল—যান, আপনি বড় যা' তা' বলেন—lover কেন হ'তে যাবে!"

"আপনি মিথ্যা-মিলনীর পাকা মেম্বার হ'য়েছেন দেখছি। এত কথা খুলে' ব'লে যেই সত্যের সঙ্গে সামনা-সামনি হ'লেন অমনি বেঁকে ব'সলেন। আরে ঠাকরুণ, এই ছলনাটুকু আর আমি বুঝি না?"

"না দেখুন, খবরদার এমন কথা তাকে ব'লবেন না। আপনি যা' বলছেন তার যদি একটু আভাস সে পায়, তবে অমনি ছিটকে পালাবে। তাকে আপনি চেনেন না ভাল ক'রে। এখনও রোজ শুয়ে থাকে ওই মূর্ত্তিটার পায়ে মাথা রেখে।"

"তবে স্বীকার করুন আপনি তাকে ভালবাসেন!"

সলজ্জ হাসি হাসিয়া লতিকা বলিল, "যান—আপনি বড় দুষ্টু। খালি আমাকে লজ্জা দেবেন!"

"লজ্জা যে নারীর ভূষণ! আপনার মুখের উপর লজ্জাটা এখন এমন সজ্জা ক'রেছে যে তার কাছে হীরা-মণির গয়না হার মানে।" বলিয়া অসীম হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল।

(১৪)

অসীমের ঘরে বসিয়া হরিচরণ বলিল, "অসীমদা' আমার পেট চলার একটা উপায় ক'রে দেও। তুমি এত বড় নামজাদা লেখক—এখন তুমি একটা কথা ব'ল্লে পাবলিশার ফেলতে পারবে না।"

অসীম বলিল, "হরি ভাই, তুমি আমায় কথাটা ব'লে লজ্জা দিলে? তুমি কি ভাবছো, তুমি ব'লবে তবে আমি চেষ্টা ক'রবো? আমি কি নিজে দেখতে পাইনে, তোমার কাজের দরকার? আমি ব'লেছি, কিন্তু বাবুরা গা' করেন না। কেন না, নাম আমার যতই থাক, তাতে আমার টেঁক ভরে না। পাবলিশারের কাছে হাত আমার পাতাই আছে—আমার নিজের পেট ভরাবার জন্যে। কাজেই, দেনদারের অনুরোধ তাঁরা গায় মাখেন না।"

"কেন দাদা? তোমার এত অভাব কিসের? তুমি তো খুব কম হ'লেও মাসে দু'তিনশো টাকা পাও, আর থাক তো এই মেসে, একা। তোমার অভাব এত কিসের?"

"বল তো ভাই? অভাব কিসের?—কত পাই আমি তা কখনও খতিয়ে দেখি নি, তবে ঘরে যা আনি তা নেহাৎ কম হবে না। কিন্তু সব এই দোর পর্য্যন্ত। পাওনাদারের তাগাদায় অস্থির হ'লে ছুটে' যাই পাবলিশারের কাছে, এনে, তাদের দিয়ে থুয়ে পরিষ্কার। বস্, তার পর যে অসীম সে অসীম।"

"কিন্তু এত পাওনাদার তোমার জোটে কোত্থেকে?"

"তাই তো আমি ভাবি! আমার একটা থিওরী আছে। মানুষ জন্মে একটা অদৃষ্টের কাচের ডোমের ভিতর। যাদের ডোমটা আস্ত থাকে তারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে যায়। আর যাদের সেটায় ফাট ধরে বা ভেঙ্গে যায়, তাদের সেই ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে নানা রকম অমঙ্গল এসে জোটে। আমার অদৃষ্টের মোড়কটার মধ্যে একটা মস্ত বড় ফুটো আছে—এ শয়তানের বাচ্ছাগুলো সেই ফুটোর ভেতর দিয়ে পিল পিল ক'রে ঢুকছে অসংখ্য—যেন রক্তবীজের ছানা—তাদের ঠেকাবার কোনও উপায় নেই।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিচরণ বলিল, "তাই যদি হয়, তবে আমার অদৃষ্টের ডোমটা বুঝি একেবারে শক্ত ঘা' খেয়ে চুরমার হ'য়ে গেছে। অমঙ্গলকে আর আমার কাছে আসতে পথ খুঁজতে হয় না, সারবন্দী হ'য়ে আসতে হয় না। হুড়মুড় ক'রে চার ধার দিয়ে তারা হৈ হৈ ক'রে ছুটে আসে।"

হাসিয়া অসীম বলিল, "নিজেকে তুমি যতটা বেশী দুর্ভাগা ভাবছো, হয় তো তা' তুমি নও। অন্ততঃ এক দিকে তো তোমার সৌভাগ্য হ'য়েছে—মেয়েমানুষের প্রাণভরা ভালবাসা তুমি পেয়েছ—সে বড় একটা কম সম্পদ নয়!"

হরিচরণের সমস্ত মুখের উপর একটা তীব্র বেদনার ছায়া পড়িয়া গেল—তার পত্নীর স্মৃতি এখনও তার অন্তরে টাটকা ঘায়ের মত টন্ টন্ করিতেছিল। সে একটু পরে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু সে সৌভাগ্য তো জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক ক'রে দিয়েছি। ভাল যে বেসেছিল, তাকে সুধু দুঃখ দিয়েই বিদায় ক'রেছি!"

নিবিড় সহানুভূতির সহিত অসীম বলিল, "সুধু দুঃখ দাও নি ভাই, তাকে তুমি যা দিয়েছ, সে একটা জীবনভরা সুখের মূল্য দিয়েও তা কিনতে পারতো। তুমি তাকে যে ভালবাসা দিয়েছ, সে সৌভাগ্যটা তুমি ছোট ক'রে ভাবছ, কিন্তু সে ভাবে নি।"

"না—তা সে ভাবে নি—সে সুধু আমায় বড় ভাল-বাসতো ব'লে।" হরিচরণের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "যাক, কিন্তু সে সব তো চুকে গেছে—এখন তো আমি পরিপূর্ণরূপে হতভাগা।"

"আমার ঠিক তা' মনে হ'চ্ছে না। আমার মনে হ'চ্ছে সাধ্বী স্ত্রীর ভালবাসা অমর। ম'লেও সে মরে না।"

হরিচরণ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোমার মুখে এ কথা অসীমদা'? তুমি তো মান না কিছু—পরলোক, অমরতা, সব তো তোমার কাছে ভুয়ো কথা।"

"নিশ্চয়! যে মরে সে বেঁচে থাকে না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই ভাই, তার ভালবাসাটা থাকে।"

"হাঁ—সে থাকে তার প্রণয়ীর মনের ভিতর একটা বিষের কাঁটাগাছ হ'য়ে।"

"না, নারীর চিত্তে মনোরম পারিজাত হ'য়ে।—অবাক্

হ'চ্ছ?—কিন্তু কথাটা ঠিক। দেশে, আমার বাড়ীতে একবার একটা সূর্য্যমুখীর চারা পুঁতেছিলাম। তাতে ফুটেছিল একটি ফুল—কিন্তু একাই সে বাগান আলো ক'রে রেখেছিল—এত বড় ছিল সে ফুল! ক্রমে শুকিয়ে গেল সে ফুল। গাছটাও শুকিয়ে গেল। জঞ্জাল ব'লে তাকে উপড়ে ফেলে দিলাম—ভাবলাম, সব চুকে বুকে গেল। মাটি খুঁড়ে আবার চারার জন্য জমী ত'য়ের ক'রলাম, সার দিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতে দেখি সেই মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে একটা চারা—দেখতে দেখতে সে বেড়ে উঠলো, ক্রমে ফুল ফুটলো, দেখি সেই সূর্য্যমুখী! সে গেছে—কিন্তু তার শোভাটুকু রেখে গেছে জমা ক'রে মাটির বুকে।"

হরিচরণ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার তো তাও নেই। সে যদি রেখে যেতো এক ফোঁটা একটা মেয়ে—নাঃ—তা হ'লে সেও তো না খেয়ে ম'রতো।"

"তবু তার ভালবাসা বেঁচে আছে—সেটুকু সে কেমন ক'রে জানি না, জমা ক'রে রেখে গেছে আর একটী নারীর বুকে।"

"তার মানে?"

একটু ঝোঁকের সহিত অসীম বলিল, "তার মানে তুমি অন্ধ—বিদ্যাসাগরের মতে তুমি একটি পুত্তলিকা—যার চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পায় না।" বলিয়া সে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল।

হরিচরণ একটু ভাবিয়া বলিল, "আমি বুঝতে পারছি তুমি কাকে লক্ষ্য ক'রে কথাটা ব'লছ। কিন্তু—অসীমদা, তোমার কাছে আমি এটা আশা করি নি। একজন পুরুষ ও একটি নারীর মধ্যে দুটো কথাবার্ত্তা হ'লেই বাজে লোকে নানা সন্দেহ ক'রে থাকে। কিন্তু তোমাকে আমি ততটা খাটো ক'রে দেখি নি। লতিকাকে আমি শ্রদ্ধা করি—তার প্রতি আমার দেনার অন্ত নেই। সে আমাকে করুণার চক্ষে দেখে, সে আমার বউকে ভালবেসেছিল ব'লে। এই সোজা কথাটুকু থেকে তুমি যে মনে ভেবে ব'সবে যে আমাদের মধ্যে একটা কিছু হ'য়েছে"—

"তুমি গণ্ডমূর্খ! আমি বুঝি সেই কথা ব'লেছি। আমি যা ব'লেছি তার বেশী কিছু মনে লুকোনো নেই। আর সে কথাটা সত্যি। লতিকা তোমাকে ভালবাসে—এমন ভালবাসে যে তোমার বউ তোমাকে তার চেয়ে বেশী ভালবাসতো না। তুমি যে সে কথা জান না, তা আমি জানি।"

হরিচরণের মনে কথাটায় যেন চমক লাগিয়া গেল। সত্যি কি? সে মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সে ভাবিল।—একবার মনে হইল, কথাটা সত্য। তার পর আবার ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল—বাজে কথা। অসীম সেই শ্রেণীর লোক—যারা মনে করে স্ত্রীলোকের পুরুষের প্রতি কোমলতার শুধু এক পর্য্যায় আছে। তাই লতিকার দরদের ভিতর সে প্রেম ছাড়া কিছু দেখিতে পায় না। কিন্তু হরিচরণের মনে হইল, সে লতিকার মনের খবরটা ঠিক জানে—সে হরিচরণকে স্নেহ করে, করুণা করে—বিশে'র কথা স্মরণ করিয়া; কিন্তু হরিচরণের প্রতি তার প্রেম—অসম্ভব।

সে একটু হাসিয়া বলিল, "অসীমদা', মাপ ক'রো, মেয়েমানুষের ভালবাসা সম্বন্ধে তোমার মতামতের খুব বেশী মূল্য দিতে পারছি নে আমি। তুমি আমার চেয়ে মেয়ে-মানুষ ঘেঁটেছ ঢের বেশী, কিন্তু তাদের সত্যিকারের ভালবাসা কখনও পাও নি। তাই রজ্জুতে তুমি সর্প ভ্রম কর।"

অসীম একটু শ্লেষের সহিত হরিচরণের দাড়ি নাড়া দিয়া বলিল, "Baby! আমাকে প্রেম শেখাবে তুমি? আমি চিনি নে ভালবাসা?—যাক চুলোয় যাক।"

হরিচরণও বলিল, "হাঁ—যাক চুলোয়। কেন না, সে ভালবাসুক আর না বাসুক তাতে কিছু আসে যায় না। কেন না, আমার এখন ঠিক ভালবাসা নেবার বা দেবার অবস্থা নয়। পোড়া মাটিতে ফুলের চারা গজায় না! যে ঘর উড়ে পুড়ে গেছে তার শূন্য ভিটেয় প্রদীপ জ্বালবার ইচ্ছাটাও হাসির কথা। ঘর না বেঁধে তাতে প্রদীপের রোশনাই করবার মত বেকুবী আর আমার দ্বারা হবে না।"

গম্ভীরভাবে অসীম বলিল, "তুমি কি ভেবেছ আর বিয়ে ক'রবে না?"

"কখনও করবো না তা ব'লতে পারি না। কিন্তু সম্প্রতি বিয়ে ক'রবার কল্পনাও মনে আনতে পারি না। বিয়ে করবার আগে খাবার জোগাড় থাকা যে উচিত এ সত্যটা ঠেকে শিখেছি।"

অসীম গাহিল, "বানের মুখে কাঠ—"

হরিচরণ বলিল, "বানে ভাসছি হয় তো ঠিক ভাই, কিন্তু

কাঠ আমরা নই। মানুষ যখন তখন ভেবে চিন্তে খানিকটা ঠিক ক'রতে হয় বই কি ?"

"যাক গে। তুমি না কি ওখান থেকে ওঠবার মতলব ক'রছো ?"

"হাঁ—একটা ঘর ঠিক ক'রেছি। কাল যাব মনে ক'রেছি।"

"তার পর ? খাবার জোগাড় ?"

"সেই সন্ধানেই ঘুরছি—তাই এলাম তোমার কাছে।"

"সে কথা বলছি না মুখখু! চাল ডালের জোগাড় হ'লেই খিচুড়ী হয় না, তাকে রাঁধতে জানা দরকার। রোজগার না হয় তুমি ক'রলে, কিন্তু তোমাকে চালিয়ে নেবে কে? তুমি যে হাবা গঙ্গারাম, জান কেবল ছবি আঁকতে, একা একা নিজেকে দু'দিন চালিয়ে নেবার ক্ষেমতা তোমার নেই।"

হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "আচ্ছা এবার দেখে নিও। এতদিন দরকার হয় নি তাই নিজে কিছুই করি নি—এখন ক'রতেই হবে।"

অসীম অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল। তার পর সে বলিল, "একটা কাজ আমার হাতে আছে—পারবে তা' ক'রতে ?"

"কি কাজ ?"

"একটা ছবি আঁকতে হবে, আমার আইডিয়া নিয়ে। ছবিটা আমাব একটা বইয়ে ছাপা হবে, কিন্তু তুমি আঁকবে বেশ বড় ক'রে—রং দিয়ে।"

"এ আর না পারবো কেন ? কি ছবি হবে বল।"

"ছবিটার নাম হবে, 'করুণা'—কিন্তু ছাঁকা idealistic ছবি চাইনে আমি,—একটি সাধারণ মেয়ের মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে করুণার ভাব। আমি তোমায় মডেল দেব, সেই মডেল নিয়ে তোমায় আঁকতে হবে।"

"তা বেশ।"

"কিন্তু একটু সামান্য অসুবিধা আছে। তোমাকে আঁকতে হবে সেই মডেলের বাড়ীতে গিয়ে। ঠিক ছবি তোলবার মত Sitting নেবে না। সর্ব্বক্ষণ তুমি তাকে দেখবে—মাঝে মাঝে দেখতে পাবে তা'র মুখে জীবন্ত করুণার ছবি ফুটে উঠছে—আমি তা' দেখেছি। ঠিক সেই সময় তোমার তুলি নিয়ে ব'সে সেই ভাবটা তুলে নিতে হবে। কাজেই তোমায় থাকতে হবে তার বাড়ীতে।"

হরিচরণ একটু ভাবিয়া বলিল, "তাই ক'রবো,—নইলে আর চলছে কই ? কে তোমার মডেল ?"

"লতিকা!"

হরিচরণ বলিল, "ওঃ, তামাসা হ'চ্ছিল আমার সঙ্গে!" তার সুরে আশায় নিরাশার ব্যথিত সুর বাজিয়া উঠিল।

অসীম বলিল, "না ভাই, তামাসা নয়, খাঁটি কথা। আমি লতিকার মুখে ওই ভাবটা দেখে অবধি ভেবেছি যে ওটাকে আমার কাজে লাগাব। একখানা বই লিখছি, কিন্তু কেবলি মনে হ'চ্ছে, কলমের আঁচড়ে ও জিনিসটাকে জ্যান্ত ক'রে তোলা যাবে না। তাই তোমার শরণ নিচ্ছি। তুমি ছবিখানা এঁকে দেও, পারিশ্রমিকের উপযুক্ত বন্দোবস্ত আমি ক'রবো।"

হরিচরণের প্রথমে বিশ্বাস হইল না। তার পর সে যখন দেখিল অসীমের প্রস্তাব পরিহাস নয়, তখন সে সম্মত হইল।

কাজেই আপাততঃ, ছবি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তার লতিকার গৃহ ত্যাগ করিবার প্রস্তাব মুলতবী রহিল। অসীম তাকে বলিল, এ সম্বন্ধে তার নামটা লতিকার কাছে না করাই ভাল।

(১৫)

দুই দিন পর অসীম লতিকার সঙ্গে দেখা করিল। হরিচরণ তখন বাড়ী ছিল না।

অসীম বলিল, "কি গো ঠাকরুণ, হরি কোথায় ?"

লতিকা হাসিমুখে তাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এ কথায় যেন তার হাসি একটা মধুর আবেগে ভরিয়া গেল। অসীম সে মুখ দেখিয়া খুসী হইল।

লতিকা বলিল, "এই বেরিয়েছেন একটু।"

অসীম বলিল, "সে এখান থেকে চ'লে যায় নি তা' হ'লে ?"

সলজ্জভাবে লতিকা বলিল, "না। সে ঘরটা ছেড়ে দিয়ে এয়েছে, বেঁচেছি।"

"তার পর ?" অসীম হাসিল।

"তার পর আবার কি ? এখানেই আছে।"

"সুধু আছে ? আর কিছু নয় ?" অসীম আবার হাসিল।

স্বপ্নজাল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS

লতিকা সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আবার কি হবে ?"

"কেন ? ছবি আঁকা হ'চ্ছে যে ?"

"আপনি কেমন ক'রে জানলেন ?"

"কেন ? হরিচরণের সঙ্গে কি আমার আলাপ নেই ভাবছেন না কি ?"

"ও তাই !"—লজ্জায় আনন্দে লতিকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—"আশ্চর্য্য খেয়াল দেখুন। আমাকে মডেল ক'রে ছবি আঁকছেন। সে ছবির যা ছিরি হচ্ছে তা' বুঝতেই পারছি। আমার না কি আবার ছবি হয় ?"

"কি জানেন ? যে যাকে ভালবাসে সে তার ভিতর অনেক রূপ দেখতে পায় যা অন্য কারও চোখেই পড়ে না।"

"কক্ষনো না—ভালবাসে না আরও কিছু ?"

"নইলে সহরে এত সুন্দর মেয়ে থাকতে আপনার ছবি তুলতে যায় কেন ?"

"সে ওঁর খেয়াল ! কিম্বা হয় তো কোনও ভিকিরি কি অনাথবাণীর ছবি আঁকবেন, তাই আমার মুখ পছন্দ হয়েছে !"

হাসিয়া অসীম বলিল, "এখন দেখতে পাচ্ছেন তো, আমার মিথ্যা-মিলনী কেমন চমৎকার চ'লতে পারে না। কেন না, আপনার কথা শুনে আমার একটুও বুঝতে কষ্ট হ'চ্ছে না যে আপনার মনে সত্যি সত্যি কি হ'চ্ছে।"

"কি হ'চ্ছে ?"

"আপনি দুটো কথা ভাবছেন,—এক ভাবছেন, নিশ্চয় হরিচরণ আপনাকে ভালবাসে ; নইলে সে আপনার ছবি তুলতে যাবে কেন ? আর ভাবছেন, আপনি নিশ্চয় খুব সুন্দর ; নইলে আর্টিষ্ট হয়ে হরিচরণ আপনার ছবি আঁকে ?"

"যান, কক্ষনো না। আমি কিছু ওসব ভাবছি না। আমার যে রূপ সে আমার দেখা আছে। তা নয় ; তবে হ্যাঁ, এই খেয়াল নিয়ে যে উনি তবু এখানে দুদিন আছেন—সেইটে আমার লাভ।"

অসীম আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চাহিয়া ছিল। লতিকা তাহা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া মুখ নীচু করিল। অসীম ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মনের ভিতর চাপিয়া বলিল, "তবু তো আপনি ভালবাসেন না ! ভালবাসেন না হরিকে, তবু সে যে দুদিন র'য়ে গেল, সেই আনন্দে একেবারে মুখ-চোখ ছেয়ে গেছে। ভালবাসলে বোধ হয় হাওয়ায় উড়তে থাকতেন।"

"যান—আপনি কিচ্ছু বোঝেন না।"

"অর্থাৎ আমি অতি বিশ্রী লোক, আপনার মনের কথা চটপট ধ'রে ফেলি।"

"কক্ষনও না।"

"অর্থাৎ—তাই তো বিপদ !"

"না—আপনার সঙ্গে কে পারবে বলুন। কথার ব্যবসা ক'রে খান আপনি।"

"তবেই তো বুঝতে পারছেন আপনি,—আমার সঙ্গে সাদাসিদে মনের কথা খুলে বলাই সব চেয়ে নিরাপদ।"

"খুলে বলাতে কিই বা বাকী রেখেছেন আপনি।" বলিয়া লতিকা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

আপনার দিকের কথাটা বেশ বুঝেছি, কিন্তু ওপক্ষের ভাব কেমন বুঝছেন ? হরি কি এগুচ্ছে না পিছুচ্ছে ? বঁড়শী গিলেছে, না ঠোকরাচ্ছে, না সুধু ঘাই মারছে ?"

"কি জানি,—আমি কোথেকে জানবো সে কথা ?"

"তবু আপনার কি মনে হ'চ্ছে ?"

একটু থামিয়া লতিকা বলিল, "না—আমি তা' বলবো না—কে জানে, আপনি শুনলে হয় তো ঠাট্টা ক'রবেন।"

"রাম বল ! এ কি ঠাট্টার কথা যে ঠাট্টা ক'রবো ? আপনি নির্ভয়ে বলুন।"

"আমার মনে হ'চ্ছে যেন—এই এমন কিছু নয়—তবু যেন মনটা একটু নরম হ'য়েছে।"

"বটে ? কিসে বুঝলেন শুনি ?"

একটা প্রচণ্ড আবেগ যেন লতিকাকে ভরিয়া ফেলিল। এ কথার আলোচনায় তার মনে যে সব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, তাতে তার সমস্ত শরীর যেন একটা প্রগাঢ় পুলকে টলমল হইয়া উঠিয়াছে—তার চিত্তের বেগ যেন সে ধারণ করিতে পারিতেছে না।

সে বলিল, "এমন কিছু নয়, কিন্তু এখন আর সর্ব্বক্ষণ তাঁর ঘরে ব'সে থাকেন না, আমার কাছে সব সময়ে এসে বসেন, গল্প সল্প করেন—আর—মাঝে মাঝে দেখেছি—আড়াল থেকে উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন—দেখে মনে হয় কি যেন খুঁজছেন, কি যেন ভাবছেন, আমার কথা।"

লতিকা ঘন ঘন নিঃশ্বাস লইতে লাগিল।

অসীম পুলকিত হইয়া বলিল, "বেশ, বেশ, খুব খুসী

হ'লাম। আশীর্ব্বাদ করি—তোমরা দুজনে সুখী হও!" তার কণ্ঠস্বরে একটুও পরিহাসের সুর ছিল না।

লতিকা বলিল, "দেখুন,—দয়া ক'রে এ-সব কথা তাঁর কাছে ব'লবেন না। তা' হ'লে—ব'লবেন না যেন।"

"না, বলবো না—আমাকে এত অবিশ্বাস ক'রবার কোনও কারণ পেয়েছ কি?"

অসীম উঠিল।

(১৬)

লতিকা বসিয়া রান্নার জোগাড় করিতেছিল। তরকারী-গুলি সুন্দর করিয়া কুটিয়া, ধুইয়া সে পরিপাটি করিয়া থালার উপর সাজাইয়া রাখিল। চাল ডাল বাছিয়া ধুইয়া দুটি বড় বাটিতে সাজাইল। ঘুরিয়া ফিরিয়া সে তেল ঘি মশলা সব জোগাড় করিয়া এক সঙ্গে পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

হরিচরণ একটু তফাতে একখানা কাগজ ও রং লইয়া বসিয়া একাগ্র মনে তার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, আর কাগজের উপর তুলির আঁচড় দিতেছিল।

লতিকা তার কাজে তন্ময় হইয়া ছিল,—হরিচরণ যে কখন আসিয়া ছবি আঁকিতে লাগিয়া গিয়াছে, সেটা সে লক্ষ্য করে নাই। সে একমনে তার অভ্যস্ত পরিচ্ছন্নতার সহিত তার কাজ করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আজকালকার রান্নার জোগাড়ের মধ্যে তার পরিচ্ছন্নতার চেয়ে বেশী একটা কিছু ছিল। হরিচরণ তার ঘর হইতে আসিয়া যখন তাকে দেখিল, তখন সেই জিনিসটা তার চোখে পড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি কাগজপত্র লইয়া বসিয়া গেল।

তুচ্ছ রান্নার কাজ, তাও লতিকা করে যেন একটা ছবির মত। তার কোটা তরকারী, মশলার থালা, তেলের বাটী সব যেন আর্টিষ্টের সাজান একটা ছবির উপকরণ। তা ছাড়া আজ একটা নিবিড় স্নেহ তার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিয়া তার সমস্ত কাজ অপরূপ সৌরভে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল। মুখে চোখে, হাত নাড়ায়, পায়ের গতিতে সর্ব্বত্র যেন এই স্নেহ, এ দরদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। এই কথাটা তার সমস্ত অন্তর ছাইয়া ছিল যে, সে রান্না করিতেছে হরিচরণের জন্য; তাকে সে ভাল করিয়া খাওয়াইবে; খাইয়া সে তৃপ্ত হইবে এই আশা, এই আনন্দ তার কাজের ভিতর অপূর্ব্ব লালিত্য সঞ্চার করিয়াছিল, তার কর্ম্মরত মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শ্রী ঢালিয়া দিয়াছিল।

লতিকা কাজ করিয়া গেল, হরিচরণের চঞ্চল অঙ্গুলি কাগজের উপর রেখার পর রেখা টানিয়া গেল—অনেকক্ষণ। তার পর, জোগাড় শেষ হইলে লতিকা আঁচল দিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

হরিচরণকে দেখিয়া তার মুখ আনন্দে ভরিয়া গেল। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভরিয়া সে বলিল, "ও কি হ'চ্ছে ওখানে ব'সে?"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল, "আপনার একটুখানি রূপ চুরী ক'রে নিলাম।"

এ কথায় লতিকার মনটা যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তার চোখ বলিল, "ওরে সর্ব্বনেশে চোর, তুই আমার সবটুকু চুরী করবি ব'লেই যে আমি আমার সব দুয়ার খুলে ব'সে আছি।"

হাসিয়া সে বলিল, "দেশে কি রূপের এত দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে যে আমার কাছে রূপ চুরী ক'রতে আসতে হ'ল আপনার মত আর্টিষ্টের! তা ছাড়া চুরী কাজটা ভাল নয়।"

"কিন্তু যে সম্পদ চুরী ক'রে ছাড়া পাওয়াই যায় না, তাকে চুরী করা ছাড়া আর উপায় কি?"

অগ্রসর হইয়া লতিকা বলিল, "দেখি, কি এমন অপরূপ সম্পদ চুরী ক'রলেন আপনি?"

হরিচরণ কাগজ চাপিয়া বলিল, "এখন দেখতে পাবেন না। এটা শেষ হ'লে তবে দেখাব।"

লতিকা বলিল, "সে হবে না, কি সাপ বাং আঁকলেন আমাকে দেখাতেই হবে।"

সে হরিচরণের হাত চাপিয়া ধরিল—এই প্রথম! সর্ব্বাঙ্গে সে পুলকের শিহরণ অনুভব করিল, চক্ষু তার প্রীতিতে ঢল ঢল হইয়া উঠিল, মুখে ভাসিয়া উঠিল প্রণয়ের সুমধুর বিচিত্র রাগ।

হরিচরণ এক মুহূর্ত্ত সে দিকে চাহিয়া রহিল। সে ছবি দেখাইল না, বলিল, "আচ্ছা, দেখাব। কিন্তু তাহ'লে আর একটু দাঁড়ান গে ওখানে—আমি চটপট শেষ ক'রে নি, তার পর দেখবেন।"

লতিকা দাঁড়াইল। ঠিক কেমন করিয়া দাঁড়াইবে সে সম্বন্ধে হরিচরণ উপদেশ দিল—শেষে নিজে আসিয়া হাত মুখ

নাড়িয়া তাকে ঠিক করিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। তার সে স্নিগ্ধ অঙ্গ স্পর্শে লতিকা কৃতার্থ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল এমনি করিয়া হরিচরণের চোখের সামনে, তার দিকে চাহিয়া—দৃষ্টিতে তার অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও প্রীতি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

হরিচরণ তাকে দাঁড় করাইয়া একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিল। তার মনে হইল লতিকার ভিতর লুকান আছে রূপ। সেই রূপ দেখিয়া তার আর্টিষ্টের দৃষ্টি পুলকিত হইয়া উঠিল। তুলির লেখায় তাহা ফুটাইবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তার চোখের এ মুগ্ধ ভাব লতিকার দৃষ্টি এড়াইল না, তার অন্তরে আনন্দের একটা তুফান বহিয়া গেল।

তার কাজ শেষ হইলে হরিচরণ বলিল, "এখন আপনার ছুটি।"

লতিকা ছুটিয়া হরিচরণের পিঠের কাছে আসিয়া তার মুখের কাছে মুখ লইয়া দেখিতে লাগিল—আনন্দে তার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

লতিকা বলিল, "বাঃ! কি সুন্দর!"

তার দিকে মুখ ফিরাইয়া হরিচরণ বলিল, "সুন্দর নয়? আপনার যে এত রূপ আছে, তা' আগে টের পাই নি।"

লতিকা বলিল, "আহা! আমার রূপ না আর কিছু—সুন্দর আপনার ছবি—আমি নই।"

বড় কাছাকাছি ছিল মুখখানা। হরিচরণের মাথাও খুব ঠিক ছিল না, সে লতিকার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া বলিল, "না গো না, তুমিই সুন্দর।"

এ আনন্দ কি ধরিয়া রাখা যায়? লতিকার সারা প্রাণ নাচিয়া উঠিল। কিন্তু তার বড় লজ্জা হইল। সে সোজা দাঁড়াইয়া বলিল, "দুর।"

সে ছুটিয়া পলাইল।

দিনের পর দিন এমনি করিয়া হরিচরণ লতিকার স্কেচ করিতে লাগিল। রূপ-বুভুক্ষুর দৃষ্টি দিয়া সে যতই লতিকার দিকে চায়, ততই তার চোখে ফুটিয়া উঠে লতিকার নূতন নূতন রূপ!

সুধু কি রূপ? রূপের এই একাগ্র সাধনায় সে লতিকার এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িল যে, সে লতিকার অন্তরের স্পষ্ট সান্নিধ্য অনুভব করিতে পারিল। যতই সে কাছে আসিল, ততই মুগ্ধ হইল। বড় মধুর কোমল, প্রীতিভরা সেবা-ভরা লতিকার চিত্ত! সেই নরম মনখানার ছাপ পড়িয়াই তার মুখ অপূর্ব্ব শোভায় ভরিয়া উঠে। তার মনের সঙ্গে এই নিবিড় পরিচয়ে হরিচরণ ধীরে ধীরে তার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

এ কথাও বুঝিতে তার বাকী রহিল না যে লতিকা তাকে ভালবাসে—অসীম মিথ্যা বলে নাই।

কিন্তু গরীব সে, নির্গুণ সে,—লতিকাকে দিবার মত তার কিছুই নাই। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তার নিঃস্বতার ব্যথায় সে মরিয়া গেল।

তাই লতিকাকে ভালবাসিবার কথা ভাবিতে সে ভয় পায়—কাঁপিয়া ওঠে তার অন্তর। সে গুম হইয়া ভাবে—ভাবে তার ভাঙ্গাচুরা অদৃষ্টের সঙ্গে আর কারও অদৃষ্ট জড়াইবার তার অধিকার নাই।

বুক তার ভাঙ্গিয়া যায়।

লতিকার এ কয়দিন কাটিল একটা বিপুল আনন্দ উৎসবে। সে বুঝিল হরিচরণের চিত্ত আর তার প্রতি উদাসীন নয়—সেও তাকে ভালবাসে। এ আনন্দের বেগে সে আত্মহারা হইয়া গেল। আর কোনও কথা সে ভাবিতে পারিল না।

এমনি করিয়া হরিচরণের দপ্তর লতিকার শতাধিক সুন্দর স্কেচে বোঝাই হইয়া গেল। অসীমের ফরমায়েসী ছবিখানাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

(১৭)

তার সম্বন্ধে হরিচরণ মাঝে মাঝে অসীমের সঙ্গে পরামর্শ করিত,—অসীমের পরিকল্পনার সহায়তায় সে তার ছবি আঁকিত।

শেষে একদিন সে অসীমকে ডাকিয়া ছবি দেখাইল—তখন ছবি প্রায় শেষ হইয়াছে। ঢাকনাটা খুলিয়া ফেলিতেই অসীম আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "Bravo! চমৎকার! হরি ভাই—এটা Exhibition-এ দিতে হবে।"

ম্লানমুখে হরিচরণ বলিল, "না ভাই, আর লাঞ্ছনার দরকার নেই। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। একবারেই অনেক শিক্ষা হ'য়েছে আমার।"

"আরে হতভাগা সেও ছবি, এও ছবি! কি বল লতিকা?"

লতিকা হাসিয়া বলিল, "আহা, আমি ছবির কিই বা বুঝি ? আমার চোখে তো সব ছবিই সুন্দর লাগে।"

অসীম বলিল, "কিন্তু এ ছবি! দেখতে পাচ্ছ না কত সুন্দর! কি মুখখানা—আহা হা, যেন কথা কইছে—রূপ যেন ঝরে' প'ড়ছে! লতিকা, তুমি কি জানতে কখনও যে তুমি এত সুন্দর ?"

লতিকা বলিল, "আমি সুন্দর না আর কিছু, উনি ওঁর মন থেকে এঁকেছেন তাই সুন্দর হ'য়েছে। আমার রূপ তো ঝরে' পড়ে যখন আরসীর দিকে চাই।"

অসীম। কিন্তু আরসীর ছবির চেয়ে এ ছবি যে ঢের বেশী সত্যি। এর ভিতর হরি ফুটিয়েছে তোমার সেই রূপ যা তুমি নিজে কখনও জানো না, হয় তো চোখেও দেখ নি। না ভাই ?

হরি। তা ঠিক! আপনার যে এত রূপ আছে সে আপনি জানতেন না ব'লেই রক্ষে, জানলেই এর চেহারা বদলে যেত।

লতিকা। যান, আপনারা দুজনে মিলে কি যে ঠাট্টা আরম্ভ ক'রেছেন তার ঠিকানা নেই। না হয় আমার রূপ নাই আছে—তাই ব'লে এমনি ঠাট্টা ক'রতে হয়।

সে একটু অভিমান করিল।

অসীম বলিল, "খুড়ি, রাগ কর তো আর বলবো না। কিন্তু মেয়েমানুষকে সুন্দর ব'ল্লে রাগ করে তা' এই প্রথম দেখলাম।

হরিচরণ ও লতিকা হাসিয়া উঠিল।

অসীম বলিল, "থা'ক, এ ছবি তোমার একজিবিশনে দিতে হ'চ্ছে। তুমি না দেও আমি দেব।"

হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "তা দেওগে তুমি। তুমি ছবির মালিক, তুমি একে ইচ্ছে ক'রলে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে পার।"

লতিকা কথাটা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইল—সে জানিত না যে ছবি আঁকাইয়াছে অসীম। সে হরিচরণের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

সে দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিয়া অসীম বলিল, "ছবির মালিক হ'চ্ছে লতিকা। তার নিজের চেহারার কপিরাইট তারই! তুমি কি বল ? একজিবিশনে দেওয়া হবে না ?"

লতিকা স্মিত-মুখে বলিল, "দিন না—বেশ তো!"

অসীম। এর পর আর কারও কথা চলে না। লতিকার যখন ইচ্ছে হ'য়েছে তার রূপটা দশজনে দেখে সুখ্যাত করুক, তখন এ ছবি পাঠাতেই হ'চ্ছে।

লতিকা। আহা, তাই বুঝি আমি বল্লুম ?

অসীম। বলনি বটে, কিন্তু কথাটা তো ঠিক।

লতিকা বলিল, "যান, আপনি অমন করেন তো আমি কোনও কথা কইব না আপনার সঙ্গে।"

অসীম। দোহাই লতিকা, তোমার না হয় কথা কইবার অন্য লোক আছে। তাই ব'লে আমাকে বঞ্চিত ক'রো না; আমার ওই সম্বল। তার পর অসীম বলিল, "তোমাকে এত সুন্দর ব'ল্লাম, একটু চা খাওয়াবে না ?"

লতিকা হাসিমুখে চা করিতে গেল।

অসীম বলিল, "ভায়া, ছবিতে কথা কয়, শুনেছ ?"

"না, ছবির মুখের কথা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয় নি।"

"দেখছো না এ ছবি কত কথা কইছে ? এ ব'লছে যে তুমি এখন লতিকাকে ভালবাস! ভাল না বাসলে ওর ভিতর এ রূপ তুমি দেখতে পেতে না, এত দরদ দিয়ে আঁকতেও পারতে না।"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "ভাই, আমি ছবি আঁকি, কবিতা লিখি না। অত সব বুঝি না।"

"কবিতা তারাই লেখে যাদের জীবনে কাব্য লাভ করবার সৌভাগ্য হয় না। তোমার কবিতা তোমার রক্তের ধারায় বইছে—তাকে কলমের খোঁচায় খুঁড়ে তোলবার দরকার হয় না, তার সময়ও নেই তোমার।"

"যাক গে—ওসব বাজে কথায় কাজ কি ভাই ? ভাল বাসি বা না বাসি তাতে কি এল গেল। পাকা বেলের মাঝখানে ব'সলে কাকের কি লাভ ?"

"কিন্তু মনে কর যদি বেল ফাটা হয় ?"

"ওসব ভাবনা ভাববার অবসর নেই আমার। আমি এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি যে, একটা পেট চালানই দায়, দুটোর কথা ভাববার কাজেই কোনও দরকার নেই।"

"কিন্তু এ স্থলে পেট চালাবার কথা না ভাবলেও তো চলে। লতিকা না হয় চাকরীই করবে।"

"থাম, দাদা, থাম। শুনতে পাবে। কি যে বকছো তার ঠিকানা নেই।"

ছবি একজিবিশনে পাঠাইয়া হরিচরণ একটু ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল।

তার হঠাৎ বড় গরজ পড়িয়া গেল অর্থ উপার্জ্জনের। তার ভাঙ্গাচোরা অদৃষ্টকে জোড়া তালি দিয়া খাড়া করিবার জন্য সে অস্থির হইয়া উঠিল।—সে আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল সুখের সংসারের—যার অধিষ্ঠাত্রী হইবে লতিকা!

সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাগজের জোগাড় করিতে লাগিল। দিন-রাত খাটিয়া ছবি আঁকিতে লাগিল।

লতিকাকে সে মুখ ফুটিয়া কোনও দিন কোনও কথা বলে নাই! কেন না, সে জানে তার পক্ষে প্রেমের কথা বলা ধৃষ্টতা। যদি ভগবান দিন দেন, আপনার পায় যদি সে একদিন দাঁড়াইতে পারে, তবে সে বলিবে—তার আগে নয়।

সে লতিকাকে বলিল, "দেখুন, এখন আমার একটা আলাদা ঘর না নিলে চলছে না। এখানে তো লোক আসে না। সদর রাস্তার উপর একটা ঘর না নিলে আমার ব্যবসা চলবে না! দয়া ক'রে অনুমতি দিন যাবার।"

লতিকার কান্না পাইল, তাই সে কথা বলিতে পারিল না। শেষে হরিচরণ বুঝাইয়া পড়াইয়া তাকে সম্মত করিল। কিন্তু লতিকা বলিল যে, বিশে'র মূর্ত্তিখানা টানাটানি করিয়া ভাঙ্গিবার কোনও দরকার নাই—সেটা লতিকার কাছেই থাকুক, আর হরিচরণের একবেলা লতিকার ওখানে রোজ খাইতে হইবে।

হরিচরণ এ ব্যবস্থায় খুসী হইল। সে একটা ঘর ভাড়া করিয়া বসিল সদর রাস্তার ধারে।

লতিকার দিন বড় কষ্টে কাটে। চিরদিন একলা থাকিয়াছে সে, তাতে কোন কষ্ট হয় নাই; কিন্তু এখন যেন তার সেই শূন্য ঘর তাকে গিলিতে আসে। হরিচরণ যে ঘরের কতখানি জুড়িয়া ছিল, তাহা সে বুঝিল সে চলিয়া গেলে।

হরিচরণ রোজ আসে—এইটুকুই তার এখনকার জীবনে প্রধান আনন্দ। তা ছাড়া অসীম আসে—তাতেও সময় কাটে বেশ। কিন্তু তবু অনেকটা—প্রকাণ্ড ফাঁক থাকিয়া যায়।

হঠাৎ একদিন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় এক নূতন অভ্যাগতের আগমন হইল। আজ সে নূতন, কিন্তু একদিন সে ছিল পুরাতন। আট দশ মাস আগে তার সঙ্গে লতিকার ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে।

যতীন ডাক্তারের সঙ্গে লতিকার অসঙ্গত রকম ভাব ছিল। প্রায় তিন চার বৎসর সে তার সঙ্গ উপভোগ করিয়াছিল—কিন্তু হঠাৎ একদিন তার মনটা ইহার প্রতি ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল। তখন সে বিশে'র শুশ্রূষা করে, তার পর হরিচরণের ঘরে গিয়া তার সেবা করে। হরিচরণ ও বিশে'কে দেখিয়া তার মনটা কেমন বিরক্ত হইয়া গেল তার নিজের এ মেকী ভালবাসার উপর। কি ভালবাসে এরা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে! ইহার পাশে যতীনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা একেবারে খেলো মনে হইয়া গেল,—সে ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

তবু অনেক দিনের বন্ধন,—ছাড়ান দায়! তাই কিছুদিন সে কিছুই বলিল না।

যতীন কিন্তু ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিল। একদিন তাকে অনুযোগ করিয়া সে বলিল, "তুমি কোথায় থাক? তোমার যে দেখাই পাওয়া দায়!"

লতিকা বলিল, "খেটে খাই, পরের চাকরী করি—কি ক'রবো?"

যতীন উষ্ণভাবে বলিল, "সুধু পরের চাকরী নয়—আর একটা কিছু হ'য়েছে। আমি যে একেবারে টের না পাই তা নয়।"

লতিকাও উষ্ণভাবে বলিল, "বেশ! হ'য়েছে তো হ'য়েছে!"

যতীন খানিকক্ষণ মুখ ভার করিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমার মতলবখানা কি বল দেখি। আমাকে এমনি ক'রে খেলিয়ে তোমার কি সুখ?"

"শুনতে চাও তবে? স্পষ্ট ক'রেই বলছি। ঘেন্না ধ'রে গেছে আমার এ সবে। ভাল লাগে না কিছু। তোমাকে দেখলে আমার গা রী রী করে।"

ইহার পর খুব একচোট ঝগড়া হইল। যতীনকে লতিকা বাড়ী হইতে বাহির হইতে বলিল—বলিল, আর যেন সে না আসে। যতীন গরগর করিয়া লতিকাকে গালিগালাজ করিয়া চলিয়া গেল।

তার পর আর সে আসে নাই। তার অভাব লতিকা কোনও দিন অনুভব করে নাই।

আজ হঠাৎ যতীনকে দেখিয়া লতিকা চমকাইয়া উঠিল। সে বলিল, "এ কি? তুমি? আবার?"

হাসিয়া যতীন বলিল, "যাচ্ছিলাম এধার দিয়ে—ভাবলাম একবার দেখে যাই তোমায়—for old time's sake."

বিনা নিমন্ত্রণেই সে চেয়ার চাপিয়া বসিল। লতিকা বড় বিব্রত বোধ করিল—একটু ভয়ও তার হইল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া যতীনকে কিছু বলিতে পারিল না।

যতীন বলিল, "তার পর—কি রকম চলছে দিন? খুব স্ফূর্ত্তি চলছে, কেমন?"

লতিকা ম্লানমুখে বলিল, "দিন যেমন চিরকার চলে আসছে তেমনি চলছে। তোমাকে ছাড়া দিন চলা বন্ধ হয়ে গেছে এমন নয়।"

"না, তা হবে কেন?—তা তোমাকে ছাড়াও আমার দিন চলছে।"

"আমি কি ব'লেছি তা চলবে না?"

"ভাবটা সেই রকমই মনে হ'য়েছিল সেদিন। আমি তোমাকে ছেড়ে যাই নি, তুমিই বিদায় ক'রে দিয়েছিলে।"

"কিন্তু ঝগড়াটা আমি সুরু করি নি।"

"যাক গে যাক, সে নিয়ে আর ঝগড়া ক'রে কি হবে এত-দিন পরে। হয় তো আমারই দোষ হ'য়েছিল, না হয় তোমারই দোষ হ'য়েছিল। সে পুরোনো কথা ঘেঁটে লাভ নেই।"

"না—আমারও ঘাঁটবার ইচ্ছে নেই।"

"তোমার যদি মনে হয় যে সে ঝগড়াটা না হ'লেই ভাল ছিল, তবে আমি এখনও সব ভুলে যেতে রাজী আছি। বল তো আমরা যেমন ছিলাম তেমনি হ'তে পারি।"

লতিকা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমার তেমন কোনও ইচ্ছেই নেই। ব'লেছি তো সেদিন, আমার ও-সবে ঘেন্না ধরে গেছে।"

"কিসে? ভালবাসায়? ভালবাসাটা কি এমনই খারাপ জিনিস?"

"ভালবাসা বল ওকে? তুমি কোনও দিন ভালবাসা দেখ নি তাই ভাবছো যে তোমায় আমায় ভালবাসা ছিল। যদি জানতে তবে বুঝতে সে জিনিস কি?"

কৌতুকের দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চাহিয়া যতীন বলিল, "ও, তাই না কি? এর মধ্যে আবার ভালবেসে ফেলেছো—হুররে!"

"আমি ভালবেসেছি কি না সে খোঁজে তোমার দরকার নেই। আমি ভালবাসা দেখেছি—ভালবাসা চিনতে শিখেছি"—

হাসিয়া যতীন বলিল, "ওইটাই হ'ল নতুন ভালবাসার একটা symptom। একজনকে ছেড়ে আর একজনকে ভাল-বাসলেই সবাই মনে করে, আগেকার ভালবাসাটা ছিল মেকী, এইটেই আসল। কিন্তু কয়েক দিন বাদে এই আসলও মেকী হ'য়ে যায়—যদি আর কেউ জুটে পড়ে!"

লতিকা রাগ করিয়া বলিল, "যাও, আমি তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কইতে চাই নে।"

"তা না চাইলে। আমারও বড় বেশী গরজ নেই। তোমার নতুন ভালবাসার জয় হোক, আমার তাতে কোনও দুঃখ নেই। এই আমি তোমার নতুন ভালবাসার মঙ্গল কামনায় drink ক'রছি।"

বলিয়া ফস্ করিয়া পকেট হইতে ফ্লাস্ক বাহির করিয়া যতীন কয়েক ঢোঁক মদ খাইয়া ফেলিল। লতিকা বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুটি করিল।

লতিকা বলিল, "আচ্ছা, এখন হ'য়েছে। বিদায় হও এখন। অতগুলো গিললে, এখুনি তো মাতলামী সুরু হবে। আমি তো তোমাকে জানি।"

"না, না, অত ভয় ক'রো না। অত চট ক'রে এখন আমি মাতাল হই নে। শোন, তুমি অন্য লোক পেয়েছ, আমার তাতে দুঃখ নেই—I wish you all joy—হুরে! Three cheers for your love—হিপ্ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে!"

লতিকা বুঝিল, মদ যতীনের মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে। সে এখানে আসিবার পূর্ব্বেই কিছু খাইয়াছিল, ক্রমে তার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ইহাকে বিদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু সে যতই যতীনকে উঠিতে বলে, সে ততই চাপিয়া বসে।

অনেক কষ্টে শেষে সে যতীনকে দাঁড় করাইল। যতীন বলিল, "আমাকে ভালবাস না তুমি কোনও দুঃখ নেই তাতে—যাকে ভালবাস তার ওপর—সত্যি বলছি—কোনও রাগ নেই। কিন্তু—for old time's sake—let us be friends.

লতিকা বলিল, "না, না, আর ফ্রেণ্ডে কাজ নেই আমার।"

"চাও না—friendship চাও না আমায়? কুছ্ পরোয়া নেই।" বলিয়া সে গট-মট্ করিয়া টলমল করিতে করিতে অগ্রসর হইল। কয়েক পা গিয়া সে পড়িবার মত হইল। লতিকা তাকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

চলিতে চলিতে যতীন আবার ফিরিয়া বলিল, "অন্ততঃ let us part as friends"—বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া লতিকার হাত ধরিয়া ঝাঁকাইল। তার পর হঠাৎ লতিকাকে ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিল, "কিছু মনে ক'রো না—for old time's sake."

হরিচরণ সেই সময় লতিকার কাছে আসিতেছিল। বাহিরের ক্ষীণ আলোকে দাঁড়াইয়া সে এই দৃশ্য দেখিল। সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত সে দাঁড়াইয়া রহিল।

লতিকা যতীনকে ধরিয়া বাহিরে আনিয়া হরিচরণকে দেখিতে পাইল। তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

সে যতীনের হাত ছাড়িয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিচরণ তার দিকে একবার চাহিল। অপরিমেয় বেদনায় তাহার অন্তর ভরিয়া গেল।

কোনও কথা না বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। লতিকা তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিচরণ অসীমের কাছে গেল।

অসীম সেদিন কোথাও বাহির হয় নাই। বসিয়া বসিয়া সে গুম হইয়া কেবলি ভাবিতেছে, ভাবিতে ভাবিতে অন্য-মনস্কভাবে সে প্রায় আধ বোতল পোর্ট নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

অসীম কোনও দিন বেশী মদ খায় না—তাকে মাতাল হইতে কেহ কোনও দিন দেখে নাই। কিন্তু আজ সে অনেকটা মদ খাইয়া ফেলিয়াছে।

তার প্রাণের ভিতর এমন একটা তীব্র জ্বালা সে অনুভব করিতেছিল যে তার জ্ঞান ছিল না। তার মনে হইতেছিল, তার জীবনে আর কোনও সার্থকতা নাই, কোনও আশা ভরসা নাই। হুতাশে তার প্রাণ ঝন্‌ঝনে হইয়া উঠিয়াছিল।

জীবনে একটি নারীকে সে ভালবাসিয়াছিল। এমন কিছু দুর্লভ অলোকসামান্যা নারী সে নয়। কিন্তু তাকে অসীম নিজেই দৌত্য করিয়া হরিচরণের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, সে হরিচরণকে ভালবাসে বলিয়া। ইহার পর তার আর বাঁচিয়া থাকিবার মত কোনও সুখ বা আশার সম্বল আছে বলিয়া মনে হইল না।

(১৮)

অসীমের চেষ্টার ফল ফলিয়াছিল। হরিচরণ লতিকাকে ভালবাসিয়াছিল। তিল তিল করিয়া সে ভালবাসা তার চিত্ত ছাইয়া ফেলিল। সে ভাবিয়াছিল, বিশে' যখন গিয়াছে তখন তার ভালবাসারও শেষ হইয়া গিয়াছে। যখন পায় পায় এ নূতন ভালবাসা তার অন্তর জয় করিতেছিল, তখনও সে মনকে বুঝাইয়াছে যে, ভাল সে কাউকে আর বাসিবে না—এ সব তার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা! কিন্তু একদিন সে আর আপনাকে বঞ্চনা করিতে পারিল না।

তাতে তার মনে স্বস্তি রহিল না। ভাল সে বাসিল, কিন্তু যাকে ভালবাসে তাকে সে তো পাইবে না; দরিদ্র সে, অন্নের কাঙ্গাল সে! কোনও দিন যে লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিবেন, স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসারী হইবার শক্তি তার হইবে, সে আশা করিতে তার ভরসা নাই। তাই ভাল-বাসিয়াও সে চুপ করিয়া রহিল। চাল নেই চুলো নেই যার সে কোন্ মুখে লতিকাকে বলিবে তার জীবনের সঙ্গিনী হইতে। তাই ভালবাসিয়াও মুখ ফুটিয়া সে সে কথা বলিতে পারিল না। বুক তার ফাটিয়া যাইত দুঃখে, কিন্তু সে দুঃখ সুধু ফুটিয়া উঠিত হতাশার গোপন নিঃশ্বাসে।

একটা ক্ষীণ আশা তার ছিল, এত ক্ষীণ যে তার দিকে ভাল করিয়া চাহিতেও তার ভরসা হইত না। অনেক গুঁতা খাইয়া তার ভরসার মুখ ভোঁতা হইয়া গিয়াছিল। তাই মনের আশে পাশে যে আশার রেখা ঝিকমিক করিয়া যাইত তার পানে সে ফিরিয়া চাহিত না। সে আশা—লতিকারই ওই ছবি।

অসীমের কথায় ছবিখানা সে একজিবিশনে দিয়াছে। বিচারকদের চোখে তাহা লাগিবে কি? যদি লাগে? যদি এ ছবির জন্য সে একটু খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে, তবে তো তার এ দুর্দ্দশা থাকিবে না! তার মত অনেক চিত্রকর দেশে অনাহারে মরিতেছে সত্য, কিন্তু যার একটু নাম পড়িয়া গিয়াছে, সে তো বসিয়া নাই। একবার যদি তার ছবি একজিবিশনে পুরস্কার পায়, তবে আর দুঃখ থাকিবে না। কিন্তু পুরস্কার সে পাইবে কি?

এ কথা সে ভাবে—বারবার অতি গোপনে সে ভাবে। ভাবে, যদি তাই হয়, তবে তো সে লতিকাকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারিবে! পুরস্কারের খ্যাতি ও উপার্জ্জনের সচ্ছলতা লইয়া যদি সে লতিকাকে বিবাহ করিতে চায়, তবে লতিকা তাতে অস্বীকৃত হইবে না।

তাই সে একজিবিশনে যায়। রোজ সে যায়, অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে আর নিজের ছবিখানার সামনে দাঁড়াইয়া পরীক্ষকের দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া দেখে। মনে হয়—মন্দ তো হয় নাই। আর সব নামজাদা ছবির পাশে তার ছবি তো তুচ্ছ হইবার মত নয়। আশা বাড়িয়া উঠে—আবার ভয় হয়।

সেদিন একজিবিশনে গিয়া সে এমনি তার ছবিখানার সামনে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। কয়েকজন লোক আসিল, সে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। একজন আর একজনকে বলিলেন, "এবারকার একজিবিশনে ছবির মত ছবি এই একখানা; আর সব সুধু মামুলী।"

হরিচরণের বুকের ভিতর হাতুড়ী পিটিতে লাগিল—আনন্দের উচ্ছ্বাস সে লুকাইয়া রাখিতে পারে না—বুক ফাটিয়া সে বাহির হইতে চায়।—যিনি এ অভিমত প্রকাশ করিলেন, তিনি দেশের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রজ্ঞ—আর্টিষ্টের অগ্রণী!

উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে হরিচরণ বাহির হইয়া আসিল। তার আনন্দ রাখিবার ঠাঁই নাই। তার অবজ্ঞাত ভবিষ্যৎ এক মুহূর্ত্তে সোণার রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। এই চিত্রের খ্যাতি তার যে পরম সৌভাগ্যের সূত্রপাত করিবে, তার ধারাবাহিক চিত্র তার মনের ভিতর খেলিয়া গেল—সে সবার কেন্দ্রে রহিল লতিকা—প্রিয়তমা লতিকা—গৃহপত্নী লতিকা,—লক্ষ্মীর অবতার লতিকা।

ফাল্গুনের ঝিরঝিরে হাওয়ায় যেন তার শীতে জমাট বাঁধা অন্তর গলিয়া তার উপর পুলকের হিল্লোল বহিয়া গেল। অধীর হইয়া সে ছুটিয়া গেল ময়দানে। সেখানে নির্জ্জনে বসিয়া সে অনেকক্ষণ তার মনোরম স্বপ্ন উপভোগ করিল।

ইহার পর আর দ্বিধা করিবার কি আছে? তার পুরস্কার সুনিশ্চিত! তবে আর বুকভরা ভালবাসা চাপিয়া দম ফাটাইবার কি প্রয়োজন আছে? সে স্থির করিল, আজই সে লতিকাকে তার প্রেম নিবেদন করিবে।

পথে ফিরিতে ফিরিতে সে যে কথা বলিবে তার নানারকম মুসাবিদা করিল। আর কথাটা শুনিয়া লতিকা কি বলিবে তার নানা কল্পনা তার মাথার ভিতর খেলিতে লাগিল। সেই সব কল্পনা উপভোগ করিতে করিতে সে ছুটিল তার প্রণয়ের দৌত্যে।

লতিকার গৃহদ্বারে আসিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এক মুহূর্ত্ত সে সেখানে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর সে ছুটিয়া পলাইল।

সে অনেক যায়গায় ছুটাছুটি করিল—কোনও খানে সুস্থির হইতে পারিল না। মনের ভিতর রাবণের চিতা জ্বালিয়া অনেকক্ষণ সে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল।

তার মনে হইল, এমনি করিয়া অতল গহ্বরে ফেলিয়া দিবার জন্য তাকে আশার একটা তুঙ্গ চূড়ায় না উঠাইলেই কি চলিয়াছিল না ভগবানের? দুঃখ দিয়া তার অন্তর জর্জ্জরিত করিয়া তাঁর আশা মিটিল না, তার সুখের জীর্ণ কঙ্কালের উপর এমনি কঠোর আঘাত করিয়া তাকে চূর্ণ না করিলেই কি চলিত না? নিষ্ঠুর বিধাতার কঠোরতার ভিতর এই সূক্ষ্ম কারচুপির এত কি প্রয়োজন ছিল?

অসীম ঠিক বলিয়াছে, ভগবান নাই—যাহা আছে সে একটা বিরাট দানব! সুধু দশমুখে সে মানবের সুখের সঞ্চয় গ্রাস করিয়া বিকট অট্টহাস্য করিতেছে। মুগ্ধ মানব অন্ধের মত তবু তার পায় লুটাইয়া কাঁদিতেছে তার করুণার প্রতি একটা অন্ধ বিশ্বাসে! মানুষ সুধু এই দানবের খেলার পুতুল!

লতিকা! অমন চিত্তহারিণী, স্নেহময়ী, দয়াময়ী—বুঝি-বা প্রেমময়ী লতিকা—সে এই! সব তার অভিনয়—সব খেলা! এতদিন হরিচরণ তার যে মায়ামূর্ত্তি তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল, পলে পলে তার চরিত্রের বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় করিয়া সে যে কোমল করুণ পবিত্র অন্তরের মহোদধি রচনা করিয়াছিল, সে সুধু একটা শূন্য! তার ভিতর কি একফোঁটা সত্য নাই!

ভাবিতে মন ভাঙ্গিয়া গেল। তার মনোময়ী প্রতিমার ওই ভগ্নস্তূপের দিকে চাহিয়া তার অন্তর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

মনে হইল নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত হইয়াছে সে—এ বঞ্চনার একটা তীব্র প্রতিশোধ লইবার জন্য সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অবশেষে সে অসীমের কাছে গেল।

* * * *

অসীমের জীবনে দুই দিন হইল একটা গুরুতর বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, এ কথা তার বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু কেন যে এমন হইল তাহা কেহ জানিল না।

হঠাৎ যেন তার জীবনটা বিস্বাদ হইয়া গেল। এতদিন সে মেসে বাসা বাঁধিয়া দিব্য আনন্দে কাটাইয়াছে, উড়িয়া ঠাকুর ও মেদিনীপুরের ঝি মিলিয়া যে সব অখাদ্য রচনা করিত, তাহা অম্লান-বদনে গলাধঃকরণ করিতে করিতে সে রহস্য করিত বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে। চোখা চোখা বাক্যবাণে ভগবানকে বিঁধিয়া বন্ধু-মহলে কাহাকেও বা ক্ষেপাইত, কাহাকেও চমকাইয়া দিত, কাহাকেও হাসাইত। বাহিরে যাইত, তারই মত দুঃস্থ সাহিত্যিক ও আর্টিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব আলাপ আলোচনা করিয়া পুলকিত হইত। আর আপনার ঘরের ভিতর স্তূপীকৃত অপরিচ্ছন্নতা ও অস্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর নির্লিপ্ত আনন্দের বেগে অপূর্ব্ব রসসাহিত্য সৃষ্টি করিত।

অসীম জানিত যে সে যাহা লেখে তা' বাজার চলন সাহিত্যের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। লোকে তার লেখার প্রশংসা করে, কিন্তু পড়ে না। তার লেখার ভিতরকার ভয়ানক ভয়ানক সৃষ্টিছাড়া কথায় লোকের আতঙ্ক হয়, আর তার আগাগোড়া যে একটা হাল্কা শ্লেষের সুর, বিশ্বের উপর যে একটা রহস্যভরা অবজ্ঞা লুকান থাকে, তার রস কেহ বোঝে না। সকলে আলোচনা করে তার গল্পের ভিতর কোথায় কি অন্যায় আছে, কোন্ গল্পটা কেমন জমিয়াছে, এই-সব কথা। অসীমের লেখা লইয়া আলোচনা হইত সর্ব্বত্র, কিন্তু তার রসবোধ হইত অতি অল্প। অসীম এ-সব আলোচনার কথা শুনিয়া হাসিত, বলিত, "এঁরা সব রসের ডুবুরী; কিন্তু সৈকতটুকু পেরিয়ে সাগরে যাবার সাহসও নেই, শক্তিও নেই। তাই চড়ার বালির উপর খালি গড়াগড়ি খাচ্ছেন আর বলছেন, সব বালি।"

তার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলিত, "এতটা স্পর্দ্ধা ভাল নয় ভায়া। জগতের মতটাকে অতটা তুচ্ছ না ক'রে সেটা নিজের সংশোধনের চেষ্টায় লাগালে ভাল হয়।"

অসীম বলিত, "ভাল নয় ব'লে হাসবো না? ভাল-মন্দ হিসাব ক'রে লোকে হাসেও না, কাঁদেও না। হাসি পায় তাই হাসে, কান্না পেলে কাঁদে। এ-সব স্বভাব দাদা, স্বভাব। আমাকে চাবুক মেরে যেটা সাদা তাকে কালো বলাতে পারবে না—এ স্পর্দ্ধাকে তোমরা যতই তিরস্কার ক'রবে সে ততই বেড়ে যাবে।"

"তুমি কি বলতে চাও তুমিই পৃথিবীর একমাত্র সমজ্দার?"

"কোনও দিন বলিনি সে কথা—ভাবিও নি। বরং নিজেকে খাটো ক'রেই বরাবর দেখে এসেছি। কিন্তু এমনি সমালোচনা যদি আর কিছুদিন চলে তবে ঠিক জানবো যে বাস্তবিকই আমি একমাত্র সমজ্দার। জান তো, সক্রেটিসকে একদিন একজন খোসামুদী ক'রে ব'লেছিল যে, তিনি এথেন্সের মধ্যে সব চেয়ে জ্ঞানী লোক। সক্রেটিস ব'লেছিলেন, দূর, আমি কিই বা জানি! জ্ঞানী লোক জানে যে তার জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞান কত প্রকাণ্ড বড়—তাই তার এ বিনয় আপনি হয়। তার পর সক্রেটিস গেলেন সব নামজাদা পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা ক'রতে। সবার কাছে ঘুরে ঘুরে আলোচনা ক'রে দেখলেন যে, সেই সব পণ্ডিতেরা কেউ কিছু জানে না; কিন্তু তাদের মনে বিশ্বাস যে, তারা সব জানে। তখন তিনি বল্লেন যে, লোকটা ব'লেছিল ঠিক,—আমিই এথেন্সের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী; কেন না, এরা কেউ কিচ্ছু জানে না,—জানে না যে—সে কথাটাও জানে না! আমিও এদেরই মত কিছুই জানি না, কিন্তু আমি জানি যে আমি জানি না। এইটুকুতেই আমি শ্রেষ্ঠ। যত দিন যাচ্ছে ভাই, আমারও তেমনি মনে হ'চ্ছে। তোমাদের বড় বড় সমজ্দারদের সমজানর দৌড় দেখে আমারও একটু অভিমান গজাচ্ছে যে আমি তাদের চেয়ে বড়—সে আমার গুণে নয়, তাদের দোষে। সত্যি সত্যি আমি একটা বড় রসজ্ঞ নই, কিন্তু এঁদের চেয়ে বড়।"

বন্ধু বলিল, "বুঝেছি—তোমার মাথাটা বেজায় ভারী হ'য়ে উঠেছে—এর ফল পাবে।"

"ফল অবিশ্যি পাব, কিন্তু ফলটা যে কি হ'বে, তা তোমাদের সেই বুড়ো ভদ্রলোকটিও জানেন না। তবে

আশা করি এই সব সমজদারদের খুসী ক'রে তাঁদের প্রশংসা পাব এমন দুর্গতি আমার হবে না !"

এই অতিরিক্ত স্পর্দ্ধায় মুখ বাঁকাইয়া বন্ধুরা একে একে তাকে ছাড়িয়া গেল। অসীমের খ্যাতি বাড়িতে লাগিল, উপার্জ্জনও বাড়িয়া চলিল; কিন্তু তার নিন্দার পরিমাণ দুইটাকেই ছাড়াইয়া গেল। যারা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, তারাও জোট বাঁধিয়া তার নিন্দা করিতে লাগিল। কেন না, হোক সে বন্ধু,—তবু সে তাদের ছাড়াইয়া এতটা উঁচু হইয়া যাইবে, ইহাও কি সহ্য করা যায় ?

অসীম হাসে আর সম্পূর্ণ বেপরোয়া হইয়া তার ঘরে বসিয়া কলম চালায়। যতই সে লেখে ততই তার শত্রুর দল বাড়িয়া যায়—তাতে তার আরও হাসি পায়।

যা লেখে, তার উচিত মূল্য সে পায় না, এ কথা অসীম বরাবরই জানে। যখন সে তার একখানা ভাল উপন্যাস একদিন দুই শত টাকায় কপিরাইট-সহ বেচিয়া আসিল, তখন তার এক বন্ধু অবাক্ হইয়া বলিল, "কি idiot তুমি, ওই বই বেচলে দু'শো টাকায়, এ যে জলের দরও হ'ল না।"

"দরটা তো আমার বইয়ের নয় ভাই, এটা হ'চ্ছে আমাদের দেশবাসীর মস্তিষ্কের মানদণ্ড। আমার বই যখন কম দামে নিতে চায়, তাতে বইয়ের অগৌরব হয় না,—লজ্জার কথা হয় তাদের যারা মিছরীর—চাই কি বাগ-বাজারের রসগোল্লার—আর মুড়ির মর্য্যাদার তফাৎ বোঝে না। অন্ধের কাছেই যখন ছবি বেচতে হবে, তখন সে যা দেয় সেইটাই লাভ, কেন না, তার কাছে সব ছবিরই যে এক দর—অর্থাৎ কাণাকড়িও নয়।"

"না, না, ও সব বাজে কথা, তোমার পাবলিশার তোমায় ঠকাচ্ছে।"

"কিন্তু আমাকে জেতাবার মত পাবলিশার যেকালে নেই, সেকালে ঠকাই যে আমার লাভ। নইলে লেখাগুলো বস্তাবন্দী ক'রে রাখলে তাতে পয়সা তো আসবেই না, সেই বস্তার ভিতর আমার আত্মা ছট্‌ফটিয়ে ম'রবে। লিখবো অথচ লেখা ছাপা হ'বে না, এটা যে কত বড় দুঃখ, সে তো জান না ভায়া ?"

এমনি হাল্কাভাবে সব দুঃখ তুচ্ছ করিয়া নির্লিপ্ত আনন্দে সে দিন কাটাইয়াছে। একদিন তাকে কেহ রাগিতে বা দুঃখ করিতে দেখে নাই, একদিন তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয় নাই।

তার পাওনাদারের অবধি নাই, কেন না, খরচ করিতে সে মুক্তহস্ত। টাকাটা হাতে আসিলেই সেটা খরচ করাই চাই। যদি তখন পাওনাদারেরা কেউ উপস্থিত থাকে, সে তাদের সৌভাগ্য—না থাকে, টাকা খরচ হইয়াই যায়। একদিন একজন তাকে বলিয়াছিল, "এই সেদিন একশো টাকা পেলে, তা থেকে দেনাগুলো দিয়ে ফেল্লেই পারতে। নাহক এদের তাগাদা সহ্য কর কেন বল দিকিনি ?"

অসীম বলিল, "পাওনাদারেরা মূর্ত্তিমান দুর্ভাগ্য। তারা যখন চোখের সামনে থাকে, তখন তাদের অস্বীকার ক'রতে পারি না। তাই বলে' যখন তারা থাকে না, তখনও তাদের বোঝা মনের ভিতর ব'য়ে বেড়াব, এতবড় বেকুব আমি নই। যখন এরা তাগাদা করে না, তখন আমি ভাবি এরা নেই; তাইতেই না অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়ে গোটাকয়েক আরামের মুহূর্ত্ত উপভোগ করি !"

কোনও কিছুই সে কোনও দিন গায় মাখে না। ভালবাসিতে গিয়া যখন সে ঠকিয়া ফিরিয়াছে, তখনও সে হাসিমুখে বলিয়াছে, "to fresh fields and pastures new." এমনি করিয়া সে সরমার কাছে, অনীলার কাছে, উত্তমার কাছে প্রেম নিবেদন করিয়া আশাহত হইয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু তবু দমিয়া যায় নাই। লতিকার কাছেও সে প্রেম লইয়া গিয়াছিল। যখন দেখিল সে হরিচরণকে ভালবাসে, তখন সে তার অভ্যাসমত সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখানেও সে আশাভঙ্গে ম্লান হইয়া যায় নাই, হাসিমুখেই সরিয়া দাঁড়াইয়া, হরিচরণকে সামনে দাঁড় করাইয়াছিল। নিজে চেষ্টা করিয়া হরিচরণকে লতিকার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল।—তবু—

দিন দিন পরীক্ষা করিয়া সে দেখিল তার চেষ্টায় ফল ধরিয়াছে। হরিচরণ লতিকাকে ভালবাসিয়াছে, লতিকা তো হরিচরণকে ভালবাসেই। যেদিন সে নিশ্চয় জানিল দুজনে দুজনকে ভালবাসে, সেদিন সে মনে মনে বলিল, "Bravo !" আর আনন্দ করিয়া হোটেলে গিয়া দুই পেগ হুইস্কী খাইয়া ফেলিল।

এ ব্যাপারের আগাগোড়াই তার মনের চারিধারে একটা ছায়া ঘোরাফেরা করিত; কোনও দিনই সে ঠিক তার অভ্যস্ত নির্লিপ্ততার সহিত তার ভগ্ন আশা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে নাই। আজ তার অনভ্যস্ত এই ছায়ায় হঠাৎ

মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দ্বিতীয় পেগের গেলাসটি হাতে ধরিয়া বসিয়া অসীম নিবিষ্টভাবে অনেকক্ষণ তার দিকে চাহিয়া রহিল। তার মুখ ভার—অন্ধকার; বুকের তলায় কি যেন একটা তোলপাড় করিতেছে।

হরিচরণের হাতে লতিকাকে সে তুলিয়া দিয়াছে। ভাবিয়াছিল ইহা তার প্রাণে সহিবে। যেমন লঘু অবজ্ঞার সহিত জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট সে বুকের ভিতর হইতে কাচিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, তেমনি এ ব্যথাটাকেও ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারিবে। কিন্তু প্রাণের ভিতর মোচড় দিয়া ব্যথাটা জানাইয়া দিল যে সে যাইবার নয়! এতদিন সে সংসার-সাগরের উপর নিশ্চিন্ত মনে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে,—আজ সে বুঝিল এক যায়গায় লুকান শিকলে তার পা বাধিয়া গিয়াছে। জীবন-সূত্রে তাল পাকাইয়া এ পর্য্যন্ত অনেক গাঁট সে ফেলিয়াছে; কিন্তু সূতা ধরিয়া টান দিতেই সে সব গ্রন্থি সরল হইয়া গিয়াছে। আজ তাতে এমন একটা গাঁট পড়িয়াছে, যাহা খুলিবার শক্তি বুঝি তার নাই।

সে আগেও ভালবাসিয়াছে। ভালবাসা তার হৃদয়-সরোবরে শেওলার মত গজায়; তার প্রয়োজন মিটিয়া গেলে তাকে অনায়াসে তুলিয়া ফেলা যায়—ইহাই সে জানিত। কিন্তু আজ সে দেখিতে পাইল যে, লতিকার প্রতি তার ভালবাসা তেমন নয়—সে একটা প্রস্ফুট শতদল—তার শিকড় বসিয়া আছে তার বুকের ভিতর। আজ সে শিকড় ধরিয়া টান পড়িয়াছে, তাই তার চিত্ত ব্যথাতুর হইয়া উঠিয়াছে।

"দুত্তোর!" বলিয়া সে গেলাস লইয়া জোর চুমুক লাগাইল। দ্বিতীয় পেগ নিঃশেষ হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বয় আসিয়া বোতল তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর এক পেগ?"

অন্যমনস্ক ভাবে অসীম ইঙ্গিত করিল, বয় আর এক পেগ ঢালিয়া দিল।

অসীম লতিকাকে মিথ্যা বলে নাই। সে মদ খায়। কিন্তু মাতাল হইবার মত খায় না। দুই পেগের বেশী সে কোনও দিনই খায় না। কিন্তু আজ দুই পেগ নিঃশেষ করিয়াও তার শরীরটা তাতাইয়া উঠিল না। মনের ভিতরকার গভীর বিষাদের চাপে হুইস্কী একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল, নেশার আমেজটুকুও আসিল না।

গম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন মুখে একটা অপ্রিয় কর্ত্তব্যের মত করিয়া অসীম তৃতীয় পেগ খাইয়া নিঃশেষ করিল। যতই সে খাইতে লাগিল, ততই তার অন্তর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

জীবনে তার যাহা কখনও হয় নাই আজ তাই হইল। অসীমের কান্না পাইল। সুস্থ চিত্তে সে যে দুঃখকে হয় তো শ্লেষের আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে পারিত, তার সুরাভিভূত চিত্তে সে দুঃখ তার সমস্ত অন্তর লইয়া তোলপাড় করিতে লাগিল।

দারুণ ব্যথার বোঝা বহিয়া সে তার মেসে ফিরিয়া আসিল। অন্ধকার ঘরে আসিয়াই তার মনটা ক্ষেপিয়া গেল। বিরক্তভাবে পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিল। সমস্ত ঘরের কুশ্রী অপরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি তার চোখের সামনে একটা কদর্য্য বিভীষিকার মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভ্রূকুটি করিয়া সে মুখ ফিরাইল।

দেখিতে পাইল তার ল্যাম্পে তেল নাই। আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল। দেশলাই কাটিটা ফেলিয়া দিয়া দুই পায় তাকে অযথা মাড়াইতে লাগিল—যেন ওই তুচ্ছ কাটিটা তার মূর্ত্তিমান হতভাগ্য। তার পর সে তার বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

শুইয়াই অনুভব করিল তার বিছানাটা পাতা হয় নাই, তার উপর বই, কাগজ, পেনসিল ইত্যাদি রাশি রাশি অনাবশ্যক জিনিস ছড়ান রহিয়াছে। ক্ষিপ্ত হইয়া সে হাতের গোড়ায় যাহা পাইল, দুমদাম করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কোনও মতে তার শুইবার মত যায়গা করিয়া লইল। চিৎ হইয়া সে তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিল।

আজ তার মনে হইল—জগৎ তার উপর নিদারুণ অবিচার করিয়াছে। তার শক্তির যোগ্য বেতন সে পায় নাই,—অবহেলা করিয়া জগৎ তাকে দিয়াছে সুধু মুষ্টিভিক্ষা! মেসের এই তুচ্ছ গৃহের অপ্রচুর আয়োজনের ভিতর অস্বচ্ছন্দতার জীবন এখন তার একটা দুঃসহ অভিশাপ বলিয়া মনে হইল। মনে হইল, তার এ দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ এই যে, তার দেশবাসী তার গুণের সমাদর করিতে জানে না। সমস্ত সংসারের উপর সে ক্ষেপিয়া উঠিল। তার এত বড় গুণপণা লইয়া সে সুধু দুঃখ-কষ্টে জীবন কেন কাটাইবে, তার কোনও সঙ্গত হেতু তার মনে হইল না।

যে জগৎ তার প্রতিভার এতবড় অসম্মান করে তার উপর সে মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল।

অদৃষ্টের এ নির্ম্মম নির্য্যাতন সে এতদিন একটা পরিহাস বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। জগতের এ তীব্র অনাদর সে দর্পের সহিত অবজ্ঞা করিয়াছে। কিন্তু আজ হঠাৎ ইহা তার বুকের ভিতর বিষের ছুরীর মত বসিয়া গেল—আজ সে তার অভ্যস্ত শান্ততার সহিত ইহাকে সম্ভাষণ করিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া সে উঠিল। পায়ে একটা কি ঠেকিল—লাথি মারিয়া তাহা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল,—কাচের গেলাস সুদ্ধ জলের কুঁজো চুরমার হইয়া ঘর জলে ভাসিয়া গেল। হাতড়াইয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া চেয়ারটায় হঠাৎ ধাক্কা খাইল—চেয়ার তুলিয়া আছাড় মারিল;—একটা পায়া ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমশঃই তার মাথা গরম হইয়া উঠিল। বাহির হইয়া ঝিকে খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করিল, কোনও সাড়া পাইল না। ঝির উদ্দেশে অকথ্য গালিগালাজ করিতে করিতে সে বোতল হাতে করিয়া দোকানে চলিল, কেরোসিন তেল কিনিতে।

পথে বাহির হইয়া সে তেলের বোতলটা ছুঁড়িয়া ফেলিল। খানিক দূরে একটা মদের দোকান ছিল, সেখানে ঢুকিয়া পড়িল। এক বোতল মদ কিনিল। পথে এক বাণ্ডিল চর্ব্বিবাতি কিনিল,—দুই বোতল সোডা কিনিল। তার পর ঘরে আসিয়া বাতি জ্বালিল। বোতল খুলিয়া মদ ঢালিল, সোডা ঢালিল, যতক্ষণ জ্ঞান রহিল সে অনবরত মদ খাইতে লাগিল। তার পর অচেতন হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরের দিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল। মনটা ভারি অবসন্ন—শরীর ক্লান্ত ও অসুস্থ বোধ করিল। কোনও মতে মুখ হাত ধুইয়া চা করিবার আয়োজন করিল।

স্পিরিট ষ্টোভটা জ্বালিয়া তার উপর জল চড়াইতে গিয়া সে হঠাৎ "দুত্তোর" বলিয়া জলগুলি ষ্টোভের উপর ঢালিয়া দিল। ষ্টোভ নিভিয়া গেল।

সে নিশ্চেষ্ট হইয়া চুপচাপ শুইয়া রহিল।

সারাদিন তার এমনি কাটিল। স্থির করিল আজ আর মদ খাইবে না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আর পারিল না; বোতল খুলিল। যতই মদ তার পেটে পড়িতে লাগিল, ততই তার অন্তরে দুঃখের সাগর উদ্বেলিত হইতে লাগিল। জগতের উপর, ভগবানের উপর, অদৃষ্টের উপর তার যত অভিযোগ, সব ভিড় করিয়া তার মনের ভিতর ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল।

সে তার ঘরের অপরিচ্ছন্নতার দিকে চাহিয়া দেখিল। ভাবিল, এমন ঘরে মানুষে থাকে? মনে পড়িল লতিকার ঘরের কথা—কি পরিষ্কার, ছিমছাম ছবিটির মত সব সেখানে। অমন একখানি ঘর, অমনি একটা স্নিগ্ধ আশ্রয় তো তার হইতে পারিত! তার ভিতর অক্লান্ত সেবা ও নিষ্ঠা লইয়া লতিকা দিনরাত ঘুরিত ফিরিত, সুধু তার সুখের আয়োজনের সন্ধানে! বিনিময়ে সে দিতে পারিত তার বুক-ছাপান ভালবাসা!

এত আয়োজন ছিল তার, কিন্তু অন্ধ অদৃষ্ট তাতে বাদ সাধিল, মাঝখানে হরিচরণকে দাঁড় করাইয়া!—আর সে নিজে মূর্খের মত অদৃষ্টের সাম্রাজ্য মানিয়া লইয়া লতিকাকে যত্ন করিয়া তুলিয়া দিল হরিচরণের হাতে! জ্বালায় তার বুকটা পুড়িয়া গেল। ঢকঢক করিয়া সে তার গেলাস শূন্য করিয়া ফেলিল। আবার পাত্র ভরিল।

হরিচরণ সেদিন রাত্রে যখন আসিয়া পৌছিল, তখন অসীম মত্ত হইয়া ঢুলিতেছে, তার চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

হরিচরণ তার এ অবস্থা লক্ষ্য করিল না, সে তার আপনার দুঃখে বিহ্বল হইয়া ছিল। তার চুলগুলি উস্কো-খুস্কো, চক্ষু দুটি উন্মত্তের মত, মূর্ত্তি ভয়ানক।

হরিচরণ ধপ করিয়া ঘরে বসিয়া পড়িল, "অসীমদা, শুনেছ তোমার লতিকার কাণ্ড?"

অসীম ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি? কি ক'রেছে সে?" তার নেশা ছুটিয়া গেল, কিন্তু তার কথাগুলি অনেকটা জড়াইয়া রহিল।

হরিচরণ বলিল, "সে—সে মাগী বেশ্যা!"

"চোপরাও শূয়ার!" বলিয়া অসীম বিকৃত কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "চোপরাও—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? বেশ্যা?—হারামজাদা!" বলিয়া সে হরিচরণের দিকে অগ্রসর হইতে গেল। কিন্তু পা টলিয়া উঠিল, সে আবার থপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

চমকিত হইয়া হরিচরণ তার মুখের দিকে চাহিল।

এতক্ষণে সে লক্ষ্য করিল যে অসীম প্রকৃতিস্থ নয়। তার ভারী রাগ হইল অসীমের উপর, ভারী দুঃখ হইল। নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় পুড়িয়া সে আসিয়াছে তার একমাত্র বন্ধুর কাছে; আর সে বন্ধু কি না ঠিক এই সময় মদ খাইয়া বেহুঁস হইয়া বসিয়া আছে! সে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

অসীম বলিল, "খবরদার, বোস বলছি, নইলে মেরে ফেলবো। কি বল্লে, বেশ্যা! এত বড় আস্পর্দ্ধা!"

তীব্রকণ্ঠে হরিচরণ বলিল, "হাঁ বেশ্যা! দুশোবার বলবো বেশ্যা! আর তোমার যদি মাথা ঠিক থাকতো, আর সব কথা শুনতে, তবে তুমিও বলতে বেশ্যা।"

অসীম বলিল, "আচ্ছা বেশ! বল, শুনছি। ভয় পেয়ো না, মাথা আমার ঠিক আছে। অসীম রায়ের মাথা বড় কেও কেটার মাথা নয় যে চট্ ক'রে খারাপ হবে। বল, কি বলতে চাও। ব'লে যাও।"

হরিচরণ খুব ঝাঁঝের সহিত বলিয়া গেল—সেদিন সে নিজের চক্ষে কি দেখিয়াছে, কি শুনিয়াছে।

সমস্ত শুনিয়া অসীম চীৎকার করিয়া উঠিল, Rightly served—বেশ ক'রেছে, খুব ক'রেছে। তুমি একটি উল্লুক, আর আমি একটি গাধা। নইলে এমন বাঁদরের গলায় মুক্তোমালা ঝোলাতে যাই। বেশ হ'য়েছে—যাও এখন গাছে ব'সে উকু উকু করো গে। আর কি? ক'রবে না? দুশোবার ক'রবে! কতদিন সে তোমার পিত্যেশে উপোসী হ'য়ে ব'সে থাকবে? খুব ক'রেছে, বেশ ক'রেছে।"

ক্রমে অসীমের কথাগুলি অসংবদ্ধ হইয়া উঠিল। বিরক্ত হইয়া হরিচরণ উঠিয়া চলিয়া গেল।

অসীম তখন শূন্য ঘরে বসিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "খুব জব্দ, আচ্ছা জব্দ ক'রেছে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। আর আমি—আমি শালা গাধা।" তার পর সে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, "গেছে সে। একদম বেহাত হ'য়ে গেছে।—হায় হায়!"

(১৯)

হরিচরণের মনের ঘরে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে তাকে তিল তিল করিয়া পোড়াইতে লাগিল। একবার এদিকে তাহা ধোঁয়াইয়া উঠে, আবার অপর দিকে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আবার আর এক দিকে সে দম করিয়া ফাটিয়া উঠে। একবার তার মন রাগে ফুলিয়া উঠে, আবার বিষাদে লুটাইয়া পড়ে, আবার অভিমানে গোঁজ হইয়া বসে। এমনি করিয়া বিচিত্রভাবে তার মন এই তীব্র আঘাতের বেদনায় নিরন্তর ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

অসীমের কাছে গিয়াছিল সে সান্ত্বনার আশায়। হতাশ হইয়া ফিরিয়া সে আর কোথাও কোনও আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল না। তার নিজের ছোট্ট ঘরখানিতে আসিয়া সে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। আহারের জন্য কোনও আয়োজন করিবার ইচ্ছা তার হইল না।

তার মনে পড়িল—একদিন নয়, একে একে অনেকগুলি দিনের কথা, যখন সে এমনি দারুণ দুঃখে হাত পা এলাইয়া তার পুরাতন কুটীরে শুইয়া পড়িত,—তখন দেবীর মত তার স্নিগ্ধ সেবা লইয়া আসিত লতিকা। সুনিপুণ কল্যাণ হস্তে সে তার সেবা করিত, তার মনের মেঘ মুছিয়া দিত, স্নেহ দিয়া প্রীতি দিয়া তাকে অভিষিক্ত করিত। লতিকার সেই সেবা, সেই স্নেহ, সেই প্রীতির কথা মনে করিতে তার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। হায়, সেই লতিকা এই!

সে দিনও তো লতিকা তাকে কত না সমাদর করিয়াছে, কত স্নেহ দেখাইয়াছে। মুখ ফুটিয়া সে বলে নাই, কিন্তু এ কথা গোপনও রাখিতে পারে নাই যে, সে হরিচরণকে ভালবাসিয়াছে! এই তার ভালবাসা! সব একদম মেকী? এক ফোঁটা সত্য নাই এ সবের তলায়!

কি কপটী এই নারী! অপরূপ তার অভিনয়-চাতুরী। তার ছলা-কলায় ভুলাইয়া সে হরিচরণকে পাগল করিয়াছে, সুধু তার বুকে এই শেল মারিবার জন্য।

তার মনে মনে সে একটা নিদারুণ লজ্জা ও অপমান বোধ করিতে লাগিল। ঠকিয়া গেলে ঠকার ব্যথার চেয়ে তার লজ্জাটা আরও বেশী লাগে। এমনি করিয়া হরিচরণ একটা তুচ্ছ চঞ্চলা নারীর মোহে ভুলিয়া গিয়াছিল, মায়াবিনীকে চিনিতে না পারিয়া তাকে দেবী বলিয়া তার পায় পূজা ঢালিতে গিয়াছিল। এটা তার পৌরুষের নিদারুণ অপমান, তার নির্ব্বুদ্ধিতার উপর নির্ম্মম পরিহাস—এই কথাটা তার মনকে পীড়া দিতে লাগিল।

এই অপমান বোধে তার চিত্ত দারুণ অস্বস্তিতে ভরিয়া গেল। আর মনের তলা হইতে তার বাঞ্ছিত প্রেমের গভীর বেদনা থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতে লাগিল।

সে অস্থির হইয়া উঠিয়া বসিল। খানিকক্ষণ প্রবল বেগে পায়চারী করিল। তার পর সে কাগজ কলম লইয়া লতিকাকে চিঠি লিখিতে বসিল।

সে লিখিল।

"তুমি যে কি, তাহা আজ জানিয়াছি। তাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; কেন না, তুমি আমার কেউ নও।"

এই নিদারুণ মিথ্যা কথাটা লিখিয়া সে একটু থমকিয়া গেল। তার পর সে মনে মনে জোর করিয়া বলিল, "হাঁ ঠিক। নিশ্চয়। সে আমার কেউ নয়। একটা বেশ্যা সে—সে আমার কি?" আবার খুব জোর করিয়া কলম ধরিয়া লিখিল—

"কিন্তু এমন করিয়া আমাকে অপমান করিবার কি দরকার ছিল তোমার? তোমাকে ভাল জানিয়া তোমার নিমন্ত্রণে তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তুমি জানিয়া শুনিয়া আমাকে এতদিন বেশ্যার অন্ন খাওয়াইলে কি সাহসে? আমি গরীব বলিয়া তুমি আমাকে এত বড় অপমান করিলে?"

এই কথার ভিতর সে যে বিষ ঢালিয়া দিল, তাহাতে সে পরিতৃপ্ত হইল। তার পর আবার লিখিল

"সুধু এই অপমান করিয়াই তুমি তৃপ্ত হও নাই—আবার তোমার পাপ প্রণয়ের সহচরের কাছে আমাকে তোমার প্রণয়ী বলিয়া পরিচয় দিয়াছ—তার কাছে আমাকে দাঁড় করাইয়া লজ্জা দিয়াছ। এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার!

"কেন? আমার কি মরিবার ঠাঁই নাই যে তোমাকে ভালবাসিতে যাইব? যাকে পদধূলির যোগ্য মনে করি না তাকে হৃদয়ে ঠাঁই দিব? তুমি তো জান, এ হৃদয়ে যাকে ধরিয়াছিলাম, সে দেবীর পদনখ স্পর্শ করিবার যোগ্য তুমি নও।

"যাক, যা হইবার হইয়া গিয়াছে। আমার অদৃষ্টে তোমার মত কৃমিকীটের কাছে অপমান হওয়া লেখা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। এখন আর তোমার ছায়া মাড়াইবার ইচ্ছা আমার নাই। তোমার ঘরে পা' দিতে ইচ্ছা করি না। যে দেবীর মূর্ত্তি তোমার ঘরে আছে, তাকে তোমার পাপ সংসর্গে রাখিব না। অবিলম্বে মূর্ত্তিটা পাঠাইয়া দিবে।"

পত্রখানা ফিরিয়া পড়িয়া তার মনে একটা উৎকট আনন্দ হইল। মনে হইল, এ চিঠি পড়িয়া লতিকার মনে একটা শক্ত রকমের ঘা লাগিবে। তার বঞ্চিত প্রণয়ের কতকটা প্রতিশোধ হইবে। ক্রুদ্ধ তৃপ্তির সহিত সে চিঠিখানি খামে পূরিয়া অবিলম্বে ডাকে ফেলিয়া আসিল।

কিছুক্ষণ মনটা বেশ শান্ত রহিল। কিন্তু তার ক্রোধ ও জিঘাংসার পূর্ণ আবেগটা কাটিয়া গেলে তার সমস্ত চিত্ত আবার একটা তীব্র জ্বালায় চিড়্‌বিড়্ করিয়া উঠিল। মনে হইল—মিথ্যা, মিথ্যা—সব কথা। লতিকা তার কেউ নয়—এর চেয়ে মিথ্যা কিছুই নাই। এখনো যে তার সমস্ত অন্তর অপরাধিনী লতিকার জন্য কামনার ব্যথায় চুরচুর হইয়া রহিয়াছে। তাকে তার মন হইতে দূর করিবে সে কেমন করিয়া?

একটা ব্যথায় অন্তরের সবগুলি ব্যথার নাড়ী টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। আর একদিন সে যে এমনি ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল বিশে'কে হারাইয়া—সেই ব্যথা তার আজ আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। বিশে'র ব্যথা-কাতর মলিন মুখখানি তার চিত্তে ভাসিয়া উঠিল, সেই পুরাতন ক্ষত আবার তাজা হইয়া উঠিল।

মনে হইল, আজ তার যে মর্ম্ম-বেদনা, সে তার অপরাধের তিরস্কার। বিশে'র স্মৃতির প্রতি অবিশ্বাসী হইয়াছিল সে, তার সর্ব্বত্যাগী ভালবাসার অপমান করিতে গিয়াছিল, তাই তার এই শাস্তি। এ চিন্তায় তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু অন্তর শান্ত হইল। প্রশান্ত চিত্তে তার স্বর্গগত পত্নীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া সে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরের দিন সে সারাদিন অশান্ত মনে ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইল। দুই চারটা ছবির বরাত ছিল, সেই উপলক্ষে সে তিন চার যায়গায় গিয়া অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া বেড়াইল। এক বন্ধুর বাড়ীতে একবেলা খাইল। তার পর ঘুরিতে ঘুরিতে একজিবিশনে গেল।

লতিকার সেই ছবিখানার দিকে সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একটা কি মোহের আকর্ষণ যেন তার চোখ দুটিকে ওই ছবির সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না।

অনেক দিন সে এই ছবির দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিয়াছে—আর্টিষ্টের চোখে সে ইহা দেখিয়াছে—আপনার সৃষ্টির প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ লইয়া সে ইহা দেখিয়াছে—কিন্তু দেখিয়াছে সুধু ছবি। আজ সে ইহার ভিতর দেখিল জ্যান্ত মানুষ!

তাহারই তুলিকার নিপুণ স্পর্শে লতিকার ছবিখানি জীবন্ত ও অপরূপ মাধুরীতে ভরিয়া উঠিয়াছে—আজ তার মনে হইল যেন ছবির ভিতর হইতে লতিকা নিজে তার দিকে চাহিয়া আছে। কি করুণ সুন্দর সে দৃষ্টি—কত স্নেহ, কত মধুরতা ভরা! কত অনুযোগ ভরা, স্নেহ-তিরস্কার-ভরা সে দৃষ্টি!

চাহিয়া চাহিয়া হরিচরণের অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। লতিকাকে সে যে কঠোর পত্র লিখিয়াছে, নিদারুণ আঘাত করিয়াছে তার কোমল অন্তরে, তার স্মৃতি এখন তার অন্তরে কশাঘাত করিতে লাগিল। হোক লতিকা অসতী, তবু সে এই লতিকা—এই কোমলহৃদয়া, সেবাপরায়ণা, প্রীতি-ভরা নারী—তাকে মিথ্যাই সে কঠোর তিরস্কার করিয়াছে। কোনও প্রয়োজন ছিল না এত কঠিন আঘাত করিবার। মনে হইল—লতিকার করুণ চক্ষু দুটী যেন তার দিকে চাহিয়া এই অনুযোগ করিতেছে—তাই সে দৃষ্টি সে সহিতে পারিল না—তার নীরব তিরস্কার তার অন্তরটা মুচড়াইয়া দিল।

যতই সে কথাটা বিচার করিল, ততই তার মনটা ভার হইয়া উঠিল। যতই সে অনুভব করিল যে সে অন্যায় করিয়াছে, ততই লতিকার অন্যায়টা তার কাছে লঘু বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অপরাধের চেয়ে শাস্তিটা যখন বেশী কঠোর হইয়া পড়ে, তখন অপরাধটা তার পাশে খাটো হইয়া যায়—শাস্তিদাতা যখন তাহা অনুভব করে, তখন তার বিচারে আর কঠোরতা থাকে না।

যখন সে ফিরিল, তখন লতিকার প্রতি তার ক্রোধের জ্বালা একেবারে নিভিয়া গিয়াছে, তার নিজের নির্ম্মম কঠোরতার অনুভূতি তার চিত্ত অনুতপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে সে আপনার ঘরে প্রবেশ করিল—নিতান্ত অপরাধীর মত। সে আশঙ্কা করিতেছিল যে তার কঠিন পত্রের উত্তরে হয় তো লতিকা পত্র লিখিয়াছে—হয় তো সে নিজেই আসিয়াছে। যে তীব্র হলাহল সে উদ্গীরণ করিয়া দিয়াছে, আজ তার প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হইতে তার অন্তর সঙ্কুচিত হইল।

সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া সে জানিল, কোনও পত্র আসে নাই, কেহ তার সন্ধানে আসে নাই। সে একটু স্বস্তি অনুভব করিল।

সামান্য রকম রান্নার আয়োজন করিয়া সে একটু বিশ্রাম করিতে বসিল। ঠিক সেই সময় তার দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইল—লতিকা!

ধড়মড় করিয়া হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার সুধু সে তাকে দেখিয়াছিল, তার পর নতনয়নে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কাল সে দুর্দ্ধর্ষ স্পর্দ্ধা লইয়া লতিকার অপরাধের তিরস্কার করিতে গিয়াছিল; আজ তার নিজের অপরাধ বোধে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল,—লতিকার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, কোনও সম্ভাষণ করিতে সাহস করিল না।

লতিকাও কোনও সম্ভাষণ করিল না। এক মুহূর্ত্ত সে অশেষ বিষাদভরা ক্লিষ্ট দৃষ্টিতে হরিচরণের দিকে চাহিল। লতিকার সহসা শীর্ণ বিষাদক্লিষ্ট মুখে একটু চঞ্চলতার আভাস দেখা দিল, ওষ্ঠাধর একটু কাঁপিয়া উঠিল, চোখের কোণ একটু চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। কিন্তু কথা কহিতে সে পারিল না।

মুখ ফিরাইয়া লতিকা তার পশ্চাতে কাকে কি ইঙ্গিত করিল। দুইটি মুটে সযত্নে বিশে'র মূর্ত্তি বহন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। লতিকা তাড়াতাড়ি ঘরের একটা দিক পরিষ্কার করিয়া একটু স্থান করিয়া দিল। মুটেরা মূর্ত্তিটি সেখানে রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

এক মুহূর্ত্ত লতিকা অপেক্ষা করিল। মূর্ত্তিটার পরিধান বস্ত্র একটু নড়িয়া গিয়াছিল, সে তাহা ঠিক করিয়া দিল, আঁচল দিয়া একটু ধূলা মুছিয়া দিল। তার পর এক মুহূর্ত্ত সে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে সস্নেহে সেই মূর্ত্তির চিবুক হস্তে স্পর্শ করিয়া সে হাতে চুম্বন করিল।

দুয়ারের কাছে আসিয়া সে একবার হরিচরণের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাই এখন।"

হরিচরণ তখন একবার সসঙ্কোচে মুখ তুলিয়া তার দিকে চাহিল। তার বুকের ভিতর দিয়া যেন একটা শূল বিঁধিয়া গেল। লতিকার মূর্ত্তি দেখিয়া সে স্তব্ধ হইল। হঠাৎ যেন একদিনে সে অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে, চোখের কোলে কালি পড়িয়া গিয়াছে, গাল চুপসাইয়া গিয়াছে! এ করুণ মূর্ত্তি হরিচরণের মর্ম্মে বেদনার সহিত বসিয়া গেল।

লতিকা অপেক্ষা করিল না, মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

হরিচরণ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

হরিচরণের ঘর হইতে ফিরিয়া লতিকা কোনও মতে রাস্তাটুকু চলিয়া ঘরের ভিতর ধপ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল! এতক্ষণ প্রাণপণ করিয়া যে ধৈর্য্য সে রচনা ও রক্ষা করিয়াছিল, তাহা এখন অশ্রুর বন্যায় ভাসিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়া সে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। তার পর দুয়ার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

পরের দিন প্রত্যূষে একজন লোক একখানা চিঠি লইয়া আসিল। লতিকা চিঠি লইয়া পড়িল। অসীম লিখিয়াছে,

"আমি বড় অসুস্থ। দয়া ক'রে আমাকে একবার দেখে যেও।"

একটা ক্লান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া লতিকা সে লোককে বলিল, "আচ্ছা তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।"

তার হাঁসপাতালে যাইতে তখনও দুই ঘণ্টা বাকী ছিল। সে কাপড় চোপড় পরিয়া একখানা গাড়ী ডাকিয়া অসীমের মেসে গেল।

ঘরে ঢুকিয়াই লতিকা ঘরের অপরিচ্ছন্নতা দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। সে ঘরের মেঝেয়, দেয়ালে, কুলুঙ্গীতে, আলনায় বই, বাসন, কাপড়, জামা, চায়ের সরঞ্জাম, খাবারের ঠোঙা প্রভৃতি বিচিত্র ভাবে এলো মেলো করিয়া ছড়ান রহিয়াছে। চারিদিকেই রাশি রাশি ধূলি-সমাবৃত বইয়ের স্তূপ। তার মধ্যে না আছে শ্রী, না আছে শৃঙ্খলা। এক পাশে একটা খাটিয়া, তার উপর গা মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে অসীম।

প্রথমে সে সন্তর্পণে অসীমের কাছে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি অসুখ, অসীম বাবু?"

অসীম বলিল, "বড় ব্যথা সর্ব্বাঙ্গে, জ্বর,—বলিতে বলিতে পাশ ফিরিয়া সে লতিকার মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। চট করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এ কি? তোমার কি অসুখ ক'রেছে?"

ম্লান হাসি হাসিয়া লতিকা বলিল, "না, আমাদের কি অসুখ করে? আমরা যে যমের অরুচি।"

"অসুখ নয়, তবে এ হাল হ'ল কেমন ক'রে?"

"কেন, চেহারা কি বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে? তা' সুশ্রীই বা আমি কবে?"

অসীম জোর করিয়া তার দুই বাহু চাপিয়া ধরিয়া আবেগের সহিত বলিল, "সুশ্রী বিশ্রীর কথা বলছি না—আমাকে ভাঁড়িও না। কি হ'য়েছে তোমার বল। কে তোমার এ দশা ক'রেছে?"

বিষাদের সহিত লতিকা বলিল, "সে কথা শুনে আপনার কি লাভ বলুন?"

হাত ছাড়িয়া দিয়া অসীম বলিল, "লাভের কারবার কোনও দিন করি নি লতিকা, লাভটা কোনও দিন আমার কোনও হিসাবের মধ্যে আসে না। কাজেই, আমার লাভ নেই ব'লে ব্যস্ত হ'য়ো না। তোমার কি হ'য়েছে বল।"

"কিচ্ছুই হয় নি,—রাত্তিরে ঘুম হয় নি, তাই বোধ হয় একটু রোগা দেখাচ্ছে।"

"রাত্তিরে ঘুম হয় নি ঠিক, কিন্তু কার জন্যে? হরিচরণের জন্যে, না যাকে সে তোমার ঘরে দেখেছিল তার জন্যে?"

লতিকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে তো সবই জানেন। আপনার বন্ধু তো আপনাকে সবই ব'লেছেন। আর জিগ্‌গেস ক'রছেন কেন?"

অসীম বলিল, "চুলোয় যাক আমার বন্ধু। আমি জিগ্‌গেস ক'রছি তোমার কথা। তুমি কি বল সেইটাই আমার জানবার দরকার।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লতিকা বলিল, "এখন থাক। দয়া ক'রে ও-কথা এখন তুলবেন না।" তার বুকের ভিতর যে কান্নাটা ঠেলা মারিতেছিল, তাহা সে কষ্টে দমন করিল, কিন্তু চক্ষু তার ঝাপসা হইয়া গেল। চক্ষু মুছিয়া সে বলিল, "যাক গে, আপনার কি অসুখ বলুন তো।"

অসীম চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিল, "অসুখ জ্বর, গায় ব্যথা। কিন্তু সেটা অতি তুচ্ছ—তার চেয়ে বড় অসুখ আছে, সে কথা তো বলবার উপায় নেই।"

লতিকা অনুমান করিল, অসীমের কোনও কুৎসিত ব্যাধি আছে। ঘরের ভিতর মদের গন্ধ সে আগেই পাইয়াছিল। অপরিসীম করুণায় তার চক্ষু ভরিয়া উঠিল।

সে বলিল, "আপনি জীবনটাকে এমনি ক'রে ছারখার ক'রছেন কেন বলুন তো? আপনার জীবনটা তো তুচ্ছ নয়, আমার মত। এর দাম আছে।"

হাসিয়া অসীম বলিল, "আমার জীবনের দাম! এটা তুমি ছাড়া জগতে কেউ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করে নি। আমার কাছে এর দাম কাণা কড়িও নয়।"

লতিকা হাসিয়া বলিল, "বড়লোকেরা বোধ হয় এমনি অন্ধই হয় নিজের বিষয়ে। কিন্তু আপনার কাছে কোনও দাম থাক বা না থাক, অন্যের কাছে আপনার প্রাণের দাম আছে। চলুন, আপনাকে আমি হাঁসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।"

"হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে? হাঁসপাতালে এ রোগের চিকিৎসা হয় না।"

"বাজে কথা। আজকাল কত রকম ইঞ্জেকশন বেরিয়েছে, কত রোগী সেরে যাচ্ছে রোজ। চলুন।"

অসীম বলিল, "তুমি যদি যেতে বল যাব। চল।"

অসীম উঠিল। লতিকাও দাঁড়াইয়া উঠিল।

অসীমের জামা জুতা কাপড় অনেক কষ্ট করিয়া নানা আশ্চর্য্য স্থান হইতে লতিকা খুঁজিয়া বাহির করিল।

সে বলিল, "মা গো, কি ক'রে আপনি এমনি এলো মেলো হ'য়ে থাকেন। গা ঘিৎ ঘিৎ করে না?—আপনি বসুন, আমি ঘরটা একটু গুছিয়ে দি।"

বলিয়া লতিকা সেই জঞ্জালের স্তূপ সংস্কার করিতে নিযুক্ত হইল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে ঘরের জিনিসপত্রের ভিতর একটা শৃঙ্খলা গড়িয়া উঠিল। ময়লার কাঁড়ি মুক্ত হইয়া গেল, ঘরখানা যেন ইন্দ্রজাল-বলে রূপান্তরিত হইয়া গেল। অলক্ষ্মীর আস্তাবলে লক্ষ্মীর আসন বসিল।

মুগ্ধ চিত্তে অসীম লতিকার কৃতিত্ব চাহিয়া দেখিল। পরিতৃপ্ত নয়নে সে তার ঘরের দিকে চাহিল। তার পর মুগ্ধ-নয়নে লতিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার সে দৃষ্টির ভিতর কোনও আবরণ ছিল না, খোলা দরজার মত সে দৃষ্টি তার অন্তর একেবারে লতিকার চোখের সামনে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। লতিকা একটু বিব্রতভাবে চক্ষু নামাইয়া বলিল, "উঠুন, চলুন এখন।"

অসীম বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, "না, এখন আর যাব না। এখন এ ঘরখানা ছাড়তে ইচ্ছা হ'চ্ছে না।"

লতিকা বলিল, "না—দেখুন, ব্যামো নিয়ে খেলাখেলি ক'রবেন না। অল্পেতে যেটা সারে, দেরী হ'লে সেইটা ভয়ানক হ'য়ে বসে।"

হাসিয়া অসীম বলিল, "যা ভাবছো তা নয় লতিকা, তেমন কোনও ব্যামো আমার নেই। একটু জ্বর হ'য়েছে ব'লে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।"

"ওমা সে কি, এই না বল্লেন আপনি যে আপনার কি একটা ব্যামো আছে?"

"সে ব্যামটা ডাক্তারের সাধ্য নয়।—যাক, সে কথা পরে হবে। এখন তোমার কথাটা একটু শুনি—যে জন্য তোমাকে আসতে ব'লেছি। শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তার উত্তর দেও। হরিচরণ কি তোমায় একেবারে ছেড়ে গেছে?"

লতিকার মুখ হঠাৎ একেবারে কালিতে ছাইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিল, "হাঁ।"

অসীম এ কথায় অন্যায় রূপে পুলকিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আর সেই বাবুটি? যাকে হরি দেখেছিল, তাঁর সম্বন্ধে তোমার ভাবটা কি?"

লতিকার চোখ একটু জ্বলিয়া উঠিল। সে কোনও উত্তর দিল না,—একটু পরে সে বলিল, "আমার হাঁসপাতালে যাবার সময় হ'য়ে গেছে—আমি যাই।" বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

সন্ধ্যা বেলায় লতিকা তার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তার চোখ দুটি ছিল হরিচরণের হাতের আঁকা একখানা ছবির উপর। তার গণ্ডের উপর অশ্রুর ধারা বহিতেছিল।

এমন সময় অসীম আসিয়া উপস্থিত হইল।

অসীমের পা টলমল করিতেছে, চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু।

লতিকা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া তার দিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন।" তার পর অসীমের অবস্থা বুঝিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আ, মরণ, অসুখ শরীরেও ঐগুলো খেয়ে ম'রেছেন?"

সে হাতে ধরিয়া অসীমকে একটা চেয়ারে বসাইল। তার পর একটা গামলা ও কয়েক ঘটি জল আনিয়া অসীমের মাথা বেশ করিয়া ধোয়াইল, ও একটা ভিজা তোয়ালে তার মাথায় জড়াইয়া দিল। এ শুশ্রূষায় অসীম কোনও বাধা দিল না।

অসীমকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লতিকা একটু তফাতে

একখানা চেয়ারে শক্ত হইয়া বসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মনে ক'রে এমনভাবে এসেছেন আমার কাছে শুনি ?"

অসীম বলিল, "কি মনে ক'রে এসেছি, সে কথা গুছিয়ে ব'লতে একটু সময় লাগবে। নেশাটা ক'রেছিলাম সেই জন্যেই—কিন্তু তা তো তুমি ছুটিয়ে দিলে। এখন একটু সময় দিতে হবে।"

"গুছিয়ে বলবার কোনও দরকার নেই। বলবারই দরকার নেই—আমি অমনি বুঝেছি। আপনি যা ভাবছেন, আমি তা' নই। আপনার বন্ধু আপনাকে মিথ্যা কথা ব'লেছেন।"

হাসিয়া অসীম বলিল, "আমি যা ভাবছি, তা তুমি না হ'তে পার; কিন্তু আমি যা ভাবছি ব'লে তুমি মনে ক'রছো, তা আমি ভাবছি না।"

"যাক, হেঁয়ালী রাখুন। স্পষ্ট কথা বলুন—স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিচ্ছি। কি চান আপনি ? কেন এসেছেন আপনি ?"

একটু থামিয়া অসীম বলিল, "স্পষ্ট শুনতে চাও—বেশ, স্পষ্টই বলছি—আমি এসেছি ভালবাসি ব'লে—আমি চাই ভালবাসা।"

হঠাৎ লতিকা এমন একটা অট্টহাসি হাসিল যে অসীম চমকাইয়া উঠিল। হাসিয়া লতিকা বলিল, 'ভালবাসা ? কেন ? আপনার বন্ধু কি বলেন নি আমি বেশ্যা ? বেশ্যা কি ভালবাসে ?"

কাতর ভাবে অসীম বলিল, "সেটা যে মিথ্যা কথা লতিকা।"

"কে বল্লে মিথ্যা ? বিশ্বাস না করেন এই দেখুন আমার বন্ধুর চিঠি। হরিচরণবাবু মিথ্যা বলেন না।"

হরিচরণের চিঠিখানি আনিয়া সে অসীমের হাতের উপর ছুঁড়িয়া দিল। অসীম পড়িল; ক্রোধে তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

অসীম বলিল, "এর পরেও তুমি তাকে ভালবাস ?"

"বাসি কি না, সে কথা শুনে আপনার লাভ ?"

"আবার লাভ! লাভ আছে আমার। তাকে যদি ভালবাস তবে তুমি আমার অস্পৃশ্যা। তাকে তুমি ভালবাস ব'লেই আমি সরে দাঁড়িয়েছিলাম। নইলে আজ যে কথা বললাম সে কথা ব'লতাম আমি অনেক আগে। কিন্তু হরিচরণ ছাড়া আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী আমি হ'তে দেব না।"

হাসিয়া লতিকা বলিল, "কেন ? এত জোর কিসে আপনার ?"

"আমার জোর এই যে আমি তোমায় ভালবাসি। আর—আমি বড় অসহায়। আর যে কেউ হোক, তার তোমাকে ছাড়া চলবে, আমার চলবে না।"

লতিকা উত্তর দিল না। অসীম যে কত বড় অসহায় জীব তাহা সে জানিয়াছিল। সে আপনি আপনার ভার বহিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাই তার এই কথাটা লতিকার হৃদয়ে করুণার এক তন্ত্রীতে আঘাত করিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

সাহস পাইয়া অসীম বলিল, "দেখ লতিকা, আমার ঘরে তুমি যখন গিয়েছিলে, কি বিশ্রী এলো-মেলো জঙ্গল হ'য়ে ছিল ঘরখানা, লক্ষ্মীর হাত পড়ে' এক মুহূর্ত্তে সেটা শ্রীমান হ'য়ে উঠলো। তখন আমার মনে হ'চ্ছিল, যে আমার এই এলো-মেলো জীবনটাকে যদি একবার তোমার হাতে তুলে দিতে পারতাম, তবে হয় তো তুমি এটাকেও তোমার কল্যাণ-হস্তে সুশ্রী ও মঙ্গলময় ক'রে তুলতে পারতে। জীবনের এতগুলো বচ্ছর কেবল গড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম, এলো-মেলো জঙ্গলের ভিতর। এখন প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছে। লক্ষ্মী-ছাড়া হ'য়ে থাকতে আর ভাল লাগে না। লক্ষ্মীকে হাতের গোড়ায় দেখে তাই স্থির থাকতে পারছি নে। আমার উপর একটু দয়া কর লতিকা। আমার এই হতচ্ছাড়া জীবনটাকে গুছিয়ে একটু সভ্যভব্য ক'রে দেও।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অনেকক্ষণ পর লতিকা বলিল, "না, ও সব পাট আমি ছেড়ে দিয়েছি—দেখেছি, পুরুষেরা সুধু দুঃখ দিতেই জানে, ভালবাসতে জানে না।"

অসীম হতাশ ভাবে মাটির দিকে চাহিয়া সুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

একটু পরে লতিকা বলিল, "ভালবাসা বলতে আপনারা যা বোঝেন আমরা তা বুঝি না। আপনি যাকে ভালবাসা বলছেন, সে জিনিসের উপর আমার লোভ কোনও দিনই ছিল না, আপনার বন্ধু যাই ভাবুন।"

অসীম চমকিত হইয়া বলিল, "আমায় ভুল বুঝো না লতিকা। আমি ভালবাসার নামে আর কিছু চাই না, ভালবাসাই চাই। আমি তোমার কাছে কোনও অন্যায় প্রস্তাব করছি না, আমি চাই তোমাকে বিয়ে ক'রতে।"

একটু বিস্মিত হইয়া লতিকা বলিল, "আমাকে বিয়ে ক'রবেন,—জাত যাবে না ?"

"জাত আমার যাবার নয়, কেন না, তোমার যে জাত সেই আমার জাত।"

"কিন্তু আপনি তো জানেন আমি—এই—আমার চরিত্র —নিষ্কলঙ্ক নয়।"

"সে হোক বা না হোক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমার অতীতকে আমি চাই না লতিকা, চাই তোমার ভবিষ্যৎ।"

লতিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নাঃ, সে হয় না অসীমবাবু।"

"কেন হয় না ? কিসের বাধা ?"

মুখ নীচু করিয়া লতিকা বলিল, "ভালবাসা অতি শাগ্‌গির যায়ও না, গজায়ও না। আপনার বন্ধুকে জন্মের মত হারিয়েছি, কিন্তু তাকে ভালবাসি নে এ কথা ব'লতে পারি না।"

লতিকার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অসীম উঠিল। অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে বলিল, "বেশ, তবে আর আমার কথা নেই। কিন্তু একটা কথা জিগ্‌গেস্ করি। হরিচরণ যদি তার ভুল বুঝতে পারে, যদি সে তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে, তবে তাকে মার্জ্জনা ক'রতে পারবে ?"

দৃঢ়কণ্ঠে লতিকা বলিল, "কখনও না, এ জন্মে না।"

অসীম অবাক্ হইয়া লতিকার মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ বাদে সে বলিল, "বেশ, তবে তাই হোক। চল্লাম। আর দেখা হবে না।"

অসীম ব্যথিত অন্তরে দুয়ারের দিকে চলিল।

তার শেষ কথাটায় লতিকার মনে আঘাত করিল। সে কাতর দৃষ্টিতে অসীমের বিষাদ-ভারাক্রান্ত মুখের দিকে চাহিল।

দুয়ারের কাছে গিয়া অসীম ফিরিয়া তার মাথায় বাঁধা তোয়ালেটা খুলিয়া দিয়া গেল।

লতিকা বলিল, "রাগ ক'রলেন আমার উপর ?"

অসীম অশেষ কাতরতার সহিত বলিল, "না—তোমার উপর রাগ ক'রবো কেন লতিকা? এ ছাড়া আর কি ক'রবে তুমি—কেন ক'রবে? এই যে আমার ভাগ্য। জীবনটাকে সুধু ছারখার করাই যে আমার অদৃষ্ট। সে অদৃষ্ট থেকে রক্ষা পাব আমি—এ কি হ'তে পারে ?"

লতিকা অসীমের হাত ধরিয়া বলিল, "অমন কথা বলবেন না। আমার জন্য আপনার জীবনটাকে নষ্ট ক'রবেন না। আমাকে যদি ভালবাসেন, তবে আপনার কথা দিতে হবে, আপনি এর পর সাবধান হবেন—আর ঐ মদটা আর খাবেন না।"

"কেন লতিকা ? কেন সাবধান হব ? লক্ষ্মীছাড়া, সৃষ্টিছাড়া একটা জীবন। যার জন্য কাঁদবার কেউ নেই, যার সমাদর করবার কেউ নেই, এমন একটা তুচ্ছ জিনিসের পেছনে অতটা যত্ন অপচয় ক'রবো কেন ? অদৃষ্ট আমাকে নিয়ে খেলা খেলতে পারে। আমিও তাকে একহাত খেলা দেখিয়ো দেবো।"

লতিকা জোর করিয়া টানিয়া তাকে বসাইল। কাতর কণ্ঠে সে বলিল, "ছি, অমন কথা বলবেন না। বেটাছেলে আপনি।"

"সেই জন্যই তো বেটাছেলের মত লড়বো অদৃষ্টের সঙ্গে ! অদৃষ্টকে ফাঁকি না দিতে পারলে পৌরুষ কিসে আমার ?"

লতিকা তার হাত ছাড়িয়া দিয়া দু হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল। তার বুকের ভিতর কাতর অন্তর আছাড়ি-পিছাড়ি করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বলিল, "দেখুন, এমন ক'রে আমাকে দুঃখ দেবেন না। বলুন—আপনি ভাল হবেন ?"

হাসিয়া অসীম বলিল, "আমি তো মন্দ নই লতিকা !"

"তা নন,—আপনি যে কত ভাল, তা কি আর আমি জানি না। তাই তো বলছি—ও ছাই আপনি ছাড়ুন বিয়ে-থা ক'রে জীবনটাকে গুছিয়ে নিন। আমি ছাড়াও তো মেয়ে আছে। বাঙ্গলা দেশে এমন কোন্ মেয়ে আছে যে আপনাকে পেলে কৃতার্থ না হবে ?"

"তার প্রমাণ তুমি।" বলিয়া অসীম কঠোর হাস্য করিল।

"আমি ?—আমাকে ভুল বুঝবেন না আপনি। আপনাকে তুচ্ছ করি নি আমি। আপনি যে আমাকে চান, সে আমার কত বড় সৌভাগ্য, তা কি আমি জানি না ? কিন্তু আমাকে দেবার অধিকার আমার নেই,—আপনাকে

বঞ্চনা কর্‌বার শক্তি আমার নেই।" বলিয়া সে মাথা নীচু করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ দুজনেই নীরবে রহিল।

শেষে অসীম বলিল, "তবে এখন আমি যাই।"

লতিকা বলিল, "না—বসুন।" তার পর আর কিছুক্ষণ পর সে বলিল, "সব তো জানেন আপনি, তবু কি আমাকে আপনি চান?"

অসীম প্রশান্তভাবে বলিল, "সমস্ত প্রাণমন দিয়ে তবু তোমাকে চাই। তোমাকে চাই বল্লে ঠিক হবে না, আমার সব ভার তোমাকে দিতে চাই।"

আর একটু স্থির হইয়া থাকিয়া লতিকা শেষে বলিল, "বেশ—নিন তবে।" বলিয়া সে অসীমের পায় লুটাইয়া তাকে প্রণাম করিল।

অসীম তাকে বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া তার অশ্রু-ভারাক্রান্ত মুখে একটি চুম্বন দিল।

২০

লতিকা আসিয়াছিল—সে তাকে একরকম কোনও সম্ভাষণ না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে! এই কথাটা হরিচরণের মনের ভিতর কেবলই আঘাত করিতে লাগিল। তার প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মাথায় হাত দিয়া ভূমিতে সে বসিয়া পড়িল।

লতিকাকে সে কঠোর আঘাত করিয়াছে, সেটা লতিকার বুকে লাগিয়াছে। কিন্তু কি দুঃখে যে সে এমন নির্ম্মম আঘাত করিয়াছে, লতিকা তার কি জানে? লতিকাকে সে যে কতখানি ভালবাসে, কত বড় ভালবাসায় ঘা খাইয়া যে সে এত নিষ্ঠুর হইতে পারিয়াছিল, তার কোনও খবর তো লতিকা জানে না!

একবার তার মনে হইয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া লতিকাকে ধরিয়া তার পায় ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে—আর একবার তার মুখ হইতে শুনিবে সে তাকে ভালবাসে কি না। একবার, শুধু একবার যদি লতিকা নিজমুখে বলে যে হরিচরণ যা দেখিয়াছিল সে একটা স্বপ্ন, তবে যে হরিচরণ হাতে স্বর্গ পাইবে। কিন্তু নিদারুণ লজ্জা ও অপরাধীর সঙ্কোচ তার দুই পায় বেড়ী দিয়া ধরিল। সে বাহির হইতে পারিল না।

পরের দিন সকালে সে স্থির করিল যে ইহাতে চলিবে না। ঠিক এমনি করিয়া তার সঙ্গে লতিকার বিচ্ছেদ হইতে পারে না। একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

সে লতিকার সন্ধানে বাহির হইল। তার বাড়ীর দুয়ারের কাছে গিয়া তার পা উঠিল না। কোন্ মুখে গিয়া সে এখন উঠিবে? কি কথা বলিবে সে? কেমন করিয়া লতিকার ঐ অভিযোগ-ভরা দৃষ্টির সামনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে?

অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সে দুয়ারের কাছে আসিল। দেখিল লতিকা বাড়ী নাই। একটু বিস্মিত হইল। তার হাঁসপাতাল যাইবার সময় হইতে তখনও দেরী ছিল। তবে সে এত সকালে গেল কোথায়?

সে বিরক্ত হইল, কিন্তু আপাততঃ যে সে সাক্ষাতের সঙ্কোচ হইতে বাঁচিয়া গেল, তাতে একটু স্বস্তিও বোধ করিল।

তার পর সে কিছুক্ষণ পথে পথে সুধু ভাসিয়া বেড়াইল। একটা দোকানে কিছু খাইয়া শেষে সে একজিবিশনে গেল।

সেদিন ছবিগুলির বিচারের ফল প্রকাশ হইবার কথা।

আশায় উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া হরিচরণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর বিচারকদের বিচার-ফল প্রকাশিত হইল। কেরাণী যখন বিচার-ফল টানাইয়া দিল, তখন হরিচরণ কম্পিত বক্ষে চক্ষুময় হইয়া তাহা পড়িতে লাগিল।

সমস্ত পড়িয়া হরিচরণ বসিয়া পড়িল।

পুরস্কার পাইয়াছে যারা চিরদিন পায় তারা, আর তাদের শিষ্য-প্রশিষ্যের দল—হরিচরণ পায় নাই। সুধু সেই তালিকার শেষে হরিচরণের নাম আরও বিশ পঁচিশ জনের সঙ্গে প্রশংসার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে।

তার জীবনের শেষ আশ্রয় যেন তার পায়ের তলা হইতে সরিয়া গেল। হরিচরণ এক মুহূর্ত্ত জগৎ অন্ধকার দেখিল।

সে কষ্টে আপনার দেহখানি টানিয়া তার ঘরে লইয়া গেল। দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

বস্, সব শেষ—সমস্ত আশার সমাধি হইয়া গিয়াছে। এখন আর তার লতিকার সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। লতিকাকে মুখ দেখাইবারও তার মুখ নাই।

সমস্ত বিশ্ব তার চোখে কালিমাময় হইয়া গেল। বাঁচিয়া থাকিবার এক বিন্দু উৎসাহ তার রহিল না।

মরুভূমির মত শূন্য উদাস অন্তরে সে সুধু নিষ্কর্ম্মা হইয়া দুই দিন পড়িয়া রহিল।

তার পর তার হুঁস হইল যে ছবিখানা অসীমের,—সেখানা তাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

ক্লান্ত চরণে সে আবার একজিবিশনে গেল। তার ছবিখানা ফেরত চাহিল। যে কর্ম্মচারীর সঙ্গে তার কথা হইল সে বলিল, "আপনার নাম হরিচরণ পাল ?"

"হাঁ।"

কর্ম্মচারীটি তার নোটবুক খুলিয়া দেখিল। তার পর বলিল, "হাঁ—আপনিই বটে। দেখুন, আপনার ছবিখানা আপনি কি বেচবেন না ?"

হরিচরণ ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "ছবি আমার নয়,—ওখানা অর্ডারি ছবি।"

"বেচলে কিন্তু ভাল গ্রাহক আছে, পাঁচশ' টাকা পেতে পারেন।"

"ছবি যখন আমার নয়, তখন আমি বেচবো কেমন ক'রে ?"

"তাঁকে কপি ক'রে দিলে হয় না ? খদ্দেরটি সেজন্য অপেক্ষা ক'রতে রাজী আছেন।"

"না, আমি ওর কপি ক'রতে পারবো না। আমার আর ইচ্ছে নেই।"

"যিনি ছবি কিনেছেন তিনিও তো বেচতে পারেন—কে তিনি ?"

হরিচরণ অসীমের নাম বলিল।

কর্ম্মচারী বলিল, "তিনি নিশ্চয় বেচবেন—আপনি একবার জিজ্ঞেস ক'রে আসুন গে।—দামের জন্য ঠেকবে না, পাঁচশো টাকার বেশীও হ'তে পারে।"

হরিচরণের এতক্ষণে একটু কৌতূহল হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, খরিদ্দারটি কে ? শুনিতে পাইল যে, ইটালীর কনসালের সঙ্গে একটি বড়লোক আসিয়াছিলেন, ছবিখানা তাঁর চোখে লাগিয়া গিয়াছে।

কর্ম্মচারীটি বলিলেন, "হাঁ, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতেও চেয়েছেন। আপনি একবার যান না সেখানে,—তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে আসুন গে।"

হরিচরণের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল, আশা আবার রঙীন হইয়া উঠিল। সত্য সত্যই যদি সে এ ছবিখানা, ধর, হাজার টাকায় বেচিতে পারে, তবে—তবে তো তার আশা আছে। লতিকার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া অসম্ভব নাও হইতে পারে। এখন মনে হইল, বোঝা-পড়া হইলেই সব মিটিয়া যাইবে; বোঝা যাইবে যে সমস্ত ব্যাপারটা হয় তো ভুল।

কম্পিত পদে সে ইটালীয়ান কন্সালের বাড়ীতে গিয়া সেই ধনী ইটালীয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। যাহা শুনিল তাহা তার সকল আশার অতীত।

সে ভদ্রলোক হরিচরণের ছবিখানার অনেক প্রশংসা করিলেন। তিনি ছবির মালিককে অনুরোধ করিতে বলিলেন। সে যদি হাজার টাকা মূল্যেও ছবিখানা না বেচিতে চায়, তবে তিনি অগত্যা একখানা কপি লইতেও প্রস্তুত আছেন।

ভদ্রলোকটি ভারত ভ্রমণ করিয়া, এখানে যাহা কিছু দেখিবার আছে, সব দেখিয়া যাইবেন বলিয়া আসিয়াছেন। তিনি ইটালীর একজন প্রসিদ্ধ ধনী ও চিত্রসংগ্রাহক। ভারতে ঘুরিয়া তাঁর যে সব জিনিস চোখে লাগিবে—বিশেষতঃ ভারতীয় জীবনের যে সব প্রকাশ তাঁর ভাল লাগিবে, সে-সবের ছবি তিনি লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, হরিচরণকে তিনি বেতন ও পাথেয় দিয়া সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিবেন, হরিচরণকে সুধু তাঁর ফরমায়েস মত ছবি আঁকিতে হইবে। বেতন প্রস্তাব করিলেন—মাসে পাঁচ শত টাকা।

আনন্দে হরিচরণের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সে কোনও মতে সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া ছুটিল লতিকার কাছে। এখন আর তার কোনও দ্বিধা, কোনও সঙ্কোচ রহিল না। লতিকাকে সে যে এতবড় অপমান করিয়াছে, লতিকার কাছে সে যে এতবড় দাগা পাইয়াছে, উৎসাহের আতিশয্যে সে সব ভুলিয়া গেল। তার সুধু মনে হইল, এতদিনে ভগবান তার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—এখন তার দুঃখের অবসান! লতিকাকে এখন সে পাইবে।

লতিকার বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তার দেখা হইল অসীমের সঙ্গে—সেও লতিকার বাড়ী যাইতেছিল। তার মুখও আনন্দে উৎফুল্ল!

অসীম তার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "এই যে হরি! তোমাকে আমি আজ সারাদিন গরুখোঁজা ক'রে বেড়াচ্ছি। আর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাতেই তোমাকে পাওয়া গেল।"

হরিচরণ বলিল, "আমিও তোমাকেই চাচ্ছিলাম! শোন, তোমার সে ছবিখানা বেচবে? হাজার টাকা দাম হ'য়েছে।"

"আমার ছবি—কোন্ ছবি?"

"ওই যে—যেখানা আমি একজিবিশনে দিয়েছিলাম।"

হাসিয়া অসীম বলিল, "সে ছবি আমার হ'ল কবে? আমি তার দাম দিয়েছি, না দেবার শক্তি আছে আমার? যাও—বেচগে তুমি ও ছবি। ওতে আর আমার দরকার নেই। এখন আমার কথা শোন—যে খবরটা শোনাবার জন্য তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। এতদিনে এ লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষ্মী মিলেছে।"

"তাই না কি? বিয়ে?"

"হাঁ।"

"কবে?"

"বিয়ে হবে মাসখানেক বাদে। একটা বেয়াড়া আইন আছে যে তিন সপ্তাহের নোটিশ না দিলে বিয়ে হয় না, তাই এই অযথা বিলম্ব। কিন্তু সে হোক, আইনকে তার পাওনা-গণ্ডা কড়াক্রান্তি মিটিয়ে দিতে আমার এখন আপত্তি নেই। আমি লক্ষ্মীলাভ ক'রেছি—ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।"

"তাই না কি? ভগবান আছেন তা হ'লে?"

"এখন আর সন্দেহ নেই ভাই—ভগবান আছেন। তিনি চিরদিনই আছেন। চিরদিনই আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার মত হতচ্ছাড়া অবিশ্বাসীকে আপদ বিপদ থেকে রক্ষা ক'রে এসেছেন—আজকের এই মঙ্গলময় পরিণতির জন্য। আজ আমার চোখের পরদা প'ড়ে গেছে। লতিকা আমার মোহের ঘোর কাটিয়ে দিয়েছে। সত্যি ভাই, সে যখন ভগবানের কথা বলে, তখন অতিবড় অবিশ্বাসীরও বিশ্বাস না হ'য়ে উপায় নেই।"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল, "ভগবানের পক্ষ থেকে তোমাকে আমি তাঁর ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, এতদিনে তাঁকে পৃথিবীতে একটা যায়গা দিলে তুমি। তোমরা তোমার জ্বালায় এতদিন অস্থির হ'য়ে ঘুরছিল।"

অসীম হাসিল, বলিল, "কেন ভাই, ভগবানকে তো আমি চিরকালই মানি, কিন্তু ঠিক এমন ব'লে মানি নি। কিন্তু লতিকা আমাকে মানিয়েছে।"

"সেজন্য তাকেও ধন্যবাদ। ভাল কথা, বিয়েটা হ'চ্ছে কোথায়? মানে, কার সঙ্গে?"

"ওঃ—সে কথা বলাই হয় নি—লতিকা—তোমার লতিকাকে বিয়ে ক'রছি আমি—সেই বেশ্যাটা।" বলিয়া অসীম হাসিল।

হরিচরণের মুখের উপর কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। সে কোনও কথা বলিতে পারিল না।

অসীম ভাবিল—হরিচরণ লতিকাকে ঘৃণা করে বলিয়া নীরব হইয়া গেল। তাই সে হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি যা ভেবেছিলে তার সম্বন্ধে, সে বিলকুল ভুল। আমি তার কাছে শুনেছি সব কথা।" বলিয়া অসীম সংক্ষেপে সেদিনকার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিয়া বলিল।

হরিচরণ অনেক কষ্টে বলিল, "তা বেশ, খুব খুসী হ'লাম। এখন তবে আসি, বিয়ের সময় দেখা হবে। আর শোন, লতিকার সঙ্গে আর আমি এখন দেখা ক'রবো না। কিন্তু আমার হ'য়ে তুমি তার কাছে মাপ চেয়ো। বলো যে, আমি যে ভুল ক'রে তার উপর অবিচার ক'রেছি, সে কথা তার পরদিনই বুঝতে পেরেছিলাম—কিন্তু ক্ষমা চাইতে সাহস হয় নি। আজ অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাচ্ছি।" তার শেষ কথাগুলি রুদ্ধ অশ্রুর আবেগে ভার হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বিদায় হইয়া গেল।

* * * *

আবার সব শেষ হইয়া গেল। হরিচরণের কাছে জীবনের আর কোনও স্বাদ রহিল না।

সে উধাও হইয়া ছটফট করিয়া অনেকক্ষণ চারিদিকে ঘুরিয়া শেষে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

কিসের জীবন? কিসের চেষ্টা? আর কিছুই সে করিবে না। একেবারে পরিপূর্ণরূপে হতচ্ছাড়া হইয়া যাইবে।

সে ইটালীয়ান ভদ্রলোককে চিঠি লিখিয়া জানাইল, চাকরী সে করিবে না, ছবি বেচিতে পারিবে না।

ছবিখানা আনিয়া সে তুলিয়া রাখিল। বিবাহের দিন ইহাই সে দম্পতীকে উপহার দিবে স্থির করিল।

তার সমস্ত মনটা যেন জড়, অচেতন হইয়া গেল—

কোনও রকম সাড়াই সে দেয় না। কেবল থাকিয়া থাকিয়া তার মনে হয়—কি প্রচণ্ড পরিহাস এই জীবন,—কি নিরর্থক একটা অভিনয়! অবিশ্বাসী অসীম আজ ইহার তলায় ভগবানকে দেখিতেছে—কি অদ্ভুত ভ্রান্তি! ভগবান! সে তো একটা ছেলেভোলান কথা! ভগবান নাই—যদি কিছু থাকে তবে সে বিকট এক রাক্ষস!

*   *   *   *

বিবাহের পূর্ব্বদিন উপহার লইয়া হরিচরণ লতিকার বাড়ীতে উপস্থিত হইল—এতদিন সে অসীম বা লতিকাকে দেখা দেয় নাই। আজ চিত্তে এক অস্বাভাবিক প্রশান্ততা লইয়া সে লতিকার কাছে গেল, উপহার দিতে।

লতিকা তার দিকে চাহিয়া হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তার এই ব্যবহার হরিচরণের মনে বড় আঘাত করিল।

সে নীরবে একা দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর লতিকা বাহির হইয়া আসিল। শান্তভাবে সে বলিল, "আপনি দাঁড়িয়ে র'য়েছেন। আসুন, বসুন।"

যন্ত্রের মত সে ঘরে ঢুকিয়া ছবিখানি রাখিয়া বসিল। বলিল, "এইটা আমার wedding present।"

গম্ভীরভাবে লতিকা সেদিকে চাহিয়া দেখিল। একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করিয়া সে বলিল, "উনি বলছিলেন, এ ছবিখানা আপনি হাজার টাকায় বেচেছেন।"

"না—বেচি নি। বেচতে পারি নি।"

"আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম। হাজার টাকা দিয়ে এ প্যাঁচামুখ কে কিনবে বলুন।"

একটা অন্তঃসারশূন্য হাসি হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "কেনবার লোক কিন্তু ছিল। আমিই বেচতে পারলাম না।"

ইহার পর কিছুক্ষণ দুজনে নীরবে নতমস্তকে বসিয়া রহিল।

একটা কোনও কথা না বলিলে ভাল দেখায় না বলিয়া অনেক মাথা খুঁড়িয়া হরিচরণ একটা কথা বাহির করিল। সে বলিল, "আপনাদের কোর্টশিপটা বড় সংক্ষিপ্ত হ'য়েছে। ব'লতে গেলে দুদিনও নয়।"

মাথা নীচু করিয়াই লতিকা সংক্ষেপে বলিল "হাঁ।"

আবার চুপ।

শেষে হরিচরণ বলিল, "যেখানে দুজনে দুজনকে অনেক দিন থেকে গোপনে ভালবাসে, সেখানে এমনিই হয়।"

লতিকা এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে মুখ নীচু করিয়াই বসিয়া রহিল। তার পর সে মাথা ঝাড়িয়া তুলিয়া বলিল, "তুমি এ কথা ব'লছো?—তুমি কি অন্ধ?"

হরিচরণ চমকাইয়া উঠিল। তার যত্নরচিত প্রশান্ততা উড়িয়া গেল। লতিকার সজল চক্ষুর দিকে চাহিয়া সবল সত্যটা তার কাছে চট করিয়া প্রকাশ হইয়া গেল। সে বুঝিল যে, লতিকা অসীমকে ভালবাসে নাই, তাকেই ভালবাসিয়াছে। তার এখন মনে হইল যে, লতিকার অসীমকে বিবাহ করা সুধু হরিচরণের স্পর্দ্ধার শাস্তি! একটা প্রচণ্ড আকুলতা তার সমস্ত অন্তর-বাহির তোলপাড় করিয়া দিল। সে একটা আবেগপূর্ণ উত্তর দিতে গিয়াই দেখিল অসীম আসিতেছে।

সে তাড়াতাড়ি বলিল, "এই যে অসীমদা' এসো—অনেকক্ষণ তোমার জন্যে ব'সে আছি।"

লতিকা উঠিয়া গেল।

*   *   *   *

ইহার পর হরিচরণের মনের ভিতর হুহু করিয়া দাবানল জ্বলিতে লাগিল। হতভাগ্য মূর্খ সে—নিজের বুদ্ধির দোষে সে করায়ত্ত স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। জীবনের সর্ব্বস্ব সে খোয়াইয়া বসিয়াছে। হাতের কাছে তার যে রাজার সম্পদ ছিল, তাহা সে দুহাতে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে,—সৌভাগ্য যখন তার দুয়ারে ঠেলাঠেলি করিতেছিল, তখনই সে তাহা পদাঘাতে দূর করিয়াছে!

আজ সে ধনীর চেয়ে ধনী, সুখীর চেয়ে সুখী হইতে পারিত। সুধু বুঝিবার ভুলে আজ সে সর্ব্বহারা!

*   *   *   *

বিবাহের দিন যে কয়টি বন্ধু আসিয়াছিল, তারা খুব সোরগোল করিয়া আনন্দ উৎসব করিল—হাস্য-পরিহাসের অবিচ্ছিন্ন বন্যা বহাইয়া দিল তারা। সব চেয়ে বেশী চেঁচামেচি করিল হরিচরণ। সে যে এত হাসিতে পারে, তা কেউ কোনও দিন ভাবে নাই। কথায় কথায় হাসিয়া সে গড়াগড়ি দিল, নাচিয়া কুঁদিয়া সে একটা হৈ চৈ লাগাইয়া দিল।

লতিকা দেখিয়া অনেকগুলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

বিবাহের পর ভোজের সময় পরিবেষণের ভার লইয়াছিল হরিচরণ। ছুটাছুট করিয়া সে পরিবেষণ করিতে লাগিল, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া সে বাড়ী মাতাইয়া তুলিল। দই পরিবেষণ করিতে গিয়া সে তিন চার জনের মাথায় দই ঢালিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিল।

তার হাসি-তামাসার মধ্যে এক মুহূর্ত্তের ছেদ ছিল না, কাজের ভিতর এক মুহূর্ত্তের অবকাশ ছিল না। সবার সঙ্গে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া কথা কহিল, হাসাহাসি করিল, অসীমকে কাঁধে করিয়া কিছুক্ষণ নাচিল,—শুধু লতিকার সঙ্গে সে কথা কহিল না, তার দিকে সে একবারও চাহিল না।

যখন পরিবেষণের কাজ শেষ হইয়া গেল, তখন হরিচরণ ক্লান্ত হইয়া একটা নির্জ্জন ঘর দেখিয়া সেখানে ঢুকিয়া পড়িল। হাতের বাসন ফেলিয়া দিয়া সে একটা লম্বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইল।

তার পিছু পিছু লতিকা সে ঘরে আসিল।

সমস্তক্ষণ সে আজ হরিচরণকে দেখিয়াছে, তার সব আশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ দেখিয়া তার বুক ঠেলিয়া কান্না পাইয়াছে; হরিচরণকে এ ঘরে আসিতে দেখিয়া সেও পলাইয়া আসিয়াছে।

লতিকা হরিচরণের হাত ধরিল। হরিচরণ চমকাইয়া তার মুখের দিকে চাহিল—তার পর নতনয়নে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লতিকার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কোনও কথা সে বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ সজল নয়নে নীরবে সে হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—হাতে হাত ধরিয়া অশেষ ব্যথাভরা দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ এমনি থাকিয়া সে বলিল, "শেষের দিনে বড় দুঃখ দিলে।" আবার সে নীরব হইল।

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সে আবার বলিল, "মেকী হাসি দিয়ে কান্না ঢাকবার এ আয়োজন মিছে।—ওঃ! এত দুঃখ আমি দিলাম তোমাকে!"

আবার কিছুক্ষণ পর সে বলিল, "আমাকে ক্ষমা ক'রো।"

হরিচরণ আর পারিল না। তাড়াতাড়ি হাত টানিয়া লইয়া সে চক্ষু ঢাকিয়া ছুটিয়া পলাইল।

উৎসবের শেষে যখন লতিকা অসীমের হাত ধরিয়া তার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিতে গেল, তখন তার ব্যাকুল চক্ষু দুটি সেই ব্যথাতুর সর্ব্বহারাকে চারিদিকে বৃথাই খুঁজিয়া ফিরিল।

তার পর হরিচরণকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

(সমাপ্ত)

স্মৃতি

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি এ

মানুষ রাখিতে চায় স্মৃতি তার প্রিয়জন তরে,
প্রতিমায়, সমাধিতে মন্দিরের নিরুদ্ধ অন্তরে,
আলো যেথা দেয় নাক প্রীতি, সমীরণ আশীর্ব্বাদ
নাহি আনে, সে আঁধারে নিখিলের আনন্দ সংবাদ
পশে নাক, মৃত হায় চিরমৃত বিস্মৃতির তলে।
প্রকৃতি রাখেন স্মৃতি আপনার বিস্তৃত আঁচলে,
তৃণ শয়নের পরে, ঝরা পাতা, মরা ফুল যত,
প্রাণ দিয়ে তারা সবে সঞ্জীবনী যোগায় নিয়ত
নব জাতকের লাগি, আলো সে পরশে নিয়ে আসে
জীবনের রসায়ন, বায়ু সেথা আনে অনায়াসে
অনন্ত প্রাণের ধারা যারে লয়ে চলে অনিবার
আকাশ বাতাস পৃথ্বী মহা পারাবার।
সে বাঁচে শৈবালে শষ্পে, বল্লরীতে কোরকে কুসুমে,
চির জাগরূক প্রাণ, মানে নাক মরণের ঘুমে।

মধ্য-ভারত

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অজন্তা

অজন্তার নারী (১নং গুহা)

বেলা সাড়ে নটার মধ্যেই আমরা অজন্তার গিরিগুহাবলীর মূলে গিয়ে পৌঁছলুম। একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর তীরে এক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অনতি-উচ্চ পর্ব্বত যেন সোজা উপরে উঠে গেছে। কোথাও এতটুকু ঢালু নয়। নীচে থেকে উপরের পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য স্তম্ভ ও তোরণ দেখে মনে হচ্ছিল, আমরা যেন কোনও প্রাচীন রাজ্যের এক বিরাট পার্ব্বত্য-প্রাসাদের সম্মুখে এসে পড়েছি। পার্ব্বত্য নদীটির নাম শুনলুম 'বাঘোরা'! এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর! চারিদিকে যেন তপোবনের একটা স্তব্ধ শান্তি বিরাজ করছে! মহামান্য নিজামবাহাদুর অজন্তা-দর্শনাভিলাষী তীর্থযাত্রীদের জন্য পাহাড়ের উপরে পৌঁছবার চমৎকার একটি সিঁড়ি তৈরী ক'রে দিয়েছেন! সেই সিঁড়ি দিয়ে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠে গেলুম। পাহাড়টি প্রায় ২৫০ ফিট উঁচু হবে। অশ্বখুরের মত একদিক থেকে আর একদিক পর্য্যন্ত ঘুরে গেছে।

প্রথমেই ১নং গুহা। এই এক নম্বর গুহার একধারে দেখলুম একটি ছোট্ট চায়ের দোকান রয়েছে। এখানে চা কেক্ রুটি ও ডিম পাওয়া যায়। 'গুহা' বলতে যে সঙ্কীর্ণ পর্ব্বত গহ্বরের কথা আমাদের মনে হয়, এগুলি তা নয়। এই গুহাগুলিকে পর্ব্বত-কন্দরস্থ প্রাসাদ বলা চলে।

এক নম্বর গুহা থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় পাশাপাশি ২৯টি গুহায় এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়টি যেন শিল্পীর মৌচাক হ'য়ে আছে। গুহাগুলি 'চৈত্য' ও 'বিহার' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যেখানে ভক্তগণ সমবেত হ'য়ে উপাসনা ক'রতেন তাকে বলে 'চৈত্য'; আর যেখানে ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা বাস করতেন তাকে বলে 'বিহার'। চৈত্যগুলির মধ্যে তথাগত বুদ্ধের এক একটি স্তূপ নির্ম্মিত আছে। ২৯টি গুহার মধ্যে পাঁচটি 'চৈত্য'। বাকী সবগুলিই 'বিহার'।

দেখলেই বোঝা যায় এটি একসময় বৌদ্ধদের একটি প্রধান আশ্রম ছিল।

একমাত্র 'ইলোরা গুহা' ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও আর প্রাচ্যের প্রাচীনতম স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কন শিল্প-কলার এমন বিরাট নিদর্শন একত্র দেখতে পাওয়া যায় না। অজন্তা ও ইলোরার তুলনায় 'বাঘগুহা' 'কার্‌লী' বা 'এলিফান্টা' প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র ব'লে মনে হয়! অজন্তায় খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধশিল্পের একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। সাতশ'বছর ধরে বৌদ্ধযুগের শিল্পীরা এই পর্ব্বতগাত্রে তাঁদের অসামান্য কলা-নৈপুণ্যের যে বিপুল পরিচয় রেখে গেছেন, তার মূল্য শুধু শিল্প হিসাবেই নয়, তদানীন্তন সমাজের রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার এবং আচার ব্যবহার প্রভৃতিরও যে সন্ধান এর মধ্যে পাওয়া যায় ইতিহাসের দিক দিয়ে তার মূল্যও অনেক। অজন্তার স্থাপত্যকলা, অজন্তার ভাস্কর্য্য, অজন্তার রঙীন প্রাচীর-চিত্রগুলি দেখতে দেখতে যখন দর্শকের মনে ভারতের গৌরবময় যুগের একটি অনবদ্য ছবি ফুটে ওঠে, তখন বিস্ময়ে, পুলকে, শ্রদ্ধায় মাথা নত ক'রে, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার না ক'রে পারা যায় না। কারণ, পৃথিবীর আর কোথাও না কি ঠিক এমনটি আর নাই।

১নং গুহার অভ্যন্তরস্থ চিত্রিত সুরঙ্গীন ছত্রতল ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত স্তম্ভরাজি

প্রত্যেক গুহার বিশেষত্ব হচ্ছে—একটু একটু ক'রে পাহাড়টির ভিতরদিক কেটে বা কুঁদে অসংখ্য স্তম্ভ-পরিবৃত এক একটি চৈত্য ও বিহারের মধ্যে—রাজসভার তুল্য সুবিস্তৃত দরবার-কক্ষ, ভিক্ষু-আবাস, স্তূপ, পূজাগৃহ ও বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছে। তদানীন্তন শিল্পীরা যে কত অসামান্য শক্তিধর ও সুদক্ষ কারুবিদ্ ছিলেন, নিজেদের বিরাট কল্পনাকে রূপ দেবার ক্ষমতা যে তাঁদের কী অসাধারণ ছিল, অজন্তার গুহায় গুহায় তাঁদের অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখতে দেখতে বার বার সে কথা মনে জাগে। তাঁদের তীক্ষ্মবুদ্ধি, অনুপম কলা-কৌশল, বিচিত্র কল্পনা ও অদ্ভুত সৃজনী-শক্তির এই প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে সেই অতীত ভারতের মহাপুরুষদের মহতী প্রতিভার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে হয়।

অজন্তার ২৯টি গুহার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছে মাত্র তেরোটি গুহা। কারণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলার বিচিত্র নিদর্শন এইগুলির মধ্যেই খুব বেশী পরিমাণে এখনও বিদ্যমান আছে। অন্য-গুলিতে প্রায় সব ধ্বংস ও লুপ্ত হয়ে এসেছে।

১, ২, ৯, ১০, ১২, ১৬, ১৭, ১৯ ও ২৬ নং গুহায় আমরা অজন্তার বিগত শিল্পবৈভবের যে প্রচুর নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলুম, অপরগুলিতে তেমন পাইনি।

পূর্ব্বেই বলেছি, অজন্তায় খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খৃঃ সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলার ভিন্ন ভিন্ন যুগের উন্নতি ও পরিণতির পরিচয় পাওয়া যায়।

এক নং গুহায় প্রবেশ করে আমরা একেবারে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে গেলুম! পর্ব্বতের গুহা বলতে যা বোঝায় এ মোটেই তা' নয়। পাহাড় কেটে বা কুঁদে তার মধ্যে চতুষ্কোণ এক হলঘর তৈরি হয়েছে। হলঘরে প্রবেশের একটিমাত্র দ্বার ও দুপাশে দুটি বাতায়ন। বাতায়নের পাশে আবার একটি করে অতিরিক্ত ছোট দরজা আছে। প্রবেশ-পথের বাইরে হলের সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা বা দরদালান। প্রবেশ-দ্বারের

বাতায়ন বৌদ্ধযুগের কারুকার্য্য-খচিত স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। হলের ভিত্তিগাত্রের বহির্ভাগও যেমন চিত্রিত ভিতরেও চারিদিক সেইরূপ চিত্রিত।

বাইরের বারান্দায় ছটি অপরূপ কারুকার্য্য-খচিত বিপুলকায় স্তম্ভ রয়েছে। হলের অভ্যন্তরেও চার কোণে চারটি ছাড়া চার পাশেও চারটি চারটি করে ষোলটি স্তম্ভ আছে। প্রত্যেক স্তম্ভগুলি একই রকম দেখতে, একই রকম স্থাপত্য-কলা ও কারুকার্য্য-মণ্ডিত, দেখে মনে হয় যেন ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা!

প্রধান হলটির চারপাশে আবার অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠরি রয়েছে দেখলুম। প্রবেশ-দ্বারের ঠিক ঋজু-ঋজু হলের বিপরীত দিকে একটি গর্ভমন্দির আছে। এই গর্ভমন্দিরের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের একটি বিরাট মূর্ত্তিও রয়েছে। প্রধান হল থেকে গর্ভমন্দিরে যেতে মধ্যে আবার একটী ছোট দালান আছে। এ দালানটিরও সামনে দুটি স্তম্ভ দেখা গেল এবং দুই প্রান্তভাগের ভিত্তি গাত্রে দুটি অর্দ্ধবৃত্তাকার স্তম্ভ রয়েছে। এই ছোট দালানটির চারি দিকের ভিত্তিগাত্রে অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে।

ভিত্তিগাত্রের সুরঙ্গীন চিত্রগুলি ও ভাস্কর্য্য সবই প্রায় দেখলুম বৌদ্ধ জাতক সংক্রান্ত। শিবীজাতক, শঙ্খপাল জাতক, বোধিসত্ত্ব, বুদ্ধের প্রলোভন বা বুদ্ধ পরীক্ষা, শ্রাবস্তীর অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি জাতকের প্রত্যেকটি গল্পকে চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে রূপ দেওয়া হ'য়েছে। গল্পকে চিত্রের মধ্যে এমন করে ফুটিয়ে তোলার কৌশল না কি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।
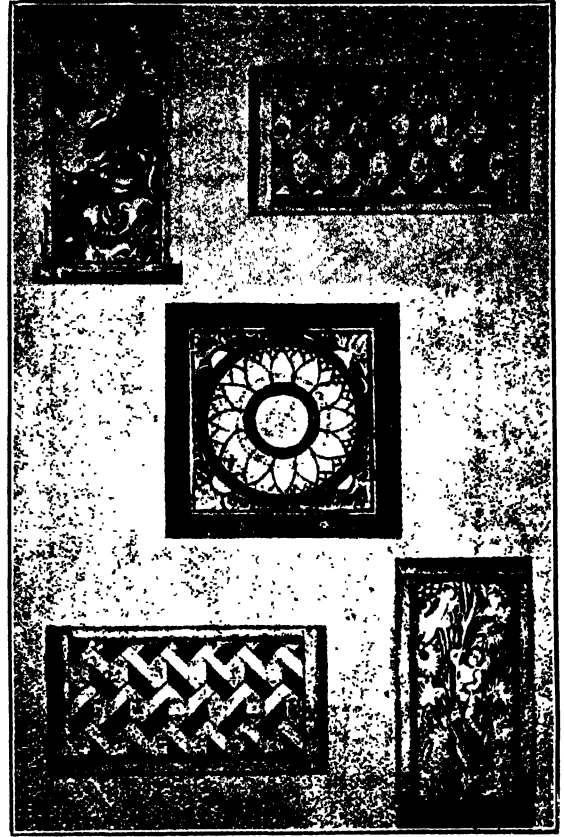
১নং গুহার ছত্রতলে চিত্রকরের তুলিকার নানা বিভিন্ন সুন্দর পরিকল্পনা

১নং গুহার ছত্রতলের কারুচিত্র

প্রধান হলটির চারি পাশ বেশ অন্ধকার। ভালো করে কিছু দেখা যায় না! কিন্তু গর্ভমন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তিটি প্রবেশ-পথের ভিতর থেকে এসে-পড়া দিনের আলোয় সতত সমুজ্জ্বল! প্রত্যেক গুহার মধ্যেই এই বিশেষত্বটা সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে।

আমাদের সঙ্গে বৈদ্যুতিক আলোর মশাল ছিল (Electric Torch)। তারই সাহায্যে আমরা বেশ ভালো করে ছবিগুলি দেখেছিলুম। যাঁদের সঙ্গে আলো থাকেনা,

গুহায় বুদ্ধপত্নী গোপার চিত্র

তাঁরা যদি দুটাকা খরচ করেন, তাহ'লে অজন্তার প্রহরীরা দর্পণে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করে অন্ধকার গুহার মধ্যে ছবিগুলিকে আলোকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। বৈদ্যুতিক আলোকে গুহা আলোকিত ক'রে তুলবারও ব্যবস্থা নিজাম সরকার করে রেখেছেন, কিন্তু, সে একটু ব্যয়সাধ্য। পনেরো টাকা জমা দিলে তবে কর্ত্তৃপক্ষ অজন্তার প্রত্যেক গুহাটি বিজলী দীপ্তিতে আলোকিত ক'রে দেবার ব্যবস্থা করেন।

আমরা যেদিন অজন্তায় গেছলুম, সেদিন সৌভাগ্যক্রমে অজন্তার যিনি রূপ-রক্ষক বা শিল্প-ভাণ্ডারী (curator) শ্রীযুক্ত সৈয়দ আহমেদ, একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা, একজন উচ্চবংশীয়া মারহাটি মহিলা ও একজন মুসলমান ভদ্রলোককে নিয়ে অজন্তাগুহা দেখাতে এসেছিলেন। মহিলাদ্বয় রূপসী, বিদুষী ও তরুণী। মুসলমান মহিলাটি 'পর্দ্দানসীন' একেবারেই নন, মারহাটি মহিলাটির তো ও আপদ নেইই, কাজেই তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে আমাদের কোনও বাধা হয়নি। সেই জন্য অজন্তা পরিদর্শনের সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল খুব ভালো!

তাঁরা অনর্গল ইংরাজীতে কথা বলছিলেন এবং হাস্য পরিহাসে ও চিত্রসন্দর্শনজনিত উল্লাসময় কলরবে অজন্তার নিভৃত নিস্তব্ধ গুহারাজ্যকে যেন জীবন্ত ও মুখরিত করে তুলেছিলেন। তাঁদের পরেই কয়েকজন ইংরাজ মহিলা এবং রাজকর্ম্মচারী এলেন। একজন ফরাসী পর্য্যটকের সঙ্গেও দেখা হ'ল। তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে অজন্তা সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন এবং তাঁর নিজের এ সম্বন্ধে মতামত উচ্ছ্বসিত হয়ে জানালেন।

১নং গুহার চিত্র—নৃপসুতার তনুত্যাগ। (ষড়দন্তজাতক)

১নং গুহার ছত্রতলের চিত্র—পারস্য দূতের সম্বর্দ্ধনা

সপরিবারে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোকও অজন্তার যাত্রী হয়েছিলেন সেদিন, এবং জলধরদাদার চেয়েও অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ এক মারহাট্টি যাত্রীকেও দেখলুম সেই পাহাড়ে উঠেছেন—যেন তাঁর মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে—অতীত ভারতের বিগতসমৃদ্ধির প্রাচীন গৌরব নিদর্শনগুলি জীবনে এই শেষ বারের জন্য দেখে তিনি পরলোকের পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন।

এক নম্বর গুহা দেখতেই আমাদের অনেকক্ষণ সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। 'দর্শকের লিপি'তে (visitors book) আমাদের মতামত লিখে যখন এক নং গুহা থেকে আমরা নিষ্ক্রান্ত হলুম, তখন আমাদের খেয়াল হ'লো যে, মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজকেই অজন্তার ২৯টি গুহার পর্য্যবেক্ষণ শেষ করে আমাদের জালগাঁও ফিরতে হবে—এখনও 'ইলোরা' যাওয়া বাকী আছে! এতক্ষণ আমরা যেন সেই বিগত বৌদ্ধযুগের স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে আত্মহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। মনে হচ্ছিল যেন সেই দুহাজার বছর আগে একদিন এখানে আমরা বাস ক'রে গেছি। এ যেন আমাদের কোন্ এক জন্মান্তরের পূর্ব্বস্মৃতি বিজড়িত আবাসভূমি!

একনম্বর গুহা থেকে বেরিয়ে আমরা দু'নম্বর গুহার মধ্যে প্রবেশ করবার সময় স্থির করলুম যে আর এত পরিপূর্ণরূপে উপভোগ ক'রে দেখতে গেলে একদিনে ২৯টি গুহা দেখা চলবেনা, ২৯দিন লেগে যাবে। অতএব একটু দ্রুতবেগে দর্শন শেষ ক'রতে হবে।

অজন্তা গুহাবলীতে যে 'এক' 'দুই' করে ধারাবাহিক নম্বর দেওয়া আছে সেগুলি পরের পর দেওয়া হয়েছে কেবল মাত্র দর্শকদের সুবিধার জন্য। শৈল-সোপান উত্তীর্ণ হয়ে পর্ব্বতশিখরদেশে পৌঁছাবামাত্র যে গুহাটি প্রথম দর্শকদের সামনে পড়ে সেইটিকেই একনম্বর দিয়ে তার পরেরটিকে দুই—তার পরেরটিকে তিন—এমনি করে পাশাপাশি গুহাগুলির পরের পর নম্বর দেওয়া হয়েছে। যুগ-বিভাগ বা প্রাচীনত্বের হিসাব করে এই সংখ্যানির্দ্দেশ হয়নি। যেমন 'অজন্তা' গুহার
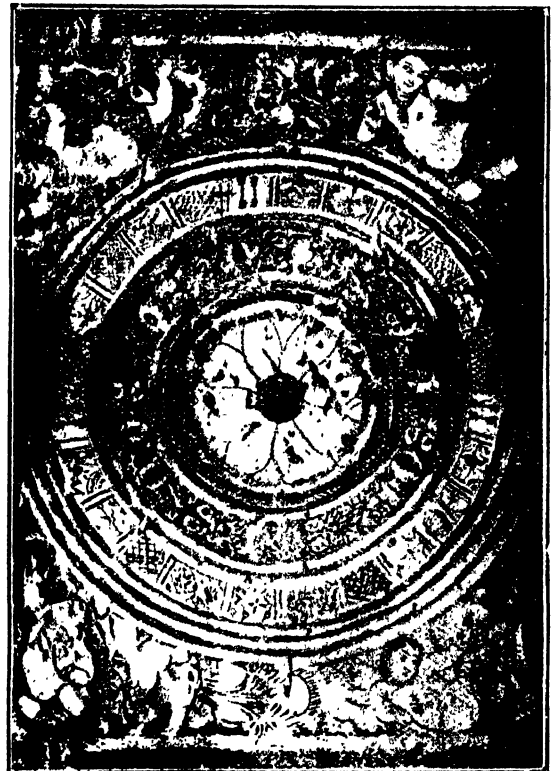
২নং গুহার ছত্রতলের মধ্য-চিত্র

যেটিতে একনম্বর পড়েছে—সেটি অজন্তার প্রথম গুহা নয়—সেটি বরং সর্ব্বশেষ গুহা বলা যেতে পারে, কারণ তার নির্ম্মাণ-কাল সপ্তম শতাব্দী ব'লে নির্দ্ধারিত হয়েছে।

বহুকাল এই অজন্তার ঐশ্বর্য্য অনাবিষ্কৃত পড়ে ছিল। কারণ চারি দিক জঙ্গলময়-পর্ব্বতে বেষ্টিত এমন একটি নির্জ্জন গুপ্তস্থানে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল যে বাইরের লোকের পক্ষে সহজে এর সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিলনা। বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধ-প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনশূন্য পরিত্যক্ত অজন্তা যেন অভিমান ভরে লোক-লোচনের অন্তরালেই অজ্ঞাতবাস ক'রছিল। মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে কৌতুহলী ইংরাজের আগ্রহ, উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসার ফলে অজন্তা আবার যেন নূতন ক'রে আবিষ্কৃত হ'য়েছিল।

৬নং গুহার সম্মুখস্থ বারান্দার চিত্রিত ছাদ-তল

১৮১৯ খৃঃ অব্দে একদল ইংরাজ সৈনিকের ইন্ধ্যাদ্রি পর্ব্বত অভিযান কালে সর্ব্বপ্রথম অজন্তার অস্তিত্ব জানতে পারা যায়। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে সার জেম্‌স্ আলেক্‌জ্যাণ্ডার বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর মুখপত্রে অজন্তা গুহার বিবরণ ও চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের মুখপত্রে অজন্তার আর একটি বিবরণ প্রকাশিত হ'য়েছিল। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্লেক্ 'বোম্বে কুরিয়ার' পত্রে অজন্তা সম্বন্ধে একটি বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেন। তার পর ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ফায়গুসান্ সাহেব বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অজন্তার বিশেষত্ব, চমৎকারিত্ব ও অসাধারণত্বের উল্লেখ করে তার একটি সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। এই রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির চেষ্টায় ও অনুরোধে ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মেজর রবার্ট গিলকে অজন্তার চিত্রাবলীর নকল তুলে আনবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে অজন্তার যে চিত্রাবলী সংগ্রহ করেছিলেন, ১৮৬৬ সালের একটি প্রদর্শনীতে সেগুলি বিলাতে দেখানো হয়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ আগুন লেগে প্রদর্শনীটি পুড়ে যাওয়ায় সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। কেবল যে পাচখানি ছবি শেষে গিয়ে পড়ায় প্রদর্শনীতে পাঠানো হয়নি

১২ নং গুহার অভ্যন্তর দৃশ্য (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত)

সেই পাঁচখানি রক্ষা পায়। এই পাঁচখানি ছবি সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়মের ভারতীয় কলাবিভাগে এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।

পরে ফারগুসান্ সাহেবের আগ্রহে ও চেষ্টায় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বোম্বাই আর্ট স্কুলের যিনি প্রধান অধ্যক্ষ, মিঃ জর্জ্জ গ্রিফিথ্‌স্‌কে অজন্তার চিত্রাবলীর পুনর্ব্বার নকল নেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তিনি দশ বৎসর ধ'রে তাঁর কয়েকজন ছাত্রের সাহায্যে কার্য্য করে প্রায় ১৪৫ খানি ছবির নকল তুলেছিলেন। কিন্তু, আবার দৈবদুর্ব্বিপাকে আগুন লেগে তাঁর প্রায় ৮৭ খানি ছবি পুড়ে গেছল! বাকী ৫৬ খানি এখন বিলাতের ভিক্টোরিয়া ও এ্যালবার্ট মিউজিয়মের ভারতীয় বিভাগে রক্ষিত হ'য়েছে, এবং দুখানি বোম্বায়ের আর্ট স্কুলের তত্ত্বাবধানে আছে। এই কয়খানি ছবি নিয়েই ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের অজন্তা সম্বন্ধের প্রসিদ্ধ বইখানি প্রকাশিত হ'য়েছিল।

তার পর ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে লেডী হেরীঙ্‌হ্যাম্ তিনবার বিলাত থেকে এসে 'অজন্তা' দেখে গিয়েছিলেন ও ছবি এঁকে নিয়ে গেছলেন। ১৯১৫ সালে তাঁর বিখ্যাত বই "অজন্তা ফ্রেস্কোস্' প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১৪ সাল থেকে নিজাম সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অজন্তাগুহা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ ক'রে—ভারতের অতীত গৌরবের এই বিরাট নিদর্শনটিকে ধ্বংসের হাত থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। বহু অর্থব্যয় ক'রে তাঁরা ইটালীর দু'জন সুদক্ষ প্রাচীর-চিত্র রক্ষণাভিজ্ঞকে আনিয়ে অজন্তার ছবিগুলির আয়ু বৃদ্ধি করিয়েছেন। ১৯১৯।২০ সালে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী পণ্ডিত ও প্রাচ্য তত্ত্ববিশারদ মুস্যেঁ ফুশেকে তাঁরা প্রচুর পারিশ্রমিক দিয়ে দু' বৎসরের জন্য এখানে আনিয়েছিলেন। অজন্তার প্রত্যেক ছবির ব্যাখ্যা, তার শিল্প-পদ্ধতি ও ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত একটি বিশদ বিবরণ তাঁরা শীঘ্রই প্রকাশ ক'রছেন। তাতে অজন্তার চিত্রগুলিও অবিকল যথাযথ রংএ মুদ্রিত করে দেবারও ব্যবস্থা হ'য়েছে শুনলুম।

১৭ নং গুহার বারান্দার চিত্রিত ছাদতল

১৭ নং গুহার বারান্দার দেওয়ালে চিত্রিত গন্ধর্ব্ব অপ্সরা প্রভৃতি বিমানচারীগণ (দক্ষিণে বিখ্যাত বেণুবাদিনীর চিত্র দ্রষ্টব্য)

অজন্তার সবচেয়ে পুরাতন গুহা হ'চ্ছে ৯নং ও ১০নং। এ দুটি আনুমানিক খৃঃ পূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বা তৎপূর্ব্বে নির্ম্মিত হ'য়েছিল।

এবং, সবচেয়ে শেষে তৈরী হ'য়েছিল ১নং ২নং ও ২৬নং গুহা। এগুলি আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। এর পর থেকেই ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-প্রভাব দ্রুত বিলুপ্ত হ'য়েছিল।

প্রত্যেক গুহার প্রবেশ দ্বার দেখলুম পৃথক। একটি গুহা থেকে আর একটি গুহায় যাবার কোনও সুড়ঙ্গপথ নেই। পুরাতন গুহাগুলির প্রবেশ দ্বার ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-কলার অপূর্ব্ব নিদর্শনে অলঙ্কৃত। হস্তী, নাগরাজ, দ্বারপাল প্রভৃতির বিরাট মূর্ত্তি খোদিত রয়েছে। প্রাচীর গায়ে ও

অজন্তাগুহার মধ্যে কয়েকটির ভিতরে ও কয়েকটির বাহিরে প্রাচীন-লিপি খোদিত রয়েছে দেখা গেল।

একটির পর একটি করে আমরা অজন্তার ২৯টি গুহা দেখা শেষ করলুম যখন তখন সূর্য্য পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। প্রত্যেক গুহার বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, এবং আবশ্যকও নেই। কারণ, সব গুহাগুলিই উল্লেখযোগ্য নয়, আমি শুধু কয়েকটি প্রধান গুহার চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য কলার কিছু কিছু উল্লেখ করে আমার অজন্তার বিবরণ শেষ করবো।

১৭ নং গুহার বারান্দার দেওয়ালের চিত্র
(রাজপ্রাসাদের বাহির ও অন্তঃপুরের দৃশ্য)

চিত্র হিসাবে শুধু ১নং ২নং ৯নং ১০নং ১৬নং ও ১৭নং গুহা—মাত্র এই ছ'টি উল্লেখ-যোগ্য!

এক নম্বর গুহায় বৌদ্ধ জাতকের যে সব চিত্র আছে তার উল্লেখ পূর্ব্বেই করেছি। কেবল একটি ছবির কথা এখনও বলা হয়নি। সেটি বারান্দার ছত্রতলে দেখতে পাওয়া যায়। একটি তুর্কী বা পারস্য জাতীয় সম্ভ্রান্ত দম্পতী সিংহাসনে বসে আছেন। পদতলে পূজাসম্ভার নিয়ে দুটি ভৃত্য উপবিষ্ট। দু'পাশে দুজন পরিচারিকা। বিশেষ-জ্ঞেরা এ ছবিখানির নাম দিয়েছেন "পারস্য-দূত"।

চন্দ্রাতপের চিত্রে ফুল, লতাপাতা, পশুপক্ষী, নরনারী প্রভৃতি। অজন্তার সমস্ত ছবিগুলিতে মোটে পাঁচটি রং ব্যবহার করা হ'য়েছে। পাহাড়ের ভিতর থেকে কেটে বার করা সেই পাথরের দেয়ালে ও ছত্রতলে প্রথমে তুঁষ ও গোবর মাটি লেপে তার উপর—পঙ্কের কাজ করা হ'য়েছিল। তার পর সেই দেয়ালের গায়ে ও ছত্রতলে শিল্পীরা পাঁচটি রংয়ের সাহায্যে বহুবর্ণ চিত্র এঁকেছেন। কোথাও তেলের রং ব্যবহার হয়নি। সমস্ত রংই জলেগুলে আঁকা। অথচ আজ এই দু হাজার বছর পরেও দেখে মনে হয় শিল্পী যেন এই মাত্র আঁকা শেষ ক'রে উঠে গেছেন! সে রংয়ের জেল্লা কোনো কোনো ছবিতে এখনও এমন টাট্‌কা রয়েছে!

২ নম্বর গুহাটি এক নম্বরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট। অজন্তার সব গুহা সমান নয়। ২ নম্বর গুহাতেও বৌদ্ধ জাতকের ছবি আছে, যেমন—ক্ষণিত্ববাদী জাতক, হংসজাতক প্রভৃতি। তাছাড়া, বুদ্ধদেবের বর্ত্তমান জন্মেরও বহু বিবরণ চিত্রিত আছে। যেমন বুদ্ধ জননী মায়াদেবীর সেই ষড়দন্তী শ্বেত হস্তীর স্বপ্ন দর্শন। বুদ্ধের জন্ম, সপ্ত-সোপান প্রভৃতি। অজন্তার বিখ্যাত ভগ্নদূতের ছবিটি এই দু'নম্বর গুহায় আছে। স্তম্ভগাত্রে লীনা তরুণীর চিত্রটিও এখানে আছে। দু'নম্বর গুহার সবচেয়ে সুন্দর ছবি হ'চ্ছে কোষমুক্ত তরবারী করে সম্ভবতঃ কোনও নৃপতি এক অপরাধিনী সুন্দরীকে হত্যা ক'রতে উদ্যত হ'য়েছেন। সুন্দরী নতজানু হ'য়ে রাজপদে

মস্তক লুটিয়ে দিয়ে যুক্তকরে নৃপচরণ স্পর্শ করে সম্ভবতঃ ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছে। নিকটেই একটি মেয়ে নতমুখে গালে হাত দিয়ে বসে আছে যেন বিষাদের জীবন্ত প্রতিমা! এ ছাড়া আরও দুটি নারী ও একটি পুরুষের চিত্র আছে এই ছবির মধ্যে, তাদেরও ভাবভঙ্গী অপূর্ব্ব!

প্রাচীনতম গুহাদ্বয়ের মধ্যে ৯নং চৈত্য-গুহার উল্লেখযোগ্য চিত্র হচ্ছে রাখালের দল উল্লাসে ছুটে চলেচে তাদের

১৬নং গুহার প্রসিদ্ধ চিত্র হচ্ছে—"নৃপসুতার তনুত্যাগ!" গুহাভ্যন্তরের বামদিকের দেওয়ালে এই অপূর্ব্ব চিত্রটি আঁকা আছে। শিল্পীর রূপদক্ষতার এমন নিপুণ পরিচয় অতি অল্পই চোখে পড়ে! এখানকার ছত্রতলের ও ভিত্তিগাত্রের অলঙ্কার চিত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য। ভল্ল ও ধনুর্ধারী কিরাত ও বনচর বর্ব্বর-দল। হরিণ, পাখী, বানর, হাতী প্রভৃতি বন্য জন্তু, তরুলতা, ফল ফুল-নদী পর্ব্বত, ঝরণা, কিন্নরী

১৭ নং গুহার ভিত্তিগাত্রের চিত্র (রাণীর প্রসাধন)

১৭ নং গুহার একখানি প্রসিদ্ধ চিত্র
মাতা ও পুত্র

গোপালের পশ্চাতে। স্তম্ভগাত্রে প্রভু বুদ্ধের ঋজু মূর্ত্তিগুলিও প্রাচীন চিত্রকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যেতে পারে!

চৈত্য-গুহাকয়টির মধ্যে ১০নং গুহাটিই হ'চ্ছে সবচেয়ে বড়! এখানেও সারি-সারি স্তম্ভগাত্রে প্রভু বুদ্ধের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। কিন্তু, পশ্চাদ্দিকের প্রাচীর গাত্রে ভীল প্রভৃতি আদিম জাতিদের যে অপরূপ সুষমামণ্ডিত চিত্রশ্রেণী আছে সেটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য!

অপ্সরা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, শঙ্খ-পদ্ম, চক্র, মৎস্য, দ্বারপাল, কীর্ত্তিমুখ প্রভৃতি যে কোনও চিত্রেই একটা শিল্প-বৈশিষ্ট্য ও কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অজন্তা চিত্রাবলীর মধ্যে রাজা, রাণী, রাজকুমারী সেনাপতি, মন্ত্রী, দাসদাসী, নর্ত্তকী, পরিচারিকা, ভৃত্য, এব উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত নরনারী, ধনী বণিক, ভিক্ষু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি

আকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, উত্তরীয়, বক্ষবাস, কটিবাস, অলঙ্কার, মুকুট, সিঁথী, কেয়ূর, কুণ্ডল, অঙ্গদ, বলয়, কণ্ঠহার, মুক্তাজাল, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, মেখলা, কাঞ্চী, বাজুবন্ধ, মণিবন্ধ, কটিবন্ধ, নূপুর প্রভৃতি অসংখ্য বিভিন্ন প্রকার বেশ ও অলঙ্কারের এত বেশী ইতর বিশেষ আছে যে পদমর্যাদায় কে ছোট—কে বড়—অতি সহজেই তা জানতে পারা যায়। অজন্তার চিত্রিত নরনারীর অঙ্গের অলঙ্কারগুলি এমন সুদৃশ্য, সুন্দর ও শোভন যে এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা

১৭ নং গুহার ভিত্তিগাত্রের চিত্র (বিশ্বান্তর জাতক)

চলে না যে সে যুগের লোকেদের রুচি বেশ সুচারু ছিল এবং তাঁরা সকলেই কলাবিদ্ ও সৌখীন মানুষ ছিলেন।

১৬নং গুহার 'সুতসোম' 'নন্দের দীক্ষা' প্রভৃতি 'জাতক' ছাড়া ভগবান বুদ্ধের এবারকার জন্ম, ঋষি অসিত কর্তৃক তাঁর কোষ্ঠীপত্র পাঠ, বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা, তাঁর সাধনা, ধ্যান, তাঁর রাজগৃহে প্রথম পদার্পণ, যুবরাজ রূপে নগর প্রদক্ষিণ কালে তাঁর প্রথম ব্যাধি, দৈন্য, জরা ও মৃত্যুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ এবং সুজাতার নৈবেদ্য গ্রহণ, প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৭নং গুহার প্রধান বিশেষত্বই হচ্ছে এর চিত্র-প্রাচুর্য্য। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—"সংসারচক্র"। সিংহাসনে বা পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট কোনও সম্ভ্রান্ত দম্পতী, সখীগণে পরিবৃতা ছত্রতলে দণ্ডায়মানা একজন রাণী, এবং বাতায়নে বা গবাক্ষপথে উঁকি মারছে কৌতূহলী দুটি মেয়ে।

১৭ নং গুহার আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এর বিমানচারী গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরাদের চিত্র। শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান

১৯ নং গুহার (চৈত্য) প্রবেশদ্বার ও সম্মুখের কারুকার্য্য

এই চিত্রাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে "বেণু-বাদিনী"র চিত্র। এ ছাড়া 'ষড়্দন্তজাতক' 'মহাকপি জাতক' 'বিশ্বান্তর জাতক' প্রভৃতি একাধিক জাতকের কাহিনীও এখানে চিত্রিত আছে। ১৭ নং গুহার যে চিত্রদুটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—সে দুটি হচ্ছে "মাতা ও পুত্র" এবং "ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব"! এ গুহায় অঙ্কিত 'শরভ জাতক' 'মাতৃ পোষক জাতক' 'মৎস্য জাতক' 'শ্যামা জাতক' প্রভৃতি কাহিনীর চিত্রগুলিও চমৎকার। 'সিংহল অবদান' এ

গুহার আর একটী উল্লেখযোগ্য ছবি। এই ছবিতে বিজয় সিংহের সিংহল জয়ের কাহিনী চিত্রিত হ'য়েছে। "রাণীর প্রসাধন" এ গুহার আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি।

অজন্তা চিত্রাবলীর অনুপম সৌন্দর্য্যের সম্যক বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে আমি সে অসম্ভবের চেষ্টা থেকে বিরত হলুম।

অজন্তার ভাস্কর্য্য শিল্পের বিশেষত্ব চোখে পড়ে ১নং ৪নং ৭নং ১৬নং ১৯নং ২০নং ২৪নং ও ২৬নং এই আটটি গুহায়। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের জন্য সাঁচী, ভারুত, অমরাবতী প্রভৃতি স্থান আজ জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। কিন্তু অজন্তা গুহাতেও যে ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায় সেকথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি! গুপ্তযুগে অর্থাৎ ৩২০-৪৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্য্য যে উন্নতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল, সে পরিচয় অজন্তা গুহা দেখতে গেলেই দর্শকের মনে না উঠেই পারে না। এক নম্বর গুহার বারান্দার উপরের দিকে পাষাণ ভেদ করে যে সচিত্র ঝালর উৎকীর্ণ করা আছে, যার মধ্যে এই মানব জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনা;—অরণ্য যুগের জীব জন্তুর অবস্থা থেকে গেঁয়ো বর্ব্বর নগের—শহর এবং রাজ-প্রাসাদের জীবনযাত্রা পর্য্যন্ত অতি সুন্দর ভাবে খোদিত করা আছে—ভাস্কর্য্য শিল্পীদের কাছে তা আজও বিস্ময়কর ব'লে মনে হয়!

৪নং গুহার 'পদ্মপাণির' যে অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তিটি পাহাড় কুঁদে বার করা হ'য়েছে—উন্নত ও শ্রেষ্ঠতম তক্ষণ শিল্পের অমন সুষমা-মণ্ডিত সুচারু নিদর্শন খুব অল্পই চোখে
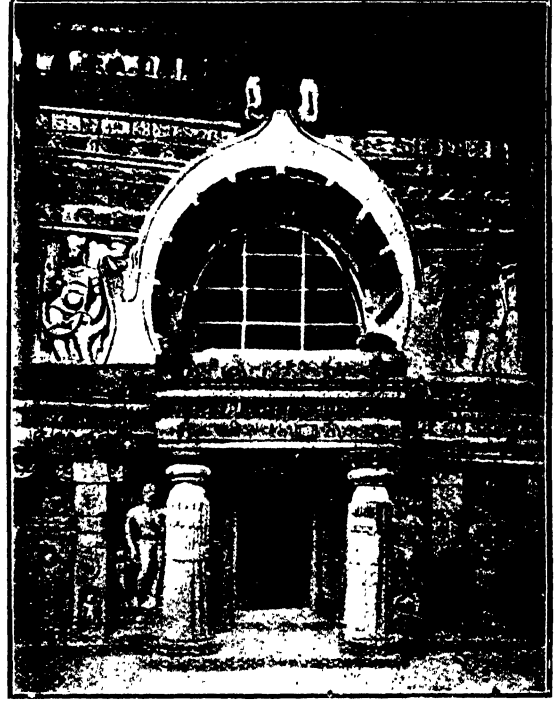
১৯ নং গুহার সম্মুখের অতুলনীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যকলা
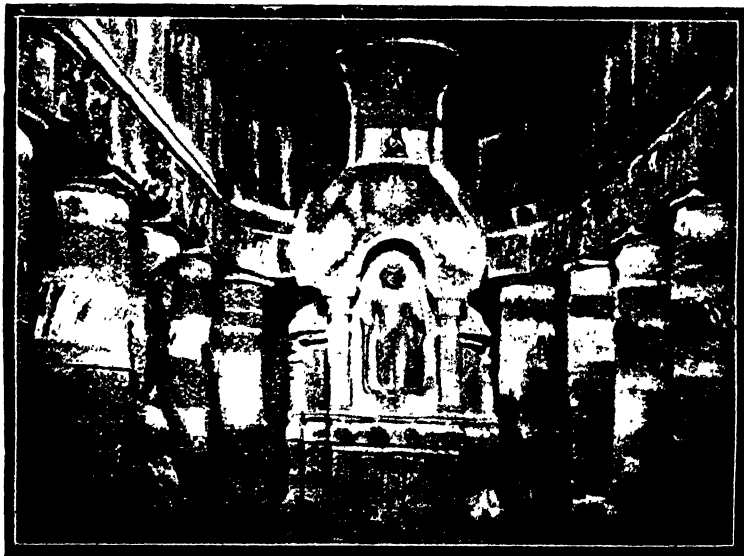
পড়ে! ৭নং গুহায় পাথরের বুকে পদ্মকলি ও প্রস্ফুট শতদলের যে অনবদ্য লীলা বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, মানস সরোবরে ইন্দিরার চরণ-কমলও বুঝি তত সুন্দর নয়। ১৬নং গুহায় নাগ দম্পতীর প্রতিমূর্ত্তি ভাস্কর্য্য-শিল্পের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। ১৯নং গুহাটি যেন কেবলমাত্র ভাস্কর্য্য-কলার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যই সৃষ্টি করা হ'য়েছিল। এই গুহার চারিদিকেই ভাস্করের করধৃত লৌহ-ফলক দুর্ভেদ্য পাষাণকেও যেন অবলীলায় ইচ্ছামতো শিল্পীর কল্পনার রূপ দিয়েছে। ২৪নং গুহার বারান্দার ধারক-বাহু (Supporting

১৯ নং গুহার অভ্যন্তর (স্তম্ভ ও ছত্রের কারুকার্য্য ও স্তূপের বিচিত্র গঠন)

Bracket) রূপে যে আকাশ বিহারিণীদের মূর্ত্তি আছে তার সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। ২৬নং গুহাটিও ১৯নং গুহার মতই বিবিধ তক্ষণ কলায় আপাদমস্তক মণ্ডিত। কিন্তু এ গুহার ভাস্কর্য্য-পদ্ধতি, ধরণ ধারণ ও ভঙ্গী ১৯নং গুহার সঙ্গে একেবারেই মেলে না! এটা চৈত্য-গুহা। এর অভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য সব যেন একটু বিরাট রকমের! 'বুদ্ধের নির্ব্বাণ' ও 'বুদ্ধের পরীক্ষা'—পাষাণে খোদিত এই দুটী মূর্ত্তি শিল্প সর্ব্বাগ্রে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত বিশাল বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি শায়িত অবস্থায় রয়েছে—গুহার বামদিকের সমস্ত দেয়ালটি প্রায় জুড়ে! কিন্তু কি সুন্দর পরিমাপজ্ঞান ছিল সেই দ্বি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় শিল্পীদের—
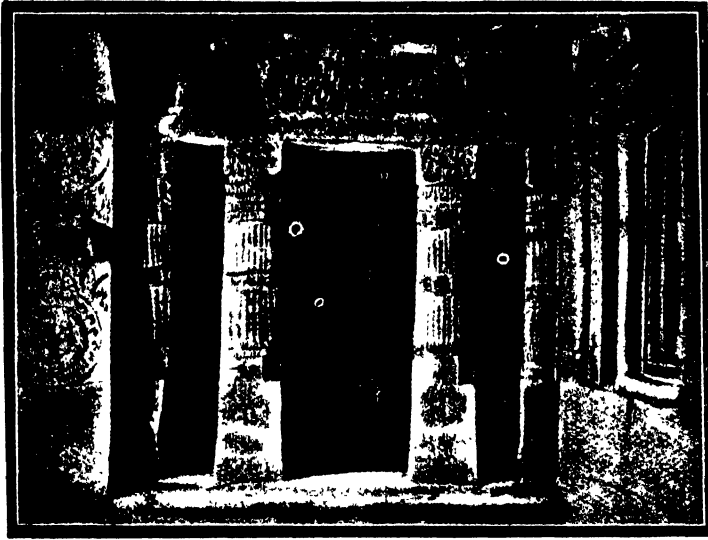
২৩ নং গুহার অপরূপ ভাস্কর্য্য শিল্প

যে এই বিরাট প্রস্তর পর্ব্বেও কোনোটিই কোথাও এতটুকু বেমানান ঠেকে না! এই শায়িত বিশাল বুদ্ধ-মূর্ত্তির তলদেশে শ্রীভগবান বুদ্ধের অসংখ্য শিষ্য-সেবক, ভিক্ষুযতি, সন্ন্যাসী, গ্রামবাসী, রাজরাণী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর নর নারীর একত্র অবস্থান এমন সুকৌশলে সন্নিবেশিত করা হ'য়েছে যে এই ভাস্কর-শিল্পীর প্রতিভার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন না ক'রে থাকা যায় না।

স্থাপত্যকলার দিক দিয়ে পূর্ব্বোক্ত 'চৈত্য-গুহা' চারিটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া 'বিহার'-গুহা'র মধ্যে ১নং ২নং ৪নং ৬নং ৭নং ১২নং ১৬নং ও ২০নং এই আটটি গুহাও দ্রষ্টব্য। ভারতীয় স্থাপত্যকলার বিবর্ত্তন বহু যুগ ধ'রে সাধিত হ'য়েছে। দেশকালের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন রাজাদের সময় ভিন্ন ভিন্ন যুগ, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রভাবে এ দেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্প এমন এক একটা পৃথক রূপ, পৃথক ভঙ্গী ও পৃথক ধারা অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পেয়েছে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা সেগুলি সহজে সনাক্ত করা যেতে পারবে বলে বিভিন্ন নামে তার শ্রেণী বিভাগ করে দিয়েছেন, যেমন 'জৈন' 'বৌদ্ধ' 'হিন্দু' বা 'ব্রাহ্মণ', 'যাবনিক' (Saracenic) আর্য্য-যাবনিক (Indo-Saracenic) 'মথুরা' 'গান্ধার' 'গুপ্ত' 'চালুক্য' প্রভৃতি। গুপ্ত-যুগের স্থাপত্য-শিল্প নির্দ্দেশের জন্য কানিংহাম সাহেব যে ছয়টি লক্ষণ বা অভিজ্ঞানের উল্লেখ করে গেছেন সেগুলি জানা থাকলে একজন আনাড়ীও অতি সহজেই গুপ্ত-যুগের স্থাপত্য শিল্পকে সনাক্ত করতে পারবে! সে ছয়টি চিহ্ন হ'চ্ছে—

প্রথম—চূড়াহীন সমতল ছাদ।

দ্বিতীয়—দরজা বা জানালার উপরকার ঝনকাঠ বা পাথরের দ্বারপিণ্ডী উভয় পার্শ্বস্থ বাজু অতিক্রম করে দু'ধারেই খানিকটা করে বেড়ে থাকা।

তৃতীয়—প্রবেশ দ্বারের দুই দিকে গঙ্গা যমুনার প্রতিমূর্ত্তি খোদিত থাকা।

চতুর্থ—মূল গৃহটির চারিদিক বেষ্টন করা স্তম্ভ-শ্রেণী ও তদুপরি মূল গৃহের ছাদের অপেক্ষা নিম্নতর ছাদ সন্নিবেশিত!

পঞ্চম—বিশাল চতুষ্কোণ শীর্ষযুক্ত স্তম্ভ ও তদুপরি বৃক্ষতলে অর্দ্ধাসীন সিংহদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত।

ষষ্ঠ—স্তম্ভ শিরে গুল্ বসানো অলঙ্কারের অদ্ভুত পরিকল্পনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্শ্ব-শৃঙ্গ-সংযুক্ত অসংখ্য মৌচাকের মতো!

প্রাক্ গুপ্ত-যুগের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-কলার প্রধান লক্ষণই হচ্ছে, তার বিরাটত্ব। তাছাড়া, তার সোপান-শ্রেণী, স্তম্ভ-শ্রেণী, দ্বারের চৌকাঠ এবং উচ্চ ভিত্তিও লক্ষ্য করবার বিষয়। পাহাড় কেটে বা পাথর কুঁদে মূর্ত্তি ও গৃহ-নির্ম্মাণের চেষ্টা, নির্ভুল স্পষ্ট রেখাঙ্কন, সমতল ক্ষেত্রে সুসম্পূর্ণ কাজ, সাধাসিধে ভঙ্গী, সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারের বাহুল্য বর্জ্জিত,

..কাটা ও লতাপাতার কাজ-শূন্য এবং বেশী রকম খুঁটি-..টি দেখাবার চেষ্টাহীন!

ভারতীয় স্থাপত্যকলার একটা নিজস্ব রূপ আছে যা ভারতেরই মৌলিক সম্পত্তি। কোনও দেশের কাছে তা ধার-করা নয়। গুপ্ত-যুগ ও প্রাক্-গুপ্ত-যুগের স্থাপত্য-শিল্পের যে অভিজ্ঞানের কথা আগে বললুম, অজন্তার স্থাপত্য-কলায় এতদুভয় যুগেরই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। শত শত বৎসর ধরে ভারতীয় স্থাপত্যকলার যে ক্রমোন্নতি ও

২৬ নং গুহার সম্মুখের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্প

বিবর্ত্তন সাধিত হ'য়েছে অজন্তার প্রত্যেক গুহাটি যেন তার ইতিহাস বক্ষে নিয়ে সযত্নে রক্ষা করছে!

অজন্তার চৈত্য ও বিহার-গুহার নির্ম্মাণ-পদ্ধতি ও গঠন-প্রণালী এবং তার কারুকার্য্য ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের গৌরব-কেতন-স্বরূপ। ৯নং চৈত্য-গুহাটি অজন্তার মধ্যে স্থাপত্যকলা হিসাবে সব চেয়ে প্রাচীন বলে স্থির হয়েছে। এ গুহাটি চতুষ্কোণ। স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা মধ্যভাগ ও পার্শ্বভাগ বিভক্ত। স্তম্ভগুলি অষ্টকোণ-বিশিষ্ট। শীর্ষদেশে ও মূলদেশে কোনও 'মুকুট' (capital) বা 'আসন' (Base) নাই। চৈত্য-গুহার একটা প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে তার অভ্যন্তরস্থ বৌদ্ধ-স্তূপ ও বহির্ভাগের সম্মুখস্থ বিরাট অশ্বখুর-তুল্য তোরণাকৃতি বাতায়ন। এটি খুব উচ্চে গুহা-প্রবেশ-পথের উপর দিকে থাকে। এই পথেই গুহার মধ্যে আলোক প্রবেশ করে। চৈত্য-গুহার মধ্যভাগের ছাদের অভ্যন্তর দেশ অন্তঃবর্ত্তুলাকার বা গম্বুজ-গর্ভের মত খিলান করা। কিন্তু স্তম্ভ-বিভক্ত পার্শ্ব-চতুষ্টয়ের ছাদের অভ্যন্তর-ভাগ সমতল। সে সময় কারুকার্য্য-খচিত কাঠের কড়ি-বরগা ও জানালা-দরজার প্রচলন ছিল, জানা যায়। ১০নং গুহাটি ৯নং গুহার
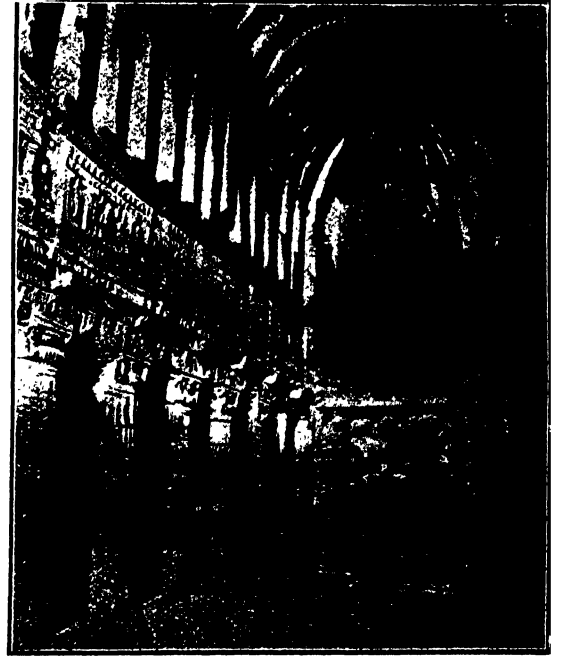
চৈত্য গুহার অভ্যন্তর

(স্থাপত্য-শিল্প ও ভাস্কর্য্য-কলার অপূর্ব্ব সমাবেশ)

অপেক্ষা আকারে বড়, কিন্তু গঠনপ্রণালী একই প্রকার কেবল স্তূপটি অন্য রকম। এ গুহার পার্শ্ব-চতুষ্টয়ের সমতল ছাদে পাথরের কড়ি বরগা কিন্তু মধ্যভাগের খিলান-করা ছাদে কাঠের কড়ি-বরগা, দেখে মনে হয়, কাঠের বদলে পাথরের ব্যবহার এইখান থেকে সুরু হ'য়েছে। ১৯নং ও ২৬নং চৈত্য-গুহা-দুটি আবার অন্য প্রকারের। পূর্ব্বোক্ত চৈত্য-গুহা দুটি হীনযানী বৌদ্ধদের এবং এ দু'টি গুহা মহাযানী বৌদ্ধদের। এগুলি ঠিক চতুষ্কোণ নয়। ১৯নং গুহাটি বিশেষজ্ঞদের মতে বৌদ্ধ-শিল্প-নৈপুণ্যের একেবারে চরম

নিদর্শন! এই গুহার প্রবেশ-পথেও কারুকার্য্য-খচিত স্তম্ভ-যুক্ত একটি গাড়ী-বারান্দা আছে। সম্মুখভাগ এবং ভিতর ও বাহির আগাগোড়াই সুচারু-কারুকার্য্য-খোদিত। সমস্তই পাথর কেটে তৈরী, কাঠের সম্পর্ক নেই কোথাও। স্তম্ভ-গুলির 'আসন' চতুষ্কোণ কিন্তু উর্দ্ধভাগ খানিকটা অষ্টকোণ, খানিকটা একেবারে গোল, খানিকটা বা স্ক্রুপের মতো প্যাঁচ-কাটা। স্তম্ভের গায়ে মধ্যে মধ্যে কারুকার্য্যখচিত বন্ধনী বা বেষ্টনী আছে। শীর্ষদেশের 'মুকুটে' বুদ্ধমূর্ত্তি-উৎকীর্ণ-করা এবং 'ধারকবাহু' রূপে বিমানবিহারীদের আকৃতি পরিকল্পিত হ'য়েছে। মহাযানী চৈত্য-গুহার অভ্যন্তরস্থ বৌদ্ধ স্তূপটি

১নং গুহার প্রসিদ্ধ চিত্র দম্পতী

আকারে, গঠনে ও শিল্প-পারিপাট্যে হীনযানীদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। হীনযানী স্তূপে কোনও মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা নেই; কিন্তু মহাযানী স্তূপে আমরা দণ্ডায়-মান ও উপবিষ্ট বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও কিন্নরগণের মূর্ত্তি খোদিত রয়েছে দেখতে পাই। মহাযানী স্তূপের আর-একটা প্রধান বিশেষত্ব দেখলুম—চূড়ার উপরে পরের পর তিনটি ছত্র কুণ্ডলাকার হ'য়ে উঠেছে! হীনযানী-স্তূপ-শীর্ষে বিশেষত্ব-বর্জ্জিত কার্ণিশ!

২৬নং চৈত্য-গুহাটি সর্ব্বশেষ নির্ম্মিত হ'য়েছিল বলে বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন। এ গুহার নক্সা ও নির্ম্মাণ-পদ্ধতি ১৯নং গুহারই অনুরূপ, কেবল কারুকার্য্য ও অলঙ্কারের দিক থেকে অনেকটা দীন। এ গুহার প্রাচীর-গাত্রে যে ভাস্কর্য্য-শিল্প তা যেমনি আকারে বড় বড়, তেমনি তার মোটা মোটা কাজ। এর অভ্যন্তরস্থ স্তূপটির সম্মুখভাগ একেবারে মণ্ডপাকার।

এই অজন্তার চৈত্য-গুহাস্থ বৌদ্ধ স্তূপের গম্বুজাকার শীর্ষদেশ থেকেই ক্রমে দক্ষিণের হিন্দু-মন্দিরের 'বিমান-শীর্ষ' বা গম্বুজাকার চূড়া ও মোগল আমলের 'ডোম' সৃষ্টি হ'য়েছে ব'লে হ্যাভেল্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। এবং চৈত্য-গুহার সম্মুখস্থ তোরণ-বাতায়নের সূচীশীর্ষ খিলান থেকেই মোগল স্থাপত্যের ত্রিকোণ-খিলানের আদর্শ গৃহীত হয়েছে বলে তাঁরা অনুমান করেন।

'বিহার' গুহাগুলির মধ্যে ১৩নং গুহাটিই সবচেয়ে প্রাচীন বলে স্থির হ'য়েছে। তবে গুহাটিতে স্থাপত্য-কলার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনও বিশেষত্ব নেই বলা চলে। ১২নং গুহাটিও খুব প্রাচীন কিন্তু এর মধ্যে স্থাপত্য-শিল্পের প্রাথমিক নিদর্শন কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। ১১নং বিহার-গুহাতে যে স্তম্ভ আছে, বিশেষজ্ঞেরা বলেন এইগুলিই না কি সবচেয়ে প্রাচীন যুগের স্তম্ভ। ৭নং গুহার গঠন-প্রণালী অন্যান্য গুহাগুলি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এটির মধ্যে প্রশস্ত 'হল' নেই। মন্দির চত্বরের মতো এই গুহার সম্মুখে স্তম্ভযুক্ত দু'টি তোরণমণ্ডপ আছে। ৬নং গুহাটির বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি দ্বিতল! অজন্তায় এই একটিমাত্র দ্বিতল বিহার-গুহা দেখতে পাওয়া যায়। বিহার গুহাগুলির মধ্যে ৪নংটিই সবচেয়ে বড় অর্থাৎ প্রশস্ত। কিন্তু, কলা সৌন্দর্য্যে সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাতিলাভ করেছে ১নং গুহা। ২নং বিহার-গুহাটি সকল দিক দিয়েই প্রায় এক নম্বরেরই অনুরূপ; কেবল কারুকার্য্য ও স্থাপত্যশিল্পের দিক দিয়ে অনেক অংশে হীন।

১৬ নং গুহাটী স্থাপত্যকলা হিসাবে বিহার-গুহার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিহারগুহার নক্সা থেকে আরম্ভ করে এর পরিমাপ, স্তম্ভ-সমাবেশ এবং ছত্রতলের পরিকল্পনা স্থাপত্যশিল্পের চরম উন্নতির পরিচায়ক ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই গুহার স্তম্ভগুলি ভারি সুন্দর।

অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে আপাদমস্তক মণ্ডিত। তোরণ-দ্বারে ঐরাবত ও প্রবেশ-পথে নাগরাজ এর শোভা বৃদ্ধি করেছে।

২০ নং বিহার গুহাটিও স্থাপত্যকলার দিক দিয়ে অতুলনীয় বলা চলে। এর সোপানশ্রেণী, বারান্দা, স্তম্ভ-মালা, দেহলী, তোরণ প্রভৃতির গঠন-পরিপাট্য বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

২৬ নং গুহাটি অসম্পূর্ণ। এর নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয়নি। কেন হয়নি, তা জানতে পারিনি। ২৫ নং গুহাটি দেখে বোঝা যায় যে, কি ভাবে এই অজন্তার স্থাপিত বিরাট বৌদ্ধ-কীর্ত্তি পুনরুদ্ধার ক'রে লোকলোচনগোচর করা হয়েছে!

বিহার গুহার প্রত্যেকটির মধ্যে একটি ক'রে বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির জন্য প্রত্যেক বিহার-গুহা-সংলগ্ন এক একটি গর্ভ গুহা আছে। এগুলি ঠিক মাঝের প্রবেশ দ্বারের ঋজু ঋজু বিপরীত দিকে।

অজন্তা গুহার চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-শিল্পের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে আমরা বিস্ময়ে পুলকে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছিলুম! ভারতের অতীত গৌরবের এই বিপুল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে গর্ব্বে ও অহঙ্কারে আমাদের বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠছিল! আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে আবৃত্তি করছিলুম—

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি
শ্যাম কম্বোজে 'ওঙ্কার ধাম'—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি,
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিটপাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর,
আমাদেরি কোনও সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে 'অজন্তায়'!"

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রূপসী অজন্তার মোহ কাটিয়ে যেন আর ফিরে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না!

২৯ নং গুহা থেকে যখন আমরা ফিরছি, অর্থাৎ অজন্তার সর্ব্বশেষ গুহাটি দর্শন করে আসবার সময় যে পথে গেছলুম, সেই পথেই ফিরতে হ'লো ব'লে আবার সকল গুহাগুলিরই সামনে দিয়ে আসতে হ'লো। কাতরভাবে তাদের দিকে শেষ বারের মতো বিদায়-চাওয়া চাইতে চাইতে আবার সেই একনম্বর গুহার প্রান্তে এসে পৌছলুম। সূর্য্য তখন প্রায় পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমরা সকলেই কাতর। অজন্তার সেই ছোট রেস্তোঁরাতে ঢুকে আমরা চারজনে চা রুটি বিস্কুট ও ডিম খেয়ে একটু ধাতস্থ হলুম। রেস্তোঁরার মুসলমান মালিকটি খুব যত্ন করে আমাদের খাওয়ালেন এবং চারজনকে চারখিলি পানও সেজে দিলেন। এইবার অনেকটা সুস্থ হ'য়ে পার্ব্বত্য সোপানশ্রেণী পার হয়ে আমরা মোটরে ফিরে এলুম এবং আমাদের সঙ্গের কলা রুটী ও মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করলুম। পরে বাঘোরা প্রস্রবিণীর জলে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে বেলা পাঁচটা নাগাদ আবার জালগাঁওয়ে ফিরে চললুম।

(ক্রমশঃ)

আত্মদান

শ্রীহরিধন মিত্র

আমার জানিত হ'য়ে, অজানিত হ'য়ে,
যে যেথানে আছো ধরা ভ'রে—
আজি আমি সবাকারে বাসিলাম ভালো
সবাকারে দিয়ে দিনু মোরে!
আমি কারো করিনাকো আশ—
কে বাঁধিবে হৃদয়ের পাশ?
সীমা মাঝে হাঁপাইয়া উঠে যায় প্রাণ
কে রাখিবে বাঁধনেতে ধ'রে?
আজি আমি সবাকারে বাসিলাম ভালো
সবাকারে দিয়ে দিনু মোরে।

কে রাখিবে, কে রাখিবে তারে? কে রাখিবে বল?
গৃহমাঝে নিজ কাছে কাছে;—
সারা ধরা ভরিবারে যে বড় ব্যাকুল
গৃহ ব'লে তার কিছু আছে?
আর, রাখা যাবেই বা কিসে?
সে যে আছে সবখানে মিশে!
অসীম গগনে কভু ঘিরে ফেলা যায়
ক্ষুদ্র এক সূতিকার ডোরে?
আজি আমি সবাকারে বাসিলাম ভালো
সবাকারে দিয়ে দিনু মোরে!

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

৩৫

সলিল আসিলে অভিমানের জ্বালায় মনের সুখ থাকে না, কিন্তু সে না আসিলেও যে অসহ্য দুঃখ দেখা দেয়। পূর্ব্ব দিন আসিয়া স্বর্ণকে অত্যন্ত অস্থির ও ক্রন্দনোন্মুখ দেখিয়া গিয়াছে বলিয়াই হয় ত সলিল এদিন আর ভরসা করিয়া সকাল বেলাই স্ত্রীকে দেখিতে আসিল না,—আসিলেন মহামায়া। শাশুড়ীকে দেখিয়াই স্বর্ণর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। যিনি একদিন তাহাকে সোনার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, আজ তিনিই যেন তাঁর বধূটীর দুটী চক্ষের বালাই হইয়া উঠিয়াছেন। স্বর্ণলতার মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস জাগিয়া আছে যে, সলিল যে তার সঙ্গে নির্লিপ্ত ভাবে চলে, এর মধ্যে তার মায়ের একটু প্রশ্রয় আছে,—পাছে ছেলে বউয়ের বশ হইয়া যায়, তাই তিনি তাকে হাতে রাখিয়াছেন।

মহামায়া মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ মা, বৌমা? শরীরটায় একটু বল পাচ্চো কি? ক্ষিধে একটু হচ্ছে?"

স্বর্ণ কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তার মনে হইল, নিশ্চয়ই সলিলের আসা আজ তার মাই বন্ধ করিয়া নিজে আসিয়াছেন,—রুগ্ন বউয়ের বিছানায় বেশিক্ষণ তাঁর ছেলের থাকা তিনি তো কোন দিনই পছন্দ করিতেন না।

বধূকে নীরব দেখিয়া মহামায়া আরতির দিকে চাহিলেন, "বৌমার শরীর কি ভাল নেই নার্স?" বলিয়াই তাঁর হঠাৎ ভাল করিয়া আরতির মুখ নজরে পড়িয়া গেল। তিনি যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন,—নার্স! তাঁর মনে হইল, সে যেন নার্স নয়, আর কেউ! এই বয়স, এত রূপ, এমন একটী মুখের ভাব, এ কি সামান্য একটা নার্সের! তিনি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, চোখ তাঁর সহসা ফিরিতে চাহিল না।

আরতি তাঁর প্রশ্নেই একটু বিপন্ন বোধ করিয়াছিল। তাঁর বধূর শরীর ভাল নাই, অথবা মন ভাল নাই, এর কোন্ কথাটাই বা বলিবে, এবং কোন্‌টা বলিলে সে চটিবে না,—তার আজকালের মেজাজ দেখিয়া সে ইহার কিছুই কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না। তাই উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়াই সে নিরুত্তরে রহিল। মহামায়া আর কোন কথা কহিলেন না, তাঁর উপস্থিতি যে তাঁর পুত্র-বধূকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, সে কথা জানিতে তাঁরও বাকি ছিল না—এতই সুস্পষ্ট এ বিরক্তি।

হঠাৎ সলিল আসিল। ডাক্তারের কাছে গিয়াছিল, ডাক্তার বলিয়াছেন, স্বর্ণলতার যে আশাতিরিক্ত উপকার হইয়াছিল, তার সমস্তটুকুই প্রায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে, এবং এর জন্য সলিল কিছু এবং নার্সও কিছু দায়ী। উভয়েই পূর্ব্বের মত তাঁদের কর্ত্তব্য পালনে অবহিত হইতেছেন না। সলিল তাই নিজের প্রতি কঠিনভাবে চোখ রাঙ্গাইয়া তার দিকের কর্ত্তব্য পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু কর্ত্তব্য তার পালন করা কঠিন হইয়া পড়িল,—মা রহিয়াছেন। তার পর সেই ঘরেই চোরের মত নতমুখী কুণ্ঠায় অস্থির আরতির প্রতি চোখ পড়িতেই তার সকল কর্ত্তব্যই সে বিস্মৃত হইয়া গেল, তার মনের অবস্থা মনে মনে অনুভব করিয়া ওই অভাগা নারীর প্রতিই তার অন্তরের সমুদয় অনুকম্পা প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তার মনে গভীর সহানুভূতির সহিত জাগিয়া উঠিল, তার মায়ের প্রতি অভিমান। মা না বিরোধী হইলে তাদের দুজনের জীবন কি আজ এমন করিয়া ব্যর্থ হইয়া যাইত!—না জানি আরতি আজ তার মাকে দেখিয়া কি ভাবিতেছে?

এই ভাবিয়া পুনঃ পুনঃই সে চকিত-চক্ষে আরতির মু[illegible] নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। কিন্তু তার সেই চঞ্চল দৃষ্টিপা[illegible] সেখানকার দুজন দর্শকের কাছেই অজ্ঞাত রহিল না। ত[illegible] চোখের সেই অনুরাগ-দীপ্ত, করুণা-কাতর চোখের ভাষা[illegible] স্বর্ণলতার জলন্ত চিত্ত দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল, তা[illegible]

সে দৃষ্টির অভিনবত্ব বিস্ময়ে একেবারে বিহ্বল করিয়া দিল মহামায়াকে।

সেই দিনই বাড়ী ফিরিয়া সুন্দরাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া মহামায়া তাকে প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি তো কাল বৌমাকে দেখতে গেছলে সুন্দর! বৌমার নার্সটীকে তোমার কেমন মনে হলো?"

সুন্দরা এ প্রশ্নে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তার পর শান্ত হইয়া সহজ কণ্ঠেই প্রতি-জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন মা?"

মহামায়া বলিল, "তা জানি না সুন্দরা! আমার কিন্তু আজ আশ্চর্য্য বোধ হয়েছে ওর প্রতি সলিলের ভাব দেখে। কি জানি মা! শেষে কি ছেলে আমার বয়ে যাবে? এত করে মানুষ করে আমার বুদ্ধির দোষেই শেষটা ওকে আমি নষ্ট করে দিলুম সুন্দরা! আমার যে আর বাঁচতে ইচ্ছে করচে না মা!"

সুন্দরা নীরব রহিল,—সে যে কি বলিবে, কিছুই যেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

মহামায়া বলিতে লাগিলেন, "ওর ওই মনের ভাব একটুক্ষণ দেখেই যা আমি বুঝতে পারলুম, বউমা দেখতে পেলে যে কি করবে তাও জানি নে। তার পর যেমন সব শুনেচি, সলিল যদি ঐ নার্স ছুঁড়িটাকে নিয়ে কোথাও পালিয়েটালিয়ে যায়, কি হবে মা?"

এবার আর সুন্দরা নীরব থাকা সঙ্গত বোধ করিল না। সে আহতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "না মা! ওরা অত ছোট নয়। ঐ যে নার্স, ওই সেই লক্ষপতি অতুলেশ্বরবাবুর মেয়ে আরতি—মুসুরিতে দেখে সলিল যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তোমার মত নয় জেনে ঐ মেয়ে—ঐ ধনীর দুলালী নিজেকে নার্স করে রেখেছে, তবু ওকে বিয়ে করতে কিছুতেই মত করেনি, অন্যকেও আর সে বিয়ে করেনি।"

মহামায়ার বিস্মিত কণ্ঠ চিরিয়া বাহির হইয়া আসিল, "ওমা, ও যে সোনার প্রতিমা রে!"

সুন্দরা বলিতে লাগিল—"পাছে সলিল স্বর্ণকে বিয়ে করতে রাজী না হয়, তাই সে নিজেকে এত দিন তার কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলেছিল। হঠাৎ এত দিন পরে এই অদ্ভুত ভাবে দেখাটা হয়েই মুস্কিল হয়েছে! সলিলকে আমি ফিরে এসেই জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে বল্লে সে কিছুই জানতো না, মাত্র এই ক'দিন জানতে পেরেচে। আমি তাকে বলেছি, ডাক্তারকে গিয়ে সে যেন নিজেই নার্স বদলে দেবার জন্য বলে। যদি দরকার হয় তার কারণও তাঁকে জানালে কোনই দোষ নেই। ওদের জন্য ভাবনা নেই মা, ভয় রয়েছে এখন স্বর্ণর জন্যে।"

মহামায়া এক দিকে আশ্বস্ত এবং অপর দিকে একান্ত অনুতপ্ত এবং সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বিষাদিত-কণ্ঠে কহিলেন, "আমার কর্ম্মের দোষ, না হলে হতভাগী আমি রূপ দেখেই কাণ্ডজ্ঞান হারালুম কেন!"

সুন্দরার উপদেশে সলিল ডাক্তারের কাছে গিয়াছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, আরতিকে স্বর্ণলতার নার্সিং হইতে মুক্তি দিবার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করা। কিন্তু ডাক্তার যখন নিজেই নার্সের কর্ত্তব্য-পালনে তুচ্ছ করার কথা তুলিলেন, তখন এতবড় সুযোগ সত্ত্বেও সলিল তাঁহাকে আরতিকে কর্ম্মচ্যুত করার কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। দুইটা কারণ আসিয়া তাহাকে এ কার্য্যে নিবৃত্ত করিল। প্রথমতঃ তার মনে হইল, হয় ত ইহাতে আরতির পক্ষে ক্ষতি করা হইবে, ডাক্তার হয় ত তার প্রতি সমধিক বিরক্ত হইবেন,—সলিলের যত ক্ষতিই হয় হোক, আরতির ক্ষতি করা তার পক্ষে অসম্ভব! আর এর সঙ্গে তার আরও একটা কথা মনে হইয়া গেল। সে ভাবিল, আরতি তো জানিয়া-শুনিয়াই সলিলের স্ত্রীর সেবার ভার লইয়াছে, অন্ততঃ পরেও তো সে জানিতে পারিয়াছিল। হয় ত—হয় ত আজও সে সলিলকে মনে মনে ভালবাসে, হয় ত তাকে দেখিতে পাইবে বলিয়াই সে এতবড় দুঃসাহসের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে! সত্যই তা যদি হয়—তবে কি তার এই ইচ্ছা-টুকুতেও বাধা দেওয়া তার পক্ষে সঙ্গত হইবে? সলিল হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। একবার তার মনে হইল, না, এ'তে তার পক্ষে অন্যায় হইতেছে। সে এখন অন্য নারীর স্বামী। আরতিকে দেখিবার—দেখা দিবার অধিকার আর তার নাই,—কেন সে আরতির এ খেয়াল-খেলার প্রশ্রয় দিবে?

একদিন যে তাহাকে অনায়াসে ভালবাসে না জানাইয়া ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ যদি আবার তার সেই অনাহুত অবমানিত অবহেলিতকে মনে পড়িয়া থাকে, তার পক্ষে হয় ত বা ইহাতেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু সলিলের মনের গঠন অন্যরূপ,—সে আর এ খেলা সহ্য করিতে অক্ষম!

তার উপর স্বর্ণলতার পক্ষে হয় ত বা ইহা সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে পারে। না—সলিল আর একে প্রশ্রয় দিবে না। এ খেলার—এই হৃদয়হীন খেয়ালের এইখানেই সমাপ্তি হোক—

কিন্তু তার আরতির প্রতি তীব্র প্রেম এবং পূর্ণ স্নেহ তাহাকে এ চিন্তাতেও প্রশ্রয় দিতে পারিল না। একবার আরতির সঙ্গে কথা না কহিয়াই সে এ সম্বন্ধে কিছুই করিতে সমর্থ হইল না। মনে মনে স্থির করিল একবার আরতিকে শুধু জিজ্ঞাসা করিবে, সে কেন স্বর্ণলতার ভার লইয়াছে? তার পর যা করিবার করিবে।

সুযোগ সেদিনও ঘটিল না। কিন্তু তার সেদিনের সেই সহানুভূতি-পূর্ণ সস্নেহ দৃষ্টি তাদের জীবনের উপর একটা আকস্মিক দুর্য্যোগের ঝড় তুলিবার নিমিত্ত কারণ হইয়া উঠিল। স্বর্ণলতা সে দৃষ্টিকে আর কিছুতেই ক্ষমা করিতে সমর্থ হইল না।

৩৬

আরতির শরীর মন আর যেন বহিতেছিল না। সুন্দরাকে দেখার পর হইতেই মঞ্জুর স্মৃতি তাহাকে সর্ব্বক্ষণ যেন গভীর ভাবে পীড়িত করিতে লাগিল। তার জোর-করিয়া-বাঁধিয়া-রাখা হৃদয়-মন যেন কার কঠোর হাতে আকর্ষিত বীণার তারের মতই এক মুহূর্ত্তে খান-খান হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়া সেখান হইতে একটা বেসুরা বিকট যন্ত্রণার্ত্ত কান্নার ধ্বনি উঠিয়া আসিতে লাগিল। বুক তার যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিয়া তার আর্ত্ত চিত্ত উচ্চরবে বলিতে চাহিতেছিল, মঞ্জু রে! ওরে যাদু আমার! আমি যে বেঁচে থেকেও মরে রইলুম! ওরে, আর কি কখন তোকে আমি দেখতে পাবো না!

সেদিন সলিলের মার সান্নিধ্য তার একান্ত অসহ্য মনে হইলেও তাঁকে দেখিয়া তার মন কিন্তু একটুও বিদ্বিষ্ট হয় নাই। একবারও তার তাঁকে তার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু বলিয়া মনে পড়িল না। বরং মা বলিয়া শাশুড়ীর শ্রদ্ধায় সে মনের মধ্যে তাঁহাকে নীরব প্রণাম নিবেদন জানাইল। সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর রূপজ্যোতিভরা মহীয়সী মূর্ত্তির উদ্দেশে মনে মনে কহিল,—

"আমায় নাও বা না নাও, তুমি আমার মা, ছেলেকে দুঃখ দিয়ে তুমিও যে দুঃখ পাচ্চো, তা আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারচি। কি করবে? ভাগ্য আমাদের, তোমার দোষ কি?

সেদিন সে ডাক্তার আসিলে তাঁকে জানাইল, অন্ততঃ ঘণ্টা কয়েকের জন্য যেন তাকে সেবাভবনে যাওয়ার অনুমতি দিয়া যান। সেখানে যে রোগী—তার শিক্ষয়িত্রী, স্বর্ণলতার ভার লওয়ার পূর্ব্বে তার চার্জ্জে ছিল, তার অসুখ বেশি হইয়াছে, তাহাকে সে আজ একবার দেখিতে যাইবে। আসল কথা এই বাড়ীর আবহাওয়া এবং বিরক্তি-বিরস এবং একান্ত অসহিষ্ণু স্বর্ণলতার নিয়ত সঙ্গ আরতি আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অথচ, সে বুঝিয়াছে, তার পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত, এ বিধান তার ভাগ্য-বিধাতার। এর হাত হইতে তার উদ্ধার নাই। এ তাহাকে সহিতেই হইবে।

তথাপি যতটুকু সময়ই হোক, এখান হইতে সরিয়া পলাইতে পারিলেও সে যেন খানিকক্ষণের জন্যও বাঁচে।

ডাক্তার সেন আরতির বিষাদ-কালিমালিপ্ত ম্লান মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবু যতটুকু পারো কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা!"

তার পর তাহার মৌন নত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়াই স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বড্ড বেশি Suffer করতে হচ্চে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার কর্ত্তব্যের সে আনন্দ হারালে কেন? তার মধ্যে তো ব্যক্তিত্ব ছিল না, এ আবার কোথা থেকে খুঁজে পেলে? না—না, মালতী, পৃথিবীতে আমায় অন্ততঃ একজনের উপরেও এটুকু নির্ভর রাখতে দাও—একজনকেও শ্রদ্ধা করতে দাও।—এর জন্য নিজের কোন লাভ-ক্ষতির পরিমাপ করতে যেও না। শুধু কর্ত্তব্য করে যাও। এ কি একজনকেও করতে দেখবো না? এ কি এত কঠিন?"

আরতির চোখ দিয়া এই স্নেহবাণী সহসা তার ভিতরে জমান অনেকখানি জলের মধ্য হইতে কয়েক ফোঁটা অতর্কিতে ঝরাইয়া ফেলিল। সে সহসাই নত হইয়া তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া গাঢ় স্বরে, "আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাই আমি পারি"—বলিয়াই ত্বরিৎপদে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার একটু বিমনা ভাবেই চলিয়া গেলেন।

যোগমায়া এক সময়ে ধাত্রী-বিদ্যায় বেশ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিল। আজ নিরাত্মীয় কুমারী জীবন তার পরের হাতেই শেষ সেবা লইতে এইখানেই তার শেষ-শয্যা বিছাইয়াছে।

রোগ দীর্ঘকালের সঞ্চিত, ক্রমেই সে ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। মালতী তাহাকে তার সমস্ত চিত্ত দিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল। সে চলিয়া যাওয়ার পর হইতে যোগমায়া নিয়তই তার অভাব অনুভব করিতেছিল। আরতিকে দেখিয়া সে অত্যন্ত আনন্দিত হইল।

কথায় কথায় যোগমায়া বলিল, "তোমায় একটা কথা অনেকবারই বলেছি মালতী! আবারও বলি, যদি সময় থাকে, এখনও তুমি বিয়ে করো, এখনও ভাল বিয়ে তোমার হ'তে পারে। এর পর কিন্তু আর সময় থাকবে না।"

দিনের বেলার বিদ্যুতের মত ক্ষীণপ্রভ অথচ অতি তীক্ষ্ণ দুঃখের হাসি হাসিয়া আরতি উত্তর করিল,—"সময় এর মধ্যেই আর নেই, সে কথা তো অনেকবারই বলেছি দিদি! বিয়ে কি সবার জন্যেই হতেই হবে?"

যোগমায়া দুঃখিত স্বরে কহিল,—"প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে নিশ্চিতই একদিন তার প্রতিশোধের পাত্র হতেই হবে, এ জেন মালতী! নারী পুরুষের যাঁরা কর্ম্মসমন্বয় করে দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁরা অদূরদর্শী বা নির্ব্বোধ ছিলেন না। যে মেয়ে তার প্রকৃত পথ না চিনে নিজের হ'য়ে নিজেই যুদ্ধ করতে দাঁড়ায়, জীবনের শেষ ক্ষণে তাকে নিশ্চয়ই তার এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আক্ষেপ করে যেতে হবে, এ আমি অনেকবারই দেখেছি। তারা যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে, তখন আর তা' শোধরাবার সময় থাকে না—এই যা দুঃখ! মরবার সময়ে আশে-পাশে ভালবাসা-মাখা ম্লান মুখ, আর সেবাপরায়ণ কাঁপনভরা হাতের দেওয়া জলটুকুন্, এ যদি না পেয়ে গেলুম, তবে জগতে এসে আর পেলুম কি রে?"

যোগমায়ার শুষ্ক নেত্র জলের অভাবে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া নিজের রোগপাণ্ডুর শীর্ণ গণ্ড সেই অশ্রুজলে ঈষৎ সিক্ত হইতে দিয়া তার পর একটা মৃদুশ্বাস মোচন পূর্ব্বক সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "একেবারে দিন চলে যাবার আগে নিজের ভুল খেয়ালটাকে ভুলে গিয়ে এখনও সোজা পথে চলতে চেষ্টা করিস্ মালতী! এর পরে অনেক পরে আমার মতন পস্তাসনে দিদি! পস্তাতে হবেই সেই, এ ধরা কথা,—আচ্ছা ভেবেই দেখ, যখন বয়েস বাড়বে, খাটতে পারবি নে, তখন তোকে বসে খাওয়াবে কে? পাসটাসও তো করলিনে, এই নার্সগিরি করে আর কত টাকাই বা জমাতে পারবি ভাই? যে, অসময়ে বসে খাবি?"

আরতির ক্লান্ত চিত্ত তর্কের জন্য সায় দিল না। সে শুধু দুর্ব্বলভাবে প্রত্যুত্তরে কহিল,—"স্বামী পুত্রই কি সকলের খুব রোজকেরে হয় দিদি? দুর্দ্দশা কপালে থাকলে তার হাত এড়ানো সহজ নয়,—সে ঘটবেই!"

তার নিজের জীবনের এই নূতন সমস্যার কথাটাই মনে হইতেছিল। যোগমায়া মৃদু বিষাদের হাসি হাসিল,—

"কপাল ছাড়া পথ তো নেইই রে ভাই! তাই না লিখেছে—'মিছে এদেশ ওদেশ করে বেড়াও, বিধিলিপি কপালজোড়া'। তাই জন্যেই তো বলছি, তাইই যখন, তখন আর সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, স্ত্রী না হয়ে, মা না হয়ে নিজের জীবনটাকে শুষ্ক নিঃসার করে তুলে সারা জীবনটা খেটেখুটে নিজেকে খাইয়ে পরিয়েই শুধু শেষ করে দিয়ে আর বেশি কি পেলুম? না হয় নিজের বাড়া ভাতের ভাগটা কারুকে বেঁটে দিতেই হলো না,—এই তো? কি এত লাভ এইটুকুতে যার জন্য অতখানি ছেড়ে দিই?"

আরতির তন্দ্রাচ্ছন্ন চিত্তে এ-সব কথা ভাল করিয়া ঢুকিতেই পথ পায় নাই। সে শুধু মনে মনে বলিল, বিয়ে আমার হয়ে গেছে সেই দিন, যেদিন তিনি মুসুরীতে আমার সঙ্গে ছবি বদল করেছিলেন। তার পরও যে আমার এমন দশা—সে ঐ বিধিলিপি।

পরের দিন সলিল আসিল না। স্বর্ণলতা আজকাল সর্ব্বদাই বিরক্ত হইয়া থাকে। আরতির সঙ্গে ভাল করিয়া আর কথাও সে কহে না। বই পড়া, গল্প করা, সে-সব পাঠ তো তাদের উঠিয়াই গিয়াছে। আজ হঠাৎ সে অনেক দিন পরে তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, ডাকিয়া বলিল,—

"মালতী! উনি হয় ত আমার ওপোর রাগ করেই এলেন না। একখানি চিঠি ভাই বেশ ভাল করে লিখে গুছিয়ে আমার হয়ে দাও তো।"

আরতি শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। তার হাতের লেখা সলিল চেনে। সলিলকে তার স্ত্রীর হইয়া পত্র লিখিতে তার একেবারেই ভাল লাগিল না। সে ঈষৎ উত্তেজিত ভাবেই বলিয়া উঠিল,—

"না—না, আমি সে পারবো না,—সে আপনি নিজেই লিখুন।"

এই বলিয়া সে দ্রুতহস্তে ঘরের এক পাশে রাখা আল্‌নার উপর ছড়াইয়া দেওয়া তোয়ালেটা অনাবশ্যকে পাট করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সেটা হইয়া গেলে গামছাখানা তুলিয়া লইল,—হাত তার তখন কাঁপিতেছে।

মুখভার করিয়া স্বর্ণ কহিল, "আমি ভাল লিখতে পারলে কি আর ওঁকে চিঠি লিখতে তোমায় মধ্যস্থ ডাকতে যেতুম!—ভগবান ঐখানেই যে আমায় মেরে রেখেছেন, লেখাপড়া আর শেখা আমার হলো কই? যে দারুণ রোগে ধরলো।"

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আরতিকে নীরব দেখিয়া বিরক্তি-বিরস পরুষ কণ্ঠে কহিল,—

"তাহলে পষ্ট করেই বলে ফেলো না, যে, আমার এতটুকু উপকার আর তোমার দ্বারা হয়ে উঠবে না! কিন্তু আমি বলি, তা' হবে নাই বা কেন? আমার সব হুকুম শোনবার ভার তো তুমি ইচ্ছে করেই নিয়েছিলে? না পেরে যদি ওঠো, তোমার ডাক্তারকে সে কথা জানিও। যতক্ষণ আমার কাছে আছ, আমার কথা মানতে হবে।"

আরতি গাঢ় রক্তবর্ণ মুখে আনত নেত্রে লিখিবার উপাদান লইয়া আসিয়া বসিল।

স্বর্ণ বিদ্যুতের মত তীব্র দৃষ্টিতে তার সেই আরক্ত মুখে হানিয়া বলিতে লাগিল, "পাঠ কিছু লিখতে হবে না, অমনিই লেখ,—'আজ তুমি এলে না কেন? জানো না কি তোমায় একটীবার চোকের দেখা দেখতে পাব বলেই এত কষ্ট সয়ে আছি। কি নিষ্ঠুর তুমি? একবার এসে চোখের দেখাটাও দিয়ে যেতে পারলে না? পুরুষ ভুলতে পারে কিন্তু মেয়েরা পারে না। তুমি যত দূরেই থাক, আমি জানি তুমি আমারই,—আর কারু হতে পারো না। আমার দিব্যি রইলো, যদি না তুমি রোজ আস। ইতি

তোমারই'

নাম লেখার দরকার নেই, এই থাক।"

আরতি চিঠিখানা ব্লট করিয়া খামে ভরিল। উপরে সুন্দরার বাড়ীর ঠিকানা সে আত্মবিস্মৃত ভাবেই লিখিয়া ফেলিল। তাকে ঠিকানা লিখিতে দেখিয়া স্বর্ণলতা আবারও একটা অগ্নিবর্ষী তীব্র দৃষ্টিশেল তার প্রতি প্রয়োগ করিল। অন্যমনস্ক আরতি তাহা লক্ষ্যও করিল না।

লেখা শেষ হইলে আরতি জিজ্ঞাসা করিল,—"চিঠিখানা কি ডাকে পাঠাব?"

বলিয়া মুখ তুলিয়া স্বর্ণর মুখের দিকে চাহিতেই অবাক্ হইয়া গেল। তার মুখ কি অস্বাভাবিক দীপ্ত; দুই চোখে যেন তার আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

বিছানার উপর মুখ গুঁজিয়া দিয়া প্রাণপণে আপনাকে সম্বরণ করিতে করিতে স্বর্ণ কহিল—

"না দরোয়ান যাক,—" (ক্রমশঃ)

ব্যর্থ পূর্ণিমা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

পূর্ণিমা রাতে বাদল নামিবে, হেন কথা কেবা জানে!
আষাঢ়ী-অমার সঙ্গে তবে সে ভেদ তা'র কোনখানে?
পূর্ণিমা মানে হাসি আর আলো—
যত চেয়ে দেখি তত লাগে ভালো;
অজানা সুরের জলতরঙ্গ ভেসে ভেসে আসে কানে;
পূর্ণিমা যদি আঁধারে লুকালো—পূর্ণিমা কেবা মানে?

চির জানাশোনা ব্যর্থ গণনা, মিথ্যা পাঁজির পাতা;—
ভরেনাক দিল, মিলেনাক মিল, শূন্য মনের খাতা!
তিথি তারিখের বাঁধাধরা পথে,
দেহ পথ চিনে' চলে কোনও মতে,
প্রাণের দীপ্তি নাহি মিলে যদি—প্রাণ তো বুঝিবে না তা।
পূর্ণিমা রাতে আলোকই সে চায়, তবে সে নোয়ায় মাথা।

সুখে ঢাকা দুখ—চিনি মাখা নিম—সুখ চেয়ে বেশী দুখ-
বঁড়সী বেড়িয়া ময়দার টোপ—শিকারেরই কৌতুক!
হোক্ না কেন সে সুবর্ণ-রথ,
চলে না যে চাকা, কাদা মাখা পথ,
রথের সারথি জগতের নাথ—নামাবলী-ঢাকা মুখ—
রহস্যময় সে যদি না হয়—ভয়ে কাঁপে তাই বুক!

পূর্ণিমা রাতে ধারা যদি নামে, আঁধার যদি সে হয়—
উঁচু করি' গলা—সোজা কথা বলা—পূর্ণিমা তাহা নয়।
ভরা আষাঢ়ের দুর্যোগ রাতে,
ঝঞ্ঝাটে ভরা ঝঞ্ঝা আঘাতে,
অন্তরবাণী রুধিয়া গলাতে পৌর্ণমাসীর জয়—
শুধু সত্যের অপলাপ নয়—মিথ্যারই অভিনয়!

শিবাজীর নৌবল এবং ইংরাজের সহিত ঘাত-প্রতিঘাত

স্যার যদুনাথ সরকার C. I. E.

(১)

১৬৫৯ সালের শেষে যখন শিবাজী বিজাপুর-রাজ্যে নানা স্থান জয় করিতে লাগিলেন, তখন ইংরাজদের প্রধান কুঠী ছিল সুরতে; এটি মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে। বম্বে দ্বীপ তখনও পোর্তুগীজদের হাতে; ইংরাজেরা রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহে যৌতুক-স্বরূপ পোর্তুগালরাজের নিকট হইতে ইহার আট বৎসর পরে এই দ্বীপ পান, এবং আরও অনেক বৎসর পরে সুরত হইতে এখানে প্রধান অফিস উঠাইয়া আনেন। সুরতের পর রাজাপুর (রত্নগিরি জেলার বন্দর) এবং কারোয়ার (গোয়ার দক্ষিণে বন্দর), কানাড়ার অধিত্যকায় হুবলী এবং খান্দেশ প্রদেশে ধরণগাঁও প্রভৃতি আরও কয়টি বড় ক্রয়বিক্রয়ের শহরে ইংরাজদের কুঠী এবং কাপড় ও মরিচের আড়ৎ ছিল।

১৬৬০ সালের জানুয়ারির প্রথমেই শিবাজীর সৈন্যেরা রাজাপুর বন্দর কিছুদিনের জন্য দখল করে এবং সেখানকার ইংরাজ-কুঠীর অধ্যক্ষ হেনরি রেভিংটন্ বিজাপুরী আমলার মালপত্র কোম্পানীর সম্পত্তি বলিয়া মিথ্যা বর্ণনা করিয়া তাহা মারাঠাদের লইতে বাধা দেন। এই ঘটনা হইতে শিবাজীর সহিত ইংরাজদের প্রথম ঝগড়া বাধে, কিন্তু তাহা অল্পেই থামিয়া যায়।

ইহার কয়েক মাস পরেই যখন সিদ্দি জোহর শিবাজীকে পন্হালা দুর্গে ঘেরিয়া ফেলেন তখন সেই রেভিংটন এবং আর কয়েকজন ইংরাজ কতকগুলি বেঁটে তোপ (মর্টার) ও বোমার মত গোলা (গ্রেনেড্) জোহরকে বেচিবার জন্য সেখানে গিয়া এই অস্ত্রের বল দেখাইবার উদ্দেশ্যে শিবাজীর দুর্গের উপর কতকগুলি গ্রেনেড্ ছুঁড়িলেন। শিবাজী লক্ষ্য করিলেন যে ইংরাজ-পতাকার নীচ হইতে একদল সাহেব এই-সব গোলা মারিতেছে।

(২)

বিদেশী বণিকদের এই অকারণ শত্রুতার শাস্তি পর বৎসর মিলিল। ১৬৬১ সালের মার্চ্চ মাসে শিবাজী রত্নগিরি জেলা দখল করিতে করিতে রাজাপুর পৌঁছিয়া ইংরাজ কুঠীয়ালদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন; কুঠী লুঠ ও ছারখার করিবার পর তাহার মেঝে খুঁড়িয়া দেখিলেন যে টাকা লুকান আছে কিনা। ফলতঃ রাজাপুরে ইংরাজ বাণিজ্য এইবার ধ্বংস পাইল। অনেক টাকা না দিলে ছাড়িয়া দিব না—এই বলিয়া সেই চারিজন ইংরাজ বন্দীকে দুই বৎসর ধরিয়া নানা পার্ব্বত্য-দুর্গে আটকাইয়া রাখিলেন।

কোম্পানীর কর্ত্তারা বলিলেন যে, যখন রেভিংটন প্রভৃতি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিবাজীর শত্রুতা করিয়া এই বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে, তখন কোম্পানী তাহাদের টাকা দিয়া খালাস করিতে বাধ্য নহে। অবশেষে অনেক কষ্ট সহ্য করিবার পর তাহারা ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৬৬৩ এমনি ছাড়া পাইল।

তাহার পর কোম্পানী রাজাপুরের কুঠী লুঠ ও ধ্বংস করার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিলেন; শিবাজী এজন্য নিজ দায়িত্ব স্বীকার করেন না, কখনও বা খুব কম টাকা খেসারৎ দিতে চাহেন। এই লইয়া বিশ বৎসরেরও অধিক সময় তর্ক-বিতর্ক চিঠি লেখালেখি চলিল। ইংরাজেরা আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা ও জেদের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজেদের এই দাবি ধরিয়া রহিলেন, বারে বারে শিবাজীর নিকট দূত * পাঠাইতে লাগিলেন। পরে হুব্‌লী ধরণগাঁও প্রভৃতি স্থানের ইংরাজকুঠীও মারাঠারা লুঠ করে, এবং তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ চাওয়া হইল। এ বিবাদ শিবাজীর জীবনকালে নিষ্পত্তি হইল না, অথচ এজন্য দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধও বাধিল না! কারণ সে যুগে ইংরাজ ও শিবাজী অনেক বিষয়ে পরস্পরের মুখাপেক্ষী ছিলেন। বম্বে দ্বীপে তরকারী, চাউল, মাংস, জ্বালানী কাঠ কিছুই জন্মিত না; এগুলি পরপারে শিবাজীর দেশ হইতে না আসিলে, বম্বের লোক অনাহারে মারা

* আষ্টিক্ (১৬৭২), নিকল্‌স্ (১৬৭৩), হেনরি অকসিণ্ডেন (১৬৭৫)।

যাইত। আর শিবাজীর রাজ্যে লবণ মোমবাতী সৌখীন পশমী কাপড় (বনাত ও সকরলাৎ) তোপ ও বারুদ ইংরাজেরাই আনিয়া দিতে পারিতেন। তা ছাড়া ইংরাজদের বেচা-কেনায় শিবাজীর প্রজাদের এবং পণ্যমাশুল হইতে রাজসরকারের অনেক টাকা আয় হইত। কাজেই এই ঝগড়া যুদ্ধ পর্য্যন্ত গড়াইল না।

(৩)

ইংরাজ বণিকেরা বেশ বুঝিতেন যে, শিবাজীকে চটাইলে তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যে তাহাদের বেচা-কেনা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে; অথচ তাঁহাদের এমন শক্তি ছিল না যে যুদ্ধ করিয়া শিবাজীকে কাবু করেন বা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করেন। তাঁহাদের একদিকে ভয় যে যদি তাঁহারা শিবাজীকে তোপ ও গোলা বিক্রয় না করেন তবে তিনি চটিয়া তাঁহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবেন; অপর দিকেও বিপদ কম নহে,—মারাঠা-রাজাকে এইরূপে সাহায্য করা হইয়াছে টের পাইলে মুঘল বাদশাহ রাগিয়া তাঁহার রাজ্য হইতে ইংরাজ-কুঠী উঠাইয়া দিবেন এবং বণিকদের কয়েদ করিবেন। ফরাসীরা এরূপ অবস্থায় অতি গোপনে কিছু ছোট ছোট তোপ ও সীসা শিবাজীকে বিক্রয় করেন।

চতুর ইংরাজকর্ত্তারা নিজ স্থানীয় কর্ম্মচারীদের লিখিয়া পাঠাইলেন—"এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে এমন সাবধানে চলিবে যেন কোনপক্ষই রাগ না করে। শিবাজীকে তোপ বারুদ বেচিবেও না, আবার বেচিতে খোলাখুলি অস্বীকারও করিবে না। অস্পষ্ট উত্তর দিয়া যত সময় কাটান যায় তাহার চেষ্টা করিবে। আর, আমরা আমাদের জাহাজ ও তোপ লইয়া গিয়া হাবশী রাজধানী দণ্ডা-রাজপুরী জয় করিতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারি, এই লোভ দেখাইয়া আলোচনার সূত্রপাত করিবে, এবং তাঁহাকে এইরূপে দীর্ঘকাল হাতে রাখিবে।"

শিবাজীও যে-টাকা একবার গ্রাস করিয়াছেন তাহা উদ্গার করিতে নারাজ। এই অবস্থায় রাজাপুর-কুঠীর ক্ষতিপূরণের জন্য আলোচনার শেষ নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভব ছিল। ইংরাজেরা এক লক্ষ টাকা দাবি করিয়াছিল। শিবাজীর মন্ত্রীরা প্রথমে ক্ষতির পরিমাণ বিশ-হাজার টাকা ধার্য্য করিলেন, পরে ২৮ হাজার এবং অবশেষে চল্লিশ হাজারে উঠিলেন। কিন্তু তাহাও নগদ নহে; ইহার মধ্যে ৩২ হাজার টাকা কতক নগদ কতক বাণিজ্য-দ্রব্য দিয়া শোধ হইবে, আর বাকী আট হাজার টাকা তিন হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত রাজাপুর-বন্দরে ইংরাজদের আমদানী মালের প্রাপ্য মাশুল মাফ করিয়া পূরণ করা হইবে।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের দরবারে (১৬৭৪ জুন) ইংরাজ-দূত হেনরি অক্‌সিণ্ডেন উপস্থিত হইয়া এই তিন সর্ত্তে মিটমাট করিয়া এক সন্ধিপত্র সহি মোহর করাইয়া লইলেন:—

(১) শিবাজী ক্ষতিপূরণ বাবদে ইংরাজদের চল্লিশ হাজার টাকা দিবেন। ইহার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ নগদ টাকা ও দ্রব্য (যেমন সুপারি)তে শিবাজীর মৃত্যুর পূর্ব্বে শোধ হয়।

(২) তাঁহার রাজ্যে ইংরাজ-কুঠীগুলি রক্ষা করিবেন। তদনুসারে ১৬৭৫ সালে রাজাপুরে ইংরাজেরা আবার কুঠী খোলেন।

(৩) তাঁহার রাজ্যের কূলে ঝড়ে কোন জাহাজ আসিয়া অচল হইয়া পড়িলে অথবা ভগ্নজাহাজের ভাসা মালগুলি পৌছিলে, নিজে জবৎ না করিয়া মালিককে ফিরাইয়া দিবেন।

কিন্তু শিবাজী ইংরাজদের চতুর্থ প্রার্থনা অর্থাৎ তাঁহার রাজ্যে ইংরাজদের মুদ্রা প্রচলিত করিতে, কিছুতেই রাজী হইলেন না।

(৪)

রাজাপুরের নূতন কুঠীর সাহেবেরা শিবাজীর সহিত ১৬৭৫ সালে দেখা করিয়া তাহার এই সুন্দর বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন:—

"রাজা ২২এ মার্চ্চ দুপুরবেলায় এখানে আসেন, সঙ্গে অনেক অশ্বারোহী পদাতিক ও দেড়শত পাল্কী ছিল। তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়াই আমরা তাঁবু হইতে বাহির হইলাম এবং অল্প দূরেই তাঁহাকে পাইলাম। আমাদের দেখিয়া তিনি পাল্কী থামাইলেন এবং কাছে ডাকিয়া বলিলেন, আমরা যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি তাহাতে তিনি খুব খুশী হইয়াছেন, কিন্তু এই

রৌদ্রের গরমে আমাদের এখন বেশীক্ষণ রাখিবেন না, বিকালে ডাকিবেন। * * *

২৩শে মার্চ্চ, রাজা আসিলেন এবং পাল্কী থামাইয়া আমাদের কাছে ডাকিলেন। আমরা নিকটে গেলে তিনি হাত দিয়া ইঙ্গিত করিয়া আরও কাছে আসিতে বলিলেন। যখন আমি তাঁহার সামনে পৌঁছিলাম, তিনি কুতূহলে আমার লম্বা পরচুল নিজ হাতে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন এবং অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। * * * তিনি উত্তরে বলিলেন যে রাজাপুরে আমাদের সব অসুবিধা দূর করিবেন, এবং আমাদের যুক্তিসঙ্গত কোন অনুরোধই অগ্রাহ্য করিবেন না। * * *

পরদিন আবার আমাদের ডাকাইয়া পাঠাইয়া দু'ঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিলেন, অবশেষে আমাদের দরখাস্তের মারাঠী ভাষায় অনুবাদ তাঁহাকে পড়িয়া শুনান হইল, এবং সব প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া ফর্ম্মান্ দিবেন, এ আশ্বাস দিলেন।"

(৫)

ভারতের পশ্চিম-কূলে বম্বে শহর হইতে ৪৫ মাইল দক্ষিণে জঞ্জিরা নামে পাথরের একটি ছোট দ্বীপ আছে। তাহার আধ মাইল পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের এক খাড়ী কোলাবা জেলার মধ্যে ঢুকিয়াছে। এই খাড়ীর মুখে উত্তর তীরে দণ্ডা নামক শহর, তাহার তিনদিকে সমুদ্র ঘেরা; আর দণ্ডার দু'মাইল উত্তর-পশ্চিমে রাজপুরী নামক আর একটি নগর; [রাজাপুর বন্দর এখান হইতে অনেক দূরে, দক্ষিণে]। এইগুলি এবং ইহাদের সংলগ্ন জমি লইয়া একটি ছোট রাজ্য; তাহার অধিকারীরা হাবশী জাতীয়,—অর্থাৎ আফ্রিকার এবিসিনিয়া দেশ হইতে আগত, ইহাদের ভীষণ কাল রং, মোটা ঠোঁট, কোঁকড়া চুল।

এই হাবশীরা তথায় কয়েক ঘর মাত্র; অসংখ্য ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখিতে হইত। তাহারা সকলেই যুদ্ধ এবং জাহাজ চালানতে দক্ষ; অন্য কোন ব্যবসা করিত না; প্রত্যেকেই যেন একজন ছোট ওমরা বা রাজপুত্র এইরূপ পদগৌরবে থাকিত। তাহাদের দলপতি পিতার উত্তরাধিকারী সূত্রে হইতেন না; জাতির মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান কর্ম্মদক্ষ বীরকে বাছিয়া নেতা স্বীকার করিয়া সকলে তাঁহাকে মানিত। হাবশী জাতি ভারতে বল-বিক্রম, শ্রম ও কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি, যুদ্ধ ও রাজ্যশাসনে সমান দক্ষতা, এবং প্রভুভক্তির জন্য বিখ্যাত ছিল। আর, দৃঢ় স্থিরমন লোক চালাইবার ক্ষমতা, এবং জলযুদ্ধে পরিপক্কতায় ইউরোপীয় ভিন্ন অপর সব জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহারা সিদ্দি (অর্থাৎ সৈয়দ বা উচ্চ-বংশজাত) নামে পরিচিত ছিল।

জঞ্জিরার পূর্ব্বদিকের তীরভূমি কোলাবা জেলা। এখানে হাবশীদের খাদ্য জন্মে, রাজস্ব সংগ্রহ হয়, অনুচরগণ বাস করে। শিবাজী উত্তর-কোঁকনে কল্যাণ, অর্থাৎ বর্ত্তমান থানা জেলা, অধিকার করিয়া তাহার পরই কোলাবা জেলায় প্রবেশ করায়, হাবশীদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইল। ইহা অনিবার্য্য; কারণ এই তটভূমি হারাইলে হাবশীরা না খাইতে পাইয়া মারা পড়িবে; সুতরাং তাহারা দণ্ডা-রাজপুরী নিজ হাতে রাখিবার জন্য প্রাণপণ লড়িতে থাকিল। অপর পক্ষে, শিবাজীও জানিতেন যে তটভূমি ও জঞ্জিরা দ্বীপ হইতে হাবশীদের তাড়াইতে বা অধীন করিতে না পারিলে তাঁহার কোঁকন প্রদেশের স্থলভাগও অসম্পূর্ণ, অরক্ষিত, হইয়া পড়িয়া থাকিবে; এই শত্রুরা জাহাজে করিয়া যেখানে সেখানে নামিয়া গ্রাম লুঠ ও প্রজাদের দাস করিয়া লইয়া যাইবে। "ঘরের মধ্যে ইন্দুর যেমন, সিদ্দিরা তেমনি শত্রু" (সভাসদ), বিশেষতঃ, তাহারা হিন্দু প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত, ব্রাহ্মণদের ধরিয়া মেথরের কাজ করাইত, সাধারণ লোকদের নাক-কাণ কাটিয়া দিত। আর, ঐ দ্বীপের ও দুর্গের আশ্রয়ে নিজ জাহাজ রাখিয়া সমুদ্রে যখন-তখন মারাঠী জাহাজ ধরিতে পারিত!

(৬)

এজন্য শিবাজীর জীবনের ব্রত হইল জঞ্জিরা দ্বীপ অধিকার করিয়া পশ্চিম-কূলে সিদ্দির প্রভাব একেবারে লোপ করা। এই কাজে তিনি অসংখ্য সৈন্য এবং যত টাকাই লাগুক না কেন খরচ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মারাঠীদের তোপ ভাল ছিল না, তোপ চালানে দক্ষতা একেবারেই ছিল না। আর তাহাদের জাহাজগুলি হাবশী-জাহাজের পাশে অবজ্ঞার জিনিষ। এই দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধটা বাঙ্গলার ছেলে ভুলান "সুন্দরবনের বাঘ ও কুমীরের" যুদ্ধের মত হইল। শিবাজীর সৈন্য স্থলপথে অজেয়,

আর হাবশীরা জল-যুদ্ধেও দুর্গরক্ষা করিতে তেমনি শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাহাদের স্থল-সৈন্য এক হাজারের বেশী নয়।

শিবাজী ১৬৫৯ সাল হইতে কোলাবা জেলায় ক্রমে বেশী বেশী সৈন্য পাঠাইয়া হাবশী রাজ্যের স্থলভূমি যথাসম্ভব দখল করিতে লাগিলেন। অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল; কখন এপক্ষ আগাইয়া আসে, কখন ওপক্ষ। অবশেষে দণ্ডা-দুর্গ শিবাজী লইলেন; আর দ্বীপটি মাত্র সিদ্দিদের দখলে থাকিল; তাহারা স্থলপথের দুর্গ ও শহরগুলি হারাইল। কিন্তু "পেট ভরিবার জন্য" জাহাজে করিয়া আসিয়া রত্নগিরি জেলায় গ্রাম লুঠিতে লাগিল। প্রতি বৎসর বর্ষার শেষে শিবাজী কয়েক মাস ধরিয়া স্থল হইতে জঞ্জিরা দ্বীপের উপর গোলা ছুঁড়িতেন, কিন্তু ইহাতে কোনই ফল হইত না। তিনি বুঝিলেন যে নিজের যুদ্ধ-জাহাজ না থাকিলে তাঁহার পক্ষে মান-সম্ভ্রম ও রাজ্যরক্ষা করা অসম্ভব। তখন নৌবল-গঠনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

শিবাজীর যুদ্ধ-জাহাজের এবং জলপথে প্রভাব বিস্তারের ইতিহাস অতি স্পষ্ট ও ধারাবাহিকরূপে জানা যায়। ১৬৫৯ সালে কল্যাণ অধিকার করিবার পর তাহার নীচে সমুদ্রের খাড়িতে (বম্বে হইতে ২৪ মাইল পূর্ব্বে) শিবাজী প্রথম জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সমুদ্রে ভাসাইলেন। এই নব শক্তির জাগরণে পোর্ত্তুগীজদের ভয় ও হিংসা হইল। পরে কোঁকন তীর দিয়া তাঁহারদ্রুত রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ নির্ম্মাণ, নৌ সেনা ভর্ত্তি, এবং কূলে জাহাজের আশ্রয় স্থল স্বরূপ জলদুর্গ ও বন্দর স্থাপন বাড়িয়া চলিল। "রাজা সমুদ্রের উপর জীন চড়াইলেন" (সভাসদ)।

শিবাজীর সর্ব্বসমেত চারিশত জাহাজ ছিল। তাহা ছোট বড় সকল শ্রেণীর, যথা ঘুরাব্ (তোপ চড়ান, সমান ও উঁচু পাটাতনের যুদ্ধ জাহাজ), গলবট্ (দ্রুতগামী পাতলা রণতরী), তরাণ্ডী, তারবে, শিবাড় এবং মাঁচোয়া (এ দুটি মালবাহী নৌকা), পগার্ ইত্যাদি। তাঁহার অধিকাংশ জাহাজই অতি ছোট, ভারি ধাতুর পাতে মোড়া নহে, এবং তীর ছাড়িয়া বহুদূরে সমুদ্রে দীর্ঘকাল থাকিতে অক্ষম; কামানের এক গোলা লাগিলেই ডুবিয়া যাইত। ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষ এগুলির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "অসার জিনিষ, ইংরাজদের একখানা ভাল যুদ্ধ জাহাজ ইহাদের একশতখানা বিনা বিপদে ডুবাইয়া দিতে পারে;" অর্থাৎ যাহাকে "মশা-মাছি" (mosquito craft) বলা হয়। সুরত বম্বে ও গোয়া ছাড়া পশ্চিম-কূলের প্রায় আর সব বন্দরের জল এত কম গভীর যে বড় বড় ভারি জাহাজ সেখানে ঢুকিতে বা ঝড়ের সময় আশ্রয় লইতে পারে না। এজন্য প্রাচীনকাল হইতেই কোঁকন ও মালবার কূলের পণ্য-দ্রব্য ছোট এবং কম গভীর (চেপ্টা তলা) নৌকায় চালান করা হইত; এসব নৌকা তীরের কাছে যেখানে সেখানে ছোট খাড়ি ও নদীতে তুফান দেখিলেই পলাইয়া রক্ষা পাইত। এই দেশের যুদ্ধ-জাহাজও সেই ধরণে তৈয়ার করা হইত; এগুলি ছোট; বড় বড় বা বেশী সংখ্যার তোপ বহিতে পারিত না; ঝড়ে সমুদ্রে টিঁকিতে বা ডাঙ্গা ছাড়িয়া দূরে গিয়া একসঙ্গে অনেক দিন ধরিয়া পালে চলিবার জন্য প্রস্তুত নহে। তাহারা সংখ্যার জোরে যুদ্ধ-জয়ের চেষ্টা করিত, তোপের গোলাতে নহে। শিবাজীও নিজ পোতগুলি এই প্রাচীন ধরণে গঠন করেন, এবং জল-যুদ্ধে এই পুরাতন রণ-নীতির কোন পরিবর্ত্তন বা উন্নতি করেন নাই। কাজেই, ইংরাজদের ত কথাই নাই, সিদ্দিদের কাছেও তাঁহার সহজেই পরাজয় হইত।

শিবাজীর নৌ-বল দুই ভাগ করিয়া রাখা হয়, দরিয়া সারঙ্গ (মুসলমান) এবং ময়া-নায়ক (হিন্দু) উপাধিধারী দুজন নৌ-সেনাপতি (এড্‌মিরাল্) ইহাদের নেতা। রত্ন-গিরি জেলার সমুদ্র-কূলের গ্রামগুলিতে জেলে ভণ্ডারী জাতের অনেক কৃষক আছে। ইহারা সমুদ্রে বাস করিতে, জাহাজ চালাইতে এবং নৌ-যুদ্ধে পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত। আগে ইহারা জলদস্যু-গিরি করিত। ইহাদের দেহ পুষ্ট, সবল এবং ব্যায়ামে গঠিত—স্থল-যুদ্ধে যেমন মারাঠা ও কুনবী জাত দক্ষ, ইহারাও ঠিক সেইমত। এই ভণ্ডারী এবং অপর কয়েকটি নীচ হিন্দুজাত—যথা কোলী, সংঘর, বাঘের ও আংগ্রে (বংশ) হইতে শিবাজী অনেক উৎকৃষ্ট নৌ-সেনা ও নাবিক পাইলেন।

পরে ঘরোয়া বিবাদের ফলে সিদ্দি সম্বল্ এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সিদ্দি মিস্‌রি, এই দুই নেতা আসিয়া শিবাজীর অধীনে কাজ লইলেন। তাঁহার অপর মুসলমান নৌ-সেনা-পতির নাম দৌলত খাঁ। কিন্তু জঞ্জিরার সিদ্দিদের জাহাজগুলি মারাঠাদের তুলনায় আকারে বড়, অধিকতর দৃঢ় ও সুরক্ষিত এবং ভাল কামান এবং দক্ষতর যোদ্ধা দিয়া পূর্ণ; সুতরাং যুদ্ধে সিদ্দিরই জয়লাভ হইত, মারাঠারা অনেক বেশী লোক ও নৌকা হারাইয়া পলাইত।

শিবাজীর অনেকগুলি জাহাজ তাঁহার নিজের এবং প্রজাদের মাল লইয়া, আরবের মোচা, পারস্যের বসরা, ইত্যাদি বন্দরে যাত্রা করিয়া, নানাদেশে বাণিজ্য করিতে লাগিল। দক্ষিণের আট-দশটা বন্দর তাঁহার এই বাণিজ্য-পোতের কেন্দ্র ও বিশ্রামস্থল ছিল। আর তাঁহার যুদ্ধের নৌকাগুলি যথাসম্ভব সমুদ্রে অরক্ষিত শত্রু-পোত এবং কূলে অন্যান্য রাজার বন্দর লুঠ করিত। সুরত হইতে বাদশাহের প্রজাদের জাহাজগুলি তীর্থ-যাত্রী লইয়া মক্কায় যাইবার পথে শিবাজীর দ্বারা আক্রান্ত হইত, কখন ধরা পড়িত। অবশেষে, আওরংজীব এই সব জাহাজ রক্ষা, পশ্চিম সমুদ্রে পাহারা দেওয়া এবং শিবাজীর নৌ-বল দমন করিবার ভার অনেক টাকা বেতনে সিদ্দিদের উপর দিলেন।

(৭)

শিবাজী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রায় প্রত্যেক বৎসরই জঞ্জিরা আক্রমণ করিতেন; এই সকল নিষ্ফল চেষ্টার একঘেয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। ১৬৬৯-৭০ সালে তিনি জেদের সহিত অতি ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সিদ্দি সর্দ্দার ফতহ্ খাঁকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন; অন্নাভাবে জঞ্জিরার পতন হয় আর কি। অথচ সিদ্দিদের উপরের রাজা আদিল শাহের নিকট হইতে কোনপ্রকার সাহায্যের আশা নাই। তখন ফতহ্ খাঁ টাকা ও জাগীর লইয়া শিবাজীকে ঐ দ্বীপ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অপর তিনজন সিদ্দি প্রধানেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া জঞ্জিরা ও সিদ্দি জাহাজগুলির কর্ত্তৃত্ব নিজ হাতে লইলেন। মুঘল বাদশাহ সিদ্দিকে পুরুষানুক্রমে "ইয়াকুৎখাঁ" উপাধি ও বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বেতন দিয়া নিজ চাকর করিয়া, সমুদ্রে পাহারা দিবার ভার দিলেন। সিদ্দি কাসিম হইলেন জঞ্জিরার আর সিদ্দি খয়রিয়ৎ স্থলভূমির শাসনকর্ত্তা, এবং সিদ্দি সম্বল জাহাজগুলির নেতা (য়্যাড্‌মিরাল, মীর বহর্)।

সিদ্দি কাসিম বড় চতুর, সাহসী ও পরিশ্রমী লোক। তিনি সুশাসনে এবং কাজকর্ম্মে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া যুদ্ধের জাহাজ ও গোলাবারুদ বাড়াইলেন, অনেক মারাঠা জাহাজ ধরিয়া ধনলাভ করিলেন। অবশেষে ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৬৭১ সালে, যখন দণ্ডাদুর্গের মারাঠা রক্ষীগণ সারাদিন হোলী উৎসবে মাতিয়া, মদ খাইয়া, রাত্রে ক্লান্ত অসাবধান হইয়া ঘুমাইতেছিল, তখন কাসিম গোপনে নিঃশব্দে দণ্ডার সমুদ্র তীরের ঘাটে (অর্থাৎ দুর্গের দক্ষিণ মুখে) চল্লিশখানা জাহাজে সৈন্য লইয়া পৌছিলেন। এদিকে সিদ্দি খয়রিয়ৎ পাঁচশত সেনা লইয়া স্থলের দিকের দেওয়ালে (অর্থাৎ দুর্গের উত্তর-পূর্ব্ব মুখে) গিয়া মহাবাদ্য ও গোলমালের সহিত সেই দেওয়াল আক্রমণ করিবার ভান করিলেন। প্রায় সব মারাঠা সৈন্য এই দ্বিতীয় দিকে ছুটিল; আর সেই অবসরে কাসিম বিনা বাধায় ঘাটের দেওয়াল বাহিয়া উঠিয়া দুর্গে ঢুকিলেন। তাঁহার জনকতক লোক মরিল বটে, কিন্তু সেই স্থলের সামান্য যে-কয়টি রক্ষী ছিল তাহারা পরাস্ত হইয়া পলাইল। কাসিম দুর্গের মধ্যে আরও অগ্রসর হইলেন। এমন সময় হঠাৎ দুর্গের বারুদের গুদামে আগুন লাগায় তাহা ফাটিয়া মারাঠা কিলাদার এবং দুপক্ষের অনেক লোক পুড়িয়া মরিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সৈন্যদল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কাসিম অমনি চেঁচাইয়া উঠিলেন, "খাস্‌সু! খাস্‌সু (তাঁহার রণ-বাণী)! আমার বীরগণ, আশ্বস্ত হও। আমি বাঁচিয়া আছি, আমার কোন জখম হয় নাই।" তাহার পর শত্রু কাটিতে কাটিতে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বদিক হইতে আগত খয়রিয়তের দলের সহিত মিলিলেন, এবং সমস্ত দুর্গ দখল করিয়া, মারাঠাদের নিঃশেষ করিয়া দিলেন।

শিবাজী জঞ্জিরা লইবার জন্য দিনরাত ভাবিতেছেন, আর কিনা তাঁহার হাত হইতে দণ্ডা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া গেল! এই সংবাদে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। গল্প আছে যে, এই বারুদের গুদাম উড়িয়া যাওয়ার সময় রাত্রিতে তিনি চল্লিশ মাইল দূরে নিজ গড়ে ঘুমাইতেছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "মনটা কেমন করিতেছে। নিশ্চয়ই দণ্ডায় কোন বিপদ ঘটিয়াছে।"

এই বিজয়ের পর কাসিম ঐ অঞ্চলে আরও সাতটি দুর্গ মারাঠাদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন এবং পরাজিত লোকদের প্রতি চূড়ান্ত অত্যাচার করিলেন। শিবাজী ও শম্ভুজী রাজত্বকাল ধরিয়া এই প্রদেশ পুনরায় দখল করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হন নাই। শিবাজী ও বাদশাহ প্রত্যেকেই বম্বের ইংরাজদের সাধিতে লাগিলেন যে জাহাজ দিয়া অপর পক্ষকে চূড়ান্ত পরাজয় করিতে সাহায্য করুন। কিন্তু ইংরাজেরা বণিকের উচিত শান্তিতে রহিল। যদিও ফরাশী কোম্পানী এই ফাঁকে গোপনে শিবাজীকে

৮০টা ছোট তোপ এবং দু হাজার মণ সীসা বেচিয়া দিয়া একচোট লাভ করিয়া লইল! ডচেরা শিবাজীর নিকট প্রস্তাব করিল যে "আপনি সৈন্য দিন, আমরা জাহাজ দিব; উভয়ে একজোটে বম্বে আক্রমণ করিয়া ইংরাজদের বেদখল করিব, আর তাহার পর দণ্ডা কাড়িয়া লইয়া আপনাকে দিব।" কিন্তু শিবাজী এ কথায় নড়িলেন না। তাহার পর কত বৎসর ধরিয়া ঢিলে তালে এই যুদ্ধ চলিতে থাকিল। দুই পক্ষই অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল।

(৮)

জলযুদ্ধ

১৬৭৪ সালের মার্চ্চ মাসে সাতবলী নদীর মুখের খাড়িতে সিদ্দি সম্বল ঢুকিয়া শিবাজীর নৌসেনাপতি দৌলত খাঁকে আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু শেষে পরাস্ত হইয়া ফিরিতে হইল; এই যুদ্ধে দুই পক্ষেরই প্রধান সেনাপতি আহত হন এবং একশত ও ৪৪ জন লোক মারা পড়ে। সিদ্দি সম্বল অন্যান্য হাবশীদের সঙ্গে ঝগড়া করায়, তাঁহাকে নৌসেনাপতির পদ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল, এবং অবশেষে (১৬৭৭ সালের নবেম্বর ডিসেম্বরে) তিনি স্বজাতির সঙ্গ ও জাহাজ ছাড়িয়া নিজ পরিবার ও অনুচর সহ শিবাজীর অধীনে চাকরি লইলেন।

জঞ্জিরা জয়ে হতাশ হইয়া শিবাজী নিজে একটি জল-বেষ্টিত দুর্গ স্থাপন করিবার ইচ্ছায় কাছাকাছি আর একটি দ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। এটির নাম খান্দেরী, বম্বের এগার মাইল দক্ষিণে এবং জঞ্জিরার ৩০ মাইল উত্তরে। ১৬৭৯ সেপ্টেম্বরে তাঁহার দেড়শত লোক চারিটি কামান লইয়াময়া নায়কের অধীনের জাহাজে আসিয়া এই শূন্য ছোট দ্বীপটি দখল করিল, এবং তাড়াতাড়ি ইহার চারিদিকে পাথর ও মাটির দেওয়াল তুলিয়া ঘিরিয়া দিল। রাজা এই সব খরচের জন্য পাঁচ লাখ টাকা মঞ্জুর করিলেন। ইহাতে ইংরাজদের ভয় হইল, কারণ বম্বেতে যত জাহাজ যাতায়াত করে সেগুলি খান্দেরী হইতে অতি স্পষ্ট দেখা যায়, এবং শীঘ্র আক্রমণ করা যায়। এই খান্দেরী শত্রুর অভেদ্য দুর্গ হইয়া উঠিলে, ইহার আশ্রয় হইতে মারাঠা যুদ্ধ-জাহাজ সমুদ্রে ইংরাজ বাণিজ্য-পোত সহজেই ধ্বংস করিতে পারিবে।

সুতরাং বম্বের ইংরাজ সৈন্য ও রণপোত মারাঠাদের খান্দেরী হইতে তাড়াইয়া দিতে আসিল। ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৬৭৯ ইংরাজ ও মারাঠার মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হইল, ইংরাজ হারিলেন, কারণ এটা প্রকৃতপ্রস্তাবে স্থলযুদ্ধই ছিল। বড় ইংরাজ জাহাজগুলি তীর হইতে দূরে থামিয়া খান্দেরী উপসাগরে ঢুকিতে দেরি করিতেছিল, কারণ তখনও সেখানকার জলের গভীরতা মাপা হয় নাই। এমন সময়ে লেফটেনাণ্ট ফ্রান্সিস্ থর্প, প্রধান সেনাপতির আজ্ঞা অমান্য করিয়া, তিনখানা পদাতিক-ভরা তোপহীন ছোট শিবাড় (মালের নৌকা) মাত্র সঙ্গে লইয়া ঐ দ্বীপে নামিতে চেষ্টা করিলেন। তীর হইতে তাঁহাদের উপর গোলাগুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। থর্প এবং আর দুজন ইংরাজ মারা পড়িল, অনেকে জখম হইল, আর অনেকে তীরে নামিবার পর মারাঠাদের হাতে বন্দী হইল। থর্পের শিবাড়খানা শত্রুরা দখল করিল; আর দুখানা বাহির সমুদ্রে পলাইয়া আসিল।

১৮ই অক্টোবর দ্বিতীয় জলযুদ্ধ হইল। সেদিন প্রাতঃকালে দৌলত খাঁ ৬০ খানা রণপোত লইয়া আক্রমণ করিলেন। ইংরাজদের আটখানা মাত্র জাহাজ ছিল, তাহার মধ্যে রিভেঞ্জ নামক ফ্রিগেট ও দুখানা ঘুরাব্ বড়, আর সব ছোট; এগুলিতে দুইশত ইংরাজ সৈন্য এবং দেশী ও সাহেব নাবিক ছিল। চৌলদুর্গের কিছু উত্তরে তীরের আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া মারাঠা জাহাজগুলি সামনের গলুই হইতে তোপ ছাড়িতে ছাড়িতে এত দ্রুত অগ্রসর হইল যে খান্দেরীর বাহিরে ইংরাজ পোতগুলি নঙ্গর তুলিয়া আগাইবার জন্য অতি কম সময় পাইল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ইংরাজদের ডোভার নামক ঘুরাবে সার্জেণ্ট মলেভারার ও অন্য কয়েকজন গোরা অত্যন্ত কাপুরুষতার সহিত আত্মসমর্পণ করিল এবং ঐ জাহাজশুদ্ধ মারাঠাদের হাতে বন্দী হইল।* অপর ছয়খানি ছোট ইংরাজ জাহাজও ভয়ে রণস্থল হইতে দূরে রহিল। কিন্তু এক সিংহই সহস্র শৃগালকে হারাইতে পারে। রিভেঞ্জ ফ্রিগেট্ চারিদিকে শত্রুপোতের মধ্যে নির্ভয়ে খাড়া রহিয়া, তোপের গোলায় পাঁচখানা মারাঠী গলবট্ ডুবাইয়া দিল, এবং আরও অনেকগুলির এমন দশা করিল যে দৌলত

---

* শিবাজী সুবর্ণগড় দুর্গে ইহাদের আবদ্ধ রাখেন। সেখানে ৬ই নবেম্বরে বন্দী ছিল, ২০ জন ইংরাজ, ফরাসী ও ডচ, ২৮ জন পোর্ত্তুগীজ অর্থাৎ ফিরিঙ্গী, এবং ৯ জন খালাসী।

খাঁ নিজ পোত লইয়া নাগোৎনায় পলাইয়া গেলেন ; রিভেঞ্জ পিছু ধরিয়া চলিল।

দুদিন পরে দৌলত খাঁ খাড়ি হইতে আবার বাহির হইলেন, কিন্তু ইংরাজ জাহাজ তাঁহার দিকে আসিতেছে দেখিবামাত্র ফিরিয়া পলাইলেন। নবেম্বরের শেষে সিদ্দি কাসিম ৩৪ খান জাহাজ লইয়া ইংরাজদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং দুই দলই খান্দেরীর উপর প্রত্যহ গোলা চালাইতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সব যুদ্ধের খরচ এবং শিবাজীর রাজ্যে তাঁহাদের বাণিজ্য বন্ধ হইবার ভয়ে ইংরাজদের কর্ত্তারা ভীত হইলেন। তাঁহাদের অর্থ ও লোক কম ; গোরা সৈন্য মরিলে নূতন লোক পাওয়া কঠিন। সুতরাং তাঁহারা শিবাজীকে খুব মিষ্ট চিঠি লিখিয়া মিটমাট করিয়া ফেলিলেন। জানুয়ারি মাসে ইংরাজ রণ-পোতগুলি খান্দেরীর উপসাগর ছাড়িয়া বম্বেতে ফিরিল।

কিন্তু সিদ্দি কাসিম খান্দেরীর পাশে আন্দেরী দ্বীপ দখল করিয়া কামান চড়াইয়া দেওয়াল গাঁথিয়া (৯ই জানুয়ারি ১৬৮০) সেখান হইতে খান্দেরীর উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দৌলত খাঁ নাগোৎনা খাড়ি হইতে নৌকাসহ আসিয়া দুই রাত্রি আন্দেরী-দখলের চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। ২৬শে জানুয়ারি তিনি তিন দিকে আন্দেরী আক্রমণ করিলেন। চারি ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ হইল ; অবশেষে মারাঠারা পরাস্ত হইয়া চৌলে ফিরিয়া গেল। তাহাদের ৪ খান ঘুরাব্, ৪ খান ছোট জাহাজ ধ্বংস পাইল, দুইশত সৈন্য মরিল, একশত জখম হইল, আর অনেকে শত্রু হস্তে বন্দী হইল। দৌলত খাঁ নিজে পায়ে বিষম আঘাত পাইলেন। সিদ্দির পক্ষে একখানিও জাহাজ নষ্ট হইল না, এবং মাত্র ৪ জন লোক হত এবং ৭ জন আহত হইল।

দেবী

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনেছি পৌরাণিক যুগে কোন্ এক সতী তাঁর গলিত-কুষ্ঠ স্বামীকে কাঁধে করে স্বামীর অভিলষিত বারাঙ্গনা-গৃহে পৌঁছে দিতেন এবং সেই বারাঙ্গনার দাসীত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেছিলেন। মহান্ কবি মধুর ভাষায় সেই সতী-মাহাত্ম্য লিখে গেছেন। আরও কত কবি, কত ভাবে কত ছন্দে কত সতী-চরিত্র মধুর ভাবে অঙ্কিত করেছেন। আধুনিক যুগে তার আদরের চেয়ে হয় ত সমালোচনাই বেশী। এই নারী-জাগরণের দিনে, অতীত যুগের সেই সব কাহিনীর আজ "অলীক" "নারীর দুর্ব্বলতা" "নারীত্বের অপমান" এমনি কত রকমে সমালোচনা হচ্ছে ; কিন্তু আজও এই দেশে তাঁদেরই যে দু'একজনের পুনরাগমন হয়, সেই কথাই আমি বলতে চাই। আজ আমি যে কাহিনী বলছি, এ আমার নিছক কল্পনা নয় ; বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি! যার কথা বলতে চাই, সে সেই অতীত যুগের সতীদের মতই উজ্জ্বল,—যার আত্মত্যাগ, সতীত্বের তেজ, তাঁদের কারুর চেয়ে হয় ত কম নয়! সে আমার ছোট ননদ দেবী! তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, যখন আমি বিয়ের কনে—শ্বশুরবাড়ী যাই। দশ বছরের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি রাতদিন আমার পাশে পাশে ফিরতো। আর তার চেষ্টা ছিল সেই কচি বুকের স্নেহ ও প্রীতি দিয়ে আমায় প্রফুল্ল রাখতে। যখন চুপ করে বসে আছি, সে জিজ্ঞাসা করেছে "হ্যাঁ বউদি, মার জন্যে মন কেমন করছে?" "না" বল্লে বিশ্বাস করতে চাইত না, ছুটে গিয়ে একটা বড় বেবী পুতুল এনে আমার হাতে দিয়ে বলতো "এটা তোমাকে দিয়ে দিলুম ; তুমি ত কালই যাবে, তার আর ভাবনা কি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব, ইত্যাদি!" দেবী নিজের জোরে অল্প দিনের মধ্যেই আমার মনের মধ্যে তার যায়গা করে নিলে। আমার বোন নাই, দেবীকে পেয়ে আমার সে অভাব পূর্ণ হল। আমার শ্বশুর স্ত্রীশিক্ষার যেমন পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনি বিরোধী ছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার। তাঁর মেয়েদের কারুর ইস্কুলে যাওয়ার হুকুম ছিল না। বাড়ীতে বুড়ো পণ্ডিত মশাই আছেন—তাঁর কাছেই মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা! দেবীও বাড়ীতেই পাঠ সাঙ্গ করেছিল। যখন তার বয়স পনের, তখন তার বিবাহ হল অবনীর সঙ্গে। অবনী বি-এ পড়ে।

তাদের বাড়ী হাওড়া জেলায় এক পল্লীগ্রামে। অবনীদের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল না হলেও, সাধারণ গৃহস্থের মতই ছিল। আমার স্বামী সমান ঘরে বোনের বিয়ে হচ্ছে না বলে ক্ষুণ্ন হওয়ায় শ্বশুর বল্লেন, "যদি "ল" পড়িয়ে পাশ করাতে পারি, তাহলে তোমার জুনিয়র করে নিলেই চলবে।" যাক্, দেবীর ত বিয়ে হয়ে গেল। শাশুড়ী জামাই দেখে বল্লেন, "আমার অমন সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু জামাইটি তেমন সুবিধের হল না!" আমারও মনটা ক্ষুণ্ন হয়েছিল, কি জানি দেবীর যদি অবনীকে পছন্দ না হয়। কারণ অবনীর চেহারা ছিল খুবই খারাপ। কিন্তু মাস খানেক পরে দেবী শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে এলে বুঝলুম অবনীকে দেবীর অপছন্দ হয়নি। বরং জিজ্ঞাসা করতে মুখ টিপে হেসে বল্লে "সত্যি বউদি, মেয়েমানুষের স্বামীর চেয়ে প্রিয় এ জগতে কিচ্ছু নেই।" আমি তার গালদুটো টিপে দিয়ে বল্লুম "এর মধ্যেই এত? · না জানি···" দেবী আমার মুখ চেপে ধরলে। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি, শাশুড়ী ঠাকুরঘরের দিকে যাচ্ছেন, তাঁর মুখে চাপা হাসি। আমাদের সকলের মনে যে একটা সন্দেহের কালো মেঘ উঠেছিল, সেটা সরে গেল। কিছুদিন পরে দেবী হাসিমুখে শ্বশুরবাড়ী চলে গেল।

বছরখানেক পরে স্বামী একদিন বল্লেন, "অবনীটা ফেল্ হয়েছে, আর পড়বে না, বলছে ব্যবসা করবে; হাজার পাঁচেক টাকা চায়। বাবা শুনে রেগে গেছেন। আমি মনে করেছি টাকাটা আমিই অবনীকে দিই। যদি ব্যবসা করে দুপয়সা আনতে পারে তাহলে দেবীটা সুখে থাকবে। না হলে ত ওর শ্বশুরবাড়ীর চাল-চুলো কিছুই নেই, বাপের কাছে একটা পয়সাও পাবে না!"

আমি বল্লুম "টাকা দাও, কিন্তু বাবাকে জানিয়ে দিলেই যেন ভাল হয়। নাহলে ওই টাকায় ব্যবসা না করে যদি আর কিছু—"

বাধা দিয়ে স্বামী হেসে বল্লেন "আরে না না, অবনী সে রকম ছেলে নয়; তোমাদের মেয়েমানুষের মন কি না,— আচ্ছা যা হোক্!"

তিন চার দিন পরে অবনী এসে টাকা নিয়ে গেল। কিছুদিন পরে আমার শ্বশুর এঁকে জিজ্ঞাসা করলেন "বেই বল্লে অবনী চিনির ব্যবসা করছে; ও টাকা পেলে কোথায়?"

আমার স্বামী চুপ করে রইলেন।

শ্বশুর বল্লেন "তুমি কি ওকে টাকা দিয়েছ?"

ইনি বল্লেন "হ্যাঁ···অনেক করে ধরলে—যদি ব্যবসা করে দুপয়সা আনতে পারে"—

বাধা দিয়ে শ্বশুর গম্ভীর ভাবে বল্লেন "ভাল করনি,— ওটা একটা হতভাগা,—মেয়েটাকে জলে ফেলা হয়েছে" বিরক্ত মুখে শ্বশুর চলে গেলেন।

মাসকতক পরে দেবী প্রসব হতে এখানে এল। দেবীর গায়ে কোন অলঙ্কার নাই দেখে শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন "তোর সব গহনা কি হল রে? শুধু দুগাছা শাঁকা,— গহনাগুলো কি অবনী—?"

দেবী বিরক্ত কণ্ঠে বল্লে "গহনা আছে, তারা বেচে খায়নি! আর যদিই বেচে খায়, সে ত এখন তাদের জিনিস, তাতে হয়েছে কি?"

শাশুড়ী গভীর বিস্ময়ে দেবীর রোষদীপ্ত মুখের পানে চেয়ে বল্লেন "জিজ্ঞাসা করতেও দোষ? পরের বাড়ীতে গেলেই কি পর হয়ে যেতে হয় মা?"

দেবী বল্লে "মেয়ে পর হওয়া ত নতুন নয় মা! কিন্তু তাই বলে, দেখে শুনে গরীবের ঘরে বিয়ে দিয়ে, তাদের উঠতে বসতে অপমান করাও ভাল নয়!"

দেবী উপরে চলে এল। শাশুড়ী স্তম্ভিত হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি দেবীকে আমার ঘরে টেনে এনে বল্লুম "পোড়ারমুখী, মার সঙ্গে বরের কথা নিয়ে ঝগড়া করতে একটু লজ্জা হল না? একেবারে মরেছ?"

দেবী বল্লে "না বউদি, আমি দেখেছি, মা বাবা কেউ ওঁর ওপর সন্তুষ্ট নয়; উনিও দুঃখ্ করে বলেন 'গরীব' বলেই এই তাচ্ছিল্য!"

আমি বল্লুম "উনি তোমার মাথাটি একেবারে খেয়েছেন।"

দেবী হেসে বল্লে "যাও"—

তার পর একথা সেকথার পর আমি যখন দেবীকে গহনার কথা জিজ্ঞাসা করলুম, সে আমার মুখের পানে চেয়ে বল্লে "কারুকে বলবে না?"

"তুই কি আমায় চিনিস না দেবী?"

দেবী মাথা নীচু করে বল্লে "তোমার ঠাকুরজামাইকে ব্যবসা করতে দিয়েছি!"

"তোর সব গহনা?"

"হ্যাঁ, সে সব বেচে চার হাজার টাকা হয়েছে!"

"আর তোর ভাই যে অবনীকে ব্যবসা করতে টাকা দিয়েছিল?"

দেবী বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বল্লে "সে টাকা ব্যবসায় লোকসান হয়েছে বউদি! কিন্তু আমার মাথা খাও, দাদাকে এ কথা জানিও না,—বল, জানাবে না?"

আমি বল্লুম "না—কাউকে বলবো না, কিন্তু তুই ভাল কাজ করিসনি দেবী। আমার বিশ্বাস হয় না যে এই টাকা অবনী ব্যবসাতে খুইয়েছে। অন্য কোনরকমে নষ্ট করে"—

বাধা দিয়ে দেবী বলে উঠলো "না বউদি, ওঁকে তুমি সেরকম মনে করো না, দোষ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, আর আমাকে যা ভালবাসেন—"

আমি হেসে বল্লুম "তোর মতন বোকাকে ভালবাসা দেখানো বুঝি শক্ত কথা?"

অবিশ্বাসের হাসি হেসে দেবী বল্লে "ঈস্, তাই বই কি! সে বুঝি আর বোঝা যায় না? আমায় কি খুকী পেয়েছ? ·· ছেলের মা হতে চল্লুম··তুমি কি যে বল বউদি, হ্যাঁ; বস, মার রাগটা ঠাণ্ডা করে আসি" দেবী নীচে চলে গেল। আমি ভাবলুম স্বামীকে এ কথা জানাবো কি না। কিন্তু দেবীর কাছে আমার প্রতিশ্রুতি মনে হতেই মন আমার কিছুতেই এতে সায় দিলে না। স্বামী জানলেই শ্বশুর শুনবেন, অবনীকে হয়ত বকাবকি করবেন, একটা বিশ্রী ঘটনার সৃষ্টি হবে। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে হল, কিন্তু তবুও কি জানি কেন মনটা আমার অবনীর বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠলো। এই ব্যাপারটাকে দেবীর মতন সরল বিশ্বাসে সহজভাবে মেনে নিতে আমার প্রাণ কিছুতেই চাইলে না।

মাসখানেক পরে দেবীর একটি ছেলে হল। দেবীর মুখে হাসি আর ধরে না, আনন্দের অবধি নাই। কিন্তু সেই হাসির উৎস না শুকাতেই অশ্রুর বন্যা এসে দেবীকে ভেঙ্গে দিয়ে গেল, আট দিন বাদে তার ছেলেটি মারা গেল। দেবী মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। দিন কুড়ি পরে অবনী দেবীকে নিতে এলে, শ্বশুর রাগ করে দেবীকে বল্লেন, "তোমার যাওয়া হবে না। এই শরীর নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে হাঁড়ি টামতে গিয়ে মরবে?"

দেবী মৃদুকণ্ঠে বল্লে "আমাকে যেতেই হবে বাবা।"

"যদি যাও, আর এখানে এস না, মনে থাকে যেন!" শ্বশুর রেগে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অবনী একটা গাড়ী ডেকে এনে দেবীকে ডাকতে, দেবী নেমে এল! আমায় প্রণাম করে বল্লে "বউদি আসি, বাবাকে বুঝিয়ে তাঁর রাগ ঠাণ্ডা করো!" আঁচলে চোখ মুছে দেবী গাড়ীতে গিয়ে উঠলো, অবনী উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিলে!

দুপুরবেলা শ্বশুর রোগী দেখে বাড়ীতে ফিরে এসেই ডাকলেন "দেবী"—

শাশুড়ী কাছে এসে ব্যথিত কণ্ঠে বল্লেন "চলে গেছে"—

শ্বশুর স্তব্ধ ভাবে কিছুক্ষণ বসে থেকে ধীরে ধীরে বাইরে বৈঠকখানায় চলে গেলেন, কেউ একটা কথা বলতে সাহস করলে না।

২

বছরখানেক কেটে গেছে! আমার শ্বশুর একদিন হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গেলেন। এই এক বছর তিনি দেবীর কোন খবর নেন নি, বাড়ীর কেউ তাঁর সামনে দেবীর নাম উচ্চারণ করতে সাহস করে নি। শাশুড়ী একবার লোক পাঠিয়ে দেবীর খবর নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্বশুর এমন রেগে তাঁকে ধমক দিয়েছিলেন, যে, শাশুড়ী কোন দিন আর মেয়ের নাম মুখে আনেন নি! অমন শান্ত স্নেহশীল শ্বশুর যে এতখানি রাগতে পারেন, এ আমি ধারণাও করতে পারতুম না, যদি না সেদিন চোখে দেখতুম। শ্রাদ্ধের সময় দেবী এল। সকলে তাকে তেমন প্রীতির চক্ষে দেখলে না,—সেই যেন শ্বশুরের মৃত্যুর কারণ। দেবীও নিজেকে সকলের সান্নিধ্য থেকে দূরে রেখে চলতে লাগলো। কিন্তু তার নির্ম্মম গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে যে একটা অতিবড় গোপন শোক মুখ লুকিয়ে কাঁদছে, এ কথা আর কেউ না জানলেও আমার অজানা রইল না। আমি ত জানি দেবী বাপকে কতখানি ভক্তি করতো, ও ভালবাসতো! শ্বশুরও সকলের চেয়ে ছোট মেয়েকেই বেশী স্নেহ করতেন। কিন্তু আমি আজও বুঝতে পারি না, কেমন করে শ্বশুরের অতবড় স্নেহ ক্রোধে রূপান্তরিত হয়েছিল, যাহাতে মৃত্যুর সময়ও তিনি দেবীর নাম পর্য্যন্ত মুখে আনলেন না। দেবীকে এবার দেখে আমার চক্ষে জল এল। সে সুন্দর চেহারা নাই, ভয়ানক রোগা হয়ে গেছে, অমন যে

সোণার মতন বর্ণ, যেন নিষ্প্রভ ম্লান! শ্রাদ্ধের দিন আমি আমার চুড়ী কগাছা ও হারটা খুলে তাকে পরাতে গেলে সে বাধা দিয়ে বল্লে "কি দরকার বউদি ?"

আমি বল্লুম "কত বাড়ীর মেয়েরা আসবে, আর তুই খালি হাতে বেড়াবি ?···ছিঃ !"

দেবী ম্লান হাস্তে বল্লে "একদিন মিথ্যে বড়মানুষী দেখিয়ে লাভ কি বউদি ?"

"বড়মানুষী নয় বোন ; তুমি এ বাড়ীর মেয়ে, শুধু সেইটুকু বজায় রেখে চলা। আর একদিন নয়, এ চুড়ীও আমি তোমায় চিরদিনের জন্যই দিচ্ছি···আমি ত তোর পর নই দেবী ?"

দেবী আর কিছু বলতে পারলে না, শুধু তার চোখের কোণ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো !

শ্রাদ্ধ চুকে গেলে, আমার স্বামী একদিন অবনীকে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার চিনির কারবার কেমন চলছে হে ?"

অবনী মাথা চুলকে আমতা আমতা করে বল্লে "আজ্ঞে, তেমন সুবিধে হচ্ছে না, অনাদায়ে কতক টাকা মারা গেল, বাজারটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে কিছু লোকসান হল !"

স্বামী হেসে বল্লেন, "বুঝেছি ; দেখ, ও ব্যবসা করা তোমার দ্বারা চলবে না। একটা চাকরীর যোগাড় দেখ, না হলে কোন্ দিন জেলে যাবে !"

অবনী চুপ করে রইল। স্বামী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার বাবা কি বলেন ?"

"তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে, তিনি আমার সঙ্গে কথা কন না !"

"কেন ঝগড়া হল ?"

"কারণ কিছুই নয়- মাসে দু পাঁচশো করে তাঁর হাতে এনে দিলে আমি খুব ভাল ছেলে হতে পারি। তাই মনে করেছি, আপনার ভগ্নিকে এখন এখানে কিছু দিন রাখবো, আর আমি একটা মেসে থাকবো। তার পর একটু সুবিধে হলেই একটা বাড়ী ভাড়া করবো।"

স্বামী বল্লেন "তুমি মেসেই বা থাকতে যাবে কেন ? আমি কি তোমায় চারটি খেতে দিতে পারবো না ? তবে, ব্যবসায় তুমি সুবিধে করতে পারবে না আমার মনে হয়। একটা চাকরী দেখতে পারতে! ভেবে দেখে যা ভাল হয় কর! আর বাপের সঙ্গে অসদ্ভাব করো না।"

সেই থেকে অবনী শ্বশুরবাড়ীতেই থেকে গেল। প্রত্যহ সকালে খেয়ে বেরিয়ে যায়, আর ফেরে রাত বারোটা, একটায়। জিজ্ঞাসা করলে বলে "কাজ ছিল।" সকলেই বিরক্ত। চাকররা দরজা খুলতে বিরক্ত হয়, ঠাকুর খাবার নিয়ে বসে থাকতে পারে না। শেষে দেবী নিজের ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে অবনীর জন্য রাত জেগে বারান্দায় পথের দিকে চেয়ে বসে থাকে! অবনী এলেই নেমে এসে নিঃশব্দে দরজা খুলে দেয়। কারণ আমার স্বামীও দু একদিন অবনীর রাত করে বাড়ী ফেরার দরুণ বকাবকি করেছিলেন। অবনীর চরিত্র সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ হয়, কেবল হয় না দেবীর। বল্লেও বিশ্বাস করবে না, কেবল কাঁদবে!

ক্রমে অবনী দেবীকে দিয়ে প্রায়ই আমার শাশুড়ীর কাছ থেকে, না হয় আমার স্বামীর কাছ থেকে ২০।৩০ করে টাকা চাইত। কখনও বলতো "পকেট মেরে নিয়েছে, একজনকে আজ দেবার কথা আছে না দিলে বড় লজ্জায় পড়বো," কোন দিন বলতো "ধার দিন, মাসকাবারে টাকা পেলেই সুধে দোব" ইত্যাদি। বাড়ী শুদ্ধ সকলেই যেন অবনী ও দেবীকে নিয়ে জ্বালাতন। ইদানিং আমার স্বামী টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন এবং শাশুড়ীকেও বারণ করে দিলেন। কিছুদিন পরে একদিন আমার মেজ ননদের নতুন জামাই এল। সকাল বেলা শোনা গেল, জামায়ের পকেটে দুখানা দশ টাকার নোট ছিল, পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন জামাইকে সে টাকা আমার স্বামী দিলেন। সে বেচারী কিছুতেই নিতে চায় না, বাড়ী শুদ্ধ সকলেই অপ্রস্তুত। জামাই চলে গেলে, স্বামী চাকরদের বকাবকি করলেন, তারা সকলেই টাকা নেওয়া অস্বীকার করলে, কারণ তারা কেউ ওপরে ওঠে না। বিকেল বেলা যখন আমি চুল বাঁধছি, তখন দেবী আমার ঘরে এল। তার মুখখানা ভয়ানক শুষ্ক ও ম্লান। দু এক কথার পরে, দেবী হঠাৎ কেঁদে ফেলে আমায় বল্লে "টাকা আমি নিয়েছি বউদি, তোমার ঠাকুর-জামাই চেয়েছিল, তার বড় দরকার। আমার মরণ হলেই বাঁচি—লোকে শুনলে কি বলবে" বলে কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগলো। আমি ত অবাক। দেবীর যে এতখানি অধঃ-পতন হতে পারে, আমি ত ধারণাই করতে পারি না। তার অবস্থা দেখে বুঝলুম, অনুতাপ ও আত্মগ্লানিতে তার হৃদয় ভরে গেছে। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাকে

সান্ত্বনা দিতে লাগলুম। কিন্তু দুদিন পরেই বুঝতে পারলুম, আমার সাবধানতা সত্ত্বেও বাড়ীর কেউ কেউ দেবীর স্বীকারোক্তি ও কান্না শুনেছে এবং সকলকে জানিয়ে দিয়েছে। শাশুড়ী সকলকে চুপ করিয়ে রাখলেন, কিন্তু সকলেই দেবীকে ঘৃণা করে সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলো।

মাস ছয় পরে আমার ছেলের অন্নপ্রাশন। সকালে স্বামী ২০০৲ টাকা এনে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন "রেখে দাও, বিকেলে নোব!"

আমি বল্লুম "এ টাকায় খোকার নেকলেশ হবে, টাকা পাবে না।"

"না—না, সে হবে না" বলে স্বামী বাইরে চলে গেলেন। দেবী তখন সেখানে ছিল। আমি টাকাটা বাক্সয় তুলে, চাবিটা বালিশের তলায় রেখে নীচে চলে গেলুম। বিকালে স্বামী আর টাকা চান নি, আমারও মনে নাই। ৩।৪ দিন পরে স্বামী টাকা চাইলে, বাক্স খুলে দেখি টাকা নাই। স্বামী বল্লেন, "তুমি নিয়েছ —মিথ্যে খোঁজাখুঁজি করছ, তোমায় বারণ করলুম নেকলেশ তৈরী এখন থাক" ইত্যাদি। তিনি খুব রেগে গেলেন,—কিছুতে বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে টাকা আমি নিইনি। লজ্জায় রাগে আমার চোখ দিয়ে জল এল। শাশুড়ী বল্লেন, "বাক্স থেকে কে নেবে বাপু?" সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করে নিলে যে টাকা আমিই রেখেছি ছেলের গহনা তৈরীর জন্যে। হঠাৎ আমার দেবীর কথা মনে পড়লো। আমি দেবীকে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলুম "ঠাকুরঝি, ঠাট্টা করে টাকা কি তুমি নিয়ে রেখেছ?"

দেবী আমার দিকে একবার চাইলে। পরে মাথা নীচু করে বল্লে "হ্যাঁ বউদি, সে টাকা আমিই তোমার বাক্স খুলে নিয়েছি। ঠাট্টা করে নয়, নেবার জন্যেই নিয়েছি। তোমার ঠাকুর জামাই কাবুলীওলার কাছে টাকা ধার করেছিল, দিতে পারছে না, তারা মারবে বলেছিল। সেই টাকা নিয়ে ওঁকে দিয়েছি।"

"মার কাছে এ কথা বলবে?"

"সকলের কাছেই বলবো, কেবল ওঁর কাবুলীওলার কাছে টাকা ধারের কথা বলবো না!"

এই বলে দেবী নেমে এসে আমার শাশুড়ীকে বল্লে "মা, বউদির বাক্স খুলে টাকা নিয়ে আমি তোমার জামাইকে দিয়েছি, দাদাকে বলো।"

আমার স্বামী শুনে হেসে বল্লেন, "মা, তোমার বউদের বল, দেবীর পায়ের ধুলো নিতে, তার কাছে পতিভক্তি শিখতে।"

স্বামী হেসে ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইলেও শাশুড়ী কিন্তু দেবীকে ক্ষমা করতে পারলেন না—দেবীকে তীব্র কটু ভৎর্সনা করলেন। পরদিন দুপুরে দেবী ও অবনী চলে গেল। শাশুড়ী একটা কথাও বল্লেন না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে না—তারা কোথায় যাচ্ছে। স্বামী কাছারী থেকে ফিরে এসে শুনে, দেবীর শ্বশুরবাড়ী থেকে খবর নিয়ে এলেন —তারা সেইখানেই আছে।

এই ঘটনার পর প্রায় বছরখানেক পরে আমার কপাল পুড়লো, স্বামী মারা গেলেন। আমার নিজেরও সে সময় খুব অসুখ। বাবা আমাকে ও আমার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পুরী এলেন। পুরীতে এসে সেই রোগ-শয্যায় শুয়ে দেবীর শোচনীয় মৃত্যুর খবর পেলুম। দেবীর একখানা চিঠি পেলুম—মৃত্যুর পূর্ব্বে সে আমায় লিখেছে—

ভাই বউদি,

তুমি যখন এই চিঠি পাবে, তখন আমি আর ইহজগতে থাকবো না। কোন্ অজানা দেশে, অন্ধকারে মিশিয়ে যাব, তা জানি না। যাবার আগে, তোমায় যা কিছু বলবার আছে, বলে যেতে চাই। কারণ তুমি আমায় মার স্নেহে, ভগ্নির আদরে, প্রিয় সখীত্বে ঘিরে রেখেছিলে। তোমার কাছে আমার কোনও কিছুই কোন দিন গোপন ছিল না, আজও নাই। আমি ইচ্ছে করে মরণকে বরণ করে নিচ্ছি, কারণ এ ছাড়া আর উপায় নাই, বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা বলে মনে হচ্ছে। তুমি হয় ত মনে করবে আমার মাথা খারাপ হয়েছে; কিন্তু ধীরভাবে ভেবে দেখলে বুঝবে সে সব কিছুই নয়। যাই যোক্, আমায় ক্ষমা করো। তুমি বলবে "এ পাপ," কিন্তু আজ আমার পাপ-পুণ্য বিচার করবার সময় নাই। মরণের পরপারে বিধাতার অভিসম্পাত বা আশীর্ব্বাদ যাই পাই না কেন, সাদরে মাথায় তুলে নোব। এই আমার বিধিলিপি। আমার ভাগ্য নিয়ে নিয়তির যে নিষ্ঠুর খেলা চলেছে, তা তুমি জান, শুধু শেষের দিকটায় কি হয়েছে জান না। তোমার ঠাকুর-জামাই কোন্ অফিসে চাকরী করছিলেন। তাঁর হাতে সেই আফিসের তহবীল থাকতো। তিনি তাই থেকে কবে তিন হাজার টাকা নিয়েছিলেন। সম্প্রতি

জানাজানি হয়েছে। তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে, তিনি লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। কাল রাত্রে চুপি চুপি এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চিরদিনের পাপের কাহিনী বলেন। তিনি ঘোড়দৌড়ে ও এক নারীর কুহকে পড়ে তার পায়ে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করে এসেছেন। দিদি, আমি জানতুম না যে সংসারে এত প্রতারণা আছে। আমার যে দেবতাকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলুম; সে দেবমূর্ত্তি কে ভেঙ্গে দিলে? তুমি জান, স্বামীর জন্য আমি নিজেকে কতখানি হীন করেছি, কত সহ্য করেছি। কিন্তু মনে তৃপ্তি ছিল, গর্ব্ব ছিল, আমার স্বামী দেবতা। তুমি হাজার বল্লেও একদিন ভাবতে পারিনি, তিনি অন্যে আসক্ত। তোমার মনে আছে? "কৃষ্ণকান্তের উইল" পড়ে একদিন বলেছিলুম স্বামীকে সন্দেহ করে, অভিমান করে পোড়ারমুখী ভ্রমর নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে আনলে। তাই, অবিশ্বাসের কালো ছায়াকে মনে কখনও স্থান দিই নি। তাঁর দ্বারা যে কোন নীচ কাজ হতে পারে, এ আমার কল্পনাতেও স্থান পায় নি। আমি স্বামীর জন্য স্নেহময় বাপের প্রাণে আঘাত করেছি, তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছি, সকলের ঘৃণার পাত্র হয়েছি। নিজেকেও নিজে কম ঘৃণা করি নি, কিন্তু সবই যে ব্যর্থ হল দিদি? তিনি কেঁদে বল্লেন "আমায় বাঁচাও দেবী, জেলে গেলে মরে যাব। টাকা পেলে তারা আর পুলিশ কেশ করবে না।" মান অপমান ভুলে আজ সকালে মার কাছে ছুটে গেলুম। মেজদার পায়ে ধরে কেঁদে সব ঘটনা বলে টাকা চাইলুম, পেলুম না। বল্লেন "তার জেল হওয়াই উচিত!" মা চুপ করে রইলেন, দিদিরা ঠাট্টা করতে লাগলো, ফিরে এলুম। আজ বাবা নাই, দাদা নাই, তুমিও দূরে। তুমি এখানে থাকলে হয়ত তোমার বাবার কাছ থেকে এনে দিতে। তিনি বড়লোক, উদার, আমি তাঁর মেয়ের মতন, নিশ্চয় আমাকে রক্ষা করতেন।

কিন্তু সে আশা নাই, তিনিও তোমার কাছে পুরীতে। তুমি আজ রোগে, শোকে ভেঙ্গে পড়েছ, অভাগিনী আমি, তোমাকে আরও ব্যথা দিয়ে যাচ্ছি, ক্ষমা করো। জগতের সব যেন আমার কাছে শুষ্ক শূন্য হয়ে গেছে। সব বিস্বাদ ঠেকছে। জায়েরা আমায় দেখে মুখ টিপে হাসছে, শ্বশুর বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। আমি কি করি বল ত দিদি? এখন রাত ১টা, সকলে ঘুমিয়েছে, সারা জগৎ সুপ্ত, কেবল জেগে একা আমি। স্বামী এখনি আসবেন, কেমন করে তাঁকে বলবো টাকা পাই নি? তুমি যদি তাঁর এখনকার চেহারা দেখতে, কান্না শুনতে, তুমিও না কেঁদে থাকতে পারতে না। বল্লেন "মা নাই, তুমি আছ দেবী; যেমন করে পার আমায় বাঁচাও।" সত্য কথা; আমার শাশুড়ী বেঁচে থাকলে তিনি কি ছেলের এ বিপদে ঘৃণা করতেন? বোধ হয় না। একজন খুনেকে হয় ত জগৎশুদ্ধ লোক ফাঁসী দেওয়াতে চায়, কিন্তু তার মা সেই সন্তানের কল্যাণের জন্যই ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। আমিও ত সেই মায়ের জাত। তোমার কাছে সত্য বলছি দিদি, স্বামীর প্রতি আমার এতটুকু দুঃখ রাগ অভিমান নাই। তাঁর কাজের বিচার কোন দিন করি নি, আজও করবো না। আমার মনের মাঝে আজ কি হচ্ছে, তোমায় লিখে জানাতে পারছি না। আজ জগৎ একধারে, অপর দিকে আমি·· আর আমাকেই আশ্রয় করে আছে বিশ্বের অভিশপ্ত আমার অপরাধী স্বামী। তাঁকে কি ঠেলে ফেলতে পারি? তুমিই বল ত দিদি! কিন্তু রক্ষা করবার ক্ষমতাই বা আমার কোথায়? কাল আমার কাছ থেকে আমার স্বামীকে পুলিশে কেড়ে নিয়ে যাবে, আমায় দাঁড়িয়ে দেখতে হবে? না দিদি, পারবো না! আমি কি নিয়ে জগতে থাকবো? ওঁকে ছেড়ে যে একদিনও থাকতে পারি নি। আমার হীনতা, আমার দুর্ব্বলতা নিয়ে লোকে হয় ত কত বলবে, ঘৃণা করবে। তাতে আমার কোন ক্ষোভ নাই, কিন্তু তুমি সইতে পারবে না, তোমার বুক ভেঙ্গে যাবে, এই ভেবেই আমার চক্ষে জল আসছে। আজ ছেলেবেলার কত কথা মনে পড়ছে। আজ কি তারিখ জান বৌদি? ·৯ই ফাল্গুন! মনে আছে?···এই দিনে আমার বিয়ে হয়েছিল? আজও আকাশে তেমনি জ্যোৎস্না, একরাশ নক্ষত্রের মাঝে সেই চাঁদ! ঘরের ভেতর জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে। সেদিন ঠিক এই সময় রাঙ্গাদিদি বাসরঘরে গাইছিলেন, মনে আছে?—

> "রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে,
> তোমায় আমায় মিলন হল, সেই মোহানার ধারে"

* * * *

হায় রে, সেই একদিন আর এই একদিন! এর মাঝে

হারেমবাসিনী

শিল্পী— শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ গুপ্ত
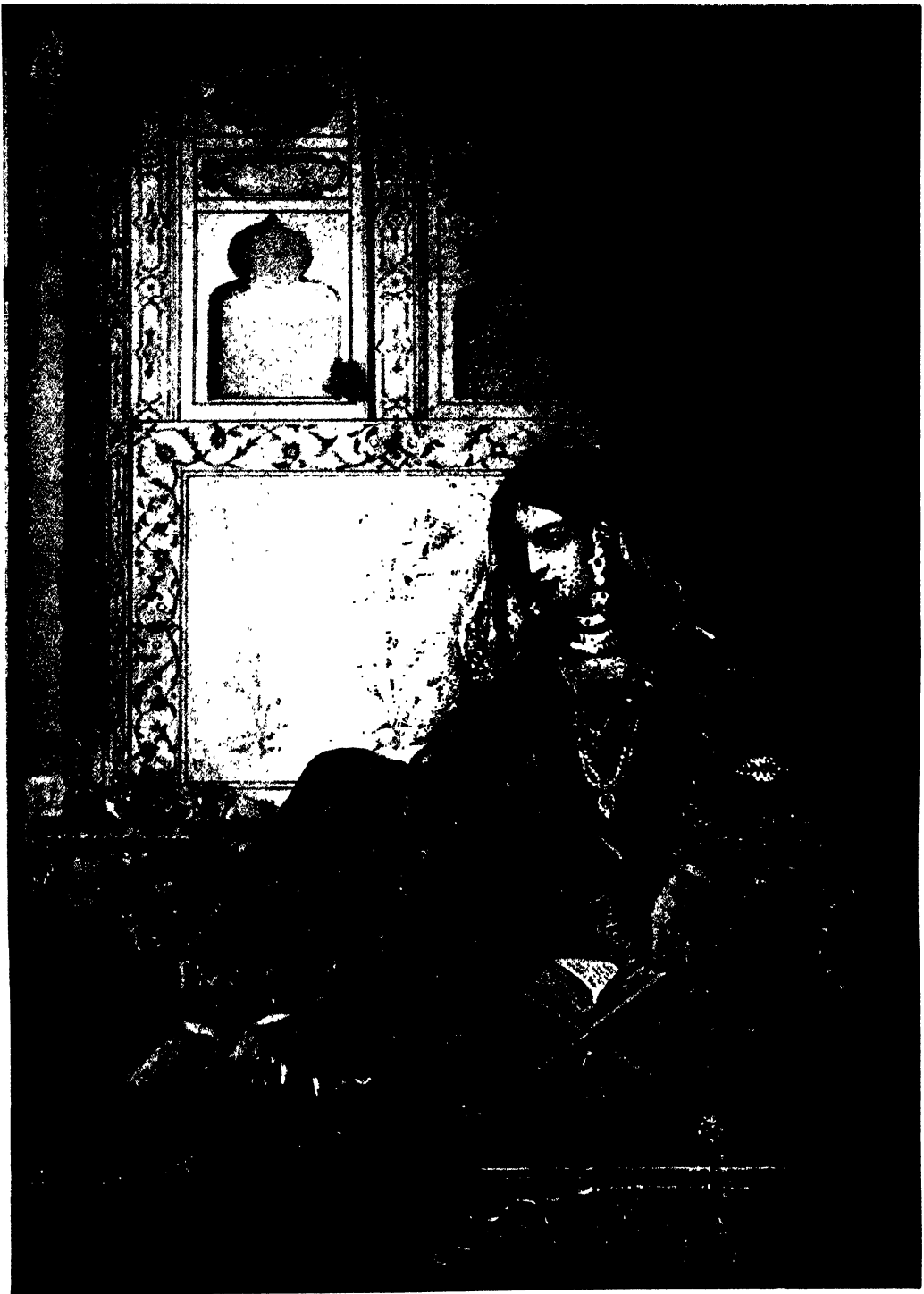
BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS

যেন কত কত যুগের সুদীর্ঘ ব্যবধান! কিন্তু আজ সেই মিলন-পূর্ণিমা! স্বামীর পায়ে প্রথম স্থান পেয়েছিলুম, আজ আবার শেষ তাঁর পায়ে স্থান চাই! তিনি এখনি আসবেন! ওঃ আর দশ মিনিট সময় আছে। বিদায় বউদি! আমার শত শত প্রণাম নাও, আমায় ক্ষমা করো। তিনি এসে পড়লে আর আমার মরা হবে না, তাঁকে দেখলে আবার আমার বাঁচতে সাধ হবে। বেঁচে থেকে ত তাঁকে রক্ষা করতে পারবো না দিদি! তাঁর উদ্ধারের ভার ভগবানের ওপর দিয়ে গেলুম। ঈশ্বর ত আমার মন দেখছেন, তাঁর কি দয়া হবে না? স্নেহলতা মরবার উপায়টা সহজ করে দিয়ে গেছে। বোতলভরা কেরোসীন ওই ঘরের কোণে আমার দিকে একান্তে চেয়ে আছে···যাচ্ছি···একটু অপেক্ষা! হ্যাঁ··· বউদি···একটা কথা, পরকাল আছে ত? আমি সেখানে প্রতীক্ষা করে থাকবো! আশীর্ব্বাদ কর, যেন মৃত্যুর পরপারে আমার দেবতাকে শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময়রূপে পাই! বিদায়···বিদায়··

অভাগিনী দেবী—

*   *   *   *

সেই টাকা দেওয়া হল, অবনী মুক্তি পেলে, কিন্তু দেবী দেখতে পেলে না! অবনী এখন কোথায় আছে, কি করছে জানি না, জানতে ইচ্ছাও নাই! কেবল দেবীর কথাই মনে হয়, আর ভাবি ওই কচি বুকে ভগবান কি বিরাট প্রেমই সৃষ্টি করেছিলেন।

আজ দুর্গোৎসব···বাঙ্গালী জীবনের একমাত্র আনন্দোৎসব! রোগ শোক-দুঃখ-প্রপীড়িত বাঙ্গালী আজ মাকে পেয়ে সকল দুঃখ ভুলেছে! সকলে মিলে মার কাছে এসে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছে! আমিও এসেছি। সেই পূজার দালানে দেবী-প্রতিমা, সেই ননদরা তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেই লোক সমাগম, ঢাকের বাজনা, পাড়ার ছেলে মেয়েরা সকলেই আছে, কেবল নাই আমার স্বামী ও দেবী! গেল বছরের কথা মনে পড়ছে··· দেবী আমার পাশটিতে দাঁড়িয়ে করযোড়ে প্রতিমার দিকে ভক্তি-আপ্লুত নেত্রে চেয়ে ছিল··আজ সে নাই! প্রাণটা কেঁদে উঠে দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে "মা, আমার দেবী কোথায়···?"

কুলগুরু চণ্ডীপাঠ করছেন···গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"

আই হ্যাজ্ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবু বি-এ পর্য্যন্ত পড়লে, কিন্তু বরাবরই লিখলে—'আই হ্যাজ্' (I has)। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতো—"জ্ঞান হলে বুঝবে।"

(১)

পূর্ণিয়ার সঙ্গে আমার বিশ বচরের পরিচয়। শুনে লোকে শিউরে ওঠে,—কৈফিয়ৎ দিতেও হয় কম নয়।

কেহ ভাবেন,—পত্নী-বিয়োগ-বিধুর হবেন;—প্রগাঢ় প্রণয়ী ছিলেন, আত্মহত্যা করতে পারেন না তাই Slow poison হিসাবে ম্যালেরিয়ার শরণ নিয়ে থাকবেন। নচেৎ এত দেশ থাকতে পেন্‌সেন্ নিয়ে লোক পূর্ণিয়ায় আসে কেনো!

বিচক্ষণ বিষয়ী ও বুদ্ধিজীবীরা ভাবেন,—চেহারা দেখে বোঝনা,—পূর্ণিয়ার Exciseএর (একসাইজের) সাইজ্ বেশ দরাজ; দু'একখানা গাঁজার দোকান হাতাবার ফিকিরে আছেন বোধ হয়। গাঁজার গরজ না থাকলে কাশী ছেড়ে এ সাজা কেউ নেয়! আবার কেঁচে তাজা হতে চান,— বোঝনা?

ইত্যাদি।—

শুনে আনন্দ ও গর্ব্ব দুই অনুভব করি। বাঙ্গালীর ব্রেন্ অত্যন্ত সাফ্, চট্ বুঝে নেয়;—তাই ইংরেজও ভয় করে—শুনতে পাই। হুতোসে বজেট্ বাড়তেও দেখতে পাই।

আমার বরাবর একটা গর্ব্ব ছিল—আমি বিশুদ্ধ

বাঙ্গালী। যেহেতু যত রকমের ভয় আছে আমার মধ্যে তার কোনটারই অভাব ছিলনা।

চাকরি বাঙ্গালীর বড় পরিচয়,—তা করতেই হয়েছিল, তবে ভস্ম হবার ভয়ে কোন দিন প্রভুর সঙ্গে চার চক্ষু এক করা হয়নি,—নেপথ্যই সুপথ্য ছিল।

শাস্ত্র যদিও শোনান,—বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল, আমার দুর্ভাগ্যে,—ভয়ই ধর্ম্মের মূল হয়ে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি চাকরি বিসর্জ্জন দিয়ে—ধর্ম্মার্জ্জনে ঝুঁকলুম,—কাশী রওনা হয়ে পড়লুম।

কাশী পরিচিতের আড্ডা। পথে বেরুলেই "কিহে,—তুমি?—কবে?" তার পর সবই ধর্ম্মকথা—"গৌর, অনুকূল, রাজন—সবাই যে এখানে। মনে আছে তো?—চলো চায়ের দোকানে—সবাইকে পাবে।"

গিয়ে দেখি,—সবাই পাকা ফল,—বোঁটা খসলেই হয়।

"এই যে—কবে? আরে এসো এসো। বেশ করেছ—আর কেনো!"

সবার হাতেই চায়ের কাপ;—"একটু চিনি দাও বাবা—আপিনটে ধরচেনা।"

—"দেখচ তো—আমাদের কাছেই বেটাদের মদ্দামী; ভালমানুষ পেয়েছেন কিনা! এইবার ঠেকেছেন দানবের হাতে,—জার্ম্মাণী হে জার্ম্মাণী। জগদম্বা আছেন! খবর রাখচতো? আগে থেকে কিছু রং কিনে রাখতে পারলে"… …ইত্যাদি।

দেখি সবই জাহান্নমের যাত্রী।

তিন ঘণ্টা অথর্ব্ববেদ শুনে বাসায় ফিরলুম, ভাবতে ভাবতে—এ যে "যে ভয়ে পালাও তুমি"!

খাই দাই বেড়াই। কিছুদিন কাটলো. কিন্তু, ধর্ম্মের নেশা জমে না।

পথে অনুকূলের সঙ্গে দেখা।

"কিহে—আর যে বড় দেখতে পাইনা! এখানে একবার এলে আর যাবার জো নেই,—খাবার সুখ কেমন? বাজারটা দেখেছ তো—মায় সুসনি, সজনে হাঁসের ডিম্! উদ্দিকে—খয়রা থেকে খাসি। যাবে কোথা।"

দুচার কথার পর বললুম—"কাশী এলুম, আজো মহাপুরুষ দর্শন হলনা, তোমরা তো অনেক দেখে থাকবে"…

"তোমার সখ্ থাকে তো অনিলকে পাঠিয়ে দেব।"

* * * *

দিন কাটেনা,—লাইব্রেরির মেম্বার হয়ে বই এনে পড়ি। হাতে ঢের সময়, ভাবি,—পাড়ার গরীবদের ছেলেদের পড়াই। একখানা বেঞ্চিও কিনলুম। তিনখানা হিন্দি প্রথম পাঠ আনলুম। আমার গয়লাকে আর পাড়ার দু'এক জনকে আমার ইচ্ছা জানিয়ে ছেলে সংগ্রহ করে দিতে বললুম।

অনিলের প্রত্যাশায়ও থাকি। সে আমার পরিচিত নয়,—এসে না ফিরে যায়।

সেটা বেস্পতিবার বৈকাল, বোধ হয় বারবেলাই ছিল। একলা বসে ভাবচি,—তাই তো, এমন দুর্লভ মানব-জন্মটা বৃথাই হয়ে গেল, কিছুই করা হ'ল না। কাশী এসেও মহাপুরুষ মেলে না!

হঠাৎ রাস্তা থেকে—নাম ধরে ডাক!—বাড়ী আছেন কি

জানালায় উপস্থিত হতেই—

"আপনার নাম * * *? অনুকূল বাবু পাঠিয়ে দিলেন, তাঁকে কিছু বলেছিলেন কি?"

"আপনিই অনিল বাবু?—এলুম বলে।"

দেবতার বেড়া-জাল—জাগ্রত-পীঠ। একটু বৈরাগ্যের বেগ্ এসেছে—অমনি সাড়া পৌঁচেছে! তা না তো আর লোক কাশী আসে!

তাড়াতাড়ি খদ্দরের কোটটা চড়াতে চড়াতে রাস্তায়।

অনিল বাবুর সঙ্গে আলাপ করতে করতে চলা গেল।

কপালের দৌড় ওপর দিকে,—চোখ ছোট, নাক টেপাখীর মত, গলা লম্বা, লোকটি ছিপছিপে, খয়ের রং। জোলাপী-আলাপি—পেটে কিছু রেখে কথা কয় না। দশ মিনিটেই পরমাত্মীয় হয়ে দাঁড়ালো। প্রচণ্ড স্বদেশী। যে কথাই হোক,—সেই ফোড়ায় হাত, আর দীর্ঘনিশ্বাস। রাবড়ির কথাতেও তাই,—"আর কি সে সোনার লঙ্কা রেখেছে, চোনা মেলেনা মশাই,—ভগবতী এখন রাজভোগ, গোরার পেটে গোয়াল। আর কি সেদিন আসবে—সে অর্জ্জুন—সে গাণ্ডীব!"

মিনিট খানেক অন্যমনস্ক,—নীরব। সশব্দ নিশ্বাস ফেলে—"আপনি ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঠিক করে বলুন আর কত দিন" ……ইত্যাদি।

অনিলের খাঁটি 'সিন্‌সিয়ারিটি' দেখে আমি মুগ্ধ। বললুম—"তুমি কাশীতে কেন ভাই?"

"আপনারা যা করবার করছেন—করবেনও, হোকনা তিল্ তিল্; breathes there a man—সে বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু ভারত বরাবরই ধর্ম্মক্ষেত্র,—এখানে মহাপুরুষ ছাড়া কিছুই হ'তে পারেনা;—এক গণ্ডুষে সাগর শুষতে তাঁরাই পারেন। মুহূর্ত্তে Man of war মাটি নেবে, চড়ায় ঠেকে ঠাণ্ডা!"

বলতেই হল—"তাঁরা ইচ্ছা করলে কি না পারেন।"

"তাইতো ঘুরে মরচি; রয়েছেনও বহুৎ। কিন্তু ওই যা বললেন—'ইচ্ছা করলেই'। কেউ নোয়না মশাই, সবারই এক কথা,—তাঁদের কাছে যে সব এক,—না আছে জাতি না আছে দেশ;—মশাই, মিষ্টার, মোঁসো—সব এক,—বাপে শালায় ভেদ নেই। মুস্কিল তো ওই। আচ্ছা, আমিও ছাড়বার পাত্র নই! আসুন—এই আশ্রম।"

কোলাহলপূর্ণ পচা গলির মধ্যে গায়ে গায়ে কেবল বাড়ী। সেই চাপের মধ্যে আশ্রম—ত্রিতল। দ্বারে বংশ-ভূষণ বিস্তৃত-বক্ষ বিকটাক্ষ দুই নিরেট জোয়ান—খইনি টিপছিলো। অনিলকে দেখে দাঁড়িয়ে সেলাম করলে।

"মহারাজ হায়?"

"হাইয়ে।"

আমি ভীতু লোক। ভোজপুরী তাল বেতাল দেখে আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা বিগড়ে বানচাল!

অনিল বুঝতে পেরে বললে,—"এখানে সকল মিঞাই জোড় হাত—যিনি যত বড়ই হোন্। সব শরণ নিয়ে বসে আছে,—প্রভাব কত!—কপাল-ভাঙা লোকই আসে।"

কতক সামলালুম।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে হাজির।

কে?

আজ্ঞে আমি।

মুরারি? আর কে?

দোর খুলে দিলেন। প্রশস্ত ঘর। সতরঞ্চির ওপর ফরাস। বসতে বললেন।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট পুরুষ—আন্দাজ আটচল্লিশ, নরুণ পেড়ে ধুতি আর ছত্রিশ ইঞ্চির গেঞ্জি। চক্ষু যেন আমার ওপর 'এক্স্-রে' ফেলে প্রেগ্-স্পট্ খুঁজছে!

ভাবচি,—মহাপুরুষ কই!

অনিল প্রণাম করলে। তবে নিশ্চয় ইনিই—আমি একেবারে সাষ্টাঙ্গে।

বললেন—"অত ভক্তি কেন? বসো।—কাশীতে কি মনে করে?"

এই বলতে বলতে গায়ে হাত দিয়ে টিপেটুপে "ও—খদ্দর"—বলে গিয়ে বসলেন।

মহাপুরুষ স্পর্শে আমার অন্তরটা কেঁপে আধ্যাত্মিক ভাব একদম অন্তর্হিত।

—"হ্যাঁ—কাশীতে কি মনে করে,—পাপ গোপন না প্রায়শ্চিত্ত মানসে। এখানে ত চোদ্দ আনা আসামীই আশ্রয় নেয়। ধর্ম্মের মত ধর্ম্ম আর নেই কিনা।"

"আজ্ঞে আমি……"

"বুঝেছি—পেন্‌সেন্ নিয়েছ। শরীর ত বেশ দেখচি,—তাড়াতাড়ি কি ছিল?—

—"গরীবের ছেলেদের শিক্ষিত করে চোক ফুটিয়ে অশান্তি বাড়াবার মাথাব্যথা—আর

"তাদেরও মাথা খাওয়া? কাশী-বাস করে লোক এই করতে নাকি?"

শুনে আমার আর রক্ত নেই, একদম কাট্! এ খবর · উঃ কি ক্ষমতা!

কথা বেরয় না। ঢোক্ গিলে বললুম,—"মাপ করবেন—সময় কাটাবার জন্যেই"…

"হুঁ—তাই Burk's Impeachment of Warren Hastings পড়া দরকার! কাশীবাসের সাধ্যায় বটে! কেন—কাশীখণ্ড অপাঠ্য বুঝি?"

কি সর্ব্বনাশ—এ খবরও·· উঃ কি কঠোর সাধনাই করেছেন,···কলিযুগেও···বাপ্ একেবারে আসল ওরেবাদ! এমনি তেমনি নয় একদম্ ওম্‌নি Scient!

আমার আর কথা সরেনা, জিভ ঠেলে ঠেলে বললুম—"কি করব 'কাশীখণ্ড' পড়তে তিন বার চেষ্টা করেছি, পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পড়েও জঙ্গল, পাহাড় আর পশুপক্ষী পার হতে পারিনি! তাই"…

—"ওঃ রেটরিক নেই,—মজা পাওনা! কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলেনা। আগে বন-জঙ্গল সাফ্ করতে হয়; তাঁরা মুক্ষ্ ছিলেন না,—ওসব trial pages,—অধ্যবসায় পরীক্ষার জন্যে, অভিনিবেশ যাচায়ের জন্যে,—বুঝলে?"

আমি একেবারে লাড্ডু মেরে পদানত।

"যাও—এর উপকার ওর উপকার ছাড়ো, নিজের চরকায় তেল দাওগে। 'পত্রিকা' পড়ে কোন্ বর্ত্তিকা জ্বালবে শুনি? খবরদার!

—"যাও—বেঞ্চি বিক্রি করে, হিন্দি প্রথম পাঠ তিন খানা পুড়িয়ে, 'কাশীখণ্ড' শেষ করে,—তার পর এসো। হ্যাঁ—খদ্দর আর খবরের কাগজ কাশীবাসের আসবাব নয়। বুঝলে?"

আমার হাড় হিম—এযে অস্থিভেদী সার্চলাইট! তিন খানা প্রথম পাঠ পর্য্যন্ত···উঃ অষ্টসিদ্ধির সুস্পষ্ট মূর্ত্তি।—এতবড় সিদ্ধপুরুষ যে মহাভারতে মেলেনা। দর্শনে অঘমর্ষণ; —ধন্য হলুম। ভেতরটা সুড়্সুড়্ করে উঠলো। কাশীর অঙ্কুর বোধ হয় সাড়া দিলে। ক্রমে ফল ধরবেই। লেগে থাকতে হবে।

বললেন—"কাশী এসেছ,—ব্রাহ্মণের ছেলে, এখন কেবল নিত্য গঙ্গাস্নান; বিশ্বনাথ দর্শন আর কাশীখণ্ড পাঠ—এই তোমার রুটিন্ রইলো। মুরারি মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিয়ে আসবে। বুঝলে,—যাও।"

আমি both সাষ্টাঙ্গ and হিমাঙ্গ হয়ে অনিলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে বাঁচলুম।

উঃ মহাপুরুষের কি প্রভাব, একেবারে আউতে আধ-সেদ্ধ করে দিয়েছেন। চক্ষুর এমন ফোকাসিং জ্যোতি দেখিনি! বুঝলুম অর্জ্জুন কেন বিশ্বরূপ দেখে আড়ষ্ট মেরেছিলেন। রাস্তায় সব চলন্ত জীর্ণ শীর্ণ বিষণ্ণ দারিদ্দির মূর্ত্তি দেখে স্ফূর্ত্তি এলো।

অনিল বললে—"আপনার জোর ভাগ্য! প্রসন্ন না হলে এত কথা কন না, উন্নতির এমন চুম্বুক উপদেশও দেন না। আশ্চর্য্য হবেন না—ত্রিকালের ডকুমেণ্ট রাখেন।"

বললুম,—"তোমার সঙ্গে যে একটি কথাও কইলেন না?"

"আমার এখন নয়নে নয়নে।"

"তোমাকে মুরারি মুরারি" · ···

"ঠাকুরদের নাম ছাড়া অন্য নাম তো উচ্চারণ করেন না। বুঝে নিতে হয়।"

বাসায় ফিরে ডায়ারিতে লিখলুম—"১৯শে চৈত্র মহাপুরুষ দর্শন। একদম আসল। জীবনের স্মরণীয় দিন, জন্ম সার্থক। আজ বুঝলুম জীবনটা বৃথাই নষ্ট করেছি। কিছুই করা হয় নি। মহাপুরুষদের সঙ্গ সহ্য করবার সামর্থ্য পর্য্যন্তও নাই। যেন অগ্নিদেবতা—ঝলসে গেছি. কি প্রভাব! তাই বোধ হয় সুধু সঙ্গে লোক পুড়ে সোনা হয়। চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু আর যে সাহস হয় না!"

অনিলকে হিন্দি-পাঠ তিনখানা দিয়ে বললুম—"তুমি ভাই গরীবের ছেলেদের দিয়ে দিও"—

বললে—"বাপরে, পুড়িয়ে ফেলতে বললেন না?"

"তবে যা হয় কোরো।"

"বরং বেঞ্চিখানা নিয়ে যাই।"

যাক্,—বার্ক ফেরৎ দিলুম, খবরের কাগজ নেওয়া খতম্।

কিন্তু থাকি কি নিয়ে? মহাপুরুষের সুমধুর প্রোগ্রাম কাম দিলে না!

২৫ বচর গরম জলে নেয়ে—গঙ্গাস্নান সইল না। তিন দিনেই সান্নিপাতের শঙ্কা! ডাক্তার বললেন—"এ বয়সে নতুন কিছু attempt করতে যাওয়ার নাম গোঁয়ার্ত্তুমি, honorable exception কেবল আফিন্ ধরাটা।"

দ্বিতীয় করণীয়—বিশ্বনাথ দর্শন। একটি দিন মাত্র সে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে—স্বেদ কম্প শ্বাসরোধ। যেন ফাঁড়া কাটিয়ে ফিরলুম। তার পর দূরে থেকে—প্রণাম। কাশী-খণ্ডের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এখন করি কি?

সমার (summer) এসে এ সমস্যার সমাধান করে দিলে। গরমে কাজকর্ম্মের নাম ভুলিয়ে দিলে। জানো-য়ারের মত দিনরাত কাটাই। গ্রীষ্মটা প্রথম বচরেই সাঁতলে একপুরু ছাল নিয়ে সরলেন। বোধ হয় হাড় ক'খানা দ্বিতীয় বচরের জন্যে রাখলেন। যদি বাঁচিতো দুর্ভাবনার কথা।

অনিল আসে,—সুবাতাস পাইনা। বলে "কোসে আঁব-পোড়া, আর ভাঙের সরবৎ লাগান; এপোপ্লেক্সি ঘেঁসবে না।"

ওরে বাবা, তাও আছে, শুনে শিউরে উঠি। এপোপ্লেক্সি সামলাতে কাশী এলুম নাকি! কাজ মন্দ নয়।

অনুকূলের সঙ্গে দেখা;—"এই যে এখনও আছ দেখচি!"

"কেন বল দিকিন?"

"কালভৈরব সদয় না হলে এখানে কারুর থাকবার যো নেই ;—দর্শন হয়ে গেছে বুঝি ?"

"কই আমিতো কোথাও যাইনি—কেবল তোমার অনিলের সাহায্যে মহাপুরুষ দর্শনটী হয়ে গেছে ভাই—enough, একদম দেবতা।

অনুকূল বললে, "তবে তো হয়েই গেছে,—ওই একেই সব।"

বললুম—"কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা,—তেমনি প্রভাব! এ যুগে এখনও যে এমন জাবালি থাকতে পারেন তা বিশ্বাসই করতুম না।"

"জাবালি বলচ' কি—কত জাবালির জন্মদাতা।"

"আরো আছেন নাকি ?"

"বহুৎ,—গলিতে গলিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। মহানির্ব্বাণ দেন আর কারা! ওঁদের কৃপাতেই চলে যাচ্ছে, বেশ আছি। অন্নপূর্ণার রাজ্য—উপায় হয়েই যায় ভাই।—

বলতে বলতে ব্যস্তভাবে—"সে ছেলেটি ?"

"কোন্ ছেলেটি ?"

"এই যে ঐখানটায় দাঁড়িয়েছিল হে, খদ্দরের সার্ট গায়ে, খালি পা,—হাতে 'মাদার' (Mother) বলে একখানা মোটা বই,—দেখনি ? -মাথা খেলে ;—আচ্ছা এখন চললুম ; যাবে কোথা !"

অনুকূল বিচলিত ভাবে বেরিয়ে গেল।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—ব্যাপার কি ? কিছু পাবে বুঝি! বোধ হয় সুদে কিছু খাটায়—তা না তো চলে কি করে! তাই বলছিল—বেশ আছি।

অনেকেই তো কিছু করেনা দেখলুম,—চলে কি করে ? বলে—মহাপুরুষের কৃপায়। তাই হবে।—অনিল আবার বলছিল—এখনো সব 'তা বড়ো' আছেন,—দেখাবে।

বলেছি—"এঁরই আগে যোগ্য হই, তার পর ভাই।"

•

অনিল এলেই দেশের দুর্দ্দশার কথা শোনায়। ইংরেজের ওপর আগুন হয়ে ওঠে। কেবলি বলে,—"এতে কি ইচ্ছে হয় বলুন। মানুষে সইতে পারে ?—নয় কি,—কি বলেন ? আমার তো মশাই"......

আরো অনেক ভীষণ ভীষণ প্রস্তাব। আমি ভীতু মানুষ, এখনও মহাপুরুষের চক্ষু তরক্ষুর মত যেন চারদিকে উঁকি মারে, একলা ঘরে শিউরে উঠি।

বলি,—"ওসব কথা থাক অনিল। মহাপুরুষের অন্তর্দৃষ্টি দেখেছ' তো। ওঁদের wireless (বে-তার) সর্ব্বত্রই।"

সে বলে—"দেশের জন্য কিছু করা ধর্ম্ম নয় কি ? ধর্ম্মের বাইরে তো যাচ্ছিনা।—

—"আচ্ছা আপনার সঙ্গে তো অনেকের আলাপ—দয়া করে আমাকে দেউস্করের "দেশের কথা" একখানা আনিয়ে দিন।—না হয় ঠিকানাটা লিখে দিন।"

অতিষ্ঠ করে তুললে। যেখানে যাই, কি ঘাটে, কি চায়ের দোকানে, কি পার্কে, একজন না একজন অনিল—ইংরেজের ওপর বারুদের বনে বসে আছে,—গরম হাওয়া ছাড়ছে! আবার শুভ বৈশাখও প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে সুরু হয় হয়,—মারমার মূর্ত্তিতে সেই 'সমার' (summer) আসছেন! যাই কোথা ?

বিশ্বনাথের বাউণ্ড্রি বেজায় কোলাহলপূর্ণ। একদিন সহরের বাইরে সিদ্ধ মহাত্মা তুলসীদাসের প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্কট-মোচন' দর্শনে গেলুম। শান্ত নির্জ্জন স্থান,—ভারি আরাম বোধ করলুম, ফিরতে আর ইচ্ছা হয় না। পড়ে রইলুম। তিনি আমার অবস্থা বুঝলেন। সন্ধ্যা দেখে তাঁকে কাতর নিবেদন জানিয়ে উদাস প্রাণে সেই জন-বিরল শান্তিকুঞ্জ ছেড়ে বাসায় ফিরতেই হল।

দোর খুলে ঢুকতেই দেখি একখানা পোষ্ট-কার্ড পড়ে। ল্যাম্পটা জ্বেলে পড়ে দেখি—সত্বর পূর্ণিয়ায় পৌছুঁবার জরুরী অনুরোধ।

প্রাণ যেন বলে দিলে,—সঙ্কটমোচনের কৃপা।

পূর্ণিয়া কোন্ দিকে, কোথায় ? জিওগ্রাফি ভুলে গেছি। তা হোক,—ইতস্ততঃ করবার মত মন ছিল না। কোথাও যেন যেতে পারলে বাঁচি।

শুনেছি,—পাপীরা কাশীতে টেঁকতে পারেনা। কি করবো,—পুণ্যের কোন দাবীই ছিলনা।

বাক্স, বাসন, বেডিং, বাসা—নিশ্চয়ই তাঁরা পুণ্যাত্মা হবেন। তাঁরা রইলেন। পাপ plus আমি প্রাতেই বেরিয়ে পড়লুম। কারো সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হলনা ;—মহাপুরুষ অন্তর্যামী তাঁকে জানানো—নিশ্চয়ই বাহুল্য। উদ্দেশে কেবল প্রণামটা জানালুম। (ক্রমশঃ)

কালি শুক্লা-চতুর্দ্দশী রাতে

শ্রীরাধারাণী দত্ত

কালি শুক্লা চতুর্দ্দশী রাতে
দক্ষিণের মধুচ্ছন্দা বায়ু মৃদু ফুল-গন্ধা
আলিঙ্গন দিলো মোর সাথে।
সারা তনু মন মম সে পরশে সহসা শিহরি'—
অপূর্ব্ব পুলক-রসে উচ্ছলি' উঠিলো যেন ভরি
অজানা আনন্দে কম্প্র হিয়ার উল্লাস-মধু ক্ষরি'
উদ্বেলিল তনু
রোমাঞ্চ জাগিল অঙ্গে দিঠি তলে সঙ্গে সঙ্গে
জাগিল স্বপ্নের ইন্দ্রধনু।

কালি শুক্লা বাসন্তিকা-রাতে
বকুল-বীথিকা তলে নব-শ্যাম দূর্ব্বাদলে
কুসুম ঝরিলো মোর মাথে।
চুমিয়া ললাট গ্রীবা ছুঁয়ে কবরীর কালো চুল
ঝরিয়া পড়িলো ক'টি বৃন্ত-খসা শিথিল বকুল,—
অসহ হরষ-রসে শান্ত-তনু তটিনী দুকূল
প্লাবি' এলো বাণ
বক্ষতটে হ'ল সুরু ঘন-কম্প দুরু দুরু
যৌবনের গান।

কালি শুক্লা চতুর্দ্দশী নিশা
প্রথম বসন্ত-গীত নিয়ে হ'লো উপনীত
মোর দ্বারে; প্রেম-তৃষা মিশা।
সে সঙ্গীতে দেহকুঞ্জে যৌবনের শ্যামা দিলো শিষ্
সে সঙ্গীতে নবভঙ্গী পেলো মোর প্রতি অহর্নিশ
সে সঙ্গীতে একসঙ্গে ক্ষরিলো অমৃত সনে বিষ
চিত্ততলে মম।
অজানা-আনন্দ সনে অকারণ-ব্যথা মনে
স্পর্শিলো প্রণম।

ওগো শুক্লানিশা তলে কাল
প্রান্তর সীমান্তে দূরে—সকরুণ বংশীসুরে
ডাক দেছে অচেনা রাখাল।
সে বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অশ্রুভরা মিনতি-মধুর
বিধুর করিলো বক্ষ লাজমৌনা জীবন-বধূর,—
ছিন্নতন্দ্রা চক্ষে তার বিভাসিলো স্বপন-সুদূর
স্তব্ধ ঘন রাতে,
সহসা হৃদয়তল আকুল উতলা হ'ল
গুরু-বেদনাতে।

কালিকার শুক্লা চতুর্দ্দশী
সারা তনু মনে মোর যৌবনের জ্যোৎস্না ঘোর
ছেয়ে গেছে চুপে চুপে পশি'।
আজিকে নয়নে তাই নূতনের অঞ্জন লেগেছে
পরাণ পূরিয়া মোর মাধুরীর উৎসব জেগেছে
আজিকে জীবন-বধূ বঁধুয়ার পরশ মেগেছে
মেলি পদ্ম আঁখি;
বুকের পিঞ্জরে মোর সুখের সঙ্গীতে ভোর
শৃঙ্খলিত পাখী।

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

২৫

জয়ন্তী সীতার ভাই এবং তাহার বন্ধু আসায় প্রথমটায় মোটেই খুসি হইতে পারেন নাই। তিনি মনশ্চক্ষে দেখিতে-ছিলেন, এমনই করিয়া সীতার আত্মীয়স্বজনে এ বাড়ী পুর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা—এ বাড়ীর নিতান্ত আপনার লোক হইয়া নিজেদের মধ্যে নিজেরাই সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে অসীম হইতে নিজেদের সসীমে—অর্থাৎ আপনার বাটীর মধ্যে যেটুকু হয় প্রভুত্ব করিতে পারিবেন। আর এই সব অনাত্মীয়েরা উড়িয়া আসিয়া সারা বিশ্বটা জুড়িয়া বসিবে এবং তাঁহাদেরই উপর অযথা প্রভুত্ব করিয়া যাইবে। উঃ, এ কল্পনাও যেন অসহ্য।

যখন প্রণব ও প্রশান্ত আহার করিতে বসিয়াছিল, তখন নিজের ঘরের জানালার ফাঁক দিয়া তিনি নিতান্ত অবহেলার ভাবে ইহাদের দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম দর্শনে সে অবহেলার ভাব দূর হইয়া গিয়া অন্তরে একটা নূতন আশা জাগিয়া উঠিল। প্রশান্তের সুদীর্ঘ সরল দেহ, সুন্দর মুখ, ছোট ছেলের মত অমায়িক সুন্দর কথা ও ব্যবহার তাঁহার মনকে তাহার পানে আকৃষ্ট করিল।

বাড়ীর সকলকে আহারাদি করাইয়া সীতা রন্ধন-গৃহে নিজের আহার্য্য লইয়া বসিতেছিল, তখন জয়ন্তী তাহার নিকটে গিয়া বসিলেন।

আজ তাঁহার একাদশী ছিল। সকাল সকাল শুইয়া পড়িয়া তিনি খানিকক্ষণ ঘুমাইয়া লইয়াছিলেন; কাযেই মনটা একটু ভাল অবস্থায় ছিল। প্রণব ও প্রশান্ত যখন আহার করিতে যাইতেছিল, সেই সময় তাঁগার ঘুমটুকু দূর হইয়া গিয়াছিল। নীচে রান্নাঘরের খোঁজ তিনি কখনও নেন নাই,—কে খাইল না খাইল সে খোঁজ তিনি কখনও রাখেন নাই।

আজ যে তিনি স্বর্গসম দ্বিতল ছাড়িয়া নরকসম রান্নাঘরে আসিয়াছেন—ইহার মূলে কারণ আছে।

যথার্থ সুপুরুষ প্রশান্তকে দেখিয়া তাঁহার মনের অতি গোপন স্থানে একটা অতি গোপন বাসনা জাগিয়া উঠিল। এই তাঁহার ইভার উপযুক্ত পাত্র। ইহার সহিত তাঁহার ইভার বিবাহ দিলে সত্যই বড় সুন্দর হয়। তিনি শুনিয়াছিলেন, এই ছেলেটী সীতার ভাই। তাই তাহার সম্বন্ধে সবিশেষ খোঁজ লইবার জন্য সীতার খোঁজ করিয়া শুনিতে পাইলেন, সে নীচে রন্ধন-গৃহে আছে। আজ বামুন ঠাকুরাণীর জ্বর হইয়াছে, রন্ধন ও সকলকে আহার করানোর ভার সীতার হাতে।

"এ কি সীতা, এই বেলা সাড়ে তিনটের সময় তুমি ভাত নিয়ে বসেছ যে,—এত বেলা গেল কেন?"

সীতা একটু হাসিল মাত্র।

জয়ন্তী একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া দরজার কাছে বসিয়া বলিলেন, "এত বেলা করে ভাত খেলে দেহটা কয় দিন থাকবে? এক দিন অনিয়মে খেলে সাত দিন তার ফল ভোগ করতে হয়।"

সীতা বলিল, "সকলকে খাওয়াতে আজ বড্ড দেরী হয়ে গেল কাকিমা। এর চেয়ে অনেক বেলাতে খাওয়াও আমার অভ্যাস আছে, ওতে আমার কিছু হয় না। আপনাদের বেলায় খাওয়া অভ্যাস নাই; তাই এক দিন এতটুকু অনিয়মের ফল আপনাদের সাত দিন ধরে ভোগ করতে হয়। কত লোক এমন আছে কাকিমা, যারা কোন দিন বেলা পাঁচটার আগে খেতে পায় না।"

জয়ন্তী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "সেও তবু বাঁধা নিয়ম বাছা। একদিন বেলা বারোটায়, আর একদিন তিনটের সময় খাব, একে বাঁধা নিয়ম বলে না। যাক গিয়ে, তুমি খেতে বসো। নিয়েছ তো ওই কয়টী মাত্র ভাত, ওতে পেট ভরবে?"

সীতা হাসিল,—"ওই আমার যথেষ্ট হবে কাকিমা, আমি ওর চেয়ে কোন দিন বেশী খাইনে। আপনার কি কোন দরকার আছে কাকিমা? তা হলে আমি সে কাজ আগে করে দিয়ে আসি।"

জয়ন্তী বলিলেন, "না বাছা, তেমন কোন দরকার নেই। তুমি খেতে বস,—ততক্ষণ দুটো গল্প করা যাক।"

সীতা কিছু সঙ্কুচিতভাবে আহারে বসিল।

জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওই যে লম্বা চওড়া শ্যামবর্ণ ছেলেটী,—ওইটী বুঝি তোমার ভাই ?"

সীতা বলিল, "হ্যাঁ, ওইটীই আমার দাদা।"

জয়ন্তী বলিলেন, "আর একটী যে পাতলা ধরণের অথচ খুব সুশ্রী ছেলে এসেছে, ওটী কে ?"

সীতা বলিল, "আমার দাদার বন্ধু। আমাদের বাসার পাশেই ওদের বাড়ী ছিল; ছোট বেলা হতে আসা-যাওয়া করতেন। বোনের মত ভালবাসেন; তাই আমায় দেখতে এসেছেন।"

"ও" বলিয়া জয়ন্তী চুপ করিয়া গেলেন।

সীতা বলিল, "আমার একটা কথা শুনবেন কাকিমা ? আপনি ইভার বিয়ে দেবেন বলে পাত্র খুঁজছেন শুনেছি,—আমার দাদার সঙ্গে বিয়ে দিন না কেন ? দাদার অবস্থা যদিও খুব ভাল নয়, তবু শিক্ষিত। আশা করা যায়—অবস্থা এককালে বেশ উন্নত করতে পারবেন।"

মুখখানা অন্ধকার করিয়া জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংসারের উপস্থিত আয় কি ?"

সীতা বলিল, "আয় বিশেষ কিছু নেই। মেসোমশাই কয়েক বিঘে জমী রেখে গেছেন। দাদা সেই সব জমী দেখা-শোনা করেন। এতে যথেষ্ট লাভ আছে,—চাকরী করার চেয়ে অনেক ভাল। আজ কাল চাকরীজীবী বাবুদের দুর্দ্দশা তো দেখতে পাচ্ছি কাকিমা! হয় তো মাইনে বেশ বেশী পান, তখন খুব চাল দেখান। কিন্তু চাকরীটি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে ভিক্ষে-পাত্র নিয়ে কাউকে হয় তো গাছ-তলাতেও বসতে হয়। দাদা চাকরী জীবনে কখনও করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। তিনি বলেন—জমী করে নিজে লাঙ্গল দেব, জমীতে নিজের হাতে সোনা ফলাব,—যা মাসে দেড়শো দু'শো টাকা মাইনের চেয়ে বেশী লাভকর। আমিও তাই বলি কাকিমা,—চাকরী করার চেয়ে চাষ আবাদ করে খাওয়া বেশী মানের। এতে কারও কথা শুনতে হয় না,—কথায় কথায় চাকরী যাওয়ার ভয় থাকে না,—নিজের ইচ্ছেয় যা করলে তাই ভাল।"

জয়ন্তী বিকৃত মুখে বলিলেন, "শুনেছি তোমার দাদা এম-এ পাশ করেছে। এই এতটা লেখাপড়া শেখা হয়েছে কি মাঠে গিয়ে লাঙ্গল ঘাড়ে করবার জন্যে ?"

সীতা হাসিয়া ফেলিল। তখনই সময় ও পাত্রী বুঝিয়া হাসি সামলাইয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "আমাদের দেশের লোকের একটা ধারণা আছে কাকিমা—লেখাপড়া শেখা শুধু চাকরীর জন্যে,—চাকরী ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য লেখাপড়ার মূলে নেই। শুনেছি, যে দেশের দৃষ্টান্ত আমাদের এ দেশবাসী সর্ব্বাংশে অনুকরণ করতে চায়, সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেক ছেলে নিজের হাতে চাষ করতে পশ্চাৎপদ হয় না। আমাদের এ দেশে যে সবই বাড়াবাড়ি; তাই এ দেশের ছেলে সব তাইতেই টেক্কা দিতে চায়। শুধু ছেলেরাই নয় কাকিমা, এ দেশের মেয়েদের শিক্ষাও সেই রকম, যার মূলে কোন মহৎ লক্ষ্য নেই। দেখেছি—এ দেশের ছেলেরা সামান্য একটা জিনিস হাতে করে নিয়ে পথে চলতে দারুণ লজ্জা-বোধ করে। অথচ যাদের দৃষ্টান্ত তারা নেয়—তারা বিনা লজ্জায়, বিনা আয়াসে প্রকাণ্ড বড় বোঝা হাতে করে নিয়ে পথ চলে। এ দেশের পনের টাকা মাইনের একটী বাবুকে দেখবেন,—তার কাপড় জামা, পায়ের জুতো, হাতের ছড়ি, আংটী, ঘড়ি কিছুরই অপ্রতুল নেই; অথচ দুবেলা পেট ভরে হয় তো সে খেতে পায় না। আমার দাদা এমন অসার শিক্ষা পান নি, যা মানুষকে অমানুষ করে দেয়, অপদার্থ করে তোলে। তিনি যে শিক্ষা পেয়েছেন, তা তাঁকে মানুষই করেছে। এম-এ পাশ করে ঘাড়ে করে লাঙ্গল নিয়ে গিয়ে জমিতে চাষ দিতে তিনি লজ্জা বোধ করেন না; বরং এতে তিনি গৌরব অনুভব করেন। আপনি যদি ইভার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে চান, আমি এখনই ঠিক করে দিতে পারি।"

জয়ন্তী গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। আসল কথা, এম-এ পাশ করা এই কৃষক-প্রকৃতির ছেলের হাতে কন্যা দান করিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না।

সীতা তাঁহার মনের কথা বুঝিল, বলিল, "দাদাকে মেয়ে দিতে যদি আপনার ইচ্ছা না হয়, আপনি প্রণব-দার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন। প্রণব-দা'ও এম-এ,—বড়লোকের ছেলে। সংসারে এক পিসীমা ছাড়া আর কেউ নেই। ইভাকে যদি প্রণব-দার হাতে দেন, তাতে ইভা যে কখনও এতটুকু কষ্ট পাবে না, এ আমি জোর করে বলে রাখছি।

তাই যদি মত করেন কাকিমা, তবে এই সামনের চৈত্র মাসটা গেলেই বৈশাখ মাসে বিয়ের উৎসব পড়ে যায়।”

জয়ন্তীর মুখের উপরকার অন্ধকার ভাবটা কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন, “তাই কর মা। এই বেলা কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকতে থাকতে ইভুর বিয়েটা দিয়ে যাই। এর পর কপালে কি ঘটবে তা কে জানে। আমার ওই একটী মাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। যাতে মেয়েটী ভাল ঘরে, ভাল বরে পড়ে, আমি তাই চাই। লক্ষ্মী মা, তুমি এইটা ঠিক করে দিয়ো, আমি চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।”

সীতার আহার শেষ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি উঠিলেন।

২৬

প্রশান্ত সীতাকে ডাকিয়া বলিল, “কি রে, তোর যাওয়ার সব ঠিক হয়েছে তো?”

সীতা বিমর্ষভাবে বলিল, “কিছু ঠিক হয় নি।”

রুষ্ট হইয়া প্রশান্ত বলিল, “তবে তোর জন্যে আমি এখানে এক মাস বসে থাকি—তাই বল। আমার আর কোন কাজ নেই কি না,—তোর এখানে বসে থাকলেই আমার সেখানকার কাজ আপনিই শেষ হয়ে যাবে। যাবি যদি, তবে আজকের মধ্যেই সব ঠিকঠাক করে নে,—কাল আমাদের ঠিক রওনা হওয়াই চাই।”

সীতা নতমুখে পদাঙ্গুলি দ্বারা মেঝের দাগ দিতেছিল, উত্তর দিল না।

রাগ করিয়া প্রশান্ত বলিল, “চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে, কবে যাবি তা কিছু ঠিক করে বলবি নে,—আমরা কত দিন এখানে ঠাকুর হয়ে পূজো খাবো বল দেখি। অন্য লোকের ধাতে এত ভোগ সইলেও, আমার ধাতে সয় না, তা তো জানিস। আমি নিজের হাতে নিজের কাজ করতে যাই, দশ বারোজন লোক অমনি ছুটে আসে—বাপ রে, এ রকম করলে মানুষ টেকতে পারে কখনও? আমি বড়মানুষের কুটুম্ব হয়ে দশ দিন এখানে সুখ ভোগ করতে আসি নি, এসেছি তোকে নিয়ে যেতে,—কিন্তু তোর যেন যাওয়ার ইচ্ছে নেই। কি তোর মনের কথা খুলে বল না কেন? জানিস তো—তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন দিন কিছু করিনি, এখনও কিছু করব না।”

সীতা মুখ তুলিল। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—“তবে এবারও তোমার বোনটীকে তোমায় ক্ষমা করতে হবে দাদা। বরাবর আমার সকল অপরাধ যেমন তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিয়েছ, এ অপরাধটাও তেমনি উড়িয়ে দাও। আমি যাব না দাদা, যেতে পারব না।”

অতিরিক্ত বিস্মিত হইয়া প্রশান্ত বলিল, “সে কি কথা রে, যাবি নে—যেতে পারবি নে—এ কথার মানে কি?”

সীতা সজল দুইটী চোখের দৃষ্টি দাদার মুখের উপরে স্থাপিত করিয়া বলিল, “এখানকার এমনি সব ব্যাপার নিজের চোখে দেখে, কাণে শুনেও কি আমায় নিয়ে যেতে চাও দাদা? ওই যে বুড়ো দাদু, উনি সব হারিয়ে আমায় পেয়ে সব ভুলে আছেন,—আমি গেলে উনি কি আর বাঁচবেন? যিনি আমার জীবনে মায়ের অভাব অনুভব করতে দেন নি, আমি গেলে কে তাঁর শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে ক্ষণিক সান্ত্বনাও দিতে পারবে, কে তাঁকে সংযত রাখবে? এঁরা মুখ ফুটে তোমায় কিছু বলতে পারেন নি; কেন না, তাঁরা বড় আপনার হয়েও একজনের নিষ্ঠুরতায় আজ বড় পর হয়ে গেছেন। দাদা, একবার ভাল করে দাদুর মুখপানে,—মায়ের মুখপানে চেয়ে দেখ দেখি, তার পরে—”

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, সে মুখ ফিরাইল।

প্রশান্ত বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে খানিক নির্ব্বাক্ ভাবে চাহিয়া রহিল; তার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—“কিন্তু এঁদের সুখ স্বচ্ছন্দতা দিতে তুই যে সর্ব্বস্ব বলিদান দিলি বোন,—তোর যে আর কিছুই রইল না।”

সীতা আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, “সে তো আজই হয় নি দাদা, আমি অনেক দিন আগেই তো আত্মবলিদান দিয়েছি। জগতে আমার সুখশান্তি চির তরেই ঘুচে গেছে,—আমি তো ইচ্ছে করেই ঐ দুঃখকে বরণ করে নিয়েছি দাদা। এর জন্যে দায়ী কাউকেই করা যায় না। তোমরা অনর্থক আমায় সুখী করবার জন্যে চেষ্টা করছ; যে হৃদয় পুড়ে শ্মশান হয়ে গেছে, সেখানে আর নূতন কিছু প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো না।”

তাহার দুইটী চোখ দিয়া হঠাৎ খানিকটা অশ্রুজল উপচাইয়া নিটোল আরক্তিম গণ্ড দুইটী ভাসাইয়া দিয়া গেল। অবাধ্য অশ্রু যে দাদার সম্মুখেই তাহাকে প্রকাশ

করিয়া ফেলিবে, তাহা সীতা জানিত না,—অপ্রস্তুতভাবে সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

"দিদি,—সীতা—"

আত্মভোলা ভাইটী বোনের অশ্রুভরা মুখখানা কোলের মধ্যে টানিয়া লইল। অভাগিনী বোনটীর অন্তরের সব খবর নিমেষে তাহার অন্তরে পৌঁছিয়া গেল; সে যে কতটা দুঃখ—কতখানি অশ্রুজল কোমল বুকখানির আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়াছে—মুখের হাসি কতটা কষ্টে টানিয়া আনিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল। ছেলেবেলা হইতে যাহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, শিক্ষা দিয়াছে, তাহার এই নিদারুণ মর্ম্ম-যাতনায় সান্ত্বনা দিবার মত কথা একটা সে খুঁজিয়া পাইল না, নীরবে শুধু তাহার চোখের জল ঝরিয়া ঝরিয়া সীতার মাথায় পড়িতে লাগিল। হায় রে, সীতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভাবিয়া একদিন সে কতই না আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর দুঃখিনী সীতার পানে তাকাইয়া সে চোখের জল রাখিতে পারে নাই। আবার ধীরে ধীরে তাহার অন্তর উৎসাহে ভরিয়া উঠিতেছিল যখন সে ভাবিয়াছিল—সীতার বিবাহ সে দিতে পারিবে। সে নারী-হৃদয় চিনিত না, সে জানিত না—সীতা সেই হৃদয়হীন পাপিষ্ঠটাকেই স্বামীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে; সে জানিত না—সীতা ইহাদের সহিত নিবিড় বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়াছে—এ বন্ধন ছিন্ন করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

চোখের জল ঝরিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ের হৃদয়হীনতার কথা মনে পড়িয়া গেল। সরলা বালিকা পাইয়া সে পাপিষ্ঠ এমন নিষ্ঠুর খেলাও করিয়া গেল,—এই কোরকটিকে অকালে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পদদলিত করিয়া সে চলিয়া গেল? ইহার জীবনে আশা আনন্দ সবেমাত্র মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল। হতভাগ্য জ্যোতির্ম্ময় যে জীবনকে পূর্ণতা দিতে পারিত, সেই জীবনের সকল সুখ হরণ করিয়া রাখিয়া গেল শূন্যতা মাত্র।

"সীতা—"

সীতা অশ্রুভরা মুখখানা তুলিল, অপ্রস্তুতভাবে অঞ্চলে মুখখানা মুছিয়া ফেলিয়া সে সোজা হইয়া বসিল। সে যে কাঁদিয়াছিল—এই ব্যাপারটাকে কি করিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে ভাবিতেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে এমনি ঘটিয়া গিয়াছে,—চাপা আর দেওয়া যায় না।

প্রশান্ত রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি সেই জন্যেই তোকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি বোন। আমার মনে হয়—আমার কাছে গেলে তুই ভাল থাকবি।"

সীতা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "আমার মনে হয় দাদা, আমি এখানে থাকলেই ভাল থাকবো। এই সন্তানহীনা মা ও সর্ব্বস্বহারা বুড়োর প্রাণে যে এতটুকুও শান্তি ঢেলে দিতে পারছি—সেইটুকুই আমার এ জীবনের সার্থকতা। আমার এ জীবন তোমরা ব্যর্থ হয়ে গেছে ভাবছ দাদা,—কিছুমাত্র নয় দাদা,—তোমাদের ধারণা ভুল। ভগবান আমার ভালর জন্যেই আমায় নির্দ্দিষ্ট করে কারও হাতে সমর্পণ করেন নি,—আমায় সকলের সেবা করবার অধিকার দিয়েছেন, সকলের দুঃখে সান্ত্বনা দিতে বলেছেন। আমার বড় কষ্ট হয় দাদা, যখন এখান হতে আমার অন্যত্র কোথাও যাওয়ার কথা হয়। জগতে আমায় অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে,—তাই দাদা, তোমার পায়ে ধরে বলছি, আমায় আর কোথাও নিয়ে যেয়ো না, এখানে এমনি ভাবে থাকবার অধিকার দাও।"

হঠাৎ সে প্রশান্তের পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে তাহা ভিজাইয়া দিল।

ব্যস্ত প্রশান্ত সন্তর্পণে পা সরাইয়া লইয়া সীতার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল,—"ওকি পাগলামী করছিস দিদি? আমি কখনও তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করি নি, কখনও ক'রব না—তা তো জানিস ভাই? যখন এতটুকুটী ছিলি, মাসিমা যখন তোকে এক বছরেরটি রেখে মারা গেলেন—তখন দশ বছরের আমি—যখন তোদের বাড়ী থেকে পড়াশুনা করতুম, তখন হতে প্রতিদিনকার কথা মনে কর দেখি দিদি! একটা দিন দাদাকে না দেখলে তুই যত কাঁদতিস, আমিও তার চেয়ে বড় কম কাঁদতুম না। তোকে যে কি রকম ভালবাসি, কতখানি ভালবাসি, তা তোকে কি করে জানাব বোন,—তা যে জানানো যায় না। যখন শুনতুম তোর সঙ্গে জ্যোতির বিয়ে হবে—তখন তাকে চিনতুম না। তার পর যখন তাকে আমার পাশে পেলুম, তখন আমরা একই সঙ্গে আই-এ পড়ছি। কৌশলে তার কল্পনা জেনে তারই অনুযায়ী তোকে আমি শিক্ষা দিয়েছিলুম। তখন

স্বপ্নেও ভাবি নি সে একটা লঘুচিত্ত মানুষ মাত্র। তার আদর্শ কিছু বাঁধাধরার মধ্যে নেই। সে আজ যে কথা বলবে, কাল সে কথার অন্যথা করবে। নাঃ, আমার দেওয়া সব শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে গেল ভাই, সব ব্যর্থ হয়ে গেল।"

সীতা শুধু ওষ্ঠে শুষ্ক হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, কিছু ব্যর্থ হয় নি দাদা। তুমি অসীমের জন্যে যে শিক্ষা দিয়েছিলে সে শিক্ষায় অসীমে জড়িয়ে পড়ছে—পড়বে, একে কি ব্যর্থ শিক্ষা বলতে চাও? আমি বলছি—আমার শিক্ষা যথার্থ সার্থকতা লাভ করবে। আশীর্ব্বাদ কর দাদা, আমি যেন তোমার শিক্ষা নিজের জীবনে বিকশিত করতে পারি।"

সে প্রশান্তের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল। প্রশান্ত তাহার মাথায় হাত রাখিল, তাহার দুইটী চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

রোম

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

রোম! The eternal city!

পিয়াত্‌সা এসেদ্রার ওপর হোটেলের জানলা থেকে বিপুল জনস্রোত ও ফোয়ারার জললীলা দেখতে দেখতে মন দুলে উঠ্‌ল—এই রোম! আড়াই হাজার বছরের ওপর পুরাতন মতন, কিন্তু পুরাতন দিনের রোমের কথা ভেবে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে রোমকে দেখলে তবেই তার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়, তখন জানা যায়—তার প্রতি পাষাণে কত গৌরবময় ইতিহাস, তার প্রতি ধ্বংস-স্তূপে কত মহিমামণ্ডিত
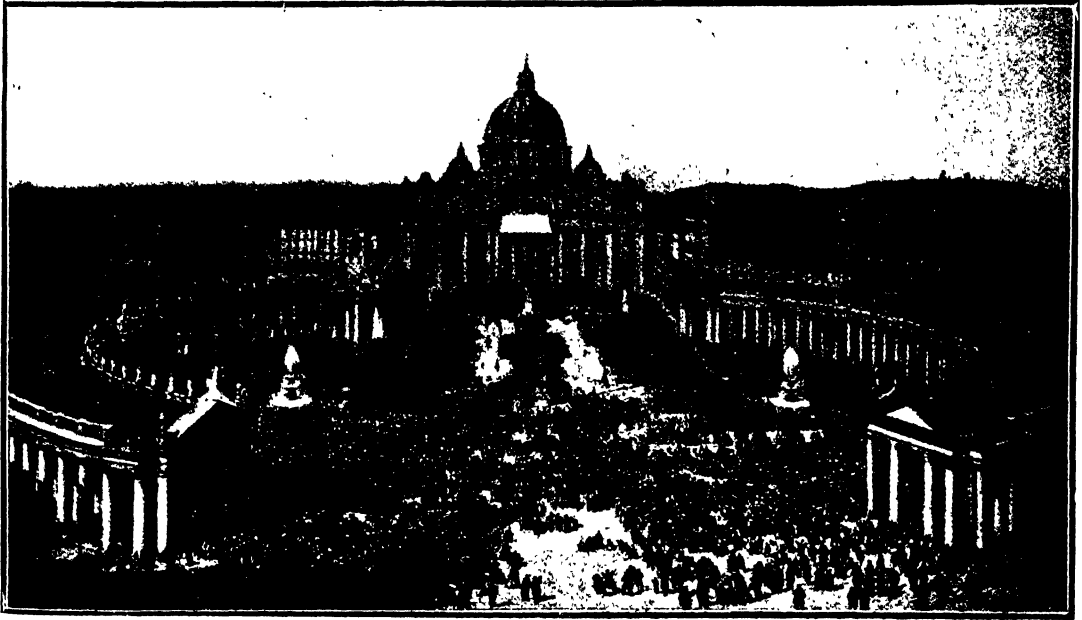
সেণ্টপিটার গির্জ্জা

এই নগরী সমস্ত ইয়োরোপীয় সভ্যতার মাতা না হলেও তার ধাত্রী। আজকের দিনের রোমকে ভ্রমণকারীর সহজ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, এ ত ইয়োরোপের অপর সকল বড় সহরদেরই স্মৃতি। তাই, প্রভাতের আলোয় রোমের পথে হ্যাটকোট-পরিহিত পথিক-প্রবাহ ও বেগমত্ত মোটরকার শ্রেণীর স্রোত দেখে এ বিংশ শতাব্দীর রোম থেকে তার মহা-গৌরবময়

যুগের একটা দিনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করল। যখন তার সাম্রাজ্য ইংলণ্ড হতে ইজিপ্ট, রাইন হতে কার্থেজ, স্পেন হতে সিরিয়া; যখন তার সম্রাট অগষ্টস্ বা ট্রাজন বা হাড্রিয়ন, যখন ভার্জ্জিল তার কবি, ভেষ্টা (Vesta) পূজা তার ধর্ম্ম, কলোসিয়ম তার আমোদের ক্ষেত্র—অতীতের যবনিকা তুলে সেই পুরাতন রোমের গৌরবময় সুখ-সম্ভোগ-দীপ্ত একটি দিন অনুভব করতে চাইলুম।
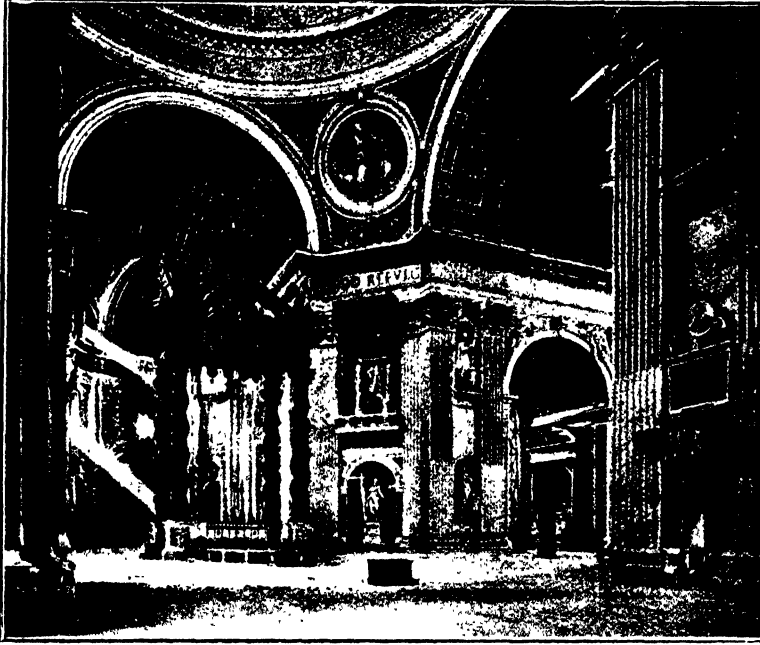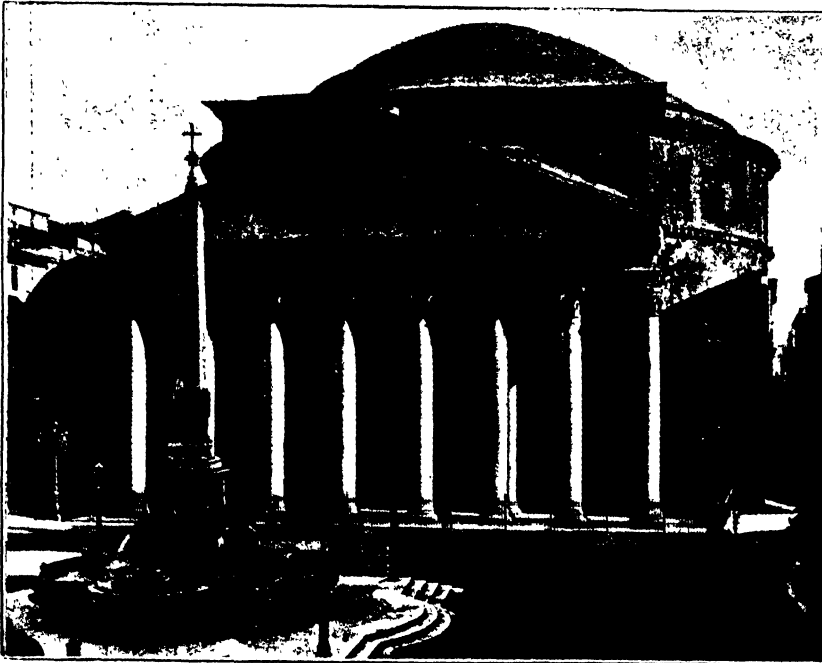
সেন্টপিটার গির্জ্জার অভ্যন্তর

তখনকার দিনের এক রোম নগরবাসী সকালে উঠে, রুটি, আঙুরের রস, মধু ইত্যাদি খেয়ে টোগা ঝুলিয়ে সরু আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে যে দিকে যাত্রা করতো সেই ফোরামের (F o r u m) দিকে যাওয়া গেল।

ফোরাম ছিল নগরবাসীদের সম্মিলন-ক্ষেত্র; প্রাচীন রোমে প্রথমে এখানে বাজার বসতো, তার পর ধীরে ধীরে এখানে দেব-দেবীদের মন্দির গড়ে উঠল, বিচারালয় তৈরী হল, জনসাধারণের সভা বসবার জন্যে বড় বড় থামওয়ালা হল নির্ম্মিত হ'ল। রোমের গৌরবময় যুগে এই ফোরাম ছিল নগরের প্রসিদ্ধ স্থান, ইহা এখন প্রাচীন রোম প্রেমিকদের তীর্থ-ক্ষেত্র। Sacra via পবিত্র পথ দিয়ে আমরা নানা দেশের ভ্রমণকারীর দল গাইড সহ বা গাইড-বই হাতে করে আ[illegible] ঘুরছি, একটা ভাঙা দেওয়াল, দু' তিনটে ভাঙা থাম, এক টুকরো পাথর, এম্নি ভগ্ন স্তূপ গুলির ঐতিহাসিক বিবর খুঁজছি। গাইড বুকে পড়ছি, ওই যে অদূরে তিনটি থা[illegible]

প্যান্থিয়ন

দাঁড়িয়ে আছে, ওরা ছিল ভেস্‌পাসিয়ানের মন্দিরের থাম; তার পাশে ছিল কন্‌করডিয়ার মন্দির। প্লেব্‌ আর

ভাঙা দেওয়াল আর কতকগুলি পাথর রয়েছে, সীজার ওখানে curia বা সেনেট হাউস তৈরী করেছিলেন। আর
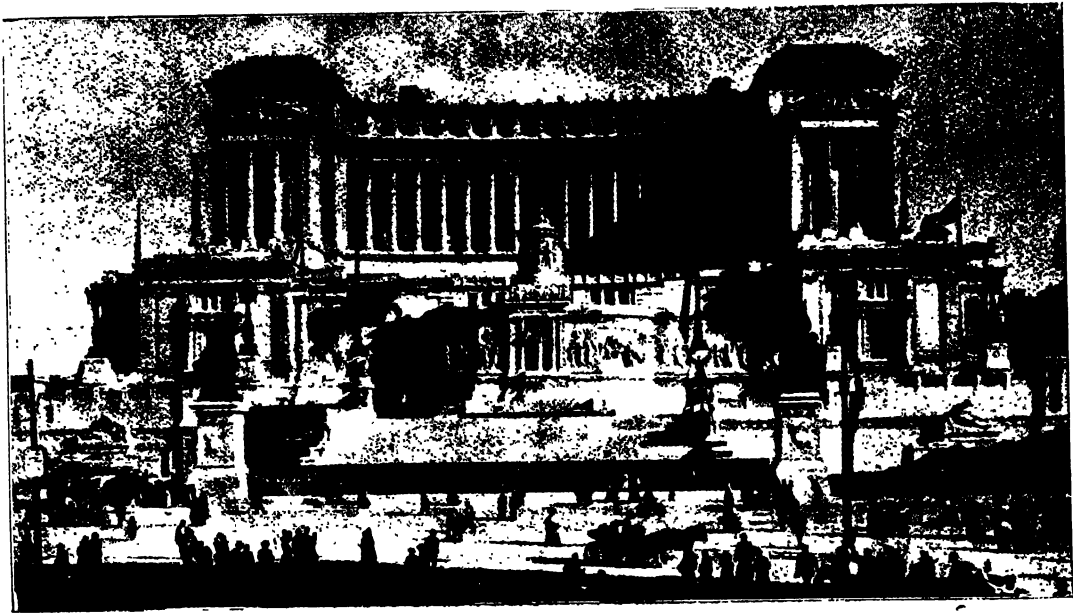
ভিক্টর এম্যানুয়েলের স্মৃতি-স্তম্ভ
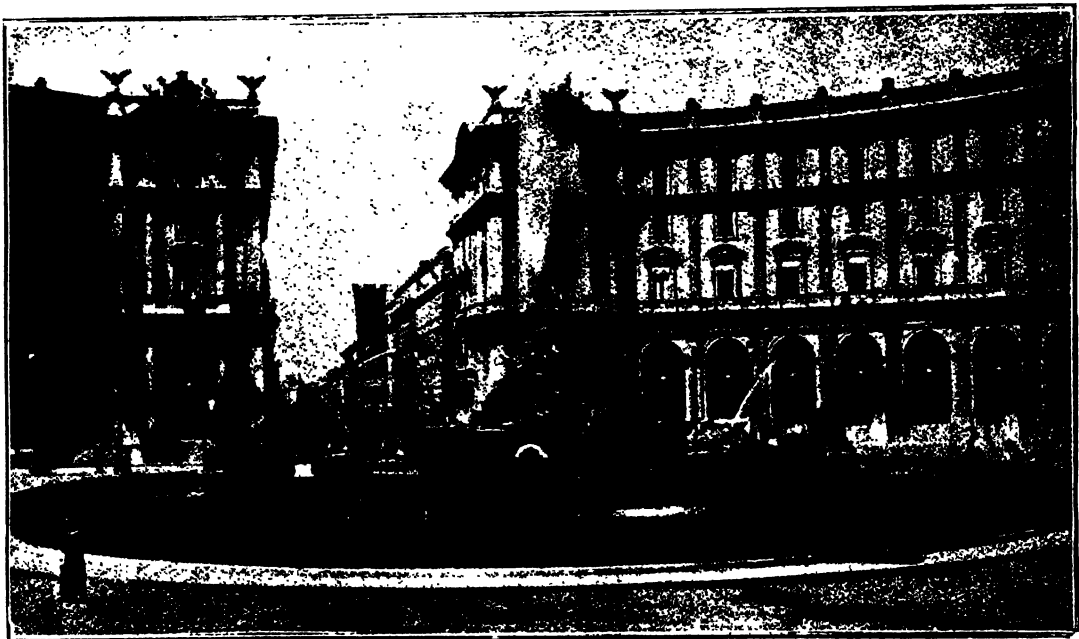
এসেড্রা প্লেস ও জলদেবীর প্রস্রবণ

প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যখন মিট্‌ল, তাদের মিলনের আনন্দ চিহ্নরূপে ওই মন্দির গড়া হয়েছিল! এদিকে যে

ওদিকের রেলিং-ঘেরা ভগ্ন-স্তূপ, ওই যে দুটী বৃহৎ পাথর অন্ধকারের গর্ভে চলে গেছে, ওই হচ্ছে রোমের প্রতিষ্ঠাতা

রমলসের সমাধি-স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ—রমলসের সমাধি! সামনে যে সুন্দর বিজয় তোরণদ্বার, ও তোরণ সেপ্টিমিউস সেভেরুস নির্ম্মাণ করেছিলেন পারথিয়ানদের ওপর বিজয় লাভের পর।

এমি গাইড বই হাতে প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ দেখে ঘুরে বেড়াতে লাগলুন। যেখানে কৃষি-দেবতা সাটার্ণের মন্দির ছিলো, সেখানে আটটি থামের তলাকার ভাঙা অংশ রয়েছে; যেখানে ক্যাষ্টর ও পোলক্সদের মন্দির ছিলো, সেখানে মার্ব্বেলের তিনটি করিন্থিয়ান থাম উদাসভাবে দাঁড়িয়ে। ওদিকে সীজারের মন্দির ছাড়িয়ে ভেষ্টাদেবীর মন্দির, সে মন্দিরে ভেষ্টা-সেবিকা চিরকুমারী পূজারিণীরা দিনরাত পবিত্রাগ্নি জ্বালিয়ে রাখতেন। ৩৯৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ওই মন্দিরে পূজার আগুণ জলেছিল। তার পর রোমের গৌরবের দিন শেষ হয়ে এল, তার সাম্রাজ্য স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল, তার পুরানো ধর্ম্ম চলে গিয়ে দাস দাসীদের মধ্যে গোপনে প্রচারিত এক নবধর্ম্ম জয়ী হয়ে উঠল, ভেষ্টার স্থানে এলেন ভার্জ্জিন মেরী, জুপিটার সাটার্ণের স্থানে এলেন ক্রুশবিদ্ধ যিশুখৃষ্ট, দেব-দেবীদের মন্দির হল খৃষ্টান চার্চ্চ। রোমের দুর্দ্দিনের সঙ্গে সঙ্গে ফোরামের সকল প্রাসাদ মন্দির বিজয় তোরণ জনহীন পরিত্যক্ত হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল, তার সব বাড়ীর বহুমূল্য মার্ব্বেল পাথর নিয়ে সহরের অন্য দিকে চার্চ্চ ও অন্যান্য বাড়ী তৈরী হতে লাগল; তার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধূলি-জঞ্জালের তলে সে রোম চাপা পড়ে গেল, সেখানে গোচারণ ভূমি হল, প্রকৃতির সবুজ আবরণে সব আবৃত হয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন প্রাচীন রোমের ইতিহাস পড়ে সভ্য জগৎ তার ধ্বংসাবশেষ জানতে উৎসুক হল তখন মৃত্তিকা খনন করায় কতকগুলি ভাঙা থাম ও ভাঙা দেওয়াল পাথর সীজার অগষ্টসের রোমের স্মৃতিচিহ্ন রূপে জেগে উঠল।

কলোসিয়াম

কিন্তু প্রাচীন রোমের এই ধ্বংসাবশেষ দেখে মন ভরে না, অর্থাৎ রোমের ইতিহাস পড়ে কল্পনার পটে সীজার-মার্কাস-অরেলিয়াসের রোমের যে গৌরবময় ছবি আঁকা আছে তা যেন ম্লান হয়ে যায়, এ সুরক্ষিত সুসজ্জিত দেওয়াল, থাম, তোরণ, পাথরের স্তূপ একটা মিউজিয়ামের মত, তাদের মাঝে হালফ্যাসানের সাজ-সজ্জাপরা নর-নারীর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের পাশে মোটরকার ছুটে চলেছে, এ

ধ্বংসাবশেষ দেখে প্রাচীন রোমের জন্য অন্তর কেমন উদাস হয়ে ওঠে। দিল্লীতে কুতব মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার করে উঠেছিল, একটা গৌরবময় লুপ্ত সাম্রাজ্য একটা আনন্দময় পুরাতন সভ্যতার সমাধি যেন দিগন্তের দীর্ঘশ্বাসে
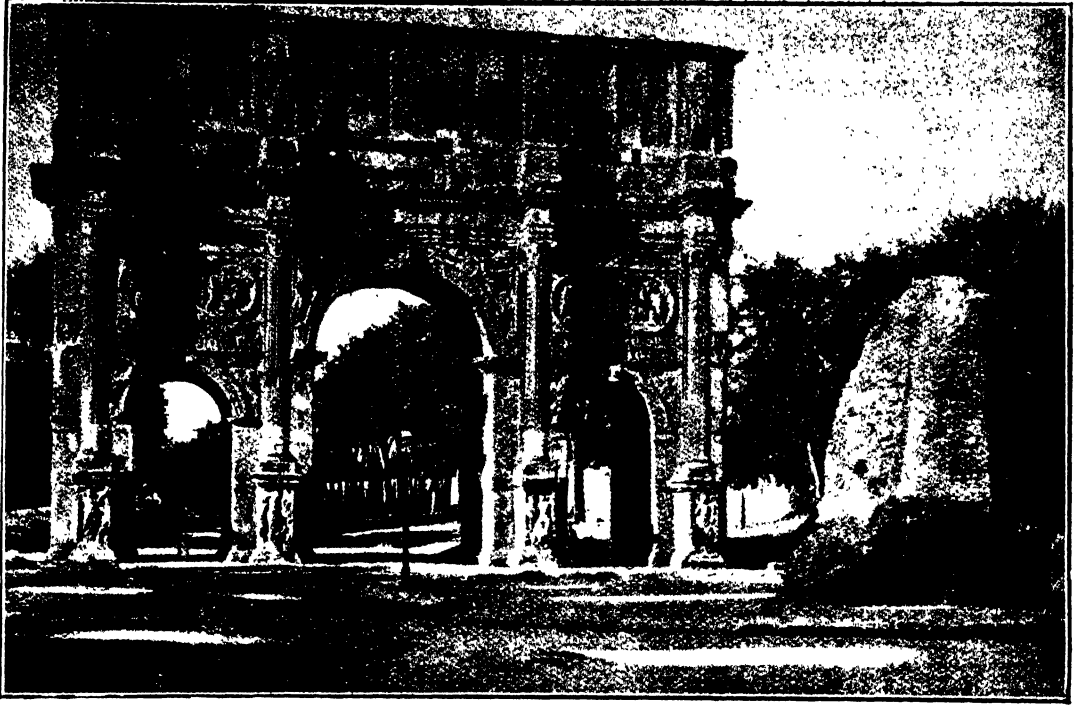
কনষ্টাণ্টাইনের তোরণ

পবিত্র প্রেম ও কলুষিত প্রেম—টিত্‌সিয়ান

ম্লান আলোয় মাইলের পর মাইল সে বিপুল জনহীন দিগন্ত প্রসারিত ধ্বংসাবশেষ যখন দেখেছিলুম, তখন অন্তর হায় হায় সকরুণ। কিন্তু রোমের ধ্বংসাবশেষ ভরে তার চারিদিক ঘিরে নবপ্রাণ ভরা ইতালীর মত্ত জীবন-কল্লোল তরঙ্গায়িত;

দেখলুম দলে দলে স্কুলের বালক বালিকারা ফ্যাসিষ্ট সাজ পরে গান গাইতে গাইতে 'পবিত্র পথ' দিয়ে মার্চ্চ করতে করতে চলে গেল, প্রাচীন রোম তাদের কাছে বিষাদিনী স্মৃতি নয়, তা হচ্ছে নব-সৃষ্টির প্রেরণা।

কিন্তু কালো বিপুল কলোসিয়াম্ দেখে মন সত্যি দুলে উঠল—কত সিংহের গর্জ্জন, কত গ্লাডিয়েটরের ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ আর্ত্তনাদ, কত সহস্র সহস্র নর-নারীর ক্রূর উল্লাস-ধ্বনি,

ঋষি আলেকজাণ্ডারের আত্মদান—লোভেরিনি

কত বিজয়োৎসবের মত্ত কোলাহল ওই বৃহৎ প্রাঙ্গণে শত শত তোরণে তোরণে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে! কলোসিয়ামকে দেখতে হয় সন্ধ্যার রাঙা আলোয় বা জ্যোৎস্নালোকে, তখন এই বিরাট মূর্ত্তি আরও বিরাট, তখন তার ভাঙা কালো রূপ আরও কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর দেখায়; যে সহস্র সহস্র বন্য জন্তু ও গ্লাডিয়েটর ওখানে প্রাচীন রোমের নগরবাসীদের ক্রূর রোমাঞ্চ দানের জন্য মরেছে, তাদের ক্ষুব্ধ

ব্যথিত দৃষ্টির মত তোরণগুলি যেন অতল-স্পর্শ অন্ধকার ভরা হয়ে চেয়ে থাকে। কলোসিয়মের পরিধি প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাইল, আশী হাজার লোক ধরতে পারে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় থিয়েটার। এই বৃহৎ রঙ্গমঞ্চের রূপ দেখলে বুঝতে পারা যায়, প্রাচীন রোম যা চেয়েছিল তা বৃহৎভাবে পেতে চেয়েছিলো,—তার সাম্রাজ্যকে যেমন পৃথিবী জুড়ে স্থাপিত করতে চেয়েছিলো, তার সুখ-সম্ভোগকে তেম্নি

একাদশ পোপ

বিপুল ভাবে পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছিলো। কলোসিয়ম্ যখন তৈরী শেষ হল তার উদ্বোধনের উৎসব একশ' দিন ধরে চলেছিলো। সে সুখ-উৎসবে পাঁচ হাজার বন্য জন্তু মারা হয়েছিলো। প্রাঙ্গণটি জলে ভরে সেখানে নকল নৌ-যুদ্ধও দেখান হয়েছিলো। এ সব কথা ভেবে রাত্রের অন্ধকারে কলোসিয়মের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে গা ছম্‌ছম্ করে, মনে হয় এ কোন রঙ্গমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ নয়, এ যেন

শ্মশানের ওপর ভীষণকৃষ্ণ স্মৃতি-স্তম্ভ, ওই তোরণসারির আড়ালে আড়ালে প্রেত-প্রেতিনীর দল নিদ্রাহারা জেগে স্তব্ধ হয়ে আছে, এখুনি বুঝি অট্টহাস্য করে উঠবে।

প্রাচীন রোমের একটি মন্দিরকে আমরা অভগ্ন ও সুন্দর অবস্থায় দেখতে পাই, সেটি হচ্ছে পান্থিয়ন। পান্থিয়নের অর্থ হচ্ছে সর্ব্বদেবতার মন্দির। প্রাচীন রোমে যা দেব-মন্দির ছিল, সপ্তম শতাব্দীতে তা রোমান ক্যাথলিক

শেষ বিচার—মাইকেল-আঞ্জেলো

চার্চ্চে পরিণত করা হয়। বাড়ীটিকে চার্চ্চ করা হয় বলেই বাড়ীটি ভগ্নস্তূপ হয়ে যায় নি। পানথিয়নের স্থাপত্য আশ্চর্য্যকর। তার ছাদ এক বৃহৎ গম্বুজ। গম্বুজের মাঝখান সব ওপরের অংশ খোলা। এই উনত্রিশ ফিট ব্যাসের খোলা গর্ত্ত দিয়ে আকাশের আলো মন্দিরে ঝরে পড়ে। গোল ছাদটির ব্যাস ১৪২ ফিট, উচ্চতাও তাই। এত বড় গম্বুজ কি করে এত আগে তৈরী করেছিল তা এখনকার স্থাপত্য শিল্পীদের বিস্ময়। এখন পানথিয়ন কেবল গির্জ্জা নয়, এখানে রাফাএলের, রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমান্থুয়েলের কবর আছে।

রোম হচ্ছে খৃষ্টান রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বারাণসী। রোমের পোপ হচ্ছেন সমস্ত রোমান ক্যাথলিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু, যিশুখৃষ্টের প্রতিনিধি। ছোট বড় সব

এপোলো ও ডফ্‌নি বার্টোনিনি

গির্জ্জার সংখ্যা ধরলে রোমে এক শতের ওপর গির্জ্জা আছে। তাদের মধ্যে সেণ্টপিটার চার্চ্চের নামই পৃথিবী-বিখ্যাত। মহারাজ কনষ্টেনটাইন যিশুখৃষ্টের শিষ্য-প্রচারক সেণ্টপিটারের কবরের ওপর এই চার্চ্চ প্রথম নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু বর্ত্তমান চার্চ্চটি সে পুরাতন চার্চ্চ নয়, এ চার্চ্চ রেনেসাঁসের ইতালীর তৈরী; ব্রামাণ্ট, রাফাএল, মাইকেল-আঞ্জেলো প্রভৃতি বহু শিল্পী এই গির্জ্জা তৈরী করতে

প্লান করেছে, সাহায্য করেছে, মাইকেল-আঞ্জেলোর সুন্দর বৃহৎ গম্বুজটি গির্জ্জাটিকে বিশেষ শ্রী-মণ্ডিত করেছে! পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কি না বলতে পারি না, তবে সবচেয়ে বৃহৎ এই গির্জ্জাটি দেখবার আগে রোমের একটি অতি প্রাচীনতম ছোট গির্জ্জা দেখতে গেলুম।

সেই গির্জ্জাটির কথা বলি। রোমের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন গির্জ্জা বলে সান্তা পুডেন্‌ৎসিয়ানার খ্যাতি আছে। রোমে যখন খৃষ্টানদের ওপর প্রবল অত্যাচার হচ্ছে, তখন পুডেন্স নামে এক রোমান সেনেট-সভ্য সেণ্টপিটারকে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর যে কন্যা সেণ্টপিটারের বিশেষ সেবিকা ছিলেন, তাঁরি নামে এই গির্জ্জাটি তাঁদের বাড়ীর যায়গায় স্থাপিত হয়েছিল। গির্জ্জার বৃদ্ধ রক্ষকটি সেই প্রাচীনতম গির্জ্জার সহিত জড়িত নানা কথা আমাদের বলতে লাগলো। পাথরে বাঁধানো একটু পথ দেখালো, ওইখান দিয়ে সেণ্ট পিটার চলেছিলেন, সেণ্ট পিটারের পদধূলি স্পর্শে ওই স্থান পবিত্র। সেণ্ট পিটার ওইখান দিয়ে চলে গেছেন! চার্চ্চের এক দিকে পুরাতন 'রোমান বাথ'। পূজাবেদিকার ওপর দেওয়ালের গায়ে ধর্ম্মপ্রচারক যিশুখৃষ্টের মোজেয়িক ছবিটি অতি সুন্দর, চার্চ্চটির মধ্যে একটি বিশেষ দেখবার জিনিস। মোজেয়িক আর্ট হচ্ছে রঙীন পাথর বা রঙীন কাচের বড় ছোট টুকরো বসিয়ে দেওয়ালে বা মেজেতে ছবি আঁকা। এই মোজেয়িক হচ্ছে ইয়োরোপের খৃষ্টান চিত্রকলার আরম্ভ। পুণ্যজ্যোতিঃময় শান্ত যিশুর মূর্ত্তি পাথরের ছোট ছোট টুকরাতে কি সুন্দর আঁকা! তাঁর একপাশে করযোড়ে ধর্ম্ম-প্রচারকগণ, অপর দিকে ভক্তিনত শিষ্যশিষ্যাগণ। পুডেন্‌ৎসিয়ানার এই চতুর্থ শতাব্দীর মোজেয়িক ছবিটি বিমুগ্ধকর।

প্রাচীন রোম ছেড়ে রেনেসাঁসের রোম দেখবার আগে রোমের মিউজিয়ামগুলি দেখা দরকার। রোমে অগণ্য মিউজিয়াম আছে,—কুড়ির ত কম নয়। তাদের মধ্যে কাপিটোলের ও ন্যাসানাল মিউজিয়াম হচ্ছে প্রসিদ্ধ; তা ছাড়া ভাটিকানের মিউজিয়ামও দেখবার জিনিষ। এ মিউজিয়ামগুলি দেখলে বোঝা যায়, প্রাচীন রোম প্রাচীন গ্রীসের নিকট তার সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য সব শিল্পের শিক্ষা নিয়েছিলো বটে, কিন্তু গ্রীসের আদর্শবাদ নিছক সৌন্দর্য্য-সাধনা তার মধ্যে ছিল না। রোম ছিল বাস্তবের পূজারী, তার শিল্পকলা ছিল ব্যবহারিক, ইংরাজীতে যাকে বলে pragmatic practical; গ্রীসের মত সে দর্শনের

ফোরাম

মায়াময় অতীন্দ্রিয় পথে বা আর্টে আদর্শ সৌন্দর্য্যের অভিসারে বাহির হয় নি। সীজার বা মার্কাস-অরেলিয়াসের যুগে আমরা কোন প্লেটো বা পলিক্লিট বা ফিডিয়াসের নাম শুনতে পাই না। ভাস্কর্য্যের চেয়ে স্থাপত্যেই রোমক প্রতিভা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলো; তার বৃহৎ সাম্রাজ্যকে দখলে রাখবার জন্যে তাকে আরও প্রসারিত করবার জন্যে রোমকে ইয়োরোপ জুড়ে গমনাগমনের পথের মালা তৈরী করতে হয়েছিল, কত নদনদীর ওপর সেতু নির্ম্মাণ করতে হয়েছিল;

বধূ (ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম)

তার অগণ্য প্রজাদের সুখ সম্ভোগের জন্য বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ, বিরাট সভাগৃহ গড়তে হয়েছিল; আর তারি সঙ্গে ভাবতে হয়েছিল কি রকম আইন করলে, আইনের কি সংস্কার করলে, শাসন প্রণালী কিরূপ ভাবে চালালে, কি শাসনতন্ত্র হলে, সৈন্য-শৃঙ্খলা কিরূপভাবে গড়লে, সমাজের নানাস্তরের নরনারীদের কি ভাবে ব্যবস্থাবদ্ধ করলে রোমের স্বাধীনতা অমর হবে, রোমের সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী থাকবে। Law ও Organisation—আইন ও ব্যবস্থাবন্ধের পদ্ধতি হচ্ছে রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। গ্রীস যেমন তার সাহিত্য, দর্শন, আর্ট দিয়ে ইয়োরোপকে পুষ্ট করেছে, রোম তেমনি তার আইন, শাসনতন্ত্র, ব্যবহারিক স্থাপত্যশিল্প দিয়ে ইয়োরোপকে সৃষ্টি করেছে।

রোমের মিউজিয়ামগুলিতে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য-সম্পদগুলি গ্রীক রূপকারদের গড়া গ্রীক অথবা ভাস্কর্য্যের মূর্ত্তির অনুকরণে গড়া। প্রাচীন রোমক ভাস্করগণ কোন অনিন্দ্যসুন্দরী ভেনাসের মূর্ত্তি গড়তে যান নি। তবে মূর্ত্তিশিল্পে তাঁদের গড়া

বংশীবাদক (ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম)

বাস্তবতাপূর্ণ প্রতিমূর্ত্তিগুলি অমর হয়ে আছে। প্রাচীন রোমের নানা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের পাথরের প্রতিকৃতিগুলি কি সজীব, কি প্রাণভরা, ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে অতুলনীয়।

প্লেটো শিক্ষাকে দুই সমান ভাগে ভাগ করেছেন,—ব্যায়ামবিদ্যা (Gymnastics) ও গীতবাদ্যবিদ্যা (music)। ব্যায়ামচর্চ্চা ও গীতবাদ্যশিক্ষা প্রাচীন গ্রীক-জীবনে এক হয়ে মিলে গেছলো। ক্রীড়াগারে চলার ছোটার ছন্দের সঙ্গে বাঁশী বাজত, বাঁশীর সুরের সঙ্গে তাল রেখে চাকা ছুঁড়তে, বর্শা

ছুঁড়তে হোত ; বাঁশীর সুরে সঙ্গত করে দৌড়ান লাফানো মল্লযুদ্ধ হত। নরদেহের সুঠাম সামঞ্জস্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য সুরের মাধুর্য্যরসে সিঞ্চিত হোত। তাই গ্রীক রূপকারগণ যে অনিন্দ্যসুন্দরী নারীমূর্ত্তি গড়ে গেছেন, তাতে যেমন তনুর পরিপুর্ণ সৌন্দর্য্য দেখি, তেম্নি অন্তরের স্বপ্নমাধুরীর পরিচয় পাই। কাপিটোল মিউজিয়ানের ভেনাস মূর্ত্তিটি আমাদের শুধু চোখ ভুলায় না, আমাদের মন ভুলায়, শুধু রক্তমাংসের লাবণ্যময় সৌন্দর্য্য নয়; সঙ্গীত আমাদের সুরের যে স্বপ্নলোকে নিয়ে যায়, রূপকার সেই পরমমাধুর্য্যময়

লেওকোন (ভাটিকান মিউজিয়াম)

স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যলোকে এ ভেনাসের মূর্ত্তি দেখে তবে পাথর খুদেছেন, তনুবল্লী যেন কোন বাঁশীর সুরে ছন্দিত। কাপিটোলের ভেনাসটি দ্বিতীয় শতাব্দীর হলেও, তাহা প্রাক্সিটেলের এক আফ্রোডিটির মূর্ত্তির অনুকরণে তৈরী। গ্রীসে যিনি ছিলেন আফ্রোডিটি, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবী, রোমে তিনি হলেন ভেনাস, নাম বদলালো, রূপ কিন্তু একই রইল।

কাপিটোলে "কিউপিড ও সাইকি"র যুগলমূর্ত্তি বড় সুন্দর লাগল। কিউপিড বা প্রেমের দেবতা চিরতরুণ, নবকিশলয়ের মত আনন্দময় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে প্রেমাবেগকম্পিতা সাইকির দীপ্ত মুখের দিকে মুগ্ধভাবে চেয়ে। গ্রীকপুরাণে সাইকি হচ্ছে মানবাত্মার প্রতীক, গ্রীসে সাইকি বা মানবের আত্মার মূর্ত্তি গঠিত হত এক সুকুমারী তরুণীরূপে। মানবাত্মা তরুণ প্রেম দেবতার কাছে নির্ভয়ে আনন্দে আত্মনিবেদন করছে, মূর্ত্তি-রচক এই আইডিয়াটিকে কি স্নিগ্ধ সুষমার সহিত মূর্ত্তি দিয়েছেন!

ভাটিকানে লেওকোন (Laccoon) গ্রীক ভাস্কর্য্যের আর একটি প্রসিদ্ধ সৃষ্টি। লেওকোন ছিলেন ট্রয়-সহরের অ্যাপলো দেবের মন্দিরের পূজারী, কিন্তু তিনি মন্দির অশুদ্ধ করাতে দেবতার অবমাননার জন্য তিনি ও তাঁর দুই পুত্র সর্প দ্বারা আক্রান্ত হন। সপুত্র সর্প দ্বারা বিজড়িত লেওকোনের বেদনাক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদের অশান্ত-ছন্দময় মূর্ত্তি গ্রীক ভাস্কর্য্যের শেষ যুগের বাস্তব ভাবোচ্ছ্বাসের যুগের তৈরী। এক ইংরাজ আর্ট-সমালোচক বলিয়াছেন,—"The group represents the extreme of a pathetic tendency in sculptor." এই মূর্ত্তিগুলিতে ভাস্করের সৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু গ্রীক আর্টের শান্ত সংহত শক্তিময় সৌন্দর্য্য নাই ; বেদনার তীব্র উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে বটে কিন্তু সৌন্দর্য্যের ভয়ঙ্করতা নেই। এখানে ব্যথায় মানবাত্মা নত হয়ে পড়েছে, সকল দুঃখকে তুচ্ছ করে সংগ্রামে অগ্রসর হবার অন্তরের বীরকে দেখতে পাই না। এর চেয়ে ভাল লাগে প্রেমসৌন্দর্য্যদেবী ভেনাসের মূর্ত্তিগুলি। মিউজিয়ামগুলিতে ভেনাসের পর ভেনাস—কত রূপের কত ভঙ্গীর ভেনাস দেখলুম। গ্রীক ভাস্করগণ ও তাঁদের শিষ্য রোমক রূপকারগণ যে ভেনাসের রূপে ভুলেছিলেন, সৌন্দর্য্যময়ী নারীর আদর্শ মূর্ত্তি গড়তে মেতে গেছলেন, তা এই ভেনাসমূর্ত্তিগুলি দেখে বেশ বোঝা যায়। ভাটিকানের স্নানের পর সঙ্কুচিতা বসে ভেনাস মূর্ত্তিটি কি সজীব কি লীলায়িত ছন্দে গড়া!

রেনাসাঁসের রোম হচ্ছে মাইকেল-আঞ্জেলো, রাফাএল, ব্রামান্টের রোম—স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে চিত্রকলায় কি অপরূপ

আর্টের আনন্দলোক! প্রাচীন গ্রীসের শিল্পীদের দেবতা ছিলেন অ্যাপলো, ক্রুশবিদ্ধ যিশু খৃষ্ট নন; তাঁদের পূজার দেবী ছিলেন ভেনাস, বিষাদিনী যিশু মাতা মেরী নন; তাদের প্রাণের পেয়ালা আনন্দের রসে উপছে পড়ত; সেই সৌন্দর্য্যতৃষ্ণাব্যথিত সুখউল্লাসময় গ্রীক প্রাণের স্পর্শে যে নবজাগরণ এল, গ্রীক ও রোমক পুরাতন শিল্পদ্রব্যগুলির প্রেরণাতে নরনারী দেহের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির যে বাসনা জাগল তারি পূর্ণ সার্থকতা দেখি মাইকেল-আঞ্জেলোর অনুপম প্রস্তরমূর্ত্তিগুলিতে, তাঁর ও রাফাএলের চিত্রলোকে।

কিন্তু সিস্‌টিনে চ্যাপেল দেখার আগে সেণ্টপিটারের এক কোণে স্থাপিত La Pieta দেখে যেতে হবে। 'পিয়েটা' মাইকেল-আঞ্জেলোর প্রথম যৌবনের সৃষ্টি। তখন তিনি প্রথম রোমে এসেছেন। কিন্তু এই যুবকের হাতের কাজে কি অপূর্ব্ব পরিপূর্ণতা রয়েছে। যিশুমাতা মেরী যিশুখৃষ্টের মৃতদেহ কোলে ধরে বসে—এই হচ্ছে রূপকারের বিষয়। এ বিষয়টি তখনকার কালের ভাস্করদের একটি প্রিয় বিষয় ছিল। অনেকেই মেরীর মূর্ত্তি গড়তে তাঁকে বেদনায় উদ্বেলিত করে দিতেন, চারিদিকে নানাজনের মূর্ত্তি তৈরী করতেন।

ভেনাস এফ্রোডিটিস (ভাটিকান মিউজিয়াম)

এস, ই, বেনিটো মুসোলিনি

আমার মত মাইকেল-আঞ্জেলোর ভক্তের শ্রেষ্ঠ তীর্থ হচ্ছে সিস্‌টিনে চ্যাপেল। সেখানে এই রেনেসাঁসের ইতালীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্যকর সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়ে অন্তর বিমুগ্ধ, স্তম্ভিত, ভাবানত হয়ে থাকে,—যেন অন্ধকার মন্দিরের ভিতর পূজারতি-উজ্জ্বল দেববিগ্রহের অলৌকিক মায়ার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

মাইকেল-আঞ্জেলোর কিন্তু শুধু মাতা ও তাঁর কোলে মৃত সন্তান। এ মাতার অন্তরতম বেদনা এত গভীর, এত নিবিড় যে, দেহের বা মুখের কোন তীব্র আবেগময় ভঙ্গীতে তা প্রকাশিত হয় নি। এ শোকের ভাষা নীরব, গভীর রাত্রির অন্ধকারে তারালোকের শূন্য নীরবতার মত। শুধু বাম-হাতের আঙুলগুলির ভঙ্গীতে কি সুন্দরভাবে প্রকাশিত

হয়েছে ঈশ্বর-ইচ্ছিত এই অবস্থায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, বুক-ফাটা মূক ব্যথাকে প্রকাশ করবার ব্যর্থতা। তলার দিকে কাপড়খানি ভাঁজে ভাঁজে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, মাতার কোলটিকে যেমন মুক্ত প্রসারিত করেছে, মাতার মূর্ত্তি যেমন বৃহৎ করে তুলেছে, তেম্নি যিশুর নগ্নতা যেন ঢেকে দিয়েছে।

চিত্রকরদের জীবন-লেখক ভাসারি পিয়েটা সম্বন্ধে লিখেছেন—"মাইকেল-আঞ্জেলো এই পিয়েটা যে কল্পনা যে মাধুর্য্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, অপূর্ব্ব আর্টের সঙ্গে তিনি মর্ম্মরপ্রস্তর যে কমনীয়তা যে স্নিগ্ধতায় ভরে দিয়েছেন, তা আর কোন ভাস্কর বহু পরিশ্রম করেও যে করতে পারবেন তা যেন স্বপ্নেও না ভাবেন। এই ভাস্কর্য্যে একটি সুন্দর জিনিস হচ্ছে খৃষ্টের দেহ; হাড়ের কাঠামোর ওপর মাংস-পেশী, শিরা উপশিরা, স্নায়ুমণ্ডলী দিয়ে নিখুঁতভাবে একটি মৃতদেহ গড়ার আর্টের যাদু, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমনভাবে খোদাই করার শক্তি, সত্যিকারের মৃতদেহের মত এমন মৃতদেহ পাষাণ খুঁদে বাহির করা—এ জিনিস আর কোথাও কেউ দেখতে পাবেন না। মৃতদেহ বটে কিন্তু মাথার ভঙ্গীতে এমন মধুরতা রয়েছে, এলায়িত হাতের পায়ের অস্থি-গ্রন্থিগুলিতে এমন সঙ্গতি রয়েছে, ধমনী ও শিরাগুলি এমন-ভাবে টানা যে মানুষের হাতে এমন মূর্ত্তি খোদিত হতে পারে ভেবে অবাক্ হতে হয়। কেউ কেউ বলেছে বটে, মেরী মাতাকে বড় অল্পবয়স্কা তরুণী দেখায়, কিন্তু নির্ব্বোধেরা বোঝে না নিষ্পাপ কুমারীদের মুখশ্রী বহুদিন তারুণ্যমণ্ডিত কমনীয় থাকে। এই মূর্ত্তি গড়ে মাইকেল-আঞ্জেলোর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।"

মানুষ-সৃজন—মাইকেল-আঞ্জেলো

সিস্‌টিনে চ্যাপেল যাবার আগে রাফাএলের ষ্টান্‌ৎসে (Raphael's Stanze) বা রাফাএলের ফ্রেস্কো দ্বারা শোভিত ভাটিকানের দোতলার তিনটি ঘর ও হল দেখতে গেলুম; কারণ মাইকেল-আঞ্জেলোর ফ্রেস্কো ছবিগুলি দেখার পর রাফাএলের এ ছবিগুলিতে আঁখি একটু আনন্দিত হতে পারে কিন্তু অন্তর ভরবে না। বস্তুতঃ মাইকেল-আঞ্জেলোর ছবির পাশে রাফাএলের ছবি যেন বড় শীতল প্রাণহীন মনে হয়। রাফাএল ছিলেন যেন বসন্তের পুষ্পবনের সহজ আনন্দের বিহঙ্গ, সে পাখীর গান বড় মধুর তাতে মন মোহিত হয়, রাফাএলের রেখার সঙ্গীত বড় সুন্দর, তাঁর বর্ণের লীলা চোখ-ভোলানো, তাঁর ম্যাডোনার মুখগুলি বড় মিষ্টি, তাঁর ছবি মন ভুলায়। কিন্তু মাইকেল-আঞ্জেলোর ছবির সামনে মন দুলে ওঠে, অন্তরের গভীরতায় নাড়া পড়ে, এ শুধু

ন্দর সৃষ্টি নয় এ ভয়ঙ্কর, প্রলয়ঙ্কর ; এ কি অসীম সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন এ কি গম্ভীর জীবনবেদনা, অথচ সে ব্যথা শান্তরূপে সংহত, রোমা রোলাঁ যাকে "eune force tumultuese au repos" বলেছেন। মাইকেল-আঞ্জেলো যেন কোন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ আকাশে গান গাইতে গাইতে উড়ে-যাওয়া পাখী, ঝড় তার ডানায় যতই আঘাত করে সে ঝোড়ো বাতাসকে ঝাপটা মেরে ততই দীপ্তস্বরে গান গেয়ে ওঠে, বজ্রের গর্জ্জনে বা বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে তার গান

পারনাসাস—রাফাএল

আরও জমে, সুর-সঙ্গতি আরও পরিশুদ্ধ হয়। দুর্ভাগ্য তাঁর কপোলে করাঘাত করেছে, দারিদ্র্য দুর্দ্দিন তাঁর জীবন অন্ধকার করেছে, কিন্তু মাইকেল-আঞ্জেলো তাঁর সৌন্দর্য্যের ধ্যানে বিক্ষিপ্তচিত্ত হন নি, তাঁর সৃষ্টি সাধনায় আর্টের সংযম দুঃখজয়ী আত্মার পরমা শান্তি হারান নি ; তাঁর সব ছবি মূর্ত্তির মধ্যে জীবনের দুঃখসংঘাত দ্বন্দ্বের সহিত ধ্যানীর শান্তিকে অনুভব করি।

রাফাএলের ফ্রেস্কোগুলির মধ্যে দু'টি ছবি বিশেষভাবে চোখে লাগ্‌ল। পারনাসাস্ (Parnassus) ছবিটি যেন রেনাসাঁসের প্রতীক। নির্ম্মল নীল আকাশের নীচে পারনা-সাস পাহাড়ের মাথায় গাছের তলে বসে অবারিতবক্ষ সুন্দর-তরুণ অ্যাপলো বেহালা বাজাচ্ছেন, তাঁর মাথায় লরেলপাতার মুকুট, গায়ের হাল্কা নীল উত্তরীয় পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, আপন সঙ্গীতসুধায় আপনি মগ্ন। তাঁর দুধারে নয় বাগ্‌-দেবীগণ (Muses) নানাভঙ্গীতে তাঁকে ঘিরে, সুন্দরী দেবীদের কারুর বসন শুভ্র কারুর সাজ হাল্কা নীল, কারুর সোণালী, কারুর ঘন লাল, কারুর বা হলদে, যেন নানা রংএর ফুল ঘিরে প্রজাপতি বসে। বামদিকে বাগ্‌দেবীর পাশে নীল সাজ-পরা অন্ধ হোমর, মাথায় লরেলের মুকুট, আকাশের দিকে চাওয়া দীপ্ত মুখের ওপর স্বর্গ হতে আলো ঝরে পড়ছে ; তাঁর এক পাশে ভার্জ্জিলের মুখ অপর পাশে লাল সাজপরা দান্তে। ডানদিকে পেট্রাক চেনা যাচ্ছে। তলায়, বামদিকে, আলেকজান্দার অ্যাচি-লিসের সমাধির ওপর হোমরের কাব্য রাখাছেন ; ডান-

দিকে, অগষ্টস ভার্জ্জিলের মহাকাব্যগ্রন্থকে অগ্নিদহন হতে রক্ষা করছেন; কারুর সাজ হাল্কা নীল, তার পাশে হলদে সোণা, তার পাশে রক্তের লাল। শোভাসাধক চিত্ররূপে ছবিটি সুন্দর, যেমন রেখার খেলা, তেম্নি রংএর সমন্বয়, মূর্ত্তিগুলির সাজানোয় রেখা ও রংএর সুন্দর সঙ্গীত!

"কারাগার হতে সেণ্ট পিটারের মুক্তিদান" ছবিটি তিনটি অংশে ভাগ করা। মাঝখানের অংশটি কারাগারের মধ্যে, দুই দণ্ডায়মান নীলবর্ম্মাচ্ছাদিত নিদ্রিত প্রহরীর মধ্যে সেণ্ট পিটার ভূমিতে সুখসুপ্ত, তাঁকে মুক্তি দেবার জন্যে দেবদূত এক প্রহরী অপরদের জাগিয়ে তুলছে, তার মশালের আলোয় নীলাভ বর্ম্ম ঝলমল করছে, দূরে আকাশে মেঘের সঙ্গে অর্দ্ধচন্দ্রের লুকোচুরি খেলা হচ্ছে। ছবিটিতে আলো অন্ধকারের এমন একটি বৈপরীত্য-লীলা আছে, মূর্ত্তিগুলি সাজানোর এমন সুন্দর সামঞ্জস্য আছে যে, ছবিটীকে দেখলেই চোখে ভাল লাগে। ছবিটির ডান অংশে যেমন চারিটি মূর্ত্তি বাম অংশেও তেম্নি চারিটি মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তিগুলির ভিতরও দুই অংশেই একটি মূর্ত্তি গতিময়, প্রাণভরা আলোকোজ্জ্বল, অপরগুলি শান্ত, স্থির। আর কারাগারের রক্তাভ দেবদূত

সেণ্টপিটারের মুক্তি—রাফাএল

কারাগারের অন্ধকারে অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে আবির্ভূত, দীপ্ত আলোয় অন্ধকার কম্পিত; বর্শা ধরে ঘুমন্ত প্রহরী দু'টির আনত মূর্ত্তির মধ্যে দেবদূতের গতিময় আলোভরা মূর্ত্তি সুন্দর বৈষম্য সৃষ্টি করে নিদ্রিত অন্ধকারভরা কারাগারকে সজীব করে তুলেছে। ডানদিকে কাঁচা সোণারংএর যিশু হাল্কা লাল রংয়ের সাজ পরে আগুনের শিখার মত, চারিদিকে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে পিটারের হাত ধরে নিয়ে চলেছেন, তাঁর জ্যোতিঃর দীপ্তিতে ঘুমন্ত প্রহরীদের লাল জামা নীল সাঁজোয়া আলোয় ঝক্‌মক্ করছে। বামদিকে, মশাল হস্তে যেন ছবিটির মধ্যবিন্দু, যেন প্রদীপের মুখের দীপ্ত শিখাটি। এই আলোর ভাষাই ছবিটির মর্ম্মবাণী, কারাগার হতে মুক্তির ক্ষেত্রে অন্ধকার হতে জ্যোতিঃতে খৃষ্ট নিয়ে চলেছেন।

সিসটিনে চ্যাপেল হচ্ছে লম্বায় ১৩৩ ফিট, চওড়াতে ৪৩ ফিট ও উচ্চতায় ৮৫ ফিট। মাইকেল-আঞ্জেলোর ছবিগুলি তার ভেতরের ছাদ জুড়ে আঁকা, এই ভেতরের দিকের বৃহৎ ছাদকে নয়ভাগে ভাগ করে বাইবেলের Genesis অধ্যায়ে বর্ণিত নয়টি ঘটনাকে সুঠাম বিরাট মূর্ত্তি দিয়ে মাইকেল আঞ্জেলো এঁকেছেন। তার পর এই নয়টি ছবি ঘিরে ফ্রেমের

ম? চারিধারে Prophets ও Sibyls মূর্ত্তি আঁকা, প্রতিমূর্ত্তি যেমন ব্যক্তিত্বে তেম্নি মহান সৌন্দর্য্যে ভরা। এই বিরাট কাজের প্রথমে মাইকেল-আঞ্জেলো কয়েকটি চিত্রকরকে সহকারীরূপে এনেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁদের তাড়িয়ে দেন। রংগোলা থেকে ভারা বাঁধান, সমস্ত ছবি তিনি একাই আঁকতে সুরু করলেন। সাড়ে চার বছরের অমানুষিক পরিশ্রমের

কাপিটোলে স্থাপিত ভেনাস-মূর্ত্তি

অত্যাশ্চর্য্যকর শিল্পসাধনার অপূর্ব্ব সুন্দর ফল এই চ্যাপেলের ছাদের চিত্রগুলি আর্ট-রসিকজনের চির-বিস্ময় চির-আনন্দ হয়ে আছে; ইয়োরোপীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এ আর্ট-সাধনার তুলনা আর নাই। আর এ সাড়ে চার বছর অর্থাভাবের সঙ্গে ঈর্ষাপরায়ণ শিল্পীদের বিদ্বেষ চক্রান্তের আবহাওয়ায় পারিবারিক অশান্তির মধ্যে, নিঃসঙ্গ নির্জ্জন জীবনে ধ্যানমগ্ন চিত্তে সৌন্দর্য্যের শিখা অন্তরে জ্বালিয়ে তাঁকে বীরের মত কাজ করে যেতে হয়েছিল।

প্রথম ছবিটি হচ্ছে, পরমেশ্বর তাঁর প্রসারিত হস্তের মহিমময় ছন্দে আলো ও অন্ধকার বিভক্ত করে দিলেন।

দ্বিতীয় ছবিটি, ঈশ্বর দুই হস্ত মত্তবেগে প্রসারিত করে এক হাতে সূর্য্য অপর হাতে চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরের এই মূর্ত্তিটি ভীষণ সুন্দর, দেহের তুলনায় হাত ও পা ছোট
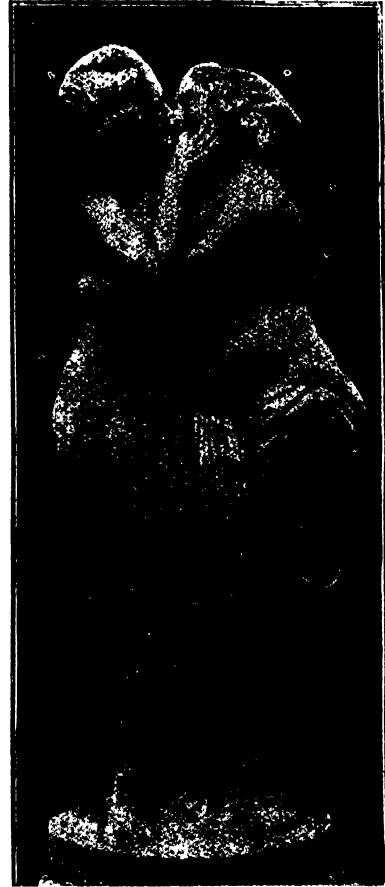
সাইকি ও কামদেব

আঁকাতে, খিলানযুক্ত ছাদে তাঁর মূর্ত্তি যেন ঝড়ের মুখে মেঘের মত উড়ে আস্ছে। এমন অপূর্ব্ব আর্টের সঙ্গে তাঁকে আঁকা হয়েছে যে চ্যাপেলের যেখানেই দর্শক থাক না কেন, সে মূর্ত্তি যেন তার দিকে চেয়ে তাকে অনুসরণ করে। তিনি যেন সর্ব্বব্যাপী—এই আইডিয়া হয়।

তৃতীয় ছবিটি, ঈশ্বর পৃথিবীর অনন্ত জলরাশিকে আশীর্ব্বাদ করছেন, প্রাণের জন্ম হোক।

চতুর্থ ছবিটি, আদামের সৃষ্টি, প্রথম মানবের জন্ম! উঁচু পাহাড়ের মাথায় নীলাকাশের তলায় একটি নগ্ন তরুণ যুবক সূর্য্যালোকে এলিয়ে শুয়ে অর্দ্ধ-জাগ্রত, অর্দ্ধ-ঘুমন্ত ভাবে। ঝড়ের মেঘের মত আনন্দময় বেগে ঈশ্বর উড়ে এলেন তার সম্মুখে, কিশোর দেবদূতের দল তাঁকে ঘিরে, তিনি যেন সুন্দর যুবক হয়ে এলেন মানবের জন্ম দানের জন্য। সুঠাম সুন্দর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে তর্জ্জনীর দ্বারা আদামের আঙুল ছুঁয়ে আদামের দেহে জীবনের চঞ্চল স্রোত সঞ্চারিত করে দিলেন, বাম হাতে সুকুমার দেববালকদের ধরে আছেন। ঈশ্বরের তর্জ্জনী-স্পর্শে আদাম যেন স্বপ্ন হতে জেগে উঠেছে, নব-জাগ্রত প্রাণ অনুভব করে স্বপ্ন-ভরা চোখে চাইছে। আদামের এই দেহ যেন কোন গ্রীক রূপকারের গড়া সুন্দর মূর্ত্তি, এই যুবকরূপে মাইকেল-আঞ্জেলো রেনেসাঁসের তারুণ্যকে তার স্বপ্ন, তার নবজাগ্রত সৃষ্টির আনন্দ ও বেদনাকে মূর্ত্তি দিয়েছেন। আদামের মুখ যেমন স্বপ্ন-ভরা তেমি ভাবী বেদনার ছায়ায় ভারাক্রান্ত। মূলতঃ মাইকেল-আঞ্জেলো হচ্ছেন একজন ভাস্কর, তাঁর এই চিত্রগুলিতে ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার অপূর্ব্ব সম্মিলন হয়েছে, প্রতিভার অপূর্ব্ব রসায়নে রং ও রেখায় গড়ে উঠেছে যেন পাথরের খোদাই করা সুন্দর মূর্ত্তি, ফিডিয়াস বা পলিক্লিটের সৃষ্টির মত; অথচ তাতে আছে অন্তরের ভাবাবেগ, কবিতার মাধুর্য্য। বস্তুতঃ আদামের এই মূর্ত্তি সৃষ্টিতে চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও কবিতার সমন্বয় দেখতে পাই, এইখানেই মাইকেল-আঞ্জেলো অতুলনীয়।

আদি দম্পতির প্রথম পাপানুষ্ঠান—মাইকেল-আঞ্জেলো

প্রলুব্ধ সেণ্ট এণ্টনি—মরেলি

পঞ্চম ছবি, ঈশ্বর আদামের পার্শ্ব থেকে নারী সৃষ্টি করলেন। ষষ্ঠ ছবি, বাম দিকে, বৃক্ষছায়ায় এলায়িত-তনু ইভ নিষিদ্ধ ফল নেবার জন্যে লুব্ধভাবে হাত বাড়িয়েছে, সর্প

উপরে নারীরূপে আদামের দিকে চেয়ে তাকে ভোলাচ্ছে; আর তার হাতের অন্তরালে ইভকে ফল দিচ্ছে; আদাম ভীত মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে নারী-রূপিণী সুন্দর সর্পের দিকে চেয়ে আবেগে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরেছে, তাদের ওপরে বৃক্ষ-পল্লবের দীর্ঘ স্নিগ্ধ ছায়া। ছবির ওপর দিকে স্বর্গরাজ্য হতে বিতাড়িত আদাম ও ইভ; তাদের আর সে লুব্ধ মুগ্ধ ভাব নেই, তারা বেদনায় ক্ষুব্ধ, অনুশোচনায় দিশেহারা, ঈশ্বরের উদ্যত বজ্রের মত দেবদূত তরবারি হস্তে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে, মাথায় প্রখর সূর্য্য, গাছের ছায়া নেই, সামনে অজানা দীর্ঘ পথ, স্বর্গের সুন্দর উদ্যান নেই; ইভ কপালে করাঘাত করে ভীত মুখে আদামের দিকে চাইছে, আদাম যেন দেব-দূতের তরবারির আঘাত এড়াবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, জীবনের দুঃখকে মেনে বীরের মত বহন করতে চলেছে। সুন্দর এই চিত্রখানি।

এর পরে নোয়ার ঈশ্বর পূজা, প্লাবন ইত্যাদি আরও তিনখানি ছবি আছে। সব ছবির বর্ণনা করার স্থানাভাব।

"Last Judgment" "শেষ বিচার" ছবিটি চ্যাপেলের পূজাবেদীর ওপর সমস্ত দেওয়াল জুড়ে আঁকা, লম্বায় ৬৬ ফিট, চওড়ায় ৩৩ ফিট। মাইকেল-আঞ্জেলো এ ছবিখানি আঁকেন তাঁর প্রৌঢ় বয়সে, সাত বছর ধরে ছবিখানি আঁকা চলেছিলো। ইয়োরোপীয় চিত্রকলার সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ ছবি-খানির বর্ণনা অসম্ভব, তবে কিছু আইডিয়া দি। পট-ভূমিকা হচ্ছে অতি স্বচ্ছ নীল, যেন মুক্ত উদার আকাশ, তার মধ্যে সূর্য্যের মত জলজ্বল করছে যিশুখৃষ্টের মহান সুন্দর মূর্ত্তি, মাইকেল-আঞ্জেলোর যিশুখৃষ্ট শীর্ণ তপস্বী নন। তিনি যেন অ্যাপলো, যেমন আত্মায় তেমি দেহে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতায় ভরা। রক্তবসনা মেরীর পাশে মানবদেহমনের আদর্শ সৌন্দর্য্যের প্রতীক স্বর্ণ-বর্ণের যিশুর মূর্ত্তি ছবিটীর মধ্যবিন্দু, তাঁকে ঘিরে নগ্ন অর্দ্ধ-নগ্ন নর-নারীর দল শেষ বিচারের তূরীর আহ্বান শুনে কবর থেকে বেগে উত্থিত হয়ে এসে দুলছে কাঁপছে টলছে, কেউ উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে, কেউ উল্লাসে ছুটে চলেছে—সমস্ত ছবি ভরা কি গতি, প্রাণের কি বিপুল স্পন্দন! বিচারক খৃষ্টের একদিকে তাঁর বিশ্বাসী ভক্তদল, শয়তান তাদের নীচে টানতে চেষ্টা করছে, দেবপরীরা তাদের ওপরে ঠেলে তুলে রাখছে, অপর দিকে পাপীর দল বৃথাই যিশুর কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করছে, আপন পাপের ভারে তারা তলায় নরকের দিকে চলে যাচ্ছে। ওপরে দুধারে দেবপরীরা ক্রুশ বহন করে নিয়ে আসছে, যে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তিনি পৃথিবীতে মরে মানবকে অমর জীবন দান করে গেছেন। আর তলায় নরক উদ্ঘাটিত হয়েছে, নরকের মাঝি কেরণ (Charon) আর্ত্তনাদমুখর পাপীপুঞ্জ নৌকায় বোঝাই করে অগ্নি-কুণ্ডের দিকে নিয়ে চলেছে।

নরকপাল-মণ্ডিত সমাধি-মন্দির

ছবিটিতে পুরুষ মূর্ত্তিগুলি সব নগ্ন, মাংসপেশীবহুল, কেহ আনন্দে কেহ বেদনায় ভাবাবেগে স্পন্দিত; কয়েকটি নারী-মূর্ত্তি হাল্কা লাল সাজ জড়ানো, কোথাও কোথাও সবুজ ছোপ। নীল প্রচ্ছদপটে সোণার উচ্ছ্বসিত স্রোতের মত তরঙ্গের পর তরঙ্গ উচ্ছলিত হয়ে নর-নারীর দল খৃষ্টের দিকে ছুটে আসছে, মধ্যে তিনি তেজোময় স্থির দাঁড়িয়ে। ছবিটির সামনে দাঁড়ালে ছবির নরনারী মূর্ত্তিগুলির মত অন্তর

লা পিয়েটা—মাইকেল-আঞ্জেলো

শিহরিত আলোড়িত ভাব-ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, মনে হয় আর্টের কি অপূর্ব্ব একটি সৃষ্টি দেখলুম।

সিস্টিনে চ্যাপেল দেখে সেদিন আর কোন চিত্রশালায় বা মিউজিয়ামে যাওয়া যায় না, মাইকেল-আঞ্জেলো মনকে অভিভূত করে থাকে।

পরদিন গেলুম বোরগেজে চিত্রশালায়। (Galleria Borghese) এ চিত্রশালায় একটি প্রসিদ্ধ ছবি হচ্ছে, টিত সিয়ানের "পবিত্র ও অপবিত্র প্রেম" (Sacred and Profane love)। ছবিটির সঙ্গে তার নামের বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। টিত্‌সিয়ান ছিলেন রূপের পূজারী, রংএর মায়াবী। সুন্দর একটি প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে দু'টি সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি আঁকাই তাঁর মৎলব। একটির নগ্নতার সৌন্দর্য্য প্রখর করবার জন্যে অপরটিকে এঁকেছেন শ্বেত বসন পরিয়ে। ছবিটিতে কোন গভীর আইডিয়া নেই, শুধু রূপের লীলা। শুভ্র মেঘভরা নীলাকাশের পটে সোণালী গাছের তলায় একটি শুভ্র বেদিকা, তার এক দিকে লাবণ্যময়ী নগ্না সুন্দরী বসে, মাথার সোণা রংএর চুল, গায়ের লাল টক্‌টকে চাদরের পেছন উড়ছে, হাতে কালো ঘট, মাথা ঈষৎ আনত করে যেন কোন স্বপ্নে বিভোর। অপর দিকে আর একটি সুন্দরী বসে, তার নীলাভ সাদা সাজ লুটিয়ে পড়েছে, তার ওপর হাতের জামার লালটুকু জ্বলজ্বল করছে, এক হাতে কালো ঘট ধরে, অপর হাতে ফুলের গুচ্ছ। দু'জনেরই দেহের রং কাঁচা সোণার—যেন আগুনের আভা। একজন আমাদের মুখের দিকে চেয়ে, অপরজন মুখ ফিরিয়ে কোন সুখচিন্তায় মগ্ন। দূরে এক দিকে ছোট গ্রাম, গির্জ্জার চূড়া দেখা যাচ্ছে, অপর দিকে ছোট পাহাড়ের মাথায় রাজপ্রাসাদের বুরুজ। দু'টি সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে কোন বসন্ত মধ্যাহ্নে পুষ্পিত বৃক্ষতলে লাবণ্যের দ্যুতিতে দেখা দিল!

রোককো যুগের ভাস্কর বার্ণিনির অনেকগুলি সুন্দর কাজ এই বোরগেজে বাড়ীতে আছে। "অ্যাপলো ও ডাফনি" যুগলমূর্ত্তি সুন্দর লাগলো। গ্রীক উপকথায় ডাফনি হচ্ছে আর্কেডিয়ার এক জলদেবতার সুন্দরী মেয়ে, অ্যাপলো তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ধরতে যায়, ডাফনি ছুটে পালায়। ডাফনির মা মেয়েকে লরেল গাছে পরিবর্ত্তিত করে ডাফনিকে অ্যাপলোর প্রেম হতে বাঁচায়। বার্ণিনি গড়েছেন নৃত্যের ভঙ্গীতে তরুণ যুবক। অ্যাপলো সুন্দরীর প্রেমে মত্ত হয়ে আসছে, তরুণী ডাফনি ধরা দেবে না বলে পালাচ্ছে, মায়ের মন্ত্রজালবশে তার তনু ধীরে ধীরে লরেল গাছ হয়ে যাচ্ছে। দু'টি মূর্ত্তিতে বড় সুন্দর সুখময় গতি আছে, নৃত্যের ছন্দ আছে, প্রেমাবেগের কম্পনে শুভ্র মর্ম্মর তরঙ্গায়িত। বোঝা যায় এ গ্রীক ভাস্করের নয়, রোককো সময়ের রূপকারের গড়া।

পথের বাহির দিকে দেখি রেনেসাঁস রোককোর রোম হতে ফ্যাসিষ্ট রোমে এসে পৌঁছেছি। সেদিন বুঝি রোমের জন্মদিনের উৎসব, প্রাচীন গৌরবের দিন স্মরণ করে জাতিকে

নবশক্তিতে গড়বার প্রেরণা লাভের জন্য এসব জাতীয় উৎসবের দিনগুলিকে মুসোলিনি বিশেষ প্রাধান্য দেন। ফ্যাসিষ্ট-তন্ত্র স্থাপন করে তিনি আজ দুর্ব্বল ইতালীকে শক্তিমান করে নবজীবন দান করেছেন; তাঁর রাজনীতি সম্বন্ধে নানা সমালোচনা করা যেতে পারে, তাঁর শক্তিলাভ ও শক্তিবৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু এ

মুসোলিনির সৈন্য পরিদর্শন

তরুণ ফ্যাসিষ্ট সেনাদল

কথা মানতে হবে যুদ্ধের পর আত্মকলহ-দুর্ব্বল ইতালীকে তিনি আজ পৃথিবীর অপর সকল শক্তিদের মধ্যে সসম্মানে সমান আসনে বসিয়েছেন। তাই ফ্রান্স আজ ইতালীর শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত, পৃথিবীর সকল শক্তি ইতালীর রাজ্য-লোলুপতায় শক্তির স্পৃহায় ভীত।

পথে দেখি দলে দলে তরুণ যুবক ফ্যাসিষ্ট দল কালো সার্ট পরে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে চলেছে; ইতালীর দিগদিগন্ত হতে যুবক ফ্যাসিষ্টগণ রোমের ২৬৮২তম জন্ম দিনের উৎসবে যোগদান করতে এসেছে; তাদের সভ্যতা কত প্রাচীন, তাদের ইতিহাস কত গৌরবময় তা স্মরণ করে আবার নব উদ্যমে জাতিকে শক্তিশালী করবার সাধনায় লাগতে হবে। সেই ফ্যাসিষ্ট দল দেখে, জাতীয় আন্দোলনের উচ্ছ্বসিত রূপ দেখে অন্তর দুল্‌ল বটে, কিন্তু ইতালীয়ান কবি কার্দুচির রোম সম্বন্ধে কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ল—যদিও রোমের সে অতীত যুগ এ বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক গৌরবময় ছিল। যদিও এখন 'পবিত্র পথ' দিয়ে চার শ্বেত অশ্ব বিজয়লাভের জন্য ঘাড় দোলায় না, তবু এ কথা কি সত্য নয়, আজ পৃথিবীর এ সভ্যতা, এ শক্তি রোমের দ্বারা অনুপ্রাণিত তারি সাধনার ফল?

দূরে ও কাছে

কথা, সুর ও স্বরলিপি— **শ্রীদিলীপকুমার রায়**

মিশ্র কীর্ত্তন-সিন্ধুড়া—তাল ঝাঁপতাল

হৃদয় মোর জীবন ভোর
মেলিয়া পাখা উড়িতে ধায়,—
(আবার) নভো বিতানে ক্ষুব্ধ প্রাণে
ফিরি ফিরি ধরাপানে চায়!
দেশে বিদেশে কেবল ভেসে
অকূলে বরিতে চাহে সে,—
(আবার) অকূলে আসি কূলের বাঁশি
বারতা তরে সদা সুধায়!
গৃহ ত্যজি সে ভাবে বরিখে
গৃহেই শুধু মুক্তি ধার,
(তখন) বাহিরে ভিড় হইতে নীড়
মাঝারে আসি পাখা গুটায়;
ডানা তাহার রুদ্ধ দ্বার
গৃহের কারা পিঞ্জরে
(শুধু) ঝাপটি মরে নিজ নিগড়ে
অসীম তরে চ্ছুসি লুটায়!

[র্সা ণধা ধমা রমপধণা ধা]

II { সমা জ্ঞা রসা সা ররাণ | ণ্া সা রা মা পা | ণা ধা পমা রমপধা মপা |
হৃ দ য় মো র জী ব ন ভো র মে লি য়া পা খা

মজ্ঞা রসা রা সরা ণ্সা | } II
উ ড়ি তে ধা য়

না না না না নর্সা | র্সা র্সা র্সা র্সরা র্সণা | ণধা ধপা পমা রমপধা মপা |
ন ভো বি তা নে ক্ষু ব ধ প্রা ণে ফি রি ফি রি ধ

মজ্ঞা রসা রা সরা ণ্সা | II II
রা পা নে চা য়

সগা গমা মপা পা পা | পমা মধা পমপা পা মগমা | গমপা পা পা পা ধপজ্ঞা |
দে শে বি দে শে কে ব ল ভে সে অ কূ লে ব রি

পা ধা ধা পধনর্সা ধনপধা | ধা ধর্সা র্সা র্সা র্রর্সনা | না র্সা নধা ণা ধপা |
তে চা হে সে - অ কূ লে আ সি কূ লে র বাঁ শি

পধা মপা পা পণা ণমা | মজ্ঞা রসা রা সরা ণ্সা | II II
বা র তা ত রে স দা সু ধা য়

মা পা পা ণধা ধনা | না নর্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা নর্সা র্রজ্ঞা র্রা র্সনা |
গৃ হ ত্য জি সে ভা বে ব রি যে গৃ হে ই শু ধু

না র্সা ণধা ণধা ণপা | পা পা পা ধপা ধমা | পা ধা ণা র্সা র্সণা |
মু ক্তি তি ধা র বা হি রে ভি ড় হ ই তে নী ড়

ণধা ধমা মা রমপধা মপা | মজ্ঞা রসা রা সরা ণ্সা | II II
মা ঝা রে আ সি পা খা গু টা য়

মা মা মা ণণা পধা | না র্সা র্সা র্সর্রর্সা র্সা | পা র্সা র্সা না র্সধা |
ডা না তা হা র রু দ্ ধ দ্বা র গৃ হে র কা রা

ধা না না র্সনা ধপা | পা ধা র্সা র্সা র্সা | ণর্সা ণধা ধপা পা ণণাম |
পি ন্ জ রে - ঝা প টি ম রে নি জ নি গ ড়ে

মা পা পা ণা ণাম | মজ্ঞা রসা রা সরা ণসা | II II
অ সী ম ত রে চ্ছ্ব সি লু টা য়

* এ গানটি যখন ১৯২৭শের অক্টোবরে মিউনিক থেকে ভিয়েনার পথে ট্রেণে রচনা করি তখন এর সুর-রচনার প্রেরণা পেয়েছিলাম বাংলার জীবিত সঙ্গীতকারদের (Composer) মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার কবি অতুলপ্রসাদের একটি গান থেকে। সে গানটি হচ্ছে "জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী।" অর্থাৎ সে গানটিতেও যেমন হিন্দুস্থানী সুর থেকে কীর্ত্তনে গিয়ে পুনরায় হিন্দুস্থানী সুরে ফিরে আসা হ'য়েছে এ গানটিতেও তাই। কীর্ত্তনের ঢঙের সঙ্গে খাঁটি হিন্দুস্থানী ঢঙের সুরের এরূপ মনোজ্ঞ মিলন ও transition-এ যে কী অভিনবত্ব ও কলাকারুর দীপ্তি ফুটে ওঠে সেটা কবি অতুলপ্রসাদের উল্লিখিত অপরূপ সৃষ্টিতে সঙ্গীতানুরাগীরা আস্বাদ ক'রে আনন্দ পাবেন ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ-গানটির সুর রচনা ঐ প্রেরণারই পদাঙ্কানুসরণে রচিত। পাছে গানটি গাইবার সময় সঙ্গীতজ্ঞ কেউ এ কলাকারুর জন্যে রচয়িতার স্বকীয়তার তারিফ করেন সেই জন্যে এটুকু ব'লে রাখতে বাধ্য হ'লাম। ভরসা করি অতুলপ্রসাদের এ-ঢঙে ভবিষ্যতে আরও গান রচিত হবে—কেন না এর মধ্যে একটা অপরূপ মাধুর্য্য আছে। (লেখকের "কুসুমের বুকে ঝুরে যে সুবাস" গানটির ঢঙও এই—তবে সেটা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করতে ভুল হ'য়ে গিয়েছিল।) বস্তুতঃ এ ঢঙ একটা "সৃষ্টি"—যেমন বাংলা-গানে গজলের ঢঙ আমদানী করা কবিবর কাজী নজরুল ইস্‌লামের একটা অবিসংবাদিত "সৃষ্টি"—তা ধূর্জ্জটিপ্রসাদ যা-ই বলুন না কেন। কারণ যেখানেই সুন্দর ও মুগ্ধকর assimilation দেখা যায় সেখানেই সৃষ্টি সত্য হ'য়ে উঠেছে বল্‌তে হবে।

("জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী" গানটির স্বরলিপি লেখকের "গীতিমঞ্জরী" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।) ইতি। রচয়িতা।

ভোলার উপহার

শ্রীউমা দেবী

ওদের ছেলেটার—
দিন-রাত্তির দস্যিপনায় টেঁকাই হোল ভার—!
যখন-তখন লাগায় গোলযোগ,
আমার যেন এ এক কর্ম্মভোগ—
ভাড়াটেদের ছেলের নষ্টামি
সইতে পারি আমি
এমন শান্ত নই যে কোন দিন
এমন উদাসীন—!
ভাবি কেবল বসে',
এমন ছেলে জন্মে যে কার দোষে ?

সেদিন সকাল হোতে,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার স্রোতে—
বদ্ধ ঘরে সঙ্গী সাথী হীন
বসে আছি এক্‌লা সারাদিন।
একটা খাতা আছে হাতে
হ'চ্ছে মনে লিখ্‌ব তা'তে—
বাদল দিনের কথা
গোপন মর্ম্মব্যথা !
এমন সময় ভীষণ শব্দ করে
কি যেন এক পড়্‌ল বিষম জোরে
ঝন্ ঝনিয়ে নীচের তলাটায়—
ব্যস্ত হোয়ে গেলাম ত্বরিত পায়।
বইএর যেমন ছিল বাতিক
যত্নও ঠিক
ছিল তেম্‌নি ধারা
নষ্ট হবে এই ভয়েতেই সারা।
তাইতে সেবার জন্মদিনে
স্বামী আমায় দিলেন কিনে,
বিলিতি কোন্ দোকান থেকে
অনেক খুঁজে, অনেক দেখে,
আলমারী এক—মেলাই টাকা দাম ;
খোদাই করা তাতে আমার নাম —

নিজে হাতে ঝাড়া-মোছার ভার
সপ্তাহে দুইবার
ছিল আমার বরাদ্দ কাজ ;—
আজকে মাথায় বাজ !
ভাড়াটেদের সেই ছেলেটা
যেমন বুদ্ধি তেম্‌নি জ্যাঠা,
চৌকি এনে তার উপরে চড়ে
নতুন খেলা গড়ে'
নিরিবিলি জমিয়েছিল বেশ—
তার পরেতে এই তো অবশেষ,
হুড়মুড়িয়ে আলমারীটা পড়েছে কাৎ হোয়ে
বইএর বোঝা লয়ে—
ভাঙা কাঁচে কপাল কেটে গিয়ে
রক্ত-ধারা পড়ছে দু'গাল দিয়ে।
কান্নাকাটি নেইক' কিছু
অপরাধীর মুখটা নীচু—
ভাবটা মনে কোন্ ফাঁকেতে পালায় কেমন করে'—
হতবুদ্ধি মা, বাবা তার দাঁড়িয়ে দুয়ার ধরে'।—

নীরব হোয়ে ব্যাপারখানা দেখে নিলুম,
শেষে বল্লুম একটু হেসে
"কি হবে আর দাঁড়িয়ে থেকে হবার যা' তা' হোল,
ছেলেটাকে ওখান থেকে তোল ;
রক্তগুলো ধুইয়ে ভাল করে—
আইডিন্‌টা লাগিয়ে দিও ধরে'।"
ধীরে ধীরে নিজের ঘরে এলাম শেষে চলে,
ওদের ছেলে ওরা বুঝুক্ কাজ কি কিছু বলে'
আলমারীটার নয় শুধু লোক্‌সান,
ওটা আমার অনেক সাধের, আমার স্বামীর দান—
সেই কথাটা মনে করে—মনটা হোল ভার—!
খুলে দিয়ে রুদ্ধ ঘরের দ্বার
বাহির পানে রইনু চেয়ে—নীরব আঁখি তুলে
পদ্য লেখা ভুলে !

সন্ধ্যেবেলা মা এল তার ধীরে—
লজ্জানত শিরে—
নীচের তলার ভাড়াটিয়া—যদি রাগের ভরে
নোটিশ দিয়ে ওঠাই বা এর পরে—
কোথায় যাবে—কম ভাড়াতে আর
বাড়ী মেলাই ভার!
ভয়ে ভয়ে বল্‌লে মোরে
"দিদি এবার ক্ষমা করে'
দাও এ ছেলেটারে—;
আবার যদি করে এমন, তারে
দিও সাজা যত তোমার খুসী,
করব না তায় দুষী!—
আমি বললুম ধীরে—
'সাজা দিলে আস্‌বে না ত ফিরে—
মেরামতটা করিয়ে নিলে পরে—
ভোলাকে আর ঢুক্‌তে না হয় দিও না ওই ঘরে"—
লজ্জাতে সে ধরতে গেল পা
অপরাধীর মা।

সেদিন রাত্রে ঢুকে শোবার ঘরে
দেখি ভোলা খাটের বাজু ধরে—
দাঁড়িয়ে একটি পাশে,
অন্য দিন ঘরে যখন আসে,
হট্টগোলে পাগল করে যেন—
আজকে এল চোরের মত কেন!
আমি বললুম "হেথায় কেন? পালা এখন নীচে,
রাত হোয়েছে, ঘুমো গিয়ে, জ্বালাস্ নেকো মিছে"—
অবাক্ কাণ্ড এ কি!
চেঁচিয়ে মেচিয়ে জবাব একটা করলে না তার দেখি—
মেজের 'পরে হঠাৎ বসে পড়ে'
বল্‌লে কর-যোড়ে—
"মাসি, এবার ক্ষমা কর তোমার পায়ে ধরি'
থেক না রাগ করি।"
সবচেয়ে বিস্ময়!
ভোলা বলে এমন কথা? যাহার পরিচয়—
দিনে রাতে সকল সময় পাচ্ছি বারে বার
অশান্ত সে, দুরন্ত সে—ত্রিভুবনে জুড়ি মেলাই ভার!
দুহাত দিয়ে নিলাম তারে তুলে,
আদর পেয়ে ভুলে

বল্‌লে কাছে এসে
একটুখানি হেসে—
"আমি জানি আলমারীটা তোমার প্রিয় কত
ঠিক যেন মোর কুকুর-ছানার মত—
মনে হোল জিমির কিছু হোলে—
আমি যেমন ভাসি চোখের জলে—
আজকে তোমার তেম্‌নি মনে হয়,
বল মাসি, সত্যি এ কি নয়?
আমার জিমির দিব্যি দিয়ে এই মল্‌ছি কাণ,
আর কখনো কোন জিনিষ করব না লোকসান।"

তার পরেতে কোঁচার খুঁট খুলে
একটি পদ্ম তুলে—
আমার হাতে দিয়ে—
চুপি চুপি বল্‌লে যেন গোপন কথা কি এ!
"ভেঙেছি ওই আলমারীটা বটে
তবু আমার বুদ্ধি এল ঘটে;
খেল্‌তে যেতে দেখি বিকেল-বেলা
বোসেদের ওই পুকুরটাতে পদ্ম'ফুলের মেলা।

ভয় পেয়ো না—নেইক বেশী জল
কেবল বুকের তল;—
সাঁতরে আমি গেলাম সেথা ভাসি
তোমার লাগি এই ফুলটি নিয়ে এলুম মাসি!
পদ্ম তুমি ভালোবাসো সেই কথাটা জানি,
আলমারীটার বদ্‌লি কিছু তাইতে দিলুম আনি!"

তার পরেতে কত যে দিন গত—
আমার ভোলার মত
বিনিময়ে কেউ দিলে না মোরে
কত জিনিষ গেল জীবন ভরে'।
কত প্রিয়, কত সাধের কতই মূল্যবান
কত জিনিষ হোল যে লোকসান!
হিসেব তাহার রাখ্‌লে কেবা হায়
মূল্য গণি' তায়!
ভয়ে ভয়ে ভবে' চোখের জলে
কোঁচার খুঁটের তলে—
লুকিয়ে কেবা আন্‌লে বদল্ তার—
একটি উপহার!

শেষ প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২০)

হরেন্দ্র ও কমল আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বেলা অপরাহ্ণ প্রায়। শয্যার উপরে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া অসুস্থ গৃহস্বামী সেই দিনের পাইয়োনিয়র কাগজখানা দেখিতেছিলেন। দিন কয়েক হইতে আর জ্বর ছিলনা, অন্যান্য উপসর্গও সারিয়া আসিতেছিল, শুধু শরীরের দুর্ব্বলতা যায় নাই। ইঁহারা ঘরে প্রবেশ করিতে কাগজ ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন, কি যে খুসি হইলেন সে তাঁর মুখ দেখিয়া বুঝা গেল। দুই হাত বাড়াইয়া কমলকে গ্রহণ করিলেন, কহিলেন, এস মা, আমার কাছে এসে বোস। এই বলিয়া তাহাকে খাটের কাছেই যে চৌকিটা ছিল তাহাতে বসাইয়া দিলেন, বলিলেন, কেমন আছো বল ত কমল?

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, ভালই তো আছি।

আশুবাবু কহিলেন, সে কেবল ভগবানের আশীর্ব্বাদ। নইলে যে দুর্দ্দিন পড়েছে তাতে কেউ যে ভালো আছে তা' ভাবতেই পারা যায়না। এতদিন কোথায় ছিলে বল ত? হরেন্দ্রকে রোজই জিজ্ঞাসা করি, সে রোজই এসে একই উত্তর দেয় বাসায় তালাবন্ধ, তাঁর সন্ধান পাইনে। নীলিমা সন্দেহ করছিলেন হয়ত বা তুমি আর কোথাও চলে গেছো।

হরেন্দ্র ইহার জবাব দিল, কহিল, আর কোথাও না, এই আগ্রাতেই মুচীদের পাড়ায় সেবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আজ দেখা পেয়ে ধরে এনেচি।

আশুবাবু ভয় ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, মুচীদের পাড়ায়? কিন্তু কাগজে লিখ্‌চে যে পাড়াটা উজোড় হয়ে গেল। এত-দিন তাদের মধ্যেই ছিলে? একা?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, একলা নয়, সঙ্গে রাজেন্দ্র ছিলেন।

শুনিয়া হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চহিল, কিছু বলিলনা। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তুমি না বলিলেও আমি অনুমান করিয়াছিলাম। যেথায় দৈবের এতবড় নিগ্রহ সুরু হইয়াছে সে দুর্ভাগাদের ত্যাগ করিয়া সে যে কোথাও এক পাও নড়িবেনা এ আমি জানিবনা তো জানিবে কে?

আশুবাবু কহিলেন, অদ্ভুত মানুষ এই ছেলেটি। ওকে দু'তিন দিনের বেশি দেখিনি, কিছুই জানিনে, তবু মনে হয় কি যেন এক সৃষ্টিছাড়া ধাতুতে ও তৈরি। তাকে নিয়ে এলেনা কেন, ব্যাপারগুলো জিজ্ঞেসা করতাম। খবরের কাগজ থেকে তো সব বোঝা যায়না?

কমল হাসিয়া বলিল, না। কিন্তু তাঁর ফিরতে এখনো দেরি আছে।

কেন?

পাড়াটা এখনো নিঃশেষ হয়নি। যারা অবশিষ্ট আছে তাদের রওনা না করে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেননা এই তাঁর পণ।

আশুবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা'হলে তোমারই বা হঠাৎ কি ক'রে ছুটি হ'ল মা? আবার কি সেখানে ফিরতে হবে? নিষেধ করতে পারিনে, কিন্তু সে যে বড় ভাবনার কথা কমল?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, ভাবনার জন্যে নয় আশুবাবু, ভাবনা আর কোথায় নেই? কিন্তু আমার ঘড়িতে যেটুকু দম ছিল সমস্ত শেষ করে দিয়েই এসেচি। সেখানে ফিরে যাবার সাধ্য আর আমার নেই। শুধু রয়ে গেলেন রাজেন্দ্র। এক এক জনের দেহ-যন্ত্রে প্রকৃতি এম্‌নি অফুরন্ত দম্ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় যে সে না হয় কখনো শেষ, না যায় কখনো বিগ্‌ড়ে। এই লোকটি তাদেরই একজন। প্রথম প্রথম মনে হোতো এই ভয়ানক পল্লীর মাঝখানে এ বাঁচ্‌বে কি ক'রে? ক'দিনই বা বাঁচ্‌বে? সেখান থেকে একলা যখন চলে এলাম কিছুতেই যেন আর ভাব্‌না ঘোচেনা, কিন্তু আর আমার ভয় নেই। কেমন কোরে যেন নিশ্চয় বুঝ্‌তে পেরেচি, প্রকৃতি আপনার গরজেই এদের বাঁচিয়ে রাখে। নইলে দুঃখীর কুটীরে বন্যার মত যখন মৃত্যু ঢোকে তখন

তার ধ্বংস-লীলার সাক্ষী থাকবে কে? আজই হরেন বাবুর কাছে আমি এই গল্পই করছিলাম। শিবনাথবাবুর ঘর থেকে রাত্রিশেষে যখন লজ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলাম—

আশুবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, এতে তোমার লজ্জার কি আছে মা? আমি শুনেচি তাঁকে সেবা করার জন্যেই তুমি অযাচিত তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে,—

কমল কহিল, লজ্জা সে জন্যে নয় আশুবাবু। যখন দেখতে পেলাম তাঁর কোন অসুখই নেই, সমস্তই ভাল, কোন একটা ছলনায় আপনাদের দয়া পাওয়াই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, তাও আপনি থাকতে দেননি, বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছেন, তখন কি যে আমার হোলো সে আপনাকে আমি বোঝাতে পারবনা। এ কথা রাজেনকেও জানাতে পারলামনা, শুধু কোনমতে তাকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। মনে মনে বোল্লাম, আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করে হাতে-পায়ে ধরে তাঁর কাছে এই প্রার্থনা আদায় করে নেবো ওই লোকটির প্রতি যেননা তিনি কোন ক্রোধ পোষণ করেন।

আশুবাবু বলিলেন, অর্থাৎ, সে আমার ক্রোধের যোগ্য নয়, এই তো তোমার বক্তব্য? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার নিজের মনের ভাব তার প্রতি কি রকম কমল?

কিন্তু সে কি আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন?

কেন পারবোনা মা, নিশ্চয় পারবো।

কমল হঠাৎ জবাব দিলনা। কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে থাকিয়া বোধ করি সে ইহাই চিন্তা করিল, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া নিষ্ফল কি না। তাহার পরে কহিল, আগে অনেক কথাই মনে হোতো। দীঘ, বহুদীর্ঘ দিনের সংস্কারে, শিক্ষায় মানুষের বুকের ওপর যে ভাব, যে আদর্শ নিঃসংশয় সত্যের আকারে চেপে বসেছে তার থেকে রেহাই পেতামনা। মুখে যাই কেননা বলি, মন কোনমতেই সায় দিতে চাইতনা যে এ শুধু আমার দুর্ভাগ্য নয় শিবনাথের অপরাধ। আজ ভাবি, তাঁকে শাস্তি দেওয়ার না আছে অধিকার, না আছে ধর্ম্ম।

আশুবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বল কি কমল—

কথাটা সম্পূর্ণ হইলনা, দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া সবাই চাহিয়া দেখিল নীলিমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে দুধের বাটি। কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সে পাত্রটা শয্যার শিয়রে তেপায়ার উপরে রাখিয়া দিয়া প্রতি-নমস্কার করিল, এবং অপরের কথার মাঝখানে বাধা দিয়াছে মনে করিয়া নিজে কোন কথা না কহিয়া অদূরে নীরবে উপবেশন করিল। আশুবাবু তাহার দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার অসমাপ্ত বাক্যের সূত্র তুলিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, এতবড় কৃতঘ্নতা, এতবড় অন্যায়ের শাস্তি দেবার অধিকার নেই? এতে ধর্ম্ম নেই? কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর লোককে যদি জিজ্ঞাসা কর, তারা একবাক্যে বল্‌বে, এই-ই মানুষের বড় অধিকার, এই-ই ধর্ম্ম। এতবড় অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া মস্ত অধর্ম্ম। হরেন্দ্র বোধ হয় এখনও তোমাকে এ কথা বলবার অবকাশ পাননি, কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করেচি ওঁকে প্রাণপণে সাহায্য কোরব। আমাকে ভুল বুঝোনা কমল, আমার নিজের দিক থেকে তার প্রতি যত ঘৃণাই থাক্, সে আমি উপেক্ষা করেচি, কিন্তু তোমার প্রতি এ অপরাধ আমি কোনমতে ক্ষমা করবনা। আইনের ফাঁক দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চিরদিন সব কথার জবাব দেওয়া যায়না এ সত্য উপলব্ধি করার শিবনাথের প্রয়োজন হয়েছে।

এতখানি উত্তেজিত হইতে আশুবাবুকে কেহ কোনদিন দেখে নাই। হরেন্দ্র নিঃশব্দ উপবিষ্ট নীলিমার মুখের প্রতি চাহিয়া বুঝিল সে আলোচনার মাঝখানে আসিয়াও প্রসঙ্গটা সমস্ত বুঝিয়াছে।

কমল হাসিয়া কহিল, আপনি চিন্তা করবেননা আশুবাবু, এই সাধু প্রস্তাবটি হরেনবাবু দেখা হওয়া মাত্রই আমাকে জানিয়েছেন, অবহেলা করেননি। আপনি মাত্র সাহায্যকারী, কিন্তু ইনিই ফরিয়াদী, এই বলিয়া সে হরেন্দ্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, কিন্তু এ সঙ্কল্প উনি ত্যাগ করেছেন। সত্যি নয়?

হরেন্দ্র বলিল, সঙ্কল্প স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিনি, শুধু বাধ্য হয়ে করচি। আপনি চান্‌না বলেই কেবল বাধা পেলাম।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সত্যিই কি এ তুমি চাওনা কমল? এ দুর্ব্বলতা তো তোমার শিক্ষা এবং স্বভাবের সঙ্গে মেলেনা মা। আমি বরাবর ভাবতাম যা' অন্যায়, তাকে তুমি প্রশ্রয় দাওনা, যা মিথ্যাচার তাকে তুমি মাপ করনা।

হরেন্দ্রই জবাব দিল, কহিল, ওঁর স্বভাবের খবর জানিনে,

কিন্তু মুচীদের পাড়ায় মরণ দেখে দেখে ওঁর শিক্ষার ধারণা বদ্‌লেছে, এ সংবাদ ওঁর কাছেই পেলাম। আগে মনের মধ্যে যে ইচ্ছাই থাক্, এখন নালিশ করতে উনি নারাজ। বলেন, একদিন শিবনাথ তো সত্যিই ভালবেসেছিলেন, আজ যদি তা' শুকিয়ে গিয়ে থাকে তাই নিয়ে তাঁকে পীড়ন করতে আমি পারবনা।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে যে তোমাকে পীড়ন করলে, তোমার প্রতি এতখানি অত্যাচার করলে তার কি জবাব ?

কমল মুখ তুলিতেই দেখিল নীলিমা একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। জবাবটা শুনিবার জন্য সেই যেন সবচেয়ে উৎসুক। না হইলে হয়ত সে চুপ করিয়াই থাকিত, হরেন্দ্র যতটুকু বলিয়াছে তার বেশি একটা কথাও কহিতনা।

কহিল, এ প্রশ্ন আমার কাছে এখন অসংলগ্ন ঠেকে। আজ স্পষ্টই দেখ্‌তে পাই একদিন আমাকে ভালবাসবার তাঁর শক্তি ছিল কিন্তু আর নেই। যা' নেই তা কেন নেই বলে চোখের জল ফেলতেও আমার লজ্জা বোধহয়, যেটুকু তিনি পেরেচেন, কেন তার বেশি পারলেননা বলে আক্ষেপ করে বেড়াতেও আমার মাথা হেঁট হয়। আপনাদের কাছে প্রার্থনা শুধু এই যে আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে দোষ যদি কাউকে দিতেই চান শিবনাথের বিধাতা পুরুষকে দিন,—তাঁকে আর টানাটানি করবেননা। এই বলিয়া সে যেন হঠাৎ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকাইয়া চোখ বুজিল। ইহার পরে বহুক্ষণ অবধি সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কাহারও মনের মধ্যে আর সন্দেহ রহিলনা যে, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় যাই কেননা ঘ'টে থাক্ এ সম্বন্ধে এই শেষ কথা। তবুও একটা বিষয়ে সকলের মনেই খট্‌কা রহিল। তাহার এই নিরাসক্ত ত্যাগ গভীরতম স্নেহ অথবা তেম্‌নি অপরিমেয় ঘৃণা,—কোন্ উৎস মুখে যে বাহির হইয়াছে তাহা কাহারও কাছেই পরিষ্কার হইলনা।

ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করিল নীলিমা, সে চোখের ইঙ্গিতে দুধের বাটিটা নির্দ্দেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ওটা যে একেবারে জুড়িয়ে গেল। দেখুন তো খেতে পারবেন, না আবার গরম করে আন্‌তে বোল্‌ব ?

আশুবাবু বাটিটা মুখে তুলিয়া খানিকটা খাইয়া রাখিয়া দিলেন। নীলিমা মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া, হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া তেম্‌নি মৃদুকণ্ঠে কহিল, পড়ে থাক্‌লে চল্‌বেনা,—ডাক্তারের ব্যবস্থা ভাঙ্‌তে আমি দেবোনা।

আশুবাবু অবসন্নের মত মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া কহিলেন, তার চেয়েও বড় ব্যবস্থাপক নিজের দেহ। এ কথা তোমারও কিন্তু ভোলা উচিত নয়।

আমি ভুলিনে, ভুলে যান আপনি নিজে।

ওটা বয়েসের দোষ নীলিমা—আমার নয়।

নীলিমা হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, তাই বই কি। দোষ চাপাবার মত বয়স পেতে এখনো আপনার অনেক—অনেক বাকি। আচ্ছা, কমলকে নিয়ে আমরা একটু ও-ঘরে গিয়ে গল্প করিগে, আপনি চোখ বুজে একটুখানি বিশ্রাম করুন, কেমন ? যাই ?

আশুবাবুর এ ইচ্ছা বোধহয় ছিলনা, তথাপি সম্মতি দিয়া কহিলেন, যাও। কিন্তু একেবারে তোমরা চলে যেওনা, ডাক্‌লে যেন পাই।

আচ্ছা। চল ঠাকুরপো আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসিগে। এই বলিয়া সে সকলকে একপ্রকার জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। নীলিমার কথাগুলি স্বভাবতঃই মধুর, বলিবার ভঙ্গীটিতে এমন একটি বিশিষ্টতা আছে যে সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার আজিকার এই গুটি কয়েক কথা যেন তাহাদেরও ছাড়াইয়া গেল। হরেন্দ্র লক্ষ্য করিলনা, কিন্তু লক্ষ্য করিল কমল। পুরুষের চক্ষে যাহা এড়াইল ধরা পড়িল তাহা রমণীর দৃষ্টিতে। নীলিমা শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছে, এই পীড়িত লোকটির স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধানতায় আশ্চর্য্যের কিছু নাই সাধারণের কাছে এ কথা হয়ত বলা চলে, কিন্তু সেই সাধারণের একজন কমল নয়। নীলিমার এই একান্ত-সতর্কতার অপরূপ স্নিগ্ধতায় সে যেন এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের সাক্ষাৎ লাভ করিল। বিস্ময় কেবল এক দিক দিয়া নয়, বিস্ময় বহু দিক দিয়া। সম্পদের মোহ এই বিধবা মেয়েটিকে মুগ্ধ করিয়াছে এমন সন্দেহ কমল চিন্তায়ও ঠাঁই দিতে পারিলনা! নীলিমার ততটুকু পরিচয় সে পাইয়াছিল। যৌবন ও রূপের প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে শুধু অসঙ্গত নয়, হাস্যকর। তবে, কোথায় যে ইহার সন্ধান মিলিবে ইহাই কমল মনের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল। এ ছাড়া আরও একটা দিক আছে যে। সে দিক আশুবাবুর। এই সরল ও সদাশিব মানুষটির গভীর চিত্ততলে পত্নীপ্রেমের

যে আদর্শ অচঞ্চল নিষ্ঠায় নিত্য পূজিত হইতেছে, কোন দিনের কোন প্রলোভনই তাহার গায়ে দাগ ফেলিতে পারে নাই।

ইহাই ছিল সকলের একান্ত বিশ্বাস। মনোরমার জননীর মৃত্যুকালে আশুবাবুর বয়স বেশি ছিলনা,—তখনও যৌবন অতিক্রম করে নাই, কিন্তু সেইদিন হইতেই সেই লোকান্তরিত পত্নীর স্মৃতি উন্মূলিত করিবার বহু আয়োজন বহু লোকে অহরহ করিয়াছে, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য দুর্গের চিররুদ্ধ দুয়ার বিদীর্ণ করিবার কোন কৌশলই কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। এ সকল কমলের অনেকের মুখে শোনা কাহিনী। এ ঘরে আসিয়া কমল অন্যমনস্কের মত কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিল নীলিমার মনোভাবের লেশমাত্র আভাষও এই বৃদ্ধের চোখে পড়িয়াছে কি না। যদি পড়িয়াই থাকে দাম্পত্যের যে সুকঠোর নীতি অত্যাজ্য প্রাণ-ধর্ম্মের একাগ্র সতর্কতায় তিনি আজীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন আসক্তির এই নব-জাগ্রত চেতনায় সে ধর্ম্ম লেশমাত্রও বিচলিত হইয়াছে কি না।

চাকর চা-রুটি ফল প্রভৃতি দিয়া গেল। অতিথিদের সম্মুখে সেই সমস্ত আগাইয়া দিয়া নীলিমা নানা কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। আশুবাবুর অসুখ, তাঁহার স্বাস্থ্য, তাঁহার সহজ ভদ্রতা ও শিশুর ন্যায় সরলতার ছোট খাটো বিবরণ যাহা এই কয়দিনেই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে,—এম্নি অনেক কিছু। শ্রোতা হিসাবে হরেন্দ্র স্ত্রীলোকের লোভের বস্তু। এবং তাহারই সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে নীলিমার বাক্‌শক্তি উচ্ছ্বসিত আবেগে শতমুখে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বলার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হরেন্দ্র লক্ষ্য করিলনা যে যে-বৌদিদিকে সে এতদিন অবিনাশের বাসায় দেখিয়া আসিয়াছে এ নীলিমা সে নয়। পরিণত যৌবনের সেই স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য, সেই কৌতুক-রসোজ্জ্বল পরিমিত পরিহাস, বৈধব্যের সীমাবদ্ধ সংযত আলাপ-আলোচনা সেই সুপরিচিত সমস্ত কিছুই যেন সে এই কয়দিনে বিসর্জ্জন দিয়া আকস্মিক বাচালতায় বালিকার ন্যায় প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছে।

বলিতে বলিতে নীলিমার হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল কমল চায়ের বাটিতে দু'একবার চুমুক দেওয়া ছাড়া কিছুই খায় নাই। সে ক্ষুণ্ণস্বরে সেই অনুযোগ করিতেই কমল সহাস্যে কহিল, এর মধ্যেই আমাকে ভু'লে গেলেন?

ভু'লে গেলাম? তার মানে?

তার মানে এই যে আমার খাওয়ার ব্যাপারটা আপনার মনে নেই। অসময়ে আমি তো কোনদিনই কিছু খাইনে।

এবং সহস্র অনুরোধেও এর ব্যতিক্রম হবার যো নেই,—এই কথাটা হরেন্দ্র যোগ করিয়া দিল।

প্রত্যুত্তরে কমল তেম্নিই হাসিমুখে বলিল, অর্থাৎ, এ একগুঁয়েমির পরিবর্ত্তন নেই। কিন্তু অত দর্প আমি করিনে, হরেন বাবু, তবে সাধারণতঃ, এই নিয়মটাই অভ্যাস হয়ে গেছে' তা মানি।

পথে বাহির হইয়া কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন কোথায় চলেছেন বলুন ত?

হরেন্দ্র বলিল, ভয় নেই আপনার বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌বনা, কিন্তু যেখান থেকে এনেচি সেখানে পৌঁছে না দিলে অন্যায় হবে।

তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক চলাচল বিরল হইয়া আসিয়াছে, অকস্মাৎ অতি-ঘনিষ্ঠের ন্যায় কমল তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চলুন আমার সঙ্গে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বোধ আপনার কত সূক্ষ্ম দাঁড়িয়েছে তার পরীক্ষা দেবেন।

হরেন্দ্র সঙ্কোচে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহা যে ভালো হইলনা, এমন করিয়া পথ চলায় যে বিপদ আছে, এবং পরিচিত কেহ কোথা হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলে লজ্জার একশেষ হইবে হরেন্দ্র তাহা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু না বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লওয়ার অশোভন রূঢ়তাকেও সে মনে স্থান দিতে পারিলনা। ব্যাপারটা বিশ্রী ঠেকিল, কিন্তু প্রতীকারের সামর্থ্যও নাই। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা মানিয়া লইয়াই সে জড়সড়র মত পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু কল্পনাও করিলনা যে ইহার চেয়েও কঠোরতর পরীক্ষা তাহার অদৃষ্টে আসন্ন হইয়া আছে। বাসার দরজার সম্মুখে পৌঁছিয়া বিদায় লইতে চাহিলে কমল কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের? আশ্রমে অজিতবাবু ছাড়া তো কেউ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। আজ তিনিও নেই, সকালের গাড়ীতে দিল্লী গেছেন, সম্ভবতঃ, কাল ফিরবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, গিয়ে খাবেন কি? আশ্রমে পাচক রাখবার তো ব্যবস্থা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, না, আমরা নিজেরাই রাঁধি।

অর্থাৎ, আপনি আর অজিতবাবু ?

হাঁ। কিন্তু হাস্‌চেন যে ? নিতান্ত মন্দ রাঁধিনে আমরা।

তা' জানি। এবং পরক্ষণে সত্যই গম্ভীর হইয়া বলিল, অজিত বাবু নেই, ফিরে গিয়ে হয়ত আপনাকে নিজেই রেঁধে খেতে হবে। আমার হাতে খেতে যদি ঘৃণা বোধ না করেন তো আমার ভারি ইচ্ছে আপনাকে নিমন্ত্রণ করি। খাবেন আমার হাতে ?

হরেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, এ বড় অন্যায়। আপনি কি সত্যই মনে করেন আমি ঘৃণার অস্বীকার করতে পারি ? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনাকে জানাতে ত্রুটি করিনি যে যারা আপনাকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন। আমার আপত্তি শুধু অসময়ে দুঃখ দিতে আপনাকে চাইনে।

এ কথায় কমল শুধু একটুখানি মুচকিয়া হাসিল, বলিল, ভয় নেই, আমি দুঃখ বিশেষ পাবোনা তা নিজেই দেখতে পাবেন। আসুন।

রাঁধিতে বসিয়া কমল কহিল, আমার আয়োজন সামান্য, কিন্তু আশ্রমে আপনাদেরও যা' দেখে এসেচি তাকেও পছন্দ করা চলেনা। সুতরাং, এখানে খাবার কষ্ট যদি না হয়, অন্যের মত অসহ্য হবেনা এইটুকুই আমার ভরসা। ঠিক না হরেনবাবু ?

হরেন্দ্র মনে মনে খুসি হইয়া উত্তর দিল, ঠিক ! আমাদের খাবার ব্যবস্থা যা' দেখে এসেছেন তা'তে ভুল নেই। সত্যিই আমরা খুব কষ্ট করে থাকি।

কিন্তু থাকেন কেন ? অজিতবাবু বড়লোক, আপনার নিজের অবস্থাও অসচ্ছল নয়, কষ্ট পাওয়ার তো কারণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, কারণ না থাক্ প্রয়োজন আছে। আমার বিশ্বাস এ সত্য আপনিও বোঝেন বলেই নিজের সম্বন্ধে ঠিক এম্‌নি ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। কিন্তু বাইরে থেকে কেউ যদি আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করে বসে, তাকেই কি এর হেতু দিতে পারেন ?

কমল বলিল, বাইরের লোককে না পারি, ভিতরের লোককে দিতে পারবো। আমি সত্যিই বড় দরিদ্র হরেনবাবু। নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার যতটুকু শক্তি আছে তাতে এর বেশি চলেনা। বাবা আমাকে দিয়ে যেতে পারেননি কিছুই, কিন্তু পরের অনুগ্রহ থেকে মুক্তি পাবার এই বীজমন্ত্রটুকু দান করে গিয়েছিলেন।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। এই বিদেশে কমল যে কিরূপ নিরুপায় তাহা সে জানিত। শুধু অর্থের জন্যই নয়,—সমাজ, সম্মান সহানুভূতি কোন দিক দিয়াই যে তাহার তাকাইবার কিছু নাই—এই কথা মনে করিয়া তাহার করুণা ও বেদনায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সত্যও সে স্মরণ না করিয়া পারিলনা যে এতবড় নিঃসহায়তাও এই দরিদ্র রমণীকে লেশমাত্র দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। আজও সে ভিক্ষা চাহেনা—ভিক্ষা দেয়। যে শিবনাথ তাহার এতবড় দুর্গতির মূল তাহাকেও দান করিবার সম্বল তাহার নিঃশেষ হয় নাই। এবং বোধকরি সাহস ও সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়েই কহিল, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করচিনে, কমল, কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু ভাব্‌তেও পারিনে যে আমাদের মত আপনার দারিদ্র্যও প্রকৃত নয়, একবার ইচ্ছে করলেই এ দুঃখ মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে। কিন্তু সে ইচ্ছে আপনার নেই, কারণ, আপনিও জানেন স্বেচ্ছায় নেওয়া দুঃখকে ঐশ্বর্য্যের মতই ভোগ করা যায়।

কমল মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, যায়। কিন্তু কেন জানেন ? ওটা অপ্রয়োজনের দুঃখ,—দুঃখের অভিনয়। সকল অভিনয়ের মধ্যেই খানিকটা কৌতুক থাকে, তাকে উপভোগ করায় বাধা নেই। এই বলিয়া সে নিজেও কৌতুকভরে হাসিল।

সহসা ভারি একটা বেসুরা বাজিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া হরেন উষ্ণস্বরে জবাব দিল,—কিন্তু এটা তো মানেন যে প্রাচুর্য্যের মাঝেই জীবন তুচ্ছ হয়ে আসে, অথচ, দুঃখ দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্র মহৎ ও সত্য হয়ে গড়ে ওঠে ?

কমল ষ্টোভের উপর হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিল, এবং আর একটা কি চড়াইয়া দিয়া বলিল, সত্য হয়ে গড়ে ওঠার জন্যে ওদিকেও খানিকটা সত্য চাই যে হরেনবাবু। বড়লোক, বাস্তবিক অভাব নেই, তবু ছদ্ম অভাবের আয়োজনে ব্যস্ত। আবার যোগ দিয়েছেন অজিতবাবু। আপনার আশ্রমের ফিলজফি আমি বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি তামাসা দিয়ে বৃহৎকে পাওয়া যায়না,—পাওয়া যায় শুধু

খানিকটা দম্ভ আর অহমিকা। সংস্কারে অন্ধ না হয়ে একটুখানি চেয়ে থাক্‌লেই এ বস্তু দেখ্‌তে পাবেন,—দৃষ্টান্তের জন্য ভারত পর্য্যটন করে বেড়াতে হবেনা। কিন্তু তর্ক থাক্‌, রান্না শেষ হয়ে এল, এবার খেতে বসুন।

হরেন্দ্র হতাশ হইয়া বলিল, মুস্কিল এই যে আপনাকে অশিক্ষিত কিম্বা মূর্খ বল্‌তে আমি পারিনে, কিন্তু ভারতবর্ষের ফিলজফি বোঝা আপনার সাধ্য নয়। আপনার শিরার মধ্যে ম্লেচ্ছ-রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে,—হিন্দুর আদর্শ ও চোখে তামাসা বলেই ঠেক্‌বে। দিন্‌, কি রান্না হয়েছে খেতে দিন্‌।

এই যে দিই, বলিয়া কমল হাসিমুখে আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। একটুও রাগ করিলনা।

হরেন্দ্র সেই দিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা ধরুন কেউ যদি যথার্থই সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে সত্যকার অভাব ও দৈন্যের মাঝেই নেমে আসে তখন তো অভিনয় বলে তারে তামাসা করা চল্‌বেনা? তখন তো—

কমল বাধা দিয়া কহিল, না, তখন আর তামাসা নয়,—তখন সত্যিকার পাগল বলে মাথা চাপ্‌ড়ে কাঁদবার সময় হবে। হরেনবাবু, কিছুকাল পূর্ব্বে আমিও কতক্‌টা আপনার মতো করেই ভেবেচি, উপবাসের নেশার মতো আমাকেও তা' মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করেচে, কিন্তু এখন সে সংশয় আমার ঘুচেচে। দৈন্য এবং অভাব ইচ্ছাতেই আসুক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আসুক ও নিয়ে দর্প করবার কিছু নেই। ওর মাঝে আছে শূন্যতা, ওর মাঝে আছে দুর্ব্বলতা, ওর মাঝে আছে পাপ,—অভাব যে মানুষকে কত হীন, কত ছোট করে আনে সে আমি দেখে এসেচি মহামারীর মধ্যে,—মুচীদের পাড়ায় গিয়ে। আরও একজন দেখেচেন তিনি আপনার বন্ধু রাজেন্দ্র। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে তো কিছু পাওয়া যাবেনা,—আসামের গভীর অরণ্যের মত কি যে সেখানে লুকিয়ে আছে কেউ জানেনা। আমি প্রায় ভাবি, আপনারা তাঁকেই দিলেন বিদায় করে। সেই যে কথায় আছে মণি ফেলে অঞ্চলে কাচ খণ্ড গেরো দেওয়া,—আপনারা ঠিক কি তাই করলেন! ভেতর থেকে কোথাও নিষেধ পেলেননা? আশ্চর্য্য!

হরেন্দ্র ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু সে আমাদের হারায়নি, হারাবার নয়,—সে আবার আস্‌বে।

কমল চুপ করিয়া রহিল, এ সম্বন্ধে আর কথা কহিলনা।

আয়োজন সামান্য, তথাপি কি যত্ন করিয়াই না কমল অতিথিকে খাওয়াইল। খাইতে বসিয়া হরেন্দ্রের বার বার করিয়া নীলিমাকে স্মরণ হইল; নারীত্বের শান্ত মাধুর্য্য ও শুচিতার আদর্শে ইঁহার চেয়ে বড় সে কাহাকেও ভাবিত না, মনে মনে বলিল, শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও প্রবৃত্তিতে বিভেদ ইঁহাদের যত বড়ই হোক, সেবা ও মমতায় ইঁহারা একেবারে এক। ওটা বাহিরের বস্তু বলিয়াই বৈষম্যেরও অবধি নাই, তর্কও শেষ হয় না, কিন্তু নারীর যেটি নিজস্ব আপন, সর্ব্বপ্রকার মতামতের একান্ত বহির্ভূত সেই গূঢ় অন্তর্দ্দেশের রূপটি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। নানা কারণে আজ হরেন্দ্রের ক্ষুধা ছিলনা, শুধু একজনকে প্রসন্ন করিতেই সে সাধ্যের অতিরিক্ত ভোজন করিল। কি একটা তরকারি ভালো লাগিয়াছে বলিয়া পাত্র উজাড় করিয়া ভক্ষণ করিল, কহিল, অনেকদিন অসময়ে হাজির হয়ে বৌদিদিকেও ঠিক এম্‌নি করেই জব্দ করেচি কমল।

কাকে, নীলিমাকে?

হাঁ।

তিনি জব্দ হতেন?

নিশ্চয়। কিন্তু স্বীকার করতেননা।

কমল হাসিয়া বলিল, কেবল আপনি নয়, সমস্ত পুরুষ মানুষেরই এম্‌নি মোটা বুদ্ধি।

হরেন্দ্র তর্ক করিয়া বলিল, আমি চোখে দেখেচি যে।

কমল কহিল, সেও জানি। আর ঐ অহঙ্কারেই আপনারা গেলেন।

হরেন্দ্র কহিল, অহঙ্কার আপনাদেরও কম নয়। সে বেলা বৌদিদির খাওয়া হোতনা,—উপবাস করে কাটাতেন, তবু হার মানতে চাইতেননা। এম্‌নি কোরে যখন-তখন গিয়ে অত্যাচার না করলেই বরঞ্চ রাগ করে কথা কইতেননা।

কমল চুপ করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র বলিল, আপনার আশীর্ব্বাদে মোটা বুদ্ধিই আমাদের অক্ষয় হয়ে থাক্‌,—এতেই লাভ বেশি। আপনাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির অভিমানে উপোস ক'রে মরতে আমরা নারাজ।

কমল এ কথারও জবাব দিলনা। হরেন্দ্র কহিল, এখন থেকে আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধিটাও মধ্যে মধ্যে যাচাই করে দেখ্‌বো। নম্বর কি রকম ওঠে তার একটা হিসেব নেবো।

কমল বলিল, সে আপনি পারবেননা, গরীব বলে আপনার দয়া হবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র প্রথমটায় অপ্রতিভ হইল, তাহার পরে বলিল, দেখুন, এ কথার জবাব দিতে বাধে। মনে হয় যেন স্পর্দ্ধার মাত্রা ডিঙিয়ে যাচ্চি। রাজরাণী হওয়াই যা'কে সাজে, কাঙালপণা তাকে' মানায়না। মনে হয় যেন আপনার দারিদ্র্য পৃথিবীর সমস্ত মেয়েকে উপহাস করচে।

কথাটা তীরের মত গিয়া কমলের বুকে বাজিল। প্রকাশ্যে শুষ্ক হাসির একটুখানি চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইলনা। মলিন ওষ্ঠাধরে তাহা ম্লান ছায়ার মিশিয়া রহিল।

হরেন্দ্র পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কমল সহসা থামাইয়া দিয়া বলিল, আপনার খাওয়া হয়ে গেছে হরেনবাবু, এবার উঠুন। ও-ঘরে গিয়ে সারারাত গল্প শুন্‌বো, এ ঘরের কাজটা ততক্ষণ সেরে নিই।

খানিক পরে শোবার ঘরে আসিয়া কমল বসিল, কহিল, আজ আপনার বৌদিদির সমস্ত ইতিহাস না শুনে আপনাকে ছাড়বোনা, তা' যত রাত্রিই হোক। বলুন।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল, কহিল, বৌ-দিদির সমস্ত কথা তো আমি জানিনে। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার এই আগ্রায়, অবিনাশদাদার বাসায়। বস্তুতঃ, তাঁর সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানিনে। যেটুকু এখানকার অনেকেই জানে, আমিও ততটুকুই জানি। কেবল একটা কথা বোধকরি সংসারে সকলের চেয়ে বেশি জানি, সে তাঁর অকলঙ্ক শুভ্রতা। বাইরে থেকে হয়ত কারও ভু'ল হয়, কিন্তু আমি জানি কোথাও তাঁর লেশমাত্র দাগ পড়েনি। স্বামী যখন মারা যান, তখন বয়স ছিল ওঁর উনিশ-কুড়ি,—তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়েই পেয়েছিলেন। সে মোছেনি, মোছবার নয়,—জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত সে স্মৃতি অক্ষয় হ'য়ে থাকবে। পুরুষ মহলে আশুবাবুর কথা যখন ওঠে,—তাঁর নিষ্ঠাও অনন্যসাধারণ—আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু—

হরেনবাবু, রাত্রি অনেক হ'ল এখন তো আর বাসায় যাওয়া চলেনা,—এই ঘরেই একটা বিছানা করে দিই ?

হরেন্দ্র বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ঘরে শোব ? আর আপনি ?

কমল কহিল, আমিও এইখানেই শোব। আর তো ঘর নেই।

হরেন্দ্র লজ্জায় পাংশু হইয়া উঠিল। কমল হাসিয়া বলিল, আপনি তো ব্রহ্মচারী। আপনারও ভয়ের কারণ আছে না কি ?

হরেন্দ্র স্তব্ধ নির্নিমেষ চক্ষে শুধু চাহিয়া রহিল। এ যে কি প্রস্তাব সে কল্পনা করিতেও পারিলনা। স্ত্রীলোক হইয়া একথা এ উচ্চারণ করিল কি করিয়া ?

তাহার অপরিসীম বিহ্বলতা সহসা কমলকেও ধাক্কা দিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আমারই ভুল হয়েছে হরেন বাবু, আপনি বাসায় যান। তাই আপনার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী নীলিমার আশ্রমে ঠাঁই হয়নি, ঠাঁই হয়েছে আশু বাবুর বাড়ী। নির্জ্জন গৃহে অনাত্মীয় নর-নারীর একটি মাত্র সম্বন্ধই আপনি জানেন,—পুরুষের কাছে মেয়েমানুষ যে শুধুই মেয়েমানুষ এর বেশি খবর আপনার কাছে আজও পৌঁছায়নি। যান্, আর দেরি করবেননা আশ্রমে যান। এই বলিয়া সে নিজেই বাহিরের অন্ধকার বারান্দায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন্দ্র মূঢ়ের মত মিনিট দুই তিন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমানবেন্দ্র সুর বিরচিত—চক্রপাণী চিত্রিত

"কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের কথা অমৃত সমান।
মানবেন্দ্র সুর কহে শুনে পুণ্যবান॥"

(অনাদিপর্ব্ব)

হাতীবস ষ্টেশন থেকেই পাণ্ডাদের কাছে চৌদ্দপুরুষের খবর দিতে দিতে তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে শ্রীধর যখন বৃন্দাবনে এসে নাম্‌লো, পাণ্ডার দল আবার তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

শ্রীধরের সঙ্গে ছিল তার পত্নী যশোদা, বিধবা ভগ্নী সরযূ, তার দশ বছরের মেয়ে সুমতি, আর আট বছরের ছেলে কানাই এবং একরাশ মোটঘাট।

পাণ্ডারা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে সুরু করেছে—নাম কি? বাড়ী কোথা? কোথা থেকে আসছে সে? তার বাপের নাম কি? মায়ের নাম কি?

পাণ্ডাদের হাতের বড় বড় খাতা থেকে কেউ তার মাসীকে, কেউ তার পিসীকে, কেউ তার দিদিমাকে টেনে বার করলে বটে, কিন্তু জিত্‌লো শেষটা পাণ্ডা দামোদর-লাল। তাদের খাতা থেকে একেবারে শ্রীধরের পিতা গদাধর ও পিতামহ মুকুন্দরাম বেরিয়ে পড়লেন!

জিনিসপত্র নিয়ে সপরিবারে একখানি গাড়ীতে উঠে কুলিভাড়া মিটিয়ে দিয়ে শ্রীধর চ'ললো দামোদরলাল পাণ্ডাঠাকুরের বাসায়। পাণ্ডাঠাকুর তাদের দ্বিতলের উপর নিয়ে গিয়ে একখানি ঘরের চাবী খুলে দিয়ে ব'ললে—এইখানে আপনারা সব বিশ্রাম করুন। আমি আপনাদের জিনিসপত্র সব উপরে তুলিয়ে দিচ্ছি।

শ্রীধর ঘরখানি দেখে খুশী হ'লো না। ঘরের কোলেই একটু বারান্দা এবং পাশে একটু ছোট ছাদ আছে বটে, কিন্তু আলো বাতাস নেই! কারণ, ঘরের তিন দিকে কোনও জান্‌লা দরজা নেই। বারান্দার দিকে শুধু একটি দরজা এবং আধখানামাত্র জানালা, তাও আবার লোহার শিক ও জাল দিয়ে এমন ক'রে ঘেরা যে একটা মাছিও সে ঘরে ঢুকতে পারবেনা।

জিনিসপত্র সব তুলিয়ে দিয়ে পাণ্ডা এসে ব'ললে—আপনারা সব একটু সাবধানে থাকবেন, জিনিসপত্রগুলো সামলে রাখবেন—

পাণ্ডার কথা শুনতে শুনতে শ্রীধরের মুখ শুকিয়ে এলো! বুক টিপ্ টিপ্ ক'রতে লাগলো! সে ভাবলে—কী

সর্ব্বনাশ! তবে কি ডাকাতের দেশে এসে পড়লুম না কি? এখানে কি সব চুরি-চামারি হয়? কেড়ে-বিগড়ে নেয়?

পাণ্ডা ব'লছিল—ঘরের বাইরে কিছু ফেলে রাখবেন না,

পাণ্ডা দামোদরলালের খাতার যাত্রী

সব জিনিস ঘরের ভিতর তুলে দরজা দিয়ে রাখতে ভুলবেন না, কারণ, এখানে—

শ্রীধর এই 'কারণটা' শোনবার জন্যই একেবারে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠেছিল।

পাণ্ডাঠাকুর বলছিল—কারণ এখানে একটু বানরের উৎপাত আছে—

শ্রীধর যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো! ওঃ! এই কথা! তারই এতো ভণিতা? সে খুব একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে—আরে রেখে দাও ঠাকুর তোমার বানরের কথা! বানর আমরা ঢের দেখেছি। বানরকে অত ভয় করতে গেলে কি আর তীর্থ করা চলে? তা ছাড়া, বানর আর নেই কোথা বলো? গোটা-দেশটাই ত' আজ বানরে ভ'রে উঠেছে!

পাণ্ডা বললে—সে তো জানি বাবু, তবু কি জানেন? একটু সাবধানে থাকাই ভালো। বেটারা বড় সব লোক্‌সান ক'রে। তাহ'লে আপনারা প্রস্তুত হয়ে নিন। আগে যমুনায় স্নান সেরে তার পর ঠাকুর-দর্শন করতে যাবেন তো?

শ্রীধর তার পত্নী যশোদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ব'ললে—হ্যাঁ, ঠাকুর, সেই ভালো, কিন্তু, ছেলে মেয়ে দুটোর ভারী ক্ষিধে পেয়েছে, এখানে কি কিছু ভালো খাবার পাওয়া যায়?

পাণ্ডা লম্বা ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ, খুব পাবেন। কি এনে দেবো বলুন? গরম জিলাবি?

শ্রীধর উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মন্দ কি। তাই নিয়ে এসো আনা দুয়েকের—

পাণ্ডা ব'ললে—দু-আনার কি হবে বাবু? ছ' আনার আনতে দিন, সের-দরে সুবিধা হবে। আপনারাও তো দর্শন করে এসে কিছু জলযোগ করবেন? তার পর, আপনাদের সেবার কি ব্যবস্থা করবো বলুন। প্রসাদ ইচ্ছা করেন কি? গোপীনাথের না রাধাবল্লভের না গোবিন্দজীর—

শ্রীধর তার মণিব্যাগ থেকে একটি টাকা বার ক'রে পাণ্ডার হাতে দিয়ে ব'ললে—এই টাকাটি ভাঙিয়ে সের-দরেই ছ'-আনার জিলিপী নিয়ে আসুন, আর বাকী দশ আনা পয়সা আমাকে ফেরত দেবেন। আর, প্রসাদ আমরা ওবেলা খাবো, এবেলা দুটি ভাত খেতে চাই। আজ দু'দিন গাড়ীতে শুধু খাবার খেয়ে আছি কি না! আমাদের সঙ্গে সব সরঞ্জাম আছে। মেয়েরাই রেঁধে দেবে, আপনি শুধু একটু যোগাড়-যন্ত্র ক'রে দেবেন।

পাণ্ডাঠাকুর যেন একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ব'ললে—তা বেশ, যেমন ইচ্ছা করেন তাই হবে। ঠাকুর দর্শন ক'রে ফেরবার পথে বাজার-হাট ক'রে আনা যাবে। আপনি এখন কুলিভাড়া আর গাড়ী ভাড়া টা দিয়ে দেবেন কি? তারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে—

শশব্যস্ত হ'য়ে শ্রীধর ব'ললে—তাই তো! ও কথা আমি একেবারে ভুলেই গেছলুম! কত দিতে হবে ঠাকুর? আমরা বিদেশী লোক, এখানকার দরদস্তর তো সব সঠিক জানিনি—

পাণ্ডা উদাসভাবে ব'ললে—পাঁচজন কুলি আট আনা হিসাবে আড়াই টাকা, আর গাড়ীভাড়া আড়াই টাকা—এই পাঁচটা টাকা এখন দিন, তার পর—

একটা বানর একপাটি জুতো তুলে নিয়ে চ'লে গেল

শ্রীধর শিউরে উঠে ব'ললে—ও বাবা! আবার তার পর? বলো কি ঠাকুর? এ যে একেবারে দিনে ডাকাতি দেখছি! এই ক'টা মোট বইত নয়; এর জন্য তোমায় পাঁচ-পাঁচটা কুলি এনে কে লাগাতে বলেছিল? আমরা যে এগুলো সব হাতাহাতি ক'রেই নিতে পারতুম! আর ষ্টেশন থেকে এইটুকু এসেছে তার গাড়ীভাড়া একেবারে আড়াই টাকা! এমন জানলে যে আমরা সব হেঁটে আসতুম ঠাকুর! গাড়ী ত ভারী! ঝড়্ঝড়্ ক'রছে! ব'সলে চালে মাথা ঠেকে—

অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে পাণ্ডা-ঠাকুর শেষে সাড়ে তিন টাকায় রফা ক'রে ফেলে টাকা নিয়ে জিলিপী আনতে গেলেন।

পাণ্ডা-বাড়ীর চাকর এসে এই সময় এক-ঘড়া জল রেখে গেল শ্রীধরদের ঘরে।

শ্রীধর একটা বোঁচ্কা খুলে তার ভিতর থেকে একখানা গামছা আর একটা বড় ঘটি বা'র করলে। কলসী থেকে ঘটিতে জল ঢেলে নিয়ে শ্রীধর ছাদের একপাশে গেল মুখ-হাত-পা ধোবার জন্য।

জুতো-যোড়াটি খুলে রেখে হাতে-পায়ে সবে একটু জল দিয়ে শ্রীধর যেমন দু'একটা কুলকুচো ক'রেছে, কোথা থেকে হুপ্ ক'রে একটা বানর এসে তার একপাটি জুতো তুলে নিয়ে চ'লে গেল।

ছেলেটা চীৎকার ক'রে উঠলো—বাবা, তোমার জুতো নিয়ে গেল বানরে—

শ্রীধর তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দেখে—তাই ত! সত্যই তো তার একপাটি জুতো নিয়ে এক বেটা বানর পালাচ্ছে—

'ধর্ ধর্' ক'রে শ্রীধর দুম্ ক'রে হাতের ঘটিটা ছাদে বসিয়ে দিয়ে কাঁধের গামছাখানা ফেলে ছুটলো জুতোচোর বানরকে তাড়া দিতে—

চক্ষের নিমেষে আর-একটা বানর এসে ঘটিটা তুলে নিয়ে চলে গেল—

শ্রীধর-পত্নী যশোদা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—ঐ যাঃ, ঘটিটা তুলে নিয়ে গেল যে গো! ওমা! কী হবে? কী সর্ব্বনেশে বানর গো!

শ্রীধর তখন জুতোর মায়া ছেড়ে ঘটি উদ্ধার ক'রতে ফিরলো।

ইতিমধ্যে আর-একটা বানর এসে শ্রীধরের গামছাখানা তুলে নিয়ে পালালো—

কানাইয়ের হাত থেকে ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়ছে

শ্রীধরের মেয়ে সুমতি চীৎকার ক'রে উঠলো—ও বাবা! তোমার নতুন গামছাখানা বানরে নিয়ে গেল—যাঃ কী হবে?

শ্রীধর প্রায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো!

এই সময় জিলিপীর ঠোঙা হাতে পাণ্ডা-ঠাকুর ফিরে এলেন। যাত্রীদের উত্তেজনার কারণ বুঝতে তাঁর বিলম্ব হ'লো না। তিনি সত্বর শ্রীধরের পুত্র কানাইয়ের হাতে জিলিপীর ঠোঙা ধ'রে দিয়ে ওদের জিনিসপত্রগুলো সব টেনেটুনে বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে তুলে ফেলতে লেগে গেলেন, যশোদা সরযূও তাঁকে সাহায্য ক'রতে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়লো—শ্রীধরও তখন বুদ্ধিমানের মতো এই কাজেই এসে যোগ দিলে—

হঠাৎ কানাই ছাদের দিক থেকে তারস্বরে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো।

কানাইয়ের কান্নার শব্দ পেয়ে সব হুড়মুড় ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে দেখে জিলিপীর ঠোঙা ছাদের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে! একপাল বানর তা কাড়াকাড়ি ক'রে সেই জিলিপীর হরির লুট কুড়োচ্ছে আর খাচ্ছে! কানাই বারান্দায় পালিয়ে এসে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে, আর তার একটা হাত থেকে ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়ছে!

সরযূ চীৎকার ক'রে উঠলো—ওমা, ছেলে যে একেবারে রক্তে ভেসে যাচ্ছে! কে এমন কাজ করলে?

ছুটে গিয়ে কানাইকে কোলে তুলে নিয়ে সভয়ে বা

উঠলো—ইস! ও বৌদি! কানুকে যে একেবারে খুন ক'রে গেছে—শিগ্‌গির একটু জলপটি নিয়ে এসো—

কানাইয়ের হাতের রক্ত আর কিছুতে থামে না! যশোদার পীড়াপীড়িতে পাণ্ডা ছুটলো ডাক্তার ডাকতে।

ডাক্তার এসে ব'ললে—এখনি হাসপাতালে নিয়ে চলুন, নইলে কোনও উপায় হবেনা!

অগত্যা মেয়েদের সাবধানে থাকতে ব'লে কানাইকে নিয়ে শ্রীধর হাসপাতালে ছুটলো। পাণ্ডা-ঠাকুরও সঙ্গে গেল।

এই আসে—এই আসে ক'রে যশোদা আর সরযূ ব'সে মুহূর্ত্ত গণনা করছিল।

অনেক বেলায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে শ্রীধর ফিরলো। কোলে কানাই। তার হাতে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা।

সরযূ এগিয়ে এসে কানাইকে কোলে নিলে। শ্রীধর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বারান্দায় ব'সে প'ড়ে ব'ললে—কেনোর হাতটা বড্ড জখম হ'য়েছে। হাসপাতালের ডাক্তার-বাবু ব'ললেন, যদি ওর হাতটা পেকে ওঠে এবং জ্বর হয়, তাহ'লে এখন কিছুদিনের মতো ওকে হাসপাতালে রাখতে হবে। চাই কি হাতটা হয়ত কেটে বাদ দেবারও দরকার হ'তে পারে! বানরে কামড়ালে না কি বিষিয়ে ওঠে!

যশোদা শুনে একেবারে হাঁউমাঁউ ক'রে উঠলো, ব'ললে—এখানে আর একদিনও না, চলো বাড়ী ফিরে যাই।

সরযূ ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ব'ললে—এখনও পুষ্কর বাকী, দ্বারকা বাকী। তীর্থ-দর্শনের সঙ্কল্প ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে কি এ-সব না দেখে ফিরতে আছে?

শ্রীধর গর্জ্জন ক'রে উঠে বললে—আর তীর্থ-দর্শন ক'রে কাজ নেই, এখন ভালয় ভালয় প্রাণটা নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারলে বাঁচি! পুষ্কর আমার মাথায় থাক্। হাসপাতালে যা' দেখে এলুম—আমাতে আর আমি নেই। সেখানে শতকরা চাল্লিশ-পঞ্চাশজন রুগী শুধু এই বানরের কামড়ে জখম হ'য়ে হাত-পা কাটিয়ে প'ড়ে আছে!

সরযূ শিউরে উঠে বললে—ওমা, কি হবে! তা হ্যাঁ দাদা, এ বানরগুলোকে এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করেনা কেন এরা?

শ্রীধর ব'ললে—শুনলুম এবার সেই ব্যবস্থা হ'য়েছে। মিউনিসিপালিটি থেকে লোক লাগিয়ে এখান থেকে সব বানর ধ'রে ধ'রে জঙ্গলে চালান দেওয়া হচ্ছে! বেশ হ[য়ে]
বেটারা কি কম পাজী! ছাতাটি ভুলে দোর-গো[ড়ায়]
রেখে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর ঘরে সবেমাত্র ঢুকিছি
আর এক বেটা অমনি কোথা থেকে হুপ্ ক'রে এসে ছাত[াটা]
নিয়ে পালালো!

সরযূ ব'ললে—আহা! তাই বুঝি অমন গলদ্‌ঘর্ম্ম হ[য়ে]
এসেছো? রোদ্দুরে ত ভারী কষ্ট হয়েছে তাহ'লে?

যশোদা বললে—ঠাকুরঝীকে একজোড়া কাপড় [কিনে]
দিতে হবে। ও তো দুখানিমাত্র কাপড় নিয়ে বাড়ী [থেকে]
বেরিয়েছিল কি না! তুমি হাসপাতালে যাবার পর ঠাকু[রঝি]
গেল রেলের কাপড়খানা ছেড়ে গা-হাত-পা ধুয়ে আস[তে]
ওমা! চোখের পল্লব পড়তে দিলেনা গা! অ[মনি]
একবেটা বানর এসে তোমার বোনের বস্ত্র-হরণ [ক'রে]
পালাল।

পাণ্ডা-ঠাকুর এসে ব'ললে—চলুন, সব উঠে পড়ুন, [আর]
বেলা করবেন না। যমুনায় এক-একটা ডুব দিয়ে চ[লুন]
সব দেব-দর্শন সেরে আসবেন চলুন। এর পর ভো[গের]
সময় হবে, তখন আর কোনও মন্দিরের দরজা [খোলা]
পাবেননা!

শ্রীধর ব'ললে—আমার আর পুণ্য করবার সাধ [নেই]
ঠাকুর, এইখান থেকেই বৃন্দাবনের তেত্রিশ কোটী দেবত[াকে]
প্রণাম জানাচ্ছি। বিকেলে ফেরবার গাড়ী কটায় [আছে]
দেখি—

সরযূ আপত্তি জানিয়ে ব'ললে—ছিঃ বৌ শ্রীধামে
গোবিন্দজী দর্শন না ক'রে কি ফিরতে পারি? সে [আমার]
প্রাণ থাকতে পারবোনা! তোমার ভয় নেই [দাদা]
গোবিন্দজী সব রক্ষে করবেন!

পাণ্ডা সরযূর কথায় সায় দিয়ে ব'ললে—এ মায়ী
বলছেন সে ঠিক কথাই। দর্শন না ক'রে গেলে মহাপা[প]
অকল্যাণ হবে।

বিরক্ত হ'য়ে শ্রীধর ব'ললে—বুঝিছি—সঙ্গে যখন
সব ঘোমটা-টানা-তীর্থ-কীট নিয়ে এখানে এসে প[ড়েছি]
তখন আর তোমাদের হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় [নেই]

পাশের ঘর থেকে একজন যাত্রী ব'লে উঠলো[—]
ব'লেছেন মশাই, একেবারেই খাঁটি কথা! বৃন্দাবনে
বানর আর পাণ্ডাদের হাত থেকে যাত্রীদের কিছুতে

স্তার পাবার উপায় নেই! ওরা যেন পরস্পরের সঙ্গে কজোট হ'য়ে এখানে রাজত্ব ক'রছে।

তারপর পত্নী ও ভগিনীর একান্ত ইচ্ছায় সে সপরিবারে নোয় স্নান করতে গেল। স্থির হ'লো—স্নানান্তে কাছা-াছি মন্দির-ক'টি ঘুরে দেব-দর্শন ক'রে তারা বাসায় ফিরবে।

পাণ্ডা-ঠাকুর মহা উৎসাহিত হ'য়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে লো।

ও বাবা! কিসে আমায় কামড়ালো গো!

মুনা-পূজা ক'রে, যমুনাকে অর্ঘ্য দিয়ে শ্রীধর যমুনায় চ নামলো। সঙ্গে পত্নী, ভগিনী ও কন্যা ।।

শ্রীধরের পুত্র কপি-দংশনে-কাতর কানাই আর জলে চ পেলে না। সে ডাঙ্গায় রইল, পাণ্ডা-ঠাকুরের র। যশোদা ও সরযূ দুই ননদ ভাজে স্থির ক'রে ফেললে যে, তারা নেয়ে এসে যমুনা-জলের স্পর্শ দিয়ে তাদের কানুকে শুদ্ধ ক'রে নেবে।

হঠাৎ সুমতি জলের ভিতর থেকে—বাপরে! মারে! গেছিরে! ও বাবা! কিসে আমায় কামড়ালো গো!—ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলো।

তাড়াতাড়ি শ্রীধর সাঁতরে গিয়ে মেয়েটাকে ধরলে এবং জল থেকে টেনে তুললে।

যশোদা ও সরযূও জল থেকে উঠে পড়লো।

সুমতির বাঁ-পায়ের কড়ে আঙ্গুল থেকে ঝর্-ঝর ক'রে রক্ত পড়ছে দেখে যশোদা একেবারে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো! সরযূ সরোদনে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো—ওগো সর্ব্বনাশ হ'য়েছে গো—মেয়েটাকে বুঝি সাপে খেলে!

যশোদা ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠে বললে—ওমা! তাই ত গো! মেয়ে যে আমার ক্রমেই নীলমূর্ত্তি হ'য়ে আসছে!

ব্যাপার দেখে পাণ্ডা-ঠাকুর কানাইকে কোলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘাটের ধারে ছুটে এলো!

শ্রীধর তখন তার নতুন কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে ফেলে মেয়ের পায়ে খুব শক্ত ক'রে বেঁধে দিচ্ছিল—সাপের বিষ পাছে না তার গায়ে চ'ড়ে উঠতে পারে!

পাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটের আরও সব স্নানার্থীদের ভীড় লেগে গেল সেখানে। দেখে-শুনে সবাই ব'ললে—ভয় নেই! ও একটু শুধু কচ্ছপে ঠুক্‌রেছে!

কিন্তু মেয়ের মা ও পিসীমার মন তা'তে স্থির হ'লো না শ্রীধর অগত্যা মেয়ে নিয়ে আবার চ'ললো হাসপাতালে।

পাণ্ডার হেপাজাতে নেয়ে উঠে পরবার কাপড়-চোপড়-গুলো যমুনার পাড়ে রেখে তারা নাইতে নেমেছিল। শ্রীধর

মেয়ে নিয়ে হাসপাতালে যাবে ব'লে কাপড় ছাড়তে এসে দেখে—সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে! ঘাটের ধারে চেঁচামেচি কান্নাকাটি হৈ চৈ হ'তেই পাণ্ডা কানাইকে নিয়ে ব্যাপার কি জানবার জন্য ছুটে এসেছিল, কাপড়-চোপড়গুলোর কথা আর তার অত খেয়াল ছিল না! এ সুযোগ কি আর ব্যর্থ যায়! তৎক্ষনাৎ ব্রজবাসী কপিধ্বজেরা তার সপরিবারের বস্ত্র-হরণ ক'রে ব'সেছিল।

শ্রীধর ভিজে কাপড়েই মেয়ে নিয়ে হাসপাতালে চ'লে গেল।

ডাক্তার সব শুনে ও সুমতিকে পরীক্ষা ক'রে দেখে একটু আয়োডিন দিয়ে তুলো ভিজিয়ে সুমতির পায়ের আঙ্গুলে বেঁধে দিয়ে বললে—ভয় নেই। আপনার মেয়েকে সাপে কামড়ায়নি। কচ্ছপেই ঠুক্‌রেছে বটে!

বিরক্ত হ'য়ে উঠে শ্রীধর বললে—তা অতো কচ্ছপই বা পুষে রেখেছেন কেন জলে? জালে ক'রে সব জড়িয়ে তুলে ফেলে অন্য দেশের হাট-বাজারে তো চালান দিতে পারেন। তাতে দু'পয়সা ঘরে আসবেও এবং ঘাটে আমাদের স্নান করাও নিরাপদ হবে!

একটু মৃদু হেসে ডাক্তারবাবু ব'ললেন—বাপ্‌রে! ও সব কচ্ছপ সেই 'কালীয়দমনের' আমল থেকে এখানে র'য়েছে! ওদের তাড়ালে আর বৃন্দাবনের থাকবে কি?—কথায় ব'লে—

"কপি-কচ্ছপ-কুঞ্জবন
এই তিনে ভাই বৃন্দাবন!"

এই বানর-তাড়ানোর ব্যাপার নিয়েই এখানে ভারী গণ্ড-গোল বেঁধেছে! দু'জন নামওয়ালা বড়লোকের হাতাহাতি হবার যোগাড়! বানর-তাড়াবার কন্‌ট্রাক্ট্ নেবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটিতে দু'জনেই টেণ্ডার দিয়েছিল, কিন্তু পেলে একজন। আর একজনের প্রাণে কি তা' সয়? সে সমস্ত লোককে ক্ষেপিয়ে তুলে…বৃন্দাবন থেকে বানর-চালান দেওয়া বন্ধ করবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেছে। বড়লাট-ছোটলাটদের সব টেলিগ্রাম ক'রেছে! খুব একটা হৈ চৈ করবার চেষ্টায় আছে!—এর ওপর আবার কচ্ছপ জুড়লে কি রক্ষে আছে? এখানকার নন্দদুলালটি যে একবার কচ্ছপ-রূপ ধারণ ক'রে-ছিলেন সে কথা বুঝি আপনার মনে নেই?—

সত্যই ত! সে কথাও শ্রীধরের মনে ছিল না! কচ্ছপ-নিপাত যে আর বৃন্দাবন থেকে সম্ভব নয় এ বিষয়ে কৃতনি- হ'য়ে ক্ষুণ্ণ মনে সে মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলো।

যমুনা হ'য়ে—ঠাকুর-দর্শন শেষ ক'রে ফেরবার প- পাণ্ডা-ঠাকুর জিজ্ঞাসা ক'রলে—কিছু প্রসাদ সংগ্রহের চে- ক'রবো কি? বেলা ত' অনেক হ'য়ে গেল। আজ আ- রান্না ক'রে খেতে গেলে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে।

মেয়েরা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজি হ'য়ে গেল শ্রীধরও দেখলে যে উপস্থিত ক্ষেত্রে এইটেই হ'চ্ছে সব চে- সদুপায়। সুতরাং সেও অমত করলেনা।

ফেরবার পথেই দু'একটি ঠাকুরবাড়ী থেকে অবিল- পাণ্ডাঠাকুর নানাবিধ প্রসাদ সংগ্রহ ক'রে ফেললেন এ- তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাসায় নিয়ে চ'ললেন।

প্রায় তারা বাসার কাছাকাছি পৌছেচে এমন স- হুপ্-হাপ্ ক'রে কোথা থেকে গোটাকতক বানর লাফ্ দি- এসে একেবারে পাণ্ডা-ঠাকুরের ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো পাণ্ডা-ঠাকুর এটা আশঙ্কা ক'রেই তাঁর হাতের মোটা লাঠি গাছটা শ্রীধরের হাতে দিয়ে তাকে ব'লে দিয়েছিল যে- আমার পিছনে পিছনে খুব সতর্ক হ'য়ে আসুন। বান- দেখ্‌লেই লাঠি তুলবেন, তাহ'লে আর ওরা কোনও উপদ্র- ক'রতে সাহস ক'রবেনা।

শ্রীধর খুব উৎসাহের সঙ্গেই এতক্ষণ লাঠি উঁচিয়ে পাণ্ড- ঠাকুরের মাথার-উপর-নেওয়া প্রসাদের ঝুড়িটি পাহারা দিতে দিতে আসছিল। বাসার কাছাকাছি এসে সে একটু অন্যমন- হ'য়ে যশোদার সঙ্গে কি কথা বলছিল! ঠিক সেই ফাঁকে এই ব্যাপার ঘ'টে গেল!

ঝুড়িসমেত উল্টে সমস্ত প্রসাদ রাস্তায় ছড়িয়ে প'ড়ে বৃন্দাবনের রজ মেখে গড়াগড়ি খেতে লাগলো।

মুখের গ্রাস এমন ক'রে নষ্ট ক'রলে দেখে শ্রীধ- একেবারে ক্ষেপে উঠলো! বানরগুলোকে সে আজ কিছু শিক্ষা দেবেই ব'লে দৃঢ়-সংকল্প হ'য়ে তেড়ে গেল সেই লাঠি উঁচিয়ে তাদের মারতে। কিন্তু বানরগুলো গেল ঠিক সময়ে পালিয়ে, আর শ্রীধরের লাঠি গিয়ে প'ড়লো, ভূপতিত প্রসা- পরম শ্রদ্ধাভরে কুড়িয়ে নিতে ব্যস্ত নিরপরাধ যশোদা সরযূর পিঠে!

এর পর শ্রীপাঠ বৃন্দাবন-ধামের মোহ আর কিছুতে শ্রীধরকে সেখানে ধ'রে রাখতে পারলে না। সেদিন

কোনও রকমে চোখ-কাণ বুজে কাটিয়ে তার পরদিনই জয়পুরীকে সে কোটী-কোটী প্রণাম ঠুকে 'জয় রাধে শ্রীরাধে ! গোবিন্দ—গোবিন্দ !' ব'লতে ব'লতে সপরিবারে বাড়ীমুখো রওনা হ'লো।

তেড়ে গেল সেই লাঠি উঁচিয়ে—

শ্রীধর বৃন্দাবন ত্যাগ করবার সময় শুধু এই একটি মাত্র ব্যাপার দেখে বেশ খুশী হ'য়ে এলো যে, সেখানকার বানর-কটকের মধ্যে বেশ একটা হাহাকার প'ড়ে গেছে ! মিউ-নিসিপ্যালিটির ঠিকেদার মহাশয়ের লোকজনেরা প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ-তিরিশটি ক'রে বানর ধ'রে জঙ্গলে চালান দিচ্ছে !

যশোদা এই মানসিক ক'রতে ক'রতে ট্রেনে উঠলো যে, হে ঠাকুর ! শ্রীবৃন্দাবন যেদিন নির্বানর হবে সেদিন আমি ষোড়শোপচারে গোবিন্দজীর মন্দিরে তোমার পূজো দিয়ে যাবো !

সরযূর কিন্তু পুষ্করটা হ'লোনা ব'লে একটা আক্ষেপ রয়ে গেল !

(অনন্তপর্ব্ব)

দেশে ফিরে এসে শ্রীধর দেখলে বৃন্দাবনের বানরদের জন্য সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের সঙ্গে দেশের অনেক গণ্যমান্য অধিবাসীও যোগ দিয়েছেন। রাস্তায় প্রাচীরপত্র লট্‌কে ঘোষণা করা হ'য়েছে যে, বৃন্দাবনের অত্যাচারিত ও অন্যায়ভাবে নির্ব্বাসিত বানরদের পক্ষ থেকে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা হবে। আজকের এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার যুগে প্রবলের দ্বারা নিষ্পেষিত কোটী-কোটী মৌন-মূক বানরদের জন্য দেশবাসীর হৃদয় অকৃত্রিম সহানু-ভূতিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কে একজন স্বদেশভক্ত মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন, এবং দেশের প্রসিদ্ধ বক্তাগণ বানরদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করবেন।

প্রসাদ বৃন্দাবনের রজ মেখে গড়াগড়ি খেতে লাগল

শ্রীধরের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না ! অসংখ্য অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, ক্ষত-বিক্ষত ও ক্ষতিগ্রস্ত নরনারীর দুঃখ, কষ্ট ও লাঞ্ছনার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে আজ এঁরা বানরপক্ষ সমর্থনের জন্য এমন বদ্ধপরিকর হ'য়ে

উঠলেন কেন? এ কি তবে সেই ঠিকেদারের কারসাজি? সেই কি এসে এদের ক্ষেপিয়েছে? বৃন্দাবন থেকে বানর তাড়ানো বন্ধ ক'রে বিপক্ষপক্ষের শত্রুতা-সাধন করাই কি এর মুখ্য উদ্দেশ্য? বানর-নির্ব্বাসনের কন্ট্রাক্ট্ না পাওয়াতে সে কি এইভাবে তার প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে?

নানারকম ভেবেও এর যথার্থ কারণ কিছুই ঠিক ক'রতে না পেরে শ্রীধর শেষে তার খুড়ো নটবরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। একটা থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে নটবর সব শুনে ব'ললে—বাপু হে! তুমি এই সহজ ব্যাপারটার কোনও সমাধান করতে পারছো না, শুনে আমি বিশেষ দুঃখিত হলুম। সাবালক হবে আর কবে? এই বৃন্দাবন যাওয়াই দেখছি তোমার কাল হ'য়েছে। সেখানে গোপ-সংসর্গ ঘটায় তোমার সাবালকত্ব পিছিয়ে প'ড়েছে। গোয়ালারা আশী বছরে সাবালক হয় জান তো?

শ্রীধর নতমুখে ভাবতে লাগলো—খুড়ো কথাটা ব'ল্‌ছে কিছু মিথ্যে নয়! বৃন্দাবনে যে রকম বেকুব বনে এসেছি—বাপ্! রামচন্দ্র যে কেন রাবণ বধে বানরদের সাহায্য নিয়েছিলেন তা' বেশ বোঝা যাচ্ছে! রাজা দশরথের পুত্রটি দেখছি বাপের মতো নির্ব্বোধ ছিল না!—বানর-কটক লঙ্কায় গিয়ে প'ড়তে রাক্ষস বেটারা যে কি রকম জব্দ হ'য়েছিল তা' আমি সম্পূর্ণ অনুমান ক'রতে পারছি! রাক্ষস-বংশ বেঁচে থাকলে জীবনে আর তারা কখনও রামের শত্রুতা ক'রতো না নিশ্চয়!

শ্রীধর বল্‌ল "খুড়ো আপনি সভায় যাবেন না?"

—কোথা যাবো? পাগল হ'য়েছিস শ্রীধর!—বাপ্‌স্‌!

শ্রীধর উত্তেজিত হ'য়ে উঠে ব'ললে—কিন্তু আমি যাবোই খুড়ো—যাবো এই হাস্যকর প্রতিবাদের প্রতিবাদ ক'রতে, আর বৃন্দাবন থেকে বানর-নির্ব্বাসন সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন ক'রতে। কারণ ব্রজবাসীদের দুঃখ আমি স্বচক্ষে হাসপাতালে গিয়ে দেখে এসেছি, নিজেও তো একজন বড় কম ভুক্ত-ভোগী নই!

সভা

ব'লতে ব'লতে ঝড়ের বেগে শ্রীধর বেরিয়ে প'ড়লো এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে সভায় যোগ দিতে ছুটলো!

একেবারে সামনের একখানি আসন দখল ক'রে ব'সলো।

দেখতে দেখতে সভাস্থল একেবারে লোকে লোকারণ্য হ'য়ে উঠলো। বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে চেয়ে শ্রীধর দেখলে সরু, মোটা, বেঁটে, লম্বা, চ্যাপ্টা, গোল—নানা আকারের ও বিবিধ পোষাকের হরেক রকম লোক এসেছেন বানর পক্ষ সমর্থন ক'রতে!

এমন সময় বাইরে থেকে বহুকণ্ঠে কার যেন জয়ধ্বনি উঠ্লো! শ্রীধর কৌতূহলী হ'য়ে উঠতে না উঠতেই দেখতে পেলে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ভদ্রলোক এসে সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রলেন।

সভার বক্তা (১)

প্রথমেই একটি উদ্বোধন সঙ্গীত হ'লো—খোল ও খঞ্জনীর সঙ্গে গুটিকয়েক শিশু কীর্ত্তনের সুরে গাইলে,—

সখি, এ কি শুনি আজি নিদারুণ বাণী!
কেন এ নিশি বলো পোহাইল,
পুন কংস নৃশংস নাকি আইল,
ব্রজপুর-সুখ-স্বপনে বজর হানি?
(যত) কপি গোপীগণে দিবে সে তাড়ায়ে
(সখি) এ শুনে কেমনে রবো লো দাঁড়ায়ে
ওহো! বহে দু'হুঁ নয়নে যমুনা পানি!

গান হয়ে যাবার পরই জনৈক বক্তা উঠে যথেষ্ট কবিত্ব প্রকাশ করে সভাপতি বরণের প্রস্তাব করলেন; এবং এই উপলক্ষে জলদগম্ভীর স্বরে বল্লেন—শ্রীবৃন্দাবন-ধামে প্রভুর সেই পুণ্য ত্রেতাযুগের পরিচিত লীলাসহচরদের সঙ্গে ভাগ্যবশে ভগবানের পুনর্মিলন ঘ'টেছিল! অহো ভাগ্য! সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা কপিগণের বংশধরেরা আজ কি না শ্রীধামে প্রপীড়িত হচ্ছে! বিজয়ীর মতোই বীরদর্পে লাঙ্গুল ঘুরিয়ে যারা সোনার লঙ্কা দগ্ধ ক'রে দিয়েছিল—তারা তো কেউ অবহেলার পাত্র নয়।—সেই বানরেশ সুগ্রীবরাজ—সেই রায় বাহাদুর কুমার অঙ্গদ—সেই মহামহোপাধ্যায় পবনসুত হনু—সেই পুণ্যচেতা নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি বানরাচার্য্যদের সুযোগ্য বংশধরগণকে যারা আজ নিষ্ঠুরভাবে ব্রজ হ'তে নির্ব্বাসিত ক'রছে, নারায়ণের সুদর্শন-চক্র অচিরে তাদের শিশুপাল ও কংসের মতো নিশ্চয় ধ্বংস ক'রবে।

চারিদিকে আবার 'সাধু'! 'সাধু'! রব উঠলো! বিপুল হরিধ্বনির মধ্যে বক্তা উপবেশন করলেন।

এইবার দ্বিতীয় বক্তা উঠলেন বক্তৃতা ক'রতে। তিনি উঠে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে শ্রোতাদের অভিমুখে দু' বাহু বিস্তার ক'রে ব'লে উঠলেন—অহো! কী বলবো? এ দৃশ্য দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে! আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি যেন ব্রজের সেই শত শত নির্য্যাতিত কপি-

সভার বক্তা (২)

সুন্দরেরা আজ আমাদের কাছে ছুটে এসেছেন তাঁদের গভীর মনোব্যথা জানাতে!

চটাপট্ চটাপট্ ক'রে গোটাকতক হাততালি পড়লো বটে, কিন্তু অধিকাংশ শ্রোতাই বক্তার এ ভাবোচ্ছ্বাসে অপ্রসন্নই হ'লেন। কপি যে সুন্দর এটা তাঁরা মনে মনে স্বীকার ক'রতে পারলেন না! কিন্তু বক্তা—তাঁর এই নির্ব্বুদ্ধিতার কথা বুঝতে না পেরে অধিকতর ভাবাবেগে ব'লতে লাগলো—ভাই সব! ব্রজবন্ধু সব! তোমাদের

প্রতি যারা অত্যাচার ক'রছে, সে হতভাগ্যেরা জানে না যে তারা আজ কী মহাপাতকের কাজ ক'রছে! তোমাদের যারা আজ নৃশংসভাবে ধ্বংস করছে—তোমাদের যারা আজ নিষ্ঠুরের মতো পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে কোন্ সুদূরে—কোন্ সাত সাগর আর তেরো নদীর পারে চালান দিচ্ছে—তারা হয়ত' ভুলে গেছে যে, তোমরা শুধু বনের বানর নও!—

শ্রোতাদের মধ্যে এবার রীতিমত একটা চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা যেতে লাগলো!

বক্তা কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে চড়িয়ে ব'ললেন—তোমরা আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ! বিজ্ঞানাচার্য্য মনীষী দ্বারবীন্ (Darwin)—যাঁর নাম শ্রবণমাত্র গাত্র রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে এবং এ কথা বুঝতে আর বিলম্ব হয়না যে, সেই মহর্ষি দ্বারবীন্ নিশ্চয় কোনও জন্মান্তরে দ্বারকায় ছিলেন!—তিনি প্রমাণ ক'রে গেছেন যে, আমাদের পিতামহ প্রপিতামহ ছিলেন তোমাদেরই মধ্যের একজন! তাই ব'লছিলেম হে ভাই সব—তোমাদের যারা আজ শ্রীপাট বৃন্দাবন থেকে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত ক'রছে, তারা তাদের পরমাত্মীয়-দেরই লাঞ্ছনা ক'রছে!

ঘন ঘন করতালি ও প্রচণ্ড হরিধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা শেষ ক'রে দ্বিতীয় বক্তা আসনে এসে উপবিষ্ট হ'লেন।

এইবার যিনি বক্তৃতা দিতে উঠলেন, শ্রীধর শুনলে ইনি না কি সেই প্রগাঢ় ভক্ত 'পরমপাদ'! এঁর শরীর তেমন স্থূল নয়, কিন্তু তিলকের ঘটায় সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত এবং হাতে মস্ত একটি হরিনামের মালা রাখবার কুঁড়োজালি! মুণ্ডিত মস্তকের মধ্যে মরুভূমির মাঝখানে ওয়েশিসের মতো টিকির গুচ্ছ একেবারে যেন পুচ্ছ তুলে রয়েছে!

ইনি বক্তৃতা দিতে উঠে কিছু ব'লবার আগেই প্রথমটা একেবারে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেললেন! তার পর বারেবার তাঁর অঙ্গের হরিনামাঙ্কিত উত্তরীয়তে চোখ মুছতে

কে কোথায় পালায় তার ঠিক নেই

মুছতে তিনি বালিকার মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মেয়েলী-ঢঙে ও মিহিসুরে ব'লতে লাগলেন—প্রভু! প্রভু আমার! কী পাপ ক'রেছিল এ দাস তোমার শ্রীচরণে দয়াময়! যে এও তাকে বেঁচে থেকে দেখতে হ'লো? গৌর হে! কতদিনে মুক্তি পাবো এ কঠিন যন্ত্রণা থেকে! ব্রজের বিচ্ছেদজ্বালা যে আর

সয়না গো সয়না! ওগো বলোগো নাথ বলো! ওগো প্রিয়তম! ওগো প্রাণাধিক! আমার জাতি-কুল-মান সব যে গেল!

পরমপাদ এখানে ভাবাবেশে মুদিতচক্ষু হ'য়ে মুখখানি আকাশের দিকে তুলে উভয় হস্তই শ্রোতাদের দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে ব'লছিলেন—এই সব মূঢ় অর্ব্বাচীনেরা কি না তাদের প্রতি অত্যাচার ক'রছে! প্রভু! প্রভু! এরা অসুর! এরা দৈত্য! এরা দানব—

আমাদের দিকে অমন করে চাহিবেন না!

শ্রোতাদের অনেকের মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা গেল!

পরমপাদ তন্ময় হ'য়ে ব'লছিলেন—জয়! জয়! প্রভু! তোমারই জয়! হবে জয়! নাহি ভয়!—এই সব অজ্ঞানান্ধ মূঢ় অর্ব্বাচীনেরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে—যাদের ওরা বানর ব'লে তাড়াচ্ছে—তারা বানর নয় গো' বানর নয়! তাদের এরা বৃন্দাবন-ছাড়া ক'রতে চায়! শুনে হাসি পায় প্রাণনাথ। ওগো, দেবো না গো!—দেবো না—তাদের আমরা ব্রজ ছেড়ে মথুরায় যেতে দেবো না—তোমার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদবো! তোমার চরণ বুকে ধ'রে আমরা শরণ নেবো!—তুমি তাদের রক্ষা ক'রবে!

শ্রীধর আর সহ্য ক'রতে পারলে না! এই সব বক্তাদের কপি-ভক্তি কতটা গভীর একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য সে আসন ছেড়ে উঠে পড়লো এবং সভা থেকে বেরিয়ে ছুটলো একেবারে পশু-পক্ষীর হাটে;—সেখান থেকে বেশী নয়,—মাত্র গোটা পাঁচ-ছয় বেশ গোদা গোদা দেখে বানর কিনে একটা খাঁচায় পুরে একখানা গাড়ীতে তুলে নিয়ে শ্রীধর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো আবার সভাস্থলের দিকে ফিরে!

সেখানে পৌঁছে শ্রীধর দেখলে যে, বানরদের প্রতিবাদ-সভা তখনও খুব জোর চলছে! এক বক্তা ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীধামবৃন্দাবন ও তথাকার বানর-মাহাত্ম্য বিবৃত ক'র-ছিলেন—সেই সোণার বৃন্দাবন—সেই শ্রীপাঠ ব্রজধাম—প্রভু গৌরাঙ্গদেব যাকে এই কলিতে পুনরায় প্রকট ক'রে তুলেছেন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য ভক্তবৎসল যেখানে আপন বৃন্দাবন-লীলার নিত্য পুনরভিনয় দেখাচ্ছেন ঐ বানররূপী ভক্তদের দিয়ে!—তাদের ব্রজচ্যুত ক'রতে চাওয়া মানে—

—এই যে মানে বুঝিয়ে দিচ্ছি ভাল ক'রে!—ব'লতে ব'লতে শ্রীধর পিছন থেকে গিয়ে খাঁচার দরজা খুলে বানর কটিকে বক্তৃতা-মঞ্চের উপর ছেড়ে দিলে!

হুপ্ হাপ্! হুপ্! হাপ্!—

দু'চারটে লাফ। বার-কতক কিচির-মিচির! ব্যস্! অমনি বাপ্‌রে বাপ্!—কে কোথায় পালায় তার ঠিক নেই! কে কার ঘাড়ে পড়ে! টেবিল চেয়ার উল্টে-পাল্টে একাকার! শিবের অনুচরেরা যেমন ক'রে দক্ষ-যজ্ঞ পণ্ড ক'রেছিল, বোধ করি ঠিক তেমনি ক'রেই সেই বিরাট প্রতিবাদ সভা একেবারে তচ্‌নচ্ হ'য়ে গেল!

ছুট্! ছুট্! পালা পালা! পড়ে কি মরে! কে কোন্‌দিকে যাবে ঠিক পায় না! বড় বড় ভুঁড়িওয়ালা অনেকেই পালাতে গিয়ে প'ড়ে চিৎপাৎ! কেউ কেউ কুমড়ো গড়াগড়ি খেতে লাগলেন।

শ্রীধর দূর থেকে দেখে বেশ খুসী হ'য়ে ব'লতে লাগলো—কেমন! হয়েছো তো! বড় যে প্রভুর লীলা-সঙ্গীদের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিল—এখন নাও, সামলাও!

হঠাৎ শ্রীধর দেখলে একজন লোক পালাতে না পেরে সভার এক কোণে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে যোড়হাত ক'রে একটা বানরের দিকে চেয়ে ব'লছে—আপনারা কি আমাদের চিনতে পারছেন না?—আমরা যে সব আপনাদের জ্ঞাতি; আপনাদেরই পক্ষ নিয়ে আজ আমরা এখানে বক্তৃতা ক'রতে এসেছিলুম। আপনাদের জন্য আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত; তবু কেন আমাদের প্রতি আপনারা অকরুণ হচ্ছেন? আপনাদের

বিপদের কথা শোনবামাত্র আমরা যে সকলে ছুটে এসেছি আপনাদের রক্ষা ক'রতে! আমাদের দিকে অমন ক'রে চাইবেন না—আপনাদের পায়ে মাথা খুঁড়ছি—অমন ক'রে আমাদের ঘন ঘন দন্ত-প্রদর্শন ক'রবেন না!

আপনারা কি আমাদের চিনতে পারছেন না?

বানরটি এই সময় তার গালে গিয়ে একটী প্রচণ্ড চপেটাঘাত ক'রলে!—

শ্রীধর খুব হেসে উঠ্‌ল! এমন সময় আর একটি লোক হন্ত-দন্ত হ'য়ে একজন পাহারাওয়ালাকে ডেকে নিয়ে এসে শ্রীধরকে দেখিয়ে দিয়ে ব'ললে—এই! এই লোকটাই জমাদার সাহেব! এই আমাদের সভার শান্তিভঙ্গ ক'রেছে! এ বৈষ্ণব-অপরাধে অপরাধী—একে পিচমোড়া ক'রে বেঁধে তুমি থানায় নিয়ে যাও! বখ্‌শিস্‌ দেবো!

শ্রীধর ফিরে দেখলে লোকটী আর কেউ নয়—স্বয়ং পরমপাদ ঠাকুর!

পাহারাওয়ালা তৎক্ষণাৎ শ্রীধরকে ধ'রে টেনে নিয়ে যেতে যেতে ব'ললে—চলো থানায়! তোম্‌রা জেল্‌ হোগা!—

শ্রীধর উত্তেজিতভাবে ব'ললে—কুচ্‌ পরোয়া নেই—চলো! এ অভিনয় বন্ধ ক'রবার জন্য জেল্‌ কি—ফাঁসি-কাঠেও ঝুলতে রাজি আছি বাবা!—

অশ্বিনীকুমার দত্ত

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

যে মহাত্মার চিত্র এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পট শোভিত করিল, তাঁহার নাম অশ্বিনীকুমার দত্ত। বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র এমন কেহ নাই, যাঁহার কাছে এই মহাত্মার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে। তিনি এ দেশে সর্ব্বজন-পরিচিত, সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয়! বরিশালের অশ্বিনীবাবু বলিলেই আর কিছু বলিতে বাকী থাকে না। বাঙ্গালা দেশে যে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, বরিশালের অশ্বিনীবাবু তাঁহাদের অন্যতম।

বরিশাল জেলার বাটাজোড়ের প্রসিদ্ধ দত্ত জমিদার বংশে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারী অশ্বিনীকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় যখন পটুয়াখালিতে মুন্সেফ ছিলেন, তখন সেখানেই অশ্বিনীকুমার ভূমিষ্ঠ হন। অশ্বিনীকুমারের জননী প্রসন্নময়ী খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও স্বদেশ হিতৈষী, মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী।

ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ও নানা সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। অশ্বিনীকুমার উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন, সর্ব্বাংশে পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই অশ্বিনীকুমার ধর্ম্ম-পিপাসু ছিলেন; অন্য ছেলেরা যখন খেলা-ধূলায় মত্ত হইত, অশ্বিনীকুমার তখন হরিনাম সংকীর্ত্তনে তন্ময় হইয়া যাইতেন; এই নামে মত্ততা অশ্বিনীকুমারের জীবনান্ত পর্য্যন্ত ছিল, এই নামসুধা পান করিয়াই তিনি সর্ব্ব বিষয়ে দেশের অগ্রণী হইয়াছিলেন—'জীবে দয়া, নামে ভক্তি' অশ্বিনীকুমারের জীবনের মূল মন্ত্র ছিল; সে মন্ত্র সাধনায় অশ্বিনীকুমার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই দেশের লোক, বিশেষতঃ বরিশাল ও পূর্ব্ববঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অশ্বিনীকুমারকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহার অতুলনীয় আদর্শ সকলকে সমভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহের অবসান হইলেও তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি এখনও দেশের অসংখ্য নরনারীকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকে।

সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষে নানাস্থানী হইয়া শেষ বয়সে ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় কৃষ্ণনগরে স্থায়ীভাবে কিছুকাল সদরালার পদে নিযুক্ত থাকেন। সেইজন্য অশ্বিনীকুমারকেও পিতার সহিত এইখানেই বাস করিতে হইত। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে অশ্বিনীকুমার এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

সত্যনিষ্ঠা অশ্বিনীকুমারের একটি মহৎ গুণ ছিল। যখন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, তখন নিয়ম ছিল—ষোল বৎসরের কম বয়সে কোন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না। অশ্বিনীকুমারের বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর। নিয়ম মত তাঁহাকে আরও দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। সাধারণতঃ এরূপ অবস্থায় ছাত্রগণ তাহাদের বয়স ষোল বৎসর বলিয়া পরীক্ষা দেয়—অশ্বিনীকুমারের বেলাতেও তাহাই হইয়াছিল। যথা সময়ে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; কিন্তু তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রকৃত বয়স গোপন করিয়া বেশী বয়স লিখাইয়া পরীক্ষা দেওয়া ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য হইল না। এই ভাবে কিছুকাল গেল, কোন মীমাংসাই হইল না। এফ-এ পাশ করিবার পর বিবেকের দংশন কিন্তু অসহ্য হইল। তিনি কলেজের অধ্যক্ষের নিকট গিয়া তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। অশ্বিনীকুমারের সত্যনিষ্ঠা দর্শনে অধ্যক্ষ চমৎকৃত হইলেন; কিন্তু এরূপ অবস্থায় আর কিই বা করা যায়, সেইজন্য তিনি অশ্বিনীকুমারকে এই বিষয় লইয়া দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন।—কিন্তু অশ্বিনীকুমার নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন—তিনি বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের গোচর করিলেন। কিন্তু এখন আর কি করিতে পারা যায়, ভাবিয়া রেজিষ্ট্রারও তাঁহাকে কলেজের অধ্যক্ষের ন্যায় উপদেশ দিলেন। কোন দিকেই কোন সুবিধা দেখিতে না পাইয়া অশ্বিনীকুমার লেখাপড়া

ত্যাগ করিয়া পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে বৰ্দ্ধমান হইতে ধরিয়া পুনরায় কৃষ্ণনগরে আনয়ন করিলেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার আর পড়িতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন না করিয়া বসিয়া থাকিবার পর তিনি বি-এ পড়িতে গেলেন। এইরূপে মিথ্যাচরণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তিনি মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিতে পারিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি-এ ও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অশ্বিনীকুমার শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হন এবং সঙ্গে সঙ্গে বি-এল পড়িতে থাকেন। বি-এল পাশ করিয়া তিনি বরিশালে ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ওকালতী তাঁহার ভাল লাগিল না। সেইজন্য তিনি তিন বৎসর ওকালতী করিবার পর ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আবার শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় বরিশালে নিজ নামে ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউসন নামক এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার সেই বিদ্যালয়টির কার্য্যে নিজেকে উৎসৃষ্ট করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বরিশাল ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউসন ব্রজমোহন কলেজে উন্নীত হইয়া বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজে পরিণত হইল। ব্রজমোহন স্বয়ং এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও চরিত্র-মাধুর্য্যে ছাত্র ও অন্যান্য অধ্যাপকগণ সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহার মহৎ চরিত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া এই কলেজের ছাত্রগণও চারিত্রে বিশিষ্টতা লাভ করিয়া বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে লাগিল।

কেবল শিক্ষাদান করিয়া আদর্শ-চরিত্র ছাত্র সৃষ্টি করিয়া অশ্বিনীকুমার ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। দেশের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে তিনিই সকলের অগ্রে যোগদান করিতেন। এইরূপে তিনি বরিশাল জেলার সর্ব্বপ্রথম নেতার আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে বরিশাল বাঙ্গলার অন্য সকল জেলাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

লর্ড কার্জ্জন যখন বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করিলেন তখন যে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইল, অশ্বিনীকুমার তাহাতে মনে প্রাণে যোগদান করিলেন। আন্দোলন দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। আন্দোলন দমন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশের যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে অন্তরীণ করিলেন, অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩ই ডিসেম্বর তিনি লক্ষ্ণৌ জেলে আবদ্ধ হন। চৌদ্দ মাস পরে তিনি অন্তরীণ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

অশ্বিনীকুমারের সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁহার রাজনীতিক প্রতিভার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। তাঁহার "ভক্তিযোগ" বঙ্গ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মেধাবী ছাত্র অশ্বিনীকুমার, উকীল অশ্বিনীকুমার, শিক্ষক অশ্বিনীকুমার, রাজনীতিক অশ্বিনীকুমার—সকল অশ্বিনীকুমারকে বাদ দিয়াও কেবলমাত্র সাহিত্যিক অশ্বিনীকুমারকে পাইলেও বঙ্গমাতা নিজেকে ধন্য বিবেচনা না করিয়া পারেন না।

কলিকাতা, ভবানীপুরে অবস্থানকালে ১৩৩০ সালের ২১এ কার্ত্তিক ৺কালীপূজার দিন অশ্বিনীকুমার পরলোকে মহাপ্রয়াণ করেন।

আজ সেই অশ্বিনীকুমারের উদ্দেশে অশ্রুর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম।

হৃদয়-মন্দির

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

নির্ব্বোধ ভাবে মন্দির ছাড়া কোথাও দেবতা নাই,
জানে না সাধুর হৃদয় তাঁহার সব চেয়ে প্রিয় ঠাঁই।
মন্দিরে শুধু হিন্দুরা নিজ বন্দ্য দেবেরে খুঁজে,

কত মন্দির মঠ দেবালয় চূর্ণ হয়েছে, তবু
তাহার লাগিয়া কোন' দেশ জাতি ধ্বংস পায় নি কভু
একটিও সাধু যে দেশে পেয়েছে লাঞ্ছনা অপমান,

আগমনী

অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য এম-এ

(১)

আজ মহাষষ্ঠীর পূর্ণ সন্ধ্যা। সানায়ের সুরে সুর-বেধ-চঞ্চল বাঙলার আকাশ মেনকার আঁখির মতো একটী পরম প্রতীক্ষা নিয়ে চেয়ে আছে। বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্যগুলার অতলস্পর্শতা ভেদ ক'রে একটি পরিপূর্ণ আবাহন ধ্বনিত হোচ্ছে—"এহি এহি, এহি!"

এই শারদীয়া বাণীর মধ্যে আগমনীর দীর্ঘ ব্যাকুলতা মূর্ত্ত হোয়ে উঠেছে। ওগো ঈপ্সিতা! ছায়া-পথে বুঝি তোমার মেখলার চকিত আভাস দেখেছিলাম; বর্ষণক্লান্ত বাদল ঋতুর শেষ মেঘ-গর্জ্জনে বুঝি তোমার রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি শুনেছিলেম;—তাই এই দীর্ঘকাল ধ'রে তোমার জন্যে নানা সুরে নানা ভঙ্গীতে এত আগমনী-সঙ্গীত ধ্বনিত হোয়ে উঠেছে! আজ শেফালীবনের শুভ্র মন্ত্রে, কাশগুচ্ছের চামর ব্যজনে, বিল্ব-চন্দনের বিল্ববরণে তোমার আগমন সম্পূর্ণ হোক। আর শিশির-শিহরিত মহাষষ্ঠী-সন্ধ্যা নিবিড় গহন কম্পিত ক'রে আহ্বান বাণী উঠুক—"এহি, এহি, এহি!"

(২)

হিমালয়ের হিম টুটেছে পাষাণ ওঠে মঞ্জরি',
সানুলতার বুকের মাঝে আদর বাজে গুঞ্জরি'।

গিরিরাজ আজকে তাঁর প্রবাসী তনয়ার অভ্যর্থনার জন্যে নববেশে তাঁর প্রাসাদ-চূড়াতে এসে দাঁড়িয়েছেন—মাথায় শুভ্র মেঘের মুকুট, দেহখানি বাষ্প-উত্তরীয়তে আবৃত, কণ্ঠে তুহিণকণার কণ্ঠমালা, আর আঁখিতে স্নেহ-চঞ্চল আহ্বান। গিরিপুরের প্রকাণ্ড অসাড়তার মাঝে আজ একটি চঞ্চলা, মুখরা, শ্রান্তিহীনা আসন্ন-মিলন-গীতিকা আহ্লাদ-সুরধুনীর কলতানের মতো বেষ্টন ক'রে বেড়াচ্ছে এই একটি পরম বাণীকে—'এহি, এহি, এহি!" পাষাণে আজ শৈত্য নাই। গিরিকন্দর থেকে আজ শত শত প্রীতি-নিঝর উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠেছে। আর গুহাশায়ী আদিম অন্ধকার গিরিবালার চরণ-ধ্বনিতে চম্‌কে উঠে তার বিশাল সুপ্তিকে ঝেড়ে ফেলে পার্ব্বত্য আনন্দের বিরাট গর্জ্জনের মধ্যে আহ্বান কচ্ছে—"এহি, এহি, এহি!"

(৩)

আজ আমাদের মধ্যে শক্তি-পূজার আরম্ভ। শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনির ভিতর আজ শক্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যজ্ঞ। কিন্তু বিশ্বশক্তির আত্মাই হোলো প্রেম। যে শক্তি জগতের মধ্যে সুষমা আনে, আর সৃজন-কৌশলে অণু-পরমাণু নিচয় অনাদি কালের গহ্বর থেকে উত্থিত হোয়ে পরস্পরের প্রীতি আকর্ষণের মধ্যে এক মহান নিখিল সঙ্গীত রচনা করে,—যে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর থেকে 'অ-সুর'কে সরিয়ে দিয়ে অনন্ত সঙ্গতির অফুরন্ত 'সুর' সৃজন করে—সেই শক্তিই বিশ্ব-আকাঙ্ক্ষার খণ্ড বেষ্টনের মধ্যে নিবিড় হোয়ে মূর্ত্ত হোয়ে শারদোৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে প্রকাশিত হোয়েছে। সৃষ্টির মধ্যে এই শক্তি পরিব্যাপ্ত হোয়ে গোপনচারিণী প্রীতি রূপে অবস্থান ক'চ্ছে। এই পরমা প্রীতির আজ জাগরণ—এই পরমা প্রীতির আজ আবাহন। হে মহামানবের চিত্ত-কুহরবাসিনী চিরন্তনী দুহিতা! আমাদের মধ্যে আজ জাগরিতা হও—আজ প্রেমের প্রচুরতার ভিতর তোমার শক্তিকে অনুভব কর্‌তে দাও। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যা-তারার আরতির মধ্যে আজ তোমাকে আমরা বরণ কর্‌ছি—

"এহি, এহি, এহি!"

যতীন্দ্রনাথ

"মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান!
*　*　*　*
*　*　*　*
মৃত্যু-অমৃত করে দান!"

আজ বাঙ্গলার একজন যুবক মরিয়া দেখাইয়া দিলেন—"মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান!"

সে মরণ কেমন? তেষট্টি দিন ধরিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন! সঙ্কল্পে অটল, প্রলোভনে অবিচলিত, প্রতিজ্ঞায় অচ্যুত,—ধীরে—অতি ধীরে প্রসারিত-বাহু বীরের মৃত্যু-বরণ! অনশনে, জলমাত্র পান না করিয়া তেষট্টি দিন ধরিয়া মৃত্যুর আবাহন! মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সঙ্কল্প সাধনের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রায়োপবেশন-ব্রত ধারণ!

বাঙ্গালী সাধক মরণকে তুচ্ছ করিয়াছেন। বাঙ্গালী কবি জীবন-মরণ লইয়া খেলা করিয়াছেন—

"রাজ্যি জুড়ে মস্ত খেলা
মরণ বাঁচন অবহেলা!
হরিবোল হরিবোল!"

আজ পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় বাঙ্গালী যুবক যৌবনের প্রথম পাদপীঠে দাঁড়াইয়া জগৎ-সমক্ষে প্রত্যক্ষে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিলেন—তেষট্টি দিন ধরিয়া মরণ-বাঁচন লইয়া খেলা করিলেন। তার পর হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে জয় করিয়া হরিবোল দিতে দিতে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়—এই অমৃতের পুত্র আমাদের যতীন্দ্রনাথ! তিনি মরিয়া দেখাইলেন—তিনি অমর—তিনি মৃত্যুঞ্জয়—তিনি অমৃতস্য পুত্রাঃ! তিনি ব্যক্তিগত রক্তমাংস-কঙ্কালময় নরজড় শীর্ণ দেহ ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতিতে অমর হইয়া রহিলেন—বাঙ্গালী জাতিকে অমর করিয়া গেলেন।

"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিল দান,
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

কবির এই উক্তি তিনি সার্থক করিলেন।

কে এই যতীন্দ্রনাথ? সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থ-ঘরের সন্তান,—কালেজের ছেলে। কিন্তু ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

বিংশ শতাব্দী ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

যতীন্দ্রনাথ দাস

যতীন্দ্রনাথ এই নবযুগের মানুষ। এ যুগের বাঙ্গালী যুবকরা প্রায় নূতন ধাতুতে গড়া। তাহারা মৃত্যু লইয়া ভাটা-খেলা করে,—হাসিতে হাসিতে ফাঁসিকাঠে চড়ে,

বন্দুকের সামনে বুক পাতিয়া দেয়। যতীন্দ্রনাথ ইহাদের সকলের সেরা—তিনি তেষট্টি দিন ধরিয়া মৃত্যু-সাধনা করিয়াছেন।

ছয় মাস পূর্ব্বে এই যতীন্দ্রনাথকে কয়জন চিনিত? তাঁহার নিজের পরিবারবর্গ, তাঁহার কলেজের সহপাঠীরা এবং—তিনি দক্ষিণ-কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন, সেইজন্য—কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট জনকয়েক লোক—ইহাই ছিল তাঁহার জগতের পরিধি। কিন্তু আজ সেই পরিধি বিস্তৃত হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের নহেন, বাঙ্গলাদেশের নহেন, ভারতের নহেন, এশিয়ার নহেন—আজ তিনি সমগ্র বিশ্বের যতীন্দ্রনাথ। নব যুগের বিশ্বের ত্যাগের ইতিহাসে—আত্মদানের ইতিহাসে তাঁহার ব্যতীত আর একজনের মাত্র নাম পাওয়া যায়—সে আয়ার্ল্যাণ্ডের ম্যাক্‌সুইনী।

যতীন্দ্রনাথ মরিলেন কেন? ভীষ্মের ন্যায় স্বেচ্ছা-মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন কেন? কিসের জন্য তিনি এইভাবে তিলে তিলে প্রাণদান করিলেন? কিসের প্রেরণায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিলেন?

সে প্রেরণা যে কত বড় মহৎ, সাধারণ মানব তাহার ধারণাই করিতে পারিবে না। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সংশ্রবে যতীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হইয়া লাহোর জেলে অবরুদ্ধ হন। জেলের ভিতর রাজনীতিক বন্দীদের প্রতি অত্যন্ত অনাচার হয়। বিশেষতঃ বিচারাধীন রাজনীতিক আসামীদের প্রতি সাধারণ দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের ন্যায় আচরণ করা হয়। ইহারই প্রতিবাদ-কল্পে যতীন্দ্রনাথ ও অপর কয়েকজন রাজনীতিক বন্দী প্রায়োপবেশন করেন। রাজনীতিক বন্দীদের প্রতি অন্যান্য দেশের ন্যায় ভদ্র ও সদ্ব্যহার করা হয়, ইহাই তাঁহাদের প্রার্থনা ছিল। এই অধিকার লাভের জন্যই যতীন্দ্রনাথের প্রায়োপবেশনে আত্মদান। কেবল নিজের জন্য নহে, কেবল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সুবিধার জন্য নহে, কোনওরূপ স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নহে—ভারতের যেখানে যত রাজনীতিক বন্দী আছে, একটা সাধারণ নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া তাহাদের সকলের প্রতিই যাহাতে সমান ও সমুচিত ব্যবহার করা হয়, এই দাবী করিয়াই যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহযোগিগণ প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। পরার্থে এই আত্মদানের সহিত কেবল দধীচির আত্মদানের তুলনা হইতে পারে।

যতীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্যে প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণ দিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই—রাজনীতিক বন্দীরা তাঁহাদের প্রার্থিত অধিকার লাভ করেন নাই। তবে কি এই আত্মদান বৃথা হইল? না—হয় নাই। এ জীবন দান সার্থক—এমন সার্থক যে পৃথিবীর আর কোথাও অপর কোন মানবের আত্মোৎসর্গ এতটা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। যতীন্দ্রনাথের এই আত্মদানে বাঙ্গলাদেশ, তথা, ভারত আজ বিশ্বের দরবারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আসন লাভ করিয়াছে—ভারত আজ বিশ্ববরেণ্য হইয়াছে—বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে—বঙ্গমাতা এমন সুসন্তান বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

যতীন্দ্রনাথ দাস বারাকপুরের সন্নিহিত ইছাপুরের দাস বংশে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দাস মহাশয় ভবানীপুরে ১৬নং প্রাণনাথ ষ্ট্রীট বাস করেন। যতীন্দ্রের পিতামহ স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় মুন্সেফী করিতেন।

ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউসন হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যতীন্দ্রনাথ সাউথ সুবার্ব্বন কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু অবিলম্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া পিতা পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পুত্র তাহাতে বিচলিত না হইয়া প্রাইভেট পড়াইয়া নিজের জীবিকার সংস্থান করিয়া দেশের কাজে নিযুক্ত থাকেন। অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন আন্দোলনও চলিতেছিল। যতীন্দ্রনাথ বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হইয়া ছয় মাসের কারাদণ্ড লাভ করেন। ছয়মাস হুগলী জেলে থাকিয়া বাহির হইয়া আসিবার পর তাঁহার পিতা আবার তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যান। যতীন্দ্রনাথ পুনরায় কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পড়াশুনা করিতে থাকেন। আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বঙ্গবাসী কলেজে বি-এ পড়িতে যান। ইতোমধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈন্যবাহিনীতেও ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ-কলিকাতা কংগ্রেস-কমিটির সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন।

প্রধানতঃ, তাঁহার চেষ্টায় দক্ষিণ-কলিকাতা তরুণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্ত্তজনের সেবা ও দুঃখ দূর করা এই সমিতির প্রধান কার্য্য ছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নবপ্রবর্ত্তিত অর্ডন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়া তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেলে, পরে মেদিনীপুর জেলে প্রেরিত হন। এখানে অত্যধিক গরমে সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া একদিন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার সহযোগী বন্দীদের শুশ্রূষায় সেবার তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। মেদিনীপুর হইতে তিনি আলিপুরে আনীত হন। তথা হইতে তাঁহাকে মৈমনসিংহ জেলে প্রেরণ করা হয়। এই জেলের কর্ত্তা লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল ও'ব্রায়েন তাঁহার অবমাননা করায় জেলের ভিতর যতীন্দ্রনাথ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ফলে যতীন্দ্রনাথ অভিযুক্ত হন, এবং প্রতিবাদে তিনিও অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। অবশেষে ও'ব্রায়েন তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে গোলযোগ মিটিয়া যায়। মৈমনসিংহ হইতে যতীন্দ্রনাথ পঞ্জাবের মিয়ানওয়ালি কারাগারে প্রেরিত হন। পরে তিনি কলিকাতায় তাঁহার নিজ বাড়ীতে অন্তরীণ হন।

মেজর যতীন্দ্রনাথ

এই সময়ে যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী পীড়িতা ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ এই ভগিনীকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি তিন সপ্তাহকাল ভগিনীর সেবা-শুশ্রূষা করিবার পর, সরকারের আদেশে চট্টগ্রামের অন্তর্গত এক গ্রামে গিয়া তাঁহাকে অন্তরীণ অবস্থায় থাকিতে হয়। এইখানে তিনি ভগিনী মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শোকে অধীর হন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে যতীন মুক্তিলাভ করেন।

গৃহে ফিরিয়া যতীন পূর্ণোৎসাহে আবার কংগ্রেসে যোগদান করেন। গত কলিকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক- বাহিনীতে তিনি একজন পদস্থ অফিসার (মেজর) ছিলেন। পরে তিনি দক্ষিণ-কলিকাতা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। বিগত ১৪ই জুন তারিখে তিনি লাহোর

ষড়যন্ত্র মামলার সংস্রবে গ্রেপ্তার হইয়া পঞ্চনদে প্রেরিত হন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বোমা নিক্ষেপের অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া শ্রীযুক্ত বটুকেশ্বর দত্ত ও শ্রীযুক্ত ভগৎ সিং জেলে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারাও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রেণীভুক্ত হন। জেলের কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের প্রতিবাদ কল্পে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম অনশন ব্রত আরম্ভ করেন। তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি জানাইবার জন্য অন্যান্য আসামীর সহিত যতীন্দ্রনাথও অনশন ব্রতীদের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য না কি বলপ্রয়োগ করা হইয়াছিল—সংবাদ-পত্রে, এবং মামলার বিচারের সময় একজন আসামীর মুখে,
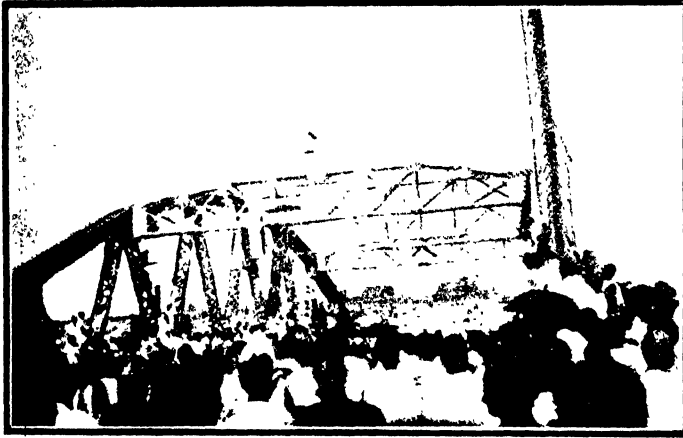
শোভাযাত্রা—হাবড়া সেতু

এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। বলপ্রয়োগের ফলে যতীন্দ্রনাথ অজ্ঞান হইয়া পড়েন ও তাঁহার নাড়ী ছাড়িয়া যায়। পরে ইন্‌জেকশন্ দিয়া ও ব্র্যাণ্ডি সেবন করাইয়া তখনকার মত তাঁহার প্রাণরক্ষা করা হয়।

দীর্ঘ তেষট্টি দিনব্যাপী অনশন ব্রত পালনকালে যতীন্দ্রনাথ যোগী-ঋষির ন্যায় নির্ম্মম চিত্তে কঠোর হস্তে আত্ম-নিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবার্থ নার্স নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। জলের সঙ্গে পাছে ঔষধ মিশাইয়া দেওয়া হয় এইজন্য তিনি শুষ্ক কণ্ঠ একটু সরস করিবার জন্য কিঞ্চিৎ জলপান করিতেও অস্বীকার করিয়াছিলেন। তপস্বীদের মধ্যেও চিত্তের এরূপ দৃঢ়তা সুলভ নহে। উপরোধ-অনুরোধ বা প্রলোভনে তিনি ব্রত ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনশন ব্রতীদের অবস্থা দেখিয়া সকলেই আশা করিতে লাগিলেন, হয় তাঁহাদের দাবীর পূরণ করা হইবে, নচেৎ এমন কোন ব্যবস্থা হইবে, যাহাতে আশ্বস্ত হইয়া অনশন-ব্রতীরা ব্রত ভঙ্গ করিয়া পুনরায় অন্ন পান গ্রহণ করিয়া শরীররক্ষা করিবেন। কিন্তু সেরূপ কিছুই হইল না। একদিকে কর্তৃপক্ষের 'প্রেষ্টিজ', অন্যদিকে অনশন-ব্রতীদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল—যতীন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে -১৩ই সেপ্টেম্বর বেলা ১টা ৫ মিনিটের সময় আত্মবলি দিলেন।

দাবানলের ন্যায় এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ ভারতময় ছড়াইয়া পড়িল। সমগ্র ভারত শোকাচ্ছন্ন হইল। একটা ঘোর বিভীষিকার অন্ধকার ভারত-বক্ষকে আবৃত করিল। দোকান-পাট বন্ধ হইল। ভারতবর্ষ শোক বেশ ধারণ করিল।

মৃত্যুকালে যতীন্দ্রনাথ লাহোর বোর্ষ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটের হাসপাতালে ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দাস দাদার শয্যাপার্শ্বে বরাবর ছিলেন। মৃত্যুকালে জেলকর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য লোক যতীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত ছিলেন।

অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটার সময় জেল-কর্তৃপক্ষ যতীন্দ্রনাথের মৃতদেহ ডিফেন্স কমিটির হস্তে অর্পণ করেন। তৎকালে জেলের ফটকের নিকটে লাহোর সহর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল বলিলেই হয়। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই বাঙ্গালী যুবক ভীষ্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলিয়া শবাধার বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক বিরাট মিছিল করিয়া শবযাত্রা করা হয়। পথিপার্শ্বস্থ গৃহসমূহ হইতে পুরনারীরা শঙ্খধ্বনি করিয়া, লাজ ও পুষ্প বর্ষণ করিয়া শব-সম্বর্দ্ধনা করিতে থাকেন। এক মাইল দীর্ঘ মিছিল তিন ঘণ্টা সময়ে সহর পরিক্রম করিয়া রাত্রি নয়টার সময় নগরপ্রান্তে একটি ময়দানে উপস্থিত হয়। সেখানে একটি সভা হইয়াছিল।

শোভাযাত্রা

সভার পর শবাধার রেলওয়ে সাইডিংএ রক্ষিত এই বিশেষ গাড়ীতে আনিয়া রাখা হয়। শ্রীযুক্ত কিরণ দাস ও পঞ্জাবী নেতৃগণ সেই গাড়ীতে শব আগুলিয়া রহিলেন! এই পারিপার্শ্বিকের কল্পনা করিয়া বাঙ্গালী কবি গাহিলেন—

"শব-সাধনার সেই ত সময় ; তার আগে—সে কি হয় ?
বন্ধু, তোমরা ফিরে' যাও ঘরে, মনে যদি লাগে ভয়।"

সে রাত্রে আর ট্রেন না থাকায় শনিবার প্রাতে ৬-৪০ মিনিটের ট্রেনে একখানি বিশেষ গাড়ীতে করিয়া শবাধার কলিকাতায় আনীত হয়।

পথিমধ্যে প্রত্যেক ষ্টেসনে—দিন নাই, রাত নাই যখন যে সময়ে ট্রেন যে ষ্টেসনে পৌছিয়াছে তখন সেই ষ্টেসনে—অসংখ্য নরনারী মৃতের প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে, শবাধারের উপর পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়াছে। বহু স্থানের বহু সংবাদপত্র বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া এই সংবাদ জনসাধারণকে জানাইয়াছে। শব কলিকাতায় পৌছাইয়া দিবার জন্য একদল পঞ্জাবী নেতা শবের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। ট্রেন যতক্ষণ যে প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল, সেই প্রদেশের একদল করিয়া পুলিশ প্রহরী ট্রেনে শবরক্ষীরূপে গমন করিয়াছিল।

শনিবার দিবারাত্রি এবং রবিবার সমস্ত দিন পথে থাকিয়া রাত্রি সওয়া আটটার সময় ট্রেন হাবড়া ষ্টেসনের ১নং প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই শবদেহের সম্বর্দ্ধনার জন্য ষ্টেসনে জনসমাগম আরম্ভ হয়। ট্রেন যখন আসিয়া পৌছিল তখন প্ল্যাটফর্ম্ম ও ষ্টেসনের সন্নিহিত সমুদায় স্থান এক বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। দলে দলে ছাত্রগণ, বিশেষতঃ, যতীন্দ্রনাথ যে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন সেই কলেজের ছাত্রমণ্ডলী রাশি রাশি পুষ্পমাল্য সহ ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেই বিশাল জনতার ভিতর দিয়া ট্রেন হইতে শবাধার বাহির করা সহজ হয় নাই। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বহু চেষ্টায় সমবেত নেতৃগণের সাহায্যে শবাধার বাহির করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে নামানো হইল। বঙ্গবাসী কলেজের ছেলেরা শবাধার স্কন্ধে করিয়া ক্যাব-রোড দিয়া বাকল্যাণ্ড ব্রিজের উপর দিয়া হাবড়া টাউনহলে লইয়া গেল। হাবড়া টাউনহল তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল—সমস্ত রাত্রি সহস্র সহস্র লোক ও মহিলা একবার করিয়া শবাধার দর্শন ও স্পর্শন করিয়া যাইতে লাগিল। নরনারী-নির্ব্বিশেষে বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী জাতি যে বীরত্বের মর্য্যাদা রাখিতে শিখিয়াছে তাহা দেখাইয়াছে মৃত্যুজয়ী বীর যতীন্দ্রনাথ। সে শব কেহ দেখিল না,—দেখিল ও স্পর্শ করিল শবাধার,—পুষ্পমাল্যে পূজা করিল শবাধারের। তাহাতেই তাহাদের কত তৃপ্তি!

সোমবার প্রভাত হইতেই শব-সৎকারের আয়োজন। সে আয়োজন জাতীয় বীরের উপযুক্তই হইয়াছিল। যে যে পথ মিছিলের যাত্রার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, পুলিশ কমিশনার শনিবারেই বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন যে ঐ সকল পথে সোমবার প্রাতঃকাল হইতে কোন যান-বাহন যাতায়াত করিবে না। সেইজন্য ঐ দিন ঐ সকল পথে কোন গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, বাস বা ট্রাম যাতায়াত করে নাই; কিন্তু হাবড়ার টাউন হল হইতে ভবানীপুরের কেওড়াতলার ঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত পথ এক নিরবচ্ছিন্ন বিশাল নরমুণ্ড-সমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল; কারণ, ঘনীভূত জনতার মধ্যে মুণ্ড ব্যতীত দেহের অবশিষ্ট অংশ দেখা যাইতেছিল না। এই জনসমুদ্রে নরনারীর ভেদ ছিল না, জাতিধর্ম্মের ভেদ ছিল না, বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর ভেদ ছিল না। সহস্র সহস্র নারী, সহস্র সহস্র জননী ভগিনী বাঙ্গলা মায়ের এই সুসন্তানকে বরণ করিবার জন্য শবযাত্রার মিছিলে যোগদান করিয়াছিলেন। দেড় মাইল দীর্ঘ মিছিল হাবড়া হইতে ভবানীপুরে পৌছিতে ছয় ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

যতীন্দ্রনাথের পিতা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দাস মহাশয় সাহিত্যসেবী। তাঁহার প্রথম সাহিত্য-রচনা—একটি ছোট গল্প। পুস্তিকাখানির নাম "শ্মশান"। তখনও যতীন্দ্রনাথ হয় ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। গল্পটি কি কেওড়াতলার শ্মশানকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল? তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আজ তিনি কেওড়াতলার শ্মশানে বিশ্বজয়ী বীর পুত্রের শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আজ তাঁহার 'শ্মশান' লেখা সার্থক হইল।

যতীন্দ্রনাথ সামরিক জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন—পেশাদার নহে বটে, তথাপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈন্যবাহিনীভুক্ত বলিয়াও বটে; স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীভুক্ত বলিয়াও বটে। অতএব শ্মশানে শবাধার হইতে তাঁহার শব বাহির করি

শোভাযাত্রা—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট

বেদীর উপর স্থাপন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সামরিক প্রথায় অভিবাদন অতি সঙ্গত ও সময়োচিত হইয়াছিল।

একদিন স্বর্গীয় সি, আর, দাসের চিতা বক্ষে ধারণ করিয়া এই শ্মশান পবিত্র হইয়াছিল। আরও কত কত বাঙ্গালী-প্রধানের নশ্বর দেহ এই শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়া ইহার পবিত্রতা বর্দ্ধন করিয়াছে। আজ যতীন্দ্রনাথের পূত শব বক্ষে ধারণ করিতে পাইয়া এই কেওড়াতলার শ্মশান স্বর্গ হইয়া গেল।

যতীন্দ্রনাথের ন্যায় সন্তানের জনক হইতে পারিলে আজ কোন্ বাঙ্গালী আপনাকে ভাগ্যবান মনে না করিবে?

যতীন্দ্রনাথ, তুমি যুবক, যুববঙ্গের তুমি আদর্শ। যতীন্দ্রনাথ, তুমি মর নাই, তোমার মরণ নাই। তোমার জড়, মর, নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু তুমি সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে অমর করিলে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতিতে তুমি অমর হইয়া রহিলে। তোমার মৃত্যু শ্লাঘ্য মৃত্যু! আমরা আজ গৌরব বোধ করিতেছি—যতীন্দ্রনাথ যে জাতি আমরাও সেই বাঙ্গালী জাতি। তোমার ন্যায় মরিবার সৌভাগ্য লাভ করিলে কোন্ বাঙ্গালী না আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিবে?

অভিসার

রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

কুঞ্জে কুঞ্জে মঞ্জু কুসুম ফুটল শোহন রাশি রাশি,
জলদ মুক্ত জোছনা যামিনী উরল গগনে হাসি হাসি।
মালতী বকুলে অলিকুল হের গুঞ্জরে,
নব মল্লিকা পুলকে শিহরি মুঞ্জরে,
বিজন সাঁঝে বাশরী বাজে যমুনা তীরে;
নীপশাখা ওই ছায়া বিছায়েছে উছল নীরে।
পবন কাহার অঙ্গ পরশ-সুরভি বহিয়া আনে ধীরে?
মর্ম্মরি পাতা ও কা'র কথা কহিছে গোপনে ফিরে ফিরে?
চারিদিকে চাহি চাকিতে কাহার সন্ধানে?
পরাণের মাঝে কার বাঁশী বাজে মন গানে।
চিত্ত চঞ্চল চরণ অচল এলায় দেহ।
অভিসারে যাব কেমনে আজিকে বল না কেহ?

সমীরণ কভু কুসুমে এমন দোদুল দোদুল দেয় দোলা?
চাঁদিনী যামিনী আকাশ ভুবন এমন কভু কি করে আলা?
মুখর ময়ূর শিখরে ষড়জে গান করে!
রমণীর দল যমুনায় আসে ভান করে!
সহসা নয়নে জল আসে কেনে কিসের তরে?
(মোর) সকল অঙ্গ শিহরি উঠে গো পুলক ভরে।
পরাণ কহিছে বঁধুয়া আসিল কেতকীনীপ বন মাঝে;
কিশোর বয়েস পিরীতি-মূরতি বিরাজে মোহন নটরাজে।
মোর পথ চেয়ে কুঞ্জ দুয়ারে বঁধুয়া আজ,
মন্দির তেজি অভিসারে যেতে সহে কি ব্যাজ?
মুখর নূপুর বসনে ঝাঁপিয়া কাঁকণ খুলি,
পিচ্ছল পথে অঙ্গুলি চাপি আয় গো চলি।

সন্তরণ-বীর প্রফুল্লকুমার, ও রবি চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষের সন্তরণ-নৈপুণ্যের পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই একবার দিয়াছি। এই বাঙ্গালী যুবক সম্প্রতি তাঁহার অদ্ভুত সন্তরণ-কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া সহস্র সহস্র দর্শককে বিস্মিত, চমকিত, চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। গত ২৯এ ভাদ্র, ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে

শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

...টা হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন রবিবার বেলা ১০টা ...মিনিট পর্য্যন্ত ২৮ ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত ভাবে হেদুয়া ...তে তিনি সন্তরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ...ত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে হেদুয়া পুষ্করিণী ২৭৮ বার পারাপার ... ইহার মধ্যে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম করেন নাই। এই ২৮ ঘণ্টাব্যাপী সন্তরণে তিনি ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করেন নাই। প্রথমবার তিনি ২ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ডে একবার পুষ্করিণীর এ-পার হইতে ও-পারে গমন করেন। এইভাবে একই গতিতে চারি ঘণ্টা সন্তরণ করিবার পর তাঁহার গতি সামান্য মন্দীভূত হয়; কিন্তু সন্তরণে বিরাম ছিল না। সন্তরণ করিতে করিতে তিনি লোকজনের সহিত রহস্যালাপ করিতে থাকেন, ক্ষুধা পাইলে সন্তরণ করিতে করিতেই আহার করেন। আহারের জন্যও তিনি সন্তরণে ক্ষান্ত হয়েন নাই। হেদুয়া পুষ্করিণী দৈর্ঘ্যে ১৬০ গজ; সুতরাং ২৭৮ বারে তিনি মোট ২৫ মাইলের অধিক সন্তরণ করিয়াছেন।

এই অষ্ট প্রহরাধিক কালব্যাপী সন্তরণ সফল করিবার জন্য গীত-বাদ্যের প্রচুর আয়োজন ছিল। হেদুয়া পুষ্করিণীর সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের উদ্যোগে এই সন্তরণের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ক্লাবই গীতবাদ্যের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সমস্ত ক্ষণ সুমধুর রাগিণীতে সানাই বাজিয়াছিল। রজনীতে পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক দীপাবলীতে সজ্জিত হইয়াছিল। শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে সাহানা-পূরবী-রাগিণী-মুখরিত সানাইয়ের বাদ্য-তরঙ্গে সুমিষ্ট তান-লয়-সঙ্গত সঙ্গীতের সঙ্গে সমান তালে অবিরাম সন্তরণ করিয়া প্রফুল্লকুমার যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা আধুনিক তরুণ বঙ্গ-জীবনে সুদুর্লভ।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের উদ্যোগে খড়দহের ঘাট হইতে আহারীটোলার ঘাট পর্য্যন্ত যে ত্রয়োদশ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, প্রফুল্লকুমার তাহাতে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। পর বৎসরও প্রফুল্লকুমার এই ত্রয়োদশ মাইল পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা নয় মিনিট কম সময়ে অতিক্রম করেন। ঐ বৎসর দ্বাবিংশ মাইল সন্তরণে প্রফুল্লকুমার প্রথমের সহিত প্রায় সমান সময়ে আসিয়াছিলেন; বিচারে তিনি

সেবার দ্বিতীয় স্থানে স্থাপিত হন। এইরূপে বহু প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া প্রায় প্রতিবারই তিনি সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন। প্রফুল্লকুমার এখন বোম্বাই সন্তরণ সমিতির সন্তরণ শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

হেদুয়ায় সন্তরণ শেষ করিয়া প্রফুল্লকুমার যখন তীরে উঠিয়া আসিলেন, সহস্র সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত জয়ধ্বনির মধ্যে হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় সাহায্যে চিৎ সাঁতার কাটিয়া চারি ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল সন্তরণ করিয়া গঙ্গা, যমুনা ও টোন্স নদীর ত্রিস্রোতা সঙ্গমস্থলের নিকটবর্ত্তী নেজা রোডে তীরে উঠিয়া পড়েন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ছয়খানি নৌকা তাঁহার সঙ্গে ছিল। সন্তরণ করিতে করিতে তিনি লুচি, কচুরী, রসগোল্লা প্রভৃতি ভক্ষণের পর তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে ও লোকজনের সহিত গল্প করিতে করিতে গমন করেন। ইতঃপূর্ব্বে
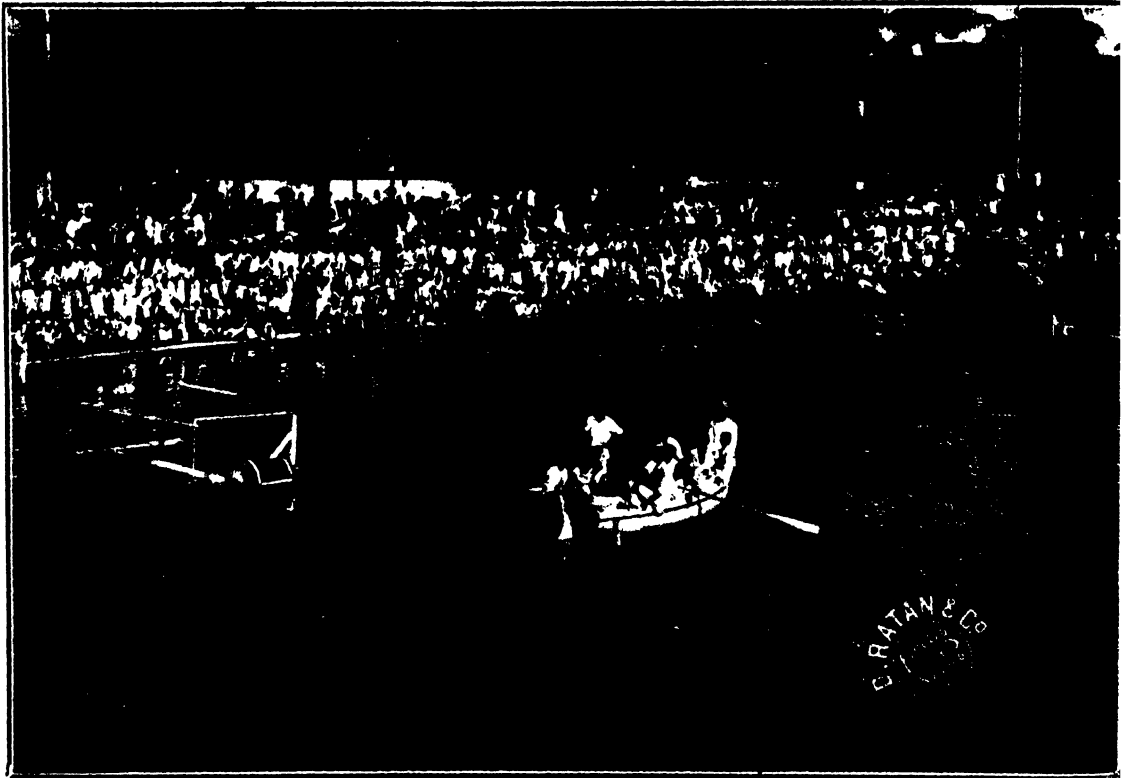
হেদোপুকুরে সন্তরণ

বিজয়ী বীরের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লয়েন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বাঙ্গালী যুবকের সন্তরণ-পটুতাও উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান রবি চট্টোপাধ্যায়কে গত ১লা সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে নয় ঘটিকার সময় হস্ত-পদ-বদ্ধ অবস্থায় দুর্গের নিম্নে যমুনা নদীতে নামাইয়া দেওয়া হয়। নদীতে স্রোত অতি প্রবল ছিল। তদ্ব্যতীত যমুনা নদীর ঐ অংশ কচ্ছপ, হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্র জলজন্তুতে পূর্ণ। এমন অবস্থায় শ্রীমান রবি চট্টোপাধ্যায় কেবল মাথার শ্রীমান রবি চট্টোপাধ্যায় কানপুর হইতে সন্তরণ আরম্ভ করিয়া ৩৭ ঘণ্টায় ১২০ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন।

প্রফুল্লকুমারের দীর্ঘ সময় সন্তরণ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া শ্রীমান পুষ্করচন্দ্র বাগ্‌চি ও অপর কোন কোন সন্তরণকারী সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করেন যে, শ্রীমান প্রফুল্লকুমার যেমন ২৮ ঘণ্টাকাল সন্তরণ করিয়াছেন, শ্রীমান পুষ্কর বাগ্‌চি তদ্রূপ ৩২ ঘণ্টাকাল সন্তরণ করিবেন। শ্রীমান প্রফুল্লকুমার সংবাদ-পত্রে এই প্রতিযোগিতায় আহ্বান পাঠ করিয়া

একাদিক্রমে ৫০ ঘণ্টাকাল সন্তরণ করিবার সামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া শ্রীমান পুষ্করচন্দ্রের আহ্বান গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতিশ্রুতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইলে শ্রীমান পুষ্করচন্দ্রও ৫০ ঘণ্টাকাল সন্তরণ করিতে সম্মত হন।

এই প্রতিযোগিতার মর্ম্ম এই দাঁড়াইল যে, কে কতক্ষণ জলে থাকিয়া সন্তরণ করিতে পারেন, কেবল তাহারই পরীক্ষা হইবে; দৈর্ঘ্য হিসাবে কে কত দূর সন্তরণ করিতে পারেন, সে প্রশ্ন উঠিবে না।

শ্রীমান পুষ্করচন্দ্র বাগচি কাশীতে থাকেন। সেইখানে সংবাদ-পত্রে শ্রীমান প্রফুল্লকুমারের সন্তরণ-বার্ত্তা পাঠ করিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। শ্রীমান পুষ্করচন্দ্রের বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। ইনি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ২৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। শ্রীমান পুষ্কর বাগচি, শ্রীমান রবি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ করিবার অভিপ্রায় আছে। শ্রীমান প্রফুল্লকুমারের সহিত শ্রীমান পুষ্করের যে প্রতিযোগিতা হইবে, কলিকাতা পটলডাঙ্গার গোলদীঘির সন্তরণ-সমিতি পুষ্করচন্দ্রের গোলদীঘিতে সন্তরণের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; এবং বোধ হয় সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব পূর্ব্ববৎ হেদোয় শ্রীমান প্রফুল্লকুমারের ভার গ্রহণ করিবেন।

এই দীর্ঘ সময় সন্তরণের প্রবর্ত্তক কিন্তু মিঃ এস, আমেদ। তিনিই প্রথমে ওয়েলেস্‌লী স্কোয়ারে একাদিক্রমে ২৬ ঘণ্টাকাল সন্তরণ করিয়া পথ প্রদর্শন করেন; এবং তাহাতে উৎসাহিত হইয়া শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ২৮ ঘণ্টাকাল সন্তরণ করেন।

এই সকল যুবক যে বাঙ্গালী জাতির গৌরব, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

সন্তরণ শেষে প্রফুল্লকুমারকে অভিনন্দন ও মাল্যদান

শোক-সংবাদ

অধ্যাপক ৺কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গত ১৩৩৬, ২৮এ ভাদ্র শুক্রবার প্রাতে নয় ঘটিকার সময় বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যক্ষ—অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর ... পরিচয়ের পরেই গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর মহাশয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসনের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। সেই হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৪৫ বৎসর ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। শেষ বয়সে তিনি কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত পণ্ডিত-প্রধান হরিনাভি

উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ হৃদ্যতা ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েক বৎসর রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গ্রামের বহু উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ

৺কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভট্টাচার্য্য এম-বি কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় পরিচালন করেন। তিনি সুযোগ্য চিকিৎসক। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের পরিবারবর্গের শোকে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।
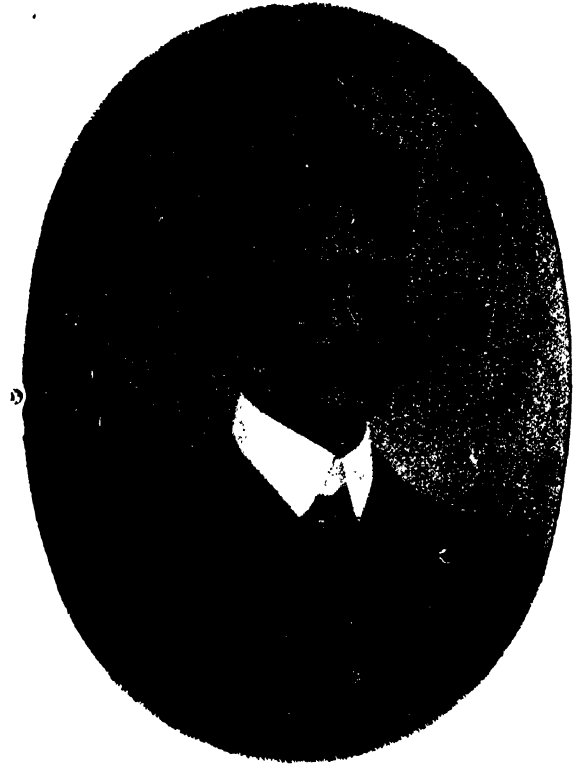
৺জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পূর্ণিয়ার গৌরব, বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালী-শ্রেষ্ঠগণের অন্যতম রায় জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাহাদুর এম-এ, বি-এল-এর অকালে পরলোক গমনে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। জ্যোতিষচন্দ্র আমাদের পরম আদরের পাত্র ছিলেন। তিনি অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ণিয়ার শ্রেষ্ঠ উকীল হন। বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের নির্ব্বাচনে তিনি উক্ত প্রদেশের কাউন্সিলের সদস্য হন। জ্যোতিষচন্দ্র ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 'ভারতবর্ষে'র একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সুবক্তা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার আর একটী বিশেষ গুণ ছিল এই যে, তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; এবং বিহার-প্রবাসী হইলেও তিনি তাঁহার জন্মভূমি

৺জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যশোহর জেলার হরিশঙ্করপুরের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার পিতা ও মাতার স্মৃতি রক্ষার জন্য তিনি তাঁহার জন্মস্থানে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রিয়দর্শন, স্বদেশ ও স্বজন-হিতৈষী, পর-দুঃখ-কাতর ব্যক্তির অকাল-বিয়োগে আমরা সুহৃদ-বিয়োগের শোক পাইয়াছি। ভগবান তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের গভীর শোকে শান্তিদান করুন।

৺সুরেন্দ্রনাথ রায়

গত ২০এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার প্রাতে সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় শ্রদ্ধেয় ৺সুরেন্দ্রনাথ রায় ইন্‌কমট্যাক্স অফিসর মহাশয় তাঁহার পরিবারবর্গ ও সহকর্ম্মিবৃন্দকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অতি অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসে ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত দক্ষিণ পাইকসা গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ হইতে সগৌরবে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতায় আসেন এবং স্বীয় প্রতিভা, সততা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এই উচ্চ সরকারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের একজন প্রিয় শিষ্য ও ছাত্র ছিলেন। গুরুদেবের ন্যায় ইঁহারও চরিত্রে সর্ব্ববিধ মহত্ত্বের বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান, দয়ালু ও অমায়িক লোক অতি বিরল বলি[লে] অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ন্যায় সজ্জনের অভাব

৺সুরেন্দ্রনাথ রায়

আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছি ও তাঁহার শো[ক]সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞা[পন] করিতেছি।

সাময়িকী

এবারে সাময়িক ঘটনার মধ্যে যেগুলি প্রধান, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হরবিলাস সরদা মহাশয়ের বিবাহ নিয়ন্ত্রণ বিল। বহুদিন রাষ্ট্রীয় পরিষদে ঘোরা ফেরার পর বিলখানি সিলেক্ট কমিটির হাতে পড়ে। কিছুদিন পূর্ব্বে সিলেক্ট কমিটীর সদস্যগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া, বিলখানির সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়া পরিষদে উপস্থাপিত করেন। বলা বাহুল্য যে, এই বিল লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে, অনেক মতভেদও হইয়াছে; বিলের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা কাটাকাটি, অনেক শাস্ত্রের নজীর, অনেক দেশাচার লোকাচারের বিবৃতি হইয়াছিল। যাঁহারা বিলের স্বপক্ষে, তাঁহারা দেশব্যাপী আন্দোলনও করিয়াছিলেন। দেশের সনাতনী দল বিলের বিরুদ্ধাচরণও যথেষ্ট করিয়াছিলেন; তাঁহারা সিমলায় পর্য্যন্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তবে, বিলের স্বপক্ষে জনমতের প্রাবল্য দেখিয়া আমরা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এই বিবাহ-নিয়ন্ত্রণ বিল আইনে পরিণত হইবে। এতদিন পরে তাহাই হইয়াছে; সেদিন রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে অধিকা[ংশ] সদস্যের ভোটের জোরে বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। [বিলের] বিলের স্বপক্ষে ৬৭ ভোট ও বিপক্ষে মাত্র ১৪ ভো[ট] হইয়াছিল। এখন আর এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করি[য়া] কোন লাভ নাই।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের গোলমাল কো[ন] রকমে চাপা দেওয়া হইয়া গিয়াছে; কলিকাতায় আপাত[তঃ] ছাত্রগণকে লইয়া কোন হাঙ্গামা পোহাইতে হইতেছে না, কিন্তু উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুরে ছাত্র-গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুর যখন রঙ্গপুরে পদার্প[ণ] করেন, তখন ওখানকার কলেজের ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করি[য়া] লাটসাহেবের সংবর্দ্ধনায় যোগদান করে নাই। এই উপলক্ষে কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় কয়েকটী ছাত্রকে গুরুদণ্ড প্রদা[ন] করেন, কয়েকজনকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দেন। এ[ই] কারণে কলেজের ছাত্রগণ উত্তেজিত হইয়া কলেজে যাওয়া বন্ধ করেন। কয়েকদিন [illegible]

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা করিয়া দেন, ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট ত্যাগ করেন। তাহার পরেই কলেজের কয়েকটী ছাত্র ও অপর দুই একজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে। অভিযোগের মর্ম্ম এই যে, গবর্ণরের আগমন উপলক্ষে যে দরবার হয়, সেই দরবার হইতে ওখানকার সরকারী উকিল মহাশয় যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন ছাত্রেরা তাঁহার মোটর আটক করে, তাঁহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে এবং তাঁহার মোটরের কাচ ভাঙ্গিয়া দেয়। সুতরাং ছাত্র-গোলযোগ আবার এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। ফল যে কি হইবে, তাহা এখনও জানা যাইতেছে না।

ডি হ্যাভিলাণ্ড ফ্লাইং স্কুলে যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র শিক্ষা-লাভ করিতেছেন, তাঁহারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। জানা গেল যে, ইঁহাদের মধ্যে তিন জন ইতিমধ্যেই "এ" শ্রেণীর সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বিমান-বিভাগের ভাইস মার্সাল স্যার সেপ্টন বেঙ্কার ইঁহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন; তিনি ইঁহাদের বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বিমান-বিদ্যা যে-ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতীয় ছাত্রগণ বিমানপোত চালনা করিতে পারিবে। ভারতীয় দলের মধ্যে মিঃ কাভালীর নাম আজ ঘরে ঘরে উচ্চারিত হইতেছে। তিনিই সর্ব্ব-প্রথম লণ্ডন হইতে ভারতে একখানি Mono Planeএ করিয়া আগমন করিতেছেন। করাচীতে আসিয়া তিনি ভারতের মাটীতে পদার্পণ করিবেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হইতেছে। ভারতীয় বিমানবীরের এই প্রথম উদ্যম ভগবান জয়যুক্ত করুন।

ধনকুবের রকফেলারের ট্রাষ্টিগণের নিকট হইতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ৭ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১ কোটী টাকা দান স্বরূপ পাইয়াছেন। ইহার মধ্য হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন লাইব্রেরীটির জন্য আড়াই লক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এই লাইব্রেরীর পরিকল্পনা করিয়াছেন সার গিলবার্ট স্কট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় এই দানের ব্যাপারকে বিস্ময়কর দান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দান করিয়া যাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য সার তারকনাথ পালিত এবং সার রাসবিহারী ঘোষ। উভয়েই আইন ব্যবসায়ে আপন আপন প্রতিভা বলে আশাতীত যশঃ এবং অর্থ লাভ করিয়াছিলেন এবং উভয়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দানের ফলেই আজ আপার সার্কুলার রোডে সায়েন্স কলেজের বিরাট অট্টালিকা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিলাতের এই সকল দানের নিকট আমাদের দেশের দাতাদিগের দান সমুদ্রের নিকট শিশির-বিন্দু বলিয়া মনে হয়; তবে আয়ের দিক দিয়াও ইহাদের মধ্যে ঐরূপ তফাৎ রহিয়াছে এ কথাও ভুলিলে চলিবে না।

ভারতবর্ষের নিরক্ষরতা দূর করিতে সরকার কি করেন—সে কথা উল্লেখ না করিয়া দেখাইতেছি, ভারতবর্ষের মোট লোক-সংখ্যা ৩১৮, ৯৪২, ৪৮০র মধ্যে মাত্র ২২, ৬২৩, ৬৫১ লোক লিখিতে-পড়িতে জানে। যাহারা একেবারে বর্ণজ্ঞানহীন, নামটিও যারা লিখিতে পারে না, তাহাদের সংখ্যা ২৯৬, ৩১৮ ৮৩০ অর্থাৎ ভারতবর্ষের উনত্রিশ কোটি ত্রিষটি লক্ষ আঠার হাজার আট শত ত্রিশ জন নর নারী বর্ণ-জ্ঞান-হীন—তাহাদের অক্ষর পরিচয়ও নাই। যে দুই কোটি ছাব্বিশ লক্ষ তেইশ হাজার ছয় শত একান্ন জন লোক লিখিতে-পড়িতে পারে বলিয়া সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ, তন্মধ্যে এমন লেখা-পড়া জানা লোকও আছে যারা কেবল মাত্র কোন প্রকারে নামটি সহি করিতে পারে। সুতরাং সত্য সত্য লেখা পড়া জানে, অন্ততঃ সামান্য বই পড়িতে পারে,এমন লোকের সংখ্যাও যে উপরিউক্ত সংখ্যার ঢের নীচে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এমনি যে দেশের অবস্থা সে দেশের সরকার, সরকারী তহবিলের ৫৫ কোটির উপরে টাকা ব্যয় করেন সৈন্য পোষণ জন্য—আর শিক্ষার জন্য জন-প্রতি এক আনা দুই আনা ব্যয় করিয়া সরকার তহবিল শূন্য বোধ করেন। সুতরাং এদেশে শিক্ষা বিস্তার কেমন করিয়া হইবে?

সেদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সম্মিলন' প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ৫৪ বৎসর বয়সপ্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দিত

করেন। এই অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—

অনেক দিন পূর্ব্বে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান সাহিত্যের ভাবধারা সম্বন্ধে একটু কঠোর ভাবেই তাঁহার মতামত প্রকাশ করেন। তদুত্তরে আমি মাসিক "বঙ্গবাণী"তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। ইহাতে আমি রবীন্দ্রনাথের ঠিক প্রতিবাদ করি নাই, বরং সবিনয়ে তাঁহাকে জানাই—তরুণ সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যতটা বলেছেন ঠিক ততটাই সত্যি কি না?

কিন্তু তাতে অনেকে বল্লেন, আমি যতটা বলেছি, ততটা বলা ঠিক হয় নি। সে যাক, তার পর বিভিন্ন মাসিকে বহু সাহিত্য রচনা প্রকাশিত হয়েচে। সে সব আমি প'ড়েছি। তাই আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে যে এ জিনিষটা অত্যন্ত গ্লানির বস্তু হয়ে উঠচে।

আমি ছেলেদের ভালবাসি, এবং আমার বিশ্বাস ছেলেরাও আমাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে! কিন্তু এ কথা অস্বীকার করতে পারছি না যে, তারা বর্ত্তমানে যে সাহিত্য গড়ে তুল্‌চে, তাতে রস থাকে না, গ্লানি থাকে।

অবশ্য যৌবনে যা ভাল লাগে বার্দ্ধক্যে তা লাগে না, যৌবনের ধর্ম্ম আলাদা, চিন্তা আলাদা, কর্ম্ম আলাদা, কিন্তু এ ধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করতে হ'লেও মনশুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে চাই। তাই ভেবেছিলাম, তরুণগণ শুদ্ধ মন নিয়ে আন্তরিক ভাবে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হবে।

কিন্তু আজ এক বৎসর পরে আমার পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তিত হ'য়েচে; মন তিক্ত হ'য়ে উঠেচে। আজ চোখ মেলে চাইলেই দেখা যায় মানুষের যত বৃত্তি আছে, তার মাত্র একটিরই বার বার আবৃত্তি এঁরা করেচেন। আমি এ বিষয় তরুণ সাহিত্যিকদের কাউকে কাউকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাতে তাঁরা বলেছিলেন, "আমাদের অন্য কোন scope নেই, অন্য কোন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র আমরা পাই না।"

আমি তার প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম—এ সমাজে অনেক দুঃখ-ক্রটী আছে সত্য, কিন্তু এ জীবনে আরও বেদনা আছে। তা কি তোমরা দেখতে পাও না? আমাদের পরাধীনতা, অজ্ঞতা বা দারিদ্র্যের বেদনা কি তোমাদের প্রাণে জাগে না? আর সমাজেও ত অন্যবিধ গ্লানি আ তারও ত কৈ কোন আলোচনা হয় না? তোমাদের সা আছে মানি, কিন্তু যে স্থানে সাহস প্রকাশে বিপ সম্ভাবনা আছে, সেদিকে যেন তোমরা সমস্তই অস্বীক করে চল।

তার উত্তরে তাঁরা বল্লেন—ওসব দিক্ সাহিত্যের ন তাছাড়া আমরা ওসব পারিও না।

আমাকেও তাঁরা বলেছিলেন যে, আমি অন্য কা যাওয়ায় নাকি সাহিত্যের ক্ষতি হচ্ছে। অবশ্য কিছু ক্ষ হয়ত হয়েছে। কিন্তু আমার দিনও শেষ হয়ে গেছে তোমরা তরুণ, তোমরা এদিকে অগ্রসর হওনা কেন আমার ত অন্য দেশের সাহিত্য কিছু কিছু পড়া আছে তাতেও দেখ্‌তে পাই, শুধু একটী দুঃখ বা একটি সমস্যা ন সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন দিকের, বিবিধ সমস্যার আলোচ তাঁরা তো বেশ প্রাণস্পর্শী ভাবেই করে গেছেন। তোমর বা পারবে না কেন? আমার এ অনুরোধ তাঁরা মান্‌ কি না জানিনে, কিন্তু আজ যাঁরা এখানে সমবেত আছে তাঁদের আমি বল্‌ব—আজকাল যে সাহিত্য হচ্ছে তা সত খারাপ হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যত কড়া করে এ কথা ব ছিলেন, তত কড়া করে বল্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। থাকলে সেরূপ ভাবেই আমি তার নিন্দা করতাম। সম্বন্ধে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে কতিপয় তরুণী আমা বলেছিলেন—"দুঃখের বিষয় আমরা লিখতে পারিনে যদি পারতাম তাহলে দেখাতাম, এই সকল গল্প পড় আমাদের কত লজ্জা ও অপমান বোধ হয়!" তাঁ আমাকে এ অনুরোধও জ্ঞাপন করলেন যে, আমি যেন সম্বন্ধে সকল তরুণকে সাবধান করে দি।

গত এক বৎসর তরুণদের সকল লেখা পড়ে আমার ধারণা হয়েছে তাতে তাঁদের নিকট আমার বিনীত অনুরো এই যে, তাঁরা প্রকৃত রসবস্তু কি তা লিখ্‌তে চেষ্টা করুন অবশ্য তাঁদের ভাষা ও বর্ণনার ভঙ্গী খুব উঁচু দরের। আমা তো মনে হয়, আমাদের অনেকের চেয়েই এঁদের লেখা ভঙ্গী ঢের ভাল। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যে রসবস্তু থাকলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাঁদের সংযমের সী অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, যে সাহস দেখালে শা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেদিকে সাহস দেখালেই এঁদে

ত্ব প্রকাশ পেত। কিন্তু তা হচ্ছে না। যেন অনেকটা দর বশেই তরুণরা সাহিত্য রচনা করেছেন। এ কথা ীকার করা যায় না যে, তাঁরা সীমা অতিক্রম করে ছেন।

আশ্বিন মাসের 'ভারতবর্ষে'র সাময়িকী-প্রসঙ্গে শঠীর ন্ধে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বিবরণ ঠ করিয়া অনেকেই শঠীর কলের সন্ধান জানিবার জন্য মাদের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। সমস্ত পত্রের পৃথকভাবে র না দিয়া আমরা নিবেদন করিতেছি, যাঁহারা এ সম্বন্ধে শষ বিবরণ অবগত হইতে চান, তাঁহারা যশোহর কোম্ ক্টরীর কর্ম্মকর্ত্তা, জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ষ মহাশয়ের সহিত পত্র-ব্যবহার করিলে সমস্ত বিবরণ গত হইতে পারিবেন। এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে যে মাদের দেশের লোকের জানিবার আগ্রহ জন্মিয়াছে, হাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্কুল ও লেজের ছাত্রদিগের মধ্যে যথাক্রমে বাধ্যতামূলক ব্যায়ামচর্চ্চা সামরিক শিক্ষা প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব াস্থাপিত করেন। অধিকাংশ সভ্যের মতে প্রস্তাবটী রগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত য়াছি। কাপুরুষ ভীরু বাঙ্গালী বলিয়া আমাদের কটা দুর্নাম আছে। কিন্তু প্রয়োজন কালে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ হইয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। সেই বাঙ্গালীর অভাব খালি শিক্ষার। উপযুক্ত ব্যায়াম ও শিক্ষা থাকিলে বাঙ্গালী অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীন হইতে পারে না। সেই হেতু ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবটী গৃহীত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তবে এই আনন্দের পরিসমাপ্তি বিষাদ কি না তাহা বলিতে পারি না। এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলেই যে তাহা সরকার কার্য্যে পরিণত করিবেন তাহা মনে হয় না। অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের ন্যায় ইহাও হয় ত চাপা পড়িয়া থাকিবে। আমরা এ বিষয়ে সদস্যগণকে অবহিত থাকিতে অনুরোধ করি। হয় ত ব্যয়ের অজুহাতে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু সামরিক ও পুলিশ বিভাগের জন্য আমরা প্রতি বৎসর যত অর্থ ব্যয় করি, তাহার কিয়দংশ এই কার্য্যে ব্যয় করিলেই চলিতে পারে। সরকার মধ্যে মধ্যে সামরিক ও সাধারণ পুলিশ নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন; তাহার জন্য সরকারী তহবিল হইতে খরচ করিতে হয় এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপর বিশেষ কর স্থাপিত হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে এই সকল উচ্চশিক্ষিত ভদ্র যুবক নিয়োগ করিতে পারিলে কম খরচে হইবে এবং জনতা দূর করা প্রভৃতি কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। অস্ত্র চালনার শক্তি থাকিলে, দৈহিক বলে বলীয়ান্ হইলে, অসাধ্য সাধন করা যাইতে পারে। যাহাদের কোন শক্তিই নাই, তাহাদের নিকট অসমসাহসিক কার্য্য আশা করা যায় না। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, এই প্রস্তাব যথার্থই কালোপযোগী হইয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

কদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "কোষ্ঠীর ফলাফল"—২॥০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত "খেয়ার শেষে"—২৲

রেন্দ্র দেব প্রণীত "খেলার পুতুল"—২৲

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন প্রণীত "কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ"—২৲

ন্মথ ঘোষ এম-এ প্রণীত "রঙ্গলাল"—৪৲

বিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ প্রণীত "ঘূর্ণি"—১॥০

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "কিশোরী"—১৲

আলো ও ছায়া" প্রণেত্রী প্রণীত "দীপ ও ধূপ"—২৲

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর প্রণীত "চিত্রে গীতগোবিন্দ"—৩৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "তরুণী"—২৲, "নিশির ডাক"—২৲, "লাল কুঠি"—১॥০

শ্রীঅখিল নিয়োগী চৌধুরী প্রণীত "মহাপূজা" (শিশুনাট্য)—৷৶০

শ্রীসীতানাথ কাব্যবিনোদ প্রণীত "দশভুজা"—১৲

শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত প্রণীত "সবুজ সুধা"—।৴০

শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি" ।০

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "চাঁদের দেশে"—।৴০

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত "শাঁখা সিঁদূর"—১৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.
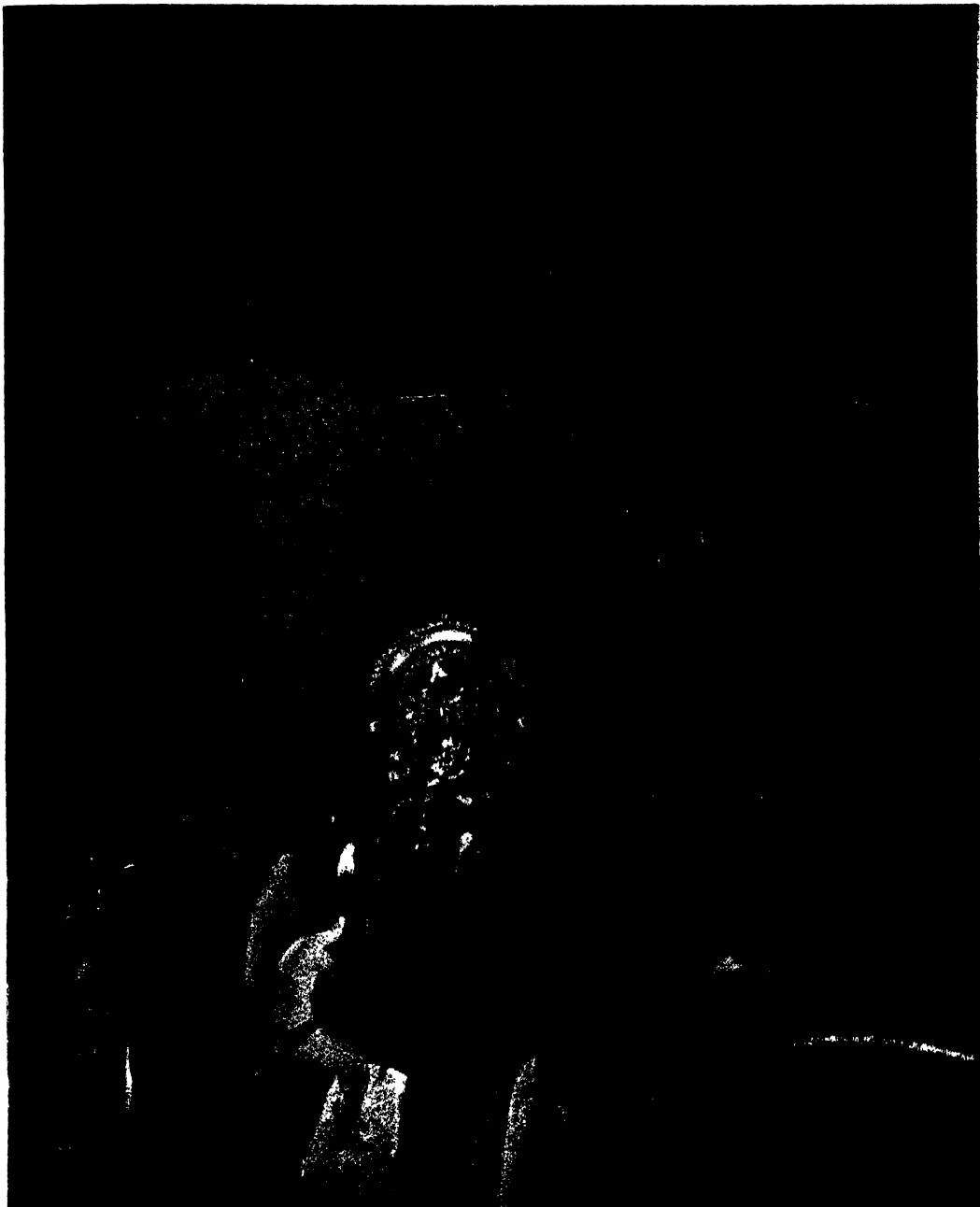
অগ্রহায়ণ—১৩৩৬

প্রথম খণ্ড } সপ্তদশ বর্ষ } ষষ্ঠ সংখ্যা

ডিগ্রীর অভিশাপ

আচার্য্য সার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ এবং ছাত্রগণ! আমার এক বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন,—একবার যেখানে গিয়াছেন, সেখানে আর যাইবেন না,—বারবার গেলে আদর থাকে না।" টাঙ্গাইলে আসিয়া যে আদর পাইলাম, তাহাতে আমার এই বান্ধবের উক্তি কাজে লাগিল না। নয় বৎসর পর দ্বিতীয়বার এখানে আসিয়াছি,—এত আদর পাইয়াছি,—আপনারা দুই দিনে আমাকে এত আপনার করিয়া লইয়াছেন যে, আপনাদের ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইতেছে।

টাঙ্গাইলে আসিয়া কি দেখিলাম?

টাঙ্গাইলের নানা প্রতিষ্ঠান দেখিলাম। আজ প্রাতে শক্তি-চর্চ্চা দেখিয়াছি। বড়ই আনন্দ পাইয়াছি। কলিকাতায় শতকরা ৫০ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য ভাল নয়; কিন্তু এখানকার যুবকগণ আমার মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে। এখানে বৎসরের ৭।৮ মাস প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, ছাত্রগণও উৎসাহী,—ইহাই টাঙ্গাইলের ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের কারণ বলিয়া অনুমান করিতেছি।

নানা দিকে সমাজ-সংস্কারের ধুয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে বহুতর বাক্য যোজিত হইয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কার্য্যের অভাবে বড়ই দুঃখ পাইতেছিলাম। টাঙ্গাইলে বাল্য বিবাহ-রোধ, বিধবা-বিবাহ ও অনাচরণীয়দের জলচল বিষয়ে কর্ম্মে অগ্রসর দেখিলাম। এ বিষয়ে টাঙ্গাইল গৌরবের অধিকারী। এখানকার সম্প্রদায়গণ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ।

এই কালীবাড়ীতে মুসলমান ভদ্রগণ উপস্থিত হইয়াছেন, দেখিতেছি। ইহাতে পরম পুলকিত হইলাম। আমার মনে হইতেছে যে এখানে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ সম্ভবে না।

এসিটেলিন ল্যাম্প জ্বলিতেছে, দেখিতেছি। Calcium Carbide হইতে এসিটেলিন গ্যাসের উৎপত্তি। ভারতবর্ষে এই পদার্থ বহু পরিমাণে খরচ হয়। আমি রাসায়নিক। এই এক পদার্থ লইয়াই আজ সমস্ত রাত্রি আপনাদের কিছু বলিতে পারি। কৃত্রিম হীরক তৈয়ারী করিবার চেষ্টার ফলে ইহার আবিষ্কার হইয়াছিল। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এমন যে ইহা তৈয়ারী করা অসাধ্য নয়। কিন্তু বাঙ্গালার যুবক সমাজের এদিকে মনোযোগের একান্ত অভাব।

নয় বৎসর পূর্ব্বে এই কালীবাড়ীতে সকালবেলা অন্ন-সমস্যার কথা বলিয়াছিলাম। এই বিষয়ে আমি সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকি; এবং যতই চিন্তা করি ততই আমার মন নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়।

অন্নসমস্যার সমাধানে শিক্ষিত বাঙ্গালীর অক্ষমতা

বাঙ্গালী আজ জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছে। এই 'সোণার বাঙলা'য় আসিয়া য়ুরোপীয়গণের তো কথাই নাই, ভারতবর্ষীয় অবাঙ্গালীগণও জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে; কিন্তু বাঙ্গালী 'নিজবাসভূমে পরবাসী' হইয়া রহিল।

বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়া এতকাল চলিয়াছে, আজও তাহার সে দোষ হইতে মুক্তি ঘটে নাই। সেকালে ন্যায়শাস্ত্রের ফলহীন আলোচনায় দিন যাপিত হইত, আর আজকাল B.A., B.SC., M.A., M.SC., D. LITT., D.SC. ডিগ্রীগ্রহণ করিয়া শিক্ষাগর্ব্বে বাঙ্গালী স্ফীত হইতেছে। কিন্তু অন্নাভাবে বুঝি বা ইহাদের মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়া গেল। যদি এই বিদ্যাশিক্ষায় জীবনধারণের কোন সুবিধা না জন্মে, বরং 'কেতাবী' হইয়া যদি জীবিকা অর্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, তবে এ শিক্ষায় কোন্ মঙ্গল সাধিত হইবে?

বিলাতে শতকরা ৯৭ জন শিক্ষিত। Sadler Commission বলেন যে, সেখানে যত লোক কলেজে পড়ে, এ দেশেও তাহাই। তবু আমাদের দেশের শতকরা ৫ জন মাত্র অক্ষর-পরিচয়-সম্পন্ন হইয়া রহিল। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেই আমাদের দেশের ছাত্র ও অভিভাবকগণ B.A., M.A.র স্বপ্ন দেখেন। তাই জীবনটা স্বপ্ন হইয়াই রহিল—কর্ম্মে নিয়োজিত হইল না।

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার মনোবৃত্তির অভাব

অন্য কথা ছাড়িয়া দিতেছি—College of Scienceএ বর্ত্তমানে এত সংখ্যক বেকার Doctor of Science তৈয়ারী হইয়াছে যে, তাহাদের লইয়া এক ভয়াবহ বিপদের সৃষ্টি হইয়াছে।

কেতাবী বাঙ্গালী

ফলিত রসায়নের কথা শুনিয়াছেন। এই বিদ্যা রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টির উপায় শিক্ষাদান করে। কিন্তু এই বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া যাঁহারা উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারিলেন না। বাঙ্গালী 'কেতাবী' হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার এ গতি রোধ করিতে হইবে। বাঙালী চাকুরীর আশায় বিদ্যা শিক্ষা করে—জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য নহে। ইহারই ফলে তাহার বিদ্যার্জ্জন ও অর্থ-উপার্জ্জন উভয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পরীক্ষা পাশ ও তাহারই ফলে চাকুরী প্রাপ্তি যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহাতে যথার্থ জ্ঞানলাভ আশা করা যায় না; এবং চাকুরীর অপ্রাচুর্য্য বশতঃ পাশ-করা ছাত্রদেরও অন্ন-সমস্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

প্রয়োজনাতিরিক্ত উকিলের সৃষ্টি

বাঙ্গালা দেশের আইন কলেজগুলিতে তিন হাজার ছাত্র পড়ে। কিন্তু আগামী দশ বৎসরের মধ্যে কোন স্থানে নূতন উকিল ভর্ত্তি না হইলে যে আইনের ছাত্রগণ বর্ত্তমান উকিলদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাটের বাজার যদি নরম হয়, গুদামে যদি পাট পর পর দুই বৎসর বোঝাই থাকে, তবে কোন্ মূর্খ আরও পাট বোনে? উকিলের উপার্জ্জন নাই, প্রতি 'বার' উকিলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তবু কেন যে নূতন উকিল তৈয়ারী হইতেছে জানি না। আলীপুর কোর্টে ৮০০ উকিল—তবু প্রতি বৎসর সেখানে উকিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে বগুড়ায় গিয়াছিলাম। পাটের ব্যবসায়ে সেখানকার এক মাড়োয়ারী এক বৎসরে ৫০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। তিনি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। সমস্ত বগুড়ার উকিলগণ এক বৎসরে ইহার অর্দ্ধেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই সকল ব্যবসায় অবাঙ্গালীর হাতে দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।

অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর বাঙ্গালায় জমিদারী লাভ

উত্তর-বঙ্গের বহু জমিদার মাড়োয়ারীদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যখন মাড়োয়ারীগণ এ দেশের জমিদারী আয়ত্ত করিয়া লইবেন।

পাট আমাদের উপকার করে না

পাট বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ পণ্য। ইহার যাবতীয় আয় যদি বাঙ্গালীর হাতে আসিত তবে মঙ্গল হইত, সন্দেহ নাই। বৎসরে প্রায় ১০০ কোটী টাকার পাট ও তাহার তৈয়ারী থলে হেসিয়ান ইত্যাদি রপ্তানি হয়। ইহার ৫০ কোটী আমরা পাই। পাট কম জন্মে বলিয়া উত্তরবঙ্গ ছাড়িয়া দিতেছি, বাকী বাঙ্গালা দেশে ৫ কোটি অধিবাসী। মাথা-পিছু ৯৲ টাকা করিয়া আমাদের বাৎসরিক পাটের আয়। 'পাট আমাদের দেশের উপকার করিতেছে' এ কথা বলিলে কে বিশ্বাস করিবে?

পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা

উপার্জ্জনের অন্য সকল পথ পরিত্যাগ করিয়া কেবল চাকুরীর আশায় বাঙ্গালী সন্তানদের B.A., M.A. পাশ করাইতেছে। ও-দেশের অনেক কুরীতি বাঙ্গালী তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সুরীতির অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পিতামাতা পুত্র-কন্যাদের প্রাথমিক শিক্ষাদান করে। এই শিক্ষার কালে যে সকল ছেলে মেধাবী বলিয়া পরিগণিত হয়, কেবল বাছিয়া বাছিয়া তাহারাই উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। এইরূপে যাঁহারা উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, কালে তাঁহাদের অনেকে যশস্বী হইয়াছেন।

কৃষির উন্নতিতে বাঙ্গালীর অকর্ম্মণ্যতা

আমাদের দেশ, কৃষকের দেশ। কৃষির উন্নতির জন্য বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই করে নাই। গভর্ণমেণ্টের দোষ দিয়া নিজ কর্ত্তব্য হইতে মুক্তি পাইলে চলিবে না। কিন্তু এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যে একটু চেষ্টা আছে তাহাতে আমরা কতটুকু সাহায্য করিতে পারিয়াছি? সৈয়দ সাওখাত হোসেন, অম্বিকাচরণ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নৃত্যগোপাল মুখার্জ্জি প্রভৃতি বার জন গভর্ণমেণ্টের অর্থে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে বিলাত গিয়াছিলেন; কিন্তু কেহ কৃষিকার্য্যে প্রবিষ্ট হইলেন না—Statutary Civilian ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইলেন—কয়েক লাখ টাকার শ্রাদ্ধ হইল। এমনি আরও কতজন বিদেশ হইতে শিল্প শিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দেশে তাঁহারা বিশেষ কোন শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। এজন্য স্বতঃই মনে হয় যে, বিদেশী বিদ্যায় কোন ফললাভ হইতেছে না।

বাঙ্গালায় অবাঙ্গালীর কৃষিকার্য্য

শিক্ষিতগণ এইরূপে কৃষিশিল্পে অকৃতকার্য্য হইলেন; অথচ ব্যারাকপুরে পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমানগণ তরকারীর ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। তাহারা তিন হাজার টাকা সেলামী দিয়া ব্যারাকপুরে জমি লইতেছে এবং ময়লা সার পাইবার উদ্দেশ্যে তত্রত্য মিউনিসিপ্যালিটিকে ১৩০০৲ টাকা খাজনা দিয়া চুক্তি করিয়া লয়। ইহারা ওখানে কোঠাবাড়ী করিয়াছে, তাহাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য দিকে বিলাত-ফেরৎ দল দেশের বেকার-সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমানগণ এ দেশে আসিয়া তরকারীর ব্যবসায়ে কেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, তাহা বলিলাম। আমেরিকাবাসী একজন তরকারী ব্যবসায়ী বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকার তরকারী বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহার নাম সিক্রক চার্লি। তিনি ৫ বৎসর বয়সে ক্ষেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন—১৪ বৎসর বয়সে তিনি একজন পূর্ণবয়স্কের উপযুক্ত কাজ করিতে পারিতেন। লেখাপড়া সামান্য শিখিয়াছিলেন এবং অর্থ হাতে হইলেই কৃষিবিষয়ক পুস্তক কিনিয়া পাঠ করিতেন। তিনি শিখিলেন—ক্ষেত্রে জল সেচন ও সার প্রদান করিতে হইবে এবং সর্ব্বকার্য্যে নিজেকেই প্রধান ভাবে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু আমরা নিজ চেষ্টাকে সর্ব্বশেষ স্থান দিয়াছি।

ইংলণ্ডের শিক্ষায় বাঙ্গালীর লাভ নাই

আমি ৫ বার বিলাত গিয়াছি। সেখানে যাইয়া এ দেশের ছাত্রগণ কি শিক্ষা করে তাহা দেখিয়াছি। বৎসর বৎসর বিলাতে ছাত্র পাঠাইয়া দেশের বহু টাকা মিথ্যা অপব্যয় হইতেছে। এ সম্বন্ধে সতর্ক না হইলে চলিতেছে না। প্রায় ২ হাজার ছাত্র সেখানে যায়—তাহাদের খরচের জন্য আমরা প্রায় ১ কোটী টাকা প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে পাঠাই।

Why bad boys become great men

সেদিনের Statesmanএ বাহির হইয়াছে "Why bad boys become great men." আমাদের দেশে যাহারা পড়াশুনায় অপটু হয়, অকর্ম্মণ্য বলিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু Statesmanএর প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে যে, এডিসন, বলডুইন প্রভৃতি যশস্বিগণ প্রথমে স্কুলে মেধাহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং এ জন্যই বেশী দিন তাঁহারা বিদ্যালয়ে গমন করিতে পারেন নাই।

উচ্চ শিক্ষা ও কর্ম্মশক্তি

প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহারা উচ্চশিক্ষিত, তাহারা কর্ম্মশক্তি হারাইয়া ফেলে। একে দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য—তাহার উপর এই বিদেশী ভাষার কোটর হইতে অতি পরিশ্রমে যে বিদ্যা অর্জ্জিত হয়, তাহাতে বাঙ্গালী ছাত্রগণের মস্তিষ্ক দারুণ পীড়া অনুভব করে। এজন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষিত অপেক্ষা অল্প শিক্ষিতগণ জীবন সংগ্রামে অধিক জয়ী হইয়াছে। Robert Clive দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির বালক ছিলেন; সেজন্য পিতামাতা কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারই প্রতিভায় ইংরাজ-রাজত্বের মূল এ দেশে প্রোথিত হইয়াছিল।

Scholarly China have failed to make modern industries in China

চীনের কথা বলিতেছি। Scholarly China have failed to make modern industries in China ইহাই তদ্দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের মত। চীনের বিদ্বানগণ সে দেশের বর্ত্তমান আর্থিক উন্নত অবস্থা গড়িয়া তুলিতে অসমর্থ ছিল। সে দেশে লোক-সংখ্যার অনুপাতে জমি কম। কিন্তু চীনদেশবাসিগণ অপর দেশে যাইয়া স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। তাহারা California মালয় প্রভৃতি স্থানে প্রথমে কুলীর সর্দ্দার রূপে কাজ করিয়া পরে সেখানকার বড় বড় রবার ক্ষেতের মালিক হইয়া কেহ লক্ষপতি কেহ বা ক্রোড়পতি হইয়াছে।

জীবন-সংগ্রামে কুলীর সর্দ্দারের কৃতকার্য্যতা

কুলীর সর্দ্দার হইলেই যে সে ক্ষুদ্র হয় না, মস্তিষ্ক থাকিলে যে ক্রমে তাহারাও বড় হইয়া উঠিতে পারে, বর্ত্তমান আফগানরাজ বাচ্চাই-সাকো তাহার প্রমাণ। ইনি অল্প-শিক্ষিত, বোধ হয় এজন্যই তাঁহার এরূপ কৃতকার্য্যতা সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের দেশের অল্প-শিক্ষিত বিখ্যাত ব্যক্তিগণ

অল্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষর হইয়া আমাদের দেশেও অনেকে যশস্বী হইয়াছেন। হায়দারআলী, শিবাজী, আকবর—ইঁহারা সকলে অশেষ গুণের আধার ছিলেন। নিরক্ষর আকবর সকল শাস্ত্রের পারদর্শীদের লইয়া নবরত্ন-সভা গড়িয়াছিলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় গৌরব আর কোন সম্রাট অর্জ্জন করেন নাই। বাঙ্গালা দেশের ব্রহ্মবান্ধব, কেশবচন্দ্র, পরিব্রাজক প্রতাপচন্দ্র অতি অল্প দিন বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাই বলিয়া কি তাঁহারা বিদ্বান ছিলেন না?

ডিগ্রী কর্ম্মশক্তির পরিমাপক নহে

এইগুলি কি কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ই থাকিবে?—আর ডিগ্রীর লোভে অর্থ ও শক্তি সমুদায় নষ্ট করিয়া দেশে বেকার-সমস্যাকে আরও গুরুতর করিয়া তোলা হইবে? চাকুরী ছাড়া ডিগ্রী গ্রহণের যেন আর কোন উদ্দেশ্যই নাই। এজন্য মনে হয় যে, সেদিন অতি শুভদিন যেদিন সার রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়াছিলেন—এবং Mr. J. C. Banerji যে শিবপুর কলেজের apprenticeship হইতে রাষ্টিকেট হইয়া কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহা যেন বাঙ্গালীর প্রতি ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

যাহার চারিটি পুত্র তাহারও ইচ্ছা যেন চারিটিই Graduate হয়। যেন এ সংসারে উহাই একমাত্র কাম্য। জ্ঞান অর্জ্জনই যদি উদ্দেশ্য হয় তো বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়া মাতৃভাষায় লিখিত কাগজ পড়িয়া যেটুকু জ্ঞান অর্জ্জন হয় তাহা সামান্য নয়।

ডিগ্রীলাভ কি স্বর্গলাভ?

মেয়েরা ছাতে চুল শুকাইবার কালে পড়সীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে—"ছেলে আমার ফেল হইয়াছে।" যেন ইহার ন্যায় গুরুতর পাপ সংসারে দ্বিতীয় নাই। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া অভিভাবকের তাড়নায় কত ছাত্র আত্মহত্যা করে। পরীক্ষা পাশের এ মোহ বাঙ্গালীকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে।

ডিগ্রী ও প্রতিভা

বিদ্যালাভ হয় না, কেবল পরীক্ষা-পাশই হইতেছে। ইহারই ফলে বিদ্যার সম্মানও বিনষ্ট হইবার পথে। সেদিন রাজসাহী গিয়াছিলাম। ২০ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে যাইয়া সেখানে যে কয়জন কৃতি পুরুষ (অক্ষয়কুমার, রমাপ্রসাদ, যদুনাথ) দেখিয়াছিলাম, আজ ২০ বৎসর পরে আর নূতন কাহাকেও দেখিলাম না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত মেধাবী, তিক্ষ্নধী, প্রতিভাবান্ ছাত্র দেখিয়াছি, আর আজকাল একজনও তেমন ছাত্র দেখিতেছি না। পরীক্ষা পাশ করাই আদর্শ হওয়াতে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি সম্মুখে রাখিয়া ছাত্রগণ কেবল তাহার উত্তরগুলি পাঠে ব্যাপৃত আছে। ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে জ্ঞানস্পৃহা বিলুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ বিদ্যা শিক্ষায় কি ফল হইবে? এই জন্যই আমি বলিয়া থাকি যে ডিগ্রী বা উপাধি অজ্ঞতার আবরণ মাত্র, উহা জ্ঞানের পরিচায়ক নহে।

ছাত্রগণের পরিবারের সম্পর্ক ত্যাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৩০ হাজার ছাত্র পড়িতেছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার পর ইহারা ম্যাট্রিক পাশ পর্য্যন্ত একটা বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কি করে? সময় ও শক্তির এই অপচয় জগতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। অথচ ইহাই লইয়া আমরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া আছি। এই ছাত্রগণ স্কুল ছাড়িয়া কলেজে গেলে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করে, সর্ব্বপ্রকার ব্যসনে কালাতিপাত করে। ক্রমে ইহাদের বাসভূমি ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। ইহারা গৃহকর্ম্ম অপমানজনক বলিয়া মনে করে, নিজ স্বার্থে মগ্ন হইয়া আশা করে যে সে কলেজে পড়ে এই দাবীতে সমস্ত পরিবার তাহার সেবা করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে।

বিদ্যার্থীর ব্যসন

ঢাকা জগন্নাথ কলেজ ও Moslem Hallএর অধ্যক্ষগণ গোপনে সকল ছাত্রের অভিভাবকের অর্থসঙ্গতির সংবাদ লইয়া ভয়াবহ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের অর্থবল অনেক কম। অতি দুঃস্থ অভিভাবকের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে এই ছাত্রগণ বিলাসিতা করিয়া ক্রমে স্বজনগণের সকল সংস্রব পরিত্যাগে উৎসুক হয়। ইহা দেখিয়া কলেজের শিক্ষার প্রতি কেহ কেহ ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু ইহাও বলিতে হয় যে ছেলে কলেজে পড়িতেছে—কালে ম্যাজিষ্ট্রেট না হউক দারোগা হইবে, এই আশায় স্ফীত হইয়া অভিভাবকগণ এই ভবিষ্যৎ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সেবায়, আদরে অন্ধ করিয়া নিজেরাই ইহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

হাতের কাজে বাঙ্গালীর আপত্তি

হাতে কাজ করিতে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের আপত্তি। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট Hoover সহিসের কাজ করিয়াছিলেন। এমনি কত উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু উদাহরণে যদি বাঙ্গালীর সংশোধন হইত, তবে তাহার এ দশা ঘটিত না। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড অতি দারিদ্র্য হইতে এই উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। অন্নাভাবের পীড়নে হাতের কাজের প্রতি শিক্ষিতদের ঘৃণা কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে সত্য, কিন্তু একেবার মৃত্যুর পূর্ব্বে বুঝি বা আর চেতনা সঞ্চারিত হইবে না।

ইংরাজী ভাষার চাপে আমাদের অবস্থা

একটি জেলায় একজন জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট ইংরাজ হইয়া থাকেন। তাহারই জন্য সমস্ত জেলার শাসন-ব্যাপার ইংরাজীতে হইবে এবং আমরা জেলাশুদ্ধ লোক ইংরাজী শিখিয়া সময় ও শক্তিক্ষয় করিব কোন্ অনুশাসনে? একবার একটী মোকদ্দমার কথা মনে পড়িতেছে। হাইকোর্টের এক মোকদ্দমায় আমি ছিলাম জুরীর Headman। Interpreter বাঙ্গালা ভাষায় প্রদত্ত সাক্ষ্য ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া জজকে জানাইতেছিলেন; জজ ইংরাজীতে উহা আমাকে জানাইলে আমি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া তাহা সহকর্ম্মী জুরীদের জ্ঞাপন করিতেছিলাম। এমনি করিয়া প্রয়োজনীয় সময়ের ৪ গুণ সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল। এমন অনাচার আর কোথাও দেখা যায় না।

সাহেবিয়ানার প্রলোভন

ইহার জন্য আমরাই দায়ী। আমরাও সাহেব হইতে চাহিয়াছিলাম। Mr. W. C. Banerjee ইংরাজী পাড়ায় বাস করিয়া সাহেবী খানা, সাহেবী পোষাক ও সাহেবী বুলি অবলম্বন করিয়া পুরা সাহেব হইয়াছিলেন। অপর একজন

ব্যারিষ্টারের মুড়ি খাইবার সখ হইলে তাঁহার স্ত্রী চাপরাসীদের আড়াল করিয়া আঁচলে করিয়া মুড়ি লইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার স্বামীকে খাওয়াইতেন। খাওয়া শেষ হইলে প্রত্যেকটী মুড়ি সংগ্রহ করিয়া গোপনে দূরে নিক্ষেপ করিতেন—পাছে আয়া চাপরাসী ধরিয়া ফেলে, ইনি সাহেব নহেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে শেষ হইবে?

আদর্শ চীন

বর্ত্তমানে চীনদেশীয়গণ জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। নানা ব্যবসায়ে ইঁহারা লিপ্ত হইয়া জাতির ধন বৃদ্ধি করিতেছেন। ইঁহারা নানা দেশে গমন করিয়া বিবাহ করিয়া জাতির শক্তি দৃঢ় করিয়াছেন—অপূর্ব্ব শক্তিতে এই জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে। আমরা এই চীনদেশের অনুকরণ করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন করিব—ইহাই আমার আশা।

আপনারা আমার পরম সমাদর করিয়াছেন। আপনাদিগকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। *

* টাঙ্গাইল ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতি রূপে টাঙ্গাইলে গিয়া সেখানে জনসভায় যে মৌখিক বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার সারাংশ শ্রীমান মনোরঞ্জন গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

শিশুর সৃষ্টি

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

শিশু, তুমি শিল্পী বড় মোহন তোমার কারু,
যুগেযুগে জগৎ জুড়ে সৃষ্টি তোমার চারু।
নেচেকুঁদে হেসে কেঁদে নিত্য অভিনয়ে
চোখ ঘুরিয়ে হাতটি নেড়ে মুখ লুকিয়ে ভয়ে,
ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে আধ' আধ' কথায়
কতক কল-মুখরতায় কতক নীরবতায়
গৃহে গৃহে এম্‌নি তোমার সৃষ্টিলীলা চলে,
ঠাকুর-মায়ের কোলে পিঠে, মার আঁচলের তলে।
রুদ্রগোপাল গড়ছ তুমি ভাঙ্‌ছ খামখাই,
আপন সৃজন রত্নে তোমার দয়া দরদ নাই।
একহাতে বি-ধ্বংস করো অন্য হাতে গড়ো,
ভাঙাগড়ার ছন্দোলীলায় আনন্দ বিতরো।
সৃষ্টি তোমার ধ্বংস-প্রবণ—স্বল্প আয়ু তার
তাই বলে তা নয় প্রাণহীন, 'নয়ক তা' অসার।
সব হতে তা বরং মধুর সরস মনোহর,
সব হতে প্রাণবন্ত তাজা জ্বলন্ত প্রখর,
সব হতে তা দেয় যে বেশী আনন্দ অমল
কুটীর হতে প্রাসাদ তোমার সৃষ্টিতে উজ্জ্বল।
সৃষ্টি তোমার বিহ্বসম জেগেই গীয়মান
ইন্দ্রায়ুধের মতন ক্ষণিক ভুলায় মনঃপ্রাণ।
ফুলের মতন প্রতি দিবস ফোটে এবং ঝরে,
ফোটা-ঝরার নাইক বিরাম, হিসাব কে তার করে?
ঘরে ঘরে হাজার হাজার নাট্য অভিনীত,
নিত্য গৃহালিন্দে শত চিত্র অলিখিত,
নিত্য নূতন কাব্যকথা, নিত্য নূতন গান,
নশ্বরতার নিঃস্বতারে হরে নবীন দান।
অমরতার অভাবেরে জিনল অজস্রতা,
অপূর্ব্বতায় ঘোষিত হয় অনন্ত বারতা।
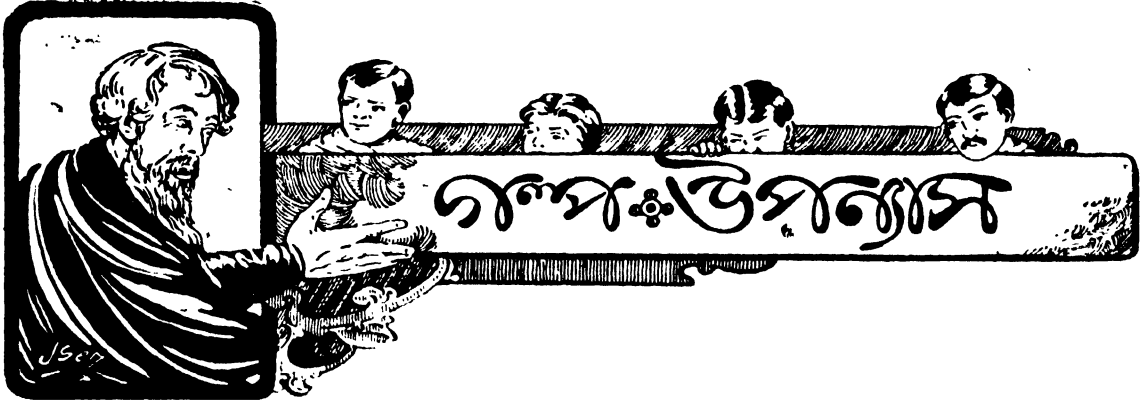
ব্রতচারিণী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

২৭

দুই দিনের জন্ম বাস করিতে আসিয়া দীর্ঘ সাত আট মাস কাটিয়া গেল, জয়ন্তী আর কলিকাতায় ফিরিলেন না। ইভাকে তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় তিনি ঘুরিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। ঘুরিয়া বর্ষা নামিল, একে একে আষাঢ় শ্রাবণ মাসও চলিয়া গেল, ভাদ্রের শেষে ঈশানী আবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলেন।

সীতা সংসারের খরচপত্রের দায়িত্বের বোঝা ইভার ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়াছিল, এ সংবাদ বিহারীলাল কিছুই জানিতে পারেন নাই; সীতাও এ সংবাদ তাঁহাকে দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করে নাই। পূর্ব্বের মতই খরচের টাকা তাহার হাতে আসিয়া পড়িত, সে তাহা ইভার হাতে পৌঁছাইয়া দিত। প্রথম মাসের শেষে ইভা হিসাবের খাতাখানা সীতার হাতে দিল, সীতা তাহা বিহারীলালের নিকটে পৌঁছাইয়া দিল।

খাতাখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বিহারীলাল হঠাৎ গরম হইয়া উঠিলেন। সেখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সগর্জ্জনে তিনি বলিলেন, "আজ কি নতুন তোর হাতে খরচ পড়েছে সীতা যে তারই জমাখরচ লিখে আমায় দেখাতে এনেছিস? আমি কোন দিন জানতে চেয়েছি কি—সংসারে কত টাকা খরচ হল,—কোন দিন বলেছি কি—কেন তুই খরচ করলি? এসব যারা দেখতে চায় তাদের দেখাস,—আমায় দেখাতে আসিস নে—এই বলে দিচ্ছি।"

কথাটা সীতা প্রকাশ করিতে পারিল না, গোপনে রাখিল; কেন না, জয়ন্তী ও ইভা ইহা শুনিতে পাইলে রাগ করিবেন—দুঃখ পাইবেন। জয়ন্তী হয় তো ইহাতে অপমান জ্ঞান করিয়া কন্যা লইয়া চলিয়া যাইবেন।

গোপন করিতে পারিল না শুধু ঈশানীর কাছে, কারণ সে কখনও তাঁহাকে কোন কথা গোপন করে নাই। ঈশানী নিঃশব্দে শুনিয়া গেলেন। বড় অভিমানিনী ছিলেন তিনি,—অসহ্য ব্যথা পাইলেও মনের কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। জয়ন্তী যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি দুই দিনেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মর্ম্মে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। জয়ন্তী যে ভাবিয়াছেন, ঈশানী তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া একাই সমস্ত বিষয় ভোগ করিবেন, ইহাই ভাবিয়া ঈশানীর চোখ দুইটী নিমেষে সজল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ইভাকে সত্যই ভালবাসিতেন, ইভাও তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল। এই ভালবাসা জয়ন্তীর চোখে বিষাক্ত ঠেকিয়াছিল। তিনি তাই কথায় কথায় সকলের সামনেই ইভাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন,—"মায়ের চেয়ে যে

বেশী ভালবাসে তাকেই বলি ডাইন।" কথাটা একদিন ঈশানীর শান্ত হৃদয়-সমুদ্রে তুফান তুলিয়াছিল, তিনি সেই দিন হইতে ইভার সম্বন্ধে অতিরিক্ত রকম সতর্ক হইয়া গিয়াছিলেন।

ইভা হঠাৎ তাঁহার এই পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিল না; দিন দুই চার তাঁহার পাশে পাশে আগেকার মত ঘুরিল। ঈশানী তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না। তাহাকে নিজের কোন কাজ করিতে দেখিলে হঠাৎ তিনি এত শশব্যস্ত হইয়া উঠিতেন, যাহা দেখিয়া ইভা নিজেই ভারি সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিত। অভিমানে তাহার হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঈশানীর দিকে আর গেল না, যতদূর সম্ভব দূরে দূরে রহিল।

ইভা বুঝিতেছিল, ইহাদের এই শান্তিপূর্ণ সংসারে ধূমকেতুর মতই তাহারা মাতা কন্যা আসিয়া পড়িয়া একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। ইঁহারা সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে বেদনা পাইতেছিলেন বটে,—সে বেদনা, সে কষ্ট তাঁহারা ঈশ্বরের দানরূপে মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুতও ছিলেন; কিন্তু তাহার মায়ের এখানে থাকিয়া নিত্য এক একটা নূতন কাণ্ড বাধাইয়া তোলাকে ঈশ্বরের দান বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন; কারণ, এ অশান্তি মানুষ নিজেই বহন করিয়া আনে। তাহার মায়ের অন্তরের ভাব মুখে যতই মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল, ইভা ততই মরমে মরিয়া আপনার মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া লইতেছিল। সে নিজেদের অশুভ গ্রহ মনে করিতেছিল এবং তফাতে সরিয়া যাইতেছিল।

সেদিন রাত্রে মায়ের পাশে বিছানায় শুইয়া সবেমাত্র তাহার ঘুম আসিতেছিল,—জয়ন্তী নিত্যকার মতই নির্জ্জনে মনের কথা এই সময়ে ব্যক্ত করিতেছিলেন। ইভা যতই এসব প্রসঙ্গ এড়াইয়া যাইতে চাহিত, জয়ন্তী ততই যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার কাণে এই গরল ঢালিয়া দিতেন। আজও ইভা একটা কাণ বালিসে চাপিয়া আর একটা কাণে হাত চাপা দিয়া ঘুমের ভানে পড়িয়া রহিল। ভাবিয়াছিল—সে ঘুমাইয়াছে জানিলে মা চুপ করিয়া যাইবেন, কিন্তু মা নিরস্তা হইলেন না। তাহাকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাহার গায়ে একটা ঠেলা দিয়া ডাকিলেন,—"ঘুমুলি ইভু? এখনও রাত দশটা বাজল না—এর মধ্যে এত ঘুম এল? আজ কয়দিন—যে কয়দিন তোকে সীতার সঙ্গে বেশী মিশতে বারণ করেছি—সেই কয়দিন তোর ঘুমও যেন অতিরিক্ত রকম বেড়ে উঠেছে। এই কয়টা দিন আগে রোজই রাত বারটার সময় শুয়েও তো রাত দু'টো পর্য্যন্ত ঘুমাতে পারতিস নে দেখেছি।"

অসহিষ্ণুভাবে ইভা বলিল, "ঘুমাতে তুমি দিচ্ছো কি না মা, যে খানিকটা ঘুমাব? সমস্ত দিনটা তবু একরকম করে কেটে যায়, রাত্রে কি করব তা বল। সীতাদির সঙ্গে মিশে কাজকর্ম্ম করতে তবু ঘুম আসত না, কাজেই এখন—"

জয়ন্তী বলিলেন, "দিনে মেসিন নিয়ে সেলাই করলে পারিস, রাতে বই টই নিয়ে দেখলেও তো হয়।"

ইভা সবেগে মাথা নাড়িল—"না, সেলাই আর ভাল লাগে না, বই পড়লেও বিরক্তি আসে। তুমি কবে কলকাতায় যাচ্ছো বল, আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না।"

অবাক হইয়া গিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "ভাল লাগছে না বলে চলে যেতে হবে? ভাল না লাগলেও তোর যে এইখানেই থাকতে হবে রে, তা বুঝি ভুলে যাচ্ছিস? তোর দাদু জ্যোতিকে ত্যাগপত্র দিয়েছে তা জানিস তো? জ্যোতি এ সম্পত্তির একটা আধলা আর পাওয়ার দাবী করতে পারবে না, শেষকালে সীতাই যে এই অতুল সম্পত্তি পাবে এ আমি কখনও সহ্য করতে পারব না। জ্যোতি না পাক ইভু, তুই তো সব পেতে পারিস, পাওয়ার অধিকার তোরও তো আছে। ওঁরা যদি তোকে তোর ন্যায্য অধিকার থেকে বিচ্যুত করতে চান, আমি তা হতে দেব কেন? সীতাকে বড় ভালবাসেন—বেশ কথা, তাকে দিতে ইচ্ছা করেন, সামান্য কিছু দিতে পারেন মাত্র, সব যে দেবেন তা কখনই হতে পারে না।"

উত্তেজিতা ইভা বলিল, "কে চায় সম্পত্তি মা, আমি এর একটা পয়সাও চাইনে। দাদুর যাকে ইচ্ছা হয় দিতে পারেন, আমায় দিতে এলেও আমি কিছু নেব না।"

বিকৃতমুখে জয়ন্তী বলিলেন, "ওই এক কথা শিখেছিস বাপু, তোর ওই লম্বা চওড়া কথা শুনলে আমার ইচ্ছে হয় না যে তোর সঙ্গে কোন বিষয়ে একটা কথা বলি। কলকাতায় যাওয়ার জন্যে যে ছটফট করছিস, সেখানে গিয়ে চিরটা কাল মামা-মামীর গলগ্রহ হয়ে থাকবি না কি? ভাল ছেলে পছন্দমত না পাওয়া গেলে—"

উগ্র হইয়া উঠিয়া ইভা বলিল, "আমি বিয়েও করব না, মামা-মামীর গলগ্রহ হয়েও থাকব না।"

দীপ্ত ভাবে জয়ন্তী বলিলেন, "না—বিয়েও করবি নে, মামা-মামীর গলগ্রহ হয়েও থাকবি নে,—তবে কি চাকরি করে খাবি এখন ?"

ইভা বালিসের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া দিয়া চাপা সুরে বলিল, "অনেক দিন আগে তুমিই তো একবার জেঠিমাকে বলেছিলে মা—ইভা চাকরী করে খাবে। আমায় শিক্ষা দেওয়ার মূলে তোমার সেই উদ্দেশ্যটাই ছিল না কি মা ?"

অতিরিক্ত রকম চটিয়া উঠিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তুই বড্ড বাচাল হয়ে উঠেছিস ইভা; এই জন্যেই আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে—মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শিখাতে নেই,—এতে তাদের গুরুলঘু বিচার থাকে না, যা মুখে আসে তাই বলে যায়। এঁরা যখন বারণ করেছিলেন তখন আমিই নেহাৎ জোর করে ধরে তোকে এই যে শিক্ষা দিতে পেরেছিলুম এখন দেখছি এ শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াই ভাল ছিল। এ লেখাপড়া বড্ড বেশী রকম আত্মমর্য্যাদা আর স্বাধীন ভাব তোর মনে জাগিয়ে তুলেছে। তাই আমাদের মেয়েদের যা ধর্ম্ম তা ভুলে গিয়েছিস, —অসঙ্কোচে বলছিস বিয়ে করব না। বিয়ে না করে আমাদের দেশে কয়টা মেয়ে আছে দেখা দেখি, আর হাতের কাছে অগাধ বিষয় সম্পত্তি পেয়ে কয়টা লোকে সে বিষয় ঠেলে ফেলেছে তাও দেখা দেখি। দেখ ইভু, বাড়াবাড়ি কিছুরই ভাল নয়, যা রয় সয় তাই ভাল।"

ইভা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

জয়ন্তী উগ্র কণ্ঠস্বর কতকটা কোমল করিয়া আনিয়া বলিলেন, "বিয়ে পরের কথা, এখন তা নিয়ে মাথা গরম করার দরকার দেখছি নে। প্রণব ছেলেটা ছিল খুব ভাল, ভাবলুম—ওর সঙ্গে যদি তোর বিয়েটা দিতে পারি, কিন্তু কথাটা তুলবামাত্র সে আপত্তি তুললে—বিয়ে করবে না, চিরকুমার হয়ে দিন কাটাবে। যাক গিয়ে, ওর মত কি ওর চেয়ে আরও ভাল ছেলে ঢের আছে। অগাধ সম্পত্তিটা হাতে পেয়ে ঠেলে দিতে চাস নে ইভা। ধর, —যদি তোর ইচ্ছে না হয়—বিয়ে যদি নাই করিস—কেন না কুলীন বামুনের ঘরের মেয়েদের সেকালে মোটে বিয়েই হোতো না, সেটা বিশেষ কিছু দোষাবহ নয়,—তবুও ভবিষ্যৎটা একটু ভাবিস। তোর দাদু যদি সীতাকে সব দিয়ে যায়, এখানে তোরও কি আর স্থান হবে ইভা ? জ্যোতির অধিকার আর রইল না; কেন না, সে ধর্ম্মত্যাগী, প্রায়শ্চিত্ত করেও সমাজে আর সে উঠতে পারবে না, কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে এক পয়সাও আর সে পাবে না। অগত্যা এর পরে তোকে বাধ্য হয়ে চাকরী করতেই হবে; কেন না, মামা-মামীর সংসারে কিছু চিরজীবনটা কাটাতে পারবি নে। তার পর—চাকরী যে করবি, মাসে বড় জোর না হয় ষাট সত্তর টাকা পাবি। সে যে কতখানি পরিশ্রম করে উপার্জ্জন করা—সেইটে ভেবে দেখ। এ দেশের মেয়েরা যতই কেন না শিক্ষালাভ করুক, একমাত্র শিক্ষাবিভাগ ছাড়া তাদের কাজ আর কোথাও নেই। তাদের শিক্ষাক্ষেত্র বিস্তৃত হতে পারে, কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। একটা জমীদারীর আয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ও যে একটা চাকরের মাইনে রে। তোর দাদুর সংসারেই ওই বেতনে কতজন কাজ করছে, আর সেই বেতনের জন্যে তুই বুকের রক্ত মুখে তুলবি। এখনও সময় আছে, দুদিন এখানে থেকে বুড়োর কাছ হতে সব নে। তার পর কেই বা এ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে মা, কলকাতায় থাকলেই তো চলবে।"

ইভা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, এ সব কথার উত্তর দিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। মায়ের মতের সহিত তাহার একটা মতও মিলিত না। সে কথা প্রকাশ করিতে গেলে এখনই ঝগড়া বাধিয়া যাইবে; সুতরাং চুপ করিয়া থাকাই ভাল। দুই চোখের উপর হাতখানা লম্বালম্বি ভাবে রাখিয়া সে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া জয়ন্তী চুপ করিয়া গেলেন। খানিক পরে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন, ইভা জাগিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

ঈশানীর জ্বর কমের দিকে না আসিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। একুশ দিন হইয়া গেল—জ্বর ছাড়িল না। সকালের দিকে জ্বর সামান্য লাগিয়া থাকিত, দুপুরে তাহার উপর খুব বেশী চাপিয়া আসিত। ইহার উপর একটী দুইটী করিয়া অনেকগুলা উপসর্গও আসিয়া জুটিয়া গেল। তখন ডাক্তার নৃপেন্দ্রনাথ মুখ বিকৃত করিলেন।

ঈশানীর মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "আমি আর বাঁচব না, না ডাক্তারবাবু ?"

নৃপেন্দ্রনাথ মুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন,

"বাঁচবেন বই কি মা। এ রকম অসুখ কত লোকের হয়, আবার সেরেও যায়।"

শ্রান্তকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "না বাবা, আমি বেশ বুঝেছি—এবারে আমি আর বাঁচব না। আজ তিন সপ্তাহ আপনি আমায় দেখছেন, এত ওষুধ দিচ্ছেন,—রোগ কমা দূরের কথা, উত্তরোত্তর বাড়ছেই। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন—আর সকলের মত আমিও মরতে ভয় পাচ্ছি। কিন্তু না ডাক্তারবাবু, মরণে আমার কি আনন্দ তা আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি যে মরবই তা আমি বেশ জানি। তবু যে এতদিন কেমন করে বেঁচে আছি, আমি তাই ভেবে সময় সময় আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আমি সকল সময় শ্রীধরের কাছে প্রার্থনা করি—আমায় মানুষের আকাঙ্ক্ষিত যা সব দিয়েছিলে ঠাকুর, নিজের অদৃষ্টের দোষে পেয়েও সব হারিয়েছি। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, এখন আমায় মরণ ভিক্ষা দাও। এই দেড় বছর আমার যে কি করে কেটেছে, দিন যে কি রকম করে চলে যায়, তা আপনি বুঝতে পারছেন না—বুঝছেন অন্তর্যামী ভগবান। আপনি তবু আমায় প্রবোধ দিতে চান—আমি বাঁচব। সে কথা তাদের বলবেন ডাক্তারবাবু—যারা বাঁচতে চায়, পৃথিবীতে থেকে যাদের পাওয়ার আশা আছে। আমার যে কিছুই পাওয়ার আশা নেই বাবা, আমি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে আছি।"

পীড়িতার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। ডাক্তার তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

সীতা নিকটে ছিল, ডাক্তার তাহাকে দূরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া শুষ্ক স্বরে বলিলেন, "বিপদের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে থেকো দিদি। মায়ের যে রকম অবস্থা দেখছি, তাতে আমি কিছুতেই আশা করতে পারছিনে। যদি এমনি থাকেন তাও ভাল। কিন্তু যদি আরও দুই একটা উপসর্গ এর পরে এসে যোগ দেয়, তাহলে আমার ক্ষমতার অতীত বলে জেনো।"

সীতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দাদুকে কথাটা বলে' যাবেন।"

সুশীলবাবু কয়দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগিনীর পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। ইভা মাঝে মাঝে নিকটে আসিয়া বসিত,—খানিকটা নীরবে থাকিয়া চোখের জল ফেলিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া যাইত।

সেদিন সকাল হইতে হিক্কা উঠিতে লাগিল, ডাক্তারের মুখখানা মলিন হইয়া গেল।

সীতা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, শুষ্ককণ্ঠে সে ডাকিল "ডাক্তার দাদা—"

ডাক্তার একবার মাত্র তাহার মুখের উপর চোখ দুইটী তুলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া গেলেন। সীতা ঈশানীর বুকের উপর মুখখানা রাখিয়া চোখের জলে ভিজাইয়া দিল।

তাহার মাথার উপর শীর্ণ দুর্ব্বল হাতখানা রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "কাঁদছিস কেন সীতা, আমি চলে যাচ্ছি বলে তুই চোখের জল ফেলছিস মা? ওরে পাগলা, আমার যাওয়ার সময় কেন চোখের জল ফেলছিস বল দেখি? আমার সকল বাঁধন খুলে দে মা। মনে কর—আমি আনন্দধামে আনন্দময়ের পায়ের তলায় আশ্রয় নিতে যাচ্ছি; সংসারে এসে শান্তি পাইনি, মা—বড় জ্বালায় জলেছি, দেখতে যাচ্ছি সেখানে শান্তি পাওয়া যায় কি না। একদিন তুইও তো সেখানে যাবি মা,—আমি অপেক্ষা করব, সেখানে তোর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। ওঠ সীতা, চোখের জল মুছে ফেল মা, হাসিমুখে আমায় বিদায় দে!"

"হাসিমুখে বিদায়?" সীতার বুকখানা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সে মুখখানা বড় বিকৃত করিয়া ফেলিল—তবু সে চোখের জল মুছিল, মুখে হাসি না আসিলেও কান্নাকে সে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেকাইল।

"যাওয়ার বেলা একবার ইভাকে আর ছোট বৌকে আমার কাছে ডেকে আন সীতা। ইভা রোজ আমায় দেখতে আসে, আমি একদিনও তার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। সে ভেবে নিয়েছে আমি তার ওপর রাগ করে এখনও আছি। সে ছেলেমানুষ,—বুঝতে পারেনি। বড় যাতনায় আমি মূর্চ্ছিতার মত পড়ে থাকতুম, কথা বলতে আমার ভাল লাগত না। আজ শেষ একবার তার সঙ্গে কথা বলে যাই, একবার তাকে ডাক সীতা।"

অশ্রুমুখী ইভা আসিয়া ঈশানীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল, তাঁহার বুকের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া জয়ন্তীর পানে চাহিয়া বিকৃত কণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "আজ যাওয়ার বেলায় বলে যাচ্ছি ছোট বউ, হয় তো কত সময় আমার কত ব্যবহারে

ব্যথা কষ্ট পেয়েছ, আজ এ সময়ে সেজন্য আমায় ক্ষমা করো। মনে করো—শোকে দুঃখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কি বলতে কি বলেছিলুম তার ঠিক নেই। আমার সব দোষ ক্ষমা কোরো।”

ইভার পানে তাকাইয়া বলিলেন, “তোকেও বড় ব্যথা দিয়েছি মা। অভিমানে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম; বেশ জানতুম তুই আমায় কতখানি ভালবাসিস, তবু আমি আমার কাছে আসার সুখ হতে তোকে বঞ্চিতা করেছিলুম, আমার কোন কাজে তোকে হাত দিতে দিইনি। তোরা দুই বোন রইলি, আমার সংসারে যেন বিশৃঙ্খলা না আসে, তোদের দাদুর ভার এখন হতে তোদের হাতেই রইল। আর যে কয়টা দিন তিনি বেঁচে থাকেন, সর্ব্বদা তাঁর কাছে থাকিস, দেখিস—তিনি যেন পাগল হয়ে না যান।”

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বিহারীলাল পুত্রবধূর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শূন্য নেত্রে তাকাইয়া দেখিলেন, যাহাকে এতটুকু বয়সে গৃহে আনিয়া সংসারের কর্ত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, মা বলিয়া যাহাকে ডাকিয়া এত দুঃখেও হৃদয়ে আনন্দ পাইতেন, আজ সেও চলিয়া যাইতেছে। তাহার স্বামী গিয়াছিল, পুত্র গিয়াছিল, নারী-জীবনের সর্ব্বস্ব হারাইয়াও সে শুধু তাঁহার পানে চাহিয়া নিজের কর্ত্তব্য প্রাণপণে পালন করিয়া যাইতেছিল, আজ সেও চলিল। বৃদ্ধ আকুল ভাবে চারিদিকে চাহিলেন। ঈশানীর বিছানা ঘেরিয়া সকলে দাঁড়াইয়া, সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর ন্যস্ত।

ঈশানীর মুখখানা মুহূর্ত্তের তরে দীপ্ত হইয়া তখনই অন্ধকার হইয়া গেল। নিভন্ত-প্রায় চোখের কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। হাঁফাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, “বাবা, একটু পায়ের ধূলো,—”

বৃদ্ধের কাণে সে কথা গেল না, তিনি দীপ্তিহীন নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিলেন—তাঁহার সব কেমন করিয়া একে একে চলিয়া যায়।

সীতা রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, “দাদু, মা পায়ের ধূলো চাচ্ছেন।”

বৃদ্ধ তথাপি নিশ্চল দেখিয়া সে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ঈশানীর ললাটে মুখে দিল।

একদৃষ্টে তিনি বিহারীলালের পানে চাহিয়া ছিলেন,—যেন কি বলিতে চান, কিন্তু সে কথা মুখে আসে না।

সীতা ডাকিল,—“দাদু—”

বিহারীলালের বাহ্য জ্ঞান এইবার যেন ফিরিয়া আসিল; তিনি সীতার পানে চাহিলেন। সীতা তাঁহার হাতখানা ধরিয়া ঈশানীর সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিল, “এখানে দাঁড়ান দাদু, মা কি বলতে চাচ্ছেন শুনুন। এর পরে এই কথাটা শুনবার জন্যে হাহাকার করলেও—”

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে আর একটা কথাও সে বলিতে পারিল না।

“মা,—বউমা, তবে আজ যথার্থই চলে যাচ্ছো কি? তোমরা সবাই একে একে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে, আর আমি,—আমি কি শুধু তোমাদের স্মৃতি উজ্জ্বল করে রাখবার জন্যে—কেবল হাহাকার করবার জন্যেই বেঁচে থাকব মা?”

বৃদ্ধ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

“বাবা—জ্যোতি—”

অভাগিনী মায়ের মুখে আর কথা ফুটিতেছিল না, তবু তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মর্ম্ম-মাঝে যে কথা জাগিতে ছিল, শত চেষ্টাতেও তাহা মুখে ফুটাইতে পারিলেন না।

সুশীলবাবু তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, “জ্যোতির কথা এখন ভুলে যান মা, শ্রীধরের চিন্তা করুন, শ্রীধরকে ডাকুন।”

দৃষ্টিহীন চোখের পার্শ্ব দিয়া দুটি ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল, আর একবার কথা কহিবার শেষ উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরাইয়া গেল।

ইভা কাঁদিতেছিল, সীতা তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, “কেঁদ না ইভা,—মা বলে গেছেন, তাঁর মৃত্যুতে যেন কেউ না কাঁদে। বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন, বড় শান্তি পেয়েছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন, ওঁকে ডেকো না।”

সুশীলবাবুকে উপস্থিতকার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়া ভূলুণ্ঠিত বৃদ্ধ দাদুকে অবলীলাক্রমে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া সীতা বাহির হইয়া গেল। খানিকটা কাঁদিতে পাইলে সে শান্তি পাইত; কিন্তু সকলেরই কাঁদিবার সময় ছিল—তাহার সময় ছিল না।

(২৮)

সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর পরে জ্যোতির্ম্ময় দেশের মাটীতে পদার্পণ করিল। বিলাতে গেলে এ দেশের ছেলেদের

যতখানি পরিবর্ত্তন হয়, জ্যোতির্ম্ময়েরও ততখানি হইয়াছিল, মনের ভিতরটা তাহার তখনও কাঁচা ছিল। বিলাতে থাকিতে কলিকাতার কথা খুব কমই মনে পড়িত,—শ্যামল লতা-পাতায়-ছাওয়া ক্ষুদ্র পল্লীখানির কথাই তাহার বেশী মনে পড়িত। সে তখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত।

সীতার কথাও যে মনে পড়িত না এমন নহে, কিন্তু সে খুবই কম। সে কল্পনায় দেখিত, এতদিন সীতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের মেয়ে চিরকাল অবিবাহিতা থাকিতে পারে না, সীতা থাকিবে কেমন করিয়া? জ্যোতি কখনও ভাবিতে পারে নাই সীতা এখনও অবিবাহিতা আছে,—এখনও একটী কুমারী হৃদয়ের পবিত্র পূজা সে নিত্য অহরহঃ পাইতেছে।

যাক, এ একটা শান্তির কথা। স্পর্দ্ধাও কম নয়। সীতা তাহার স্ত্রী হইবে—কথাটা মনে করিতেও হাসি পায়। কবে দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হইয়াছিল—তাহাদের পুত্রকন্যা জন্মিলে বিবাহ দিতে হইবে। তাহার পর মেয়েটী কুৎসিত, অঙ্গহীনা হোক, মূক হোক তবু সে তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, জীবনের সহধর্ম্মিণী করিতে হইবে এমন কোনও অর্থ নাই। দাদু আর মা সেই কোন্ অতীতের জের বহিয়া বেড়াইতেছেন, জ্যোতির হাতে সীতাকে দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। সীতাকে বিবাহ করিলে সে কি কোন দিকে উন্নতি লাভ করিতে পারিত? সপ্তাহ অন্তর দেবযানীর যে দীর্ঘ পত্র আসে তাহা পড়িয়া কতটা তৃপ্তি পাওয়া যায়! সীতা কি এমন পত্র লিখিতে পারে?

বৃদ্ধ দাদুর কথা মনে করিতে তাহার চক্ষু দুইটী অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া উঠিত। আহা, বড় কষ্টে বড় আবেগে বৃদ্ধ ত্যাগপত্রখানা দিয়াছেন, সে পত্র আজও জ্যোতির বাক্সের মধ্যে পড়িয়া আছে। যে জ্যোতি কখনও তাঁহার মুখের সম্মুখে একটা কথা বলে নাই, সে কি না তাঁহার আদেশ অবহেলা করিল, তাঁহার দান ফেলিয়া দিল, দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া গেল? বড় কষ্টে দুঃখে, অভিমানে বৃদ্ধের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি আদেশ করিয়াছেন, জ্যোতি যেন নিজেকে তাঁহার বংশধর বলিয়া কোথাও পরিচয় না দেয়,—জ্যোতি মনে করুক, সে তাঁহাদের কেহই নহে।

আর সেই চিরদুঃখিনী ব্রহ্মচারিণী মা—!

চিরসংযত, চিরশান্তস্বভাবা মা আমার! কখনও তাঁহার হৃদয়ের একটা কথাও তিনি প্রকাশ করেন নাই। স্বামীর মৃত্যুর পরে পাছে জ্যোতি কাঁদে এই ভয়ে তিনি চোখের জলও ফেলিতে পারেন নাই। জ্যোতির মনে পড়িত সেই দিনের কথা—যে দিন সে সকল সঙ্কোচ লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া মায়ের কাছে জানাইয়াছিল, সে দেবযানীকে বিবাহ করিবে, বিলাত যাইবে। সেদিন মায়ের মুখখানা শবের মতই মলিন হইয়া উঠিয়াছিল,—তিনি কি রকম ব্যাকুল চোখে তাহার পানে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কতক্ষণ একটী কথা ফুটিতে পায় নাই, কিন্তু বুকের মধ্যে যাহা করিতেছিল তাহা মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মায়ের কথা মনে করিতে জ্যোতির চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িত।

দাদু যে এ জীবনে তাহাকে ক্ষমা করিবেন না, তাহা সে বেশই জানিত। দাদুর সম্মুখীন হইবার সাহসও তাহার ছিল না। কিন্তু তিনি না ক্ষমা করুন,—মা কি ক্ষমা করিবেন না? মা সন্তানের উপর রাগ করেন, অভিমান করেন; কিন্তু সে রাগ অভিমান তো চিরকাল থাকে না। কথাতেই সে আছে—কুপুত্র যদি বা হয়—কুমাতা কখনও নয়। সে ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া কায়স্থ-কন্যা বিবাহ করিয়াছে, ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে,—দারুণ অপরাধে সে অপরাধী। সমাজ তাহাকে ক্ষমা করিবে না, দাদু তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু মা—তাহার স্নেহময়ী মা,—তিনিও কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন না?

আশার আলোকে তাহার অন্ধকার হৃদয়খানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আছে,—মায়ের বুকে তাহার স্থান আছে। মাকে সে দেখিতে পাইবে, মায়ের বুকে সে মাথা রাখিতে পাইবে, মায়ের চোখের জলের সঙ্গে তাহার চোখের জল মিশাইতে পারিবে। মায়ের পায়ের ধূলা সে পাইবে, মায়ের আশীর্ব্বাদ সে লাভ করিবে। সে কুপুত্র হইলেও মা স্নেহহীনা নন। তিনি যে স্নেহময়ী মা।

বিলাতে এই কয়টা বৎসর সে দেশের খবর কিছুই পায় না। বন্ধুদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিত; তাহাতে কিছুই জানা যাইত না। এখনও বাংলা দেশের একটী পার্শ্বে এক নিভৃত পল্লীর জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে, এ কথা শুনিলে সকলে যে হাসিবে।

দেশের মাটীতে পা দিয়া তাহার মনে হইল—এইবার সে বাড়ীর খবর পাইতে পারিবে।

শ্বশুর, শাশুড়ী, স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব—সকলেই নূতন ব্যারিষ্টারকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। সুরেশবাবুর প্রিয় বন্ধু ডাক্তার এন, মিত্র বলিয়াছিলেন, জামাতার দেশে ফিরিয়া আসা উপলক্ষে সুরেশবাবুর একটী প্রীতিভোজ দেওয়া আবশ্যক।

সুরেশবাবুর স্ত্রী মাধবী বলিলেন, "ঠিক কথা বলেছেন ডাক্তার মিত্র,—সমাজে জ্যোতিকে পরিচিত করে দেওয়া চাই। কিন্তু আপনার বন্ধুটীকে বলাও যা না বলাও তাই। আপনি সময় পেলে একবার সন্ধ্যের দিকে আমাদের বাড়ী আসবেন, যা কথাবার্ত্তা আমার সঙ্গেই হবে; কেন না ওঁর নাগাল পাওয়া ভার। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক কতটুকু তা তো আপনি বেশই জানেন।"

শেষের দিকটায় তাঁহার কণ্ঠস্বর একটু আর্দ্র হইয়া উঠিল, তিনি স্বামীর পানে একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

বাস্তবিকই সংসারের সঙ্গে এই লোকটীর সম্পর্ক ভারি কম ছিল। তাঁহার একটা বিশেষ দোষ ছিল। সংসারের কোন জটিলতার মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করিতে চাহিতেন না। নিজে যেমন সাধাসিধা ধরণের লোক ছিলেন, সেইরূপ সাধাসিধা ধরণটাই পছন্দ করিতেন। যশোহর জেলার অন্তঃপাতী কোন পল্লীগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে ছিলেন তাঁহার এক বৃদ্ধা মাসীমা। ধর্ম্মত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেশের সহিত—সমাজের সহিত সকল সম্পর্ক রহিত হইয়া যায়। তথাপি তিনি বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে একদিনের জন্যও দেশে যাইতেন, মাসীমার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আসিতেন। তিনি যে দেশে যান, মাসীমার সহিত দেখা করেন, এ সংবাদ মাধবীর নিকট অজ্ঞাত ছিল। মাধবী পল্লীগ্রামকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন, কুসংস্কারান্ধ মাসীমাকে তাহাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিতেন। একবার মাসীমার নামটা বড় আবেগে স্ত্রীর নিকটে করিতে গিয়া সুরেশবাবু স্ত্রীর মুখে বিরক্তি রেখা ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন। মাসীমা তাঁহার তিন বৎসর বয়স হইতে কি করিয়া তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে গিয়াছিলেন, স্ত্রীর বিরক্তি ভাব দেখিয়া থামিয়া গিয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত্তে স্ত্রীর অন্তরটা তিনি স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইয়াছিলেন, আজ বাইশ তেইশ বৎসর তিনি দেশের নাম, মাসীমার নাম আর স্ত্রীর কাছে করেন নাই। তাঁহার মুখে মাসীমার অপূর্ব্ব স্নেহের কথা অনেকেই শুনিতে পাইত, কেবল মাধবীই আর কোন দিন শুনেন নাই। তাঁহার মনে অভিমান বড় প্রবল ছিল। সেই অভিমানই স্ত্রীর কাছে মাসীমার কথা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল।

তিনি নিজের ঘরটীতে দিব্য আরামে থাকিতেন। আহারের সময়টা মাত্র স্ত্রীর সহিত দেখা হইত। সেই সময়টুকুর মধ্যে সুবিধা পাইয়া মাধবী এত কথা শুনাইয়া দিতেন যে, স্বামী বেচারা কোনক্রমে দুইটা নাকে-মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হইতেন।

স্বামীটিকে লইয়া মাধবীর জ্বালা সহিতে হইত বড় কম নয়। উচ্চশিক্ষা লাভ করিলেও সুরেশবাবু সামাজিক আচার-ব্যবহার একটাও শিখিতে পারেন নাই। বাহিরে যেই কেন আসুক না, তিনি তাঁহার নির্জ্জন গৃহকোণ ছাড়িয়া কিছুতেই বাহির হইতেন না। চারিদিকে আলমারি ঠাসা বই, টেবিলে রাশি রাশি বই। এই বইয়ের গাদায় আসিয়া পড়িলে মাধবীর দম বন্ধ হইয়া আসিত। কিন্তু সুরেশবাবু পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া ইহার মধ্যে আত্মহারাভাবে বসিয়া থাকিতেন। নিয়মিতভাবে কলেজ যাইতেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাহিরে ঘুরিয়া আবার আসিয়া সেই বইয়ের সাগরে যে ডুব দিতেন, কেহ তাঁহার সাড়া পাইত না।

আশ্চর্য্য এই—মাধবী যাহাদের ঘৃণা করিতেন, তিনি তাহাদের ভালবাসিতেন। তাঁহার ছাত্রগণের এই ঘরটীতে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল; অথচ এই ছেলেগুলিকে মাধবী আদৌ দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল—এ দেশের ছেলেরা লেখাপড়া শিখিলেও শিষ্টাচার কাহাকে বলে তাহা শিক্ষা করে নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা দেবযানী যখন এই সব ছেলেদের মধ্য হইতে জ্যোতির্ম্ময়কে ভাবী স্বামীরূপে নির্ব্বাচন করিয়া লইল, তখন তিনি একেবারেই অসম্মত হইলেন। কিন্তু সুরেশবাবু এ কথা শুনিয়া ভারি খুসী হইয়া উঠিলেন, কারণ সকল ছেলের মধ্যে তিনি জ্যোতির্ম্ময়কে বেশী রকম ভালবাসিতেন। জ্যোতির্ম্ময় যে বংশের ছেলে তাহা তিনি বেশ চিনিতেন। এককালে রামনগরের জমিদার-পুত্র প্রতাপের সহিত তিনি বি-এ পড়িয়াছিলেন। প্রতাপের সহিত তাঁহার খুবই আলাপ ছিল।

প্রথমটায় আনন্দিত হইয়াই তিনি বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন,

মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, জ্যোতির সঙ্গে দেবযানীর বিয়ে হতে পারে না, এ একেবারেই অসম্ভব।"

যতক্ষণ তিনি সপক্ষে ছিলেন ততক্ষণ মাধবী বিপক্ষে ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে স্বামী অমত দিলেন তৎক্ষণাৎ তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন—"কেন, অসম্ভব কিসে?"

সুরেশবাবু উত্তর দিলেন, "কারণ সে তার বংশের একটীমাত্র ছেলে। দেবযানীকে বিয়ে করতে তাকে শুধু ধর্ম্ম নয়—মা দাদু সমাজ সবই ত্যাগ করতে হয়। ব্রাহ্মণ-পুত্রের সঙ্গে কায়স্থ-কন্যার বিয়ে হিন্দুসমাজের পণ্ডিতেরা কখনই অনুমোদন করবেন না এটা তো বোঝ মাধবী। এতে মা দাদুর বুক ভেঙ্গে যে দীর্ঘশ্বাস পড়বে, সে দীর্ঘশ্বাস কি এদের জীবন সুখময় করতে পারবে মনে কর?"

তাঁহাকে অমত করিতে দেখিয়া মাধবীর ঝোঁক পড়িয়া গেল—যেমন করিয়াই হোক, এ বিবাহ দিতেই হইবে। হয় তো এ বিবাহ হইত না যদি না সুরেশবাবু ভবিষ্যৎ পানে চাহিয়া অমত প্রকাশ করিতেন। শেষটায় মর্ম্মাহত সুরেশবাবু সরিয়া গেলেন, বিবাহ ব্যাপারে তিনি যোগ দেন নাই।

জ্যোতির বিলাত যাওয়ার প্রস্তাবে তাঁহার মত ছিল না। বিলাতে গেলে মানুষ মানুষ হয়, এ দেশীয় শিক্ষায় তাহাদের মানুষ করিতে পারে না, এমন কোন প্রমাণ তিনি এ পর্য্যন্ত পান নাই। তাঁহার অমত দেখিয়া মাধবীর ঝোঁক পড়িয়া গেল জামাতাকে বিলাতে পাঠাইতেই হইবে, না হইলে তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন না।

সুরেশবাবুর যাহা অপছন্দ হইত, দুইএকবার মৃদু আপত্তি করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। সেই একই বিষয় লইয়া বেশী কসাকসি করা তাঁহার স্বভাব-বহির্ভূত ছিল।

এইরূপ অবাধ্য স্বামী লইয়া মাধবীকে দিন কাটাইতে হইতেছিল। প্রতি পদে স্বামীকে সতর্ক করিয়া দিতেন, শিষ্টাচার সভ্যতাতে স্বামীকে একেবারে আনাড়ি দেখিয়া সজল চোখে ললাটে করাঘাত করিতেন। হায় রে, যে চিরটাকাল জ্ঞানার্জ্জনে জীবন কাটাইয়া দিতেছে, সে এইটুকু জ্ঞানও কি পায় নাই।

মেয়েরা শিক্ষা পায় মায়ের নিকটে। মা যে ভাবে চলেন মেয়েরা সেইভাবে চলিতে অনুপ্রাণিতা হয়। মাধবীর আদর্শে দেবযানী গঠিয়া উঠিয়াছিল। পিতার উপদেশ সে পায় নাই এমন নহে, কিন্তু পিতার মনোমত সে নিজেকে গঠন করিয়া লইতে পারে নাই। ইহার জন্য তাহাকে অপরাধিনী করা যায় না; কেন না, সংসারে মায়ের আধিপত্য অব্যাহত; পিতা বড় দূরে থাকিতেন। মা স্বেচ্ছামত দেবযানীকে গর্ব্বিতা-প্রকৃতির বিলাসিনী রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। স্বামীকে সে দেবতা রূপে ভক্তি করিতে পারে নাই, মানুষ হিসাবে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং তাহারই হিসাব রাখিতেছিল। একমাত্র কন্যার এরূপ অধোগতি দেখিয়া সুরেশবাবু অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। পত্নীর শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যখন তিনি অতি মৃদুকণ্ঠে দুই একটা কথা বলিয়াছিলেন, তখন মাধবী রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন; এবং স্পষ্টই তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—মেয়েদের সংবাদ মেয়েরাই রাখে, কি ভাবে তাহাদের সংসার নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা মেয়েরাই জানে। পুরুষে জানে না বলিয়াই তাহাদের হাতে মেয়েদের শিক্ষার ভার কোনকালে নাই এবং কোনকালে থাকিতেও পারিবে না। যদি পুত্র হইত, পিতা তাহাকে শিক্ষা দিতেন,—মাধবী তাহাতে একটা কথাও বলিতেন না। কন্যাকে তিনি যে ভাবেই গড়িয়া তুলুন না, তাহাতে কথা বলিতে আসা নিষ্প্রয়োজন।

সুরেশবাবু আর কোন দিন একটা কথাও বলেন নাই। আপনার গৃহে পরের মত তিনি বাস করিতেন। লোকে জানিত, তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার কন্যা। তিনি জানিতেন, ইহারা কেহই তাঁহার আপনার নহে।

এই অতিরিক্ত নিরীহ সরল লোকটীর সংস্কার ও বিশ্বাসের উপর অবিশ্রান্ত আঘাত করিয়া মাধবী নিজেই যে তাঁহাকে সংসার হইতে অনেক দূরে সরাইয়া দিয়াছিলেন তাহা ভাবেন না। মনের দুঃখে স্বামীকে আরও কটুকথায় ব্যথিত করিয়া তুলিতেন, নিজেও ব্যথা বড় কম পাইতেন না। স্বামীকে তিনি যথেষ্ট ভালবাসিতেন; কিন্তু তাঁহার কথায় বা কার্য্যে একদিনও সে ভাব ফুটিতে পারে নাই। সুরেশবাবুর ধৈর্য্যশক্তি অসীম, বড় ব্যথা পাইলেও তিনি মুখ ফুটিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। মুখে কখনও বড় মলিন একটু হাসির রেখা ফুটিয়া তখনই মিলাইয়া যাইত। নির্জ্জনে হাত দুখানা ললাটে ঠেকাইয়া তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের এই বিশ্বাসে মাধবী আঘাত করিলেও তাহা শিথিল না হইয়া বদ্ধমূল হইতেছিল।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সহিত মোগলের সঙ্ঘর্ষ

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ

খাঁ জাহান—ঈশা খাঁ সঙ্ঘর্ষ

ঈশা খাঁর অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা গতবারে করা হইয়াছে। এইবার খাঁ জাহানের সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষের বিবরণ অনুসরণ করা যাউক।

১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে দেখা গেল, ইব্রাহিম নাড়াল এবং করিমদাদ মুসাজাই নামক আফগান সর্দ্দারদ্বয় ঈশা খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ভাটি প্রদেশে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছে। আকবরনামায় এই সর্দ্দারদ্বয়ের কোন পরিচয় নাই। আকবরনামার বর্ণনায় বোধ হয় তাঁহারা ভাওয়ালের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের জমীদার ছিলেন। ভাওয়াল, তালেপাবাদ, সেলিমপ্রতাপ, চাঁদপ্রতাপ এবং সুলতানপ্রতাপ তখন গাজীবংশের অধিকারে। কাজেই তাঁহারা সম্ভবতঃ সোনার গাঁ—মহেশ্বরদির জমীদার ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মোগল নাওয়াবার অধ্যক্ষ শাহ বর্দ্দিকে পর্য্যন্ত বিদ্রোহীগণ দলে টানিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল!

খাঁ জাহান সৈন্য লইয়া বাহির হইলেন। পথে গোয়াঁস নামক স্থানে দায়ুদের মাতা নৌলখা সপরিজনে আসিয়া খাঁ জাহানের আশ্রয় লইলেন। এই গোয়াঁস মুর্শিদাবাদ জেলার একটি পরগণা—ঐ নামে একটি ক্ষুদ্র সহরও রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়। উহা গঙ্গার দক্ষিণ তীরস্থ সদর রাস্তার উপরে। গঙ্গা পার হইয়া উত্তরবঙ্গে যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে তাহাও গোয়াঁস হইয়াই গিয়াছে। এই স্থান বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ সহর হইতে ১৩।১৪ মাইল সোজা পূবে এবং তাঁড়া সহর হইতে ৩৪।৩৫ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত।

পূর্ব্বেই আফগান সর্দ্দার মতি বা মুহম্মদ খাঁ খাসখেলের উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই মতি দায়ুদের বাছা বাছা ধনরত্ন স্বীয় হস্তগত করিয়াছিল। কাজেই তাহার প্রতি নৌলখার ভাল ভাব আসিবার কথা নহে। এই সময় মতিও আসিয়া খাঁ জাহানের বশ্যতা স্বীকার করিলে নৌলখা সুযোগ পাইলেন। নৌলখার অভিযোগে মতির প্রাণদণ্ড হইল। এই ব্যাপারের উপর আবুল ফজল বক্র কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—"এই সময় মতি ও নৌলখায় বিরোধ উপস্থিত হইল। খাঁ জাহানের অভিপ্রায় ছিল মতিকে শেষ করিয়া দেওয়া,—মতির প্রাণদণ্ড হইল। প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, মতির বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনার যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার জন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া,—সঙ্গে সঙ্গে মতির হাত হইতে কি ধনদৌলত ছিনাইয়া লওয়া হইল তাহা যাহাতে প্রকাশ না পায় সেই উদ্দেশ্যও সাধিত হইয়া গেল!" (A. N. III. 376)

ক্রমে কুচ করিয়া মোগল সৈন্য পূর্ব্ব দেশে অগ্রসর হইতে লাগিল। শাহ বর্দ্দিও বিদ্রোহী পক্ষ ত্যাগ করিয়া আবার সম্রাটের পক্ষে আসিয়া যোগ দিলেন। খাঁ জাহান যখন ভাওয়াল সহরে * আসিয়া ছাউনী ফেলিলেন, তখন ইব্রাহিম নাড়াল ও করিমদাদ প্রমুখ আফগানগণ আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ঈশা খাঁর উচ্চ শির কিন্তু নমিত হইল

* বেভারিজ সাহেব লিখিয়াছেন—ইহা ঢাকা জেলার রণভাওয়াল। বেভারিজের নির্দ্দেশ বোধ হয় ঠিক নহে; রণভাওয়াল ময়মনসিংহ জেলার পরগণা, আর খাঁ জাহানের তালিপাবাদের উপর দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন দেখিয়া মনে হয়—তিনি আসিয়াছিলেনও এই পথেই। এই পথে আসিয়া ঢাকা জেলার ভাওয়ালে আসিয়াই ছাউনী ফেলা সম্ভবপর, ময়মনসিংহের রণ-ভাওয়ালে নহে। ভাওয়ালের গাজী জমীদারের রাজধানী ছিল লক্ষ্যা-তীরে বর্ত্তমান কালীগঞ্জের সংলগ্ন চৌরা নামক স্থানে। টেইলার সাহেব বর্ত্তমান নাগরীকে ভাওয়াল গ্রাম বলিয়াছেন (Taylor, Topography P. 110.)। নাগরী বর্ত্তমান কালীগঞ্জ হইতে ৪।৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। রেনেলের মানচিত্রে যেখানে ভাওয়াল সহর অঙ্কিত আছে (৬নং মানচিত্র) তাহা নাগরী গ্রাম বলিয়াই বোধ হয়। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন কিন্তু নাগরীর অস্তিত্বই ছিল না। নাগরী বর্ত্তমান কালে ঢাকা জেলাস্থ দেশীয় খ্রীষ্টানগণের এক বড় উপনিবেশ। এই স্থান, এক মতে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, এক মতে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান উপনিবেশে পরিণত হইয়া বিখ্যাত স্থান হইয়া উঠে। (Mr. H. E. Stapleton's article in J. A. S. B. 1922, P. 50. f.n. 3 and page 51, para 1.

না। শাহবর্দ্দি ও মুহম্মদ কুলির অধীনে বৃহৎ সেনাদল ঈশা খাঁর সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া গেল। বাদশাহী নাওয়ারা লক্ষ্যার উজানে বাহিয়া সম্ভবতঃ লাখপুর হইয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র দিয়া এগারসিন্দুর পৌঁছিল। এই স্থানটি ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে—বামার নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্র হইতে উত্থিত হইয়াছে ঠিক তাহারই সম্মুখে। নামটি প্রকৃত পক্ষে এগারসিন্ধু অর্থাৎ এগারটি নদীর মিলন-স্থল। ময়মনসিংহ জেলার বর্ত্তমান কালের ১″—৪ মাইল মানচিত্রেও এখন পর্য্যন্ত এই স্থানের "সিন্ধু"গুলির খাত চিত্রিত আছে, গণিয়া ১১।১২টি এখনও পৃথক করা যায়। এগার সিন্দুরে এক সময় বৃহৎ কেল্লা ছিল, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল। *

এগারসিন্দুরের নিকট ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়া বাদশাহী নাওয়ারা ধীরে ধীরে সরাইলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মেঘনা বাহিয়া উহা যখন কাস্তলের নিকট পৌঁছিয়াছে এমন সময় ঈশা খাঁ উহার গতিরোধ করিলেন। কাস্তল বা সাধারণ কথায় কাইটাইল অষ্টগ্রাম হইতে দুই মাইল পশ্চিমে, মেঘনার প্রাচীন খাত ধলেশ্বরী নদীর তীরে।

ঈশা খাঁ তখন ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী, বাদশাহী ফৌজের সহিত আঁটিয়া উঠা তখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি পরাজিত হইয়া পূর্ব্বদিকে হঠিলেন। বিনা সাহায্যে বাদশাহী ফৌজের সহিত লড়া অসম্ভব দেখিয়া তিনি ত্রিপুরারাজের সাহায্য প্রার্থনা করিতে গেলেন। সম্ভবতঃ নিজের সৈন্য সামন্ত পশ্চাতে রাখিয়া তিনি মেহারকুল পরগণার উপর দিয়া অর্থাৎ বর্ত্তমান কুমিল্লা সহরের নিকট দিয়া উদয়পুর রাজধানীতে পৌঁছিলেন। রাজার কাছে সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলে মন্ত্রীগণ প্রবল-প্রতাপান্বিত আকবর বাদশাহের সহিত বিরোধ অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে মহারাজকে বারণই করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরারাজের নিয়োগে অনেক পাঠান সর্দ্দার ছিল। রাজমালায় লিখিত আছে যে এই রকম দুই পাঠান সর্দ্দার তাজখাঁ বাজখাঁর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা ঈশা খাঁকে উজীরের শরণাপন্ন হইতে বলিলেন। ঈশা খাঁ কিন্তু বুদ্ধি করিয়া মহারাণী অমরাবতীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনে তাঁহার স্নেহ-কোমল মাতৃ-হৃদয় গলাইয়া ফেলিলেন। মহারাণী তাঁহাকে স্তনধৌত জল পান করাইয়া পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে মহারাজের স্নেহ পাইতেও তাঁহাকে বেগ পাইতে হইল না। অমরমাণিক্য ঈশা খাঁকে মসনদালি খ্যাতি দিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ ৫২০০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। *

এদিকে কিন্তু ত্রিপুরার সাহায্য আসিয়া পৌঁছিবার

Also "History of the Portuguese in Bengal" by J. A. Campos, P. 248) চৌরা (স্থানীয় লোকে উচ্চারণ করে 'চৈরা') বর্ত্তমান কালীগঞ্জ হইতে সোজা এক মাইল উত্তরে এবং টঙ্গী ভৈরব রেল লাইনের আধ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ষ্টেশন আড়িখোলা হইতে দেড় মাইল পূর্ব্বোত্তরে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই গ্রামের নাম নূতনতম থানাম্যাপ গুলিতে দেওয়া হয় নাই এবং চৌরার প্রকাণ্ড দীঘিটি বড়নগর গ্রামের অন্তর্গত দেখান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু দিন ভাওয়াল-রাজের কালীগঞ্জ কাচারীর নায়েব ছিলেন—তিনি লিখিয়াছেন, বড়নগর চৌরার অদূরবর্ত্তী গ্রাম। (ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, অগ্রহায়ণ, ১৩২১, ২৫৩ পৃষ্ঠা। "ভাওয়ালের গাজীবংশ নামক প্রবন্ধ। কাছেই চান্দাইয়া নামে এক গ্রাম আছে—চলতি কথায় লোকে চৌরার সহিত ইহার নাম যুক্ত করিয়া—'চৈরা চান্দাইয়া' বলে।

* The fort of Egarasindur must have commanded a very strong position when the Brahmaputra flowed below its ramparts. The Brahmaputra has now dried up to the narrowness of a canal and the whole of the old river-bed which is more than a mile broad is now under cultivation But the grandeur of the position of Egarasindur can still be seen at a glance if one stands on the citadel of the fort, Occupying the apex of the angular piece of land formed by the sharp bend of the Brahmaputra, it was almost unassailable when the river was full. The now dried up channel called the Sankha river whose old bed can still be seen near Shah Jahan's mosque, also afforded protection. The earthen rampart of the fort still stands about 8 feet high in places and the buruz and the gateway still show traces of masonry construction....... The town of Egarasindur must have been a very considerable one at the time of its highest prosperity. Toke on the opposite side was a big mart and seems to have been to Egarasindur, what Howrah now is to Calcutta.

"Notes on antiquarian remains on the Lakhya and the Brahmaputra."

Dacca Review, Feb.—Mach. 1917. P. 326-27.

* ইছা খাঁয়ে সেইকালে মনে বিবেচিল।
মহারাণী প্রতি সেই মাতৃ সম্বোধিল।

পূর্ব্বেই পাশার দান বদলাইয়া গিয়াছে! আবুল ফজল লিখিয়াছেন,—ঈশা খাঁর পরাজয়ের পরে বাদশাহী সৈন্য যখন সরাইল-জোয়ানসাহিতে লুটতরাজে মত্ত এমন সময় মজলিস দিলাওয়ার এবং মজলিস প্রতাপ নামক এই অঞ্চলের দুই জমীদার সহসা ঐ অঞ্চলের নদীনালাগুলি হইতে অসংখ্য যুদ্ধনৌকা বাহির করিয়া বাদশাহী নাওয়ারা আক্রমণ করিলেন। এই দুই জমীদার জোয়ানসাহী ও খালিয়াজুড়ীর জমীদার বলিয়া পূর্ব্বে অনুমিত হইয়াছে। অমর মাণিক্যের অমরসাগর খননে যাহাঁরা সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাঁদের মধ্যে অষ্টগ্রাম ও বানিয়াচঙ্গের দুই জমীদারের কথা জানা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাদের নাম লিপিবদ্ধ হয় নাই। বানিয়াচঙ্গের জমীদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা হবিবখাঁর এক পুত্রের নাম ছিল মজলিস আলমখাঁ (শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ, তৃতীয় খণ্ড—৩০ পৃষ্ঠা)। এই সময় এই অঞ্চলে মজলিস নামের যেন ছড়াছড়ি দেখা যায়। বাদশাহী সৈন্য আক্রমণকারী মজলিস প্রতাপ ও মজলিস দিলাওয়ার যে খালিয়াজুড়ী, জোয়ানসাহী (অষ্টগ্রাম) অথবা বানিয়াচঙ্গের জমীদারের মধ্যে হইবেন, এই কথা অনেকটা নিশ্চিততার সহিত বলা যায়। এই সময়ের আর এক জমিদারী "তরফ"—শ্রীহট্টের বিখ্যাত পরগণা। রাজমালা হইতে জানা যায়, উহার এই সময়কার জমীদারের নাম ছিল ফতে খাঁ।

মজলিসদ্বয়ের আক্রমণের সম্মুখে বাদশাহী নাওয়ারা দাঁড়াইতে পারিল না। বাদশাহী কোষার যোদ্ধা ও মাঝি-মাল্লাগণ নৌকা ফেলিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বাদশাহী ফৌজের অন্যতম অধ্যক্ষ মুহম্মদকুলী প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইতে গিয়া পরাজিত ও বন্দী হইলেন। শাহবর্দ্দি প্রাণ লইয়া পলাইলেন। বাদশাহী ফৌজের এমন পরাজয় বাঙ্গালা দেশে বোধ হয় আর হয় নাই। ত্রিপুরাধিপতির সাহায্য-সেনা লইয়া ঈশা খাঁ সরাইলে আসিয়া দেখেন, বাদশাহী ফৌজ সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। * ঈশা খাঁ সানন্দে ত্রিপুরারাজকে বাদশাহী সৈন্যের ও নাওয়ারার পরাজয় বার্ত্তা লিখিয়া জানাইলেন।

এদিকে পরাজিত বাদশাহী ফৌজের ও নাওয়ারার ভগ্নাংশ যখন আসিয়া ভাওয়াল পৌছিল এবং এই বার্ত্তাও শুনা গেল যে ত্রিপুরা মহারাজের অসংখ্য সৈন্য লইয়া ঈশা খাঁ সরাইল পৌছিয়াছে, তখন বাদশাহী সৈন্যের মধ্যে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত খাঁ জাহান তাঁড়ায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। আকবরনামাতে লিখিত আছে, প্রত্যাবর্ত্তন-পথে টীলা গাজী নামে একজন জমীদার বাদশাহী সৈন্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই,—আবুল ফজলের ভাষায়—"বাদশাহের কর্ম্মচারীগণের নিরাশার মধ্যাহ্নে বিজয়ের আলোক প্রকাশিত হইল।" চারিদিকে বিশিষ্ট জমীদার-গণের মধ্যে এই টীলা গাজীর সাহায্য না পাইলে এবার খাঁ জাহানকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই টীলা বা টালা গাজী বর্ত্তমান তালেপাবাদ পরগণার মালিক ছিলেন। (J. A. S. B 1874. P. 201 and Dacca Gazetteer. P. 24.) ভাওয়ালের মূল গাজীবংশের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল জানা যায় না। এই সময় ইব্রাহিম নাড়ালও নিজের পুত্রকে নানাবিধ উপহার সহ খাঁ জাহানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। খাঁ জাহান মানে মানে তাঁড়ার নিকটে তিনি যে শ্রীহট্টপুর নামক দ্বিতীয় সহর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তথায় ফিরিয়া আসিলেন—এবং আশ্চর্য্য 'দৈবানুকূল্য সম্বন্ধে শাহানসাহের নিকট বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন।' ভাবটা এই যে দৈব সহায় ছিল তাই

রাণী স্তন ধৌত জল ইছা খাঁ খাইল।
রাজা রাণী পুত্র তুল্য তাকে স্নেহ কৈল॥
সেই কারণ হৈল ইছা খাঁর তরে।
ইছা খাঁ মচলন্দানি খ্যাতি দিল পরে॥
ইছা খাঁর প্রতি রাণী রাজাতে কহিল।
মহারাজা সৈন্য দিতে তাকে আদেশিল॥
*　　*　　*　　*
তদবধি ইছা খাঁর মচলন্দানি খ্যাতি।
সৈন্য সনে বিদায় হৈয়া গেল শীঘ্রগতি।

রাজমালা—১৯২ পৃষ্ঠা।

* সৈন্যসনে বিদায় হৈয়া গেল শীঘ্রগতি॥
সরাইলে গিয়া সৈন্য রহিল তখন।
বঙ্গসৈন্য তত্ব পাইয়া ভঙ্গ সেই ক্ষণ॥
এই বার্ত্তা নৃপতিকে লিখে ইছা খাঁয়।
মহারাজা তুষ্ট হৈল এই যে বার্ত্তায়॥

রাজমালা—১৯২ পৃঃ

ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছি, নচেৎ ফিরিবার আর কোন আশাও ছিল না! এমন দেশেও যুদ্ধ করিতে লোকে যায়?

ভাটির যুদ্ধ হইতে ফিরিবার অল্প কাল পরেই ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খাঁ জাহান মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বিষয়ে আবুল ফজল লিখিয়াছেন—"ভাটির যুদ্ধ হইতে সফলকাম (বিফলকাম?) হইয়া ফিরিয়া খাঁ জাহান শ্রীহট্টপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের সারল্য আত্মসুখলিপ্সার উন্মাদনকারী মদ্যের নেশায় কতকটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইমানের পর্দ্দা ছিন্ন হয় নাই। অল্পকাল মধ্যেই তিনি রোগশয্যায় শয়ন করিলেন·····এবং জীবনের সূত্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। দেড় মাস যাবৎ উদর বেদনায় ভুগিয়া তিনি ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর পরলোকে গমন করিলেন।"

সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিক ব্লকম্যান সাহেব তাঁহার আইন-ই আকবরীর প্রথম ভাগের অনুবাদে (৩৩ পৃষ্ঠা) আবুল ফজলের উপরিউদ্ধৃত মন্তব্য হইতে ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, ঠিক সময়ে কালের আহ্বানে মহাপ্রস্থান করাতেই খাঁ জাহান বিদ্রোহে লিপ্ত হওয়ার কলঙ্কের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন,—আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে ইমানের পর্দ্দা অব্যাহত রাখা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত। সেই আমলে বাঙ্গালা-দেশে চাকরী শাস্তির সামিল বলিয়াই গণ্য হইত। তাহার উপর আবার দুর্দ্ধর্ষ আফগানগণের সহিত মহামারী প্লাবিত বাঙ্গালাদেশে যুদ্ধ। আবার এমন নদী নালা বিল সমাকুল স্থানে যুদ্ধ, যেখানে মোগলগণের প্রধান বল অশ্বারোহীসৈন্য কোন কাজেই আসে না—নৌকাই সেথাকার প্রধান যুদ্ধোপকরণ। সেই নৌবহরের অধ্যক্ষ শাহবর্দ্দিও বিদ্রোহী হইতে হইতে রাজভক্তির গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এদিকে মতির হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া এবং বঙ্গদেশ লুণ্ঠন-লব্ধ অজস্র ধনদৌলত অশ্রান্ত বেগে মনটাকে আগ্রা দিল্লী অভিমুখী করিয়া আরাম আয়েসের দিকে ঠেলিতেছিল। এমতাবস্থায় শরিষাতে যে ভূত চাপে নাই,—আবুল ফজলের ভাষায় ইমানের পর্দ্দা যে ফাঁক হয় নাই, তাহার জন্য আকবরের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিবার আবুল ফজলের কারণ আছে।

নিশির ডাক

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্

পূর্ব্বাভাস

দীননাথের কাগজের কারবার,—দোকান রাধাবাজারে। যত বড় বড় ছাপাখানা তার দোকান হইতে কাগজ লয়; সে-কাগজে একালের কত গল্প উপন্যাসই না ছাপা হয়! পাঠক-পাঠিকা সে সব গল্প-উপন্যাস পড়িয়া মুগ্ধ হন্—কিন্তু দীননাথের দোকানের কাগজেই যে সে গল্প-উপন্যাস ছাপা, এ খবর তাঁদের ক'জনই বা জানেন! এই কাগজের মারফৎ বাঙ্‌লা সাহিত্যের সঙ্গে দীননাথের পরিচয়, এবং সে পরিচয় যে ঘনিষ্ঠ, এ কথা অনেক প্রকাশক ভালো করিয়াই জানেন।

দীননাথের বয়স আটত্রিশ বছর। যে-ভাবে সে মানুষ হইয়াছে, এবং ব্যবসায়-সূত্রে আধুনিক সাহিত্যের যে-হাওয়া তার গায়ে পরশ বুলাইতেছে, তাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে সমাজ-বিধি-সম্বন্ধে ঘরে সে রহিয়া গিয়াছে সনাতন সেকেলে, এবং বাহিরে হইয়াছে পুরাপুরি আধুনিক। অর্থাৎ পরের ঘরের নারীকে সে পর্দ্দার বাহিরে দেখিতে চায়,—আলাপে-আচরণে তাঁদের কোনো কুণ্ঠা থাকিবে না। সঙ্গীত ও প্রেমের চর্চ্চায় তাঁদের সকল দিক দিয়া উৎসাহিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু ঘরের মধ্যে নিজের পত্নী বিলাস-ভূষণের কোনো আব্দার তুলিবে না, কায়মনোবাক্যে স্বামীর দাসীবৎ জীবন যাপন করিবে, পর্দ্দার আবরণ এতটুকু শিথিল করিবে না, মুক্ত আলো ও হাওয়ার উপর কোনো দাবী রাখিবে না, ইত্যাদি!

ইহার ফলে দীননাথ থিয়েটারে যায়, বায়োস্কোপ দেখে,

তরুণ-সভার বৈঠকে হাজিরা দিয়া নারীর অবাধ স্বাধীনতার আলোচনায় সহস্রমুখ হয়; এবং ঘরে পত্নী বনলতা ময়লা কাপড়-চোপড় পরিয়া বাটনা বাটে, রান্না করে, ঘর ঝাঁট দেয়, ও পতিকে দেবতা-জ্ঞানে তাঁর সর্ব্ববিধ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলে,—পথের ধারের জানলাগুলার কাছে ভুলিয়াও দাঁড়ায় না—পাছে কেহ কোথা হইতে দেখিয়া ফেলে! এমনিভাবেই দিন চলিতেছিল।

দীননাথের বাড়ী ঠিক সদর রাস্তার উপর নয়। সদর রাস্তা হইতে একটা সরু গলি পূর্ব্বমুখে চলিয়া গিয়াছে; সে গলিতে গাড়ী ঢোকে না। এই গলির মধ্যে তার বাড়ী।

দীননাথের একখানি মোটর-গাড়ী আছে। গাড়ীখানি ছোট আদালতের একটা দেন্‌দারী-নিলামে সে নগদ সাতাশি টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছিল। ভারতে যখন প্রথম মোটর-গাড়ীর আমদানি হয়, এ গাড়ীখানি তখন এ-দেশে আসে। সুতরাং রহস্যপ্রিয় লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ যতই করুক, ইতিহাসে এ গাড়ীর রীতিমত মূল্য আছে। গাড়ী সে নিজে হাঁকায় না, সোফার আছে। সোফারটী খুব হুঁশিয়ার—নাম নফরা। দীর্ঘকাল গাড়ী হাঁকাইয়াও নফরা কোনোদিন মানুষ মারে নাই। তবে তার একটু মুদ্রাদোষ আছে—থাকিয়া থাকিয়া সে কেমন ঘুমাইয়া পড়ে। ষ্টীয়ারিংয়েও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। এজন্য দীননাথকে সর্ব্বক্ষণই গাড়ীতে একটু হুঁশিয়ার থাকিতে হয়!

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যসখী

বেলা দশটা বাজিয়াছে। আহারাদি সুসম্পন্ন করিয়া দীননাথ কারবার দেখাশুনার কাজে গৃহত্যাগ করিল। পত্নী বনলতা সন্তর্পণে পথের ধারের ঘরের খড়খড়ির পাখী তুলিয়া পথের পানে চাহিল। পথ ঐ একরত্তি গলি। দীননাথ বাড়ীর বাহির হইয়া দোতলার পানে চাহিল—এধারকার খড়খড়িগুলা বন্ধ হইতে আছে। নিত্য সে বাড়ীর বাহির হইবার সময় চাহিয়া দেখে, এধারে খড়খড়ি খোলা আছে কি না। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তার আদেশ যে যথারীতি পালিত হইতেছে, ইহাতে খুশী হইয়া নিশ্চিন্ত মনে সে যাত্রা করিল।

শাস্ত্রে আছে, পথে বর-নারী-দর্শন শুভযাত্রার লক্ষণ! সে দেখিল, গলির মুখে এক রূপসী তরুণী—একালের ফ্যাশনে শাড়ী-পরা, কাজেই মুখ ঘোমটায় ঢাকা নাই; পায়ে একজোড়া লাল রঙের ভেলভেটের নাগরা; দিব্য স্বচ্ছন্দ গতি! এ গলিতে এমন মূর্ত্তি সে কখনো চক্ষে দেখে নাই। তার বিস্ময় বোধ হইল। এবং মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মের ফলে তার এই প্রথম বিস্ময়ে বিভ্রম এবং সে বিভ্রম ক্রমে মোহে রূপান্তরিত হইল! সে ঘাড় কাৎ করিয়া অবিচল নেত্রে এই মূর্ত্তিমতী বিদ্যুল্লতার পানে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রূপসী তরুণীও তার পানে সচকিতে চাহিল। চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র তরুণীর মুখে হাসি ফুটিল এবং সে গতির বেগ আর একটু ত্বরিত করিয়া দীননাথের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

দীননাথের মোহ ভাঙ্গিল। সে ঈষৎ অপ্রতিভ হইল এবং দ্রুতপদে আসিয়া মোটরে উঠিয়া বসিল। একখানা ট্যাক্সি তার মোটরের সামনে দাঁড়াইয়া ছিল। সে উঠিয়া নিজের গাড়ীতে বসিবামাত্র ট্যাক্সিখানা ভুশ করিয়া চলিয়া গেল। নিজের অজ্ঞাতে দীননাথের দৃষ্টি পড়িল ঐ ট্যাক্সি-খানার নম্বরের উপর—T 351. ট্যাক্সিখানা যেন কোন্ অমর লোক হইতে কোন্ ত্রিদিব বাসিনীকে আনিয়া তার গৃহে নামাইয়া দিয়াছে! কে ইনি?

দীননাথের সোফার গাড়ীতে ঠেশ দিয়া ঘুমাইতেছিল। দীননাথ তাকে ধাক্কা দিল। সোফার তীর-বেগে উঠিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ী ভীষণ ধোঁয়া ছড়াইয়া প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ তুলিল, তার পর সহসা চলিতে সুরু করিল। গাড়ীতে বসিয়া দীননাথ লক্ষ্য করিল, আশ-পাশের যত বাড়ী, দোকান, চলন্ত পথিক···সব মিলিয়া তালগোল পাকাইয়া একটা মাত্র ইংরেজী হরফ ও তিনটা অঙ্কের সৃষ্টি করিয়া চর্‌কির মত ঘুরিতেছে! সে হরফটি T. এবং অঙ্কগুলি 351.

ওদিকে গৃহমধ্যে তরুণী আসিয়া প্রবেশ করিবামাত্র বনলতা ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল, আসিয়াই তরুণীকে আবেগে বুকে জড়াইয়া ডাকিল—রাণী, রাণী···

তরুণীর নাম রাণী। রাণী কহিল,—তুই—বনো! এ কি মূর্ত্তি! মাগো! সে শ্রী, সে রঙ কোথায় গেল!

বনলতা হাসিল, হাসিয়া কহিল—আর্য্যামির হোমকুণ্ডে সে-সব নিক্ষেপ করেচি, ভাই।

রাণী আপনাকে বনলতার বাহু-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে সে কহিল,—তার মানে? তোর কি চিরদিনই হেঁয়ালি চলবে না?

বনলতা কহিল—ভাগ্যে এই হেঁয়ালিটুকু আছে, নাহলে কি নিয়ে যে দিন কাটাতুম ·!

রাণী কহিল—খুলে বল্ দিকিনি সব।

বনলতা কহিল,—সে অনেক কথা। দাঁড়িয়ে কথা শোনার প্রথা বাঙলা থিয়েটারেই শুধু আছে। তা, এ তো থিয়েটার নয় ভাই, কঠিন সংসার। আর আমরাও জীবন্ত মানুষ; থিয়েটারের নাটকের পাত্র-পাত্রী নই। কাজেই সব কথা শুনতে হলে তোমায় উপরের ঘরে এসে বসতে হবে।

রাণী কহিল—চলো।

দুজনে দোতলার ঘরে আসিয়া বসিল। মেঝের একধারে দীননাথের উচ্ছিষ্ট পড়িয়া আছে। বনলতা কহিল—খাবি তো?

রাণী কহিল—না। আমি খেয়েই আসচি। তোর খাওয়া হয়েচে?

বনলতা কহিল—না।

রাণী কহিল—তবে খেতে বোস্। খেতে খেতে তোর ভাগ্যের কাহিনী বলবি আর আমি তোর সামনে বসে খাওয়া দেখতে দেখতে সে কাহিনী শুনবো।

বনলতা কহিল,—তাহলে একটু অপেক্ষা কর্, আহারের জোগাড় দেখি।

রাণী কহিল,—বামুনকে বল্ না ডেকে।

বনলতা কহিল—বামুন তো নেই।

রাণী কহিল—কেন? কোথায় গেল? উড়ে বামুনদের রকম কি সর্ব্বত্রই এক! বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর!

বনলতা কহিল—বামুন আমার নেইই, তা যাবে কোথায়! এ আর্য্য-গৃহ, বুঝলি। আমি আর্য্য-গৃহিণী; নিজের হাতে স্বামীকে রেঁধে খাওয়াতে হয়, স্বামীর খাওয়া হলে তাঁর পাতে প্রসাদ পাই···

রাণী কহিল—অবাক্ করলি ভাই! অথচ তোর স্বামীর অবস্থা তো ভালোই ··

বনলতা কহিল—ত হোক্। তিনি আর্য্যজাতীয়·· এবং আর্য্যামির গর্ব্ব তাঁর ষোল আনা!

রাণী কহিল—তাই এই পাত পাড়া হয় নি, বুঝি? ও! তা বেশ, বসো—দেরী করলে ওই দেব-বাঞ্ছিত পাত্রখানি রোগের খনিতে পরিণত হবে। যে-রকম মক্ষিকার প্রাদুর্ভাব ···একালের পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বলে, মক্ষিকাই সকল রোগের বাহন এবং রোগের ব্যাসিলি ভক্তি-টক্তির কোনো তোয়াক্কা রাখে না।

বনলতা হাসিয়া নীচে নামিয়া গেল ও আহার্য্য আনিয়া পাতে ঢালিয়া ভোজনে মনোনিবেশ করিল।

রাণী কহিল,—কিন্তু তোর স্বামী এমন···! একবার দেখতে হবে।

বনলতা কহিল,—চোখে চোখে মিলন তো হলো বাড়ী ঢোকবার মুখে···

রাণী সকৌতুহলে প্রশ্ন করিল,—তার মানে?

বনলতা কহিল—ওই তো তুইও আসছিলি, আর উনি বেরুচ্ছিলেন ··

রাণী কহিল—যে মিন্সে ওই·· মাপ কর ভাই, একটা অভদ্র ইতর কথা বলে ফেলেচি তোর দেবতার উদ্দেশে—যে রকম চোখে চাইছিল, যেন চোখ দিয়েই খেয়ে ফেলবে··· তার ব্যবহারকে লক্ষ্য করে বলেচি···

বনলতা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তার জন্য অত সঙ্কোচ কেন! তুই তো ব্যাকরণ ভুল করিস নে ··

রাণী কহিল—ওই তোর স্বামী-দেবতা! বেশ রসিক দেখলুম···আমার পানে যে কটাক্ষ হান্‌ছিলেন, আমার এই আধুনিক সাহিত্যের নায়কগুলোর কথা মনে পড়ছিল · শুধু চেহারার যা তফাৎ·· নাহলে আচরণ ··

বনলতা কহিল—অথচ জান্‌লার ধারে আমার দাঁড়াতে মানা। পাছে···

রাণী কহিল—চোখের ইঙ্গিতে দুনিয়া ওলোট-পালোট করে দাও! তাহলে খাসা আছিস, দেখচি।

বনলতা কহিল—তা আর বলতে! সব সয় ভাই, শুধু এই ইতর নিষেধগুলো গায়ে কাঁটার চাবুক মারে সর্ব্বক্ষণ! এর চেয়ে মরণ ঢের ভালো।

রাণী কহিল—এমন অভদ্র মনও মানুষের হয়! ছি—তা একটা ফন্দী এঁটে জব্দ করে দেবো?

বনলতা কহিল—তাতে আমিই বেশী জব্দ হবো।

রাণী হাসিল, হাসিয়া কহিল,—না লো না···বাংলা

ছোট গল্প পড়িস্ না? তারি একটা প্লট একটু এদিক-ওদিক করে খাশা বেকুব বানিয়ে দিতে পারি তোমার প্রাণ-সখাটিকে···

বনলতা কহিল,—তাতেই কি নিয়ম পাল্টাবে?

রাণী কহিল—তার সঙ্গে থাকবো আমি···ছাখ্ না মজা।

বনলতা কহিল—তুই যে বাঙ্লা ফার্শ গড়ে তুলবি, ভাবছিস্···! জীবনটা ফার্শ নয়। মানে, ফার্শে দেখিস্ না, একজন পদে পদে আস্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়ে চলেছে, তার পর শেষ দৃশ্যে একটু বেকুবির অবতারণা, অমনি হীরো নাক-কাণ মলে বলে উঠলো, বটে! ব্যস্! আর না—আস্পর্দ্ধার চরম হয়েচে, আজ থেকে আমি নতুন মানুষ! ··এ-সব আজগুবি পরিবর্ত্তন আনাড়ির লেখা বইয়েই চলে—বুদ্ধিমান বিধাতার কলমের মুখে এ-সব আজগুবি অনাসৃষ্টি কখনো বেরোয় না ভাই।

রাণী কহিল—স্কুলে পড়েছিলি না—যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কুত্র দোষঃ! একটু মজা—তোর এ একটানা অন্ধকার জীবনে আলোর একটু বিদ্যুৎ-বিকাশও ঘটবে তো!

বনলতা কহিল,—ছাখ্··

রাণী কহিল,—আজ উপক্রমণিকা সেরে চলে যাবো। কাল সকাল-সকাল আসবো··বেলা আটটায়। তাহলে তোর ওঁর সঙ্গে দেখা হবে তো?

বনলতা কহিল—হবে।

রাণী কহিল—সেই কথাই রইলো তবে!

তার পর বনলতার আহার সম্পন্ন হইলে দুই সখীতে বসিয়া বহু কথা হইল এবং বেলা পাঁচটায় রাণী বিদায় লইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চিত্ত-চাঞ্চল্য

সন্ধ্যা ছ'টায় দীননাথ বাড়ী ফিরিল। হাত-মুখ ধুইয়া নিজের ঘরে আসিয়া দেখে, টেবিলে একখানা চিঠি, খামে আঁটা। ডাকে আসে নাই। খামের উপর তারই নাম—মেয়েলি হাতের লেখা।

সকৌতূহলে খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িয়া সে দেখে, চিঠিতে লেখা আছে—

ওগো মন-বনের বিহঙ্গ, কি সুরে ভোলালে আমায়, তা তুমিই জানো! কে বলে, তরুণ না হলে প্রেম জাগে না? তরুণ নেহাৎ কাঁচা। তোমার প্রেমের আশায় প্রাণের মধ্যে মণিদীপ জ্বেলে আমি বসে আছি! তোমার প্রীতি পাবো না?

পায়ে নিষেধের শত শিকল ঝম্‌ঝম্ বাজে। এ শিকলের ভার কত আর বহি, বলো? বাহিরের ওই উদার মুক্ত হাওয়ায় ডানা মেলে বেড়ানোর আশা কি একান্ত দুরাশা?

কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ফটকে থাকতে পারবে কি? নীল শাড়ী-পরা তরুণী তাহলে মনের কথা কবার অবকাশ পায়। শুনলে এমন কোনো অনর্থ ঘটবে না—এ আশা অকুতোভয়ে দিতে পারি। ইতি

সুর-ভোলা অবলা

দীননাথের অঙ্গে রোমাঞ্চ হইল—এ কি সম্ভব! এ চিঠি তার? হাঁ খামে এই যে তারি নাম! কিন্তু কে এ অবলা? কোথায় থাকে? কোথায় তাকে দেখিল?··· কারো ফন্দী নয় তো?

কিসের ফন্দী? সে কারো সঙ্গে কোনো দুশমনি করে নাই! তবে··?

যাইতে হইবে! আজকালকার উপন্যাসে গল্পে এমন তো ঘটিতেছে! তার প্রতিধ্বনি জীবনে জাগিতে পারে, এ কল্পনা তার মনে কখনো স্থান পায় নাই!···প্রাণটা খুশীতে ভরিয়া উঠিল। পাঁচশো রীম কাগজের অর্ডার পাইয়াও সে কখনো এমন খুশী হয় নাই! ··

কাল! আজই দেখা করিতে বলিল না কেন? তার হাতে এমন কোনো কাজ ছিল না! কাল? তার মানে, এখনো চব্বিশ ঘণ্টা!···সে যেন এক যুগ!

বনলতা পানের ডিপা হাতে প্রবেশ করিল। দীননাথ কহিল—রেখে চলে যাও। আমায় বিরক্ত করো না। একটা কাজের কথা ভাবছি!

বনলতা হতাশ দীন নেত্রে দীননাথের পানে চাহিল। দীননাথ তখন প্রেমের স্বপ্নে এমন মশগুল যে সে দৃষ্টি তার নজরে পড়িল না!

দীননাথ ভাবিল, এই একটানা নীরস জীবন মানুষের পক্ষে বহা অসম্ভব! কুলজা চাটুয্যে ঠিক কথা লেখে—তার লেখায় কোথাও বাধা-নিষেধ নাই···তাকে এবার বিনা-লাভে কাগজ সাপ্লাই করিব! ··

পলে পলে চিন্তা তরঙ্গ-বিস্তারে সাগরের মত উত্তাল হইয়া উঠিল। দীননাথের ছোট বুকে সে তরঙ্গের উদ্দাম

নৃত্য-লীলা···বহিয়া বেড়ানো সম্ভব নয়! দীননাথ ডাকিল,—নফরা···

নফরা নীচে বাসন মাজিতেছিল; মনিবের ডাকে কাছে আসিল। মনিব বলিল,—গাড়ী ঠিক আছে?

নফরা কহিল,—আছে।

দীননাথ কহিল—তৈরী হয়ে নে। বেরুতে হবে এখনি। বিশেষ দরকার। ··

নফরা গাড়ী ঠিক করিতে গেল। দীননাথ মুখে সাবান দিল, তারপর শুভ্র বেশে সজ্জিত ভূষায় বাহির হইয়া পড়িল। পাশের বাড়ীতে গ্রামোফোনে গান বাজিতেছিল,—লয়লা কি খেলা খেলে, এ যে নতুন খেলা! ··

নফরার নিদ্রার মধ্য দিয়া সেই মোটর চালানো—এবং মোটর আসিয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দাঁড়াইল। দীননাথ গাড়ী হইতে নামিল; নামিয়া চারিধারে চাহিল। সাহেব-মেমের ভিড়—ছেলেমেয়েরা ঐ ছুটাছুটি করিতেছে! দীননাথের সাবেক মোটর সেখানে দাঁড়াইতে তার শ্রী দেখিয়া মেমেরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, তাদের ছেলেমেয়েরা নিদ্রালু নফরাকে লক্ষ্য করিয়া মাটীর ঢেলা ছুড়িতে লাগিল। নীল শাড়ীর চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না! নীল ফ্রক দু-চারিটা দেখা গেল—কিন্তু সেদিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে প্রাণে শঙ্কা জাগে!

সহসা দীননাথের খেয়াল হইল, তার ঐ মোটর এখানকার লোকগুলির মনে অনেকখানি কৌতুকের সঞ্চার করিয়াছে! এ গাড়ী রাধাবাজারের পথে নিরুপদ্রবে দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু এ সৌখীন পাড়ায় বিঘ্ন বহু।

'সুর-ভোলা অবলা' এ জায়গা মনোনীত করিল কি বলিয়া? এই ভিড়ে প্রাণের গোপন কথার নিবেদন কি অবাধে চলা সম্ভব! তার চেয়ে ইডন্ গার্ডন্—এখন অনেকটা পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত, কাজেই সে জায়গা নিরালা হইত! ঠিকানাও চিঠিতে দেওয়া নাই। থাকিলে এক লাইন লিখিয়া সবিনয়ে দীননাথ এ ভুলটুকু দেখাইয়া দিত!

দাঁড়াইয়া বসিয়া ঘুরিয়া বহুক্ষণ কাটিল···আশ-পাশের হাস্য-কলরব কমিয়া আসিল। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর আবির্ভাবে স্থানটুকু ক্রমেই তার পক্ষে দুর্বহ হইয়া উঠিল। কারণ, এরা ইংরাজ প্রণয়ী-প্রণয়িনী·· কালা লোকের সান্নিধ্যে মেজাজ হয়তো সহসা চটিয়া উঠিতে পারে! গাড়ীতে চড়িয়া দীননাথ নফরাকে কহিল,—বাড়ী চল্ ··

আহারাদি সারিয়া শয্যার আশ্রয়ে চক্ষু মুদিয়া 'সুর-ভোলা অবলা'র একখানি মুখ সে কল্পনার তুলিতে বুকের উপর আঁকিতে লাগিল! যতই রঙ ফলাক, তবু নাক-মুখ-চোখ হুবহু দাঁড়ায় ওই বিবাহিতা পত্নী শ্রীমতী বনলতার মত! দীননাথ বিরক্ত চিত্তে সে-মুখ মুছিয়া সকালের সেই গলি-পথ-চারিণী কিশোরীর মুখ স্মরণ করিবার প্রয়াস পায়, কিন্তু হায়রে, চকিত-চরণার সে-মুখ তেমন ভালো করিয়া দেখিতে পায় নাই যে···

গাঢ় নিদ্রার মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল,—যেহেতু সময় কাহারো মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না! এবং প্রভাতে দীননাথের চিত্ত আশায়-পুলকে সজীব সরস হইয়া উঠিল। বনলতাকে সে বারবার বলিয়া দিল, আজ বাড়ী ফিরিতে রাত হইতে পাবে—বিশেষ জরুরি কাজ আছে। হয়তো বাহিরে খাইয়া আসিবে। সে যেন ওবেলায় আহারাদি সারিয়া লয়!

বেলা আটটা···তেল মাখিয়া দীননাথ স্নান করিতে চলিল। বনলতা কহিল,—এত তাড়াতাড়ি যে?

দীননাথ অপ্রতিভ হইল; কিন্তু সে-ভাব চাপিয়া কহিল,—একটু তাড়া আছে। একটা বড় অর্ডার···

—ওঃ! বলিয়া বনলতা কোটা আনাজগুলো লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

স্নান করিয়া নিজের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া দীননাথ মাথায় ব্রশ চালাইতেছে, এমন সময় বাহিরে রমণী-কণ্ঠে সুমধুর স্বর জাগিল,—কোথায় আমাদের বন্ধুবর—তোমার প্রিয়তম?···

সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পগন্ধে চারিদিক সুরভিত করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন—কালিকার গলি-পথচারিণী চকিত-চরণা সেই তরুণী! দীননাথের দুই চক্ষু বিস্ময়ে সুগোল আকার ধরিল এবং তার বিস্ময়ের মাত্রা কমিবার পূর্ব্বেই তরুণী কহিল—আপনি আমার বাল্যসখী বনলতার স্বামী—সুতরাং আমারো বন্ধু!

পত্নীর উপর চকিতে দীননাথের শ্রদ্ধা জাগিল। এমন সুরূপা, সুবেশা, সুভাষিণী তরুণী তার পত্নীর বাল্যসখী! ···বাঃ!

রাণী কহিল,—আপনি অবাক হয়ে রইলেন যে ! বিস্ময়ের কারণ নেই···যেহেতু কাল সকালে আমাদের চার চক্ষে মিলন ঘটেছিল···যদিও স্থানটী বিশ্রী···আপনার বাড়ীর সামনেকার ঐ নোংরা সরু গলির মধ্যে ! ক্ষমা করবেন—আপনাকে চিনতুম না বলে কোনো রকম অভিবাদন করতে পারিনি !

দীননাথের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না ! এই মূর্ত্তি, আর এমন অলঙ্কার-সরস বাক্‌ভঙ্গী···একালের গল্প-উপন্যাসেই সে যা পড়িয়াছে ! ঠিক। জীবনে এমন না ঘটিলে তারা কি আর মিথ্যা কথা লিখিয়া যায় !

রাণী কহিল,—মাথায় ব্রশ্‌ চালাচ্ছেন ! ও কি, ব্রহ্মতলের চুলগুলো যে বুলবুলির ঝুঁটির মত উঁচু হয়ে রইলো ! এ আমার সখীর দোষ। দেখে ব্রশ করে দিতে পারে না ! এই বুঝি স্বামিসেবা ! দিন্‌ তো আমায় ব্রশটা ··

ব্রশ দিতে হইল না। রাণী দীননাথের হাত হইতে ব্রশটা টানিয়া লইয়া দীননাথকে কহিল—বসুন আপনি ঐ চেয়ারটায়···

যন্ত্র-চালিতের মত দীননাথ তাই করিল। রাণী সামনে দাঁড়াইয়া দীননাথের মাথায় ব্রশ চালাইতে লাগিল, দীননাথের মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল। রাণী বনলতাকে কহিল—এমনি করে এদিক ওদিক ব্রশ চালাবি। স্বামীর মাথা বলে বেজায় ভক্তি-ভরে স্পর্শ করবি না—এ বা কি রকম ? হাজার হোক, মানুষ-দেবতা, মন্দিরের পাষাণ-দেবতা তো নয় ! এতে কোনো পাপ হবে না। এ সেবাটুকু না করলেই পাপ। আমার কাজ এই—তাঁর মাথা আমিই আঁচড়ে দিই···যতবার দরকার, তত বারই···

দীননাথ ভাবিল, সার্থক জন্ম এই রূপসীর 'ওঁর'···এমন যত্নে কেশের পারিপাট্য সাধিত করেন !···

রাণী কহিল,—একটা কথা বলবো। শুনতে হবে ··

দীননাথ অকৃতজ্ঞ নয়। সে কহিল—বলুন ··

রাণী কহিল,—আজ বিকেলে আমাদের ওখানে আপনাদের নিমন্ত্রণ···ঐখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরবেন···বুঝলেন !

মুস্কিল ! ওধারে আজ সন্ধ্যায়···তাই তো ! সে ··না, সেদিকটায় অমনোযোগী হওয়া ঠিক নয় ! একটা মস্ত সুযোগ ! অথচ এদিকটাও রক্ষা করা চাই !

দীননাথ কহিল—তাইতো, ওবেলায় একটু জরুরি কাজ আছে···তা রাত ন'টা দশটায় গেলে চলবে ?

রাণী কহিল—বেশ। সখীকে আমি নিয়ে যাবো—আপনি রাত নটা-দশটায় যাবেন, খাওয়া-দাওয়া করে ওকে নিয়ে আসবেন।

দীননাথ কহিল—ঠিকানা ?

রাণী হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ঠিকানা দেবো বৈ কি। নাহলে আপনি যাবেন কি করে ?

দীননাথ কহিল—যে আজ্ঞে।

রাণী কহিল—সখীকে আমি দুপুরবেলায় নিয়ে যাবো, কেমন ?

দীননাথ কহিল—বেশ।

মাথায় ব্রশের কার্য্য শেষ হইল। রাণী কহিল—দেখে যা সখী—রোজ দুবেলা মাথা এমনি ঠিক করে দিবি, বুঝলি ? আপনার অনুমতি আছে তো দীনুবাবু ?

দীননাথ হাসিয়া কহিল—নিশ্চয়।···

দোকানে এক বিভ্রাট ! প্রকাণ্ড কোন্‌ সাহেবী ফার্ম্মের অর্ডার পাঠাইয়া বিল তৈয়ারী করিয়া দরোয়ানকে দীননাথ বলিয়া দিল,—টাকা নিয়ে আসবি।

দরোয়ান চলিয়া গেল।

বাড়ীওয়ালার ভাড়ার বিল আসিয়াছিল। টাকা গণিয়া দিতে পাঁচ টাকা বেশী চলিয়া গেল। খুচরা দু'রীম কাগজ কিনিয়া এক প্রেশওয়ালা কুড়ি টাকার নোট দিল। দাম ষোল টাকা এগারো আনা—তাকে চারটাকা পাঁচ আনার পরিবর্ত্তে পাঁচ টাকা সাত আনা ফিরাইয়া দিল। লোকটা অবাক হইয়া একবার দীননাথের পানে চাহিল, পরক্ষণে কুলির প্রত্যাশায় না দাঁড়াইয়া নিজেই কাগজের মোট বহিয়া সরিয়া পড়িল !

আধ ঘণ্টা পরে দরোয়ান ফিরিয়া সংবাদ দিল, সাহেব গালি দিয়া মাল ফিরাইয়া দিয়াছে।

—কেন ?

দরোয়ান কহিল—সাহেব যে কাগজ চাহিয়াছিল, সে কাগজের পরিবর্ত্তে বালির কাগজ দেওয়া হইয়াছে ; তাছাড়া বিলের টাকা মোট ৪৩৭৲ টাকার পরিবর্ত্তে যোগ দিয়া ৫১৭৲ টাকা করা হইয়াছে।

দীননাথ বিল লইয়া দেখে, ইঃ, তাইতো, যোগে ভার

ভুল হইয়াছে! দরোয়ানকে হাঁকিল,—বালির কাগজ রেখে ওই বাণ্ডিল নিয়ে যা···

দরোয়ান বলিল—সাহেব বলিয়াছে, আর কাজ নাই। তার জরুরি দরকার ছিল। সে অন্য দোকান হইতে কাগজ আনাইয়া লইবে!

এত বড় অর্ডারটা···! তাইতো!

দীননাথ বিরক্ত হইল। নাঃ—কাজ বেশ চলিতেছিল। এমন ভুল তার কখনো হয় নাই! শুধু ঐ সুর ভোলা অবলা···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, দূর হোক—কারবার ঢের করিয়াছি। এখন একটু আরাম চাই! মন···মন··· মনকে আর সে পিপাসু রাখিবে না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সে আসে ধীরে,
যায় লাজে ফিরে!

সাড়ে পাঁচটায় আজ দোকান বন্ধ হইল! লোক-জন মহা খুশী। বিশ বছরের মধ্যে এ দোকানে এমন কাণ্ড ঘটে নাই! বাবুর এমন সুমতি ঘটিয়াছে ·····

গাড়ী বাড়ীমুখো দেখিয়া দীননাথ হাঁকিল—না, ধর্ম্মতলার দিকে।

নফরা ধর্ম্মতলার দিকে গাড়ী চালাইয়া দিল।

ঐ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। পথের একধারে গাড়ী রাখিয়া উন্মনা দীননাথ বেঞ্চে বসিল। দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে। গাড়ীর পর গাড়ী চলিয়াছে প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্শ—লোকের পর লোক—সাহেব হইতে কুলি, কেরাণী হইতে পাহারওয়ালা অবধি! নীল শাড়ীর প্রান্তটুকু শুধু···হাওয়ায় কোনোদিকে তার উড়িবার লক্ষণ নাই! দীননাথ চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতে বসিল—কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ··

ঐ যে একখানা লাল মর্ণ্-কারের মধ্যে·· নীল শাড়ীর পতাকা ঐ · আঃ!

দীননাথ ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল······নিজের গাড়ীর কাছে আসিয়া দেখে, নফরা চিরাভ্যাসমত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। ডাকিয়া ধাক্কা দিয়া তাকে তুলিয়া দীননাথ গাড়ীতে বসিল, কহিল—চালা—জোরে চালা, শীগ্গির···

নফরা লাফাইয়া নীচে নামিয়া হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া ষ্টার্ট দিতে উদ্যত হইল। হ্যাণ্ডেল যত ঘোরায় ঘোরে,···কিন্তু সেই আশ্বাসে ভরা ঝর্‌র্‌-রব গাড়ীর অঙ্গের কোনো স্থান ভেদ করিয়া উঠিতে চায় না!

দীননাথ কহিল—হলো কি?

নফরা কহিল—আজ্ঞে, ষ্টার্ট হচ্ছে না।

দীননাথ কহিল—হচ্ছে না? ···

গলদ্ঘর্ম্ম নফরা জবাব দিল,—না।

হতাশভাবে দীননাথ চারিদিকে চাহিল, ট্যাক্সি···একটা ট্যাক্সি ··বেচারা সেক্স্পীয়রের রিচার্ড দি থার্ড নাটক পড়ে নাই। পড়িলে বুঝিত রিচার্ডের সেই উক্তি,—A horse! A horse! my kingdom for a horse আজ তার পক্ষেও হুবহু কেমন খাটিয়া যায়! এক···এক সেকেণ্ড ·· ওঃ, দীননাথ ধারে কাগজ দিতে রাজী, কোথায় কে প্রকাশক আছো, একখানা শুধু গাড়ী দিয়া তার জীবনের এই চরম ও পরম মুহূর্ত্তটিকে সফল করিয়া দাও গো! ···

পনেরো মিনিট পরে গাড়ী সেই মধুময় আশ্বাস-বাণী তুলিল। কিন্তু সে মর্ণ-কার তখন·····?

কোথায় বা নীল শাড়ীর সে বিজয় নিশান! গাড়ীখানার নম্বরও যদি দেখিয়া রাখিত! ·····

দীননাথের বুকের উপর যেন ঐ আকাশখানা ঝুপ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল! সঙ্গে সঙ্গে ঐ আধখানা চাঁদ আর তার আশপাশের যত ঝিকিমিকি নক্ষত্রগুলা! মাঠের চতুর্দ্দিক বেড়িয়া গ্যাশের থামে আলোর মালা দুলিতেছিল। সেগুলা যেন কার নির্ম্মম আকর্ষণে ছিঁড়িয়া আঁধারে লুটাইয়াছে! দীননাথের মাথা ঘুরিয়া গেল—সে চক্ষু মুদিল।

যখন চোখ চাহিল, তখন দেখে, বাড়ীর সেই গলির মুখে গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে!···অদূরে সেই বাড়ীটায় তেমনি গ্রামোফোন চলিয়াছে—তবে সে লয়লার গান নয়। গ্রামোফোনে তখন বাজিতেছে,—

কোথা আলো,—ওগো অন্ধ নয়ন,
আলেয়ায় ছলিয়াছে!

ছলনা! শুধু আলেয়ার ছলনাই সার! হায়রে, নীল শাড়ী ··

রাত ন'টায় সখীর কাছে নিমন্ত্রণ। · থাক, আর পারা যায় না। মন অবসাদে আচ্ছন্ন—যাইবার শক্তি নাই!

দোতলায় উঠিয়া দীননাথ দেখে, টেবিলের উপর চিঠি। সেই হাতের অক্ষর! বিভ্রম? না,—চিঠি সত্যই!

চিঠিখানা তুলিয়া পড়িয়া দেখে, লেখা আছে—

নির্ম্মম, পাষাণ······তরুণীর এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলে! তার চেয়ে আমায় গুলি করিয়া মারিলে না কেন? আমায় পথে ফেলিয়া বুকের উপর তোমার ঐ মোটর গাড়ী চালাইয়া গেলে না কেন? তাতেও বুকে এমন বেদনা বাজিত না তো! প্রেম-ভিখারিণী নারী······তার ভয় যে প্রতিপদে—তা'ও সে গ্রাহ্য করে নাই। হায় নিষ্ঠুর, তবু এ অবহেলা ·····!

মন মানে না। আবার আঘাত পাইতে চায়! কাল বেলা পাঁচটায় বালিগঞ্জ এভেনিউর কাছে লেকে—ঠিক ঐ মাঝের দ্বীপখণ্ডের সামনে আসিয়ো। নহিলে লেকের কালো জলে এ মনের জ্বালা নিভাইব। কালিকার নিশানা—লাল শাড়ী! মনে রাখিয়ো।

সুর-ভোলা অবলা।

মনের মধ্যে নিমেষে ফাগুন জাগিল! শত বিহঙ্গের কাকলী-কলরবে মন মাতিয়া উন্মাদ হইল। আরাম, আরাম, এ দুনিয়ায় এমন আরামও আছে! আঃ!

আলমারি হইতে সদ্য-প্রকাশিত হালের উপন্যাস-মণি 'গোয়ালা-পাড়া' খুলিয়া দীননাথ পড়িতে বসিল। পড়ায় মন লাগিতেছিল না। 'গোয়ালাপাড়া'র প্রথম পরিচ্ছেদে নায়িকা উতলার উদাস মনের গতির তালে দীননাথের মন দোল খাইতে লাগিল।

আবার সেই কণ্ঠস্বর!—বাঃ, খুব গেলেন তো! একজন মহিলার মর্য্যাদারও দাম নেই আপনার কাছে!

দীননাথ অপ্রতিভ হইল। সেই নীল শাড়ী এখানে আসিয়া···চমকিয়া চোখ তুলিয়া সে দেখে, না, এ নীল শাড়ী নয়—স্ত্রীর বাল্যসখী সেই রূপসী তরুণী!···দু' নম্বরের চিঠিখানা পাইয়া দুনিয়ায় আর কোথায় কি আছে, বেচারা ভুলিয়া গিয়াছিল! ফশ্‌ করিয়া কোনো জবাব তার মুখে জোগাইল না।

রাণী কহিল—নারী না হয়ে যদি ব্লটিং প্যাড কি টিটাগড় মিলের কাগজ হতুম, তাহলে আমার দাম থাকতো, না?

দীননাথ কহিল—খেটেখুটে ·····

রাণী কহিল—পরিশ্রান্ত হয়েচেন! গিয়ে নয় দেখতেন, সে শ্রান্তি দূর করতে পারতুম কি না ·····

মেয়েটি বেশ! বাঃ! কথাগুলার মধ্যে একালের হাওয়ার মিঠা পরশ! তাই? না, সুরভোলা অবলার মত এ তরুণীও ····?

রাণী কহিল—বেশ···আমাদের তো মান নেই, অভিমান নেই······আমরা অবলা নারী মাত্র ·····

দীননাথ কহিল—মাপ করবেন। আর একদিন নয় সুযোগ দেবেন······

রাণী কহিল—বটে! বেশ, কালই তাহলে ·····কেমন? ভুলবেন না যেন! বলেন তো, ওঁকে বলবো, এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন···

দীননাথ কহিল—না, না, তাঁকে আবার কষ্ট দেওয়া কেন! আমি নিশ্চয় যাবো।

রাণী কহিল—ম্যাটিনী পাঁচটায়?

চিঠির কথা মনে পড়িল—লেকের ধারে এনগেজমেণ্ট।

দীননাথ কহিল—না, তা বোধ হয় হয়ে উঠবে না··· তবে ঐ রাত ন'টায়।

রাণী কহিল—কথা পাকা রইলো······! কেমন?

দীননাথ কহিল—নিশ্চয়।

রাণী কহিল—আজকের গর-হাজিরের জন্য জরিমানা কিছু চাই—

দীননাথ কহিল—বলুন—

রাণী কহিল—আজকের মত কালও সখীকে নিয়ে যাবো। তার পর আপনি গিয়ে তাকে নিয়ে আসবেন।

হাসিয়া দীননাথ কহিল—আচ্ছা।·· ···

রাণী ডাকিল—সখী······

বনলতা আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। রাণী কহিল,—দেখুন দিকিনি, সখীর সাজ—কেমন মানিয়েচে! আপনার মনের মত সাজাতে পেরেচি?

দীননাথ চাহিয়া চাহিয়া স্ত্রীকে দেখিল। সাজিলে তার এই নিত্যকার স্ত্রীটিকেও নেহাৎ মন্দ দেখায় না তো! কিন্তু না ·····শুধু সাজে কি হইবে? এ স্ত্রী! দীননাথ কহিল—দরকার কি···? স্ত্রীর এত বেশ-বিন্যাস···

রাণী হাসিয়া উঠিল, কহিল—সব স্বামীই যদি স্ত্রীদের সম্বন্ধে এমনি রায় দেন, তাহলে পথে-ঘাটে কি-সুখে বিচরণ করবেন আপনারা? সুবেশা সজ্জিতা সুরূপার দর্শন পাবেন কোথায়? দুনিয়ার শোভাই যে তাহলে আপনাদের চোখে ম্লান নির্জীব হয়ে পড়বে··

কথাটা সঙ্গীন। দু'দিনের দু'খানি চিঠিতে এ কথার মর্ম্ম দীননাথ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। সে কোনো জবাব দিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

টায়ার-বিভ্রাট

পরের দিন আবার তেমনি চাঞ্চল্য। তবে আজ তার মাথায় প্ল্যান খাটিতেছে বিস্তর। প্রথম নফরাকে আজ সে শুভ্র বেশে সজ্জিত করিয়াছে; গাড়ীটা দুপুরবেলায় সাফ্ করাইয়াছে—ষ্টার্ট দিতে গতি না ফশকাইয়া যায়! কালিকার নিদ্রালুতার জন্য নফরার দু'টাকা জরিমানার হুকুম হইয়া গিয়াছে—সাবধান নফরা, আজ হুঁশিয়ার! আবার সেন ··

বেলা সাড়ে তিনটায় আজ দোকান বন্ধ হইল। লোকজন ভাবিল, সত্য যুগ আবার ফিরিয়া আসিতেছে না কি!···তারা হরির লুট মানত করিল—এক মাস এমনি চলিলে, নগদ সাড়ে-সাত আনার বাতাসা ··

দীননাথ প্রথমে আসিল ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট এক হেয়ার-কাটারের দোকানে; জুল্‌পি ছাঁটিয়া ভালো করিয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া লইল। তার পর মিউনিশিপ্যাল মার্কেট। সেখানে তারে-গাঁথা প্রকাণ্ড ফুলের মালা কিনিল, নগদ পাঁচ টাকা মূল্যে। পকেটে একটি রঙীন কাগজ ছিল, সেই কাগজটায় বিখ্যাত আধুনিক-কবি অশ্রান্তকুমারকে দিয়া একছত্র লিখাইয়া আনিয়াছিল—'উতলা রজনীর সচেতন স্মৃতি-ভরা প্রণয়-প্রীতির বিনোদ-মালা—প্রণয়-সুখে সুখী দীন দীননাথ'—মালার সঙ্গে সেই কাগজটুকু আঁটিয়া সে গাড়ীতে আসিয়া বসিল, বসিয়া নফরাকে কহিল,—লেকে চল্···

নফরা সবিস্ময়ে প্রভুর পানে চাহিল।

দীননাথ কহিল—কালীঘাটের ট্রামডিপোর পর মনোহরপুকুর। সেই দিকে ··

—ওঃ! বলিয়া নফরা গাড়ী চালাইল।

ছবির পর ছবি—নানা রঙে রঙীন! দীননাথের বুকের উপর ঢেউ তুলিয়া ছবির মালা ভাসিয়া চলিয়াছিল! লেকের ধারে আসিয়া দীননাথ জলে রুমাল ডুবাইয়া ফুলের মালায় জল দিল, তার পর ঘড়ি খুলিয়া দেখিল,—পাঁচটা বাজিয়া দশ মিনিট! আর কুড়ি মিনিট!···

কিন্তু প্রথমেই কি কথা কহিবে সে? সে যদি প্রথমে কথা কয় তো কি তার জবাব দিবে? কতকগুলো মাসিকপত্র হইতে কটা কবিতার পাতা সে ছিঁড়িয়া আনিয়াছিল—সেগুলা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।···

আবার মোটরের ভেঁপু!··ঐ যে লাল শাড়ী·· নিশানের মত আঁচলের সেই দোলন···ঐটিই নিশানা!·· দীননাথ তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া কহিল—দে ষ্টার্ট··· দেরী নয়···

ষ্টার্ট দেওয়া হইল। কিন্তু গাড়ীখানা বহুদূরে আগাইয়া চলিয়াছে! ওখানে ভিড়—ঠিক। আজ গাড়ীর নম্বরটা দীননাথ দেখিয়া লইয়াছে—নম্বর মুখস্থ হইয়া গিয়াছে ··

দীননাথ নফরাকে কহিল—চ' চট্ করে পূবদিকে · ঐ গাড়ীর ঠিক পিছনে···

আগের গাড়ী বেশ জোরে চলিয়াছে · দীননাথ কহিল—জোরে চালা···

নফরা কহিল—যে আজ্ঞে! ··

মোড়, পথ চক্র ওদিক হইতে গাড়ী আসিতেছে · পদে পদে বাধা! সে বাধা অতিক্রম করিয়া বহুদূর পথে আসিয়া সহসা দীননাথ দেখিল, মুখস্থ-করা নম্বরের গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া আছে—গাড়ীর মধ্যে কেহ নাই! তবে···

সাম্‌নে জলের কাছে তরুণীর মেলা পনেরো-ষোলজন··· পাঁচ-সাতখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। লাল শাড়ী? একটা নয় এক, দুই, তিন—ইস্, সাতখানা। উহাদের মধ্যে কোন্ শাড়ীখানি··? শেষে কি···? না ··বিপদ আছে! দীননাথ হতাশ হইল। উপায়?

নিজের গাড়ীটাকে একটু দূরে দাঁড় করাইয়া দীননাথ নামিল।···গাড়ীর নম্বরটাই সে নয় জানে কিন্তু এই পত্রের লেখিকা···?

বহুক্ষণ কাটিল। তরুণী দলের মধ্য হইতে তার পানে চাহিয়া দেখিতেছে···ঐ যে···না? সকলেই যে তার পানে চাহিয়া দেখে! কৌতুক?···দীননাথের লজ্জা হইল। দীননাথ সরিয়া আসিল···এ কি প্রমাদ! জলের ধারে আসিয়াও পিপাসা মিটাইতে পারিবে না···এ কার অভিশাপ?

ঐ যে তরুণীর দলে চাঞ্চল্য! একজন ছ'জন করিয়া সকলে পথের দিকেই আসে! সে দ্রুত নিজের গাড়ী হইতে নগদ পাঁচ টাকা দামের সেই প্রণয়-প্রীতি-নিবেদনের বিনোদ মালাটি লইয়া সেই মুখস্থ-করা নম্বরের গাড়ীর মধ্যে রাখিয়া অদূরে এক গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।…

তরুণীরা ঐ যে একে একে চলিয়া যায়! ··এই গাড়ীর দিকেই আসিতেছে···একজন···না, ছ'জন! ছ'জনেরই পরণে লাল শাড়ী!···ও চিঠি উঁহাদের মধ্যে কে তাকে লিখিয়াছে?···দীননাথ গাছের আড়ালে আরো ছ'পা সরিয়া গেল।

তরুণী ছজন আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল—মালা হাতে লইল হাসিল। ও কি উল্লাস গাড়ীর মধ্যে! গাড়ী চলিল। ঐ যে করাঙ্গুলির সঙ্কেত··তাকে ডাকিতেছে? তবে তাকে দেখিয়াছে, নিশ্চয়!···আঃ!

দীননাথ গাড়ীতে উঠিয়া নফরাকে কহিল,—চালা গাড়ী—

নফরা গাড়ী চালাইল! ··ছনিয়া কাঁপাইয়া সহসা এক প্রবল বজ্রনাদ! দীননাথ চমকাইয়া আকাশের পানে চাহিল—আকাশে মেঘ নাই! তবে শব্দ? তারপর নফরাকে কহিল,—মেঘ নয়। গাড়ী থামালি কেন?

নফরা গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কহিল,—আজ্ঞে, টায়ার ফেটেচে।

দীননাথ কহিল—আমার গাড়ীর?

নফরা কহিল,—হ্যাঁ, কত্তা।

সর্ব্বনাশ!···নাঃ—যাক, এ ছনিয়া রসাতলে নামিয়া! দীননাথ চক্ষু মুদিয়া গাড়ীতে ঠেশ দিয়া শুইয়া পড়িল, মন সকাতরে ডাকিল, বাজ, কোথায় বাজ—এই বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ো···সব শেষ হোক্!

ষ্টেপনি-হুইল লাগাইয়া নফরা গাড়ী চালাইয়া বড় রাস্তায় আসিল, কহিল,—বাড়ী যাবো?

বাড়ী? দীননাথ চোখ চাহিল—সে গাড়ীর চিহ্নও নাই! কিন্তু বাড়ী?·· না, তার চেয়ে সেই কিশোরী সখীর গৃহে···মনটা তবু!···

দীননাথ কহিল—না, বাড়ীতে নয় ..ঝামাপুকুর।

ঝামাপুকুরে রাণীর বাড়ী।

ঝামাপুকুরে পৌছিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া দীননাথ কহিল,—এটা কি শ্রীশবাবুর বাড়ী?

ভৃত্য কহিল—আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীশ রাণীর স্বামী। ভৃত্য কহিল—আপনি হোগলকুড়ে থেকে আসচেন?

দীননাথ কহিল—হ্যাঁ।

ভৃত্য সবিনয়ে কহিল—উপরে আসুন···

দীননাথ ভৃত্য-সহ উপরে আসিল। সজ্জিত ঘর···সোফা, কৌচ···দেওয়ালে ছবি। সবগুলিই ফটোগ্রাফ। রাণীর ছবি, না? হাঁ। ইস্, রাণী মোটর চালাইতেছে! কত বেশের কত রকমের ছবি! ওঃ! খাশা!

দীননাথ কহিল—তোমার বাবু কোথায়?

ভৃত্য কহিল—বাবু বিদেশ গেছেন। কাল আসবেন।

দীননাথ কহিল—ওঃ!

ভৃত্য বিদায় লইল। পরক্ষণে··এই যে সখী! রাণী আসিয়া কহিল—আজ তাহলে ভুল হয়নি! তবু ভালো!

দীননাথ অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিল, রাণীর পরণে লাল শিল্কের শাড়ী। ছনিয়া আজ লালে লাল হইয়া গেল না কি!···

রাণী কহিল—আমাদের আজ একটা পার্টি ছিল—লেকে। এত মেয়েও জড়ো হয়েছিল!

লেক! মেয়েদের পার্টি!··দীননাথের বুকে ছুঁচ ফুটিতে লাগিল।

রাণী ডাকিল—সখী···

বনলতা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দীননাথ চাহিয়া দেখে, বনলতার পরণেও লাল শিল্কের শাড়ী···তার উপর গলায় একটা মস্ত ফুলের মালা! সে শিহরিয়া উঠিল।

রাণী কহিল—আজ আমাদের একটা এ্যাডভেঞ্চার হতে বসেছিল। পার্টি সেরে সখী আর আমি আমাদের মোটরে এসে বসে দেখি, এই মালা ছড়াটি আমাদেরি একজনের প্রণয়-কামী কে দীন দীননাথ কবিতা-লেখা টিকিট এঁটে গাড়ীতে রেখে গেছে! ছ'জনে মহা-তর্ক···আমি সখীকে বলি, তোর উদ্দেশে এ মালা! ও বলে, না, এ মালা আমার উদ্দেশে!

দীননাথ মাথা নত করিল। তবে এ ফন্দী···?

রাণী কহিল—শেষে আমি বোঝালুম, আমার জীবনে প্রণয়-প্রীতির বিনোদ-মালার অসদ্ভাব ঘটেনি কোনোদিন··· তোরই বরং অভাব রয়ে গেছে। অতএব, এ মালা

তোর···তা ছাড়া দীননাথ নাম লেখা। তা এ-নামের মর্য্যাদা সে রক্ষা করবে না তো কে করবে, বলুন তো? তাই ওর গলায়···দেখুন দিকিনি, কেমন মানিয়েচে!

দীননাথ মাথা তুলিতে পারিল না—কোনো কথা তার মুখে ফুটিল না।

রাণী কহিল—দেখুন, পরস্ত্রীকে এমনিতেই পুরুষ সুরূপ দেখে! সুবেশে সজ্জিতা দেখলে তো কথাই নেই! আপনারও সে রোগ আছে। রাগ করবেন না। সেদিন আপনাদের গলির মুখে একাকিনী আমি···আমার পানে কি দৃষ্টিতেই না চাইছিলেন! অথচ বনলতা আমার চেয়ে ঢের সুন্দরী! তাকে ঘরে কি বেশেই রেখেছেন! মাঝে মাঝে স্ত্রীকে সুবেশে সুসজ্জিত করবেন—মনটা তাতে ভালো থাকবে, আরাম পাবেন। তাহলে নৈরাশ্যের জ্বালা বুকে বয়ে একদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, আর পরের দিন লেকে মোটরে চড়ে ছুটোছুটি করে যে অন্ততঃ বেড়াতে হবে না—এ কথা অকুতোভয়ে বলতে পারি!

দীননাথ চিঠিখানা হাতে লইয়া কহিল—এ চিঠি তবে?

রাণী কহিল—যদি অভয় দেন তো বলি ··

দীননাথ কহিল,—বলুন···

রাণী কহিল,—চিঠি আমারি পরিকল্পিত···আর শ্রীমতী বনলতা কর্ত্তৃক সুচিত্রিত।···বুঝতে তো পারেন নি!··· সুরভোলা অবলাকে লাল শাড়ীতে কেমন মানায়, জানি না। তবে আমার এই সখীকে···দেখুন দিকিনি, কেমন মানিয়েচে ·· দেখুন চেয়ে!···

দীননাথকে চাহিয়া দেখিতে হইল—কিন্তু চোখের দৃষ্টি তখনি নামিয়া পড়িল।

রাণী কহিল—আর্য্যামির নিন্দা করচি না। স্ত্রী স্বামীর ছায়া···তা ছাড়া তার নিজের অস্তিত্ব নেই, এ কথাও মানি। তবে দোহাই আপনাদের, স্ত্রীকে শুধু মানুষ বলে একটু দরদ করবেন। দাসী-চাকরের ব্যথা-বেদনা বুঝতে পারেন, অথচ স্ত্রীর সাধ-আহ্লাদে সায় দেবেন না—এ কি ঠিক? কি বলেন? কথা কচ্ছেন না যে!

দীননাথ কহিল—নিশির ডাক্ বলে একটা কথা আছে না—তার ঘোরে মানুষের বাক-শক্তি লোপ পায়, শুনেচি। আমাকেও নিশিতে ডেকেছিল। চেষ্টা করবো···যাতে ঐ আর্য্যামির গোঁড়ামি ত্যাগ করতে পারি।

উৎসব

শ্রীপরেশচন্দ্র সেন বি-এ

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষে" তৈলের খনির টুইঙ্গাদের বার্ষিক উৎসবের কথা বলিয়াছি। এবার আরও কয়েকটি উৎসবের কথা বলা যাক্। আমাদের দেশে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ। আমাদের দেশের মত ব্রহ্মদেশেও পর্ব্বের পর পর্ব্ব। সে দেশের লোকদের সমগ্র জীবনটাই যেন উৎসবময়!

ইয়ুলের "Mission to Ava" নামক বইটিতে উৎসব ও শোভাযাত্রা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। তাহাতে তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশের দুই একটি উৎসব যথারীতি ভারতবর্ষীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

সে দেশের সাহিত্য ও শিল্পের উপর ভারতবর্ষীয় প্রভাব আশ্চর্য্য রকমের। সে দেশের উপাখ্যান এবং রূপকথাগুলিও ভারতবর্ষীয় উপাদানে গঠিত। উৎসব উপলক্ষে মহাভারতের প্রাণস্পর্শী অধ্যায়গুলি শত সহস্র দর্শকের সম্মুখে অভিনীত হইয়া থাকে। রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে সুসজ্জিত হস্তী অশ্ব ইত্যাদি শোভাযাত্রার সঙ্গে বাহির করিবার রীতি স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত আছে। পুরীর রথযাত্রা এবং ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল যেমন নয়নানন্দকর ও চিত্তাকর্ষক, রেঙ্গুন, মাণ্ডেলে এবং মোগকের পদ্মরাগ ও হীরার খনিতে উৎসব উপলক্ষে যে শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহাও ঠিক তেমনি নয়নানন্দকর ও চিত্তাকর্ষক।

বার্ম্মার দুইটি উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে এপ্রিল মাসের 'ওয়াটার ফেষ্টিভ্যালের'

কথা বলিয়াছি। আর একটি উৎসব অক্টোবর মাসের 'থাডিন্‌জিউ ফেষ্টিভ্যাল' বা শরৎ-উৎসব।

'ওয়াটার ফেষ্টিভ্যালে'র দিনে নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে জলকেলি, শোভাযাত্রা, দীপালি এবং 'ভুজ্যতাং দীয়তাং' ইত্যাদি মহাসমারোহে চলিতে থাকে। নির্ম্মল উজ্জ্বল আকাশের তলে খোলা মাঠে দিগ্‌দিগন্তর হইতে লোক আসিয়া জমা হয়। তরুণ তরুণীরাই উৎসবের আসরখানিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখে; তাহাদের হাসির হর্‌রায় তারুণ্য রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

যাত্রার আগে আগে চলিতে থাকে। সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের সমস্ত ভার থাকে সঙ্গীতবিশারদ "বায়িনে"র উপর।

কাগজের তৈয়ারী নানা রকম বিস্ময়কর বস্তু শোভাযাত্রার সঙ্গে বাহির করিতে দেখা যায়। হস্তী অশ্ব সিংহ ব্যাঘ্র এবং মুখোস্‌পরা ভীমকায় মনুষ্য-মূর্ত্তি শোভাযাত্রার বৈচিত্র্য বাড়াইয়া তোলে! একটি শ্বেতহস্তীর মূর্ত্তিও শোভাযাত্রার সঙ্গে বাহির করা হয়। হস্তীটির পিঠে বেশ করিয়া আঁটিয়া সেকেলে একখানি নাগরদোলা বাঁধিয়া রাখা হয়। সেই অপূর্ব্ব সুন্দর জন্তুটির স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্যই
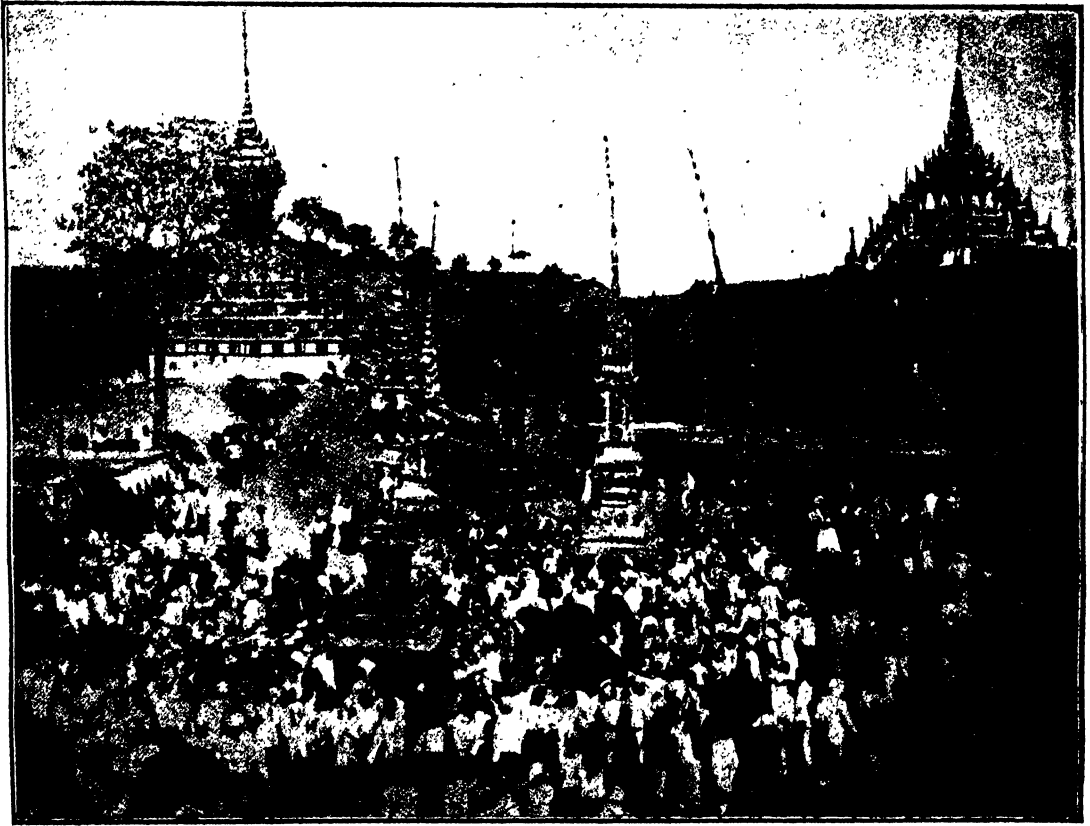
খোলা মাঠে উৎসব

অক্টোবর মাসের 'থাডিন্‌জিউ' উৎসবের প্রধান বিশেষত্ব ইহার শোভাযাত্রা। শত সহস্র নরনারী যখন শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে, তখন ইহাদের লোকবলের বিশালতা সম্বন্ধে ধারণা করিবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটে।

বাদ্যকরগণ ঢাক পিটাইয়া, সানাই বাজাইয়া শোভা-

বোধ হয় ঐ মূর্ত্তিটি তৈয়ারী করা হয়। হংসাকৃতি, ময়ূরাকৃতি এবং ড্রেগণাকৃতি সুবৃহৎ নৌকাগুলি ঠেলাগাড়ীর উপর রাখিয়া মাঝিমাল্লারা সারি-গান গাহিয়া চলিতে থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন ধরিয়া শোভাযাত্রা বাহির হয়। উৎসব-উল্লাসে প্রত্যেক নরনারীর দেহ-মন অপূর্ব্ব সজীবতা লাভ করে!

উৎসবের দিনে যে কোনো রঙ্গালয়ের সাম্‌নে দর্শকেরা ভিতরে ঢুকিবার জন্য অত্যন্ত ভিড় জমাইতে সুরু করিয়া দেয়; ইহার একটা বিশেষ কারণও আছে। উৎসবের দিনে উচ্চভাব-মূলক প্রাণস্পর্শী নাটকগুলিই অভিনীত হইয়া থাকে। রেঙ্গুনের রঙ্গালয়ে জীবন-নাট্য ও ঐতিহাসিক নাট্যই অত্যধিক অভিনীত হইতে দেখা যায়।

সে দেশের সাধারণ নাটকগুলি প্রেমের কাহিনী ও ভূতের কাহিনীতেই জর্জ্জরিত। ভৌতিক প্রেমের কাহিনী-গুলি হাস্যোদ্দীপক রসিকতায় জল্‌জলে। সে দেশের লইয়া ব-দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যায়। দীর্ঘ দিবস, আর কত বিনিদ্র রজনী আন্‌মনে কাটে, সোয়েমিও আর আসে না! মন্ত্রশক্তির জোরেও সে যখন আসে না, তখন একটি শ্বেত-শুভ্র হংসের গলদেশে একখানি লিপি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। হংসদূতটি বিচিত্র মেঘলোকে বিচরণ করিতে করিতে ব-দ্বীপে সোয়েমিওর কাছে যায়। লিপিখানি হস্তগত হইলে সোয়েমিও দেশে ফিরিয়া আসে। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে নট-দম্পতী জাঁকালো পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া শ্রেষ্ঠী-কন্যার শুভবিবাহের শুভবার্ত্তা প্রচার করে। তার পর নট-

শওবাদের কুঞ্জভবনে শরৎ উৎসব

হোটেল, কাফে, রেঁস্তরায় নাকি একটা বাঁধা বুলি শুনিতে পাওয়া যায়:—

"Nothing is unfair
In Love and War."

রোমান্টিক দেশ! একখানি গীতি-নাট্যে মা-মেলিয়া ও সোয়েমিওর প্রণয়-কাহিনী সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া অভিনীত হয়! শ্রেষ্ঠী-কন্যা মা-মেলিয়া স্বাস্থ্যবতী, রূপবতী ও বিদ্যাবতী। বাগ্দান করিয়া সোয়েমিও সাত-ডিঙ্গা

দম্পতীর পাতায়-ঢাকা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কত রকম সুরে কথাবার্ত্তা হয়।

কথাবার্ত্তার সর্ব্বত্র অনুরাগ-দীপ্ত আভাষ।

নট বলে, "আমি দেখি।"
নটী বলে, "আমি শুনি।"
নট বলে, "আমি জীবন।"
নটী বলে, "আমি প্রেম।"

ঐ গীতি-নাট্যখানির আখ্যানবস্তু খুবই সরল। সঙ্গীত,

জলকেলি উৎসবে শোভাযাত্রা

শোভাযাত্রায় অশ্বপৃষ্ঠে টুইঙ্গা বালকগণ

দৃশ্যপট এবং সাজসজ্জার মনোহারিত্ব থাকাতে নাটকের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য দ্বিগুণ ভাবে দর্শকদের অন্তর স্পর্শ করে!

বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীগুলিতে বীরজনোচিত তর্জ্জন গর্জ্জন, বারুদ বন্দুক, কামান গোলা ইত্যাদির ব্যবহার নার্ভাস্ দর্শকদের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করাইয়া দেয়!! কামান-গুলি রঙ্গমঞ্চের এক কোণে অন্ধকারের অন্তরালে পড়িয়া থাকে। মহাশক্তিশালী ধুরন্ধরদের মহা-অভিযানের তলে তলে যে দুরভিসন্ধি ও নির্ম্মমতা লুক্কায়িত আছে, উহার এতটুকু অনুভব করিলেও সুস্থ চিত্তে অসুস্থতা জন্মে।

না কি তাহারা বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সে যাই হোক্, উৎসবের দিনে এ দেশের যাবতীয় রঙ্গালয়গুলির আলোকোজ্জ্বল রূপ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়।

এ দেশের আরো দুই একটি উৎসবের কথা এখনো বলিতে বাকী আছে। শিন্‌ফু, আল্লু এবং কর্ণবেধ ইত্যাদি উৎসব সাধারণতঃ সামাজিকতার খাতিরে পারিবারিক ঠাট বজায় রাখিয়াই ঘটা করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। শিন্‌ফু এবং আল্লু উৎসবে ফুঙ্গীদের আহার্য্য দেওয়া হয়। কর্ণবেধ উৎসবে ছোট ছোট মেয়েদের কান বিঁধিয়া, মাক্‌ড়ী পরাইয়া,

শরৎ-উৎসবে শোভাযাত্রা (শান ষ্টেট্)

পৌরাণিক কাহিনীগুলিও নাটকাকারে অভিনীত হয় এবং ইহাতেই জনসাধারণের বেশীরকম পক্ষপাত দেখা যায়। চলচ্চিত্রে আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনীগুলিও বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। গত বৎসর রেঙ্গুনে আসিয়া বার্ম্মা চলচ্চিত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে শুনিয়াছিলাম। বার্মিজ্ ফেভারিট্ কোম্পানী চলচ্চিত্রে "শকুন্তলা" ও "শ্রীকৃষ্ণ" দেখাইবার আয়োজন করিয়াছিল এবং তাহাতে

টোপর মাথায় দিয়া বরণ করিবার রীতি। শোভাযাত্রা, আলোকসজ্জা, নহবতে বাদ্য এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেদের বসিবার জন্য কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উচ্চ মঞ্চ ইত্যাদির অবস্থা-বিশেষে ব্যবস্থা করা হয়। পোওনা-ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন এবং "নম্ নম্" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সুকণ্ঠ গায়কের মত মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ দেশে বিয়েতেও অত ঘটা হয় না, কর্ণবেধ উৎসবে যত ঘটা হয়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষভাগে বার্ম্মার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা, জাতির কল্যাণ কামনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল। সেই "ন্যাশনাল্ ডে" বা জাতীয় জাগরণের দিন স্মরণ রাখিবার জন্য এখনও নগরে নগরে উৎসব হয়, শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

কর্ণবেধ উৎসবে শোভাযাত্রা

আকিয়াব অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট উৎসব সমুদ্রপূজা। উৎসবের দিনে অসংখ্য স্নানার্থী সমুদ্রসৈকতে আসিয়া মিলিত হয়। এখানে অসীম অনন্ত জলধির নীল তরঙ্গ নিশিদিন সাগরবেলা সিক্ত করিয়া দিয়া যায়। "সন্দজী" মন্দিরের পশ্চাতে দূরদিগন্ত-বিস্তৃত নারিকেলকুঞ্জ, সম্মুখে অসীম অনন্ত সুনীল ফেনিল জলরাশি। প্রত্যেক স্নানার্থীর প্রাতর্বন্দনা হইতে সুরু করিয়া চন্দ্রালোকে আলোকিত সন্ধ্যায় ক্ষণে ক্ষণে বন্দনা-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মহাসিন্ধুর তরঙ্গাঘাতে ঐ বন্দনার প্রতিধ্বনি লহরে লহরে ভাসিয়া আসে। আকিয়াবের চারিদিকে পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গমালা মুহুর্মুহু উচ্ছ্বসিত। উৎসবের দিনে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে!

শানদেশের বারোটি ষ্টেটের প্রত্যেকটিতে "শওবা" শাসনকর্ত্তাদের এলাকায় থাডিন্জিউ ফেষ্টিভ্যাল (শরৎ উৎসব) মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বাগিন

থাডিন্জিউ উৎসবের ক্রীড়া-কৌতুক যথার্থই বিস্ময়কর। এই উৎসব উপলক্ষে ইয়ংহোয়ে ষ্টেটের ইন্লে হ্রদের তীরে City of Towers নামক একটি নগর তৈয়ারী করা হয়। সিটি অব্ টাওয়ার্স দেখিবার জন্য দিগ্‌দিগন্ত হইতে লোক আসে। মিশরের পিরামিড, আগ্রার তাজমহল, সিক্কোর ধর্ম্মমন্দির, কান্দীর দন্তমন্দির এবং মাণ্ডেলের কারুকার্য্যময় কাষ্ঠনির্ম্মিত

বর্দ্ধন করে। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য সৃষ্টি করিবার জন্য সিটি অব্ টাওয়ার্স তৈয়ারী করিবার অদম্য প্রচেষ্টা। যে ঐরাবৎ ইরাবতীর বিশাল স্রোতের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই ধুরন্ধর ঐরাবৎ এই নগরের শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত। আর গরুড়, যাহার ভ্রমণপথ অসীম অনন্ত আকাশপথে সেই গরুড়কেও এই নগরের শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত করা হইল। কি সুন্দর-পরিকল্পনা!

সিটি অব্ টাওয়ার্সের প্রাসাদ, মন্দির ও মিনারগুলি পুরু রঙ্গিণ কাগজ এবং অভ্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। ঐ টাওয়ার ও মঞ্চগুলি বেত বাশ ইত্যাদি দ্বারা এমন মজবুত করিয়া তৈয়ারী যে, ঝড়ের দোলায়ও সিটি অব্ টাওয়ার্সের বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। কাগজ ও অভ্র দ্বারা মিনার ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিবার কলা-কৌশল বার্ম্মা ও শান-দেশের একটা জীবন্ত আর্ট। ব্রহ্মদেশের ফুঙ্গিবিয়ান উৎসবেও ঐ রকম টাওয়ার, মিনার এবং মঞ্চ তৈয়ারী করিতে দেখা যায়। সিটি অব্ টাওয়ার্স নির্ম্মাণ করিবার জন্য কয়েকজন সুনিপুণ কারিগর, সূত্রধর এবং চিত্রকর নিযুক্ত করা হয়। উহারা বংশানুক্রমে ঐ কাজ করিয়াই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক প্রাসাদ ও টাওয়ারের অভ্যন্তরের আচ্ছাদনগুলি নানারকম পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্র দ্বারা সুশোভিত থাকে। তাজমহলে মোগল বাদশাদের ছবি, পিরামিডে মিশরের নরনারীর ছবি, নিক্কোর ধর্ম্মমন্দিরে জাপানী ছবি এবং প্রদর্শনী-গৃহে শান-শওবাদের পিতৃ-পিতামহের সুবৃহৎ তৈলচিত্র, অতীত যুগের উৎসব, শোভাযাত্রা এবং সংসারযাত্রা ইত্যাদির চিত্র যথা-স্থানে সাজাইয়া রাখা হয়। পুরাতন চিত্রাবলীর ভিতরে পারিবারিক চিত্রগুলি যেন এক চিরন্তন সুরের জয় গাহিতেছে। প্রথম ফসল দর্শনে গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রীর গালভরা হাসি, গৃহপ্রাঙ্গণে মাকে ঘিরিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আনন্দ-উল্লাস, শ্রেষ্ঠীপুত্রের জন্মোৎসব, শ্রেষ্ঠী-তনয়ার কর্ণবেধ উৎসব ইত্যাদি; শতবর্ষ পূর্ব্বে ঠিক যেমনভাবে এ দেশে পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম্ম, পূজাপার্ব্বণ এবং আনন্দ-

নান্‌হু 'তারাদেবীর' মন্দির-প্রাঙ্গণে শওবার লোকজন

উৎসব ইত্যাদি চলিত, আজিও ঠিক তেমন সমারোহেই সব কাজ চলিতেছে।

সিটি অব্ টাওয়ার্সের কেন্দ্রস্থলে একটি সুবৃহৎ জলাশয় আছে। জলাশয়ের চারি কোণে চারিটি স্ফটিক স্তম্ভ। এই অপূর্ব্বসুন্দর দীঘির শুভ্র স্বচ্ছ জলে প্রস্ফুটিত পদ্মগুলি আপন সৌন্দর্য্যে আপনি বিভোর হইয়া আছে। পদ্মবনের সুধা ও সুরভিতে চারিদিক আমোদিত; চারিদিকে সৌরভময় হিল্লোল। এ-হেন সুষমা-ছড়ানো পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের মাঝে সিটি অব্ টাওয়ার্স নির্ম্মিত হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে অগণ্য দর্শক এই নগরে আসে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য দোকান ষ্টল্ ইত্যাদি বসিয়া যায়। দেশজাত শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কারুকার্য্যময় রৌপ্যপাত্র, পদ্মরাগখচিত পোষাক পরিচ্ছদ, হস্তীদন্তনির্ম্মিত বাক্স কৌটা বোতাম চেন্, লেকার ওয়ার্কের নানারকম চিত্রিত পানপাত্র ভোজন পাত্র এবং পুষ্পাধার, রেশমী রুমালের উপর বহুবর্ণে অঙ্কিত চিত্র ইত্যাদি খুব সস্তায় কিনিতে পাওয়া যায়।

লক্ষ্যবেধ

সূর্য্য যখন আস্তে আস্তে ডুবিয়া যায়, তখন গর্জ্জনিনাদে তোপধ্বনি হয়, সিটি অব টাওয়ার্সের উচ্চ মঞ্চ হইতে ভৈরব সুরে বিউগল্ বাজিয়া উঠে, ইন্‌লে হ্রদের তীরে কুটীরে কুটীরে শিঙ্গাধ্বনি হয়। বৈদ্যুতিক আলোকে সমগ্র নগরটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। সিটি অব্ টাওয়ার্সের চারি দিকে মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যাবন্দনা ও আরতি সুরু হয়।

"দেউলে দেউলে মন্দিরে কত
বাজে উৎসব-বাঁশী
লক্ষ পূজারী বন্দনা গায়
নিত্য নিয়ত আসি'।"

নান্‌হু 'তারাদেবীর' মন্দির-প্রাঙ্গণে কাঁশর ঘণ্টা আর ঢাক বাজিয়া উঠে। চন্দ্রাতপতলে বীণার ঝঙ্কার, বাঁশীর তান আর জলতরঙ্গের টাং টুং টুনাটুন্ ধ্বনি শোনা যায়। গোধূলি লগ্নে 'তারাদেবীর' স্বর্ণ-প্রতিমার সামনে বন্দনা-সঙ্গীত গাহিয়া সুকুমারমতি বালকগণ ময়ূরপুচ্ছ হস্তে সুল-লিত ভঙ্গীতে আরতি করে। ঐক্যতান বাদনে দেবালয় মুখরিত হইয়া উঠে।

উৎসবে বৈঠকী বাজনা

এই উৎসব উপলক্ষে ইন্‌লে হ্রদে বাচ্‌খেলা একটি পরম উপভোগ্য বস্তু। বিউগল্‌ বাজিয়া উঠিলেই সারি সারি নৌকা তীরের বেগে ছুটিয়া চলে। নৌকাগুলির বিশেষত্বও আছে প্রচুর। কোনো নৌকা হংসাকৃতি, কোনো নৌকা ড্রেগণ্যাকৃতি, কোনো নৌকা ময়ূরাকৃতি। নৌকা-চালকেরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ের সাহায্যে দাঁড়গুলি সুকৌশলে ফেলিয়া হুর্‌রে হুর্‌রে ধ্বনি তুলিয়া নৌকা চালাইতে থাকে। হ্রদের তীরে ব্যাগ্‌-পাইপ, বিউগল্‌ এবং ঢাকের বাদ্য চালকদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে। ক্রীড়াকৌতুক হিসাবে বাচ্‌খেলা শানদের বিশেষ প্রিয়।

শোভাযাত্রায় শ্বেতহস্তীর মূর্ত্তি

সিটি অব্‌ টাওয়ার্সের সামনে খোলা মাঠে ঘোড়ার খেলা, এলিফেণ্ট ফাইট্‌ এবং কক্‌ ফাইট দেখিবার জন্য দিগ্‌দিগন্ত হইতে লোক আসে। শানদেশ সুশ্রী সুন্দর এবং বলশালী ঘোড়ার জন্য প্রসিদ্ধ এবং শানরা নানারকম ভঙ্গীতে ঘোড়াকে লাফ খাওয়াইতে ভারি ওস্তাদ। কক্‌ ফাইটের কথা বিশেষ আর কি বলিবার আছে! মুর্গীতে মুর্গীতে লড়াই, সেটাও অবশ্য অতি আমোদজনক ব্যাপার!

এলিফেণ্ট ফাইটে মহাশক্তিশালী ঐরাবতের মত দুইটি বিশালকায় হস্তী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি করিয়া লড়াই করিতে সুরু করিয়া দেয়। সে কি ভীষণ লড়াই! ব্যাণ্ডের বাজনার তালে তালে পা ফেলিয়া শুঁড় তুলিয়া বিরাট গর্জ্জনে হস্তী দুইটি আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তোলে! গ্রীস ও রোমের গ্লাডিয়েটার্সদের মত পোষাক-পরিহিত এক একজন পরিচালক হস্তী দুইটিকে চালনা করে। হস্তীর বোধশক্তি অত্যন্ত প্রবল। হস্তীর জয়-পরাজয়ের উল্লাস ও বিষাদ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হস্তীযুদ্ধ মানুষকে শক্তিমন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়া তোলে, এটাই ঐ যুদ্ধের বিশেষত্ব। শান ষ্টেট্‌সের মত ভারতবর্ষের কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে (বিশেষতঃ মধ্যভারতে) উৎসব এবং বিবাহ উপলক্ষে হস্তী-যুদ্ধ প্রচলিত আছে।

শোভাযাত্রায় স্বেচ্ছাসেবক

এই উৎসব উপলক্ষে ইন্‌লে হ্রদের তীরে পুষ্পতোরণ-শোভিত অপূর্ব্ব সুন্দর একটি কুঞ্জে বহু তীরন্দাজ মিলিত

হয়। 'লক্ষ্যবেধ' করিবার জন্য একটি সুউচ্চ স্তম্ভের শীর্ষ-দেশে সংলগ্ন লৌহচক্রের কেন্দ্রস্থলে পুতুল-প্রমাণ একটি লাক্ষা-নির্ম্মিত পাখী থাকে। সেই পাখীটির পাশেই খাঁচার ভিতরে আরো দুইটি পাখী রাখা হয়। প্রথম পাখীটি স্থান-ভ্রষ্ট হইলেই দ্বিতীয় পাখীটি যন্ত্রচালিতবৎ চক্রের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয় পাখীটিকে স্থানভ্রষ্ট করিলে তৃতীয় পাখীটিও আসিয়া পড়ে। তীরন্দাজ এমন তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শর-নিক্ষেপ করে যে, একটির পর একটি করিয়া তিনটি পাখী চোখের নিমেষে লৌহচক্র হইতে পড়িয়া যায়। আকাশ-প্রদীপের মত ঐ লৌহচক্রটি একবার উপরে উঠানো যায়, আবার নীচে নামানো যায়। প্রত্যেক তীরন্দাজ ঐ রকম পাখী রাখিয়া 'লক্ষ্যবেধ' করে। তীরন্দাজদের সুগঠিত দেহ, একাগ্রতা এবং দৃষ্টিশক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

উৎসবের শেষ দিনে শওবাদের কুঞ্জ-ভবনে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষে কুঞ্জভবনের শোভাসজ্জা সুরুচিপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। স্তরে স্তরে পুষ্প-লহর, নানাবর্ণের চিত্রিত ফানুস, এবং অসংখ্য পতাকা এই সুবৃহৎ গৃহখানিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলে। এই সঙ্গে থাডিনজিউ উৎসবের একখানি ছবি দেওয়া হইল। ছবিখানিতে এখানকার শওবা ও শওবার ভ্রাতা গদির উপর বসিয়া আছেন। শওবার পশ্চাতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ এবং শওবা পরিবারের ছেলে-মেয়েরা; গদির নীচে প্রাঙ্গণে দুইখানি মোটর বাসের উপর দুইটি শ্বেতহস্তীর মূর্ত্তি; হস্তীর পিঠে শওবা-বাড়ীর ছেলেরা বসিয়া; হস্তী দুইটির দুই পাশে দুইজন শক্তিশালী বল্লমধারী; মধ্যস্থলে পুষ্পপত্রে সুশোভিত চতুর্দ্দোলায় শওবা-পুত্র এবং আরো কয়েকটি ছেলে বসিয়া; চতুর্দ্দোলার সামনে দ্বিচক্রযানের উপর পুষ্পলহরের বেষ্টনীযুক্ত দুইটি সুবৃহৎ দামামা। ইহার দুই পাশে শওবার লোক-লস্করগণ; কাহারো হস্তে জরির ঝালরযুক্ত পাখা, কাহারো হস্তে রৌপ্য-নির্ম্মিত কারুকার্য্যময় জলাধার, কাহারো হস্তে কোষ নিষ্কোষিত তরবারী।
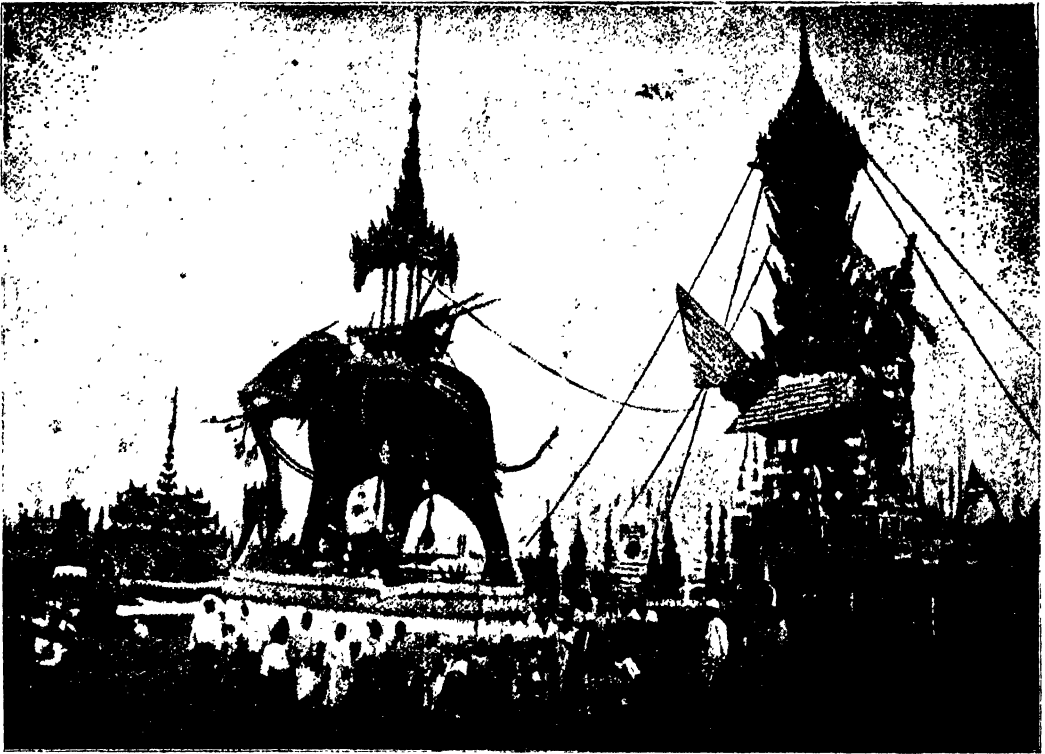
সিটি অব টাওয়ার্সের দ্বারদেশে শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত ঐরাবত ও গরুড়

মহোৎসবের ভোজের পর শওবাদের বাড়ী হইতে শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রায় সুসজ্জিত হস্তী অশ্ব,

অসংখ্য পতাকাধারী, ছত্রধারী এবং বল্লম বন্দুক ও নানা রকম অস্ত্রশস্ত্রধারী একদলের পর আর একদল পথ বাহিয়া চলিতে থাকে। উৎসবকর্ম্মীদের ভিতরে কেরেণ, শান এবং মংক্মের জাতীয় লোকগণ উৎসব-সাজে সজ্জিত হইয়া শোভাযাত্রার সঙ্গে বাহির হয়। জনতার ভিড়ের মধ্যে দর্শকদের সাহায্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। শোভাযাত্রা "পওয়ু-পিয়ায়ু" মন্দিরের সাম্‌নে আসিয়া পৌঁছিলেই শওবাগণ হস্তীপৃষ্ঠ হইতে

চেট্টিদের প্রতিষ্ঠিত সুব্রমণি মন্দির (রেঙ্গুণ)

অবতরণ করিয়া নগ্নপদে দেবালয়ে প্রবেশ করেন। শওবাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়-তোরণে তিনবার তোপধ্বনি হয়। এই উৎসব উপলক্ষে শানদের জাতীয় জীবনের বিশালতা সম্বন্ধে ধারণা করিবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই উৎসব দেখিয়া বলিয়াছেন "ইয়ংহোয়ে ষ্টেটের ইন্‌লে হ্রদের তীরে অক্টোবর মাসে যে উৎসব হয় তাহার ক্রীড়া-কৌতুক যথার্থই বিস্ময়কর। এ দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই যেন সৌন্দর্য্যসাধক ও শক্তি-সাধক।"

বার্ম্মা এবং শানদেশের উৎসবের কথা ত বলা হইল। এখন ভারতের নানাপ্রদেশের যত লোক এ দেশে বাস করিতেছে, তাহাদের উৎসব সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা যাক্। বার্ম্মার নানা স্থানে মহাসমারোহে শারদোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। মাণ্ডেলে, এনান্‌জঙ এবং রেঙ্গুণে এই উৎসব উপলক্ষে এমন আয়োজন হয় যাহা বাংলাদেশের অনেক স্থানে হয় না। অবশ্য এটা বাঙ্গালী ও বাংলার গৌরবেরই কথা।

সকল প্রদেশের লোকের চেয়ে চেট্টিদের বাৎসরিক সকল উৎসবের প্রতিই বিশেষ আন্তরিকতা আছে বলিয়া মনে হয়। চেট্টিদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে মন্দিরে এই সময়ে মহাসমারোহে উৎসব চলিতে থাকে; পূজার বাড়ীর সন্ধ্যারতির শঙ্খনিনাদে দিকে দিকে আনন্দের ধ্বনি, জয়ের ধ্বনি শোনা যায়।

যৌথ

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হ'চ্ছিল। বৃষ্টির এ সময় নয়, কিন্তু সন্ধ্যায় সেই যে কালবোশেখীর প্রবল তাণ্ডবের সঙ্গে একটুক্‌রো কাল মেঘ উঠেছিল, সেটা বিস্তৃতি লাভ ক'রে, রাত দশটা পর্য্যন্ত একেবারে প্রবল ধারা বইয়ে দিলে মহানগরীর উত্তপ্ত বুকের ওপর।

রমেশ তার দোকান ঘরের একেবারে রাস্তার ধারের খোলা জানালার পাশে বসে, প্রকৃতির এই অযাচিত অপরিমিত দানের আশ্চর্য্য খেলা দেখছিল। মুখ তার বিবর্ণ, বিশুষ্ক, চোখ-দুটার দৃষ্টি কোন্ সুদূর দিগন্তে ন্যস্ত। বৃষ্টির ঝাট যে খোলা জানালার পথে এসে তার অনেকখানি ভিজিয়ে দিচ্ছিল—সে দিকে লক্ষ্য নেই।

তার কর্ম্মচারী অবিনাশ অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে,—বাবু, জানলাটা বন্ধ ক'রে দোব কি, ভিজে গেল সব যে!

নিস্তব্ধ ঘরে হঠাৎ অবিনাশের কথার শব্দে চম্‌কে উঠে রমেশ বল্লে, না।

অবিনাশ সবিনয়ে বল্লে, জামা কাপড় অনেকখানি ভিজে গেল যে!

রমেশ একবার নিজের জামা কাপড়ের দিকে চেয়ে একটুখানি স'রে ব'সে বল্লে, যাক্ গে।

ব'লে সে আবার সেই উন্মাদ ধারাপাতের দিকে চুপ্ ক'রে চেয়ে রৈল। যতদূর চোখ যায় শুধু অবিশ্রাম বর্ষণ,—জলের পর জল। কোলাহলময়ী নগরী, প্রকৃতির এই দুর্দ্দান্ত খেয়ালের আকস্মিকতায় একেবারে স্তব্ধ স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে, রাস্তা শূন্য, পথিক-হীন, এবং রাজপথের বিপুল জল-প্রবাহ পয়ো-প্রণালীর অপরিসর রন্ধ্র-পথের চারি দিকে ঘুরে-ঘুরে কেবলই জমে উঠছে!

খানিকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, রমেশ বল্লে, —কোনও উপায়ই আর নেই, না অবিনাশ!

অবিনাশও প্রত্যুত্তরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ্ ক'রে রৈল।

ইকনমিক্‌সে সসম্মানে এম্-এ পাশ ক'রে রমেশ এই লোহা লক্কড়ের দোকান খুলেছিল। সে মনে মনে সঙ্কল্প করেই গতানুগতিকের চিরন্তন পন্থা অনুসরণ করে চাকুরী খোঁজেনি,—নবীন যৌবনের উদ্দাম আশায় তার মন পরিপূর্ণ ছিল, এবং সে নিশ্চয়ই জানত যে নিষ্ঠার সঙ্গে যদি সে তার ব্যবসায় চালাতে পারে, ত' একদিন লক্ষীর স্বর্ণ কমলের পাপড়িটি তার হাতে আসবেই। মরুভূমির পার থেকে লোটা-কম্বল সার করে যারা বাংলার মাটিতে পদার্পণ ক'রে অবিলম্বে কমলার পদ্ম-বনের অনেক-খানি ইজারা নিয়ে ব'সে, তাদেরই দৃষ্টান্ত তাকে লুব্ধ করেছিল।

কিন্তু মরুভূমির পারে যে সৌভাগ্যের হাওয়া অবিরত বয়, বাংলা দেশে যে তা একান্ত দুর্ল্লভ, এই কথা বুঝতে রমেশের লেগে গেল ৪।৫ বছর। নিঃসন্দেহে বুঝলে তখন যখন গোবিন্দরাম চামেরিয়া তার ওপর হাজার দশেক টাকার ডিক্রি করে নিলে।

সেই ডিক্রি এখন জারীর অবস্থায়—হয়ত' দিন-দশ-পনরর মধ্যে, তার নিজের বলবার যা কিছু আছে তা গিয়ে পড়বে চামেরিয়ার হাতে।

টাকার অনেক চেষ্টা ক'রে সে পায় নি। মাথায় এত বড় ডিক্রি খাঁড়ার মত ঝুলছে,—পশ্চাতে প্রবল লুব্ধ শত্রু, কে দেবে তাকে টাকা? অথচ যদি সে টালটা সামলাতে পারত' ত হয় ত' তার জীবনের প্রবাহই ফিরে যেত অন্য পথে; কারণ তার দোকানে যে জিনিষ মজুদ আছে, এবং যা স্বল্প দিনেই জলের দামে বিকিয়ে যাবে, তার উচিত মূল্যে ডিক্রীর দেনা স্বচ্ছন্দে দুবার পরিশোধ হ'য়ে যায়, এবং এ একটা গুজবও তার শুনতে বাকী নেই যে মহাযুদ্ধের জন্য অচিরেই লোহা-লক্কড়ের দাম অসম্ভব চ'ড়ে যাবে। ঠিক সেই কারণেই

বোধ করি চামেরিয়ার এত লোভ এবং এরূপ ক্ষিপ্রকারিত্ব, অথচ অদৃষ্ট তার হাত-পা একেবারে সম্পূর্ণ ই বেঁধে রেখেছে!

আজ এই দুর্দ্দিনের দুর্য্যোগ তাকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল এই কথা, যে এই ঝঞ্ঝা নেমেছে যেন তারি জীবনে! একেবারে দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন ক'রে,অন্ধকার ক'রে,—কোথাও এতটুকু আশার অবকাশ নেই! অথচ, আজকের এই বৃষ্টির মতই তা নামল, একান্ত অসময়ে,একান্ত অপ্রত্যাশিত। তার পর সেই ঝঞ্ঝা যখন খড়-কুটো ধূলো মাটি উড়িয়ে মুহূর্ত্তে সমস্ত বিপর্য্যস্ত করে দিয়ে, দিগন্তে মিলিয়ে যাবে, তখন সে বসবে একেবারে পথের মাঝখানে, শুষ্ক বিশীর্ণ উপদ্রুত ভূপাতিত বৃক্ষেরই মত।

রমেশ বল্লে, অবিনাশ, একবার বিপিন-সাহাদের ওখানে গিয়েছিলে? তারা কিছু আশা দিলে না?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বল্লে, না।

—একটুও না? একটুও যদি দিত, তা হ'লে আমি না হয়, আর একবার যেতাম। হাজার হোক বিপিনের সঙ্গে পড়েছিলাম ত'!

অবিনাশ বল্লে, না বাবু, আপনার আর গিয়ে কাজ নেই। বিপিন-বাবু বোধ করি সে পড়ার কথাটুকু ভুলেই গেছেন। আজ তাঁরা আমার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করলেন, তাতে আপনাকে আমি সেখানে কিছুতেই যেতে দিতে পারবনা বাবু।

ব'লে অবিনাশ রমেশের দিকে চাইতে রমেশ তার মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, সে অপমানের গ্লানি সেখান থেকে তখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি।

রমেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, তবে তাই হবে।

আবার দু'জনে খানিকটা চুপ্ ক'রে রৈল। হঠাৎ রমেশ কথা কইলে, বল্লে, অবিনাশ, আমি ত' গেছি,—তোমার কি হবে?

অবিনাশ নিঃশব্দে তার কপালে হাত ঠেকালে।

এই অবিনাশ যে তার কতখানি, তা ভাল ক'রে বুঝত ব'লেই, রমেশ এই দুঃখেও অবিনাশের কথা ভুলতে পারেনি। যখন নতুন ব্যবসায় সুরু করে রমেশ একজন বিশ্বস্ত লোক অনুসন্ধান করছিল, তখন একদিন খালি-পায়ে মাত্র একখানি চাদর গায়ে অবিনাশ এসে দাঁড়াল কর্ম্ম প্রার্থী হ'য়ে। তার বাড়ী ফরিদপুরে, সংসারে বৃদ্ধা মা আর বিধবা ভগ্নী। তাদেরই ভরণ-পোষণের দায়িত্ব, নিঃসম্বল তাকে খালি পায়ে, এই মহানগরীর বুকের মাঝ-খানে পাঠিয়ে দিলে। তিন দিন অনাহারের পর রমেশের সঙ্গে দেখা। সে ছিল স্বল্পভাষী এবং তার প্রশংসা-পত্রের কোন বালাই ছিলনা, কিন্তু তার মুখই ছিল তার অন্তরের সব চেয়ে বড় সাক্ষী। রমেশ ভুল করেনি, সে মুখে সে-দিন তার যে পরিচয় পেলে, তা একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও মিথ্যা হয়নি।

এই উপলক্ষে এত বড় একজন বিশ্বাসী অকপট বন্ধু হারান—এও রমেশকে কম ব্যথা দিচ্ছিলনা।

রমেশ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, অবিনাশ চল্লুম, রাত হ'লো অনেক।

অবিনাশ ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে, তা হ'লে একটা গাড়ী ডাকি বাবু—।

রমেশ সংক্ষেপে বল্লে—না।

—রাস্তায় এত জল, তা ছাড়া এখনও বৃষ্টি হ'চ্ছে,—একটা গাড়ী নইলে,—

রমেশ জোর করে হেসে বল্লে,—এত রাত্রে, এত দুর্য্যোগে কোথায় গাড়ী পাবে অবিনাশ। তার চেয়ে চলেই যাই, এইটুকু ত রাস্তা।

ব'লে রমেশ সেই জলের মাঝখানে নেমে পড়ল।

অবিনাশের চোখে জল এল এই কথা মনে করে যে, তার মুক্তহস্ত মনিবকে আজ এই দুর্য্যোগের রাতেও গাড়ী চ'ড়ে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে হ'ল।

খাতা-পত্র গুছিয়ে অবিনাশ তাদের যথাস্থানে রাখছে এমন সময় আবার রমেশের গলার আওয়াজ পেয়ে অবিনাশ দেখ্‌তে পেলে যে আগাগোড়া সিক্ত রমেশ ফিরে এসে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে তাকেই ডাকছে।

অবিনাশ উঠে এসে বল্লে, ইস্—একেবারে ভিজে গেছেন যে বাবু!

রমেশ বল্লে, তা হোক। কিন্তু আমি কাল পুরী যাব মনে করছি, অবিনাশ।

—পুরী? হঠাৎ সেখানে কেন, বাবু?

রমেশ বল্লে—হঠাৎ-ই ত' অবিনাশ। কাকে আর নোটিশ দেব বলো? কে আমার এমন শুভার্থী আছে যে নোটিশ না পেলে—বলে সে হাস্‌তে লাগলো। তার পর

হৈমন্তিকা

শিল্পী— শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ চৌধুরী

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS

বল্লে, হাঁ, তুমি একজন আছ বটে, তাই ত ব'লতে এলাম। মনটা তবু যদি একটু অন্য দিকে ফেরে—

অবিনাশ বল্লে—কিন্তু বাবু এই সময়টা—আমি কি একা সামলাতে পারব, ভারী ঝঞ্ঝাট যে!

রমেশ আবার হাসলে, বল্লে, অবিনাশ, হিসেবের খাতায় একেবারে শূন্য বসিয়েই রেখে দিয়েছি, সুতরাং ভয় নেই, তুমিও যেমন সামলাবে, আমিও তেমনি। নেহাৎ দরকার বোঝ খবর দিও—। ব'লে আবার যাবার জন্যে ফিরলে।

কতদিন হবে বাবু সেখানে—?

অবিনাশের দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে চেয়ে বল্লে—ঠিক ত' কিছুই বলা যায় না অবিনাশ!

২

রমেশ গিয়ে বসেছিল সমুদ্রের ধারে বালির ওপর। তখনও সন্ধ্যা হয়নি, বেলা পড়ে আসছে।

ছেলেবেলা থেকে যে সমুদ্র তাকে মুগ্ধ করেছে, সে আজ তাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেল্লে। দিক্-দিগন্ত জোড়া ঐ যে অগাধ, আশ্চর্য্য, ফেণোর্ম্মি, অতল মহানীল, রমেশ মিলিয়ে দেখলে সে যেন তার জীবনের প্রতিচ্ছবি, যেখানে ওরই মতন অসীম অতল ভবিষ্যৎ তার উত্তাল তরঙ্গাঘাতে তার জীবনকে প্রতি মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর পীড়নে ব্যথিত করছে। ওরই মত তার ভবিষ্যতের কোন কূল, কোন কিনারা, কোনও তল নেই।

সৌখীন দেশ-পর্য্যটক, স্বাস্থ্যকামী, প্রেমিক প্রেমিকা, দলে দলে সান্ধ্য-বায়ু সেবন করতে এসেছে এই সমুদ্র তীরে। কেউ বা একাগ্র মনে, এতটুকু ত্রুটি না থাকে, এমনি ক'রে সর্ব্বাঙ্গে মুখে চোখে স্বাস্থ্যকর সমুদ্র-বায়ু গ্রহণ করছে, কেউ বা কলহাস্যে সঙ্গিনীর সঙ্গে সমুদ্র-তট মুখরিত ক'রে চলেছে, কেউ বা পীড়িত—স্বাস্থ্যের উন্নতি-কামনায় জীর্ণ দেহভার কোনও রকম ক'রে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে। সবাই চলেছে নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে, কেউ বা তার দিকে ক্ষণিকের জন্য চেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বহু লোকের সে সময়টুকুও নেই।

দিগন্তে যখন প্রকাণ্ড চাঁদ অগাধ নীলের ওপর সহসা ভেসে উঠল, তখন রমেশ যেন হঠাৎ চম্‌কে উঠল।

পূর্ণিমার চাঁদ যেদিন মানুষকে অরূপের রাজ্যে নিয়ে যায়, রমেশের আজ সেদিন নয়। তবুও সেদিনের স্মৃতি তার কাছে আজও মলিন হয়নি, তাই এই অসীমের মাঝখানে ব'সে তার সেই সকল দিনের কথাই মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো।

এই জীবনে সে দুটো জিনিষে হাত দিয়েছিল। দুটোতেই নিষ্ফল হয়েছে,—দু বারই পরাজিত।

আশ্চর্য্য এই যে আজ এই ক্ষতির দিন তাকে আরও একটা বড় ক্ষতির কথাই বারবার মনে করিয়ে দিতে লাগল, যা নিঃশেষে চুকে-বুকে গেছে, যার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। অথচ সেই ক্ষতের জ্বালাই যেন তার সমস্ত বুকটা আজ জুড়ে বসল।

ছোট কাহিনী। যৌবনের আরম্ভে সে ভালবেসেছিল সুরমাকে। সুরমা ছিল বড়লোকের মেয়ে, তার ছিল সাধারণ অবস্থা। বোধ করি অপরাধ এইখানেই। অপরাধ? তবে এই বিরাট মহাসমুদ্র কিসের টানে বারবার ভেঙ্গে পড়ে ওই ক্ষুদ্র ভঙ্গুর সৈকতে? রমেশ ভাবতে লাগলো, অপরাধ যদি হয় ত' সে কোন্ বিধাতা এই সৈকত-সমুদ্রের খেলাকে দিনের পর দিন প্রসন্ন মুখে ক্ষমা ক'রে সেই খেলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ বিভোর হ'য়ে আছেন? কোন্ দেবতা তারই সাক্ষী ক'রে পাঠিয়ে দিলেন ওই পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদকে?

অথচ সুরমাও ভালবাসত তাকে। বাসত কি? রমেশ অতীতের সেই দিনগুলোর অতল তলে ডুব দিয়ে ভাল ক'রে মনে ক'রে দেখলে,—বাসত নিশ্চয়ই। সেই আশ্চর্য্য স্নেহ-কোমল তার মুখ, আশ্চর্য্য তার কণ্ঠস্বর। বিদায়ের শেষ দিনটিতে তার যে চোখ দেখেছিল, আকাশের কোন তারারই সঙ্গে তার উপমা হয় না।

অথচ সুরমার পিতার কঠিন অপমানকর বাণী একদিন তাদের স্বপ্নের প্রাসাদকে মুহূর্ত্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, তাকে বার ক'রে ধূলো-কাদার পথে।

তার পর থেকে সে সুরমার কোন সন্ধান নেইওনি, পায়ওনি। সে কোন ধনীর অঙ্কশায়িনী হ'য়েছে নিশ্চয়ই—এই কথা মনে ক'রে সে ও-দিককার স্মৃতি একেবারে মুছে ফেলতেই চায়।

তার পর তার দ্বিতীয় অভিযান ভাগ্য-ক্ষেত্রে। জীবনের শ্রেষ্ঠ তিন চারটে বছর এরি পেছনে অপব্যয় করে, সে আজ পরাজয়ের গভীর অপমান আর জ্বালা ব'য়ে আবার পথে নামল।

ওই আশ্চর্য্য অগাধ সমুদ্র, ওই কমনীয় মহানীল, ওই মূর্ত্তিমান সৌন্দর্য্য! তার দিকে চেয়ে দুই হাত জড়ো করে, রমেশ মনে মনে বলতে লাগল, তোমার অগাধ শীতলতার মাঝখানে আমার জন্যে এতটুকু স্থান দিও, হে মহাসুন্দর!

মশায়ের নিবাস বুঝি কলকাতায়?

রমেশ চম্‌কে ফিরে দেখলে তারই বয়সী একজন যুবক তার পাশে এসে বসেছে।

রমেশ আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—কেন বলুন দেখি?—আমার সম্বন্ধে আপনার এ আগ্রহ যে!

যুবক হাসলে, বল্লে—এই দু' তিন দিন ধ'রে দেখছি কি না, এইখানটিতে রোজ আপনি এসে বসেন, নড়েনও না, বেড়ানও না, অথচ অনেক রাত্রি অবধি একা একা চুপ্‌টি ক'রে ভাবেন, দেখে স্পষ্টই মনে হয় খুব একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েচেন। তাই ভাবলাম, একবার আলাপ ক'রে দেখি।

রমেশ আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে স্নেহে ও সমবেদনায় তা কোমল। বল্লে, হাঁ, কলকাতায় থাকি,—খুব দুশ্চিন্তা যাচ্ছে বৈ কি!

আগন্তুক বল্লে, কারুর অসুখ বুঝি? আপনার স্ত্রীর—

রমেশ ঘাড় নেড়ে বল্লে, আমি বিয়েই করিনি ত' স্ত্রী! না—অসুখ বিসুখ কারুর নয়—অন্য কারণ।

আগন্তুকের কথা বলবার ভঙ্গী আছে, কথা বার করবার কৌশলও কম নয়। ধীরে ধীরে সে রমেশের কাছ থেকে সকল কথাই শুনে নিলে। তার আরও একটা কারণ বোধ হয় এই যে, তিন-চার দিন একান্ত নির্জ্জনতায় রমেশও হাঁপিয়ে উঠেছিল, দুঃখে দরদী একজনকে পেয়ে সে আর কিছুই গোপন করতে পারলে না।

আগন্তুক বললে, কিন্তু এ সময়টিতে আপনার কলকাতা ছেড়ে আসা কি ঠিক হয়েছে?

রমেশ বল্লে, ঠিক-অঠিক বুঝি না। আর সেখানে থাকতে ইচ্ছা হ'লনা, পাশার দান ত' পড়ে গেছে, সে ত' আর ফিরবেনা।—বুঝলেন কি না!

আগন্তুক ঘাড় নেড়ে বল্লে, ঠিক বলেছেন, পাশার দানই বটে! কিন্তু তবুও এমন সময়—

রমেশ বল্লে, বলেছি ত', অবিনাশ আছে! সে আমার চেয়ে বোঝে ভাল, এই ব্যবসা তার কাছে আমার চেয়ে আপনার। তার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আর এখন ত' বাকী রৈল এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটুকু মাত্র—তা সে করতে পারবে—বলে রমেশ হাসবার মত করলে।

আগন্তুক বল্লে, ওই যে বল্লেন, পাশার দানই বটে—একেবারে হক্ কথা! কিছুই বলা যায় না, দান কখন কার ভাগ্যে কেমন ক'রে যে পড়ে।

৩

রাস্তায় চলতে চলতে ক্ষিতীশ বল্লে, সুরমা, রমেশবাবু বড় বিপদে পড়েছে।

সুরমা সংক্ষেপে বল্লে, শুনেছি সব দাদা। কতটুকু দূরেই বা ছিলাম আমি।

বাকী পথটা সে চুপ্ করেই রইল। ক্ষিতীশ কি দু' একটা কথা বলেছিল, কিন্তু তার জবাব না পেয়ে সেও সমস্ত পথটা নিঃশব্দেই অতিবাহিত করলে।

ক্ষিতীশ সুরমার মাসতুতো ভাই। সুরমার পিতার মৃত্যুর পর, সে-ই সুরমার কাজকর্ম্ম দেখ্‌ত। ইদানীং সুরমার শরীর ভাল থাকছিলনা; তাই ডাক্তারের পরামর্শে দিনকতক হ'ল পুরীতে এসেছে।

এইখানে অপ্রত্যাশিত সন্ধান মিলল তার যার সাক্ষাতের আশায় এই পাঁচ বৎসর সুরমার প্রতি রক্ত-বিন্দু উন্মুখ হয়ে ছিল, এবং যার অদর্শনে তার দেহটাও ক্রমশঃই হাল ছেড়ে দিয়ে ভাসা নৌকারই মত কোনও রকমে ভেসে চলেছিল।

চাঁদের আলোতে জীবনের সেই পুরাতন সাথীকে চিনতে তার একটুও দেরী হয়নি। সমস্ত হৃদয়টা বক্ষের কপাট খুলে তারি পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিল, কিন্তু বাধা ত' একটা নয়। তাই ক্ষিতীশকে পাঠিয়েছিল তার ইতিবৃত্ত জানতে।

মুখের চেহারা দেখে সুরমা অনুমানই করেছিল যে রমেশের দেহ অথবা মনের মধ্যে কোনও একটা নিশ্চয়ই সুস্থ নয়।

তাদের মধ্যে যখন কথা হ'চ্ছিল, তখন অদূরে বসে সুরমার মনের ভেতরটা দোল খাচ্ছিল ঠিক তেমনি করে যেমন ক'রে বারম্বার দোল খেয়ে উঠছিল, আজ পূর্ণিমার উদ্বেল সাগরে উচ্ছৃঙ্খল ঢেউগুলো।

বাড়ী ফিরে এসে সুরমা বল্লে, দাদা, এর একটা উপায় করতে হয়।

ক্ষিতীশ একেবারে গাছ থেকে পড়ল। উপায়? উপায় কি করবো বোন? আর ওর জন্যে তোমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন? কে ও লোকটা?

সুরমা খানিকটা মাটির দিকে চেয়ে কি ভাবলে। তার পর তার দুইটা বড় বড় আর্দ্র চোখ ক্ষিতীশের মুখের ওপর স্থাপিত ক'রে বল্লে, ও যে কে তা তুমি চিনবে না দাদা, কিন্তু আমি চিনি আজ এই ষোল বছর ধ'রে,—আর চিনি বলেই ওকে এমনি ক'রে কিছুতেই নিজেকে ক্ষয় করতে দোবোনা। না দাদা, তুমি বুঝবেনা।

তার রহস্যময়ী ভগ্নীটির এ আবার এক নতুন দিক্, কিন্তু বোঝা যে একেবারে গেলনা, তা নয়। পরমাশ্চর্য্য বিধাতৃ-বিধানের এই পথের আভাষটা চোখের সামনে খুলে যাওয়া মাত্র ক্ষিতীশেরও চোখ দুটো চক্‌চকে হয়ে উঠল। সে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়ল, বল্লে, আচ্ছা তবে পরামর্শ করা যাক্ কি করা যায়—

সুরমা বল্লে পরামর্শ টরামর্শ জানিনে—ওকে বাঁচাতেই হবে কোন-রকমে।

তার মানে দশ হাজার টাকা দিতে হবে? একেবারে অতগুলো টাকা?

উত্তরে সুরমা যে দৃষ্টিতে ক্ষিতীশের দিকে চাইলে, তাতে সে এতটুকু হয়ে গেল। অপ্রতিভ হ'য়ে বল্লে, আচ্ছা, দশ হাজার টাকাই না হয় দেওয়া গেল, কিন্তু কাকে, রমেশকে?

সুরমা মাথা নেড়ে বল্লে, না—ও কারুর দান নেবেনা। সে তুমি নেওয়াতে পারবেনা।

তবে চামেরিয়াকে?

সুরমা বল্লে, তাও হয়না। শুনলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

তবে?

তুমি তার দোকানে গিয়ে দশ হাজার টাকার জিনিষ কিনবে, ঠিক যা দাম তাই দিয়ে। তার পর অবিনাশের সঙ্গে গিয়ে সেই টাকাটা দিয়ে ডিক্রী পরিশোধ করবে। জিনিষগুলো দিন পনর পরে নিয়ে যাবে বলো। এতে যদি সে ক্ষমা করে। বুঝেছ, তোমাকে কালই চলে যেতে হয় দাদা।

ক্ষিতীশ বল্লে, তবে ওকে খবর দিইগে?

সুরমা ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে, না—না, এমন কাজও করনা দাদা। জাননা ওর কত বড় অভিমান আমার ওপর। জানলে সে ওই সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে। একটি কথাও সে যেন টের না পায়,—তুমি গিয়ে অবিনাশকে নিয়ে এই সব ক'রে এসো। তার পর আমি দেখবো।—

সুরমা চ'লে গেলে, ক্ষিতীশ স্ত্রী-চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য সম্বন্ধে সেই পুরাতন প্রবচনটা মনে মনে বারম্বার আওড়ে, মাথা নেড়ে নেড়ে নিঃশব্দে তার ভারি তারিফ্ করতে লাগলো।

৪

চার দিন পরে সকাল বেলা স্নান সেরে এসে তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে, সুরমা ডাকলে, কেষ্ট—ও কেষ্ট।

কেষ্ট এসে দাঁড়াতে সুরমা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, গিয়েছিলি,—

কেষ্ট বল্লে, গিয়েছিলাম মা।

গিয়েছিলি ত' খবর কি? বাবু আছেন?

আছেন, কিন্তু—

কিন্তু কি রে—?

বড় অসুখ বাবুর—

সুরমা সেখানে বসে পড়ল। এই দু' দিন সমুদ্র তীরে রমেশকে না দেখতে পেয়ে সে আজ সকালে সি-বীচ হোটেলে তার খবর নিতে পাঠিয়েছিল। এই খবর পেয়ে তার মাথার ভেতর ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো।

আজ ক্ষিতীশও নেই, সে একলা মেয়ে-মানুষ, এই বিপদে সে কি করে? ওই শীর্ণ শরীর-মন, তার ওপর যদি রোগ আশ্রয় ক'রে থাকে—ভাবতে ভাবতে সুরমার দুই চোখ জলে ভরে গেল; এত কাছাকাছি, চোখের ওপর, তবুও সে কিছুই করতে পারবেনা? তার এই পীড়ায় কে দেখবে তাকে? কে শুশ্রূষা করবে, সময়ে কে খাওয়াবে, কে ওষুধ দেবে? তার চোখের সামনে এমনি ক'রে আত্ম-হত্যা করবার জন্যেই কি পুরীতে এই ক্ষণিকের দেখা দেওয়া?

কেষ্টকে বল্লে, কেষ্ট, বাবুকে একটা গাড়ী করে এখানে আনতে পারবি রে?

কেষ্ট প্রমাদ গণলে, বল্লে, পারব ত', কিন্তু বাবু যদি না আসে ত' কি করব মা?

সুরমা ধমক দিয়ে উঠল, না আসে ত'—কেন আসবেনা, কেন তুই তাকে আনতে পারবিনে? জানিস্ নে তার রোগা শরীর—

কেষ্ট বিস্মিত হ'য়ে হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রৈল।

সুরমা বল্লে ড্রাইভারকে গাড়ী ঠিক করতে বল। হতভাগা যদি কোন কাজের হয়। আমিই যাব তাকে আনতে। তুই-ও যাবি সঙ্গে। যা—বল, এখনি গাড়ী ঠিক করে।

হোটেলের ম্যানেজার গিয়ে খবর দিতে রমেশ বল্লে সে কোথাও যাবেনা, সাত-জন্মে তার কোনও মেয়ে-মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই।

ম্যানেজার এসে বল্লে, মা, তিনি ত' আসতে চাননা।

সুরমা বল্লে, চলুন, আমিই যাচ্ছি, বলে তার সর্ব্বাঙ্গ আলোয়ানে আচ্ছাদিত ক'রে ম্যানেজারের অনুগমন করলে।

স্ত্রীলোক যখন সশরীরে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন তাকে দেখে জ্বর গায়েও রমেশ বিছানার ওপর খাড়া উঠে বসল।

একটি-মাত্র দুয়ারের অবকাশে যে-টুকু আলো আসছিল তাতে চিনতে দেরী হ'লো। বোধ করি চোখকেও বিশ্বাস হ'চ্ছিল না। খুব ঝুঁকে পড়ে, দু'বার চোখ রগড়ে রমেশ যেন কিছুতেই বুঝতে পারেনা। বল্লে—সুরমা?

সুরমা বল্লে, চলো—ওঠো; ঢের হয়েছে। তখন কেষ্ট তাকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে দিলে।

বিছানায় শুইয়ে একটা গরম কাপড় রমেশের দেহের ওপর টেনে দিয়ে সুরমা হাত দিয়ে তার কপালের তাপ অনুভব ক'রে বল্লে, এ কি কাণ্ড বল দেখি তোমার।

রমেশ উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়ে ছিল, বল্লে—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে সুরমা।

সুরমা বল্লে, ও তোমাদের জাতেরই দোষ,—বুঝতে পারবেনা। চুপ ক'রে শুয়ে থাক দিকিনি। এখন আমি যা বলি তাই করতে হবে তোমাকে।

করতে হবে?

সুরমা বল্লে, হাঁ—করতে হবে! এই আমার হুকুম!

বড় বড় দুই ফোঁটা জল রমেশের চোখ বেয়ে পড়ল। সুরমাও মুখ ফিরিয়ে তার অশ্রুরোধ করলে।

রমেশ বল্লে, কিন্তু সুরমা, তুমি জান না। আমি একেবারে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছি, পথে বসেছি।

সুরমা বল্লে, বেশ করেছো, তোমরা যেমন সহজে পথে বসতে পারো, তেমনি বসাতেও পার। কিন্তু ও কি করছ বলত, চুপ ক'রে একটু শুয়ে থাকতে পারোনা।

রমেশ বল্লে, কেমন করে চুপ করে থাকি সুরমা, কিছুই যে বুঝতে পারচিনা।

সুরমা তার কাছে বসে তার ডান হাতটা আপনার হাতের ভেতর নিয়ে, নিজের মুখটা রমেশের মুখের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লে, বুঝতে পারছোনা নিষ্ঠুর! কেমন ক'রে বুঝবে এই পাঁচ বছর কি ক'রে কেটেছে আমার? তোমরা আগুন লাগিয়ে দিয়ে অভিমান ক'রে চ'লে যাও,—কেমন করে বুঝবে সেই আগুনের দাহ, যা তিলে তিলে,—সে আর বলতে পারলেনা, বিছানায় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রমেশ সুরমার মাথার ওপর দুই হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চাপড়াতে লাগল,—বল্লে, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি, হাঁ সুরমা, বুঝেছি ত'!

সুরমা চোখ মুছে উঠে বসল, বল্লে—এবার চুপ ক'রে থাক তা হ'লে।

—চুপই ত করেছি—

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দে, সুরমা বিছানা ছেড়ে দাঁড়াতেই ক্ষিতীশের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল 'সুরমা,' আর তার পর মুহূর্ত্তেই সে ঘরে ঢুকে একেবারে অবাক হয়ে বলে উঠল, এ কি রমেশ বাবু যে—অসুখ না কি?

পরমুহূর্ত্তেই গলা বাড়িয়ে ডাকলে অবিনাশ—অবিনাশ, তোমার বাবু যে এখানে!

অবিনাশ ঘরে ঢুকে একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল,—এই বাবু দশহাজার টাকার মাল কিনে বাঁচিয়ে দিলে বাবু, বাঁচিয়ে দিলে!

ক্ষিতীশ বল্লে—আমি নয় হে আমি নয়, ওই মা-লক্ষ্মী।

অবিনাশ সুরমার দিকে ফিরে মাটিতে মাথা ঠুক্‌তে লাগল।

সুরমা অনুচ্চ কণ্ঠে ক্ষিতীশকে বল্লে—দাদা, ওঁর শরীর অসুখ, তোমরা এতখানি পথ এলে, এঁকে নিয়ে যাও, ঠাণ্ডা হবেন।

উভয়ে চলে গেলে, রমেশ বল্লে, এ আবার কি কাণ্ড, সুরমা?

সুরমা বল্লে, বুঝতে পারলেনা আবার? তোমার সরিকদার হোলাম গো, সরিকদার হোলাম আজ থেকে! কোন ব্যবসাই ত' একা চালাবার যুগ্যতা নেই তোমার, তাই দেখি আজ থেকে দু'জনে মিলে চালাতে পারি কি না!

রমেশ চোখের জল মুছতে মুছতে বল্লে,—চলবে সুরমা, এইবার চলবে।

আর্য্য-শাস্ত্র

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

বিধবা বিবাহ (ক)

বিধবা-বিবাহ লইয়া আজকাল আলোচনা আন্দোলন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রায়ই এখানে সেখানে উক্ত বিবাহের খবর পাওয়া যায়। যে দেশে সামান্য শিক্ষিত পরিবারের মধ্যেও কুমারী কন্যার বিবাহ অত্যধিক ব্যয়সাধ্য ও একপ্রকার ক্রমেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে, "দেশাত্মবোধ" "স্বরাজ" "স্বাধীনতা" "আত্মনির্ভর" প্রভৃতি শব্দের প্রচলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের বাজারে বরের মূল্যও ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে, কচিত্ দু'একটি বিশিষ্ট ভদ্র-পরিবার বাদে, প্রায় সর্ব্বত্রই পুত্র বিক্রয়ের কুপ্রথা দাবানলের ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, সেই দেশে বিধবার বিবাহ চলা উচিত কি না, তাহা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হইলেও কিন্তু—অপরাজেয় ও অসীম-শক্তি কাল ধীরে ধীরে তাহার পথ আপনিই করিয়া লইতেছে, ও ক্রমে লইবেও। কালের সমক্ষে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতিতা ও বিরোধিতা—উভয়েরই মূল্য তুল্য। যাহা করিবার, কাল তাহা করিবেই।

কিন্তু তাই বলিয়া,—শাস্ত্রের দোহাই দিয়া উক্ত বিবাহের প্রতিকূলতা করিতে যাওয়া ঠিক নহে। কিছুদিন যাবত্ দু'একখানা বাংলা দৈনিক ও মাসিক পত্রে দেখিতেছি, দু'একটি সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিত, "বিধবা-বিবাহ বেদবিরুদ্ধ" "উহা বেদে নাই"—ইত্যাকার উক্তি করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসু-ভাবে আমি নিম্নলিখিত বৈদিক মন্ত্রগুলি উপস্থাপিত করি-তেছি। ইহাদের সমাধানের উপায়, তাঁদের মতে, কি প্রকার?

(১)

"যা পূর্ব্বং পতিং বিত্ত্বাথান্যং বিন্দতে পরম্।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বিযোষতঃ॥"

অথর্ব্ববেদ, ৯ম কাণ্ড, ৩অ, ৫সূ, ২৭ মন্ত্র।

(অজমীঢ়)

সায়ণ কৃত পদচ্ছেদ—যা পূর্ব্বং পতিং বিত্ত্বা অথ অন্যং বিন্দতে পরম্। পঞ্চৌদনং চ তৌ অজং দদাতঃ ন বিযোষতঃ॥

বঙ্গার্থ—যে নারী প্রথমতঃ এক পতি প্রাপ্ত হইয়া পরে অন্য পতি প্রাপ্ত হয়, তাহারা উভয়ে, অর্থাৎ ঐ নারী ও তাহার দ্বিতীয় পতি অজপঞ্চৌদন দান করিলে কোনো দিন আর বিযুক্ত হয় না।

এই স্থলে ত স্পষ্টতঃ দেখিতেছি—বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণরূপে বেদানুমত, "বেদ বিরুদ্ধ" নহে। "পূর্ব্বং পতিং"—প্রথম পতি এবং "অথ অন্যং পরং বিন্দতে—" পরে অন্য যে পতিকে প্রাপ্ত হয়,—এইরূপ অর্থ ছাড়া ঐ স্থলের অন্য কোন অর্থ ত পাওয়া যায় না। তার পর আর একটি মন্ত্র এই—

(২)

"কুহস্বিত্ দোষা কুহ বস্তোঃ অশ্বিনা
কুহঅভিপিত্বং করতঃ কুহ উষতুঃ।
কঃ বা শযুত্রা বিধবা ইব দেবরং
মর্য্যংন যোষাকৃণুতে সধস্থআ॥

ঋগ্বেদ, ১০ম, ৩ অ, সূ৪০, মন্ত্র ২। (মোক্ষমূলর)

সায়ণ কৃত ভাষ্য—"হে অশ্বিনৌ! 'কুহস্বিত্'—কস্বিত্ 'দোষা'—রাত্রৌ 'কুহ'—ক্বা 'বস্তোঃ'—দিবা ভবথঃ, 'কুহ'—ক্বা 'অভিপিত্বং'—প্রাপ্তিং 'করতঃ'—কুরুথঃ, 'কুহ'—ক্বা 'উষতুঃ'—বসথঃ। কিঞ্চ 'বাম্'—যুবাম্ 'কঃ'—যজমানঃ 'সধস্থে'—সহস্থানে বেদ্যাস্থে 'আকৃণুতে'—আকুরুতে, পরিচরণার্থম্ আত্মাভিমুখী করোতীত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তৌ দর্শয়তি—'শযুত্রা'—শয়নে 'বিধবা ইব'—যথা মৃতভর্তৃকা নারী 'দেবরং' অভিমুখীকরোতি। 'মর্য্যংন'—যথা চ সর্ব্বং মনুষ্যং যোষা'—সর্ব্বা নারী সম্ভোগকালে অভিমুখীকরোতি, তদ্বত্—ইত্যর্থঃ॥"

বঙ্গার্থ—হে অশ্বিন দেবতাদ্বয়! তোমরা রাত্রিতে

কোথায় থাকো, দিনেই বা কোথায় থাকো? তোমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই বা কোথায় প্রাপ্ত হও? কোথায় তোমরা বাস কর? কোন্ যজমান বেদি নামক সহস্থানে তোমাদের উভয়কে পরিচর্য্যার জন্য, অর্থাত্ সেবার জন্য নিজের দিকে আকৃষ্ট করে? এই স্থলে দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন,—বিধবা অর্থাৎ মৃতভর্ত্তৃকা নারী যেমন শয্যায় স্বীয় দেবরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং সমস্ত নারীরাই যেমন শয্যায় সম্ভোগ-সময়ে পুরুষদিগকে নিজের নিজের দিকে ফিরাইয়া লইয়া থাকে।

এই মন্ত্রেরই ব্যাখ্যাবসরে যাস্কাচার্য্য নিরুক্তগ্রন্থে 'দেবর' শব্দের—ব্যুত্পত্তি করিয়াছেন—"দেবরঃ কস্মাত্ দ্বিতীয়ঃ বরঃ উচ্যতে" অর্থাত্ 'দেবর'—এই নামের কারণ কি? যেহেতু—ইহাকে দ্বিতীয় বর বলা হয়, সেই জন্যই ইহার নাম দেবর। বিধবা—অর্থাত্ মৃতভর্ত্তৃকা নারীর যে দেবরের সহিত পুনরায় বিবাহ হইত, এই কথা উক্ত ঋগ্মন্ত্রে অতি স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে। তার পর আর একটি মন্ত্রে আরও স্পষ্টতররূপে বিধবা-বিবাহের কথা দেখিতেছি—

(৩)

"তস্মাত্ একস্য বহ্বো জায়াভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ-পতয়ঃ"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩।৭, খণ্ড ১২

বঙ্গার্থ—এই কারণে একজন পুরুষের বহু জায়া হয় (হইতে পারে, কিন্তু) একটি স্ত্রীর একই সময়ে বহু পতি হয় না (হইতে পারে না)।

এই শ্রৌতমন্ত্রে,—একই সময়ে বহু পতি হয় না—এই কথায় সময়ান্তরে পত্যন্তর হইতে পারে—এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে।

অনেকে কিন্তু এই শ্রুতিটিকে বিধবা-বিবাহের প্রতিকূল প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে না বুঝিয়া ঐ প্রকার বলেন,—ইহা বলিলে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের অমর্য্যাদা করা হয়। আমার মনে হয়—তাঁহারা বুঝিয়াও—এই শ্রুতির প্রকৃত তাত্পর্য্য সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও, নানাকারণে হয় ত, ঐরূপ প্রতিকূল অর্থ করিতে বাধ্য হন্। প্রকৃত ব্যাপারটা কি, দেখা যাউক। ঐ শ্রুতিটিকে দুইজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, বহু শত বত্সর পূর্ব্বে কি চক্ষে দেখিয়াছেন এবং উহার কি অর্থ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, ক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

(ক) সুপ্রসিদ্ধ মিত্রমিশ্র স্বীয় বীরমিত্রোদয়-নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন,—

"অথাধিবেদনম্। তদুক্তম্ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—'একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি, নৈকস্যৈ বহবঃ সহ-পতয়ঃ' ইতি—সহ-শব্দ সামর্থ্যাত্ ক্রমেণ পত্যন্তরং ভবতি ইতি গম্যতে। অতএব 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপত্সু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে'—ইতি মনুনা স্ত্রীণামপি পত্যন্তরং স্মর্য্যতে।"

(অধিবেদন প্রকরণ, বীরমিত্রোদয়)।

বঙ্গার্থ—অধিবেদন কথিত হইতেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—একজন পুরুষের বহু জায়া হইতে পারে; কিন্তু একটি স্ত্রীর বহু সহপতি (এক সময়ে বহু স্বামী) হইতে পারে না,—এই শ্রুতিতে সহশব্দের বলে ক্রমে (অর্থাত্ পতির অভাব হইলে) পত্যন্তর (অন্যপতি) হইতে পারে, এ কথা বুঝা যাইতেছে। এই জন্যই 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি বচনের দ্বারা মনুই স্ত্রীলোকের পত্যন্তরের বিধান করিয়া গিয়াছেন॥"

তাহা হইলে দেখিতেছি,—শুধু মিত্রমিশ্র নহেন, মনুও ঐ পত্যন্তরের বিধানকর্ত্তা ছিলেন এবং ঐ প্রসিদ্ধ 'নষ্টে মৃতে' বচন যাহা পরাশরের বলিয়াই বিদিত, মনুও স্বীয় সংহিতায় উহা স্মরণ করিয়া গিয়াছেন। অথচ বর্ত্তমান মনুসংহিতায় ঐ বচনটি নাই! পরাশর-সংহিতার টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্যও ঐ 'নষ্টে মৃতে'—বচনটি মনুর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অথচ পরবর্ত্তী কালে, কোন্ সময়ে যেন উহা মনুর সংহিতা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য ব্যাপার! তবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। পরে দেখাইব যে, কেবল সংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নহে, স্বমত স্থাপনের জন্য, বেদাদির মন্ত্র পর্য্যন্ত অবাধে অন্যথাকৃত হইয়াছে। যাহা হউক উদ্ধৃত (৩) চিহ্নিত শ্রুতিটি যে, বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের প্রতিপাদিকা, তাহা মিত্রমিশ্র যেমন স্বীকার করিয়াছেন, তেমনই প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠও তদীয় মহাভারত-টীকায় অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন।

দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণের সময়ে যুধিষ্ঠির যখন রাজা দ্রুপদকে কহিলেন—

"সর্ব্বেষাং ধর্ম্মতঃ কৃষ্ণা মহিষী নো ভবিষ্যতি।
আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বেষাং গৃহ্ণাতু জ্বলনে করান্॥
(মহা, আদি ১৯৫ অ ২৬) বঙ্গবাসী।

(কৃষ্ণা ধর্ম্মানুসারে আমাদের পঞ্চভ্রাতারই মহিষী হইবেন। সুতরাং তিনি জ্যেষ্ঠানুক্রমে অগ্নি-সমীপে আমাদের করগ্রহণ করুন।)—

তখন দ্রুপদ বলিলেন—

"একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন!
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ॥
লোক বেদ-বিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ।
কর্ত্তু,মর্হসি কৌন্তেয়! কস্মাৎ তে বুদ্ধিরীদৃশী॥
(ঐ, ঐ, ২৭, ২৮) বঙ্গবাসী।

(হে কুরুনন্দন! একজন পুরুষের বহু পত্নী হইতে পারে, কিন্তু একটি নারীর বহু পুরুষ পতি হয়,—ইহা ত কথনো শুনি নাই।

কুন্তীনন্দন! তুমি স্বয়ং একজন ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ও পবিত্রাচার-সম্পন্ন হইয়া লোকবিরুদ্ধ এবং বেদ-বিরুদ্ধ কর্ম্ম কদাচ করিতে পারো না। তোমার এমন কুবুদ্ধি হইল কেন?)

যুধিষ্ঠিরও তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে দ্রুপদকে কহিলেন,—

"সূক্ষ্মো ধর্ম্মো মহারাজ! নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্।
পূর্ব্বেষামানুপূর্ব্ব্যেণ যাতং বর্ত্মানুযামহে॥
(ঐ, ঐ, ২৯) বঙ্গবাসী

(মহারাজ! ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম আমরা জানি না। পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে পথে গিয়াছেন, যথাযথভাবে, আমরা সেই পথের অনুসরণ করিতেছি মাত্র।)

এই উনত্রিশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ কহিতেছেন—"সূক্ষ্মঃ—'নৈকস্যা বহবঃ সহ-পতয়ঃ'—ইতিশ্রুত্যা 'সহ'—ইতি যুগপত্ বহুপতিত্ব নিষেধো বিহিতঃ, নতু সময় ভেদেন—" অর্থাত্—"সূক্ষ্ম"—ইহার তাত্পর্য্য এই যে একটি নারীর পক্ষে একই সময়ে বহু পতির নিষেধ বিহিত হইয়াছে, নতুবা, সময় ভেদে—অর্থাত্ বিভিন্ন সময়ে একই নারীর বহু পতি নিষিদ্ধ হয় নাই। ইহার দ্বারা, নীলকণ্ঠও যে, পূর্ব্বধৃত (৩) চিহ্নিত শ্রুতির বিধবা বিবাহ বিধানার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং যাঁহারা, ঐ শ্রুতির দোহাই দিয়া, এক নারীর বহু পতি হইতে পারে না, উহা বেদবিরুদ্ধ—ইত্যাদি সিদ্ধান্ত করিতে যান, তাঁহারা যে কতটা ভুল করেন, একবার নিজেরাই ভাবিয়া দেখুন।

তার পর, আর একটি বৈদিক মন্ত্রে দেখিতেছি—বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের কথা প্রাঞ্জলভাবে উক্ত হইয়াছে। মন্ত্রটি এই—

(৪)

"সমান-লোকো ভবতি পুনর্ভুবাংপরঃ পতিঃ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি॥
(অথর্ব্ব, ৯ম, ৩ অ, ৫ সূ, ২৮) অজমীঢ়।

বঙ্গার্থ—বিধবার সহিত তাহার দ্বিতীয় পতি একই লোকে (পরলোকে) বাস করে, যে দ্বিতীয় পতি দক্ষিণা দ্বারা সমুজ্জ্বল অজপঞ্চৌদন দান করে।—

এই মন্ত্রে "পুনর্ভুবা" এবং "অপরঃ পতিঃ" এই শব্দ ক'টির দ্বারা "বেদবিরুদ্ধ"-বাদি-গণের মুখ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর একটি শ্রৌতমন্ত্রে অধিকতর স্পষ্টভাবে বিধবা বিবাহের সমর্থন ও সায়ণাচার্য্যেরও সম্পূর্ণ অনুমোদন দেখিতেছি যথা—

(৫)

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীব-লোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্ত-গ্রাভস্য দিধিষোস্তমেতং পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব॥
(কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬, ১, ৪)

সায়ণ কৃত ভাষ্য॥—"তাং প্রতিগতঃ সব্যে পাণৌ অভিপাদ্য উত্থাপয়তি দেবরঃ জরদ্দাসো বা। হে 'নারী!' ত্বম্ 'ইতাহং'—গত-প্রাণম্ 'এতং'—পতিম্ 'উপশেষে'—উপেত্য শয়নং করোষি। 'উদীর্ষ্ব'—অস্মাত্পতি-সমীপাত্ উত্তিষ্ঠ। 'জীব-লোকম্ অভি'—জীবন্তং প্রাণি সমূহম্ অভিলক্ষ্য 'এহি' —আগচ্ছ। 'ত্বং হস্ত-গ্রাভস্য'—পাণিগ্রাহকঃ 'দিধিষোঃ' —পুনর্বিবাহেচ্ছোঃ 'পত্যুঃ এতজ্জনিত্বং'—জায়াত্বম্ 'অভি-সম্বভূব'—আভিমুখ্যেন সম্যক্ প্রাপ্নুহি—ইত্যর্থঃ॥"

বঙ্গার্থ॥—দেবর অথবা কোন বৃদ্ধ দাস (সেবক) মৃতপতির পার্শ্বে শয়ানা বিধবা স্ত্রীর হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইতেছে ও কহিতেছে,—হে নারি! তুমি গত-প্রাণ (মৃত) পতির নিকটে আসিয়া শয়ন করিয়া আছ! ওঠ, এই মৃত পতির সমীপ হইতে উঠিয়া জীবিত প্রাণি-সমূহের দিকে

ফিরিয়া এস। যে তোমার পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক তোমাকে পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, সেই পতির সম্মুখে আসিয়া তাহার সম্পূর্ণরূপে পত্নীত্ব প্রাপ্ত হও।

এই স্থলে সর্ব্ববেদ-ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য অতি স্পষ্টভাবে, বিধবাবিবাহের কথা, উক্ত মন্ত্রের ভাষ্য প্রসঙ্গে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জানিনা, এই সায়ণাচার্য্যই, কেন আবার ঋগ্বেদ-ভাষ্যে, ঈষত্-পরিবর্ত্তিত এই মন্ত্রেরই অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা হউক, এই উদ্ধৃত মন্ত্রভাষ্যে সায়ণকৃত ব্যাখ্যা দেখিয়াও "বিধবা-বিবাহ বেদবিরুদ্ধ" "উহা বেদে নাই"—এই কথা যাঁহারা বলিতে চান,—তাঁহাদের উক্তির সমীচীনতা পাঠিকগণই বিচার করিবেন।

আর একটি বৈদিক মন্ত্রেও বিধবাবিবাহের কথা দেখিতেছি,—

(৬)

"ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপত্বা মর্ত্ত্য প্রেতম্।
ধর্ম্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি॥"

(অথর্ব্ব, ১৮শ কাণ্ড, ৩ অ, ১, ১,) অজমীঢ়।

বঙ্গার্থ॥—হে মর্ত্ত্য! (মানব!) এই নারী পতিলোক কামনা করিতেছে এবং পুরাণধর্ম্ম পালন করিতে চাহিতেছে। তুমি প্রেতের (মৃত ব্যক্তির) পাশে এস, এবং ইহলোকে ঐ নারীকে সন্তান ও ধনরত্নাদি দান কর। এই মন্ত্রে পাইতেছি,—বিধবা মৃত পতির সমীপে থাকিয়া পুনরায় পুরাতন ধর্ম্মানুসারে পতিলোক চাহিতেছেন, তাই মর্ত্ত্য পুরুষ অর্থাত্ জীবিত পুরুষকে বলা হইতেছে যে, হে পুরুষ, তুমি এই মৃত পতির পাশে আসিয়া ঐ নারীকে ইহলোকে সন্তানবতী কর ও ধনরত্নাদি দাও। অনেকে এই মন্ত্রটিকেও সহমরণের সমর্থকরূপে উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য,—যে নারী সহমৃতা হইতেছে, তাহাকে ইহলোকে কি করিয়া সন্তানদান ও ধনরত্নাদি দান সম্ভবপর? এই মন্ত্রদর্শনের অনেক পূর্ব্বেও যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ এই মন্ত্রেই পুরাণ ধর্ম্ম পালন করিতেছে বা পালনের জন্য এতদর্থক 'অনুপালয়ন্তী'—এই শতৃ-প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে। বহু পূর্ব্বেও যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এই নারী সেই পুরাতনী প্রথাই অনুসরণ করিতেছেন মাত্র—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে যাঁহারা সহমরণ অর্থ টানিয়া আনিতে চান, তাঁহারা মন্ত্রের চতুর্থ পাদস্থিত 'সন্তান দান ও ধনরত্নাদি দানের' কি ব্যবস্থা করিবেন?

শ্রৌত-সাহিত্যে বিধবা বিবাহের প্রতিপাদক আরও বহু স্থল পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে হঠাত্, "বেদবিরুদ্ধ" "উহা বেদে নাই"—এরূপ কথা বলা শোভা পায় না। নিম্ন-লিখিত শ্রুতিটি বিধবা বিবাহের পূর্ণ সমর্থিকা হইলেও, বিরুদ্ধবাদিগণ, ইহা তাঁহাদের অনুকূলে ব্যবহার করিতে চান;—

(৭)

"যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকোদ্বে
জায়ে বিন্দেত।
যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্ যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা
দ্বৌ পতী বিন্দেত॥

(তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬, ৬ ৪)

বঙ্গার্থ—একটি যূপকাষ্ঠে যেমন দুই গাছা রশি বাঁধা যায়, তদ্রূপ একজন পুরুষ দুইটি জায়া লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যেমন একগাছা রশি দুইটি যূপকাষ্ঠে বাঁধা যায় না, তদ্রূপ, একটি নারী দুইটি পতি লাভ করিতে পারেন না।

এই মন্ত্রের "নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত"—একটি নারী দুইটি পতিলাভ করিতে পারেন না,—এই অর্থ করিয়া, বিরুদ্ধ-বাদিগণ এই মন্ত্রটিকে বিধবা বিবাহের প্রতিষেধকরূপে ব্যাখ্যা করেন। বাস্তবিক কিন্তু, মন্ত্রার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা মনে হয় না। কথাটা এই,—একদা একগাছি রশি দিয়া দুইটি দারু (খুঁটি) যেমন বাঁধা হয় না, তেমনই একদা একটি রমণী দুইটি পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে পারেন না। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ সময়ে একই রশি পৃথক্ পৃথক্ কাষ্ঠস্তম্ভে যেমন বাঁধা যায়, তদ্রূপ পৃথক্ সময়ে অর্থাত্ পতির অবিদ্য-মানতায় একই নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন। কোন কারণে একটা খুঁটিতে যখন কোনো রশি বাঁধা যায়, তখন সেই রশিই অন্য খুঁটিতে বাঁধিবার হেতুই থাকে না। তবে ঐ খুঁটিটি ভাঙ্গিয়া গেলে বা বন্ধনের অযোগ্য হইলে, ঐ রশিই তখন অন্য খুঁটিতে বাঁধিতে হয়। এক পতি বিদ্যমান থাকিতে পত্যন্তর গ্রহণের প্রসক্তিই যে নাই, তাহাই এই মন্ত্রের দ্বারা সূচিত হইতেছে। এক খুঁটি ঠিক থাকিলে

কেহ যেমন তাহা হইতে রশি খুলিয়া লইয়া অন্য খুঁটিতে বাঁধিতে যায় না, তদ্রূপ পতি থাকিতে পত্যন্তরের সংগ্রহেই বা নারীর বৈধ কামনা হইবে কেন? এই সাত চিহ্নিত মন্ত্রটি পূর্ব্বোক্ত (৩) চিহ্নিত মন্ত্রস্থিত "সহ পতয়ঃ" শব্দেরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

শুধু ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে। বেদে এমন মন্ত্রও দেখা যায়, যাহাতে একাধিক পতি বিদ্যমান থাকিতেও নারীর পত্যন্তর গ্রহণের কথা আছে। যথা—

উত যৎ পতয়ো দশ স্ত্রিয়াঃ পূর্ব্বে অব্রাহ্মণাঃ।
ব্রহ্মা চেদ্ধস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা॥

অথর্ব্ব, ৫ম, ৪অ, মন্ত্র ৮। (অজমীঢ়)

বঙ্গার্থ—যদি কোন স্ত্রীর প্রথমতঃ দশটি অব্রাহ্মণ পতিও থাকে, এবং পরে কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া উহার পাণিগ্রহণ করেন, তবে, ঐ ব্রাহ্মণই সেই স্ত্রীর একমাত্র পতি হইবেন।

এই শ্রুতি অনুসারে, পূর্ব্বকালে; পতিসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নারীর পুনঃ পত্যন্তর গ্রহণের কথা, অর্থাৎ সধবার পুনর্ধবা হইবার কথা পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং "বিধবা-বিবাহ বেদ-বিরুদ্ধ" "উহা বেদে নাই"—ইত্যাকার উক্তির দ্বারা বক্তা লোক-নয়নে কতটা মর্য্যাদার সহিত পরিদৃষ্ট হন, তাহা তিনিই একবার ভাবিয়া দেখুন। এবং জনসাধারণ, উক্ত শ্রৌত-স্থলগুলির সমাধানে কি প্রকার সন্দিহান্ হইয়া পড়েন, তাহাও একবার চিন্তা করুন। এই সমস্ত শ্রৌতমন্ত্র ছাড়া ঋগ্বেদের "ইমা নারীরবিধবা"—এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রের পরিবর্ত্তনের ইতিহাস এবং তৎ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা ক্রমে পরে আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

অবসর

কুমারী মমতা মিত্র

দারুণ চিন্তায় যদি কাটে কাল নিরবধি,
শ্রান্তকায় বিরাম না পায়।
নির্নিমেষ চেয়ে রই এমন সময় কই?
কী ফল বাঁচিয়া তবে হায়!
বসিয়া বিটপী-ছায় গাভী সে যেমন চায়,
চোখে তা'র পলক না রয়,
তেমনি চাহিতে হায় পরাণ সদাই চায়,
নাই যে গো নাই সে সময়।
যাই যবে অতিক্রমি সুনিবিড় বনভূমি,
অবসর নাই দেখিবার
কোথায় তরুর তলে শশক লুকায় ছলে
সযতনে শাবকে তাহার।
যামিনীতে নভ-তলে মৌন তারারাজি জ্বলে,
হাসি দিয়ে ছায় চরাচর;
দিবসে নদীর নীরে বুদ্‌বুদ ভাসিয়া ফিরে,
হেরিবার নাই অবসর।
প্রকৃতি-কটাক্ষ-পাতে চঞ্চল চরণাঘাতে
জেগে ওঠে দ্বন্দ্ব সে মোহন।
নয়ন ভরিয়া হায় হৃদয় হেরিতে চায়—
সে সময় পাই নে কখন।
আঁখিকোণে ফোটা হাসি অধরেতে পরকাশি
মূর্ত্ত হয় রূপের ভিয়ানে,
মুগ্ধ চোখে চেয়ে রই হেন অবকাশ কই?
নাই তৃপ্তি হতাশ জীবনে!
ব্যর্থতায় পূর্ণ ধরা চূর্ণ সাধ দিশাহারা,
ক্লান্ত কায় বিরাম না পায়,
নির্নিমেষ চেয়ে রই, এমন সময় কই?
কী ফল জীবনে তবে হায়!

বিবিধ-প্রসঙ্গ

নৃত্য

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

নৃত্যের ইতিহাস খুঁজতে হলে আমাদের প্রথমেই প্রকৃতির কাছে যেতে হবে ; কারণ, মানুষ যা কিছু পেয়েচে, তা তাঁরি কাছ থেকে ; তাঁরি রহস্য-কক্ষ ভেঙ্গে-চুরে লুটে নিয়ে। কোথায়ও তিনি মানুষের কাছে নিজেকে অবারিতভাবে মুক্ত করে দিয়েচেন, কোথায়ও বা মানুষ তার বুভুক্ষা নিয়ে তাঁকে জোর করে কেড়ে নিজের পিপাসা মিটিয়েচে। মানব সভ্যতার ইতিহাস সেইদিনই সার্থক হবে যেদিন সে নিজের অনুশীলনে প্রকৃতির সমস্ত অণুপরমাণুর সঙ্গে তার অখণ্ড সম্বন্ধ সত্যসত্যই টের পাবে।

যখন মানুষ সৃষ্ট হয়নি, প্রকৃতির ভ্রূণ মধ্যেও যখন সে রক্তমাংসের অবয়ব পায়নি, তখনও কিন্তু নৃত্যের সৃষ্টি হয়েচে। ময়ূর তখনও ময়ূরীর সামনে নাচে—তাকে মুগ্ধ করবার জন্যে, তাকে সহচরীরূপে পাবার জন্যে। বহু যুগ পরে—প্রাগৈতিহাসিক কালে মানুষের দাম্পত্য জীবনে নৃত্যকে যেরূপে আমরা দেখতে পাই তা তখন ছিল এই পক্ষী-নৃত্যের মধ্যে—তাদের পতিপত্নী নির্ব্বাচনে।

তার পর ধীরে ধীরে মানুষের সৃষ্টি। ধীরে ধীরে তার সভ্যতার বিকাশ। আরো ধীরে ধীরে তার সভ্যতার পরিণতি। মানুষ যখন অতি অসভ্য, ভূতপ্রেতের উপাসনাও যখন তারা জানে না, তখনও কিন্তু নৃত্য তাদের মধ্যে দেখা দিয়েচে—সে ঐ পতিপত্নী নির্ব্বাচনে। আর্ট বলতে এখন আমরা যা বুঝি তা তাদের ভেতর তখন দুটি রূপে দেখা দিয়েছিল—একটি বাহিরের, আর একটি অন্তরের রূপে। কুটীর-নির্ম্মাণ সে আর্টের বহিঃরূপ, আর নৃত্য—অন্তরের রূপ। তখন তাদের জাতি ছিল না, ধর্ম্মও ছিল না ; কিন্তু দল (clan) ছিল—আর ছিল নৃত্য। অপরিচিত অপরিচিতায় দেখা হলে তারা জিজ্ঞেসা করতো "কি নাচ তুমি নাচ ?" সেই নাচ দিয়ে পরস্পরকে তারা চিনতো—কে কোন্ দলের (clan) ; কোন্ পাহাড় বা কোন্ দ্বীপে তারা থাকে। পশুপক্ষীদের মতই নেচে, যে যাকে মুগ্ধ করতে পারতো অসভ্যদের ভেতর সেই তাকে বে করতো—এই ছিল অতি আদিম বিবাহ রীতি। তারপর তাদের ভেতর যখন ধীরে ধীরে সভ্যতার উন্মেষ হোল, অঙ্কুররূপে ধর্ম্মভাব দেখা দিল, তখন নাচের সঙ্গে তারা ধর্ম্মকেও জড়িয়ে ফেললে। আজিকার দিনে সভ্য মানুষের প্রয়োজন অনেক জিনিষের, সেই প্রয়োজন সমূহের উপর তার মন কমবেশী ছড়িয়ে পড়েচে। তাই মনের গভীরতা, প্রয়োজনের মূল্য, আর পরস্পরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কমে গিয়েচে, কিন্তু তখন প্রয়োজন ছিল কম, তাই প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশী, আর পরস্পরের যোগাযোগও ছিল খুব নিবিড় ; সেই জন্যে দেখা যায়, মানব-সভ্যতার গোড়ার দিকে নৃত্য ও ধর্ম্ম মানুষের সর্ব্বময় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পূর্ব্বে জাতি ছিল না, কিন্তু আমরা যে যুগের কথা এখন বলচি তখন মানুষের ভেতর জাতির সৃষ্টি হয়েচে, প্রত্যেক জাতির ভেতর বিভিন্ন ধর্ম্মেরও সৃষ্টি হয়েচে, ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নৃত্যেরও অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন হয়েচে ; তাই প্রাগৈতিহাসিক একজন অপরিচিত আর একজনকে জানবার জন্যে যেমন জিজ্ঞেসা করতো, "কি নাচ তুমি নাচ ?" তেমনি এখন তার ধর্ম্ম জানবার জন্যে একজন অন্যকে ঠিক ঐ প্রশ্নই করতো। উপাসনাই তখন ছিল নৃত্য,—ধর্ম্মের সঙ্গে নৃত্য তখন এত জড়িয়ে পড়েচে। শুধু ধর্ম্মে নয়, জীবনের অন্য নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে—যথা—জন্মলগ্নে, বিবাহবাসরে বীজরোপণ ও শস্যকর্ত্তনের সময়ও নৃত্য ছিল তাদের অপরিহার্য্য অনুষ্ঠান।

এই গেল প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। তার পর যখন আমরা ঐতিহাসিক যুগে এসে দাঁড়ালুম, তখনও ধর্ম্মের সঙ্গে নৃত্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। তখনকার দিনে মানুষের বিশ্বাস ছিল স্বর্গের দেবতারাও নাচেন, আর নাচ তাঁরা বড় ভালবাসেন। এরই পরিকল্পনা থেকে নটরাজ মহাদেবের উদ্ভব, দেবসভায় নৃত্যপরা অপ্সরাদের সৃষ্টি, আর পরবর্ত্তীকালে দেবমন্দিরে দেবদাসীদের প্রবর্ত্তন। ধর্ম্মের সঙ্গে নৃত্যের যোগাযোগ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সমান ভাবে ছিল, এখনও কিছু কিছু রয়েচে। খৃষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ইউরোপীয় ইতিহাসে দেখা যায়, খৃষ্টের জীবন-বেদ পুরুতরা নৃত্য করে দেখাতেন। তখন 'চার্চ্চ' ছিল না, ছিল নৃত্য-রঙ্গমঞ্চ। তাই থেকে ধীরে ধীরে চার্চ্চের পরিণতি। খৃষ্টান পুরুতরা নৃত্য করে খৃষ্টের যে জীবন-বেদ দেখাতেন, তা কথা বা সংগীতের সমবায়ে নয়—সে ছিল মূক নৃত্য। তাই থেকে শেষে নাট্য বা ড্রামার উৎপত্তি। খৃষ্ট-ধর্ম্মে তখন নানারূপ নৃত্য ছিল। এক এক নৃত্য এক এক বিশেষ সময়ে অভিনীত হোত। এই বিভিন্ন নৃত্য থেকে খৃষ্টীয় বিভিন্ন রীচুয়েলস্-এর (Rituals) সৃষ্টি হয়েচে। ইংলণ্ডের চার্চ্চ সমূহে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রকম নৃত্য চলেছিল, ফ্রান্সে চলেছিল সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, আবার স্পেনে চলেছিল আরো বেশী—অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নৃত্যের চরম বিকাশ স্পেন দেশেই হয়েছিল।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইউরোপ তার নৃত্য প্রাচীন মিশরের কাছ থেকে পেয়েছিল। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে নৃত্য সেখানে খুবই উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। মিশরীয় সভ্যতার ঢেউ ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র ভূমধ্যসাগরের তটভূমে যখন প্রথম এসে আঘাত করলে, তখন ইউরোপ তার সভ্যতার সহচরীরূপে তার নৃত্যকলাকেও বরণ করে নিলে। ভূমধ্য-সাগর পার হয়ে সেই নৃত্যকলা 'সার্ডীজ়ে' এসে পূর্ণরূপে বিকসিত হোল। পরে সার্ডীজ থেকে গেল রোমে।

পূর্ব্বেই বলেছি, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ইউরোপের ধর্ম্মসক্রান্ত ব্যাপারে

নৃত্য প্রচলিত ছিল। ঐ শতাব্দীতে প্রণয় ব্যাপারেও নৃত্য, সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ, তাও আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই। ধর্ম্ম-নৃত্যের মত, এই প্রণয়-নৃত্যও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পেনে খুব উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। এখনও কোন কোন অসভ্য দেশে বিবাহযোগ্যা কুমারীরা মাথার নৃত্য করে, অর্থাৎ গানের তালে তালে মাথার দীর্ঘকেশ ও শিথিল কবরীকে তারা নাচায়। সে-কালে আফ্রিকা, পলিনেসিয়া এবং প্রাচীন রোমে প্রণয়-নৃত্যের খুবই প্রচলন ছিল। মেয়ে পুরুষ একই সঙ্গে নাচতো। সে নৃত্যের ভঙ্গীতে ছিল দোলন। উত্তর ইউরোপ খুব ঠাণ্ডা জায়গা—তাই সেখানকার প্রণয়-নৃত্য পায়ের কম্পনে দেখান হোত। জাপান, যাভা ও মাডাগাস্কারের নৃত্য ছিল বাহুর সঞ্চালন, দক্ষিণ সমুদ্রের কোন কোন দ্বীপের নৃত্য শুধু আঙুলের হেলন ও কম্পন।

কালক্রমে নৃত্যকলায় একটা যুগান্তর উপস্থিত হোল। যে নৃত্য শুধু ধর্ম্ম ও প্রণয়ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল, তা শেষে ব্যবসায়ে দাঁড়াল, নৃত্য-বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যার সামিল হয়ে গেল। এই পরিবর্ত্তন ইউরোপে খুব বেশী দিনের নয়; বোধ হয় তিনশ বছরের বেশী হবে না। কিন্তু ভারতবর্ষে, তার ঢের পূর্ব্বে নৃত্য-বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যায় দাঁড়িয়েছে। আমাদের নৃত্য-বিদ্যার বিশেষ কোন ধারাবাহিক প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না, সুতরাং কোন্ সময় হতে নৃত্যবিদ্যা এখানে অর্থকরী বিদ্যা হয়েছে তা বলা শক্ত; তবে এইটুকু নিশ্চয় করে বলা যায় যে, দুহাজার বছরের কম ত নয়ই বরং বেশী। কেন?—তার প্রমাণও পরে দিয়েছি।

নৃত্য অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত হওয়ায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নৃত্য-কৌশলের খুব উন্নতি হয়েছে। নৃত্যের এই বিবর্ত্তনের মূলে আছে খুব সম্ভবতঃ অর্থ-সমস্যা। যে জিনিষ মানুষ প্রথমে ধর্ম্ম ও প্রেমের জন্য করতো, অভাবের তাড়নায় তারি সাহায্যে শেষে তাকে খেতে-পরতে হোল। উপাসনার অঙ্গরূপে তখন যে নৃত্য ব্যবহৃত হোত, তাই এখন আমাদের দেশে 'দেবদাসীর' নৃত্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

কালক্রমে ইউরোপীয় নৃত্য 'ক্লাসিক' ও 'ব্যালেট্' এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। যদিও ক্লাসিক নৃত্যের বিকাশ গ্রীসে, তথাপি মূল অনুসন্ধান করলে জানা যায় তার প্রথম উদ্ভব মিশরে। ব্যালেট নৃত্য ইটালীতে খুবই উন্নত হয়েছিল। ব্যালেট নৃত্যের মত ক্লাসিক নৃত্যের রেওয়াজ আজকাল ইউরোপে তত নেই, কিছু আছে আমেরিকায়। ক্লাসিক নৃত্য ভাব-প্রধান; নর্ত্তক বা নর্ত্তকী নিজের ছন্দোবদ্ধ অঙ্গসঞ্চালনে ভাবকেই রূপ দেবে, আর, ব্যালেট নৃত্য সুর ও সৌন্দর্য্য-প্রধান,—অর্থাৎ গৎের সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তান-লয়-সংযোগে বাহিক সৌন্দর্য্যের সাহায্যে তাকে প্রকাশ করবে। গ্রীক্ ক্লাসিক নৃত্য থেকে গ্রীক 'ড্রামার' উৎপত্তি। বিখ্যাত প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার সোফোকল্স্ নিজের রচিত নাটকে নিজেই নাচতেন। গ্রীক নাট্যের যখন খুব উন্নতি হোল, নব নব ভাব, নব নব সুরের ঝঙ্কার এসে যখন তাকে অনুরণিত করলে, তখন সে আর ক্লাসিক নৃত্যের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না, তার সীমা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসে আর এক ...

—তারি নাম 'ব্যালেট'। সুতরাং ব্যালেট নৃত্যের বিকাশ ইটালীতে হলেও তার জন্ম গ্রীসেই এবং তাকে ক্লাসিক নৃত্যের বিদ্রোহী কন্যা বলা যেতে পারে। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে 'ডিউক অফ্ মিলানের' বিবাহ-বাসরে সভ্য-জগতে প্রথম ব্যালেট নৃত্য দেখা দেয়। সেই নৃত্যকলা দর্শকবৃন্দকে এতদূর মুগ্ধ করেছিল যে, অন্যান্য অভিজাত বংশ তার খুবই অনুরাগী হয়ে পড়েন! কেথেরিণ-ঈ-মেডিসি যখন ফ্রান্সের রাণী হন তখন এই নৃত্যকলা তিনি তথায় সঙ্গে করে নিয়ে যান। ফ্রান্সের স্বভাব-সৌন্দর্য্য জ্ঞান তাকে আরো সুন্দর করে গড়ে নিয়ে তার মহিমা বাড়িয়ে তুললে। রাজা, রাণী রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক বড় বড় মনীষী, কবি, সাহিত্যিক সকলেই ব্যালেট নৃত্যে মজে গেলেন। তাঁরা নিজেরাই নাচতেন। তখনও ব্যালেট নৃত্যের কোন স্কুল বা প্রতিষ্ঠান হয়নি। চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময় ব্যালেট নৃত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ব্যালেট নৃত্যে পেশাদার নর্ত্তকীদের আমদানী মাত্র তিনশ বছর পূর্ব্বে। লিউলী নামক এক ব্যক্তি এই পদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। আজকাল রুষ দেশের ব্যালেট নৃত্য জগৎ-প্রসিদ্ধ। ফ্রান্সের নৃত্যকলা সে ছাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা হলেও রুষীয় ব্যালেটের উদ্ভব ফ্রান্স থেকেই। রুষে গিয়ে সে অধিক মার্জ্জিত হয়েছে মাত্র। সমস্ত ইউরোপে ব্যালেট নৃত্যেরই এখন প্রাধান্য, ক্লাসিক নৃত্য সেখানে বড়-একটা ঠাঁই পায় না। সে আটলাণ্টিকে ডুব মেরে, গিয়ে উঠেছে আমেরিকায়। ইসাডোরা ডানকান্ নামা জনৈকা নর্ত্তকীর হাতে পড়ে ক্লাসিক নৃত্য সেখানে জেগে উঠেছে।

এই গেল পাশ্চাত্য নৃত্যের মোটামুটি ইতিহাস। ভারতীয় নৃত্যের এ-রকম ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও পাওয়া যায় না, তা পূর্ব্বেই বলেছি। তবে যতদূর অনুমান করা যায়, কি প্রাচ্য, আর কি পাশ্চাত্য—উভয়তই মানব-সমাজে নৃত্যের প্রথম সৃষ্টি দাম্পত্য প্রেমে, তার পর ধর্ম্মে। কালক্রমে মানব-সমাজ যেমন ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লো, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বিভিন্ন মনোভাব, বিভিন্ন কলাকুশলী ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে নৃত্যও তেমনি দেশে দেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করলে।

ভারতীয় নৃত্যকলা বহুধা বিভক্ত। কিন্তু কতদিন পূর্ব্বে তারা অভিজাত সম্প্রদায়ে উঠেছে, তা এখন নিশ্চয় করে কে বলবে? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র দু হাজার বছর আগের লেখা। তাতে পেশাদার নর্ত্তক-নর্ত্তকীর উল্লেখ আছে। সুতরাং বুঝা যায়, আরো বহু কাল পূর্ব্বে ভারতীয় নৃত্যের বিকাশ হয়েছিল। তা না হলে রাজা মহারাজারা পয়সা দিয়ে তা শুনতে যাবেন কেন? বৌদ্ধযুগে বাংলাদেশে বুদ্ধনাটক" ও "বাজিল নাচ" নামে দুটি নাটক নৃত্য-সংযোগে দেখান হোত। তবে বৌদ্ধ ভিক্ষু, না পেশাদার নর্ত্তক-নর্ত্তকী অথবা উভয় শ্রেণীর লোকই তাতে নাচতেন কি না তা এখন বলা যায় না। যতদূর জানা যায়, নৃত্য সম্বন্ধে সব চাইতে প্রাচীন প্রামাণ্য ৮০০ বছর আগের বই—"নর্ত্তক নির্ণয়"; পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল নামক এক ব্যক্তি তা লিখে গিয়েছেন।

মান্দ্রাজ ও তাঞ্জোর সহরে দক্ষিণী নৃত্য এবং দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ সহরে হিন্দুস্থানী নৃত্যের উৎকর্ষ হয়েছিল। মুসলমান বাদশারা এসে খাঁটি ভারতীয় নৃত্যের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করেন। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান প্রাধান্য তেমন হয়নি বলে, সেখানে নৃত্যের ভিতর ভারতীয় ভাব অনেকটা বজায় আছে, কিন্তু হিন্দুস্থানে ভারতীয় নৃত্য তার প্রাচীন ভাব খুবই হারিয়ে ফেলেচে। হিন্দুস্থানের ভেতর একমাত্র বৃন্দাবনের রাসধারীরা আমাদের প্রাচীন নৃত্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেচে, কিন্তু চতুর্দ্দিকের বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় পড়ে তার উৎকর্ষ সাধন হয়নি, চিরকাল মামুলিই রয়ে গেচে।

দুঃখের সহিত বলতে হচ্চে, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে সংগীতের একটি বিশেষ ধারা বহুদিন থেকে চলে এলেও নৃত্যের কোন বিশেষ রূপ বাংলাদেশে কোন দিন ছিল না, এখনও নেই। বাংলায় যা আছে তা মুসলমানী আমলের দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ নাচের ধারকরা ঢং। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে চৈনিক দূত মাহুয়ান্ বাংলায় এক রকমের নাচ দেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু তা ধর্ম্ম-নৃত্য। আর এক-রকমের নাচও এখানে ছিল, যার নাম 'খাতু', কিন্তু তা খুব উঁচু দরের জিনিষ নয়। মুর্শিদাবাদের নবাবদের আমলে বাংলাদেশে নৃত্যের উৎকর্ষ হয়েছিল, কিন্তু তা ঐ মুসলমানী নাচ। এখানে এখন থিয়েটারী নাচ আছে, কিন্তু তা খাঁটি ভারতীয় নয়,—দক্ষিণী, মুসলমানী ও ইউরোপীয় নাচের জগাখিচুড়ী। তাতে কলা হয় ত আছে, কিন্তু রস নেই।

ভারতীয় নৃত্যের দুটি অঙ্গ—''তাণ্ডব' ও 'লাস্য'। তাণ্ডবের দুটি রূপ—'পেবলি' ও 'বহুরূপ'; লাস্যেরও তাই,—'স্ফুরিত' ও 'যৌবত'। 'পেবলি' নৃত্যে—অভিনয়ের স্বল্পতা, কিন্তু অঙ্গবিক্ষেপ বাহুল্য; 'বহুরূপে'—ভাব প্রকাশের জন্য চোখমুখের নানারূপ ভঙ্গীর সমাবেশ। 'স্ফুরিত' নৃত্য—আলিঙ্গন চুম্বনাদিযুক্ত, 'যৌবত'—তাল-মান-লয়-সংযুক্ত ও তদ্দ্বারা নিয়মিত, তবে 'যৌবতে' তাদের সমাবেশ বেশী। ভক্তিরত্নাকর 'স্ফুরিত' ও 'যৌবত' নৃত্যের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেচেন—

''যত্রাঙ্কেঽভিনয়ে ভাবৈ রসৈরাশ্লেষ চুম্বনৈঃ
নায়িকা নায়কো যত্র নৃত্যতঃ স্ফুরিতং হিতৎ।
মধুরাবদ্ধ লীলাভির্নটিভি যত্র নৃত্যতে
বশীকরণ বিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতম্॥''

বৈদিক যজ্ঞের মত ভারতীয় নৃত্যও অত্যন্ত অনুষ্ঠান-বহুল, এবং আগাগোড়াই নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নৃত্য-সভায় কে কোথায় বসবেন, নৃত্যশাস্ত্র প্রথমেই তা বলচেন,—সম্মুখে রাজা, তাঁর দক্ষিণ পাশে অমাত্য ও পুরোহিতগণ, বামপাশে পুরাণ ভট্ট, পিছনে কোষাধ্যক্ষ, নিকটে বিদ্বান, কবি ও বন্ধুবান্ধব। নৃত্যের অধিকারী কে?—

''নৃত্যেনাসমরূপেন সিদ্ধির্নাট্যস্য রূপতঃ।
চার্ব্বধিষ্ঠান বন্নৃত্যং নৃত্য মস্যবিড়ম্বনা॥'' (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

অর্থাৎ—যিনি রূপবান বা রূপবতী। রূপ থেকেই নাট্যের সিদ্ধি, নৃত্য চারু অধিষ্ঠান, যার রূপ নেই নৃত্য তার বিড়ম্বনা।

প্রকৃত নৃত্য কাকে বলা যেতে পারে?

''দেবরুচ্যা প্রতীতো যস্তালমানরসাশ্রয়ঃ সবিলাসোঽঙ্গঃ
বিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ, লায়াদুত্তিষ্ঠতে বাদ্যং
বাদ্যাদুত্তিষ্ঠতে লয়ঃ, লয়ঃ তালসমারব্ধং ততো নৃত্যং প্রবর্ত্ততে।''
(সংগীত দামোদর)

ভারতীয় নৃত্যে অঙ্গ-সঞ্চালন অনেক প্রকার; শুধু মস্তক-সঞ্চালনই ঊনিশ রকমের। তার পর দৃষ্টি চার রকমের—রসদৃষ্টি, স্থায়ীদৃষ্টি, সঞ্চারি দৃষ্টি ও ব্যভিচারী দৃষ্টি। মুখরাগের প্রকার চার, ভ্রূবিকারের সাত, বাহু-সঞ্চালনের আঠার। নৃত্যে অনুরাগ জনক ও অর্থপ্রকাশক যে অঙ্গুলি বিন্যাস, তার নাম হস্তক। সংযুক্ত হস্তক আটত্রিশ রকমের, অসংযুক্ত হস্তক ও নৃত্য হস্তক বত্রিশ রকমের।

বাঁশী বা অন্যরূপ লয়-যন্ত্রের অনুগমন করে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান, তাঁকে বলে চালক।

নৃত্যের উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণ তের রকমের। অঙ্গে অনুরক্তি-জনক অঙ্গ সন্নিবেশের নাম স্থানক। স্থানক সাতাশ প্রকার।

চরণ, জংঘা বক্ষ ও কটি আয়ত্ত করাকে চারী বলে; চারী বিরাশ রকমের।

হাতে হাতে, পায়ে পায়ে, বা হাতে পায়ের যে সংযোগ তার নাম করণ করণ ষোল প্রকার। এই সমস্তের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশে খাঁটি ভারতী[illegible] নৃত্যের পরিপূর্ণ রূপ। ভারতীয় নৃত্য নানাবিধ। মাত্র কয়েকটির উল্লে[illegible] আমি এখানে করলুম—কমলবর্ত্তনিকা, ময়ূরি, চক্রবন্ধ, নাগবন্ধ বৃতলতিকা, নেরি, করণ নেরি, রবিচক্র ও পদ্মবন্ধ।

ভারতীয় চারু শিল্পের মত ভারতীয় নৃত্যও ভাব-প্রকাশক। ভাবে[illegible] এর উৎপত্তি, ভাবেই এর পরিণতি। ধরুন, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধা অ[illegible] কাতরা, উন্মাদিনীর মত ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্চেন, নর্ত্তক বা নর্ত্তকীকে এ[illegible] ভাবটি তাঁর নৃত্যের ভেতর ফুটিয়ে তুলতে হবে, অথচ নৃত্যকলার বি[illegible] লঙ্ঘন না কোরে। কিংবা ধরুন,—''কাসার মধ্য স্ফটিকোচ্চ গে[illegible] পঙ্কেরুহে ভৈরবমর্চ্চয়ন্তী। তার স্বরাদ্ধ বিশুদ্ধ গীতা বিশালনে[illegible] কিল ভৈরবীয়ম্॥'' অর্থাৎ—বিশালনেত্রা ভৈরবী সর্ব্বোচ্চ সুরে, বিশু[illegible] গানে, স্বচ্ছ সরোবর মধ্যে স্ফটিক নির্ম্মিত উচ্চ গৃহে পদ্মহস্তে মহাদে[illegible] অর্চ্চনা করচেন—ভৈরবীসুরের এই রূপটি নর্ত্তকীকে ভাব দি[illegible] নৃত্যের মধ্যে দেখাতে হবে। এ খুবই শক্ত। ভাবের মধ্যে নিজে[illegible] হারিয়ে না ফেললে এ হয় না। খুব উচ্চ শ্রেণীর নর্ত্তক হতে হলে যে[illegible] নৃত্যকলাবিদ্ হওয়া চাই, তেমনি মনোবিদ্‌ও হওয়া চাই। এর মধ্যে [illegible] কোন একটির অভাব থাকলে নৃত্য অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। বর্ত্তমানকা[illegible] ইউরোপীয় নৃত্যের উন্নতির যুগ, আর ভারতীয় নৃত্যের অধঃপতন যুগ। [illegible] কারণ, ইউরোপের নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা শিক্ষিত, আমাদের দেশে [illegible] অধিকাংশই অশিক্ষিত। অসংস্কৃত, অশিক্ষিত মন উচ্চ ভাব ধা[illegible] নিতান্তই অক্ষম।

সকল দেশের মনীষীরাই নৃত্যের পক্ষপাতী। অর্জ্জুন নৃত্য-কু[illegible] ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গের ভক্তিমূলক নৃত্য প্রব[illegible] করেন; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের 'নববৃন্দাবন' নাটকে নৃত্যের স্থান দি[illegible]

প্লেটো বলেচেন, "A Good education consists in knowing how to sing and dance well." নিট্‌জে স্বীকার করেচেন, "My style is dance, every day I count wasted in which there has been no dancing.

আর্টকে বাদ দিয়েও, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণে নৃত্যের যথেষ্ট স্থান আছে। জীবনকে এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল হতে না দিয়ে, নৃত্য তাকে ছন্দোবদ্ধ করে। তবে মনে রাখা উচিত, ইউরোপীয় ও ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। ইউরোপের চারু-শিল্পের মত নৃত্যও সেখানে রূপ-প্রধান, আমাদের নৃত্যে রূপের সমাবেশ থাকলেও তা ভাব-প্রধান। রূপ-প্রধান বলে ইউরোপীয় নৃত্য রিরংসার দ্যোতক, ভারতীয় নৃত্য ভাব-প্রধান বলে আধ্যাত্মিকতার পোষক। দেহের রূপ সীমাবদ্ধ, সুতরাং ইউরোপীয় নৃত্য সসীম ; ভাব অনন্ত, তাই ভারতীয় নৃত্য অসীম।

নৃত্যকলা-কৌশলে মানুষের সীমাবদ্ধ বিক্ষিপ্ত মনকে যিনি অনন্ত ভাবময়ের দিকে নিয়ে যেতে পারেন, তাঁরি নৃত্য সার্থক।

গোগল ও রুশ সাহিত্য

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

রুশ সাহিত্য সম্বন্ধে একটা বড় কথা এই যে এখানে কোনো দিন অতি মানবতার ঢেউ উঠে নাই। রাশিয়ার মরু প্রান্তর ও নির্দীপ তুষারের মত ধূসর ঔদাসীন্য ও কঠিন শীতলতা ইহার সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে।

রুশীয় কথা-সাহিত্যের প্রথম উৎপত্তি ফরাসীদের অনুকরণে। ফ্রান্সে তখন ভলটেয়ারের যুগ ; তাঁহার খ্যাতির দীপ্তি সেদিনের রুশ সাহিত্যের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তার পর, বায়রণ, গোয়েটে, শীলার—ইহাদের প্রতিভাও এককালে রাশিয়ার সাহিত্যের অন্তর-লোকে অনেকখানি ছায়া ফেলিল। রুশ সাহিত্যের উল্লেখ-যোগ্য প্রথম উপন্যাস 'A Hero of Our Time' লারমেনতাফের রচনা। ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের বাহিরে তখন বায়রণের প্রচণ্ড প্রতিভা এবং তাহার চেয়ে প্রচণ্ড উচ্ছৃঙ্খলতার খ্যাতি। লারমেনতাফের এই আখ্যায়িকার মধ্যে এই অশান্ত, বিদ্রোহী কবিচিত্তের অনেকখানি আভাষ আছে। ইহার প্রায় সমস্তটা জুড়িয়াই চলিয়াছে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছ অমিতব্যয়িতার স্রোত। রাশিয়ার সত্যিকার ইতিহাস ইহার মধ্যে অতি অল্পই আছে।

রুশ-সাহিত্যের ইহাই প্রথম স্তর ; Romanticismএর যুগ। Idealismএর ধারণাটা ইহাদের গোড়া হইতেই নাই।

লারমেনতাফের পরেই যে ব্যক্তি তাঁহার অদ্ভুত সত্য-দৃষ্টি ও গভীর প্রতিভা লইয়া রুশ-সাহিত্যের পূর্ব্বাচল আলো করিয়াছিলেন, তাঁহারি নাম গোগল। গোগল সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, আর একজনের সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা দরকার। ইনি কবি এবং ঔপন্যাসিকের কিছুই ন'ন। সাহিত্যে যে দলের নাম শুনিলেই আমরা আজ ভয় পাই ইনি সেই দলের। অর্থাৎ সমালোচক। তবু রুশ সাহিত্যের সহিত ইঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই।

ইঁহার নাম Blienski। ব্লায়নস্কি উপন্যাস বা কাব্য কিছুই লেখেন নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবু তাঁহাকে স্রষ্টা বলিতে আজ আর কেহ কুণ্ঠিত নয়। এই সৃষ্টি তাঁর সমালোচনা। শুধু ছিদ্রান্বেষণ বা ব্যক্তিবিশেষের গুণ-গান নয়, রাশিয়ার সমস্ত লেখককে বিপুলতর, সুন্দরতর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল আহ্বান।

ব্লায়নস্কি বলিয়াছিলেন, রুশ সাহিত্যকে পৃথিবীর সাহিত্য-সভায় গর্ব্বের সহিত দাঁড়াইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে পরস্ব প্রত্যাহার করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। সকল দেশের সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধেই এই কথাটি অভ্রান্ত ভাবে সত্য। ব্লায়নস্কি বুঝিয়াছিলেন, রাশিয়ার উচ্চ মরু বালুকার বুকে ফ্রান্সের সৌখীন মদ ও বায়রণের উন্মত্তচারিতায় ভাল ফসল ফলিবে না। রাশিয়ার সত্যকার ধূলা মাটি, আনন্দ বেদনার সহিত পরিচিত না হইলে অনাগত ভবিষ্যেও ইহার মহাসন প্রস্তুত হইবে না।

ব্লায়নস্কির সেদিনের এই সত্য ভাষণের ফলে গোগলের আবির্ভাব। রুশ সাহিত্যের আজিকার যে সমুদ্ভাসিত রূপ আমাদের চোখের কাছে এত ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, ইহার মূলে আছেন ব্লায়নস্কি। তাই বলিতে-ছিলাম, তিনিও স্রষ্টা। তিনি না ডাক দিলে হয় ত গোগলের আসা হইত না ; গোগল না পৌঁছিলে হয়ত তুর্গিনিফ্ ও টলষ্টয়ের জন্য আরও কিছুকাল করিয়া অপেক্ষায় থাকিতে হইত। বস্তুতঃ, গোগল তাহার গল্প, উপন্যাস ও প্রহসন দিয়া রাশিয়ার সাহিত্যে যে জমি প্রস্তুত করিয়া যান তাহাতেই তুর্গিনিফ্ করিয়াছিলেন বীজ বপন এবং সেই বীজই টলষ্টয় ও গর্কীর হাতে পড়িয়া এমনি ছায়া ও ফলশালী হইয়া উঠিয়াছে।

গোগলের লেখা উপন্যাসের মধ্যে Dead Souls এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি ছোট গল্প 'Cloak' আজ অবধি রুশ গল্পের আদর্শ হইয়া আছে। এগুলি ছাড়া, গোগলের আরও তিনখানি বইয়ের নাম, 'The mantle', 'Revizor, ও 'Inspector' শেষের খানি উপন্যাস নয়, কৌতুক-নাট্য।

Dead Souls প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪২ সালে এবং সেই দিন হইতেই রাশিয়ার সত্যকার গদ্য সাহিত্যের সুরু। অনেকের মতে, রুশ সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি উপন্যাস সৃষ্টি হইয়াছে তাদের প্রত্যেকটির উৎপত্তি গোগলের এই 'Dead Souls' হইতে। 'All the masrer-pieces that have come since, have grown out of it'

ডষ্টয়ফস্কি Dead Souls অপেক্ষা বহুদিন পূর্ব্বের রচনা সেই ছোট গল্পটির ('ক্লোক') সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

"We have all issued out of Gogol's Cloak"

এককালে গোগলের রচনা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইয়া গেছে— যেমন প্রত্যেক নূতন সৃষ্টি লইয়া প্রত্যেক কালে হয়। কেহ বলিয়াছিলেন, 'ডেড্ সোলস'এর মধ্যে Don Quixote এর প্রভাব আছে, কেহবা ইহার মধ্যে Pick wick papers এর ছায়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অভিমত যে একেবারেই ভিত্তিহীন এমন নয়, গোগলের হাসির সহিত Dickens এর খানিকটা সাদৃশ্যও আছে, কিন্তু ঐ সব বাদ দিয়াও

এই কাহিনীর মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে যাহা গোগলের সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং সম্পূর্ণ রুশ দেশীয়। "রুশ দেশীয়" এই কথাটা বলিতে কি বুঝায়, যাঁরা টলষ্টয়, তুর্গেনিফ ও গর্কীর লেখার সহিত পরিচিত, তাঁহাদের বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার আরম্ভ গোগলে এবং এই Dead Soulsএ।

এই কাহিনীর পাতায় পাতায় মানুষের দুর্দ্দশা ও পাপের প্রতি এমনই একটা অকথিত সহানুভূতি নিঃশব্দ ধারায় বহিয়া গেছে, যে তাহার তুলনা Dickensএ' খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। মানুষ যে পাপ ও গ্লানি সঙ্গে লইয়া জন্মায় না এবং সমস্ত পাপ ও কদাচার হইতে তাহার সত্যিকার মানুষটা যে একেবারেই বিচ্ছিন্ন এবং অনেক বড়—এই বাণী আমরা প্রথম গোগলের মুখেই শুনি। অথচ, এত বড় একটা কথা বলিবার জন্য গোগল কোথাও এতটুকু 'চেষ্টার' সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, সাদা কথায় হাসিতে হাসিতে যাহা বলিবার তাহা বলিয়া গেছেন।

এই যে হাসিতে হাসিতে বলা, এইটাই গোগলের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এ' জিনিষ গোগল এবং রাশিয়ার একান্ত আপনার। স্পেন ও ইংলণ্ডের সাহিত্যে সেদিন ইহার সন্ধানও ছিল না।

Dead Soulsএর আখ্যান-বস্তুর মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। রাশিয়ায় তখন সার্ফডামের যুগ। এক একজনার অধীনে যতগুলি 'প্রাণী' (souls) থাকিত,—সেই হিসাব করিয়া তখনকার দিনে মানুষের অবস্থার বিচার চলিত। প্রত্যেক প্রাণী হিসাবে সংসারের কর্ত্তা ব্যক্তিকে কর দিতে হইত এবং প্রত্যেক প্রাণীর নাম 'আদম সুমারীর' খাতায় লিখাইয়া রাখিবার প্রথা ছিল। খাতায় লিখানো ব্যক্তিদের কাহারো মৃত্যু হইলেও তাহার অংশের কর দিতে হইত।

তবু, এই প্রথার একটা সুবিধা এই ছিল যে এই মৃত ব্যক্তিগুলির নামে স্থানীয় ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার লওয়া চলিত। 'Dead Souls'এর নায়ক Chichikov ঠিক করিল, অল্প মূল্যে সেই মৃত 'প্রাণীগুলি' খরিদ করিয়া লইবে এবং যাহারা বিক্রয় করিবে তাহারাও কর দান হইতে অব্যাহতি পাইবে। অথচ, সে নিজে রাশিয়ার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বহু সংখ্যক 'মৃত-দাস' খরিদ করিয়া তাহাদের নামে প্রভূত অর্থ ঋণ লইতে পারিবে এবং এই ভাবেই নিজের সৌভাগ্যের সূচনা করিবে।

বস্তুতঃ, আখ্যান বস্তু হিসাবে ইহা কিছুই নহে। কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর হাতে এমনি অকিঞ্চিৎকরই হঠাৎ অপরূপ হইয়া উঠে। Chichikov রাশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, ইহারই মধ্যে গোগল তাঁহার দেশের অন্তর প্রকৃতিখানি আমাদের চোখের সম্মুখে রূপে, রসে উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। এক একটি গ্রামের এক একটি নূতন রূপ!—আর এই রূপ তা'র বাহিরের দৃশ্য চিত্র নয়, বাস্তবিকতার আলোকে সমুজ্জ্বল!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোগলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর হাসি। এই হাসি ও কৌতুকাক্ষম Dead Soulsএর একটা বিশিষ্ট অংশ। গোগল নিজেই বলিয়াছিলেন, 'হাসি জিনিষটা সর্ব্বত্রই লুকাইয়া আছে। কিন্তু আমরা এই হাসির মাঝখানেই আছি বলিয়া সহজে তা আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু শিল্পী যদি সেগুলি তাঁর শিল্প-কৌশলে খণ্ডিত করিয়া, ধরুন, রঙ্গমঞ্চের উপর উপস্থিত করেন, তাহা হইলে হাসিতে আমরা গড়াগাড়ি যাই আর ভাবি, কি আশ্চর্য্য! ইতিপূর্ব্বে এটা আমাদের চোখে পড়ে নাই!'…

কিন্তু Dead Souls এবং Gogolএর হাসি কেবল বাহিরের। কবি Pushkin ছিলেন গোগলের উৎসাহদাতা বন্ধু। Dead Souls এর আখ্যান ভাগে Pushkinএর অনেকখানি হাত ছিল। এই আখ্যানটিকে রূপ দিয়া গোগল একদিন পুস্কিনের সামনে পাঠ করিতেছিলেন। কতকটা শুনিয়া Pushkin হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'ঈশ্বর! কী দুর্ভাগা দেশ এই রাশিয়া!'—'God! What a sad country Russia is' এমনি বেদনাময় গোগলের হাসি।

বস্তুতঃ, Dead Souls বই খানির ভিতর পাঠকের এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিবার অবসর নাই! একের পর এক, রাশিয়ার উৎকট বীভৎসতা ও দৈন্য আসিয়া পাঠকের শ্বাসরোধ করিবার চেষ্টা করে এবং কাহিনী শেষ হইয়া গেলে মনে হয়, দুর্গন্ধ অন্ধকার গুহা হইতে যেন মুক্ত নীলিমার তলে আসিয়া দাঁড়াইলাম। Pushkin বলিয়াছিলেন, "গোগলের হাসির আড়ালে একটি অদৃশ্য অশ্রু-প্রবাহ লুকানো আছে।"—এ কথা যে গোগল সম্বন্ধে কত বেশী সত্য, তাহা একা Dead Souls. পাঠেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

কিন্তু আমাদের এবং রুশ সাহিত্যের দুর্ভাগ্য এই যে, আজ আমরা ইহার যতটুকু পড়িতে পাই সেটা মূল Dead Soulsএর খণ্ডাংশ মাত্র। গোগল ইহার দ্বিতীয় অংশের পাণ্ডুলিপি শেষ করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় অংশ পর্য্যন্ত লিখিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল। কিন্তু নিদ্রাহীন নিশীথের কোনো এক ভয়ানক মুহূর্ত্তে, মানসিক অবসাদের ঘোরে Dead Soulsএর দ্বিতীয় খণ্ড এবং আরও অনেক রচনা তিনি আগুনের মুখে সমর্পণ করেন। কেন যে তিনি এইভাবে এগুলিকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন, এতদিন পরে সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলাও চলে না এবং যাহা জানা যায় তাহাও তেমনি অকিঞ্চিৎকর! কেহ বলেন, ধর্ম্ম চিন্তা প্রবল হওয়াতেই এমনি হয়, কিন্তু এ কথা যথেষ্ট ও বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। আজীবন সাহিত্য-সাধনা করিয়াও গোগল অভাবের বেদনা হইতে মুক্তি পান নাই, সে দিনের নিস্তব্ধ নিশীথ প্রহরে সেই অভাব ও অতৃপ্তির ব্যথাই যে তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তোলে নাই, এতদিন পরে সে কথা কে বলিবে?

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গোগলের জন্ম হয়। জন্মস্থান, 'লিটিল রাশিয়ার' অন্তর্গত Sorotchintz গ্রাম। উনিশ বছর বয়সে গোগল কলেজ ছাড়িয়া সেণ্টপিটার্সবার্গ যাত্রা করেন। সেখানে, সরকারের অধীনে অনুলিপিকার কেরাণীর চাকরি পান। কিন্তু, বেশী দিন সেখানে থাকিতে পারিলেন না। কি একটা প্রয়োজনে মায়ের কাছ হইতে কিছু টাকা পাইয়াছিলেন, সেইগুলি সমেত হঠাৎ একদিন আমেরিকা-যাত্রী জাহাজে উঠিয়া বসিলেন। আমেরিকায় কোনো ফল হয় নাই। সেখান হইতে ফিরিয়া গোগলের অভিনেতা

হইবার সখ গেল। কিন্তু কণ্ঠস্বর দুর্ব্বল,—অভিনয় করা চলিল না। গোগল কবিতা লেখা সুরু করিলেন এবং সেগুলির কেহ প্রশংসা করিল না। প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলেন কেহ গ্রহণ করিল না। অবশেষে সেগুলি আগুনের গর্ভে গেল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে হইতে গোগল লেখক হিসাবে খ্যাতি-লাভ করিতে সুরু করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহাই তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা ছিল। কেবল মধ্যে একবারে কোথায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কাজে এমনি অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে লাঞ্ছনার আর অবধি ছিল না! অল্পকাল পরেই সে কাজ ছাড়িয়া দিয়া গোগল বলিয়াছিলেন, "I am once more a free Cossack"—আবার স্বাধীন হইলাম।

মানুষের সমস্ত সুখের চেয়ে বোধ করি স্বাধীনতার আনন্দই বড়!

গোগলের উপন্যাসের মত, তাঁহার জীবনেও নারীর বিশেষ কোনো স্থান নাই। যদি থাকে তাও খুব অল্প,—জানা যায় না। কিন্তু ইহার কারণ বোধ হয় তাঁহার আকৃতি। গোগল সুপুরুষ ছিলেন না। গোগলের সমসাময়িক এক ব্যক্তি তাঁর আকৃতির বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার পা দুটি তাঁর দেহের তুলনায় বিশেষভাবে ছোটো ছিল; ঘাড় হেঁট করিয়া হাঁটিতেন। বেশ-ভূষার প্রতি এতটুকু দৃষ্টি ছিল না, লম্বা চুলগুলি এলোমেলোভাবে মুখের চারি-পাশে লুটাইত এবং সে দিকে চাহিলেই হাসির উদ্রেক হইত।"

গোগলের শেষ দিনগুলি কাটিয়াছিল অশেষ দুর্গতির মধ্যে। কোথায় কখন থাকিতেন কেহ জানিত না। লেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কেমন করিয়া চলিত সে কথা তিনিই জানিতেন। আজ এ দেশ, আর একদিন অন্যত্র—কক্ষচ্যুত গ্রহের মত এমনিভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। লোকে দেখিয়া পাগল মনে করিত। গোগল হাসিতেন! মনে মনে তাহাদের প্রতি অসীম অনুকম্পা বোধ হইত। বেশীর ভাগ রোমে কাটাইতেন—রোমই তাঁর সমস্ত স্থানের মধ্যে প্রিয় ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জেরুশালেম তীর্থে গিয়াছিলেন কিন্তু আত্মার অসন্তোষ তাহাতে নিভে নাই।

গোগলের চরিত্রের বহুমুখী জটিলতার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। হাসি ও অশ্রুর এমন বিচিত্র সঙ্গম খুব কমই আমাদের চোখে পড়ে। গোগল নিজেই বলিয়াছিলেন, 'আমি হাসিতে চাহিয়াছি, কিন্তু আমার সমস্ত হাসি শোকান্ত হইয়া উঠিয়াছে। হে বিশ্ব ধাত্রি, আমায় শান্তি দাও।' ঐ তাঁহার অন্তরের আর্ত্তনাদ!

জেরুশালেম হইতে গোগল মস্কোয় ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে একটি ব্যাগ ছাড়া আর কিছু নাই! ব্যাগটি হাতে করিয়া গোগল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, আহার জুটিত না, প্রায় উপবাসেই দিন কাটিত। যখন যাহা হাতে আসিত, দরিদ্রদের ডাকিয়া তা'র ভাগ দিতেন। দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেন এবং রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় মধ্যে মধ্যে অস্বাভাবিক কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিতেন!

গোগলের মৃত্যু—সেও অদ্ভুত! মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে গোগল চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'সিঁড়ি কই! সিঁড়ি!'……এবং পরক্ষণেই এই অদ্ভুত মানুষের অদ্ভুত জীবন-নাট্যের উপর মৃত্যুর নিষ্ঠুর যবনিকা পড়িয়া গেল! চোখের সামনে পৃথিবীর সমস্ত আলো নিঃশেষে নিভিবার পূর্ব্বে গোগল হয়ত পরপারে পৌঁছিবার সিঁড়ি চাহিয়াছিলেন, কে জানে!

গোগলের সমাধি প্রস্তরের বুকে লেখা আছে—

"আমি আমার নিষ্ঠুর হাসি হাসিতে চাই—"

ভারলগ্রামে পুরাতন কীর্ত্তি ও কাহিনী-মূলক ইতিহাস

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও "বাংলার ডঙ্কা ছিল, হুঙ্কার ছিল," প্রায় প্রতি পল্লীতেই দুই একজন কীর্ত্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে—সে বিষয়ে জানিবার স্পৃহা আমাদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। সর্ব্ব বিধ্বংসী কাল যেখানে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছে সেখানে ত কথাই নাই; যেখানে এখনও কিছু ভুক্তাবশেষ আছে, সেখানেও এগুলিকে উজ্জ্বল করিবার প্রচেষ্টা আদৌ দেখা যায় না!

ভারলগ্রাম নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত—পূর্ব্ববঙ্গ রেল-পথের পোড়াদহ জংশনের অনতিদূরে অবস্থিত। ভারলের মুলুক মাধাইএর সম্পর্কীয় কাহিনীর প্রচলন ও তদীয় কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নদীয়া কাহিনীর সঙ্কলয়িতা মহাশয় এ বিষয়ে একটুও আমল দেন নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা যখন কুষ্টিয়া মহকুমার নানা স্থান হইতে গ্রাম্য-সাহিত্য সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, ঐ সময়ে ভারলের পুরাতন কীর্ত্তি ও কাহিনীমূলক ইতিহাস আমাদের শ্রুতি গোচর হয়। তৎপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হইলে ঐ স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যেরূপ কাহিনীমূলক ইতিহাস পাইয়াছি, বর্ত্তমানে তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। ঐ সম্পর্কে প্রামাণ্য বিবরণাদি বিষয়ে পরে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

মুলুক মাধাইএর বাসভবনের ভিত্তি এখন বেশ উঁচু আছে। বাস-ভবনের সম্মুখে "তেলটুঙির পুকুর" নামক একটী বৃহৎ পুকুরের এখনও প্রায় আড়াই হাত খাত বিদ্যমান আছে। প্রবাদ যে এই পুকুরে জল-বিহারের জন্য, সোণার গলুই বিশিষ্ট ময়ূরপঙ্খী নৌকা ছিল। ইহার একটু দূরেই "বিষপুকুর" নামে আর একটী পুকুর আছে। এতদ্ভিন্ন বাড়ীর পিছন দিকে আর একটী পুকুর আছে, এটী চালধোওয়ার পুকুর নামে অভিহিত। পুকুরটী অনুমান ১৫০ হাত লম্বা হইতে পারে। ইহার অনতিদূরেই আর একটী পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে এটীর নাম "ধনতলার পুকুর।"

শুনা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত "তেলটুঙির পুকুরে" কিছুকাল পূর্ব্বে দুতিমণ্ডল নামে একটী লোক সোণা নির্ম্মিত একটী নৌকার চোখ পাইয়াছিল। এই পুকুরটীর পরপারে কাটদা মাইনর-স্কুলের শিক্ষক মৌলভী কফিল উদ্দিন আহম্মদ সাহেবের বাড়ী। ইঁহার বয়স অনুমান ৪৮ বৎসর হইবে।

ইনি বাল্যে "তেলটুণ্ডির পুকুরে" সাঁতার দিবার মত জল দেখিয়াছেন। এখানকার পতিত ইষ্টকাদি লইয়া পূর্ব্বে অনেকে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এখন এখানে ইষ্টকাদি বিশেষ নাই। বাটীর এক স্থানে বহু অনুসন্ধানের পর কয়েকখানা পুরাতন ধরণের ইঁট পাওয়া গিয়াছে।

মুলুক মাধাইএর সম্পর্কে কাহিনীমূলক ইতিহাস এইরূপ পাওয়া যায় যে, একদা এক সন্ন্যাসী আষাঢ় মাসের কোনও একদিনে ইঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হন। ইঁহারা না কি জাতিতে কুম্ভকার ছিলেন—মৃৎপাত্র নির্ম্মাণই ইঁহাদের পেশা ছিল। সন্ন্যাসী ঘরের চালে একটী ছোট ঝুলি রাখিয়া বাহিরে যান। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। কুম্ভকার গৃহস্বামী কোদালি হইতে কাদা ছাড়াইবার জন্য চালের ছাঁইচে রাখিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত সন্ন্যাসীর ঝুলির মধ্যে পরশ পাথর ছিল, ঐ পরশ পাথর ধুইয়া কোদালির উপর জল পড়াতে কোদালি সুবর্ণ খণ্ডে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসীর ঝুলি হইতে ঐ পরশ পাথর ইঁহারা হস্তগত করেন। সন্ন্যাসী ফিরিয়া পাথর চাহিলে ইঁহারা অপলাপ করেন। সন্ন্যাসী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও পাথর না পাইয়া এবংবিধ কার্য্যের ফলস্বরূপ ইঁহারা এককালে সবংশে নির্ম্মূল হইবেন এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া যান। *

এই পরশ পাথরের সাহায্যে ইঁহারা অতি অল্পকালের মধ্যে সবিশেষ বিত্তশালী হইয়া উঠেন। পরে সিপাহী নিযুক্ত করিয়া গ্রাম দখল করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই মুলুক মাধাই একজন নামজাদা ভূস্বামী হইয়া উঠেন। পরে মুলুক মাধাই নবাবের কর দান বন্ধ করিয়া দিলে নবাব তাঁহার বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করেন। "তেলটুণ্ডির" পুকুরের অপর পারে নবাব সেনার সহিত যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে না কি নবাব সেনার পরাজয় হয়। নবাব না কি মুলুক মাধাইএর বীরত্বে সন্তুষ্ট ও প্রীত হইয়া তাঁহাকে এক পরগণার শাসনভার প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করেন। মুলুক মাধাই নবাবের এই উদারতার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া, যাত্রাকালে একজোড়া কপোত সঙ্গে লইয়া যান। † নবাব দরবারে মুলুক মাধাই একটী পরগণার শাসনভার লাভ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গৃহাভিমুখে ফিরিবার সময় দৈবাৎ একটী কপোত উড়িয়া আসে। কপোত বিজোড় ফিরিয়া আসাতে পরিবারগণ অনর্থ ঘটিয়াছে মনে করিয়া সপরিবারে প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করেন। সকলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া "তেলটুণ্ডির" পুকুরে আসিয়া ময়ূরপঙ্খী নৌকাতে আরোহণ করেন; অতঃপর কুঠার দ্বারা নৌকার তলদেশ ছিদ্র করিয়া দেওয়া হয়। মুলুক মাধাই বাড়ীতে ফিরিয়া দেখেন জনকোলাহলে নিয়ত মুখরিত বাসভবন জনমানবশূন্য। তিনি তখন শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া তেলটুণ্ডির জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন! এইরূপে মুলুক মাধাই সবংশে নিহত হন। মুলুক মাধাইএর ঐশ্বর্য্য ও শৌর্য্য সম্পর্কে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই খুব বেশী অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বোক্ত পরশমণির সম্পর্কে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় যে, উহা পূর্ব্বে জগতী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বারখাদা গ্রামে মাটীতে প্রোথিত একটী পাথরের গায়ে সংলগ্ন ছিল। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী উহা চিনিতে পারিয়া, রাত্রিতে করীষ সংগ্রহ করিয়া, ঐ পাথরের চারিপার্শ্বে অগ্নি সংযোগ করেন। অগ্নির তাপে উহা প্রস্তর খণ্ড হইতে খসিয়া আসিলে তিনি উহা আত্মসাৎ করেন। এই প্রস্তরখণ্ড অদ্যাপি বারখাদা গ্রামে বিদ্যমান আছে। কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহার পূজা হইয়া থাকে।

ভারলের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহেও মুলুক মাধাইএর কীর্ত্তির কথা শুনা যায়। ভারল এখন নিবিড় জঙ্গল সমাচ্ছন্ন। লোকজনের বসতিও খুব বিরল। গ্রামটীতে দিবাভাগে প্রবেশ করিতেও প্রাণে একটু আতঙ্কের সঞ্চার হয়। গ্রামটী মুসলমান-প্রধান। হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র কয়েকঘর কুম্ভকার আছে।

* দেবগ্রামে দেবপালের সম্পর্কেও ঠিক এইরূপ কাহিনী পাওয়া যায়।

† বঙ্গের আরও অনেক ভূস্বামীবংশে নিধনের মূলে এইরূপ কপোত কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গত ১৩৩৪ সালের চৈত্র সংখ্যার "ভারতবর্ষে" মল্লিখিত "নদীয়া গোষ্ঠবিহারের ইতিহাস ও ধ্বংসাবশেষ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বাঁশী

শ্রীশ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায়

১

খট্ ক'রে একটা শব্দ হ'তেই কল্যাণীর ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভিতর মিশমিশে কালো অন্ধকার। মাঘ মাস—কন্‌কনে শীত। তার উপর সেদিন সন্ধ্যা থেকে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। তখনও এক একবার বিদ্যুৎ চম্‌কে ঘরের মুরুলির ফাঁক দিয়ে আব বাঁশের ঝাপ্‌রী দেওয়া জানালার ভিতর দিয়ে এক ঝলক ক'রে আলো এসে ঘরের ভিতর খানিক দুর পর্য্যন্ত আলো ক'রে দিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে এক একটা দম্‌কা হাওয়া এসে ঘরের জীর্ণ কপাটটাকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সেই রকম যা' হোক্ একটা শব্দে কল্যাণীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে একবার তা'র স্বামীর নাকের কাছে হাত দিয়েই বুঝতে পারলে যে স্বামী তা'র অকাতরে ঘুমুচ্ছে। কত রাত্ তা' জানা নাই; চোখে তা'র ঘুম জড়িয়ে রয়েছে;—মনে হ'ল এইমাত্র সে কাজকর্ম্ম সেরে শুয়েছে। সে খোকাকে তা'র বুকের কাছে টেনে নিয়ে কাঁথাখানা বেশ ক'রে জড়িয়ে আবার শুয়ে পড়লো। খোলার ঘরের উপর বৃষ্টির জল পড়ে' এক-রকম ছড়্ ছড়্ তড়্ তড়্ আওয়াজ হ'চ্ছিল;—নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে সেই শব্দ তার বুকের মধ্যে কেমন এক-রকম ভয় ও আনন্দ উৎপাদন ক'রছিল। সেই উদাস-করা শব্দে কাণ পেতে রেখে কল্যাণী তখনই আবার ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু গরীব দুঃখীর কপালে শান্তিপূর্ণ নিদ্রা কোথায়? আবার খানিক পরেই চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত ক'রে একসঙ্গে কারখানার সব ক'টা বাঁশী বেজে উঠলো। খোকা আঁতকে উঠে মা'কে জড়িয়ে ধরতেই তা'র মুখে মাইটা গুঁজে দিয়ে কল্যাণী তা'কে থামালে। আর তা'র শোয়া হ'ল না—শোবার যো কি? বাঁশী বেজে উঠেছে, আর বিছানায় থাকা অসম্ভব। আস্তে আস্তে উঠে তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়ে' মাথার বালিসের নীচে হ'তে নেক্‌ড়ায় জড়ান দিয়াশালাইটা বা'র ক'রে কোনও রকমে ঢুলতে ঢুলতে প্রদীপটা সে জ্বেলে ফেল্‌লে। খোকা তখনও মাই টান্‌ছে। প্রদীপের আবছায়ায় মিট্‌মিটে আলোতে মেটে ঘরের ভিতরকার অন্ধকার যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। বাঁশী তখনও বাজছে;—ভোর হ'য়ে এসেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শীতে হাত্ পা অসাড় ক'রে দিচ্ছে! স্বামীকে ডেকে দিতেই হ'বে,—আর ত ঘুমুলে চলবে না! কিন্তু কল্যাণী আজ কিছুতেই যেন তার স্বামীকে জাগাতে পারছিলো না;—নিদ্রিত স্বামীর মুখের পানে চেয়েই সে কেমন এক-রকম হতাশ করুণ নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল মনে হ'তে লাগলো—সন্ধ্যার সময় তার স্বামী জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে কাজ থেকে ফিরে এসে বলেছিল—'দেহটা ভাল নেই, সর্ব্বশরীর টাটিয়ে বিষফোড়া হ'য়েছে, দুপুর বেলা থেকে জ্বরও হ'য়েছে, বাবুকে এত ক'রে বল্লুম যে দু'দিনখানি ছুটি দিন্, তা কিছুতেই রাজী হ'ল না, বলে এ মরসুমে যা'র তাঁত বন্ধ যাবে, সায়েব বলেছে, তাকেই চাকরীতে জবাব দেবে।'

বাঁশী থেমে গেল। কল্যাণী একটু সজাগ হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে দরজা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। তার পর কি ভেবে আবার সে স্বামীর গায়ে একবার হাত দিয়ে অনুভব ক'রলো—গা' তখনও খুব গরম। অন্য দিন এতক্ষণ ডাক্‌তে হয় না, সে আপনি উঠে পড়ে, কিন্তু আজ যেন তার ওঠবার শক্তিই নাই। কল্যাণী ইতস্ততঃ করতে লাগলো, কি যে সে ক'রবে যেন তা' ঠিক ক'রতে পারছিল না। ওদিকে আবার সেই রকম বিকট শব্দে বাঁশী বেজে উঠলো—এই শেষ বংশীধ্বনি! আধ ঘণ্টার মধ্যে কারখানায় না পৌঁছিলে, সেথাকার ফটক বন্ধ হ'য়ে যা'বে,—একবেলার মজুরী কাটা যা'বে। কল্যাণীর সংসারে আধবেলার মজুরীর মূল্য অনেক! বাড়ী থেকে চট্‌কল মোটে পাঁচ মিনিটের রাস্তা। পথে দু'একজন লোক তখন চলতে সুরু ক'রেছে,—একটা ছোকরা বিকৃত নাকি-সুরে একটা অশ্রাব্য ও কদর্য্য গানের এক চরণ গাইতে গাইতে চলেছে, তা'রই পিছু পিছু আরও কয়েকটা ছোকরা অনর্গল হাততালি দিতে দিতে আর বিড়ি

টানতে টানতে চট্‌কলের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'চ্ছে। কল্যাণী তাদের কা'রো কা'রো মুখ চেনে,—গলার আওয়াজও কতক কতক বুঝতে পারে। তারা রোজই ঐ পথ দিয়ে কারখানায় যাতায়াত করে। এক-একদিন এমনও হ'য়েছে যে নিকটের খাল থেকে স্নান করে বা কাপড় কেচে আসবার সময় ওদের কারো না কা'রো সঙ্গে কল্যাণীর স্পষ্ট চোখো-চোখি হ'য়ে গেছে,—আর সে জড়সড় হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ঢুকে বেড়ার আগলটা বন্ধ করে দিয়েছে।

বাইরে হ'তে একটু ভাঙা গলায় কে ডাকলে—"লালু খুড়ো বেরিয়েছ না কি ?"

কল্যাণী জবাব দিলে—"কে—সর্দ্দার কাকা ?"

জবাব এল—"হ্যাঁ গো বেটী ;—লালমোহন বেরিয়ে গেছে ?" সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে আলিমদ্দি সর্দ্দার মুখ বাড়ালে। দোর আগে হ'তেই খোলা ছিল। সর্দ্দারের হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল। তখনও বাহিরে খুব অন্ধকার।

তাকে দেখে কল্যাণী একটু বিপন্ন হ'য়ে বল্লে—"এঁর গা খুব তপ্ত। অনেক রাত্রি অবধি গা হাত সব টিপে দিয়েছি। কিছুই খান্‌নি।"

আলিমদ্দি বল্লে—"তবে ওকে ডেকো না। খুব কোসে আজ ঘুমুক ; কাজে গে' আজ দরকার নেই—"

"বাবু যে ছুটি দিতে চায়নি, বলেছে তাঁত বন্ধ গেলে কাজ যাবে ?"

"বাবুর মাথা যা'বে—সে আমি যা বলবার কয়বার তা বলবো এখন। তুমি কপাট বন্ধ ক'রে দাও, বড্ড হিম আস্‌তেছে, বাচ্ছাটার আবার সর্দ্দী লাগ্‌বে।—আমি এখন চন্ন্‌। দুপুরের টাইমে আসবো'খন্।"

আলিমদ্দি চলে গেল। তার কথায় কল্যাণীর একটু সাহস হ'ল। এই লোকটা তাঁত ঘরেরই একজন সর্দ্দার। জাতিতে মুসলমান বটে কিন্তু প্রাণটা খুব খোলসা। বয়সও হ'য়েছে। এ না থাকলে হয় তো লালমোহন আর কল্যাণীর সংসার করাই অসম্ভব হয়ে উঠতো। এরা দুটী স্ত্রী-পুরুষে একান্ত বিপন্ন হ'য়ে একদিন যখন এই গ্রামে উপস্থিত হ'য়েছিল, সেই সময় এই আলিমদ্দিই এদের আশ্রয় দিয়েছিল—সাহস দিয়েছিল। সেই দিন আলিমদ্দির স্ত্রী করিমন বিবি আপনার হাতে দুধ দুয়ে এই দুটি বিদেশী গৃহহারা তরুণ আর তরুণীকে পান করিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ক'রেছিল। সে আজ দু'বছর আগেকার কথা। খোকার বয়স এখন এক বছর। যে ঘরখানিতে এরা আজ বাস ক'রছে এও সেই আলিমদ্দির হাতেরই ছাওয়া। জমিটুকুও সে জোগাড় ক'রে দিয়েছিল।

২

একটু একটু করে মেঘ আর কুয়াশা কেটে গিয়ে ক্রমশঃ দিনের আলো ফুটে উঠলো। খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে দোলায় শুইয়ে রেখে কল্যাণী ঘরের বাসিপাট সেরে ফেল্লে। করিমন সেই সময় এক ঘটী দুধ এনে দাওয়ায় বসিয়ে রেখে ঝাঁটা গাছটা নিয়ে উঠান সাফ্ করতে লেগে গেল। কথায় কথায় সে সকল কথাই কল্যাণীর কাছ থেকে জেনে নিয়ে বল্লে—"আমি ঘর দোর ততক্ষণ আগলাচ্ছি, তুমি চট করে বাসন ক'খানা মেজে নিয়ে একেবারে খাল থেকে ছ্যান করে এসগে। চুলোটা আমি ধরিয়ে রাখবো, তুমি শীগ্‌গীর দুধ জ্বাল দে ওঁয়াকে আর খোকাকে খাইয়ে দাও। বাস রে বাস্! সারারাত কিছু মুখে দেয়নি, কতই না জানি আমার বাছার পেট্‌টা জ্বলতে নেগেছে।" কল্যাণী নাইতে চলে গেল।

খোকার কান্নায় লালমোহন জেগে উঠে এদিক ওদিক চেয়ে খানিকটা স্তব্ধ হয়ে পড়ে থেকে দু'তিন বার আপনার চোখ রগড়ালে। তখন বাহিরে বেশ রোদ উঠেছে—ঝাপরীর ফাঁক দিকে এক একটা স্বর্ণ রেখার মত রেখা এসে ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই এ-রকম বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুনো সত্যি না স্বপ্ন তা সে প্রথমটা ঠিক ক'রতে পারছিলো না। তাহ'লে কি সে আজ কাজে যায় নি ? কেউ কি তাকে ডেকে দেয়নি ? কল্যাণীই বা কোথায় গেল ? এমন ত কখনও হয়নি। সে উঠতে গেল, কিন্তু পার্ল্লে না, —মনে হ'ল হাত পা গুলো যেন অসাড় হ'য়ে গেছে। সমস্ত দেহ যেন তার বিশ মণ ভারি! নাড়তেই পারছিল না! খোকা চিলের মত চেঁচাতে আরম্ভ করলে। অনেক চেষ্টা করলেও সে তাকে দোলা থেকে তুলে নিতে পারলে না। দু'বার সে নিজের স্ত্রীর নাম ধরে ডাক্‌বার চেষ্টা করলে, কিন্তু গলা থেকে আওয়াজ বেরুল না,—গলার ভিতর দারুণ ব্যথা অনুভব করলে, অনেক কসরৎ করেও সে জিভ নাড়তে পারলে না! তখন নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে একান্ত

অসহায়ের মতোই সে বিছানায় পড়ে রইল। করিমন ও-দিকের ছোট রান্না ঘরটার দাওয়ায় লোহার উনানে কেরাসিন তেল আর ঘুঁটে জেলে দিয়ে দেখলে কয়লা একখানিও নাই। তাই দৌড়ে নিজের ঘর থেকে কয়লা আনতে গিয়েছিল। তাদের বাড়ী বাগানটার ওপারেই। কয়লা এনে উনানে ঢেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে সে খোকাকে নেবার জন্যে ঘরে ঢুকে দেখলে লালমোহন মিট্‌মিট ক'রে চেয়ে শুয়ে রয়েছে। তাই দেখে করিমনের বেজায় রাগ হয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—"ধন্যি যাহোক্, ছেলেটা যে এমন করে চেঁচাচ্ছে—গলা নেগে যাচ্ছে, তা একে কি তুলে নিতে নেই ?"

—বলেই সে থতমত খেয়ে গেল। লালমোহনের দিকে চেয়ে আর সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না! দেখলে তা'র চোখে কেমন এক রকম বিহ্বল দৃষ্টি, আর সমস্ত মুখখানা হাঁড়ীর মতো ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো যেন লাল করম্‌চা! তখন করিমন খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাল কোরে লালমোহনের পানে চেয়ে দেখে বল্লে—"ও মা, এ কি হ'য়েছে গো! গায়ে গুটি বেরিয়েছে যে!" লালমোহন অতি কষ্টে একখানা হাত তুলে নিজের কপালে ঠেকালে, ইসারা করে জানিয়ে দিলে যে তা'র কথা বলবার শক্তি নেই। কল্যাণীও সেই সময় কাপড় কেচে বাসন মেজে হন্তদন্ত হ'য়ে এসে ঘরে ঢুক্‌ছিল,—দরজায় পা দিয়েই সে সব বুঝতে পারলে। ভোরের আঁধারে যা চোখে পড়েনি, দিনের আলোয় তা' স্পষ্টই দেখতে পেলে। তা'র মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল,—হাত-পাগুলো তারও যেন সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেল। বাসনগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে সে বসে পড়লো, কেবল মুখ দিয়ে তার একটা অস্পষ্ট কথা বরুলো—"কি হবে মা!"

করিমন ঝেঁঝে উঠে বল্লে—"কি আবার হবে? নাও ওঠ, আমি কেবল ছোঁবই না, বাহিরে থেকে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। রসো না,—এখনই ওঝা ডেকে আনছি। তুমি তোমার ঐ যে কি বলে সে দেবতার নাম করে পয়সা তুলে রাখ ত দেখি।"

কল্যাণী কেঁদে ফেল্লে। লালমোহন সবই বুঝতে পারছিল—তারও চোখ জলে টপ্‌টপে হ'য়ে উঠলো।

করিমন কল্যাণীকে ধমক দিয়ে বল্লে—"বেটীর পানসে চোখে জল লেগেই আছে। অমন করলে আমি কিছু পারব না ব'লে রাখছি। এখনই ঘরে চলে' যা'ব। আর এদিক মাড়া'ব না। ব্যারাম কি লোকের হয় না?"

কল্যাণীর লজ্জা হ'ল—অনুশোচনা হ'ল। চোখের জল মুছে উঠলো। একখানা শুক্‌নো কাপড় আল্‌না থেকে পেড়ে নিয়ে বাহিরে ছাড়্‌তে চলে' গেল। তাই দেখে লালমোহনের চোখে আবার একটু তৃপ্তির আভাস ফুটে উঠ্‌লো। স্ত্রীর বিপন্ন ভাব দেখে সে আপনাকে আরও যেন বিপন্ন মনে ক'রছিল।

সেই সময় তা'দের পড়সী লক্ষ্মণ মাইতি একখানা ভাঁজ-করা কাগজ হাতে কোরে উঠানে এসে দাঁড়ালো দেখে, করিমন আর কল্যাণী এক সঙ্গেই জিজ্ঞাসা ক'রলে কি তা'র দরকার।

লক্ষ্মণ বল্লে—"মাধব সামন্ত সেই যে তা'র বিধবা ভাজের জমীখানা পোনের টাকায় বাঁধা রেখেছিল, এখন টাকা পেয়েও সে তা ছাড়তে চায় না, বলে, আরও দশ টাকা দিচ্ছি আমায় একেবারে বিক্রী করে দাও। তা' অতখানি জমী কি ছ' গণ্ডা এক টাকায় বেচ্‌তে মন লাগে?"

করিমন বল্লে—"তা তুই বেচবি কেন? বাঁধা রাখলেই কি বেচতে হয়?"

কল্যাণী জিজ্ঞাসা ক'রলে—"তুমি এখন কি করতে চাও লক্ষ্মণ?"

লক্ষ্মণ বল্লে—"সেই কথাই ত বাবা ঠাকুরের কাছে বল্‌তে এসেছি। ওনার কাছে সলা করে যা যুক্তি হ'বে সেই মতোই ক'রবো মাঠাক্‌রুণ—শুনন্ু উনি না কি ঘরে আছে?"

তখন কল্যাণী তা'র স্বামীর ব্যারামের কথা বল্লে। শুনে লক্ষ্মণ চম্‌কে উঠলো—"মা'র দয়া! বল কি মাঠাক্‌রুণ?"

"হ্যাঁ—তাই ত হ'য়েছে। এখন ত ওসব কথা হ'তে পারে না লক্ষ্মণ, উনি ভাল হ'য়ে উঠুন—"

লক্ষ্মণ বল্লে—"সে কথা কি একবার বল্‌তে? কি আর আমার এমন কাজ,—ছাইএর কাজ,—না হয় আমার জমীটুকু যা'বে, ওনার পরাণটা থাক্‌লে—"

করিমন বল্লে—"চুপ কর বাপু, বেশী কথা ক'ও না; তুমি একবার মহেশতলায় যাও দিকি—"

"গিরীশ চক্কোত্তিকে ডাকতে? এক্ষুনি;—শেতলা বাড়ীর চক্কোত্তি মশাই এলেই মা'র দয়া সেরে যাবে।" তার পর কল্যাণীর দিকে চেয়ে বল্লে—"দোরটা ছাড় না মাঠাকরুণ, আমি একবার বাবা ঠাকুরকে দেখে যাই?"

দরজা ছেড়ে দিতে লক্ষ্মণ ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলে, লালমোহন চোখ বুজে পড়ে আছে। অনেকবার ডেকেও আর তা'র সাড়া মিললো না। এই অজ্ঞান আচ্ছন্ন ভাব দেখে কল্যাণীর চোখের জল আর বাধা মানলো না—হুহু করে দু'গাল বেয়ে পড়তে লাগলো। করিমনও এবার ততটা শক্ত হ'তে পার্লে না, আঁচলে চোখ মুছে বল্লে,—"যা লক্ষ্মণ, আর দেরী করিসনি—চক্কোত্তি মশাই আবার কোন্ গাঁয়ে বেইরে যাবে, তাঁর অনেক দূরের ডাক আসে।"

লক্ষ্মণ বল্লে—"আমি যেখান থেকেই হোক্ ঠাকুরকে পাকড়া করে আনবো, তার ভয়টা কি? কিছু ভেব না মাঠাকরুণ—ওনার জন্যে গাঁশুদ্ধ লোক আমরা পেরাণ দেব। তুমি ঘরে ধুনো গঙ্গাজল দাও—আর যা' তা' কাপড়ে ছুঁও না। ছেলেটাকে না হয় আমাদের বউ এসে নেবে'খন"—এই বলেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

৩

এক মাস মরণ-বাঁচনের সন্ধিক্ষণে থেকে মা শীতলার অনুগ্রহে লালমোহনের জীবনের আশা পাওয়া গেল। কল্যাণীর অক্লান্ত সেবা আর পাড়া পড়সী আবাল বৃদ্ধ বনিতার আন্তরিক যত্ন ও নিঃস্বার্থ চেষ্টা তদ্বিরের ফলে এ যাত্রায় সদ্য মৃত্যুর মুখ হ'তে সে ফিরে এল। মা শীতলার সেবাইৎ গিরীশ চক্রবর্ত্তী এখনও প্রত্যহ আসে। অন্যান্য স্থলে সে অনেক উপার্জ্জন ক'রলেও এখানে,—এই দরিদ্র পল্লীর লোকেরা, বেশী অর্থ তাকে জোগাতে পারেনি। লালমোহনের অবস্থা যখন নিতান্তই সঙ্কটাপন্ন,—যখন সে একেবারেই বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত, সেই সময় কথায় কথায় চক্রবর্ত্তী শুনেছিল যে এরা ব্রাহ্মণ,—মাত্র কয়েক বৎসর এই পল্লীতে বাসা ক'রে আছে; আর নিকটস্থ চটকলে তাঁত চালায়। আলিমদ্দি সর্দ্দার আর তার স্ত্রী করিমন বিবি এদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। চোখেও দেখা গেল যে এই মুসলমান দম্পতি লালমোহন আর কল্যাণীকে যেন ঠিক নিজের ছেলে মেয়ের মতোই স্নেহ করে। ওই দু'টী প্রৌঢ় স্ত্রী পুরুষ দিবারাত্রি সজাগ পাহারা দিয়ে এদের রক্ষা ক'রছে, আর তা'দেরই খাতিরে আর হুকুমে অন্যান্য প্রতিবাসীরাও যখন যা' দরকার এনে যোগাচ্ছে। এই পাড়াটায় মুসলমানেরই ভাগ বেশী, মোটে দু' পাঁচ ঘর হিন্দু বাস করে। সকলেই চটকলে তাঁতের কাজ করে; সেইজন্য এখানটার নামই তাঁতীপাড়া। তা'দের মধ্যে কারো কারো ঘরে আবার হাতে চালানো তাঁতও আছে; তাতে তারা কাপড় গামছা বুনে ঘরাও খদ্দেরদের বিক্রী করে; এমন কি এখানকার কেউই কাপড় কিনতে সহজে বাজারে ছোটে না। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর একটা মজার জিনিষ লক্ষ্য করলে; সেটা এই যে—লালমোহন আর কল্যাণীর ঘর-সংসারের যা কিছু সবই ওই ক'ঘর হিন্দু পড়সীরাই নির্ব্বাহ করে দিচ্ছে। রাঁধবার যোগাড় তারাই করে দেয়,—কেবল একবার কল্যাণী দু'টো চাল ফুটিয়ে নেয় মাত্র। তা'র কচি ছেলেটি পর্য্যন্ত অপর একজনের কাছে মানুষ হ'চ্ছে। লক্ষ্মণ মাইতির স্ত্রী তা'কে নিয়ে রেখেছে।—মাই পর্য্যন্ত খাওয়াচ্ছে। বাইরের সব দেখাশুনা, ওষুধ-পত্র আনা, লোকজন ডাকা, দিন-রাত্রি পাহারা দেওয়া, রাত জেগে বসে' থাকা, এসব আলিমদ্দি আর তার স্ত্রী আর তাদের স্বজাতির মধ্যে আরও দু'চারজনই ক'রে থাকে। গরুর দুধ দুয়ে এনে উনান ধরিয়ে দিচ্ছে মুসলমান—আর তাই জ্বাল দে' এনে রোগীকে খাওয়াচ্ছে হিঁদু—এ বেশ দেখবারই তারিফ্! ভিন্ন ধর্ম্মীর মধ্যে এ-রকম সম্প্রীতি দুর্লভ!

সেদিন চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করলে—"আজ কেমন বোধ ক'রছো লালমোহনবাবু?" লালমোহনের জ্ঞান হবার পর থেকে তাকে 'বাবু' 'মশায়' ছাড়া গিরীশ চক্রবর্ত্তীর থেকে অপর সম্বোধন বা'র হয়নি। নেহাৎ কুলির মত তা'কে দেখাত না।

লালমোহন একটু চুপ্ করে থেকে তার পর বল্লে—"কাল থেকে বেশ একটু সুস্থ বোধ ক'রছি। তবে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলুম, পা' কাঁপতে লাগলো।"

কল্যাণী ঘোমটাটা একটু সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বল্লে—"এখনই দাঁড়ান কেন বাপু? কোবরেজ মশায়, আপনি ওঁকে চলাফেরা ক'রতে মানা ক'রে দিন।"

আলিমদ্দি কাজ থেকে ফিরে এসেছে তখন। সে বল্তে লাগলো—"না লালু-খুড়ো, ওরকম গোঁয়ারতুমি ক'রো

না বাবু,—খোদার দোয়ায় পরাণটা য্যাখন ফিরে পেয়েছ, ত্যাখন দুদিন পরে ত সবই হ'বে ?"

লালমোহন বল্লে—"বাঁচলে সবই যে চাই। অজ্ঞান ছিলুম কোন চিন্তাই ছিল না ; ওমনি ওমনি যদি অজ্ঞানই থেকে যেতুম—"

"কি হ'ত তা'হলে ?"

"কি হ'ত ? হুঁঃ—কি আর হ'ত !—"

"দ্যাখ খুড়ো, মনটাকে অমনতর গুমরে রেখ না। ওর চেয়ে আর পাপ নেই বাবু।"

সে কথা কাণে না তুলেই লালমোহন ব'ল্লে—"বাবু কি বল্লে সর্দ্দার ?"

"কি আবার বল্‌বে ? একটা এক্‌টিনি লোক দে আমি কাজটা চালিয়ে নে যাচ্ছি। তুমি সেরে উঠলেই কাজে গে বসবে। আমি য্যাতক্ষণ আছি ত্যাতক্ষণ তোমার ভাবনা এক চুলও নেই।"

"তা ঠিক বটে ; তবে বাবু—হরিবিলাসবাবু আমার উপর কি জানি কেন—"

"তোমার উপর নারাজ বল্‌ছো ? হ্যাঁ—তা' একটু সময় সময় চুকলী কাটে বটে,—তা' হোক্‌গে। আমাকে চটিয়ে সে কিছু করতে পারবে না। এইখানে তার পরাণ, জান্‌লে ?" এই বলে সে আপনার ট্যাঁক্‌টা দেখিয়ে দিলে।

আলিমদ্দির কথায় লালমোহন একটু বিরক্ত হয়ে ডাক্‌লে "সর্দ্দার—"

আলিমদ্দি থতমত খেয়ে গিয়ে বল্লে—"না—তাই বল্‌ছি। তা'বলে কি দেব না কি ?"

লালমোহন অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বল্লে—"দেখো, তা যেন তোমার দ্বারা অন্ততঃ না হয় সর্দ্দার। প্রতিজ্ঞা করে তা পালন করা চাই।"

গিরীশ চক্রবর্ত্তী তাদের দুজনের কথাবার্ত্তা বুঝতে না পেরে উঠে পড়ে বল্লে—"ওসব ভাবনা এখন দিন কতক ছেড়ে দিয়ে আগে বেশ সেরে উঠুন লালমোহনবাবু।" বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

আলিমদ্দিও তার সঙ্গে সঙ্গে উঠানে নেমে এসে বল্লে—"আমিও তাই বল্‌তে লেগেছি কোবরেজ মশায় ; বলে ভারি ত কর্ম্ম ! লালু খুড়ো ঝা নেকাপড়া জানে, অমন দশটা বাবুর কাজ একা করতে পারে।"

চক্রবর্ত্তী একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"নেকা-পড়া জানে ?"

"জানে বৈ কি !—অনেক জানে। বাবুদের তাই লেগেই ত এত আক্রোশ, বলে, কোন্ দিন সায়েবের নজরে নেগে যা'বে, শেষকালে আমাদের তাড়া'বে।" কথা কইতে কইতে তখন তা'রা দুজনেই বেড়ার ধারে এসে পড়লো।

চক্রবর্ত্তী বল্লে—"তবে সর্দ্দার সে অমন ছোট কাজ ক'রছে কেন ?"

"কাজটা কি ছোট হ'ল কোবরেজ মশায় !"

গিরীশ একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বল্লে—"না, তা নয়, তবে কি না নেকাপড়ার কাজও ত নিতে পারতো ?"

"সে ওর খেয়াল ঠাকুর মশায়। আমি আগেই তা' লালুখুড়োকে বলেছিলুম। বলেছিলুম সাহেবের কাছকে গে' দাঁইড়ে পোর্‌চয় কর।—অমন খুবসুরৎ চেহারা, ঠিক ভুলে যা'বে, তোমায় নেকাপড়ার কাজ দেবে। তা' ও বল্লে' যে না, তাঁতীর কাজ শিখতে ওর বড্ডা ইচ্ছে। তাই ত আমি হাতে ধরে কাজ শেখাম্‌। নইলে ? বাস্‌রে ! যা ইঙ্গিরী বই পড়ে !"

বেড়ার আগলটা খুলে দুজনেই পথে বেরিয়ে পড়লো। শীতের সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দুর থেকে পথে একটা লোক হন্ হন্ করে এগিয়ে আস্‌ছিল, কিন্তু সাম্‌নে দু'জন মানুষকে দেখেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আপনারা বল্‌তে পারেন, শিশির চাটুয্যে এখানে কোথায় থাকে ?" সেদিকে কাণ না দিয়ে গিরীশ চক্রবর্ত্তী বল্লে—"আজ তবে চল্লুম সর্দ্দার, এবার চারদিন পরে আসবো। আর কোন ভয় নেই, একটু সাবধানে থাক্‌লেই সব সেরে যা'বে।"

আলিমদ্দি বল্লে—"তবে সেলাম কোবরেজ মশায়, মধ্যে মধ্যে এখন দেখবেন। আমি আপনার যেমন করে পারি মান রাখবো।"

গিরীশ চক্রবর্ত্তী চলে' যাবার পর আলিমদ্দি মিঞা আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলে—"কার নাম আপনি বল্লেন ? শিশির চাটুয্যে ! কই না ত', ও নামের কেউ এখানে ত নেই। আপনি কোত্থেকে আস্‌ছেন ?"

"চন্নপুর থেকে—"

"কম্‌নে যাবেন ?"

"এই তো স্যাঁক্‌রেলের কলবাজার ?"

"স্যাঁক্‌রেল বটে, তবে কলবাজার আরও পো টাক্ পথ, সে কলের ঠিক্ পশ্চিম গায়ে। এটা হ'ল পূব্ব্ দিক্।"

"তাঁতীপাড়া কোন্‌খানটায় বল্‌তে পার ?"

"সে তো এইখানটাই। এরেই তাঁতীপাড়া বলে।"

"তাহ'লে তোমাদের এখানে শিশির চাটুয্যে বলে' কেউ নেই ?"

"উহুঁ। এখানকার সব আমি জানি।"

"এই ২০।২২ বছরের ছোকরা, লম্বা চওড়া চেহারা, বেশ ফর্শা, জোয়ান্, মাথায় কোঁক্‌ড়ানো চুল, আর এখানে তা'র স্ত্রীকে নিয়ে বাসা ক'রে আছে—"

সেই সময় করিমন বিবি লালমোহনের বাড়ীতে আস্‌ছিল, আগলের ধারে অচেনা লোক দেখে সে এক পাশে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এদেরই কথাবার্ত্তা শুন্‌ছিল। আগন্তুকের মুখে চেহারার বর্ণনা শুনে এগিয়ে এসে বল্লে—"হ্যাঁ গো বাবু, ওই রকম ছেলে বৌ নে' এখানে একজন আছে—আমি তা'দের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোমার কি নাম বল দিকি ?"

করিমনের কথায় আগন্তুক যেন একটু আশ্বাস পেয়ে হাপ ছেড়ে ব'ল্লে—"চল ত বাছা দেখিয়ে দেবে।"

আলিমদ্দি তা'র স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"তুই তেমন লোক্‌কে জান্‌বি কি করে' ? যা' তা'একটা ওমনি বল্লেই হ'ল ?"

করিমন বল্লে—"যা' তা নয় ; তুমি চুপ কর না। তোমার নাম কি গা ?"

"আমার নাম ? আচ্ছা বোলো, বাঞ্ছারাম।"

"আচ্ছা। আপনি এখন তাহ'লে এনার সঙ্গে যাও ; আমি একটু কাজ সেরে তোমায় তা'দের বাড়ী দে' আস্‌বো। ওগো তুমি তোমার দাওয়ায় ত্যাতক্ষণ বসাও গে, আমি এখুনই আসছি।"

আলিমদ্দি একটু হতবম্ব মেরে গেল। কিন্তু স্ত্রীর কথায় আর কোনও বাদানুবাদ না করে' আগন্তুককে নিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল। আর করিমন বিবি তখন আগল ঠেলে কল্যাণীদের বাড়ী ঢুক্‌লো।

৪

পরের দিন দুপুর বেলায় ঘরের মেজেয় একখানা মাদুরের ওপর লালমোহন শুয়ে ছিল, আর বাঞ্ছারাম বসে' তা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছিল। একটু দূরে কল্যাণী তা'র ছেলেকে দোলায় শুইয়ে আস্তে আস্তে তা'কে দোল দিতে দিতে উভয়ের কথা শুনে যাচ্ছিল। বাঞ্ছারাম বল্লেন,—"তুমি যাই কেন না বল, তোমার আরও দিন কতক কোল্‌কেতার বাসায় থেকে অপেক্ষা করা উচিত ছিল না কি ? তা' হ'লে ত আমার সঙ্গে দেখা হ'ত। তুমি চলে' আস্‌বার দিন আষ্টেক বাদেই আমি গিয়ে দেখলুম কেউ কোথাও নেই।"

লালমোহন বল্লে—"আমার তখনকার মনের অবস্থা আপনি কল্পনা করতে পার্‌বেন না। আমি তখন নির্ব্বান্ধব, নিঃসহায়। আপনারা সকলেই আমায় ছেড়ে গেছেন। তা'র ওপর ঘাড়ে একটি মুমূর্ষু রোগী,—তিনি ত বে'র সাত দিন পরেই মারা গেলেন।"

—"কেন, সমিতির ছাত্রেরা ?"

—"একমাত্র সুশীলবাবুই শেষ পর্য্যন্ত এসেছিলেন। আর সকলেই একে একে আমায় ত্যাগ ক'রেছিল। যে মুহূর্ত্তে প্রকাশ হ'ল যে বে' করার অপরাধে বাবা আমায় তেজ্যপুত্র ক'রেছেন—বিষয় থেকে আমি বঞ্চিত হ'য়েছি, সেই মুহূর্ত্তেই সকলে আমাকে একটা দুঃস্বপ্নের মত—সমাজের অস্পৃশ্যের মত ভেবে নিয়ে গা' ঢাকা দিলে। শুন্‌লাম—বাপ-মা তা'দের আমার সঙ্গে মিশতে বারণ ক'রে দেছে।" বলেই লালমোহন হাস্‌তে লাগলো।

বাঞ্ছারাম আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন—"কি দুর্ভাগ্য সমাজের। অপরাধ কই—অপরাধ কোথায় ?"

কল্যাণী এতক্ষণ চুপ করে বসে' ছিল—মাথার কাপড়টা একটু সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বল্লে—"আমি সেই সময়েই বলেছিলুম আমায় ত্যাগ ক'রে ঘরে ফিরে গিয়ে বাপের পায়ে ধরে মার্জ্জনা চাইতে। তাহ'লে আজ এই দীনহীন কাঙালের মত এই দূরদেশে লুকিয়ে থাক্‌তে হ'ত না। তুমি যেখানকার সেথায় থাক্‌তে, বাপ-মারও মর্য্যাদা থাক্‌তো। আমার ভাগ্যে,—আমিই তোমার চিরজীবনের পথের কাঁটা হ'য়ে রইলুম।" তা'র গলাটা ধরে' এল, সে আর কথা কইতে পারলে না। চুপ ক'রে বসে নখে ক'রে মাটিতে আঁক কাট্‌তে লাগলো।

লালমোহন অনেকক্ষণ ধ'রে সেই স্থির নিশ্চল প্রতিমার মত মূর্ত্তিটির পানে চেয়ে থেকে বল্লে—"কি দোষে তোমায় ত্যাগ ক'রবো কল্যাণী ? একদিন আদর ক'রে তোমায় গ্রহণ

ক'রেছিলুম কি আর একদিন তোমায় ত্যাগ ক'রবো বলে' ?"

কল্যাণী বল্লে—"তখন ত আমি জানতুম না যে তুমি তোমার বাপ মা সকলকার অমতে বে' করছো।—মাসীমার কথাও থাক্‌বে না, সমাজও আমাদের বে'তে মত দেবে না।"

একটু বিরক্তির সঙ্গে লালমোহন বল্লে—"সমাজ মত দিক্ চাই না দিক্, বে' ত ফেরান চলে না কল্যাণী? শালগ্রামও ছিল—পুরোহিতও ছিল, অনুষ্ঠানের ত্রুটিও কিছু হয়নি। লোকাচার মানিনি বটে, শাস্ত্রের ত কোনই অমর্য্যাদা করিনি।"

বাঞ্ছারাম বলে' উঠলেন—"লোকাচারই এখন শাস্ত্রকে ছাপিয়ে উঠেছে। লোকে শুনে কি বলবে সেই ভেবেই মানুষে অস্থির যে—"

লালমোহন জিজ্ঞাসা ক'রলে—"মানুষের মনুষ্যত্বকে, কর্ত্তব্যকে লোকাচারের নাগপাশে বেঁধে রাখাটাই কি সমাজের প্রধান কাজ?—চুপ ক'রে রইলেন কেন? আপনিই ত এ বিবাহ দেছেন?"

বাঞ্ছারাম বল্লেন—"আমার আর এতে বলবার কি আছে? আমি বিবেকেরই অনুসরণ ক'রেছিলাম।" তা'র পর একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বল্লেন—"তবে দেখ, আমি শাস্ত্রই পড়েছি,—পৌরোহিত্য কখন' করিনি; হয়ত তাঁ'দের মতে এটা ঘোর অন্যায়। তাঁ'রাই ত এখন সকল বিধান দিয়ে থাকেন, লোকেও তাই মেনে চলে। আমি তোমার এই বিবাহে মত দিয়েছি, নিজেই সম্প্রদানের মন্ত্র পড়িয়েছি;—কিন্তু আমার দাদা তোমাদের কুল-পুরোহিত, তাঁ'রই বিধানে তোমার বাপ্ তোমায় তেজ্যপুত্র ক'রেছেন—আর অসামাজিক কাজে সহায়তা ক'রেছি বলে' আমার বাসোচ্ছেদ ক'রে আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

এই ঘটনা শুনে পর্য্যন্ত তা'দের স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে বড় আঘাত লেগেছিল। গত রাত্রে বাঞ্ছারাম যখন তাঁর অপমান আর লাঞ্ছনার কথা বিবৃত ক'রেছিলেন—কেমন ক'রে লালমোহনের বাপ্ তাঁ'কে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে দাসী-চাকরের সমুখে অপমান করে' বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কর্ম্মচারীদের হুকুম দিয়ে তাঁ'র ঘরের চাল কেটে তা'তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সে সময় লালমোহন আর কল্যাণীর চোখের জল বাধা মানেনি। দু'জনেই কাতর হ'য়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রেছিল। এখন আবার সে কথার উত্থাপন হওয়াতে তা'রা মাথা নীচু ক'রে বসে' রইল। অনেকক্ষণ ঘরটার মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ ক'রতে লাগ্‌লো—কা'রো মুখ দিয়েই কোন কথা বা'র হ'ল না। খানিকটা সেই ভাবে কেটে যা'বার পর বাঞ্ছারাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"এখন মনে হয় তোমরা, দু'জনে সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিলেই বোধ করি ভাল হ'ত, কা'রো কোন কথা বল্‌বার থাক্‌তো না।"

লালমোহন অল্প হেসে বল্লে—"হ্যাঁ—মনকে চোখ ঠারা হ'ত বটে। কেউ কেউ সে কথা বলেও ছিলেন, কিন্তু আমি সেটাকে কাপুরুষের কাজ বলে মনে ক'রেছিলুম।"

—"কাপুরুষের কাজ মনে ক'রেছিলে!" বাঞ্ছারাম বিস্মিত হ'য়ে লালমোহনের মুখের দিকে চাইলেন।

লালমোহন কতকটা যেন কৈফিয়ৎ দেবার মতই বল্লে—"না না, আপনি আমার কথায় মনে ক'রবেন না তাব'লে যে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের দোষ দিচ্ছি। সে কথা নয়। সে ধর্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট উদারতা আছে আমি তা' অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি কেন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রতে যা'ব? সহায়-সম্পত্তি-হীনা নিস্তারিণী দেবীর অরক্ষণীয়া মেয়েকে বিবাহ ক'রে, বা সেই অবস্থার মধ্যে থেকে বারেন্দ্র সমাজের একটি পাত্রীকে ঘরে এনে সত্যই কি আমি ধর্ম্মে পতিত হ'য়েছি?"—তার পর একটু চুপ ক'রে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে আবার লালমোহন বলতে লাগ্‌লো—"যাক্, কেন আর মিছে সে সব কথার আলোচনা করা। এ নিয়ে ত আপনারা অনেক বাদানুবাদ ক'রেছেন, আমাকেও যেমন আদেশ দিয়েছিলেন—কর্ত্তব্য ভেবে আমিও তাই ক'রেছিলুম।"

অনেকক্ষণ আবার সব চুপ্‌চাপ্ রইল। তার পর বাঞ্ছারাম বল্লেন—"তোমার শেষটা ত এখন শোনা হয়নি? লেখাপড়া হঠাৎ ছাড়্‌লে কেন?"

লালমোহনের রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে আবার একটু ম্লান হাসি দেখা দিলে। সে বল্লে—"কই আর তা' হ'ল। আগের মাস থেকেই ত বাবা টাকা বন্ধ ক'রে দিছলেন। আপনি চলে' যা'বার পর একদিন কলেজ থেকে এসে দেখি, আমার সেই মানুষ-করা মা—যে আমার বাসায় ছিল, এরই কাছে

একখানা চিঠি আর কিছু টাকা রেখে পুরন ঝিটাকে পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়ে দেশে চলে গেছে। চিঠিটা আপনারই,—পড়েও ব্যাপারটা বুঝে নিলুম। তবে মনে ক'রেছিলুম দু'একদিনের মধ্যেই ফিরবে। দু' হপ্তা কেটে গেল, কেউ এল না। তা'র পর কল্যাণীর মা' যেদিন মারা যান্ সেইদিন আবার বাবার উইলের কপি পেলুম—বাবাই পাঠিয়েছেন, তা'তে আমায় তেজ্যপুত্র করা আছে। আমি কিন্তু কোন কথাই কা'রো কাছে লুকুই নি। বাড়ীওলা ভাড়ার তাগাদা জুড়ে দিলে। নতুন ঝি চাকর মাইনে না পেয়ে হৈ হৈ ক'রতে লাগ্‌লো; ডাক্তারও বাকি টাকা ক'টার জন্যে লিখে পাঠা'লে। দেখ্‌লুম আসরে নামা'বার বেলা বাঙালী সমাজে অনেকে জোটে, শেষে কৈফিয়ৎ দেবার সময় এলেই সব গা' ঢাকা দেয়—আর আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখে।" এই পর্য্যন্ত বলেই লালমোহন শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে' বালিসে মাথাটা দিয়ে শুয়ে পড়লো।

বাঞ্ছারাম বল্লেন—"আমাদের ওপর যেন সে কলঙ্ক চাপিও না। আমি যে কেন আস্‌তে পারিনি, তা'র কারণ ত সবই শুনেছ। তা'র পর তিনি, যিনি তোমায় মানুষ ক'রেছেন, তিনি মস্ত বড় একটা ভুল ক'রেছিলেন;—তাঁ'রই বিশেষ অনুরোধে আমি দেশে গিয়ে সেখানে যা' যা' ঘটেছিল—কেবল সেই খবরটা দিছলুম,—তাই লিখেছিলুম তোমার বাবা উইল বদ্‌লেছেন; তিনি কেন যে তা'র প্রতীকার করবার আশায় একেবারে সেথা গিয়ে হাজির হ'লেন বল্‌তে পারি না। অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতা হ'য়েছিল তাঁ'র। হয় তো বা তোমার বাবা বাড়ীতে তাঁ'কে বন্দী ক'রে রেখেছেন—তাই বা কে বল্‌তে পারে? এক বছর আমি গ্রামের ত্রিসীমানায় যাইনি। সহরেই ছেলে পড়িয়ে কোন গতিকে চালাচ্ছি। সম্প্রতি—এখানে আসবার কিছু দিন আগে শুনলুম তোমাদের বাড়ীর সকলেই না কি কোল্‌কেতায় র'য়েছেন।" লালমোহন বিরক্তভাবে বল্লে—"যাক্ সে কথা, এখন আমার কথাটা শুনুন। শেষে তাগাদার চোটে অস্থির হ'য়ে আমি আমার ঘড়ী চেন্ আংটী যা' ছিল সব বেচে সকলের দেনা মেটা'লুম। বাসা কাজে-কাজেই তুলে দিতে হ'ল। তার পর ভাবলুম, কোল্‌কেতা সহর—ছেলে ফেলে পড়িয়ে যা' হয় ক'রে একটা ব্যবস্থা ক'রে নেব। তাই কল্যাণীকে ওর এক পিসীর বাড়ীতে দিন কতক রেখে একটা আস্তানা খুঁজে বা'র ক'রবো ভেবে একদিন ওকে সেখানে নিয়ে গেলাম—"

বাঞ্ছারাম আগ্রহের সহিত বল্লেন—"সে তো খুব ভালই হ'ত—"

—"আগে শুনুন না, ভাল ত হ'ত, কিন্তু তা'তে আরও বিপরীত হ'ল।"

—"বটে? তিনি কি বল্লেন?"

—"তিনি যা' বল্লেন, সে কথা মুখে আনা চলে না। অনেক অকথা কুকথা বলে' তিনি কল্যাণীর স্বর্গীয়া মা'কে গালাগালি ক'রলেন, আর জানালেন যে তাঁর স্বামী একজন সমাজপতি লোক, ও মেয়েকে ঘরে রাখ্‌লে পাঁচজনে গায়ে থুথু দেবে। তা'র পর গৌরচন্দ্রিকা শেষ হ'লে স্পষ্ট বল্লেন—'তুমি বাপু তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এখনি চলে' যাও। নইলে কর্ত্তা এসে পড়্‌লে একটা অনর্থ বাধা'বে, পাঁচজনে তা'কে মানে গণে,—ও কলঙ্কের কথা আর ঢাক পিটে বেড়িও না।"

বাঞ্ছারাম স্তব্ধ হ'য়ে লালমোহনের মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বল্লেন—"তোমার শ্বশুরের আজ যদি হাজার দশেক টাকার কোম্পানীর কাগজ বা ইন্‌সিওরেন্স্ পলিসি থাক্‌তো, তাহ'লে দেখ্‌তে—তিনিই আবার আদর ক'রে তোমাদের গাড়ী থেকে নামিয়ে নিতেন।"

লালমোহন বল্লে—"তা হয় ত হোত। তখন সেই সন্ধ্যার সময় পথের মাঝে আমি কি করি! বাসা তুলে দিয়েছি। আমি অঘোর ভাবনায় পড়লুম। কল্যাণী কাঁদছে—পিসীর দুর্ব্বাক্য বুকে তা'র শেল বিঁধে দিয়েছে। কিছু না ঠিক ক'রতে পেরে তাড়াতাড়ি গাড়ী ফিরিয়ে এক বন্ধু—আপনি ত জানেন সেই নলিনীদের বাড়ী—?"

—"হাঁ—হাঁ, যা'র বাড়ী থেকে তোমার বে' হ'য়েছিল।"

—"হাঁ। তা'দের বাড়ীতে গিয়ে নামলুম। কিন্তু আর সে নলিনী ছিল না। তা'রা বড়লোক—বাপ ধানবাদের কুঠিতে থাকে, মা' আর ছেলে কোল্‌কেতায় থাকে। সেদিন আমায় তা'রা আমলই দিলে না।"

—"কেন—কেন, তা'রা ত আগে অনেক সাহায্য ক'রেছিল?"

—"তখন জানতো আমিও জমীদারের ছেলে, তাই সাহায্য ক'রেছিল। পথের ভিখারী দেখে আর সে ভাবে

কথাই কইলে না।" একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস লালমোহনের বুক থেকে উঠে গলার কাছে আট্‌কে তা'কে একেবারে চুপ্ করিয়ে দিলে,—সে যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে হাতখানা বুকের ওপর রেখে আবার শুয়ে পড়লো।

ঘরটার মধ্যে তখন যেন জমাট নিস্তব্ধতা বিরাজ ক'রতে লাগ্‌লো—কা'রো কোন কথা ক'বার শক্তি ছিল না। খোলার চালের ওপর একটা কাক্ উড়ে এসে বস্‌তেই সেই শব্দটায় সকলকার চমক ভাঙিয়ে দিলে। বিষণ্ণ মুখে কল্যাণী বল্‌তে লাগ্‌ল—"ওগো, চুপ কর, এখনও তোমার শরীর বড় দুর্ব্বল, কথা বল্‌তে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছো—ও পুরন কাহিনী বলে' আর কি হ'বে?"

লালমোহন আবার উঠে বসে' বল্লে—"না, কল্যাণী কথাটা শেষ' করে নি। পূর্ব্বেই সব লোক-জানাজানি হ'য়ে গিছলো। আমাদের গোমস্তা বাবার হুকুমে আমার সব বন্ধু-বান্ধবের কাছে আমার নামে অনেক কথা বলে' গিছলো। আমার দুষ্কৃতির জন্যেই যে বাবা আমায় তেজ্যপুত্র ক'রেছেন, এইটাই সকলের বিশ্বাস। নলিনীও আমায় আশ্রয় দিতে স্বীকার ক'রলে না। তা'র মা আগে আমায় কত ভালবাসতেন, তিনি ভিতরে ডাকিয়ে বল্লেন—'না বাছা, তোমার অনেক দোষ, তুমি স্বদেশী কর, খদ্দর পর, কোম্পানী তোমার পিছনে লেগে আছে। তোমার আপন বাপ্‌ই যখন ঠাঁই দিতে ভয় পেলে, তখন আমরা বাছা আর কি ক'রতে পারি?' নলিনীর ব্যবহারে আমার মাথাটার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে' উঠ্‌লো। বাপ-মা, সমাজ-ধর্ম্ম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সব একে একে আমার চোখের সমুখ থেকে সরে' গেল। আর কা'রো কথা আমার মনে রইল না। নলিনীকেও আর বিপন্ন ক'রতে চাইলুম না। কল্যাণীকে নিয়ে রাত্রিটুকু কোন গতিকে তা'দের বাইরের ঘরে কাটিয়ে, ভোরের অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে কা'রেও কোন কথা না বলে' একেবারে আর্ম্মানী ঘাটে এসে হাজির হ'লুম,—তা'র পর দু'খানা রাজগঞ্জের টিকিট কিনে দু'জনে বেলা দশটার জাহাজে চড়ে' বস্‌লুম। তখন আমার সঙ্গে ছিল পাঁচ টাকা দশ আনা আড়াই পয়সা। সেই থেকে হেতা আমি কি ক'রছি না ক'রছি তা' ত সবই শুনেছেন?"

বাঞ্ছারাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"আলিমদ্দি সর্দ্দারের মধ্যেও অনেক মনুষ্যত্ব আছে। যাই হোক্, আমাকেও যদি একটা খবর দিতে তাহ'লে এতকাল ধ'রে তোমার অনুসন্ধান ক'রে বেড়া'তে হ'ত না। তখনই আমি চ'লে আস্‌তাম।"

লালমোহন বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল—হতাশভাবে বল্লে—"কারো আছে আমাদের অস্তিত্ব জানা'বার ইচ্ছা ছিল না। তবে না কি ব্যারামটা বড়ই শক্ত হ'য়েছিল, যদি মরে যাই, কল্যাণীর জানা লোক কেউ থাকবে না—সেই ভেবেই আন্দাজে পুরন বাড়ীওলার ঠিকানায় চিঠিখানা লিখেছিলুম, যদি কোন দিন আপনার চোখে পড়ে।"

বাঞ্ছারাম বল্লেন—"আমি যে প্রায়ই সেখানে সন্ধান নিতে যেতাম।"

সেই সময় বা'র হ'তে কে ডাক্‌লে—"লালমোহন বাবু কি ক'র্‌ছেন?"

লালমোহন একটু চকিত হ'য়ে বল্লে—"হরিবিলাস বাবু না কি? আসুন না।"

কোন জবাব না দিয়েই হরিবিলাস ঘরের দরজা ঠেলে উঁকি মারলে। কল্যাণী চট্ ক'রে ঘোমটা টেনে উঠে পড়লো। হরিবিলাস তাই দেখে যেন একটু অপ্রস্তুত হ'য়েই বল্লে—"ও—আপনার স্ত্রী এখানে আছেন—তবে এখন আসি। একটা বিশেষ কথা ছিল।" লালমোহন বসে' বসেই বল্লে—"না—না, সে কি কথা, আপনি একটু পাশ দিন্ না, এখনই ও চলে' যাবে।"

এক রকম দরজা চেপেই সে দাঁড়িয়ে ছিল, লালমোহনের কথায় সরে' দাঁড়া'তেই কল্যাণী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কল্যাণী মুখখানা ঢেকে ফেলবার পূর্ব্বেই হরিবিলাস তা'র অনুপম সৌন্দর্য্য আর অপূর্ব্ব যৌবনশ্রী দেখে এ'কবারে বিমুগ্ধ হ'য়ে গিছলো। কেবলই মনে হ'চ্ছিল—'এত রূপ লালমোহনের স্ত্রীর! হতভাগা,—একটা তাঁতি বই কিছুই নয়—।' কল্যাণী চলে গেলেও সে সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরে যে আরও দুজন আছে, সে কথা যেন সে ভুলেই গেল।

লালমোহন ডাক্‌লে—"আসুন, ঘরের ভিতর এসে বসুন—" হরিবিলাসের চমক্ ভাঙলো—"হ্যাঁ—এই যে" বলেই সে ঘরের ভিতর এসে বসে বল্লে—"কই, আপনি ত' এখনও সারতে পারেন নি?" বলেই সে লালমোহনের দিকে

চেয়েই চোখটা নামিয়ে নিলে। লালমোহনের চোখের একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ছিল। গম্ভীরভাবে লালমোহন বল্লে—"আপনার কি বলবার আছে বলুন—ইনি আমার আপনার লোক।"

৫

কল্যাণী তাদের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে ধীর-মন্থর গতিতে সোজাসুজি উঠানটা পার হ'য়ে ওদিককার ছোট রান্নাঘরখানির দাওয়াতে গিয়ে চুপ ক'রে বস্‌লো। হাতে তা'র তখন কোন কাজই ছিল না,—ছেলেকেও ঘুম পাড়িয়ে দোলায় শুইয়ে রেখে এসেছে। তখন সে কি ক'রবে না ক'রবে ঠিক ক'রতে না পেরে ভাবলে, তবে একবার নাস্তুদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি। নাস্তুর বাপ নফর মিস্ত্রী চট্‌কলেই কাজ করে, সেই পাড়াতেই থাকে। কল্যাণী উঠি উঠি ক'রছে, এমন সময় একদল ছেলে-মেয়ে মহা হৈচৈ ক'রতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। তা'দের দেখে কল্যাণী বল্লে—"কি রে কি, তোদের আজ আবার ঝগড়া বাধ্‌লো না কি? ওসব আবার কেন—ওসব এখন কে খাবে?" ছেলেগুলো তখন কেউ বা নাউ শাক্, কেউ বা পুঁই শাক্, কেউ গোটাকতক বিলাতী আমড়া, কেউ দু'টো কয়েৎবেল আর চারটি পাতি লেবু এনে তা'র পায়ের কাছে রেখে পরস্পর ঠেলাঠেলি ক'রতে ক'রতে ঢিব ঢিব ক'রে প্রণাম ক'রতে লাগলো। তা'দের মধ্যে একটু মাথায় উঁচু একটি ছেলে বল্লে—"বিলের কৈ, শিঙি মাছ ত' আন্‌তে পান্নুনি মা'ঠান্, নইলে আজ এই এত ছ্যাল।" অমনি তা'র মুখের কথা লুফে নিয়ে আর একটা গালফুলো গোবিন্দ গোছের ছেলে বল্‌তে লাগলো—"আলিগদ্দির বিবি মাছ আনতে দিলে না যে মা'ঠান, নইলে—হুঁ। এতক্ষণ আপনি তাহ'লে দেখতে পেতে।" কল্যাণী বল্লে—"না রে বাবা, না, মাছ-টাছ কিছু এখন আনিস্‌নি, ওসব এখন হাঁড়িতে তুলতে নেই যে ধন। আর এসবই বা এত আন্‌লি কেন—এত রাঁধবেই বা কে, আর খাবেই বা কজন?" একজন ছেলে জবাব দিলে—"ঝা পার বেনিয়ে নিও, বাকি না হয় ফেলে দেবে। দরকার হ'লেই আবার এনে দেব তা'র কি, গাছের জিনিষ।" আর একজন জিজ্ঞাসা ক'রলে—"বাবাঠাকুর কেমন আছে গা মা'ঠান্?" কল্যাণী বল্লে—"তোমাদের কল্যাণে একটু সেরেছেন বাবা, এইবার কাজ-কর্ম্ম ক'রবেন। তোদের পড়া-শোনা সব বন্ধ আছে, নয় রে?"

—"হিঁ গো মা'ঠান্, ওমাস থেকে ত সবই বন্ধ আছে—কে আর পড়া ব'লে দেবে? কাজ থে এসে ওই আপনারাই এট্টু পড়ি নিকি।"

কল্যাণী জিজ্ঞাসা ক'রলে—"কারখানার আর কা'কেও তোরা জিগ্‌গেস্ ক'রতে পারিস্ না?"

কল্যাণীর কথায় অবাক্ হ'য়ে গিয়ে একজন বল্লে—"তা কি আমরা পারি?"

—"কেন পারিস্ না?"

—"কেউ তা বলে দেয় না মা'ঠান্। সব টাট্টা ক'রে গালাগাল দেয়।" তার পর গলার আওয়াজটা খাটো ক'রে বল্লে—"ওই যে দত্ত মোশাই, আমাদের তাঁত ঘরের বাবু—এখন আপনাদের ঘরকে এল, ওনাকে সেদিন আমি একবার বলেছিনু—'বাবু যদ্দিন না আমাদের ইনি সেরে না ওঠেন, সাঁঝের বেলা আমরা এসবো—এট্টু পড়া বলে দেবেন?' তা' তেড়ে মারতে এল মা'ঠান্! বল্লে—'শালা ব্যাটারা, নেকা-পড়া শিখে নাট্‌সায়েবী করবি না কি? যা' সব নলি গুছোগে যা, নইলে সায়েবকে দে নাতি খাওয়াব।'"

কল্যাণীর প্রাণটা করুণায় গলে' গেল। তা'দের দিকে চেয়ে বল্লে—"তোরা সব কত ক'রে রোজ পাস্ বাছা?"

সেই ছেলেটি জবাব দিলে—"চোদ্দ পয়সা মা'ঠান্,—আমরা ছোক্‌রারা আর কত পা'ব?"

—"তোদের বাপ-মা, তা'রাও ত কাজ করে? তবে এত কচি বয়সে এখনি তোদেরও কাজে লাগিয়েছে কেন? পাঠশালে যা'বার বয়স—"

—"আর মা'ঠান্! কাজ না ক'রলে খাব কি? বাবা ত হপ্তায় মোটে চার ট্যাকা আর মা আড়াই ট্যাকা এই ত তা'রা দুজনে কামায়। ঘরের ভাড়া দে, সর্দ্দার দরোয়ান বাবুদের দে কত আর থাকে মা'ঠান্? আমার চোদ্দটি পয়সায় তবু তোমার গে হপ্তায় এক ট্যাকা সাড়ে আট আনা ঘরে আসে।"

অমনি আর একজন বল্লে—"আর পাঠশালে পড়বার কথা যে বল্‌ছো আপনি, সে কি আমাদের ঘরে হয় গা মা'ঠান্। তবে বাবাঠাকুর না কি অমনি পড়া শেখায়, তাই—"

কল্যাণীর মুখে আর কথা বেরুল না। এই সব অকাট্য যুক্তির কাছে আর কোন উত্তরই দেওয়া চলে না। বাপ-মা আর এই দুগ্ধ-পোষ্য বালকেরা সবাই মিলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে সপ্তাহে বড় জোর আটটি মাত্র টাকা রোজগার করে; যদি সারা মাসটা কাজ হয়, তবে মাসে বত্রিশটি টাকা ঘরে আসে। তার পর অসুখ-বিসুখ আছে, কল বন্ধ আছে, —আর এই দুর্মূল্যের বাজারে,—উঃ কি কষ্ট! কল্যাণী চট্ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"হ্যাঁ রে, তোরা ক'টি ভাই বোন্? তোদের ঘরে আর কে কে আছে?"

ছেলেটি উত্তর দিলে—"এই আমি, আমার ছোট দু'টো ভাই আর একটা বুন্, আর বাবা, মা, নানী—"

—"থাম্ বাবা থাম্, আর বল্‌তে হ'বে না, আমি সব বুঝতে পেরেছি রে—তোরা তাহ'লে সাতটি খেতে। তোর নানী খুব বুড়ী হ'য়ে গেছে, না রে?"

—"ও খুব বুড়ী সে, কোমর বেঁকে গেছে—নাটি ধ'রে চলে; রাত্তিরে চোখে সে দেখতে পায় না।"

কল্যাণীর বুকের ভিতরটা তোল্‌পাড় ক'রে উঠলো। চোখ দু'টো তা'র জলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল। সে যেন তা'র চোখের সাম্‌নে দেখতে পেলে—একঘর কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তা'দের মা'কে ঘিরে দাঁড়িয়ে কেবল খাই-খাই ক'রছে,আর তা'দের মা সকালে উঠে কিছু খেতে দিতে না পেরে এক হাতে চোখের জল মুছচে আর অপর হাতে কা'রো গায়ে বা মাথায় হাত বুলিয়ে তা'কে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রছে—কত রকম মিথ্যা কথা বলে তা'দের ভুলা'বার বৃথা চেষ্টা ক'রে তাড়াতাড়ি কারখানায় চলে' যা'বার জন্যে বাড়ীর বাইরে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু সে সব আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস ক'রতে না পেরে সেই ক্ষুধার্ত্ত উলঙ্গ শিশুর দল মা'র পিছনে পিছনে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। অপর দিক হ'তে একজন জীর্ণা শীর্ণা শুষ্ক কঙ্কালের মত বৃদ্ধা লাঠিতে ভর দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট্ খেতে খেতে এগিয়ে গিয়ে তা'র সেই নাতি-পুতিদের ধ'রে রাখবার জন্যে বৃথা পরিশ্রম ক'রে পথের মাঝেই বসে' বসে' হাঁপাচ্ছে আর চেঁচিয়ে বল্‌ছে—'ওরে আয় আয়, ঘরে আয়, যাস্‌নি যাস্‌নি, পথে গাড়ী চাপা পড়ে এখনি মা'রা যা'বি। বড় সায়েবের হাওয়ার গাড়ী এখনি বেরুবে। আয় দাদা আয় দিদি, মা'কে তোদের কাজে যেতে দে, নইলে ফটক বন্ধ হ'য়ে যা'বে—বাঁশী অনেকক্ষণ থেমে গেছে। না গেলে রোজ কেটে নেবে, ঘরে একটাও চাল নেই। এই আধলাটা নিয়ে উড়েদের দোকান থেকে মুড়ি কিনে এনে ভাগ ক'রে খা'। কল্যাণীর বুকের ভিতর থেকে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে উঠে এসে বাইরের বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে গেল। সেই রকমই কতকগুলি অস্থিচর্ম্মসার ক্ষুধার্ত্ত ছেলে মেয়ে তখন তা'কে ঘিরে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। যেন তা'র কাণের কাছে অবিরত ধ্বনি উঠছে—'ওগো, আমাদের খেতে দাও, খেতে দাও,—পেট ভরে না খেতে পেয়ে আমরা এত শীর্ণ, এত দুর্ব্বল।' সে এক এক ক'রে সব ক'জনেরই মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। হঠাৎ তা'র চিন্তা-ধারা বাধা পেয়ে তা'কে অন্য দিকে নিয়ে গেল। তা'র মনে হ'ল—'আমিও ত এদেরই একজন। আমার স্বামীও ত এদের বাপ-খুড়োর মত কলঘরে তাঁত চালায়—পুরো সাতটা দিন খেটে তবে শনিবার সাতটি টাকা নিয়ে ঘরে এসে আমায় রাখতে দেয়। আজ এক মাসেরও উপর কাজ নেই—ঘরে একটা পয়সাও নেই। যা' ছিল সব ফুবিয়ে গেছে। আলিমদ্দিরা সব দিকে নজর রেখেছে বলেই অভাব টের পাইনি। কিন্তু—।' তখন তা'র মনে হ'ল—'আচ্ছা, আরও দু'তিনটি ছেলে মেয়ে হ'লে আমাদের অবস্থা কি ভীষণ দাঁড়া'বে! কোথা থেকে তা'দের খাওয়াবো, কে যোগা'বে! শিক্ষাই বা তা'রা পাবে কেমন ক'রে? এদের মত এই রকম ক'রেই ত তা'রা তখন বেড়া'বে?—গরীবের ঘরে বেশী ছেলে পুলে হওয়া ভাল নয়!' মাথাটা কল্যাণীর কেমন ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠলো। এমন সময় তা'র মনে আপনা হ'তে একটা প্রশ্ন উঠলো—'এই সব ছেলে মেয়েগুলি যা'রা এখন এমনি অসভ্যের মত ধূলো কাদা মেখে বেড়াচ্ছে, কারখানায় গিয়ে সামান্য রোজগার ক'রে বাপ-মার সাহায্য ক'রছে, এরা যদি বেশ সৎ শিক্ষা পায়, একটু লেখাপড়া শিখতে পারে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ভদ্র সংসর্গে বেড়াতে পায়, তখনও কি এরা এমনিতরই থাকবে! এরা কি তখন বেশ মানুষের মত মানুষ হ'য়ে আর কোন রকম একটা আলাদা উপার্জ্জনের পথ বেছে নিতে পারবে না?' কল্যাণীর অন্তরাত্মা যেন সাড়া দিয়ে বল্লে—'হ্যাঁ পারবে, খুব পারবে, আজীবন সে সুযোগ পায়নি বলেই ত এরা এমন দুর্দ্দশা ভোগ ক'রছে। কেউ এদের মুখ চায় না বলেই ত এরা এক পাশে ঠেলা প'ড়ে র'য়েছে

—সমাজই এদের সমাজের আবর্জ্জনা ক'রে রেখেছে! এক-খানা কালো পর্দ্দা এদের চোখে ঢাকা রয়েছে তাই ;—যেদিন সেই মোটা কালো পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে এতটুকু আলোর সন্ধান এরা পা'বে বা কেউ সেটুকু দেখিয়ে দেবে, সেদিন কেউ আর এদের ঠেলে রাখতে পারবে না ; নিজেরাই নিজেদের পথ খুঁজে নিয়ে আলোর সন্ধানে ছুটে বেরিয়ে পড়বে।' কল্যাণীর নির্ম্মল চিত্তে এই কথা উদয় হ'বা মাত্রে সে যেন অন্তরে কেমন একটা নতুন প্রেরণা অনুভব ক'রলে,—যেন তা'র বুক থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে গেল। এমন স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বে সে কখন পায়নি ; এ যেন একটা নতুন ইঙ্গিত। পরক্ষণেই তা'র মনে হ'ল—প্রায় বছরাবধি তা'র স্বামী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে এসে হাত-মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তিন চার ঘণ্টা যতক্ষণ সে বাইরে থাকে—আলিমদ্দির স্ত্রী এসে তা'র সঙ্গে গল্প-গাছা ক'রে কাটায়। কিছুদিন এমনি ক'রে কেটে গেলে পর একদিন স্বামীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা'তে স্বামী উত্তর দিয়েছিল—আলিমদ্দির বাইরের ঘরে একটা পাঠশালার মত করা হ'য়েছে, সেখানে সব কারখানার মজুরদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পড়তে আসে। তা'র স্বামী তা'দের এই অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়েছে। পড়া-শোনার এমন নেশা ধ'রে গেছে যে ছেলে মেয়েদের দেখাদেখি বুড়ো বুড়ো লোকগুলো পর্য্যন্ত পড়তে সুরু ক'রেছে। আর সব মিস্ত্রী আর সর্দ্দারেরা মিলে হপ্তায় দু' আনা চার আনা ক'রে চাঁদা দিয়ে একটা ফণ্ড খুলে ফেলা হ'য়েছে ; সেই পয়সা থেকে যখন যা' দরকার হয়—বই, শ্লেট, পেন্সিল কেনা হয়। কল্যাণী শুনেছিল বটে কিন্তু এতদিন তা'র মনের মধ্যে কোন ছাপ পড়েনি। কিন্তু আজ হঠাৎ এই শুভ মুহূর্ত্তে সেই সব কথা মনে পড়ে তা'র অন্তরে কেমন একটা শিহরণ এনে দিলে—তা'র চোখের সমুখে তা'র স্বামীর একটা উজ্জ্বল মূর্ত্তি ভেসে উঠলো, এ মূর্ত্তির দর্শন সে অদ্যাবধি পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে গর্ব্বে তা'র বুকখানা ভরে উঠলো, ভগবানের উদ্দেশে তা'র মাথা নত হ'য়ে পড়লো। ছেলে মেয়েদের দিকে প্রসন্ন মূর্ত্তিতে চেয়ে সে বল্লে—"ছাখ বাবা, উনি যদ্দিন না বেশ ভাল হ'য়ে সেরে ওঠেন, তোরা আপনা-আপনি পড়া-শোনা করিস্—যেন ছাড়িস্ নি। আর যখন কিছু জেনে নেবার দরকার হ'বে, আমার কাছে আস্‌বি, আমি যা পারি বলে দেব।"

কল্যাণীর মুখে এই কথা শুনে ছেলেরা মহা উল্লাসে বলে উঠলো—"তুমি বলে দেবে মা'ঠান্,—তুমি আমাদের পড়া নেবে ?"

—"হ্যাঁ রে, আমার কাছেই আস্‌বি, আর কোথাও যাস্‌নে।"

একজন ছেলে তখন একটু বিমর্ষ হ'য়ে বল্লে—"তা' মা'-ঠান্, এই নেংটে-পুঁটে-সুরফৎ কি মেতু এরা য্যাখন্ ত্যাখন্ আস্‌তে পারে ; কিন্তু আমরা কাজে নেগেছি—সন্ধ্যাবেলা ছাড়া ত পারবোনি ?"

কল্যাণী বল্লে—"তখনই আস্‌বি। যখন তোদের সুবিধে হ'বে তখনই আস্‌বি,—আমার ত সব সময়ই ছুটি।"

৬

ছেলেরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে মহা কলরব ক'রছিল। সেই সময় হরিবিলাস, বাঞ্ছারাম, আর তা'দের পিছনে লাঠি ধ'রে আস্তে আস্তে লালমোহন এসে উঠানে নাম্‌লো। হরিবিলাস বল্‌ছিল—"আপনাকে আর কষ্ট ক'রে আস্‌তে হ'বে না, যা'ন্ শুন্‌গে। যাক্—তাহ'লে ওই কথাই রইল। আমি সায়েবকে বল্‌বো—আরও দিনকতক আপনি কাজে লাগতে পারবেন না—কি বলেন ?" লালমোহন বল্লে—"দেখুন মশাই, আমার যা রোগ্—এত বেশী কথা আপনাকে বল্‌তে হ'বে না। সায়েবরা এ রোগ্‌কে যমের মত ভয় করে। রোজটা না দিক্ কাজটা থাক্‌বে ত, কি বলেন হরিবাবু ?" বলেই সে একটু হাস্‌লে। তা'র পর সে ভাব সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—"আর যদি আপনাদের কলে কাজটা নাই থাকে, তা'তেই বা কি,—আমি ত আর আপনাদের মত বাবুও নই, কেরাণীও নই,—মজুরদার মানুষ, কাজ গেলে আমাদের কাজের ভাবনা নেই।" হরিবিলাসের চোখ তখন চতুর্দ্দিকে কল্যাণীর সন্ধান ক'রে ফিরছিলো। সে এসে দাঁড়াতেই কল্যাণী ছ্যাঁচা বেড়ার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হরিবিলাস লালমোহনের কথার খোঁচাটা বুঝলে—কিন্তু সেটা প্রকাশ না ক'রেই বল্লে—"এ ছোঁড়াগুলোকে এত নাই দেন কেন ? ছোটলোকগুলো আপনার আস্কারা পেয়ে আজকাল বেজায় মাথায় চড়ে বসেছে। কা'রেও মান্‌তে চায়না। এই

ছোঁড়ারা, তোরা এখানে কি ক'রছিস্? আ' মলো, তোরা দু'টোতে বড় যে কাজে যাস্‌নি? এ বেলা কামাই ক'রেছিস বুঝি? রোস্—হপ্তার দিন মজা দেখা'ব।" বলেই কর্কশ দৃষ্টিতে তা'দের পানে চাইলে।

ধমক খেয়ে ছোঁড়ারা লম্বা দৌড় দিলে। হরিবিলাস বাবুকে তা'রা যমের মত ভয় ক'রতো। কলের বড় বাবু—তা'দের সকলকার এক রকম অন্নদাতা। কারখানার মজুরেরা ম্যানেজার সাহেবের চেয়ে বাবুকেই বিশেষ চেনে, ভয়ও করে। গেরস্তর ঝি চাকর যেমন যা'র হাত থেকে বাজারের টাকা—মাইনে-কড়ি পায়, যা' কিছু ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা, তা' তা'কেই করে। জমীদারের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাঁ'র গোমস্তাই মান্য পায় বেশী। সেই হিসাবে হরিবিলাসের কলের মজুরদের ওপর অখণ্ড প্রতাপ। তা'ছাড়া, বিধাতার করুণায় বাবুর মূর্ত্তিখানির আর তুলনা নেই। নাক মুখ চোখ, গায়ের রং, সবই এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। শরীরখানির ওজন কত তা' জানা না থাকলেও, রাস্তা দিয়ে যখন তিনি যাতায়াত ক'রতেন—রাস্তা কেঁপে উঠতো, আর ছেলেমেয়েরা ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌তো। কলের অন্য বাবুরা ঠাট্টা ক'রে তা'র নাম রেখেছিল 'দুরমুস্ দত্ত'—আর সে কথা কিছু অন্যায়ও নয়। বাস্তবিকই পথে নতুন খোয়া চাপিয়ে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের কর্ত্তারা যদি এই বৃষস্কন্ধ বাবুটিকে বার-কতক তা'র ওপর চলাফেরা করা'তো, তাহ'লে আর রূল টানার বিশেষ প্রয়োজন হ'ত না। কারখানার মজুরদের রক্ত শোষণ ক'রে ক'রে হরিবিলাসের মেদ-মাংস এতই বেড়ে গিয়েছিল।

অনর্থক ছেলেগুলোকে তাড়না করায় লালমোহন বিরক্ত হ'য়ে বল্লে—"আহা হা, ও বেচারাদের ওপর তম্বি করেন কেন? ছেলেমানুষ ওরা, রোজ কি কাজে মন দিতে পারে? ভদ্রঘরের ছেলেরা অমন বয়সে রাত্রে একা বেরুতে পারে না।" বাঞ্ছারাম লালমোহনের কথায় সায় দিয়ে বল্লে—"তা' ঠিক্ কথা। এখনই ওদের খেটে খেতে হ'চ্ছে—এ্যাঁ!"

হরিবিলাস তা'তে বল্লে—"না খাট্‌লে খা'বে কি, ওরা ছোটলোক ব্যাটারা। ওদের নিয়ে আবার লালমোহনবাবু পাঠশাল খুলেছেন, জানেন মশাই? আক্কেলটা দেখুন একবার!—বলি, আপনি ত ঠাকুরমশাই, বলুন দিকি, অনাচার আর কা'কে বলে? শাস্তোরে আপনার কি আছে? বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হ'য়ে যত হতভাগা মেলেচ্ছগুলোকে নিয়ে থাকা, তাঁত চালিয়ে ওই রকমই বুদ্ধি হ'য় বটে—ছিঃ! ধর্ম্মে কি এসব সয়?"

লালমোহন বা বাঞ্ছারাম কোন কথাই কইল না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। হরিবিলাস বলেই যেতে লাগ্‌লো—"তা'র পর ঘরের ভিতর আপনাকে এতক্ষণ যা' বল্‌ছিলুম সেগুলো বেশ ক'রে সমঝে চল্‌বেন! আপনি এই যে এদের নিয়ে পাঠশালা করেন—নানা রকম কুশিক্ষে দ্যান, রোজ বাড়িয়ে দেবার জন্যে এদের হ'য়ে নিত্যি দরখাস্ত করেন, সায়েবরা পর্য্যন্ত সে কথা শুনেছে।"

লালমোহন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হরিবিলাসের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে একটু সন্দিগ্ধ হ'য়ে বল্লে—"তাই না কি? আপনি বুঝি বলেছেন?"

হরিবিলাস উত্তর দিলে—"নাও কথা, তা'দের কি চোখ্ কাণ নেই? আর এ যে হ'বারই কথা, বুঝলেন না? লেখাপড়া জানা একটা লোক এসে দুম্ ক'রে যদি তাঁতীর কাজ করে আর অষ্টপ্রহর মজুরদের সঙ্গে মেশে, তাহ'লে সন্দেহ ত হ'বেই। যাই হোক, লালমোহনবাবু, ছোটলোকগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়ে তা'দের চোখ্ ফুটিয়ে দিয়ে আপনি যে দেশের কতটা ক্ষতি ক'রছেন, আর ওদের মাথা খাচ্ছেন, তা' আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না।"

লালমোহন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"ওদের তাতে কি ক্ষতি হ'তে পারে তা' আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন হরিবাবু? আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম। ওদের একটু আধটু লেখাপড়া শেখালে বরং পরম উপকারই করা হয়। আর প্রত্যেক মানুষেরই তা' করা দরকার। একখানা রুটি গড়ে নিয়ে যা'রা সাত টুক্‌রো ক'রে খায়, সারা পরিবারটা মিলে আপনাদের কলে মজুরী ক'রে যা'রা দু'বেলার পেটভরা অন্নসংস্থান ক'রে উঠ্‌তে পারে না,—ঘরের বাইরে তা'দের কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে, কত দেশের কত অসভ্য জাত মানুষ হ'য়ে উঠ্‌ছে তা'র খবরই রাখে না, তা'দের মানুষ ক'রে দেওয়াটা কি ধর্ম্ম নয়? এই মাত্র আপনি যে শাস্ত্রের কথা বল্লেন—ভাল, বলুন দিকি, শাস্ত্রের কোন্‌খানটায় লেখা আছে যে জোর ক'রে এই সব দীনহীন কাঙালের মুখের গ্রাস কেড়ে খাওয়া আর তা'দের অন্ধকারে ফেলে রাখাটাই ভদ্রলোকের বা বর্ণশ্রেষ্ঠ

লোকের আসল ও সনাতন ধর্ম্ম ?" আর বেশী কথা লালমোহন বল্‌তে পারলে না—তা'র গলার স্বর কাঁপ্‌ছিল, সে তখনও বড় দুর্ব্বল। লাঠির ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে সে দাওয়ার ওপর বসে' পড়লো।

হরিবিলাসের মুখটা হাঁড়ীর মত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে বল্লে—"আমি আপনার ভালর জন্যেই বল্‌তে এসেছিলুম, নইলে কোন দরকারই ছিল না। সায়েবদের বিশ্বাস, আপনি মজুরদের ক্ষেপিয়ে কলের মধ্যে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি ক'রছেন। বাবুরাও আপনার ব্যাভারে দিন দিন বিরক্ত হ'য়ে পড়েছে। তা'রা বলে আপনার জন্যেই সর্দ্দাররা বাবুদের আর মান্‌তে চায় না।"

হরিবিলাসের কথায় বাধা দিয়ে লালমোহন বল্লে—"সেটা আপনাদের মস্ত বড় ভুল—আমি কা'কেও কিছু শিখিয়ে দিইনি। বাবুদের অসম্মান ক'রতে আমি কোন সর্দ্দারকেই বলিনা। তবে তা'রা যদি আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য বুঝে নিতে চায় তা'তে আপনাদেরই বা এতটা আক্রোশ কেন ?"

বাঞ্ছারাম এগিয়ে গিয়ে হরিবিলাসের হাত দুটো ধ'রে বল্লে—"যান্ হরিবাবু, আপনি ঘরে যান্, স্বজাতির ওপর কি রাগ ক'রতে আছে ? কেন মিছে সন্দেহ ক'রছেন ? আমি বেশ বল্‌তে পারি—একটু আধটু লেখাপড়া শেখান, আর পাঁচটা হিতোপদেশ দেওয়া ছাড়া লালমোহনের আর কোনই উদ্দেশ্য নেই।"

হরিবিলাস আর অন্যান্য বাবুরা সত্য সত্যই লালমোহনের ওপর চটে উঠেছিল। আজকাল প্রায় সমস্ত মিস্ত্রী আর সর্দ্দাররা মুখের ওপর চোপ্‌রা করে—বাবুদের প্রাপ্য গণ্ডা সহজে দিতে চায় না। অনেক জোর জবরদস্তি ক'রে তবে তাদের কাছ থেকে আদায় ক'রতে হয়। কলের সব ক'জন বাবু একত্রে পরামর্শ ক'রে তবে আজ হরিবিলাসকে পাঠিয়েছিল, লালমোহনকে একটু সাবধান ক'রে দিতে,—নইলে তা'কে দেখ্‌তে আসা একটা ছলমাত্র। বাবুরা তা'কে তাঁত ঘর থেকে সরা'বার জন্যে অনেক চেষ্টা ক'রেও পারেনি। যে কোন সর্দ্দার বা মিস্ত্রী বা কোন তাঁতী বাবুদের বিষ-নয়নে পড়তো, তা'কে তিন দিন টেঁক্‌তে হ'ত না—অতি সহজেই তাড়ানো যেত। কিন্তু লালমোহনকে তাড়ানো কিছু শক্ত হ'য়ে পড়েছিল। সকল সাহেবই এই লোকটাকে চিন্‌তো। এর কথাবার্ত্তা চালচলন সব ভদ্রলোকের মত—দেখতে সুপুরুষ, লেখাপড়া জানে, অথচ সব ঘরের মিস্ত্রীদের সঙ্গে মিশে নানা রকম কাজকর্ম্ম ক'রে বেড়ায়। নিজে রীতিমত তাঁত চালিয়ে পেটের খোরাক উপায় করে। কিছুকাল এই রকম ক'রতে দেখে কোন কোন সাহেব লালমোহনকে তা'র কারণ জিজ্ঞাসা ক'রেছিল। সে তা'তে স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল যে, পাঁচ রকম কাজ শিখে নিয়ে ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে কলকারখানা করবার মতলব আছে, তাই হাতে ক'রে সব কাজ সে শিখে বেড়াচ্ছে। এই রকম লোককে মনে মনে সাহেবেরা ভালই বাসে, কাজে কাজেই লালমোহনকে তারা উৎসাহই দিত।

বাবুরা তার ওপর চটেছিল অন্য কারণে। কারখানার মধ্যে নানা রকম দুর্নীতি ছিল। সততার ধার কেউ সেখানে ধারতো না। ঘুস্ নেওয়া আর ঘুস্ দেওয়া দুইই ছিল সেখানকার সনাতন প্রথা। সাহেবরা সে সব দেখেও দেখতো না। মাঝে পড়ে গরীব দুঃখীরা মা'রা পড়তো ; আর মন্দ কাজটাই তা'রা ভাল বলে জান্‌তো। লালমোহনের চেষ্টায়, শিক্ষায় আর অধ্যবসায়ের গুণে ক্রমশঃ সেই সব জুলুম অত্যাচার বন্ধ হ'তে লাগলো, দুর্নীতিও কম্‌তে আরম্ভ হ'ল। বাবুরা চট্‌লো তাইতে। সহজে নির্ব্বিবাদে আর তা'রা ঘুস নিতে পারতো না। অথচ লালমোহনের নামে যা' তা' বলে সাহেবদের কাছে লাগালে নিজেরাই ধরা পড়ে' যা'বে। ঘুস্ নেবার কথা প্রমাণ হ'লে তারাই শাস্তি পা'বে। সেজন্যে কিছু উপায় ক'রতে না পেরে তা'রা মনে মনে চট্‌তে লাগলো। এইবার তা'রা—লালমোহনের কামা'য়ের সময় মতলব এঁটেছিল যে যদি কিছু না ক'রতে পারি, তাহ'লে সবাই মিলে রটা'ব যে লালমোহন মজুরদের মাথা গরম ক'রে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে—আর সে একজন স্বদেশী পাণ্ডা।

হরিবিলাসের আজকের কথার আভাষেই লালমোহন বুঝতে পারলে যে হাওয়া কোন্ দিকে বইছে। তা'র বিরুদ্ধে যে বাবুরা মহা চক্রান্ত ক'রে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে লালমোহনের আর কোনই সন্দেহ রইল না। কিন্তু সে ভেবে দেখলে, উপস্থিত ক্ষেত্রে শত্রুদের রাগিয়ে না দিয়ে মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে রেখে কাজ ক'রে যাওয়াই ভাল। নইলে মজুরদের পক্ষের

ক্ষতি হ'বারই বেশী সম্ভাবনা। এখনও তা'রা ঠিক গড়ে' ওঠেনি। চার হাজার লোকের মধ্যে এখনও পূরোপুরি সদ্ভাব স্থাপিত হয়নি। যেদিন সেটা হ'বে, সেদিন উপরওলা মনিবেরা পর্য্যন্ত তা'দের দাবী অগ্রাহ্য ক'রতে পারবে না। বাবুদের জুলুম আর অত্যাচার তখন সহজেই নিবারণ করা যেতে পারবে। এই সব বিবেচনা ক'রে বসে বসেই লালমোহন বল্লে—"হরিবাবু, অন্যায় সন্দেহ ক'রে মিছামিছি আমার দোষ দেবেন না। আমি কি আপনাদের ছাড়া, না তাঁত চালিয়েই আমার চিরদিন চল্‌বে? ওটা আমার কি রকম খেয়াল হ'য়েছিল; তাই ওদের লেখাপড়া শেখা'তে গিয়েছিলুম। আপনিও যেমন—ও কুম্ভকর্ণের ঘুম, ও কি সহজে ভাঙবে?"

একটু নরম হ'য়ে হরিবিলাস তখন বল্লে—"আমাদেরও ত তাই ইচ্ছা। ওসব ছেড়ে ছুড়ে ভদ্র-সংসর্গে আসুন দিকি, দেখবেন কত মজা তখন পাবেন, পকেটে পয়সা ধর্‌বে না। ওই ছোটলোক ব্যাটারাই তখন সেধে পয়সা দিয়ে যা'বে। সেই কথাই ভাল। আপনি সেরেসুরে উঠুন—আমরাই পাঁচজনে আপনাকে টেনে নেব। এখন তবে চল্লুম।"

হরিবিলাস চলে গেলে বাঞ্ছারামের দিকে চেয়ে লালমোহন বল্লে—"ব্যাপারখানা বুঝ্‌লেন ত? সুনীলবাবুর সেই তখনকার কথাগুলো মনে আছে আপনার? সব দিক ভেবে এই কাজই এখন আমি সেরা কাজ বলে' মাথায় তুলে নিয়েছি। এগিয়েও অনেকটা গিয়েছি। ঘটনাক্রমে আপনিও যথাকালে এসে পড়েছেন। তখন ভরসা করি, সবাই যেমন আমায় ত্যাগ ক'রেছে, আপনি সে রকম ক'রবেন না।" বলেই লালমোহন স্থির দৃষ্টিতে বাঞ্ছারামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বাঞ্ছারাম একটু ভেবে তার পর বল্লেন—"সংসার সমাজ যখন আমাদের চায় না, আত্মীয়েরাও যখন আমাদের অস্পৃশ্য ভেবে দূর ক'রে দিয়েছে, তখন ঘর-সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে যে বৃহৎ কাজ মানুষের মুখ চেয়ে পড়ে আছে, আমরা তা'তেই ডুবে যাই এস। ধর্ম্মাধর্ম্ম বোঝবার কোন দরকার নেই। দেঁতো হাসি হেসে সমাজে বাস করার চেয়ে সমাজ যা'দের পরিত্যাগ ক'রেছে, সেই সকল অস্পৃশ্যদের সঙ্গেই আমাদের বাস করা ভাল।"

মধুর হাস্যোজ্জ্বল মুখে কল্যাণী এসে তা'দের মাঝখানে দাঁড়ালো। তা'কে দেখেই বাঞ্ছারাম বল্লেন—"কি মা, এত আনন্দ কিসের?" কল্যাণী বল্লে—"যদ্দিন না উনি ভাল ক'রে সেরে ওঠেন, আর সেরে ওঠবার পরেও, আমি মজুরদের ছেলে মেয়েকে পড়া'ব।" তা'র পর স্বামীর দিকে চেয়ে বল্লে—"তুমি আমায় মত দেবে?" লালমোহন মুগ্ধ হ'য়ে কল্যাণীর মুখের পানে চেয়ে ছিল, কল্যাণীর কথায় বল্লে—"পারবে কল্যাণী? লজ্জা-সরম-ঘোমটা সব বিদায় দিয়ে অবরোধ-প্রথাকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়ে পথে এসে দাঁড়া'তে হ'বে। আত্মীয়তা—"

কল্যাণী বল্লে—"আত্মীয় কে?"

বাঞ্ছারাম বল্লেন—"এরাই আত্মীয়, যা'দের তুমি মানুষ ক'রে গড়ে' নিতে চাচ্ছ।"

কল্যাণী আকাশের দিকে চোখ রেখে বল্লে—"অনেক দিনই ত এদের আপনার ভেবে নিয়েছি।" তার পর স্বামীকে আবার জিজ্ঞাসা ক'রলে, "তুমি এখনও মত দাওনি। তোমার মতই তোমার আদেশ,—আর স্বামীর আদেশ পালন করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।"

লালমোহন বল্লে—"কল্যাণী নাম তোমার সার্থক হোক্।"

৭

এইখানে আমাদের কিছু পূর্ব্বের কাহিনী বলা দরকার, না হ'লে গল্পের শেষটা বড় খাপ্‌ছোড়া বোধ হ'বে। চন্দনপুরের অমিয় চাটুয্যে খুব একটা নামজাদা জমীদার না হ'লেও জমীদার বটে। তাঁর সেই জমীদারীটা পৈতৃক নয়—স্বোপার্জ্জিত। তিনি পূর্ব্বে কোন এক সেরেস্তায় নাজিরী ক'রতেন। সদরালা, মুন্সেফ, আর কালেক্টরীর মধ্যে থাকার জন্যে, আর নিজেও খুব চালাক চটপটে ছিলেন বলে' বছর পনের কুড়ির মধ্যে তিনি একটু একটু ক'রে বিষয়-সম্পত্তি বাড়াতে লাগলেন। কালেক্টরী বা পত্তনী দু' রকম মহলই তাঁর ছিল। অনেক নাবালক অবীরা বিধবার সম্পত্তি বাকী খাজনার দায়ে নীলামে উঠতো, চাটুয্যে মশাই সুযোগ আর সুবিধা পেলেই ভিতরে ভিতরে বন্দোবস্ত ক'রে সেই সব ছোট-খাট মহলগুলি স্ত্রীর নামে কিনে নিতেন। কাজে কাজেই তাঁ'র স্ত্রী নবীনকালীর বয়স যখন ষোল কিম্বা সতের, সেই সময়ের মধ্যেই সেই স্ত্রীলোকটী নিজের অজ্ঞাতসারে সরকারী কাগজে জমীদারনী বলে' প্রচারিত হ'য়েছিলেন।

বেশীর ভাগ সম্পত্তি কেন্‌বার তাঁ'র সুবিধা হ'য়েছিল—অমিয়বাবু যখন মুর্শিদাবাদে নাজিরী ক'রতেন। ওই অঞ্চলে থাকবার সময়ই তাঁর প্রকৃত পক্ষে জমীদার হ'বার বাসনা হ'য়েছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে এখানে সেখানে অল্প অল্প সম্পত্তি খরীদ ক'রতে ক'রতে অবশেষে যখন তাঁর জমীদারীর আয় দশ বারো হাজারে দাঁড়াল, সেই সময় তিনি এসে চন্নপুরে বাস ক'রলেন। এই চন্নপুর তাঁ'র পৈতৃক বাসস্থান নয়—তবে বছর কয়েক পূর্ব্বে এই গ্রামের মধ্যে তিনি খানিকটা বাস্তুজমী আর একখানা ভাঙা বাড়ী কিনে সেখানাকে বেশ সংস্কার ক'রে রেখেছিলেন। নাজিরী ছেড়ে দিয়ে এইবার সেই বাড়ীতে জমীদার হ'য়ে বস্‌লেন। ক্রমে ক্রমে দেশের সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হ'তে থাক্‌লো। কেউ আর তাঁর জন্মস্থানের কথা জানতেও চাইল না, জান্‌বার কা'রো দরকারও ছিল না। যখন এসে চন্নপুরে তিনি বাস ক'রেছিলেন তখন পরিবারের মধ্যে ছিল এক চিররুগ্না স্ত্রী নবীনকালী, একটি পাঁচ ছয় বছরের বালক, তা'র নাম শিশির, আর বামাঠাকরুণ নামে একটি স্ত্রীলোক—বয়স আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ। সে-ই কিন্তু সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তা'র কারণ, স্বয়ং জমীদার-গৃহিণী বাতে পঙ্গু—বছরের মধ্যে আট মাস তিনি শয্যাগত থাক্‌তেন, আপনার ছেলেটাকে পর্য্যন্ত দেখা-শোনা ক'রতে পারতেন না। দৈবক্রমে ওই স্ত্রীলোকটী অমিয়বাবুর সংসারে এসে জুটেছিল বলেই ছেলেটী বেঘোরে মারা যায়নি। তা'কে প্রসব করার পর থেকেই গৃহিণীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হ'তে থাকে। শেষে সর্ব্বাঙ্গ বাতে পঙ্গু হ'য়ে গিয়ে একেবারে দুরারোগ্য হ'য়ে পড়ে। শোনা যায়, অমিয়বাবু যখন বহরমপুরে ছিলেন, সেই সময়েই এই বিপত্তি ঘটেছিল। শিশুকে রক্ষা করার বিষয়ে যখন অমিয়বাবু এক-রকম হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন, তখন ভগবান বামাঠাকরুণকে জুটিয়ে দিয়েছিলেন। বামার স্বামী বদ্ধ পাগল ছিল,—তা'কে যখন বহরমপুরের পাগলা-গারদে আট্‌কে রেখে সেখানে তা'র চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা হয়, সেই সময় বামাও সঙ্গে এসেছিল। বাইরে একটা বাসা ভাড়া ক'রে কিছুকাল সে থাকে। অবশেষে স্বামীর উন্মাদ রোগ যখন কিছুতেই আর সাম্‌লো না, আজীবন গারদেই থাকতে হ'বে শুনলে, তখন নিঃসহায় হ'য়ে বামা কোন একটা ভদ্র পরিবারের মধ্যে থেকে যা'তে নিজের ইজ্জৎ বজায় রাখতে পারে তা'র অনুসন্ধান ক'রতে থাকে। সে একেবারেই নিঃস্ব, অথচ বয়স আর রূপ দুই তা'র ছিল। ব্রাহ্মণের মেয়ে, ভাল রাঁধতে জানতো শুনে বিপন্ন অমিয়বাবু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বামাকে নিযুক্ত ক'রেছিলেন। আরও একটা মস্ত সুবিধা হ'য়েছিল,—কিছু দিন পূর্ব্বেই তা'র একটি সন্তান হ'য়ে মারা যায়, স্তনে তখন দুধও অপর্য্যাপ্ত ছিল, সেই দুধ খেয়ে শিশির মানুষ হ'তে লাগলো। নবীনকালীর স্তনে এক ফোঁটাও দুধ ছিল না। চন্নপুরে এসে পর্য্যন্ত বামাকে সকলেই 'বামুন মা' আখ্যা দিয়েছিল।

যাই হোক, চিররুগ্না হ'লেও নবীনকালীকে নিয়ে আর জমীদারীর কাজ কর্ম্ম দেখে অমিয় বাবুর দিনগুলো এক-রকম কাট্‌ছিল মন্দ নয়। কিন্তু সে সুখটুকুও তাঁর কপালে বেশী দিন সইলো না। চন্নপুরে আসবার বছর কতক পরেই নবীনকালী মারা গেল,—অমিয়বাবুর বয়স তখনও চল্লিশ পার হয়নি। কুড়ি বাইশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, যখন সবে মাত্র চারি দিক গুছিয়ে নিয়ে একটু আরামের নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেয়েছেন, সেই সময় দুর্ঘটনা ঘটে গেল! দশ বছরের বালক শিশির একেবারেই মাতৃহারা হ'ল—আর বামাকে বেশী ক'রে আঁক্‌ড়ে ধর্‌লে। কচিবেলা থেকেই সে বামার ন্যাওটো ছিল, তবুও এক-আধবার নবীনকালী তা'কে কোলে নিত, আদর টাদর ক'রতো,—এখন একেবারেই তা' ঘুচে গেল।

পত্নী মারা যা'বার পর থেকেই অমিয়বাবু অন্দর মহলের সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে উঠিয়ে দিলেন। সমস্ত ক্ষণই তিনি বিষয়-কর্ম্মের কাজ নিয়ে বাহিরে বাহিরে কাটা'তেন—কোন কোন দিন রাত্রেও বা'র বাড়ীতে শুতেন! বামা শিশিরকে নিয়ে আর সংসারের রান্না-বান্না নিয়ে অন্দর মহলে কর্ত্রীত্ব ক'রতো,—খরচের টাকা অমিয়বাবু প্রতি মাসেই তা'র হাতে দিয়ে দিতেন। বামা যা' বল্‌তো তাই দিতেন, কখন হিসাব পর্য্যন্ত চাইতেন না। ঝি-চাকর-মালী-দরোয়ান সবাই বামাকে মান্য করতো। অমিয়বাবু চন্নপুরে এসে পর্য্যন্ত সাধারণ কাজে সকলকেই উৎসাহ দিতেন,—অনেক ভার-বোঝা ক্রমশঃ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছিল। গ্রামের ভিতর ত দলাদলি লেগেই ছিল—আর তিনি ছিলেন পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট্, কাজেই ঝগড়া-ঝাটি, ভাগাভাগি এ সকলের

রফা-নিষ্পত্তি তাঁকেই প্রায় ক'রতে হ'ত। তা'ছাড়া গ্রামের হরিসভা, ব্রাহ্মণসভা,—হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী, বহু বিবাহ নিবারণী প্রভৃতি নানা সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁ'র যোগ ছিল। কারণ অর্থও আছে আর সময়ও যথেষ্ট আছে, তাই সকল দলের পাণ্ডারাই তাঁ'র মুখাপেক্ষী হ'য়ে পড়তো—আর তিনিও সব কাজে দশ টাকা খরচ ক'রতেন। গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা বাড়া'বার তাঁ'র আগ্রহও কিছু ছিল। প্রায়ই বল্‌তেন 'আমার আর সংসারে সুখ কি? ওই একটা ত ছেলে, ওর জন্যে কিছু রেখে বরং দশটা সৎ কাজে খরচ ক'রে হাতের সুখ ক'রে যাই। টাকা ত হাতের ময়লা—কি বল হে তোমরা?' যা'দের কাছে বল্‌তেন, তারাও উৎসাহ দিত, বল্‌তো, 'সে তো ঠিক্ কথাই, পয়সা থাক্‌লেই কি সকলে খরচ করে চাটুয্যে মশাই? যখের ধন আগ্‌লেই থাক্‌তে চায়; আপনি মহৎ ব্যক্তি, তাই এ কথা বলেন। যা খরচ ক'রছেন, তা' সব তোলা রইল, আবার ফিরে পাবেন। পুণ্যের দেহ,—তেমনি হীরের টুক্‌রো ছেলেও হ'য়েছে আপনার। আঃ, কি পড়া শোনায় আঠা! এগার বছরের ছেলে, তা' দিনরাত বই নিয়েই আছে।' কেউ বা বলতো —'যা' বল্লেন গাঙুলী মশাই, ছেলেটীর মুখে রা'টি নেই। বিনয়ী নম্র শান্ত—মাষ্টারদের মুখে সুখ্যাতি ধরে না। ও ছেলে, দেখবেন আপনারা, পরে জেলার হাকিম হবে।' অমনি ঘোষাল মশাই বল্লেন—'কি যে বলেন আপনারা তার ঠিক নেই। রাজার ছেলে সে, চাকরী ক'রতে যাবেই বা কেন? জমীদারী দেখবে।' এই রকম ক'রে চাটুয্যে মশা'য়ের দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু কোন কোন সময়ে দেখতে পাওয়া যেত, তিনি বড় বিমর্ষ হ'য়ে পড়্‌তেন। মনের সুখ যে তাঁ'র মোটেই ছিল না, তা' সব সময়েই বুঝতে পারা যেত। কখন কখন তাঁ'কে বল্‌তেও শোনা গেছে যে, এত ঐশ্বর্য্য থেকেও তাঁ'র সংসার করা মোটেই হ'ল না। স্ত্রী তাঁ'র থেকেও ছিল না। যাও বা ছিল, তা'ও গেল।

এমন সময় হঠাৎ একদিন বাড়ীতে কানাঘুসা হ'তে লাগলো যে, চাটুয্যে মশাই না কি দ্বিতীয় সংসার ক'রতে মনস্থ ক'রেছেন। তা'রই কিছু দিন পরে লোকনাথপুরের নকুড় আচায্যির আঠারো বছর বয়সের মেয়ে অনঙ্গমঞ্জরী দেবী চেলির কাপড় পরে' হাস্‌তে হাস্‌তে অমিয়বাবুর অন্দরে এসে নতুন বৌ নাম নিয়ে জেঁকে বস্‌লো। বে'টা যে একেবারেই গোপনে সম্পন্ন হ'য়েছিল তা' নয়—তবে প্রথমটা চাপা ছিল বটে। একেবারে সব ঠিক ঠাক হ'য়ে যাবার পর বে'র দিন দুই আগে পাড়ার পাঁচজন মুরুব্বিকে ডেকে অমিয়বাবু নিজের মনোভাব ব্যক্ত ক'রলেন। সেই দিন কথাটা চারি দিকে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল, আর বুঝতে পারা গেল যে চাটুয্যে-বাড়ীর পুরোহিত রামনিধি তর্কচূড়ামণিই এই বিবাহের ঘটক। তিনিই না কি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চেষ্টা চরিত্র ক'রে দরিদ্র নকুড় আচায্যির অরক্ষণীয়া কন্যাটীর পাণিগ্রহণে চাটুয্যে মশাইকে রাজি করিয়েছিলেন। নইলে দ্বিতীয় সংসার করবার তাঁ'র মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

তা' চাটুয্যে মশায়ের বিবাহ করবার ইচ্ছা থাক্ চাই না থাক্, পাড়াপড়শীর তা'তে কিছু আসে যায় না—আর সে কৈফিয়ৎ চা'বার কা'রো অধিকারও নেই। যে যা ভাবলে তা'র সে মনেই রয়ে গেল। আড়ালে কেউ কেউ বল্লে বটে যে, বহুবিবাহ-নিষেধের বক্তৃতা দিয়ে, বই পড়ে' শুনিয়ে, তাঁ'র নিজের বে' করা তা'বলে উচিত হয়নি। এইবার বিধবা বিবাহের দোষ দেখিয়ে কোন্ দিন না কেউ বিধবাই বে' করে বসে। অমিয়বাবু সে সভারও সভাপতি ছিলেন।

প্রথমে যেদিন বাড়ীতে কথাটার প্রচার হ'ল—দাসী-চাকরেরা সব মুখ-চাওয়া-চায়ি ক'রতে লাগলো। বামাও শুনলে, কিন্তু তা'র মোটেই বিশ্বাস হ'ল না। বল্লে, তা' না কি আবার হয়? এই এত্তবড় ছেলে থাকতে ভীমরতী যা'রা, তা'রাই আবার বে' করে। বামা চিরদিনই মুখরা, আর তা'র ক্রমে ক্রমে এতটা প্রতিপত্তি হয়ে উঠেছিল যে, সে কা'কেও দৃক্‌পাত ক'রতো না—সময়ে সময়ে কর্ত্তাকেও দু' কথা শুনিয়ে দিত। অনেক সময় অমিয়বাবু চুপ ক'রে থাক্‌তেন বা হেসে চলে' যেতেন। আজ আবার নিস্তার,—বাড়ীর পুরোনো ঝি, যখন এসে সেই বে'র কথাই বল্লে, তখনও বামা তা'কে খুব এক চোট গালাগালি দিলে। তখন ইস্কুল যাবার সময়—শিশির ভাত খাচ্ছিল,—বামাঠাকরুণের চীৎকার শুনে সে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"কি হ'য়েছে বামুন-মা? নিস্তারকে তুমি অত বক্‌ছো কেন?" বামা তা'র দিকে ফিরে বল্লে—"ও কিছু নয় খোকনমণি, তুমি খেয়ে নাও, নইলে ইস্কুলের বেলা হ'য়ে যা'বে। এই নাও, দুধে আর চারটি ভাত তোল, আজ এত কম খাচ্ছ কেন? ওমা, সারা বেলাটা যে পেট

জলে যা'বে।"—তা'র পর শিশিরকে খাইয়ে, তা'কে আঁচিয়ে, কাপড় চোপড় বই শ্লেট সব গুছিয়ে, চাকরের হাতে তা'কে জিম্মা ক'রে দিয়ে মাঝের দরজায় গিয়ে সে দাঁড়ালো। খোকন ইস্কুলে চলে' গেলে পর, বামা ভিতর মহলে ফিরে, রান্নাঘরের একটু-আধটু কাজ যা' সারতে বাকী ছিল, সেই সব গুছুতে লাগলো। অস্থির হাতে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে আরও তা'র যেন দেরী হ'তে লাগলো।—হাঁড়ীটা তুলতে গিয়ে কড়াটা তুললে, দুধের বাটীতে ভুলে ঝোল্ ঢেলে ফেললে, তা'র পর আবার সেই বাটীটা ধুয়ে নিয়ে তুলে রাখলে। এই রকম গোলমাল হ'তে দেখে আপনা-আপনি অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে সে তখনকার মত যেখানকার যা সব ফেলে রেখে রান্নাঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠে পা টিপে টিপে একেবারে কর্ত্তার ঘরে গিয়ে হাজির হ'ল।

অমিয় বাবু তখন একমনে কিসের একটা ফর্দ্দ মেলাচ্ছিলেন; ঘাড়টা ফিরিয়ে বামাকে দেখে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"কি খবর বামা? শিশিরের ইস্কুলের জলখাবারের পয়সা চাই বুঝি?" এই বলে তিনি ঘড়ীটার পানে তাকালেন। বামা উত্তর দিলে—"না, সে আমি খোকনকে দিইছি, এখনও পাঁচ টাকা আমার কাছে আছে। আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছি।"

—"বল?"

—"নিস্তারের কাছে যা' শুনলুম তা' কি সত্যি?"

—"কি শুনেছ—কি সত্যি?"

—"এই আপনি না কি আবার বে' ক'রবেন?"

অমিয়বাবু একটু চুপ ক'রে থেকে আর একবার হাতের ফর্দ্দটার এ-পিঠ ও-পিঠ ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তার পর বল্লেন—"হ্যাঁ বামা, কথাটা সত্যি।"

—"সত্যি!—ঠিক্ বলছেন ত? মাথার কোন গোলমাল হয়নি?"

—"শৈ—বামা!"

—"ছিঃ! ও আবার কি? মাথা খারাপই হ'য়েছে—না?"

—"যাও, নিজের কাজ করগে। কেন মিছে মন খারাপ ক'রছো? ও সব ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।" এই বলে' অমিয়বাবু চোখের চশমাটা খুলে নিয়ে কোঁচার খুঁটে মুছতে লাগলেন।'

বামা চট্ ক'রে মুখের উপর উত্তর দিলে—"আজ্ঞে, আপনার কথাই ঠিক্। আমরা দাসী বাঁদী বৈ ত নই, আমাদের বড় লোকের কথায় কথা কওয়া সাজে না।"

এই কথায় অমিয়বাবু একবার দাঁড়িয়ে উঠে বামার মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু চোখোচোখি হ'বা মাত্রেই তাঁ'র নিজের চোখ মাটীর দিকে নেমে গেল;—তিনি আবার চেয়ারে বসে' পড়লেন। তার পর জানালার বাইরে দৃষ্টিটা রেখে আস্তে আস্তে বল্লেন—"তোমাকে আমি ত দাসী বাঁদী বলিনি,—এ কথা তুমি বেশ ভালই জান।"

অমিয়বাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বামা বল্লে—"সে আপনার অনুগ্রহ। দাসী, বাঁদী, না হয় রাঁধুনী, ও একই কথা। তা' যাক্—"

অমিয়বাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"তুমি কি বলতে চাও, খুলেই বল না?"

বামা তখন একবার উঁকি মেরে ঘরের বাইরেটা চকিতের ন্যায় দেখে নিয়েই অমিয়বাবুর দিকে আরও একটু অগ্রসর হ'য়ে অপেক্ষাকৃত চাপা গলায় বল্লে—"দেখুন, আপনি বড় লোক, কাজেই আপনার সবই শোভা পাবে, কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলেই বামা থেমে গেল; মাথাটা নীচু ক'রে অনেকক্ষণ ধ'রে সে ভাবলে। কি যে ভাবলে তা' সে নিজেই জানে। মুখটা তা'র যেন ক্রমশঃ লাল হ'য়ে উঠলো,—আবার একবার চতুর্দ্দিকে দেখে নিয়েই খুব তাড়াতাড়ি বল্লে—"কিন্তু খোকনকে আমি যে কতটা ভালবাসি সে ত আপনি জানেন—আর সে ভালবাসাটা কি আমার অন্যায়?" বলেই বামা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অমিয়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। অমিয়বাবুর গলার স্বরটা ঈষৎ কেঁপে উঠলো—কিন্তু সে এত অল্প ক্ষণের জন্যে যে সহজে তা' বুঝতে পারা অসম্ভব। কতকটা জড়িত স্বরে তিনি উত্তর দিলেন—"বেশ ত, সে ভালবাসা আমি ত কেড়ে নিতে যাচ্ছি না। তুমি যা' আছ তাই থাকবে, তোমার খোকনও যেমন আছে তেমনি থাকবে, সে বিষয়ে কোনই ত্রুটি হ'বে না বামা, বুঝলে?"

—"আজ্ঞে বুঝলুম বৈ কি" বলে বামা আর একবার পিছন ফিরে দোরের দিকে চেয়ে দেখলে। অমিয়বাবু আল্না থেকে একটা সার্ট পেড়ে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বলে গেলেন—"যাও—এখন যাও, আমি ভেবে দেখবো,

অন্য সময় আরও কথা হ'বে"—জামাটা পরা হ'য়ে গেলে আর্সির কাছে দাঁড়িয়ে চুল ফেরা'তে ফেরা'তেই আবার বল্‌তে লাগলেন—"খোকন জন্মাবার পর থেকেই তা'র মা'র সূতিকার ব্যারাম হ'য়েছিল। তার পর দেখতে দেখতে তা'র সর্ব্বাঙ্গ বাতে পঙ্গু হ'য়ে পড়েছিল। সে তো তুমি ভালই জান? তোমার মাই খেয়েই ও মানুষ হ'য়েছে, তোমাকে মা'র মতই ভক্তি শ্রদ্ধা করে, পুরোপুরি তোমারি ন্যাওটো।" চুল ফেরান হ'য়ে গেলে তিনি বামার দিকে ফিরে বল্লেন—"কে সে কথা না জানে বামা? নবীনকালী আরও ক'টা বছর বেঁচে ছিল বটে, কিন্তু তুমি ত জান, কি রকম সে বেঁচে থাকা?" বলেই অমিয়বাবু একটু হাস্‌লেন। অধীরা হ'য়ে বামা উত্তর দিলে—"দোহাই আপনার, আমাকে আর অত ক'রে মনে ক'রে দিতে হ'বে না। কি যে হ'য়েছিল না হ'য়েছিল সে সব আমিও জানি আপনিও জানেন। সেই ক'টা বছর কি ভাবে যে কেটেছিল আজ তা'র সাক্ষী খুঁজে পাওয়া না গেলেও, ক্ষতি বিশেষ কিছু হ'বে না। সেই জন্যেই আজ জান্‌তে এসেছি। তা' এই মতটা সেই সময় হ'লেই ত বেশ হ'ত—মা'কে হারা'বার সঙ্গে সঙ্গেই খোকন একজন নতুন মা' পেত, আমিও ন্যাওটো হ'তে দিতুম না।" বলেই বামা তীব্র দৃষ্টিতে অমিয়বাবুর দিকে চাইলে।

এইবার অমিয়বাবু যেন কিছু বিরক্ত হ'লেন। তাড়াতাড়ি বল্লেন—"তুমি বড় বেশী কথা কইছ। মানুষের মেজাজ সকল সময় এক রকম থাকে না বামা। আমি বল্‌ছি, প্রতিজ্ঞা করছি—তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই। তোমার মর্য্যাদা চিরদিন যেমন থেকে এসেছে তাই থাকবে।"

—"মর্য্যাদা'!—"

—"হ্যাঁ। খোকন তোমা ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু জানে না। মোটে এগার বছর তা'র বয়স, সম্পূর্ণ ভাবেই তুমি এক-রকম তা'র মা'র স্থান অধিকার ক'রে আছ— এ অবস্থায় আর কোনই ব্যবস্থা হ'তে পারে না বামা—"

—"পারে না বলেই আমার এতদিন ধারণা ছিল। নবীনকালীর মৃত্যুর পরও সে ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গিছলো। কিন্তু আজ আপনি আমার সকল ধারণাই একেবারে উল্টে দিলেন। যাক্—এখন দেখি, আরও কতদূর আপনি যেতে পারেন।" এই বলেই বামা ঠাকরুণ এদিক ওদিক আর একবার দেখে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ত্বরিৎ পদে সিঁড়ী দিয়ে নীচে নেমে গেল। নীচে নামতেই বিরাজী গলাটা উঁচু ক'রে বল্‌তে লাগলো—"কোথা গেছলে গা বামুন মা? বাস্ রে বাস্! তিন ঘণ্টা মাছের চুবড়ী কোলে ক'রে বসে আছি, কে যে একটু নুন হলুদ দেয় তার ঠিকেনা নেই,— সখের দাসী নিস্তারের পর্য্যন্ত দেখাটি পাবার যো নেই। বেলা তিন পোর্ হ'ল, এর পর কখন কি ক'রবো বল দিকি?" বিরাজীর গলার ওপর আর এক পর্দ্দা চড়িয়ে বামা ঠাকরুণ বল্লে—"বোকিস্‌নি ম্যালা—থাম্। তিন ঘণ্টা বসে' আছে ওমনি বল্লেই হ'ল। আমি কতক্ষণ গেছি লা?" বল্‌তে বল্‌তে বামা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো। লোকের চোখের সমুখ থেকে সে যেন তখন পালাতে পার্‌লেই বাঁচে।

৮

তা' যাই হোক্, নকুড় আচায্যিকে তা'র অরক্ষণীয়া কন্যার দায় থেকে মুক্ত করবার জন্যই হোক্, অথবা নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই হোক, নতুন বৌকে সংসারে এনে পর্য্যন্ত অমিয়বাবুর কিন্তু গোল বাধলো বামা ঠাকরুণকে নিয়ে। সে প্রথম দিন থেকেই অনঙ্গমঞ্জরীকে বাড়ীর গিন্নী বলে' একেবারেই মেনে নিতে পার্লে না। বে'র এক বছর পরে অনঙ্গ যখন পাকাপাকি ঘর ক'রতে এল—সে এসেই দেখলে সেখানে তা'র বিরুদ্ধে একটা প্রবল দল খাড়া হ'য়েছে। এত বড় বাড়ীটার মধ্যে সেই যেন একঘরে হ'য়ে আছে। সবাই যেন তা'কে কোণঠেসা ক'রতে চায়। বাড়ীর দাসী রাঁধুনী সবাই কেমন এক রকম ছম্‌ছমে দৃষ্টিতে তা'র দিকে তাকায়—আড়ালে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কয়, এক ডাকে কাছে আসে না। জিজ্ঞাসা ক'রলে ন্যাকা সেজে কেউ বলে—'শুন্‌তে পাইনি বৌমা',—কেউ বলে, 'অম্‌নে ছিনু বৌদি',—এই রকম নানা অছিলা ক'রে সাম্‌নে থেকে সরে পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু রান্নাঘরের ভিতর অষ্টপ্রহর তা'দের জটলা হয়,—নয় তো বামা ঠাকরুণের শোবার ঘরে গিয়ে সবাই মিলে গল্প করে, আর পান-দোক্তার শ্রাদ্ধ করে। প্রথম থেকেই অনঙ্গ শিশিরকে আপনার দিকে টেনে নেবার বিধিমত চেষ্টা ক'রতে লাগলো, কিন্তু তা'র নাগাল পাওয়া দুষ্কর। সে বামাকে ছাড়া আর কা'কেও আমোল দেয় না। তা'রই কাছে খায়, শোয়। সে যা' বল্‌বে—শিশিরের কাছে

তাই বেদবাক্য। বছরাবধি চেষ্টা ক'রেও অনঙ্গ পূরো দশ মিনিটের জন্যেও শিশিরকে কাছে রাখতে পারেনি। কথাই সে কইতো না।

একদিন সে ইস্কুল থেকে এসে যেমন উপরে উঠেছে, অমনি অনঙ্গ ঘর থেকে বেরিয়ে তা'কে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর ক'রে চুমো খেয়ে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্লে। বালক প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গিয়ে টানা-টানি ক'রে পালা'বার চেষ্টা ক'রলে বটে, কিন্তু তা'র পর বেশ শান্ত-শিষ্ট হ'য়ে অনঙ্গর কোলে বসে' তা'র মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল। অনঙ্গ জিজ্ঞাসা ক'রলে—"বল দিকি খোকনমণি—আমি তোমার কে ?" শিশির বল্লে—"তুমি এ বাড়ীর নতুন বৌ, আমার কেউ নয়।" কথাটা—অনঙ্গর বুকে বেশ একটা ধাক্কা মারলে,—কিন্তু সেটা সে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে আর একটা চুমো তা'র গালে দিয়ে বল্লে—"ছিঃ! ও কথা তোমার বলতে নেই। আমি যে তোমার মা হই।"

শিশির বল্লে—"আমার মা' ত মরে গেছে—বামুন মা বলেছে। ঐ যে আমার মায়ের ছবি রয়েছে।" বলেই সে ছুটে গিয়ে ছবির নীচে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে তা'র মা'র ছবিখানা দেখিয়ে দিলে। অনঙ্গ তা'কে আবার কোলে নিয়ে বল্লে—"ওঃ। এই কথা তোমায় বলেছে বুঝি ? না, সে ঠিক জানে না, তুমি তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রো দিকি। আমিও তোমার মা' হই।"

শিশির বল্লে—"আচ্ছা করবো।"

এমন সময় হৈ হৈ ক'রতে ক'রতে বামাঠাকরুণ উপরে এসে পড়লো—চেঁচিয়ে বল্লে—"এক ফোঁটা দুধের ছেলে, কোন্ সকালে স্কুলে গেছে, এখনও একরত্তি জলও বাছা মুখে দেয়নি, আর তুমি এইখানে আটকে রেখেছ ?" প্রথম দিন থেকেই বামা অনঙ্গমঞ্জরীকে তুমি বলে ডাকতো। অনঙ্গ তা'র কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে শিশিরকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্লে—"যাও বাবা, খেয়ে এস,—কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে, খাবার খেয়ে ছুটে একবার আমার কাছে আসবে, জান ?—আমি তোমায় একটা জিনিষ দেব।" বালক প্রতিশ্রুতি দিয়ে বামার সঙ্গে নীচে নেমে গেল। একটু পরেই সে অনঙ্গর কাছে এসে বল্লে—"কি দেবে দাও ?" অনঙ্গমঞ্জরী তখন ট্রাঙ্ক খুলে কাগজে জড়ান কি একটা বা'র ক'রে বল্লে—"এটা কি বল দিকি খোকামণি ?"

শিশির লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে বল্লে—"ওটা যে ফুটবল। আমায় তুমি দেবে ?—ও আমার জন্যে এনেছ বুঝি ?"

"হ্যাঁ, তোমার জন্যে কিনে এনেছি। তুমি এই নিয়ে ওই উঠানে রোজ খেলা করবে, কেমন ?"

"কই দাও ?"

"তুমি আমায় আর একটা চুমো দাও ?"

বালক তখন একেবারে অনঙ্গমঞ্জরীর গলা জড়িয়ে ধরে মুখ বাড়িয়ে দিলে। অনঙ্গ তা'র দু'গালে দুটো চুম খেয়ে তার হাতে বলটা দিতেই, সে ছুটে নেমে যা'বার জন্যে সিঁড়ীর দরজার কাছে গেল। অনঙ্গ আর তা'কে না ধরে' জিজ্ঞাসা ক'রলে—"এইবার থেকে আমার কাছে আস্বে—ডাক্‌লে সাড়া দেবে ?"

বালক বল্লে—"হ্যাঁ—রোজ আসবো।" এই বলেই সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে উঠোনে দুপ্ দুপ্ ক'রে বলটা নিয়ে খেলা ক'রতে লাগলো, আর অনঙ্গ উপরের খড়খড়ির পাশে দাঁড়িয়ে তা'র খেলা দেখতে লাগলো। শিশিরকে জলখাবার খাইয়ে বামা পুকুরে গা' ধুতে গিছলো। এখন গা ধুয়ে এসে ভিজা কাপড়ে উঠনে পা' দিয়েই জিজ্ঞাসা ক'রলে—

"ওটা কি খোকা ?"

"দেখতে পাচ্ছ না ? এটা ফুটবল, আমি খেলবো।"

"বেশ বাবা বেশ, খেলা কর।—কে এনেছে ধন ? তোমার বাবা কিনে দিয়েছে বুঝি ?"

"দূর—তা' কেন, নতুন মা আমার জন্যে কিনে এনেছে।"

"কে—কে এনেছে ?"

"আঃ—একশো বার ক'রে ব'লতে হ'বে! আমি বলে এখন খেলছি! নতুন মা দিয়েছে বল্লুম ত।" বলেই শিশির বলটাকে গড়িয়ে দিয়ে তা'র সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগলো। বামাঠাকরুণের মুখ থেকে কেবল একবার বেরুলো—"নতুন মা!"—এই বলেই সে একবার ওপরের দিকে চাইলে, চাইতেই অনঙ্গর সঙ্গে তার চোখোচোখি হ'য়ে গেল। অনঙ্গর মুখে একটু বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠলো, কিন্তু বামার মুখখানাতে কে যেন কালি মাখিয়ে দিলে। সে আর

দাঁড়াল না, হন্ হন্ ক'রে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে থেকেই বামাঠাকরুণের বুকে আর পেটে এমন ব্যথা ধরলো যে উননে হাঁড়ি চড়লো না। নিস্তার সদরে ছুটে গিয়ে অমিয়বাবুকে জানালে—"বামুন মার বড় অসুখ ক'রেছে, আজ খাবার দাবার বড় আবস্তা, বাবু একবার ভিতরে এলে ভাল হয়।" অমিয়বাবু তাঁর গোমস্তা গোপেশ্বরকে শীগ্‌গীর ক'রে হারাণ ডাক্তারকে খবর দিতে বলে', বাড়ীর ভিতর চলে' গেলেন। গিয়েই দেখেন দরদালানের এক ধারে—গায়ের মাথার কাপড় সব এলো মেলো হ'য়ে পড়েছে—আর বামাঠাকরুণ ঠিক কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্ ক'রছে। বাড়ীর সব ক'জন দাসী একত্র হ'য়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে জটলা করছে, অথচ কেউ কোনও ব্যবস্থাই করেনি। অমিয়বাবু ঢুকেই বল্লেন—"ডাক্তারকে খবর দিয়েছি, সে এখনই আসবে। তোরা সব কি করছিস্? যা' দিকি খানিকটা জল গরম ক'রে আন্—একটা বোতলে ভরে' পেটে বুকে সেক্ দে।" কাতরাতে কাতরাতে বামা বল্লে—"ওগো, এ আমার সে অম্বলের ব্যথা নয়,—সেক্ দিলে এর কিছু হ'বে না।" অমিয় বাবু বল্লেন—"আচ্ছা—আচ্ছা, ডাক্তার এলেই ব্যথা আরাম হ'য়ে যা'বে, ভয় কি?" তার পর আর একজন দাসীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"নতুন বৌ কোথা রে?"

দাসী উত্তর দিলে—"উনুন একেবারে খাই খাই করছিল দেখে তিনি ভাত চড়িয়ে দিয়েছেন।"

আবার বামা কোঁথাতে কোঁথাতে বল্লে—"তোরা তা'কে রাঁধতে দিলি কেন বাপু?—ছেলেমানুষ, এখনই হাত পুড়িয়ে ফেল্‌বে। তোদের ঘটে কি কিছু বুদ্ধি নেই?"

দাসী বল্লে—"আমরা কি করবো—তিনি যে আতান্তর শুনে আপনি এসে রান্না ঘরে ঢুক্‌লো গো!"

অমিয়বাবু বল্লেন—"ও সব কথা এখন তোমায় ভাব্‌তে হ'বে না বামা, তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাক।"

হারাণ ডাক্তার এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা ক'রেও অসুখ কি ধরতে পারলে না। যাতনা যে ঠিক কোন্‌খানে তা' বামা নিজেই ঠিক করে' বল্‌তে পার্‌লে না; একবার এখানে একবার ওখানে এই রকম পাঁচ যায়গায় দেখাতে লাগলো। কিন্তু এত যাতনা যে এক মুহূর্ত্ত সে স্থির হ'তে পারছিল না। খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে ডাক্তার অমিয়-বাবুকে বল্লে—"দেখুন, এতটা যন্ত্রণা ত দেখা যায় না—উপস্থিত আমি একটা মর্ফিয়া ইন্‌জেক্ট ক'রে দি, ঘুমিয়ে পড়ুক,—কি বলেন?"

অমিয়বাবুও অস্থির হ'য়ে পড়েছিলেন, তাইতেই মত দিলেন। বামাঠাকরুণ তখন চেঁচিয়ে বল্লে—"না ডাক্তারবাবু, আমায় তোমার ফুঁড়ে ওষুধ দিতে হ'বে না। তুমি লিখে ওষুধ দিতে পার ত দাও।"

ডাক্তার বল্লে—"ভয় কি আপনার, এখনি ব্যথা সেরে যা'বে, কিছু লাগবে না!" এই বলে হারাণ ডাক্তার পকেট থেকে যন্ত্রপাতি বা'র ক'রতে ক'রতে একজন দাসীকে গরম জল খানিকটা আন্‌তে বল্লে। বামা একেবারে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে' পড়ে বল্‌তে লাগলো—"ও আমি কক্ষনো ফুঁড়তে দেব না—আমি মরে' গেলেও দেব না। খোকনমণির মাকে ফুঁড়ে ফুঁড়েই মেরে ফেলেছে তা'রা। শিশিতে ওষুধ দেবে ত দাও—নইলে আমার কিছু চাই না।"

তা'র আলুথালু বেশ আর এই রকম পাগলের মত চেঁচানীতে অমিয়বাবু ভয় পেয়ে গেলেন—বল্লেন,—"কাজ নেই ডাক্তার, প্রেস্‌ক্রিপসন লিখে দাও, আমি এখনই ওষুধ আনিয়ে নিচ্ছি।" হারাণ ডাক্তারও ভাবলে, কাজ নেই বাবু, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইন্‌জেক্ট করে; শেষকালে যদি কিছু হয় বদনামের ভাগী হ'তে হ'বে। বামাঠাকরুণকে সে বিশেষ রূপেই জানতো, মনে মনে কিছু ভয়ও করতো;—তা'র কারণ, এই বাড়ীটাতে এই স্ত্রীলোকটীর কি রকম আধিপত্য তা' গ্রামের সবারই জানা ছিল, আর তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে বাড়ীটাতে যে অন্য ডাক্তার কেউ সহজে মাথা গলাতে পারবে না, এ বিশ্বাসটাও হারাণ ডাক্তারের ছিল। আরও একটা কথা, এক একজন মেয়েমানুষের কেমন এক রকম দৃষ্টি থাকে—যে দৃষ্টি পুরুষের উপর পড়লে যেমনই শক্ত লোক সে হ'ক না কেন, মাথাটা তার গুলিয়ে যেতেই হ'বে। আর তা'কে খুসী করতে ইচ্ছা হ'বে। বামার সেই রকমের দৃষ্টি ছিল। সে দৃষ্টি বা চাহনী পুরুষকে আজ্ঞাকারী ক'রে ফেলতো। আর সেদিকে বেশীক্ষণ চাহিতে পারা যেত না।

প্রেসক্রিপসন লিখেই ওষুধ এলো। নিস্তারের উপরই বামার অসুখের তদ্বিরের ভার পড়লো। নিস্তার বাড়ীর সকলের চেয়ে পুরোনো ঝি···বামার সঙ্গেই তা'র বেশী মেলা-

মত গৃহস্থকে দেবতার অনুরূপ আহার্য্য 'কুইনিন্' কিনে রাখতে হয়,—জলযোগ হিসেবে চলে।

তাই সভয়ে সরে পড়ি।—পড়িলামও।

৩

শুভদৃষ্টি যেন সতৃষ্ণ ছিল,—প্রথমেই অনিলের সঙ্গে দেখা,—সে বললে—পুর্ণিয়ায় বেশ ছিলেন,—না? বিবেকানন্দের রজর-মেকার কলমে লেখা—আপনার কেমন লাগতো? ঐ রকম লোকেরই দরকার।—কি লোকই জন্মে গেছেন! গেরুয়া ঢাকা 'গ্যারিবল্ডি',—কি বলেন?"

আবার—"কি বলেন?"

কি আর বল্‌বো,—কথা তো সত্যিই। যে বাসায় ছিলুম সেখানে স্বামীজির কয়েকখানা বই ছিল, তাই নাড়াচাড়া করতুম বটে। কিন্তু অনিল তা জানলে কি করে? এও মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে গেছে নাকি! এই অল্প সময়ে!

বুঝতে পেরে বললে,—"কিছু না,—গুরুর কৃপা।"

হতভাগ্য আমি,—এমন সুবিধা সত্বেও কি করছি! কিন্তু 'কাশীখণ্ড' মনে পড়লে যে পেছিয়ে দেয়!

* * * * *

বাসার নিকটেই একটি তরুণের আমদানী হয়েছে দেখছি। রূপে স্বাস্থ্যে দিব্যি। বাসার সামনেই বেড়ায়। যেন আমার সঙ্গে কথা ক'বার ইচ্ছা। আমিই ডেকে কথা কইলুম।

খাসা ছেলে—কালীকুমার। কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে বি এস্‌সি পড়ে—আত্মীয়ের বাসায় থাকে। বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুরাগী।

বলে—"শুনেছি আপনি একজন···দয়া করে আমাকে কিছু উপদেশ দিতে হবে, আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত করবো। আপনার বইটই দরকার হলে আমাকে বলবেন—কলেজ লাইব্রেরিতে সবই রয়েছে। 'কার্ল্ মার্কস্' দেখবেন?—ঐ খানাই হাতে রয়েছে—যুগ প্রবর্ত্তক"; ইত্যাদি।

তরুণদের দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়; 'না' বলতেও বাধে। বললুম—"ও এখন থাক—এক সময় আমিও সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলুম বটে,—তুমি ভাই বঙ্কিমবাবু, রবিবাবু, আর শরৎবাবুর যা লেখা বেরিয়েছে, তাই ভাল করে দেখ,—বার বার,—আর কিছু দেখ আর না দেখ। রসে সৌন্দর্য্যে শিল্পে আমাদের অমন সম্পদ রামায়ণ মহাভারত ছাড়া আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই,—কারণ বহুদিন কিছু দেখিনি, বইও মেলেনা।"

বইয়ের অভাব কি! ওর জন্যে আপনি ভাববেননা। হ্যাঁ—আমিও মশাই বঙ্কিম বাবুকেই বুঝতে চাই,—আনন্দ মঠের শেষাংশটায় তিনি কি mean—ইঙ্গিত করলেন ধরতে পারিনা।—আমি নিয়ে আসব,—আমাকে একটু কষ্ট স্বীকার করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

প্রবন্ধে, দার্শনিক গবেষণায়, কে কি mean করলে বোঝাটাই দরকারি কথা, সাহিত্যের রসোপলব্ধিই প্রধান কথা, তার বোঝাবুঝির সাড়া আনন্দের মধ্যেই পাওয়া যায়। তার মধ্যে মতলব খুঁজতে যেওনা।

অত বড় লোকের প্লানটা (planটা) না বুঝলে যে কিছুই পাওয়া হলনা মশাই। আচ্ছা আমি বই নিয়ে না এলে হবেনা।"

"বাঃ, ছেলেটির বোঝবার শেখবার আগ্রহ তো বেশ।"

* * * * *

৪

বড় দিনের বন্ধে অনেকেই তীর্থ করতে, বেড়াতে কাশী আসেন। আমাদের গ্রামের গুটি তিনেক ছেলেও আমার বাসায় হাজির। আমি তাদের নিয়ে ব্যস্ত।

কালীকুমার কখনো ছাত থেকে, কখনো রাস্তা থেকে কেবলি নজর রাখছে। আমি দেখেও দেখছি না—মনে একটু কষ্টও পাচ্ছি। তা হোক—পরীক্ষা সামনে—তার কি পড়াশোনা বা অন্য কাজ নেই। সারাদিনই তো ছাতে না হয় পথে—কলেজের পড়া করবে কখন?

বৈকালে যেই ছেলে তিনটি বেড়াতে বেরুলো—কালীকুমার হাজির।

হাতে আনন্দ মঠ, বগলে র‍্যাপারের মধ্যে একটি মোড়ক।—

—"আপনার জন্যে একখানি দুষ্প্রাপ্য বই এনেছি, পড়ে দেখবেন। আপনি তো কেবল তিন জনের নাম করলেন, একবার দেখবেন,—আরও লেখক জন্মেছে!

কি বই?

শেষ-বিদায়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অবনী সেন

"কানাই দত্ত"। বইখানি বার করে দেখালে। ওপরটা দেখেই চম্‌কে গেলুম। বল্লুম—

তিনি আবার কে ?

সে কি মশাই, আমাদের 'ট্রেটার্-কিলার' কানাই, এরাই দেশের দেবতা। বিশ্ব জানে আর আপনি জানেননা! এ আপনাকে দেখতেই হবে।

আচ্ছা, যাঁরা এসেছেন—আগে যান, তার পর দেখিও।

হ্যাঁ—ওঁরা কারা ? বেশ জোয়ান তো! বাঃ! কস্‌রতের শরীর,—না ? কি করেন ?

বাঙ্গালীর ছেলেরা আর কি করে,—চাকরি করে।

বোধ হয় ভাল খেলোয়াড়,—চলন্ একদম্ ইরেক্ট্ (খাড়া)। বিবাহ হয়েছে ?—

ঠিক বলতে পারলুম না,—বাঙালীর ছেলে বিশ্ পেরিয়েছে আর বিবাহ হয়নি! তবে ছেলে মেয়ে হয়েছে বোধ হয়,—খেলনা, চুড়ি আর কি কি কেনবার কথা বলাবলি করছিল।

কারুর ফরমাজ থাকতেও পারে। হ্যাঁ—'আনন্দ মঠের' ইঙ্গিতটা কি সেইটে জানতে চাই। আপনারা এক আঁচড়ে ধরতে পারেন।

এই বলে বই খুললে—

ব্যাখ্যা থেকে ভগবান রক্ষা করলেন।

পাড়ায় মুকুন্দবাবু থাকেন। বেশ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণ লোক। তাঁর কাশীবাস বাসি হয়ে এসেছে। আমার ওপরও ১৫ বচর চড়িয়েছেন। তামাক খেতে খেতে আমার বাসার দিকে লক্ষ্য করে আসছেন দেখে, কালীকুমার তাড়াতাড়ি বই মুড়ে বললে,—আচ্ছা আসবো'খন—একটা কাজ ফেলে এসেছি, মনে পড়ে গেল। 'কানাই দত্ত' রেখে যাচ্ছি, যাঁরা এসেছেন—দেখবেন তাঁরা কত আগ্রহে পড়বেন, সময় কাটানও হবে; rare book, পাওয়া তো যায়না।—একটা মস্ত কাজ হয়ে যাবে।

"এখন নিয়ে যাও—এর পর"...

মুকুন্দবাবু এসেই পড়েছিলেন, কথা কবার আর সময় ছিল না। ব্যস্তভাবে বগলে পুরে উঠে পড়লো।

মুকুন্দবাবু তার দিকে এমন ভাবে চাইলেন,—দেখে যেন জ্বলে গেছেন।

বললেন,—আপনি কাশীবাস করতে এসেছেন,—এ সব পাপ জোটে কেন ? পরিচিত নাকি ?

"না—এমনি, পাড়ায় থাকে। হিন্দু কলেজে বি-এসসি পড়ে।

ও অনেক কলেজেই পড়ে,—সব (Sc) এসসি তেই আছে। এখানে সব ছেলেরাই চিনে ফেলেছে,—আবার কোন্ কলেজে যায় দেখুন।

স্বদেশী বুঝি ?

সে সব আমার ছেলের কাছে শুনবেন। যাই হোক্—আসতে দেবেননা। আপনার সমবয়সীও নয়, আত্মীয়ও নয়। তার ওপর কয়টি দেশস্থ ভদ্রসন্তান আপনার বাসায় এসেছেন না ? তাঁদের বিপদে...

সহসা দাঁড়িয়ে উঠে—"ঐ—ঐ না, কাকে ঠেলে নিয়ে গলিতে ঢুক্‌ছে ?"

"অনিল বোধ হয়, আমার কাছেই আসছিল—তাকেই টানলে। চেনে নাকি!—

—"কাল ছেলেগুলি বিন্ধ্যাচল বেড়াতে যাবে, সঙ্গে আমাকেই যেতে হবে।"

"তা যান। কেউ দেশের কথা কইলে কান দেবেন না—একেবারেই avoid করবেন,—এড়াবেন, ওদেরও বলে দেবেন।

আমি ভীতু লোক,—বড় ভয় পেলুম। বললুম—"আপনি দয়া করে আমার বাসায় এসে বসবেন, আমি কারুকে কিছু বলতে পারি না..... "

"দেখছি তাই করতে হবে;—একসঙ্গে 'কথামৃত' পড়া যাবে।"

চলে গেলেন।

মুকুন্দবাবু খুব রাশভারী লোক। স্পষ্টবক্তাও। আমি যেন অভিভাবক পেলুম। তবে এ সন্দেহ তাঁর মিছে,—বোধ হয় আমার চেয়েও ভীতু হবেন! অমন সুন্দর ছেলে কালীকুমার, আর অনিল তো আধ্যাত্মিক নিয়েই আছে। বাইরে বোঝবার যো নেই। ও-কাজের দস্তুরই ওই...

(ক্রমশঃ)

মধ্য-ভারত

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(ইলোরা)

গোধূলির ম্লান রক্তিমা ছায়া দিগন্ত প্রান্তে ধীরে ধীরে যখন আসন্ন সন্ধ্যার আবির্ভাব সূচনা করছে, ঠিক সেই সময় আমরা জালগাঁওয়ে ফিরে এলুম।

সকালে আমাদের স্নান হয়নি এবং খাওয়া দাওয়াটাও তেমন সুতসই হয়নি ব'লে ষ্টেশনের বাথরুমে বেশ করে স্নান করে নিয়ে আমি আর গোরক্ষপুরের বঙ্কিমবাবু বেরুলুম শহরের দিকে সান্ধ্য ভোজের ব্যবস্থা করতে। জলধরদা' আর দিবাকরবাবু ষ্টেশনেই রইলেন।

জালগাঁও শহরের মধ্যে যেটি সবচেয়ে ভালো দিশী হোটেল (বিলিতি হোটেলের নামগন্ধও সেখানে নেই) সেখানে গিয়ে কী সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তার সন্ধান ক'রে দেখলুম—তৈরী যা আছে তার মধ্যে মাংসের পোলাও ছাড়া আর কিছু আমাদের চলবেনা! হোটেলের মালিকটিকে দেখতে গুণ্ডা গোছের হ'লেও মানুষটি বেশ ভালো। তিনি ব'ললেন—আপনারা কি খেতে চান বলুন, আমি তৈরী করিয়ে দিচ্ছি। এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগবেনা।

আমাদের রাত্রি দশটার গাড়ীতে জালগাঁও থেকে মানমাদ যাবার কথা, সেখান থেকে রাত্রি বারোটায় গাড়ী বদল করে আওরাঙ্গাবাদ পৌছবার কথা ভোর বেলা। আওরাঙ্গাবাদ থেকে আমরা মোটর নিয়ে 'ইলোরা গুহা' দেখতে যাবো স্থির করিছিলুম। সুতরাং যথেষ্ট সময় আছে দেখে, আমরা ওই মাংসের পোলাওর সঙ্গে চারজনের মতন কারি, মটন কোর্মা, ডিমের মামলেট ও খান কয়েক কোপ্তা তৈরী ক'রে দেবার অর্ডার দিয়ে, এক ঘণ্টা সময় কি ভাবে কাটানো যায় ভাবতে ভাবতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।
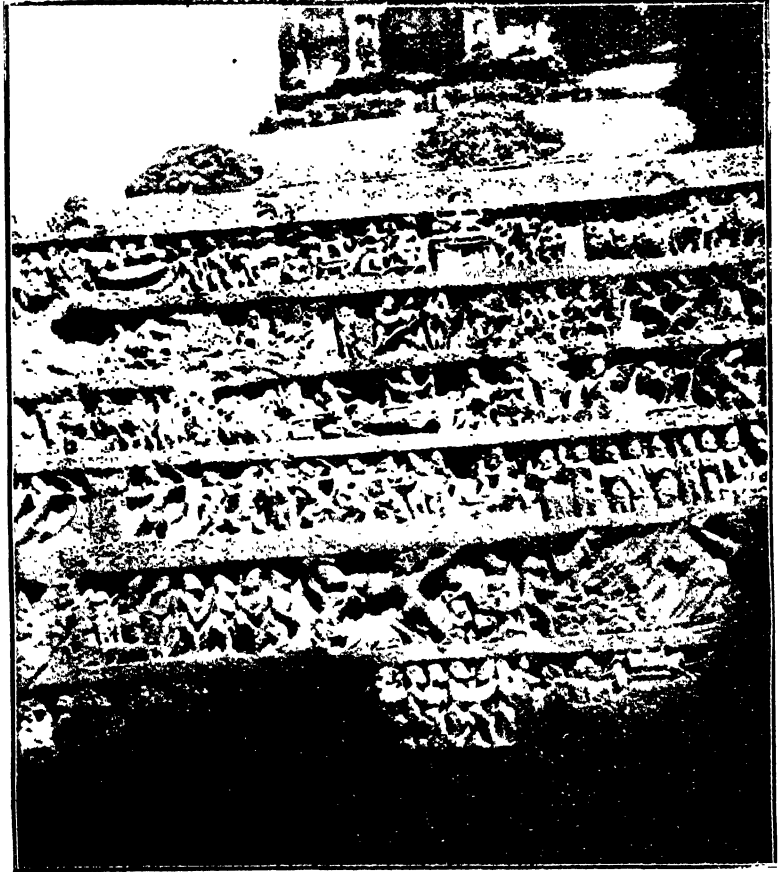
মন্দির-গাত্রে খোদিত রামায়ণের চিত্র

খানিকদূর গিয়ে দেখি, সামনে এক 'সিনেমা হাউস'! কি ফিল্ম আজ দেখানো হবে খবর নিয়ে দেখতে যাবা

আর উৎসাহ হ'লোনা। আরও খানিকদূর এগিয়ে দেখি, পথের পাশের একটি মাঠে হাট বসেছে। ফলমূল, তরি-তরকারী, চালদাল, কাপড় জামা থেকে আরম্ভ ক'রে খেলনা, পুতুল ও মণিহারী জিনিসের অসংখ্য দোকান বসে গেছে। গীতবাদ্য ও রংতামাসাও দেখানো হ'চ্ছে। অনেকটা 'মেলা'র মতো যেন! ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশী এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ সুবেশা ও সুশ্রী! মেলার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক ঘণ্টা সময় সহজেই কাটিয়ে দেওয়া গেল। আমার সঙ্গী বঙ্কিম-বাবু একটী সুন্দরী তরুণী পসারিণীর কাছ থেকে কিছু সওদা করবার প্রলোভন সম্বরণ ক'রতে পারলেন না। অত্যন্ত অনাবশ্যক কিছু জিনিস তিনি কিনছেন দেখে আমি তাঁকে বন্ধুভাবে নিষেধ করলুম। কিন্তু তিনি আমার নিষেধ শুনলেন না, বরং আমাকে নিতান্ত অরসিক ও অকবি ব'লে ভৎর্সনা করলেন।

রাবণের কৈলাস উৎপাটন প্রয়াস!

মেলার জিনিসপত্র প্রায় সমস্তই হয় জার্ম্মাণী নয় জাপানে প্রস্তুত সস্তার খেলো মাল। কাজেই কিছু কেনবার প্রবৃত্তি হয়নি আমার। আমি শুধু পোলাওর সঙ্গে ব্যবহার করবার সুবিধা হবে ব'লে— গুটি কয়েক নেবু কিনে ফেললুম। এ নেবুগুলি না পাতি না কাগজী! দুইয়ের মাঝামাঝি একরকম।

মেলায় ঘোরা শেষ ক'রে বেরিয়ে আসছি —হঠাৎ পথের ধারে একটি লঙ্কাওয়ালী বেশ বড় বড় টকটকে লাল কাঁচা লঙ্কা বিক্রয় করছে দেখা গেল। বঙ্কিমবাবু কিছু কাঁচা লঙ্কা না কিনে মেলা থেকে বেরুতে পারলেন না! কারণ, লঙ্কাওয়ালীর গালের রক্তিম আভার সঙ্গে তার ডালার টাট্‌কা-ভেঙে আনা লঙ্কাগুলির লালচে রং যেন প্রতিযোগিতা করছিল!

হোটেলে আসতেই হোটেলওয়ালা অভি-বাদন ক'রে জানালে খাবার প্রস্তুত। একটা বড় ট্রেতে খাবারগুলি সাজিয়ে নিয়ে হোটেলের একজন খানসামার মাথায় চাপিয়ে ষ্টেশনে নিয়ে আসা গেল।

আসবার সময় একটি রাস্তার মোড়ে দেখলুম এক প্রকাণ্ড বটগাছ, তার তলদেশ বাঁধানো। সেই বটগাছ সংলগ্ন একটি ছোটখাটো মন্দিরও রয়েছে। অনেকগুলি স্ত্রীলোক সেখানে জড় হয়ে ধূপ দীপ জেলে সেই বটবৃক্ষের অর্চ্চনা করছে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের সঙ্গেই একটি না একটি ছেলে মেয়ে রয়েছে। সন্ধান নিয়ে জানা গেল যে, সন্তানের কল্যাণের জন্য পুত্রবতী জননীরা এই বটের অর্চ্চনা করেন।

ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে আমরা একরাত্রির জন্য যে অস্থায়ী বাসা বেঁধেছিলুম, তারই মাঝখানের গোল টেবিলটির উপর খবরের কাগজকে টেবিল-ক্লথ ক'রে ঢেকে আমরা চারজনে সান্ধ্য-ভোজে বসে গেলুম।

জালগাঁওয়ের জল-হাওয়ার গুণেই হোক্, বা আমাদের সারাদিনের গুহা পরিদর্শনজনিত ক্লান্তির জন্যই হোক সকলেই বেশ ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে উঠেছিলুম। সুপকারদের রন্ধনের তারিফ্ ক'রতে ক'রতে পরম পরিতোষের সঙ্গে আমাদের সান্ধ্য-ভোজ শেষ করলুম। জিনিসপত্র সব গোছানোই ছিল। কেবল ঘটীবাটি, গেলাস, গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি খুচ্‌রো জিনিসগুলো বেঁধে ছেঁদে নিয়ে গাড়ীর অপেক্ষায় ক'জনে মানমাদের গাড়ী এসে পড়লো। আমরা ক'জনে একটা খালি কামরা দেখে উঠে পড়লুম। দাদার কাছ থেকে তাড়া খেয়ে জিনিসপত্রগুলো সব ঠিক উঠলো কি না, ভালো ক'রে দেখে মিলিয়ে নিতে হ'লো। ষ্টেশনে আমি এবার কিছু ফেলে এলুম কি না, তিনি বার বার সে খবরটুকু নিলেন। এবং সমস্ত জিনিস উঠেছে জেনে তবে নিশ্চিন্ত হ'লেন।
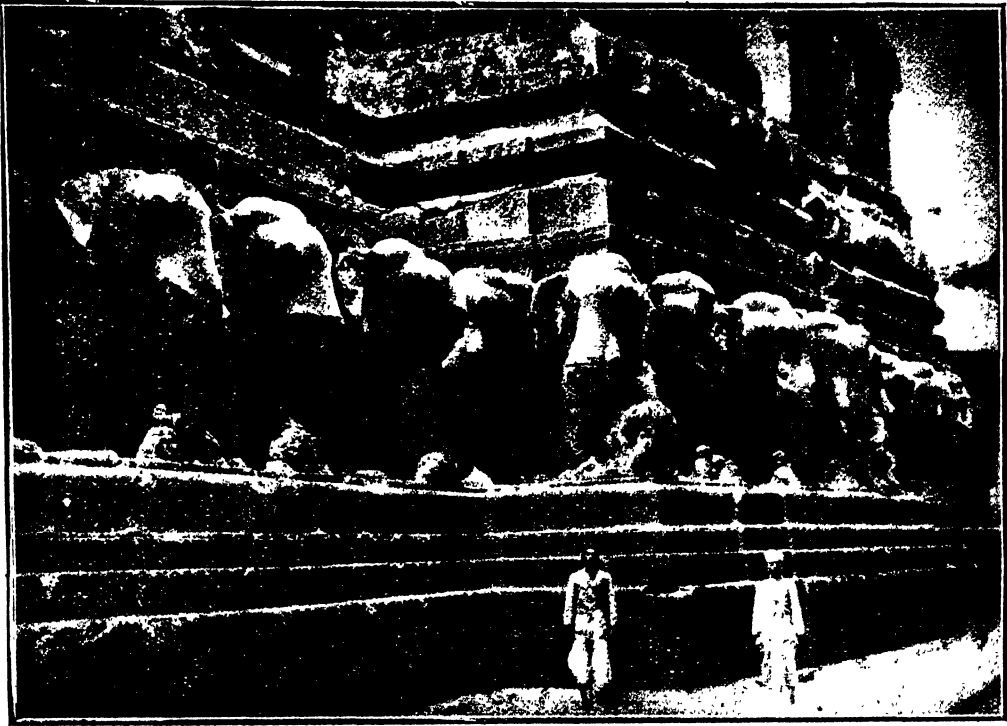
কৈলাস মন্দির মূলের ঐরাবতাসন

মিলে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর বেরিয়ে এসে অপেক্ষা ক'রতে লাগলুম।

শীতের রাত্রি যতই এগিয়ে আসছিল, পৌষের প্রখর ঠাণ্ডার হিমকরস্পর্শ ততই আমরা অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করতে পারছিলুম। দিনের বেলা তেমন শীতবোধ হয়নি। অজন্তায় আমাদের গরম জামা, ওভারকোট সব খুলে আমরা মোটরে রেখে গেছলুম। দুপুরে বেশ একটু ঘেমেও উঠতে হ'য়েছিল। কিন্তু, এখন শুধু ওভারকোট পরা নয়, তার কলার উল্টে গলার উপর তুলে দিয়ে এবং মাথার টুপী যথাসম্ভব টেনে কাণ ঢাকা দিতে হয়েছিল।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমরা ভেবেছিলুম, রাত্রি বারোটায় যখন গাড়ী বদল ক'রতে হবে, তখন আর কেউ শোবোনা। এ সময়টুকু গাড়ীতে গল্প ক'রে কাটিয়ে দেবো। কিন্তু গাড়ীর কোলে বসে দোল খেতে খেতে আমাদের সকলেরই ক্লান্ত দেহ অবিলম্বে নিদ্রার কবলে চোখ বুজিয়ে আত্মসমর্পণ ক'রলে।

হঠাৎ 'মানমাদ!' 'মানমাদ!' কাণে আসতেই ঘুম ভেঙে গেল! ধড়মড়িয়ে সব উঠে পড়লুম। 'কুলি!' 'কুলি!' বলে সমস্বরে ক'জনে চীৎকার করতে লাগলুম— কিন্তু তাদের আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলুমনা।

নিজেরাই ব্যস্ত হ'য়ে সমস্ত মালপত্র ধরাধরি ক'রে গাড়ী থেকে নামিয়ে ফেললুম।

ইতিমধ্যে কুলিরা এসে পড়লো। আওরাঙ্গাবাদের গাড়ীতে আমাদের জিনিস সব তুলে দিতে ব'লে আমরা নিশীথ রাত্রের তীব্র শীতে কাঁপতে কাঁপতে চায়ের দোকানে গিয়ে হাজির হলুম। গরম চা' ছু' এক কাপ খেয়ে ধাতস্থ হ'য়ে আমরা গাড়ী বদল করলুম।
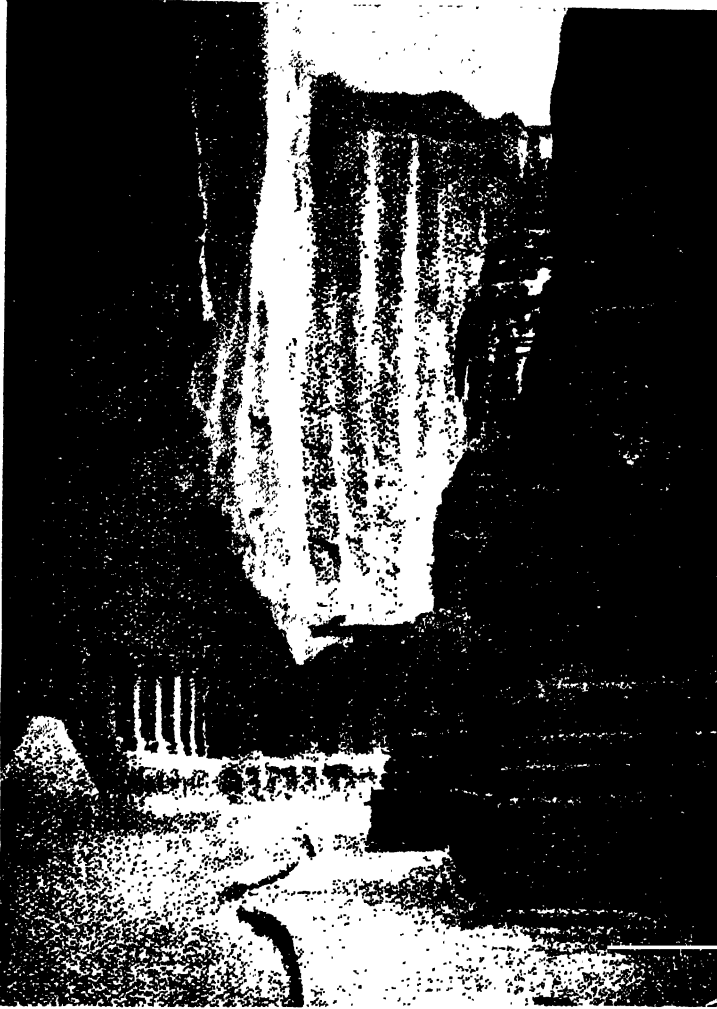
আবার সেই মালের সতর্ক হিসাব নেওয়া হ'লো। সব ঠিক্ উঠেছে দেখে সে রাত্রের মতো নিশ্চিন্ত হ'য়ে শোয়া গেল।

কৈলাস-মন্দির-পরিবেষ্টিত পর্ব্বতপ্রাচীর ও বারান্দা

ভোর ছ'টায় আওরাঙ্গাবাদে এসে নামলুম। শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট উষা। তখনও প্রভাতের আলো ভালো ক'রে ফোটেনি। ভোরের কণ্‌কণে ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাস আমাদের গায়ের সমস্ত গরম কাপড়কে তুচ্ছ ক'রে একেবারে হাড়ের সঙ্গে পরিচয় করে নিতে লাগলো। সে পরিচয়ের নিবিড় আবেগে আমাদের আপাদ-মস্তক ক্ষণেক্ষণে থর-বিকম্পিত হ'য়ে উঠছিল!

মালপত্র সব প্ল্যাটফর্ম্মের উপর ফেলে রেখে চা-ওয়ালার শরণাগত হওয়া গেল। তাকে তাড়া দিয়ে খুব খানিকটা চা তৈরী করিয়ে নিয়ে ক'জনে একাধিক পেয়ালা পান করে মোটর গাড়ীর দর ক'রতে লেগে যাওয়া গেল। আওরাঙ্গা-বাদ ষ্টেশন থেকে ইলোরা গুহার দূরত্ব মোটে চৌদ্দ মাইল। মোটরবাস্‌ওয়ালারা একটাকা ক'রে মাথা-পিছু নিয়ে আমাদের পৌঁছে দিতে চাইলে। কিন্তু, আমাদের মতলব ছিল অন্যরকম। সময় আমাদের হাতে অত্যন্ত কম। ৬ই জানুয়ারীর মধ্যে জলধরদাদাকে কলকাতায় ফিরতেই হবে, নইলে "ভারতবর্ষ" বেরুতে দেরী হ'তে পারে। বঙ্কিমবাবু ও দিবাকরবাবু ব'ললেন—"৬ই জানুয়ারী গোরক্ষপুরে ফিরতে না পারলে তাঁদের 'বেকার' অবস্থায় একেবারে এখান থেকেই দেশে ফিরে যেতে হবে! আর কর্ম্মস্থলে মুখ দেখানো চলবে না!" আমার ছুটিও যদিও ২১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছিল, তবু ৬ই জানুয়ারীর মধ্যে ইলোরা, নাসিক্, বোম্বাই, পুণা ঘুরে কলকাতায় ফিরতে গেলে যে রকম বিদ্যুৎ-গতিতে ভ্রাম্যমান হওয়া দরকার, অগত্যা সেইরূপ ব্যবস্থাই ক'রতে হ'লো।

চারজনে পরামর্শ ক'রে স্থির করলুম যে, আজকে তারিখ হ'লো ৩রা জানুয়ারী। আজ ইলোরা দেখে আওরাঙ্গাবাদে ফিরে এসে যদি আবার মানমাদ হ'য়ে বোম্বাই যাওয়া হয়,

তাহ'লে ৫ই তারিখের আগে নাসিক্ দেখে বোম্বাই পৌঁছাতে পারবো না, একদিন ও একরাত্রি অকারণ বিলম্ব হ'য়ে যাবে, কিন্তু আওরাঙ্গাবাদে আর না ফিরে যদি সকালের দিকেই ইলোরা দেখা শেষ ক'রে একেবারে চাল্লিশগাঁওয়ে গিয়ে বেলা একটার ট্রেণ ধ'রতে পারি, তাহ'লে আজই ৪টে নাগাদ আমরা 'নাসিক্' গিয়ে পৌঁছতে পারবো। বিকেলটায় নাসিক পরিদর্শন শেষ ক'রে আবার আজই রাত্রি দশটার গাড়ীতে বোম্বাই রওনা হওয়া যাবে। তাহ'লে ৪ঠা জানুয়ারী ভোরে বোম্বাই পৌঁছুতে পারবো। চৌঠা থেকে ৬ই পর্য্যন্ত তিন দিন বোম্বায়ে থাকা যাবে। তারই মধ্যে একদিন গিয়ে পুণাও বেড়িয়ে আসা হবে, তারপর ৬ই রাত্রের গাড়ীতে বোম্বাই ছেড়ে যে যার ঘরমুখো হবো।

যে কথা সেই কাজ! এইভাবে গেলে একটা দিন পুরো যখন হাতে পাওয়া যাবে

মন্দির-পরিবেষ্টিত মূর্ত্তিশ্রেণী (ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্য্য)
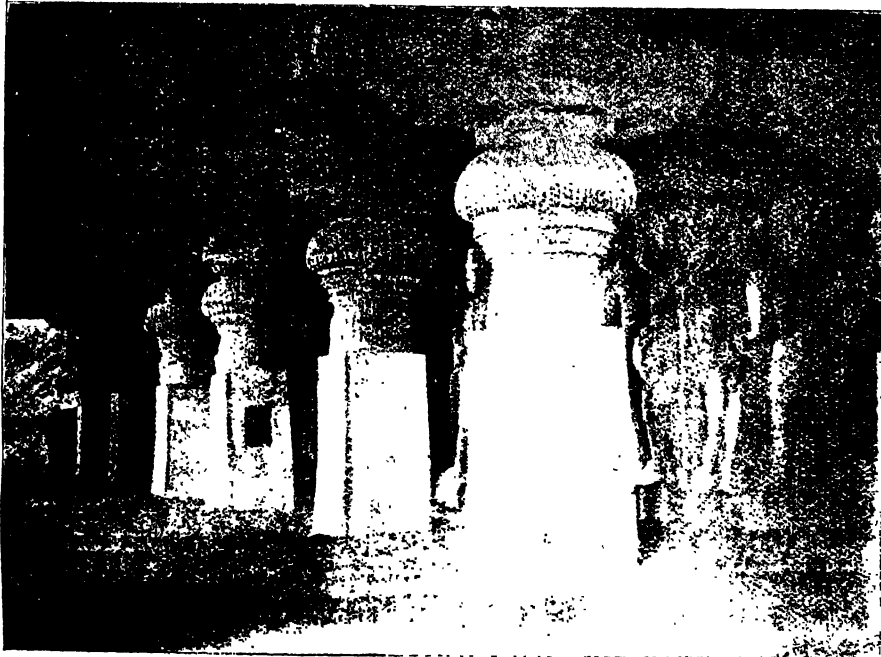
বারান্দার স্তম্ভশ্রেণী

তখন আর এতে অন্য মত কি থাকতে পারে? আমরা তাই আর মোটরবাসে ইলোরা না গিয়ে একখানি 'সপ্তাসন' 'ইলোরা গুহা' দেখাতে নিয়ে যাবে। আবার পথে দাঁড় করিয়ে দৌলতাবাদের প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য দুর্গটি দেখবার সুযোগ দেবে।
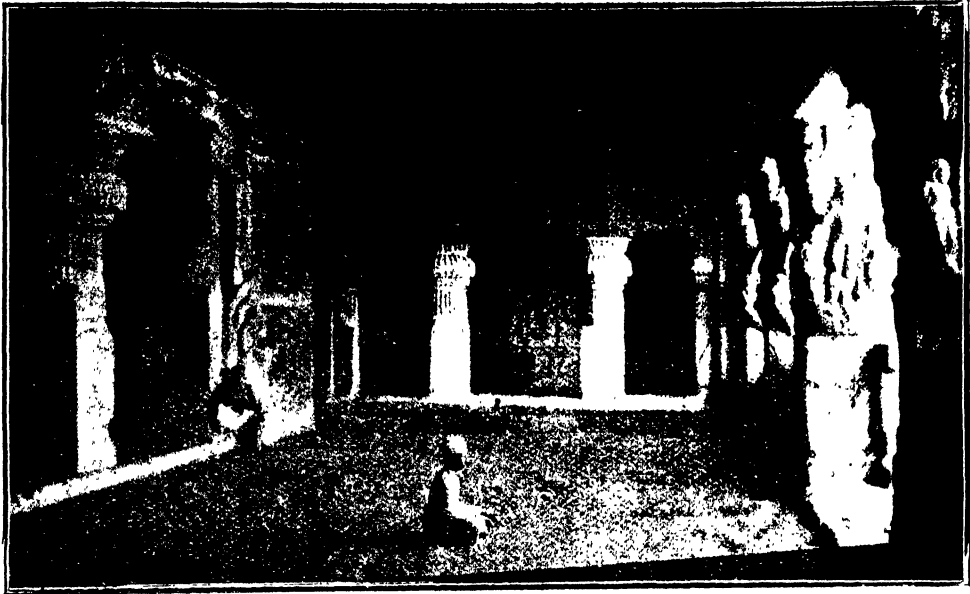
একটি ব্রাহ্মণ্য গুহার অভ্যন্তর

কৈলাস মন্দির-প্রাঙ্গণ

তার পর আমরা যদি বেলা ১০টার মধ্যে 'ইলোরা' দেখা শেষ ক'রতে পারি, তাহ'লে সে নিশ্চিত আমাদের ৫৬ মাইল দূরে চাল্লিশগাঁওয়ে নিয়ে গিয়ে বেলা একটার ট্রেণ ধরিয়ে দিতে পারবে। 'দুর্গা' ব'লে মালপত্র সব মোটরের মধ্যে কতক এবং কতক ফুটবোর্ড ও মাডগার্ডের উপর তুলে বেঁধে ছেঁদে নিয়ে 'ইলোরা' যাত্রা করলুম। তখনও সাতটা বাজেনি।

বেলা আটটার মধ্যেই ইলোরা গুহার সম্মুখে এসে নামলুম আমরা। এখানে মোটর প্রায় পাহাড়ের গুহার

Seven Seater) ডজ্ গাড়ী চল্লিশ টাকার ঠিক ক'রে দ্বার পর্য্যন্ত আসতে পারে এমন ভাবে ঢালু রাস্তা তৈরী

পথে আমরা দৌলতাবাদের পার্ব্বত্য দুর্গটি দেখে আসতে ভুলিনি। আওরাঙ্গাবাদ থেকে দৌলতাবাদ মাত্র ৮ মাইল দূরে। মোগল সম্রাট আওরাঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তিনি এই আওরাঙ্গাবাদ শহরটি প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন এবং নিজের নামেই এর নামকরণ ক'রেছিলেন—আওরাঙ্গাবাদ। আওরাঙ্গাবাদ শহরটির সর্ব্বাঙ্গে এখনও সেই প্রাচীন মোগল নগরীর বিশেষত্বের ছাপ সুস্পষ্ট লেগে রয়েছে দেখা গেল। এতকালেও যে এ শহরটির খুব বেশী কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। প্রাচীন মোগল শহর—সেই ডোম, মীনার, মসজেদ্, ত্রিকোণ খিলান, স্তম্ভ-তোরণ, নহবৎখানা মুশাফের মহল—বেশ লাগছিল তার মধ্যে দিয়ে যেতে। ছোট্ট শহর। শীঘ্রই আমরা নগর-প্রাকারের তোরণ দ্বার পার হ'য়ে তার পার্ব্বত্য উপকণ্ঠে এসে পড়লুম।

অনেকদূর থেকেই দৌলতাবাদের পার্ব্বত্য দুর্গের গগনস্পর্শী চূড়া দেখা যাচ্ছিল। আমরা দৌলতাবাদে পৌঁছে দেখলুম শহরটি ধ্বংস হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু ওই দুর্ভেদ্য পাষাণ কেল্লা! একটি উঁচু পাহাড়ের একেবারে চূড়োর উপর এই কেল্লাটি তৈরী হ'য়েছিল। পাহাড়টি সোজা উপরে উঠে গেছে ব'লে এটিতে চড়া একটু দুরারোহ ব্যাপার ব'লেই মনে হ'লো। ওঠবার চেষ্টাও কেউ করলুম না, কারণ আমাদের একান্ত সময়াভাব। নইলে, ইলোরা যাবার পথে এই আওরাঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ ও খুল্‌দাবাদ এই তিনটি যায়গাতেই অনেক কিছু দেখবার ছিল। আওরাঙ্গাবাদ শহর থেকে তিন মাইল দূরে যে গিরি গুহা আছে, ৬৫০ খৃঃ অব্দে বৌদ্ধ ভক্তদের দ্বারা সেটি নির্ম্মিত হ'য়েছিল। বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য-শিল্পের যে অপূর্ব্ব নিদর্শন এই আওরাঙ্গাবাদের গুহায় এখনও দেখতে পাওয়া যায় তা' অন্যত্র দুর্লভ! কিন্তু, কোনও উপায় ছিল না সে সব দেখে যাবার, আমাদের অবকাশের আয়ু তখন প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে। তাই, ভগবদ্দর্শনাভিলাষী সাধক যেমন সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের মায়া ত্যাগ ক'রে ছুটে যায় তার পরম প্রেয়র সন্ধানে, তেম্‌নি ক'রে আমরা পথের ধারে ধারে ছড়ানো ছোট-খাটো বিস্ময়ের সামগ্রীগুলিকে বেদনার সঙ্গে বর্জ্জন ক'রে ছুটে চ'ললুম একেবারে সেই বিশ্বের বিরাট বিস্ময়ের বস্তু 'কৈলাস' দেখতে।

কৈলাসের নন্দীপীঠ

কৈলাস মন্দির-প্রাঙ্গণের ধ্বজস্তম্ভ
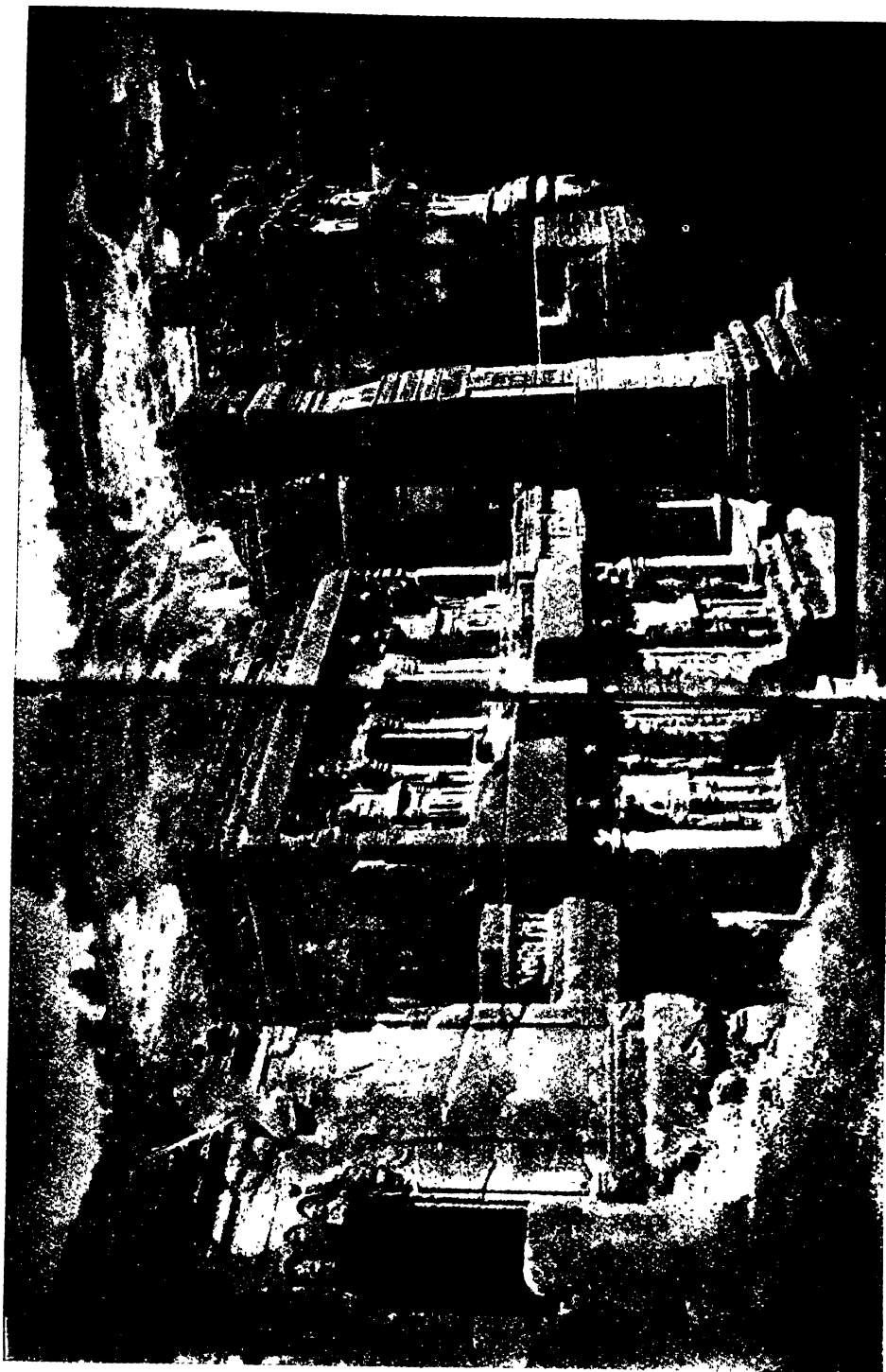
ইলোরার প্রধান দ্রষ্টব্য এই কৈলাস মন্দির। অবনীর অষ্টম আশ্চর্য্যের চেয়েও অধিকতর অদ্ভুত মানবের এই বিস্ময়কর কীর্ত্তি! বিশাল পর্ব্বতের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে এই বিরাট মন্দির সৃষ্ট হ'য়েছে। এই শিব-নিকেতনের বিপুল আয়তন এবং এর অসামান্য স্থাপত্য-কৌশল ও ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্য দেখে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে ভাবতে হয়—এও কি সম্ভব? মানুষে কি কখনো এ জিনিস গড়তে পারে? এ নিশ্চয়ই সেই বিশ্বকর্ম্মার কাজ!—

আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে, অর্থাৎ ভারতে বৌদ্ধ কীর্ত্তির অব্যবহিত অস্ত বেলায় এবং ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পুনরভ্যুদয়ের প্রথম প্রভাতে এই কৈলাসের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হ'য়েছিল। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই মন্দির সমাপ্ত হ'তে সম্ভবতঃ শত বৎসরেরও অধিককাল লেগেছিল। কারণ, এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রায় তিরিশ লক্ষ বর্গ ফিট পরিমাণ পাথর তাদের কাটতে হ'য়েছিল। পাহাড়ের বুকের কঠিন পাষাণ-ভার ছেদ ক'রে সেকালের অদ্ভুতকর্ম্মা শিল্পীরা ২৭৬ ফিট লম্বা ও ১৫৪ ফিট চওড়া একটি প্রকাণ্ড গহ্বর খনন ক'রেছিল। মধ্যে ১০৭ ফিট উঁচু একটি স্তূপ ছেড়ে রেখেছিল। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই বিশাল গহ্বরের গভীরতাও ১০৭ ফিট। এই যে বিরাট পাষাণ স্তূপটিকে তারা গহ্বরের মধ্যস্থলে অক্ষত রেখেছিল, এইটিকেই তারা পরে একটি অভ্রংলিহ দ্বিতল মন্দিরে রূপান্তরিত ক'রে নিয়েছিল। আমরা তাজমহল দেখে অবাক্ হ'য়ে যাই! কিন্তু এই গিরি-দেউল কৈলাসের অসামান্য পরিকল্পনা ও কারুকার্য্যের কাছে বিশ্ব-বিশ্রুত তাজমহলও যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে!

কৈলাস মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরে বৃহদাকার ঐরাবত, সিংহ, গরুড় প্রভৃতি যে সব অতিকায় জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা আছে, আজ তাদের অধিকাংশই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু সেদিন বোধ হয় তাদের অস্তিত্ব বজায় ছিল। মন্দিরের গাত্রে দেখতে পাওয়া যায়, তারা কেউ চরে বেড়াচ্ছে, কেউ যুদ্ধ ক'রছে, কেউ শত্রুকে পদদলিত ক'রছে! ভিত্তিভূমির তলপত্তনের উপর প্রশস্ত দালান, সুদৃশ্য চতুষ্কোণ স্তম্ভরাজি, দ্বারমণ্ডপ, পুণ্য পীঠ, আসন-বেদী প্রভৃতি, সে যুগের ভাস্কর শিল্পীদের অসাধারণ কলা-কৌশল ও রূপ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। তারা যেন চেয়েছিল এমন একটি দেবমন্দির গ'ড়ে তুলতে—ভূ ভারতে যার তুলনা মিলবে না! তাদের এ উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হ'য়েছিল সে বিষয়ে আর কোনো মতদ্বৈধ থাকতে পারেনা।

কৈলাসের মন্দির চত্বর

মন্দির গাত্রে মহাভারত ও রামায়ণের যে সব কাহিনী

পাষাণ চিত্রে উৎকীর্ণ করা আছে তা দেখে অনেকে এই কৈলাসের নাম রেখেছেন 'গিরিকাব্য' (Rock Poem)। মন্দিরটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৬৪ ফিট লম্বা এবং উত্তর দক্ষিণে ১০৯ ফিট লম্বা। মন্দিরের চারদিকেই চারিটি ৪৫ ফিট উঁচু ধ্বজস্তম্ভ আছে। মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে যে মূর্ত্তি চিত্রটি উৎকীর্ণ করা আছে সেটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। লঙ্কেশ্বর রাবণ স্বয়ং বাহুবলে কৈলাস পর্ব্বতটিকে সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা ক'রছেন। কৈলাস শৃঙ্গে হর-পার্ব্বতী ব'সেছিলেন। পার্ব্বতী সভয়ে যেন পতিকে জড়িয়ে ধ'রেছেন। একজন পরিচারিকা প্রাণভয়ে পলায়ন ক'রছে।
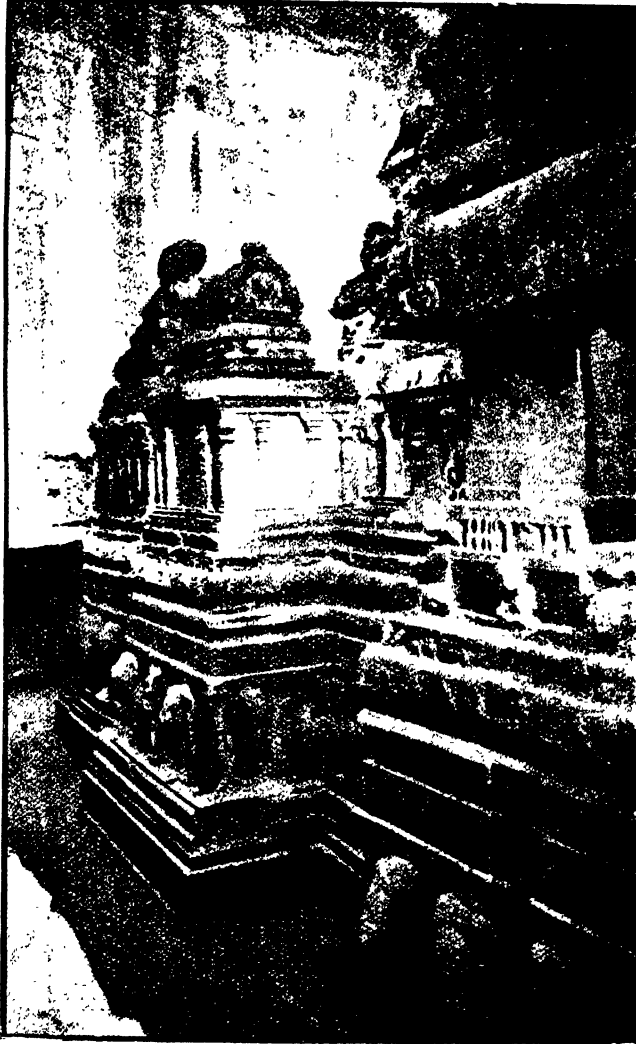
কৈলাসের পঞ্চদেবতা মন্দির

উৎকীর্ণ করা আছে, সেগুলি আকারে ও ভঙ্গীতে অবিকল জীবন্ত হাতীর মতো! মন্দির-প্রাঙ্গণটি পরিবেষ্টন ক'রে চারিদিকে একটি প্রশস্ত বারান্দা ঘুরে গেছে। এই বারান্দাটি আবার কোথাও দ্বিতল—কোথাও ত্রিতল। এই বারান্দার দেওয়ালের গায়ে সারি সারি নানা দেব দেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে। ভাস্কর্য্য-শিল্পের দিক থেকে বিচিত্রতা ও সুসম্পূর্ণতা হিসাবে এগুলির অসাধারণ বিশেষত্ব আছে। বাঘেশ্বরী, কালী, কালভৈরব, নিয়তি, মহাকাল প্রভৃতির মূর্ত্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দেখলে কষ্ট হয় যে, এমন মূঢ় বর্ব্বরের দলও তখন পৃথিবীতে ছিল, যারা জগতের এমন অদ্বিতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্প ও কলা নৈপুণ্যের অপূর্ব্ব নিদর্শনকেও ধ্বংস ক'রে ফেলতে চেষ্টা ক'রেছিল—তাদের পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতার দোহাই দিয়ে! শুধু কি ভাস্কর্য্য? এই কৈলাস মন্দিরাভ্যন্তরও আগাগোড়া অজন্তার মতোই বহুবর্ণে চিত্র-বিচিত্র করা ছিল, তার ক্ষীণ চিহ্নাবশেষ আজও একেবারে লুপ্ত হয়নি, —কিন্তু বিধর্ম্মীরা নির্ব্বিকার হ'য়ে সে শোভাও নষ্ট ক'রে দিতে পেরেছিল!

মাত্র একহাজার বৎসর আগেও এই কৈলাস ছিল ভারতের এক মহাতীর্থ ভূমি। দেশ-দেশান্তর থেকে অসংখ্য তীর্থযাত্রীরা আসতো শিবের পূজা দিতে এখানে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম যে 'গ্রীষ্মেশ্বর'—সে যুগে এখানে তাঁরই বিগ্রহ ছিল! এখন তিনি ইলোরা গায়ে আশ্রয় নিয়েছেন। বর্ত্তমানে এ সবই নিজামরাজ্যভুক্ত হ'য়েছে। এ মন্দিরও দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত হ'য়ে মাটিচাপা ছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ একে নূতন করে আবিষ্কার করেছে। নিজাম সরকার একে এখন তাঁদের সযত্ন তত্ত্বাবধানে রেখেছেন।

দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী সম্রাট দন্তীদুর্গ অষ্টম শতাব্দীতে এই কৈলাস-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন ব'লে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। এখানে পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন গুহাও আছে অনেকগুলি। সুতরাং ইলোরার প্রধান

শিল্প-ধারার ত্রিবেণী সঙ্গম একত্র দেখতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতগাত্রে সারি সারি এই গুহাগুলি প্রায় কিঞ্চিদধিক এক মাইল স্থান জুড়ে আছে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে! বৌদ্ধ গুহাগুলিই সবচেয়ে প্রাচীন বলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অভিমত দিয়েছেন। অজন্তাগুহার সঙ্গে ইলোরার এই বৌদ্ধগুহাগুলির এত বেশী সৌসাদৃশ্য আছে যে এগুলির আর নূতন করে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষত্বের মধ্যে এখানে একটি ত্রিতল বৌদ্ধগুহা দেখা গেল, এবং চিত্র অপেক্ষা ভাস্কর্য্যের প্রাধান্যই এখানে বেশী! ইলোরার এই পর্ব্বতের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে সারি সারি বৌদ্ধগুহা দেখতে পাওয়া যায় এবং উত্তরাংশে জৈন-মন্দির-শ্রেণী। এগুলি 'ইন্দ্রসভা' নামে খ্যাত। এই বৌদ্ধ ও জৈন গুহাগুলির ঠিক মধ্যভাগে সারি সারি প্রায় ১৫।১৬টি ব্রাহ্মণ্যগুহা। ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্য ও শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্যই যেন এই বিরাট মন্দির কৈলাস সে গুলির মধ্যে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এটিকে কিন্তু আর গুহা বলা চলবেনা। ব্রাহ্মণ্য যুগের প্রভাবে প্রস্তুত এখানে প্রায় ১৫।১৬টি গুহা আছে বটে কিন্তু সেগুলি সমস্তই প্রায় বৌদ্ধগুহার অনুকরণে নির্ম্মিত! কেবলমাত্র এই কৈলাস মন্দির গুহার মধ্যে থেকেও গুহার অবগুণ্ঠন খুলে ফেলেছে এবং বৌদ্ধ-প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে ফেলতে পেরেছে!

কৈলাসের মন্দিরে প্রবেশ করবার সময় আমরা বুঝতে পারিনি কিন্তু, যে এটি গুহা নয়! কারণ, গুহার প্রবেশ-দ্বারের মতোই কৈলাসের মন্দিরের তোরণ-দ্বারও পর্ব্বতগাত্র ভেদ করে নির্ম্মিত হ'য়েছে। কিন্তু, ভিতরে প্রবেশ করেই আমরা বিস্মিত হ'য়ে গেলুম। তোরণ-দ্বার পার হবার পরই মাথার উপর আর পর্ব্বতের চিহ্নমাত্র নেই! আকাশ দেখা যাচ্ছে!

প্রবেশ-দ্বারের বাইরের দিকে দশ অবতারের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। ভিতর দিকে উভয় পার্শ্বে পর্ব্বত খোদিত কক্ষ বা বাসগৃহ রয়েছে দেখা গেল। তার পরই সম্মুখে প্রকাণ্ড এক 'কমলা'র মূর্ত্তি। পদ্মাসনা লক্ষ্মীর শিরে গজযুথ শুণ্ডের দ্বারা বারি বর্ষণ করছে।

মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণে ও বামে দুটি বিপুলাকার ঐরাবত দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে একটির অত্যন্ত ভগ্নদশা দেখে দুঃখ হ'লো। প্রাঙ্গণের সম্মুখে সুবৃহৎ নন্দীপীঠ। এটি দ্বিতল এবং মন্দির ও তোরণ শীর্ষের সঙ্গে সেতু দ্বারা সংযুক্ত। এই নন্দীপীঠের উভয় পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোণ ধ্বজস্তম্ভ আছে।
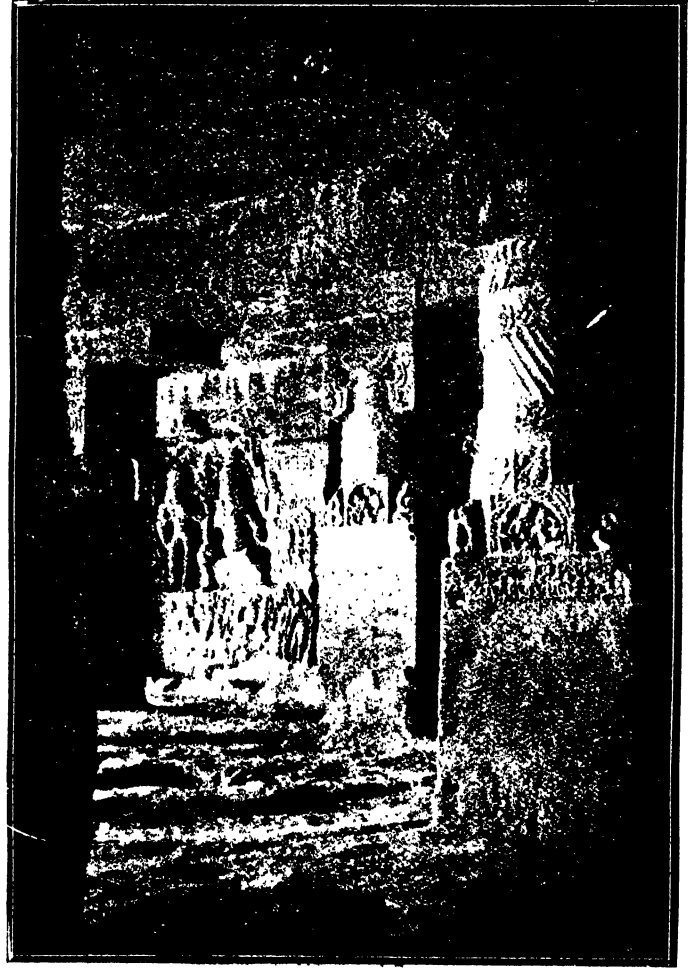
কৈলাসে অন্নপূর্ণা

নন্দীপীঠকে মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রছে যে সেতু তার

[দি]য়ে পরস্পর বিপরীত দিকে শিবের দুটি বড় বড় মূর্ত্তি আছে। একটি তাঁর কালভৈরব মূর্ত্তি; অপরটি মহাযোগীরূপে ধ্যানী মহেশ্বর! একটিতে আছে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ করা, অন্যটিতে আছে মহাভারতের কাহিনী উৎকীর্ণ করা।

দ্বিতলের উপর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বে

লঙ্কেশ্বর মন্দিরের প্রবেশদ্বার

এই সেতুর উভয়পার্শ্ব দিয়ে মন্দিরের দ্বিতলে উঠবার সোপান-শ্রেণী। এই দুই সোপানের প্রাচীর-গাত্রেই দুই শৈব দ্বারপাল গদা স্কন্ধে দণ্ডায়মান। ভিতরে একটি প্রশস্ত দালান। ৫৭ ফিট চওড়া ও ৫৫ ফিট লম্বা। এই দালানের মধ্যে বড় বড় চৌকো থাম উঠেছে ষোলোটি। এই ষোলোটি থাম মন্দিরের ছাদটি ধারণ করে আছে। এই দালানের পূর্ব্বপ্রান্তে গর্ভমন্দির ও বিগ্রহ-গৃহ। বিগ্রহ-গৃহ-দ্বারের উপরে মধ্য স্থলে পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে পার্ব্বতী; তাঁর উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেব ও গন্ধর্ব্ববৃন্দ। গর্ভ-মন্দিরের উত্তর দিকের প্রাচীর-গাত্রে হরপার্ব্বতী অক্ষক্রীড়া ক'রছেন—উৎকীর্ণ ছিল,

দক্ষিণের প্রাচীরগাত্রে শিবদুর্গা বৃষভারোহণে যাচ্ছেন। শিবের কোলে কুমার! সঙ্গে প্রমথবৃন্দ।

বিগ্রহ-গৃহদ্বারের উভয় পার্শ্বে দ্বারপালের পরিবর্ত্তে মকর-পৃষ্ঠে গঙ্গা ও কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে যমুনা দাঁড়িয়ে! বর্ত্তমানে উভয়েরই মুখ দুটি ভেঙে গেছে। বিগ্রহ-গৃহ চতুর্দ্দিকে ১৫ ফিট করে দীর্ঘ একটি সাধারণ চতুষ্কোণ কক্ষ। ছত্রতলে একটি শুধু বড় গোলাপের মতো শতদল ফুল। এর মধ্যে কী যে বিগ্রহ ছিল, শিবের মূর্ত্তি না লিঙ্গ তা আজ জানবার উপায় নেই, কারণ মুসলমানেরা অনুগ্রহ করে তাকে অনেক আগেই ধ্বংস করেছিলেন। অনুমানে লিঙ্গই ছিল ব'লে মনে হয়। কারণ এই কৈলাসকে কেউ কেউ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলে উল্লেখ করে গেছেন। তা ছাড়া রাঠোর রাজাদের সৌভাগ্যের যুগে মধ্যভারতে লিঙ্গায়েৎ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রভাবই খুব বেশী রকম চোখে পড়ে।

দ্বিতলের উপর প্রধান মন্দিরের চারিদিক পরিক্রমণ করবার মতো ছাদ আছে। এই ছাদের ধারে ধারে ঘিরে আরও পাঁচটি ছোট ছোট মন্দির আছে। এই পঞ্চ ক্ষুদ্র মন্দিরে যে কোন্ পঞ্চ দেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন তা' আর জানবার উপায় নেই!

মন্দির থেকে বেরিয়ে সেতুর উপর দিয়ে আমরা নন্দীপীঠে গেলুম। নন্দীমণ্ডপের মধ্যে দেখি একটি ছোট্ট পাথরের বৃষ রয়েছে! বেশ বোঝা যায় এটি অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করে এনে এখানে রাখা হ'য়েছে। আসল বৃষটি স্থানচ্যুত হ'য়েছে। এটি একটি জাল-নন্দী!

শিব তাণ্ডব

কৈলাসের মন্দির থেকে নেমে আমরা আবার প্রাঙ্গণে এসে পড়লুম। প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে দক্ষিণের বারান্দার উপর দিয়ে ভাঙা সিঁড়ি অতি কষ্টে বে'য়ে আমরা যজ্ঞশালায় গিয়ে উঠলুম। এটি ৩৭ ফিট লম্বা ও পনেরো ফিট চওড়া। যজ্ঞশালার সামনে দুটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগাত্রে দুটি এলোকেশী বামার মূর্ত্তি আছে। সঙ্গে তাদের বামন অনুচর। ভিতর দিকে দুটি থামের পিছনে দুটি বেদী আছে। তিন দিকে দেওয়াল। দেওয়ালের ধারে ধারে বড় বড় সব মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। প্রথমেই বাঘেশ্বরী মূর্ত্তি। চার হাত। হাতে ত্রিশূল, পদতলে ভীষণ এক ব্যাঘ্র! দ্বিতীয় মূর্ত্তিও প্রায় ওই একই রকম। তৃতীয় মূর্ত্তি কাল বা নিয়তি! এক ভয়াল কঙ্কাল মূর্ত্তি কটিতে ভুজঙ্গ মেখলা ও কণ্ঠে ফণীহার! শবাসনে সমাসীনা! পার্শ্বে এক হিংস্র ব্যাঘ্র একটি শবের পা চিবিয়ে খাচ্ছে! তার পরই কালীমূর্ত্তি, সঙ্গে ডাকিনী! পিছনের দেওয়ালে গণপতি, একটী স্ত্রীলোক এক শিশুকে নিয়ে শার্দ্দুল-পৃষ্ঠে বসে আছেন ইন্দ্রাণী, পার্ব্বতী ও নন্দী, লক্ষ্মী ও গরুড়! কার্ত্তিকেয়ী ও তাঁর শিশু, সঙ্গে বাহন ময়ূর চঞ্চুপুটে একটি সর্প ধরে আছে। ত্রিশূল হস্তে চতুর্ভুজা বৃষবাহনা আর এক দেবী, এবং সরস্বতী মূর্ত্তি। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে

আরও তিনটি দেবীমূর্ত্তি, ও একটি স্থূলকায় বামনের মূর্ত্তি। কেউ কেউ বলেন ওঁরা শিবকালী, ভদ্রকালী ও মহাকালী। এই তিন কালীর রূপ! পাহাড় কেটে প্রমাণ আকারের এই বড় বড় মূর্ত্তিগুলি পাশাপাশি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাস্কর্য্য-শিল্পের যেন চরম নিদর্শন! মূর্ত্তিগুলি দেওয়ালের ধারে ধারে কুঁদে বার করা হয়েছে বটে, কিন্তু দেওয়ালের সঙ্গে লেগে নেই কোনওটি। কৈলাস মন্দিরের এই যজ্ঞশালার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে আমরা ভাবতে লাগলুম—কী অসাধারণ প্রতিভা ও কলা-নৈপুণ্য নিয়েই না এই অদ্বিতীয় ভাস্কর ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিলেন! কী বিরাট তাঁর কল্পনা! কী মহান্ তাঁর ধ্যান!—আর কী অসীম দক্ষতার সঙ্গেই না এই পাহাড়ের বক্ষ ভেদ ক'রে তিনি তাঁর অনুপম ভাবনাকে এ হেন অপরূপ রূপ দিয়ে গেছেন!

অষ্টভুজ শিব

প্রাঙ্গণের উত্তর দিকের বারান্দা ঘুরে আর একটি সোপান অতিক্রম ক'রে আমরা এবার যেখানে এসে পৌছলুম—এটিকে বলে—লঙ্কা বা লঙ্কেশ্বর। এরও প্রবেশ-পথের সম্মুখেই 'কমলা'র মূর্ত্তি রয়েছে দেখলুম। উপরের ঘরটি ১২৩ ফিট লম্বা ও ষাট ফিট চওড়া। এর ছাদ একটু নীচু। ২৭টি সুবৃহৎ স্তম্ভ এই লঙ্কার ছত্র ধারণ ক'রে রয়েছে। প্রত্যেক স্তম্ভটি অতি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত। দক্ষিণের স্তম্ভ-গুলি আবার একটি নীচু পাষাণ-বেষ্টনী দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই বেষ্টনীর ভিতর দিকটি ভাস্কর্য্য মণ্ডিত। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি, তার পর অর্দ্ধনারীশ্বর। তৃতীয় ভৈরব বা বীরভদ্র, চতুর্থ হরপার্ব্বতী, পঞ্চম শিবদুর্গা ও গণেশ। সব শেষে করোটী-কিরীট শিরে রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য!

লঙ্কার বিগ্রহ-গৃহ ও গর্ভ-মন্দির অনেকটা কৈলাসের প্রধান মন্দিরের অনুকরণেই তৈরী করা হ'য়েছে দেখা গেল। প্রদক্ষিণ পথের দক্ষিণে রাবণের কৈলাস উৎপাটন ও উত্তরে শিবদুর্গার অক্ষক্রীড়ার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। বিগ্রহ-গৃহের দ্বারপার্শ্বে সেই গঙ্গা যমুনার মূর্ত্তি। বিগ্রহ-গৃহের পশ্চাতের দেওয়ালে ত্রিমূর্ত্তি শিব অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের এই তিন মুখ তাঁর একই দেহে দেখানো হ'য়েছে।

কৈলাস-মন্দির-প্রাঙ্গণের চারিপার্শ্বের পর্ব্বত-বেষ্টনীর মধ্যে যে সুদীর্ঘ অলিন্দ গুহা বা বারান্দা আছে পূর্ব্বেই বলেছি তার পশ্চাতের প্রাচীর-গাত্রে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে। পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে সুরু ক'রলে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই সূর্য্য-গ্রহ বা অরুণ-দেবতা। তার পরই বরাহ অবতার। তার পরই তাপসী উমা। এইবার একটি কক্ষ। কক্ষাভ্যন্তরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, মধ্যে চতুর্ভুজ শিব। শিবের সঙ্গেই একপাশে

নন্দী, একপাশে ভৃঙ্গী। তার পরই আবার বারান্দা। প্রথমে নৃসিংহ অবতার, তার পর গণপতি। দক্ষিণে দ্বারপাল। পশ্চিমে সপ্ত-মাতৃকা।

প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে একটি ছোট দেব-মণ্ডপ। মণ্ডপের সম্মুখে দুটি স্তম্ভ। ভিতরের দিকে দেওয়ালে তিনটি নদী-মাতৃকার মূর্ত্তি। মকরবাহন গঙ্গা, কূর্ম্মবাহন যমুনা, পদ্মবাহন সরস্বতী। পট-ভূমিকায় লতা-গুল্ম, সরীসৃপ, জলজ তরু প্রভৃতিও উৎকীর্ণ করা আছে।

দক্ষিণদিকের বারান্দায় পরের পর বারোটি সুবৃহৎ মূর্ত্তি আছে। চতুর্ভুজা যোগমায়া, বলজী, কালীয়-দমন,

মন্দিরের সুদৃশ্য বারান্দা

বরাহ অবতার, গোবর্দ্ধনধারী, অনন্ত-শয্যা, নৃসিংহ, দত্তাত্রেয়, চতুর্ভুজ শিব ও অর্দ্ধনারীশ্বর। উত্তরদিকেও বারোটি মূর্ত্তি আছে। দশমুণ্ড রাবণের মাথায় শিবলিঙ্গ। গৌরী, হর-পার্ব্বতী, শিব দুর্গা, বিষ্ণু, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী-নারায়ণ, বলভদ্র ইত্যাদি। পূর্ব্বদিকের বারান্দায় ১৯টি মূর্ত্তি আছে। হর-পার্ব্বতী, ভৈরব, দৈত্যাসুর, কালভৈরব, বালভৈরব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের এমন সুন্দর সমন্বয় খুব কম মন্দিরেই দেখতে পাওয়া যায়। কৈলাসের বিস্ময়কর শোভা সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য দেখতে দেখতে, তার স্থাপত্য-কলা ও ভাস্কর্য্য-শিল্পের অপরূপ নৈপুণ্য আলোচনা ক'রতে ক'রতে আমরা এমনই মুগ্ধ ও তন্ময় হ'য়ে গেছলুম যে, বাইরে আমাদের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে—আজই এখনই ৫৬ মাইল দূরে চালিশগাঁও ষ্টেশনে বেলা একটার ট্রেন ধরবার জন্য রওনা হ'তে হবে—এসব কথা একেবারেই ভুলে গেছলুম। কৈলাস পর্য্যবেক্ষণ যখন শেষ হ'লো, ঘড়ী খুলে দেখলুম ১২টা বাজে! এখনও ইলোরার সমস্ত গুহাই দেখা বাকী রয়েছে! তখন প্রায় একরকম ছুটতে ছুটতেই আমরা বিদ্যুৎ-বেগে কয়েকটি মাত্র বৌদ্ধ ও জৈন গুহা দেখে নিয়ে ইলোরা থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বৌদ্ধ ও জৈন গুহাগুলি আমরা যেরকম তাড়াতাড়ি দেখা শেষ করেছিলুম তাতে তার কোনও বিশদ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। বৌদ্ধ গুহাগুলির সম্বন্ধে পূর্ব্বেই ব'লেছি যে অজন্তা গুহার সঙ্গে তার বহু সাদৃশ্য আছে। এগুলি খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ব'লে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন। জৈন গুহাগুলির মধ্যে দু' একটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে আমি ইলোরা প্রসঙ্গ শেষ ক'রবো।

ইলোরায় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গুহা সংখ্যায় যেমন ১৫।১৬টি ক'রে দেখতে পাওয়া গেল, জৈন গুহা কিন্তু সংখ্যায়

অতগুলি নয়। মোটে পাঁচ-ছ'টি মাত্র! বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলি যেমন প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত; জৈন গুহাগুলি কিন্তু সে ভাবে অবস্থিত নয়! ব্রাহ্মণ্য গুহার উত্তর প্রান্ত থেকে প্রায় ২০০ গজ তফাতে জৈন গুহা আরম্ভ হ'য়েছে। এগুলির নির্ম্মাণকাল খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ব'লে প্রত্ন-তত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন।

জৈন গুহার প্রথমটির নাম 'ছোট কৈলাস।' এটি সব

কৈলাসে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মন্দির

শেষ তৈরী হ'য়েছিল এবং হুবহু কৈলাস মন্দিরের অনুকরণে! তবে আকারে কৈলাসের চেয়ে অনেক ছোট, তাই এর নাম হ'য়েছে 'ছোট কৈলাস'। দ্বিতীয়টির নাম 'ইন্দ্রসভা' ইন্দ্রসভা যদিও দুটি দ্বিতল ও একটি একতল গুহার সমাবেশে সৃষ্ট হ'য়েছিল, কিন্তু, এর প্রথমটিকেই লোকে ইন্দ্রসভা। ব'লে উল্লেখ ক'রে; দ্বিতীয়টিকে ব'লে 'জগন্নাথসভা'।

ইন্দ্রসভার তোরণ-দ্বার দক্ষিণদিকে। এই দ্বারের পূর্ব্বাংশে একটী মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে নগ্ন পার্শ্বনাথের বিগ্রহ আছে। পার্শ্বনাথের মাথার উপর ছত্রধারিণীরা সপ্ত-নাগছত্র ধারণ ক'রে রয়েছে। ছত্রধারিণীদের নীচে তরুণী নাগিনীদ্বয় এবং উপরে মহিষবাহন যমরাজ রয়েছেন। তাঁর পশ্চাতে আরও উপর দিকে গন্ধর্ব্বগণ শঙ্খ বাজিয়ে চলেছে।

পার্শ্বনাথের দক্ষিণে সিংহ-পৃষ্ঠে এক দৈত্য। তার নীচে পার্শ্বনাথের এক ভক্ত দম্পতীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। তার পাশে আরও দক্ষিণে রয়েছেন গৌতম স্বামী। ইনিও উলঙ্গ। এঁর সঙ্গে একাধিক ভক্ত নরনারী আছেন। মন্দিরাভ্যন্তরে বিগ্রহ হ'চ্ছেন 'মহাবীর'। ইনি জৈন তীর্থঙ্করদের মধ্যে সর্ব্বশেষজন। মহাবীর বিগ্রহের পশ্চাতের দেওয়ালে রয়েছেন ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী এক তরুতলে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ওটি ইন্দ্রাণী নয়—জৈন দেবী অম্বা বা অম্বিকা!

এতো গেলো ইন্দ্রসভার বাইরের ব্যাপার। ভিতরে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ ক'রলে প্রথমেই চোখে পড়ে, দক্ষিণে পাষাণ-বেদীর উপর এক প্রকাণ্ড ঐরাবত। বামে এক সুন্দর স্তম্ভ ছিল, সেটি ভেঙে পড়েছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি মণ্ডপ বা মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে এক চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি, সম্ভবতঃ ২৪জন জৈন তীর্থঙ্করদের মধ্যে কেউ হবেন। কেউ বলেন উনি প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ, কেউ বলেন উনি শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর! এই তীর্থঙ্করের বেদীটা চক্রযুক্ত এবং সিংহবাহন। পৌরাণিক রাজন্যগণের বসবার সিংহাসনের মতো।

প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে একটি প্রশস্ত গুহা আছে। এই গুহার দক্ষিণদিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে ত্রয়োবিংশৎ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি। তার বিপরীত দিকের দেওয়ালে রয়েছে হরিণ ও কুকুর সঙ্গে নিয়ে গৌতম স্বামী।

এই পার্শ্বনাথ, মহাবীর, গৌতম স্বামী প্রভৃতি তীর্থঙ্করদের একই রকম মূর্ত্তি জৈন গুহাগুলির প্রায় সবকটিতেই পুনঃ পুনঃ দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চাতের দেওয়ালে সেই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী বা অম্বিকা দেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা।

ইন্দ্রসভার একটি জৈন গুহার মধ্যে দেখলুম, বারান্দার

প্রাচীর-গাত্রস্থ নকল থামের গায়ে ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তি-নাথের প্রকাণ্ড দু'টী নগ্ন প্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। মূর্ত্তির তলায় কার মূর্ত্তি এবং কে নির্ম্মাণ ক'রেছে তাদের নাম লেখা র'য়েছে।

দ্বিতলের বারান্দার উপর উঠে বারান্দার প্রান্তভাগে ইন্দ্র ও অম্বিকার বিরাট প্রতিমূর্ত্তি চোখে প'ড়ে। বট বৃক্ষতলে ইন্দ্র এবং আম্রবৃক্ষ তলে অম্বিকা। সঙ্গে তাদের অনুচরবর্গ। বারান্দার দেওয়ালে সারি সারি সমস্ত জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ র'য়েছে দেখা গেল।

দ্বিতলের প্রশস্ত দালান, ছত্রতল, প্রাচীর সমস্ত যে এককালে সুরঙ্গীন চিত্রে পরিশোভিত ছিল তার নিদর্শন আজও লুপ্ত হয়নি একেবারে। ধ্বংসাবশেষ এখনও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

'ইন্দ্রসভা' ভালো ক'রে দেখা শেষ না ক'রেই আমাদের পালিয়ে আসতে হ'লো। ঘড়ীর কাঁটা ক্রমাগতই ছুটছিল একটার দিকে! পাছে ট্রেন মিস্ করি ব'লে আর কালবিলম্ব না ক'রে মোটরে উঠে আমরা চাল্লিশগাঁওয়ের দিকে রওনা হলুম।

ইলোরা থেকে চাল্লিশগাঁওয়ে যাবার পার্ব্বত্য পথ যে এত সুন্দর সে আমাদের ধারণাই ছিল না! একপাশে উঠে গেছে গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা সুশ্যাম বনানী বেষ্টিত!—আর একদিকে নেমে গেছে একেবারে অতলস্পর্শী খাদ কোন্ দূর শালবন ও স্বর্ণক্ষেত্রের মধ্যে; সামনে অসীম আকাশ! পাহাড়ের পাশ দিয়ে দিয়ে সরু একটু পথ এঁকে বেঁকে উঠে নেমে ঘুরে ঘুরে চ'লেছে। সেদিন সকালে আমাদের চোখে চারিপার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন একটি স্বপ্নলোকের মায়া বিস্তার ক'রেছিল সেখানে, যে, আমাদের মনে হ'চ্ছিল, যেন কোন্ অলকাপুরী পরিদর্শনে চ'লেছি আমরা! প্রকৃতির এই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী রূপ—এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখে আর একবার এমনিই অপরিসীম আনন্দে মুগ্ধ ও বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলুম—সে শিলং থেকে চেরাপুঞ্জী যাবার পথে! তিরিশ মাইল পথ মনে হয় যেন মেঘরাজ্য ভেদ ক'রে আকাশের বুকের ভিতর দিয়ে চলেছি বৈজয়ন্তীর তোরণাভিমুখে! কোথায় লাগে তার কাছে দার্জ্জিলিঙ—সিমলার সৌন্দর্য্য!
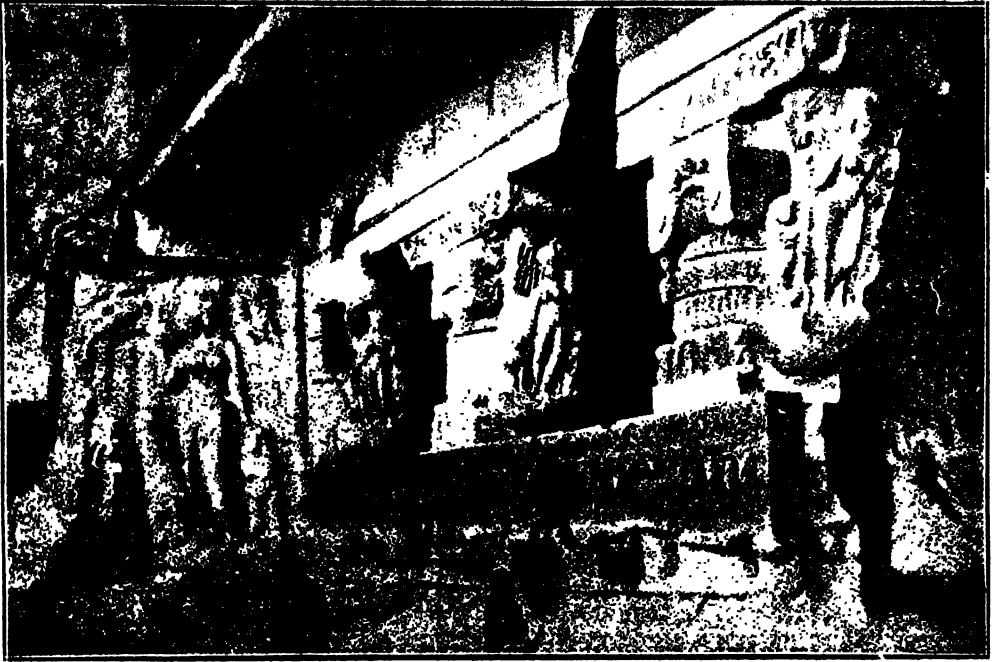
ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কারুর চারু সম্মিলন!

ইলোরা থেকে চাল্লিশগাঁওয়ে যাবার পথে যে আমাদের জন্য এত বড় একটা বিস্ময় ও আনন্দ অপেক্ষা ক'রছিল এ আমরা কেউ কল্পনাই করিনি। তাই, সেই আশাতীত কি

পাওয়ার হর্ষ ও তৃপ্তি আমাদের সকলের ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি ও ভাবনা সব যেন ভুলিয়ে দিয়েছিল!

হঠাৎ জানতে পারা গেল মোটর থেকে গোরক্ষপুরের দিবাকরবাবুর 'বেডিংটা' কেমন ক'রে কখন রাস্তায় প'ড়ে গেছে! গাড়ী খানিক দূর পেছিয়ে নিয়ে এসে খোঁজা হ'লো—পাওয়া গেল না! এদিকে আমাদের তখন আর একটী মিনিটও বিলম্ব করবার উপায় নেই। চাল্লিশগাঁওয়ে একটার ট্রেন যেমন ক'রে হোক ধ'রতেই হবে, নইলে একটা দিন মারা যায়! একজন সাইক্লিষ্ট ছোক্‌রাকে সেই সময় বিপরীত দিক্ থেকে আসতে দেখে তাকে ব'লে দেওয়া হ'লো যে সে যেন খোঁজ ক'রে সেটি উদ্ধার করে। মোটর ড্রাইভারের সে চেনা লোক। মোটর ড্রাইভারকে ব'লে দেওয়া হ'লো চাল্লিশ গাঁও থেকে ফেরবার সময় সে যেন সেই আওরঙ্গাবাদের ষ্টেশন মাষ্টারকে পত্র লিখে দেওয়া হ'লো যে তিনি যেন সেই বেডিং মোটর ড্রাইভারের কাছ থেকে নিয়ে—"মানমাদ" ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেন। দিবাকরবাবু বোম্বে থেকে ফেরবার পথে মানমাদ থেকে সেটি গাড়ীতে তুলে নেবেন।

পথের দু'ধারের স্বর্গীয় দৃশ্যের পরম আনন্দে দিবাকরবাবু তাঁর বেডিংয়ের দুঃখ অচিরাৎ বিস্মৃত হ'লেন। মিনিট দশ পনেরো মাত্র শুনেছিলুম—তাই তো, নূতন আক্কোরা কম্বল একখানা আছে ওর মধ্যে। এই আসবার আগে নূতন মশারী তৈরী করিয়ে এনেছি! বিছানার চাদর এক ধোপ পড়েছে মাত্র! লেপখানা বেশীদিনের নয়—ইত্যাদি! তার পর কোথায়ই বা বিছানা—কোথায়ই বা চাদর—আর কোথাই বা মশারী—সব মন থেকে ধুয়ে মুছে গিয়ে একটা শুধু অনির্ব্বচনীয় পুলকের পরম অনুভূতি আমাদের চিত্তক'টি পূর্ণ ক'রে তুলেছিল!

আমাদের মোটর যখন চাল্লিশ গাঁও ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো—একটা বাজতে তখন আর মাত্র ১৫ মিনিট বাকী! খুশী হয়ে মোটরওয়ালাকে বখশীস্ দিয়ে বিদায় করলুম, কিন্তু দুরন্ত ক্ষুধায় তখন আমরা ক'জনেই আক্রান্ত! দাদাকে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে বসিয়ে বঙ্কিমবাবু গেলেন নাসিকের টিকিট্ ক'রতে এবং আমি ও দিবাকরবাবু গেলুম কিছু পিত্তিরক্ষার মতো খাদ্য সংগ্রহ ক'রতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুড়ি, ছোলা ভাজা, জিলাপী ও কলা ছাড়া আর কিছুই সে ষ্টেশনে সংগ্রহ ক'রতে পারা গেলনা। অগত্যা তাই কিনে নিয়ে এসে আমরা কোনও রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলুম। অবিলম্বে ট্রেন এসে পড়লো। কুলির সাহায্যে মালপত্র তুলে নিয়ে আমরা নাসিক রওনা হলুম।

বেলা চারটে নাগাদ আমরা নাসিক রোড ষ্টেশনে এসে

ইলোরা—বৌদ্ধগুহা

সুবোধ বসু। গভর্মেন্ট প্রিন্টিং অফিসে কাজ করেন তিনি। আমরা স্থির করিছিলুম রাত্রে তাঁর ওখানে খেয়ে নিয়ে বোম্বাই রওনা হবো। নাসিক রোড ষ্টেশন থেকে মোটর-বাসে করে আমরা নাসিক টাউনে গিয়ে পৌঁছলুম। পথে যেতে যেতে সুবোধ বসুর বাসার সন্ধান করলুম কিন্তু, নাসিক থেকে ১৮ মাইল দূরে। নাসিকের এই ত্র্যম্বকেশ্বর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। ভারতের এক মহাতীর্থ। কাথিয়াবাড়ের সোমনাথ, উজ্জয়িনীর মহাকাল, আহম্মদনগরের নাগনাথ, দেওঘরের বৈদ্যনাথ, পুণার ভীমশঙ্কর, হিমালয়ের কেদারেশ্বর, কাশীর বিশ্বনাথ, কর্ণাটের মালিকার্জ্জুন বা
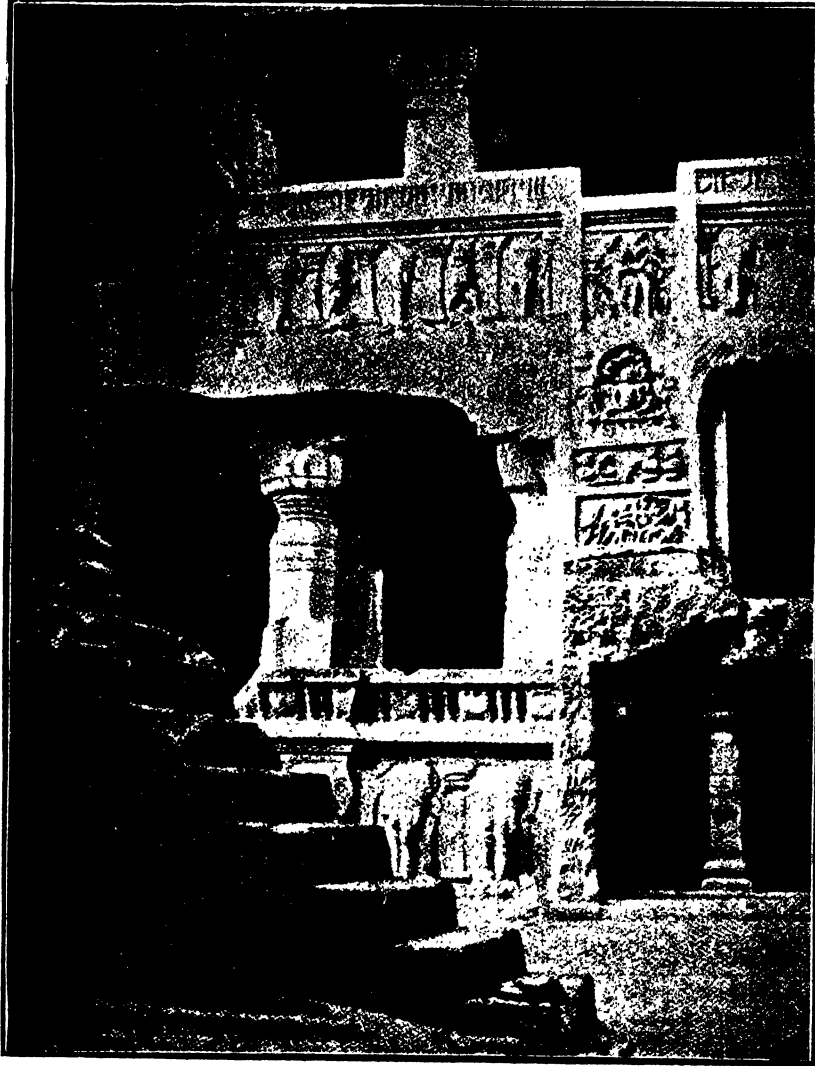
ইন্দ্রসভার প্রাঙ্গণ

দুর্ভাগ্যবশতঃ তার ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারলুমনা। তখন ৫টা বেজে গেছে। সূর্য্য ডোববার আগে নাসিক দেখে নিতে হবে। সুবোধ বসুর সন্ধান পরিত্যাগ করে নাসিক শহর থেকে আমরা দশ টাকা ভাড়ায় একখানি মোটর ঠিক ক'রে ত্র্যম্বকেশ্বর দর্শন ক'রতে চললুম। ত্র্যম্বকেশ্বর শৈলেশ্বর, মান্দ্রাজের দক্ষিণে রামেশ্বর, মালবের ওঙ্কারনাথ, কৈলাসের গ্রীষ্মেশ্বর এবং নাসিকের এই ত্র্যম্বকেশ্বর এরা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ বলে খ্যাত। ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দির সন্নিকটে বিন্ধ্যগিরি থেকে পুণ্যতোয়া গোদাবরী নদীর উৎপত্তি।

"ইন্দ্রসভার"
ইন্দ্রমূর্ত্তি

ইন্দ্রসভার
জৈন স্থাপত্য
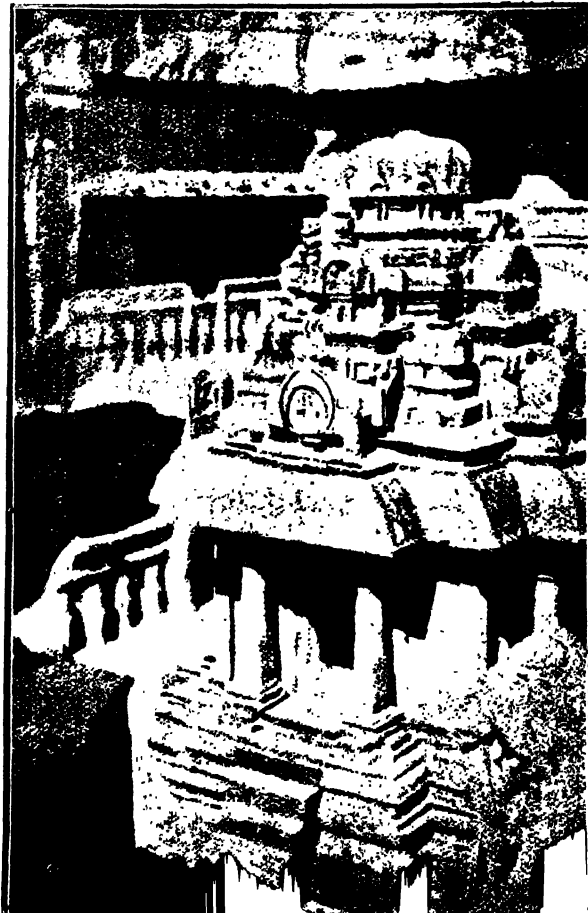
আমরা বিন্ধ্যগিরির উপর থেকে সূর্য্যাস্ত দেখবো ব'লে মোটরওয়ালাকে সূর্য্য থাকতে থাকতে ত্র্যম্বকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিতে পারলে বখশীস্ দেবো বললুম। সেও প্রাণপণে মোটর ছুটিয়ে দিলে। ফাঁকা রাস্তা, দু'ধারে শুধু বিস্তৃত মাঠ। তীরবেগে মোটর ছুটলো সূর্য্যের নাগাল ধরবার জন্য। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য তখন বিন্ধ্যগিরি শিখর পার্শ্ব হ'তে আমাদের রকম দেখে সম্ভবতঃ হাসছিলেন! সূর্য্য আগে পালাবেন, কি আমরা গিয়ে তাঁকে ধ'রতে পারবো বি ন্ধ্য গি রি র উপর—এই নিয়ে আমাদের মধ্যে ঘোর তর্কবিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। সূর্য্যের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের মোটর তখন ছুট্‌ছিল প্রচণ্ড বেগে! কিন্তু, বিন্ধ্যপর্ব্বতমূলে

সঙ্গেই মানবের স্পর্দ্ধাকে যেন উপহাস ক'রে স্বর্ণবর্ণ সূর্য্য অস্তাচলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! সন্ধ্যার আঁধার অবগুণ্ঠনের প্রান্তটুকু মাত্র দেখা যাচ্ছে যখন দিগন্তের দিকে, সেই সময় আমরা তিনজনে তিনখানা ডুলি করে ৭৫০ সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের উপর উঠলুম গোদাবরীর উৎস দেখতে। দিবাকরবাবু ডুলি নিলেন না, হেঁটেই উঠে এলেন।

কিন্তু, গোদাবরীর উৎস দেখে আমরা অত্যন্ত হতাশ হলুম! এত কষ্ট ক'রে ছুটে আসা ও ডুলী করে পাহাড়ের উপর উঠা বৃথা ব'লে মনে হ'লো। কারণ গোদাবরীর উৎস ব'লে যে স্থান আমাদের দেখানো হ'লো সে একটি সম্পূর্ণ ফাঁকি মাত্র! নিছক যাত্রী ঠকানো ছাড়া আর কিছুই নয়। মন্দিরের ভিতর পাহাড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে! সেই যদি গোদাবরীর উৎস হয় তাহ'লে গোদাবরীর একান্তই দুর্ভাগ্য বলতে হবে!

পাহাড়ের উপর থেকে বিরক্ত হয়ে নেমে এসে আমরা ত্র্যম্বকেশ্বর দর্শন করলুম। তখন রাত্রি হয়েছে প্রায় আটটা! আমাদের সঙ্গে একজন মারহাট্টি ছেলে গাইড্ হ'য়ে এসেছিল। ছেলেটি বেশ ইংরিজী ব'লছিল, খুব ভদ্র! শুনলুম কলেজে পড়ে। এখন ছুটী, তাই দেশে এসে পৈতৃক পেশা ধরে কিছু উপার্জ্জন ক'রছে।

ত্র্যম্বক দর্শন ক'রে আমরা নাসিকে পঞ্চবটী দেখতে গেলুম, যেখানে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাসিকা ছেদন ক'রেছিলেন। এই পঞ্চবটী ও গোদাবরী আমরা দক্ষিণে যাবার সময় মান্দ্রাজ অঞ্চলে দেখেছি এবং সেই দিক দিয়েই যে রামচন্দ্র গেছলেন সেটা মেনে নিতে রাজি আছি, কিন্তু, এই নাসিকের পঞ্চবটী যে নকল ও জাল তাতে আর কোনও ভুল নেই! সুতরাং এখানে সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন হয় নি এবং সেজন্যও এর নাম নাসিক নয়। এখানে সুদর্শনচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর নাসিকা পতিত হয়েছিল। তাই এ স্থানের নাম নাসিক এবং ৫২ পীঠের একটি তীর্থরূপে পরিগণিত। এই মতটা বরং গ্রহণ করা যেতে পারে।

পঞ্চবটী থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা নাসিক রোড ষ্টেশনে চ'লে এলুম। তখন রাত্রি ৯৷৷০টা বাজে! সুতরাং নাসিকের বিখ্যাত গুহাগুলি দেখে যাবার বাসনা এবারকার মতো পরিত্যাগ ক'রতে হ'লো।

রাত্রি দশটায় বোম্বায়ের গাড়ী। সুতরাং আমরা কিছু আহার সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লুম। কিন্তু, চা ও গরম দুধ ছাড়া আর কিছুই ষ্টেশনে পাওয়া গেলনা। জলধরদা' দুধ খেলেননা—শুধু এক কাপ চা খেয়ে নিলেন। আমরা কেউ কেউ এক এক গ্লাস দুধও খেলুম—চা'ও ছাড়লুমনা।

নাসিক যাবার সময় আমাদের সমস্ত মালপত্র ষ্টেশনে "Left Luggage" ক'রে রেখে গেছলুম। সেগুলি খালাস ক'রে নিলুম। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সিল্ক ব্যবসায়ী প্রভাসচন্দ্র

জৈন মন্দিরের কারুকার্য্য খচিত বিরাট স্তম্ভ

গুঁই আমাদের তাঁর গৃহে অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। নাসিকে নেমেই বিকেলে আমরা তাঁকে বোম্বাইয়ে একখানি টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছিলুম। গাড়ী এসে পড়তেই আমরা একখানি খালি কামরা দেখে উঠে পড়লুম। সারারাত ঘুমোনো চাই তো! বিশেষ, পেটে যখন কিছু নেই!

৪ঠা জানুয়ারী ভোর পাঁচটায় বোম্বাই গিয়ে পৌঁছলুম।

বোম্বাই শহর আমাদের কলিকাতা মহানগরীর চেয়ে যে দেখতে সুন্দরী সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই। একদিকে মালাবার গিরি আর একদিকে সাগর পেয়ে বোম্বাইয়ের রূপ যেন উথলে উঠেছে! সেখানকার ঘরবাড়ীগুলিতেও একটি ভারতীয় শ্রী বিরাজ করছে। তিনদিন মাত্র আমরা বোম্বাইয়ে ছিলুম। তারই মধ্যে বোম্বাইয়ের Bengal Clubএর বাঙালী সভ্যবৃন্দ 'জলধরদাদাকে' নিমন্ত্রন ক'রে নিয়ে গিয়ে একদিন অভিনন্দন দিলে। বোম্বাইয়ে শুনলুম প্রায় চার হাজার বেশ ঝক্‌ঝকে হ'য়ে উঠছে। বোম্বাই থেকে পুণা যাবার রেলপথের দূরত্ব মাত্র ১১৯ মাইল। কিন্তু এর মধ্যে বোধ হয় খুব কম করে অন্ততঃ ২৭টি টানেল্ আছে! এক একটি টানেল্ নেহাৎ ছোট নয়! আগাগোড়া পাহাড় কাটতে কাটতে বাষ্পীয় যানের লৌহপথ পুণার পার্ব্বত্যভূমে গিয়ে পৌঁছেচে। এই রেলপথের সৌন্দর্য্য একান্ত উপভোগ্য। আর ভোর বেলা পুণার সাবিত্রী পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য্যোদয়—সেও একটা দেখবার মতো কিছু!
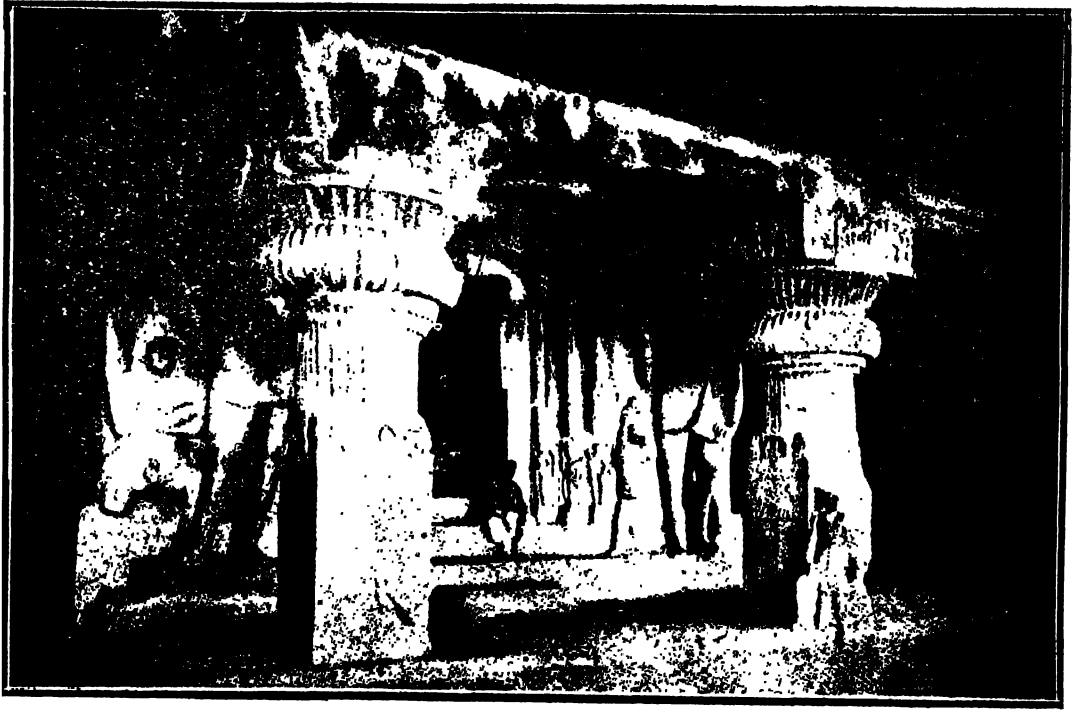
জৈন মন্দিরের দ্বারপাল

বাঙালী আছেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে দলাদলি ঝগড়া বিবাদ এত বেশী যে তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে পারেন নি। বোম্বাইয়ের প্রভাসবাবু সপরিবারে আমাদের ক'জনকে খুব আদর যত্ন ক'রেছিলেন। আমরা তাঁর বাড়ীতে যেন একেবারে রাজার হালে ছিলুম। আমি একদিন বোম্বাই থেকে বেরিয়ে গিয়ে শিবজী-তীর্থ—বালগঙ্গাধর তিলকের জন্মভূমি পুণ্য পুণা শহর ঘুরে এলুম। পুণার প্রাচীন শহরটি অতি কদর্য্য। নূতন শহরটি

পুণা থেকে ফিরে এসে সেইদিনই রাত্রে [illegible] ৬ই জানুয়ারী আমরা কলকাতা রওনা হলুম। দিবাকরবাবু ও বঙ্কিমবাবু আগের দিনই চলে গেছলেন। আমার ছুটীর তখনও দিন পনেরো হাতে ছিল ব'লে কলকাতা ফেরবার পথে মোগোলসরাইয়ে নেমে আমি কাশী চলে গেলুম। দাদা কলকাতায় ফিরে গেলেন।

—শেষ—

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

৩৭

আরতির মন বিরক্তিপূর্ণ বিষাদে যেন আগাগোড়াই ভরিয়া উঠিয়াছিল। কি অচ্ছেদ্য বন্ধনেই যে সে ইহাদের সহিত সংবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে—ইহা হইতে তার যেন কিছুতেই আর মুক্তি নাই। আঃ, অদৃষ্টের এ যে কি তীব্র পরিহাস,—ভাগ্যদেবতার এ এক নিষ্ঠুর খেলা!

স্বর্ণলতার ব্যবহার তার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তার চেয়েও অসহনীয় হইয়াছিল সলিলের করুণা-সজল দৃষ্টি! যতই তাহারা পরস্পরকে পরিহার করিতে সচেষ্ট থাক, তবু সেই এতটুকু চকিত স্ফুরিত ক্ষণিকের চাহনি, সে যেন রাত্রি-দিন ধরিয়াই তাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতে থাকে, তার সর্ব্বশরীরে এবং মনে সে তাহা অনুভব করিতে থাকে। সে দৃষ্টির নীরব বেদনা ক্ষুব্ধ চিত্তের তিরস্কার নির্ব্বাক্ ভাষায় নিবেদন করিয়া দেয়—সে দৃষ্টির ব্যথিত সহানুভূতি তেমনই গোপন বিষাদে তার দিকে চাহিয়া বলে,—এ কি অদৃষ্ট তোমার আরতি! যেখানে রাণী হইতে পারিতে, সেখানে কি না বাঁদী হইয়া আসিলে!

না—না, অসহ্য!—অসহ্য! আরতিও মানুষ। দাসখত লিখিয়া দাসীত্ব স্বীকার করিলেও সে মানুষ বই আর কিছুই নহে। পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া সে নিজেকে ইহজীবনের সকল সুখে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়াছে বটে; কিন্তু তাতেও সে নিঃস্বার্থ ছিল না,—সে দিনে সুখের চেয়ে শান্তিই তার একমাত্র কাম্য ছিল। এ অশান্তি সে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। এ বন্ধন তাহাকে কাটাইতেই হইবে।

দ্রুতকম্পিত হস্তে ডাক্তার সেনকে সে একখানা পত্র লিখিল। পত্রে যতখানি জানানো যায়, তাহা সে খুলিয়াই লিখিল। লিখিল—"আপনি আমার অবস্থা এবারেও বুঝিবেন কি না জানি না, বুঝাইবার সাধ্য আমারও নাই।—আমার গোপন রহস্য জানিতে চাহিয়াছিলেন, সে রহস্য আজ বলিব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। তাহা এই, একদিন যে বাড়ীর সকল সম্বন্ধ, সকল অধিকার হাতের কাছে পাইয়াও কোন কারণে তাহা নিজেই গ্রহণ করিতে পারি নাই, আজ অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় নিজের অজ্ঞাতে ঢুকিয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় সে বাড়ীর দাসীত্ব পর্য্যন্ত আমায় বহন করিতে হইতেছে। ভগবান জানেন, আমি কত চেষ্টাই এখান হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য করিয়াছি, এবং আপনারও তাহা আদৌ অজ্ঞাত নহে। কিন্তু আমার ভাগ্য বিরোধী, তাই সে চেষ্টা আমার সফল হয় নাই! ফলে যে ক্ষতি কোন দিনই আমার অভিপ্রেত ছিল না, তাহাই ঘটিতেছে।"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া আর যেন তার কথা যোগাইল না, তাই লেখা সে বন্ধ করিয়া দিল।

পাশের ঘরে তখন টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে,—সে শব্দ হয় ত বা তার কাণে, হয় ত বা তার মনের মধ্যেই প্রবেশ করিল না,—সে কলম হাতে লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কি লিখিবে? কেমন করিয়াই বা লিখিবে?—এ চিঠি পাঠাইতেও যে লজ্জা বোধ হয়! না-জানি তিনি এ পত্র পড়িয়া তাহার সম্বন্ধে কি ধারণা করিবেন? এ পত্র পাঠাইবার পর আর কি সে ডাক্তার সেনের সাক্ষাতে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে?

অর্দ্ধলিখিত পত্র টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া ক্ষণ পরে সে নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত শিথিল শরীরে বিছানার উপর এলাইয়া শুইয়া পড়িল; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই তার মনে হইল, এ বাড়ী, এ ঘর সলিলের। আসানপুরের শেষ রাত্রি তার মনে পড়িয়া গেল। সে রাত্রে সে চোরের মত লুকাইয়া একবার—মনে করিয়াছিল বুঝি বা সেই প্রথম ও শেষবার,—সলিলের শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া তার বিছানায় তার বালিশে মাথা রাখিয়াছিল। আর—

মনে করিতেই তার চোখ দিয়া দর-দর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।—আর—আর—সেই তার উপভুক্ত শয্যাতলে পড়িয়া তার গায়ের গন্ধ, হাতের স্পর্শ নিজের দেহে মনে অনুভব করিয়া, সেদিন সেই তার মাথার বালিশের উপর সে তার অনেকখানি বুকফাটা অশ্রুজলের সঙ্গে তার উদ্দেশে আঁকিয়া দিয়া আসিয়াছিল,—তার প্রগাঢ় প্রেমে পরিপূর্ণ প্রথম চুম্বন-রেখা।

সেদিন সলিল একমাত্র তারই ছিল, কিন্তু আজ?—আরতি কাঁদিয়া ফেলিল,

"কেন, আমায় আবার এখানে টেনে আনলে ঠাকুর! সে কি আমার দর্প চূর্ণ করতে?"

সহসা সবিস্ময়ে শুনিল, তার মাথার কাছে অত্যন্ত মৃদু স্বরে কে যেন ডাকিতেছে,—

"আরতি!"

এ নামে তাহাকে আর কে ডাকিবে?—এ কি! এ যে সত্যই সলিল! তার কল্পনা তো নয়!

সলিল আসিয়া আরতির অনতিদূরে দাঁড়াইল। অশ্রুজলে আরতির সমস্ত মুখ তখন শিশিরে ভেজা পদ্মের মতই আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে। তার সুবৃহৎ স্থির গাম্ভীর্য্যময় নেত্র দুটী সলিল-সিক্ত পদ্মপত্রের মতই টলটল করিতেছিল। তাহা হইতে তখনও সূত্রচ্ছিন্ন মুক্তামালার মত, অজস্র অশ্রুবিন্দু টপটপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে অশ্রু সংবরণ করিতে আজ আরতির মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্তেরও সাধ্য হইল না। সলিলের মনের কঠিন ভাষা সেই অনুতপ্ত অশ্রু-স্রোতে কোথায় যেন ভাসিয়া গেল। সে যে-সব কথা বলিবে বলিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল, ভুলিয়া গিয়া নীরবে আরতির অশ্রু-প্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘর নিস্তব্ধ, বাহিরের কোলাহল উদ্যানের মধ্যস্থতায় কিছু মন্দীভূত হইয়া প্রবিষ্ট হইতেছে। সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, জানালার বাহিরে ছাদের কার্ণিসের উপর বসিয়া যে পাখীটা এতক্ষণ ডাকিতেছিল, সেটা হয় ত আপনার নীড়ের উদ্দেশে উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

আরতি আত্মস্থ হইয়া উঠিয়া খাট হইতে নামিতে গেলে, সলিল তাহাকে বাধা দিয়া ঈষৎ ব্যগ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

"তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আমার কইবার আছে, একটু বসো।"—

আরতি আদেশ পালন করিল। কথাগুলা যে কি, সে কথা বুঝিতে তার বিলম্ব ঘটে নাই। সলিল তবে বিচারকের দাবীতেই আজ তাকে দেখা দিয়াছে!—হয় ত সে তা' করিতে পারে!

সলিল নিজে আসন গ্রহণ করিল না, পূর্ব্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল—

"অনেক কথাই জানতে ইচ্ছে করে আরতি! কত প্রশ্নই যে এ তিন বৎসর ধরে আমার মনের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে, সে বোধ করি হিসাব করা যায় না,—কিন্তু কিই বা আর জানবো? জেনেই বা হবে কি? যা হ'বার সে ত আমার হয়েই গ্যাছে! জীবন যে এত বড় দুঃসহ হতে পারে—তিন বৎসর পূর্ব্বে কোন দিনই তা' আমি ভাবতে পারিনি!

যাক্ সে কথা, আমার দুঃখ আমি তোমায় শোনাতে আসিনি,—আমার যা বলবার আছে বলে নিয়ে, তার পর তুমি আমায় কি বলবে শুনে যাব।"

এই বলিয়া সলিল আরতির মৌন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর এক মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থাকিয়া শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—"তুমি হয় ত আমাকে একটুখানি ভুল বুঝেছিলে আরতি! সেইটুকু আমার বুকে—যে শূল আমার জন্য ব্যবস্থা করে তুমি দিয়েছ, তার মাঝখানেও—কাঁটা হয়ে ফুটে আছে। বলা উচিত ভেবে আজ নিতান্ত অপ্রয়োজনেও তাই তোমায় জানাচ্ছি, আসানপুরে আমার নির্লিপ্ততাকে যদি তুমি আর-কিছু মনে করে নিয়ে থাকো, সে তোমার ভুল, এবং হতে পারে—আমার নির্ব্বুদ্ধিতা। তোমায় কোন রকমে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, তোমায় অসুস্থ ও অপ্রকৃতিস্থ দেখেই বিয়ের কথাটা পাড়তে আমি দেরি করেছিলুম। এর থেকে যে অন্য সন্দেহ তোমার মনে জাগতে পারে, ঈশ্বর জানেন—সে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

আরতি আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"দেবতাকে দানব যদি কেউ ক্ষণিকের জন্যও নিজের মনের পাপে ভেবেই থাকে, ভগবান তার সেই ভুলকে বেশীক্ষণ প্রশ্রয় দিতে পারেন না! আমি যে আপনাদের সাংসারিক সুখের জন্যেই চলে এসেছিলুম, এও কি আপনাকে আজ বলতে হবে?" আরতির

যে অশ্রু অনেক কষ্টে প্রশমিত ছিল, তাহা আবার পতনোন্মুখ হইয়া উঠিল।

অভিমানাহত কণ্ঠে সলিল কহিল,—

"তবে কেন লিখেছিলে 'আমায় তুমি ভালবাস না'? তখন সে কথা আমার বিশ্বাস হয়নি,—কিন্তু এত দিনে ধারণা আমার বদলে গেছে। এই ডাক্তার সেনই হয় ত তোমায় আমাকে ভালবাসতে দেননি—না? ইনি নিশ্চয়ই তোমার পূর্ব্বপরিচিত?"

আরতির উদ্গত অশ্রু-প্রবাহ একটা সুবিপুল বিস্ময়ের তাড়নায় চোখের মধ্যে ফিরিয়া গেল, সে হতবুদ্ধির মত উচ্চারণ করিল,—

"ডাক্তার সেন? ডাক্তার সেন কি করেছেন?"

সলিলের শান্ত দৃষ্টি তীক্ষ্ণোজ্জ্বল হইল, গলার স্বর তাহার ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে তীব্র দৃষ্টি আরতির মুখে স্থির করিয়া বলিল,—

"তিনি তোমায় ভালবাসেন। আমার মত কি না বলতে পারিনে, তবে খুবই বেশী এটা বলতে পারি। সে কি তুমি নিজেই জানো না, আরতি?"

আরতির ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল,—কোন মতে সে কহিল, "উনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। পৃথিবীতে উনিই আমার আজ একমাত্র বন্ধু। কিন্তু না—না,—ও কথা আপনি বলবেন না।" বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সলিল কোন কথা বলিল না। তার কান্নাতেও সে বাধা দিল না। তার দুই নেত্রের তীব্র ঈর্ষা-জ্বালা যেন সে আরতির ঐ অশ্রুধারায় ধুইয়া লইতে চাহিয়াই নিষ্পলক নেত্রে তার অশ্রু-পরিপ্লুত মুখখানা দেখিতে লাগিল। তার পর আরতিকে শান্ত হইবার অবসর দিয়া প্রশ্ন করিল,—

"আমায় ডেকেছিলে কেন আরতি?"

আরতি বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল,—"আপনাকে ডেকেছিলুম? সে কি!"

সলিল আরতির ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিতে গিয়া সহসাই যেন মনের কাছে মার খাইল। আরতি তাকে ডাকিয়া আনিয়া এখন যে লজ্জায় পড়িয়া অস্বীকার করিতেছে, এই কথাই তার সোজাসুজি মনে হইয়াছিল। কিন্তু তখনই মনে পড়িল আরতির গত চরিত্র! সে তো তেমন মেয়ে নয়। সলিলকে ডাকিয়া আনিয়া একটা মিথ্যা অভিনয় দেখাইবার মত লঘু প্রকৃতি তো তার নয়! তবে?

কিন্তু না—না, আরতি তাহাকে ডাকিয়াছে বই কি। না ডাকিলে সে কি কখন এমন করিয়া তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে পারে? সস্নেহে সে কহিল, "ডেকে কিছু অন্যায় করেছ কি আরতি? আমার বোধ হয় এ ভালই হলো। এমন করে অপরিচিতের মত ব্যবহার আর আমি তোমার সঙ্গে করে উঠতে পারছিলুম না। কিন্তু একটা কথা এখনও আমার জানবার আছে আরতি! এত দিন পরে এমন করে আবার আমায় দেখা দিতে কেন এলে? অত দূরে চলে গিয়ে,—এমন করে আমার এত কাছে কেন তুমি আবার ফিরে এলে? এ কি ভাল করেছ? তোমার মন বলে কিছু নেই, তোমার পক্ষে হয় ত কিছুই অসম্ভব নয়! কিন্তু আমি তো দেবতাও নই, পাথরও নই, নেহাৎ রক্তে মাংসে গড়া সামান্য মানুষ মাত্র! আমি কি এতটাই সইতে পারবো মনে করেছ? অথবা বরাবরের মত আমার কথাটা এবারও হয় ত তোমার ভাবতে মনে পড়েনি।"

এ তিরস্কারের মধ্যে যে জ্বালাভরা ভর্ৎসনা ছিল,—তার চেয়েও যে তীব্র অভিযোগ তার উপরে আরোপিত হইল, তাহাতেই আরতি যেন মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া গেল। সে অস্ফুট আর্ত্তনাদের মতই উচ্চারণ করিল,—

"আমি কি জানতুম এ আপনার বাড়ী? আর উনি আপনার স্ত্রী? যেদিন থেকে জেনেছি, ঈশ্বর জানেন, এ বাড়ী ছেড়ে পালাবার জন্যে কি চেষ্টাই আমি করেছি। কিন্তু এমনই কপাল আমার,—আচ্ছা, আপনি কেন বল্লেন, আমি আপনাকে ডেকেছি? আমি আপনাকে কিসের জন্য ডাক্‌বো? কে বলেছে এ কথা, যে, আমি আপনাকে ডেকেছি? এত সাহস কি আমার হতে পারে?"

আরতির এই কথায় সলিল যেন ঈষৎ ভয় পাইয়া গেল। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে আরতির উত্তেজনায় ঈষদারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিল,—

"তুমি তো আমার আসবার জন্যে নিজেই চিঠি লিখেছিলে আরতি!"

আরতি উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "সে কি আমার লেখা? আমি তো সে আপনার স্ত্রীর কথামত লিখে দিয়েছিলুম।" তার মুখ সেই চিঠির ভাষা স্মরণ

করিয়া গভীর লজ্জায় রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিল।
—ছি ছি ছি! সলিল শেষে তাকে এমনই অপদার্থ ঠাহর করিল? সে স্বেচ্ছায় এখানে ঢুকিয়া আজ এই নিতান্ত অসময়ে আবার তার স্বেচ্ছা-পরিত্যক্ত অধিকারের মধ্যে চোরের মত প্রবেশ-চেষ্টা এমন হীনভাবেই করিতেছে, এ সন্দেহও তার মনে জন্মিয়াছে না কি?

সলিল সত্যই এ কথা বিশ্বাস করিল না, সে মৃদু হাসিয়া কহিল,—

"হতে পারে তা',—আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলুম। কিন্তু ফোনে যখন তোমায় জিজ্ঞেস করলুম, তুমি তো তা বল্লে না? নিজেই লিখেছ বলে স্বীকার করলে! তা' না হলে আমিই কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে ভরসা করতুম?
—করেছি কি একদিনও? মনে আমার যাই থাক?"

আরতি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল,—"ফোনে? আমি? কখন করেছিলেন ফোন? আমি তো ও-ঘরে ছিলুম না? কে ধরলে? কে জবাব দিলে? আশ্চর্য্য ত?"

শুনিয়া সলিলের মুখ পাংশু হইয়া গেল, তার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ক্ষণকাল স্তম্ভিত-প্রায় থাকিয়া সে খাটের উপর এক প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—

"বুঝেছি, এ সব তাহ'লে স্বর্ণরই কাণ্ড! কিছু দিন থেকেই তার মনে যে একটা কিছু হয়েছে, তা' আমিও জানতে পারছিলুম! এখন যা' হবে, সে আমার জানাই আছে। হয় ত এ ঝড় তোমার উপর দিয়েও খুব জোরে বইবে, -জানি না তার ধাক্কা কতটা প্রবল!—

—যাক,—সে যা হবে, তা' হবে,—তোমায় আমি বলে রাখছি আরতি! আমার কাছে কিছুই তুমি কোন দিন নিতে চাওনি, আজও হয় ত চাইবে না, কিন্তু যদি কখন দরকার বোধ কর,—যত বেশী বা যত কমই হোক—যদি আমার কাছে কোন সাহায্যের দরকার বোধ কর,—আমায় তুমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বোলো। আজ এ কথা স্বীকার করা আমার পক্ষে যত বড় অপরাধজনকই হোক,—তবু এ আমি কোন মতেই অস্বীকার ক'রে নিজেকে সাধু সাব্যস্ত করতে পারবো না,—আমি আজও তোমায় ঠিক সেই রকমই ভালবাসি। হয় ত যত দিনই বাঁচবো, আমায় তা' বাসতে হবে।—"

আরতির বিবর্ণ মুখ বিবর্ণতর হইয়া গেল, তার চোখ নাক, কাণ সমস্ত জ্বালা করিতে লাগিল। কান্না তার বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে উদ্যত হইয়া উঠিল। সে নিজের মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া দাঁত দিয়া সবলে নীচের ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া সেই প্রবল রোদনাবেগকে প্রাণপণে প্রশমিত রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তার গলার কাছে একটা করুণ কাতর আর্ত্তনাদ ক্ষণে ক্ষণে বিস্ফোরকের বেগে আপনাকে ফাটাইয়া দিতে উদ্দাম হইয়া উঠিতে লাগিল—ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, অমন করিয়া আর বলিও না! তুমি যে কত স্নেহময় সে কি আজ আমি নূতন করিয়া জানিব? ওগো, সে যে আমার বুকে শেল হইয়া বিঁধিয়া, কাঁটা হইয়া ফুটিয়া আছে, আমার মৃত্যুর অধিক হইয়া আছে! এ দুঃখ কি আমার মরণান্তরেই ভুলিবার?

কিন্তু সলিলের ঐ আত্মাভিব্যক্তি কত বড়ই যে বিপ্লব আনিতে পাবে, সে ধারণা যদি তাদের একটুও থাকিত!

ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘরের মধ্যদ্বার সবেগে খুলিয়া সশব্দে ঘরে আসিয়া ঢুকিল স্বর্ণলতা। তার শীর্ণ মুখ সকালবেলার আরক্তাভ পূর্ব্বাকাশের মত সমুজ্জ্বল রক্ত-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছিল। তার কৃষ্ণতার দুই চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত তড়িতালোকের মতই দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তার মধ্য হইতে যে আলো ঠিকরাইয়া পড়িল, তাহা সার্চ্চলাইটের মতই তীব্র এবং এক্সরে'র মতই অস্থিভেদ্য!

একবার চকিত কটাক্ষে দুজনকার প্রস্তরীভূত মূর্ত্তি দেখিয়া লইয়া, উন্মত্ত ঝড়ের হাওয়ার মতই এক রকমের উন্মাদ হাসি হাসিয়া, স্বর্ণলতা সলিলের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাল যে তুমি কতই বাস, তার সাক্ষ্য বরং তোমার হয়ে আমিই এঁকে দিচ্চি!

তোমার অস্থি দিয়ে, মজ্জা দিয়ে, প্রাণ থাকে ত তাই দিয়ে, সমস্ত দেহ মন আত্মা দিয়েই তুমি ওকে কত যে,—কত যে ভালবাস, তা আমার মতন করে আর কেউ জানে না,— হয় ত' তুমি নিজেও না! এরই জন্যে তোমার চোখ, তোমার মন একটী দিনের তরেও আমার দিকে ফিরে চেয়ে দেখেনি,— সত্যি ক'রেই দেখেনি! যেচে, কেঁদে, মান খুইয়ে,—বলতে গেলে প্রায় পায়ে ধরে তোমার কাছে আমি যতটুকু পেয়েছি, সে নেহাৎ লোভী বলেই আমি নিতে পেরেছি,—একটুখানি ইজ্জৎ জ্ঞান যে মেয়ের আছে, সে পারে না। সেও যা'

দিয়েছ তা' আমাকে যে দাওনি, সে আমার দেহ বেশ স্পষ্ট করেই অনুভব করেছে! আমি মগ্য হ'তে পারি,—অন্ধ নই। দেখতে পাচ্ছি, আমায় উপলক্ষ্য করে কি তোমাদের চলেছে! আমায় শীগ্‌গির করে মারবার জন্যে ঐ ডাক্তারকে হাত করে, এই জোচ্চুরির ফাঁদ পেতে—ফাঁদ পেতে—ও বাবা! ও বাবা!—"

স্বর্ণলতা উত্তেজনায় ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিল। তার পা টলিতেছিল, হাত কাঁপিতেছিল, কিন্তু সে সব সে গ্রাহ্যও করিল না। পুনশ্চ হতবুদ্ধি, বাক্যহীন, বুঝি বা স্পন্দহীন স্বামীর দিকে তেমনই জলন্ত দৃষ্টি হানিয়া বলিতে লাগিল,—

"আমার মনের সন্দেহ আজ মেটাবো বলেই অমনি ধারা করে চিঠি লেখালুম, ভাবলুম, যদি সত্যিকারের কোন কিছু না থাকে তো তুমি আমার চিঠি বুঝে নিয়ে আমারই কাছে আসবে। তার পর টেলিফোন বেজে উঠলো,—ঘরে ইনি ছিলেন না,—ধর্ম্মের কল কি না!—আমিই ধরলুম, আর হবি তো হ, আমারই কাণে এলো—'কে? আরতি!' আমি তো এঁকে মালতীবলেই জানতুম,—তখন বুঝতে পারলুম, ইনি মালতী নন, আরতি! মাথায় চট্‌ করে একটা ফন্দি ঢুকলো,—জবাব দিলুম, 'হুঁ!' ইনি বল্লেন, 'আমায় তুমি যে চিঠি লিখেছ, সে চিঠি কি আমার স্ত্রী লিখিয়েছে?' বল্লুম, না! শুনে, ওঃ, আনন্দ বুঝি আর ধরে না! সেই যে 'সত্যি!' বলে উঠলেন, আমার বুক সেইখানে কেনই যে ভেঙ্গে গেল না! —বল্লেন, 'আমায় তুমি যেতে লিখেছ?' কোন মতে জবাব দিলুম, 'হ্যাঁ।' ও বাবা! ও বাবা! আর আমার প্রাণে সহ্য হচ্চে না গো! আমায় এরা মেরে ফেল্লে গো! আমি বাঁচতে পারতুম, আমায় ঐ হতভাগী বাঁচতে দিলে না। আমার স্বামী কেড়ে নিয়ে পোড়ামুখী আমায় খুন করলে—"

স্বর্ণলতা ঝঞ্ঝাতাড়িত বৃক্ষ-পত্রের মতই কাঁপিতেছিল,—সহসা সে পতনোন্মত হইতেই আরতি তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া জাগিয়া উঠিল; এবং তখনও সলিলকে তেমনই নিশ্চেষ্ট ও প্রায় নিশ্চেতন দেখিয়া সে ত্বরিৎ বেগে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু তার চেষ্টা সফল হইল না, পতনোন্মুখী হইয়াও স্বর্ণলতা আরতির সাহায্য-হস্ত গ্রহণ করিল না, সে প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া আরতির হাত সরাইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"রাক্কুসি! সয়তানি! ছুঁস্‌নে আমায়! তোর জন্যেই আমার সব গেছে, আমি এই বয়েসে মরতে বসেছি, তোকে ঝাঁটা মেরে বিদায় না করে আমার—আমার—স্বস্তি নেই—নেই—নেই—তুই দূর হ; দূর হ—দূর হয়ে যা · আ—আ—"

আর্ত্তশ্বাস প্রাণপণে টানিয়াও স্বর্ণ তার কথা শেষ করিতে পারিল না,—সহসা রুদ্ধকণ্ঠ ও নিরুদ্ধশ্বাস হইয়া সে সবেগে মাটিতে পড়িয়া গেল। আরতি ধরিয়া না ফেলিলে মার্ব্বেল পাথরের মেঝেয় পড়িয়া হয় ত মাথা তার ভাঙ্গিয়া যাইত। ধীরে ধীরে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া ভয়ার্ত্ত চোখে সলিলের দিকে চাহিতে গিয়াই আরতি দেখিতে পাইল, দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া অপর কোন ব্যক্তি অত্যন্ত দ্রুত চরণে কক্ষে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সে জুতার শব্দেই চিনিতে পারিল, সে ব্যক্তি আর কেহ নয়, স্বয়ং ডাক্তার সেন। এক দিকে প্রবলতম আশ্বাসে, অপর দিকে তীব্রতম লজ্জায় সে যেন স্রোতোহত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। এক একবার তিনি তিনজনের দিকেই চাহিয়া দেখিলেন। স্বর্ণলতার অবস্থা দেখিয়াই তাঁর মুখে চক্ষে একটা নিরাশা-ব্যঞ্জক গভীর বেদনা নীরবে প্রকটিত হইয়া উঠিল। তার পর তখনও পর্য্যন্ত সেইরূপ স্তব্ধ অনড় শয্যাতলে উপবিষ্ট সলিলের এবং স্বর্ণলতার ভূমি-প্রসারিত মূর্চ্ছিত দেহের পার্শ্বে নতজানু, ভূমি-লগ্ন-দৃষ্টি অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত-প্রায় আরতির দিকে চোখ পড়িতেই তাঁর সেই ব্যথিত দৃষ্টি গাম্ভীর্য্য-বিরস হইয়া উঠিল।

অগ্রসর হইয়া তিনি স্বর্ণলতার পাশে নত হইয়া সর্ব্ব প্রথম আরতিকে সম্বোধন করিলেন,—"বাইরে আমার মোটর দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষণি তুমি সেবা ভবনে চলে যাও, এখানকার চার্জ্জ তোমার শেষ হয়েচে। যাও—যাও—দেরি করো না—"

আরতি নিঃশব্দে কলের পুতুলের মত উঠিয়া, কোন দিকে একটীবার না চাহিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তারের সস্নেহ কণ্ঠে আজ এমন একটা তীক্ষ্ণতা ছিল, যে, তার এই অসাড় চিত্তবৃত্তির উপরেও সেটা অপারেসন ছুরীর মতই তীব্র আঘাত জাগাইয়া দিয়াছিল। ডাক্তার তাকে কি চোখে দেখিয়া তার জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন, সে কথা বুঝিতে তার বিলম্ব ঘটিল না।

৩৮

সেবা-ভবনে পৌঁছিয়া আরতি কোন দিকে না চাহিয়াই কলে-চলা পুতুলের মত প্রাণহীন ভাবে সুবৃহৎ সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিতেছিল,—দেখা হইয়া গেল ডাক্তার রুদ্রের সহিত। ব্যস্ত ভাবে তিনি নামিয়া আসিতেছিলেন, হাতে তাঁর দু' তিনটা ঔষধের শিশি। আরতিকে দেখিয়া থামিয়া পড়িয়া সেই শিশি-শুদ্ধ হাত তুলিয়া তাহাকে নমস্কার জানাইলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

"বাঁচলুম! আপনি এসেছেন মিস রায়! আমি তো তিনতালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অস্থির হয়ে পড়েছি। যদি কোন কাজ না থাকে, খানিকক্ষণের জন্য ওষুধ-ঘরে গিয়ে একটু বসুন গে', যখন যে ওষুধটা দরকার হবে, ফোনে খবর দেবো, আর লোক পাঠাবো, বার করে সেটা তার হাতে দিয়ে দেবেন তো, আর কেউ তো পারবে না।"

আরতির মনের কাছাকাছি প্রশ্ন উঠিল, কার কি হয়েছে? কিন্তু তার জিহ্বা কোন শব্দই উচ্চারণ করিল না। সে শুধু ঈষৎ মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইল, এবং সিঁড়ির ধাপে যেমন পা তুলিতেছিল তেমনই পা বাড়াইল। ডাক্তার নিজ হইতেই বলিলেন,—নার্স·····কের অবস্থা আজ মোটেই ভাল নয়। দুজনে দুদিকে চলিয়া গেল।

আরতি স্তব্ধ হইয়া ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে দেখা তার বহু পূর্ব্বেই শোধ হইয়া গিয়াছে। যে একটীমাত্র লোকের কাছে পাওয়া বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আজ তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, আজ সে সেই জিনিষটাই হারাইয়া ফিরিয়াছে! তিনি যে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছেন, ঘৃণা করিতেছেন, তাঁর কাছ তার যে আজ আর কিছুমাত্র মূল্য নাই, সে কথা ঐ একটুখানি দৃঢ় প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়াই প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর বেশী কিছুরই প্রয়োজন তো ছিল না। বাস্তবিকই তো তার অপরাধ লোক-চক্ষে সামান্য নয়! আর অত বড় বুদ্ধিমান লোকটার ততটুকু ভূয়োদর্শন-জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে।

একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। এই ঘরে তাদের দুজনকার সংযুক্ত পরিশ্রমের ফল চারিদিক ছাইয়া রহিয়াছে। এই কর্ম্ম-কঠোর যন্ত্রালয়ের মধ্যেই সে তার এতদিনকার শূন্য হৃদয়ের যৎকিঞ্চিৎ খোরাক খুঁজিয়া পাইয়াছিল। তাই এঘর তার তীর্থভূমি।

কলের পুতুলের মতন সে তার নিয়মিত কাজগুলি সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। ইহার প্রত্যেক যন্ত্রের গায়ে তাহার হাতের স্পর্শ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া লাগিয়া আছে। প্রত্যেকটাকেই ঝাড়ন দিয়া মুছিতে গিয়া তার হাতের আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের আঙ্গুলের ডগা ও মাথার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তার মনে পড়িল, কি গভীর তন্ময়তারই সহিত তিনি ইহাদের মধ্য দিয়া মানব জাতির উপকারার্থ কত শত প্রকার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়াই নিজেকে সর্ব্বপ্রকার ভোগবঞ্চিত করিয়া রাখিয়া থাকেন। গভীর ক্লান্তিও কখনও তাঁহার এতটুকু কর্ত্তব্য-চ্যুতি ঘটাইতে পারে না। তাহাকে কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ বুঝিলে সেই তিনি কি তাহাকে কোন মতেই ক্ষমা করিতে পারিবেন,—সে তার অসম্ভব আশা! অথচ এখান হইতে বিতাড়িত হইলে আর সে কোন্‌খানে গিয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

সে দ্রুতহস্তে অথচ সুচারুরূপেই জিনিষপত্রগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার যথাস্থানে যথাযথভাবে সেগুলিকে স্থাপন করিতে লাগিল। এ ঘরের কাজ তার জন্মের মত শেষ হইয়া গিয়াছে। হয় ত এর পর আর কখনও সে এ ঘরের চৌকাটের মধ্যে পদার্পণও করিবে না। যদি স্বর্ণলতা বাঁচিয়া উঠে, ডাক্তার সেন জানিতে পারিবেন, তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সাহায্যকারিণীর দ্বারা কি ভীষণ ভাবেই প্রতারিত হইয়াছেন! আর যদি তার মৃত্যু হয়, এতবড় একটা জয়ের মুখে যার দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছে, তাহাকে তিনি কি কোন দিনই আর ক্ষমা করিতে পারিবেন?—না। কিন্তু সে যে তাঁকে তার পিতার আসনে বসাইয়াছে। এ জগতে আর তো তার কেহই নাই।

নীরবেই সে তার ম্লান দৃষ্টি দিয়া সেই গাম্ভীর্য্যময় নানা প্রকার ঔষধ দ্বারা তীব্র গন্ধে ভারাক্রান্ত ঘরখানার কাছে চিরদিনের মতই বিদায় লইল। এই চির-বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তও সে জানিতে পারে নাই, যে, এই বাড়ী এর পর হইতে আমৃত্যু তার কাছে সহস্র অপ্সরা-নর্ত্তিত পারিজাত-গন্ধামোদিত নন্দনকাননের মতই চিরনন্দিত হইয়া থাকিবে। কারণ এ যেন এ পৃথিবীর বাহিরে আনন্দ-নিরানন্দের চির-অতীত দ্যুলোক! এখানে তার ফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

"ডিজিটেলিশের শিশিটা পাঠান তো মিস রায়!"

যে আলমারিতে রাশি রাশি শিশির প্রায় সবগুলাই

মানুষের জীবন এবং মৃত্যু অবস্থাবিশেষে এবং পরিমাণ নির্ব্বিশেষে একসঙ্গেই দিতে ও নিতে সমর্থ, সেইটার চাবি তিনি শুধু তাঁর আলমারিটা এবং আরতিকেই চিনাইয়া রাখিয়াছিলেন ; আর কোন ব্যক্তির তাহা জানা ছিল না। আরতি ছুটিয়া আসিয়া গোপন স্থান হইতে চাবি লইয়া আলমারি খুলিল। খুলিবামাত্র তার চোখে পড়িয়া গেল আর্সেনিক। সহসা তার বুকের মধ্যে দুম্‌দাম্ করিয়া যেন কার লাঠির ঘা পড়িতে লাগিল, "আর্সেনিক!"—আঃ, আবার সেই চিরপরিচিত আর্সেনিক। সেই যা দিয়া তার বাপ—তার চিরস্নেহময় বাপ—তাদের সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াছেন, এ সেই আর্সেনিক!

কম্পিত হস্তে ডিজিটেলিশের শিশিটা তুলিয়া লইয়া সে দ্বার সমীপস্থ ভৃত্যের হস্তে দিয়া আসিল। চাকরটা চলিয়া গেলে, আবার সে সেই খোলা আলমারীটার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। সেটা বন্ধ করিবার জন্য কবাটের উপর হাত রাখিয়াও যেন কার প্ররোচনা বলে হাতখানা সরাইয়া লইল, দোরটাকে বন্ধ করিতে পারিল না। তখন তার বুকের মধ্যেব সেই শব্দটা এত বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাই দিয়া তার দুই কাণ যেন পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছিল। বাহিরে তখন যদি ঢাক পিটানো হইত, তো হয় ত সে বাজনার শব্দও তার কাণের মধ্যে ঢুকিতে পথ পাইত না।

একদিন সে জলে ডুবিতে চাহিয়াছিল। সেই পূর্ব্ব কথা তার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল।

তার বাবা এই আর্সেনিক খাইয়াই নিজেকে শেষ করিয়াছিলেন,—এই এমনই অবস্থায় পড়িয়াই সেই তাঁর হাতের কাছের আর্সেনিকের শিশিটাকে হয় ত তিনিও প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। সেই বা তবে কিসের লোভে এতবড় সুযোগকে প্রত্যাখ্যান করিবে? ওঃ, জীবন যেন তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে আর কাজ কি? বাঁচিয়া থাকার বিড়ম্বনা আর যেন তার সহ্য হইতেছে না।

তার বোধ হইল, সেই বুকের ভিতরকার শব্দটা বাড়িতে বাড়িতে, ক্রমশঃ যেন সেটা তাকে পৃথিবীর সকল শব্দ হইতে আড়াল করিয়া দিয়া সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। হাজার হাজার কামানের গোলা, লক্ষ লক্ষ বড় বড় লোহার হাতুড়ী, আরও যেন কত কি দিয়াই সেই বিকট ভীষণ শব্দরাশি তৈয়ারি। আর তার চারিদিকে যেন সেই একটি শব্দ ভিন্ন আর কোথাও কোনখানে কোন কিছুই নাই। দিন নাই, দিনের আলো নাই, এ ঘর নাই, সে নিজেও নাই। তবে কি সে পাগল হইয়া যাইতেছে? না, পাগল সে কোন মতেই হইবে না। তার আগে—

অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাত বাড়াইতে একটা শিশি তার হাতে ঠেকিল। এ নিশ্চয়ই তার নির্ব্বাচিত সেই আর্সেনিকের শিশি! আঃ, এই ত তার সকল শ্রান্তির, সকল চিন্তার, সকল সন্দেহের চরম মীমাংসা! সে সাগ্রহে শিশিটা লইয়া জ্যাকেটের বুকের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তার পর অনেকখানি যেন সংযত হইতে পারিয়া দ্রুত হস্তে আলমারি বন্ধ করিয়া দিয়া ফিরিয়া গেল।

সারা রাত তার জাগিয়া কাটিল। নীচের ঘরের রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দ হইতেছিল। ভোরের দিকে রোগীর জীবনের শেষ আশাটুকুরও সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। নাড়ী ছাড়িয়া গিয়া ঘাম আরম্ভ হইল,—অস্থির রোগী ক্রমশই স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। আরতি সেই আর্সেনিকের শিশি বুকের মধ্যে লুকাইয়া চোরের মত শঙ্কিত চিত্তে এই মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে স্তব্ধ বসিয়া রহিল। ক্ষণেক্ষণেই উঠিয়া গিয়া ঐ ছোট শিশিটা খালি করিয়া ফেলিতে তার মনের মধ্যের লোভ দুরন্ত হইয়া উঠিতে থাকিলেও, সে প্রাণপণ বলে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। মনকে বারেবারেই বুঝাইল—আর একটুখানি থাকো না, আগে এর দেনাটুকু চুকিয়ে দিই, তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে—"

মনকে এ কথা সে বলিল বটে, কিন্তু নিজের অসাড় ও অবসন্ন দেহকে এ বুদ্ধিতে বুঝাইয়া উঠিতে পারিল না। যার দেনা সে মিটাইতে বসিয়া রহিল, তার মুখে একবিন্দু জলও সে চামচে করিয়া তুলিয়া দিল না, দিতে মনে পড়িল না,—এম্‌নই উদ্‌ভ্রান্ত ও অবশ সে হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাক্তার সেন সেই পর্য্যন্ত আর এখানে ফিরিয়া আসেন নাই। হয় ত ওখান হইতেই সোজা বাড়ী গিয়াছেন, না হয় ওইখানেই আছেন,—কি যে ঘটিয়াছে কিছুই বুঝা যায় না! স্বর্ণলতা কি ভাল হইয়া উঠে নাই? তার সে মূর্চ্ছা কি আর ভাঙ্গিল না? কে জানে? ওঃ ভগবান! এ'

আবার তার ভাগ্যে কি করিয়া তুলিলে? এত নির্ম্মম তুমি? যাদের ভয়ে সে হত্যাকারী—খুনী আসামীর মত লুকাইয়া ফিরিয়াছে, একেবারে সোজা টানিয়া আনিয়া সেই তাদের মধ্যেই তাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া আজ কি তাকে সত্যকার হত্যাকারীই তৈরি করিলে?

আরতি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। উঃ—যদি স্বর্ণলতা না বাঁচে? কিন্তু কেন? কেনই বা সে না বাঁচিবে? মূর্চ্ছা তো তার আগেও ক'বার না কি হইয়াছিল! কই—মরে নাই ত? তবে এবারই বা মরিবে কেন?

সে একান্ত চিত্তে তন্ময় হইয়া ভগবানের কাছে তার জীবন ভিক্ষা করিল। মনে মনে বলিল,—আমার আয়ু আমি তাকে দিচ্ছি, আনন্দের সঙ্গে দান করচি,—তাই নিয়ে ওকে বাঁচিয়ে দাও, ভাল রাখো, ওঁরা সুখী হোন, ওঁদের সুখে রাখো। হে ঈশ্বর! তুমি তো অন্তর্যামী, সবই তো জানতে পারচো, আমার মনে কোন দুঃখ নেই, লোভ নেই,—শুধু ওঁর যে সুখের জন্য আমি নিজেকে চিরদুঃখী করেছি, সেইটুকুই ওঁকে তুমি দিও।"

সহসা আরতি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সে হয় ত ঈষৎ একটুখানি লোভে পড়িয়াই এ কাজে তেমন জোর করিয়া ইস্তফা দেয় নাই! ডাক্তারকে তো সব কথা বলাও চলিত। তবে কি সলিলকে দেখিতে পাওয়ার লোভটুকু তার মনের মধ্যে গোপনে সঞ্চিত রাখিয়াই এই কাণ্ডটা সে বাধাইয়াছে? ভগবান জানেন! তেমন স্পষ্ট করিয়া ত কই তা' মনেও হয় না? কিন্তু যদিই তা' হয়, তথাপি অতটুকু পাপের ও কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্তই তাকে করিতে হইতেছে?

হঠাৎ সে সংযত হইয়া উঠিয়া শুনিল, কে তাহাকে যেন নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। সে ভীষণ ভাবে চমকাইয়া উঠিল। কে? কেন? কোথা হইতে আসিল?—কি বলিবে? কি খবর দিবে? কার কথা বলিবে?

বেলা তখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত-প্রায়। ডাক্তার সেনের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডাক্তার রুদ্র আরতির পাশে দাঁড়াইয়া সহানুভূতিপূর্ণ উদ্‌গ্রীব নেত্রে তার দিকে চাহিয়া তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"আপনি তো সবই বোঝেন মিস রায়! কি আর করবেন বলুন?—অত শোকাকুল হবেন না। একদিন তো সব্বাইকেই এই পথে যেতে হবে। সমস্ত রাত এক ভাবে বসে রয়েছেন, আর তো ওঁর জন্যে করবার কিছুই কারু বাকি নেই, আর কেন? উঠে যান, চানটান করে একটু বিশ্রাম করুন গে।"

আরতি তার শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া বিছানার উপর চাহিয়া দেখিল, যে এতক্ষণ সেখানে পড়িয়া মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাকে সে আর দেখিতে পাইল না, তাহার পরিবর্ত্তে সাদা একখানা 'বেড-কভার' দিয়া কি যেন একটা ঢাকা রহিয়াছে! আরতি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল,—মুহূর্ত্তে তার মুখ দিয়া একটা সুস্পষ্ট আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিল,—

"বাবা!—ও—বাবা গো!"

তার অপ্রকৃতিস্থ অস্থির চিত্ত দ্রুতবেগে পিছন ফিরিয়া যেন চিরঅপগত অতীতের মধ্যে সবেগে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। আর একদিনের এই রকমই শয্যালীন স্তব্ধ অনড় বস্ত্রাবৃত আর একজনের নিদারুণ অবিস্মৃত স্মৃতি তার মানস দৃষ্টি ভেদ করিয়া বহির্দৃষ্টির সাক্ষাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে কাতর করুণ আর্ত্ত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াই সংজ্ঞাহারা হইয়া লুটাইয়া পড়িল। তার যেন মনে হইল, ওই আচ্ছাদিত বস্ত্র পিণ্ড আর কিছু বা আর কেহ নহে, এ তার সেই আত্মঘাতী পিতৃদেহ! আবার যেন তিনিই তাকে তার একান্ত দুঃসময়ে—জীবনের সকল অবলম্বন ও ধৈর্য্য যখন তাহাকে নির্ম্মম হইয়া ছাড়িয়া গিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে তাহার অভিপ্সিত পথ দেখাইতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন!

ডাক্তারটী ঈষৎ করুণাপূর্ণ বিস্ময়ে তাহার বিহ্বল দেহ সযত্নে মাটি হইতে তুলিতে তুলিতে তাঁহার সাহায্যকারিণী অপর নার্সকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"এত কম বয়সে এমন কাঁচা মন নিয়ে ইনি এ পথে কেনই বা আসতে গেছেন!—"

নার্স উত্তর করিল, "মিস রায়ের ঐ স্বভাব! ও রোগীর সেবা প্রাণ দিয়ে করে,—কিন্তু সেই রোগী যদি মরলো, অমনি ও ছুটে পালাবে। কক্ষনো মরা মানুষ ও সইতে পারে না। আর একবারও এই রকম করেছিল। কিন্তু এ' কি! এ যে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। দাঁতি লেগে গেছে। সেবারে এতটা হয়নি ত! একটু শুধু কি রকম হয়ে গেছলো, তার পর খুব কাঁদলে।"

"ষ্ট্রেচার আনাচ্চি, ওঁকে ওঁর নিজের ঘরে নিয়ে যেতে হবে, এখানে আর রেখে কাজ নেই। আহা, এত যার নরম মন, সে এলো কি না, মৃত্যুর খেলা দেখতে। অদৃষ্টের এ যেন পরিহাস!"

সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেও আরতি একটা গভীর অবসাদের মধ্যেই প্রায় সারা দিনটা ডুবিয়া রহিল। মূর্চ্ছা তার ভাঙ্গিয়া গেলেও, মূর্চ্ছাবসন্নতা তাহার চিত্তাশ্রয় করিয়া তার দেহকেও ভর দিয়া রহিল। ডাক্তার রুদ্র করুণার্দ্র চিত্তে তার শয্যাপার্শ্বে সারাক্ষণই যাতায়াত করিলেন। নার্সরা সকলেই আরতিকে ভালবাসিত, তার শুশ্রূষা তারা সযত্নেই করিল। শুধু সংবাদ পাইয়াও তাহাকে দেখিতে আসিলেন না—ডাক্তার সেন। তাঁর এতবড় কর্ত্তব্যচ্যুতি বোধ করি ইতঃপূর্ব্বে আর কখন কেহ দেখে নাই। তাই সেবাভবনের সংশ্লিষ্ট সকলেই ঈষৎ বিস্ময়ানুভব করিল। এ ছাড়া, দুএকজন মনের মধ্যে গোপনে একটুখানি লজ্জা বোধ করিয়া, নিজের মনকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিল যে, 'কি রকমই সন্দিগ্ধ মন আমাদের! ওই পাথরে-গড়া মানুষটা যে কাজ ভিন্ন আর কোন কিছুরই ধার ধারে না,—ওকে একটু যেন টান দেখাত বলে আমরা মনে করেছিলুম, ওর বুঝি কপাল ফিরেছে! কোথায় কি? কাজ বেশি পায়, তারই ওটুকু দাম। আজ অসুস্থ হয়ে কাজের বাইরে চলে গেছে, তাই ওর মূল্যও ওর কাছে শেষ হয়েছে!'

আরতির যখন ভাল করিয়া সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দেড় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—সেবাভবনের রোগীদের রাত্রি-ভোজন সমাধা করাইয়া কর্ম্মচারিবর্গ অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়াছে। চারিদিকে বিশ্রামগ্রহণের একটা প্রচেষ্টা এবং বিশ্রাম প্রাপ্তির একটা প্রশান্তি ধীরে ধীরে সারা অট্টালিকাময় যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। কেবল কোন কক্ষে বা কক্ষান্তরে যন্ত্রণাকর রোগ-যাতনার অর্দ্ধস্ফুট বিলাপ-মর্ম্মর অকস্মাৎ সেই প্রায় শান্ত-প্রকৃতির তন্দ্রাচ্ছন্ন বক্ষতলে ঈষৎ চমক তুলিয়া দিয়া আবার কিছুক্ষণের জন্য মিলাইয়া যাইতেছিল।

আরতি অনেকখানি সুস্থ হইয়া তার শয্যাপার্শ্বের চেয়ারে উপবিষ্ট প্রতীক্ষা-নিরত নার্সের দিকে চাহিয়া দেখিল। মেয়েটীর নাম চপলা। বেশী দিনের লোক নয়, নূতন আসিয়াছে; কিন্তু বেশ কার্য্যতৎপর, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধীর-স্বভাব। আলোর সুইচের দিকে ফিরিয়া একখানা বাংলা নভেল লইয়া সে পড়িতেছিল, আরতি স্থিরনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তাকে দেখিতে দেখিতে তার দুচোখ জলে ভরিয়া উঠিল। একদিন,—একদিন—সেদিন আরতি আর এখানে থাকিবে না,—সেদিন হয় ত এই মেয়েটী—এই চপলা তার সামান্য যায়গাটুকু দখল করিয়া লইবে। হয় ত, হয় ত একদিন ডাক্তার সেন তাকে যেমন করিয়া নিজের পূর্ণ বিশ্বস্ত সহকারিণী রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনই করিয়া ইহাকেও তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্রী করিয়া লইবেন! এ পৃথিবীর বালির ঘরে কারু শূন্য স্থান পূর্ণ হইতে তো কই বিলম্ব ঘটে না?

হয় ত তার হাতের সরু দুটী চুড়ির একটুখানি মৃদু নিক্কণ শোনা গিয়াছিল,—চপলা মুখ ফিরাইল, বই মুড়িয়া তার কাছে উঠিয়া আসিল,—"জেগে আছ মালতীদি, জল খাবে?"

আরতি নিঃশব্দে মাথা নাড়িল। তার চোখ দিয়া দুটী ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিয়াছিল, হাত দিয়া সন্তর্পণে মুছিয়া ফেলিল।

"কত রাত চপলা?"

চপলা টেবিলের কাছে গিয়া টাইমপিসটার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল,—"দশটা বেজে পাঁচ মিনিট।"

আরতি একটা ক্লান্তির কাতর শ্বাস ত্যাগ করিল,—"তুমি এখনও জেগে কেন, চপলা? যাও ঘুমোও গে।"

চপলা একটু ইতস্ততঃ করিল, "তুমি একলা থাকবে? আরও খানিকক্ষণ না হয় থেকে যাই,—শরীরটা কেমন বোধ করচো মালতীদি?"

"ভাল",—বলিয়া আরতি আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল,—"আমি তো ভালই আছি, মিথ্যে কেন রাত জাগবে, তুমি যাও,—আমিও আবার ঘুমের চেষ্টা দেখি।"

বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

চপলার ঘুম পাইয়াছিল। ডাক্তারও বলিয়া গিয়াছেন, মালতীর দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কোন অসুখ এখন নাই। সে নিজেই যখন ভাল আছে বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে চাহিতেছে, তখন বিদায় লইয়া ঘুমাইতে যাওয়া অন্যায় বলিয়া তারও মনে হইল না।

"তাহলে যাচ্চি, মালতীদি, কিছু দরকার থাকে ত

প্রহরী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS

বলো,—হ্যাঁ,— এই ষ্টিম্যুলেণ্টটা একবার দিতে বলে গ্যাছেন যে।—" বলিয়া সে একটা কাচের গ্লাশে খানিকটা জলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ষ্টিম্যুলেণ্ট মিশাইয়া পাত্রটা আরতির মুখের কাছে লইয়া আসিল।

পান করিয়া আরতি ঈষৎ একটু কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে বলে গ্যাছেন? ডাক্তার সেন?"

চপলা ঠোঁট টিপিয়া একটা তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গীর সহিত উত্তর করিল, "হ্যাঁঃ—ডাক্তার সেন আবার তোমার-আমার মতন লোকের রোগের খবর নিতে আসচেন! ডাক্তার রুদ্র।"

আরতির বুক চিরিয়া আর একটা গভীর রুদ্ধশ্বাস গলার কাছে উঠিয়া আসিল, কিন্তু বাহির হইতে পারিল না। চপলা নিজে হইতেই বলিতে লাগিল,—

"মানুষটা যেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করা একটা প্রাণহীন বস্তু, অথবা একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। মন বলে ওঁর মধ্যে কোন কিছুরই বালাই নেই! সকালে তো আজ আসেনই নি,—বেলা প্রায় তিনটের সময় যখন এলেন, ডাক্তার রুদ্র আপনার অসুখের কথা বল্লেন। শুনে কোন কথাই বল্লেন না, একবার জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করলেন না যে কেমন আছে! ডাক্তার রুদ্র নিজ হইতেই বল্লেন, 'মিস রায়ের মনটা বড্ড নরম, মৃত্যু দৃশ্য বেয়ার করতে পারলেন না,—সকড্ হয়ে ওই রকম হয়ে পড়লেন।' একটু চাপা হাসিমাত্র হেসে তখনই বেরিয়ে চলে গেলেন। ওঁর কাছে হয় ত মরণ দেখে সকড্ হওয়াটা হাস্যজনক! নিজে অত শক্ত কি না।"

আরতি নিঃশব্দে রহিল। এই তাচ্ছিল্য হাসি এবং নির্লিপ্ততা সেই পরম স্নেহময় চিত্তে আজ কোথা হইতে যে জাগিয়া উঠিয়াছে, চপলা তো সে কথা জানে না,—জানিলে কখনই তাঁহাকে সে দোষ দিতে পারিত না। ডাক্তার সেন যে তাহাকে স্বেচ্ছাতন্ত্রা কলঙ্কিনী মনে করিয়াই তার সম্বন্ধে এই নিরপেক্ষভাব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

"তাহলে চল্লুম মালতীদি, শুভ রাত্রি অতিবাহিত করো—" বলিয়া স্বচ্ছন্দ লঘু চরণে মৃদুস্বরে একটা গানের আধখানা চরণ গাহিতে গাহিতে চপলা চলিয়া গেল। দ্বারের বাহির হইতেও তার চাপা গলার মৃদু গুঞ্জন শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল,—

—"আমি সুদূরের পিয়াসী—"

আরতির সেই রুদ্ধশ্বাসটা তার বুকখানাকে যেন জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল।

নির্জ্জন ঘরে একা হইবামাত্র তার সারা দিনের কুহেলিকাচ্ছন্নবৎ চিত্ততলে চাপা দেওয়া সহস্র দুশ্চিন্তার বৃশ্চিক তাকে যেন একসঙ্গে চারিদিক দিয়া দংশন করিয়া উঠিল। ডাক্তার সেন তাহাকে কতবড় সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, সে তাঁর এই নির্ম্মম ব্যবহারেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। আর এতবড় নিশ্চিত এ প্রমাণ যে, অন্যের চক্ষেও এর অসঙ্গতি ধরা পড়িতে বাকি নাই! স্বর্ণলতা হয় ত তার কাল্পনিক এবং সত্যকার সকল সন্দেহই ডাক্তারের কাছে ব্যক্ত করিয়াছে। সে যে করিবে, এ' তো জানা কথাই; এবং প্রমাণ তার বিপক্ষে এত বেশী যে বিশ্বাস করিবার পক্ষেও বিন্দুমাত্র বাধার কারণ নাই। ডাক্তার নিজেই যে তার 'আই উইটনেস'। তিনি নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখিয়াছেন, তার পরে এ সব কথায় অবিশ্বাস করার কোন উপায়ই তো বাকি থাকে নাই?

ঘৃণায় আরতি যেন শিহরিয়া উঠিল,—লজ্জায় সে মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া গেল।

তার পর তার মনে পড়িল সলিলকে। তিনি নিজে কি কিছুই বলিবেন না? কিন্তু বলিবার তাঁর দিক হইতে কিছু তো নাইও! কি বলিবেন? তিনি নিজেই যে প্রধান অপরাধী! সে অপরাধ তিনি কোন্ মুখে অস্বীকার করিবেন! আর করিলেই বা সে কথা শুনিবে কে? স্বর্ণলতা যে নিজের কাণেই তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছে যে, তিনি আজও তাহাকে ভালবাসেন!

আরতি নিজের ভাবনা ভুলিয়া সলিলের কথাই তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিল। স্বর্ণলতা ভাল আছে,—নিশ্চয়ই সে ভাল হইয়াছে। কিন্তু সলিলের কাল্পনিক অপরাধকে সে ক্ষমা করে নাই,—তার সত্যকার এতবড় অপরাধকে সে কি আর কখনও ক্ষমা করিতে পারে? না, নিশ্চয়ই না। সলিলের বাকি জীবনে এ পাপের শাস্তি তাকে কত বড় করিয়াই যে বহন করিতে হইবে, তার সমস্ত জীবন যে তাহার ভারে কতখানিই ভারি হইয়া উঠিবে, সে কথা ভাবিতে তার মন যেন পাথরের মত ভার বোধ করিতে লাগিল। মুসুরীর কথা তার মনে পড়িল। যেদিন তারা বিবাহপণে আবদ্ধ ভবিষ্যৎ পতি-পত্নী বোধে প্রথম পরস্পরকে সম্ভাষণ করিবার সুযোগ

পাইয়াছিল, সেদিনের সেই সুখোজ্জ্বল চিত্র আজ এই নিষ্প্রভ জীবনের ক্ষীণালোকে স্বপ্নের মতই প্রতীয়মান হইল। সলিল, সানন্দ, সুন্দর জীবনের তেজে জ্যোতিষ্মান, ভবিষ্যতের আশায় উৎসাহিত সেই তরুণ পুরুষ, আজ কি ঐ অকাল-প্রৌঢ় নিরানন্দ নিস্তেজ লোকটা! আরতির বুক ফাটিতে চাহিতে লাগিল। কেন সে অমন দুর্জ্জয় অভিমানে তার কথা ভাবিয়া দেখিল না? অজ্ঞ সে, অন্ধ সে—বুঝিতে কত বড়ই ভুল করিয়া ফেলিল! সকল পুরুষের প্রকৃতি যে এক নয়, এ কথা যদি সে জানিত,—সে যদি তাহাকে সত্যকার চেনা চিনিত, তার যদি একটুও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকিত,—এমন করিয়া তিনটা জীবনের সকল সুখ, সমস্ত আশা আজ হয় ত বিসর্জ্জিত হইয়া যাইত না। সলিলের প্রেম যে এতখানি প্রবল তা তো সে ভাবে নাই! সে মনে করিয়াছিল, যে পুরুষ এক স্ত্রী মরিলে আবার বিবাহ করে, পত্নী বর্ত্তমানে দুশ্চরিত্র হয়, সেও তো তাদেরই একজন; অনায়াসেই সে বিবাহ করিয়া আরতিকে ভুলিয়া যাইবে। হায়, তাই যদি সে পারিত! কেন সলিল তার মত দুর্ভাগিনীকে এত ভালবাসিল? কেন তাকে আজও সে ভুলিতে পারিল না?—তার মধ্যে কি আছে এতখানি পাইবার মত?

আরতি শয্যাতলে উঠিয়া বসিল। তার চিন্তাভারক্লিষ্ট দুর্ব্বল বক্ষ যেন এত বড় গুরু ভার বহিতে পারিতেছিল না। শ্বাস তার রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। শিথিল দেহে ও স্খলিত পদে সে উঠিয়া গিয়া, একটা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিল। জনবিরল রাজপথ একটা বিরাট-মূর্ত্তি অজগরের মতই বিশ্রাম করিতেছে,—তার ইতস্ততঃ সাপের মাথার মাণিকের মত বিদ্যুতের আলোগুলা তীব্র রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছে। মধ্যে মধ্যে দু'একখানা মোটরকার বা দু'একটা পথিক সেই সুপ্তিমগ্ন অজগরের বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

বাহিরের হাওয়ায় তপ্ত ললাট ঈষৎ শীতল বোধ হইতে, আরতির মন আবার তার সঙ্কটসঙ্কুল সমস্যাময় বর্ত্তমানের দিকেই সভয়ে ছুটিয়া আসিল।

এখন তার কর্ত্তব্য কি? ডাক্তার সেন তাহাকে সন্দেহ করিয়াছেন। সলিলের ব্যবহারে তার স্ত্রীর সম্বন্ধে যে ত্রুটী আছে, সে কথা তিনি প্রথমাবধিই সন্দেহ করিয়াছিলেন। সে ব্যবহারের সঙ্গে যে আরতিরও যোগ আছে, সেই কথাটাই সেদিন জানা হইয়া গিয়াছে। সে যদি তাঁকে সেই চিঠিখানাও শেষ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়া দিত! যাক্, যা হইয়াছে, সে তো আর এখন কোন মতেই ফিরিবে না।

সে দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইল, এখান হইতে বিদায় লইতে হইবে বলিয়া সে এতখানিই বা কাতর হইয়াছে কেন? তার মনে হঠাৎ একটা সংশয় জাগিল। সলিলের সেই ঈর্ষা-বিকৃত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিদ্বিষ্ট বাক্যগুলা তার মনে পড়িয়া গেল! ডাক্তার সেন তাহাকে ভালবাসেন! না—না, এ কথা নিশ্চয়ই সত্য নয়। নিশ্চয়ই না।—কিন্তু—কিন্তু সে নিজেই কি বাসে? তাঁকে ছাড়িতে হইবে বলিয়া, তিনি অশ্রদ্ধা করিতেছেন বলিয়া এত দুঃখ সে কেনই বা অনুভব করিতেছে? অনেক কিছুই তো সে ত্যাগ করিয়াছে,—ডাক্তারের আশ্রয়, সেবা-ভবনের চাকরী সে সবের তুলনায় কিছুই তো নয়। তবে কেন এ ব্যাকুলতা!

আরতি চিন্তিত কাতর চিত্তে নিজের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুল ভাবে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কই না, সেখানের রত্ন-সিংহাসনে আজও তো সলিলেরই সুন্দর মূর্ত্তি তার সেই কন্দর্পের ন্যায় তরুণ রূপ লইয়া সেইরূপ উজ্জ্বল ভাস্বর মূর্ত্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত! সে তো কই এতটুকুও ম্লান হইয়া যায় নাই! সে মূর্ত্তিকে চিন্তা করিতে করিতে আরতির দুচোখ দিয়া অজস্র ধারা বহিয়া গেল। তার দিকে চাহিয়া দুহাত যোড় করিয়া, সে তাহার উদ্দেশে মনে মনে বলিল,—'প্রিয়, প্রিয়তম! জীবনের চিরারাধ্য! তোমায় আমি ভুলবো! তোমার কোন্ কথাটা ভুলে যাবো? এ জন্মে তো পেলুম না, জন্মান্তরে পাবার আশা নিয়ে তোমার আশায় আমি যুগান্তর অবধি বসে থাকবো। সে জন্মেও যদি না পাই, আবারও তো জন্মান্তর আছে! অন্তহীন কালের কাছে দুএকটা জন্ম আর কতটুকু! আবার আমাদের দেখা হবে, একদিন আমি তোমায় পাবোই পাবো।'

মন তার অনেকখানি হাল্কা হইয়া আসিল। মনে মনে এই বলিয়া সে মীমাংসা করিয়া লইল,—ভাল সে ডাক্তার সেনকেও বাসে,—সত্যকারই সে ভালবাসা। ভালবাসার শুধু একই রূপ নয়। এই শ্রদ্ধেয়, স্নেহময়, ন্যায়নিষ্ঠ আশ্রয়-দাতাকে সে তার অন্তরের মধ্য হইতেই বড় ভাইএর, প্রিয় বন্ধুর, পিতার মত ভক্তি, সম্মান ও ভালবাসার অঞ্জলি দিয়া ফেলিয়াছে,—তিনিও তার মনের মধ্যের নিতান্ত অল্প স্থান

জুড়িয়া রাখেন নাই। তাই আজ তাঁর জন্যও তার প্রাণ বড় অল্প কাঁদিতেছিল না।

সেই ডাক্তার সেন যখন কাল সকালে আসিয়া অথবা না আসিয়াই কঠিন দৃঢ় আদেশে তাহাকে তাঁহার সংস্রব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিবেন, লোকে যখন তার পশ্চাতে নানারূপ জল্পনা-কল্পনায় তার উদ্দেশে কালির আঁচড় কাটিতে থাকিবে,—হয় ত তিনিই তার কথা অন্যের কাণেও তুলিবেন,—স্বর্ণলতা নিশ্চয়ই তাঁহাকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করিয়া তুলিবে,—সলিল হয় ত এ-সব কাণ্ডে তার প্রতি সত্য-সত্যই বিরক্তি বোধ করিবে,—সেও তো তাকে স্বেচ্ছায় তাদের বাড়ীর চাকরী স্বীকার করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল? নাঃ, এ জীবন অভিশপ্ত! এর ভার বহন করা আর একান্তই নিষ্প্রয়োজন!

আরতি সহসা চমকিয়া উঠিল। কই! তার সেই দুঃসময়ের বন্ধু, পিতৃবন্ধু, অসহায়ের সহায় আর্সেনিক? তাড়াতাড়ি সে বুকের ভিতরে খোঁজ করিল, —কই? কোথায় তার সেই অকূলের কাণ্ডারী? পারের বন্ধু? অসহায়ের একান্ত সহায়? আরতির মাথা ঘুরিয়া গেল। সে তো শিশিটা তার বুকের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কে বাহির করিয়া লইল? কেমন করিয়া খোয়া গেল? ডাক্তার রুদ্র বা চপলা নার্স, অথবা আপনিই কোথাও পড়িয়া গিয়াছে? গভীর হতাশায় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সে খাটের উপর বসিয়া পড়িল। তার ভাগ্যে লাঞ্ছনা অপমান লেখা রহিয়াছে—কে তাহাকে তাহা হইতে রক্ষা করিবে?

দ্বারের বাহিরে প্রশ্ন হইল,—

"মে আই কম ইন?"

স্বর সে চিনিতে পারিল না, চিনিবার সামর্থ্য তার ছিল না, ভয়ে তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এত রাত্রে? কে আসিল? কেন আসিল?—হয় ত ঐ আর্সেনিকের শিশি চুরির বিচার করিতেই বা সে আসিতেছে। দুবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর কোন মতে তার স্খলিত জিহ্বা দিয়া সে জড়িত স্বরে উচ্চারণ করিল—

"ইয়েস—"

সভয়-কম্পিত বক্ষে চাহিয়া দেখিল, এই গভীর নিস্তব্ধপ্রায় মধ্যরাত্রে তার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন—সারা দিন ও অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত যিনি তাঁর সংবাদ মাত্র গ্রহণ করেন নাই, সেই ডাক্তার সেন। কিন্তু তিনি একা নহেন, তাঁর পশ্চাতে এক শুভ্রবসনা, শুভ্রবরণা বর্ষীয়সী বিধবা মূর্ত্তি দেখা গেল।

আরতি অবাক্ আকৃষ্ট চক্ষে দুজনের দিকেই চাহিয়া রহিল। মহিলাটীকে তার পরিচিত বোধ হইলেও সে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। রমণী নীরবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিস্ময়-স্তব্ধতায় অচলা আরতিকে নিঃশব্দে নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন, তাঁর অজস্র অশ্রুজলে আরতির মাথার চুল ভিজিয়া গেল।

ঘর নিদারুণরূপে নিস্তব্ধ, এত নিস্তব্ধ যে তার মধ্যে টাইমপিসটার চলার শব্দকে কলের চাকাঘোরার শব্দের মতই সুপ্রকট বোধ হইতেছিল। আরতি শুষ্ক, রুক্ষ, অশ্রুহীন, স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, কোন কল্পনা কোন চিন্তাই তার মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল না।

অনেকক্ষণের অনেক অশ্রুবর্ষণের পর মহামায়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া অদূরে দণ্ডায়মান ডাক্তারের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

"ভোরের ট্রেনেই আমি দেশে ফিরচি ডাক্তার সেন! অনুগ্রহ করে একে আজ রাত্রেই আমার নিয়ে যেতে অনুমতি দিন।"

ডাক্তার সেন সস্মিত মুখে চাহিলেন,—আরতির মৃত্যু-পাণ্ডুর ও তেমনই ভাবশূন্য মুখের দিকে স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—"ইচ্ছা হলে, অনায়াসে। ইনি যে 'রেজিগ্‌নেসন' লেটার আমায় লিখ্‌ছিলেন, সে আমি পেয়েছি,—এঁকে ডিসমিস বা ডিস্‌চার্জ্জ কর্ব্বার আমার আর দরকার হলো না, যদিও কর্ব্বার মতন কারণ বর্ত্তমান ছিল—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই আরতি—সেই বিস্ময় বিহ্বলতায় অভিভূত আরতি প্রবলভাবে চমকাইয়া উঠিল,—কারণ ছিল? কি, কি? কি, সে কারণ?—

ডাক্তার সেন আরতির খুব কাছে সরিয়া আসিলেন, হাতের মুঠায় চাপা একটা ছোট্ট শিশি দেখাইয়া স্মিতমুখে বলিতে লাগিলেন,—

"ডাক্তার রুদ্র তোমার হার্ট পরীক্ষা করতে গিয়ে হার্ট-ডিজিজের পরিবর্ত্তে যা ডায়াগনসিস করেছেন, সে এই। যাহোক, এটা যখন ফেরত পাওয়া গেছে, চুরির চার্জ্জ

থেকে তোমায় আমি এঁর জামিনেই মুক্তি দিলুম। তুমি এঁর সঙ্গে যেতে পারো, মালতী !"

এই বলিয়া উভয়কে পথ দেখাইবার ভাবে তিনি তাহাদের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। আরতি বিনা প্রশ্নে উঠিয়াই মহামায়ার হস্তে ধৃত যন্ত্রের পুতুলের মত তাঁহার অনুসরণ করিল।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা শব্দশূন্য। অতিক্রম-পথের দুধারে বিদ্যুতালোকের সুইচ টেপা ও এই তিনজনের পদধ্বনি ব্যতীত কোথাও কোন সাড়াশব্দই বাকি ছিল না। বহু সুপ্রশস্ত দালান পথসিঁড়ি অতিবাহিত করিয়া অবশেষে গাড়ি-বারান্দার তলায় যেখানে সুন্দরার বাড়ীর উইস্‌লি নাইটকার অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানে আসিয়া তাহারা পৌছিল। মহামায়া ডাক্তারকে নমস্কার জানাইয়া গাড়িতে উঠিয়া আরতিকে ডাকিলেন—

"এসো মা !"

তখন আরতি সহসা চট্‌কাভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া ডাক্তার সেনের দিকে চাহিল। ততক্ষণে ডাক্তার সেন তার আর একটুখানি কাছে আসিয়া হাস্যস্মিত মুখে তাহাকে সম্বোধন করিতেছিলেন,—

"আমি কিন্তু তোমায় 'আরতি'র পরিবর্ত্তে চিরকাল ধরে 'মালতী' বলেই মনে করবো—বিদায় মালতী !"

সমাপ্ত

ময়নামতীর চর

বন্দে আলী মিয়া

দূরে যতো চলে আঁখির সীমানা বালি আর সুধু বালি
জলি ধানগুলো হোয়ে গেছে কাটা উঠে গেছে চৈতালী।
পাটের জমিরা করুণ নয়নে চাহিচে নির্নিমেষ,
অঙ্গে তাহার বিধবা নারীর শুভ্র কঠিন বেশ।
খড়গুলা সব কাঁদে ফোঁপাইয়া চাষীরা গিয়েচে ফেলে
দুপুরের রোদ অন্তরে ওর দিয়েচে আগুন ঢেলে।
পদ্মার সাথে পেতেছিলো সই গাজনা খালের জল
সেই থেকে হোথা পড়িয়াছে চর আর নামেনি ক ঢল্,
আদিম কালের বালিকা ধরণী সাগর জননী বুকে
ঝড়ো বাতাসেতে উড়াইয়া বালি নাচিছে সকৌতুকে।
দহের সলিল শুকায়েচে কবে নাহি তার ইতিহাস
ময়নামতীর ঘাটে শুধু চলে খেয়া নাও বারো মাস।

* * * *

বালু ভরা আজ ধুসর মরুভূ ময়নামতীর চর
আছিল ওখানে শিব মন্দির জাগ্রত কালীঘর।
গোয়ালের পাড়া ডোমের বসতি ছিলো তার চারি পাশে
বাগ্দীর বাড়ী চাষীদের কুঁড়ে আজো যেন চোখে ভাসে।
পুরানো পাকুড় ছিলো ওই হোথা কাঁচা ও-সরক ঘেঁসি
সন্ধ্যার কাক আসিত সেথায় সুখ-নীড় অন্বেষি।
মুচিদের ছোটো পাতার ছাউনী ছিলো ওর শাখা তলে
বাঁচায়েছে তারা বুকে সাপটিয়া বাদলের ঝড় জলে।
গর্মীর রোদে শ্রান্ত বেহারা নামায়ে সোয়ার ডুলি,
ওরি ছায়াতলে খেয়েচে বাতাস মাজার গামছা খুলি।
বেসর দুলায়ে মাজন দশনা সুর্মা নয়না মেয়ে
ডুলির কাপড় ফাঁক করে' করে' দেখেচে বাহিরে চেয়ে।
সাথে নিয়ে চলে পোট্‌লা ভরিয়া বেগুন কুমড়া কদু
ভিন্ গাঁ হইতে আন্ গাঁয়ে চলে জেলের ঝিয়ারী বধূ;
ওরি কিছু দূরে বাঁশঝাড় তলে ছিলো হোথা পড়ো বাড়ী
কত বৌঝির নিশাস্ যে ওর বাতাস করেচে ভারী !
চক্ মজিদের মোয়াজ্জিনের গুণের ছিলো না শেষ
দরগা পীরের বিবিকে লইয়া হলো সে নিরুদ্দেশ।
রাখাল বালক সাথীদের সাথে নেমেছিলো ওই খালে
সেই শেষ তার উঠিল না আর ফিরিল না কোনো কালে।
পদ্মা ভাঙনে ভেঙেচে সেবার ময়নামতীর গাঁ
কে যে কোথা গেছে ঘর দোর ছাড়ি নাহি তার ঠিকানা—
গত রজনীর স্বপনের সম যেন আজি মনে হয়
জগতের ছোটো খেলা ঘরে তারা করেছিলো অভিনয়;
কাল যেথা ছিলো পল্লী বসতি আজি সেথা বালুচর
নীড়হারাদের তপ্ত নিশাসে ধূ ধূ করে প্রান্তর।

* * * *

চরের ডাহিনে আছিলো যেথায় বিন্দি পাড়ার হাট
সেখানে আজিকে সর্ বন মাঝে হয়েচে শ্মশান ঘাট।
মানুষ সেথায় পায়ে হেঁটে গেছে বিকি কিনি করিবারে
চৌদলে চড়ি আসিচে সে আজ মরণ অন্ধকারে;
চারিপাশে তার আধপোড়া বাঁশ ভাঙা কল্‌সীর কাণা
শিমূলের গাছে আধ্‌প'র রাতে শকুনী ঝাপুটে ডানা।
মাংসের লোভে ছেঁড়া বালিসের তুলা লয়ে বারে বার
শৃগাল গৃধিনী করিচে বিবাদ—কাঁদে খুলি কাঁদে হাড়।

অভিশাপ

শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু এম-এ, বি-এল

ক

আসামের এক প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে লতাচেরা চা বাগান। স্থানটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা। যতদূর দৃষ্টি যায় পাহাড়ের উপর পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেন আপন বিশালতার গর্ব্বে আপনিই বিভোর। চারিদিকেই পাইন, দেবদারু আর শালের জঙ্গল। সীমাহীন বনানীর স্নিগ্ধ শ্যামলতা পাহাড়ের কর্কশতাকে যেন স্নেহের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গিরিগাত্র বাহিয়া নির্ঝরিণী অবিরাম ঝরিয়া পড়িতেছে,—কখনও এখানে, কখনও ওখানে। ফুল অফুরন্ত। পাহাড়ের গায়ে সারা বৎসর ধরিয়াই ফুলের উৎসব লাগিয়া আছে।

তখন এপ্রিল মাস। রোডোডেনড্রনের পালা শেষ হইয়া পড়িয়াছে। এবার গোলাপের পালা। তাই চারিদিকে গোলাপের হাসি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মিনতি দেখিল এ গোলাপ সযত্ন-রক্ষিত টবের বাঁধনেই বাঁধা থাকে না। লোকের বাড়ীর আনাচে কানাচে, রাস্তার ধারে, পাহাড়ের গায়ে যেখানে সেখানে ফুটিয়া মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

চা-বাগানের বড়বাবু পরেশ মুখুজ্যের কন্যা মিনতি ষোড়শ-বর্ষীয়া, সুন্দরী। প্রকৃতির ক্রোড়ে আজন্ম পালিতা ; তাই পার্ব্বত্য রমণীর মত শঙ্কা-বিহীন, সঙ্কোচশূন্যা। গিরি-নির্ঝরিণীর মতই চঞ্চল তার প্রকৃতি, উদ্দাম তার মনের গতি।

অল্পদিন হইল মিনতির বিবাহ হইয়াছে। পিতার অনুগ্রহে তাহার স্বামী সেই বাগানেই চাকরী পাইয়াছে। কিন্তু এ বন্ধন ঝরণার মুখে শিলাখণ্ডের মত তাহার চঞ্চলতাকে আরও প্রখর করিয়া তুলিয়াছে। তাই সুযোগ পাইলেই সে তাহাদের বাগানের বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বাগানের কাজ শেষ হইলে কুলীরমণীরা দল বাঁধিয়া গান গাহিতে গাহিতে ফেরে। মিনতি দেখে, কি সুন্দর তাদের মুখের প্রফুল্লতা, কি নির্ভয় তাদের চোখের চাহনী, কি নৃত্যশীল তাদের গতির ভঙ্গী! যেন পাহাড়ের গায়ে একরাশ ফুল—বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া পথিকের গায়েই পড়িতেছে! সংসারে তাদের যে কোনরূপ বাঁধন আছে তা মনে হয় না। মিনতির মনে হয় ওরাই সুখী। ইচ্ছা হয়, ওদের মত বাধাহীন জীবন লইয়া পাহাড়ের বুকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

খ

লতাচেরা চা-বাগানে আজ মহোৎসব। ম্যানেজার এক বৎসরের ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন। বাগানের বড়বাবু, ছোটবাবু ইত্যাদি বাবুগণ এবং ঠিকাদার, সর্দ্দার প্রভৃতি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া বড় সাহেবের উপযুক্ত বিদায়-ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত। সামান্য কেরাণী হইতে কুলী পর্য্যন্ত কেহই তাহাদের চাঁদার জুলুম হইতে পরিত্রাণ পায় নাই।

সে দিনকার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আয়োজন ছিল কলিকাতা হইতে আনীত সিনেমা। সুদূর আসামের চা-বাগানে এ একটা অভাবনীয় ব্যাপার। বাঙ্গালী কর্ম্ম-চারীদিগের পরিবারস্থ সকলেই গিয়াছে। মিনতিও গিয়াছে। সমাগত দর্শকবৃন্দের আদর-আপ্যায়নে নিযুক্ত পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবক সমীর সে রাত্রে মিনতির দৃষ্টি এড়াইল না।

সিনেমা শেষ হইয়া গেল। সাদা কাপড়ের পর্দ্দায় সমীর ছায়াচিত্র দেখিয়াছিল, কিন্তু সে কিসের ছায়া, একমাত্র সেই বলিতে পারে। প্রোগ্রাম বিতরণের সময় যে মেয়েটী তার দিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, সেই মেয়েটীর আয়ত চক্ষু দুটী বুঝি তার হৃদয়ে স্থায়ী ভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। স্ক্রীনের উপর হইতে বায়স্কোপের ছবি মুছিয়া গেল, কিন্তু সমীর ও মিনতির হৃদয়পটে আজ যে ছবি ফুটিয়া উঠিল তাহার স্মৃতি মুছিবে কিসে ?

পরদিন মিনতি গতরাত্রের কথা ভাবিল। তাহার

অশান্ত হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া অলক্ষ্যে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। কার যেন মুখ কেবলই তাহার পানে চাহিয়া থাকে। দূরে ঐ গাছটার উপরে যে এক ঝাড় নাগকেশর ফুটিয়া আছে, সেই ফুলের মধ্য দিয়া যেন সেই চোখ দুটী তার পানে চায়। তাহাদের বাগানের একধারে মাধবীলতার যে ঝোপটী সন্ধ্যার পর জোনাকীর আলোয় জলিয়া উঠে, তার মধ্যেও সেই মুখ উঁকিঝুঁকি মারে।

মিনতি আর পারে না। দিবসে নিশায়, আহারে বিহারে যতবার সে ভুলিবার চেষ্টা করে, ততবারই তাহার মন বিফল হইয়া ফিরিয়া আসে। ভুলিবে বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া মিনতি আজ চিঠি লিখিতে বসিল।

গ

সমীরের জীবনে এ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে তাহা বৈচিত্র্যময় বলিয়াই মনে হয়। মন তাহার ছেলেবেলা হইতেই কিছু দুঃসাহসিক। ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যখন বাঙ্গালীর আমন্ত্রণ আসিল, তখন আর সমীর স্থির থাকিতে পারিল না। দুঃসাহসিক মন তাহাকে যৌবনের প্রারম্ভেই মেসোপটেমিয়ার মরু-প্রান্তরে লইয়া ফেলিল। নূতন দেশ, নূতন কর্ম্মজীবন তাহার চঞ্চল মনকে যথেষ্ট আহার দিয়াছিল; কিন্তু নিবৃত্তি দিতে পারে নাই। তাই দেশে আসিয়া সে বসিয়া থাকিতে পারিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে আসামের চা-বাগানে চাকরী লইয়া আসিল। কিন্তু শান্তি কোথায়?

দুদিন আগে এখানে যে তরুণী তাহাকে কটাক্ষে বিদ্ধ করিয়াছিল সে ক্ষত তো তাহাকে অহর্নিশ যন্ত্রণা দিতেছে। সমীর ভাবে "ও কিছু না।" তাহার মনে পড়ে সন্ধ্যা সমাগমে বসোরার রাজপথে কতশত সুন্দরী তাহাকে ইঙ্গিতে আত্মনিবেদন করিয়া দিয়াছে। তার মত কত বঙ্গবাসী যুবা সে অনলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে তো সে মোহ অবহেলায় ঠেলিয়া আসিয়াছে।

মনে পড়িল সেইদিনকার কথা, যেদিন ক্লান্ত শরীরে শিবিরে ফিরিবার পথে তাহাদের অফিসারের যুবতী কন্যা এলিসি তাহার হাত ধরিয়াছিল। আকাশ সেদিন অস্তোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত আভায় আজকের মতনই রঞ্জিত হইয়াছিল। শুষ্ক খর্জ্জুর-কুঞ্জের ভিতর দিয়া যে বাতাস বহিতেছিল, তাহাতে কি এমনই একটা উদাস ভাব ছিল। এলিসির অপরাধ, সে সমীরকে ভালবাসিয়াছিল। যখন সমীর তাহাদের বাংলার সম্মুখ দিয়া যাইত, তখন সে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার প্রতি চাহিয়া থাকিত। কিন্তু ভালবাসা অন্ধ কি না, তাই সে সমীরের কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পায় নাই, খালি দেখিয়াছিল তাহার প্রসন্ন আনন, সুদৃঢ় বাহু, আর সুঠাম দেহশ্রী। এলিসির ভালবাসার চিহ্ন সমীর কয়েকবার ফুলের উপহারের মধ্যে পাইয়াছিল। কিন্তু সে আরও কিছু ভাবিয়া রাখিয়াছিল। সে দেখিয়াছিল এলিসির আত্মদানের পিছনে এলিসির পিতা, তাহাদের অফিসারের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে তাহার সাধের চাকরী কেন জীবনটাও এক মুহূর্ত্তে উড়িয়া যাইতে পারে।

তাই সে সুন্দর সন্ধ্যায় যখন এলিসি তাহার হাত ধরিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে প্রেম নিবেদন করিল, তখন সমীরকে নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইয়াছিল—'এলিসি, তোমার এবং আমার কল্যাণের জন্য আমাদের আজকের মিলনই চরম হউক।'

আজ আবার সেই পরীক্ষা আসিয়াছে। মনকে দৃঢ় করিয়া সমীর দ্রুত পদচারণা করিতে লাগিল। হঠাৎ বিছানার উপর নজর পড়ায় দেখিল একগোছা ফুল আর তার সঙ্গে বাঁধা একটুক্রা চিঠি। সমীর ব্যস্ততার সহিত চিঠি লইয়া পড়িল—"প্রিয়তম,—বায়স্কোপে তোমায় দেখিয়া অবধি মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। তোমায় দেখিতে বড় সাধ। একটীবার শুধু দেখা দিবে না কি? ইতি তোমারই মিনতি।"

সমীরের মস্তিষ্কে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে সব জিনিষই তাহার পরিষ্কার বোধগম্য হইল। পরীক্ষা যে আসিয়াছে তাহা নিশ্চিত।

ঘ

মনকে সংযত করিবার চেষ্টায় সমীর এই কয় দিন নিজেকে কর্ম্মের ব্যস্ততায় ডুবাইয়া দিয়াছে। কিন্তু কিসের ছায়া যেন তাহার চারি পাশে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন বেড়াইতে যায়, তখন কে যেন তার পথের উপর দিয়া সরিয়া যায়; যখন বেড়াইয়া ফিরে তখনও কে যেন তাহার প্রতীক্ষায় পথের পাশে দাঁড়াইয়া থাকে।

বিব্রত হইয়া সমীর চিঠি লিখিল—"মিনতি, আমার একান্ত অনুরোধ আমার পথে আর আসিও না।" আরও লিখিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না। মিনতির ব্যথাভরা মুখখানি তাহার স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল, চিঠি আর লেখা হইল না। ভাবিল, 'কি অন্যায় করিয়াছে সে? পার্ব্বত্য আবহাওয়ায় আজন্ম পালিত মিনতি যদি প্রকৃতির উদ্দাম বাসনার একটু অংশ পাইয়া থাকে—চিরন্তনী নারীর প্রেরণা যদি তাহার বুকে একটু তীব্র ভাবেই বাজিয়া থাকে, তাহাতে দোষ কি?' দেখা সে করিবে বলিয়া স্থির করিল।

সমস্ত দিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাত্রে সমীরের ঘুম ভাল হইল না। স্বপ্ন দেখিল—দুর্গম পাহাড়ে একা উঠিতেছে। অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় মনে হইল কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে। কাছে গিয়া দেখিল মিনতি। মন তাহার তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

আবার স্বপ্ন দেখিল, ভীষণ তরঙ্গময় সমুদ্রে তাহারা দুইজনে ভাসিতেছে—সে আর মিনতি। শরীর তাহাদের অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মিনতি বলিল "এবার আমরা দুজনেই ডুবিব।" সমীর চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ ঝড় উঠিল, মিনতি ভয়ে তাহাকে দুই বাহু দিয়া বদ্ধ করিয়া ফেলিল। মগ্নপ্রায় হইয়া সমীর চীৎকার করিতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল!

এ কি স্বপ্ন না সত্য! প্রথমটা সমীর ভাল বুঝিতে পারিল না। দেখিল সে বিছানাতেই শুইয়া আছে, আর মিনতির বাহুযুগল তাহাকে নিবিড়ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

কম্পিত হস্তে আপনাকে মিনতির বাহুবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমীর উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "চলে যাও মিনতি, এখনই। এখনও রাত্রির অন্ধকার আছে।" কণ্ঠস্বর তাহার ধীর, প্রচ্ছন্ন ব্যথায় ভরা—যেন বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত এখনই লুটাইয়া পড়িতে পারে।

ব্যর্থতার দারুণ ক্ষোভে মিনতির ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। দলিতা ফণিনীর মত সে গর্জ্জিয়া উঠিল "যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা বলে যাই, আপনি আমার হৃদয়ে আজ যে আঘাত দিলেন জগতের নারীর কাছ থেকে যেন এমনি আঘাত পান চিরদিন।"

পরদিনই সমীর আফিসে জবাব দিয়া চা-বাগান হইতে বিদায় লইল। এখনও সে অশান্ত হৃদয় লইয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কতদিন ঘুরিবে, কে জানে।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

হলিউডে চীনা নর্ত্তকী—

হলিউডে চীনা রমণীরাও যোগ দিয়েচেন। অনেকে ইতিমধ্যে শক্তিশালিনী অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করে ফেলেচেন। এঁরা দু'জন অভিনেত্রী ন'ন, নর্ত্তকী। এক জনের নাম বো লিং, আর এক জনের নাম বো চিং। কোনটি কে সে কথা বলবার উপায় নেই, কারণ দু'জনের আকৃতি, চোখ মুখ হুবহু এক ত' বটেই, উপরন্তু তাঁরা যমজ ভগ্নী। সমস্ত হলিউডে চীনা অভিনেত্রী অনেক আছেন, কিন্তু যমজ কেবল এঁরাই। নৃত্য-গুণে এঁরা খ্যাতি অর্জ্জন করেচেন।

হলিউডে চীনা নর্ত্তকী

চলচ্চিত্রের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্যর্থ প্রেমিক—

এর চেয়ে যোগ্য বিশেষণ খুঁজে পেলুম না। ইটালীর ক্যাষ্টেলাণ্টা পাহাড়ের বুকে চৌত্রিশ বচর আগে চিত্রজগতে রুডলফ ভ্যালেন্টিনো নামে পরিচিত এক মানব-শিশুর জন্ম হয়। সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে একত্রিশ বচর পরে তার মৃত্যু-তিথিতে সমস্ত সভ্য জগৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে শোক প্রকাশ করবে। বস্তুতঃ চলচ্চিত্রে অভিনয় করে মানুষের মনের ওপর এতখানি প্রতিপত্তি বিস্তার করবার সৌভাগ্য আর কোনো চিত্র-নটের হয়নি। অর্দ্ধেক পৃথিবী একদিন

শেখবেশী রুডলফ ভ্যালেন্টিনো

তাঁকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক নামে অভিহিত করেছিল। কোনো কোনো মাসে রুডলফের চিঠির সংখ্যা যোলো হাজার অতিক্রম করেচে। বলা বাহুল্য সেগুলির অধিকাংশই নারী লিখিত প্রেমপত্র।

শুনলে মনে হয়, ভ্যালেন্টিনোর মত সুখী পুরুষ পৃথিবীতে আর কেউ হয়ও নি, হ'বেও না। কিন্তু যাদের সঙ্গে রুডলফের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল তাঁরা জানেন, অতবড় দুঃখী খুব কমই দেখা গেছে। অভিনয় ক্ষেত্রে অর্দ্ধজগৎ তাঁকে আদর্শ প্রেমিক বলে স্বীকার করলেও, বাস্তবে তিনি প্রণয় ব্যাপারে সুখী ছিলেন না। বাস্তবিক, এই অদ্ভুত মানুষটির জীবন-কথা দিয়ে বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করা চলে। একদিন যার অন্ন মিলতো না, তার পর হঠাৎ সে অর্দ্ধেক পৃথিবীর হৃদয়েশ্বর। কিন্তু আভিজাত্যকে তিনি ঘৃণা করতেন। যে আমেরিকা তাঁকে ঐশ্বর্য্যের শিয়রে বসিয়েছিল তাকে তিনি ঘৃণা করতেন, যারা তাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক বলে সম্মানিত করেছিল তাদেরও তিনি ঘৃণা করতেন। রুডলফ দুবার বিবাহ করেছিলেন এবং দু'বারই তা ভাঙ্গতে হয়েছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি চিত্র-নাট্যে অশেষ প্রতিভাশালিনী পোলা নেগ্রির সঙ্গে বিবাহের অভিলাষ প্রকাশ করলেও, আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে তা পূর্ণ হয়নি।

গ্যালিলিয়োর স্মৃতি—

ইটালীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্ব্বিদ গ্যালি-লিয়োর নামে স্যানফ্রান্সিস্কোয় এই স্মৃতি মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত
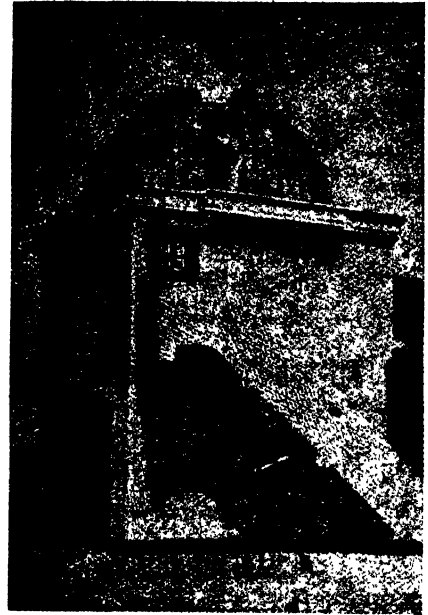
গ্যালিলিয়োর স্মৃতি-মন্দির

হয়েচে। গ্যালিলিয়ো হাই ইস্কুলের ছাত্রেরা এরই উপর থেকে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করে। এর মধ্যে দুটি মূল্যবান দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে। এবং নির্ম্মাণ

কার্য্যের জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। ইস্কুলের ছাত্রেরাই সে ব্যয়ভার বহন করেচে। এই শিক্ষাগারটির বৈশিষ্ট্য এই যে এর উপরের গম্বুজটিকে ইচ্ছে মতো ঘোরানো যায় এবং তার মধ্যে উপরের আকাশের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়।

আকাশ-স্পর্শী অট্টালিকা

আধুনিক সভ্যতা আমেরিকার অট্টালিকাগুলিকে যতখানি উঁচু করে তুলেচে তেমন বোধ করি আর কিছু নয়। ওখানকার এক একটি অট্টালিকাকে ছোট খাট সহর
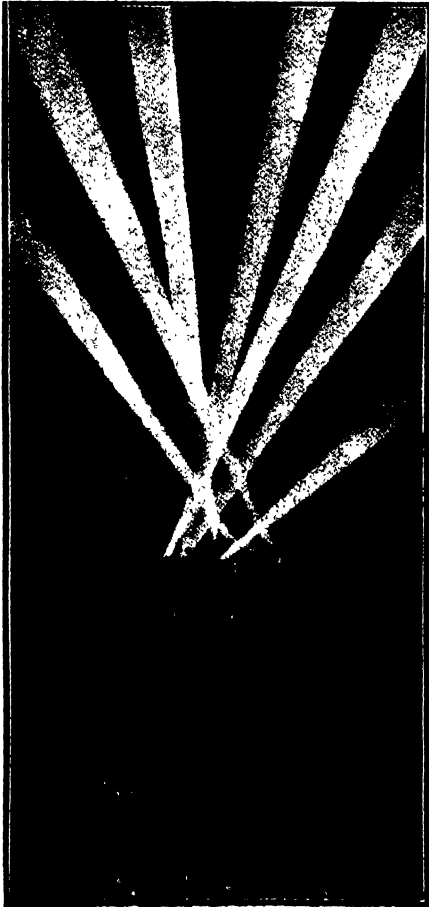
আকাশ চুম্বী অট্টালিকা

বললে বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় না। এই বাড়ী দুটি তারি নিদর্শন। এখানে ব্যাঙ্ক আছে, তিন হাজার দর্শকের উপযোগী একটি প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চ আছে।

একশটি মোটর রাখবার উপযোগী 'আস্তাবল' আছে, এবং বিভিন্ন বাসিন্দার প্রায় প্রত্যেকেরই এক একটি ছোটখাট আফিস আছে। আহার-কক্ষ, শয়ন কক্ষ ত' আছেই, তা ছাড়া আছে ছেলেদের খেলবার উপযোগী স্থান, নাপিতের
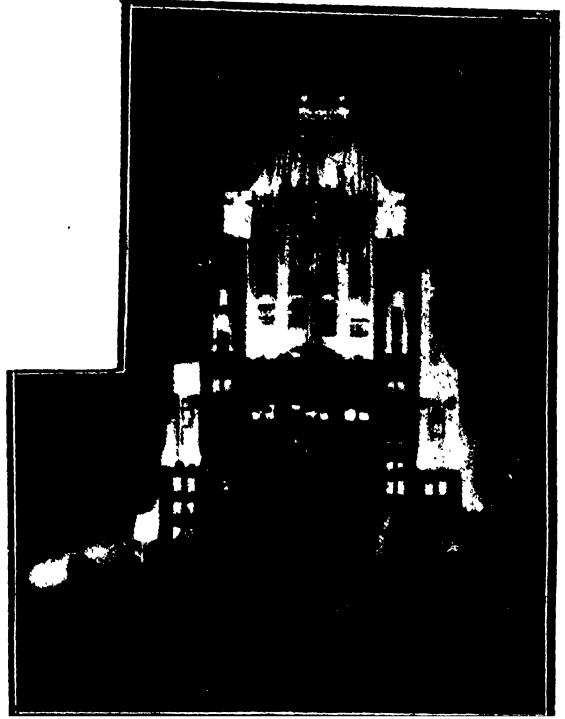
গগনস্পর্শী প্রাসাদ

দোকান, আরও কয়েক রকম দোকান, ডাক্তারখানা আর ক্লাব ঘর। এদের এক একটিকে ছোটখাট সহর বললে অত্যুক্তি হয় কি ?

এঞ্জিনের প্রথম যুগ—

আমেরিকায় রেল ইঞ্জিন প্রথম চলতে সুরু হয় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তখন সংখ্যা এত অল্প যে তাদের প্রত্যেকের এক একটি নাম দেওয়া অসম্ভব ছিল না। নিউইয়র্কে প্রথম যে এঞ্জিনটি রেল-পথে যাতায়াত সুরু করে, সেটির নাম 'ডিউইট ক্লিণ্টন।' আজ এঞ্জিনের যে সুসংস্কৃত মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়, সে দিন তা' ছিল না। তখন ধূম-নির্গমনের চোঙটিই ছিল এঞ্জিনের একটা
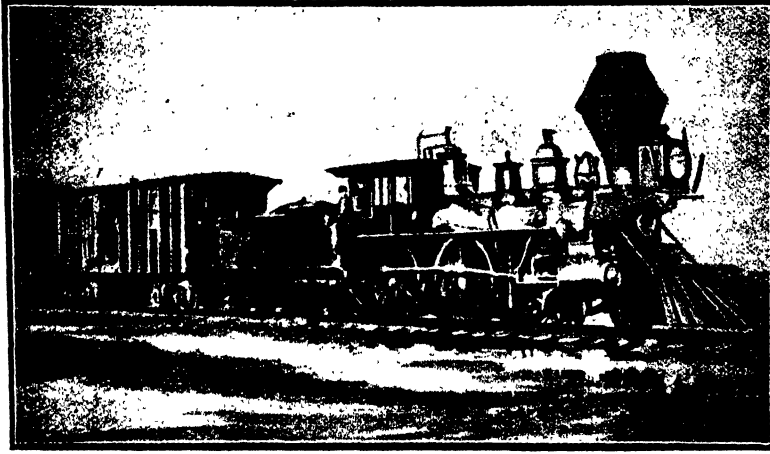
প্রথম যুগের এঞ্জিন

দেওয়া হ'ল, সেটি সেকালের এঞ্জিনের প্রতিকৃতি। নিউইয়র্কে প্রথম যে এঞ্জিনটি চলাচল সুরু করে, এটি তার পরের অবস্থা।

বধূ-বেশ—

প্রত্যেক দেশের বিবাহ সজ্জার মধ্যে এক একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। এখানে দু'টি দেশের বধূর বিবাহ-কালীন প্রতিকৃতি দেওয়া হ'ল। একটী চীনের, অপরটি পূর্ব্বযুগের রাশিয়ার। অবশ্য দুটির কোনোটিই সেই দেশের মেয়ে ন'ন। এঁরা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী। একজন মেরিলীন মোরগ্যান, আর একজন ডায়না এলিস। চিত্র নাট্যের জন্যেই এঁদের ঐ দুই দেশের বধূবেশ ধারণ করতে হয়েছিল। অনুকৃতি যে সকল রকমে নিখুঁত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

চীনের বধূ

প্রাচীন রাশিয়ার বধূ

ফ্যারাও-এর কোষাগার—

গত শতাব্দীর প্রারম্ভ-ভাগে এই পার্ব্বত্য অট্টালিকাটি আবিষ্কৃত হয়েচে। শোনা যায়, খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হ'বার কিছুকাল

পূর্ব্বেই এটি কোনো ফ্যারাও কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। সেকালে এটি কোষাগার রূপে ব্যবহৃত হ'ত। এই অট্টালিকার ভেতর তিনটি ঘর,—পার্ব্বত্য-পাথর কেটে তৈরী আর চমৎকার কাজ করা। প্রবেশ-দ্বারটি উচ্চতায় তিরিশ ফিট। বাণিজ্যের ফলে গ্রীস্, রোম, আরব এবং পারস্য থেকে ফ্যারাও যা' কিছু লাভ করতেন, তাই এসে জমত এই অট্টালিকার কক্ষে। রোমের পতনের পর জনসাধারণ কর্তৃক এটি পরিত্যক্ত হয়। সিনাই উপদ্বীপের অন্তর্গত পেত্রা সহরে গভীর উপত্যকার মধ্যে এর অবস্থিতি।

ফ্যারাওএর কোষাগার

কলম্বসের স্মৃতি—

নতুন জগৎ খোঁজবার উদ্দেশ্য নিয়ে কলম্বস একদিন দেশ ছেড়ে অকূল সমুদ্রের বুকে ভাসতে সুরু করেন। তার পর বহু কাল গেছে। সম্প্রতি স্পেনের অন্তর্গত প্যালোসে—অর্থাৎ, যেখান থেকে কলম্বস নিরুদ্দেশ-যাত্রা সুরু করেছিলেন, সেইখানে তাঁর একটি সত্তর ফিট উচ্চ বিরাট মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। শ্রীযুক্তা হ্যারিপাইন হুইটনি এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেচেন।
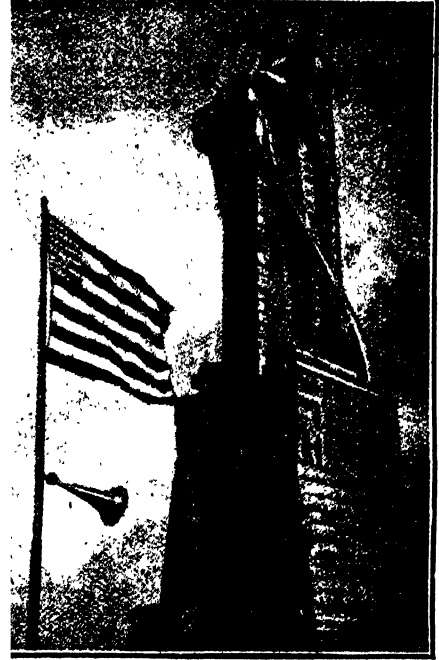
কলম্বসের স্মৃতি

জাহাজের অগ্নি-নিবারণ

ডাঙায় আগুন লাগলে যে উপায়ে তা' প্রশমিত করা হয়, তা' নতুন করে বলবার দরকার নেই। কিন্তু সমুদ্রগামী জাহাজে আগুন লাগলে কি করে তা' নিবারণ করা হয় সে কথা হয় ত অনেকে জানেন না, সে দৃশ্য সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। এখানে যে ছবিটি প্রকাশিত হ'ল, তা' লক্ষ্য করলে জাহাজের আগুন কি করে নিভানো হয় তা বোঝা সহজ হ'বে। জাহাজে আগুন লেগেচে, এবং অতিকায় ন'ল দিয়ে জল পাম্প করে তা' নিভাবার উদ্যোগ চলেচে।

প্রত্যেকটি নল দিয়ে মিনিট-পিছু বারো হাজার গ্যালন জল আসচে।

জাহাজের অগ্নি নিবারণ

মোটরে তেল নেবার সহজ উপায়—

পথের মাঝখানে মোটরের তেল ফুরিয়ে এল। চালক তাড়াতাড়ি গাড়ী নিয়ে তেলের দোকানে এলেন। কিন্তু দোকানদার অনুপস্থিত।—হয় ত প্রণয়িনীর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কইতে গেচে, কিম্বা আর কোথাও। এ' অবস্থায় চালক কি করবেন? আর একটা দোকান পর্য্যন্ত পৌঁছবার আগেই যদি গাড়ী বন্ধ হয়ে যায়!

এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে দোকানগুলি একটা নতুন ব্যবস্থা করেচে। দোকানদার থাকুক বা না থাকুক, যতটুকু তেল দরকার তার উপযুক্ত দাম এইটির ভিতর ফেলে দিন। তা হ'লেই, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বে। কিন্তু নোট বা চেক ফেলে দিলে চলবে না, মুদ্রা-মূল্য দেওয়া চাই। কারণ সেগুলি ভিতরের বিশেষ একটি যন্ত্রে গিয়ে আঘাত করলে, তবে তেল পাবেন, নইলে নয়।
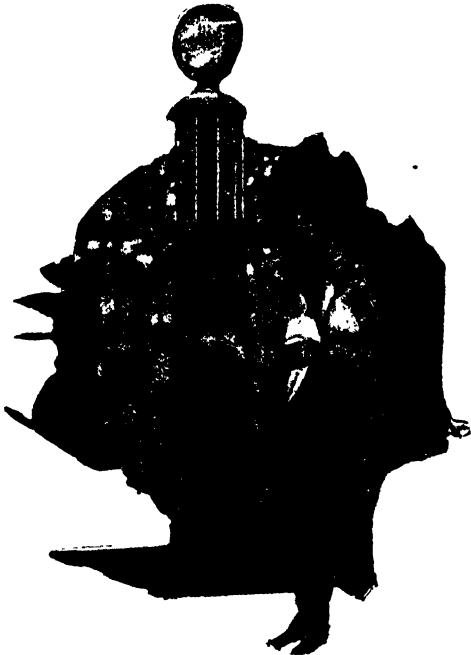
মোটরে তৈল লইবার সহজ উপায়

জন গিলবার্ট—

ছবির জগতে জন গিলবার্টের নাম কারো অজানা নেই। ছবির পর্দ্দায় যেমন, বাস্তবেও ঠিক তেমনি,—গিলবার্ট এক অক্লান্ত প্রেমিক! শ্রীমান পূর্ব্বে একবার বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তা' রাখতে পারেন নি। তার পর বিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রিটা গার্ব্বোর সঙ্গে কিছুকাল অত্যন্ত

অভিনয় কালে গিলবার্ট

ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়ায় সবাই আশা করেছিল তাকেই তিনি বরণ করে ধন্য করবেন, কিন্তু হঠাৎ সেদিন আয়েনা ক্লেয়ার নাম্নী এক অভিনেত্রীর পাণি-গ্রহণ করে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়েচেন। প্রকাশ, বিবাহের দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে শ্রীমতী ক্লেয়ারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং পক্ষ কালের মধ্যেই বিবাহ! ক্যালিফোর্ণিয়ার নিয়ম অনুসারে অনুমতি পত্র পাবার তিন দিন পরে বিবাহ করতে হয়, কিন্তু শ্রীমানের ততখানি ধৈর্য্য না থাকায় ট্রেণ যোগে নাভাদায় গিয়ে সেই দিনই উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই ব্যস্ততা দেখে অনেকে সন্দেহ করচেন, শীঘ্রই হলিউডে বিবাহ-বিচ্ছেদের একটি বড় রকমের সংবাদ শোনা যাবে। যদি যায়—যথা সময়ে খবর দেব। উপস্থিত ভারত-বাক্য উচ্চারণ করা ছাড়া উপায় কি! শ্রীমানের বাৎসরিক উপার্জ্জন বর্ত্তমানে এক লক্ষ পাউণ্ড!

শ্রীমতী গিলবার্ট

ছায়া

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

বাড়ীটা যেন থম্ থম্ করে। শোকাচ্ছন্ন বুকচাপা দীর্ঘনিশ্বাস আজও থেকে থেকে ক্ষুদ্র পরিবারটির মধ্যে ফুলে ফুলে ওঠে। মৃত্যু যেন গৃহখানির একমাত্র আনন্দটুকু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে!

—এত বাধা বিপত্তি, এত কথার খেলাপ, এত লগ্ন-বিপর্য্যয়—তবু সেই নিয়তির টানে বিবাহ ঘটে গেল।...... বর্ষাকাল; প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে সাপের মাথা ছিঁড়ে যায়, গাছ-পাথর পড়ে', রাস্তায় বুক-ভোর জল দাঁড়িয়ে পথ বন্ধ হয়ে গেল,—বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী কেউ এল না—

তবু শাঁখ বাজ্‌লো উলুধ্বনি দিল, শুভদৃষ্টি হলো, সাত এয়োতি সাত পাক ঘুরলো!

কিন্তু বছর না ঘুরতেই মেয়ে হলো বিধবা। স্বামীস্ত্রীতে ভাবও হয়নি। জঙ্গলের আফিসে ছেলেটি চাকরি করতো; সেইখানেই বুনো জ্বরে ভুগে হঠাৎ একদিন কাবার হয়ে গেল।—

একেই বলে নিয়তি! এবং এরই জের টেনে চল্‌তে হবে মেয়েটিকে সারা জীবন ধবে'।

মা তাই মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে। বলে—হা ভগবান!

জামাইটি ছিল বড় প্রিয়। পুত্রহীনার সমস্ত মমতা, সমস্ত মায়া গিয়ে পড়েছিল সেই পরপুত্রটির ওপর। অনেক দুঃখের জামাই!

একাদশীর কর্ম্মহীন দিনটিতে বিমলা কেবল এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। আর রাত্রির অন্ধকারে দুটি সজল চোখ বহুদূর পর্য্যন্ত ঠেলে দিয়ে বোধ করি সেই অদৃশ্য নিয়তির দিকে তাকাবার চেষ্টা করে। তার বিস্মিত দুটি চোখের মধ্যে বিধবার সেই চিরকালের প্রশ্ন ঘনিয়ে ওঠে।

আর সরোজিনী আড়ালে গিয়ে কাঁদে—অমন জামাই··· বাবা তুমি গেলে কোথায়? কি অপরাধ করলাম—হে মা চণ্ডি! বাছাকে আমার কোল ছাড়া করলে!

তা হয় ত হয়েছিল কোনো অপরাধ! দেবতার কোপদৃষ্টি

থেকে কোনো অনাচার এড়িয়ে যাওয়া কি বড় সহজ কথা ?

সেদিন থেকে সরোজিনীর কি যে হলো কে জানে! দিনরাত ঘরে গোবর ছড়া দেয়, দশবার করে' স্নান করে, পঁচিশবারের ওপর সারা বাড়ীটায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে বেড়ায়। এ নিয়ে পাড়ায় যেমন কাণাকাণি, আশপাশের বাড়ীগুলিতে তেমনি অশান্তি।

জামাইয়ের শোক ত আছেই—

তা ছাড়া আর একটা কিছু গোলমাল যেন লেগেই থাকে। ছোট্ট বাড়ীটিকে ঘিরে নারীকণ্ঠের সুতীক্ষ্ণ আওয়াজ প্রায় সকল সময়েই আশপাশের শ্রোতার কাণগুলিকে অধীর করে' রাখে।

একহারা ডিগ্‌ডিগে গড়ন; রোগা রোগা দুখানি হাতে দুগাছি সোণার পাত মোড়া ঢাকাই শাঁখা,—সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের মধ্যে ও ছাড়া আর কিছু নেই; মাথার পাতলা কটাসে চুলগুলির মাঝামাঝি চওড়া মেটে সিঁদূর; পরণে একখানি ময়লা রুটো শাড়ী। যৌবনের কোনো গরিমাই সে দেহে নেই,—কোনো দিন যে ছিল তাও এক নজরে বিশ্বাস করা কঠিন।

ঝগড়া-ঝাঁটি অশান্তি শুধু ওই দুখানি ঘর, একটুখানি দালান, একফালি উঠোন আর সদর দরজার জামটুকু নিয়েই।

তা সরোজিনী অন্যায় কিছু বলে না। বলে—দেবো না? অনিষ্ট কল্লে গাল দেবো না? আমি ত কারো বাড়ীর দরজায় মাছের কাঁটা ফেল্‌তে যাইনি!

মা'র গলার আওয়াজ শুনে বিমলা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বয়স এখন তার পনেরো কি ষোল। রূপ যেন ছড়িয়ে পড়ছে।

বলে—চুপ কর মা চুপ কর। ও বাড়ীর ওরা কি মনে করে বল দেখি?

তুই থাম্‌ দেখি লা আবাগি? চুপ করবো!—নর্দ্দমার জলের ছিটেয় আমার ধব্‌ধবে কাপড়খানা চুলোয় গেল, বলি ব্যাটার মাথা খেয়ে সব্বনাশীরা কানা হয়ে বসেছে? দেখতে পায় না?

বিমলা বলে—কই, জলের ছিটে ত তোমার কাপড়ে লাগেনি!

লাগেনি! একশোবার লেগেছে! হাওয়া লেগে এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে—নৈলে নাকের ওপর ধরে আবাগিদের দেখিয়ে দিতাম!

তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।—বলে' বিমলা সেখান থেকে সরে' যায়।

শুচিবায়ুগ্রস্ত নারীটির কয়েকটি জঘন্য আচার বাড়ীটিকে সর্ব্বদা একটি দুষ্ট আবহাওয়ায় ভরিয়ে রেখেছে। সমস্ত ঘরগুলির দেয়ালে প্রায় দুহাত উঁচু করে' গোবর লেপে দেওয়া,—সেখানে মাছি ভন্‌ভন্‌ করে, পোকায় বাসা বাঁধে, কাঁকড়া বিছা বেরোয়, আবার দুর্গন্ধেও টেঁকা যায় না। ধোপাকে কাপড় কাচ্‌তে দেওয়া হয় না, কারণ ছোট জাতের ঘর থেকে কাপড় ফিরে এলে তার নাকি জাত যায়। টাকা পয়সা সরোজিনীকে কোনো দিন ছুঁতে দেখা যায়নি,—ওগুলো নাকি অনেকের নোংরা হাত ঘুরে আসে। বাজারের তরীতরকারীগুলি প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নিজে হাতে ধুয়ে আনা চাই; পথে কেউ হঠাৎ ছুঁয়ে ফেললেই—বাস্‌, সব ফেলে দিয়ে আস্‌তে হবে! বাড়ীর ভেতরে আর বাইরে সমস্ত নোংরা স্থানগুলি সে নিজেই মুক্ত করে, কারণ রান্নাঘরের সংশ্লিষ্ট নর্দ্দমায় ঝাড়ুদারের হাত পড়লেই ত একেবারে ধর্ম্মনাশ!

অতি পরিচ্ছন্নতার বাহুল্যে ঘর দোর দিবারাত্র কেমন যেন শ্রীহীন হয়ে থাকে। এখানে সেখানে শ্যাওলা পড়া; ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে থাকে; কেঁচোয় মাটী তোলে; আরশোলায় ডিম পাড়ে। জিনিসপত্রগুলি জলে ধুয়ে ধুয়ে এক পুরু ছ্যাৎলা পড়ে' আছে। বিছানাগুলি কোনো দিন রোদে পড়ে না—কি জানি পাখ্‌পক্ষীতে যদি নষ্ট করে' দেয়! ঘরগুলির একটা ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধে তার ত্রিসীমানায় আসবার উপায় নেই। কোনো সহজ সুস্থ মানুষের পক্ষে এ বাড়ীতে বাস করা কঠিন।

বিমলার নীচে সরোজিনীর সবশুদ্ধ তিনটি সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে। এই কিছুদিন আগে যেটি মারা গেল সেটি সাত-আট বছরের একটি দুরন্ত ছেলে। ছুটে ছুটে বেড়াতো. হাঁক্‌-দৈ মান্‌তো না। দিনে অন্তত পাঁচবার সরোজিনী তাকে কল্‌তলায় নিয়ে গিয়ে কেচে আন্‌তো।—ম্যালেরিয়া হল! জ্বর ছাড়ে আর সরোজিনী তাকে চান্‌ করায়—কারণ সে ডাক্তারের ওষুধ খেয়েছে। আবার রোগে পড়ে।

এমনি করে' সেই কঙ্কালসার ছেলেটি একদিন নিঃশব্দে স্থির হয়ে গেল।

স্বামীটি জীবন-বীমার আফিসে চাকরি করেন। অতিরিক্ত বৈষয়িক লোক। মাঝে মাঝে আসেন আবার টাকার গন্ধ পেয়েই চলে' যান্। দেশে দেশে ঘোরাই তাঁর কাজ।

আহারের সময় সরোজিনীকে দুনিয়ার লোকে দেখতে পায় না। কেন না, সে অতি লজ্জার কথা; সেই অবস্থাতেই এঁটো হাতে সে মাটীতে শুয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটায়; দরজাটা ভেজানোই থাকে। সন্ধ্যার আহার শেষ করে' তবে সে ঘর থেকে বেরোয়।

বিমলা মাঝে মাঝে অত্যন্ত রেগে ওঠে। বলে—মরবে তুমি, এ তোমার রোগ; এই রোগেতেই তুমি মরবে তা বলে দিচ্ছি। তবু যদি না হাত-পায়ে হাজা ধরে' পোকা পড়তো, তা হলেও বুঝতাম! জল ঘাঁটা না ছাড়লে হাজার ওষুধ দিলেও তোমার হাত-পা ভাল হবে না। ওই পোকা পড়া হাতে খাও, পূজো কর—লজ্জা হয় না? বেঁচে থাকতেই তোমার নরক ভোগ হয়ে যাচ্ছে আর কি!

আ মর্!—বলে' একটু হেসে মুখে গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে সরোজিনী আহ্নিক করতে বসে।

এমনিই; এর কোনো মানে নেই। এই শুচিবায়ুগ্রস্ত মন তার আগেও ছিল না, ভবিষ্যতে থাকবে কি না কে জানে! মনে হয় জামাইয়ের মৃত্যুর সেই নিদারুণ শোকটা তার মনকে পঙ্গু করে' কতকগুলি অন্ধ কুসংস্কারের মধ্যে গলা টিপে মেরেছে।

কিন্তু সেই শোকটাকে আড়াল করে' দাঁড়াতে পারে এমন কিছুই নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-হীনা মাতার বুকখানি ক্রমশঃ উদ্বেল হয়ে ওঠে। সঙ্গীহীনা নিঃসম্বল কন্যাটির দিকে চেয়ে মায়ের চোখে জল গড়িয়ে আসে। মেয়ের সারাজীবন কাটবে কেমন করে! প্রতিদিনের দীর্ঘ নিদ্রাহীন রাত্রিই বা কাটে কি নিয়ে।

আঃ বাবারে বাবা—বিমলা বলে—আমাকে শুদ্ধ পাগল কল্লে! অমন করে' হাই-হুতোশ কল্লে কোথায় যাই বল ত? সব মানুষই কি বুড়ো হয়ে মরে?

রাত্রে বিমলা যখন নিজের জীর্ণ শয্যাটির ওপর শুয়ে থাকে, সরোজিনী আলো হাতে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে হেঁট হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। দেখে—মুখের রেখার কোনো অদল-বদল হয়নি, বেদনার কোনো চিহ্ন সে মুখে নেই! সে যেন একখানি ছবি; হঠাৎ তাকে বুঝতে পারা একটু কঠিন।

মায়ের দুটি চোখ মেয়ের মুখের দিকে স্থির নিবদ্ধ হয়ে থাকে। হে ভগবান, কোলে তার একটি ছেলেও নেই? কি আশা নিয়ে সে থাকবে? কি সান্ত্বনা নিয়ে?

শিয়রের ক্ষীণ প্রদীপশিখাটি তাকে যেন ঘুম পাড়িয়ে রেখে বিদায় নিয়েছে! বালিশের পাশে একটি শুকনো অপরাজিতা ফুল, একগাছি পুঁথির মালা, একটি কলাপাতা মোড়া বাঁশী—এমনি কয়েকটা আজে বাজে জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে! পায়ের কাছে কেবল এক শিশি লাল কালি, একটা খাঁকের কলম আর একখানা হিজিবিজি কাটা কাগজের টুক্রো।

সরোজিনী আস্তে আস্তে আবার এ ঘরে আসে। খোলা জানলার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার গা'টা যেন ছম্ ছম্ করে' ওঠে। স্পষ্ট চেয়ে দেখে একটা যেন মানুষের ছায়া,—যেন সেই জামাইয়ের মুখ! তার পর যেন একটু করুণ হেসে সে ছায়া সরে' যায়।

মনে মনে সরোজিনী বলে—জামাই হয়ে তুমি চলে গেছ, ছেলে হয়ে আবার কোলে এস। তোমাকে আমি বুকে করে' মানুষ করবো বাবা। হে ঠাকুর!

বিছানায় শুয়ে সরোজিনী সারা রাত এই নিয়ে ভাবে। হঠাৎ কখন্ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সে স্বপ্ন দেখে, জামাই বলছে—'তোমাকে মা বলে ডাক্তে আমার ভারি ইচ্ছে করে!'

পাড়ার দু'একটি মেয়ে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন। খাওয়া-দাওয়ার পর ওবাড়ীর ভৈরবী দিদিও একবার ঢুঁ মেরে যান্। অত্যন্ত সন্তর্পণে একটি পাশে এসে বসে পড়ে' বলেন—আজ তোদের কি রান্না হল রে বিম্লি?—ও কি লা, পান খাওয়া আবার ছাড়্লি কবে? মুখখানা যে ফ্যাক ফ্যাক্ করে!

বিমলা বলে—মিথ্যে খরচ বাড়াবার কি দরকার?—তার পর হঠাৎ ভৈরবী দিদির মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠে বলে—তোমার বুঝি খেতে ইচ্ছে হয়েছে?

আমার? আরে রাম বল! খেতে ইচ্ছে আমার

কিছুতেই নেই, তবে যদি জোর করে' কেউ দেয়,—আর শুন্‌লি ওবাড়ীর হরর-মার কথা? এসেছে যে! শ্বশুর বাড়ীতে উপোস দিয়ে আর কদ্দিন থাকা যায় মা? তা ছাড়া—

হঠাৎ গলা নামিয়ে চুপি চুপি ভৈরবী দিদি এমন কতকগুলি কথা বলতে সুরু করে' দেন্ যে সেগুলি কোনো তরুণী বিধবার পক্ষে না শুনলেও চলে। অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কতটুকু বাদ দিয়ে কতটুকু বলা উচিত সে জ্ঞান সকল প্রবীণা স্ত্রীলোকের থাকে না। ভৈরবী দিদিরও নেই। ওবাড়ীর হরর-মা আর তার স্বামীকে নিয়ে হেসে হেসে তিনি যে আলোচনা এবং সরস রসিকতা সুরু করে' দিলেন, তাতে বিমলার মুখ চোখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি উঠে যাবার সময় বলে' গেল—তুমি যে কি বল ভৈরবী দিদি তার ঠিক নেই। যত সব আজগুবি কথা তোমার!

মাইরি ভাই, এই তোর গা ছুঁয়ে বল্‌ছি।—হেসে লুটোপুটি খেয়ে ভৈরবী দিদি বললেন—আজ তবে আসি ভাই।

যাচ্ছ? বাঁচ্‌লাম!

কথাটা শুনেই হঠাৎ ভৈরবী গম্ভীর হয়ে গেলেন। দরজার কাছে গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে বললেন—বিধবা হলি তবু হাড়-জ্বালানে কথাগুলো তোর গেল না বিম্‌লি!

কি ভাগ্যি যে সরোজিনী সেখানে ছিল না।

দেখতে দেখতে আবার বছর ঘুরে আসে। কর্ত্তা বারকয়েক এসেছিলেন; আবার কাজ নিয়ে চলে গেছেন।

মায়ের শরীর তেমন ভাল নেই। মুখে অরুচি; পরিশ্রম করতে গেলে বুকে হাঁপ লাগে। ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে বিমলা বলে—শুচিবাই একটু কমাও মা, ওই তোমার যত নষ্টের গোড়া।

সরোজিনী কন্যার কাছে লজ্জিত হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বলে—তা নয় বাছা, কপাল আমার আবার পুড়েছে।

কথাটা আর এগোয় না।

গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে। পুকুরের ওপারে বাঁশঝাড়ের মাথায় কালো কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। নারকেল গাছের সড়সড়ে হাওয়ায় পুকুরের জল শিউরে শিউরে কাঁপতে থাকে। মেঘের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দূর মাঠের পথে গরু-বাছুরগুলো ল্যাজ তুলে ছুটোছুটি করে। নিম আর কলাগাছের মাথায় মেঘের ছায়া নেমে আসে।

মা বলে—সকাল সকাল কাপড় কেচে আয় মা। বিষ্টি নামলে আর ঘাটে যেতে পারবি নে।

গামছাখানি হাতে করে' নিয়ে বিমলা বাইরে এসে দাঁড়ায়। সরকারদের বাগানে দেবদারু গাছের মাথায় মেঘের পানে চোখ তুলে হঠাৎ তার চোখ দুটো যেন জ্বালা করে' ওঠে। আজকের এই কর্ম্মহীন সজল সন্ধ্যা তার ঠিক কেমন করে' কাটবে তা সে বেশ জানে! ঘরের জান্‌লাটি খোলা থাকবে—জলে-ভেজা হাওয়া মুখে চোখে এসে লাগবে; একটি পিদিম জ্বল্‌বে; মাথা আর মুখের ছায়া পড়বে দেয়ালের গায়ে; সে তখন পড়বে 'সতীনাটক'! এই কিছুদিন আগে সরোজিনী তাকে বইখানি কিনে দিয়েছে!

বুকের ভেতরটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। এই উদার নব-বর্ষার মাঝখানে তার কি কোন ঠাঁই নেই? এই ঝড়, এই বৃষ্টি, এই অন্ধকার, এই মেঘ-মেদুর আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ সে যদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে—তাতে এমন কি অপরাধ! কি অপরাধ, যদি চুপি চুপি সে একটিবার বলে—আমার কোনো দোষ নেই!

ঝম্ ঝম্ করে' ততক্ষণে বৃষ্টি নেমে আসে। নারিকেল গাছগুলি দুলে' দুলে' ভিজ্‌তে থাকে। বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

ধীরে ধীরে বিমলা নেমে যায়। তুলসীমঞ্চের ওপর একটুখানি বসে; ইচ্ছা করে সমস্ত দেহখানি দিয়ে এই নববর্ষাকে সে একান্ত আপনার করে' নেয়।

প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সে আবার উঠে দাঁড়ায়। আজকে শান্ত স্থির হয়ে থাকবার দিন যেন নয়। সমস্ত মনের এপার ওপার যেন আকুল হয়ে উঠেছে। খিড়কির দরজার কাছে এসে সে একবার দাঁড়ালো। উতলা বুকের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে কে যেন পদধ্বনি করে' চলেছে। চকিত দৃষ্টিতে সে ঘন ঘন বাইরের দিকে তাকাতে লাগলো।

নারীর সেই চিরন্তন কামনা, স্ত্রীজাতির সেই পরম পরিচয়, চিরদিনের সেই অভিসারের অভিলাষ, অন্তর-অরণ্যে সেই

সুগম্ভীর কেকাধ্বনি, সেই চারু কদম্বমূলের সঙ্কেত, সেই ছিন্ন-মালিকার মোহ, আর কুঞ্জবনের নিশি-জাগরণ—সব একাকার হয়ে বিমলাকে সুমুখের দিকে ঠেলে দিল!

ভীরু ত্রস্তপদে কয়েক পা গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে' সে দাঁড়ালো। কোথায় যাবে সে? পথ ত তার জানা নেই! কতটুকু শক্তি তার!

অদূরে ভৈরবীদিদির বোনপো ছাতিটি মাথায় দিয়ে এদিকে আসছিল। হঠাৎ চোখ নামিয়ে তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি পিছনের পথ ধরে' বিমলা পুকুরের দিকে চলে' গেল।

ঘাটে নেমে কাপড় কাচ্‌তে কাচ্‌তে তার মনে হলো, ছি ছি, এ কোথায় চলেছিল সে! সংসারে এ মনোবিকারের মূল্য কি?

ঘরে উঠে আসতে সরোজিনী বলল—এত ডাক্‌ছি, কোথায় ছিলি রে?

একটু হেসে বিমলা বল্‌লে—ডুব সাঁতার কাট্‌ছিলাম মা।

মা বল্‌ল—মরবার ভয় নেই?

বিমলা আবার হাসলো। হেসে বল্‌ল—সেই জন্যেই ত পালিয়ে এলাম!

এমনি করেই আবার দিন চল্‌তে থাকে।

সরোজিনী বলে—ছুটে ছুটে বেড়াতিস, এখন যে বড় এক যায়গায় বসলে আর নড়তে চাসনে?

বিমলা বলে—মা যেন কি! মেয়ে মানুষের ছুটে বেড়িয়ে কি লাভ?

তা বটে! সরোজিনী আস্তে আস্তে চলে' যায়। জামাইটিকে নিষ্করুণ ভাবে মনে পড়ে। সে থাকলে হয় ত নিশ্চয় এতদিনে বিমলার কোলে একটি ছেলে হতো! তাকে নিয়ে একটু উদ্বেগ, একটু আনন্দ নিশ্চয় ঘট্‌তো। তাকে নিয়ে ছুটে বেড়িয়েও লাভ ছিল,—এই কর্ম্মহীন পীড়াদায়ক অবসরের মধ্যে বসে ছট্‌ফট্ করতে হতো না!

শরৎকাল শেষ হয়ে যায়। নীল আকাশ, সাদা মেঘ ও রোদ-বৃষ্টিতে মিশে রামধনুর খেলা আর বিশেষ কারো নজরে পড়ে না। কাশের বন ঈষৎ মলিন হয়ে গেছে, কলা পাতার ওপর এখন শিশির পড়ে, শিউলির গন্ধে এখন আর সে নেশা নেই। শুধু কেবল ভরা নদীর ওপর দিয়ে বহু দূরে হাঁসের দল উড়ে চলেছে—এখনো দেখা যায়।

সরোজিনীর দিন আসন্ন হয়ে আসে। পরিশ্রম করবার অক্ষমতায় শুচিবাই আজকাল তেমন আর প্রখর নয়। বিমলা বলে—তোমার মেয়ে হলে এবার কি নাম রাখবো জানো মা? রাধা!

অকস্মাৎ মরা জামাই যেন চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ায়। সরোজিনী বলে—পোড়ারমুখি! মেয়ে কেন হবে?

বেশ ত, ছেলে হলে নাম রাখবো—শ্যামল!

হঠাৎ সরোজিনীর চোখে জল আসে। বলে—সে ছেলে তোকেই দেবো বিম্‌লি, তুই নিস্ তাকে, তোর কোলেই মানুষ হবে। আমার আর দরকার নেই!

বিমলা হেসে বলে—তুমি ত বেশ লোক মা? আমি বেচারা এক পাশে পড়ে' আছি, আমাকে দিয়ে ছেলে মানুষ করাবে? কত মাইনে দেবে শুনি?

সরোজিনীও হেসে বলে—আ মরণ! আগের জন্মে তুই নিশ্চয় ঝি ছিলি!

বিমলা খিল্ খিল্ করে' হেসে ওঠে। বলে—এ জন্মেও তাই।

বিধবার দিন কেমন করে' কাটে তা সবাই জানে। অবারিত অবসরের মধ্যে আনন্দহীন মন চিরকালের জন্যে ছুটি পেয়ে গেছে। প্রতিদিনের শুধু একই চিন্তা—আর কতখানি পথ বাকি! এই না?

সরোজিনী বলে—চিঠিও লিখিস্‌নে, বই থেকে পদ্যও টুকিস্‌নে—তবে কাগজ-কলম নিয়ে কি হিজিবিজি করিস্?

বিমলা বলে—ছাই! কী আবার! বসে' থাকার চেয়ে ব্যাগার খাটাও ভাল!

মাথা আর মুণ্ডু!—সরোজিনী বলে—ওই তোর ঘরে একখানা কাগজ পড়েছিল দেখছিলাম; কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে, আন্দাজ কচ্ছিলাম পুরুষ মানুষের ছবি এঁকে-চিস। না?

ঢোঁক গিলে বিমলা বল্‌ল—ছবি? পুরুষ মানুষের? কি যে বল তুমি মা তার ঠিক নেই!—বলতে বলতে উঠে তাড়াতাড়ি সে আড়ালে চলে' গেল।

সরোজিনীর দিন সত্যিই আসন্ন হয়ে আসে। এবং সেই আসন্নতার সঙ্গে একটা যেন উদ্বেগের ছায়া ক্রমশ ভীতিজনক

হয়ে ওঠে। নির্জ্জন দুপুরের নিঃশব্দতায় হঠাৎ ওধার থেকে যেন কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার আলো জ্বলতেই কে যেন কোথা থেকে এসে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দেয়—কিছুই বোঝা যায় না। একদিন তুলসীমঞ্চের ওপর দেখা গেল, জামাই এসে যেন বসে রয়েছে·····

আর একটু হলেই সরোজিনী সেখানে ফিট্ হয়ে পড়ে' যেত। রাতের বেলায় জ্যোৎস্নার আলোয় ছাদের পাঁচিলের ওপর কে চলাফেরা করে—এ ত' প্রায় নিত্যই দেখা যায়। খড়মের শব্দ ত নিতান্তই অভ্যস্ত ঘটনা! সরোজিনীর মনে হয়, এ সেই জামাইয়েরই ছলনা! বেচারার না হয়েছে শ্রাদ্ধ, না হয়েছে বা গয়ায় পিণ্ডদান!

আহা থাক্, বাছারে, আর পিণ্ডি নয়! সে ফিরে আসচে!—সরোজিনী বলে—ওসব কিছু না; ভয় অমন একটু আধটু এ সময়ে হয়েই থাকে। এ যা হচ্ছে এ ত' আর সহজ ব্যাপার নয়।

বিমলা হেসে বলে—বাঁচলাম! শুচিবাই ছেড়ে যে তোমার ভূতের বাই ধরেছে, এ বরং ভাল। এতে হাজা ধরে না,—আনন্দও আছে।

মধ্যরাত্রে সত্যিই সরোজিনার ঘুম ছাঁৎ করে ভেঙে যায়। একটি অদৃশ্য পুরুষ তার চারিদিকে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কি যেন একটা কথা তার বলবার আছে। কোনো দিন গভীর ঘুমের ঘোরে স্বপনে দেখা দিয়ে যায়। বলে—মা আমিই তোমারই কাছে যাবো।

সকাল বেলা হতেই পূজা-অর্চ্চনা সুরু হয়। নানা দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করতে গেলে এগুলো চাই। গ্রহের কোপ-দৃষ্টি ভাল নয়। এবারের ছেলে যেন বাঁচে!

মায়ের মনোভাব বিমলা কি আর বুঝতে পারে না। লজ্জায় সময় সময় মায়ের কাছেই সে মুখ লুকিয়ে বেড়ায়।

মা বলে—ওই ডুরে কাপড়খানা আছে, ওখানা দিয়ে ভাল কাঁথা একখানা সেলাই করিস। আর নতুন ধোয়া কাপড় আনাবো তাতে ছোট ছেলের পা-জামা হবে!

ভাবী পুত্রটির জন্য ঝুমঝুমি আসে, কাঁচকড়ার একটা বড় পুতুল আসে। বিমলা বলে—তিন চাকার একখানি গাড়ী তাকে কিনে দিও মা, পুরুষ মানুষের গাড়ী চড়বার সখ বড্ড বেশি।

সরোজিনী বলে—তা ত' দিতেই হবে। ওসব তুই ব্যবস্থা করিস বাছা, ছেলে তোরই হবে—আমি শুধু পেটে ধরবো বৈ ত নয়!

বিমলা হাসতে হাসতে উঠে যাবার সময় বলে' যায়—সোণার পাথর বাটি!

আড়ালে গিয়ে চুপ করে' সে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে ভাবে, সেই অদৃশ্য পুরুষটির শব্দ সাড়া কিম্বা দর্শন সে ত' কই কোনো দিন মুহূর্ত্তের জন্যও পায় নাই। সেই নির্ম্মম কঠিন আত্মীয়স্বজনহীন জীবনের বন্ধুটি! রোগে দুঃখে উপবাসে যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হয়ে একাকী গভীর অরণ্যের মধ্যে সেই যে প্রাণত্যাগ করেছে—স্ত্রীর সঙ্গে মুহূর্ত্তের সম্বন্ধও কি তার ছিল না? স্বামী হয়ে যে রইল না—অন্যের উদরজাত সন্তান হয়ে সে কোলে থাকবে—এ অপমান সে সইবে কেমন করে'? সে যে শুধু একটি সন্তান চায়, কেবলমাত্র একটি ছেলে মানুষ করতে চায়—এত বড় মিথ্যা কথা কে আজ প্রচার করতে সুরু করেছে?

মা বলে—হাসচিস যে অত করে?

বিমলা বলে—ভূত হয়ে জঙ্গল থেকে আসতে গেলে রেল ভাড়া ত আর লাগে না, তাই তুমি অত ঘন ঘন দেখা পাচ্ছ!

সরোজিনী একটু রেগে উঠে বলে—দিন দিন বড় হচ্ছিস, হিঁদুয়ানী তোর যাচ্ছে কোথায়?

কিন্তু তিরস্কার করতে গিয়ে কন্যার দিকে ভাল করে' তাকিয়ে মায়ের মুখে আর কথা ফোটে না। মাথায় তেল নেই, সীঁথি মুছে গেছে, শুক্‌নো চুলে জট্ পড়েছে। শীতের হাওয়ায় গালের চামড়া শুকিয়ে উঠেছে, ঠোঁট ফেটে দুই কোণে ঘা ফুটেছে। সংসারের কাজ করে' হাত দুখানি একেবারে শ্রীহীন—সেদিন ঘাটের ধারে আছাড় খেয়ে বাঁ-হাতের ঘাখানি আজও শুকোয়নি। পায়ের গোড়ালি ফেটে গিয়ে রক্ত জমে' আছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। ছেঁড়া কাপড়খানি এত ময়লা যে আর পরা চলে না।

মৃত সত্যবানের প্রাণভিক্ষার জন্য সাবিত্রী যেন ক্ষত বিক্ষত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে!

ম্লান হেসে বিমলা বল্‌ল—ঝির মতনই চেহারা হয়েছে, না মা?

মা নিঃশব্দে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীটির সেই একই কথা—শ্যামল

আসছে! শ্যামল আসছে রথে, হাতীর হাওদায়, সোনার নৌকায়—শ্যামল আসছে পক্ষীরাজের পিঠে।

নিরুপায় একটি তরুণীর অবলম্বন স্বরূপ শিশুর রূপে দেবতা আসছেন স্বর্গচ্যুত হয়ে।

আর রাত্রে সরোজিনীর সেই আদিকালের স্বপ্ন!—সেই শ্বেত হস্তী উদরে প্রবেশ করছে!

মা বলে—রাতে দরজা দিয়ে ঘুমোবি মা! কি জানি যদি ভয়-টয় দেখে···এ বাড়ীতে যে রকম ভয় হয়েছে—

বাড়ীতে হয়নি; হয়েছে তোমার ওপর!—বিমলা বলে।

সেই কথাই ত বল্‌ছি; ও একই কথা!

রাত্রে প্রতিদিন বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বিমলার মাথার মধ্যে নানা খেয়াল চেপে বসে। পা টিপে টিপে চোরের মতন ভেতরের দিকে দরজায় কাণ পেতে শোনে, মায়ের আর কোনো সাড়া শব্দ নেই! একটু হেসে সে তখন ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। রাত ঘন গভীর। বাগানের জান্‌লা দিয়ে একটু একটু হাওয়া আসতে থাকে। পিদিমটা ভাল করে' উস্কে শিখাটা উজ্জ্বল ক'রে তোলে। তার পর কুলুঙ্গি থেকে চাবি নিয়ে খুট্‌ করে' নিজের তোরঙ্গর ডালাটি খুলে ফেলে।

সে যেন চোর! অপরাধীর মত বুকের ভেতরটা তার ধক্ ধক্ করে।

ফুলশয্যার সেই শাড়ীখানি, রেশমের ব্লাউসটি, গায়ে-হলুদের সেই প্রসাধন-আসবাবগুলি, স্বামীর উপহার দেওয়া কাণের দুটি দুল, ননদের মুখ-দেখানি সোনার নোয়া,—সমস্তগুলি সে একে একে বা'র করে' আনে।

তার পর দুল পরে, রুলি নোয়া পরে, ব্লাউস গায়ে দেয়, শাড়ী ঘুরিয়ে পরে; আয়নাটি সুমুখে রেখে চুল বাঁধে, শিশি থেকে আল্‌তা নিয়ে পায়ে লাগায়, ছোট্ট রাঙা একটি কৌটো খুলে কম্পিত হস্তে সিঁদুরের টিপ্ নিয়ে সীঁথির ওপর টেনে দেয়।

প্রথম শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশ থেকে এতটুকু মৃদু জ্যোৎস্না জান্‌লার ধারে এসে পড়ে।

নিজের হাতে আঁকা সেই অস্পষ্ট বিকৃত স্বামীর ছবিটি সে ডান দিকে বিছানার ওপর রাখে, আর কোলের ওপর রাখে কাঁচ্‌কড়ার সেই নূতন খোকা পুতুলটি! তার পর সুমুখে পেরেকের গায়ে আয়নাটি ঝুলিয়ে রেখে সে নিঃশব্দে বসে' থাকে। সে যেন সদ্য-বিবাহিতা; বিধবা বলে' আর তাকে কিছুতেই চেনা যায় না।

তার মুখের মধ্যে কে যেন হেসে ওঠে। কিন্তু চোখে তার সুতীক্ষ্ণ কৌতুক কিম্বা সুনিবিড় বেদনা—কোন্‌টা ফুটে আছে, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

তার পর আয়নার মধ্যে নিজের দুটি চোখ আর নজরে পড়ে না। চোখের জল ফেটে পড়ে' সব একাকার হয়ে যায়।

পরদিন পায়ে শুধু আল্‌তার অস্পষ্ট দাগটুকুই নজরে পড়ে।

মা বলে—ও কি রে?

বিমলা বলে—লাল কালি লাগিয়েছি মা; পায়ের ঘা ওতে একটু ভাল থাকে।

নাস্তিক আর কাকে বলে! বিশ্বাস করলে বস্তু মেলে—হিঁদুঘরের মেয়ে হয়ে এই চল্‌তি কথাটাও মেনে চলে না। এই মেয়েরাই দুঃখ পায়।

আমি তেমন মেয়ে নই—বিমলা বলে আজকাল আমি সব বিশ্বাস করি। এই সেদিন রাতে চুপ করে শুয়ে আছি, এমন সময়,—ও কি, ওদিকে অমন করে' তাকাচ্ছ কেন?

দুটো ঠোঁট সরোজিনীর একবার কেঁপে উঠলো। বড় বড় চোখে চুপি চুপি বল্‌ল—কে যেন দাঁড়িয়েছিল!

চোর বুঝি?

হঠাৎ রেগে উঠে সরোজিনী বলে—তোর এক কথা! চোর হতে যাবে কেন?

বিমলার মুখে হাসি এসে আবার ফিরে গেল। বল্‌ল—দিন-দুপুরে যদি কেউ এসে দাঁড়ায় ত সে চোর ডাকাত ছাড়া আর কিছুই নয় মা। সে যে আত্মীয়-ভূত বলে ভক্তি করবো তা পারবো না। গায়ের জোরে পুরুষ মানুষের চেয়ে কম নই! হয় লাঠি না হয় বঁটি হাতে নেবো, তা বলে দিচ্ছি।

অদৃশ্য সেই পুরুষটিকে স্মরণ করে' সরোজিনী বল্‌ল—ছি ছি, বিম্‌লি, তোর জ্ঞান আর হলো না দেখছি।

আচ্ছা এবার জ্ঞান হবে, দাঁড়াও।—

তার পর দিন বিমলা বল্‌ল—কাল রাতে কে আমার দরজার কড়া নাড়ছিল মা, মাইরি বলছি।

অকস্মাৎ সরোজিনী মুখ ফিরিয়ে বল্‌ল—ওই দ্যাখ,

আমি বলেছিলুম! এ ত' মিথ্যে হবার নয়, আমি যে জানি!

স্বামী হয়ে স্ত্রীর কথা কি আর কেউ জানে?

রাতের বেলা অন্ধকারে সেদিন হঠাৎ বিমলা অস্ফুট চীৎকার করে' উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সরোজিনী তার হাত চেপে ধরে' বল্‌ল—ভয় পেলি বুঝি? কার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকিয়েছিলি?

বিমলা বল্‌ল—সেই যে সে!

কে?

সেই জঙ্গলে যে মরে গেছে, সে!

ভয়ে ভয়ে মা ও মেয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌লো। অন্ধকারে বিমলার মুখখানা ভাল করে' দেখা গেল না! তাহলে বোঝা যেত', লজ্জা আর হাসি সে-মুখে এক সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু সে রাত আর কাটলো না। ভয়ের আঘাতে সরোজিনীর পেটের মধ্যে ব্যথা ধরেছিল। সে ব্যথায় আকাশ থেকে তারা খসে' পড়ে।

ধীরে ধীরে সরোজিনীর কাৎরানি বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো। আগে থেকে সমস্ত ব্যবস্থাই প্রস্তুত ছিল। দাই ডাক্‌তে বিমলাকে কষ্ট পেতে হল না।

সরকারি ভৈরবী দিদিও অনুগ্রহ করে' এলেন।

রাত্রি শেষে একটি অপরিচিত অতিথির সদ্যোজাত নবীন কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বিমলা কাঠ হয়ে বাইরে বসে' ছিল। দাই ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো—উলু দাও গো, উলু দাও—ছেলে হয়েছে!

বুকের সমস্ত রক্ত অকস্মাৎ যেন তোলপাড় করে' উঠলো। লাফিয়ে উঠে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিমলা বল্‌ল—অ্যাঁ, ছেলে হয়েছে জীবুর মা?

ছেলে হয়েছে, এই কথাই বলতে হয় ভাই। এ আমাদের নিয়ম!

ভৈরবী দিদি বললেন—তা হোক বাছা, বেশ হয়েছে। মেয়ে কি আর মানুষ নয়? এই ত বিম্‌লির মেজ মাসী পোয়াতি, ছেলে হলে বিম্‌লিই গিয়ে তাকে মানুষ করবে। আহা, ছোট বিধবা মেয়ে, পরের ছেলে যদি মানুষ করতে পায় ত বাঁচে!

শ্যামল নয়—রাধা!

শ্যামল গেছে মামার বাড়ী!

চাই শিক্ষা—চাই স্বাস্থ্য

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্

এ দেশে একটি প্রবচন প্রচলিত আছে,—"ভাগের-মা গঙ্গা পায় না।" ইংরাজদের আমলে, প্রায় সকল কাযই এমন-ভাবে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া গিয়াছে, যে প্রত্যেক কায ও তাহার কর্ম্মকর্ত্তা যেন এক একটি স্বতন্ত্র রাট্ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। যিনি শিক্ষক, তিনি মনে করেন যে, ছাত্রদিগের মানসিক রসদ যোগান ছাড়া, ইহজগতে তাঁহার আর কর্ত্তব্য নাই। যিনি চিকিৎসক, তিনি মনে করেন যে, লোকরা ব্যারামে যতক্ষণ না পড়ে, ততক্ষণ সমাজের মধ্যে তাঁহার কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব কিছুই নাই। কর্ম্মগুলি এই রকমে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, রাজকার্য্যের নিত্য পরিচালনায় রাজার সুবিধা হইলেও, প্রজার দিক হইতে দেখিলে, আদৌ কল্যাণকর নহে; এইজন্য প্রজার তরফ হইতে রাজকার্য্যের ব্যবস্থার প্রতি red-tape, লেফাফা বা কেতা দোরস্ত প্রভৃতি ব্যঙ্গবাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। আর, এই বিচ্ছিন্নতার ফলে, সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবার পূর্ণ অবকাশ লোপ পাইয়াছে—ভাগের মার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিতেছে না।

সমাজটাকে একটা অখণ্ড প্রতিষ্ঠান মনে না করিলে, সমাজের কল্যাণ সাধন করা সুবিধাজনক হয় না। চোখ কাণ বুজিয়া, সোজা বাঁধা-রাস্তা ধরিয়া চলিলে, হয় ত চিকিৎসক রোগীদিগের চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা করিবার সুযোগ পান; কিন্তু সেই চিকিৎসক একটু চোখ কাণকে সজাগ রাখিলে অন্য রকমে বা দিকে সমাজের আরো কল্যাণ

সাধন করিতে পারেন। শিক্ষকও হয় ত ইতিহাস-সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া ইতিহাস অধ্যাপনার সুবিধা করিয়া লইতে পারেন; কিন্তু সেই শিক্ষক মাঝে মাঝে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাইলে, লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া, হয় ত সমাজের পরোক্ষেও অন্যান্য বিষয়ে উপকার সাধন করিতে পারেন। বস্তুতঃ, এই দেহ রক্ষা করিবার অজুহাতে রসনা নানা রকম রসাস্বাদ রূপ সুখ ভোগ করিবার জন্য, হস্ত-পদাদিকে নানা রকম ক্লেশ দিলেও পরস্পর অন্যোন্য-সাপেক্ষ না হইলে, তাবৎ দেহের কল্যাণ সাধন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সামান্য ঘড়ী হইতে দেহযন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পর্য্যন্ত—প্রত্যেকটির প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অপরাংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে কায না করিলে সকলই বিকল হইয়া যায়।

আমাদেরও হইয়াছে তাই। নামে মাত্র এখন হিন্দুদের সমাজ আছে—সমাজ আছে সুধু দলাদলি করিবার বেলায়। আসলে, কিন্তু, আমাদের সমাজ নাই। "ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ," "ব্রাহ্ম-সমাজ," "ধনীদের সমাজ," "চাকুরিয়াদের সমাজ," "গোঁড়া বামুনদের সমাজ" প্রভৃতি সুবিধাবাদ-মতে-সঞ্জাত "সমাজ" এখানে গড়িতেছে, ওখানে ভাঙ্গিতেছে। কাযেই, বিরাট হিন্দু-সমাজ-রূপ মহাসাগর এখন ছোট-ছোট অসংখ্য ডোবার আকারে পরিণত হইয়াছে। এই পরিণতির কারণ কি? এই পরিণতির নানা কারণ; তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই কয়েকটি—

(১) নগদ পয়সার মাহাত্ম্য—বর্ত্তমান যুগে, Ready money is Aladin's lamp এ কথা বুঝাইবার জন্য সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। যাহার হাতে নগদ পয়সা আসিয়া পড়িতেছে, সেই ভুঁইফোড় নেতা সাজিয়া, নিজ-নিজ দল পুষ্ট করিতেছে।

(২) ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষার গোঁড়ামি—যাহার ফলে, নকল সাহেবীয়ানার উৎকট সংস্করণ গজাইয়া উঠিতেছে।

(৩) স্বার্থ-সংরক্ষণ—যথা, বিলাত-ফেরতের দল। যাঁহারা বিলাত ঘুরিয়া আসেন, তাঁহারা এ দেশে শিক্ষিতদিগকে ঠেলিয়া রাখিয়া, সময়ে-অসময়ে নিজ দলের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রায়ই সংঘবদ্ধ ভাবে কায করেন।

(৪) ধর্ম্মান্ধতা—অথবা আচার-নিষ্ঠা? "ধর্ম্মং যো বাধতে ন চ ধর্ম্মং অধর্ম্মং হি তৎ।" বর্ত্তমানে, ধর্ম্মান্ধতার উগ্রতা সকলেই অল্প-বিস্তর ভোগ করিতেছেন।

ফল কথা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, স্বার্থ, অর্থ—যাহা লইয়াই হউক না কেন, দলাদলির মাত্রা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এইরূপে সমাজ ভাঙিতে ভাঙিতে, চরম-ভাঙায় উপস্থিত হইবার আশঙ্কা আছে। এখন, ভাঙা (analysis, বিশ্লেষণ) ছাড়িয়া, গড়ার দিকে (synthesis, সংশ্লেষণ) আমাদিগকে মন দিতেই হইবে। এখন হিন্দুর বিভিন্ন দলকে ত বটেই, পরন্তু হিন্দু ও মুসলমান—উভয়কেই একতালে হৃদয়ের স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এখন হিন্দুর অনিষ্টে মুসলমানের অনিষ্ট, মুসলমানের অনিষ্টে হিন্দুর অনিষ্ট—এ কথা, যত দিন যাইতেছে, ততই যেন হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।

এই ভাঙার দুর্নিবার স্রোতকে রুদ্ধ করিয়া গঠনের দিকে মন দিতে হইবে। গঠনমূলক কার্য্য অতীব দুষ্কর—এক জনের বা এক দলের বা এক জাতির বা ধর্ম্মের সাধ্য নহে। সকলেই হাত ধরাধরি করিয়া, গলাগলি হইয়া, এক যোটে, এক দমে লাগিতে হইবে—তবে যদি সিদ্ধি লাভ হয়। আমি ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়ালীর কায করিতে নামিয়াছি—আমার বিষয় ক্ষুদ্র, সামর্থ্য ততোঽধিক ক্ষুদ্র। আমি স্বয়ং চিকিৎসক এবং আমার স্বর্গগত পিতৃদেব একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষক ছিলেন (৺কৃষ্ণচন্দ্র রায়)। তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্তে শিক্ষা-সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কাযেই, শিক্ষক ও চিকিৎসক, এতদুভয়ের অন্যোন্য সাহায্যে জাতিগঠনের কি সুযোগ আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীগীতার প্রথম কথাই হইতেছে—দুঃখের "অত্যন্ত" অনুভূতি না হইলে, "কায" হয় না। এবং কাযই ভগবানের প্রকৃষ্ট আরাধনা। কাযেই, এ প্রবন্ধ পাঠে তাঁহারাই উপকৃত হইবেন, যাঁহাদের মধ্যে এই "অত্যন্ত" অনুভূতি জাগিয়াছে। এ যাবৎ, এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গলাদেশে, আমরা ঘোর স্বার্থ-পথে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া সুধু দিনগত পাপক্ষয় করিতেই শিখিয়াছি। গৃহকর্ত্তারা নিয়মিত আপিষে যান; ছাত্ররা নিয়মিত পাঠাভাস করেন—পরস্পরের মধ্যে অন্য ধ্যান বা জ্ঞান থাকে না। কাযেই, চাকরীজীবী বা ব্যবহারাজীব বাঙ্গালী অর্থোপার্জ্জন করেন, নিজ-নিজ স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণ করেন এবং দেহান্তে হয় কিছু অর্থ রাখিয়া যান, নতুবা স্ত্রী-পুত্রকেও "ভাসাইয়া" যান।

ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই বর্ত্তমান যুগের পরমার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এটি ঘোর তামসিকতার লক্ষণ—মৃত্যুর অগ্রদূত। ইংরাজরাও নিজ নিজ স্ত্রীপুত্রাদির জন্য অর্থোপার্জ্জন করেন; কিন্তু তাঁহাদের পাড়ায় কোনও নারী ধর্ষিতা হইতে পায় না, তাঁহাদের পাড়ায় কেহই বুভুক্ষিত থাকে না—সারা জাতি পরের অভাব মোচনের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তাঁহাদের এই রাজসিকতা উৎকট ভাবে কখনো কখনো আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হয়। আর আমরা—সকলেই স্বয়ংসিদ্ধ, সকলেই স্বার্থপর, সকলেই স্বল্পবুদ্ধি!!!

বর্ত্তমান সময়ে, আমরা "মা-বাপ" ইংরাজের হস্তে আমাদের শিক্ষার পুরা ভার ও চিকিৎসার কতকটা ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। ফলে, শিক্ষাব্যাপারে আমরা পুরা দস্তর ইংরাজের অনুবর্ত্তিতা ও অধীনতা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু এরূপ করিলে ত চলিবে না। "আমাদের" ছেলেদের শিক্ষার ভার "আমাদিগকে" লইতেই হইবে—নতুবা জুলিয়াস সিজারের বাণী ভারতময় খাটিয়া যাইবে। ব্রিটেন বিজয়ী সিজারকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, "এত অর্থ ও লোকক্ষয় করিয়া যে ব্রিটেন্ জয় করিলে, সে বিজিত দেশকে বশে রাখিবার জন্য তুমি কি করিয়াছ?" তাহার উত্তরে চতুর ও দূরদর্শী সিজার বলিয়াছিলেন—"I have established hundreds of Roman schools there." অর্থাৎ প্রত্যেক ইংরাজকে নকল রোমান বানাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে ইংরাজ আমাদের হাঁড়ীর ভিতরে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তবু এখনো শিক্ষার ভার আমরা নিজ হস্তে লইলাম না। কি করিয়া লইব, পরে বলিতেছি।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যাঁহাদের শারীরিক অথবা মানসিক দীনতার জন্য, অপর কোনও উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহারাই শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হন। আমি এমন কথা বলিতে চাহি না যে, শিক্ষকদিগের মধ্যে মনীষাসম্পন্ন অথবা অনন্য-সাধক নাই;—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের সংখ্যা অতীব সামান্য। যাহা হউক, ...র উপরে এই বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ শিক্ষকই এমন ...ক, যাঁহারা নিজেরাও তেমন কর্ম্মকুশল ন'ন এবং তেমনভাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন না,—বেশীর ভাগ এই কারণেই বর্ত্তমান সময়ে এত ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা। অথচ এমন নির্জ্জীব লোকরাও আজ সংঘবদ্ধ হইয়াছেন। আজ যদিও তাঁহারা দু চার "দলে" বিভক্ত, তথাপি শিক্ষক-সমাজ সংঘবদ্ধ হইয়াছেন—এটি দেশের পক্ষে সুসংবাদ। আশা করি, আমার জীবদ্দশাতেই দলাদলি ছাড়িয়া সমস্ত বাঙ্গালা-দেশের শিক্ষকদিগের মধ্যে গলাগলির ভাব দেখিয়া যাইব—এবং সমগ্র ভারতব্যাপী একটি বিরাট শিক্ষক-সংঘও দেখিয়া যাইব।

এত নির্জ্জীব, এত স্বল্পবেতনভোগী, এত নিগৃহীত শিক্ষকরাও সংঘবদ্ধ হইয়াছেন, আর অভিভাবকরা হইতে পারেন না? Parents' Association—অভিভাবক-সংঘ প্রত্যেক বিদ্যালয় লইয়া গঠিত হওয়া চাই। প্রথমে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সকল অভিভাবককে একত্র হইতে হইবে; পরে, একটি গ্রামের ও জেলার অভিভাবক-সংঘ গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষক-সংঘ শুধু শিক্ষকদিগের স্বার্থ-সংরক্ষণে ব্যস্ত। প্রথম-প্রথম অভিভাবক-সংঘকেও স্ব-স্ব স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দল বাঁধিতে হইবে। অভিভাবকরা যদি তাহা না করেন, তবে বলিব তাঁহারা কুম্ভকর্ণ এবং যে দিন তাঁহাদের চেতনা হইবে, সেই দিনই তাঁহাদের নৈতিক বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—অর্থাৎ তখন আর বালকরা তাঁহাদিগকে মানিবে না—কেন তাহা বলিতেছি। আমার একটি বন্ধু অপর একটি লোকের কাছে নিজ পুত্রের অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করিলে, লোকটি বলেন—"তোমার ছেলে তোমার গালে চড় মারে না ত—তোমার ছেলেকে তবে ভাল ছেলে বলিতে হইবে তো!" ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার এতটা বাড়াবাড়ি না হইলেও, লোকের মন কত দুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে!!!

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, কোনও প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলাম—"আমার পেটে ক্ষুধা বোধ হইলে, আমাকেই তাহা জানাইতে হইবে—অপরের অনুভূতির উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ছাত্ররা সংঘবদ্ধ হইয়া শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে স্ব-স্ব অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে যদি প্রয়াস না পান, তবে কোনও দিন ছাত্রদিগের যথার্থ দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করা ঘটিবে না। বোবার শত্রুও নাই বটে, মিত্রও যোটে না। আপনার

পায়ে ভর দিতে শিখুন, সংঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করুন, মুখ খুলিতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন না,"—ইত্যাদি। আজ এই দুই বৎসর ধরিয়া নানা যায়গায় ছাত্রসভা, ছাত্র-সংঘ, ছাত্র-সম্মেলন দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, এতদিন পরে এ দেশে ছাত্র জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকে শিক্ষকরা দলবদ্ধ হইয়াছেন। অপর দিকে ছাত্ররা দলবদ্ধ হইতেছেন। মাঝে সুধু অভিভাবকরা কুম্ভকর্ণ সাজিয়া থাকিবেন ?

"সব ঠিক্ আছে—যেমন চলিতেছে তেমনি চলুক—তোমার-আমার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই"—ইত্যাকার মনোভাবকে দূরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। জাগিতে হইবে—জাগিয়া ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় কি হইতেছে, তাহার তুলনায় আমরা কি পাইতেছি বা কি পাইতেছি না, এবং আমাদের দেশের ও সমাজের আবহাওয়ায় কি খাপ খায় বা কি খাপ খাইতেছে না,—এ সমস্ত বিষয়ে অভিভাবকগণকে অবহিত হইতে হইবে। এ দেশের শিক্ষাপদ্ধতি ক্রমে, এক ক্ষুরেই সকলের মাথা কামান হয়—এবং অনেক স্থলেই, মুড়ি-মিছরির প্রভেদ থাকে না!!! শিক্ষা রীতিমত ব্যক্তিগত ব্যাপার—পরিধেয় বসন ও ভূষণের ন্যায় একজনের জামা বা গহনা অপরের ঠিক্ মত হয় না—যদিও মোটামুটি ভাবে সকলের জামার ফ্যাসান বা ঢং একই রকমের হইতে পারে। শিক্ষা বিষয়ে চাই unity,—চাই না uniformity। এ কথা টোলের পণ্ডিতরা বুঝিতেন, ইংরাজ যে বুঝেন না তাহা নহে। তবে এ দেশের শিক্ষাদান-প্রণালী প্রধানতঃ ইংরাজের রাজকার্য্য-পরিচালনার উপযোগী লোক প্রস্তুত করিবার জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া, আমাদের শিক্ষা এত ঢালা ও বেপরোয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এবং আমরা শিব না হইয়া অনেক স্থলে অপর কিছু হইয়া পড়িতেছি!!!

এবার একটু কাযের কথায় মন দেওয়া যাউক।—শিক্ষার প্রথম কথা—স্বাস্থ্য। দেহের স্ফূর্ত্তি ঘটিলে তবেই তো মনের স্ফূর্ত্তি ঘটান সম্ভব—নতুবা নহে। দেহের স্ফূর্ত্তি ঘটাইতে হইলে, রীতিমত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান চাই। সংক্ষেপে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপার নির্দ্দেশ করিতেছি—

(১) স্বাস্থ্য পরীক্ষা—নিয়ম করিয়া, রীতিমত ভাবে করান চাই। তজ্জন্য, আবশ্যক মত ডাক্তার-দল ও তাঁহাদিগের প্রয়োজন মত আপিস ও যন্ত্রাদির ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে (organization)। (২) পরীক্ষাকে ফলোপধায়ক করিতে হইলে, দুইটি জিনিষ অতীব প্রয়োজনীয়—

প্রথমতঃ—ছাত্র-স্বাস্থ্যের ত্রুটিগুলির অপসারণের জন্য (Remedy) রীতিমত হাসপাতাল বা তত্তুল্য ব্যবস্থা থাকিবে; এবং ইন্‌স্পেক্টর দল থাকিবেন, যাঁহারা বাঁধা নিয়মে এই সংশোধনীর বহর কতদূর প্রসারী হইতেছে বা হইতেছে না, তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সন্ধান রাখিবেন (Follow-up inspectors)।

দ্বিতীয়তঃ—ছাত্রদিগের অধীতব্য বিষয়গুলির সংখ্যা হ্রাস করিতেই হইবে। যাহাতে নিম্ন শ্রেণীতে মাত্র ২।৩ ঘণ্টা দৈনিক পড়ান হয়, তাহা করা চাই। যদি তাহা সম্ভবপর না হয়—এবং বিশেষ করিয়া বোর্ডিং স্কুলে, ও শীতকালে সকল বিদ্যালয়ে—দিনে অন্ততঃ দুই দফায় দুই ঘণ্টা করিয়া আমোদ ও ক্রীড়ার (Games and sports organized) জন্য ছুটির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। একাদিক্রমে আধঘণ্টার বেশী কোনও ক্লাশ বসিবে না—এবং প্রত্যেক ক্লাসের প্রত্যেক ছেদের (Interval) পরে, অন্ততঃ দশ মিনিট করিয়া বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া উচিত। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া জিম্‌ন্যাষ্টিকের জন্য বরাদ্দ করা চাই (Gymnastics)।

এই ভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরিদর্শন করিলে, ছেলেরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে, তাহাদের নৈতিক চরিত্রও ভাল হইতে থাকিবে এবং কালে তাহারা রীতিমত "মানুষ" গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দেশের চিকিৎসকেরা ব্যারাম সারাইতেই জানেন—ব্যারামের প্রতিষেধ করিতে জানেন না—অভ্যস্তও ন'ন। তাহার উপরে টাকা রোজগারের জন্য যে রকম কাড়াকাড়ি লাগিয়া গিয়াছে, তেমন অবস্থায় উদার-হৃদয় মহাপ্রাণ চিকিৎসক খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য হইবে। কাযেই, অন্ততঃ প্রথম প্রথম যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী ও অভিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাদের সাহচর্য্য অতীব আবশ্যক হইয়া পড়িবে। কালে, ঘন ঘন এই সকল পরিদর্শক চিকিৎসকদলের মধ্যে পরামর্শ দ্বারা, উন্নতি ঘটান সম্ভবপর হইবে।

এখানে বলিয়া রাখি যে, ছাত্র-স্বাস্থ্যের পরিদর্শন কালে সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষকদিগের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাইতে হই এবং শনৈঃ শনৈঃ যাহাতে অদৃষ্টবাদী, শ্লথ প্রকৃতির

স্বয়ং উন্নত-স্বাস্থ্য হন ও স্বাস্থ্য ব্যাপারে রীতিমত অবহিত-চিত্ত হন, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। যেদিন হইতে শিক্ষকরা বুঝিবেন ব্যায়াম চর্চ্চার ও শারীরিক যত্নের কত সুফল, সেদিন হইতে ছাত্র-স্বাস্থ্যোন্নতির ভার কতকটা তাঁহারাও লইতে পারিবেন। তখন দেশের হাওয়া ফিরিবে। সেই হাওয়া ফিরাইবার জন্য কাহারা অগ্রণী হইতে প্রস্তুত আছেন? বোধ-সৌকর্য্যার্থ ছাত্র-স্বাস্থ্য পরীক্ষার জায়গুলি কোষ্ঠকাকারে নিম্নে লিখিয়া দিলাম—

(অ) স্বাস্থ্য পরিদর্শন—
- (ক) সাধারণভাবে দেহ পরীক্ষা—
  - (১) ছাত্রদিগের।
  - (২) শিক্ষকদিগের।
  - (৩) বিদ্যালয় সংক্রান্ত ভৃত্য ও কেরাণীদিগের।
- (খ) দন্তরোগের জন্য বিশেষ পরীক্ষা ও চিকিৎসা।
- (গ) সংক্রামক রোগনিবারণের জন্য প্রচেষ্টা।
- (ঘ) বিশেষ বিশেষ ব্যারামগ্রস্তদিগের পরিদর্শন, যথা—
  - (১) খঞ্জ, বিকলাঙ্গদিগের জন্য
  - (২) স্বল্প-মেধাযুক্ত ছাত্রদিগের জন্য
  - (৩) যাহাদের বুক দুর্ব্বল এমন ছাত্রদিগের জন্য
  - (৪) ক্ষীণদৃষ্টি ছাত্রদিগের জন্য
- (ঙ) স্কুল বাটী পরিদর্শন।

(আ) অঙ্গচালনা বা ব্যায়াম—
- (ক) নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য।
- (খ) উচ্চ " " "।
- (গ) শিক্ষকদিগের জন্য।

(ই) স্বাস্থ্য-শিক্ষা—স্বাস্থ্য-মূলক সদভ্যাসের অনুষ্ঠান। শারীরিক পোষণ (nutrition) সম্পর্কিত বিশেষ শিক্ষা।

(ঈ) গৃহস্থালী ও সমাজ সম্পর্কিত মানসিক স্বাস্থ্যের চর্চ্চা—(study of mental health) অর্থাৎ, মনোবৃত্তির চর্চ্চা ও সংযম শিক্ষা।

(উ) শিক্ষকদিগকে স্বাস্থ্য-বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান দান।

(১) সাধারণ স্বাস্থ্য কথা, (২) সেবা-শুশ্রূষার কথা, (৩) আকস্মিক বিপদের চিকিৎসার কথা, (৪) খুব সাধারণ ব্যারামের প্রতিষেধ ও চিকিৎসার কথা, এই সবগুলির একত্র সম্মিলন অতীব প্রয়োজন। এই কার্য্য-তালিকা দেখিতে ছোট হইলেও, আসলে বহুদূর-প্রসারী। বিদ্যালয়ে অথবা বিদ্যালয়ের নিকটে খেলিবার মাঠ (ground) চাই, ক্রীড়া ও ব্যায়ামের জন্য যথেষ্ট সরঞ্জাম (apparatus) চাই, ক্রীড়া কৌশল সম্পর্কিত বহু বই লাইব্রেরীতে রাখা চাই, স্বাস্থ্য ও দেহ সম্পর্কিত নানা রকমের ছবি, চার্ট, (chart) ও "মটো" (motto) চাই, শারীরিক পোষণ (nutrition) সংক্রান্ত খাদ্য-দ্রব্যের বিশ্লেষণ মূলক (analytical) তালিকা ও তুলনামূলক ছবি (comparative tables) চাই—ইত্যাদি ইত্যাদি বহু বিষয়ক বহু রকমেরই অনেক কিছু চাই।

এ দেশে শিক্ষিত যুবকদের অভাব নাই—তাঁহারা ঐ সকল চার্ট, মডেল, ছবি প্রভৃতি এ দেশেই তৈয়ারী করিতে পারিবেন। এই ভাবে তাঁহাদিগকে কার্য্যে ব্রতী করায় দুইটি লাভ আছে; প্রথমতঃ, বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান; ও দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা বিষয়ক আবহাওয়ার সৃষ্টি। শিক্ষা ব্যাপারটা ষোলআনা "বেণেতি" ব্যাপার হইয়াছে ও এই জন্য বিদেশীর হাতেই আছে—অথচ মানুষ হইবার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা, আমাদের!

সম্মুখেই "বোর্ড অফ সেকেণ্ডারি এডুকেশনের" কুহেলিকাচ্ছন্ন কায়া দেখা দিতেছে। "লেফাফা-দোরস্ত" হিসাবে, উহার কার্য্য তালিকা (scheme) ও পাঠ্য-তালিকা (syllabus) বেশ মনোরম। কিন্তু তাহার পিছনে কি আছে কে জানে? যেভাবে শনৈঃ শনৈঃ সরকার সর্ব্ব রকমের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে কবলিত করিতেছেন তাহাতে উক্ত বোর্ডকেও একটী সোণার শিকল বলিয়া মনে হয়। এ সকল অতীত ও আশু বিপদের কথা স্মরণ রাখা আমাদের কর্ত্তব্য।

উপসংহারে স্মরণ করাইতে চাই—

(১) "শিক্ষা" আমরা কতটা পাইয়াছি—অর্থাৎ আমরা মানুষ হইতে পারিয়াছি কি?

(২) এই শিক্ষার মাশুল আমরা কতই না দিয়াছি!

(৩) আর কতদিন আমরা এইভাবে কাটাইব?

(৪) এখনই চাই—
- (ক) নিজ নিজ অবস্থার সম্যক অনুভূতি।
- (খ) শিক্ষাকে ষোল আনা "জাতীয়" করিয়া লওয়া।

(গ) ছাত্র-সংঘ, অভিভাবক-সংঘ ও শিক্ষক-সংঘ গঠিত হওয়া ও একত্র মিলিত হইয়া কাজ করা।

(ঘ) ছাত্র ও শিক্ষক (এবং "শিক্ষক" বলিলে, বিদ্যালয়ের ছোট বড় সকল বেতনভুক কর্ম্ম-চারীকেই বুঝায়)—উভয়েরই একসঙ্গে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান।

(ঙ) শিক্ষার চাপ কমানো—খেলা-ধূলা, বিশ্রামের বেশী অবসর দেওয়া—বিনামূল্যে বিদ্যালয়ে খাদ্য (tif-fin) যোগান—বর্ত্তমান প্রণালীর মত পরীক্ষার বালাইকে দূর করা।

(চ) একটা প্রকৃত শিক্ষার আবহাওয়ার সৃষ্টি করা—ব্যক্তিগত ভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদিগের মানসিক ও দৈহিক উন্নতির চেষ্টা করা—এক কথায়—

দেশের জন্য
দেশী ঢংএ ঢালিয়া সাজা!!!
কে আছ যোগী, কে আছ বাঙ্গালার মানুষ—
এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রকট হও!!!

স্বপ্ন-ভঙ্গ

শ্রীনিত্যধন চক্রবর্ত্তী

গ্রামের বারোয়ারী-তলার পাশ দিয়ে যে সরু গলিটা মাঠের দিকে চ'লে গেছে, তারই বুকের ওপর কোন্ মান্ধাতার আমলের সেকেলে পুরোনো একখানা পোড়ো বাড়ী—যায়গায় যায়গায় ফাট্ ধ'রে চুণ সুরকী ঝ'রে প'ড়েছে—আর তার মধ্যে থেকে অশথ আর বটগাছের শিকড়গুলো বেরিয়ে প'ড়ে এদিক্ ওদিক্ ছড়িয়ে প'ড়েছে।

বাড়ীখানি ভূতের বাড়ী বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। আশে-পাশে কোন লোকেরই বাস ছিল না। পাড়ার লোকেরা অনেকেই সন্ধ্যার পর সেই রাস্তা দিয়ে আনাগোনা কর্‌ত না, কি জানি তাদের ভয় হ'ত,—বুঝি কোনদিন মট্ কোরে ঘাড়টা মট্‌কে ওই দূরের জঙ্গলে ফেলে দেবে। কিন্তু পাড়ার কতকগুলো ডেঁপো, বয়াট্, একরোকা ছোঁড়া এসব কথায় বিশ্বাস কর্‌তো না। তারা ব'লত "ভূত আবার কি? আমরাই ত সব এক-একটা আস্ত ভূত!" অতঃপর সবাই মিলে সেই পোড়ো বাড়ীর একখানা ঘরে তাদের যাত্রাপার্টির আখড়া খুলে ফেল্লে। সবাই বল্লে, "নিতান্ত মর্‌বার জন্যে যখন পালক উঠেছে, তখন আর হাজার বার বারণ কোরেই বা লাভ কি?"

এমনি কোরে অনেক দিন কেটে গেছে—সেই গ্রামের অবস্থারও আগের চেয়ে আজ অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। কিন্তু সেই পোড়ো, ভাঙ্গা, ঘুণধরা বাড়ীখানার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। সেই ক্লাব-রুম্—যেখানে একদিন দোয়ারের গলার আওয়াজে, ভূত ত ভূত, ভূতের বাবা পর্য্যন্ত "ত্রাহি, ত্রাহি" কোরে জন্মের মত বিদায় নিয়েছিল,—সে ঘর আজ একেবারে নিস্তব্ধ। সন্ধ্যা হ'লে কেউ আর ধুনী জেলে একটিং সুরু ক'রে দেয় না, কিম্বা সুরজ্ঞ সঙ্গীতাচার্য্য মহাশয় তাঁর সেই ভারি বাজখাঁই কণ্ঠে বড় বড় রাগরাগিণীর আলাপও করেন না—একেবারে নিঃঝুম।

ক্লাব হ'য়ে অবধি বেশ পুরো দমেই কলঙ্ক-ভঞ্জনের মহলা চল্‌ছিল, কিন্তু হঠাৎ গ্রামের হাব্‌লা টাইফয়েড্ আর পীলের ব্যায়রামে ভুগে, যেদিন ক্লাবের মায়া কাটিয়ে, হঠাৎ একদিন বলা কওয়া নেই চক্ষু বুজ্‌লে, সেইদিন থেকেই ক্লাবের দর্‌জাতেও প্রকাণ্ড একটা আড়াই সের ওজনের তালা পড়্‌লো।

এই হাব্‌লা ছিল হাব্‌লারই মত দেখ্‌তে। মাথাটা ছিল একটু বড় আর মোটা এবং বুদ্ধিটা ছিল ততোঽধিক স্থূল। কিন্তু সে গাইতে পার্‌ত বেশ। সেই জন্যে ক্লাবের তরফ্ থেকে সম্পাদক মদন ঘোষ, তাকেই কেষ্টর পার্টের উপযুক্ত ম'নে কোরে রীতিমত নাচ গান শিখিয়েছিল। তার গান শুনে সকলেরই মনে হ'ত যে, তাদের এই যাত্রার কেষ্ট ঠাকুরটির যদি হঠাৎ একদিন সত্যি সত্যি কেষ্ট-প্রাপ্তি ঘটে, তাহ'লে এমনটি পাওয়া অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌বে; উপরন্ত হয় ত

শেষে সব পণ্ড হ'য়ে যাত্রার আখ্ড়াটাই উঠে যাবে। ফলে হ'লও তাই।

এমনি কোরে কিছুদিন যায়—যাত্রার দল উঠি উঠি কর্ছে,—এমন সময় হঠাৎ একদিন মদন মাষ্টার কোথা থেকে একটি ফুট্‌ফুটে ছোক্‌রা ধ'রে এনে হাজির। নূতন কেষ্টকে পেয়ে ঝিমন্ত যাত্রার দলটি হঠাৎ সজাগ হ'য়ে উঠ্‌লো। সেই অন্ধকার ক্লাব-রুমে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় কেরোসীন্ তেলের আলো আবার জ্ব'লে উঠ্‌লো, এবং সঙ্গে সঙ্গে দোয়ারের ভীষণ চীৎকারে পোড়ো বাড়ীটা ভেঙ্গে পড়্‌বার উপক্রম কর্‌লে।

এই নবাগত কেষ্ট ঠাকুরটির নাম মুকুল। এই মুকুল যে কে, তা কেউই জান্‌তো না, জান্‌তে চাইতোও না। চেহারাটি দিব্যি ফুট্‌ফুটে,—ছিপ্‌ছিপে গড়ন—রঙ্ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ,—চোখ দুটি ভাসা ভাসা—একটা স্বপ্নের আমেজ যেন চোখ দুটিতে সর্ব্বদাই মাখান র'য়েছে। গ্রামের লোকে বল্লে—হ্যাঁ, এতদিনে কেষ্টর মত কেষ্ট পাওয়া গেছে।

এমন করে যখন মাস তিনেক বেশ কেটে গেল,—একদিন সকালে সেই বারোয়ারী-তলায় ভৈরবীতে সানাই বেজে উঠ্‌লো. সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের গ্রামের ছেলেমেয়েদের আনন্দের মেলা ব'সে গেল। মদন ঘোষের ক্লাবে খুব জবর রকমের রিহার্সেল চ'লতে লাগ্‌লো। দিন নেই, রাত নেই, সর্ব্বদাই ক্লাবের দরজাখানা খোলা—সে এক ফলাও ব্যাপার।

গ্রাম থেকে কিছু দূরে যেখানে মাঠের শেষ রেখাটি দূরে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেছে—সেইখান্‌টিতে পারুলদের বাড়ী। পারুলের বয়েস ষোল কি সতের হবে। আট বৎসর বয়সে,—ও-পাড়ার পরাণ মণ্ডলের ব্যাটা নারাণ মণ্ডলের সঙ্গে তার বিবাহ হ'য়েছিল। তার পর বছর না ফির্‌তেই হঠাৎ একদিন সিঁথের সিঁদুর, হাতের নোয়া খুইয়ে বাপের বাড়ী এসে সেই যে ঢুক্‌লো—সেই থেকে শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে তার সকল সম্বন্ধ চুক্‌লো। তার পর আজ প্রায় আট বৎসর কেটে গেছে—সে আজ আর বালিকাটি নাই—সবই বুঝ্‌তে শিখেছে—এইটুকু কেবল বুঝ্‌তে পারেনি, যে বিধাতা তার সিঁথি থেকে সিঁদুর-রেখাটি পর্য্যন্ত মুছে নিয়েছিলেন. তিনি তার মন থেকে নারীত্বের বালাইটুকু পর্য্যন্ত কেন মুছে ফেলে দেন নি।

ঝুলন্ উপলক্ষে মদন ঘোষের যাত্রার দল বারোয়ারী তলায় গাইবে। সন্ধ্যা না হ'তেই বারোয়ারী-তলায় ভিড় জম্‌তে সুরু কোরেছে। গ্রামের ইতর-ভদ্র মেয়েরা সকলেই দলে দলে যাত্রা শোন্‌বার লোভটুকু না সাম্‌লাতে পেরে সরাসর এসে চিকের আড়ালে যায়গা কোরে নিয়েছে।

পারুল তার মার সঙ্গে সন্ধ্যার অনেক আগেই এসে, চিকের সাম্‌নে যায়গা দখল ক'রে বসে ছিল। ক্রমে ঢোলে কাটি পড়্‌লো, দোয়াররা তালের মিছরি আর লবঙ্গ মুখে পুরে, বাঁ কাণে হাত দিয়ে, বিশ্বগ্রাসী হাঁ কোরে চীৎকার সুরু ক'রে দিলে;—সঙ্গে সঙ্গে চার চারখানা বেহালা, একটা ক্ল্যারিওনেট, দুটো এস্রাজ, দুজোড়া খঞ্জনি এবং একজোড়া করতাল একটা রীতিমত হট্টগোলের সৃষ্টি ক'রে ব'স্‌ল। প্রলয় কাণ্ড—কাণের পর্দ্দা ফুটো হবার উপক্রম।

পারুল চুপ ক'রে বসে দেখছিল,—মামুলি ব্যাপার,—কোন বৈচিত্র্য নাই। বৈচিত্র্যের কিন্তু অভাব হ'লো না, যখন কেষ্ট ঠাকুর আসরে নাম্‌লো। সত্যিকারের কেষ্ট ঠাকুরও বুঝি এত সুন্দর হয় না। দর্শকরা সব কলরব কোরে উঠলো, বুড়ীর দল হরিধ্বনি ক'র্‌তে লাগলো—পারুল কেবল নির্ব্বাক্ হ'য়ে ব'সে রইলো। কেন কে জানে, তার কান্না আস্‌তে চাইছিল। তার পর কেষ্ট ঠাকুরটি যখন পায়ের উপর পা বেঁকিয়ে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়ে হেলে দুলে বাঁশী হাতে মিহি কণ্ঠ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গান গাইতে লাগলো—পারুলের তখন মনে হ'তে লাগ্‌লো. সে যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছে—বড্ড করুণ সে গান—সে যেন কান্না আর কান্না—সে যেন মিনতিভরা প্রাণের ব্যাকুল আকুতি! পারুলের ছোট্ট বুকখানি ব্যথাতুর হ'য়ে উঠ্‌লো।

তার পর প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। মদন ঘোষের যাত্রার দল গ্রামান্তরে বায়না নিয়ে গাইতে চ'লে গেছে—এখনও ফেরেনি। পারুল প্রায়ই খোঁজ নেয়, আবার কবে বারোয়ারী-তলায় যাত্রা হবে;—কেউই সঠিক সংবাদ দিতে পারে না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে কতদিন সেই তরুণ ছেলেটির কথা ভেবেছে;—সেই স্বপ্নমাখা করুণ চোখ দুটি,—কি করুণ মিনতিভরা তার চাহনি! রাধিকার কথা তার মনে পড়ে যায়,—কুলত্যাগিনী রাধিকা,—সহানুভূতিতে তার বুকের ভিতরটা পূর্ণ হ'য়ে ওঠে—বেচারা রাধিকা।

পাড়ার বর্ষীয়সীরা নানান্ কথা বলে—ও ছেলে বেশী দিন বাঁচবে না। কেষ্ট ঠাকুরের ভূমিকায় নেমে পর পর তিনটি

ছেলে অকালে মারা প'ড়েছে—সেই থেকে কেষ্ট ঠাকুর সাজবার জন্যে কেউ ছেলে ছাড়্‌তো না। ওটা না কি কারুর সয় না,—দৈবের বিধান,—মানুষ কি কোর্‌বে ইত্যাদি!—আজ এই অপরিচিত সুন্দর ছেলেটির জন্যে সারা গ্রামের মাতৃহৃদয় বেদনায় টন্ টন্ কোরে উঠেছে।

পারুল ব'সে ব'সে কেবলই সেই কথা ভাবে। তার মনে হয়, ছুটে গিয়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে ব'লে আসে "ওগো, তুমি ও পোড়া অলুক্ষুণে পার্ট ছেড়ে দাও।" কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই। ঐ সুন্দর তরুণ ছেলেটির চোখ দুটি যেমন করুণ—তার ভবিষ্যৎ জীবনটাও ঠিক তেমনই করুণ। সে দুদিনের জন্যে এসেছে, আবার দুদিন পরেই চ'লে যাবে—একেবারে পৃথিবীর ওপারে—যেখানের সংবাদ পারুল কিছুই জানে না। যতই সে এ কথা ভাব্‌তে থাকে, ততই এই তরুণটির জন্যে তার বুকের ভিতরটা গুমরিয়া গুমরিয়া কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে থাকে। পাড়ার প্রবীণরাও ঐ একই কথা বলাবলি করে—সেই একই করুণ কাহিনী। উপরন্তু তারা এই ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যে, "ও ছেলে যদি বেঁচে থাক্‌তো, তাহ'লে একটা লোকের মত লোক হ'ত—কিন্তু তা তো আর হবার যো নাই—ভগবান ভাল-গুলিকেই আগে কোলে টেনে নেন—ইত্যাদি। তারা এমনি ভাব্‌টা দেখায়, যেন মুকুল নামক এই তরুণ ছেলেটি ইতিমধ্যেই ম'রে গেছে, এবং তার ভবিষ্যতে "লোকের মত লোক" হবার আশা ভরসা সেই সঙ্গে জন্মের মত শেষ হ'য়ে গেছে। পারুলের মনও প্রবীণদের এই সকল কথায় সায় দেয়। এই তরুণ ছেলেটি আর কিছুদিন বাঁচতে পেলে যে ভবিষ্যতে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লোক হ'ত, সে বিষয়ে তারও কোন সন্দেহ ছিল না। অমন চোখ কখনও সাধারণ লোকের হয়? ও যেন স্বর্গের দান। কিন্তু দুদিনে সবই শেষ হয়ে যাবে—থাক্‌বে কেবল করুণ একটি স্মৃতি,—করুণ—বড় করুণ! পারুলের দম ফেটে কান্না আসে।

এমনি কোরে পারুল যতই ভাবতে থাকে—সেই তরুণ ছেলেটি মাত্র কয় দিনের জন্য এসেছে, তার পর হঠাৎ একদিন এমন এক রাজ্যে চ'লে যাবে, যেখানের সন্ধান কেউই জানে না, ততই এই তরুণটিকে সে কল্পনার রঙিন্ কোরে, সুন্দরতর কোরে দেখ্‌তে থাকে। সে যেন এ পৃথিবীর জিনিষ নয়—স্বর্গ থেকে কয়েক দিনের জন্য এসেছে, আবার হঠাৎ একদিন সেইখানেই ফিরে যাবে। তার মনে হয়—ছুটে গিয়ে সে একবার এই তরুণ ছেলেটীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে' শুধু কেবল খানিকটা কেঁদে আসে—একেবারে ছোট মেয়ের মত কোরে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে,—আর কিছু নয়।

গ্রামের শেষ বরাবর ছোট্ট একটি নদী। আশে পাশে অশথ আর বটগাছের ঝুরিগুলো গুণটানা দড়ির মত জলের উপর নেমে প'ড়েছে।

সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছিল—আষাড়ের ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যা—যেমন করুণ, তেমনি ম্রিয়মাণ। সারাটা দিন বৃষ্টির পর, এই কিছুক্ষণ হ'ল আকাশটা সামান্য একটু ফরসা হ'য়েছে বটে, কিন্তু আকাশে বাতাসে এখনও একটা বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে র'য়েছে। আসন্ন সন্ধ্যার আব্‌ছায়াটুকু আজ যেন অন্য দিনের চেয়ে আরও করুণ, আরও বিষাদময়—একটা যেন স্বপ্নের আমেজ তাতে জড়ানো।

পারুল তার ছোট্ট কলসীটি কাঁখে নিয়ে আঁকা বাঁকা, সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথটি ধ'রে নদীতে জল আন্‌তে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, কার করুণ কণ্ঠ যেন বাদ্‌লা হাওয়ায় কেঁদে কেঁদে ফির্‌ছে। কে গায় এ? কে গায়? এ সুর যে সে চেনে—পারুলের বুকখানা হঠাৎ ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌ল—তবে কি—?

সে জোরে জোরে পা চালাতে লাগ্‌ল। নদীর কিছু দূরে একটা বটগাছের তলায় এসে সে দাঁড়াল,—জনপ্রাণী নাই, কেবল নদীর জল ছল্ ছল্ ক'রে চ'লেছে। আর অদূরে একটা শিরিস গাছের উচ্চ শাখায় গৃহাগত পাখীগুলো কিচ্‌মিচ্ ক'রছে—তারি কোলাহল, আর সব নিস্তব্ধ।

সেই করুণ নির্জ্জন সন্ধ্যার স্বপ্নমাখা ক্ষণটিতে নদীর তীরে ব'সে ও কে গান গায়? পারুল গাছের আড়ালে চুপ্ কোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লো—অদূরে জলের প্রায় কিনারার কাছে ব'সে আপন মনে কে গান গাইছে—

স্রোতের শিউলি আমি—
স্রোতে ভেসে যাব চ'লে।
ভুলে যাস্ রাধা ব'লে ছিল কেউ এ গোকুলে
বধূরে বলিস্ সখি, সেও যেন ভোলে—

পারুল পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল। বুঝি বা তার বুকের স্পন্দনটুকুও বন্ধ হ'য়ে গেছে। কি করুণ সে গান—সে যেন বিদায় কালের দুটি ফোঁটা অশ্রুজল—আর কিছুই নয়।

তার মনে হ'তে লাগ্‌লো, ছুটে গিয়ে তার পা দুটো বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে আসে "যাবার বেলায় আমাকেও সঙ্গে নাও—আমিও স্রোতের শিউলি ছাড়া আর কিছুই নই—কিছু হ'তে চাইও না।"

পারুল কিন্তু স্রোতের শিউলি হ'য়ে ভেসে গেল না—বাড়ী ফিরে এসে প্রতিদিনকার মতই ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি কাজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টা কোর্‌তে লাগ্‌লো।

বাড়ী ফির্‌তেই তার মা ব'লে উঠ্‌লেন—"আর শুনেছিস্‌, আস্‌ছে শনিবারের দিন বারোয়ারী তলায় মদন ঘোষের যাত্রার দল সুভদ্রা হরণের পালা গাইবে যে!"

পারুল কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ কল্লে না, মুখ গুঁজে আপন মনে ভাতের হাঁড়িতে কাটি দিতে লাগ্‌লো। পারুলের মা আবার বল্লেন—"ওদের যাত্রার দল আজ সকালে ফিরেছে। আমার কিন্তু বাপু ঐ ছেলেটার জন্যে বড় ভাবনা হয়। আহা, সোনার চাঁদ ছেলে গো, কেন সাধ ক'রে মর্‌তে এলি।"

পারুল তথাপি কোন উত্তর দিলে না—তার কাণে কেবল স্বপ্নের মত একটি গানের একটি মাত্র কলি ভেসে আস্‌তে লাগলো—

স্রোতের শিউলি আমি,
স্রোতে ভেসে যাব চলে—

এমনি কোরে দিন কাটে। সন্ধ্যা হ'লেই পারুল তার ছোট্ট কলসীটি কাঁখে তুলে নিয়ে নদীতে জল আন্‌তে যায়; আর একটি তরুণও নদী-তীরে প্রত্যহ সন্ধ্যায় এসে বসে,—গান গায় না, শুধু চুপ্‌ ক'রে ব'সে থাকে,—নিঃশব্দে। পারুল জল ভ'রে ঘরে চ'লে আসে—তরুণটী চুপ্‌ কোরে ব'সে থাকে,—অন্ধকারে কেবল চকিতের মত চারি চক্ষের মিলন হয়—আর কিছু না। মাথার উপর সন্ধ্যার তারাটি নির্নিমেষে চেয়ে থাকে। বটগাছের শুক্‌নো পাতাগুলো এলোমেলো বাতাসে সর্‌ সর্‌ সর্‌ সর্‌ কোরে ওঠে—নদীর জল ছল্‌ ছল্‌ ছল্‌ ছল্‌ কোরে ব'য়ে চলে যায়।

এমনি কোরে আরও কিছু দিন যায়। বারোয়ারী-তলায় মেরাফ্‌ বাঁধা সুরু হ'য়ে গেছে। মদন ঘোষের যাত্রার দল রিহার্সেল দিয়ে দিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। নূতন পালা, নূতন সাজ-সরঞ্জাম, জমিদার বাবু খরচ দেবেন—ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব আস্‌ছেন, আশে-পাশের চার-চারখানা গ্রাম একেবারে কোমর বেঁধে লেগে গেছে—কন্যাদায় বল্লেই হয়। হাতে আর মাত্র সাতটা দিন, এর মধ্যে সব ঠিক ক'র্‌তে হবে—আলো রে—বাজনা রে,—চা রে—বিস্কুট রে—টেবিল রে—নিশেন রে—মালা রে,—কাজটা ত আর কম নয়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছটা দিন কাট্‌লো, রাতটা পোহালেই হয়। সব তৈরী—কেবল হাঁ করার ওয়াস্তা। দোয়াররা দুদিন থেকে কিছু খাচ্ছে না—সংযম কর্‌ছে—দায়িত্বটি ত বড় কম নয়। কেবল ক্ষিদে পেলে মধ্যে মধ্যে একতাল কোরে ঘি-চপ্‌চপে হালুয়া মুখে ফেলে দিচ্ছে। আহার নয় ঔষধ, নইলে গলা খুল্‌বে কেন? জমিদারের খরচ—সুতরাং বেপরোয়া।

পাড়ার মোড়ল নকুড় পাল ইতিমধ্যেই গলা ভেঙে ব'সে আছেন। তথাপি রেহাই নেই; সেই ধরা গলাতেই কারণে অকারণে চেঁচামেচি কর্‌তে ছাড়্‌চেন্‌ না—ওটা না কি তাঁর মুদ্রাদোষ। ছেলের দল আহার-নিদ্রা ত্যাগ কোরেছে—জমিদারের রাত্রে ঘুম নেই, তাঁর বহুমূত্র রোগ বেড়ে গেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আস্‌ছেন—সহজ কথা নয়।

এমনি ধারাটা যখন চারিদিকের অবস্থা, তখন হঠাৎ চারিদিকে আগুনের মত এই সংবাদটা ছড়িয়ে পড়্‌ল যে, মুকুলকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে না কি সন্ধ্যার পর সেই যে "এক্ষুনি আস্‌ছি" ব'লে ক্লাব-রুম থেকে বেরিয়ে গেছে, এতটা রাত হ'ল, এখনও পর্য্যন্ত তার দেখা নেই। মদন মাষ্টার মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লো, নকুল মণ্ডলের ধরা গলা আরও ধ'রে গেল। জমিদার শয্যা নিলেন, দোয়ারের দল বেগতিক দেখে, তাল তাল হালুয়া গলাধঃকরণ কর্‌তে সুরু কোরে দিলে—মেয়েরা অকারণে ছেলে ঠেঙ্গাতে লাগ্‌লো—ছেলেরা অকারণে বায়না সুরু কোরে দিলে। চার-চারখানা গ্রামের মনের চেহারা এক নিমেষে বদ্‌লে গেল।

এমনি ধারাটা যখন অবস্থা,—তখন হঠাৎ কোথা থেকে বাতাসে ভেসে আর একটা সংবাদ এসে পৌঁছুল—কৈবর্ত্তদের পারুল ব'লে যে বিধবা মেয়েটা ধিঙ্গি হ'য়ে বাপের বাড়ী ব'সে থাক্‌তো, তারও না কি কোন সন্ধান মিল্‌ছে না। চারখানা গ্রাম হার্টফেল ক'র্‌তে ক'র্‌তে হঠাৎ যেন চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌লো। নকুড় পাল ধরা গলাতেই চেঁচিয়ে

উঠ্‌লো—"একঘোরে কর্‌তে হবে।" মেয়ের দল জটলা বেঁধে ঘোঁট্‌ পাকাতে সুরু কোরে দিলে। পাড়ার মাতব্বরেরা অত রাত্রেও চণ্ডীমণ্ডপে ঠেলে গিয়ে উঠ্‌লো। শিরোমণি ঠাকুর ঘন ঘন শ্লোক আওড়াতে সুরু ক'রে দিলেন—তামাকের ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস ঘোলাটে হ'য়ে উঠ্‌লো।

* * * *

পাঁচ বৎসর পরের কথা। বরানগরের বাজারের পাশ দিয়ে যে অপরিচ্ছন্ন নোংরা গলিটা এঁকে বেঁকে বরাবর পূর্ব্ব দিকে চ'লে গেছে, তারি শেষাশেষি একটা খোলার বস্তির ভিতরকার একটা ছোট্ট খপ্পরের মধ্যে একটি যুবতী তার শতচ্ছিন্ন মলিন শয্যার উপর চুপ্‌ ক'রে নীরবে বসে ছিল, আর তার পাশেই একটি ছোট ছেলে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। এই কিছুক্ষণ হোলো অদূরে দাঁয়েদের কালীবাড়ীর ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—চারিদিক অন্ধকার। কুঠুরিটির মধ্যে এক কোণে কুলুঙ্গীর উপর একটা কেরোসীনের ডিবে নিব্‌ নিব্‌ ক'রে জ্বলছে,—আর তা থেকে অনর্গল ভুষো বেরিয়ে বেরিয়ে ঘরখানাকে একেবারে বিষাক্ত কোরে তুলেছে।

হঠাৎ বাইরে অন্ধকারের ভিতর থেকে আওয়াজ এলো —"পারুল"—এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি মনুষ্য মূর্ত্তি সেই অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ ক'র্‌লে। কোনরূপ ভূমিকা না কোরে লোকটা সোজাসুজি ব'লে উঠ্‌লো—"আমাকে এখুনি যেতে হবে—একটা টাকা বাক্স থেকে বের ক'রে দে দেখি!"

স্ত্রীলোকটি অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলে "টাকা কি আমি বিয়োবো?"

আগন্তুক দাঁত খিঁচিয়ে উঠ্‌লো—"কেন সেদিন ত পাঁচ টাকা দিলুম—গেল কোথা শুনি?"

"সেদিন নয়,—সে আজ মাসখানেক হ'তে চ'ল্‌লো,— মনে কোরে দ্যাখো" ব'লে যুবতী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বস্‌লো।

আগন্তুক ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো—"সাধ কোরে উপোস্‌ কল্লে আমি কি ক'র্‌বো শুনি?—মিত্তিরদের মেজবাবু অত কোরে—"

কথাটাকে শেষ ক'র্‌তে না দিয়েই যুবতী ছিটুকে উঠ্‌লো—"তোমার মেজবাবুকে ব'ল, তার মুখে আমি ঝাড়ু মারি—"

"তবে উপোস ক'রে মরোগে যাও, আমাকে কিন্তু দুষ্‌তে পারবে না ব'লে রাখ্‌ছি" বল্‌তে বল্‌তে লোকটা যেমন অন্ধকারে কক্ষে প্রবেশ ক'রেছিল, তেম্‌নি অন্ধকারেই আবার মিলিয়ে গেল।

কোন কথা না ব'লে, যুবতী নিঃশব্দে তার ঘুমন্ত শিশুটিকে বুকের মধ্যে তুলে নিলে, এবং তার পর ঠিক ছোট মেয়ের মত ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

অন্ধকারে বস্তির পিছনকার পোড়ো জমিটার উপরকার নারকেল গাছগুলোর শুক্‌নো পাতাগুলো এলোমেলো বাতাসে খড়্‌ খড়্‌ খড়্‌ ক'রে আওয়াজ ক'র্‌তে লাগ্‌লো,—আর সব নিস্তব্ধ।

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বঙ্গদেশের মনস্বিবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদিগকে বঙ্গসাহিত্য পরমাত্মীয় বলিয়া দাবী করিতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রাপ্য। যাঁহাদিগকে প্রকৃত সাহিত্যিক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। তিনি অবসর সময়ের সৌখিন সাহিত্যিক ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক অতি বিরল।

হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি বলিয়া বিখ্যাত। এই গ্রামের যে রায় বংশে রামমোহন জন্ম গ্রহণ করেন, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সেই রায় বংশের জ্যেষ্ঠ শাখার সন্তান। বঙ্গীয় ১২৬০ অব্দের ১৫ই চৈত্র তাঁহার জন্ম হয়।

রাধানগর গ্রামের প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শৈশবে মহেন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ হয়। পরে

তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু প্রবেশিকা শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার পর সংস্কৃত কলেজে তাঁহার শিক্ষা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। দারিদ্র্যের পীড়নে তাঁহাকে কলেজ ত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে তিনি একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। পরে আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

পঠদ্দশাতেই তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তক স্যামুয়েল হানিম্যান সাহেবের একখানি ক্ষুদ্র জীবন-চরিত রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না। ইহাই তাঁহার সাহিত্য-সেবার সূচনা। তাঁহার প্রতিষ্ঠা শিক্ষক রূপে নহে—সাহিত্যক্ষেত্রে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যাঁহাদিগের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিষদের গঠন কার্য্যে, পরিষদের সর্ব্ববিধ উন্নতি প্রচেষ্টায় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কি পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ না জানিতে পারেন; কিন্তু যদি কখনও পরিষদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখিত হয়, তাহা হইলে পরিষদ্ প্রতিষ্ঠায় মহেন্দ্র-নাথের কতখানি হাত ছিল তাহা জানিতে পারা যাইবে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরিষৎ পত্রিকার উন্নতির জন্য, পরিষদের অধিবেশনে পাঠযোগ্য প্রবন্ধ সংগ্রহের জন্য তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিতেন।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়ী হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ স্থানান্তরিত হইলে রাজা বাহাদুরের বাড়ীতে সাহিত্য-সভা স্থাপিত হয়, এবং তথা হইতে সাহিত্য-সংহিতা নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই দুই কার্য্যে মহেন্দ্রনাথ রাজা বিনয়কৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তিনি রাধানগর হইতে তাঁহার সমস্ত সংগৃহীত পুস্তক নৌকাযোগে কলিকাতায় আনিয়া সাহিত্য-সভাকে দান করেন। এই সকল পুস্তকের সংখ্যা বড় অল্প ছিল না, এবং তন্মধ্যে নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল। এই সমস্ত গ্রন্থ তিনি নিঃস্বার্থভাবে সাহিত্য-সভাকে দান করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির ত একটা মূল্য আছেই; তদ্ব্যতীত, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে এরূপ দানের মূল্যও বড় অল্প নহে। এই সাহিত্য-সভার তিনি সহকারী সম্পাদক এবং সাহিত্য-সংহিতার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ "আর্য্যদর্শন" পত্রে প্রথমে তিনি লেখকরূপে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ইহার সহকারী সম্পাদকের পদে বৃত হন। মহেন্দ্রনাথ আরও অনেক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। হানিম্যানের জীবন-বৃত্তান্ত ব্যতীত তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-চরিত প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত প্রাচীন আর্য্য রমণীগণের জীবন-বৃত্তান্ত প্রাচীন কালের হিন্দু নারীর শিক্ষা-দীক্ষা, মনীষা, ধর্ম্মপ্রবণতা সম্বন্ধে বঙ্গীয় পাঠকের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতদ্ব্যতীত তিনি বাঙ্গলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গলার নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া পরে অপরে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি এই ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনার জন্যও তিনি অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেন। এই সকল সংগ্রহ তৎ-সম্পাদিত "পুরোহিত" ও "অনুশীলন" পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। "কল্পনা" নামক একখানি মাসিক-পত্র এবং "জন্মভূমি" মাসিক পত্রও তিনি সম্পাদন করিয়া-ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি অনেক অপ্রকাশিত নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার সংগ্রহ এত অধিক ছিল যে, স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহাকে সংগ্রহের "এনসাইক্লোপিডিয়া" নামে অভিহিত করিতেন। বঙ্গীয় সন ১৩১৯ অব্দের ৪ঠা অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গ সাহিত্যের এই একনিষ্ঠ সাধকের দেহান্ত ঘটে। "ভারতবর্ষ" আজ এই মহাত্মার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইল।

পিতৃযজ্ঞ

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল

আমরা (হিন্দুরা*) মৃত পিতা, মাতা, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান কর্ম্ম করিয়া থাকি। ঐ কর্ম্ম বৎসরে একবার মাত্র করি। শ্রাদ্ধ শব্দ স্মৃতি-পুরাণ-গৃহ্যসূত্রে নানা স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব ; এবং সেই অর্থ অনুসারে আমাদিগের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধপিণ্ডদানকর্ম্ম শাস্ত্রসঙ্গত কি না তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভগবান মনু পঞ্চ মহাযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিধি দিতেছেন যে ঐ পাঁচটী যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থ প্রতি দিন করিবেন। এই পাঁচটী যজ্ঞের নাম ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও নৃ-যজ্ঞ। ঋষিযজ্ঞের অর্থ স্বাধ্যায় অর্থাৎ ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ পাঠ ; ভূতযজ্ঞের অর্থ বলিবৈশ্বদেবকর্ম্ম অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত জীবের উদ্দেশে নৈবেদ্য প্রদান ; পিতৃযজ্ঞের অর্থ তর্পণ অথবা "শ্রাদ্ধ" ; দেবযজ্ঞের অর্থ যথাবিধি হোম করা ; এবং নৃযজ্ঞের অর্থ অতিথিকে অন্নদান। (মনু ৩,৭০, ৮১)। সুতরাং শ্রাদ্ধস্বরূপ পিতৃযজ্ঞ আর্য্যগণের প্রত্যহ কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধ অর্থে যাহাই হউক তাহা পশ্চাৎ দেখিব। কিন্তু ভগবান মনুর মতে উহা নিত্য কর্ত্তব্য। এই কথাই অন্য ভাবে বলিলে বলা যায় যে, নিত্যকর্ত্তব্য কোন এক অনুষ্ঠানের নাম শ্রাদ্ধ।

আমরা কিন্তু মৃত পিতামাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ বৎসরে একদিন মাত্র করিয়া থাকি ; প্রতি দিন শ্রাদ্ধ করি না।

আমাদিগের মত মৃতের শ্রাদ্ধ করিয়া প্রাচীন কালে সাধু কর্ম্মিগণ অতীব নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন বলিয়া অনুতপ্ত হইতেন, এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। মৃতের শোক-মোহে অভিভূত হইয়া অকস্মাৎ মৃতের শ্রাদ্ধ করায় সুধিগণ অসঙ্গত কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া প্রাচীন কালে দুঃখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মৃতের শ্রাদ্ধ করিয়া তৃপ্তি বোধ করি, নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া লজ্জিত হই না। মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে মৃতের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা বিবৃত হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ভীষ্ম বলিতেছেন, নিমিরাজা পুত্রশোকে আকুল হইয়া অমাবস্যা তিথিতে মৃত পুত্রের সদ্‌গতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন এবং পুত্রের নাম গোত্রাদির উল্লেখ করতঃ পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। তৎপর শোকের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে অনুতাপ করিয়াছিলেন যে, "পূর্ব্বকালে মুনিগণ যেরূপ কার্য্য করেন নাই এরূপ কার্য্য আমি কেন করিলাম।" তিনি প্রাচীন রীতির বিপরীত কার্য্য করিয়া ধর্ম্মভঙ্গ ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণরা তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিবেন বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। অনুশাসনপর্ব্বে দেখিতে পাই,

> অকৃতং মুনিভিঃ পূর্ব্বং কিংময়েদমনুষ্ঠিতম্।
> কথং নু শাপেন ন মাং দহেয়ু ব্রাহ্মণা ইতি॥

নিমি রাজার এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মৃতকের শ্রাদ্ধ করিয়া তিনি অনুতপ্ত ও ব্রহ্মশাপের ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা অথবা পিণ্ডদান করা হইত না। তিনি মোহের বশে ইহা কেন করিয়াছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে শোকের প্রভাবেই তিনি ঈদৃশ অনার্য্য-সেবিত স্বর্গপ্রাপ্তির বিঘ্নকর দুষ্কর্ম্ম করিয়া বসিয়াছেন। তিনি শোকে বুদ্ধিহীন হইয়া এবং মোহে অজ্ঞান হইয়া মৃত পুত্রের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিয়া এমন কার্য্য করিয়া বসিয়াছেন যে, তদ্রূপ কার্য্য দেবগণ কিংবা ঋষিগণ কখনও করেন নাই। এই হেতু তিনি কঠিন শাপগ্রস্ত হইবার ভয়ে কম্পিত হইতেছিলেন।

> শোকস্য তু প্রভাবেন এতদকর্ম্ম-কৃতং ময়া।
> অনার্য্য জুষ্টমস্বর্গমকীর্ত্তিকরণং দ্বিজ॥

* অতঃপর হিন্দু শব্দের পরিবর্ত্তে আর্য্য শব্দ ব্যবহার করিব।

নষ্টবুদ্ধি স্মৃতিসত্ত্বো হৃজ্ঞানেন বিমোহিতা।
ন চ শ্রুতং ময়াপূর্ব্বং ন দেবৈঃ ঋষিভিঃকৃতং।
ভয়ং তীব্র, হি পশ্যামি মুনি শাপাৎ সুদারুণম॥

অর্থাৎ—শোকের প্রভাবে আমি এই কর্ম্ম করিয়াছি। এ কর্ম্ম অনার্য্যজুষ্ট, অস্বর্গ্য এবং অকীর্ত্তিকর। আমি নষ্টবুদ্ধি হইয়াছিলাম। অজ্ঞান মোহে আমার কিছুই স্মরণ ছিল না। এরূপ কার্য্য আমি কখনও পূর্ব্বে কাহাকেও করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। দেবগণ ও ঋষিগণ এরূপ কার্য্য কখনও করেন নাই। মুনিগণ আমাকে সুদারুণ শাপ দিবেন; আমার তীব্র ভয় হইতেছে।

নিমি রাজা প্রথম মৃতকের শ্রাদ্ধ করেন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধ বিধিকে "নৈমিক শ্রাদ্ধ" বলা হইয়া থাকে। মৃতের দাহ-কার্য্য এবং অন্ত্যেষ্টি কার্য্যকে স্বায়ম্ভব বিধি বলা হইয়া থাকে। এই দুই অনুষ্ঠানের দুই পৃথক নাম।

যাঁহারা মৃতকের শ্রাদ্ধ করেন তাঁহারা সকলেই বিশ্বাস করেন যে শ্রাদ্ধ না করিলে মৃতের আত্মা নরকগামী হয়; এবং করিলে ঐ আত্মা স্বর্গগামী হয়; আর্য্যগণের সর্ব্ব-শাস্ত্রেই স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগের উল্লেখ অসংখ্যবার করা হইয়াছে। জীব যেরূপ কর্ম্ম করে তদ্রূপ ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত জন্মজন্মান্তর নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে। এ কথা আর্য্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছে। এক্ষণে, পুত্র-পৌত্রগণ মৃতের শ্রাদ্ধপিণ্ডদান না করিলে যদি মৃতের নরকপ্রাপ্তি হয়, তবে ঐ মৃত ব্যক্তি, জীবিত কালে নানা সৎকর্ম্ম করিয়া থাকিলেও, স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারিল না; বরং অপরের (পুত্র পৌত্রগণের) অকর্ম্ম-হেতু তাঁহাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তি জীবিত কালে দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিলেও অপরের শ্রাদ্ধপিণ্ডদান কর্ম্ম ফলে স্বর্গসুখ ভোগের অধিকারী হইল। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা। ইহাতে কর্ম্মফলবাদ সম্পূর্ণ-রূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং মৃতের শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান করণে কিংবা অকরণে ঐ মৃতের স্বর্গ অথবা নরক-প্রাপ্তি নিতান্ত অসঙ্গত কথা। মৃত ব্যক্তি স্বর্গ পাইতে হইলেও নিজের কর্ম্মফলেই পাইবে, নরক পাইতে হইলেও নিজের কর্ম্মফলেই পাইবে। অপর কেহ কোন কর্ম্ম করিলে অথবা না করিলে মৃতের স্বর্গ অথবা নরক-প্রাপ্তি হইতে পারে না! এই সর্ব্বজনবিদিত কথা স্মরণ রাখিলেও শ্রাদ্ধ শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝা কঠিন হয় না।

এই প্রসঙ্গে পুনর্জ্জন্মবাদও বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। আর্য্যশাস্ত্রে পুনর্জ্জন্ম সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। জীবের এই জন্মই প্রথম ও শেষ নহে। মৃত ব্যক্তি স্বীয় সদসৎ কর্ম্মের ফল ভোগ নিমিত্ত ভোগদেহ ধারণ করতঃ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে। এ মতও আর্য্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তি যদি কৈবল্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে তাঁহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান সর্ব্বথা নিষ্ফল। কিন্তু দোষগুণে পাপপুণ্যে জড়িত গৃহস্থ ব্যক্তি ত কৈবল্য মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতেই হয়। এরূপ স্থলে তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ শ্রাদ্ধ করিলে কি ফল হইতে পারে? যে পুত্র শ্রাদ্ধ করিতেছেন, মনে করুন, তাঁহার পিতার নাম ছিল রামরতন। রামরতন মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার নাম হইয়াছে মহেশচন্দ্র। যে আত্মা স্থূল দেহ ধারণ করিয়া রামরতন বলিয়া পরিচিত ছিল সেই আত্মাই রামরতনের স্থূল দেহ ত্যাগের পর অপর এক স্থূল দেহ ধারণ করতঃ মহেশচন্দ্র নামে পরিচিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতার "বাসাংসি জীর্ণানি" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থও তাহাই। রামরতনের পুত্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে কিংবা পিতার নামে পিণ্ডদান করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবে কে? মহেশচন্দ্র না কি? শ্রাদ্ধ ত স্থূল দেহের নহে; শ্রাদ্ধ ত আত্মার। রামরতনের আত্মা মহেশচন্দ্রের দেহে বসিয়া হয় ত শ্রাদ্ধ বাসরে নিষিদ্ধ আহার করিতেছে। সে কি তৎকালে পুত্রের সাত্ত্বিক পিণ্ড প্রাপ্ত হইবে? সে ত জানেই না যে সে রামরতন ছিল এবং তাহার রামরতন অবস্থার পুত্র আজি শ্রাদ্ধ করিতেছে। সুতরাং ঐ শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানে তাহার তৃপ্তিলাভ হইবে কেমন করিয়া?

কোন কোন পুরাণে মৃতের শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ এবং কতিপয় স্থানে অপ্রসঙ্গতঃ মৃতের শ্রাদ্ধের কথার উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু দেবী ভাগবতে, বিষ্ণুভাগবতে, * শিবপুরাণে, আদিপুরাণে, বামনপুরাণে এবং আরও কোন কোন পুরাণে শ্রাদ্ধের

---

* শ্রীমদ্ভাগবত।

উল্লেখ বিন্দুমাত্রও নাই। এ সকল পুরাণেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। কিন্তু মৃতের শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবগণ মৃতের উদ্দেশে দানকে শ্রাদ্ধ বলেন না। শ্রাদ্ধবাসরকে "দিবসী" বলিয়া থাকেন।

মনুসংহিতার "পিতৄণ শ্রাদ্ধৈঃ" কিংবা "পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্" নির্দ্দেশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করা উচিত। উহাই নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞ।

কিন্তু "পিতৃ" কাহারা ?

"পিতৃ" কে ? "পিতৃ" বলিতে কি নিজের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহকে বুঝিতে হইবে ?" "পিতৃ" শব্দের অর্থ কি তাহাই ? বোধ হয় শাস্ত্রজ্ঞ কোন ব্যক্তিই "পিতৃ" শব্দের এরূপ অর্থ করিবেন না।

মনু-সংহিতায় দেখিতে পাই—

মনোহৈরণ্যগর্ভস্য যে মরিচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষামৃষীনাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ॥
বিরাটসুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিশাত্বাশ্চ দেবানাং মারিচা লোক বিশ্রুতাঃ॥
দৈত্যদানব যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগ রক্ষসাং।
সুপর্ণ কিন্নরাঞ্চ স্মৃতাঃ বর্হিষদোত্রিজাঃ॥
সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যা নামাজ্যপাঃ নাম শূদ্রানাং তু সুকালিনঃ॥
সোমপাস্ত কবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোঙ্গিরসঃ সুতাঃ।
পুলস্তস্যাজ্যপাঃ পুত্রাঃ বশিষ্ঠস্য সুকালিনঃ॥

ইহার অর্থ এই—হিরণ্যগর্ভের পুত্র মনু, তাঁহার পুত্র মরিচী আদি ঋষিগণ, ঐ ঋষিগণের পুত্রগণকে পিতৃগণ বলে। বিরাটের পুত্র সোমদসুত সাধ্যগণকে পিতৃ কহা যায়। মরিচীর পুত্র অগ্নিশত্ত্ব, তিনি দেবতাদিগের লোকবিশ্রুত পিতৃ। দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রক্ষ, সুপর্ণ এবং কিন্নরদিগের পিতৃ বর্হিষদ, তিনি অত্রির পুত্র। বিপ্রদিগের পিতৃ সোমপা। ক্ষত্রিয়দিগের পিতৃ হবির্ভূকগণ। বৈশ্য-দিগের পিতৃ আজ্যপা। আর শূদ্রদিগের পিতৃ সুকালী। সোমপা কবির পুত্র। হবির্ভুক অঙ্গিরার পুত্র। আজ্যপ্ পুলস্ত্যের পুত্র। আর সুকালী বশিষ্ঠের পুত্র। *

এই সংশ্রবে মনু পিণ্ডদানের ও ব্রাহ্মণ সেবনের বিস্তৃত ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা উপরি উক্ত "পিতৃ"গণের উদ্দেশে পিণ্ডদান ও ব্রাহ্মণ সেবা। পিণ্ডদাতার নিজের পিতা, পিতামহ এস্থলে পিতৃপদবাচ্য নহে।

মনু অন্যত্র বলিয়াছেন—

বসূন্ বদন্তি তু পিতৄণ রুদ্রাং শ্চৈব পিতামহান্।
প্রপিতামহাংস্থাদিত্যান্ শ্রুতিরেষা সনাতনী॥

অর্থাৎ- বসুদিগকে পিতৃগণ, রুদ্রদিগকে পিতামহগণ এবং আদিত্যদিগকে প্রপিতামহগণ বলে। বসুগণ ২৪ বৎসর, রুদ্রগণ ৩৬ বৎসর এবং আদিত্যগণ ৪৮ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সদাচারী ও বিদ্বান্ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, জ্ঞান এবং তপস্যার দ্বারা ইহাঁরা পিতৃপদবাচ্য হইয়াছেন। (ছান্দোগ্য ৩ প্রপাঃ ১৬ খঃ)। কোন কোন পুরাণেও ছান্দোগ্য উপনিষদের এই কথা উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিত হইয়াছে যে—

তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি দেয়ানি যোগিভ্যো যত্নতঃ সদা।
পিতৄণাং হি বলং যোগো যোগাৎ সোম প্রবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ—যোগীদিগকে যত্ন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ দিতে হইবে; যোগই পিতৃদিগের বল। যোগ হইতেই সোম জাত হয়।

"যোগীদিগকে শ্রাদ্ধ দিতে হইবে", ইহা হইতে বুঝা গেল যে জীবিত যোগীদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নানাবিধ দ্রব্য দান করা উচিত। তাহা হইলেই, জীবিত ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিলেও শ্রাদ্ধ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ইহা বুঝা যাইতেছে।

বায়ু পুরাণে শ্রাদ্ধ কল্পে উল্লেখ আছে যে—

গৃহস্থানাং সহস্রেন বানপ্রস্থ শতেন চ।
ব্রহ্মচারী সহস্রেন যোগী হেকো বিশিষ্যতে॥
যস্তিষ্ঠেদেকপাদেন বায়ুভক্ষ শতং সমা।
ধ্যান যোগী পরস্তস্মাদ্ ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্॥
আদ্য এবগণঃ প্রোক্ত পিতৄণামমিতোজসাং।

এই সকল হইতেও পিতৃগণ কে, তাহা বুঝা কঠিন হয় না।

* পিতৃ শব্দ ব্যবহার করিবার নিমিত্ত ভাষায় যে দোষ ঘটিল তাহা ক্ষমার্হ।

পুরাণে পিতৃগণকে "দেবসূনো" অর্থাৎ দেবতাদিগের পুত্র বলা হইয়াছে। বায়ু পুরাণে প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে—

তে তু জ্ঞান প্রদাতারঃ পিতরো বো ন সংশয়,
ইত্যেতে পিতরো দেবাঃ দেবাশ্চ পিতরঃ পুনঃ
অন্যোন্য পিতরঃ হ্যেতে দেবাশ্চ পিতরশ্চহ

অর্থাৎ—জ্ঞানদাতাদিগকেও পিতৃগণ বলা যায়। দেবগণ অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকেও পিতৃগণ বলা যায়; এবং পিতৃগণকেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলা যায়। মনু ৩।১৯২ শ্লোকে বলিতেছেন যে অক্রোধন, শৌচাচার, সদা ব্রহ্মচারী, ত্যক্তশাস্ত্র মহাভাগদিগকেও পিতৃ বলা হয়।

উপরে যে সকল প্রমাণ দর্শিত হইল এবং ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে স্থানে স্থানে যে ভাবে "পিতৃ"গণের উল্লেখ আছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, নিজের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহদিগকে পিতৃগণ বলে না। আমরা তাঁহাদিগকেই পিতৃগণ মনে করিয়া তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর পিণ্ডদান করিয়া থাকি। ইহা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নহে। তাহা হইলেও, তাঁহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইলে শাস্ত্রানুসারে এবং না হইলেও ভক্তির আধিক্য হেতু জীবিতকালে শ্রদ্ধার দান পাইবার যোগ্য। জীবিতকালে উত্তম অন্ন, বস্ত্র, পাদুকা প্রভৃতি দান করতঃ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই প্রীত রাখা কর্ত্তব্য। ইহাকেও শ্রাদ্ধ বলা যাইতে পারে। নিজের পিতা, পিতামহ প্রভৃতির উদ্দেশে এইরূপ শ্রাদ্ধই কর্ত্তব্য।

পিণ্ড-প্রাপ্তি সম্বন্ধে কতিপয় পুরাণে যেরূপ লিখিত আছে তাহা অতীব বিস্ময়কর। আমরা পূর্ব্বে রামরতনের ও মহেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, রামরতনের পুত্র-দত্ত পিণ্ড মহেশচন্দ্র কোন প্রকারেই পাইতে পারে না, যদিও রামরতনই মরিয়া পরজন্মে মহেশচন্দ্র হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন পুরাণকার আশ্চর্য্য উপায়ে মহেশচন্দ্রের নিকট পিণ্ড পৌঁছাইয়া দিতেছেন। আমাদিগের রামচন্দ্র পরজন্মে মহেশচন্দ্র হইয়াছে। কিন্তু সে মনুষ্য হইয়া নাও জন্মিতে পারিত। রামচন্দ্র মরিয়া পশু, পক্ষী, যক্ষ, দানব সকলই হইতে পারিত। পদ্মপুরাণকার বলেন (তিনি যদি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হ'ন তবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেন) যে মৃত ব্যক্তি পুনর্জ্জন্মে যে যোনিই প্রাপ্ত হউন পিণ্ডও তদনুকূল পদার্থের মূর্ত্তি গ্রহণ করতঃ তাঁহার ভোগ্য হইবে। যদি পিতামাতা মরিয়া দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে পিণ্ডান্ন অমৃত হইয়া তাঁহাদিগের আহার্য্য হইবে। তাঁহারা দৈত্য হইয়া থাকিলে ভোগরূপে, পশু হইয়া থাকিলে তৃণরূপে, যক্ষ কিংবা দানব হইয়া থাকিলে মদিরারূপে, রাক্ষস হইয়া থাকিলে রক্তরূপে, মনুষ্য হইয়া থাকিলে অন্নজলরূপে, স্ত্রীজাতি হইয়া থাকিলে রতিশক্তি রূপে এবং সকল অবস্থাতেই বায়ুরূপে ঐ পিণ্ডান্ন তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিবে। * নিরঙ্কুশ কল্পনা ইহার অধিক আর কতদূর দৌড়াইতে পারে? এই শ্রেণীর লেখা কি বেদব্যাসের হইতে পারে? যাহা হউক, "শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধ করিলে অথবা না করিলে তাঁহার পিতা, পিতামহগণ স্বর্গে অথবা নরকে যাইবেন," এ কথার এখন কি দশা হয়? পদ্মপুরাণকার পুনর্জ্জন্মের সহিত পিণ্ড-প্রাপ্তির যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত স্বর্গ-নরকের কোন সংস্রবই দেখা যায় না। পিণ্ডের নানা বস্তুতে পরিণত হওয়ার এবং এক ক্ষেত্রে রতিশক্তিরূপেও পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া সহজে বুঝিতে পারিতেছি না। পদ্মপুরাণকার তাহা বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হইতে পারিতাম।

ফলতঃ, পিতৃ শব্দের প্রাচীন ও প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হওয়াতেই, নিজের পিতা পিতামহদিগকে পিতৃপদবাচ্য মনে করাতেই নানাবিধ বিস্ময়কর কল্পনা সৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ, প্রাচীন কালে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিবার কিংবা তাঁহার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। জীবিত কালে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান দ্বারা পিতা, পিতামহ, মাতা প্রভৃতিকে তৃপ্ত করা হইত। ইহাই প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

পিণ্ডদান। মৃতের পিণ্ডদান এ কথার অর্থ কি?

---

* দিব্যো যদি পিতামাতা শুভকর্ম্মানুযোগতঃ।
তস্মাৎঅমৃতং ভূত্বা দিব্যত্বেঽপ্যনুগচ্ছতি॥
দৈত্যত্বে ভোগরূপেণ পশুত্বে চ তৃণর্ভবেৎ।
শ্রাদ্ধান্নং বায়ুরূপেণ নানা ত্বে বো পতিষ্ঠতি
পানং ভবতি যক্ষত্বে রাক্ষসত্বে চ আমিষং॥
দানবত্বে তথাপানং প্রেতত্বে রুধিরোদকং।
মনুষ্যত্বেঽন্নপানাদি নানা ভোগরসাং ভবেৎ
রতিশক্তি স্ত্রীয়কান্ন * * *

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিঃ অঃ ১০।

দাতার স্বত্ব লোপ এবং গৃহীতার স্বত্ব উদ্ভব হইলে দান কহে। পিণ্ডদাতা পিণ্ড দিবার পর তণ্ডুলাদি পিণ্ড পদার্থে তাঁহার যে স্বত্ব ছিল তাহার লোপ হইতে পারে; কিন্তু মৃত ব্যক্তির ঐ পদার্থে স্বত্ব উদ্ভব হইবে কি প্রকারে? মৃতের তো কোন পদার্থে স্বত্ব উদ্ভব হইতে পারে না। সুতরাং মৃতের সম্বন্ধে দান শব্দও ব্যবহৃত হইতে পারে না। জীবিত ব্যক্তিকেই দান করা চলে, মৃত ব্যক্তিকে চলে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কোন কোন পুরাণে মৃতের শ্রাদ্ধ করিবার উল্লেখ আছে; কোন কোন পুরাণে নাই। পূর্ব্বে মৃতের শ্রাদ্ধ করা হইত না, পরে হইয়াছে। নিমিরাজার উপাখ্যান হইতেও তাহাই জানা যায়। তবে এ অনুষ্ঠানের মূল কারণ কি? নিমিরাজা সর্ব্ব প্রথমে মৃতের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপরে তাঁহার কার্য্য অনুকরণ করে নাই। তিনি নিন্দিত হইয়াছিলেন এবং আত্মগ্লানি অনুভব করিয়াছিলেন; অনুকৃত হ'ন নাই। চীনদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত মৃতকের উদ্দেশে নানাবিধ পদার্থ দান করা হইয়া থাকে। মৃত পিতা পিতামহদিগকে ঐ সকল দান দ্বারা তুষ্ট করা চীনা গৃহস্থগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠান। তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর ভারতবর্ষে আসিয়া বুদ্ধগয়াদি স্থানে মৃতের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে ভারতীয়-গণ সেই অনুষ্ঠান অনুকরণ করিতে আরম্ভ করেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের ইহাতে অর্থপ্রাপ্তিও ছিল। সুতরাং তাঁহাদিগের চেষ্টায় এ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত প্রচলন হইয়া থাকিবে, ঈদৃশ অনুমান অসঙ্গত হয় না।

অর্থ, লোকে সঞ্চয় করিতে পারিলে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করে না। যে অনুষ্ঠানে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হয় সে অনুষ্ঠান প্রচলন করিতে নিশ্চয়ই বাহ্যিক এবং আন্তরিক কারণের গুরুতর প্রভাব আবশ্যক হইয়াছিল। আন্তরিক কারণ ভক্তি, শোক, মোহ, স্নেহ; এবং বাহ্যিক কারণ, ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিতগণের আধিপত্য এতদ্দেশীয় সমাজে অত্যন্ত অধিক ছিল। সুতরাং মৃতের শ্রাদ্ধপিণ্ডদান অবশ্য-কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান স্বরূপে প্রচলিত হইবার ঐ উভয়বিধ কারণের অভাব হয় নাই। এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎসহ চীনাগণের অনুকরণ করাও অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল। অবশেষে যশাকাঙ্ক্ষা এবং ধন-সম্পদ দেখাইবার দম্ভ, এই উভয় কারণ বশত শ্রাদ্ধপিণ্ডদান কর্ম্ম বহুব্যয়-সাধ্য এবং আড়ম্বর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ মীমাংসা করিলে ভ্রম হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা দেখিলাম যে—এতদ্দেশে শ্রাদ্ধপিণ্ডদান কর্ম্ম পিতৃযজ্ঞ স্বরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত পিতা পিতামহ প্রভৃতির উদ্দেশে ঐ অনুষ্ঠান আচরিত হয়। পিতৃযজ্ঞ প্রাত্যহিক কর্ম্ম; বর্ষে একদিন মাত্র অনুষ্ঠেয় নহে। আমরা ইহাও দেখিলাম যে প্রাচীনকালে মৃতকের শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান করা হইত না। কেহ শোক মোহ বশতঃ করিলে নিন্দিত হইতেন; কারণ উহা সনাতনী প্রথা নহে। উহা অনার্য্য-জুষ্ট অস্বর্গ্য ও অকীর্ত্তিকর। জীবিত পিতা পিতামহ-গণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নবস্ত্র পাদুকা গন্ধমাল্যাদি দান করাই শ্রাদ্ধ। এইরূপ কার্য্য প্রত্যহই করা যাইতে পারে এবং কর্ত্তব্যও। আমরা দেখিলাম পিতৃগণ কে; শাস্ত্রে কাহাকে পিতৃগণ বলিয়া সংজ্ঞা দিয়াছে। নিজের পিতা পিতামহ-দিগকে "পিতৃগণ" বলে নাই। ভ্রমবশতঃ, অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা স্বার্থবশতঃ "পিতৃগণ" শব্দে নিজের পিতা পিতামহ-গণকে বুঝা হইতেছে; এবং বর্ত্তমান প্রণালীর শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান ঐরূপ ভ্রমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমরা দেখিলাম যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকারিগণ শ্রাদ্ধকরণের যে ফল কল্পনা করিয়া থাকেন তাহা সর্ব্বশাস্ত্রোক্ত সর্ব্বজনবিদিত কর্ম্মফলবাদের এবং পুনর্জ্জন্মবাদের সহিত সম্পূর্ণ অসমঞ্জস এবং পৃথক। জীবিতের উদ্দেশে প্রদত্ত শ্রদ্ধার দান, অর্ব্বাচীন কালে মৃতকের শ্রাদ্ধপিণ্ডদানে পরিণত হইয়াছে। এ পরিণতি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ; কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। আন্তরিক ও বাহ্যিক কারণ বশতঃই স্বাভাবিক নিয়মে এরূপ বিকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। অজ্ঞতা; চীন দেশীয়গণের সংসর্গ; এবং সমাজে-বহু-সম্মানিত সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থ, এতদুভয়ই জীবিতের অনুষ্ঠান মৃতের প্রতি প্রয়োগ করিবার প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

যাহা হউক মৃতকের শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান কর্ম্ম অর্ব্বাচীন প্রথা,—সনাতন প্রথা নহে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে।

---

* এই প্রবন্ধের নিমিত্ত আমি উপাধ্যায় রামদেব আচার্য্য এবং পণ্ডিত জয়দেব বিদ্যালঙ্কার মহোদয়গণের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে ৬টা ৩৩ মিনিটের সময় ন্যাশন্যাল সন্তরণ-সমিতির তত্ত্বাবধানে হেদুয়ার পুষ্করিণীতে একটি দীর্ঘকালব্যাপী সন্তরণ-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীমান মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী ও শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ পাল সন্তরণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মৃত্যুঞ্জয় ২৯

শ্রীমান রবি চট্টোপাধ্যায়

ঘণ্টা ৩ মিনিটে হেদুয়া পুষ্করিণী ২১০ বার পারাপার হন; এবং বীরেন্দ্র ৩২ ঘণ্টা ১২ মিনিট সন্তরণ করিয়া হেদুয়া পুষ্করিণী ৩৪০ বার এপার-ওপার করেন। শ্রীমান বীরেন্দ্র পাল ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ২২ মাইল সন্তরণ করিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর ওয়েলেসলী পুষ্করিণীতে ৯০ গজ সন্তরণে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ মাইল সন্তরণে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দেও এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ২৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পঞ্চম, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল অলিম্পিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় এবং পর বৎসর ৩০ মাইল সন্তরণে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষ হেদুয়া পুষ্করিণীতে ২৮ ঘণ্টা-কাল সন্তরণ করিয়া পথ প্রদর্শন করিলে অনেকেই দীর্ঘকাল-ব্যাপী সন্তরণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে উৎসাহিত হন। তাহার ফলে মৃত্যুঞ্জয় ২৯ ঘণ্টা ও বীরেন্দ্র ৩২ ঘণ্টা সন্তরণ করেন। তৎপরে শ্রীমান প্রফুল্লকুমারের চেষ্টায় হেদুয়ায় ন্যাশন্যাল সন্তরণ সমিতির উদ্যোগে এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান রবি চট্টোপাধ্যায় ৫০ ঘণ্টার অধিক কাল সন্তরণ করিবার অভিপ্রায়ে গত ২০শে আশ্বিন রবিবার প্রাতঃকালে সাত ঘটিকার সময় জলে অবতরণ করেন। ন্যাশন্যাল সুইমিং ক্লাবের উদ্যোগ আয়োজন সুন্দর হইয়াছিল। শ্রীমান প্রতিশ্রুতি পালন ত করিয়াছেনই —ততোঽধিক করিয়াছেন। তিনি পঞ্চাশ ঘণ্টার স্থলে সাড়ে চুয়ান্ন ঘণ্টা জলে থাকিবার পর মঙ্গলবার বেলা দেড়টার সময় তীরে উত্তীর্ণ হন। জলের তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি, বৃষ্টি, দুর্য্যোগ প্রভৃতি কারণে তাঁহার মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইলেও তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। ডাক্তাররা মধ্যে মধ্যে তাঁহার উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীমান রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক্ষণে পৃথিবীর দীর্ঘকাল সন্তরণকারীদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেন; আর প্রথম স্থানে আছেন মিঃ ওয়েজ। তিনি ৬২ ঘণ্টা সন্তরণ করিয়াছেন।

এই প্রতিযোগিতার ব্যাপারে অন্যান্য অনেক ক্লাবের সন্তরণকারীরা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। দুই দিন ধরিয়া হেদুয়া পুষ্করিণী লোকে লোকারণ্য ছিল। শ্রীমানের কৃতিত্ব দর্শনে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা তাঁহাকে অনেকগুলি পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। ৫৪॥ ঘণ্টা কাল সন্তরণের

ফলে শ্রীমান রবি চট্টোপাধ্যায় ৫টি স্বর্ণপদক, রূপার কাপ, রিষ্টওয়াচ, স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও রৌপ্য মূর্ত্তি প্রভৃতি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

বিদেশে দীর্ঘকাল সন্তরণ করিয়া যাঁহারা যেরূপ ফল লাভ করিয়াছেন, "সময়" পত্র হইতে আমরা তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

১৮৬৫ অব্দের চ্যানেল সন্তরণের পর ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন ম্যাথিউজ ওয়েব ১৮৭৯ অব্দের মে মাসে ৮৪ ঘণ্টা কাল সন্তরণ করেন। তাঁহার এই রেকর্ড গ্রাহ্য হয় নাই। কারণ তিনি দিনে ১৪ ঘণ্টা করিয়া সন্তরণ করিতেন এবং অবশিষ্ট সময় ভাসিয়া কাটাইতেন। তাহার পর তিনি রেকর্ড ভঙ্গ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ১৮৮৩ অব্দের জুলাই মাসের ২৩এ সন্তরণ আরম্ভ করেন। জুলাই মাসের ২৪এ তিনি ৬০ ঘণ্টা সন্তরণ করিবার পর জলে ডুবিয়া মারা যান। তাঁহার এই রেকর্ড ১৯২৭ অব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। তাহার পর ১৮২৭ অব্দের ৩০এ জুলাই মিস বালিশ ও ফিলিস জিটেনফিল্ড নামক ত্রয়োদশ বর্ষীয়া দুই বালিকা ৬২ ঘণ্টা ২০ মিনিট সন্তরণ করিয়া উক্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেন। এই দুই বালিকার সাহস দেখিয়া সন্তরণ জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সাত জন সন্তরণকারী তাঁহাদের দক্ষতা দেখাইতে লাগিলেন।

সন্তরণ-নিরত—শ্রীমান মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী ও শ্রীমান বীরেন্দ্র পাল

তাহার পর আগষ্ট মাসে মিসেস লিকাডরিয়ার ক্যালিফোর্নিয়ার কোল্টন সহরের এক পুষ্করিণীতে ৫৬ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড সন্তরণ করেন। ইহার প্রায় এক মাস পরে মাষ্টার আর্থর রিজো ১৭ই সেপ্টেম্বর ৫৯ ঘণ্টা ১২ মিনিট সন্তরণ করেন। ঠিক এক সপ্তাহ পরেই নিউইয়র্কের মিসেস মার্টল হাডলষ্টন পূর্ণ ৬০ ঘণ্টা সন্তরণ করিয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। প্রায় ১২

এক অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী ৬০ ঘণ্টা সন্তরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ১০ই অক্টোবর ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের লশ অ্যাঞ্জিলসের নিকট এক হ্রদে জিমি চেরী ৬৫ ঘণ্টা ১২ মিনিট সন্তরণ করেন। এই রেকর্ড হইবার পর নিউইয়র্কের মিসেস্ লতিমুর স্কোমেল ৭২ ঘণ্টা দুই মিনিট ৪ সেকেণ্ড সন্তরণ করেন। মিসেস স্কোমেল ১৯২৮ অব্দের ১৫ই অক্টোবর সন্তরণ আরম্ভ করেন এবং ১৮ই সন্তরণ শেষ করেন। তাঁহার এই রেকর্ডের পর মাষ্টার আর্থার রিজো পুনরায় রেকর্ড ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ৬২ ঘণ্টা সন্তরণের পর আর সন্তরণ করিতে পারেন নাই। অধুনা মিসেস্ লতিমুর স্কোমেলের রেকর্ড সর্ব্ব প্রথম বলিয়া গণ্য করা হয়।

শোক-সংবাদ

৺সুখেন্দুবিকাশ দত্ত

ইনি পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালক—চট্টগ্রামের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। গত ২১শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির সাধারণ অধিবেশনের পর অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত ইনি যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন পশ্চাৎ হইতে অন্ধকারে আততায়ীর ছুরিকার আঘাত প্রাপ্ত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া বেলগাছিয়া হাসপাতালে রাখা হয়। গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সুখেন্দু চট্টগ্রাম সহর হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত শারদাকুমার দত্তের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার পিতামহ ৺ চৈতন্যচরণ দত্ত চট্টগ্রামের উকীল ছিলেন। সুখেন্দু ম্যাট্রিক ক্লাসের প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন—প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান

৺সুখেন্দুবিকাশ দত্ত

অধিকার করিতেন। রাজনীতিক দলাদলির চয়ণে এই নিরীহ, নিরপরাধ বালক আত্মবলি দিলেন। এই বালকের এইরূপ অপঘাত মৃত্যুতে কেবল আমরা কেন, সমগ্র বঙ্গদেশ শোকান্বিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন এবং শ্রীভগবানের চরণে লোকান্তরিত শিশু আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

৺রায় অন্নদাপ্রসাদ সরকার বাহাদুর

রায় অন্নদাপ্রসাদ সরকার বাহাদুর বি-সি-ই অবসর-প্রাপ্ত চিফ্ ইন্‌জিনিয়র এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগের

৺রায় অন্নদাপ্রসাদ সরকার বাহাদুর

সেক্রেটারি ছিলেন। গত ২৫এ ভাদ্র মঙ্গলবার ৬৮ নং হরিশ মুখার্জ্জি রোডস্থ নিজ বাস-ভবনে তিনি ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজ হইতে বি-সি-ই ডিগ্রী পাইয়া গত ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগে প্রথমে সহকারি ইনজিনিয়ারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ অধ্যবসায় ও কৃতিত্বগুণে চিফ্ ইনজিনিয়ার ও সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সভ্য ছিলেন; সাউথ সুবারবন স্কুলের সহকারি সভাপতি, কলিকাতা ইউনিভারসিটির ফেলো এবং হাওড়া জেলা-বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তাঁহার আদি নিবাস হাওড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুলমৌড়ীর নিকট যুবেশ্বর গ্রামে। তাঁহার চেষ্টায় সেখানে স্কুল স্থাপিত ও অনেক পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল। শেষ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১০০৲ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে ২৭৫০৲ টাকা বেতনে বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করেন। তিনি একজন অতি সজ্জন, অমায়িক, বিনয়ী, নিরহঙ্কার, নির্ব্বিরোধী ও ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন আই-সি-এস্ এক্ষণে গোয়ালিয়রের জেলা জজ্। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া বঙ্গের লাট বাহাদুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সমবেদনা জানাইয়া এক পত্র দিয়াছেন। ভগবান তাঁহার পরিবারবর্গকে তাঁহাদের এই গভীর শোকে শান্তি-বিধান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু, প্রবীণ সাহিত্যিক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর ইহজগতে নাই। বিগত ৭ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। পরলোকগমনকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। এমন স্থিরধী, শান্ত, বিনয়ী, বন্ধুবৎসল সুহৃদের পরলোক-গমনে আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। কিছুদিন হইতে সুধীন্দ্রনাথ নানা অসুখে ভুগিতেছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি কার্সিয়ংসহরে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি না হওয়ায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হন। ইহারই ফলে অকস্মাৎ হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার জীবন শেষ হইয়াছে। সুধীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ, প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন, তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সতীর্থ ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছোট ছোট গল্পগুলি বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার 'মঞ্জুষা' নামক

গল্প-সংগ্রহ পুস্তক যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছিল। এখনও তাঁহার লিখিত 'কাসিমের মুরগী' গল্পের কথা আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত আছে। পরলোকগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উন্নতিকল্পে সুধীন্দ্রনাথ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গ-সাহিত্য একজন শ্রেষ্ঠতম লেখক হারাইলেন। আর আমরা যে কি হারাইলাম তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমরা তাঁহার পুত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ (অধুনা রুষিয়া-প্রবাসী) ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

স্নেহের দাগ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

ঘুরে ঘুরে বুড়ী জীর্ণশীর্ণ,
ভিক্ষা করিয়া খায় ;
'রাজেশ্বরী' এ অদ্ভুত নাম
কি দিয়াছে তারে হায়।
খঞ্জ কুব্জ অতি কুৎসিত
বয়স ষাটের পার,
বুঝিতে পারিনে মদন নামটী
রাখিল কেমনে তার।
সুখের মূর্ত্তি দেখেছিল কি না
জানার উপায় নাই,
"সুখলাল" নাম বাগ্দীর ঘরে
কে রেখেছে তার ভাই।
সদাই দুঃখ অতি জরাতুরা
ছাড়ে না যাহারে ব্যাধি,
তাহার নামটী রাখিয়া গিয়াছে
কোন জন আহ্লাদী ?
নামের সহিত চেহারা মিলায়ে
বসে বসে ভাবি আমি,
চক্ষু ছাপায়ে দরদর ধারে
বারি-ধারা ঝরে নামি।

জনক জননী স্বজনের স্নেহ
শত আদরের কথা,
স্মরাইয়া দেয়, বুকেতে আমার
জাগায় দারুণ ব্যথা।
ভাঙ্গা নৌকার সিঁদুরের দাগে
হেরি উৎসব তার,
বুড়া বকুলের জীর্ণ বেদীতে
পুলক প্রতিষ্ঠার।
মোছা এলুনের লক্ষ্মীর পাঁজে
কমলায় খুঁজি বৃথা
ভগ্ন প্রদীপ স্মরায় আমারে
রজনী দীপান্বিতা।
নামের খেয়াল স্মরি অনুক্ষণ
কভু কাঁদি কভু হাসি,
অন্নাভাবের বেদনা ভুলায়
অন্নপ্রাশন আসি।
দৈন্যের মাঝে নয়নের জলে
গৌরব হেরি নিতি,
'পুরীর' শুষ্ক 'কেয়ার' ঠোঙায়
রথ যাত্রার স্মৃতি।

সাময়িকী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মঙ্গল ব্যবস্থার অন্তর্গত স্বাস্থ্য-পরীক্ষা-শাখার ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পর্য্যবেক্ষণ-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণে একটি আশার বাণী ধ্বনিত হইতে শুনিতেছি। নয় বৎসর ধরিয়া এই পরীক্ষা চলিতেছে। প্রতি ত্রৈবার্ষিক রিপোর্টের তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে, অল্পে অল্পে ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতেছে—ছেলেদের দণ্ডায়মানের ও চলনের ভঙ্গী, বুকের মাপ, দৈর্ঘ্য প্রভৃতির অল্প বিস্তর উন্নতি ঘটিতেছে। আর দেহের ভার প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় যথা পূর্ব্বং তথা পরং আছে—কোন উন্নতি হয় নাই। কতক ছেলের দৃষ্টিশক্তি, দন্ত, চর্ম্ম ও হৃদয়ের অবস্থা ভালই। মোটের উপর রিপোর্ট আশাজনক বলিতে হইবে। অবশ্য এই যে সামান্য উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাকে আরম্ভ মাত্র বলা যাইতে পারে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যদি ছেলেদের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে খর দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে আমাদের ছেলেরাও একদিন অন্যান্য দেশের ছেলেদের সঙ্গে স্বাস্থ্য বিষয়ে সমকক্ষতা করিতে পারিবে।

সাইমন কমিশনের অনুষঙ্গী হিসাবে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য হার্টগ কমিশন নামে যে উপ-কমিশন গঠিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার সার ফিলিপ হার্টগ এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। তদ্ব্যতীত পাঁচজন সদস্য এই কমিশনে ছিলেন; যথা,—(১) বিলাতের শিক্ষা সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সার আমহার্ষ্ট সেলবি বিগ; (২) পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সার সৈয়দ সুলতান আমেদ; (৩) পঞ্চনদের শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ সার জর্জ্জ এণ্ডারসন; (৪) পঞ্চনদের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রাজা সার নরেন্দ্রনাথ; এবং (৫) মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী।

ভারতীয় জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ যে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক এই সত্য দেশবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেক দিন ধরিয়াই উপলব্ধি করিতেছেন। হার্টগ কমিশনও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ধীরে ধীরে ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ভাবে কাজ হইতেছে, কমিশন তাহার অনুমোদন করেন না; কারণ, ইহাতে দেশের নিরক্ষরতা হ্রাস পাইতেছে না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় হইতেছে, তাহা প্রায় বৃথা হইতেছে। পাঠশালায় ছেলেদের অক্ষর পরিচয় হয় বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত পড়িলে তাহারা একটু একটু লিখিতে বা পড়িতে শিখে, ততদূর শিক্ষা তাহারা লাভ করে না। কাজেই তাহারা প্রায় নিরক্ষরই থাকিয়া যায়। হার্টগ কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শিক্ষাদান পদ্ধতির সংশোধন করিয়া ছেলে-মেয়েদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়া দিতে পারিলে অর্থব্যয়ও সার্থক হয়, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। কমিশনের এই সিদ্ধান্ত কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না!

বাঙ্গলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার জন্য একটি আইনের পাণ্ডুলিপি বিরচিত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় প্রাথমিক আলোচনার পর উহা সিলেক্ট-কমিটির হস্তে অর্পিত হয়। প্রকাশ এইরূপ যে, এই সিলেক্ট-কমিটির পঞ্চান্ন জন সদস্য বিলটির আলোচনা করিয়া উহার এমন ভাবে সংশোধন করিয়াছেন যে, বিলটি প্রায় নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথম অবস্থার বিলটিতে সরকারই ছিলেন প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা। সংশোধিত বিলে জনসাধারণকে কতকটা কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার প্রদান করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। অতএব, বিলটি যখন ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনার জন্য উত্থাপিত হইবে, তখন উহা কি ভাবে

গৃহীত হয় তাহা দেখিবার বিষয় বটে। আমাদের মনে হয়, সিলেক্ট-কমিটির সংশোধন অনেকটা ন্যায়ানুমোদিতই হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ভার যে দেশের অধিবাসীদের হাতেই থাকা উচিত, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা না থাকাতেই যত গণ্ডগোলের উৎপত্তি হইতেছে। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া পাশ্চাত্য প্রথানুমোদিত শিক্ষা-প্রণালী এদেশে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শিক্ষার ব্যভিচার ঘটিতেছে। সেইজন্য প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের ভার প্রধানতঃ দেশের লোকের হাতে থাকাই আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

এ দেশে উচ্চ শিক্ষাও যে বৃথা হইতেছে, ইহাও অনেকেরই মত; এবং হার্টগ কমিশনও তাহাই মনে করেন। কোন রূপে কয়টা 'পাশ' করিয়া 'চাকুরী'র যোগাড় করা, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ লাভ করা বর্ত্তমানে উচ্চ শিক্ষা লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য—'প্রকৃত শিক্ষা' লাভ করা উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। কমিশন বলেন, এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। যাহারা সরকারী বা বে-সরকারী চাকুরী করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে তদুপযোগী শিক্ষা দেওয়া হউক; এবং পরীক্ষা করিয়া লোক নির্ব্বাচন করা হউক। আর যথার্থ শিক্ষা লাভ যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করুন। সরকারের সর্ব্বোচ্চ পদগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়া নিযুক্ত করিলেই চলিবে। নব দিল্লী নগরে বিশ্ববিদ্যালয় কনফারেন্সের উদ্বোধন উপলক্ষে বড়লাট লর্ড আরউইন হার্টগ কমিশনের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া কনফারেন্সের উপরই ইহার মীমাংসার ভারার্পণ করিয়াছেন।

এ দেশের স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারের অনগ্রসর অবস্থা দর্শন করিয়া কমিশন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এ দেশের মেয়েরা যা একটু আধটু শিক্ষা লাভ করে তাহা তাহাদের বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃ-গৃহে লব্ধ হয়। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়া তাহারা সংসার-ধর্ম্ম আরম্ভ করে, শিক্ষা লাভের সুযোগ আর বড় একটা পায় না। এক্ষণে সর্দ্দার বিবাহ-আইন পাশ হইয়া যাওয়াতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পিতৃ-গৃহে থাকিতেই হইবে। সুতরাং শিক্ষা লাভের জন্য তাহারা আরও কিছু সময় প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সর্দ্দা আইনের সার্থকতা দেখা যাইতেছে। এ দেশে একই বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকার একত্র শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা নাই দেখিয়া কমিশন বিস্মিত হইয়াছেন; এবং অপর সকল বিষয়ে অনুন্নত আসাম প্রদেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকারা একত্র অধ্যয়ন করে দেখিয়া কমিশন প্রীতি লাভ করিয়াছেন। এ দেশের লোক বালক ও বালিকার একত্র এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের স্বভাবতঃই বিরোধী। আসাম প্রদেশে যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহার কারণ বোধ হয় ইহা নহে যে ঐ প্রদেশের অধিবাসীরা বালক বালিকার একত্র অধ্যয়নের পক্ষপাতী। খুব সম্ভবতঃ ঐ প্রদেশে যথেষ্ট সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় না থাকায়, কিম্বা স্বতন্ত্র বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ না থাকাতেই বাধ্য হইয়া বালক-বালিকার একত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। বালক বালিকার একত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা না থাকা হার্টগ কমিশন হীনতার লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যাহা কিছু বিলাতী তাহাই উন্নতির লক্ষণ, এবং তাহাই এ দেশে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ দেশটিকে সর্ব্বপ্রকারে বিলাতী ছাঁচে ঢালিয়া লইবার দুঃস্বপ্ন যাঁহারা দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা উভয় দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান ও অবস্থার কথা, উভয় দেশের অধিবাসীদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্যের কথা বিবেচনা করিয়া দেখেন না। এবং সেই জন্যই, যে সকল বিলাতী ব্যবস্থা এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা দেশের মাটী, জল-হাওয়া, দেশের লোকের আচার ব্যবহার, মনোভাব প্রভৃতির সহিত খাপ খাইতেছে না। পক্ষান্তরে, কমিশন যে বালক-বালিকার একত্র অধ্যয়নের প্রশংসা করিয়াছেন, সেই ব্যবস্থা বিলাত প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে প্রচলিত থাকাতেও তাহার ফল ভাল হইতেছে না দেখিয়া ঐ সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, এবং বালক ও বালিকার স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন। বিলাতেই যে ব্যবস্থা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, তাহারই আদর্শে এ দেশে কোন অব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

সর্ব্বশেষে কমিশন ভারতবাসীদের শিক্ষার ভার ভারত গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। কারণ, তাহা হইলে সমগ্র ভারতে একই ভাবে একই প্রকার শিক্ষার প্রবর্ত্তন করার সুবিধা হইবে, সমগ্র ভারতবাসী একই প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়া একই ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে পারিবে। এক দিক দিয়া এই প্রস্তাবটি বেশ সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। ভারত গবর্মেণ্টের পরিচালনে সমগ্র ভারতে একই প্রকার শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সমগ্র ভারতবর্ষ যেমন একটি অখণ্ড দেশে পরিণত হইয়াছে, ভারতে "নেশন বিল্ডিং"এর যেমন অনেকটা সুবিধা হইয়াছে, সমগ্র ভারতে একই প্রকার শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে সেই "নেশন বিল্ডিং"-এর কার্য্য আরও অগ্রসর হইতে পারিবে। এক হিসাবে প্রস্তাবটি সুতরাং সঙ্গতই বোধ হইতেছে। কিন্তু ইহার অপর একটা দিকও আছে। সমগ্র ভারতে একই পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করিতে হইলে একমাত্র ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিতে হইবে। অথচ, শিক্ষার বনিয়াদ দৃঢ় করিতে হইলে প্রাদেশিক মাতৃভাষাকেই যে শিক্ষার বাহন করা উচিত, অনেকেই এখন এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। এবং এই মতও অসঙ্গত ও অযথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। এই দুই পরস্পর বিরোধী মতের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে তাহাই বিবেচনার বিষয়। অথচ, তাহা না হইলে শিক্ষা ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যে হইবে না, তাহাতেও কোন ভুল নাই।

ভারতবর্ষের নিকটতম প্রতিবাসী আফগানিস্থান রাজ্যে যে বিপ্লব চলিতেছিল, এতদিনে বোধ হয় তাহাতে যবনিকা-পাত হইতে চলিল। জেনারেল নাদির খাঁ বাচ্চা-ই সাক্কো ওরফে হবিবুল্লাকে পরাজিত করিয়া কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। রাজ্যে এক প্রকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় আফগানিস্থানের অধিকাংশ অধিবাসী নাদির খাঁকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব রাজা হবিবুল্লা সদলবলে আত্ম-সমর্পণ করেন। নাদির খাঁ বিলক্ষণ উদারতা প্রকাশ পূর্ব্বক হবিবুল্লাকে ক্ষমা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হবিবুল্লার প্রাণরক্ষা হয় নাই। কোন কোন অসন্তুষ্ট উপজাতি হবিবুল্লা ও তাঁহার সহচরগণকে নাদির খাঁর সম্পূর্ণ অনভিমতে গুলি করিয়া বধ করিয়াছে। নাদির খাঁ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আফগানিস্থানের অধিবাসীদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে রাজপদ গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া রাজ্য সুশাসনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। দোকান-পাট আবার খুলিতেছে; পথ-ঘাট অনেকটা নিরাপদ হইয়াছে; ব্যবসা-বাণিজ্য ধীরে ধীরে পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে, রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলাও ক্রমে ক্রমে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কোন একটা রাজ্যে বিপ্লব চলিতে থাকিলে তাহার প্রতিবাসী রাজ্যগুলিকেও কিছু উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। আফগানিস্থানের গণ্ডগোলে ভারতবর্ষের অবস্থাও সম্ভবতঃ কতকটা সেইরূপ হইয়াছিল, কারণ, ভারতের অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশ আফগানদিগের সহধর্ম্মী। যাহা হউক, এক্ষণে নাদির খাঁর সুশাসনে আফগানিস্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষ অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিবে। তবে এখনও আফগানিস্থানে ও ভারতবর্ষে অল্প সংখ্যক লোক নাদির খাঁর উপর সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লার পক্ষপাতী। কিন্তু স্বয়ং রাজা আমানুল্লা বিদেশ হইতে তারযোগে নাদির খাঁর সিংহাসন লাভে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং নাদির খাঁর এই মুষ্টিমেয় বিরুদ্ধ দল যে বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

আগামী সরস্বতী পূজার অবকাশে, ১৭ই মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী, রবিবার দক্ষিণ-কলিকাতাবাসিগণের উদ্যোগে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশন হইবে। সাহিত্যিকগণের অভ্যর্থনার জন্য যে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাহার সভাপতি হইয়াছেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি হইবেন বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর শাখা-সম্মেলনগুলির নেতৃত্ব করিবেন যথাক্রমে (১) শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী (সাহিত্য-শাখা), (২) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (দর্শন-শাখা), (৩) কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় (ইতিহাস-শাখা) ও (৪) ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন (বিজ্ঞান-শাখা)।

উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের আহ্বানকারীরা এবার একটু নূতনত্বের সমাবেশের চেষ্টা করিতেছেন। আমরা বহুবার বলিয়াছি যে তিন দিনের জন্য এক স্থানে সমবেত হইয়া ঝড়ের মত বেগে অল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ পাঠ করায়, এবং আরও অসংখ্য প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া ধরিয়া লওয়ায়, সাহিত্য-সম্মেলন প্রহসন মাত্রে পর্য্যবসিত হয়—সম্মেলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না—পঠিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া প্রবন্ধগুলি লোক-লোচনের অগোচর রহিয়া যায়—আর পঠিত ও শ্রুত প্রবন্ধগুলির মর্ম্ম সম্মেলন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিবার পথেই লোকে ভুলিয়া বসে—কচিৎ-কদাচিৎ কোন কোন প্রবন্ধ কোন কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

—

এই একঘেয়ে ও ব্যর্থ সাহিত্য-সেবার বিড়ম্বনার পরিবর্ত্তে ভবানীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন, আমরা তাহার অনুমোদন করিতেছি। তাঁহারা বলিতেছেন যে, সম্মেলনে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইবে, অধিবেশনের সময় তাহার আলোচনা যাহাতে সম্ভবপর হয়, সেই চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সম্মেলনের অধিবেশনের পূর্ব্বেই সম্মেলনে পঠিতব্য প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত-সার মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। তবে অবশ্য প্রবন্ধ-লেখকগণ অভ্যর্থনা-সমিতিকে সাহায্য করিলেই তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। লেখকগণ যদি আগামী পৌষ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রবন্ধ বা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত-সার অভ্যর্থনা-সমিতির নিকটে পাঠাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহারা উহা মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে পত্র ব্যবহার করিতে হইলে ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, এই ঠিকানায় সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ ঘোষ মহাশয়গণের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে হইবে। সম্মেলনের এই প্রচেষ্টা কতদূর সফলতা লাভ করে তাহা দেখিবার বিষয়। সম্মেলন আরও একটি কর্ম্ম করিবেন—তাঁহারা সম্মেলনের সঙ্গে সাহিত্য, ইতিহাস ও কারুশিল্প পরিপোষক একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছেন। বৈচিত্র্যের হিসাবে ইহাও মন্দ হইবে না। ইহার সঙ্গে একদিন সমবেত সকল সাহিত্যিককে লইয়া যদি সামাজিক সম্মেলন, বৈঠকী আলাপ বা মজলিসের মত কিছু করা হয়, তাহা হইলে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ উপস্থিত হইয়া অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে যথার্থ সাহিত্য-"সম্মেলনে" পরিণত হইতে পারে।

—

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বড়লাট আরউইন বিগত ৩১শে অক্টোবর যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ পাঠকগণের গোচরার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন—

আমি অল্পদিন হইল ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি। সে স্থানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সুদীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আমি পাইয়াছিলাম। এ দেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমি সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে ভারতের মনোভাব, উৎকণ্ঠা ও আশা আকাঙ্ক্ষার বিষয় যতদূর সম্ভব অকপটভাবে আমার দেশবাসীকে জ্ঞাপন করা আমি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। আমার সেই প্রতিশ্রুতি পালনে শুধু যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা নহে, উপরন্তু দেশের সমগ্র দল ও ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা আমি লাভ করিয়াছি। তাঁহারা আমার বক্তব্য শ্রবণ করিতে এবং বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

যে সমস্ত বিষয় মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীর ভাবে অভিভূত করে সেইরূপ বিষয় লইয়া নানা সমস্যা এখন উপস্থিত। নানা রাজনৈতিক ব্যাপারেও মানুষের চিত্তবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া আছে। যে সময় রাজনীতিক্ষেত্রে শান্তি বিরাজিত থাকে তখন মানুষের মনে প্রায় ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয় না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সময়োপযোগী এই সমস্ত অশান্তিকর মনোভাবের পশ্চাতেও ভারতবাসীর যে একটি বিরাট জনমত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা মহামান্য সম্রাটের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ। ভারতের জনসাধারণ কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব স্পষ্টতঃ বুঝিতে এবং তাঁহাদিগকে নিজেদের চিত্তবৃত্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য উদ্গ্রীব।

ভারতের ঘটনা-পরম্পরার জন্য কিম্বা সে সমস্তের অর্থ আংশিকভাবে জ্ঞাত থাকায় গ্রেট ব্রিটেনের ব্যক্তিবর্গ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে পারে, কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ভারত এবং

গ্রেট ব্রিটেনের পরস্পরকে বুঝিবার জন্য একটী গুরুতর দায়িত্ব উপস্থিত। পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া সম্পূর্ণ হইলে সমগ্র জগতের উপর ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে। প্রধান মন্ত্রী এবং ভারতসচিবের সহিত আমার আলোচনার সময় ভারতীয় সমস্যার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। দুই বৎসর পূর্ব্বে পার্লামেণ্ট নিযুক্ত কমিশন ভারতীয় চিন্তাধারার ও কার্য্য-পদ্ধতির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সে বিষয়ের আলোচনায় কোন পক্ষেরই বিশেষ কোন লাভ নাই। যাহা বাস্তব ও সত্য বিবেচক ব্যক্তি তাহাই গ্রহণ করেন, যাহা হওয়া উচিত ছিল সে দিকে আর লক্ষ্য করেন না।

সাইমন কমিশন ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সহায়তা লাভ করার পর সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছেন। কমিটির রিপোর্ট পার্লামেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতে শাসনপ্রণালীর কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তাহা বলা অসম্ভব ও অসঙ্গত। প্রত্যেক ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের এ বিষয়ে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার অধিকার অব্যাহত রাখিতে বাধ্য। কিন্তু রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে ব্রিটিশ ভারতের মতামত প্রকাশের পক্ষে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় ভারতে শাসন প্রণালীর উন্নতির বিষয়ে মোটামুটি কি ভাবে আলোচিত হইতে পারে ভারতে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়াছে।

আট মাস পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলাম। আমি তাহার দু একটী কথা এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক পক্ষে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে ও বিবেচনামূলক মতামত প্রকাশ করিবার পার্লামেণ্টের অধিকার সম্বন্ধে অস্বীকার করা ভারতের পক্ষে যেরূপ লাভজনক নহে—অন্ততঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে যাহা সম্মতি লাভ করিতে পারে, সেইরূপ সমাধান চেষ্টার গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ করাও পার্লামেণ্টের পক্ষে অসঙ্গত।

রাজনীতি ক্ষেত্রের কার্য্যপ্রণালীর মূল ও অনুসরণীয় নীতি ত্যাগ করা প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথার্থ অন্তরায়।

কমিশনের সভাপতি সার জন সাইমন প্রধান মন্ত্রীর সহিত পত্র ব্যবহারে উল্লেখ করিয়াছেন যে ভারতে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সময় তিনি এবং তাঁহার সহযোগিগণ ভারতের শাসন-বিধির ভবিষ্যৎ উন্নতির গতির বিষয় চিন্তা করিতে যাইয়া ভবিষ্যতে ব্রিটিশ ভারত এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত সে বিষয়টীও স্মরণ রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে বৃহত্তর ভারতের এই দুই প্রধান অংশের কিরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া দরকার সে বিষয়েরও যথাযথ ভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

তিনি আরও বলেন যে কমিশনের রিপোর্টে ও গবর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে পরে যেরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন তাহাতে যদি এই দূরদৃষ্টি রক্ষিত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানে যেরূপ কার্য্য-প্রণালীর প্রস্তাব করা হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা সংশোধন করার প্রয়োজন হইতে পারে। তিনি পরামর্শ দেন যে সাইমন কমিশন এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটীর রিপোর্ট প্রদত্ত, বিবেচিত এবং প্রকাশিত হইবার পর এবং তৎসম্বন্ধে সম্মিলিত পার্লামেণ্ট নিযুক্ত কমিটীর কার্য্য-কালের পূর্ব্বে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন তাহাতে যতদূর সম্ভব ঐক্য বিধানকল্পে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গের সহিত রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনার কথা ইতঃপূর্ব্বে ১৯২৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারীতে সার জন সাইমনের আমার নিকট [ ] পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি পার্লামেণ্টে বিলরূপে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে উপরিউক্তরূপে বিবেচিত হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহাদিগের প্রস্তাবিত এইরূপ একটী সম্মেলন হওয়া প্রয়োজন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কমিশনের এই অভিমতগুলির সহিত সম্পূর্ণ একমত। ব্রিটিশ ভারতের উন্নতিবিধায়ক সমস্যা-গুলির সমাধান করিতে তাঁহারা যেরূপ ব্যগ্র ব্রিটিশ ভারতের সহিত ভারতীয় রাজন্যবর্গের সম্পর্কিত সমস্যাগুলির গুরুত্বও তাঁহারা সম্যক উপলব্ধি করেন। এই উভয়ের সামঞ্জস্য-বিধানই তাঁহারা তাঁহাদের ভারতে মূলনীতি প্রবর্ত্তনের জন্য আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন।

১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসের ঘোষণায় ব্রিটিশ নীতির যে শেষ উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে ভারত যাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অংশরূপে ক্রমশঃ স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থার কথা বর্ণনা আছে। আমি সম্প্রতি বলিয়াছি আমি যাঁহার নিকট হইতে মহামান্য সম্রাটের আদেশ প্রাপ্ত হই তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে ১৯১৯ সালে পার্লামেণ্ট যে কার্য্য পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়াছিল, তাহা দ্বারাই ব্রিটিশ ভারত উপনিবেশ সমূহের মধ্যে তাহার যোগ্য স্থান অর্জ্জন করিতে পারে ইহাই তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিগণও একাধিকবার প্রকাশ্যভাবে সাধারণের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ উপনিবেশসমূহের সমান অংশীদাররূপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যমধ্যে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিবে ইহাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যথার্থ অভিপ্রায়। ১৯১৯ সালের ঘোষণার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে গ্রেটব্রিটেনে এবং ভারতে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমি ইহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি যে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণায় ভারতের শাসন প্রণালীর যে স্বাভাবিক উন্নতির চরম অবস্থার কথার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বই আর কিছুই নহে।

এই সিদ্ধান্তগুলি পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ভারতীয় রাজন্যবর্গের ইহাতে প্রকৃত স্থান লাভের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমরা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইলেও সর্ব্বথা ইহা বাঞ্ছনীয় যে বর্ত্তমানে যাহা করা হইবে শেষ উদ্দেশ্যের সহিত যেন তাহার সামঞ্জস্য থাকে।

সুতরাং কমিশন ও কেন্দ্রীয় কমিটীর রিপোর্ট প্রদত্ত, প্রকাশিত এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিবার পর তাঁহারা ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় এবং ভারতের রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদিগকে পৃথক অথবা সম্মিলিত ভাবে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করিবেন। তাঁহাদের লইয়া যে সম্মেলন হইবে তাহাতে ব্রিটিশ ভারতের এবং নিখিল ভারতের সমস্যাসমূহের বিষয় আলোচিত হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে এই উপায়ে পরে এই সমস্ত গুরুতর বিষয় সম্পর্কে নানা প্রস্তাব পার্লামেণ্ট সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং ইহাতে অধিক সংখ্যক লোকের সম্মতি পাওয়া যাইতে পারিবে।

এ কথা আমার পক্ষে বলা নিষ্প্রয়োজন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এইরূপ কার্য্য দ্বারা ভারতের বিভিন্ন দলের ব্যক্তিবর্গ একমত হইতে পারিবেন বলিয়া আমার খুব বিশ্বাস। আমার আরও বিশ্বাস যে ভারতের মঙ্গলকামী যে যেখানে থাকুন এবং যেই হউন না কেন, তাঁহারা ভারত এবং ব্রিটেনের সম্বন্ধের মধ্যে যে সংশয়জাল বর্ত্তমান তাহা ছেদন করিয়া বাহির হইবার বাসনা করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বর্ত্তমানে যে কার্য্যপদ্ধতির প্রস্তাব করা হইতেছে, তাহা ভারতীয় রাষ্ট্রশরীরকে নিরাময় ও সুস্থ করিবার অকপট বাসনা হইতে প্রসূত এবং এই উপায়ে গঠনমূলক রাষ্ট্রনীতি দ্বারা এই সমস্ত গুরুতর সমস্যাগুলিতে হস্তক্ষেপ করিয়া আমরা সাফল্য লাভ করিতে পারিব।

এই ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর দিল্লীতে ভারতের স্বদেশী নেতৃবৃন্দের একটী আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। মহাত্মা গান্ধীও সেই সভায় উপস্থিত হন। মহাত্মা কয়টী সর্ত্তে গোল টেবিল বৈঠকের সমর্থন করিবার প্রস্তাব করেন। অনেক বাদানুবাদ ও আলোচনার পর নেতৃবর্গ যে বর্ণনা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাঁহারা বলিয়াছেন—

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারিগণ বিশেষ যত্নসহকারে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ স্থান নির্দ্দেশের সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুরের ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়াছি। ঘোষণায় সারল্য এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় জনসাধারণের অভিমতের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টার বিষয় আমরা উপলব্ধি করিতেছি। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের আবশ্যক অনুযায়ী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে যে চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাহাতে সহযোগিতা করিতে পারিব বলিয়া আশা করি। তবে দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাস ও সহযোগিতা অর্জ্জন করি-বার জন্য কয়েকটি কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি।

সকলে যাহাতে মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারেন

এজন্য একটী সাধারণ মিলন-নীতির প্রবর্ত্তন আবশ্যক; রাজনৈতিক বন্দিগণকে মুক্তি প্রদান প্রয়োজন, প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে জনসাধারণের প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ভারতের কংগ্রেস সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত বলিয়া তাহা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বড়লাট বাহাদুর যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইহা এইরূপ বুঝিতেছি যে, কবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক হইবে না কিন্তু ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালীর কার্য্যপদ্ধতি রচিত করিবার জন্যই সম্মেলনের বৈঠক হইবে। আমরা আশা করি যে, বড়লাট বাহাদুরের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় যে আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমরা ভুল করিতেছি না।

যে পর্য্যন্ত না নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় সে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অধিকতর উদার নীতির অনুসরণ করা আবশ্যক। প্রস্তাবিত সম্মেলনের উদ্দেশ্যে শাসন ও ব্যবস্থা ।০৩।গের মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্য স্থাপন এবং বিধিসঙ্গত উপায় ও কার্য্য-প্রণালীর উপর অধিকতর সম্মান প্রদর্শন প্রয়োজন।

জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া দরকার যে আজ হইতে দেশে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে—নূতন শাসন বিধান কেবল মাত্র তাহার নিদর্শনরূপে কার্য্য করিবে। সম্মেলনের সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইহার সাফল্যের জন্য আমরা মনে করি যে, যত শীঘ্র সম্ভব উহা আহ্বান করা প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত নেতৃবর্গ ইহাতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন—

মিঃ গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল, স্যার তেজ বাহাদুর, ডাঃ এনিবেসান্ত, ডাঃ আন্সারী, সরোজিনী নাইডু, ডাঃ মুঞ্জে, মিঃ এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, মিঃ শেরওয়ানী, মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত, মিঃ এনি, ডাঃ বি, সি, রায়, মিঃ ভি, জে, প্যাটেল, মিঃ সৈয়দ মহম্মদ, মিঃ জগৎ নারায়ণ মল, মিঃ খলিলুল জমান, মিঃ সর্দ্দার সিং, সার আবদার রহিম, মামুদাবাদের রাজা, সার আলি ইমাম, মৌলানা আবুল কাশেম আজাদ, মিঃ বিজয়রাঘব আচারিয়া প্রভৃতি; এবং আরও ২৭ জন ভারত নেতা ইহাতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের ঘোষণাপত্র এবং ভারতীয় নেতৃগণের মন্তব্য প্রদত্ত হইল। যাঁহারা এই মন্তব্যপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নাম নাই; তিনি এই ঘোষণাপত্রকে কোনরূপ প্রাধান্য দিতে সমর্থ নহেন; বাঙ্গালী নেতৃগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। আর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই ঘোষণাবাণীর পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। নেতৃগণ যে সকল সর্ত্তে গোল টেবিল সমর্থন করিয়াছেন, সে সকল সর্ত্ত গৃহীত হইবে কি না বলা যায় না; না হইবারই কথা, কারণ বড়লাটের ঘোষণা প্রচারিত হইবার পরই বিলাতের যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহারা যে সকল অভিমত প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র শাসন যে এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইবে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে এমন কার্য্য করিবেন, তাহার সম্ভাবনা অতি কম। একজন ত খুলিয়াই বলিয়াছেন, যাঁহারা জাত-ভাই ভগিনী, তাঁহাদের দেশেই ঐ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, অন্যত্র নহে—নহে—নহে। আমরা ভাবিতেছি এই কথা যে, সাইমন কমিসনের রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বে সাত-তাড়াতাড়ি এই ঘোষণা প্রচারের উদ্দেশ্য কি? এখন ত ইহার কোন প্রয়োজনই ছিল না। তবে একটা কথা আছে এই যে, এ দেশের অনেক দল কমিশন বর্জ্জন করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এ দেশী নেতৃগণকে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রীয় সমস্যা আলোচনার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন। কিন্তু, এই গোল টেবিলে যোগ দিবার জন্য কোন্ ভাগ্যবানদিগকে আহ্বান করা হইবে, তাহা জানিতে পারা যাইতেছে না। আমাদের নেতৃগণ বলিয়াছেন যে, তাঁহাদেরই সংখ্যাধিক্য চাই। সে কথাও গ্রাহ্য হইবে কি না, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ বিলক্ষণ আছে। এই রকম নানা কথা ভাবিয়া, নানা ঘোষণা-বাণীর ইতিহাস স্মরণ করিয়া আমরা এই ঘোষণা-বাণীতে এখনই উল্লসিত হইবার কোন কারণই দেখিতেছি না এবং নেতৃবৃন্দের এই মন্তব্য প্রকাশেরও কোন সার্থকতা উপলব্ধ হইতেছে না। ঔপনিবেশিক শাসন-প্রণালী ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের পর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হইবে বলিয়া মহাত্মা গান্ধী যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার গতি কি হইবে? নেতৃগণ বলিবেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ত ঔপনিবেশিক শাসন প্রণালী দিবার প্রতিশ্রুতিই দিলেন। তবে আর কি? সুতরাং আমরা সবই পাইয়া গেলাম; কিন্তু এই পাওয়াটা যে কবে হইবে, তাহা যেমন সাত হাত জলের নীচে পড়িয়া ছিল, তাহাই থাকিল। আমরা ত ঘোষণা-বাণীর এইটুকুই অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম।

বরিশালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা, সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন ও তাঁহার সহকর্ম্মী আরও কয়েকটী যুবক ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১০ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে জামিন দিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা কারাগারে আবদ্ধ হন। কারাগারে অবস্থান সময়ে

সতীন্দ্রনাথ অনশন-ব্রত গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ কাল অনশনে থাকায় সতীন্দ্রনাথের অবস্থা অতীব শঙ্কটজনক হয়, এমন কি তিনি এমন অবস্থায় উপনীত হন যে, যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার পরলোক গমনের সম্ভাবনা হয়। অবশেষে অনেকের অনুরোধে তিনি অনশন-ব্রত ত্যাগ করেন। এদিকে বরিশালে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতে থাকে। অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের পর আসামী-পক্ষের আবেদন অনুসারে হাইকোর্ট উক্ত মোকদ্দমার বিচারভার কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে সমর্পণ করেন। বিগত ২৮শে অক্টোবর প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবর্গ উক্ত মোকদ্দমার বিচার শেষ করিয়াছেন। আসামী-দিগের প্রতি দণ্ডাদেশ এইরূপ—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনকে তিন বৎসর সৎ ভাবে থাকিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকার মুচলেকা ও পাঁচ হাজার টাকার জামিন দিতে হইবে, অন্যথায় তাঁহাকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অন্যান্য আসামীদিগকেও জামিন মুচলেকা দিতে হইবে, অন্যথায় সতীন্দ্র সেনের অপেক্ষা কম দিনের জন্য কারাগারে গমন করিতে হইবে। ইতঃপূর্ব্বে সতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত ধারার বিধানমত মোকদ্দমা আরম্ভ করা হইয়াছিল; কিন্তু পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ ও অন্যান্য গোলযোগ আপোষে নিষ্পত্তি হয় এবং সতীন্দ্রনাথও বিগত জুলাই মাসে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করেন। তাহার কিছুদিন পরেই রমেশ চট্টোপাধ্যায় নামক একটী ষোল বৎসরের ছেলে বরিশালের পুলিশ সবইন্স্পেক্টর যতীশচন্দ্র ঘোষের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়। বরিশালে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়; হাইকোর্ট সেই দণ্ড রদ করিয়া বালকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ প্রদান করেন। ইহার পরেই সতীন্দ্রনাথকে পুনরায় ঐ ১১০ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়। সরকার পক্ষ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, ঐ হত্যাকাণ্ডের সহিত এবং অন্যান্য অশান্তিজনক ঘটনার সহিত সতীন্দ্রনাথের বিশেষ সম্বন্ধ আছে; তাঁহারই প্ররোচনায় এই সকল অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না পাইলেও সতীন্দ্রনাথ যে একজন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি এবং সর্ব্বদা আইন-ভঙ্গকারী বদ্‌লোক, বিচারক মহোদয়ের এই ধারণা জন্মে; তাহারই ফলে এই কঠোর দণ্ডাদেশ। আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, সতীন্দ্রনাথ বরিশালের বর্ত্তমান সময়ে নেতা, তাঁহার আদেশ সকলে মান্য করে, এই তাঁহার প্রধান অপরাধ। এ অপরাধ যে আইনের চক্ষে গুরুতর, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই অপরাধেই দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্তকে স্বদেশী আমলে অন্তরীণে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। সতীন্দ্রনাথকে আমরা বিশেষ ভাবেই জানি। তিনি যে আইন-বিরুদ্ধ কোন কাজে যোগদান করিতে পারেন,—হত্যাকাণ্ডের প্ররোচক হওয়া ত বহু দূরের কথা,—এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে। স্বদেশ-হিত-ব্রত সতীন্দ্রনাথ স্বদেশ-সেবারূপ মহা অপরাধের জন্য কারাগারে যান, ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই; কিন্তু তিনি যে অন্যায় ও অত্যাচারের প্রশ্রয়-দাতা, হত্যাকাণ্ডের প্ররোচক, এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিব না।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-বিবরণ ১ম খণ্ড—২॥•
ঐ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-বিবরণ ২য় খণ্ড—২॥•
শ্রীসার যদুনাথ সরকার প্রণীত "শিবাজী"—২।•
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী সিরিজের "পেশাদারী প্রতিহিংসা" ও "রাজার সাক্ষী" প্রত্যেক—৸•
রজনীকান্ত সেন প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "শেষ দান"—১।•
শ্রীরেবতীমোহন বর্ম্মণ প্রণীত "তরুণ রুশ"—১৲
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-পুস্তক "বরদা ডাক্তার"—১৲
এস্ জি মজুমদার প্রণীত উপন্যাস "সুলোচনা"—২৲
শ্রীবিমলেন্দু চৌধুরী প্রণীত "মহারাজ নন্দকুমার"—৸•
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "বিজয়া"—১৲
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "ত্রিপুরারি"—১॥•
শ্রীরামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত নাটক "কর্ণ-দিগ্বিজয়"—১॥•
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত নাটক "সমুদ্র গুপ্ত"—১।•
শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত নাটক "সুনন্দা"—১।•
শ্রীকনকতারা ঘোষ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "রেখা"—৸•
শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত "ডিগ্‌বাজী খাঁ"—৸•
শ্রীপ্রভাংশুকুমার গুপ্ত প্রণীত "চীনের বিনুনী"—॥•
শ্রীসুনির্ম্মল বসু ও শ্রীসুবিমল বসু প্রণীত "সরগরম"—।৵•

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

সপ্তদশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—